দেশ
শোকের সেই মহররম
গৌরকিশোর ঘোষ □ হোসেনুর রহমান
আবুল বাশার □ বাহারউদ্দিন
জয়ন্ত বসু

সত্যজিৎ রায়ের
গোয়েন্দা ফেলুদার অসামান্য কাহিনী
দার্জিলিং জমজমাট
দাম ১২·০০

ভৌগোলিক অনন্যতায় ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যময়তায় যে-ভূখণ্ড ফেলুদার অন্যতম প্রিয়, যে-শৈলশহরে তাঁর গোয়েন্দাগিরির হাতেখড়ি, সেই দার্জিলিঙের পটভূমিকাতেই এক অসামান্য জমজমাট কাহিনী উপহার দিয়েছেন ফেলুদার স্রষ্টা।
বোম্বাইয়ের বোম্বেটে থেকে সেবার হিন্দি ছবি করছিলেন যে-তরুণ চিত্রপরিচালক, তাঁরই নতুন ছবির শুটিং দার্জিলিঙে। এ-কাহিনীও জটায়ুর। জটায়ুর সঙ্গে ফেলুদা-তোপ্‌সেকেও সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পরিচালক। সেই সূত্রেই ফেলুদার দার্জিলিঙে পদার্পণ। আর কী অদ্ভুত ভাগ্যের ফের, সেবারের মতো এবারও ফেলুদাকে নামতে হল গোয়েন্দার ভূমিকায়।
যাঁর বাড়িতে শুটিং, খুন হলেন সেই বৃদ্ধ গৃহকর্তা। অতীব কৌতূহলকর চরিত্রের বৃদ্ধ। দিনে ঘুমোন, রাত্রে জেগে থাকেন। খবরের কাগজ থেকে যাবতীয় গরম খবরের কাটিং জমান খাতায়। কে খুন করল তাঁকে? কেনই-বা এই খুন?
বৃদ্ধের অতীত জীবনের অধ্যায় ঘেঁটে কীভাবে ফেলুদা উদ্ধার করলেন নানান চমকপ্রদ সূত্র আর কীভাবে তার সাহায্যে ছাড়ালেন সমুদয় রহস্যের জট, তাই নিয়েই এই দুর্ধর্ষ উপন্যাস। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সত্যজিৎ রায়।

শেখর বসুর
কালজয়ী কাহিনী-সংকলন
বারোটি কিশোর-ক্লাসিক
দাম ২০·০০

গত চারশ বছর সময়কালের মধ্যে যত বিদেশী ক্লাসিক বেরিয়েছে, তার মধ্য থেকে প্রধান বারোটিকে এই আশ্চর্য গ্রন্থে বেছে নিয়েছেন শেখর বসু। ঝরঝরে গতিময় বাংলায় ছোটদের মনের মতো করে শুনিয়েছেন সেই এক ডজন ক্লাসিকের গল্প। যুগোত্তীর্ণ এই কাহিনীগুচ্ছে রয়েছে রবিনশন ক্রুশো, গালিভারস ট্রাভেলস, ডন কুইকসোটের গল্প, ট্রেজার আইল্যাণ্ড, আংকল টমস কেবিন, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স জাতীয় বিখ্যাত বারটি উপন্যাস।
নিছক ভাষান্তর নয়, পৃথিবীবিখ্যাত এই গ্রন্থগুলির মূল মেজাজ ও সৌন্দর্যের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন শেখর বসু তাঁর এই পরিশ্রমী ও অন্তরঙ্গ সাহিত্যকর্মে। সেইসঙ্গে যুক্ত করেছেন লেখক-লেখিকাদের সচিত্র জীবনী, প্রতি গল্পের প্রেক্ষাপটের কথা এবং কিশোর- ক্লাসিক তথা অনুবাদ-সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তর দুর্লভ তথ্যে সমৃদ্ধ সুদীর্ঘ, সজীব একটি আলোচনা।
লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ : অন্যরকম ১০·০০ মাঝখান থেকে ১০·০০ নেতাজীর সহধর্মিণী ১০·০০ সাত বিলিতি ছেড়ে গেল ৮·০০

মীরা বালসুব্রমানিয়ামের
প্রবলেম সলভার
পুল্লা রেড্ডি
দাম ১০·০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
ভয়ের মুখোশ
দাম ১০·০০
সীমানা ছাড়িয়ে
দাম ৬·০০
কবন্ধবিগ্রহের কাহিনী
দাম ১২·০০

সত্যেন্দ্র আচার্যের
কোপাইকুণ্ডার কাপালিক
দাম ১০·০০

সুভদ্রকুমার সেনের
পোড়ো বাড়ির রহস্য
দাম ৮·০০

অশেষ চট্টোপাধ্যায়ের
চেনাশোনার বাইরে
দাম ১২·০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের
বলে গেছেন রামশন্না
দাম ১৬·০০

শৈবাল মিত্রের
ঋষিশৃঙ্গের সেই রাত
দাম ১০·০০

দিব্যেন্দু পালিতের
ইয়াসিন ইয়াসিন
দাম ১৫·০০

মতি নন্দীর
কলাবতী
দাম ১২·০০
এস্পিয়ারিং
দাম ১০·০০
অপরাজিত আনন্দ
দাম ১২·০০

বুদ্ধদেব গুহর
রুআহা
দাম ২০·০০
অ্যালবিনো
দাম ১০·০০
বাঘের মাংস এবং অন্য শিকার
দাম ১৫·০০

আনন্দ বাগচীর
মৃত্যুর টিকিট
দাম ১০·০০

আশা দেবীর
আসল টেনিদা
দাম ১০·০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
শুরুর থেকে শুরু
দাম ১০·০০

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের
রুকুসুকু
দাম ১০·০০
কলকাতার নিশাচর
দাম ১০·০০
ইতি পলাশ
দাম ১৪·০০

প্রকাশিত হচ্ছে
সুদীপ্তা সেনগুপ্তর
দক্ষিণ মেরু অভিযানের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা
আণ্টার্কটিকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
অবিস্মরণীয় উপন্যাস
দূরবীন
দাম ৬০·০০

'দূরবীন' শুধু দূরকেই কাছে আনে না, উল্টো করে ধরলে কাছের জিনিসকেও দূরে দেখায়। সেকাল-একাল অতীত-বর্তমান অনন্য কৌশলে একাকার এই উপন্যাসে। চলমান শতকের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের যাবতীয় পরিবর্তন তিন প্রজন্মের অসামান্য কাহিনীর মধ্য দিয়ে উদ্‌ঘাটিত।

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
দুই স্তর কাহিনী
আশ্চর্য ভ্রমণ
দাম ১০·০০

এক স্তরে দুরন্ত কাহিনী, অন্য স্তরে জীবনের অনন্য ভাষ্য। এ-উপন্যাসের নায়ক ইন্দ্রজিৎ নামের ছত্রিশ বছরের এক যুবক, যার আশ্চর্য ভ্রমণ কেবলই পশ্চাৎ-স্মৃতিকে উজ্জ্বলতর করে ফিরিয়ে আনে চোখের সামনে। অথচ সামনের দিকেও অপেক্ষা করে থাকে এক মেয়ে। এই বিপরীতমুখী ভ্রমণ-প্রয়াসের দুর্বার কাহিনী 'আশ্চর্য ভ্রমণ'।

প্রকাশিত হয়েছে
সমীর মুখোপাধ্যায়ের
সিদ্ধ উপন্যাস
আবালসিদ্ধির মোড়
দাম ১৪·০০

লোকে বলে, 'সিদ্ধিব্যাটা'। অর্থাৎ বাক্‌সিদ্ধ। যাকে যা বলেন, তাই ফলে যায়। এর চাকরি, ওর পদোন্নতি, তার ব্যবসা। ক্রমশ রটতে থাকে খ্যাতি। এ-তল্লাট থেকে-ও-তল্লাট, এ-পাড়া থেকে সে-পাড়া, গ্রাম থেকে শহরে। হুড়মুড়িয়ে বাড়তে থাকে ভক্তদের ভিড়। সবাই চান 'বাবা'র দর্শন, সমস্যায় সান্ত্বনা। কিন্তু যাঁকে ঘিরে এই আয়োজন, সেই 'সিদ্ধিব্যাটা' কি বস্তুতই অলৌকিক কোনও অবতার? নাকি তাঁরও এই খোলসের নীচে রয়েছে দুঃখ-সুখ-স্বপ্ন-কামনায় ভরা এক সাধারণ হৃদয়, রক্তাক্ত এক লৌকিক জীবন, যা তাঁকে করেছে ঘর-ছাড়া? ঠেলে দিয়েছে পথে-পথে, সত্যের সন্ধানে?
সেই প্রশ্নের উত্তর এই উপন্যাসে। সত্যের মুখ যেখানে ভক্তির আতিশয্যে আড়াল, সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে দুর্লভ দক্ষতায় তরুণ ঔপন্যাসিক সমীর মুখোপাধ্যায় শুনিয়েছেন 'সিদ্ধিব্যাটা' ওরফে মল্লিনাথের তীব্র কৌতূহলকর এক জীবনকাহিনী; উন্মোচিত করেছেন এক জীবনদর্শন, যা পৌঁছে দেয় আরও বড় এক সত্যে। প্রচ্ছদ : সুনীল শীল

ট্রামের জন্য ভাবনা

১১ জুলাই সংখ্যায় গৌতম গুপ্তের 'ট্রাম-পুরাণ' নিবন্ধটি পড়ে দীর্ঘদিনের ট্রাম-অনুরাগী হিসেবে প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা না করলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া হয়। শ্রীগুপ্তের বক্তব্যের সঙ্গে সার্বিকভাবে একমত হলেও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কিছু সংযোজন, ত্রুটি সংশোধন ও ট্রামকে আরো জনপ্রিয় ও যুগোপযোগী করে তুলতে নির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব রাখছি। উপযুক্ত মহলে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলে কলকাতাবাসীরা তাঁদের এই হৃত সাম্রাজ্য নতুন করে ফিরে পেতে পারেন। প্রথমেই ট্রামকে একটি পরিচ্ছন্ন যানবাহন হিসেবে শনাক্ত করতে হবে। এর অন্য কোন সংজ্ঞা দিলে চলবে না। একথা একটি শিশুও জানে, ট্রাম সস্তা, নিরাপদ ও দূষণমুক্ত। কেবলমাত্র বৃদ্ধ খোকারাই বুঝতে চান না ট্রাম একটি দ্রুতগতির যানবাহন, যদি তার চলার জন্যে সংরক্ষিত পথ থাকে।

শ্রীগুপ্তের লেখাটি পড়ে অনেকের মনে এরকম একটা ধারণা হতে পারে যে পৃথিবী থেকে ট্রাম প্রায় অবলুপ্তির পথে এবং ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম নেই। কলকাতায় এটি প্রায় ফসিল। কিন্তু প্রকৃত চিত্র এতটা হতাশাব্যঞ্জক নয়। এই পত্রলেখকের পশ্চিম ইউরোপের বহু বড় বড় শহরে প্রচুর ট্রাম চড়ার বিশদ অভিজ্ঞতা রয়েছে। ঐসব দেশে অন্যতম দ্রুতগতির যানবাহন হিসেবে ট্রামের বিশেষ সমাদর রয়েছে এবং সুদূর ভবিষ্যতেও ট্রাম উঠিয়ে দেবার কোন পরিকল্পনা নেই সেই সব স্বপ্নিল দেশে। এমনকি খোদ নিউ ইয়র্ক শহরেও সদম্ভে প্রতিনিয়ত ট্রাম চলাচল করছে—যদিও তা ভূগর্ভে পাতাল রেলের বড় বড় টার্মিনাল স্টেশনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার জন্যেই। পার্থক্যের মধ্যে শুধুমাত্র ট্রামের পরিবর্তে এগুলির নাম রাখা হয়েছে 'লাইট রেল'। যেহেতু ট্রাম ও লাইট রেলগুলির মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে কারিগরি দক্ষতার। তাই সাধারণ যাত্রীদের কাছে এই দুটি শব্দ সমার্থক। পৃথিবীতে যত শহরে ট্রাম চড়েছি, তার মধ্যে আমস্টারডামের ট্রাম সবচেয়ে সুন্দর। আয়তনে ও রঙের বাহারে এটি অনেক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকেও অনায়াসে হারিয়ে দিতে পারে।

শ্রীগুপ্তের নিবন্ধের সঙ্গে নীলরতন মাইতি অঙ্কিত কলকাতার ট্রাম লাইনের একটি মানচিত্র ছাপা হয়েছে। মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে—বাগবাজার লুপের কাছ থেকে বেলগাছিয়া রোডকে ছেদ করে একটি ট্রাম লাইন মূল রেল লাইনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এটি একটি ছাপার ভুল। এতদঞ্চলে ঐরূপ কোন ট্রাম লাইন নেই। তাছাড়া ডার্বিশায়ারের ট্রামওয়ে মিউজিয়ামের যে দোতলা বাসের ছবিটি মুদ্রিত হয়েছে, ওটি সম্ভবত একটি দোতলা ট্রামের ছবি। বিদ্যুৎচালিত যে ট্রলি-বাস বিদেশের রাস্তায় চলে। তা কোন অর্থেই ট্রাম নয়। কেননা তা নির্দিষ্ট লাইনের ওপর চলে না, পাকা রাস্তা দিয়েই অনায়াসে চলতে সক্ষম। অথচ এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে গাড়িটি নির্দিষ্ট দুটি লাইনের ওপর গড়াচ্ছে। আরো কয়েকটি আংশিক সত্য রয়েছে শ্রীগুপ্তের লেখায়। হাওড়া শহর থেকে প্রকৃত অর্থে ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়নি, কেননা আজও কলকাতার ট্রামগুলো হাওড়া স্টেশন অব্দি যাতায়াত করে। যদিও শহরের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত সেগুলি আর পৌঁছয় না। তবে পুরোনো ট্রাম লাইন শুধুমাত্র হাওড়ার রাস্তার নিচে সমাধিস্থ করে রাখা হয়েছে তা নয়। কলকাতার স্ট্যাণ্ড রোডের উত্তরভাগে যে ট্রামলাইন পাতা ছিল, ঐ রাস্তায় ট্রাম চলাচল বন্ধ হওয়ায় সেগুলিও কংক্রিটের রাস্তার নিচে অবিকৃত অবস্থায় বসানো আছে। আসলে এটি নিছক একটি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত। ট্রাম লাইন তুলে ফেলতে যত খরচ পড়ে, তার থেকে অনেক কম খরচায় সেগুলিকে তলায় রেখে উপর দিয়ে রাস্তা বানানো যায়।

উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় ট্রাম চলাচল সুষম করতে গেলে অবিলম্বে কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। শ্রীগুপ্ত যে কটি প্রস্তাব রেখেছেন তার ওপর আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা আছে। ট্রামের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির প্রাথমিক সোপান হচ্ছে নতুন নতুন রুট চালু করা। দুটি ভাবে এই নতুন রুট চালু করা যায়। এক, এখনও যে সব গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ট্রাম লাইন বসেনি অথচ যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে, উপযুক্ত সমীক্ষার মাধ্যমে সেগুলিকে চিহ্নিত করে সেখানে নতুন লাইন বসানো। দুই, যেখানে যেখানে ট্রাম লাইন বসানো আছে অথচ যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও নতুন রুট চালু হয়নি, অবিলম্বে সেই রুটগুলি চালু করার ব্যবস্থা করা। দুঃখের বিষয় এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই অধিকতর সুবিধাজনক হওয়া সত্ত্বেও কলকাতা ট্রামের কর্তৃপক্ষেরা কি এক রহস্যময় কারণে এনিয়ে একটুও ভাবনা চিন্তা করছেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে শ্যামবাজার গালিফ স্ট্রীট থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড বরাবর শেয়ালদা-পার্কসার্কাস হয়ে গড়িয়াহাট অবদি সুন্দর প্রশস্ত ট্রাম লাইন অনাদি অনন্তকাল ধরে পড়ে আছে, অথচ এই লাইনে নতুন রুট চালু করার কোন পরিকল্পনা ট্রাম কর্তৃপক্ষের নেই। অন্যতম উদাহরণ হিসেবে বিধাননগর থেকে হাওড়া স্টেশন, বেলগাছিয়া থেকে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, শ্যামবাজার থেকে মানিকতলা হয়ে হাওড়া স্টেশন, বিধাননগর থেকে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ম কিংবা উত্তর কলকাতা থেকে খিদিরপুর প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও দূরত্বের দিক থেকে দেখতে গেলে এর থেকে অনেক বেশি পথ রোজ ট্রামকে পাড়ি দিতে হয় বেহালা হাওড়া স্টেশন রুটে।

নতুন ট্রাম লাইন পাততে গেলে শুধুমাত্র সেই সব অঞ্চলেই পাততে হবে যেখানে সংরক্ষিত পথ পাওয়া যাবে। এই নিয়ম অনুযায়ী পার্ক সার্কাস থেকে সুন্দরীমোহন এভিনিউ হয়ে মৌলালী, বেলেঘাটা ফুলবাগান থেকে ভি আই পি রোড বরাবর দমদম এয়ারপোর্ট, টালিগঞ্জ থেকে আনোয়ার শাহ রোড বরাবর যাদবপুর এবং অতি অবশ্যই সল্ট লেকের অভ্যন্তরে ট্রাম চালানো উচিত—তা বিধাননগরের অধিবাসীদের প্রভাবশালী অংশের যত বড় আপত্তিই থাকুক না কেন। এই অঞ্চল ট্রাম চলাচলের পক্ষে অতি সুগম ও দূষণমুক্ত। বিশেষ করে সল্ট লেকের অনেক অভ্যন্তরে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের স্বার্থেই এ প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ ছাড়া পূর্ব কলকাতার সঙ্গে পশ্চিম কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল। ফুলবাগান থেকে শ্যামবাজার-শোভাবাজার মাত্র ২/৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে দুবার বাস পাল্টাতে হয়। বিধাননগর রোড স্টেশনের ব্রিজের সংস্কার করে ছোট্ট একটি ট্রামলাইন যদি উল্টোডাঙা মেন রোড বরাবর হাতিবাগান অবদি সম্প্রসারিত করা যায়, তবে এতদঞ্চলের লক্ষ লক্ষ ট্রাম-অনুরাগীর অনেকখানি সুবিধে হয়ে যায়।

অতি অল্প খরচ করে কয়েকটি নতুন রুট চালু করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রধান প্রধান কয়েকটি রাস্তার মোড়ে ট্রাম লাইনটিকে শুধুমাত্র একটুখানি ডানদিকে বা বাঁদিকে বেঁকিয়ে নিতে হবে। উদাহরণগুলি নিচে দেওয়া হল :— (১) মানিকতলার মোড়ে উল্টোডাঙার ট্রামগুলিকে শ্যামবাজার অভিমুখে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় ; (২) হাতিবাগানের মুখে গ্রে স্ট্রীটের ট্রামগুলিকে কলেজ স্ট্রীটের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় ; (৩) শ্যামবাজারের মোড়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডের ট্রামগুলিকে বেলগাছিয়া অবদি এগিয়ে দেওয়া যায় ; (৪) উত্তর কলকাতা থেকে আসা ট্রামগুলিকে ওয়েলিংটনের মোড়ে লেনিন সরণি পেরিয়ে সোজাসুজি ওয়েলেসলি-পার্ক স্ট্রীটের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় ; (৫) গড়িয়াহাটার মুখে পার্কসার্কাস থেকে আসা ট্রামগুলিকে দেশপ্রিয় পার্কের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় ; (৬) বড়বাজারের মুখে হাওড়া বা শেয়ালদা থেকে আসা ট্রামগুলিকে চিৎপুরের দিকে নতুন বাজার অভিমুখে বেঁকিয়ে দেওয়া যায়।

কলকাতার রাস্তায় চলার উপযোগী করে তুলতে হলে ট্রামের বগিগুলিরও কিছু পরিবর্তন করা দরকার। যত অসুবিধেই থাক ট্রামে দুটি শ্রেণী রাখা অনর্থক। মূলত পরিচ্ছন্ন যানবাহন হিসেবে চিহ্নিত করে যাত্রীসাধারণের আরামের কথা বিবেচনা করে দুটি বগিতেই পাখা লাগানো দরকার এবং পিছনের বগিটির বসবার আসনের বিন্যাস প্রথম বগিটির মতই করা উচিত। এতে দণ্ডায়মান যাত্রীদের জন্য উপবিষ্ট ব্যক্তিদের বাতাস চলাচলের কোন অসুবিধে হয় না। তাছাড়া নির্দিষ্ট কয়েকটি অপরিসর রাস্তায় জ্যাম এড়াবার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে এক বগির ট্রাম চালানো দরকার। যেমন রবীন্দ্র সরণি, বিধান সরণি, ইলিয়ট রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড প্রভৃতি। এ ছাড়া মাসিক টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রত্যেকটি রুটের কণ্ডাকটরের কাছেই থাকা উচিত। মানুষের এত সময় নেই যে সদর দপ্তরে গিয়ে মাসিক টিকিট কাটবে। ক্ষমতার এইটুকু বিকেন্দ্রীকরণ করলে ট্রামে চড়ার যাত্রীসংখ্যা আরো বাড়বে।

কলকাতার একটি স্থানে ট্রাম লাইন খুব বিপজ্জনক বাঁক নিয়েছে। এটি বিধাননগর রুটে বিধানশিশু উদ্যানের কাছে। অবিলম্বে এটি নিয়ে চিন্তাভাবনা না করলে অদূর ভবিষ্যতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়া ভবানীপুরের লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা চিন্তা করে পূর্বেকার ন্যায় ট্রাম লাইন বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ম থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে। এক্ষেত্রে মেট্রো রেলের তরফ থেকে প্রতিবন্ধকতা কেন আসছে, তা নিয়ে

সত্যজিৎ রায়ের
গোয়েন্দা ফেলুদার অসামান্য কাহিনী
দার্জিলিং জমজমাট
দাম ১২·০০

ভৌগোলিক অনন্যতায় ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যময়তায় যে-ভূখণ্ড ফেলুদার অন্যতম প্রিয়, যে-শৈলশহরে তাঁর গোয়েন্দাগিরির হাতেখড়ি, সেই দার্জিলিঙের পটভূমিকাতেই এক অসামান্য জমজমাট কাহিনী উপহার দিয়েছেন ফেলুদার স্রষ্টা।
বোম্বাইয়ের বোম্বেটে থেকে সেবার হিন্দি ছবি করছিলেন যে-তরুণ চিত্রপরিচালক, তাঁরই নতুন ছবির শুটিং দার্জিলিঙে। এ-কাহিনীও জটায়ুর। জটায়ুর সঙ্গে ফেলুদা-তোপসেকেও সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পরিচালক। সেই সূত্রেই ফেলুদার দার্জিলিঙে পদার্পণ। আর কী অদ্ভুত ভাগ্যের ফের, সেবারের মতো এবারও ফেলুদাকে নামতে হল গোয়েন্দার ভূমিকায়।
যাঁর বাড়িতে শুটিং, খুন হলেন সেই বৃদ্ধ গৃহকর্তা। অতীব কৌতূহলকর চরিত্রের বৃদ্ধ। দিনে ঘুমোন, রাত্রে জেগে থাকেন। খবরের কাগজ থেকে যাবতীয় গরম খবরের কাটিং জমান খাতায়। কে খুন করল তাঁকে? কেনই-বা এই খুন?
বৃদ্ধের অতীত জীবনের অধ্যায় ঘেঁটে কীভাবে ফেলুদা উদ্ধার করলেন নানান চমকপ্রদ সূত্র আর কীভাবে তার সাহায্যে ছাড়ালেন সমুদয় রহস্যের জট, তাই নিয়েই এই দুর্ধর্ষ উপন্যাস। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সত্যজিৎ রায়।

শেখর বসুর
কালজয়ী কাহিনী-সংকলন
বারোটি কিশোর-ক্লাসিক
দাম ২০·০০

গত চারশ বছর সময়কালের মধ্যে যত বিদেশী ক্লাসিক বেরিয়েছে, তার মধ্য থেকে প্রধান বারোটিকে এই আশ্চর্য গ্রন্থে বেছে নিয়েছেন শেখর বসু। ঝরঝরে গতিময় বাংলায় ছোটদের মনের মতো করে শুনিয়েছেন সেই এক ডজন ক্লাসিকের গল্প। যুগোত্তীর্ণ এই কাহিনীগুচ্ছে রয়েছে রবিনশন ক্রুশো, গালিভারস ট্রাভেলস, ডন কুইকসোটের গল্প, ট্রেজার আইল্যাণ্ড, আংকল টমস কেবিন, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স জাতীয় বিখ্যাত বারটি উপন্যাস।
নিছক ভাষান্তর নয়, পৃথিবীবিখ্যাত এই গ্রন্থগুলির মূল মেজাজ ও সৌন্দর্যের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন শেখর বসু তাঁর এই পরিশ্রমী ও অন্তরঙ্গ সাহিত্যকর্মে। সেইসঙ্গে যুক্ত করেছেন লেখক-লেখিকাদের সচিত্র জীবনী, প্রতি গল্পের প্রেক্ষাপটের কথা এবং কিশোর- ক্লাসিক তথা অনুবাদ-সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তর দুর্লভ তথ্যে সমৃদ্ধ সুদীর্ঘ, সজীব একটি আলোচনা।
লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ : অন্যরকম ১০·০০ মাঝখান থেকে ১০·০০ নেতাজীর সহধর্মিণী ১০·০০ সাত বিলিতি ছেড়ে গেল ৮·০০

ছোটদের সেরা উপহার

মীরা বালসুব্রমানিয়ামের
প্রবলেম সলভার পুল্লা রেড্ডি
দাম ১০·০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
ভয়ের মুখোশ
দাম ১০·০০
সীমানা ছাড়িয়ে
দাম ৬·০০
কবন্ধবিগ্রহের কাহিনী
দাম ১২·০০

সত্যেন্দ্র আচার্যের
কোপাইকুণ্ডার কাপালিক
দাম ১০·০০

সুভদ্রকুমার সেনের
পোড়ো বাড়ির রহস্য
দাম ৮·০০

অশেষ চট্টোপাধ্যায়ের
চেনাশোনার বাইরে
দাম ১২·০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের
বলে গেছেন রামশন্না
দাম ১৬·০০

শৈবাল মিত্রের
ঋষিশৃঙ্গের সেই রাত
দাম ১০·০০

দিব্যেন্দু পালিতের
ইয়াসিন ইয়াসিন
দাম ১৫·০০

মতি নন্দীর
কলাবতী
দাম ১২·০০
এম্পিয়ারিং
দাম ১০·০০
অপরাজিত আনন্দ
দাম ১২·০০

বুদ্ধদেব গুহর
রুআহা
দাম ২০·০০
অ্যালবিনো
দাম ১০·০০
বাঘের মাংস এবং অন্য শিকার
দাম ১৫·০০

আনন্দ বাগচীর
মৃত্যুর টিকিট
দাম ১০·০০

আশা দেবীর
আসল টেনিদা
দাম ১০·০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
শুরুর থেকে শুরু
দাম ১০·০০

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের
রুকুসুকু
দাম ১০·০০
কলকাতার নিশাচর
দাম ১০·০০
ইতি পলাশ
দাম ১৪·০০

প্রকাশিত হচ্ছে
সুদীপ্তা সেনগুপ্তর
দক্ষিণ মেরু অভিযানের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা
আণ্টার্কটিকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
অবিস্মরণীয় উপন্যাস
দূরবীন
দাম ৬০·০০

'দূরবীন' শুধু দূরকেই কাছে আনে না, উল্টো করে ধরলে কাছের জিনিসকেও দূরে দেখায়। সেকাল-একাল অতীত-বর্তমান অনন্য কৌশলে একাকার এই উপন্যাসে। চলমান শতকের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের যাবতীয় পরিবর্তন তিন প্রজন্মের অসামান্য কাহিনীর মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটিত।

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
দুই স্তর কাহিনী
আশ্চর্য ভ্রমণ
দাম ১০·০০

এক স্তরে দুরন্ত কাহিনী, অন্য স্তরে জীবনের অনন্য ভাষ্য। এ-উপন্যাসের নায়ক ইন্দ্রজিৎ নামের ছত্রিশ বছরের এক যুবক, যার আশ্চর্য ভ্রমণ কেবলই পশ্চাৎ-স্মৃতিকে উজ্জ্বলতর করে ফিরিয়ে আনে চোখের সামনে। অথচ সামনের দিকেও অপেক্ষা করে থাকে এক মেয়ে। এই বিপরীতমুখী ভ্রমণ-প্রয়াসের দুর্বার কাহিনী 'আশ্চর্য ভ্রমণ'।

প্রকাশিত হয়েছে
সমীর মুখোপাধ্যায়ের
সিদ্ধ উপন্যাস
আবালসিদ্ধির মোড়
দাম ১৪·০০

লোকে বলে, 'সিদ্ধিব্যাটা'। অর্থাৎ বাক্সিদ্ধ। যাকে যা বলেন, তাই ফলে যায়। এর চাকরি, ওর পদোন্নতি, তার ব্যবসা। ক্রমশ রটতে থাকে খ্যাতি। এ-তল্লাট থেকে ও-তল্লাট, এ-পাড়া থেকে সে-পাড়া, গ্রাম থেকে শহরে। হুড়মুড়িয়ে বাড়তে থাকে ভক্তদের ভিড়। সবাই চান 'বাবা'র দর্শন, সমস্যায় সান্ত্বনা। কিন্তু যাঁকে ঘিরে এই আয়োজন, সেই 'সিদ্ধিব্যাটা' কি বস্তুতই অলৌকিক কোনও অবতার? নাকি তাঁরও এই খোলসের নীচে রয়েছে দুঃখ-সুখ-স্বপ্ন-কামনায় ভরা এক সাধারণ হৃদয়, রক্তাক্ত এক লৌকিক জীবন, যা তাঁকে করেছে ঘর-ছাড়া? ঠেলে দিয়েছে পথে-পথে, সত্যের সন্ধানে?
সেই প্রশ্নের উত্তর এই উপন্যাসে। সত্যের মুখ যেখানে ভক্তির আতিশয্যে আড়াল, সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে দুর্লভ দক্ষতায় তরুণ ঔপন্যাসিক সমীর মুখোপাধ্যায় শুনিয়েছেন 'সিদ্ধিব্যাটা' ওরফে মল্লিনাথের তীব্র কৌতূহলকর এক জীবনকাহিনী; উন্মোচিত করেছেন এক জীবনদর্শন, যা পৌঁছে দেয় আরও বড় এক সত্যে। প্রচ্ছদ : সুনীল শীল

ট্রামের জন্য ভাবনা

১১ জুলাই সংখ্যায় গৌতম গুপ্তের 'ট্রাম-পুরাণ' নিবন্ধটি পড়ে দীর্ঘদিনের ট্রাম-অনুরাগী হিসেবে প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা না করলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া হয়। শ্রীগুপ্তের বক্তব্যের সঙ্গে সার্বিকভাবে একমত হলেও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কিছু সংযোজন, ত্রুটি সংশোধন ও ট্রামকে আরো জনপ্রিয় ও যুগোপযোগী করে তুলতে নির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব রাখছি। উপযুক্ত মহলে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলে কলকাতাবাসীরা তাঁদের এই হৃত সাম্রাজ্য নতুন করে ফিরে পেতে পারেন। প্রথমেই ট্রামকে একটি পরিচ্ছন্ন যানবাহন হিসেবে শনাক্ত করতে হবে। এর অন্য কোন সংজ্ঞা দিলে চলবে না। একথা একটি শিশুও জানে, ট্রাম সস্তা, নিরাপদ ও দূষণমুক্ত। কেবলমাত্র বৃদ্ধ খোকারাই বুঝতে চান না ট্রাম একটি দ্রুতগতির যানবাহন, যদি তার চলার জন্যে সংরক্ষিত পথ থাকে।

শ্রীগুপ্তের লেখাটি পড়ে অনেকের মনে এরকম একটা ধারণা হতে পারে যে পৃথিবী থেকে ট্রাম প্রায় অবলুপ্তির পথে এবং ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম নেই। কলকাতায় এটি প্রায় ফসিল। কিন্তু প্রকৃত চিত্র এতটা হতাশাব্যঞ্জক নয়। এই পত্রলেখকের পশ্চিম ইউরোপের বহু বড় বড় শহরে প্রচুর ট্রাম চড়ার বিশদ অভিজ্ঞতা রয়েছে। ঐসব দেশে অন্যতম দ্রুতগতির যানবাহন হিসেবে ট্রামের বিশেষ সমাদর রয়েছে এবং সুদূর ভবিষ্যতেও ট্রাম উঠিয়ে দেবার কোন পরিকল্পনা নেই সেই সব স্বপ্নিল দেশে। এমনকি খোদ নিউ ইয়র্ক শহরেও সদম্ভে প্রতিনিয়ত ট্রাম চলাচল করছে—যদিও তা ভূগর্ভে পাতাল রেলের বড় বড় টার্মিনাল স্টেশনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার জন্যেই। পার্থক্যের মধ্যে শুধুমাত্র ট্রামের পরিবর্তে এগুলির নাম রাখা হয়েছে 'লাইট রেল'। যেহেতু ট্রাম ও লাইট রেলগুলির মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে কারিগরি দক্ষতার। তাই সাধারণ যাত্রীদের কাছে এই দুটি শব্দ সমার্থক। পৃথিবীতে যত শহরে ট্রাম চড়েছি, তার মধ্যে আমস্টারডামের ট্রাম সবচেয়ে সুন্দর। আয়তনে ও রঙের বাহারে এটি অনেক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকেও অনায়াসে হারিয়ে দিতে পারে।

শ্রীগুপ্তের নিবন্ধের সঙ্গে নীলরতন মাইতি অঙ্কিত কলকাতার ট্রাম লাইনের একটি মানচিত্র ছাপা হয়েছে। মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে—বাগবাজার স্তূপের কাছ থেকে বেলগাছিয়া রোডকে ছেদ করে একটি ট্রাম লাইন মূল রেল লাইনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এটি একটি ছাপার ভুল। এতদঞ্চলে ঐরূপ কোন ট্রাম লাইন নেই। তাছাড়া ডার্বিশায়ারের ট্রামওয়ে মিউজিয়ামের যে দোতলা বাসের ছবিটি মুদ্রিত হয়েছে, ওটি সম্ভবত একটি দোতলা ট্রামের ছবি। বিদ্যুৎচালিত যে ট্রলি-বাস বিদেশের রাস্তায় চলে। তা কোন অর্থেই ট্রাম নয়। কেননা তা নির্দিষ্ট লাইনের ওপর চলে না, পাকা রাস্তা দিয়েই অনায়াসে চলতে সক্ষম। অথচ এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে গাড়িটি নির্দিষ্ট দুটি লাইনের ওপর গড়াচ্ছে।

আরো কয়েকটি আংশিক সত্য রয়েছে শ্রীগুপ্তের লেখায়। হাওড়া শহর থেকে প্রকৃত অর্থে ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়নি, কেননা আজও কলকাতার ট্রামগুলো হাওড়া স্টেশন অব্দি যাতায়াত করে। যদিও শহরের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত সেগুলি আর পৌঁছয় না। তবে পুরোনো ট্রাম লাইন শুধুমাত্র হাওড়ার রাস্তার নিচে সমাধিস্থ করে রাখা হয়েছে তা নয়। কলকাতার স্ট্র্যাণ্ড রোডের উত্তরভাগে যে ট্রামলাইন পাতা ছিল, ঐ রাস্তায় ট্রাম চলাচল বন্ধ হওয়ায় সেগুলিও কংক্রিটের রাস্তার নিচে অবিকৃত অবস্থায় বসানো আছে। আসলে এটি নিছক একটি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত। ট্রাম লাইন তুলে ফেলতে যত খরচ পড়ে, তার থেকে অনেক কম খরচায় সেগুলিকে তলায় রেখে উপর দিয়ে রাস্তা বানানো যায়।

উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় ট্রাম চলাচল সুষম করতে গেলে অবিলম্বে কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। শ্রীগুপ্ত যে কটি প্রস্তাব রেখেছেন তার ওপর আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা আছে। ট্রামের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির প্রাথমিক সোপান হচ্ছে নতুন নতুন রুট চালু করা। দুটি ভাবে এই নতুন রুট চালু করা যায়। এক, এখনও যে সব গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ট্রাম লাইন বসেনি অথচ যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে, উপযুক্ত সমীক্ষার মাধ্যমে সেগুলিকে চিহ্নিত করে সেখানে নতুন লাইন বসানো। দুই, যেখানে যেখানে ট্রাম লাইন বসানো আছে অথচ যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও নতুন রুট চালু হয়নি, অবিলম্বে সেই রুটগুলি চালু করার ব্যবস্থা করা। দুঃখের বিষয় এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই অধিকতর সুবিধাজনক হওয়া সত্ত্বেও কলকাতা ট্রামের কর্তৃপক্ষেরা কি এক রহস্যময় কারণে এনিয়ে একটুও ভাবনা চিন্তা করছেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে শ্যামবাজার গালিফ স্ট্রীট থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড বরাবর শেয়ালদা-পার্কসার্কাস হয়ে গড়িয়াহাট অবদি সুন্দর প্রশস্ত ট্রাম লাইন অনাদি অনন্তকাল ধরে পড়ে আছে, অথচ এই লাইনে নতুন রুট চালু করার কোন পরিকল্পনা ট্রাম কর্তৃপক্ষের নেই। অন্যতম উদাহরণ হিসেবে বিধাননগর থেকে হাওড়া স্টেশন, বেলগাছিয়া থেকে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, শ্যামবাজার থেকে মানিকতলা হয়ে হাওড়া স্টেশন, বিধাননগর থেকে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ম কিংবা উত্তর কলকাতা থেকে খিদিরপুর প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও দূরত্বের দিক থেকে দেখতে গেলে এর থেকে অনেক বেশি পথ রোজ ট্রামকে পাড়ি দিতে হয় বেহালা হাওড়া স্টেশন রুটে।

নতুন ট্রাম লাইন পাততে গেলে শুধুমাত্র সেই সব অঞ্চলেই পাততে হবে যেখানে সংরক্ষিত পথ পাওয়া যাবে। এই নিয়ম অনুযায়ী পার্ক সার্কাস থেকে সুন্দরীমোহন এভিনিউ হয়ে মৌলালী, বেলেঘাটা ফুলবাগান থেকে ভি আই পি রোড বরাবর দমদম এয়ারপোর্ট, টালিগঞ্জ থেকে আনোয়ার শাহ রোড বরাবর যাদবপুর এবং অতি অবশ্যই সল্ট লেকের অভ্যন্তরে ট্রাম চালানো উচিত—তা বিধাননগরের অধিবাসীদের প্রভাবশালী অংশের যত বড় আপত্তিই থাকুক না কেন। এই অঞ্চল ট্রাম চলাচলের পক্ষে অতি সুগম ও দূষণমুক্ত। বিশেষ করে সল্ট লেকের অনেক অভ্যন্তরে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের স্বার্থেই এ প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ ছাড়া পূর্ব কলকাতার সঙ্গে পশ্চিম কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল। ফুলবাগান থেকে শ্যামবাজার-শোভাবাজার মাত্র ২/৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে দুবার বাস পাল্টাতে হয়। বিধাননগর রোড স্টেশনের ব্রিজের সংস্কার করে ছোট্ট একটি ট্রামলাইন যদি উল্টোডাঙা মেন রোড বরাবর হাতিবাগান অবদি সম্প্রসারিত করা যায়, তবে এতদঞ্চলের লক্ষ লক্ষ ট্রাম-অনুরাগীর অনেকখানি সুবিধে হয়ে যায়।

অতি অল্প খরচ করে কয়েকটি নতুন রুট চালু করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রধান প্রধান কয়েকটি রাস্তার মোড়ে ট্রাম লাইনটিকে শুধুমাত্র একটুখানি ডানদিকে বা বাঁদিকে বেঁকিয়ে নিতে হবে। উদাহরণগুলি নিচে দেওয়া হল :—

(১) মানিকতলার মোড়ে উল্টোডাঙার ট্রামগুলিকে শ্যামবাজার অভিমুখে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় ; (২) হাতিবাগানের মুখে গ্রে স্ট্রীটের ট্রামগুলিকে কলেজ স্ট্রীটের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় ; (৩) শ্যামবাজারের মোড়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডের ট্রামগুলিকে বেলগাছিয়া অবদি এগিয়ে দেওয়া যায় ; (৪) উত্তর কলকাতা থেকে আসা ট্রামগুলিকে ওয়েলিংটনের মোড়ে লেনিন সরণি পেরিয়ে সোজাসুজি ওয়েলেসলি-পার্ক স্ট্রীটের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় ; (৫) গড়িয়াহাটার মুখে পার্কসার্কাস থেকে আসা ট্রামগুলিকে দেশপ্রিয় পার্কের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় ; (৬) বড়বাজারের মুখে হাওড়া বা শেয়ালদা থেকে আসা ট্রামগুলিকে চিৎপুরের দিকে নতুন বাজার অভিমুখে বেঁকিয়ে দেওয়া যায়।

কলকাতার রাস্তায় চলার উপযোগী করে তুলতে হলে ট্রামের বগিগুলিরও কিছু পরিবর্তন করা দরকার। যত অসুবিধেই থাক ট্রামে দুটি শ্রেণী রাখা অনর্থক। মূলত পরিচ্ছন্ন যানবাহন হিসেবে চিহ্নিত করে যাত্রীসাধারণের আরামের কথা বিবেচনা করে দুটি বগিতেই পাখা লাগানো দরকার এবং পিছনের বগিটির বসবার আসনের বিন্যাস প্রথম বগিটির মতই করা উচিত। এতে দণ্ডায়মান যাত্রীদের জন্য উপবিষ্ট ব্যক্তিদের বাতাস চলাচলের কোন অসুবিধে হয় না। তাছাড়া নির্দিষ্ট কয়েকটি অপরিসর রাস্তায় জ্যাম এড়াবার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে এক বগির ট্রাম চালানো দরকার। যেমন রবীন্দ্র সরণি, বিধান সরণি, ইলিয়ট রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড প্রভৃতি। এ ছাড়া মাসিক টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রত্যেকটি রুটের কণ্ডাকটরের কাছেই থাকা উচিত। মানুষের এত সময় নেই যে সদর দপ্তরে গিয়ে মাসিক টিকিট কাটবে। ক্ষমতার এইটুকু বিকেন্দ্রীকরণ করলে ট্রামে চড়ার যাত্রীসংখ্যা আরো বাড়বে।

কলকাতার একটি স্থানে ট্রাম লাইন খুব বিপজ্জনক বাঁক নিয়েছে। এটি বিধাননগর রুটে বিধানশিশু উদ্যানের কাছে। অবিলম্বে এটি নিয়ে চিন্তাভাবনা না করলে অদূর ভবিষ্যতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়া ভবানীপুরের লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা চিন্তা করে পূর্বেকার ন্যায় ট্রাম লাইন বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ম থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে। এক্ষেত্রে মেট্রো রেলের তরফ থেকে প্রতিবন্ধকতা কেন আসছে, তা নিয়ে

উচ্চতর মহলে খোঁজখবর নেওয়া প্রয়োজন।
বনেদী কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্য হচ্ছে ট্রাম। যে কোন মূল্যে এই ট্রামকে মাথা উঁচু করে কলকাতার বুকে চলে বেড়াতে দিতে হবে। কলকাতার উদারতার সুযোগ নিয়ে প্রতিনিয়ত রাস্তা বেদখল করে নিচ্ছে যারা, ট্রামের বিনিময়ে তাদের স্বার্থরক্ষা করা চলবে না। বেশ কিছুদিন আগে হাওড়াগামী ট্রামে এক দার্শনিক কণ্ডাকটরকে বড়বাজার-হাওড়া ব্রিজের মুখে চেঁচাতে শুনেছিলাম, 'কলকাতার শেষ এসে গেছে। যাঁরা কলকাতায় থাকবেন, নেমে যান।' বুকটা কেমন করে উঠেছিল। ট্রামহীন হাওড়া শহরের মত অবস্থা যদি একদিন কলকাতারও হয়। কলকাতার সে শেষ যেন কোনদিনও না আসে।

সমরকুমার বসু
কলকাতা-৬

॥ ২ ॥

১১ জুলাই 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত গৌতম গুপ্তর 'ট্রাম পুরাণ' নামক বিশেষ নিবন্ধের একটি তথ্যে আমার মনে কিছু সংশয় দেখা দিয়েছে। কলকাতার ট্রামের ইতিকথা প্রসঙ্গে নিবন্ধকার বলেছেন, শহরে প্রথম ট্রাম চলেছিল ১৮৭৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। চালিয়েছিল তখনকার কলকাতার পুরসভা, ঘোড়ায় টানা ট্রাম। রুট ছিল শিয়ালদহ থেকে বৈঠকখানা রোড, বৌবাজার স্ট্রিট, ডালহৌসী স্কোয়ার, কাস্টমস হাউস ও স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত। কিন্তু গত ২৫ নভেম্বর ৭৯ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে জ্যোৎস্না সাউ-এর 'ট্রামগাড়ির ইতিকথা' নামীয় একটি ফিচার প্রকাশিত হয়। তা' থেকো হুবহু তুলে দিচ্ছি : 'বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ট্রামগাড়ির চলন হয় ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে। তখন চৌরঙ্গি পাড়া, চিৎপুরে ও শিয়ালদহে ট্রাম চলত। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে মধ্য কলকাতায় ট্রাম চলাচল শুরু হয়। অবশ্য তখন ট্রাম ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যেত। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম থেকে বৈদ্যুতিক ট্রাম চালু হয়।' এখন প্রশ্ন, কোন্ তথ্যটি সঠিক ? গৌতম গুপ্তর না জ্যোৎস্না সাউ-এর ? এ বিষয়ে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বিদ্যুৎ ভৌমিক
তারকেশ্বর, হুগলি

॥ ৩ ॥

১১ জুলাই ৮৭ তারিখের 'দেশ'এ গৌতম গুপ্ত লিখিত "ট্রাম পুরাণ"-এ যে কলকাতার ট্রাম লাইনের মানচিত্র দেখান হয়েছে, তাতে কয়েকটি ভুল রয়েছে। যেমন, গ্যালিফ স্ট্রিট, শ্যামবাজার, জোকা, এগুলোকে ডিপো হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এগুলি ডিপো নয়, এগুলোকে টার্মিনাস বলাই ভাল। আর নোনাপুকুর ঠিক ডিপো নয়। নোনাপুকুর হল ট্রাম কোম্পানির কেন্দ্রীয় কর্মশালা।

কালীপদ চক্রবর্তী
কলকাতা-৫৬

'ধর্ম ও আমি'-র পত্রোত্তর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ধর্ম ও আমি' রচনাটি (দেশ, ২৫ এপ্রিল) পাঠক মহলে রীতিমতো কৌতুককর বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এ-প্রসঙ্গে রুচিরা শ্যামের একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে ২৭ জুনের 'দেশ'এ। শ্রীমতী শ্যামের বক্তব্য তর্কাতীত নয় ; তাঁর কয়েকটি সিদ্ধান্তের উপর আমার কিছু বক্তব্য আছে।

রুচিরা লিখেছেন : 'শুধু ভারতে কেন সারা পৃথিবীতেই ঈশ্বর ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে বহু সাধনা হয়েছে, বহু সাধক তাঁদের অনির্বচনীয় উপলব্ধির বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু তাকে তো 'গবেষণা' বলা যায় না। কারণ গবেষণা সব সময়েই তথ্যভিত্তিক, প্রমাণনির্ভর। ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের পার্থক্য তো এখানেই !'... রুচিরার বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য হল : বিজ্ঞান সব সময়ই তথ্যভিত্তিক ও প্রমাণনির্ভর। আর ধর্ম তার দাবী-দাওয়ার কোন প্রমাণ দেয় না — তা বিশেষত বিশ্বাস-নির্ভর।

বিষয়টি অনুধাবন করা যাক। আসলে ফিজিক্যাল সায়েন্টিস্টরা যখন কিছু 'প্রমাণ' করেন তখন তাকে ঠিক ম্যাথম্যাটিক্যাল প্রুফ বলা যায় না। একে 'প্রুফ' না বলে 'ভেরিফাই' বলা যেতে পারে। 'প্রুফ' আর 'ভেরিফিকেশন'-এর মধ্যে পার্থক্য আছে।

বৈজ্ঞানিকরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি প্রকল্প খাড়া করেন। এরপর তাঁরা পরীক্ষার দ্বারা ঐ প্রকল্পকে যাচাই করেন। ভেরিফিকেশনে যদি প্রকল্পটি দাঁড়াতে পারে তখন সেটি তত্ত্বে পরিণত হয়। এখন এই তত্ত্ব অন্য সব বৈজ্ঞানিকরা যাচাই করেন। এর সত্যতা সম্বন্ধে তাঁরাও নিঃসংশয় হলে এটি সূত্রে পরিণত হয়। এখন অনেক বৈজ্ঞানিক যদি অনেক বছর ধরে এভাবে মিলিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হন তখন তাঁরা এটিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে মেনে নেন। কিন্তু প্রশ্ন হল : এই প্রাকৃতিক নিয়ম ব্যাপারটি আদতে কী ? এটি তো নিছক একটি ফিজিক্যাল প্যারামিটার এর বিবরণ বলা হচ্ছে। এগুলি কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে লগ্ন হয়ে আছে ! গভীর অর্থে, একে প্রমাণ বলা যায় কি ?

এরপর আসি প্রুফের প্রশ্নে। একটি সূত্রকে প্রমাণ করতে হ'লে সব পরিস্থিতিতেই তার সত্যতা প্রমাণ করতে হয়। ফিজিক্যাল সায়েন্টিস্টদের পক্ষে এটি একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। কারণ তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব জায়গায় এই সূত্রকে মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন না। তাছাড়া বর্তমানের মতো অতীতে এটি সম্ভব হত কিনা, বা ভবিষ্যতেও এটি একইভাবে ব্যবহার-উপযোগী হবে কিনা তা-ও তিনি মিলিয়ে দেখতে পারছেন না। সুতরাং বিজ্ঞানীকে 'বিশ্বাসে'র উপর বিশ্বাস করতে হচ্ছে! আবার ম্যাথমেটিক্যাল প্রুফ আরও গোলমেলে ব্যাপার! একজন ম্যাথমেটিসিয়ান কাজ করেন প্রতীকের মাধ্যমে। তিনি 'ধরে নেন' এই প্রতীকগুলি দেশ-কাল-নিরপেক্ষ। তিনি বলেন এগুলি বর্তমানের মতো অতীত-ভবিষ্যতেও সমান কার্যকরী। কিন্তু ম্যাথমেটিসিয়ানের প্রতীকসর্বস্ব সূত্র যখন বস্তু বা শক্তির উপর প্রয়োগ করা হয় তখনই গোলমাল বাধে। কারণ প্রতীক প্রযোজ্য আদর্শ পরিস্থিতি যা বাস্তবে কোথাও মেলে না। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানে সবসময়ই নতুন নতুন সূত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে এবং হচ্ছেও। সুতরাং বিজ্ঞান কোন সময়ই নিশ্চিত করে বলতে পারছে না 'এটাই সত্য' আর গাণিতিক সূত্রেও সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। কারণ এগুলি বস্তুকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। আর এই বস্তুর জ্ঞানই যদি সন্দেহজনক হয় তাহলে গাণিতিক নিয়মগুলিকে সন্দেহের উর্ধ্বে রাখি কেমন করে? গণিতের সংখ্যা বা জ্যামিতির আকৃতি তো নিছক কনসেপ্ট। গণিতের ৪, ৫, ৬, ৭ ইত্যাদি সংখ্যা সম্বন্ধে বলা হয় এর একটি অপরটির থেকে এক কম বা বেশি। এই ধরনের ব্যাখ্যা logic সমর্থিত নয়। লজিকের মতে এগুলি interdependence দোষে দুষ্ট। আবার curvature of space-এর ফলে জ্যামিতিতে আপনি নিখুঁত বর্গক্ষেত্র বা বৃত্ত আঁকতে পারবেন না। অঙ্কে গ্রাফ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু গ্রাফের মূলবিন্দু অর্থাৎ x-axis আর y-axis যেখানে পরস্পরকে ছেদ করছে সেই বিন্দুর মাত্রা 0,0 বলে যে দেখানো হয় তারও কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। সুতরাং এখানেও ধর্মজগতের মতোই concept, idea, symbol ইত্যাদির ব্যাপারটি মেনে নিতে হচ্ছে!
সুতরাং ধর্মের মতো বিজ্ঞানেও আমাদের অনেক জিনিস মেনে নিতে হয়—বিশ্বাস করতে হয়। বিশ্বাস করতে হয় থার্মোডায়নামিকসের closed systemকে, black body অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়, idea gas মেনে নিতে হয়, বিশ্বাস করতে হয় Avogadro's number-এ। রুচিরা শ্যাম বলেছেন: 'উপনিষদের কোন কবি বলেছেন বুদ্ধি মেধা বা শ্রুতি দিয়ে তাঁকে (ঈশ্বরকে) জানা যায় না, যাঁর কাছে তিনি নিজের মহিমায় স্বপ্রকাশ হন কেবল তিনিই তাঁর মহিমা জানতে পারেন। এই রাজসিক উপলব্ধির স্থান বিজ্ঞানে নেই.....।' তাই কি? ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু বিজ্ঞানেও আছে! বিজ্ঞান বলছে মাইনাস ২৭৩·১৪°c-তে গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যায়, কিংবা আলোর গতিতে চললে আপনার ভর অসীম হবে। রুচিরা দেবী, কোন্ ইন্দ্রিয়তে আপনি এগুলি অনুভব করবেন!
রুচিরা দেবী প্রশ্ন করেছেন: 'যম কি জিজ্ঞাসু নচিকেতাকে কোনো প্রমাণ দিতে পেরেছিলেন?'

কোন প্রমাণ ? প্রত্যক্ষ জ্ঞান ? প্রত্যক্ষ জ্ঞানই কি সব সময় সত্যি ? আমি আকাশে সাতরঙা রামধনু দেখছি। আমার কাছে ঐ বর্ণবিন্যাসই সত্যি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলবেন — রামধনু বলে কিছু নেই—ওটা optical illusion. আমি আকাশ নীল দেখছি। কিন্তু আকাশ কি নীল ? আমি বসে বসে লিখছি : আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার গতিবেগ শূন্য। কিন্তু কেউ যদি মহাকাশ থেকে টেলিস্কোপ তাক করে আমাকে দেখে সে দেখবে আমি প্রচণ্ড বেগে ঘুরছি। প্রত্যক্ষ জ্ঞান গভীর থেকে গভীরতর হলে, গভীরতর সত্য প্রকাশ করবে। আমার বাড়ির দেওয়ালের রঙ সাদা। একজন কেমিস্ট্রির ছাত্র বলবে—না, ওটা ক্যালসিয়ামের যৌগ। যে-চশমা পরে আমি লিখছি সেটি আমার কাছে শুধুই কাঁচ—কিন্তু আপনি বলতে পারেন তা সিলিকন কম্পাউন্ড।

তা ছাড়া সব কিছুর প্রমাণ তো একইরকম হয় না ! অ্যানাটমির সাহায্যে অবচেতন মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। তাই বলে কি ফ্রয়েডকে বাতিল বিবেচনা করতে হবে ? এখানে মেথডোলজি ভিন্ন। ধর্মেরও তেমনি নিজস্ব মেথডোলজি আছে। সেটা মানতে আপত্তি কোথায় ? ধার্মিকেরও ল্যাবরেটরি আছে,—সেটি তার মন। যোগীও ইন্‌স্ট্রুমেন্ট নিয়ে কাজ করেন। ধ্যান, জপ, আসন, প্রাণায়াম তাঁর ইনস্ট্রুমেন্ট,সাধুর findings তার উপলব্ধিতে ধরা পড়ে ; সমভাবাপন্ন সাধুর পক্ষেই এই finding বোঝা সম্ভব। কিন্তু একজন lay man এর হদিশ পায় না। বিজ্ঞানেও তাই $E=mc^2$ বৈজ্ঞানিকরা এ কথা মানেন। কিন্তু যে-মানুষটি মাঠে চাষ-বাসের কাজ করেন তাঁকে এটি বোঝান যাবে কি ? অথচ এটি তো বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল—যা কিনা, রুচিরাদেবীর মতে, 'তথ্যভিত্তিক, প্রমাণনির্ভর'।

অরবিন্দ সামন্ত
রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান

প্রসঙ্গ কথা

৮ আগস্ট "দেশ" পত্রিকায় পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের "প্রসঙ্গ কথা" সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সোমনাথ রায় লিখেছেন, লর্ড হার্ডিঞ্জ "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরও ছিলেন না। চ্যান্সেলর ছিলেন কারমাইকেল। প্রসঙ্গত বলি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে সম্মান জানাতে এগিয়ে আসেননি।…বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের চাপে পড়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে সম্মান জানাতে বাধ্য হন। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি ঘোষিত হবার অন্তত তিন সপ্তাহ আগে (২০ অক্টোবর, ১৯১৩) হার্ডিঞ্জ গভর্নর তথা চ্যান্সেলর, কারমাইকেলকে লিখছেন, I do not care whether the Criminal Intelligence Department give him a bad character or not. I am determined to give him an Honorary Degree (B. R. Nanda, Gokhale : The Modern Moderates and the British Raj. p. 400)।" সোমনাথবাবু হার্ডিঞ্জের ঐ চিঠি থেকে সিদ্ধান্ত করেন, "এই চিঠি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এর আগেই হার্ডিঞ্জ কারমাইকেলের কাছে রবীন্দ্রনাথকে উপাধিদানের প্রস্তাব রেখেছিলেন যার উত্তরে কারমাইকেল তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর সম্পর্কে সি আই ডি রিপোর্ট সুবিধাজনক নয়।......উপরে উদ্ধৃত চিঠিতে হার্ডিঞ্জ কিন্তু এবার ধমকের সুরেই কথা বলেছেন। এর পরেই কারমাইকেল স্যার আশুতোষকে এই প্রসঙ্গে চিঠি দিয়েছিলেন। কারমাইকেল-আশুতোষ পত্রাবলী কয়েক বছর আগে "দেশ" পত্রিকারই একটি বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।"

"দেশ"-এর সেই সংখ্যায় "কারমাইকেল-আশুতোষ পত্রাবলী" নয়, কারমাইকেলের লেখা একখানি মাত্র পত্র আমার সেই রচনায় প্রকাশিত হয়। আশ্চর্য বোধ করি, সোমনাথবাবু সেই পত্রের উল্লেখ করলেও তার তারিখটি নজর করেননি, পত্রের বক্তব্যও প্রণিধান করেননি। কারমাইকেলের সে-চিঠিখানি লেখা—৫, অক্টোবর, ১৯১৩, আর সোমনাথবাবুর উদ্‌ধৃত কারমাইকেলকে লেখা হার্ডিঞ্জের চিঠির তারিখ ২০ অক্টোবর, ১৯১৩। তবুও পত্রলেখক লিখলেন, হার্ডিঞ্জের চিঠির পর কারমাইকেল স্যার আশুতোষকে ঐ চিঠি দিয়েছিলেন ! সে-চিঠিখানি আবার প্রকাশ করি :

PRIVATE
Government House
Darjeeling

5th Oct, 1913
Dear Sir Asutosh,
I will at once write to Lord Hardinge, and ask if he is likely to have any objection to the conferring of an Honarary Degree on Rabindranath Tagore. I shall strongly urge that he should agree. I can hardly conceive it possible that he should not, but it has not always been clear to me what reasons actuate the Education authorities in India, so I do not like to express a definite opinion too quickly.

Yours very sincerely
Carmichael

To
The Hon. Sir Asutosh Mookerjee

প্রকৃতপক্ষে, তখনকার আইনকানুন অনুসারে গভর্নর জেনারেল হার্ডিঞ্জই ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং বাংলার গভর্নর কারমাইকেল ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর (University of Calcutta, Calendar, 1956, Part I, pp 19-20)।

তাই, এই চিঠি দুটি পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়, ভাইস-চ্যান্সেলর আশুতোষ রেক্টর কারমাইকেলকে রবীন্দ্রনাথকে ডক্টরেট উপাধিদানের প্রস্তাব জানান, যার উত্তরে কারমাইকেল আশুতোষকে ৫ই অক্টোবর ওই পত্র লেখেন। তারপর, রেক্টর কারমাইকেল চ্যান্সেলরকে ওই প্রসঙ্গে যে চিঠি দেন তারই উত্তরে সোমনাথবাবুর উদ্ধৃত লর্ড হার্ডিঞ্জের ২০ অক্টোবরের ওই পত্রখানি।

অতএব, সোমনাথবাবুর ধারণা যে লর্ড হার্ডিঞ্জ "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ছিলেন না" যেমন ভ্রান্ত, তেমনি তাঁর সিদ্ধান্ত যে "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে সম্মান জানাতে এগিয়ে আসেননি" "বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের চাপে পড়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে সম্মান জানাতে বাধ্য হন"—সম্পূর্ণ যুক্তিহীন ও ভ্রান্তিমূলক।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কলকাতা-২৫

'শিশু ভোলানাথেরা'

১৮ জুলাই '৮৭ সংখ্যার 'দেশ'-এ প্রকাশিত শ্যামল সান্যালের 'শিশু ভোলানাথেরা' নিবন্ধের এক স্থানে (৯৬ পৃষ্ঠার ১ম কলমে) লেখা হয়েছে, "১৯৮১-র জনগণনার হিসেবে দেখা যায় ভারতে ১৪ বছরের কম বয়সের শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ১২ কোটি ৪৫ লক্ষ অর্থাৎ দেশের মোট শিশুদের ৫·৫ শতাংশই শ্রমিক।" হিসেব করলে দাঁড়াচ্ছে, ভারতের মোট শিশুর সংখ্যা ২২৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬৩ হাজার। সারা পৃথিবীতেও কি অত শিশু আছে? নাকি পরিসংখ্যান ব্যাপারটাই এ রকম।

অনুপ ঘোষাল

জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

॥ ২ ॥

১৮ জুলাই 'দেশ' পত্রিকায় 'শিশু ভোলানাথেরা' শিরোনামে শ্যামল সান্যালের বিশেষ নিবন্ধটি পড়লাম। প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথে ঘুরে ফিরে তাকালে যা দেখতে পাই সেই ছবি, আর তারই কথা খুঁজে পেলাম শ্যামলবাবুর লেখায়। তবে শহরের শিশুশ্রমিকদের মত গ্রামের শিশু মজুরদের অবস্থাও আজ খুব করুণ। এখানেও ওরা নানাভাবে কাজকর্ম করে বেঁচে থাকার সংগ্রামে ব্যস্ত। ভাবতে অবাক লাগলেও এখানকার শিশু-মজুররা রোদ জলে ভিজে পুড়ে বাবুর ক্ষেত থেকে ১ কেজি লংকা তুলে পঁচিশ পয়সা করে পায়। দুধের শিশুদের (যদিও তারা দুধ খেয়েছে কি না জানি না) বেছে বেছে সেই এক কেজি লংকা তুলতে বহু সময় লেগে যায়। চায়ের দোকানে, মিষ্টির দোকানে আরও অন্যান্য দোকানে এক একটা শিশুকে বার-চোদ্দ ঘণ্টা করে খাটাতে হয়। ইদানীং আমাদের বনগাঁ লোকালেই দেখতে পাচ্ছি ঐ শিশুরাই জীবনটাকে হাতের মুঠোয় ভরে চলন্ত ট্রেনে হকারি করছে।

'আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ' শেষ হয়ে গেছে সেই কবে অথচ এরা যা ছিল তাই রয়ে গেছে । বরঞ্চ এখন 'অপুষ্টি' আরও বেশি করে এদের গ্রাস করতে চলেছে ।

যদিও বিদেশে যাইনি, তবু বর্তমান ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যে, বর্তমানে শিশুদের মধ্যেও যেন একটা শ্রেণী বিভাগ গড়ে উঠেছে ; সব শিশুরাই তাই আজ শিশু নয় ।

জানি না, এই সব বৈষম্য কবে দূর হবে ? কবে মানুষ বলতে শুধু মানুষকেই বুঝবো, আর শিশু বলতে বুঝবো সব শিশুদের ?

সুধীর সেন

চাঁদপাড়া, উঃ ২৪ পরগনা

সেই রসিক লেখক

৪ জুলাই ১৯৮৭ সংখ্যার দেশ পত্রিকায় "১৩৪, মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের সেই রসিক লেখক" শীর্ষক প্রচ্ছদ নিবন্ধে শতদল গোস্বামী হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্তীর দুঃস্থ জীবন যাপনের যে কাহিনী শুনিয়েছেন তা বড়ই মর্মস্পর্শী । মনে হয় তিনি যদি 'প্রচণ্ড ভোজনবিলাসী' না হতেন বা একটু মিতব্যয়ী হতেন তাহলে নিশ্চয় অভাব তাঁর 'নিত্যসঙ্গী' হতে পারতো না । 'চপ কাটলেট রাবড়ি খেয়ে সিনেমা দেখে খরচ করতেন । টাকা হাতে এলে সঙ্গে সঙ্গে খরচ না-করা পর্যন্ত স্বস্তি পেতেন না ।' নিজের বইয়ের কমপ্লিমেন্টারী কপিগুলোও বিক্রি করে যা পেতেন 'সেই টাকায় ভালমন্দ খেতেন ।' সেজন্যই তাঁর অভাব ছিল 'স্বরচিত' যা 'সর্বদা লেগে থাকত ।' প্রকাশকদের কাছে বহুবার ঠকেছেন । তাঁর ধরাবাঁধা আয়ও ছিল না । তবু যদি তিনি লিখে যে টাকা পেতেন সে টাকা ঠিকমত খরচ করতেন তাহলে 'তাঁর একক জীবন স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কাটা' অসম্ভব হ'ত না । মনে হয় এই ধারণার বশবর্তী হয়েই শরৎচন্দ্র 'ষোড়শী'র বেনিফিট নাইটের টিকিট বিক্রির টাকা তাঁকে দিতে কার্পণ্য করেন । তবু এটি অন্যায় বঞ্চনা । এ নিয়ে তিনি তাঁর 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা' বইয়ে আক্ষেপ করে গিয়েছেন—'উপন্যাসে দরদী শরৎচন্দ্র জীবনের বাস্তব বিন্যাসে এক নিমেষে কোথায় যে হারিয়ে গেলেন ! মনে পড়ল কবির কথা, কাব্য পড়ে যেমন ভাবো, কবি তেমন নয় গো ! কিন্তু তাহলেও একী ! যাঁর লেখার পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে এত দরদ, টাকার দিক দিয়ে ধরতে গেলে তার এই দস্তুর !"

শিবরাম চক্রবর্তীর শেষজীবন অযত্নে অনাদরে কেটেছে । এর কারণ অবশ্যই অর্থ নয় । তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনই দায়ী । যে ভাবে তাঁকে গেঞ্জি পরে সভায় যেতে হয়েছে, পাখার অভাবে গরমে কষ্ট পেতে হয়েছে আর যে ভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে তা বড়ই মর্মান্তিক । শুধু অর্থ সাহায্য না করে তাঁকে অন্যভাবে একটু আরামে যত্নে রাখার ব্যবস্থাও করা যেতো তো । আমরা তা করতে পারি নি । এটা লজ্জার কারণ ।

গোস্বামী মশায় লিখেছেন, 'কোনো স্বীকৃত সাহিত্যপুরস্কার তিনি পেয়েছেন কিনা জানি না ।' এ প্রসঙ্গে জানাই তিনি 'প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার' পেয়েছিলেন ১৯৭৫ সালে । 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার' (মরণোত্তর) পান ১৯৮১ সালে । এ ছাড়াও তিনি পেয়েছিলেন শিশু সাহিত্য পরিষদের 'ভুবনেশ্বরী পদক' বাংলা ১৩৬৮ সনে এবং 'মৌচাক শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক পুরস্কার' ইংরাজী ১৯৬০ সালে ।

অজিতেন্দ্র সিংহ

নতুন দিল্লী-৩

ষোড়শী নাটক প্রসঙ্গে

৪ জুলাই, ৮৭'র 'দেশ'-এ শ্রীশতদল গোস্বামীর লেখা '১৩৪, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের সেই রসিক লেখক' নিবন্ধটি পড়লাম। খ্যাতকীর্তি লেখক শিবরাম চক্রবর্তী সম্পর্কে একটি মনোগ্রাহী নিবন্ধ উপহার দেবার জন্য লেখক আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মত পাঠককে কিছুটা ধাঁধায়ও ফেলেছেন বৈকি । শ্রী গোস্বামী লিখেছেন "শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা'র মঞ্চসফল নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শিবরামদা—'ষোড়শী'", এ তথ্য অভিনব, ঠিক এর বিপরীত তথ্য পাই স্বয়ং শরৎচন্দ্রেরই একটি পত্রে । ২৬ ফাল্গুন, ১৩৩৪ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একটি পত্রে শরৎচন্দ্র লিখছেন—

"আপনার চিঠি পেয়েছি । 'ষোড়শী' সম্বন্ধে আপনার অভিমত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি ।

...এই নাটকখানা লিখেছি আমার একটা উপন্যাস অবলম্বন করে । তাতে যত কথা বলতে পেরেছি, চরিত্র সৃষ্টির জন্য যত প্রকার ঘটনার সমাবেশ করতে পেরেছি এতে তা পারিনি ।

লেখবার সময় বারবার অনুভব করেছি—এ ঠিক হচ্ছে না ।...সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হলো আমার ষোড়শী"....ইত্যাদি । [পত্রটি মুদ্রিত অবস্থায় পেয়েছি শ্রী অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য-র লেখা "নানা রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থের 'শরৎ-রবি' নামাঙ্কিত নিবন্ধে (পৃঃ ১২৫) গ্রন্থটির প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স] উদ্ধৃত এই পত্রাংশে আমরা যে মূল্যবান তথ্যটি পাই তা হলো শরৎচন্দ্রের নিজস্ব স্বীকারোক্তি, —"এই নাটকখানা লিখেছি..." এই স্বীকারোক্তির অর্থ কি ? আমার তো মনে হয় শরৎচন্দ্র বলতে চেয়েছেন যে

'দেনাপাওনা'র নাট্যরূপ ষোড়শী তাঁরই লেখনীসঞ্জাত।
তাহলে যে স্মরণীয় বঞ্চনার কাহিনী শ্রী গোস্বামী উপস্থিত করলেন তার পুরোটাই যেন কেমন গোলমেলে ঠেকে।
আশা করি পত্রে উল্লিখিত 'ধাঁধা'টি গুণিজনের নজরে আসার সুযোগ পাবে। আমি চাই এ বিষয়ের উপর একটু স্পষ্ট আলোকপাত।

শৈবাল বসু
জলপাইগুড়ি

খেলোয়াড় তৈরির স্বপ্নে

২০ জুনের দেশ পত্রিকায় 'খেলা' বিভাগে প্রকাশিত মানস চক্রবর্তীর "খেলোয়াড় তৈরির স্বপ্নে" শীর্ষক লেখাটির একটি অংশের বেশ কয়েকটি ভুল, অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ তথ্যের সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
এই অংশে স্বনামধন্য সাঁতার প্রশিক্ষক কে পি সরকার মহাশয় সম্বন্ধে লেখা হয়েছে। কিন্তু প্রথমেই বলি যে, যাঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছে তাঁর সঠিক সম্পূর্ণ নামটা অন্তত প্রতিবেদকের জানা উচিত ছিল (কালীপদ নয় কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার)। এছাড়া তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যাদের 'রত্ন' বলে অভিহিত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে 'বিশ্বজিৎ দে' কে ? তবে বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক কৃতী সাঁতারু এবং কে পি দা'র ছাত্রর নাম 'বিশ্বজিৎ দে চৌধুরী'।

এরপরে কে পি দা'র ক্লাব কোচিং সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে হেদুয়ার ন্যাশনাল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন ও তারপরই কলেজ স্কোয়ার ক্লাবে কোচিং করিয়েছেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়। কে পি দা ন্যাশনাল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের (১৯৪২ থেকে ১৯৬৭), পরে বউবাজার ব্যায়াম সমিতিতে (১৯৬৮ থেকে ১৯৭৩) কোচিং করিয়েছেন। এবং এই পর্বে ওঁর বেশ কয়েকজন ছাত্রই বাংলা ও পরে ভারতের হয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁদের অনেকের নামই এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
বউবাজার ব্যায়াম সমিতির একজন সক্রিয় আজীবন সদস্য হিসাবে কে পি দা'র সঙ্গে যথেষ্ট আন্তরিকভাবে মেশার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এবং সেই সুবাদেই এই প্রতিবেদন দেখে, ওঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে জানতে পেরেছি যে, দেরিতে ছাত্ররা আসার জন্য বউবাজার ক্লাবের কোন কর্মকর্তার সঙ্গে আজ অবধি তাঁর মনোমালিন্য বা মান-অভিমান হয়নি। স্বভাবতই প্রশ্ন থেকে যায় প্রতিবেদক এ সম্পর্কে যে ঘটনার (একদিন দেরি করে... ওরা রেগে যাবে—পৃঃ ৮৭ দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করেছেন তার খোঁজ পেলেন কোথা থেকে ? এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বউবাজার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন নামে কোন সাঁতার সংস্থা আছে বলে জানা নেই।
এরপরে আর এক জায়গায় তিনি ডঃ আরনস্ট ম্যাগলিস্কোর লেখা বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যতদূর জানি 'সুইমিং মাস্টার' নামে ওঁর লেখা কোন বই আজ অবধি প্রকাশিত হয়নি। সাঁতারের বাইবেল বলে কথিত যে বইটির কথা শ্রীচক্রবর্তী উল্লেখ করতে চেয়েছেন তার নাম 'সুইমিং ফাস্টার'।
এছাড়া প্রতিবেদনে কে পি দা'র বর্তমান কর্মপরিধি সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নেই। কাজেই সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের ধারণা জন্মাতে পারে যে, বর্তমানে বোধ হয় কে পি দা অভিমান (?) করে বাড়িতে বসে রয়েছেন বা সাঁতার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। যেটা বাস্তবে একেবারেই বিপরীত, কারণ উনি বর্তমানে বউবাজার ব্যায়াম সমিতি (সন্তরণ বিভাগ), লা-মার্টিনিয়ার স্কুল ও ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবের সাঁতার প্রশিক্ষণের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন। এবং এখনও তিনি আগের মতোই রোদ, জল, ঝড় ইত্যাদি উপেক্ষা করে তাঁর দায়িত্ব পালনের ঐকান্তিক চেষ্টা ও একাগ্রতা নিয়ে নিমগ্ন। এছাড়া মাত্র দু' বছর আগেই তাঁর এক সুযোগ্য ছাত্র তপন ঘোষ বম্বেতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান এজ গ্রুপ চ্যাম্পিয়নে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-১৪

নাট্যকারের বক্তব্য

৮ আগস্টের 'দেশ'-এ শিল্পসংস্কৃতি বিভাগে গান ও পাঠনাট্য শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'লেপ'। শীর্ষনামেই প্রকাশ অনুষ্ঠানটি পাঠনাট্যের। 'লেপ'ও পঠিত হয়েছে নাট্যাকারেই। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'লেপ' বললে বোঝায় গল্প, এবং গল্পটি গল্পাকারেই পাঠ করলে পাঠনাট্যের রস ও মজা আদায় করা যায় না। এ তো নাট্যাকারের কৃতিত্ব ও সুনামের পকেটমারা।
বাঁশ দিয়েই বাঁশি হয়, তাই বলে বাঁশির কারিগরকে বাঁশওয়ালার থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা না দিলে অন্যায় হয়। অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই নাট্যকারের নাম ঘোষণা হয়েছে, তবে এ অনুল্লেখ কেন ? 'দেশ' পত্রিকা অন্তত মূল কাহিনীকার ও নাট্যকারের স্ব স্ব ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত ; তাই এই ক্ষোভ। নাট্যকারেরা এইভাবে উপেক্ষিত হলে অচিরে পাঠনাট্যের আসরে অনেক জনপ্রিয় গল্পকারেরা আর নিবেদিত হবেন

না। তখন পাঠনাট্য নয়, পাঠগল্পের আসর করতে হবে।
'লেপ'-এর নাট্যকার বর্তমান পত্রলেখক, এতদ্দ্বারা এই অকৃতজ্ঞ পারফর্মিং আর্টের ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলেন।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

হুগলী-৭১২১০৩

স্তানস্লাভস্কি

১৫ আগস্ট ১৯৮৭ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় ধরণী ঘোষের অভিযোগ পড়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি নিশ্চিত জানি 'দ সিগাল' স্তানস্লাভস্কির 'মাই লাইফ ইন আর্ট' এবং এই সংক্রান্ত বহু তথ্য তাঁর জানা, শুধু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপান্তরিত 'পাখি' নাটকটি তাঁর পড়া নেই। নাটকটির সমালোচনায় আমি রূপান্তর প্রসঙ্গে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাখি'কে মূল নাটক হিসেবে ধরে বলেছি 'প্রযোজনায় সেটি নেই'। ধরা যাক তাঁর উদ্ধৃতি অনুযায়ী চেখভের নিনা বা নমিতা যদি "The sky is end the Moon is just rising, and I kept urging on the horse" এই কথার অনুবাদ যদি সংলাপে আনা যেত তবে 'হর্স' শব্দটি শুনেই এদেশের দর্শক বলতেন ধরণী দ্বিধা হও। এর পরিবর্তে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নিনা বা নমিতাকে একটি সাইকেল নিয়ে মঞ্চে ঢোকালেন। একটি গ্রামে সাইকেল নিয়ে একটি মেয়ে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে দর্শক মেয়েটির গোত্রান্তর বুঝে যায় (চেনা মুখ প্রযোজনায় এই সাইকেল নেই) ফলে আবারও প্রমাণিত হয় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কিভাবে এদেশের মাটিতে বিদেশের ফুল ফোটাতে পারেন।
দ্বিতীয়ত তিনি লিখেছেন, স্তানস্লাভস্কির কিছু কিছু লাইন আমি সরাসরি অনুবাদ করে দিয়েছি। আমি প্রসঙ্গক্রমে নাম উল্লেখ না করে বলেছি। তিনি আমার 'মূল নাটক' বলতে যেরকম ভুল বুঝেছেন, সেরকম পাঠকও বুঝতে পারে আমি বোধ হয় সমস্ত আলোচনাটাই সরাসরি অনুবাদ করেছি—এই দেশে সরাসরি অনুবাদ বা সম্পূর্ণ বিদেশী সমালোচনাও টুকে তুলে দেওয়ার নজির আছে।
সবশেষে সবিনয়ে জানাই, মূল রচনা না পড়ে শুধু বোধিনী পড়ে পরীক্ষা দেওয়ার বয়স আর নেই।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

কলকাতা-৩৩

'অশান্ত এক অভিযাত্রার কাহিনী'

'দেশ' পত্রিকার ১৩ জুন সংখ্যায় শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ মহাশয়ের প্রচ্ছদ নিবন্ধ 'অশান্ত এক অভিযাত্রার কাহিনী'তে দুটি ভুল চোখে পড়ল, প্রথমত, তিনি যে অধিবেশনের কথা উল্লেখ করেছেন তা সেকেন্ড নয় থার্ড বা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেস। দ্বিতীয়ত, এটি ১৯২০ জুলাই ১৯ থেকে আগস্ট ৭ পর্যন্ত চলে, শ্রীঘোষের বক্তব্য অনুযায়ী জুন ১৯ থেকে নয়। (দ্রঃ Lenin, Collected Works, Vol. 31, Progress Publishers, Moscow, 1977) এখানে উল্লেখ্য গ্রন্থলোক বিভাগে 'অশান্ত ব্রাহ্মণের বিপ্লবী প্রচেষ্টা' নিবন্ধে শ্রীগৌতম নিয়োগীও প্রায় একই ভুল করেছেন, তাঁর অবগতির জন্য জানাই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্রাসেলসে, ১৬-২২ আগস্ট, ১৮৯১ খ্রী।

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

কলকাতা-৩২

সেকালের ফুটবল

১১ জুলাই ১৯৮৭ 'দেশ' পত্রিকায় মুকুল দত্ত লিখিত "সেকালের ফুটবল" শীর্ষক উপভোগ্য সচিত্র প্রতিবেদনটি আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম।
শ্রীদত্ত বহু বছরের পুরনো ক্রীড়া সাংবাদিক এবং ফুটবল বিষয়ে তিনি একজন Seasoned Campaigner। এ ছাড়া বিগত পঞ্চাশ বছরের ওপর তিনি বহু বড় ম্যাচের প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর নিবন্ধে অতীতকালের বেশ ক'জন দিক্‌পাল ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়দের নামের উল্লেখ নেই দেখে বিস্মিত হয়েছি। তাঁরা হলেন ডাঃ সন্মথ দত্ত, আবদুল হামিদ, বাঘা সোম, করুণা ভট্টাচার্য, পল্টু গাঙ্গুলী, দেবী ঘোষ, কে দত্ত, ডাঃ টি আও প্রভৃতি। এঁদের ছবি ছাপা হলেও সুখী হতাম।

পীযূষকান্তি রায়

নিউ দিল্লি-১৯

দেশ

সম্পাদকীয়

প্রাণ ধারণের গ্লানি

দেশের অবস্থা ভালো নয়। সর্বদিক থেকে নানা সমস্যা ঘনিয়ে আসছে। আঁধার করে আসে। প্রকৃতি আর মানুষ উভয়েই উঠে পড়ে লেগেছে শান্ত, সুস্থ, জীবনছন্দকে বিপর্যস্ত করার জন্যে। উত্তরবঙ্গ বন্যায় ভাসছে দক্ষিণ বঙ্গে খরা। উত্তরবঙ্গে এমন ভয়াবহ বন্যা স্মরণকালের মধ্যে হয়নি। ব্যাপকতায় '৭৮ সালকেও যেন অতিক্রম করে গেছে। নদীবাঁধ প্রকল্পে আমাদের অনেক কিছু করার আছে। প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পশ্চিম বাংলার মানুষকে তেমন কোনও রিলিফ দিতে পারেনি। বৃষ্টি না হলেও আমরা অসহায়, হলেও আমরা অসহায়, অথচ প্রকৃতি সব সময় যে মানুষের মুখ চেয়ে চলবেন এমন আশা করা যায় না। তিনি কখনও কৃপণ, কখনও অকৃপণ। আমরা অপ্রস্তুত। হয় তো উদাসীন। রক্ষণাবেক্ষণে আমরা তেমন তৎপর নই। আমাদের ব্রিজ ভেঙে ট্রেন জলে পড়ে যায়। আমাদের বাঁধ খুলে দেশ ভেসে যায়। আমাদের হাসপাতালের ছাদ ঝরে পড়ে যায়। মানুষের গাফিলতিতে মানুষেরই চরম দুর্গতি। বন্যাত্রাণে রাজনীতির ফলে দুর্গত মানুষ আরও অসহায় বোধ করেছে। টেলিভিসানের কল্যাণে ডাঙ্গার মানুষ ঘরে বসেই দেখেছে জলবন্দী মানুষের অবস্থা। হেলিকপ্টার থেকে ঝরে পড়ছে খাদ্যের প্যাকেট, নিচে অসহায় মানুষের কাড়াকাড়ি, ছেঁড়াছিঁড়ি। ওই দৃশ্যে একটি সত্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বর্তমান ব্যবস্থায় নিরাপত্তা আর নির্ভরতা কমতে কমতে এমন এক অবস্থায় এসে গেছে, যখন মানুষকে যে কোনও পরিণতির জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা বিজ্ঞানের বড়াই করি, ম্যানেজমেন্টের গর্ব করি, অথচ কি খরা, কি বন্যা উভয় পরিস্থিতিতেই আমরা সমান অসহায়।

প্রকৃতি মারলে মানুষের কিছু করার নেইই হয় তো, কিন্তু মানুষে মানুষ মারলেও আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা অসহায়। পঞ্জাবে প্রতিদিন যা ঘটছে তার চেয়ে নারকীয় ঘটনা আমরা আর কি ভাবতে পারি! সেখানে প্রশাসন যত শক্তিশালী করা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদীদের সাহস ততই বেড়ে যাচ্ছে। সব দেখলে মনে হয় মানুষ জীবটি কেমন! এ জীব নির্বিচারে, শীতল মস্তিষ্কে স্বজাতিকে ফুলশয্যার বিছানা থেকে টেনে তুলে এনে কুপিয়ে মারতে পারে। একটি গদি, কিছু ক্ষমতা, নেতৃত্ব, মন্ত্রী হওয়া, এইসব লক্ষ্য সামনে রেখে স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি আর সেই দাবিতে একের পর এক নিরীহ মানুষ হত্যা। এই জেনোসাইড একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব। শ্রীলঙ্কা বুদ্ধকে ভুলে স্টেনগান আর অটোমেটিক রাইফেলের ভজনা করছে। সম্মানিত অতিথির ঘাড়ে অর্বাচীন নৌসেনা আগ্নেয়াস্ত্রের কুঁদো চালিয়ে দিচ্ছে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার অহঙ্কার ভেদ করে হত্যাকারী প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীসভার ঘাড়ে গ্রেনেড ছুঁড়ছে একটি মাত্র কারণে, বিদ্বেষ, ঘৃণা, স্বার্থ। সব মিলিয়ে মানুষের অবস্থা খুবই খারাপ। কয়েকদিন আগে আমাদের পুলিসের কর্তা ব্যক্তিদের একজন জানিয়েছেন, আমাদের কলকাতার গাড়ির চালকদের কোনও সিভিক সেন্স নেই। প্রসঙ্গটি উঠেছিল কলকাতার ভয়াবহ এক পথ-দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে। উল্টোডাঙ্গার কাছে একটি লরি পাঁচ ছ'জনকে চাপা দিয়ে চলে গেল। পথ দুর্ঘটনা, শিল্প দুর্ঘটনা, আগুন, খুন, আত্মহত্যা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বেড়েই চলেছে। মৃত্যুর সঙ্গেই আমরা ঘর করি; কিন্তু অকালমৃত্যুকে মেনে নেওয়া যায় না। সারা ভারত জুড়ে চলেছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। রাজনৈতিক হানাহানির পাশাপাশি সামাজিক হত্যাকাণ্ড। বধূনিগ্রহ। বধূহত্যা।

অর্থনীতিতেও সুখের ছবি ধরা পড়ছে না। অসংখ্য কলকারখানা বন্ধ। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলছে। হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারি বেকার। বিকল্প রুজি রোজগারের কোনও ব্যবস্থা নেই। পণ্যমূল্য বাড়তে বাড়তে আর সসীম নয় অসীমে ছুটছে। প্রশাসনের শুধুই হুমকি, অসাধু ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করা হবে। এই প্রাণ ধারণের গ্লানি কবে শেষ হবে ইতিহাস জানে না!

আর কতো দূরে যেতে হবে

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

পিছুটান আমারও ছিল না
সম্মুখেই চোখ রেখেছি
কেবল একান্ত আর্ত ঘুমের শরীর
রৌদ্রে জেগে ওঠে পুনরায়

পিছুটান তোমারও কি ছিল
কেবল পারদ-ভাঙা বিকেলের
আর্দ্র ধূসরতা আর
চোখে থই থই পুনরুত্থানের মন্ত্র বাজে

সমুদ্র-সন্নিভ ভালোবাসা
ক্লিশে-ক্লান্ত উপমার মতো
সমুদ্র-সন্নিভ ভালোবাসা
অলিন্দের প্রান্ত ছুঁয়ে থাকা

কতদূর কতদূর কতদূর তবে
কনিষ্ঠায় ধরে রেখে সঞ্চারী বিশ্বাস
আমাদের আর কতো দূরে যেতে হবে

এই শব্দ

জয়তী রায়

এই শব্দ ছেনে কার প্রতিকৃতি
তুই রেখে যাস ঘরের সমুখে,
কার গত জন্মের পাপ
নক্ষত্রের ক্রোধ
ফেটে পড়ে যোজন যোজন,
ছায়াপথ মাড়িয়ে মাড়িয়ে
পৃথিবীর সুষমায় ।
কোন ফুল জন্মান্ধ ছিল,
কার স্নেহ ভুল পথে এনেছিল
এই ব্যভিচার ?
অসহ আর্তিতে কার কণ্ঠ চেপে ধরে
কদমের রোমহর্ষ ঢেকে রাখে
নিজস্ব স্বরূপ—
গান ভুলে গেলে এখনও কি নেমে আসে
শাসনের চোখ !
অথচ আশ্চর্য সূর্যাস্ত ছিল
মাঠের ওপারে
সবুজ বৈঁচির ঝোপে
জোনাকিরা খেলা করেছিল :
সেই নীল এখনও উজ্জ্বল করে
ঘরের চৌকাঠ ;
তবে কেন ফুঁসে ওঠে সবুজ বাতাস
কার ক্রোধ ভেঙ্গে ফেলে
মূর্তি প্রতিদিন ।

স্মৃতিস্বপ্ন

নারায়ণ সেন

এই তো সেই গলি
এই গলির ভেতর দিয়েই হেঁটে আসতেন আমার বাবা
এই গলির ভেতর দিয়েই মনে আছে একদিন
আমার ছেলেবেলা চিরকালের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে গেল
আর ফিরে এল না, ভাঙা পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে
আজও আমি দেখতে পাই কিভাবে শীতের সকাল হেঁটে আসে
সন্ধ্যা এসে বসে থাকে জবুথবু ঘরের দাওয়ায় ।

আজ বাবা নেই, তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন দেশে
চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় পড়াপাঠা ছেলে
ভিখিরি মায়ের কোলে শুয়ে থাকে অবাঞ্ছিত শিশু
ফুটোফাটা ছেঁড়া কাথার মতো ।

রাত্রি হলে নষ্ট চাঁদেরা বেরিয়ে পড়ে
ঘরছাড়া গরুর মতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে মনচোরা নারী
তবু এই গলি, এখনো সন্ধে হলে ডাকে
ঘুমও পাড়ায় ঠিক মায়েরই মতন ।

এখনও এই গলির ভেতরে হাঁটে বাবা
এখনও খৈ মুড়ির মতো স্নেহ সোহাগ ভালোবাসা ছড়িয়ে ছিটিয়ে
কে যেন দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধকারে
সে কি আমার মা ? ভাঙা পাঁচিলের ধারে ঘন ছায়ায় দাঁড়িয়ে
এখনো কাটা সুতো ধরে ভেসে যাওয়া অসংখ্য ঘুড়ির ।

সে তো আমারই ছেলে বেলা অন্য কারো নয়
এমন ছলনা হাতছানি, স্বপ্ন সে কি মিথ্যে হতে পারে !

কাঁচের গ্লাস

দেবেশ দাস

গত পরশু রাতে হুইস্কি ঢালা হয়েছিলো
তিন সার্থক প্রবাসী বন্ধুকে সেলিব্রেট করলাম
সারারাত ভালোবাসার কথা মাটি দিয়ে চেপে রেখে

বহুদিন পর অনেকে কাছাকাছি হওয়ায়
উষ্ণতার আগুনে গলে ঘর ভরে গেছিলো
শৈশবে, যৌবনের কলেজ লনে, একগোছা
ফুলের তোড়ায়

সবাই চলে গেলে পর ওখানেই জল দিয়ে
ডুবিয়ে রেখেছি একটা ক্রিসেন্থিমামের ডাল
দুটো ফুল ঝরে গেছে, কুঁড়িটা
প্রতিকূল হাওয়ায় লড়াইয়ে ব্যস্ত
নিজেকে ফুটিয়ে তুলবে বলে ।

দেখি নাই ফিরে

সমরেশ বসু

চিত্র □ বিকাশ ভট্টাচার্য

॥ ছত্রিশ ॥

শ্রাবণের শুক্লপক্ষ শেষ। কৃষ্ণপক্ষ চলছে। শিক্ষা, বিদ্যা, কলাভবন থেকে শুরু করে সমস্ত বিভাগ খুলে গিয়েছে। শালবীথির ধারে ঘণ্টাতলায় আবার ঘণ্টা বাজছে। শিশু বিভাগের ছেলেমেয়েদের কলকলানির সঙ্গে, আশ্রমের পাখিরাও গলা মিলিয়েছে। মানুষের জগৎ সম্পর্কে অবোধ পাখি-পাখালিরা যেন কিচিরমিচির ডাকে, অথবা শিস্ দিয়ে জিজ্ঞেস করছে, "কোথায় ছিলে বন্ধুরা? তোমরা এসে আমাদেরও ঘুম ভাঙালে।"

রামকিঙ্করের এ কল্পনা যেন একান্ত মিথ্যা না। কচিকাঁচা থেকে শুরু করে বড়োরাও অনেকেই চলে গিয়েছিল। গিয়েছিলেন শিক্ষকরাও। কিচেনে ভোজের রাজ্য ছিল বন্ধ। কাকেরা দেশান্তরী হয়েছিল। কাঠবেড়ালিরা কোথায় পালিয়েছিল, আশ্রম ছিল যেন এক শূন্য মন্দিরের মতো। এই বিরাট আশ্রম-মন্দিরের ওরাই বিগ্রহ। শালবীথির পশ্চিমের খোলা অঙ্গনে বিস্তর শিউলি গাছ। ছোট ছোট গাছ গুলোর কোনোটাতে এই শ্রাবণেই দু-চারটি করে ফুল ধরতে আরম্ভ করেছে। সকালে শিউলিতলায় শিশুদের ভিড়। যে-ক'টি ফুল মেলে, তাও যে অনেক সাধের। আর কোথা থেকে এলেন চিকণ কালা, পাশে সাদা পাখা দোয়েল মন্দ? শিস্ দিয়ে ঘরণীকে বড়োই ডাকাডাকি। ওরা বোবা ছিল, নাকি রামকিঙ্কর কানে কালা ছিল, বলা কঠিন। কুহু রব আজও থামেনি। থামবে সেই সাপ যখন গর্তে যাবে। উত্তুরে বাতাসের নখ যখন ধারালো হয়ে উঠবে, তখন।

এদিকে বলতে গেলে, লেগে গেল একটা গোলযোগ। অবস্থা ওলটপালট। গ্রীষ্মের ছুটির পরে পুরনো ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এসেছে বেশ কিছু নতুন ছাত্রছাত্রী। ভিড়ের কারণে মাথা গোঁজার ঠাঁইনাড়া হতে হলো অনেককে। তার মধ্যে রামকিঙ্করও বাদ যায়নি। কলাভবন আর শিক্ষাভবন মিলিয়ে যারা ছিল প্রাক্‌কুটিরে, তাদের কয়েকজনকে যেতে হলো পশ্চিম-দক্ষিণের সত্যকুটিরে। সত্যকুটিরের পশ্চিমেই বেণুকুঞ্জ। কুঞ্জবিহারী শাস্ত্রী মহাশয়ের বাসস্থান সত্যকুটিরের লাগোয়া, কিঞ্চিৎ পশ্চিমে। ছুটি কাটিয়ে

ফিরেছে প্রভাতমোহন, বিনোদবিহারী। নিশিকান্তও অল্প কিছুদিনের জন্য গিয়েছিল বসিরহাটের বাড়িতে। উদ্দেশ্য ? কবিতা রচনা অবিশ্যি। তার সঙ্গে আমন্ত্রণ। কাব্য আর শিল্পের সঙ্গে যেখানে ভোজের ব্যাপারটা শূন্য, নিশিকান্তর সাক্ষাৎ সেখানে কদাচিৎ মেলে।
ইতিমধ্যে বীরভদ্ররাও চিত্রা চাকরি পেয়ে চলে গিয়েছে লখনৌ। নতুন এসেছে বেশ কয়েকজন। বনবিহারী শেষ এসেছে বালি থেকে। প্রভাতমোহন, বিনোদবিহারী আর বনবিহারীর চেহারায় সামান্য একটা মিল আছে। তিনজনেই ফরসা। তিনজনেই মাথায় প্রায় সমান। বনবিহারী কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। অবিশ্যি তার চোখে চশমা নেই। নতুনদের মধ্যে আরও এসেছে গীতা রায়, বাসুদেবন, কাত্যায়নী দেবী, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপানাথ রামানুজ, কেশব রাও, রঘুবীর। ছেলেদের মধ্যে সবাই এসে ভিড় করলো সত্যকুটিরে। ছাত্রীরা গেল দ্বারিকে, ছাত্রী নিবাসে।
"প্রাক্ ছেড়ে সত্যে এলেও সব কুটিরেই গাদাগাদি।"
বিনোদবিহারীর মন্তব্য, "এভাবে বেশি দিন থাকা চলবে না। নিশ্চয়ই ব্যবস্থা একটা কিছু হবে।"
বনবিহারীর সহাস্য নিবেদন, "আপনাদের সুখের ঘরে ভিড় জমিয়ে ফেললুম।"
"কিছু নয় দাদা, কিছু নয়।" নিশিকান্তর নিশিচন্দ্রে সাদা দাঁতের ঝিলিক, "যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় নজন। আর যদি কিচেনে নাম না লিখিয়ে নিজের হাতে রান্না করে খান, তবে দেখবেন, সুজনদের সঙ্গে সুখী জীবনের কী স্বাদ!"
বিনোদবিহারীর গম্ভীর স্বরে ঈষৎ বক্রতা, "নিশিকান্তবাবু, ওটা সুখী জীবনের স্বাদ নয়। এক দিনে এক ডজন ডিম খেয়ে, দুদিন চিত্তির দিয়ে শুয়ে থাকার সুখ। আর ঐ যে তেঁতুল পাতার তুলনা দিলেন, ওটা এক আধদিন হট্টমন্দিরেই মানায় ভালো। যেখানে রোজ থাকতে হবে, সেখানে পোষায় না।"
"অবস্থাটা অবিশ্যি ততোটা খারাপ হয়ে ওঠেনি।" প্রভাতমোহনের বাস্তব বর্ণনাই সত্যি, "একেবারে গায়ে গায়ে গাদাগাদি করে নেই আমরা। তবে আমি শুনেছি, শিক্ষা আর কলাভবনের জন্য নতুন ছাত্রাবাসের কথা ভাবা হচ্ছে।"
বনবিহারীর স্বরে জিজ্ঞাসু অনুসন্ধিৎসা, "এক দিনে এক ডজন ডিম খেয়ে দুদিন চিত্তির দিয়ে শুয়ে থাকার সুখটা বুঝলুম না।"
"কী করে বুঝবেন ?" বিনোদবিহারীর গম্ভীর মুখে হাসি ফুটেছে, "আপনি কি একলা হাঁড়িতে খিচুড়ি রেঁধে, একদিনে এক ডজন ডিম কখনো খেয়েছেন ?"
বনবিহারী অবাক চোখে তাকিয়ে ঘাড় নেড়েছে, "না মশাই। এক ডজন তো দূরের কথা, আধ ডজনও এক দিনে খাইনি।"
"এক দিনে এক ডজন সত্যি নয়/ পৌনে ডজন ঠিক আছে।"
নিশিকান্ত কবিতা শুনিয়েছে, "ছয়ে বারোয় মিল নয়/ নয়েতে হিসেব রয়েছে।"
বনবিহারীর অবাক হাসি ঘোচেনি, "তার মানে, একদিনে ন'টা ডিম খেয়েছেন ? হাঁস, মুরগি না পায়রার ?"
"হাঁসের।" নিশিকান্তর সহাস্য স্বীকারোক্তি। "মুরগির ডিম ছোট। পায়রার ডিমের তো কথাই নেই। দুডজনেও কুলোবে না। তবে কোথায় পাওয়া যায় তার খোঁজ জানি, খেয়েও দেখেছি কাঁচা। সব ডিমের স্বাদই এক। কাক শালিকের ডিমের খোঁজ পাইনি। পেলে দেখবো। তবে পায়রাগুলো রাগী আছে। বাসায় হাত ঢুকিয়ে ডিম নিতে যেতেই, উড়ে এসে গালে মেরেছিল পাখা ঝাপটার এমন থাপ্পড়, খুব হকচকিয়ে গেছলাম। পায়রারাও মারতে জানে।"
নিশিকান্তর স্বীকারোক্তিতে হাসির রোল পড়েছে। রামানুজ, রঘুবীরের বোধ হয় গা ঘুলিয়ে উঠেছে। এমনিতেই ওরা নিরামিষাশী। তার ওপরে ঐ সব অখাদ্যের কথা! নিশিকান্ত আরও দুজনকে দেখিয়ে হেসেছে, "আমি পৌনেতে ঠিকই। এরা হাফে। এর নাম প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এ ছিল রামকিঙ্কর বেজ। হঠাৎ প্রবাসীতে দেখলাম, ও হয়েছে রামপ্রসাদ দাস।"
আর এক প্রস্থ হাসি সত্যকুটিরে ঢেউ তুলেছে। বনবিহারী ছিল অন্ধকারে। রামকিঙ্করের মুখে ছিল অস্বস্তির হাসি। গ্রীষ্মের ছুটির অবকাশে বেআক্কেলে কাণ্ডটা ও ঘটিয়েছে। ঘটিয়ে এখন চুপ। ও মিসেস মিলোয়ার্ডের কাছে যখন আধুনিক ভাস্কর্যের শিক্ষা নিচ্ছে, রঙ তুলি থেকে এক দিনের জন্যও হাত গুটিয়ে নেয়নি। ঝোলা কাঁধে বাইরে যায়নি বটে, কাজ করেছে ঘরে বসে। তেল রঙের

কাজ বায়েন বউ অন্নপূর্ণার পরে আর হয়নি। কাজ করেছে জল রঙে। ওয়াশ জাতীয় কাজটি দেখে পছন্দ হয়েছিল মাস্টারমশাইয়ের। কলকাতাগামী একজনকে পেয়ে, সেই ছবিটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন 'প্রবাসী'তে। পত্র লিখে দিয়েছিলেন নিজে। ছবিটি ছাপা হয়েছে এই 'শ্রাবণ' সংখ্যায়। শিল্পীর নাম রামপ্রসাদ দাস। কে রামপ্রসাদ দাস? অচেনা নতুন নাম। কিন্তু প্রথম ছাপা ছবিতেই শিল্পীর অবনীন্দ্র-নন্দলালের ঘরানা চিনতে কারোর ভুল হয়নি। খোঁজ খোঁজ কে রামপ্রসাদ দাস। হতবাক অবাক ঝিলিক দেখা দিয়েছে নন্দলালের চশমার কাঁচে। 'প্রবাসী' পত্রিকার পাতা খুলে, তাকিয়েছেন রামকিঙ্করের মুখের দিকে, "এটা তো আমার চোখে পড়েনি! ও হে রামকিঙ্কর, তুমি আবার রামপ্রসাদ দাস হলে কবে? আমি তো ছবির তলায় তোমার নাম সইটার দিকে তাকিয়ে দেখিনি।"

"মাস্টারমশাই, দোষটা রামকিঙ্করবাবুর নয়।" বিনোদবিহারীর গম্ভীর অথচ সকৌতুক মন্তব্য শোনা গেছে, "দোষ তাদের, যারা ওঁর নাম পদবী নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে।"

বিনোদবিহারীর কথা শুনে সবাই এক প্রস্থ হেসেছে। হাসবার সুযোগ কেউ ছাড়তে চায় না। হাসতে পেলে কে আর বিরস মুখ দেখাতে চায়। সকলের বয়স আর পরিবেশটাও ভাববার। নন্দলালের বিস্ময় তবু ঘোচেনি, "কিন্তু এটাই তো ওর প্রথম ছাপা ছবি নয়। ও এখানে আসবার আগেই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে 'সীতা লব কুশ' ছবি। তাতে নাম ছিল রামকিঙ্কর প্রামাণিক। গত বছরের ডিসেম্বরে লখনৌ একজিবিশনে ও যখন সোনার মেডেল পেয়েছিল, তখন ও নিজে আমাদের শান্তিনিকেতন পত্রে পদবী সংশোধন করে দিয়েছে, প্রামাণিক নয়, বেজ। তারপরেও আবার রামপ্রসাদ দাস কেন?"

"রামকিঙ্করবাবু দশচক্রে ভগবান ভূত হয়েছেন।" বিনোদবিহারীর চোখের চশমার মোটা কাঁচে বুদ্ধিদীপ্ত হাসির ঝিলিক দিয়েছে, "নাম পদবী নিয়ে সকলের হাসি মস্করায় আবার নাম ছাপার আগেই কিঙ্করকে করে দিয়েছেন প্রসাদ। বেজকে দাস।"

সকলের হাসির মধ্যেই নন্দলাল মুখ তুলে তাকিয়েছেন রামকিঙ্করের বিব্রত লজ্জিত নত মুখের দিকে, "ওরকমটি আর করো নাই হে কিঙ্কর। এত বারে বারে নাম বদলালে চলে? বংশদত্ত নামটিই তো বেশ। রামকিঙ্কর বেজ। তোমার পদবী নিয়ে ক্ষিতিমোহনবাবু ব্যাখ্যা করেছেন। বেজ বৈর্জ্য বৈদ্য। তোমরাই হচ্ছো এ দেশের এককালের শল্যচিকিৎসক। কোন্ দুঃখে তুমি নামপদবী বদলাবে? কিন্তু এখন তো আর 'প্রবাসী'র ছাপা নাম বদলাবার উপায় নাই।"

"নাই যখন ছেড়ে দেন।" সকলের হাসির মধ্যে রামকিঙ্করের অস্বস্তিদায়ক স্বর শোনা গিয়েছে, "আর ঐরকম ভুল করব নাই।"

বনবিহারীকে ঘটনাটা শুনিয়েছে নিশিকান্ত। বনবিহারীর ফর্সা মুখে চেপা হাসি ফুটেছে। সকৌতুকে তাকিয়ে দেখেছে রামকিঙ্করের লজ্জিত সরল গ্রাম্য মুখের দিকে, "তার মানে আপনারা পেছনে লেগেই ওঁকে বিপথগামী করেছেন। দেখবেন মশাই, আমিও গ্রাম থেকে এসেছি। আমাকে নিয়ে পড়বেন না যেন।"

"বালি আবার গ্রাম হল কবে?" বিনোদবিহারীর মুখে হাসি। চশমার কাঁচে ভ্রূকুটি দৃষ্টি, "হ্যাঁ, এককালে বালি হয় তো গ্রাম ছিল। সে তো কলকাতাও তাই ছিল। বইয়ে পড়েছি, কলকাতা সুতানুটি গোবিন্দপুর তিনটি গ্রাম কিনেছিল ইংরেজরা। সুতানুটি গোবিন্দপুরের নাম লোকে ভুলে গেছে। আছে কেবল শহর কলকাতা। বরং নিশিকান্তবাবুদের বসিরহাটকে এখনও গ্রাম বলতে হয়।"

নিশিকান্ত দু' হাত তুলে উদাত্ত স্বরে কবিতা রচনা করেছে, "গ্রামের মানুষ ভাই, গ্রামীণ আমি/কলকাতার মানুষ ভাই, শহুরে তুমি।/ গ্রামের মানুষ বলে মোরে করো না তুচ্ছ/ কাক কি কোকিলই হই, পরিনি ময়ূর পুচ্ছ।"
"তার মানে, কলকাতার শহুরে মানুষরা কি ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করে থাকে ?" বিনোদবিহারীর স্বর ও মুখ গম্ভীর।
নিশিকান্ত হেসে বেজেছে, "তাই কখনো বলতে পারি মশাই ? গুরুদেবও তো কলকাতারই মানুষ। মাস্টারমশাইদের বাড়ি হাতিবাগানে। আপনারা সব এমনিতেই আসল ময়ূর। তবে কলকাতার ঠগ জোচ্চোরের জ্বালায়, গ্রামের মানুষরা দিশেহারা। কলকাতায় পা দিতেই ভয়।"
বিনোদবিহারী কোনো ব্যাপারেই সহজে দমবার পাত্র না, "ছিপ ফেলে, জলে চার ছড়িয়ে মাছ ধরেছেন কখনো ?"
"চার ছড়িয়ে ছিপ ফেলিনি।" নিশিকান্ত মাথা নেড়েছে, "এমনি ছিপ ফেলে মাছ ধরবার চেষ্টা করেছি। কোনোদিন বঁড়শিতে গাঁথতে পারিনি।"
বিনোদবিহারীর ফর্সা মুখে ফুটেছে বাঁকা হাসি, "তাহলে আর আপনি শিকারের কী বুঝবেন ? শহরের ঠগ জোচ্চোরেরা গ্রামের লোকদের জন্য চার ছড়িয়ে ছিপ ফেলে বসে থাকে। গ্রামের মানুষ তো ! চারের গন্ধে, টোপের লোভে, টোপ গেলে। আর বধ হয়। এখন পারেন তো, কলকাতার ঠগ-জোচ্চোরদের নিয়ে একটা কবিতা লিখে রেখে দিন। গুরুদেব বিদেশ থেকে ফিরলে দেখাবেন।"
সকলের হাসির স্রোতে নিশিকান্ত ভেসে গিয়েছে। বইয়ের পোকা বাক্যবাগীশ বিনোদবিহারীর সঙ্গে কথায় এঁটে ওঠা তার দায়। কবিতা সে যতোই ভালো লিখুক।

মিসেস মিলোয়ার্ড রবীন্দ্রনাথের ঘাড় আর দাড়িসুদ্ধু মুখ গড়ছেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে থাকতেই মাটি দিয়ে গড়ে, প্লাস্টারে ছাঁচ রেখে দিয়েছিলেন। সেই ছাঁচ থেকে আবার নতুন করে গড়ার কাজ শুরু করেছেন। নতুন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বনবিহারী, মূর্তি গড়বার কাজে কিছুটা উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। প্রভাতমোহন, সত্যেন বিশীর সঙ্গে রমেন চক্রবর্তীও নিয়মিত আসছেন পশ্চিম তোরণের দোতলায়। অনুকণার সঙ্গে নতুন ছাত্রী ইন্দুসুধা ঘোষ। নন্দলাল মাঝখানে কিছুদিন পশ্চিম তোরণের দোতলায় আসেননি। মিসেস মিলোয়ার্ড রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে হাত দিয়েছেন। সংবাদটা পেয়ে আবার রোজ আসতে লাগলেন।
রামকিঙ্কর লক্ষ্য করেছে মিসেস মিলোয়ার্ডের কাজ মাস্টারমশাইয়ের ভালো লাগছে না। ইতিমধ্যে মিসেস মিলোয়ার্ড কিছু নতুন কাজ শিখিয়েছেন ছাত্রছাত্রীদের। তার মধ্যে বিশেষ করে কোনো ছেলে বা মেয়েকে, নানান ভঙ্গিতে দাঁড় করিয়ে বা বসিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে দাঁড়ালে, সামনে ও পাশ থেকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেমন দেখায়। দেখিয়েছেন নানান ভঙ্গিতে বসিয়ে। প্রথমে দেখে মনে হয়েছে, ঐ কাজে এমন কী শেখার আছে। মিসেস মিলোয়ার্ডও ছাত্রছাত্রীদেব মনের এ কথাটা বোধহয় জানতেন। হয়তো নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানতেন। সেইজন্যই বোধহয় বলেছেন, "কেবল দেখা না। প্রত্যেকেই এ ভঙ্গিগুলো স্কেচ করে ফেল। তাহলেই দেখবে, কোথায় কী পরিবর্তন ঘটেছে।"
রামকিঙ্কর অবাক ! ম্যাডাম একটুও ভুল বলেননি। সামনে থেকে একজনের দাঁড়ানো মুখ চিবুক গলার সংস্থান দেখা যায় এক রকম। বসে পাশ থেকে দেখলেই, গলা আর চিবুকের সংস্থান যায় বদলে। চোখে দেখে মনে রাখার চেয়ে, স্কেচ করে দেখলে, তা আরও ভালো বোঝা যায়। মিস পট এই ধরনের কাজ শেখাননি। অথচ রামকিঙ্করের কাছে মনে হয়েছে, বাস্তব মূর্তি গড়ার কাজ শেখার ঐ রকমটাই সত্যিকারের হাতেখড়ি!
মিসেস মিলোয়ার্ড কি একজন বড় মূর্তি শিল্পী ? রামকিঙ্কর রবীন্দ্রনাথের পিছনের ঘেঁটি মাথার চুল আর সামনের দাড়ি পর্যন্ত গড়ে ওঠা মূর্তির দিকে তাকায়। ম্যাডামের মুখের দিকেও তাকায়। আর মনটা খারাপ হয়ে যায়। উনি কি গুরুদেবের বসে থাকা সামনের মুখের স্কেচ করেননি ? করে থাকলে কি তাঁর একবার চোখে ঠেকেনি, কোথায় যেন একটা কী গোলমাল আছে ? একটা অসঙ্গতি !

"ফলো মী।" মিসেস মিলোয়ার্ড বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে, উত্তরের গোয়ালপাড়ার পথে, ডাক দিয়েছেন পশ্চিমে ফিরে, "আমরা ঐ সাঁওতাল গ্রামে যাবো। ওদের বিভিন্ন ভঙ্গির স্কেচ তোমরা করবে। আমিও করবো। তারপরে আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো, পুরুষ আর মেয়েদের বিভিন্ন কাজের সময় তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গি কেমন দেখায়।"
সে-সব দেখান তিনি নিখুঁত। আঁকা স্কেচের মধ্যে মূর্তির বৈশিষ্ট্য কোথায় কেমন হবে, অনেক সময় ঘুরন-চৌকিতে তিনি নিজেই গড়ে দেখিয়েছেন। মিস পট ছোট লোহার যন্ত্র দিয়ে কোনোও এক জায়গায় সামান্য একটু ছুঁইয়ে পেশীর যে কুঞ্চন দেখিয়েছেন, মিলোয়ার্ড সেইভাবেই দেখিয়ে দেন, চোখের কোলে ছুঁইয়ে। নাকের পাশে, গালে অথবা চিবুকে ছুঁইয়ে। তিনি প্রত্যেককে হাতে ধরে শিখিয়েছেন, প্লাস্টার অফ প্যারিসে ছাঁচ তোলা। মিস পট শিখিয়েছিলেন কেবল সত্যেনকে। এখন প্রভাতমোহন, সুধীর খাস্তগীর, সত্যেন বিশী আর রামকিঙ্কর নিয়মিত শিখছে।
বনবিহারীর উৎসাহ সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই কমে এসেছে। সে এখন লাইব্রেরির দোতলায় আঁকার কাজেই বেশি ব্যস্ত। তা ছাড়া, বনবিহারীর সঙ্গে নিশিকান্তর ভাব জমেছে ভালো। যার প্রাণের দরজা খোলা, নিশিকান্ত সহজেই সেখানে ঢুকতে পারে। জয় করে নেয় গোটা মানুষটাকে। সেই দিক দিয়ে, রামকিঙ্কর নিশিকান্তকে ছাড়তে পারেনি। অবকাশে, গানের আসর বসলেই ও সেই আসরে বসে যায়।
মিসেস মিলোয়ার্ডের বর্তমান নির্দেশ, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে তাদের নিজের হাতে কিছু গড়তে হবে। বাইরে থেকে এঁকে নিয়ে আসা স্কেচ থেকে। অথবা পশ্চিম তোরণের দোতলায় কারোকে বসিয়ে, দাঁড় করিয়ে যদি গড়তে ইচ্ছা করে, তাও গড়তে পারে। বাইরে যেখানে খুশি ঘুরন-চৌকি আর মাটি নিয়ে গড়ে আনতে পারে। কিন্তু সবাইকেই গড়তে হবে। ছাত্রীরা কেউ হাত লাগায়নি। সত্যেন বিশী, রমেন্দ্র চক্রবর্তীর মতো কাজ দেখছে বেশি। গড়ছে না কিছুই। প্রভাতমোহন, সুধীর আর রামকিঙ্করের যেমন মাটি কেটে বয়ে আনার কামাই ছিল না, তেমনি গড়ার দিকেও তিনজনের ঝোঁক বেশি।
রামকিঙ্কর প্রথমে ঠিক করতে পারেনি, কী গড়বে। স্কেচগুলো হাতে তুলে দেখেছে। নিতান্ত ছোট মাপের পুতুল গড়ার ইচ্ছা ওর হয়নি। ও সুধীরকে ধরে বসলো, "আপনি পাশ ফিরে বসুন। আমি আপনার পাশ ফেরা বাস্ট গড়বো।"
সুধীর ভুরু কুঁচকে হেসেছে। আসলে লজ্জা পেয়েছে, "আমাকে নিয়ে কেন মশাই ?"
এই সব নবীন যুবাদের পরস্পরকে 'আপনি' 'মশাই' সম্বোধনের মধ্যে কী একটা কৌতুক আছে। যাদের পরস্পরকে তুমি বা তুই বলা উচিত, তারা বলে আপনি আজ্ঞে মশাই। সকলেরই বেশ বয়স্ক গম্ভীর ভাব। আসলে ভিতরের মন কাঁচা। বাইরের বয়স্কদের চোখে, অতএব কৌতুক। ব্যতিক্রম নিশিকান্ত। সে রামকিঙ্করকে সহজেই 'তুমি' করে নিয়েছে। বনবিহারীও তুমি হয়েছে। ছুটির পরে ফিরে এসে প্রভাতমোহন আর সুধীরও তুমি। হয়নি বিনোদবিহারীর সঙ্গে। তার কপা ট বন্ধ। দূরত্বটা কমাতে চায়নি। রামকিঙ্কর সুধীরকে মোড়ায় বসিয়ে, পাশ থেকে স্কেচ করেছে। প্রভাতমোহন দেখছে। সুধীর স্বয়ং মডেল। রামকিঙ্করের আঁকা স্কেচ দেখে সে খুশি। প্রভাতমোহনের আর নিজের কাজ করা হয় না। রামকিঙ্করের কাজ দেখছে।

"কাজের নেশাটা ভালো নয়। নেশা আর কাজে ডুবে যাওয়া আলাদা কথা। নেশায় একটা মত্ততা থাকে। কাজে মত্ততা থাকলে

চলে না। যদি মত্ততা এসে যায়, তবে কয়েকদিন কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়াই ভালো। জীবনের সব কিছুর সঙ্গে কাজও থাকবে। সৃষ্টির কাজে মন যদি আপনি ডুবে যায়, তবে তাকে আমরা বলি ধ্যান। কিন্তু শিল্পীও মানুষ। তার হুঁস থাকা দরকার। কথায় বলে, যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। রাঁধতেও হবে। চুলও বাঁধতে হবে। কথাগুলো বলেছেন নন্দলাল। রামকিঙ্কর মনে রেখেছে। সুধীরের আবক্ষ মূর্তি গড়তে গড়তেই, অবকাশ সময়ে হঠাৎ একদিন ওর মনে হল, বাড়িতে একটা চিঠি লেখা দরকার। আসলে ও সেই গত বছর হেমন্তে ঘর ছেড়ে এসেছিল। তারপরে আর ফিরে যায়নি। হেমন্তের পরে শীত বসন্ত গত হয়েছে। বাংলার নতুন বছরের এই শেষ শ্রাবণে আকাশ যেন মাঝে মাঝেই গুকু গুকু। মেঘ রোদের খেলায় আসন্ন শরতের আভাস। প্রকৃতিই যে ওর মনে ঘরের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে, তা ওর সচেতন ধারণায় নেই। কেবল মনে হলো, অনেকদিন ঘরের খবর নেই। বাঁকুড়ার খবর নেই। মা বাবা দাদা বউদি দিবাকর কেমন আছে, কিছু জানে ন। বিশ্বনাথ অতুলদেরই বা কী খবর? বাঁকুড়ার অনেক মুখের মধ্যে জ্বলজ্বলিয়ে উঠেছে অনন্ত জ্যাঠার মুখ। গত বছর চলে আসার আগে, অনন্ত জ্যাঠার সঙ্গে দেখা করে এসেছিল। জ্যাঠার চোখের দৃষ্টি কমে এসেছিল। শরীরটাও কেমন ভেঙে পড়েছিল। অথচ তার আগেই, রামকিঙ্করকে নিয়ে অনন্ত জ্যাঠা পাহাড়ে পথে পথে রঙ খুঁজে বেড়িয়েছে। বিদায় নিয়ে চলে আসবার সময় জ্যাঠার চোখ দুটি টলটলিয়ে উঠেছিল, "তু আবার সি খরা জ্বালার সোমায় আইসবি। বুড়া হঁইচি। কবে আছি, কবে নাই। ঘুরে আয়। দেখা হব্যাক..." খরা জ্বালা—গ্রীষ্মের ছুটিতে যাওয়া হয়নি। তার আগে অল্প কিছুদিনের শীতের ছুটি ছিল। তখন পৌষমেলা আর আশপাশের ছবি এঁকে বেড়িয়েছে। তারপরে এলেন মিস পট। তিনি গেলেন, মিসেস মিলোয়ার্ড এলেন। ঐরকম বাইরের অনেক পণ্ডিত পুরুষ-মহিলারা এসেছেন গিয়েছেন। আফ্রিকা থেকে এন্ড্রুজ ফিরে এসেছেন। ওর আর দেশে যাওয়া হয়নি। দেশের কথা মনে পড়লো। কেন পড়লো, তা ওর অজ্ঞাত। সকলের কথা মনে হলো। একবারও মনে হলো না, ওর কথাও বাঁকুড়ার ঘরে-বাইরের লোকেরা ভাবছে। কেবল মনে হলো, অনেকদিন হয়েছে, পৌঁছুনো সংবাদ ছাড়া আর কিছু জানানো হয়নি। ওর কথা জানতে চেয়েও কেউ কোনো পত্র লেখেনি। তা নিয়ে ওর অনুযোগ অভিযোগও কিছু মনে আসেনি। নিজের কর্তব্য ভেবে, বাবাকে চিঠি লিখেছে: "শ্রীচরণকমলেষু বাবা, অনেকদিন তোমাদের কোন খবর পাই নাই। ভাবিয়া মন খারাপ হইল। গ্রীষ্মের ছুটির সময় ঘরে যাওয়া হয় নাই। যাইবার কথা ছিল। নতুন শিক্ষার কাজ আসিল। আর যাওয়া হইল না। শ্রাবণ চলিয়া যাইতেছে। মনে পড়িল, অনেকদিন তোমাদের খবর পাই নাই। পূজার ছুটি হইবার আগেই ফিরিব। বিশ্বনাথ অতুলকে বলিবে। অনন্তজ্যাঠাকে বলিবে। তুমি আর মা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম লইবে। বউদি দাদাকে প্রণাম করি। দিবুকে আমার আদরবাসা দিবে। আশুদের খবর কতদিন পাই না। সকলের কথা মনে পড়ে। বাঁকুড়া একরকম। শান্তিনিকেতন আর একরকম। এখানে নিত্যনতুন কত মানুষ যে আসে। কত কত দেশের লোক আসে। দিন কোথা দিয়া কাটিয়া যায় বুঝা যায় নাই..."

গত পৌষমেলার আগেই লখনৌ থেকে সুবর্ণপদকের সংবাদ ছাপা হয়েছিল। সুবর্ণপদক এ শেষ শ্রাবণের মধ্যেও এসে পৌঁছায়নি। সে খবর কি বাবাকে চিঠিতে লিখবে? নিজেকে জিজ্ঞেস করেছে, সেই সে কোন কালের শিল্পী বালক এখন একুশ বছরের তরুণ। নিজেকে জিজ্ঞেস করেই, ওই কী লজ্জা! ও কথা কি নিজের হাতে লিখে বলা যায়? হলোই বা বাবা। কথাটা ও লিখতে পারেনি। সুবর্ণপদক যখন আসবে, বাড়ি নিয়ে গিয়ে দেখাবে। বন্ধুরা দেখবে। আশু মহারাজ দেখবেন। বিভূতিবাবু দেখবেন। আর অনন্ত জ্যাঠা দেখবে। জ্যাঠার ফর্সা হাসি মুখটি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। তার সেই চোখের দৃষ্টি। আনন্দেও চোখ জোড়া ভিজে ওঠে।

রামকিঙ্কর আরও ভেবেছে, পঁয়ত্রিশ টাকার কথা কি লিখবে? পদক এখনও আসেনি। কিন্তু লখনৌ থেকে অসিত হালদারের চিঠি আর মনিঅর্ডার এক সঙ্গেই এসেছে। ওর পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিটি একজন পঁয়ত্রিশ টাকায় কিনে নিয়েছেন। বিক্রির আগে, অসিত হালদার সম্মতি চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন নন্দলালকে। নন্দলাল অসিত হালদারের চিঠির বৃত্তান্ত রামকিঙ্করকে জানিয়েছিলেন। তাঁর চোখের চশমার কাঁচে ছিল স্নেহ স্নিগ্ধ খুশির হাসি, "শিল্পীর ভাগ্যে কখন কি ঘটে, কেউ বলতে পারে না। হয় তো পঁয়তিরিশ টাকাটা কম। যে একটা ছবির জন্য পঁয়তিরিশ দিতে পারে, সে পঞ্চাশ টাকাও দিতে পারে। ওরে সরস্বতীই যখন লক্ষ্মীর বেশে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, খারাপ কী? তোমার আপত্তি নাই তো?"

আপত্তি? রামকিঙ্কর প্রথমে বুঝতে পারেনি। কিসের আপত্তি? অই, মাস্টারমশাই যে কী বলেন! ও হেসে নতমুখে মাথা নেড়েছিল, "না না। উ... ও তো অনেক!"

"এই হল শিল্পীর কথা!" নন্দলাল মাথা ঝাঁকিয়ে হেসেছিলেন, "থাকা খাওয়া পরাটা চাই। তার বেশি আর কী? আমরা তো টাকা জমাই না। বেশি পেলে দেখা যাবে, নতুন কিছু করা যায় কি না। ছবি এঁকেছি। মাছের ভাগা তো বসাই নাই, দরাদরি আমাদের কাজ না। যাদের কাজ, তাদের। খুশি হয়ে যা দেবে, খুশি হয়ে হাত পেতে নেবো। এঁকেছি তো ছবি। যারা আঁকে, তারা সবাই শিল্পী না। যারা দেখে, তারা সবাই রসিক সমঝদার না। তোমার ভালো লেগেছে? ছবিটি সওদা করবে? ঐটি আসল পুরস্কার। টাকা দিলে। দশজনের মতো একজন হয়ে সংসারে থাকবো। তা হলে অসিতবাবুকে চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

তারপরেও আর ঐ কথা কেন? মাস্টারমশাই কথা শেষ করে চলে যাবার আগে রামকিঙ্করের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখেছিলেন। কোমল হাসি ছিল তাঁর মুখে, "তোমার হাতে মা সরস্বতী আরও শক্তি দিন।"

এই টাকার কথা কি বাবাকে লেখা যায়? রামকিঙ্কর ভেবেছে, আবার সেই নিজেকে জিজ্ঞাসা। নিজেকেই মাথা নেড়ে জবাব, "না।" বাঁকুড়া থেকে যা আয় করে নিয়ে এসেছিল, তা কি ও সব খরচ করেছে? প্রায় দশ মাস হতে চলেছে। ও বেহিসেবি হয়নি। এখনও পর্যন্ত বিড়ি কেনার পয়সা কারোর কাছে ধার করেনি! নিশিকান্তর সঙ্গে খিচুড়ি আর ডিম খেতে গিয়ে, ওকে বাড়তি দু টাকা চার আনা দিতে হয়েছে। ভুবনডাঙার দোকানীর ধার মেটাতে। দু টাকা চার আনায় দুশো হাঁসের ডিমের ঋণশোধ। নিশিকান্ত ওর কাছে আর টাকা চায়নি। নিশিকান্ত গুরুদেবের মতো ছবি আঁকতে চায়। আঁকুক। রবীন্দ্রনাথের দুটি ছবি ও দেখেছে। মনে একটা অস্পষ্ট কল্পনা এনে দেয়। কিন্তু অনুকরণের কোনো ইচ্ছা ওর হয়নি। কিন্তু নিশিকান্তর মতো প্রাণ কার আছে? ঐরকম গান কে বাঁধতে পারে? সুরটা অবিশ্যি দেয় শান্তিময় ঘোষ। কালীমোহন ঘোষ মশাইয়ের বড় ছেলে। গুরুদেবের গান যেমন গাইতে পারে, নাচতেও পারে তেমনি। সেই কোন্ ছেলেবেলা থেকে আশ্রমের থিয়েটারে ওকে সাজিয়ে গান করানো শুরু হয়েছিল। রামকিঙ্কর শান্তিময়ের সেই ছেলেবেলাটা দেখেনি। কিন্তু এখন দেখছে প্রায় তরুণ গায়ককে। নিশিকান্তর গানের দল ছাড়াও, রামকিঙ্কর তার হেঁসেল ছেড়ে আসতে পারেনি। টাকা যদি সে চায়, ও দেবে। এখনও ও বাঁকুড়ায় ফিরে যাবার রেলগাড়ি ভাড়া ছাড়াও, পাঁচটি চকচকে সিকি ওর পিঁপড়ের গর্তে রেখে দিয়েছে। সত্যি কি আর পিঁপড়ের গর্তে পয়সা রাখা যায়? পয়সা রাখার জায়গাটি ওর কাছে পিঁপড়ের বাসা।

না, পঁয়ত্রিশ টাকার কথা ও বাবাকে লেখেনি। পুজোর ছুটির সময় যখন যাবে, তখন যতোটা পারবে, বাবার হাতে তুলে দেবে। কথাটা মনে হতেই মায়ের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। সংসারের যে কী নিয়ম। বোঝা যায় না। ছেলে হয়ে সংসারে টাকা দিতে হলে বাবার হাতেই দিতে হয়, বাবা তুলে দেয় মায়ের হাতে। মায়ের আনন্দও সেটাই। মা ঐরকমই চায়। পুত্রের উপার্জিত ধন, বাবা

তুলে দেবে গর্ভধারিণীর হাতে।
চিঠি চলে গেল। সুধীরের আবক্ষমূর্তি পাশ থেকে ফিরলো সামনে। রামকিঙ্করের নিজের ইচ্ছায়। পাশ ফেরানো মূর্তিটা মনের মতো হচ্ছিল না। সুধীরকে আবার মুখোমুখি বসিয়ে স্কেচ করলো। মূর্তির প্রাথমিক কাজ করলো দুদিনে। মাটিতে সুধীর আবক্ষ ফুটে উঠতে লাগলো দ্রুত। মিসেস মিলোয়ার্ড তিনদিন ধরে দেখলেন। কিছু বললেন না। চতুর্থ দিন তাঁর মুখে অবাক খুশির হাসি, "আমার দেখিয়ে দেবার মতো কিছুই বাকি নেই। এক কথায় চমৎকার।"
ছাত্রভবনের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা রামকিঙ্করের কাজ দেখতে এলো। মাস্টারমশাই নন্দলালও এলেন। তাঁর চশমার কাচে খুশির ঝিলিক, "রামকিঙ্করের হাতকে রোখা যাবে না। সুধীরকে আমি জীবন্ত দেখছি এই মূর্তিতে। আর যিনি শেখান, তাঁর হাতের কাজ দেখ। ভদ্রমহিলা গুরুদেবের কী একটা মূর্তি দাঁড় করিয়েছেন। আবার বলছেন, ওটাকে ওঁর দেশে নিয়ে গিয়ে মার্বেলে গড়বেন। যা খুশি তাই করুন। তোমরা যা পারো শিখে নাও।"
রামকিঙ্করের সুধীর দেখে, বনবিহারী আবার পশ্চিম তোরণের দোতলায় আসতে আরম্ভ করলো। মন্দাকিনী আর গীতা নামে দুই ছাত্রীও এলো। মিসেস মিলোয়ার্ড তখন জীবন্ত মডেল রেখে কাজ শুরু করার নির্দেশ দিলেন। নন্দলাল শুনলেন। প্রথম দিন কোনো জবাব দিলেন না। পরের দিন প্রশ্ন তুললেন, "কী রকমের জীবন্ত মডেল হবে?"
"আমি নগ্ন মেয়ে পুরুষকে নিয়ে কাজ এখনই চাই না।" মিসেস মিলোয়ার্ড জবাব দিলেন, "যে ছাত্রছাত্রীরা মডেল সামনে রেখে কাজ করতে চায়, মডেলের খরচটা তাদেরই দিতে হবে। মডেলরা আসবে জামাকাপড় পরে।"
নন্দলাল হাসলেন, তাঁর হাসিতে স্বস্তি, "শুরু হোক।"
শুরু হলো। সাঁওতাল মেয়ে পুরুষরা এলো পশ্চিম তোরণের দোতলায়। রামকিঙ্কর ওদের দেখে চিনতে পারলো না। এতো ওদের জামাকাপড়ের বহর! সেই জন্মকাল থেকে যে-মাঝি মাঝিনদের দেখে এসেছে, তারা প্রায় ভদ্রলোকের মতো সেজে এসে বসলো, মেয়েরা জামা গায়ে দেয়নি। কিন্তু এমনভাবে শাড়ি জড়িয়ে এলো, যেন ওরা সেজেগুজে থিয়েটার করতে এসেছে। সবাই খুব উৎসাহ নিয়ে আগে স্কেচ করতে শুরু করলো। রামকিঙ্করের কোনো উৎসাহ নেই। মাঝি-মাঝিনদের সেই হাসিখুশি চেহারা নেই। যারা দুতিনজন এসেছে, কাঠ হয়ে সব বসে থাকে। রামকিঙ্কর চেষ্টা করেছে সুধীর খাস্তগীরের চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে। তবু সবাই বলেছে জীবন্ত। মাঝি-মাঝিনদের মূর্তি গড়ার সময়, মিসেস মিলোয়ার্ডের সেই সব নির্দেশ কোথায় গেল?
রামকিঙ্কর দেখলো কৌতূহলী দর্শক মাঝি-মাঝিনদের। যারা তাদের সাজগোজ করা মডেলদের দেখতে এসেছে। আশ্রমের বাবু বিটা বিটিদের আঁকা গড়া দেখে, ওদের চোখে মুখে কী কৌতুকের হাসি! রামকিঙ্করের ইচ্ছা হলো, দর্শক মাঝি-মাঝিনদের স্কেচ করবে। মাটিতে গড়বে। মাঝখান থেকে ওর চকচকে একটা সিকি গেল জলে। ওর মূর্তি গড়ার কাজের সব উৎসাহ যখন নিবু নিবু বাতির মতো, তখন মিসেস মিলোয়ার্ড খুলে ধরলেন ল্যান্টারির সম্পাদিত বই। ইংরেজি বইয়ের নাম "মডেলিং-এ গাইড ফর টিচার্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস।" দু খণ্ডের দুটি বই। ভিতরের পাতায় পাতায় মেয়ে পুরুষের ছবি। পোশাক পরা। নগ্ন। তাদের শরীরকে নানাভাবে টুকরো টুকরো করে দেখানো হয়েছে গড়ার পদ্ধতি। মেয়ে পুরুষ ছাড়াও আছে প্রকৃতি। গাছপালা ফুল পাখি পতঙ্গ। আছে ঘোড়া বগু বাঘ সিংহের মূর্তির নানা ভঙ্গি। মানুষ ও প্রাণীর কঙ্কালের ছবি। আর ছোট মূর্তি না। প্রমাণ মাপের চেয়েও বড় মূর্তি তৈরির প্রথম শুরু লোহার শিক বাঁকিয়ে আর্মেচার তৈরি। মাস্টারমশাইয়ের শরণ নিতে হল। লোহা কেনার টাকা চাই। কেবল লোহা হলে হবে না। সীসাও চাই। বৃহৎ প্রতিমা মাপের মানুষ আর প্রাণীর মূর্তি গড়তে হলে আর্মেচার হল প্রধান কাজ। প্রতিমার যেমন কাঠামো। বাঁকড়ি যাকে বলে ম্যাড় বাঁধা। ইংরেজিতে আর্মেচার। তার আছে

নানান মাপজোক। কত বড় মূর্তি হবে। কত ভার লোহা আর সীসার কাঠামোকে বইতে হবে, আর্মেচার তৈরি হবে সেই মাপে। মাস্টারমশাই লোহা আর সীসা আনিয়ে দিলেন। রামকিঙ্কর, প্রভাতমোহন, সুধীর, সত্যেন, বনবিহারী সেই কাজে লেগে গেল। তারই সঙ্গে দেহ সংস্থান বোঝার জন্য দরকার হয়ে পড়লো নরকঙ্কালের। কোথায় পাওয়া যাবে? উত্তরের গোয়ালপাড়ার পথে। না। এখানে কঙ্কাল মিলবে না। কঙ্কাল মিললো কঙ্কালীতলায়। কোপাইয়ের ধারের শ্মশানে। কিন্তু আস্ত একটা মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যায় না। মাথার খুলি আর হাত পা, শরীরের নানা অংশের হাড়ের টুকরো কুড়িয়ে আনলো রামকিঙ্কর, প্রভাতমোহন, সুধীর। মিসেস মিলোয়ার্ড দেখে, দুঃখে হাসলেন। হতাশায় মাথা নাড়লেন, "একটা আস্ত নরকঙ্কাল না হলে, এভাবে কিছু করা সম্ভব নয়।"
মাস্টারমশাইয়ের কানে কথাটা গেলো। সাতদিনের মধ্যে কলকাতা থেকে লোকের হাতে এলো একটি কাঠের বাকসো। বাকসো এলো পশ্চিম তোরণের দোতলায়। বাকসো খুলে দেখা গেল একটি আস্ত নরকঙ্কাল। মিসেস মিলোয়ার্ডের সঙ্গে, সকলেই হাততালি দিয়ে নেচে উঠলো। শুরু হলো নতুন কাজ। রামকিঙ্কর এই নরকঙ্কাল ছাড়াও ল্যান্টারির বই নিয়ে কাটাতে লাগলো দুপুর বিকেল। মহা ভাদ্রের দীর্ঘতম বেলায় শরত এসেছে রৌদ্রচ্ছায়ায়। কোপাইয়ের জলে আকাশের নীল প্রতিবিম্ব। গাছপালা গাঢ় সবুজ। দেখলে মনে হয় যেন পাতায় পাতায় কাজল কিরণ।
মিসেস মিলোয়ার্ডের বিদায় আসন্ন হয়ে এলো। আশ্রমে পুজোর ছুটি সাড়া পড়েছে। রামকিঙ্করের কোনো খেয়াল নেই। নতুন কাজ শেখার ধ্যানে ডুবে আছে। বাঁকুড়ার চিঠি এলো। হাতের লেখা চেনা। অতুলের হাতের লেখা। বয়ান হলো চণ্ডীচরণ বেজের, "তোমার চিঠি পাইয়াছি। বিশেষ দুশ্চিন্তায় ছিলাম। গরমের ছুটিতে আস নাই। পত্রপাঠ আসিবে। তুমি আসিয়া দুর্গাতলায় প্রতিমা গড়িবে। তোমার অনন্ত জ্যাঠার নিদান হইয়াছে। তোমাকে দেখিতে বড় সাধ ছিল..."
আহ্। রামকিঙ্কর কি ভুল পড়েছে? অতুলের চেনা হাতের লেখা বারে বারে পড়েছে, "তোমার অনন্ত জ্যাঠার নিদান হইয়াছে। তোমাকে দেখিতে বড় সাধ ছিল। এ জীবনে আর হইবে না..."
ল্যান্টারির বইয়ের খোলা পাতা চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে উঠেছে। একটি স্নেহ মুগ্ধ বৃদ্ধের ফর্সা মুখ ভেসে উঠেছে, 'গ্রেজ এ্যানাটমির' ছবির পাতায়। "অই কিঙ্কর, তুর হাতে মা ভর করেচ্যেন..."

(ক্রমশ)

পূর্ব-পশ্চিম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তর পর্ব : ৩

সাদা পা জামা আর তাঁতের পাঞ্জাবি পরা, তার ওপর একটা গরম হাফ-কোট, আর মুখে পাইপ নিয়ে শেখ মুজিব বসে আছেন তাঁর বত্রিশ নম্বর ধানমণ্ডির বাড়িতে, বসবার ঘরে। সারাদিন ধরে মানুষজন আসার বিরাম নেই, আসছে অজস্র মিছিল, পার্টিকর্মী ও শুভার্থীরা ঘিরে বসে আছে তাঁকে। কথা বলতে বলতে শেখ সাহেবের মুখে ফেনা উঠে আসছে। তাঁর পাশেই সাদা পাজামা ও পাঞ্জাবির ওপর একটা শাল জড়িয়ে বসে আছেন তাজুদ্দীন, তাঁর মুখে অজস্র চিন্তার রেখা, থুতনিতে একটা আঙুল। এক এক সময় ক্লান্ত হয়ে গিয়ে শেখ মুজিব অত্যুৎসাহীদের বলছেন, তোমরা তাজুদ্দীন সাহেবের সাথে কথা কও, আমারে একটু চিন্তা করতে দাও।

দু'দিন আগেই "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" এবং "স্বাধীন বাংলা শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ" প্রতিরোধ দিবস পালন করেছে। দেশের জনসাধারণ এখন উত্তাল। শেখ মুজিবের ঐ দোতলা বাড়ির ছাদে শস্যশ্যামলা বাংলার প্রতীক সবুজের পটভূমিতে, শহীদের রক্তে-রাঙা সূর্যের প্রতীক লাল বৃত্তের মধ্যে, সোনালি রঙে পূর্ববাংলার মানচিত্র আঁকা এক নতুন পতাকা। শ্রমিক নেতা আবদুল মান্নান ঐ একই রকম আর একটি পতাকা তুলে দিয়েছে বাড়ির সামনে। এই বাড়ি এখন ছাত্র, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবীদের এক বৃহৎ অংশের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র।

শেখ মুজিবের মুখে, চোখে, ভুরুতে নিদারুণ অস্বস্তি। স্বাধীন বাংলা! পাকিস্তান কি ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছে? পাকিস্তান ভাঙা কি এতই সহজ? তা ছাড়া, কেনই বা তিনি পাকিস্তান ভাঙতে চাইবেন এখন! ছয় দফা দাবীর জয় হয়েছে, এবারের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবার পর বাঙালী মুসলমানের হাতে শাসন ক্ষমতা না দিয়ে ইয়াহিয়া খান যাবে কোথায়? শেখ মুজিব গোটা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব পেলে তিনি পাকিস্তান ভাঙতে যাবেন কেন?

ছাত্ররা ছয় দফার থেকেও বাড়িয়ে এগারো দফা দাবী তুলেছে। স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন বাংলা রব উঠেছে চতুর্দিকে। সামরিক শাসকদের হাত থেকে দেশের অর্ধেক অংশ ছিনিয়ে নেওয়া কি মুখের কথা? তিনি প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু বাংলার মাটির দুর্গ পশ্চিম পাকিস্তানীদের কামানের মুখে কতক্ষণ টিকবে? শুধু মনের জোর দিয়ে কি রাইফেল-বোমার বিরুদ্ধে লড়া যায়? তিনি পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা আটানব্বই ভাগ ভোট পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যদি সত্যি লড়াই লাগে তাহলে কি এ দেশের সব মানুষ তাঁর পিছনে এসে দাঁড়াবে? যদি লড়াই লাগে…সে লড়াই কতদিন ধরে চলবে ঠিক নেই, কত লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট হবে, সে দায়িত্ব তিনি একা নেবেন?

পার্টির উগ্রপন্থী সদস্যরা তাঁকে বারবার বলছে ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের সঙ্গে আলোচনায় আর যোগ না দিতে। অযথা কথা বাড়িয়ে, দেরি করিয়ে দেবার কৌশলে ওরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরও সেনা আনাচ্ছে। কিন্তু শেখ মুজিব এখনও চূড়ান্ত বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। তাঁর এখনও ধারণা, ইয়াহিয়া খান লোকটা আইয়ুবের মতন কূটকৌশলী নয়, এর চক্ষু লজ্জা আছে, নির্বাচনের ফলাফলকে এই সেনাপতি মর্যাদা দেবে। আলাপ, আলোচনা এখনো একেবারে অন্ধ গলিতে পৌঁছোয়নি, আজ রাত্রেই একটা কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে যেতে পারে।

মাঝখানে বেশ গরম পড়ে গিয়েছিল, আজ আবার একটু শীত শীত ভাব। থমথম করছে বাতাস। প্রত্যেকটি মানুষের মুখে কী হয় কী হয় ভাব। আজ সারাদিন ধরেই একটা গুজব চতুর্দিকে ঘুরছে যে যে-কোনো মুহূর্তেই মিলিটারি এসে আওয়ামী লীগের সব নেতা এবং ছাত্র নেতাদের বন্দী করবে!

সকাল থেকে পঞ্চান্নটি মিছিল এসেছে শেখ সাহেবের কাছে, তার মধ্যে শুধু মহিলাদেরই মিছিল ছিল ছটা। সকলেরই এক কথা, এবারে কিছুতেই সামরিক শাসকগোষ্ঠীর কাছে নতি স্বীকার করা হবে না। শেখ মুজিব অভিভূত হয়ে পড়ছেন। দৃঢ় ভাষায় তাদের ভরসা দিতে গিয়েও তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে যাচ্ছে। যদি সত্যিই রাষ্ট্রবিপ্লব বেঁধে যায়, কোন কোন দেশ সাহায্য করবে, কারা অস্ত্র দেবে? যদি কেউ না দেয়? যদি ইণ্ডিয়াও দেোনা মনা করে? তা হলে কামানের মুখে ছাতু হয়ে যাবে এই সব সরল, তেজী

আদর্শবাদী ছেলে মেয়েগুলো ! না, শেখ মুজিব এখনও আলোচনার টেবিলে বসে সমাধান সূত্র খুঁজতে চান। খানিকবাদেই ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের সময় নির্দিষ্ট আছে।

হুড়মুড় করে একদল ছাত্রলীগ জঙ্গী বাহিনীর ছেলে ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। তাদের মুখপাত্র হয়ে কামরুল আলম খসরু বললো, মুজিবভাই, আপনি আন্ডার গ্রাউন্ডে চলুন। আপনার এখন বাড়িতে থাকা ঠিক হবে না।

মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে শেখ মুজিব প্রবল ভাবে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, তোরা তৈরি হ-গে যা ! আমার জন্য ভাবিস না। আমার আর কী করবে, বড় জোর ধরে নিয়ে যাবে। তা বলে আমি চোরের মতন পালিয়ে যেতে পারি না। তা ছাড়া আমি পালিয়ে গেলে আমার খোঁজে ওরা সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার চালাবে, বাড়ি ঘর পুড়ায়ে দেবে। আমার লোকদের আমি বিপদের মুখে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে পারি না।

কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি হলো, কিন্তু শেখ মুজিব অনড়। তিনি আলোচনার শেষ দেখতে চান !

ছাত্রদলের সঙ্গে সিরাজুলও বেরিয়ে এলো বাইরে। একজন কেউ বললেন, আচ্ছা শেখ সাহেব তো গোঁয়ারের মতন বসে থাকবেনই ঠিক করেছেন, কিন্তু ভাবী আর ছেলেমেয়েদের এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত না ? সংগ্রাম শুরু হলে এই বাড়িই তো ফার্স্ট টার্গেট হবে।

সিরাজুল আবার ভেতরে খবর নিতে গেল। ফিরে এসে জানালো যে ভাবী আর পরিবারের অন্য সবাই শামিবাগে এক আত্মীয়ের বাড়িতে চলে গেছেন।

এবার ওরা চললো জহুরুল হক হলের দিকে। তার আগে, মধুর ক্যান্টিনে ছাত্র লীগের মিটিং আছে রাত এগারোটায়।

পাকিস্তানের ভাবমূর্তির স্রষ্টা কবি ইকবালের নামে ছিল ছাত্রদের একটি হস্টেল, ইকবাল হল। ছাত্ররা সেই নাম বদলে দিয়েছে। সামরিক বাহিনীর সাজানো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের মতনই আর একজন আসামী ছিলেন সার্জেন্ট জহুরুল হক। বিচার শেষ হবার আগেই কারাগারের মধ্যে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয় এই সৎ মানুষটিকে। ছাত্ররা তাই তাঁকে স্মরণীয় করেছে ইকবালের নাম মুছে দিয়ে।

জিন্নার নামে যে রাস্তা, সে রাস্তার নামও পাল্টে সূর্য সেনের নামে রাখার দাবী তুলেছে ছাত্ররা।

—মধুদা, পাঁচ কাপ চা !

অন্যরা এখনো আসেনি। সাজাহান সিরাজ ও নজরুল ইসলাম না এলে মিটিং শুরু করা যাবে না। চা খেতে খেতে কাদের জিজ্ঞেস করলো, এই সিরাজুল, তুই যার বাসায় থাকোস, সেই বাবুল মিঞা এক আর্মির মেজরের কোয়ার্টারে যাতায়াত করে ক্যান রে ?

সিরাজুল কিছু উত্তর দেবার আগেই অন্য একজন বললো, মদ মুদ গেলতে যায় বোধ হয় ! আমাগো প্রফেসরদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছে ফিফ্‌থ কলামনিস্ট !

কাদের বললো, কিন্তু বাবুল চৌধুরীরে ভালো মানুষ বইলাই জানতাম। মদ তো খাইতো না আগে, সিগারেটও টানতে দেখি নাই। হ্যার পোশাক পরিচ্ছদের মতন মানুষটাও ক্লিন আছিল।

—আলতাফের ছোট ভাই তো ! ঐ আলতাফের পত্রিকা এই ইলেকশানের সময় আওয়ামী লীগকে সাপোর্ট করে নাই। হেই কাগজের মালিক ঐ হোটেলওয়ালা হোসেন মিঞা আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিডেটের এগেইনস্টে কনটেস্ট করছিল। ওরা সব কয়টাই দুই নম্বরী !

—আমি বাবুল চৌধুরীর কাছে পড়ছি। এমনিতে তো মার্কসিস্ট, অথচ আর্মির সাপোর্টার কিছুদিন আগেই চীনা ঘুইরা আসলো।

—ঐসব ফরেন ট্রিপের লোভেই তো আমাগো তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালরা আর্মির ধামা ধরে। এইসব কয়টা হারামখোররে একদিন খতম করতে হবে !

—কী রে, সিরাজুল, চুপ কইরা আছোস ক্যান ? বাবুল চৌধুরীর নুন খাইছোস, তাই কিছু বলবি না।

সিরাজুল মাথা নীচু করে রইলো। বাবুল চৌধুরীকে এক সময় সে পীরপয়গম্বরের মতন ভক্তি শ্রদ্ধা করতো। এই মানুষটির জন্য সে মনিরাকে

নিয়ে গ্রাম থেকে চলে আসতে পেরেছে। ঢাকা শহরে আশ্রয় পেয়েছে। বিদ্বান ও নিখুঁত ভদ্রতার প্রতিমূর্তি বাবুল চৌধুরী ছিল তার আদর্শ পুরুষ।

সেই বাবুল চৌধুরী তার শ্রদ্ধার আসন থেকে কত নীচে নেমে এসেছেন!

সারা দেশ যখন শেখ মুজিবের নামে রোমাঞ্চিত হচ্ছে, তখনও বাবুল চৌধুরী উঠতে বসতে শেখ সাহেবের নামে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। জামাতে ইসলামীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে বলে যে ছয় দফা হলো পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র। আওয়ামী লীগ ভারতের টাকা খায়, ইন্দিরা গান্ধীর অঙ্গুলি হেলনে এই পার্টি পাকিস্তানের সর্বনাশ করছে। আর্মি যে ইস্ট পাকিস্তানের ওপর অনবরত দুরমুশ চালাচ্ছে, এই মার্চ মাসেই কত ছাত্রকে গুলি করে মেরে ফেললো, সে সম্পর্কে বাবুল চৌধুরীর কোনো প্রতিবাদ নেই। এখনও নির্লজ্জের মতন তার বন্ধু এক ওয়েস্ট পাকিস্তানী মেজরের বাড়িতে খানাপিনা করতে যায় নিয়মিত। কেউ কেউ বলে, সেই মেজরের স্ত্রীর সাথে নাকি বাবুল চৌধুরীর গোপন আশনাই আছে।

মঞ্জু ভাবীর মতন অমন চমৎকার এক মহিলা, তাকেও খুব কষ্ট দিচ্ছে বাবুল চৌধুরী। প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি, মঞ্জু ভাবী রাগ করে চলে যায় বাপের বাড়ি। আর ঐ আলতাফ, সেটা তো একটা শয়তান। সে মনিরার ওপর কুদৃষ্টি দিয়েছে।

সিরাজুল বললো, না, আমি বাবুল চৌধুরীর নুন খাই নাই। উনি বাসায় থাকতে দিয়েছেন ফ্রিতে, সেটা ঠিক, কিন্তু কোনোদিন আমি তার কাছ থেকে এক আধলাও সাহায্য নিই নাই। এবার ও বাসা ছেড়ে দেবো।

হঠাৎ দূরে পরপর কয়েকটা বিকট শব্দ হতেই ওরা কথা থামিয়ে উৎকর্ণ হলো। মেশিন গানের আওয়াজ! এখন গুলি চলছে কোথায়? এখন তো প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শেখ সাহেব ও ভুট্টোর মিটিং চলার কথা।

কাদের উঠে গিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখলো, রাস্তায় লোকজন ছুটোছুটি করছে। আরও কয়েকবার গুলির আওয়াজ শোনা গেল। মন্টু নামে একটা ছেলে দৌড়োতে দৌড়োতে এসে বললো, আইস্যা পড়ছে। আইস্যা পড়ছে! আর্মি, আর্মি!

এবার শোনা গেল মেঘ গর্জনের মতন গুরু গুরু ধ্বনি। ট্যাঙ্ক বেরিয়েছে মনে হচ্ছে। লোকজন দুপদাপিয়ে পালাচ্ছে। আর এখানে থাকার কোনো মানে হয় না। চায়ের দাম টেবিলের ওপর রেখে সিরাজুল বললো, মধুদা, তুমিও দোকান বন্ধ করে দাও। জগন্নাথ হলে চলে যাও।

জহুরুল হলে দোতলার একটি ঘরে কিছু বোমা ও কয়েকটি থ্রি ও থ্রি রাইফেল জড়ো করে রাখা আছে। পুলিশই হোক আর আর্মিই হোক, তাদের কিছুতেই হলের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সিরাজুলরা এসে দেখলো কিছু ছেলে হল ছেড়ে পালাচ্ছে। কাদের তাদের ধমক দিতে লাগলো। হলে একসঙ্গে এত ছেলে থাকতে ভয়ের কী আছে? কয়েকজন তবু পালিয়ে গেল, কয়েকজন ফিরলো।

সিরাজুলরা পজিশন নিল দোতলার ঘরটায়। এখনও তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। এত তাড়াতাড়ি কি আলোচনা ভেঙে গেল? শেখ সাহেব বলছিলেন, কাল থেকেই মার্শাল ল তুলে নেবার খুবই সম্ভাবনা। তা হলে আজ রাত্তিরে রাস্তায় আর্মি বেরুবে কেন?

প্রচণ্ড শব্দে একটা শেল এসে পড়লো খুব কাছাকাছি। তারপর আর একটা। কামান থেকে গোলা দাগছে? জানলা দিয়ে আর্মির গাড়ি বা কিছুই দেখা গেল না। কাদের একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে ছুঁড়ে মারলো পরপর দুটো বোমা। তারপরই শুরু হলো বৃষ্টির মতন গুলিবর্ষণ।

প্রথমে লুটিয়ে পড়লো কাদের, তারপর মন্টু। কাদের যে মরে যেতে পারে তা বিশ্বাসই করতে পারছে না সিরাজুল। এক মিনিট আগে ও লাফিয়ে লাফিয়ে চিৎকার করে যে খানসেনাদের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করছিল, একটা গুলিতেই সে শেষ হয়ে গেল? কাদেরের নিস্পন্দ শরীরটা ধরে পাগলের মতন ঝাঁকাতে লাগলো সিরাজুল।

কে যেন একজন জোর করে টেনে নিয়ে গেল সে ঘর থেকে। হলের মধ্যে ছাত্রদের গুলি করে মারবে। যে-কোনো ছাত্রকে!

এখন আর বাইরে বেরুবার উপায় নেই, হুড়োহুড়ি করে ছেলেরা চলে যাচ্ছে ছাদে। ছাদে এসে গোলা পড়লে তারা আবার নেমে আসছে নিচে, কে যে কোথায় যাবে তা ঠিক করতে পারছে না, যেন খাঁচার মধ্যে ইঁদুরের দৌড়। আতঙ্কের চিৎকার আর বারুদের ধোঁয়ায় পুরো জায়গাটা যেন
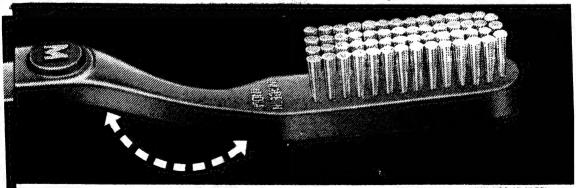
নরক।

সিরাজুলের হাতে তখনও রাইফেল, সেটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল হায়দার। পেছন দিকের একটা ঘরের জানলা ভেঙে বাইরে এসে ওরা দু'জন অন্ধকারের মধ্যে একটু দৌড়ে গিয়ে দেখতে পেল গ্যারেজ, আর কিছু চিন্তা না করে দু'জনে উঠে পড়লো সেই গ্যারেজের চালের ওপর। সেখানে আরও দু'তিনজন ছাদে গা মিশিয়ে শুয়ে আছে, তারা বললো, চুপ চুপ!

আর্মি একটু পরেই ঢুকে পড়লো হলের মধ্যে, প্রত্যেক ঘরে ঘরে গিয়ে গুলি করে মারছে ছেলেদের। শুধু ছাত্র হওয়াই অপরাধ। যারা জীবনে কখনো রাজনীতি করেনি তারা হাউ হাউ করে কাঁদছে, কেউ কেউ ভাঙা ভাঙা উর্দুতে দয়া ভিক্ষে করছে, সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো কথা নেই, শুধু গুলি, শুধু গুলি!

গ্যারেজের ছাদে পাঁচটা প্রাণী একেবারে কাঠ হয়ে আছে সিরাজুল অনবরত ভাবছে, মরে যাবো, মরে যাবো! কাদের মরে গেছে, আমিও মরে যাবো। কাদের, কাদের, একটু আগে বেঁচে ছিল কাদের, সে আর নেই! কাদের বোমা ছুঁড়ে ভুল করেছিল, কিন্তু বোমা না ছুঁড়লেও ওরা গুলি চালাতোই, ছাত্র আন্দোলন একেবারে শেষ করে দেবার জন্য ওরা সব ছাত্রদেরই মেরে ফেলার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে। এরকম নির্লজ্জভাবে আর্মি এসে সিভিলিয়ানদের মারবে, এ রকম কি কেউ ভাবতে পেরেছিল?

মনিরার কী হবে? সিরাজুল যতক্ষণ না বাড়ি ফেরে, ততক্ষণ মনিরা জেগে থাকে। আজ কথা ছিল,শেখ সাহেবের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের মিটিং-এর ফলাফল কী হলো তা না জেনে বাড়ি ফেরা হবে না। সারারাত ও কোনো হলে কাটিয়ে দিতে পারে। আজকের রাতটা কী আর কাটবে? যদি গ্যারেজের ছাদের ওপর টর্চের আলো ফেলে···বাঁচার আশা নেই···শুধু মৃত্যু আর্তনাদ আর গুলির শব্দ···কেউ বাঁচবে না। পূর্ব বাংলার যুবশক্তিকে আজ এরা ধ্বংস করে দেবে···

জহুরুল হলের সঙ্গে সঙ্গে আরও সাঁজোয়া গাড়ি গিয়ে আক্রমণ করলো জগন্নাথ হল, সলিমুল্লা হল, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবাসগুলি। নির্বিচারে হত্যা। কামান ও মর্টারের গোলায় লাল হয়ে উঠছে আকাশ।

জগন্নাথ হলের ছেলেরা ভেবেছিল, তারা মাইনরিটি কমিউনিটি, তাদের গায়ে হাত পড়বে না। হলে সরস্বতীর মূর্তি রয়েছে, সেই প্রতিমা নিশ্চয়ই খান সেনারা ছোঁবে না। বেশীর ভাগ ছাত্র গোলাগুলির আওয়াজ শুনে সেই সরস্বতী প্রতিমার পেছনে গিয়ে জড়াজড়ি করে বসেছিল।

কিন্তু আর্মির চোখে পূর্ব পাকিস্তানের সবাই হিন্দু অথবা হিন্দুর দালাল। বাঙালী মুসলমান খাঁটি মুসলমান নয়। তাদের আরও বোঝানো হয়েছে যে প্রচুর ভারতীয় হিন্দু অনুপ্রবেশকারী ঢাকায় আত্মগোপন করে ছাত্রদের খ্যাপাচ্ছে।

মিলিটারি জগন্নাথ হলে ঢুকে লাথি মেরে ভেঙে ফেললো সরস্বতী প্রতিমা। একদল ছাত্রকে দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি চালাবার পর আর একদল ছাত্রদের বাধ্য করা হলো লাশগুলো বাইরে বয়ে নিয়ে যেতে। তারপর তাদের মেরে সেই লাশ বয়ে নিয়ে গেল আর একদল ছাত্র।

জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট, ইংরিজির অধ্যাপক জ্যোর্তিময় গুহ ঠাকুরতা বাধা দিতে এসে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। দর্শনের প্রবীণ অধ্যাপক গোবিন্দ দেব নিজের কোয়ার্টার থেকে ছুটে এলেন, তিনি হাত তুলে বললেন, আমার ছেলেদের মেরো না। তোমাদের অফিসার কে আছে, তাঁর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দাও।

অফিসারটি ডঃ দেবের মাথায় রিভলভারের কুঁদো দিয়ে মেরে সেই বৃদ্ধকেও বাধ্য করলো মৃত ছাত্রদের লাশ বইতে।

কামান দাগা হলো ইত্তেফাক অফিসে, পুড়িয়ে দেওয়া হলো 'পিপল' পত্রিকার কার্যালয়, গোলা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হলো ভাবা আন্দোলনের শহীদ মিনারের চূড়া। মিলিটারি চলাচলে বাধা দেবার জন্য কয়েকটি রাস্তায় লোকেরা ব্যারিকেড করেছিল, ট্যাঙ্ক এসে সেই ব্যারিকেড উড়িয়ে দিল, আগুন লাগিয়ে দিল কাছাকাছি সব কটি বাড়িতে। যারা মরছে তারা মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও বুঝতে পারছে না, তাদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের এত রাগ কেন। শুধু বাঙালী হওয়াই অপরাধ?

সিরাজুলরা গ্যারেজের ছাদ থেকে নামলো পরদিন বিকেলবেলা।

দিনের আলো ফোটার পর শুরু হয়েছিল কবর খোঁড়ার পালা। ছাত্রাবাসগুলির সামনের জমিতেই সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে এক হাত দু'হাত মাটি খুঁড়ে তারমধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে লাশ। দু'একটা হাত-পা বেরিয়ে থাকছে, তাতে কিছু আসে যায় না।

সামরিক গাড়ি ও বুটের আওয়াজ যখন আর শোনা গেল না তখনই ভরসা করে নেমে পড়লো সিরাজুলরা। হায়দার সারারাত মুখে হাত চাপা দিয়ে বমি করেছে। সেই বমি সিরাজুলের গায়েও লেগেছে, দু'জনের জামাতেই দুর্গন্ধ। হায়দারের চোখ দুটিও ঘোলাটে হয়ে গেছে। দারুণ সাহসী হায়দারই কাল সিরাজুলকে বাঁচিয়েছে, কিন্তু এখন আর সে মানসিক চাপ সহ্য করতে পারছে না।

অনেক মৃতদেহ এখনও কবর দেওয়া হয়নি। ছড়িয়ে আছে রাস্তায়। কয়েকটা আধ পোড়া বাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, কোথাও কোনো শব্দ নেই। যেন সত্যিকারের একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত ঢাকা নগর।

একটা গলির মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলেন জিন্নাত আলী, ইনি জহুরুল হলের সহ-সভাপতি। মুখখানা একেবারে বরফের মতন সাদা, ওদের দেখেও কোনো কথা বললেন না।

রাস্তার গা ঘেঁষে ঘেঁষে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে ওরা। মৃতদেহগুলিকে দেখে ওরা যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না যে নিজেরা কী করে বেঁচে আছে! শেখ সাহেব কোথায়, তিনি কেন প্রতিবাদ করছেন না?

খানিকটা এগোতেই একজন মিলিটারি চেঁচিয়ে উঠলো, কৌন হ্যায়?

আশ্চর্য ব্যাপার, সৈনিকটি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ঠিক মাঝখানে। হাতে সাব-মেশিনগান তবু তাকে ওরা দেখতে পায়নি কেউ। ওরা দেখছিল শায়িত মৃত দেহগুলির মুখ, কোনো কোনো লাশ একেবারে ছিন্নভিন্ন, তবু এদের মধ্যে চেনা কেউ আছে কিনা, সেটা জানার ব্যাকুলতা।

মিলিটারিটি একেবারে ওদের সামনে, পালাবার কোনো উপায় নেই।

প্রায় প্রৌঢ় চেহারার এক পাঠান, চোখ দুটো লালচে, চৌকো চোয়াল। সাক্ষাৎ মৃত্যু দূত। একটু নড়া চড়া করলেই পরপর গুলিতে ফুঁড়ে দেবে সবাইকে।

সিরাজুল তাকালো জিন্নাত আলীর দিকে। তিনি যদি কোনো বুদ্ধি বার করতে পারেন। সিরাজুল দেখতে পাচ্ছে মনিরার মুখ। মনিরা যেন ভালো থাকে। শেখ মুজিব কোথায়? তাঁর কিছু হয়নি তো!

সৈন্যটি হাতের অস্ত্র নেড়ে ইঙ্গিত করলো কাছে আসার। রবার দিয়ে তৈরী তিনটি পুতুলের মতন ওরা এগিয়ে গেল।

আশ্চর্য ব্যাপার সৈনিকটির মুখের ভঙ্গি বেশ নরম। সে একবার চট করে পেছন দিক দেখে নিয়ে বললো, ইধার কেয়া কর রহা হ্যায়?

জিন্নাত আলী বললেন, স্যার, হামলোগ ইদারহি রহেতা হ্যায়।

সৈনিকটি জিজ্ঞেস করলো, মুসলমান হ্যায় ইয়া হিন্দু হ্যায়?

হায়দার বললো, মুসলমান হ্যায় সাব, মুসলমান, হামলোগকো সবহি ক খৎনা হ্যায়।

সৈনিকটি ইঙ্গিত করলো পাজামা খুলে ফেলতে। কেউ বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলো না। সৈনিকটি ভালো করে তাকিয়ে দেখলোও না, মুখ ফিরিয়ে নিল। অস্ত্রটা নিচু করে সে বললো, যাও, জলদি জলদি ভাগ্ চলো, অভি আভি কাপটেন সাব চলা আয়গা। তব তো তুমলোগকো ম্ভি নেহি ছোড়েগা!

তারপর সে দুঃখিত ভাবে মুখ কুঁচকে বললো, কেয়া হো রহা হ্যায় ই দেশ মে!

পাজামার দড়ি না বেঁধেই দৌড়োলো ওরা তিনজন। (ক্রমশ)

অঙ্কন : অনুপ রায়

বাংলার পুতুল-শিল্প ও তার শিল্পীরা

প্রবীর সেন

পুতুল বলতেই প্রথমে মনে পড়ে মেলার কথা। বাঙলাদেশে খুব কম মেলাই আছে যেখানে পুতুল পাওয়া যায় না। হালফিলের আধুনিক মেলার কথা বাদ দিলে দেখা যাবে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত সমস্ত মেলার সঙ্গেই পুতুলের একটা নাড়ীর যোগ।

পূজা-পার্বণের সঙ্গে মেলার যেমন যোগ তেমনি মেলার সঙ্গে পুতুলেরও একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দুটির যোগ অঙ্গাঙ্গি।

ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান ও পূজা-পার্বণকে উপলক্ষ করে স্মরণাতীত কাল থেকেই নানা উৎসব, নানা মেলা। কথায় বলে, বারো মাসে তেরো পার্বণ। অর্থাৎ সারা বছর ধরেই চলছে এইসব উৎসব আর অনুষ্ঠান। বৈশাখ থেকে চৈত্র অবধি পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মত মেলা হয়। তার মধ্যে বেশির ভাগই ধর্মীয় মেলা। যেমন রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, চড়ক, দোল, করম, রঙ্কিনী, চণ্ডী, মনসা, মহরম, ইদুজ্জোহা, পীর, গাজী, উরুস। আরও' কত কী।

বর্ষা এবং গ্রীষ্মে মেলার সংখ্যা আনুপাতিক হারে কিছুটা কম। শরৎ হেমন্ত শীত এবং বসন্ত এই সময়টাই মেলার সংখ্যা অনেক বেশি। ভাদ্রসংক্রান্তি, বিশ্বকর্মা পূজা ও অরন্ধন থেকে চৈত্র সংক্রান্তির গাজন পর্যন্ত অনুষ্ঠানের শেষ থাকে না। এইসব মেলাকে কেন্দ্র করে কুম্ভকারদের অনেক কিছু নির্ভর করে। এমন অনেক অঞ্চল আছে যারা সংবৎসরের মাটির হাঁড়ি-কড়া মেলা থেকেই কিনে রাখেন।

উৎসব বা পালা পার্বণ বাঙালীর জীবন-শক্তিকে যেমন অক্ষুণ্ণ রেখেছে, তেমনি বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের এই প্রাচীন লোকশিল্পের ধারা। এই মেলায় এখনও এমন পুতুল পাওয়া যায় যার কাল নির্ধারণ করতে গেলে দেখা যাবে তা আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসারী।

বহু বছর ধরে চলে আসছে আমাদেরই এই লোকশিল্প। বিভিন্ন অঞ্চলে এসে এখানকার জল মাটি আর জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে এক একটা আঞ্চলিক রূপ নিয়েছে। কোথাও সেই ধারার সামান্যতম পরিবর্তন হয়নি, আবার কোথাও এত বেশি পাল্টে গেছে যা আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে কোন মিল নেই।

হরপ্পা-মোহেনজোদারোর 'মাদার গডেসের' সঙ্গে পাঁচমুড়ার মা-পুতুল বা ষষ্ঠী পুতুলের মিল পাওয়া যায় অনেক। বাঁকুড়া বীরভূম পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের পোড়া মাটির পুতুলের গড়নের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন রীতি পরম্পরা চলে আসছে। পাখির মত দেখতে বাঁশি, মাটির গরুর গাড়ি, নারী মূর্তি যার সঙ্গে এখানকার পুতুলের পার্থক্য খুব কম।

বাঙলার পুতুল প্রসঙ্গে যেমন মেলার কথা চলে আসে তেমনি চলে আসে এখানকার কুমোর সমাজের কথা। আঞ্চলিক দেবদেবী বা পৌরাণিক দেবদেবীর কথা। এইসব পুতুল যদি বিষয়বস্তুর দিক থেকে ভাগ করি তাহলে মোটামুটি তিনটে ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। দেবদেবীর মূর্তি, পশুপাখির মূর্তি অথবা নারী মূর্তি।

পৌরাণিক মূর্তির মধ্যে যেমন রাধাকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শিব, গণেশ, গণেশজননী। আবার আঞ্চলিক দেবদেবীদের মধ্যে আছেন ষষ্ঠী, দক্ষিণরায় বাবা, বনবিবি, আটেশ্বর, ওলাই চণ্ডী, বড়খাঁ গাজী, টুসু-ভাদু, করম, সিনি, সত্যপীর ইত্যাদি। পশুপাখিদের মূর্তির মধ্যে বেশিরভাগ দেবদেবীদের বাহন যেমন ইঁদুর, পেঁচা, সাপ, গরু, বেড়াল ইত্যাদি। তাছাড়া আছে ছোটদের জন্য ভল্লুক, বাঁদর, মাছ মুখে নিয়ে বেড়াল ও বাঘ ; নারী মূর্তির মধ্যে আছে মা ও ছেলে, বেনেবৌ, কলসি কাঁখে বউ, গোয়ালিনী, ইত্যাদি।

বর্তমানে অনেক পৌরাণিক বা লৌকিক দেবদেবী পুতুল হিসেবেই দেখা হয়। এইসব পুতুলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আকৃতি এবং ছন্দ। পৌরুষ ও সরলতা। অল্প কিছু রেখা বা আঁচড় দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে শক্তি এবং 'ডায়নামিজম'।

বাঁশের পুতুল : পেঁচা

যাঁরা এই ধরনের মাটির টেপা পুতুল তৈরি করেন তাঁদের গঠনের মধ্যে প্রিমিটিভ কোয়ালিটি এখনও বর্তমান আছে। এদের ফর্মগুলো গ্রোটেস্ক্ কিন্তু তার মধ্যে একটা গতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন ট্র্যাডিশনাল শিল্পীরা হাত পা এবং শরীরের বিশেষ কোন অংশ রিয়্যালিস্টিক্যালি দেখায় না। একটা মোটা লাইন অথবা কার্ভ লাইন দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন। কোন ছাঁচের ব্যবহার নেই। শরীরে কয়েকটা অংশ আলাদা ভাবে মাটির ডেলা জুড়ে তৈরি করা হয়। নরম অবস্থায় বাঁশের চেঁচাড়ি অথবা সরকাঠি দিয়ে নানা রকম নকশা আঁকা হয়। লম্বায় এই পুতুল আড়াই ইঞ্চি থেকে ছয় সাত ইঞ্চির মধ্যে হয়।

নব্যপ্রস্তর যুগের এই প্রাচীনতম মৃৎশিল্পের ধারা মহিলাদের মধ্যে এখনও টিঁকে আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন এই মৃৎশিল্পের বিপ্লব সর্বপ্রথম মহিলারাই করেন। বাঙলাদেশেও সেই একই ধারা। রোজকার গৃহস্থালীর পর অবসর সময়ে এঁরা পুতুল গড়েন। কখনও দেবদেবীর মূর্তি, কখনও সামাজিক বিষয় নিয়ে। যেমন গম-পেষানী, উকুন বাছানী ইত্যাদি। শুধু যে কুম্ভকারদের মেয়ে বৌ-রাই এই সব পুতুল গড়েন তা নয়, অন্যান্য ঘরের মহিলারাও পুতুল তৈরি করেন। এইসব পুতুল বেশির ভাগ গার্হস্থ্য উৎসব বা ব্রতের জন্য।

এক সময়ে যাঁরা হাঁড়ি-কলসি তৈরি করেতেন তাঁরাই একদিন মৃৎশিল্পীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। অবশ্য সকলেই যে হতে 'পেরেছেন তা নয়, এমনও দেখা যায় যাঁরা প্রাচীন কাল থেকে এখনও পর্যন্ত হাঁড়ি-কলসির কাজ করে আসছেন। এছাড়া নমশূদ্ররাও এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে সূত্রধর গোষ্ঠীর লোকেরাও মূর্তি তৈরি করেন। বাঙলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই এই গোষ্ঠীর শিল্পীদের দেখতে পাওয়া যায়। আবার এমনও দেখা যায় উপাধিতে কুম্ভকার অথচ তাঁরা কোন দেবদেবীর মূর্তি করেন না। পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরা পুতুল এবং হাঁড়ি-কলসি তৈরি করেন। পাল উপাধিরাও এই কাজ করেন। বিশেষ করে কলকাতা, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদে এঁদের দেখতে পাওয়া যায়। বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পীদের বংশগত উপাধি হল দাস, খাঁ, পাল, প্রামাণিক, পাত্র, সন্ন্যাসী, বারিক কুণ্ডু।

পাঁচমুড়ার শিল্পীরা আবার চারটি উপজাতিতে বিভক্ত—রাঢ়ী চৌরাঢ়ী খোট্টা, মগয়া। উপজাতিগুলোর অর্থ বৃত্তগত আবার স্থানগত।

যেমন খোট্টা হল বিহারী, মগয়া হল মগধের বাসিন্দা। অশোক মিত্র তাঁর 'দ্য ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টস অব ওয়েস্টবেঙ্গল' বইতে কুম্ভকারদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। কুচল, হাদ্মর আর দেওরা। কুচল তৈরি করেন ছোট ছোট মাটির পাত্র—খুরি, ভাঁড়, পিলসুজ, প্রভৃতি। হাদ্মর তৈরি করেন বড় বড় মাটির পাত্র, যেমন গরুকে খাওয়ানোর মেছলা, কলসি, জালা। আর দেওরা শ্রেণী দেবদেবীর মূর্তি।

বাঙলার টেরাকোটা মন্দিরগুলোর অলংকরণ করেছিলেন সূত্রধর গোষ্ঠীর শিল্পীরা। তাঁরা ছিলেন পাল, দে, দত্ত, সাঁই, বর্ধন, মাইতি, কুণ্ডু, শীল ইত্যাদি। এঁরা সাধারণত কাঠ, মাটি ও পাথর দিয়ে নানারকম জিনিস তৈরি করতেন। যেমন কারুকার্য করা জানলা দরজার কপাট, বৃষকাঠ গরুর গাড়ি, মন্দির, রথ এবং দেবদেবীদের মূর্তি। বাঙলার বেশির ভাগ পাথরের মূর্তি দাঁইহাটের

টেরাকোটা : কুকুর
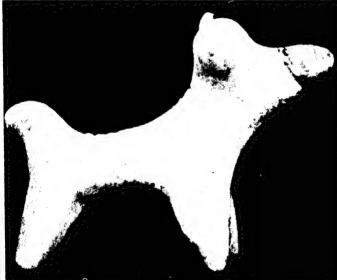
সূত্রধররা তৈরি করেছিলেন। বর্ধমানের নতুন গ্রামে এখনও কয়েকঘর সূত্রধর পরিবার কাঠের পুতুল তৈরি করেন।

কুম্ভকারদের উৎপত্তি সম্পর্কে একটা পুরান কাহিনী প্রচলিত আছে। তাতে বলা হয়েছে মহাদেব এই কুম্ভকারদের সৃষ্টি করেন। চড়ক সংক্রান্তির দিন নীলবতী দুর্গার সঙ্গে মহাদেবের বিয়ে হবে, এমন সময় চারটে মঙ্গলঘটের দরকার হল। কিন্তু কোথাও তা পাওয়া গেল না। তখন মহাদেব সূত্রধরদের সৃষ্টি করলেন। যাঁর নাম রুদ্রপাল। রুদ্রপালের বংশ রক্ষার জন্য দুর্গা সৃষ্টি করলেন তাঁর স্ত্রীকে। তাঁকে দেখতে অবিকল দুর্গার নিজের মত। সেই দেখে রুদ্রপাল অবাক হলেন। এ মহা বিপদ, নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারেন না। মহাদেব তখন ঠিক করলেন রুদ্রপালের স্ত্রীর নাকে নাকছাবি, মাথায় টিকলি থাকবে না। তাতেই রুদ্রপাল পার্থক্য করতে

বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রীতিতে পুতুল তৈরী হয় ▲
পুতুল তৈরী করেন 'দেওরা' শ্রেণীর কুম্ভকারেরা ▼

পারলেন নিজের স্ত্রীকে। আজও এই সম্প্রদায়ের মেয়েরা কেউ মাথায় বা নাকে কোন রকম গহনা পরেন না। সেই জন্য বাঙালী কুম্ভকারদের উপাস্য দেবতা বিশ্বকর্মা নন। এঁদের উপাস্য দেবতা শিব। বৈশাখ মাসে রাঢ় অঞ্চলের কুম্ভকারেরা চাকের উপর শিবমূর্তি বসিয়ে রাখেন। পুরো মাস তাঁরা কোন রকম মাটির কাজ করেন না।

বারো মাস ফল ধরে একমাস মানা।
যতগুলি ফল ধরে ততগুলি কানা।।

বর্তমানে পশ্চিমবাঙলায় কুম্ভকারদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ বা বর্ণবিভাগ নিয়ে তেমন কোন বাঁধাবাঁধি নেই। হাঁড়ি-কলসি বা দেবদেবীর মূর্তি এখন সব গোষ্ঠীর কুম্ভকাররা অল্পবিস্তর করে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রীতিতে পুতুল তৈরি হয়। কোন কোন অঞ্চলের বিশেষত্ব হল মাটির পুতুল, আবার কোথাও-বা কাঠের পুতুল-এ ছাড়া আছে পাতা শোলা আর গালার পুতুল।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর লোকশিল্প প্রবন্ধে লিখেছেন, "কৃষিজীবী সমাজের কারিগররা হাতের কাছে যে সব উপকরণ পেয়েছিলেন সেগুলিকেই ব্যবহার করেছিলেন রূপ নির্মাণের জন্য। এই কারণে মাটি, কাঠ এই দুটিকে লোকশিল্পের প্রধান উপকরণরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। তার সঙ্গে এসেছে কড়ি, দড়ি, বেত, বাঁশ, ঘাস, কাপড়, কম্বলের টুকরো ইত্যাদি সহজলভ্য বস্তু। মোট কথা ভারতীয় লোকশিল্পের পরম্পরা ধারণ করে আছে কাঠ ও মাটি। বলা বাহুল্য, এই দুইটি উপকরণ অতি প্রাচীন। এই কারণে মাটি ও কাঠে নির্মিত নিদর্শনগুলিতে প্রাচীনত্বের ছাপ অনুসন্ধান করা হয়তো নিরর্থক হবে না। বিশেষ ভাবে জীবজন্তুর মধ্যে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা প্রথম শতাব্দীর প্রস্তর উৎকীর্ণ মূর্তির সঙ্গে তুলনীয়। এই প্রসঙ্গে ভরুতের বানর ও লোকশিল্পীর হাতে গড়া মাটির বা কাঠের বানরের তুলনা করা যেতে পারে।"

বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের মধ্যে প্রধান হল মাটির পুতুল। এই জেলার বিভিন্ন গ্রামে যে সমস্ত পোড়া মাটির পুতুল পাওয়া যায় তাদের বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব স্থানীয় রীতি আছে। প্রত্যেকটার সঙ্গে চরিত্রগত কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়।

বাঁকুড়ার সমস্তটা জুড়ে আছে সিনি উপাধির দেবতা। সিনি হলেন দেবী। তিনি গ্রাম রক্ষয়িত্রী, শস্যদাত্রী, দয়াবতী বৃদ্ধা। তাঁকে তুষ্ট করতে পারলে সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। সিনি দেবীর কোন মূর্তি নেই। এঁর প্রতীক হিসাবে পোড়ামাটির ঘোড়া, হাতি। ইনি সর্বত্রই গাছের তলায় থাকেন। এই দেবীকে কেউ ব্যক্তিগতভাবে পূজা করেন না। এঁর পূজা গ্রামগতভাবেই হয়। সিনি দেবীর পুজো হয় পয়লা মাঘ। কোথাও মকর সংক্রান্তিতে। কোন বড় গাছের তলায় সিনি দেবীর থান থাকে, পূজার সময় গ্রামবাসীরা এসে পোড়া মাটির ঘোড়া হাতি ঐ থানে রাখেন। কোন কোন জায়গায় সিনিকে 'সুনি'ও বলা হয়। এটা হয়তো সুনিয়া শব্দের অপভ্রংশ। সুনিয়া শব্দের

অর্থ 'আদি'। বিনয় ঘোষ তাঁর রাঢ়ের মৃৎশিল্প প্রবন্ধে লিখেছেন—"বস্তুত বাঁকুড়ার এই প্রাচীন গ্রাম্য দেবস্থানগুলিই আমার কাছে বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের আদি ও অকৃত্রিম মিউজিয়াম বলে মনে হয়েছে। হাতি ঘোড়া দেবস্থানে মানত ও উৎসর্গের জন্য দেওয়া হয়, তাই বংশানুক্রমে উৎসর্গীত হাতি-ঘোড়ার স্তূপ প্রত্যেক দেবস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরনো হাতি-ঘোড়া এই সব দেবস্থানে দুর্লভ নয়, শতাধিক বছরের প্রাচীন নিদর্শনও দেবস্থানের আশপাশের মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায়। পুরনো হাতি-ঘোড়ার ভঙ্গি, গড়ন ও কারুকার্য অন্য রকমের। কাজেই যাঁরা বাঁকুড়ার এই মৃৎশিল্পের স্টাইল ক্রমবিকাশের বিশেষ অনুশীলন করতে চান, তাঁদের বাঁকুড়ার প্রাচীন গ্রাম্য দেবস্থানে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

বিষ্ণুপুরে যে সমস্ত গ্রামে এই ধরনের মাটির পুতুল পাওয়া যায় তাদের মধ্যে পাঁচমুড়ার শিল্পীরা বেশি কুশলী। পাঁচমুড়ার প্রভাব আশপাশের অনেক গ্রামের উপর পড়েছে। আবার সোনামুখী, হামীরপুর ও রাজগ্রামের স্টাইল-এর সঙ্গে পাঁচমুড়ার বিশেষ কোন মিল নেই। সোনামুখীর ঘোড়ার গলা পাঁচমুড়ার থেকে লম্বায় কম। কান অনেকটা রিয়্যালিস্টিক। পাঁচমুড়ার ঘোড়ার মত মাথা থেকে কান আলাদা করা যায় না। ল্যাজ ও কান দেহের সঙ্গে লাগানো থাকে। পাঁচমুড়ার ঘোড়ার কান পাতলা, বাঁশ পাতার মত। এদের ঘাড়ের কাছে লাগাম থাকে। এদের চোখের সঙ্গে মুরলুর ঘোড়ার মিল পাওয়া যায়। সোনামুখীর পুতুলের গড়ন অনেকটা গোল। এদের দেহে অনেক বেশি অলংকার থাকে। চোখ আঁচড় দিয়ে আঁকা। লেজ স্বাভাবিক।

বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে শালতোড়া থানায় মুরলু গ্রাম। এখানকার ঘোড়ায় এখনও কোন রকম আধুনিকতার ছাপ পড়েনি। অনেকের ধারণা বাঁকুড়ার ঘোড়ার যে ঘরানা তার সূচনা প্রথমে এখান থেকে শুরু হয়। মুখ নাক কান আঙুলে টিপে তৈরি। বাঁকানো গলা। ঘাড়ের দু'দিকে সামান্য নকশা থাকে।

এখানকার আরো একটা নিদর্শন হল মনসার ঘট, মনসার ঝাড় বা চালি। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় যে সমস্ত মনসার ঘট পাওয়া যায় তার সঙ্গে কোনো মিল নেই। একটা ঘটের উপরে অর্ধবৃত্তাকারে সাপের ফণা পর পর সাজানো থাকে। ঘোড়া বা হাতির মত এই মনসার চালি একটা অনবদ্য মূর্তি।

কুম্ভকাররা চাক ঘুরিয়ে যে-ভাবে ঘট, খুরি, গেলাস তৈরি করেন, ঠিক সেই ভাবেই চাক ঘুরিয়ে তৈরি করেন ঘোড়ার পা, মাথা, দেহ প্রভৃতি অংশ। ভেতরটা থাকে ফাঁকা। এমনভাবে তৈরি যে প্রত্যেকটা অংশ জুড়ে নেওয়া যায়। আঙুলে টিপে টিপে মুখের আদল আনা হয়। চোখ, লাগাম এবং শরীরের অলংকার আলাদা মাটির বেড়ি দিয়ে তৈরি হয়। বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়ে আঁচড় কেটে সেগুলোয় যথাযথ নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। কাঁচা মূর্তিগুলো প্রথমে ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে তার উপর হলুদ

মমি পুতুল
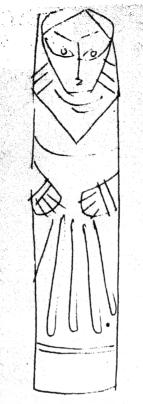
বাঁকুড়ার পুতুলের মধ্যে পাঁচমুড়ার মা-পুতুল একটা বিস্ময়কর শিল্প নিদর্শন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই মা-পুতুলের প্রপিতামহী ছিলেন সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জোদারোর পশু আকৃতির মাতৃকা দেবী।

টেপা পুতুল

রং-এর একটা প্রলেপ লাগিয়ে নেওয়া হয়। যাকে স্থানীয় লোকেরা বলে 'বনক' বা 'বেলি-বনক'। এর পর পণ সাজিয়ে ভাঁটিতে শুকনো খড় পাতা জ্বালানো হয়। প্রথম দফা পোড়ানোর ফলে পোড়া মাটির লাল রং যথার্থভাবে ফুটে ওঠে। যে-গুলো কালো করার প্রয়োজন, সেগুলো ভাঁটিতে দেওয়া হয় আর একবার। দ্বিতীয় বারে যথেষ্ট পরিমাণে ঘুঁটে ব্যবহার করা হয় এবং যাতে ঘুঁটের ধোঁয়া কোন ফাঁক বা ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে না যায় তার জন্য সমস্ত পথগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার ফলে দ্বিতীয় দফায় মূর্তিগুলো দেখতে হয় কালো কষ্টি পাথরের মত।

বাঁকুড়ায় এক সময় বাঘের মূর্তিও তৈরি হত। বড়ামদেবীর প্রতীক বা ছলন দেবার জন্য। এই বড়ামদেবী আদিবাসী সাঁওতাল, লোধা, মহালী এবং বাউড়ী প্রভৃতি জাতির উপাস্য দেবতা। বড়াম দেবতার জন্য বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পীরা বেশ কিছু উপার্জন করেন। লোধাদের বিশ্বাস বড়াম পশুপাখির দেবতা। যখন ঐ অঞ্চলে ঘন জঙ্গল ছিল—বাঘ ও বন্য হাতিদের আক্রমণ থেকে এই দেবীই রক্ষা করতেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার 'বারা' এবং বড়ামের অনেকটা মিল। উভয়েই ব্যাঘ্র দেবতা।

বাঁকুড়ার পুতুলের মধ্যে পাঁচমুড়ার মা-পুতুল একটা বিস্ময়কর শিল্প নিদর্শন। বাড়ির বৌ-রা অবসর সময় নরম মাটি দিয়ে আঙুলে টিপে টিপে তৈরি করেন এই পুতুল। সাধারণত এই পুতুল রোদে শুকানো বা পোড়া মাটির হয়।

পাঁচমুড়ার মা-পুতুল প্রসঙ্গে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই মা-পুতুলের প্রপিতামহী ছিলেন সিন্ধু উপত্যকার মহেনজোদারোর পশু আকৃতির মাতৃকা দেবী। মাটির তলা থেকে যে সমস্ত মাতৃকা মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই দাঁড়ানো মূর্তি।

এদের মধ্যে কারো কোলে সন্তান আবার কারো মধ্যে আসন্ন মাতৃত্বের লক্ষণ দেখা যায়। কোমরে মেখলা, গলায় হার, মাথায় ঘন চুল।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে মাতৃপূজার প্রথম প্রচলন হয়েছিল নিপ্পারে। আবার কেউ বলেন আনাটোলিয়ায় অথবা সিরিয়ায় এর উৎপত্তি হয়েছিল এবং সেখান থেকে ক্রমশ মেসোপটেমিয়ার দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

দ্রাবিড় নারীদের মাতৃদেবীকে আর্যরাও তাদের নিজের করে নিয়েছিলেন। আজও ইনি হিন্দু নারীদের কাছে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে অরণ্য ষষ্ঠী দেবী নামে পূজিত হন।

বাঁকুড়ায় অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির রাত থেকে টুসুর পুজা বা উৎসবের শুরু হয়। সারা পৌষ মাস ধরে চলে। ভাদুর পূজা হয় ভাদ্র মাসে। এই পূজা উপলক্ষে এখানে টুসু ও ভাদুর মাটির তৈরি মূর্তি পাওয়া যায়। টুসুর গায়ের রঙ হলুদ, মাথায় রাংতার মুকুট, পরনে লাল রঙের শাড়ি বা ঘাগরা। সারা অঙ্গে শোলার এবং রঙিন কাগজের তৈরি গহনা। মাথার পিছনে ফুলকাটা চালচিত্র। টুসুদেবীর সব সময় দাঁড়ান মূর্তি হয়।

ভাদুর গায়ের রঙ হলুদ, টানা টানা চোখ, মাথায় মুকুট। পরনে শাড়ি অথবা ঘাগরা। ভাদুর

এক হাতে সন্দেশ বা নাড়ু, অন্য হাতে ধানের শিষ কিংবা পান।

টুসু-ভাদুর মূর্তি বীরভূম ও পুরুলিয়াতেও পাওয়া যায়। গান হল উৎসবের প্রধান এবং একমাত্র অঙ্গ। সূত্রধরগোষ্ঠীর শিল্পীরা এই মূর্তি তৈরি করেন।

বাঙলাদেশে কৃষ্ণনগরের পুতুলের খুব প্রসিদ্ধি ছিল। বহু গান, কবিতা এবং ছড়ায় তার উল্লেখ আছে। বাসরঘরে জামাইকে ঠকানো হোত কৃষ্ণনগরের পুতুল দিয়ে। দেখলে আসল না নকল সহজে বোঝা যেত না। যেমন রুই-কাতলা, চিংড়ি মাছ, আরশোলা, টিকটিকি। নিমকী, সিঙাড়া, পানতুয়া। কলা, শসা, আম, পেঁপে, কাটা তরমুজ, পাকা ফুটি ইত্যাদি। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের ঐতিহ্য মাত্র দুশো বছরের। শুরুতে এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জমিদার এবং ইংরেজরা। এঁদের উৎসাহ এবং ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার ফলে সেই সময়ে বেশ কিছু উন্নতমানের কাজ হয়েছিল। এঁরা দক্ষ ছিলেন, 'ন্যাচারাল মডেলে'। হুবহু নকল করে এঁরা তৈরি করতেন মাটির ছোট ছোট মডেল। যেমন পুরনো বাড়ি, পানসি নৌকো, বাঘ শিকারী, খানসামা, আয়া, ছোট ডিঙ্গি, ভিস্তি, দরজি, ধোপা, কুলি, ফকির ইত্যাদি।

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের সঙ্গে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির কোন মিল নেই। বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের পুতুল বা মূর্তির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়

সোনামুখীর ঘোড়া

এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতিতে তৈরি।
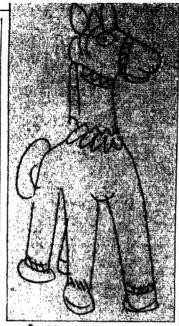
নবদ্বীপ বা শান্তিপুরের তুলনায় কৃষ্ণনগর শহর অনেক পরে তৈরি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহযোগিতায় এখানকার শহরের গৌরব এবং প্রসার ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকে। তার আগে এখানে ছিল সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো। রাজার হাতেই ছিল শাসন ক্ষমতা। কৃষ্ণনগরের রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক। এই রাজবংশের অন্যতম রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন উন্নতমনস্ক এবং শিল্পরসিক। আলীবর্দীর সময় থেকে মীরজাফরের সময় পর্যন্ত তাঁর খুব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল।

জনশ্রুতি আছে তিনি প্রথম বাঙলাদেশে কালীপূজা এবং জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পূজার প্রবর্তন করেন। তার ফলে দেবমূর্তি গঠনের রেওয়াজ এখানকার কুম্ভকারদের মধ্যে শুরু হল।

কৃষ্ণনগরে তিন ধরনের মৃৎশিল্পীদের দেখতে পাওয়া যায়। প্রধান অঞ্চল ঘূর্ণী। এখানকার শিল্পীদের দক্ষতা সূক্ষ্ম বস্তুবাদী পুতুল, দেবদেবীর মূর্তি গঠন এবং ভাস্কর্যে। কুমোরপাড়া বা ষষ্ঠীতলার সাধারণ স্তরের শিল্পীরা ছোট ছোট ছাঁচের পুতুল বানান। রাজবাড়ির কাছে নতুন বাজারের শিল্পীরা প্রধানত মূর্তিশিল্পী। দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী মূর্তি পরিকল্পনায় এখানকার রাজ পরিবারের ঐতিহ্য এখনও বজায় রেখেছেন। বর্তমানে এই শিল্পের অবস্থা খুব সঙ্গিন। এখানকার মৃৎশিল্পের যে কিংবদন্তীর মত খ্যাতি ছিল তা আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। এখানকার শিল্পীদের ছেলেরা তাদের বৃত্তি ছেড়ে অন্য কাজে চলে যাচ্ছেন। যাঁরা টিকে আছেন তাঁরা মাটির পুতুল বাদ দিয়ে পাথরের মূর্তি বানানোর কাজে চলে যাচ্ছেন। তাতে লাভ বেশি।
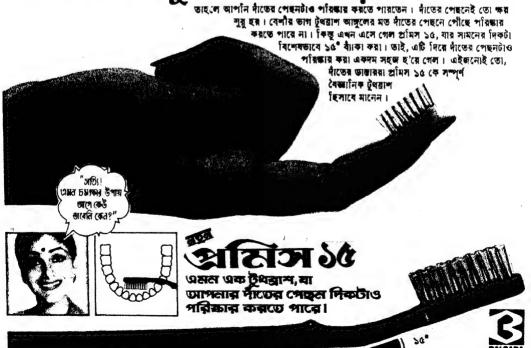
প্রমথ চৌধুরী তাঁর আত্মকথায় কৃষ্ণনগরের অনুকরণ সর্বস্ব পুতুল ছাড়াও আহ্লাদী পুতুলের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই পুতুল এক সময় যেমন কৃষ্ণনগরেও পাওয়া যেত, এখনও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে দেখতে পাওয়া যায়। বীরভূমের আহ্লাদী পুতুলের যা গড়ন, মজিলপুরের গড়াই-এর অনেকটা একই গড়ন। মালদহ, নবদ্বীপে এক ধরনের মাটির পুতুল পাওয়া যায়—হাতির পিঠে কিংবা ঘোড়ার পিঠে বসা মূর্তি। স্থানীয় গ্রাম্য মেলায় সাধারণত এগুলি দেখতে পাওয়া যায়। পুতুলগুলোর নিচের অংশটা দেখা যায় না। ঘোড়া অথবা হাতির শরীরের সঙ্গে মিশে থাকে। এই পুতুলের সঙ্গে বাঁকুড়ার রেলপুতুলের কোথায় যেন মিল পাওয়া যায়। রেলপুতুল যেমন পোড়া মাটির, তাতে কোন রং-এর ব্যবহার নেই। কিন্তু এই পুতুলে সামান্য রঙের ব্যবহার হয়। সাদা অথবা হালকা বাসন্তী রঙের উপর তুলি দিয়ে মাথার পাগড়ি, গলার হার, জামার নকশা ও হাতের আঙুলের সাজেশান থাকে। স্থানীয় লোকেরা এই পুতুলকে ঘোড়া পুতুল, হাতি পুতুল বলে।

পুরুলিয়ার দীপাবলী পুতুলের সঙ্গে মেদিনীপুরের পরী পুতুলেরও অনেক মিল। পুরুলিয়ার বলরামপুর গ্রামে কয়েকঘর পরিবার দীপাবলী পুতুল তৈরি করেন। এঁরা নিজেদের বিহারী কুমোর বলে পরিচয় দেন। এঁদের পূর্বপুরুষ এক সময় গয়া-হাজারীবাগ থেকে এ দেশে আসেন। পুতুল গড়া ছাড়াও এঁরা সারা বছর মাটির টালি বা খাপড়া এবং হাঁড়ি-কলসি বানায়। দেওয়ালীর সময় এই সব পুতুলের হাতে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

পরীপুতুল বা দীপাবলীপুতুলের মত মেদিনীপুর অঞ্চলে আর এক ধরনের পুতুল পাওয়া যায় যার নাম গয়লানী। এক হাত কোমরে, অন্য হাতে দুধের কেঁড়ে অথবা বাচ্চা ছেলে ধরে আছে। মাথায় মুকুটের পরিবর্তে চুড়ো করে চুল বাঁধা।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মজিলপুরের মাটির পুতুলে এই ধরনের কোন গ্রোটেস্ক ফর্ম দেখতে পাওয়া যায় না। শুধু বারা মূর্তি ছাড়া। অন্যান্য পুতুলে আধুনিকতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। যদিও সেই আধুনিকতা তার ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করেনি। এখানকার পুতুলের মধ্যে লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি বেশি প্রধান্য পায়। যেমন বনবিবি, ওলাইচণ্ডী, বড় খাঁ গাজী, দক্ষিণরায়, নারায়ণী বারা বা আটেশ্বর ইত্যাদি।

এই সব মূর্তি ছাঁচে এবং হাতে গড়া দুই-ই হয়। লৌকিক দেবদেবী ছাড়াও পালা পার্বণ উপলক্ষে মেলাতে বিক্রির জন্য নানা রকম পুতুল পাওয়া যায়। যেমন রাধাকৃষ্ণ, গড়াই, নন্দ, মহাদেব, বেনে বৌ, জগন্নাথ, কলসি কাঁখে নিয়ে বৌ, মাছ মুখে বেড়াল, কুকুর, বাঘ ইত্যাদি। এই সব পুতুল ছাঁচের তৈরি। মাঝখানটা ফাঁপা। দুটো অংশ আলাদা ভাবে ছাঁচ তুলে জুড়ে দেওয়া হয়। দেবদেবী বাদে আর সব পুতুল পণে পোড়ান হয়।

কিছুদিন আগেও এ অঞ্চলের প্রবীণ শিল্পী মন্মথনাথ দাস জীবিত ছিলেন। ওঁর তৈরি পুতুলের মধ্যে বিখ্যাত হল রাধাকৃষ্ণ, জগন্নাথ, গড়াই, দক্ষিণরায় ও নারায়ণী মূর্তি। দক্ষিণরায় এবং নারায়ণী মূর্তির সঙ্গে কুচল কুম্ভকারদের বারা মূর্তির অনেকটা মিল। মাঘ মাসের প্রথম দিকে বারা ঠাকুরের পূজা হয়। এই মূর্তি দেখতে ঘটের মত। ঘটের উপরের একভাগ উঁচুর দিকে বাড়ানো। অনেকটা পাতার আকৃতি, এটাই দেবতার মুকুট। মুকুটের উপর তুলির আঁচড়ে লতাপাতা আঁকা। হরপ্পা-মোহেনজোদারোর শ্মশ্রুমণ্ডিত পুরুষ মূর্তিটির সঙ্গে বারা ঠাকুর (মুণ্ডমূর্তি) বা দক্ষিণরায়ের গালপাট্টার এক আশ্চর্যজনক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।
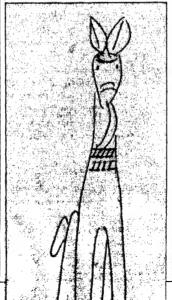
টেপা পুতুল

হাতির পিঠে রাজামশাই

বনবিবির মূর্তি বারা ঠাকুরের মূর্তি মত অতটা বিমূর্ত নয়। ইনি ভক্তবৎসলা ও দয়াবতী। হিন্দু মুসলমান উভয়ের দেবী। তাই এঁর দু'রকম মূর্তি দেখা যায়। মুসলমান অঞ্চলে এঁর আকৃতি কিশোরী বালিকার মত। মাথায় টুপী, বিনুনি করা চুল, গলায় বন-ফুলের মালা, পরনে পিরান বা ঘাগরা পাজামা, পায়ে জুতো। এক হাতে আশাবাড়ি বা দণ্ড। কোথাও কোলে একটা বাচ্চা ছেলে দেখা যায়—বাহন মুরগী বা বাঘ।

হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে বনবিবির আকৃতির সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। গায়ের রঙ হলুদ, মাথায় মুকুট, গলায় হার বা ফুলের মালা, সর্ব অঙ্গে অলংকার। হাতে কোন প্রহরণ বা আশাদণ্ড থাকে না। কোলে একটা শিশু।

আটেশ্বর অরণ্যরক্ষক বা পশুদের দেবতা। গায়ের রঙ নীল। মাথায় পাগড়ি, বাবরী চুলের কিছুটা দেখা যায়। মালকোঁচা মারা ধুতি। ডান হাতে একটা মুগুর, কানে মাকড়ি, গলায় হার। বাঁশ পাতার মত বড় বড় চোখ, বিশাল এক জোড়া গোঁফ।

কালুরায় ব্যাঘ্রদেবতা। দেহের রঙ সাদা অথবা হলুদ। মাথায় পাগড়ী, বাবরী চুল, কপালে তিলক, টিকলো নাক, চওড়া গোঁফ। এক হাতে

ঘোড়া : পাঁচমুড়া

টাঙ্গি আর এক হাতে ঢাল। পিঠে তীরধনুক। বাহন ঘোড়া অথবা কুমীর।

ওলাইচণ্ডীর আরো নাম। যেমন ওলাবিবি, বিবিমা। ইনি ওলাওঠা রোগ নিবারণের দেবী। হিন্দু অঞ্চলে এঁর আকৃতি হল অতসী ফুলের মত হলুদ গায়ের রঙ। টানা টানা চোখ। মুখের গড়ন খুব সুন্দর। দাঁড়িয়ে বা বসে থাকেন। কখনও কোলে একটা শিশু দেখা যায়। হাতে বালা, গলায় হার, মাথায় মুকুট। পরনে নীল রঙের শাড়ি। মুসলমান অঞ্চলে পিরান পাজামা টুপি, ওড়না নাগরা জুতা পরা থাকে।

বড় খাঁ গাজী ইনি বনবিবি বা দক্ষিণরায়ের মত ব্যাঘ্র দেবতা। এঁকে অনেকে জিন্দাপীর বা গাজীসাহেব বলেন। এঁর গায়ের রঙ গোলাপী বা হলুদ। পরনে মুসলমানী চোগাচাপকান পিরান মাথায় টুপি বা পাগড়ি, মুখে লম্বা দাড়ি এবং গোঁফ। ইনি ঘোড়ার পিঠে বসে থাকেন। এক হাতে লাগাম আর এক হাতে আশাদণ্ড।

দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রদেবতা। গায়ের রঙ হলুদ, মাথায় মুকুট, কপালে রক্ততিলক, টানা টানা চোখ, পাকানো গোঁফ, লম্বা জুলফি। হিন্দু রাজাদের মত যোদ্ধার বেশ। হাতে তীর - ধনুক অথবা বন্দুক।

পাঁচুঠাকুর বা পেঁচোঠাকুর। ইনি শিশুরক্ষক, গায়ের রঙ কালো, ঝুঁটি বাঁধা চুল। কোন কোন জায়গায় মাথায় দু'খানা শিঙ দেখা যায়। চোখগুলো বড় বড়, কপালে তিলক। এঁর স্ত্রী পাঁচি ঠাকুরাণী স্বামীর সঙ্গে সর্বত্র পূজা পান। এঁর গায়ের রঙ হলুদ, পরনে চওড়া লাল পাড় শাড়ি, মাথায় সিঁদুর, সর্বাঙ্গে গহনা।

লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি তৈরি ক্রমশ কমে আসছে। এখনও যে সব জায়গায় পাওয়া যায় তার মধ্যে জয়নগর, মজিলপুর, বারাইপুর, শিবানীপুর, চৈতন্যপুর বড়িবা প্রভৃতি অঞ্চলে। এইসব পুতুল প্রতিমা যাঁরা তৈরি করেন তাঁরা জাতিতে পটিদার, সূত্রধর, মাহিষ্য কোথাও নিম্নবর্ণের হিন্দু।

এখানে আরো এক ধরনের পুতুল তৈরি হয়, পুতুল নাচের পুতুল। এক সময় কলকাতা এবং তার আশপাশে বসা-সঙ ও পুতুল নাচের খুব চল ছিল। সেকালে বিভিন্ন পূজা পার্বণে নানা ধরনের মাটির পুতুল দিয়ে সাজানো হত। তাকে বলত বসা-সঙ। যে সঙ কোন রকম নড়াচড়া করে না। জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পুতুল দিয়ে সাজানো হত। সেই সঙ্গে থাকত পুতুল নাচের পালা। এই পুতুল নাচের নদীয়া, চব্বিশ পরগণা ও মালদহ জেলায় প্রচলন ছিল বেশি। এই কাঠের পুতুলের শিল্পীরা ছিলেন কর্মকার বা সূত্রধর গোষ্ঠীর। নরম কাঠ থেকে তৈরি হয় এই পুতুল। চব্বিশ পরগণার রাজবেড়িয়ায় কিশোরী কর্মকার এবং জয়নগরের সতীশ হালদার এখনও এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। পুতুলগুলো দুই থেকে আড়াই ফুটের মত লম্বা। কোমরের নীচের অংশ খোদাই করা হয় না। শুধু গলা কোমর কাঁধ কনুই-এর কাছে জোড় থাকে। পুতুল নাচের বাজিকরেরা এই পুতুল দিয়ে রামায়ণ-মহাভারত এবং বিভিন্ন পৌরাণিক পালা দেখিয়ে থাকেন।

ঘোড় সওয়ার : পাঁচমুড়া

কাঠের পুতুল প্রসঙ্গে বলতে গেলে বর্ধমানের নতুন গ্রামের কথা প্রথমেই বলতে হয়। এখানে কয়েক ঘর সূত্রধর শিল্পী চিরাচরিত প্রথায় কাঠের পুতুল তৈরি করে আসছেন। লক্ষ্মী পেঁচা, শ্রীগৌরাঙ্গ, মমি পুতুল প্রভৃতি। এইসব পুতুল এক সময় কালীঘাটের মন্দিরের দু'পাশের দোকান গুলোতে প্রচুর বিক্রি হত। যার ফলে এগুলো কালীঘাটের পুতুল নামেই পরিচিত ছিল।

এই পুতুলগুলো সাধারণত আমড়া, জিওল, ছাতিম, শিমুল প্রভৃতি কাঠ থেকে খোদাই করে মূর্তির আদলে আনা হয়। তারপর রঙ লাগানো হয়। তুলির টানে চোখ মুখ ও কাপড়ের ভাঁজ আঁকা হয়।

পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের পুতুল তৈরি হয়। যেমন বর্ধমান জেলায় নতুনগ্রাম, দাঁইহাটি, পাটুলী, কাষ্ঠশালী, হুগলী জেলার শ্রীরামপুর, চন্দননগর, হাওড়া জেলার থলে-রসপুর, মেদিনীপুর জেলার বক্সীবাজার, আনন্দপুর, ঝাড়বনী এবং বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, বেলতোড়া প্রভৃতি অঞ্চলে। গড়বেতা, দাসপুর ও বক্সীবাজারের শিল্পীরা এই সব কাঠের পুতুলের সঙ্গে ছোট ছোট ঢেঁকি তৈরি করেন।

বাঁকুড়ার পুতুল যেমন ভাবপ্রধান বা Abstract তেমনি বীরভূমের গালার পুতুল অনেকটা এই রীতির। শান্তিনিকেতনের কাছে ইলামবাজার। একসময় গালার পুতুলের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার গালার পুতুল সারা বাংলায় পাওয়া যেত।

গোপাল শুঁই নামে এক দক্ষ গালা শিল্পীকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসা হয়। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ বিষয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন। শিল্পসদন প্রতিষ্ঠার পর গোপাল শুঁই শ্রীনিকেতনে এসে কাজ শুরু করেন। পরে এই বিভাগটির পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন সন্তোষ ভঞ্জ।

অনেকটা মাটির টেপা-পুতুলের মত আঙুলের চাপে গালায় লেচিকে একটা রূপ দেওয়া হয়। মুখ হাত পা আলাদা আলাদা তৈরি করে সেগুলো পরে এক এক করে জুড়ে নেওয়া হয়। কাল লাল সবুজ প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের গালার লেত্তি বা ফিতে দিয়ে পুতুলের মাথার চুল, গয়না বা শাড়ির পাড় তৈরি হয়।

মাটির পুতুলের থেকে কাঠ, গালা বা সোলার পুতুলের চাহিদা ক্রমশ কমে যাবার মূলে মানুষের ধর্মবিশ্বাস এবং রুচির অভাব। বাঁকুড়ার মৃৎশিল্প শহরকে কেন্দ্র করে টিকে নেই। টিকে আছে অসংখ্য গ্রামীণ মানুষের লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে। গালার পুতুলের পিছনে সে-রকম কোন ধর্মের যোগ ছিলো না। তাছাড়া গালার দাম বৃদ্ধি পাওয়াতে সাধারণ মানুষের কাছে এর চল কমে আসতে লাগলো। বর্তমানে যে গালার পুতুল পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণ গালার নয়। মাটির টেপা পুতুলের উপর পাতলা গালার একটা প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়।

তালপাতার পুতল। যার নাম তালপাতার সেপাই। এখন বলতে গেলে এটি দুর্লভ। বীরভূমের কয়েকটা অঞ্চলে এই পুতুল এক সময় পাওয়া যেত। এখনও হয়তো খোঁজ করলে পাওয়া যেতে পারে, তবে কোন নিশ্চয়তা নেই। কলকাতার আশপাশে কিছু কারিগর বাচ্চাদের খেলনা বা পুতুল বানায়। এরা একটা বাঁশের উপর খড় জড়িয়ে নানারকম পুতুল ও খেলনা সাজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করে। এদের কাছে কাপড়ের পাখি, কাগজের কুমীর মুখোস, পাটকাঠির সাপ, কখন কখন তালপাতার সেপাইও দেখতে পাওয়া যায়। শোলার পুতুলের অবস্থা অনেকটা একই রকম। যদিও সোলার থেকে পুতুল ছাড়াও প্রতিমা সাজাবার অনেক কিছু তৈরি হয় যার ফলে শোলা শিল্পীরা সেটাকে নির্ভর করে কোন মতে টিকে আছে। কলকাতার কুমোরটুলি নতুনবাজার বাগবাজারের মালাকারদের অবস্থা প্রায় একই রকম। দেশ ভাগের পর পূর্ববঙ্গের অনেক শোলা শিল্পীরা কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে উঠে এসেছে। উত্তর কলকাতায় রাস বা চৈত্র সংক্রান্তির সময় এই শোলার পুতুল দেখতে পাওয়া যায়। মোষের সিং বা হাতির দাঁতের পুতুলের সেই একই অবস্থা। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ ও খাগড়া অঞ্চলে আজও হাতির দাঁতের পুতুল পাওয়া যায়। এক সময় নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পটির শুরু হয়েছিল। এঁরা বেশিরভাগ বৈষ্ণব। কৃষ্ণমূর্তি ছাড়াও নানা দেবদেবীর মূর্তি, নৌকো, জীবজন্তু প্রভৃতি তৈরি করেন।

বর্তমানে আমরা যেগুলোকে পুতুল বলছি তার বেশির ভাগ দেবদেবী অথবা কোন কাল্ট অবজেক্ট। এই লোকশিল্পের যে বিস্ময়কর সৃষ্টি তা মূলত নামগোত্রহীন। যাঁরা এই সব সৃষ্টি করেছেন তাঁরা কোন মৌলিকতা দাবী করেন না। তাঁরা বলেন একটা গোষ্ঠীর কথা। একটা প্রবহমান ঐতিহ্যের কথা।

অঙ্কন : সমীর বিশ্বাস ও প্রবীর সেন
ছবি : 'ফোক আর্ট অব বেঙ্গল' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত ■

বিষাদ সিন্ধু

গৌরকিশোর ঘোষ

আমার কাছে মহরম মানেই বিষাদ সিন্ধু। অর্থাৎ অপরিমিত শোক। ঝিনাইদহের যে গ্রামে আমার শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলো কেটেছে, সেখানে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করত। সেই কারণেই হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের প্রধান উৎসবগুলো সম্পর্কে অনেক বেশী ওয়াকিবহাল ছিল। বেশী দিনের কথাও নয়, মাত্রই বাট বছর আগেকার কথা। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ সময় সম্প্রীতি থাকলেও মাঝে-মধ্যে যে বিবাদ বাধত না, তা নয়। যেটা বলতে চাইছি, তা হল এই যে, সে আমলে বিবাদই বাধুক আর সৌহার্দ্যই থাকুক, তখনকার মুসলমান তখনকার হিন্দুকে যতটা জানত, বা তখনকার হিন্দু তখনকার মুসলমানকে যতটা জানত,—আমরা যেমন জানতাম জুলুয়া কী, আকিকা কী, ওরাও তেমন জানত, অন্নপ্রাসন কী, শুভদৃষ্টি কী—এখন স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এখনকার হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে ততটা জানাশোনা নেই। এ কথা সাধারণভাবেই সত্য। ব্যক্তিগত উদাহরণ এখানে ধরছিনে।

দেশ ভাগের আগে আমাদের গ্রামগুলো মোটামুটি যেভাবে বিন্যস্ত ছিল, তাতে প্রায় অধিকাংশ গ্রামেই হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করত। হিন্দুপ্রধান বা মুসলমানপ্রধান গ্রাম যে ছিল না, তা নয়, কিন্তু শুধুমাত্র হিন্দু গ্রাম বা শুধুমাত্র মুসলমানের গ্রাম, এটা বড় একটা চোখে পড়ত না। ফলে জন্ম বিবাহ মৃত্যুকে ঘিরে যে হিন্দু মুসলমানের জীবনযাত্রা তার মোটামুটি খবর সকলেরই জানা ছিল। তাই মুসলমান পাড়ায় সন্ধ্যার পর কাড়ানাকাড়ায়, পরে যাকে ডগর বলে জেনেছি, কাঠি পড়লেই হিন্দু পাড়ার লোকেরা জেনে যেত মহরম এসে গিয়েছে। আবার হিন্দু পাড়ায় ঢাকে কাঠি পড়লে মুসলমানেরা জেনে যেত দুর্গা পূজা এগিয়ে এসেছে। কৌতূহলী হিন্দুদের ভিড় জমত মুসলমানদের আখড়ায়, যেখানে প্রতিসন্ধ্যায় ঢাল সড়কি লাঠি নিয়ে ওস্তাদরা কারবালা যুদ্ধের মহড়ায় মেতে উঠতেন। বারোয়ারি মণ্ডপে প্রতিমার কাঠামোয় খড় জড়ানো শুরু হতে না হতেই যে সব কৌতূহলী শিশুর ভিড় জমত, তাতে হিন্দু মুসলিম দুইই থাকত। মইষেকুড়ো গ্রামের মুসলমান পাড়া আর আমাদের মথুরাপুর গ্রামের হিন্দু পাড়া ছিল কাছাকাছি। মাঝে কেবল একচিলতে নদী, নাম নবগঙ্গা। ঝিনাইদহ থেকে আমাদের গ্রামের হরিসভায় ফুলদোলের দিন বিগ্রহ আনতে হত, ঠাকুর আসতেন চৌদোলায় চড়ে, একেবারে মইষেকুড়োর বুকের উপর দিয়েই। খোলকরতালের আওয়াজ পেতে না পেতেই গোটা মইষেকুড়ো গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা পথের দুধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকত। মইষেকুড়োর মান্নান ছিল আমার সহপাঠী। সে আমার দেখাদেখি বিগ্রহকে প্রণাম করে তার বড় চাচার কাছে ধমক খেয়েছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

মহরমের মিছিলের তাজিয়া আর মাতম দেখার জন্যে আমরাও ভিড় করে দাঁড়াতাম গ্রামের পথে। ওই মইষেকুড়োর জেয়াদ আলি সর্দার ছিল ঢাল সড়কিতে এক নম্বর ওস্তাদ। মহরমের দিন যে ঢাল সড়কির খেলার প্রতিযোগিতা হত, তাতে জেয়াদ সর্দারের সামনে কেউই দাঁড়াতে পারত না। জেয়াদ সর্দার ছিলেন আমাদের অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান সকলেরই আদরের আর গর্বের বস্তু। যদিও কেউ কেউ সন্দেহ করত যে, জেয়াদের একটা ডাকাতের দল আছে।

জন্ম বিবাহ মৃত্যুকে ঘিরে যে হিন্দু মুসলমানের জীবনযাত্রা তার মোটামুটি খবর সকলেরই জানা ছিল। তাই মুসলমান পাড়ায় সন্ধ্যার পর কাড়ানাকাড়ায়, পরে যাকে ডগর বলে জেনেছি, কাঠি পড়লেই হিন্দু পাড়ার লোকেরা জেনে যেত মহরম এসে গিয়েছে।

জেয়াদকে আমি বেশ ছোটবেলায় দেখেছি। ওঁকে যেমন বেজায় ভয় পেতাম, আবার তেমনি ওঁর নেওটাও ছিলাম। জেয়াদ সর্দার এক ধরনের হাঁকাড় দিতেন সড়কি খেলার সময়। তাতে আমার পিলে চমকে যেত। ভয় এই কারণে। আর শীতকালে তিনি যখন মাঠে বসে বসে গুড় জ্বাল দিতেন, তখন স্কুল ফেরতা আমাদের কাউকে দেখতে পেলে রস খেতে দিতেন। কোনও কোনও সময়ে তার মধ্যে আসকে পিঠেও থাকত। নেওটা হবার কারণ এই। দুঃখ হয়, আমার ছেলেমেয়েদের মনে এই ধরনের কোনও সুখস্মৃতি নেই বলে।

দেশ ভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামের এই চিত্রটা বেশ দ্রুত বদলে যায়। অধিকাংশ গ্রামই হয়ে পড়ে সর্বাংশে হিন্দুর, না হয় সর্বাংশে মুসলমানের। এই পোলারাইজেশন হিন্দু ও মুসলমান, দুইয়েরই ক্ষতি করেছে বলে আমার ধারণা। বাংলাদেশের কথা বলতে পারব না। এদিকের অধিকাংশ জেলার চেহারাই এই। মুরশিদাবাদ জেলার বা মালদহের গ্রাম বিন্যাসের কোনও পরিবর্তন হয়েছে কি না, সেটা বলতে পারছিনে। কলকাতা শহরে অবশ্য বরাবরই হিন্দু এবং মুসলমানের বসতি মূলত আলাদা আলাদাভাবেই ছিল। দেশ ভাগের আগে কলকাতা শহরে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা এখনকার চাইতে অনেক বেশী ছিল বলেই বিভিন্ন মহল্লায় মুসলিম পরব যে সব অনুষ্ঠিত হত, সেগুলো এখনকার চাইতে অনেক বেশী হিন্দুর নজরে পড়ত। তাতে মাঝে মাঝে অশান্তিও ঘটত, কিন্তু মোটামুটি অনেক বেশী হিন্দু সে সব পরবের খোঁজখবর রাখত। এখন, যেটা আমাকে কষ্ট দেয়, সেটা হল হিন্দু এবং মুসলমানের একেবারে ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্টের মনোভাব। মনে হয় কেউ কাউকে ভাল করে চেনে না। অশান্তির মাত্রা কমাতে গিয়েই হয়ত আমরা পরস্পরের মধ্যে অপরিচয়ের বেড়াটাকেই উঁচু করে গেঁথে তুলছি।

আমার আরও দুঃখ এই কারণে যে, ছোট বয়েস থেকে এ পর্যন্ত আমি মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে ওঠাবসা করবার যে সুযোগ পেয়েছি, আমার ছেলেমেয়েরা সে সুযোগ থেকে একেবারে বঞ্চিতই থেকে গিয়েছে। '৭১ সালে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে, আমার কিছু বন্ধু এদিকে এসে পড়েছিলেন। একটা পরিবার আমাদের বাড়িতেও এসে কিছুদিন থেকেছিলেন। একই বাড়িতে মুসলিম পরিবারের সঙ্গে থাকবার যে স্বাদ, আমার ছেলেমেয়েরা সেই প্রথম পেয়েছিল। এই সুযোগে দুই পরিবারের সমবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে হৃদ্যতা জন্মেছিল, তা এখনও অটুট আছে দেখে আনন্দই হয়।

আমার বিষাদের কাহিনী এমনভাবে বলছি যে, কারো কারো মনে হতে পারে, আমি বোধ হয় গ্রহান্তরের মানুষ সম্পর্কেই আলোচনা করছি। আমি যাদের কথা বলছি, তাদের ভাষা আর আমার ভাষা এক, দেশ বা পরিবেশও এক। তবু সত্যের খাতিরে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, আমরা, শুধু ধর্ম আলাদা, এই কারণে একে অপরের কাছে একেবারে গ্রহান্তরের মানুষেই পরিণত হয়েছি। দুটো সমাজ একেবারে আলাদা হয়েই আছে। সংখ্যালঘু হবার ফলেই হয়ত পশ্চিমবঙ্গে বাঙলাভাষী মুসলমান নিজেদের একেবারে গুটিয়েই নিয়েছেন। এমন কি বামফ্রন্টের আমলেও সরকারি হাউজিং এস্টেটে হিন্দুর পাশাপাশি কোনও মুসলমানকে বাস করতে

দেখা যায় না। এগারো বছর ধরে বি টি রোডে একটা সরকারি হাউজিং এস্টেটে বাস করে এসেছি। কোনও মুসলিম প্রতিবেশীর দেখা পাইনি।

যেখানে অবস্থা এই রকম সেখানে এক সম্প্রদায়ের পালাপার্বণ সম্পর্কে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ অবহিত হবেন কীভাবে ? আমার বিষাদের কারণ এই। অপরিচয়ের আড়াল এত নিশ্ছিদ্র বলেই হিন্দু এবং মুসলিম, উভয়ের সম্পর্কে উভয়ের মনেই প্রচণ্ড অভিমান, ভয়ও হয়ত বা জমে আছে। কেউ কারো সত্য পরিচয় পায় না বলেই একে অন্যের সম্পর্কে যত সব আজগুবি ধারণা মনে পুষে রাখে। এবং সেই অলীক ধারণাকেই এক সময় সত্য বলে গ্রহণ করে। আমার বন্ধু রায়হান আলি একদিন বলেছিলেন, জানেন, অবস্থা যেমন হয়ে আসছে, তাতে করে মুসলমানের পক্ষে আর বেশীদিন কাকাতুয়াকে কাকাতুয়া বলা যাবে কিনা সন্দেহ। চাচাতুয়া না বললে তাদের মুসলমানত্ব রক্ষা করা যাবে না। কথাটা ঠাট্টা করে বললেও তাঁর কণ্ঠে সেদিন গভীর বিষাদ মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

প্রাক স্বাধীনতাকালে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বলেই দেশ ভাগ ঘটে গেল। ভাবা গিয়েছিল আগে শান্তি তো আসুক, সম্পর্কের কথা পরে ভাবা যাবে। দেশ ভাগ করে শান্তি এসেছে কতটা, সেটা বিবেচ্য। তবে হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক যে শীতল হয়ে এসেছে, সে বিষয়ে কোনও ভুল নেই। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরে, এখন, দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমান আরও মুসলমান হবার সাধনায় মেতেছে এবং হিন্দু আরও হিন্দু হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। মানুষ যাতে মানুষ না থাকে, যাতে সম্প্রদায় হয়ে ওঠে, তারই জন্য চলেছে নিরন্তর মহড়া। এই ডামাডোলে আমরা একটা সত্য থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখছি। সেটাও একটু বলা দরকার। দেশ ভাগ হয়েছিল, একটা তত্ত্বের ভিত্তিতে। তত্ত্বটা ছিল এই যে, মুসলমানদের ধর্ম ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দুদের চাইতে আলাদা। এবং ধর্ম আলাদা বলেই মুসলমান আলাদা জাতি। ধর্ম, শুধুমাত্র ধর্মই এই জাতীয়তার ভিত্তি। জিন্না এই তত্ত্ব প্রচার করেই পাকিস্তান পেয়ে গিয়েছিলেন। ভারতের কংগ্রেস নেতারা, গান্ধী এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত জিন্নার তত্ত্বকে মেনে নিয়ে ভারত ভাগ করলেন। দুঃখের কথা এই যে, যে মুসলমান জিন্নার নেতৃত্বে পাকিস্তান কায়েম করেছিলেন, হিন্দু মন কেবল তাদের কথাই মনে রাখল। অর্থাৎ তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে থাকল। আর যে মুসলমান ভারতকেই স্বদেশ বলে গ্রহণ করে, ভারত থেকে না নড়ে, জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বকে ফাঁসিয়ে দিলেন, যা নেহরুর মতো পরাক্রান্ত নেতা পারেননি, যে কাজ বল্লভভাই পটেল করতে ব্যর্থ হলেন, সেই কাজই যখন কয়েক কোটি মুসলমান ভারতকে আপন দেশ বলে বরণ করে নিয়ে, এমন কি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবার ঝুঁকি নিয়েও, বিনা বাক্যে বুঝিয়ে দিলেন যে, ধর্ম দিয়ে জাতিতত্ত্ব নিরূপণ করা যায় না, সেই মুসলমানদের হিন্দু মন আদৌ বুঝতেই পারল না। বুঝতে চেষ্টাও করল না। যাদেরকে ভাই বলে বুকে টেনে নেওয়া উচিত ছিল, সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন হিন্দু তাদেরকে পাকিস্তানি দালাল বলে দূরে ঠেলে রাখল।

এটা মনে করার কোনও কারণ নেই যে, কেবলমাত্র অপারগ মুসলমানই ভারতে থেকে গিয়েছিল। যাদের সামর্থ্য ছিল, তারা সবাই পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। এটা ঠিক যে, সমাজের উপরের তলার অধিকাংশ মুসলমান তাঁদের বাপ-দাদার ভিটে ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সংখ্যায় অনেক কম হলেও, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও, পাকিস্তানে না গিয়ে ভারতকেই নিজের দেশ বলে জ্ঞান করে যাঁরা থেকে গেলেন, তাঁদের সংখ্যাও খুব কম নয়। আজাদ, হুমায়ুন কবির, নজরুল ইসলামের কথা তুলব না। কিন্তু অধ্যাপক, শিক্ষক, সাংবাদিক, বিচারপতি, পদস্থ অফিসার, ডাক্তার, যাঁরা ইচ্ছে করলেই ওপারে চলে যেতে পারতেন, তাঁরা ভারতে থাকার ঝুঁকি মেনেই এখান থেকে স্থানত্যাগ করেননি। কারণ তাঁরা দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাস করেননি। পাকিস্তানকে তাঁরা মেনে নিতে পারেননি। কেন ? এটা কি হিন্দু কখনও বুঝতে চেষ্টা করেছে ? হিন্দু বা মুসলিম, এই চোখে এঁদের বিচার না করে, যদি এঁদের মানুষ হিসাবে বিচার করবার চেষ্টা হত, তাহলে যে সমস্যায় আজ আমরা প্রত্যেকে পীড়িত হচ্ছি, সেই সমস্যা অনেক আগেই আমরা উত্তীর্ণ হয়ত হতে পারতাম। কারণ পাকিস্তান সম্পর্কে এঁদের মনোভাবের হিন্দুর মনোভাবের কোনও তফাত ছিল না। মানুষ হিসাবে এঁদের দেখে যদি আমরা এঁদের দিকে এগিয়ে যেতাম, তবে এঁরাও আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতেন। কারণ হিন্দুর চেয়ে ভারতীয় মুসলমানেরাই দেশ ভাগের পরে অধিকতর মানসিক অস্বস্তির মধ্যে পড়েছিলেন। এই মানসিক অস্বস্তিই ওঁদের এগিয়ে আসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবং সেটা দূর করা সম্ভব ছিল একমাত্র হিন্দুদের পক্ষেই।

যে মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে নতুন পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ দেশভাগের পর, ভারতে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক সহজ হয়ে উঠতে পারত, সেই পরিবেশটিই সৃষ্টি করা হয়নি বা যায়নি। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন করে একটা আড়াল তৈরি হয়ে গেল। স্বাধীনতার পরে যে প্রজন্ম তৈরি হল, তার কাছে হিন্দু এবং মুসলমান একে অন্যের কাছে অপরিচিতই রয়ে গেল।

হিন্দু সংখ্যায় বেশী, তাদের পূজাপার্বণের ঢেউ অনেক দূর ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমান সংখ্যায় কম, তাই পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম পরব পার্বণের খবর, ঈদ এবং মহরম ছাড়া, হিন্দুর আঙিনায় এসে পৌঁছায় না। আবার হিন্দু ক্রিসমাস, গুড ফ্রাইডে এমন কি, ইস্টার সম্পর্কেও যতটা সচেতন, ততটা ঈদউলফিতর, ঈদুজ্জোহা, শবেবরাত, শবেকদর, এমন কি মহরম সম্পর্কে সচেতন নয়।

ঈদ মিলনের উৎসব। ঈদ আবার দুটো। রমজান মাসে এক মাস রোজা রাখার পরে আসে ঈদউলফিতর। আর তারই, অর্থাৎ ঈদউলফিরের দু মাস দশ দিন পরে পালিত হয় ঈদুজ্জোহা বা ঈদউল্আজহা। একে বকর-ঈদও বলা হয়। এই দিন হজরত ইব্রাহিম তাঁর ছেলেকে ঈশ্বরের কাছে কোরবানী অর্থাৎ উৎসর্গ করেছিলেন, সেই পুণ্য কর্মের স্মরণে মুসলমান সাধ্যমত নানাবিধ পশু কোরবানী করে থাকেন। আমাদের সময়ে হিন্দু-মুসলমানে এমন আড়াল ওঠেনি। কোরবানীতে গরু জবাই করা নিয়ে হিন্দু-মুসলিমে দাঙ্গা বেধেছে যেমন, তেমনি আবার ঈদের দিনে আমাদের বাড়িতে 'ঈদের মাংস', অবশ্যই খাসির, মুসলিম বন্ধুরা দিয়ে গিয়েছেন। শবে বরাত অর্থাৎ সৌভাগ্যের রাত এবং শবে কদর অর্থাৎ যে রাতে নবী মোস্তাফা মহম্মদের কাছে কোরান অবতীর্ণ হয়েছিল, এই দুটো পার্বণ, ছোট বয়সে দেখেছি, মুসলিমদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ঈদে যে রকম ধুম হত, সেই রকম না হলেও মুসলমানদের যে পরবটি নিয়ে হৈ হৈ কাণ্ড হত, সেটা মহরম। মহরমের মিছিল। তাজিয়া, দুলদুল ঘোড়া, গ্রামের বাইরে কারবালা, লাঠি সড়কি ঢাল এবং শোকোন্মত্ত মানুষের হায় হাসান হায় হোসেন বলে বক্ষে করাঘাত, মাতম, এমন একটা আবহ সৃষ্টি করত আমাদের মনে, যা ভোলা কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখ এই, আমার ছেলের বয়স এখন চব্বিশ, তার মনে এই মাতমের কোনও অনুষঙ্গ নেই। আমি এ বিষয়ে খুবই সচেতন যে, আমাদের সময়ে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য নেমে আসেনি। সেটাও এই মাটিরই মর্ত্য ছিল। মহরমের মিছিল নিয়ে তখন দাঙ্গাও হয়েছে। কোন্ মিছিল নিয়েই বা না হয়েছে ? দুর্গা পূজার বিসর্জনের ঢাকের বাদ্যিকে উপলক্ষ করেও দাঙ্গা হয়েছে। কারণ তখন পলিটিক্সই ছিল দাঙ্গার পলিটিক্স্। দাঙ্গা বাধাতে না পারলে মুসলিম লিগ তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। আমার বলার কথা এই যে, সব মুসলমানই লিগের অনুসারী ছিল না। কংগ্রেসের ব্যর্থতা এইখানে, কংগ্রেস, মুসলমানদের মধ্যে যারা লিগের ভক্ত ছিল না, তাদের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। তাদের কাছে টানতে পারেনি। কারণ পলিটিক্স্ দিয়ে কাউকে কাছে টানা যায় না। হিন্দু মনের বড় ত্রুটি এইখানে যে, মুসলিম সমাজের তুষ আর চালকে সে এক করে দেখেছে। তাদের আলাদা করতে পারেনি। কারণ আমরা ধর্ম এবং রাজনীতির তবকে মোড়া সম্প্রদায়টাকেই শুধু আমল দিয়ে এসেছি। এই খোসা ছাড়িয়ে ব্যক্তি মানুষটাকে বার করে আনতে পারিনি। দেশ ভাগের পর পাকিস্তানপন্থীরা পাকিস্তানে চলে গেলেন। ভারতে যে সব মুসলিম থেকে গেলেন, তাঁদের মধ্যে পাকিস্তানপন্থীদের সংখ্যা যদি থেকে থাকেও তো তাদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। অধিকাংশ মুসলিমই ছিলেন ভারতপন্থী। মুসলিম লিগের সেই ঘোর প্রতাপের দিনেও দেওবন্ধীরা মুসলিম লিগ, জিন্না কিংবা দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। এ খবর অধিকাংশ হিন্দুরই জানা নেই। দেওবন্ধ এবং আলিগড় ভারতের এই দুইটি শহর মুসলিমদের কাছে শিক্ষার পীঠ। দেওবন্ধীরা ছিলেন ধর্মের ব্যাপারে রক্ষণশীল। মৌলবাদী।

আলিগড়িরা ছিলেন আধুনিক। তবু আলিগড়িরা পাকিস্তান চেয়েছিলেন। দেওবন্দীরা ভারতকে অখণ্ড রাখতে জিন্নার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। কাজেই ভারত ভাগ হলে দেওবন্দীদের ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে যাবার কোনও প্রশ্নই ওঠেনি। তাঁরা যাবার চেষ্টাও করেননি। নিজের অধিকারেই তাঁরা ভারতে আছেন।

কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর হিন্দু মন এই ঘোষিত ভারতবাদী মুসলিমদেরও কেন আপন করে নিতে পারেনি? কেন বারবার সন্দেহ করেছে যে, এঁরা পাকিস্তানের দালাল?

যে সব মুসলমান স্বেচ্ছায় ভারতে রয়ে গেলেন, তাঁদেরকে হিন্দু মন কেন আপন স্বদেশবাসী বলে ভাবতে পারে না? বাধা কোথায়? আজ কি আমাদের এই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া উচিত নয়?

এই প্রশ্নের উত্তর যদি খুঁজে পাই, তবেই মিলনের পথ তৈরি হতে পারে। আমি যে মিলনের কথা বলছি, সেটা রাজনীতির মঞ্চ থেকে গড়ে তোলা ঠুনকো দলের মিলন নয়, আমি বলছি মনের মিলনের কথা। হিন্দুর সঙ্গে মুসলিমের মনে মনে বন্ধনের কথা। একের মনে যদি অন্যের প্রতি সন্দেহ থাকে, তাহলে এ মিলন হতে পারে না। রহিমুদ্দিনের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের মনের মিল হতে পারে তখনই, যখন রহিমুদ্দিন রমেশচন্দ্রের বা রমেশচন্দ্র রহিমুদ্দিনের হাঁড়ির খবর জানতে পারবে। হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে স্বাধীনতার পর থেকে নতুন করে যে অপরিচয়ের আড়াল গড়ে উঠেছে, সেটা আমরা ভাঙতে পারছিনে, এটা যেমন সত্য, তেমনই আরও একটা সত্য আছে, যেটা আমাদের চোখে পড়ে না। সেই সত্যটি হচ্ছে এই যে, ভারতের হিন্দু মুসলমান ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এঁদের আলাদা করার শক্তি কারোরই নেই। সেই কারণেই বিচ্ছেদের চেষ্টামাত্রই এত যন্ত্রণাদায়ক।

অতএব এই সত্য মেনে নেওয়াই ভাল। ভারতে হিন্দু থাকবে, মুসলমান থাকবে, শিখ থাকবে, ক্রিশ্চিয়ান থাকবে, বৌদ্ধ থাকবে, জৈন থাকবে, সকলে আপন আপন চরিত্র বজায় রেখেই থাকবে, আজ যাদেরকে অন্ত্যজ শ্রেণীতে ফেলে রাখা হয়েছে তারাও একদিন ক্রমে ক্রমে উঠে এসে নিজের মহিমান্বিত স্থান করে নেবে এই ভারতেই। এইটেই ভারতবর্ষ। অর্থাৎ ভারতের চিরাচরিত পথ। এই পথের ওলটপালট করার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। কারো সাধ্যও নেই। মিলন না বিরোধ, কেমনভাবে থাকবে, সেইটে হল প্রশ্ন।

মিলন যদি কাম্য হয়, তবে একে অপরকে জানতে হবে। বুঝতে হবে। একে অপরের প্রতি সহিষ্ণু হতে হবে। পরব পার্বণগুলো মিলনকে এগিয়ে আনতে পারে। তাই একের পরব পার্বণ সম্পর্কে অন্যের চোখ বুজে থাকলে চলবে না। একের জীবনযাত্রার ধরনধারণ সম্পর্কে অন্যকে খবরাখবর রাখতে হবে। তবেই অপরিচয়ের আড়াল একটু একটু করে খসতে শুরু করবে। আমাদের বাল্যকালে যে সব পাঠ্য বই রচিত হত, সেই সব বইতে একদিকে যেমন করুণাময়ী রাণী

মিলন যদি কাম্য হয়, তবে একে অপরকে জানতে হবে। বুঝতে হবে। একে অপরের প্রতি সহিষ্ণু হতে হবে। পরব পার্বণগুলো মিলনকে এগিয়ে আনতে পারে। তাই একের পরব পার্বণ সম্পর্কে অন্যের চোখ বুজে থাকলে চলবে না।

ভিক্টোরিয়ার কাহিনী থাকত, অন্যদিকে তেমন আবার রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, মহরমের কাহিনী, সোহ্‌রাব রুস্তমের উপাখ্যান, রাজা ক্যানিউটের কাহিনী, এই সবও থাকত। জীবনী থাকত যেমন ডেভিড হেয়ার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তেমনি থাকত বিদ্যোৎসাহী দাতা হাজী মহম্মদ মহসীনের। তাপসী রাবেয়ার কথাও আমরা জেনেছি পাঠ্য পুস্তক থেকেই। গৌতম বুদ্ধের জন্মকথার সঙ্গে আমরা দেবকীনন্দন যশোদাদুলাল কৃষ্ণের জন্মকথা, মাতা মেরীর পুত্র যীশুর কথা, হজরত মোহাম্মদের কথা, শচীনন্দন নিমাই পণ্ডিতের কথা, এ সব তো আমরা পাঠ্য পুস্তক থেকেই জেনেছি। একই বইয়ের মধ্যে পাশাপাশি যদি এই সব চরিতকথা পড়তে পারা যায়, তবে বালক-বালিকার মনে কোনও ভেদজ্ঞান জন্মাতে পারে না। সবাইকেই আপনার লোক বলে মনে হয়। অন্তত আমাদের মনটা যে এইভাবেই গড়ে উঠেছে, তা তো জানি। মুসলমান সব সইতে পারে কিন্তু বেইমান বললে সেটা সইতে পারে না, এই কথাটা আমরা শিখেছি শরৎচন্দ্রের লেখা থেকেই। এবং সেটা আমাদের মনে এমন গভীরভাবে দাগ কেটে রেখেছে যে, কোনও দিনই তা ভুলতে পারিনে। কারবালার মর্মভেদী কাহিনী পড়েছি মীর মোশারফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থে। চোখের জলে বুক ভেসে গিয়েছে।

মুসলমানেরা ধর্মভাবে এমনই আচ্ছন্ন যে, পান থেকে চুন খসলেই তারা মারমুখী হয়ে ওঠেন, এমন একটা কথা আমরা হামেশাই শুনে থাকি। কথাটা হয়ত একেবারে মিথ্যেও নয়। কিন্তু আমাদের অজ্ঞতার দোষে আমরা প্রতিনিয়ত মুসলমানদের মনে যে আঘাত দিয়ে থাকি, সে সম্পর্কে বিশেষ চেতনা কারো মনে দেখিনে, এটাও তো সত্যি। আমাদের বাল্যকালে পাঠ্য পুস্তকে ভুল তথ্য আমরা বিশেষ পাইনি। সেই কারণেই সম্ভবত আমরা বইয়ের লেখাকে বেদ বাইবেল কোরান সমান জ্ঞান করতাম। এ আমলের লেখকদের অসতর্কতা এত যে, ভূরি ভূরি ভুল তথ্য পাঠ্য পুস্তকে থেকে যায়। এবং তা সম্প্রদায় বিশেষের পীড়ার কারণ হয়ে ওঠে। এই সত্য অস্বীকার করা যায় না। এ সবই ঘটে অপরিচয়ের জন্য। কারবালার কাহিনী আর কুরুক্ষেত্রের কাহিনী পাশাপাশি পড়লে একটা মিল খুবই নজরে পড়ে। সেটা এই যে, দুইই আদতে জ্ঞাতি হত্যার কাহিনী। অতিরিক্ত লোভ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে, মানুষের সার্বিক বিনাশের কারণ হয়ে ওঠে এবং সার্বিক যুদ্ধ যে পাপাত্মা পুণ্যাত্মায় কোনও ভেদ করে না, এই দুটি কাহিনী আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দেয়। যে নারী আমার নয়, তাকে গায়ের জোরে লাভ করতে যাওয়ার পরিণাম যে কত মর্মবিদারী হতে পারে, সেটা রামায়ণে, ইলিয়াডে আর কারবালার কাহিনীতে সুন্দরভাবে বিধৃত আছে। এ সবই তো মূলত বিষাদ সিন্ধু। সীতা, হেলেন, জয়নব, সহৃদয় পাঠকের চোখে এক হয়ে যায়।

কারবালার বিষাদ সিন্ধুর স্মৃতি উদ্‌যাপনই মহরম পরবের উদ্দেশ্য। সুন্দরী জয়নব বিবি এজিদকে প্রত্যাখ্যান করে হজরত মোস্তাফা মহম্মদের কন্যা ফতেমা বিবির পুত্র ইমাম হাসানকে পতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। বিবি জয়নবকে হস্তগত করার জন্য এজিদ চক্রান্ত করে ইমাম হাসানকে প্রথমে বিষ প্রয়োগে হত্যা করান এবং পরে ইমাম হাসানের ছোট ভাই ইমাম হোসেনকে কারবালার মরুপ্রান্তরে সবংশে নিধন করেন এজিদ। ঘটনাটা ঘটে হিজরি ৬১ সনে মহরম মাসের ৮ তারিখে। মহরম মাস মুসলিম পঞ্জিকার প্রথম মাস।

হিন্দু মুসলিম ক্রিশ্চিয়ান বলে কথা নেই, এই কাহিনী সমগ্র মানুষ জাতির কাহিনী। যেমন রামায়ণ, যেমন মহাভারত, যেমন ইলিয়াড। যেমন সোহ্‌রাব রুস্তমের কাহিনী। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, মহরমের পরবকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজেও হানাহানির অন্ত নেই। ভেদবুদ্ধির এমনই মহিমা। এমন একটা শোকাবহ ঘটনা শিয়া-সুন্নি সঙ্ঘর্ষের উৎস হয়ে উঠবে, এ কথা কে ভাবতে পেরেছিল?

যেমন আনন্দ মানুষে মানুষে মিলনের হেতু হতে পারে, তেমন মহাশোকও মানুষে মানুষে মিলনের সেতু হতে পারে। কিন্তু এই কথাটাই আমরা ভুলে বসে থাকি। মনে ভালবাসা না থাকলে মানুষ উদার হতে পারে না। হাত বাড়িয়ে কাউকে বুকে টেনে নিতে পারে না। ভালবাসা না থাকলে মানুষ মানুষকে মানুষ বলেই চিনতে পারে না। তখন কেউ হয়ে যায় হিন্দু, কেউ হয়ে যায় মুসলমান। কেউ হয় শিয়া, কেউ হয় সুন্নি। হায়, বিষাদ এইখানেই।

অঙ্কন : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ধর্ম উৎসব প্রগতি

হোসেনুর রহমান

মুসলমান সমাজে উৎসব বড় গম্ভীর। কারণ, উৎসবের প্রাণ বাঁধা থাকে ধর্মের কঠিন তত্ত্বে। কোন কোন সময় ধর্মোৎসব বা মিলনোৎসব সর্বক্ষণ তাকিয়ে থাকে মসজিদের দিকে। তাকিয়ে থাকে সমাধিভূমি বা কবরস্থানের দিকে। এর অর্থ: উৎসবমুখর মুসলমান পরকাল, ঈশ্বর এবং যাঁরা চলে গেছেন তাঁদের মধ্যেই যেন সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকতে চান। তাই উৎসবের দিনে এই মানুষ অবশ্যই কিছুটা কম উৎসবপ্রবণ হতে বাধ্য। মুসলমানের জীবনে কবরস্থান অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে পরম আনন্দের মুহূর্তেও। উৎসব যতটা কর্তব্য, ততটা নেহাতই উৎসব নয় মুসলমানের কাছে।

মুসলিম বিশ্বে দুটি মাত্র প্রধান উৎসবের মূলেও ইসলামের ভিত্তি আসল কথা। এরা সাধারণ অর্থে কোনও হাল্কা উৎসবের মেজাজ উৎপন্ন করে না। ধর্মবিশ্বাস প্রসারের, সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি প্রকাশের একটি বিশেষ সুযোগমাত্র। ইসলাম ধর্মপ্রচারক সচেতনভাবেই উৎসব বা ধর্মাচরণ যথাসম্ভব সহজ সরল নিরাভরণ করে রাখলেন। এর একটি বড় কারণ ইসলাম সমস্ত অর্থে সাধারণ ও সরল মানুষের ধর্ম। তাই ইসলামে গভীর কোনও মরমীবাদ (মিস্টিসিজম) বা এমন কী অধ্যাত্মবাদ (স্পিরিচুয়ালিজম) যত্রতত্র দেখা যাবে না। এ সব কারণেই ইসলামের উৎসব বারো মাসে তেরো পার্বণ নয়। এবং যতটুকু উৎসব আছে তার পেছনে আছে ইসলামের কাঠামোকে উজ্জ্বল করে তোলার সজাগ, সচেতন চেষ্টা।

দুটি উৎসবের একটির ভিত্তিভূমি হচ্ছে, তীর্থযাত্রার সমাপ্তিসূচক উৎসব। অর্থাৎ একটি উৎসব যা অনুষ্ঠিত হচ্ছে দীর্ঘ ক্লেশ ও কৃচ্ছ্রসাধনের পর। অনেক ক্লান্তি, অনেক শ্রান্তির পর একটি ভোজসভা বলতে পারেন। ভোজ নিশ্চয়ই উৎসবের একটা বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু ভোজই উৎসবের সবিশেষ প্রাণ নয়। অন্যটিও অনুরূপ। দীর্ঘ একমাস উপবাসের পর আর একটি উৎসব। একমাস কৃচ্ছ্রসাধনের পর আবার একটি ভোজসভা—যা ঘোষণা করছে দীর্ঘ একমাস উপবাস সমাপ্তির। এই জাতীয় উৎসব প্রতিবছর মুসলমানকে সাহায্য করে গভীরতর বা ঘোরতর অর্থে মুসলমান হয়ে উঠতে। ঈদে বা বাকর-ঈদেও তাকে সবসময় correct থাকতে হয়। কোথায় একটা অদৃশ্য ধর্মের শাসন তাকে সর্বদাই শৃঙ্খলিত করে রাখে। তাহলে কি মুসলমান সমাজের উৎসব উৎসব নয়? অন্তত বাইরে থেকে যাঁরা ঈদের সকালবেলায় রেডরোডে নামাজের সমাবেশ দেখেন বা পরের দিন সকালবেলা খবরে কাগজে ছবি দেখেন তাঁরা অভিভূত হয়ে যান। অসংখ্য মানুষ পশ্চিমদিকে ঈশ্বরের নামে মাটিতে কপাল ঠেকাচ্ছে। মনোরম সে দৃশ্য! নামাজের শেষে একজন অপরিচিত অন্য একজনকে গভীর প্রেম নিয়ে আলিঙ্গন করছেন। তারপর সেই একই দৃশ্য। যেমন বিজয়ায় প্রণাম, নমস্কার, আলিঙ্গন। শুভেচ্ছা বিনিময়। তারপর মিষ্টান্ন। মুসলমানদের মধ্যেও মিষ্টান্ন বিতরণের রেওয়াজ বহুলপ্রচলিত। এই মিষ্টান্ন বলতে প্রধানত সেমইয়ের পায়েস, জরদা ইত্যাদি বোঝায়। আর নিজেদের মধ্যে বিরানী তো চলছেই। এই হল উৎসব। অর্থাৎ পরবর্তী অংশে সংস্কৃতির কোনও মেজাজ দেখতে পাবেন না। ধর্ম, ধর্মানুভাব, ধর্মীয় সংস্কৃতি যেখানে সর্বক্ষণ বিরাজ করছে সেখানে শিল্পসংস্কৃতি বা সাহিত্যসংস্কৃতির উজ্জ্বলতা সম্ভব নয়। তাই মুসলিম বিশ্বে নাটক, নভেল, নৃত্য, চিত্রকলা—উন্নতমার্গে আজও গিয়ে পৌঁছল না। যেমন পশ্চিমবঙ্গে শারদসাহিত্য। দরিদ্র বাঙালি বহু পুজোসংখ্যা কিনে পড়ে বা সংগ্রহ করে। প্রতি বছর এই সাহিত্যসংখ্যার চরিত্র, অঙ্গসৌষ্ঠব, সময়ের দাবি মেনে পাল্টায়, যেমন পাল্টায় দুর্গাপ্রতিমার চেহারা থেকে অনুষঙ্গ পর্যন্ত। দুর্গাপূজা বাঙালির এক সার্বিক সামাজিক উৎসব। প্রতি বছর শিল্পীর, লেখকের, কবির নতুন ভাবনাচিন্তার প্রকাশ ঘটে, কেবল সাহিত্যে নয়, প্রতিমা নির্মাণে, প্যাণ্ডেলের শিল্পসম্ভারে। শারদীয়া উৎসব বাঙালির পরিবর্তন-আকাঙ্ক্ষাকে সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরে প্রকাশ করে। এই প্রকাশে জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাঙালি ও অবাঙালি এসে উপস্থিত হয়। এইতেই শারদোৎসব সকলের হয়ে উঠতে পেরেছে। যিনি এতটুকু দুর্গাপূজায় ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাননি, যিনি রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতাপে পুজোয় কোনো বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন না, যিনি এ সব অহেতুক বলে বাতিল করে দেন, তিনিও ওমুক পল্লীর ঠাকুর দেখতে যান অষ্টমীর রাতে। তিনি বাগবাজারের প্রাচীন প্রতিমা ও তার ডাকের সাজ দেখে বলেন,—এমনটি তোমাদের একেলে শিল্পীরা করতে পারবে না। বা মধ্য কলকাতার কোনো প্যাণ্ডেল দেখে অভিভূত না হয়ে পারেন না। এসব প্রমাণ করে হিন্দু পুজো তো আছেই দুর্গাপুজোর চার দিন, আবার ওই পুজোকে ঘিরে বিশাল একটা মুভমেন্ট চলে প্রতিবছর। এই মুভমেন্ট বাঙালিকে আগামী সারা

ছবি: শৈবাল দাস

বছর বেঁচে থাকবার ও বোধকরি চিন্তা করবার প্রচুর খাদ্য দেয়। দুঃখের কথা, মুসলমানের উৎসব একেবারে অন্য জীবনের প্রতিজ্ঞা এনে দেয়। সে জীবন নিরঙ্কুশ নীতিসর্বস্ব, ঈশ্বরচিন্তায় সর্বক্ষণ মগ্ন, ধর্মানুভাবে কেবলমাত্র মুসলমান সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ ঈদ, বাকর-ঈদ থেকে হজ পর্যন্ত মুসলমানের আরাধনা ইসলামি সলিডারিটির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রতি বছর যাঁরা বর্মা মুল্লুক থেকে বা ইন্দোনেশিয়া থেকে বা মালয়েশিয়া থেকে হজ করতে যান মক্কায় তাঁরা ঘরে ফিরে আসেন আরো অধিকতর মুসলমান হয়ে। এই অধিকতর মুসলমান বনে যাওয়ার মূলে যে একটা আধ্যাত্মিক প্রেরণা কাজ করে তা বলা যাবে না। মূলত ইসলামে একটা সংকট আছে অধ্যাত্মবাদের জগতে। সেই সংকট মোচন করতেই উলামাদের বহুবারই অনেক বেশি রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহারের দিকে ঝুঁকতে হয়েছে। আর রাজনীতিক ক্ষমতার প্রতি একবার নজর পড়লে তাবড় তাবড় মৌলানা-উলামার দল পথভ্রষ্ট হয়েছেন। বা রাজনীতিক ক্ষমতাভোগী উলামা সাধারণ মুসলমানকে আর সামাজিক বৌদ্ধিক সংস্কৃতিতে নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে দেননি।

তাহলে কি মুসলমানের মনে উৎসবের রঙ ধরেনি ? ধরেছে বৈকি ? ইসলাম বহু দেশ জয় করেছে। স্বভাবতই সে সব দেশের মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। যেমন পারস্য দেশ। কিন্তু পারস্য দেশের শিয়া সম্রাটেরা "paid little regard to the mosaic and Koranic prohibition, and thus a school of art was formed which became extended to India under the patronage of Akbar." অর্থাৎ পারস্য বা ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়া ধর্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু দেশজ সংস্কৃতি বিসর্জন দেয়নি। আর ভারতবর্ষে মুঘলসম্রাট আকবর ধর্মচিন্তার জগতে বিস্ময়কররূপে সারসংকলনবাদে (Eclecticism) বিশ্বাসী ছিলেন। অনেক কিছু স্বাভাবিকভাবেই শিল্প প্রতিভায় অবিনশ্বর পারস্য থেকে এ দেশে তিনিই আমদানী করেছিলেন। পারস্যের নওরোজ, পরে বাংলাদেশের নববর্ষ উৎসব হল আকবরের সৌজন্যে। আকবর ধর্মের বাইরের আচার অনুষ্ঠান এহ বাহ্য বলে বর্জন করেছেন বার বার। আকবর সব ধর্মকর্মের মধ্যে ভারতীয় লোকচিত্তের একতাকে তুলে ধরতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। বিশেষ করে তিনি একটি ভারতবর্ষীয় সমাজচিন্তাকে সবিশেষ প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। দীন-ই-এলাহি তার প্রমাণ। "...when he introduced the Din Ilahi, or Divine Faith, he changed the mosques and prayer-rooms into store-rooms, or put them in charge of Hindu watchmen." এবং সর্বোপরি ইরানের সুফি সাধকেরা ভারতীয় ইসলামের বিপুল পরিবর্তন সাধন করল। চিস্তি সঙ্ঘের সুফিদের মরমী চেতনা, বৈরাগ্যসাধনা, সার্বিক যুক্তিবাদ মুসলমানের কঠোর একেশ্বরবাদী চিন্তাকে সেই হেতু বিশ্বসংসারের সকল সম্পৃক্ততা থেকে দূরে থাকার প্রবণতাকে এবং যা কিছু অমুসলমানিয়ানা তাকে আপত্তিকর মনে করাকে প্রবল আঘাত হানলে। ক্রমশ মুসলমানের মনের নিভৃতে গভীর অধ্যাত্মচিন্তা দানা বাঁধতে লাগল। আকবর থেকে দারা শিকো পর্যন্ত এক মুক্ত ধর্ম সারসংকলন স্পৃহা চলে অবলীলা ক্রমে। মুসলমান সৈনিকের ঘোড়া শান্ত হয়ে এল। অভিজাত মুসলমান সমাজে সুফিবাদের মন্ত্র শোনা গেল। উদারমনা মুসলমান আকবরের পরিচালনায় ইসলামের যুক্তি ও শাশ্বতরূপকে মানুষের কাছে তুলে ধরলে। এই চিন্তার প্রবাহকে স্বভাবতই বরদাস্ত করতে পারলে না গোঁড়াপন্থী সুন্নি মুসলমানেরা। শঙ্কিত সুন্নিরা ভাবলে "that Islam in India could be vitiated and Muslim society eroded by accommodation with idolatry." এই আশঙ্কাই গোঁড়াপন্থীদের পাগল করেছিল। তারা নির্মল নিরঙ্কুশ ইসলাম, আদি ও অনন্ত ইসলামকে রক্ষা করতেই আওরঙজিবকে সমর্থন জানিয়েছিল। আর 'যত মত তত পথে'র প্রবক্তা দারাকে প্রাণদণ্ডাদেশ দেবার সময় আওরঙজিব একটিমাত্র অপরাধের কথা উল্লেখ করেছিলেন, 'দারা ইসলামের বিরুদ্ধ বিশ্বাস পোষণ করেছিল।' সেদিন থেকে ভারতবর্ষের ইসলামের ইতিহাসে উৎসবের আলো নিবে গেল। বেঁচে থাকল ধর্ম, বেঁচে থাকল নামাজ, রোজা, হজ। ধর্মের কঠোর কর্তব্যপালন শেষে এক একটি ভোজসভা। এই হল উৎসব, যদি বলতে চান।

মুসলমান সমাজে উৎসব বড় গম্ভীর। উৎসবের প্রাণ বাঁধা থাকে ধর্মের কঠিন তত্ত্বে ছবি : অঞ্জন ঘোষ

মহরম বলতে বাঙালি মুসলমান কারবালা প্রান্তরের হাসান-হোসেনের মর্মান্তিক ট্র্যাজিডিকে বোঝে। অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান মহরমের মর্মকথা মীর মশারাফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' থেকে সংগ্রহ করে থাকে। এখনো দিদিমা-ঠাকুমারা মুসলমান ছেলেমেয়েদের 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'বিষাদ সিন্ধু'র গল্প বলে ঘুমপাড়াতে চেষ্টা করেন। বহু শিক্ষিত মুসলমান মীরের বিষাদ সিন্ধুকে মুসলমানের মহাভারত বলে থাকেন। এখানে কারবালা, ওখানে কুরুক্ষেত্র। এখানে এজিদ, ওখানে দুর্যোধন। আবার পারস্য দেশের মহরম আর ভারতবর্ষের মহরম এক নয়। এ দেশের মহরম এ দেশের মানসিকতা ও মেজাজের সঙ্গে মিশে এসেছে বহুলাংশে। হায়দ্রাবাদের মহরম আর কলকাতার মহরম আবার এক নয়। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে মহরমকে কোনোমতেই উৎসব বলা যাবে না। তবু সাম্প্রতিক কালে যারা কলকাতার পথে মহরম পালন করে তারা অতীত দিনের সমস্ত মহরম-ঐতিহ্যকে ম্লান করে দিয়েছে। এক ভয়াবহ উৎসবে পরিণত হয়েছে মহরম। লাঠি-সোটা, বোমা-পটকা, এক অবর্ণনীয় উন্মত্ততা! আগুন নিয়ে খেলা প্রমাণ করে না যে হাসান হোসেনের ট্রাজিডি মুসলমান সমাজের কাছে কোনোপ্রকার শ্রদ্ধা দাবি করতে পারে। মহরম নাকি দুঃখভোগ ও যন্ত্রণাভোগের মধ্যে দিয়ে স্বরূপের সন্ধান। কিন্তু আজ বোধকরি রাজনৈতিক কারণেই মহরম তার ঐতিহ্য —আনন্দবিনোদন নয়, ঐশ্বর্য বা ক্ষমতা প্রচার নয়, ভোগ বা সম্ভোগ তো নয়ই—থেকে সরে এসেছে।

আবার বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মহরম অতীতে এদেশে বহুক্ষেত্রেই মনোজ্ঞ উৎসবে পরিণত হত। হিন্দুমুসলমানের সম্পর্ক এমন উৎসবের মধ্যে দিয়ে অনেক বেশি পাকাপোক্ত হয়ে আসত। বহু প্রদেশে সে কালে

প্রয়োজনের তাগিদ, না অপ্রয়োজনের আনন্দ ?

ছবি : অঞ্জন ঘোষ

অগণিত হিন্দু নিজেদের পার্থিব সংস্কৃতিকে রক্ষা করে মহরমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করত। দাক্ষিণাত্যের জাফর শরীফের ভাষায় দেখুন গুজরাতের মহরম : "Many Hindus have so much faith in these Cenotaphs, standards, and the Buraq, that they erect them themselves and become Faqirs during the Muharram. In Gujrat, as the cenotaphs pass in procession, poor Hindu and Mussalman men and women, in fulfilment of vows, often throw themselves in the roadway and roll in front of the Cenotaph...

"In Gujrat on the ninth day of the festival some Hindu women wear wet clothes, a symbol of the ceremonious bathing after a death in the family, and drop pieces of hot charcoal on their bodies.

"Next day when the shrines are being taken to the river some low-caste Hindus, in the hope of securing the well-being of their children or the cure of some disease, offer to the shrines various kinds of food, coco-nuts, red threads, cloth and even camels and elements or the flesh of cock, goat, or buffalo, and with a coco-nut in their hands roll in front of the Cenotaph". (Islam in India or the Qanun-I-Islam, composed under the direction of, and translated by G. A. Herklots, M. D., First pubd. 1921, P166-7)

একেই বলে স্বাভাবীকরণ বা আত্মীকরণ। হিন্দুর মানসিকতায় যেমন করে ভক্তি পূজানিবেদন আসে সে মুসলমানের তাজিয়াকে তেমন করেই নিজের মত করে নিয়েছে।

এখানে এটুকু বললেই চলবে, বাঙালি মুসলমান,শিয়াদের এই মহরমে খুব মেতে উঠতে শেখেনি। আজই যদি কোন বাংলাদেশিকে জিগেস করেন: কেমন মহরম করছেন আপনাদের দেশে? উত্তরে তিনি বলবেন: বিহারিরা চলে গেছে মহরমও শেষ হয়ে গেছে। এই যুক্তির সম্প্রসারণ এক অর্থে ভারতবর্ষে দেখা যাবে, বা বলা ভাল দেখা যেত। গুজরাটের 'মহরম উৎসব' কীভাবে পালিত হত জাফর শরীফ বলেছেন। 'মহরম উৎসব পালিত হত সেকালে বরোদায়। 'সেন্ট্রাল প্রভিনসেস'-এ। হিন্দু (নিম্নবর্গের অবশ্যই)-রা কীভাবে নিজেদের সাংস্কৃতিক পদ্ধতি রক্ষা করে মহরম পালন করত—এ সব বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে ১৯১১-র সেনসাস রিপোর্টে। এই একটিমাত্র সময় যখন হিন্দুরা মুসলমানদের হাতে দুটো অন্নগ্রহণ করত। অর্থাৎ ধর্ম তখন সমাজে আনন্দোৎসব ছিল। আর এখন? প্রতিবছর রীতিতে মহরম পালিত হচ্ছে। প্রতিবছরই হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা হচ্ছে। সেকালেও যে হোত না তা বলা যাবে না। তবে সে কালে সাম্প্রতিক কালের মত দাঙ্গা এমন রেগুলার ফিচার ছিল না।

সম্প্রতি ধর্ম-উৎসব আর আনন্দ-উৎসব নেই। আমরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি ধর্ম-উৎসবের নামে একপ্রকার পরিচয় বা আমার সম্প্রদায়ের অভিন্নতা প্রকট হয়ে উঠছে। একটা দৃষ্টান্ত : আজ যখন মহরম পালিত হয় বা এমন কি সাবি বারাত, তখন শান্তিপ্রিয় মানুষ—হিন্দুমুসলমান—উভয়ই ভয় পেতে ভালবাসেন। কারণ অতীতে সাবি বারাতের রাতে এত টেম্পো, লরি, বাস, মোটর বাইকের অভিযান আমরা দেখিনি। এমনও দেখেছি, এইসব দ্রুতগামী যান পুণ্যার্থীদের নিয়ে চলেছে খিদিরপুর থেকে পার্ক সার্কাসের দিকে। একটি প্রশ্ন, রাত দশটা-এগারোটায় এরা কোথায় চলেছে? পার্ক সার্কাসের কবরস্থান গোবরার উদ্দেশে? রাতের অন্ধকারে মৃতজনস্মরণ সাবি বারাতের একটি অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু এতদিন তো ওই অঞ্চলবাসীরা ঐ অঞ্চলের ষোলআনা মুসলমান কবরখানায় যেত। আজ কেন তাদের আসতে হচ্ছে অন্য এক অঞ্চলে? এক পল্লীর অধিবাসী মহরম বা সাবি বারাত করতে অন্য পল্লীতে চলে যাচ্ছে। এবং ধর্মানুষ্ঠান পালনের রীতিনীতিও পাল্টে গেছে। এখন এ সব ধর্মানুষ্ঠান অনেক বেশি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, অনেক বেশি হিংসাত্মক জঙ্গি দেখায় এই ধর্মপ্রাণদের। স্বভাবতই সমাজে চারিদিকে একটা টেনশন বিরাজ করে। এ প্রসঙ্গে সকলেরই মনে পড়ে যাবে, গত এপ্রিল মাসে সাবি বারাতকে নিয়ে যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলেছিল মিরাটে তা আজও একেবারে নিবে যায়নি। এই যে ধর্মানুষ্ঠানকে উদ্দেশ্য করে মুসলমানেরা সর্বত্রগামী হচ্ছে, এর একটি কারণ তারা তাদের গণশক্তি প্রকাশ করতে চাইছে। তারা ধরে নিচ্ছে এই ধারার মধ্যে দিয়েই মুসলমান সমাজের অস্তিত্ব শুধু যে রক্ষা পাবে তাই নয়, তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের চোখে অনেক বেশি সম্মানিত হয়ে উঠবে। এখানেই যত গোলযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই গোলযোগ খেলার মাঠেও দেখা যাচ্ছে। কলকাতায় মহামেডান স্পোর্টিং এর খেলা থাকলে কলকাতাবাসীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। যদি মহামেডান হেরে যায়? আমি খেলার ব্যাপারটা একেবারেই বুঝি না। কিন্তু রেড রোডের ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। তখনই এ সব দুঃস্বপ্নের কাহিনী শুনতে পাই। আসলে ব্যাপারটা কেবলই খেলায় হারজিত নয়। মহামেডান দলের সমর্থক (খেলোয়াড় তো, শুনেছি, বেশির ভাগই অমুসলমান) দলের পরাজয় হলে মুসলমানের পরিচয় ক্ষুণ্ণ হল মনে করে। আর তাই থেকে যতসব বিপত্তি। খেলার বা খেলা দেখার আনন্দের চেয়ে মুসলমান পরিচয়টা বড় হয়ে উঠছে। কলকাতা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত এই পরিচয়পিপাসা মুসলমানকে ক্ষতবিক্ষত করছে।

ফিরে আসি উৎসবে। আধুনিক পৃথিবীতে মানুষের সব ধ্যান-ধারণাই পাল্টে গেছে। এবং দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। সেখানে ধর্ম ও উৎসবের ধারণা পাল্টে যেতে বাধ্য। যেমন আপনি মনমত টিকিট পেলে মাঠে যেতেও পারেন। নইলে ঘরে বসে দূরদর্শন সেবনই ভাল। তাতে আপনার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বাঁচে। এবং লাঠি সোটা বা ঢিলের অবিমিশ্র ব্যবহার থেকে প্রাণটাও বাঁচে বৈকি? বাইরের প্রতি আকর্ষণ আধুনিকের কমে আসছে প্রতিদিন।

আজ আর আধুনিক মন বাইরে এসে বহু মানুষের ভিড়ে উৎসবে যোগ দিতে চায় না। বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলী সভ্যতা আধুনিক মানুষকে অনেক নতুন যন্ত্রের ব্যবহারে কেবল মত্ত করেনি। এই সভ্যতা তার জীবনে নিরন্তর অনেক নতুন নির্ভরতার জায়গা তৈরি করে দিয়েছে। এবং দিচ্ছেও। বলাবাহুল্য সে সেই সব নতুন জায়গায় নতুন করে বাধা পড়ছে। অনেক সময় মন বলে প্রচলিত ধর্মের ধারণাকে পরাভূত করেছে এই কৃৎকৌশলী সভ্যতা। এবং একই সঙ্গে আমাদের 'সেকেন্ড নেচার' তৈরি করে দিয়েছে বলতে পারি। দূরদর্শন, ভিসি আর, ট্রিপল্ অ্যান্টিজেন, প্রি-নেটাল ক্লিনিক, ডি ডি টি—এ সব আমাদের জীবনকে যে নিত্যদিন সমৃদ্ধ করছে তাই নয়। আধুনিক মানুষের একটা আধুনিক বিবেক তৈরি হয়ে এসেছে। এই আধুনিক বিবেকী মানুষ বলছে, আমাকে আরো দ্রুতধী হতে হবে। বেঁচে থাকবার জন্যে বহু দূরের মানুষের (সমস্ত অর্থে) সঙ্গে বহু গভীরে গিয়ে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। আজকের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অর্থই উপযোজন বা সমন্বয়। অর্থাৎ আধুনিক বিবেক একই সঙ্গে নতুন প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার করছে, আবার প্রচণ্ড এক সমস্যার সামনেও এসে দাঁড়াচ্ছে। এই কৃৎকৌশলী সভ্যতা সেই সমস্যার সৃষ্টি করছে। এখানে মৌলবাদী মুসলমান মন বলছে: আমরা একটা বিকল্প পার্সপেকটিভ দেব। নিজেদের ধন্যবাদ দিচ্ছে এই ভাষায়: We congratulate ourselves that we are not subject to the moral depravities of the materialistic age." মৌলবাদী ও সনাতনবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েই বলছি: জানি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রতিটি সমাজ বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলী সভ্যতার হাতে পড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে বসেছে। কারণ এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতা প্রায় বিনা নোটিসে এসে পড়েছে। তাই একটু আগে বিজ্ঞান ও নতুন সভ্যতার সঙ্গে সর্বক্ষণ বোঝাপড়া করে চলতে হবে এই কথাটাই বলছিলাম। তবু জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়েই আমরা এই পৃথিবীতে বাঁচব এবং মরব।

মুসলমান বন্ধুদের উদ্দেশে। এই কৃৎকৌশলী সভ্যতার কোন দান থেকে আপনি নিজেকে বঞ্চিত করতে পারেন? পরিবার পরিকল্পনা থেকে আপনার আসন্ন সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর ছেলে-না-মেয়ে আসছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিরূপণ করা থেকে বাইপাস সার্জারি থেকে মক্কায় হজযাত্রার প্রাক্কালে প্রয়োজনীয় টিকা (কিন্তু যে কোন ধর্মপ্রাণ হজযাত্রী তীর্থ করাকালীন মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি পুণ্যের বলে মনে করেন, আমার ধারণা ছিল) নেওয়া পর্যন্ত—সব আপনি করছেন। অর্থাৎ আমরা নতুন Cultural traditions উদ্ভাবন করতে বাধ্য হচ্ছি। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও মুসলমানদের নতুন করে চিন্তা করতে হবে। আজকের পৃথিবীতে ধর্ম ও সংস্কৃতির অর্থ ও মান

শিয়া এবং সুন্নি : অনন্ত দ্বন্দ্বের পশ্চাৎপট

"দেবতা বলে কিছু নেই, আছেন ঈশ্বর। মহম্মদ সেই ঈশ্বরের দূত।"

এই বিশ্বাস অন্তরে নিয়ে জীবনযাপন করছে পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলমান। ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে মরক্কোর ইসলামজগতে আধিপত্য ছড়িয়ে রাখা সত্তর কোটি সুন্নি মতাবলম্বীরাই হোক, বা ইরানে যারা শাসক, লেবানন, বাহ্‌রিন এমন কি ইরাকেও যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, ন' কোটি জনসংখ্যার শিয়াপন্থীরাই হোক— এই শাহাদা—প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাস থেকে উঠে আসা স্বীকারোক্তি গাঁথা আছে প্রত্যেকের হৃদয়ে।

অবশ্য এই শাহাদায় শিয়াপন্থীরা আরো একটি বাক্য সংযোজন করেছে। 'এবং আলি হলেন ঈশ্বরের বন্ধু।' শিয়াদের কাছে হজরত আলিই হলেন মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ; যথেষ্ট আবেগের সঙ্গেই তারা এই দাবি পোষণ করে। আর, একথা বললে ভুল হবে না, ইসলাম ধর্মের দুটি দ্বিমুখী ধারার জটিল সম্পর্ক ক্রমশ জটিলতর হয়েছে, সময়ের গণ্ডি না মানা রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব বীভৎসতম রূপ ধারণ করেছে— কেবলমাত্র আলির প্রতি প্রশংসোসূচক এই কটি অতিরিক্ত শব্দ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে।

মহম্মদের অন্যান্য ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের মধ্যে জামাতা আলিই ছিলেন তাঁর উপদেশাবলীর সঙ্গে সর্বাধিক পরিচিত। অথচ, ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীরা উত্তরাধিকারী নির্বাচনের সময় আলিকেই এড়িয়ে গিয়েছিলেন। 'শিয়াৎ আলি', অর্থাৎ আলির পক্ষভুক্ত ব্যক্তিরা অবশ্য তখনও এই বলে বাকবিতণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছিলেন যে, মহম্মদ স্বয়ং আলি এবং তাঁর পরিবারকে বংশানুক্রমে ইসলাম ধর্মের বিধায়ক নির্বাচিত করে গিয়েছেন। একান্ত অধ্যবসায়ের জোরে আলি শেষ পর্যন্ত ৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম ধর্মের কর্তৃত্ব পেলেন বটে, কিন্তু সে কেবল পাঁচ বছরের জন্য। পাঁচ বছর পর তিনি নিহত হলেন। ফলত, খলিফা পদের দাবিদার হলেন তাঁর পুত্র হোসেন। এর পরেই এল সেই কলঙ্কিত অধ্যায়। ইরাকের কারবালা প্রান্তরে হোসেনের পরিবারের প্রায় প্রত্যেকে নিহত হলেন প্রতিপক্ষের সৈন্যদের হাতে। নিষ্ঠুর অত্যাচারের পর হোসেনের মাথা কেটে তাঁকে হত্যা করা হল। স্বয়ং মহম্মদের দৌহিত্রকে হত্যার এই ঘটনা গোটা ইসলামের পক্ষেই ছিল আতঙ্কজনক।

জ্ঞাতিহত্যার ভিতর দিয়ে এই যে জটিলতার সূত্রপাত, তা কালক্রমে এক শক্তিশালী প্রবাহে রূপান্তরিত হল। 'শিয়াৎ আলি' —যাঁরা কালক্রমে শিয়াপন্থী বলে পরিচিত হলেন, তাঁদের কাছে মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকার স্থাপনের এই বিয়োগান্তক প্রচেষ্টা এক বিরাট অনুপ্রেরণা হয়ে উঠল। ধর্মবিশ্বাসের জন্য

হজরত আলি, 'ঈশ্বরের বন্ধু'

আত্মোৎসর্গের এক চরম দৃষ্টান্ত হয়ে রইল এই ঘটনা। তাই শহীদের মত আত্মদান শিয়াদের ধর্মীয় নায়ককে অনুকরণের এক পন্থা। ইরানে, যেখানে জনসংখ্যার নব্বই শতাংশই শিয়াপন্থী, সেখানে হোসেনের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলিকে অবলম্বন করে আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণায় আর বীররসে পরিপূর্ণ অজস্র নাটকের অভিনয় চলে নিয়মিত। প্রতি বছর হোসেনের মৃত্যু দিবস অর্থাৎ মহররমের দিন হাজার হাজার শোকতপ্ত মানুষ ইরানের পথে পথে শিকল দিয়ে, গাছের ডাল দিয়ে নিজেদের আঘাত করতে থাকে ; যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আত্মশোধনের পথ খোঁজে।

শিয়ামতে বিশ্বাসীরা কেবলমাত্র মহম্মদ এবং বারো জন ইমামের কর্তৃত্ব স্বীকার করে। এই বারো জন ইমামের মধ্যে রয়েছেন, আলি, হোসেন এবং তাঁদেরই প্রত্যক্ষ বংশধরেরা। এই ইমামরা মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন বলে মনে করে শিয়াপন্থীরা। দ্বাদশতম, অর্থাৎ শেষ ইমাম ৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে আত্মগোপন করেন। কিন্তু শিয়াদের বিশ্বাস তিনি আবার পরিত্রাতা মাহ্দির ভূমিকায় আবির্ভূত হবেন, শাসন করবেন গোটা পৃথিবীকে। এবং ততদিন পর্যন্ত শিয়া মৌলবীরাই ইসলামের ব্যাখ্যাকার হিসাবে কাজ করবেন। ইরানের শাসনকর্তা আয়াতোল্লা খোমেইনি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তাঁর রাজদণ্ডকেই মাহ্দির প্রতিনিধিসূচক বলে ঘোষণা করেছেন। খোমেইনি নিজেকে সপ্তম ইমামের দিক থেকে মহম্মদের বংশোদ্ভূত বলে দাবি করেন। অবশ্য তিনি নিজেকে পুনরাবির্ভূত দ্বাদশ ইমাম বলে প্রচার করেন না একথা ঠিক। কিন্তু তাই বলে তাঁর অনুগামীরা তাঁকে দ্বাদশ ইমাম বলে সম্ভাষণ করলে তাদের নিরস্ত করতেও উৎসাহিত বোধ করেন না। বস্তুত কোনো কোনো শিয়াপন্থীর বিবেচনায় খোমেইনির প্রতি এই সাগ্রহ বিশ্বাস ভ্রমপ্রযুক্ত এবং মৌলবাদ বিরোধী।

সুন্নিরা আলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও তাঁরা ইমামকে ঐশ্বরিক মাধ্যম বলে গণ্য করেন না। সুন্নিপন্থী ইমামরা প্রধানত নামাজ পাঠ ইত্যাদি পরিচালনা করেন। প্রত্যেক সুন্নি ('সুন্নি') শব্দটা এসেছে 'সুন্না' থেকে যার অর্থ 'পয়গম্বরের ঐতিহ্য') মনে করে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যেকেই সরাসরি সংযোগস্থাপনে সক্ষম। সুন্নিরা যেমন আবেগের বহিঃপ্রকাশ পছন্দ করে না—তাদের কাছে নিভৃত উপাসনাই ঈশ্বর ভক্তির প্রধান পন্থা, তেমনি শিয়াদের কাছে ধর্মীয় আবেগের অবাধ বহিঃপ্রকাশই প্রশ্রয় পায় বেশি। সুন্নিরা নিজেদেরই মূল ইসলাম ধর্মের ধ্বজাধারী বলে মনে করে। এমন কি শিয়া মতবাদকে তারা ইসলাম ধর্মভুক্ত কোনো পন্থা বলেই স্বীকার করেনি, অন্তত ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত।

পারস্য উপসাগরের আরব রাষ্ট্রগুলির বেশ কয়েকটিতে সুন্নি শাসক এবং শিয়া প্রজাদের মধ্যে সম্পর্ক খুবই সূক্ষ্ম এবং ভঙ্গুর। যতই হোক, শিয়াদের কাছে মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছাড়া অন্য কারো অধীন শাসনপ্রণালী অত্যন্ত ঘৃণ্য এক ব্যাপার। জনসংখ্যার প্রায় সত্তর শতাংশ শিয়া অধ্যুষিত বাহ্‌রিনে ১৯৮১ সালে একটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটেছিল। সন্দেহ করা হচ্ছে এটি ঘটেছিল তেহরানের প্ররোচনায়। কুয়েতেও খুব সম্ভবত ইরান-ঘেঁষা সন্ত্রাসবাদীরাই ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা ফেলে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, অথচ সেখানে শিয়ারা জনসংখ্যার ২৪ শতাংশমাত্র।

ইরাকের মোট জনসংখ্যার ষাট শতাংশ শিয়া মতাবলম্বী। অবশ্য ইরাক-ইরান যুদ্ধের প্রসঙ্গে তারা প্রথমে ইরাকী, পরে শিয়াপন্থী। আরবী এবং পারসিকদের প্রাচীন শত্রুতা তাদের ধর্মীয় সহানুভূতিকেও যেন ছাপিয়ে গেছে মনে হয়। ইরানী শিয়াদের ধর্মোন্মাদনার ছোঁয়া প্রতিবেশী ইরাকীদের গায়ে এসে পৌঁছচ্ছে যথেষ্টই। তেহরান তার আক্রমণের প্রেরণা হিসাবে স্মরণে রেখেছে কারবালা প্রান্তর, সেই অভিমুখেই তার আক্রমণ রচিত হচ্ছে। যুদ্ধবন্দী ইরানী সৈন্যরা সগর্বে তুলে ধরে দেখায় 'স্বর্গের চাবি'—তাদের গর্বের উৎসস্থল। 'স্বর্গের চাবি' আসলে তাদের বুকে লাগানো পরিচয়জ্ঞাপক ধাতুর তকমা—সৈন্যদলে নাম লেখানোর সময় যা তারা পেয়েছিল। একজন ইরাকী কর্তাব্যক্তির মন্তব্য : ইরানীরা এখনো হোসেনের সেই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

'টাইম' পত্রিকা থেকে সংগৃহীত

অনুবাদ : যুধাজিৎ দাশগুপ্ত

অতি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলী সভ্যতা এ সব পাল্টে দিয়েছে ইতিমধ্যে। আধুনিক সভ্যতার কীর্তিকলাপ,যোগাযোগ ব্যবস্থা, দৈনিক সংবাদপত্র, বই (হার্ড কাভার, সফ্ট কাভার ও বিশেষত পেঙ্গুইন, পেলিকান) এবং বিজ্ঞাপন জগতের প্রচার কর্ম আজকের আধুনিক মানুষকে প্রতিমুহূর্তে এক নিদারুণ মনস্তাত্ত্বিক প্রোসেসের মধ্যে যেতে বাধ্য করছে। এই বিশাল পরিবর্তন আমাদের আবার বাধ্য করছে আজকের পৃথিবীর ধর্মকর্মকে নতুন করে বিচার করতে। আমরা নতুন মান, তথ্য, মূল্য নিয়ে আজ আবার ভাঙা হাটে বসেছি।

আমি নিঃসন্দেহ: মুসলমান সমাজের আধুনিক বিবেক মীরাটে ধর্মের নামে দাঙ্গা চাইছে না। হিন্দু সমাজের আধুনিক মনও চাইছে না। হিন্দুদের জন্যে বহু মুক্ত মানুষ বলছেন। আমি মুসলমান সমাজের কথাই বলি। সে কথাটা এই রকম। ১৯৮৭-তে ভারতবর্ষে নতুন উৎসব মেলা বসুক। যাকে আমরা আনন্দ-উৎসব বলতে পারি। ধর্মকে বুঝতে হলে ধর্মপ্রাণেরা 'personal realization'-এর জগতে প্রবেশ করুন। তাহলে তাদের দেখা যাবে না মীরাটের পথে। আর যারা আধুনিক? তারা নতুন উৎসবের পথে পা বাড়াবেন। একটা প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ করা যাক। দু-চার বছর আগেও কি কলকাতার তথা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা দূরদর্শনের পর্দায় মক্কার হজ দেখবেন ভেবেছিলেন? মুসলমানের তো ছবি দেখাই বারণ। তাও আবার চলচ্চিত্র। আমি টেলিভিশন সেটের সামনে এত ভিড় দেখেছিলাম যে বলার কথা নয়। আমি বহু অমুসলমানকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে থাকতে দেখেছি। মুসলমানের ধর্মচিন্তার জগতে এ কী কম বিপ্লব বলবেন? আমি জানি, দূরদর্শন এমন আরো উদ্যোগ নিতে পারে। কিন্তু কর্মকর্তারা ভয় পান। পাছে গোঁড়াপন্থী মুসলমানেরা 'ধর্ম বিপন্ন', 'ধর্ম গেল'—বলে রব তোলে। কিন্তু মুসলমান সমাজ আজ এ দেশে পরিষ্কার দুটো জগতে বাস করে। এক জগতের অধিবাসীদের আমরা সহজেই চিনতে পারি। অন্যটি সংখ্যায় কম হতে বাধ্য। এরা বাস করে আধুনিক জগতে। এরা চায় মুসলমানের জীবনে অন্তর্দৃষ্টি ফিরে আসুক। মুসলমান বুঝুক বৃহত্তর অর্থে সংস্কৃতি বা সভ্যতা হল সেই জটিল সমগ্র—যার মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্প-কলা, সাহিত্য, দর্শন, নীতিশাস্ত্র—সব আছে। আজকের এই সংস্কৃতি বলছে আজকের উৎসব আজকের আধুনিক মানুষের বিবেকসম্মত হবে। উৎসবের অর্থ তো কোনমতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে পারে না। আজ কেন বাকর-ঈদে কলকাতায় বসে মুসলমানকে উট পর্যন্ত আমদানি করতে হয়। মুসলমানত্বের সবটাই কি আনুষ্ঠানিকতায়, আরো বেশি আনুষ্ঠানিকতায় এসে ঠেকেছে? এই সব আনুষ্ঠানিক ধর্ম-উৎসবের বিরুদ্ধ চিন্তা করবার সময় আজ এসেছে। আমাদের চিন্তা করতে হবে কোন কোন উৎসব সমস্ত ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে। কোন উৎসব প্রাঙ্গণে পুলিস প্রহরার দরকার হবে না। সেই সব উৎসবকে জাতীয় উৎসব বলে ঘোষণা করতে হবে। আমরা মধ্যযুগের দিকে তাকিয়ে চৈতন্য-দিবস, আকবর-দিবস জাতীয়-উৎসব বলে সিরিয়াসলি পালন করতে পারি। এঁদের জীবনচর্যা, মানব প্রেম, সমন্বয়বাদ এ সব হবে আমাদের জাতীয় উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। অন্যদিকে আধুনিক কালে রামমোহন, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, আজাদ আমাদের বিশেষ চর্চার দিন হবে। ঐ সঙ্গে নবান্ন, হলকর্ষণ, বিশ্বকর্মা পূজা গোটা দেশ পালন করুক। ইতিমধ্যে আমরা মহাত্মা যিশু, মহাত্মা নানক, মহাত্মা কবীরকে যুক্তিতর্ক শ্রদ্ধা সহযোগে বিচার করব। ধীরে ধীরে আমরা আনুষ্ঠানিক ধর্ম-উৎসবের জায়গা জাতীয় জীবন থেকে কমিয়ে আনব। জানি, একদিনে এসব সম্ভব নয়। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে আমাদের পূজা, ঈদ—ইত্যাদি যথাসম্ভব শাস্ত্রীয় আচারপদ্ধতি মুক্ত হয়ে যথার্থ উৎসবে পরিণত হোক। উৎসবের একদা আমরা অর্থ করেছিলাম দেশের হৃদয়কে এক করা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা। দেশব্যাপী মঙ্গলচিন্তাকে বড় করে তোলা। প্রয়োজনের তাগিদে পারস্পরিক সম্পর্ক সংকীর্ণ হয়ে আসে, অপ্রয়োজনের আনন্দে হৃদয়ের সম্বন্ধ বিস্তার লাভ করে। আমরা উৎসবের দিনে সে দিকে দৃষ্টি দিতে চেষ্টা করব। কিন্তু আজ এ কাজ করতে হলে যে কোন উৎসবের আগে আমাদের সম্মিলিত কল্যাণশক্তির উদ্যোগ চাই। হিন্দু-মুসলমান সমাজের নিরপেক্ষ নির্ভীক মানুষদের নিয়ে সর্বত্র উপদেষ্টা মণ্ডলী গড়ে তুলতে হবে। সর্বত্র উৎসবের দিনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে হবে। এ কাজে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ সমানহারে চলা চাই।

আমি কিন্তু আমার মূল বক্তব্য থেকে সরে যাইনি। এই অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা বেশিদিন চলবার নয়। শেষ পর্যন্ত আধুনিক মানুষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে তার ব্যক্তিগত বিবেকের টানেই সমাজ কর্ম করবে। অতীতের নির্দেশ তার জীবনে আর তেমন করে বর্তাচ্ছে না। এ কথা সে প্রতিদিন অনুভব করবে। তাকে বলতেই হবে যে একটা সময়ে তার একটাই পরিচয় ছিল। সে তার পিতার পুত্র। অতএব পিতাই সাব্যস্ত করে দিতেন পুত্র ভবিষ্যতে ডাক্তার হবে না উকিল হবে। আজ পিতার একমাত্র দায়িত্ব পুত্রকে আগামীদিনের জন্যে সমস্ত অর্থে প্রস্তুত করে দেওয়া। সে কী হবে কী করবে সেটা সাব্যস্ত করে দেওয়া নয়। অর্থাৎ যে ভবিষ্যৎ আজও আমাদের জানা নেই সেই ভবিষ্যতের জন্যে সন্তানকে এক কঠিন ব্যক্তিত্বে পরিণত করাটাই কেবলমাত্র পিতার কর্তব্য। অর্থাৎ সন্তানকে বুদ্ধিদীপ্ত, দায়িত্বশীল নাগরিক করে তোলাই পিতার প্রধান কাজ। উদ্ভাবনী ক্ষমতা, বৌদ্ধিক সাহস, অসীম কর্মোদ্যোগ—আজকের পৃথিবীতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বেঁচে থাকবার সামগ্রী। অর্থাৎ আজকের তরুণের ভাবীকালের পরিচয় সে ডাক্তার, শিক্ষক, সাংবাদিক। এ সবই তাকে চূড়ান্তরূপে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে পরিণত করবে। সে ধীরে ধীরে কৃৎকৌশলী সভ্যতার মূল্যবোধের কাছে নিজেকে সমপর্ণ করবে। সে দিন কী তার ধর্মাচরণের চরিত্রটা পাল্টে যাবে না? সে দিন কী সে নতুন এক আধুনিক গোষ্ঠীর সভ্য হবে না? এবার সে নিজের কাছে নিজেই ধরা পড়বে।

আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড বলছেন, ধর্ম শেষ পর্যন্ত "What the individual does with his solitariness." আবার তাঁকে বলতে হচ্ছে, কোন মানুষকেই তার সমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। মানুষ শেষ পর্যন্ত একাই এই বিশ্বপৃথিবীটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে একদিন। এবং 'আমি বনাম এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড' নাটকের সবটা কোনদিনই আমি আয়ত্ত করতে পারি না। অর্থাৎ আধুনিক বিবেক আবিষ্কার করতে পারছে যে ধর্ম বাজারে বসে দাঙ্গা করে, সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে সম্মেলন বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে করা যায় না। ধর্মেরও যুক্তিসম্মতকরণ আধুনিক মানুষকেই করতে হবে। যুক্তিবাদের মধ্যেই আধুনিক মানুষের ধর্ম রক্ষা পাবে। ধর্ম নিয়ে তো মানুষ ১৯৮৭-তে জঙ্গলে ফিরে যেতে পারে না। সে যদি নেহাতই ধর্ম করে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে, হাসপাতালে, গবেষণাগারে, মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠানে ধ্যানস্থ হয়েই করবে।

আধুনিক ব্যক্তি মুসলমান আজ মর্মে মর্মে বুঝেছে যে আগুন নিয়ে নেশা করে লাঠি খেললেই মহরম করা হয় না। ধর্ম তো করা নিশ্চয়ই হয় না। আর এমন ধর্মাচরণের মধ্যে দিয়ে মুসলমানের ধর্মীয় পরিচয়ও রক্ষা পায় না। আজ আধুনিক ব্যক্তি মানুষ কোন পরিচয়ের জন্যে ব্যস্ত বা ব্যাকুল —তা ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

আজ আধুনিক মুসলমানের সামনে প্রশ্ন একটাই: একদিকে তার ধর্ম বিশ্বাস আর একদিকে তার আধুনিক রুচি ও প্রগতির ক্রমবর্ধমান এই পৃথিবী। একটা তার বিশ্বাস, অন্যটা তার প্রিয়তম এই পৃথিবী। সে কী করবে? দুটো জগতের মধ্যে নিত্যদিন যে ব্যবধান বাড়ছে তা ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিয়ে ঘুচিয়ে ফেলবে? না, এই দোটানার মধ্যে পড়ে নিজের আধুনিক জীবনের আত্মশক্তি, আত্মপরিচয়, এই পৃথিবীতে একটিবার মাত্র বেঁচে থাকার বিশেষ তাৎপর্য—এ সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে অগণিত মুসলমানের মধ্যে এক অবিশেষ মানুষ হিসেবে প্রতিদিন একটু একটু করে মৃত্যুতুল্য জীবন বহন করে নিজেকে ধন্য মনে করবে। ঈশ্বরকে পাচ্ছে মনে করে আত্মহত্যা করবে। আধুনিক ব্যক্তি মুসলমানকে এ সিদ্ধান্ত আজই নিতে হবে। কারণ, এই সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আধুনিক মুসলমান গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্যে, তার অন্তর্দৃষ্টির সম্প্রসারণের জন্যে, তার নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপ্তির জন্যে প্রাচীন ধর্মাচরণের ও ধর্মীয় মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন দাবি করবে। আর এইতেই তার মঙ্গল। সমস্ত ভারতবর্ষের মঙ্গল। অতএব এই পৃথিবীরও মঙ্গল বটে। ■

ইসলামি পার্বণের সামাজিক নৃতত্ত্ব

বাহারউদ্দিন

ইসলামি পর্ব-পার্বণের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও নৃতাত্ত্বিক উৎস অনুসন্ধানে এই কয়েকটি প্রাথমিক তথ্যই মনে রাখা উচিত যে, তাবৎ অর্থেই ইসলাম একেশ্বরবাদী ধর্ম। তার ভেতর-বাইরে—সর্বত্রই যুক্ত হয়ে আছে নিগূঢ় ও আপসহীন একেশ্বর-চিন্তা। বহুমুখী আরব জনগোষ্ঠীকে একই বিশ্বাসের ছত্রতলে সংগঠিত করার জন্যেই হক, বা তার মধ্যে গভীর আরববোধ (উরুবিয়ত) গড়ে তোলার জন্যেই হক,—এক অভূতপূর্ব ঈশ্বরানুগত্যকেই সমাজ-সংস্কারে, ধর্মীয় অনুশাসনে এবং [illegible] সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন মহাপুরুষ মুহম্মদ। নিজের সংস্কারকর্ম ও সংহতচিন্তাকে যে-নাম (ইসলাম) দিয়েছিলেন তিনি, সেই নাম ও তার শব্দার্থেও যুক্ত হয়ে আছে প্রায় অচিন্তনীয় ঈশ্বর-চিন্তা। সচরাচর, দুটি অর্থেই ব্যবহৃত হয় ইসলাম শব্দটি। বলাবাহুল্য, দুটি আলাদা ধাতু থেকেই, আলাদা আলাদা উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করা হয়

ছবি : সুধীর চ্যাটার্জী

ভিন্ন ভিন্ন অর্থ। যখন 'সলমুন' ধাতুকে কেন্দ্র করে ব্যাখ্যা করা হয় শব্দটি, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় শান্তি, আরাম, যুদ্ধ-বিরতি ও মুক্তি। কিন্তু, যখন 'সালাম' ধাতুকে কল্পনা করা হয় এর উৎস, তখন এর অর্থ হয় অর্পণ করা, আত্মসমর্পণ করা বা কোন কাজে সম্মত হওয়া। আরবি শব্দতত্ত্বে দুটি ধাতুরই আরও বেশ কিছু অর্থ আছে। কিন্তু ইসলামি অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয় না এসব অর্থ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং আরব-ঐক্য ও শান্তি স্থাপনে তার অভূতপূর্ব সাফল্যের কথা বিবেচনা করে, সচেতনভাবেই শান্তি অর্থে ব্যাখ্যা করা হয় ইসলামকে। যাঁরা অস্বীকার করেন ইসলামের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, যাঁরা অস্বীকার করেন তার মতাদর্শের পরস্পর বিরোধিতা, যাঁরা তার অনুশাসনে দেখতে পান সর্বকালীন ও সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য, ব্যবহারিক কারণেই যাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন তার সহনশীলতা ও গ্রহণ ক্ষমতার উপর—তাঁরাই প্রধানত শান্তির ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করেন ইসলামকে। ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে উচ্চারিত কোরানের দুটি আলাদা আলাদা 'আয়াত'—পঙ্ক্তির (লা ইকরাহা ফি দ্বিন—ধর্মে নেই জবরদস্তি এবং লাকুম দ্বিনুকুম ওয়া লিয়া দ্বিন—তোমার ধর্ম যেমন তোমার জন্যে, আমার জন্যেও তেমনি আমার ধর্ম) উপর ভিত্তি করেই তার সহনশীলতা ও সর্বকালীন শান্তি স্থাপনের প্রয়াসকেই এঁরা মূল্যায়িত করেন ব্যাপক অর্থে। এই ব্যাখ্যায় আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি রয়েছে, কিন্তু এ কথাও সত্য, ইসলামের অন্তর্নিহিত তত্ত্বে সহনশীলতারও উপাদান আছে অনেক। এ জন্যেই, চিরন্তন শান্তির ধর্ম বলেও ইসলামের পেছনে খাড়া করা হয় যুক্তি—এবং এই ধরনের যুক্তির উপর দাঁড়িয়েই ইসলামের উদার-তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন সুফিরা আর, ভারতীয় ইসলামেও তার জঙ্গী স্বভাবের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল সহনশীলতার ব্যাখ্যা। ভারতে, ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির এটাও সম্ভবত একটি কারণ। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি থেকে আরম্ভ করে মওলানা আবুলকালাম আজাদ পর্যন্ত, ভারতে, ইসলামের তাত্ত্বিক আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে এই উদার ব্যাখ্যাই। উলামা সম্প্রদায়ের এক প্রবীণ অংশ ইসলামের সহনশীলতাকে বড় করে দেখেছিলেন বলেই যেমন কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বিনা প্রশ্নে, ঠিক তেমনি ধর্মের নামে দেশ ভাগের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন সংগঠিত শক্তি নিয়ে। এবং এই একটি কারণেই, ভারতীয় ধর্ম-নিরপেক্ষতার সহনশীলতাকেও মেনে নিতে হয়ে ওঠেননি খুব একটা জিজ্ঞাসু। কমিউনিজম ভারতে যেরকম প্রতি মুহূর্তেই সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গে করে চলেছে আপস, ঠিক তেমনি ভারতীয় ইসলামও এই উপমহাদেশের পরম্পরাগত ধর্মবোধ এবং ধর্মবোধকেন্দ্রিক গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে নিজেকে। অবস্থার চাপে পড়েই কি করতে হচ্ছে এমন সমঝোতা? সম্ভবত নয়। এই সমঝোতার ইঙ্গিত রয়েছে তার ভারতীয় বিকাশে,

কমিউনিজম ভারতে যেরকম প্রতি মুহূর্তেই সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গে করে চলেছে আপস, ঠিক তেমনি ভারতীয় ইসলামও এই উপমহাদেশের পরম্পরাগত ধর্মবোধ এবং ধর্মবোধকেন্দ্রিক গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে নিজেকে।

উদার ও কল্যাণমুখী ব্যাখ্যায়। নইলে, ইসলামের যে-মৌলিক চরিত্র, তার যে ঈশ্বর-একাগ্রতা বরং বলা উচিত, ঈশ্বর সর্বস্বতা রয়েছে, তার সঙ্গে হিন্দু ঘেঁষা ধর্ম-নিরপেক্ষতার আঁতাত গড়ে ওঠার কথা নয় কোন অবস্থাতেই। এই সর্বগ্রাসী ঈশ্বরতত্ত্বের জন্যেই—ভারতীয় ইসলামের উদার ব্যাখ্যা ও সমঝোতাকে বরদাস্ত করতে পারেননি আরেকদল উলামা। এঁরাই আজ এই উপ-মহাদেশে সনাতনপন্থী বলে চিহ্নিত। ধর্ম-নিরপেক্ষতার সঙ্গে ইসলামের আঁতাতকে ধর্মীয় বিকৃতি বলেই চিহ্নিত করেছেন এই উলামারা। ঈশ্বর সর্বস্বতাই তাঁদের কাছে ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও কেন্দ্রীয় আদর্শ। এই আদর্শের জোরেই বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ ইসলাম তাত্ত্বিক মওলানা আবুল আলা মওদুদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং লিগ-কংগ্রেসের পশ্চিমী ধাঁচের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রায় কুফরি বলে চিহ্নিত করতেও হননি কুণ্ঠিত। এই আদর্শের ভিত্তিতে মৌলিক প্রশ্ন তুলে, সমস্ত সাংগঠনিক শক্তি প্রয়োগ করেই ধর্ম-নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। দেশ ভাগের পর ভারতীয় ধর্ম-নিরপেক্ষতার সুস্পষ্ট-উচ্চারণে এতই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন এই মওলানা যে, তাঁর মনে হল, ভারতের ইসলামকে নির্মূল করে দেবে এই ধর্ম-নিরপেক্ষতা, ধর্ম বলে কিছুই থাকবে না আর, অতএব, অধর্মীয় রাষ্ট্রের চাইতে, হিন্দু রাষ্ট্রকেই স্বাগত জানানো উচিত ভারতীয় মুসলমানদের। পাকিস্তানে বসেই এই ফতোয়া জারি করেছিলেন মওদুদি। ভারতীয় ধর্ম-নিরপেক্ষতার নির্দিষ্ট কোন চেহারা ফুটে ওঠেনি তখনও, তার মধ্যে তখনও বিকশিত হয়নি হিন্দুর 'যত মত তত পথের' ভাবাদর্শ। এই সুযোগ ছিল না। সময়ও ছিল না। ধর্ম সম্পর্কে দেশের কর্ণধার নেহরুর অনীহা দেখেই অনেকের মত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন এই মওলানাও এবং এ জন্যেই চরম হতাশাগ্রস্তের উক্তি করেছিলেন তিনি। পরে তাঁর মতও বদলেছে। ধর্ম-নিরপেক্ষতার সঙ্গে সমঝোতা করতে শিখেছে ভারতীয় জমাত-এ-ইসলামি। আর, এই সমঝোতায় সে বিশ্বাসী হয়ে উঠল তখনই, যখন আশ্বস্ত হতে পারল যে, ধর্ম-নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, ধর্ম-নিরপেক্ষতা মানে অসাম্প্রদায়িকতা—সকল ধর্মের অধিকারকে সরকারিভাবে মেনে নেওয়ার নামই ভারতীয় ধর্ম-নিরপেক্ষতা। ব্যবহারিক কারণে সংগঠনের স্বার্থেই ধর্ম-নিরপেক্ষতার ভারতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন মওলানা মওদুদি, কিন্তু যে-কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিশ্লেষিত হয়েছে তাঁর ইসলাম, সেখান থেকে এক পাও নড়তে দেখা যায়নি তাঁকে। একবারও না। তৌহিদের সার্বিক প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এই লক্ষ্য থেকেই শুরু হয় তাঁর ইসলাম-ব্যাখ্যা। মওদুদিও ইসলামের মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব ও তত্ত্বের পরস্পর বিরোধিতাকে এড়িয়ে গেছেন সযত্নে। সচেতনভাবে। সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ ইসলাম এবং আল্লার একত্বেরই নির্ভেজাল অন্বেষক ছিলেন তিনি, আর এ জন্যেই 'সালাম' ধাতু থেকেই ইসলাম শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন, এই ব্যাখ্যার পেছনে শব্দতাত্ত্বিক যুক্তি খুঁজে পেতেও অহেতুক হাতড়াতে হয়নি তাঁকে। আরবি শব্দতত্ত্বে, 'সালাম' শব্দের ব্যাখ্যা আছে অনেক কিন্তু, প্রধান যে-ব্যাখ্যাটি ইসলামি অনুষঙ্গে, সম্ভবত রাজনৈতিক কারণেই, সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত ও গ্রহণযোগ্য—তা হল অর্পণ করা, অনুগত হওয়া কিংবা আত্মসমর্পণ করা। একই ঈশ্বরের ছত্রতলে, আরব ঐক্য ও আরব জাতীয় চেতনা গড়ে তোলার খাতিরে গোড়া থেকেই গুরুত্ব পেয়ে আসছে এই ব্যাখ্যাও। ইসলামের আরব-চেতনা স্বীকার করেননি

হজরত মহম্মদের আবির্ভাব-উৎসব ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী

মওদুদি। এটা কাঙ্খিতও ছিল না তাঁর কাছে। ইসলাম ও তাঁর তৌহিদ তত্ত্বকে কেন্দ্র করে যে-রাজনৈতিক ভাবাদর্শ পুনরুজ্জীবিত করার ইচ্ছে ছিল তাঁর, সেখানে আরব চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করার কথাও নয়। করেননিও তাই। বরং, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, আরব চেতনাকে যথাসম্ভব অস্বীকার করে নির্ভেজাল তৌহিদ ও তার ঈশ্বর সর্বস্বতাই বিশ্লেষণ করে গেছেন আমৃত্যু। তাঁর ইসলামি অনুশাসন ব্যাখ্যায়ও একইভাবে গুরুত্ব পেয়েছে চূড়ান্ত ঈশ্বরতত্ত্ব। বলাবাহুল্য, এই ধরনের সর্বব্যাপী ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিটি সেমিটিক ধর্মেরই লক্ষণ। কি খ্রীষ্ট ধর্ম, কি ইহুদি ধর্ম, কি ইসলাম সর্বত্র ঈশ্বরই সর্বেসর্বা। বহুবিধ সংস্কারে, গ্রহণ-বর্জনে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ঈশ্বরচিন্তার সমন্বয় ও সম্মেলনে খ্রীষ্ট ঈশ্বর তার মৌলিক চরিত্র অনেকাংশেই বর্জন করতে হয়েছেন বাধ্য, সুফির ঈশ্বর ও খানিকটা তাই—কিন্তু নির্ভেজাল ইহুদি ও ইসলামি ঈশ্বর আজও টিকিয়ে রেখেছেন তাঁর আদি ও অকৃত্রিম মেজাজ। ইসলামি ঈশ্বরের ভাবমূর্তিকে সামনে রেখে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ইহুদির যোহেভারই স্বগোত্রীয় তিনি, যোহেভা যেমন সহ্য করতে পারেন না অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে, ইসলামের ঈশ্বরও তাই। যোহেভা যেমন দাবি করেন চূড়ান্ত ও প্রশ্নহীন আনুগত্য, ইসলামের ঈশ্বরও তেমনি; যোহেভা রাষ্ট্র পরিচালনায় যেমন চাপিয়ে দেন তাঁরই যাবতীয় নির্দেশ, ইসলামের ঈশ্বরও তেমনি নিজেরই অনুশাসন চালিত সিংহাসনে বসে থাকতে চান একাকী—অংশীদারত্ব —শিরকি—মোটেই বরদাস্ত হয় না তাঁর।

এরকমই এক সর্বগ্রাসী ঈশ্বর-চরিত্রকে কেন্দ্র করে হজরত মুহম্মদ এবং তাঁর অনুগামীদের আরব ও ধর্মচিন্তা বিবর্তিত হয়েছিল বলেই ইসলামের ধর্মীয় অনুশাসন, আচার-অনুষ্ঠান ও পর্ব-পার্বণ থেকে যাবতীয় প্রাক ইসলামি উপাদান ঝেড়ে মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে যুগ যুগ ধরে। আবার, ইসলাম ও আরবচেতনা হজরত মুহম্মদ ও তাঁর আরব অনুগামীদের কাছে সমার্থক ছিল বলেই, আরব-অভ্যাসই প্রধানত গুরুত্ব পেয়েছে নতুন ধর্মে, আরব অভ্যাসের সঙ্গেই শেষ পয়গম্বরকে করতে হয়েছে আপস, মেনে নিতে হয়েছে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব। সত্য চার খলিফা—খুলাফা—এ রাশ্দিদিনরা করে গেছেন এই চেষ্টা। দ্বিতীয় খলিফা ওমর তো এতই আরবমনস্ক ও আরব শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিলেন যে, সাম্রাজ্যের প্রসারেও তাঁর মনে হয়েছিল খণ্ডিত হতে পারে নির্ভেজাল আরব-চরিত্র। আরবমনস্কতার জন্যেই অনারবদের আধিপত্য স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না ওমর। খলিফা, নির্বাচিত হবার পরই অনারব ইহুদি ও নাজরানের খ্রীষ্টানদের ঠেলে পাঠিয়ে দিলেন আরবের বাইরে। ওমর গঠন করতে চাইলেন সামরিক শৃঙ্খলাযুক্ত এমন একটি জাতি—যার চেতনায় থাকবে দুটি সত্তা—একটি ধর্মীয়, অন্যটি জাতিগত। ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রসারে স্বাতন্ত্র্যচ্যুত হয়ে উঠুক আরবরা, কিংবা আধিপত্য বেড়ে উঠুক অনারবদের—এমন অবস্থা কল্পনা করতেও সম্ভবত শিউরে উঠতেন ওমর—সম্ভবত এ জন্যেই অনারবদের নাগরিকত্ব স্বীকার করেননি, সম্ভবত এ জন্যেই রাষ্ট্র-বিস্তার ও রাষ্ট্র-রক্ষার দায়িত্ব দেননি অনারবদের; কিন্তু, রাষ্ট্রের ভেতরের ও বাইরের চাপের কাছে দৃঢ় চিত্তের খলিফা ওমরকেও হার মানতে হল শেষ পর্যন্ত, তুলে নিতে হল আরব স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কঠোর ব্যবস্থা, পারস্যের চাপেই অব্যাহত রাখতে হল আরব বিজয়। ওমরের মৃত্যুর পর অবস্থার আরও পরিবর্তন হল, তৃতীয় খলিফা ওসমানের আমলে পারস্য সাম্রাজ্য পুরোপুরি আরবদের অধিকারে এল, রোমান সাম্রাজ্যের একাংশেও স্থাপিত হল কর্তৃত্ব; আর, এইভাবেই ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রে অনারবদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও দিতে হল অধিকার, আরব-অনারব সকলেই স্বীকৃতি পেল আরব রাষ্ট্রেরই প্রজা—আরব রূপে। রাষ্ট্রের প্রজা ও সীমা বৃদ্ধির ফলে দেখা দিল আরও একটি লক্ষণ, বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্ঘর্ষ ও সমন্বয় হয়ে উঠল অনিবার্য। ব্যাপক আরব-সংস্কৃতি গঠনের প্রক্রিয়াও দেখা দিল, আর এই প্রতিক্রিয়ার পরবর্তী উমাইয়ারা রাষ্ট্রে অবাধে

ছবি : দেবীপ্রসাদ সিংহ

রমজানের উপবাসের অবসান

ছবি : শুকদেব বাচীহ

ফিরিয়ে আনলেন প্রাচীন আরব-অভ্যাস তাই বলে ইসলামের উচ্চ-ঘোষিত একেশ্বরবাদ যে চাপা পড়ে গেল, রাষ্ট্রে ম্লান হয়ে গেল তার ভাবাদর্শ, এমন নয় ; বরং আরও উজ্জ্বলভাবেই সহাবস্থান শুরু হল একেশ্বর-চিন্তা ও আরব-অভ্যাসের এবং এই দুই সত্তার প্রকাশ্য প্রণয়েই গড়ে উঠল চোদ্দশ বছরের আরব কিংবা ইসলামি সংস্কৃতি। ধর্মীয় সত্তাকে যেমন ছাপিয়ে উঠতে পারেনি ইসলামের আরব সত্তা ঠিক তেমনি আরব সত্তাকে, আরবদের গোত্রীয় অভ্যাসকে, তার আচার-আচরণকে শাস্ত্রকারদের হাজার চেষ্টাও ঠেলে পাঠাতে পারেনি ইসলামের বাইরে। কী অনুশাসনে, কী দৈব-চিন্তায়, কী স্বর্গনরকের ধারণায়—কী পালা পার্বণের সর্বত্রই একেশ্বর তত্ত্বের পাশাপাশি কখনও অবদমিত, কখন বা মুখ উঁচিয়ে আছে প্রাচীন আরব ও সেমিটিক লোক-বিশ্বাস। আর এটাই স্বাভাবিক, কেন না মুহম্মদের জন্ম হয়েছিল আরবে, কেন না তাঁর মাতৃভাষা ছিল আরবি, এক জাতি-সত্তায়ও তিনি ছিলেন একজন পূর্ণাঙ্গ আরব এবং ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে আরবদেরই সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি, করেও ছিলেন, নিজের স্বপ্নের চাইতেও বেশি সাফল্য লাভ করেছিলেন মুহম্মদ, না চাইলেও, তাঁর হাতেই গড়ে উঠেছিল প্রথম সংহত আরব রাষ্ট্র, ধর্মীয় হলেও এই রাষ্ট্র ছিল একান্ত আরবীয়—তার অনেকটাই প্রাচীন আরবদের গোত্রীয় শাসনতন্ত্র প্রসূত। গোত্রীয় সাম্যচেতনা এবং গোত্রীয় গণতন্ত্রই দুই মৌলিক আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত হল নতুন রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রের পরিচালক হলেন মুহম্মদ কিংবা তাঁর অনুগামীরা। কিন্তু তার একচ্ছত্র মালিক হলেন ঐ অদৃশ্য শক্তি—যাঁর কোন জাত নেই, ভাষা নেই, নেই গোত্রচেতনা। আছে এক নির্ভেজাল একত্ব—তৌহিদ—আর একত্বই হয়ে উঠল তাঁর চূড়ান্ত অহঙ্কার ও অলঙ্কার। একত্বের স্বীকৃতি ঘটিয়েই নবজাগ্রত আরবদের তামাম শক্তির উৎস হিসেবে অদৃশ্য সিংহাসনে বসলেন তিনি ; রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিপতি জাত ও গোত্রহীন ছিলেন বলেই ইসলামি রাষ্ট্রের জাতিতত্ত্ব আটকা পড়েনি ভৌগোলিক সীমারেখায়, কিন্তু রাষ্ট্র-নায়করা বংশ পরম্পরায় আরব ছিলেন বলেই মানবিক, গোত্রীয় ও জাতীয় সীমাবদ্ধতায় খণ্ডিত হল রাষ্ট্র ও ধর্মের সার্বজনীন ও সর্বকালীন চরিত্র। বলাবাহুল্য, আজও ইসলামের রাষ্ট্রকাঠামো, ধর্মীয়অনুশাসন এবং আনুষঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠান ব্যক্তি ও অসীমের দ্বন্দ্বে প্রতি মুহূর্তেই হয়ে ওঠে বড় বেশি পীড়িত, আরব অভ্যাসের চাপেই আজও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি ইসলাম।

॥ দুই ॥

ইসলামের উদ্ভব হয়েছে মক্কার বাণিজ্যিক ও গোত্রীয় পরিবেশে, আর তার সার্বিক ও সাংগঠনিক বিকাশ ঘটেছে মদিনার কৃষিভিত্তিক সমাজে —এই সমাজকে কেন্দ্র করে। মক্কার ইসলাম ছিল ব্যক্তির চিরন্তন ধর্ম-জিজ্ঞাসার অগোছালো খসড়া, আর মদিনার ইসলাম হল এক বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের অতি দ্রুত বাস্তবিক প্রক্রিয়া। মক্কার ইসলাম ছিল একজন সচেতন আরবের স্বপ্ন, আর মদিনার ইসলাম হল তারই বাস্তবায়িত ও পূর্ণাঙ্গ প্রচ্ছায়া। ফলে, মক্কার ইসলামে, বিশেষ বিশেষ ও মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধর্মীয় আচার ছাড়া বৃহত্তর সমাজ ও সংস্কৃতি গঠনের কোনো আদলই গড়ে ওঠেনি। মক্কার বাণিজ্যিক ও প্রতিকূল পরিবেশে হয়ত তা সম্ভবও ছিল না। হিজরতের পরই কৃষি ভিত্তিক ইহুদিদের পুজো-পার্বণ ও প্রধান প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে নব গঠিত মুসলিম সমাজের এবং এখানেই বাণিজ্য ও গোত্রনির্ভর মক্কার প্রাচীন সামাজিক অভ্যাস ও সেমিটিক ইহুদির ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ইসলামী প্রকল্পনা খাড়া করলেন হজরত। এখানেই তাঁর কাছে নির্দেশ এল, পালন করতে হবে উপবাস, এখানেই তাঁর কাছে ঈশ্বরের দূত জিব্রাইল বলে গেলেন, আরবদের সুপ্রাচীন হজব্রতকে অঙ্গীভূত করতে হবে ইসলামি অনুশাসনে ; মদিনার কৃষিভিত্তিক পরিবেশেই শুরু হল ঈদ পালন এবং একই বংশোদ্ভূত সেমিটিক ইহুদির ধাঁচে কৃষিনির্ভর পালা-পার্বণের সঙ্গে যুক্ত হল ভবঘুরে বেদুইন আরবের চিরায়ত উৎসব-চিন্তা। এই জন্যেই সম্ভবত ইসলামি উৎসবের আত্মা ও শরীরে একেশ্বর আনুগত্য ছাড়াও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে আরও দুটি বৈশিষ্ট্য ও দ্বন্দ্ব। একদিকে গোত্রীয় আরবের অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান পালনের সীমায় সে আবদ্ধ অন্যদিকে কৃষিনির্ভর সমাজের সৃজনশীলতা ও রহস্যময়তায় সে সমৃদ্ধ। প্রায়ই, বিশেষ করে পশ্চিমী সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকেরা এই একটি কথাই ঘুরে ফিরে বলে থাকেন যে, যেহেতু ইসলামের অধিকাংশ আচার ও অনুষ্ঠানজ্ঞাপক আরবি শব্দের সঙ্গে মিল আছে হিব্রু শব্দের এবং যেহেতু মদিনায়, ইহুদিদের দেখাদেখিই ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পর্ব পালনে উৎসাহিত হয়েছিল মুসলমানেরা, সে জন্যেই তার পর্ব-পার্বণের এক বড় অংশ হিব্রু ও খ্রীষ্ট বিশ্বাসজাত হতে বাধ্য। কিন্তু এই প্রশ্নটাই ইউরোপীয় নৃতাত্ত্বিকেরা এড়িয়ে যান কিভাবে যে, কিসের জন্যে ইহুদি খ্রীষ্ট ও ইসলামি উৎসব ও উৎসবজাত শব্দে প্রভাব রয়েছে কৃষিনির্ভর সিরিয়া ও প্রাচীন সিরিয়াক জনগোষ্ঠীর? এ দিকের লক্ষণ? এর কারণ কি এই যে, তিনটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ই তাদের উৎসব চিন্তায় উর্বরাতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রাচীন সিরিয়াক জনগোষ্ঠীর কৃষিনির্ভর আচার-অনুষ্ঠানের কাছে ঋণগ্রস্ত? না, এর কারণ এই যে, একই সেমিটিক' বংশজাত বলেই একই ধরনের বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে আছে তাদের উৎসব ও পর্ব? এই প্রশ্নের একটি মীমাংসা হওয়া জরুরি। এই প্রশ্নের উত্তরেই লুকিয়ে আছে একেশ্বরবাদী এই তিন ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানের পরস্পর বিরোধিতা, সমান্তরাল ঐক্য ও রহস্যময়তার উত্তর। এই মীমাংসারই যথার্থ উত্তর পাওয়া যাবে ইহুদি, খ্রীষ্টান ও মুসলমানের উৎসবের কতটা একেশ্বর চিন্তার অনুগামী, আর কতটাই বা তার ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন জনগোষ্ঠী ও জাতিগত অভ্যাসের দ্বারস্থ। তিনটি ধর্মেরই উৎসব আজ ধর্মীয় আবরণে এতই পীড়িত যে তার কতটা সার্বজনীন ও লোকায়ত, আর কতটাই বা সাম্প্রদায়িক ও একেশ্বর বিশ্বাস অঙ্কিত—তা চিহ্নিত করতে প্রায় নাভিশ্বাস উঠে যায় নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের। সমাজতন্ত্রের একজন সাধারণ ছাত্র হিসেবেই এসব প্রশ্ন তুললাম আমি, ইসলামি উৎসবের অন্তর্নিহিত ও পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই বাধ্য হয়েছি এসব প্রশ্ন তুলতে, ইসলামি উৎসবজ্ঞাপক শব্দে সিরিয়াক শব্দের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করেই জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে আমার চিন্তা।

॥ তিন ॥

ইসলামের মতই অনেকটা অনাড়ম্বর ও সহজ-সরল তার পার্বণ। সংখ্যায়ও অল্প। প্রধান পার্বণ বলতে তিনটি। দুই ঈদ ও মহররম। দুই ঈদের সঙ্গে ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক কারণে যুক্ত হয়ে আছে রমজান ও হজ। আর, রমজানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে উপবাস ও শব-এ-কদরের মহিমাময় রাতের অনুষ্ঠান-পর্ব। এছাড়াও, হজরত-মুহম্মদের জন্ম-মৃত্যুর দিন, মুহম্মদের মেরাজের নৈশ ভ্রমণের রাত এবং শাবান মাসের শব-এ-বারাত (১৫ শাবানের রাত) সামাজিক পর্ব

মহরম ও মুসলমান

ইমাম মৌলানা মহম্মদ সাবির

নানা কারণে মহরমের এই দিনটি অতি পবিত্র। মহরম মাসের দশ তারিখে হজরৎ এ আদম জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ এই দিনেই ভয়ঙ্কর এক অগ্নিকাণ্ড থেকে হজরৎ ইব্রাহিমকে বাঁচিয়েছিলেন। হজরৎ মুসা ইস্রায়েলের গোলামি খতম করে দিয়েছিলেন এই দিন। এই দিনই হজরৎ ইসার বিপদভঞ্জন হয়েছিল।

হজরৎ মহম্মদ যখন মদিনা পৌঁছেছিলেন তখন ইহুদিরা শুধুমাত্র দশ তারিখে রোজা পালন করতেন। হজরৎ প্রবর্তন করলেন দুটি রোজার। নয় আর দশ। মহরমের দিনের পবিত্র কর্তব্য হল, গরিব, দুঃখীকে খাদ্য দান। বস্ত্র দান। দান আমাদের ধর্মের একটা বড় দিক। সৎকর্ম আমাদের ধর্মের একটি বড় আচার। সৌভ্রাতৃত্ব আমাদের ধর্মের একটা বড় শিক্ষা। কোনও ধর্মই ভেদবুদ্ধি শিক্ষা দেয় না। আমাদের ধর্মও দেয় না। হিন্দু-মুসলমানে কোনও তফাত নেই।

চিরঞ্জীব : সব ধর্মই ভালবাসার ধর্ম ; তবু কেন মানুষে মানুষে এত হানাহানি ?

ইমাম : ধর্ম নেই তাই এত হিংসা। এত হানাহানি। পূর্বে এই দেশেই তো দেখেছি মুসলমান বাদশায় হিন্দু উজির। হিন্দু রাজার মুসলমান মন্ত্রী। একশ দেড়শ বছর আগেও কি ধর্ম নিয়ে দাঙ্গা হত ? ভেদবুদ্ধির জনক হল ইংরেজ। রাজত্বের স্বার্থে হিন্দু-মুসলমানকে মুখোমুখি করেছে। সেই ঐতিহ্যই আমরা টেনে আসছি। স্বাধীন ভারতের স্বার্থান্বেষী নেতারাও যে কোনও কারণেই হোক এই বৈরিতা বজায় রেখেই চলতে চান। ঁরা কেউই আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী নন। সকলেই ভেজাল শাসক। ভেজাল গুরুতেও দেশ ছেয়ে গেছে। কি মুসলমান ধর্মগুরু, কি হিন্দু ধর্মগুরু ! আলেম ঠিক হলে তো জনগণ ঠিক হবে। জনগণ এখন হাতে হাতে হাতিয়ার হয়ে ঘুরছে। বিভ্রান্ত মানুষ। তাই লড়াই শুধু হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টানে নয়। লড়াই হিন্দুতে হিন্দুতে। মুসলমানে মুসলমানে। শিখের সঙ্গে শিখের।

চিরঞ্জীব : আচ্ছা, কারবালা, তাজিয়া, ঝাণ্ডা ইত্যাদির সঙ্গে মহরমের কি সম্পর্ক ?

ইমাম : কোনও সম্পর্ক নেই। আমি সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমান। শিয়াদের সঙ্গে ওসবের সম্পর্ক থাকতে পারে। আমরা চার খলিফাকে হজরৎ মহম্মদের বৈধ উত্তরাধিকারী বলে মনে করি। শিয়ারা কেবল চতুর্থ খলিফা হজরৎ আলিকে স্বীকার করেন। হজরৎ আয়েষা হজরৎ ওমর কেন সেই মর্যাদায় বঞ্চিত হবেন ?

চিরঞ্জীব : আপনারা কি তাহলে ধর্মের বহিরঙ্গের চেয়ে অন্তরঙ্গ দিকটাই গ্রহণ করেছেন ?

ইমাম : আমাদের ধর্ম বুঝতে হলে আপনাকে বুঝতে হবে প্রেম। বুঝতে হবে সাম্য। জাকাৎ কাকে বলে জানেন ?

চিরঞ্জীব : বুঝিয়ে দিন।

ইমাম : প্রত্যেক মুসলমানের পবিত্র কর্তব্য হল কিছু কিছু সঞ্চয় করা। সঞ্চয়ের বিধান নির্দিষ্ট হার হল, মোট আয়ের আড়াই শতাংশ। অর্থাৎ হাজারে পঁচিশ টাকা। পূর্বে বাদশা ছিলেন বেয়তুল মাল। যার অর্থ মালের ঘর। সকলের এই সঞ্চিত অর্থের জিম্মাদার। এই অর্থ তিনিই বিতরণ করতেন দীনদুঃখীকে। বেয়তুলমাল আর নেই ; তবু যাঁরা প্রকৃত ধার্মিক তাঁরা এখনও সঞ্চয় করেন এবং উৎসবের দিনে দু হাতে দান করেন। আল্লাহর কিতাব কোরান শরীফ। হজরৎ হচ্ছেন সিরৎ এ পয়গম্বর। প্রকৃত মুসলমান হজরৎ-এর বাণী এবং কর্মের অনুসরণ করেন। হজরৎ-এর ওপর কোরান অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত জীবনটাই কোরান শরীফ। যাঁরা তাঁর বাণী এবং কর্ম জীবনে প্রতিফলিত করেন না, তাঁরা মুসলমান নন। কোরান এবং হদিশ দুটিই পবিত্র গ্রন্থ। কোরানকে বোঝার জন্য হদিশ পাঠের প্রয়োজন। দুটি গ্রন্থ একই সঙ্গে পড়তে হয়।

চিরঞ্জীব : ইসলাম প্রেমের ধর্ম। তবু পৃথিবীর মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তির এত অভাব কেন ? সদ্ভাবের এত অভাব কেন ?

ইমাম : তারা কেউই ঈশ্বরের জিম্মাদারি মানে না যে। বার্নার্ড শ বলেছিলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে উমদা ধর্ম হল ইসলাম ; আর সবচেয়ে খারাপ লোক হল মুসলমান। কেন না তারা কেউই ধর্মের নির্দেশ অনুসারে চলে না। ইরানের খোমেয়িনি কি প্রকৃত মুসলমান ? এত বড় একটা গণহত্যা কার জন্যে হল ? কার জন্যে ইসলামের পবিত্র শহরে রাস্তা রোকো প্রভৃতি পাপ কার্য অনায়াসে ঘটে গেল ? ধর্ম মানলে এসব ঘটতে পারত ! এইসব ইসলাম বিরোধী কাজ। আমাদের ধর্ম সুন্দর, আমাদের আচরণ অসুন্দর। আমাদের সমস্ত উৎসবের সুর—দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে। ওই দেখুন, আজ শুক্রবার, নামাজের দিন, আজান শুনতে পাচ্ছেন, উঠানের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সমবেত নামাজের দৃশ্য। মুসলমানের ধর্ম হল মিলনের ধর্ম। তারই একটি রূপ গণ-নামাজ। তবু আমরা ধর্ম থেকে, কোরান থেকে, হদিশ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি কেন।

সাক্ষাৎকার : চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ, তবে ধর্মীয় উৎসব হিসেবে দুই ঈদের যে মর্যাদা এবং শিয়া মতবাদে বিশ্বাসীদের কাছে যে-গুরুত্ব পায় মহররম—তার তুল্য হতে পারে না অপর কোন পর্ব বা অনুষ্ঠান। এই তিন প্রবীণ পর্বের সঙ্গেই গভীরভাবে জড়িয়ে আছে বিশ্ব মুসলিমের ভাবাবেগ ও বিশ্বাস এবং এই তিন পর্বের ভেতর বাইরের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান যদি দেখা হয় খতিয়ে—বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে—নৃতত্ত্বের আলোকে,— তাহলে দেখা যাবে ঈশ্বর ও ব্যক্তি কাস্টে লুকিয়ে আছে সেমিটিক ও ইরানী লোকজ বিশ্বাস। বলা বাহুল্য, প্রাচীন লোক-বিশ্বাস খতিয়ে দেখাই আমার এই নিবন্ধের লক্ষ্য, কারোর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, ধর্মবিশ্বাসীদের সঙ্গে আমার বিরোধ নেই কোনো, বাড়তি মিত্রতাও নেই তেমনি, প্রশ্নহীন আনুগত্য থেকেই যেখানে যাত্রা শুরু করেন একজন বিশ্বাসী, সেখানে লোকজ বিশ্বাস ও ধর্মের আচার-আচরণের উৎস, বিবর্তন ও ক্রমপরিণতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেই এগোতে হয় আমাকে, অতএব একজন বিশ্বাসী এবং আমার লক্ষ্যস্থলও ভিন্ন, তবে যে-কোন বিশ্বাসীর সঙ্গে স্বাস্থ্যময় মতভেদে নেই কোনো আপত্তি। থাকার কথা কি ? ইসলামের প্রতিটি পার্বণই চান্দ্রমাস ও চান্দ্রবর্ষে নিয়ন্ত্রিত। চান্দ্রবর্ষ গণনার নিয়মানুসারেই স্থির হয় পর্ব-পালনের তারিখ ও মাস। এ জন্যেই ভিন্ন ভিন্ন বছরে হেরফের ঘটে তিথি পালনের তারিখের, এ জন্যেই তারিখ নিয়ে এক অঞ্চলের সঙ্গে আরেক অঞ্চলের দেখা দেয় মতভেদ ও পার্থক্য চান্দ্রবর্ষ গণনার ভুল-ভ্রান্তির জন্যেই তারিখ নিয়ে দেখা দেয় বিভ্রাট ও বিভ্রম। প্রাচীন আরবরা চান্দ্র ও সৌর বর্ষের নিয়মানুসারেই দিন গুনত বছরের। তাদের ঋতু-নির্ধারণে প্রভাব ছিল চান্দ্রবর্ষের। প্রতি দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরে বারো মাসের সঙ্গে যোগ করত আরেকটি মাস। জ্যোতির্বিদ্যার (ইলমুন নুজুম) সঙ্গে খুব একটা পরিচয় ছিল না তাদের।

ঈদ-উজ্-জোহার নামাজ ছবি : সমীরণ মুখোপাধ্যায়

জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবে তাদের পর্ব-পার্বণের তারিখ স্থির হত বলেও মনে হয় না।প্রতিটি পর্বের তারিখ ও মাস স্মরণে রাখতেন গোত্র পিতারা। এটা খুব একটা কষ্টকরও ছিল না। কেননা, স্থির ঋতুতে, বছরের বিশেষ সময়েই পালিত হত সামাজিক উৎসব ও ধর্মীয় পার্বণ। মুহম্মদের মৃত্যুর কিছুদিন আগেই এক প্রত্যাদেশে বছর গণনার আরব প্রথা নির্মূল করে দেওয়ার নির্দেশ এল। চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী স্থির হল বারো মাসের বছর। বছরে মোট দিনের সংখ্যা হল ৩৫৪। এর ফলে ৩৩টি মুসলিম বর্ষের সমান হল ৩২টি সৌরবর্ষ। নিয়মমাফিক চান্দ্রবর্ষ গণনা শুরু হবার পর থেকেই, চান্দ্রবর্ষের নিয়মানুসারে ইসলামি পর্ব-পার্বণ সময়ের স্থিরতা হারালো এবং পৌত্তলিকতাদুষ্ট আরবের পর্ব-পালনের সঙ্গে ইসলামি উৎসব পালনের সময়ের যে-নৈকট্য ছিল—তাও দূর হয়ে গেল—আর এই দূরত্ব সৃষ্টির জন্যেও আজ ইসলামি উৎসবে প্রাচীন আরব লোক বিশ্বাসের প্রভাব আঁচ করাও কঠিন হয়ে উঠেছে খানিকটা। প্রসঙ্গত প্রশ্ন উঠতেই পারে, দিনের জন্যে মৃত্যুর ঠিক আগে আগে চান্দ্রবর্ষ গণনা চালু করার নির্দেশ এসেছিল মুহম্মদের কাছে? এর পেছনে কাজ করেছে কোন্ যুক্তি?

বছর গণনাকে নিয়মতান্ত্রিক করার জন্যেই কি কায়েম করা হল চান্দ্রবর্ষ, না, মুসলিম বর্ষকে, তার পর্ব-পালনের সময়কে প্রাচীন আরবের লোক বিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যেই প্রত্যাদেশের মাধ্যমে স্থির হল ৩৫৪ দিনের বছর? কারণ যাই হক না কেন, চান্দ্রবর্ষ চালু হওয়ার ফলে নিয়মমাফিক বছর গণনা শুরু হল, পর্ব-পালনও তার ঋতুনির্ভরতা হারাল, কৃষি নির্ভর ও উৎপাদনমুখী সমাজের আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে স্থায়ী দূরত্ব সৃষ্টি হল ইসলামি উৎসবের, এবং একই নিয়মে বারো অথবা তের মাসে বছর গণনা শুরু করল আরব মুসলিমরা।

শব-এ-বারাত ও মহররম

বছর গণনার এই নিয়ম অনুসারেই মহররম আরবি বর্ষের প্রথম মাস। ইসলামে নববর্ষের কোন অস্তিত্ব নেই। প্রাচীন আরবরা নববর্ষ পালন করত বলে সঠিক খবরও পাওয়া যায় না। তবে ইহুদিদের মধ্যে নববর্ষ পালনের রেওয়াজ ছিল। ইহুদিরা বিশ্বাস করে নববর্ষেই পৃথিবী সৃষ্টি করেন ঈশ্বর। আরবি শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাতটি ইসলামে গুরুত্ব পূর্ণ। এই রাতেই মৃতের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানান মুসলমানরা। কোরানে রাতটির কোন উল্লেখ নেই। ইন্দোনেশিয়া, ভারত, ইরান ও মিশরে এই রাতে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত করার রেওয়াজ আছে। আরবিতে এই রাতটি 'লায়লাতুল বারা' এবং ফারসিতে শব-এ-বারাত নামে পরিচিত। ভারতে ফারসি প্রভাবিত শবে বারাত নামটিই প্রচলিত। আরবি 'বারা' শব্দের সঙ্গে হিব্রু 'বেরিয়া' শব্দের ধ্বনিগত মিল রয়েছে। 'বেরিয়া' শব্দের অর্থ সৃষ্টি। আগেই বলেছি, ইহুদিদের মধ্যে নববর্ষ পালনের রেওয়াজ ছিল। সৃষ্টি দিবসকেই নববর্ষ বলে চিহ্নিত করা হয় ইহুদি কিংবদন্তীতে। এদিকে হিব্রু 'বেরিয়া' শব্দের ধ্বনিগত প্রভাব রয়েছে আরবি 'বারা' শব্দের এবং শবে বারাতের আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গেও বিভিন্ন প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নববর্ষজাত লোকাচারের অনেক মিলও রয়েছে। অতএব ১৫ (মতান্তরে ১৪) শাবানের রাতটি প্রাচীন আরব কিংবা অন্য কোন সেমিটিক জনগোষ্ঠীর কাছে সম্ভবত নববর্ষের রাত হিসেবেই বিবেচিত হত, কিন্তু কালক্রমে, চান্দ্রবর্ষের প্রভাবেই সে হারিয়ে ফেলে তার ঋতুনির্ভর স্থিরতা ও গুরুত্ব। এমন সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এখনও মিশরে শব-এ-বারাতের আচার অনুষ্ঠানে ছড়িয়ে আছে গভীর লোকবিশ্বাস। মিশরবাসীরা বিশ্বাস করে, স্বর্গে একটি বিশেষ গাছ আছে। এই গাছে আছে সংখ্যাহীন পাতা। প্রতিটি পাতায় লেখা আছে বিশ্বের একেকটি মানুষের নাম। ওই বিশেষ রাত্রে যতটা পাতা ঝরে, ততজনের মৃত্যু হয় প্রতি বছর। পাতা নাকি ঝরে পড়ে ঠিক সূর্যাস্তের পরই। শব-এ-বারাতের রাতকে নিয়ে এই ধরনের লোকবিশ্বাস আছে বলেই মিশরে ঐ বিশেষ দিনটিতে সন্ধ্যার পরেই অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ প্রার্থনা। এই লোককাহিনীর সঙ্গে নববর্ষের কোন যোগাযোগ আছে কিনা জানি না। মিশরে পারস্যের প্রভাবে বসন্তেই এক সময় নববর্ষ পালিত হত। পালিত হত ইরাক ও সিরিয়ায়। বাগদাদের কোন কোন খলিফাও সাড়ম্বরে পালন করতেন নববর্ষ উৎসব। পনেরো শতকের মিশরে নববর্ষে সাধারণ প্রজারা গিয়ে জড় হতেন রাজপ্রাসাদে, এবং ওই দিনটিতে অবাধ পান-ভোজনও চলত। মিশরের নববর্ষ উৎসবে পারস্যের নওরোজের প্রভাব পড়েছিল। পরে এই প্রভাব ম্লান হয়ে আসে। আরব দুনিয়ায় নববর্ষ পালনের রেওয়াজ নির্মূল হয়ে যায়। কিন্তু, মধ্যযুগীয় ঐ রেওয়াজ এবং আজও পনেরো শাবানের শব-এ-বারার অস্তিত্ব দেখেই অনুমান হয়, এক সময় হয়ত নববর্ষ পালনের প্রথা ছিল আরব কিংবা অন্য কোনো সেমিটিক জনগোষ্ঠীর মধ্যেও। পরে ওই প্রথা বিলীন হয়ে যায় এবং অনুষ্ঠানহীন নববর্ষ চালু হয় মহররমে।

ইরানে শিয়া অভ্যুত্থানের আগে ইসলামে মহররম অনুষ্ঠান পর্বের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। মহররমের অনুষ্ঠান প্রকৃত অর্থে ইসলামের অন্তর্ভুক্তও নয়। সুন্নি ইসলামের সঙ্গে মহররমের শোকানুষ্ঠানের যোগাযোগও নেই। মহররম ব্যাপক আকারে পালিত হয় ইরান, সিরিয়া ও ইরাকের একাংশে। লেবাননেও পালিত হয় মহররম। পাক-ভারতে শিয়ারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য। তবুও ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সাড়ম্বরে পালিত হয় এই পার্বণ। সুলতানি ও মুঘল আমলে, ইরানি অভিজাতশ্রেণীর প্রভাবে এই উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল শিয়া মতবাদ। নবাব, আমীর ও উমরাহদের এক বড় অংশই ছিল শিয়া। এঁদের প্রভাবেই সুন্নি প্রজাদের মধ্যেও মহররম পালনের রেওয়াজ চালু হয়। আরও একটি কারণে, সুন্নিদের ঘোর শিয়া বিরোধও মহররম পালনকে দমিয়ে রাখতে পারেনি ভারতে। এই কারণটি আবেগজাত। মহররম অনুষ্ঠানের কেন্দ্রীয় চরিত্র হজরত মুহম্মদের দৌহিত্র হোসেন না হয়ে যদি অন্য কোন ঐতিহাসিক পুরুষ হতেন, তাহলে সুন্নিদের মধ্যে এই পার্বণ এত জনপ্রিয় হয়ে উঠত কিনা সন্দেহ। কারবালার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে নিহত হয়েছিলেন মুহম্মদের 'নয়ন-মণি'। এ জন্যেই এই হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করে শোকবিহ্বল ও আবেগচঞ্চল হয়ে ওঠে সুন্নি মুসলিমও। সুন্নি ইসলাম মহররমের পৌত্তলিকতা-দুষ্ট অনুষ্ঠানের ঘোর বিরোধী। শিয়ারা মুহম্মদের জামাতা ও তাঁর দৌহিত্রদের যে-চোখে দেখেন, তা সুন্নি ইসলামের পরিপন্থী। সুন্নি ইসলামে প্রাচীন ইরানী অবতারতত্ত্ব প্রভাবিত ইমামের কোন অস্তিত্ব নেই। থাকার কথা নয়। সুন্নি ইসলামে ঈশ্বর এবং তাঁর শেষ পয়গম্বরই চূড়ান্ত। কিন্তু শিয়ারা মনে করে, শেষ পয়গম্বরই চূড়ান্ত নন। হজরত মুহম্মদের জামাতা আলি এবং তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে ঐশ্বরিক প্রচ্ছায়া পড়েছে এবং বংশ পরম্পরায় ঈশ্বরের অভিজ্ঞান হয়ে জন্ম নেন ইমামরা। আজকের শিয়া বিশ্বে, এই বিশ্বাস থেকেই, আয়ত উল্লাহ খুমেইনিকে শিয়ারা ইমাম জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে। আর শ্রদ্ধাবোধ অনেকটা ব্যক্তিপুজোর ধাঁচেই গঠিত। আয়ত উল্লাহ মানেই ঈশ্বরের অভিজ্ঞান। আয়ত উল্লাহকে 'রুহ উল্লাহ'ও বলা হয়ে থাকে। রুহ উল্লাহ মানে ঈশ্বরের আত্মা। আদি ও খাঁটি ইসলামে মানুষ কখনও 'ঈশ্বরের আত্মা' হিসেবে কল্পিত হতে পারে না। প্রাচীন ইরানীরা বিশ্বাস করত, রাজার মধ্যেই বিকশিত হন ঈশ্বর। রাজাই ঈশ্বরের মানবিক বিকাশ। অতএব রাজার সামনে অবনত হওয়া,

ঈদ-উল-ফিতর। খুশির ঈদে কেনাকাটা — *ছবি : তারাপদ ব্যানার্জি*

শব-এ-বারাতের রাতে আলোর রোশনাই — *ছবি : শৈবাল দাস*
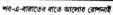
তাঁর প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলা প্রতিটি প্রজারই কর্তব্য। রাজাই প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের অবতার। প্রাচীন ইরানের এই অবতারত্ব নির্মূল করতে পারেনি ইসলাম। বরং ইসলামি বিশ্বাসেই ইরানি অবতারতত্ত্বকে চাপিয়ে দেওয়া হয় শিয়া মতবাদের মাধ্যমে। ইরানি অবতারতত্ত্ব পুনরুজ্জীবিত করে এক সময় প্রাচীন রাজতন্ত্র কায়েম করারও চেষ্টা হয়েছিল পারস্যে। এই চেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করেন আরব খলিফারা। কিন্তু অবতারতত্ত্বের বিনাশ ঘটানো সম্ভব হয়নি। ইমাম তত্ত্বেই আশ্রয় নিল অবতারতত্ত্ব। বংশপরম্পরায় ইমামই শিয়াদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা। একমাত্র তাঁর সাহায্যেই মুক্তি পেতে পারেন বিশ্বাসীরা। এই ইমামতত্ত্বের জোরেই ৭৯ সালে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে ইমাম শাসিত কঠোর শিয়া ইসলাম প্রবর্তিত হয় ইরানে।

ইরাকের কুফায় ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে উমাইয়া খলিফা এজিদের হাতে নিহত হন ইমাম হোসান। ঐ দিনটি ছিল মহররমের তারিখ। নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক কারণেই নিহত হয়েছিলেন ইমাম। কিন্তু তাঁর হত্যাকাণ্ডকে ধর্মীয় ভাবাবেগে রঞ্জিত করে দিলেন আলির অনুগামীরা। হোসানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর সমাধিস্থল এক প্রধান তীর্থ কেন্দ্র হয়ে উঠল। এবং আত্মবলির জোরালো প্রতীক হিসেবেও চিহ্নিত হতে লাগলেন তিনি। গ্রিক চার্চ যেমন মনে করত মানুষের পাপের ফলে,—কিংবা পাপ আর পরিত্রাণের জন্যেই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন যিশু, ঠিক তেমনি, হুসেনের ক্ষেত্রেও সিয়াদের একাংশের ধারণা অনুগামীদের স্বার্থে, তাঁদের মুক্তির জন্যেই আত্মবলির পথ বেছে নিয়েছিলেন ইমাম হোসেন। তাঁর হত্যাকাণ্ড নিছক হত্যাকাণ্ড নয়। আত্মবলির প্রতীক। হোসেনের এই আত্মদান পরবর্তী কালে শিয়া কিংবদন্তীতে আরও অনেক আত্মবলির প্রেরণা হয়ে ওঠে। গ্রিক চার্চের বিশ্বাসে হোসেনের আত্মবলি সংক্রান্ত জন-বিশ্বাস প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে। পশ্চিম এশিয়ার ব্যাপক অঞ্চলে, বিশেষ করে সিরিয়া ইরাকে এক সময় গ্রিক চার্চের গভীর প্রভাব পড়েছিল।

মহররমের অনুষ্ঠান-পর্ব পালিত হয় মাসের ১০ তারিখ। এই অনুষ্ঠান শোকের অনুষ্ঠান। বিলাপ করতে করতে হোসেনের শব যাত্রার নাটকে যোগ দেন ভক্তরা। তাদের হাতে থাকে পতাকা, আর মিছিলের কেন্দ্রে থাকে হোসেনের কফিন। কফিন বয়ে নিয়ে চলেন একদল। কোথাও কোথাও কফিন মিছিলের পিছনে ছোটে চারটি ঘোড়া ও শোক বিহ্বল মানুষ। আর তাদের পেছনে থাকে আরেকটি শক্ত সমর্থ ঘোড়া। এই ঘোড়া হোসেনের প্রিয় সওয়ার দুলদুলের প্রতীক। ইসলামের অন্য কোন পার্বণে এই ধরনের শোক মিছিলের রেওয়াজ নেই। শহিদের কফিন সাজিয়ে, বিলাপ করতে করতে, সেই কফিন নিয়ে মিছিল করা গ্রহণযোগ্য নয় ইসলামে। তা সত্ত্বেও, শিয়া মতবাদে এবং মহররমের অনুষ্ঠানে আজ স্বীকৃত সত্য এই অদ্ভুত শোক মিছিল। শিয়া মতবাদে ইরানি লোক-বিশ্বাসের প্রভাব থাকলেও, এই শোক মিছিল ইরানি বিশ্বাসজাত নয়। মহররমের শোক মিছিল এবং তার প্রতীকধর্মিতার সঙ্গে মেসোপোটেমিয়ার অ্যাডোনিস-তামুজ 'কাল্টের' গভীর সম্পর্ক রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিয়া মতবাদ গড়ে ওঠেনি ইরানে। গড়ে উঠেছে ইরাককে কেন্দ্র করে। গোড়ার দিকে শিয়াদের প্রায় সকলেই ছিল ইরাকি ও আরব বংশজাত। শিয়া মতবাদ গড়ে ওঠার সময় ইরাক ও তার আশপাশ অঞ্চলে অ্যাডোনিস-তামুজ পুজোর ব্যাপক প্রচলন ছিল। সাধারণ বিশ্বাসীরা মনে করত, গ্রীষ্মের প্রবল তাপে মৃত্যু হয়েছে ঐ দেবতার। দেবতার করুণ মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ৭ দিন ধরে পালিত হত শোক। দেবতার শব নিয়ে হাহুতোশ করতে করতে বের করা হত শোক মিছিল। মিছিলে অংশ নিত শত শত মানুষ। শিয়ারাও মনে করেন, কুফায় প্রবল জলকষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন হোসেনের পরিবার। জলকষ্টে তাঁর প্রিয় পুত্রের মৃত্যু হয়। ফোরাত নদীর জল নাকি বন্ধ করে দিয়েছিলেন 'নিষ্ঠুর' এজিদ। অ্যাডোনিস-তামুজ পুজোয় গ্রীষ্ম যেমন অপ-দেবতা হিসেবে কল্পিত ঠিক তেমনি শিয়া কিংবদন্তীতেও এজিদ পাপাত্মা হিসেব চিহ্নিত। অ্যাডোনিস-তামুজ পূজারীদের বিশ্বাসেই এই শিয়া কিংবদন্তী গড়ে উঠেছিল কিনা, তা বলা মুশকিল, তবে, অ্যাডোনিস-তামুজের পূজা-পদ্ধতির সঙ্গে মহররমের আচার-অনুষ্ঠানের মিল রয়েছে গভীর। মহররম পার্বণ শুরু হয় দশম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দেই প্রথম মহররম-অনুষ্ঠান পালিত হয়েছিল বলে খবর পাওয়া যায়। এর দুশ বছর পরেও আরমেনিয়া খুজিস্তান ও ইরাকের আশপাশ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল অ্যাডোনিস পুজো। অতএব, অ্যাডোনিস-জাত বিশ্বাসে মহররমের

আচার-অনুষ্ঠান গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে বিস্তর।

রমজান, শব-এ-কদর ও ঈদুল ফিতর

ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি পার্বণের একটি হল এই ঈদ-উল ফিতর। ইসলামি অনুষঙ্গে এই পার্বন ঈদ-উল-সগির—ছোট ঈদ, ঈদ-উল-সদকা দান-খয়রাতের ঈদ অথবা রমজানের ঈদ বলেই চিহ্নিত। রমজানের উপবাস-অবসানের পরই অনুষ্ঠিত হয় বলেই রমজানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে এই পার্বণ এবং একটি কারণেই তার মেজাজও অপেক্ষাকৃত উচ্ছল। রমজান ইসলামের নবম মাস। রমজান ছাড়া, অন্য কোনো মাসের নাম উল্লেখিত হয়নি কোরানে। কোরানের দ্বিতীয় সুরা অল বকরের (বকর শব্দটি হিব্রু বকন থেকে গৃহীত। বকর শব্দের অর্থ গাভী এবং আরবি বকর শব্দের অর্থ গো বাছুর) ১৮৫ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এই মাস। মাসটি ইসলামে পবিত্রতম বলে চিহ্নিত। হজরত মুহম্মদও তাঁর হদিসে এই মাসের মহিমা কীর্তন করেছেন। মুহম্মদ বলেছেন, এই মাসেই খুলে দেওয়া হয় স্বর্গের দরজা এবং রুদ্ধ হয়ে যায় নরকের দ্বার। শয়তানের পায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয় লাগাম। যাঁরা উপবাস করেন, তাঁদের জন্যেই এ মাসে খুলে দেওয়া হয় স্বর্গের বিশেষ দরজা 'রায়হান'। উপবাসকারীর পাপও এই মাসে ক্ষমা করেন ঈশ্বর। রমজানকে এইভাবে মর্যাদাপূর্ণ বলে চিহ্নিত করার কারণ সম্ভবত এই যে এই মাসেই নির্গত হয়েছিল কোরান, এই মাসেই নৈশ ভ্রমণে —মেরান— গিয়েছিলেন হজরত মুহম্মদ এবং এই মাসেই প্রথম প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন তিনি। পবিত্র মাসের ধারণার সঙ্গে প্রাচীন আরব ও অন্যান্য সেমিটিক জনগোষ্ঠীর পরিচিত ছিল, তবে, তাদের পবিত্র মাস রমজান ছিল না অন্য কোন মাস ছিল—তা বলা কঠিন। গোটা মাস জুড়ে উপবাস-ব্রত পালনের সঙ্গেও তাদের পরিচয় ছিল কিনা তাও সঠিকভাবে জানা যায় না। কিন্তু উপবাস-ব্রতের যে প্রচলন ছিল, এবং আত্মশুদ্ধির জন্যে কিছু কিছু মানুষ যে উপবাস করত—তার প্রমাণ আছে অনেক। 'রমজান' শব্দটি আরবি 'রমজ' ধাতু থেকে আগত। রমজ মানে দাহ, তাপ, পোড়ানো। আরবি শব্দতাত্ত্বিকদের ধারণা, চান্দ্রবর্ষ চালু হওয়ার অনেক আগে, প্রাচীনকালে গরমের মওসুমে এই মাস পড়ত বলে এর নাম হয় রমজান। রমজানের সঙ্গে উপবাসের আরবি প্রতিশব্দের ধ্বনিগত কোন মিল নেই। উপবাসের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'সওম'। এর অর্থের সঙ্গেও উপবাস ব্রতের কোন মিল নেই। এর অর্থ হল আরাম বা বিশ্রামে থাকা। মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়ার আগে উপবাস ব্রতের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক পরিচয় ছিল না মুসলমানদের। হিজরতের পরই উপবাসের সঙ্গে সরাসরি তাঁদের পরিচয় ঘটে। এবং হিজরতের পরেই সম্ভবত ইহুদি সিরিয়াক সূত্র থেকে উপবাসের প্রতিশব্দ হিসেবে 'সওম' শব্দটি গ্রহণ করেন মুহম্মদ। কোরানের ১৯ নং সুরা মরিয়মের ২৭ নং আয়াতে 'সওম' শব্দটির উল্লেখ আছে। কোরানতাত্ত্বিকেরা এই 'সওম'-এর ভিন্ন অর্থ করেছেন। এর অর্থ নাকি 'নীরবতা' অথবা পর্দা। বলা বাহুল্য সুরা মরিয়মের প্রত্যাদেশ আসে মক্কায়। হিজরতের আগে। মদিনায় নয়। অতএব মরিয়মের 'সওম' কখনও উপবাসের 'সওম' হতে পারে না। দ্বিতীয়, আগেই বলেছি, হিজরতের আগে মুসলমানদের মধ্যে উপবাস-ব্রতের প্রচলন ছিল না। তবে, মুহম্মদের সমসাময়িক 'হানিফ' নামক একদল স্বাধীনচেতা ভক্তদের মধ্যে ইহুদি বিশ্বাসজাত উপবাস প্রথা চালু ছিল বলে উল্লেখ করেন কোন কোন ইউরোপীয় নৃতাত্ত্বিক। মুহম্মদের অনুগামীদের মধ্যেও হিজরতের আগে উপবাসের প্রচলন ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু কেউই এ ব্যাপারে পেশ করতে পারেননি যথার্থ প্রমাণ। সে যাই হোক, আনুষ্ঠানিক ও আবশ্যিক উপবাস ব্রতের সঙ্গে মুসলমানদের প্রথম পরিচয় ঘটে মদিনায়। মদিনায় কৃষিজীবী ইহুদিরা মহররমের দশ তারিখ, আশুরা দিবসে উপবাস পালন করত। ইহুদিরা মনে করত, এখনও মনে করে, এই আশুরা দিবসেই সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু করেন ঈশ্বর। ইহুদিদের দেখাদেখিই হোক, অথবা অন্য কারণেই হোক, আশুরা দিবসে মুলসলমানদেরও উপবাস পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এবং এই নির্দেশ 'আসার' পর থেকেই আনুষ্ঠানিক উপবাস পালন শুরু হল। কালক্রমে ইহুদিদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এবং সম্ভবত এরই পরিপ্রেক্ষিতে আশুরা উপবাসের পরিবর্তে রমজানে মাসজুড়ে উপবাস পালনের নির্দেশ এল। এই নির্দেশ এল দ্বিতীয় হিজরিতে সুরা 'বাকরাহ' এর ১৮৩—১৮৫ আয়াতে। আর এই নির্দেশ অনুসারেই রমজানের উপবাস আবশ্যিক বলে ঘোষিত হল। উল্লেখ করা হয়েছে, ২৭ রমজানের (শব-এ-কদর) রাতটি একটি বিশেষ পার্বণের রাত বলে গুরুত্বপূর্ণ। এই রাতের মহিমা কীর্তন করেছে কোরান। বলেছেন মুহম্মদও। এই রাতেই নাকি প্রথম নির্গত হয় কোরান। প্রাচীন আরবদের মধ্যেও এই ধরনের একটি বিশেষ মহিমান্বিত রাতের সন্ধান মেলে। প্রাক ইসলামি আরবদের মহিমায় রাতটি কী করণে সুচিহ্নিত ছিল, কী ছিল তার গুরুত্ব তার হদিস দিতে পারেন পশ্চিমী সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকদের অনেকেই ইসলামের লায়লা-তুল-কদর—মহিমাময় রাত এবং ইহুদিদের আশুরা পর্বের মধ্যে দেখতে পান সামঞ্জস্য। তাঁদের যুক্তি হল এই যে, ইসলামের কোরান সৃষ্টির ধারণা এবং উহুদিদের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিশ্বাস এই দুই রাতের গুরুত্বে হয়ে উঠেছে সমার্থক। অতএব অগ্রগামী ইহুদির বিশ্বাসে অনুগামী মুসলমানের বিশ্বাস প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে। যুক্তি দিয়ে এই অনুমান কায়েম করা মুশকিল। কেননা, কোরান আর জগৎ সৃষ্টির ধারণা এক নয়। এক হতে পারে না। এই অনুমানে কষ্টকল্পনা আশ্রয় পেয়েছে বড় বেশি। লায়লা-তুল-কদর এবং আশুরা পর্বের মধ্যে যোগাযোগ থাক অথবা না থাক আশুরা পর্বকে মুসলমানরাও মর্যাদা দেন। এদিন অনেকেই অতিরিক্ত পুণ্যের আশায় পালন করেন উপবাস। ইহুদিদের আশুরা উপবাসের তুলনায় রমজানের উপবাসের নিয়ম কানুন অনেক বেশি কঠোর ও দীর্ঘমেয়াদী। রমজানের উপবাসের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলীয় খ্রীষ্টীয় উপবাসের মিল রয়েছে। খ্রীষ্টীয় উপবাসের মেয়াদ আরও দীর্ঘ। ৪০ দিন ধরে উপবাস-ব্রত পালন করেন পূর্বাঞ্চলীয় খ্রীষ্টানরা, মুসলমানদের দীর্ঘ মেয়াদী ৩০ দিনের উপবাসে খ্রীষ্টীয় উপবাসের প্রভাব পড়া বিচিত্র নয়।

রমজানের উপবাস অবসানের প্রতীক হিসেবেই আবির্ভূত হয় ঈদ-উল-ফিতর। ঈদের প্রচলিত অর্থ উৎসব। কিন্তু তার আভিধানিক অর্থ পুনরাগমন কিংবা বারবার ফিরে আসা। ধর্মীয় অনুষ্ঠান জ্ঞাপক অধিকাংশ শব্দের মত ঈদ শব্দটিও মূলত সিরিয়াক। আরবি ভাষায় কখন কোন অবস্থায় এই সিরিয়াক শব্দটি গৃহীত ও স্বীকৃত হয়েছে—তার কোন উল্লেখ নেই আরবি শব্দতত্ত্বে। ঈদ-উল-ফিতর এই শব্দযুগলের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে উপবাস ভাঙার উৎসব। ঈদ শব্দটির অর্থের সঙ্গে আজকের অর্থের কোনো যোগাযোগই নেই, কিন্তু সামাজিক উৎসবের প্রকৃতিকে অর্থবহ করে তোলে তার আদি অর্থ। সামাজিক উৎসব বার বার ফিরে আসে, আর ঈদ শব্দের আদি অর্থেও আছে তার ইঙ্গিত। ঈদ শব্দটির আদি অর্থ ও তার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম খতিয়ে দেখে মনে হয়, হয়ত এককালে এই ধরনের এক সামাজিক উৎসবের সঙ্গে পরিচিত ছিল—সিরিয়াক জনগোষ্ঠী। হয়ত তার কৃষিজ আচারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এই উৎসব এবং তাদের কাছ থেকেই আচার অনুষ্ঠান জ্ঞাপক শব্দের মতই আরববা আমদানি করেছেন এই উৎসব ও তার প্রকৃতিকে। ঈদের আনন্দমুখর প্রকৃতিতে কৃষিজ আচার অনুষ্ঠানের লক্ষণও রয়েছে বিস্তর। ঈদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'রমজান' ও 'সওম' শব্দ দুটির আদি আজকের অর্থেও রয়েছে এই নৃতাত্ত্বিক ইঙ্গিত। গোড়াতেই রমজান ও সওমের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঈদ, সওম এবং রমজানের মূল অর্থ এবং তাদের উৎসভূমির ভিত্তিতেই অনুমান হয়, বাণিজ্যনির্ভর মক্কায় জন্ম নেয়নি ঈদ কিংবা রোজার উপবাস, জন্ম নিয়েছে কৃষিনির্ভর সমাজে হয়ত বা প্রাচীন সিরিয়ায়।

ঈদুল আজাহা ও কোরবানি

একইভাবে ঈদ উল-আজহার সঙ্গেও যুক্ত হয়ে আছে প্রাচীন আরবের লোকবিশ্বাস। ঈদ উল-আজহার আচার অনুষ্ঠান, বিশেষ করে তার কোরবানি— পশু বলি প্রথা এবং এর সঙ্গে যুক্ত ইব্রাহিম ইসমাইলের পুরাণটি খুঁটিয়ে দেখলেই মনে হয় সেমিটিক আরবের সুপরিচিত লোকবিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এই উৎসব এবং একথাও মনে হয় কেবল পশুবলির প্রথাই চালু ছিল না প্রাচীন আরবে, নরবলিও চালু ছিল। আরব পুরাণ ও কিংবদন্তীতে নরবলির ইঙ্গিতও মেলে। আর এ সব বলি প্রথারই ইসলামি সংস্কার হল কোরবানি। এবং হজ ও ঈদ উল-আজহাও ছিল আরব কিংবা অন্য কোন সেমিটিক জনগোষ্ঠীর নবান্ন উৎসবের অঙ্গ। ■

বেরিয়ে পড়ুন অজানার সন্ধানে দৌড়বাজ সাথী হিরোর সংগে।

হিরো হাই-স্পীড (জেণ্টস)
৩-স্পীড ফ্রী হুইল
একটু ঘুরে আসার মুডে বেরিয়ে পড়া, কিম্বা শহরে যাওয়া; রাস্তায় উঁচু নীচু পথের বাধা যাই থাকুক না কেন, হিরো যতক্ষণ সংগে আছে ততক্ষণ পরোয়া কিসের।
ধূসর, সবুজ, লাল, মেরুন-এমনকি কালো আর নীল রঙেও হিরোর রূপটি খাসা।
১৬ টি মডেল। পাঁচটি ছোটদের জন্য; বাকি বড়োদের। গিয়ার সহ অথবা গিয়ার বিহীন।
ছোটখাট দূরত্ব হোক অথবা দূর পাল্লা হোক, হিরো সাইকেলে চড়ে সফরের রোমাঞ্চই আলাদা।

চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের রঙিন পূজাবার্ষিকী

বিশেষ প্রবন্ধ
চিদানন্দ দাশগুপ্ত
সেবাব্রত গুপ্ত

৬টি নয় এবার ৭টি
উপন্যাস
বিমল মিত্র
মতি নন্দী
দিব্যেন্দু পালিত
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
দুলেন্দ্র ভৌমিক
বাণী বসু
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

২টি বড় গল্প
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব গুহ

অমিতাভ বচ্চন পুরোদমে ফিল্মে এলেন, কিন্তু কতদিন ?
অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে নতুন ধরনের লেখা লিখেছেন বিপ্রদাস

মিঠুনের দাবি তিনিই সুপারস্টার। কিন্তু
চমকপ্রদ বিশ্লেষণ করেছেন স্বপনকুমার ঘোষ

শ্রীদেবীর বিকল্প কে ?
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন অনামিকা

রেখা আজও কেন দর্শকদের আগ্রহের কেন্দ্র বিন্দু
বিতর্কিত রেখাকে নিয়ে আরও বিতর্কিত লেখা

সত্যজিৎ রায় এবং তরুণ মজুমদার বিপরীত মেরুর এই দুই পরিচালকের মধ্যে কোথাও কি সাযুজ্য আছে ?
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসন্ধানী লেখা

বাংলার নায়িকা একদা বোম্বাইতে কদর পেয়েছিলেন কিন্তু আজ ?
অনিরুদ্ধ ধরের দুঃসাহসিক রচনা।

কৃষ্ণ লিখছেন কাপুর পরিবারকে নিয়ে সুদীর্ঘ রচনা এছাড়াও থাকছে আদূর দর্শন, বাংলা ও বোমবাই তারকাদের নিয়ে আরও অনেক লেখা।

বোমবাই ফিল্ম মিউজিক কি ক্রমেই বিদেশী সুর নির্ভর হয়ে উঠছে ?
পার্থপ্রতিম চৌধুরীর লেখায় তারই নিপুণ বিশ্লেষণ।

তারকাদের ফ্যাশন। অজস্র রঙিন ও সাদা কালো ছবিতে চোখ ধাঁধানো অঙ্গসজ্জায় অনন্য এবারের পূজাবার্ষিকী

দাম : ৩৬·০০ টাকা

কল্পকাল্পনিক মহরম

আবুল বাশার

মাটির সঙ্গে গাছের শিকড়ের যে সম্বন্ধ ধর্মের সঙ্গে ধর্মের কাহিনীগুলির সেই সম্বন্ধ। শিকড়ের মাটি আল্‌গা হলে গাছ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, কাহিনীকে বাদ দিলে ধর্মেরও দাঁড়াবার কোন উপায় নেই। মাটি যেমন শিকড়কে এবং শিকড় যেমন মাটিকে ধরে আছে, ধর্ম আর ধর্মের কাহিনী ঠিক সেইভাবে পরস্পরকে ধরে আছে। কাহিনীর গুরুত্ব সম্পর্কে মুন্সী প্রেমচন্দ একবার বলেছিলেন ধর্মের শরীর থেকে কাহিনীগুলোকে টেনে নিলে ধর্মের কাঠামোই ভেঙ্গে পড়বে, ধর্ম টিকবে না। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর এই রকমই ছিল।

যুগ যুগ ধরে ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে ধর্মের কাহিনীগুলি। ধর্মের দু'টি দিককেই সে রক্ষা করেছে, তার বাহির ও অন্তর। ধর্মের নীতি (Ethics) অথবা তার বাহ্য ব্যবহারিক আচরণ, প্রথা। এই উভয় পক্ষই কাহিনী আশ্রিত। ধর্ম-কাহিনীর গুরুত্ব বোঝাতে প্রেমচাঁদ যেমন বলেছেন, অন্য কেউ বলে থাকতেও পারেন, আমাদেরও বলতে হচ্ছে যে সাহিত্যের 'ফর্ম' আর 'কন্টেন্ট' সম্বন্ধে যে-ধরনের নিহিত সম্পর্ক আমরা বারংবার আবিষ্কার করি, ধর্ম আর ধর্মের কাহিনী সম্পর্কেও ঠিক তাই। একটি ছাড়া অন্যটি চিন্তা করা যায় না। সেই কাহিনী ছন্দোবদ্ধ হ'লে তার পরমায়ু আরো দোলায়িত হয়, ছন্দ স্পন্দনে তা যুগ থেকে যুগান্তরে, হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে স্পন্দিত হওয়ার, গুঞ্জরিত হওয়ার, এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে বহে চলার বেগ সঞ্চার করতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর কিংবা যীশুই টিকে আছেন তাঁদের উপমা (বস্তুগত তুলনা প্রতিতুলনা বা সমতুলনা) আর কাহিনী-রূপকের জোরে। এই কাহিনী রূপকতা ও উপমা উপমান উপমিতের চারুত্ব যে টিকে আছে, সেই টিকে থাকার মধ্য দিয়ে ধর্মের শিকড় আরো শক্তিশালী হয়েছে। উপমা আর রূপকের, কাহিনী ও কবিত্বের জোর না থাকলে তাঁদের দার্শনিকতা পাষাণে পতিত গম ফলের মতন নিষ্ফল হয়ে যেত, অঙ্কুর গজাত না, যে-উপমা স্বয়ং যীশুই দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন খানিকটা অন্যভাবে, ভিন্ন প্রসঙ্গে, এখানে তার উল্লেখ প্রয়োজন নেই। উল্লেখ করবার এইটুকু যে দার্শনিকতা বা নীতি-আদর্শ বোঝাতে সহজ রাস্তা উপমা আর রূপকের আশ্রয়, কবিতার আশ্রয়, কাহিনীর দ্বারস্থ হওয়ার কুশলী বুদ্ধি। এইটুকু ধর্মবেত্তারা খুব সুন্দর করে বুঝেছিলেন। প্রেমচন্দের সঙ্গে আমরা এক্ষেত্রে একমত হতে পারি। (তাঁর নিবন্ধ 'জীবন মে সাহিত্য কা স্থান' দ্রষ্টব্য)।

কথাগুলি এ কারণে উল্লেখ করতে হল যে মহরমও মানুষের অন্তরে কাহিনীর জোরে, গ্রাম্য পুঁথি আর ছড়ার ছন্দে ও গায়নে টিকে আছে। সেই কবিত্ব আর কাহিনী বাদ দিলে মহরমের অন্তর বাহির ভেঙ্গে পড়ত কবেই। বিষাদ-সিন্ধুর জোরও তার কাব্যময়তায় আর কাহিনী বয়নে। মীর মোশারফ হোসেন লিখেছেন, "বিষাদ-সিন্ধুর সমুদয় অঙ্গই ধর্ম-কাহিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট।" তা কারবালার প্রকৃত রাজনৈতিক ইতিহাসের চেয়ে শক্তিশালী। মহরম গ্রাম্য কবির জারিগানে এবং মর্সিয়ায় অধিক প্রোজ্জ্বল। কারণ তা রামকৃষ্ণঠাকুরের মতন তত গভীর না হলেও সরল এবং মাটিমাখা মায়াবী ঘনতায় স্নিগ্ধ। জনগণ কবিত্বের সারল্য পছন্দ করে। সেই গ্রাম্য কাতর বিবরণ অগভীর দার্শনিকতায় নিরেট হলেও কাব্যের অবোধ সারল্যে অটুট। যথা :

"বনে কাঁদে বনের পশু গো
পাখি কাঁদে বিলে। ওরে দুনিয়াজাহান
কাঁদে সব

ছবি দেবীপ্রসাদ সিংহ

"হোসেন হোসেন ব'লে গো।"

শুধু তাই নয়, ইতিহাসকে তারা 'মিথে' পরিণত বা রূপান্তরিত করতে ভালবাসে। মহরম তাই আজ এক ধরনের গ্রামীণ 'মিথ' মাত্র, তা আর কোন ঐতিহাসিকের করায়ত্ত লিপি মাত্র নয়। ঐতিহাসিক লেখ্য রূপের চেয়ে তা জনগণের কল্পকথা, উপকথার প্রশ্রয়ে স্বগত স্বাধীন। তা অতিকথা, অতিকল্পনায় পীড়িত ধর্মের এক প্রখর কিস্‌সা। কিস্‌সা আর 'মিথ' এখানে গঙ্গা যমুনার মিলিত প্রবাহে মিশেছে। প্রকৃত ইতিহাসের শাসন এখানে আলগা হয়ে গিয়েছে অথবা তা প্রবেশাধিকারের খিড়কি পথও খুলে রাখেনি। বরং গ্রাম্য মহরমের সঙ্গে পুঁথি আর সাদর-স্পৃষ্ট বিষাদ-সিন্ধুর যোগ। গাঁয়ের অনেক বাঙালি মুসলমান গৃহই তার সাক্ষী। সেখানে এলে দু'খানি পুস্তক তাকে তোলা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। একখানা বহুল পঠিত নয়, কিন্তু বাড়ির সম্মান বাড়ায়, তা হচ্ছে 'বিষাদ-সিন্ধু'। দ্বিতীয় খানি বহুল পাঠে জরাজীর্ণ, তা হচ্ছে কাছাছল আম্বিয়া কেতাব (পুঁথি)। এরই সঙ্গে সমগ্র কোরান আর হাদীসের দু'এক খণ্ড পাওয়া যায়। ফাউ হিসেবে নজরুলের 'সঞ্চিতা' পাওয়া যেতে পারে। আরো কিছু খুচরো ফাউ পাবেন, হিন্দী সিনেমার গানের শস্তা মুদ্রণের ভুলে ভরা পাতলা এক বিঘত বই, যার প্রচ্ছদে ধর্মেন্দ্র কিংবা বোম্বাই সুন্দরীর ছবি। এছাড়া আপনি যদি আরো ফাউ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস সাদরে গ্রহণ করাতে চান তাহলে আপনাকে রবীন্দ্রজন্মের দু'শো পঁচিশ (২২৫) বৎসরের উৎসবের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বোম্বাইয়ের ফিল্মিক মারদাঙ্গার সঙ্গে পুঁথির বীরদের পারঙ্গমতার সাংঘাতিক মিল আছে, মহরমের প্রকৃত বীরত্ব আর জিহাদ সেই অনুষঙ্গে স্মরণীয় হলেও সিনেমা তার কাছে বাস্তবিক নস্য মাত্র, কিন্তু তা একভাবে আনুষঙ্গিকও বটে। পুঁথির এক নোকতা উদ্ধার করা যাক।—

"আশিমণ লোহার গর্জ্জ বগলে দাবিয়া
ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ চলিল হাঁকিয়া।"

এমন বীরের সাক্ষাৎ মীর মোশারফ হোসেনের বিষাদ-সিন্ধুতে পাওয়া খুব মুশকিল। কিন্তু মুসলমান বাঙালি এমন বীরত্বের উপাসনা করে কেন না বুঝলে মহরমের উন্মাদনা ও জোশ বোঝা যাবে না। বোঝা যাবে না মহাবীর হজরত আলীর হুংকার কীভাবে সূর্যের উদয়স্থান (মশরেক) থেকে সূর্যাস্তের কিনারা (মগরেব) অবধি তরঙ্গায়িত হয়ে ব্যাপ্ত হওয়ার মত শক্তিশালী ছিল। উপমা আর রূপ কল্পনার অতিরেকেই মহরমের প্রকৃত ইতিহাসকে ছাপিয়ে জারিগানের রচয়িতার কলমে মহরমের মিথকে ধারণ করেছে, অতি কল্পনার জোরেই 'সুপারম্যান' তৈরি হয়, মিথের ফোড়ন ছাড়া তা অসম্ভব। মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর অসামান্য গ্রন্থ 'ইনসানিয়াত মৌৎ কে দরওয়াজে পর' গ্রন্থে ইতিহাস ও কল্পকাহিনীর সীমারেখা সংক্রান্ত ভাবনায় ইতিহাস-দর্শনের উদ্গাতা ইবনে খলদুনের একটি মূল ঐতিহাসিক নীতির উল্লেখ করে বলেছেন, খলদুন ইতিহাস বিচারের মূলনীতি রূপে একথাই মেনে

বন্দেমাতরম ধ্বনির সঙ্গে কারবালার জিহাদ কীভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মিলিত হত সে অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধ দেখতে পায়নি। হিন্দু না ওরা মুসলিম, এই সন্দিগ্ধ ভাবনাই জাতীয় ঐক্যে কারবালার বীরত্বকে অনুপ্রবেশের সুযোগ দেয়নি।

নিয়েছিলেন যে ঘটনা যতই জনপ্রিয় ও বিখ্যাত হবে, রূপকথার আমেজ তাতে ততই বেশি থাকবে। যাই হোক। মুসলমান ঘরের তাক বা বাঁশের চাঙারি-সুরক্ষিত 'বিষাদ-সিন্ধু' থেকে বেদনা ও বিষাদ গড়িয়ে তরল হয়ে নেমে মর্সিয়া লেখকের ছন্দে পয়ারে ত্রিপদীতে মুখ গুঁজেছে, একথা অনুমান করাও শক্ত হবে না, যদি সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুঁথির উৎসও মনে রাখি। এইভাবে গ্রাম জীবনে মহরমের কাব্যের শরীর গঠিত হয়েছে। মহরমের অভিনয়শিল্পে সম্প্রতি কালে হিন্দী সিনেমার 'ভায়োলেন্স' মেশানো হুতাশন আর মারণ-মোহ গৃহ-কারবালার আগরবাতির ধূমায়িত সৌরভের সুতোর মত জড়িয়ে ধরেছে। মহরমের দুর্গতির জন্য হিন্দী সিনেমার ক্যামেরাও নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ দায়ী। সত্যি বলতে কি, কম দায়ী নয়। কারণ মুসলমান আজও মনে করে, 'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালাকে বাদ।' মহরমের তাজিয়ার জৌলুস আর মাতমের রক্ত-ক্ষরণে বাহ্যত ইসলাম জিন্দা হয় বৈকি। প্রতি বছরই হয়।

কোরানে যতখানি গুরুত্বের সঙ্গে সালাত (নামাজ) প্রতিষ্ঠা বা 'কায়েম' করার কথা বলা হয়েছে, অনুরূপগুরুত্বে ইমানদার মুসলমানের জন্য জিহাদের নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে। ইসলাম এবং জিহাদ এমনভাবে একাঙ্গ যে কোথাও কোথাও ইসলাম শব্দটির আক্ষরিক অর্থে সংশয় প্রকাশ করা হয়। ইসলামকে শান্তির ধর্ম কেন বলা হবে,

মহরমের আবেগ তাই জাতীয় জীবনে যথার্থ বিকাশ লাভের পথ না পেয়ে অন্যভাবে মুসলমানের অন্তরে বিকৃত হয়েছে। অতীতের জোশ থেকে মস্তি আসে, কিন্তু পুঁথিপাঠে গর্বিত ইসলাম আজকার বস্তু-পরিসীমার যথার্থ ভূমিকা ও তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারে না। সে কারণে মহরমের বিকারকেই আমরা মহরম মনে করি।

সে সম্পর্কে নানান প্রশ্ন দেখা দেয়। মুসলমানদের একখানি বিখ্যাত পুঁথির নাম জঙ্গনামা। জঙ্গ বা জং অর্থ যুদ্ধ। জারির ছড়াদার তাঁর জারির অধ্যায়গুলিকে শহীদনামা বা পিয়াসনামা ইত্যাদি নামে শনাক্ত করেন। 'জিহাদ' আর 'শহীদ' এই দুটি শব্দের মধ্যে দূরত্ব একটি হাইফেনের। ইসলাম সেই নিরিখে জিহাদী ও শহীদী ধর্ম। এই ধর্মকে জিন্দা রেখেছে কারবালা। কথাটি অতএব শুধুমাত্র কবিকল্পনা নয়। কোরানের অভিলাষই কারবালার যুদ্ধে রূপায়িত হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে অগ্নি পরীক্ষার কুণ্ড রচিত হয়েছিল কারবালার প্রান্তরে এজিদের হাতে। মহম্মদী ধর্ম ও কোরেশ বংশের এবং আলীর বংশের অগ্নিপরীক্ষা। সেই রক্তক্ষরিত স্মৃতির নাম মহরম। একথা মহরমের অন্তরের কথা। বাহিরের কথা আলাদা। বাহিরের দিকটা ক্যামেরায় ধরা যায় বলেই তা সহজেই অভিনয়যোগ্য, মুসলমানের ইমান আমান নষ্ট হয়েছে, অভিনীত মহরম আর তাই অন্তরের নির্দেশে চলে না, বাহ্যত তা এখন বিকারগ্রস্ত।

এমন কেন হল? কারবালার স্মৃতিতে মস্তি আছে আর এক ধরনের আরবী খুয়াব মিশে ছিল দীর্ঘকাল। মুসলমান যদি এই দেশকে দার-উল-হর্ব (অনৈস্লামিক রাষ্ট্র) না মনে করত, তাহলে সে একটি রক্তাক্ত স্বাধীনতার যুদ্ধ মারফত তার অতীত কারবালাকে জিইয়ে তুলে জাতীয়তাবাদের অন্য একটা সার্থকরূপ খাড়া করতে সক্ষম হত। বঙ্কিমের দেশবন্দনা আর মাতৃবন্দনার একাকার অনুকার বন্দেমাতরম ধ্বনির সঙ্গে কারবালার জিহাদ কীভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মিলিত হত সে অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের স্বাধীনতাযুদ্ধ দেখতে পায়নি। হিন্দু না ওরা মুসলিম, এই সন্দিগ্ধ ভাবনাই জাতীয় ঐক্যে কারবালার বীরত্বকে অনুপ্রবেশের সুযোগ দেয়নি।

মহরমের আবেগ তাই জাতীয় জীবনে যথার্থ বিকাশ লাভের পথ না পেয়ে অন্যভাবে মুসলমানের অন্তরে বিকৃত হয়েছে। অতীতের জোশ থেকে মস্তি আসে, কিন্তু পুঁথিপাঠে গর্বিত ইসলাম আজকার বস্তু-পরিসীমা (Material conditon)-তার যথার্থ ভূমিকা ও তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারে না। সে কারণে মহরমের বিকারকেই আমরা মহরম মনে করি। হিন্দু মুসলমানের ধর্মগত সুস্থ মিলনে আমাদের জাতীয়তাবাদ গঠিত না হতে পেরে, তা হয়েছে এক পেশে, এখাম থেকেই মহরমকে কেন্দ্র করেও মুসলমানের সংখ্যালঘু সমস্যাকীর্ণ মন পুঁথির পাতায় অতীত বীরদের অসম্ভব শৌর্যের কল্পনায় অলৌকিক ক্ষমতার অবিশ্বাস্য ক্রিয়া কলাপকে দীন কবিত্বে অঙ্কিত করতে চেয়েছে, সেই পুঁথিবন্দী বীর উপাসনার ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে নিজেদের মুগ্ধ আর সন্তুষ্ট করেছে তারা। আজকার অভিনীত মহরমেও সেই আস্ফালনই মুখ্য তাপ, অতীতের ওম, সঙ্গে চণ্ডবিকার, মহরম এক বিভ্রান্ত শোকোৎসব, তার মস্তি বাঙালি জীবনে এক অভিশাপ মাত্র। তারকোনো ইতিবাচকতা নেই। ছিল। নেই। হতে পারত। হয়নি। মহরমের

জোশ এক নিবন্ত চুল্লি। ধর্মীয় কাহিনীর গায়ে নিবন্ত চুল্লির ছাই লেগে আছে, মহরমের সাম্প্রতিক শেষ রঙ ধূসর।

রঙের কথা যখন উঠল তখন মহরমের কাহিনীর প্রধান দুটি রঙ, সেই রঙের কথা বলি, রূপকাল্পনিক রঙ সবুজ ও লাল। 'বিষাদ-সিন্ধু'তে নবীশ্রেষ্ঠ হজরত মুহম্মদের দুটি ভবিষ্যদ্বাণী গৃহীত হয়েছে, মুসলমানদের কাছে সেই দুইটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ মিথ বা কল্পকথা রূপে গণ্য করা দুরূহ, কতখানি তার নবী-কল্পনা আর কতখানি গণ-কল্পনা কে বলবে? যেমন, অন্য একটি উদাহরণ, 'নবীর ইশারা মাত্র চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হল,' এই অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে মুসলমান সন্দেহ করে না, বরং তারা বলে মহাকাশ অভিযাত্রীরা চাঁদের গায়ে আধাআধি ফেটে যাওয়া দাগ দেখেছেন, নবীর ইশারাতেই চাঁদ জোড়া লেগেছিল বটে, কিন্তু দাগ পড়ে গেছে, এই ধরনের অলৌকিকের চর্চা গ্রামে এখনও প্রসিদ্ধ। ইউরোপীয় রেনেশাঁসের আঘাতে এই মন টলেনি, মক্কার হজারে আসুয়াদ পাথরের মত সে মন অনড় অটল। অধিকাংশে মুসলমানেরই 'মিথ'-কে মিথ বলার সাহস নেই, ইতিহাস আর কল্পকথার পার্থক্য তারা করে না। লৌকিকে অলৌকিকে কোন প্রভেদ নেই। হজরত মুহম্মদ ঈশ্বর দর্শনে মহাশূন্যে গমন করেছিলেন, তাঁর এই শূন্যমার্গণ এক ধরনের ভ্রমণ, তাকে বলে 'মিরাজ'। শতকরা ৯৯ ভাগ মুসলমানের ধারণা হজরত নবী সশরীরে এই 'মিরাজ' সম্পন্ন করেন। সেই মিরাজকালীন নবী দুটি রঞ্জিত গৃহ দর্শন করেন। একটি সবুজ রঙের। অন্যটি লাল। ফিরিস্তা জিব্রাইল নবীকে গৃহ দু'টির প্রতীকী তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন। নবী-দৌহিত্র ইমাম হাসানকে এজিদ বিষ খাইয়ে হত্যা করেন, হাসানের দ্বিতীয়া পত্নী জায়েদা সেই বিষ (হীরক চূর্ণ) স্বামীকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলেন। জায়েদা এজিদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে এই কাজ করেন। মৃত্যুকালে হাসানের মুখবর্ণ হয়েছিল সবুজ। সবুজ ঘরখানি তারই প্রতীক। জারিদার ইয়াকুবের ভাষায় সেই রঙ হল, 'নীলাপিলা', অর্থাৎ তা নীল ও পিঙ্গলবর্ণ।

ইমাম হোসেন এজিদের সেনাপতি সিমারের হাতে নিহত হন, খঞ্জর দিয়ে হোসেনকে হত্যা করা হয়, দ্বিতীয় রক্তাক্ত গৃহটি তারই ইঙ্গিত দেয়।

এই প্রসঙ্গে গ্রামীণ অন্য একটি কল্পকথার সন্ধান আছে। বিষাদ-সিন্ধুতে সে কথা নেই। গ্রাম্য জারিদার এই কল্পকাহিনীর ভিতর দিয়ে মহরমে প্রবেশ করেছে। হাসান হোসেনের মাতা, মা বরকত (অন্নপূর্ণা) ছিলেন ভুবনেশ্বরী, তাঁর রূপের কোন তুলনা ছিল না। সেই রূপ তিনি প্রকট হতে দিতেন না। লুকিয়ে রাখতেন। কেন রাখতেন, তার পেছনেও কল্পকাহিনীর যুক্তি বড়ই সুন্দর। কথিত হয়, মা ফতেমার কখনও হায়েজ (মাসিক ঋতুস্রাব) হত না, তাই তিনি চির-পবিত্র, তাঁর শুচিতা অনন্য। এখানে মাতৃরূপকে বড় করে দেখাতে গিয়ে শুচিতা সম্পর্কে এই ধরনের কল্পনা স্বাভাবিক। কিন্তু ফতেমার পুত্রদ্বয় কিশোর অবস্থায় মায়ের সবচেয়ে উদ্ভাসিত সুনগ্ন উন্মোচিত রূপ সহসা দেখে ফেলেন এবং বিমোহিত হয়ে সেই লুক্কায়িত রূপের প্রশংসা করেন, সেকথা হজরত আলী (ফতেমার স্বামী)-র কানে ওঠে, পুত্রদের সেই প্রশংসায় ঈর্ষান্বিত হজরত আলী স্ত্রীকে তলবের সুরে ঠাট্টাচ্ছলে বলেন—তুমি নিজেকে আমার কাছে গোপন রাখো? তোমার সম্পূর্ণ রূপ আমি কখনও দেখিনি। তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়েছ।

—একথা কে বলে গো? তাদের যেন জহরে কহরে মরণ হয়।

জগজ্জননী ফতেমা ক্ষিপ্ত হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন, জানতেন না এমন কথা তাঁরই পুত্ররা বলতে পারেন। মহরমের জারিতে এই জহর কহরের কাহিনী সুছাঁদ, ললিত হয়ে গীত হয়। জহর পানে হাসান এবং কহর অর্থাৎ বিভীষণ সিমারী হত্যায় নিধন হন হোসেন। নবীকল্পনার ভবিষ্যৎ অপেক্ষা মায়ের অভিশাপের ফলশ্রুতি গাঁয়ের মানুষকে বেশি স্পর্শ করে। জারির প্রসিদ্ধ কলি :

> "এ কেমন কাফেরের দেশ গো
> জহর মিলে পানি মিলে না।"

নবীর দ্বিতীয় কল্পনা দাস্ত কারবালা। বিষাদ-সিন্ধুতে লেখক হোসেনের মুখ দিয়ে সেকথা চমৎকার বর্ণনা করেছেন—"মাতামহ

মহরম-এর রক্তক্ষরণের স্মৃতিতে— হায় হাসান, হায় হোসেন

ছবি : দিলীপ ব্যানার্জি

(হজরত মুহম্মদ) বলিয়া গিয়াছেন, যে-স্থানে তোমার অশ্বপদ মৃত্তিকায় দাবিয়া যাইবে, নিশ্চয় জানিও, সেইই তোমার জীবন বিনাশের নির্দিষ্ট স্থান এবং তাহারই নাম দাস্ত কারবালা। মাতামহের বাক্য অলঙ্ঘনীয়। পথ ভুলিয়া আমরা কারবালায় আসিয়াছি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমরা কি কর্ণে কিছু শুনিতে পাইতেছ ? দৈব শব্দ কিছু শুনিতেছ ?

"তখন সকলেই মনোনিবেশ করিয়া শুনিতে লাগিলেন—চতুর্দিকেই 'হায়'! 'হায়' রব।

"হোসেন বলিলেন—মাতামহ ইহাও বলিয়া গিয়াছেন চতুর্দিক হইতে যে স্থানে 'হায়'। 'হায়'!' শব্দ উত্থিত হইবে, নিশ্চয় জানিও সেই কারবালা।"

হোসেন কারবালায় আরো একটি আলামত (লক্ষণ) লক্ষ্য করলেন। শিবির নির্মাণ আর রন্ধন-উপযোগী কাঠ সংগ্রহের জন্য সঙ্গীদের জঙ্গলে পাঠালেন, তাঁরা গাছে কুঠারাঘাত করামাত্র গাছের দেহ থেকে দরদর করে রক্তপাত হতে লাগল।

হোসেন কুঠারের রক্তমাখা দৃশ্য দেখে তৃতীয়বার বললেন—"নিশ্চয়ই এই কারবালা।" তথাপি সেখানেই হোসেন শিবির স্থাপন করলেন। এ-স্থানে রামায়ণ মহাভারতের যে নিয়তিবাদ, তাইই অন্য কাহিনীর আধারে ভারতীয় মনকে আপ্লুত করে। বলবার কথা এই যে মহরমের কাহিনীর নিয়তিতাড়িত দুর্দশার করুণ রস হিন্দু মনকে সিক্ত করেছে। শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা আর নবীর ভূমিকার মধ্যে ভবিষ্যৎ সন্দর্শনের সাযুজ্য তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন। দ্বিতীয়ত নিয়তির কথাই ফের উল্লেখ করতে হয়। মহরমের কাহিনীতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ছায়া, অশ্বের পা পুঁতে যায় কারবালায়, কুরুরণে রথের চাকা মাটিতে ঢুকে পড়ে। হোসেনের মৃত্যুও ভীষ্মের স্বেচ্ছামৃত্যুর শামিল।

সিমার খঞ্জর চালিয়েও কিছুতে হোসেনকে হত্যা করতে পারে না। অস্ত্র পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠে, কিন্তু কাটে না। এখানে ফের জারিদার অদ্ভুত কল্পকথার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কথিত আছে, হোসেনের জন্ম মুহূর্তে নবী ফতেমার গৃহে উপস্থিত ছিলেন। আঁতুড় অবস্থায় সদ্যোজাত শিশুকে নবীর কোলে এনে স্থাপন করা হয়। অথবা অন্য কোন সময়ও হতে পারে। নবী সেই শিশুর সর্বাঙ্গে চুম্বনে সহস্র চিহ্ন অঙ্কিত করেন, শরীরে কোন স্থান বাদ ছিল না। কেবল স্কন্ধের পেছন ভাগে নবী (মাতামহ) চুম্বন দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে হোসেন সিমারকে বলছেন—এভাবে তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না। উপুড় করে ঘাড়ের পেছনে আঘাত কর। স্বেচ্ছামৃত্যু ছাড়া একে আর কী বলা যায়! তাছাড়া স্বয়ং সিমারকেও জারির রচয়িতা মিথে পর্যবসিত করেছেন। সিমার ওরফে আবু-লু-লু-জিলজোশ এজিদের সৈন্য কিংবা সেনাপতিই নয়, এ-হচ্ছে মূর্ত অধর্ম, চিরকালীন ঘাতকের বিগ্রহ, হজরত ওমরকে যে হত্যা করে তারও নাম ছিল আবু-লু-লু-জিলজোশ। যুগে যুগে সে ধর্মকে বিনাশ করতে ইতিহাসে আসে।

গ্রামের জারিদার ও সুন্নী মৌলবীদের মুখ-ফেরতা এই বিবরণ সত্যমিথ্যা ইতিহাস দিয়ে যাচাই করার অবকাশ এ-নিবন্ধে নেই। জনমনে এই ঘটনার মান্যতাই বড় কথা। যাই হোক, মহরমে হিন্দুমনকে অনুপ্রবেশের জন্য লোকায়ত জীবন দুর্যোধন আর এজিদকে মিলিয়ে রেখেছে। তাছাড়া দু'টি উপাখ্যানই জ্ঞাতিদ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি। বিষাদ-সিন্ধু বা মহরমে রামায়ণের কিঞ্চিৎ কাহিনী সাযুজ্যও লক্ষ করা যায়। দশরথের তিন স্ত্রী। ইমাম হাসানেরও তিন স্ত্রী। দ্বিতীয়া স্ত্রী কৈকেয়ী যেমন কূট বুদ্ধি দ্বারা চালিত এবং দাসীর কথায় কান দিয়ে সংসার ছারখার করেন, মহরমের ঘটনাতেও দ্বিতীয়া স্ত্রী জায়েদা দাসীবশ্য বা ইতর নারী সলাহ্ দ্বারা আক্রান্ত হন এবং স্বামীকে বিষপানে হত্যা করেন। মহরমে খানিক বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। রামায়ণে কৈকেয়ীর অসন্তোষই রামচন্দ্রকে বনবাসী করেছে, রামায়ণের কাহিনীকে প্রসারিত ও সঞ্চালিত করেছে। রামের সমূহ দুর্গতির প্রাথমিক কারণ তিনিই।

তাছাড়া মূল দ্বন্দ্বের শুরুতে মহরম নারী-আসক্তিকে (জয়নবের ঘটনা) কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। অন্তত গ্রামের মানুষ সেই চোখেই মহরমের উপাখ্যানকে বিচার করে থাকে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস তাদের কাছে ততটা গ্রাহ্য হয়নি, গ্রামের ছড়াদার এজিদকে কখনও রাজনীতির কুশলী ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করতে চান না, বরং তাকে নারী-আসক্ত একজন অতিসাধারণ মানুষ হিসেবে দেখেন। এজিদকে বারংবার কামিনা বলে গালি দিয়ে অসম্মান করেন। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে যে, কারবালার সমূহ হত্যাকাণ্ডের নায়ক এজিদ কিনা। সুমাইয়ার পুত্র ইবনে জিয়াদই খুব সম্ভব সেই নৃশংস হত্যাকারী। বরং ইমাম হোসেনের মৃত্যুতে মহামান্য এজিদ তামাম জিন্দেগী অশ্রুপাত করে কাটিয়েছেন। তাঁর শোকাহত অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিদের নামের তালিকাও দীর্ঘ। তন্মধ্যে এজিদের ভৃত্য কাসিমবিন আব্দুর রহমানের সাক্ষ্য নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস যাই হোক, জারির কাহিনীকারের এই পারিবারিক ইতিবৃত্ত থেকে উৎপন্ন রস হিন্দু সাধারণ জনকেও একভাবে মহরমে আকর্ষণ করেছে বিগত কালে। তাছাড়া পুরাণকথার সৃত রসও কম উপাদেয় নয়। হিন্দু অন্নপূর্ণা আর মুসলিম মা-বরকত একাকার। হজরত ফতেমা আর কুলশম দুই ভগিনী। কুলশম ধনী। ফতেমা দরিদ্র। দরিদ্র বলে কুলশম বোনকে উপেক্ষা করতেন। কোন প্রকার খানাপিনায় বোনকে ডাকতেন না। একবার সেইরকমই হয়েছিল। ফতেমা মনে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি অভিমানবশত একবার মনস্থ করলেন সমাজের দশজনকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবেন। কুলশমকেও জিয়াফত (নিমন্ত্রণ) করলেন। দারিদ্র্যের দুর্দশা উপভোগ করার জন্য কৌতূহলী কুলশম ভগিনীর বাড়ি এসে দেখলেন খাবারের আয়োজন অতি সামান্য। এক হাঁড়ি ভাত রেঁধেছেন ফতেমা, যা একখানা রুমালে ঢেলে নিয়ে পরিবেশন করছেন, কিন্তু অত

লোককে পরিবেশন করার পরও রুমাল খালি হচ্ছে না। অন্নপূর্ণার ঘটনাও কতক সেইরকম।

হাসানপুরের কাঠমিস্ত্রি ভিখুর মা যশোদা দাসী ফতেমার এই গল্প করতেন। তাঁর গলায় ছিল কাঠের সরুচিকণ কণ্ঠি। ভিখু আমার ছেলেবেলায় আমাকে কাঁধে করে লাল নগরের কারবালায় মহরম দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভিখুর বাড়ির উঠোনে যেমন গুণাইযাত্রার আসর বসত, মহরমের সময় ভিখু সাইড ড্রাম বাজাতেন, জ্যোৎস্না রাতে মহরমের একমাস আগে থেকে মহড়া চলত। আমি দেখেছি, মণ্ডলা বক্সের সঙ্গে, যে-লোক পরে বাউল দীক্ষা নেয়, ভিখু সমান তালে লাঠি খেলছেন। বানাপাটা ঘোরাচ্ছেন পইপই। বিলুপ্ত স্মৃতির গায়ে ধূসর রঙ এসে লাগছে। ছেলেবেলায় সখ করে কবিতা লিখেছিলাম :

> নিমপাতা ঝিরিঝিরি
> কদমের ডালে কত ফুল।
> সেখানে মহড়া দেবে
> মহরমের সখীন মানুষ।

সেই সখীন মানুষ আজ নেই। ভিখুর সখীন বউ তাঁদের উঠোনে শায়িত লাঠিখেলার সাজ সরঞ্জাম ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতেন। বাদ্যযন্ত্র ছুঁতেন। বানা, পাটা, ভোঁতা তলোয়ার, ভোঁতা ছোরা, সড়কি, গাদকা। ডংকা, ঝাঁঝি, সাইডড্রাম। চাঁদ তারা আঁকা আসমানী নিশান। তাতে কখনও বানা বা পাটার ছবি থাকত। প্রতীক নিয়ে চৌধুরি হাসানপুর আর নতুন হাসানপুর বা গিরিনগরের সঙ্গে বচসা আর মারামারিও বেঁধে যেত। শক্তিশালী দল ছাড়া চাঁদতারার প্রতীক পেত না, তলে তলে থানার সঙ্গে মুখিয়া কথা বলে প্রতীক ঠিক করতেন। তা নিয়ে বিস্তর ঝামেলার কথা মনে পড়ে। দু'দলের মুখিয়ায় তুমুল তক্ক হতে শুনেছি।

তখনকার গাঁয়ে গাঁয়ে মহরমী আখড়াগুলি ছিল সুদক্ষ লেঠেলে মজবুত। প্রত্যেক আখড়ার একজন করে মুখিয়া থাকত। মুখিয়ার হাতে থাকত চমরী-ঝাণ্ডা। কাসিদের হাতে ময়ূর ঝাণ্ডাও দেখেছি। ময়ূর ঝাণ্ডার অভাবী বিকল্প হল রুমাল। কাসিদ আসলে কে সেকথা বলার আগে, তার কিঞ্চিৎ বর্ণনা দেওয়া যাক। কাসিদের পরনে লুঙ্গি বা পাজামা। কোমর বেষ্টন করে চামড়ার বেল্টে গাঁথা থাকে পেতলের ঘুঙুর ঘন্টি। কাসিদরা গলায় তিনকোণা পরোটা সাইজ রুমাল ভাঁজ করে তৈরি করে নেয় এবং ঘাড়ের পেছনে ঝুলিয়ে নেয় শিরদাঁড়া বরাবর। পরোটার লেজ ঝুলতে থাকে। খালি পা। মুখিয়া ওদের চালিত করেন। আখড়ার মুখিয়া চমরী ঝাণ্ডা দোলাতে দোলাতে চলেন। বিখ্যাত ধার্মিক লোকেদের কবরে, জিন্দাপীরের কবরে, ঘোড়া পীরের আস্তানার সমাধিতে কাসিদের দল বাংলা মর্সিয়ার পঙক্তি সুর করে আউড়াতে আউড়াতে মুখিয়ার নির্দেশে দরগা জিয়ারৎ (কবর-দর্শন) করে। সেই অবস্থায় কাসিদের গা থরথর করে কাঁপে আর ঘুঙুর ঘন্টি ঝংকৃত হয়, মাঝে মাঝে হজরত আলীর হায়দরী হাঁকের অনুকরণে 'হেই!' 'হেই!' করে গমক দিয়ে অদ্ভুত কণ্ঠ ঝাঁকুনি মারে, ঝাণ্ডা

ছোঁয়ানোর জন্য মর্সিয়ার কলির ফাঁকে ফাঁকে হাঁক সমন্বিত দেহী কম্পন কবরে ছুঁয়ে সঞ্চারিত করতে চায় যেন। পীর বুঝি জেগে উঠবেন, কারবালার উত্তাপ ছড়িয়ে চলে কাসিদের দল। কাসিদ কে? কাসিদ কেন যায়? কোথায় যায়?

পানিপিয়া নজরানা গ্রাম থেকে কাসিদ চলেছে লালবাগের কারবালা। কিন্তু জারির ইতিহাসে কাসিদ গিয়েছিল দামেস্ক থেকে মদিনা। তার নাম ছিল মোসলেম। জয়নবের কাছে গিয়েছিল তাকে বিধবা বানাতে। জয়নবের স্বামীর নাম ছিল আব্দুল জব্বার। এজিদ কাসিদ পাঠিয়েছিলেন। জব্বারকে দামেস্কে কাসিদ মারফত ডেকে এনে সাজানো বোন সালেহার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব আর অর্থের লোভ দেখিয়ে স্ত্রী জয়নবকে তালাক দিতে লুব্ধ করেছিলেন। জয়নবকে জব্বার তালাক করলেন। স্বামীস্ত্রীর বিচ্ছেদের পর এজিদ বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন জয়নবের কাছে। কাসিদ আবার চলল। পায়ে হেঁটে মরুপথ অতিক্রম করছে এমন সময় রূপবান আক্কাশ কাসিদের উদ্দেশ্য জানতে পেরে অসামান্যা রূপসী জয়নবকে শাদী করার জন্য নিজেকেও একজন প্রার্থী রূপে ঘোষণা করলেন। কাসিদ সেই প্রস্তাবও জয়নবের কাছে বহে নিয়ে চলল। পথে ফের ইমাম হাসানের সঙ্গে দেখা। তিনিও জয়নবকে বিয়ে করতে চান।

বলা বাহুল্য হাসানই জয়নবকে জিতে নিলেন বংশ গৌরবে আর মহম্মদী ধার্মিকতার গুণে। এজিদ হেরে গেলেন। নারীর প্রতি মোহর রূপময় কেচ্ছার আসক্তি আর প্রেমকে যে বহন করেছে সে-ই কাসিদ। অনুরূপ কোন এক কাসিদই মর্মন্তুদ কারবালার মৃত্যু বিবরণ পালোয়ান আবু হানিফার কাছে বহে নিয়ে গেছে। কাসিদকে 'সে' না বলে 'তিনি' বলা উচিত। মীর সাহেব লিখেছেন—"কাসেদ (বা কাসিদ) যদিও বার্তাবহ, কিন্তু বঙ্গদেশীয় ডাক হরকরা যেরূপ পত্রবাহক সেরূপ মনে করিবেন না। রাজ-পত্রবাহক, অথচ সভ্য ও বিচক্ষণ—মহামতি মুসলমান লেখকগণ ইহাকেই 'কাসেদ' বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কাসেদের পরিচ্ছদ সভ্যতাবর্জ্জিত নহে। সুধীর, সুগম্ভীর, সত্যবাদী, মিষ্টভাষী, সুশ্রী না হইলে কেহ কাসেদ পদে বরিত হইতে পারে না। বিশেষভাবে মনোনীত করিয়াই আব্দুল জব্বারের নিকট কাসেদ প্রেরিত হইয়াছিল।"

অতএব পানিপিয়া নজরানা থেকে কাসিদ চলেছে লালবাগ। পরনে ধূলামলিন লুঙ্গি, কাঁধে পট্টি লাগানো ফুলহাতা নীল সস্তা পিরহান, দাঁতে পানের পিক-দাগ, মস্তিষ্কের কোষে কোষে হতবুদ্ধি তাড়িত আচ্ছন্নতা। পেছনে ডঙ্কার গুরুগুরু ধ্বনির সঙ্গে ধেয়ে আসছে আখড়ার খেলোয়াড়, কাসিদের দু'দণ্ড বিশ্রামের সময় নেই। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে কাসিদ। রানারের ঝুনঝুন ঘণ্টা বেজে চলেছে। দারিদ্র্যপীড়িত শুকনো মুখ। পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখে আখড়া পেছনে পড়ে রইল। কিন্তু কী সংবাদ সে বহে নিয়ে চলেছে? বাগড়ীর শুধু চালডাল তেলনুনের ঢালা-খিচুড়ি খাওয়া দরিদ্র কাসিদ কোথায় যায়? কেন যায়?

কাসিদ যাচ্ছে কাক-ভোরে। ভিখুর বউ ঝাঁট

মহরম শিয়াদের কাছে পূজা ছাড়া কিছু নয়—কবর-পূজা

ছবি : তারাপদ ব্যানার্জি

দিয়ে জল ছিটিয়ে চলার পথ সাফ আর টলটলে করে রেখেছে। তার ছেলের একখানা পা তয়ানক সরু, লিকলিকে, সেই ব্যারাম যে সারে না কিছুতে। কারবালায় বউয়ের মানত আছে। সব মুসলমান বউরা যখন ঝাঁট দিচ্ছে, ভিখুর বউ কেন দেবে না? সব ভগবানই এক। সব ডঙ্কা সমান বাজে। সব ঝাঁঝির এক গলা। কাসিদ এই পথে যাবে, তাদের পায়ে ভিখুর বউয়ের হাতে ছেটানো জলের সোঁদাগন্ধ আর মৃত্তিকার রেণু লেগে থাকবে। ফতেমার হাতে স্বর্গের চাবি। তেনার আশীর্বাদে খোকার পা সেরে যাবে বৈকি! পানিপিয়ার দশরথ নামে এক বৃদ্ধ চেঁপো কাসিদের হাতে পাঁচসিকে পয়সা গুঁজে দিয়ে বউ বলে—বটপাতায় মোড়া চিনির ঘোড়া বাপজী! কিনে নিও। ফতেহাসিনী, সেই মানসিক ফতেমার দোলনার কাছে রেখে এসো। বলো, নিশিবউ পাঠিয়েচে!

বৃদ্ধ কাসিদ দশরথ সেখ সেই কৈশোর থেকে হরসন লালবাগ যাচ্ছে, মৃত্যু অবধি যেতে হবে। বাপ মা তাকে কাসিদ মেনে গেছে। বন্ধ্যা মায়ের মানসিক ছিল, ছেলে হলে তাকে কাসিদ করবেন, তাই মৃত্যু পর্যন্ত তাকে ইমামবাড়ার ভিতরে, যেখানে নকল দোলনা ঝুলছে, সারিসারি ইমাম বংশের শিশুদের যারা মৃত কারবালার যুদ্ধে, সেই কারবালায় ইমামবাড়ার ভিতরে মহরমের তামাম রাত বিড়ি টেনে টেনে জারির প্রচণ্ড আর্তনাদের মাঝে ঢুলতে আর বেদম কাশতে হয়। নিশিবউ কোথায় জানি না! দশরথের মতনই একজন বৃদ্ধকে গত বছরও লালবাগের কারবালায় ঐধারা ঢুলতে আর কাশতে দেখেছি।

শিয়াদের মহরমে, নবাবী মহরমে, সুন্নী দশরথ আর নিশিদাসী সুনয়না রঙিন বউ কীভাবে ঢুকে পড়ে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। জীবনে ও প্রীতিতে প্রবেশ করার অদ্ভুত সংস্কারাচ্ছন্ন জীব অস্তিত্বে গূঢ় অথচ কোন সিধে পথ নিশ্চয়ই ছিল। হিন্দু-মুসলমান শিয়া-সুন্নীর মিলিত একটা জীবন-কাঠামো দেখতে পাওয়া যায়, দরিদ্র শিয়া, দরিদ্র হিন্দু কি সুন্নী ভগবানকে জৈব বিপন্নতার ভিতর প্রায় একই মুদ্রায় ধ্যান করতে পারে, শরণ নিতে মন বাধক মানে না। কারণ জগজ্জননী ফতেমার দারিদ্র্য, ইমাম হাসান হোসেনের দারিদ্র্য তৃণমূলস্থিত (Grass-root-level) জীবনকে কারবালার বৃহৎ দুঃখের তরঙ্গে সমশীর্ষে স্থাপন করে, হৃদয়াবেগের সমতা পয়ারে মাত্রাবদ্ধ হয় জারির মাতমে। ধর্ম ছাড়াও জীবনের একটা অন্য ধর্ম আছে। তারই বিসর্জন-আবহ আজ কেবলই স্মৃতিতে ধ্বনিত হয়। এইবেলা স্বীকার করাও ভাল মহরম এক ধরনের মুসলিম পূজা ছাড়া কিছু নয়, কবর-পূজা। সুন্নীরা মহরমের ব্যাপারে কাসিদবেশী দাস্য স্বভাবে হীনমন্য, শিয়ার কবর-পূজার প্রখর সমালোচক। শিয়ারা হজরত আলীর বংশোদ্ভূত, কারবালায় হোসেনের একমাত্র জীবিত কনিষ্ঠ সন্তান জয়নল আবেদীনের বংশধর। কিন্তু সুন্নীরা গোপনে সেখানেও সন্দিহান, মুখে প্রকাশ না করলেও সংশয়িত, শিয়ারা সত্যিই কারা? এজিদ না জয়নলের শিলশিলার প্রবাহ? সন্দেহেই মানুষ বিভক্ত হয়। শিয়া সুন্নী আর হিন্দু। মহরম এক মুঠোয় এই তিনকে ধরতে চেয়েছিল। লালবাগে মাতমের দিন এখনও কিছু নিচু বর্ণের হিন্দুরা অংশ গ্রহণ করে, আগুনের খেলায় রতন মেথরের মত মানুষও পা পুড়িয়ে খেলা দেখায়। এসবই আজ যেন দৈব-লভ্য বাঙালির সঞ্চয়। নবাবরা মহরমে মহরমে এই প্রীতিকে স্মরণ করতেন, যাপন করতেন। এই জেলায় তাঁদের সম্প্রীতির পরিচয় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। বিশেষত ওয়াসেফ আলি মীর্জার প্রচেষ্টা সর্বাপেক্ষা প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু আজ সকলই কেমন আলগা হয়ে যাচ্ছে। একের মধ্যে তিনের সেই ধর্মসূত্র জট পাকিয়ে গিয়েছে। মহরমের কাহিনী আর পয়ারের জোরও কমে আসছে। অন্তর-বাহির সবই ধসে পড়ছে।

মজুমদারদের বালাখানার সামনে নশীপুরের দল এ-বছর ডঙ্কা পিটে লাঠিখেলা দেখায়নি। ক্ষীর খিচুড়ির আনাজ দেয়নি চককালীতলার মণ্ডপের বাবুরা। অথচ গত জীবনের স্মৃতি চর্চায় এবছর তাঁদেরও খেদ দীর্ঘশ্বাসের মত বেজেছে, আহা! এমন তো ছিল না! তাহলে কেমন ছিল? (ছেলেরা কেমন করে গাইবে, হায় হোসেন কারবালা খিচুড়ি খেয়ে পেট ঝোলা?)

সেইসব রাঙা রঙিন বাবুরা কোথায় চলে গিয়েছে? কাসিদের কোমর ভেঙেছে পাটের নিম্নগামী দর, অভাব তার জিভে খর বালির মত শুষ্ক হয়ে পুড়ছে। এখন এক অন্য পিয়াসনামার সারিগান গ্রামে গ্রামে অলিখিত থাকে, তার কোন ভাষা নেই। জমিদার চলে গিয়েছে। কিন্তু জমি দখলের লড়াই তো শেষ হয়নি। এককালে জমিদার শ্রেণী মহরমবাদী জেহাদী সুন্নী লেঠেলদের জমিদারী স্বার্থরক্ষার পাহারাদার হিসেবে নিয়োগ করতেন, বর্তমানে দুষ্ট রাজনৈতিক দলগুলি বর্গা পাট্টার লড়াইতে তাঁদের ব্যবহার করে চলেছেন। বুলবুলির লড়াই দেখা জমিদার আর নেই, লাঠিখেলা কে দেখবে? গত দু'বছর আগেও বর্গাদারীর হেফাজতে লেঠেল জখম হয়েছে এই জিলায়। পানিপিয়ার কাসিদ এখন ঝাপসা জলরঙের অস্পষ্ট ভূত।

ঘটনা আরো কিঞ্চিৎ বিশদ করা যাক। নবাবী মহরম আর সুন্নীর মহরম কিয়দংশে সম্পূর্ণ পৃথক। মুর্শিদাবাদ জিলায় একমাত্র লালবাগে যাঁরা এই শোকোৎসব দেখেছেন, তাঁদের পক্ষেই এই পার্থক্য অনুভব করা সহজ। সুন্নীরা মূলত

কাসিদবেশী আর বহিরাগত, রবাহূত বললে সুন্নীর রাগ করার কিছু নেই। শিয়ারা কখনও 'কাসিদ' ছাড়ে না বা পাঠায় না। শিয়ারা নিজেদের আলিমওলা হোসেন-অলার জাত বলে জানে, লোকস্তরে তাদের সংখ্যালঘুত্বের অদ্ভুত যুক্তি আছে। তারা মহরমের মূল কর্ণধার, ধ্বজাধারী। তাদের ধ্বজা সুন্নীর চাঁদতারার মত নিরক্ত নিশান নয়। (আগে অবশ্য আস্তাবলের মাঠে মহরমে রূপোর তাজ জ্বল জ্বল করত, নবাবী জৌলুস)। মহরমের দিন দু'ধরনের নিশান দেখা যাবে, রক্তের ছিটে লাগা শিয়ার সংখ্যালঘু নিশান আর লালবাগে বহিরাগত গ্রামীণ সুন্নীর রাঙা নিশান, শোণিতহীন। সুন্নীরা তাই সধীন মহরমবাদী। শিয়া রমণী-পুরুষ মহরম মাসে কালো পোশাক পরে, কুমারী ও বিবাহিত রমণীরা অলংকার খুলে রাখে, শোকের চিহ্ন। এক্ষেত্রে হিন্দু সংস্কারের কিছু যোগ আছে। সুন্নীরা কালো পোশাক পরে না। মহরম মাসে শিয়ারা বিয়ে-শাদী করে না, একেবারেই নিষিদ্ধ। মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। চাহরমের (মহরমের চতুর্থ দিন) দিন কিন্তু মাংস খায়। মাংস যেন আরবীখানা, মাছ বাঙালীর শুধুই। কী বিচিত্র সংস্কার! সুন্নীদের সেইসব বালাই দেখি না। সুন্নী কখনও গৃহে কারবালা স্থাপন বা তৈরি করে না। শিয়ারা করে। পুজোর ঘরের মত করে কারবালা সাজায়। তাই বলছিলাম, এখান থেকেও শিয়া সুন্নীতে বিভেদ ঘটেছে।

ইসলামে পূজা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মহরম শিয়ার অবধায়কতায় পূজার শামিল। আলম, পাঞ্জা, মোটা মোমবাতি, ঘোড়া, নানান অস্ত্রশস্ত্র যা কাগজ বা সোলায় তৈরি সামগ্রী ঘরে সাজানো, দিব্যি পূজাগৃহের মত তার শোভা। গৃহকর্ত্রী সেই গৃহে বসে থাকেন আর সুন্নীর মানত গ্রহণ করেন। হিন্দুরাও মানসিক করেন পূর্বেই বলেছি। তাছাড়া শিয়া পরিবারের আরো কিছু বাড়তি খরচ আছে। তাঁরা কাসিদের জন্য খানাপিনার ব্যবস্থা রাখেন, আপ্যায়ন করেন, ক্ষীর খিচুড়ির প্রসাদ দিয়ে স্বস্তি দান করেন। লালবাগের নৈনিহাল মীর্জার মা আমাকে বলেছিলেন—এই যে ব্যবস্থা করেছি, এরই নাম গুজলার করা। আসগারিয়া (হোসেনের শিশুপুত্র কারবালার যুদ্ধের সময় যার জন্ম এবং শত্রু হস্তে যার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়, তার মৃত্যুদিনের শোকানুষ্ঠান) অব্দি এইরকম চলবে। কাসিদের সম্মান করতে হবে তো! আমরা তো 'কাসেদ' নই, আমরা ক্ষত্রিয়। আমরা যুদ্ধ করেছি, রক্ত দিয়েছি, কারবালায় দিয়েছি, পলাশীতে দিয়েছি। দুই যুদ্ধের একই হুতাশন!

নৈনিহাল বলেছিল—আপনি নজরুলের 'কাণ্ডারী হুশিয়ার', কবিতাটা স্কুলে পড়েছেন কি?

শুধিয়েছিলাম —তুমি পড়েছ নাকি?

নৈনিহাল বলল—হ্যাঁ। আমি তো বাংলা স্কুলে পড়েছি। তা, ওই কবিতার, 'বাঙালির খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর' কথাটা মনে পড়ছে আপনার? ওই যে খঞ্জর ওটা সিমারী খঞ্জর, এজিদের খঞ্জর। ক্লাইভ আর এজিদ একই লোক। সেইজন্যেই আমাদের কাছে কারবালা

আর পলাশী আলাদা যুদ্ধ ছিল না। সুন্নীরা ওই কবিতাটার মানে বোঝেনি, হিন্দুরাও বোঝেনি, 'খঞ্জর' কথাটা নজরুল খামাকা লেখেননি, সেই অস্ত্র সিমারের হাতে ছিল। আর অস্ত্রখানাও যুত ছিল না, ভোঁতা ছিল সেই কারণে মহরমে লেঠেলদের খেলোয়াড়দের হাতে দেখবেন ভোঁতা অস্ত্র। তা, সেকথা বাংলা স্যারকে বলতে তিনি তো হেসেই আকুল। কী বুঝবেন তিনি? তিনি তো হিন্দু টিচার। মহরমটা অভিনয়,কিন্তু শুধুই কি অভিনয়?

নৈনিহালের কথায় আমি কিন্তু হাসিনি। ওর মাকে শুধিয়েছিলাম—আপনারা সংখ্যায় এত কম কেন?

উনি বললেন—ক্ষত্রিয়রা সংখ্যায় চিরকালই কম। তাছাড়া কারবালায় সব মরে গেল কিনা! এক জয়নল আবেদিনই রইল। তার বংশ আর কত হবে? মহম্মদী বেগ আর দানশা ফকির আসলে সব হচ্ছে সিমার। নবাবকে সিমারই হত্যা করল।

সেই একই 'মিথ' ঘুরে ফিরে আসছে। আর সংখ্যালঘু শিয়ার সংখ্যালঘুত্বের শিয়াসুন্নীর দু'ধরনের ব্যাখ্যাও বিভেদের সুক্ষ্মরেখা মহরমের স্মৃতিতে মিহিন ফাটল ধরিয়ে রেখেছে। নৈনিহালের মা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেছিলেন অদ্ভুত। বললেন—তফাত কোথায় জানলে, তফাৎ ওই কলমায়। সুন্নীর কলমা আর শিয়ার কলমা আলাদা। নিয়ৎ আলাদা। সেইখানেই যে তফাৎ ঘটে গেল। সুন্নীরা বলে, আমরা আলি মওলা (হজরত আলী, চতুর্থ খলিফা)কে নবীর সম্মান দিই। তা দিই বৈকি! কেন দিই সে-কথা ওই কলমা বল, নিয়ৎ বল, সেখানে লেখা আছে। আর এই যে 'সিদ্দাগা' দেখছ, (সিজদাগাহ=সিজদা করার মৃত্তিকা নির্মিত বা কাঠের তৈরি বস্তু, যার উপর মাথা ঠেকিয়ে শিয়ারা নামাজ পড়ে, সেই মাটি কাবা বা কারবালা থেকে সংগৃহীত হয়), এই জিনিসটাকেও সুন্নীরা সহ্য করে না।

নৈনিহালের মায়ের কলমা বা কালাম উদ্ধৃত করা যাক।

আছহাদো আন লাইলাহা ইলাল্লাহ্ ওয়াদাহু লা-শরিক-আল্লা ওয়া আছহাদো আন্না মহাম্মদান আবদাহু রছুলহু আলিউন ওয়ালিউল্লাহ ওয়াছিয়ে (অছিয়ে) রছুলুল্লাহ ওয়া খলিফাতাহু বিলা ফজল্।

কলমার শেষে যেখানে 'আলিউন ওয়ালিউল্লাহ ওয়াছিয়ে রছুলুল্লাহ ওয়া খলিফাতাহু বিলা ফজল্' উল্লেখ ও যুক্ত করা হয়েছে, এই সংযোজনের ফলেই শিয়ার সঙ্গে সুন্নীর বিভেদ তৈরি হয়েছে। এই অংশটুকু সুন্নীর কলমায় নেই। বাংলায় কালাম্‌টির সংযোজনহীন অংশের তাৎপর্য খুব সহজ। ঈশ্বরের কোন শরিক বা অংশীদার নেই। তিনিই একমাত্র উপাস্য। খোদার একমাত্র প্রেরিত রছুল হজরত মহম্মদ (দঃ)। এই অব্দি শিয়া-সুন্নীর ঐক্য। কিন্তু তারপরেই হজরত নবীর অভিপ্রায় ঘোষিত হচ্ছে। আলিউন ওয়ালিউল্লাহ, হচ্ছেন হজরত আলি, যিনি রছুলের অছি মোতাবেক অনুগৃহীত প্রতিনিধি ও খলিফার (একমাত্র?) দাবীদার।

মহরমের শোকোৎসব আজ রোশনীর ভিয়ানে চেপে, লাঠিখেলার উৎসাহে জারিত হয়ে আনন্দধারায় পরিণত হয়েছে

শেষাংশটুকু কলমা থেকে বর্জন করা মানে শিয়ার অস্তিত্বই দুনিয়া থেকে মুছে ফেলা। শুধু তাইই নয়, শিয়ারা মনে করেন খলিফা হওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তিই ছিলেন হজরত আলি। প্রথম খলিফা তিনিই হবেন, এই প্রত্যাশা ইতিহাসে পূরণ হয়নি। সেই ক্ষোভ ও অবিচার প্রত্যেক শিয়ার মনে গাঁথা আছে। এই সম্পর্কে অনেক লোক-গল্প লালবাগে এলে শুনতে পাওয়া যায়। সেই কাহিনীর লোভ এখানে সংবরণ করতে হচ্ছে। অতএব সিদ্দাগার কথা বলি। কথা হল, সুন্নী মনে করছে, শিয়ারা নামাজের মধ্যেও পৌত্তলিক। সিদ্দাগা আসলে কাবার টোটেম, যা ভিন্ন রূপে ইসলামের পূর্ববর্তী যুগে পৌত্তলিকরা ব্যবহার করত। শিয়ারা সেই পৌত্তলিকতার স্মৃতি বহন করছে। যখন নবীর যুগে নামাজ চালু হয়, পৌত্তলিকরা নামাজে দাঁড়িয়ে বগলের ভিতর টোটেম, শোনা যায়, সোনার বিগ্রহ, লুকিয়ে রাখত। লোকচলিত গল্প আছে, নবীর নির্দেশে নামাজে দাঁড়িয়ে কান অব্দি দু'হাত তোলার, কানের লতি অব্দি আঙুলে ছোঁয়ার নির্দেশ, যাকে 'ওলা' দেওয়া বলে, এই বিশেষ নামাজী মুদ্রা, বগলে লুকনো টোটেমের গোপনীয়তা ফাঁস করতে বিশেষ কৌশলমাত্র। কারণ হাত তুললেই সেইসব ক্ষুদ্র পাথর বা ধাতব বিগ্রহ বগল থেকে খসে পড়ত। কিন্তু কাবা বা কারবালার সুবাদে শিয়ারা সেই টোটেম (সিদ্দাগা) ধরে আছে। মঞ্জিল মাটি অর্থাৎ মহরমের শেষদিন শেষ অবধি সোলা কাগজের তাবৎ কারুকাজ, আলম, পাঞ্জা, ঘোড়া ইত্যাদি, দোলনা বা অন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি সবই তো কবরে পুঁতে ফেলা হয়। সুন্নীদের কাছে এইসব কবর-পূজার কোন তাৎপর্য নেই, আছে গোপন ঘৃণা। সিদ্দাগার প্রতীকী উপাসনা ঘৃণ্য বস্তু। এ-যেমন আছে, অন্য দিকটাও আছে। সেটাও বলা আবশ্যক। নইলে সাম্প্রদায়িক নানান সংস্কারের ভিতর মানুষের প্রীতিভাবনার মনটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

> *"মাতামহ বলিয়া গিয়াছেন, যে স্থানে তোমার অশ্বপদ মৃত্তিকায় দাবিয়া যাইবে নিশ্চয় জানিও, সেইই তোমার জীবন বিনাশের নির্দিষ্ট স্থান এবং তাহারই নাম দাস্ত কারবালা। মাতামহের বাক্য অলঙ্ঘনীয়। পথ ভুলিয়া আমরা কারবালায় আসিয়াছি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই" —বিষাদ সিন্ধু*

খলিফাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ জটিলতা, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের ফলে, প্রথম খলিফা হিসেবে হজরত আলীর স্বীকৃতির অন্যথার ফলে এবং উক্ত দাবীর অসম্মান ও অমর্যাদার পরিণামেই শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব, কলমার পার্থক্য প্রসঙ্গে এ-কথার ইঙ্গিত করেছি। কিন্তু যা বলা হয়নি, তা হল, এই দ্বন্দ্বেরই ফলশ্রুতি এবং তার প্রতিক্রিয়া থেকেই সুফি মতবাদের জন্ম। মূলত শিয়াদের অভ্যন্তরীণ বিবাদ, সুন্নীর গোঁড়ামী, খারেজি আর অন্যান্য ফেরকা (দল)-র ভিতরের আসল আর ইমান ও শিরক্ (অংশীবাদ) আর কুফরীর সংজ্ঞা নিরূপণ সংক্রান্ত বিসংবাদ উদ্ভূত সুফিদর্শন মুর্জিয়া সম্প্রদায়ের দার্শনিকতায় পুষ্টি ও স্ফূর্তি লাভ করে। সুফিদর্শনের ভিত্তি মুর্জিয়া সম্প্রদায়ের মৌলচিন্তার অন্তর্গত। মুর্জিয়া সম্প্রদায় খলিফাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ রেষারেষি সম্ভূত।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এইরকম। আসল হচ্ছে মৌখিক বিশ্বাস এবং আচরণীয় বিষয়। ইমান আন্তরিক বিশ্বাস। মুর্জিয়ারা ইমানের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আসল অর্থাৎ ইসলামের ধর্মীয় আচরণবাদকে তেমন আমলই দেয়নি। শুধু তাইই নয়, শিরক সংক্রান্ত ধারণায় তারা অত্যন্ত

ছবি : রাজীব বসু

সহনশীল। ইহুদি, খ্রীষ্টান ও মূর্তিপূজার মতবাদকে এক লজ্জে মিলিয়ে নিয়ে গ্রাহ্য করতে চেয়েছে, কে কাফের আর কে নয়, এই সংজ্ঞায়নে তারা মোটেই উৎসাহী ছিল না। সাধারণ মানুষ ধর্মের কড়াকড়ি পছন্দ করে না, তাই তারা মাটির তলায় লুকিয়ে থাকা এই মুর্জিয়া মনকে ভালবাসে, হলই বা সে সুন্নী। তা নইলে বাগড়ীয় দরিদ্র জীবনবাদী অশিক্ষিত মুসলমান, শিয়ার মহরমে এত সচ্ছল স্বচ্ছন্দ হতে পারত না।

এই প্রসঙ্গে আরো এক কথা বলতেই হয়। কোরানের একটি আয়াতে মুছাল্লা অর্থাৎ সিজদাযোগ্য ঠাঁই অর্থাৎ সিজদাগাহ্‌র উল্লেখ পাওয়া যায়। আয়াতটি হল :

"ওত্তাখিযু মিম্-মাকামি ইব্রাহীমা মুছাল্লা।"

কথাটা ভাঙ্গলে দাঁড়াচ্ছে যে, 'মকামে ইব্রাহীমকে সিজদাগাহ্ রূপে গ্রহণ করো।' মকামে ইব্রাহীম হল, হজরত ইব্রাহীম পয়গম্বরের বাসস্থান বা কবরস্থান। যেখানে তিনি মৃত্যুর পরও অস্তিত্বমুখর ও চিহ্নিত, সেটাই তাঁর মকাম। মূর্তির বদলে মকাম। অতএব কাবায় সিজদা বলতে ইব্রাহীমের স্মৃতি ফলককেই বোঝাচ্ছে নাকি, মূর্তির বিকল্প। তা যদি হয়, তাহলে ঠিক এই সিজদা (নামাজী প্রণাম) করার নির্দেশ থেকেই শিয়াদের মধ্যে কবর-পূজার উদ্ভব হয়েছে। হিন্দুদের তীর্থপূজার মত। শিয়া-সুন্নীতে তফাত শুধু কিঞ্চিৎ প্রকরণে (Form)। অথবা হজারে আসুয়াদ (কালো পাথর যা মক্কার দেওয়ালে গাঁথা আছে)-কে হাজী (হজযাত্রী)-রা যে চুম্বন করে, তা টোটেম চুম্বনের শামিল। শিয়ারা সিজদাগাহকে পকেটে করেও বহে নিয়ে বেড়ায়, তা দেখেই সুন্নীরা প্রাচীন আরবী লোক পূজার টোটেমকে সিন্দাগার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে।

তাই বুদ্ধি দিয়ে মাপলে একথা মানতেই হবে যে, মহরম মৌলবাদীর কাছে বিভেদের কাঠখড়। সেই কারণেই আমরা সে পথে যাচ্ছি না, আমাদের পথ জারিদারী, জৈব বিপন্নতার কাসিদী পথ, কল্প কল্পনার আবেগে মিলিত। এইপথে কাঁটা দেবার মৌলবিবাদী গোঁড়া সনাতন ভাবনার সম্পন্ন মুসলমান, ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক ধ্বজীরা সতত প্রস্তুত। কিন্তু সাধারণের জীবন সেই মানা শোনে না, কাঁটার ভয়ে কে ডরায় ? পৌত্তলিকতার ভয়, ঘৃণা সবই দরিদ্র মুসলমানের কাছে তুচ্ছ। মহরম তার কাছে আজ মেলা। মহরম আজ, আজ কেন, গোড়া থেকেই বলা যায়, ধর্মের বাউন্ডারি ছাড়িয়ে, শোকোৎসবকে আনন্দধারায়, রোশনীর ভিয়ানে রসায়িত করে নিয়েছে, অবশ্য শোককে চেপে রেখে হারিয়ে দিয়ে, লাঠিখেলা, মর্সিয়া, শোনা, জারির সার্কাসে পরিণত করতে ক্রমশ উৎসাহিত হ'য়েছে। হিন্দুধর্মীয় উৎসবগুলির পাল্টা মজা মহরমকে আক্রান্ত করেছে দিনেদিনে। আর সেই মজা চড়কপূজার মতনই বীভৎস। মহরমে প্রতিবছর লালবাগে আগুন খেলার যে সার্কাস অবশ্য তা সার্কাস ছাড়া কিছু নয়। হিন্দুকে দোষ দেবার জন্য হিন্দুরাই আছেন, কিন্তু মুসলমানকে দুষবে তেমন মানুষ কারবালার মেলায় আমি দেখিনি। ধর্মানুষ্ঠানের উচ্ছৃঙ্খলাকে দুষলে মুসলমানের ধর্ম রেগে যায়, মুসলমানের ধর্ম কলা-বউয়ের মতন স্পর্শভীরু। কিন্তু বারবার বলি, গোড়াতেও বলেছিলাম, ইসলাম জিহাদী ধর্ম। সেটা এখন কথার কথা। ইসলাম বলেই না, সমগ্র ধর্ম বস্তুটারই ভিতরের দিকে লাঞ্ছিত না করলে, বাইরের মজা উৎপন্ন হয় না। ভেতরে যত মরবে, বাহির তত উলঙ্গ হবে। চলন্ত বহমান কবরসদৃশ কফিন কাঁধে একমাত্র মুসলমানই আজ কালো পোশাকে মঞ্জিল মাটির দিন সহিংসে বিষাদকে আনন্দে নাচিয়ে মহরমকে তামাসায় পরিণত করতে পেরেছে। মারহাবা (প্রশংসোসূচক ধ্বনি)। সমস্ত প্রশংসা মুসলমানের জন্য। দীন সুন্নীর লেঠেলি এখন এক ঠাট্টা ঠাট্টা খেলা, এই বুঝি মারে, ওই বুঝি মারে ! আসলে সে কাউকেই মারবে না। সত্যিই কি মারতে পারবে ? কী জানি কখন কী ঘটে ? হিন্দুরা কিন্তু আজকাল আর এই ঠাট্টা তামাসাও বুঝতে চাইছে না, ভাবছে এই বুঝি মারে, ওই বুঝি মারে। কেন এমন হচ্ছে ? শুধু কি মহরমের বর্বরতা আর বীভৎসতার জন্যই ? গতবছর জৌলুস আর তাজিয়ার ঝলকে মাতমের হিংস্র মাতলামীর দৃশ্য দেখে লালবাগের গণ-প্রিয় মানুষ রোহিণীদাস মহাশয় অজ্ঞান হয়ে গেলেন বলে ? নাকি জনৈক ব্যবসায়ীর ছোট মেয়ে মহরম দেখে সাতদিন জ্বরে ভুগল বলে ? গত মহরমেই গঙ্গার ঘাটে জনৈক জয়নব বিবি মানতে এসে ঘোলাটে তিন পুরুষের দ্বারা মৃদুমন্দ লাঞ্ছিত হতে যাচ্ছিল, কেই-বা খবর রাখে, তার চিৎকার কেউ কেউ শুনেছে, জারির কেচ্ছায় ত্রিমুখী দ্বন্দ্বের একটা বাস্তব অভিনয় হয়ে গেল বলেই কি ধরে নিতে হবে, মহরমের গায়ে অপচ্ছায়া ঘুরছে ?

আরো কোন গভীরতর হিংসা আর বিদ্বেষ ও ভাঙ্গন আমাদের ঘিরেছে। গরিব মুসলমান সেকথা জানে না, হিন্দুও না। এখন এক আশ্চর্য বিপন্নতা কলমকে ঘিরে ধরছে। মুর্শিদাবাদ জিলার যে গ্রামীণগঞ্জ এলাকায় আমার বর্তমান নিবাস, তার নাম ইসলামপুর। মূল ইসলামপুরের বাসিন্দা যারা তার শতকরা ৭০ ভাগ হিন্দু। এই ইসলামপুরেই সবচেয়ে বড় এই দিগরের বাইশ পুতুলের মণ্ডপ স্থাপিত হয়েছে অনেক বছর আগে। খুবই উল্লেখযোগ্য আর জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণাঢ্য পূজা হয় এখানে। এখানেই একদা পাশের মুসলিম গাঁ নশীপুরের মহরমদল এসে হরসন লাঠিখেলা দেখিয়ে গেছে। ইসলামপুর গঞ্জের নিতান্ত গা-লাগা তাঁতীগ্রাম, যার চরিত্র খানিকটা শহুরে, সেই চক বাজারকেও ইসলামপুর নামের সঙ্গে একই হাইফেনে উচ্চারণ করা হয়। বলা হয় চক-ইসলামপুর। চকের বাসিন্দার শতকরা হিন্দু সংখ্যা ৯৯ ভাগ। চক-ইসলামপুরের চারপাশের গ্রামগুলি ব্যাপকভাবে মুসলিম অধ্যুষিত, হিন্দুগ্রাম নেই বললেই চলে।

কিন্তু গ্রাম-ব্যবস্থার এই ধরনের বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও হিন্দু জীবনধারা মুসলমানদের নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশেষত ধর্মীয় উৎসবগুলির ক্ষেত্রে পারস্পরিক জীবনধর্মের 'লেনদেন' চলেছে সুদীর্ঘ কাল। কেতাবী বা পূজিত ধর্ম ছাড়াও, পূর্বেই উল্লেখ করেছি, জীবনের একটা অস্তিত্বগত হিন্দু-মুসলমানের যৌথ কাঠামো দেখতে পাই, যার মূল উপাদান কেবল মাত্র জীবন, ধর্মের বিভিন্নতার, মধ্যে যার এক ধরনের মিলিত আচরণবাদী প্রকাশ ঘটে। যেমন দুর্গাপূজায় ও মহরমে। মন্ত্রে ও কলমায় হিন্দু-মুসলমান নিজেদের আলাদা ক'রে রেখেছে ঠিকই, কিন্তু জীবনের বাকি অংশ যখন উৎসব মুখর হওয়ার অবকাশ পায়, তখন তৃণমূলস্থিত ব্রাত্য চাপা পড়া সাধারণ জীবন, ধর্মের এক অন্য মর্মে প্রবেশ করে। ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতার মধ্য থেকে উৎসবের অংশটুকুকে নিচের তলার মানুষ সযত্নে কেটে নিয়ে গন্ধিত রুমালের মত পকেটে রাখে বা গলায় বা কব্জিতে কাসিদের পানা বেঁধে নেয়। ধর্মের বাকি গুহ্য গোপন অংশ, যা মন্ত্রে বা কলমায় নিষিক্ত, তা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিকতার কঠোর ধাতব শক্তি, তার সঙ্গে অতি সাধারণ জন, দরিদ্র অবহেলিত মানুষ এক প্রকার কুণ্ঠিত সভয় দূরত্ব রচনা করে চলতে চায়। তারা জীবন অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে, জীবনে ও প্রীতিতে প্রবেশ করার সহজ রাস্তা হিন্দু-মুসলমান উভয় তরফেই একটি। একমাত্র। তা হচ্ছে লোকোৎসব। ভিখু দাসের বউ মনে করত সব ধর্মই এক। একথা পয়লা মান্য করতে হবে, নইলে উৎসব মিথ্যা, তার মজাটাই হবে মাটি। একথা সাধারণ মানুষ যত বোঝে, যেভাবে, জীবন অস্তিত্বের ঘর্ষণে, গমনে, দ্বন্দ্বে-যন্ত্রণায়, আমরা শিক্ষিতরা ততটা বুঝি না। আমরা যুক্তি দিয়ে চর্চা করতে পারি, ওদের কিন্তু জীবন দিয়ে ধারণ করতে হয়। সব ধর্মই সমান, সব ঈশ্বরই আসলে এক, এ-কথার সামান্য মান্যতা না থাকলে অনেক আপদ জুটে যায়, জীবনের সুস্থ স্বভাব ক্ষুণ্ণ হয়, একথা আসলে জারিগান সারিগানের ধুয়ার মতন ধ্যান করতে হয়, ধর্মের বাকি সব ভুয়া। এই পরম উপলব্ধির পরই সাধারণজন উৎসবে প্রবেশ করতে চায়। তখনই তো পথ সহজ হয়।

নিশিবউ আর পানিপিয়ার বৃদ্ধ কাসিদ সেই পথ চিনেছিল, রামকৃষ্ণঠাকুরের মত কোন একটা সিধে পথ আবার বলছি, নিশ্চয়ই ছিল। ভারতবর্ষ আজ সেইপথে অসংখ্য কাঁটা ছড়িয়ে দিয়েছে, দশরথের পা কাঁটায় বিক্ষত, সে ছয়ঘরীর অশোক তলায় মুখ হাঁ করে এবছর ধুঁকেছে আর কাতর যন্ত্রণায় বিলাপ করেছে, সে আর ছুটতে পারছে না। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ কাঠামোয় ঘা মারছে আশ্চর্য নখর, উদ্ধত, চণ্ড চাপা ত্রাসে। ডংকার গায়ে কাঠি পড়লে হিন্দুর মুখ কালো হয়ে যাচ্ছে এই ইসলামপুরেই। মুসলমান ভয়ে ভয়ে ঝাঁঝি নাড়ছে। নিশিবউ এই পথে কখনও আর ঝাঁট দেবে না। হিন্দু-মুসলমান শিয়া-সুন্নীর শুভস্য প্রেমার্ত জুলুয়া বাতিগুলি কি নিবে যাচ্ছে ? কাঁটায় পথ যে কণ্টকিত। কাসিদ গাইছে, কোন এক বৃদ্ধ দশরথ :

হোসেন কে পাঁচবাতি
এক বাতি জুলুয়া
কাঁদছে রে সকেনাবিবি
হায় হোসেন কারবালা ॥

রাজনীতির কোন ছুপা এজিদ নাকি জিয়াদ সব বাতি নিবিয়ে পথে কাঁটা ছড়িয়ে যাচ্ছে। কাঁটা সরাবার লোক আমরা দেখি না। ■

টোকাম্যাক : শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ

জয়ন্ত বসু

আমাদের জীবনধারণের জন্যে যেমন অক্সিজেনের প্রয়োজন, মানব সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তেমনি প্রয়োজন হল শক্তির। আধুনিক যুগে এই শক্তি প্রধানত বিদ্যুৎ-শক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়, তবে যান্ত্রিক শক্তি, তাপীয় শক্তি ইত্যাদিরও বেশ কিছুটা ব্যবহার আছে। শিল্প, কৃষি, যানবাহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতিতে, এমনকি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক উপকরণেও শক্তির অজস্র ব্যবহার। বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সভ্যতার অগ্রগতি, এই দুইয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে শক্তির চাহিদা দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। অথচ যে সব উৎস থেকে আমরা শক্তি পাই, তাদের কতকগুলির মজুত ভাণ্ডার ক্রমশ কমে আসছে, অন্যগুলির ক্ষেত্রে শক্তি সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেজন্যে কয়েক দশক পরে শক্তির দুর্ভিক্ষের প্রবল সম্ভাবনা। বহু বিজ্ঞানীর মতে এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে যদি মানুষ এক ধরনের কৃত্রিম সূর্য তৈরি করতে পারে, আকারে যা, বলা বাহুল্য, সূর্যের চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু প্রকৃতিতে প্রায় একই রকম। এটা সম্ভব হলে কয়েক শো কোটি বছরের জন্যে আর শক্তির অনটন নিয়ে ভাবতে হবে না, বলতে গেলে চিরকালের জন্যেই শক্তি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

কাজটি কিন্তু সহজ নয়। গত প্রায় তিরিশ বছর ধরে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনো সার্থক কৃত্রিম সূর্য তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এই কাজকে বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলা যায়।

এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা নানা রকম যন্ত্র তৈরি করে সেগুলিকে কৃত্রিম সূর্য হিসাবে কাজ করানো যায় কিনা, তাই নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং এখনো করছেন। যে যন্ত্র সবচেয়ে আশাপ্রদ বলে মনে হচ্ছে, তার নাম টোকাম্যাক। এই যন্ত্র ব্যবহার করে গত বিশ বছরে বিজ্ঞানীরা সাফল্যের পথে অনেকখানি এগিয়েছেন। প্রায় সব দেশেই এবং আন্তর্জাতিক ভাবেও ধরে নেওয়া হয়েছে যে, যদি কৃত্রিম সূর্য তৈরি করা সম্ভব হয়, তবে তা সর্বপ্রথম সম্ভব হবে টোকাম্যাক যন্ত্র ব্যবহার করে। এজন্যে কৃত্রিম সূর্য নির্মাণের যে চ্যালেঞ্জ, তা আজ পর্যবসিত হয়েছে সফল টোকাম্যাক তৈরি করবার চ্যালেঞ্জে।

এরকম টোকাম্যাক নির্মাণের এখনো যেমন অনেকগুলি প্রযুক্তিগত সমস্যা আছে, তেমনি আবার রয়েছে টোকাম্যাকের অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি মৌলিক সমস্যাও। এই

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটনে টি এফ টি আর (টোকাম্যাক ফিউসান টেস্ট রিয়্যাক্টর) যন্ত্র, যাতে প্লাজমার উষ্ণতাকে ২০ কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত তোলা সম্ভব হয়েছে। উষ্ণতার দিক থেকে বর্তমানে এটি হল বিশ্ব-রেকর্ড

সব সমস্যা সমাধানের জন্যে নানান আকারের ও নানান বৈশিষ্ট্যের টোকাম্যাক নিয়ে বহু দেশেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। আমাদের দেশে কলকাতার সাহা ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর গবেষণাগারে সম্প্রতি একটি টোকাম্যাক যন্ত্র বসানো হয়েছে। উদ্দেশ্য : কয়েকটি মৌলিক সমস্যা সম্পর্কিত গবেষণা এবং এ ধরনের যন্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন ও পারদর্শিতা লাভ। ভারতে এইটিই সর্বপ্রথম টোকাম্যাক। গুজরাটের গান্ধীনগরে ইন্সটিটিউট ফর প্লাজমা রিসার্চ নামক প্রতিষ্ঠানে আর একটি টোকাম্যাক নির্মাণের তোড়জোড় চলেছে।

শক্তি-সমস্যার স্বরূপ ও তার সম্ভাব্য সমাধান

সভ্যতার চাকাকে সচল রাখবার জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন, ভবিষ্যতে তার যোগান অব্যাহত রাখবার সমস্যাটি কী, তা একটু আলোচনা করা যেতে পারে। বর্তমানে শক্তির মূল উৎস হল কয়লা, খনিজ তৈল ও গ্যাস। সমস্ত পৃথিবীতে যত শক্তির ব্যবহার হয়, তার শতকরা প্রায় পঁচাশি ভাগ পাওয়া যায় এগুলি থেকে। এগুলিকে বলা হয় জীবাশ্ম জ্বালানি (fossil fuel) কারণ বহু কোটি বছর আগে মাটির নিচে চাপা পড়া উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের রূপান্তরে এগুলির উৎপত্তি। ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে এই সব জ্বালানির মজুত ভাণ্ডার যেমন দ্রুত হারে কমে আসছে, তাতে হিসেব করে বলা যায় যে, কয়েক দশক পরেই ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির মজুত নিঃশেষিত হবে— তেল ও গ্যাস নিঃশেষিত হবে সম্ভবত এখন থেকে ১০-১২ বছরের মধ্যেই। তাছাড়া মনে রাখতে হবে যে, জীবাশ্ম জ্বালানির মজুত সব দেশে সমান নয়— যে সব দেশে মজুত নেই বা থাকলেও কম, তাদের ক্ষেত্রে সঙ্কট অনেক আগেই ঘনীভূত হবে।

জলস্রোত, জোয়ার-ভাঁটা, বায়ু চলাচল ইত্যাদি থেকে যে শক্তি পাওয়া যেতে পারে, তার পরিমাণ চাহিদার তুলনায় খুবই কম। ভূপৃষ্ঠে মোট সৌরশক্তির পরিমাণ বিপুল হলেও তা এত বিস্তীর্ণ স্থানের উপর ছড়িয়ে থাকে যে, তা দিয়ে আঞ্চলিক কিছু কিছু কাজকর্ম সম্ভব হলেও ব্যাপক চাহিদার যোগান দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তাহলে ভরসা কেবল পারমাণবিক শক্তি। বর্তমানে যে ধরনের পারমাণবিক চুল্লি থেকে আমরা শক্তি পাই, তাকে বলা হয় বিভাজন চুল্লি (fission reactors)। কারণ ইউরেনিয়াম-২৩৫ আইসোটোপের মতন অপেক্ষাকৃত ভারী পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বিভাজনের (অর্থাৎ প্রায় সমান দুটি খণ্ডে ভেঙে যাওয়ার) ফলে উৎপন্ন যে শক্তি, তাই রয়েছে এই চুল্লির কার্যকারিতার মূলে। মাত্র এক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়, তা ৪,০০০ টন কয়লার শক্তির সমান। তবুও বিভাজন চুল্লির উপযোগী জ্বালানি মেলে যে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম থেকে, পৃথিবীর বুকে তাদের সঞ্চয় সীমিত হওয়ায় বিভাজন চুল্লির ব্যাপক ব্যবহার শক্তির অনটনকে খুব বেশি হলে কয়েক দশক হয়তো পিছিয়ে দিতে পারবে। তাছাড়া এই ব্যাপক ব্যবহারের একটি বড় সমস্যাও আছে। বিভাজন চুল্লিতে যে তেজস্ক্রিয় ভস্ম উৎপন্ন হয়, তার সদ্‌গতি করা এক দুরূহ সমস্যা। ২০০০ খ্রীস্টাব্দে পৃথিবীতে যে মোট শক্তি ব্যয়িত হবে, তা যদি কেবল বিভাজন চুল্লি থেকে সংগ্রহ করা হয়, তাহলে যে তেজস্ক্রিয় ভস্মের সৃষ্টি হবে, তা প্রায় এক কোটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় ভস্মের সমান!

আর একরকম পারমাণবিক চুল্লিও হতে পারে, যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় 'সংযোজন চুল্লি' (fusion reactors), সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি 'কৃত্রিম সূর্য'। এতে হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের মতন হাল্কা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সংযোজনের (অর্থাৎ জুড়ে যাওয়ার) ফলে বিপুল শক্তির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। আমাদের সুপরিচিত নক্ষত্র সূর্য এবং আরো বহু নক্ষত্রে নিউক্লিয় সংযোজন প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হচ্ছে। সূর্যের মধ্যকার অত্যধিক উষ্ণতায় (কেন্দ্রস্থলে উষ্ণতা প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস) সেখানকার হাইড্রোজেন গ্যাসের অণু-পরমাণুরা অত্যন্ত গতিশীল হয় এবং তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে পরমাণু পরিবার ভেঙে গিয়ে ভিতরের ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াস (এক্ষেত্রে প্রোটন কণা) মুক্ত অবস্থায় বিরাজ করে। এইরকম বহু মুক্ত ইলেকট্রন ও সমানসংখ্যক নিউক্লিয়াসের সমাবেশকে 'প্লাজমা' বলা হয়। প্লাজমা হল পদার্থের একটি বিশেষ অবস্থা— চতুর্থ অবস্থা, পদার্থের তৃতীয় অবস্থা গ্যাসের সঙ্গে যার অনেক পার্থক্য আছে। যা হোক, সূর্যের অত্যন্ত উষ্ণ প্লাজমা মাধ্যমে নিউক্লিয়াসগুলি প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন হয় এবং সেই গতির ফলে পারস্পরিক বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ সত্ত্বেও পরস্পরের খুব কাছে চলে আসতে পারে। তখন নিউক্লীয় সংযোজন ঘটে থাকে। বিজ্ঞানীরা যে সংযোজন চুল্লি নির্মাণে সচেষ্ট আছেন, তাতে সূর্যের উষ্ণ প্লাজমার মতন (বস্তুত আরো উষ্ণ) প্লাজমা তৈরি করা হবে এবং সেই প্লাজমায় যথেষ্ট সংখ্যক নিউক্লীয় সংযোজন ঘটলে বিপুল শক্তির উদ্ভব হবে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, মানুষ পঞ্চাশের দশকেই নিউক্লীয় সংযোজন প্রক্রিয়ায় প্রচণ্ড শক্তি সৃষ্টি করতে পেরেছে, তবে তা অনিয়ন্ত্রিতভাবে, হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে। সংযোজন চুল্লিতে সেই হাইড্রোজেন বোমাকে যেন পোষ মানানো হবে, তার শক্তির উৎপত্তি হবে নিয়ন্ত্রিতভাবে, যাতে মানুষ ইচ্ছা মতন সেই শক্তিকে কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করতে পারে।

সূর্যের জ্বালানি যে সাধারণ হাইড্রোজেন, ক্ষুদে সূর্যরূপ সংযোজন চুল্লিতে তা ব্যবহার করলে নিউক্লীয় সংযোজন যথেষ্ট সংখ্যায় হবে না। সংযোজন চুল্লির মূল জ্বালানি ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম। জল থেকে এই ডয়টেরিয়াম পাওয়া যেতে পারে। সমুদ্রের জলের অণুতে যে হাইড্রোজেন আছে, তার ৬৫০০ ভাগের এক ভাগ হল ডয়টেরিয়াম। ঐ জলরাশির পরিমাণ সুবিশাল হওয়ায় মজুত ডয়টেরিয়ামের পরিমাণও যথেষ্ট। হিসেব করে দেখা যায় যে, এক লিটার জলে যেটুকু ডয়টেরিয়াম আছে, তাই থেকে যে শক্তি পাওয়া যেতে পারে, তা ৩৫০ লিটার পেট্রোলের শক্তির সমান। সমুদ্রের জলে যে ডয়টেরিয়াম আছে, সংযোজন চুল্লির জ্বালানি হিসেবে তা মনুষ্য সভ্যতার চাহিদাকে অন্তত ১০০ কোটি বছর মেটাতে পারবে। সুতরাং বলা যায়, সংযোজন চুল্লি নির্মাণের প্রচেষ্টা সফল হলে কার্যত চিরকালের জন্যে শক্তি-সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, সংযোজন চুল্লি নির্মাণের কাজ কিছুটা সহজ হয় যদি কেবল ডয়টেরিয়াম ব্যবহার না করে ডয়টেরিয়াম ও হাইড্রোজেনের অন্য আইসোটোপ ট্রিটিয়ামের মিশ্রণকে সংযোজন চুল্লির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাতেও বেশ অনেক কাল শক্তির যোগান দেওয়া সম্ভব, কারণ ট্রিটিয়ামকে তৈরি করে নেওয়া যায় লিথিয়াম থেকে, যা ভূত্বকে মোটামুটি যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

সাফল্যের শর্ত

গত তিরিশ বছর ধরে চেষ্টা করেও বিজ্ঞানীরা যে এখনো সংযোজন চুল্লি নির্মাণে সাফল্য লাভ করতে পারেননি, তার কারণ হল এই সাফল্যের জন্যে দুটি দুরূহ শর্তকে অবশ্যই পালন করতে হবে। এ বিষয়ে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

প্লাজমা মাধ্যমে নিউক্লীয় সংযোজন ঘটাতে হলে যে সেই প্লাজমার উষ্ণতা কেন খুব বেশি হওয়া দরকার, তা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু কেবল নিউক্লীয় সংযোজন ঘটলেই তো হবে না, প্রতি সেকেন্ডে সংযোজনের সংখ্যা যথেষ্ট হতে হবে যাতে সংযোজনের ফলে উৎপন্ন মোট শক্তি উষ্ণ প্লাজমা থেকে বিকিরণের ফলে বিনষ্ট শক্তির চেয়ে বেশি হয় এবং প্লাজমা থেকে উদ্বৃত্ত শক্তি পাওয়া যেতে পারে কাজে লাগানোর জন্যে। অর্থাৎ এ যেন বলা যায়, প্লাজমার আয় তার নিজের ব্যয়ের থেকে বেশি হতে হবে যাতে তার উদ্বৃত্ত সম্পদ সে অন্যকে দিতে পারে। এর জন্যে প্লাজমার উষ্ণতা কত হতে হবে, তা হিসেব করে দেখা হয়েছে। সংযোজন চুল্লির জ্বালানি ডয়টেরিয়াম হলে সেই চুল্লির সাফল্যের প্রথম শর্ত : প্লাজমার উষ্ণতা অন্তত ৪০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস হওয়া দরকার। জ্বালানি হিসেবে ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের মিশ্রণ ব্যবহার করলে প্রয়োজনীয় উষ্ণতা অন্তত চার কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাস্তবক্ষেত্রে প্লাজমা থেকে বিকিরণ ছাড়াও অন্যান্য ভাবে শক্তিক্ষয় হয় বলে প্রয়োজনীয় উষ্ণতা আরো কিছুটা বেশি হওয়া দরকার—যেমন কার্যকর সংযোজন চুল্লিতে ডয়টেরিয়াম-ট্রিটিয়াম জ্বালানির ক্ষেত্রে উষ্ণতা হতে হবে দশ থেকে কুড়ি কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই সব উষ্ণতার কাছে সূর্যের কেন্দ্রস্থলের উষ্ণতাও হার মেনে যায়।

সূর্যের চেয়েও মানুষের তৈরি সূর্যের উষ্ণতা

যে বেশি হওয়া দরকার, তার কারণ হল—সূর্যের তুলনায় এর আয়তন অনেক কম হওয়ায় সংযোজনের ফলে উৎপন্ন শক্তি বহুলাংশে কম হয় ; বিকিরণের ফলে বিনষ্ট শক্তির পরিমাণও তেমনি কমে যায় বটে কিন্তু ঠিক ঐ অনুপাতে কমে না। সেজন্যে বিনষ্ট শক্তির সঙ্গে উৎপন্ন শক্তির অনুপাতকে সমান রাখতে হলে উষ্ণতাকে অপেক্ষাকৃত বেশি করা দরকার।

সূর্যের চেয়েও উষ্ণ প্লাজমা তৈরি করা যেমন এক মহা-সমস্যা, তেমনি আর এক বিরাট সমস্যা হল তাকে নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা। কারণ ঐ প্লাজমার মধ্যে প্রচণ্ড গতিশীল কণাগুলির পক্ষে চারদিকে ছড়িয়ে পড়াই স্বাভাবিক। অথচ যে আধারের মধ্যে প্লাজমার সৃষ্টি হবে, প্লাজমা যদি তার দেওয়ালের সংস্পর্শে আসে, তাহলে তাপ পরিবহণের ফলে প্লাজমার উষ্ণতা অচিরেই অনেকখানি কমে যাবে। কিন্তু উষ্ণ প্লাজমা অন্তত খানিকক্ষণ স্থায়ী হলে তবেই তার মধ্যে বেশ কিছু নিউক্লিয়াসের সংযোজন ঘটতে পারে। আবার ঐ সময়ের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক নিউক্লিয়াসের সংযোজন ঘটতে হলে নিউক্লিয়াসের সংখ্যাও যথেষ্ট হওয়া দরকার। বস্তুত বিজ্ঞানী জে ডি লসন হিসেব করে দেখান যে, সংযোজন চুল্লিতে উষ্ণ প্লাজমা তৈরি করতে যে শক্তি ব্যয়িত হবে ও বিকিরণের ফলে যে শক্তিক্ষয় ঘটবে, উৎপন্ন কার্যকর শক্তিকে যদি তাদের যোগফলের চেয়ে বেশি হতে হয়, তবে n ও t-এর গুণফলকে একটি নির্দিষ্ট মানের চেয়ে বেশি হতে হবে, যেখানে n হল প্লাজমার প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা এবং t হল সেকেণ্ডের হিসেবে প্লাজমার স্থায়িত্বকালের পরিমাণ। এইটিই হচ্ছে সংযোজন চুল্লির সাফল্যের দ্বিতীয় শর্ত। লসনের নামানুসারে একে বলা হয় 'লসনের শর্ত'। সংযোজন চুল্লির জ্বালানি যদি কেবল ডয়টেরিয়াম হয়, তাহলে উক্ত নির্দিষ্ট মান হল $১০^{১৬}$; জ্বালানি ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের সংমিশ্রণ হলে ঐ মান হচ্ছে $১০^{১৪}$।

বর্তমানে সংযোজন চুল্লি নির্মাণের প্রচেষ্টা চলেছে মূলত দুটি পদ্ধতিকে অবলম্বন করে। প্রথম পদ্ধতিতে বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে বা অন্য কোন ভাবে উষ্ণ প্লাজমা তৈরি করে চুম্বকক্ষেত্র দিয়ে গঠিত এক অদৃশ্য পিঞ্জরে তাকে আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করা হয়। চুম্বকক্ষেত্রের একটি ধর্ম এই যে, তা গতিশীল আহিত (অর্থাৎ বিদ্যুৎসম্পন্ন) কণার গতিকে প্রভাবিত করতে পারে। সংযোজন চুল্লির মধ্যে এমন চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করা হয়, যাতে বাইরের দিকে আগত কণাগুলির দিক পরিবর্তিত হয় এবং কণাগুলি চলে যায় ভিতরের দিকে। এইভাবে চুম্বকক্ষেত্র যেন এক পিঞ্জরের সৃষ্টি করে, প্লাজমা যার বাইরে আসতে পারে না। চৌম্বক আবদ্ধকরণের ভিত্তিতে যে সব বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগুলির নাম হল টোকাম্যাক, স্টেলারেটর, চৌম্বক দর্পণ ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে প্লাজমায় প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা মোটামুটিভাবে $১০^{১৪}$; সুতরাং লসনের শর্ত পালিত হওয়ার জন্যে ডয়টেরিয়াম-ট্রিটিয়াম
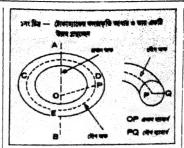
জ্বালানির ক্ষেত্রে প্লাজমার স্থায়িত্বকাল অন্তত ১ সেকেণ্ড হওয়া দরকার।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে লেসার নামক বিশেষ রকম আলোর উৎস থেকে সুতীব্র রশ্মি নিক্ষেপ করা হয় ক্ষুদ্রাকৃতি ডয়টেরিয়াম-ট্রিটিয়াম খণ্ডের উপর। ঐ খণ্ডটি নিমেষের মধ্যে উষ্ণ প্লাজমায় রূপান্তরিত হয় এবং প্রথমে সংকোচনের ফলে তার ঘনত্ব যায় খুব বেড়ে। তবে সামান্য সময় পরেই প্লাজমা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লেসার রশ্মির পরিবর্তে দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রনগুচ্ছ বা আয়নগুচ্ছকেও প্লাজমা তৈরি করবার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ঐসব ক্ষেত্রে ঘন
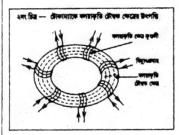
প্লাজমার স্থায়িত্বকাল মোটামুটিভাবে মাত্র ১ ন্যানো সেকেণ্ড (অর্থাৎ ১ সেকেণ্ডের ১০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ)। কিন্তু প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে কণার সংখ্যা $১০^{২৫}$ হতে পারে বলে লসনের শর্ত পালিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

টোকাম্যাক—সবচেয়ে উজ্জ্বল সম্ভাবনা

সংযোজন চুল্লি নির্মাণের জন্যে যত রকম যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে বা হচ্ছে, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল টোকাম্যাক (Tokamak), কারণ এ পর্যন্ত যে সমস্ত ফল পাওয়া গেছে, তা থেকে অধিকাংশ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের কর্মকর্তাদের ধারণা যে, এই যন্ত্র ব্যবহার
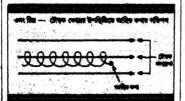
করে সার্থক সংযোজন চুল্লি নির্মাণের সম্ভাবনা সবচেয়ে উজ্জ্বল। 'টোকাম্যাক' হচ্ছে রুশ ভাষায় একটি সংক্ষেপিত শব্দ, যার সম্পূর্ণ অর্থ 'বলয়াকৃতি চৌম্বক প্রকোষ্ঠ' (toroidal magnetic chamber)। রাশিয়ার বিজ্ঞানী এল এ আর্টসিমোভিচকে টোকাম্যাকের জনক বলা হয়—ষাটের দশকের শেষের দিকে তিনিই সর্বপ্রথম টি-৩ নামক টোকাম্যাক যন্ত্র ব্যবহার করে আশাব্যঞ্জক ফল লাভ করেন এবং বিজ্ঞানীদের সচেতন করেন এর সম্ভাবনা সম্পর্কে।

টোকাম্যাক যন্ত্রে একটি বলয়াকৃতি ধাতব আধারকে অনেকাংশে বায়ুশূন্য করে তার মধ্যে উষ্ণ প্লাজমা সৃষ্টি করা হয় (১ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। চোঙাকৃতি বা ঐরকম কোন আধারে প্লাজমা থাকলে সেই আধারের দুই প্রান্ত দিয়ে প্লাজমা বেরিয়ে যেতে পারে বা প্রান্তে আঘাত করে উষ্ণতা হারাতে পারে। বলয়াকৃতি আধারের কোন প্রান্ত না থাকায় এই অসুবিধা নেই। বলয়াকৃতি আধারটি যে জায়গাকে ঘিরে থাকে, তার ঠিক কেন্দ্রস্থল বরাবর যদি একটি সরলরেখা কল্পনা করা যায় (১ নং চিত্রে AOB রেখা), তা হলে সেই রেখাকে বলা হয় টোকাম্যাকের প্রধান অক্ষ (major axis)। আর আধারের ভিতরে ঠিক মাঝখান দিয়ে যদি একটি বৃত্তাকার রেখা কল্পনা করা যায়— যেমন চিত্রে CDE রেখা, তবে সেই রেখাকে বলে গৌণ অক্ষ (minor axis)। গৌণ অক্ষের যে ব্যাসার্ধ অর্থাৎ প্রধান অক্ষ থেকে তার যে দূরত্ব OP, তাকে বলা হয় প্রধান ব্যাসার্ধ (major radius)। গৌণ অক্ষের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে আধারটির যে কোন উল্লম্ব প্রস্থচ্ছেদ নিলে তা বৃত্তাকার হয় ; সেই বৃত্তের ব্যাসার্ধ PQ-কে বলে গৌণ ব্যাসার্ধ (minor radius)। বলয়াকৃতি আধারের মধ্যে প্লাজমাকে আবদ্ধ রাখবার জন্যে নানান উপায়ে যে উপযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়, তাই হল টোকাম্যাকের বৈশিষ্ট্য। এজন্যে এই চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, বলয়াকৃতি আধারকে বেড় দিয়ে অনেকগুলি তারকুণ্ডলী রাখা হয়, যেগুলির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠালে বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় (২ নং চিত্র)। এই সব কুণ্ডলীকে বলা হয় বলয়াকৃতি ক্ষেত্রকুণ্ডলী (toroidal field coil)। আমরা জানি, কোন গতিশীল আহিত কণার উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবের ফলে ঐ কণা চৌম্বক বলরেখার চারপাশে পাক খেতে খেতে চৌম্বক বলরেখা বরাবর চলতে থাকে (৩ নং চিত্র)। সুতরাং চৌম্বক বলরেখার আড়াআড়ি পথে কণাটি যেতে পারে না। এইভাবে প্লাজমার সব কণাই চৌম্বক বলরেখাগুলি বরাবর আবদ্ধ থাকে এবং বলরেখার আড়াআড়ি পথে গিয়ে আধারের দেওয়ালে আঘাত করতে পারে না। টোকাম্যাক যন্ত্রের বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্রে কিন্তু অন্য একটি ব্যাপারও ঘটে। এই ক্ষেত্রের মান আধারের ভিতরের দিকে বেশি থাকে, বাইরের দিকে কম। ক্ষেত্রের মানের তারতম্যের জন্যে এবং বলরেখার
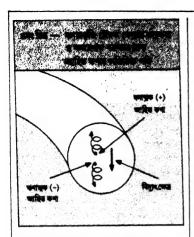
বক্রতার জন্যেও আহিত কণাগুলি উপরের বা নিচের দিকে একটি অতিরিক্ত গতি লাভ করে— ঋণাত্মক ইলেকট্রন যদি উপরের দিকে যায়, ধনাত্মক নিউক্লিয়াস যায় নিচের দিকে ; আর ইলেকট্রন নিচের দিকে গেলে নিউক্লিয়াস উপরের দিকে যায় (৪ নং চিত্র)। ফলে আধারের মধ্যে উপরে ও নিচে বিপরীত আধানযুক্ত কণার আধিক্য হওয়ায় একটি উপর-নিচ বিদ্যুৎক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুৎক্ষেত্র ও বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্রের সম্মিলিত প্রভাবে প্লাজমা আধারের বাইরের দিকে গতিশীল হয় ও আধারের দেওয়ালে গিয়ে আঘাত করে।

এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে একটি অতিরিক্ত চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, যার চৌম্বক বলরেখাগুলি গৌণ অক্ষকে সর্বত্র বেষ্টন করে থাকবে। টোকামাক যন্ত্রে এই বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্র (poloidal magnetic field) তৈরি করা হয় প্লাজমার মধ্য দিয়ে বলয়াকৃতি বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করে (৫ নং চিত্র)। বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্র ও বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্র, এই দুইয়ের সমন্বয়ে যে চৌম্বক বলরেখার উৎপত্তি হয়, তা সর্পিল আকারের— বলয়ের দিক বরাবর চলতে চলতে তা কিছুটা উপর বা নিচ এবং পাশের দিকে সরে যেতে থাকে। বলয়াকৃতি আধারের গৌণ অক্ষের সঙ্গে আড়াআড়ি যে প্রস্থচ্ছেদ FGH ৬ নং চিত্রে

চিত্র : নীলাঞ্জন ...
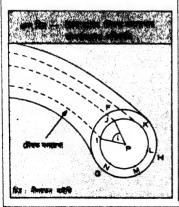
দেখানো হয়েছে, ধরা যাক একটি চৌম্বক বলরেখা তাকে প্রথমে I বিন্দুতে ছেদ করে গেছে। ঐ বলরেখাকে অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, বলয়ের দিক বরাবর একবার সম্পূর্ণ ঘুরে আসবার পর ঐ রেখা প্রস্থচ্ছেদ FGH-কে IJK বৃত্তের পরিধির উপরিস্থিত অন্য কোন J বিন্দুতে ছেদ করে যাচ্ছে। বলরেখাটিকে আরো অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, বলয়ের দিক বরাবর আর একবার ঘুরে এসে তা প্রস্থচ্ছেদ FGH-কে K বিন্দুতে ছেদ করছে। এইভাবে ছেদবিন্দু IJK বৃত্তের পরিধির উপর দিয়ে ক্রমাগত সরে যেতে থাকে। টোকামাকে IPJ কোণের গুরুত্ব অনেকখানি ; একে বলা হয় আবর্তনজাত পরিবর্তন (rotational transform)। ক্রুস্কাল ও সোফ্রানভ নামে দুজন বিজ্ঞানী তত্ত্বগতভাবে প্রমাণ করেন যে, প্লাজমার স্থায়িত্বের জন্যে এই কোণের মান ৩৬০ ডিগ্রির চেয়ে অবশ্যই কম হতে হবে। সাধারণত অন্যভাবে এ শর্তটিকে প্রকাশ করা হয়। ঐ কোণকে i এবং q=৩৬০°/i লিখলে সহজেই বোঝা যায় যে, প্লাজমার স্থায়িত্বের জন্যে q-এর মান ১-এর চেয়ে বেশি হতে হবে। q-কে বলা হয় 'নিরাপত্তা নির্দেশক' (safety factor) কারণ প্লাজমার অস্তিত্বের

৫নং চিত্র — বলয়াকৃতি আধারে বিদ্যুৎপ্রবাহের জন্যে বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি
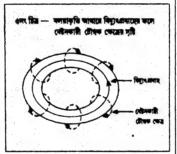
নিরাপত্তা নির্ভর করে এর মানের উপর।

যা হোক, কোন আহিত কণা যখন সর্পিল বলরেখা বরাবর চলতে থাকে, তখন তা কিছুক্ষণ বলয়াকৃতি আধারের উপরের অর্ধে থাকে (যেমন ৬ নং চিত্রে I, J, K বিন্দুতে), কিছুক্ষণ থাকে নিচের অর্ধে (যেমন L, M, N বিন্দুতে)। উপর বা নিচের দিকে আহিত কণার যে ক্ষতিকারক গতির কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে (৪ নং চিত্র দেখুন), এখনো সেরকম গতি থাকে কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই যে, এখন আর কণাটি মোটামুটি উপর বা নিচের দিকে যায় না, গৌণ অক্ষ থেকে একই দূরত্বে থেকে যায়। ৬ নং চিত্রের সাহায্যে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই চিত্রে প্রদর্শিত আধারের প্রস্থচ্ছেদের কেন্দ্র P বিন্দুতে গৌণ অক্ষ একে ছেদ করে গেছে। ধরা যাক, কোন কণা J বিন্দুতে রয়েছে এবং তার গতি উপরের দিকে। কণাটি তাহলে P বিন্দু থেকে সরে যেতে থাকবে। আবার পরে যখন কণাটির অবস্থান M বিন্দুতে হবে, তখনো তার গতি হবে উপরের দিকে ; ফলে সে কিন্তু তখন P বিন্দুর দিকে সরে আসতে থাকবে। এইভাবে দেখানো যায় যে, কণাটি যতক্ষণ নলের উপরের অর্ধে থাকে, ততক্ষণ সে যতখানি গৌণ অক্ষ থেকে সরে যায়, কণাটি নিচের অর্ধে থাকলে ততখানি ঐ অক্ষের দিকে সরে আসে। সুতরাং মোটের উপর সে গৌণ অক্ষ থেকে একই দূরত্বে থেকে যায়। যে সব আহিত কণার গতি নিচের দিকে, তারাও একই কারণে মোটের উপর গৌণ অক্ষ থেকে একই দূরত্বে থাকে। ফলে আধারটির মধ্যে উপরে বা নিচে আগেকার মতন আহিত কণার আধিক্য হয় না। সেজন্যে কোন উপর-নিচ বিদ্যুৎক্ষেত্র উৎপন্ন হয় না এবং প্লাজমাও বাইরের দিকে সরে যায় না। এই ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছে বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্র যোগ হওয়ার ফলে।

অন্য একটি কারণে কিন্তু প্লাজমার এখনো বাইরের দিকে সরে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। প্লাজমার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হলে যে বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, বলয়াকৃতি আধারের ভিতরের দিকে তার মান বাইরের দিকের মানের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। এজন্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের সঙ্গে ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রের পারস্পরিক ক্রিয়ায় ভিতরের দিক থেকে প্লাজমার উপর যে চাপ P_i প্রযুক্ত হয়, বাইরের দিক থেকে চাপ P_o-এর চেয়ে তা বেশি (৭ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। ফলে প্লাজমার প্রবণতা হয় বাইরের দিকে সরে যাওয়ার। প্লাজমার এই গতি রোধ করবার জন্যে বলয়াকৃতি আধার থেকে কিছুটা উপরে ও কিছুটা নিচে তারকুণ্ডলী রেখে ও তাদের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত করে উল্লম্ব চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। প্লাজমার মধ্যস্থ বিদ্যুৎপ্রবাহের উপর এই চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্রিয়ার ফলে একটি ভিতরমুখী চাপ প্রযুক্ত হয় প্লাজমার উপরে। এই চাপ যদি সঠিক মানের হয়, তা হলে ভিতর ও বাইরে থেকে প্লাজমার উপর প্রযুক্ত মোট চাপ সমান হয় এবং প্লাজমার বাইরের দিকে সরে যাওয়ার আর কারণ থাকে না। বলয়াকৃতি আধারের উপরে ও নিচে যে তারকুণ্ডলীর কথা বলা হল, সেগুলিকে বলা হয় উল্লম্ব ক্ষেত্র কুণ্ডলী (Vertical field coils)। এ সব ছাড়াও আধারের উপরে ও নিচে অনুভূমিক ক্ষেত্র কুণ্ডলী (horizontal field coils) বা উল্লম্ব সংশোধন কুণ্ডলী (vertical correction coils) রেখে এবং তাদের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়ে এমন অতিরিক্ত চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয় যে, উপর বা নিচের দিকে প্লাজমার সরে যাওয়ার কোন প্রবণতা থাকলে তাও যাতে রুদ্ধ হয়ে যায়। এইভাবে টোকামাক যন্ত্রে নানান চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে তৈরি এক অদৃশ্য পিঞ্জরে অত্যুষ্ণ প্লাজমাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করা হয়।

বলয়াকৃতি আধারের মধ্য দিয়ে যে বিদ্যুৎপ্রবাহের কথা আগে বলা হয়েছে, তা যে কেবল বেষ্টনকারী চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, তাই নয়, প্লাজমাকে উৎপন্ন করে তাকে অনেকখানি উত্তপ্তও করে তোলে ; কারণ প্লাজমার বৈদ্যুতিক রোধ (resistence) আছে এবং রোধযুক্ত কোন পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হলে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয়িত হয় ও তার রূপান্তর ঘটে পদার্থটির তাপশক্তিতে। বিজ্ঞানী জুলের

নামানুসারে এ পদ্ধতিকে বলা হয় 'জুল তপ্তকরণ' (Joule heating)। অনেক সময় আবার ওহ্‌মের নামানুযায়ী একে বলা হয় 'ওহ্‌মীয় তপ্তকরণ' (Ohmic heating)। যা হোক বলয়াকৃতি আধারে বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা হয় বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশের সাহায্যে। ট্রান্সফর্মার নামক যান্ত্রিক উপাদানের কথা আমরা অনেকেই জানি— টোকাম্যাক যন্ত্রে বলয়াকৃতি আধার একটি বড় ট্রান্সফর্মারের গৌণ কুণ্ডলী হিসেবে কাজ করে (৮ নং চিত্র)। ঐ ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠালে ও সেই বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিবর্তনশীল হলে বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশের ফলে বলয়াকৃতি আধারের মধ্যে বিভব-পার্থক্য বা ভোল্টেজের সৃষ্টি হয়। এর ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎপত্তি ঘটে এবং তা প্লাজমার সৃষ্টি করে তাকে উত্তপ্ত করে তোলে। এজন্যে ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীকে বলা হয় 'জুল তপ্তকরণ কুণ্ডলী' (Joule heating coil)। ৮ নং চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, ট্রান্সফর্মারে তেমনি লোহার কাঠামো ব্যবহার করলে জুল তপ্তকরণ কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়ে বলয়াকৃতি আধারের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিভব-পার্থক্য সৃষ্টি করা যায়। তবে এর সীমাবদ্ধতা থাকায় এবং অন্যান্য দু একটি অসুবিধার জন্যেও বর্তমানে অনেক টোকাম্যাক যন্ত্রে, বিশেষত খুব বড় যন্ত্রগুলিতে বায়ু-মাধ্যমেই বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশের কাজটি হয়ে থাকে।

টোকাম্যাক সম্পর্কিত গবেষণায় অগ্রগতি

রাশিয়ায় টি-৩ নামক টোকাম্যাকে মোটামুটি ঘন প্লাজমাকে ১০ লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়েও কিছু বেশি উষ্ণতায় প্রায় ১০ মিলিসেকেণ্ড (অর্থাৎ ১ সেকেণ্ডের ১০০ ভাগের ১ ভাগ সময়) ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে—১৯৬৮ সালে এ কথা ঘোষিত হওয়ার পর টোকাম্যাক সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ব্রিটেন, জার্মানী প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে যেমন একদিকে টোকাম্যাক নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি চীন, ব্রাজিল প্রভৃতি উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও টোকাম্যাক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। আমাদের দেশেও টোকাম্যাক সম্বন্ধীয় গবেষণার যে সূত্রপাত হয়েছে, আমরা পরে তা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

যে সব টোকাম্যাক নির্মিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল : সোভিয়েত ইউনিয়নের টি-১০ ও টি-১৫, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাল্‌কাটর, পি এল টি, ডি-৩ ও টি এফ টি আর, জাপানের জে টি-৬০, ইওরোপের জেট (জয়েন্ট ইওরোপীয়ান টোরাস— ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত) ও পশ্চিম জার্মানীর অ্যাস্‌ডেক্স। বর্তমানে কার্যরত বড় আকারের টোকাম্যাক সম্বন্ধে ধারণার জন্যে আমরা আমেরিকার প্রিন্সটনে অবস্থিত টি এফ টি আর (টোকাম্যাক ফিউশ্যান টেস্ট রিয়্যাক্টর) যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি :
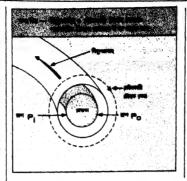
কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তোলা সম্ভব হয়েছে। তবে n ও τ-এর গুণফলের মান যথেষ্ট না হওয়ায় লসনের শর্ত পালিত হয়নি। আবার এম আই টি-তে অবস্থিত অ্যাল্‌কাটর যন্ত্রের প্লাজমায় লসনের শর্ত পালিত হয়েছে কিন্তু উষ্ণতা যথেষ্ট হয়নি। আশা করা যাচ্ছে, সংযোজন চুল্লির জন্যে প্রয়োজনীয় দুটি শর্তই অদূর ভবিষ্যতে একসঙ্গে পালিত হওয়া সম্ভবপর হবে।

টোকাম্যাক সম্পর্কিত গবেষণায় লক্ষণীয় অগ্রগতির মূলে যে প্রধান কারণগুলি রয়েছে, সেগুলি নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

(১) তপ্তকরণের পরিপূরক ব্যবস্থা —প্লাজমার

৮নং চিত্র — বলয়াকৃতি আধারে বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎপত্তি

চিত্র : নীলরতন মাইতি
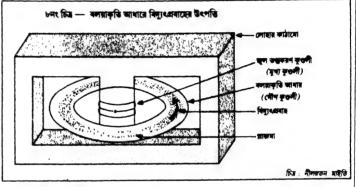
প্রধান ব্যাসার্ধ ২ মিটার ৪৮ সেন্টিমিটার, গৌণ ব্যাসার্ধ ৮৫ সেন্টিমিটার, বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্র ৫·২ টেসলা অর্থাৎ ৫২,০০০ গাউস, প্লাজমায় সর্বাধিক বিদ্যুৎপ্রবাহ ২·৫ মেগা-অ্যাম্পীয়ার অর্থাৎ ২৫ লক্ষ অ্যাম্পীয়ার। কয়েক মাস আগের খবরে প্রকাশ, টি এফ টি আর যন্ত্রে ডয়টেরিয়াম-ট্রিটিয়াম প্লাজমার উষ্ণতাকে ২০

উষ্ণতাকে যথেষ্ট বাড়াতে হলে কেবল বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে তা সম্ভব নয়, কারণ উষ্ণতা বাড়তে থাকলে প্লাজমার রোধ কমে যায় এবং 'জুল তপ্তকরণ' ক্রমেই অকেজো হয়ে পড়ে। সুতরাং উষ্ণতা বাড়াবার জন্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছাড়াও পরিপূরক ব্যবস্থা থাকা দরকার। শক্তিশালী বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ কণাগুচ্ছ
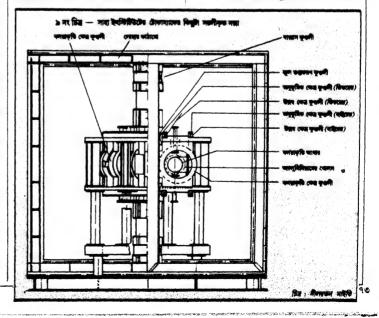
৯ নং চিত্র —

চিত্র : নীলরতন মাইতি
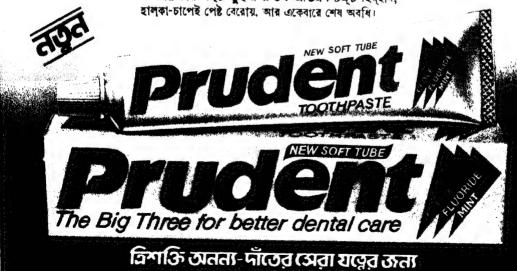
অথবা উচ্চশক্তিসম্পন্ন বেতার তরঙ্গ বা মাইক্রো-তরঙ্গ বলয়াকৃতি আধারে প্লাজমার মধ্যে পাঠিয়ে উষ্ণতা বহুলাংশে বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

(২) ডি-টি খণ্ডের অনুপ্রবেশ— টোকাম্যাক যন্ত্রে সাধারণত ডয়টেরিয়াম-ট্রিটিয়াম (সংক্ষেপে ডি-টি) গ্যাসকে প্লাজমায় রূপান্তরিত করে তাকে উত্তপ্ত করা হয়। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ঐ প্লাজমার মধ্যে যদি যথাসময়ে ক্ষুদ্রাকৃতি ডি-টি খণ্ডকে (DT pellet) ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে তা নিমেষের মধ্যে বাষ্পীভূত হয়ে প্লাজমায় রূপান্তরিত হয় এবং এইভাবে n ও t-এর গুণফলের মান বেশ কিছুটা বেড়ে যেতে পারে। বস্তুত এই পদ্ধতিতেই সর্বপ্রথম অ্যাল্‌কাটর যন্ত্রে লসনের শর্ত পালন করা সম্ভব হয়েছিল।

(৩) প্লাজমার আকৃতি— কোন কোন টোকাম্যাকে বলয়াকৃতি আধারে প্লাজমার আকৃতিকে এমন করা হচ্ছে যে, তার উল্লম্ব প্রস্থচ্ছেদের আকৃতি বৃত্তাকার না হয়ে হয় ইংরেজি অক্ষর D-এর মতন বা বরবটির বীজের চেহারার মতন। এর ফলে একই চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত বেশি চাপযুক্ত প্লাজমাকে (অর্থাৎ উষ্ণতা সমান থাকলে বেশি ঘনত্বের প্লাজমাকে) আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব। তবে এতে প্লাজমার মধ্যে অস্থায়িত্ব অবশ্য বেড়ে যায়।

(৪) অতি পরিবাহী চুম্বক— বিদ্যুৎবাহী উপাদান যদি অতি পরিবাহী হয়, তা হলে তার মধ্য দিয়ে বিপুল বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠালেও তার উত্তপ্ত হয়ে ওঠার সমস্যা থাকে না এবং এইভাবে প্রচণ্ড শক্তিশালী চুম্বক তৈরি করা যায়। এরকম অতি পরিবাহী চুম্বক (super conducting magnet) ব্যবহার করে টোকাম্যাকে চৌম্বক ক্ষেত্রকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

(৫) অবিশুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ— প্লাজমার মধ্যে অবিশুদ্ধির (impurities) উপস্থিতি দূষণের কাজ করে ; দূষণ অর্থাৎ দূষিত পদার্থের উপস্থিতি যেমন মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, অবিশুদ্ধির উপস্থিতি তেমনি প্লাজমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। বিশেষত কয়েক ধরনের অবিশুদ্ধি প্লাজমার মধ্যে থাকলে বিকিরণজনিত শক্তিক্ষয় অনেকাংশে বেড়ে যায় ও প্লাজমা অচিরেই উষ্ণতা হারায়। বলয়াকৃতি আধারের ভিতরের দেওয়ালকে যাতে যথাসম্ভব পরিষ্কার ও অক্ষত রাখা যায় এবং প্লাজমা যাতে যথাসম্ভব কম তার সংস্পর্শে আসে, তার জন্যে নানান ব্যবস্থা অবলম্বন করে প্লাজমায় অবিশুদ্ধির পরিমাণকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা গেছে।

ভারতে টোকাম্যাক

শক্তি-সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে টোকাম্যাকের অপরিসীম গুরুত্ব ও এই যন্ত্র সম্পর্কিত গবেষণায় উন্নত দেশগুলির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বিবেচনা করলে আমাদের দেশে এই বিষয়ে গবেষণা শুরু করবার আবশ্যকতা সহজেই বুঝতে পারা যায়। ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুতি হিসেবে এখন থেকেই
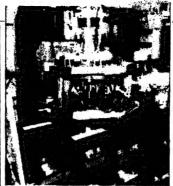
ভারতের প্রথম টোকাম্যাক (১০ নং চিত্র)

টোকাম্যাক ও তার ভিতরের অত্যুষ্ণ প্লাজমা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করা দরকার। তাছাড়া মনে রাখা দরকার যে, টোকাম্যাক সম্পর্কিত কিছু কিছু সমস্যার এখনো সমাধান হয়নি ; এইসব সমস্যার সমাধানে যদি আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করেন, তা হলে তাঁদের সেই গবেষণা একদিকে যেমন সত্যিকারের অর্থবহ হবে, অন্যদিকে তেমনি আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম অগ্রসর বিষয়ের চর্চার ক্ষেত্রে ভারতের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে।

সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে দুটি টোকাম্যাক প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। একটি হল কলকাতার সাহা ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নামক প্রতিষ্ঠানে ; গত প্রায় ২৫ বছর ধরে প্লাজমা সম্পর্কে সেখানে যে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে, তারই সম্প্রসারণ হিসেবে এই প্রকল্পের অবতারণা। অন্য প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল আমেদাবাদের ফিজিকাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে 'প্লাজমা ফিজিক্স প্রোগ্রাম'-এর নামে ; কয়েক মাস আগে মূলত প্রকল্পটিকেই ঘিরে আমেদাবাদের কাছে গান্ধীনগরে গড়ে উঠেছে ইন্সটিটিউট ফর প্লাজমা রিসার্চ। দুটি প্রকল্পেরই উদ্দেশ্য : টোকাম্যাক সম্পর্কিত কিছু কিছু বিষয়ে মৌলিক গবেষণা এবং এই যন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভ ও অভিজ্ঞতা অর্জন।

সাহা ইন্সটিটিউটের টোকাম্যাকের একটু বিস্তৃত পরিচয় এখানে দেওয়া হবে। ভারতে এটিই সর্বপ্রথম টোকাম্যাক। ঐ ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বিশদ আলোচনার ভিত্তিতে এই যন্ত্র ও তার প্রধান আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলি তৈরি করেছেন জাপানের টোশিবা কর্পোরেশন নামক খ্যাতনামা কোম্পানী। যন্ত্রটিকে বসানো ও চালানোর জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় পরিকাঠামো ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে তাঁদের বিধাননগরের গবেষণাগারে তৈরি করা হয়েছে। ঐ যন্ত্র ও তার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলিকে আমদানি করে গত মে মাসে সেগুলিকে যথাস্থানে বসানো হয়েছে এবং যন্ত্রটির বিভিন্ন অংশ পরীক্ষার পর গত ১০ জুলাই এটিকে চালু করা হয়েছে সার্বিকভাবে।

এই টোকাম্যাকের একটি ছবি ১০ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। এটি দৈর্ঘ্যে ২ মিটার ৬৯ সেন্টিমিটার ও উচ্চতায় ২ মিটার ৬২ সেন্টিমিটার ; ওজনে প্রায় আট টন। যন্ত্রটির মূল অংশগুলি নির্দেশ করবার জন্যে কিছুটা সরলীকৃতভাবে এর একটি নকশা ৯ নং চিত্রে দেখানো হল। নকশাটির বাঁ দিকের অর্ধাংশে যন্ত্রটিকে অক্ষত দেখিয়ে ডান দিকের অর্ধাংশে দেখানো হয়েছে যন্ত্রটির মাঝখান বরাবর একটি উল্লম্ব প্রস্থচ্ছেদ অর্থাৎ যন্ত্রটিকে ঠিক মাঝখান দিয়ে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কেটে ফেললে ভিতরের অংশ যেভাবে দেখা যাবে, সেই প্রস্থচ্ছেদ। চিত্রে যে লোহার কাঠামো দেখা যাচ্ছে, তা হচ্ছে টোকাম্যাকের ট্রান্সফর্মারের অংশ ; ৮ নং চিত্র প্রসঙ্গে এই ট্রান্সফর্মারের কার্যপ্রণালী আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই কাঠামোর মাঝখানে ২৪ সেন্টিমিটার ব্যাসের যে দণ্ডটি রয়েছে, তাকে ঘিরে আছে নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত নির্মিত বলয়াকৃতি আধার, যার মধ্যে তৈরি হয় অত্যুষ্ণ প্লাজমা। এই প্লাজমার প্রধান ব্যাসার্ধ ৩০ সেন্টিমিটার, গৌণ ব্যাসার্ধ ৭$\frac{১}{২}$ সেন্টিমিটার। আধারটির ভিতরে 'সীমিতকারী' (limiter) নামে কয়েকটি পাত ব্যবহার করে প্লাজমাকে দেওয়াল থেকে কিছুটা দূরে সীমিত রাখবার প্রাথমিক ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলয়াকৃতি আধারকে বাইরে থেকে ঘিরে আছে একটি অ্যালুমিনিয়ামের খোলস (shell)। আধারের মধ্যে প্লাজমাকে যথাস্থানে আবদ্ধ রাখায় এর একটি ভূমিকা আছে। আধার ও খোলসকে বেষ্টন করে রয়েছে ষোলটি বলয়াকৃতি ক্ষেত্র কুণ্ডলী। এগুলির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়ে প্লাজমার কেন্দ্রস্থলে ২ টেস্‌লা (অর্থাৎ ২০,০০০ গাউস) পর্যন্ত চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায়।

ট্রান্সফর্মারের মাঝখানের দণ্ডকে বেষ্টন করে আছে দুটি জুল তপ্তকরণ কুণ্ডলী— এরা ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীর কাজ করে। এ দুটিতে বিদ্যুৎপ্রবাহের মান একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি হলে ট্রান্সফর্মারের লৌহ-অংশ সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ বিদ্যুৎপ্রবাহ বাড়ালেও চৌম্বক বলরেখারা আর বাড়তে চায় না। বায়্যাস কুণ্ডলী (bias coil) নামে দুটি অতিরিক্ত কুণ্ডলী ব্যবহার করে ও তাদের মধ্য দিয়ে যথাযথ বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়ে প্রথমে ট্রান্সফর্মারের মধ্যে ঈপ্সিত দিকের বিপরীত দিকে চৌম্বক বলরেখা সৃষ্টি করে রাখা হয়। এভাবে জুল তপ্তকরণ কুণ্ডলীতে কার্যকর বিদ্যুৎপ্রবাহের মান প্রায় দ্বিগুণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। ফলে বলয়াকৃতি আধারের মধ্যে ৭৫,০০০ অ্যাম্পীয়ার পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে এই বিদ্যুৎপ্রবাহ স্বভাবতই পরিবর্তনশীল ও কয়েক মিলিসেকেণ্ড মাত্র স্থায়ী। ট্রান্সফর্মারের মাঝখানের দণ্ডকে একটু দূর দিয়ে বেষ্টন করে রয়েছে চারটি উল্লম্ব ক্ষেত্র কুণ্ডলী ও চারটি অনুভূমিক ক্ষেত্র কুণ্ডলী। এদের অর্ধেক রয়েছে উপরের অংশে ও অর্ধেক নিচের অংশে। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, এইসব কুণ্ডলীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে বলয়াকৃতি আধারে প্লাজমাকে যথাস্থানে আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করা হয়।

বলয়াকৃতি ক্ষেত্র কুণ্ডলী, জুল তপ্তকরণ

কুণ্ডলী ও উল্লম্ব ক্ষেত্র কুণ্ডলীতে যথেষ্ট বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনার জন্যে প্রথমত বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন থেকে পৃথক পৃথক 'ক্যাপাসিটার ব্যাংকে' (capacitor bank) বিদ্যুৎ-শক্তি সঞ্চিত করে রাখা হয়। পরে ঐ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে খুব সামান্য সময়ের জন্যে ঐ কুণ্ডলীগুলির মধ্য দিয়ে বিপুল বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠানো হয় এবং তার ফলে প্রয়োজনীয় প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়ে কয়েক মিলিসেকেণ্ডের জন্যে উষ্ণ আবদ্ধ প্লাজমার উৎপত্তি ঘটায়। এভাবে পাঁচ মিনিট (বা আরো বেশি সময়) অন্তর অন্তর বলয়াকৃতি আধারে উষ্ণ প্লাজমা উৎপন্ন করা যেতে পারে। বায়্যাস কুণ্ডলী ও অনুভূমিক ক্ষেত্র কুণ্ডলীর জন্যে ক্যাপাসিটার ব্যাংক ব্যবহার করা হয় না; বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের পরিবর্তী প্রবাহ থেকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থায় সমপ্রবাহ তৈরি করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঐ কুণ্ডলীগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বলয়াকৃতি আধারে প্লাজমা তৈরি করবার আগে বায়ু-নিষ্কাশন পাম্পের সাহায্যে সেটিকে যথাসম্ভব বায়ুশূন্য করে ফেলা হয়। এই অবস্থায় আধারটিকে সংলগ্ন একাধিক হিটার কুণ্ডলীতে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়ে একনাগাড়ে তিন-চার দিন ধরে আধারটিতে ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় উত্তপ্ত রাখা হয়। আধারটিকে এইভাবে 'সেঁকে নেওয়ার' (baking) উদ্দেশ্য: আধারটির ভিতরের দেওয়ালের মধ্যে যে সব গ্যাসীয় অণু-পরমাণু শোষিত হয়ে বা অন্যভাবে আবদ্ধ থাকে, সেগুলিকে দেওয়াল থেকে বের করে দেওয়া, যাতে সেগুলি পাম্পের মাধ্যমে আধার থেকে বেরিয়ে চলে যায়। প্লাজমা উৎপন্ন হলে সেগুলি তা হলে আর দেওয়াল থেকে বেরিয়ে এসে প্লাজমাকে দূষিত করবে না। যা হোক, এইভাবে আধারটিতে বায়ুর চাপ হয় মাত্র ১০[illegible] মি·মি· পারদ। অতঃপর আধারটিতে ডয়টেরিয়াম বা যে কোন ইপ্সিত গ্যাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এক বিশেষ ব্যবস্থায়, যাকে বলা হয় 'গ্যাস ফুৎকার ব্যবস্থা' (gas puffing system) অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করা হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে। $১০^{-৩}$ থেকে $১০^{-৪}$ মি· মি· পারদ, এইরকম চাপের সেই গ্যাসকে সামান্য কিছুটা আয়নিত করা হয় প্রাক-আয়নন ব্যবস্থার (pre-ionization system) সাহায্যে।

এই ব্যবস্থায় আধারটির এক অংশের মধ্য দিয়ে দ্রুতগামী ইলেকট্রনগুচ্ছ পাঠানো হয় এবং গ্যাসের অণু-পরমাণুর সঙ্গে ইলেকট্রনদের সংঘর্ষের মাধ্যমে আয়নন ঘটিয়ে প্লাজমা উৎপাদনের প্রাথমিক পর্ব সম্পন্ন করা হয়, যাতে তারপর বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশের সাহায্যে উষ্ণ প্লাজমা উৎপাদন অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে।

বলয়াকৃতি আধারের চারধারে এবং উপরে ও নিচে মোট ৪৪টি বড় বড় ছিদ্র আছে। এইসব ছিদ্রের সঙ্গে যুক্ত নলগুলিকে ৯ নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে। এই সব নল ও ছিদ্রের মাধ্যমে বলয়াকৃতি আধারের ভিতরের প্লাজমা সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া হয়। এটা করা হয় দু ভাবে: এক, প্লাজমা থেকে যে সব কণা ও বিকিরণ বাইরে বেরিয়ে আসে, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে; দুই, বাইরে থেকে বিকিরণ (মাইক্রো-তরঙ্গ, লেসারের আলো ইত্যাদি) বা কণাগুচ্ছ প্লাজমার মধ্যে পাঠিয়ে তাদের উপর প্লাজমার প্রভাব লক্ষ্য করে।

বিধাননগরে সাহা ইনস্টিট্যুট ভবনের একতলায় যে ভাবে টোকাম্যাক ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিগুলি রাখা আছে, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যাক। একটি গবেষণাগারের কিছুটা একধারে রয়েছে মূল টোকাম্যাক যন্ত্র; অন্য ধারে রয়েছে একটি নিয়ন্ত্রক (controller), যা বায়ু-নিষ্কাশন পাম্পের কাজ, বলয়াকৃতি আধারকে সেঁকে নেওয়া, আধারে গ্যাসের ফুৎকার ও গ্যাসের প্রাক-আয়ননকে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে। সামনের ঘরে রয়েছে ক্যাপাসিটার ব্যাংক ইত্যাদি বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবস্থা ও সেগুলির একটি নিয়ন্ত্রক। টোকাম্যাক যন্ত্রের ঘরের পাশের নিয়ন্ত্রণ-কক্ষে রয়েছে মূল নিয়ন্ত্রক; টোকাম্যাকের মধ্যে প্লাজমা উৎপাদনের সময় তার সাহায্যে যাবতীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। টোকাম্যাক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষিত হয় ভূগর্ভস্থ তারসমষ্টিকে (ও কোন কোন ক্ষেত্রে আলোকবাহী তন্তুকে) কাজে লাগিয়ে। টোকাম্যাক যন্ত্রের দু'পাশে যে বেশ কিছুটা জায়গা রাখা আছে, সেখানে ভবিষ্যতে বেতার তরঙ্গের সাহায্যে প্লাজমাকে উষ্ণতর করবার পরিপূরক ব্যবস্থা রাখা হবে, এরকম পরিকল্পনা রয়েছে। তাছাড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার জন্যে টোকাম্যাকের চারধারে নানান যন্ত্রপাতি বসানোর তোড়জোড় চলেছে। তেমনি আবার আয়োজন হচ্ছে ঐ সব পরীক্ষার তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্যে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে হরেক রকম ব্যবস্থা বসানোর।

সাহা ইনস্টিট্যুটের টোকাম্যাক ব্যবহার করে ঐ ইনস্টিট্যুটের বিজ্ঞানীরা যে সব মৌলিক গবেষণার কথা চিন্তা করছেন, সেগুলির দু-তিনটি নিচে উল্লেখ করা হল:

(১) উষ্ণ প্লাজমা থেকে নানারকম বিকিরণ এবং কিছু কিছু কণাও বলয়াকৃতি আধারের ভিতরের দেওয়ালে গিয়ে আঘাত করে। তখন দেওয়াল থেকেও কণা ও বিকিরণ প্লাজমার মধ্যে প্রবেশ করে। এই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা জ্ঞান লাভ করতে উৎসুক কারণ সংযোজন চুল্লিতে এগুলির সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে।

(এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, টোকাম্যাক যন্ত্রে সুদৃঢ় চৌম্বক পিঞ্জর থাকলেও প্লাজমার কিছু কিছু কণা কিভাবে দেওয়ালে পৌঁছয়? এর উত্তর হল: যদিও আহিত কণা চৌম্বক বলরেখার চারধারে পাক খেতে খেতে ঐ রেখা বরাবর চলমান হয়, অন্য কোন কণার সঙ্গে সংঘর্ষ হলে তার গতিপথ পরিবর্তিত হয় এবং সে বাইরের দিকে খানিকটা চলে যেতে পারে। এইভাবে কয়েক বার সংঘর্ষের ফলে ঐ কণা ক্রমশ বাইরের দিকে চলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আধারের দেওয়ালে পৌঁছয়। তাছাড়া প্লাজমার মধ্যে স্বতই যে সব স্পন্দনশীল বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, তাদের প্রভাবেও আহিত কণা ক্রমে বাইরের দিকে চলে যেতে পারে।)

(২) প্লাজমার মধ্যে নানা ধরনের 'অস্থায়িত্ব' বা ক্রমবর্ধমান চাঞ্চল্য দেখা দেয়, যেগুলি প্লাজমার অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলতে পারে। এগুলির প্রকৃতি সম্যক ভাবে নিরূপণ করে তাদের উৎপত্তি বন্ধ করবার উপায় নির্ধারণ করা বিজ্ঞানীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

(৩) টোকাম্যাকের প্লাজমার উষ্ণতা বাড়াবার জন্যে অন্যতম পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ প্রয়োগের কথা আগে বলা হয়েছে। এই প্রয়োগের যে সব সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি, সাহা ইনস্টিট্যুটে সেগুলি সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার পরিকল্পনা রয়েছে।

আরো উল্লেখ্য যে, ভারতের পূর্বাঞ্চলে উষ্ণ প্লাজমা বিষয়ক শিক্ষণ-কেন্দ্র হিসেবে যাতে সাহা ইনস্টিট্যুটের অগ্রণী ভূমিকা থাকে, টোকাম্যাককে ঘিরে সেরকম পরিকল্পনাও রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে টোকাম্যাকের ভিত্তিতে সার্থক সংযোজন চুল্লির নির্মাণ প্রায় সুনিশ্চিত; তখন উষ্ণ আবদ্ধ প্লাজমা সম্পর্কিত প্রযুক্তিবিদ্যার চাহিদা নিঃসন্দেহে খুব বেশি করে দেখা দেবে।

গান্ধীনগরে ইনস্টিট্যুট ফর প্লাজমা রিসার্চ নামক প্রতিষ্ঠানে যে টোকাম্যাক স্থাপিত হবে, তার জন্যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সাহা ইনস্টিট্যুটের টোকাম্যাক প্রকল্প গ্রহণের অনেক আগে থাকতেই। এই টোকাম্যাকের নাম হবে 'আদিত্য'। এর প্রধান ব্যাসার্ধ হবে ৭৫ সেন্টিমিটার, গৌণ ব্যাসার্ধ ২৫ সেন্টিমিটার, বলয়াকৃতি চৌম্বক ক্ষেত্র ১৫,০০০ গাউস ও প্লাজমায় বিদ্যুৎপ্রবাহ ২৫০ হাজার অ্যামপীয়ার। এই টোকাম্যাক মূলত ভারতেই তৈরি করা হচ্ছে তবে শতকরা ২০-২৫ ভাগ যন্ত্রাংশ ও উপাদান আমদানি করা হবে বিদেশ থেকে।

জেট, টি এফ টি আর ইত্যাদি যে-সব বিরাট টোকাম্যাকের কথা আগে বলা হয়েছে, সেগুলির তুলনায় ভারতের দু'টি টোকাম্যাকই অনেকখানি ছোট আকারের। তবে এ দু'টির মাধ্যমে আমাদের দেশে যে টোকাম্যাক সম্পর্কিত গবেষণার সূচনা হচ্ছে, এটা আনন্দের কথা। আরো উল্লেখ্য যে, উন্নত দেশগুলি সমেত অন্যান্য কয়েকটি দেশেও একাধিক ছোট টোকাম্যাক নিয়ে কাজকর্ম হচ্ছে, কারণ কিছু কিছু মৌলিক গবেষণার পক্ষে এগুলি অত্যন্ত উপযোগী এবং সেই সব গবেষণার ফল সার্থক সংযোজন চুল্লি নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যেই আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা সম্প্রতি বিশেষ সভার ব্যবস্থা করছেন ছোট টোকাম্যাকগুলিতে প্রাপ্ত ফলাফল আলোচনা করবার জন্যে; প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে হাঙ্গেরির বুডাপেস্টে এবং দ্বিতীয় সভা গত বছর জাপানের নাগোয়ায়। আমরা আশা করব, ভারতে টোকাম্যাক সম্পর্কিত গবেষণা সার্থক হবে এবং সংযোজন চুল্লি নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারত তার স্বাক্ষর রাখতে পারবে।

চিত্র : নীলরতন মাইতি

স্বপ্ন আজ সার্থ[illegible] হয়েছে!

পাইলট! এরোপ্লেন চালানোই ওর জীবনের স্বপ্ন ছিল। ছেলেবেলা থেকে ওর এই একই ধ্যান এবং একই ভাবনা। আমার মনে আছে, ওকে শক্ত-সমর্থ ভাবে বেড়ে ওঠার জন্য দিনে দুবার করে হরলিক্স খেতে বলতাম।

আজ ওর স্বপ্ন সত্যিই সার্থক হয়েছে — ভেবে কত ভাল লাগছে, ওকে দিনে দুবার করে হরলিক্স খাবার অভ্যাস করিয়েছিলাম।

এত বছর ধরে হরলিক্সই ওকে সার্থকতার পথ দেখিয়েছে।

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে উপকারী

হরলিক্স ঘন দুধ, মল্টেড বার্লি আর সোনালী গমের দানার পুষ্টিগুণে ভরা একটি সুস্বাদু পানীয়।
১০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে, পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি পরিবারে পুষ্টি যুগিয়ে আসছে।

পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়

বিজ্ঞান যেখানে মাটির কাছাকাছি

সমরজিৎ কর

সৌরশক্তি মানুষের জীবনধারায় কত দ্রুত পরিবর্তন আনতে পারে ত্রিপুরার বড়মুড়া হিলস তার প্রমাণ। রাজধানী আগরতলা। কলকাতা থেকে বিমানে মিনিট পঁয়ত্রিশের মত পথ। দূরত্ব কম হলেও দুই রাজধানীর মধ্যে অনেক পার্থক্য। কলকাতা কংক্রিট এবং কারখানার শহর। আগরতলা প্রাকৃতিক স্বর্গ। শহরময় অজস্র গাছপালা। টিনে ছাওয়া ছোট ছোট ঘরবাড়ি। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনেই ছোট্ট একটি বাগান। শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদ। এখন যা বিধানসভা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। চোখে পড়বে কিছু কিছু আবাসন এবং সরকারি দপ্তরের ঘরবাড়ি। এগুলি অবশ্য কংক্রিটের। শহর ছেড়ে আসাম যাওয়ার পথ ধরে এগিয়ে গেলেই পড়বে একের পর এক গ্রাম। তারপর অরণ্য পরিবৃত পাহাড়ী অঞ্চল। বড়মুড়া, আঠারোমুড়া।

৫ আগস্ট ত্রিপুরা বিজ্ঞান সভার নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম আগরতলায়। ৬ আগস্ট হিরোসিমা দিবস। এই উপলক্ষে ওই দিন তাঁরা একটি জনসভার আয়োজন করেছিলেন। সেই সভায় উপস্থিত থাকার জন্যই নিমন্ত্রণ।

বিকেল পৌনে চারটেয় আগরতলা বিমানবন্দরে পৌঁছতেই দেখি ত্রিপুরা বিজ্ঞান সভা থেকে এসেছেন দেবাশিস দাশগুপ্ত এবং সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। দুজনই এই বিজ্ঞান সভার কর্মী, তরুণ। বয়েস তিরিশের কিছু বেশি। তাঁদের সঙ্গে মিনিট কুড়ির মধ্যে গিয়ে হাজির হলাম ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান এবং কারিগরি কাউন্সিলের ডেপুটি সেক্রেটারি এবং ভারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী শ্রীশান্তিপদ গণচৌধুরীর দপ্তরে। তিনিই ত্রিপুরা বিজ্ঞানসভার সেক্রেটারি।

দেবাশিস পরিচয় করিয়ে দিতেই শান্তিবাবুই তুললেন সৌর শক্তির কথা। বললেন, ত্রিপুরায় প্রচুর পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গেছে। সেই গ্যাসের সাহায্যে বড়মুড়ায় উৎপাদন করা হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তি। প্রয়োজনে কিছুটা বিদ্যুৎ আমরা পাই আসাম থেকে। তার সবটাই ব্যবহৃত হয় শহরাঞ্চলে এবং এমন সব জায়গায় যেখানে বিদ্যুতের তার নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। যে সব জায়গায় তার টেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি, সেখানে আমরা সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করছি। এর জন্য কাজে লাগান হচ্ছে ফোটোভোল্টেইক কোষ। বিশেষ করে সেই সব অঞ্চলে যেখানে তার খাটিয়ে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে খরচ পড়ে অনেক। চলুন না, বড়মুড়ার একটি গ্রাম দেখে আসুন। প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলে আদিবাসী কুকীদের গ্রাম। সেখানে গেলে সৌরবিদ্যুৎ যে মানুষের জীবনে কতটা পরিবর্তন আনতে পারে নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।

বললাম, কখন যাবেন।

এখুনি যেতে পারি। বললেন শান্তিবাবু।

বেশ তো, চলুন। পথে যেতে যেতে সাধারণ মানুষের জন্যে আপনারা যে সব পরিকল্পনা নিয়েছেন সে সম্পর্কে শোনা যাবে।

তা হলে আর দেরি করে লাভ নেই, চলুন।

জিপে গিয়ে উঠলাম। সামনের আসনে। পাশে শান্তিবাবু। পেছনের আসনে দেবাশিস এবং সঞ্জয়।

আগরতলা ছোট্ট শহর। মাত্র এক লক্ষ মানুষের বাস। উঁচু নিচু পথ ধরে শহরের বাইরে আসতে সময় লাগল মিনিট দশেকের মত। তারপর হাইওয়ে। চলে গেছে আসামের কাছাড় জেলার দিকে। কিছুটা এগোতেই দুপাশে ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে গ্রাম। সেখানকার অধিবাসীদের বেশির ভাগই বাংলাভাষী। কয়েকটি আদিবাসী এলাকাও পড়ল। কুড়ি কিলোমিটারের মত এগোতেই শুরু হল চড়াই। এখান থেকে বড়মুড়া হিলসের শুরু। ঢেউ এর মত পাহাড়। এক একটি ঢেউএর মাথা এক একটি চূড়া। মোট বারোটি চূড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই পার্বত্য এলাকা। সম্ভবত বারোচূড়াই অপভ্রংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে 'বড়মুড়া'য়।

এক পাশে পড়ল একটি নদী। খাদের মত। হাঁটু প্রমাণ জল। স্রোতও রয়েছে। দেখলাম সেই স্রোত ভেঙে একটি লোক ধীর পদে হেঁটে চলেছে। তার হাতে একটি মাটির কলস।

শান্তিবাবু ড্রাইভারকে গাড়ি দাঁড় করাতে

ধোঁয়াহীন চুল্লিতে রান্না করছেন রানীর খামার গ্রামের বধূ মণিরানী দাস

বললেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, আসুন। এ অঞ্চলের আদিবাসীরা কি ভাবে পানীয় জল সংগ্রহ করে দেখে যান। বলেই সেই লোকটিকে দেখালেন তিনি।

বুঝতে পারলাম, কলস নিয়ে লোকটি নদীতে নেমেছে পানীয় জল সংগ্রহ করতে। নদীর নাম হাওড়া ।

আমার মনের কথাটি হয়ত ধরতে পেরেছিলেন শান্তিবাবু। বললেন, ভাবছেন লোকটি নদী থেকে জল সংগ্রহ করছে ? না না। ও তো মাটি গোলা জল। ও জলে রোগ জীবাণু আছে। আছে আরো নানা রকম ক্ষতিকর সামগ্রী। এখানকার মানুষ নদীর জল কখনো পান করে না।

তা হলে লোকটা যাচ্ছে কোথায় ?

সেটাই তো দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। আসুন।

গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। পাহাড়ের গা ঘেঁষে পথ। পথের ঠিক পাশ বেয়ে নেমে গেছে খাড়াই। জুতো মোজা খুলে খাড়াই বেয়ে নদীতে নেমে জল ভেঙে গিয়ে হাজির হলাম সেই লোকটির কাছে। নদীর বিপরীত পারে। হাঁটুর নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে জলস্রোত। জলের তল থেকে ফুট তিনেক উপর খাড়াই পাড়ে লাগান রয়েছে আধ চেরা একটি বাঁশের টুকরো। লোকটি তার ডগায় ধরে রেখেছে হাতের কলস। আর সেই বাঁশের খোল বেয়ে জল এসে পড়ছে কলসের ভেতর।

লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, এই জলই কি আপনারা খেয়ে থাকেন ?

আমরা কেন, সবাই খায়। চিরকাল এই জলই খেয়ে আসছে এ অঞ্চলের মানুষ। একসময় আমাদের রাজারাও খেতেন। লোকটি বলল।

বুঝতে অসুবিধা হয়নি। জলের উৎসটি আসলে একটি প্রস্রবণ। ভূস্তরে জমে থাকা জল অবিরত ধারায় ঝরে পড়ছে। সেই ধারাই এ অঞ্চলের পানীয় জলের অন্যতম উৎস।

শান্তিবাবু বললেন, ওই যে শুনলেন না, এক সময় এ জল রাজারাও খেতেন। এদের বিশ্বাস, যে জল রাজারা খেতেন সে জল তো অমৃত। সে বিশ্বাস এখনো ম্লান হয়নি।

জিজ্ঞেস করলাম তা না হয় হোল। কিন্তু এ জল যে অপকারী নয়, তারই বা প্রমাণ কি ?

এ ধরনের ধারার জল পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষায় রোগ জীবাণু বা অনিষ্টকারী কোন বস্তু ধরা পড়েনি। উৎকৃষ্ট জল। কত পরিষ্কার দেখছেন তো ? একটু খেয়েই দেখুন না।

ধারার জল পান করলাম। সত্যিই সুস্বাদু। কাচের মত স্বচ্ছ জল।

শান্তিবাবু বললেন, ত্রিপুরার এ ধরনের অঞ্চলে নলকূপ তেমন কাজ করে না। নলকূপ বসাতে খরচও যেমন অনেক, বসানর অল্প দিন পর নষ্টও হয়ে যায়। তাই পানীয় জলের জন্যে এ ধরনের জল ধারার সংস্কারে হাত দিয়েছি আমরা। ধারাগুলির চারপাশ কংক্রিট দিয়ে বাঁধানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। বর্ষায় খাড়াই বেয়ে জল নামে। সেই জলে থাকে কাদামাটি। রোগজীবাণু। ধারার জলে যাতে তা মিশতে না পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির কোন দরকার নেই। একমাত্র প্রাকৃতিক পদ্ধতির সংরক্ষণ ছাড়া।

হাওড়া নদী ছেড়ে আরো কুড়ি কিলোমিটার উজিয়ে গেলাম বড়মুড়ার চড়াই উৎরাই পথ ধরে। একটি প্রাথমিক স্কুলের সামনে এসে আমাদের গাড়ি থামল। দেখলাম আমাদের আগেই সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে একদল তরুণ কর্মী। হাইওয়ে সোজা চলে গেছে কাছাড়ের দিকে। এখান থেকে কুকী পল্লীর দূরত্ব দুই কিলোমিটারের মত। এ পথে গাড়ি চলে না। সামনে ছোট্ট একটি মাঠ। মাঠ পেরোতেই পাঁচ ছয় মিটারের মত চওড়া একটি পার্বত্য নদী। একটু ডান দিকে বাঁক নিয়েই অবশ্য চওড়া হয়েছে। পাড় থেকে খানিকটা মাটি খাড়াই বসে গিয়ে নদীর বুকে এসে জমেছে এক ফালি টিবির মত।

সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসেছে ততক্ষণে। সেই আলোআঁধারি অবস্থায় একফালি গাছের কাণ্ডের উপর দিয়ে আমরা পার হয়ে গেলাম। তারপর শুরু হল ঘন বন। বনের ভেতর দিয়ে পায়ে চলার মত পথ। কিছুটা এগোতেই এক কুকী ছেলে বলল, দিন দুই আগে পাঁচিলের মত উঁচু এই জায়গাটায় নাকি বাঘ দেখা গিয়েছিল। শিশু বাঘ। নিশ্চুপ বসে ছিল টিবির উপর। লোকের সাড়া পেতেই গা ঢাকা দেয়।

মিনিট পনেরর মধ্যে আমরা অনেকটা উঠে এলাম। এবার গভীর অরণ্য। শাল সেগুনের বন। বুনো কলাগাছ। বাঁশের ঝাড়। কোথাও পাশ থেকে পাহাড়ের ঢাল নেমে গেছে অনেক নিচে। সেখানেও বন।

এক জায়গায় পাহাড়ের দুই ঢালের ফাঁক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটি খুদে নদী। শান্তিবাবু বললেন, 'এই নদীর এক পাশে বাঁধ দিয়ে আমরা জলাধার তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছি। এই জলাধার থেকে যাতে চাষের জল পাওয়া যায় তার জন্যেই এই উদ্যোগ। এছাড়া ওই জল এখানকার মানুষ পান করতেও পারবে। জলাধারে যাতে মাছ চাষ করা যায় তার কথাও ভেবেছি আমরা।

ততক্ষণে অন্ধকার নেমেছে। এবার টর্চের আলোয় পথ চলা। গাছপালার মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। কিন্তু কিছুটা এগোতেই রীতিমত বিস্ময়। দেখতে পেলাম, কিছু দূরে অন্ধকারের মাঝে বিদ্যুতের আলো। যেন বিদ্যুৎ আলোকিত এক আধুনিক পরিবেশ। দূর থেকে আলোকিত বসতি এলাকা যেমন দেখায়, ঠিক তেমনিই। সেখানে পৌঁছতে মিনিট পাঁচের বেশি লাগেনি।

পাহাড়ের এ জায়গাটা কিছুটা সমতল। সমতল ঈষৎ ঢালু হয়ে নেমে গেছে।

একপাশে কমিউনিটি পাওয়ার সাপ্লাই সেন্টার। সেন্টার বলতে একটি ছোট্ট বাড়ি। বাড়ির ছাদে ফোটোভোল্টেইক কোষের প্যানেল। সেই প্যানেল সূর্যের আলো থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে। বাড়িটির বাইরে বারান্দা। দুটি ঘর। একটি বড়। সন্ধ্যের দিকে সেখানে এসে হাজির হয় এখানকার কুকীপল্লীর মানুষ। ছেলে মেয়ে থেকে শুরু করে বউ-ঝি, পরিবারের পুরুষ। ঘরের এক কোণে রয়েছে টেলিভিসন। তার আকর্ষণেই আসে তারা। ছোট ঘরটিতে রয়েছে সঞ্চয়ক কোষ। ফোটোভোল্টেইক কোষ থেকে বিদ্যুৎ এসে জমে ওই সব কোষে।

শান্তিবাবুর সঙ্গে গ্রামটি দেখলাম। প্রত্যন্ত এই পরিবেশে কুকীরা কত যুগ ধরে বাস করছে কে জানে। না ছিল তাদের স্বাস্থ্যবিধি, না ছিল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা। দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে আবহমান কাল তারা বাস করে এসেছে এই গ্রামে। আহার্য বলতে ছিল বন্য লতাপাতা ফল মূল। অথবা বন্য প্রাণী। চাষবাস ছিল। তাও সামান্য। তাদের জীবনটাই ছিল আত্মকেন্দ্রিক। কিন্তু এখন তার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে।

এখানে এখন বাস করছে মোট পঞ্চাশটি পরিবার। প্রতিটি পরিবারের ঘরে জ্বলছে একটি করে টিউবলাইট। সন্ধ্যে হলেই তারা ভিড় করে টেলিভিসনের সামনে। টেলিভিসনের শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম তারা মন দিয়ে দেখে। দেখতে পায় ভারত এবং পৃথিবীর নানা রকম কাণ্ডকারখানা। সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম। ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীও দ্রুত পালটাচ্ছে।

একটা মজার কথা বললেন শান্তিবাবু।—জানেন, গোড়ায় এই টিউবলাইট নিয়ে এদের কিছুটা অসন্তোষ ছিল।

কেন ? প্রশ্ন করলাম।

গোড়ায় এদের আমরা যে সব টিউব দিই, সেগুলি সাধারণত যেসব টিউব আমরা ব্যবহার করে থাকি, তাদের চেয়ে লম্বায় ছিল অর্ধেক। সেই টিউব পেয়ে এদের ধারণা হয়, এরা গরীব বলে এদের বঞ্চিত করা হয়েছে। এর জন্যে পরে এদের আমরা লম্বা টিউবই দিয়েছি। এখন এরা খুশি।

কয়েক জনের বাড়িতে গেলাম। দেখলাম তারা ধোঁয়াহীন চুল্লিও ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তাদের বোঝান হয়েছে, বনের গাছপালা সংরক্ষণ করা দরকার। কম কাঠে যদি প্রয়োজন মত তাপ পাওয়া যায়, তা হলে কম গাছ কাটলেই চলে। এর জন্যেই ব্যবহার করা উচিত বিশেষ ধরনের চুল্লি। তাতে কম কাঠেই রান্না চলে। অথচ ঘরবাড়ি ধোঁয়ায় কালো হয় না। যে রাঁধে তার শারীরিক কষ্টও হয় না। এ ধরনের চিন্তাভাবনা ঢোকানোর জন্যে ত্রিপুরা সরকার বেসরকারি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য নিচ্ছেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রিপুরা বিজ্ঞান সভা।

এই কুকী গ্রামে আগে কোন পায়খানা ছিল না। এখন বসান হয়েছে কমিউনিটি ল্যাট্রিন। কুকী গ্রামের সবাই এই ল্যাট্রিনে অভ্যস্ত হয়েছে এখন। এ ছাড়াও দেখলাম ঘরে ঘরে ফিলটার। এখানকার সবাই এখন ফিলটার করা জল খায়। পোড়া মাটির তৈরি ফিলটার। দেখতে ঠিক বাজারের পলিথিন ফিলটারেরই মত। ত্রিপুরাতেই তৈরি হচ্ছে। বাজারের ফিলটারের দাম যেখানে চারশ টাকা, সেখানে এই ফিলটারগুলির এক একটির দাম পড়ছে তিরিশ টাকা। টিউব লাইট, টেলিভিসন, কমিউনিটি ল্যাট্রিন সবই দিয়েছে সরকার। ফোটোভোল্টেইক কোষ এসেছে সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক লিমিটেড অথবা ভারত

হেভী ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড থেকে। এ ধরনের কাজে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছে ভারত সরকারের বিজ্ঞান এবং কারিগরি দপ্তর।

শান্তিবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, সৌর কোষের সাহায্যে নিখরচায় বিদ্যুৎ সরবরাহের তো ব্যবস্থা করলেন। এখানকার মানুষকে পয়সা খরচ করে আর কেরোসিন তেলের আলো জ্বালাতে হয় না। তাতে দুর্লভ জ্বালানি তেলেরও সাশ্রয় হোল। কিন্তু এই যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা—ধরুন কারোর বাড়ির সুইচ অকেজো হয়ে গেল, অথবা বিদ্যুৎ সংযোগে দেখা দিল গোলমাল—সে ক্ষেত্রে মেরামতির কাজটি চালাবে কে? শহর তো দূরে। সেখান থেকে লোক ডেকে কাজ করান তো আর সব সময় সম্ভব নয়।

তারও ব্যবস্থা হয়েছে। বললেন শান্তিবাবু। একটা কথা বলে নিই। মানুষ দরিদ্র হলেই তো আর সব সময় ভিক্ষুক হয় না। এই যে কুকীদের দেখছেন। এরা আদিবাসী দরিদ্র। বিনে পয়সায় দিনের পর দিন বিদ্যুৎ নেওয়াটাকে এরা মর্যাদার চোখে দেখে না। অতএব আমরা বললাম ঠিক আছে। পরিবার পিছু মাসে পাঁচটি করে টাকা দাও। এরা রাজি হয়ে গেল। আমরা এই গ্রামেরই একটি ছেলেকে বেছে নিলাম। এই সেই ছেলে। বলেই একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। বছর কুড়ি বয়স। সলজ্জ। স্কুল ফাইনাল দেবে। বললেন, এই গ্রামের বৈদ্যুতিক কাজকারবারের দায়িত্ব আমরা একেই দিয়েছি। মোট পঞ্চাশটি পরিবার। সেখান থেকে পরিবার প্রতি পাঁচটাকা হিসেবে মাসে আড়াইশ টাকা পাওয়া যায়। এই ছেলেটিকেই দেওয়া হয় এই টাকা। তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুতের ব্যাপারে কোন গোলমাল হলে এই ছেলেটিই মেরামতি করে। এতে গ্রামবাসীর সমস্যাও মিটল, এই ছেলেটিও রোজগার করল মাসে আড়াইশ টাকা।

শুনলাম এ পর্যন্ত কুড়িটি আদিবাসী গ্রামে ফোটোভোল্টেইক কোষের সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলোক ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৮৭-৮৮ সালের মধ্যে এই ভাবে আরো দশটি গ্রামে যোগান হবে বিদ্যুতের আলো। এছাড়া সৌরশক্তি চালিত জলের পাম্প বসান হয়েছে কুড়িটি। এতে উপকৃত হয়েছেন এ রাজ্যের ২০০ জন চাষী, যাদের চাষবাসের জন্যে এতকাল শুধু বর্ষার জলের উপরই নির্ভর করতে হত। ১৯৮৭-৮৮ সালে আরো ১০০টি সৌর পাম্প বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

কুকী পল্লী থেকে ফেরার পথে গিয়েছিলাম বড়মুড়ার গ্যাস থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট দেখতে। তখন রাত প্রায় নটা। দুটি ইউনিট। একটি চলছে। টারবাইন খারাপ হয়ে যাওয়ায় অপরটি চালু করাই সম্ভব হয়নি। প্রাকৃতিক তেল এবং গ্যাস কমিশনের চেষ্টায় এ রাজ্যে পাওয়া গেছে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস। অতএব বিদ্যুৎ উৎপাদনের মত প্রয়োজনীয় গ্যাসের কোন ঘাটতি নেই। ঘাটতি যা, তা পরিচালনাগত ব্যবস্থাপনায়। শুধু যন্ত্র হলেই তো কাজ চলে না। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মানুষের। এখানে যেসব কর্মীরা রয়েছেন তাঁদের অসুবিধে অনেক। নিজেদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অরণ্যময় অঞ্চলে তাঁরা কাজ করেন। শহর আগরতলা মিনিট চল্লিশের পথ। সামনে সড়ক। সে সড়ক দিয়ে প্রতিদিন চলে সরকারি বাস। এক্সপ্রেস। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সামনে কোন স্টপ না থাকায় কর্মীরা যে তার সুযোগ নেবেন তার উপায় নেই। উঁচু মহলের সঙ্গে তাঁরা দরবারও করেছেন। শুনলাম পরিবহণ সচিবালয় থেকে স্টপের অনুমোদনও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গড়িমসিতে এখনো তা বাস্তবায়িত হয়নি। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের নিয়মিত শহরে যাতায়াতের জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা করেননি। তাতে কোন ক্ষতিও নেই। স্টেটবাসের স্টপ থাকলেই চলে যেত। তা না হওয়ায় কর্মীরা অসন্তুষ্ট। এখানে পানীয় জলেরও অভাব। তার জন্য দরকার একটি গভীর নলকূপ বলা বাহুল্য শুধু ত্রিপুরাতেই নয়, উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে ভারতের বেশির ভাগ বিদ্যুৎ কেন্দ্রেরই উৎপাদন ঠিক মত হয় না। এক্ষেত্রে ত্রিপুরার মত আরো নানা রকম হিউম্যান প্রোবলেম যে দায়ী, হয়ত অনেকেই সে কথা স্বীকার করবেন।

যে ব্যাপারটা সবচেয়ে ভাল লাগল সেটা হল, জনসাধারণকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলার জন্যে ত্রিপুরা সরকার বিভিন্ন জনহিতকর বিজ্ঞান সংস্থাকে প্রত্যক্ষ ভাবে কাজে লাগাচ্ছেন।

যেমন ধরুন, আগরতলার কিশোর বিজ্ঞান চক্র। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে। তারপর থেকেই জনসাধারণ বিশেষ করে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা তৈরির লক্ষ্য নিয়ে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটি। সেক্রেটারি সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বললেন, 'আমাদের বার্ষিক খরচ দশ হাজার টাকার মত। আমাদের সদস্যরা নিয়মিত গ্রামীণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে। এছাড়াও রাজ্য বিজ্ঞান প্রদর্শনী, পূর্ব ভারতীয় বিজ্ঞান ক্যাম্প এবং শিশুদের জন্যে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিজ্ঞান

রামনারায়ণ চক্রবর্তীর সোলার কুকারে রান্না চলছে

প্রদর্শনীতেও নিজেদের মডেল দেখিয়ে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে।' কিশোর বিজ্ঞান চক্রকে ত্রিপুরা সরকার এবছর পনের হাজার টাকা অনুদান দিয়েছে। এই টাকায় তাঁরা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে একটি ওয়ার্কশপ করবেন। এছাড়াও তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের জন্যে নিয়মিত আলোচনাচক্র, পোস্টার প্রদর্শনী, বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা এমন অনেক কিছুই করে আসছেন।

ত্রিপুরা সায়েন্স ফোরাম' বা ত্রিপুরা বিজ্ঞান সভা এখন আগরতলার একটি বিশিষ্ট বেসরকারি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় মাত্র বছর তিন আগে ১৯৮৩ সালে। জনসাধারণকে শুধু বিজ্ঞান সচেতন করে তোলাই নয়, দৈনন্দিন জীবনে তারা যাতে নানা রকম সমস্যারও সমাধান করতে পারে, সে ব্যাপারে ব্যাপক প্রকল্প নিয়ে কাজ করছেন তাঁরা। এঁদের কর্মধারা অনেক প্রোফেশনাল।

যেমন ধরুন, গোড়ায় এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবক হিসেব কাজ করতেন। এখন কোন কোন কর্মী সম্মানী পেয়ে

পথের আবর্জনা মুক্ত করার কাজে ত্রিপুরা বিজ্ঞান সভার কর্মীরা

থাকেন। এক একটি কর্মসূচী রূপায়ণের জন্যে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তাঁরা উপসমিতি তৈরি করেন। প্রকাশিত করেন ত্রৈমাসিক জার্নাল। যাতে প্রকাশ করা হয় তাঁদের কাজকর্মের বিবরণ। সভা সমিতি, প্রদর্শনী এসব তো আছেই, সেই সঙ্গে রয়েছে নানা রকম প্রোজেক্ট।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই প্রতিষ্ঠানের যাঁরা প্রধান তাঁরা কেউ অধ্যাপক কেউ সরকারি এবং আধা-সরকারি সংস্থার বিজ্ঞান কর্মী। যেমন, বর্তমান সভাপতি হচ্ছেন ডঃ অশোক ভট্টাচার্য। ইনি আগরতলা এম বি বি কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান। সম্পাদক শ্রী শান্তিপদ গণচৌধুরী। ইনি ত্রিপুরা সরকারের বিজ্ঞান এবং কারিগরি দপ্তরের সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার। কোষাধ্যক্ষ শ্রীপ্রমোদলাল ঘোষ। ইনিও বিজ্ঞান এবং কারিগরি দপ্তরের একজন অফিসার। সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন শ্রীদেবাশিস দাশগুপ্ত। ইনি ত্রিপুরা ফারমাসিউটিক্যালস-এর সিনিয়র কেমিস্ট। বিভিন্ন পেশার কর্মী হওয়ায় এই বিজ্ঞান সভার কাজকর্ম এক একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হচ্ছে।

সভাপতি ডঃ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বললেন, '১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসে পশ্চিম ত্রিপুরার বিশালগড়ের উপজাতি অধ্যুষিত হেরমা গ্রামে গিয়ে আমরা প্রশিক্ষণের কাজে হাত দিই। ওই সময় সেখানকার গ্রামবাসীদের পুকুর এবং কুয়োর জল কিভাবে জীবাণুমুক্ত করে পান করা যায় তাঁদের সে ব্যাপারে হাতে কলমে শিক্ষা দেন সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্ত্রিক অথবা ওই ধরনের পেটের রোগ হলে কি করা উচিত সে ব্যাপারেও হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এ কাজটি করেন দেবাশিস দাশগুপ্ত। তিনি সঙ্গে অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই যন্ত্রে জলের জীবাণু দেখে স্থানীয় মানুষ ব্যাপারটির গুরুত্বও বুঝতে পারেন। শান্তিবাবু গ্রামবাসীদের শেখান ধোঁয়াহীন চুল্লি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তার প্রণালী এছাড়া আমাদের আর এক সদস্য কুমুদরঞ্জন মল্লিক জৈব সার তৈরির পদ্ধতিও শেখান।

আগরতলায় ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি সারানর কোন লোক ছিল না। ব্যবস্থাও না। ওদিকে হাসপাতালগুলিতে এক্স-রে যন্ত্র, ই সি জি প্রভৃতির মত যন্ত্র মেরামতের অভাবে পড়ে থাকে। ভুক্তভোগী হয় রোগী। এই সমস্যাটির সমাধানেও এগিয়ে আসেন ত্রিপুরা বিজ্ঞান সভা। তাঁরা খরচ করে কলকাতা থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসে যন্ত্রগুলি সারানোর ব্যবস্থা করেন। হাসপাতালের কর্মীদের যন্ত্রগুলি সারানোর ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর জন্য ওই কর্মীদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপও করেন তাঁরা—চিকিৎসাগত বৈদ্যুতিক যন্ত্রাবলীর মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ এই ছিল ওয়ার্কশপের মূল বিষয়। এতে কাজ হয়েছে। হাসপাতালের ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির কিছু হলে বাইরে থেকে আর লোক আনতে হয় না, কর্মীরাই সারিয়ে নেন।

ত্রিপুরা বিজ্ঞান সভা সোলার ড্রায়ার তৈরি এবং পরীক্ষার কাজে হাত দিয়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের পানীয় জলের নমুনা পরীক্ষা করে তার ফলাফল সরকারকে দিচ্ছেন। দেখলাম ত্রিপুরার বিশালগড় ব্লকের পানীয় জলের উপর পরীক্ষা চালাচ্ছেন এখন। সংগ্রহ করছেন বিভিন্ন উৎস থেকে জলের নমুনা। তারপর মাপা হচ্ছে সেই সব নমুনার আম্লিক এবং ক্ষারকীয় মান, তাতে কতটা লোহা প্রভৃতি ধাতু এবং কোন্ কোন্ বীজাণু রয়েছে, কত তার পরিমাণ ইত্যাদি। এই কাজের জন্যে ফোরাম মাসিক ১০০০ টাকা সম্মানী দিয়ে এক জন প্রোজেক্ট অফিসার নিযুক্ত করেছেন। তাঁকে সাহায্য করছেন চারজন ফিল্ড ইনভেসটিগেটর, যাদের প্রত্যেককে দেওয়া হচ্ছে মাসে ৪০০ টাকা। প্রোজেক্টটির জন্যে ভারত সরকারের বিজ্ঞান এবং কারিগরি দপ্তর ফোরামকে ২৫০০ টাকা অনুদান দিয়েছেন। এক বছরের প্রোজেক্ট। উল্লেখ্য এই প্রতিষ্ঠানটি ত্রিপুরা রাজ্যের জন্যে ভারত সরকারের ন্যাশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সহকারী হিসেবে কাজও শুরু করেছে। গ্রামীণ প্রদর্শনীতে কর্পোরেশন উদ্ভাবিত কিছু কিছু বস্তু দেখানোর দায়িত্ব নেন তাঁরা। বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্যে ত্রিপুরা সরকারও তাঁদের অনুদান দিচ্ছেন। তাঁরা কাজ করছেন।

আগরতলায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও উদ্ভাবনার পরিচয় পেয়েছি। যেমন দেবাশিস দাশগুপ্ত। নিজের গবেষণাগারে তাঁকে কিপস অ্যাপারেটাসের সাহায্যে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস তৈরি করতে হয়। তিনি লক্ষ করলেন, স্টপ কক বন্ধ করলেও এ থেকে গ্যাস বেরোয়। এতে কাজের পরিবেশ হয় বিষাক্ত। নিজের উদ্ভাবনী ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ওই যন্ত্রের হেরফের ঘটিয়েছেন তিনি। তাঁর নতুন ধরনের এই যন্ত্র যখন বন্ধ থাকে তা থেকে এতটুকু গ্যাস বেরোয় না। যন্ত্রটির পেটেন্টও নেওয়া হয়েছে।

পরিচয় হল রামনারায়ণ চক্রবর্তীর সঙ্গে। আগরতলায় তাঁর তিরিশ নম্বর অফিস লেনের বাড়িতে। পড়াশুনা হায়ারসেকেন্ডারি পর্যন্ত। অসুস্থতার দরুন পাশ করতেও পারেননি। পদার্থবিদ্যা এবং গণিতে ভাল করেছিলেন। কিন্তু বাদ সাধল বাংলা ভাষা। আর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। গোড়ায় চাকুরি করেছেন কখনো স্টেট ব্যাঙ্ক অভ ইন্ডিয়ায়, কখনো অন্যত্র। অবশেষে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পূর্ত বিভাগে যোগ দিলেন ওয়ার্ক অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে। ১৯৬৫ সালে। এখন মেকানিক। এখানে এসে জল সরবরাহমূলক কাজ করতে গিয়ে মাথায় এল সৌরশক্তি ব্যবহারের কথা। শেষ পর্যন্ত তা নিয়ে লেগেও পড়লেন। তৈরি করলেন সোলার হিটার এবং সোলার কুকার। কোন সফিসটিকেশন নেই। আগরতলায় সস্তায় পাওয়া যায় এমন সব সাজসরঞ্জাম কাজে লাগিয়ে। খরচ কম অথচ তাতে কাজ হচ্ছে। এ ব্যাপারে তাঁর যে উদ্ভাবন ক্ষমতারও পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বাড়িতে গিয়ে তার পরিচয়ও পেলাম। দেখলাম বাড়ির ছাদে বসিয়েছেন তিনি নিজের তৈরি সোলার হিটার এবং কুকার। কুকারে মাছ রান্না হচ্ছে। হিটারে জল গরম হচ্ছে। গরম জল তাঁর নিজের সংসার ছাড়াও ব্যবহার করছেন পাশের প্রতিবেশী। রামনারায়ণবাবু বললেন, অতিরিক্ত মেঘলা দিন ছাড়া বছরের সবসময় এগুলিতে কাজও চলে। তাঁর বাবা মা খুশি। সেকেলে মানুষ। কিন্তু আধুনিক এই প্রযুক্তি তিনিও পছন্দ করেন। বলতে কি তিনিই ছাদে এনে দেখালেন সোলার কুকারে মাছ রান্না। এক গাল হেসে বললেন, কাঠ কয়লার খরচ নেই, ধোঁয়া নেই। বিনি পয়সায় রান্না করছি কেমন দেখুন। দেখে সত্যিই ভাল লাগল।

ফেরার সময় একটি কথাই মনে হল। দেশের সাধারণ মানুষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং বিজ্ঞানমুখী নয়—এটা ভুল ধারণা। আসলে বিজ্ঞানকে যখন তারা নিজের মত করে পায়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি যখন তাদের নিজেদের সঙ্গতির মধ্যে থাকে এবং অনায়াস হয়, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তারা গ্রহণ করে। যেমন দেখলাম আগরতলায়। ত্রিপুরা বিজ্ঞান সভা এই দিকটি মনে রেখেই রচনা করেছেন তাঁদের কার্যক্রম। সফলও যে হয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ফোরামের সভাপতি ডঃ অশোক ভট্টাচার্যকে প্রশ্ন করেছিলাম : দেখুন, আপনাদের অনেক উৎসাহী কর্মী। এখন তাঁদের হাতে সময় আছে, কাজ করছেন ফোরামের হয়ে। কিন্তু যখন তাঁদের বয়েস বাড়বে, বাড়বে ব্যক্তিগত সমস্যা হয়ত কর্মীদের কেউ চলে গেলেন তখন তো সমস্যা দেখা দিতে পারে ? তাই মনে হয় আপনাদের কিছু স্থায়ী কর্মী থাকা দরকার। বেতনভুক কর্মী। এ কাজে সরকারও সাহায্য করতে পারেন উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য দিয়ে ?

ডঃ ভট্টাচার্য আমার প্রশ্নটি শুনে বললেন, যতটা সম্ভব এটা আমরা এড়িয়ে চলতে চাই। বেতনভুক কর্মী হলেই ফোরামের অবস্থাটা আর স্বেচ্ছা প্রতিষ্ঠানের মত থাকবে না। আর তার দরকারই বা কোথায় ? এখন যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের অনেকে চাকরি করেন, অথবা ছাত্রছাত্রী। তাঁদেরও ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব আছে। তবুও তো তাঁরা উৎসাহের সঙ্গেই কাজ করছেন। মাইনে দিয়ে এ উৎসাহ সবসময় মেলে না। একদল কাজ করবেন সেই ফাঁকে নতুন একদল উৎসাহী কর্মী গড়ে উঠবেন। আমাদের ফোরাম এটাই চায়। এই কালচারটাই আমরা গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। ব্যক্তিগত সমস্যা থাকবেই। তবু তারই ফাঁকে জনহিতকর কাজে কিছুটা সময় দেওয়ার মত মানসিকতা গড়ে তুলতে চাই আমরা। এ কাজে কিছুটা সফলও হয়েছি। অনেকে আনন্দের সঙ্গেই করে চলেছেন ফোরামের কাজ। তাও দেখছি।

ডঃ ভট্টাচার্য ঠিকই বলেছেন। তার প্রমাণ পেলাম হিরোসিমা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় গিয়ে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অত ভীড় কোন বিজ্ঞান সভায় দেখা যায় না। শ্রোতাদের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহই প্রমাণ করে বিজ্ঞান সংস্কৃতি মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে ত্রিপুরা বিজ্ঞান সভার পদক্ষেপ যথেষ্ট বলিষ্ঠ।

লোহা এবং বার্ধক্য

জরা বা বার্ধক্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা কত রকম তত্ত্বের কথাই না বলে থাকেন। এবার আরো একটি নতুন তত্ত্বের কথা শোনা গেল। নতুন এই তত্ত্বে বলা হচ্ছে, শরীরের কোষে অতিরিক্ত লোহার অণু (free iron) জমলে কোষের আবরণ বা সেল মেমব্রেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবরণীর মধ্যেকার চর্বিজাতীয় বস্তু জারিত হয়ে আবরণীর ক্ষতি করে। দেখা গেছে, সাধারণ অবস্থায় কোষ-আবরণী থেকে নির্গত হয় ফেরিটিন (ferritin) নামে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ—প্রোটিন। কোষে সঞ্চিত লোহার অণু এই যৌগ আটকে রাখে। প্রয়োজন হলে ছেড়ে দেয়। কিন্তু লোহার মাত্রা বেশি হলে অতিরিক্ত লোহা ফেরিটিনের পক্ষে বন্দী অবস্থায় রাখা আর সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় কোষ-আবরণী বিনষ্ট হয়ে কোষের কার্যক্ষমতা হ্রাস করে। আবির্ভূত হয় জরা বা বার্ধক্য। তত্ত্বটি নিয়ে অবশ্য প্রশ্নও তুলেছেন কেউ কেউ। তাঁদের বক্তব্য, এমনও তো হতে পারে, আসলে শরীরের কোষে লোহার মাত্রা হয়তো ঠিকই রয়েছে, কিন্তু সেই লোহাকে ধরে রাখার মত উপযুক্ত পরিমাণ ফেরিটিনই কোষের পক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না? তার ফলেও অতিরিক্ত লোহা মুক্ত অবস্থায় জমতে পারে? সমালোচকদের এই বক্তব্য উড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। তবে তত্ত্বটির যাঁরা সমর্থক, তাঁদের বক্তব্য, লোহাঘটিত ওষুধপত্র খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া দরকার। শরীরের কোষে মুক্ত লোহার পরিমাণ বাড়ে না বাড়ে তার জন্যেই এটা দরকার। কারণ বস্তুটি কোষ-আবরণীর যে ক্ষতি করে এ সম্পর্কে [illegible] কোন সন্দেহ নেই।
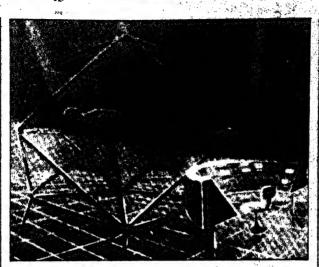
সঙ্গীত-চিকিৎসা

ওষুধপত্রের বালাই নেই, গরম জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকা, অথবা বিশেষ ধরনের ব্যায়াম—প্রাকৃতিক চিকিৎসার হরেক পদ্ধতি বলতে এতকাল যা জানা ছিল তার কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। শরীরটাকে সুস্থ রাখতে এবং রোগচিকিৎসায় এবার আসরে নামছে সঙ্গীত। চিকিৎসার পদ্ধতিও সহজ। নরম একটি শয্যায় কিছুক্ষণ ধরে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকা। পাশে কমপিউটার। রোগ অনুসারে টেপ রেকর্ডে বিশেষ একটি সঙ্গীত বাজান হবে।

কমপিউটার সেই সঙ্গীত রূপান্তরিত করবে কম্পনে।

কম্পনের স্পর্শে শরীরের স্নায়ু এবং পেশী ধীরে ধীরে হতে থাকবে শিথিল। অতঃপর রোগের উপশম। অভিনব এই চিকিৎসাপদ্ধতির উদ্ভাবক মাইকেল ব্র্যাডফোর্ড নামে এক শারীরবিজ্ঞানী।

তিনি মনে করেন, আমাদের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ রোগের কারণ মানসিক অথবা শারীরিক চাপ।

ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'স্ট্রেস'। সঙ্গীতের নিয়ন্ত্রিত কম্পন এই চাপ কমিয়ে দিয়ে রোগের উপশম ঘটায়।

ঘ্রাণ এবং আচরণ

গন্ধদ্রব্য মানুষকে প্রফুল্ল করে যেমন, আবার কখনো কখনো বিষাদেও আচ্ছন্ন করে। যেমন ধরুন, ল্যাভেন্ডারের গন্ধ? যাঁরা বিষণ্ণ, দেখা গেছে ল্যাভেন্ডারের গন্ধ তাঁদের প্রফুল্ল করে তোলে। মন মেজাজে নিয়ে আসে বেশ একটা প্রাণবন্ত ভাব। কিন্তু বেশ খোশ মেজাজে যাঁরা রয়েছেন, এই গন্ধ তাঁদের বিষণ্ণ করে। তাঁদের মধ্যে নিয়ে আসে নিরুত্তাপ আবেগ। অথবা ধরুন, রসুনের গন্ধ। মেয়েরা এবং পুরুষের মধ্যে যাঁরা দুর্ভাবনাজনিত চাঞ্চল্যে ভুগছেন, রসুনের গন্ধ তাঁদের মধ্যে ঘটায় মানসিক অবসাদ। তুলনায় যাঁদের মধ্যে দুর্ভাবনা কম, এই গন্ধে মনের দিক থেকে তাঁরা অনেকটা সতেজ হন। বিভিন্ন গন্ধদ্রব্যের সাহায্যে হাসপাতালের রোগীদের মানসিক চাপ কমাতে গিয়ে এমন অনেক তথ্যই সংগ্রহ করেছেন টেক্সাস ক্রিশ্চিয়ান ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানী এইচ ডাইন লুডভিগসন।

আগামী শতাব্দীর গোড়ায় চাঁদের বুকে কিভাবে খনি অঞ্চল গড়ে তোলা হবে, তার পরিকল্পনা। অবশ্য মার্কিন দেশের

চাকা

সজল দাশগুপ্ত

ক তদিন বাদে দেখা হলো তোর সঙ্গে! সেই কলেজ ছাড়ার পরই ছাড়াছাড়ি—'

—হ্যাঁ, একষট্টি—আর এখন? প্রায় দু' যুগ বাদে বলতে পারিস—

—কলেজে ইউনিয়ন করতে গিয়ে তোদের সঙ্গে কি ভীষণ মারপিট হত। তুই আবার তোদের মধ্যে একটু বেশি রাজনীতি করতি। অকালপাকা—।

—এখন আমরা সব একরকম।

—কি করছিস এখন?

—কেরানিগিরি। এল ডি সি। কমার্শিয়াল ট্যাক্সে—।

—বেশ ভাল জায়গা। উপরি আছে, তাই না?'

—উপরি বলছিস কেন? খাট্‌তি পূরণ বল্। যারা ফর্মটর্ম নিতে আসে—। কাগজের ভাঁজে দু' এক টাকা দেয়। পিওনটাই আদায় করে। ভাগাভাগি করে নিই—।

—তা হলে বল্—ওকে শোষণ করছিস?

—শোষণ নয়, সহাবস্থান করছি। মিলেমিশে না থাকলে ও-ও পাবে না, আমিও পাব না।

কামরাটা ভিড়ে ঠাসাঠাসি। একটা চাপা গুমোট গরমে কলকল করে ঘামছে অবনী। আজ ক' দিন ধরে মেঘ আসছে, হাওয়ায় কেটে যাচ্ছে। জানালার কাছে গিয়ে একটু দাঁড়াতে পারলে ভাল হত। ওখানে তিরতিরে বাতাস বইছে। কোণায় বসে দু'জনে খোসমেজাজে গল্প করছে। যে কিনা কমার্শিয়াল ট্যাক্সের কেরানি, সে সিগারেট ধরাল।

—কতদিন বৃষ্টি নেই। আষাঢ় শেষ হতে চলল। কেমন পচা গরম দেখেছিস? ইস্, ও পাশটা দ্যাখ্, কি দারুণ মেঘ করেছে। জলে টল টল করছে মেঘটা। আজ নামবেই—।

—সীতাংশু কোথায় রে?

—ক্যালকাটা পুলিশে।

—তাই! সবই তাহলে ওলোটপালোট? ও-ত কলেজে দিনরাত কিউবা ভিয়েতনামের উপর কি সুন্দর সব আলোচনা করত। এমন সিরিয়াস ছেলে সত্যি তখন চোখে পড়ত না।

—এখন সিরিয়াস চার্জে সাসপেণ্ডেড্।

—যাঃ। কি যাতা বলছিস্?

—যা তা নয়।

—চার্জটা কি?

—রেপ্। জেল হাজতে এক আসামীকে—

—আই ডোন্ট বীলিভ্। সীতাংশুর মত ছেলে—

—বিশ্বাস আমিও প্রথমে করিনি। কাগজেই বেরিয়েছে—

বাইরে প্রকৃতিটা থমথম করছে। আজকাল ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে বুকে কেমন একটা শ্বাসকষ্ট হয়। মনে হয় হার্টটা কাজ করছে না। মাথাটার উপর মন খানেক পাথর চাপান ভারের মত লাগে। উপসর্গটা ইদানীংকালের। বলেনি লতাকে। সৌম্যকেও না। বললে লতা আরও নার্ভাস হয়ে পড়বে। এমনিতেই আজ ক' বছর ওর স্নায়ুর উপর যা চাপ পড়ছে। সামনে পাচিলের মত একটা বিরাট শরীর। জানালাটা পুরো আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। আর তিনটে স্টেশন। তারপরেই অবনী নামবে। কিন্তু এটুকুও অসহ্য। দিনকে দিন যা ভীড় বাড়ছে। বিশেষ করে এই লাইনটায়। লোকের আর শেষ নেই যেন।

—এই রে, জল আসছে।

—বৃষ্টি নামল নাকি দাদা?

—একটা ফোঁটা হাতে পড়ল।

—নামুক, নামুক। আকাশ ফুটো হয়ে নামুক।

স্টেশনে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে তেড়ে ফুড়ে বৃষ্টি এল। প্লাটফর্মটা লোকে লোকে ছয়লাপ। আপ আর ডাউন একসঙ্গে ঢুকতে পিল পিল করে মানুষ নেমেছে। অফিস ফেরতা ডেলীপ্যাসেঞ্জার সব। ট্রেন থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে স্টেশন চত্বরের শেডের নিচে এসে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে গেছে। এখানে তিল রাখার জায়গা নেই আর। শেডের নিচে ঢালাও দোকানপাট সব। বড় বড় ঝুড়ি দু' পাশে সাজিয়ে কাঠের প্যাকিং বাক্সের উপর কাগজ পেতে হরেকরকম ফলের বাজার। আপেল আঙুর মোসাম্বি। গেট ঠেলে ঢুকবার মুখে অষ্টধাতুর আংটি আর বিশাল নবগ্রহের ছবি সাজিয়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে একজন। অবনী গুনেছিল একদিন। শেডের নিচে ছাপ্পান্নটা দোকান। তারই মধ্যে দিয়ে সরু হাতখানেক জায়গা ছেড়ে দিয়েছে প্যাসেঞ্জারদের যাতায়াতের জন্য। ঐ টুকুই পথ—আর সব বেদখল। একদিন ত তাড়াহুড়োতে দৌড়তে গিয়ে ঝুড়িতে ধুতির কোঁচা আটকে পড়ে গিয়েছিলেন এক ভদ্রলোক। ধুতিটা ফালা ফালা। হি—হি করে হাসির রোল উঠেছিল হকারদের মধ্যে।

—দাদা বোধহয় বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছিলেন। টেরেন্ ফেল—

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল অবনী ঐ বে-আক্কেলে হকারগুলোর মস্করা। তখন একবার মধ্যবিত্ত রক্তটা ছলাৎ ছলাৎ করে উঠেছিল রাগে। ইচ্ছে করছিল চুলের মুটি ধরে দু' ঘা লাগিয়ে দিতে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পারেনি। পরক্ষণেই একটা উল্টো বাতাস ভিতরটা শান্ত করে। কি হবে। যে যা করছে করুক। পথে ঘাটে ঝামেলা বাধিয়ে দরকার কি! কত লোক ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সবটা। কেউ ত প্রতিবাদ করল না। তারই বা কি দরকার আগ বাড়িয়ে পরের হ্যাপা সামলানো।

আজও পড়তে পড়তে এক ভদ্রমহিলা শেষ পর্যন্ত সামলে নিলেন। পেছন থেকে কে একজন একটু ধমক চমকের মত বলে উঠল—একটু পেছিয়ে বসতে তো পার। যাকে বলা সে তখন ব্যস্ত আপেল ওজন করতে। কথা শোনবার সময় নেই। যিনি কিনছেন তিনি রাস্তা জুড়ে উবু হয়ে ব্যাগ খুলে ধরেছেন।

—কত ওজন হলো?

—দেড় কিলো বাবু।

—দেড় কোথায় একটু টান ত আছেই—

—ও দাদা, একেবারে হরধনু হয়ে রাস্তা জুড়ে বসেছেন? যাব কি করে? ক্রেতা ভদ্রলোক একটু নড়লেন।

—যান না পেছন দিয়ে। কে বাধা দিচ্ছে?

—পেছন দিয়ে? আপনার ঘাড় ডিঙিয়ে? আচ্ছা বে-আক্কেলে মানুষ ত আপনি।

—কেন? আপনি কি কানা? এত লোক যেতে পারছে, আপনি পারছেন না?

—পারি ত। পারি। ফুটবলের মত আপনার পাছায় কষে যদি একটা লাথি মারি, তবে রাস্তা

পরিষ্কার হবে।

হরধনুর ভঙ্গী থেকে টান টান ছিলার মত সোজা হলেন ভদ্রলোক এবার। লেগে যায় আর কি! ফল বিক্রেতাই মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে দুজনকে আলাদা করে সরিয়ে দেয়।

বচসার মানুষটি বোধ হয় ব্যস্ত। হাতের ব্যাগটা দিয়ে মাথা বাঁচিয়ে রাস্তায় নেমেই একটা রিকশায় উঠে বসেন। রিকশা থেকে মুখ ঘুরিয়ে একটা কিছু আক্রমণাত্মক ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন। কি বললেন শোনা গেল না। এ পাশে রাগ তখন তুঙ্গে। বিশেষ করে ভদ্রলোকের প্রস্থানের পর।।

—যা যা—কত দেখলাম—বলে এ পাশ তখন গজরাচ্ছেন সমানে। দুটো ফিচেল ছোকরা ভীড়ের মধ্যে এক কোণে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ বেশ মজা লুটছিল ব্যাপারটায়। গণ্ডগোলের সময় তারস্বরে চিৎকারও করে উঠেছিল 'বাঙালী জেগেছে' 'বাঙালী জেগেছে' বলে। এক পক্ষ চলে যেতে এবার গীতার শ্লোক

আওড়াল—'শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, ক্লীব হইওনা, ইহা তোমাকে মানায় না—' । ভদ্রলোক একবার ঘাড় ঘুরোতে ছেলে দুটো মুখ ঘুরিয়ে নিল।

বৃষ্টিটা একটু ধরতে রাস্তায় নামে অবনী। লোডশেডিং। চারদিক অন্ধকারে ডুবে আছে। দু' পাশের দোকানগুলোতে টিম টিম করে আলো জ্বলছে। চামড়ার ব্যাগটা দিয়ে মাথা আড়াল করে হাঁটতে থাকে অবনী। হেঁটে এসে যশোর রোডের মোড়। বাসস্ট্যান্ড। একটা প্রাচীন বটগাছ। তার নিচে অনেকে দাঁড়িয়ে বাসের আশায়। এই এক যন্ত্রণা। সারাদিন অফিস কাছারী করে এসপ্ল্যানেড থেকে শেয়ালদা হেঁটে এসে ট্রেনে হ্যাচড়াহ্যাচড়ি করে যদি বা নামা গেল, এখন বাসের জন্য ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা। গাছের পাতা বেয়ে টপ্ করে এক ফোঁটা জল অবনীর চশমার কাঁচে গড়িয়ে পড়ে। চশমাটা খুলে কাঁচ মুছল। ফ্রেমটা কেমন নড়বড়ে হয়ে গেছে। আলগা। নাকের উপর নেমে আসে। বারবার তুলতে হয়। আর চলবে না এটা। ভীড়ভাট্টায় ধাক্কা লেগে কোন্‌দিন চোখ থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে ভাঙবে। 'করব' 'করব' করেও হয়ে উঠছে না। পাল্টানো মানেই শ' দেড়েকের ধাক্কা। অফিস থেকে বিল করে পাবে চল্লিশ টাকা। তা-ও তিন বছরে একবার।

—দাদা, বাসটা আছে ত?

—কি জানি?

—এখনত লাস্ট কারটা, তাই না?

—হ্যাঁ।

—লাষ্ট কারের জন্য কোন টাইম্ থাকে না আবার। এক একদিন এক এক সময় আসে—।

যাত্রীদের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি বানিয়েছিল একটা শেড্। এখন সেটা মরসুমি ফলের দোকান। মাথার উপর ইলেকট্রিক তার থেকে হুক করে আবার টিউব জ্বলে দোকানে। বৃষ্টি বাদলে বেচা কেনা কম। আয়েসী মেজাজে পা ছড়িয়ে পেছনে ফলের ঝুড়িতে হেলান দিয়ে ছোকরা রেডিও চালিয়ে 'বিবিধভারতী' শুনছিল।

—লাস্টকার আসবে না দাদা।

ভীড়ের সবাই উৎসুক হয়ে তাকায় ছেলেটার দিকে।

—আসবে না? কেন?

—ঝঞ্ঝাট হয়েছে।

—ঝঞ্ঝাট কোথায়?

—খোসদেলপুর। ডেরাইভারকে ইট মেরেছিল ওখানে। তাই নিয়ে ঝঞ্ঝাট।

—ল্যাঠা চুকেই গেল। হাঁটা যাক—

ভীড় পাতলা হতে থাকে। যে যার পথ ধরে। অবনী দাঁড়িয়ে থাকে একটু সময়। এদিক ওদিকে তাকায়। অনেক সময় পাড়ার চেনাজানা দু' একজন সাইকেল আরোহী পাওয়া যায়। দেখা হলে বললে নিয়ে যায়।

—দাদা, কদ্দূর যাবেন?

—কচুয়ামোড়।

—আমি যাব শিববাড়ী। কি করি এখন? অনেকটা রাস্তা। প্রায় দু মাইল। এক পা এক পা করে অবনী রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে। হাতঘড়ি দেখে। রাত ন'টা। হেঁটে যেতে কম পক্ষে চল্লিশ মিনিট। তার মানে বাড়ি পৌঁছতে প্রায় দশটা। ওপাশে গোটা দুয়েক রিকশা। সিটে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে এলিয়ে আছে রিকশাওয়ালা দু'জন।

—এই রিকশা যাবে?

অবনী এসে দাঁড়ায় রিকশার পাশে।

—কোথায় যাবেন?

—কচুয়া মোড়।

—যাব। ক' জনা?

—একা।

—চার টাকা লাগবে।

—কেন? চার টাকা কেন? ভাড়া ত দু' টাকা।

—ও-ই লাগবে। না হলে হাঁটুন, পয়সা বাঁচবে।

কান মাথা গরম হয়ে ওঠে অবনীর। গাড়ি থেকে ওকে টেনে নামানো যায়। পিচ্ রাস্তার উপর ফেলে দু' এক ঘা কষে দেওয়া যায়। ভেতরটা রাগে চনমন করে ওঠে।

—চলুন, দু'জনে শেয়ারে যাই। আমি শিববাড়ী নেমে যাব। আপনি চলে যাবেন। দেখ ভাই, চার টার নয়, পুরোপুরি তিন টাকা দেব।

কান চুল্কোতে চুলকোতে আধশোয়া হল রিকশাওয়ালা—অর্থাৎ মানে মানে কেটে পড়।

হাঁটতেই শুরু করে অবনী। একা। ঝিরঝিরে বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস বইছে থেকে থেকে। ভেতরের টেনশানে টের পায়নি এতক্ষণ। বেশ শীত শীত করছে। পেছনে পায়ের শব্দ।

—হাঁটতেই শুরু করলেন?

—হ্যাঁ। কি আর করব?

—তা-ও ঠিক। কি-ই বা করার আছে? মিউনিসিপ্যালিটি ওদের রেটও বেঁধে দিয়েছে। দিনে-রাতে কত মাইলে কত ভাড়া। কেউ মানে না। নিয়মগুলোই সার। কেউ দেখে না, ভাবে না। আমরা হাঁটছি, আর একজন হয়ত চার টাকাতেই যাবে। এই করেই ত বাড়ছে সব।

—তা কি করা যাবে? যে পারবে যাবে।

—তা হলে ত প্রতিবাদ হলো না।

একটা সিগারেট ধরালেন উনি।

—খাবেন নাকি একটা?

—না, আমি খাই না।

—খান না? বেশ করেছেন। আমি যদি ছাড়তে পারতাম। পারি না। একবার দুম্ করে একটা প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলাম আর খাব না। বিরাট বীরত্ব দেখিয়ে ভরা সিগারেটের প্যাকেট ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। বাইরে। তারপর তিনটে দিনও কাটেনি। যে কে সেই। আসলে আমাদের মত মধ্যবিত্তদের ক্যারেকটারে কোন ফার্মনেস্ নেই।

ওঁর সিগারেটটা বোধ হয় নিবে গিয়েছিল। লাইটার টিপে ধরালেন আবার। সেই আলোতে অবনী দেখল ওঁকে এক পলক। বৃদ্ধ। প্রায় ষাটের মত বয়স। মাথা জুড়ে টাক। পরনে ধুতি-শার্ট। ক' দিনের না-কামানো দাড়ি গালে।

—আগে হাঁটতে পারতাম। এখন পারি না। বয়স হয়ে গেছে। এখন একটু হাঁটলেই পা-টা ভারী ভারী লাগে। আপনি না থাকলে হয়ত একা একা আসতে সাহস পেতাম না। চার টাকা দিয়েই চাপতে হত। আপনার হেঁটে আসা দেখে মনে বল পেলাম।

তরতরিয়ে জল ছিটিয়ে পাশ দিয়ে একটা রিকশা চলে গেল।

অবনী ধুতিটা উঁচু করে ধরে।

—মানুষের যে কোন কষ্ট আছে, দেখলে বোঝা যায় না। এত হাহাকার আছে তার কোন চিহ্ন নেই। সবাই কেমন দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে সব।

—কি করবে? রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাপাবে?

অনেকটা বিরক্ত হয়েই অবনী কথাগুলো ছুঁড়ে দেয়।

—না, তা কেন? তবে অভাব অভিযোগের একটা প্রকাশ থাকে না? তাতো নেই।

একদল মানুষ আছে, যাঁরা বেশ সুখে আছে—কি বলেন?

—সব কালেই ছিল। এখনও আছে। ভবিষ্যতেও থাকবে।

—আমি বাঁ দিকে যাব। চলি তাহলে।

—আসুন।

অন্ধকারে অবনী একবার ঘাড় ঘুরিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করল।

তারপরে আবার সোজা হাঁটতে থাকে।

বাড়ির দরজায় এসে নক্ করলে দরজা খোলে সৌম্য।

—বাবা, এত দেরী! মা যা ভাবছে—

হাত থেকে ব্যাগটা নেয় সৌম্য।

—ইস্ তুমি যে ভিজে গেছ একেবারে। দাঁড়াও তোয়ালে আনি।

পাশের ঘরে চলে যায় সৌম্য। এ ঘরে তক্তপোশে ছড়ানো ছেটানো বইখাতার রাশ। সৌম্য পড়ছিল। ঐ এক দোষ ওর। গুছিয়ে বসে পড়তে পারে না। গোটা তক্তপোশ জুড়ে সব ছত্রাকার। বালিশটা এক পাশে। চাদরটা কুঁচকে জড়ো হয়ে পড়ে আছে পায়ের কাছে।

—এই নাও, সরাসরি বাথরুমে যাবে। খুব ভিজে গেছ।

—তাই যাই।

বাথরুমে হাত মুখ ধুতে ধুতে টের পায় অবনী রোজকার মত সৌম্য স্টোভে জল চাপাল। রান্নাঘর থেকেই সৌম্য ডাক পেড়ে জিজ্ঞেস করে—বাবা, ট্রেন লেট্ ছিল?

—না রে। বাসটা নেই। কি সব ঝামেলা হয়েছে কোন্‌দিকে। বন্ধ হয়ে গেছে।

—সে কি? তুমি তাহলে এলে কিসে?

—হেঁটে।

—হেঁটে এলে? এই বৃষ্টিতে? একটা রিকশাও পেলে না? এদিকে নৈহাটির বাসও প্রায় পনের দিন বন্ধ। সতুকাকুরা সব ব্যারকাপুর ঘুরে ঘুরে নৈহাটি যাচ্ছে। বলছিল আজ। কবে যে চালু হবে তারও ঠিক নেই।

—আর চালু হবে! ইট ইজ্ নো বডি'স বিজনেস্। কতগুলো লোক যাতায়াত করতে পারছে কি পারছে না, সেটা কোন ব্যাপার নয়। তোর মাকে টনিকটা দিয়েছিলি?

—হ্যাঁ।

অবনী দেখে তিন বছরের অভ্যাস সৌম্যকে নিপুণ রাঁধুনি বানিয়ে দিয়েছে। সাঁড়াশী দিয়ে গরম জলের বাটিটা নামিয়ে চা ভেজাচ্ছে সৌম্য। কৌটো খুলে বিস্কুট সাজায় প্লেটে।

—বাবা, একটা ডিম ভেজে দেব?

—না না। তুই চা দে। একটু পরেই ত ভাত খাব।

—অফিসে টিফিন করেছিলে ত?

—হ্যাঁ।

পাশের ঘরে ঢোকে অবনী। নীল ডুম্ জ্বলছে একটা। পঁচিশ পাওয়ারের। সারা ঘরে হাল্কা নীলাভা ছড়িয়ে আছে কুয়াশার মত। ঠাকুরের আসনটার কাছে রাখা ধূপদান থেকে ধূপের ধোয়া উঠছে সরু রেখায়। ধূপের গন্ধ ভেসে আছে ঘরটার আলোর কুয়াশায়। বেশ একটা মনোরম স্নিগ্ধতা এখানে। টানটান মেজাজটা হঠাৎ শিথিল হয়ে আসে এ ঘরে এলে। বিছনায় মাথা ঘোরায় লতা।

—এত রাত হলো? খুব ভাবছিলাম।

বিছানার পাশে বসে অবনী। সময়টা কেমন বিষণ্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এ ঘরের চৌহদ্দিতে। আশে পাশের সব থেকে আলাদা একটা নির্জন পৃথিবী আর তার একমাত্র বাসিন্দা।

—কেমন আছ আজ?

—রোজ যেমন থাকি। রাত হল কেন তোমার?

—লাস্ট বাসটা নেই। হেঁটে এলাম।

—একটা রিকশাও পেলে না?

—পেয়েছিলাম। ডবল ভাড়া চাইল। রেগেমেগে হেঁটেই এলাম।

লতা চোখ তুলে অবনীর দিকে তাকিয়ে থাকে একটু সময়। চায়ের কাপ নিয়ে সৌম্য ঢোকে।

—বাবা, একটু পরে ভাত খেয়ে নিও। টেবিলে সব ঢেকে রেখেছি।

এ ঘরের দরজা টেনে সৌম্য বেরিয়ে যায়। কোমর পর্যন্ত লতার চাদরে ঢাকাই সারা বছর। শীতগ্রীষ্ম বারো মাস। কোমরের নিচ থেকে ডান পা'টা বিশ্রীভাবে বেঁকেচুরে নেমে গেছে। পায়ের পাতার উপর থেকে বিঘতখানেক নেই। অ্যামপুট করা।

—সারাদিন পাড়ায় যা হয়েছে। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছিল। এ ঘর থেকে চেঁচিয়ে সৌম্যকে পাশে আনিয়ে বসিয়েছি।

অবনী জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

—কেন? কি হয়েছিল?

—গগন দস্তিদারের গুণ্ডা ছেলেটা সারাটা দুপুর বোমাবাজি করেছে একদল ছেলে নিয়ে। ঐ বড় রাস্তায়। সেখান থেকে হৈ হৈ করে আবার কতগুলো ছেলে বোমা নিয়ে ছুটে যাচ্ছিল এই রাস্তা ধরে। সে কি শব্দ! লতা একটু থামে।

—শোবে এখানটায় একটু? গড়িয়ে নাও না! খাবে ত আরও খানিকক্ষণ বাদে। কি ভাবছিলাম! বাইরে বৃষ্টিবাদল, পাড়ার এই অবস্থা, তুমি আসছ না। শুয়ে শুয়ে ভয়ে মরছিলাম। কত সব আজে বাজে চিন্তা। কি বোঝাব তোমায়? সব ত সব সময় বলিও না।

অবনী একটু কাত হল। লতার পিঠে হাত রাখে। উঁচু বালিশে শুয়ে শুয়ে কমিক্স পড়ছিল লতা। বুকের উপর নামানো ছিল আধ খোলা বইটা। নানারকম বই মাথার কাছে। সারাদিন শুয়ে শুয়ে ঐ সব বইয়ে মুখ ডুবিয়ে সময় কাটাতে হয় লতাকে। দুপুরটা টানা রবারের মত লম্বা। সময় কাটে না। ঠিকে ঝিটা তখন থাকে। মেঝেতে সতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে থাকে। বিকেলে সৌম্য কলেজ থেকে ফিরলে ও চলে যায়।

—ভোট কবে গো?

—কেন? এখনও তারিখ ঠিক হয়নি।

—প্রশান্তবাবুর বাড়ির দেওয়ালে লিখছিল সব আজ। তোমাকেও আবার ভোট হলেই বাইরে যেতে হবে, তাই না?

—হ্যাঁ। কিছু টাকাও পাব।

—কত?

—শ' খানেক।

—শেষ মাস হলে কাজে দেবে।

—শেষ আর প্রথম কি? সবই সমান।

—ইরুর চিঠি এসেছে!

ইরু মানে ইরাবতী। অবনীর ছোট বোন। ওরা থাকে গৌহাটিতে।

—কি লিখেছে?

—ওরা ফ্ল্যাটের জন্য দরখাস্ত করেছে। সল্টলেকে। সমীরবাবু পাকাপাকি চলে আসতে চাইছেন। তোমাকে তদ্বির করতে লিখেছে।

—আমি একদম সময় পাই না। কোথায় তদ্বির করব।

—জানি ত।—একটা কথা বলব? যদি কিছু না মনে কর। অবনী তাকায় লতার মুখে—।

—চিঠিতে নিজেদের কথাটুকু ছাড়া আর কিছু নেই। আমার কথা, সৌম্যর পড়াশুনার কথা—এ সব কি জিজ্ঞেস করতে নেই?

একটা দুঃখভরা অভিমান ডেলা পাকিয়ে যায় লতার স্বরে।

—আজকাল কেউ কারো কথা ভাবে না, লতা।

—নিজের দাদা, বৌদি, ভাইপোর কথাও নয়?

অবনী মুচকি হাসল একটু। লতার এই চার দেওয়ালের পৃথিবীটুকুতে এখনও ঐসব আছে—দাদা, বৌদি, ভাইপো—রক্তের টান, সম্পর্ক, ভালবাসাবাসি—।

—তুমি বুঝি শুয়ে শুয়ে ঐসব ভাবছিলে চিঠি পেয়ে—?

—তেমন কিছু নয়। তবে খুব কষ্ট হচ্ছিল।

লতার এই চেহারাটা বেশী দিনের নয়। বছর তিনেকের। বছর তিনেক আগে শিলিগুড়ি বেড়াতে গিয়ে একটা মারাত্মক অ্যাকসিডেন্টে ওর ডান পা'টা যায়। বাঁ দিকের কোমরের হাড়ও ভেঙে কয়েকটুকরো হয়ে গিয়েছিল। সেবার নেহাৎ আয়ুর জোরে বেঁচে গেল লতা। কিন্তু ঐ বাঁচাটুকুই হল। সারা জীবনের মত পঙ্গু হয়ে ফিরে এল। সেই থেকে ওর মন জুড়ে স্পর্শকাতরতা। যত দিন যাচ্ছে ততই সেটা গভীর হচ্ছে। এই বোধ হয় কেউ ওকে অবজ্ঞা করল, কেউ বোধ হয় অবহেলা করল—দিনরাত শুধু এই মানসিক কষ্ট নিয়ে তিনটে বছর শুয়ে আছে বিছানায়। ক্লান্তিতে চোখের পাতা বুজে আসছিল অবনীর। কখন কোন্ ফাঁকে বোধ হয় নাক ডাকতে শুরু করেছিল। লতা ঠেলে তুলে দেয়—।

—খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়। ঘুমে ঢুলছ যে—।

—বড্ড ধকল গেছে আজ।

—কাল না হয় অফিসে না গিয়ে একদিন বিশ্রাম নাও।

—কি রে, এত জলদি ফিরে এলি কলেজ থেকে?

—অনার্সের ক্লাস হলো না।

—হল না? কেন?

—কে জানে? কোন কারণ নেই। পি· এস বললেন আজ ক্লাস নেব না। চলে এলাম।

সৌম্যর চোখে মুখে একরাশ বিরক্তি। ঘরে ঢুকে বই খাতাপত্তর তক্তপোশটায় ছুঁড়ে রেখে বাথরুমে ঢোকে। হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে লতার কাছে যায়। কলেজ থেকে এসেই মায়ের ঘরে ঢোকে রোজ। বিছানার পাশে বসে একবার করে। ওকে নিয়ে অবনীর এক চাপা গর্ব আছে। এ পাড়ায় সৌম্য একটা ছেলে। ছেলের মত ছেলে। মেধা, বুদ্ধি, বিবেচনা সব মিলিয়ে ওর মত ছেলে বিরল।

লতার পাশে বসলে লতা ওর চুলে বিলি কাটে।

—খেয়েছিস কিছু টিফিনে?

—টিফিনই হলো না। ক্লাস ত হলো সবেমাত্র দুটো। আর খাব কি?

—দুধটা খেয়ে নে।

—ইচ্ছে করছে না, মা। সৌম্যর মধ্যে একটা অস্থিরতা দানা বাঁধছে। আজকাল খুব অল্পেই ওর মেজাজে চিড় ধরে। অবনী লক্ষ্য করেছে। অথচ ছোটবেলা কি শান্তই না ছিল।

—তা অত বিরক্ত হচ্ছিস কেন? কলেজে অমন একটু আধটু অফ যায়। ও নিয়ে অত বিরক্ত হলে চলে?

—একটু আধটু? এর নাম একটু আধটু! পড়াশোনা হচ্ছে না। পি ডি আসছেনই না। কলকাতা থেকে আসেন। অনেক দিন পর গতকাল এলেন বিকেল তিনটেয়। দুটো ক্লাস মার গেল। বিকেলে এসেই বললেন গা ম্যাজ ম্যাজ করছে। ক্লাস নেব না আজ। বি কে নাকি স্টেট্ ডেলিগেশান নিয়ে যাবেন ফ্রাঙ্কফুর্ট। ওখানে কোন্ ইউনিভারসিটিতে নাকি টানা লেক্চার দেবেন ক'দিন। আজ মাসখানেক হল সেজন্য উনি দিল্লি-কলকাতা করছেন। ফোর্থ পেপারটা পুরো ওর। ভাল করে দুটো চ্যাপটারও কমপ্লিট হলো না।

—বলিস কি? তোরা প্রিন্সিপ্যালকে বলেছিস?

—কি বলব? ব্যাপারটা কি ওঁর অজানা? তাছাড়া প্রিন্সিপ্যাল টোট্যালি সাইফার। কেউ মানছে না ওঁকে। প্রাকটিক্যাল যে কবে হবে কে জানে!

অবনী চুপ করে দাঁড়িয়ে শোনে সব।

আছেন শুধু পি কে এম। একা। গুচ্ছের ট্যুইশানি নিয়ে দিব্যি বাড়িতে অলটারনেট্ কলেজ খুলে বসেছেন।

অবনী পায়ে পায়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। একটু আগে ঝিরঝিরে একটুখানি বৃষ্টি হয়ে গেছে। সামনের কাঠ টগর গাছটার পাতার ডগা বেয়ে টুপটাপ জল পড়ছে তখনও। দুটো শালিক গাছটার ডালে ঠোঁট ঘষছে। এখন নরম এক চিলতে রোদ গাছের পাতা ছুঁয়ে ঝিকমিক করছে। খানিকক্ষণ বাদে সৌম্য এসে বাইরে দাঁড়ায়। অবনীর পাশে।

—বাবা, তুমি অফিস থেকে লোন তুলে একটা হুইল চেয়ার কিনে আন। মাকে নিয়ে বাইরে একটু ঘুরিয়ে আনতে পারি। আজ তিন বছর মা একভাবে শুয়ে। একেবারে ঘরবন্দী। ঐ এক ঘর—এক বিছানা। মা কেমন নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

অবনীর মনে অন্য চিন্তা। সৌম্যর কথাগুলো ঠিক ঠিক কানে ঢুকল না।

—আচ্ছা, সুদীপ, কাকলী, বিজয়—ওরা কি করছে রে?

—কি করছে মানে?

—এই যে তোদের ক্লাস হচ্ছে না—'

সৌম্য এবার হেসে ফেলে।

—তুমি তাহলে ঐ সব ভাবছ? আমার কথাটা তোমার কানেই যায়নি? ওরা ত সব প্রাইভেট পড়ছে। পি কে এমের কাছে।

—অনার্স পেপার?

—হ্যাঁ। আমি যে কি করব, আমার ত কিচ্ছু হয়নি।

সেই অন্ধ অসহায় রাগটা খাবলাতে থাকে অবনীকে। এ-ও এক শোষণ। জমিদাররা চলে গেছে। নতুন জমিদার গজাচ্ছে সমাজের এ কোণে সে কোণে। এদের মুখে সব প্রোগ্রেসিভ্ কথাবার্তা। সভাসমিতি সেমিনারে দাপিয়ে ভাষণ দিতে পারে। দেয়। কিন্তু কাজের বেলা সব অন্যরকম।

—কত করে নেন উনি?

—নব্বই টাকা। সপ্তাহে একদিন।

আঁতকে ওঠে অবনী।

—বলিস কি? নব্বই টাকা পারহেড্? সারাদিনে কতগুলি এমনি আছে?

—অনেক। সঠিক সংখ্যা জানি না। তা-ও পি· কে· এম অনেক কনসিডারেট্। অন্যদের রেট ত একশ' পঁচিশ।

—তুই পড়বি?

সৌম্যর এবার অবাক হওয়ার পালা। সে বোঝে সব। আর ছোটটি নেই। মাসের অর্ধেকটা পর্যন্ত কুলোয় না। টানাটানি হ্যাচড়াহ্যাচড়ি করে জগদ্দল পাথরের মত সংসারটা বয়ে বেড়ানো। নড়ে না, চড়ে না। চারদিকে সমুদ্রের মত সীমাহীন টানাটানি। এটা নেই, সেটা নেই। মাসের শেষের দিকে মায়ের ওষুধগুলো পর্যন্ত আনা হয়ে ওঠে না।

—তুমি কি বলছ বাবা? মাসে নব্বই টাকা!

কাঠগোলাপের একটা ডাল ভাঙে অবনী। ঝুঁকে পড়েছে জানালা বরাবর। এখান দিয়ে রোদ ঢোকে না। সকাল বেলাও কেমন অন্ধকার অন্ধকার থাকে।

—দিতে হবে।

—কোত্থেকে দেবে?

কোত্থেকে সে হিসাব অঙ্কে মিলবে না। এই মুহূর্তে অবনী নিজেও জানে না কোত্থেকে দেবে। তবে এটা বুঝেছে দিতে হবে।

—দেব, দেব।

ভেতর ঘর থেকে লতা ডাকছে সৌম্যকে। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। রোদ পড়ে আসছে। সৌম্য চলে যায় ভেতরে। অফিসে সেদিন নিকুঞ্জর কথাটা তোলপাড় করতে থাকে অবনীর মগজে—'দেখ দাদা, যেমন ভাল রেজাল্ট করেছে, মদত দিও। ভাল টিউটর দিও। কলেজে কিস্যু হয় না।' ওর সেই কোন্ এক আত্মীয়র ছেলের কথা বলছিল। হায়ার সেকেন্ডারীতে তিনটে লেটার পাওয়া ছেলেটা নাকি অনার্সে খুব খারাপ করেছিল। পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে চান্সই পেল না।

—কি করবে? গরীব মধ্যবিত্ত বাপ। ট্যাকের জোর নেই। নিজে নিজে পড়ল। অনার্স পেপারেই নম্বর খারাপ। চিরদিনের মত পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল—

—তারপর?

উৎসুক অবনী প্রশ্ন করেছিল।

—তারপর আর কি? একজন কেরানি বাড়ল। আমাদের টোট্যাল নাম্বারের সঙ্গে এক সংযোজন। তাই বলছি দাদা, লড়ে যেও ছেলের জন্য।

—বাবা, চা খাবে?

—তোর ত আর দু' বছর, তাই না?

সৌম্য ঝরঝর করে হেসে ফেলল এবার।

—নাঃ সত্যিই দেখছি, তোমার মাথায় একটা জিনিস ঢুকলে আর বেরোয় না। ভেতরে এসো। চায়ের জল চাপিয়েছি।

—অবনী, বাড়ী আছিস?

রোববারের সকালে এ মানুষকে দেখবে এমন আশা অবনীর ছিল না। কারণ এ মানুষটিকে এ তল্লাটে আজকাল কালেভদ্রে পাওয়া যায়। তাই ডাক শুনে বাইরে এসে অবনী হকচকিয়ে যায় প্রথমটা। কুমার সান্যাল। সঙ্গে স্বপন গুপ্ত আর সুজিত।

—কুমারদা, তুমি?

—হকচকিয়ে গেছিস, তাই না?

কুমার সান্যাল হাসল। ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন হাসি।

—তা, স্বপন আর সুজিতকে নিয়ে সকালবেলা কোন্ রাজ্য জয় করতে বেরিয়েছ?

—কোন রাজ্য নয়। সরাসরি তোর কাছে।

—ইয়ার্কি মারার জায়গা পাও না, না?

—বিশ্বাস কর।

স্বপনও হাসল।

—সত্যি অবনীদা, সরাসরি আপনার কাছে।

—আমার কাছে? কেন?

—আছে, আছে। ভেতরে যেতে দে আগে।

কুমার ঢুকে পড়ে স্বপন সুজিতকে নিয়ে। বসে তক্তপোশটায়। পা ছড়িয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে।

—তুমি ত এ তল্লাট ছেড়েই দিয়েছ। আজকাল আসোটাসো না।

—অনুযোগ করতেই পারিস। তবে যেখানেই

থাকি না কেন, তোর খবর নিয়ে থাকি। কুমার অবনীর প্রথম যৌবনের সঙ্গী। কলেজে এক বছরের সিনিয়র। ও-ই ওকে হাতেখড়ি দিয়েছিল মিছিলে সমাবেশ ময়দানে যাওয়ার। তখন কুমারের একটা চেহারা ছিল। পাজামা পাঞ্জাবি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। কলেজ চত্বরে দেবদারু গাছের ছায়াঘেরা রাস্তাটা ধরে একা একা কুমার হেটে এলে মনে হত একজন মানুষ আসছে যাকে হাজার মানুষ থেকে আলাদা করা যায়।

—লতা কেমন আছে রে, অবনী?

—ঐ ত—ঐ ঘরে। একই রকম।

—তুই কেমন আছিস্, বল।

—কেমন আর আছি! চলে যাচ্ছে। মধ্যবিত্তের বাঁচা।

হেসে ওঠে স্বপন।

—বেশ বলেছেন অবনীদা। মধ্যবিত্তের বাঁচা। কোন রং নেই, সংজ্ঞা নেই, রিস্ক নেই, তাই না?

অবনীও হাসল একটুখানি।

—স্বপন, তুমি নাকি পার্টির কাজ করতে গিয়ে সাইকেল থেকে মাথা ঘুরে উল্টে পড়ে গিয়েছিলে একদিন?

—সে খবরও পেয়েছেন তাহলে? কে বলল? মলয়?

—হ্যাঁ। কি হয়েছিল?

—তেমন কিছু না। একটু প্রেসারটা ডাউন হয়ে গিয়েছিল। সাধনদা ছিলেন বাড়িতে সে সময়। সবাই রিকশা করে সটান সাধনদার ডিসপেনসারিতে নিয়ে গিয়েছিল। দেখেটেখে ধমকালেন একটু। বললেন—এবারের মত ঠিক হয়ে যাবে। এর পর ওল্টালে উল্টেই থাকতে হবে।

—তা-ও তুমি সংযত হচ্ছ না। তোমার বাবা সেদিন বাজারে একরাশ অভিযোগ করলেন।

পার্টির কাজ করতে টো টো করে স্বপন দিনরাত। এই তিরিশ বছর বয়সেই মাথায় টাক পড়ার উপক্রম হয়েছে। রোগা কালো লিকলিকে চেহারা। রোজ আঠারো কুড়ি কাপ চা গেলে।

স্বপন মাথার তালুতে হাত বুলোল।

—আর কি হবে দাদা? একদিন যেতেই হবে।

একটু সময় চুপচাপ থেকে স্বপন হঠাৎ বলে—যে জন্য এসেছিলাম। কুমারদা, আপনি বলুন।

কুমার সান্যাল সিগারেট ধরিয়েছিল। ধোঁয়া ছাড়ে।

—তুমি বলতে পারছ না?

—পারব না কেন? অবনীদাকে আবার সংকোচ কিসের? দাদা, একটা কনভেনশান করছি আমাদের ইয়ুথ ফোরামের। একটা বড় রকমের রিস্ক নিয়ে ফেললাম। প্রায় সতের হাজার টাকার মত মোট খরচা। চাঁদার জন্য বেরিয়েছি।'

অবনী হাসল এক চিলতে।

—সেটা আগেই টের পেয়েছিলাম। তোমার পাঞ্জাবির ঝুল পকেটে বিল বই। তা, আমার কিন্তু এ মাসে দারুণ ক্রাইসিস্—। প্রচণ্ড চাপের মধ্যে আছি। সৌম্যর পড়াশোনার খরচটা দিনকে দিন চেপে বসে যাচ্ছে সাঁড়াশির মত।

—আপনাকে বেশী ধরিনি। একদম বেশী ধরিনি।

—তাও শুনি। বলে ফেল—

ওরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

সুজিত বিল বইটা টেনে বের করে খসখস করে অবনীর নাম লিখে কলম ধরে বসে থাকে।

—গোটা তিরিশেক আজ নেব আপনার কাছে।

অবনীর মুখটা রুক্ষ হয়ে ওঠে হঠাৎ।

—ক্ষেপেছ? মাসের পনের দিন চলে লোনে। জান—?

—জানব না কেন? ঠিক জানি। বাবাকে দেখি ত।

—দেখ! বোঝ তাহলে?

—বুঝি, দাদা। আর না হয় তিরিশটা টাকার ঋণ বাড়তি চাপল। কষ্ট করে যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁদের কাছেই ত যাচ্ছি। আর্থিক কৃচ্ছ্রতা বাড়ার মানে চেতনা বাড়া—

অবনী মুখের কথা থামিয়ে দেয় স্বপনের। না হলে আরও কিছু বলে যেত হয়ত।

—থাম। এই বয়সে চেতনা বাড়িয়ে লাভ নেই। আর ঐসব কথা তোমার মত বয়সে আমিও বলতাম। বেশ গুছিয়ে সাজিয়ে বলতাম।

কুমার একটা পুরনো ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল। এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। এবার মুখ খুলল।

—কিন্তু তোকে দিতেই হবে অবনী।

—দেব না বলিনি। অত পারব না।

—বেশ আমি রফা করে দিচ্ছি। কোন কথা বলিস না আর। পনের টাকা দিবি।

স্বপন একবার গাঁইগুঁই করে উঠতে যাচ্ছিল। কুমার হাত ইশারা করে ওকে থামতে বলে।

—ঐ ঠিক আছে। ওর সত্যিই একটু অসুবিধা আছে।

সুজিত বিল বইয়ের টাকার অংশটা ভরতি করে দিয়ে বিল কেটে এগিয়ে দেয় অবনীর দিকে। ব্যাগ খুলে অবনী টাকাটা দিয়ে দেয়। ওঁরা উঠে পড়ে। বাইরে বেরিয়ে স্বপন আবার মুখ ঘোরায়।

—ও! অবনীদা, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। বাড়ি থেকে বেরোবার মুখেই আপনার ষাটের দশকের কমরেডকে দেখলাম পুরো সংসার নিয়ে বাড়িতে ঢুকছে। 'রক্তকরবী'র 'নন্দিনী'। একেবারে মুখোমুখি। আমাকে দেখেই থমকাল। 'আমি এলাম, তুই এক্ষুনি বেরোচ্ছিস?' যা মুটিয়েছে না! কমরেড বেশ খাচ্ছে দাচ্ছে ভাল অবনীদা।

—কে? কৃষ্ণা এসেছে? আজই?

—হ্যাঁ। যাবেন বিকেলে। আমি বলে রাখব।

—ও যাবে কবে?

—জামাইবাবু এসে নিয়ে যাবে! সপ্তাখানেক থাকবে।

—শুনছ?

অবনী দাঁড়িয়েছিল বাইরে। শেষবেলার গাম্ভীর্য চারধারে। ডাক শুনে ভিতরে আসে।

—ডাকছিলে?

—হ্যাঁ। বস এখানে।

অবনী বিছানার একপাশে বসল।

—বলছিলাম টনিকটা গতকালই শেষ হয়ে গেছে।

অবনীর উৎকণ্ঠিত স্বর বেরোয়— সে কি? আজ খাওনি. তাহলে? বলনি ত!

সন্ধেবেলা এনে দেব।

—আমি বলছিলাম কি—এ মাসে আর টনিকটা এনো না। শুধু শুধু কতগুলো টাকা ভজিয়ে—। গত মাসেরও সব শোধ করতে পারনি ওষুধের দোকানের টাকা। তারপর এ মাসের বিল ত আছেই। ছেলেটা একটু দুধ খেতে পারে না। পড়াশোনা করে। এখন যদি একটু ভালমন্দ না খেতে পারে—

অবনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে সব।

—তা হোক—, ওষুধটা তার জন্যে বাদ থাকবে?

মোড় থেকে মাইকের শব্দ ভেসে আসছে। সেই কখন থেকে কে যেন সমানে বক্তৃতা করে যাচ্ছে মাইকে।

—কি হচ্ছে মোড়ে বল ত? কান ঝালাপালা—

—স্ট্রীট কর্নার করছে কেউ হয়ত।

—সৌম্যর টিউটরের টাকা লাগছে এ মাস থেকে, তাই না? নব্বই টাকা। টাকাটা রেখেছ ত?

—হ্যাঁ।

—ওটা সৌম্যর কাছে রেখে দিও। হাতে থাকলেই খরচ হয়ে যাবে। এ মাস থেকে একটা মোটা অঙ্ক চেপে গেল আবার। টাকার মুখই দেখা যাচ্ছে না।

অবনী চুপ করে খানিকক্ষণ বসে থাকে। অসহায় নিঃস্ব মানুষের মত। মগজের মধ্যে হিসাব নিকাশ ছিঁড়ে খেতে থাকে তাকে ফালা ফালা করে।

অনেকক্ষণ বাদে স্বগতোক্তির মত করে কথা বলে অবনী—একেই বলে বেঁধে পেটানো। কেষ্ট বাগ্দীর অভিশাপ—

লতা বুঝতে পারে না। তাকিয়ে থাকে।

—কি বলছ? কেষ্ট বাগ্দী কে?

—সে এক গল্প। শুনবে? ছোটবেলা কি করতাম জান? তিন চারজন মাঠে গিয়ে একটা বাঁধা গরুর চারদিকে চারকোণায় দাঁড়াতাম। মোটা লাঠি থাকত হাতে। প্রথম জন গরুটাকে পেটাই করতে শুরু করলেই ও ছুটে এক কোণায় যেত। সেখানে দ্বিতীয়জন পেটাত। তারপর তৃতীয়জন। তারপর চতুর্থজন। এমনি করে চারদিক থেকে গরুটাকে পেটাতাম। কি যে আনন্দ পেতাম না। গরুটা মার খেয়ে খেয়ে পাগল হয়ে উঠত। কিন্তু দড়ি ছিঁড়তে পারত না।

লতা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

—ইস্—ভীষণ নৃশংসতা—

—গরুর মালিক কেষ্ট বাগ্দী দেখতে পেয়ে একদিন তাড়া করেছিল। ধরতে না পেয়ে শাপমন্যি করেছিল খুব। 'বড় হয়ে তোদেরও অমনি হবে।' তাই হয়েছে। চারদিকে রক্তচোষারা

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুষছে সব।

লতার চোখ বিষণ্ণ হয়।

চোখের জমিতে দুঃখ জমে।

—সব ঠিক হয়ে যাবে। সৌম্য দাঁড়ালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—তদ্দিনে সংসারের সাত অবস্থা হবে।

স্ট্রীট কর্নারের মাইকের বক্তৃতা থেমেছে এবার। গণসঙ্গীত ভেসে আসছে। গা গরম করা গণসঙ্গীত।

—আমাদের সময়ে কলেজের কোন ছেলে প্রাইভেট পড়ার কথা ভাবতেই পারত না। শুনিনি কখনও।

—তখন ক্লাস নোটই সব ছিল—।

—এখন ক্লাসই হয় না। তার আবার নোট কি!

—রুগী না থাকলে ডাক্তারের চলে কিসে?

অবনী হাসল।

—বেশ বলেছ। রোগ সৃষ্টি করা দরকার ডাক্তারের জন্যেই।

লতা একটু আলগা হয়ে উঠে বসে। পেছনে বালিশ উঁচু করে দেওয়া।

—ওসব থাক। শোন—ক'টা দিন ছুটি নেবে?

—হঠাৎ ছুটি নিতে বলছ কেন?

—ভাল লাগে না। একদম ভাল লাগে না। আজ তুমি সৌম্য দুজনেই বাড়ি। সুন্দর কাটল। কাল থেকে—শুধু শুয়ে শুয়ে বছরগুলো গড়িয়ে গেল।

সৌম্য ঢোকে। হাতে চায়ের কাপ।

—মা, চা নাও। বাবা, তুমি এটা।

মাথার কাছে ছোট্ট টুল। সৌম্য চায়ের কাপ নামিয়ে রাখে। চলে যায় পাশের ঘরে।

—কতদিন আকাশ দেখিনি।

বেলা শেষের বিষণ্ণতা হঠাৎ হাল্কা কুয়াশার মত ছড়িয়ে যেতে থাকে ঘরময়। একটু আগেকার লতার মুখের ভাবটাও পাল্টে গিয়ে দুঃখ যন্ত্রণায় নিরক্ত হয়ে যেতে থাকে। ঘরটা অন্ধকার। অবনীর হঠাৎ নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। মনে হয় বড় নিঃসঙ্গ। কেউ কোথাও নেই। আত্মীয় স্বজন পরিজন প্রতিবেশী—সবার থেকে বিচ্ছিন্ন সর্বত্যাগী এক নিঃস্ব মানুষের মত।

—কাল সি. টি. ডি'র টাকা তুলে এনেছ না?

—হ্যাঁ।

—ফিক্সড করে দিও। কত পেলে?

—বিয়াল্লিশ শ'।

—ঐ টুকুই আমাদের যা। তা-ও তুমি ডিফল্ট করতে। আমি বলে বলে দেওয়াতাম। মনে আছে?

অবনী প্রসন্ন চোখে তাকাল লতার দিকে।

—সৌম্য যখন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়তে যাবে—ঐ টাকাটা দিয়ে ওর হয়ে যাবে। তোমার উপর চাপ কমে যাবে।

এ ঘর থেকে গলার স্বর উঁচু করে সৌম্যকে ডাকে অবনী।

সৌম্য এসে দাঁড়ায়।

—কিছু বলছ বাবা?

—হ্যাঁ। এই খামটা রেখে দে। সি. টি. ডি'র টাকাটা আছে। কাল আমার অফিস আছে। ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকাটা ফিক্সড করবি তোর নামে।

—কত আছে এতে?

—বিয়াল্লিশ শ'।

—পুরোটাই ফিক্সড করব?

—পুরোটাই।

কতদিন বাদে যেন বাঁচার রং ফিরেছে এ বাড়িতে। সৌম্য লাফাচ্ছে এঘর ওঘর। কখন বিকেল হবে। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখে। সারা দুপুর ধরে আধঘন্টা বাদে বাদে ঘড়ি দেখছে। 'বাব্বা', মোটে দু'টো বাজে। সময় কাটছেই না। রোববারের দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নেয় অবনী। দীর্ঘ দিনের অভ্যেস। শীত গ্রীষ্ম বারো মাস। আজ চোখ বুজে শুয়ে আছে। নিশ্চুপ। মাঝে মধ্যে লতা ঠেলে পরখ করছে।

—ঘুমোলে নাকি! এত ঘুমোতে পার!

—কে বললে ঘুমোচ্ছি?

—নাক ডাকছিল ত!

—ধ্যেৎ। বাজে কথা।

অবনী উঠে বসে।

সৌম্য ঢোকে। অবনীর গা ঘেঁষে বসে বিছানায়।

—বাবা, তুমি সত্যি সত্যি বলত—তুমি কি আদৌ রাগ করোনি?

—কেন? আমি কিছু বলেছি তোকে?

—তা বলনি। তবে তোমার অত গ্র্যান্ড ফিউচার—, হিসাব নিকাশ করা ছকে আঁকা সব, আমি আদৌ তোমাকে জিজ্ঞেস না করে—নস্যাৎ করে দিলাম। মনটা খুব খুঁত খুঁত করছে।

সকাল পর্যন্ত অবনীর মনে এরকম একটা কিছু যে ছিল না, তা নয়। কাল অফিস থেকে ফিরে এসে ঝকঝকে মোড়কে হুইল চেয়ারটা দেখে তার ভিতরে একটা প্রতিবাদী মানুষ হঠাৎ বিদ্রোহ করে উঠেছিল। রাতে শুয়ে শুয়েও বিক্ষুব্ধ চিন্তায় উথালপাথাল হয়েছে ভিতরটা। একসঙ্গে অনেকগুলো অনটন সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। লতার বন্ধকী হার, সৌম্যর একটা প্যান্টের পীস, অফিসের ধার শ' তিনেক—এতসব বকেয়া সরিয়ে রেখে দাঁতে দাঁত কামড়ে সে টাকাটা তুলে রাখতে চেয়েছিল।

—মা, আজ সেই আকাশী রংয়ের শাড়িটা পড়বে? কি ভাল যে লাগবে তোমায়!

লতার মধ্যেও একটা অশান্ত সমুদ্র হুল্লোড় তুলছে। অবনী তার গর্জন শুনতে পাচ্ছে। চুল ধরে সৌম্যর মাথায় ঝাঁকুনি দেয় লতা—তোর আনন্দ আর ধরে না, না?

—আনন্দ! আজ কত বছর বাদে তোমাকে বাইরে নিয়ে যাব। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাব সব। ইচ্ছে করে লাফ ঝাঁপ মারি। পাড়া মাথায় করে নাচি। একটা বিপ্লব হয়ে গেল, নিঃশব্দ বিপ্লব, তাই না মা?

লতা হাসল শুধু।

খোলা আকাশের নিচে অবিশ্রান্ত হাসছে লতা। অবনী দেখল। লতা আকাশ দেখছে। দেখছে অঘ্রানের আকাশের রঙ ধূসর মাঠ, দূর দূরান্তের ঘন নীল বনচ্ছায়া। পার্কটা জুড়ে বাচ্চাদের হুটোপুটি।

—ওগুলো, ওগুলো কি পাখী রে, সৌম্য?

—কি জানি মা! শীতের পাখী সব।

—কি সুন্দর রঙ, পাখাতে! যে-বার তোর বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম বিজনবাড়ি—, সেখানে ঠিক এইরকম পাখী দেখেছিলাম। বিজনবাড়ির আকাশ কি ছিমছাম, আরও ঝকঝকে। ঐ দ্যাখ—ঐ যে গাছটা, ওটার পাতা থেকে লম্বা ডাঁটি বেরিয়ে ফুল ফোটে—এত্তবড়, ঠিক আইভরী কালার। কি নাম বলত?

—সোনালচাঁপা।

—ধ্যেৎ। তুই ফুলই চিনিস না। নাইটকুইন। নাগচম্পা।

এক ঝাঁক পায়রা খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছিল পার্কের ঘাসে। হুইল চেয়ারটা এগিয়ে আসতেই ওরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়। সৌম্য হুইলচেয়ারটা ঠেলে ঠেলে এগাতে থাকে লতাকে নিয়ে। অদ্ভুত প্রশান্তি আজ লতার চোখে মুখে। শ্যাম্পু করা চুল উড়ছে বাতাসে কানের পাশ দিয়ে। মুখে হাল্কা প্রসাধন। একটা নরম স্নিগ্ধ গন্ধ ছড়াচ্ছে গা থেকে। অবনী হাঁটতে হাঁটতে লতাকে দেখে। কোমর থেকে একটা ফুলকাটা চাদরে ঢাকা পা দুটো।

—তুই হাঁফিয়ে গেছিস।

—কে বললে?

—বড় নিঃশ্বাস ফেলছিস।

—ধ্যেৎ। এ টুকুতেই হাঁফিয়ে যাব?

—তোর বাবাকে দে।

—না। আজ পুরোটাই আমি। ঐ দিকটায় যাবে, মা? ও পাশের রাস্তাটায়। খুব নির্জন রাস্তা ওটা। ওখান দিয়ে গিয়ে সোজা সীতুকাকুর বাড়ি। তোমাকে দেখে প্রথমে ভড়কে যাবে। দারুণ খুশী হবে সীতুকাকু। যাবে মা? বাবা, যাবে?

অবনী ঘাড় দুলিয়ে সম্মতি দেয়। লতা তাকিয়ে দেখল।

—চল্ তাহলে। তোর বাবা ত যেতে বলল।

আরে— এই— বলতে না বলতে— দেখ কাণ্ড— ছুটছিস এত জোরে— পড়েটড়ে—

ফাঁকা নতুন পীচঢালা রাস্তায় গড় গড় করে হুইলচেয়ার ছুটোচ্ছে সৌম্য। আর কিশোরীর মত অনেক দিনের ফেলে আসা বয়সটা লতাকেও ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা এগিয়ে গেছে অনেক দূর। ওখান থেকে মাথা ঘুরিয়ে ডাকছে লতা অবনীকে।

—এই, তুমি এস, পেছিয়ে পড়লে যে।'

হাত নেড়ে ওদের এগোতে বলে অবনী।

নিঃশব্দ বিপ্লবই বটে। অবনী পারত না। সৌম্য পেরেছে। তার আগামী প্রজন্মের হাত ধরে নীল নীল বাঁচার আশ্বাস অঘ্রানের আকাশী রংয়ের মত ফুল হয়ে ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে। এতদিন নিস্তরঙ্গ স্বাদহীন জীবনটার মধ্যে কোথায় যেন বাঁচার আনন্দটুকু হারিয়ে গিয়েছিল। অবনী একবার বুক ভরে বাতাস টেনে নিল।

অঙ্কন : সুব্রত চৌধুরী

চি ত্র ক লা

মেঘ মেদুর বরষায়

প্রদর্শনী করলেন স্পেকট্রাম আর্টিস্টস সারকল। স্থান আকাদামি অফ ফাইন আর্টস। কাল আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহ। কুশীলব ছ'জন। নাটক স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত। যদিও অনেকেরই প্রিয় বিষয় নারীর বিবসনা দেহের ভূগোল। কিংবা মুখ চোখের লালিত্য। মাস কয়েক আগে এঁদের প্রদর্শনীর মান এতই নিম্নমুখী ছিল। এবার তুলনায় সকলেই যেন কূলকিনারা পেয়েছেন। যদিও ছবি মিষ্টি যেন একটু বেশি।
আলেখ্য বা অঙ্কন কোনও ক্ষেত্রেই যেন একটি মাধ্যমকে কেউই বাছেননি। ফলে দৃশ্য-রাগরাগিণী মিশ্র মাধ্যমে রূপায়িত।
রাণা ধর তরল রেখার ছন্দে পুরুষ্টু বুকের "মায়ের" সামনে রেখেছেন তার সরল শিশুকে। তেমনি ছোট দুই ভাইবোন যেন শৈশবের নিষ্পাপ প্রতিমূর্তি। "রানী" পার্শ্বচিত্র এবং ভঙ্গিতে ধ্রুপদী। নীল প্রধান ছবি, সামান্য হলুদ আর সবুজের দোহারে সাদা রেখার ভেতর থেকে বের করে এনেছেন। বরং "চিন্তাময়ী" কালো রঙে বাদামী কাগজে যেন জেবড়ে গেছে। দেহের দাঁড়াবার ভঙ্গি রাণা এঁকেছেন ভাল।
মিলন দাশের "গণেশ"-এর দুটি ছবি রঙের প্রাধান্য রূপবন্ধের মজাটাকে চেপে দিয়েছেন খানিকটা। একটা আবার বাটিক বাটিক ধরনের। একটি ছবিতে কলকাতার বাবুকে কোঁচানো ধুতি পরে বসে থাকতে দেখা যায় কুকুর নিয়ে। পাখা হাতে সাবেককালের এক মহিলাকে দেখা যায় পোষা বেড়ালের পাশে অন্যটিতে। এগুলি অলঙ্কারধর্মী কাজ। একটি ছবিতে গাছের ওপর দুটি পাখিকে ভয় তারস্বরে চিৎকার করতে দেখা যায়। নিচে একটি শিকারী বিড়াল। ওপর-নিচে দুটি প্রায়-ডিম্বাকৃতি খণ্ডে, দৃশ্য দুটি রচনার একই সূত্রে গেঁথেছেন। ঈষৎ সচিত্রকরণদোষ কিন্তু শিশুচিত্রের রূপারোপের সারল্য অঙ্গীকার করার জোরে কেটে গেছে খানিকটা।

সমীর সাহা মূলত ছাপাই ছবিকার। তাঁর অঙ্কনে তাই ছাপাই ছবির বুনোটের মজা, ভুষো কালি ব্যবহারের গুণে আর কলমের আঁচড়ে এসেছে। কখনও "আমলা"র প্রতিকৃতির ছায়ার বিকৃতিতে ফুটে ওঠে অবিমিশ্র আত্মম্ভরিতা। কখনও "পাগলের" ঘোলাটে দৃষ্টি। কখনও ঋজু কিন্তু তীর্যক বনের গাছগাছালির আরণ্যক ধূসরিমা। আর পেঁচার চরিত্রের-

ভাইবোন : রাণা ধর

নিহিত গম্ভীর রূপ।
জয়ন্ত মুখুজ্জে অবশ্য মজেছেন নদীর দুপারের নিসর্গের রূপে। মাঝি নৌকাও আছে। আকাশে বিকেলের রঙের বিমূর্তিও তাঁর বিষয় কখনও। কাব্য করার সময় দেওয়ালপঞ্জির ভূচিত্রের ভাবটা তাঁকে এড়িয়ে চলতে হবে আরও খানিকটা। অঞ্জন সেনগুপ্ত ব্রিটিশ "রাজ" এবং বিবসনরূপ নিয়ে কল্পনাবিলাসে আত্মহারা।
অরূপ গুপ্তের "বিড়াল" ঘরের চারিদিকে মাছের দিবাস্বপ্ন দেখে চলতে ফিরতে। সামান্য লালে "বিড়ালের" প্রতিকৃতিতে ধরা এক রাজসিক চরিত্র যা ভঙ্গিতে সিংহের সগোত্র। রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে পাশ থেকে দেখা এক কিশোরী এবং দশাসই এক মহিলাকে। এক্ষেত্রে মজাটা হল দুজনেই দিগম্বরী। পাশ থেকে এক মহিলার মুখ আর হাত ভীষণ নির্জন এবং নরম করে এঁকেছেন একটি ছবিতে।
প্রত্যেকের কাজ ছবির শর্ত মেনেছে। এতখানিই যখন পারা গেছে, তখন প্রত্যেককেই এই সুযোগে নিজস্ব শৈলী গড়ার দিকে মন দিতে হবে। মিশ্র নয়, শুদ্ধ মাধ্যমের নির্বাচনও জরুরী।

সন্দীপ সরকার

স ং গী ত

গানের খেয়া, দানের কূল

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের নিজস্ব রবীন্দ্র-চর্চা-ভবনের সম্প্রসারণের জন্য একটি সাহায্য-সন্ধ্যার আয়োজন করেছিলেন 'খেয়া' সংস্থা, বিড়লা অ্যাকাডেমিতে। শুরুটি খুবই ঢিলেঢালা, অনুষ্ঠান-বিন্যাসও যে সুপরিকল্পিত, বলা যাবে না, তবু টেগোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের কোষাধ্যক্ষা মঞ্জুলা বসুর হাতে যখন, ভবন-তহবিলের জন্য, এক হাজার এক টাকার একটি চেক তুলে দিলেন 'খেয়া'র তরফে রমা বসু, এই সন্ধ্যার যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি মুহূর্তে দেখা দিল লঘু হয়ে।

শুরু হয়েছিল পপি সাহার নটরাজ-বন্দনা নৃত্যানুষ্ঠান দিয়ে। সঙ্গীতের আসরের সূচনা করলেন মনোশ্রী লাহিড়ী। ব্রহ্মসঙ্গীতে তাঁর পক্ষপাত এবং রবীন্দ্রনাথের দুরূহ গানে যথার্থ শিক্ষণের পরিচয় ধরা পড়ল এ সন্ধ্যার সাতটি রবীন্দ্রসঙ্গীত নিবেদনে। 'আমার মন তুমি নাথ' বেশ দরদ দিয়েও গেয়েছেন। কিন্তু কণ্ঠ তাঁকে সাহায্য করেনি। সঙ্গীতের আসরের শেষ শিল্পী ছিলেন নীলা মজুমদার। তিনি শোনালেন কাব্যগীতি, সে-গুচ্ছে ছিল অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান।

গানের আসরের মধ্যবর্তিনী রমা বসু বলতে গেলে অবাকই করেছেন। এঁর গান আগে কোনও আসরে শুনিনি। অথচ বয়সের দিক থেকে মনে হল না, সবে গাইছেন। সবে যে গাইছেন না, ধরা পড়ল দক্ষতাপূর্ণ নিবেদনেও। একডজন গানের ডালিতে তিনি রেখেছিলেন ছটি রবীন্দ্রসঙ্গীত ও ছ-খানি অতুলপ্রসাদের গান। রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী তাঁর আয়ত্ত, কণ্ঠও সুরসমৃদ্ধ, যদিও কোমলতায় কিছুটা অভাব তাঁর কণ্ঠে সব গানকে প্রার্থিত সরসতা দেয় না। কিন্তু যখন অতুলপ্রসাদী ধরলেন রমা বসু, দক্ষতা পেল নতুনতর মাত্রা। দরদ ও দাপটে নিজেকে সহজেই প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন তিনি। এই পর্বের দুটি গান 'ওগো আমার নবীন শাখী' এবং প্রচলিত চলন-ভোলানো 'যাব না যাব না ঘরে' বস্তুতই এই সন্ধ্যার অন্যতম স্মরণীয় উপহার।
এই সন্ধ্যার যন্ত্রানুসঙ্গীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রূপেন ঘোষ ও অশোক ঠাকুর (খোল ও তবলা), অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (এস্রাজ), ও দুলাল লাহিড়ী (বেহালা) এবং পঞ্চানন বড়াল (মন্দিরা ও এফেক্টস)।
মনোশ্রী লাহিড়ীর গানে অন্তত পাখোয়াজ প্রয়োজনীয় ছিল।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

বিরহ জিনিসটা কি

কবি, নাট্যকার, গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালী সংস্কৃতির স্মরণীয় পুরুষ। তাঁর কাব্য, নাটক, প্রহসন, স্বদেশ প্রেমের ও হাসির গান-সব কিছুতেই আমরা এক

মাধুরী মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

পৌরুষদীপ্ত, প্রাণবন্ত, উদাত্ত, আবেগময় প্রখর ব্যক্তিত্বকে পাই যা আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে একটি বিশেষ রসে সমৃদ্ধ করেছিল। তাঁর জন্মের ১২৫তম বর্ষপূর্তি হবে ১৯৮৮তে। গত ১৯ জুলাই তাঁর ১২৪তম জন্মদিবস পালন করে সেই কথা মনে করিয়ে দিলেন 'মিলনী' নামের একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা। এই উপলক্ষে বিদ্যামন্দিরে মঞ্চস্থ হ'ল দ্বিজেন্দ্রলালের একটি প্রহসন এবং গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁর দুজন সহশিল্পী—মাধুরী মুখোপাধ্যায় ও জয়তী দত্ত—শোনালেন দ্বিজেন্দ্র-গীতি।

গানগুলির নির্বাচনে ও গ্রন্থনায় লক্ষ্য ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য ও সঙ্গীত প্রতিভার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে শ্রোতাদের পরিচয় ঘটানো। প্রেম, দেশপ্রেম, ঈশ্বরপ্রেম, বৈরাগ্য, প্রকৃতি ও ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রভৃতি বিচিত্র স্বাদের সুনির্বাচিত কয়েকটি গান অতি সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করলেন শিল্পীরা কখনও একক কখনও সম্মেলক কণ্ঠে। 'বরষা আইল', 'একি মধুর ছন্দে', 'তুমি যে প্রাণের বঁধু', 'নীল আকাশের অসীম ছেয়ে', 'মহাসিন্ধুর ওপার হতে' এবং 'ধন-ধান্য-পুষ্পভরা' ইত্যাদি একদা এবং এখনও জনপ্রিয় গানগুলির সঙ্গে ছিল দুটি দুরন্ত হাসির গান। ভাবে ও সুরে স্বতন্ত্র স্বাদ ও চরিত্রে দ্বিজেন্দ্রগীতির অনন্যতা সুস্পষ্ট হয়েছিল পরিচ্ছন্ন পরিবেশনার গুণে। সঙ্গীতাংশের অনুষ্ঠান আরও মনোজ্ঞ করেছিল প্রতি গানের সুর ও ভাববস্তু সম্পর্কে গোবিন্দগোপালের নানা মন্তব্য।

১৮৯৭ সালে প্রকাশিত 'বিরহ' দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকের রচনা। দাম্পত্য কলহ ও প্রেম নিয়ে সহজ রসিকতার এই প্রহসন দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রতিভার কোন উৎকৃষ্ট নিদর্শন নয়, ঘটনা-সংস্থানে কোন চমকপ্রদ জটিলতা নেই, সংলাপে নেই শ্লেষ-ব্যঙ্গ-শাণিত ঝকঝকে বুদ্ধির দীপ্তি বা প্রখর কৌতুক। তা সত্ত্বেও কৌতুকাবহ পরিস্থিতি ও চরিত্রকল্পনার গুণে প্রহসনটি যে উপভোগ্য তার প্রমাণ পাওয়া গেল মিলনীর সদস্যদের সৌখিন অভিনয়ের সরল সাফল্যে।

সৌখিন মঞ্চায়নে যে-সব ত্রুটি প্রত্যাশিত তার অনেকগুলির থেকে এই প্রযোজনা মুক্ত ছিল না। পরিবর্জন ও পরিমার্জনের ফলে নাটকটি যেমন একদিকে এক পরিচ্ছন্ন রূপ পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে কিছু উপভোগ্য সংলাপ ও দৃশ্য বাদ পড়েছে। ফটো তোলার দৃশ্যটিতে হাসির উপাদান ছিল প্রচুর কিন্তু সংক্ষেপিত করায় এবং সুষ্ঠু উপস্থাপনার অভাবে দৃশ্যটির কমিক আবেদন ক্ষুণ্ণ হয়েছে খুবই। গানগুলির ব্যাপারে আরও যত্ন নেওয়ার অবকাশ ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন গানগুলিই প্রাণ। দৃশ্যান্তরে কুশীলবদের মঞ্চপ্রবেশ এবং বিভিন্ন দৃশ্যে মঞ্চচারণা আরও সুবিন্যস্ত হওয়া উচিত ছিল।

কুশল চরিত্রাভিনয় এই প্রযোজনার সাফল্যের অন্যতম কারণ। এবং এই কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, প্রধানত তপন মল্লিক (রামকান্ত) মঞ্জুশ্রী মিত্র (চপলা) এবং কাজল সেন (নির্মলা)। হীরেন মিত্রের গোবিন্দ একটু নিষ্প্রভ এবং উচ্চাবচতাহীন হলেও অন্যান্য চরিত্রগুলির সঙ্গে বেমানান হয়নি। পল্লীবালা ও কৃষককন্যা গোলাপী বিশ্বাসযোগ্য হয়নি মূলত রূপসজ্জার ত্রুটিতে। আবহসঙ্গীত ছিল খুব প্রশংসনীয়, দায়িত্ব নিয়েছিলেন নরেন্দ্র মিত্র ও অমর নাহা। মঞ্চসজ্জায় যত্ন ছিল খুবই, কিন্তু পরিচালকের নাম জানা গেল না কিছুতেই।

মনসিজ মজুমদার

এত সুর আর এত গান

কয়েক শতাব্দীর ঐতিহ্যের পথ বেয়ে বাংলা গান আজ যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে পিছনে ফিরে চাওয়াটা সততই সুখের সন্দেহ নেই, তবে তার সঙ্গে কোথায় যেন মিশে থাকে এক বেদনাবোধও। সমৃদ্ধ অতীতের পাশে ইদানীংকার বাংলা গানের চেহারা কেমন যেন মলিন, বিবর্ণ! এ কোন উত্তরাধিকার! পুরনো দিনের দিকে এক ঝলক তাকালেই দেখা যাবে বেশ কিছু প্রতিভাবান গীতকার-সুরকার যাঁরা ঋদ্ধ করেছেন বাংলা গানের জগৎ। আর এঁদের দিকেই ফিরে দেখার প্রয়াস করেছিলেন দোয়েল গোষ্ঠী। মূলত কয়েকজন সুরকারের গান নিয়ে গোর্কী সদনে তাঁদের সাম্প্রতিক নিবেদন : সুরের ধারা। এক সন্ধ্যায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য সুরকারের গান হাজির করা সম্ভব নয়, আর যে-সব গান উপস্থাপিত করা হল সেগুলি যে প্রাসঙ্গিক সুরকারগণের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নয়—এই সহজ স্বীকারোক্তিটুকু ছিল গ্রন্থনায় (সংকলন ও গ্রন্থনা : শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ থেকে সলিল চৌধুরী, সুধীন দাশগুপ্ত—এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় স্বাভাবিকভাবেই বাদ পড়েছেন কয়েকজন অসামান্য সুরকার। সীমাবদ্ধ এঁদের প্রচেষ্টা, কিন্তু

সুপ্রীতি ঘোষ

পরিকল্পনা সাধুবাদযোগ্য। অবশ্য গানের সার্বিক পরিবেশন খুব আশাসঞ্চারী নয়। সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য সংগীত-পরিচালিকা সুপ্রীতি ঘোষ। বয়সের ভারে এখন তাঁর কণ্ঠে ক্লান্তি নেমেছে ঠিকই তবে সেদিন কণ্ঠ ছিল আগাগোড়া মসৃণ। সুতরাং সুবিচার পেল বহুমুখী প্রতিভা হীরেন বসুর অতুলনীয় রচনা, অতীতের সেই সাড়া জাগানো গান—'আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও'। পুজো, মহালয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে আছে আকাশবাণীর বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠান : মহিষাসুরমর্দিনী। আর তারই সুপ্রীতি ঘোষের গাওয়া 'বাজল তোমার আলোর বেণু' আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে আছে। সেদিনও গাইলেন, আবারও ভাল লাগল। এ-গানের সুরকার পঙ্কজকুমার মল্লিক, গায়ক হিসেবে যতটা, সুরকার হিসেবে ততটা সঠিক মূল্যায়ন তাঁর এখনো হল না। পঞ্চাশের দশকে শ্যামল গুপ্তের কথায় নচিকেতা ঘোষের সুরে সুপ্রীতি ঘোষ রেকর্ড করেছিলেন আধুনিক 'কৃষ্ণচূড়ার স্বপ্নঝরা'। সুরের চলনে—ছন্দ প্রয়োগে যে মুনশিয়ানা' নচিকেতা ঘোষের তার আভাস আছে এই গানে তবে এটি সুরকারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নয়। প্রসঙ্গত নচিকেতা ঘোষের 'আমার গানের স্বরলিপি' কখনও ভোলা যাবে কি?

অনুষ্ঠানের আর-এক মনোরম উপহার—কম বয়সী শালিনী চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া নজরুলগীতি 'মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর'। মিষ্টি, নরম। রবীন্দ্রনাথের চারটি গান পরিবেশিত হল। প্রতিটি গানের প্রথম পঙক্তিতে 'আনন্দ' কথাটি আছে, প্রাথমিকভাবে মনে হলেও একটু গভীরে গেলেই বোঝা যাবে যে গানগুলি একই যোগসূত্রে গাঁথা নয়। 'আনন্দ' কথাটি বিভিন্ন অর্থে আসে বিভিন্ন গানে। গান চারটির পরিবেশন আশানুরূপ নয়। রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-

দ্বিজেন্দ্রলালের গান যতটা ব্যাপ্ত হওয়ার কথা ছিল ততটা হয়নি—এটা আমাদেরই লজ্জা। এঁদের রচনায় প্রসাদগুণ সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলাটাই বাহুল্য। সেদিন পরিবেশিত এঁদের একটি করে গান প্রার্থিত মানে পৌঁছোয় নি। ত্রিশের দশকে উদিত হয়েছিলেন এক স্মরণীয় সুরকার—সুরসাগর হিমাংশু দত্ত। তাঁর গান কোমল ভাবাবেগের, অথচ সুপরিকল্পিত বুদ্ধিদীপ্ত সুররচনা। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'নতুন ফাগুনে যবে' সেদিন বিফলে গেল জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের মেলডিহীন কণ্ঠের পরিবেশনে। পাশ্চাত্য সুরের অনুসরণ আছে সুরসাগরের 'তোমারি পথ পানে চাহি'—গানে, অনুকরণ নেই। প্রদীপ্ত বসুর কণ্ঠে মোটামুটি সুগীত গানটি। অতীতের আর এক দিকপাল সুরকার কমল দাশগুপ্ত। মেলডি তাঁর গানের প্রধান সম্পদ। তাঁর সুপরিচিত 'এমনি বরষা ছিল সেদিন' সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে মোটামুটি পরিচ্ছন্ন রূপে এল। বাংলা গানে লোকসংগীতকে কি অসামান্যভাবেই না ব্যবহার করেছিলেন শচীনদেব বর্মন! রাজা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে শচীনদেবের 'রঙ্গিলা রঙ্গিলা রে' শচীনদেবের গায়নভঙ্গীর বালখিল্য অনুকরণ হয়ে দাঁড়াল। মেলডি প্রধান গানের অন্যতম সফল সুরকার সুধীন দাশগুপ্তের 'ঐ উজ্জ্বল দিন' এখনও সমান আকর্ষক। প্রাণবন্ত হয়েছিল সেদিন গানটি সমবেত কণ্ঠে। গানের চলনে-ছন্দে পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণে নবস্বাদ এনেছিলেন সলিল চৌধুরী। তাঁর 'অবাক পৃথিবী' গানে নন্দন দাশগুপ্ত আবেদন রেখেছিলেন। সম্মেলক কণ্ঠে 'ও আলোর পথযাত্রী'-ও মন্দ নয়। কোন কোন গানের সঙ্গী ছিল নৃত্য।

স্বতন্ত্রভাবে চোখে পড়েছেন নৃত্য-পরিচালিকা অনন্যা চট্টোপাধ্যায়। ভাষ্যপাঠে ছিলেন সৌমেন সরকার ও সুপ্রিয়া সরকার, যন্ত্রানুষঙ্গে বিপ্লব মণ্ডল, মানব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

স্বপন সোম

ন্ত্য

ভারতোৎসবে নিবেদিত নৃত্যোৎসব

সম্প্রতি কলকাতার সোভিয়েত দূতাবাসের সাংস্কৃতিক দপ্তরের সহযোগিতায় ইউথ গিল্ডের উদ্যোগে গোর্কিসদনে পাঁচদিন ব্যাপী যে নৃত্য-উৎসব অনুষ্ঠিত হল তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যথার্থ প্রতিভাসম্পন্ন নবীন নৃত্যশিল্পীদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করা। ১৯৮৭-৮৮ সালে মস্কোয় আয়োজিত ভারতোৎসবের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শনে এই উৎসব নিবেদিত হয়েছিল।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে ভারতোৎসবে নিবেদিত এই নৃত্যোৎসবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ উপলক্ষে ভারত-রাশিয়ার মৈত্রী প্রসঙ্গ প্রাধান্য পায়। তাছাড়া ছিল শিল্পী পরিচিতি। মূল অনুষ্ঠানের আগে প্রতিদিন রাশিয়ার নৃত্যবিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র প্রদর্শন অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

নৃত্যোৎসবে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়: বর্তমানে এই শহরে ভারতীয় 'ধ্রুপদী' নৃত্যচর্চার কতখানি প্রচার ও প্রসার ঘটেছে তারই একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া সহজতর হল যা অত্যন্ত আশাসঞ্চারী।

প্রথম অধিবেশন ॥ ওড়িশী নৃত্য পরিবেশন করলেন গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের অন্যতমা ছাত্রী রীণা জানা। সম্ভবত আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠান অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় রীণা তাঁর অনুষ্ঠান সূচী সংক্ষিপ্ত করে নেন। তাঁর অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল মঙ্গলাচরণ, পল্লবী, পদম ও মোক্ষ। যদিও মঞ্চে আর্বিভাবেই রীণা তাঁর উপযুক্ত তালিমের পরিচয় প্রদানে সক্ষম হন তবুও মঙ্গলাচরণে মঞ্চাবতরণের অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে সময় লেগেছে। পল্লবীতে যেখানে ভাবাভিনয়সমৃদ্ধ নৃত্তাংশে চরম উৎকর্ষের প্রকাশ সেখানে রীণা অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নৃত্যসংগঠনে দেহের ললিত ভঙ্গিমায় রূপসৃষ্টি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। অভিনয় অংশে কিছু দুর্বলতা আছে। এবিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। মোক্ষে ভাবের গভীরতার অভাবে যান্ত্রিক মনে হয়েছে। তবে রীণা জানা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতির আশ্বাস জানিয়েছেন। সহযোগী শিল্পীদের মধ্যে পাখোয়াজে কিশোর ঘোষ এবং বাঁশিতে দুলাল দাস উল্লেখযোগ্য সহায়তা করেছেন। বন্দনা সেনের অনুপস্থিতিতে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা কত্থক নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। দীপা ও মিতা চক্রবর্তী নিতান্তই শিক্ষার্থী। তাঁরা নৃত্তাংশে কোনোই আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। মীরার ভজন-এর নৃত্যরূপায়ণে রসের বড়ই ঘাটতি—হয়তো প্রত্যাশিতও নয়। তুলনামূলকভাবে চন্দ্রা মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বিষ্ণু বন্দনা অনেকখানি আকর্ষণীয়। বিশেষ করে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের দৃঢ় প্রত্যয়ী নৃত্তাংশ অনেকখানি প্রত্যাশা জাগাতে সক্ষম হয়েছে। সহযোগী শিল্পী জটিলেশ্বর ভৌমিক, বীরেশ্বর কুমার ও গৌতম বসু সার্থক সহযোগিতা করেন।

রত্না ঘোষ

দ্বিতীয় অধিবেশন ॥ এই অধিবেশনের প্রথম শিল্পী ছিলেন প্রিয়দর্শিনী সোম (ঘোষ)। তিনি পরিবেশন করলেন মোহিনী আট্টম। থাঙ্কমণি কুট্টির অন্যতমা ছাত্রী প্রিয়দর্শিনী এই নৃত্য ধারার আঙ্গিক ও প্রকরণ ইতিমধ্যে অনেকখানি আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই নৃত্যশৈলীর ছন্দোময়তার উজ্জ্বলতায় যে আনন্দময় প্রকাশ তা প্রিয়দর্শিনীর নৃত্যভঙ্গিমায় বারেবারেই মূর্ত হয়েছে। পরিবেশিত 'পদম'টিতে তাঁর নৃত্যাভিনয় স্মরণীয় নিবেদন। কালীয় নর্তনম-এ বিভিন্ন ছন্দের বিন্যাস বৈচিত্র্য রূপায়ণে প্রিয়দর্শিনী যে দক্ষতা প্রদর্শন করলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মোহিনী আট্টম নৃত্যশৈলীর আঙ্গিকটিকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে পরিবেশন করার মধ্যে যে সংযমের ও সতর্কতার প্রয়োজন তা প্রিয়দর্শিনী তাঁর অভিজ্ঞতায় আরো পরিণত করে তুলবেন এ প্রত্যাশা করা যায়। সহযোগী শিল্পীদের মধ্যে নট্টুভঙ্গমে সুচিত্রা মিত্র, কণ্ঠসংগীতে লক্ষ্মীনারায়ণ স্বামী, এড়ক্কয়-এ কেশব পোড়োয়াল এবং হারমোনিয়মে শ্রী রামকৃষ্ণের সার্থক সহযোগিতা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। দ্বিতীয়ার্ধে কত্থকনৃত্য পরিবেশন করেন সন্তোষকুমার এবং মধুমিতা রায়। এঁরা দুজনেই বিভিন্ন গুরুর কাছে প্রাথমিক তালিম নেবার পর বর্তমানে পণ্ডিত বিজয়শঙ্করজীর তত্ত্বাবধানে তালিম প্রাপ্ত হচ্ছেন। ঘরানাদার এই দুই তরুণ শিল্পীর নৃত্যানুষ্ঠানে সহজেই উপলব্ধি করা যায় এঁদের প্রস্তুতিতে খাদ নেই। ত্রিতাল ও ঝাঁপতালে এই নৃত্যশৈলীর বিভিন্ন আঙ্গিক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করলেন। অত্যন্ত লয়দার এঁরা। তবে মঞ্চে মধুমিতার সঙ্গে সন্তোষকুমারকে বেশ বেমানান লাগে। মধুমিতার উপস্থাপনা এমনই সৌন্দর্যময় যে সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লখনৌ ঘরানার সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি

অনিতা মল্লিক

অক্ষুণ্ণ রেখেও মধুমিতা নৃত্তাংশগুলিকে যে অনায়াস ভঙ্গিতে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলেন তা রীতিমতো ঈর্ষণীয়। তা সে গৎ নিকাশ, পাল্টা হোক অথবা আমদ বা টুকড়াই হোক সব আঙ্গিক ও প্রকরণের মধ্যে মধুমিতার সৌন্দর্যচেতনা বিভাসিত হয়—এখানেই তার স্বাতন্ত্র্য। বিন্দাদিন মহারাজের রচিত ভজন 'মেরি শুনো নাথ'-এর রূপায়ণে মধুমিতা অপরূপ আবেদন সৃষ্টি করলেন। মধুমিতা অনেক প্রত্যাশা জাগাসেন সেই কথাটি তাঁকে স্মরণ করাতে চাই। গোপাল মিশ্র এবং সুভাষ ব্যানার্জির তবলা সহযোগিতা ছাড়াও গুরু পণ্ডিত বিজয়শঙ্করজীর সহযোগিতা বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

তৃতীয় অধিবেশন ॥ এই অধিবেশনে প্রথম পর্বে ওড়িশী নৃত্য পরিবেশন করেন দীপান্বিতা রায়। যথারীতি মঙ্গলাচরণে অনুষ্ঠানের সূচনা। শঙ্করভরণে পল্লবী ছিল তাঁর এদিনের শ্রেষ্ঠ নিবেদন। দেহভঙ্গিমার বিচিত্র লীলা অথবা ছন্দের আন্দোলনে প্রাণস্পন্দন প্রকাশে তাঁর উৎকর্ষ

যতখানি মঞ্চ ব্যবহারে কিন্তু তিনি ততখানি সচেতন নন। তাঁর এই অসতর্কতার জন্য অভিনয় অংশগুলি যেমন বনমালী দাস কৃত 'তো লাগি গোপদণ্ড'—অনেকখানি দীপ্তিহীন। দশাবতারে আবার দীপান্বিতার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। এখানে অবশ্য চরিত্রগুলির পেলব রূপায়ণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে। সার্বিক বিচারে তিনি ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠছেন। সহযোগী শিল্পী ছিলেন কিশোর ঘোষ, দুলাল দাস এবং অজিত রক্ষিত।

প্রিয়দর্শিনী সোম

দ্বিতীয়ার্ধের শিল্পী ছিলেন অনিতা মল্লিক—পরিবেশন করলেন ভরতনাট্যম। অনিতা এখন বেশ পরিণত হয়েছেন। কেবল আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যেই নয়, দেহভঙ্গির সুষম সৌন্দর্যে, জটিল যতির বিন্যাস রূপায়ণে, সচল স্থাপত্যের কারুকৃতি রচনায় অনিতা অনিন্দ্যসুন্দর। মঞ্চে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ী এবং তাঁর উপস্থাপনায় একটি ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে সক্ষম। পল্পা সুব্রহ্মণ্যম বিন্যস্ত 'আনন্দতাণ্ডব' পদমে অনিতা যে ভাবসঞ্চার করতে সক্ষম হলেন তা সার্থক শিল্পসৃষ্টি। তাঁর অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে আর বিশেষভাবে উল্লেখনীয় ছিল তিল্লানা। এখানে বিভিন্ন যতি বিন্যাসের বৈচিত্র্যে দেহভঙ্গিমার বিচিত্র লীলায় অপরূপ লাবণ্য ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেন সুকুমার কুট্টি, ডি কান্নন ও এস হরিহরণ প্রমুখ।

চতুর্থ অধিবেশন ॥ এই অধিবেশনের প্রথম শিল্পী ছিলেন রত্না ঘোষ। তিনি পরিবেশন করলেন ওড়িশী নৃত্য। মঙ্গলাচরণের পর আরভীপল্লবীতে এই নৃত্যশৈলীতে তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। আঙ্গিকগত ক্রিয়াপরতার পরিচ্ছন্নতা এবং মাধুর্য রত্নার বৈশিষ্ট্য। তবে বিচিত্র বিভঙ্গে কখনো কখনো উর্ধ্বাঙ্গ আরো কমনীয়তা প্রত্যাশা করে। জয়দেবের পদ রূপায়ণে রত্নার অভিনয়অংশের দক্ষতার বিশেষ সাক্ষ্য মেলে। 'কৃষ্ণতাণ্ডব' পল্লবীটিতে রত্না যেন পূর্ণ বিভায় নিজেকে বিকশিত করতে সক্ষম হলেন—কারণ অভিনয়ে তাঁর ক্ষমতা স্বাভাবিক। সহযোগিতা করেন কিশোর ঘোষ, শৈলেনদাস প্রমুখ। পরবর্তী শিল্পী ডাঃ মালবিকা মিত্র। কথক নৃত্য শিল্পী মালবিকা মস্কোয় আয়োজিত ভারতোৎসবে যোগদানকারী নির্বাচিত শিল্পীদের মধ্যে অন্যতমা। তিনি অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শঙ্কর বন্দনা দিয়ে। ক্রমে উঠান, ঠাট, অমদ, পরণ, তিহাই, লড়ির মাধ্যমে ছন্দোবৈচিত্র্যের বিচিত্রলীলার নিদর্শন পেশ করেন। 'তেটে কতা গদি ঘেনে'-র বিভিন্ন বিন্যাস অথবা 'তাকিট তাকিট ধিনা'র লয়কারী মুগ্ধ করে রাখে। বিভিন্ন মালার বিভাজনের মধ্যে লয়ের আনন্দ তিনি যে কেবল দর্শকদের উপভোগ করান তা নয়, নিজেও উপভোগ করেন, তাই অমন আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তবে মানতেই হবে সহযোগী শিল্পীর গান দক্ষতায় নয় শ্রবণসুখের বিচারে উপভোগ্য হয়ে ওঠেনি তাতে রসাস্বাদনের কিছু বিঘ্ন ঘটেছে। অভিনয় অংশে বিরহী নায়িকার অনুভব বর্ণনায় তাঁর দক্ষতা ঈর্ষণীয়। সঠিক বিচারে অত্যন্ত উপভোগ্য অনুষ্ঠান।

পঞ্চম অধিবেশন ॥ এই অধিবেশনে শিল্পী ছিলেন তিনজন। প্রথম শিল্পী কুহেলী চ্যাটার্জী কথক নৃত্য পরিবেশন করলেন। তিনি নিতান্তই শিক্ষার্থী। তাঁর মধ্যে কোনো সম্ভাবনা নেই তা নয়, কিন্তু যে প্রস্তুতি নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হলে দর্শকদের

মালবিকা মিত্র

দীপান্বিতা রায়

অভিনন্দন পাওয়ার সম্ভাবনা অর্জন করা সম্ভব তা এখনো তাঁর আয়ত্তাধীন নয়। এছাড়া নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কথক নৃত্যশৈলী যে সৌন্দর্য সৃষ্টির উৎসে পৌঁছিয়েছে সে বিষয়ে কুহেলী ওয়াকিবহাল নন। এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এদিনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পী ছিলেন থাঙ্কমণি কুট্টির ছাত্রী দেবযানী মজুমদার। দেবযানীর মধ্যে একটি স্বাভাবিক ছন্দোময়তা আছে। ভরতনাট্যম শৈলীর বিভিন্ন করণ ও অঙ্গহার প্রয়োগেই দেবযানী যে কেবল নিজেকে প্রস্তুত করেছেন তা নয়, নিজের স্বাভাবিক অভিনয় ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহারে তিনি নৃত্তাংশগুলিকেও সুষমামণ্ডিত করতে সক্ষম হয়েছেন। দেবযানী দশাবতার বর্ণনাটি যে দক্ষতায় উপস্থাপিত করলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। তাঁর পাদকর্ম, দৃষ্টিকর্ম ও বাহু আন্দোলনের সৌষাম্যে এমন একটি লাবণ্য, এমন একটি ভাবব্যঞ্জনার প্রকাশ যা সত্যিই সহজে দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে। সহযোগী শিল্পী সুকুমার কুট্টি (কণ্ঠসঙ্গীত), শিবদাস (মৃদঙ্গম), এস· হরিহরণ (বাঁশি), গীতামূর্তি (বেহালা) পূর্ণ সহযোগিতা করেন। অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী ছিলেন মালবিকা সেন। তিনি পরিবেশন করলেন কথকনৃত্য। প্রবীণ নৃত্যশিক্ষক প্রহ্লাদ দাসের ছাত্রী মালবিকা এখন অনেক পরিণত। তাঁর প্রস্তুতিও আছে যথেষ্ট। লখনৌ ঘারানার ঐতিহ্যবাহী তাঁর নৃত্তাংশ বেশ আকর্ষণীয়। পরণগুলিতে তাঁর লয়ের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। চক্রদার পরণে তিনি ছিলেন অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়।

ইউথ গিল্ডের পাঁচদিন ব্যাপী নৃত্যোৎসব একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইল।

সুভাষ চৌধুরী

না ট ক

সখী সমিতি

আগে থেকে জানা না থাকলে বোঝা শক্ত যে এই নাটকের সব চরিত্রাভিনেতাই মহিলা। সম্প্রতি বিদ্যামন্দির মঞ্চে এ· আই· ডব্লিউ· সি—দক্ষিণ কলকাতা সাংস্কৃতিক সংঘের সভ্যাদের দ্বারা আয়োজিত জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' অবলম্বনে 'আসামী' নাটকটি দেখতে গিয়ে এই চমকটি উপভোগ করা গেল। সুহৃদ চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ মূল কাহিনীকে টলে যেতে দেয়নি। জেল জীবনের সুখ দুঃখ নিয়ে এই মর্মস্পর্শী কাহিনীটি পরতে পরতে বিন্যস্ত হয়েছে দীপ্ত নাট্যরূপে। এঁদের নাট্যচর্চা নিশ্চয়ই সৌখিন কিন্তু অনুভবী অভিনয় অনেক অভাবকেই আড়াল করে দিয়েছে। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনা নৈপুণ্যও তারিফযোগ্য। মঞ্চটি কুশলী কিন্তু পুরনো ধাঁচের। এ প্রসঙ্গে ভাবনাচিন্তার অবকাশ ছিল। আলোক পরিকল্পনা মামুলি। নাটকটিতে দুটি মাত্র মহিলা চরিত্র তাও খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র নয়। বাকি সব পুরুষ চরিত্রে মহিলারা দাপটে অভিনয় করেছেন। গিরীনের ভূমিকায় মঞ্জুশ্রী কুশারী (গানে অভিনয়ে) দারুণ সপ্রতিভ। মলয়ের ভূমিকায় রেবা চট্টোপাধ্যায় সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে অস্বস্তিতে পড়লেও সুন্দর করেছেন। ভূতনাথের ভূমিকায় শোভনা দে সুন্দর। শেফালী মুখোপাধ্যায়কে মিঃ রায়ের ভূমিকায় ঈষৎ আড়ষ্ট ঠেকেছে। বদর মিজ্জার ভূমিকায় গীতা মুখোপাধ্যায়কে অসম্ভব ভাল মানিয়েছিল। তপতী গুপ্ত (ধনরাজ) ও আরতি ঘোষ (পামডিল্লা) দুজনেই অভিনয়ে দড়।

চন্দ্রিমা সেনের ডাঃ থাপা, শ্রীমতী গুপ্তের রমজান ও রানু ঘোষের জমাদারের কথা না উল্লেখ করলে অন্যায় হবে।

মহিলারা যে কোনো ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই—এমনকি পুরুষদের চরিত্রে অভিনয়েও, তা এ সন্ধ্যায় বেশ বোঝা গেল।

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

হিন্দুস্তান মিল্‌স
হয়ে উঠুন চমকপ্রদ আধুনিক সাধারণের
মধ্যে আকর্ষণীয়। থ্যাকারসের
কাপড়ে আপনার কল্পনার সৃষ্টি হয়ে
উঠুক বাস্তব। সৃষ্টি করুন সেই
বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্ব যা সবার মাঝে
অনন্য— ঠিক যেমন থ্যাকারসে।
কাপড় যদি থ্যাকার্সের হয় সুখ্যাতি তার বিশ্বময়।
থ্যাকারসে
সেরা কাপড় রপ্তানিকারকদের
প্রথম পছন্দ।

দারুণ গল্প শোনালে, মজ্জ।
ধন্যবাদ ডায়ানা। তোমরা সুবাই সুখে থাকো. এই কামনা করি।
?

রাজাদাদা, উনি কী বললেন ?
বললেন যে…
আমরা সবাই যেন সুখে থাকি।

পথে বেরিয়ে চোখে পড়ল সম্রাট জুনকরের উদ্যোগে তৈরি খাল-পাহাড়।
একদম বাবার মতো দেখতে।
আসলে অরণ্যদেবদের সকলের মতো দেখতে।
5/4

"স্বর্গোদ্যানের পথে পড়ল সেই আশ্চর্য অরণ্যও, বাতাসে যেখানে অরণ্যদেবের নাম ধ্বনিত হয়…
অরণ্যদেব…
বাতাসে কী নাম বাজছে, শুনেছিস ?

কিলা-উয়িতে পৌঁছে গেছি। সমুদ্রে স্নান করবে ?
হ্যাঁ! হ্যাঁ।
না না, একেবারে স্বর্গোদ্যানে গিয়ে চান করব!

কিলাউয়ি ছাড়িয়ে এগোচ্ছে
তারও পরে—অনেকটা এগিয়ে অরণ্যদেবের স্বর্গোদ্যান…
সেখানকার সমুদ্রতটের বালিতে মেশানো আছে সোনার গুঁড়ো…
ক্রমশ ● ১

আনন্দ, গীত ও উৎসব

তপন ঘোষ

সারা দেশ যখন রিলায়েন্স ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট জ্বরে জবুথবু তখনি প্রায় আকাশ থেকে ঘটনা দুটি পড়ল। জোড়া অঘটন। নায়ক আনন্দ ও গীত। বিশ্বনাথন আনন্দ ও গীত শেঠি। আনন্দর ১৮, গীতের ২৬। একরকম আচমকাই ঘটছে। একটি রবিবারেই এমন অভাবনীয় সুখবর, কিছুটা অমাবস্যায় চাঁদের উদয় গোছের। এশিয়ান ট্র্যাক ফিল্ডে উষা এশিয়ার রানের-রাণী লকেটটা ফিলিপিনো লিডিয়ার কাছে খুইয়ে এসেছে। বিশ্বে চারশ মিটার হার্ডলসে যখন তার স্থান চড়চড় করে ২৮-এর নীচে নামছে, সেসময় ভারতীয় ক্রীড়া-মঞ্চ প্রায় নিশুতি অন্ধকারেই ছিল। চোখ ধাঁধিয়ে দিল দাবাড়ু আনন্দ ও বিলিয়ার্ডস-বীর গীত শেঠি। একঘেয়ে কপচানি চলছিল—রিলায়েন্স কাপ, সুনীল- কপিল- বেঙ্গসরকার ক্যাপ্টেনসি ইত্যাদি। এই সাফল্য এতই আচমকা প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্ট কারও কাছ থেকেই 'বাহবা' শব্দটি ওরা পেল না। বলতে পারেন, রাজনৈতিক দিক থেকে মাননীয় দুজনেই দারুণ ঘূর্ণিপাকে পড়েছিলেন তাই হয়তো ওদের সহচররা ঠিক ওদের মনে করিয়ে দিতে পারেননি। সদ্য ইসরায়েলের সঙ্গে ডেভিস কাপের খেলা- না-খেলার বড় ব্যাপার কাটিয়ে ওঠার খোঁয়ারিতেই ওরা ছিলেন। ঘটনাটা দিল্লিতে ঘটলে তাও "সাবাশ" কিছু পাওয়া যেত। দুটো ঘটনাই ঘটেছে দেশ থেকে দূরে। একটা আয়ার্ল্যান্ডের বেলফাস্টে আর দ্বিতীয়টি ফিলিপিনসের বাগুইয়োতে। অগত্যা এই খোলামকুচি প্রাপ্তি।

হতে পারে গীত শেঠির চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কেরামতিটি দু বছর আগেও ঘটেছে। সে বছর দিল্লিতে শেঠি আর্থার ওয়াকার ট্রফিটি পেয়েছিল। গৌরব তালিকায় গীত তৃতীয় ভারতীয়। উইলসন জোনস ও মাইকেল ফেরেরারা সে খাতিরে জ্যেষ্ঠ। আর বিলিয়ার্ডস তো কমনওয়েলথের বাইরে প্রচারের বৈভবে নেই। ক্রিকেটের পাশে বিলিয়ার্ডস তেমন বড় খেলা নয়। ভক্ত খুঁজলে ক্রিকেট অনুরাগীদের কাছে নস্যি। গীত সেদিক থেকে প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টের কাছে চট করে যখন তখন কনগ্র্যাচুলেশনস-কীপ ইট আপ্ গোছের কিছু আশা করতেই পারে না। গীত দ্বিতীয়বার ট্রফি জিতে ফিরলে এয়ারপোর্টে উষ্ণ সান্নিধ্য পায় স্ত্রীর। একদিক থেকে ওকে ফেরেরার চেয়ে বড় মনে হয়েছে। মধ্যগগনে থাকাকালীন ফেরেরা বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়নকে গুরুত্ব না দেওয়া নিয়ে ক্ষোভ দেখিয়ে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। গীত ক্ষোভ বিক্ষোভের রাস্তায় নেই। পৃষ্ঠপোষকতাহীন পরিবেশেও সে চ্যালেঞ্জের আকাশে রকেট পাঠিয়ে দিয়েছে—আমি উনআশিতেও জিততে চাই।

সরকারী উপরতলার অনাদর আনন্দকেও ছুঁতে পারেনি। তামিল সরকার ওকে আধ লাখ দেওয়ায় প্রতিশ্রুত। একজন ভারতীয় কিশোরের পক্ষে জুনিয়র ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়া মস্ত ব্যাপার। প্রভিন থিপসের মত একমাত্র গ্র্যান্ড মাস্টারের ভাই অভয় থিপসের

বিশ্বনাথন আনন্দ

কাছে আনন্দের চ্যাম্পিয়ন নজিরটি রীতিমত গায়ে কাঁটা দেওয়ার মত শিহরণ জাগিয়েছে। ওর মতে—এই ছেলেটার জন্য আমাদের সকলের বিরাট আশা ছিল। ওকে নিয়ে এত ভাল ভাল ভাবলেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মত অবিশ্বাস্য কিছু আশার মধ্যে ছিল না। কারণ, প্রশংসার এমন প্রচেষ্টায় আমরা সব ভারতীয়ই গৌরবান্বিত।

বিলিয়ার্ডস নয় কমনওয়েলথ গম্ভীর খেলা, কিন্তু দাবার আন্তর্জাতিকতাকে কে হেলাফেলা করবে? দাবার সেরা দেশ রাশিয়ায় কেতাদুরস্ত সাত লাখ প্লেয়ার খেলে। দাবা চর্চার ঐতিহ্যে ভারত সে তুলনায় শিশু। মস্তিষ্কের এমন কূট-ক্রীড়ায় আনন্দ অসাধারণ ধীমত্তার পরিচয় দিলেও দেশ জুড়ে বিরাট হইচই ফেলতে পারলো না। আসলে ওদের দুজনের কৃতিত্বকে ওজন করার মানসিক দাঁড়ি-পাল্লা এখনও আমরা তৈরি করে উঠতে পারিনি।

খেলা দুটো নিছকই ঘর-কুনো। বিলিয়ার্ডস এমনি সাধারণ মানুষের চোখে ধনী চালিয়াতের সময় কাটানোর খেলা। শারীরিক লম্ফঝম্ফের মাপে এটা প্রদর্শনযোগ্য খেলা নয়। দাবা বিত্তশালীর খেলা না হলেও এটাও অনেকের কাছে কুঁড়ে লোকের সময়বধের খেলা। মানসিক দুনিয়ায় ধারালো মগজকে শান দেওয়ার এমন চমকপ্রদ

গীত শেঠি

খেলাটির তাই আদর না পাওয়াই স্বাভাবিক। গীত এবং আনন্দ এই এত কম বয়সেই কিন্তু দুটি খেলাতেই চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বুদ্ধির খেলায় বিপক্ষকে বিব্রত করতে আনন্দ এই আঠার বছর বয়সেই দারুণ ওস্তাদ। শেঠির কারিকুরি সারা টেবলজুড়ে ছড়ানো এই বয়সেই।

এখন নয় তাৎক্ষণিক উদাসীনতাকে ক্ষমা করা যায়, নিছক ভুল এবং সেটা প্রথম দফার হিসাবেই, ঝুঁকি নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতেও কলম কাঁপছে না। ওরা সাম্প্রতিক স্পোর্টস-প্রেমী ব্যবসায়ীদের খুব একটা নেক নজরে আসবে এমন গ্যারান্টিও সামনে নেই। বিদেশ থেকে আমদানী করা মেইজ বিছানো বিলিয়ার্ডস টেবল জোগাড় করাই মুশকিল তার উপর সরকারি অনুদানে উৎসাহ পাওয়ার আশা করাটা উচিত হবে না। সবই আমদানী করতে হয়। এমনকি সৃদৃশ্য ওই বলটাও। কমবয়সী সকলের হাত এতে দ্রুত সড়গড় হবে, এহেন ভাল ভাবার ঠাঁই নেই। অগত্যা ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা চরিত্রের হামাগুড়ি দিতে দিতে এমন গীত শেঠিরা ছিটকে বেরয়। চ্যাম্পিয়ন হলে কাগজ ছবি ছাপবে, অবশ্য ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তার বিঘে বিঘে জমির পাশে পড়ে থাকা নামমাত্র ছটাক বা কাচ্চা পরিমাণ জায়গাতে। অবশ্য সেদিন যদি ক্রিকেটের বড় খবর থাকে তবে চ্যাম্পিয়ন গীত শেঠির খবরটা নেহাত ছোট হয়ে ক' লাইনে বেরতে পারে। ছবি-টবি আশা করবেন না। রাজত্ব করার সময় ইংরেজ এদেশে নানা খেলাই মাঠে ক্লাবে ময়দানে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে, সেই ফেলে যাওয়া ছেলেপুলের এখনি কেউ হৃষ্টপুষ্ট আর কেউ বা রোগা টিঙটিঙে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে চ্যাম্পিয়ন হও, এটাই মোদ্দা স্লোগান।

ছাব্বিশ বছরের গীতের চেয়ে

আঠার বছরের আনন্দের কৃতিত্বের গভীরতা কম নয়। কম পয়সার, সব বয়সের, কম জায়গার খেলা দাবা। কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া দাবার বোর্ডের চারপাশে তেমন ভীড় নেই। এমন হৈ-চৈ-হীন ভারত-পটভূমি থেকে উঠে আনন্দ ফিলিপিনসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মঞ্চকে নড়িয়ে দিয়ে এসেছে। সোভিয়েতের মত দেশে দাবা জাদুকরের জীয়নকাঠির কাজ করে গোটা সমাজকে সুস্থতা দিয়েছে। দাবা চল হওয়ার আগে রুশীদের মারকুটে, মদ্যপ ও হল্লাবাজ লোকের সংখ্যা কম ছিল না। সরকারি উদ্যোগে সমাজের ওই অমসৃণ গোষ্ঠীকে দাবার ছকে টেনে আনা হয়। গ্রাম, শহর, কারখানা জুড়ে ঝুনো-কচি দাবাড়ুরা গিসগিস করছে। একটা খেলা এমন ঐতিহ্যপূর্ণ জাতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে। শুনলে তাক্ লাগে। জুনিয়র বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আনন্দের দাবার রহস্য ভারতীয়দের এখনো নাড়া দেয়নি।

এমন আশ্চর্য রঙ্গভূমির ছেলে আনন্দ এবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে কারো কাছেই মাথা নোয়াননি। সোভিয়েত, নরওয়ে এবং পূর্ব ইউরোপের ২০ বছরের কমবয়সী চৌখস দাবাড়ুরা ওখানে হাজির হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীদের বেশীর ভাগই এই মাদ্রাজের কলেজ-যুবকটির চেয়েও বয়সে বড় ছিল। দু দল গ্রান্ড মাস্টার এবং এগারজন ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার খচিত এই টুর্নামেন্টে আনন্দর বাছাই তালিকায় থাকার কথা নয়। কিন্তু এই হেলাফেলার আনন্দ এবার টুর্নামেন্টের এক নম্বর পছন্দ নরওয়ের সাইমেন অ্যাজেস্টিনকে হারিয়ে সাড়া জাগায়। অতঃপর আনন্দের জয়ের ছন্দে দ্রুততা যোগ হয়। এটাই স্বভাবসিদ্ধ। ওর মুখোমুখি বোর্ডের ওধারে অতঃপর যে বসেছে সেই হেরেছে। শেষের দিকে এমন দুর্বার গতির পাশে আনন্দের প্রথম গেমগুলো বড় হালকা মনে হবে। হারতে হারতে বেঁচে ড্র করার ঘটনাই বেশী। উপরপুর চেস-সেন্স না থাকলে এইরকম হারতে হারতে জেতার শীর্ষে পৌছানো অসম্ভব। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ক্যাসপারভ, কার্পোভ অথবা স্প্যাসকির সাফল্যের নজিরগুলো আনন্দের তরফে একটা সোনালী ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। ওরাও এক সময় জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। আরও বড় কথা চেস আর বিলিয়ার্ডস দুটোই সঙ্গীহীন খেলা। ভারত থেকে প্রচারবিহীন খেলায় চ্যাম্পিয়নরা যে যার নিজের আওতায় বেড়ে ওঠে। এটাও ঠিক একা জেগে ওঠার ট্র্যাডিশনও গীত ও আনন্দরা বজায় রেখেছে।

দাবা মগজ তোলপাড়ের খেলা। কথায় বলে দু' মণ তেল পুড়লেও দাবাড়ুর ধ্যান ভাঙ্গা মুশকিল। আনন্দর মানসিকতায় চটপটে ভাবটা প্রবল। খেলায় চমক আছে। বিদেশীরাও ওর খেলায় মুগ্ধ। দুমদাম খেলতে খেলতে হঠাৎ বিপাকে পড়লে থতিয়ে যায় না। এই দ্রুত খেলার ঘরানাতেই এই বয়সেই গ্রান্ড মাস্টারের মর্যাদা থেকে মাত্র একটু দূরে দাঁড়িয়ে আনন্দ, খেলায় বেড়ে ওঠার ভাবটা এই ধারায় রাখতে পারলে ও দেশের মুখ আলো করবে।

অন্য আলো ফেলে ওদের ক্ষুদ্র জয়কে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে একটা অদ্ভুত সমীক্ষায় পৌছানো যাচ্ছে। এক সময় ব্রিটিশ এম্পায়ারের লোকজন এদেশে শিক্ষিত শ্রেণীকে মাজা-ঘষা করতে খেলার কালচারে ডুবানোরও চেষ্টা করেছে। এই প্রচেষ্টা ইন্ডোর গেমস, বিলিয়ার্ডস ঘরের চার দেওয়াল ও এটিকেটের কড়াকড়ি এড়িয়ে বেরোতে পারেনি। আন্তর্জাতিক দিক থেকে ছড়ানো বলতে ওই কমনওয়েলথের উঠোনেই যা দাপাদাপি। যদি কেউ বিলিয়ার্ডসে তেমন বড়সড় টুর্নামেন্ট জেতে তখনই হাততালির রোল শোনা যায়। কিছুদিন বাদে যে কে সেই। খেলার ঠোঁটকাটা [illegible]রা বলাবলি করে, ওটা হাই-সোসাইটির খেলা। গীত শেঠি কিন্তু হাই-সোসাইটির কেউ নয়। মধ্যবিত্ত সমাজ থেকেই সে উঠে এসেছে। ভারতীয় খেলাধুলায় মধ্যবিত্তদের এখন দাপাদাপি। এটা সুখের চিহ্ন। আবার এও দুঃখের, উন্নতির দৌড়ে এটা এখন মাঝারি স্তরে পড়ে রয়েছে।

আনন্দ যে খেলা খেলে অর্থাৎ দাবা, রাশিয়ার অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। রাশিয়ার পুচ্ছ ধরে গোটা সমাজতান্ত্রিক পূর্ব ইউরোপে দাবার ছক পাতা রয়েছে। অত্যন্ত ইনটেলেকচুয়াল গেম হিসাবেই দাবার কদর। মিশ্র অর্থনীতির দেশ ভারত কিন্তু ব্যাপারটা এখনো তেমন চারিয়ে নিতে পারেনি। অল্প জায়গায় কম পয়সায় এমন মস্তিষ্কের ব্যায়ামকারী খেলাটি এই উপমহাদেশ নিতে পারছে না। আনন্দের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার হুজুগে যদি ব্যাপারটা ক' সেন্টিমিটার এগোয় তো মন্দ হবে না। অবশ্য কতটা এগোবে, সেটাই দুশ্চিন্তার, যেখানে ক্রিকেটের মত এক সময়ের এম্পায়ার গেম গোটা দেশের মানুষের আনন্দ- আশা- নিরাশার বেশীর ভাগই মন্থন করছে। সদ্য উদাহরণ, রিলায়েন্স ক্রিকেট কাপের হইহল্লায় সারা দেশ ব্যস্ত। আনন্দ আর গীতের গৌরবটুকু তাহলে শুধু খবর কাগজের পাতাতেই শুকনো আনুষ্ঠানিক তৃপ্তি দিয়ে শেষ হত না।

কপট রাগ-দুঃখে বলতে হয়, এমন রিলায়েন্স কাপের হুজুগে ওরা কেন চ্যাম্পিয়ন হতে গেল? বাপ-ঠাকুর্দা এম্পায়ারের গৌরবকে কোথায় রাখি, কোথায় রাখি করে হন্যে হয়ে জীবন-দীপ শেষ করে গেছেন, অথচ তাদের বংশধরদের সামান্যতম হুঁশ থাকা উচিত ছিল যে, ক্রিকেট উৎসব ঘিরে হৈ চৈ-এর মধ্যে অন্য কোনো ভাল কিছু ঘটানো ঠিক হবে না। লাভ-লোকসান যাই হোক সারা দেশ এখনও ক্রিকেট ক্রিকেট করেই ইষ্টমন্ত্র জপছে।

চেষ্টা, অর্থ, আত্ম-সম্মান, গুরুত্ব, ভবিষ্যৎ অবদান সব দিক থেকে এই ক্রিকেট খ্যাপামি কোথায় যে নিয়ে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। কেন যে আমরা এতে জড়িয়ে পড়েছি তার সঠিক উত্তর দেওয়া মুশকিল। ইংরেজের দম্ভ চুরমার করতেই কি লজ্জার মাথা খেয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপের আয়োজন হাতে নিয়েছি। প্রশ্ন ধাক্কা খাবে, একা কেন নিলাম না। থার্ড ওয়ার্ল্ডের ছাপ মারা, তিনটে টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপস, একটি কুস্তি প্রতিযোগিতা, একটি ওয়ার্ল্ড কাপ হকি, দুটি এশিয়াডের ব্যবস্থাপক আমাদের দায়িত্বের কাঁধে এখনও কি যথেষ্ট পেশী তৈরি হয়নি? পাঁচ বছর আগে এশিয়াডের জন্য হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে অথচ পৌনে সাত কোটি খয়রাতের এই ওয়ার্ল্ড কাপ করা কি এমনি কষ্টকর হয়ে উঠত! সব মিলে আসর পাততে খরচ দশ কোটি। হয়তো একা করলে আরও কিছু বেশী খরচ হত। বেশীর ভাগ বিদেশী মুদ্রা যদি বিদেশীদের পকেটে যায়ই তবুও পাকিস্তানের সঙ্গে যৌথ দায়িত্বে এমন মাথা-হেঁট গৌরবকে নিয়ে মাতামাতি করার যৌক্তিকতা কোথায়? সত্যিই এমন ভুলের ফাঁদে জড়ালে আনন্দ অথবা গীত কাউকেই তেমন আমল দেওয়ার ফুরসত পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

এরই মধ্যে আমাদের পূর্বতন শাসক পুরুষরা রটাতে শুরু করেছে, এটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিক থেকে নিছকই ভারত-পাকিস্তান ওয়ার্ল্ড কাপে দাঁড়াবে? বথাম- গাওয়ার- মার্শাল- গার্নার প্রমুখের ওয়ার্ল্ড কাপে না আসার ম্যাজম্যাজানির হেতুকে ছোট করার অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে, দু-দেশের সম্পর্কটা যে এখনো তেমন তো নয়, এটাই মঙ্গলের কথা। এর উপর দঃ আফ্রিকার ইস্যুতে ইংল্যান্ড পুরোপুরি বয়কট করলেও করতে পারত। আম্পায়ারও সব আমাদের নয়। সাহেবসুবো এসে খবরদারি করেছে, আমাদের মাঠ, পরিবেশ খেলার উপযুক্ত হয়েছে কিনা, মাঝে মাঝে আমাদের হুঁশের চামড়ায় চিমটি কেটে দেখতে ইচ্ছে হয়, আমরা স্বাধীন হয়েছি তো? এরপর ওরা খুঁত কাটবে, এটা ভাল হয়নি, ওটা ভাল হয়নি। হোটেল, খবর পাঠানোর সুযোগ, যাতায়াত ব্যবস্থা, দর্শকদের ব্যবস্থা, কীটকীটাণুর উপদ্রব নিয়ে দেশের হেনস্থাকর রিপোর্ট ওরা পাঠাবেই। আমাদের মুখে চুনকালি পড়বে। এতসব জেনেশুনেও আমরা দিনের অর্ধেকের বেশি সময় ঘাড় হেঁট করে কাজ করে যাচ্ছি, যাতে সাহেবদের আপ্যায়নে ত্রুটি যেন কিছু না হয়। চারিদিক ঢাকঢুকি দিয়ে কলকাতাকে তিলোত্তমা করা হবে, সবই ঔপনিবেশিক খোয়াবের জন্য। এরই মাঝে আনন্দ ও গীত শেঠি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমাদের বিব্রত করেছে। আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ এবার রাখতে পারব কিনা, এই গুণতুকের খেলায় মত্ত ছিলাম। কাগজ ভর্তি মত-অমতের ছয়লাপ। আদৌ খেয়াল ছিল না যে এই দুই ছোকরা এমন বৃহৎ কিছু করতেই পারে। সত্যিই ওরা আমাদের আবহমানের এম্পায়ারি চটকায় রীতিমত ঝাঁকুনি দিয়েছে। আমরা অপ্রস্তুত ছিলাম। ■

গোপালের মতে

পঙ্কজ রায়ের টিমটা এরকম ছিল : পঙ্কজ রায়, গোপাল বসু, নির্মল চ্যাটার্জি, শ্যামসুন্দর মিত্র, অম্বর রায়, কার্তিক বসু, দাস্তু ফাড়কর, প্রবীর সেন, মণ্টু ব্যানার্জি, শুটু চৌধুরী ও দিলীপ দোশি। একই টিম—যাকে বাংলার সর্বকালের সেরা একাদশ বাছতে বসে কিন্তু এর সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমত নন পঙ্কজ রায়ের জুড়ি ওপেনার।

যে দল গোপাল বসু গড়ে দিলেন তা একটি শর্তসাপেক্ষে তৈরি। সাধারণ রঞ্জি ট্রফি ম্যাচের উইকেট যেমন হয় খেলা হবে সেই উইকেটে, বোম্বাই-এর মতো জায়গায়, যেখানে পেস বোলারদের লাঞ্চের পর পিচ থেকে সাহায্য পাবার প্রশ্ন নেই। কেন কে দলে আসছেন, কেন অনেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বাদ পড়ছেন এবার তা নির্বাচকের মুখে শোনা যাক : ওপেনার হিসাবে প্রথমেই এসে যাবেন পঙ্কজ রায়। বাংলার সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যানকে টিমে নেওয়া নিয়ে কোনও প্রশ্নই থাকতে পারে না। তবে অবশ্যই প্রশ্ন থাকবে দ্বিতীয় ওপেনার কে? ১৯৮৪ বা ১৯৮৫-তে যদি এই টিম তৈরি করতে বসতাম, তাহলে নিঃসন্দেহে পঙ্কজদার সঙ্গে থাকত অরুণলাল। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়, গত দু তিন বছরে দারুণ কিছু স্কোর করে ফেলেছে ফুচা (প্রণব রায়)।

যা ওর বাবা ছাড়া বাংলার আর কোনও ওপেনারের নেই। না, প্রকাশ পোদ্দার বা পলাশ নন্দীরও নেই। দ্বিতীয় ওপেনার হিসাবে আমার পছন্দ প্রণব রায় (অনেকে উদারতা দেখিয়ে যেমন নিজের তৈরি টিম থেকে নিজেকে বাদ দেন গোপালও তাই করেছেন। যদিও স্বীকার করতে রাজি নন। তাঁর বক্তব্য, আমি এই টিমে আসি না। ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে ফুচার পারফরমেন্স আমার চেয়ে অনেক ভালো।) তিন নম্বরে এসে যাচ্ছে অরুণলাল, এই জায়গায় ওর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী নির্মল চ্যাটার্জি, নির্মলদাকে যাঁরা ব্যাট করতে দেখেছেন তাঁরাই জানেন জিনিয়াস বিশেষণটা যদি বাংলার একজন ব্যাটসম্যানেরও নামের আগে বসানো যায়—তিনি নির্মল চ্যাটার্জি। কিন্তু জিনিয়াস হলেই তো হয় না, প্রয়োগ ক্ষমতাটাও থাকা চাই। থাকা চাই বড় স্কোর। এবং এখানেই অরুণলাল মেরে বেরিয়ে যাচ্ছে। খুব সত্যি কথা বলব? গত তিন চার বছর অরুণের যা পারফরমেন্স, তা পঙ্কজদাকেও ঢেকে দেয়। চার, পাঁচ ও ছয় নম্বরে পরপর এসে যাচ্ছে অম্বর রায়, শ্যামসুন্দর মিত্র ও দাস্তু ফাড়কর। এই নির্বাচনগুলো ব্যাখ্যা করার নিশ্চয়ই দরকার নেই।

সাত নম্বরে লোক ঠিক করা নিয়ে কিঞ্চিৎ সমস্যায় পড়ছি। কাকে নেব ব্যাটসম্যান, বোলার না অল রাউন্ডার? আমার পছন্দ একজন অল রাউন্ডার যে একই সঙ্গে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হবে। ফাইভ ডাউনে কেন ওপেনার চাইছি? ওর উত্তর হচ্ছে এরকম শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন আপে যখন সাত নম্বর ব্যাট করতে নামবে ধরে নেওয়া যায় স্কোর ভালই থাকবে এবং দ্বিতীয় নতুন বলটা খেলতে হবে।

দুজনের নাম এ জায়গায় উঠছে—এস কে গিরিধারি এবং পলাশ নন্দী। গিরিধারি ভাল ব্যাটসম্যানই শুধু ছিলেন না, অফ স্পিনার হিসেবেও ছিলেন যথেষ্ট যোগ্য। আমার পছন্দ কিন্তু পলাশ। টেস্ট ছাড়া আর সব পর্যায়ের ক্রিকেট ও খেলেছে এবং যথেষ্ট রান করেছে। আট নম্বরের জায়গা বরাদ্দ টিমের উইকেটকিপারের জন্য। সেরা দলের কিপার কে? কে হতে পারেন, প্রবীর সেন ছাড়া? খোকনদার কিপিং আমি দেখিনি তবে যেটুকু শুনেছি তার এক শতাংশও যদি সত্যি হয় ওঁর কাছাকাছি কেউ নেই। নয় এবং দশ নম্বর যথাক্রমে সুব্রত গুহ ও দিলীপ দোশি। ওদের নিয়ে আলোচনা করার কোনও প্রয়োজন দেখছি না।

শেষ জায়গাটা মিডিয়াম পেসার দিয়ে ভরাট করা যায় আবার স্পিনারও নেওয়া যায়। যদি মিডিয়াম পেসার নিতে হয় তাহলে এই দুজনের মধ্যে কাউকে—দুর্গাশঙ্কর মুখার্জি বা সমর চক্রবর্তী। কিন্তু যাকেই নেওয়া হোক তাকে দিয়ে বোলিং ওপেন করানো যাচ্ছে না।

সুব্রত ও ফাড়করের পর তিন নম্বর বোলার হিসাবে আক্রমণে এসে মরা উইকেটে খুব সাফল্য এরা পাবেন কী? মনে হয় না। তার চেয়ে এমন কাউকে চাইব যার কাছে ব্যাটিং পিচেও টিম উইকেট পাবার আশা করতে পারে। এদিকটা ভাবলে অনিবার্যভাবে উঠবে সৌমেন কুন্ডুর নাম, কুন্ডুদা যে দেশের হয়ে কখনও খেলার সুযোগ পাননি তার জন্য দায়ী দুর্ভাগ্য। কিন্তু ওর যোগ্যতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। হ্যাঁ, এগার নম্বরে আমি রাখছি এই বিখ্যাত লেগ স্পিনারকে।

গোপাল বসুর টিম তাহলে দাঁড়াচ্ছে পঙ্কজ রায়, প্রণব রায়, অরুণলাল, অম্বর রায়, শ্যামসুন্দর মিত্র, দাস্তু ফাড়কর, পলাশ নন্দী, প্রবীর সেন, সুব্রত গুহ, দিলীপ দোশি ও সৌমেন কুন্ডু। চোখ বুজে বলে দেওয়া যায় অনেকেই একমত হবেন না। বেশ কয়েকটি নির্বাচন নিয়ে তর্ক জুড়তে চাইবেন। এবং এই ধরনের কাল্পনিক নির্বাচনের মজাটা ঠিক সেখানেই।

তারকাদের কুসংস্কার

রেস্তোরাঁর নাম পর্টোফিনিও। দক্ষিণ লন্ডনের এই ইতালীয় রেস্তোরাঁর মালিক বিখের প্রায় সব টেনিস তারকাকে চেনেন। পর্টোফিনিওতে ঝুলছে টেনিস সুপারস্টারদের অনেকের স্বাক্ষরিত বড় বড় ছবি, বরিস বেকার সই করে আরও লিখেছে, 'উইম্বলডন ফাইনালের আগের রাতে দুবার আমি এখানে ডিনার করেছি। দুবারই চ্যাম্পিয়ন। আবার যদি কখনও ফাইনালে উঠতে পারি, আগের রাতে এখানেই খেয়ে যাবো।' ম্যাচের জন্য শারীরিক দিক দিয়ে ফিট থাকা যতটা প্রয়োজনীয় ততটাই প্রয়োজন মানসিক দিক দিয়ে নিজেকে সবল রাখা। টেনিসে যত টাকা আসছে, যত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ছে ততোই যেন আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ছে এই মানসিক প্রস্তুতির ব্যাপারটা।

আর এই মানসিক চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে টেনিস তারকাদের কুসংস্কার। বরিস বেকার একা নয়, শীর্ষস্থানীয় হোক, মাঝারি মানের খেলোয়াড় হোক, সবাই কমবেশি কোনও না কোনও সংস্কার আচ্ছন্ন। ভিটাস গেরুলাইটিস বরাবর বড় ম্যাচের আগের রাত্তিরটা কাটিয়েছেন ডিসকোথেক-এ বা বান্ধবীদের সঙ্গে স্ফূর্তি করে। ভিটাসের ধারণা, এতে তাঁর স্নায়ু খুব ঝরঝরে থাকত। জন ম্যাকেনরোর আবার প্রস্তুতির ধরনটা অন্যরকম। মনে করা যাক, এক ঘণ্টার মধ্যে ম্যাকেনরো উইম্বলডন ফাইনাল খেলতে নামবেন। স্ট্র্যাটেজি কষাটষা নয়, এসময় মার্তকে তিনি বিশ্রাম নেন লকার রুমে হেডফোনে কমিকস পড়ে বা লৌহাগারে বসে ওয়াকম্যানে রক মিউজিক শুনে।

মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা জন্তুজানোয়ার খুব ভালবাসেন। এ বছর ফরাসি ওপেনের সময় কনকর্ডে উড়িয়ে এনেছিলেন তাঁর পাঁচটি কুকুর ও একটি বেড়ালকে। যখনই বড় কোনও টুর্নামেন্টে মার্টিনা খেলতে নামেন এই পশুগুলিকে রেখে আসেন লকার রুমে। এতে নাকি তিনি খুব নিশ্চিন্ত হয়ে খেলতে পারেন। ইভান লেন্ডল কোর্টে নেমে প্রথমেই খুঁজে নেন তাঁর কোচ ও বান্ধবী কোথায় বসেছেন। খেলা দেখতে যতই ভীড় হোক লেন্ডল ঠিক বার করে নেবেন ওঁরা কোথায় বসেছেন। সুবিধে হয়—লেন্ডল নাকি এতে খুব নিরাপদ বোধ করেন।

যখনই কোনও র‍্যালি হয় বেকার তাকায় ওঁর কোচের দিকে। সাঙ্কেতিক ভাষায় কিছু নির্দেশ ছুঁড়ে দেন টিরিয়াক। এবং বেকারেরও একটা নির্দেশ দেওয়া থাকে। তা হল খেলা চলাকালীন জায়গা থেকে এক ইঞ্চিও নড়তে পারবেন না কোচ। তাহলেই নাকি ওর খেলা খারাপ হয়ে যাবে। বিয়র্ন বর্গ বড় বড় টুর্নামেন্টে খেলে গেছেন একই টি শার্ট পরে। প্রতিদিন খেলার পর ময়লা টি শার্টটিকে ধুতে হত (প্রাক্তন) স্ত্রী মারিয়ানার। কেননা পরের দিনই হয়তো আবার খেলা রয়েছে।

"রিবার"? খেলার সময় কথা বলেন কাল্পনিক এক ঈগলের সঙ্গে। ধরে নেন তার ডান কাঁধে ঈগলটি বসে রয়েছে। 'এস' সার্ভ করার পর তার দিকে চেয়ে বলেন, কি রকম দিলাম? এই ঈগলের অস্তিত্ব অনুভব না করতে পারলে তাঁর নাকি খেলাই হয় না। মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা যা বলেন, তাই কি ঠিক? হয়তো। "একটু ছিটগ্রস্ত না হলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায় না।"

গৌতম ভট্টাচার্য

ছিন্নমূল শৈশব

শৈশব যায় কিন্তু শৈশবের বেদনা যায় না। তার স্মৃতি আবিষ্ট করে রাখে আমৃত্যু। পৃথিবী জুড়ে চিরকাল শিশুর ওপর যে অত্যাচার হয়েছে তার নজির কোন বয়স্কের ইতিহাসে মিলবে না। শিশুর জগৎ আমাদের সবচেয়ে কাছের হয়েও সবচেয়ে দূরের। তাই সাহিত্যে তার প্রতিফলন আমাদের কাছে দুর্লভ ঐশ্বর্যের মত মনে হয়।

শিশুরা মাতৃক্রোড়ে শুধু সুন্দর নয়, প্রকৃতিস্থ এবং স্বাভাবিক। মাতৃদুগ্ধের মতই তার পরিপুষ্টির জন্যে চাই পারিবারিক স্নেহচ্ছায়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মত দরিদ্র দেশগুলিতে তারা নিরন্তর উপেক্ষা এবং অনাদরের মধ্যেই বেড়ে ওঠে। জনবহুল সংসারে শিশুরা অবাঞ্ছিত হয়েই আসে। খাদ্যঘটিত অপুষ্টির চেয়েও তাদের মানসিক বঞ্চনা অনেক বেশী ক্ষতিকারক হয়ে দেখা দেয়। অনাথ শিশু হয়ে ওঠে পথের আবর্জনা। অনাথ না হলেও পিতামাতার যৌথ আশ্রয় অধিকাংশেরই জোটে না। পশ্চিমের সঙ্গতিবান দেশগুলিতেও শিশুর ভাগ্যের হেরফের হয়নি সর্বত্র। সেখানে মনস্তাত্ত্বিক বিকারগ্রস্ত অনেক পরিবারেই নাড়ির টান, রক্তের টান অনেকখানি আলগা। বিবাহবিচ্ছেদ এবং পুনঃপুনঃ বিবাহ যেখানে নারীপুরুষ উভয়পক্ষেই অনিবার্য ঘটনা, সেখানে বাড়তি শিশুর বোঝা ভগবানেও বয় না। তাদের মর্মান্তিক পরিণতির দিকে তাকাবার সময় ব্যস্ত সমাজের নেই। বাণিজ্যিক শোষণের আর দুরারোগ্য রোগের শিকার হয়ে ওঠে এই মনুষ্যেতর প্রাণীরদল। অমৃতস্য পুত্রাঃ কথাটা ভাগ্যের পরিহাসের মত, ব্যঙ্গের মত শোনায়।

অথচ শৈশবের স্মৃতি সবচেয়ে দীর্ঘজীবী। সেই নিষ্পাপ সরলতার ওপর কঠিন ও কুটিল সংসারের যে নিষ্ঠুর সীলমোহর পড়ে তার দাগ উত্তরজীবনে গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। তবু কিছু কিছু মানুষ এই ভাঙাচোরা পোড়খাওয়া শৈশবের পুঁজি নিয়েও মাথা তুলে দাঁড়ায়। তাদের সংবেদনশীল হাতের ছোঁয়ায় পৃথিবীর অমর শিল্পকলা আর সাহিত্য জন্ম নেয়। জন্ম নেয় আগামীকালের অপরাজিত মানবকের দল। শিশুর জগৎ ও জীবনের নিজস্ব সংবাদদাতা তারা।

অনেক বিখ্যাত মানুষের জীবনেই বোধ হয় এই একটা জায়গায়, এই আদিপর্বে এক বেদনার্ত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। হয়তো বলার অপেক্ষা রাখে না টম সইয়ার, অলিভার টুইস্ট, টারজান, সুপারম্যান এবং লিটল অরফান অ্যানির মতো বিশ্ববিখ্যাত চরিত্ররা সকলেই অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হয়েছিল।

এইরকম পিতৃমাতৃহীন হতভাগ্য জীবনের সত্য ও কাল্পনিক কথা লিখেছেন বাল্যে অনাথ এক বিদেশিনী, আইলীন সিমসন। তাঁর সাম্প্রতিক বইটির নামও তাই : 'অরফ্যানস : রিয়্যাল অ্যাণ্ড ইম্যাজিনারি'।

১৯৮২ সালে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁর অন্য ধরনের একটি গ্রন্থের সুবাদে। কবি জন বেরির সঙ্গে তাঁর বিবাহের উপভোগ্য স্মৃতিকথাটির নাম 'পোয়েটস ইন দেয়ার ইয়ুথ'। সিমসন অনাথ ছিলেন আগেই বলেছি, তবে একবারে হতভাগ্য হয়তো ছিলেন না। ভাগ্য তাঁর সঙ্গে কিছুকাল নিষ্ঠুর খেলা খেলেছিল হয়তো কিন্তু সেই অন্ধকার নিরুত্তাপ এবং প্রায় অসহনীয় জীবন থেকে অনতিবিলম্বেই তিনি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ অনাথ শিশুর মতো তাঁর অকালমৃত্যু ঘটেনি, কিংবা তিনি নষ্টভ্রষ্ট ধূলিসাৎ হয়েও যাননি। এই জন্যেই হয়ত তিনি নিজেকে 'লাকি ওয়ান' বলেছেন। তা তাঁর জীবনে এক ধরনের ভাগ্য তো বটেই, হয়তো সৌভাগ্যও বলা যায় কিঞ্চিৎ পরিমাণে। আইলীন সিমসনের যখন এগারো মাস বয়স তখন তাঁর মা যক্ষ্মারোগে মারা গিয়েছিলেন। এইরকম পারিবারিক বিপর্যয়ে নিরুপায় হয়ে পরে তাঁর বাবা তাঁকে আর তাঁর দিদিকে এক ক্যাথলিক কনভেন্ট স্কুলে পাঠিয়ে দেন। সিমসনের বয়স যখন ছ'বছর তখন জানতে পারেন বিষক্রিয়ার ফলে তাঁর বাবার আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে।

কনভেন্টের জীবন অমানবিক ছিল না কিন্তু কঠোর শাসনের ও কৃচ্ছ্রসাধনের জীবন ছিল। আইলীনের স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল পর পর তিন বছর নিউমোনিয়ায় ভুগে। শেষে চিকিৎসকের পীড়াপীড়িতে তাঁর অভিভাবক কাকা শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্যকর জায়গার খোঁজ করে নিউ জার্সির এক প্রিভেনটোরিয়ামে ভর্তি করে দেন। সম্পূর্ণ নীরোগ হবার পর সিমসনকে নিয়ে গেলেন তাঁর এক বৃদ্ধ মাসী। মহিলা ছিলেন এক স্কুলের শিক্ষিকা, কঠোর এবং অতিমাত্রায় হিসেবী। ফলে তাঁর হেফাজতে সিমসনের দিনগুলি খুব আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিয়েই কাটছিল। বেশ কিছু বছর পরে জানা গেল আইলীনের বাবা তাঁর জন্যে মোটা রকমের টাকাই রেখে গিয়েছিলেন কিন্তু আইলীনের অভিভাবক কাকাটি সেই অর্থ গোপনে আত্মসাৎ করে বসে আছেন। যাই হোক তাঁর এক বড় দিদির সাহায্য ও সাহচর্য শেষ দিকে তাঁকে শৈশবের দুর্ভাগ্য থেকে অনেকখানি মুক্ত করে। তাঁর বিবাহ হয় এবং সাইকোথেরাপিস্টের জীবিকায় বৃত হন, এবং লিখতে শুরু করেন।

কিছু কাল্পনিক এবং সত্যিকারের অনাথ বালকবালিকাদের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকথাকে তুলনা করে সিমসন তাঁর কাহিনীকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন ঘটনায় উপঘটনায়। রুশো থেকে শুরু করে জেন আয়ার প্রভৃতির জীবন ইতিহাসের তথ্যাবলীকে প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করে অনাথ শিশু-মনস্তত্ত্বের যে ছবি এঁকেছেন আইলীন,তা মনকে পীড়িত করে উপর্যুপরি বিচ্ছেদ বেদনা ও কান্নার কারুণ্যে। স্বভাবতই একঘেয়েমি এসে গেছে তাঁর মধ্যে পুনরুক্তি ও পুনঃপুনঃ প্রতিধ্বনির ফলে। আইলীন তাঁর উপখ্যানকে, তাঁর এই মিশ্র জীবন চিত্রকে সম্প্রসারিত করতে গিয়ে খানিকটা ভুল পথেও চালিত হয়েছেন। কিন্তু চরিত্র যথাতথ্যে আলোকিত হয়নি। যেমন ধরা যাক চার্লি চ্যাপলিন কিংবা কিপলিং সেই অর্থে অনাথ ছিলেন না। পিতামাতার কাছ থেকে সঙ্গ ও সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন মাত্র। ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে লেখিকা তাঁর সংগৃহীত উপাদান সর্বত্র তলিয়ে এবং খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেননি। তাঁর তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তকে বিশ্বাসযোগ্য রকমে বাস্তবায়িত করে তুলতে পারেননি কোথাও কোথাও। তবে অপরের গল্পকথা এবং কাল্পনিক উপাদান নিরপেক্ষ হয়ে বিচার করলে সিম্পসনের আত্মজীবনকাহিনীটি অনবদ্য হয়েছে।

রহস্যের দুই ধারা

রসের চেয়ে রহস্যের দিকে মানুষের মনোযোগ ক্রমশ বাড়ছে। কারণটা কি শুধু একালের দ্রুতলয় জীবন আর সময়াভাব? জীবিকাজন্দ দিনদৌড়ের মাঝখানে স্যাণ্ডুইচ হয়ে যাওয়া অবকাশ, সময়ের মাপা কাটপীস মানুষের ফাস্টফুড হয়ে উঠেছে বলে? নাকি দুশ্চিন্তিত মানুষ আর বাড়তি চিন্তার বোঝা মাথায় নিতে চাইছে না? নাকি রস উপভোগের জন্য রসিকের প্রয়োজন, শিক্ষাচর্চার প্রয়োজন অথচ এখন দেশে দেশে সাক্ষর মানুষের

সংখ্যা যত বেড়েছে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা তত বাড়েনি, সেই জন্যে ? কারণটা যাই হোক বাজার চাইছে রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা আর গুপ্তচর কাহিনী। বাজারের এই পাইকারী টান বিচলিত করে তুলেছে লেখকদের। সাহিত্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অর্থকরী জনপ্রিয়তার বিরোধ বেধেছে। যদিও জনমনোরঞ্জনের গর্তে আপোস করা যে কোনো রচনার মতই অপরাধ সাহিত্যও জাতে খাটো হয়ে রয়েছে এখনো তবু এদিকে ঝুঁকেছেন এমন লেখকের সংখ্যা যে তলায় তলায় বাড়ছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে এখন পাল্লাপাল্লির লড়াইটা জমে উঠেছে পটভূমি পরিবেশ প্রাচীন কিংবা আধুনিক বিষয়বস্তু নিয়ে ততটা নয় যতটা তার আকৃতি তথা রচনার চারিত্রিক পদ্ধতি নিয়ে। রহস্যকাহিনী স্বয়ংসম্পূর্ণ এক দমকের কাহিনী হবে অর্থাৎ একটি স্বতন্ত্র একক গল্প হবে যার মধ্যে ট্র্যাজেডির মতই আরোহণ শীর্ষবিন্দু এবং অবরোহণ বা পরিণামী উপসংহার থাকবে এটাই অধিকাংশ লেখকের পছন্দ। কিন্তু আজকের পাঠক এবং প্রকাশক চাইছেন ক্রমান্বয়ী রচনার মধ্যে একটি প্রিয় চরিত্রের বারংবার আবির্ভাব। অর্থাৎ গল্পের চেয়েও তারকা প্রীতি বা অতিনায়ক পূজাই তাঁদের কাছে বড় হয়ে ওঠে। এই সিরিজ বা ধারাবাহিক চরিত্রায়নের গল্পমালাই বেশী জনপ্রিয়। মানুষের এই মনস্তত্ত্ব কমবেশী চিরকালই ছিল তার প্রমাণ শার্লক হোমস,অরকিউল পোয়েরো, নীরো উলফ থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের রবার্ট ব্লেক, মোহন, প্রতুল, কিরীটী, ব্যোমকেশ, জয়ন্ত-বিমল-ফেলুদা প্রমুখের অতিমাত্রায় জনপ্রিয়তা। কিন্তু সিরিজ লেখা অনেক লেখকের কাছেই শেষ পর্যন্ত একঘেয়েমির কোঠায় গিয়ে দাঁড়ায়, মুখ বদলের সুযোগ না থাকায় তাঁদের মনে হয় তাঁরা একই বই বারবার লিখে চলেছেন। যে জন্যে কনান ডয়েল একবার বেঁকে বসেছিলেন, যদিও হোমস-কে গুম খুন করা শেষ পর্যন্ত জনচাহিদার ধোপে টেঁকেনি।

তবে যে কারণেই হোক, লেখকের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ যাই হোক, অধিকাংশ গোয়েন্দা কাহিনীকারকেই ধারাবাহিকতার শর্তেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। রীতিগত অসুবিধে পুনরুক্তি এবং মানসিক অবসাদ থাকা সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে, সেরা অপরাধভিত্তিক উপন্যাসের আধুনিক নজির মুখ্যত এসেছে এই অনুবর্তনের ধারা থেকেই। সম্ভবত স্যার জন অ্যাপলবি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এক কাল্পনিক অবসরপ্রাপ্ত প্রধান, সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছেন ধারাবাহিক ভূমিকায় পুনঃপুন অবতরণ করে। অক্সফোর্ডের এক প্রাক্তন শিক্ষক মাইকেল ইনস-এর বয়স এখন আশি। অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় তিনি পেরিয়ে এসেছেন রহস্য গল্পের জগতে। চতুর, প্রাণবন্ত এবং উদ্ভট কল্পনার সঙ্গে সজাগ কৌতুকবোধ মিশে তৈরি হয়েছে তাঁর অনবদ্য স্টাইল। রহস্য-সূত্র এবং তার সমাধানে অভূতপূর্ব ব্যাপার হয়তো নেই কিন্তু প্যাঁচ-পয়জারে ভরা প্লট রচনায় তাঁর প্রশংসনীয় দক্ষতা আগের মতই আছে—একথা মনে হবে তাঁর হালের বই 'অ্যাপলবি অ্যাণ্ড দি অসপ্রেস' পড়লে।

ধারাবাহিক চরিত্র সৃষ্টির গল্পে আর এক উল্লেখযোগ্য নজির রেখেছেন বহুসৃজনশীল ব্রিটিশ লেখিকা এডিথ পারজিটার (তাঁর বহুমুখিতার মধ্যে চেক কবিতার অনুবাদকর্মও একটি)। দ্বাদশ শতকের মঠবাসী সন্ন্যাসী ব্রাদার ক্যাডফেল-কে নিয়ে লেখা তাঁর ত্রয়োদশতম উত্তেজক উপন্যাস 'দি রোজ রেন্ট' সম্প্রতি বেরিয়েছে। এডিথ তাঁর রহস্য উপন্যাসগুলি লেখেন এলিস পিটারস এই ছদ্মনামে। ব্রাদার ক্যাডফেল স্মরণ করিয়ে দেয় তার এক বিশশতকী আত্মীয়কে, জি· কে· চেস্টারটন রচিত আমাদের সুপরিচিত ফাদার ব্রাউনকে।

এক আমেরিকান লেখিকা মার্থা গ্রিমস তাঁর সিরিজের নবম গ্রন্থ 'দি ফাইভ বেলস অ্যাণ্ড ব্লেডবোন'-এ পৌঁছে তাঁর ঝুলে যাওয়া সুনাম আবার ফিরে পেয়েছেন। গ্রামীণ ব্রিটেনকেই তিনি তাঁর রহস্যকাহিনীর পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমান কাহিনীর গৌণ চরিত্রগুলিতে ডিকেন্সের স্কেচধর্মী চরিত্রের ছাপ লক্ষ করা যায়। ব্রিটিশ রহস্য গল্পে সাধারণত কাহিনী ফাঁদা হয় কাল্পনিক গ্রামকে দৃশ্যপট হিসেবে নিয়ে। কিন্তু মার্থা তাঁর স্থানিক বর্ণনাকে বাস্তবিক করে তোলার জন্যে কিছু সত্যিকারের নাম ব্যবহার করে থাকেন। আমেরিকান লেখকরা, বিশেষ করে সাংবাদিকতার পোড়খাওয়া লেখকরা জনবহুল শহরের বাস্তব মানচিত্রকে তাঁদের ক্যানভাস হিসেবে ব্যবহার করতে ভালোবাসেন। মাইকেল কলিনস-এর এক হাত ওয়ালা গোয়েন্দা ড্যান ফরচুনের কার্যকলাপ মানহাটানে। কলিনসের কাহিনী কাল্পনিক রাজনীতির আঁচে তাতানো।

এড ম্যাকবাইন-এর সিরিজ পরিচিত হয়ে আছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ক্রিমিন্যাল ল-ইয়ার ম্যাথু হোপের জন্য। 'পাস ইন বুটস' হোপকে নিয়ে নতুন কাহিনী। সাউথ ক্যালিফোর্নিয়ার সাইকোলজিস্ট চরিত্র অ্যালেকস ডেল অ্যাওয়ারকে গোয়েন্দা হিসেবে গড়ে তুলেছেন জোনাথান কেলারম্যান। কেলারম্যানের সাহিত্যগুণেসমৃদ্ধ অ্যালেক্সের নতুন কীর্তি কাহিনীটির নাম 'ওভার দি এজ'।

সিরিজ লেখকদের অনেকগুলি নতুন বই-ই বেরিয়েছে অল্পকালের মধ্যে। সবগুলির উল্লেখের প্রয়োজন নেই তবে এক বহুখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিকের অ্যাসোসিয়েটেড এডিটার জে· ডি· রীড এবং তাঁর স্ত্রী ক্রিস্টিনা রীডের নাম বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পটপ্রেক্ষিতে কাহিনী বুনেছেন তাঁরা। ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের অভাবনীয়তায় তাঁরা ছাড়িয়ে গিয়েছেন অপরাপর লেখকদের। তাঁদের সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'এক্সপোজার' এক উপর্যুপরি খুনের জমাট কাহিনী। হত্যাগুলির পিছনে রীতিমত বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছেন কার্যকারণ সূত্রটিকে, অর্থাৎ হত্যার উদ্দেশ্যকে। যাকে বলা যেতে পারে রহস্যের মূল ভিত্তি। যে ব্যাপারটি যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তবায়িত না হলে গোটা প্লটটাই নড়বড়ে হয়ে যায়।

কিন্তু গোয়েন্দা কাহিনী যত সহজে এক নায়কতন্ত্রের ধারা বহন করে ক্রমশ পদ্ধতি অনুসরণ করতে এগিয়ে এসেছে গুপ্তচর কাহিনী তত সহজে ব্যাপারটা মেনে নিতে রাজী হয়নি। স্পাই স্টোরির ক্ষেত্রে অসুবিধে এই যে তাতে গুপ্তচর দীর্ঘায়ু হলেও বারান্তরে তার গোপনীয়তার চমক নষ্ট হয়ে যায়।

মোটকথা একক রচনা এবং ধারাবাহিক রচনার টানাপোড়েনে কোন ধরনের রচনা শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পাবে, লেখকদের মানসিকতা এবং প্রকাশকের প্ররোচনা কোনটি জয়ী হবে তার মীমাংসা এখনো শেষ হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় ট্রিলজি বা একাধিক পর্ব রচনার দৃষ্টান্ত মৌল সাহিত্যে উপন্যাসের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। গ্রন্থ

রহস্য গল্পের বাজার এখন ভালই। এক বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে তার চাহিদা দিন দিন বাড়ছেই। মানুষ চায় তার প্রতিদিনের জীবন সমস্যা এই কাল্পনিক উত্তেজনায় ভুলে থাকতে। কিন্তু এই নতুন স্বাদের নেশার খোরাক যোগাতে লেখকদের ঘাড়ে চেপে বসছে তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রের ভূত।

নেহরু ও সমাজবাদ

ত্রিদিব চক্রবর্তী

নেহেরুজ আইডিয়াজ অব সোশ্যালিজম/ এস. সি. ঘোষ/

ওশেনিয়া পাবলিশিং হাউস/ কল-৬/ ৯০.০০

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য এবং রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই নেহরুর পরিচয় সাধারণের কাছে। কিন্তু তার বাইরে আরো বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী যে নেহরু তাঁকে আমাদের চিনিয়ে দিতে সাহায্য করেছে আলোচ্য বইটি। আসলে দার্শনিক নেহরুর স্থান রাজনৈতিক কর্মী নেহরুর থেকে অনেক উর্ধ্বে। তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং জীবনদর্শন তাঁকে তাঁর জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। এমনই একটি বিশেষত্ব হল গণতান্ত্রিক আধারে তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রকাশ। বলা বাহুল্য, লেখক শ্রী ঘোষের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হল নেহরুর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা।

এ কথা অনস্বীকার্য যে কংগ্রেসকে গণ-আন্দোলনের অভিমুখী করে তোলার কৃতিত্ব যেমন গান্ধীজীর ছিল, কংগ্রেসের কর্মসূচীর মধ্যে সমাজবাদের ভাবাদর্শ আনবার কৃতিত্ব তেমনি জওহরলাল নেহরুর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, সমাজবাদের প্রতিনিধি হয়েও তিনি তথাকথিত "সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী"র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। আসলে নেহরুর চিন্তার স্বকীয়তা তাঁকে তৎকালীন কংগ্রেসের অন্যান্য সমাজবাদী নেতাদের থেকে নিঃসন্দেহে পৃথক করে রেখেছিল। নেহরু চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তাঁর অনায়াস আধুনিকতা। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে, আধুনিক মনস্কতার মধ্য দিয়ে ভারতকে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পরিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। নেহরু স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, আধুনিক মনোভঙ্গী, সমাজদর্শন ও কর্মোদ্যোগ ছাড়া কোনও জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। তাই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই ঘোষণা করতে পেরেছেন Industrialize or perish, অর্থাৎ শিল্পায়নের একমাত্র বিকল্প অবলুপ্তি।

এহেন চরিত্রের অধিকারী নেহরুর সমাজবাদ স্বভাবতই ছিল মিশ্র ধাতুতে গড়া। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতে যে সমাজবাদের আভাস পাওয়া গিয়েছিল, নেহরু ছিলেন তারই প্রধান প্রতিনিধি। মূলত নেহরুর চেষ্টায় ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কর্মপন্থা নিয়ে কিছু মৌলিক নীতি ঘোষণা করা হয়, যার পিছনে ছিল তাত্ত্বিক সমাজবাদী চিন্তা এবং সাম্যবাদী সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রেরণা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রীয় সংস্থার সাহায্যে সেই সব শিল্পের পরিচালন ছিল এই কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান বিষয়। আসলে ১৯২৭ সালে সোভিয়েত রাষ্ট্র

দেখার অভিজ্ঞতা, সেখানকার দৈনন্দিন জীবনে সাম্যভাব, গণসংস্কৃতির প্রসার ইত্যাদি নেহরুকে আকৃষ্ট করেছিল বেশি মাত্রায়। সেই জন্য সমাজবাদী তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার চেয়েও তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল পরিকল্পিত অর্থনীতির আদর্শ। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সমাজবাদের প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্যই তাঁকে পরিকল্পনার ভিত্তিতে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে এগিয়ে চলবার প্রেরণা জুগিয়েছিল। লেখক শ্রীঘোষের মতে, মূলত ত্রিশ দশকেই নেহরুর সমাজবাদী চিন্তাধারা পূর্ণ রূপ নিয়েছিল। কারণ, ওই সময়েই তিনি অধিক মাত্রায় সোভিয়েত কর্মনীতির দিকে ঝুঁকেছিলেন। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সোভিয়েত শিল্পবিপ্লবের সাফল্যে নেহরু ছিলেন বিস্ময়াবিষ্ট। অবশ্য চল্লিশ দশক থেকেই তাঁর চিন্তাধারায় কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তবে জাতীয় সম্পদ যাতে ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য অপব্যবহৃত না হয়ে শুধু জাতীয় স্বার্থেই ব্যবহৃত হয় নেহরুর পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রতি আকৃষ্ট হবার মূলে ছিল সেই উদ্দেশ্য।

একথা ঠিক যে, তাত্ত্বিক সমাজবাদী চিন্তাধারায় নেহরুর কোন বিশেষ অবদান খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে শ্রীঘোষের মতে, ব্যবহারিক জীবনে সমাজতান্ত্রিক ধারায় তাঁর কিছুটা অবদান অবশ্যই রয়েছে। প্রথমত, নেহরু সমাজবাদকে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেননি। অন্যদিকে সমাজবাদের বিশ্ব-মানবতা দিকের উপর গুরুত্ব দিয়ে নেহরু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামকে এক শক্ত বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, নেহরু সব সময়েই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একমাত্র সম্ভব শান্তিপূর্ণ অহিংসার পথেই। বস্তুত এই দিকেই গড়ে উঠেছে নেহরুর সমাজবাদী চিন্তাধারা—যা শ্রীঘোষ স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন।

আজ এ কথা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না যে, সাম্যবাদ কোন বিমূর্ত ধারণা নয়। দেশকালের বিচারে এক সামগ্রিক জীবনদর্শনরূপে এর প্রয়োগ কাম্য। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে মার্ক্সবাদ প্রয়োগে বিকৃত ও রাষ্ট্রতন্ত্রের উদ্ভবে সমাজবাদ সম্বন্ধেই নানা প্রশ্ন ও বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা যায় যে, শ্রীঘোষ লিখিত বর্তমান বইটি জিজ্ঞাসু পাঠকদের নিশ্চয়ই কিছুটা চিন্তার খোরাক যোগাবে।

ভারতশিল্প প্রসঙ্গে

সন্দীপ সরকার

ভারতীয় শিল্পধারা : প্রাচ্য ও বৃহত্তর ভারত/ দেবপ্রসাদ ঘোষ/

সাহিত্যালোক/ কল-৬/ ২৫.০০

দেবপ্রসাদ ঘোষের বয়স এখন তিরাশী। ভারতশিল্পের ওপর জীবিত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তিনি বোধহয় প্রবীণতম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচীন ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব এবং শিল্পকলার ইতিহাস চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর বিপুল অবদান সঙ্গত কারণেই দেশ-বিদেশের সারস্বত সমাজে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছে। অন্যদিকে আশুতোষ সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সেটির ক্রম শ্রীবৃদ্ধির জন্য তাঁর তন্নিষ্ট তপস্যা সমান সাধুবাদের দাবী রাখে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায়ও তেমনি তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। বানাগড়, চন্দ্রকেতুগড়ের খননকার্য পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় তাঁর অবদান রয়েছে। অন্য দেশে কখনও তাঁকে যেতে হয়েছে গবেষকরূপে কখনও অতিথি অধ্যাপনা কার্যে। বস্তুত তাঁর বহুমুখী প্রয়াসের জন্যেই যে পরিমাণ গবেষণা পত্র, প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ রচনা করা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল, তা সময়াভাবে তাঁর পক্ষে হয়ে ওঠেনি। তাহলে তিনি অনায়াসে শিল্পকলা ঐতিহাসিক হিসাবে স্তম্ভরূপে পরিগণিত হতে পারতেন। এখন তাঁর পরিচয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান পথিকৃৎ ভারতীয় সংগ্রহশালা-বিজ্ঞানী হিসাবেই প্রধানত। ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা পরিষদের সভাপতি

ছিলেন, বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান এবং ভক্তিতার সূত্রেই।
দ্যমান গ্রন্থের নিবন্ধ প্রবন্ধ পত্রপত্রিকার জন্য নানা য় লিখেছিলেন। গ্রন্থের প্রথম পর্যায় তাঁর হরপ্পা গর চারুকলা থেকে পূর্ব-ভারতীয় আদিবাসীদের তুশিল্প সম্বন্ধে নানা বিষয় তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা াছে। ঘুরে ফিরে লোকশিল্প প্রসঙ্গ এসেছে গানের ্যার মতো। দু একটা লেখা সভার বক্তৃতার খিতরূপ —"২৪ পরগণার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন" মন —যা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তির আগে প্রবন্ধের াকারে পরিবর্ধিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল : এসব ক্ষেত্রে বক্তব্যের কাঠামোটুকু আছে, তথ্যের শাঁস লের অভাব একটু বেশি। সুতরাং বাদ দিতে ারলে ভাল হতো। বইয়ের শরীর বৃদ্ধির জন্যেই ম্ভবত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে মনে হল। ড়িষ্যার চিত্রাবলী এবং মণ্ডনশিল্প সম্বন্ধে দুটি বন্ধই প্রথম পর্যায়ে গ্রন্থিত। দ্বিতীয় পর্যায়ে "বৃহত্তর রত" এবং মূলত ইন্দোনেশিয়ার শিল্প সংস্কৃতির পর প্রবন্ধগুলি সন্নিবেশিত। এরমধ্যে "যাদুঘর বং তার বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে আলোচনা আলাদা উল্লেখের দাবী রাখে। নানা সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা বলে, কখনও আবার সাধুভাষা দু একটি প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন সেজন্যেও, আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে প্রবন্ধগুলির বিষয় এবং সুরের ঘনবদ্ধ ঐক্য নেই। কিন্তু চিন্তা এবং মননে একটা ধারাবাহিক সূত্র আছে। সূত্রটি হল অবহেলিত লোকশিল্প সম্বন্ধে তীব্র আকর্ষণ এবং মানুষের শিল্পসুকৃতিতে ভারতবর্ষের অনন্য ভূমিকা।

বাংলার পটের প্রাচীন কুলপরিচয় খুঁজতে খুঁজতে তিন বুদ্ধদেবের "চরণচিত্র" (পটচিত্রের তৎকালীন নাম) দেখার ঘটনা তদানীন্তন সাহিত্য থেকে বার করেছেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্খলিপুও পূর্বাশ্রমে যে "মঙ্খ" বা পটুয়ার পুত ছিলেন এটাও দেখিয়েছেন। আড়াই হাজার বছর ধরে পটচিত্রের ধারা প্রবহমান একথা এখনকার গবেষকরা অবশ্য জানেন। অগ্রজ গবেষক যে বহু আগে এই বিষয় লিখেছিলেন, বিস্ময় এবং হর্ষ সেইখানে। পটুয়াদের সমাজিক মর্যাদা হ্রাস এবং বাংলা ছাড়া তাঁদের সম্প্রদায়গত অবলুপ্তির কারণ হিসাবে তিনি মনে করেন, মুসলমান আগমনের পর পটুয়াদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ। কল্পানুমান(হাইপথিসিস)হিসাবে যতই যুক্তিযুক্ত মনে হোক, তথ্য প্রমাণ হাজির করতে পারেননি বলে, তাঁর এ মত গ্রহণ করা গেল না। এরমধ্যে কেউ যদি দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি খুঁজে পান, তাহলে তাঁকে কি আমরা দুষব ? প্রশ্ন উঠবে বঙ্গভূমিতে হিন্দু-মুসলমান একাধারে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও পটুয়ারা টিকে গেলেন কেমন করে ?

শিল্পকলাকে ধ্রুপদী এবং লোক এই দুই পর্যায় ভাগ করার ব্যাপারে তাঁর আপত্তি আছে। বিশেষত আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ নাগর শিল্পের যে নতুন পরম্পরা তৈরি হয়েছে, সেবিষয় তাঁর বিরাগ তিনি গোপন করে রাখতে পারেননি। এরই প্রতিপক্ষ হিসাবে লোকশিল্পের বহমান এবং 'দিশী' ধারাকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। কিন্তু এই গ্রন্থে তিনি স্বীকার করেছেন যে, পাণিনি (হায়! একালে কোনও ভারতীয় বৈয়াকরণিক ভাষাতাত্ত্বিক সমকালীন ভারতীয় শিল্পকলার সম্বন্ধে তুল্য খোঁজখবর করেন না) শিল্পীদের দুই দলে ভাগ করেছিলেন, গ্রামশিল্পী (এখনকার ভাষায় লোকশিল্পী) এবং রাজশিল্পী (এখন এঁরা শুধু শিল্পী নামেই অভিহিত)। বৌদ্ধ জৈন আমলে পটুয়াদের বলা হত 'শৌভিক' বা 'শোভনিক'।
এসব মত পার্থক্য সত্ত্বেও বলতে হয় যে যখনই যে বিষয় আলোচনা করেছেন তত্ত্ব তাঁর নখদর্পণে এবং বিশ্লেষণও সরস। তা সে আলোচনা গাঙ্গেয় নিম্নবঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, বা উড়িষ্যার মণ্ডনশিল্প বা ইন্দোনেশিয়ার শিল্পসংস্কৃতি, বিষয় যাই হোক।
যদিও একথা মনে হয়েছে, পরাধীনতার জ্বালায় হীনমন্যভাব-সঞ্জাত স্বাদেশিকতার যে অভিযান প্রায়শ তার প্রকাশ ঘটেছে। আগে লেখা বলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমকালীন গবেষণার তথ্যগুলির ব্যবহার ঘটেনি। ফলে কিছু কিছু বিষয় তারিখচিহ্নিত।
এই মানসিকতার ফলে প্রাচীন এবং মধ্যযুগে ভারতীয় নৌ-বাণিজ্যকে অন্য একটা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। পরাধীন জাতি অতীতকে স্বর্ণযুগ হিসাবে কল্পনা করে ইতিহাসকে সোনালী রঙে লেখার একটা প্রবণতা দেখায়। আমরাও কালাপানি পার হয়ে বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে অসভ্য বর্বরদের সুসভ্য করেছি, সুদূর প্রাচ্যের শিল্পকলার আলোচনায় এমন একটা গর্বিত জাত্যভিমান তিনি প্রকাশ করে ফেলেছেন। পশ্চিমী পণ্ডিতরা যেমন তখন (কেউ কেউ এখনও), এমন গর্ববোধ, ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে, প্রকাশ করে ফেলেন। দেখাতে চান, সেকেন্দর শাহর অভিযানের জন্যে ভারতীয় সংস্কৃতি পরিশীলিত হল। ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দোচীনের শিল্পসংস্কৃতিতে ভারতীয় উপাদান এবং ঔপনিবেশিক অবদান যথেষ্ট আছে, কিন্তু একথাও স্বীকার্য, সেখানকার জনগোষ্ঠী সমাজ বিকাশ, দর্শন এবং শিল্প অভিব্যক্তির কতগুলি বিশেষত্ব আছে। সে সব দেশের শিল্পসংস্কৃতিকে এসবই স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। সেসব দেশের গবেষকরা নতুন তথ্য জড়ো করে অন্যতর তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের নিজের জাতির ইতিহাস

রচনা করছেন। আমাদের প্রজন্মের ফরাসি, ওলন্দাজ এবং ভারতীয় গবেষকরা ওঁদের এসব তথ্যের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অস্বীকার করতে পারছেন না বরং স্বাগতই জানাচ্ছেন। কারণ এখনকার বোধ বলে, বৈদেশিক প্রতাপ এবং প্রভাব কোনও সভ্যতার শৈল্পিক অভিব্যক্তিকে আচ্ছন্ন করলে সে জাতির সৃজনীশক্তি ব্যাহত হয়। অনুকরণ দিয়ে বড় মাপের শিল্পসৃষ্টি হয় না। আবার দ্বৈপায়ন বৃত্তিতে মনের দরজা জানালা বন্ধ করলেও চিত্তির। মানুষের সৃজনীশক্তির নানান ধারায় আদান-প্রদানের সরণী আপনা থেকেই তৈরি হয়। সেই সংশ্লেষণী রসায়ন আরও বিচিত্র এবং জটিল। সংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পসংস্কৃতির টীকাভাষ্য রচনা সেই কারণে ইদানীং পরিত্যক্ত।

কিন্তু এসব ত্রুটি সামান্য। গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে তথ্য আহরণ এবং বিশ্লেষণে অন্তর্লস্পর্শী গভীরতা আছে। প্রবন্ধগুলি পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার এবং পুস্তকাকারে গ্রন্থিত করে প্রকাশক কাজের কাজ করেছেন। বইয়ের পেছনে ছবিগুলি আর্ট পেপারে ছাপা হলেও ব্লকের স্ক্রিন সম্বন্ধে যত্ন না নেওয়ায় ছবিগুলো আবছা হয়েছে। তবু বইটি মূল্যবান এবং শিক্ষিতজনের অবশ্যপাঠ্য।

জাতীয় বিপ্লবীর কর্মজীবন

গৌতম নিয়োগী

ভারতের মুক্তিযজ্ঞে বিপ্লবী : অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়/ সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়/

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং/ কল-৭/ ৩০·০০

আধুনিক ইতিহাসচর্চায় এ-কথা প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নানা ধারার, নানা মতের এবং নানা চরিত্রের ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিরোধ মিলে গিয়েছিল এবং প্রত্যেকের একক কিংবা মিলিত প্রচেষ্টায় ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়। এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে তাই শুধু 'জাতীয়তাবাদী' আন্দোলন ঠিক বলা নয়, কেননা 'জাতীয়তা' বা 'জাতীয় চেতনা' এগুলির উন্মেষ কিভাবে হয়, কাদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিলো এগুলি বিতর্কিত ব্যাপার। ঠিক যে, ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় এগুলির উপর ঝোঁক ছিলো মাত্রাতিরিক্ত বেশী, কারণ ইতিহাসের দিকে তাকানো হত উপর থেকে। ফলে প্রাধান্য পেত মধ্যবিত্ত-শ্রেণী-কেন্দ্রিক 'জাতীয়তাবাদী আন্দোলন'। তাছাড়া, কিছুকাল আগে পর্যন্ত ইতিহাসচর্চায় আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রতিই শুধুমাত্র দৃষ্টি দেওয়া হত। ফলে আন্দোলনের সামগ্রিক চরিত্র, প্রত্যয়, পরিপ্রেক্ষিত, প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া থেকে যেত অগোচরে। স্বাভাবিকভাবেই অধুনা বিজ্ঞানসম্মত এবং নিরপেক্ষ ইতিহাসচর্চায় আগেকার 'এলিটিস্ট' দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটাই বাতিল হয়ে গেছে। ফলে স্বীকৃতি পেয়েছে ব্রিটিশবিরোধী প্রতিরোধ ও সংগ্রাম হয়েছিলো নানাস্তরে। নিচের তলায় নানা অঞ্চলের উপজাতি বিদ্রোহ ও কৃষক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সীমাবদ্ধ অথচ বিশেষ মূল্যবান জাতীয় আন্দোলন ; অহিংস আন্দোলন ; সশস্ত্র বৈপ্লবিক প্রতিরোধ প্রভৃতি ধারার মধ্য দিয়ে। মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত শ্রেণীর যেমন এর সঙ্গে যোগ ছিলো, যেমন ছিলো জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী, তেমনি ছিলো শ্রমিক, কৃষক এবং নানা উপজাতির মানুষের যোগ। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বা অহিংস আন্দোলনের ধারার পাশাপাশি ছিলো নানা জাতীয় বৈপ্লবিক সশস্ত্র ধারা। প্রত্যেকটিই মূল্যবান কারণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য ছিলো সকলেরই এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সকলেরই দান আছে।

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে ইতিহাসচর্চায় সম্প্রতি এ-কথা স্বীকৃত হলেও প্রতিটি ধারা নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ গবেষণা ও চর্চা হয়নি। ফলে প্রচারধর্মী কিছু দলের বর্তমান ইতিহাস-বিকৃতির ফলে ভবিষ্যতে 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যাঁরা জীবনের জয়গান' তেমনি অনেক মানুষের কথাই ইতিহাস থেকে হারিয়ে যাবে। শুধু জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনেরই পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস থাকা উচিত সবিস্তারে পূর্ণাঙ্গ অনুপুঙ্খবহুল কয়েক খণ্ডে। কিছু কিছু জীবনী, বহু বিপ্লবীদের স্মৃতিচারণ এবং অল্প হলেও বেশ ভালো কিছু মূল্যায়ন অবশ্য রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। ইতিহাসানুরাগী সাধারণ বাঙালি পাঠকদেরই নয়, আপামর যুব-ছাত্র ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এগুলি অনুপ্রাণিত করবে। ঠিক এই কারণেই প্রয়াত বিপ্লবী নেতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-কথা প্রকাশ বিশেষ মূল্যবান। জীবন-মৃত্যু যাঁদের পায়ের ভৃত্য ছিলো এবং চিত্তকে যাঁরা ভাবনাহীন রেখেছিলেন, সেই বাঙালি বিপ্লবীদের অন্যতম অমরেন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ জীবন-কথা আমাদের দিলেন তাঁর পুত্র প্রবীণ বিপ্লবী সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়। কোনো সন্দেহ নেই 'চীপ অফ দ্য ওল্ড ব্লক' সত্যব্রতবাবুই ছিলেন এ-বিষয়ে যোগ্যতম লেখক। তাঁকে অজস্র সাধুবাদ।

'বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথের জীবন শুধু তাঁর জীবনের ধারাবাহিক কতকগুলি ঘটনার সংকলন নয়— তাঁকে কেন্দ্র করে যে জীবন, সে একটা বিরাট যুগ'— একথা মুখবন্ধের প্রথম লাইনেই জানিয়েছেন লেখক। বস্তুত পক্ষে হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায় পরিবারের অমরেন্দ্রনাথের জীবনকে কেন্দ্র করে সমসাময়িক যুগের বিস্তারিত ইতিহাস জানা গেল। এটাই গ্রন্থের বড়ো গুণ। গ্রন্থটির অন্যান্য গুণাবলীর কথাও একটু বলা দরকার। অমরেন্দ্রনাথ (১-৭-১৮৮০— ৪-৯-১৯৫৭) সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন 'স্বদেশী' আন্দোলনের সময়। এর আগে উত্তরপাড়া, ভাগলপুর এবং কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে শিক্ষা

করেছিলেন। বাঘ মেরে আহত যতীন্দ্রনাথ
পাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যান্ডেজ-বাধা অবস্থায় আলাপ
রেন্দ্রনাথের। স্বদেশী আন্দোলনের সময়
কুমার মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, চিত্তরঞ্জন দাস,
অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে আলাপ। লেখক
রিতভাবে তাঁর কর্মজীবন আলোচনা করেছেন।
রেন্দ্রনাথের নিজের লেখা থেকে তথ্য সংগ্রহ
ছেন। বরাবরই গঠনমূলক রাজনীতি তাঁর
দ। শুধু বাঘাযতীন নয়, মতিলাল রায়, বারীন
, ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
াইলাল দত্ত, রাসবিহারী বসু, বিপিন দাস,
দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরে এম· এন· রায়), জিতেন
ড়ী, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, যাদুগোপাল
পাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি বহু বিপ্লবীর
ও তাদের কর্মকাণ্ড সুন্দরভাবে লেখা হয়েছে।
বীদের আত্মীয়-স্বজনদের উপর ইংরেজদের
াচার মর্মস্পর্শী। রোমাঞ্চকর লাগে
রেন্দ্রনাথের সন্ন্যাসী বেশে আত্মগোপনের কাহিনী
তে। 'একদিকে কংগ্রেসে ক্ষমতাবৃদ্ধি,
জমক, অধিবেশন ও আন্দোলন— অন্যদিকে
বীদের পুনর্গঠন, নব সংগঠন ও নবধারা' দুই
াচিত হয়েছে। স্পষ্ট এবং খোলাখুলি
লাচনা খুবই উপভোগ্য। কংগ্রেস যখন
দলিতে মত্ত তখন একে একে ফাঁসিতে বা
কের গুলিতে প্রাণ দিচ্ছেন বিপ্লবীরা। লেখক
ন দাসের ৬৩ দিন অনশনের মৃত্যুতে গান্ধীজীর
তায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন (পৃঃ ১২৭)।
াদেশেও 'গান্ধীবাদী নেতাদের অনেকে যেমন
বীদের অন্তরঙ্গ বলে মনে করতে পারতেন না,
নি ভারত সরকারও তাঁদের অহিংসবাদী বলে
স করত না' (পৃঃ ১৩০)। স্বাভাবিক, কারণ
া ও বন্দুক ভিন্ন জিনিস। 'আত্মশক্তি লাইব্রেরী'
লেখকের আলোচনা উল্লেখ করার মতো কারণ
না বইতে এত বিস্তারিত তথ্য পাইনি।
বন্দ্রনাথ রায়ের শেষ পর্ব নিয়ে বেশ কিছু নতুন
আছে। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশ যে ব্রিটিশ
ারের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে চেয়েছিলো
৭ থেকেই, ফলে বামপন্থী কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট
, সুভাষচন্দ্রের জয় তারা মেনে নেয়নি—
দি ঘটনাও (পৃঃ ১৮১-৮৩) সঠিক।
রন্দ্রনাথ শেষ জীবনে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক
যোগ দেন, সে-সব কাহিনীও বলা হয়েছে
ারে।
র কয়েকটি দুর্বলতা ও ত্রুটি আছে। প্রথমত
ক পেশাদার ঐতিহাসিক না হওয়ার ফলে বহু
হাসিক উপকরণ ব্যবহারই করেননি, যা সম্প্রতি
শিত হয়েছে। তাঁর 'রচনাসূত্রটি' খুবই সীমিত।
য়ত এমন অনেক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে
যেগুলি সহজেই বাদ দেওয়া যেত, বিশেষ করে
গ্রন্থের শেষের দিকে। তৃতীয়ত, লেখক ভারতের
স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক অধ্যায় আলোচনা
করেছেন, অতি সাধারণভাবে। সে-বিষয়ে অনেক
ভালো বই এখন পাওয়া যায়। যেমন ক্ষমতা
হস্তান্তর নিয়ে। তাছাড়া লেখক আবেগের দ্বারা
পরিচালিত হয়েছেন, সে-কথা সহজেই বোঝা যায়।
তবে এইসব ত্রুটি গ্রন্থটির মর্যাদা এবং তথ্যের প্রাচুর্য
বিন্দুমাত্র কমায়নি। গ্রন্থটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।
অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রচনাপঞ্জী এবং
কয়েকটি দুর্লভ চিত্র গ্রন্থটির সম্পদ। ইতিহাস
পদবাচ্য না হলেও ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে
গ্রন্থটি ঐতিহাসিকদের কাছে যোগ্য সমাদর পাবে।

মহাপুরুষের কথা

সোনামন মুখোপাধ্যায়

পুরুষোত্তম প্রসঙ্গে/ শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/ মনোমোহিনী ধাম/ দেওঘর/ ৪০·০০

"শিষ্ট সুন্দর ও মঙ্গলপ্রদ" কোনো বিষয় নিয়ে "একটা ভালো বই" লিখতে বলেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র প্রতিঋত্বিক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়কে।

"শিষ্ট সুন্দর ও মঙ্গলপ্রদ" বিষয়বস্তু নির্ধারণে বিভ্রান্ত লেখক ডুবুরী হয়ে ভাবনার অতলসাগরে ডুব দিলেন এবং সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন সেই অভীষ্ট বিষয়বস্তু যার আক্ষরিক নাম "পুরুষোত্তম প্রসঙ্গে"।

যথার্থ গভীর আকুলতা তীব্র সংবেগ এবং ঐকান্তিক সদিচ্ছা মানুষকে যে কোনো "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার" অতিক্রম করতে সাহায্য করে।

প্রায় দৃষ্টিহীন লেখক শৈলেন্দ্রনাথ শুধু গভীর নিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়কে বুকে করে, অস্পষ্ট স্মৃতির পুঁজি সংবল করে ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান বৃতিসুন্দরের সাহায্যে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন, যদিও "পুরুষোত্তম প্রসঙ্গে" গ্রন্থটি শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বিচ্ছিন্ন বা একক জীবনালেখ্য নয়।

বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী লেখক শৈলেন্দ্রনাথের ছাত্র জীবনেই শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে তীব্র কৌতূহল জাগে। যে কৌতূহল পরবর্তী পঞ্চাশ বছর শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে তাঁকে বিভোর করে রেখেছে। সুদূর ময়মনসিংহ থেকে পাবনা হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রম এবং পরবর্তীকালে বিহারের দেওঘরে সৎসঙ্গ আশ্রম—এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার বাঁকে বাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবনালেখ্য থেকে আহরণ করে যে মহার্ঘ আলোকবর্তিকা তিনি সংগ্রহ

করেছেন তারই লিখিত চিত্র এই গ্রন্থ। নিছক কৌতূহলোদ্দীপ্ত হয়ে ছিটকে আসা লেখক পরবর্তীকালে প্রায় অনুক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুরের পাশে ছায়াটি হয়ে থেকে তাঁর প্রতিটি বাণীকে, প্রত্যেকটি আচরণকে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বিচার বিশ্লেষণ করে, তাঁর জীবনদর্শন, আধ্যাত্মিক চেতনা, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শাস্ত্রীয় নীতিনির্দেশকে পরখ করে অবশেষে কিভাবে তারসঙ্গে একাত্ম হয়ে মিলেমিশে গেলেন—বিভিন্ন ঘটনার পরম্পরার ভেতর দিয়ে অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক। আজ যা অতীত-কাহিনী, ইতিহাস হয়ে গিয়েছে—লেখকের সাবলীল ও আন্তরিক বর্ণনায় তাই যেন জীবন্ত হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী লেখক সাগ্রহে লিপিবদ্ধ করে, লীলাসঙ্গীদের ছোট ছোট মনোজ্ঞ কাহিনী এবং এই মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন স্তরের আলোকময় বর্ণনায় আমাদের মুগ্ধ করেছেন। অধিকাংশ ঘটনাই লেখক শৈলেন্দ্রনাথের স্মৃতি আহৃত বলে গ্রন্থটি মৌলিকতার দাবী রাখে। সূচনাপর্বে "আমার কথা"র রচনাংশও মনোজ্ঞ। পাঁচশত পৃষ্ঠা (অধ্যায়বিহীন) সংবলিত গ্রন্থটির ছাপা অতি স্পষ্ট, চমৎকার এবং প্রায় নির্ভুল। প্রচ্ছদটিও পরিচ্ছন্ন।

কবিতা এবং কবিতার অনুবাদ

মল্লিকা সেনগুপ্ত

প্রেমে পরবাসে/ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত/ নাভানা/ কলকাতা/৩০·০০

মূর্খ স্বপ্নের গান/ শামশের আনোয়ার/ বিশ্ববাণী/ কল-৭৩/৮·০০

দাউদ হায়দারের প্রেমের কবিতা/ নওরোজ সাহিত্য সংসদ/ ঢাকা/৩৫·০০

'প্রেমে পরবাসে' হাইনরীশ হাইনের কবিতার দ্বিভাষিক একটি সংকলন যার অনুবাদ সম্পাদনা ও অসাধারণ ভূমিকাটি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের। হাইনের জীবনপঞ্জী থেকে জানা যাচ্ছে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'রাটক্লিফ' প্রকাশিত হয়েছিলো 'ব্যর্থ প্রণয়বেদনার অভিঘাতে।' এই রুদ্ধবাসনার মুক্তি ঘটল প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটিতে। বিপ্লবোত্তর জার্মানির প্রধানতম কবিদের একজন হাইনে, বিপুল তাঁর রচনাসম্ভার, গান, কবিতা, প্যারোডি, নাটক, নৃত্যকবিতা এবং আত্মজীবনীমূলক লেখায় সমৃদ্ধ। অর্থাৎ নির্বাচনের কাজটি বেশ দুরূহ, যা অলোকরঞ্জন অনায়াসেই সম্পাদন করেছেন। হাইনের নির্বাচিত কবিতাগুলি অসাধারণ, প্রেমের কবিতার মধ্য দিয়ে জীবনের গভীর যন্ত্রণা ও আনন্দকে ফুটিয়ে তোলার আভাস পাওয়া যায়। একমাত্র সেই প্রেমের কবিতাই মহৎ যা প্রেম থেকে উত্তোরিত হয়ে যায় বিশ্বলোকে, জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা এসে আছড়ে পড়ে, প্রেম যেখানে পরিবাহীমাত্র। হাইনে এবং অলোকরঞ্জনের যুগ্মপ্রয়াস সেই মহৎ কবিতার কাছে আমাদের পৌঁছে দিয়েছে। বিদেশী কবিতাকে বাঙালীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজটি বুদ্ধদেব বসুর পর হাতে তুলে নিয়েছেন অলোকরঞ্জন, সেজন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য। তবে জার্মান ভাষা না জানা আমার মতো পাঠকের মনে হতে পারে হাইনে অলোকরঞ্জনের মতোই লিখতেন, অনুবাদের সীমাবদ্ধতা এখানেই সুন্দর কিন্তু কম বিশ্বাসযোগ্য।

বাটের কবিদের তালিকায় উজ্জ্বল একটি স্থান শামশের আনোয়ারের। 'মূর্খ স্বপ্নের গান' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। শামশেরের কবিতায় পরাবাস্তব একটি জগৎ পাওয়া যায়, গান, কলম, ঘোড়া তাঁর প্রিয় মোটিফ। 'জলের কাছে গিয়ে দেখি জল তার প্রতিভা হারিয়েছে' বা 'এক দীর্ঘ রেডইণ্ডিয়ান ডাক্তোডাগামাকে নৈঃশব্দ্যের মানে বুঝিয়েছিলো'—এরকম লাইনে বোঝা যায় শামশের একজন প্রকৃত কবি। তবে বাটের বিবৃতিমূলক গদ্যভাষার মেজাজ অপরিবর্তিতভাবেই রয়ে গেছে এই বইটিতে। বইটির প্রচ্ছদ খুব খারাপ কিন্তু বইটিতে অসাধারণ কিছু কবিতা আছে। রোমান্টিকতার বিপরীত মেরু থেকে যাত্রা শুরু করেও শামশের স্পর্শ করেছেন কবিতার দুরূহ অন্তঃপুর। এখানেই তার সার্থকতা।

'সব পরিণীতা/ নবনীতা/ চাও দূরে/ মৃত্যুবাসরে/ উজ্জয়িনীপুরে/ একা/ দীর্ঘ পথরেখা/ জুড়ে/ বিহ্বল সুরে/ ঘুরে ঘুরে/ একটি পাখি, গান/ গাহিতেছে ম্লান'— অসংখ্য কবিতার বই লিখেও দাউদ হায়দার কি করে এরকম অজস্র বালখিল্য লাইন লিখতে পারেন বোঝা মুশকিল। ভূমিকায় দাউদ জানাচ্ছেন 'আমি, নারীর মধ্যে প্রকৃতি, প্রকৃতির মধ্যে নারীকে পাই'— এই ক্লিশে কিছুই বলে না। অপরিচ্ছন্ন মুদ্রণের এই বইটির স্বার্থে অলোকরঞ্জনের দাউদ হায়দার নামাঙ্কিত কবিতার ব্যবহার দুঃখজনক। বাংলা কবিতা কতদূর এগিয়ে গেছে তা দাউদ জানেন না কিন্তু যে ত্রিভুজ বা বরফি আকৃতির ফ্রেমকাট কবিতা একদা আমদানী হয়েছিলো বাংলা ভাষায় তার কয়েকটি অনুকরণ এখানে পাওয়া যায়।

ছড়ায় প্রেম

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

ছড়া যখন ছড়িয়ে/ (সং) এম· সাকিল আহমেদ/ আবুল বাসার হালদার/ ২৪ পরগনা/১০·০০

ছড়ানো প্রেম/ (সং) শ্যামলকান্তি দাশ/ যুগ প্রকাশনী/ কল-৯/৫·৫০

কবিতা ছড়া অথবা কোনো গদ্যের সংকলন যখন প্রকাশিত হয়, আমরা ধরে নিই সম্পাদক নিঃস্বার্থ। যশাকাঙ্ক্ষা নয়, অন্য এক ধরনের শুভবোধে আক্রান্ত হয়ে সম্পাদনার গুরুভার তিনি নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন। শুভবোধটি অনেকটা এরকম—পাঠক সমসাময়িক কিংবা ক্রমবিবর্তমান সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবেন, সাহিত্যধারাটি সম্পন্ন অথবা অপুষ্ট কিনা তা নিয়ে নিজস্ব মননের আলোকে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন। 'ছড়া যখন ছড়িয়ে' নামের সংকলন গ্রন্থটিতে ছোটদের জন্য লেখা ছড়া সংকলিত হয়েছে। এটি পড়তে বসলে এক ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়, সেটি হোল, যাঁরা নামী ও প্রতিষ্ঠিত কবি তাঁদের সম্পর্কে অভিযোগ ওঠে না, কিন্তু সম্পাদকমশাই বোধহয় কবি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তাই এমন অনেক অজ্ঞাতকুলশীল কবির কবিতা মুদ্রিত হয়েছে, সেগুলি অপাঠ্য। সম্পাদক যখন স্বয়ং একজন কবি, তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশার সুরও খুব স্বাভাবিকভাবেই উঁচু তারে বাঁধা হয়ে যায়। 'ছড়ানো প্রেম' সম্পাদনা করেছেন কবি শ্যামলকান্তি দাশ। ঠিক এই মুহূর্তে শুধুমাত্র প্রেম প্রণয়কে উপজীব্য করে ছড়ার সংকলন বের করার প্রয়োজন আছে কিনা, সেটি অন্য প্রশ্ন, তবু সংকলনটি বেশ উপভোগ্য। কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তিনি রীতিমতো সযত্ন ও সতর্ক। শুরু করেছেন কবি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা রেখে। যাঁদের কবিতা নিয়ে এই সংকলন, তাঁরা অনেকেই ছড়া লেখায় সিদ্ধহস্ত, আবার কেউ-বা শুধু অবসর বিনোদনের জন্য ছড়া লেখেন। হালকা চালে লেখা মজার ছড়ার পাশাপাশি ছন্দ ও মিলের মাধ্যমে লেখা গুরুগম্ভীর কবিতাও আছে। বইটির অঙ্গসজ্জা, প্রচ্ছদ সুন্দর। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ভূমিকা লিখে দিয়ে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রচ্ছ

ভ

কণ্টকেনৈব

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

হাজার বছরেরও আগে চৈনিক
কেরা লক্ষ করেছিলেন একটি
ত সম্পর্ক— আঘাতের সঙ্গে
মুক্তির। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে
ত হয়ে ফিরে অনেক সময়
। দেখতেন তাঁদের শরীরের
নও পুরাতন ব্যাধি নির্মূল হয়ে
ছ। অনেকে এটাতে
বিকিকত্ব চাপাতে চাইলেও
ৎসাবিদগণ কিন্তু চুপ করে
কেননি। তাঁরা গবেষণা চালাতে
লেন। পাথর, বাঁশ, কাঠ ছুঁচলো
বা মাছের কাঁটা দিয়ে
গ্রস্তের শরীরে খোঁচা দিয়ে
সন্ধান পেলেন বহু রোগ
ক বিন্দুর। এ সকল
গুলির পরিধি এক ইঞ্চির দশ
র এক ভাগ। ঐ দেশের রাজা
ম্রাটরা বলা বাহুল্য, এ
ষণার পৃষ্ঠপোষকতাই করে
ছেন। পরবর্তীকালে সঙ
দের রাজত্বের সময় সম্রাট
ইতের বিশেষ আদেশ বলে
তোলা হয়েছিল বিভিন্ন রোগ
ক বিন্দু সম্বলিত একটি ব্রোঞ্জ
। কেবলমাত্র মিঙ রাজত্বকালে
কিৎসা বন্ধ ছিল রাজরোষে।
তীকালে ঐ দেশেই বিপ্লবীরা
ষ্ঠিত চিকিৎসকের সঙ্গে
শ্য যোগাযোগের অবকাশ বা
গ না পাওয়ায় এই সূচী বিদ্যার
প্রচলন করেন। এবং এই সময়
ই এই চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক
পায়। একটা কথা মনে রাখা
জন যে পৃথিবীর সর্বত্রই
াতি চিকিৎসায় কাঁটা
নোর প্রচলন আছে আদিকাল
ই। কিন্তু কোথাও এটি
নিকভিত্তি লাভ করেনি
শ ছাড়া। উনবিংশ শতকে
যায় ব্রিটেনে ডাঃ জন
ল এই সূচী চিকিৎসা দ্বারা
দরী রোগীর নিরাময়ের কথা
। করেছেন। বলাবাহুল্য, ধাতু
থেকেই সোনা রুপোর সূঁচের
র হয়েছে। এবং আকুপাংচার
কথটি ইংরেজদের কৃপায়
জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ক্রমে এ
বিদ্যা ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি,
রাশিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে
পড়েছে।

চীনা আকুপাংচার শাস্ত্রে চি (Tchi)
নামক এক শক্তির উল্লেখ করা
হয়েছে। এটি জীবনীশক্তি। যা
জড়েও আছে জীবেও আছে। এই
জীবনীশক্তি মানব দেহে উচ্চ-নীচ
দুই বিপরীত স্রোতে বইছে, ইন
হচ্ছে নেতিবাচক স্রোত। আর
ইয়ান ইতিবাচক। ৬টি ইয়ান স্রোত
বয়ে যায় নিরেট (Solid) পথে।
আর সমসংখ্যক ইনের স্রোতপথ
হলো ফাঁপা। যেমন পাকস্থলী, অন্ত্র
ইত্যাদি। ইন এবং ইয়ান দুইই
দেহের সম্মুখ এবং পশ্চাতভাগ
দিয়ে সমান্তরালভাবে বয়ে থাকে।
অতএব প্রত্যেকের ১২টি করে
স্রোতপথ বা চ্যানেল আছে।
সম্মুখভাগের স্রোতপথ নিরেট।
পশ্চাতভাগেরগুলি ফাঁপা। এই
স্রোতপথগুলিকে মেরিডিয়ানও
বলা হয়। কিন্তু এই স্রোত বা
স্রোতপথ দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। কোনও
শিরা ও বা ধমনীতেও নেই এরা।
কিন্তু প্রতিটি চ্যানেলেই এদের
অবস্থিতি । সেখানেই কয়েকটি
করে 'বিন্দু' বা আকু পয়েন্ট।
সমুখস্থ মধ্যপথ এবং পশ্চাদভাগের
মধ্যপথ সমান্তরাল নয়। চি এর
প্রবাহ পথ এ দুটি। এদের সঙ্গে
রয়েছে কিছু সহযোগী পথ বা সাব
চ্যানেল। এখন এইসব স্রোতপথে
চলা চি প্রবাহ যদি বেড়ে যায় বা
কমে তবেই শরীর তার ভারসাম্য
হারিয়ে ফেলে, সৃষ্টি হয় নানান
রোগের। অভিজ্ঞ আকুপাংচার
চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখেন চি
স্রোত কমেছে না বেড়েছে। এবং
সেই মত ব্যবস্থা নেন। ব্যবস্থা মানে

ঐ রোগের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বিন্দুতে
ছুঁচ ফুটিয়ে পনের থেকে কুড়ি
মিনিট রাখা। শরীরের ধর্মই হল
বাইরের বস্তু ভেতরে ঢুকলে তাকে
ঠেলে বের করে দেবার চেষ্টা করা।
এ ধাক্কা প্রতি সেকেণ্ডে দুবার করে
অর্থাৎ মিনিটে একশ কুড়ি বার করে
হয়। আকুপাংচারের ছুঁচ ভেতরে
গিয়ে শরীরের রক্তরক্ষী শ্বেত
কণিকার সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়।
ফলে রোগ জীবাণু যুদ্ধে পরাস্ত হয়।
সেরে ওঠে রোগী।

এই হচ্ছে মোটামুটি আকুপাংচার
তথ্য। আর একটি চিকিৎসাও বহু
প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বে চালু
আছে। সেটি হল চৌম্বক
চিকিৎসা। বিখ্যাত ইওরোপীয়
মিস্টিক প্যারাসেলসাস চুম্বকের বহু
ব্যাধি দূরীকরণের আশ্চযজনক
ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন।
বহু মার্কিনী গবেষকও এ ব্যাপারে
গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। চলতি
বিশ্বাস অনুযায়ী ও চুম্বকের ব্যথা
নিরাময়শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে।
গ্রহ-রত্নপ্রেমীরাও পাথরের চৌম্বক
শক্তির ওপর নির্ভর করেই পাথর
পরার প্রেসকৃপশন দিয়ে থাকেন।
চুম্বক-পাথর বাত, উদরী এবং
হার্নিয়া সারাবার ক্ষমতা রাখে বলে
প্রাচীন বিশ্বাস। যদিও মনে করা
হত চুম্বক-পাথর এক ধরনের বিষও
বটে, জিলান, (Zeilan) রাজ ঐ
পাথরের পাত্রে সকল রকমের খাদ্য
গ্রহণ করে এ বিশ্বাস মিথ্যা প্রমাণ
করেছিলেন। কথিত আছে এ
প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ যৌবন লাভ
করেছিলেন তিনি। আরও অদ্ভুত
সব ধারণাও ছিল। স্ত্রীর আনুগত্যের
পরীক্ষা করা হতো অনেক সময়

কাজাখিস্তানের সহকারী প্রধানমন্ত্রীকে চিকিৎসা করছেন ডাঃ শ্যামল রায় এবং গৌতম সমাদ্দার।

বালিশের নীচে চুম্বক রেখে দিয়ে। হোমিওপ্যাথির বিখ্যাত গ্রন্থকার ডাঃ অ্যালান তাঁর দি মেটিরিয়া মেডিকা অফ নমোডস-এ চুম্বক শক্তির ব্যবহারে নির্মিত তিনটি অত্যাবশ্যক ওষুধের কথা বলেছেন। (ম্যাগনেটিস পোলিও অ্যাম্বো, ম্যাগনেটিস পোলাস আর্কটিকাস এবং ম্যাগনেটিস পোলাস অসটালিস)। চুম্বকের দুই মেরু। উত্তর মেরুর চরিত্র শীতল এবং প্রতিরোধী। আর দক্ষিণ মেরু উচ্চ এবং শক্তিবর্ধক। ইঁদুরের ওপর পরীক্ষায় দেখা গেছে চুম্বকের উত্তর মেরুর প্রয়োগে ক্যানসার টিউমার ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেছে। অথচ দক্ষিণ মেরুর প্রয়োগে ঐ জাতীয় টিউমার গিয়েছে বেড়ে। পরীক্ষা চালিয়েছিলেন ডাঃ রয় ডেভিস, গ্রীন কোভ স্প্রিংস, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র।

এবার দেখা যাক বিশেষজ্ঞরা মেগনেটো থেরাপি সম্বন্ধে কি বলেন। "আমাদের শরীর নিজেই এক শক্তিশালী ও অনিয়মিত চুম্বক ক্ষেত্র বিশিষ্ট যন্ত্র। সেই জন্যই শরীরের উপর চুম্বকক্ষেত্র বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। রক্তের ভিতরে যে হিমোগ্লোবিন আছে তাকে শক্তিশালী (২৮০০গাউস) চুম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই চুম্বকীয় ও আয়নিত করা সহজ। এই চুম্বকায়িত ও আয়নিত হিমোগ্লোবিন বেশি অক্সিজেন বহন করতে পারে ফলে এই চুম্বকীয় ও আয়নিত রক্ত সচ্ছন্দে রক্তবহা নালীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং রক্তের ঘনত্বকে বৃদ্ধি করতে বাধা দেয়। ফলে আমাদের রক্তবহা নালীর ভিতরের দেয়ালে কোলেস্টরল ও চর্বিকে জমতে দেয় না। এবং রক্তবহা নালীর ভিতর কোন থ্রম্বাস বা ইম্বোলাস সৃষ্টি হতে পারে না। রক্তকে চুম্বকীয় ও আয়নিত করে এইভাবে আমরা করোনারি

DISEASES CURED BY MV-ACUPULSER

*Common cold and influenza * Palpitation and Anxiety High blood pressure * Insomnia * Headache * Toothache * Abdominal pain * Indigestion * Vomiting Diarrhoea * Dysentery * Congestion, Swelling and pain of the eye * Impotence * Irregular menstruation Painful menstruation * white discharge * Absence of the menses * Lactation deficiency * A buzzing, thumping or ringing sound in the ears * Spondylitis Arthritis * Sprain * Injury of the back * Injury of the soft structure of the ankle * Injury of the soft structure of the knee * Bronchitis * Bronchial Asthma * Diabetes * Acute Appendicitis * Eczema piles * Facial Paralysis * Sciatica * Paraplegia Hemiplegia * Hysteria * Sinusitis * Whooping cough Poliomyelitis * Retention of Urine * Cardiac Diseases Furuncle * Pain in Planta * Epilepsy * Myopia Color Blindness * Glaucoma * Pharyngitis * Prostatitis Renal Colic * Prolapse of Uterus * Pelvic Inflammatory Diseases * Morning sickness * Infantile Malnutrition * Acute Infantile Convulsion * Chronic infantile Convulsion etc.*

থ্রম্বোসিসের মত জটিল ও কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারি। শুধু তাই নয়, এই চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে দেহের পুষ্টিতন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক হয় এবং কোষ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দুর্বলতা ও স্মৃতিশক্তিকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।"

উপরোক্ত দুই প্রকার চিকিৎসার সংযুক্তিতে একটি নতুন চিকিৎসাপদ্ধতির প্রচলন হয়েছে এই কলকাতাতেই। বলা বাহুল্য, কিছু পরিবর্তিত উপায়ে। এই আধুনিকীকরণ বিনা গবেষণায় হয়নি। প্রসঙ্গত বলে রাখি সূচী চিকিৎসার ধরনও ইতিমধ্যে পাল্টেছে কিছুটা এই গবেষকদের চেষ্টায়। তাঁরা বলেছেন : শরীরের আকুবিন্দুতে সূঁচ ফোটানোর পরিবর্তে সেকেন্ডে দুই বার

.../85-Elect — 16.12.85

The Director,
Cottage & Small Scale Industries,
[illegible].

Dear Sir,

Kindly refer to this office letter of even number dated 11-10-85 according approval for the manufacture of Electronic Acupulser [illegible] Nos. per annum in favour of M/s. Shyamlal Roy & Sri Gautam Samaddar, Calcutta. This has the reference to your letter No.[illegible]/Elect/[illegible] dated 20.7.85.

This office has reviewed the application of the party and their representation subsequent to the issue of above quoted approval letter from this office. It is to confirm that through this letter the above quoted approval letter stands modified to read Electronic Acupulser [illegible] Nos. per annum ([illegible] numbers per annum). You are requested to kindly assist the party accordingly. The other conditions of the approval remain the same.

Yours faithfully,

(Ajit Kumar [illegible])
Industrial Adviser(Electronics)

Copy to:-

1. Department of Electronics, Social Electronics Group, Lok Nayak Bhawan, New Delhi, w.r.t. their U.O. No.[illegible] dated 13.12.85.
2. JCCI&E, Calcutta.
3. Director, SISI, Calcutta.
4. M/s. Shyamlal Roy & Sri Gautam Samaddar, 7/1B [illegible] Lane, Calcutta-700031.
5. Master File

(Ajit Kumar [illegible])
Industrial Adviser(Electronics)

16/12/85

কেন্দ্রীয় সরকারের ছাড়পত্র

ইলেকট্রনিক পালস (বাইফেসিক স্পাইক ওয়েভ) চালনা করলে সূঁচ ফোটানোর মত একধরনের মৃদু অনুভূতির সৃষ্টি করে। মস্তিষ্কের সেরিব্রাম কেন্দ্রে অবস্থিত ধূসর পদার্থের একটি অংশ এই অনুভূতিকে গ্রহণ করে এক জটিল জৈব রসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তনের ফলে শরীরে ব্যথা অনুভূতি ক্ষমতা কমে যায়। শুধু তাই নয় কোন রোগীর নির্দিষ্ট আকুবিন্দুতে পাল্‌সাবের উত্তেজনা সৃষ্টি করলে রক্তের শ্বেত কণিকার স্বল্প সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আসে এবং শরীরের মধ্যে রোগজীবানু প্রতিরোধ বা ধ্বংসকারী ক্ষমতা সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে জীবানু বাহিত বহুবিধ রোগের প্রতিকার সম্ভব হয়। নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কোন কোন আকুবিন্দুতে উত্তেজনা সৃষ্টি করলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারী ক্ষমতা স্পষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ফলস্বরূপ মানসিক ও স্নায়বিক নানাধরনের রোগ নিরাময় সম্ভব হয়। আরো এক ধরনের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, আকুবিন্দুতে উত্তেজনা সৃষ্টি করলে দেহের ভিতরে একধরনের জৈব বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়ে দেহের ভিতরকার বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির রস ক্ষরণ ক্ষমতা স্বাভাবিক করে। ফলে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির রস ক্ষরণের স্বল্পতা বা বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত রোগ হয়ে থাকে; সেই সমস্ত রোগগুলিকে নিরাময় করা অধিকাংশক্ষেত্রেই সম্ভব হয়।

এখন প্রায় সিকিভাগ সময়ে অর্থাৎ
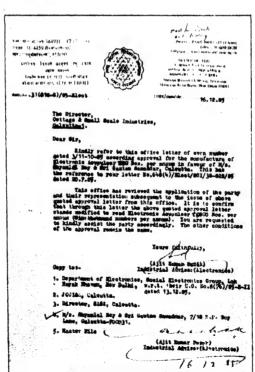
মিনিটেই প্রয়োজনীয় ফল লাভ
যায়। রোগ নিয়ন্ত্রক
দ্রগুলিতে এই আক্ষেপণ সৃষ্টি
তকারক নয়। কারণ, প্রথমত
র সহ্য করতে পারে সেকেণ্ডে
হাজার খোঁচা যেখানে এ
ৎসায় দেওয়া হয় একই সময়ে
র মাত্র। বিদ্যুৎ প্রবাহও দেওয়া
আকুপালসারে। শরীরের
ক্ষমতা ১৫০ ভোল্টের চেয়ে
কম। অতএব পার্শ্বফল বা
ড এফেক্ট নেই। বাজারের
লিত ওষুধের সাইড এফেক্টের
য় তো প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি।
নেটো থেরাপিতেও নেই সাইড
ক্ট। কেন না মনুষ্যদেহ সহ্য
ত পারে প্রতি বর্গইঞ্চিতে
০০ গাউস। আর এ চিকিৎসায়
য়া হয় মোটে ২৮০০ গাউস।
পালসার এবং ম্যাগনেটো
পির মিলিত চিকিৎসার যে
র উদ্ভাবন হয়েছে তার নাম
ভি আকুপালসার যা ব্যাটারি
বিদ্যুৎ উভয়েই চলে। সেটি
ই বলা হয়েছে, কলকাতার
ষ্কার। দুই বঙ্গ সন্তানের যুগ্ম
প্রচেষ্টায় এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে
পাওয়া যাচ্ছে।

কবি বলেছেন খাঁচার পাখি আর বনের পাখির মিলনের কথা—যেটি সংঘটিত হয়েছিল বিধাতার ইচ্ছায়। কিন্তু সেটি বোধহয় সঠিকার্থে মিলন ছিল না। তাই খাঁচা আর বনের সংমিশ্রণে নতুন কিছু সৃষ্টি হয়নি। যে দুই বঙ্গ সন্তানের কথা বর্তমানে আলোচনা করতে যাচ্ছি তাঁদের পরিচয়টা পাখি দুটির গল্প মনে করিয়ে দিলেও পরবর্তী অধ্যায়ে অন্য চিত্র দেখতে পাওয় গেল। ডাঃ শ্যামল সি রায় ছিলেন সূচী চিকিৎসা বিশারদ ডাঃ বিজয় বসুর ছাত্র। চোদ্দ বছর ধরে করছিলেন তিনি আকুপাংচার চিকিৎসা। আজ থেকে বছর পাঁচেক পূর্বে তাঁর কোনও এক বনধু একটি যন্ত্র বিদেশ থেকে এনে তাঁকে দেখান। এই যন্ত্রটিতে ইলেকট্রিক পালসার এবং ম্যাগনেটিক ইনডাকশন দুয়েরই ব্যবস্থা রয়েছে। যন্ত্রটি দেখে শ্যামলবাবুর মাথায় চিন্তা খেলে গেল। একটি যন্ত্র তৈরি করতে হবে। এ রকমেরই তবে এর চেয়ে উন্নত ধরনের।

তাঁর সঙ্গে জুটে গেলেন আর এক উৎসাহী যুবক। গৌতম সমাদ্দার। অতঃপর দুজনের নিদ নাহি আঁখিপাতে। সর্বত্র খুঁজে বেড়ান পথ। কিভাবে একটি কারখানা খোলা যায়। নিজেদের পকেটের স্বাস্থ্য যে অতীব করুণ। ইতিমধ্যে কাগজের বিজ্ঞাপন নজরে এল—'সিডার তরফ থেকে। তাঁরা নতুন নতুন উদ্যোগ গড়ার জন্য অহ্বান জানিয়েছেন উদ্যোগীদের। এখানে একই ছত্রতলে সর্বপ্রকারের পরামর্শ মিলবে। অতএব চলো সিডা সেখানে এস এন চ্যাটার্জী তাঁদের উপদেশ দিলেন স্কীম করে জমা দেবার। ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মিডিসিনেও তিনি পাঠিয়েছিলেন চিকিতসকদের মতামতের জন্য। ডাঃ অমিয়কুমার হাটির মত মহান চিকিৎসক তাঁদের উৎসাহও দিলেন। সিডা থেকেই জানতে পারেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনানসিয়াল কর্পোরেশনের কথা। কর্পোরেশন দেন আর্থিক সাহায্য। ওঁরা কর্পোরেশনের কলকাতা শাখায় যোগাযোগ করেন। সেখান থেকে ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক্স শিল্পের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার-এর কাছে। এবং কয়েক মাসের মধ্যেই মিলল অনুমোদন। ইতিমধ্যে মার্জিন মানি জোগাড়ের ব্যাপারে অসুবিধে দেখা দিয়েছিল। সাত লাখ টাকার উদ্যোগ। পনের শতাংশ মার্জিন মানি মানে একলাখ পাঁচ হাজার টাকার ধাক্কা। এঁরা জোগাড় করবেন কোথা থেকে? হঠাৎ দৈবানুগ্রহের মত একদিন টিভির একটি আলোচনা চক্রে শুনলেন কারিগরি যোগযতাসম্পন্ন উদ্যোগীর ক্ষেত্রে মার্জিন মানি কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সেই নিয়ে আর্জি জানিয়ে মোটে আঠাশ হাজার

দিয়েই পার পাওয়া গেল। মধুকবি অর্থ অন্বেষণে বাকি কিছুই রাখেননি। কিন্তু তবু তাঁর কপালে কাঁটা আর ফণীর দংশনই জুটেছিল। আমাদের আলোচ্য দুই উৎসাহীও সর্বত্র ঘুরেছেন টাকার জন্য। ছোটখাট আঁচড়ও যে খাননি তা নয়। তবে অদম্য উৎসাহে সব বাধাকেই দূর করেছেন। সৃষ্টি হয়েছে কিওর আপ ইলেকট্রনিকসের।
আকুপালসারের এই যন্ত্রের কাজ কেমন হচ্ছে তা বুঝবার জন্য ডাঃ রায় পাঁচ বছর গবেষণা চালিয়ে গেছেন ৪১টি সাধারণ চালুঅসুখের চিকিৎসার ফলাফল লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন খাতায়। দেখা গেছে সাফল্য শতকরা আশি ভাগেরও বেশি। আর এই পরীক্ষা নিরীক্ষায় জ্ঞাতব্য ছিল অনেকগুলি বিষয়। শরীরে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর ভূমিকা আকুপালসারের ক্ষেত্রে ঠিক কিরকম, কতক্ষণ ধরে এক একটি বিন্দুতে উত্তেজনা সৃষ্টি করা উচিত, কোন সময়ের মধ্যে চিকিৎসা শেষ করতে হয়, রক্তচাপের হ্রাস বৃদ্ধি কোন কোন বিন্দুতে চিকিৎসার ফলে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং অনিদ্রা রোগে এম ভি আকুপালসারের ভূমিকা কি। কিন্তু কে এগিয়ে আসবেন এ পরীক্ষায় নিজের দেহ নিয়োগ করতে। ডাঃ রায়ের স্ত্রী পতির গবেষণায় সাগ্রহে নিজেকে পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে দিলেন। তাঁর ওপরে প্রথমে পরীক্ষায় নিশ্চিত হয়ে অন্যান্যদের চিকিৎসায় হাত লাগিয়েছেন ডাঃ রায়। দিল্লির বাণিজ্য মেলায় পশ্চিমবঙ্গ মণ্ডপে সরকারি ব্যয়ে উপস্থিত থেকে ডাঃ রায় ও গৌতম সমাদ্দার চিকিৎসা করেছেন শত শত রোগীর যার মধ্যে ছিলেন অনেক ভি আই পিও। বলাবাহুল্য এ চিকিৎসা বিনামূল্যে।

কিওর আপ ইলেকট্রনিক্সের দাবি তাঁরাই ভারতবর্ষেতথা বিশ্বে আকুপালসারের বর্তমান চিকিৎসা পদ্ধতির প্রবর্তক। কিন্তু এই চিকিৎসা পদ্ধতি তাঁরা আবদ্ধ রাখতে চান না নিজেদের মধ্যে। তাই প্রতিটি যন্ত্রের সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য পুস্তিকায় সমস্ত রোগের চিকিৎসার উপায় বাতলে দিয়েছেন। কোন্ কোন্ আকুপয়েন্ট কি কি রোগের নিয়ন্ত্রক তাও উল্লেখ করে দিয়েছেন তাঁরা চিত্রসমেত। এখন লবণহ্রদের ছোট্ট একটি কেন্দ্র থেকে তাঁরা বিতরণ করছেন নতুন যন্ত্রটি অত্যন্ত ন্যায্যমূল্যে। বলাবাহুল্য সাড়া পাওয়া যাচ্ছে অভূতপূর্ব। বাঙলার এই অভিনব আবিষ্কার সারা ভারতে একদিন দিগ্বিজয় পতাকা ওড়াবে সেই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলেছেন কিওর আপ ইলেকট্রনিক্সের উদ্যোক্তারা। আমরা আপামর জনও সেই দিনটির অপেক্ষায় আছি।

MV = মানে Magnetic Vibrators Acupulser মানে সূঁচের মত Pulse একের মধ্যে দুই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি।
MV-Acupulser একটি অষুধ ছাড়া চিকিৎসা পদ্ধতি। অষুধ খেলে যে ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া হয় এই চিকিৎসায় সেইরকম কোন সম্ভাবনা নেই।
অত্যন্ত জটিল ও বিপদজনক ব্যাধিছাড়া ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।
ডাক্তার ছাড়াই সাধারণ মানুষ এই যন্ত্র সহজেই ব্যবহার করতে পারে এবং ৪১টি রোগ ও উপসর্গ থেকে মুক্তি পেতে পারে।
আকুপালসার ও ঘূর্ণিয়মান চুম্বক ক্ষেত্রের মাধ্যমে দীর্ঘ পাঁচ বছর গবেষণা করে পৃথিবীতে কিওর আপ ইলেকট্রনিক্সই প্রথম Instruction Monual of MV Acupulser নামে ৫২ পৃষ্ঠার একটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন। এই বই যে লেখা আছে (ক) এম ভি আকুপালসার কি ও কিভাবে কাজ করে। (খ) কিভাবে যন্ত্রটি চালাতে হয়। (গ) রোগীর প্রতি নির্দেশ (গ) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা করা চলবে না। (ঘ) কিভাবে আকুবিন্দুর নির্দিষ্ট স্থান খুঁজে পেতে হয় ঙ) চি যে পথে চালিত হয় তাদের নাম, শক্তি এবং সাংকেতিক চিহ্ন (চ) প্রতিটি প্রণালীর রোগ লক্ষণ এবং প্রতিটি বিন্দুর এনাটমিকাল পজিশন। ৩৪টি রেখা চিত্র, যার মাধ্যমে আকুবিন্দুগুলির সঠিক স্থান নির্দেশ করা আছে। (ছ) ৪১টি রোগ ও উপসর্গের বিস্তারিত ব্যবস্থাপত্র। যার সাহায্যে যেকোন সাধারণ মানুষ নিজের চিকিৎসা নিজেই করতে পারবেন।
(জ) ভারতবর্ষে MV Acupulser -এর Pioneer হচ্ছে:—

CureUp ELECTRONICS®

THE PIONEER OF ACUPULSER

CD-211, Sector 1, Salt Lake City, Calcutta-700064

Our Authorised Chemist Shop:
GIRISH PHARMACY:
167B, Rash Behari Avenue, Gariahat Junction,
Calcutta-700019. Phone: 46-8647.

স্ফটিক-স্বচ্ছ ইসি কালার!

যার অনুকরণ করতে চায় সব টিভি-ই!

ইলেকট্রনিক্স করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড হায়দ্রাবাদ ৫০০ ৭৬২

Karishma/EC/10/9416/BG

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭
দেশ
মোদের গরব
মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা
বাংলা ভাষা
মোদের গরব
আ মরি বাঙলা ভাষা

সূচীপত্র

দেশ

২৬ ভাদ্র ১৩৯৪ □ ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ □ ৫৪ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা

প্র চ্ছ দ নি ব ন্ধ

বি শে ষ নি ব ন্ধ

বি জ্ঞা ন

এ ই দে শ এ ই বি শ্ব

সা হি ত্য

শি ক্ষা সং স্কৃ তি

খে লা

ব্য ঙ্গ কৌ তু ক

গ ল্প

ক বি তা

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

এবং নিয়মিত বিভাগ সমূহ

প্র চ্ছ দ

সুব্রত চৌধুরী

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক
৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ২০ পয়সা পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা

৩৫

'যার ভাষা হায়/ভুলিতে সবে চায়/'—এই সঙ্গীত-কলিটি বঙ্গজননী সম্পর্কে অনেককাল আগে করা রবীন্দ্রনাথের এক খেদোক্তি। আজ কেবল ভোলা নয়, পুরো বিলুপ্ত করার আয়োজন চলছে সেই ভাষাকে।
শিক্ষাক্ষেত্র, আদালত, সরকারি দফতর থেকে এ-ভাষা বিতাড়িত। সে শুধু সাহিত্যের জোরে অস্তিম লড়াই লড়ছে। এভাবে সে বাঁচবে কদিন! কী ভাবে ঔপনিবেশিক শক্তি পৃথিবীতে বহু জাতির মাতৃভাষাকে গ্রাস করেছে ইতিহাসে তার অনেক নজির রয়েছে। এখানেও সে কাজ চলছে ইংরেজ আমল থেকেই। তবু অমেয় প্রাণশক্তিতে

বঙ্গভাষার যেটুকু অস্তিত্ব এখনও টিকে আছে তাও লুপ্ত হতে চলেছে হিন্দির গর্ভে। অনেক আগে, আঠারো-শ' একানব্বইতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, সর্বব্যাপী গভীর অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে মাতৃভাষার মাধ্যমে এদেশে শিক্ষার প্রসার ঘটানো দরকার। এর পরও বহু মনীষী যেমন প্রাণপণ লড়েছেন বঙ্গভাষার জন্য, তেমনি এর সর্বনাশ সাধনের চেষ্টাও করেছেন বেশ কিছু বঙ্গসন্তানই। যতোই বলি 'আ মরি বাংলা ভাষা,' সে আজ মরণোন্মুখ। কোথাও মানুষ হচ্ছে 'ভাষা-শহীদ,' আর এখানে ভাষাই বুঝি শহীদ হচ্ছে।

২৯

বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় সতের-শ' চুরাশির পঁচিশ মার্চ ক্যালকাটা গ্যাজেটে। এই বিজ্ঞাপনগুলির মধ্যে আমাদের তখনকার সমাজচিত্র এবং গদ্য গঠনেরও ইতিহাস ধরা পড়ে। যেমন, এক সায়েবের বিজ্ঞাপনের নমুনা : 'আমার স্ত্রি কেলারিন্দা বরোস আমার বাটী হইতে অনাহুতা গিয়াছে অতএব আমি খবর দিতেছি কেহু যদি কেলারিন্দা বরোসের সহিত সনশ্রপ করে তবে আমী তাহার নামে আদালতে নালিস করিব।' ইতিহাসের এমনি অনেক উপাদান এখানে উপস্থিত।

২৩

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্থ যে কী, তার দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন রুডলফ হেস। হিটলারের এই ডেপুটি উনিশ-শ' একচল্লিশ সাল থেকে কারাগারে কাটিয়ে তিরানব্বুই বছরে এক বিতর্কিত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিদায় নিলেন।

২৬

জননবিদ্যার অভিব্যক্তি ও তার অগ্রগতির যে ধারা বর্তমান বিশ্বে মানব কল্যাণে নিয়োজিত সেই জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং নিয়ে এখানে এক প্রবাসী বাঙালি বিশেষজ্ঞের আলোচনা। সেই সঙ্গে এব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও রবীন্দ্র-আইনস্টাইন আলোচনা বিশ্লেষণ করে কবির বিজ্ঞানচিন্তার উপর নতুন আলোকপাত করেছেন লেখক।

৭৩

যে 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসটির সঙ্গে শতবর্ষ ধরে বাঙালি পাঠক পরিচিত, প্রথম সৃজনের সময়ে কি উপন্যাসটি তেমনি করেই নির্মাণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র? বিস্ময়ের কথা, এতকাল অগ্রথিত এমন সব অংশ রয়েছে যা পাঠ করলে আমরা দেখতে পাব ভিন্নতর প্রফুল্ল, ভিন্নতর ব্রজেশ্বর, অন্যতর ভবানী, অন্যরকম নয়নতারা এবং অনেক অন্য ধরনের ঘটনাসন্নিবেশ।

বিক্রমাব্দের সন্ধানে

১ আগস্ট দেশ পত্রিকায় ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'বিক্রমাব্দের সন্ধানে' নিবন্ধে একটি গুরুতর ভ্রান্তি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রারম্ভিক উদ্ধৃতিটির উৎস নির্দেশে ১নং টীকায় তিনি লিখেছেন : 'আল বিরূনী, কিতাবো ফি তহ্‌কীক্‌-ই-মলিল হিন্দ্‌ মিন মকুলতিন্‌ মকবুলতিন্‌ ফিন্‌-সকল-ই-ঔ মরজুলতিন (এ সাচাউ সম্পাদিত, লন্ডন, ১৮৮৭)' এবং মন্তব্য করেছেন, 'সাচাউ মূল গ্রন্থে লিখিত "হিন্দিয়ান" কথাটির স্থলে অনুবাদে লিখেছেন "হিন্দু"।' তিনি অধ্যায় নং এবং পৃষ্ঠাও উল্লেখ করেছেন।

আল বিরুনির মাতৃভাষা ছিল ফার্সি। কিন্তু গ্রন্থাদি লিখেছেন আরবি ভাষায়। উল্লিখিত গ্রন্থটি আরবিতে লিখিত। মূল ও প্রকৃত টাইটেল হল : "ফি তহ্‌কিক মা লি'ল-হিন্দ্‌ মিন্‌ মকুলতিন্‌ মকবুলতিন ফি'ল্‌—অক্‌ল অও মরজুলতিন্‌।" এই টাইটেলের গোড়ায় বিরুনির পরবর্তী আলোচকরা 'কিতাব্‌' শব্দটি অবশ্য যুক্ত করতেন ঐতিহ্যসম্মত প্রথা অনুসারে। কিন্তু শব্দটি কদাচ 'কিতাবো' নয়। আরবি কিতাব (পুস্তক)-এর সঙ্গে 'ও' সাফিক্স প্রযোজ্য নয়, 'উল' সাফিক্স প্রযুক্ত হয় প্রয়োজন অনুসারে। যেমন 'কিতাব-উল-হিন্দ' হতে পারে। 'কিতাবো হিন্দ্‌' অশুদ্ধ। সাচাউ সম্পাদিত গ্রন্থের টাইটেল 'কিতাবো' নেই।

তাছাড়া 'এ.সাচাউ' কে? ই সি সাচাউ গ্রন্থটির সম্পাদনা করেন। পূর্বোক্ত আরবি টাইটেলে সাচাউ (Sachau) এর সম্পাদিত ভার্সান বেরিয়েছিল ১৯২৫ সালে লেইপজিগ থেকে, প্রকাশক O. Harrasowitz এবং এর আগেই ১৯১০ সালে সাচাউ দুই খণ্ডে গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ বের করেন। তার টাইটেল ছিল সম্পূর্ণ ইংরেজি : Alberuni's India. An Account of the Religion, Philosophy, Literature, Geography, Chronology, Astronomy,Customs, Laws and Astrology of India.' প্রকাশক Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. London.এতে সাচাউ যথারীতি একটি দীর্ঘ ভূমিকাও যুক্ত করেন। প্রশ্ন জাগে, তাহলে শ্রীমুখোপাধ্যায় কথিত এ. সাচাউ কে? নাকি নিছক মুদ্রণভ্রান্তি?

ই. সি. সাচাউ ১৮৭৯ সালে লন্ডনের ডাব্লিউ এইচ অ্যালেন প্রকাশন সংস্থা থেকে বিরুনির 'কিতাব্‌ অল্‌-জমাহির ফি মা'রিফত্‌ অল্‌-জওয়াহির' নামের আরবি গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশ করেছিলেন 'Chronology of Ancient Nations' নামে। ১৮৭৮ সালে লেইপজিগ থেকে প্রকাশিত বিরুনির আরও একটি গ্রন্থ সাচাউ সম্পাদনা করেন। সেটির আরবি টাইটেল 'কিতাব আল্‌ আত্‌হার আল্‌-বাকিয়াহ্‌ আন্‌ আল-কুরান আল্‌-খালিয়াহ্‌' তিনি বহাল রাখেন। কারণ এটি সম্পাদিত গ্রন্থ। যাই হোক শ্রীমুখোপাধ্যায়ের প্রদত্ত তথ্যসূত্র অনুসারে ধরে নিচ্ছি, সাচাউ বিরুনির পূর্বোক্ত গ্রন্থটি মূল আরবি টাইটেলেই ১৮৮৭ সালে লন্ডনের কোনও প্রকাশন সংস্থা থেকে সম্পাদনা করেন। তাহলে সেটি ইংরেজি ভার্সান হওয়া উচিত, যদিও সম্পাদনা এবং অনুবাদ এক জিনিস নয় (যেমন মাক্সমুলার ঋগ্বেদ সম্পাদনা করেন, আবার কতকাংশ অনুবাদও করেন)। কিন্তু এই বিচিত্র পরিস্থিতিতে সাচাউ-এর সম্পাদিত ১৮৮৭ সালের মূল আরবি টাইটেলযুক্ত গ্রন্থটি সংশয় সৃষ্টি করে না কি? শ্রীমুখোপাধ্যায় উদ্ধৃতিটির প্রকৃত উৎস কী? নিবন্ধের শুরুতে শ্রীমুখোপাধ্যায় যে বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত করেছেন তা তাঁরই প্রদত্ত তথ্য সূত্রে মূল আরবি গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের বাংলা অনুবাদ গণ্য হয়। তিনি যে আরবি জানেন না, তা স্পষ্ট। এতে সংশয় আরও বাড়ে। মূলে নাকি 'হিন্দিয়ান' ছিল, সাচাউ 'হিন্দু' করেছেন। সংশয় ঘনীভূত হয়। আরবিতে ভারত 'হিন্দ্‌' এবং ভারতীয় হল 'হিন্দো/হিন্দু' (আরবি বর্ণে শব্দটি সাজালে হামজা + নু + দাল=হিন্দ্‌ এবং এর সঙ্গে 'ওয়াও/অও' বর্ণ সাফিক্স হিসেবে যুক্ত করলে 'হিন্দো/হিন্দু' হয়। এটি একবচন)। বহুবচনে পুংলিঙ্গে উন যুক্ত হয়। কাজেই হিন্দুগণের আরবি হল হিন্দো'উন/হিন্দু'উন। কদাচ 'হিন্দিয়ান' নয়। আরবি শব্দের শেষের বর্ণটি যদি স্বরবর্ণবর্জিত হয়, তবেই 'উন' উচ্চারিত হবে 'আন'। যেমন মুসলিম-এর বহুবচন মুসলিমান। স্ত্রীলিঙ্গে বহুবচনে আত্‌ যুক্ত হয়। যেমন মুসলিমাত্‌। বিশেষ উল্লেখ্য, আরবি ওয়াও/অও বর্ণের উচ্চারণ সুনির্দিষ্ট নয়, এটি দেখতে একটি প্রকাণ্ড ইংরেজি কমা চিহ্নের গড়ন। ক্ষেত্র বিশেষে ও এবং উ দুইই উচ্চারিত হয়। ইংরেজিতে এটি 'aw' লেখা চলে। কিন্তু কোনও শব্দের শেষে যুক্ত হলে ইংরেজিতে un লেখা যায়। উচ্চারণ 'উন'।

না হয় ধরে নিচ্ছি, বিরুনির মাতৃভাষা ফার্সি ছিল বলে মাতৃভাষার প্রবণতায় 'হিন্দুদের' কথাটির ফার্সিরূপ ঢুকিয়েছেন তাঁর আরবি গ্রন্থে। ফার্সিতেও হিন্দ্‌ হল ভারত। 'ভারতবাসী' ফার্সি 'ই' সাফিক্স যোগে 'হিন্দি' হয়। এর ফার্সি বহুবচনেও ক্ষেত্রবিশেষে ওন/উন্‌ (ওয়াও বা অও বর্ণের সঙ্গে নু বর্ণ যুক্ত হয়ে) যুক্ত হয় এবং তাহলে 'হিন্দুদের' ফার্সিরূপ দাঁড়ায় হিন্দিওন/হিন্দিউন। ওন/উন-এর ফার্সি উচ্চারণ হল ওঁ/উঁ। ফলে শব্দটি হবে হিন্দিওঁ/হিন্দিউঁ। কিন্তু হিন্দিওঁ প্রয়োগসিদ্ধতা অর্জন করেছে এবং এটি বাংলায় 'হিন্দিয়োঁ' লেখা চলে। কাজেই 'হিন্দিয়ানদের' কথাটি ভুল ও অসিদ্ধ। বিশেষত এতে বহুবচনের সঙ্গে আরও একটি বাংলা বহুবচন 'দের' যুক্ত করা হয়েছে (ফার্সি দিগর থেকে বাংলায় 'দিগের' এবং তা থেকে 'দের' এসেছে)। ওমরাহদের বললে যেমন ভুল হয়।

শ্রীমুখোপাধ্যায় বিরুনির নামেও ভুল করেছেন। 'আবু রায়হান মুহম্মদ বিন আহমদ' লিখে 'বা (অথবা?) আলবিরুনি' লিখেছেন। শুদ্ধ নাম : 'আবু রায়হান মুহম্মদ ইবন আহ্‌মদ আল-বিরুনি'। জন্ম প্রাচীন পারস্যের বিরুন নামক স্থানে (আধুনিক খিবা)। খোয়ারজম্‌ (Khwarazm) শহরের উপকণ্ঠে রুক্ষ জমির (ইংরেজি Barren) ওপর বসতি ছিল বলেই ফার্সিতে বিরুন বলা হত। যাই হোক আরবি বিন্‌ এবং ইবন্‌ শব্দের অর্থ এক (Son/son of) হলেও সুপ্রচলিত নামটি ব্যবহার করা উচিত। মুহম্মদ-বিন-কাশিমকে মুহম্মদ-ইবন-কাশিম লিখলে ভাষাগত ভ্রান্তি ঘটে না। কিন্তু প্রথম নামটিই সুপ্রচলিত বলে ঐতিহাসিক ভ্রান্তি ঘটে।

আল-বিরুনির গ্রন্থাদির আধুনিক কাল পর্যন্ত বিশদ হিস্টোরিওগ্রাফিক্যাল রেকর্ড প্রখ্যাত ইরানি পণ্ডিত সৈয়দ হোসেন নসর (Seyyed Hossein Nasr)-এর তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ১৯৭৩ সালের ইংরেজি গ্রন্থ 'al-biruni, An Annotated Bibiliography' এবং আমেরিকা থেকে Shambhala Publications (1123, Spruce street, Boulder, Colorado 80302) কর্তৃক প্রকাশিত 'An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines' গ্রন্থে মিলবে। বিরুনির মূল পাণ্ডুলিপির কপির তস্য কপি ইউরোপের বিভিন্ন প্রত্নশালায় রক্ষিত। আর একটা কথা। শ্রীমুখোপাধ্যায় ২৭ নং টীকায় স্বরচিত একটি গ্রন্থে 'পার্থিয়ান' শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং ইংরেজির দৌলতে 'পার্থিয়া' খুবই চালু। কিন্তু ভ্রমক্রমে চালু। গ্রিকরা পার্সিয়া (স্থানীয় ভাষায় পারস) বলত এবং রোমান বর্ণমালায় লেখা হয় Parthia. এখানে th-এর উচ্চারণ 'স'। রোমান বর্ণমালা অনুসারে পারসি (আরবি উচ্চারণে ফার্সি) ভাষার স-গুলিকে 'Th' এবং জ/ঝ-গুলিকে 'D/DH' লেখা হয়। রোমান বর্ণমালায় আরবি বর্ণমালার চতুর্থ বর্ণটিকেও 'Th' লেখা হয়, যার শুদ্ধ উচ্চারণ থ এবং স-এর মাঝামাঝি, থ-এর কাছাকাছি। কিন্তু Parthia এই রোমান হরফে লিখিত শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ পার্সিয়া।

শ্রীমুখোপাধ্যায় আল-বিরুনির উল্লিখিত গ্রন্থের টাইটেলে রোমান হরফে লেখা 'mardhulatin' কে তো ঠিকই 'মরজুলতিন্‌' লিখেছেন! যদিও এই শব্দের 'জ'-এর শুদ্ধ উচ্চারণ ফরাসি Jean শব্দের জ-এর মতো।

আমার বক্তব্য, টীকায় তথ্য উৎস নির্দেশের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও সংশয় সৃষ্টি করা উচিত নয়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কলকাতা-১৪

বাঙালীর আশ্রয়

১১.৭.৮৭ তারিখের দেশ পত্রিকায় 'বাঙালীর আশ্রয়' নামক সময়োপযোগী সম্পাদকীয়টির জন্য আপনাকে সাধুবাদ জানাই।

ইদানীং উত্তর ও মধ্য কলকাতায় ৪০/৫০ বছর বসবাসকারী ভাড়াটে উচ্ছেদের একটা হিড়িক পড়ে গেছে। কোনো নির্জন দ্বিপ্রহরে একটি বাড়ি ঘিরে কিছু অশক্ত, বৃদ্ধ, কিছু শিশু, কিশোর কিশোরী ও সামর্থহীন মধ্যবয়সী মানুষের বোবাকান্নার সামনে বীরদর্পে পুলিশের প্রবেশ ও আসবাবপত্র ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে থাকার দৃশ্য খুব স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। গৃহহীনদের গৃহদানের সদিচ্ছার বছরে কিছু মানুষ যে ক্রমান্বয় গৃহচ্যুত হচ্ছেন অথবা হওয়ার খাঁড়া মাথায় নিয়ে কালাতিপাত করছেন মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের রক্ষা করার কোনো প্রকল্প হাতে নিয়েছেন কিনা জানতে পারলে পত্র-লেখিকা ও তার মতো শহর কলকাতার বহু আদি বাসিন্দা উপকৃত হবেন।

বহুবছরের ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের আইনগত দিকটি

আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করতে চাই। West Bengal Premises Tenancy Act -এর ১৩ নং ধারার সব ক'টি অংশ বিশেষ করে ১৩(৬) নামক অংশটি ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের এক চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করেছে, সঙ্গে যোগ দিচ্ছে Transfer of Property Act-এর ১০৬, ১০৮ ইত্যাদি কয়েকটি অশুভ ধারা। এ ধরনের উচ্ছেদের বিশিষ্ট রূপটি সাধারণত এই—

বাড়িওলা ভাড়াটে সমেত বাড়িটি এমন কাউকে বিক্রয় করছেন যাঁর নিজের আবাস নেই (অবশ্যই বেনামীতে আছে) অথবা তিনি বাড়িটি এমন কাউকে আইনানুসারে হস্তান্তর করছেন যাঁর স্বনামে কোনো বাড়ি নেই। West Bengal Land Premises Act -এর ১৩ (৬) নং ধারা এই দুষ্ট চক্রান্তের সামিল হয়ে ৪০/৫০ বছরের ভাড়াটেকে মাত্র ১ মাসের সময় দিয়ে উচ্ছেদের নোটিস দিচ্ছেন। পুরাতন ও নূতন বাড়িওলা এবং কিছু মানবিকতাহীন unscrupulous আইনজীবী এতদিনের বসবাসকারীদের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুতে পরিণত করে আদালতের বাহবা কুড়োচ্ছেন। West Bengal Premises Tenancy Act-এর ১৩ নং ধারার সব ক'টি অংশ ও ব্যাখ্যার মূলোৎপাটন আশু প্রয়োজন। ১৩ (৬) নং ধারায় বলা হচ্ছে বাড়িওলার বাড়ি না থাকলে ১ মাসের মধ্যে ভাড়াটিয়াকে বাড়ি ছাড়তে হবে।

অহো! সমাজতান্ত্রিক দেশ ভারতের আইনের কি মহিমা! এখানে ১ বছর বসবাসকারীর বাড়ির ওপর যত অধিকার ৫০ বছরের বসবাসকারী ভাড়াটিয়ার অধিকার তার থেকে এক দিনও বেশি নয়।

মহামান্য আইন বাড়িওলাকে দুর্বল, অসহায় ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে এ ধরনের হস্তান্তরের পর মাত্র ৩ বছর বাদে মামলা রুজু করবার অধিকার দিচ্ছেন। যারা ৫০ বছর পরের বাড়িতে মাথা গুঁজে পড়ে রইলো ৩ বছরেই তারা নূতন বাড়ি করে ফেলবে বা উঠে যেতে পারবে? বলতে পারেন আমরা কোথায় আছি? কোথায় যাবো? কোন দণ্ডকারণ্য বা মরিচঝাঁপি আমাদের জন্য প্রস্তুত? পূর্ববঙ্গের সুফলা জমির স্মৃতিও আমাদের কোনো দিন ছিল না! আজীবন কলকাতাবাসী শিক্ষিত ভদ্র নির্বিরোধী মানুষগুলি কলকাতার ৩০০ বছর পূর্তির উৎসবের সামনে দাঁড়িয়ে নতুন ইহুদীতে পরিণত হচ্ছেন! তাঁদের রক্ষাকল্পে সরকার কোনো প্রকল্প নিয়েছেন কি?

বাড়িওলার মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে এরা সঞ্চয় তেমন কিছুই করেননি যে অন্যত্র বাড়ি করবার স্বপ্ন দেখবেন। যে ব্যক্তি ৫০ বছরের ভাড়াটিয়া সমেত বাড়ি কেনে এমন অঞ্চলে যেখানে বিশাল একটি Complex-এ হাজার খানেক flat বিক্রী হচ্ছে সেখানে এই ব্যক্তিকে ষড়যন্ত্রকারী, মতলবী ও অপরাধী বলে চিহ্নিত না করে আইন তাঁকে ৫০ বছরের ভাড়াটিয়া তাড়িয়ে স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করার মহিমা দেখাচ্ছেন।

গৃহহীনদের গৃহদানের এই আন্তর্জাতিক সদিচ্ছার বছরে সরকার যদি আইনের পরিবর্তন সাধন করে এই সব দুর্বল, স্বল্পবিত্ত মানুষকে গৃহচ্যুত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচান তবে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীনদের নিজ জমি চাষের অধিকার দান করে সরকার যে সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন শহরাঞ্চলেও দীর্ঘকালীন ভাড়াটিয়াদের এই বাড়িতে আজীবন বসবাসের অধিকার দিন। বিত্তবান এক শ্রেণীর পুরাতন, নূতন বাড়িওলা ও কিছু বিবেকবুদ্ধিহীন আইনজীবীর পুষ্ট আঁতাতকে ভেঙে দেবার আবেদন জানিয়ে ভাড়াটিয়া ও বাড়িওলা উভয় পক্ষের সুবিধার্থে পত্র-লেখিকা সদবুদ্ধিসম্পন্ন, জনগণ, আইনব্যবসায়ী, মন্ত্রী, এম. এল. এ, বিচারক ও সাংবাদিকদের সামনে কয়েকটি প্রস্তাব রাখছেন :—

১। West Bengal Land Premises Act-এর 13 নং ধারার সব কটি অংশ বিশেষ করে 13 (6) নং ধারাটিকে কালাকানুন বলে চিহ্নিত করে এখনই তা repeal করা হোক অথবা তাকে এমন একটি সভ্য মার্জিত ও মানবিক রূপ দেওয়া হোক যাতে দীর্ঘকালীন ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের অস্ত্র হিসাবে আইনটি কখনো ব্যবহার করা না যায়। এর সঙ্গে Transfer of Property Act -এর ১০৬, ১০৮ ইত্যাদি ধারাগুলিও যেন শর্তহীনভাবে ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করা যায়।

২। বাড়িওলা যদি বাড়ি বিক্রয় করতে, মর্টগেজ দিতে অথবা অন্য কোনোভাবে বাড়িটিকে আইনগত ব্যবহার করতে চান তবে তাঁকে ভাড়াটিয়াকেই আগে জানাতে এবং প্রথমেই ক্রয় করবার সুযোগ দিতে হবে (অবশ্যই ন্যায্য মূল্যে)। সাধারণত এগুলি করা হয় অত্যন্ত গোপনে এবং ধূর্ততার সঙ্গে।

৩। ভাড়াটিয়া লিখিতভাবে বাড়িটি কেনবার অক্ষমতা জানালেই কেবলমাত্র অন্য ব্যক্তিকে বাড়িটি বিক্রী করা যাবে বা অন্য কোনোভাবে ব্যবহার করা যাবে। এ ধরনের transaction-এ ভাড়াটিয়াকে একটি পার্টি ধরে নিতে হবে। নতুন বাড়িওলাকে ভাড়াটিয়ার আজীবন বসবাসের অধিকার মেনে নিয়েই বাড়িটি কিনতে হবে। অথবা তাঁকে ভাড়াটিয়ার সঙ্গে আগেই কথা বলে জেনে নিতে হবে ভাড়াটিয়ার পক্ষে বাড়িটি ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব কিনা।

৪। যিনি ৪০/৫০ বৎসরের ভাড়াটিয়া সমেত বাড়ি কিনে ৩ বছর বাদে সেই ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদের নোটিস দেবার সাহস করবেন আইনের চোখে তাঁকে ষড়যন্ত্রকারী ও দোষী হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

West Bengal Premises Tenancy Act বা Transfer of Property Act যেন এই ভুঁইফোঁড় বাড়িওলার রক্ষাকার্যে ব্যবহার করা না যায়। গৃহহীনদের গৃহদানের সদিচ্ছার এই আন্তর্জাতিক বর্ষে এবং কলকাতার ৩০০ বছর পূর্তির প্রাক্কালে সরকারকে আবেদন জানাই কিছু শিক্ষিত, ভদ্র, নির্বিরোধী মানুষকে ৫০ বছর যেখানে তাঁদের আবাস, এখানেই যাঁরা হারিয়েছেন বাবা, মা, পিতামহ ও পিতৃব্যদের, স্বাগত জানিয়েছেন ভবিষ্যৎ বংশধরদের, নিকটস্থ কর্মস্থল, এই পল্লীতে যাঁরা জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, বার্ধক্যের পথে পা বাড়িয়েছেন, এখানেই তাঁদের শেষ নিশ্বাস ত্যাগের অধিকার দিন। পাঠ্যপুস্তকে লেখা থাকে Tenancy Right is as good as Property Right কিন্তু কার্যকালে অসাধু পুরাতন ও নূতন বাড়িওলা এবং কিছু বিবেকবুদ্ধিহীন আইনজীবী ও বিচারকের সামনে এ মন্ত্র মাথা নোয়ায়।

বাম ফ্রন্ট সরকারের তৃতীয় বিজয়ের পর আমরা যাঁরা একটি বাড়িতে একাদিক্রমে ৪০/৫০ বছর বাস করছি, আমরা কি এখানে আজীবন বসবাসের অধিকার আশা করতে পারি না? 'বাড়িওলার মাথার ওপর ছাদ নেই' এমন একটা pleading-এর সুযোগই কোনো আইনের দেওয়া উচিত নয়, যেখানে বিত্তশালী বাড়িওলা ৫০ বছরের ভাড়াটিয়া সমেত কোনো বাড়ি কেনেন। এ ধরনের বাড়িওলাকে চক্রান্তকারী বলে সবাই যখন চিনতে পারেন তখন আইন কেন এই অসাধু ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য গড়া হবে এবং একদল নির্বিরোধী ভদ্রমানুষকে আইনানুসারে উচ্ছেদ করার উল্লাসে মানবিকতাহীন আইনজীবী ও বিচারক উল্লাসে ফেটে পড়বেন এবং পরস্পরের পিঠ চাপড়াবেন?

'দেশ' পত্রিকা আবাসনের ব্যাপারটিকে বরাবর গুরুত্ব দিচ্ছেন, কিন্তু সর্বাগ্রে দরকার শহর কলকাতার পুরানো বাসিন্দাদের সহজে উচ্ছেদ করার জন্য তৈরি এই West Bengal Premises Tenancy Act ও তার ১৩ নং অশুভ ধারা। Transfer of Property Actকে যদি এ ক্ষেত্রে মৌল অধিকার বলে টেনে আনা হয় তবে ভাড়াটিয়ার পক্ষে যে বাড়িতে তার জন্মস্থল, পিতৃপুরুষের মৃত্যুস্থল ও নিকটস্থ কর্মস্থল—সে বাড়িতে আজীবন বসবাসের অধিকারকেও মৌল অধিকারের মর্যাদা দিতে হবে।

রুবি সরকার

কলকাতা-৬

পণ্ডিতসমাজ : বিস্মৃত ও অনুল্লেখিত ব্যক্তিত্ব

২০ জুন 'দেশ' পত্রিকায় বাংলার পণ্ডিতসমাজ সম্পর্কে যে সারগর্ভ নিবন্ধমালা প্রকাশিত হয়েছে তা অত্যন্ত সময়োচিত। যে ভাষা ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারাকে সহস্র সহস্র বৎসর ধরে লালন করে এসেছে সেই ভাষা ও তার শিক্ষকবৃন্দের দুর্গতি ও অবহেলার যে চিত্র এই নিবন্ধমালায় প্রতিফলিত হয়েছে তার জন্যে নিবন্ধ লেখকদেরকে আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীজীবন্যায়তীর্থ ও নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

বাংলার বেশ কিছু সরকারী উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিতদের নাম উল্লেখ করেছেন। অতীত ও বর্তমানের সংস্কৃত চর্চার প্রাণকেন্দ্রগুলির নামও উল্লেখ করেছেন তাঁরা। এঁদের বেশির ভাগই সম্ভবত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী। কিন্তু তাঁদের বিবরণী থেকে কিছু কিছু প্রথিতযশা কায়স্থ পণ্ডিতদের নাম অনুল্লেখিত থেকে গেছে মনে হয়। যাঁরা বহুগ্রন্থের প্রণেতা এবং যাঁদের প্রণীত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত প্রধানত তাঁদেরই নাম নিবন্ধদ্বয়ে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু যাঁর কথা বলতে চলেছি তাঁর গবেষণাধর্মী ও অনূদিত গ্রন্থগুলি অমুদ্রিত থেকে গেছে। সম্ভবত এই কারণেই তিনি আলোচনার আওতায় আসতে পারেননি।

এই কায়স্থ পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত পাংশাতে। নাম ললিতকুমার কাব্য সাংখ্যবেদতীর্থ (১৮৮৭—১৯৭২) ইনি বসুবংশোদ্ভব। মঃ মঃ সীতারাম শাস্ত্রী ও মঃ মঃ শিবকুমার শাস্ত্রী তাঁর উপাধ্যায় ছিলেন। ১৯১৩ ও ১৯১৬ সালে তিনি যথাক্রমে বেদ ও সাংখ্য বিষয়ে সরকারী 'তীর্থ' উপাধিপ্রাপ্ত হন। স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে হেডপণ্ডিত হিসেবে সামান্য বেতনে চাকুরি করতেন আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত সারস্বত চতুষ্পাঠীতে শাস্ত্র চর্চা চলত। শিক্ষার্থীদের বিনাবেতনে পড়াতেন। চতুষ্পাঠী চলত মাত্র ৩৫ টাকার অনুদানে (সরকারী ও বে-সরকারী) এর বিনিময়ে তাকে সারা বছর ধরে দু'-একজন ছাত্রের আহার, বাসস্থানের দায়িত্ব বহন করতে হত।

অস্বাভাবিক অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে তাঁর দিন কেটেছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। অতি সাধারণ জীবনযাত্রা। নিরামিষভোজী। পরনে ধুতি ও চাদর, পায়ে চটি ও খড়ম। চতুষ্পাঠীতে বেদ (প্রধানত সাম ও ঋক), বেদান্ত, বৈষ্ণবদর্শন, কাব্য, সাংখ্য ব্যাকরণ, স্মৃতি ইত্যাদি শাস্ত্র পড়ানো হত। সরকারী পরীক্ষা দিত তাঁর ছাত্রেরা Bengal Sanskrit Association গৃহীত পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে—নবদ্বীপ ও কলকাতা কেন্দ্রে (Calcutta Pandit Sava)। তাঁর জীবনে দুটি ইচ্ছা প্রবল ছিল। এক, মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ (যা কায়স্থ পণ্ডিতের ভাগ্যে জোটেনি) আর দুই, তাঁর বিরচিত মূল ও অনূদিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণ যার একটিও পূরণ হতে পারেনি। গ্রন্থ মুদ্রণ করতে পারেননি অর্থাভাবে। শুধু একখানি গ্রন্থ পাণিনি ব্যাকরণের বঙ্গানুবাদ 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদী'র (৩৯৭৫ সূত্র সমন্বিত ও কাত্যায়নের বার্তিকসহ) একটি সংস্করণ তিনি বহুকষ্টে কলকাতার ক্যাত্যায়নী মেশিন প্রেস (৩৯/১ শিবনারায়ণ দাস লেন) থেকে ছাপিয়েছিলেন। প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বই। তখনকার বিক্রয়মূল্য ছিল ৬ টাকা। এটা ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি কালে। যে সব অন্যান্য গ্রন্থাবলী তি রচনা করেছিলেন তার একটি জীর্ণ তালিকা আ কাছে এখনো রক্ষিত আছে। তা থেকে উদ্ধৃত করছি।

মূল সংস্কৃত গ্রন্থাবলী : ১) ষড়দর্শনকারিকা ২) ঈশ্বরবাদ ৩) প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্যা নীতিবিজ্ঞানম ৪) রাজপ্রশস্তি (সংস্কৃত শ্লোকে রচিত) টীকা সহ অনুবাদ গ্রন্থাবলী ; ৫) মানবগৃহ্যসূত্র ৬) পাণিনি ব্যাকরণ (মূল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা) মুদ্রাপনীয় গ্রন্থাবলী ; ৭) সামবেদ সংহিতা (ভাষ্য ও অনুবা সহ) ৮) লঘু কৌমুদী (মূল অনুবাদ ও প্রক্রিয়া) : বৈয়াসিক ন্যায়মালা। বঙ্গীয় কায়স্থ সভা এই সব গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ (Synopsis) নিজব্যয়ে মু করেন book-let আকারে এবং এই সভারই বিদ্যোৎসাহী কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই মুদ্রিত book-let টি একটি যুক্ত আবেদন পত্র সহ তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ও গভর্নরের কাছে প্রেরণ করেন এই কায়স্থ বেদজ্ঞ পণ্ডিতকে মহামহোপাধ উপাধি প্রদানের জন্য। কিন্তু তাঁদের এই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি উপাধি পাননি কলকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি পরি ছিলেন। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বাংলা সরকা তদানীন্তন পলিটিক্যাল সেক্রেটারী এস এন রায়, কে দত্ত, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, জাস্টিস মন্মথনা মুখোপাধ্যায়, গণপতি সুব, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রলাল মিত্র (স্যর বি এল মিত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাত যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী আরো অনেকে। বাংলার ব বিশিষ্ট পণ্ডিত বিশেষ করে ভাটপাড়া, ফরিদপুর ও কলকাতার পণ্ডিতসমাজ তাঁকে ভালভাবে জানতেন।

তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গোয়ালন্দ মহকুমার রাজবাড়ি শহরে সরকারী সংস্কৃত পরীক্ষার একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন পূর্বাঞ্চলের ছাত্রদের সুবিধার জন্য। কেন্দ্রটির নাম ছিল "গোয়ালন্দ সারস্বত সম্মেলন"। তিনিই এই কেন্দ্রের সম্পাদক ছিলেন প্রতি বছর এই কেন্দ্রে Bengal Sanskrit Associationএর পরিচালনায় সংস্কৃতের বিভিন্ন শাখায় আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা গৃহীত হত। বিনাব্য পরীক্ষার্থীদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হত।

এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। সবই ওলটপাল হয়ে গেল। তারপর বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলো। বাংল বিভাগের পর তিনি কৃষ্ণনগরে চলে আসেন (নগেন্দ্রনগর) এবং ডন বস্কো মিশনারী স্কুলে সংস্কৃত ও বাংলার শিক্ষক নিযুক্ত হন ষাটের দশকে গোড়ার দিকে। কৃষ্ণনগরে এসেও তিনি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন এবং শাস্ত্রচর্চা ও অধ্যাপনা চালিয়ে যান। পশ্চিম বাংলা সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ গৃহীত পরীক্ষায় তাঁর চতুষ্পাঠী থেকে ছাত্রেরা পরীক্ষা

দিত।
স্বল্প পরিসরে তাঁর সমগ্র কর্মজীবন তুলে ধরা সম্ভব নয়। কাগজপত্রও অনেক হারিয়ে গেছে। যা আছে তা জীর্ণ ও ছিন্ন। যেগুলো রাখতে পেরেছি তার ওপর ভিত্তি করেই এই সংক্ষিপ্ত পত্ররচনা।
অমিয়কুমার বসু
কলকাতা-৫৯

মিন্টো প্রসঙ্গে

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর লেখা 'ব্যাঘ্র কুমির ও পণ্ডিত প্রকল্প' প্রবন্ধের অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্রলেখক নির্মল দাস লিখেছেন, ওয়ারেন হেস্টিংস "লর্ড মিন্টোর ৪০/৫০ বৎসর পূর্বে ভারতে আসেন।" কথাটা ঠিক নয়। লেখক বোধ হয় এখানে মিন্টোর প্রথম আর্লকেই বোঝাতে চেয়েছেন। যদি তাই হয়, মিন্টো ১৮০৭ থেকে ১৮১৩ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল ছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস এদেশ থেকে চলে যান ১৭৮৫তে। বছরের হিসেবে দেখা যাচ্ছে হেস্টিংসের বাইশ বছর পর মিন্টোর প্রথম আর্ল এদেশে এসেছিলেন—৪০/৫০ বছর পরে নয়। অবশ্য কোম্পানির এক সাধারণ কর্মচারি হয়ে হেস্টিংসের প্রথম এদেশে আসা ১৭৫০-কে ধরলে মিন্টোর আগমনের সাতান্ন বছর আগে এসেছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস।
লর্ড হেস্টিংস অর্থাৎ মার্কুইস হেস্টিংস (আগে ময়রার আর্ল) সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক

লিখেছেন, "ইনি লর্ড মিন্টো এবং লর্ড আমহার্স্টের কিছু আগে বা পরে ভারতে আসেন।" পত্রলেখকের এ মন্তব্য থেকে বেশ বোঝা যায় ইতিহাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই তাঁর। এবিষয়ে নিঃসংশয় হলে "কিছু আগে বা পরে ভারতে আসেন" বাক্যটি লিখতেন না। মিন্টোর আগে নয়, মার্কুইস হেস্টিংস এবং লর্ড আমহার্স্ট দুজনেই গভর্নর জেনারেল হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন মিন্টোর পরে। মার্কুইস হেস্টিংস ১৮১৩-তে, আমহার্স্ট ১৮২৩-এ।
কমল সরকার
কলকাতা-৩৫

বারোয়ারি উপন্যাস

৪ জুলাই ১৯৮৭-র সংখ্যায় প্রকাশিত হিমানীশ গোস্বামীর লেখা 'ত্রিশ লক্ষ টাকা এবং পনের জন লেখক' পড়লাম। লেখাটির এক জায়গায় রয়েছে—'স্থির হয়েছিল বেতারে পনের জন সাহিত্যিক একটি উপন্যাস পাঠ করবেন, উপন্যাসটির নাম দেওয়া হয়েছিল পঞ্চদশী'। সেই উপন্যাস আসলে 'বারোয়ারি উপন্যাস'। এর পরে রজনীর মধ্যে শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় প্রশ্ন রেখেছেন —'এটাই কি প্রথম বারোয়ারি উপন্যাস?'
এই প্রসঙ্গে জানাই, প্রায় নব্বই বছর আগে দুজনে মিলে 'বঙ্কিমবাবুর গুপ্তকথা' নামে একটি উপন্যাস লেখা হয়েছিল। লেখকদ্বয় ছিলেন সেকালের বিখ্যাত সাহিত্যিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি। উপন্যাসটি দুইটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। বারোয়ারি উপন্যাসের সূচনা প্রসঙ্গে সুকুমার সেন লিখেছেন '১২৯৯ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী কোন বিলাতী পত্রিকায় একাধিক লেখকের সমবায়ে ধারাবাহিকভাবে উপন্যাস রচনা দেখিয়া ভারতীতে এমনি যৌথ উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেছিলেন।' ছজনে মিলে পাঁচটি পরিচ্ছেদে লিখেছিলেন 'নববর্ষের স্বপ্ন' নামে একটি ছোট 'নূতন ধরনের উপন্যাস'। উপন্যাসটি 'ভারতী' পত্রিকার পাঁচটি সংখ্যায় কিছু মাস বাদে বাদে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম পরিচ্ছেদটি লেখেন স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী। প্রকাশিত হয় ১২৯৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে। পরের অনুচ্ছেদের লেখক ছদ্মনামা 'শ্রী অঃ' সম্ভবতঃ ইনি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। তৃতীয় পরিচ্ছেদটি লেখেন দুজনে মিলে। এঁরা হলেন দীনেন্দ্রকুমার রায় এবং শশিভূষণ বসু। চতুর্থ এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদ লেখেন যথাক্রমে

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং সরলাবালা দাসী। এই ভারতী পত্রিকাতেই দ্বিতীয় বারোয়ারি উপন্যাস প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় তখন ভারতীর সম্পাদক। বারোজনে মিলে একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়েছিল। উপন্যাসটির নামও দেওয়া হয়েছিল 'বারোয়ারি'। প্রথম প্রকাশ আরম্ভ হয়েছিল বৈশাখ ১৩২৭ থেকে। বারটি পরিচ্ছেদের প্রথম পরিচ্ছেদের লেখক ছিলেন 'প্রেমাঙ্কুর আতর্থী'। এতে আর যারা লিখেছিলেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রমথ চৌধুরী। রচনাটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বই আকারে ছেপে বের হয় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ বের করেন ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।

১৯২৩ সালে ষোল জন লেখকের লেখা উপন্যাস 'ভাগের পূজা' সরাসরি বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক মণ্ডলীতে ছিলেন—শৈলবালা ঘোষজায়া, বিজয়রত্ন মজুমদার, সরলাবালা বসু, বিশ্বপতি চৌধুরী, চারুবালা বসু, অজয়কুমার সেন, নীলা দেবী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, গিরিবালা দাসী, জলধর সেন, স্নেহশীলা বসু চৌধুরাণী, শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ এবং নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

উৎপলকুমার সরকার

মরিচা, মুর্শিদাবাদ।

'জীয়নকাঠি—নিরুদ্দেশ'

১৮ জুলাই 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত দেবাশিস দাশগুপ্তের লেখা রবীন্দ্রসদনের রবীন্দ্রজন্মোৎসব "জীয়নকাঠি—নিরুদ্দেশ" পড়ে ২/১টি জায়গায় মন্তব্য না করে থাকতে পারছি না। শ্রীদাশগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন যে "লক্ষণীয়, ইদানীং পুরোন নাটকে প্রযোজনার একটি প্রবণতা দেখা যায়; কিন্তু কখনই গিরিশচন্দ্রের 'জনা' ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ' প্রযোজিত হয় না। এ কি অনীহা অথবা কাব্যে অনভ্যাস? অন্য দিকে আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটকের আসর জমজমাট। কিন্তু স্ত্রীভূমিকা বর্জিত নাটকের মত কাব্যবর্জিত নাটক, হয়ত একই কারণে বিদেশের অনেক নাটক ভাষান্তরিত এবং রূপান্তরিত হয় কিন্তু শেক্সপীয়র নয়।"

শ্রীদাশগুপ্তের মত নাট্য সমালোচকের বোধ হয় স্মরণে নেই যে বেশ কয়েক বছর ধরেই কলকাতা 'থিয়েট্রন' গোষ্ঠী নিয়মিতভাবে কাব্যনাট্য প্রযোজনা করে আসছেন। যথা বুদ্ধদেব বসুর 'প্রথম পার্থ ও সংক্রান্তি' (১৯৭৮-৭৯) এবং 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' (১৯৮১-৮৫)। শেষোক্ত নাটকটি '৮১-৮৫-র মা নিয়মিতভাবে ১৮/১৯বার মোটামুটি সাফল্যের স অভিনীত হয়েছে।

এই 'থিয়েট্রন' গোষ্ঠীরই ১৯৮৬ জুলাই-সেপ্টেম্বর মধ্যে শেক্সপীয়ারের 'কিং লিয়রের' অনুবাদ 'রাজা লিয়র' একাডেমী, রবীন্দ্রসদনে পাঁচবার অভিনীত হয়েছে।

নাট্য সমালোচকের এতখানি বিস্মরণ বোধ হয় আমাদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল না।

কমল সেনগুপ্ত

কলি ৩১

সাহিত্যে জবরদখল

৪ জুলাই 'দেশ'-এ সাহিত্য বিভাগে 'সূর্যগ্রহণ' পড়লুম। তথ্যটি কিছুকাল আগে সংবাদপত্র অলঙ্কৃত করেছিল। 'সূর্যগ্রহণ'-এ আরো বিস্তারিত পড়ে খুব মজা পেয়েছি। রবীন্দ্রসাহিত্যে শুধু বাংলা ভাষাই নয় ভারতের অন্যান্য ভাষাও ধন্য সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মালয়ালম ঔপন্যাসিক ডঃ পুনাথিল কুনহাবদুল্লার 'কন্যাবনঙ্গল' এর এই বিপজ্জনক তথ্যের আবিষ্কারক এক সাংবাদিক।

এই প্রসঙ্গে বলছি—আমি সাংবাদিক নই। কিন্তু অনেকদিন আগে গত সত্তর দশকে একটি পত্রিকা পেয়েছিলুম। বাংলাদেশে প্রকাশিত। এই পত্রিকাটির জন্ম ভাষা আন্দোলনের পর। মরুফা খানম মলি নামক এক কবির লেখা 'তিমির বিদার' কবিতাটি দেখে আমি স্তম্ভিত। আজন্ম পরিচিত "ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়" গানটি পরিষ্কার বাংলা হরফে মুদ্রিত। পত্রিকাটির নাম 'সপ্তর্ষি'।—রিয়াজুল হক সম্পাদিত। বইটি আমি সযত্নে রক্ষা করেছি অনবদ্য কৌতুকের নিদর্শন হিসেবে।

পত্রিকাটির প্রথম পৃষ্ঠায় অবশ্য কবি-প্রশস্তি আছে 'বিশ্বকবির সোনার বাংলা/নজরুলের বাংলাদেশ/জীবনানন্দের রূপসী বাংলা/রূপের যে তার নাইকো শেষ—বাংলাদেশ।'

প্রথমেই নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ করে পুজো দিয়ে—কবি নিশ্চিন্তে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

ডঃ কুনহাবদুল্লা প্রথমে পুজো দেননি বলে ধরা পড়ে গেলেন।

নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা-১৯

নিজভূমে পরভাষী

মাতৃভাষাই মানুষের সেই মাটির শিকড় যা তাকে নিজের পায়ে খাড়া রেখেছে। এই ভাষাই তার শিরদাঁড়া, তার চরিত্র, তার সত্যিকারের মুখশ্রী। বাঙালী শিশু যে ভাষায় প্রথম মা ডেকেছিল, প্রথম দাগা বুলিয়েছিল স্বরবর্ণের আদি অক্ষরে সেই ভাষাই বীজমন্ত্রের মত থেকে গেছে তার রক্তের মধ্যে, সংস্কারের মধ্যে। এই ভাষায় কথা বলতে বলতেই একদিন সে ঘুমিয়ে পড়েছে, শেষ বারের মত। তার চেতনার গঙ্গাযমুনার মধ্যে মিশে রয়েছে তার মাতৃভাষা। তার স্মৃতি তার ইতিহাস তার ঐতিহ্য। এই মুখের ভাষাই কালক্রমে হয়ে উঠেছে তার পাঠ্য ভাষা, লেখ্য ভাষা। হয়ে উঠেছে তার দেশকালের অখণ্ড পরিচয়। তার বিশিষ্টতা ধরা রয়েছে এই মাতৃভাষার আধারেই।

জীবিত প্রাণী মাত্রেই পরস্পরের মধ্যে শব্দ বিনিময় করে। কীটপতঙ্গ, পশুপাখি, মানুষ, সবাই। বিনিময় করে এক ধরনের শব্দায়িত সংকেত। তার মানসিক অবস্থার স্থায়ী এবং অস্থায়ী প্রতিধ্বনি। এরই নাম ভাষা। ইতর প্রাণীর কথা জানি না, তবে মানুষের বেলায় কিন্তু প্রথমে এসেছিল অঙ্গভঙ্গি, অভিনয়, শরীর সংকেত। মানুষের স্পর্শকাতর মনকে এই জাতীয় দৃশ্যসংকেত থেকে শ্রব্য-সংকেতে পৌঁছুতে অনেক সময় লেগেছিল। কমিউনিকেশনের এই শব্দতরঙ্গ, এর দৌড় আকর্ণ, অর্থাৎ কান পর্যন্তই। তাই এর দ্বারা তখন দূরভাষণ সম্ভব হয়নি। ভাষা আসলে শব্দ সমষ্টি, সুচিন্তিত সবিন্যস্ত এবং অর্থসঙ্গত কথামালা। অন্য শব্দ, যেমন ধাতু-নিসর্গ নিষ্পন্ন শব্দের মতই কথাশব্দও শ্রব্য, চোখে দেখা যায় না, শুধু কানে পৌঁছায়, হয়তো মনেও।

তাই কথাশব্দকে যেদিন মানুষ কথাচিত্রে রূপান্তরিত করতে শিখল বর্ণমালার মাধ্যমে, ভাষা সেদিন থেকেই কেবল দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হল তাই নয়, তার দিগন্ত প্রসারিত হল আর এক দিগন্তে।

আজ থেকে দুশো বছরের বেশী পিছনে তাকাতে হবে না বাংলা ভাষার মুদ্রণের ইতিহাস খুঁজতে। এক বাঙালী কারিগর সেদিন অনেক যত্নে বাংলা হরফ খোদাই করেছিলেন। তারপর আর একটি মানুষ সেই ছাপা হরফকে ছেদ যতিচিহ্নে সাজিয়ে নতুন গদ্যছন্দে ঢালাই করেছিলেন। গদ্যের সেই রাজপথে একের পর এক এগিয়ে এসেছিলেন সাহিত্যের রথী মহারথীর দল। কখনো তাঁরা সারথি এবং রথী একসঙ্গে। অল্পকালের মধ্যেই বাংলা ভাষা তার নিজস্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের সেই বাংলাভাষা আমাদের জীবনে কবে কথামৃত হয়ে উঠলো। বঙ্গভাষা হয়ে উঠল বঙ্গজননী। বঙ্গজননীর এই বাকপ্রতিমা যুগ যুগ ধরে বাঙালী তার হৃদয়ে-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে নিল। সরাসরি সংস্কৃতাগত বাংলা ভাষা ভারতবর্ষের ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে যে একটি বলিষ্ঠ এবং সমৃদ্ধতম ভাষা তাতে সন্দেহ নেই। বাংলাসাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের প্রায় প্রথম সারিতে বসার যোগ্য হয়ে উঠেছে অল্পকালের মধ্যেই। এ আমাদের আত্মতৃপ্তির কথা, গৌরবের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু গৌরবের দিন বোধহয় এবার শেষ হতে চলেছে। আমাদের অন্যমনস্ক অবহেলায় বাংলা ভাষায় অবক্ষয় শুরু হয়ে গেছে। এক দিকে আমাদের আত্মবিস্মৃতি, অন্যদিকে এই ভাষাকে গ্রাস করার এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, একদিকে সরকারী ঔদাসীন্য অন্যদিকে জীবিকার কাছে আমাদের মাতৃভাষাকে বাঁধা রাখার প্রবণতা ক্রমশ বাংলাভাষাকে এক মিশ্রভাষায় পরিণত করতে চলেছে। আমাদের দিন যাপন প্রাণ ধারণের সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে যখন প্রবল ভাবে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন ছিল তখনই আমরা মুঠো আলগা করে ফেলেছি। মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের পরিকল্পনা আমাদের ছিল বহুকাল থেকেই। সেই স্বাধীনতা প্রাপ্তিরও অনেক আগে থেকেই। বানান সংস্কার, ভাষা সংস্কার, পরিভাষা রচনার প্রয়াস সবই অনেক উৎসাহ নিয়েই শুরু হয়েছিল বহু পণ্ডিত ও মনীষীর আন্তরিক চেষ্টায়। কিন্তু তারপর স্বাধীনতা আমাদের সব সঙ্কল্পের ওপরেই এক শিথিল বাতাবরণ সৃষ্টি করল। দেশপ্রেম আর আদর্শ নগদ রাজনীতির উলটো চাপে ম্লান আর ফিকে হয়ে এল। আমাদের মুখের কথার সঙ্গে মনের কথার, আমাদের বাক্যের সঙ্গে ব্যবহারের যোগটা ক্ষীণ হয়ে এল। তারপর দীর্ঘ চল্লিশবছর ধরে শুধু বহ্বাড়ম্বর আর লঘুক্রিয়ায় কালক্ষেপণ চলেছে। যা করণীয় ছিল কিছুই হয়নি। ভাগের মা গঙ্গা পায় না বলে একটা কথা শোনা যায়, কিন্তু এই মাতৃরূপিণী আমাদের ভাগের বাংলাভাষার গঙ্গাপ্রাপ্তিতে বোধহয় এখন আর সন্দেহের কোন কারণ বা অবকাশ নেই। শিক্ষা থেকে, সংস্কৃতি থেকে, সরকারী কাজকর্ম থেকে এমন কি সাহিত্য থেকেও মাতৃভাষাকে ক্রমশ স্খলিত করে এনেছি আমরা। বঙ্গের বাকপ্রতিমার বিসর্জনের ঢক্কা নিনাদ এখন কান পাতলেই শোনা যাবে। দেশ জুড়ে যখন চালাকি আর চালবাজিতে কালনেমির লঙ্কাভাগ চলেছে, তখন ঘরে তাড়ানো বাইরে খেদানো বাংলাভাষার অস্তিত্ব মৌখিক আলাপে-বিলাপে টিকে আছে মাত্র। খাঁটি 'বাংলা'-র প্রতি টানটুকুও যদি মাতৃদুগ্ধের দিকে ঝুঁকতো তাহলে এই প্রজন্ম অন্যরকম হত। দেশ এখন আমাদের কাছে ভোট প্রসবিনী ভূমিখণ্ড মাত্র এবং দশ এখন দশচক্রের সাজানো কুশীলব। তাই মাতৃভাষা কেবল একটা বাঁধাবুলি হয়ে দেওয়ালে দেওয়ালে আর সরকারী নির্দেশনামায় স্তোক বাক্যের মত ঝুলে থাকলেই চলবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবেন আপনাদের কেউ কেউ কেন কখনই কফি পছন্দ করেন নি
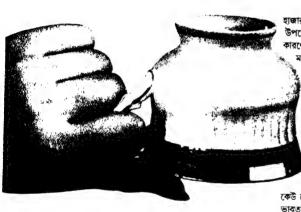
হাজার বছর ধরে লোকে কফি উপভোগ করে আসছেন নানান কারণে কফির তরতাজা স্বাদ, মন মাতানো গন্ধ, চনমনে অনুভূতি কিংবা শুধুমাত্র কফি ব্রেক, কফি টাইম বা কফি হাউসে নিয়মিত কফি পানের অভ্যেসই এর অন্যতম কারণ।

কিন্তু ভারতবর্ষে কফির আনন্দ বিভিন্ন কারণে আমাদের অজানাই থেকে গেছে। তার কারণ আমরা অনেকেই জানতাম না কিভাবে এক কাপ ভালো কফি তৈরী করা যায় বা কেউ কেউ কফি অত্যন্ত দামী পানীয় বলে ভাবতাম। এবার নেস্‌লে আপনাদের জানাবে কফির প্রকৃত গুণাগুণ এবং কিভাবে আপনারা সকলেই উপভোগ করতে পারেন এক কাপ ভালো কফি।

খুব সহজেই তৈরী হয় দারুন নেস্‌ক্যাফে।

ঠিকমত নেসক্যাফে কফি বানাতে কাপে এক চামচ নেস্‌ক্যাফে নিন (কড়া কফির জন্য চামচ উঁচু করে ভরে নেবেন) কাপে গরম জল ঢালুন। এবার প্রয়োজন মত চিনি ও দুধ মিলিয়ে নাড়িয়ে নিন।

আর কিছু করার কোন প্রয়োজন নে কারণ গরমজলে নেস্‌ক্যাফে পলকে মিশে যায়। ঠিক এই কারণেই নেস্‌ব ইনষ্ট্যান্ট কফি বলে পরিচিত।

নেস্‌ক্যাফে কখনই ফোটাবেন না।

ফোটানোর ফলে কফির মজাদার স্বা ও মনমাতানো গন্ধ নষ্ট হয় এবং এই কারণেই অনেকের নেস্‌ক্যাফের মত এত চনমনে ও মজাদার পানীয় বিস্বা লাগে।

আপনি নেস্‌ক্যাফে যতটা দামী ভাবে ততটা নয়।

নেস্‌ক্যাফে 50 গ্রাম জার বা প্যাকেট থেকে পাবেন 50 কাপ সতেজ ও উপভোগ্য কফি। অর্থাৎ মাত্র 22 পয় প্রতি কাপ।

এত কম খরচে আর কোন পানীয়ই আপনাকে দিতে পারবে না এত পরি

সব কফি এক নয়।

কিছু কফিতে চিকরী জাতীয় পদার্থ মেশানো হয়। মেশানো কফি সস্তা পড়ে কিন্তু আসল কফির স্বাদ তাতে পাওয়া যায় না।

অন্য দিকে নেস্‌ক্যাফে এই জাতীয় পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং 100% পরিতৃপ্তির জন্য তৈরী 100% খাঁটি কফি।

আবিষ্কার করুন নেসক্যা

এবং কেন আপনাদের সবার অবশ্যই ভালো লাগবে নেস্‌ক্যাফে

আপনিও কফিকে আপন করুন।

নেস্‌ক্যাফে প্রকৃতির জাদুকরী চনমনে স্বাদ ও তাজা অনুভূতিতে ভরপুর যা আপনি যেকোন সময়ে যেকোন জায়গায় উপভোগ করতে পারেন। বাড়ীতে নেস্‌ক্যাফে আনুন কারণ নেস্‌ক্যাফে দিনের শুরুতে আপনাকে সারাদিনের জন্য প্রস্তুত করে আর দিনের শেষে দূর করে সারাদিনের অবসাদ।

এই মুহুর্ত্তগুলো নেস্‌ক্যাফে দিয়ে ভরিয়ে তুলুন।

সকালের অবসর, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডার মুহুর্ত্তে, বাড়ী ফেরার পর এই সমস্ত প্রিয় মুহুর্ত্তগুলো আপনার অবসরের মুহুর্ত্ত, একে অপরের সান্নিধ্যে আসার মুহুর্ত্ত। এই ধরণের মুহুর্ত্তগুলো নেস্‌ক্যাফে দিয়ে ভরিয়ে তুলুন। কারণ নেস্‌ক্যাফে আপনার আধুনিক জীবনযাত্রার উপযোগী আধুনিক তৃপ্তিদায়ক পানীয়।

TSA/FSL/750/BEN

কফির পরিতৃপ্তি।

ছায়াসুন্দরী

তারাপদ রায়

দিনকাল এমন হয়েছে যে
আমার নিজের ছায়া পর্যন্ত
আমার সঙ্গে থাকতে চায় না।
এক পাশ থেকে আমাকে ভয়ে ভয়ে দেখে,
দেখে কি করছি, কোথায় যাই
একেক সময় মনে হয় এখনই বেঁকে বসবে,
আমার সঙ্গে থাকবে না,
আমার সঙ্গে কোথাও যাবে না।

শ্রীমতী ছায়াসুন্দরীকে আমি অনেক বোঝাই,
তাকে বলি,
'দ্যাখো,
আমার সঙ্গে থাকাই তোমার একমাত্র কাজ,
তুমি ইচ্ছে করলেই
যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো না,
যা ইচ্ছে করতে পারো না।'

শ্রীমতীকে আমি বারবার বোঝানোর চেষ্টা করি,
'আমার এপাশে কিংবা ওপাশে
বড় জোর সামনে বা পিছনে থাকা ছাড়া
তোমার কোনো উপায় নেই।
ঐ নদীর তীরে পলাশবনে সবুজ ও লাল
ঐ পাহাড়চূড়ায় ঝর্নার জলে সূর্যাস্তের সোনা
আমি বুঝতে পারছি, সবই চমৎকার।
কিন্তু আমি যদি না যাই
তুমি ইচ্ছে করলেই যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো না,
যা ইচ্ছে করতে পারো না।'

অভিমানিনী ছায়াসুন্দরী দাসী
মাথা নিচু করে নিরুত্তর বসে থাকে,
কিছুক্ষণ পরে খেয়াল হয়,
আমিও মাথা নিচু করে নিরুত্তর বসে আছি।

মোচ্ছব

অলকেশ ভট্টাচার্য

তাঁর জন্য কাঁসার জামবাটি পাথরের পিলসুজ ভেসে যায়
নবান্নের মোচ্ছবে।
তাঁর জন্য খুদ মাড়িয়ে আস্কেপিঠে আর দু'জামবাটি পায়েস
শৈবী থাকে।

পশ্চিমী গ্রাম্য বাতাস খুলে দেয় নারকেলকাঠির গোল মালা,
চকিত আনন্দে নেচে যায় কুটুম।

মাদল বাজলেই গা থেকে কাঁথা সরিয়ে রাখেন,
গ্রামবাসীর সঙ্গে হাই তুলতে তুলতে গিলতে বসেন মদ।
আগামী নবান্নের মোচ্ছবে সবাই হাজির হবে কি না
ভাবতে ভাবতেই তিনি কাশতে বসেন, উবু হ'য়ে চেপে ধরেন বুক।
মোচ্ছবের গান অনেক উঁচু থেকে তাঁকে ডাক দেন, 'আয়, আয়'।

আমরা পারি না

উদয়ারুণ রায়

বাড়ির কাছের বাঁকটা পেরোতেই
জানলায় তোমার মুখ দেখি;
টানে, মন টানে, এমন করেই—
গোমুখের পথ টেনে ছিল।

পাহাড়ের কাছ থেকে শিখেছি অনেক
বিশাল বৃক্ষের দল বড় বেশি স্থির থাকে
যৌবনের দিনে, যুবক সন্ন্যাসী যেন।
উন্নত শির আকাশ ছুঁয়েছে।
ছলেবলে ঝর্না শরীর টলাতে পারেনি কোনদিন।
ওরা পাথর ভেঙেছে, পাথর ক্ষয়েছে নিজে থেকে।
ঝর্না শরীর টলাতে পারেনি কোনদিন।

পাহাড়ের কাছ থেকে শিখেছি অনেক
যৌবনের দিনে অদ্ভুত স্থির থাকে যুবক সন্ন্যাসী,
আমরা পারি না।
জানলায় তোমার মুখ দেখে আমরা পারি না
বিশাল বৃক্ষের দল যেটা পারে।

ভ্রমণ

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

এই অন্ধকার জুড়ে তোমার ভ্রমণ বেজে চলে
একি ছায়া—কংক্রীট—বোতলে শনাক্ত করা
একফালি মদ
মদের মতন ছায়া বেড়ে চলে আমার শরীরে
এই অন্ধকার জুড়ে

এই অন্ধকারে তুমি সম্ভবত শপথ নিয়েছো
বৈভবে শপথ বাক্য বিভাহীন স্নিগ্ধ লাল সিঁড়ি
একদা তোমার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ এই মন
লাল সিঁড়ি পার হলে শুরু হবে তোমার ভ্রমণ

এই অন্ধকারে শুধু জেগে থাকে বনের স্তব্ধতা
যেন-বা সে প্রত্যাখ্যাত বালকের তীব্র আলোড়ন
এখন পেরোতে হ'লে ছেলেবেলা স্নিগ্ধ লাল সিঁড়ি
অন্ধকারে শুরু হবে তোমারও সুতীব্র ভ্রমণ

অহল্যায়ন

মহুয়া চৌধুরী

১

হাড়ের কাঠামো হবে, বিবর্ণ মাংসের দেওয়াল
অলোকসামান্য এই দোরগুলি বন্ধ হয়ে
খোলা থাকবে একটি দরোজা
ঘরে দরজা রাখতে হয়, ঘরে অভিমান রাখতে নেই
কেউই আসবে না জেনে
তবু একটি দরজা রাখা—নিয়মসম্মত—
কারণ দরোজা ছাড়া কোনো ঘর ঠিকঠাক নয়—

২

(কেউ আসুক কেউ আসুক
অনেকদিন কেউ আসেনি
সিঁড়িতে মার শব হক্কা ঘিরে নাচে
অনেকদিন কেউ আসেনি।
কেউ আসুক কেউ আসুক অনেকদিন কেউ আসেনি)

৩

সব ঘর ফিরে পাবে।
আপাতত নিজে ঘর হওয়া।
তোমার একান্ত অসময়ে হারানো ঘরের চিতা উল্টে ফের
উঠে আসবে আধপোড়া প্রেত,
অনেক মৌনের পরে পরে ঘর
ডুবে গেলে শিকড় ও মাংসের কথায়
দরোজা দেয়াল ভেঙে ফিরবে আবার
ঘরের কাঠামো থেকে সাদা ফোয়ারার মতো ছিটকে বেরোবে
কংকাল—
ধপ্‌ধপে কংকাল—নার্সিসাসের।

৪

তবু, আপাতত ভাঙা শেষ
এই মাত্র
শেষ গৃহ
ভাঙা হয়ে গেল।

ওরা চলে যায়

বিভুদান মুখোপাধ্যায়

আমস্তক দেহকে চুবিয়ে ময়ূরাক্ষীর জলে
ওরা চলে যায়। চলে যায় শুদ্ধ হ'য়ে
আপন আপন ঘরে।

মানুষের পোড়া গন্ধে উচ্ছিষ্ট কয়লায়—
স্বামীর সন্তানের রুটি সেঁকা হয়;
ভাত সেদ্ধ হয়।
ঘেমে লাল বীর সূর্য নেমে নেমে আসে
পাতালের অন্ধকারে ঘুম মুছে দিতে।
পোস্টাপিসের লোক বাড়ি বাড়ি বার্তা বিলি করে:
'পত্রেতে নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়',
সোনার জলেতে উষ্ণ, 'ইতি ভবদীয়'।
'তোমার মামলার ফল আগামী হপ্তায় জেনো শনিবার দিন।'
'শ্রাদ্ধেতে আসাই চাই—ইতি ভাগ্যহীন।'
'বাড়িতে খলেই ফেলো, দেরী করো যদি
দেখতে পাবে না আর।' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কলরব করে পাখিকুল দিগন্তের সবুজ পাহাড়ে;
কলায় কলায় চাঁদ বেড়ে কলেবরে
পৃথিবীর অন্ধকার শুষে নিয়ে কলঙ্কিত হয়ে যায়।
নামের কাঙাল কবি—বিঘূর্ণিত আঁখির বলয়—
ভস্মের কালিতে তার অক্ষর সাজায়।
কার্তিক সন্ধ্যায় দোলে ফানুসের শুষ্ক বিলাসিতা।

বালিতে পায়ের গর্তে এঁদো হাওয়া রেখে, কাজ সেরে
ওরা চলে যায়—শববাহকেরা।

সময়ের সন্ধি লগ্নে

আরতি সরকার

প্রতি দিন সন্ধে হলে মনে হয়
কোথাও সকাল হল
সময়ের সন্ধি লগ্নে
পূরবীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে ভৈরব

তারপর প্রবৃদ্ধ মানুষের মত বেলা
বাড়ে, পশ্চিম আকাশে নামে
অস্তাচলের ছায়া, সে দিকে তাকিয়ে
এক দেশের এক রানীর স্বপ্নের কথা
মনে পড়ে যায় আমার:

তেহাই-এ তিনবার তাল পড়ে
চমকে জেগে উঠি আমি—
"নীল...নীল...অন্ধকার...অকূল...
পাথারে...এক...মহাদ্যুতি...জবাকুসুম"
তবে কি, ব্রাহ্মক্ষণ ...

রূপদর্শীর ঝাঁকিদর্শন

এটা আর ওটা কি এক হল

বফর্স কেলেঙ্কারির সঙ্গে যাঁরা রডন স্কোয়ার কেলেঙ্কারিকে এক করে দেখছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁদের বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারেননি।

বফর্স হল কেন্দ্রের ব্যাপার আর রডন স্কোয়ার হল রাজ্যের ব্যাপার, এই দুই কি এক হতে পারে? শ্রী টার্নকি নন্দন ঘুষপতিয়া বললেন।

সে কথা অবিশ্শি ঠিক। আবার অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে একটু খিচ তো থেকেই যায়। যায় না কী?

টার্নকি নন্দন ঘুষপতিয়া : বফর্স ডিলে খিচ তো থাকবেই। ওখানে তো খুবই কেলেঙ্কারি হয়েছে। কিন্তু রডন স্কোয়ার নিয়ে কোনও খিচ নেই। একটা এঁদো পুকুর ছিল যেখানে, সেখানে এখন কলকাতার কালচার ভি হবে, ঔর বিজিনেস সেন্টার ভি হবে। এখানে কোনও খিচ নেই, কেলেঙ্কারি ভি নেই।

আচ্ছা টার্নকি নন্দনজি, আপনি বলছেন, বফর্স ডিলে খুব কেলেঙ্কারি হয়েছে। একজ্যাক্টলি কী কেলেঙ্কারি হয়েছে, আপনি কি সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করতে পারেন?

টার্নকি নন্দন ঘুষপতিয়া : পেপার পড়ুন, পেপার পড়ুন, সব জিনিস পুরা সে পুরা জানতে পারবেন। হাঁ, এর মধ্যে একটা কথা আছে। চিফ মিনিস্টার বলেচেন, বড় বড় পেপার পড়বেন না। তাহলে কনফিউজ্ হয়ে যাবেন। ছোট ছোট পেপার পড়বেন তো সব ঠিক ঠাক জানতে পারবেন। আমারও অ্যাডভাইস্ হচ্ছে এই, ছোট ছোট পেপার পড়তে চলুন। পার্টি পেপার পড়তে চলুন।

টার্নকি নন্দনজি, একটা ছোট পেপারেই তো পড়লাম যে, রডন স্কোয়ার প্রাইভেট সেকটরের হাতে তুলে দেবার যে ষড়যন্ত্র হয়েছে, তাতে প্রাইভেট সেকটর সত্তর কোটি টাকা মুনাফা লুটবে।

টার্নকি নন্দন ঘুষপতিয়া : বলুন তো, মুনাফা লোটার মধ্যে দুর্নীতি কী আছে? আর এই মুনাফা তো কোনও কাংগ্রেসি রাজত্বে লোটা হচ্ছে না। হচ্ছে কি?

তা অবিশ্শি হচ্ছে না। হচ্ছে বামফ্রন্টের রাজত্বেই।

টার্নকি নন্দন ঘুষপতিয়া : বস্ বস্। আর কি জানতে চান? বামফ্রন্টের পলিসি আর কাংগ্রেসি রাজের পলিসির মধ্যে যে তফাৎ আছে, এটা তো সবাই জানে। না কী?

হ্যাঁ, তা অবিশ্শি জানে।

টার্নকি নন্দন ঘষপতিয়া : বস্ বস্। তবে তো সবই পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই নয় কী?

কোন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল টার্নকি নন্দনজি?

টার্নকি নন্দন ঘুষপতিয়া : আরে রডন স্কোয়ার। এখন বুঝতে পারলেন তো, রডন স্কোয়ার নিয়ে কোনও কেলেঙ্কারি নেই। এবং বফর্স ডিলের দুর্নীতির সঙ্গে রডন স্কোয়ারের কোনও তুলনা কেন হতে পারে না, সেটা বুঝে গেলেন তো?

সেটা বোঝা গেল কি, টার্নকি নন্দনজি?

টার্নকি নন্দন ঘুষপতিয়া : এখনও বুঝতে পারলেন না?

খুবই দুঃখিত টার্নকি নন্দনজি, কিন্তু সত্যি বলতে কি, ঠিক বোঝা গেল না।

টার্নকি নন্দন ঘুষপতিয়া : তাহলে, একটু থিওরিটিক্যাল আলোচনা করে নিতে হয়। কি বলেন?

আপনি যেমন বলবেন টার্নকি নন্দনজি।

টার্নকি নন্দন ঘুষপতিয়া : আচ্ছা বলুন তো, বামফ্রন্ট কি চায়? আচ্ছা, আপনাকে বলতে হবে না। আমিই বলে দিচ্ছি। বামফ্রন্টের গোল হচ্ছে, একটা সোস্যালিস্ট সমাজ কায়েম করা। না কী?

হাঁ, টার্নকি নন্দনজি, ওটাই বামফ্রন্টের গোল।

টার্নকি নন্দন ঘুষপতিয়া : তবে বুঝেছেন দেখছি। কিন্তু সে গোলে রিচ্ করবে কি ভাবে?

খুব শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন টার্নকি নন্দনজি? একটু ভাবতে হবে। আচ্ছা, এর সঙ্গে কি কলকাতার পার্ক বেচে দেবার কোনও সম্পর্ক আছে?

টার্নকি নন্দন ঘুষপতিয়া : একেবারে নেই, তা বলি কি করে? তবে এর পিছনে একটা ডিপ্ থিংকিং আছে, একটা অনেস্ট প্রিন্সিপল্ ভি আছে। বুঝলেন? আমাদের আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা পুঁজিতান্ত্রিক সমাজটাকে আগে পুরো পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে নিয়ে যেতে হবে। এর জন্য বহোৎ ক্যাপিট্যাল চাই। না কী?

বটেই তো, টার্নকি নন্দনজি। বটেই তো। বহোৎ ক্যাপিট্যাল চাই। জ্যোতিবাবু তো এই ক্যাপিট্যালের খোঁজেই আজ লণ্ডন যাচ্ছেন তো কাল আমেরিকা যাচ্ছেন। তাই না?

টার্নকি নন্দন ঘুষপতিয়া : রাইট্। ক্যাপিট্যাল না হলে সোসালিজম্ হবে কি করে, বলুন?

হওয়া খুবই মুশকিল, টার্নকি নন্দনজি। হওয়া খুবই মুশকিল।

টার্নকি নন্দন ঘুষপতিয়া : জ্যোতিবাবুকে এই বয়সে ক্যাপিট্যালের জন্য বিদেশে ঘুরতে দেখে আমাদের খুবই মনে কষ্ট হল। আমরা তখন কমরেড মেয়রকে বললাম, মেয়র স্যার, ক্যাপিট্যাল তো আপনার পাকিটেই আছে। কলকাতার পার্কগুলোই তো স্যার, আমাদের সলিড্ ক্যাপিট্যাল। এটাকে ধীরে ধীরে লিকুইড্ করে ফেললেই তো ক্যাপিট্যাল জেনারেট হয়ে যাবে। মেয়র কলকাতার ছেলে, আমরা মুখ খুলতে না খুলতেই তিনি সব বুঝে গেলেন। প্রথমে সত্নারায়ণ পার্ক, তারপরে রডন স্কোয়ার। তারপর ক্রমে ক্রমে সব আসবে। ময়দান নিয়ে একটু গোলমাল হবে, মনে হয়। কেন্দ্র ময়দান নিয়ে খুবই ঝামেলা পাকাবে। সেই জন্যই আমরা কেন্দ্রে একটা ফ্রেণ্ডলি গভর্নমেন্ট চাইছি। বুঝেছেন তো? ভি পি সিং প্রাইম মিনিস্টার হলে আমরা ময়দান ক্যাপ্চার করতে পারব।

এতক্ষণে তবু ব্যাপারটা খানিকটা ক্লিয়ার হল টার্নকি নন্দনজি। রডন স্কোয়ারে সত্তর কোটি টাকা ডেভেলপারদের পকেটে চলে যাবে। তারপর ক্রমে ক্রমে ময়দান ... আচ্ছা টার্নকি নন্দনজি, রাজভবনের ভিতরের মাঠটাকেও সোসালিজমের স্বার্থে লিকুইড্ করে ফেলা যায়, তাই না?

টার্নকি নন্দন ঘুষপতি : গুড় সজেশন। হাঁ, ওটা লিকুইড্ করে দিতে পারলে কমসে কম সাত আট শ ক্রোড় তো মবলক এসে যেতেই পারে।

মাত্র সাত আট শ কোটি! টার্নকি নন্দনজি, রাজভবন থেকে এত কম মুনাফা আসবে?

টার্নকি নন্দন ঘুষপতিয়া : মানি মার্কেট টাইট আছে না?

আচ্ছা টার্নকি নন্দনজি, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালটাকেও তো লিকুইড্ করে দেওয়া যায়। যায় না?

টার্নকি নন্দন ঘুষপতিয়া : কেন যাবে না। নিশ্চইয়ই যাবে। তেমন তেমন ডেভেলপারের হাতে পড়লে ফোর্ট উইলিয়াম ভি লিকুইড্ হয়ে যেতে পারে।

আচ্ছা, টার্নকি নন্দনজি, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে কত আমদানি হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

টার্নকি নন্দন ঘুষপতিয়া : ওখান থেকে ডেভেলপারদের পাকিটে কমসে কম হাজার ক্রোড় এসে যেতে পারে।

আর ফোর্ট উইলিয়াম থেকে?

টার্নকি নন্দন ঘুষপতিয়া : ফোর্ট থেকে? তা ধরুন, টার্ন কি প্রসেসে ফোর্টকে লিকুইড্ করতে পারলে হাজার দো হাজার টাকা মুনাফা ইজ্জিলি বের করে নেওয়া যায়। আমাদের এস্টিমেটে কলকাতায় যেটুকু ফাঁকা জায়গা পার্কে হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে পড়ে আছে, সেগুলো লিকুইড্ করে দিলে অন্তত দশ হাজার কোটি টাকা ডেভেলপারদের পাকিটে এসে যেতে পারে। ওবিশ্শি এ ব্যাপারে ডেভেলপারদের একেবারে ফ্রি হ্যান্ড দিতে হবে। আর এই টাকা বামফ্রন্ট যদি ইনভেস্ট করতে দেয় তো পশ্চিমবঙ্গ রাতারাতি ক্যাপিট্যালিস্ট স্টেট বনে যেতে পারে। জ্যোতিবাবুকে ক্যাপিটালের জন্য ফালতু এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হবে না। হাঁ, এখন বলুন এই কাজের সঙ্গে কি বফর্সের তুলনা করা যায়? বলুন?

আরে না না। কিসে আর কিসে? এটা আর ওটা কি এক হল?

VIMAL
শাড়ি

বৈ দে শি কী

স্প্যান্ডাউ দুর্গের সাত নম্বর কয়েদী

অরুণ বাগচী

স্প্যান্ডাউ প্রাসাদের সাত নম্বর কয়েদী অবশেষে মারা গেলেন। বিশ্বের সব চেয়ে নিঃসঙ্গ, সব চেয়ে মূল্যবান কয়েদী রুডলফ হেস। একদা হিটলারের ডেপুটি, একদা নাৎসী ডিক্টেটরের প্রাণের বন্ধু, একদা তাঁর সব চেয়ে অনুগত শিষ্য। ন্যুরেমবুর্গ বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন হেস। আত্মীয়বন্ধুরা উল্লসিত হয়েছিলেন তখন—যাক্, অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়া গেছে। নইলে নাৎসী নেতৃত্বমণ্ডলে তাঁর যা স্থান ছিল তাতে ফাঁসিকাঠ এড়ানোটাই মস্ত ভাগ্য। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মানে তো বড় জোর চোদ্দ কি ষোল বছর। তার পরই মুক্তি পাবেন তিনি। তখনও জীবনের অনেকখানি বাকি পড়ে থাকবে। পুনর্গঠিত জার্মানীতে হয় তো কিছু ভাল কাজ করে যাবার সুযোগ পাবেন। কে জানে!

হেস কিন্তু নিজে অতটা আশাবাদী ছিলেন না। বিচার চলাকালে তাঁর হাবভাব দেখে অনেকের ধারণা হয়েছিল যে সম্ভবত তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। আর একদল বলেছে, সবটাই নাটক। হেস পাগল সাজছেন ইচ্ছে করে। নইলে তাঁকে মরতে হবে সাধারণ কয়েদীর মতো, সেকথা তিনি বেশ জানেন। লোকটি আসলে ভাল খেলোয়াড়। যাই হোক, হেস পরে অনেককে বলেছেন, ভেবেছিলাম বছর দশেক আটক রাখবে ওরা। এখন যা দেখছি, তাতে আর জ্যান্ত ছাড়া পাব না। মরে গেলে তবেই মুক্তি মিলবে। মরা শরীরটা ছেলেপুলেদের হাতে দেবে কিনা সেটাই সন্দেহ।

হেস যা ধারণা করেছিলেন তার প্রথমটুকু সত্য হয়েছে, শেষ অংশ নয়। বন্দী অবস্থাতেই মরতে হয়েছে হেসকে। স্প্যান্ডাউ জেলে তাঁর নিজের কুঠুরিতে নয়, অসুস্থ অবস্থায় ব্রিটিশ সামরিক হাসপাতালে। ওই হাসপাতাল অবশ্য জেলের চৌহদ্দির মধ্যেই। মৃত্যুর পর তাঁর দেহটা অবশ্য তুলে দেওয়াও হয়েছে পুত্র উলফ রুডিগার হেসের হাতে। সেটা নিয়ে উলফ চলে গেছেন বাভেরিয়ায়। ভুন্সিডেল কবরখানায় পূর্বপুরুষদের পাশেই কবরস্থ হবেন। তবে তার আগে আর এক দফা শবপরীক্ষা হয়েছে মৃত্যুর যথার্থ কারণ জানবার জন্য। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন হেস। মৃতের কোটের পকেটে সেই মর্মে একটা চিরকুট পাওয়া গেছে। হেসের ছেলে ওই আত্মহত্যার ঘটনা বিশ্বাস করেন না। বলছেন, চিরকুটটা সম্ভবত জাল। নইলে আমায় দেখতে দেওয়া হত। তবে তাঁকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। তাই দ্বিতীয়বার শব পরীক্ষার ব্যবস্থা। ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র অ্যান্ডারসন পারডন বলেছেন—ওঁরা কী বিশ্বাস করতে চান সেটা ওঁদের ব্যাপার। তবে আমরা নিশ্চিন্ত যে হেস আত্মহত্যা করেছেন। গত কাল, অর্থাৎ ২৩, ৮ তারিখে শব পরীক্ষার পরও অবশ্য নিশ্চিন্ত হতে পারেননি হেস পরিবারের লোকেরা।

হিটলারের সঙ্গে হেস

> হেস মারা গেলেন ৯৩ বছর বয়সে। দীর্ঘকালীন কয়েদী হিসাবে বিশ্বের রেকর্ড সম্ভবত তাঁরই। ১৯৪৫-এ ন্যুরেমবুর্গ বিচারের পর একটানা চল্লিশ বছর স্প্যান্ডাউ জেলে বন্দী।

যাবজ্জীবন বন্দী হেস

হেস মারা গেলেন ৯৩ বছর বয়সে। দীর্ঘকালীন কয়েদী হিসাবে বিশ্বের রেকর্ড সম্ভবত তাঁরই। ১৯৪১ সালের মে মাস থেকে ইংলন্ডে ইংরেজদের হাতে বন্দী ছিলেন। ১৯৪৫-এ ন্যুরেমবুর্গ বিচারের পর যুদ্ধজনিত অপরাধের জন্য একটানা চল্লিশ বছর স্প্যান্ডাউ জেলে বন্দী। শেষ কুড়ি বছর অত মস্ত প্রাসাদ কারাগারে একমাত্র তিনিই ছিলেন কয়েদ হয়ে। বাকি ৫৯৯টি সেল বা কুঠুরি ছিল বিলকুল খালি। বিচারের পর অনেকেই যাঁরা আটক ছিলেন পরে পরে তাঁদের কেউ মারা যান, কেউ ছাড়া পেয়ে বাইরের জগতে চলে যান। শেষ দুজন যাঁরা ছাড়া পান তাঁরা হলেন এককালের নাৎসী যুব নেতা বালদুর ফন স্কিরাক এবং হিটলারের পেয়ারের স্থপতি আলবের্ত স্পীয়র। পরের কুড়ি বছর রুডলফ হেস একেবারে এক এবং অদ্বিতীয় বন্দী। উনবিংশ শতকে নির্মিত লালরঙা স্প্যান্ডাউ প্রাসাদের সাত নম্বর কয়েদী হেসের জন্যই অত বড় একটা জেলের সব ঠাটবাট বজায় রাখা হয়েছে। ঠাটবাট বলে ঠাটবাট। গর্ব করবার মতোই সব ব্যয়বহুল প্রহরার আয়োজন। পশ্চিম বার্লিন প্রশাসন বছরে পাঁচ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার ডলার খরচা করেছে ওই জেল চালাবার জন্য। যে চার "বিজয়ী" শক্তি বার্লিনের দায়িত্ব নেয় যুদ্ধশান্তির পর, সেই চার শক্তিই এক মাস অন্তর অন্তর স্প্যান্ডাউ জেলের প্রহরার ভার গ্রহণ করে এসেছে টানা একচল্লিশ বছর। ফ্রান্স, ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকা। সর্বদা, প্রতি মাসে, একশ সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিয়েছে স্প্যান্‌ডাউ। গেটে, নজরদারী তোরণশীর্ষে, বড় বড় সন্ধানী আলো চালু রাখার কাজে, তড়িৎবাহী বেড়ার খবরদারিতে। এমনকি যখন অসুস্থ হেস হাসপাতালে থেকেছেন, তখনও দিনরাত ফাঁকা জেল পাহারা দিয়ে চলেছেন সতর্ক প্রহরীরা।

প্রশ্ন উঠতেই পারে যে নখদন্তহীন বৃদ্ধকে এইভাবে আটক রাখার কী প্রয়োজন ছিল? পশ্চিম জার্মানীর বর্তমান পটভূমিতে কার কী

ক্ষতি করতে পারতেন ওই অসুস্থ মানুষটি ? যুদ্ধের পর যা হয়েছে হয়েছে। কিন্তু এত দিন পরও কি তখনকার সেই ক্রোধ, সেই ঘৃণা, সেই বিদ্বেষ জমিয়ে রাখতে হবে ? বেঁচে থাকতে থাকতেই কি বৃদ্ধকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব ছিল না ? সঙ্গত ছিল না ? এত খরচ খর্চা করে রুডলফ হেসকে পাহারা দিয়ে যাওয়া কি একটা প্রহসন হয়ে ওঠেনি ? জাপানী সমরনেতাদের বিচারের সময় বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল যেসব মন্তব্য করেছিলেন তা না হয় এখন নাই তোলা হল। গত চল্লিশ বছরে বহু দেশের বহু ক্লিন্ন ঘটনার ওপর থেকেই কি যবনিকা উঠে যায় নি ? বুকে হাত রেখে কে বলবে, আমি অকলঙ্ক, আমি নির্দোষ ? ভিয়েৎনামের যে হিংসা শিহরিত অধ্যায়, স্ট্যালিন আমলের যে নির্যাতনের কাহিনী তাঁর দেশের নেতারাই পরবর্তীকালে ফাঁস করে দিয়েছেন, প্যালেস্টিনীয়দের প্রতি ইজরায়েল সরকারের যে নির্মম আচরণ—এগুলো কি চট করে ঝেড়ে ফেলা যাবে ? সুতরাং যুদ্ধে হেরে গেছে বলেই জার্মানী বা জাপানের প্রতি চিরকাল বিরূপতা পোষণ করতে হবে, এর পিছনে যুক্তি কিছু নেই। এই ধরনের কথা বারবার উঠছে, বেশ কিছুদিন ধরে উঠতেও থাকবে।

আসলে রুডলফ হেস মুক্তি পাননি সোভিয়েত সরকারের আপত্তির ফলে। মুক্তি দিতে ব্রিটেন, ফ্রান্স বা আমেরিকার আপত্তি ছিল না। শেষ দিকটায় আর ছিল না। কিন্তু যেহেতু চার অভিভাবক-পক্ষ একমত না হলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্ভব ছিল না, সেই কারণে রাশিয়ার আপত্তির ফলেই হেসের বন্দিত্ব ঘোচেনি। এজন্য সোভিয়েত নেতৃত্বকে অপবাদও কুড়োতে হয়েছে, কিন্তু তবু তাঁরা বিচলিত হননি। এর কারণ কী তা বুঝতে গেলে রুডলফ হেস নামক বিচিত্র চরিত্রটির উত্থান পতনের ইতিহাস পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

সবাই জানেন, হেস ছিলেন অ্যাডলফ হিটলারের একেবারে কাছের মানুষ। প্রথমাবধি যে সমস্ত নেতা হিটলারের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের অদৃষ্ট জড়িত করে ফেলেছিলেন, হেস তাঁদেরই অন্যতম। হিটলারের প্রতিভা ও নিষ্ঠা সম্বন্ধে, জার্মান জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা হিসাবে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে, এতটুকু সংশয় ছিল না এঁদের। প্রশ্নাতীত ছিল হেসের আনুগত্য বোধ। সর্বদাই তিনি হিটলারকে বলতেন, 'আমার স্বপ্নের মানুষ, আমার নেতা, মাই ফ্যুয়েরার।' বলতেন, 'জার্মানী ? হিটলার ইজ জার্মানী অ্যান্ড জার্মানী ইজ হিটলার !' সত্যি কথা বলতে কী, নাৎসী নেতাদের মধ্যে তাঁর মতো নিঃস্বার্থ আনুগত্য আর কারও ছিল না। গ্যোয়েরিং, গোয়েবলস, রিবেনট্রপ, হিমলার, বরম্যান সবাই হিটলারের সেবা করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিরাট উচ্চাকাঙ্ক্ষাও পোষণ করেছেন তাঁরা। নিজেদের পকেট ভারী করার জন্য, আপন পরিবারের জন্য সর্বপ্রকার বিলাসসামগ্রী সংগ্রহে, অনুগতজনদের ক্ষমতায় বসিয়ে দিতে, এঁরা সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছেন। হেস এঁদের মতো কিন্তু ছিলেন না। হিটলার আর জার্মানী, এই দুই প্রতীকই ছিল তাঁর আরাধ্য। তাঁর স্বাধীন কর্মজীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি উভয়ের সেবা করে গেছেন। নিজের বিপদ তুচ্ছ করে তিনি ইংল্যান্ড উড়ে যান ইংরেজদের বোঝাতে যে হিটলার আসলে কী চান, কোথায় চার্চিলের ভুল হচ্ছে হিটলারের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে হিসাব কষতে, কেন ইয়োরোপের স্বার্থে জার্মান-ব্রিটিশ সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। ইংরেজদের মন তিনি গলাতে পারেননি। মাঝখান থেকে হিটলার তাঁকে পাগল বলে, বিশ্বাসঘাতক বলে ধিক্কার দিয়েছেন। তাঁকে ত্যাগ করেছেন। হেস কিন্তু কখনও নাৎসীবাদ ত্যাগ করেননি, এবং শেষ পর্যন্ত ওই হিটলারের সহকর্মী হবার সুবাদে মৃত্যু পর্যন্ত জেল খেটে গেছেন। মুখেও যদি তিনি একটিবার বলতেন যে তিনি আর নাৎসী নন, ওই আদর্শবাদ অমানবিক, তবে হয় তো রাশিয়ানরা কিছু নরম হত কিন্তু হেস তা করেননি। ন্যুরেমবার্গেও সমস্ত আদালতের সামনে হিটলার প্রসঙ্গে জোর দিয়ে বলেছেন, "যে মানুষটির কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছি, দীর্ঘ দিন ধরে যাঁকে সেবা করার সৌভাগ্য ঘটেছে, আমার অভিজ্ঞতায় তাঁর মত বিরাট আর কাউকে আমি দেখিনি।"

প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়ে দুবার বিশ্রীভাবে আহত হন হেস। একবার ভের্দুনে, আর দ্বিতীয়বার রুমানিয়ায়। তাঁর ফুসফুসের মধ্য দিয়ে গুলি চলে যায়। দ্বিতীয়বার হাসপাতালে থাকার সময় এরোপ্লেন সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ জন্মে। ওটা তখন নতুন একটা যুদ্ধাস্ত্র। সেরে উঠে ভাল প্লেন চালানো শিখে নিলেন হেস। তখনও অবশ্য জানতেন না যে ওই বিদ্যাই তাঁর পতন ডেকে আনবে। হেসের জীবনের সম্ভবত সব চেয়ে বড় ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি মেসারস্মিট জঙ্গি বিমান। যাই হোক, মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর সমগ্র জার্মান জাতিকে যে অপমান ও অসম্মানের মধ্যে আসতে হল তাতে অসংখ্য জার্মান তরুণের মতো হেসও দারুণ মর্মপীড়া ভোগ করেছেন। অন্ধকার আশাহীন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাঁরা বারবার অভিসম্পাত করেছেন ব্যর্থ সেই নেতৃত্বকে যা জার্মানদের মতো একটা আত্মসচেতন জাতিকে চরম লাঞ্ছনা অবমাননার মধ্যে টেনে এনেছে। হিটলারের মতো কেউ যখন এসে তরুণদের আবার উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছে, স্পষ্ট ভাষায় ধিক্কার দিয়েছে ক্লীবমন্য নেতাদের, চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে সেইসব বিজয়ী শক্তিকে যারা ঘটনাচক্রের সহায়তা নিয়ে জার্মান জাতিকে নতজানু হতে বাধ্য করেছে, এবং ভরসা দিতে পেরেছে সেই ভবিষ্যৎকে সম্ভব করার যেখানে জার্মানী আবার পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, তখন সেই তরুণেরা আর স্থির থাকতে পারেনি। দলে দলে এসে ভিড় করেছে হিটলারের পিছনে। তারাই সাহায্য করেছে হিটলারকে অনিবার্যভাবে ক্ষমতার দুর্গের দিকে এগিয়ে যেতে। বিয়ার হলের সেই বিখ্যাত বিদ্রোহ, ১৯১৯ সালের নভেম্বরে মিউনিখ শহরের রাস্তা দিয়ে আগুয়ান হিটলারের নেতৃত্বে সংগঠিত বিক্ষোভ মিছিল, বিচার ও জেল খাটবার সময় তাঁর কাছাকাছি উপস্থিত থাকা—সর্বক্ষেত্রে উন্মাদনাগ্রস্ত যুবকদের মধ্যে থেকেছেন হেস। লানডসবুর্গ দুর্গে বন্দী হিটলার যখন পৃথিবীকে তাঁর ভয়ঙ্কর উপহার দেবার জন্য 'মাইন কাম্‌ফ' লিখছেন, তখন স্টেনো সেজে তাঁর ডিক্টেশন নিয়েছেন কে ? রুডলফ হেস। আশ্চর্য কী যে, ক্ষমতায় এসে হিটলার তাঁকেই 'ডেপুটি ফ্যুয়েরার' বলে স্বীকৃতি দেবেন ? অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উনিশটি দপ্তরের দায়িত্ব দেবেন ? তা ছাড়া তিনি হেসকে ডেকে বলে দিলেন, "যারা আজ আমার নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে, চেয়ারে বসেই তারা কিন্তু নানান খেলা শুরু করে দেবে। আমার বিরুদ্ধে যাবে। আমি চাই তুমি সবার ওপর নজর রাখো। এবং সরাসরি সব কিছু আমাকে জানাও।" তিনি আরও ফরমান দিলেন : "পার্টি (নাৎসী) ঘটিত সর্ব ব্যাপারে আমার হয়ে সিদ্ধান্ত নেবে রুডলফ হেস। তার নির্দেশ যেন আমার নির্দেশ বলে মানা হয়।" এই নিয়ম বলবৎ ছিল হেস ইংল্যান্ড চলে যাবার মুহূর্ত পর্যন্ত। তার পর ওই দায়িত্ব পেলেন হেসেরই সহকারী মার্টিন বরম্যান।

প্রশ্ন হচ্ছে, এতখানি ক্ষমতা কীভাবে সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিলেন হেস ? হিটলার কি খুশি হয়েছিলেন ? পরবর্তীকালে মার্টিন বরমান যখন পার্টি চালাবার দায়িত্ব পান তখন তিনি যে ভাবে সেটা কাজে লাগিয়েছিলেন অবশ্যই হেস সেই হৃদয়হীন দৃঢ়তা কখনই দেখাতে পারেননি। সেটা তাঁর স্বভাবে ছিল না। প্রশাসনের দিক থেকেও তিনি গ্যোয়েরিংকে তাঁর দুই নম্বর পদটা ছেড়ে দিয়ে তৃতীয়স্থানে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। হেসের পক্ষে সব চেয়ে যেটা মর্মান্তিক তা হল হিটলার তাঁকে এড়িয়ে যেতে শুরু করেন। এর দুটো কারণ ছিল। প্রথমত হিটলার শুধু হেসকে নয়, তাঁর প্রথম জীবনের বহু সঙ্গীসাথীকেই শেষটা এড়াতে চাইতেন। কারণ, এরা দেখা হলে বা ফোনে সর্বদাই কিছু না কিছু সুবিধার জন্য আবদার তুলতেন। এটা বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল হিটলারের পক্ষে। হেস অবশ্য এই ধরনের সুবিধা চাইবার মানুষ ছিলেন না। তবে অভিমান জানাতেন। অকারণে দীর্ঘ সময় আটকে রাখতেন হিটলারকে। তা ছাড়া দ্বিতীয় কারণটা হল : জ্যোতিষী, তুকতাক, জড়িবুটি ইত্যাদি নিয়ে হেস বড়ই লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। দারুণ জরুরী মন্ত্রণাসভা হচ্ছে, হেস হঠাৎ পকেট থেকে একটা চুম্বক বের করে হিটলারের পোশাকের চারপাশে ঘুরিয়ে নিলেন। নিজের জামাটামায় ঘসে নিলেন। কী, না দুষ্টু লোকের বিষাক্ত মন্ত্র অসৎ আত্মার অপকার ইত্যাদি দোষ ওই চুম্বক দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া হল। ইহুদিরা যে সর্বদা হিটলারের অনিষ্টের জন্য শয়তানের সহায়তা নিচ্ছে, ভূত পাঠাচ্ছে, এটা হেস বিশ্বাস করতেন। আর হঠাৎ হঠাৎ ফোন করে হিটলারকে বলতেন, এটা এখন কর, ওটা কোরো না, কারণ জ্যোতিষীরা তারা নক্ষত্র বিচার করে জানাচ্ছে—ইত্যাদি। নাৎসী নেতাদের অনেকেরই জ্যোতিষে বিশ্বাস ছিল, হিটলারেরও দুর্বলতা ছিল। কিন্তু হেসের ভালবাসার অত্যাচারে বিব্রত হয়ে পড়তেন হিটলার। এড়াতে চাইতেন হেসকে।

মনঃক্ষুণ্ণ হেস ঠিক করলেন হিটলারের কাছে পূর্বের প্রতিষ্ঠা পেতেই হবে। ব্রিটেনে উড়ে গিয়ে তিনি সরাসরি সেখানকার সরকারকে বুঝিয়ে বলবেন, হিটলারের সঙ্গে কেন সন্ধি করা দরকার। কেন ব্রিটেন-জার্মান সহযোগিতা ছাড়া ইয়োরোপের স্বার্থ সুরক্ষিত নয়। কেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে খর্ব করতে না পারলে দাবানলের মতো কমিউনিজম ইয়োরোপকে গ্রাস করে নেবে। অর্থাৎ, রাশিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা হিটলার তখন করেই নিয়েছেন। তার আগে তিনি চাইছিলেন ব্রিটেনকে শত্রু হিসাবে পিছনে না রেখে যেতে। বোমাবর্ষণ করে ব্রিটেনকে নতজানু করা গেলে ভালই। নতুবা তিনি ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তি করে তবে সোভিয়েতভূমির দিকে অগ্রসর হবার কথা ভাবছিলেন। প্রায়ই মন্ত্রণাসভায় হিটলার গাল দিতেন চার্চিলের 'নির্বুদ্ধিতা এবং জিদকে'। বলতেন, ওই লোকটা ব্রিটেনের সর্বনাশ করবে।

ব্রিটেনে উড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া এক, আর যাওয়া আরেক ব্যাপার। ওই পরিস্থিতিতে গোপনে একটা লাগসই বিমান সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার ছিল। হেস গিয়ে জেনারেল আরনস্ট উদেৎকে বললেন, আমার একটা দুই ইঞ্জিনবিশিষ্ট মেসার্সস্মিট-১১০ বিমান চাই। বিমান বাহিনীর সরবরাহ কর্তা এবং গোয়েরিঙের ডান হাত উদেৎ সেই আবেদন নাকচ করে দিলেন। বললেন, "ফ্যুয়েরারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসুন, তবে দিতে পারব। কারণ সব প্লেনই তো ইংলন্ড আক্রমণে লাগছে। জানেন তো সবই।" মনে মনে চটে গেলেও হেস চুপ করে রইলেন। হিটলারকে এর মধ্যে তিনি জড়াতে চান না। বুদ্ধি করে তিনি স্বয়ং গেলেন মেসার্সস্মিটের কাছে। বললেন, "পুরানো বন্ধুত্বের দোহাই, তোমার তৈরি একটা প্লেন আমাকে দাও। আমি পাইলট হিসাবে নিজেকে ফিট রাখতে চাই। অ্যান্ড আই ওয়ান্ট দ্য বেস্ট প্লেন। অর্থাৎ তোমার তৈরি প্লেন। সর্বোৎকৃষ্ট বিমান বলতে তো ওটাই।" বন্ধুতার দাবিতেই হোক, আর তোশামোদেই হোক একটা প্লেন জুটল হেসের কপালে। থেকে থেকেই হেস চলে যেতেন আউগসবুর্গ। প্লেনটা নিয়ে চালাবার অভ্যাস করে নিতেন। এটা ১৯৪০-এর কথা। শীতের আগেই অন্তত বিশবার প্লেন নিয়ে আকাশে টহল দিলেন হেস।

জানুয়ারী মাসেই একবার উড়ে ব্রিটেন যাবার চেষ্টা করেন হেস। কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ফিরে আসতে হয় তাঁকে। উড়বার আগে একটা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অ্যাডজুটান্ট ক্যাপ্টেন পিনৎসের হাতে। বলেছিলেন, একেবারে হিটলারের হাতে তুলে দিও। তাতে লিখেছিলেন—"এই চিঠি যখন আপনার হাতে পৌঁছবে, মাই ফ্যুয়েরার, তখন আমি ইংল্যান্ডে পৌঁছে গেছি।" কেন তিনি আপন নেতার সঙ্গে পরামর্শ না করে, তাঁর অনুমতি না নিয়ে একাই ইংলন্ডে গেছেন তা বর্ণনা করে, তাঁর পরিকল্পনা কী তা বলে, চিঠির শেষ পর্বে লিখেছিলেন, "আমি জানি ইংরেজদের বোঝানো শক্ত কাজ হবে। যদি আমার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, আপনি অনায়াসেই বলতে পারবেন যে এর সঙ্গে আপনার কোনও যোগ ছিল না। আপনি বলবেন, আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।"

এই চিঠিটাই কয়েকমাস বাদে, মে মাসের ১১ তারিখে পৌঁছল হিটলারের হাতে তাঁর বাভেরিয়ার শৈলনিবাসে। তার আগে দুদিন ধরে দারুণ উৎকণ্ঠায় ছিলেন হিটলার সহ সবাই। কোথায় গেলেন হেস? কী হল তাঁর? চিঠিটা পেয়ে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন হিটলার। পত্রবাহক ক্যাপটেন পিনৎসেকে গ্রেফতার করাবার নির্দেশ দিলেন। উদেৎকে ফোনে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি মনে হয় হেস ইংলন্ডে পৌঁছতে পারবেন?" উদেৎ বললেন, "কোনও মতেই তা সম্ভব নয়। হেস ব্যর্থ হবেন।" হিটলার বললেন, "তাই যেন হয়। সমুদ্রে ডুবে মরুক লোকটা।"

স্প্যান্ডাউ কারাগারের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছেন হেস

কিন্তু সমুদ্রে ডুবে মরলেন না হেস। উদেৎ ভুল আন্দাজ করেননি। আউগসবুর্গ থেকে ইংল্যান্ড টানা ৮০০ মাইল। ওই পরিস্থিতিতে একলা বিমান নিয়ে হেসের পক্ষে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া অসম্ভব ব্যাপারই ছিল। কিন্তু দৃঢ়চিত্ত হেস ঠিক পেরে গেলেন। জার্মানী থেকে তিনি উড়ে গেলেন উত্তর সমুদ্রের ওপর। তারপর পশ্চিমমুখো হয়ে স্কটল্যান্ড। ব্রিটিশ উপকূলরক্ষীদের শোনদৃষ্টি এড়াবার জন্য মেঘের মধ্যে ঢুকে গেলেন হেস। আউগসবুর্গ ছাড়বার পাঁচ ঘণ্টা পর প্যারাশুটের সাহায্যে তিনি নামলেন ইগলশ্যাম বলে একটা গ্রামে। ঠিক বারো মাইল দূরে ডিউক অব হ্যামিলটনের খামারবাড়ি। ওটাই ছিল হেসের লক্ষ্য। ১৯৩৬ সালে মিউনিখ অলিম্পিকের সময় হেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় হ্যামিলটনের। সেই সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে হেস ব্রিটিশ সরকার তথা উইন্সটন চার্চিল নামক এক জেদী ব্যক্তির সমীপে পৌঁছলেন। পরমপ্রিয় ফ্যুয়েরার যে ব্রিটেনের প্রতি সদিচ্ছাসম্পন্ন এবং মিত্রতাকামী, হেসের সেই ওকালতি অগ্রাহ্য করলেন চার্চিল। ওদিকে মিউনিখে বসে প্রচণ্ড রাগারাগির পর হিটলার তখন সক্ষোভে বরম্যানকে বলছেন—"দেখো তো হেস কী বিপদে ফেলল আমাকে। কে বিশ্বাস করবে আমি কিছুই জানতাম না? সবাই ধরে নেবে আমিই নত হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে আপস চাইছি।" তড়িঘড়ি রোমে পাঠালেন রিবেনট্রপকে। মুসোলিনীকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার জন্য। আর হুকুম দিলেন হেসের পেটোয়া সব কটা জ্যোতিষীকে পাকড়ে গারদে পুরে দেবার জন্য। ওই ব্যাটারাই যত নষ্টের গোড়া।

হেসের ব্যাপারে রুশীদের হিসাব এইরকম। প্রথমত লোকটা পাকা নাৎসী, কখনও কোনও ভাবে তার অনুতাপ প্রকাশ পায়নি। কারণ, কৃতকর্মের জন্য লোকটা লজ্জিত নয়। দ্বিতীয়ত, হিটলারের একেবারে কাছের মানুষ তিনি। বরাবরই ছিলেন। তা তাঁর স্থান দ্বিতীয় তৃতীয় যাই হোক। তাঁকে মুক্তি দেওয়া মানেই হল জার্মানীর নয়া নাৎসীরা তাঁর চারদিকে ভিড় করবে এবং আবার ঘোঁট পাকাবার চেষ্টা করবে। (এই আন্দাজটা যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ, ভুন্সিডেল শহরে হেসের অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষে এই ধরনের লোকরা দলে দলে সমবেত হচ্ছে—২৪ আগস্ট তারিখে প্রকাশিত সংবাদ!) তৃতীয়ত রাশিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস, হিটলার যাই বলুন, তিনিই হেসকে ব্রিটেনে পাঠিয়ে চুক্তি করার তালে ছিলেন যাতে নিশ্চিন্ত মনে রাশিয়া আক্রমণ করা যায়! চার্চিল নরম হয়ে পড়লে সব ব্যাপারটাই অন্য রকম হত। তখন আর হিটলার হেসকে পাগল বলে গাল দিতেন না। (দ্রষ্টব্য: মাইন ক্যাম্প গ্রন্থে হিটলার লিখছেন— ইয়োরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ব্রিটেন বা ইতালি ছাড়া আর কেউ নেই যাকে নিয়ে চলা যায়!) অতএব, সোভিয়েত নেতাদের কাছে হেস এক অসহায় বৃদ্ধ বন্দীমাত্র ছিলেন না। সোভিয়েত স্বার্থবিরোধী এক চক্রান্তের তিনি ছিলেন 'রিম অ্যান্ড স্পোকস'! তাঁকে ক্ষমা করা সম্ভব নয়।

রুডলফ হেস খুব বুদ্ধিমান চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন না। হলে হয় তো চল্লিশ বছরের বন্দীজীবনকে কাজে লাগাতে পারতেন। মানবসভ্যতাকে উপহার দেবার মতো কিছু রেখে যেতে পারতেন। বিশ্বের বীভৎসতম অমানবিকতার প্রতিনিধি হিসাবে দুঃখের দি... কাটাতে হত না ওই নাৎসী নেতাকে। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলতেন দুনিয়ার বিমর্ষ এক মানুষ। সুখের দিনেই যিনি বিমর্ষ, নিঃসঙ্গ বন্দীজীবনে তিনি কী? চার চারবার আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করে পঞ্চমবার তিনি সফল হলেন তিরানব্বই বছর বয়সে। এটা কি আদৌ ট্র্যাজেডি? ২২ জুন ১৯৪১—হিটলার যেদিন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অগ্রাহ্য করে মস্কো দখল করার জন্য সৈন্য পাঠালেন, সেদিন কি হেস চার্চিলকে কিছু বলবার সুযোগ পেয়েছিলেন? ■

জেনেটিক্ ইঞ্জিনিয়ারিং ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ

ভৈরব ভট্টাচার্য

প্রগলভতা, বাচালতা, ধৃষ্টতা ইত্যাদি নানা অভিযোগ উঠতে পারে— যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের নাম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সঙ্গে যুক্ত করতে চেষ্টা করে। রবীন্দ্রনাথ বিগত দিনের কবি ও চিন্তানায়ক, আর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অতি সাম্প্রতিক এক বৈজ্ঞানিক গবেষণা, যার বয়স এক যুগের বেশি হবে না। তবু প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তার উদার আকাশে এই বৈজ্ঞানিক বিচারের মেঘ কখনও কি ভেসে এসেছিল?

ক্যান্সার কোষের সঙ্গে সুস্থ 'বি'-কোষ যুক্ত করে কৃত্রিম উপায়ে অসংখ্য 'বি' কোষ বা 'মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি' সৃষ্টি করা সম্ভব। ছবিতে একটি কৃত্রিম 'বি' কোষ বিভাজিত হতে দেখা যাচ্ছে

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে আমাদের যেটুকু ধারণা তাতে জানি, মানুষের কল্যাণের জন্যে জননবিদ্যার অভিব্যক্তি ও পরিচালনাকে এই নামে অভিহিত করা হয়। বিষয়টি মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন—

১। রিকমবিনান্ট ডি এন এ টেকনোলজি অথবা বিভাজনের মাধ্যমে পুনর্গঠিত ডি এন এ (ডিঅক্সিরিবো নিউক্লিক এসিড)।

২। মাইক্রোবায়াল জেনেটিক ট্রান্সফরমেশন অথবা জীবাণু জেনেটিক সত্তার রূপান্তর করণ।

৩। সোমাটিক সেল ফিউশন অর্থাৎ দৈহিক কোষের সংমিশ্রণ।

জীবদেহে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করে বিবিধ রাসায়নিক সংমিশ্রণের সংযোগে। বহিরাগত প্রোটিন জীবদেহে ব্যাধির সংক্রমণ করে। সংক্রামক ব্যাধির বিষক্রিয়া থেকে শরীরকে সুস্থ রাখতে শরীরমধ্যস্থ একদল রাসায়নিক সৈন্য বা এনটিবডি প্রতিক্ষণ সজাগ থেকে বাইরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়। এরা জীবদেহের অত্যন্ত আপনজন, কিন্তু কর্মক্ষমতায় তারা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত এবং কোন কোন সময়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এদের পলিক্লোনাল এনটিবডি বা বহুমুখী প্রতিরক্ষার সৈন্য বলা যায়।

শরীরের কতকগুলি বিশিষ্ট কোষকে শ্বেত কণিকা বা লিমফোসাইট বলা হয়। তারা রাসায়নিক যুদ্ধে প্রয়োজনমত শ্রেণীবদ্ধ এনটিবডি তৈরি করে যুদ্ধের জয় সুনিশ্চিত করতে চেষ্টা করে। এই দেহরক্ষী সৈনিকদের একটি শ্রেণী —যারা সম আকারবিশিষ্ট ও সমধর্মী তাদের উৎপত্তিও শ্বেতকণিকা থেকে। এদেরই মনোক্লোনাল এনটিবডি বলা হয়। জেনেটিক সূত্রে এদের একটিকে অপরটি হতে পৃথক করা যায় না। জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার জন্য এরা একান্ত প্রয়োজনীয়।

মাত্র এক যুগ অর্থাৎ বারো বৎসর আগে জীবন বিধ্বংসী ও নিত্য সম্প্রসার্যমান ক্যান্সার বা কর্কট জীবকোষের ভয়ঙ্কর শক্তিকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করবার চেষ্টা শুরু হয়। কর্কট জীবকোষ ধ্বংস করা কঠিন এবং এত দ্রুত বংশবিস্তার দ্বারা জীবদেহ নিঃশেষ করে ফেলে যে কর্কট রোগ হলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মাইলস্টাইন ও কেইলার তাঁদের স্বতঃলব্ধ জ্ঞান বা ইনটুইশনে অনুভব করেছিলেন যে শরীরের প্রতিরক্ষাকারী সৈন্যরা শ্রেণীগতভাবে সমধর্মী জীবকোষ থেকে জন্মলাভ করে। এই জীবকোষগুলিকে কর্কট কোষের অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পারলে ওরা শুধু এক ধরনের সৈন্য যুগ যুগ ধরে জন্ম দিতে পারবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মনোক্লোনাল এনটিবডি বা ঐকিক প্রসার্যমান দেহরক্ষক সৈনিকের অফুরন্ত উৎপাদন জীবদেহের বাইরেও সম্ভব হবে। তাঁরাই একটা ক্যান্সার কোষের সঙ্গে এই ধরনের জীবকোষকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করে প্রথম মনোক্লোনাল এনটিবডি প্রস্তুতকারক জীবকোষকে অমরত্ব দান করেন। শরীরের বাইরে রেখেই কোষগুলির এই সংযোজন ঘটানো হয়েছিল।

মাত্র এক যুগ গবেষণার পর বায়োটেকনিক শাস্ত্র শরীরের অধিকাংশ রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে এই মনোক্লোনাল এনটিবডির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করবার চিন্তা ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। আমরা আশা করছি এই মনোক্লোনাল্ এনটিবডি প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় কর্কট কোষের ভয়ঙ্কর ও নিত্য সম্প্রসার্যমান শক্তিকে মানুষের কল্যাণে বিশেষভাবে ব্যবহার করা যাবে।

প্রিন্সটনের নিরবচ্ছিন্ন শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় বসে অনেকদিন ভেবেছি, পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই মহামানব— আইনস্টাইন এবং রবীন্দ্রনাথ কি জেনেটিক্স বিজ্ঞানের বিষয়ে কিছু ভেবেছিলেন? আইনস্টাইন এই প্রিন্সটনেই তাঁর কর্মময় জীবনের শেষ কয়েক বৎসর কাটিয়েছিলেন। তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এখনও এখানেই আছেন। তাঁর দেহাবসানের পর তাঁর মস্তিষ্ক পরীক্ষা নিয়ে যে বিপুল আলোড়ন হয়েছিল তাও ঘটেছিল ২৪৫ জেফারসন রোডের একটি বাড়িতে যা আমার বাসগৃহেরই সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী ভবন, যেখানকার ছায়া নিয়ত আমাদের উপর পড়ে আইনস্টাইনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আইনস্টাইন তাঁর গবেষণায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শক্তির সামঞ্জস্য চিন্তা করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শক্তি এবং ভর আলোকগতির বর্গ-মানে পরস্পর পরিবর্তনশীল ($E=MC^2$)। তাঁর এই অতি সূক্ষ্ম চিন্তাধারা আমাদের সহজ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না। তাঁর মত মনীষীর চিন্তায় কি জেনেটিক-এর জটিল তত্ত্ব আরও সহজে আয়ত্ত হতে পারত না?

আর যখন রবীন্দ্রজীবনের কথা চিন্তা করি তখনও বিস্ময়ের অবধি থাকে না। রবীন্দ্রপ্রতিভার যাদুস্পর্শে সাহিত্যের এমন কোনও বিভাগ নেই যা সুবর্ণমণ্ডিত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কবির বিজ্ঞানচেতনা তাঁর মহর্ষি পিতার সস্নেহ শিক্ষায় আশৈশব লালিত হয়েছিল। তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনার অন্তরালে ফল্গুধারার মত সেই বিজ্ঞানচেতনা সুস্পষ্টভাবে প্রবাহিত রয়েছে। এমনকি যে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাঙালীর প্রাণের সামগ্রী, আত্মার আত্মীয়— তার মধ্যেও থেকে থেকে বিজ্ঞানের অবিনশ্বর বাণী যেন বিদ্যুৎচমকের মতই আমাদের সচেতন করে দেয়। যেমন যখন তিনি গেয়ে ওঠেন—

আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনই লীলা তব,
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।

তখন দেখতে পাই, এ অনুভূতি তো জেনেটিক্ বিজ্ঞানের চরম কথা।

রবীন্দ্র রচনাবলীর সাগর সৈকতে যে একখানি মাত্র বিজ্ঞান গ্রন্থের সন্ধান মেলে তা যে রত্নাকরের অপার ঐশ্বর্যেরই ইঙ্গিত বহন করে তা কবিগুরুর 'বিশ্ব পরিচয়' গ্রন্থখানি পড়লেই বোঝা যায়। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের আলোচনার মধ্যে যখন তিনি বলেন—

"প্রত্যেক কোষটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাদের প্রত্যেকের নিজের ভিতরেই একটা শক্তি আছে যাতে করে বাইরে থেকে খাদ্য নিয়ে বহুগুণিত করতে পারে। এই বহুগুণিত শক্তির দ্বারা ক্ষয়ের ভিতর দিয়ে, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রাণের ধারা প্রবাহিত হয়। বংশাবলীর মধ্য দিয়ে এই জীবদেহ একটি প্রবাহ সৃষ্টি করে নূতন নূতন রূপের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে।"

তখন কি আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে যে কবির গভীর অনুভূতিতে জেনেটিক্ শাস্ত্রের শাশ্বত সত্য স্বতঃই উদঘাটিত হয়েছিল?

রবীন্দ্রনাথ জেনেটিক্ ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পৃথকভাবে কিছু লিখেছিলেন কিনা তার সন্ধানে সম্প্রতি আমি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ নিমাইসাধন বসু এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ সহায়তা করেন। শ্রীনিকেতনে কবি তাঁর পল্লীসংস্কারের যে বৃহৎ ও ব্যাপক কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন সেখানে দেখলাম ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে মেনডেল আবিষ্কৃত উদ্ভিদের জীন সম্বন্ধে গবেষণা কবি তাঁর কাজে লাগিয়েছিলেন। কৃষির উন্নতিকল্পে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় শিক্ষালাভের জন্য তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এবং বন্ধুপুত্র সন্তোষ মজুমদারকে সুদূর আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন সে কথাও মনে পড়ে। এবং শুধু কৃষি নয়, গোপালনেও যে তাঁর উৎসাহ কম ছিল না সে কথাও শুনলাম। গো-প্রজননে বর্তমান লেখকের মৌলিক গবেষণা সফলতার যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তা যদি কবির প্রবর্তিত কাজে লাগানো যায় সে বিষয়েও উপাচার্য মহোদয়ের সঙ্গে আলোচনা হল। ফলে শ্রীনিকেতনে এবং বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক, ছাত্র ও কর্মীদের নিকট আমার বক্তৃতার ব্যবস্থাও হল। ভরসা পেলাম

ব্যাকটেরিয়ায় আচ্ছাদিত 'বি' কোষ—অন্যতম দেহরক্ষী

তাঁরা এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হবেন।

আমার গবেষণার বিষয় জনন-শাস্ত্র, যার মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গও অপরিহার্যভাবেই এসে পড়ে। সে বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট অভিমত পাওয়া গেল বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত কিছু চিঠিপত্রে। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ এখন থেকে ৬০ বৎসরেরও আগে কবি যে প্রগতিশীল মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন, স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত ততটা অগ্রসর হতে সম্মত হননি। ঐ

'টি'-কোষ সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করছে একটি ক্যান্সার কোষকে। ডান দিকে) আক্রমণের শেষে ক্যান্সার কোষের জালের মত ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে

সময়ে কবি নিউইয়র্কের "আমেরিকান বার্থ কন্ট্রোল লীগ"-এর সভানেত্রী শ্রীমতী মার্গারেট স্যাঙ্গারের অনুরোধে যে লিখিত অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন সেটি নিয়ে বিশেষ কোন আলোচনা হয়নি বলে উভয়ের দুখানি পত্র এখানে তুলে দিচ্ছি। সঙ্গে আমাদের সাধ্যানুযায়ী তার বিশ্লেষণও দেওয়া হল।

মূল পত্র দুখানি 'বিশ্বভারতী'র কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশ করা সম্ভব হল।

রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা মার্গারেট স্যাঙ্গারের পত্র

September 30, 1925

Dear Dr. Tagore,

The Indian papers just received report that Mahatma Gandhi has been visiting you at Santiniketan. Perhaps you have seen his recent statement in opposition to Birth Control. You have travelled all over this earth, and you have observed the joys and sorrows and miseries of the world, and we take it for granted that with your international outlook on life and human society you cannot but feel friendly towards Birth Control.

We should feel highly honored if you would send us a statement regarding birth control for publication in our Birth Control Review. In a recent issue of this review, we published your exquisite poem "The Beginning" from the "Crescent Moon". Under separate cover we are mailing you copies of the review and some books and pamphlets.

Please exchange with the Birth Control Review your "Visva Bharati Quarterly" and "The Santiniketan". We are friends of your great and old country.

With best wishes for your health and your International University.

Very Sincerely Yours,
American Birth Control League, Inc.
Margaret Sanger
President

রবীন্দ্রনাথের জবাব

August 12, 1925

I am of opinion that "Birth Control" movement is a great movement not only because it will save women from enforced and undesirable maternity, but because it will help the cause of peace by lessening the number of surplus population of a country scrambling for food and space outside its own rightful limits. In a hunger-striken country like India it is a cruel crime thoughtlessly to bring more children to existence than could properly be taken care of, causing endless sufferings to them and imposing a degrading condition upon the whole family. It is evident that the utter helplessness of a growing poverty very rarely acts as a check controlling the burden of over-population. It proves that in this case nature's urging gets better of

the severe warning that comes from the providence of civilised social life. Therefore, I believe, that to wait till the moral sense of man becomes a great deal more powerful than it is now and till then to allow countless generations of children to suffer privations and untimely death for no fault of their own is a great social injustice which should not be tolerated. I feel grateful for the cause you have made your own and for which you have suffered.

I am eagerly waiting for the literature that has been sent to me according to your letter and I have asked our Secretary to send you our Visvabharati Journal in exchange for your Birth Control Review.

Sincerely Yours,
Rabindranath Tagore

রবীন্দ্রনাথকে লেখা মার্গারেট স্যাঙ্গারের চিঠিতে দেখি, সে সময়ে মহাত্মা গান্ধী যে

রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন : সৃষ্টির রহস্য কি জড়িয়ে আছে কার্য-কারণ সম্পর্কহীন যোগাযোগে অথবা পরিসংখ্যানগত নিশ্চয়তায় !

শান্তিনিকেতনে ছিলেন তা তিনি জানতেন; গান্ধীজী যে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথার বিরোধী তাও তিনি বলেছেন। বস্তুত মহাত্মার মতে মানুষের নৈতিক চরিত্র সবল করে সংযম অবলম্বনই জন্মনিয়ন্ত্রণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গান্ধীজীর অভিমত গ্রহণ না করে জনসাধারণের উপযোগী মার্গারেট স্যাঙ্গারের মতকেই সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন, প্রবৃত্তির বশে পরিচালিত হয়ে মানুষ স্বাভাবিক আবেগ দমনে ব্যর্থ হয় এবং অবাধ বংশবৃদ্ধি করে অশেষ দুঃখের কারণ ঘটায়।

... মনে রাখতে হবে, আমেরিকাতেও জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে তখনও অনেক প্রতিবাদ হয়েছে, এমনকি বার্থ কন্ট্রোল লীগের নির্ধারিত সভায় কোন কোন সময় বক্তৃতা পর্যন্ত বাতিল করতে হয়েছে— তার বহু প্রমাণ প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহশালায় মার্গারেট স্যাঙ্গারের কাগজপত্রের মধ্যে দেখেছি।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পাওয়া জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের পক্ষেই বিশেষ সহায়ক হয়েছিল সন্দেহ নেই।

এই তো গেল রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে জেনেটিক্ ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত। তিনি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী প্রাণশক্তির অবিনশ্বর লীলা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তাতে জীনের পরমাণুশক্তিও স্বীকৃতি পেয়েছে বলা যায়। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ১৪ জুন বার্লিনে আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে কথোপকথন হয় ডঃ সুধীন ঘোষ তা শর্টহ্যাণ্ডে লিখে নিয়েছিলেন। সেই কথোপকথনের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মতবাদের কিছু সন্ধান পাওয়া যায়।

আইনস্টাইন মনে করতেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত রয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে চারটি মৌলিক শক্তির দ্বারা।

১। বৈদ্যুত-চুম্বক শক্তি বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ফোর্স।

২। অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ বা গ্রাভিটি ও গ্রাভিটেশন।

৩। অণুমধ্যস্থ প্রবল শক্তি বা স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স।

৪। অণুমধ্যস্থ দুর্বল শক্তি বা উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আইনস্টাইন এই চার শক্তিকে একসূত্রে বাঁধতে চেষ্টা করেছেন। পদার্থবিদরা তাঁর স্বপ্ন সফল করবার জন্য এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আরও একটি শক্তির কথা যাকে বলা চলে প্রাণশক্তি বা এনিমেশান। আইনস্টাইন প্রাণশক্তিকে রাসায়নিক শক্তির অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। এই প্রাণশক্তিই বস্তুত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গবেষণার বিষয়। কবির চেতনায় সেই প্রাণশক্তির পৃথক অনুভূতি যে জেগেছিল এটাও পরম বিস্ময়ের কথা। এখানে তাই আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনের প্রয়োজনীয় অংশ তুলে দিচ্ছি। এটি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের শীলে জি মাড ম্যানাসক্রিপ্ট লাইব্রেরীর সৌজন্যে পেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের কথোপকথনের অংশবিশেষ

Tagore : I was discussing with Dr. Mendel today the new mathematical discoveries which tell us the realm of infinitesimal atoms. Chance has its play, the drama of existence is not absolutely destined.

Einstein : The facts that make science tend towards this view do not say good-bye to causality.

Tagore : May be not, yet it appears that the idea of causality is not in the elements but that some other force builds up with them an organised universe.

Einstein : One tries to understand in the higher plane how the order is. The order is there where the big elements combine and guide existence. But in the minute elements, this order is not perceptible.

Tagore : Thus, duality is in the depth of existence the contradiction of free impulse and the directive will, which works upon it and evolves an orderly scheme of things.

Einstein : Modern physics would not say they are contradictory. Clouds look as one from a distance, but if you see them nearby, they show themselves as disorderly drops of water.

Tagore : I find a paralell in human psychology. Our passion and desires are unruly but our character subdues these elements into a harmonious whole. Does something similar to this happens in the physical world? Are the elements rebelious, dynamic with individual impulses? And is there a principle in the world which dominates them and puts them into an orderly organisation?

Einstein : Even the elements are not without statistical order. Elements of radium will always maintain their specific order now and ever onward, just as they have done all along. There is then a statistical order in the elements.

Tagore : Otherwise the drama of existence would not be too desultory. It is that constant harmony of chance and determination which make it eternally new and living.

Einstein : I believe that whatever we do or live for has its causality and it is good forever that we cannot see through it.

শুধু বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গেই নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু রচনায়— প্রবন্ধে, কবিতায়, এমনকি গানেও এই নিত্য প্রবহমান প্রাণশক্তির কথা বার বার বলেছেন যাতে মহাকবির চেতনায় জেনেটিক্ বিজ্ঞানের স্বীকৃতি মেলে।

আজ সমগ্র জগৎ এই বিজ্ঞানের আলোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। আমরাও যদি সমানতালে এগিয়ে যেতে পারি তবে আমাদের দেশের সার্বিক মঙ্গল সাধিত হবে। জেনেটিক্ ইঞ্জিনিয়ারিং সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প অল্প খরচে প্রবর্তন করা সম্ভব— যা আমাদের গরিব দেশের পক্ষে উপযোগী। আর তাতে উৎপন্ন বস্তু দেশের মানব ও গৃহপালিত পশু উভয়েরই অশেষ কল্যাণসাধন করতে পারবে। আমি তাই দেশের যুবসমাজ ও দেশনায়কদের দৃষ্টি জেনেটিক্ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রতি আকর্ষণ করি।

দেশ

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপনের ভাষা

গোলাম মুরশিদ

আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপনের যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য। ভারতে প্রাচীন ও মধ্যযুগে কী হতো, জানিনে। কিন্তু ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের পর বিজ্ঞাপন প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অবশ্য প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা থেকে বিজ্ঞাপন প্রচার করা সম্ভব হয়নি। কারণ, বিজ্ঞাপন প্রকাশের বাহন—পত্র-পত্রিকা এবং পত্র-পত্রিকা মুদ্রণের জন্যে ছাপাখানা, এর কোনোটাই কলকাতায় ছিলো না। সেজন্যে ১৭৬৮ সালে উইলেম বোলটস নামক কম্পানির একজন কর্মচারী ঘোষণা করেছিলেন যে, কলকাতায় কেউ ছাপাখানা স্থাপন করতে চাইলে, তিনি সাহায্য করবেন। তাঁর আহ্বানে অন্তত কয়েক বছরের মধ্যে কেউ সাড়া দেননি। ইতিমধ্যে অবাধ্যতার কারণে কম্পানি তাঁকে বিলেত পাঠিয়ে দিলে তিনি নিজে অবশ্য বাংলায় ছাপার উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু বাংলা টাইপ তৈরি করিয়েছিলেন লন্ডনের প্রখ্যাত এক হরফ নির্মাতার কাছ থেকে। বোলটস শেষ পর্যন্ত বাংলায় কিছু ছাপতে পারেননি, অথবা বঙ্গদেশে ছাপাখানাও স্থাপন করতে পারেননি।

কিন্তু ছাপাখানা স্থাপনে কম্পানির অনীহা থাকলেও, জেমস অগস্টাস হিকি বেসরকারি উদ্যোগে কলকাতায় প্রথম ছাপাখানা বসান ১৭৭৭ সালে এবং ভারতবর্ষের প্রথম পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৭৮০ সালের জানুয়ারি মাসে। তাঁর প্রেস থেকেই ছাপা হয় বঙ্গদেশের প্রথম বিজ্ঞাপন। তবে এসব বিজ্ঞাপন ছিলো ইংরেজি ভাষায়।

বাংলা বিজ্ঞাপন প্রথম প্রকাশিত হয় কয়েক বছর পরে, ১৭৮৪ সালে। হিকির পত্রিকা **বেঙ্গল গ্যাজেটে** সরকারের এবং গবর্নর জেনারেলসহ সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যাপক এবং অনেক সময়ে ভিত্তিহীন সমালোচনা থাকত। সেজন্যেই সরকারি আনুকূল্যে ১৭৮০ সালের নভেম্বর মাসে একটি সাপ্তাহিক—**ইন্ডিয়ান গ্যাজেট** পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তারপর ১৭৮৪ সালের চৌঠা মার্চ সরকারি প্রেস থেকে সরকারি আনুকূল্যে প্রকাশিত হয় **ক্যালকাটা গ্যাজেট** পত্রিকা। এই পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায়, ২৫ মার্চ তারিখে, প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা বিজ্ঞাপন।

তখন বাংলা ছাপার ব্যবস্থা ছিলো একমাত্র কম্পানির প্রেসে। হ্যালহেডের ব্যাকরণ ছাপার জন্যে উইলকিনস এবং পঞ্চানন কর্মকার মিলে ১৭৭৭-৭৮ সালে যে-বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন, তাই দিয়েই এই বিজ্ঞাপন এবং প্রথম দুটি বাংলা বই মুদ্রিত হয় ১৭৮৪ সালে।

ওপরে যে-বিজ্ঞাপনের কথা বললাম, সেটি কোনো ব্যক্তিগত অথবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন ছিলো না। এটি ছিলো ইংরেজি, বাংলা এবং ফারসিতে ছাপা একটি সরকারি বিজ্ঞাপন। অতঃপর সরকারি কতোগুলো বিজ্ঞাপন এই তিন ভাষাতে, কখনো কখনো হিন্দিসহ চার ভাষাতে ছাপার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। সেই সুবাদে ১৮০০ সাল পর্যন্ত ১৭ বছরে সহস্রাধিক বাংলা বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় **ক্যালকাটা গ্যাজেটের** পাতায়।

ক্যালকাটা গ্যাজেটে মুদ্রিত প্রথম বাংলা বিজ্ঞাপন

بخلایق و عوام اشتهار داده میشود خانها و باغات و زمین وغیره مطابق تفصیل ذیل بابت گورنر جنرل مستر هستنگ صاحب اگر تا اول ماه اپریل سنه ۱۷۸۴ انگریزی بخوشی خرید فروخت نشود به نیلام فروخت خواهد گردید و این ماه مذکور بتاریخیکه نیلام خواهد شد خبر آن اشتهار خواهد یافت فرد تعلیقه خانه و اشیا وغیره مذکور پیش مستر لارکن صاحب است هر کسانیکه اراده خرید آن دارد پیش صاحب معزالیه رفته معاینه بکنند

دفعه اول خانه سابق مقام علیپور مع اسباب و عمارات و باغات که متقریب و متصل خانه است

دفعه دوم خانه نو مقام علیپور مذکور مع اسباب و بنگله و خانهای لوازمه زراعت و اصطبل

دفعه سیوم چراگاه اهوان وغیره و مشتمل و متصل آن که دو سه قطعه زمین است

دفعه چهارم موازی یکصد و شش بیگهه بسوه زمین اخراج بمقام [illegible] کناره مغرب دریای گنگ که بمقابله یک کروه بطرف جنوب شهر سرامپور واقع است

تحریر فی التاریخ بیستم ماه مارچ سنه ۱۷۸۴ انگریزی مطابق دهم ماه چیت سنه ۱۱۹۰ بنگله

সমস্ত লোককে এস্তাহার দেয়া যাইতেছে শ্রীযুত গবনর জানরেল মেস্তর হিস্টিন সাহেবের ঘর সকল ও বাগান ও জমিন ও গয়রহ মতাবেক তফসিল আয়েন্দ আর ইঙ্গরেজি সন ১৭৮৪ সালের আপরেল মাহের পহিলাতক খোস খরিদে বিক্রি যাইবে অর মাস মজকুরের মধ্যে যে তারিখে নিলাম হইবেক তাহার খবর এস্তাহার পাইবেক বাড়ি ও জমিন আদি মজকুরের তাফসিলের সর্দ্দ শ্রীযুত লারকিন সাহেবের নিকটে আছে যে সকল লোকের কিনিবার ইচ্ছা থাকে সাহেব মজকুরের নিকট গিয়া ফর্দ্দ দৃষ্টি করহ

১ দফা মোকাম আলিপুরের সাবেক ঘর মায় জিনিষ ও দওয়াজিমা ও এমারত সকল ও বাগান যে ঘরের নিকটে আছে

২ দফা মোকাম আলিপুর মজকুরের নুতন ঘর মায় জিনিস ও দওয়াজিমা ও বাঙ্গালা ঘর ও কৃষিকর্ম্মের সামগ্রী রাখিবার ঘর ও আস্তবল

৩ দফা হরিণ আদি চরিবার স্থান ও তাহার সামিল দুই তিন কিত্তা জমিন যে আছে

৪ দফা রিসড়া মোকামে গঙ্গার পশ্চিম পারে এক সও ছয় বিঘা আচাবো কাটা জমিন পাথেরবারি শ্রীরামপুরের সহর হইতে দক্ষিণ দিগ এক ক্রোশ অন্তর আছে

তারিখ ২০ বিসা মাহ মার্চ সন ১৭৮৪ ইঙ্গরেজি মাতাবেক ১০ চৈত্র সন ১১৯০ বাঙ্গালা

Mess. WILLIAMS & RANKIN,

HAVING purchased an investment of China Goods provided by Mr. John MacIntyre, an old resident in China, beg leave to inform the Ladies and Gentlemen of the Settlement, that the goods will be exposed to sale at their Ware-house, as soon as landed.

March 15.

To be LET,

And entered upon immediately,

THAT upper-roomed House and Premises Situated near to the Old Court-house, and lately occupied by Mr. Petrie. For further particulars enquire of Mr. Charles Barton.

March 13.

To be SOLD,

IN the Armenian-street, opposite to Mr. Bondfield's (No. 10), excellent Bourdeaux Wine in casks and bottles, and fine-sample Sweet Oil in cases of 12 bottles.— Transfers on the Treasury will be taken in payment, or goods in barter.

Calcutta, March 18.

এসব বিজ্ঞাপন ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের মতো সংক্ষিপ্ত ছিলো না। কোনো কোনো বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন, বস্তুত, **ক্যালকাটা গ্যাজেটের** আট-দশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত গড়াতো। সব বিজ্ঞাপন যে সরকারি ছিলো, তাও নয়। কয়েক বছরের মধ্যেই বহু ব্যবসায়িক এবং ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হতে থাকে। এই বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপনগুলো একত্রিত করলে মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা দাঁড়াবে সম্ভবত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদযোগে ছাপা সবগুলো বাংলা বই-এর মোট পৃষ্ঠাসংখ্যার তুলনায় বেশি। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের নমুনা হিসেবে এই বিজ্ঞাপনগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

আশ্চর্যের বিষয়, গুরুত্বপূর্ণ এই বিজ্ঞাপনগুলোর কথা আমাদের গবেষকরা কোথাও উল্লেখ করেননি। **ভারতবর্ষ** পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাংলা হরফের জন্মকথা' (১৯৩৯) প্রবন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৮৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি সম্ভবত **ক্যালকাটা গ্যাজেটের** অন্য সংখ্যাগুলো খুঁজে পাননি। এবং সেজন্যেই বাংলা বিজ্ঞাপন নিয়ে, বিশেষ করে বাংলা গদ্যের নমুনা হিসেবে এই বিজ্ঞাপনগুলোর গুরুত্ব নিয়ে তিনি কোনো আলোচনা করেননি।

দুই

সেকালে যেসব বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত সেগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। বেশির ভাগ বিজ্ঞাপনই প্রকাশিত হতো রাজস্ব বিভাগের পক্ষ থেকে। যে জমিদারগণ যথাসময়ে খাজনা পরিশোধ করতে পারতেন না, তাঁদের জমি নিলাম হতো। কিন্তু নিলামের আগে, জমিদারির গুরুত্ব অনুযায়ী, তিন-চার-পাঁচ সপ্তাহ ধরে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো। ইতিমধ্যে খাজনার টাকা জমা দিলে, নিলাম রদ হতো। কখনো কখনো জমিদারগণ বাড়তি কিছুটা সময়ও চেয়ে নিতেন। জমিদারি নিলামের প্রথম বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিলো রাজস্ব বিভাগের Preparer of Reports জোনাথান ডানকানের নামে। তিনি বেনারসে চলে যাবার পর ১৭৮৭ সালের জুলাই মাস থেকে এ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে থাকে জর্জ চার্লস মেয়ারের নামে। তারপর ১৭৯০-এর দশকে প্রথমে কলেক্টরগণের নামে এবং তারপর রাজস্ব বিভাগের সচিবের নামে এই জাতীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

যে আমলের কথা বলছি, তখন লবণ আর আফিম উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার ছিলো কম্পানির। সেজন্যে কম্পানিই উৎপাদিত লক্ষ লক্ষ মণ লবণ আর শত শত সিন্দুক আফিম ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতো বিজ্ঞপ্তি দিয়ে। লবণ এবং আফিম দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক পদাধিকার বলে প্রথমে ছিলেন ডানকান এবং তারপরে মেয়ার। সেজন্যে ডানকানের নামেই লবণ এবং আফিম বিক্রির প্রথম দুটি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। ডানকান চলে যাবার পর কয়েক মাস এ দায়িত্ব পালন করেন মেয়ার। তারপর ১৭৮৮ সাল থেকে লবণ আর আফিম বিক্রির দায়িত্ব বর্তে ভিন্ন একজন তত্ত্বাবধায়কের ওপর।

রাজস্ব বিভাগের পর সরকারি যে-দপ্তর থেকে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিলো, তা হলো পাবলিক ডিপার্টমেন্ট। সরকারি নতুন আইন-অধ্যাদেশ থেকে আরম্ভ করে কলকাতা নগরীর মালিকহীন কুকুরনিধন পর্যন্ত বিচিত্র ধরনের বিজ্ঞাপন এই দপ্তরের নামে প্রচারিত হতো। এই দপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তার স্বাক্ষরে এসব বিজ্ঞাপন ছাপা হতো। তবে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিলো ই হে-র নামে। বহু আলোচিত 'শিক্ষাগুরু' গ্রন্থের রচয়িতা জন মিলারের নামেও বেশ কয়েকটি

জমি নিলামের বিজ্ঞাপন

কাগজের একই পাতায় ছয়টি জমি নিলামের বাংলা বিজ্ঞাপন। সঙ্গে ইংরেজি ও ফারসি তর্জমা

বিজ্ঞাপন দেখা যায়। বোর্ড অব ট্রেড, শুল্ক বিভাগ ইত্যাদির পক্ষ থেকেও কতোগুলো বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়।

বেসরকারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ব্যক্তিও আলোচ্যকালে অনেকগুলো বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিলো। বিষয়বস্তু এবং ভাষার বৈচিত্র্যে এই বিজ্ঞাপনগুলো বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

তিন

ডানকানের নামে জমি নিলামের প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৭৮৬ সালের ৬ জুলাই তারিখে। ঐ মাসের ২৭ তারিখে অনুরূপ যে-বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয়, তা থেকে এ ধরনের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু এবং ভাষার নমুনা পাওয়া যাবে।

> ইস্তহার দেয়া জাইতেছে তারিখ ১ আগস্ত···সাহেবান বোর্ডের হুকুম মাফিক খালিসা সরিফার কছহরিতে মহালাত ও মৌজে জাত বমোজ্জিম তফঃসিল জয়েল নিলামে বিক্রি হবেক যেকেহ খরিদ করিতে চাহ ঐ তারিখে কচহরি মজকুরে হাজির হইয়া খরিদ করহ ইতি—
>
> ১ দফা মোকাম সুতির কারখানার ইমারত যে পূর্ব্বে মেগোইন সাহেবের দখলে ছিল···
>
> ২ দফা পরগনে মাইহাটী ওগয়রহ হিস্যা গোবিন্দপ্রসাদ চৌধুরির নামে যে লিখাজায় কিম্বা তাহার মধ্যে যে কিছু আবস্যাক চৌধুরি মজকুর সাহেবান কমিটে খালিসা সরিফার··· দিক্রি মাফিক রামকিশোর চক্রবর্ত্তির যে কর্জ্জা দেনা হইয়াছে তাহা আদায়ের কারণ ইতি—

ডানকান চলে যাবার পর, মেয়ারের নামে জমি নিলামের যে বিজ্ঞাপনগুলো ছাপা হয়, সেগুলোর পাঠ প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। এমনকি বিভিন্ন জিল্‌'র কলেক্টরগণের নামে কয়েক বছর পরে যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, সেগুলোতেও পূর্ববর্তী গৎ কমবেশি অনুসৃত হয়েছিলো। কিন্তু ১৭৯০-এর দশকের শেষদিকে রাজস্ব সচিবের স্বাক্ষরে প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলো আগের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। ৩০ পৃষ্ঠার ডান দিকের চিত্রে এ-ধরনের কয়েকটি বিজ্ঞাপন দেখা যাবে।

লবণ বিক্রির বিজ্ঞাপনগুলো সব সময়ে দীর্ঘ হতো। এগুলোর গোড়াতে বর্ণনা থাকতো কোথায় কতোটা লবণ বিক্রি হবে। তারপর প্রতিবারেই ছাপা হতো বিক্রির শর্তাদি। নিচে এ ধরনের একটি বিজ্ঞাপনের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি।

> নমক বিক্রির পাচ দিবস পরে আমানত ট(া)কা জাহা দাখিল করিতে হইবেক তাহার এওজ কুম্পানির কাগজ দিলে আমানত রাখা জাইবেক ডিষকৌন্ট বাদে নমক লওনের জে তারিখ নিরোপন হইলো সেই করার মাফিক জদি নমক নালয় তবে নমক পুনরায় বিক্রি হইবেক ইহাতে জাহা লোকসান হইবেক তাহা পহিলা খরিদারের আমানত টাকা হইতে লওয়াজাইবেক নগদ টাকা দাখিল করিয়া প্রত্যক্ষে নমকের তনখা লইবেক আমানত টাকা সেস কিস্তিতে মযুরা পাইবেক পাচ সও

ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখ সাল ১৭৮৫ সন ইঙ্গরেজি শ্রী° হিষ্টিন বাহাদর কোম্পানির জাহাজের থাকিয়া বাঙ্গালার বড় সাহেবির ও বাঙ্গালির কাজের ইস্তফা লিখিয়া পাঠাইলেন বিলাতের বাদসাহের সন এ ও সন কোর্ট ডিরেক্টরের দুই হুজুর সায়েতে লিখিয়াছেন তখন বাঙ্গালার গবর্ণরের কাম করেন কিম্বা ই[illegible] দিবেক কি ডাক্তার হইয়া তাহার বড় সাহেবির আমলায় থাকিবেক তাহার পিছে যে কৌন্সিল সাহেব সাহেব থাকিবেক সেই বড় সাহেব হইবেক গবর্ণর হিষ্টিনের ইস্তফা দিবার সময় শ্রী° জান মেকফারসন [illegible] হিষ্টিন সাহেবের মোহর মহরায় কৌন্সলি ছিলেন এই জন্য [illegible] খবর দেওয়া জাইতেছে যে ফে[illegible] মাসের ৮ তারিখ হইতে শ্রী° জান মেক ফারসন বাহাদর বাঙ্গালার গবর্ণর হইলেন আর বড় সাহেবির দ[illegible] দিব্য করিয়া হিষ্টিন সাহেবের আমলায় কাইম থাকের বড় সাহেব হইলেন ইতি সন ১৭৮৫ সাল ইঙ্গ[illegible] তারিখ ১২ ফিবরেল

জন ম্যাকফারসনের নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

লটারির বিজ্ঞাপন। ১৭৮৪

কলিকাত্তা জুলাই সন ১৭৮৪ ইঙ্গরেজি মোতাবেক ২৯ আসাড় সন ১১৯১ বাঙ্গালা পুরাণা আদালতের ঘরে লটারি খেলা হইবেক — — — — — — —

একারণ ছোট বড় সকলকে সংবাদ দেয়া জাইতেছে যে তিন হাজার লটারির কাগজ এক এক কাগজ দস মোহরের দাম টাকা একসত সাটি সিক্কা করিয়া এসলে চারি লক্ষ আসি হাজার টাকা সিক্কা হইয়াছে ইহার মধ্যে দুই হাজার একসত লটারির কাগজ দাখিল হইয়াছে নয়সত লটারির কাগজ বাকী আছে আহার বাসনা হয় বাজার [illegible] মেস্তর মেটকাফ সাহেবের বাটিতে গিয়া দাখিল করে — —

ঐ লাগের চিঠী সকল তিন সত পঞ্চত্রিস চিঠী ইহার বিত° এক চিঠী লক্ষ টাকার এক চিঠী পঞ্চাস হাজার টাকার এক চিঠী ত্রিস হাজার টাকার এক চিঠী বিস হাজার টাকার আর দুই চিঠী দস হাজার টাকা করিয়া আর চারি চিঠী পাঁচ হাজার টাকা করিয়া আর পনরো চিঠী দুই হাজার টাকা করিয়া আর পঞ্চাস চিঠী এক হাজার টাকা করিয়া আর দুই সত সাটি চিঠী পাঁচ সত টাকা করিয়া — — —

তাহার চিঠী আগে বাহির হইবেক সে জেমোনা দস হাজার টাকা পাইবেক আর তাহার চিঠী সকল পিছে বাহির হইবেক সে বিস হাজার টাকা জেমোনা পাইবেক সবসুদ্ধ চারি লক্ষ আসি হাজার টাকা সিক্কা হইল থালি সাদা কাগজের চিঠী দুই হাজার ছয় সত পঞ্চসষ্টি হইয়াছে — — —

এই লটারির কাজে নিযুক্ত মেস্তর গুড়উইন সাহেব মেস্তর পিয়ার সাহেব মেস্তর পেস্কার্টন সাহেব মেস্তর কালবিন সাহেব মেস্তর [illegible] সাহেব মেস্তর [illegible] সাহেব মেস্তর মেটকাফ সাহেব মেস্তর মেকনাব সাহেব মেস্তর এলিস সাহেব এই সাহেবের দিগের পরামর্শ স্থির হইয়াছে — — — —

যে লোকেরা জিতিবেক তাহার মধ্যে কিস্তাপে নয় টাকার হিসাবে দিবেন ইহার আদ্দেক ইংরাজি পাঠশালার অনাথের খরচ হইবেক আর আদ্দেক যে সাহেব কাজের আঞ্জাম করিয়াছে সেই পাইবেক — —

CALCUTTA GAZETTE.

Published by Authority.

VOL. XX.] THURSDAY, FEBRUARY 27, 1794. [No. 522.

To Sir JOHN SHORE, Bart.
Governor General in Council,
&c. &c. &c.

MESSRS. DAVIDSON & MAXWELL

FOR SALE.

ADVERTISEMENT.

ইস্তাহারনামা

MRS. SPIEGEL,

CALCUTTA THEATRE.

For the Benefit of Mrs. Couzens.
THE COMEDY OF
BETTER LATE THAN NEVER
With an
OCCASIONAL PROLOGUE

Now Published,
AT THE MIRROR PRESS,
Bengal Kalendar & Register,

REMITTANCE.

Remittance to England.

কালকাটা গ্যাজেটে প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের বিজ্ঞাপন। ১৭৯৪

মোন নমকের কম তনখা হইবেক না—নমক ছাড়ের টাকা সিগ্রহ মোক্তার কার সাহেবের দপ্তরে দাখিল করিতে হইবেক...পহিলা বিক্রির তারিখ হইতে তিন মাহার মধ্যে সোহবত দেওয়া জাইবেক।

এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৭৮৭ সালের ১২ মে তারিখে। পরবর্তী তের বছর লবণ বিক্রির বহু বিজ্ঞাপন যথাক্রমে মেয়ার, ক্যালভার্ট, গ্রিগুল এবং কটনের নামে প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু ডানকান লবণ বিক্রি সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনের যে কাঠামো তৈরি করে দিয়েছিলেন, কম বেশি তা-ই সবাই অনুসরণ করেন। এমনকি নিরোপন, সিগ্রহ, প্রতীক্ষা, সুভিত্তা (সুবিধা) ইত্যাদি অনেকগুলো প্রাদেশিক বানানও অক্ষুণ্ণ থাকে।

ভাষা এবং বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য দেখা যায় পাবলিক ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপনে। জমি নিলাম এবং লবণ ও আফিম বিক্রির মতো নির্দিষ্ট কোনো বিষয়বস্তু না থাকায়, এই বিজ্ঞাপনগুলোয় বিশেষ কোনো গৎ বা ভাষাগত কোনো ঐক্য লক্ষ্যগোচর নয়। এক এক সময়ে এক একজন কর্মকর্তার নামে এসব বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিলো। হেস্টিংস পদত্যাগ করায় নতুন গবর্ণর জেনরেল হলেন জন ম্যাকফারসন, কলকাতায় কিছু বিদেশী লোক এসে নানা উৎপাত করছে, বঙ্গদেশ থেকে নারীপুরুষ কিনে নিয়ে অন্যত্র বিক্রি করা হচ্ছে—এই দাস ব্যবসায় বেআইনি, বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, সুতরাং এখান থেকে খাদ্যশস্য অন্যত্র চালান দেওয়া যাবে না ; লবণের দাম বেড়ে যাওয়ায় দরিদ্ররা লবণ কিনতে পারছেন না, অতএব বাজারে বাড়তি লবণ ছাড়া হলো ; কলকাতায় ওড়িয়াদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার হচ্ছে, এসবের জন্যে শাস্তিভোগ করতে হবে ইত্যাদি বহু ধরনের বিজ্ঞাপন পাবলিক ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো। নিচে এ ধরনের একটি বিজ্ঞপ্তি উদ্ধৃত করছি। এটি প্রচারিত হয়েছিলো জন মিলারের নামে। কলকাতায় প্রায়ই ঘরবাড়িতে আগুন লেগে যেতো এবং তার ফলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হতো। এর প্রতিকার করার জন্যেই এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়।

এই তারিখ অবধি সহর কলিকাতার মধ্যে বসতবাটী কিম্বা দোকানঘর ওগয়রহ খড় কিম্বা বিচালি কিম্বা হোগলা ও দরমা ওগয়রহ দ্রব্য জাহাতে সিগ্র অগ্নি লাগে ইহা দিয়া ছাইতে পারিবা না—

এই তারিখ অবধি কেহ খড় সহর কলিকাতায় আনিতে পারিবা না আর বাঁস গরান দরমা এবং জাহাতে হটাত অগ্নি লাগে এমন জিনিষ গোলা করিয়া কেহ সহরে রাখিতে পারিবা না আর জে কেহ মহাজন লোক বাঁস খড় গরান দরমা বিচালি ওগয়রহ গোলা করিয়া রাখিয়াছো ঐ তারিখ অবধি পোনের রোজের মধ্যে উঠাইয়া লইবা

জে সকল বাটী ও দোকানঘর ওগয়রহ খড় কিম্বা বিচালি কিম্বা হোগলা ও দরমা দিয়া ছাওয়া আছে তা ১ নবম্বরের পর থাকিবে না।

তবে বিষয়বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন। বাড়ি, লটারির টিকিট, অলঙ্কার ইত্যাদি বিক্রি থেকে আরম্ভ করে তীর্থ করতে যাবার আগে সকলের দাবিদাওয়া মিটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ—সবই এসব বিজ্ঞাপনে লক্ষ্য করা যায়। নিচে এ জাতীয় কয়েকটি বিজ্ঞাপনের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি।

১· দসওঁ জুলাই সন ১৭৮৪ ইংরেজি...বাঙ্গলা পুরানা আদালতের ঘরে সরতি খেলা হইবেক একারণ ছোটবড় সকলকে সংবাদ দেয়া জাইতেছে যে তিন হাজার সরতির কাগজ এক এক কাগজ দস মোহরে...ইহার মধ্যে দুই হাজার এক সত সরতির কাগজ দাখিল হইয়াছে নয় সত সরতির কাগজ বাকী আছে জাহার বাসনা হয় বাঙ্গাল বেঙ্ক মেজর মেটকাফ সাহেবের বাটিতে গিয়া দাখিল করো...জাহার চিঠী আগে বাহির হইবেক সে জেয়াদা দস হাজার টাকা পাইবেক আর জাহার চিঠী সকল পিছে বাহির হইবেক সে বিস হাজার টাকা জেয়াদা পাইবেক...

২· বোম্বাই হইতে কাং নেকলেষ পেলি সাহেবের সঙ্গে গোলাম মহিদিন খানসামা আসিয়াছিল সে মেছুয়াবাজারে রাজুবাড়ের বাটিতে ছিল সে বোম্বাইয়া লোক মোছলমান তাহার বএস বৎসর ত্রিসেক সে সাহেবের মশমল ও ডুরিয়া আ (র) ২ কাপড় ও জিনিষ বিস্তর লইয়া পলাইয়াছে যদি তাহাকে কেহ ধরিয়া কিম্বা খবর ডাক্তার কাং টাষকল সাহেবের কাছে আনিতে পারহ তবে তাহাকে সাহেব ৫০ পঞ্চাশ টাকা বক্সিষ দিবেন ইতি—

৩· শ্রীরামলোচন বাবু ও গোকুলচন্দ্র মিত্র দুই জনে আদালতে ধলেপুর পরগনার ধানের

খবর দেওয়া যাইতেছে
যে মোহকবা দরখাস্ত দেওয়া যাইবেক
শ্রীযুত মেম্বার সাহেবানের কাছে
বিতে ম.গ.ম ১ তিবরের মাহাতক
কম্ ও গলী পবদয়া নাশকরিবার
কারণ ইহার মিয়াদ একবৎসর ইং
১ মার্চ ১৭৯৭ সাল দরখাস্ত
গাওয়া যাইবেক বিনশন নহরের
যার কিম্বা ওত তিরিতন যারকিম্বা
দক্ষীণ তিরিতন যাহা নকল রাস্তা
ও গলী ও দরদালান নাশকরিবে এই
প্রকার ইসকেপিকরের দিগের
তাঁরে যার কিম্বা অন্য কোনো
লোককে তাহাকে ঐ কাজে মোকরর
করাতে এইপ্রকার গড়খানা
বহুবাজারে মরকাজীদে ওয়া যাইবেক
যার কনট্রাক্টর ও কনট্রাকটর দিগের
দরখাস্ততে নিরশানা নিলেন বরাবর
মেং আলান্দির সাহেব নিরশানার

জন মিলার সাহেবের বিজ্ঞাপন

কাজিয়া হইয়াছিল তাহাতে মিত্র ময়ুকুর এখানে হারিয়াছিলেন সেই মকদ্দমা বিলাতে গিয়াছিল তাহাতে ও বাবু জিতিলেন মিত্র ময়ুকুর হারিলেন।

৪· আমার স্ত্রি কেলারিন্দা বরোস আমার বাটী হইতে অনাহুতা গিয়াছে অতএব আমি খবর দিতেছি কেহু জদি কেলারিন্দা বরোসের সহিত সনশ্রপ করে তবে আমী তাহার নামে আদালতে নালিশ করিব আর সেই কেলারিন্দা বরোসকে জদি কেহ কর্জ্জ দেয় তবে আমার সঙ্গে সে দাত্তার এলাকা নাহি।

৫· প্রানকৃষ্ণ বিস্বাষ তিন কোম্পানির সারটীফিকেট দিয়াছিলেন সোনাতন সিলকে যুদ যানিবার নিমিত্তে তাহাতে তিনি সেই তিন সারটীফিকেট সহিত অদরসন হইয়াছেন তাহার নম্বর সন তারিখ নিচে জিগির আছে।

৬· বিক্রি হইবেক।

একটা বড় সুবুদ্ধী সিংহির মাদি বাচ্ছা আরাবী মুলুকের ইহার কির্ম্মত সিক্কা ২০০০ দুই হাজার তঙ্কা জে কেহ খরিদ করিতে চাহে মেং দৃং এন কোং সাহেবকে জিজ্ঞাসিলে পাইবেক—

৭· মতালকে জেলা চব্বিষ পরগনার রসা সাকীনের শ্রীগোরী চরন ঘোষের এডবেরটাইষ আমারদিগের তালুক ও বাজেজমী ওগয়রহ সমস্ত সাধারণ আছে ইহার হিস্যাদায় আমি হিস্যা অংসাঅংস চিহ্নীত কাহার হয় নাই তাহাতে আমার ছোটভাই শ্রীরাধাচরন ঘোষ কারসাজী করিয়া ঐ সাধারণ তালুক ওগয়রহ আমার হিস্যা পয়মাল করিবার কারণ কারসাজী বিক্রি অথবা বন্দক দেওনের উদ্যোগে আছেণ অতয়েব সকলকে জানাইতেছী তোমরা কেহ খরিদ অথবা বন্দক কিবল রাধাচরন ঘোষের দস্তখতে লইবে নাই লইলেও মঞ্জুর হইতে পারিবেক নাই ইতি শ্রীগোরীচরন ঘোষস্য।

উদ্ধৃত বিজ্ঞাপনগুলো বিচিত্র বিষয়ের। সেকালের কলকাতায়, বিশেষ করে ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে, যে কর্মকাণ্ড চলছিলো, তারই আভাস পাওয়া যায় এসব বিজ্ঞাপন থেকে। মালয় থেকে দুর্বৃত্তরা এসে কলকাতার ধারে কাছে দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়েছে, ইংরেজ কর্মচারীরা বাঙালি নারী-পুরুষকে জোর করে ধরে নিয়ে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে বিক্রি করছে, নায়েবরা কম্পানির নাম করে রায়তের ওপর অত্যাচার করছে, ছদ্মবেশী ইংরেজ পুলিশ সেজে সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছে, আফিম উৎপাদনের জন্যে ইংরেজরা স্থানীয় লোকেদের দাদনি দিচ্ছে, বেসরকারি উদ্যোগে বীমা কম্পানি স্থাপনের চেষ্টা চলছে, হসপিটাল চালু করার জন্যে চেষ্টা করছেন ভদ্রলোকেরা ইত্যাদি কৌতূহলোদ্দীপক বহু খবরই এসব বিজ্ঞাপন থেকে পাওয়া যাবে। কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য হলো জমিদারি নিলাম বিষয়ে। আমাদের ঐতিহাসিকরা বলেছেন যে, খাজনার দায়ে শতাব্দীর শেষ দু দশকে মুসলমানদের জমিদারি নিলাম হয়ে যায় আর কলকাতাবাসী নগদ টাকাওয়ালা হিন্দু ব্যবসায়ীরা সেসব জমিদারি কিনে রাতারাতি অনুপস্থিত জমিদারে পরিণত হন। কিন্তু এসব বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যে জমিদারিগুলো নিলামে বিক্রি হয়েছে, তার পনেরো আনাই হিন্দুদের। আমার ধারণা, এসব বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত তথ্য থেকে এ সম্পর্কে যথার্থ সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব।

কিন্তু আলোচ্য বিজ্ঞাপনগুলোর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব বাংলা গদ্যের নিদর্শন হিসেবে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ-পূর্ববর্তী গদ্যের ব্যাপক নমুনা অতি সাম্প্রতিককালের আগের পর্যন্ত পাওয়া

ভাষা এবং বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য দেখা যায় পাবলিক ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপনে। জমি নিলাম এবং লবণ ও আফিম বিক্রির মতো নির্দিষ্ট কোনো বিষয়বস্তু না থাকায়, এই বিজ্ঞাপনগুলোয় বিশেষ কোনো গৎ বা ভাষাগত কোনো ঐক্য লক্ষ্যগোচর নয়।

বিক্রি কারণ—
মাং দ্রীং বাথমেন এন কো—
বিক্রি হইবেক নিলামে একদোতালা
পাকা বাটী নিলাম হইবেক রোজ
শনিবার তারিখ ১৮ মাগস্ত মাহ
মামলা কিতা জমী মওজাকে বড়
বাজারের বড়তলা জমী কমবেশ
/৪ চারিকাটা সাবেক মহলে
হাঁথ সমার ও পাইসার খুব
কিফাতের মাওতাত বটে ইহাতে
কতো ঘর ওগয়রহ কালাতে
নিলাম দিবসের মধ্যে মেং দ্রীং
বাথমেন এন কো সাহেবের কাছেতে
দেখিতে পাইবেক দরখানের বিলপাল
যাহে তাহার বিক্রী লিখিয়া
দেওয়া যাইবেক ইহার খবর
খবরা নাগাবেক লা লিখবাটী
মামলা পাইবেক ইতি——

এই বিজ্ঞাপনটি ত্রিভাষা ছাড়া কেবল বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল

যায়নি। বর্তমান বিজ্ঞাপনগুলো সেই অভাব অনেকাংশে দূর করেছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আগেকার বাংলা গদ্যের যেসব নমুনা এযাবৎ পাওয়া গেছে, সেসবের মধ্যে রয়েছে ১· চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ ; ২· কিছু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ; এবং ৩· উনিশখানা মুদ্রিত আইনগ্রন্থ ও কিছু সরকারি কাগজপত্র। এসবের মধ্যে চিঠিপত্র এবং দলিল দস্তাবেজের ভাষা, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, সর্বত্রই আরবি-ফারসি প্রভাবিত। অপরপক্ষে মুদ্রিত আইনগ্রন্থগুলোর মধ্যে যেগুলো ডানকান, মেয়ার এবং ফরস্টারের নামে প্রকাশিত, সেগুলোর ভাষা সংস্কৃত প্রভাবিত। বহু জায়গায় এই সংস্কৃতায়ন চেষ্টাকৃত এবং কৃত্রিম। শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদির ভাষাতেও সংস্কৃত প্রভাব কমবেশি লক্ষণীয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে : মধ্যবর্তী স্টাইলের কোনো বাংলা কি সেকালে প্রচলিত ছিলো না ?

বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত বিজ্ঞাপনের ভাষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সে ধরনের বাংলাও সেযুগে প্রচলিত ছিলো। সজ্ঞানে সংস্কৃতধর্মী বাংলা প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন ফরস্টার এবং তাঁর মুনশিরা আর আরবি-ফারসি প্রভাবিত স্টাইল ধরে রাখার প্রয়াস পান পুরনো রীতিতে শিক্ষিত মুনশিরা। কিন্তু মধ্যরীতির যে ভাষা লিখিত না থাকায় হারিয়ে গেছে, আমার ধারণা কোনো কোনো বিজ্ঞাপনে তারই আভাস পাওয়া যায়। আর সে জন্যেই, পুরনো বাংলা গদ্যের ইতিহাস পুনর্নির্মাণে এই বিজ্ঞাপনগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। ■

শারদীয়া
আনন্দবাজার পত্রিকা
১৩৯৪

বিশেষ আকর্ষণ

কন্যাজন্ম : কন্যাবিসর্জন

ধর্ম ও সংস্কারের নামে আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে নারী-নির্যাতন চলে এসেছে। সতীদাহকেই তার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বলে মনে করা হত। কিন্তু তার চেয়েও নির্মম প্রথা ছিল জন্মানো মাত্র কন্যাসন্তানকে হত্যা করা অথবা গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া। সেই সম্পর্কে প্রচুর তথ্যে পূর্ণ সুদীর্ঘ-সচিত্র এই রচনা লিখেছেন : অভী দাস।

বাঈজী-বিলাস

ওয়াজেদ আলি শা-র সঙ্গে লখনউ থেকে কলকাতায় আসেন বাঈজীরা। তারপর বাবু-কালচারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গিয়েছিল বাঈজী-কালচার। তারই রোমাঞ্চময় ইতিহাস এই সচিত্র-সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে। একেবারে হাল আমলের কলকাতার বাঈজীরাও এই রচনার অন্তিম পর্বে উপস্থিত। লিখেছেন : সোমনাথ চক্রবর্তী।

যাযাবর ইরানীদের সঙ্গে

ভারতবর্ষের সব প্রান্তেই এই সুদর্শন যাযাবর সম্প্রদায়ের পরিচয় ইরানী হিসেবে। ইউরোপে এরাই কি জিপসি নামে পরিচিত? হঠাৎ পাশাপাশি কয়েকটা তাঁবু ফেলে এদের আকস্মিক উদয়, দু-চারদিন পরেই ভোজবাজির মতো উবে যায় এই অসাধারণ সুন্দরী বেদেনীর দল। কোথা থেকে এল, কেন এল, কী এদের রীতিনীতি, বিভিন্ন ইরানী দলের সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘুরে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এই সচিত্র রচনা। লিখেছেন : অঞ্জলি দে।

বড় গল্প

বিমল কর
সমরেশ মজুমদার

প্রবন্ধ

সুকুমার সেন

উপন্যাস

কালকূট
রমাপদ চৌধুরী
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব গুহ
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
রাধানাথ মণ্ডল

গল্প

আশাপূর্ণা দেবী
মতি নন্দী
ইন্দ্রমিত্র
মহাশ্বেতা দেবী
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
দিব্যেন্দু পালিত
আশীষ বর্মন
অভ্র রায়
শেখর বসু
তুলসী সেনগুপ্ত প্রমুখ

কবিতা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
জগন্নাথ চক্রবর্তী
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়
তারাপদ রায়
সুনীল বসু
আনন্দ বাগচী
বটকৃষ্ণ দে
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
আলোক সরকার
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়
রত্নেশ্বর হাজরা
দেবারতি মিত্র
অরুণ বাগচী
বিজয়া মুখোপাধ্যায়
সাধনা মুখোপাধ্যায়
মানস রায়চৌধুরী
পার্থসারথি চৌধুরী
প্রমোদ বসু
প্রমুখ

দাম : ৩৬·০০ টাকা

পূজা সংখ্যা মানেই আনন্দবাজার

CLARION-CARAB

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও সাহেবি গদ্য

লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

সাহেবদের লেখা বাংলা গদ্যের কালানুক্রম নির্ণয় করা সহজসাধ্য কাজ নয়। গ্রিয়ার্সনের মতে জন চেম্বারলেন এবং ডেভিড উইলকিন্স-কৃত খ্রীষ্টীয় প্রার্থনার একটি তথাকথিত বঙ্গানুবাদই সম্ভবত ইংরেজ সাহেবদের লেখা বাংলা রচনার প্রথম নিদর্শন। এই লেখাটি ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই রচনাটি যথার্থ বাংলা কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বস্তুত উইলকিন্স নিজেই এই সন্দেহের কথা ব্যক্ত করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, উল্লিখিত রচনাটি বাংলা হরফে লেখা হলেও তা আদৌ বাংলা ভাষা নয়; তাঁর ধারণা যে সেই সময় বাংলা ভাষার খুব সম্ভব প্রচলনই ছিল না।[১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলা ভাষা তথা বাংলা গদ্যের প্রচলন ছিল কিনা, সেই বিতর্ক আপাতত মুলতুবি রাখা যেতে পারে। তবে বিতর্ক সৃষ্টি না করেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্থাৎ এ-দেশে ইংরেজ রাজত্ব যখন কায়েম হয় তার আগের যুগে ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গে বাংলা ভাষার যথেষ্ট পরিচয় ঘটে ওঠেনি। তাই সে যুগে তাঁদের লেখা বাংলা গদ্যের যথেষ্ট নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়নি—তা সম্ভবও নয়।

কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই কলেজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদগণের উৎসাহ ও উদ্যোগে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মত বাংলা গদ্যরীতি তথা গদ্যভাষারও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের দেশীয় ভাষার প্রকাশনাগুলির গুরুত্ব সর্বজনবিদিত। এই বিষয়ে পুনরালোচনা নিরর্থক। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই প্রকাশনাগুলির গুরুত্ব এই নয় যে এগুলিই বাংলা গদ্য রচনার প্রথম ফসল। বস্তুত এর আগেও বাংলা গদ্যের নমুনা দেখা গিয়েছে। কিন্তু প্রতিদিনের কাজকর্মে সেই ভাষা ব্যবহার করার মত যথেষ্ট মজবুত বা সমৃদ্ধ ছিল না। সেই হিসেবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রকাশিত বাংলা গদ্যের ভাষা যে অনেক বেশি লোকায়ত এবং উন্নতমানের ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কলেজের সাহেব ছাত্রদের দ্বারা রচিত বাংলা গদ্যের কয়েকটি নমুনা পরীক্ষা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। এখানে এমন একটি নমুনা উদ্ধৃত করা হল। এটি হেনরি সারজ্যান্ট নামে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জনৈক ছাত্রের রচিত একটি পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের

লর্ড ওয়েলেসলি

অংশবিশেষ। সারজ্যান্ট ১৮০৮ সালে ঐ কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় 'ইলিয়াড'-এর কিয়দংশ অনুবাদ করেন। তাঁর রচনা শ্রীমদ্ভাগবত-এর একটি গদ্যার্থ সংগ্রহের পাণ্ডুলিপি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এই পাণ্ডুলিপির প্রথম ও শেষ ভাগ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল:

প্রথমাংশ:

"পূর্ব্বকালে পরীক্ষিত নামা এক রাজা তিনি অস্ত্র শাস্ত্রে বিশারদ এবং যুদ্ধেতে অতি বড় শূর ছিলেন। তাঁহার পূর্ব-পুরুষ পাণ্ডু নামে রাজা অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন :—

এক দিবস রাজা পরীক্ষিত মৃগয়াসক্ত হইয়া মৃগান্বেষণ করত এক হরিণ প্রতি বাণাঘাত করিলেন। তাহাতে কুরঙ্গ সেই স্থান হইতে অতি শীঘ্র পলায়ন করিলেন। নৃপতিও পশ্চাত ধাবমান হইয়া পিপাসা ও ক্লান্ত হইয়া বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেই নির্জ্জন স্থানে শমীক নামা এক সিদ্ধ ঋষি বাস করেন তাহার আরাধনার এই নিয়ম দুগ্ধপোষ্য গোবৎস মুখ হইতে ভূমিতে স্বয়ং পতিত দুগ্ধমাত্র পান করিয়া তপস্যা করেন।"

শেষাংশে:

"সেইকালে কৃষ্ণ কারাগারের যে স্থানে বসুদেব ও দেবকী আছেন সেই স্থান গিয়া আপন পিতার ও মাতার চরণোপান্তে পতিত হইলেন যদ্যপি বসুদেব ও দেবকী গাত্রোত্থান করাইতে বহুবিধ যত্ন করিলেন কিন্তু কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ থাকিয়া এইরূপ বিনয়বাক্য কহিতে লাগিলেন হে পিত হে মাত তোমরা যে সন্তানের নিমিত্তে নানাপ্রকার ব্যামোহযুক্ত ও শোকাকুল হইয়াছিলা সেই পুত্র দ্বারা কিয়দ্দিন সুখেতে কালযাপন করহ। তখন বসুদেব ও দেবকী কৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম জানিয়া অনেক প্রকার স্তব ও প্রার্থনা করিলেন তদনন্তর কৃষ্ণ মৃত্তিকা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত : হেনরি সারজ্যান্টের অনুবাদ

সারজ্যান্ট ছাড়া কলেজের আরো কয়েকজন কৃতী ছাত্র বাংলা গদ্যের অনুশীলনে বিশেষ রকম উৎসাহ প্রদর্শন করেন। এ ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষও ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করবার জন্য তাঁদের নানাভাবে প্রেরণা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন পরেই এখানে প্রতি বছর বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বিতর্ক সভা ও রচনাপ্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত। এইসব প্রতিযোগিতায় সফল ছাত্রদের মধ্যে নানারকম পুরস্কার ও পদক বিতরণ করা হত। বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি নির্ভরযোগ্য ও বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত এইসব সাংবাৎসরিক পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতাসমূহের কিছু ধারাবাহিক বিবরণীর সন্ধান পাওয়া যায়।[২] কিন্তু এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার আগে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে কিছু প্রারম্ভিক পরিচয় দিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ-দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য বিলেত থেকে তরুণ সিভিলিয়ানদের নিয়ে আসা হত। কোম্পানির প্রত্যক্ষ উৎসাহদানের ফলে এই সকল সিভিলিয়ানরা দেশীয় আমলাদের সমস্ত রকমের

গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারিত করে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় নিজেরাই ক্রমে ক্রমে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। এঁরা ছিলেন ভাগ্যান্বেষী যুবক এবং অনেক সময় স্বদেশে শিক্ষাদীক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই চাকরি পাওয়ার আশায় এঁদের ভারতে ছুটে আসতে হত। ভারতে এসে অগাধ ক্ষমতা এবং অপরিমিত অর্থের দৌলতে এঁরা প্রায়শই দাম্ভিক, উচ্ছৃঙ্খল এবং অকর্মণ্য হয়ে পড়তেন। অথচ কর্নওয়ালিশ কোড (মে, ১৭৯৩) চালু হওয়ার পর এইসব প্রায় অপদার্থ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের উপরেই আরও বেশি করে প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। কর্নওয়ালিশ এই সকল কর্মচারীদের সততা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য কিছু সাময়িক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয়নি। আসলে এইসব তরুণ সিভিলিয়ানরা যে দেশ শাসন করতে এসেছিলেন সেখানকার অধিবাসীদের আচার আচরণ, ভাষা এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন এবং এমনকি এ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করবার জন্য তাঁরা আগ্রহও বোধ করতেন না। ১৭৯০ সালে ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে গভর্নর জেনারেলের একটি প্রসিডিংস থেকে জানা যায় যে, কোম্পানির সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষালাভে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সে সময় কোম্পানির তরফে শিক্ষার্থীদের একটি বিশেষ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় সামান্য পরিমাণ ভাতার জন্য এই ধরনের শিক্ষা অর্জনের জন্য বড় একটা কেউ এগিয়ে আসেননি।

অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে আসে যে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্যই এই সকল তরুণ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত করানোর জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা আবশ্যক হয়ে উঠল। লর্ড ওয়েলেসলি এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তাঁরই ব্যক্তিগত উৎসাহে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজে তিন বছরের জন্য এক একটি শিক্ষাক্রম চালু করা হয়। আধুনিক ইতিহাস ও সাহিত্য, প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্য, আন্তর্জাতিক আইন, নীতিবিদ্যা, ভারতীয় ইতিহাস ও আইনবিধি (রেগুলেশন), জুরিসপ্রুডেন্সসহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা প্রভৃতি এই কলেজের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে সকল ভারতীয় ভাষায় এই কলেজে পঠন-পাঠন হত সেগুলি হল—আরবি, ফার্সি, হিন্দুস্তানী, সংস্কৃত, বাংলা, মারাঠি, তামিল, তেলেগু এবং কানাড়ি। এছাড়া রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি নানারকম বৈজ্ঞানিক বিষয়ও এই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ এবং সদর আদালতের মাননীয় বিচারকদের নিয়ে গঠিত একটি সমিতির উপর এই কলেজের পরিচালন ভার অর্পিত হয়েছিল। কলেজ অফিসের খাতাপত্র দেখাশোনার জন্য তিনজন বাঙালি করনিক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁরা হলেন সর্বশ্রী জগমোহন চট্টোপাধ্যায়, দত্তরাম পাকড়াশি এবং কালীচরণ ঘোষাল। কলেজের বাঙালি গ্রন্থাগারিকের নাম ছিল মোহনপ্রসাদ ঠাকুর।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রাচ্যবিদ্যা ও ভাষা বিষয়ে অধ্যাপনা করার জন্য অনেক ইংরাজ মনীষী আহ্বান করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক লব্ধপ্রতিষ্ঠ পাদ্রী উইলিয়াম কেরি-র নাম সকলেই জানেন। ইনি ছাড়া আর কয়েকজন বিদেশী অধ্যাপকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা ফার্সি ও আরবি ভাষার অধ্যাপক ম্যাথু লামসডেন ও মেজর জন ওয়েস্টন, হিন্দুস্তানী ভাষার অধ্যাপক উইলিয়াম টেইলর ও ক্যাপ্টেন টমাস রোবাক এবং বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক উইলিয়াম প্রাইস। বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করার জন্য কয়েকজন বাঙালি পণ্ডিতও এই কলেজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে হেড পণ্ডিত রামনাথ ন্যায়বাচস্পতি (১৮০১) ও সেকেন্ড পণ্ডিত রামজয় তর্কালঙ্কার (জুলাই ১৮১৬) ভিন্ন আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় (মে ১৮০১), কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত (সেপ্টেম্বর ১৮০১), রামকিশোর তর্কচূড়ামণি (নভেম্বর ১৮০৫), পদ্মলোচন চূড়ামণি (মে ১৮০১), শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার (সেপ্টেম্বর ১৮০১), রামকুমার শিরোমণি, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, রামচন্দ্র রায় (মার্চ ১৮০৩), নরোত্তম বসু (মার্চ ১৮০৬) এবং কালীকুমার রায় (মার্চ ১৮০৩)।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পঠন-পাঠন বেশ আগ্রহ নিয়েই শুরু করা হয়েছিল। চার্লস মেটকাফ এবং উইলিয়াম বাটারওয়ার্থ বেইলি-র মত কোম্পানির নামকরা সিভিলিয়ান ও গভর্নর জেনারেলরাও এই কলেজের ছাত্র হিসাবে শিক্ষালাভ করে কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করেন। কিন্তু যেহেতু লর্ড ওয়েলেসলি বিলেতের কোর্ট অফ ডিরেকটর্স-এর আগাম অনুমতি না নিয়েই এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই কারণে কোম্পানি পরিচালকসভা কলেজটি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন। তাঁরা সিভিলিয়ানদের প্রশিক্ষণের জন্য ১৮০৫ সালে লন্ডনের কাছে হেইলিবারি কলেজ প্রতিষ্ঠা করলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গুরুত্ব ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে। ফলে এক বছর বাদে অর্থাৎ ১৮০৭ সালে এই কলেজটি একান্তভাবেই ভারতীয় ভাষাসমূহের পঠনকেন্দ্র (সেমিনারি) হিসাবে পরিণত হয়। এরপর হিন্দু কলেজ প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ার পর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গুরুত্ব আরও কমে যায় এবং অবশেষে ১৮৫৪ সালে এর লুপ্তি ঘটে।

কিন্তু যে কয় বছর এর অস্তিত্ব ছিল সেই সময়ের মধ্যে ইউরোপিয়ান এবং বিশেষ করে বিলিতি সাহেবদের মনে বাংলা ভাষা সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করবার কাজে এই কলেজ প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আগেই বলা হয়েছে কলেজের সাহেব ছাত্রদের মধ্যে বাৎসরিক বিতর্ক সভা ও বাচন প্রতিযোগিতার (Disputation & Declamation) আয়োজন করা হত। এই সভায় এক একটি পূর্ব-নির্ধারিত বিষয়ের উপর বিতর্কমূলক বক্তৃতাদানের জন্য ছাত্রদের আহ্বান করা হত। সাধারণত বিতর্কিত বিষয়টির সপক্ষে বলবার জন্য একজন আমন্ত্রিত হতেন এবং তারপর তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করবার জন্য পরপর দুইজন ছাত্রকে আহ্বান করা হত। সবশেষে সভার পরিচালক বা মডারেটর উভয়পক্ষের বক্তৃতা বা রচনা শোনার পর নিজস্ব মন্তব্য ঘোষণা করতেন। মডারেটরের বিচার অনুযায়ী প্রতিযোগিতায় সফল ছাত্রদের আর্থিক পুরস্কার, মেডেল অথবা সার্টিফিকেট অফ মেরিট দিয়ে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হত। বছরের কোন একদিনে পুরস্কার সভার আয়োজন করা হত। সেখানে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ও অন্যান্য সমাগত অতিথিবৃন্দের মাঝখানে স্বয়ং গভর্নর জেনারেল সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিতেন। বাংলা ভিন্ন অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও একই রকম প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত এবং সেই সকল পরীক্ষার সফল প্রতিযোগীদের মধ্যেও একই রকম আড়ম্বর সহকারে পুরস্কার বিতরণ করা হত।

এই সকল প্রতিযোগিতার আসরে সাহেবদের লেখা যে সকল বাংলা গদ্য রচনা পাঠ করা হত সেগুলি আধুনিক বাংলা ভাষার পাঠকের মনে যথেষ্ট ঔৎসুক্য সৃষ্টি করবে। ডঃ সুশীলকুমার দে-র মতে এগুলি সেকালের ইউরোপীয়দের লেখা বাংলা গদ্যরীতির একটা সাধারণ নমুনা ("The average specimen of 'Ewropean prose' of the time") হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কলেজের ছাপাখানায় এই গদ্য রচনাগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটিই (সম্ভবত তিন) ইংরাজি অনুবাদসহ আলাদা গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু সব কয়টি রচনার সন্ধান না পাওয়া গেলেও ১৮০২ থেকে ১৮১৮-র মধ্যে অনুষ্ঠিত মোট পনেরোবারের প্রতিযোগিতার তারিখ, রচনার বিষয় এবং অংশগ্রহণকারীদের নাম ইত্যাদি তথ্যের হদিশ পাওয়া গিয়েছে। এই তালিকার উপর চোখ বোলালে রচনা প্রতিযোগিতার জন্য কি রকম প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্বাচন করা হত সে সম্পর্কে একটা আন্দাজ করা যেতে পারে। রচনার বিষয়টি ইংরাজিতে অনুবাদ করে তালিকায় দেখানো হয়েছে। আমরা সেটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলায় পুনরনুবাদ করে এখানে পেশ করছি।

১। তাং : ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮০২, বিষয় : "আসীয়ীয়েরা ইয়ুরোপীয়েরদের মত নীতিজ্ঞ হইতে পারিবে।" প্রস্তাবক : ডব্লিউ বি মার্টিন, প্রথম বিরোধী বক্তা : ডব্লিউ বি বেইলি, দ্বিতীয় বিরোধী বক্তা : এইচ হজসন, পরিচালক : ডব্লিউ সি ব্লাকারি।

২। তাং : ২৯ মার্চ, ১৮০৩, বিষয় : "হিন্দু লোকেরা ভিন্ন জাতি এই প্রযুক্ত তাহারদের বিদ্যা বৃদ্ধির হানি হয়।" প্রস্তাবক : জে হান্টার, প্রথম বিরোধী বক্তা : ডব্লিউ বি মার্টিন, দ্বিতীয় বিরোধী বক্তা : ডব্লিউ মর্টন, পরিচালক : ডব্লিউ সি ব্লাকারি।

৩। তাং : ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮০৪, বিষয় : "সংস্কৃত ভাষার উৎকৃষ্ট এবং অদ্যাবধি সুলভ

গ্রন্থগুলি প্রচলিত ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশ ঘটানো সম্ভব।" প্রস্তাবক : মিঃ টড, প্রথম বিরোধী বক্তা : মিঃ ইম্পে (সিনিয়র), পরিচালক : রেভাঃ কেরি।

৪। তাং : ২ মার্চ, ১৮০৭, বিষয় : "বাংলা দেশে জনস্বার্থমূলক কার্যাদি নির্বাহের জন্য বাংলা ভাষার জ্ঞান অতি আবশ্যক।" প্রস্তাবক : এলিস, প্রথম বিরোধী বক্তা : টাইটলার, দ্বিতীয় বিরোধী বক্তা : ডিক, পরিচালক : রেভাঃ কেরি। (এরপর প্রতি বছরের বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় রেভাঃ কেরি-ই পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।)

৫। তাং : ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮০৮, বিষয় : "পূর্বতন যে-কোন সরকারের তুলনায় ব্রিটিশ সরকারের আমলেই বাংলার অধিবাসিবৃন্দ অধিকতর সুখে দিনযাপন করছেন।" প্রস্তাবক : টাইটলার, বিরোধী বক্তা : ডিক।

৬। তাং : ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮০৯, বিষয় : "হিন্দুদের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ সম্যক অনুধাবন করার মাধ্যমেই তাদের আচার ও গৌরব সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।" প্রস্তাবক : এইচ সারজ্যান্ট, প্রথম বিরোধী বক্তা : ডব্লিউ ফরেস্টার, দ্বিতীয় বিরোধী বক্তা : জে ফারনিকস।

৭। তাং : ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮১০, বিষয় : "বাংলা দেশে যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে তা স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পত্তির নিরাপত্তা ও কল্যাণ সাধনে সাহায্য করবে।" প্রস্তাবক : জি পর্চার, প্রথম বিরোধী বক্তা : ডব্লিউ এইচ বেলি, দ্বিতীয় বিরোধী বক্তা : আর এম বার্ড।

৮। তাং : ৭ আগস্ট, ১৮১১, বিষয় : "মনুষ্য সমাজে নাগরিক জীবনের শিল্প ও স্বাচ্ছন্দ্যের যে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় তা মূলত বাণিজ্য ও নৌবিদ্যার সম্প্রসারণের জন্যই সম্ভব হয়েছে।" প্রস্তাবক : আর লেউইন, প্রধান বিরোধী বক্তা : টি জে ড্যাসউড, দ্বিতীয় বিরোধী বক্তা : এ এন্ডারসন।

৯। তাং : ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮১২, বিষয় : "সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলা সর্বোত্তম।" প্রস্তাবক : জি রিচার্ডসন, প্রথম বিরোধী বক্তা : সি মর্লি, দ্বিতীয় বিরোধী বক্তা : এইচ চেস্টনি।

১০। তাং : ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮১৩, বিষয় : "প্রাচ্য রচনারীতি একটি বিশেষ দেশের চেয়েও একটি বিশেষ যুগেরই লক্ষণ প্রকাশ করে।" প্রস্তাবক : এইচ ডব্লিউ হবহাউস, প্রথম বিরোধী বক্তা : সি হার্ডিঞ্জ, দ্বিতীয় বিরোধী বক্তা : ই জে হ্যারিংটন।

১১। তাং : ২০ জুন, ১৮১৪, বিষয় : "বাঙালি বিদ্বৎসমাজ কর্তৃক সংস্কৃত অধ্যয়নের ফলেই বাংলা ভাষা অবহেলিত হয়ে রয়েছে।" প্রস্তাবক : সি ডব্লিউ স্মিথ, প্রথম বিরোধী বক্তা : জে মাস্টার, দ্বিতীয় বিরোধী বক্তা : সি এম ডাল্টন।

১২। তাং : ২৫ জুলাই, ১৮১৫, বিষয় : "বাংলা ভাষার মাধ্যমে বৈষয়িক ক্রিয়া কর্মসহ সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়েও যথোচিত অনুশীলন চালানো সম্ভব।" প্রস্তাবক : আর ক্যাভেনডিস, প্রথম বিরোধী বক্তা : আর ম্যাকনাগটেন, দ্বিতীয় বিরোধী বক্তা : এ ম্যুরে।

১৩। তাং : ১৫ জুলাই, ১৮১৬, বিষয় : "রাজনৈতিক ও দর্শন বিষয়ক রচনা অপেক্ষা ইতিহাস বিষয়ক রচনার পক্ষেই বাংলা ভাষা অধিকতর সুপ্রযুক্ত।" প্রস্তাবক : টি ক্লার্ক, প্রধান বিরোধী বক্তা : ডব্লিউ উইলকিনসন দ্বিতীয় বিরোধী বক্তা : টি জি ভাইবার্ট।

১৪। তাং : ৩০ জুন, ১৮১৭, বিষয় : "কথামালা ও গল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রাচ্য দেশীয় পদ্ধতির সুবিধা, বাংলা ভাষাতেই সবচেয়ে স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়।" প্রস্তাবক : টি ক্লার্ক, প্রথম বিরোধী বক্তা : ডি ম্যাকফারলেন, দ্বিতীয় বিরোধী বক্তা : ই ডব্লিউ ককারেল।

১৫। তাং : ১৫ আগস্ট, ১৮১৮, বিষয় : "বাংলা ভাষায় শব্দ চয়নের বিশেষ সুবিধা এই ভাষাকে প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা ভাব সমৃদ্ধ ভাষা হিসাবে চিহ্নিত করেছে।" প্রস্তাবক : টি ক্লার্ক, প্রথম বিরোধী বক্তা : জি জে মরিস, দ্বিতীয় বিরোধী বক্তা : এইচ এস বোলডার্সন।

উল্লিখিত পনেরোটি রচনার মধ্যে ১৮০২ সালের প্রতিযোগিতায় মার্টিন লিখিত প্রথম রচনাটি এখানে যথাসম্ভব উদ্ধৃত করা হচ্ছে। যথাসম্ভব কথাটি এখানে সচেতনভাবেই প্রয়োগ করা হয়েছে, কেননা মূল রচনায় ব্যবহৃত বর্ণমালার কয়েকটি অক্ষর (যথা, বর্তমানে ব্যবহৃত 'র'-এর বদলে সে আমলের লেখায় ব্যবহৃত পেট কাটা 'ব' বা বর্তমান অসমিয়া ভাষার 'ৰ') এখন একেবারেই অপ্রচলিত। ছাপাখানার ভাণ্ডার থেকে উধাও এই সকল অক্ষরের পরিবর্তে সেই স্থলে প্রযোজ্য হালের অক্ষরগুলি বসানো হয়েছে। ফলে মূল রচনাটি যৎকিঞ্চিৎ পরিমার্জিত করেই এখানে প্রকাশ করা হল।

আসীয়ীয়েরা ইয়ুরোপীয়েরদের মত নীতিজ্ঞ হইতে পারিবে

'অনেক লোকের অনুমান যে আসীয়ীদের বুদ্ধি ইয়ুরোপীয়েরদের বুদ্ধির মত নহে তন্নিমিত্ত তাহারা ইহারদের মত নীতিজ্ঞ হইতে পারিবে না এই দ্বই এক বাক্য হইতে উৎপন্ন। যে তাহারদের দেশে গ্রীষ্ম শীত কি আর কোন গুণ আছে যাহাতে মনের ক্ষমতা এবং বুদ্ধি হ্রাস হয় কিম্বা তাহারদের এই স্বভাব যে মনের পরাক্রম অতি ক্ষুদ্র কি সৃষ্টি কর্তৃকরণক এই মত জন্মিয়াছে যে সে উত্তম সুখ ও ভোগ যাহাতে বুদ্ধিতে প্রাপ্ত হয় তাহার অযোগ্য। এই দুই বাক্যের মধ্যে এক বাক্যের মিথ্যাতা এবং অন্যের অপ্রকৃততা প্রকাশ করিতে যত্ন করি।

যাহারা এ-কথা কহেন তাঁহারা অন্য কথার মধ্যে বলিয়াছেন যে গ্রীষ্ম শীতের এমত স্বভাব যে তাহাতে মনের যোগ্যতা হ্রাস হয় এবং সে কারণ অন্তঃকরণের রাগও হ্রাস হয়।

ইহার সত্য মিথ্যা বোধার্থে প্রথমে আমারদের বিচার করিতে হবে মনে অনুভব কিমত হয়। তাহার পর সে অনুভব গ্রীষ্ম শীত করণক ন্যূনাধিক হয় কি না।

যে এক মহাপুরুষ জগতের কর্তা আছেন সে সহজ অনুভব। কিন্তু অন্য যত অনুভব প্রত্যক্ষের দ্বারা। যে মতে অনুভবের বাহুল্য হয় এবং স্মৃতিতে থাকে এবং যুক্ত হয় সেই মত আমারদের জ্ঞান এবং বুদ্ধি এবং বিজ্ঞতা বৃদ্ধি হয়। যদি গ্রীষ্ম শীতের সে পরাক্রম যাহা অনেক লোকে বলে তবে অবশ্য যে ইন্দ্রিয় করণক বাহ্য বস্তুর সন্নিকর্ষ হয় এবং যাহার দ্বারায় মনের প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত হয় সে ইন্দ্রিয়ের গ্রীষ্ম শীতেতে হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিম্বা যে সামর্থ্যে অনুভূতের স্মৃতি এবং একত্র করণ হয় সে সামর্থ্যের নাশ হয়। কিন্তু আমরা কি বুঝিতে পারি যে গ্রীষ্ম শীতের স্বভাবে কোন গুণ আছে যাহাতে এমত ফল হয়? আমরা কি আস্থা করিতে পারি যে কেবল গ্রীষ্ম শীতের স্বভাবে ইন্দ্রিয় ও স্মৃতি ও একত্র করণের ক্ষমতা নষ্ট হয়? এক জ্ঞানবান রচনাকর্ত্তা বলেন, "মানুষের গঠনানুসারি যাহাতে অক্ষম হয় তদ্ব্যিতেরক প্রতি প্রাধান্যতা এবং শ্রেষ্ঠতা যাহা মানুষেরা পাইতে পারে তাহা পাওনের সামর্থ্য আছে।"

যদি আমরা এক বালককে শিক্ষা করাইতে চাহি সে পৃথক পৃথক জ্ঞান ও ভজনের যত কারণ ইয়ুরোপে শিক্ষা করায় তবে আমরা কি প্রথমত জিজ্ঞাসা করিব তাহার জন্মভূমী? কিংবা যদি জানিতে পাই যে তাহার উৎপত্তি হিন্দুস্থানে তবে তাহার মনে বুদ্ধির এক কিরণ ক্ষেপণ করণে এবং আমারদের ভজনে তাহার মন আকর্ষণে কি নিরাশ হইব? কোন সত্য বাক্য স্বস্বভাবের সীমা পর্য্যন্ত কহিলে ও তাহার হৃদয়ঙ্গম করিলে যদি তাহার মন অনবিরুদ্ধ না হয় এবং তাহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় তবে তাহার মনোভূমীর রাজা বড় প্রবল হইলে ও অবশ্য পরাজিত হয়। "স্বপ্রকাশিত সত্য বাক্য যদি এমন সর্বজয়ী হয় তবে গ্রীষ্ম শীত কিম্বা দুরাচার বিজয়ী নহে।"

ইহা ব্যতিরেক যদি গ্রীষ্ম শীতেতে বুদ্ধি হ্রাস বৃদ্ধি হয় তবে নিকটবর্ত্তি দেশ নিবাসি লোক অত্যন্ত উন্মত্ত হইত কিন্তু আমরা দেখি যে তাহা নহে আতেনসীয় ও থৈবীয় অতি সান্নিধ্য তত্রাপি তাহারদের স্বভাব এবং রীতি এবং গুণ এবং গতি অত্যন্ত ভিন্ন। ফ্রান্সের মধ্যে গাস্কনিরা অধিক রসিক কিন্তু পীরিণী পর্বত পার হইবা মাত্র দেখিতে পাই প্রগাঢ় ইস্পানীয়েরদের গম্ভীর স্বভাব। এবং আর২ অনেক উদাহরণ দিতে পারি যে মানুষের বুদ্ধির বৈলক্ষণ গ্রীষ্ম শীতের ফল নহে কিন্তু দেশের শাসনের ফল।

যে গ্রীষ্ম শীতের এমত পরাক্রম মানুষের মনের উপর তাহার বিপরীত যাহা আমরা প্রত্যহ দেখি। গ্রীনলণ্ড লোক অতি শীতের মধ্যে থাকিয়া আপনারদের বন-মানুষতা ত্যাগ করিয়াছে। এবং আমারদের অনেক স্থানের লোক হইতে অধিক নীতিজ্ঞ। যে পূর্ব্বে মূর্খতাতে মগ্ন এবং পাপে আচ্ছাদিত ছিল যাহার অন্তঃকরণ দয়াতে কখন কোমল হইত না এবং পশুবৎ ভজন জ্ঞান হীন ছিল সে মনে মনে কান্দিয়া পূর্ব্বগতি ত্যাগ করিয়া

অপর গতিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছে এবং সল্লোক ও নম্র ও দয়াশীল হইয়াছে এবং এই কামনা করে। যাহা এখন কহিয়াছি তাহা হইতে এ অনুমানের মিথ্যাত্বের প্রমাণ আর কি অধিক হইতে পারিবে।

সে আর এক অনুমান যে আসীয়েয়ারা স্বস্বভাবানুক্রমে এমন নীতিজ্ঞ হইতে পারিবে না তাহার অপ্রমাণ্য সাধনে অধিক যুক্তির প্রয়োজন নহে। বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞতা যেমন যেমন বাড়ে তেমন লোকের সুখ বাড়ে ঈশ্বর আপনার সৃষ্টির সুখ দেখনেতে সন্তুষ্ট থাকেন। অতএব আমার এ বাক্যের প্রতিবাদী কহুন ঈশ্বর কোন দেশের সমুদায় লোকের বুদ্ধি হ্রাস যাহাতে হয় এমত সৃষ্টি করিয়াছেন কেন।

উপাখ্যানে প্রচুর প্রমাণ আছে যে বুদ্ধির আগমণ পূর্ব্বদিক হইতে হইয়াছে এবং যে শিল্পবিদ্যা আর আর জ্ঞানের উদয় এবং শিক্ষা ছিল এদেশে মিছর এবং ফিনিকিয়ার মধ্যে প্রকাশ হওনের বহুকাল পূর্ব্বে। এক বুদ্ধিমান রচক বলে যে পূর্ব্বকালে গ্রিক দেশের মধ্যে এক বর্ণ ছিল তাহার নাম পেলাসগি যাহারা উপদিষ্ট হইল পূর্ব্ব দেশ হইতে বিশেষত আসীয়া হইতে। এবং বুদ্ধি এ স্থানে প্রফুল্লা হইয়াছিল সে স্থানে প্রচার হওনের অনেক কাল পূর্ব্বে।

কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে যাবত ইয়ুরোপের মধ্যে জ্ঞান অবিরত হইয়াছে এবং অন্বেষণের ইচ্ছা যোগাইয়া দিয়াছে সমস্ত প্রতিবাসিরদিগকে তাবত আসীয়ীয়েরা বুদ্ধিহীন এই কেমন ? ইহার উত্তর এই দুই দেশের শাস্ত্রে একত্র দৃষ্টি করিলে জানিতে পারিব। সমস্ত লোকের সহিত শত্রুতাকরণ মহম্মদের শাস্ত্রে প্রধান লক্ষণ। অহঙ্কার ও দ্বেষ ও আর আর লোকের সহবাস এবং মনুষ্যতা কার্য্যে অনংশতা ত্যাগ এ সমস্ত নিঃস্বরে তাহার কৃত শাস্ত্রের ধারা হইতে। তাহাতে শিক্ষা করায় যে সমস্ত লোক তাহারদের শত্রু যাহারা পাইঘম্বরের ক্ষমতা অপহ্নব করে ও তাহারদের সহিত বান্ধবতা কেবল পাপ নহে কিন্তু তাহারদিগকে সংহার করণ প্রকৃত ক্রিয়া। মহম্মদের আজ্ঞাবহ লোক আর২ লোকেরদিগকে কেবল তাহারদের শাস্ত্র পরিগ্রহ করাইতে চাহে এবং যে অন্ধকারে আপনারা মজিয়াছে সে অন্ধকারে মজাইতে চাহে সকলকে যাহারা তাহারদের করতল। একজন সুরচক যে পূর্ব্ব দেশের বিদ্যা বড় জ্ঞাত হইয়াছে তিনি রচিয়াছেন যে তাহারা জ্ঞান কেবল ত্যাগ করেনা কিন্তু ঘৃণা করে। ইহার সামগ্রী কেবল লোপ করায় না কিন্তু তাহা পাইবার এবং আচরণ করিবার ইচ্ছা নিবিয়া গিয়াছে। এখন সে কুদৃষ্টি ছাড়িয়া সুদৃষ্টিতে মনোযোগ করি। খ্রীষ্টিয়ান বর্ণেরদের মধ্যে যদি কোন সুলক্ষণ প্রধান হয় তবে তাহা সে জ্ঞান ও বিদ্যাপ্রাপ্তির ইচ্ছা যাহা সে দেশে সর্ব্বত্র ব্যাপে। জন্তুব ও বুদ্ধি ও ধর্ম এ তিন বর্গের যত বিদ্যা সে সকল বিচার করিয়া মনে সুপ্রকাশ হয় এবং যে শিল্পকর্ম্ম মনুষ্যের বড় হিত তাহা ও জানা গেল। বুদ্ধির শিখা একবার প্রজ্বলিত হইলে সমস্ত লোক যাহারা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের আছে তাহারা সে দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হইয়াছে কিন্তু যে দেশে মহম্মদের ধর্ম্ম আছে সে দেশে সর্ব্ব বিদ্যা ও নিবর্ত্ত হইয়াছে। অতএব বুঝি পূর্ব্ব দেশীয়েরদের বুদ্ধি হ্রাসের এ হেতু। এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মরূপ সূর্য্য বিনা কেহ এ অজ্ঞান অন্ধত্বটি নষ্ট করিতে পারিবে না।

যাহারা হিন্দু লোকেরদের গ্রন্থ পড়িয়াছে তাহারা হিন্দু লোকেরদের যে রূপ ব্যাখ্যা করে তাহা গ্রন্থ হইতে অধিক। তত্রাপি "তাহারা নিতান্ত উতপন্নমতি এক বুদ্ধিমান"। তাহারদের কবিতায় অত্যন্ত অসম্ভব কথা কিন্তু অলঙ্কারাদি রচনা ভাল ও সে লাতিন কয়েক কাব্যেরওলা মানিতে হইবে যাহা আমরা এত ব্যাখ্যা করি।

যদি এই মত ক্ষমতা তাহারদের পূর্ব্ব কালে ছিল তবে আমরা বুঝি যে তাহারা অধিক জ্ঞানবান হইতে পারিবে। আমরা ও ইহার অপেক্ষিত বটে যে তাহারা কোন কালে হবে সম্প্রতি ইয়ুরোপীয়েরদের সমান বর্ণ ও কর্ত্তৃত্ব ও শিল্পকর্ম্ম ও ব্যবস্থাতা দেওনেতে।'

হাল আমলের বাংলা ভাষার পাঠক উদ্ধৃত রচনাটির অর্থভেদ করতে নিঃসন্দেহে গলদঘর্ম হবেন। রচনাটির যুক্তি সম্ভার কতখানি গ্রহণযোগ্য সে-বিষয়ে যদি কোন প্রশ্ন না-ও তোলা হয় তাহলেও এর বাক্যের গঠন, বানান এবং যতি চিহ্ন প্রভৃতির দুর্বোধ্যতা পাঠককে স্বভাবতই ক্লান্ত করে তুলবে। ডঃ সুশীল কুমার দে এই শ্রেণীর সাহেবি গদ্যের কয়েকটি ত্রুটি নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে এই বাংলা বড় বেশি রকম সংস্কৃত ঘেঁষা, এগুলির বাক্যবন্ধ (Syntax) রীতিমত জটিল, বাক্ বিধি বা ইডিয়মগুলিও বহুলাংশে অপ্রচলিত। সবচেয়ে বড় কথা রচনায় ব্যবহৃত শব্দের বানান প্রণালী (Orthography)ও ভুলে ভরা। সে যুগের রচনায় একমাত্র দাঁড়ি ও প্রশ্নবোধক চিহ্ন ছাড়া সচরাচর আর কোনরকমের যতি চিহ্ন ব্যবহার করা হত না। এই চিহ্নগুলি উল্লিখিত রচনাতেও ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এ সবের যদৃচ্ছ প্রয়োগের ফলে যতি চিহ্ন ব্যবহারের সার্থকতা নষ্ট হয়েছে। রচনার লিখনশৈলী (Style) সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল। এই রকম অনাবশ্যক জটিল লিখনশৈলীর ফলেই রচনাটি এ কালের পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। কিন্তু এই সকল ত্রুটি নির্দেশ করার পরও এ কথা মনে রাখতেই হবে যে এগুলি এমন কয়েকজনের লেখা বাংলা যাঁদের মাতৃভাষাই নয় এবং যাঁরা সেই ভাষার পঠন পাঠনে তখনো শিক্ষানবিশ ছাড়া আর কিছুই নয়। অনুমান করা যেতে পারে যে শিক্ষানবিশীর প্রথম ধাপে তাঁরা যে ধরনের গদ্য লিখতেন পরবর্তী কালে তা আরো উন্নত হয়েছিল। যে পনেরোবারের প্রতিযোগিতার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সে সময়ের প্রতিটি বছরের রচনা যদি খুঁজে পাওয়া যেত তাহলে সেগুলির তুলনামূলক বিচার করে সাহেবি গদ্যের ক্রমোন্নয়ন সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা অর্জন করা সম্ভব হত। বর্তমান প্রবন্ধে মার্টিনের লেখা উদ্ধৃত রচনাটি ১৮০২ সালের, এর ছয় বছর পরে সারজান্ট নামক যে সাহেব ১৮০৯ সালের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর লেখা শ্রীমদ্ভাগবতের পাণ্ডুলিপির কিছু অংশও এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই রচনার সামগ্রিক মান মার্টিনের রচনাটির চাইতে অনেকাংশেই উন্নত বলে মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানগুলিকে ইতিপূর্বে বাচন ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কলেজের সংশ্লিষ্ট মিনিটস-এ এগুলিকে ডিসপিউটেশন এবং ডিক্ল্যামেশন বলে মন্তব্য করা হয়েছে। কলেজের তরুণ বিদেশী শিক্ষার্থীদের স্থানীয় ভাষায় সহজভাবে কথোপকথনের অভ্যাস করানোর জন্যই এই প্রতিযোগিতাগুলি আহ্বান করা হত। এ সম্পর্কে কলেজের ছয় নম্বর স্ট্যাটিউট-টি এখানে মূল ইংরাজিতে উদ্ধৃত করা হল :

"Whereas it is necessary, that the students destined to exercise high and important functions in India , should be able to speak the Oriental Languageswith fluency and propriety; It is therefore declared, that Public Disputations and Declamations shall be holden in the Oriental languages at stated times, to be prescribed by the Council of the College."

তাই যদি হয় তাহলে পরীক্ষাটি ছিল বিতর্কের প্রতিযোগিতা। সে ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার লিখিত বিবরণীগুলি (অন্তত যে কয়টির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে) যথার্থ কারা রচনা করেছিলেন (অর্থাৎ, সেগুলি প্রতিযোগীদের নিজেদেরই রচনা, না বিতর্ক সভায় তাঁদের বক্তব্য শুনে তাঁদের হয়ে অন্য কেউ রচনা করেছিলেন) সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যেতে পারে। কিন্তু কলেজের প্রসিডিংসগুলি খুঁজে এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। তাই স্বভাবতই মনে হয় যে এগুলি ছিল আসলে বাচন প্রতিযোগিতা (Set speech)। অর্থাৎ প্রতিযোগীরা বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে নিজস্ব রচনাটি লিখে নিয়ে আসতেন এবং সভাস্থ অতিথি ও পরীক্ষকমণ্ডলীর মাঝে সেগুলি নির্দিষ্ট দিনে পাঠ করে শোনাতেন।

সাহেব ছাত্রদের লেখা এই সকল রচনা সম্পর্কে ডঃ সুশীল কুমার দে মন্তব্য করেছেন যে, এগুলি সমসাময়িক কালের বাংলা গদ্য যথা 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) এবং 'লিপিমালা' (১৮০২) প্রভৃতির তুলনায় খুব বেশি রকম নিকৃষ্ট ছিল না। এবিষয়ে আগ্রহী গবেষকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

তথ্য সূত্র

(১)*De, Sushil Kumar, Bengali Literature in the nineteenth century, Calcutta, 1962, p 57*

(২) ক। *Primitae Orientales, Vol II, Calcutta, 1803*

খ। *Essays by the students of the College of Fort William, Calcutta, 1802*

গ। *Roebuck T, Annals of the College of Fort William, Calcutta, 1819*

(৩) ইস্পে অসুস্থতার জন্য শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন।

(৪) ক্লার্ক অসুস্থ থাকায় এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেননি।

গ্রামীণ গানেই কি শেষপর্যন্ত বঙ্গভাষা টিকে থাকবে ?

খুব স্থিরভাবে ভেবে দেখার বিষয় এখন আমাদের সামনে অনেক জমে আছে। তার মধ্যে গুরুত্ব অনুসারে বেছে নিতে গেলে বঙ্গভাষার বিষয়টিই সবথেকে আগে উঠে আসে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গভাষা। বাইরে-ঘরে সর্বত্র এখন আমাদের ভাষা আক্রান্ত হচ্ছে। ভাষা নিয়ে যাঁরা চর্চা করে থাকেন তাঁরা বলেন ভাষা বস্তুটি লোহা-পাথরের মতো নয়। তাত্ত্বিকেরা ভাষাকে নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ পরিবর্তনশীলতা তার স্বভাব। যুদ্ধক্ষেত্রে দীর্ঘদিন বর্ম এঁটে জমি ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের মুখের ভাষার পক্ষে অসম্ভব। ভাষা রুখে দাঁড়ায় শুধুমাত্র যদি ভাষাব্যবহারকারী সমাজ তাকে পেশীনির্মাণে সহায়তা করেন, তার উপকূলের নোংরা নালার জল বেধে, বুকের তলার চোরাবালি প্রতিনিয়ত সরিয়ে তাকে তার সামাজিক জলধারার স্বাভাবিক স্রোতস্বিনী করে তুলতে পারেন। কিন্তু যেখানে তা হয় না সেখানে এই আধুনিক ভাষাসংঘাতের যুগে ভাষা আর টেকে না। গত একশ বছরে পৃথিবীতে অনেক মানুষ তাদের মাতৃভাষাকে বদলে নিয়েছে, শুধু ব্যক্তিগত ভাবে নয়, সামাজিক ভাষাবর্জনও অনেক ঘটেছে।

বঙ্গভাষার গানের সংরক্ষণের ভালো ব্যবস্থা আজও নেই

বাংলাভাষাও এই চক্রের বাইরে নয়। আমাদের যতো ভাষাপ্রেমই থাকুক, বাংলা গানে যতো যাদুই থাকুক, এ-ভাষা যদি ঘরে-বাইরে সর্বত্র আমাদের সবরকম কাজের ও প্রয়োজনের মুখ্যভাষা না হয়ে উঠতে পারে; আমরা যদি সেভাবে তাকে গড়ে না তুলতে পারি, যদি আজকের এই হামলা চলতেই থাকে, তবে আশঙ্কা হয় আজ যে ক্ষয়কে মনে হচ্ছে তিলাকৃতির তা দু-এক বছরের মধ্যে সুবিপুল ধসে রূপান্তরিত হবে। কতদিন আর কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ তার নিরক্ষরতার সামর্থ্যে এ-ভাষাকে রক্ষা করতে পারবে। কত বছর ?

এ-সব কু-ডাকের কারণ পৃথিবীতে গত একশ বছরে অনেক ভাষা-উপড়ানো দেশের দৃষ্টান্ত পাচ্ছি। দেখা গেছে সে-সব হতভাগ্য দেশে সমৃদ্ধ ভাষা ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এসে দেশের মাতৃভাষাকেই হটিয়ে দিয়েছে। হটিয়েছে কোথাও পঞ্চাশ কোথাও নব্বুই বছরে। যে দেশে উপনিবেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে সেখানে এ-রকম মাতৃভাষার মহীরুহ উপড়ে creole বা

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের নৈহাটির বাড়ি

খিচুড়িভাষার বুনোজঙ্গলের উদ্ভব হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত কম নয়—যেমন হাইতি, ফ্রেঞ্চ গায়না, জামাইকা ইত্যাদি। হাইতিতে এখন মোট জনসংখ্যার নব্বই শতাংশ লোক বলেন ফরাসি ও ওদের পুরোনো ভাষার এক খিচুড়ি। বাকি দশ বলেন বিশুদ্ধ ফরাসি। অর্থাৎ সে দেশে পুরোনো স্বদেশী ভাষাটি আর নেই। ফ্রেঞ্চ গায়নাতে এ-রকম খিচুড়ি বলিয়ে মানুষ হচ্ছেন তিরানব্বই শতাংশ। এ-রকম ইংরেজি খিচুড়ি হয়েছে গায়নাতে, জামাইকাতে। জামাইকার ২২ লক্ষ লোকের মধ্যে ২০ লক্ষই খিচুড়ি ইংরেজি বলেন। তবে খিচুড়ির সবথেকে বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ রান্না হয়েছে বলিভিয়াতে। সে দেশের পুরোনো ভাষা ছিল 'আয়মারা' ও 'কুয়েছুয়া'। পেট্রল ও টিনের লোভে পার্শ্বস্থ ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো থেকে স্প্যানিশরা বলিভিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ার পর এক-এক অঞ্চলে এক-এক রকমের মিশ্রণ হয়েছে। কোথাও হয়েছে স্প্যানিশ-আয়মারা, কোথাও স্প্যানিশ-কুয়েছুয়া। কোথাও আয়মারা-স্প্যানিশ- কুয়েছুয়া তিনটে ভাষাই মিশে গেছে। স্বাদগন্ধের এই বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে বিশুদ্ধ আয়মারা ও কুয়েছুয়া ওদেশে এখন বলেন ষাট লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র তেরো লক্ষ লোক। বলিভিয়ার দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং পাহাড়ঘেরা প্রাকৃতিক বন্ধুরতা তার ভাষাবদলকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি। বন্যপ্রাণী লুপ্ত হবার মতো ব্যাপক হারে এই ভাষালুপ্তির ব্যাপারটি পৃথিবীতে গত দু-শতকের দান। এর আগেও ভাষা রূপান্তরিত হয়েছে, কিন্তু যে প্রবল গতিতে গুচ্ছ গুচ্ছ ভাষা আট-নয় দশকে খিচুড়ি বনে যাচ্ছে সে-রকম ঘটনা এর আগে বিশেষ পাই না।

ভাষা আমাদের দেশেও প্রবল গতিতে খিচুড়ি হচ্ছে। আমাদের এই কলকাতার ভাষা উচ্চশিক্ষিত বাঙালির ভাষাও খিচুড়ি হচ্ছে। একটা দৃষ্টান্ত রাখা যাক। বুদ্ধদেব গুহ গত শারদীয় (১৯৮৬) 'দেশ' পত্রিকায় "'জে' ফর জেলাসী" নামে একটা গল্প লিখেছিলেন। উচ্চমার্গের লোকজনের গল্প। দুই বন্ধুর বম্বে বিমানবন্দরে মোলাকাত হবার পর বৈভবের কথাবার্তায় যখন গল্প এগোচ্ছে তখন পত্রিকার ৩৮৩ পৃষ্ঠায় মোট ৮৩০টি শব্দের মধ্যে ইংরেজি শব্দ পাচ্ছি ১১৮টি। অর্থাৎ প্রতি ৮টি শব্দের মধ্যে একটি ইংরেজি। পরের পৃষ্ঠায় (৩৮৪) যখন নায়ক গৌতম ফিরে গেছে তার 'সাদামাটা' শৈশবের স্মৃতিচারণায় সেখানে ইংরেজি কমে দাঁড়াচ্ছে মোট ৫২০ শব্দের মধ্যে ৪৪টিতে। অর্থাৎ প্রতি বারোতে এক। বুদ্ধদেব গুহর অতিরিক্ত ইংরেজি ব্যবহারের মুদ্রাদোষ আছে এ-কথা মনে করার হেতু নেই। কারণ তাঁর জঙ্গলের গল্পে বেশি ইংরেজি পাচ্ছি না; অন্যদিকে আর তিন-চার জন সাহিত্যিকের উচ্চমার্গের লোকজনের গল্প থেকে হিসেব করে একই রকমের ইংরেজির অনুপাত পাওয়া যাচ্ছে। এ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে উচ্চমার্গের বাঙালিরা এখন গড়ে প্রতি দশে একটি অন্তত ইংরেজি শব্দ বলেন এবং এক-দশমাংশ ইংরেজিতে ভাবেন। বিষয়-অনুসারে এ অনুপাতের কিঞ্চিৎ ওঠানামাও হয়। কিন্তু শিক্ষিত ও সম্পন্ন বাঙালির মাতৃভাষার শতকরা দশভাগ ইংরেজি খেয়ে নিয়েছে এ-কথা অস্বীকার করার আর উপায় দেখছি না।

এবার এই বিষয়টিকে ভাষার ধারাবাহিকতায় ফেলে দেখা যাক। আচার্য সুনীতিকুমার ১৯৪১ সালে এক বক্তৃতায়[১] বলেছিলেন— 'বাঙলায় প্রায় ৮/৯ শত ইংরেজি শব্দ ইতিমধ্যেই naturalised অর্থাৎ পূর্ণরূপে গৃহীত হয়ে বাঙলা বনে গিয়েছে।' সুনীতিকুমার ভাষার ব্যাপারী। তাঁর জমাখাতার '৮/৯ শত' শব্দ ১৯৪১ সালের বঙ্গীভূত ইংরেজি শব্দের সংখ্যা। চলন্তিকার প্রথম প্রকাশ ১৯৩০ সালে। প্রথম সংস্করণে 'চলন্তিকা'য় শব্দ ছিল ২৬,০০০। 'চলন্তিকা'য় রাজশেখর বসু অপ্রচলিত বাংলা শব্দ রাখেননি কিছু বঙ্গীভূত ইংরেজি শব্দও 'চলন্তিকা'য় আছে। সুনীতিকুমারের ৮/৯ শত এবং রাজশেখরের ২৬,০০০ পাশাপাশি রেখে একটা অনুপাত কষলে ফল পাচ্ছি একশটি বাংলা শব্দে সাড়ে তিনটি ইংরেজি। পদ্ধতিটি খুব পাকাপোক্ত হলো না। তবু চল্লিশের দশকের পরে বঙ্গভাষায় ইংরেজি শব্দের অনুপ্রবেশ যে বিপুল হারে বেড়েছে সুনীতিকুমারের শব্দসংখ্যা থেকে প্রাপ্ত গড় এবং বুদ্ধদেবের গল্পের গড়ের পার্থক্য তার একটা আংশিক প্রমাণ। একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে এখন আর ইংরেজি শব্দের বঙ্গীভূত হবার দরকার হয় না—যে-কোনো ইংরেজি শব্দ, এমনকি ইংরেজি বাক্যগঠনপ্রণালীও বাংলায় অবলীলাক্রমে ব্যবহৃত হয়। এই খিচুড়িভবনই হচ্ছে ভাষাবদলের প্রথম ধাপ।

একদিক থেকে মনে হতে পারে যে, শব্দের এই পাইকারী আগমনে ভাষার কোনো ক্ষতি নেই। বরং এ পদ্ধতিতেই ভাষার উন্নতি হবে। কিন্তু এ যে আগমন নয়, এ হচ্ছে সংক্রমণ; শব্দটিকে হজম করার সময় পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। এ গেল একদিক। অন্যদিকে ভাবা যেতে পারে সমাজের উচ্চমার্গের ২/৫ শতাংশ লোক খিচুড়ি বাংলা বা হিব্রুতেই কথা বলুন তাতে অবশিষ্ট বাংলার কার কি এসে যাবে! কিন্তু বিষয়টা আমাদের ক্ষেত্রে সে-রকম ছেড়ে রাখার মতোও নয়। কলকাতার উপভাষা হচ্ছে আমাদের নানা প্রান্তের নানা উপভাষার মধ্যে সকলের জানা বারোয়ারি উপভাষা। এ ভাষায় আমরা বই পড়ি, খবর পড়ি, গান গাই, নিরক্ষরতা অপনোদন করি, পঞ্চায়েতের বিজ্ঞপ্তি জারি করি, রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দের কবিতা পড়ি। কলকাতার উপভাষাকে সরিয়ে রেখে পুরুলিয়ার মাহাতো এবং কোচবিহারের মিঞার পরস্পরের ভাষা বোঝার কোনো উপায় থাকবে না। এই ভাষা যদি খিচুড়ি হয়ে, পর্যাপ্ত ইংরেজি গিলে, দিনে দিনে অবশিষ্ট বাঙালির কাছে দুর্বোধ্য হয়ে পড়তে থাকে তবে আমরা আবার এক নতুন বিপদের মাঝখানে গিয়ে পড়ব। বঙ্গসংস্কৃতির একেবারে মূল নড়ে যাবে। ফলে এই খিচুড়ির ব্যাপারটা খুব তাচ্ছিল্য করার মতো নয়।

॥ দুই ॥

ভাষার ক্রম-অবলুপ্তির একটি অন্য ধরনের লক্ষণও আমরা আমাদের দেশে পাই। পশ্চিমবঙ্গেই পাই। এবং দুটি বিপরীতমুখী ভাষার গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসলে আমরা কিছু সূত্রও সম্ভবত দেখতে পাই। পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালি মাতৃভাষা এখন প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষের, নেপালি ৭ লক্ষের। দুটিই ছোট গোষ্ঠীর ভাষা কিন্তু অমাদের চোখের সামনেই দুটি ভাষার দু-রকমের ভবিষ্যৎ স্থির হচ্ছে। এবং ঘটনা কোনদিকে গড়াচ্ছে একটা ছোট দৃষ্টান্ত থেকেই তা স্পষ্ট হবে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে যে মাধ্যমিক পরীক্ষা হয় তাতে গত তিনবছর ধরে (৮৪-৮৬) নেপালি ভাষায় (প্রথম ভাষা) পরীক্ষা দিয়েছে বছরপ্রতি প্রায় ৪ হাজার জন ছাত্র।

নেপালিদের হারে পরীক্ষায় বসলে অন্তত ১০ হাজার সাঁওতালি ছাত্র-ছাত্রীকে সাঁওতাল ভাষায় প্রতিবছর পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু গত তিন বছর ধরে সংখ্যাটি দাঁড়িয়ে আছে মাত্র 'এক'-এ। তাও প্রতিবছর নতুন একটি 'এক' নয়—বীরভূমের একটিই ছাত্র পর পর দু-বার ফেল করে এই 'একত্ব' জিইয়ে রেখেছেন। অর্থাৎ একটি ভাষাগোষ্ঠী তাঁদের ভাষা পড়ছেন, অন্যটি পড়ছেন না। কেন? সাঁওতালিরা তাঁদের মাতৃভাষাকে নেপালিদের থেকে কম ভালোবাসেন—ঘটনা এ-রকম নয়। মাতৃভাষার প্রতি আকর্ষণ ও প্রীতি মানুষমাত্রেরই সহজাত ও স্বাভাবিক। কিন্তু ভাষার প্রতিদানের ক্ষমতার উপর তার ব্যবহারের

হাজার বছর বয়সের ভাষার সব থেকে জনপ্রিয় গ্রন্থ কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি (১৬১০ খ্রী·) ছবি : লেখক

ব্যাপ্তি নির্ভর করে। জীবিকাক্ষেত্রে সাঁওতালি জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই ; সাঁওতালি শিখে কেউ চাকরি পাবে না, কোনো ব্যবসাতেই এ ভাষাজ্ঞানের কোনো রৌপ্যমর্যাদা নেই। উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে, সাঁওতালদের আধুনিক বিদ্যাচর্চায়, এ ভাষার স্থান এখনো দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলা যায়নি। বইপত্র যা হয়েছে তাও অধিকাংশই হয়তো অতি পণ্ডিতি নয়তো বটতলীয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় ভালো পুস্তক সাঁওতালিতে প্রায় নেই। বিশ্বভারতীর একটি ডিপ্লোমাকোর্সের বাইরে এদেশে সাঁওতালি শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। শিক্ষক নেই ; শিক্ষক গড়ে তোলার, বই লেখার সংগঠনও নেই। ফলে জাতি হিসেবে সাঁওতালদের প্রগতির সঙ্গে তাঁদের মাতৃভাষার বিশেষ যোগাযোগ আর পাই না। তাই শুধুমাত্র সম্প্রদায়গত আনন্দানুষ্ঠান ও ঘরোয়া ব্যবহার ছাড়া ওঁদের মাতৃভাষারও বহির্জীবনে আর কোনো স্থান নেই। অন্যদিকে নেপালিও ছোটো গোষ্ঠীর ভাষা কিন্তু বহির্জীবনে তার ব্যবহার ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। নেপালির পশ্চিমবঙ্গে একটি সরকারি তকমা আছে। নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষার জন্য তার নিজস্ব রেডিও স্টেশন আছে ; সম্প্রতি অকাদেমি হয়েছে, দৈনিক পত্রিকা, টাইপরাইটার ইত্যাদিও আছে। সে সঙ্গে দার্জিলিংয়ের চাকরি পেতে নেপালি জানতে হয়। ফলে তার স্কুল-কলেজি কাঠামো প্রস্তুত হয়েছে : বইপত্র আছে। নেপালির সঙ্গে ইংরেজি শিখে নিলে ভাষাশিক্ষার বৃত্ত তাই এদেশে সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু আঠারো বছরের নিরক্ষর ক্ষেতমজুর সাঁওতাল মেয়েটিকেও বর্ধমানে বাংলা রাজমহলে মৈথিলি শিখতে হয়। অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ভাষা আজকের দিনে স্বাভাবিকভাবেই ক্রম প্রসারতা লাভ করে। এবং ভাষার অর্থনৈতিক সামর্থ্যই আজকে তার টিকে থাকার অন্যতম শক্তি। কারণ ভাষাজ্ঞানও যেহেতু আজ বিক্রয়যোগ্য পণ্য তাই কোন ভাষা কোন হাটে কত দামে বিকোয় সে অনুসারে ভাষার মূল্য নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। ভাষাকে টিকে থাকতে হলে এই মূল্যরক্ষার বাজারে লড়ালড়ি করে টিকে থাকতে হবে। প্রথমেই বঙ্গভাষার বিপদের কথা বলেছিলাম কারণ মাল্টিন্যাশনালের ভাষা ইংরেজি এবং ন্যাশনাল ভাষা হিন্দী হচ্ছে আমাদের ঐ বাজারের দৈনিক প্রতিপক্ষ।

এ-সব প্রসঙ্গ সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষার বিষয়টিতে যাবার আগে আমাদের ভারতবর্ষের ভাষাচিত্রটিও একটু ভালো করে দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

॥ তিন ॥

প্রচুর ভাষা আমাদের দেশে। কুড়ি হাজারের বেশি মানুষ বলেন এ-রকম মাতৃভাষার সংখ্যা ভারতে ৬৬। বলা হয় ভারতের মতোই নাকি বহু ভাষার দেশ রাশিয়া : কিন্তু সেখানে কুড়ি হাজারের বেশি লোকে বলেন ৪২টি ভাষা, চীনেও এই সংখ্যা ৪২। ক্রমপর্যায়ে এরপরেই ভাষাপ্রাচুর্যের দেশ কানাডা, কেনিয়া এবং ফিলিপাইনস। এই তিনটি দেশে এই সংখ্যা ২৬।

অর্থাৎ পৃথিবীতে ভাষাবৈচিত্র্যের দিক থেকে আমরা ভারতীয়রা রয়েছি শীর্ষস্থানে। অনুপাত কষে দেখছি আমাদের দেশের ৩৩ শতাংশ মানুষ হিন্দুস্থানি বলেন। হিন্দুস্থানি অর্থাৎ হিন্দি এবং উর্দু। দুটি একই ভাষার দু-রকম সাহিত্যিক চেহারার নাম। আচার্য সুনীতিকুমার বলছেন, দুটোরই ধ্বনি এবং ব্যকরণ এক 'প্রভেদ শুধু বর্ণমালা ও উচ্চভাবের শব্দ লইয়া।' এই ৩৩ শতাংশ মানুষের মধ্যে আমাদের দেশে হিন্দি বলেন ২৮ শতাংশ, উর্দু ৫ শতাংশ। বাকি ৬৭ ভাগ লোক বলেন অন্যান্য ভাষা। তার মধ্যে তেলুগু বলেন ৮·২ শতাংশ, বাংলা ৮·১ শতাংশ, মারাঠি ৭·৬ শতাংশ, তামিল ৬·৯ শতাংশ, এ-রকম। অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি ভাষার সংখ্যাগত আধিপত্য আমাদের দেশে নেই। তবুও হিন্দিকে অফিসের ভাষা নির্বাচনের সময় সংখ্যাধিক্যের কথাটিই সবথেকে জোর গলায় তোলা হয়েছিল। হিন্দি থেকে অনেক উন্নতভাষা তখন দেশে ছিল তবুও শতকরা হারে কিছু বেশি মানুষ হিন্দি বলেন বলেই হিন্দি অফিসের ভাষা হয়েছিল। এখানে বলে রাখা ভালো হিন্দি আমাদের রাষ্ট্রভাষা নয়। রাষ্ট্রভাষা বলে কোনো ব্যাপার আমাদের সংবিধানে নেই। দেশেও নেই।

তবে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ধর্ম ও সংস্কৃতিরক্ষা, চাকুরির সুযোগ ইত্যাদির জন্যে নানা রক্ষাকবচের ব্যবস্থাও আছে সংবিধানের ২৯, ৩০, ৩৪৭ ও ৩৫০ ধারায়। সংবিধান রচয়িতারা বুঝেছিলেন যে শুধুমাত্র আইনকানুন গড়ে দুর্বলভাষার উপর প্রবলের নিত্য-আক্রমণ প্রতিহত করা যাবে না। তাই জাতীয় স্তরে পরস্পরের বোঝাপড়ার মারফত কিছু রক্ষাকবচ গড়ে তোলার কথাও তখন ভাবা হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলন ও ১৯৬১ সালে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে এ-সম্পর্কে নানা নির্দেশক নীতিও প্রণীত হয়েছে। অর্থাৎ সংবিধান রচয়িতারা সব ভাষারই বিকাশের পথ খোলা রাখার চেষ্টা করেছিলেন। বাগানের নানা বর্ণের ফুলের প্রতি সমদৃষ্টি আমাদের ভাষানীতির মূলকথা। 'অফিসের কাজে হিন্দি চলবে'—শুধু এটুকু আমাদের ভাষানীতি নয়।

সংবিধান প্রণেতারা বিষয়টাকে কি পর্যায়ে রাখতে চেয়েছিলেন তার একটা উদাহরণ রাখা যাক। সংবিধানের ৩৫০ক ধারায় বলা হয়েছে ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুদের প্রাথমিকস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের অধিকার থাকবে। সংবিধানের এই প্রস্তাব অত্যন্ত উদার এবং সুদূরপ্রসারী। কিন্তু এ-সব সাধুপ্রস্তাবের কার্যক্ষেত্রে কি পরিণতি হলো তাও দেখে রাখা ভালো। উপরিউক্ত মন্ত্রীসম্মেলনে সব রাজ্যের মন্ত্রীরা এ বিষয়ে সর্বসম্মত হয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ করলেন যে, কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনো শ্রেণীতে যদি ভাষাগত সংখ্যালঘু দশজন ছাত্রও থাকে অথবা বিদ্যালয়ে সব মিলে ৪০ জন সংখ্যালঘু ভাষার ছাত্র থাকে তবে সে ছাত্ররা সে বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাবে। মাধ্যমিক স্তর সম্পর্কে সূত্র দাঁড়ালো অন্তত

বাংলা ভাষার সপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমায়েত

ছবি · তপন দাস

৬০ জন ছাত্র যদি বিদ্যালয়ে শেষ চারটি শ্রেণীতে পড়ে এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে যদি কমপক্ষে ১৫ জন ছাত্র থাকে তবে মাধ্যমিক স্তরেও সে ছেলেরা মাতৃভাষায় পড়ার সুযোগ পাবে।' । বলা বাহুল্য যে এসব আইনকানুনের প্রয়োগ কোথাও হয়নি। হিন্দি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় বসলে এ-রকম আরও দৃষ্টান্ত পাবো।

॥ চার ॥

হিন্দি সম্পর্কে গত কুড়ি বছর ধরে একটা কথা আমরা বারবার শুনে আসছি। যখনই কোথাও গণ্ডগোল বেধেছে, কেউ দু-একটা মোক্ষম যুক্তির অবতারণা করেছেন তখনই দিল্লীশ্বরেরা বলেছেন 'কারও উপরে জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া হবে না'। প্রতিশ্রুতিটি বেশ লক্ষ করার মতো। কিন্তু প্রশ্ন তা হলে—কি প্রক্রিয়ায় হিন্দি একমাত্র সরকারি ভাষা হয়ে উঠবে? এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করে কোথাও বলা হয়নি। কিন্তু প্রতিশ্রুতিটির সূত্র ধরে আমাদের মনে করে নিতে হয় যে বিষয়টি অন্যভাষার লোকেদের শুভবুদ্ধির উপরে ছেড়ে দেওয়া হবে। কারণ যা চাপানো হবে না তাকে প্রচলিত করার আর একটিমাত্র উপায় থাকে—সে হচ্ছে তাকে স্ব-ইচ্ছায় গ্রহণ করানোর পথ খুলে অপেক্ষা করা। আমাদের সংবিধানের সুরও এ-রকমই। জোর করে ধর্ম, ভাষা, অভিমত আমরা কারও উপর চাপাতে পারি না। মানুষ নিজে বেছে নেবে। আমরা উদ্ধত তর্জনীর সংকেতে কাউকে বলতে পারি না ঐটা বাছো। ওই সম্প্রদায়ে যাও।

কিন্তু হিন্দির বিষয়ে এ-সব সাংবিধানিক সুর খাটছে না। দু-একটা উদাহরণ দেবো। এখন দেশের সর্বত্র হিন্দি অফিসার নিযুক্ত হচ্ছেন। সবরকমের কেন্দ্রীয় সরকারি অফিস, সরকারি শিল্প, ব্যাঙ্ক, গবেষণা সংস্থা সর্বত্র হিন্দি অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। হিন্দি যেহেতু মূল অফিসিয়াল ভাষা তাই অফিসে-অফিসে তার ব্যবহারের একটা ব্যবস্থা থাকুক। সবাই হিন্দি জানবেন এ-রকম তো নয়, প্রয়োজনে হিন্দি থেকে বা হিন্দিতে ঐ অফিসার নথিপত্রের অনুবাদ করে দিতে পারবেন। কিন্তু এ-পর্যন্ত বিষয়টি থেমে রইলো না। নিয়ম হয়েছে হিন্দিতে পাওয়া সমস্ত চিঠির জবাব হিন্দিতেই দিতে হবে। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ নিয়ম। শুধুমাত্র হিন্দিতে যে-সব চিঠি সরকারি দফতরে আসবে তাদের জন্যে এ-নিয়ম।

এই বিধির সূত্রে অনেকগুলো নতুন বিষয় বোঝার সুবিধা হয়েছে। প্রথমত এখানে নিশ্চিতভাবে হিন্দি চাপানো হল। এ নিয়মে প্রত্যেকটি কর্মীকে হিন্দি শিখতেই হবে। অন্য উপায় নেই। এখানে বলে রাখা ভালো কেন্দ্রীয় সরকার তাদের অফিসে হিন্দি বাধ্যতামূলক করতে পারেন, তাতে আইনের অন্তত বাধা নেই। কিন্তু মুখে বলবো হিন্দি চাপানো হবে না,কার্যত চাপাবো এ কী ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, এ নিয়ম ইংরেজি থেকে হিন্দির অবস্থানকে সুবিধাজনক অবস্থায় নিয়ে এলো। তৃতীয়ত এবং এক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—এ-নিয়মে হিন্দি ভাষার উপকারের থেকে হিন্দিভাষীর উপকার অনেক বেশি হবে। দেশের আনুমানিক পঞ্চাশ ভাগ লোক হিন্দি বোঝেন না। তাঁরা সরকারের সঙ্গে যে ভাষায় চিঠিপত্র লিখবেন সে ভাষায় উত্তর পাবার গ্যারান্টি রইলো না; কিন্তু হিন্দিভাষী লোকেরা তা পেয়ে গেলেন। এ-নিয়মও সংবিধানের সুরে মিলছে না। সংবিধানের ১৭ নম্বর পার্টে ৩৫০ নম্বর আর্টিকেলে বলা হয়েছে ভারতের যে-কোনো লোকের যে-কোনো ভারতীয় ভাষায় সরকারের কাছে চিঠিপত্র লেখার অধিকার থাকবে। ৩৫০ বি আর্টিকেলে বলা হয়েছে একজন স্পেশাল অফিসার থাকবেন সংখ্যালঘুভাষীদের এ-সব সুযোগ-সুবিধা দেখার জন্যে। এ-সব বিধি অন্যরকমের প্রত্যাশা জাগায়। তার বদলে এ কী অদ্ভুত একপেশে নিয়ম। হিন্দি ভাষার ক্ষমতার প্রসার এবং হিন্দিভাষীদের ক্ষমতা ও সুবিধার প্রসার দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। অন্যভাষাকে সংকুচিত না করে হিন্দি ভাষার ক্ষমতার প্রসার ঘটুক তাতে সকলেরই সম্মতি থাকবে। কিন্তু অন্য ভাষায় কথা-বলিয়েদের তুলনায় হিন্দিভাষীদের একরত্তি বেশি ক্ষমতা বা একবিন্দু বেশি সুবিধাও অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। হিন্দি সম্প্রচারের সবথেকে ভয়ংকর দিক হচ্ছে এই ঝোঁক। প্রতি পদক্ষেপে দেশের মানুষদের বুঝিয়ে চলা দরকার ছিল যে ভাষার প্রচারবৃদ্ধি ও ভাষায় কথা বলিয়েদের ক্ষমতাবৃদ্ধিকে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে না। হিন্দি যেহেতু সংখ্যায় বেশি এবং সে যেহেতু সুবিধাটা নিচ্ছে তাই ধৈর্য ধরে এই

ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন দিবসে এপার বাংলার সংগ্রামী ভাষাপ্রেমীরা — *ছবি : রাজীব বসু*

বোঝানোর দায়িত্বটাও ছিল হিন্দিওয়ালাদেরই। কিন্তু ওরা সে রাস্তাতে তো গেলেনই না বরং এর থেকেও কঠোর বিধি সব চালু করে বসলেন। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ডিভিশনের হেড অফিস থেকে ১৯৮২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর প্রচারিত এক চিঠিতে বলা হয়েছে From now it is not necessary to ascertain willingness of the employees for nomination for (i) Hindi classes and (ii) Hindi typing and Hindi stenography classes. While nominating the employees it should be borne in mind that all non-Hindi knowing employees are to get the requisite training within the maximum period of 5 years। অর্থাৎ হিন্দি চাপানো হচ্ছেই। সরকার, ব্যাঙ্ক, বড় শিল্প, গবেষণা সংস্থা সর্বত্র। চাপানোর উদ্দেশ্য কর্মীরা হিন্দি জেনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকবেন এ-জন্যে নয়। সমস্ত কাজ হিন্দিতে হবে বলে। মনে হয় সরকার এ-বিষয়ে এ-রকম তৎপর কারণ এর পেছনে আছে আমাদের হিন্দি অঞ্চলের ভোটের লোভ। ঐ ভোটের জন্যে ৩৩ ভাগ লোকের ভাষা সারাদেশকে গিলতেই হবে। অন্যদিকে 'হিন্দি চাপানো হবে না' এই মিথ্যে কথাটিও একটি ভোটপ্রার্থী অভিব্যক্তি। এর লক্ষ্য অহিন্দি অঞ্চল।

এবং শুধু সরকারি কাজ নয়। সংস্কৃতিতো বটেই এমনকি শিক্ষার ক্ষেত্রেও হিন্দির প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে। গত পনেরো বছরে

আপনার কিশোরী মেয়েটি সঠিক ব্রা পরছে কি?

পলি রুবিয়াঃ ২৬টাকা

টীন-এজার

বাড়ন্ত মেয়েদের জন্য বিশেষ উপযোগী 'ফ্রন্ট ওপেন' স্টাইলের ব্রা
নরম কুঁচি দেওয়া ইলাসৃটিক দিয়ে তৈরী

"কোন কিশোরী মেয়েরই অত্যধিক আঁটসাঁট ব্রা বা জামা পরা উচিত নয়। তাতে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়"।

–এক নামী গাইনিকলজিস্ট্

আপনার মেয়ে স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক হোক, হেসে খেলে বেড়ে উঠুক– আপনার মত আমরাও তাই চাই। তার প্রথম ব্রা পরার অভিজ্ঞতা যেন বিরক্তিকর, অস্বাস্থ্যকর না হয়। তাই "টীন-এজার" ব্রা। সুন্দর ফিট করে অথচ বেঁধে বসে না। কারণ এর পিঠে আর পাশে নরম কুঁচি দেওয়া ইলাসৃটিক আছে। আর কাঁধে নামী দামী লাইক্রা* ইলাসৃটিক টেপ।

"টীন-এজার" ব্রা অতি সহজেই পরা যায়।

সামনে একটি হুক্ সহজেই লাগানো যায়। ব্রা পরতে যারা প্রথম শিখছে তাদের কথা ভেবে এই ব্যবস্থা।

এখন

২৬ টাকায় গোলাপী, কালো, লাল ও হালকা বাদামী রঙেও পাওয়া যাচ্ছে। ম্যাচিং প্যান্টিও পাবেন ঐ রঙে।

* লাইক্রা হল আমেরিকার দ্যুপঁ কোম্পানির রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেডমার্ক।

TEENAGER BRA
by belle

Belle Wears Pvt. Ltd.
54/B, Suburban School Road,
Calcutta—700 025
Phone: 48-3708

ARTIG 330 (R3)

যদি কাছাকাছি বেল'এর অনুমোদিত দোকান খুঁজে না পান, তবে আমাদের লিখুন। আমরা দোকানের ঠিকানা পাঠাব, অথবা আপনার বাড়িতেই পাঠিয়ে দেব বেল'এর লেডি অ্যাডভাইসার কে। (কেনবার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।)

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অন্যভাষা শেখার বিভাগ বিশেষ খোলা হয়নি, কিন্তু সর্বত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে হিন্দি বিভাগ খোলা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার বিষয়ে অন্য সমস্ত ভাষা নিয়ে কোনো সার্বিক নীতি নেই। নীতি হচ্ছে হিন্দি জিন্দাবাদ। এ-প্রসঙ্গে প্রচুর প্রমাণ দাঁড় করানো যায়। ১৯৮৪ সালে কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের যে বার্ষিক রিপোর্ট বেরিয়েছে তাতে দেখছি ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে হিন্দি পড়াবার বিভাগ আছে ৭৫টি। অন্যদিকে বাংলা, মরাঠি, তেলুগু, গুজরাটি, কন্নাড়, তামিল, পঞ্জাবি, ওড়িয়া, মালয়লাম, অসমিয়া, কাশ্মীরি, মণিপুরী এই ১২টি ভাষার জন্যেও সর্বমোট ৭৫টি বিভাগ। অথচ এই সমস্ত ভাষা দেশের ৫২ ভাগ লোকের মাতৃভাষা। মঞ্জুরি কমিশনের পক্ষপাতিত্বের শেষ এখানেও নয়। ১৯৮৬ সালে শুধু হিন্দিতে জুনিয়ার ফেলোশিপ পেয়েছেন ৭৮ জন, ভারতের অন্য সমস্ত ভাষা মিলে পেয়েছেন ৭১ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দির শিক্ষকের সংখ্যাও আনুপাতিক হারে অনেক বেশি। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষে সবথেকে বেশি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য পড়ায়। সেখানে আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগে পঞ্জাবি, বাংলা, তামিল, মালয়ালাম, কন্নাড়, গুজরাটি, মরাঠি, তেলেগু, সিন্ধি, অসমীয়া, মণিপুরী এই তেরটি ভাষা ও সাহিত্য পড়াবার জন্যে ২৬জন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন ১৯৮৪ সালে; কিন্তু শুধুমাত্র হিন্দির জন্যে ছিলেন ১৭ জন। গবেষণা, বইপত্র কেনার টাকা, অনুদান সবই হিন্দিতে মাত্রাতিরিক্ত বেশি। অন্যরা সবসময়েই বঞ্চিত। আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দু-তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রকল্পের জন্য মঞ্জরী কমিশনে বারবার টাকা চেয়েও পাননি।

শুধু শিক্ষা নয়, যেখানে কোনো সভ্য ও শিক্ষিত দেশ ভেজাল মেশায় না, সেই সেন্সাসের কাজকর্মে পর্যন্ত অন্যায় হস্তক্ষেপ হয়েছে। এ শতাব্দীর প্রথম (১৯০১) জনগণনায় দেখছি ভারতে বাংলাভাষীর সংখ্যা ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ। হিন্দি তখন দু-ভাগে ভাগ করে দেখানো হত : পূর্বী হিন্দি ও পশ্চিমা হিন্দি। এই দুই হিন্দির সম্মিলিত সংখ্যা তখন ছিল ৬ কোটি ২৮ লক্ষ। অর্থাৎ শতাব্দী শুরু করেছি আমরা বাংলাভাষী ও হিন্দিভাষীর মধ্যে পৌনে দু কোটি লোকের পার্থক্য নিয়ে। ১৯৬১ সালের গণনায় এই উপমহাদেশে বাঙালির মোট সংখ্যার থেকে হিন্দিভাষীদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো প্রায় দু কোটি ত্রিশ লক্ষে। কিন্তু ১৯৭১ সালে এসে আমাদের সব হিসেবপত্র গুলিয়ে গেল, এ-সময়ে দেখছি এই উপমহাদেশে হিন্দিভাষীর সংখ্যা বাঙালির থেকে এক লাফে ৮ কোটি বেড়ে গেছে। শুধু অস্বাভাবিক নয়, অসম্ভব বৃদ্ধি। ১৯৬১ সালে ভারতে হিন্দি ছিল ১২ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের মাতৃভাষা।[5] ১৯৭১ সালে মাতৃভাষার হিসেব এখনো বেরোয়নি কিন্তু হিন্দিভাষী লোক হয়ে গেল ২০ কোটি ৮৫ লক্ষ।[6] এ-পরিমাণ হিন্দিবলিয়ে হঠাৎ কোথা

ভারতের সর্বস্তরে হিন্দি ভাষা ঢুকিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কেন্দ্রীয় সরকার *ছবি : পি-আই-বি*

থেকে এসে উদয় হলেন? জন্ম এবং মৃত্যু হারে এ-সময়ে পশ্চিমবাংলার সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের কোনো পার্থক্য দেখছি না। ১৯৬১-৭০ এ-সময়ে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের হাজার প্রতি জন্মহার ছিল যথাক্রমে ৪৪·৩, ৪২·৫ ও ৪১·৯। মৃত্যুহার ছিল প—১৮·৫, উ-২৪·২, বি- ২৩·৩।[7] অর্থাৎ এ-সময় মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির হার পশ্চিমবঙ্গেই বেশি ছিল। এ-অবস্থায় ব্যাপারটা যেভাবে ঘটতে পারে সেভাবেই হিন্দিবলিয়ের সংখ্যা বেড়েছে। অর্থাৎ হিন্দি-মাতার গর্ভে নয়, ঐ সন্তানদের উদয় হয়েছে অন্য উৎস থেকে। সেন্সাসের নিয়ম-কানুন পাল্টে, ভাষার নিয়ম-কানুন না মেনে অন্যভাষার লোকদের জোর করে হিন্দিভাষী বলে দেখানো হয়েছে।[8] উদ্দেশ্য খুবই সরল। হিন্দিভাষীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। কারণ মাত্র ২৮ ভাগের অনুপাত কর্তাদের পছন্দ হচ্ছে না। এত কমসংখ্যা নিয়ে রাষ্ট্রভাষাগিরি করা যায়? তাই রাতারাতি কিছু ভাষা ধরে ওদের বলে দেওয়া হয়েছে যে তারা এখন থেকে হিন্দিভাষার সম্মান পাবে। এই রীতির দাক্ষিণ্যে কোন কোন ভাষা ও উপভাষাকে হিন্দির 'দহ'তে আত্মবিসর্জন দিতে হয়েছে, তার সম্পূর্ণ তালিকা সরকারি উৎস থেকেই তুলে দেওয়া যায়।[9] বলা বাহুল্য, তালিকা ছোটো নয়। ১ আওধী, ২ বাগলখণ্ডি, ৩ বাগরি রাজস্থানি, ৪ বনজারি, ৫ ভদ্রওয়াহি, ৬ ভারমৌরিগাড্ডি, ৭ ভোজপুরী, ৮ ব্রজভাষা, ৯ বুন্দেলখণ্ডি, ১০ ছামবেয়ালি, ১১ ছত্রিশগড়ি, ১২ ছুড়াহি, ১৩ ধুমধারি, ১৪ গাড়োয়ালি, ১৫ গোজরি, ১৬ হরৌতি, ১৭ হরিয়ানি, ১৮ কাংরি, ১৯ খইডারি, ২০ খোড়তা-খোট্টা, ২১ কুলবি, ২২, কুমায়ুনি, ২৩ কুরমালি থার, ২৪ লামানি-লাম্বাড়ি, ২৫ লোধি, ২৬ মদেশিয়, ২৭ মাগধি-মগহি, ২৮ মৈথিলি, ২৯ মালবি, ৩০ মাণ্ডেয়ালি, ৩১ মাড়োয়াড়ি, ৩২ মেওয়াড়ি, ৩৩ মেওয়াতি, ৩৪ নাগপুরিয়া, ৩৫ নিমাড়ি, ৩৬ পাহাড়ি, ৩৭ পাঁচপরগনিয়া, ৩৮ পাওয়ারি-পওয়ারি, ৩৯ রাজস্থানী, ৪০ সদন-সাদরি, ৪১ শিরমৌরি, ৪২ সোন্দোয়ারি, ৪৩ সুরগুজিয়া। এই তালিকা নিয়ে বেশি আলোচনার প্রয়োজন নেই। এই তালিকা সংলগ্ন ব্যাখ্যা পড়ে মনে হয় আরও অনেক ছোটো ভাষাকে হিন্দির অন্তর্ভুক্ত করে দেখানো হয়েছে। কারণ গ্রিয়ার্সন সাহেব তাঁর পুস্তকে ভারতে ভাষার সংখ্যা বলেছিলেন—১৭৯টি, উপভাষা- ৫৪৪।[10] ১৯৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ধরা হচ্ছে ভারতবর্ষে ভাষা ও উপভাষার মিলিত সংখ্যা ১০৫।[11] এখানে বলে রাখা ভালো পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে ১০/১১ টির বেশি ভাষা যায়নি। অর্থাৎ নিরুদ্দিষ্ট ভাষারা অধিকাংশই হিন্দির গর্ভে গিয়ে ঢুকেছেন বলেই মনে হয়। বাংলাভাষার সংসার থেকেই চুরি গেছে মালদার খোট্টা উপভাষা ও জলপাইগুড়ির প্রায়-বঙ্গীভূত সাদরি। আর একটু অনুগ্রহ করলেই বাকি অংশটুকুও অনায়াসেই নিয়ে নেওয়া যেতো। তবে যতটুকুই হয়েছে তাতেও বেশ আন্তর্জাতিক নাড়াচড়া পড়ে গেছে। যে-পণ্ডিতরা কখনো সাতে-পাঁচে থাকেন না সেই এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার (১৯৮৫) সম্পাদকেরা পর্যন্ত থতমত খেয়ে বলেছেন significant overstatement by census[12]। এদিকে যে পরিমাণ গোজামিল দেওয়া হয়েছে তাতে ষোল বছর ধরে ১৯৭১ সালের মাতৃভাষা-সম্পর্কিত সেন্সাস রিপোর্ট বের করার সাহস কোনো সরকারেরই হচ্ছে না। আমার বিশ্বাস ঐ রিপোর্ট কখনো বেরোবেও না। ১৯৮১ সালের ভাষার সেন্সাসও এখনো বেরোয়নি। কে জানে ভেজালের দর্শন নিয়ে উচ্চমার্গে পণ্ডিতদের মধ্যে হয়তো বাতচিত চলছে। বস্তুত এ-সব নিয়ে ভাবতে বসলে বোঝা যায় যে ভারত সরকারের দূরদৃষ্টির কোনো অভাব

নেই। ভাষা বিভাগটিকে সংস্কৃতি বা শিক্ষাদপ্তরের অধীনে না রেখে তাঁরা অনেক আগেই রেখেছেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে। অনতিবিলম্বেই বিভাগটিকে যখন প্রতিরক্ষা দপ্তরের অধীনে পাঠাতে হবেই তখন এ-সব গোপনীয় কাগজপত্র প্রকাশ করে দেশের নিরাপত্তার ক্ষতি আর করা কেন।

॥ পাঁচ ॥

এই রাক্ষুসে ভাষানীতির ফল দেশের পক্ষে ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। এই যে আজকাল যার-যার ভাষা নিয়ে যে-যে ভাবছেন দেশে নবাগত এই ভাষাসাম্প্রদায়িকতার কারণ হিন্দির ঊর্ধ্বচাপ। অসমের কথা আর বলে কাজ নেই। সেখানে অন্যরাজ্যের লোক চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গেলে তাকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।'' দার্জিলিং-এ নেপালি রাজ্য গঠনের দাবীর সূচনাও ভাষাভিত্তিক ভিন্নতাবোধ থেকে। শুধু এ-দুটি নয়, সমগ্র ভারতেই ভাষা নিয়ে ধুন্দুমার কাণ্ড চলছে। অসমিয়া দেড়শ বছর আগে বাংলার উপভাষা ছিল কিন্তু কোঙ্কনি এই সেদিনও ছিল মরাঠির উপভাষা। মাত্র দশ বছর আগে সাহিত্য অকাদেমি কোঙ্কনিকে পৃথক লিখিত ভাষার এক সাহিত্যিক স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই স্বীকৃতির সূত্রেই গোয়ায় অফিসিয়াল ভাষার স্বীকৃতির জন্য গত দু-বছর ধরে এক তুমুল সংগ্রাম শুরু হয়েছে। এ সংগ্রামে লোক মরেছে এ পর্যন্ত আটজন। যেহেতু মরাঠি বলেন মুখ্যত হিন্দুরা এবং কোঙ্কনি বলেন মূলত ক্যাথলিকরা তাই ভাষাযুদ্ধের সঙ্গে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাও জড়িয়ে পড়েছে। হিন্দু প্রধান উত্তর গোয়া এবং ক্যাথলিকপ্রধান দক্ষিণ গোয়া এখন তিক্ততা এবং পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ঘৃণায় কার্যত প্রায় দুটি দেশ। কোঙ্কনি সাহিত্য কোন লিপিতে লেখা হবে দেবনাগরী নাকি রোমান এই টেকনিক্যাল তর্কেও কেউ সাম্প্রদায়িক যুক্তির ঊর্ধ্বে উঠতে পারছেন না। ওদিকে তামিলনাড়ুতে গত এক বছর আবার নতুন করে হিন্দি-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। এ আন্দোলনও যথেষ্ট উগ্র। ওখানেও ডজন-ডজন বোমা ফাটছে: লোক মরছে। খবর গত কয়েক মাসে চারজন মরেছেন, আহত প্রায় পঞ্চাশ। অর্থাৎ ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার মতো ভাষার প্রশ্নেও এখন ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা, যুক্তি-তর্ক-আলোচনার স্থান থাকছে না। ধর্মীয় ব্যাপারে আজকাল কোথাও-কোথাও সকালের গুজব দুপুরে দাঙ্গা হয়ে রাত্তিরে মৃতদেহস্তূপে পরিণত হয়। এই সর্বনাশা বিপদ চলেছে ভাষার ক্ষেত্রেও। তবু বলা যায় এদেশে ভাষার তুলনায় ধর্মে একটা সুবিধা আছে। কারণ যত দাঙ্গাই হোক তবু এ দেশ ধর্মবৈচিত্র্যের দেশ নয়। মাত্র চারটি ধর্মের অনুপাত এখানে শতকরা ১এর ঊর্ধ্বে। এবং হিন্দুদের আনুপাতিক প্রাধান্য দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর থেকে ১১ গুণ বেশি। হিন্দু এখানে ৮৭·৭ ভাগ, মুসলমান ১১·২, খ্রীষ্টান ২·৬, শিখ ১·৬। কিন্তু শতকরা ১ এর উপরে ভাষা পনেরোটি। ভারতবর্ষে যে বৈচিত্র্যের মাঝে আমরা ঐক্য খুঁজি তা মুখ্যত ভাষাগত ও

বাংলাভাষা নিয়ে আশুতোষের কাজ অবিস্মরণীয়

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। গ্রিয়ার্সনের হিসেব অনুসারে ৭২৩টি ভাষা ও উপভাষা এ দেশে আছে। এ-রকম হারে ভাষাদ্বেষ বাড়তে থাকলে, গোয়ার মতো ভাষাদ্বেষ ও ধর্মদ্বেষ মিশতে থাকলে—কি উপায় হবে আমাদের? অন্নদাশঙ্কর রায় ছাব্বিশ বছর আগে এক প্রবন্ধে'' ভাষানীতি আলোচনা করে বলেছিলেন, 'বহুভাষী দেশ বহুরাষ্ট্র হবে', 'ভারত যদি ছত্রভঙ্গ হয় ভাষার ইস্যুতেই হবে।' উপরের ঐ ঘটনাবলী কি সেই সর্বনাশের পূর্বসূচনা নয়? এক দুর্বল ভাষানীতি নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম তারপর সে হীনবল নীতির প্রয়োগের সময় নিরপেক্ষতা ও ধৈর্যের বদলে পক্ষপাতদুষ্ট কুটিলতা দিয়ে তাকে উৎরে দেবার বাসনায় আজ আমরা দেশজুড়ে দুরারোগ্য এক ভাষারোগের জন্ম কি দিইনি? কিছু লোকের উদার অপদার্থতা, কিছু লোকের অন্যের স্কন্ধারোহনের অদম্য জৈবিক বেগ এবং অন্যকিছু লোকের নিশ্চিন্ত-নির্বোধ-নিদ্রা অবাঞ্ছিত এই অবস্থাকে কি ঘনিয়ে তোলেনি? অন্নদাশঙ্করের ভবিষ্যদ্বাণী একসময় কারও-কারও কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল: আজ যতদিন যাচ্ছে সে-রকম মনে করার কোনো উপায় কি থাকছে?

॥ ছয় ॥

ভারতে একমাত্র আমাদেরই এই সমস্ত উৎপাত তুচ্ছ করার শক্তি ছিল। কিন্তু আমরা বাঙালিরা আমাদের ভাষার প্রতি যে ব্যবহার করছি তারও কোনো তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথ এক শ্লেষাত্মক গানে বঙ্গজননী সম্পর্কে লিখেছিলেন যার 'ভাষা হায়/ ভুলিতে সবে চায়'। এ কথাটিতে সে যুগে হয়তো শ্লেষ ছিল আজ এ কথায় শ্লেষ নেই। এখন বঙ্গভাষা ভুলতে চাওয়াই হচ্ছে বাঙালির খোলামেলা প্রাত্যহিক বাসনা। এখন তিনিই উপহাসাস্পদ যিনি সন্তানকে বঙ্গভাষার স্কুলে পাঠান, বাংলায় চিঠি লেখেন, সভায় বাংলা বলেন, বঙ্গভাষায় দুরূহ চিন্তার বই লেখেন। আজকাল সকালবেলা রাস্তার মোড়ে দাঁড়ালে দেখা যাবে কসাই যেমন ছাগসন্তানকে টানে তেমনি শিশু ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সাহেব বানাবার জন্যে। দিনকে দিন সমাজে সেসব

রাজ্যসরকারের শিক্ষানীতির মরীচিকা: প্রাইমারি স্তরে ইংরাজি তুলে দেওয়া আর ভাষা শিক্ষার পাঠক্রম থেকে সাহিত্যের বিদায়

লোকের সংখ্যা বাড়ছে যাদের আর কি ঠিক আছে জানি না, তবে মূল ব্যাপারটার ভুল হয়ে গেছে, জন্মানোর স্থান ভুল নির্বাচিত হয়ে গেছে। অথচ এ রকম হবার কথা ছিল না। এই শতাব্দী আমরা শুরু করেছিলাম খুবই পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে। তবু কেন এ-রকম হল?

ইতিহাসে পরে যাবো। আপাতত ইংরেজি মাধ্যমের বিষয়টা দেখে নিই। এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখি পৃথিবীতে যে দু-একটি বিষয়ে এখনো পণ্ডিতদের মধ্যে একটা আস্ত জঙ্গল নষ্ট হবার আগেই সিদ্ধান্ত হয়, 'শিক্ষার সর্বোত্তম মাধ্যম মাতৃভাষা' তেমনি একটি সর্বজনসম্মত বিষয়। সমাজবিজ্ঞানে অপরাধের নানা ভাগ আছে। আইন বাঁচিয়ে যে অপরাধ করা হয় তাকে বলে হোয়াইট কালার ক্রাইম। কোনো ছাত্রকে তার মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়বার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি অন্যভাষায় পড়ানো হয় তবে তাও এক শ্বেত অপরাধ। এ বিষয়ে যাঁদের সংশয় আছে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের উপর বিশ্বাস থাকলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়ুন। বিশ্বাস যদি অন্যত্র থাকে তবে সাহেব-পণ্ডিতদের পুঁথি ঘাটুন; স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট পড়ুন। যাঁরা শাস্ত্র গুলে খেতে চান তাঁরা Psycholingustics-এর বই ঘাঁটুন। সর্বত্র এক কথা। কেউ ভদ্রতা করে অপরাধ শব্দটি হয়তো বলেননি। কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে মানুষ যত সহজে শিখতে পারে ও অধীত বিদ্যাকে পরিপাক করতে পারে অন্য ভাষায় তা হয় না। হওয়া সম্ভব নয়। একটি শিশুকে অন্য ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান পড়াবার অর্থ তার মনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটানোর উৎস-মুখ বন্ধ করে দেওয়া। নতুন বিদ্যার সঙ্গে তার নিজের জীবনের প্রাত্যহিক ছন্দের পথ আগলবদ্ধ করে রাখা, তার নিজস্বতা ও মৌলিকতার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া।

ছবি : অশোক চক্রবর্তী

এ সব কথা যে নিছক বুলি নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে আমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার ছাত্রদের ফলাফল থেকে। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পর্ষদের ছাপানো স্কুল তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র কলকাতায় মাধ্যমিক পর্ষদের অধীনস্থ ইংরেজি মাধ্যম স্কুল আছে ৩৬টি (১৯৮৩)। এ সব স্কুলের মধ্যে প্রচুর বিখ্যাত স্কুল আছে যেখানে একটি সিটের জন্য বিপুল সংখ্যক মানুষ গিয়ে হেদিয়ে পড়েন। সেই জনসমুদ্র থেকে ছেলের পরীক্ষা, ছেলের মা বাপের পরীক্ষা ইত্যাদি নানা রকমের ঝাড়াই-বাছাই শেষ করে স্কুল কর্তৃপক্ষ যাদের বেছে নেন আনুমানিক সেই দশ বারো হাজার ছেলেমেয়ে অবশ্যই কলকাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান। এবার এই দুর্দান্ত শিশুদের কি অবস্থা হয় দেখা যাক।

১৯৮৩-১৯৮৬ এই চার বছরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষায় প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে স্থান পেয়েছে মোট ৮৩ জন ছাত্র। এর মধ্যে কলকাতার স্কুলের ছাত্র মোট ৪৪ জন তারমধ্যে ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র মাত্র ৩ জন। এই তিনজন ছাত্র যথাক্রমে ১৯৮৩ সালে গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের অজন্তা বিশ্বাস (একাদশতম), ১৯৮৪ সালে সাউথপয়েন্ট স্কুলের ছাত্র সায়ন ভট্টাচার্য (দশম), এবং ১৯৮৩ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র অভিজিৎ ধরচৌধুরী (বিংশতম) এ ছাড়া ইংরেজি মাধ্যমের কোনো ছাত্রকে গত চার বছরের প্রথম কুড়িজনের মধ্যে পাচ্ছি না। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে মোট ৮৩ জন ছাত্রের মধ্যে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র মাত্র ৫ জন, বাকি ৭৮ জন বাংলার। এই ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজিতে লেটার পাবার অসম্ভব কাজটা যে তিনজন ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের মধ্যেও দুজন বাংলা মাধ্যমের ছাত্র। এবং এই ব্যাপারটা ঘটল এমন একটা সময়ে যখন সরকারি নীতির ফলে বাংলা মাধ্যমের স্কুলে সর্বত্র ইংরেজির ফল ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে। তবু কেন এরকম হয়? সব মিলে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে যে কলকাতার পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের অধীন সমস্ত ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল (৩৬টি) মিলে যত ভাল ছাত্র তৈরি করছেন একা কলকাতার হিন্দু বা হেয়ার স্কুল তার ৩/৪ গুণ ভালো তো করছেই, উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট হাইস্কুল বা টাকী হাউস স্পনসর্ড স্কুলও এককভাবে তার সমান করছে। কোনো চরমতম নিন্দুকেও বলবেন না যে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে শৃঙ্খলা নেই বা মাস্টারমশাইরা অযোগ্য। এ-সব দুর্নাম মাঝে মাঝে বাংলা স্কুল সম্পর্কেই শোনা যায়। তবু এ রকম একটা চিত্র কেন পাচ্ছি? এ কি অন্যভাষায় শেখার কুফল নয়?

এ যুক্তিতে কারও কারও মনে সংশয় থাকতে পারে কারণ দিল্লিবোর্ড আছে। ওদের স্কুলের নাকি আরও সুনাম। সেখানে ছাত্ররা নাম্বার পায়ও নাকি প্রচুর। ভাবা যেতে পারে যে দিল্লী বোর্ডের ছাত্ররা নিশ্চয়ই এ সমস্ত প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করবে! এ প্রসঙ্গে শ্রীসমর মুখোপাধ্যায়ের এক লেখায়[১৩] দেখছি প্রেসিডেন্সি কলেজের ভর্তির পরীক্ষায় আমাদের মধ্যশিক্ষা বোর্ডের ছাত্রদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাত্র ১৮ শতাংশ দিল্লি বোর্ডের ছেলে ভর্তির সুযোগ পায়। অনুমান করি এই আঠারোর মধ্যে কিছু আছে এ যুগের অরবিন্দ; যারা প্রতিভার গুণে যে কোনো মাধ্যমকেই কাবু করে নিতে পারে: বাকি কিছু ইংরেজি মাতৃভাষার ছেলে। পশ্চিমবঙ্গে ১০৫টি দিল্লি বোর্ডের স্কুল আছে। ওদের ছাত্রসংখ্যা প্রচুর। শ্রীমুখোপাধ্যায় আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ খবর দিয়েছেন 'প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি অনার্সে গত কয়েক বছর ধরে ৫/৬ জনের বেশি কোনো দিল্লি বোর্ডের ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারছে না।' এ প্রসঙ্গে আর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পৌঁছে দেখছি কলকাতার
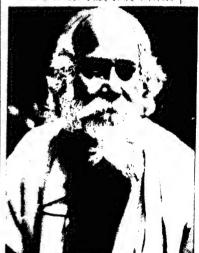
বাংলা 'ভাষা হায়/ভুলিতে সবে চায়।'

এই ভেতো ছাত্ররা এখনো এই দুর্দিনেও ভারতশ্রেষ্ঠ ছাত্র। অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গবেষণা বৃত্তি দেবার জন্য ভারতে ১৪৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্রদের মধ্যে যে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করেন তাতে কলকাতার ফল উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৬ সালের ৩ আগস্ট যে পরীক্ষা হয়েছে তাতে দেখছি সমস্ত ভারত থেকে জিওলজিতে বৃত্তির জন্য যে ৬১ জন ছাত্র নির্বাচিত হয়েছে তারমধ্যে ৩৭ জন কলকাতার। কেমিস্ট্রিতে ২১৩ জনের মধ্যে ৬৭ জন কলকাতার, ফিজিকসে ৬৪ জনের মধ্যে ১৪ জন। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষাতেও বাংলা মাধ্যমের ছেলেদের ফলই ভালো। আমাদের এই ছেলেরাই দেখছি দেশের বিজ্ঞানী হবে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবে, শ্রেষ্ঠ পেশায় নিযুক্ত হবে। অথচ ব্যাপক বাছাই করে যে দুশ আড়াই শ স্কুল পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রভর্তি করে তারমধ্যে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলই বেশি। ওরা পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লি বোর্ড মিলে শুধুমাত্র কলকাতার শ্রেষ্ঠতম ১০ হাজার শিশুকে

ইংরেজি স্কুলের এই বালকটিকে দেখে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'তোতাকাহিনী'র কথা *ছবি : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়*

যে প্রতিবছর বেছে নেন সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমতই থাকতে পারে না। তারপর সে শিশুদের কি পরিশ্রম! কি বিপুল পুস্তক ভার! কী মর্মান্তিক অর্থব্যয়। তারপরেও দেখা যাচ্ছে বাংলা বাছাইয়ের ১০-১২টি স্কুল ইংরেজি বাছাই থেকে প্রায় ১০ গুণ ভালো ছাত্র বের করছে। এই বিপুল অপচয়ের জন্যই আমরা অপরাধ শব্দটি ব্যবহার করেছিলাম। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও মাতৃভাষা না রেখে আমরা এ ক্ষতি করে চলেছি কিন্তু স্কুলের ক্ষতি জীবনে অপূরণীয়।

তবে শুধু সন্তানের বাপ-মা নয়, রাজ্যের সরকারটির দায়িত্বও এ ব্যাপারে কম নয়। ইংরেজি মাধ্যমে না-পড়ানো আর ইংরেজি না-পড়ানো এক কথা নয়। যতো আমরা মাতৃভাষার মাধ্যমে যাবো তত বেশি আমাদের ইংরেজিও শিখতে হবে। সরকার উচ্চশিক্ষাস্তরে অনার্সে স্নাতকোত্তর ক্লাসে ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়ার কোনো ব্যবস্থা করলেন না অথচ স্কুলে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি তুলে দিয়ে সবাইকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুললেন। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার! শিক্ষানীতিতে মরীচিকা গড়ে রেখে পথভ্রষ্ট অভিভাবককে দায়ী করা চলে না। ইংরেজি মাধ্যমের দিকে এই বিপুল জনস্রোতের পেছনে সরকারের ঐ নীতি। কারণ খুব স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই মধ্যবিত্তরা বুঝেছেন যে ভাষা হিসেবে ইংরেজি আমাদের শিখতেই হবে। শিখতে হবে জাতীয় ঐক্যের জন্য, বহির্জগতের জ্ঞানসাম্রাজ্যের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগের জন্য। এ-ছাড়াও ইংরেজি এখন পৃথিবীর ভাষা হয়ে উঠছে সে জন্যেও শিখতে হবে। গত কুড়ি বছরে ইংরেজির অবস্থান অনেক পাল্টে গেছে। সারা পৃথিবী এখন ঝাঁপিয়ে পড়ে ইংরেজি শিখছে, এমন কি চীনও। যে টিভি প্রোগ্রামটি পৃথিবীতে সব থেকে বেশি লোকের প্রিয় অনুষ্ঠান তার নাম 'ফলো মি'। চীনদেশের টি ভির একটি ইংরেজি শেখানোর অনুষ্ঠান। দেখেন দশকোটি মানুষ। পৃথিবীর ৭৬টি দেশের অফিসিয়াল ভাষা এখন ইংরেজি। নতুন সরকারি নিয়মে কলেজে তিন বছর, প্রাইমারি স্কুলে দু বছর ইংরেজি পাঠের সময় কমিয়ে সরকার বলছেন এখন ছেলেরা নাকি আগের থেকেও ভালো ইংরেজি শিখছে। এ-সব

> ***সত্যেন্দ্রনাথ সেনের সময়টুকু বাদ দিয়ে মাতৃভাষা বিতাড়নের ব্যাপারে প্রচুর অভূতপূর্ব কাজ কলকাতার শিক্ষাবিদরা করে ফেলেছেন। অনার্সে ও এম এ-তে মাতৃভাষায় লেখার নিয়ম হয়েছিল, কিন্তু বই হল না। বই প্রণয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কোনো উদ্যোগও নিলেন না।***

অসম্ভব ও অবান্তর কথা। এই জেদাজেদির মধ্যে না গিয়ে নতুন করে ইংরেজি শেখার সর্বজনগ্রাহ্য ও আধুনিক পদ্ধতি আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এবং ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের ছাত্রমেধ বন্ধ করতে হবে। কারণ প্রতি বছর পঁচিশ হাজার 'দুর্দান্ত' ছাত্রের সর্বনাশ করার অধিকার আমাদের নেই।

॥ সাত ॥

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করে তোলার প্রচেষ্টা আমরা শুরু করেছি প্রায় একশ বছর আগে থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিষয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই ইতিহাস এখানে সংক্ষিপ্তভাবে দেখে নেবার দরকার আছে, কারণ এই ইতিহাসের সূত্রে এদেশের মনীষীরা ভাষার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কি চেয়েছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় শেষ পর্যন্ত কি গড়তে কি গড়ে তুললেন তা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাবে। শুরু হয়েছিল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য। তাঁর প্রথম সমাবর্তনে (১৮৯১) তিনি বললেন, আমাদের সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য আমাদের 'dark depths of ignorence all round' দূর করার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে এদেশে শিক্ষার প্রচলন ঘটানো প্রয়োজন। বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ আলোচনার সূচনা বোধকরি এখানেই। ঠিক এক বছরের মধ্যেই (১৮৯২) রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় লিখলেন 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ। ইংরেজির মতো এক সমৃদ্ধ ভাষার বদলে কেন আমরা মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখবো তার হেতুসমূহ তখন অনেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও অনুধাবন করতে পারছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে লিখলেন 'ইংরেজি আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা, কিন্তু ভাবের ভাষা নহে।' ভাবের ভাষা কাজের ভাষার থেকেও বেশি প্রয়োজন। কারণ 'আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক।' সেই স্বাধীনতা যেহেতু আমরা শিক্ষায় রাখিনি সেজন্যে 'তেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপান্ত কিছু গড়িতে পারিতেছি না, তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না।'[১০] কারণ শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ হয়নি। আমাদের শিক্ষা অসভ্যদের রঙ-উল্কির সজ্জার মতো বহিরঙ্গের এক প্রহসন হয়ে আছে। এ শিক্ষা হজম হচ্ছে না। 'আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সঙ্গে তাহার অল্পই যোগ।' এই প্রবন্ধ পড়ে যুবক রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করে চিঠি লিখেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং সিনেট সদস্য আনন্দমোহন বসু। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'প্রতিছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে।'[১১]

এই সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে আর এক যুবক সিনেটে এক প্রস্তাব নিয়ে

ইংরেজি মাধ্যমের দিকে বিপুল ছাত্র-স্রোত ও অভিভাবকদের পথপ্রতীক্ষার পিছনে আছে রাজ্যের ভ্রান্ত শিক্ষানীতি *ছবি : তারাপদ ব্যানার্জি*

এলেন। যুবকের নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি প্রস্তাব করলেন,যে সমস্ত কলাবিভাগের ছাত্র সংস্কৃত ভাষাকে পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করেন তাঁদের বাংলা, হিন্দি, উর্দু এই তিনটির মধ্যে যে কোনো একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা পড়তে হবে। এই অত্যন্ত নিরীহ প্রস্তাবের বিপক্ষেও তখন প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে গেল। পক্ষে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমোহন এবং চন্দ্রনাথ এই দুই বসু। তবুও প্রস্তাব ১৭ : ১১ ভোটে পরাস্ত হলো। সাহেবরা দল বেঁধে ভোট দিয়ে এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন : ঘটনা কিন্তু সে রকম ছিল না। আনন্দমোহন বসু রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন 'আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।' স্বদেশীয়দের মাতৃভাষা বিতাড়নের বিজয়যুদ্ধের সূচনা সে থেকেই। কিন্তু আশুতোষও হাল ছাড়বার পাত্র নন। যুবক আশুতোষ প্রৌঢ় হয়ে ১৯২১ সালে একটু আঁট বেঁধে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার উদ্যোগ নিলেন। তখন তিনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। শহর-গ্রাম-গঞ্জ থেকে স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের ডেকে এনে বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা বসলো মে ৭, ১৯২১ তারিখে। সে সভায় প্রস্তাব পাশ হল যে মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন (স্কুলে)। সে প্রস্তাব ১৯২২ সালের ৭ জুলাই সেনেট অনুমোদন করলেন। কিন্তু এবারেও কার্যসিদ্ধি হল না। এবার পিছিয়ে গেলেন সরকার। আশুতোষের মৃত্যু হল এই স্বপ্নের রূপায়ণ না দেখেই। আশুতোষের ভাষাশিক্ষা নীতি ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে উদারতম। শুধু বাংলা নয় সমস্ত ভারতীয় ভাষার প্রতি ছিল তাঁর সমান দৃষ্টি। ভারতবর্ষে আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার মডেল কি হওয়া উচিত আশুতোষ তাঁর আমলের বাংলা এম এ-র পাঠক্রমে তার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সে নিয়মানুসারে যে বাংলায় পড়বে তাকে অন্য দুটি ভারতীয় ভাষাও শিখতে হবে। অন্যদের ক্ষেত্রেও তাই নিয়ম।

আশুতোষের মৃত্যুর পর পিতার আরব্ধ কাজ নতুন করে শুরু করলেন শ্যামাপ্রসাদ। রবীন্দ্রনাথের কলমও কিন্তু থেমে নেই। অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি এই এক বিষয়ে। আবার শুরু হলো আলোচনা, কমিটি গঠন। আবার শ্যামাপ্রসাদের উজ্জীবিত বক্তৃতা, আবার প্রস্তাব পাশ (১৯৩২)। এবার সরকারি অনুমোদনও পাওয়া গেল (১৯৩৫)। ছাত্র-ছাত্রীরা মাতৃভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা দিলেন ১৯৪০ সাল থেকে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এক বছর আগে।

শ্যামাপ্রসাদ দ্রুত আরও কিছু কাজ করলেন। বিষয় ধরে ধরে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি গঠিত হল। সঙ্গে বাংলা বানান সংস্কারের একটি সমিতি। তিনি সে যুগে সমাবর্তনে বক্তৃতা করলেন বাংলায় (১৯৩৭), সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রচিত নিবন্ধকে পি এইচ ডির সুযোগদানের নিয়মও করলেন। এবং শ্যামাপ্রসাদের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মানসিকতা গড়ে উঠলো তার পরিণতিতে ডিগ্রি কোর্স পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠ স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত বাংলায় উত্তরপত্র লেখার নিয়ম-কানুনও ধীরে ধীরে প্রণীত হল। কিন্তু ঐ 'স্বদেশীয়' সাহেবরা আবার নড়েচড়ে উঠলেন ১৯৬২ সালে। তখন দেশ জুড়ে চলছে ভাষাবিতর্ক। তার মাঝখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরজিৎ লাহিড়ী সমাবর্তন ভাষণে বললেন, উপাচার্য অন্তত অনার্স এবং স্নাতকোত্তর স্তরে ইংরেজিকে পাঠমাধ্যম হিসাবে রাখা প্রয়োজন। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুক্তি উচ্চবিদ্যার উচ্চমাধ্যম চাই। সে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও যে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে কবি হয়েছেন সে সংবাদও উপাচার্য মহাশয় জানালেন। সেই শুরু হল স্বদেশীয়দের পুনরাক্রমণ। মাঝখানে সত্যেন্দ্রনাথ সেনের সময়টুকু বাদ দিয়ে মাতৃভাষা বিতাড়নের ব্যাপারে প্রচুর অভুতপূর্ব কাজ কলকাতার শিক্ষাবিদরা করে ফেলেছেন। অনার্সে ও এম এতে মাতৃভাষায় লেখার নিয়ম হয়েছিল, কিন্তু বই হল না। বই প্রণয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কোনো উদ্যোগও নিলেন না। স্নাতকশ্রেণীতে ইংরাজি বা বাংলা কোনো ভাষাশিক্ষারই আর আবশ্যকতা নেই। ইংরেজি বাংলা বিষয় হিসেবে না পড়েও বিজ্ঞান, হিসেবশাস্ত্র তো বটেই কলাবিভাগের স্নাতকও ডিগ্রী ধারণ করে বেরিয়ে আসছে। তার উপর এসে জুড়েছে 'কম্পালসারি অ্যাডিশনাল' নামের এক অতীব বিস্ময়কর বকচ্ছপ। এ সব আবোল

তাবোল কাণ্ডজ্ঞানহীন নীতি দেখে মনে হয় যে ভাষা ও সাহিত্যপাঠ জাতির কি প্রয়োজনে লাগে তার প্রাথমিক ধারণাসমূহ বিশ্ববিদ্যাতীর্থের নীতিনির্ধারকরা বাড়িতে তালাবন্ধ করে রেখে তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন। আজকাল যে সব গেঁয়ো কোঁদল বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে এ সব তার পরিণতিও হতে পারে। কারণ কোনো স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন চিন্তার এ রকম এলোমেলো পরিণতি হতে পারে না।

মাতৃভাষায় উচ্চবিদ্যার চর্চার সঙ্গে যদি একটি বিদেশিভাষা শিখে নেওয়া হয় তবে কার্যক্ষেত্রে কোথাও যে কোনো অসুবিধা হয় না তার প্রমাণ প্রচুর। রবীন্দ্রনাথ সে যুগে জাপানিদের কথা বলেছিলেন। জাপানে সমস্ত শিক্ষা হয় মাতৃভাষায়। ইংরেজি ওরা শেখে আমাদের থেকে কম। অথচ বিশ্বজুড়ে কিছু টেকনোলজিতে ওদের বিজ্ঞানীদের নিয়ে এখনো কাড়াকাড়ি হয়। আমরাই মারুতিতে এনেছি জাপানীদের, রাশিয়ানদের স্টীল প্ল্যান্টে। ওঁরা সবাই মাতৃভাষায় লেখাপড়া শিখেছেন। তাতে ইণ্ডাস্ট্রিতে কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে শুনিনি। মুজতবা আলি বলেছেন মিশরের বাকী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা।[১০] সেখানে ছাত্ররা আরবি মাধ্যমে ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিংও শেখে। গত ১৫/২০ বছরের মধ্যে এ রকম উদ্যোগ আমরা দেখেছি মালয়েশিয়াতে। এবং একটি দেশ স্বাধীন হবার পর তার বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে কিভাবে ভাষা ও শিক্ষা জড়িয়ে পরিকল্পনা করতে পারে তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মালয়েশিয়া।

মালয়েশিয়া আমাদের মতোই এই সেদিনও পরাধীন ছিল। ১৯৫৭ সালে স্বাধীন হবার পর আমাদের মতোই তাদেরও শিক্ষায়, প্রশাসনে, ব্যবসাক্ষেত্রে ইংরেজি-নির্ভরতা ছিল। ওদের দেশও বৈচিত্র্যের দেশ। বিশেষ করে ধর্মবৈচিত্র্য ওদের আমাদের থেকেও বেশি। মুসলমান ৫২·৯, বৌদ্ধ ১৭·৩, চীনা লোকধর্ম ১১·৬, হিন্দু ৭·০, খ্রিস্টান ৬·৪। সেখানে চীনা-মালয়ে দাঙ্গাও হয়। তদুপরি মালয় ভাষাটিও বোধকরি বঙ্গভাষা থেকে কম জোরদার। বলেনও কম লোক ৯০ লক্ষ (১৯৮৬), সাহিত্যেরও সৌরভ আমাদের মতো নেই। এই দুবলা ভাষাকে সম্মুখবর্তী করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মালয়েশিয়ার শিক্ষাবিদরা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা কিন্তু দেখার মতো। 'ইউনিভার্সিটি অফ মালয়' মালয়েশিয়ার সবথেকে বড় বিশ্ববিদ্যালয়। কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের যে বার্ষিক পুস্তক (১৯৮৪) বেরোয় তাতে দেখছি সেখানে ওঁরা কলা, সমাজবিজ্ঞান, প্রশাসন, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও আইন ইত্যাদি বিষয় মালয় ভাষার মাধ্যমে শেখান। সঙ্গে ওঁরা ইংরেজিকে রেখেছেন একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে নয়। মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অ্যানথ্রোপলজি, জেনেটিক্স, নিউক্লিয়ার সায়েন্স সব কিছু পড়ানোর মাধ্যমে মালয় ভাষা। কি করে এই অসাধ্য সাধন করলেন তার কিছু সূত্র পাচ্ছি মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্সের সাম্প্রতিক পাঠক্রম এবং আনুষঙ্গিক নিয়ম-কানুন থেকে। সেখানে ভর্তি হতে গেলে শুধু বিজ্ঞানের উচ্চ ডিগ্রি ও ভালো অনার্স থাকলেই চলবে না। ওদের নিয়ম All candidates must reach a reasonable standard of proficiency in Bahasa Malaysia. এবং তারপরেও সে ছাত্রকে ওরা আবার নিয়মিত নিয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের Language unit-এ। সেখানে ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ও বিজ্ঞানীরা মিলে নিয়মিত অনুবাদ, আলোচনা ও নানা শর্ট কোর্স চালাচ্ছেন। আছে নানা দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণের ব্যবস্থা। একেবারে পেশাদারী ব্যবস্থাপনা। এ গেল এক রকমের কাঠামো। মালয়েশিয়ার টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার অন্য রাস্তা ধরেছেন। ওদের বিষয় যেহেতু উচ্চ টেকনোলজি তাই সমস্যাও একটু বেশি। অনূদিত পুস্তক যে-সব বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে সে সব ওরা মালয় ভাষায় পড়াচ্ছেন। বাকি ইংরেজিতে। এভাবে প্রথম বর্ষে ইংরেজি একেবারেই নেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে আছে শতকরা দশ ভাগ, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। অর্থাৎ ওরা পর্যায়ক্রমে ইংরেজি তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন।

এই হচ্ছে একটা পরিকল্পনার চেহারা। আমরা কি আমাদের ভাষা নিয়ে এ রকম পরিকল্পনা করি? রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যালয়েও এই পরিকল্পনা কি আছে? কতজন বিদেশি ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে যার জন্যে রবীন্দ্রনাথ জীবনে সবথেকে বেশি প্রবন্ধ যে-বিষয়ে লিখেছেন সে বিষয়টিকে অবহেলা করতে হবে? এক প্রথাভাঙ্গা আইডিয়া থেকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। আমরা সেই আইডিয়ার বিকাশ ঘটাতে কি ব্যর্থ হইনি? আইডিয়ার সঙ্গে নতুন আইডিয়া যুক্ত না করে আমরা জুড়েছি অনুকরণ ও সমঝোতা। এই একই বিষয় ঘটেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্যতম শর্ত ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান। হয়েছে সেখানেও?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সভায় মাস্টারমশাইরা স্নাতক শ্রেণী থেকে ভাষা ও সাহিত্যপাঠ তুলে দিলেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়। তিনি লিখেছেন 'সেনেট এবং অ্যাকাডেমিক কাউনসিলে আমি খুব আপত্তি জানিয়েছিলাম যে একাজটা ভাল হচ্ছে না, অন্যায় হচ্ছে। ঠেকাতে পারিনি। বৈজ্ঞানিকেরা দলে ভারী ছিলেন। তাঁরা বললেন আমাদের ল্যাবরেটরিতে প্রচুর সময় যায়, আর আজকাল বিজ্ঞানচর্চা অত্যন্ত demanding সময় ও শক্তি দুটোই দাবি করে বেশি। সেইজন্যেই···· তুলে দিচ্ছি।'[১১] বস্তুত এই তুলে দেবার আগেও বিজ্ঞানের ছাত্রদের সবাইকে ভাষা-সাহিত্য পড়তে হত না। তবুও বিজ্ঞানীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-সাহিত্য তাড়ানোর হোতা। নানা কুসংস্কারে পীড়িত বিজ্ঞান-বুভুক্ষু এই সমাজে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমরা ধন্দে আছি—এই সার্বিক পতনের যুগে যে বিশ্ববিদ্যাতীর্থ উত্তীর্ণ স্নাতক রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্যগ্রন্থ বা শরৎচন্দ্রের একটিও উপন্যাস না পড়ে বেরিয়ে এলো, তার চেহারা কেমন হবে। যে বিদ্যাসাগরের জীবন জানলো না, নজরুলের কবিতায় ক্রোধ ও যন্ত্রণা কিভাবে মিশে থাকে, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় কিরকম নাচুনি জাগে, জীবনানন্দের চোখের দৃষ্টি ও শ্রবণক্ষমতা কী ভাবে শব্দে-শব্দে বিস্তৃত হয় এ সব যে বুঝলো না সে কীরকম বাঙালি হবে। তরুণ বয়সে সাহিত্যের অদরকারী ক্লাশে মাস্টারমশাইরা আমাদের সাহিত্যপাঠের ইন্দ্রিয়সমূহ এত বছর ধরে খুলে দিয়েছেন। তারপর সেই সাহিত্যবোধ কাজ করেছে নাটকের দলে, ছোট ম্যাগাজিনে, পাড়ার লাইব্রেরিতে এমন কি ব্যক্তিগত চরম দুর্যোগে এবং সঙ্কটেও। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে বঙ্গদেশে সাহিত্য বাদ দিয়ে কি মানুষ গড়া চলে? স্বাদেশিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, পরহিতব্রত এ-সব আমরা যত কমই শিখে থাকি না কেন শিখেছি কোথায়? নেতাদের বক্তৃতায়? আমাদের গ্রামজীবন, ভারতবর্ষের অনাথ-আতুরদের জীবনবৃত্তান্ত বারবার দেখিয়ে-দেখিয়ে পূর্ণাঙ্গ স্বার্থপরতা থেকে কে আমাদের রক্ষা করছে বারবার? কোনো সমাজবিজ্ঞানী? আমরা কি সাহিত্য-শিক্ষিত জাতি নই? সাহিত্য সরিয়ে রাখলে এই দুর্দিনেও আমাদের মনে আবেগ উদ্যম ও স্পৃহা কে আর গড়তে পারে? এ সব প্রশ্ন কি আরও demanding নয়?

আমরা জানি না মাস্টারমশাইরা এ সব ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন কি না। আমরা এ কথাও জানি না মাষ্টারমশাইরা কোন বিজ্ঞানীকে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের আদর্শ মডেল বলে মনে করেন, হরগোবিন্দ খোরানা নাকি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়! এই প্রশ্নটি বোধকরি বেশি demanding.

॥ আট ॥

অন্যদিকে সরকারি কাজকর্মে বাংলাভাষার প্রচলন বিষয়ে গত চল্লিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকাও যথেষ্ট আরামপ্রদ। প্রথম চৌদ্দ বছর সুনিদ্রায় কাটিয়ে ১৯৬১ সালে হঠাৎ কি মনে করে একটি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্ট ওরা হাজির করলেন। সে বড় জবরদস্ত আইন। তাতে বলা হল দুর্জয়লিঙ্গে নেপালী ও বাংলা দুটিই এবং তলায় বাংলা হবে languages to be used for the official purposes of the state of West Bengal. আরও বলা হলো দু'বছরের মধ্যেই এই আইন কার্যকর হবে। (....effect from such date not later than two years from the date of commencement of this Act.) ১৯৬৩ সালে এক এমাগুমেন্ট করে হঠাৎ two শব্দটি পাল্টে four করা হলো। অর্থাৎ নতুন করে ঠিক হল যে ১৯৬৫ সাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গে সব কাজ বঙ্গভাষায় হবে। কিন্তু সেই ৬৫ খ্রীস্টাব্দ আজও বঙ্গদেশে আসেনি। তার আগেই ১৯৬৪ সালের পশ্চিমবঙ্গের ১৯ নম্বর অ্যাক্টে আবার বিড়ালটি খাঁচায় পুরে ফেলা হল। খুব গম্ভীরভাবে বলা হল যে বাংলার সুবিধা প্রত্যাহার করা হচ্ছে না কিন্তু ইংরেজি থাকবে।

কি রকম প্রক্রিয়ায় থাকবে তার বয়ানটি অত্যন্ত চমৎকার : for all official purposes of the state of West Bengal for which it was being used immediately before that day [20]. প্রশ্ন জাগে এই যদি বাসনা ছিল তবে ১৯৬১ সালের জবরদস্ত আইনটি হাজির করা কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর অতীব সরল। এ আইন চালাক বাঙালিকে বোকা বানাবার আইন। ১৯৬১ সালে দেশের ভাষানীতির প্রশ্নে বাঙালিচিত্তে যে ক্রোধ ও অসন্তোষ জমে উঠেছিল তার প্রশমনের জন্যে একটি আইনের দরকার ছিল। ১৯৬৪ সালে এসে দেখা গেল আইন আর দরকার নেই : উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে।

এই আইন প্রত্যাহারের সূত্রে বোঝা যাচ্ছে যে রাজনীতির ও সরকারের লোকেরা বিষয়টাকে আমাদের মতো করে বোঝেননি। বঙ্গভাষা সরকারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, সে যে শুধুমাত্র মহাকরণের ঘরোয়া বিষয় নয় বরং বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতির নিরাপত্তা ও প্রগতির কেন্দ্রস্থানীয় বিষয় সে কথা আমাদের শাসকবর্গ আজও ঠিকমত অনুধাবন করেননি। সে জন্যেই এ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা, কোনো উদ্যোগ এ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি।

তবে একটি চেষ্টা হয়েছিল ১৯৪৮ সাল নাগাদ। পরিভাষা সংসদ গড়ে পরিভাষার প্রথম স্তবক প্রকাশিত হল রাজশেখর বসুর সভাপতিত্বে (১৯৪৮)। ভূমিকায় সদস্যরা একটি মূল্যবান কথা বললেন, 'ইংরেজি ভাষাকে আয়ত্ত করিবার জন্য আমরা এতদিন যে পরিশ্রম করিয়াছি তাহার এক-চতুর্থাংশও যদি আমরা আমাদের মাতৃভাষার আলোচনায় ব্যয় করি তাহা হইলে যে সকল শব্দ আমাদের নিকট এখন অপরিচিত বোধ হইতেছে, সেগুলি আর অপরিচিত বা দুর্বোধ থাকিবে না।'[21] কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ মানুষরা যে পরিভাষা গড়েছেন তার কতিপয় শ্রুতিকটু শব্দ নিয়ে দেশজুড়ে শুরু হল হাসিঠাট্টা, রঙ্গব্যঙ্গ, তামাশা। পরিভাষার কাজ খুব সহজ নয়। অর্ডার মাফিক সর্বজন মনোহর পরিভাষা রাতারাতি রচনা করাও সম্ভব নয়। গ্রহণ বর্জন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিনে এ বিষয়ে নিপুণতা আসে। এ সব ভালো করে বিবেচনা না করে কিছু শ্রুতিকটু শব্দ তুলে ধরে বিষয়টিকে খেলো করে ফেলা হল। অসাধারণ কিছু পরিভাষাও ওরা করেছিলেন যেমন Smuggling অপনয়ন seduction সংলোভন brake horse power রোধাশ্বশক্তি ballot paper মতপত্রী adultration অপমিশ্রণ। এ সবও ঠাট্টা মস্করার আড়ালে চাপা পড়ে গেল। এ সব শব্দ আমরা এখন ব্যবহার করি না। এ পুস্তিকা এখন আর ছাপা পর্যন্ত হয় না। আজকাল নতুন আমলাদের এ সব জানাবারও কোনো ব্যবস্থা নেই। সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে কর্তারা সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে বাংলাকে কখনো সরকারী ভাষা করা হবে না। অথচ গ্রামে-গ্রামে পঞ্চায়েত হয়েছে। সেখানে নেতারা অধিকাংশই এসেছেন সোজাসুজি মাটি থেকে। আজকাল ব্লকস্তর থেকে পরিকল্পনা তুলে আনার

হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার সরকারী চেষ্টার একটি নিদর্শন — *ছবি : অলোক মিত্র*

চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু ভাষার অবস্থানটি হয়ে আছে এ সব উদ্যোগের পরিপন্থী। বস্তুত ভারতবর্ষে মাতৃভাষার প্রচলনের ক্ষেত্রেও আমরা যে সব থেকে পিছিয়ে আছি এই অনুমান আমার দৃঢ় হয়েছে বাংলা টাইপরাইটারের বিক্রি সম্পর্কে খবর নিতে গিয়ে। রেমিংটন কোম্পানি বাংলাসহ সমস্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষায় টাইপরাইটার বিক্রি করেন। ওঁদের রিজিওন্যাল ম্যানেজার শ্রীসেনগুপ্ত আমাকে বলেছেন যে বাংলা টাইপরাইটারের বিক্রি ওদের সব ভাষার তুলনায় কম। গত তিন বছর ওড়িয়া টাইপরাইটার ওরা বেচেছেন পাঁচ হাজারের বেশি। বাংলা তিন বছরে মাত্র তিন শ। তেলেগু, কানাড়া,তামিল, মরাঠি সমস্ত ভাষায় বাংলা থেকে বেশি টাইপরাইটার বিক্রি হয়। এ সব তথ্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে বাংলা ভাষা আমরা কোনও কাজেই ব্যবহার করি না। ভাষাপ্রেম আমাদের মৌখিক, সরকারি কাজে বাংলা প্রচলনের কথা আমাদের নির্ভেজাল প্রতারণা। কলেজ আদালত স্কুল বিশ্ববিদ্যালয় সরকার—কোথাও আমরা বাংলাভাষাকে পাত্তা দিচ্ছি না। শুধুমাত্র সাহিত্যের জোরে এভাষা তার অন্তিম লড়াই লড়ছে।

॥ নয় ॥

এ নিবন্ধের শেষে একটি ঘটনা বলি। অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১৯৬১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে এক প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাব : বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কাজে ; সব পরীক্ষায়, ভাষণে, গবেষণায় বাংলাভাষার ব্যবহার আবশ্যক করতে হবে। প্রস্তাব নথিবদ্ধ হবার পর একের পর এক সিনেটের সভা হয় কিন্তু ওই প্রস্তাব তোলার আর সময় হয় না। শেষে উপাচার্য বিধুভূষণ মালিক একদিন বিজনবাবুকে ডেকে পাঠান। বিজনবাবুর ভাষা প্রেমের যথেষ্ট প্রশংসা করে উপাচার্য অনুরোধ করলেন বিজনবাবু যেন প্রস্তাবটি তুলে নেন। কেন ? কারণ দেশের নাকি তখন খুব বিপদ, চীন ভারত আক্রমণ করেছে। অতএব...

মনে হয় আজও এজাতীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণেই বঙ্গভাষার প্রচলন ঘটানো যাচ্ছে না। কে জানে ! সাম্প্রতিক রেগনের অস্ত্র কেলেঙ্কারি ও ইন্দোনেশিয়ায় গরুর মড়কের সঙ্গেও বঙ্গভাষার প্রসারের ব্যাপার ইতোমধ্যে যুক্ত হয়ে পড়েছে কি না ! কিছুই অসম্ভব নয় !

তথ্যসূত্র

১। বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দ (প্রবন্ধ) : বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : পৃ ৭১।

২। বাংলাভাষা প্রসঙ্গে : পরিশিষ্ট : পৃ ৩৭৪

৩। পশ্চিমবঙ্গে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত। পুস্তিকা। স্বরাষ্ট্রবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৬।

৪। বাংলা ছন্দ সমীক্ষা : গবেষণা পরিষদ : ভূমিকা।

৫। *Census of India 1961, Vol-i, Part-ii c(ii) language tables page ccxxxvi Annexure iii*

৬। *Census of India 1971/ series-i part ii c i) social and cultural tables, page-9*

৭। *Child in India A statistical profile Ministry of Welfare, Govt of India, page 88*

৮। দ্র· *Census of India, Series-I, Part II, C-I social and cultural tables p-6*

৯। ঐ *Page-6*

১০। *Linguistic Survey of India, Vol-I, Part-I P-26-27*

১১। *Census of India Series-I Part II, C-I, Social and Cultural Tables, P-6*

১২। *Encyclopaedia Britannica 1985 vol 22: p 613*

১৩। *India today April 15 1987 page 122*

১৪। দ্রঃ যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা : (প্রবন্ধ)। দেশ সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা

১৫। আনন্দবাজার, মার্চ ১৮, ১৯৮৭

১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষা : শিক্ষার হেরফের

১৭। দ্রঃ শিক্ষা ব্যবস্থায় মাতৃভাষার প্রবর্তনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা : বিজনবিহারী ভট্টাচার্য. সুবর্ণলেখা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৪

১৮। ইংরেজি বনাম মাতৃভাষা : মুজতবা আলী : ধূপছায়া।

১৯। প্রতিবাদের কণ্ঠ (প্রবন্ধ) : প্রতিবাদের ভাষা : পৃ—২৪

২০। দ্র· *The West Bengal Code, Second Edition, Vol VIII, Bengal Act—1958-64; Act XIX of 1964, Section-2*

২১। পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বরাষ্ট্র (রাজনীতি) বিভাগ : সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা। দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৫২) ভূমিকা

লেখা

সুপারকনডাকটর

সমরজিৎ কর

এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে দেখলাম সেখানকার এক নম্বর বিজ্ঞানীরা এখন শশব্যস্ত। রীতিমত সন্ত্রস্ত। সব সময় কি হয় কি হয় ভাব। ব্যস্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার। উদ্বিগ্ন সে দেশের বিখ্যাত গবেষণা এবং উদ্ভাবনার প্রাণকেন্দ্র এটি অ্যান্ড টি বেল ল্যাবরেটারিজ। ১৯৫০-এর দশকে এই প্রতিষ্ঠানেই আবিষ্কৃত হয়েছিল ট্র্যানজিস্টার। যা ইলেকট্রনিক্স শিল্পে ঘটিয়েছে এক অকল্পনীয় বিপ্লব। হলে কি হবে, ইলেকট্রনিকসে মার্কিন দেশের সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী এখন জাপান। তারা করল আবিষ্কার, আর সেই আবিষ্কারটি মুঠোয় ভরে জাপান এখন তাদের উপরই টেক্কা দিচ্ছে। জাপান ইলেকট্রনিক্স শিল্পে পৃথিবীতে এখন এক নম্বর, দেখলাম, একথা মার্কিন বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। যার অর্থ ইলেকট্রনিকসের বাজারে মার্কিন দেশ পিছনের সারিতে। মার্কিন প্রযুক্তিবিদরা সুপার কমপিউটার নিয়ে যত গর্বই করুন না কেন, ইউনিভার্সিটি অভ পিটস্‌বার্গ, ওয়েসটিংহাউজ, প্রভৃতির মত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের শয়নে স্বপনে সব সময় জাপান। সব সময় ভয়, এই বুঝি তাদের উপর জাপান টেক্কা মারল। এখন গোদের উপর বিষফোড়ার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে আর একটি বিষয়—সুপারকনডাকটার। বাংলায় যাকে বলা হয় অতিপরিবাহী। তাঁদের সবারই লক্ষ্য, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এমন ধরনের বস্তু আবিষ্কার করতে হবে, যা উচ্চতর তাপমাত্রায় বিদ্যুৎ পরিবহনে অতিপরিবাহী হিসেবে কাজ করতে পারে। কারণ তাঁরা জানেন, ট্র্যানজিস্টার আবিষ্কারের পর এটাই হবে বর্তমান শতাব্দীর আর একটি শ্রেষ্ঠতম সাফল্য। এ সাফল্য শিল্প এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ঘটাবে বড় রকমের উত্তরণ। যে দেশ প্রথম তা অর্জন করবে, আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে সেই দেশই হবে এক নম্বর। ফলে এ নিয়ে মার্কিন দেশে সব সময়ই সাজসাজ ভাব। অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরমাণু বোমার উদ্ভাবনার মতই গুরুত্বপূর্ণ। নিউ মেকসিকোর সেই সান অ্যালামস গবেষণাগার। এক সময় ছিল পরমাণু বোমা বিষয়ক গবেষণার সূতিকাগার। 'হাই টেক' নিয়ে এই গবেষণাগার এখন শশব্যস্ত। একবিংশ শতাব্দীর দিকে লক্ষ রেখে এখানকার গবেষকরা কাজ করছেন। কাজ করছেন এমন সব বিষয় নিয়ে যাদের অনেকই এখন পর্যন্ত তত্ত্ব অথবা 'ব্লুপ্রিন্ট'। তাদের বাস্তবায়িত করে প্রযুক্তির আঙিনাকে তাঁরা

চীনের অ্যাকাডেমিকা সিনিকার ইনসটিটিউট অভ ফিজিকস-এর পদার্থবিজ্ঞানী ঝেংজিয়ান ঝাও নতুন ধরনের অতি পরিবাহী বস্তুবিষয়ক গবেষণায় এখন শিরোনাম। এ ধরনের বস্তুর জন্যে চাই রেয়ার আর্থস। ঝাও সম্প্রতি বলেছেন, চীন রেয়ার আর্থস-এর অফুরন্ত ভাণ্ডার

এমনভাবে গড়ে তুলতে চান যাতে করে ওই সব ক্ষেত্রে তাঁদের কোন প্রতিযোগী থাকতে না পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাঁরা হয়ে উঠতে পারেন 'একম' এবং 'অদ্বিতীয়ম'। তাঁদেরও কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান বিষয় 'সুপারকনডাকটর'। এর জন্যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালছে মার্কিন সরকার। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও দেওয়া হচ্ছে প্রচুর অর্থ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী এবং বেসরকারী গবেষণাগারগুলিকে বলা হচ্ছে, যত রকম চেষ্টা দরকার, করুন। অর্থের জন্যে চিন্তা করবেন না।

সুপারকনডাকটর তৈরির ঘোড়দৌড়ে মার্কিন বিজ্ঞানীরা এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এ দৌড়ে তাঁরাই একমাত্র প্রতিযোগী নন। জাপান এবং চীনকে নিয়েও তাঁদের আশঙ্কা। দু-এক বছরের মধ্যেই হয়তো সাফল্য আসবে, কিন্তু সাফল্যের বরমাল্য কার গলায় পড়বে তা বলা শক্ত।

হাই টেমপারেচার সুপারকনডাকটর তৈরির ব্যাপারে মার্কিন দেশকে প্রথম হতেই হবে। অর্থাৎ যাকে বলে যুদ্ধকালীন গবেষণা ব্যবস্থা।

শুধু তাই নয়। মার্কিন দেশের সরকারী প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউনডেশন। ওয়াশিংটন ডি· সি-তে তাদের সদর দপ্তর। সে দেশে বৈজ্ঞানিক এবং প্রায়োগিক গবেষণার নিয়ন্ত্রণ এবং মূল্যায়নের বড় রকমের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানটির উপর। দেখলাম, সেখানেও তৎপরতা। পৃথিবীর কোথায় কোথায় সুপারকনডাকটর নিয়ে কতটা অগ্রগতি ঘটল তার উপর নিয়মিত চোখ রেখেছেন তাঁরা। এ কাজে দেশে কোন প্রতিষ্ঠানকে কতকটা অনুদান দেওয়া যায় এতটুকু বিলম্ব না করে তাও করে যাচ্ছেন।

সাফল্যের সঙ্গে আশঙ্কা। সুপারকনডাকটরের ঘোড়দৌড়ে মার্কিন বিজ্ঞানীরা এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এ দৌড়ে তাঁরাই তো একমাত্র নন। দুটি দেশকে নিয়ে এখন সব সময়েই তাঁরা আতঙ্কিত। জাপান এবং চীন। এ বছরের গোড়ায় টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চারজন বিজ্ঞানী—শিন-ইচি উচিদা, হাইদেনোরি তাকাগি, কিতা সাওয়া এবং তানাকা—জানিয়েছেন, এ কাজে তাঁরা অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। এমন গুজবও শোনা যাচ্ছে, ইতিমধ্যে জাপানী বিজ্ঞানীরা এমন বস্তু তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন, যা সাধারণ তাপমাত্রায় অতিপরিবাহী বা সুপারকনডাকটরের মত ব্যবহার করে। কথাটা মার্কিন বিজ্ঞানীরা অবশ্য বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাঁদের কাছে চীনও আর উপেক্ষণীয় নয়। চীন বিকাশশীল দেশ। তাঁদের ভাষায় তৃতীয় পৃথিবীর অন্তর্গত। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির দিক থেকে পাশ্চাত্যের তুলনায় পেছনে। তাই আদাজল খেয়ে কাজ শুরু করেছেন সে দেশের বিজ্ঞানীরা। বিষয় : সুপারকনডাকটর। এ ক্ষেত্রে তাঁদের পারঙ্গমতাও আর উপেক্ষা করা যায় না। যদি তাঁরা সফল হন, তাঁদের মর্যাদা বাড়বে। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক মানচিত্রে চীনের আসন প্রথম সারিতে এসে দাঁড়াবে। বেজিং-এর ইন্সটিটিউট অভ ফিজিকস অভ দ্য অ্যাকাডেমিয়া সিনিকা মাস পাঁচেক আগে দাবি করেন, তাঁরা এমন ধরনের বস্তু তৈরি করেছেন যা ৩৯ ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রায় অতিপরিবাহী হিসেবে কাজ করে। তার তিন মাস পরে শোনা গেল, ৭০ ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রায় কাজ করে এমন অতিপরিবাহী তৈরির যোগ্যতাও তাঁরা অর্জন করেছেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রগতিও বড় কম নয়। তাঁরাও দ্রুত সাফল্যের

দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। পশ্চিম জার্মানিও বসে নেই। এই প্রতিযোগিতায় শামিল হয়েছেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও। উল্লেখযোগ্য কাজ চলছে বোম্বাই-এর টাটা ইন্সটিটিউট অভ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ, বাঙ্গালোরের ইনডিয়ান ইনসটিটিউট অভ সায়েন্স, কলকাতার সাহা ইনসটিটিউট অভ নিউক্লিয়ার রিসার্চ, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে। সম্প্রতি এ নিয়ে কথা বলেছিলাম বাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অভ সায়েন্সের ডিরেক্টার এবং প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞানবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক সি· এন· আর রাও-এর সঙ্গে। তাঁদের দাবী: তাঁরা ৯০ ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রা পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। "সবুর করুন, আমরা কয়েক মাসের মধ্যেই আরো সংবাদ দিতে পারব। তখন ২২০ ডিগ্রি কেলভিনে গিয়ে পৌঁছব আমরা। কতকটা স্বগতোক্তির মত কথা বললেন অধ্যাপক রাও। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও যথেষ্ট তৎপর। তাঁদের গবেষণা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণও বটে।

কবর থেকে তুলে প্রাণপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

সাধারণ মানুষের কাছে এখন বড় প্রশ্ন: সুপারকনডাকটর বা অতিপরিবাহী কী? এ নিয়ে এত হই চই-ই বা কেন?

পদার্থবিজ্ঞানীরা বৈদ্যুতিক পরিবাহিতার দিক থেকে পদার্থকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন—পরিবাহী এবং অপরিবাহী। যে সব বস্তুর মধ্যে বিদ্যুৎ শক্তি পরিবাহিত হয় তাদের বলা হয় বিদ্যুৎ পরিবাহী। সমস্ত ধাতুই এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। অধাতুর মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবাহী হিসেবে কাজ করে একমাত্র গ্র্যাফাইট (কার্বন)। যে সমস্ত বস্তুর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎশক্তি পরিবাহিত হয় না, তারা পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে। অর্থাৎ অপরিবাহী। উদাহরণ, কাঠ, কাচ, ইত্যাদি। তবে কোন কোন বস্তু বিশেষ অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবাহীর ভূমিকা নেয়। যেমন ধরুন, সিলিকন। বিশুদ্ধ সিলিকন বিদ্যুৎ অপরিবাহী। কিন্তু সেই সিলিকনের মধ্যে যদি কিছুটা খাদ থাকে, যেমন ধরুন যৎসামান্য বোরন, তখন তা বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষমতা অর্জন করে। এ ধরনের পরিবাহীকে বলা হয় 'সেমিকনডাকটর' বা অর্ধ-পরিবাহী। উল্লেখ্য, এ ধরনের পরিবাহীর সাহায্যেই তৈরি করা হয়ে থাকে সিলিকন সৌর-কোষ।

আরো একটি ঘটনা। কোন পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, সেই পরিবাহী সেই বিদ্যুৎ প্রবাহে কিছুটা বাধা সৃষ্টি করে। এই বাধাকেই ইংরেজিতে বলা হয় "ইলেকট্রিক্যাল রেজিসট্যান্স"। বাংলায় বৈদ্যুতিক রোধ। গ্র্যাফাইটের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাড়লে তার বৈদ্যুতিক রোধ কমে। কিন্তু ধাতুর বেলায় দেখা যায়, ধাতুর তাপমাত্রা বাড়লে তার 'রোধ'ও বেড়ে যায়।

বৈদ্যুতিক এই 'রোধে'র ব্যাপারে একটি নাটকীয় আবিষ্কার করেছিলেন হল্যান্ডের বিজ্ঞানী

অতিপরিবাহী তৈরির আর এক নায়ক হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের পল চু। এ বছর মে মাসে প্রকাশিত তাঁর এক গবেষণাপত্রে তিনি একটি বস্তুর কথা উল্লেখ করেন। যার মধ্যে রয়েছে Yb নামক একটি মৌলিক পদার্থ। এ থেকে অনেকের মনে হয় রহস্যজনক এই অতিপরিবাহীর মধ্যে রয়েছে ইট্রেরবিয়াম। চু অবশ্য পরে সংশোধন করে বলেন, ওটা টাইপের ভুল। আসলে হবে Y অর্থাৎ ইট্রিয়াম। কারোর কারোর ধারণা, গবেষকরা গোপনীয়তা রাখতে অনেক ক্ষেত্রে সঠিক ফরমুলা প্রকাশ করতে চাইছেন না। আর এরজন্যে চু হয়ত ইচ্ছে করেই Y-এর পরিবর্তে টাইপ করেন Yb।

বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত তিরিশটি ধাতুর সন্ধান পেয়েছেন যারা বিশেষ বিশেষ তাপমাত্রায় অতিপরিবাহী হিসাবে কাজ করে। বিজ্ঞানীরা এখন এমন একটি পদার্থের সন্ধানে রয়েছেন, যা উচ্চতর তাপমাত্রাতেও অতিপরিবাহী হিসাবে কাজ করতে সক্ষম।

ফরাসী বিজ্ঞানীরা এখন অতিপরিবাহিতা বিষয়ে যে বস্তুটি নিয়ে গবেষণা করছেন তার ফরমুলা $Y Ba_2 Cu_3 O_6$। ছবিতে তার গঠন দেখান হল।
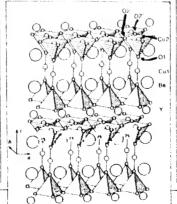
অধ্যাপক ক্যামারলিং ওনেস। সেটা ১৯১১ সাল। ওই বছর তিনি আবিষ্কার করলেন পারদের একটি অদ্ভুত ধর্ম। পারদ ধাতু; এবং সুপরিবাহী। কিন্তু তার তাপমাত্রা কমিয়ে যখন ৪·২ ডিগ্রি কেলভিনের নিচে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তার মধ্যে দেখা যায় অদ্ভুত এক চরিত্র। ওনেস লক্ষ করলেন, ওই অবস্থায় পারদের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু করলে পারদ সেই প্রবাহে কোন 'রোধ'ই সৃষ্টি করে না। করলেও তা এতই কম যে না করারই মত। পরিবাহীর এই বিশেষ ধর্মটির তখন নাম দেওয়া হয় 'সুপার কনডাকটিভিটি' বা 'অতিপরিবাহিতা'। ১৯১৩ সালে এই আবিষ্কারের জন্যে ওনেসকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। পরে তাঁর এই আবিষ্কার পদার্থবিজ্ঞানে একটি নতুন শাখাও সৃষ্টি করে। যার নাম 'ক্রাইওজেনিক্স'। অতিরিক্ত নিম্ন তাপমাত্রায় পদার্থের চরিত্র অনুসন্ধান এই শাখাটির মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল।

মজার ব্যাপার এই, পদার্থের 'অতিপরিবাহিতা' চরিত্রটি আবিষ্কৃত হল ঠিকই, কিন্তু তারপর এ নিয়ে তেমন কোন কাজ হয়নি। গোড়ায় পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে ব্যাপারটা ধাঁধার মতো মনে হয়েছিল। তাত্ত্বিকদের কাছে তখন একটিই প্রশ্ন: অতিরিক্ত নিম্ন তাপমাত্রায় পরিবাহী কেন হারায় তার বিদ্যুৎরোধী ক্ষমতা? মাঝে মাঝে এ নিয়ে কিছু কিছু তত্ত্ব দাঁড় করালেও, আবিষ্কারের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরেও এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে তেমন মাথাও ঘামাননি বিজ্ঞানীরা।

অবশেষে এল আশার সংকেত। ১৯৫৭ সাল। সাফল্যের পাদপীঠে এসে দাঁড়ালেন তিন মার্কিন বিজ্ঞানী—জন বার্ডিন, লিয় কুপার এবং জন শ্রিফার। পদার্থের অতিপরিবাহিতার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা ওই বছর দাঁড় করালেন নতুন একটি তত্ত্ব। যার নাম দেওয়া হল, 'বার্ডিন, কুপার এবং শ্রিফারের তত্ত্ব' বা সংক্ষেপে BCS তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অতিপরিবাহীর চরিত্র উদ্ঘাটনে যথেষ্ট সাহায্য করল।

নতুন অধ্যায়

ধাতব-পরিবাহী কেলাসের সমন্বয়ে তৈরি হয়। পদার্থবিজ্ঞানীরা এই তথ্যটি আগে থেকেই জানতেন। তাঁরা এটাও জানতেন, পরিবাহীর কেলাসগুলিকে পরস্পর সংবদ্ধ অবস্থায় রাখতে সাহায্য করে ইলেকট্রন। ধাতুর পরমাণুগুলিরই ইলেকট্রন। তাপমাত্রা বাড়লে এই ইলেকট্রনগুলি অস্থির হয়। আবার অতিরিক্ত নিম্ন তাপমাত্রায় নিয়ে এলে, যেমন ধরুন, তরল হিলিয়ামের তাপমাত্রায়, ওই ইলেকট্রনগুলির মধ্যে একটি সাম্য অবস্থা বিরাজ করে। বলা হয়, কেলাস-সংবদ্ধকারী ইলেকট্রনগুলি যত অস্থির হয়, পরিবাহীর 'রোধ' (resistance) ততই বাড়ে। পক্ষান্তরে, যখন তারা সাম্য অবস্থায় থাকে, পরিবাহীর রোধ কমে যায়।

১৯৫০ সালে এইচ· ফ্রোহ্‌লিশ এবং জন বার্ডিন পরস্পর স্বাধীনভাবে দাঁড় করালেন একটি

তত্ত্ব। এই তত্ত্বে দেখান হল, ধাতুর কেলাসের মধ্যে থাকে এক ধরনের 'ভাইব্রেশনাল এনার্জি' বা কম্পনশক্তি। নির্দিষ্ট শক্তির আধার হিসেবে ধরে নিয়ে, আলোকশক্তির 'একক'-কে যেমন 'কণা' হিসেবে কল্পনা করা হয় এবং সেই কণার নাম দেওয়া হয় 'ফোটন', ঠিক তেমনি কেলাসের এই কম্পনশক্তির 'একক'-কেও তাঁরা কণা হিসেবেই ধরে নিলেন। এক একটি কণা যেন নির্দিষ্ট পরিমাণ কম্পনশক্তির এক একটি 'প্যাকেট'। আর তার নাম রাখা হল 'ফোনন'। ফ্রোহ্‌লিশ' এবং বার্ডিন বললেন, কেলাসের বন্ধনকারী ইলেকট্রন কণা এবং ফোনন কণার পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অতিপরিবাহিতার সম্পর্ক রয়েছে। ফ্রোহ্‌লিশের মতে, ধাতব কেলাসের মধ্যে প্রবাহিত হওয়ার সময় ইলেকট্রনগুলি পর্যায়ক্রমে কম্পিত ফোননকণাগুলিকে শোষণ এবং পরিত্যাগ করতে থাকে। উল্লেখ্য, ইলেকট্রন কণার প্রবাহকেই বলা হয় বিদ্যুৎ প্রবাহ।

সাধারণ তাপমাত্রায় উচ্চ রোধ বিশিষ্ট একটি তারের কুণ্ডলী দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ প্রায় হয় না বললেই চলে (বাঁদিকে)। (ডানদিকে) তরল নাইট্রোজেনে, প্রায় ১০০ ডিগ্রি কেলভিনেরও কম তাপমাত্রায় কুণ্ডলীটি নিমজ্জিত করলে তারের রোধ কমে, তড়িৎপ্রবাহ বাড়ে এবং বাল্বটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

১৯৫৬ সালে ব্যাপারটা আর এক ধাপ এগিয়ে দিলেন লিয়। ইলেকট্রন নিগেটিভ বিদ্যুৎধর্মী কণা। তাতে থাকে নিগেটিভ বা ঋণাত্মক বিদ্যুৎ আধান। কুলম্বের সূত্র অনুসারে বিপরীত আধান সমন্বিত কণা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং সমধর্মী বিদ্যুৎ-কণা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ বলকে বলা হয় 'কুলম্ব ফোর্স' বা 'কুলম্বের বল'। অতএব কুলম্বের সূত্র অনুসারে বলা যায়, পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে যখন ইলেকট্রন কণাগুলি প্রবাহিত হয়, তখন তাদের মধ্যে কাজ করে 'বিকর্ষণ বল'। কুপার দেখালেন, কোন বস্তু যখন অতিপরিবাহীর মত আচরণ করে, তখন ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্যরকম। পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহের সময় ইলেকট্রন এবং ফোননের মধ্যে চলে প্রতিক্রিয়া। ইলেকট্রন কণা পর্যায়ক্রমে ফোনন কণা শোষণ করে এবং বর্জন করে। আর তখন ইলেকট্রন কণাগুলির উপর কুলম্বের বল দারুণভাবে কমে যায়। এমনকি তা শূন্যে গিয়েও দাঁড়াতে পারে। বিশেষ কোন অবস্থায়, ইলেকট্রন কণাগুলির মধ্যে 'বিকর্ষণ বলে'র পরিবর্তে 'আকর্ষণ বল'ও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। তখন দুটি করে ইলেকট্রন কণা বিরাজ করে এক একটি সংবদ্ধ 'জোড়' (pair) হিসেবে। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'বাউন্ড পেয়ার' (bound pair)। কুপারের সম্মানে এই 'জোড়ে'র নাম দেওয়া হয়েছে 'কুপার পেয়ার' (Cooper pair)।

এই সব ধারণার উপর নির্ভর করেই বার্ডিন, কুপার এবং শ্রিফার গড়ে তুলেছেন 'বি সি এস' তত্ত্ব। তাঁরা দেখিয়েছেন, কোন বস্তু যখন 'অতিপরিবাহী' হিসেবে কাজ করে, তখন তার মধ্যে সৃষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক 'ইলেকট্রন পেয়ার' বা 'ইলেকট্রন জোড়'। পেয়ারগুলি ওই অবস্থায় পরিবাহীর মধ্যে নির্দিষ্ট প্রতিসাম্য পদ্ধতিতে গতিশীল হয়। কতকটা লেজার রশ্মির মত। অথবা নির্দিষ্ট শৃঙ্খলায় সৈনিকদের মার্চ করে পথ চলার মত। ফলে বৈদ্যুতিক রোধ প্রায় শূন্যে এসে দাঁড়ায়।

১৯৫০ সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল আরো একটি তত্ত্ব—'আইসোটোপ এফেক্ট'। এই তত্ত্বে বলা হয়: অতিপরিবাহীর পরম তাপমাত্রা (Critical temperature ;অর্থাৎ যে তাপমাত্রায় কোন বস্তু 'অতিপরিবাহিতা' অর্জন করে) পরিবাহীর ভর-সংখ্যা বা 'মাস নাম্বারে'র (mass number) বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। মৌলিক পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন (হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস ছাড়া)। তাদের যোগ করলে যে সংখ্যাটি দাঁড়ায়, সেই সংখ্যাকেই বলা হয় পদার্থের ভর-সংখ্যা বা 'মাস নাম্বার'। শেষোক্ত এই তত্ত্বটির সাহায্যে কোন বস্তু কোন তাপমাত্রায় 'অতিপরিবাহী' হিসেবে আচরণ করবে তা জানা যায়। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত তিরিশটি ধাতুর সন্ধান পেয়েছেন, যারা বিশেষ বিশেষ তাপ মাত্রায় অতিপরিবাহী হিসেবে কাজ করে। বলা

বাহুল্য সবার ক্ষেত্রেই এই তাপমাত্রা এতই কম। (প্রায় ৭ থেকে ৯ ডিগ্রি কেলভিনের কাছাকাছি), যে, অত নিম্ন তাপমাত্রা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি করতে গেলে প্রযুক্তিগত অসুবিধে তো থাকেই, সেই সঙ্গে দরকার হয় প্রচণ্ড খরচ।

প্রতিযোগিতার পাদপীঠে

বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী স্যার নেভিল মট সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন: সুপারকনডাকটরের ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন 'যত মত, তত পথে'র মত। যত তত্ত্ব, তত তাত্ত্বিক। ৪ জুন 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে দেখা যাচ্ছে, BCS তত্ত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কোন কোন বিজ্ঞানী। "এটি অ্যান্ড টি বেল ল্যাবোরেটারির গবেষক বেরট্রাম ব্যাটলগ এবং তাঁর সতীর্থরা বলছেন, উচ্চতর তাপমাত্রা, অর্থাৎ ৯০ ডিগ্রি কেলভিন বা তার উপরে 'ইলেকট্রন-ফোনোনে'র ব্যাখ্যার দরকার নেই। বিষয়টি তাঁরা অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করছেন। বিতর্ক থাক। আসল কথা এই সুপারকনডাকটর উদ্ভাবনায় সবাই এখন এগিয়ে চলেছেন নতুন একটি পথ ধরে।" ধাতু নয়। সুপারকনডাকটর হিসেবে তাঁরা যা পেতে চান —তা ধাতু এবং অধাতুর বিশেষ ধরনের যৌগ। এমন যৌগ যা উচ্চ তাপমাত্রায়, সম্ভব হলে আমাদের ঘরবাড়িতে যে ধরনের তাপমাত্রা থাকে সেই তাপমাত্রায় অতিপরিবাহী হিসেবে কাজ করবে।

নতুন এই উদ্যোগ, বলতে গেলে, প্রথম শুরু হয় জুরিখে, সেখানকার আই বি এম গবেষণাগারে। বেরিয়াম, ল্যানথানাম, কপার এবং অক্সিজেন (Ba-La-Cu-O)-এর মিশ্রণে তৈরি যৌগ ব্যবহার করে ওই গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা অতিপরিবাহী বস্তু তৈরি করতে সমর্থ হন বছর তের আগে। বস্তুটি ২৩ ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রায় অতিপরিবাহীর চরিত্র অর্জন করেছিল। তারপর থেকেই হই হই পড়ে যায়। ১৯৮৪/৮৫ সালে কান বিশ্ববিদ্যালয় ল্যানথানাম, কপার এবং অক্সিজেনের সঙ্গে বেরিয়াম, স্ট্রনশিয়াম অথবা ক্যালসিয়াম মিশিয়ে একাধিক যৌগ তৈরি করে এ ব্যাপারে অনেকটা সফল হয়। কাজ চলছে হিউস্টনে, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে। চীনের অ্যাকাডেমিয়া সিনিকার ইন্সটিটিউট অভ্ ফিজিকসের বিজ্ঞানী ঝেংজিয়ান ঝাও সম্প্রতি দাবি করেছেন, কিছু কিছু বিশেষ মৌল, যেমন স্ট্রনশিয়াম, বেরিয়াম প্রভৃতি কাজে লাগিয়ে তাঁরা অদূর ভবিষ্যতে এমন ধরনের সুপারকনডাকটর তৈরি করতে চলেছেন, যা অনেক উঁচু তাপমাত্রায় কাজ করতে পারবে। কেউ কেউ অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে ইট্রিয়াম যুক্ত করেও পরীক্ষা চালাচ্ছেন।

সমস্যাও দেখা দিয়েছে অনেক। কেউ কেউ সুপারকনডাকটর তৈরি করছেন। কিন্তু দু-তিন বার বিদ্যুৎ প্রবাহের পর তা আর অতিপরিবাহী হিসেবে কাজ করছে না। কারোর কারোর ক্ষেত্রে পরিবাহীর কিছুটা দৈর্ঘ্য হয়ত অতিপরিবাহী হিসেবে কাজ করল, বাকি অংশ সাধারণ পরিবাহী (যার রোধ থাকে) হিসেবেই থেকে গেল। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের সংস্পর্শে অতিপরিবাহিতা ধর্ম নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া তাপমাত্রা তোলার চেষ্টা তো রয়েছেই। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, যতক্ষণ না স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সুপারকনডাকটর পাওয়া যাচ্ছে, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তার চল করা সম্ভব নয়। খরচ বেশি বলে। তবে অবস্থা দেখে মনে হয় দুই এক বছরের মধ্যে সফল হবেন গবেষকরা। সাফল্যের জয়মাল্য কার গলায় পড়বে, সেটা বলা শক্ত।

প্রাপ্তি

যদি এমন কোন বস্তু তৈরি করা যায় যা সাধারণ তাপমাত্রায়, তা না হলেও তরল কার্বন ডাইঅকসাইডের তাপমাত্রায় 'অতিপরিবাহী' হিসেবে কাজ করে, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সেটা যে বড় রকমের সাফল্য হবে বলাই বাহুল্য। সাধারণ বিদ্যুৎ পরিবহনের কথাই ধরুন।

প্রচলিত পরিবাহীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে গিয়ে প্রায় ৭ শতাংশ বিদ্যুৎ শক্তি নষ্ট হয়। রোধের দরুন পরিবাহী গরম হয়। কিছুটা বিদ্যুৎ শক্তিই সৃষ্টি করে ওই উত্তাপ শক্তি, যা কোন কাজে আসে না। অতিপরিবাহীতে কোন রোধ নেই। তাই বিদ্যুৎ পরিবহনে অতিপরিবাহী ব্যবহার করলে এই অপচয় বন্ধ করা যাবে। তাপপারমাণবিক সংযোজন পদ্ধতিতে দরকার প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন চুম্বক—বৈদ্যুতিক চুম্বক। তারজন্যে চাই প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি। মোটা তারের কয়েলের মধ্যে দিয়ে অতটা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার সময় সৃষ্টি করে প্রচুর উত্তাপ। এ ক্ষেত্রেও বিদ্যুতের বড় একটি অংশের অপচয় হয়। তা ছাড়া উত্তাপের হাত থেকে চুম্বককে বাঁচানো দরকার। কারণ উচ্চতর তাপমাত্রায় চুম্বকের চৌম্বকগুণ থাকে না। কয়েল হিসেবে অতিপরিবাহী ব্যবহার করলে এই সমস্যাটি দূর করা যাবে। যেমন ধরুন, সুপারকমপিউটার। সাধারণ পরিবাহী ব্যবহার করার দরুন, সুপারকমপিউটার যথেষ্ট গরম হয়। গরম হলে তার কার্যক্ষমতা কমে। সুপারকমপিউটার শীতল রাখার জন্যে এখন তাই তরল ফ্রেয়ন ব্যবহার করা হচ্ছে। সুপারকনডাকটর ব্যবহার করলে তার প্রয়োজন হবে না। ইলেকট্রনিকসের ক্ষেত্রেও তা ঘটাবে বড় রকমের বিবর্তন।

মজার ব্যাপার এই, বেল ল্যাবরেটারিতে দেখলাম, সেখানকার বিজ্ঞানীরা ধরেই নিয়েছেন, উচ্চতাপমাত্রায় অতিপরিবাহী তৈরির ব্যাপারে সাফল্যের বরমাল্যটি মার্কিন বিজ্ঞানীরাই পাবেন। তাই সুপারকমপিউটারের উপর নির্ভর করে প্রযুক্তির কোন কোন ক্ষেত্র সমৃদ্ধ করা যায়, এখন থেকেই সে ব্যাপারে পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা। এ কাজে মার্কিন ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউনডেশন প্রচুর অর্থও বরাদ্দ করেছেন। সাফল্যের পর এতটুকু দেরি না করে দেশ এবং বিদেশের বাজার দখল করাই যে তাঁদের লক্ষ্য, তা বলাই বাহুল্য। ■

এই যন্ত্রে শূন্য ডিগ্রী কেলভিনের নিকটতম—প্রায় এক ডিগ্রীর দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের মধ্যে তাপমাত্রা নামিয়ে আনা সম্ভব

দেখি নাই ফিরে

সমরেশ বসু

চিত্র □ বিকাশ ভট্টাচার্য

॥ সাঁইত্রিশ ॥

বাঁকুড়ার যুগীপাড়ার দুর্গাতলার প্রতিমা গড়া শেষ। রামকিঙ্কর দুর্গা প্রতিমা গড়লো। অন্যান্য কারিগরেরা গড়লো লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ। পুজোও আসন্ন। চালচিত্রে রঙ লাগানোর পরেই, প্রতিমার অঙ্গে ঘাম তেল লেগেছে। চক্ষুদানের অপেক্ষা।

বাঁকুড়া শহরের উত্তরে গন্ধেশ্বরীতে, পূর্ণ শরতের জলস্রোত বহে। দক্ষিণে বহে ভরা দ্বারকেশ্বর। থামে না। দুর্গাতলায় প্রতিমা গড়া শেষ। অনন্ত পাল নেই। বাঁকুড়ার বৃদ্ধ ছুতার, পটুয়া, পুতুল প্রতিমা গড়ার বহুকালের মানুষ। যুগীপাড়ার অধিবসীরা ভাবত, অনন্ত পাল না থাকলে, দর্গাতলার প্রতিমা কে গড়বে! সে জন্য তার হাতে গড়া কারিগর রামকিঙ্কর আছে। প্রতিমা তৈরি হয়েছে। অনন্ত পাল নেই। দাঁড়িয়ে দেখেনি। খর জ্যৈষ্ঠের দুপুরে ঘরের মেঝেয় তালাইয়ে শুয়েছিল ভালো মানুষ। আর ওঠে নাই।

রামকিঙ্করের কাছে মৃত্যু প্রত্যক্ষ এসেছিল ছোট বোনের অপঘাত নিদানের আঘাতে। অনন্তজ্যাঠার মৃত্যু ও দেখেনি। পুবের লক্ষাতোড়ার শ্মশানে তার শেষ শয়ান। আগ্রাসী আগুনের ক্ষুধায় ছাই হয়েছে। এই ভাবনার সময়ে, ওর মনে পড়েছিল সেই গান, 'কর তাঁর নাম গান/ যত দিন রহে এ প্রাণ।' ছাতিম তলা থেকে গোয়ালপাড়ায় সেই শ্মশানযাত্রা। শেষ শয়ানে ছিলেন নিচু বাংলার মর্মরমূর্তি, নরদেবতা। আগ্রাসী আগুনের শিখায় তিনিও ভস্ম হয়েছিলেন। মৃত্যুর এই চিন্তা নিয়ে রামকিঙ্কর বাড়ি ফিরে বাবা মায়ের দিকে তাকিয়েছিল। ও বাড়ি ফেরায় সকলেই তখন হাসিখুশি। নানান কুশল কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা। খুশি বাবা মায়ের দিকে, এগারো মাস বাদে তাকিয়ে আন্‌খা মনে হয়েছিল, কোথায় একটা ছায়া বেড়ে বড় হয়ে উঠেছে। সেই ছায়ার তলে বাবা মা দাঁড়িয়েছিল। অনন্ত জ্যাঠার শূন্যতায় সেই ছায়া দেখেছিল। মহাকালের ছায়া। দেখেছিল বাবা মা দুজনের শরীরে বার্ধক্যের দাগ পড়েছে। বাবার হাসিতে একাধিক দাঁতের জায়গা ছিল শূন্য। ওর চোখে ভেসে উঠেছিল, প্রবাসী পত্রিকায় দেখা সারদামণির ফটো। সারদামণির চির সধবার যে-মূর্তি ওর ধ্যানের জগতে রয়েছে, ফটোর সারদামণি ভিন্ন একজন। পা মেলে বসে থাকা পাকা ছোট চুল লোলচর্ম বৃদ্ধা। সে ছবি ও মনে রাখেনি।

রামকিঙ্করের ধ্যানের মধ্যে যে-সারদা দেবী রয়েছেন, তাঁকে তো ও

কেবল ভক্তির চোখে দেখেনি । সৌন্দর্যের মধ্যেও দেখেছে । ওর শিল্পী সত্তাকে বাদ দিয়ে ও কোথাও নেই । ইন্দ্রাণীর মৃত্যু ওকে স্বজন হারানোর আঘাত দিয়েছে । অনন্তজ্যাঠার মৃত্যু দিয়েছে জীবনের নতুন বোধ । মনে জাগিয়েছে জটিলতা । নদী পথ বদলায় । শুকিয়ে যায় । আবার অন্য নদীর সৃষ্টি হয় । স্রোতে বহে । জীবনের শেষ আছে । আবার জীবন অশেষও বটে । অনন্ত জ্যাঠা চলে গিয়েছে । এই প্রথম ওর খেয়াল হলো, বাবা মা-ও চলে যাবে । একই গতি সকলের । কেউ থাকবে না । অথচ আসাও বন্ধ হবে না । একটি মানুষের কাছে জীবন ছোট । কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড ও জীবজগৎ বিশাল । জন্ম-মৃত্যু নিরন্তর ।

রামকিঙ্কর এবার প্রতিমা গড়েছে অনন্তজ্যাঠার গড়া প্রতিমার মতো । সবাই বলেছে, অনন্ত ছুতারের পিতিমে । বিশ্বনাথ অতুলরা অন্যরকম আশা করেছিল । সে-আশা মেটেনি । অথচ ওরা খুশি হয়েছে । দুজনেই বড় হয়েছে । সংসারের দায়দায়িত্ব বেড়েছে । পাল্লা দিয়ে কাজও বেড়েছে । বিশ্বনাথের স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে । ঘটনাটার মধ্যে বিশ্বনাথের একটা গৌরব গাম্ভীর্য অথচ লজ্জাও যেন মিশে আছে । সে-লজ্জা খুশির মোড়কে ঢাকা । দিনের শেষে, সমস্ত কাজের পরে তিন বন্ধু নানা জায়গায় বেড়াতে যায় । শহরের বাইরে, দ্বারকেশ্বরের ওপারে । বন্ধুদের চোখেও রামকিঙ্কর কেবল বড় হয়নি । ক্রমাগত নাকি নতুন হচ্ছে । শান্তিনিকেতনের নানা খবরে তারা অবাক হয় । কিন্তু রামকিঙ্করের ভবিষ্যৎ এখনও অন্ধকার । বিশ্বনাথ-অতুলের জীবন তাদের বংশবৃত্তির সঙ্গে নিশ্চিত পথে চলেছে । প্রতিদিনের কাজের মধ্য দিয়ে তাদের আহার জোটে । জীবন বিকশিত হয় । রামকিঙ্করের বিকাশ এখনও অন্ধকারের পথে । অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ । তবু বন্ধুরা বলে, রামকিঙ্কর কেন বিয়ে

করবে না। তাদের কাছে এটা অস্বাভাবিক।
রামকিঙ্কর হাসে। মাথা নাড়ে। বলে, শান্তিনিকেতনে ওর যারা সহপাঠী, এমনকি সহপাঠিনীদের অনেকেরই বিয়ে হয়নি। কিন্তু তাদের কি বিয়ে হবে না? রামকিঙ্কর এ জিজ্ঞাসার জবাবে বলে, হবে। ও জানে, ইতিমধ্যেই কারোর কারোর বাড়িতে বিয়ের কথা উঠেছে। কারোর কারোর বিয়ে আসন্ন। ও তাদের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারে না। বিয়ের কথা ওর মনে আসে না।
এবারই প্রথম চণ্ডীচরণ তার ছোট ছেলের বিয়ের কথা তুলেছে। রামকিঙ্কর বাবার হাতে কুড়িটি টাকা তুলে দিয়েছে। গত বছরের পূজার ছুটিতে যখন এসেছিল, তখনও দিয়েছিল। ও এখনও ছাত্র। কিন্তু এই প্রথম চণ্ডীচরণের প্রত্যয় হয়েছে, ছেলে তার বসে থাকবে না। সংসারে ছবিরও কদর আছে। ছবি কেনবার লোক আছে। বোধ হয় সে প্রথম তার ছোট ছেলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে। সে এবার নির্দ্বিধায় বিয়ের কথা তুলেছে। সম্পূর্ণা স্বামীর কথায় আহ্লাদিত হয়েছে, "অই গ কিঙ্করের বাপ! এতকাল পরে যদি বিটার বিয়ার কথা মনে হইচে, বুল ক্যানে, আমি উয়ার জন্য কনে দেখি!"
বসন্তবালাও খুশি! রামপদ নিজেও ভাইয়ের বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে চেয়েছে। দিবাকর হাততালি দিয়ে নেচেছে, "কাকার বিয়া হব্যাক। কাকার বিয়া হব্যাক।"... ও রোগা লম্বা হয়েছে, মুখ অবিকল ওর মায়ের মতো। এখন ইস্কুলে পড়ে।
চণ্ডীচরণ যখন গম্ভীর মুখে বিয়ের প্রস্তাব তুলেছে, রামকিঙ্কর হেসে মাথা নেড়েছে, "এখনও দেড় বছর ছাত্র জীবন। ক[illegible]। তারপরে দেখা যাবে।"
"অই কিঙ্কর, মা বাপ কি চিরকাল বেঁচ্যে থাকব্যাক [illegible] সম্পূর্ণা সকাতর প্রশ্ন তুলেছে, "আমার ছোট বিটার বউয়ের [illegible] না দেখ্যে, মরেও শান্তি পাব নাই।"
রামকিঙ্কর হেসে মাথা নেড়েছে, "দু'বছর দেখতে [illegible] চল্যে যাব্যাক।"
কথাটা চণ্ডীচরণের মনে ধরেছে। ছেলে বড় হয়েছে [illegible]। ব্রাহ্মণ কায়স্থর ঘরে ঐ বয়সেও আইবুড়ো ছেলে দেখা যায়। রামকিঙ্কর বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছে। চণ্ডীচরণ সম্পূর্ণাকে বোঝাবার অক্ষম চেষ্টা করেছে। কারণ সম্পূর্ণার মন আর মানতে চায় না।
বসন্তবালা অবাক। অস্থির আর উদ্বিগ্নও বটে। দেবরকে আলাদা পেয়ে সে মাথার ঘোমটা টানতে ভুলে গিয়েছে, "কত্তকাল পরে বাপের ইচ্ছা হইচে আর বিটা বিয়াতে গররাজি! আর কবে বিয়া

করব্যাক গ ঠারপো ?"
"উ যে সি কী পেজাপতি না কিসের নিবন্ধ বুলে ?" রামকিঙ্কর বউদির দিকে তাকিয়ে হেসেছে, "বিয়ার সময় না হল্যে কী করে হব্যাক ?"
রামকিঙ্কর এ যাত্রায় বাঁকুড়ায় ফিরে পুবা ভাষায় কথা বলেছে। বউদির সামনে বলতে বেধেছে। বসন্তবালা ভুরু কুঁচকে রামকিঙ্করের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছে, "তুমার কী মতলব, ঠাঅর পাই না। তুমার ইখন বিটা হবার বয়স হইচে। আর কবে বিয়া করব্যাক ? শুনি ত, যিখানে থাক, সেখানে আইবুড়ি বড় বড় বিটিছেল্যারা নেকাপড়া শিখে। কারুক্কে মনে ধরেচ্যে কী ?"
"উখানে উ সব কিছু হয় নাই।" রামকিঙ্কর হেসে মাথা নেড়েছে। বসন্তবালার সন্দেহ ঘোচেনি, "বুঝি নাই তুমাকে। তুমি যেন কেমন হয়্যা যাইচ। ক্যানে ?"
ক্যানের কোনো জবাব নাই। কারণ বসন্তবালার জিজ্ঞাসাটা সরাসরি রামকিঙ্করকে না। এই দুর্বোধ্য সংসারের কাছেই তার জিজ্ঞাসা। তার নিজের জীবন সম্পর্কে সমস্ত জিজ্ঞাসার ইতি হয়ে গিয়েছে। স্বামী তার কাছে জিজ্ঞাসার অতীত। কিন্তু সংসারের আর সব যাবৎ মানুষ সম্পর্কেই তার জিজ্ঞাসার কোনো শেষ নেই।
রামকিঙ্কর সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য বিভূতিবাবুকে দেখতে গিয়েছিল। তাঁর শরীর বিশেষ ভালো নেই। আশুমহারাজেরও নাকি মাঝে মাঝে জ্বরজ্বালা হয়। তাঁরা ওকে আশীর্বাদ করেছেন। অনিলবরণ রায়ের বিয়ে হয়েছে। তাঁর অনুগামীরাও কেউ কেউ বিয়ে করেছে। গত বছর ও যখন শান্তিনিকেতনে ছিল, তখন গান্ধীজী বাঁকুড়ায় এসেছিলেন। অনিলবাবুর সঙ্গে গান্ধীজীর দেখা হয়নি। ও শুনেছে, গান্ধীজী দশ এগারো বছর আগেই শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল নিজের ছেলেরা ও ছাত্ররা। মার্চ মাসের দশ তারিখটি আশ্রমে 'গান্ধীদিবস' হিসাবে পালিত হয়। মার্চ মাসের দশ তারিখে, সমস্ত কাজের লোকের ছুটি। ঘরদরজা পরিষ্কার থেকে, রান্নাবান্না, বাসন মাজা, এমনকি পায়খানা পরিষ্কার করার দায়ও ছাত্র, শিক্ষকদের। গান্ধীজী চারমাস শান্তিনিকেতনে থেকে, ছাত্র শিক্ষকদের দিয়ে নিজেদের সব কাজ করাতেন। তিনি চলে যাবার পর, সেই নিয়ম বন্ধ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করেননি। তিনি জানতেন, ছাত্র শিক্ষক কারোরই ঐসব কাজ স্বেচ্ছাকৃত ছিল না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করানো তিনি অনুচিত মনে করতেন। গান্ধীজী এগারো বছর আগে মার্চ মাসের দশ তারিখ থেকে ছাত্র শিক্ষকদের স্বেচ্ছাব্রতী করেছিলেন। তাঁকে স্মরণ করার জন্য, প্রতি বছর ঐ দিনে, সকল কাজর দায়িত্ব ছাত্র আর শিক্ষকদের।
কলাভবনের ছাত্রদের কাজ পায়খানা পরিষ্কার করা। কারণ মাস্টারমশাই নন্দলাল বিশেষ করে ঐ কাজটিই বেছে নিয়েছিলেন। অতএব, ছাত্ররাও তাঁর অনুগামী, ছাত্রীদের রেহাই দিয়ে পাঠানো হয় রান্নাঘরের কাজে।
রামকিঙ্কর বাঁকুড়ায় জন্ম থেকে পায়খানা ব্যবহার করেনি। বাড়িতে ঐ পাট ছিল না। শান্তিনিকেতনেও ও যায় 'মাঠ করতে'। বেশিরভাগ ছেলেরাই যায়। কটিই বা পায়খানা আছে। একজন মেথরই যথেষ্ট। তবু রামকিঙ্করের অবাধ্য মন ঘাড় বাঁকিয়েছিল। প্রতি অমাবস্যা আর পূর্ণিমাতে নিজেদের ঘর দরজা, উঠোন আগাছা, আবর্জনা নিজেরা পরিষ্কার করে। তা বলে খাটা পায়খানা পরিষ্কার করা ? যারা পায়খানা ব্যবহার করে, তাদেরই তো পরিষ্কার করা উচিত। ওর মনে যখন এই প্রশ্ন আর বিতণ্ডা চলছিল, দেখেছিল মাস্টারমশাই মাথায় বেঁধেছেন একটা ফেট্টি। গায়ে পরেছেন ছেঁড়া জামা। ধুতি উঠেছে হাঁটুর কাছে। ময়লা ফেলার পাত্র তাঁর মাথায়। হাতে একটা বাঁশের বাখারি আর মাটির মালসা। কেবল কাজে না। চেহারাও একজন মেথর। গোঁফ জোড়া ঠিক ছিল। মানায়নি কেবল চশমায়।
রামকিঙ্করের মনের সকল প্রশ্ন আর চিন্তার তৎক্ষণাৎ ইতি হয়েছিল। ও তৈরি হয়ে, অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের অনুগামী হয়েছিল। কেবল এই একটি কথাই ও বাঁকুড়ায় কারোকে বলেনি। ভয় ছিল, পাছে ওকে সবাই অচ্ছুত করে দেয়। ভয়টা একান্ত অমূলক ছিল না। বাঁকুড়ার মানুষের কাছে কলকাতা এক অবাক করা আজব শহর। সেখানে কী নেই ? শান্তিনিকেতনও তাদের কাছে এক অবাক জগৎ। সেটা আশ্রম। বিশ্বভারতী। সারা পৃথিবীর মানুষ সেখানে শিখতে, শেখাতে আসে। তাদের রামকিঙ্কর সেখানে আঁকা গড়া শিখছে। কিন্তু ও সেখানে খাটা পাইখানা পরিষ্কার করে, তা যে-কোনো কারণেই হোক, জাত যেতেই পারে।

আশু বাঁকুড়ায় মামাঘর এসেছিল গত বৈশাখে। খরায় পুড়ে ঝুরে মৌকুচি থেকে এসেছিল। আশা ছিল ছোট মামার সঙ্গে দেখা হবে। সবাই ঐ রকম ভেবেছিল। রামকিঙ্কর গ্রীষ্মের ছুটিতে ঘরে আসবে। নতুন কাজের আগ্রহে ও আসেনি। এখনও ওর মন অনেকখানি শান্তিনিকেতনে পড়ে আছে। টানটা আঁকা আর গড়ার। সেখানে আঁকা গড়াটাই কাজ। সেই নিয়ে কথা। সেই কাজেরই নানারকম বই আছে লাইব্রেরিতে। ইংরেজি বই বেশি। বাঙলা যৎসামান্য। ইংরেজি পড়ে বোঝা কঠিন, তবু ও পড়ার চেষ্টা করে। বোঝার চেষ্টা করে। পুরোপুরি পারে না। অর্ধেকই কি পারে ? কিন্তু কিছু কিছু কথা কেবল ইংরেজিতেই বলা হয়। তাতেই বোঝা যায়। যেমন, 'আর্মেচার'। আসলে তো ম্যাড়। অনেক ইংরাজি কথার ঠিক ঠিক মানে না বুঝেও, একরকম ভাবে বোঝা যায়। সেটা কিছু কম না। তা ছাড়া আছে ছবি। অনেক। আর অনেক রকম। এখন ল্যাণ্টারির দু' খণ্ড বই ওর সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। দুপুরে হাতে পেলে আর ছাড়তে ইচ্ছা করে না। দেখেও যে কতো বোঝা যায়। দেখে, আর এঁকে এঁকে। গ'ড়ে গ'ড়ে। মিসেস মিলোয়ার্ড বই দুটি রেখে গিয়েছেন। কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। মিসেস মিলোয়ার্ডের কাছে অনেক কাজ শেখা হয়েছে। দেশের প্রতিমা গড়ার সঙ্গে মূর্তি গড়ার একটা মস্ত ফারাক আছে। প্রতিমাকে তিনদিক থেকে দেখলেই হয়। বাস্তব মূর্তিকে দেখতে হয় সব দিক থেকে। সামনে পিছনে, দুপাশে থেকে।
মিসেস মিলোয়ার্ড মিস পট-এর চেয়ে সব কাজই অনেক ভালো আর বেশি করে শিখিয়েছেন। নতুন কাজও শিখিয়েছেন। অথচ কী অবাক। তাঁর নিজের গড়া রবীন্দ্রনাথের মুখ ভালো হয়নি। ভালো মন্দর চেয়ে বড় কথা, কোনো দিক থেকেই সেই দাড়ি আর পেছনের ঘাড় পর্যন্ত মূর্তি ঠিক হয়নি। তাঁর বলা সেই চরিত্রও ফোটেনি। বাস্তবেও হুবহু হয়নি। কেন এমন হল ? মাস্টারমশাই নন্দলাল পশ্চিম তোরণের দোতলায় গুরুদেবের মূর্তি গড়া দেখতে এসেছেন রোজ। হেসেছেন। মাথা নেড়েছেন। মিসেস মিলোয়ার্ড যেদিন রবীন্দ্রনাথের মূর্তির প্লাস্টার অফ প্যারিসে ছাঁচ নিয়েছিলেন, নন্দলাল ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে তাকিয়েছিলেন, "কী করবেন আপনি ছাঁচ তুলে ?" মিসেস মিলোয়ার্ডের হাসিতে কোনো দ্বিধা ছিল না, "আমি এ ছাঁচ আমার দেশে নিয়ে যাবো। তামায় ঢালাই করবো। নয় তো মার্বেল পাথরে গড়বো।"
"কিন্তু মাদাম, ওটা তো কোনোদিক দিয়েই গুরুদেবের মুখ হয়নি !" নন্দলালের স্বরে ও মুখে ছিল অবাক ক্ষোভ, "আপনার গড়া মুখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো চিহ্নই নেই। বাস্তবে নেই। ভাবেও নেই। আপনি কি তা দেখতে পাচ্ছেন না ?"
মিসেস মিলোয়ার্ড অসঙ্কোচে হেসে মাথা নেড়েছিলেন, "না মিস্টার বসু, আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি গুরুদেভাকে সামনে বসিয়ে এ মুখ তৈরি করেছি। আমি জানি, আমি ঠিকই করেছি। আমি এটা মার্বেলে গড়বো।"
"মাদাম মিলোয়ার্ড, আপনি এটা সোনায় ঢালাই করতে পারেন, তাতেও কিছু হবে না।" নন্দলালের মুখে আর কোনো ক্ষোভের চিহ্ন ছিল না। তিনি হেসে মাথা নেড়েছিলেন, "আপনি ভাস্কর বুর্দেলের শিষ্যা। আপনাকে আমি কী বলবো। আপনার দেখার চোখ নেই, বোঝার মন নেই, তা যেমন বলতে পারি না, তেমনি, আপনাকে আমি বাধাও দিতে পারি না। কারোকেই পারি না। আপনি একটা মূর্তি গড়ে, যাঁর খুশি বলতে পারেন। আপনার সে-স্বাধীনতা আছে।

কিন্তু আমারও এ কথা বলার অধিকার আছে, এটা কিছুই হয়নি। গুরুদেবের মুখ তো নয়ই।"

মিসেস মিলোয়ার্ডের মুখ শক্ত হলেও, তিনি হেসেছিলেন, "ধন্যবাদ মিস্টার বসু। আপনি যা-ই বলুন, আমি এই ছাঁচ নিয়ে দেশে ফিরবো। নিশ্চিত একটা স্থায়ী রূপ দেবো। তামা বা মর্মর মূর্তি, যাই হোক।" তিনি ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়েছিলেন।

কেউ কোনো মন্তব্য করেনি, করার কোনো প্রশ্নই ছিল না। মিসেস মিলোয়ার্ড কারোর কোনো মন্তব্য শুনতে চাননি। তিনি সকলের মুখ দেখে মনের ভাব বুঝতে চেয়েছিলেন। মাস্টারমশাই উঠে দাঁড়িয়ে হেসেছিলেন, "মাদাম, আপনি সেই কোন্ দূর দেশ থেকে আমাদের ভাস্কর্য শেখাতে এসেছেন। আপনি একজন শিল্পী। আমি কৃতজ্ঞ। আপনাকে সম্মান জানাই।"

মিসেস মিলোয়ার্ডের জন্য কোনো বিদায় উৎসব হয়নি, তা নিয়ে কোনো কথাও ওঠেনি। মিসেসেরও কোনো প্রত্যাশা ছিল না। তাঁর বিদায়ের সময় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন না। ক্ষিতিমোহন আর নেপাল রায় বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। মাস্টারমশাই নিজে গরুর গাড়িতে, বোলপুর ইস্টিশনে গিয়েছিলেন তাঁকে বিদায় দিতে। রামকিঙ্কর আর সুধীর গাড়ির সঙ্গে হেঁটে গিয়েছিল। মিসেস মিলোয়ার্ড রেলগাড়িতে ওঠবার আগে, নন্দলালের সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন, "গুরুদেভার মূর্তির সম্পর্কে আপনার কথা আমার মনে থাকবে। গুরুদেভাকে বলবেন, আমি এখানে সব দিক থেকেই খুব ভাল ছিলাম। তুলনাহীন আতিথেয়তা। তাঁকে আমি চিঠি লিখবো।" তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সুধীর আর রামকিঙ্করের দিকে, "তোমাদের মতো ছাত্র পেয়ে আমি সুখী হয়েছি। আমি যদি তোমাদের কিছু শেখাতে পেরে থাকি, তা হবে আমার গুরুর আশীর্বাদ। থেমো না। যখন যা গড়তে ইচ্ছে করবে, তাই গড়বে। কিছু করলেই সমালোচনা শুনতে হয়। কিন্তু থেমো না। অনেক বাধাও আসতে পারে। তবু থেমো না। সুধীর! রামকিঙ্কর তোমার আবক্ষ মূর্তি খুব সুন্দর করেছে। তুমি ওর আবক্ষ মূর্তি করো। বিদায়..."

দুপুরের মেঘলা ভাঙা আকাশে, এক রাশ কালো ধোঁয়া উড়িয়ে রেলগাড়ি চলে গিয়েছিল। মিসেস মিলোয়ার্ড চলন্তগাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়েছিলেন। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে সুধীর আর রামকিঙ্করও হাত নেড়েছিল। ফেরার পথে নন্দলাল গাড়িতে ওঠেননি। দুজনের সঙ্গে হেঁটে ফিরেছিলেন। তাঁর মুখে ছিল অন্যমনস্কতা, "মিসেস মিলোয়ার্ড তোমাদের যা বলে গেলেন, কথাগুলো চিরকাল মনে রেখে দিও। উনি একটুও ভুল বলেননি। খাঁটি সত্যি কথা বলেছেন। আর দেখ, যাবার আগে আমাকে বললেন, গুরুদেবের মূর্তির সম্পর্কে আমার কথা ওঁর মনে থাকবে। কেন বললেন? জানিয়ে গেলেন, আমার সমালোচনার কথা তিনি বিবেচনা করবেন। নইলে ওকথা বলতেন না। ওঁদের কাছে আমাদের অনেক শেখার আছে।"

মিসেস মিলোয়ার্ডকে বিদায় দিতে গিয়ে রামকিঙ্করের মন খারাপ হয়েছিল। তাঁর প্রীতি ও স্নেহের করমর্দনের ছোঁয়া ওকে কৃতজ্ঞ করেছে। তিনি কেবল হাতেকলমে কাজ শেখাননি। কথা বলেও অনেক শিখিয়েছেন। ফ্রান্সের ভাস্কর রদ্যাঁর কথা শুনিয়েও তিনি মনের ভিতরে কাজেরই একটা আবেগ আর উৎসাহ জাগিয়ে দিয়েছেন। ভাস্কর্য সৃষ্টি আর রদ্যাঁর কথা বলতে গিয়ে তিনি ইংরেজি 'প্যাশন' শব্দটা অনেকবার বলেছেন। "রদ্যাঁ ওয়াজ ভেরি মাচ প্যাশনেট ইন হিজ ক্রিয়েশনস্। হিজ লাভ অ্যান্ড সরোজ।" প্যাশন মানে তো আবেগ? কিন্তু 'প্যাশন' শব্দের অন্য মানেও অনেকে করে। তার সঙ্গে রদ্যাঁর 'প্যাশন' মেলে না। মিসেস মিলোয়ার্ড আবেগকে খুব বড় করে দেখাতে চেয়েছেন। আবেগ না থাকলে কোনো কিছু সৃষ্টি হয় না। কথাটা মিথ্যা না। কোনো কিছু আঁকতে গড়তে গেলেই, মনে একটা আবেগ আসে। সেটা ওর কাছে একটা আগ্রহ আর আনন্দের মতো। বায়েনবউকে চোখের সামনে না দেখে আঁকার সময় ওর মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিল। বায়েনপাড়ার কালী বায়েনের বউ অন্নপূর্ণাকে মন থেকে তেল রঙে এঁকেছিল। মন থেকে সেই দেখার মধ্যে কি ঐ আবেগ ছিল? প্যাশন? ও জানে না। আবেগের অনুভূতিটা যে কেমন, ওর কাছে স্পষ্ট না। অথচ যখনই নতুন কিছু এঁকেছে বা গড়েছে, তখন মনের ভিতরে একটা কী হতে থাকে। সেই যে কবে মাটি দিয়ে রেল এঞ্জিন গড়েছিল? তখন মনের ভিতরের ভাব কেমন জল ছাপাছাপি গন্ধেশ্বরীর মতো টান আর ভরা ভরা হয়ে উঠেছিল। পরের দিন পাঠশালাতে যাবার কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল। আর বাবার সেই বেড়ন!...

রামকিঙ্করের মনের অবস্থা এখনও সেই রকম। কাজের টান ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে না। অথচ, সব সময়েই শান্তিনিকেতন ওকে টানছে। পশ্চিম তোরণের দোতলা হাতছানি দিচ্ছে। হাতছানি দিচ্ছে লাইব্রেরির বই। না, সুধীরের আবক্ষ মূর্তির কথা ওর একবারও মনে আসছে না। নতুন কিছু করার জন্য মন বড় আনচান করছে। অনন্তজ্যাঠার মৃত্যুশোক কাটিয়ে ওঠবার পরেই, শান্তিনিকেতনের কথাই প্রথম মনে এসেছে। অনন্তজ্যাঠার মৃত্যু ওকে এই বোধ দিয়েছে, সংসার মৃত্যুশীল। আবার সৃষ্টির প্রেরণাও সব সময় মনকে টেনেছে। সেই সঙ্গেই মনে পড়ছে মিসেস মিলোয়ার্ডের কথা। তিনি হাতে ধরে এতো ভালো কাজ শিখিয়েছেন। কথা বলে শিল্পের ভিতরের রহস্য বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু মাস্টারমশাই একটুও ভুল বলেননি। ম্যাডামের গড়া রবীন্দ্রনাথকে কোনো দিক দিয়েই চেনা যায়নি। রামকিঙ্করের চোখেও স্পষ্ট ধরা পড়েছে। খুব অস্বস্তি বোধ করেছে। মাস্টারমশাইয়ের প্রতিটি কথায় মনে মনে সায় দিয়েছে। আর অবাক মেনেছে ম্যাডামের জেদ দেখে! তিনি একজন বিখ্যাত ভাস্করের ছাত্রী। তিনি রবীন্দ্রনাথকে সামনে থেকে দেখে তাঁর মুখ গড়েছেন। ম্যাডামের কি চোখের সেই দৃষ্টি নেই? যে-দৃষ্টি দিয়ে ঠিক জিনিসটি চেনা যায়? তিনি নিজে যা ব্যাখ্যা করে বলেন, তাঁর কাজের মধ্যে সেই ব্যাখ্যাকে দেখতে পাননি? তবে কেন মাস্টারমশাইয়ের কথা মানতে চাননি?

চলে যাবার সময় বোলপুর ইস্টিশনে কি ম্যাডাম তাঁর ভুল মেনেছিলেন? নির্ঘাৎ মানেননি। মাস্টারমশাইয়ের সমালোচনার কথা তাঁর মনে থাকবে। মাস্টারমশাইয়ের কথা, ম্যাডাম বিবেচনা করবেন। তাঁর সেই জেদ আর ছিল না। রামকিঙ্কর স্বস্তিবোধ করেছিল। আর তাঁকে বিদায় দিতে গিয়ে মন খারাপ হয়েছিল। তাঁর শেখানো রীতিতে কাজ করার জন্য ওর মনে সততই একটা ব্যস্ততা। মনের এ অবস্থা নিয়ে ও গেল মৌকুচি।

রামকিঙ্করের এই প্রথম বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ের রেলগাড়িতে ভ্রমণ। ও মৌকুচি যাবার আগে, শরত দাস এসেছিল। যুগীপাড়ার দুর্গাপূজার একজন কর্তা ব্যক্তি। পাঁচটি টাকা দিয়েছিল। ওর মনে পড়েছিল অনন্তজ্যাঠাকে। ঐ টাকা ও ফেরাতে পারেনি। আর একবার অনন্তজ্যাঠার শূন্যতা মনে বেজেছিল। মনে হয়েছিল, যে-দুর্গাতলায় অনন্তজ্যাঠা নেই, সেখানে ও আর কেন প্রতিমা গড়তে যাবে? গড়ার সেই আনন্দ আর আগ্রহ কোথায়? এ বছর ওর মনে একটাই আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। প্রতিমা গড়তে হবে অনন্তজ্যাঠার মতো। কিন্তু আর কি ভবিষ্যতে গড়বে?

রেলগাড়ি চলে না, এঞ্জিন হাঁকে? গাড়ি যতো না ছুটেছিল, এঞ্জিনের ঝকঝক ফোঁস ফোঁস ফোঁসানি তার চেয়ে অনেক বেশি। আর চলেছে যেন নেচে নেচে দুলে দুলে। মাঝে মাঝে কী হ্যাঁচকা টান! মাঠ তেপান্তর কাঁপিয়ে কুক্ কুক্ বাঁশি বাজাচ্ছে। ধোঁয়া ছড়িয়ে দিচ্ছে আকাশে। আকাশ থেকে ধোঁয়া নামছে নিচে। রেল লাইন কোথাও গিয়েছে গাছপালা বনের মধ্য দিয়ে। কোথাও গ্রামের ধার দিয়ে। গ্রাম পড়ে খুব কম। যখন কোথাও দাঁড়ায়। তখন লোকালয় আসে। উঁচু প্ল্যাটফরম কোথাও নেই। দুধাপ পা দানির নিচে কাঁকর পেটানো শক্ত মাটি। ইস্টিশন।

মৌকুচিতে গাড়ি এসে পৌঁছুলো ভাতখাউকি বেলায়। কার্তিক মাস। নীল আকাশে কোথাও এক ফোঁটা মেঘ নেই। রোদ আছে।

রোদে তেমন তাত নেই। গাছপালা এখনও সবুজ। বেলা ইতিমধ্যেই ছোট হতে আরম্ভ করেছে। ভাত খেয়ে ওঠার পরেই তা ঠিক ঠাহর হয়। কিন্তু এ সময়ে কুটুমবাড়ি যেতে লজ্জা করে। পাত পেত্যে খাত্যে এল্যে কী ? রামকিঙ্কর জোরে পা চালিয়ে হাসলো। রেলগাড়ি যেমন সময়ে পৌঁছে দিয়েছে, সেরকমই এসেছে। ও নিজের ইচ্ছায় তো এ সময়ে আসেনি। আশু কি যজমান ঘরে কামিয়ে ফিরেছে ?

"আশুতোষ প্রামাণিক ঘরে আছে কী ?" রামকিঙ্কর বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসলো। জিজ্ঞাসু চোখে রঙ্গ। বাড়ির সবাই ভালো আছে তো ? অথচ আবার রুদ্ধ হাসি থমকে আছে ওর ঠোঁটের কূলে।

মাটির দুই পাঁচিলের মাঝখানে, বাঁশের আগল সরিয়ে একজন বেরিয়ে এলো। আদুর গা মানুষটির চোখে জিজ্ঞাসা, "কে বটে ?"

"আমি রামকিঙ্কর।" ও আশুর কাকা চিনতে পারলো।

আশুর কাকা প্রথম চিনতে পারেনি। রামকঙ্কিরের আপাদমস্তক দেখছিল। কী করেই বা পারবে। রামকিঙ্কর খদ্দরের পাজামা পাঞ্জাবি পরে এসেছে। এই প্রথম পাজামা করেছে বোলপুরের দর্জিকে দিয়ে। বাড়ির লোকেরাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। আশুর কাকা হাসলো, "অই কী বলে গ। রামকিঙ্কর বটে ? এস্য এস্য।" বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁকলো, "আশু, দ্যাখ কে আইচে।"

"সবাই ভাল আছে ত ?" রামকিঙ্কর বাড়ির ভিতরে ঢুকলো। আশু তখন ঘরের বাইরে কুলির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরও আদুর গা। আগের চেয়ে এক বিঘত মাথা চাড়া দিয়েছে। পরনের মোটা আট হাত কাচা উঠেছে হাঁটুর ওপরে। চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে উঠলো, ঝাঁপিয়ে পড়ে দু হাত দিয়ে রামকিঙ্করকে জড়িয়ে ধরলো, "অই ছোট মামা !"

বাপরে ! আশু কি ছোট মামার হাড়গোড় ভাঙবে ? ঘরের দাওয়ায় একজন ঘোমটা মাথায় বসেছিল উনোনের ধারে। ঘোমটা আরও টেনে দেবার আগেই তার চোখেও হাসি ঝিলিক দিল। আশুর বউ। মুখখানি মনে ছিল। এর মধ্যেই সেই ছোট বউটি কেমন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো থাকোমণি, আশুর জেঠি আর খুড়ি। আশুর কাণ্ড দেখে সবাই হাসছে।

"মামা ন্যাওটা ভাগনা বটে।" আশুর খুড়ি হেসে বাঁচে না। আশু রামকিঙ্করকে ছেড়ে মুখ সরিয়ে দেখলো। মুখে দু দিনের আকাটা কালো গোঁফ দাড়ি। খুশিতে নিজেকে যেন ধরে রাখতে পারছে না "কত্ত দিন দেখি নাই, অ্যাঁ ? অই ছোট মামা, তুমি কি ফারসা হয়্যা গেইচ ? চুল কে ইরকম কেটেচ্যো। বড় বাহার ! হাজামতের কী পালিশ ! আর ই-ইটি কী পরেচ্য বটে ?"

"উসব কথা পরে হব্যাক।" থাকোমণি এগিয়ে এলো, "ছোটমামাকে টুকদু সুস্থির হত্যে দে। বাবা মা'র খবর শুনি। তু কবে বাঁকুড়ায় এয়েচু বটে ?"

রামকিঙ্কর দেখলো, বড়দিদির চোখের কোল বসা। মুখখানি শুকনো। হাসিটি মরা চাঁদের মতো ম্লান। দিদির শরীর ভালো নেই। রামকিঙ্কর তবু হাসলো। বাড়ির কুশল জানালো। ওর বাঁকুড়ায় আসতে অনেক দেরি হয়েছে। অনন্তজ্যাঠার খবর কি তোমরা জানো ? জানো না। এই তো খবর। আশুর কথা কেবলই মনে পড়ে। ও বৈশাখে বাঁকুড়ায় গিয়েছিল। না এসে থাকতে পারলো না। আর কেম্নাইয়ের মতো গাড়িটা ঝিক ঝিক করে কী অসময়ে যে এলো। সত্যি, কেম্নোর মতো গাড়ি বটে। নইলে এমন অসময়ে কুটুম বাড়িতে পৌঁছোয় ?

"ছোট মামা উসব কথা রাখ।" আশু একবার দাওয়ার উনোনের ধারে দেখে নিল, "তুমার পেটের ভাত ফুটাইতে, কারুব চল শুকাইতে হব্যাক নাই। চাপব্যে আর নামব্যে। ইসব জামা টামা ছাড়। চল বাঁধে যাই। তা'পরে কেরালির ডাল আর গুগলি পোস্ত দিয়ে ভাত খাবে।"

গুগলি পোস্ত কতোদিন খাওয়া হয়নি। শুকনো ভাতে বড় স্বাদের খাদ্য। আশু ঘরে বসে জিরোবার সময় দিল না। বাঁধের ধারে গাছতলায় বসে দু'জনে বিড়ি খেতে খেতে কথা বলেছে। কতো যে তার প্রশ্ন। আর কতো না বলবার কথা। হ্যাঁ। ছোটমামা ঠিক ধরেছে। মায়ের শরীরটি ভালো যাচ্ছে না। সংসারে অশান্তিও আছে। দাদার বউটির মুখ সব সময় ব্যাজার। আশুর বউকে দেখতে পারে না। ঐ সেই একই তরো। জায়ে জায়ে ভাব ভালবাসা নেই। বউদির এক মেয়ের পর আবার একটি পেটে ধরেছে। আশুর ঐ রকম কথা। আর ছোট মামার ভাগনে বউটি যে কী করছে কে জানে। বলতে গিয়ে আশুর কী হাসি ! যতো লজ্জা ততো সুখ। তার বউ যে ডাগর হয়েছে, সে-কথা কেমন করে বোঝাবে ? বউ ডাগর হলে স্বামীর শরীর মনের যে কী অবস্থা হয়, তা-ই বা কেমন করে বোঝাবে। যে পুরুষ বিয়ে করেনি, তাকে বোঝানো যায় না। তবে আশু এইটুকু জানে, তার বউ যে কোনো দিনই গর্ভবতী হতে পারে। বউয়ের কথা না। দশ বারো বিউনি সব গিন্নিদের কথা। তারা বউকে দেখলে বুঝতে পারে। এখন নাকি

যে-কোনো দিন নতুন সংবাদের অপেক্ষা।

রামকিঙ্কর দেখলো, আশু ওর চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ পুরুষ হয়ে উঠেছে। অনেক বেশি সংসারি। লোকচরিত্র জ্ঞান বেড়েছে। রামকিঙ্করের প্রতি ওর তেমনি প্রীতি। অচলা ভক্তি। কিন্তু দুজনের মধ্যেই অপরিচয়ের ব্যবধান বেড়েছে। দুজনের জগৎ আলাদা। দুজনের জীবনকে দেখাও ভিন্ন হয়ে উঠেছে। আশু তো শুনে থ ! এখনও ছোটমামাকে আঁকা গড়া শিখতে হচ্ছে ? কতো দিন যে ছোট মামার আঁকা গড়া দেখেনি। আগের বেবাক কি বদলে গিয়েছে ? অবাক কথা বটে ! খাঁটি বিলিতি মেমসাহেব হাতে ধরে কাজ শেখায় ! ডাগর মেয়েরা এক সঙ্গে কাজ করে ? তারাও আঁকা গড়া করে ? বিয়ে হয়নি ? শোনো কথা !

বাড়ির গিন্নি বউরা যখন সবাই বিকেলে যজমান বাড়ি গিয়েছে, আশু নিজের বউকে আটকেছে। যেতে দেয়নি। ছোটমামার সঙ্গে কথা বলবে না ? লজ্জা করলে চলবে কেন ? আশুর ছোটমামা

বটে। সেই বিয়ের কনে দেখেছিল। তারপরে আবার দেখা। আশু নিজেই রামকিঙ্করের সামনে শান্তিনিকেতনের কথা বউকে শুনিয়েছে। আর ঘোমটা টেনে, হেসে কথা সেই একই। ভাগনের বিয়ে হয়ে গেল। মামা আর কতোকাল আইবুড়ো থাকবে। কোন্ জায়গায় যেন থাকে? বড়বড় সব আইবুড়ো মেয়েরা সেখানে আছে। পুরুষ প্রকৃতি বলে কথা। কী ঘটতে কী ঘটবে, কিছু কি বলা যায়? ভাগনেটিই বা কেমন? নিজে বিয়ে করে, মামার কথা ভুলে বসে আছে। মামাকে ধরে পড়ুক। মেয়ে দেখুক।
রামকিঙ্কর বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে হেসেছে। বলেছে, বিয়ে করবে। আশুর মতো রোজগার যখন করবে, তখন। বউকে খাওয়াতে হবে না? সব কথাতেই, গোড়ার কথা আসে। পুরুষ মানুষ রোজগার না করলে বিয়ে করে না। কিন্তু ছোটমামা কবে রোজগার করবে। কতোকাল শিখবে? বয়স হয়ে যাচ্ছে। আশুর কী দুশ্চিন্তা। দুশ্চিন্তা তার বউয়েরও। তবে ছোটমামা যেন কেমন বদলে গিয়েছে। সেই আগের মতোটি আর নেই। পাজামা পরতে তার একটুও কুণ্ঠা নেই। পাজামা পরতে লজ্জা করবে কেন? সবাই পরে। বাঙালীরা পরে। ভারতবর্ষের সব দেশের মানুষ পরে। চীন জাপানের লোকেরা পরে। বিলিতি সাহেবরাও পরে। সেই জন্যই আশুর জিজ্ঞাসা, রামকিঙ্করের আঁকা গড়াও নিশ্চয় বেবাক বদলে গিয়েছে। তার ইদানীং কালের আঁকা গড়া দেখার বড় সাধ। কী করেই বা আশুর সে সাধ মিটতে পারে।
"ছোটমামা, আমি শান্তিনিতনে যাব।" আশু তার কৌতূহলকে বাগ মানাতে পারে না, "আমি ই পরেই তুমার সঙ্গে যাব। তুমি কেমন থাক, কী কর, দেখ্যে আসব।"
রামকিঙ্কর হেসেছে, "শান্তিনিতন আবার কী?" শান্তিনিকেতন। শান্তিনি-কেতন। কিন্তু এখন তুই কুথা যাবি? আমি ছাত্র, ফ্রি ছাত্র। উখানে আমার টাকা পয়সা দিতে হয় না। সব ছাত্রছাত্রীকেই দিতে হয়। যখন চাকরি করব, টাকা রোজগার করব, তখন যাবি।"
আশু কি সহজে ছাড়তে চায়। মৌকুচিতে দুটো দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল। আশুর ইচ্ছা সে রামকিঙ্করকে আসানসোলে পৌঁছে দিয়ে আসবে। অনেক কষ্টে ওকে থামানো গিয়েছে। রামকিঙ্করের কোনো ঠিক নেই, ও কোন্ পথে শান্তিনিকেতন ফিরবে। আর এ সময়ে কেনই বা মিছিমিছি পয়সা খরচ করে বাঁকুড়ায় যাবে।
যজমান ঘরে কতো কাজ। বিদায়ের সময় কারোরই চোখ শুকনো রইলো না। বড়দিদির সঙ্গে তার জায়েদের চোখও জলে ভরে উঠলো। আশুর বউদি বউও চোখ মুছলো। অথচ জায়ে জায়ে বিবাদ বিসংবাদ লেগেই আছে। একজনের চোখের জল সকলের চোখ ভিজিয়ে দেয়। প্রাণে যদি এতো মিল, তবে বিবাদ ক্যানে হয়। সংসারের রীতিই এমন বিপরীত। আশুর খুড়া জ্যাঠাদের মুখের হাসিও বিষণ্ণ। কুটুমের নিমন্ত্রণ রইলো। আবার যেন আসা হয়। মৌকুচি ইস্টিশনে রেলগাড়ি আসার আগে, আশু তিনটি বিড়ি খেয়ে ফেললো। আর গাড়ি যখন এসে, আবার ছেড়ে দিল, গাড়ির সঙ্গে ওর কী দৌড়। এই সেই আশু। এখন ওকে দেখলে কে বলবে, ও অনেক বড় হয়েছে। দু'দিন পরে বাবা হবে। রামকিঙ্কর স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে, রেলগাড়ির ধোঁয়ার আড়ালে, আশু চোখ মুছছে। অই আশু! আর ছুটিস নাই…

সময়ের কথা কে বলবে। কোথাও একটা ঘড়ি নেই। তবে রেলগাড়ি যখন বেলিয়াতোড় এসে সোঁ সোঁ শব্দ করছে, তখন সকাল উতরে গিয়েছে। ভাতখাউকি বেলার এখনও অনেক দেরি। বি· ডি· আর-এর দেশলাইয়ের বাক্সের মতো খেলনা রেলগাড়ি। বাঁকুড়া থেকে ছেড়েছে সেই কাক ভোরে।
রামকিঙ্কর গাড়ি থেকে নামলো। ওর সঙ্গে নামলেন রানীগঞ্জের মোড়ের বাসিন্দা ক্ষেত্রমোহন সিংহ। লোকে বলে ক্ষেত্তর সিং। রামকিঙ্কর চলেছে শান্তিনিকেতন। ক্ষেত্রবাবুর কথায়, ও তাঁর সঙ্গী হয়েছে। এ পথে ও কখনও যায়নি। এ পথে বোলপুর যেতে হলে ওকে পাঁচ সাড়ে পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে, দামোদর পেরিয়ে যেতে হবে। অন্যান্য বগি থেকে আরও পাঁচ সাতজন যাত্রী নামলো। এঞ্জিনটা সোঁ সোঁ করছে না: যেন ফোঁস ফোঁস নিশ্বাসে হাঁপাচ্ছে। আর কালো ধোঁয়া উঠছে আকাশে। বাতাস নেই। থাকলে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়তো। অনেক ওপরে উঠে পুবে ভেসে যাচ্ছে।
ক্ষেত্রমোহনের হাতের ঝোলাটা বেশ বড়। মানুষও শক্ত পোক্ত। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। মালসাট দেওয়া ধুতি পরা। তার ওপরে হাত কাটা গোল গলা জামা। রামকিঙ্করের গায়ে পাজামা পাঞ্জাবি। গাড়ির এঞ্জিনের ধোঁয়া আর কয়লার গুঁড়ো লেগেছে মাথায় মুখে। কয়লার গুঁড়ো থেকে যাত্রীদের রেহাই নেই। যদি খোলা জানালার ধারে বসে, তবে তো কথাই নেই। আর জানালার ধারে জায়গা পেলে কেউ ছাড়ে না। গাড়িতে চেপে মাঠঘাট গ্রাম মানুষ পশুপাখালি দেখতে সবাই চায়। তবে এ ছোট রেলগাড়ির গতি বড় মন্থর। রামকিঙ্কর বলতে গেলে, ঝাড়া হাত পা। কাপড়ে জড়ানো একটি মাত্র চৌকো ছোট পেটি ওর হাতে। প্যাঁটরা নিয়ে বাঁকুড়ায় আসেনি। বিছানা আর খাবার থালা গেলাসও রেখে এসেছে সত্যকুটিরের ঘরে।
জয়পুরের নতুন ছাত্র সোহাগমল নিজেই তার হেফাজতে রেখেছে। সঙ্গে বেশি ভারী বোঝা থাকলে ক্ষেত্রমোহনের সঙ্গী হতো না। বোঝা নিয়ে পাঁচ ক্রোশের বেশি পথ হেঁটে যাওয়া কষ্টকর।
রামকিঙ্কর ক্ষেত্রমোহনের সঙ্গে রাস্তায় এসে উত্তরে হাঁটলো। রেলগাড়ি কুক্ দিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দে চলতে শুরু করলো। এ গাড়ি যাবে সোনামুখি। সোনামুখির আঁকাবাঁকা পথ গিয়েছে পুবে। ক্ষেত্রমোহনের সঙ্গে রামকিঙ্কর উত্তরে হাঁটছে জোর কদমে। এ রকম হাঁটলে ভাতখাউকি বেলার মুখে মুখে দামোদরের ধারে চুনাপোড়া ঘাটে পৌঁছে যাবে। ক্ষেত্রমোহন রামকিঙ্করকে সঙ্গে নিয়েছে দুটি কারণে। একলা এতোটা পথ হাঁটতে ভালো লাগে না। অবিশ্যি দিনের বেলায় নির্জনেও ঠ্যাঙাড়ের ভয় নেই। কিন্তু একলা হয়ে গেলেই মনটা আঁটুপাটু করে। ধু ধু মাঠের পথে, হঠাৎ ঝোপ ঝাড় দেখলে একটা অশুভ ধন্দ লাগে। মাঝে মাঝে গ্রাম ছাড়া, কেবল নির্জন শালবন। ছায়ায় অন্ধকার। একজন সঙ্গে থাকলে, কথাবার্তা বললে মনে জোর পাওয়া যায়।
পথ চলতে বিড়ি খাওয়া একটা সমস্যা। ক্ষেত্রমোহনের সামনে রামকিঙ্কর কোনো দিন বিড়ি খায়নি। বেলিয়াতোড় গ্রাম ছাড়াবার আগেই ওর যামিনী রায়ের কথা মনে পড়লো। উনি এখন গ্রামে আছেন না কলকাতায়, ও জানে না। উনি কলকাতায় প্রায়ই নাকি যান। সেখানে তাঁর অনেক ভক্ত আর পৃষ্ঠপোষক আছেন।
ক্ষেত্রমোহন ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়েছেন। যাবেন চুনাপোড়া ঘাটেই। চুনাপোড়া ঘাটে চুন আর চুনাপাথর পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে কোঠাবাড়ি গড়ার মশলা তৈরি হয়। ক্ষেত্রমোহনের পারিবারিক ব্যবসা। তাঁর পক্ষে এ রাস্তা সহজ। বেলিয়াতোড়ের মানুষ নিশ্চয়ই এই বড়জোড়ার পথে, চুনাপোড়া ঘাট পেরিয়ে, ওপারে দুর্গাপুরে যায়। বর্ধমান জেলার ছোট এক ইস্টিশন দুর্গাপুর। দুর্গাপুর থেকে কলকাতায় যাওয়া সহজ। খানা হয়ে, বোলপুরেও যাওয়া যায়।
রামকিঙ্কর বাঁকুড়া থেকে বেলিয়াতোড় পর্যন্ত আসতে, রেলগাড়ির বগির এক প্রান্তে সরে গিয়ে একটা বিড়ি খেয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল গুড় মুড়ি আর চা খেয়ে। খেতে দিয়েছিল বউদি। দাদা আর দিবাকর ভিতর বাড়ির ঘরে ঘুমোচ্ছিল। বাবা মাও ভিতর বাড়ির আর একটা ঘরে শুয়েছিল। রামকিঙ্কর পুবের বাগানের সামনের ঘরে একলা ছিল। বাড়িতে এলে ওকে ঐ ঘরটি ছেড়ে দেওয়া হয়। বাবা মায়ের সঙ্গে শোবার দিন কবে শেষ হয়ে গিয়েছে। ও মুড়ি খাবার সময়েও মা ঘুমোচ্ছিল। বাবা পুবের ঘরে বসে হুঁকো টানছিল। বেরোবার আগে বাবা মাকে ডেকে দিয়েছিল। "আবার কবে আসবি?" মা হাই তুলে জিজ্ঞেস করেছিল। আবার নিজেই জবাব দিয়েছিল, "উ কথা আর ক্যানে জিগেঁস করি। ভগমান কবে সেদিন দিবে কে জানে। দুগ্‌গা দুগ্‌গা।"
মায়ের একটি কথার মধ্যেই অনেক কথা উহ্য ছিল। বউদির কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হয়েছিল আগেই। তবু বউদি ঘোমটার আড়াল

থেকে উৎসুক ব্যগ্র চোখে তাকিয়েছিল। তার মন খারাপ হয়েছিল। কালীপুজোর আগেই এবার রামকিঙ্কর চলে যাচ্ছে। বউদির জীবনের কোথাও কিছু বদল হয়নি। তার চোখের সামনে দিবাকর মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, এইটি একমাত্র সান্ত্বনা। রামকিঙ্করও ঘরছাড়া। ওর সঙ্গে বাবা এসেছিল রানীগঞ্জের মোড়ে, সিংহদের বাড়ি পর্যন্ত। এবার এসে বাবার হাতে পনেরো টাকা দিয়েছিল। আর দিতে পারেনি। ওর ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত। হঠাৎ আর কোনো ছবি বিক্রি হবে, এমন কোনো আশা ছিল না।

"শুন কিঙ্কর, তু উ বাগে কুথা যাচ্ছু ?" ক্ষেত্রমোহন হেসে ডাকলেন, "আয় দুজনে বিড়ি ধরাই। সে হাঁটা থামিয়ে জামার পকেট থেকে বিড়ি আর দেশলাই বের করলো।

রামকিঙ্কর অপ্রস্তুত। ক্ষেত্রমোহন ধরেছেন ঠিক। ও শালবনের পথে একটু আড়ালে যাবার চেষ্টায় পা বাড়িয়েছিল। উদ্দেশ্য বিড়ি খাওয়াই বটে। কিন্তু ক্ষেত্রমোহনের বাড়িয়ে দেওয়া হাত থেকে বিড়ি নিতে, হাত উঠলো না। তিনি হাসলেন, "খা না, আমিও খাব। এক সাথে যাঁহ'চি। কত্তখানি রাস্তা। কে আর দেখচে। লে।" রামকিঙ্করের হাতে বিড়িটা গুঁজেই দিলেন।

রামকিঙ্কর হাসলো। ক্ষেত্রমোহন নিজের বিড়ি ধরিয়ে, কাঠির আগুন ওর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ও ধরালো। একটাই স্বস্তি।

ক্ষেত্রমোহনের বয়স বেশি না। চলতে চলতে তিনি সংসার আর ব্যবসার নানান কথা বললেন, চুনাপোড়া ঘাট পর্যন্ত একবারও ছবি আঁকা বা শান্তিনিকেতনের কথা একটিও জিজ্ঞেস করেননি। কথা দিয়েছিলেন, দামোদরের ওপারে দুর্গাপুর ইস্টিশনে পৌঁছে দেবেন। রামকিঙ্কর দেখলো, ওর ছায়া নিজের পায়ের তলায়। সূর্য মাথার ওপরে। নীল আকাশের মতোই বালুচরের মাঝামাঝি দামোদর দক্ষিণে বহে। জল গভীর। খেয়া নৌকোর ভাড়া মাথা পিছু আধ পয়সা। ওপারে গেলে, দুর্গাপুরের পথ সামান্য। কেনই বা মিছে ক্ষেত্রমোহন আধ পয়সা খরচ করবেন ? রামকিঙ্কর বারণ করলো। আরও কয়েক যাত্রীর সঙ্গে ও খেয়া নৌকোয় উঠলো। এই

চুনাপোড়া ঘাটে এখন লোকজনের ভিড়। চুন পোড়ানোর চুল্লি জ্বলছে অনেকটা উঁচু পাড়ে। বাতাসে তারই গন্ধ। সন্ধ্যা হয়ে এলেই, এই রাস্তাঘাট হয়ে উঠবে ঠ্যাঙাড়েদের শিকারের জায়গা। অথচ এখন মনে হয়, রঙ কাগজ নিয়ে বসলে, দামোদর, কারখানার চুল্লি, লোকজন গাছপালার এক নতুন ছবি আঁকা যেতো।

রামকিঙ্কর বিকালে শান্তিনিকেতনে পৌঁছোলো। সতাকুটিরের বাঙালী বন্ধুরা কেউ ফেরেনি। ভাইফোঁটার পরে সবাই ফিরবে। সোহাগমল ওকে হেসে অভ্যর্থনা করলো। খুব খিদে পেয়েছিল। নিশিকান্ত থাকলে তার খুন্তি কড়া বের করে ডিম ভেজে দিতো। ও নিজেও করে নিতে পারতো। কিন্তু খিদে থাকলেও, তার কষ্ট তেমন বোধ হচ্ছিল না। ওর মনের ভিতরে কী একটা আলোড়ন চলছে। কিসের আলোড়ন ও বুঝতে পারছে না। পরের দিন ভোরবেলা ও গেল পশ্চিম তোরণের দোতলায়। তখনও দরজা খোলেনি। যে-কাজের লোকটির কাছে চাবি থাকে, তাকে ডেকে নিয়ে এলো। সে দরজা খুলে দিয়ে চলে গেল। ভিতরে কুমোর ঘরের মতো মাটির গন্ধ। ও গিয়ে উত্তরের জানালা খুলে দিল। ভিতরে আলো এলো। ঘুরন চৌকিগুলো এক পাশে দাঁড় করানো রয়েছে। ও এগিয়ে গেল সেই উঁচু তাকের কাছে। যেখানে মিস পট্‌-এর করা দিনেন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি রয়েছে। আরও দু একটি অসমাপ্ত ছোটখাটো ছাত্রদের কাজ রয়েছে। আর রয়েছে ওর গড়া সুধীর খাস্তগীরের আবক্ষ মূর্তি। ও সেই মূর্তি দেখলো। সকলেই প্রশংসা করেছে। মিসেস মিলোয়ার্ডও করেছিলেন, সুন্দর কাজ !

রামকিঙ্কর সুধীরের মূর্তির মাথায় হাত দিল। টেনে নিচের মেঝেয় ফেললো। মাটির শুকনো মূর্তি, মাঝখান থেকে ভেঙে চূর্ণ হলো। ওর মুখে স্বস্তি। মুখ নামিয়ে দেখলো।

"একি করলে কিঙ্কর !" সিঁড়ির দরজার সামনে নন্দলালের অবাক মুখ দেখা গেল। তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন। সীমাহীন বিস্ময় তাঁর মুখে, "ভাঙলে কেন ?"

রামকিঙ্কর হাসলো, "ভাল হয় নাই।"

(ক্রমশ)

দিগন্তের চেহারাচরিত্র

শিবশম্ভু পাল

১ ।। উঠিয়া পর্বতচূড়ে

নীহার কাজে বেরনোর সময় ছোট ফোমলেদারের হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে কলম, পার্স, টিফিনের বাক্স, চশমা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে একটা মাঝারি আকারের নাইলনের থলিও পুরে নেয়, রোজই। রাতের দিকে হ্যান্ডব্যাগ আর থলিটার আধার-আধেয় সম্পর্ক উল্টে যায়, বাড়ি ফেরে থলের মধ্যে হ্যান্ড ব্যাগটাকে ঢুকিয়ে। থলেটা তখন কানায়-কানায় ভর্তি হয়ে যায়। প্রতিদিন সে কত কী যে কেনে। কেনার দরকার থাক, বা, না-থাক, দরকার তৈরি করে নেয়। বয়েস এবং সেইসঙ্গে ব্যর্থতা ও সার্থকতার থ্রি-ইজ-টু-ওয়ান অনুপাতে তৈরি অভিজ্ঞতার ঘষা লেগে-লেগে ক্ষয়ে যাওয়া, টালখাওয়া ব্যক্তিগত কল্পনাশক্তির যতটুকু ওর মগজে পড়ে থাকে তার সবটাই সে কাজে লাগায় একজন শিল্পীর মতো, যদিও সাহিত্য-টাহিত্যের সঙ্গে তার মানসতার দূরত্ব মেরুপ্রমাণ। কিন্তু এই দৈনন্দিন কেনাকাটার ক্ষেত্রে সে সত্যিই একজন উঁচুদরের শিল্পীর মতোই অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে অদ্ভুতভাবে জুড়ে দেয়। অতীতে, সুদূর-অদূর-অনতিদূর অতীতে, কিছু একটা জিনিসের দরকার ছিল, ধরা যাক, অ্যাডেসিভ কিংবা চটজলদি কফির গুঁড়ো, কিন্তু ছিল না, ভবিষ্যতে হয়তো বাজারে নাও মিলতে পারে ভালোজাতের কনডেনসড মিল্ক, চায়ের স্বাদ তো জমবে না তাহলে—এভাবেই কেনাকাটার ইচ্ছেটাকে নীহার অতীতের অভাববোধ এবং ভবিষ্যতের নেতিবাচক সম্ভাবনার থিসিস-অ্যানটিথিসিসের টানামানিতে বর্তমানের বাস্তব, আধাবাস্তব, প্রায়বাস্তব, কাল্পনিক—যে কোনো ধরনেরই হোক না কেন, প্রয়োজনের তাগিদটা দুর্বার করে তোলে এবং নাইলনের থলে ভর্তি হয়েই চলে। যেন এই কেনাকাটা নীহারের ত্রিকালব্যাপ্ত পাওয়া-না-পাওয়ার একটা ছদ্মদার্শনিক সিনথিসিস।

অবশ্য বাঁধামাইনের চাকরিতে এরকম বিপণন-বিলাস সম্ভব নয়। কিন্তু পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েস থেকে নীহার নানান ধরনের টুকটাক কাজকর্ম, 'অড জব্স' যাকে বলে, করে আসছে। টুইশানি তো করতই, তাছাড়া পুজোর সময় জুতোর দোকানে সাময়িক সেলসম্যানগিরি, সাবকন্ট্রাক্টারদের অধীনে রাস্তা তৈরির অস্থায়ী নজরদারি, ডেপুটেশন ভেকান্সিতে স্কুলমাস্টারি—মোট কথা, বসে থাকেনি কোনোদিনই। তারপর সার্ভিস কমিশনের
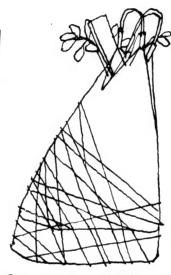
পরীক্ষায় পাস করে সরকারি চাকরি, চাকরি করতে-করতেই ডবলু-বি-সি এস-এ বসে যাওয়া, পদোন্নতি, ফায়ারব্রিগেডের প্রশাসনিক অফিসার, ফিনান্স, ডেপুটি সেক্রেটারির র‍্যাঙ্ক, এবং সাঁইতিরিশ বছরে যথারীতি বিয়ে। বিয়ের বছর দুই পর চাকরির সমান্তরালে বড় সম্বন্ধীর মাছের ব্যবসায়ে ঘুমন্ত অংশীদারি। টাকা থেকে টাকা বাড়ছে, 'একমবহুস্যাম্'-এর একটা ফাজিল ডিসটরটেড দৃষ্টান্ত যেন : ছিলুম একটাকা, হয়ে গেলুম বহুটাকা গোছের ব্যাপার আর কি! হ্যাঁ, জমি কেনাবেচাও নীহারের অর্থোপার্জনের একটা লোভনীয় বা লাভনীয় পন্থা ছিল বইকি। জমি কিনে বছর দুইতিন পর সেটা তিনগুণ চড়া দামে বেচে দেওয়া, ইনকামট্যাক্স বাঁচাবার জন্যে খানকতক এল, আই, সি, জাতীয় সঞ্চয়পত্র কেনা, তাছাড়া ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের চড়াসুদে মেয়াদি আমানত—ফর্দ বাড়িয়ে লাভ নেই। সম্প্রতি মধ্যমগ্রামে পাঁচকাঠা জমি সে বল্লরীর নামে রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে।

কিন্তু তার কেনাকাটার দৈনিক ও সান্ধ্য উন্মাদনার পেছনে কি অপব্যয়ের বাবুয়ানা কাজ করছে? আপাতদৃষ্টে সেরকমই মনে হয়। পয়সা যখন আছে এবং পিঁপড়ে থেকে ইক্ষুরস নিষ্কাশনের প্রবৃত্তি যখন তার নেই, তখন যেভাবেই হোক, ওড়াও। নোট থাকলে ভূতেরও পিতৃশ্রাদ্ধ হয় কিন্তু আসল ঘটনা তা নয়। ব্যয় ওকে করতেই হবে, তারজন্যে বিশেষ এক ধরনের যুক্তিবোধও তার আছে, যে-বোধ প্রায় দার্শনিকতার এক্তিয়ারে পড়ে যায়, আমাদের কাছে তা হাস্যকর মনে হলেও, অবাস্তব মনে হলেও। তবু জিনিস কেনার সময় নীহার যেরকম দরদস্তুর করে তাতে তো তাকে মারাত্মক হিসেবিই মনে হয়। পাঁচটা দোকান ঘুরে ঘুরে, এমন কি ন্যায্যমূল্যের শেষ দুর্গ বলে বহুকথিত সেই 'সমবায়িকা'র দামেও কখনো কখনো আস্থা না রেখে সামান্য চারআনা-আটআনার তারতম্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় সে আবার বাজারের আশেপাশে, বাজারের ভেতর নিজেকে চিরুনির মতো চালিয়ে দেয়, টুথপেস্টের দর নেয়, রিফাইনড বাদামতেল, সেভিং ক্রিম কি বিজ্ঞাপনের জৌলুসধন্য নামীদামি জেলি—তুলনামূলক কম দামে কেনার সাফল্য, সানন্দ সাফল্য, অর্জনের জন্যে পয়সা ও সময় যুগপৎ খরচ করতে তার দ্বিধা হয় না, অবসাদ আসে না।

বস্তুত কেনাকাটার কাজটা নীহারের কাছে তক্তা ধরে পেরেক মারার মতো তাৎক্ষণিক, দ্রুত, দায়সারা কোনো বাধ্যতা নয়। ঘোরাঘুরি, দরকরা, দামের তুলনামূলক বিচার এবং শেষপর্যন্ত ন্যূনতম দামে বাজার সারার মধ্যে একটা যুদ্ধজয়ের তৃপ্তি, ঝাঁজ, হারিয়ে-যাওয়া চাঞ্চল্যের পুনরুদ্ধার চেখেচেখে উপভোগ করে সে। কষ্ট হয়, অবসাদ আসে, কিন্তু সেটা একেবারে শারীরিক ব্যাপার।

সেই কোন ছেলেবেলায় কার একটা পদ্যে সে পড়েছিল : 'উঠিয়া পর্বতচূড়ে/ ধরণীরে হেরি দূরে/ পথের দুঃখক্লেশ ভ্রম মনে হয়—' এ অনেকটা সেইরকম। এত কষ্ট, এত হাঁটাহাঁটির পর, দরাদরি, দোকানদারদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি সব সে ভুলে যায় যখন দ্যাখে ঐ চুপসে যাওয়া, রিক্ত, শূন্য নাইলনের থলে কেমন একটু-একটু করে ভরে উঠছে, শূন্যতার নিরঞ্জন অন্ধকার থেকে থলেটা কেমন প্রযত্নলালিত গাছের মতো, পরিচর্যিত রুগির মতো, ক্রমে ক্রমে সচ্ছল, সচ্ছলতর, ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠছে। সন্ধের পর শ্যামবাজারে নামার সঙ্গে সঙ্গেই তার হাতের ঐ নাইলনের মাঝারি আকারের ভাঁজকরা থলেটা যেন কথা কয়ে ওঠে, যেন গড়ে ওঠে এক অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তা নীহারের সঙ্গে, যে-সম্পর্কের মধ্য থেকে সে নিজেকে যেন দেখতে পায়, নিজের ভূমিকাকে শনাক্ত করে নিতে পারে, যে-ভূমিকার সঙ্গে লগ্ন হয়ে যায় তার সমস্ত কল্পনা এবং যে-কল্পনায় একাকার হয়ে যায় ওর ভূতভবিষ্যতের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানও।

আঁকা—এসব নিয়েই থাকত। রুবি চিরকালই মাথামোটা, প্রাইমারি পর্যন্ত টেনেটুনে পাস করার পর ফাইভ থেকে দুবছরে একবার করে প্রমোশন পেত। বয়েস বাড়ছে, বছর নষ্ট হচ্ছে এবং ক্লাস বাড়ছে না। ক্লাস এইটে তো দুবছর থেকেও ফেল করল, স্কুল থেকে প্রগ্রেস রিপোর্টের সঙ্গে টি· সি গেঁথে দিল। কিন্তু তপু ঠিক বেরিয়ে যেত। রুবির যখন ক্লাস সিকস অথচ বয়েস চোদ্দ, তপু ক্লাস সিক্সে, বার বছর বয়েস, সেকেন্ড হয়ে প্রমোশন পেল। আর রুনি? তার কথা আর কী বলব। মেয়েটা পড়াশুনোই আর করল না। সে-ও বড়দির মতোই, কিন্তু গোঁ আছে ষোলআনা, কিছুতেই এক ক্লাসে দুবছর থাকতে চাইত না।

২ ।। বল্লরী ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

আজ তপু, মানে তর্পণ বেঁচে থাকলে হয় এম· এ পড়ত, নয়তো কোনো কাজেকম্মে লেগে যেত। ও আমারই ধাত পেত, চুপচাপ বসে থাকার ছেলে ও নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে ও কী হোত, না-হোত আগে থেকে কী করে ভেবে বসলুম, কে জানে। বোধ হয় বিশ্বাস। বোধ হয় প্রথম্‌ পুত্র সন্তানের জীবৎকালীন কিছু সুখস্মৃতি, কিছু রমণীয় দুষ্টুমি, কিছু আদরে-ছেয়ে-দেওয়া মুহূর্তের উপভোগ্যতা অকালমৃত্যুর বিচ্ছেদ যন্ত্রণার ভেতর এরকম একটা ইতিবাচক বিশ্বাসের সুযোগ রেখে দেয়। যা হতে পারত তা-ই সে হোত, এবং নিশ্চয়ই সেটা শুভময় গৌরবময় কিছু, যদি সে বেঁচে থাকত। তাছাড়া, সম্ভাবনা যখন মৃত্যুর পুরু ও স্থায়ী অন্ধকারে চাপা পড়ে গেছে, সেটা ভালো না মন্দ কিছুই আর জানার উপায় নেই, তখন ভালোটাই ভেবে নেওয়া ভালো। এটাও একরকম দ্য বেনেফিট অফ দ্য ডাউট বলা যায়। তপুর পড়াশুনোয় বুদ্ধি ছিল, সকালে ঘন্টাদেড়েক আর সন্ধের পর ঘন্টাদুই বই নিয়ে বসত, বাদবাকি সময় তো খেলাধুলো, দিদির পেছনে লাগা, কচি বোনটাকে চটকানো, ছুটোছুটি, হাত-পা ছড়িয়ে রঙের বাক্স-প্যাস্টেল নিয়ে ছবি

কান্নাকাটি খাওয়াদাওয়া বন্ধ, গুম মেরে বসে থাকা, শেষকালে বল্লরীর চাপে হেডমিস্ট্রেসের কাছে ধরাধরি, বিল্ডিংফান্ডে মোটা টাকার চাঁদা দিয়ে জোর করে ওকে উঠিয়ে দিতুম। এভাবে বছর দুই চলার পর—

যাক গে। তপুকে, শুধু তপু কেন, রুবি-রুনি কাউকেই আমি পড়াতুম না, সময় পেতুম কোথায়। অফিস সেরে ক্লাবে আড্ডা, নাটকের রিহার্সাল, বড়সম্বন্ধীর সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে, টাকাপয়সা নিয়ে কথাবার্তা—এসবেই মেতেছিলুম। তাছাড়া সত্যি বলতে কী, গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলুম ঠিকই, ডবলু বি সি এস পাসও করেছি, নইলে আর করে খাচ্ছি কী করে, কিন্তু সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরে মাস্টারি করব ভাবলেই গায়ে জ্বর আসত। কেমন একটা যুক্তি—দুরাত্মার তো ছলের অভাব হয় না—খাড়া করতুম: ছেলেমেয়েদের কানের কাছে পড়্না-পড়্না করলে কখনই পড়া হয় না, পড়ার ভাণই শুধু হয়। ওটা নিজেদের চাড়েই হয়। আমি বরং ভালো একসপিরিয়েন্সড একজন, দরকার হলে দুজন, টিউটরের ব্যবস্থা করছি। টাকা যা লাগে দেব। (আচ্ছা, 'দুরাত্মা' বিশেষণটা কেমন নিজের গায়ে চাপিয়ে নিয়েছি এটা কেন হল? শখের আত্মসমালোচনা? নাকি, সত্যি কথাটাই একটু ঠাট্টাচ্ছলে বলে নিলুম এখানে? আবার, কথাটা বলে হয়তো একটু আদরও করে থাকতে পারি নিজেকে, মা যেমন নিজের ছেলেকে বাঁদর বলে সোহাগ করে। কিন্তু কথাটা অন্য কেউ বললে সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে উঠব নিশ্চয়ই।)

বল্লরী বলত—থাক, ফাঁকি দেবার ইচ্ছে থাকলে—আমার যদি উপায় থাকত আমিই দেখতুম। ছেলেটার জন্যে তো ভাবছি না, কিন্তু মেয়ে দুটোর তুমি বারোটা বাজিয়ে দিলে—

তপু ফোড়ন দিত: ঠিক আছে দিদি, আমিই তোকে পড়াব। তুই আমাকে স্যার বলবি তো? রোজ একটা করে চকলেট দিবি, তাহলেই হবে—

বল্লরী ধমকে দিত: ছি, ওরকম বলে না, দিদি হয় না?

তপু চুপ করে যেত। বল্লরী সেই একই কথা ঘ্যানঘ্যান করত: মাস্টার রাখবে রাখো, কিন্তু নিজে একটু দেখাশোনা না করলে—

আমি বিরক্ত হয়ে ওকে চুপ করতে বলতুম। বিরক্তিটা ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংকোচনের জন্যে ততটা নয়, যতটা, আমি ঠিক বোঝাতে পারব না হয় তো, মানে মানুষ হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে ওর মারাত্মক কিছু বিচ্যুতির জন্যে। লেখাপড়া ও জানে না, ঠিক আছে, সেতো আজ নতুন করে জানছি না, কিন্তু এই নিরক্ষরতাকে যতদিন যাচ্ছে কেমন অদ্ভুতভাবে ও বাহাদুরির পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। সংসারের কাজকর্ম সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সমানে করে যাচ্ছে, কিন্তু কাজের মধ্যে কোনো গোছ নেই; কেমন এক ধরনের উদাসীনতা, এলোমেলো ভাব সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেখানে-সেখানে, খাটের ছত্রিতে শাড়ি জড়ো করা, চায়ের কাপডিশ এঁটো হয়ে টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে তো রয়েইছে, জুতোগুলো এখানে কিছু, ওখানে কিছু, প্রায় দিনই দুপুরে ঘরে তালা দিয়ে সিনেমা যাচ্ছে, কি, বাপের বাড়ি, পাড়ার চ্যাংড়া ছেলেদের সঙ্গে হ্যাহ্যাহিহি—কিছু বললেই ও রেগে যা খুশি বলত। এইসব নানান ঝামেলার দীর্ঘ, দীর্ঘকালীন একঘেয়েমি আমার বিরক্তির একটা পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করে দিয়েছিল। বনেদি পয়সাওলা ঘরের মেয়ে, স্ত্রীশিক্ষার চাষবাস নেই। বিয়েতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বাবা-মায়ের, পেড়াপিড়িতে একদিন সবান্ধবে মেয়েটাকে দেখতে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে গেল। রূপ। ওর রূপের জোরেই শেষ অব্দি গুরুজনদের সুপুত্র হতে বাধ্য হয়েছিলুম।

যাক, তারপর একদিন স্মরজিৎকে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর জন্যে ঠিক করলুম। স্মরজিৎ আমার ভ্রাতৃপ্রতিম, আবার বন্ধুও বটে। পাড়াপ্রতিবেশী, লেখাপড়ার লাইনের লোক। সময় নেই, সময় নেই করে এড়াতে চেয়েছিল, শেষপর্যন্ত বল্লরীই তাকে রাজি করাল। কী করে করাল, অনুমান করতে পারি; এবং সে অনুমান বাস্তবের চেয়েও বাস্তব। ও প্রায়ই আমার বাড়ি গল্পগুজব করতে আসত, সন্ধ্যের সময়, বা, এমনকি—স্কুল ছুটি থাকলে—দুপুরেও। কখনো সখনো আমার সঙ্গেও দেখা হয়ে যেত, যেদিন দৈবাৎ একটু সকাল-সকাল ফিরতুম। কতবার আমাকেই ও বলেছে, 'নীহারদা, বলুবৌদির জবাব নেই। চা-টা যা করে না—ফাস্ ক্লাস। আসলে কী জানেন, জিনিয়াস। স্পর্শমণি। বলুবৌদি হচ্ছেন তাই। যা-ই ছোঁবেন, সোনা।' হ্যাঁ, নির্দোষ দেবরশোভন কথাই বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঘাসে মুখ দিয়ে তো চলি না। 'আচ্ছা নীহারদা, বৌদি এরকম ছোট্ট মুর্গির ডিমের মতো থুতনি আর গলার নিচের দুখানা প্যারালাল সরু সরু লাইন কোত্থেকে পেলেন বলুন তো?'—এ ধরনের স্তবস্তুতির ভেতরকার মানে বুঝতে আমার স্প্লিট সেকেন্ডও দেরি হয় না। সুতরাং স্মরজিৎ রাজি তো হবেই। এরকম রমণীরঞ্জন বাক্য হুটহাট বেশ সপ্রতিভ ঢঙে বলে সে সরলতা দেখাত বটে, কিন্তু সরলতাও একরকম শিল্প, মারাত্মক শিল্পই বলা যায়, অবশ্য সময় সুযোগমতো সেটা প্রয়োগ করলে। বল্লরী, যে সুন্দরী তা আমাকেও মানতে হবে এত কথার পরেও।

হাফইয়ার্লিতে দুই বোনই কিছুটা উন্নতি করল। রুবি পাঁচ নম্বরের জন্যে অঙ্কে ফেল করল, রুনি এই প্রথম অঙ্কে পঁয়ত্রিশ পেল, ইতিহাস ভূগোলে অবশ্য কুড়ি-বাইশের বেশি উঠল না। আগে তো প্রগ্রেস রিপোর্ট লাল দাগে লাল দাগে যেন দোল খেলত। ইংরিজিতে বললে বিশ্বাস করবেন না, দুজনেই চল্লিশের ঘরে। স্মরজিতের প্রশংসা করতেই হয়। তপু যথারীতি শতকরা পঞ্চান্ন পেয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখল। আর একটু মন দিয়ে পড়লে ফার্স্ট ডিভিশন মার্কস পেত, কিন্তু আর একটু মন দিলে সে আর তপু থাকত না। ওকে যেভাবে দেখে আসছি সেভাবেই দেখতে চাই। বাড়ি থেকে গলি, গলি থেকে বাড়ি ছুটোছুটি করছে, মুখে অনবরত হিন্দি-বাংলা গান, ঘামে জবজব করছে সারা গা, হাতে ক্রিকেটের ব্যাট, অজয় বসুর বাংলা রিলের নকল করছে, যখন তখন হাত পা ছড়িয়ে ছবি আঁকতে বসে গেছে, নালিশ করছে রুবির নামে, জ্বালাতন করছে বল্লরীকে—এসবের বদলে হঠাৎ যদি দেখি মুখ গম্ভীর করে টেবোটেবো গাল নিয়ে সবসময় বইয়ে-মুখে বসে আছে, ভালো লাগবে কি?

কিন্তু অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর বড়দিনের ঠিক আগে রাস্তায় খেলতে গিয়ে গাড়িচাপা পড়ে তপু শেষ হয়ে গেল।

৩ ॥ ওয়াকম্যান

ছুটির দিনে নীহার বাড়ি থেকে পারতপক্ষে কোথাও বেরয় না। সেদিন সে খাটের ওপর শুয়ে-বসে খবরের কাগজ, অফিসের ফাইল ঘাঁটে, কি হাল্কা কোনো গল্পের বইটই পড়ে, কথাবার্তা কম বলে। আবার ঘুমিয়েও পড়ে। এরই মধ্যে টিভিটা চালিয়ে দেয়, ছাইভস্ম যা হয় হোক, নীহার কিছুক্ষণ ঐ গর্দভ-বাক্সের দিকে তাকাল কি তাকাল না,নিজের মধ্যে গুটিয়ে যায়। অথচ ঘর হয়তো ভরে গেছে আত্মীয়স্বজনে, সবাই হয়তো গোগ্রাসে গিলছে রবিবারের প্রভাতী কি মাধ্যাহ্নিক সোপঅপেরা কিংবা ক্রিকেটের ভারতীয় আক্রমণ অথবা প্রতিরোধ। বাচ্চাদের চ্যাঁভ্যাঁ, রান্নাঘর থেকে মাংসকষার গন্ধ, বল্লরী আর তার বোনেদের পারিবারিক কথাবার্তার সহাস্য টুকরো। নীহার এরই মধ্যে, এই জটলা, চিৎকার, গুলজার নরকের মধ্যে গড়ে নেয় ওয়াকম্যানের মতো অন্য নিরপেক্ষ একটা একাকিত্ব, একাকিত্বের শান্তি, স্মৃতি যন্ত্রণা। কিংবা, কোনোটাই আলাদা একক, স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। হয়তো কোনো হার্মোনাইজড বৃন্দগানের মতো, যার ভেতর থেকে কখনো বেরিয়ে আসে শান্তি, কখনো স্মৃতি, কখনো যন্ত্রণা। বেলা গড়িয়ে যায়, ডাইনিং টেবিলে ছ-জন করে বসে যায়, নীহার তখনও ঝিমোচ্ছে। বল্লরী স্বামীর এই থম মেরে থাকা জড়ভরতীয় ভঙ্গি দেখে আগে-আগে বিরক্তি প্রকাশ করত, আজকাল আর ঘাঁটায় না। 'যা করছে করুক, আমার কি। খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। দুটো বাজতে চলল, এখনও চানের সময় হল না বাবুর। মরুক গে—' বড়মেয়ে রুবিকে শোনায় বল্লরী।

দুটো বেজে যাবার পর নীহার বাথরুমে ঢোকে। যেভাবে ঢোকে, যে-বিলম্বিত তেতালায় খাওয়াদাওয়া সারে তাতে দুটো কি তিনটে বেজে যাওয়া শুধু একটা ঘড়ির বাস্তবতা, রোদ্দুর বেড়ে-যাওয়া আর পড়ে-যাওয়ার বাস্তবতা, আর কিছু না। চান তো করতেই হবে, পেটে তো কিছু দিতেই হবে। যেন ইলেকট্রিক বিলের শেষতারিখ, এরপর টাকা দিলে রিবেট মিলবে না। আর টাকা যখন দিতেই হবে তখন শেষদিকেই হোক আর প্রথমদিকেই হোক, ল্যাঠা চুকিয়ে দেওয়াই ভালো। যেন নীহার সেরকম একটা ল্যাঠা চুকোতেই বাথরুমে ঢোকে। তার কাছে দশটা বাজলেও যা, দুটো বাজলেও তা-ই। খাওয়া দাওয়ার পর আবার বিছানা, খবরের কাগজ। আসলে ছুটির দিনে সে নিজেও নিজের কাছ

থেকে ছুটি নিতে চায়। যেন অন্য দিনগুলোর অন্তহীন কেজো-অকেজো যাবতীয় বাচালতার প্রায়শ্চিত্ত করছে এইসব রবিবারে বা ছুটির দিনে। নাকি, যে-ঘরটায় সে শোয়, বসে, কথা বলে, ঘুমোয় সেই ঘরের সঙ্গে সেই বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্কের ফাটলের মধ্যে নীহারের এই নিস্পৃহতার শেকড় ঢুকে গেছে। চারদেয়ালের ঘনিষ্ঠ বেষ্টনের ভেতর নিজের মুঠোর সহজতায় যে-দিগন্তকে সে ধরে রাখতে চেয়েছিল সেটা ঘরের ভেতর থেকে হাতের তেলো থেকে স্খলিত হয়ে স্বস্থানে, দূরে, আকাশরেখার নিচে প্রস্থান করেছে। নীহার অবশ্য দিগন্তটিগন্ত বোঝে না, কিন্তু বল্লরীকে বোঝে, স্মরজিৎকে বোঝে, তপু-রুবিকে বোঝে, শুক্লাকে বোঝে এবং ইদানীং রুনিকেও সে বুঝে চলেছে। কেন যে এত বোঝে শুধু সেটাই সে বোঝে না।

৪॥ সব আলো জ্বেলে দিই

দেখতে-দেখতে তিনবছর হয়ে গেল, রুবির বিয়েটা আজও মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারিনি। বাড়ি থেকে পালিয়ে পাড়ার একটি ছোকরাকে বিয়ে করল কালীঘাটে গিয়ে। সেখান থেকে ওরা চলে গিয়েছিল বর্ধমানে-শক্তিগড় না কোথায় যেন। অথচ আমি ওর বিয়ে দিতে চেয়েছিলুম বেশ ঘটা করেই। লেখাপড়া ওর হোত না। সতের বছর বয়সেই ওর গড়নটা ছিল ওর মায়েরই মতো ফাঁপালো। দু'একজনকে লাগিয়ে দিয়েছিলুম ভালো একটি পাত্রের জন্যে। বড় ছেলেটা তো বুকের পাঁজর খসিয়ে দিয়ে চলে গেল। শুনেছিলুম, সুশান্ত পাত্র হিসেবে ভালোই, বি-কম পাস, ব্যাঙ্কে চাকরি করে। আমি নাকি হাজার চেষ্টা করেও রুবির মতো অশিক্ষিত পাঁচপাঁচি মেয়ের জন্যে এমন পাত্র পেতুম না—এমন কথা অনেকেই বলেছিল আমায়। হতে পারে ; কিন্তু কী দরকার ছিল রুবি আর সুশান্তর চোরের মতো ব্যবহার করার। কী দরকার ছিল জলের তলার হাঙরের মতো আমার হাঁটু থেকে পা, পায়ের থেকেও অনেক জরুরি, বিশ্বাস খুবলে নেবার ? বল্লরী অবশ্য মেনে নিয়েছে, বিশেষত্ব জাম্বোটা হবার পর। ঐ নাতির মুখ চেয়েই—

অতঃপর শুক্লা। এত বাজে, কুরুচিকর এই প্রসঙ্গ যে, বেশ কিছুটা বাদসাধ দিয়েই বলতে হবে আমাকে, এবং বলতেই হবে, ফলে কোনো কোনো জায়গা মনে হতে পারে চট করে ঘটে গেল। ফাঁকফোকরগুলো আপনারা যা হোক কিছু কল্পনা দিয়ে ভর্তি করে নেবেন, প্লিজ।

বল্লরীই ব্যাপারটাকে কিলিয়ে পাকিয়ে দিয়েছিল।

আমার ভায়রাভাই ভবতোষ, আমারই বয়সী, দীর্ঘকাল ধরে এটা-সেটা নানান দুর্বোধ্য আধিব্যাধিতে ভুগে বছর দুই আগে সংসারটা ভাসিয়ে চোখ বুজল। একমাত্র রোজগারি, পোষ্যের সংখ্যা পাঁচ-ছ'জন। বড় ছেলে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে কমার্স পড়ছে, শুক্লা ক্লাস টেন-এ, আরও দুটো মেয়ে ছোট ক্লাসে। বল্লরী আমাকে ওদের মাসে মাসে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করতে বলল, শুক্লাদের পড়াশুনো যাতে চলে, বিশেষত পল্লবটার কোনো কাজটাজ—অর্থাৎ ওদের পরিবারের অভিভাবক করে দিল আমাকে। আমি প্রথমে পল্লবকে একটা পার্টটাইম কাজের ব্যবস্থা করে দিলুম। সকালে ভোর পাঁচটা থেকে সাড়ে আট'টা পর্যন্ত শিয়ালদার পাইকারি মাছের বাজারে বড় সম্বন্ধীর আড়তে খাতাপত্র লেখালেখি আর দেখাশুনোর চাকরি। সেজদিরা সকলেই খুব খুশি। 'মেসোমশাই, এবার কিন্তু দাদাকে বাবার অফিসে একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বাবা তো রিটায়ার করার আগেই—' সঙ্গত কারণেই পিতৃশোকে শুক্লার গলা বুজে গিয়েছিল।

—হ্যাঁ, সেতো কিছু একটা করতেই হবে। পল্লব, তুই একবার বাবার অফিসে লেবার অফিসারের কাছে একটা দরখাস্ত লিখে নিয়ে দেখা কর। উইডো-পেনশন, গ্র্যাচুইটি কবে নাগাদ কতটা পাওয়া যাবে সেটার জন্যে বিস্তর ছুটোছুটি করতে হবে। লেখালেখির কাজ আমিই করে দেব। কিন্তু শুক্লা, তোর পড়াশুনোর খবর কী ?

—ভালো হচ্ছে না। সাইন্স গ্রুপটায়—দূর, পড়া-টড়া আমার কপালে নেই। দু'একটা ছোটখাটো বাচ্চাদের ট্যুইশানি যদি পাই—শুক্লার মুখে আর কথায় যেন দ্বিতীয় সেজদিকেই দেখতে পেলুম।

নিজের দোষেই হোক, কি মেধার অভাবেই হোক, রুবিটার পড়াশুনো তো হলই না। ছোট মেয়েকে গোবরডাঙায় একটা আবাসিক স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। সেখানেও যে বিশেষ সুবিধে হবে ভরসা হয় না। কিন্তু শুক্লা কোনো বছর নষ্ট করেনি। সব বিষয়ে বিনা প্রাইভেট টিউটরে ঠিক রগ ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। মাধ্যমিকের বেড়া ডিঙোনো ওর পক্ষে এমন কিছু শক্ত নয়। মাত্র একটা গ্রুপ, সাইন্স গ্রুপে অন্তত একশ দুই, মানে ৩৪%-এর জন্যে ও আটকে যাবে ভাবতেই পারি না। বল্লরীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললুম। ও-ই তো আমার ডি ফ্যাক্টো গার্জিয়ান।

ও বলল, কেন ? শুক্লা তো আজকাল সন্ধের দিকে একটা ট্যুইশানি করছে, তুমি জানো না ?

—কই, না তো! হয়তো সামান্য বিশ তিরিশ টাকা, সে জন্যেই—

—তা হোক, তবু জানানো উচিত ছিল। আসলে মেয়েটা খুব ধড়িবাজ, ম্যানেজ করার ক্ষমতা ওর খুব। নইলে দেখছ না, বছরের পর বছর কীরকম পাশ করে যাচ্ছে। এমন কিছু বুদ্ধি নেই ওর—

—বলছ, প্রমোশনটাও ও ম্যানেজ করে নিয়েছে ?

—তোমাকেও না ও ম্যানেজ করে নেয়। শাঁসালো মেসো, একটু বামাক্ষ্যাপাও আছে—বল্লরী ঠোঁট টিপে ওর স্বীয় চটক ছড়িয়ে হাসছিল।

—ধুর, কী যে বলো না—আমি স্বভাবতই বল্লরীর দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যাই : তারপর তোমার কলিযুগের লক্ষ্মণের খবর কী ? স্মরজিৎ ঠিকমতো প্রস্তুতি করছে তো ? শালা, প্রস্তুতির ঘেন্না ধরে গেল !

—গোয়েন্দা লাগালেই পারো। —বল্লরী কতটা ঠাট্টা করল, কতটা ওর শৌখিন দেহের দিকে খামখেয়ালি নৈশভোজে আমায় ডাক দিল, ঠিক বলতে পারব না।

বালিশে মাথাটা যুত করে ঠেকিয়ে নড়ে-চড়ে বল্লরী বলল—শোনো, কোনো মাস্টার-টাস্টার রাখতে যেয়ো না। একটা কোচিঙে ঢুকিয়ে দিয়ো। মাইনে সব দিতে হবে না, টাকা কুড়ি দিলেই হবে। —সেদিন বল্লরী বেশ ভালো মেজাজেই ছিল।

পরদিন রাত ন'টা নাগাদ সেজদির বাড়ি গেলুম। শুক্লাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বল্লরীর কথাগুলো ছবি হয়ে গেল আমার সামনে। ট্যুইশানির কথা সে-ও কিছু বলল না, আমিও না। শুধু 'ধড়িবাজ' 'ম্যানেজ' শব্দগুলোর কুয়াশা থেকে ওকে যে-ভাবে, যে-ভঙ্গিতে স্পষ্ট হতে দেখছিলুম তাতে ওকে আমার কন্যাপ্রতিম বলে ঠিক মনে হল না। 'শুক্লা, ধান্দা তোর যদি থাকে, আমিও কিছু কম যাই না। তুই, শেষে তুইও আমায় এক্সপ্লয়েট করবি!' মনে মনে বলছিলুম। কিন্তু সংস্কারে প্রচণ্ড চোট খেলুম। একদিকে শুক্লা, সদ্য বিধবা শ্যালিকার মেয়ে, অন্যদিকে আমার বিবাহ পূর্ব ব্যর্থ প্রণয়ের স্মৃতি, বিবাহিত জীবনের পানসে দিন রাত্রি, অবৈধ সম্পর্কের জোরালো নাটক, ফ্রয়েডের প্যাঁচালো অন্ধকার—

বললুম, স্কুলে রোজ যাচ্ছিস তো ?

—কই আর। সংসারের ধাক্কা সামলাতে···মারও শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। দাদা সকালে বেরিয়ে যায়। বুড়ি-টুনির সকালে ইস্কুল। একহাতে রান্না-টান্না করে, নাঃ, স্কুল ছেড়েই দেব।

—এতদূর এসে ঠেকে যাবি ? সেটা ভালো কথা নয়। পরীক্ষাটা দিয়ে দে।

—বলতে-বলতে আমার মাথার মধ্যে মেসোমশাই আর জৈব পুরুষসত্তার পারস্পরিক কাটাকুটির খেলা শুরু হয়ে গেল।

—কী হল, হঠাৎ চুপ করে গেলেন ?

—না, ও কিছু না। —সামান্য কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললুম—শোন, তুই কাল সন্ধের সময় শ্যামবাজারের মোড়ে বুকস্টলটার সামনে দাঁড়াবি। এক জায়গায় নিয়ে যাব।

—কোথায় ?

—দেখতেই পাবি।

—ত নাটক করছেন কেন বাবা, বলেই ফেলুন না।

—প্রসঙ্গ থেকে বুঝে নে, দেখি কেমন তোর বুদ্ধি। এই নে, ধর—ব্যাগ থেকে একটা কলম বের করে শুক্লার হাতে দিলুম। এই ধরনের জিনিস কোনো-কোনো পার্টি আমায় মাঝে মধ্যে উপহার দেয়। বললুম, পছন্দ হয়েছে ?

—দেখতে বেশ সুন্দর। ডিপ কালোর গায়ে সরু সরু লালের দাগ, ক্লিপটা খুব স্মার্ট, আপনার মতো—

—খুব চ্যাংড়া হয়ে গেছিস, না ? তাহলে ঐ কথাই রইল।

—কোন কথা ?

—ঐ যে বললুম, গেস ফ্রম দ্য কনটেকসট—

—অ। মনে হচ্ছে পড়াশুনো সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার। ঠিক ?

—একেবারে সেন্ট পারসেন্ট ঠিক। —ওর ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিই : দেখা যাক, কতটা কী করা যায়। পল্লব কলেজ থেকে এখনও ফেরেনি ? ন'টাতো অনেকক্ষণ বেজে গেছে।

পরের দিন সন্ধের পর শুক্লাকে ভূপেন বসু অ্যাভিন্যুয়ে একটা টিউটোরিয়াল হোমে ভর্তি করে দিলুম।

বল্লরীকে বললুম। ও চুপচাপ শুনে গেল। শুধু বলল, ভালোই করেছ। কিন্তু আর বেশি প্রশ্রয় দিয়ো না, পেয়ে বসবে। পুলুর চাকরি হয়ে গেলে আর টাকাও দিতে হবে না। রোজ রোজ ওখানে যাবারই বা কী দরকার। নিজের মেয়েদের পড়াশুনোর ব্যবস্থা করতে পারলে না—

—এ কী বলছ! তোমারই দিদির জন্যে, বোনঝির জন্যে···তুমিই তো বলেছিলে—

বলেছিলুম বিপদ-আপদের দিনে আত্মীয় হিসেবে একটু পাশে দাঁড়াতে। শুক্লাকে নিয়ে মোগলাই পরটা মাংস খেতে বলিনি। —বল্লরী হঠাৎ কথাটাকে কুড়ুলের মতো উঁচিয়ে সজোরে ঘা মারল আমাকে।

—কে বলল তোমায় ?

—তুমি অন্তত না। এর থেকেই যা বোঝবার বুঝেছি—ওর চোখ আর দাঁত থেকে ড্রাকুলার মতো যেন রক্ত গড়াচ্ছিল।

—এ আবার বলার মতো কথা নাকি, অ্যাঁ ? শুক্লা আমার মেয়ের মতো···কোচিং থেকে বেরিয়ে বলল, মেসোমশাই, খিদে পেয়েছে, খাওয়ালুম। ছি ছি, তুমি এতটা—

—আর তুমি কতটা ? শুক্লাকে কাল পেন দিয়েছ একটা, বলেছ তুমি ? এত লুকোনো কীসের ? আজ বিকেলে পুলু এসেছিল, তাই জানতে পারলুম।

—তাতে কী ?

—কিছু না। আমি তোমাকে চিনি, আজ আর একবার চিনলুম। সুব্রতার কথা আমি ভুলে যাইনি। অথচ ঘরে বৌ পোষার সাধ আছে ষোলআনা—

—বলু, দাস ফার অ্যান্ড নো ফারদার। —আমার গলার মধ্যে কী ছিল, কান্না না গর্জন, নাকি দুটোই, বলতে পারব না : আমি স্মরজিৎ নই। তোমার মুখে এ কথা মানায় না।

—না, তুমি স্মরজিৎ নও, এমন কী তার নখের যোগ্যও নও। লম্পট, চরিত্রহীন—কথা শেষ করার আগেই সরু তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে খাটের ওপর গালে হাত দিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে ভেঙে গেল বল্লরী।

চড়টা খুব জোরেই মেরেছিলুম।

শুক্লাদের বাড়ি এক হপ্তা গেলুম না। কিন্তু ঐ সাতদিনেই একটা বিদ্রোহ, বল্লরীর বিরুদ্ধে, রুবির বিরুদ্ধে, আমার নিজেরও বিরুদ্ধে একটু-একটু করে মোমেন্টাম সংগ্রহ করে আটদিনের দিন ফেটে পড়ল। শুক্লাকে সেদিন টিউটোরিয়াল হোমের দরজার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে সোজা একটা সিনেমা হলে ঢুকে পড়লুম। এই শুরু। পাহাড়ের গা বেয়ে শয়তানের গড়িয়ে দেওয়া রাক্ষুসে বোল্ডারের মতো বিক্ষুব্ধ একটা আক্রোশ প্রবল থেকে প্রবলতর, থেকে প্রবলতম গতিতে পাতালের দিকে সাঁ সাঁ ছুটে চলল এক মাস, দু'মাস, তিন'মাস, কে শুক্লা, কোথায় ওর অবস্থান কিচ্ছু দেখিনি, দেখতে চাইনি, আর তারপর চুরমার হয়ে গেল সব। প্রায় বছর খানেক পর শুক্লা একদিন আমার মুখের ওপর বলে দিয়েছিল, 'মেসোমশাই আপনি আর আমাদের বাড়ি আসবেন না। আমি বিয়ে করছি। রমেনদা আপনার সঙ্গে আমাদের মেলামেশা পছন্দ করে না।'

রুনি গোবরডাঙা থেকে ফিরে এসেছে। জোর করে জনৈক প্রভাবশালী বন্ধুর সুপারিশে ওকে ওখানে নাইনে ভর্তি করে দিয়েছিলুম। সব বিষয়েই ফেল। বলল, আমি আর পড়ব না। ছবি আঁকা শিখব। ছন্দাদির স্কুলে ভর্তি করে দাও।

—বেশ, শেখো। কিন্তু আজকালকার বাজারে একটাও পাস না করে···বিয়ে দেব কী করে ?

—বিয়ে করব না। তোমাদের দেখে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

—পাকামি করিস না তো, পরে আপসোসের আর জায়গা পাবি না। কেন, একটু তো উন্নতি হচ্ছিল, স্মরজিৎ যখন তোকে দেখত।

—স্মরজিৎ কাকুর কথা ছেড়ে দাও। দিদির বিয়ের পর তো পড়ানো ছেড়েই দিলেন। আর তুমি আমাকে বাড়ি থেকে একরকম তাড়িয়ে ধাবধাড়া গোবিন্দপুরে পাঠিয়ে দিলে। —রুনি ঘর ছেড়ে ভেতরে চলে গিয়েছিল। ওর রুক্ষ উদ্ধত ভঙ্গি আমার ভালো লাগেনি।

রাগ চেপে আবার আমি ওকে ডাকলুম। বললুম, তোর মাসতুতো বোন মঞ্জুকে দেখেছিস ? কী ছিল ? গবেটস্য গবেট। কিন্তু দ্যাখ, পরে কেমন ইমপ্রুভ করেছে। আজ সে স্কুল ফাইন্যাল দিচ্ছে। বলছে, ফার্স্ট ডিভ তো পাবই, স্টার হবে কি না ডাউট আছে।

—তুলনা দিয়ে কথা বলবে না। মঞ্জু মঞ্জু, আমি আমি। আমি খারাপ মেয়ে আমি জানি, নতুন করে বলতে এসো না। বিশ্রী লাগে—রুনি সেই একইরকম কাঠ-কাঠ গলায় ঝেঁজে উঠল।

—লোকে তো দেখেও শেখে। চেষ্টা করলে—

—হবে না। আমি কাকে দেখব ? তোমায় আর মাকে ? —বলে ঠোঁট বাঁকিয়ে থুতুর মতো নাক দিয়ে একটা ছোট হাসি ছুঁড়ে দিল রুনি : মা দুপুরে সিনেমা যাবে, বিকেলে মামার বাড়ি, স্মরজিৎ কাকুর সঙ্গে নিউমার্কেট আর তুমি রাত দশটায় বাড়ি ফিরবে—

—রুনি, এত রাফ টোনে কথা বলচিস কেন ? কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলচিস ?

—কথা বোল না, জানো তো আমি ভালো মেয়ে নই।

—সেটা কোনো বাহাদুরি নয়, ভালো হতে হবে।

রুনি আবার উঠে যাচ্ছিল। আমি ওর ঘাড় ধরে টেনে খাটের ওপর জোর করে বসালুম ওকে : ভেবেচিস কী ? এত বাড় কীসের তোর ? —রাস্তা থেকেও আমার গলা শোনা যাচ্ছিল।

—কী করবে ? মারবে ? মারো, মেরে শেষ করে দাও আমায়, এই নাও—গলার শিরা ফুলিয়ে চীৎকার করতে করতে রুনি আলনার তলা থেকে একপাটি চটি বের করে আমার হাতে তুলে দিল।

—অ্যান্ড য়ু ডিজার্ভ ইট—বলে আমি ঝাঁপিয়ে যাচ্ছিলাম, বল্লরী এসে 'খুব নাটক হয়েছে, আর কেলেঙ্কারি করতে হবে না বলে রুনিকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। লো অলটিচ্যুডে গর্জমান প্লেন দূরে মিলিয়ে গেলে যে স্তব্ধতা ঘনায় সেটাই নেমে এল ঘরের মধ্যে।

অনেকদিন, বোধ হয় একযুগ পর, বুকশেলফের লকারের ভেতর থেকে তপুর ফটোটা বের করে বুকে চেপে শব্দ করে কেঁদে ফেললুম।

রাত্রে সেদিন বাড়িতে কেউ ছিল না। বাড়ি অন্ধকার। বাইরের ঘরে টেবল-ল্যাম্পের ছোট একটা আলোর বৃত্তের মধ্যে মাথা নিচু করে চুপচাপ অফিসের কাগজপত্র দেখছিলুম। একসময় বাথরুমে যাবার জন্যে উঠলুম। ডাইনিং স্পেস, টেবল, কিচেন, বেডরুম, প্যানট্রি সব অন্ধকার, নিস্তব্ধ, কেমন ছমছম করছে চতুর্দিক। সব আলো জ্বেলে দিলুম। আর চারদিক কেমন শ্বেতী রুগির গায়ের মতো অসহ্য ক্যাটকেটে সাদা আলোয় ভরে গেল। আর যেদিকে যতবার চোখ ফেরাই ততবারই জ্বলন্ত উনুনে জলের ঝাপটার মতো একটা ভেজা শব্দ বুকের ভেতর সজোরে ঝপ করে উঠে মিলিয়ে যায়। সেই শব্দের সঙ্গে ম্যাজিকের মতো অদৃশ্য হয়ে যায় একটার পর একটা জিনিস। মিটসেফ ফাঁকা, কিচেন ফাঁকা, কৌটোয় বিস্কুট নেই, ফাঁকা, চায়ের টিন খোলা পড়ে রয়েছে, ফাঁকা, থালা, বাসন, কাপ-ডিশ, হ্যাঙারে শার্ট, আলনায় শাড়ি কোথাও কিছু নেই···কয়েক মুহূর্তের এই দৃশ্যটাই যেন অনন্ত হয়ে রইল।

৫॥ অ্যাকশন রিপ্লে

প্রথম অধ্যায় থেকে কয়েকটা লাইন এখানে আবার তুলে দিচ্ছি : "···কেনাকাটার ইচ্ছেটাকে নীহার অতীতের অভাববোধ এবং ভবিষ্যতের নেতিবাচক সম্ভাবনার থিসিস-অ্যানটিথিসিসের টানামানিতে বর্তমানের বাস্তব, প্রায়-বাস্তব, কাল্পনিক—যে কোনো ধরনেরই হোক না কেন, প্রয়োজনবোধটা দুর্বার করে তোলে এবং নাইলনের থলে ভর্তি হয়েই চলে। ···দ্যাখে ঐ চুপসে যাওয়া, রিক্ত, শূন্য নাইলনের থলে কেমন একটু-একটু করে ভরে উঠছে ; শূন্যতার নিরঞ্জন অন্ধকার থেকে থলেটা কেমন লালিত গাছের মতো, পরিচর্যিত রুগির মতো···সচ্ছল, সচ্ছলতর, ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠছে।···"

ঐ দেখুন, আজও সেই দৃশ্য। টানা অন্তত এক ঘন্টা নীহার দোকানে দোকানে, ফুটপাত বদল করতে-করতে ঢুকবে, ঘোরাঘুরি করবে, একটার পর একটা জিনিস কিনে আবার থলেটাকে ভর্তি করতে থাকবে, কারণ এ ছাড়া আর কিছুই ভর্তি করার সাধ্য তার নেই।

অঙ্কন : সুব্রত চৌধুরী

'দেবী চৌধুরানী'

অগ্রন্থিত পাঠ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কালজয়ী সৃষ্টি 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসের বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক অংশ, কয়েকটি নাটকীয় অধ্যায়, স্রষ্টার লেখনী থেকে একদা নির্গত হলেও আজও তা রচনার শতাধিক বৎসর পরেও অ-গ্রন্থিত এবং দুষ্প্রাপ্যতার কারণে এখনো তা লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গেছে। এই উপন্যাসের এমন কিছু দুর্লভ অংশবিশেষ—সেই সূত্রে নূতনতর কাহিনী উদ্ধার করতে পেরেছি, যে-পাঠ দেবী চৌধুরানী উপন্যাসের কোনো সংস্করণে, বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো গ্রন্থাবলীতে, কোনো রচনাবলীতে বা সংকলনগ্রন্থে আজ পর্যন্ত মুদ্রিত হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের যে দুষ্প্রাপ্য পাঠ আমরা এখানে উদ্ধার করবো—তাতে ভিন্নতর প্রফুল্ল, আর এক ব্রজেশ্বর, অন্য এক ভবানী পাঠককে পাবো। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রাবলী—প্রফুল্ল ব্রজেশ্বর নয়নতারা ভবানী পাঠক সৃজনের প্রথম পর্যায়ে কেমনতন ছিল, সংশোধনী-লেখনী কর্তৃক পরিমার্জনের পূর্বে, সৃষ্টিমুহূর্তে কাহিনীর ধারা কোন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল—তা অতিশয় কৌতূহলকর আকর্ষণীয় বিষয়। রচনার উৎসমুখে পৌঁছতে পারলে, শুধু সৃষ্টি নয়—স্বয়ং স্রষ্টাও নূতন করে আমাদের চোখে আবিষ্কৃত হন।

আমাদের সংগৃহীত পাঠ—দেবী চৌধুরানী উপন্যাসের আদি পাঠ। উনিশ শতকের সেই বহুখ্যাত মাসিক পত্রিকা বঙ্গদর্শনের দুষ্প্রাপ্য ফাইল থেকে এই আদি পাঠ সংগৃহীত। দেবী চৌধুরানী উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ কালেই—অর্থাৎ বইয়ের একেবারে প্রথম সংস্করণ থেকেই এই সকল অংশ স্বয়ং গ্রন্থকার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিল।

দেবী চৌধুরানী উপন্যাস বঙ্গদর্শনে অংশত প্রকাশিত হয় ১২৮৯ পৌষ (১৮৮২ ডিসেম্বর) থেকে চৈত্র এবং ১২৯০ কার্তিক থেকে মাঘ—মোট আট সংখ্যায়। ১২৯০ বৈশাখ থেকে আশ্বিন সংখ্যার বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়নি। ১২৯০ মাঘ সংখ্যার পর বঙ্গদর্শনের প্রকাশ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গদর্শনে ১২৯০ মাঘ (১৮৮৪ জানুয়ারি) সংখ্যায় দেবী চৌধুরানী উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১২৯১ বৈশাখে (১৮৮৪ মে) সম্পূর্ণ দেবী চৌধুরানী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় উপন্যাসের প্রথম খণ্ড সতেরো পরিচ্ছেদে

সম্পূর্ণ হয়, আর দ্বিতীয় খণ্ডের দশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ছাপা হয়। গ্রন্থে মুদ্রিত দেবী চৌধুরানী তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে ষোল পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় খণ্ডে বারো পরিচ্ছেদ ও তৃতীয় খণ্ডে চৌদ্দ পরিচ্ছেদ।
সাময়িকপত্রে উপন্যাসের দুই খণ্ডের যতটা অংশ বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, গ্রন্থাকারে প্রকাশসময়ে ঔপন্যাসিক তার বহু অংশ সংশোধন ও পরিমার্জন করেন। একটা বছর পেরোতে না পেরোতেই তাঁর নিজের লেখা তাঁর কাছে অমনোনীত হয়ে যায় ; নিজের সৃষ্টিকে সুন্দরতর করে তোলার আকুলতায় তাঁকে একই রচনার জন্য আবার ধরতে হয় কলম—গড়ে ওঠে পুরাতন নামে নূতন কাহিনী, নূতন চরিত্র, সমৃদ্ধতর জীবনদর্শন।
দেবী চৌধুরানী উপন্যাসে প্রফুল্ল বিবাহের পর দিনই 'কুলটা' 'জাতিভ্রষ্টা' ইত্যাদি মিথ্যা অপবাদে শ্বশুর হরবল্লভ কর্তৃক বিতাড়িত হয়েছিল। মায়ে-মেয়ে ক' বৎসর তীব্র দারিদ্র্য এবং অর্ধাহারে অনাহারে কাটিয়ে শেষে জীবনরক্ষার শেষ ঠাঁই হিসেবে প্রফুল্ল তার শ্বশুরবাড়ির দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত। এবারেও হরবল্লভ তাঁর অষ্টাদশবর্ষীয়া সুন্দরী ব্রাহ্মণকন্যা পুত্রবধূকে 'ঝাঁটা মেরে বিদায়' করার আদেশ দেন। কিন্তু ব্রজেশ্বরের ছোটবউ সাগরের ঐকান্তিক অনুকম্পা ও প্রীতির ফলে একটি মাত্র রাতের জন্য চিরবঞ্চিত প্রফুল্ল চিরআকাঙ্ক্ষিত স্বামীসঙ্গলাভের দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করে।
আমরা এখন যে কাহিনী পড়ি তাতে আছে : ব্রজেশ্বর ও প্রফুল্লকে সাগর তার নিজের ঘরে বাইরে থেকে কুলুপ এঁটে পালিয়ে আসে এবং সে-রাত্তিরটা সাগর ব্রহ্মঠাকুরানীর পাশে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। 'পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই সাগর' এসে ঘরের কুলুপ খুলে দিয়ে যায়। বইতে কুলুপ আঁটা ও কুলুপ খোলার মাঝে আর কোনো বিবরণ নেই। কিন্তু বঙ্গদর্শনের পাঠে সেই রাত্রের কাহিনী নিম্নরূপ :

> 'এখন নয়নতারা [মেজবউ] জানে যে স্বামী সাগরের ঘরে ; তাকে একবার আড়ি পাতিতেই হইবে। সে যখন আসিয়া জুটিয়াছিল—তখন সাগর দ্বারে কুলুপ দিয়া পলাইয়াছে। নয়নতারা আড়ি পাতিয়া বুঝিয়া গেল যে বাগদী বউ ঘরে আছে। রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে মনে মনে বলিল— "সাগরি বাঁদরী—অধঃপাতে যাও—উনুনমুখী—চুলোমুখী—আপনি শুতে জায়গা পায় না শঙ্করাকে ডাকে।" তখন নয়নতারা, একজন দাসীকে শিখাইয়া পড়াইয়া শ্বশুরের কাছে পাঠাইলেন। সে কোন কাজের ছলে কর্তার কাছে গিয়া, কথায় কথায় বলিয়া আসিল যে মুচি বউ—প্রফুল্ল বাগদী ঘুচিয়া ক্রমে মুচিতে দাঁড়াইতেছিল—মুচি বউ ব্রজেশ্বরের ঘরে শয়ন করিয়াছে। তখন কর্তার হুকুম হইল যে কালই প্রাতে নয়ান বৌমা স্বহস্তে তাহাকে ঝাঁটা মারিয়া বিদায় করিবেন। ব্রজেশ্বরের ভাগ্যে কর্তা মহাশয় এক কাঁড়ি তিরস্কার জমা করিয়া রাখিলেন।
> এদিগে প্রভাত হইতে না হইতেই সাগর আসিয়া, ঘরের কুলুপ খুলিয়া দিয়া গেল।'

এই কুলুপ খোলার পরের ঘটনাও বইয়ে ও বঙ্গদর্শনে ভিন্নরূপ। বইয়ে আছে : ' "কটাশ—ঝনাৎ" করিয়া কুলুপ শিকল খোলার শব্দ হইল—প্রফুল্ল ও ব্রজেশ্বর তাহা শুনিল। প্রফুল্ল বসিয়াছিল—উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, সাগর শিকল খুলিয়াছে, আমি চলিলাম। স্ত্রী বলিয়া স্বীকার কর না কর, দাসী বলিয়া মনে রাখিও।" ' এর পর বইয়ের ঘটনা : ব্রজেশ্বর তার নিজের আঙুল থেকে খুলে একটি বহুমূল্য হীরক-অঙ্গুরীয় প্রফুল্লের আঙুলে পরিয়ে দেয়। 'আপাততঃ ইহার মূল্যে কতক দুঃখ নিবারণ হইবে।' প্রফুল্ল স্বামীকে বলে, 'আমি এ আঙ্গটিটি বেচিব না। না খাইয়া মরিয়া যাইব, তবু কখন বেচিব না।' অতঃপর প্রফুল্ল ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে এলে সাগর ও নয়নের সঙ্গে দেখা হয়। শ্বশুরঘরে যে প্রফুল্লর স্থান নেই—শ্বশুর হরবল্লভ যে পুত্রবধূকে চুরি ডাকাতি করেই খেতে বলেছে—এ সংবাদ অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ মেজ-সতীন নয়ান বউ প্রফুল্লকে প্রফুল্লচিত্তে জানিয়ে যায়। 'দেখা যাবে' বলে প্রফুল্ল বিদায় নেয়। 'প্রফুল্ল আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিল না। একেবারে বাহিরে খিড়কীদ্বার পার হইল। সাগর পিছু পিছু গেল। প্রফুল্ল তাহাকে বলিল, "আমি, ভাই, আজ চলিলাম। এ বাড়িতে আর আসিব না। তুমি বাপের বাড়ি গেলে, সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।"/ সা। তুমি আমার বাপের বাড়ি চেন ?/প্র। না চিনি, চিনিয়া যাইব।/সা। তুমি আমার বাপের বাড়ি যাবে ?/প্র। আমার আর লজ্জা কি ?/সা। তোমার মা তোমার সঙ্গে দেখা করিবেন বলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।/ বাগানের দ্বারের কাছে যথার্থ প্রফুল্লের মা দাঁড়াইয়া ছিল। সাগর দেখাইয়া দিল। প্রফুল্ল মার কাছে গেল।'

ঘরের কুলুপ খোলা থেকে প্রফুল্লর মায়ের কাছে আসার মধ্যবর্তী ঘটনা বঙ্গদর্শনে ভিন্নরূপ :

> 'প্রফুল্ল বসিয়াছিল—উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"সাগর শিকল খুলিয়াছে। আমি চলিলাম। যে যে কথা হইয়াছে, তাহা তোমার মনে থাকিবে কি ?"
> ব্রজেশ্বর বলিল, "ভুলিবার কথা কোন্‌টা ?"
> প্র। সবই ভুলিবার কথা—কেন না আমিই যে ভুলিবার বস্তু। কিন্তু কথাটা চিরদিনের জন্য মনে রাখ, তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা। বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমি না হয় ভাল করিয়া আবার তোমায় জিজ্ঞাসা করি। প্রথম কথা, তুমি আমায় ত্যাগ করিলে বটে ?
> ব্র। এমন কথা কেন বল ? তোমায় আমি কখন ত্যাগ করিব না—যে স্ত্রী ত্যাগ করে সে মহাপাতকী। তবে যত দিন আমার বাপ বর্তমান আছেন, তত দিন তোমায় আমায় দেখা সাক্ষাৎ হইবে না। পিতার অবাধ্য কোন মতেই হইতে পারিব না—অবাধ্য হইবার আমার সাধ্য কি ? কিন্তু পিতার অবর্তমানে—
> প্র। অর্থাৎ তোমার আর আমার প্রাচীন বয়সে, তুমি আমায় গ্রহণ করিবে। ভালই। তত দিন আমি খাইব কি ? আমার শ্বশুর একথায় যে উত্তর দিয়াছেন তাহা ত তোমারই মুখে শুনিলাম। তোমারও কি সেই মত ? চুরি, ডাকাতি, ভিক্ষা করিয়া খাইব, তোমারও কি সেই মত ?
> ব্রজেশ্বর অধোবদন হইল। কিছু পরে বলিল, "আমার নিজের কিছু নাই কিন্তু যেমন করিয়া হউক আমি কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া তোমাকে পাঠাইয়া দিব।"
> প্র। সংগ্রহ করিয়া—অর্থাৎ বাপের টাকা হইতে কোনমতে কিছু লইয়া। তাহা আমি লইব না—তোমার বাপের এক পয়সা আমি খাইব না। তুমি নিজে উপার্জন করিয়া আমায় খাওয়াইতে পার না ?
> ব্র। আমি বাপের অধীন—ঘরের বাহির হইতে পাই না—নহিলে উপার্জনে আমি অক্ষম নহি। সে চেষ্টা এখন করা বৃথা।
> প্র। তবে তোমার কিছু দিয়া কাজ নাই। আমি পারি, চুরি ডাকাতি ভিক্ষা করিয়াই খাইব। না পারি মরিয়া যাইব।
> ব্র। অমন কথা মুখে আনিও না। আমার একটি আঙ্গটি আছে—অনেক টাকা দাম—ঐটি লইয়া যাও—এখন কিছু দিন চলিবে—তার পর—
> প্র। আঙ্গটি লইয়া আমি কোন্ বাজারে বেচিতে যাব ? তবু আঙ্গটিটি দাও। তোমার সঙ্গে এক রাত্রের জন্য যে সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাতেই আমার জন্ম সার্থক হইয়াছে ; মধ্যে মধ্যে আঙ্গটি দেখিয়া এ স্মরণ করিব। কিন্তু এ আঙ্গটি আমার কাছে দেখিলে কেহ চোর বলিয়া ধরিবে না ত ? কিংবা আরও কি—
> ব্র। এ আঙ্গটিতে আমার নাম খোদা আছে। নিতে কোন ভয় করিও না।
> এই বলিয়া ব্রজেশ্বর আঙ্গটি আনিয়া দেখাইলেন, তাহার ভিতর পিঠে তাঁহার নাম ফারসী অক্ষরে খোদিত আছে। প্রফুল্ল আঙ্গটি লইল।
> ব্র। এখন কোথায় কি প্রকারে তোমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া দাও।
> প্র। সে ভার তোমার উপর—আমার যত দূর সাধ্য তাহা করিয়াছি। এখানে ত আর আমার আসা হইতে পারে না। তুমি আমাদের বাড়ি যাইবে ?
> ব্রজেশ্বর আবার অধোবদন হইল—বলিল "শত্রুরা জাতি মারিবে।"
> প্র। তবে দেখা সাক্ষাৎ এই পর্যন্ত। যদি আর একবার কখনও কোন গতিকে সাক্ষাৎ হয়—
> ব্র। যদি কোন গতিকে সাক্ষাৎ হয়—তবে কি ? চুপ করিলে কেন ?
> প্র। তখন তুমি আমায় চিনিতে পারিবে কি ? এ বয়স ত থাকিবে না।
> ব্র। আমি ভুলিব না।
> প্র। ভুলিবে।
> এই বলিয়া প্রফুল্ল এক হাতের পিতলের বালা খুলিয়া জোর করিয়া তাহা দুইখানা করিয়া ভাঙ্গিল। বলিল, "আধখানা বালা তোমার কাছে থাক। আধখানা আমার কাছে রহিল। আধখানায় আর আধখানা মিলাইলে, তুমিও চিনিবে, আমিও চিনিব। এখন চলিলাম। মনে থাকে যেন—আমায় বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলে।" এই বলিয়া

প্রফুল্ল দ্বার খুলিয়া বাহির হইল—ব্রজেশ্বর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।
দ্বার খুলিয়া প্রফুল্ল দেখিল দ্বার পার্শ্বে নয়নতারা ঝাঁটা হাতে দাঁড়াইয়া আছে। প্রফুল্লকে দেখিয়াই নয়নতারা বলিল, "বের ত মাগী, ঝাঁটা মেরে তোর বিষ ঝেড়ে দিই।"
প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, "তুমি কি বাড়ির ঝাড়ুওয়ালা নাকি?"
নয়নতারা জ্বলিয়া অঙ্গারের মত হইল। মারিবার জন্য ঝাঁটা তুলিল। প্রফুল্ল সরিল না। ব্রজেশ্বর ঘরের ভিতর হইতে এসব দেখিতে পাইল—ঝাঁটা প্রফুল্লের ঘাড়ে পড়ে পড়ে এমন সময়ে ব্রজেশ্বর নয়নতারার হাত হইতে ঝাঁটা কাড়িয়া লইল। প্রফুল্ল আবার হাসিয়া নয়নতারাকে বলিল— "তুমি মনঃক্ষুন্ন হইও না দিদি—ও ঝাঁটা মারাই হইয়াছে। ইহজন্মে আমি তাই ভাবিব। মনে থাকে যেন—তুমি আমাকে ঝাঁটা মারিয়া এ বাড়ি হইতে বিদায় করিলে।"
প্রফুল্ল আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিল না। একেবারে বাহিরে খিড়কী দ্বার পার হইল। দেখিল সেখানে সাগর ঘেরা বাগানে ব্রহ্মঠাকুরানীর পূজার ফুল তুলিতেছে। প্রফুল্ল বাগানের কাছে গিয়া বলিল, "আমি ভাই আজ চলিলাম। এ বাড়িতে আর আসিব না। তুমি বাপের বাড়ি গেলে সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।"
সা। তুমি আমার বাপের বাড়ি চেন?
প্র। না চিনি, চিনিয়া যাইব।
সা। তুমি আমার বাপের বাড়ি যাবে?
প্র। আমার আর লজ্জা কি? আমি আর কুলের কুলবধূ নই। সে নাম আমার ঘুচিয়াছে।
সা। ছি, অমন কথা বলিও না। তোমার মা, তোমার সঙ্গে দেখা করিবেন বলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।
বাগানের দ্বারের কাছে যথার্থ প্রফুল্লের মা দাঁড়াইয়া ছিল। সাগর দেখাইয়া দিল। প্রফুল্ল মার কাছে গেল।
ব্রহ্মঠাকুরানীর গুণে প্রফুল্লের মার উপবাস ও নিরাশ্রয় দুঃখ সহিতে হয় নাই। এখন মায়ে ঝিয়ে সাক্ষাৎ হইলে পরস্পরের সংবাদ পরস্পরের কাছে শুনিল। প্রফুল্লের মা বলিল, "এখন সাধ মিটিল। চল ঘরে যাই।" '

বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত দেবী চৌধুরানী উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের নবম ও দশম পরিচ্ছেদের বহু অংশ বর্জিত হয়ে গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদে (নবম) সংহত হয়েছে। পত্রিকায় মুদ্রিত উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদ গ্রন্থে সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে। পত্রিকায় মুদ্রিত দ্বাদশ পরিচ্ছেদ গ্রন্থে দশম পরিচ্ছেদ হয়েছে। পত্রিকায় মুদ্রিত ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের কাহিনী সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গ্রন্থে একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদ হয়েছে। পত্রিকায় মুদ্রিত প্রথম খণ্ডের চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ গ্রন্থে যথাক্রমে ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।
বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে কেবল প্রফুল্ল কর্তৃক মোহর এবং হীরা-পান্না-চুনি উদ্ধারের বিবরণ প্রদত্ত। গভীর রাত পর্যন্ত প্রফুল্ল মাটির নীচ থেকে মৃত বৈষ্ণবের দেওয়া বারো ঘড়া ধন সংগ্রহ করেছে কিন্তু রাত্রি দুই প্রহরের পর জনা কুড়ি পঁচিশ ডাকাত এসে প্রফুল্লর সেই ভগ্ন অট্টালিকা আক্রমণ করে। পত্রিকায় মুদ্রিত দশম পরিচ্ছেদে মৃত বৃদ্ধের পরিচয় এবং এই বিপুল ধনদৌলতের সামগ্রী কেমন করে এই অট্টালিকায় এসে সঞ্চিত হয়েছিল তার ইতিহাস বিবৃত। ডাকাতদলের হাত থেকে এই ধনরাশি কিরূপ কৌশলে বৃদ্ধ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল

তারও চমকপ্রদ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে একটির পর একটি ঘড়া উদ্ধারের বিস্তারিত বিবরণ পরিত্যক্ত হয়েছে। পত্রিকায় মুদ্রিত দশম পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদের শেষাংশে যুক্ত এবং বাকি অংশ (পত্রিকায় মুদ্রিত দশম পরিচ্ছেদের) গ্রন্থ থেকে বর্জিত।

গ্রন্থে নবম পরিচ্ছেদের একটি অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ :

'খুঁড়িতে খুঁড়িতে "ঠং" করিয়া শব্দ হইল। প্রফুল্লের শরীর রোমাঞ্চিত হইল—বুঝিল ঘটি কি ঘড়ার গায়ে শাবল ঠেকিয়াছে। কিন্তু কোথা হইতে কার ধন এখানে আসিল, তার পরিচয় আগে দিই।'

বঙ্গদর্শনে এই স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিলেন তা উদ্ধৃত করি :

> 'খুঁড়িতে খুঁড়িতে "ঠং" করিয়া শব্দ হইল। প্রফুল্লের শরীর রোমাঞ্চিত হইল—বুঝিল ঘটি কি ঘড়ার গায়ে শাবল ঠেকিয়াছে। ঘড়া কি ঘটি ? একটা চুমকি ঘটি বাহির হইলেও প্রফুল্ল খুসী—পৃথিবীতে প্রফুল্লের কিছুই নাই—একখানি বস্ত্র মাত্র।
>
> প্রফুল্ল খুঁড়িতে লাগিল—ঠং ঠং করিয়া শাবল বাজিতে লাগিল—না এ বাটিঘটি নয়, বড় একটা লোটা হবে। খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাত্রের আকার দেখা গেল—কি সর্বনাশ ! এ যে ঘড়া বোধ হইতেছে ! এক ঘড়া টাকা ! প্রফুল্লের বিশ্বাস হইল না—এত অর্থ তাহার কপালে ঘটিবে না।
>
> ক্রমে ঘড়াটা সব বাহির হইল—মুখে খুরি আঁটা। প্রফুল্ল সেটাকে তুলিবার চেষ্টা করিল—কিছুতেই পারিল না—বড় ভারি। তখন প্রফুল্ল, অগত্যা তাহার মুখের খুরি খুলিয়া ফেলিল। দেখিয়া প্রফুল্লের মাথা ঘুরিয়া গেল। টাকা নহে—এক ঘড়া মোহর ! ! এত অর্থ লইয়া প্রফুল্ল পৃথিবীতে কি করিবে ?
>
> প্রফুল্ল ঘড়া তুলিতে না পারিয়া আঁজলা আঁজলা করিয়া মোহর তুলিয়া মাটিতে রাখিতে লাগিল—ইচ্ছা গণিবে কত মোহর। কিন্তু অঙ্ক বিদ্যায় তত দখল নাই—গণিয়া সংখ্যা করিতে পারিল না। কেবল কাঁড়ি করিয়া সাজাইল। কিন্তু তুলিতে তুলিতে মোহর ফুরাইল—হরি ! হরি ! এ আবার কি উঠে। যাহা উঠিল, তাহা কুঁদোর আগুনের প্রতিফলনে লক্ষ অগ্নি বিকশিত করিল—প্রফুল্ল চিনিল—হীরা, পান্না, চুনি ! অঞ্জলিপূর্ণ হীরা, পান্না, চুনি উঠিতে লাগিল।
>
> প্রফুল্ল শত সহস্রবার মনে মনে জননীকে স্মরণ করিল। ভাবিল, "হায় মা ! তুমি বাঁচিয়া থাকিতে এ টাকা পাইলাম না। আমি যদি এ টাকা রাখিতে পারি, রাজরানীর মত কাটাইব। কিন্তু তুমি, মা ! না খাইয়া মরিয়াছ !"
>
> প্রফুল্ল আবার মনে মনে ভাবিল, "পৃথিবীতে এত ধন আছে, তাহা আমি জানিতাম না ? যাই হউক, এখন পুঁতিয়াই রাখি। এই ভাবিয়া, প্রফুল্ল কেবল পঞ্চাশৎ স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া লইয়া, আবার ঘড়া পুঁতিয়া রাখিল, তখন প্রফুল্ল অতিশয় সহর্ষচিত্তে সিঁড়িতে উঠিতে চলিল। যাইতে যাইতে হঠাৎ মনে হইল—"আরও যদি থাকে ? আর থাকে ত লইয়া কি করিব ? যা পাইয়াছি, আমার যাবজ্জীবনের পক্ষে অনন্ত ঐশ্বর্য।" এই ভাবিয়া প্রফুল্ল সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল। অর্দ্ধেক উঠিয়া, কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিল না। ভাবিল—"ভাল, দেখিই না কেন, আর আছে কি না।" আবার শাবল লইয়া বসিল। যেখানে ঘড়া পাইয়াছিল, তাহার চারি পাশে খুঁড়িতে লাগিল। খুঁড়িতে খুঁড়িতে—ঠং ! আবার শাবলে বাজিল। আবার ঘড়া ! আবার কেবল মোহর ! নীচে আবার তেমনি হীরা, পান্না, চুনি পাইল। প্রফুল্ল ভাবিল "আজ নিশ্চয় আমি মরিয়া যাইব—এত ধন মনুষ্যের ভোগে কখন হয় না।"
>
> "ভাল দেখিই না কেন কুবেরের কত ধন আছে ?" এই বলিয়া প্রফুল্ল আবার খুঁড়িতে লাগিল। আবার ঠং ! —আবার সেইরূপ ঘড়া—আবার উপরে মোহর, নীচে হীরা, পান্না, চুনি।
>
> প্রফুল্ল বেশ করিয়া সব পুঁতিল। মনে ভাবিল, "আরও যদি থাকে, তা আমি চাই না। আমি যা পাইয়াছি, রাখিতে পারিলে দিনাজপুরের রানীর সঙ্গে টক্কর দিতে পারিব।" প্রফুল্ল সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল। বড় পরিশ্রম হইয়াছিল। প্রফুল্ল গোহালে গিয়া আবার গরু দুইয়া দুধ খাইল। তার পরে খড়ের শয্যা রচনা করিয়া শুইল। একা সেই জঙ্গলের ভিতর ভগ্ন অট্টালিকায় শয়ন করিতে বড় ভয় করিতে লাগিল। প্রফুল্লের বড় সাহস—তাহার পরিচয় আমরা যথেষ্ট দিয়াছি ; তথাপি ভয় করিতে লাগিল। বিশেষ সেই ঘরে সেই দিন মানুষ মরিয়াছে—প্রফুল্ল আলো নহিলে শুইতে পারিল না, তেল খুঁজিতে লাগিল। তেল পাইল না—কিন্তু খুঁজিতে খুঁজিতে দুইটা মোমবাতি পাইল। তাই জ্বালিয়া, খড়ের বিছানা করিয়া প্রফুল্ল শয়ন করিল। শয়ন করিয়া প্রফুল্লের ঘুম হইল না। আরও ঘড়া আছে কি ? না আর ধন পৃথিবীতে থাকিতে পারে না। থাকিলেই বা ? আর লইয়া কি হইবে ? তবু দেখিলে ক্ষতি কি ? না—দেখিব না। না দেখিলেও ঘুম হয় না। ঘুম হইল না—কাজে কাজেই প্রফুল্ল আবার বাতি জ্বালিয়া সুরঙ্গে নামিল। আবার শাবল লইয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল—আবার ঠং করিয়া শাবল ঘড়ায় বাজিল। আবার—এক ঘড়া ধন বাহির হইল।
>
> এইরূপে প্রফুল্ল বার ঘড়া ধন পাইল।
>
> রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে পর প্রফুল্ল হাত পা ধুইয়া আবার আসিয়া শয়ন করিল। এবার বোধ হয় পরিশ্রমের ফলে একটু নিদ্রা আসিল। কিন্তু অকস্মাৎ ভয়ানক কোলাহলে প্রফুল্লের নিদ্রাভঙ্গ হইল। যেন একশত লোক মার মার ! কাট কাট ! শব্দ করিতেছে। প্রফুল্ল থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে তৃণশয্যা হইতে উঠিল। বেশ করিয়া মনোভিনিবেশ পূর্বক শব্দ শুনিতে লাগিল। শব্দ তাহার দ্বারে। মার মার ! কাট কাট শব্দ নহে, তবু অনেক লোকের কোলাহল ধ্বনি বটে। সর্বনাশ এ-জঙ্গলে এত লোকের শব্দ—এ নিশ্চিত ভূত। নিতান্ত তা না হয় তবে ডাকাত।
>
> রে রে হৈ হৈ শব্দ মধ্যে প্রফুল্ল, একটা শব্দ বেশ বুঝিতে পারিল। প্রফুল্ল ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়াছিল, সেই দ্বারে যেন সহস্র লোকে ঠেঙ্গাইতেছে। দ্বার ভাঙ্গিয়া যায়—আর থাকে না। প্রফুল্ল তখন মনে মনে সকল দেবতাকে ডাকিল। একবার ভাবিল যে তক্তা তুলিয়া সুরঙ্গে নামিয়া গিয়া লুক্কায়িত থাকি। তার পরে ভাবিল যে, নীচেয় গেলে, তক্তার উপর ত বিছানা করিয়া তক্তা লুকাইতে পারিব না—যাহারা দ্বার ভাঙ্গিতেছে, তাহারা দেখিতে পাইয়া তক্তা তুলিয়া নীচেয় গিয়া ধরিবে। তখন প্রফুল্ল বুঝিল যে, সাহস ভিন্ন রক্ষার অন্য উপায় নাই। একে স্বভাবতঃ প্রফুল্লের অনেক সাহস—তাতে কয়দিন ধরিয়া প্রফুল্ল অনেক দুঃখ যন্ত্রণা পাইয়াছে—অনেক বিপদে পড়িয়া উদ্ধার পাইয়াছে—অনেক সাহস করিয়াছে। অতএব সাহসে ভর করিয়া, প্রফুল্ল গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তখন মোমবাতি জ্বলিতেছিল।
>
> দ্বার খুলিবামাত্র, হুড় হুড় করিয়া জন-কুড়ি পঁচিশ কালান্তক যমের ন্যায় জোয়ান ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।'

পূর্বেই বলেছি, বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত দেবী চৌধুরানী উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে (ক) ভগ্ন অট্টালিকাবাসী বৃদ্ধের পরিচয়, (খ) মাটির নীচে সঞ্চিত পুরাতন ধনদৌলতের পূর্ব-ইতিহাস, এবং (গ) আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত এই বিপুল ধনরাশি দরিদ্র বৃদ্ধ-বৈষ্ণব কেমন করে ডাকাত-দলের হাত থেকে গত কয়েক বছর রক্ষা করে এসেছে—তার বিবরণ আছে। গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠে এই পরিচ্ছেদের প্রথম দুটি অংশ গৃহীত হয়েছে, শেষাংশ পরিত্যক্ত। পাঠকবর্গের এ-কথাও নিশ্চয় স্মরণ আছে যে, পত্রিকায় মুদ্রিত দশম পরিচ্ছেদের যে-অংশ গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে তা গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদের শেষে সংযুক্ত হয়েছে—পৃথক পরিচ্ছেদ করা হয় নি।

গ্রন্থে নবম পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদ এইরূপ :

'কৃষ্ণগোবিন্দ ঘড়াগুলি সাবধানে পুঁতিয়া রাখিল। বৈষ্ণবীকে এক দিনের তরেও এ ধনের কথা কিছুই জানিতে দিল না। কৃষ্ণগোবিন্দ অতিশয় কৃপণ, ইহা হইতে একটি মোহর লইয়াও কখনও খরচ করিল না। এ ধন গায়ের রক্তের মত বোধ করিত। সেই ভাঁড়ের টাকাতেই কায়ক্লেশে দিন চালাইতে লাগিল। সেই ধন এখন প্রফুল্ল পাইল। ঘড়াগুলি বেশ করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া আসিয়া প্রফুল্ল শয়ন করিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, সেই বিচালির বিছানায় প্রফুল্ল শীঘ্রই নিদ্রায় অভিভূত হইল।'

এই স্থলে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র যে বিবরণ দিয়েছিলেন, এখানে উদ্ধৃত হল :

> 'কৃষ্ণগোবিন্দ ঘড়াগুলি সাবধানে পুঁতিয়া রাখিল। বৈষ্ণবীকে একদিনের তরে এ ধনের কথা কিছু জানিতে দিল না। কৃষ্ণগোবিন্দ অতিশয় কৃপণ, ইহা হইতে একটি মোহর লইয়াও কখনও খরচ করিল না। এ ধন গায়ের রক্তের মত বোধ করিত। সেই ভাঁড়ের টাকাতেই কায়ক্লেশে দিন চালাইতে লাগিল।

শয়তানের কথায় আসা যাক্ কিছু কাজের কথায়।

ঈর্ষা জাগান টিভি ম্যাজিকের জোরে তৈরী হয়না। ব্ল্যাক্ ম্যাজিকের দৌলতেও নয়। সুতরাং ওনিডার মালিক হিসেবে আপনাকে যখন আপনার পড়শীর ঈর্ষার মোকাবিলা করতেই হবে, তখন তাঁর সাথে ওনিডার গুণের কথা আলোচনা করতে ক্ষতি কি?

ওঁকে প্রথমেই জানিয়ে দিন যে ওনিডার সম্পর্ক পাতা আছে এক বিশ্ববিখ্যাত আন্তর্জাতিক কারিগরীর সাথে। এবং তাহলেই বিশ্বাস করতে সুবিধে হবে, অতঃপর আপনি যা যা তাঁকে দেখাবেন।

যেই উনি প্রাকৃতিক হুবহু রঙে নিখুঁত আর অতি স্পষ্ট ছবি দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যাবেন তখন আপনি জানাবেন ওনিডা-র রহস্য—অন্য টিভির তুলনায় অনেক বেশি 'রেজোলিউশন' আর টিভির ভেতরেই সরাসরি সিগন্যাল প্রসেসিং।

তারপর যেই উনি ওনিডার মধুর আওয়াজ শুনে একেবারে অবাক হবেন তখন আপনি তারও কারণ দেখাবেন—এর অভিনব ট্রিপল স্পীকার সিস্টেম, যা থেকে আপনি সব ফ্রিকোয়েন্সীই অতি পরিষ্কার শুনতে পান। আর দেখাবেন সেই বিশেষ ইয়ার ফ্ল্যাপ্স যা আপনাকে টেনে নিয়ে যায়—সরাসরি টিভির মধুর আওয়াজের দুনিয়ায়।

আর হ্যাঁ, এটা অবশ্যই বুঝে গেছেন যে এত কথা বলা মানে শুধু তারিফ করাই নয়। আসল উদ্দেশ্য হ'ল—পড়শীদের ঈর্ষা থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া আর তা আপনি হতে পারবেন তখনই, যখন ওঁরা একে একে সকলেই ওনিডা কিনে ফেলবেন। কি বলেন?

ওনিডা কর্ডলেস্ রিমোটের সাথে। পড়শী ঈর্ষায় জরজর, আপনি খুসিতে ডগমগ।

তারপর, বড় ডাকাইতের ভয় হইল। বাবাজী হাট হইতে নিত্য ডাকাতের গল্প শুনিয়া আসিত ; আরও দেখিত যে, এই বনে ডাকাতের মত লোক সর্বক্ষণ যায় ; বোধ হয় এ বনে ডাকাতদের একটা আড্ডা থাকিবে। সে কথা বাস্তবিক সত্য। ডাকাতেরাও দেখিত যে, বৈরাগী সপ্তাহে সপ্তাহে বন হইতে হাটে যায়, হাট করিয়া বনে প্রবেশ করে। ডাকাতেরা সন্ধান লইতে লাগিল। ভাঙ্গা বাড়ি দেখিয়া গেল। জানিল যে, এইখানে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী বাস করে, কিছু কাজকর্ম করে না, অথচ স্বচ্ছন্দে দিনপাত করে। বুঝিল ইহাদের কিছু আছে।

অতএব একদিন তাহারা জনকতক জুটিয়া সেখানে ডাকাইতি করিতে আসিল। ভাঁড়ের টাকাগুলি লুটিয়া লইল। তারপর "আর কি আছে দে", বলিয়া কৃষ্ণগোবিন্দকে বাঁধিয়া মশাল দিয়া পোড়াইতে লাগিল। কৃষ্ণগোবিন্দ কিছুই দিল না বরং অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল, "আমার আর কিছুই নাই।" মারিয়া ফেল. —ফেল. কিন্তু আর কিছু পাইবে না। বরং আমায় ছাড়িয়া দিলে কিছু পাইবে। আমার টাকা আছে সত্য, কিন্তু টাকা এখানে নাই। আমি মুর্শিদাবাদে চাকরি করিতাম, শেঠের বাড়ি আমার টাকা গচ্ছিত আছে। বছর বছর সেখানে গিয়া আমি সুদ নিয়া আসি। আমি স্বীকার করিতেছি যে, যখন আমি সুদ আনিব. তোমরা আসিলে তোমাদের কিছু দিব। সব দিব না। সব যদি নাও, তবে আমি এ দেশ থেকে পালাইব ; আর পাইবে না। আর যা ইচ্ছাক্রমে দিব, তাহা যদি লইয়া সন্তুষ্ট হও, তবে বছর বছর আসিও, বছর বছর দিব।"

ডাকাতেরা দেখিল এ বন্দবস্ত মন্দ নয়। আপাততঃ আর কিছু ত পাওয়া যায় না—তাহারা স্বীকৃত হইয়া বুড়াকে ছাড়িয়া দিল। বুড়া একটা দিন অবধারিত করিয়া দিল। ডাকাইতেরা চলিয়া গেল। বুড়া, দুই চারি দিন কায়ক্লেশে কাটাইয়া শেষে ঘড়া হইতে কিছু মোহর বাহির করিয়া একটা ভাঙ্গা হাঁড়িতে পুরিয়া তাহাতে কাদা মাখাইয়া বৈষ্ণবীকে দেখাইল, বলিল, "কৃষ্ণ দয়া করিয়াছেন, আবার কিছু পাইয়াছি।" তাহা খরচ করিয়া দিন চালাইতে লাগিল। ডাকাতেরা অবধারিত তারিখে আসিলে তাহাদের কিছু দিল।

এরূপে দুই চারি বৎসর গেল। ডাকাতেরা তাহাকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। সেও ডাকাতদিগকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। এমন কি কোন ডাকাতের ঘরে খাবার না থাকিলে, সে আসিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের কাছে টাকাটা সিকেটা ধার লইয়া যাইত। ডাকাতেরা সাধ্য হইলেই ঋণ পরিশোধ করিত—কেন না নহিলে আবার চাহিলে পাইবে না। এইরূপ করিতে করিতে কৃষ্ণগোবিন্দ তাহাদের দলের মহাজন দাঁড়াইয়া গেল। শেষে সে দলমধ্যে একজন গণ্য হইল। তাহাকে কোন ডাকাইতিতে যাইতে হইত না ; সে কেবল অসময়ে টাকা যোগাইত। তাহার আসল ফেরৎ পাইত, কিন্তু সুদ পাইত না। কিন্তু তাৎপরিবর্তে সকল ডাকাইতির লাভের এক অংশ পাইত। তাহাতেই তাহার দিনপাত হইতে লাগিল ; রাজা নীলাম্বরের ধন আর ছুঁইতে হইল না। সেই ডাকাতের দল—আজ প্রফুল্লের সম্মুখে উপস্থিত।'

বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছেদ গ্রন্থে সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে—একথা আগে বলেছি। সেই লুপ্ত পরিচ্ছেদটি এখানে সংগৃহীত হল :

'ডাকাইতেরা প্রফুল্লকে দেখিয়া বলিল "আ মোলো! এটা কে? তুই এখানে কেন? বুড়ো কোথায়?"

প্রফুল্ল সকল সাহস জমা করিয়া বলিল, "তিনি মরিয়াছেন।"

আঃ এমন বুড়ো মরেছে, কে মারলে? আমরা থাকতে বুড়ো মরে?

প্র। তিনি জ্বরবিকারে মরেছেন।

ডা। কবে জ্বর হলো? মিছে কথা! তুই তাকে ধরিয়া দিয়েছিস।

প্র। উঠনে তাঁকে গোর দিয়াছি—গিয়া একজন না হয় দেখিয়া আইস।

দুই চারিজন ডাকাত দেখিতে ছুটিল। অপরেরা প্রফুল্লকে ধমক চমক করিতে লাগিল।

ডাকাইতেরা বলিতে লাগিল "তার বৈষ্ণবী কোথায়? তুই কে?"

প্র। বৈষ্ণবী, তাঁর যা কিছু ছিল, তাহা লইয়া পলাইয়াছে।

ডা। আ মোলো! এত বড় স্পর্দ্ধা! কোথা পালিয়েছে বল্ তো?

প্র। তা জানি না।

ডা। তুই কে? তুই এখানে কেন?

প্র। আমি বাবাজির পুষ্যি মেয়ে।

ডা। পুষ্যি মেয়ে! কই বাবাজির ত পুষ্যি মুষ্যি ছিল না—কখন শুনি নাই।

প্র। বৈষ্ণবীর ভয়ে তিনি প্রকাশ করিতেন না। আমাকে একঘর কুটুম্বের বাড়ি লুকিয়া রেখেছিলেন।

ডা। তা এখন বুঝি টাকা লুট্‌তে এসেছিস?

প্র। ব্যামো শুনে এসেছি।

ডা। তুই আবার ব্যামো শুনলি কার কাছে?

প্র। বৈষ্ণবী হাটে গল্প করেছিল তাইতে শুনেছি।

ডা। বটে? তুই এসে পেলি কি?

প্র। কিছু না। সব বৈষ্ণবী নিয়ে গেছে বলেছি ত।

ডা। কেন মুর্শিদাবাদের টাকা? সে কে পাবে?

প্র। সে সব মিছা কথা।

প্রফুল্ল জানে না কোন্ টাকার কথা হইতেছে, সুতরাং আন্দাজি আন্দাজি উত্তর দিতে লাগিল। কিন্তু বড় বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও সাহস। ডাকাইতেরা বলিল "মিছে কথা! তুই কি আমাদের ফাঁকি দিতে চাস? আমরা যে কতবার টাকা ধার নিয়ে গিয়েছি।"

প্র। সে নিয়ে গিয়েছ ঘরের টাকা।

ডা। সে কি? বুড়া আমাদের ফাঁকি দিত? তা ঘরের টাকা সব বৈষ্ণবী মাগী নিয়ে গিয়েছে। আমরা আর ধার পাব না?

প্র। পাবে না কেন?

ডা। কোথা পাইব? কে দিবে?

প্র। আমি দিব।

ডা। তুই? তুই কোথায় পাবি? তবে তুই বুড়ার টাকা পেয়েছিস।

প্র। না, টাকা কিছু পাই নাই। কিন্তু বুড়োর টাকাও বড় ছিল না। তাঁর বিদ্যা ছিল, আমি সেই বিদ্যা পেয়েছি।

ডা। বিদ্যাটা কি?

প্র। তা তোমাদের বলবো কেন?

ডা। বলবিনে? কেটে ফেলব।

প্র। ফেল, ফেল। আমি যাব, কিন্তু তোমাদের টাকা ধার দিবে কে?

ডা। আচ্ছা, নাই কাটলেম। বিদ্যাটা কি, শুন্‌বার ক্ষতি কি?

প্র। তোমরা কারও সাক্ষাতে বলবে না?

ডা। না—বল।

প্র। তিনি সোনা তৈয়ার করিতে জান্‌তেন। আমাকে তাই শিখিয়া গিয়াছেন। তোমাদের তাই তৈয়ার করিয়া দিতেন।

ডা। হাঁ হাঁ বটে! বাবাজি বাজারে মোহর ভাঙ্গাইত শুনিয়াছি। তা বিদ্যাটা তুমি শিখিয়াছ মা?

প্র। একরকম শিখিয়াছি। আজ আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ; আমার হাতে সোনা হয়।

ডা। আমাদের শিখাইবে?

প্র। তা যদি শেখ, তা আমার কাছে যেমন শিখিবে, আমাকে অমনি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এ বিদ্যা পরকে দিয়া আর বাঁচিতে নাই। তাও না হয়, আজি রাজি হইলাম ; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কাকে শিখাইব? এ বিদ্যা ছয় কান হইলে ফলে না। তাই একজনকে বৈ আর শিখাইতে পারিব না—কাকে শিখাইব?

ডাকাইতেরা সকলেই বলিল "আমাকে! আমাকে! আমাকে! আমাকে!" ডাকাইত মহলে বড় গোল বাধিয়া গেল। ঝগড়া হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম হইল।

প্রফুল্ল বলিল, "বিবাদ বিসম্বাদে কাজ নাই। এ মন্ত্র সকলের কোষ্ঠীতে ফলে না। বাবাজি বৈষ্ণবীকে এ বিদ্যা শিখাইতেন, কিন্তু তার কোষ্ঠীতে মিলিল না। তাকে এ বিদ্যা না দেওয়াতেই সে রাগ করিয়া টাকা-কড়ি চুরি করিয়া পালাইয়া গেল। কাল তোমাদিগের কোষ্ঠী লইয়া আসিবে, আর একজন দৈবজ্ঞ লইয়া আসিবে। আমি তাহাকে দিয়া বাছাই করাইব।

ডাকাতেরা মুখ চাওয়া চায়ি করিতে লাগিল ; কোষ্ঠী ত কারও নাই।

প্রফুল্ল বলিল, "কোষ্ঠী নহিলে হইবে না। আমারও মৃত্যু হইবে, তোমাদের হাতেও ফলিবে না।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া ডাকাতেরা বলিল, "তা, মা, তোমার বিদ্যা তোমাতেই থাক্। আমাদের টাকা পাইলেই হইল। আমাদের বার্ষিকটা দেবে ত?"

প্র। দেব।

ডা। আর সময়ে অসময়ে ধার ধোর?

প্র। দেব।
ডা। তোমার মালের ভাগ তোমাকে ঠিক আনিয়া দিব।
প্র। আমি ভাগ চাই না। আমার কুলাইবে। বাবাজির সাহস ছিল না। এতে ভূত প্রেতের দৌরাত্ম্য আছে, তাই তিনি কম সোনা করিতেন। আমার সে ভয় নাই, আমি বেশি করিয়া সোনা করিব। আমি ভাগ নিব না।
ডাকাতেরা। (সকলে একত্রে) জয় হউক মায়ি ! জয় হউক ! সুদ নেবে না ?
প্র। না।
ডাকাইতেরা। জয় হউক মায়ি। আজ পরীক্ষা করিয়াছিলে ?
হাঁ। যা করিয়াছি, তাহা তোমরা লইয়া যাও। —এই বলিয়া প্রফুল্ল যে শত স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা ডাকাইতদের দিলেন।
পাইয়া ডাকাতেরা আহ্লাদে উন্মত্ত হইল। কেহ প্রফুল্লকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, কেহ "মার জয় হউক" বলিয়া নাচিতে লাগিল। কেহ বলিল, "আজ হইতে তুমি আমাদের মা, আমরা তোমার ছেলে।" সকলেই প্রফুল্লের স্তব স্তুতি করিতে লাগিল। তারপর যে দস্যু কথোপকথনের প্রধান ভার লইয়াছিল, সে বলিল, "মা ! তুমি কোথায় থাকিবে ? কোথায় তোমার দেখা পাইব ?"
প্র। আমি এইখানেই থাকিব।
ডা। তুমি ছেলেমানুষ, একা এ বনের ভিতর ভাঙ্গা বাড়িতে থাকিবে ?
প্র। তোমরা থাকিতে আমার ভয় কি ?
ডা। তা নিশ্চিন্ত থেকো মা ! আমরা বেঁচে থাকিতে তোমার গায়ে কাঁটাও ফুটবে না।
প্র। আমার কোন ভয় নাই। আমি অনেক মন্ত্র তন্ত্র জানি।
ডা। তা বেশ মা। আর আমাদের যা হুকুম করবে তাই করবো।
প্র। তা করতে হবে। তা নইলে এখানে আমার থাকা হবে না।
ডা। তা কি করবো এখন, আজ্ঞা কর।

প্র। কাল আমার চারিজন দাসী এনে দেবে, আর আটজন পুরুষ মানুষ চাকর দেবে। তারা জল তুলিবে, কাঠ কাটিবে, বাজার করবে, আর আর কাজ করবে। তোমাদের বিশ্বাস হয়, এমন লোক এনো। আমি মনের মত মাহিয়ানা দিব।
ডা। তা সব কাল দিব। আমাদেরই ঘরের মেয়েছেলে পাঠাইয়া দিব। তোমার চাকরি করবে তার ক্ষতি কি ?
প্র। আর চারিজন দরওয়ান।
ডা। অন্য দরওয়ানে কাজ নাই মা ! আমরাই তোমার দরওয়ানী করব, আমাদের কিছু কিছু দিও। আর কি চাই ?
প্র। আর আর আমার বাজার হাট, বাসন-কোষন, কাপড়-চোপড়, ঘর-কন্নার জিনিস সব কিনিয়া দিতে হবে। এই বাড়ি মেরামত করে দিতে হবে।
ডা। সে সব আমরা পারব না। তার জন্য পাঠক ঠাকুরকে পাঠিয়ে দেব।
প্র। পাঠক ঠাকুর কে ?
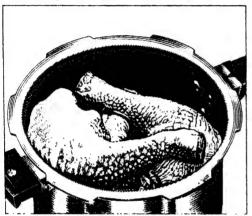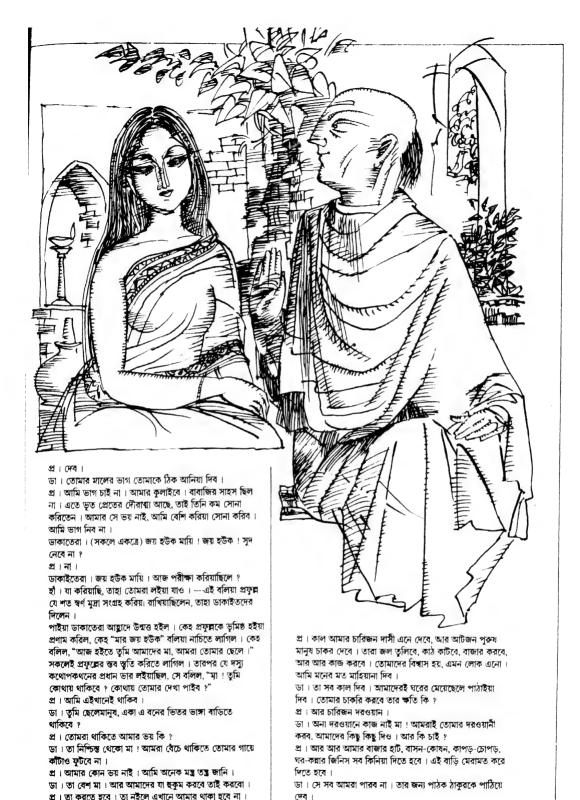
ডা। জান না? আমাদের দলপতি।
প্র। হাঁ হাঁ, বাবাজির কাছে তার নাম শুনেছি। তা পাঠিয়ে দিও।
ডাকাতেরা প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। প্রফুল্ল দ্বার বন্ধ করিয়া আবার শুইল। কিন্তু আর নিদ্রা হইল না।

গ্রন্থের পাঠে : প্রাপ্ত মোহরের একখানি নিয়ে হাটে যাবার পথে প্রফুল্লের সঙ্গে ডাকাত দলের প্রধান ভবানী পাঠকের হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত কাহিনী সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। সেখানে ডাকাতদলের কাছে সংবাদ পেয়ে ভবানী পাঠক নিজেই সকালে ভাঙা অট্টালিকায় এসে প্রফুল্লর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত উপন্যাসের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ভবানী পাঠক ও প্রফুল্লের সাক্ষাৎকার নিম্নরূপ :

বেলা প্রহরেকের মধ্যে ভবানী পাঠক, প্রফুল্লের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রফুল্ল দেখিবার প্রত্যাশা করিতেছিলেন—চৌগোঁপ্পাওয়ালা শির-উঠা পাকান-শরীর ডাকাতের সর্দার; এলো কি-না গোঁপ-কামান ফোঁটাকাটা নধর-শরীর ভট্টাচায্যি বামুন। প্রফুল্ল কিছু বিস্মিত হইল। পরিচয় পাইয়া বলিল, "আপনি কি মনে করিয়া আসিয়াছেন?"
ভবানী। তুমি ডাকিতেছিলে না?
প্রফুল্ল। কাল রাত্রে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল, তাহাদিগের দলপতিকে পাঠাইয়া দিবে—কিন্তু আপনি কে?
ভবানী। আমিই ডাকাতের দলপতি—তোমার কি প্রয়োজন আছে বল?
প্রফুল্ল কিছুই বলিতে পারিল না। গত রাত্রের ভীষণ ব্যাপারে সে বহুসংখ্যক দস্যু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াও তাহাদের চীৎকারেও চুপ করে নাই—সাহস করিয়া কথা কহিয়াছিল, কিন্তু ইহার সম্মুখে পারিল না। দুর্দশা দেখিয়া ভবানী বলিল, "তোমার ঘর বাড়ি, জিনিস পত্র, দাস দাসী চাই?"
প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। ভবানী বলিল, "তোমার এ সকল চাই আমি শুনিয়াছি। কিন্তু কেন? তোমার টাকা আছে বুঝিয়াছি, সে টাকা কয়দিন থাকিবে?
প্র। এমন কথা কেন বলিতেছেন?
ভ। বনবাসীদিগকে দেখিয়াছ ত? তাহারা তোমার টাকা কয়দিন রাখিবে?
প্র। আমার টাকা এখানে নাই।
ভ। এ কথা আমার কাছে বলা বৃথা—আমি তোমার দেওয়া পুরাণ মোহরগুলি দেখিয়াছি। বোধ হয়, তুমি এই পুরাণ বাড়িতেই টাকা পাইয়াছ—এইখানে টাকা আছে।
প্র। যদি এখানে আমার টাকা থাকে—তোমরা কি তাহা কাড়িয়া লইবে?
(প্রফুল্লের মুখ বিষন্ন।)
ভ। আমি কাড়িয়া লইব না। কে লইবে তাও আমি জানি না। কিন্তু তুমি নিঃসহায় বালিকা—এ বনের ভিতর, টাকা দূরে থাক, জাতিকুল কিছুই রাখিতে পারিবে না।
প্রফুল্ল প্রায় কাঁদিয়া ফেলে, কিন্তু যে সাহসের গুণে এত বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছিল, সেই সাহসের উপর ভর করিয়া কহিল, "নিঃসহায় কিসে? আপনাকে আমি সহায় ধরিয়াছি।"

ভ। আমি তোমার সহায় হইলে তোমার সে-সকল ভয় নাই বটে, কিন্তু আমার কথা না শুনিলে আমি কি প্রকারে তোমার সাহায্য করিব?
প্র। আপনার কি কথা শুনিতে হইবে?
(প্রফুল্ল বড় ভীত হইয়াছে।)
ভ। আমি যাহা বলিব, তাহাই শুনিতে হইবে। আমি শপথ করিতেছি, আমি তোমাকে কখন অধর্মে প্রবৃত্তি দিব না। যদি কখন কোন অধর্মে প্রবৃত্তি দিই, তুমি আমার কথা শুনিও না। তাহা ভিন্ন আর যাহা বলিব, শুনিতে হইবে।
প্রফুল্ল কাঁদিতে লাগিল। ভবানী পাঠক বলিল, "কাঁদ কেন মা?"
প্রফুল্ল চোখের জল মুছিল। বলিল, "আপনি আমাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছেন,—আপনি যাহা বলিবেন, তাহা করিব।
ভ। উভয়ে শপথ করিতে হইবে। কিন্তু সে পরে হইবে। আগে তোমার মঙ্গলার্থ, তোমাকে সৎপরামর্শ দেওয়া আমার উচিত। তোমার ভালর জন্যই বলিতেছি—এ ধন তুমি গ্রহণ করিও না।
প্র। কেন?
ভ। তুমি অনাথা—এ ধন রক্ষা করিবে কি প্রকারে? ধনের জন্য সর্বস্ব খোয়াইবে?
প্র। সেই জন্য আপনাদের সাহায্য খুঁজিতেছি। বৈরাগী এত দিন রক্ষা করিয়াছিল কি প্রকারে?
ভ। বৈরাগীর কথা স্বতন্ত্র। তুমি সুন্দরী যুবতী অনাথা—তুমি এ ধন লইয়া হয় বিপদে পড়িবে, নয়, পাপাচরণ করিয়া নরকে যাইবে।
প্র। ধনে পাপ।
ভ। হাঁ—যদি যথার্থ শ্রীকৃষ্ণে না অর্পণ কর।
প্র। সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে?
ভ। সর্বস্ব। যদি এ ধন গ্রহণ কর, তবে সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর।
প্র। সর্বস্বই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিব—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কে? কোথায়? তিনি কি প্রকারে আমার এ ধন গ্রহণ করিবেন?
ভ। তুমি লেখাপড়া জান?
প্র। না।
ভ। তবে আজি তুমি লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ কর।
প্র। কে শিখাইবে?
ভ। আমি।
প্র। লেখাপড়া শিখিব কেন?
ভ। আমি তোমাকে দুই-একখানা গ্রন্থ পড়াইব।
প্র। তাহাতে কি হইবে?
ভ। শ্রীকৃষ্ণের ধন কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে দিতে হয় তাহা শিখিবে।
প্র। সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণকে দিব—আমার ত কিছু নাই, আমি খাইব কি?
ভ। আমার বাড়ি দেখাইয়া দিব, প্রত্যহ তুমি সেখানে গিয়া ভিক্ষা করিও। যাহা ভিক্ষা পাইবে, তাহাই খাইবে।
প্র। আপনার ধন থাকিতে ভিক্ষা করিয়া খাইব?
ভ। প্রফুল্ল-মনে তুমি যদি এই ধন শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ না কর, তবে তিনি গ্রহণ করিবেন না। তিনি গ্রহণ না করিলে আমার দলের ডাকাইতেরা উহা বেবাক গ্রহণ করিবে।
প্র। শ্রীকৃষ্ণ কে? ঠাকুর ত মন্দিরে দেখি—তিনি ধন গ্রহণ করিবেন কি প্রকারে? তাঁর কি কিছু নাই?
ভ। তিনি জগদীশ্বর—সব তাঁর।
প্র। তবে তাঁর আমার ধনে প্রয়োজন কি?
ভ। লেখাপড়া শেখ—বুঝাইব। এখন কেবল এইমাত্র মনে থাকে যেন তুমি আমার মা। আমি তেমার ছেলে। আমি তোমাকে ভাল পরামর্শ বৈ মন্দ পরামর্শ দিব না।
প্র। আপনি কি সত্যসত্য ডাকাতি করিয়া থাকেন?
ভ। সত্যসত্যই। কিন্তু সে সকল কথা পরে হইবে।
প্র। কবে সে কথা বলিবেন?
ভ। যে দিন তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হইবে।'

লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছে উপন্যাসের যে-অংশ বঙ্কিম প্রথম লিখেছিলেন মুখ্যত সেই অংশেরই বিপুল সংশোধন ও পরিবর্তন ঘটেছে। বঙ্গদর্শনে ১২৮৯ পৌষ থেকে চৈত্র সংখ্যায় উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন। অতঃপর ছয় মাস পত্রিকা বন্ধ থাকে ও ১২৯০ কার্তিক পত্রিকা পুনঃপ্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অসম্পূর্ণ দেবী চৌধুরানী ওই সংখ্যা থেকে আবার লিখতে শুরু করেন। ১২৯১ বৈশাখে দেবী চৌধুরানী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় ১২৯০ কার্তিক থেকে মাঘ সংখ্যায় উপন্যাসের যতটা অংশ প্রকাশিত হয়, গ্রন্থে তার প্রায় হুবহু গৃহীত হয়েছে। কোনো কোনো স্থলে সামান্য যে পরিবর্তন ঘটেছে তা কাহিনীর দিক থেকে গুরুতর নয়। কিন্তু যে অংশ বঙ্কিমচন্দ্র-কর্তৃক বিপুল পরিবর্তিত হয়েছে তা বঙ্গদর্শন ছয় মাস বন্ধ থাকার পূর্বে প্রকাশিত অংশ; অর্থাৎ উপন্যাসের যে-অংশ কিছুকাল পূর্বে তিনি রচনা করেছিলেন।
বছরে বছরে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে 'পরিমার্জিত' করতে চেষ্টা করেছেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছু কাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তারপর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে।' তাই, ১২৮৯ চৈত্রে যে-বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখি, ১২৯১ বৈশাখে তিনি পূর্ববর্তী-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে অনেক সংশোধিত সমৃদ্ধ এবং সফল।

অঙ্কন : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ব-পশ্চিম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তরপর্ব : ৪

কৃষ্ণনগরে বিমানবিহারীদের বাড়ির একটি অংশে হঠাৎ আগুন লেগে গেল এক রাত্রে। বিমানবিহারী দু'দিন আগেই সপরিবারে দেশের বাড়িতে এসেছেন। অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা চলেছিল, তিনি এলেই প্রতিবেশীরা অনেকেই দেখা করতে আসে, খাওয়া দাওয়া হয়। রাত দশটার সময় খানিকটা ঝড় উঠে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। আগুন লাগার স্বাভাবিক কোনো কারণই নেই, কেউ লাগিয়েছে। গোয়াল ঘর আর হাঁসঘর থেকে রান্নাঘর অনেকটা দূর, কিন্তু তিন জায়গাতেই আগুন ধরেছে একসঙ্গে। সেই আগুন ছড়িয়ে গিয়েছিল বসতবাড়ির পেছন দিকে দোতলা পর্যন্ত।

শেষ রাত্রে হৈ চৈ, হুড়োহুড়ি, হাঁকাহাঁকি, পাটোপাড়া থেকে অনেকে ছুটে এসেছিল সাহায্য করতে, পাছ-পুকুর থেকে ঘড়া ঘড়া জল এনে আগুন নেবাবার চেষ্টা চলতে লাগলো। এ সময় মনে হয়েছিল গোটা বাড়িটাই বুঝি ভস্ম হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত বসতবাড়ির খুব বেশী ক্ষতি হয়নি, হাঁসগুলো সব মরে গেছে, একটা গরু দারুণ ভাবে ঝলসে গেছে। তার আর্ত চিৎকারে কান পাতা দায়। গরুটাকে বাঁচানো যাবে না, আবার মুমূর্ষু গরুটাকে মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার কথাও কেউ চিন্তা করছে না। একজন ভেটেরিনারি ডাক্তারকে ডাকতে লোক গেছে, সে কখন আসবে তার ঠিক নেই।

বিমানবিহারীর এক জ্ঞাতি দাদা রাজচন্দ্র চুরুট টানতে টানতে বিজ্ঞভাবে বললেন, এ নির্ঘাৎ নকশালদের কাজ। তোমাদের আমি আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম, বিমান!

সদ্য ভোর হয়েছে, গোয়ালঘর রান্নাঘরের খড়ের চালে প্রচুর জল ঢালা হলেও এখনও সেখান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে উঠছে ধোঁয়া। বিমানবিহারীর কাকার ছেলেরা প্রচুর খাটা খাটনি করে চলেছে, অলি আর বুলিও হাত লাগিয়েছে।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিমানবিহারী চশমার কাচ মুছলেন। রাজচন্দ্র কবে তাঁকে নকশালদের সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন, তার মনেই পড়লো না। এক ধরনের মানুষ থাকে যে কোনো ঘটনা ঘটলেই বলে, আমি তো আগেই বলেছিলাম, রাজচন্দ্র সেই দলে।

বিমানবিহারী ভাবলেন, নকশাল ছেলেদের তাঁদের বাড়ির ওপর রাগ থাকবে কেন? তাঁরা তো জমিদার বা জোতদার নন। তাঁদের পরিবারের কুড়ি বাইশ বিঘে জমি আছে মাত্র। বিমানবিহারী কলকাতায় বইয়ের ব্যবসা করেন। কৃষ্ণনগরের বাড়িটি বিক্রি না করে রেখে দিয়েছেন, এই তাঁর দোষ?

রাজচন্দ্রদাদা নিজে পুরনো কংগ্রেসী এবং তাঁর দুই ছেলেও কংগ্রেসের পাণ্ডা। বিমানবিহারীর কাকার ছেলেরা সি পি এম পার্টির সদস্য। এ শহরের ইস্কুল-কলেজের ছাত্ররা নাকি দলে দলে নকশালপন্থী হয়ে গেছে। এখন কংগ্রেস-সি· পি· এম ও নকশাল ছেলেদের মধ্যে ত্রিমুখী লড়াই চলছে নানান জেলায়। প্রতিদিনই কাগজে কয়েকটি তরুণপ্রাণ বিনষ্ট হবার সংবাদ থাকে।

বিমানবিহারীর পুত্র সন্তান নেই, দুটি মেয়ে পড়াশুনো নিয়েই ব্যস্ত, কলেজ রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত হয়নি। তাদের পরিবারটি রাজনৈতিক পরিবার নয়। তবে তাঁরা কাদের আক্রমণের লক্ষ্য?

বছরখানেক আগে বিমানবিহারী কঙ্কালের ছবি আঁকা একটি লাল কালিতে লেখা চিঠি পেয়েছিলেন। সেই চিঠিতে তাঁর কোনো অপরাধ নির্দেশ করা হয়নি। তাঁকে কোনো ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়াও হয়নি, তাঁকে যে খতমের তালিকায় রাখা হয়েছে, সেই কথাটিই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

চিঠিখানা দেখে বিমানবিহারী যে খুব ভয় পেয়েছিলেন তা নয়, বিভ্রান্তবোধ করেছিলেন। তিনি আইন ও বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রকাশ করেন, মাঝারি ধরনের ব্যবসা, এতে কৃষক আর শ্রমিক নিপীড়নের কোনো ব্যাপার নেই, তবু তাঁকে হত্যা করা হবে কেন?

চিঠিখানা তিনি পুলিশ কমিশনারকে দেখিয়েছিলেন।

পুলিশ কমিশনার তো হেসেই উঠলেন সে চিঠি দেখে। প্রথমে একটি লাল কলম নিয়ে, পরে সেটি বদলে একটি সবুজকালির কলম নিয়ে তিনি চার জায়গায় দাগ দিয়ে বললেন, এই দ্যাখো, বিমান, তিনটে বানান ভুল। এক জায়গায় কনস্ট্রাকশান ভুল। নকশালরা এ চিঠি লিখতে পারে না।

গ্রাফটার অল, ভালো ভালো ছাত্রেরা ঐ দলে ভিড়েছে, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা আছে, যতই মাথা বিগড়োক, তারা লেখাপড়া জানে। তারা এরকম বাজে চিঠি লিখবে না। কতকগুলো লুম্পেন এখন নকশালদের নাম করে যা তা করে বেড়াচ্ছে। তুমি এ চিঠিটা ফেলে দিতে পারো। আর তুমি যদি চাও, পুলিশ প্রোটেকশানের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে সব সময় একজন সেপাই ঘুরবে, এ ব্যাপারে বিমানবিহারীর একেবারে মনঃপূত হয়নি।

কমিশনার আরও বললেন, দেখো, এরপর বোধ হয় তোমার কাছে দু'পাঁচ হাজার টাকা চাঁদার জুলুম করতে আসবে। আমাদের কাছে খবর আছে, এরকম এক্সটরশান চলছে। অনেকে ভয় পেয়ে দিয়ে দেয়। সেরকম কোনো ইন্ডিকেশন পেলেই তুমি টক করে আমাদের খবর দিয়ে দেবে। এই গভর্মেন্টের আয়ু আর বেশি দিন নেই, চায়না ব্যাক আউট করেছে...

বিমানবিহারী জিজ্ঞেস করেছিলেন, আচ্ছা রুনু, ছেলেগুলো তো একটা বড় আদর্শ নিয়েই এসেছিল, হয়তো তারা মিস গাইডেড, কিন্তু ভালো ভালো ছেলে, কিন্তু তাদের যে ধরে ধরে মেরে ফেলা হচ্ছে, এটা কি ঠিক ; এটা তোমরা আটকাতে পারো না ?

---খুন করলে যে শাস্তি পেতে হয়, তা তো একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। এরা যে রাস্তায় ঘাটে যাকে-তাকে খুন করছে, চায়না রাশিয়াতেও তো এরকম ইনডিসক্রিমিনেট কিলিং দিয়ে রেভোল্যুশন শুরু হয়নি। আমরাও তো কিছু পড়াশুনো করেছি, নাকি ?

ঘরে অন্য লোক ঢুকে পড়তে আর বেশী কথা হয়নি। বিমানবিহারী উঠে পড়েছিলেন। কমিশনার তাকে আশ্বস্ত করবার জন্য আবার বলেছিলেন, তুমি চিন্তা করো না। এইসব আজে বাজে চিঠি পেয়ে কয়েকজনের হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে শুনেছি, ইচ্ছে করলে কিছুদিন অন্য জায়গায় বেড়িয়ে এসো...এদের ব্যাপারটা শিগগিরই শেষ হয়ে যাচ্ছে...তোমার সেই বন্ধুর ছেলে ভালো আছে তো ?

এর দু'তিন দিন বাদেই কুমোরটুলীতে একজন হাইকোর্টের বিচারক খুন হলেন দিনের বেলায়, প্রকাশ্য রাস্তায়।

তখন বিমানবিহারী ভাবলেন, তিনি যে আইনের বই ছাপেন, সেটাই কি তবে দোষের ? এদেশে এখনও ব্রিটিশ-রচিত আইনই মোটামুটি চলে, তার ওপর ঐ বিপ্লবী ছেলেদের রাগ আছে ?

পুলিশ খুনের পর, বিচারক, অধ্যাপক, ভাইস চ্যান্সেলর খুন শুরু হয়ে গেল। কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় গিয়ে বিমানবিহারী শুনলেন যে টালায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেও নাকি পুলিশ পাহারা বসেছে, তারাশঙ্করের নামেও ঐ রকম লাল কালিতে লেখা জঘন্য ভাষায় চিঠি এসেছে।

বিমানবিহারী কল্যাণীর কাছে ঐ লাল চিঠির কথা গোপন রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পুলিশ কমিশনারের স্ত্রীই তাকে একদিন ফোন করে কথায় কথায় জানিয়ে দেন। কল্যাণী দারুণ ভয় পেয়ে গেলেন, বিমানবিহারী তাঁকে কিছুতেই শান্ত করতে পারলেন না, সপরিবারে তাঁকে চলে যেতে হলো বেনারস।

কুমোরটুলীর ঐ বিচারক খুন হবার পর বিমানবিহারী তাঁর বন্ধু প্রতাপ সম্পর্কেও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রতাপ জেদী মানুষ, কারুর সঙ্গে নরম নরমভাবে কথা বলা তাঁর ধাতে নেই। এখন যা দিনকাল, কালীপুজোর চাঁদা দিতে অস্বীকার করলেও পেটে ছুরি বসিয়ে দেয়।

বেনারসে বেশ বড় একটা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। বিমানবিহারী প্রতাপকেও তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে বেনারস যাবার জন্য অনেক অনুরোধ করেছিলেন, প্রতাপ রাজি হননি। বিমানবিহারী মমতাকেও গিয়ে ধরেছিলেন, মমতা ম্লান হেসে বলেছিলেন, আপনার বন্ধু একবার না বললে কি তাকে দিয়ে হাঁ করানো যায়, আপনি জানেন না ?

বিমানবিহারী সূক্ষ্ম অনুভূতির মানুষ। প্রতাপের অসম্মতির কারণটা তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। দুই পরিবারের আর্থিক অবস্থার অনেক তফাত ! বেনারসে এক সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে গেলে বিমানবিহারীই বেশীরভাগ খরচপত্র চালাবেন, সেটাই মেনে নিতে পারবেন না প্রতাপ ! তাঁর মালখানগরের বংশগৌরব তাতে নষ্ট হবে ! বিপদের সময় মানুষ কি বন্ধুর কাছে আশ্রয় নেয় না ? তা হলে আর বন্ধুত্ব কী ? প্রতাপের সব কিছুই আলাদা। বিমানবিহারী কিছু টাকা প্রতাপকে ধার হিসাবে দিতে চেয়েছিলেন, প্রতাপ বলেছিলেন, তোমার কাছে আমার ঋণের পাহাড় জমে গেছে, আর বাড়াতে চাই না !

বেনারসে দু'মাস নিরুপদ্রবেই কেটেছিল। কল্যাণী কিছুদিন হাঁপানীতে ভুগছিলেন, তাঁর বেশ স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো। স্থানীয় বাঙালী ক্লাবের দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে গান গেয়ে বেশ নাম হলো তাঁদের ছোট মেয়ে বুলির। অলি গান শেখা ছেড়ে দিলেও বুলির খুব গানের দিকে আগ্রহ, সে এর মধ্যেই রেডিওর অডিশনে পাস করেছে।

আগ্রায় বেড়াতে গিয়ে দেখা হলো জাস্টিস স্বরূপ মিত্রের সঙ্গে। তিনিও তিন মাস ধরে আগ্রায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন। এ যেন সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার অবস্থা, বাধ্য হয়ে কলকাতা ছেড়ে বাইরে থাকা ! এরকম কতজন যে ঐ রকম লালকালির চিঠি পেয়েছে কে জানে !

স্বরূপ মিত্রের ছেলে প্রবীর থাকে পশ্চিম জার্মানিতে, সে দেখা করতে এসেছে বাবা-মার সঙ্গে। সে তাদের পশ্চিম জার্মানিতে নিয়ে যেতে চায়। প্রবীর খুব চমৎকার ছেলে। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি মিষ্টি ব্যবহার। প্রবীর এখনো বিয়ে করেনি শুনেই কল্যাণী দারুণ উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। এই প্রবীরের সঙ্গে অলির সম্বন্ধ করা গেলে একেবারে রাজযোটক হতো !

জ্যোৎস্নারাতে সবাই মিলে তাজমহল বেড়াতে যাওয়া হলো, প্রবীরের সঙ্গে অনেক গল্প করলো অলি, কিন্তু তারপর আর কিছুই না। বিয়ের প্রস্তাবে সে কান দিতেই চায় না একেবারে। এখনকার তরুণ-তরুণীরা বেশ সাবলীল ভাবে মেলামেশা করে চায়ের দোকানে গল্প করে, এক সঙ্গে বেড়াতে যায়, তবু যে তাদের কথায় কথায় প্রেম হয়ে না, এটাই বুঝতে পারে না কল্যাণী। তাঁদের কালে বয়ঃসন্ধির পর থেকেই মেয়েদের বিয়ের জন্য প্রস্তুত হতে হতো। প্রায় প্রতিদিনই এই প্রসঙ্গে শুনতে হতো মাসি-পিসি-আত্মীয়স্বজনদের কথা, বিয়েটাই যেন ছিল মেয়েদের জীবনের প্রধান ঘটনা। আর এখন মেয়েরা বিয়ের খুব ভালো সম্বন্ধও উড়িয়ে দেয় এক কথায়।

বিমানবিহারী অলির বিয়ের ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখান না। মেয়ে যদি বিয়ে একেবারেই না করে, তাতেও তাঁর আপত্তি নেই, মেয়ে তাঁর ব্যবসা দেখবে। অলি এর মধ্যেই তাঁর প্রকাশনার অনেকটা ভার নিয়েছে।

কলকাতায় ফিরে আসার পর বিমানবিহারী খবর পেলেন যে প্রতাপের ওপর একবার আক্রমণ হয়ে গেছে এর মধ্যে। তারা বেনারস যাবার এক সপ্তাহের মধ্যেই। প্রতাপ চিঠিতে কিছুই জানাননি।

শিয়ালদার কাছেই, প্রতাপ আদালত থেকে বেরুবার পর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন, সরকার থেকে গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে, তিনজন হাকিম এক গাড়িতে যাতায়াত করেন, আর দু'জন ছিলেন প্রতাপের খানিকটা পেছনে। একটি ছেলে হঠাৎ যেন তাঁর সামনে মাটি ফুঁড়ে উঠে একটা ছুরি তুললো। এক সময় ফুটবল খেলতেন প্রতাপ, এখনও তাঁর স্নায়ু শিথিল হয়নি, তিনি হাতের গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটি সঙ্গে সঙ্গেই তুলে ধরলেন বুকের কাছে, ফলে ছুরিটা তাঁর ডান বাহুতে খানিকটা ঘেঁসে গেল। পরের মুহূর্তেই প্রতাপ সেই ব্যাগটি দিয়ে ছেলেটির মুখে একটা আঘাত করলেন। তারপরই হৈ চৈ উঠে গেল, ছেলেটির আরও দু'জন সঙ্গী ছিল, তারা একটা বোমা ফাটালো, সেটা অবশ্য পালাবার পথ পরিষ্কার করবার জন্য।

ছেলে তিনটিকে ধরা গেল না। কেউ অবশ্য তাদের ধরার জন্য পিছু ধাওয়াও করেনি।

প্রতাপের জামা রক্তে ভিজে গেলেও প্রতাপের আঘাত তেমন গুরুতর না। অন্য হাকিমদের অনুরোধেও তিনি হাসপাতালে যেতে রাজি হননি, সোজা বাড়ি চলে এসেছিলেন, নিজের রুমাল দিয়ে বেঁধে নিয়েছিলেন ব্যাণ্ডেজ।

বিমানবিহারীর সঙ্গে দেখা হবার পর প্রতাপ বলেছিলেন, আরে না না, ওরা আমাকে মারতে আসেনি। আমাকে নিশ্চয়ই অন্য কারুর বদলে ভুল করে...। আমাকেই টারগেট করলে কি ওরা এত সহজে ছেড়ে দিত ? ওরা তিনজন ছিল, সঙ্গে বোমা ছিল...। আমাকে ওরা মারবে কেন বলো ! আমি তো ক্রিমিন্যাল কেস বা পলিটিক্যাল কেস করি না। কোনো নকশাল ছেলেকে শাস্তিও দিইনি...

কী জন্য যে কে কাকে মারছে সেটাই তো বোঝার উপায় নেই, যাদবপুরের ভাইস চ্যান্সেলর যেদিন রিটায়ার করলেন, সেদিনই বাড়ি ফেরার

পথে তাঁকে খুন করার কী যুক্তি থাকতে পারে ? সব খুনই কি নকশাল ছেলেরা করছে ? এখন তো খুনের কারবারে নেম পড়েছে অনেকেই। এমনকি কারুর ওপর ব্যক্তিগত রাগ থাকলেও তাকে খুন করে সেটা রাজনৈতিক হত্যা নামে চালিয়ে দেওয়া যায়। এই সব খুন নিয়ে পুলিশও মাথা ঘামায় না, তারা নকশালদের মারতে ব্যস্ত।

বাবলুর বাবা হিসেবে অন্য পার্টির ছেলেদেরও রাগ থাকতে পারে প্রতাপের ওপর, তারাই হয়তো প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে কথা বিমানবিহারী বললেন না ! ছেলের ব্যাপারে প্রতাপ খুবই স্পর্শকাতর। প্রতাপের এখনও দৃঢ় ধারণা শিলিগুড়িতে বাবলু নিজের হাতে কারুকে খুন করেনি, তার কোনো বন্ধু-টন্ধুর দায়িত্ব সে ইচ্ছে করে নিজের কাঁধে নিয়েছে।

প্রতাপকে সাবধানে চলা ফেরা করার জন্য উপদেশ দেওয়ার কোনো মানে হয় না। বিমানবিহারী নিজেই বা কী করে সাবধান হবেন ? চোর-ডাকাতদের সম্পর্কে সাবধান হওয়া যায়, যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হলে মাথা বাঁচানোর চেষ্টা করা যায়, কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা খুনী হয়ে উঠলে তাদের সম্পর্কে আর কী করে সতর্ক হওয়া যাবে ? এরা তো প্রায় নিজেদের বাড়ির ছেলেরই মতন। নানান কাজে, এই বয়েসী ছেলেরা বাড়িতে বা অফিসে অনবরত আসে, তাদের যে-কেউ হঠাৎ একটা ছুরি বা রিভলভার বার করতে পারে। রাস্তাঘাটে যে-কেউ একটা কথা বলার ছুতো করে হঠাৎ মেরে দেয়। এই রকমই তো ঘটছে। সন্ধের পর কোনো কোনো রাস্তায় যাওয়াই নাকি অপরাধ ! কাগজে এরকম খবর বেরোয় যে মফস্বলের কোনো ছেলে হয়তো কলকাতায় এসে কোনো আত্মীয়ের বাড়ির ঠিকানা খুঁজছে, তাকে স্পাই সন্দেহ করে খতম করে দেওয়া হলো ! পুলিশ থেকে তো ম্যাপ এঁকে ঘোষণা করে দেওয়া হয়নি যে সন্ধের পর কলকাতার কোন কোন রাস্তায় ঢোকা নিষিদ্ধ !

বিমানবিহারী গাড়িতে চলাফেরা করেন, তাঁর তবু খানিকটা নিরাপত্তা আছে। বাড়ির দরজায় একজন দারোয়ান বসিয়েছেন। কিন্তু প্রতাপ যেন বেপরোয়া। আদালতে যাওয়া আসার সময়টুকু শুধু তিনি গাড়ি পান, কিন্তু অন্য সময় বাড়িতে বসে থাকার মানুষ তিনি নন। প্রতিদিন পায়ে হেঁটে বাজারে যান। ছুটিছাটার দিনে বাসে-ট্রামে ঘোরেন। একবার যার ওপর আক্রমণ করে বিফল হয়েছে, পরের বার তাকে পুরোপুরি শেষ করে দেবার জন্য যে আততায়ীরা সুযোগ খুঁজবে, সে সম্পর্কে প্রতাপের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। যা হয় হোক, এই রকমই যেন তাঁর মনোভাব।

এবারেও কৃষ্ণনগরে আসার আগে,বিমানবিহারী প্রতাপকে সঙ্গে আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মমতার সামান্য শরীর খারাপ, এই অজুহাতে প্রতাপ এড়িয়ে গেছেন। মমতা আলসারে কষ্ট পান, কৃষ্ণনগরের জল ভালো, এখানে কয়েকদিন থাকলে মমতার উপকারই হতো।

কলকাতার রাস্তায় এখন সব সময় ভয়ে ভয়ে চলতে হয়। সারা ভারতেই এখন কলকাতা সম্পর্কে বিষম বদনাম। অফিসের কাজে বা ব্যবসার কাজেও বম্বে ও দিল্লি থেকে কেউ এখন কলকাতায় আসতে চায় না। বিদেশী টুরিস্টরা তো কলকাতার নাম শুনলেই আঁতকে ওঠে। কৃষ্ণনগরে এসে বিমানবিহারী অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলেন। এটা তাঁর জন্মস্থান, নিজের জায়গা, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকে তাঁদের পূর্ব পুরুষের ইতিহাস আছে এই শহরে। তাঁদের এক পূর্ব পুরুষের সঙ্গে কবি রামপ্রসাদের পরিচয় ছিল। রামপ্রসাদের নিজের হাতে লেখা দু'খানি গানের পাণ্ডুলিপি তাঁদের পারিবারিক সম্পদ।

বিমানবিহারী এই শহরের অনেক মানুষকে চেনেন, বছরে তিন চারবার এখানে নিয়মিত আসেন, তাঁর মায়ের নামে এখানে একটি স্থানীয় স্কুলের একাংশে পাকা বাড়ি তুলে দিয়েছেন। জ্ঞাতিদের সঙ্গে কোনো শত্রুতা নেই, তাঁর কাকাদের সঙ্গে সম্পত্তি আপোসে ভাগ করা হয়ে গেছে। কাকা এখন জীবিত নেই কিন্তু তাঁর ছেলেরা তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। এখানে কারা এসে তাঁর বাড়িতে আগুন লাগালো ? আগুনে যত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার জন্য নয়, তাঁর জন্মস্থানে কেউ তাঁকে অবাঞ্ছিত মনে করে, এই ধাক্কাটাই বেশী করে বিমানবিহারীর মনে লেগেছে !

গো-বদ্যি আসবার আগেই থেমে গেল আহত গরুটার আর্তনাদ। যারা আগুন লাগিয়েছে তারা গোয়ালঘর আর হাঁসঘরের দরজা খুলে দিতে পারতো না ? তাহলে অবোলা প্রাণীগুলোকে মরতে হতো না এমন ভাবে।

মানুষের ওপরেই তো মানুষের রাগ থাকে। ওদের ওপরে তো নয়?

একটা জিনিসও খোয়া যায়নি, শুধু তিনটে গরু চুরি করে নিলেও অনেক টাকা পেত। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, চোর-ডাকাতদের কাজ নয়, যারা আগুন লাগিয়েছে তাদের উদ্দেশ্য শুধু ধ্বংস করা!

অলি দু'কাপ চা নিয়ে এসে বললো, বাবা তোমরা ভেতরে যাও, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে কী করবে?

রাজচন্দ্র বললেন, ইস অলি-মা, তোমার মুখখানা যে কালি বর্ণ হয়ে গেছে। তুমি আর আঁচের কাছে যেও না!

অলি আঁচল দিয়ে মুখ মুছে দুঃখী গলায় বললো, বাবা, তিনটে হাঁস মরে গেছে, আর দুটোও বেশীক্ষণ বাঁচবে না। ওগুলো কী হবে?

বিমানবিহারীর বদলে রাজচন্দ্রই বললেন, ফেলে দিতে হবে। মরা হাস খেতে নেই। কিংবা দ্যাখো যদি ঐ যারা বাইরে থেকে এসেছে তারা কেউ নেয়!

অলি বললো, আমি খাবার কথা বলিনি। যে-দুটো এখনো বেঁচে আছে, ওদের গায়ে কী বার্নল লাগানো যায়?

বিমানবিহারী কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি বাড়ির বার মহলের দিকে চলে গেলেন। রাজচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু রাজচন্দ্র এখন তাঁর সঙ্গ ছাড়বেন না। কথা বলা তাঁর নেশা, শেষ রাত্রে তিনি ঘুম ভেঙে উঠে এসেছেন, এখন বিমানবিহারীর ওপর প্রচুর উপদেশ বর্ষণ করে তার ক্ষতিপূরণ করবেন।

বিমানবিহারীর সঙ্গে যেতে যেতে রাজচন্দ্র নিচুগলায় বললেন, তোমার ঐ খুড়তুতো ভাইগুলো···মুখে খুব মিষ্টি ভাব থাকে, ওদের বিশ্বাস করো না, এই আমি বলে দিলাম, কখন যে কুলোপানা চক্কোর তুলবে তার ঠিক নেই!

বিমানবিহারী বললেন, রাজুদা, ছোটকাকার ছেলেদের সঙ্গে আমার তো আর কোনো স্বার্থের সম্পর্ক নেই। তবু দেখুন ওরা নিজেরাই গায়ে পড়ে আমার উপকার করতে এসেছে।

—ওসব লোক দেখানো ব্যাপার, বুঝলে? ওরাই যে আগুন লাগায়নি, তার কোনো গ্যারান্টি আছে? এটাই ওদের কায়দা বুঝলে, বাঁ হাত বাড়িয়ে তোমাকে সাহায্য করবে, আর ডান হাতে তোমাকে ছুরি মারবে!

রাজচন্দ্র একটু আগেই নকশালদের দায়ী করেছিলেন, এখন আবার বিমানবিহারীর খুড়তুতো ভাইদের নামে দোষ চাপাচ্ছেন। বয়েস হয়েছে, কখন কী বলেন মনে রাখতে পারেন না।

এটাও বিমানবিহারী জানেন যে, কিছু কিছু লোকের ব্যাধি থাকে সব সময় অপরের নামে নিন্দে করা। এই যে রাজচন্দ্র তাঁর খুড়তুতো ভাইদের নামে তাঁকে বিষিয়ে দিতে চাইছেন, এতে ওঁর নিজের কোনো লাভ নেই। শুধু শুধু ঝগড়া বাধিয়েই আনন্দ।

বিমানবিহারী রাজচন্দ্রের কোনো কথায় গুরুত্ব দেন না, কিন্তু বয়েসে বড় বলে ওঁর মুখের ওপর কোনোও কড়া কথা বলতে পারেন না।

রাজচন্দ্রের বয়েস সত্তরের ওপর, শরীরে এখনও বেশ সামর্থ্য আছে। সারা জীবন জীবিকা অর্জনের জন্য কোনো কাজ করেননি, পারিবারিক সম্পত্তিতেই চলে গেছে। কলকাতা থেকে তিনি দামী চুরুট আনান, আরও তাঁর কিছু কিছু শখের জিনিস কলকাতা থেকে আসে। কিন্তু তিনি নিজে কলকাতায় যেতে চান না। কলকাতার জল-হাওয়া তাঁর সহ্য হয় না।

—অলি-মা'র বিয়ে দাও এবার! দুটো পাস তো দিয়েছে। এরপর মেয়ে অরক্ষণীয়া হয়ে যাবে। আমাদের এখানে একটি সুপাত্র আছে, সম্বন্ধ করবো নাকি? ছেলেটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ভালো বংশ।

—রাজুদা, অলির বিয়ের ব্যাপারটা আপনি অলিকেই জিজ্ঞেস করবেন। তার অমতে তো কিছু হবে না।

বিমানবিহারীর কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বিরক্তি ফুটে উঠেছিল তাই রাজচন্দ্র চুপ করে গেলেন। বাড়িতে আগুন লেগেছে, সেই চিন্তায় বিমানবিহারী নিমগ্ন, এখন কি মেয়ের বিয়ে নিয়ে চিন্তা করার সময়?

একটু পরে রাজচন্দ্র আবার সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, বিমান, তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি নাকি একটা খুনে নকশাল ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়ে দিয়েছো?

এবার বিমানবিহারী দারুণ চমকে উঠলেন। যে-ব্যাপারটি অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল, তা কৃষ্ণনগরেও পৌঁছে গেল কী করে? বাতাসে কী খবর

ছড়ায়? মাত্র তিন-চার জন ছাড়া বাবলুর ঘটনা আর কারুরই জানবার কথা নয়। অথচ যে রাজচন্দ্র কখনো কলকাতায় যান না। তাঁর কানেও এ খবর এতদিন পরে পৌঁছে গেছে!

রাজচন্দ্র আবার বললেন, কে যে কার ওপর এখন বদলা নিচ্ছে তার ঠিক নেই, বুঝলে? নকশালদের মধ্যেও দল ভাগ হয়ে যাচ্ছে শুনছি। তুমি ঐ যে একজনকে দেশের বাইরে পাঠিয়েছো, সেজন্য তোমার ওপর অনেকে রেগে আছে। সাবধান, বিমান, সাবধানে থেকো! *(ক্রমশ)*

সমর সেন

এই প্রথম এত কাছে থেকে আমরা এক দেহে দুটি মানুষের মৃত্যু দেখলাম।
দীর্ঘ একচল্লিশ বছরের স্বেচ্ছা-নীরবতার পর আধুনিক বাংলা গদ্যকবিতার অন্যতম দিশারি কবি সমর সেন গত ২৩ আগষ্ট ১৯৮৭ অতি অকস্মাৎ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। সেই সঙ্গে চলে গেছেন আর একটি মানুষ যিনি আমৃত্যু একটানা দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নির্ভীক নিরপেক্ষ রাজনৈতিক সাংবাদিকতায় অগ্রণী ছিলেন। সম্পাদক সমর সেন এবং কবি সমর সেন উভয়েই ছিলেন বুদ্ধিজীবী নগর বাংলার শেষ স্বাধীন সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রয়ানের সঙ্গে সঙ্গে উদার মননশীল চক্ষুষ্মান একটি যুগও বুঝি চোখ বুজলো চিরদিনের মত। এবং শেষ নিঃশ্বাস পড়ল প্রাক স্বাধীনতা পর্বের ধ্রুপদ-খেয়ালে বাঁধা বুদ্ধিদীপ্ত বাংলা কবিতার। এক অর্থে রোমান্টিক অ্যান্টি রোমান্টিসীজমেরও।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিষ্প্রদীপ দিনগুলি আর আত্মঘাতী সংঘর্ষের আঁধি পেরিয়ে যাঁরা সদ্য বাংলা কবিতায় এসেছিলেন, কবি হিসেবে কিংবা পাঠক হিসেবে, তাঁদের মুখে মুখে তখন সমাজের রূঢ় ভাষ্যকার সমর সেনের কিছু নিকষপঙক্তি প্রায়ই শোনা যেত : আধুনিক বাংলা কবিতার তৎকালীন পাঁচ প্রধানের পাশে তিনি ছিলেন আর এক প্রধান এবং এক অনন্য কবি। 'মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন, তার পর আলকাতরার মত রাত্রি', কিংবা 'এখানে সন্ধ্যা নামল, /শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শুয়োরের চামড়ার মতো,/ গলিতে গলিতে কেরসিনের তীব্র গন্ধ,/ হাওয়ায় ওড়ে শুধু শেষহীন ধুলোর ঝড় ;/ এখানে সন্ধ্যা নামলো শীতের শকুনের মতো।'
অনেক টুকরো কথার সচিত্র টিপ্পনী ও তির্যক শ্লেষে ভরা তাঁর কবিতার ক্ষিপ্র ভঙ্গিটি একদিকে যেমন সুবোধ্য সরলীকরণের দিকে এগিয়েছে অন্যদিকে তেমনি গদ্য কবিতার ছন্দ ও ছাঁচ পাল্টে দিয়েছে। কবিতার কক্ষপথ রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছে অনেক দূরে! বঙ্গীয় সময় ও সমাজের বিরোধাভাস বেআব্রু হয়ে ধরা পড়েছিল সমর সেনের নগর চিত্রে: দেশপ্রেম এবং রাজনীতির খাঁই থেকে শুরু করে কামুক কলকাতার অপ্রকৃতিস্থ জীবনযাপন কিছুই তাঁর কটাক্ষ এড়িয়ে যেতে পারেনি। মধ্যবিত্ত বাঙালীর দাম্পত্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত প্রেম ইস্তক। 'আর কোন দিন কি মুছে যাবে/ স্যাকারিনের মতো মিষ্টি একটি মেয়ের প্রেম!' ব্যঙ্গ এবং আর্তি কোথাও এরকম সহবাস করেছে। সমর সেনের কবিতার উদ্ভট আধুনিকতা এবং অশ্লীলতা নিয়ে শনিবারের চিঠি প্রথম দিকে উঠে পড়ে লাগলেও এবং কিছু মানুষের কাছে তা কবিতার অক্ষম প্রয়াস মনে হলেও বুদ্ধদেব বসুই প্রথম এই তরুণতম কবির মধ্যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। বিষ্ণু দে ধূর্জটীপ্রসাদও তাঁর কবিতাকে স্বাগত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। অনুরাগীজনের বৃত্ত ক্রমেই প্রসারিত হতে থাকে। সমর সেনের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল সম্ভবত 'পূর্বাশায়'। তখনও তিনি গদ্যকবিতার দিকে হাত বাড়াননি, বুদ্ধদেব বসুই তাঁকে এব্যাপারে মনোযোগী করে তোলেন। অবশ্যই বেশী কবিতা লেখেননি সমরবাবু, আঠার বছর বয়স থেকে তিরিশ বছর, ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বারো বছরে মাত্র পাঁচটি চটি বই তাঁর সাকুল্যে কবিকৃতি। প্রথম কাব্যগ্রন্থটি বেরিয়েছিল নিজের খরচে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সোনার মেডেল বেচে। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে যখন তাঁর কবিখ্যাতি তুঙ্গে, বহুল আলোচিত তো বটেই, তরুণ কবিদের মুখে মুখে তখন নস্টালজিক দীর্ঘশ্বাসের মত তাঁর কবিতার লাইন ঘুরছে, যখন সিগনেট প্রেস বের করলেন অতিশোভন কলেবরে 'সমর সেনের কবিতা' (১৯৫৪), তাঁর গ্রন্থিত এবং অগ্রন্থিত কবিতার সংগ্রহ, তখন মনে হয়েছিল, অনেকেরই মনে হয়েছিল, দীর্ঘ আট বছর পরে কবি বোধহয় আবার প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছেন। যে দেশে সব মানুষেরই অবসর গ্রহণের একটি বয়স বাঁধা আছে কিন্তু কবির নেই, যে দেশে পরশুরামের অভিশপ্ত কুঠারের মত কবির আত্মঘাতী কলম হাত থেকে খসে না, কবিতাকে তাঁরা শেষ দিন পর্যন্ত অবৈধ পেনশনের মত ভোগ করে যেতে চান সে দেশে সমর সেনের এই অকাল স্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণ কেবল বিস্ময়ই উদ্রেক করে। সমর সেনের রচিত কবিতার সংখ্যা বেশী নয় সেকথা আগেই বলা হয়েছে। কবিতা সংগ্রহটিকে ধরলে তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা মোট ছটি। কয়েকটি কবিতা (১৯৩৭), গ্রহণ (১৯৪০), নানাকথা (১৯৪২), খো[লা] চিঠি (১৯৪৩), তিন পুরুষ (১৯৪৪) ও সমর সেনের কবিতা (১৯৫৪)। ১৯৭৮ সালে এই শক্তিমান কবির 'বাবুবৃত্তান্ত' একটি অসামান্য গদ্যগ্রন্থ আবার আমাদের চমকে দিয়েছিল। প্রায় দেড়শ পৃষ্ঠার শীর্ণকায় এই বইটির কিন্তু ধার এবং ভার দুইই আছে। এটি শুধু সমর সেনের আত্মকথাই নয় বিগত এক দীর্ঘ বিস্মৃত অধ্যায়ের জমাখরচের রোমাঞ্চকর হিসেবের খাতা। বহু খ্যাতকীর্তি অবিস্মরণীয় মানুষের অতি ব্যক্তিগত অ্যালবামের মতই মূল্যবান। কলকাতা, দিল্লী, মস্কো প্রধানত এই তিন শহরের জীবনছন্দ, বিশেষ করে বাবু কলকাতার চোখের জল যেন এরমধ্যে ধরা রয়েছে। অসামান্য গদ্যের মোচড়ে তাঁর ঠোঁটের বঙ্কিম হাসিটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এমন খোলাখুলি অথচ ক্ষিপ্র আঁচড়ে তিনি পরিজন ও পারিপার্শ্বিক সুদ্ধ নিজের সতর্ক ছবিটি ধরে দিয়েছেন যে পড়ার পর মনের মধ্যে একটাই আপসোস পাক খেতে থাকে যে বইটি এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল কেন। কৌতূহলী পাঠক অনুসন্ধান করলে এর মধ্যে সমর সেনের নেপথ্য জীবনের এমন সব দুর্লভ সূত্র পেয়ে যাবেন যা থেকে একটা পরিপূর্ণ ইতিহাসই উঠে আসবে রহস্য গল্পের মত। সমরবাবু এই একবারই আমাদের ঠকালেন, এই অসামান্য স্মৃতিকথাটির এক একটি চূড়ান্ত বিন্দুতে হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল তুলে ইঙ্গিতে হেসে গেলেন। বাবুবৃত্তান্ত বইটির মধ্যে তাঁর কয়েকটি বুদ্ধিদীপ্ত রম্য নিবন্ধও সংযোজিত হয়েছে। এর মধ্যে 'উড়ো খৈ' পর্যায়ের লেখাগুলি আনন্দবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছিল।
'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' খ্যাত আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের পৌত্র সমর সেনের জন্ম হয়েছিল বাগবাজারের বিশ্বকোষ লেনের এক বিশাল যৌথ পরিবারে, ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ নভেম্বর। তাঁদের আদি নিবাস ছিল ঢাকার মানিকগঞ্জে। বাবা অরুণচন্দ্র ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন্স, রংপুরের কারমাইকেল প্রভৃতি কলেজ ঘুরে শেষ পর্যন্ত থিতু হয়েছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে। সমরবাবুর মাতৃকুল ছিলেন পশ্চিমবঙ্গীয়। সহোদর ছয় ভাই এবং তিন বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। আট বছর বয়সে হাতে খড়ি,

বাংলা দেশের তাবৎ বুদ্ধিজীবীর শেষ নিকটবর্তী প্রিয়জন বলতে একজনই ছিলেন, তিনি সমর সেন। কবি সাংবাদিক সম্পাদক ও অনুবাদক এই চতুর্মুখ ভূমিকায় কৃতবিদ্য হয়েও রাজনীতির রণাঙ্গনে তিনি ছিলেন স্বার্থহীন শব্দহীন লড়াকু এক নেপথ্য ব্যক্তিত্ব। ন বছর আগে প্রকাশিত তাঁর একমাত্র গদ্যগ্রন্থ 'বাবুবৃত্তান্ত'-এ রয়ে গেল কিছু অন্তরঙ্গ আত্মকথা।

২ বছর বয়সে মাতৃবিয়োগের পর কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হন। বিলম্বে বিদ্যাভ্যাস শুরু হলেও পড়াশোনায় দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিলেন। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। অস্থির একগুঁয়ে এবং চাপা স্বভাবের। পৈতৃক সূত্রেই আড্ডা ছিল তাঁর রক্তে। ফলে পড়াশোনায় বেশী সময় দিতেন না। স্কটিশ চার্চ কলেজে থেকে বি এ পরীক্ষায় প্রথম হলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ-তেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। বাল্যকাল থেকেই বাগবাজারী আবহাওয়ায় এচোঁড়ে পেকেছিলেন, সেই সঙ্গে ইংরেজীতেও। ইংরেজীটা তিনি ভালোই লিখতেন। পরবর্তী কালেও তাঁর সাংবাদিক ইংরাজী বিদেশেও প্রশংসিত হয়েছে। আপাত উন্নাসিক সমর সেনের বন্ধু ভাগ্য ছিল অসামান্য। রিসার্চ স্কলার হিসেবে দুটি বছর শুধুই আড্ডা দিয়ে রাজনীতি আর সাহিত্য চর্চা করে চলে গেলেন অধ্যাপনার কাজ নিয়ে কাঁথিতে, প্রভাতকুমার কলেজে। বেতন ১০০ টাকা। বছরখানেক সেখানে কাটিয়ে অক্টোবর ১৯৪০-এ দিল্লীতে, কমর্স্যাল কলেজে। ১৯৪১-এ দিল্লীর হরিপ্রসন্ন সেনের কন্যা সুলেখার সঙ্গে বিবাহ। কলেজের চাকরিতে মন টিকছিল না। ছুটি ছাটায় কলকাতায় এসে চাকরির চেষ্টা করেন। দিন সাতেক এক বিজ্ঞাপনী অফিসে কাজও করেছিলেন। তারপর আবার দিল্লীতে ফিরে অল ইন্ডিয়া রেডিও-র সংবাদ বিভাগে যোগ দেন। সাড়ে পাঁচ বছর একটানা এই কাজ করার পর ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে দীর্ঘ ৯ বছরের দিল্লীপর্ব চুকিয়ে কলকাতায় স্টেটসম্যান পত্রিকায় যোগ দেন। প্রায় সাত বছর এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সপরিবারে মস্কো রওনা হন অনুবাদকের দায়িত্ব নিয়ে। এখন যার নাম 'প্রগতি প্রকাশালয়' তখন সেই সংস্থার নাম ছিল 'বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়'। ওখানে বাংলা বিভাগটি তখন জমজমাট। তাঁর পূর্বপরিচিত বন্ধু কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং অভিনেতা রাধামোহন ভট্টাচার্য তখন ওখানে। ছিলেন ননী ভৌমিক, ফল্গু কর এবং শুভময় ঘোষ।

প্রায় সাড়ে চার বছর মস্কোয় ছিলেন সমর সেন। ক্রমে ওখানেও আর মন টিকছিল না। বাঙালীরা সকলেই চলে গিয়েছিলেন একে একে, আড্ডা দেবার উপযোগী ভারতীয়রাও ছিলেন না কাছে ভিতে। তার ওপর তাঁর দুই মেয়ের শিক্ষার ব্যাপারেও অসুবিধে হচ্ছিল। ফলে কলকাতায় এক বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকরি নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। সাত মাস বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করার পর হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে যুগ্ম সম্পাদকের পদে যোগ দেন। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত এই পত্রিকায় ভালোই ছিলেন। পরে একটি সংবাদ ছাপার ব্যাপারে মতভেদ হওয়ায় ইস্তাফা দিয়ে কয়েকমাস বেকার। তারপর অক্টোবর মাসের গোড়ায় এক নতুন ইংরেজী সাপ্তাহিক NOW বেরলো। হুমায়ুন কবিরের অনুরোধে এই পত্রিকার দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। এই পত্রিকাই হয়ে উঠলো তাঁর সত্যিকারের সংগঠনী কর্মক্ষেত্র। বহু সাংবাদিককে তিনি টেনে নিয়ে এলেন স্বনামে বেনামে 'নাও'-এর পাতায়। কিছু তরুণ প্রতিভাকেও হাতেকলমে তালিম দিতে থাকলেন। তাঁর কৃতিত্বে 'নাও' ক্রমশ এক দৃঢ় চরিত্র নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, কাটতি বেড়ে চলল দ্রুত গতিতে। কিন্তু সমরবাবু মানুষটি কখনোই সন্ধি জানতেন না। তাঁর একগুঁয়ে বেপরোয়া স্বভাবের জন্যে কোথাও মচকাতে প্রস্তুত ছিলেন না। পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মত ভেদ হওয়ায় ১৯৬৮ 'র জানুয়ারীতে সরে আসতে বাধ্য হলেন। স্থির করলেন আর চাকরি নয়, এবার স্বাধীনভাবেই কাজ শুরু করবেন। প্রকাণ্ড ঝুঁকি নিয়ে, অনেক পরিচিত শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে টাকা তুলে ১৮ই এপ্রিল বের করে ফেললেন নতুন সাপ্তাহিক 'ফ্রন্টিয়ার'। অনেক দুর্যোগ পার হয়ে, অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করে পরিচিত বন্ধু ও অনুরাগীজনের অকৃত্রিম ভালোবাসায় ও শ্রদ্ধায় কাগজটিকে দাঁড় করালেন সগৌরবে। একটানা বিশ বছর এই 'ফ্রন্টিয়ার'ই ছিল তাঁর শেষ প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্র, মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যেখান থেকে তিনি পিছু হটেননি। এখানে তিনি ছিলেন ত্বরিৎকর্মা, তীক্ষ্ণকলমী সম্পাদক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের মনস্তাত্ত্বিক ভাষ্যকার। এক আবেগহীন, নিষ্কম্প সত্যসন্ধানী ব্যক্তিত্ব। দেশের বর্তমান লঙ্কাকাণ্ডে তাই সমর সেনের দেহপাত অনেকটা সম্মুখ সমরে বীরবাহুর পতনের মতই মনে হয়।

মেদিনীপুরের সাহিত্য পরিষদ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বেশ কয়েকটি শাখা-পরিষৎ আছে যাদের সম্বন্ধে আমরা অনেকে সচেতন নই। এদের মধ্যে কিছুর অবলুপ্তি ঘটলেও বেশ কয়েকটি শাখা-পরিষৎ এখনও তাদের কার্যকলাপ সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে আসছে। মেদিনীপুর শাখা এদের অন্যতম। ১৩১৮ সনের ভাদ্র মাসে সাহিত্যসেবা, পুরাকীর্তি ইত্যাদি বিষয়ে চর্চা এবং প্রচারের উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে পরিষদের মুখপত্র 'মাধবী'র একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানের (১৩৪৪) সভাপতি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণ, সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের (১৩৬৮) সভাপতি ফণিভূষণ চক্রবর্তীর ভাষণ, ক্ষিতিমোহন সেনের 'বিদ্যাসাগরের মেদিনীপুর', প্রবোধকুমার ভৌমিকের 'মেদিনীপুরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ এই বিশেষ সংখ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে। অকৃতদার কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ফণিভূষণ চক্রবর্তী তাঁর চাঁছাছোলা মন্তব্যের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'মাধবী'তে প্রকাশিত তাঁর ভাষণের একটি মন্তব্য : '...আধুনিক কবিতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেও একথা সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে শেলী কীটস রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির রচনা যদি 'কবিতা' হয়, তবে আধুনিক কবিতাকেও সেই একই নামে অভিহিত করা একেবারেই যুক্তিযুক্ত নয়। এ রচনার কোন ভিন্ন নাম দেওয়া উচিত। ...এই প্রস্তাবের কারণটা একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে পরিস্ফুট করা যেতে পারে। নৃত্য একপ্রকার অঙ্গ-সঞ্চালন নৃত্যের একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। পক্ষান্তরে মাসল কনট্রোল বা পেশীকুঞ্চন এবং প্যারালাল বারে ঊর্ধ্বপদ হয়ে ময়ূরগমনে চলাও অঙ্গ সঞ্চালন এবং ঐ প্রকার দেহ-দোলনের যে একপ্রকার সৌন্দর্য নেই, তা নয়। কিন্তু তাই বলে মাসল কনট্রোল ও প্যারালাল বারে কসরতও নৃত্য বলা শব্দের অপপ্রয়োগ।...'
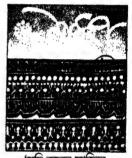
'যদি বলেন সাহিত্য পরিষদ এত দিনে কি এমন কাজ করিয়াছে—তবে সে কথাটা ধীরে বলিবেন এবং সঙ্কোচের সহিত বলিবেন। আমাদের দেশের কাজের বাধা যে কোথায়, তাহা আমরা তখনই বুঝতে পারি যখন আমরা নিজেরা কাজ হাতে লই।' (রবীন্দ্রনাথ)— এই মাপকাঠিতে মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের ৭৫ বছর পূর্তি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মাসে মাত্র কয়েক মিনিট ব্যয় করুন...
স্তন- ক্যানসার থেকে রক্ষা পান!

মাসে মাত্র কয়েক মিনিট ব্যয় করুন... স্তন-ক্যানসার থেকে রক্ষা পান। স্তন-ক্যানসার যে এক সাংঘাতিক গুপ্ত রোগ তা সব মহিলাই জানেন। এবার ঐ দুঃশ্চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্তি দিন। স্তন-ক্যানসার পুরোপুরি সারানো যায়। যে মহিলার ঐ রোগ একেবারে শুরুতেই ধরা পড়ে তিনি বাকী জীবনটা সুস্থ দেহে ও শান্তিতে কাটাতে পারেন।

সেরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হ'ল-- প্রতিমাসে নিজেকে নিজেই একবার পরীক্ষা করে নিন মাত্র কয়েক মিনিট, যা আপনার জীবন বাঁচাবে!

দেখুন কি ভাবে: শুয়ে পড়ুন—প্রতিটি স্তন নিজের আঙুল দিয়ে আলতো করে টিপুন—স্তনের তলা থেকে বোঁটা পর্যান্ত, ছোট ছোট পাক দিয়ে। এবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও ঠিক ঐভাবে করুন। দেখুন—বুকে কোনো মাংসপিণ্ড বা শক্তগাঁট বা বুকের কোষ পুরু ইত্যাদি হয়েছে কিনা। দুটি বোঁটাতেই আলতো করে চিমটি কাটুন। কোনো রস দেখা গেলেই সত্বর আপনার ডাক্তারকে জানান।

কোনো ঝুঁকি নেবেন না। বছরে একবার সম্পূর্ণ ক্যানসার চেক- আপ করিয়ে নিন ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটির যেকোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে (ডিটেকশন সেন্টার) চলে আসুন অথবা আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

এখন ক্যানসার-বীমা!

ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটি প্রবর্তন করলো **ভারতের একমাত্র** বীমা পলিসি, যা ক্যানসার রোগ-ধরা বা তার চিকিৎসা বাবদ যাবতীয় খরচ যোগাবে। সামান্য কিছু টাকা দিন আর আপনি ও আপনার স্ত্রী/স্বামী দুজনেই ৪০,০০০ টাকার আওতায় থাকুন। আরো জিগ্যাসা থাকলে ফোন করুন।

অন্যান্য কেন্দ্রে চেক করাবার জন্য যোগাযোগ করুন:

- পালিকা মেডিক্যাল সেন্টার ৪৮, বাবর রোড, বেঙ্গলি মার্কেট, নিউ দিল্লী-১১০ ০০১, ফোন: ৩৮১০১৩
- ১৫ এ শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০, ফোন: ৪৬৩৮১২
- ১২৭, আরমানী স্ট্রীট, মাদ্রাজ-৬০০ ০০১, ফোন: ৬১৪৪৪

ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটি

তাড়াতাড়ি ধরা মানে তাড়াতাড়ি সারা।

দুর্বল যুক্তি আর তথ্যের এক করুণ সমাবেশ

শান্তিদেব ঘোষ

রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বদেশচেতনা/
সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়/
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ/
কল-৭৩/২৪·০০

সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্রসংগীতে স্বদেশ চেতনা" গ্রন্থটি পাঠ করে বোঝা গেল যে, তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডাক্তার" উপাধি লাভের উদ্দেশে এটি রচনা করেছিলেন। সেই কারণে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তিনি যে ভাবে তাঁর গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়গুলিকে পরপর সাজিয়েছেন, তা হল, অবতরণিকা, লেখিকার কথা, দুটি পর্বে প্রস্তাবনা, আটটি পরিচ্ছদ, নির্ঘণ্ট ও গ্রন্থপঞ্জী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আংশিক অর্থানুকূল্যে এটি মুদ্রিত। এই বিভাগের এক মন্ত্রী আমাকে একবার বলেছিলেন, বিভাগের নীতি হল, প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ গবেষকদের গ্রন্থ প্রকাশে আর্থিক আনুকূল্য করা। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের বিবরণ থেকে জানা গেল যে, এই বিভাগ সম্প্রতি তাঁদের সেই মতের পরিবর্তন করে নবীন গবেষকদের গ্রন্থ প্রকাশে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন। নবীনদের উৎসাহিত করণের এই নীতিকে আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

শ্রীমতী সীমা "লেখিকার কথা" অধ্যায়ে বলেছেন, "উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বদেশী আন্দোলনের প্রকাশ এবং রবীন্দ্রনাথের স্বদেশীসঙ্গীতে তার প্রতিফলন----মূলত এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল্যায়ন এবং তার বিশ্লেষণ এই গবেষণা গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই মূল্যায়ন স্বভাবতই একান্তভাবে সাঙ্গীতিক উপাদানের বিশ্লেষণ নয়। স্বদেশীসঙ্গীতে প্রতিফলিত স্বাদেশিক চেতনা সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টাও হয়েছে এতে। তাই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলির সোসিও মিউজিকোলজিকাল অ্যানালিসিস বলতে যা বোঝায় আলোচ্য গ্রন্থে তারই প্রাথমিক উদ্যম গ্রহণের ক্ষীণ প্রচেষ্টা আছে।" কিন্তু, এর পরেই যা বললেন তার সঙ্গে এর বিরোধ দেখা দিয়েছে। যেমন "অধ্যাপক অরুণকুমার বসুর 'বাঙলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থে এই বিষয়ে প্রথম বিস্তারিত আলোচনার উদ্যোগ থাকলেও স্বদেশীসঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানের স্বরগত বিশিষ্টতার প্রসঙ্গ সেখানে অনুপস্থিত। এই গবেষণায় সেই অসম্পূর্ণ দিকটির উপর আলোকপাত করার একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ... গানগুলির সুরসৃষ্টিগত বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য স্বরলিপির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ...

সুর তাল লয়ের ক্ষেত্রে এই স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলিতে রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক সিদ্ধি কি পরিমাণে নিপুণ ও সার্থক, তার পর্যালোচনাই এ গ্রন্থের উদ্দিষ্ট।'

গবেষিকা যে, দুদিক নিয়েই আলোচনা করেছেন, তা পরিষ্কার বোঝা যায় সমগ্র গ্রন্থটি পাঠ করে। তবুও, এইরূপ পরস্পরবিরোধী উক্তি তিনি কেন করলেন তা বোঝা গেল না।

উপরোক্ত দুটি বাক্যের মধ্যে প্রথমটিতে লেখিকা বলেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বদেশী আন্দোলনের প্রকাশ এবং রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-সঙ্গীতে তার প্রতিফলনের প্রকাশ বিষয়ের আলোচনাই তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে, উনিশ শতকের শেষভাগ বলতে তিনি কোন সময়কে বোঝাতে চাইছেন তা পরিষ্কার করে বলা দরকার ছিল। তা না হলে, মনে প্রশ্ন জাগছে যে, উনিশ শতকের মধ্যভাগের "জাতীয় মেলা" বা "হিন্দুমেলা"র আন্দোলনের এবং বিংশ শতকের প্রথম দশকের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে রচিত, গুরুদেবের স্বদেশী গান, তাঁর আলোচনার মুখ্য বিষয় নয়। কিন্তু এইরূপ উক্তি সত্ত্বেও তিনি সব যুগের গান সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে এই উক্তির সংশোধন হওয়া দরকার।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে আছে, গুরুদেবের স্বদেশী গানের সুর তাল ও লয়ের সাঙ্গীতিক সিদ্ধি কতখানি ঘটেছে তা স্বরলিপির সাহায্যে তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন হচ্ছে যে, ভারতীয় "আকারমাত্রিক", "দণ্ডমাত্রিক" বা ভাতখণ্ডে প্রচলিত স্বরলিপির সাহায্যে গানের সুর তাল ও লয়ের সাঙ্গীতিক সিদ্ধি প্রকাশ করে বোঝানো কি সম্ভব ? ইয়োরোপীয় স্টাফ স্বরলিপিতে গান ও বাজনার ক্ষেত্রে যা সম্ভব হয়েছে, কোন প্রকার ভারতীয় স্বরলিপিতে তা এখনো সম্ভব হয়নি। গ্রন্থে মুদ্রিত স্বরলিপির সাহায্যে যাবতীয় স্বদেশী গানের সাঙ্গীতিক সিদ্ধি তখনি প্রমাণিত হবে, যখন, যাঁরা, ঐ গান সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিদিত, তাঁরা তা গেয়ে শোনাবেন। যাঁরা, গ্রন্থে প্রকাশিত, বাংলা স্বদেশী গানের স্বরলিপি প্রথম করেছিলেন, তাঁরা, তার সাহায্যে গানের সুরের মূল কাঠামোটিকে ধরে রাখবার কথা ভেবেছিলেন, তাঁরা সামগ্রিকভাবে গানের গীতরূপের সিদ্ধির পরিচয় দিয়ে যাননি।

রামমোহন রায়ের যুগ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতার আন্দোলন পর্যন্ত স্বদেশী চেতনার মূল সুর ছিল, ভারতের পরাধীনতার গভীর এক মর্মবেদনা, প্রাচীন ভারতের গৌরব গাথা, নিজের জন্মভূমিকে জন্মদাত্রী মায়ের মত ভালবাসা এবং ইংরেজদের শাসনের দ্বারা জর্জরিত ভারতের জনসমাজকে মুক্তির জন্য উত্তেজিত করে তোলা। এই প্রসঙ্গের আলোচনায় লেখিকা, স্বদেশীসঙ্গীতে প্রতিফলিত স্বাদেশিক চেতনায় সোসিও মিউজিকোলজিকাল অর্থাৎ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কথা বলতে গিয়ে, বিশেষ করে বলেছেন "বীটনের ব্ল্যাক বিল-এর পরাজয়, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, এবং নীল বিদ্রোহের পথ থেকে আমাদের বুদ্ধিজীবী মহলে এক ধরনের জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।" একথা তিনি কেন লিখলেন যুক্তি ও তথ্যসহ তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন ছিল। এই কটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কোন গান বা কবিতার পরিচয় আছে কী ? এই আন্দোলন কটিকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য গানের উল্লেখ থাকলে, এই সংশয়ের নিরসন সহজে হত।

লেখিকা পৃথিবীর অন্যান্য কতগুলি দেশের জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে বিষদভাবেই আলোচনা করেছেন, কিন্তু, তিনি, ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায়, দেশের স্বাধীনতার প্রেরণায়, যে সব গান রচিত হয়েছিল, তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন কেন ? একজন ভারতীয়ের পক্ষে এইরূপ পক্ষপাতিত্বকে শ্রেয় বলে মনে করি না।

গ্রন্থে উল্লিখিত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল বা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের গানটির সম্পর্কে লেখিকা বলেছেন, "বিভিন্ন দেশের জাতীয়সঙ্গীত আলোচনা প্রসঙ্গে বলা চলে একই সঙ্গে কয়েকটি দেশের 'সঙ্গীত' হিসাবে এ গান আদৃত হয়েছে।" পরেই

বলছেন। "বিশেষ কোন দেশের 'স্বদেশ' বা 'জাতীয়' সঙ্গীত—কোন পঙক্তি ভুক্তই এটি হতে পারে না। বিংশ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেই এ গানটি গীত হয়। এ গানকে তাই 'আন্তর্জাতিক সঙ্গীত' নামে ভূষিত করা হয়েছে।" পঙক্তিকটি পড়ে লেখিকা যে ঠিক কী বলতে চেয়েছেন তা পরিষ্কার হল না।
এ গানটি যে উদ্দেশ্যে প্রথম রচিত হয়েছিল, তা কি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি? এ যুগে পৃথিবীর সব দেশই সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে, নিজের দেশ বা জাতীর চিন্তায় মগ্ন। সেই কারণে, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গানটি কোন দেশেই স্থান পেল না। এমনকি কার্ল মার্ক্সের ধর্মে দীক্ষিত কমিউনিস্ট দেশগুলিও এ গানকে তাঁদের দেশের জাতীয় বা স্বদেশী সঙ্গীত বলে গ্রহণ করেনি। তাঁরা সকলেই নিজেদের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবাশ্রয়ী জাতীয়সঙ্গীত রচনা করে, আজ তাই গাইছেন বা বাজাচ্ছেন। বাংলা ভাষায় অনুবাদিত এই গানটির কথা আজ দুই বাংলার সর্বহারা মানুষের ক'জনই বা জানে, বা ক'জনই তা গাইছে। এ গানটির অনুবাদ প্রথম মহাযুদ্ধের বেশ কয়েক বছর পর প্রচলিত হয়েছিল কার্ল মার্ক্সের অনুগামী বাংলার বুদ্ধিজীবীদের আগ্রহে। ফরাসী ভাষার মূল গানটির বাংলা অনুবাদ যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের অনুবাদে প্রোলেটেরিয়াত শব্দটিকে বলা হয়েছিল সর্বহারা। সেই কারণে, তাঁদের গানে "জাগো সর্বহারা", "আয় সর্বহারা" এবং "ছিন্ন সর্বহারা" শব্দকটি আছে। এ যুগে এই শব্দটি খুবই পরিচিত। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ভারতের শোষিত ও দরিদ্র জনসাধারণের কথা চিন্তা করে "সবহারা" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, ১৯১০ সালে, তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যের "যেথায় থাকে সবার অধম" গানটিতে। এই গানটি সমেত "হে মোর দুর্ভাগা দেশ" এবং "তিনি গিয়ে গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ" কবিতাতেও দেশের সবহারাদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনার কথা তিনিই প্রথম প্রকাশ করে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গ এখানে তুলতে হলো এই কারণে যে, লেখিকা, কাজী নজরুলের স্বদেশীসঙ্গীতের সর্বহারাদের কথা বলতে গিয়ে বলছেন : "রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাতে জাতীয় জাগরণের উদাত্ত আহ্বান আছে। কিন্তু এতে প্রত্যক্ষভাবে বৈপ্লবিক চেতনার আভাস ঘটেনি। সর্বহারা জনগণের সঙ্গে এর নাড়ীর যোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। অপরদিকে নজরুলের লেখনীতে দৃঢ় বাস্তবতার প্রকাশ।... আধুনিককালে নজরুলই প্রথম সমাজসচেতন সুর স্রষ্টা ও গীতকার।" আমরা জানি, নজরুল ১৯২১/২২ সালে প্রথম কবি, সুরস্রষ্টা ও গীতকাবরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্বদেশীসঙ্গীতের যে সূচী বা তালিকা আছে, তার অনেকগুলি গানকেই গুরুদেব নিজে স্বদেশ পর্যায়ের গানে স্থান দেননি। কেন তিনি তা দেননি, তার বাস্তব কারণও যে আছে, একথা লেখিকার অবশ্যই চিন্তা করা উচিত ছিল।
শ্রীমতী সীমা, গুরুদেবের গানে স্বদেশ চেতনার কথা গ্রন্থে আলোচনা করতে গিয়ে, প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বহু রকমের সংবাদের সমাবেশ করেছেন। কিন্তু তাকে যথাযথ ভাবে সর্বত্র কাজে লাগাতে পারেননি। এমন অনেক কিছু সহজে বলেছেন, যা তর্কাতীত নয়। তাঁর সেইসব মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে যে যুক্তি ও তথ্যসমাবেশের প্রয়োজন ছিল, তার অভাব খুব।

ইতিহাসের অন্তরালে

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাস ও ঐতিহাসিক/অমলেশ ত্রিপাঠী/
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ/কল-১৩/১৩·০০

চাইনিজ মঙ্কস্ ইন ইন্ডিয়া/লতিকা লাহিড়ী/
মোতিলাল বানারসীদাস/দিল্লী/১২৫·০০

ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। ইতিহাস দর্শন বিষয়ক আলোচনার পথিকৃৎ অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর ইতিহাসচেতনা সম্পর্কে কোন আলোচনাই বোধ হয় যথেষ্ট নয়। দীর্ঘ চার দশক ধরে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন। ইতিহাসের দর্শন নিয়ে আলোচনায়ও তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে বেছে নিয়েছেন কয়েকটি বিষয়। ঐতিহাসিক হিসাবে হেরোডোটাস, থুকিডিডিস, র‍্যাঙ্কে, কটন, মেকলে, র‍্যাঙ্কে, ফিসার, লেফেভ্র এবং ইংরাজ ফরাসী ও রুশ বিপ্লবের ইতিহাস প্রসঙ্গে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। অন্যান্য মানবিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক, ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্য, বিষয়বস্তু ও ঘটনা নির্বাচনে প্রতিফলিত ঐতিহাসিকের পক্ষপাত, তার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল দেশ, শিক্ষা, শ্রেণী ও স্বার্থের লীলা। ইতিহাসে নৈতিক বিচারের স্থান, ইতিহাসে কার্যকারণের সম্পর্ক ও সিদ্ধান্তের আপেক্ষিকতা লেখকের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে উদ্ভাসিত।
এই লেখাগুলির বেশির ভাগই পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে 'ইতিহাস' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। 'রুশ বিপ্লবের মহাভাষ্যকার' এটি ছাপা হয় রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। তিনি এই সংকলনে দুটি নতুন রচনা যোগ করেছেন, সে-দুটি হল র‍্যাঙ্কে ও

অ্যাকটন। লেখক নিজেই মুখবন্ধে বলেছেন, "পুরানো লেখাগুলি অতি আধুনিক আলোচনার আলোকে পুনর্বিচার, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেছেন।" ইতিহাসের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই সংকলনটি অমূল্য। এক জায়গায় এত অত্যাধুনিক তথ্য দুর্লভ। বিশেষ করে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ বিপ্লব বা ঐতিহাসিক লেফেভ্‌র বা মেকলে সম্বন্ধে তাঁর নতুন তথ্য যে-কোন ইতিহাসের ছাত্রেরই জ্ঞান বৃদ্ধি করবে। অধ্যাপক ত্রিপাঠী দীর্ঘ ৪০ বছর ইতিহাস সাধনার পর তাঁর পরিণত ও পরিশীলিত মেধা দিয়ে এই সংকলনটি প্রকাশ করে বিদগ্ধজনের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন। ইংরেজ, ফরাসী ও রুশ বিপ্লবের উপর তিনটি লেখা আছে। কিন্তু এতে বিপ্লবের তত্ত্ব আলোচিত হয়নি, হয়েছে বিপ্লবের ইতিহাসদর্শন। এই তিন বিপ্লব সম্বন্ধে সমকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। তিনি এই প্রতিক্রিয়াগুলির আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করে সমস্ত তথ্য উজাড় করে দিয়েছেন। ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে জানতে গেলে লেফেভ্‌র-এর বইও আমাদের পড়া একান্ত প্রয়োজন। নাহলে নীচুতলার মানুষ যারা ফরাসী বিপ্লবের গ্রানাইট দৃঢ় ভিত তৈরি করেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে আমরা থেকে যাব অজ্ঞ। এই লেখাগুলি ছাড়া 'গণতান্ত্রিক পররাষ্ট্রনীতি' লেখাটি দীর্ঘ ৩৫ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা। এখানেও আধুনিক সমস্ত লেখকের লেখা এবং ঘটনাগুলির সম্যক্ বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি যে প্রবন্ধটি উপহার দিয়েছেন তা সত্যিই তাঁর ধীশক্তির পরিচায়ক। সমস্ত আলোচনার শেষে লেখকের জিজ্ঞাসা "রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনই গণতন্ত্রের সম্মুখে একমাত্র বাঁচার পথ ছিল। কিন্তু ইংলন্ডের চিরাচরিত বৈদেশিক নীতি জার্মেনি ও রাশিয়ার মধ্যে কোন আদর্শগত পার্থক্য খুঁজে পায়নি—কণ্টকের দ্বারা কণ্টক নিপাত করতে চেয়েছে। এই ভ্রান্ত মূল্যবোধ দীর্ঘ ছয় বছরের জন্য সারা পৃথিবীকে অকল্পনীয় অপচয়ের গহ্বরে টেনে নিয়েছে। এখন চিন্তা করার বিষয়—যুদ্ধাপরাধ বাস্তবিক কারা করেছিল এবং গণতন্ত্রের সুমহান ঐতিহ্যকে কারা লাঞ্ছিত করেছে!" (পৃষ্ঠা ১৭২)

লেখক মুখবন্ধে জানিয়েছেন তিনি আর একটি সংকলনে হাত দিয়েছেন। তাতে 'শিল্প বিপ্লব ও ঐতিহাসিক' ছাড়া টয়নবি, নেমিয়ার, ব্লখ, হিল, টমসন, ব্রোদেল ও লাদুরির ওপর আলোচা থাকবে। ছাত্র হিসাবে আমাদের দাবী মাত্র একটি সংকলন না করে অবসর জীবনে যদি তিনি একের পর এক সংকলন প্রকাশ করেন তাহলে আমরা শিক্ষকতা জীবনে হয়ত কিছুটা বিশেষ সুবিধা পাব। তিনি দীর্ঘকাল ধরে আরও ইতিহাস গবেষণা করুন এবং আমাদের সামনে তুলে ধরুন তাঁর সহজ-স্বচ্ছ চিন্তাভাবনাগুলি।

দ্বিতীয় আলোচ্য পুস্তকটির অনুবাদিক অধ্যাপিকা লতিকা লাহিড়ী। ইৎসিং-এর লেখা চীনা ভাষার 'Biographies of Eminent Monks' পুস্তকটির অনুবাদ করেছেন। প্রথমেই যেটা দৃষ্টিকটু মনে হয় তা হল অনুবাদ করা হয়েছে তাদের জন্যই যারা চীনা ভাষা জানে না। যদি তাই হয় তাহলে প্রতিটি লাইনে অহেতুক চীনা ভাষা জুড়ে দিয়ে তিনি আমাদের প্রতিনিয়ত হোঁচট খেতে সাহায্য করেন। কোন অনুবাদেরই কি তা লক্ষ্য হওয়া উচিত? এর পর পুস্তকটির সংযোজনে তিনি চীনা ভাষায় সমগ্র পুস্তকটি সংকলিত করেছেন। এর কি কোন প্রয়োজন ছিল, একমাত্র পুস্তকটির কলেবর বৃদ্ধি করা, তাঁর চীনা ভাষায় দখল সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করা এবং পুস্তকটির মূল্য বৃদ্ধি করা ছাড়া? এই পুস্তকে ৫৬ জন চীনা ভিক্ষুর আগমনের সংবাদ জানা যায় যারা অশোকোত্তর যুগে ভারতবর্ষ ও গৌতম বুদ্ধের দেশ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়ে কঠোর পরিশ্রম করে এদেশে এসেছিলেন। এদের উদ্দেশ্য ছিল ভগবান বুদ্ধের দেশে তীর্থভ্রমণ এবং সেই সঙ্গে যথাসম্ভব বৌদ্ধ পুস্তক সংগ্রহ করে দেশে নিয়ে যাওয়া এবং তা চীনা ভাষায় অনুবাদ করে জনসমক্ষে তুলে ধরা। এই মনোজ্ঞ বিবরণ পড়তে গিয়ে আমরা দেখতে পাই কি কঠোর পরিশ্রম করে এই সন্ন্যাসীরা জীবন তুচ্ছ করে জল ও স্থল উভয় পথেই ভারতবর্ষে এসেছিলেন। পথশ্রম, খাদ্যের অভাব, অসম জলবায়ু কোন কিছুই তাদের প্রতিহত করতে পারেনি। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, তার শিক্ষা ব্যবস্থা, কেন চীনা ভিক্ষুদের আকর্ষণ [illegible] ইত্যাদি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে যা গবেষক ছাড়াও সাধারণ পাঠকদেরও আকর্ষণ করবে। অধ্যাপিকা লাহিড়ী দীর্ঘকাল চীনা ভাষার চর্চায় নিরত আছেন সুতরাং তাঁর অনুবাদ যে সার্থক হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। পুস্তকটির পাঠ্যতালিকাটিও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দু'দেশের সংস্কৃতি জানবার জন্য এই ধরনের পুস্তকের বহুল প্রকাশ কাম্য।

ছোটদের জন্য তিনটি

মালবী গুপ্ত

পাগলা-সাহেবের কবর/ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/ কলকাতা-৯/১০.০০

জঙ্গলমহলে গোগোল/ সমরেশ বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/কলকাতা-৯/১০·০০

লাইটার/সমরেশ মজুমদার/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/কল-৯/১৫·০০

শিশু ও কিশোর মনের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইদানীংকালের তাবৎ কবি-সাহিত্যিককে বেশ একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে দেখা যায়। তবে বলতে দ্বিধা নেই যে সব সাহিত্যকর্মই খুব সফল হয়ে ওঠে এমনটা নয়। এবং যথার্থ শিশুসাহিত্য বয়স্ক মনের কাছেও গভীর আবেদন রাখতে পারে। সেখানেই তাঁর সার্থকতা। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় যখন ছোটদের জন্য কলম তুলে নেন, তখন তাঁর সরস ভাষার সাচ্ছন্দ্যে কাহিনীর উপস্থাপন এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। তাঁর 'পাগলা-সাহেবের কবর' এই দাবিরই অনুকূলে যায়।

ক্লাস সেভেনে তিনবার ফেল করা হরিবন্ধুকে মানুষ হওয়ার জন্য বাবা মা ভাই বোন সবাইকে ছেড়ে সাঁওতাল পরগনায় মোতিগঞ্জে পাঠান হল 'চারুবালা বেঙ্গলি স্কুল'-এ ভর্তি হওয়ার জন্য। কারণ সেই 'স্কুলের নাম-ডাক গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানানোর জনাই।' স্কুলে প্রথমদিনই হরিবন্ধু শিক্ষকদের শপাশপ বেতের শব্দে আর ক্লাসের তাগড়াই চেহারার ছেলেদের ভয়ঙ্কর র‍্যাগিং-এর চোটে 'হেঁদিয়ে' পড়েছিল। মোতিগঞ্জে যাট-সত্তর বছর আগে মারা যাওয়া এক পাগলা-সাহেবকে নিয়ে নানা কিংবদন্তী চালু ছিল। কেউ নাকি বিপদে পড়লে বা আক্রান্ত হলেই ঐ দয়ালু পাগলা-সাহেব সাদা ঘোড়ায় চড়ে ঝড়ের বেগে এসে আক্রান্তকে রক্ষা করত। মোতিগঞ্জের বহুলোকই সাহেবের কবর খুঁজে বেড়াত। কারণ কথিত ছিল গলায় লাখ টাকা দামের মাদুলি সমেত সাহেবকে কবর দেওয়া হয়েছিল গোপনে। পাকেচক্রে হরিবন্ধুও ঐ কবরের অনুসন্ধান কাজে জড়িয়ে পড়ল। সেই সুবাদে যেমন তার বৃদ্ধচোর পটলদাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল, তেমনি কবর অনুসন্ধানকারী এক বদমাইস দলের হাতে প্রায় ধরা পড়তে পড়তে শেষে রক্ষা তো পেলই, সেইসঙ্গে আবিষ্কারও করে ফেলল মোতিগঞ্জের মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই সাহেবের কবরস্থান, গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথে। কেবল তাই নয় পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ডবল প্রোমোশন পেয়ে ক্লাস নাইনে উঠে পড়ল হরিবন্ধু। কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ অবধি এক দুরন্ত কৌতূহলে পাঠকের এতটুকু অন্যমনস্ক হবার সুযোগ থাকে না। পটলদাসের সঙ্গে হরিবন্ধুর মত পাঠকেরও যেন এক গভীর সখ্যতা গড়ে ওঠে। গল্পের টানটান মেজাজটি আগাগোড়া অক্ষুণ্ণ থাকে। অবাস্তবকেও অতিবাস্তব বলে মনে হয়।

ক্ষুদে গোয়েন্দা গোগোলের সঙ্গে এতদিনে ক্ষুদে পাঠক পাঠিকাদের নিশ্চয়ই ভাব হয়ে গেছে। গোগোল মানেই তো রহস্য। আর সেই রহস্য উদ্ঘাটনের নায়কও সে নিজেই। কলকাতা থেকে বাবা মা'র সঙ্গে গোগোল জঙ্গলমহল তথা বাঁকুড়ার দূর গ্রামে ছুটি কাটাতে গিয়ে কি করে এক ভয়ঙ্কর খুনের সাক্ষী হয়ে পড়ে আচমকা। এবং গ্রাম্য এক কিশোর ও তার দুই আদিবাসী সাকরেদদের সাহায্যে সেই খুনীকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয় সেই সব কাণ্ডকারখানা নিয়েই 'জঙ্গলমহলে গোগোল' সমরেশ বসুর এক রহস্য কাহিনী। প্রবল উৎসাহে গোগোলের জ্যোতুমেসোর সঙ্গে জঙ্গলে ভুতোকাকার শিকার দেখতে যাবার কাহিনী তেমন রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠেনি। তবে শিকারে গিয়ে কানাই মুখুজ্যে ওরফে কেনোর সঙ্গে গোগোলের সাক্ষাৎটি বেশ নাটকীয়। 'শূন্যে ওড়া মোরগকে তীর ছুঁড়ে', কিংবা বুনো শুয়োরের গায়ে ভুতোকাকার গুলি লাগার আগেই দুই সাকরেদ সহ কেনোর তীরে লক্ষ্যভেদের ঘটনায় কেনো কেবল গোগোলের চোখেই 'এক অসাধারণ হিরো' হয়ে ওঠে তাই না। যেন পাঠকের ভালোবাসাও আদায় করে নেয়। কাহিনীর গতি প্রথমদিকে মন্থর হলেও শেষেরদিকে বেশ জমে উঠেছে। গোগোল হঠাৎই যখন শিকারি ভুতোকাকাকে ভাঙা মন্দিরের কাছে সন্দেহজনকভাবে গায়ের জামা বদলে 'এদিকে ওদিকে দেখে সোজা গ্রামের বাইরে রাস্তার দিকে খুব জোরে সাইকেল' চালাতে দেখে 'গোগোলের মনে কেমন খটকা লাগল'। আর সেই খটকাই গোগোলকে ভুতোকাকার পেছনে ধাওয়া করিয়ে তার তৃতীয় খুনের সাক্ষী তো করলোই, সঙ্গে সঙ্গে তার নিজেরও চরম বিপদ ডেকে আনল। প্রতি মুহূর্তেই তখন পাঠকের মনে হয়—এই বুঝি গোগোল ভূতনাথের হিংস্র থাবায় ধরা পড়ে গেল।

বিশেষ করে যখন 'নবীন চাটুজ্যের কলকাতার কুটুমের ঘাড় না মটকে ছাড়ব না' বলে ভুতোকাকা ভাঙা দেওয়ালের ফোকর গলে গোগোলের দিকে হিংস্র গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন গোগোল কেন পাঠকের বুকও ভয়ে হিম হয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কেনোর সাহস, বুদ্ধি এবং তীরন্দাজী পারদর্শিতায় গোগোল প্রাণে বেঁচে গিয়ে ভূতনাথকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিল। প্রথমদিকের ঢিলেমি কাটিয়ে গল্পের শেষাংশ বেশ একটা গা ছমছমে পরিবেশ তৈরি করে ফেলে। পড়তে পড়তে ক্ষুদে পাঠকদের গায়ের লোম খাড়া হয়েও উঠতে পারে। বইটিতে কয়েকটি অপ্রত্যাশিত ভুল চোখে পড়ল। যেমন 'বীণা মাসির ভাসুর জ্যোতুমেসো', অথচ লেখক সমরেশ বসু এক জায়গায় বলছেন 'বীণা মাসির মা—মানে জ্যোতুমেসোর বউ হলেন আর এক মাসি···তাই তিনি গোগোলের জবামাসি'। আর ভুতোকাকা সম্পর্কে গোগোলের তুমি আপনির গোলমাল কি তার বয়সোচিত ভ্রান্তি নাকি ভুলটি প্রুফরিডারের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে?

সমাজের কিছু বদ লোক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে খারাপ উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়ে অনেক সময় সাধারণ মানুষের জীবনে মৃত্যুর অভিশাপ ডেকে আনে। আমেরিকার জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী লাইটার আবিষ্কার করে বাজারে ছেড়েও আবার তুলে নেয়। একটি বোতাম টিপলে লাইটার থেকে বেরিয়ে আসে এক অদৃশ্য আগুন যাতে সিগারেট ধরানো যায়, আর একটি বোতাম টিপলে এমন একটা অদৃশ্য রশ্মি বা রে বেরিয়ে আসে তার দশ ফুটের মধ্যে যে কোন প্রাণীকে একেবারে অসাড় করে দিতে পারে কিছুক্ষণের জন্য। ঐ কোম্পানি বাজারে ছাড়া লাইটারগুলোর মধ্যে দুটি শেষ অবধি ফেরত পায় না। আর ঐ দুটি খোওয়া যাওয়া লাইটার নিয়েই রহস্যের সূচনা। এবং এই রহস্যভেদ করতেই লেখক সমরেশ মজুমদার তাঁর 'লাইটার'-এ সেই পরিচিত জুটি সত্যসন্ধানী অমল সোম এবং তার সহকারী অর্জুনকে পাঠকের সামনে হাজির করান। দুটি লাইটার নিয়ে দুটি কাহিনীর অবতারণা। প্রথমটির পটভূমি জলপাইগুড়ি শহর ছাড়িয়ে ভুটান সীমান্তে 'সামচি'-র মনেস্টারিতে গিয়ে শেষ হয়। যেখানে অর্জুনের সঙ্গে পাঠকও আসল এবং জাল লাইটারের বিধ্বংসী ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে। গল্পের একেবারে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত সহকারী সত্যসন্ধানীকে লেখক অন্ধকারেই রেখে দিলেন যে আসল খুনী কে। অথচ পাঠক দেখছে প্রথম থেকে অর্জুনই আগাগোড়া রহস্যসন্ধানের জন্য দৌড়ঝাঁপ করে চলেছে। শেষে ঐ রহস্যের জট ছাড়াতেই অমল সোমের হঠাৎ আবির্ভাব। প্রথমটিতে ঘটনার ঘনঘটায় গল্প বেশ জমেছে। তবে দ্বিতীয় কাহিনীটি যেন তড়িঘড়ি শেষ করা হয়েছে। দ্বিতীয় লাইটারের সন্ধানে অর্জুন আমেরিকার ঐ কোম্পানির আমন্ত্রণে নিউইয়র্কে যাচ্ছে প্যান-অ্যাম বিমানে করে। পথে ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে হঠাৎই দুই বিদেশী 'পাওলো' এবং 'আরমান্ডো'-কে দেখে অর্জুনের সন্দেহ হয়। আর সেই সন্দেহকে সত্যি প্রমাণ করতে ম্যানহাটনে পৌঁছনোর দ্বিতীয় দিনেই 'পাওলো'-দের ডেরায় হানা দিয়ে লাইটার উদ্ধার করে ফেলে। মনে হয় যেন অর্জুনকে দ্বিতীয় লাইটার রহস্য উদ্ঘাটনের একক হিরো বানাবার জন্যই লেখক এত দ্রুত কাহিনীর উপান্তে পৌঁছে যান, যে পাঠক প্রস্তুত হবারও সুযোগ পায় না।

তিনটি বইয়ের প্রচ্ছদই সুন্দর। তবে গোগোলকে বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়।

এসে গেছি !
এসে গেছি !

হিরোকে নদীর এ-পারে রেখে যাচ্ছি । বাঘ-সিংহ দেখলে ভড়কে যেতে পারে ।

অরণ্যদেবের স্বর্গোদ্যান একটি দ্বীপ । জঙ্গল আর দ্বীপের মধ্যে বইছে নদী । সেই নদীতে আছে ভয়ঙ্কর পিরানহা মাছ।
দ্বীপের এ-দিকে সমুদ্র···

স্বর্গোদ্যান !
হো-হো !
লাফাস না, পড়ে যাবি !
স্বর্গোদ্যানে আসার দারুণ আনন্দ···

অরণ্যদেবের গলা শুনে দ্বীপের প্রাণীরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে ।
!
!
!
5/11

নদীতে নামতে পারে মাত্র দুটি প্রাণী···
হিজ হিজ···
হিস্‌স্‌···

গুহামানব হিজ আর প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী স্টেগি, আজও যারা বেঁচে আছে···
তাদের চামড়ায় পিরানহার দাঁত বসে না···
হিজ ও আবার কী করছে ?

হিজ খুব গর্বভরে দেখাচ্ছে, সে স্টেগির পিঠে চড়তে পারে···
হিজ হিজ
হিস্‌স্‌···
ক্রমশ ● ২

এস· ও· এস· শিশুপল্লী দেখে এলাম

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

এস· ও· এস· মা ও ছেলে-মেয়ে

স্কুলে পাঠাচ্ছেন এস· ও· এস· মা

এস· ও· এস· ছেলে-মেয়েদের খেলা

'সেভ আওয়ার সোলস'—সংক্ষেপে এস· ও· এস·। সংক্ষেপিত এই বর্ণত্রয় আন্তর্জাতিক এক সংকট-সংকেত। এই সংকেতে সাড়া দিয়েই সারা পৃথিবীর নানা প্রান্তে গড়ে উঠেছে আশ্চর্য নিরাপত্তা-মেশানো এক আশ্রয়-আশ্বাস : 'এস· ও· এস· চিলড্রেনস ভিলেজ'। সেই আশ্রয়, নাম থেকেই স্পষ্ট যে, শুধু শিশুদের জন্য। অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত, অনাথ, অনিকেত সেইসব শিশুদের জন্য, যাদের কথা সচরাচর কেউ ভাবে না। সবাই ভাবে না, কিন্তু কেউ-কেউ ভাবেন। এস· ও· এস· শিশুপল্লীর কথা যেমন ভেবেছিলেন হেরমান মেইনের নামের বিরল মাপের এক দরদী মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ছিন্নমূল শিশুদের কথা ভেবে অস্ট্রিয়ার ইমস্ট-অঞ্চলে মেইনের গড়ে তোলেন প্রথম এস· ও· এস· শিশুপল্লী। যুদ্ধদীর্ণ য়ুরোপের অসংখ্য নামহীন, গৃহহীন, মাতাপিতৃহীন, ছেলে-মেয়ে তাদের নতুন ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিল মেইনের-এর স্বপ্নসম্ভব সেই শিশুপল্লীতে। সেই শুরু। সেটা ছিল ১৯৪৯ সাল। অচিরে সারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে

এস· ও· এস· শিশুপল্লীর পারিবারিক কাঠামোটি মূলত মাতৃতান্ত্রিক

পড়েছে এস· ও· এস· শিশুপল্লীর নিত্য-নতুন শাখা। বিশ্বের যে-নব্বইটি দেশে এখনও পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছে এস· ও· এস· শিশুপল্লী, ভারত তার অন্যতম। ভারতেই এখন ছাব্বিশটি কেন্দ্র। সন্দেহ নেই, এস· ও· এস· শিশুপল্লী এখন পৃথিবীব্যাপী এক আন্দোলনেরই অন্য নাম। এবং সেই আন্দোলন বৃহত্তর সমাজেরই অন্যতম জরুরী এক আন্দোলন। কেননা, শিশুরাই আগামী পৃথিবীর একমাত্র উত্তরাধিকারী। তাদের সুষ্ঠু লালনপালনের দায়িত্ব সমাজের। আন্তর্জাতিক এস· ও· এস· শিশুপল্লীর যিনি আজ প্রধান কর্ণধার সেই হেলমুট কুটিন নিজেও শৈশবে লালিত হয়েছেন এস· ও· এস· চিলড্রেনস ভিলেজে। অস্ট্রিয়ার ইমস্ট-এ। আন্তর্জাতিক এই সংস্থার বর্তমান প্রেসিডেন্ট কুটিন এর আগে ছিলেন এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল। ১৯৮৬ সালে প্রয়াণ ঘটেছে এই আন্দোলনের জনকের। মেইনের নেই, কিন্তু অনশ্বরভাবে বেঁচে আছেন তিনি তাঁর এই মহৎ প্রয়াসের মধ্যে। একদা অনাথ কিংবা পরিত্যক্ত, পরবর্তীকালে

ছবি : সুধীর চ্যাটার্জী

অঙ্গে অঙ্গে লিরিল-এর তরতাজা করা তরঙ্গ!
লিরিল
তরতাজা করা সাবান
লেবুর মত চনমনে তরতাজা করা সাবান।

সুরমা শিশুপল্লীর সম্মুখভাগ

এস· ও· এস· পাঠাগার

সমাজে স্বাভাবিক রূপে প্রতিষ্ঠিত, অসংখ্য ছেলেমেয়ের আত্মবিশ্বাসী ও হাসি-ঝলমল জীবনের কেন্দ্রে হেরমান মেইনের-এর চিরকালীন আসন।

মেইনের-এর এই প্রয়াস আরও কয়েকটি দিক থেকে অনন্য। এস· ও· এস· শিশুপল্লীকে প্রচলিত অর্থে অনাথ-আশ্রম করে তুলতে চাননি তিনি। যে-মুহূর্তে কোনও শিশু আশ্রয় পেল এস· ও· এস· শিশুপল্লীতে, সেই মুহূর্ত থেকে সে এস· ও· এস· পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একান্ত আপনজন। কোনও অবস্থাতেই আর বাইরের কোনও সংস্থা বা ব্যক্তির হাতে বা নিঃসন্তান দম্পতির হাতে তুলে দেওয়া হয় না এস· ও· এস· শিশুকে। এস· ও· এস· আন্দোলন প্রধানত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটায়। প্রথমত, প্রতিটি শিশুকে এখানে পালন করা হয় পারিবারিক পরিমণ্ডলে। দ্বিতীয়ত, দুঃস্থ ও নিঃসহায় নারীরা এখানে এস· ও· এস· মা হিসাবে খুঁজে পান সেবামূলক জীবিকার সংস্থান এবং বাৎসল্যমণ্ডিত সাংসারিক জীবনযাপনের সানন্দ দায়িত্ব। তৃতীয়ত, সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীও যাতে এ-জাতীয় সমাজমুখী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ শরিক হতে পারেন, তার জন্য রয়েছে নানারকম উদ্যোগগ্রাহী পরিকল্পনা বা স্পনসরশিপ প্রোগ্রাম। এককালীন বা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অর্থ সাহায্য করে যে-কেউ বাইরে থেকে পালন করতে পারেন এস· ও· এস· ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা বা ভরণপোষণের কিছু-না-কিছু দায়িত্ব।

এস· ও· এস· শিশুপল্লীর পারিবারিক কাঠামোটি মূলত মাতৃতান্ত্রিক। প্রধানত পিছুটানহীন মেয়েদের মধ্য থেকেই বেছে নেওয়া হয় এই গুরুত্বপূর্ণ পদের উপযুক্ত প্রার্থীদের। নিজের সন্তানসহ এস· ও· এস· শিশুপল্লীতে মা হয়ে এসেছেন, এমন দৃষ্টান্তও অবশ্য দুর্লভ নয়। এস· ও· এস· পল্লী গঠিত হয় অনেকগুলি বাড়ি নিয়ে। প্রতিটি বাড়ির কর্ত্রী একজন এস· ও· এস· মা। তাঁর তত্ত্বাবধানে ও স্নেহ-শাসনে বড় হতে থাকে তাঁর পরিবারভুক্ত এস· ও· এস· ছেলেমেয়েরা। এক-একটি বাড়ির ছেলেমেয়ের সংখ্যা দশ-বারোজন করে। নানান বয়সের। পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো। বড়দের কাছ থেকে পড়া বুঝে নেয় ছোটরা, মেয়েরা মাকে সাহায্য করে ঘর-গেরস্থালির কাজে, সামলায় ছোট ভাইবোনদের। যেসব ক্ষেত্রে পদবী অজ্ঞাত, সেখানে এস· ও· এস· মায়ের পদবীই হয়ে ওঠে ছেলেমেয়ের পদবী। মায়ের ধর্মমত বর্তায় সন্তানের উপর। নিজের মাইনে ছাড়াও এস· ও· এস·-মা পান সন্তানপিছু মাসিক ভাতা। তাই দিয়ে সংসার চালান, ছেলেমেয়েদের আবদার মেটান। কখনও-বা উৎসবের আয়োজনও করেন। অনেকগুলি এস· ও· এস· বাড়ি মিলে যে এস· ও· এস· পল্লী তার সামগ্রিক দায়িত্ব যাঁর উপর তাঁকে বলা হয় ভিলেজ ফাদার বা পল্লী-পিতা। প্রশাসনিক কর্তৃত্ব তাঁর। পুরো পল্লী যাতে যৌথ পরিবারের মতো মিলেমিশে থাকে সেদিকে নজর রাখতে হয় তাঁকে।

এস· ও· এস· পল্লীর ছেলেমেয়েরা যাতে বৃহত্তর সমাজজীবনে প্রবেশের উপযুক্ত হয়ে ওঠে, তার জন্য ছোটবেলা থেকেই বিশেষভাবে তৈরি করে তোলা হয় তাদের। খুব ছোটদের জন্য পল্লীর ভিতরেই থাকে নার্সারি। সেখানে প্রথম পাঠ সাঙ্গ হলে পাঠানো হয় বাইরের স্কুলে। ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি হয় তারা। পল্লীতে রয়েছে সান্ধ্য কোচিংয়ের ব্যবস্থা। উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়া বুঝে নেয়। বলা যায়, প্রাইভেট টিউশনের বিকল্প ব্যবস্থা। এ-ছাড়াও নাচ গান, ছবি আঁকা, খেলাধুলা, শরীরচর্চা সমস্ত কিছু শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে এস· ও· এস· চিলড্রেনস ভিলেজে। রয়েছে লাইব্রেরি, অসুখবিসুখের জন্য ডাক্তার।

সাধারণত ছ-বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদেরই নেওয়া হয় এস· ও· এস· পল্লীতে। একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর স্থানান্তরিত করা হয় এস· ও· এস· যুবপল্লীতে। সেখান থেকে উচ্চতর পড়াশুনার সুযোগ পেয়ে ছেলেমেয়েরা প্রবেশ করে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে।

এস· ও· এস· পল্লীতে গানের ক্লাস

শুধু পড়াশুনাই নয়, নাচ-গান ও অন্যান্য কলাবিদ্যাও এখানে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত

॥ ২ ॥

এস· ও· এস· কর্মকাণ্ড যে কত ব্যাপক ও বাস্তবসম্মত, তা চাক্ষুষ দেখার সুযোগ মিলল এই কদিন আগে। হেরমান মেইনের-এর জন্মদিন ২৩ জুন। সারা পৃথিবীর নব্বইটি দেশের যাবতীয় এস· ও· এস· পল্লী ও সহযোগী সংগঠন একযোগে সেদিন পালন করেন, 'এস· ও· এস· দিবস।' কলকাতার লবণ-হ্রদে যে-এস· ও· এস· শিশুপল্লীটি ধানের শিষে শিশির বিন্দুর মতো কাছে থেকেও চক্ষুর অন্তরালে এতকাল, তারই আমন্ত্রণ এসে পৌঁছল। এস· ও· এস· দিবসকে কেন্দ্র করে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী উৎসবে যোগ দেবার জন্য আন্তর্জাতিক আশ্রয়বর্ষে এই বিশেষ আমন্ত্রণ। সেই সঙ্গে ছিল এক সাংবাদিক-সম্মেলন। এস· ও· এস· শিশুপল্লীর পশ্চিমবঙ্গ শাখার অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীমতী রেহান দত্ত। পল্লী-পিতা শ্রীযুক্ত এস কে মিত্র ও অন্যান্য সহযোগীরা সবাই ছিলেন সেই সাংবাদিক সম্মেলনে। যে-হলটায় এই আয়োজন, তার তিন দিকের দেয়াল জুড়ে টাঙানো ছিল আহ্বায়ক এস· ও· এস· শিশুপল্লীর ক্ষুদে বাসিন্দাদের হাতের কাজের অজস্র নমুনা। মুগ্ধ বিস্ময়ের সূচনা, বলা যায়, এখান থেকেই। বস্তুতই যেন 'দেখে-দেখে আঁখি না ফিরে।' এতই দক্ষ, প্রতিশ্রুতিপূর্ণ কিছু কাজ। খুব সংক্ষেপে অথচ ভারী মনোগ্রাহী ভঙ্গিতে শ্রীমতী রেহান দত্ত তুলে ধরলেন এস· ও· এস· চিলড্রেনস ভিলেজের একটি রূপরেখা। শুরু থেকে ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক বিবরণ। ভাষণ শেষে দিলেন উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর। তাঁর কথা থেকেই জানা গেল ভারতে এই আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছয় ষাট দশকের মাঝামাঝি। হরিয়ানার কাছে গ্রিনফিল্ডে তৈরি হয় প্রথম এস· ও· এস· শিশুপল্লী। বিধাননগরের দু নম্বর সেকটরে ১৯৭৭ সালে তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অনন্য এই এস· ও· এস· শিশুপল্লীটি। জমি দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৭৫-এ। বাড়ি তৈরির ব্যয়ভার অবশ্য বিদেশ থেকে সংগৃহীত। কুড়িটি বাড়ি নিয়ে এই পল্লী। ২০৮ জন ছেলেমেয়ে। এর মধ্যে পঁচিশটি ছেলেমেয়ের ব্যয় বহন করেন বাইরের সদাশয় মানুষ। এস· ও· এস· পল্লীতে শিশুদের যেভাবে লালনপালন করা হয়, সেই পদ্ধতি ভারত সরকারের অনুমোদন পেয়েছে। দেশের অন্যান্য শিশু-প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এই রীতি গ্রহণ করার জন্য নাকি সুপারিশ করেছেন ভারত সরকার।

বিকাশ দাসের শিল্পকর্ম, সহযোগী অসীম দাস

কলকাতার এস· ও· এস· চিলড্রেনস ভিলেজে চারটি পল্লী। আশা পল্লী, প্রীতি পল্লী, আনন্দ পল্লী ও শ্রী পল্লী। এক-একটিতে পাঁচটি করে পরিবারের বাস। সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে নিজেরাই ঘুরে-ঘুরে দেখলাম বিভিন্ন জায়গা। লাইব্রেরি, বাড়িঘরদোর, খেলার মাঠ। তখন ভর বিকেল। ছেলেরা ব্যস্ত ফুটবল নিয়ে। মেয়েরা দল বেঁধে চাপছে দোলনা, খেলছে এক্কা-দোক্কা। দু-একজন ভিড় জমিয়েছে লাইব্রেরিতে। দারুণ প্রাণচাঞ্চল্য চতুর্দিকে। কোনও বিষণ্ণ ছায়া নজরে এল না। কোথাও না! আলাপ হল এস· ও· এস· মা মেরি দাশের সঙ্গে। প্রথম থেকে যুক্ত এই বিধাননগর এস· ও· এস· ভিলেজে। বারজন ছেলেমেয়ে সামলান। তিন নম্বর বাড়ির নমিতা ঘোষ আছেন বিরাশি সাল থেকে। তাঁর পাঁচ ছেলে। ছয় মেয়ে। একেবারে ছোট্ট কমলিকা ঘোষ। ছিয়াশিতে এসেছে এই পরিবারে। আর· জি· করে জন্ম কমলিকার, চিৎপুর হোম থেকে সরাসরি এখানে। বিকাশ নামে যে-ছেলেটির আঁকা ছবি অবাক করেছিল, সেও এই বাড়িরই ছেলে। প্রতিটি বাড়ি চমৎকার ভাবে গোছানো। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। উষ্ণ অন্তরঙ্গ। এক-এক বাড়িতে খান পাঁচেক শোবার ঘর, প্রশস্ত খাবার টেবিল বারান্দায়, ছিমছাম রান্নাঘর। দুটো জিনিস দেখে মুগ্ধ হলাম। একটি বাড়িতে ছোট্ট এক মেয়ে মাকে সমানে আবদার করছে, "মা, বিস্কু খাব।" এই অধিকার বোধটুকুর মধ্যেই লুকনো রয়েছে এস· ও· এস· আন্দোলনের প্রকৃত সাফল্যের অন্যতম দিক। ফিরে আসার পথে আলাপ হল প্রাক্তন দুই এস· ও· এস· ছেলের সঙ্গে। দুজনেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তবু শিকল কেটে উড়ে যাননি। এখনও নিয়মিত আসেন। পারিবারিক যে-বন্ধনের কথা ভেবেছিলেন হেরমান মেইনের, নিঃসন্দেহ তারই প্রভাবে এই অমোঘ পিছুটান।

সার্থক, তাঁর স্বপ্ন, সুযোগ্য তাঁর উত্তরাধিকারীরা।

এশিয়ার ঘুমন্ত অ্যাথলীট

সুপ্রকাশ ঘোষাল

এই মুহূর্তে এশিয়ার দ্রুততম পুরুষ তালাল মনসুরের মনের কোণে দুঃখের মেঘ ছেয়ে রয়েছে। কাতারের এই অ্যাথলীটটি খানিকটা আলাদা ধাতের। আত্মকেন্দ্রিকতার ছোঁয়াচ নেই ওর হাবভাবে। একজন সফল অ্যাথলীট হিসাবে অহেতুক অহমিকার ঘোরে তালাল টলমল নয়। এসবের তাৎপর্য তাঁর কাছে অন্য রকমের। গত এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড মিটে এই গুণটুকু অন্যদের মধ্যে আদৌ চোখে পড়ে নি।

তালাল নিজের সাফল্যের দূরবীণে কাতার ও এশিয়ার স্বার্থের পাশে ইউরোপীয়ানদের ভূমিকার তুলনায় ব্যস্ত। উনি যেন কাতার ও এশিয়ার মুখোজ্জ্বল করার ভার নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছেন। তাই গত এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড মিটে যতবারই জিতেছেন ততোবারই কাতার ও এশিয়ার জয়গান তার মুখে ধ্বনিত হয়েছে। এ সব শুনে প্রথমে রীতিমত হকচকিয়ে যেতাম, ভেবেছি, দেশ ও মহাদেশের মাটির প্রতি টান অন্য কোনো অ্যাথলীটের মুখে তো শুনিনি, আমার অবাক হওয়ার দৌড় দুম করে শেষ হয়ে গেছে। তালাল মনসুরের সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বললেই বোঝা যায় ইয়োরোপীয়ানদের উপর তাঁর যেন একটা জাতক্রোধ রয়েছে। অবশ্য ক্রোধ বললে হয়ত পুরোপুরি ঠিক বলা হয় না।। ব্যক্তিগতভাবে কারো ওপর কোনো রাগ নেই তাঁর। আসলে খেলাধূলোর জগতে ইয়োরোপীয়ানদের এই দীর্ঘ আধিপত্য যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না তালাল। তাই তাঁর আক্ষেপ, ইয়োরোপ আর কতদিন আমাদের উপর প্রভুত্ব করবে? এশিয়াই বা আর কতদিন তার বিপুল জনশক্তি, সূর্যস্নাত প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্যে বেড়ে ওঠা অঢেল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েও কতদিন মেনে নেবে ইয়োরোপের এই দাপট?

কথাটা শুধু তালাল মনসুরকেই ভাবায় নি, ভাবিয়েছে আরো অনেককেই। কিন্তু কী কারণে এশিয়া আজো পিছিয়ে রয়েছে তা অনুসন্ধান করার আগে জানা দরকার অ্যাথলেটিকসে এশিয়া আর ইয়োরোপের মধ্যে দক্ষতার ব্যবধান কত সহস্র যোজন দূরে রয়েছে। একথা ঠিক যে জাপান এবং চীনের অভ্যুত্থানের পর বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে এশিয়া আজ আর তেমন নগণ্য নয়। তবু কয়েকটা উদাহরণ দিলেই পরিস্থিতিটা যে এখনো কত করুণ সেটা পরিষ্কার হবে।

এখন কি আমাদের একমাত্র ভরসা কাতারের তালাল মনসুর?

এ নিয়ে ভাবনা চিন্তায় লিডিয়া ডি ভেগার কথা প্রথমে টোকা দেয়। খ্যাতি আর দাপট ফিলিপিনসের এই সুন্দরী মহিলাকে আলোকিত করছে। গ্ল্যামার যেন সর্বাঙ্গে জড়িয়ে। এশিয়ার প্রথম সারির অ্যাথলীট। এই মহাদেশের ক্ষিপ্রতম নারী। অথচ সদ্য শেষ হওয়া রোমের বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে যেতে চাননি। মেনে নিয়েছিলেন বাস্তবকে। তাই রোমের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ দানের কথা মন থেকে অনেক আগেই মুছে ফেলেছিলেন তিনি। "হ্যাঁ ব্যাপারটা দুঃখের, এবং নিশ্চয়ই লজ্জার, কিন্তু সত্যি কথাটা অস্বীকার করার চেষ্টা করে তো লাভ নেই। এশিয়ায় দ্রুততম মেয়ে অ্যাথলিট হয়েও, বিশ্বমানের বিচারে আমি নেহাতই তুচ্ছ। তাই নিছক অংশগ্রহণের জন্যে আমার রোমে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই," অকপটে স্বীকার করেছিলেন লিডিয়া।

আর সময়ের পরিসংখ্যানও লিডিয়াকে সর্বতোভাবে সমর্থন করে। এমনকি প্রায় চার বছর আগের লস এ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকের সঙ্গেই যদি তুলনা করি, তাহলেও আমরা দেখব ১০০ মিটারে এশিয়ার সেরা মেয়ে লিডিয়া ভীষণভাবে পিছিয়ে রয়েছেন। সোলে ১১·৫৩ সেঃ ১০০ মিটার দৌড় শেষ করে রেকর্ড করেছিলেন লিডিয়া। অন্যদিকে লস এ্যাঞ্জেলসে যিনি সপ্তম স্থান পেয়েছিলেন তাঁর সময় ছিল ১১·৪৩ সে·। অর্থাৎ এশিয়ার যিনি দ্রুততমা, বিশ্বের প্রথম সাতজনের মধ্যেও তার স্থান হয় না। তার উপর সিঙ্গাপুরে লিডিয়া তো ১০০ মিটারে তাঁর সোলের সময়কেই ছুঁতে পারেননি। কাজেই উন্নতির তো কোনো আশাই নেই, উল্টে অবনতির লক্ষণ স্পষ্ট। অথচ এই তিন বছরে বিশ্বের অনেক দেশের অ্যাথলিটরাই লস এ্যাঞ্জেলসের সময়কে আরো কমিয়ে আনার সাধনায় মগ্ন ছিলেন। যার ফল

আমরা দেখতে পেলাম রোমে, তারপর দেখবো সোলে।

এখানে লিডিয়া ডি ভেগার উল্লেখ করলাম একটা উদাহরণ হিসেবে। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ফর্মের উন্নতি বা অবনতি নির্দেশ করার জন্যে নয়। শুধু এইটুকু বোঝাবার জন্যে যে এশিয়ার যাঁরা নায়ক বা নায়িকা বিশ্বের দরবারে তাঁরা মোটেই কল্কে পাওয়ার যোগ্য নন। যেমন পি টি উষা। এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ৪০০ মিটারের হার্ডলার।

বিশ্ব মানের প্রতিযোগিতায় কিন্তু উষার কোনো আশা নেই। আমাদের বৃহৎ অ্যাথলীট-যজ্ঞ সোল-সিঙ্গাপুরের নায়িকা বিশ্বের দরবারে ইংরাজী পরিভাষায় যাকে বলে অলসো র‍্যান। তাহলেই বুঝুন তফাৎটা কোথায় এবং কতটা।

উদাহরণ এমন আরো অনেক দেওয়া যায়, অ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন বিভাগে, বিভিন্ন স্তরে। এই বিশাল জনবহুল মহাদেশের দুর্দশা যে কতটা, সে ছবিটা তাহলে নিশ্চয়ই আরো পরিষ্কার হয়। কিন্তু তাতে উদ্দেশ্য কিছু সিদ্ধ হয় না। বরং যে কথাটা বার বার মনে খোঁচা দেয় তা হল এই পিছিয়ে পড়ার কারণ কী? ধনী দরিদ্র, জনবহুল, অজনবহুল নানান রকম দেশ নিয়ে আমাদের এই এশিয়া মহাদেশ। সমস্যা আছে বহুরকম। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক। কিন্তু জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের সঙ্গে মোটামুটিভাবে তাল মিলিয়ে চললেও, খেলাধূলার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অ্যাথলেটিকসের ক্ষেত্রে এশিয়া আজো এত পিছিয়ে রয়েছে কেন? বড় কথা, অ্যাথলেটিকস যখন মাদার-গেম। অ্যাথলেটিকস চর্চার আগ্রহের ভালমন্দ একটা দেশে মানুষের স্বাস্থ্যের দিকটা জানিয়ে দেয়। প্রশ্নটা প্রথমেই রেখেছিলাম জাপানের প্রবাদপ্রতিম হ্যামার থ্রোয়ার মুরোফুসির কাছে। শালপ্রাংশু, মহাভুজ, প্রায় লৌহমানব এই মুরোফুসি। মধ্য চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁছেও আজো এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন হ্যামার থ্রোয়ার। অ্যাথলেটিকসের এক অনন্য সাধারণ চরিত্র। সিঙ্গাপুরে এসেছিলেন মুরোফুসি খেলোয়াড় হিসেবে নয়, কোচ হিসেবে। তাঁর কঠোর তত্ত্বাবধানে নিবিড় অনুশীলনের মধ্যে ডুবে রয়েছেন জাপানের বেশ কিছু প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ হ্যামার থ্রোয়ার ও শট পাটার। অপলকে জাপানী অ্যাথলীটদের পারফরমেন্স লক্ষ্য করতে করতে ভেবে চিন্তে জবাব দিচ্ছিলেন মুরোফুসি। বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর বিশ্লেষণী মনের ধারালো যুক্তি দিয়ে এক এক করে বুঝিয়ে বললেন এশিয়ান অ্যাথলেটিকসের সমস্যাগুলো।

চীন এবং জাপান। এশীয় অ্যাথলেটিকসের এরাই নিশ্চয়ই পুরোধা, অবিসংবাদিতভাবে। —মুরোফুসি কিন্তু নিজ দেশ জাপানের উন্নতিতে খুব একটা সন্তুষ্ট নন। বিশেষ করে উন্নতির গতিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর এশিয়ায় জাপানীরা নিশ্চয়ই সবচেয়ে সফল জাতি। পরাজয়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আজ আবার তারা সারা পৃথিবীকে জয় করে নিতে উদ্যত, এক নতুন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের দৌলতে। অথচ, এই বিশাল সাফল্যের সার্বিক প্রতিফলন কী ঘটেছে তাদের খেলাধূলায়?

অন্তত মুরোফুসি তা মনে করেন না। "উন্নতি যে হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই", বললেন মুরোফুসি, "কিন্তু আমেরিকার মতো ক্রমাগত এগিয়ে চলার ব্যাপারটা জাপানে ঘটেনি এখনো। আমেরিকায় মনে হয় যেন রোজই কেউ না কেউ কোনো রেকর্ড ভাঙার চেষ্টা করছে। অমুক কলেজে, নয়তো অমুক মিটে। অথবা ইন্ডোর প্রতিযোগিতায়। জাপানে কিন্তু এই রকম ব্যাপক সর্বাত্মক ব্যাপার কিছু হয় নি, প্রচুর সুযোগ সুবিধে থাকা সত্ত্বেও।"

এই নিয়ে যে একটা আফসোস আছে মুরোফুসির মনে, সেটা কথা বলে সহজেই বোঝা গেল। প্রসঙ্গক্রমে এশিয়ার অন্যান্য দেশের কথা এল। যেমন চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো, ভারত।

চীনকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানালেন মুরোফুসি। দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে থেকে প্রতিভাবান অ্যাথলীটদের ঠিক ঠিক মত খুঁজে বার করে তাদের বিজ্ঞানসম্মত ট্রেনিং দিয়ে অ্যাথলেটিকসে এত ব্যাপকভাবে এবং এত দ্রুত উন্নতি এশিয়ার আর কোনো দেশ করতে পেরেছে বলে মুরোফুসি মনে করেন না। চীন যেন সেই অর্থে সারা এশিয়ার পথপ্রদর্শক, যদিও চীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছে এমন কোনো দেশের নাম করা খুবই দুঃসাধ্য।

মুরোফুসিরও সেটাই দুঃখ। বললেন, "যে সমস্ত সমস্যা চীনকে একদিন নীচে টেনে রেখেছিল, সেই একই রকম সমস্যা আরো অনেক দেশের আছে। যেমন প্রতিকূল অর্থনৈতিক অবস্থা, বিশাল জনসংখ্যা, অশিক্ষা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগঠনের অভাব। চীন যেভাবে এই সব বাধা সরিয়ে, সমস্যাগুলোর সমাধান করেছে তা থেকে নিশ্চয়ই অনেকের অনেক কিছু শেখার ছিল। কিন্তু কেউই তা করেনি"।

এই প্রসঙ্গে কথা উঠল ভারতকে নিয়ে। একটা কথা এখানে বলে রাখি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফল যেমনই হোক, ভারতের সম্বন্ধে অনেক দেশেরই কিন্তু খুব উঁচু ধারণা আছে। যে কোনো আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকসের আসরে বিদেশী প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বললেই এটা বোঝা যায়। অথচ আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকসের ক্ষেত্রে উঁচু ধারণা তৈরি হওয়ার মত তেমন কিছুই তো আমরা এখনো করতে পারি নি।

আসলে ভারতের সম্বন্ধে বিদেশীদের এই আশাবাদ তার বিপুল অ্যাথলেটিকস সম্ভাবনাকে ঘিরে। বিশাল দেশ, বিরাট জনসম্পদ। সেই সঙ্গে খেলাধূলোয় ভারতের উৎসাহের কথাও সবাই শুনেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের চোখে ভারত এক ঘুমন্ত দানব যার সুপ্ত শক্তি পূর্ণ বিকশিত হলে এশিয়ার অ্যাথলেটিকস শক্তিসাম্যে ভীষণ রকম ওলট পালট ঘটে যেতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন, এই ঘুমন্ত দানবের ঘুম ভাঙাবে কে? কি সেই মারাত্মক আফিম যার প্রভাবে যে আজও অবসন্ন, নির্জীব। বিদেশী অ্যাথলেটিকস প্রেমিকরা অনেক চেষ্টা করেও উত্তর পান না সে প্রশ্নের। পি টি উষার দিকে দেখিয়ে কোরিয়ার এক কর্মকর্তা বলেছিলেন, "তোমাদের এত বড় দেশের ওই একজন মাত্র বলার মত অ্যাথলীট। তোমাদের তো গণ্ডা গণ্ডা উষা থাকা উচিত। আর সত্যি বলতে কী এতদিন পরেও যে উষার থেকে ভাল কাউকে তোমরা খুঁজে পাওনি, সেটা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। উষার যেখানে শেষ, সেখান থেকে অন্য কেউ যদি আরো এগিয়ে চলতে পারত, তাহলেই তো তোমরা বিশ্বমানে পৌঁছে যেতে পারতে। অথচ দেখ তোমরা উষাতেই আটকে রয়ে গেলে। এবং আমার মনে হয় এশিয়া যে এখনো বিশ্বমানের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে এটা তার মস্ত একটা কারণ। এশিয়ার বেশীর ভাগ দেশেই দেখা যায়, এক দুজন বড় অ্যাথলীট, আর তার ধারে কাছে কেউ নেই। ফলে পি টি উষা, লিডিয়া ডি ভেগা বা তালাল মনসুরের ক্ষমতা যেখানে শেষ, এশিয়ার অ্যাথলেটিকস মান সেখানেই সীমাবদ্ধ। অথচ পশ্চিমে আজ যদি ১০০ মিটারে কেউ আধ সেকেণ্ড সময় কমাল তো কাল আর একজন তা থেকে আরো এক ছটাক সময় ছেঁটে ফেলে দিল। এইভাবে ওরা এগিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত; আর এশিয়া রয়েছে এক জায়গায় থেমে।"

কিন্তু ব্যক্তিগত প্রতিভায় যাঁরা এশিয়াশ্রেষ্ঠ হয়েছেন তাঁরা কেন বিশ্বের প্রথম সারি থেকে এতটা পেছনে রয়েছেন? কেন লিডিয়া ডি ভেগা ইভলিন অ্যাশফোর্ডের কাছাকাছি পৌঁছতে পারছেন না! কেন তালাল মনসুর এড্উইন মোজেসকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন নি এখনও? কেন ৪০০ মিটার হার্ডলসে উষার সময় বাড়ছে যখন তাঁর আগের দশজন হার্ডলার ক্রমশঃ সময় কমাবার চেষ্টায় সফল হচ্ছেন। কেন এই সীমাবদ্ধতা? তাহলে কী সামগ্রিকভাবেই ট্র্যাক এবং ফিল্ড ইভেন্টে এশিয়ার ক্ষমতা বাকী পৃথিবীর চেয়ে নিকৃষ্ট? এবং এর কারণ কী সামগ্রিকভাবে এশীয় অ্যাথলীটদের শারীরিক সীমাবদ্ধতা?

মনে হয়েছিল এ প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারেন কোনো পশ্চিমী কোচ, যিনি ইয়োরোপ এবং আমেরিকার উন্নত মানের নিরিখে এশিয়ার অ্যাথলীটদের ক্ষমতা যাচাই করে দেখতে সক্ষম। তাই কথাটা পেড়েছিলাম কাতারের বেলজিয়ান কোচ ওলেগ কুনৎজের কাছে। ভীষণ জনপ্রিয় তিনি আজ কাতারের অ্যাথলেটিকস মহলে; কী খেলোয়াড়, কী কর্মকর্তা সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ। তালাল মনসুর তো বার বার স্বীকার করলেন কুনৎসের কাছে তাঁর ঋণের কথা।

বেশ রসিক লোক এই বেলজিয়ান কোচ। কেউ একজন

কে প্রশ্ন করেছিল যে য়োরোপের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আরাম ড়ে তিনি কাতারের মত উষর রুভূমির দেশে গেলেন কেন? ফার মোর কমফর্ট", কুনৎজের ড়জলদি জবাব, "পারস্য পসাগরীয় কোনো তৈল সম্পদে মৃদ্ধ দেশে ভাল একটা চাকরি পলে নিশ্চয়ই কারো আত্মহত্যা রার ইচ্ছে হয় না, এটুকু আমি াপনাকে নিশ্চিত করে বলতে ারি।"

বোঝাই যায় অনেক টাকা দিয়ে কুনৎজকে ধরে রেখেছে কাতার, এবং তার পুরো উশুলও কাতার পাচ্ছে। তবে যে ব্যাপারটা কুনৎজকে ভাবাচ্ছে সেটা এশিয়ানদের শারীরিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা নয়, টেকনিকের প্রতি তাদের অনীহা। "এখানে বেশীর ভাগ অ্যাথলীটই দেখছি স্বতঃস্ফূর্ত দায়াহীন চেষ্টায় বিশ্বাস করে। সেটা ভাল, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত টেকনিক যে অ্যাথলেটিকসে আজ কতটা জরুরী সেটা এরা কিছুতেই বুঝতে চায় না। বা বুঝতে হলে অ্যাথলেটিকসে উৎসাহই হারিয়ে ফেলে অনেক সময়। অথচ টেকনিক না আয়ত্ত হলে নিজের শারীরিক ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় না। এবং সেই কারণেই মনে হয় এশিয়দের শারীরিক ক্ষমতা সামগ্রিকভাবেই অন্যদের থেকে কিছুটা কম। কিন্তু সেটা হতে পারে না। বিজ্ঞান কখনোই এমন কথা সমর্থন করবে না," ব্যাখ্যা করে বললেন কুনৎজ।

অতএব এগিয়ে চলতে হলে এশিয়াকে তার নিজের শক্তিকে চিনতে হবে, এবং সেই সঙ্গে জানতে হবে কী উপায়ে এই শক্তিকে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগানো যায়। উত্তর কেরালায় কান্নানোর শহরের সমুদ্রতটে মাসের পর মাস রোদ, বৃষ্টি ঝড়ে মাইলের পর মাইল দৌড়ে, পি টি উষা পি টি উষা হয়েছেন ঠিকই। সেটা তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছাশক্তির জয়। কিন্তু বিশ্বের দরবারে উষাকে আজ হয়ত এতটা নগণ্য হতে হত না, যদি উন্নত বিজ্ঞানসম্মত বিদেশী ট্রেনিংয়ের যে সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন তা কাজে লাগাতেন। এবং উষা একা নয়, বিজ্ঞানসম্মত ট্রেনিংয়ের অভাবে প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এমন অ্যাথলীটের সংখ্যা আজ এশিয়ায়

লিডিয়া ডি ভেগা এশিয়া-সেরা কিন্তু বিশ্বমানে তুচ্ছ

নেহাত কম নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর জন্যে দায়ী পরিস্থিতির প্রতিকূলতা। তাই সব থেকেও বিশ্বমানের চেয়ে এশিয়ার দূরত্ব আজো বিস্তর।

সত্যি কথা বলতে কি, এক চীন ছাড়া এশিয়ার আর সমস্ত দেশেই সংঘবদ্ধ, পরিকল্পিত প্রচেষ্টার ভীষণ অভাব। একটা নির্দিষ্ট মান বা লক্ষ্যকে সামনে রেখে, প্রতিভাবান অ্যাথলীটদের খুঁজে বার করে তাদের বৃহত্তর প্রতিযোগিতার জন্যে তৈরী করার কোনো দীর্ঘমেয়াদী সুপরিকল্পিত উদ্যোগই এই সব দেশে নেওয়া হয় না। এমন কী ধনী দেশগুলোতেও নয়। যেমন ধরুন ফিলিপিনসের কথা। মোটামুটিভাবে বেশ সম্পন্ন দেশ ফিলিপিনস, খেলাধূলোয় উৎসাহও খুব। কিন্তু লিডিয়া ডি ভেগাকে বাদ দিলে অ্যাথলেটিকসে ফিলিপিনসের কী পরিচয়?

ব্যাপারটা বেশ সহজ করে বুঝিয়ে বলেছিলেন লিডিয়ার বাবা ফ্রান্সিসকো ডি ভেগা। "আমার পরিবারে খেলাধূলোর চর্চা আছে, তাই লিডিয়া বড় অ্যাথলীট হতে পেরেছে। কিন্তু সবার বাড়ীর পরিবেশ তো আর এক রকম নয়; আর সকলের বাবা অ্যাথলেটিকস কোচও নন। আমি একথা বলছি না যে যাদের পরিবারে খেলাধূলোর চর্চা নেই তাঁরা কেউ অ্যাথলীট হচ্ছেন না। হচ্ছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু অনেক বেশী কষ্টের মধ্যে দিয়ে অনেক বেশী সমস্যার মোকাবিলা করে। সংঘবদ্ধ চেষ্টা হলে এই সমস্যাগুলো অনেক সহজ হয়ে যায়। ব্যক্তিগত চেষ্টা হলে অনেকের পক্ষেই এই এত বাধা পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। গরীব দেশগুলোর কথা বুঝতে পারি। যেমন ভারত। কিন্তু আমাদের মত দেশে অথবা কোরিয়া বা জাপানে যদি সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা হয়, তবে তার কী প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া

বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক ট্রেনিংয়ে অনীহাই কি উষাকে অস্তাচলে ঠেলে দিচ্ছে?

হবে ভাবা যায় না।"

কথাটা পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলো সম্বন্ধেও সত্যি। তেলের দৌলতে অনেক পয়সার আমদানী করেছে ওরা। কাজেই ওদের পক্ষে কোনো সমস্যাই নয় দেশের প্রতিভাবান অ্যাথলীটদের খুঁজে বার করে উন্নত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা। কিছু উদ্যোগ অবশ্য ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে এখন বহু ইয়োরোপীয় কোচ রীতিমত ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। পয়সাও কামাচ্ছেন প্রচুর। নিকট ভবিষ্যতে তাঁদের পরিশ্রমের ফসলও হয়ত কিছু আমরা দেখতে পাবো।

তবে একটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় এশিয়ার অ্যাথলেটিকসে। অনেক সময়েই অনেক অ্যাথলিটকে তাঁদের জাতীয় বা ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় রীতিমত ভাল ফল করতে দেখা যায়। অথচ আন্তর্জাতিক স্তরে গেলেই তাঁরা আশানুরূপ ফল করতে ব্যর্থ হন। এর কী কারণ?

ব্যাপারটা খুঁজতে গেলে কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবার সম্ভাবনা। সত্যি কথা বলতে কী, দেশী বিদেশী যে অ্যাথলেটিকস কোচের কাছেই কথাটা পেড়েছি তাঁরা ঠারে ঠারে ডোপ ব্যবহারের কথা বলেছেন। অন্য দেশের কথা জানি না তবে আমাদের দেশে কিন্তু ব্যাপারটা নেহাত মিথ্যে নয়। সিঙ্গাপুরে ভারতীয় দলের কোচ বিদ্যাসাগর তো কথাটা স্বীকারই করে ফেললেন। তবে সেই সঙ্গে আরো একটা ভাববার মতো কথা তিনি বলেছিলেন, "ডোপ ব্যবহার করলে অ্যাথলীটদের নিজেদেরই ক্ষতি হয়। জাতীয় স্তরে ভাল করে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হলে আদতে কোনোই লাভ হয় না। তবে সেই সঙ্গে যে কথাটা মনে রাখার দরকার তা হোলো, বিদেশেও ব্যাপক ডোপ ব্যবহার হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই চোরের দায় ধরা পড়ে এশিয়ানরা। ইয়োরোপীয়ানরা অনেক চালাক। ওরা চুরিটাও ভাল করে করে। আমরা না পারি ভাল করে সাধনা করতে। না পারি আমাদের অ্যাথলীটদের ভাল খেতে দিতে, ভাল সুযোগ সুবিধে দিতে। না পারি চুরি করে বাজিমাৎ করতে।"

কথাটার মধ্যে তীব্র শ্লেষ থাকলেও, কথাটা মনে হয় অনেকাংশেই সত্যি। ■

নাসতাসে স্পেশাল

ইলি নাসতাসের চিরকালই রাখঢাক, গুড়গুড় কম। যা বলেন একেবারে দুমদাম সোজা মুখের ওপর বলে দেন। হপ্তাদুয়েক আগে টিপিক্যাল নাসতাসে মার্কা একটি মন্তব্য তিনি ছুঁড়েছেন। বলেছেন, "দু তিনজনকে বাদ দিলে এখনকার টেনিস তারকাদের খেলা দেখতেই ভাল লাগে না।" 'দু-তিনজন' কে কে ? না ম্যাকেনরো, নোয়া ও বেকার। চল্লিশে পড়া রুমানিয়ার সর্বকালের সব

থেকে বিতর্কিত (হয়তো-বা সেরাও) খেলোয়াড়টির অভিমত, বাকিরা টেনিসে উৎসর্গপ্রাণ নয়। এরা এসেছে টাকা পিটিতে আর কম্প্যুটার র‍্যাঙ্কিংয়ে নিজেদের নাম ওপরের দিকে দেখতে। খুব খোলাখুলি বলেছেন নাসতাসে—লেণ্ডল বা ভিল্যান্ডার খারাপ এমন কথা আমি বলছি না, ওরা যথেষ্টই প্রতিভাবান। কিন্তু যেরকম রসকষহীনভাবে খেলে সেটা দেখে একদমই আরাম পাওয়া যায় না।"

তাহলে দোষী কারা ?

"সব থেকে ভয় পাই কাদের জানেন ? পাবলিক, প্লেয়ার কর্মকর্তা কাউকে না, আপনাদের। প্রেসের লোকদের। ভাল করে দেখলেন কি দেখলেন না কিন্তু দুমদাম লিখে দিলেন ব্যস আমাদের সর্বনাশ।" রামরাজাতলায় অন্নপ্রাশনের এক নেমন্তন্ন খেয়ে উঠে সবে ঘুম ঘুম আমেজটা আসছে, কলকাতার এক নামী রেফারি এভাবে রসভঙ্গ করলেন। "আপনারা তো কাঁচের ঘরে (প্রেস বক্স) বসে সমালোচনাই করে খালাস। একবার ভেবে দেখেছেন কী অসুবিধের মধ্যে আমাদের ম্যাচ খেলাতে হয় ? সমালোচনা করুন ঠিক আছে, কিন্তু তার আগে আমাদের ব্যথাটাও জানুন। অন্তত জানার চেষ্টা করুন।" ভদ্রলোকের কথাগুলো খুব যুক্তিসঙ্গত মনে হল আমার। অতঃপর ওই প্রীতিভোজের অনুষ্ঠানেই কাগজ ও পেন ধার করে বেশ কিছু কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে বসে পড়া গেল। সংশ্লিষ্ট রেফারি বলতে আগ্রহী কি কি অসুবিধের মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয়। আমি শুনতে আগ্রহী এই অসুবিধেগুলো কাটাতে কি ধরনের এবং কী কী আপোস তাঁরা করেন। সাংবাদিকের দিক থেকে শর্ত রইল, খোলাখুলি সব বলতে হবে। মেনে নিয়ে রেফারিটি পাল্টা শর্ত আরোপ করলেন তাঁর নাম প্রকাশ করা চলবে না।

প্রথম প্রশ্ন : আচ্ছা বড় টিমের এগেনস্টে আপনারা পেনাল্টি দেন না কেন ? বহুবার দেখেছি সুব্রত বা মনোরঞ্জন বক্সের মধ্যে ফাউল করেও রেহাই পেয়ে গেছে, যেহেতু বিপক্ষে ছোট টিম।

"দেখুন, দিই না কথাটা ঠিক না, দিই। তবে কম। যখন দেখি গোটা মাঠ ব্যাপারটা ভালভাবে দেখেছে, তখন দিই। এরকম যদি হয় ফাউলটা খুব কৌশলে করা হয়েছে, আমি ছাড়া বিশেষ কেউ বোঝেনি তখন দিই না। দিলে কী হবে জানেন ? প্রথমত মাঠ ক্ষেপবে। দ্বিতীয়ত, আপনারা যাঁরা ব্যাপারটা দেখেননি তাঁরা পরের দিন বড় বড় করে লিখবেন রেফারির ভুল সিদ্ধান্তে ম্যাচ ড্র বা অমুক বড় টিমের হার। ব্যস আমার শেষ। কত ফুটবলার আছে খেলতে খেলতে রেফারিকে গালাগাল দেয়। আপনি ওই কাঁচের ঘর থেকে বুঝতেও পারবেন না। কিন্তু দিচ্ছে। এদের ওষুধ হচ্ছে পাল্টা গালাগাল দেওয়া। ওই খেলাতে খেলাতেই দিয়ে যান। কার্ড বার করেছেন কী মরেছেন। সত্তর দশকের এক নামী লিঙ্কম্যানের অভ্যেস ছিল রেফারি সতর্ক করে দিলে হাতজোড় করে রেফারির দিকে এগিয়ে যাওয়া। এমনভাবে হাতজোড় করে এগোবে যেন মনে হবে ক্ষমা চাইছে। আসলে তা নয়, হাতজোড় করেই গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে, শালা শু···। আপনি কার্ড দেখাবেন ? কোনও লাভ নেই। সে খেলা শেষ হলেই প্রেসের কাছে ছুটবে। আপনারাও ভাববেন তাই তো, কি জঘন্য রেফারিং। একটা লোক ওভাবে ক্ষমা চাওয়ার পর কার্ড দেখালো ! ব্যস লিখে দিলেন তিন কলম ; বলিষ্ঠ সাংবাদিকতা হল। এদিকে আমাদের প্রাণ যায়।"

তবু যতই বলুন বড় ক্লাবকে আপনারা টেনে খেলান। সাপোর্টারদের যদি এতই ভয় তাহলে রেফারিং করতে না আসাই তো ভাল, আমার প্রশ্ন ?

"না, না ভুল করছেন।" রেফারিটি আবেদনের ভঙ্গিতে হাত পা নেড়ে বললেন, "সাপোর্টারদের ভয় নয়। ভয় হচ্ছে ক্লাব অফিসিয়ালদের বদমাইসিকে। যেই একটা ক্লোজ ডিসিশন ক্লাবের বিরুদ্ধে গেল আর তা নিয়ে কাগজে সমালোচনা বেরোল তারা ছুটবে আই এফ এ-র কাছে। বলবে এ রেফারিকে আর আমাদের ম্যাচ দেবেন না। আর আই এফ এ জানেন তো, মুখে বড় বড় কথা যতই বলুক, বড় ক্লাব চাপ দিলে কেঁচো। এরপর সত্যিই আপনাকে ওই ক্লাবের ম্যাচ দেবে না। তখন আপনি কোথায় যাবেন ? হ্যাঁ আপনি হয়তো ঠিক করলেন এসব গ্রাহ্য করবেন না। দারুণ ব্যক্তিত্ব দেখিয়ে সব ম্যাচ খেলিয়ে যাবেন। শেষে কি হবে জানেন, দেখবেন কয়েকটা ম্যাচ পরে আর খেলাই পাচ্ছেন না, দাদা, বাঁচতে হলে আপোস আপনাকে করতেই হবে।"

কলকাতা মাঠের স্টার ফুটবলারদের সামলানো সম্পর্কে অতঃপর কিছু 'টিপস' উপহার পাওয়া গেল ভদ্রলোকের কাছ থেকে। **দেবাশিস রায়, সুব্রত ভট্টাচার্য**—ওদের বিপক্ষে প্রথম ফাউলটা ধরতেই হবে। তা না হলেই কিন্তু আইন নিজের হাতে নিয়ে নেবে। সুব্রত সম্পর্কে খুব সাবধান থাকতে হয় ভীড়ের মধ্যে। কোনও কিছু দাবী করে হয়তো মোহনবাগান ফুটবলাররা রেফারিকে ঘিরে ধরেছে। এবার সুব্রত ওই ভীড়ের মধ্যে ঢোকা মানে হয় রেফারির পা মাড়িয়ে দেবে নয়তো কনুই দিয়ে তলপেটে গুঁতো মারবে। এত সূক্ষ্মভাবে করবে যে কেউ দেখতেই পাবে না। **কৃষ্ণেন্দু রায়**—ওর একটা ভয়ঙ্কর ট্যাকল আছে—কোবরা ট্যাকল। ওই ট্যাকলটা করলেই কড়া ওয়ার্নিং দিতে হবে। নইলে কিন্তু সারা খেলায় চালিয়ে যাবে। **মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য** বিপক্ষে স্ট্রাইকারের মুখে ও কনুই দিয়ে মারে। এমন সময় মারে যখন রেফারি উল্টোদিকে তাকিয়ে। মনোরঞ্জনের কনুইটা সব সময় খেয়াল রাখতে হয়। **চিমা** —বিপক্ষ যখন ওকে খুঁচখাচ ফাউল করে যাচ্ছে তখন কিন্তু ওর পাশে থাকতে হবে। নইলে চিমা গরম হয়ে গেলে ওকে থামানো খুব মুশকিল। —**ভাস্কর গাঙ্গুলি** ভাস্কর বরাবরই হাত পা ছোঁড়ে। তবে আগে কিন্তু কখনও রেফারিদের গালাগাল দেয়নি। যা ইদানীং ওকে করতে দেখছি। 'স্বীকৃত ভদ্র ফুটবলারের' তালিকায় পাওয়া গেল এই পাঁচটি নাম—অতনু, কৃশানু, অলোক, বিশ্বজিত ও প্রশান্ত।

শেষ প্রশ্ন, আপনারা কিন্তু বড় টিমের অফসাইডও দেখেন না। এরকম বহু হয়েছে শেষ সময়ে অফসাইড থেকে পাওয়া গোলে বড় টিম জিতেছে। রেফারিটি প্রতিবাদ করেন না। বরং একগাল হাসেন। ঠিকই বলেছেন, "তবে শুধু আমরা অফসাইড দিই না নয়, সে-সব ক্ষেত্রে লাইন্সম্যানও ফ্ল্যাগ তোলে না। তুললে তো ইটের ঘায়ে উড়ে যাবে। কি দরকার ? একটা ম্যাচ খেলিয়ে পাই তো পঁচিশ টাকা। তার জন্য এত ঝঞ্ঝাট, এত অশান্তি কেন নেব ? দূর মশাই। সত্যি কথা বলব ? আমরাও চাই বড় টিম বেরিয়ে যাক। তাহলে সবার শান্তি।"

গৌতম ভট্টাচার্য

অঙ্কন : দেবাশিস দেব

চি ত্র ক লা

মধ্যগ্রীষ্মের রাত্রির স্বপ্ন

কিংবা দুঃস্বপ্ন। ইদানিং রাজ্যের বাটে চারুকলা মহাবিদ্যালয় ছাড়াও অননুমোদিত মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয়—নৈশ সপ্তাহান্তিক, প্রবাসরীয়—গত মহাযুদ্ধে হঠাৎ গজানো ব্যাঙ্কের মতো পাড়ায় পাড়ায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। ফলে শিল্পীদের দলে বহিরাগতের মতো অনেক আধপাকা, স্বশিক্ষিত। এইসব অননুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলি কতগুলি টোটকা এবং মুষ্টিযোগ শিখিয়ে দেয়। কিছু তাক লাগানো হাতসাফাইয়ের সহজ কায়দা।

কিন্তু অনুমোদিত সংস্থায় পাঁচ বছর ধরে যথারীতি পরিশীলিত অনুশীলন আর এইসব তোতাপাখি ইস্কুলে বুলি শেখার তফাত, অভ্যস্ত চোখে ধরা পড়ে। অনেকে কিন্তু এখন, শেকসপিয়ারের পরীদের রাণীর মতো কি এক বিভ্রান্তিতে, গাধার মাথা পরা ভাঁড়কে দেবদূত রূপে দেখে, তার প্রেমে মজেন। একথা আকাদমি অফ ফাইন আর্টসের বর্ষাকালীন (মিড সামার) প্রদর্শনী দেখে মনে হল। যন্ত্রতন্ত্রের উপভোগী হয়েও আধুনিক বোধ মনের অন্ধকারকে স্পর্শ করতে পারছে না অনেকের ছবিতে। কিছু কৌশল এবং বাণিজ্যিক ক্যালেন্ডারের সস্তা সৌন্দর্যবোধ মিলে সে এক বিশ্রী ব্যাপার।

ভাস্কর্যে উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল না। দুর্গাদাস ডাও "বেহালাবাদক" মূর্তিটিতে লোহার ঘোরানো সিঁড়ির জিলিপির প্যাঁচের মতো তলগুলো নিয়ে খেলতে চেয়েছেন। একদিকে এতে নৈপুণ্য নেই, অন্যদিকে রূপবন্ধ সম্বন্ধে আধুনিক ধারণাও স্পষ্ট নয়। চোখে দেখা যায় না এমন ছবি ছিল। কিছু কিছু জলচিত্র ছিল যা দুদণ্ড দেখা যায়। নিসর্গচিত্রই বেশি। হয়তো আর্ট কলেজের বার্ষিক প্রদর্শনীর কথা সেই সব ছবি মনে করিয়ে দেয়। বস্তুত জলরঙে আধুনিক ছবি কিন্তু আঁকা হল না তেমন। দু একজন এ হিসাব থেকে হয়তো বাদ পড়েন। কিন্তু বেশিরভাগ সচিত্রকরণ কিংবা আর্ট কলেজের ছবি। পলাশ বিশ্বাস "একা এক মেয়ে" ছবিটিতে ঘরে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঈষৎ উদ্ভিন্ন যৌবনা। ধরনটা মানিকলাল বাড়ুজ্জের মতো। অগুরুগন্ধী নাহলে কিন্তু ছবি উতরোয় না। দীপঙ্কর দত্তর পাহাড় আকাশ নিয়ে কাজটি ছোট ছোট চৌকো রঙ দেবার রীতি পল সিনিয়াকের বিভাগবাদী (ডিভিসানিস্ট) ওরফে বিন্দুবাদী

লিঙ্গরাজ মন্দির, শিল্পী : পরেশনাথ মাইতি

(পয়েন্টালিস্ট) কাজের মতো। যদিও প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বর্ণের ব্যবহার করে চাক্ষুষী বিভ্রমসৃষ্টির ব্যাপারটা নেই। যা স্যুরা থেকে সিনিয়াক পর্যন্ত নব্য প্রতিচ্ছায়াবাদী (নিও ইমপ্রেসেনিস্টদের) খেলা। ছবিটা তবুও সরলতাগুণে আকৃষ্ট করে। পরেশনাথ মাইতির "মরমী" এবং "লিঙ্গরাজ", সুদীপ নন্দীর জলাধারের কংক্রিটের কাঠামো এবং চালাঘর, চারপাশের কাগজের সাদা শূন্যতার জন্য মন্দ লাগে না। জলরঙ কালোর ব্যবহারে সামান্য স্বচ্ছতা হারালেও শুক্তি রায়ের "একা" জানালার ধারে আমাদের দিকে মুখ করে একটি মেয়ের হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকার ছবি। কাচের শার্সির বাইরের আলো, মেয়েটির এলো কালো চুল, লাল শাড়ির দাউ দাউ আগুনে ঘন বেদনার উদ্ভাস। ঢঙটা অন্য কারো মতো নয়। বিকাশ সাহার "থিম্পু" পাহাড় উপত্যকা নিয়ে কাব্য করা। সুমিত্রা দত্ত চৌধুরীর অনুভূমিক জল এবং আকাশ নিয়ে ছবিটা স্বচ্ছতাগুণে আবেশ তৈরী করে। আবার বলরাম জানার চালাঘরে বউ ছাগল নিয়ে "পরিবার"টিও মন্দ নয়। প্রদোষ পালের মস্ত বড় ছবি "জগন্নাথ ঘাটে" স্নানার্থীর ভিড় এবং "মরমী" ছবিতে নিসর্গের প্রশান্তি ফুটেছে। ছবি দুটিতে কলেজী গন্ধ থাকলেও কাজগুলি ভাল। জলরঙে সুব্রত পালের "একজন শিক্ষকের প্রতিকৃতি" চলনসই।

তেলরঙে উপেন মল্লিকের বিভৎস ছবি ছিল। বিষয়বস্তু সুন্দরীর ফোলা পায়ে ব্যান্ডেজ। অরবিন্দ মুখুজ্জের দুটি প্রতিকৃতিতে একই বৃদ্ধের মুখ। রচনা বলতে কিছু নেই। বসিয়ে আঁকা। এর মধ্যে "নিখোঁজ" ছবিতে একটা বিষণ্ণতার ছাপ লেগেছে, রঙ চাপানোর মুনশীয়ানা আছে। কিন্তু প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তব ছাড়াও প্রতিকৃতি সম্ভব। নীরদ মজুমদারের স্ত্রী পুত্রকন্যার অসাধারণ প্রতিকৃতি দেখে থাকবেন তিনি। তড়িৎ চৌধুরীর প্রজাপতি এবং একটি মেয়ে নিয়ে ছবিটা মন্দ নয়।

ছাপাই ছবি বিভাগেও কিছু কাজ ছিল তা রূপবন্ধ বা করণকৌশলে একরকম চলে যায়। রূপক চাকির বাদামি সোনালী পাথরছাপ ছবিতে স্টিম ইঞ্জিনের খালাসির মাথায় রুমাল বাঁধা চেহারা এনেছেন। মিনতি দাসের লিনোকাট ছবিটায় ছোট হলেও নর নারীর আবেগঘন মুহূর্ত এসেছে। তারকনাথ দাসের কালি কলমে দীর্ঘায়িত করে একজন মুখ আঁকাটায়, কাজ করে সূক্ষ্ম সংবেদ। ১৮৫টা কাজের মধ্যে পঞ্চাশ ভাগ বাতিল হতে পারতো।

অনিন্দ্য গোলাপের কাঁটা

দলটা পুরনো। প্রথমে নাম ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল ইয়াং আর্টিস্টস ফেডারেশান। তখন দলে পৃথ্বীশ শিকদার, পৃথ্বীশ সেনের মতো তরুণ শিল্পী অসিত মণ্ডলকে সঙ্গে করে চিত্রকলায় বেশ একটা অন্যরকম আবহ তৈরি করেছিলেন। মাঝখানে পৃথ্বীশ শিকদার দল ছাড়লেন। সেইসময়, বা একটু আগে পরে, "ইয়ং" শব্দটা তুলে দেওয়া হল। এলেন প্রবীণ বসন্ত পণ্ডিত, প্রৌঢ় কার্তিক পাইন এবং সত্যেন পোদ্দার। দু এক বছর থেকে, তাঁরাও দলত্যাগ করলেন। এবারে দেখছি পৃথ্বীশ সেনও নেই (আকাদমি অফ ফাইন আর্টস ২২—২৯ শ্রাবণ)। এ যেন ময়দানে তাঁবু আছে, নামী পুরনো খেলোয়াড় আছে কিছু। কিন্তু দলের সেই রমরমা নেই।

বঙ্কিম বাড়ুজ্জের কাজে একটা মান থাকে, যদিও বিষয়বৈচিত্র্য থাকে না। তিনটে কাজের মধ্যে দুটি জলরঙ। একটিতে জলরঙের ওপর তেলখড়ি

রয়েছে। একটিতে দেখি, নির্জন প্রান্তর, দূরে গ্রামের অস্পষ্ট ছায়া। একাকিনী মেয়েটি সম্মুখপটে। কিংবা হলুদ ফুলন্ত গাছের সামনে দিয়ে কাঁধের ওপর লগির ফাঁদে ধরা পড়া পাখি নিয়ে চলেছে। ছবিতে উজ্জ্বল রঙের ফাগ উড়েছে। তেলখড়ি দিয়ে বুনোট তৈরী হয়েছে। কিন্তু রচনার কাঠামো নেই। ফলে অমেরুদণ্ডী প্রজাপতির মতো ফুরফুরে ছবিগুলো।

অসিত মণ্ডল এবার মাছমারা মেয়েদের নিয়ে মজেছেন। টেম্পেরায় আঁকা ছবি। পেছনে একটি বা দুটি সমতল রঙ। তার ওপর মূল রূপবন্ধের প্রতিবিম্ব। সরল ও বক্র সমান্তরাল রেখা দিয়ে অঙ্কন। তারপর রঙ। সবুজ, লাল, নীল রঙের ব্যবহার হলেও, মেটে বাদামী রঙে কালো বা তামাটে মেয়েদের আঁকার চেষ্টার মধ্যে কপোলকল্প চিত্রের তাল কেটেছে সামান্য। জল আছে। জেলেনী আছে। জাল আছে। জালে মাছ আছে। রঙীন। স্বপ্নের এই নারীরা অ্যাকুরিয়ামের মাছ ধরছে! সমান্তরাল রেখায় অস্থিসংস্থানকে প্রাধান্য দেওয়া কল্পনার তালভঙ্গ করেছে। একটা ছবিতে স্বপ্ন কল্পনার গরুর গাড়ি এঁকেছেন। অসিত বড়দের জন্য রূপকথার জগৎ তৈরি করেন।

সমীর ঘোষ শিল্পতত্ত্ব এবং ইতিহাস ভালোই জানেন। কিন্তু পটের যুদ্ধক্ষেত্রে এর বারুদ এসে পৌঁছয় খানিকটা ভিজে। ফলে নানারকম বিপত্তি শুরু হয়। একটি ছবিতে এঁকেছেন দোতলার প্রসারিত ঘরের মেঝে। সম্মুখপটে সিঁড়ি নেমে আসছে। এঁকেছেন ঘনকবাদী (কিউবিস্ট) শৈলীতে। কিন্তু এরসঙ্গে "অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ"-এর রূপারোপ (স্টাইলাইজেসান) মেলেনি। "স্বৈরাচার" ছবিতে বিরাট চাবুক হাতে লোক। ওপরে একসার পিঠ কুঁজো মানুষ কিছু বইছে। নিচে আরেক সারে। 'হেঁইও জোয়ান' বলে দড়ি টানছে। রচনাটার প্রসাধন ভাল। কিন্তু অঙ্কনের দুর্বলতার জন্য কৌশলটা ঠিক খাটে না। এর "মোরগওয়ালি"র নাকটা মোরগের মতো। দুটো মোরগ যেন ঐ বিক্রেতার রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভাবনাটা মুগ্ধ করে। উপস্থাপনার কায়দাও আছে। কিন্তু টিমটিমে ভোলটেজ, কম রঙের জন্য শেষ পর্যন্ত মন ওঠে না।আর অতিরিক্ত খুঁটিনাটি জমা করেন বেশি।

প্রদ্যোৎ রায়ের একটি সাদামাটা নিসর্গচিত্র এবং তপন কুমার বিশ্বাসের কালো সাদা অঙ্কনে মেয়েদের গেরস্থালি কাজকর্ম-অন্যের চুল বাঁধা, ঘর মোছা, পোষা পায়রা আদর করা, ব্যবহৃত দৃষ্টিকোণ থেকে আঁকা হলেও, চলে যায়। মুকুল প্রসাদের "সেতু" বা ভোরের "মোরগ"ও চলনসই। কিন্তু কাজল দাশগুপ্ত প্রমুখ নেহাৎ অভ্যাসবশত ছবি এঁকেছেন। ডাক্তারদের মতো শিল্পীদের কলা মহাবিদ্যালয়ে রি-ওরিয়েন্টেশান কোর্স থাকা উচিত।

বাসন্তী দাভে তেলরঙ বালি-টালি মিশিয়ে ঈষৎ উদ্ভিন্ন ভাস্কর্যের মতো করে আকাশে "সুদূরের পিয়াসী" এক পাখি এঁকেছেন। আর ভারতীয় ভাস্কর্যের পরম্পরা মেনে গণেশ এবং লক্ষ্মী। পাথরে শ্যাওলা ধরা ভাস্কর্যের ভাবটা এসেছে। কিন্তু দুটো ছবির মানসিকতা ভিন্ন। করণকৌশলের ঐক্য থাকলেও, শৈলীর নেই। পরম্পরা মানা না-মানার স্ববৈপরীত্য এর ছবিতে।

মোট কথা দলীয় প্রদর্শনী আরও একটু যত্ন নিয়ে করা উচিত। এবারেরটা নেহাত দায়সারা গোছের মনে হল।

সন্দীপ সরকার

সং গী ত

অন্তরে ভুল ভাঙবে কি ?

শিল্পীদের মত বেদনাবাহী আর কে আছে? 'ছান্দসিক' আয়োজিত কলামন্দিরের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গান দিয়ে। ঠিক তার আগের দিন মধ্যরাত্রে শিল্পী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত। শ্মশান থেকে ফিরে সকলেই ভারাক্রান্ত। তবু বন্ধুবিয়োগের বেদনা নিয়েই দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে গাইতে হয়। যদিও তিনি প্রথম দুটি গান প্রয়াত শিল্পীর উদ্দেশে গাইলেন। তারপর বর্ষার গান। কিন্তু প্রতিটি গানেই 'আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে', 'তিমির অবগুণ্ঠনে' বা 'বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে' সব গানেই প্রয়াত শিল্পীর কথা মনে এসে যায়। রবীন্দ্রনাথ এইভাবেই সর্বতো চেতনায় ছড়ানো। একটি জায়গার ছবি যেমন বিভিন্ন কোণ থেকে নিলে বিভিন্নভাবে ধরা দেয়---সেইভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতও আনন্দ বেদনার বিভিন্ন অনুভব আনতে পারে।

অর্ঘ্য সেন

এই অনুভব হয়তো 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যেও সঞ্চারিত; কিন্তু অসিত চট্টোপাধ্যায়ের নৃত্য পরিকল্পনা তো সেই দিনের নয়, ফলে প্রশ্ন জাগে। হৃষীকেশ সেনের সঙ্গীত পরিচালনায় 'এ শুধু অলস মায়া' গানে ছেলেদের কণ্ঠ প্রায় অশ্রুত। 'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়' বা 'বাজো রে বাঁশরি বাজো' আনন্দকে দুঃসহ করে গেল। অবশ্য আনন্দ-বেদনায় সুর কম লাগতেই পারে, খুবই রিয়ালিস্টিক গান। অর্ঘ্য সেনের সব ক'টি গানই গভীরে প্রবেশ করে। আবার দীপক সেন কেন যে তিনটি অরুণেশ্বরের গান গাইলেন জানি না। সমস্ত নৃত্যনাট্যের মেজাজ তখন বিধ্বস্ত। 'বাহিরের ভুল' আরও প্রকট হল, 'অন্তরের ভুল'ও দৃঢ় হয়ে গেল। নতুন শিল্পী হিসেবে রূপা সেন বেশ ভাল। শুধু তার 'সখী আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না' গানটি মনে হয় বিরহের বেদনা নয়, ভূতের ভয়ে আর্তবিলাপ। আমরা অনেকেই সম্পূর্ণ ভাবনায় ভাবিত নই। প্রশ্ন উঠতে পারে, হঠাৎ 'সখী আঁধারে একেলা ঘরে'র মত বর্ষার গান কেন? বিচ্ছেদের পরে অরুণেশ্বরের গান 'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল' সূত্রধার বলেন, 'তাপার্তমন খুঁজে বেড়ায় অনাবৃষ্টির জল' 'রবিকর ব তব প্রতীক্ষায়'। 'তুমি যে খেলার সাথী, সে তোমারে চায়' যার জন্য প্রতীক্ষার শেষে, 'ঝরঝর নীরে, নিবিড় তিমিরে' —কমলিকা। 'পথ জানে না।' আর একটি গানেও বলা আছে, 'রৌদ্রদাহ হলে সারা, নামবে কি ওর বর্ষাধারা'। এই রূপকটি কোথাও অনুভব হয় না। 'জাগরণে যায় বিভাবরী' গানের সঙ্গে নাচ দেখলে মনে হবে কোন ঘুমের ওষুধে কাজ হচ্ছে না। 'আগল-ধরে দিলেম নাড়া'-তে খিল খোলার কী প্রাণান্ত প্রচেষ্টা।

গৌরী ঘোষ

অলকানন্দা রায়ের সুন্দর নাচ সত্ত্বেও মনে প্রশ্ন জাগে, 'ওই বুঝি বাঁশি বাজে, বনমাঝে কি মন মাঝে' গানে বাঁশি দেখাতেই হয়। 'স্বপনে ব্যথার মালাতে' যেন শুভদৃষ্টির মালা বদল। 'বাঁধিনু যে রাখী পরাণে তোমার' কি রাখীপূর্ণিমার গান? কেন হাতে রাখী পরানোর মুদ্রা দেখানো হয়? 'আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো' গানে প্রলাপ বোঝাতে যেন মুখে পানপরাগ ফেলা হয়। একদিক দিয়ে নৃত্যপরিকল্পনা আধুনিক, কারণ 'দে পড়ে দে আমার তোরা' গানে মনে হয় মেয়েদের কলেজে কেউ চিঠি ছুঁড়ে ফেলেছে। তাই নিয়ে প্রত্যেকের কৌতূহল। 'শস্য ক্ষেতের গন্ধখানি একলা ঘরে দিক সে আনি/ ক্লান্ত গমন পান্থ হাওয়া লাগুক আমার মুক্ত কেশে' —গানের কাব্যও হারিয়ে যায়। 'তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে' গানে, আনন্দের এলোমেলো বন্যায় কেউ কেউ হোঁচট খান। অবশ্য 'বুকের আঁচলখানি ধূলায় ফেলে আঙিনাতে মেলোগো' কথার আক্ষরিক নৃত্যানুবাদ পর্যন্ত এগোয়নি। ড্রেসারের কাছে মায়া কুমারীদের পোশাক ছিল। মেয়েরা সেই পোশাক পরে উর্বশী বন্দনা করে গেলেন— যদিও 'মায়ার খেলার' ভুল আর শাপমোচনের ভুলের কয়েক যোজন দূরত্ব। ইন্দ্রাণী খুব শান্ত, তিনি নাচ দেখেন মনে হয়, বউভাতের দিন সলাজ নববধূ উপহার নেবার প্রতীক্ষায় বসে আছেন।

'ছান্দসিক' প্রযোজনায় সবচেয়ে ভালো লাগে দিলীপ রায়, পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষের ভাষ্যপাঠ। দিলীপ রায়কে খুব কম অনুষ্ঠানে শোনা যায়। তাই বেশি ভালো লাগে। শুধু 'জ্বলে উঠল আলো' এই জায়গাটা সবাই একরকমভাবে বলেন। নাটকীয়তা এখানে অনিবার্য, কিন্তু প্রত্যেকে একইভাবে বলবেন কেন?

ানে তো কোনো বাধ্যতামূলক
লিপি নেই। একটি জায়গায়
্যে আছে—'বীণায় বাজে কেদার
াগ কালাংড়া' প্রত্যেক
ুষ্ঠানেই আলাদাভাবে দেখানোর
ষ্টা করা হয়। রবীন্দ্রনাথের বোধ
় সেই লক্ষ্য ছিল না। তাহলে
কটি বাক্যে শেষ করতেন না।

াসলে উদ্দেশ্য ছিল বিরহের রাত
াটিয়ে করুণ সকাল পর্যন্ত অতন্দ্র
তে বোঝান। যেমন এক জায়গায়
রজের' উল্লেখ আছে মিলনের
াগমনী হিসাবে। এই অনুষ্ঠানে
একটি বাক্যে না বলে রাগের নামগুলি
বিভিন্ন জায়গায় বলা হল এবং
সেতারে রাগটি শোনান হল। এই
সম্পাদনা উল্লেখযোগ্য হতে পারত,
যদি তা বিরহের ব্যাপ্তি থেকে
মিলনের আনন্দে নিয়ে যেতে পারত।

প্রতিবার 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য
দেখার সময় আমরা বলতে
চাই—জ্বলে উঠুক আলো, আবরণ
যাক ঘুচে। কিন্তু 'সেই আবরণ ক্ষয়
হবে গো"—বলে আশ্বাস খুব বেশি
শোনা যায় না।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

ন া ট ক

ভোজবাজ ও তাদের শিকার

একজন বিদুষী ইংরেজ মহিলাকে আমি একবার জিজ্ঞেস করি, 'কলকাতা আপনার কেমন লাগছে?' তিনি উত্তরে বলেন, 'ভাল। তবে অনেক ব্যাপারে খুব আশ্চর্য লাগে।' প্রশ্ন করি, 'যথা?' তিনি তাঁর আশ্চর্য লাগার তালিকা পেশ করেন। সেই তালিকার একটি : 'আপনাদের সব তাতেই—খাওয়া। কারুর সন্তান হবে এই সুসংবাদ শোনা মাত্র—খাওয়াও। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো—খাওয়াও। অন্নপ্রাশন—খাওয়াও। স্কুলে পাস—খাওয়াও। বিয়ে—খাওয়াও।

এমনকি, নিকটজন মারা গেল—খাওয়াও।' নিকটজনের মৃত্যুতে খাওয়ার দাবি (পারলৌকিক ক্রিয়ার নলচে আড়াল দিয়ে), এর বীভৎসতা, দরিদ্রের উপর নিপীড়ন—এ সবই আমাদের গা-সওয়া। এমনকি, এই অন্তিম কাজের সংস্কার আমাদের ভেতরে এতটাই ঢুকে বসে আছে যে, বামুন বা জমিদার বা মোড়লদের শয়তানির সুযোগ আরো বেড়ে যায়। যেমন বেড়েছে শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ'-এ। অত্যাচারের সুযোগ মোড়লরাও করে নেয়, যেমন নিয়েছে প্রেমচন্দের 'মৃতক ভোজ' গল্পে। কথাগুলি নতুন করে মনে পড়ল ২ আগস্ট সন্ধ্যায় কলামন্দিরের নিম্নতল হল-এ গিয়ে। সেখানে প্রেম চন্দের ১০৭তম জন্মবার্ষিকী পালন করলেন সঙ্গীত কলামন্দির সংস্থা। প্রথমে প্রেম চন্দের নাটক বিষয়ে অধ্যাপক দিলীপ মিত্রের বক্তৃতা। পরে 'মৃতক ভোজ' গল্পের অভিনয়। নাট্যরূপ দিয়েছেন রাজেন্দ্র কানুনগো এবং আশা শাস্ত্রী। নির্দেশক—প্রতাপ জয়সওয়াল।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট প্রকাশিত প্রদ্যুম্ন মিত্র অনূদিত প্রেম চন্দের যে গল্পসংগ্রহটি বঙ্গভাষী পাঠকদের সবচেয়ে পরিচিত, সেই বইতে এ গল্পটি নেই। গল্পটি তাই অনেক বাঙালীর কাছে অপরিচিত। গল্পটি সংক্ষেপে এই রকম : শুরু একটি মৃত্যু দিয়ে। রামনাথ (অনিল খাটুওয়ালা) মারা যায়। কন্যা রেবতী (শালু অগ্রবাল) ও পুত্র মোহনকে (কুনাল ঠক্কর) নিয়ে সুশীলা (উমা মেহতা) বিধবা হয়। ব্রাহ্মণেরা এসে ছেঁকে ধরে সুশীলাকে—ভাল করে রামনাথের শ্রাদ্ধ ও আত্মীয়বান্ধব-ভোজ করাতে হবে, নইলে রামনাথের আত্মার অক্ষয় স্বর্গবাস হবে না। বহু আপত্তি সত্ত্বেও সুশীলাকে শেষ পর্যন্ত বসত-বাড়ি বিক্রি করতে হয় মোড়লদেরই একজনের কাছে বাজারদরের চেয়ে সস্তায়। একটা ঘর ভাড়া করে উঠে যায় সুশীলা। ভাড়া দিতে না পেরে সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়। ওঠে গিয়ে বস্তিতে। এক সবজিওয়ালী বুড়ির দয়ায় কোনো রকমে বেঁচে থাকে। পুত্র মোহন অসুস্থ হয়ে পড়ে। টাকার অভাবে ডাক্তার জোটে না। সুশীলা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, 'ছেলের রোগ আমাকে দাও। ছেলেকে সুস্থ করে তোলো।' ভগবান বদ্ধ কালা। কিন্তু কখনো-সখনো ফস্ করে এক-আধটা কথা শুনে ফেলেন। সুশীলার এই কথাটা উনি শুনলেন এবং মঞ্জুর করে দিলেন।

মোহন দ্রুত আরোগ্য লাভ করে এবং সুশীলা রোগগ্রস্ত হয় ও মারা যায়। রইল বাকি দুই—ভাই ও বোন। রেবতী একটু বড় হয়েছে। তার দিকে নজর পড়ে প্রৌঢ় ঝাবরমলের (ও পি গুপ্তা)—সে রেবতীকে বিয়ে করতে চায়। তার পিছনে পঞ্চায়েতী মদত আছে। অগত্যা কিশোরী রেবতী বাঁচবার জন্যে নদীর জলে ডুবে মরে। থেকে যায় একটি নিঃস্ব অনাথ বালক। সে সারা জীবন ধরে শুনতে থাকে মৃতের ভোজের মাশুল। প্রেম চন্দ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, আমরা সবাই এক-একটি অগ্রদানী। আমরা এ প্রথা মানি। শ্রাদ্ধের

মৃতক ভোজ' নাটকের একটি মুহূর্ত

নিমন্ত্রণ পেলে খুশী হই—উপহার দিতে হয় না। শোকার্তের অশ্রু ও অর্থকষ্টের উপরে আমরা পাত পাতি, ছাঁদা বাঁধি।

গল্পের কালপরিধি বিস্তৃত, সংহতি সামান্য। যাকে আমরা সাধারণত নাটকীয় বলি, তেমন ঘটনা নেই। এ গল্পের নাট্যরূপ আদৌ সম্ভব কিনা, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। নাট্যরূপদাতারা হুবহু গল্পটিকে পর পর বলে গিয়েছেন। খুবই বিশ্বস্ত। ফলে, অভিনয়যোগ্যতা কমই রয়ে গেছে। বহু জায়গায় গল্প স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অথবা মঞ্চে উপস্থিত সব ক'টি চরিত্র ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে—যেন এক প্রতিযোগিতা। তাতে দর্শক অস্থির হয়ে ওঠে ও তাদের চোখে জলের বদলে বিপরীত জিনিস দেখা দেয়। এর আগে বাংলায় যাঁরা প্রেমচন্দের গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন, তাঁরা অনেকেই কিছু স্বাধীনতা নিয়েছেন। এটা নেওয়া উচিত ছিল কিনা, নিলে কতটা নেওয়া চলে, এ সব বিতর্কের মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু তাঁদের গুণ, তাঁরা নাট্যরূপটিকে অনেকটা অভিনয়যোগ্য করে তুলেছেন। কিন্তু এখানে হয়েছে উলটো। বিশ্বস্ত, কিন্তু নাটক হিসেবে দাঁড়ায়নি। এই মৌলিক ত্রুটি নির্দেশক প্রতাপ জয়সওয়াল কাটিয়ে উঠতে পারেননি। শিল্পীদের অবস্থাও হয়েছে বিড়ম্বিত। উমা মেহতা 'লাল কনের' (রক্তকরবী) নাটকে নন্দিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। কিন্তু এখানে লাগাতার অশ্রু বিসর্জন করা ছাড়া তাঁর আর বিশেষ কিছু করবার ছিল না। অন্যান্য শিল্পী ও নেপথ্যকর্মীদের কথা আলোচনা করে লাভ নেই।

তাঁরা সকলেই কমবেশি মৌলিক ত্রুটির শিকার। ভবিষ্যতে এ নাটকের অভিনয় করলে নির্দেশককে সব কিছু পুরোটা ঢেলে সাজাতে হবে।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

ন ৃ ত্য না ট্য

গতানুগতিক নিবেদন

তাসের দেশকে রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্যের পর্যায়ে ফেলা হয়ে থাকে। অথচ ইদানীংকালে অধিকাংশ প্রযোজনাতেই তাকে নৃত্যনাট্যরূপে আখ্যা দেওয়া হয়—যদিও সেখানে নৃত্যের অংশ সামান্যই। রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত সুরঙ্গন-এর প্রযোজনাটিও এর ব্যতিক্রম নয়। সামগ্রিকভাবে যদিও এঁদের প্রযোজনায় যত্নের ছাপ লক্ষ্য করা যায় তবুও কিছু প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে এসে পড়ে। যেমন কিছু শিশুশিল্পীকে তাসের

পোশাকে সজ্জিত করে মঞ্চের পিছনে দাঁড় করিয়ে রাখার অথবা একেবারে শেষ দৃশ্যে তাদেরকে গ্রুপ থিয়েটারের অনুকরণে, প্রেক্ষাগৃহের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করিয়ে মঞ্চের দুধারে স্থাণুর মত সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানোর

সুরঙ্গন-এর 'তাসের দেশ'

মধ্যে সার্থকতা কোথায় ? সম্পূর্ণভাবে এই প্রযোজনা যদি শিশুদের হত তবে কিছু বলার ছিল না। পরিচালক যেখানে রেখা মৈত্র সেখানে এই ধরনের অযৌক্তিকতা আশা করা যায় না।

নৃত্য পরিকল্পনাতে রেখা যথেষ্ট কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন—কিন্তু সমবেত নৃত্যাংশে একে অপরের দেখে করার প্রবণতার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। রাজপুত্রের ভূমিকায় প্রদীপ দের মঞ্চ ব্যবহার এবং সপ্রতিভ নৃত্য সকলের প্রশংসা আদায় করে। সুন্দর তাঁর অভিব্যক্তি। সদাগর পুত্ররূপী সোমা বসুও যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ—কিন্তু তাঁর পোশাকের অমন রঙ কেন ? হরতনীরূপী মুনমুন দত্ত নৃত্যে যতখানি সহজ অভিব্যক্তিতে ততখানি নয়। মঞ্চের পিছনে যাঁরা চরিত্রগুলির সংলাপ পাঠ করেছেন—তাঁরা কখনোই নাট্যের গভীরে যেতে পারেননি। ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল কিন্তু তা আলাদাভাবে উল্লেখের দাবি রাখে না।

নৃত্যাংশের তুলনায় সংগীতাংশ বেশ দুর্বল। সম্মেলক গানগুলিতে যথেষ্ট বোঝাপড়ার অভাব পরিলক্ষিত হল।

দেবাশীষ ঘোষের কণ্ঠস্বরটি ভাল, তিনি গেয়েছেনও আন্তরিকতার সঙ্গে, যদিও তাঁর আরও অনুশীলনের প্রয়োজন। শ্রাবণী সেনের 'কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়' আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য।

যন্ত্রসংগীতে বিপ্লব মণ্ডল, রঞ্জন মজুমদার, বিষ্ণু সাধুখাঁ ও অমল সরকার উপযুক্ত নাটকীয়তার পরিবেশ তৈরি করেছিলেন।

অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে অর্ধ শতকেরও অধিক শিশুশিল্পীদের দিয়ে প্রণামশীর্ষক যে নৃত্যানুষ্ঠান রেখা উপহার দিলেন তা রীতিমতন বিস্ময়কর। তিনি নিজে একজন দক্ষ শিল্পী ও তাঁর শিক্ষার ভিতটি সুদৃঢ় বলেই এত উচ্চমানের একটি উদ্বোধনী নৃত্য তাঁর পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। পরবর্তী জয়পুরী ঘরানার সমবেত কত্থক নৃত্যেও তাঁর কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বারীন মজুমদার

বি বি ধ

দেহপট সনে নট

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মৃত্যুর আটাশ বছর পর তাঁকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান হল। এর আগে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু অনুষ্ঠান হয়েছে, কিন্তু প্রায় সবই ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মত। 'শৈশরিক' সংস্থা এই প্রথম ব্যাপক উদ্যোগ নিলেন। অথচ আধুনিক থিয়েটারের ভাবনার পথিকৃৎ শিশিরকুমার। 'সীতা' নাটকের পর নানা প্রশস্তি, শিবরাম চক্রবর্তীর সমালোচনা, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতা—সব দেখেই আমরা সেই দামাল হাওয়াকে চিনতে পারি। গিরিশচন্দ্রের প্রেরণা—শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সখা। আর শিশিরকুমারের যাতায়াত জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের কাছে, আড্ডা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক দিকপালের সঙ্গে। নাট্য প্রযোজনায় তখন অন্য চিন্তা। অথচ মৃত্যুর আটাশ বছর পর হলেও সেই কাজ নিয়ে বিশ্লেষণ হল না। ছবি খুব কম। যাও বা আছে সেগুলি পোর্ট্রেট। সামান্য কয়েকটি দৃশ্যের ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু কখনই বিভিন্ন লেখায় যে রকম পাই সেই রকমভাবে 'দিগ্বিজয়ী'র কম্পোজিশন, 'সীতা' নাটকের মঞ্চসজ্জা, বিভিন্ন সময়ে আলোর ব্যবহার আর পেলাম কোথায়। 'নবান্ন' নাটকের পর 'দুঃখীর ইমান' নাটকের ছবিও কী পেয়েছি ? যদি থাকে তবে উদ্যোক্তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব সেই দলিলগুলি নিয়ে একটি প্রদর্শনী করা।

শিশিরকুমারের আমেরিকা সফরের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নানা জায়গা থেকে। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ডাইরি তার মধ্যে একটি মূল্যবান সম্পদ। বারবার একজন বিরাট প্রতিভাকে মঞ্চ ছাড়তে হয়েছে। কেন ? বিশ্লেষণ করা দরকার তা নিয়েও।

অনুষ্ঠানে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী চক্রবর্তী, অনুপকুমার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সকলেই স্মৃতিচারণ করলেন, শ্রদ্ধা জানালেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সুন্দরভাবে বিল্বমঙ্গলের অংশ পাঠ করলেন। চিরকিশোর ভাদুড়ী উদ্দেশ্যের কথা জানালেন—সবই প্রথাগত।

শিশির কুমার

শিশিরকুমারের শতবার্ষিকীর সামা[ন্য] কয়েকদিন বাকি আছে। আশা কর[ি] ইতিমধ্যে কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে, কিন্তু এরকম অগোছালভাবে নয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়পর্বে নাটকের গান শোনালেন গীতা সেন ও তাঁর সম্প্রদায়। জানি কৃষ্ণচন্দ্র দের মত প্রতিভাবান শিল্পী পাওয়া যাবে না।

তবু এটুকু আশা করা অন্যায় নয়, শিশিরকুমারের সঙ্গীত চিন্তার বৈশিষ্ট্যটুকু তুলে ধরা হবে। তা হল না। 'সীতা' নাটক উদ্বোধনের দিন নহবতখানায় সানাই বাজানো হয়—তার সঙ্গীত বা আবহ চিন্তা নিশ্চয়ই অন্যরকম ছিল যেমন 'শেষরক্ষায়' 'তোমরা সবাই ভালো' গাইতে গাইতে দর্শকের মধ্যে চলে আসা। কিন্তু সেই ব্যতিক্রমী চিন্তার পরিচয় পাওয়া গেল না। অন্যদিকে বিস্তারিত হওয়ার সুযোগও কম।

শিশির মঞ্চেই শিশিরকুমার স্মরণে অনুষ্ঠানের সময়সীমা নিয়ে বিধি নিষেধ আছে।

'শৈশরিক' উদ্যোগকে আগাম ধন্যবাদ—যদি তাঁরা শতবার্ষিকীতে কিছু করতে পারেন। বহুদিন আগে মহম্মদ আলী পার্কে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন শিশিরকুমার। বাইরে কোন আওয়াজ না পেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। একজন উদ্যোক্তা জানালেন, অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে, শিশিরকুমারের আপত্তিতে বক্তৃতায় মাইক ব্যবহার করা হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে পিছনে বসলাম। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে প্রতিটি কথা। (ওই বছরই সম্মেলনে তিনি 'সধবার একাদশী' মঞ্চস্থ করেছিলেন।) তাঁর ভাষায় তিনি তখন 'ভাড়াটে কেষ্ট'। বক্তৃতার এক জায়গায় জাতীয় নাট্যশালা হয়নি বলে তিনি ক্ষোভ জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা—'শেম শেম' বলে চিৎকার করে উঠল। সরকারি খেতাব প্রত্যাখ্যান করার সেই সাহসী মানুষটি দর্শকদের ধমকে বললেন, 'এখানে চিৎকার করে কী লাভ ? চিৎকার নয় আদায় করতে পারবেন ?'

তাঁর পরিকল্পনা মত জাতীয় নাট্যশালা আমরা আজও করতে পারিনি। এইবার তিনি হয়ত অলক্ষ্যে আমাদের নিরুত্তাপ থিয়েটার-দর্শকদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলছেন—'শেম শেম'।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

ভ

ম

মজিদ কত বড় ফুটবলার ? চুনী ও বলরামের চেয়ে বড় ? প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪৮, ৩২
মজুতদারি ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ৩৯, ৪৬, ১৬ সে ১৯৭২ : ৬৫৩, সম্পা
মঞ্জু দে
আমার কথা শা ১৯৬৩ : ২৮৮, স
মঞ্জু দে—আত্মকথা শা ১৯৬৩
মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯, ৪৩
মঞ্জু মিত্র
এক দেশে এক রাজা ছিলেন ৩৫, ৩০, ২৫ মে ১৯৬৮ : ৪৩৪, ক
এক পোশাকের মধ্যে দুজন ৩৪, ৪৩, ২৬ আ ১৯৬৭ : ৩০০, ক
এল এস ডি ৩৫, ৩, ১৮ ন ১৯৬৭ : ২২৬, ক
কার্নিভালে ৩৫, ১২, ২০ জা ১৯৬৮ : ১১৫৮, ক
চাবি হারিয়ে গেলে ৩৫, ৩৪, ২২ জুন ১৯৬৮ : ৮৫০, ক
মরা মাছির কয়েকটা লাশ ৩৫, ৩৮, ২০ জু ১৯৬৮ : ১২৬৬, ক
শূন্য বোতলের নীচে, মৃত্যুর কাছাকাছি ৩৬, ১৪, ১ ফে ১৯৬৯ : ১৮, ক
মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়
অদ্বিতীয় ডন ব্র্যাডম্যান ৩৭, ১১, ১০ জা ১৯৭০ : ১১২৯-১১৩১, স
অননুকরণীয় জাদুকর ৩৬, ৯ (বি), ২৮ ডি ১৯৬৮ : ১০৫৩-১০৫৬, স
অভাবনীয় ক্রিকেট বি ১৯৭৬ : ১২৯-১৩৫, স
উইলো কাঠে সুরের আগুন বি ১৯৭৪ : ১৩৯-১৪৪, স
ক্যাঙ্গারুর দেশে ভারতীয় ক্রিকেটারেরা বি ১৯৭৭ : ১৫৯-১৬৫, স
ক্যালিপ্সোদ্বীপের ক্রিকেট ৩৩, ২১, ২৬ মা ১৯৬৬ : ৭৮৩-৭৮৬
ক্রিকেটে শতাব্দীর মিছিল বি ১৯৮০ : ১৬৯-১৭৩, স
দ্বীপপুঞ্জের দুই সূর্য ৩৪, ৯ (বি), ৩১ ডি ১৯৬৬ : ৮৬১-৮৬৪, স
মঞ্জুভাষ মিত্র
এক বিলাসিনী নারী অর্ধশায়িত ললিতশয্যায়, হাতে বই চোখে স্বপ্ন ৫০, ১৩, ২৯ জা ১৯৮৩ : ৪৫, ক
বোহেমিয়া শব্দটির অর্থ ৪৯, ৪৫, ১১ সে ১৯৮২ : ৪৮, ক
মধু খাঁড়ির নিঃসঙ্গ মাতাল ৪২, ১৫, ৮ ফে ১৯৭৫ : ৮৪, ক
মিরিক—না যাওয়া ৪৭, ৩৯, ২৬ জু ১৯৮০ : ২৫, ক
শেমিজে ছুঁয়েছে জল স্নানকালে ৫০, ৪৮, ১ অ ১৯৮৩ : ১৩, ক
সপ্তগ্রামে বর্ষা নামে ৪৮, ৩৩, ৫ সে ১৯৮১ : ৩৭, ক
সমুদ্র ৪৫, ৩৫, ১ জু ১৯৭৮ : ৩৯, ক
মঞ্জুলা মিত্র
কবি সত্যেন্দ্রনাথ ২৩, ৩৪, ২৩ জুন ১৯৫৬ : ৫৬৭-৫৬৯, স
মঞ্জুলিকা দাশ
আহ্বান ২৭, ২, ১৪ ন ১৯৫৯ : ১৪২, ক
ইছামতী ২৮, ৩৩, ১৭ জুন ১৯৬০ : ৬০২, ক
কোন ভাড়াটের নিবেদন ৩৩, ১৯, ১২ মা ১৯৬৬ : ৬০৬, ক
নেপথ্যে ৩০, ৩১, ১ জুন ১৯৬৩ : ৫১৭-৫২১, গ
মঞ্জুশ্রী ঘোষ
বিহারের বাংলা ৪০, ৩৩, ১৬ জুন ১৯৭৩ : ৬৮৭-৬৮৮
মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায় ৩০, ২০
মঞ্জুশ্রী সরকার
চাউলের ইতিহাস ৩০, ৫১, ১৯ অ ১৯৬৩ : ১২১৫-১২১৯
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত
কাছে দূরে ৪৫, ৫০, ১৪ অ ১৯৭৮ : ১৭, ক
কিছু ভুল ৪৯, ৫২, ৩০ অ ১৯৮২ : ৩৭, ক
ঠিক ৪৮, ৫, ২৯ ন ১৯৮০ : ১৩, ক
তান্ত্রিক ৫০, ৫০, ১৫ অ ১৯৮৩ : ৪২, ক
তাহলে ৪৫, ১০, ৭ জা ১৯৭৮ : ৩৯, ক
দেখা ৪৮, ৩৩, ৫ সে ১৯৮১ : ৩৭, ক
দোষী ৪৯, ৩৪, ২৬ জুন ১৯৮২ : ৪৯, ক
পরিক্রমা ৪৭, ৫, ১ ডি ১৯৭৯ : ৩৯, ক
ভিখারিণী ৪২, ৪২, ১৬ আ ১৯৭৫ : ১৭৭, ক
মৃত রামধনু ৪৬, ২৩, ৭ এ ১৯৭৯ : ৩৯, ক
সমীপেষু ৩৬, ৭, ১৪ ডি ১৯৬৮ : ৬৪২ ক
সুদূর সুন্দর ৪৭, ২৫, ১৯ এ ১৯৮০ : ৫৫,ক
সুন্দরের কাছে ৫০, ৩৩, ১৮ জুন ১৯৮৩ : ২৮, ক
মট, নেভিল ৪৫, ৫
মণি চক্রবর্তী
রূপময় ভারত ২৯, ৩৬, ৭ জুন ১৯৬২ ১০৩২-১০৩৩, আলোকচিত্র
মণিকা দেবী
ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ ২১, ৪, ২৮ ন ১৯৫৩ : ২২৩—২২৬, স
মণিকা নাথ ৪৩, ২৩
মণিকুন্তলা মুখোপাধ্যায়
একদিন নিশ্চয়ই ৪১, ৪৯, ৫ অ ১৯৭৪ : ৭৪৫, ক
মণিবজ্র । অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শা ১৯৬১
মণিভূষণ ভট্টাচার্য
অন্তরীণ ২৭, ২৮, ১৪ মে ১৯৬০ : ১৯০, ক
অন্ধকার, কয়েকটি শব্দ ২৯, ১৩, ২৭ মা ১৯৬২ : ১২৩১, ক
এখন সময় ২৯, ৩১, ২ জুন ১৯৬২ : ৫৩২, ক
জ্বর ৩০, ৩৭, ১৩ জুন ১৯৬৩ : ১০৭২, ক
দ্বিতীয় মৃত্যু ২৯, ২৫, ২১ এ ১৯৬২ : ১০৭৬, ক
নতুন ভাড়াটে ৩১, ২, ১৬ ন ১৯৬৩ : ১৪০, ক
পুরাতনী ৩১,১০, ১১ জা ১৯৬৩ : ৯৩৮, ক
পোশাক ২৮, ১৮, ৪ মা ১৯৬১ : ৩৮২, ক
বর্ষার রাত ২৭, ২৫, ২৩ এ ১৯৬০ : ৯০২, ক
হাত ৩৩, ২২, ২এ ১৯৬৬ : ৮৫১, ক
মণিময়ের গোলাপবাগান । সত্যেন্দ্র আচার্য ৪৬, ৩২
মণিমোহন পাল ৪৮, ২৫—৪৮, ২৬
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩, ৩৫
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩, ৩৫
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯, ৪২
মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় *দেখুন* শঙ্কর
মণীন্দ্র গুপ্ত
অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে ৩৯, ১০, ৮ জা ১৯৭২ : ১০২২, ক
ত্রিযামা ৩৭, ৪৯, ৩ অ ১৯৭০ : ৯৭৬, ক
শব্দ ৪০, ৩৪, ২৩ জুন ১৯৭৩ : ৮০২, ক
মণীন্দ্র রায়
অপর্ণার দুঃখ শা ১৯৫৯ : ১৭৪, ক
আমি আর আমার কবিতা ৩৯, ২৮ (সা), ১৩ মে ১৯৭২ : ২১৭-২২৪
আনন্দ এবং আনন্দ ২৩, ৩৭, ১৪ জু ১৯৫৬ : ৭৬৮, ক
উঠতি দিনের রবিন শা ১৯৮২ : ২০, ক
একটি বা দুটি আলবাট্রাস শা ১৯৮১ : ২৬, ক
কাকে তুমি চাও ২৭, ২৩, ৯ এ ১৯৬০ : ৭৫১, ক
কিছু যে জোটে না ২৪, ৩৪, ২২ জুন ১৯৫৭ : ৬৫৫, ক
কোন পরিণামে ২৫, ২৭, ৩ মে ১৯৫৮ : ৩
খড়োর জঙ্গলে এই শা ১৯৮৩ : ৩৪৪, ক
গত অনাগত শা ১৯৬০ : ৫৮, ক
ঝড় থেমে গেছে ২৭, ৩১, ৪ জুন ১৯৬০ : ৪২
তোমার অর্কিড হাসি শা ১৯৮০ : ৬৫, ক
দুই আকাশ ২৭, ১৯, ১২ মা ১৯৬০ : ৪২৪
দুঃস্বপ্নের হ্যাণ্ড ওভার ৫০, ৩, ২০ ন ১৯৮২ : ক
দ্য লা ক্রোয়ার ঘোড়া ৫০, ২৯, ২১ মে ১৯৮ ১২, ক
নিজের মৃত্যুসংবাদ শুনে ৫০, ৪১, ১৩ আ ১৯৮ ১০, ক
প্রতিশ্রুতি শা ১৯৫৫ : ৯৪, ক
বন্ধুর জন্য ২৪, ২১, ২৩ মা ১৯৫৭ : ৫০
বন্ধুর জন্যে শা ১৯৫৬ : ৬২, ক
বাগ্মার জন্যে ২৫, ৮, ২১ ডি ১৯৫৭ : ৬৬৬
ভাষা তার বোবা ২৩, ৫০, ১৩ অ ১৯৫৬ : ৭৩
যতো দূরে যাও ২৭, ৪২, ২০ আ ১৯৬০ : ২০৬
যদি সে আকাশ পাই শা ১৯৫৭ : ৮৯, ক
যারে মন, ডুবে যা ২৮, ৬, ১০ ডি ১৯৬০ : ৪২০
শস্যের মাটি যে—২৪, ৪০, ৩ আ ১৯৫৭ : ৫৫
শানাইয়ের রঙের আকাশ ২৮, ১৭, ১৫ ফে ১৯৬ ১৫০, ক
শেষ দৃশ্যে ২৭, ৩৫, ২ জু ১৯৬০ : ৭৬৮
শেষ বসন্ত ৪৯, ৪৪, ৪ সে ১৯৮২ : ২৭
হারাণ মিস্তিরী শা ১৯৫৮ : ৩৫, ক
মণীন্দ্র রায় ৩৯, ২৮ (সা)
মণীন্দ্রকুমার ঘোষ
সৌর রশ্মির প্রয়োগ ২৫, ৩৪, ২১ জুন ১৯৫৮ ৬৩৫—৬৩৮ স
মণীন্দ্রনাথ দাস
মাইথন বাঁধ নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায় ২১, ৩৪, ২ জুন ১৯৫৪ : ৫৯৭—৬০০, স
মণীন্দ্রনাথ সেন ৪৮, ১৮
মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
আচার্য নন্দলাল বসু শা ১৯৫৪ : ২৫-৩০, স
দুর্গামূর্তির আধুনিক রূপ ২২, ৫, ৪ ডি ১৯৫৪ ৩২১-৩২৭, স
রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প ২২, ৩৪, ২৫ জুন ১৯৫৫ ৬৪৯-৬৫৪, স
সতীর্থ রমেন্দ্রনাথ ২২, ৩৮, ২৩ জু ১৯৫৫ ৯৯৩-১০০০, স
মণীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
ফ্রেজারগঞ্জের সমুদ্র সৈকতে ৩২, ২৩, ১০ এ ১৯৬৫ : ৯৭১-৯৭৪, স
মণীন্দ্রলাল বসু ২৯, ৫০ ; ৪৭, ৪৭
মনীশ ঘটক
অন্বর্থ ২৫, ৪৩, ২৩ আ ১৯৫৮ : ২৩৫, ক
অহমের বাত ইব প্রবাসি ৩২, ২, ১৪ ন ১৯৬৪ : ১১২, ক
আগুন তাদের প্রাণ ৩৬, ৩৩, ১৪ জুন ১৯৬৯ : ৪৪, ক
উজান সোঁতে শা ১৯৫৮ : ৩৪, ক
ঋতুরঙ্গ শা ১৯৫৭ : ৮৬, ক
একস্থং তদভুমারী ৩২, ৪৮, ২ অ ১৯৬৫ : ৯১৭, ক
কা ত্বদন্যা ৩৪, ৫০, ২১ অ ১৯৬৭ : ১০৫৭, ক
কেউ আছে জানি ৪৩, ১৭, ২১ ফে ১৯৭৬ : ২২৮, ক
দুই গৃহ ২৫, ৩৪, ২১ জুন ১৯৫৮ : ৬১৭, ক
ধীমহি ২৫, ৪৯, ৪ অ ১৯৫৮ : ৬৬৪, ক

ত্বকের বন্ধু

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

প্রকৃতি মানুষের যেমন বন্ধু তেমন আর কেউ নয়। শুধু মানুষ কেন জীবজন্তু উদ্ভিদ সকলেরই। প্রকৃতির কাছ থেকেই পায় সকলে সূর্যালোক, বাতাস, জল, মাটি, আকাশের শীতলতা—ক্ষিত্যপতেজমরুৎব্যো-ম। এবং এ সকল বস্তুর সমন্বয়ে জীবন ধারণ করে সকলে। ফল ফুল ফোটে গাছে। প্রাণী বংশ বিস্তারের মাধ্যমে বিস্তৃত করে তার অস্তিত্ব। অবশ্য প্রকৃতির রোষও যে নেমে আসে না ধ্বংসের ভয়াল রূপটি ধরে এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু ক্রমবিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে প্রত্যেকেই খুঁজে পায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার পথটি। যারা পারে না তারা বিলুপ্ত হয়ে যায় ধরণীতল থেকেই। প্রকৃতিতেই আছে সব। তোমার প্রয়োজন মত বেছে নাও। কাজে লাগাও তাকে, সমূলে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই প্রয়োজনের তাগিদেই বাঘ-বেড়ালও ঘাস খায়। সেটাই অবস্থা বিশেষে তাদের ওষুধ যে। মানুষের কথা একটু স্বতন্ত্র। প্রথম প্রথম সেও শুধুমাত্র প্রকৃতি নির্ভর ছিল। পরে তার বুদ্ধির জোরে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করল স্বীয় কর্তৃত্ব। ধীরে ধীরে সভ্যতার হাত ধরে হতে শিখল আত্মনির্ভর। গড়ে উঠল কলকারখানা, জনপদ, বাঁধ। এই মানুষই বারুদের মুখে সুস্তনী ধরিত্রীর পাহাড় উড়িয়ে সমতল রক্ষা করল তাকে। খনি খননের নামে প্রতি নিয়ত চালাতে লাগল ধর্ষণ। শ্যামল বর্ণ কেশোপম বনরাজিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সে তাকে করল মুণ্ডিত মস্তকা। ফল কি দাঁড়াল ? নিশ্বাসে বিষ, অনিয়মিত বর্ষণ, নতুন নতুন বন্যা এলাকার সৃষ্টি। অস্থানে অসময়ে

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোলাম নবী আজাদকে গুণাগুণ বোঝাচ্ছেন ডাঃ দেবনাথ।

ঘটে যায় ধরিত্রীর ঘন ঘন মাথা নাড়া। তাই আজ নতুন করে শ্লোগান উঠেছে—চলো ফিরে প্রকৃতির কোলে। কবির কবেকার আর্তনাদে এতদিন পরে সবাই গলা মেলাচ্ছেন, দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ শহর।

মানুষের ত্বক প্রকৃতির সূর্যালোক, নির্মল বাতাস ইত্যাদির সাহচর্যে সজীব ও সুস্থ থাকে। কিন্তু এ কোন প্রকৃতি আজ আমাদের ঘিরে ? বাতাসে ধোঁয়া কালি—পেট্রোল ডিজেলের, সূর্যালোক এসে নামতে পারে না ধরায়। বেদান্তের মায়ার মতই ধূম্রজালে আচ্ছন্ন সে। কলকারখানার ধোঁয়া যেন 'নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস'। ধুলো কালি পেট্রোল তেল ইত্যাদি মিলেমিশে ত্বকের ওপরে পড়ছে নিয়ত প্রলেপ। ফলে ত্বক মুখের ছিদ্র পথ যাচ্ছে বন্ধ হয়ে। দেহের পরিত্যাজ্য দূষিত জলীয় পদার্থ যা অনেকটা বেরিয়ে আসে এ পথ দিয়ে, রাস্তা পায় না নির্গমনের। ত্বকদ্বার দিয়ে অক্সিজেনও পারে না প্রবেশ করতে। তাই জন্ম নেয় খোস, পাঁচড়া, ফোঁড়া নানান চর্ম রোগ। সামান্য কাটা ঘা শুকতে চায় না সহজে। ত্বক ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। তার ওপরে আধুনিক প্রসাধনের প্রলেপ কলকাতার ইট বারকরা ভাঙা বাড়ির দেওয়ালে চুনকামের মতই বিসদৃশ লাগে।

অথচ এই প্রকৃতিতেই এখনও আছে আমাদের বন্ধু—যদিও তারা বিস্মৃত প্রায়। তাদের সাহচর্যে আমরা ফিরে পেতে পারি ত্বকের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য। সেই চন্দন, নিম, ক্যালেণ্ডুলা, মোম ইত্যাদি। যাদের ব্যবহারে ভারতীয় নারী এবং পুরুষ সুত্বকের অধিকারী হয়েছে এককালে।

দেখা যাক এরা কে কোন উপকার করে থাকে মানুষের।

চন্দন : অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে চন্দনের ব্যবহার চলে আসছে। জন্মালে চন্দনের চর্চা, বিবাহেও তাই। মৃত্যুকালেও চন্দন অপরিহার্য অঙ্গ সামাজিকতার, লোকাচারের। একধাপ এগিয়ে বলা

যায় হিন্দু ধর্মের প্রতিটি পদক্ষেপেই এর প্রয়োজন। এষ সচন্দন বিল্বপত্রাঞ্জলি...ইত্যাদি মন্ত্রে বা স্তোত্রে তার প্রমাণ।

চিকিৎসাশাস্ত্রে চন্দনের ব্যবহার জ্বর, পূজমেহ, দুষ্টস্রাব, অপস্মার, বমন, হিক্কা, হুপিং কাশ বা শূল রোগ— কোথায় নয়! এসকল রোগে ভিন্ন ভিন্ন অনুপানের সঙ্গে সেবনীয় চন্দন নির্দিষ্ট পরিমাণানুযায়ী। বসন্ত রোগে গুটিতে মাখানো হয় চন্দন বাটা। সেরে ওঠার পরেও ক্ষত দূরীকরণে চাই তাকে। বিষফোঁড়ার বিষ দূর করে সে। অতিরিক্ত ঘর্ম হলে চিকিৎসক উপদেশ দেন চন্দনের প্রলেপ দিতে সঙ্গে বেনামূল এবং কর্পূর। ঘামাচি, মাথাধরা, শিশুদের নাভি পাকায় বা তাদের মাথার ঘায়ে চন্দন ছিল চিকিৎসকের নিদান। শাস্ত্রে চন্দনকে বলা আছে দাহ প্রশামক, গাত্র দুর্গন্ধ সংহারক, বর্ণপ্রসাদক, বিষনাশক হিসেবে। চন্দন রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রিত করে এ জাতীয় উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে সর্বঅঙ্গে চন্দন লেপন করেন তা যে শুধু মাত্র শরীর স্নিগ্ধ রাখা এবং সুগন্ধের জন্য তা মনে হয় না। এই ধর্মে ক্রোধের নিয়ন্ত্রণ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সারাগায়ে এবং মাথায় চন্দনের প্রলেপ ক্রোধকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারে বলে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সেকালে। পরিবেশকেও দূষণের হাত থেকে বাঁচায় চন্দন, চন্দন তেলের তাই ব্যবহার মৃতের গায়ে।

নিম : এমনই আর এক উপকারী বন্ধু নিম। সংস্কৃত ভাষায় একটি শ্লোক আছে যাতে বলা হয়েছে বসন্তকালে যে নিম্বভক্ষণ করে না তার মুখে আগুন। রহস্যাচ্ছলে বলা হলেও নিমের গুরুত্ব বোঝাতে এটি

জ্যাবোবাড়ি কেশতেল বোতলজাত হচ্ছে।

বেশ ভালভাবেই সক্ষম। নিম বাতাসকে শোধন করে। তাই ভারতবাসী নিমের গাছ লাগায় বাড়ির চারিধারে। পথের পাশে। হাম বা বসন্ত রোগ হলে বিছানায় নিমপাতা বিছিয়ে দেওয়া হত আগে। নিমের কচি পাতা বুলিয়ে ঐসব রোগের চুলকুনি বন্ধ করা হত। নিমের তেলের তো বহু উপকারিতা। বিশেষত চর্মক্ষতে। নিমের কষ দাঁতের জীবাণু রোধক। শাস্ত্রে যে ঔষধকে বলা হয়েছে—তিক্তমাশু **ফলপ্রদম্**— তিক্ত এবং আশু ফলপ্রদ অর্থাৎ চট জলদি নিরাময়ক, কথাটা বোধহয় নিমকে মনে রেখেই। জ্বর জারিতে তো নিমের পাঁচন ছিল অবশ্য ব্যবহার্য।

ক্যালেণ্ডুলা : আর ক্যালেন্ডুলা নামটা বিদেশী হলেও গাঁদা নামটা পরিচিত আমাদের সবার। ছোটবেলায় অনেকেই কেটে ছড়ে গেলে গাঁদা ফুল গাছের পাতা থেঁতো করে বা চিবিয়ে কাটা জায়গায় লাগিয়েছেন দু'তিন দশক আগেও। পল্লী অঞ্চলে এখনও এর ব্যবহার। ক্যালেণ্ডুলা এই গাঁদা গোত্রের গাছ। হোমিওপ্যাথি পুস্তকে দেখি ক্যালেন্ডুলার প্রশস্তি। কেটে যাওয়া, আঘাত লেগে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া বা অন্য প্রকার ঘায়ে জলের সঙ্গে ক্যালেন্ডুলার মূল অরিষ্টের বাহ্যিক প্রয়োগ ক্ষতস্থানে পূঁজ জমতে দেয় না। পুরোনো ঘায়ে অলিভ অয়েল বা নারকেল বা তিল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ক্যালেন্ডুলার ব্যবহারে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য সাধারণ তেলের মিশ্রণেই এই ফললাভ। চন্দন বা নিমতেলের সঙ্গে ব্যবহারে যে অত্যাশ্চর্য ফল পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ নেই। লিউকোরিয়া রোগে ক্যালেন্ডুলা মিশ্রিত জলে জরায়ু প্রক্ষালনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। দাঁত তোলার পরে রক্ত বন্ধ না হলে ক্যালেন্ডুার কুলকুচি অত্যন্ত ফলপ্রদ। ফোড়াতেও ক্যালেন্ডুলার প্রয়োগ।

মোম, ল্যানোলিন : ত্বককে শুধুমাত্র রোগ নিরোধক প্রাকৃতিক বস্তুদ্বারা সমৃদ্ধ করলেই চলে না। দেখতে হয় সে যেন মসৃণ থাকে। উজ্জ্বলতাও যেন বাড়ে। তাই পূর্বে মৌমাছির চাক থেকে সংগ্রহ করা মোম দিয়ে ত্বকের পরিচর্যা চলন ছিল। শুষ্ক একজিমায় বাহ্যিক প্রয়োগে উপকার মেলে। আর ল্যানোলিন চামড়াকে রাখে নরম। মলমের আধার হিসেবে ব্যবহৃত এই পশমজাত স্নেহ পদার্থটি। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকেও করে তোলে নরম ও মসৃণ। ত্বক এটিকে খুব তাড়াতাড়ি শুষে নিতে পারে।

যদি উপরোক্ত ত্বক-বন্ধুদের একত্র করে ব্যবহার করা যায় তবে ত্বক যে সুরক্ষা পায় এবং দর্শনীয় হয়ে ওঠে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঝুড়ি ভর্তি হীরে

সুন্দর কেশের সাথী

...কের বন্ধু

...ন্না চুনী, প্রবাল ইত্যাদি সামনে ফেলে দিলেই যেমন যে কেউ সুন্দর রত্নের হার গড়তে পারেনা, প্রয়োজন হয় সুদক্ষ মণিকারের ঠিক তেমনি চন্দন তেল, নিম তেল, ক্যালেন্ডুলা, ল্যানোলিন, প্যারাফিন ইত্যাদির সহযোগে ত্বকের যত্নকারী মলমটি তৈরি করতে পারেন কেবল মাত্র যোগ্য অধিকারীই। অন্যথায় মর্কট সমীপে বেদ বেদান্ত উপস্থাপনার মতই প্রচেষ্টাটি হবে নিষ্ফলা।

এমনই একজন অধিকারী হলেন ডাঃ এস ডি দেবনাথ। যাঁর পরিচয় এখন বঙ্গভূমে বিশেষভাবে ছড়িয়ে গেছে জ্যাবোরান্ডি কেশ তেলের প্রবর্তক হিসাবে। জ্যাবোরান্ডি কেশ তেলেই নিজের গবেষণা সীমাবদ্ধ না রেখে ডাঃ দেবনাথ চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর গবেষণা। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর গবেষণাগার থেকে নিত্য নতুন দ্রব্য। জ্যাবোসেন্টা অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম এমনই একটি গবেষণার ফসল। ১৯৮৫ সাল নাগাদ তাঁর মাথায় এর চিন্তা আসে। তারপর দুবছরের নিরলস চেষ্টায় এটি এখন বাজারে বেরোবার উপযোগী। আশা করা যাচ্ছে এ পুজোতেই সবাই হাতে পেয়ে যাবেন। দামটি রাখা হচ্ছে আয়ত্তের মধ্যেই। চার টাকা চল্লিশ পয়সা। স্থানীয় কর আলাদা। গত বছর পার্ক হোটেলে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গুলাম নবী আজাদও। তিনি উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন এই ক্রীমটির ব্যাপারে।

ডাঃ দেবনাথ এই প্রতিবেদকের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন যে তিনি অনেকের ওপর জ্যাবোসেন্টা অ্যান্টিসেপটিক ক্রীমের পরীক্ষা করে খুব ভাল ফল পেয়েছেন। খুঁতখুঁতে সন্দিগ্ধ মন আমার। তাই প্রশ্ন করি কেন এই ক্রীমটির প্যারাফিন-বেস। অন্যান্য অনেকের মতোই পেট্রোলিয়াম বেস নয় কেন। উত্তরে অভিজ্ঞ চিকিৎসক জানান পেট্রোলিয়াম জেলি খনিজ তৈলোৎপন্ন। চামড়ার ক্ষতি হতে পারে এটির শোধন সঠিকভাবে না হলে। তাছাড়া আমরা তো পূর্বেই দেখেছি মোম বা প্যারাফিনের নিজস্ব উপকারিতা রয়েছে।

জিজ্ঞাসা তবু থামে কই? অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডাঃ দেবনাথ কেমন করে বাহ্যিক প্রয়োগের ক্রীম অনুমোদন করেন। হোমিও শাস্ত্র তো তার বিরোধী। ডাঃ দেবনাথের উত্তর—ত্বকের রসক্ষরণ হলে বাহ্যিক প্রয়োগে মানা। অন্যথায় নয়। তাহলে তো তৈল মর্দন বা স্নান করাও বন্ধ করে দিতে হয়। এ ক্রীমটি রোগ হবার আগেই ত্বকের বর্মস্বরূপ কাজ করবে—এ কথাও জানান তিনি। এ দূষিত পরিবেশে সেটার একান্ত প্রয়োজন।

অ্যালুমিনিয়াম টিউবকে করা হয়েছে আধার। ফলে বিপদের ভয় নেই। আর এই টিউব আসে মেটাল বক্স থেকে। অতএব—মা ভৈষীঃ।

ডাঃ দেবনাথ কিন্তু ইতিমধ্যে অপর একটি দ্রব্য চালু করেছেন বাজারে। সেটির নাম জ্যাবোসেন্টা মেডিকেটেড পাউডার। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এটি রোগ প্রতিরোধক। বিতাড়কও বটে। এতেও চন্দন ইত্যাদি রয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে স্যাবাডিলাও।

স্যাবাডিলা বীজের শাঁস থেকে তৈরি মূল অরিষ্ট ব্যবহার হয় চর্মরোগে। গাত্র চর্ম যদি পার্চমেন্ট কাগজের মত শুষ্ক হয় কিংবা যেখানে যদি হয় কাঁটার মত উদ্ভেদ, নখ হয় পুরু ও মোটা, গায়ের স্থানে স্থানে লালবর্ণ বিন্দু ও রেখার হয় সৃষ্টি তবে প্রয়োজন এই ওষুধটির।

জ্যাবোসেন্টা মেডিকেটেড পাউডার ঘামাচিরও শত্রু। কিন্তু চন্দন বেস বলে অন্যান্য প্রিকলিহিট পাউডারের মত চিড় বিড় করে না। তাই নামে প্রিকলি হিট কথাটি নামে ব্যবহার করা হয়নি।

বাজার থেকে কিনে পাউডার সরাসরি ট্যালকম পাউডারের মূল উপাদান হিসাবে ব্যবহার করলে অনেক সময় বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। কারো কারো অ্যালার্জি হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা দেয় নতুন নতুন বিপত্তি। সেটা চিকিৎসক হিসাবে ডাঃ দেবনাথ কখনই ঘটতে দিতে পারেন না। তাই পাউডার এনে সেটিকে জীবানুমুক্ত করে নেন তিনি। এ

বছরের মে মাসের প্রথম দিনই বাজারে ছাড়া হয়েছে এই জ্যাবোসেন্টা মেডিকেটেড পাউডার। এবং চাহিদাও হচ্ছে বাজারে ভালোই। দাম দশ টাকা নব্বুই। স্থানীয় কর ব্যতিরেকে।

ডাঃ দেবনাথের সংস্থা এস ডি দেবনাথ হোমিও ল্যাবোরেটরি (প্রাঃ) লিমিটেড চুলের ব্যাপারে আরও মাথা ঘামিয়ে বের করেছেন জ্যাবোসেন্টা হেয়ার লোশন। এটিও বাজারে পুজোর আগেই বের হচ্ছে। চুলের ডগা ফাটা, মাথার খুস্কি ওঠা ইত্যাদি প্রতিরোধের জন্য একটা কিছুর প্রয়োজন উপলব্ধি করছিলেন তিনি। তাই চালাচ্ছিলেন গবেষণা। এই গবেষণা চালাতে গিয়েই তিনি বুঝেছিলেন চুল ওঠার একটা বড় কারণ খুস্কি বা

ঘামাচিও রোধ করে জ্যাবোসেন্টা মেডিকেটেড পাউডার

ত্বকের বন্ধু

মরামাস। সাদা সাদা আটার ভূষির মত বস্তুটির সঠিক উৎপত্তির কারণ এখনও জানা যায় নি। মানসিক চিন্তা, টাটকা বায়ুর সংস্পর্শের অভাব, হরমোনের মাত্রার হেরফের বা অতি ক্লান্তি যে কোনটিই খুস্কির কারণ হতে পারে। খুস্কির আক্রমণ প্রবল হলে অনেক সময় মনে হয় মাথায় বুঝি কোনও ঘা হয়েছে। মাথার চামড়ার 'এপিডারমাল সেল' খুব বেশি পরিমাণে নষ্ট হতে থাকলে খুস্কি বলে বোঝা যায়। অনেক সময় ভাইরাস ইনফেকশন বা জীবানু সংক্রমণ থেকেও খুস্কি হয়। ফলে কেশ পতন দ্রুততর হয়। সাধারণতঃ মানুষের মাথায় কেশ জন্মায় মাসে এক লক্ষ থেকে দু লক্ষ। বাড়ে বারো মিলিমিটার বা আধ ইঞ্চির মত। তিন বছর বৃদ্ধির পর বেশির ভাগ কেশেরই পতন হয়। এবং তিন মাসের মধ্যেই সেই জায়গায় নতুন চুল জন্মায়। দৈনিক তিরিশটি থেকে একশটি কেশের পতন একটি স্বাভাবিক ঘটনা। চুল জন্মায় অনেকটা টবের গাছের মতন। মাথার চামড়ার নিচে থলির মত একটি ক্ষেত্র আছে যাকে বলে ফলিকল। এই ফলিকলের সংখ্যা কিন্তু জন্মকালেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তী জীবনে এরা আর সংখ্যায় বাড়ে না। চুলের মূলটি হচ্ছে একমাত্র জীবন্ত অংশ। এটি বৃদ্ধিকালে পুরোনো মৃত চুলকে সরিয়ে দেয় ঐ ফলিকল নামক টব থেকে। ফলে পুরাতন কেশের বিদায় ঘটে মাথা থেকে। এই কেশ বিদায়ের ব্যাপারটা যদি পূর্বোল্লিখিত মাত্রার থেকে বেশি হয় তবেই টাক পড়তে থাকে।

অতএব খুস্কি হটাও চুল বাঁচাও। বাডিয়াগা বা একরকম শুষ্ক সামুদ্রিক স্পঞ্জ চুলের রোগ বিশেষত খুস্কি প্রতিরোধ করে। তার সঙ্গে কিছু গ্লিসারিন এবং অন্যান্য ভেষজের সংযোজনায় তৈরি করলেন ডাঃ দেবনাথ জ্যাবোসেন্টা হেয়ার লোশন। এটিতে চুল চটচটে হয় না। অথচ উজ্জ্বল থাকে। চুলের ডগা-ফাটা রোগও সেরে যায়।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে জ্যাবোরান্ডি হেয়ার অয়েল থাকতে আবার একটি হেয়ার লোশন কেন একই সংস্থা থেকে। তার উত্তর হল জ্যাবোরাণ্ডি খুস্কি দূর করতে অক্ষম। তাই জ্যাবোসেন্টা হেয়ার লোশন ব্যবহার করে খুস্কি দূর করে তারপর ফিরে যেতে হবে জ্যাবোরান্ডিতে।

বলা বাহুল্য ডাঃ দেবনাথের জ্যাবোরাণ্ডি বাজারে আলোড়ন তোলায় অনেকেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অনুকরণে বেশ কয়েকজন/ কয়েকটি সংস্থা বাজারে জ্যাবোরাণ্ডি ছেড়েছেন। এখন সবই আসল লক্ষ্মীবাবুর দোকান। তবে উদ্ভাবক ডাঃ দেবনাথের জ্যাবোরাণ্ডি কিনতে গিয়ে দোকানীর কাছ থেকে বেশি কমিশন দেওয়া অন্য জ্যাবোরাণ্ডি কিনে অনেকেই হতাশ হয়ে পড়েছেন। এবং সামগ্রিকভাবে জ্যাবোরাণ্ডি কেশ তেলের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাই ডাঃ এস ডি দেবনাথ হোমিও লেবোরেটরি (প্রা) লিমিটেড ট্রেড মার্ক রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আবেদন করেছেন। অপেক্ষা করে আছেন অনুমোদনের। ইতিমধ্যে গবেষণায় আরও উন্নতমানে পৌঁছেছে তাঁদের জ্যাবোরাণ্ডি কেশ তেল। কলকাতা বা পশ্চিম বাংলাই নয়—জ্যাবোরাণ্ডি এখন জয় করেছে বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মেঘালয় এবং মণিপুরের বাজারও। লিভাসল (লিভার টনিক) এবং অ্যালফালফা নামক সাধারণ টনিকও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। উত্তর চব্বিশ পরগনার গাড়ুলিয়ায় এস ডি দেবনাথ হোমিও ল্যাবোরেটরির ফ্যাক্টরি। আপিস উত্তরপাড়ার কবি কিরণধন স্ট্রিটে। আর হাওড়া সাবওয়ের মুখে সেই পুরোনো সেলস কাউন্টার এবং ডাঃ দেবনাথের চেম্বার তো আছেই। এই শেষোক্ত স্থানটি থেকে দাতব্য চিকিৎসালয়গুলিকে কম দামে ওষুধ সরবরাহ করা হয়—পাইকিরি এবং খুচরো বিক্রি তো হয়ই। এত কাজের মধ্যে থেকেও প্রতিদিন সন্ধ্যায় রোগীর চিকিৎসা করে থাকেন তিনি।

সুরেন মার্কেটিং এজেন্সি এঁদের বিপণনের সমস্ত ভার কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাঁদের কাছে বহু সংস্থা এখনও আসছেন নতুন নতুন উৎপাদনগুলির ডিলারশিপ নেবার জন্য। আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই জ্যাবোরাণ্ডি তেলের মত জ্যাবোসেন্টা গ্রুপের উৎপাদনগুলি সারা পূর্ব ভারতে জনপ্রিয় হবে। সেই প্রথম দিনের প্রচার সঙ্গী আডকিং পাবলিসিটি সার্ভিসের সহযোগিতায় তাদের নাম ফিরবে মুখে মুখে।

তবে মুখে মুখে যে ডাঃ দেবনাথের নাম অনেক দূরই ছড়িয়েছে তার প্রমাণ নানা স্থান থেকে তাঁকে দেওয়া সম্মানে। পঁচাশি সালে রোটারি ক্লাব হাওড়া, দিল্লির ক্রিটিক সার্কল অফ ইন্ডিয়া, বেনারসের ইন্ডিয়ান সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল লাভার্স অরগানাইজেশন, প্রভৃতি সংস্থা থেকে সম্মান পেয়েছেন তিনি। ভবিষ্যতে আরও পাবেন নিশ্চয়ই। কেননা সুগন্ধ চন্দনবৃক্ষের সুবাস চারিপাশের বনকে করে আমোদিত। তাকে লুকিয়ে রাখা যায় না চেষ্টা করেও। ডাঃ দেবনাথের পরিচিতিও এই হাওড়া হুগলি পশ্চিমবঙ্গের সীমানা তো ছাড়িয়েছেই। আশা করব ভারতবর্ষের সীমানাও সে অতিক্রম করবে অচিরেই।

ডাঃ এস. ডি. দেবনাথ
হোমিও ল্যাবোরেটরী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা বাস স্ট্যান্ড,
হাওড়া সাবওয়ে,
হাওড়া–৭১১১০১

দেশ
বিচারের বাণী
সিংহ □ কিশলয় ঠাকুর □ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়
সাক্ষাৎকার
সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়
সুমন চট্টোপাধ্যায়
ত্রিনিদাদ

Randy Brandy
A hot banana and brandy souffle.
Gateaux Be There
Your choice of gâteaux: walnut, strawberry and passion fruit.
যে
দেয়ানেয়ায়
প্রীতির
ছোঁয়া
Terool
From
Raymond's

সূচীপত্র

দেশ

২ আশ্বিন ১৩৯৪ □ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ □ ৫৪ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সাক্ষাৎকার

বিজ্ঞান

শিক্ষা

জিজ্ঞাসা

প্রকৃতি

ভ্রমণ

বিদেশের চিঠি

খেলা

গল্প

কবিতা

ধারাবাহিক রচনা

ধারাবাহিক উপন্যাস

প্রচ্ছদ

লালুপ্রসাদ সাউ

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক
৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
বিমান মাশুল . ত্রিপুরা ২০ পয়সা পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা

৩৯

মেকলে বলেছিলেন, ভারতের লোকেরা মামলাবাজ। তা একবার যখন মামলা করার একটা জায়গা অর্থাৎ আদালত পাওয়া গিয়েছে দেশ ছেয়ে যাবে মামলায়। কথাটা তিনি যে অর্থেই বলুন, দেশে আজ শুধু মামলা ছেয়ে যায়নি, পাহাড় জমেছে মকদ্দমার। মেকলের স্বদেশবাসী একদা এখানে বিচারের নামে সামান্য অভিযোগেও লোককে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছে। কিন্তু আজকের জনকল্যাণধর্মী স্বাধীন রাষ্ট্রে বিচার করেই 'বিচার'। বিচার তাই বিলম্বিত হতে পারে। পারে আরও অনেক কারণে। কিন্তু এতে কি বঞ্চনাও বাড়ে না ? জনচিত্তে তাই নিয়ে
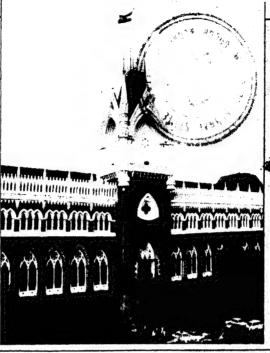
আছে বিতর্ক। ভাবনা তাই ধর্মাধিকরণেরও। এর সমাধান নিয়ে বিচারপতিরা কী ভাবছেন, কী বলছেন দেশের আইনবিদরা, কোনদিকেই বা জনমত—এই নিয়ে এবারকার প্রচ্ছদ নিবন্ধমালা। কেন হল না দেবযানী হত্যার আসামীর ফাঁসি, খুনির শাস্তি কি প্রাণদণ্ড না বিকল্প কিছু, যাবজ্জীবন মানে কী সেই প্রসঙ্গও আলোচিত এখানে। সেই সঙ্গে আছে হাইকোর্টের নথির পাহাড় খুঁড়ে তুলে আনা নানা কাহিনীর মণিমুক্তো। আদালত সর্বদেশেই মানব-সভ্যতার ইতিহাস ধরে রাখে, তাই এদেশে না থাকলেও অন্য গোলার্ধেরও কোনও উচ্চতম আদালতে রক্ষিত হয় মনুর মূর্তি। কিন্তু কোথায়, কেন ?

৭৭

ত্রিনিদাদে ভারতীয়দের সন্ধানে গিয়ে লেখিকা পেয়েছিলেন অ্যামেরিন্ডিয়ানদের। অনেক কিছুই তাঁদের অন্য রকম। তবু ধর্মে যাঁরা হিন্দু, তাঁরা দেওয়ালিতে মাটির প্রদীপ জ্বেলে মাতিয়ে তোলে দ্বীপটিকে। চোদ্দশ' আটানব্বুই সালের ত্রিশ জুলাই কলম্বাসের জাহাজ যেদিন ভিড়ল এখানে সেই দিন থেকে এই সুন্দর দ্বীপটির জীবনধারার আধুনিককাল পর্যন্ত বিবর্তনের কাহিনী বর্ণিত এই রচনায়।

৫৩

জনস্বার্থের মামলাগুলি বাড়ছে, আবেদনকারীর অধিকারও বেড়েছে। দেশে সামাজিক বিপ্লব সম্ভব করার কাজে জনস্বার্থের মামলাই বড় হাতিয়ার—বলছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়।

১৭

উপর্যুপরি তিনবার নির্বাচনে বিজয়িনী শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচার ইংলণ্ডের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করলেও এক নয়া ভাঙনের আভাসও কি ধরা পড়েছে এই নির্বাচনের ফলাফলে ? স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস, উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের ভোট কি তিনি পেয়েছেন ? যে ঐতিহাসিক কারণে ইংলণ্ডের সঙ্গে ওই দেশগুলি যুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, তা কি আজ বিযুক্ত হয়ে যেতে চাইছে নতুন পটভূমিতে ?

৯২

আসন্ন বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ভারতীয় দলের এক সদস্য বাংলার অরুণলাল সহ-খেলোয়াড় শ্রীকান্ত, রবি শাস্ত্রী, দিলীপ বেঙ্গসরকর, কপিলদেব, গাওস্কর এবং অন্যান্যদের সম্বন্ধে এক অন্তরঙ্গ আলোচনা করেছেন এবারের 'খেলা'য়।

প্রকাশিত হয়েছে

সুদীপ্তা সেনগুপ্তের

পৃথিবীর শেষ আবিষ্কৃত মহাদেশ-অভিযানের অভিজ্ঞতা

আন্টার্কটিকা

দাম ৫০·০০

আন্টার্কটিকা। পৃথিবীর তলায় লুকিয়ে-থাকা শেষ আবিষ্কৃত মহাদেশ। তুষারঝড়ের বাসভূমি, পৃথিবীর শীতলতম, শুষ্কতম, উচ্চতম এবং দুর্গমতম মহাদেশ। বিশ্বের নানান উন্নত দেশ আজ আন্টার্কটিকায় স্থাপন করেছে গবেষণা-কেন্দ্র।
আন্টার্কটিকার তৃতীয় ভারতীয় অভিযানে স্থান পেয়েছিলেন প্রথম বাঙালী মহিলা বিজ্ঞানী সুদীপ্তা সেনগুপ্ত। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না ভূতত্ত্ববিদ্। এই গ্রন্থে সেই অভিযানেরই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার গল্প শুনিয়েছেন তিনি। রুদ্ধশ্বাস কৌতূহল নিয়ে শুনতে হয় এই কাহিনী।
সুদীপ্তা সেনগুপ্তের এই গ্রন্থ শুধু তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিখুঁত রোজনামচা ভাবলে ভুল হবে। বস্তুত, আন্টার্কটিকা সম্পর্কে যাবতীয় প্রশ্নেরই উত্তর এই বইতে। শুরু থেকে অদ্যাবধি আন্টার্কটিকাকে ঘিরে যত ধরনের জল্পনাকল্পনা ও অভিযান-অভিজ্ঞতা, সমস্ত কিছু শুনিয়েছেন তিনি এই বইতে। তাঁর চোখে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, কিন্তু কলমে দুর্লভ সাহিত্যিক দক্ষতা। তাই শব্দ হয়ে উঠেছে চলচ্ছবি। স্বাদু, সজীব, সরস, তথ্যসমৃদ্ধ এক প্রামাণিক চলচ্ছবি।
বহু রঙীন ছবি, সাদাকালো ছবি ও চার্ট এ-বইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এর আকর্ষণ বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে।
প্রচ্ছদ : সত্যপ্রিয় সরকার।

২২০০ কপি নিঃশেষ

সমরেশ বসুর

ঝড়-তোলা উপন্যাস

শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে

দাম ১২·০০

সমরেশ বসুর হাতে অবশ্য প্রথম নয়, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘদিন পরে লেখা হল একটি প্রকৃত-অর্থে রাজনৈতিক উপন্যাস, যা কিনা পড়বার পরই শেষ হয়ে যাবে না, নতুন করে ভাবাবে ; বিশেষত সেইসব পাঠক-পাঠিকাকে—যাঁরা বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক কিংবা কর্মী, অথবা উঁচুতলার নেতৃত্বের আসনে সমাসীন। এক মজদুর পার্টি-ক্যাডারের আত্মানুসন্ধানকে ঘিরে এ-যেন পার্টিরই নতুন হিসেবনিকেশ। শুরু থেকে অদ্যাবধি প্রতিটি পদক্ষেপের সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ।
যে-আদর্শে একদিন চার পুরুষের মজুর, হাতে শিকল-পরা নাওয়ালরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, সেই আদর্শ কি আজও অটুট ? পার্টি কি হারায়নি তার চরিত্র ? মজদুর কি সরে যায়নি মধ্যবিত্ত ইনটেলিজেনসিয়ার নেতৃত্বের আড়ালে ? নাকি নাওয়ালই আজ বিভ্রান্ত ? তার নিজেরই চরিত্র-ভাবনার বদল ঘটেছে ?
দুর্লভ দক্ষতায়, অকৃত্রিম মমতায়, জীবন্ত ও গতিময় এক কাহিনীর মধ্য দিয়ে এমনতর নানার প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজেছেন সমরেশ বসু।

ছোটদের সেরা উপহার

আশাপূর্ণা দেবীর
রাজকুমারের পোশাকে
দাম ১০·০০
গজ উকিলের হত্যারহস্য
দাম ১০·০০
ভুতুড়ে কুকুর
দাম ১০·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর
লাভের বেলায় ঘণ্টা
দাম ১০·০০

তারাপদ রায়ের
ডোডো-তাতাই পালা কাহিনী
দাম ১০·০০
একটি কুকুরের উপাখ্যান
দাম ১০·০০

চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্তের
মেজদার নানারকম
দাম ৮·০০

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ধূমকেতু রহস্য ও হ্যালি
দাম ১২·০০

প্রবাসজীবন চৌধুরীর
হল দেখা হল চেনা
দাম ১০·০০

সুখরঞ্জন দাশগুপ্তের
রেল চলে ঝমাঝম
দাম ৩০·০০

বিমল মিত্রের
রাজা হওয়ার ঝকমারি
দাম ১০·০০
দাশরথির বাহাদুরি
দাম ১০·০০
কে ?
দাম ১৫·০০

লীলা মজুমদারের
বাতাসবাড়ি
দাম ৬·০০
কাগ নয়
দাম ১০·০০
সব ভুতুড়ে
দাম ১৬·০০

সংকর্ষণ রায়ের
গভীর গহন
দাম ৮·০০

সুজিতকুমার সেনগুপ্তের
রহস্যময় সেই রিভলবার
দাম ৮·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ভূমিকম্পের পটভূমি
দাম ৬·০০
শরদিন্দু অমনিবাস (৪র্থ)
দাম ৩০·০০

রণজিৎকুমার রায়ের
শিকারকাহিনী
দাম ৬·০০

চুনী গোস্বামীর
খেলতে খেলতে
দাম ২৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স-এর যাবতীয় উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ ও নাটকের তালিকা প্রকাশিত হবে আগামী সংখ্যা থেকে।

প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের

সুবিশাল স্মৃতিকথা

দিনগুলি মোর

দাম ২৫·০০

যে-কোনও স্মৃতিকথাই একদিক থেকে ইতিহাসের উপাদান। আর যখন কোনও ঐতিহাসিক শোনান তাঁর জীবন-পরিক্রমার অন্তরঙ্গ বিবরণ, তখন তা হয়ে ওঠে আরও মূল্যবান আরও প্রামাণিক এক দলিল। যেমন এই আত্মজীবনী। নিতান্ত ঐতিহাসিক বললে অবশ্য প্রতুলচন্দ্র সম্পর্কে কমই বলা হয়। কেননা, কৃতবিদ্য এই মানুষটির জন্ম, জীবিকা ও শিক্ষাসূত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতার পরিধি আরও ব্যাপক ও বর্ণময়। তাঁর কৈশোর কেটেছে পুব বাংলায় ও কলকাতায়, শিক্ষা কলকাতার স্কুলে ও প্রেসিডেন্সিতে, ডক্টরেট লনডনে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ছিলেন নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য। যোগ দিয়েছেন বহু ঐতিহাসিক সম্মেলনে। আর তাই, সত্তরের মধ্যদিনের এই স্মৃতিতে ভিড় করে আসে অর্ধশতাব্দীকালেরও বেশি সময়ের এক বর্ণাঢ্য, চলমান ইতিহাস। সেই ইতিহাসই এই গ্রন্থে।
তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব, প্রবল বৈদগ্ধ্য ও প্রসন্ন রসবোধে উজ্জ্বল এই ইতিহাসের প্রতিটি পঙ্ক্তি। এমন প্রাণবন্ত যে মনে হয়, সামনে বসে গল্প শুনছি। সমীর বিশ্বাসের আঁকা পুরনো কলকাতার বহু স্কেচ এ-গ্রন্থের অতিরিক্ত আকর্ষণ।

১১০০ কপি নিঃশেষ

নীললোহিত-এর

রম্য ভ্রমণকাহিনী

তিন সমুদ্র সাতাশ নদী

দাম ৩০·০০

নীললোহিত—যাঁর বয়স কখনও সাতাশ ছাড়ায় না, নীললোহিত—যাঁর পায়ের তলায় সর্ষে এবং তার ফলে যিনি টুঁড়ে বেড়ান বিশাল ভারতের যাবতীয় চেনা-অচেনা জায়গা—এবার পাড়ি দিয়েছেন ইউরোপ-আমেরিকাতে। আর সেই ভ্রমণেরই রম্য কাহিনী এই গ্রন্থে।
বলতে গেলে, এ প্রায় অর্ধেক পৃথিবী পর্যটন। ইউরোপের হল্যান্ড, ফ্রান্স আর ইংল্যান্ড, ওদিকে আমেরিকার এফোঁড়-ওফোঁড় ও কানাডা। কোনও ঠিকঠিকানা নেই, ইচ্ছেমতো বেড়ানো। আহার যত্রতত্র, শয়ন হট্টমন্দিরে। নীললোহিতের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতাও তাই সব হিসেবের বাইরে। বিদেশ দেখে হীনম্মন্যতায় গলে পড়েন না তিনি। সহজ চোখে দেখেন, পছন্দ-অপছন্দের কথা স্পষ্ট করে বলেন। পুরোপুরি আড্ডার মেজাজে লেখা এ-বইতে বিদেশের অনুপুঙ্খময় বর্ণনা যেমন রয়েছে, সেইসঙ্গে রয়েছে ওখানকার বাঙালীদের জীবনযাপনের ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ ছবি। এবারের ভ্রমণে অনেকের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়েছে ওখানে, এমন-কী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেও।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ৩১-৪৩৫২

শিল্পশ্রমিক আন্দোলন

'দেশ' ১ আগস্ট সংখ্যায় চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য 'পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সংহার' প্রবন্ধে দুজন শ্রমিক নেতার বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরেছেন। এ সম্পর্কে আমার কিছু বলার আছে। ১৯২৬ সালে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইন বিধিবদ্ধ হয়। এর বহু পূর্ব থেকেই অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন চলে আসছে। এ আই টি ইউ সির জন্ম হয় ১৯২০ সালের ৩১ অক্টোবর। আই এন টি ইউ সি'র জন্ম হয় ১৯৪৭ সালের ৩মে। আই এন টি ইউ সি শ্রমিক সংগঠনে প্রথম বিভেদ আনেনি। এর পূর্বে এ আই টি ইউ সি-তে কয়েকবার বিভাজন হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে মানবেন্দ্রনাথ রায় ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবার গঠন করেছিলেন।
আই এন টি ইউ সির প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সভাপতিত্ব করেছিলেন। এজন্য তাঁকে আই এন টি ইউ সি-র জনক বলে উদ্দেশ্যমূলক প্রচার করা হয় কিন্তু এ আই টি ইউ সির প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে লালা লাজপৎ রায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বলে তাঁকে এ আই টি ইউ সির জনক বলা হয় না। কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারের জন্য আই এন টি ইউ সি গঠিত হয়নি। এ আই টি ইউ সির ভিতরে যে সমস্ত কংগ্রেসী, সমাজতন্ত্রী ও নির্দলীয় অ-কম্যুনিস্ট কাজ করতেন তাঁরা জেল থেকে গভীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ করেন যে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী কোনো সাড়া দেননি। কেবলমাত্র আহমেদাবাদের বস্ত্রশিল্প শ্রমিক ও জামসেদপুরের লৌহশিল্প শ্রমিক আগষ্ট বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেন। কারণ ঐ দু স্থানের ইউনিয়নের নেতৃত্বে ছিলেন কংগ্রেসীরা। ১৯৪৩ সাল থেকে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে দ্রুত গতিতে। মূল্যবৃদ্ধির হাত থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে রক্ষার জন্য এ আই টি ইউ সি ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে কোনও প্রতিরোধ সংগ্রামের (Industrial action) ডাক দেয়নি। তখন শোষিত, নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণীর নিকট তাঁদের আহ্বান ছিল—উৎপাদন বাড়াও, শিল্পে শান্তি রক্ষা কর। এই নীতি সিটু আজ পশ্চিমবঙ্গে অনুসরণ করছে।
১৯৪৫ সালের শেষ দিকে সকল কংগ্রেসী ও সমাজতন্ত্রীরা জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। ১৯৪৬ সালের বিধানসভা ও কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনের পর তাঁরা অনুভব করেন যে সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণীর একটি স্বাধীন সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠন থাকা প্রয়োজন। তারই ফলশ্রুতিতে আই এন টি ইউ সির জন্ম। আই এন টি ইউ সি কংগ্রেসের লেবার ফ্রন্ট নয়। আজও বহু অকংগ্রেসী আই এন টি ইউ সিতে কাজও করেন। আই এন টি ইউ সির বর্তমান সভাপতি জি রামানুজ সংগঠনের জন্মলগ্ন থেকেই এর কর্মী। তিনি কোনো দিন কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন না, এখনও নেই।
মনোরঞ্জন রায় বলেছেন—'কংগ্রেস যে মালিকপক্ষের হয়ে কাজ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেটি প্রতীয়মান হয় মালিকবর্গকে লেখা তাঁদের চিঠি থেকে।' এরূপ কোনো চিঠির কথা আমি জানি না।
১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়। তার পরদিন ১০ আগস্ট সিলেট-কাছাড় চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট সাধারণ সম্পাদক শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের চা বাগান কর্তৃপক্ষের (যাদের বেশির ভাগ ছিলেন ব্রিটিশ) নিকট একটি চিঠি দেন। তার কিছুটা অংশ আমি নিচে তুলে দিচ্ছি :
'...The members of the union view with great concern the decision of the Congress Working Committee, which, it is feared, may involve the unorganised section of the tea garden labourers as well. These innocent people may be overtaken by the whisper campaign of the rumour-mongers who are already trying to utilise the popularity of the Indian National Congress for serving their own cause of creating chaos and turmoil in the country...
We appeal to you, in the interests of our country and the United Nations in the prosecution of war, to allow our union workers to move freely in the tea gardens for Anti-Jap propaganda and organisation, to keep up the morale of tea garden labourers.'
মালিকপক্ষের অনুগ্রহ ভিক্ষা ও দেশের স্বার্থবিরোধী কাজের এর চাইতে নিকৃষ্টতম উদাহরণ আর আছে কি ?

মহীতোষ পুরকায়স্থ
শিলচর-৭৮৮০০১

গুরুশিষ্য সংবাদ

২০ জুন প্রকাশিত 'দেশ'-এর প্রচ্ছদ প্রবন্ধগুলিতে বাংলায় পণ্ডিতসমাজের বর্তমান অবস্থার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থাপনার জন্য আমাদের অভিনন্দন জানাই এবং সেই সঙ্গে আমাদের অতি সাম্প্রতিক দুর্দশার কথা আমি নিবেদন করতে চাই। পত্রটি বিলম্বিত কিন্তু আমাদের সমস্যাগুলি পুরনো নয়, একেবারে আজকের, এই মুহূর্তের।
টোলের পরীক্ষা আট বছর বন্ধ। ছাত্রের অভাবে সংস্কৃত কলেজে পণ্ডিতমশাইরা বারটা থেকে চারটা পর্যন্ত তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে 'দেশওয়ালী ভাইয়া'র সঙ্গে "মুলুকের গল্প" না হয় শ্রাদ্ধ শান্তি যজ্ঞের সন্ধান করেন, নিরুপায় অনেকেই দিবানিদ্রাটুকুও সেরে নেন পাঠকক্ষেই।
সংস্কৃতের এমন দুর্দিনে দিল্লীর রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানম-এর অনুমোদনে এশিয়াটিক সোসাইটি সম্পূর্ণ টোলের ধারা না রেখেও বিশেষ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করেন। 'উচ্চতর সংস্কৃত শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান' নামে কাজ আরম্ভ হয় ১৯৮৫ সালের ৩ আগস্ট। উদ্বোধন করতে এসে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং ঘোষণা করেন—এই প্রতিষ্ঠানটি পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম সংস্কৃতশিক্ষা কেন্দ্র হবে। ১৯৮৫ সালের শিক্ষাবর্ষের প্রথম দু মাস, পার্ক স্ট্রীটেই পড়াশুনা চলেছিল, তারপর ১৯ অক্টোবর থেকে ১২৩এ, হরিশ মুখার্জী রোডে প্রতিষ্ঠানটি স্থানান্তরিত হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় এই বাড়িটি এশিয়াটিক সোসাইটির দখলে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সাময়িক দায়িত্বপ্রাপ্ত তৎকালীন ভূমিসংস্কার মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী মহাশয়। প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় অনন্তলাল ঠাকুর মহাশয়ের সুপরিচালনায় ডঃ গোপীনাথ ভট্টাচার্য, পঞ্চানন শাস্ত্রী, বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, নর্মদা তর্কতীর্থ, শ্রীমোহন তর্কতীর্থের মত মহাপণ্ডিতগণের সমবেত প্রচেষ্টায় শাস্ত্রী এবং আচার্য কোর্সের পড়াশোনায় রীতিমত জোয়ার আসে। এবং ১৯৮৬-৮৭ এই দুই শিক্ষাবর্ষেই পরীক্ষায় ফলাফলও খুবই ভাল হয়। পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার একমাত্র আশা ভরসার স্থল এই প্রতিষ্ঠানটিকে সম্প্রতি নষ্ট করার চক্রান্ত চলছে। প্রতিষ্ঠান চলতে না চলতেই ৩০-১-৮৬ তারিখে হরিশ মুখার্জী রোডের বাড়িটি হঠাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সোসাইটির হাত থেকে ফিরে পেতে চান এবং তা নিয়ে মামলা চলতে থাকে, গত ৩০-৭-৮৭-তে বিদ্যাপীঠের বাড়িটি রাজশক্তির সাহায্যে অধিগ্রহণের কথা শোনা যায় এবং বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের চেষ্টায় আদালতের স্থগিতাদেশের ওপর নির্ভর করে এক চরম অনিশ্চয়তার সঙ্গে শুরু হয় ১৯৮৭-৮৮ সালের পড়াশোনা। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক কারণে কিছু পণ্ডিত প্রতিষ্ঠানটি স্বতন্ত্ররূপে অন্যত্র পরিচালনার জন্য দিল্লীতে সুপারিশ করেন। তাঁদের চেষ্টায় কলকাতায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানম-এর কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। এই ঘটনায় কোন গোষ্ঠীর হর্ষ বা বিষাদের কারণ ঘটলেও আমরা ছাত্ররা এই ক্ষতি স্বীকার করব কেন ? আমরা মনে করি এই শিশু ও সম্ভাবনাময় একমাত্র প্রতিষ্ঠানটি হত্যার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতের সমাধি রচনার পথ সুগম হবে।

এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে সরিয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে স্বতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠা করার হীন চেষ্টাকে আমরা নিন্দা করছি। যেহেতু শুধু এই প্রতিষ্ঠানেই নিয়মিত এবং সুচারুরূপে অধ্যয়ন অধ্যাপনা হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকগণের কাছে পাঠলাভের সুযোগ এখানে রয়েছে। এছাড়াও আছে দুর্লভ গ্রন্থাগারের সুযোগ। সর্বোপরি এশিয়াটিকের নাম মাহাত্ম্যেও যে এই প্রতিষ্ঠান ভাল ছাত্রদের আকর্ষণ করে এ কথা বলা বাহুল্য।
আজ পর্যন্ত এমন কোন সূত্র নাই যার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে স্বতন্ত্ররূপে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হয় এবং একথাও ঠিক যে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানটির বিদ্বৎসমাজে গুরুত্ব অর্জন করতে এখন অনেক সময় লাগবে। তৎসত্ত্বেও সংস্কৃতজীবী কিছু পণ্ডিতগণের এই পরিকল্পিত পন্থায় সংস্কৃত হত্যার চেষ্টা নজীরবিহীন।
ততদিনে বর্তমান সমস্ত সুযোগ সুবিধা হারিয়ে আমরা সংস্কৃত শিক্ষার্থীরা হয়তো আবার অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বিলাপ করব। তাই আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার মাধ্যমে রাজ্য ও

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রার্থনা জানাই আমাদের এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাপীঠটি দয়া করে চালু রাখুন— ভবিষ্যতের কথা জানি না— আমরা এখন এখানেই পড়তে চাই।

লোকনাথ চক্রবর্তী
এবং ছাত্রবৃন্দ
উচ্চতর সংস্কৃতি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান
দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা

চরকা

১ আগস্ট ১৯৮৭ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় 'চরকার তুলো' শীর্ষক চিঠিতে চিত্রদীপ সেন গান্ধীজির চরকা খদ্দর প্রচারের নীতি সম্পর্কে লিখেছেন, 'ওঁর চরকার ব্যাপারটা কেমন দুর্বোধ্য।' যমুনালাল বাজাজের কাছ থেকে ওয়ার্দ্ধা তুলো কেনায় খদ্দরের মধ্যে যে industrialism ঢুকেছিল সে প্রসঙ্গ বোঝাবার জন্য শ্রীসেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। খদ্দর প্রসঙ্গে আর দুই মনীষীর মন্তব্য চিঠিতে যোগ করে দিলে পুরো খাদির ব্যাপারটাই পরিষ্কার হয়ে যেত ও কোন দুর্বোধ্যতাও থাকত না বিবেচনা করে তাঁদের মন্তব্যগুলি এখানে নিবেদন করছি।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গান্ধীজির রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলায় স্পষ্টই বলেছিলেন, 'তাঁর (মহাত্মাজির) আসল ভয় সোশিয়েলিজমকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? এইখানে মহাত্মাজির দুর্বলতা অস্বীকার করা চলে না।' গান্ধীজির চরকার প্রতিও শরৎচন্দ্র আস্থাহীন হয়ে পড়েছিলেন সেকথা মহাত্মাজিও জানতেন। গান্ধীজির প্রশ্নের উত্তরে শরৎচন্দ্র তাঁকে জানিয়েছিলেন, চরকায় তাঁর একবিন্দুও বিশ্বাস নেই। গান্ধীজি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'Why don't you belive that the attainment of swaraj will be helped by spinning?' উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'No I don't belive. I think attainment of swaraj can only be helped by soldiers and not by spiders.' এবার দেখা যাক খোদ রবীন্দ্রনাথ চরকা সম্পর্কে কি বলেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'The programme of the charka is so utterly childish that it makes one despair to see the whole country deluded by it

অজিতেন্দ্র সিংহ
সেবা নগর, নতুন দিল্লী-৩

ধর্ম ও ঈশ্বর

'ধর্ম ও ঈশ্বর' (দেশ ১৮-৭-৮৭) সম্বন্ধে সুবীর ব্যানার্জী উপহাস করে মন্তব্য করেছেন : "তাই 'ধর্ম-ঈশ্বর' এসবকে সম্পূর্ণভাবেই নেশার দর্শন বলা যায়—আর যদি তাই হয় তা হলে সমাজে নেশাগ্রস্ত মানুষকে অপরাধী বললে ধর্ম-ঈশ্বর এসবে যাঁরা নেশা করেন তাঁদেরকে অপরাধী বলতে বাধা কোথায়?" অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব দর্শনতত্ত্ব অনুযায়ী 'ধর্ম-ঈশ্বর' হল গাঁজাখোর মদোমাতাল প্রভৃতি নেশাগ্রস্ত অপরাধী মানুষদের মতো আর এক ধরনের নেশাখোর মানুষদের দর্শনতত্ত্বের বিষয়। আবার অন্যত্র তিনি লিখেছেন : 'ধর্মপ্রচারক, প্রবক্তা (!) এরা শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ধর্ম ও ঈশ্বরকে ব্যবহার করে।' যাই হোক ধর্ম ও ঈশ্বর এই দুটি শব্দের প্রকৃত অর্থ না বুঝে তিনি এইরূপ উদ্ভট মন্তব্য করেছেন।
যাই হোক, 'ধর্ম' এই শব্দটির শব্দভিত্তিক অর্থ হল, যা মনকে ধরে রাখে, অর্থাৎ যা চঞ্চল মনকে রিপুর প্রভাব থেকে মুক্ত করে, তাকে সংযত করে ধরে রাখে। অবশ্য এর উদ্দেশ্য হল, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য মনকে প্রবৃত্ত করে রাখানো। মনকে সংযত করে ধরে রাখা যায় সাধনার দ্বারা স্বভাবের উৎকর্ষ সাধন করে। তাই ধর্মসাধন হল স্বভাবের উৎকর্ষ সাধন। এর জন্য নির্দিষ্ট আছে বিশেষ আচরণবিধি যাতে উদ্দেশ্য সাধিত হয়। তাই ধর্ম 'নেশার দর্শন'-ভিত্তিক কোনো আধুনিক ফ্যাশান নয়। প্রাচীন যুগের ইতিহাস পাঠ করবার সদিচ্ছা থাকলে সুবীরবাবু জানতে পারতেন, এইরূপ ধর্মসাধনার দ্বারা প্রাচীন ভারতের আর্য ও হিন্দুরা, মধ্যযুগের বৌদ্ধরা যথাক্রমে ভারতে ও বহির্ভারতে আদর্শ সভ্যতা বিস্তার করেছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায় : 'হিন্দুসভ্যতা···উচ্চ-নীচ, সবর্ণ-অসবর্ণ, সকলকেই ঘনিষ্ঠ করিয়া বাঁধিয়াছে, সকলকে ধর্মের আশ্রয় দিয়াছে, সকলকে কর্তব্যপথে সংযত করিয়া শৈথিল্য ও অধঃপতন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।"
সুবীরবাবুর আর একটি আবিষ্কারের কথা হল : "এক শ্রেণীর প্রভাবশালী মানুষ অতীতে তাদের শক্তিশালী ভাববাদী চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে আপামর অজ্ঞ দুর্বলচিত্ত মানুষের দুর্বলতার সুযোগে সৃষ্টি করেছে ঈশ্বর।" তাঁর এই মন্তব্যের মধ্যে গন্ধ পাওয়া যায় এক বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের বৈশিষ্ট্যের।
যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে কেউ সৃষ্টি করেনি। ধ্যানস্থ হয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা যায়, তাঁর শক্তিকে অনুভব করা যায়। এইভাবে আর্যযুগে ধ্যানী জ্ঞানী আর্য ঋষিগণ জলে-স্থলে জড় জীবে অন্তরীক্ষে —এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর অপর নাম ব্রহ্ম, তাঁকে পরমাত্মাও বলা হয়। ঋষিরা ধ্যানস্থ হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বরের শক্তি অনুভব করেছিলেন বলেই ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলে অভিহিত করতেন। ভারতে আদিম যুগের পর হল আর্য যুগ, আর্য সভ্যতার যুগ। আর্য সভ্যতার কথা ইতিহাসের বিষয়, উদ্ভট কল্পনার বিষয় নয়। এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যভিত্তিক নয় সুবীরবাবুর মনগড়া এই মন্তব্যটি :
"আদিম যুগে জীবনের অনিশ্চয়তা, প্রকৃতির কাছে মানুষের বারে বারে পরাজয়, প্রকৃতি সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞান এবং এর কাছে অসহায়তার জন্য অজ্ঞ ও দুর্বলতার সুযোগে উদ্ভব হয় আত্মা-পরমাত্মা, সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর প্রভৃতির।"

এবার আমি আমার পূর্বোল্লেখিত কথাগুলির সমর্থনের জন্যে বিশ্ববরেণ্য মনীষী রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথার উদ্ধৃতি দিলাম।
"ধর্মের সরল আদর্শ একদিন আমাদের ভারতবর্ষেই ছিল। উপনিষদের মধ্যে তার পরিচয় পাই। তাহার মধ্যে যে ব্রহ্মের প্রকাশ আছে তাহা পরিপূর্ণ, তাহা অখণ্ড, তাহা আমাদের কল্পনা জাল দ্বারা বিজড়িত নহে।

"এই বিচিত্র সংসারকে উপনিষদ্ ব্রহ্মের অনন্ত সত্যে, ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন। উপনিষদ্ কোনো বিশেষ লোক কল্পনা করেন নাই, কোনো বিশেষ মন্দির রচনা করেন নাই, কোনো বিশেষ স্থানে তাঁহার বিশেষ মূর্তি স্থাপন করেন নাই—একমাত্র পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকলপ্রকার জটিলতা, সকলপ্রকার চাঞ্চল্যকে দূরে নিরাকৃত করিয়া দিয়াছেন।..."
যুগ পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম ও ঈশ্বর নিয়ে যে জটিলতা বেড়েছে, তা আমার আলোচ্য বিষয় নয়। ধর্ম ও ঈশ্বর-এর আদি কথা নিয়ে আলোচনা করলাম, যাতে ঐ প্রসঙ্গে সুবীরবাবুর বিভ্রান্তিকর মন্তব্যগুলি জনসাধারণের মনে কোনো রেখাপাত না করে।

গৌরীদাস মল্লিক
হুগলী

বাঙালীর আশ্রয়

১১ জুলাই, ১৯৮৭ সম্পাদকীয় 'বাঙালীর আশ্রয়' পড়ে খুবই ভাল লাগল। আপনাদের মত উঁচু মহলের মানুষ যে আমাদের অর্থাৎ সাধারণ অবহেলিতদের কথা চিন্তা করেন এ ভেবেও আনন্দ পাচ্ছি।
আমি শুধু একটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই—এই অবহেলিত শ্রেণী যাঁরা এই শহরের একটা বড় অংশ কিভাবে নিষ্পেশিত—সামান্য একটু আশ্রয়ের জন্য।
দক্ষিণ ভাগের একটা অংশ কসবা তিলজলা অঞ্চল যা কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে আনা হয়েছে সেই অঞ্চলের একটা চিত্র আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই। হয়ত একটু বিরক্তিকর তবুও আবেদন রইল একটু পড়ে দেখবার জন্য :—
১। হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে একখানা অ্যাসবেসটস ছাউনির ছোট ঘর টালীর ছাউনির ছোট বারান্দা সহ মাসিক ২০০ টাকায় ভাড়া নিলাম।
বাড়ির মালিক আলাদা ইলেকট্রিক মিটার থাকা সত্ত্বেও আমাকে মিটারের দায়িত্ব দিতে অরাজি হলেন। অতএব ভাড়া ১৮০+২০ ইলেকট্রিক বাবদ নিয়ে রসিদ দিলেন।
২। পাখা বাবদ ২৮ টাকা মাসিক বিনা রসিদে।
৩। জলের বন্দোবস্ত নেই।
৪। স্নানের ঘরের প্রশ্নই ওঠে না - একটা বারোয়ারি পায়খানা।
৫। সবচেয়ে মজা হলো অগ্রিম টাকা পরিশোধ হয়ে আসতেই ভাড়াটিয়ার সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু হয়ে যাবে। সেই ভাড়াটিয়াকে যেন তেন প্রকারে তুলে দেওয়া হবে।
আবার নতুন করে অগ্রিম দেয় ভাড়াটিয়া আসবে-এই কাহিনী এই অঞ্চলে সুবিদিত ও প্রচলিত।
আপনি আশা প্রকাশ করেছেন যে বর্তমান সরকার এই নিম্ন মধ্যবিত্তের জন্য এগিয়ে এল এবার হয়ত কিছু করার চেষ্টা করবেন।
সেই বৃহৎ আশা নিয়েই দিন গুনবো।

জীবন কুমার ব্যানার্জী
কলকাতা - ৩৯

॥ ২ ॥

১১ জুলাই ১৯৮৭ তারিখের সাপ্তাহিক 'দেশ' এর আপনার সম্পাদকীয় 'বাঙালীর আশ্রয়' যেন আমারই মনের কথা—এবং বাস্তব সত্য। বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই নিবন্ধ আমাদের সকলকেই ভাবিয়ে তুলেছে। একটা ভাবপ্রবণ আত্মবিস্মৃত জাতির সম্পূর্ণ বিলুপ্তির ইঙ্গিত যেন আপনার এই লেখায় পাওয়া যাচ্ছে—তা খুবই বেদনাদায়ক-প্রত্যেকটি চিন্তাশীল বাঙালীর কাছে —আর এর বিহিতও করতে পারেন প্রাদেশিক সরকার—সকল সচেতন বঙ্গ সন্তানের সাহায্যে। আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীর উপর আমাদের অগাধ আস্থা। হয়তো রাজনৈতিক স্তরে এই মহৎ কাজ খুবই পক্ষপাতদুষ্ট ও কষ্টকর হবে—তবে যেখানে অন্যসব রাজ্য নানান রকম নিয়মকানুন কবে স্থানীয় জনগণের এই অবক্ষয় রোধ করতে চেষ্টা করছেন, সেখানে আমাদের সরকার ঐ সব ব্যবস্থা নিলে দোষ কোথায়?

নিখিলেশ মজুমদার
কলকাতা-৩৩

উদ্ভিদ উদ্যান

১ আগস্টের 'দেশ' সংখ্যায় প্রকাশিত প্রণব লালা-র 'দু শ বছরের তরুণ ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান' রচনাটি পড়ে যুগপৎ বিস্মিত ও হতাশ বোধ করছি।
'দেশ'-এর মত সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ সঠিক তথ্যপূর্ণ ও সুসংবদ্ধ হবে বলে আশা করেছিলাম। শ্রীলালা তা পূরণ করতে পারেননি। আপনার ও সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে তাই কিছু তথ্য জানানোর চেষ্টা করছি।
নিবন্ধের প্রথম পাতাতেই ৩৯ পৃষ্ঠায় ছবির প্রসঙ্গে এক জায়গায় লেখা আছে 'পদ্মপুকুর'। এরকম ২৬টি পুকুর আছে বাগানে।' আবার ৪১ নং পৃষ্ঠায় একটি ছবির উপরে লিখছেন 'উদ্যানের বিভিন্ন অংশে রয়েছে এরকমই পঁচিশটি জলাশয়।' আর ৪৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন 'বাগানে ২৫/২৬টি লেক আছে।' অর্থাৎ শ্রীলালা নিশ্চিত নন ঠিক কটা পুকুর বা লেক আছে বাগানে। প্রকৃত সংখ্যা হবে ২৫—বোটানিক গার্ডেন কর্তৃক প্রকাশিত ইস্তাহার অনুসারে। বর্ষাকালে ২৬টি পুকুরই ভরে থাকে নানারঙের পদ্ম এমন দাবি বোধ হয় উদ্যান কর্তৃপক্ষও করেন না। 'পদ্মজাতীয় উদ্ভিদ' বলতে শ্রীলালা কি বুঝিয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। আর লেকগুলো মোটেই পদ্মপুকুর নয়। বিশাল লেকের এক কোনায় কিছু পদ্ম ফুটলেই তাকে পদ্মপুকুর বলা যায় কি? আসলে লেকগুলোর প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে উদ্যান কর্তৃপক্ষের মত হল '...for growing tropical & subtropical plants of the world on a phytogeographical basis...' কিন্তু পুকুরগুলোর বাস্তব অবস্থা বড়ই করুণ। পদ্মপুকুর নয়, জলজ আগাছায় ভরা পুকুরগুলো দূর থেকে দেখলেই কাছে যেতে ভয় করে।
প্রণববাবু বোটানিকাল গার্ডেনকে অপূর্ব মোহময় সুগন্ধী ফুলের বাগান বলে অভিহিত করেছেন—যা পড়তে গিয়ে হোঁচট লাগল। আর কর্নেল রবার্ট কিড সম্বন্ধে যত দূর জানি, পেশায় না হলেও নেশায় উনি Horticulturist ছিলেন। সুতরাং উদ্ভিদ বিষয়ে

লেখাপড়া তাঁর নিশ্চয়ই ছিল।
আর একটি তথ্য এ প্রসঙ্গে বলি, 'দি ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন'-এর আয়তন ১১২ হেক্টর, আর এর বর্তমান নামকরণ হয় ১৯৫০ সালে, ১৯৫২ সালে নয়।
মহাবট প্রসঙ্গে জানাই, ১৯২৫ সালে যখন গাছটি কেটে ফেলা হয়, তখন এর মূল কাণ্ডের বেড় ছিল ৪০ মিটারের মত নয়, ৩২·৪৯ মিটার। এর বর্তমান পরিধি ৪০০ মিটারের বেশী তো বটেই, সঠিক সংখ্যা ৪০৪ মিটার। ৩০ মিটারেরও বেশী উঁচু স্তম্ভমূল লেখক কটা দেখেছেন জানি না, উদ্যান কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুসারে সবচেয়ে উঁচু স্তম্ভমূলের উচ্চতা ২৯ মিটার।
নাসরীগুলো দর্শনীয় সন্দেহ নেই, তবে তা দর্শন করতে গেলে যে বিশেষ অনুমতি লাগে, সেকথা লেখক উল্লেখ করলে পাঠকের উপকার হত।
জায়েণ্ট লিলি বা ভিকটোরিয়া আমাজনিকা আছে ২, ৪ ও ২১ নং লেকে। ২, ৪ ও ১১ নং-এ নয়।
নামের সঙ্গে মিলিয়ে পাম হাউসের কাছেপিঠে সশাখ পামের অবস্থান কল্পনাতেই সম্ভব। বাস্তবে দুজনের মধ্যে ব্যবধান সহস্র হাতের। সশাখ পাম বা Branched Palm (Hyphanae Sp.) অবস্থিত ৫ নং ডিভিসনে, Palmyra Avenue-এর ধারে আর তার নিকটতম পাম হাউস (Large Palmhouse)টি অবস্থিত ১৭ এবং ১৮ নং ডিভিসনের মাঝামাঝি।
বাগানে ফার্ন ও ক্যাকটাসের জন্যও আলাদা আলাদা হাউস আছে এরকম তথ্য এই প্রথম জানলাম।
আর সর্বোপরি ২০০ বছরের উদ্ভিদ উদ্যানকে 'তরুণ' বলা দুঃসাহসের কাজ নিশ্চয়ই, কেননা 'ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন' পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ উদ্ভিদ উদ্যান বলেই পরিচিত।
ভারতের এই ঐতিহ্যময় বাগানটি নিয়ে নিশ্চয়ই রচনা করা যেত একটি মূল্যবান নিবন্ধ। কত স্মৃতি বিজড়িত, বহু আজব ঘটনার সাক্ষী এই বাগানকে নিয়ে 'দেশ' পত্রিকা নিশ্চয়ই পাঠককে উপহার দিতে পারত একটি আকর্ষণীয় রচনা। আরো কত অজস্র দর্শনীয় বৃক্ষরাজি আছে বাগানে, তাদের পরিচিতি সহজেই উদ্ঘাটন করতে পারতেন লেখক। তাতে আগ্রহ বাড়ত পাঠকের। যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়া যেত উদ্যান-স্রষ্টাদের।

শৈবাল বিশ্বাস
রহড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা

॥ ২ ॥

১ আগস্টের দেশ পত্রিকায় প্রণব লালার বোটানিকেল গার্ডেনের উপর লেখায় কিছু কিছু বিষয়ের উল্লেখ আছে যা খানিকটা বিশদ আলোচনার দাবী রাখে। তিনি লিখেছেন যে পাট, চা, কফি, কোকো, তামাক ইত্যাদি অনেক প্রজাতির গাছ বিদেশ থেকে এদেশে এনে পরীক্ষা চালানো হয়। পাট বিদেশ থেকে সত্যিই আনানো হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত সন্দেহ আছে, তাই শ্রীলালা কোন সূত্র থেকে এই খবর সংগ্রহ করেছেন জানতে উৎসুক। সন্দেহটা এই কারণে যে, পাট আমাদের দেশেরই গাছ যদিও এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এই গাছ জন্মায়। এদেশে চায়ের চাষের প্রচলন সম্বন্ধে একটা তথ্য পাচ্ছি বরেন্দ্রসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "বাংলা ব্যাকরণের পথিকৃৎ/ন্যথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড" বইতে এইরকম : "অবশেষে হেস্টিংসের সুপারিশক্রমে ১৭৮৪ খ্রীঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যোসেফ ব্যাঙ্ক নামে একজন বিচক্ষণ উদ্ভিদ বিজ্ঞানীকে ভারতে পাঠায়। মিঃ ব্যাঙ্ক চা চাষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বছর তিনেক চীনের কোন এক চা বাগানে ছিলেন। তাঁরই সহায়তায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে আসাম ও দার্জিলিং-এ চায়ের চাষ শুরু হয়।" মিঃ ব্যাঙ্কের ভারতে আসার সময়টা লক্ষ করার মত—বোটানিকেল গার্ডেন স্থাপিত হবার প্রায় তিন বছর আগে। তাই, এমনো তো হতে পারে যে রবার্ট কিডকে সাহায্য করার জন্যে মিঃ ব্যাঙ্ক এদেশে এসেছিলেন ? শ্রীলালা লিখেছেন যে কিড সাহেবের উদ্ভিদ বিষয়ে লেখাপড়া কিছু ছিল কিনা এ তথ্য জানা নেই। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর শেষে শ্রীচক্রবর্তীর লিখিত ৫১ নং পরিশিষ্টে (পৃ· ৪০২) কিড সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ ও বোটানিকেল গার্ডেন প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা। (উৎস : Cotton's Calcutta Old and New)। এ সম্বন্ধে যাঁরা জানেন তাঁরা যদি আরো আলোকপাত করেন তবে ভাল হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে বোটানিকেল গার্ডেন ও তৎসহ কিডের নাম এসে পড়ায় মহর্ষির জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ না করলেই নয়। মহর্ষি তাঁর আত্মজীবনীর তৃতীয় পরিচ্ছেদে লিখেছেন, "আমি সুবিধে পাইলেই দিবা দুই প্রহরে একাকী বোটানিকেল উদ্যানে যাইতাম। এই স্থানটি খুব নির্জ্জন। এই বাগানের মধ্যস্থলে যে একটা সমাধিস্তম্ভ (আসলে কিডের স্মৃতিস্তম্ভ) আছে, আমি গিয়া তাহাতে বসিয়া থাকিতাম। মনে বড় বিষাদ।....বিষয়ের প্রলোভন আর নাই, কিন্তু ঈশ্বরের ভাবও কিছুই পাইতেছি না ; পার্থিব ও স্বর্গীয়, সকল প্রকার সুখের অভাব। জীবন নীরস, পৃথিবী শ্মশানতুল্য। কিছুতেই সুখ নাই, কিছুতেই শান্তি নাই। দুই প্রহরের সূর্যের কিরণ-রেখা-সকল কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত। সেই সময় আমার মুখ দিয়া সহসা এই গানটি বাহির হইল, 'হবে, কি হবে দিবা-আলোকে, জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার'। এই আমার প্রথম গান। আমি সেই সমাধিস্তম্ভে বসিয়া একাকী এই গানটি মুক্তকণ্ঠে গাইতাম।" মহর্ষি সেই সময়ের কথাই বলেছেন যখন তিনি চলতি বিলাস ও প্রমোদে ক্লান্ত হয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি থেকে আনন্দ আহরণের জন্য উদগ্রীব। এবং সেই কাঙ্ক্ষিত মানসিক উত্তরণ এই বোটানিকেল গার্ডেনেই ঘটেছিল। সেই হিসেবে বোটানিকেল গার্ডেনকে ইতিহাসসমৃদ্ধ পবিত্র স্থান বলা যায়।

শম্ভুলাল বসাক
কলিকাতা-৬৭

যুক্তবর্ণের প্রকৃতি নির্ধারণ

মনোজকুমার মিত্র মহাশয়ের নিবন্ধ (দেশ, ১৬ শ্রাবণ ১৩৯৪) 'যুক্তবর্ণের প্রকৃতি নির্ধারণ' প্রসঙ্গে কয়েকটি বক্তব্য সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই। শ্রীমিত্রের প্রস্তাবটি অভিনব, অতএব, আলোচনার যোগ্য। বিচার বিবেচনার আগে অবশ্য বর্ণরূপের বিভিন্ন দিক বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। প্রথম প্রশ্ন, লিপিকরের (বা লেখকের) যোগ্যতা কী ? মাত্রাস্ত্রং প্রতিবন্ধানি যো জানাতি স লেখকঃ ? যদি তাই হয়, তবে বলতে হয়, শ্রীমিত্রের প্রদর্শিত যুক্তাক্ষরে মাত্রাজ্ঞানের বড়ই অভাব। দ্বিতীয় প্রশ্ন, কার এবং ফলাচিহ্ন নিয়ে। মূল বর্ণ কখনও ছোট কখনও বড়। আবার ফলা কখনও ক্ষুদ্র কখনও বিশাল। লিপিসৌন্দর্যের বিকাশে, অতএব, বিস্তর অন্তরায়।
নিবন্ধে প্রদর্শিত মতে জ্ঞ, ষ্ণ, হ্ম, হ্ন, হ্ণ প্রভৃতি অনচ্ছ বর্ণের স্বচ্ছরূপ সম্ভব কি ?
জ্ঞ = জ্ + ঞ (উচ্চারণ গাঁ) = $জ_{ঞ}$ হবে ?
ষ্ণ = ষ্ + ণ, না ক্ষ + ঞ ? = $ষ_{ণ}$ না $ষ_{ঞ}$?
হ্ম = হ্ + ম (উচ্চারণ ম্হ) = $হ_{ম}$?
হ্ণ = হ্ + ণ (উচ্চারণ ণ্হ) = $হ_{ণ}$?
হ্ন = হ্ + ন (উচ্চারণ ণ্হ) = $হ_{ন}$?
উপরিউক্ত পাঁচটি যুক্তবর্ণের বিশ্লিষ্ট রূপ কি সঠিক উচ্চারণের সহায়ক হবে ? নাকি পৃথক বর্ণ হিসেবে

অনচ্ছরূপই বহাল থাকবে ?
শ্রীমিত্রের সঙ্গে আমি একমত যে, বর্ণরূপের অনচ্ছতার নিরসন একটি পবিত্র কর্ম। কিন্তু সব কটি বর্ণকেই তো আর স্বচ্ছ করা যাবে না ! শ্রীমিত্র অন্তত ক্ষ (ক্+ষ, উচ্চারণ খ্য) বর্ণের ক্ষেত্রে এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করেছেন। এজন্য ধন্যবাদ। প্রসঙ্গত বলি, এটা পথ নয়। লাইনো বাংলা টাইপের প্রবর্তক মনীষী সুরেশচন্দ্র মজুমদারের অনুসৃত নীতিই সঠিক পথের দিশারী।
উপসংহারে নিবেদন, হরফের একটি ইতিহাস আছে। সংস্কারের নামে সে ইতিহাসের অমর্যাদা করা সমীচীন নয়। যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত বর্ণরূপের ঐতিহ্যকে হুজুগের বশে বিকল্প করতে চাওয়াকে সংস্কৃতি বলে না। সংস্কারের এ প্রচেষ্টা তো নৈরাজ্যের সহায়ক মাত্র।
একটি বিশেষ বর্ণ প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তব্য মননশীল পাঠকের দরবারে পেশ করছি।
আচার্য সুনীতকুমার বলেছেন, "শ্রী শব্দকে "রী লিখিয়া সহজ করিবার চেষ্টা করিলে লিপিসৌন্দর্য শ্রীহীন হইয়া পড়িবে। 'শ্রী' একটি পৃথক অক্ষর (ideogram)—ইহাকে "রী' করিলে নন্দনরসাত্মক (aesthetic) হানি ঘটিবে।"

প্রসুন দত্ত,
মুদ্রণপত্র,
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার,
আলিপুর, কলকাতা-২৭

বারোয়ারি কথা

৪ জুলাই-এর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হিমানীশ গোস্বামীর প্রচ্ছদ নিবন্ধ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় গজেন্দ্রকুমার মিত্র ৮ জুলাই যে তথ্য পেশ করেছেন, তা সবিনয়ে সম্প্রসারণ করতে চাইছি। উনি ঠিকই বলেছেন, বাংলা সাহিত্যের প্রথম বারোয়ারি উপন্যাস-এর নাম 'বারোয়ারী উপন্যাস', প্রকাশক ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। বাড়তি খবর হল, উপন্যাসটির প্রকাশকাল, ২ মে, ১৯২১। যে বারোজন লেখক এই উপন্যাসটি লিখেছিলেন, তাঁদের সম্পূর্ণ তালিকাটি এইরকম —প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রমথ চৌধুরী। লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৭ বঙ্গাব্দের (ইং ১৯২০) 'ভারতী' নয়, 'ভারত' পত্রিকায়, বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত বারোটি সংখ্যায়। এছাড়াও আরও দুটি বারোয়ারি উপন্যাসের কথা জানা যায়, একটি হল রসচক্র (১৯৩৬) ও আর একটি ভালমন্দ (১৯৫২)। দুটিরই সূচনা অংশ লেখেন শরৎচন্দ্র। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের (ইং ১৯৩০) বৈশাখ মাসে 'উত্তরা' পত্রিকায় 'রসচক্র' উপন্যাসের সূচনা ঘটে। 'ভালমন্দ' উপন্যাসটি আমরা ছোটবেলায় বাড়িতেই দেখেছি, এর লেখক ছিলেন মোট দশজন। এঁরা হলেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, প্রবোধকুমার সান্যাল, নরেন্দ্র দেব, রাসবিহারী মণ্ডল ও অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল।

সুগত মিত্র
কলকাতা-৮৯

ফুটবল

ফুটবলের উপর লেখা রচনাগুলো (দেশ) ১১ জুলাই ভাল লাগল। যদিও ভারতীয় ফুটবলে বাংলার অবদান অস্বীকার করা সম্ভব নয়, তবুও বর্তমানে ফুটবলে অন্যান্য রাজ্যের অগ্রগতি নিয়ে আরও বিশদ আলোচনা থাকলে খুশি হতাম।
কলেজ জীবনের প্রথম দিকে বেশ কিছু ফুটবল খেলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে কলকাতা ময়দানে। সেটা সত্তরের দশক। এক ঝাঁক প্রতিভাবান ফুটবলার তখন ময়দান কাঁপিয়ে রাখতেন। তাঁদের খেলা দেখার দুর্বার আকর্ষণে তখন গ্যালারি উপচে পড়ত। কলকাতার তিন প্রধান ক্লাব তখন থেকেই বোধহয় আরও বেশী করে কোচের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। এর আগে অবশ্য ভারতীয় ফুটবল রহিম সাহেবের মত এক মহান কোচকে পেয়েছে। পার করে এসেছে গর্ব করার মত সোনার দিনগুলি। সত্তরের দশকে ফুটবলের নেশায় যখন কলকাতার মানুষ পাগল, তখনও কিন্তু এশীয় মানে আমরা অনেক পিছনে চলে গেছি। চীন, ব্রহ্মদেশ, জাপান আমাদের হেলায় হারায়। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি তখনও এ খেলার স্বাদ পায়নি।
নিজেদের নিয়ে যখন আমরা মাতোয়ারা তখন দূরদর্শন বোধ হয় প্রথম চোখ খুলে দিল। আটাত্তরের বিশ্বকাপের ফাইনালে দেখা গেল আর্জেন্টিনা আর হল্যান্ডের মধ্যে তীব্র লড়াই। দুধ আর ঘোলের পার্থক্য তখন আমরা বোধ হয় একটু বুঝলাম, তারপর আশির দশকের গোড়ায় এল নেহরু কাপের খেলা। স্বচক্ষে দেখলাম আমাদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের পার্থক্য। ফ্রান্সিসকোলি, রামোসের কথা চট করে ভোলা যায় না। বিরাশির এশিয়াডে নিজের দেশে আমাদের ফুটবলাররা অপেক্ষাকৃত ভাল ফল দেখাল। কিন্তু আমাদের গোল করার দীনতা সব আশাকে শেষ করল।
দ্বিতীয়বারের জন্য যখন কলকাতা নেহরু কাপের দায়িত্ব পেল, তখন আমরা দেখলাম আন্তর্জাতিক মানের আরও এক ঝাঁক প্রতিভাবান ফুটবলার। সহজে ভোলা সম্ভব নয় স্মোলারেক, গারেকা, লাজলো কিস্ প্রভৃতিদের অসাধারণ খেলার কথা। এই আশির দশকে ভারতীয় ফুটবল পেয়েছিল এক বিশ্ববিশ্রুত কোচ মিলোভান সাহেবকে। তাঁর তত্ত্বাবধানে ভারতীয় ফুটবল যেন একটু নড়েচড়ে বসল। গোলকানা ফুটবলাররা এতদিনের ধারণা ভুল প্রমাণ করতে লাগল। আন্তর্জাতিক আসরে কিছু সাফল্য এল। কিন্তু নোংরা রাজনীতি ফুটবলের দৈন্যদশাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমরা হারালাম মিলোভানের মত কোচকে। আশির দশকে কলকাতার ফুটবলাররা পেয়ে গেছেন প্রচুর প্রচার। নানা ধরনের খেলার ম্যাগাজিন মূলত এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। এই চামড়ার বলের সুবাদে এই তারকা ফুটবলাররা মালক্ষ্মীর কৃপা লাভ করেছেন দারুণভাবে। আর সেই সঙ্গে তাল রেখে ভারতীয় ফুটবলের মান নেমেছে নিচের দিকে। মাত্র কয়েকটি বড় খেলা ছাড়া কলকাতা ময়দান এখন

প্রায় সুনসান। ছিয়াশির বিশ্বকাপ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে প্রকৃত তারকা খেলোয়াড়েরা এই গ্রহের কোথায় আছেন!
ভারতীয় ফুটবলের রোগ-নির্ণয়ের ব্যাপারে ফুটবলবোদ্ধা বিশেষজ্ঞদের মতামত কিছু জানার সৌভাগ্য হয়েছে। আমাদের ফুটবলের মান বাড়ানর জন্য দরকার অতি অল্পবয়স্ক সম্ভাবনাময় ছেলেদের ধারাবাহিক নিবিড় অনুশীলন। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের এই কথাগুলি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু 'ক্যাচ দেম ইয়াং' কথাটি শুধুই কথার কথা থেকে গেছে। ইদানীং একমাত্র ব্যতিক্রম টাটার ফুটবল আকাদেমি। এদের কাছে প্রত্যেক ফুটবলপ্রেমীর অনেক আশা। কিন্তু ফুটবল ফেডারেশন এখনও হাত গুটিয়ে কেন? শুধুই কি আর্থিক প্রতিকূলতা? পরিকল্পনার অভাবও ত যথেষ্ট পরিমাণে। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা এর মধ্যেই বিবর্ণ। আকর্ষণহীন। সাব-জুনিয়ার প্রতিযোগিতা বয়স ভাঁড়ানর প্রতিযোগিতার নামান্তর। একথা বিশ্বাস করা যায় না যে আমাদের এই বিশাল দেশে প্রতিভার অভাব আছে। প্রকৃত অভাব সম্ভবত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও তাকে বাস্তবায়িত করার আন্তরিক প্রচেষ্টা।
আন্তর্জাতিক মানের রেফারিং নেহরু কাপে দেখা গেছে, বিশ্বকাপে ত কথাই নেই।
(এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে নেহরু কাপে বিখ্যাত কোচ বিলারডোকে মাঠের বাইরে পাঠানোর কথা)। আমাদের দেশে রেফারিদের নানা সমস্যা আর প্রতিকূলতার মাঝে কাজ করতে হয়। তবে এটাও চোখের সামনে দেখা যে অনেকক্ষেত্রে তাঁদের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব ও উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দেওয়ার কারণে খেলার মাঠে আগুন ছড়িয়েছে। খেলোয়াড়ের চোট- আঘাত এক বিরাট সমস্যা। এক্ষেত্রে স্পোর্টস্ মেডিসিনের এক মস্ত বড় ভূমিকা আছে। বিদেশের যেকোন নামী দলের সঙ্গে থাকে কোচ, ম্যানেজার আর অবশ্যই ফিজিওথেরাপিস্ট। তাঁরা নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করেন আবার নিজেদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। আমাদের যেকোন দলে কোচ আর ম্যানেজারের দেখা পাওয়া গেলেও দক্ষ আর যোগ্য ফিজিওথেরাপিস্টের বড়ই অভাব। ফলে বিদেশে আমাদের খেলোয়াড়েরা নানারকম আঘাতে দ্রুত ও সঠিক চিকিৎসা পান না। এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটাও ভেবে দেখা একান্ত দরকার।
ফুটবল এমনই এক খেলা যেখানে উত্তেজনা থাকবেই। এই খেলার জন্য লোক সাময়িকভাবে বাস্তববুদ্ধি হারিয়ে বসে। ফুটবল নিয়ে মেঠো হাঙ্গামা দেশে-বিদেশে লেগেই আছে। ইউরোপীয়ান কাপের ফাইনালের ঠিক আগে ব্রাসলসের স্টেডিয়ামে যা ঘটেছিল, তা আন্তর্জাতিক ফুটবলের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। তবে এই অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা ওদেশে নেওয়া হয়েছে। আশি সালের সেই মর্মান্তিক অধ্যায় যেন আর না আসে। এ ব্যাপারে আমাদেরও সজাগ হওয়ার সময় এসেছে।
কলকাতা এখনও ফুটবলের মক্কা। কেরল, গোয়া, পঞ্জাব যথেষ্ট অগ্রসর হলেও বাংলাকে ছাড়া ফুটবল ভাবা যায় না। বাঙালীর গর্বের বস্তু এই ফুটবল। তার দৈন্যদশা আমাদের মানসিক যাতনার কারণ। ভারতীয় ফুটবলের এই দীর্ঘদিনের রোগের প্রকৃত ও দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন। নচেৎ রোগ দুরারোগ্য হলে হাত কামড়ান ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না।

গৌতম ঘোষ
কলকাতা ৭০০০১০

হিমালয়ে অলৌকিক

২৫ জুলাই-এর দেশ পত্রিকার ধ্রুব মজুমদার মহাশয়ের লেখা "হিমালয়ে অলৌকিক" প্রবন্ধে ইন্দোনেশিয়ার নিউগিনির বর্তমান নাম হিসেবে "ইরিয়ান জয়" কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা যবদ্বীপ প্রভৃতি বহু স্থানের নামই সংস্কৃত বা ভারতীয় ভাষাসমূহ থেকে উদ্ভূত। এবং নিউগিনির বর্তমান নাম "ইরিয়ান জয়া" (জয় নয়)। এটা ভারতীয় হিসেবে আমাদের ভুল করা ভাল দেখায় না।
আর তাছাড়া লেখক বারংবার "নিউগিনি" লিখতে গিয়ে "নিউ গায়ানা" লিখেছেন। আমাদের গোটা এশিয়া মহাদেশেই "গায়না" বলে কোনো দেশ বা ভূখণ্ড নেই। গায়না আছে দক্ষিণ আমেরিকায়—তিনভাগে বিভক্ত তিনটি গায়না। গায়না এবং গিনি দুটি পৃথক শব্দ। এদের উচ্চারণ, বানান ও ভৌগোলিক অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মলয় সিংহরায়।
কলকাতা-১০

বাঘা যতীন

২৭ জুন সংখ্যা 'দেশ'-এ (পৃঃ ১৩) মনোজকুমার মিত্র এক পত্রে "বাঘা যতীনের সঠিক নাম রহস্যাবৃত" লিখেছেন। সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করবার অভিপ্রায় জানাই যে, সম্ভবত ১৯০৬ সালে বাঘ মারা উপলক্ষেই "বাঘা যতীন" আখ্যাটি (ওই বানানে) প্রচলিত হয়; এর স্বপক্ষে সমসাময়িক কোনও পত্রিকা অবশ্য পাইনি যা সরাসরি এই অনুমানকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ১৯১০-১১ সালে জেল থেকে যতীন্দ্রনাথ তাঁর দিদিকে চিঠি দিয়েছেন অবশ্যই 'জ্যোতি' স্বাক্ষর সমেত; কিন্তু তার পাশাপাশি, ওঁর মামলার নথিপত্রে Jotin এবং Jatin Mukherjee বানানের ব্যবহার দেখি। ১৯১১ সালে কারামুক্তির পরে তাঁকে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করা আইনসিদ্ধ নয়, এই প্রতিবাদ-সমেত তিনি প্রথমত ছোটলাটকে এবং তারপর খোদ বড়লাট হার্ডিঞ্জকে সুন্দর যুক্তি সাজিয়ে যে দীর্ঘ পত্র দেন ইংরেজিতে, তাতেও তিনি সই করেছেন Jyotindranath Mukherjee বানানে। বালেশ্বর যুদ্ধ সংক্রান্ত কাগজপত্রে ১৯১৫ সালে ছাপা হয় Jotin বানান। ১৯১৮-১৯ সালে রাওলাট রিপোর্টেও ওই বানান চালু থাকে। যুদ্ধের পরে, অজ্ঞাতবাস বা কারাবাসের শেষে বিপ্লবীরা যখন ফিরে এসে নূতন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন এই "যতীন্দ্রনাথ" বানানটাই তাঁরা বেছে নিলেন; ১৯২৩ সালে বাংলা থেকে পঞ্জাব অবধি প্রকাশ্যে বালেশ্বর যুদ্ধের স্মৃতি-বার্ষিকী উদ্‌যাপন করাতে যে ব্যাপক আয়োজন করেছিলেন এঁরা, তার পুরোভাগে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, যাদুগোপাল, অমরেন্দ্রনাথ, উপেন বাঁড়ুজ্যে, প্রফুল্ল সরকার, সুরেশ মজুমদার প্রভৃতি নমস্য ব্যক্তি; এঁদের স্বীকৃতি নিয়েই "যতীন্দ্রনাথ" বানান প্রচলিত হয়েছিল।

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ফ্রান্স

সংশোধন

৮ অগস্ট ১৯৮৭ তারিখে প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকার শিল্প-সংস্কৃতি বিভাগে আমাদের একটি অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। 'গান ও পাঠনাট্য' শীর্ষক ওই আলোচনায় 'অজাতক' গল্পটির নিবেদক রূপে নাম করা হয়েছে 'দেবরাজ রায় ও মিনতি রায়'। বস্তুত, মিনতি রায় নামে কেউ ওই নিবেদনে অংশ নেননি। যিনি ছিলেন তাঁর নাম তুলসী রায়। জানি না, কিভাবে এই বিস্ময়কর ভ্রান্তি ঘটলো। যদি মুদ্রণ-প্রমাদ হয়, অনুগ্রহ করে সেই ভ্রম সংশোধন করে বাধিত করবেন।

ভবানীকুমার ঘোষ
সম্পাদক, শিল্পী যাযাবর
কলকাতা-৩৭

॥ ২ ॥

৮ অগস্ট সংখ্যায় শিল্পসংস্কৃতি বিভাগে আমার একটি প্রতিবেদনের শিরোনামে একটু ভুল থেকে গেছে। 'জন্ম নিল কর্ণ'র জায়গায় হবে 'জন্ম নিল কর্ণ'।

স্বপন সোম

আইন ও আদালত

স্বাধীন হবার প্রথম শর্তই হয় তো ন্যায়বিচার। সমস্ত মানুষের জন্যে একটি সংবিধান। সমান অধিকার। কাজির বিচারের কথা আমরা গল্পে পড়েছি। চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের বিচারসভা পুরাকালে ছিল। ন্যায়বিচার হত কিনা সন্দেহ আছে। মোগল ভারতে বিচারের নামে অজস্র অত্যাচারের কাহিনী প্রচলিত আছে। অপরাধীর হাত কেটে নেওয়া, চোখ খুবলে আনার অমানবিক পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। গ্রামের মুখিয়া, পঞ্চায়েত প্রধানরা যা করতেন তাকে 'রোম্যান জাস্টিস' বলা যাবে না। এ দেশে আইন ও আদালত ইংরেজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বিচারের ইংরেজ-পদ্ধতি ও ফরাসী পদ্ধতিতে অনেক তফাত। ইংরেজের চোখে সবাই নিরপরাধ। প্রমাণ করতে হবে তার অপরাধ। ফরাসীপদ্ধতিটা হল বিপরীত।

ইংরেজশাসনে এদেশে বহু নিয়মকানুন, আইন, আইনের ধারা তৈরি হয়েছে। বসেছে নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত। হাইকোর্টের ওপর সুপ্রীম কোর্ট। আইন আদালতকে ইংরেজরা আলাদা

একটা 'গ্ল্যামার' দিয়েছিলেন স্বাভাবিক কারণেই। মানুষের একটা ভীতির ভাব যাতে থাকে। ভয়ের তো বটেই। মানুষের ভাগ্য নিয়ে যেখানে নাড়াচাড়া হয়। বিচারকের রায়ে যেখানে মুণ্ড দেহচ্যুত হয়। আমির হয়ে যায় ফকির। আদালতের আঙিনায় সকলকে হয় তো যেতে হয় না, তবু আদালত অতি গম্ভীর, তার আইনের হাত অতি নির্দয়। আইনের চোখে যে অপরাধী, রাজা হলেও তার মুক্তি নেই। আইনের চোখে কারোর খাতির নেই। আদালতের পোশাক আলাদা। বিচারকরা একসময় পরচুল পরিধান করতেন। বিচারকক্ষে অশালীন আচরণ চলে না। এমন কি জামার হাতা গোটানোও নিষিদ্ধ। বিচারককে সম্বোধন করতে হয় 'মাই লর্ড' বলে। আইনের জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগৎ। আঁটসাঁট। বিষণ্ণ। ক্ষমাহীন।

উচ্চ আদালত ক্রমে হয়ে দাঁড়াল অভিজাতের আদালত। ভারতের ধনবান জমিদার সম্প্রদায় ও রাজামহারাজাদের লড়াইয়ের ক্ষেত্র। যত অর্থ তত মামলা। আইন ব্যবসা রাজা মহারাজাদের কল্যাণে হয়ে দাঁড়াল সাংঘাতিক উপার্জনের ক্ষেত্র। অভিজাত পরিবারের মেধাবী পুত্ররা বিলেত ছুটতেন। লিনকলনস ইন, গ্রেজ ইন থেকে হয়ে আসতেন বার-অ্যাট-ল। ব্যারিস্টার হওয়া মানে সাহেব হয়ে যাওয়া। সেকালের ব্যারিস্টার, আই. সি. এস, দর্শনীয় প্রতিভা। রাজের কাছাকাছি ব্যক্তিত্ব। বিদেশিনী স্ত্রী। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথাই স্মরণে আনা যাক। সায়েবি কায়দায়, সায়েবি ঢঙে, সাজানো বাংলোয় উন্নাসিকের জীবনযাপন। ইংরেজের আদালতে দিশি সাধারণ মানুষ কোন্ অন্যায়ের প্রতিকার চাইতে যাবে? গাউন পরিহিত ন্যায়ের যোদ্ধাদের দক্ষিণা দিতে হত গিনির হিসেবে। বিচারের বাণী তখন নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে। আইন এক জিনিস। আইনের প্রয়োগ আর এক জিনিস। আইনকে অন্যায়ের স্বার্থে লাগিয়ে বিচারকে প্রহসনে পরিণত করার প্রতিভা ইংরেজের ছিল। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি দিয়ে বিচারের নামে অবিচারের শুরু। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, স্বদেশী আন্দোলনের বীর যোদ্ধাদের একতরফা বিচারে প্রাণদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন, আদালতের আস্থাকে সন্দেহজনক করে তুলেছে। তাছাড়া যে-ইংরেজ বলত, 'জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনায়েড,' সেই ইংরেজই আমাদের শিখিয়ে গেছে লালফিতার মাহাত্ম্য। জিম করবেট, 'মাই ইন্ডিয়া' গ্রন্থে ইংরেজ সরকার, ইংরেজের বিচারব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে গেছেন। তিনি লিখেছেন, আদালত প্রতিষ্ঠার আগে বিচার ব্যবস্থা কত সুন্দর ও সহজ ছিল! সাধারণ গরিব মানুষ আইনের আশ্রয় নিতে গিয়ে এখনকার মতো দুহিত হত না। কুমায়ুন ডিস্ট্রিক্টের কমিশনার জায়গায় জায়গায় তাঁবু ফেলতেন। সন্ধের দিকে সূর্যাস্তের পর প্রকৃতি ঠাণ্ডা হলে শুরু হত বিচারসভা। বাদী, বিবাদী উভয়পক্ষই গাছতলায় উপস্থিত। জমিজমার মামলা, স্ত্রী নিয়ে মামলা, মারামারি, কাজিয়া, দেনাপাওনা, সব রকমের মামলা গাছতলায় হাজির। দু-পক্ষকে দুদিকে রেখে শুরু হত কমিশনারের পায়চারি। পাক মারতে মারতে মামলার জট খুলে যেত। উকিল নেই, ব্যারিস্টার নেই, কমিশনারের মধ্যস্থতায় সব সমস্যার সমাধান। করবেট লিখছেন, সে একটা যুগ ছিল যখন আইনব্যবসায়ীরা একালের মতো মামলা জিইয়ে রেখে মক্কেল মেরে বড়লোক হবার সুযোগ পেত না। ইংরেজ শাসনের পতনে লালফিতের ভূমিকা কতটা বিচার করে দেখা উচিত।

দেশ স্বাধীন হল। সাধারণ মানুষ কি বিচারের, আইনের, আদালতের সুযোগ নিতে পারছে! আইন অতি ব্যয়সাপেক্ষ। পুরনো আইনের সংস্কার প্রয়োজন। প্রয়োজন আদালত প্রশাসনের রদবদল। পশ্চিমবাংলায় লিগ্যাল এড সোসাইটি হয়েছিল গরিব মানুষকে আইনের সুযোগ এগিয়ে দেবার জন্যে। সবই কাগজেকলমে। আদালতে আদালতে মামলার পাহাড় জমে আছে আর আইনের ঘাড় মটকে কালো গাউন আর পরচুল সময়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে। আইনসভার হাতে দেশের আইন, আদালতের হাতে বিচার, পুলিশের হাতে প্রয়োগ। আইন আছে, বিচার আছে, প্রয়োগেই সমস্যা। রাজনীতি ক্রমশই আইন ও আদালতকে গ্রাস করছে।

জলের খোঁজে

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

জলের খোঁজে পেরিয়ে গেলাম কয়েকটা গ্রাম ।
শুকনো লাল ডাঙার মাটি শাবল দিয়ে খুঁড়লাম ।
জল নেই । কিন্তু কে যেন বলেছিল এখানে জল আছে ।
মরুভূমির নীচে আছে স্নানঘর,
ভিজে জামাকাপড় বদলানোরও আছে ব্যবস্থা ।
জলের খোঁজে তা হলে আর ক'টা গ্রাম
আমাদের পেরিয়ে যেতে হবে ?...
আর কতদিন !

শুধু জল নয়, আমাদের আছে সন্তানকামনাও ।
পুরোহিত বললেন, আরও ছ' টাকা চার আনা লাগবে
ফিরে এলাম । উড়িয়ে দিলাম হাতের লাল ফুল
ঝোড়ো হাওয়ায় ।

কতদিন, এভাবে আর কতদিন ?
জল নেই, তা বলে জলদিশারিও থাকবে না ?

গাছের পাশে

শ্যামলকান্তি দাশ

অন্ধকারে ফুল ফোটায় গাছ,
গাছের ডালে অন্ধকার, ব্যাধ—
ব্যাধের মতো কেউ-না-কেউ আসে
ভাঙে গাছের নিচু নরম পাতা !
রাখে পাতার শিরায় খরচোখ !
হানে কুঠার, হেদিয়ে যায় মাটি,
ছড়িয়ে পড়ে রোদরঙিন হাওয়া !

এবার হাওয়া গুটিয়ে নাও বিষ,
পতঙ্গের ডানায় লাগে ছাই !
তরুণ ব্যাধ, বন্ধ করো ঝাঁপি,
কোটরে মরা পক্ষিণীর ছানা !

ফুল ছোটায় অন্ধকারে গাছ,
গাছের নখে এখনও সাত রং !

জন্মমাটি

পার্থসারথি চৌধুরী

অরণ্যবাসের শেষে মানুষ ঘরেই ফেরে,
যেন তার অরণ্য প্রবাস ।
আসলে তা সত্য নয় বুঝেছি রক্তের মধ্যে,
গৃহসুখ অর্বাচীন ভ্রমের বিকার ।

যেখানে মাটির বুকে জলধারা কেটে চলে খাত,
যেখানে ভূমির রসে উদ্ভিদের জীবন ভরেছে,
যেখানে বৃক্ষের দেহে পৃথিবীর সেরা মায়া মাখা,
আকাশে মেঘের খেলা,
ধরাতলে কীট আর পতঙ্গের নিরিবিলি ঘর,
সেখানে মানুষও পারে মাটির শরীরে
ঘর গেঁথে পালিত পশুর সঙ্গে
সত্যনিষ্ঠ চিরকালে জীবন কাটাতে ।

আমাদের ঘর
কৃত্রিম নগর ছেড়ে কোনদিন সহজে যাবে না,
তার গায়ে উষ্ণ শ্বাস নিষ্ফলতা দাগ রেখে যায় ।

বনবাসে গৃহসুখ যেজন জেনেছে
তারে আর প্রবাসী বোলো না ।
আসলে সে পরমার্থ ছেড়ে
ভুবনের আবর্জনা ঘেঁটে যায় বিমুগ্ধ আহ্লাদে ;
তার পরিচয়
অনভ্যাসে দিনেদিনে হয়ে গেছে ক্ষয় ।

শাল আর কুড়চির বৃষ্টিস্নাত কলেবর দেখে
তার বুকে কান্নাকান্না অভিমান জমে,
বুঝেও বোঝে না যেন
এইখানে ছিল তোলা পিপাসার জল
প্রাণের আরাম হয়তো দুখিনী প্রেম
দিনহারা সময়ের সুখদ প্রবাহ ।
সেসব ছেড়ে যে আজ কেটে গেল সমস্ত জীবন
সে তো কারো তর্জনে ঘটেনি,
বোধের অভাব শুধু,
তার জন্য দোষ কার, ছন্নছাড়া রক্তের স্বভাব ।

তবু এই বনে এসে
জন্মান্তের স্মৃতিজল হাহাকারে মেশে ।
এই ভূমি ছিল পড়ে এমনই বিজন,
দূরের ট্রেনের শব্দ,
টিলার বসতি,
চাঁদের কলার সঙ্গে রূপময় কেলি ।
আহা রে পৃথিবী, তোর এতো শান্তি ফেলি
আমরা বিবাগী মূর্খ চির ঘরছাড়া ।
তবুও ছুটেই আসি জন্মমাটি,
কুসুমিত বনের কিনারা ।

আমার আবাস

কৃষ্ণা বসু

সহজ লজ্জতা থেকে কিছু দূরে রয়ে গেছে আমার আবাস ।
ঠিক আকাশের গায়ে নয়, মাটির ওপরে নয়,
কিছু মাঝামাঝি আছে বাড়িটি আমার,
ঠিক ইটকাঠে গড়া নয়, বাতাস বিলাসী নয় খুব,
বাতাস রয়েছে ঢের, প্রাণ ভরে শ্বাস মেলে এমন বাতাস ;
রক্তমাংসজ কোন মানুষ থাকেনি এই ঘরের ভিতর,
অথচ মানুষ আছে, অপরূপ প্রস্তাবনা আছে,
প্রণয়সম্ভাষ আছে আর আছে অনুপম হিং টিং ছট !
ঘরের চৌদিকে আছে শূন্যের বাগান,
বাগানে রয়েছে ঢের অমূল-কুসুম,
একটি নদীও আছে বাড়ির পশ্চিমে,
ঠিক নদী নয়, যেন স্বর্গীয় প্রপাত !
সেই প্রপাতের পাশে নার্সিসাস ফুটে আছে, একা ।
এরকম ঘরবাড়ি নিজেই করেছি আমি,
বাগান দিয়েছি নিজে, বৃক্ষগুলি,
বৃক্ষের কোটর, প্রাচীন পেঁচাটি আছে তার মধ্যে,
হিংসুটে পাতাগুলি ঘিরে আছে লাবণ্যকুসুম ।

ঠিক আকাশের গায়ে নয় মাটির ওপরে নয়
মাঝখানে রয়ে গেছে বাড়িটি আমার !

বরফ-পাহাড়

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

কাছে দূরে পাহাড়ের সাদা সাদা মাথা—
এ এক বরফ পাহাড়ের দেশ ।
ঘরের ভেতর শুয়ে আছে
মা ও দুই মেয়ে । অন্য ঘরে
জানলার কাছে বসে একজন তাকিয়ে রয়েছে অপলক
যে দিকে দু'চোখ যায় সেই দিকে ।
এরা সবাই এসেছে এক আগুনের দেশ থেকে,
এমন আগুন যা জ্বালিয়ে দিয়েছিলো
তাদের ঘর-গেরস্থালি, তাদের স্বপ্ন, তাদের বেঁচে থাকা ।
সেই আগুন নেভাতে
তারা সবাই এসেছে এক বরফের দেশে ।
তৈরী হচ্ছে রাস্তা—ঘুম থেকে উঠে পাথর ভাঙছে
চার বুড়ো, পাশে পিচ গলাচ্ছে আরো কয়েকজন,
সর সর শব্দে পাতারা কথা বলছে
মেঘের সঙ্গে । সেই একজন
উঠে পাশের ঘরে ঢুকলো—শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ—
ফিরে এসে সে আবার বসে পড়লো চেয়ারে ।
ভোর হচ্ছে
রোদ স্পষ্ট হচ্ছে পাহাড়ের মাথায়
একটু একটু করে বরফ-পাহাড় আবার গলতে শুরু করেছে ।

রত্নাকরের এপিটাফ্

মৃণাল চক্রবর্তী

"সুদক্ষিণা, তুমি কি আজো আগের মতই আছো আমার ?"
প্রশ্ন শুনে সারা আকাশ ভেঙে পড়লো চতুর্দিকে,
শবের মতো শীতল দেহে শকুনগুলো ভিড় জমালো,
তোমার ঠোঁটে জটিল হাসি, বললে তুমি, "তোমার ছিলাম ।"

"সায়ন্তনু, তুই তো ছিলি বন্ধু আমার, তাই ছিলি না ?"
প্রেক্ষাপটে জষ্ঠি মাসের মেঘ ঘনালো, সায়ন্তনু
মেঘের ভারে মুখ নামিয়ে আসর-ভাঙা সুরের মতন
বললো আমায়, "ছিলাম বুঝি ?"

"তোমরা—আমার আত্মীয়েরা ? ওরা সবাই এদিক ওদিক
থাকার মত ঠিক না হলেও তোমরা আছো তাই না আমার আত্মীয়েরা ?"
পাঁকের জলে পোঁকো মাছের মতন ঘোলা চোখগুলোকে
নামিয়ে নিয়ে বললো ওরা, "বলছো বুঝি ? তাহলে আছি ।"

বৃষ্টিশেষে শ্রাবণভোরে নিঃস্ব উজল আকাশ যেমন
কিংবা কোন একঘরে আর ভিটেচ্যুত সাপের মতন
একলা আমি নাকের কাছে ঠাণ্ডা বাতাস, হাতের পাশে
হাত-ভাঙা কাপ, চা জুড়োচ্ছে, পুড়ছে তামাক, মৌন কলম

এবং আমার, রত্নাকরের, পঁচিশ বছর—এক এপিটাফ ।

হে সন্ন্যাসী

রথীন্দ্র মজুমদার

হে সন্ন্যাসী, এই সংসারের জটাজালে
নারী-পুরুষ-শিশুর মোহন শব্দের
ধুলো-খেলা ছেড়ে উঠে এসো, এসো স্তব্ধতায়
অগ্নি-দাহ তোমার বুকের রক্তের রৌদ্র-তৃষ্ণার
মগ্ন রাত, বৃষ্টি-ধারার নিশ্বাস আত্মায়
দেখো, দেখো, তাকাও, ফিরে তাকাও
মনের মানুষ যে তোমার সে কোথায়
অন্ধকার ভ্রূণ-জলের স্রোতের যে লীলা
সে আজো ডাকছে তোমায় : আয়, আয়
স্তনের আঠালো গন্ধে ভরে উঠেছে ভুবন
সবুজ দিগন্ত জুড়ে ফুল আর ফলের উৎসব
গোপন প্রেমিকার দু চোখের মণির আলোয়
দুই ভ্রূ-র মধ্য-শিরার জ্যোতির যন্ত্রণায়
কেন, কেন, তুমি কেন পাগল
এই জন্ম, চাও, চাও, নব জন্ম, জন্মান্তর
বেদনার চোখের জলে শেষ বন্ধন সঙ্গম-ক্রিয়ায়
আঃ, আঃ, শেষ মুক্তি রুদ্ধ কান্নার চিৎকার
শরীর-শৃঙ্খল ছিঁড়ে নগ্ন হ'য়ে ভাঙো এই বিগ্রহ
মন্ত্র, মন্ত্র, তোমার ধ্যানের ঈশ্বর
জাগ্রত চেতন, শেষ রজনীর নক্ষত্রের
শেষ চুম্বন, জড়াও, বিদায়, এই স্বপ্ন-সংসার ।

বৃদ্ধি-বিকাশের সুস্বাদু রীতি-
ফ্যারেক্সের® রীতি!

আপনার শিশুর উচ্চতা আর ওজন* পরীক্ষা করুন	শিশু পুত্র		শিশু কন্যা	
	ওজন	উচ্চতা	ওজন	উচ্চতা
৩ মাসে	৫.২ কেজি.	৫৯.১ সেমি.	৪.৯ কেজি.	৫৮.৪ সেমি.
৬ মাসে	৬.৭ কেজি.	৬৪.৭ সেমি.	৬.১ কেজি.	৬৩.৭ সেমি.
৯ মাসে	৭.৩ কেজি.	৬৮.২ সেমি.	৬.৯ কেজি.	৬৭.0 সেমি.
১২ মাসে	৮.৪ কেজি.	৭৩.৯ সেমি.	৭.৮ কেজি.	৭২.৫ সেমি.

* ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যল রিসার্চ দ্বারা প্রকাশিত।
এ হল ভারতীয় শিশুর গড়পড়তা হিসেব মাত্র। শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের হার দেখে ডাক্তারবাবু খুশি থাকলে, নির্ভাবনায় থাকুন।

বিনামূল্যে শিশুর যত্ন সম্বন্ধে রঙীন পুস্তিকার জন্যে এই ঠিকানায় লিখুন: গ্লিণ্ডিয়া লিঃ, (FPD/26). ডাঃ অ্যানী বেসান্ত রোড, ওয়ার্লি, বম্বে-৪০০ ০২৫।

সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্যে আপনার শিশুকে পুষ্টিতে ভরপুর ফ্যারেক্স খাওয়ান।

ফ্যারেক্স®

বৃদ্ধি-বিকাশের সুস্বাদু রীতি

লণ্ডন

নির্বাচন ও নাগরিক অধিকার

দীপঙ্কর ঘোষ

নির্বাচন আর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জনমনে নতুন ভাবে উত্তেজনা আর আশা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। সেটা সব দেশেই হয়। লড়াইটা আরো জমজমাট হয় যখন বেশ কিছু কাল একই রাজনৈতিক দল দেশ শাসন করার পর নতুন করে নির্বাচনে নামে তখন সাধারণ জনতা দেখবার অপেক্ষায় থাকেন যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বাজীমাৎ করতে পারলো না তাদের বিরোধী দল পেছন থেকে দ্রুত বেগে ছুটে এসে জয়ের খুঁটি পেরিয়ে গেল। তেমনি একটা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বৃটেনে সাধারণ নির্বাচনের আহ্বান দেওয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মিসেস্ মার্গারেট থ্যাচার ১৯৭৯ সাল থেকে ক্ষমতায় আসীন হয়ে ১৯৮৩-র নির্বাচন জয় করে একাদিক্রমে নয় বছর শাসন চালিয়ে বেশ আস্থার সঙ্গে ১৯৮৭-র সাধারণ নির্বাচনের ডাক দিয়েছিলেন। আপনারা নিশ্চয়ই বহুবার শুনেছেন এবং পত্র-পত্রিকায় পড়েছেন যে মিসেস্ মার্গারেট থ্যাচারের রক্ষণশীল দল বেশ কতোগুলো নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে তৃতীয় বারের মতো ক্ষমতায় নির্বাচিত হয়েছেন। তাই নির্বাচনের কথার পুনরাবৃত্তি করার দরকার নেই। ভোট দেওয়া এদেশে বাধ্যতামূলক নয়। তবু নাগরিক অধিকারের এই বিশেষ দিকটার সদ্ব্যবহারকে নৈতিক কর্তব্য বোধে এদেশের বেশির ভাগ লোক মনে করেন। নির্বাচনে শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক ভোট দিয়েছেন। পছন্দসই প্রার্থীর নামের সামনে চিহ্ন দিয়ে ভোটের কাগজটা বাক্সে রাখতে গিয়ে দেখা গেলো ভোট বাক্সটা বহু লড়াইয়ের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। জরাজীর্ণ, টোল খাওয়া আর দুমড়ানো চেহারার ভোট বাক্সটা উত্থান-পতনের প্রতীক। বাক্স ভেঙ্গে ভোটপত্র ঢোকানো কিংবা বার করে নেবার কোনো ঘটনা ঘটেছিল বলে শোনা যায়নি। বহু নির্বাচনে ঐ একই বাক্স সেবা করে আসছে আর তাতেই চেহারায় একটু-আধটু বয়সের ছাপ পড়েছে। ব্রিটেনের বহু নির্বাচনের সাক্ষী ঐ ভোট বাক্সগুলো নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলো ১৯৮৭-র নির্বাচনে।

এই শতকে মিসেস থ্যাচার একমাত্র ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যিনি পর পর তিনবার নির্বাচনে জয়ী হলেন। সেই সঙ্গে এবারের পার্লামেণ্টে, এই প্রথমবার তিনজন কৃষ্ণাঙ্গ সদস্য নির্বাচিত হয়ে এলেন। আর সেই সঙ্গে নির্বাচিত হয়ে এলেন একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণ সদস্য। তবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি এবারেই প্রথম নির্বাচিত হয়ে আসেননি, আগেও হয়েছিলেন। ব্রিটিশ নন এমন প্রথম ব্যক্তি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হয়েছিলেন দাদাভাই নৌরজি। ১৮৯২ সালে উদারপন্থী দলের প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন দাদাভাই নৌরজি। আর রক্ষণশীল দলের প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন স্যার মানচেরজি ভাওনাগরী। শ্রমিক দলের সদস্য হিসেবে শাপুরজি সাকলাৎওয়ালা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯২২ সালে। শাপুরজি সাকলাৎওয়ালা ১৯২৪ সালে শ্রমিক দলের সদস্য পদ ত্যাগ করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বলে চিহ্নিত হন এবং ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন। ঐ তিনজন ভারতীয়ের পর গত ষাট বছর ধরে ব্রিটিশ সংসদে অশ্বেতাঙ্গ কিংবা এশিয় বংশোদ্ভূত অন্য কোনো সদস্য ছিল না। বিশের দশকে

নবনির্বাচিত মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার

ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের পর এই প্রথমবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নির্বাচিত হলেন আফ্রো-ক্যারিবিয়ো কোনো সদস্য। এদের মধ্যে একজন হলেন মহিলা। ১৯৮৭-র সাধারণ নির্বাচনে মোট ২৭ জন অশ্বেতাঙ্গ ও এশিয় বংশোদ্ভূত প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তাঁদের চারজন নির্বাচিত হয়েছেন—সেদিক থেকে হিসাবটা খারাপ নয়। অভিবাসী জনগণের মধ্যে আশা আকাঙ্ক্ষা যে আগের চাইতে অনেক বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে এ থেকে তাঁর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তারা ব্রিটিশ সমাজের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে একত্রিত হয়ে অধিকার ও দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসছেন। উত্তর লণ্ডনের মিশ্রিত বর্ণের এক অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়ে এলেন ৪৩ বছর বয়স্ক বার্নি গ্রান্ট।

বছর বিশেক আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের গায়ানা থেকে বার্নি গ্রান্ট এসেছিলেন এদেশে। এবারে শ্রমিক দলের মনোনয়ন লাভ করে তিনি পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়েছেন। উত্তর লণ্ডনের ঐ নির্বাচনী এলাকা যদিও চিরাচরিত ভাবে শ্রমিক দলের দৃঢ় ঘাঁটি এবং আগের নির্বাচনে শ্রমিক দলের প্রার্থী সাড়ে এগারো হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন তবু ঐ অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের যথেষ্ট প্রাধান্য রয়েছে। বার্নি গ্রান্ট মাত্র চার হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হতে পেরেছেন। অপেক্ষাকৃত কম ভোট পাওয়ার কারণ তাঁর চরম বাম ঘেঁষা দৃষ্টিভঙ্গি না তাঁর চামড়ার রঙ তা নির্ধারণ করা খুবই কষ্টকর। এবারের নির্বাচনে বার্নি গ্রান্ট যেমন প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ পার্লামেন্ট সদস্য হয়েছেন তেমনি ডায়ানা এবট্ নির্বাচিত হলেন প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা সদস্য। লণ্ডনের উত্তর মধ্যাঞ্চলের হেকনি থেকে নির্বাচিত ডায়ানা এবটে-র বয়েস ৩৩ বছর। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডায়ানা এবট্ এ দেশের সংখ্যালঘু বর্ণের লোকেদের নানা অসুবিধের বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে প্রায়ই স্পষ্ট ভাষায় কথা বলে থাকেন। তবু, তাঁর কেন্দ্রের সকল বর্ণের লোকেরাই তাঁকে ভোট দিয়েছেন এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রথম মহিলা অশ্বেতাঙ্গ সদস্যাকে সবাই জানিয়েছেন অভিনন্দন। তৃতীয় কৃষ্ণাঙ্গ সদস্যও নির্বাচিত হয়েছেন পশ্চিম লণ্ডনের ব্রেণ্ট নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে। তৃতীয় কৃষ্ণাঙ্গ সদস্য ৩৬ বছর বয়স্ক পল বোটেং, পেশায় সলিসিটর এবং শ্রমিক দলের মধ্যে চরমপন্থী বলে তাঁকে গণ্য করা হয়। শ্রমিক দলের ঐ তিনজন সদস্যই নির্বাচিত হয়েছেন বৃহত্তর লণ্ডন থেকে। এর বাইরে আর মাত্র একজন অশ্বেতাঙ্গ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবারের পার্লামেন্টে। ইনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ৩০ বছর বয়স্ক কিথ্ ভাজ। মধ্য ইংলণ্ডের লেস্টার (পূর্ব) নির্বাচনী এলাকার পার্লামেন্ট সদস্য কিথ ভাজ ভারতের গোয়া অঞ্চলের আদি অধিবাসী। কিথ ভাজ বলেন নির্বাচনে অভিবাসন এবং শুধু অভিবাসী জনগণের বিষয়গুলোকে ভোটাররা আলাদা করে দেখেন না। এদেশের মূল সমস্যা যেমন বাসস্থান, চাকরি-বাকরি, শিক্ষা এবং জাতীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থাগুলোকে ভোটাররা সব চাইতে বেশি গুরুত্ব দেন।

গণতান্ত্রিক প্রায় প্রত্যেক দেশেই ভোটাররা স্থানীয় সমস্যা ও সুখসুবিধেগুলোকে সব চাইতে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ব্রিটিশ নির্বাচনে তার জ্বলন্ত উদাহরণ ১৯৪৫ সালের ভোট। প্রয়াত স্যার উইনস্টন চার্চিলের নেতৃত্বে রক্ষণশীল দল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয়লাভ করলো কিন্তু ১৯৪৫ সালে তাঁরা ভোটযুদ্ধে শ্রমিক দলের হাতে পরাজিত হলো। আর এবারের নির্বাচনও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে সমস্যাগুলো দেশের উত্তর ভাগে যতো প্রকট হয়েছে, হয়তো অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ দক্ষিণাঞ্চলে ঠিক ততটা নয়। রক্ষণশীল দল তৃতীয়বার নির্বাচনে জয়ী হলেও ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসের মধ্যে একটা বিশাল রাজনৈতিক ফাটল সৃষ্টি করেছে এবারের নির্বাচন। এর আগের নির্বাচনগুলোতে এদেশের মানুষের মধ্যে এতো গভীর পার্থক্য এর আগে আর কখনও সৃষ্টি হতে দেখা যায়নি। সেদিক থেকে আরো একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হলো এবারে। দেশের উত্তরে স্কটল্যাণ্ড এবং পশ্চিমে ওয়েলস সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে ভোট দিয়ে সরকারের প্রতি সমর্থন এবং অনাস্থা দুই প্রকাশ করেছে। স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস শ্রমিক দলকে বিস্তৃত যেমন সমর্থন দিয়েছে তেমনি অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণ ইংল্যাণ্ড ও লণ্ডন—রক্ষণশীল দলের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রকাশ করেছে। স্বভাবতই একটা কথা মনে জাগে যে ব্রিটিশ জনগণের মধ্যে কি তবে একটা বড় ধরনের বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে? একদিকে কম সুবিধেভোগী জাতীয় নিরাপত্তার আওতায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বেকারভাতা নির্ভর খেটে খাওয়া মানুষ আর অন্য দিকে মধ্য থেকে উচ্চবিত্ত এবং সরকারী সুযোগ সুবিধের ওপর কম নির্ভরশীল জনগণ। হয়তো এ কারণে উত্তর ও পশ্চিমের সীমিত সুবিধে ভোগীরা আগের চাইতে অনেক বেশি করে শ্রমিক দলের শাসন কায়েম করতে চাইছে। বস্তুতপক্ষে এবারের পার্লামেন্টে শ্রমিক দলের মোট ২২৯জন সদস্যের মধ্যে ঐ অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন ১৭০ জন সদস্য। অন্যদিকে রক্ষণশীল দলের ৩৩৪টি আসনের মধ্যে দল পেয়েছে মাত্র ৭৯টি আসন।

ব্রিটিশ রাজনীতিতে ভৌগোলিক মেরু করণ অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে শ্রমিক দল বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করেছিল। সেবারে দলের ৫৯ ভাগ পার্লামেন্ট সদস্য এসেছিলেন স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস ও উত্তর ইংল্যাণ্ড থেকে। এবারে শতকরা হিসেবের দিক থেকে, শ্রমিক দল ঐসব অঞ্চল থেকে ৭৪ ভাগ আসন সংগ্রহ করেছে। রক্ষণশীল দলের অতীত ইতিহাস প্রায় একইরকম। ১৯৫৯ সালে হ্যারল্ড ম্যাকমিলান যখন বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন তখনও রক্ষণশীল দলের মাত্র ৩২ ভাগ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস্ ও উত্তর ইংল্যান্ডের থেকে। এবারে ৩২ ভাগের তুলনায় তাঁরা পেয়েছেন মাত্র ২১ ভাগ। রক্ষণশীল দলের স্কটল্যাণ্ডে অত্যন্ত বেশি হারে জনপ্রিয়তাহানির কথাটা অনেকের মনে চিন্তার উদ্রেক করেছে। ত্রিশ বছর আগেও পরিস্থিতিটা এত গুরুতর ছিল না। যুক্তরাজ্যের চারটি অংশের মধ্যে ভোটযুদ্ধে তখনও এত বেশি করে পার্থক্য ধরা পড়েনি। কিন্তু সারা দেশে সম্পদ বণ্টনের তারতম্য ঘটায় জনগণ তার বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলো ভোটের মাধ্যমে। ভোটের এই বিস্তৃত ব্যবধানের পুরোপুরি রাজনৈতিক তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠতে আরো কিছু সময় লাগবে। তবে এটা ঠিক যে বৃটেনের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা এখন আরো বেশি করে গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে পড়েছে। স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসকে যুক্তরাজ্যের দুটি অঞ্চল হিসেবে গণ্য করলে প্রশ্নটা তত বড় হয়ে দেখা দিত না। ওয়েলস, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড এবং বিশেষত স্কটল্যাণ্ডকে তাদের বৈশিষ্ট্যের দরুন আলাদা একেকটি জাতি বলে স্বীকার করা হয়। স্কটল্যাণ্ড নিজস্ব 'নোট' ছাপায় এবং ইংল্যাণ্ডের পাউণ্ড স্টার্লিং-এর মূল্যমানে তার আন্তর্জাতিক মূল্য নির্ধারিত হয়। স্কটল্যাণ্ডে ছুটি, শাসনপদ্ধতি এবং রাজনীতির বেশ কিছু অংশ ইংল্যাণ্ডের চাইতে আলাদা। আন্তর্জাতিক খেলাধূলোর ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য বা বৃটেন নামে কোনো দল যোগ দেয় না। (একমাত্র অলিম্পিক এর ব্যতিক্রম) সেখানে ইংলন্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ার্ল্যান্ড আলাদা আলাদা দেশ হিসেবে যোগ দেয়। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া কর্তৃপক্ষগুলো তা স্বীকারও করে নিয়েছে। ঐতিহাসিক দিক থেকে ঐ অংশগুলো নিজেদের ইচ্ছায় ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের অংশ হয়েছিল।

কিন্তু বিগত বছরগুলোতে ঐসব অঞ্চল নিজেদের অধিকার সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে উঠছে। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় ঐ অংশগুলোর জন্য আলাদা আলাদা ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পদও রয়েছে। স্কটল্যান্ড ও ওয়েলসের রাজধানী শহরগুলোতে পৃথক প্রশাসনিক দপ্তরও রয়েছে। যুগ বদলেছে। স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসের সনাতনী শিল্পগুলো যেমন জাহাজ তৈরী, কয়লাখনি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইস্পাত শিল্প ইত্যাদি আজকাল কম্পিউটার ও আধুনিক ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সঙ্গে পাল্লায় পিছিয়ে পড়েছে। যার ফলে প্রবল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বেকারি। ঐ অঞ্চলের বেশ কিছু বাসিন্দার ধারণা রক্ষণশীল দল শুধু লন্ডনকেই দেশের একমাত্র নগরী হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। স্কটল্যান্ড ও ওয়েলসের জন্য আলাদা আলাদা পার্লামেন্টের ধ্যানধারণা যদি ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা আবারও জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে তবে অবাক হবার কিছু থাকবে না। সাধারণ নির্বাচন-উত্তর ব্রিটিশ রাজনীতিতে এ প্রশ্নটা বড় করে দেখা দিয়েছে যে নির্বাচনে স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসের জনগণ যে মতামত দিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কি সে-রায় অগ্রাহ্য করতে পারবেন! আইনত হয়তো পারেন। যুক্তরাজ্যের শক্তির মূল কেন্দ্র হিসেবে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইংলণ্ডের ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যা ও সমৃদ্ধি। তবে নৈতিক প্রশ্নটা আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে—এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির দিক থেকে এটা কতোটা যৌক্তিক তাও ভাববার বিষয়। পর পর তিনবার ঐতিহাসিক নির্বাচন জয়ের পর যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন অংশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ দূর করাকেই লন্ডনের প্রধান কর্তব্য বলে এখন বিবেচনা করা হচ্ছে।

দেখি নাই ফিরে

সমরেশ বসু

চিত্র □ বিকাশ ভট্টাচার্য

জোটে যজমান বাড়ির বিয়ে, অন্নপ্রাশন, নানান উপলক্ষে। তার প্রত্যাশায় সারা বছর দিন মাস থাকলে হয় না।
রামকিঙ্করের নিরামিষে ক্ষুধা মন্দ হয় না। অরুচি ঐ পাচকদের আতেলা আঝালা আলুনি ডাল ব্যঞ্জনে। ভাতের মাটি কাঁকরের তো কথাই নেই। নিশিকান্ত রায়চৌধুরি ঐ ভোজনে নেই। আশ্রমে অনুমতি আছে, অভাবেই হোক আর অরুচিতেই হোক, কেউ যদি নিজের হাতে পাক করে খেতে চায়, খাবে। নিশিকান্তর মতো আরও কেউ কেউ আপনা হাতের পথিক। মধুও সেইখানেই। আশ্রমের রান্না ঘরের খাবারে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। নিশিকান্তর নিমন্ত্রণে জোটে রাজসিক খানা। ভোজনরসিক লোক বটে। অন্যকে ভোজন করিয়ে যে সুখ, তা কপালে নেই। পয়সার অকুলান। অতএব, তার নিমন্ত্রণ হলে অন্তত দুটো পয়সা, তার অধিক এক আনা সে হাত পেতেই চেয়ে নেয়। ধীরেন্দ্র দেববর্মা, প্রভাতমোহন, সুধীর, শিক্ষাভবনের সুজিত সেই নিমন্ত্রিতদের তালিকায় নিয়মিত সভ্য। রামকিঙ্করও। তবে, ওকে যতোটা পারা যায়, পয়সা থেকে রেহাই দেওয়া হয়। সবাই জানে, ওর ঘর থেকে টাকা আসে না। অবৈতনিক ছাত্র। একমাত্র ছবি বিক্রি হলে হাতে কড়ি জোটে। যখন জোটে, তখন ও নিজেই নিশিকান্তর হাতে তুলে দেয়। নিশিকান্তর মতো পেটুক কেউ না। পেটুক আছে অনেক। বিলেতের নানান দেশের আর চীন জাপানের অতিথিরাও কম ডিম খান না। ডিমের সুবিধা রসিয়ে রান্না না করলেও হয়। সেদ্ধ করে পকেটে ঢুকিয়ে নিলেই ল্যাটা চুকে যায়। তারপরে চলো যেথা সেথা। নিশিকান্তকে হারানো কারোর সম্ভব না। রোজ তো আর রান্না করে না। সপ্তাহে খুব বেশি হলে তিন চার দিনই যথেষ্ট। এক দিনেই ডজনাধিক ডিম্ব হজম করতে, একদিন থেকে দুদিন ঘুমিয়ে কাটাতেই হয়। কিন্তু নিশিকান্তর পক্ষে যা সম্ভব, সকলের পক্ষে ততোটা সম্ভব না।
ছাত্রীরা অবিশ্যি কেবল লাঠি আর ছোরা খেলা নিয়েই ব্যস্ত ছিল না। তাদের লাঠি আর ছোরা খেলা নিয়ে বয়স্ক কারোর কারোর কিঞ্চিৎ আপত্তি ছিল। কারণ ঐ খেলার দিকে নাকি পুলিশের কুনজর থাকতে পারে। ইংরেজরাজের দিশি গোয়েন্দাদের দৃষ্টি আর ঘ্রাণশক্তি নাকি অনেক প্রাণীর চেয়েও বেশি। তবে, ছাত্রীরা লুকিয়ে কিছু করে না। তা ছাড়া, ইংরেজির অধ্যাপক জাহাঙ্গীর ভকিলের স্ত্রী ছাত্রীদের শেখান গুজরাতি গরবা নাচ। তালে তালে খাটো লাঠি ঠোকার সেই নাচ দেখতে ভালো লাগে। তবে, গত বছর আচার্য রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে কোনারক বাড়িতে সন্ধ্যার পরে, মাস্টারমশাই-এর বড় মেয়ে গৌরীর নাচের নাকি তুলনা হয় না। নটীর পূজা নাটকে সে হয়েছিল নটী। আসলে রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী' কবিতাকেই তিনি 'নটীর পূজা' নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন। অহিংসা ছিল এই নাটকে একটি বড় উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথ মাসখানেক আগে গিয়েছিলেন আগরতলা, ত্রিপুরার রাজগৃহের নিমন্ত্রণে। মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য তাঁর বন্ধু। তাঁকে রাজা দেখিয়েছিলেন মণিপুরি নাচ। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন সেই নাচ দেখে। বিশ্বভারতীতে ভালো নাচের অভাব ছিল। তিনি তখনই ব্যবস্থা করে এসেছিলেন, একজন মণিপুরি নাচের শিক্ষককে যেন পাঠানো হয়। সেই ডাকেই, নবকুমার সিংহের আগমন। আর তার কাছে হয়েছিল গৌরীর নাচের শিক্ষা।
রামকিঙ্করের কানে খবর আসতো। ওর চেয়ে এক বছর বয়সে ছোট গৌরীর নাচ শেখা কোনোদিন দেখতে যায়নি। যাবার কোনো কারণও ছিল না। অধিকারও না। এমন কি কোনারক বাড়িতে সেই নাটক দেখতে যাবারও অনুমতি ছিল না। ওর একলার না। ছুটির আশ্রমে ওর বয়সী কোনো ছাত্রেরই কোনারক বাড়ির নাটক দেখতে যাবার অনুমতি ছিল না। গিয়েছিলেন সেই সব শিক্ষকরা সস্ত্রীক, যাঁরা গ্রীষ্মের ছুটির সময়েও ছিলেন। রামকিঙ্কর শুনেছিল সাবিত্রীর কাছে। সাবিত্রী ছাত্রী। ওর কোনো বাধা ছিল না। সাবিত্রী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল, "আমি এসেছি নাচের দেশ থেকে। কিন্তু গুরুদেবের বাংলা গানের সঙ্গে এমন সুন্দর নাচ আমি কখনো দেখিনি। গৌরী যে ঐরকম সুন্দর নাচতে পারে, ভাবতে পারিনি। দিনুদার চোখ থেকে ঝর ঝর করে জল পড়ছিল।"
গ্রীষ্মের ছুটির সময় ছাত্রীদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের মেয়ে সাবিত্রী ছিল। তা ছাড়াও সাবিত্রী গান করেছিল। এ ঘটনা ঘটেছিল গত বৈশাখে। তারপরে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন বিদেশে। আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন সাতই পৌষের দু দিন পরে। সাতই পৌষের দিন তিনি থাকতে পারেননি বলেই বোধ হয়, গত বছরের মতো পৌষমেলায় বাইরের অতিথিদের তেমন ভিড় হয়নি। কিন্তু মেলা জমেছিল ভালো। রোশনচৌকি বসেছিল গত বছরের মতোই। নহবতে সানাই বেজেছিল প্রায় অন্ধকার থাকতেই। পূজার ছুটি শেষ হবার আগেই রামকিঙ্কর ফিরে এসেছিল। এসে পর্যন্ত ওর কাজ বন্ধ ছিল না। কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিদ্যা লক্ষ্মীর পূজাও বটে। মেলায় কলাভবনের একটি আলাদা তাঁবু বসে। সেখানে সকলের কিছু না কিছু তৈরি পসার সাজানো হয়। কার্ডে আঁকা ছবি ছাড়াও থাকে একটু বড় মাপের ছবি। ছাত্রীদের থাকে প্রধানত আঁকা ডিজাইনের রঙিন ছবি। নকশার সেলাই। কাগজে আঁকা গাছপালার নানা অলঙ্করণ। ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছবি এঁকেছিল রামকিঙ্কর। নানা মাপের। তার মধ্যে পোস্টকার্ডের মাপেও বেশ কয়েকটি ছিল। সবই ছিল মেলার পসরা।
মাস্টারমশাই কেবল উৎসাহদাতা ছিলেন না। তাঁর আঁকা কার্ডও ছিল কয়েকখানি। বিনোদবিহারী, প্রভাতমোহন, সুধীর খাস্তগীর, নতুন বনবিহারী, সোভাগমল গেহলট, সুকুমার দেউস্কর, ধীরেন দেববর্মা, নিশিকান্ত, হরিহরণ আরও অনেকে। একমাত্র রামকিঙ্কর একটি মাটির মূর্তি গড়েছিল। মূর্তি না বলে সেটিকে পুতুল বলাই সঙ্গত। বুর্দেলের প্লাস্টারের উপহার মূর্তির অনুকরণে একটি সাঁওতাল ছেলে। হাতে তীর ধনুক। মাস্টারমশাই নন্দলাল কলাভবনের সাজানো পসরা দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। পসরার সামনে বসে, রহস্য করে হেসেছিলেন, "ওহে ধীরেন, আমাকে এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল বা কলম দাও তো। আঁকা জোকার নয়। ছোট্ট একটা চিরকুটের মতো হলেই হবে।"
ধীরেনদা কাগজের টুকরো আর পেন্সিল দিয়েছিলেন। নন্দলাল পিছন ফিরে, কাগজে কিছু লিখেছিলেন। কেউ কিছু দেখতে পায়নি। তিনি কাগজের টুকরোটি জামার পকেটে ঢুকিয়ে সকলের জিজ্ঞাসু মুখের দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন, "কী লিখলুম, কেউ জিজ্ঞেস করো না। তবে না দেখিয়েও লিখলুম, তোমাদের সামনেই। চিরকুটটা চার পাঁচ দিন পরে দেখলেও চিনতে পারবে। মেলা শেষ হবার পরে যদি ভুলে যাই, আমাকে একটু মনে করিয়ে দিও। কী লিখেছি, কেন লিখেছি, তখন তোমাদের সকলের সামনে ফাঁস করবো।"
সবাই ছিল অবাক নিশ্চুপ। নিজেদের মধ্যে নানারকম কথা হলেও মাস্টারমশাইয়ের রহস্য কেউ বুঝতে পারেনি। বিনোদবিহারীর গম্ভীর মন্তব্য ছিল, "আমার মনে হয়, কারোর ছবি সম্পর্কে কিছু একটা টিপ্পনি কেটেছেন।"
কলকাতা থেকে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ ছাব্বিশে ডিসেম্বর এসেছিলেন বিশ্বভারতীর আচার্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। সেইদিনই রাত্রে বাজি পোড়ানো হয়েছিল। যাত্রা হয়েছিল দু দিন। যাত্রা করেছিল সেই আদিত্যপুরেরই দল। তৃতীয় দিন সাঁওতাল মাঝি মেঝেনরা নেচেছিল। একমাত্র দেখা যেতো, আশ্রম প্রাঙ্গণে নাচতে এসেও, মেয়েমদ্দ সবাই হাঁড়িয়া খেয়ে আসতো। হাঁড়িয়া যদি না খাবে, তবে মজা কিসে? ওদের জীবনে সবটাই সাদাসিধে, সহজ। লুকোছাপা কিছু নেই।
পৌষমেলায় কেবল কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরাই পসরা সাজিয়ে বসেনি। বিশেষ করে শিক্ষাভবনের ছাত্রছাত্রীরা তৈরি করেছিল নানারকম পিঠে আর মিষ্টি। বিকেলের জমে ওঠা মেলায় গরম গরম আলু আর মোচার চপ ভেজে এনে সাজাতো। গরম করবার জন্য কাছেই রেখেছিল একটি ছোট কাঠের উনুন। পসার তাদের ভালো জমেছিল। আসলে পুজোর ছুটির আগে আনন্দমেলায় শিশু আর

পাঠ বিভাগের ছেলেমেয়েরাই বেশি নানারকম তৈরি খাবার বিক্রি করে। সেই সময়টাও কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা যারা থাকে, তারা কিছু ছবি এঁকে খদ্দের খোঁজে। আনন্দমেলার আসরের চেহারাটা আলাদা। সেখানে খদ্দেরদের হাত ধরে টানা যায়। আনন্দমেলায় উৎসবে সবাই আশ্রমের। পৌষমেলায় আসে কলকাতা আর নানান জায়গা থেকে নানা রকম লোক। সেখানে আছে যাচাই বাছাই। মন্দিরের উত্তরের মাঠের মেলায় আরও নানারকম দোকানপাট বসে।

মেলা ছিল মোট তিনদিন। চারদিনে সব শেষ। একটি দোকানও আর ছিল না। আশ্রমের কাজের লোকের সঙ্গে মেথেনরা হাত মিলিয়ে, মাঠ ঝাঁটিয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছিল। পঞ্চম দিনে সকালে কলাভবনের ছোট তাঁবুটি গোটানো হয়েছিল। রোজই দিনের শেষে সব গুছিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হতো। তাঁবু গোটানোর সময় পসরা ছিল না। মাস্টারমশাই এক মাঝির দেওয়া চুটা টানছিলেন প্রাণপণে। ধোঁয়া বেরোচ্ছিল না মোটে। মাঝি মেথেনদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরাও হেসে বাঁচেনি। বিনোদবিহারী স্মরণ করিয়েছিল, "মাস্টারমশাই সেই চিরকুটে কী লিখেছিলেন, আজ এখন দেখান।"

"হ্যাঁ, কথাটা বিনোদের ঠিক মনে আছে দেখছি।" নন্দলালের চশমার কাঁচে কৌতুকের ঝিলিক লেগেছিল, "অবশ্য সেই জামাটা গায়ে না থাকলেও, এই জামার পকেটে আমি কাগজের টুকরোটা নিয়ে এসেছি।" তিনি পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলেন।

ছাত্রছাত্রীরা সবাই জিজ্ঞাসু অবাক চোখে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে। তিনি কাগজের টুকরোটি বের করে তুলে দেখিয়েছিলেন, "দেখ, সেই কাগজটিই তো? একটু দুমড়ে গেছে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ...." সবাই রব করেছিল।

নন্দলাল কাগজটি সামনে তুলে পড়েছিলেন, "লেখা আছে দুটি কথা। রামকিঙ্কর সব চেয়ে বেশি। এটা তখন লিখে রেখেছিলুম আমার ভবিষ্যদ্ বাণী হিসেবে। এখন তোমরা দেখ, মিলেছে কি না।"

সকলের এক মুহূর্ত লেগেছিল, রহস্যটি বুঝতে। মুহূর্ত পরেই সবাই হেসে বেজেছিল, "ঠিক ঠিক ঠিক।"

মাস্টারমশাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি মিলেছিল। রামকিঙ্করের ছবিই বেশি বিক্রি হয়েছিল। এমন কি ওর নকল পুতুলটিও কলকাতার একজন কিনে ছিলেন। বিনোদবিহারীর সহাস্য মন্তব্য ছিল, "কিন্তু আপনার চেয়ে তো বেশি বিক্রি হয়নি। আপনার তো সব কটি কার্ডই বিক্রি হয়ে গেছে।"

"তা গেছে।" নন্দলাল মাথা ঝাঁকিয়ে হেসেছিলেন, "তেমনি মনে রাখতে হবে, আমার চারটি কার্ড বিক্রি হয়েছে। কিঙ্করের সাতটির মধ্যে পাঁচটিই বিক্রি হয়েছে। তা ছাড়া বিক্রি হয়েছে ওর মাটি দিয়ে গড়া পুতুল। পুতুলটা ও এমনভাবে রঙ করেছিল, যেন প্লাস্টার অফ প্যারিসে তৈরি। ওটাকে যদি পোড়ানো যেতো, থাকতো আরো বেশি দিন।"

রামকিঙ্কর বাদে, আর সকলেরই সবচেয়ে বেশি বিক্রির সংখ্যা দু তিন খানা। ওর পাঁচ খানার মধ্যে দুটি দু টাকা। বাকি তিনটির প্রত্যেকটি আট আনা। মাস্টারমশাইয়ের বড়মাপের প্রত্যেকটি ছবিই দু টাকা করে বিক্রি হয়েছে। রামকিঙ্করের ছবি বিক্রি সাড়ে তিন টাকা। মাটির মূর্তিটি দু টাকা। মোট পাঁচ টাকা আট আনা। বাকি সকলের প্রত্যেকটি ছবিই বিক্রি হয়েছিল আট আনায়। ছবি, পুতুল, সবগুলোর ক্রেতাই ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কথা ছিল আগেই মেলার ছবি বিক্রির টাকা আলাদা জমাতে হবে। কলাভবনের নতুন বড় তাঁবু কেনার জন্য। তাঁবু নিয়ে নানান জায়গায় বেড়াতে আর আঁকতে যাওয়া হবে। রামকিঙ্করের কাছে নতুন কথা 'একস্‌কারশন'। ও সব টাকাই তুলে দিয়েছিল মাস্টারমশাইয়ের হাতে। বাকিরা সকলেই দু এক আনা কম দিয়েছিল। মাস্টারমশাই কিছু বলেননি। তিনি রামকিঙ্করের হাতে দু টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, "তোমার চাঁদাই সব চেয়ে বেশি। হাত খরচের জন্য দু টাকা রাখো।"

রামকিঙ্কর হেসেছিল। সে কি কেবলই হাসি? কৃতজ্ঞতায় ওর দু চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল।

সকলেই তাদের ছবি বিক্রির দু এক আনা পয়সা নিশিকান্তর হাতে তুলে দিয়েছিল। কথা এখানে একটিই। নিশিকান্তর দুটি ছবির একটিও বিক্রি হয়নি। তার ছিল অদ্ভুতদর্শন একটি মকরের মুখ। আর একটি প্যাঁচার। সেটা প্যাঁচা না হয়ে একটি উদ্ভট পক্ষীর মুখ হয়েছিল। যা নেই ভূ-ভারতে। নিশিকান্তর কোনো আফসোস ছিল না। কারণ শস্তা চটকদার ছবি তো সে আঁকে না। সে সকলের ছবি বিক্রির পয়সা দিয়ে, ডিম ভাজা, খিচুড়ি, পাঁঠার মাংস রান্না করে খাইয়েছিল। সেও কিছু দিয়েছিল। রামকিঙ্করকে তুলনায় মাত্র দু আনা দিতে হয়েছিল। সেক্ষেত্রে সবাই ছিল বন্ধুবৎসল। দু আনা না দিলেও ওর কাছে পয়সা চাওয়া হতো না। সকলেরই বাড়ি থেকে কম বেশি কিছু টাকা আসতই। এক সময়ে অর্ধেন্দুপ্রসাদ, মণীন্দ্রভূষণ, সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন চক্রবর্তী টাকা উপার্জনের জন্য বিমর্ষ আর হতাশ বোধ করতো। বর্তমানের অনেকেরই মন ক্রমে উপার্জনের চিন্তায় চিন্তিত হয়ে উঠছে।

রামকিঙ্কর ওর পিঁপড়ের সঞ্চয় সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু সকলের সঙ্গে সকলের মতো খরচ করতে না পারায় মনে কেমন একটা দীনতা বোধ জাগে। অথচ ও নিরুপায়। ওর যা সঞ্চয় আছে, ইচ্ছা করলে পাঁচ টাকাও খরচ করতে পারে। একলাই কয়েকদিন খাইয়ে দিতে পারে সবাইকে। তারপরে? ওর দুবেলা অন্ন জুটবে। এক বর্ষা থেকে, দুই বর্ষা কেটে গিয়েছে। সামনে তৃতীয় বর্ষা। শেষ হয়ে গেলে ওর দু বছর পূর্ণ হবে। তারপরে থাকবে আর একটি আগন্তুক বর্ষার শুরু ও শেষ, পূর্ণ হয়ে যাবে তিন বছর। তখন ও আর ছাত্র থাকবে না। ছাত্র না থাকলে অবৈতনিক বলেও কিছু থাকবে না। খাওয়া থাকার টাকা দিয়ে হয় তো এখানে থাকা যাবে। সে টাকা ও কোথায় পাবে।

বাইশ বছরের প্রাণ-মনকে এখনও ভবিষ্যতের হতাশা পাকে পাকে জড়াতে পারে না। দু বছর আগে, বর্ষার শুরুতে যখন রামানন্দ চাটুয্যা মশায়ের ডাক গিয়ে পৌঁছায়নি, মনে হয়েছিল একটা ভয় যেন অজগরের মতো ওকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছিল। দৈব মনে হলেও, সে-ডাক ছিল প্রত্যাশিত। মুহূর্তের মধ্যেই ও হতাশা মুক্ত হয়েছিল। এখন ওর প্রাণের শক্তি অনেক বেশি। সেই শক্তি ও পেয়েছে শান্তিনিকেতনে এসে। মাস্টারমশাই নন্দলালের কথাগুলোও ভোলেনি। চোখের সামনে অনেককে চাকরি পেয়ে চলে যেতে দেখেছে। বড়দের মধ্যে রমেন চক্রবর্তী আর মাসোজী যে-কোনো দিনই চাকরির ডাক পেতে পারে। ওর ভবিষ্যতে কী আছে, জানে না। ধীরেন দেববর্মা চলে গিয়েছেন লন্ডন। সেখানে ইন্ডিয়া হাউসে তিনি দেওয়ালে ছবি আঁকবেন।

রামকিঙ্কর এখন নিজেকে সঁপে দিয়েছে কাজের মধ্যে। এবার বাঁকুড়া থেকে ফিরে এসে ওর দিনগুলো কাটছে যেন একটা ঘোরের মধ্যে। বাঁকুড়া থেকে এসেছিল ভাইফোঁটার আগেই। এখানে তখনও পুজোর ছুটির নিরিবিলি দিন-রাত্রি। ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত শীত বসন্ত। গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হতে চলেছে। শান্তিনিকেতন এখন রৌদ্রদগ্ধ তৃষ্ণার্ত হয়ে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। মেঘ জমছে। কোথা থেকে ধেয়ে আসে বাতাস। জমে ওঠা মেঘ উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু মেঘ জমতে থাকা আকাশের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, বর্ষা আসন্ন। এ মেঘ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের সেই মেঘ না। যে-মেঘ বিন্দুর মতো ভারী নিরীহ চেহারায় দেখা দেয় বায়ু বা ঈশাণ কোণে। সেই কালো বিন্দু যেন একটি ভিমরুলের চাক। কোন্ অদৃশ্য থেকে কে তাকে খোঁচা দেয়। আর সে মুহূর্তে আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। দারুণ গর্জনে বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ ঘষায়, মাতঙ্গ ঝড়ে শন্‌শন্ নেমে আসে নিচে। ভয়ঙ্কর আর বিধ্বংসী তার খেলা। আসন্ন বর্ষার মেঘের আকাশ ক্রমেই যেন জল ধরে রাখছে। এখনও আশ্রম স্তব্ধ। ঘন্টাতলার ঘন্টা নিশ্চুপ।

পুজোর ছুটির পরেই ঘনিয়ে আসে শীত। শীতেও আশ্রমে যেন

একটা ছুটিরই পরিবেশ থাকে। পৌষমেলার আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। তারপরেই অনেকে শীতের ছুটিতে চলে যায় আশেপাশের গ্রামগুলিতে নবান্নের শেষে, নানা দিকে নানা মেলায় যায় মানুষ। অগ্রহায়ণে, পুবের রেল লাইনের উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে, দিগন্তবিস্তৃত পাকা আমনের গন্ধ নিতে ইচ্ছা করে। তখন খেজুর গাছগুলোর চাছাঁ কপালে, মাটির ছোট কলসি ঝোলে। সরু বাঁশের গুঁজে রাখা ঠিলির ভিতর দিয়ে, টুপিয়ে রস পড়ে। মৌমাছি সেখান থেকে সারাদিন নড়ে না। কাক শালিক নানা পাখিরাও খেজুরের চাঁছা কপালে রসের সন্ধানে আসে। খোয়াই রোদ পোহায়। পাখিদের ডাক কম শোনা যায়। পাকা ধানের খেতে তখন তাদের মোচ্ছব চলতে থাকে।

শীতের সময়েই এসেছিলেন বের্গম্যান সাহেব। তিনি একজন ভাস্কর। কিন্তু তিনি মাটির টালিতে রিলিফের কাজ শিখিয়েছিলেন। রিলিফ না রিলিভো? বিনোদবিহারী, সত্যেন বিশির সেই সব কথা রামকিঙ্করের মনে পড়েছিল। ও কোপাইয়ের উঁচু পাড়ের মাটির দেওয়ালে যেমন মূর্তি ফুটিয়ে তুলতো, বের্গম্যান সেইরকম কাজ করতেন। বিষ্ণুপুরের মন্দিরের টেরাকোটা কাজের মতোই, আগে একটি মাটির টালি করতেন। তার গায়ে মাটি দিয়ে নানারকম মূর্তি তৈরি করতেন। ছাত্ররা তাঁর কাজের অনুকরণ করতো।

রামকিঙ্করও করতো। কিন্তু বের্গম্যানের কাজগুলো যেন পাকা হাতের ছিল না। যে-কাজ রামকিঙ্কর ওর হাত আঙুল আর নখ দিয়ে ফুটিয়ে তুলতো, বের্গম্যান ব্যবহার করতেন ছোটখাটো নানান যন্ত্রপাতি। নন্দলাল বলেছিলেন, "উনি মিসেস মিলোয়ার্ডর মতোই একজন মূর্তি গড়ার শিক্ষক। প্রভাতমোহন বের্গম্যানের সামনেই বাঙলায় বলতো, "ইনি কিছুই জানেন না। কী যে করেন, তা উনি ছাড়া কেউ বোঝে না। উনি নাকি আবার ভাস্কর। আমি চললুম। ভালো লাগে না।" সে সত্যি সত্যি চলে যেতো।

অন্যদের উৎসাহ ছিল না। রামকিঙ্কর অবাক হয়ে ভাবতো, সেই কোন সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এলেন সাহেব। টালির ওপর কাঁচা হাতের কাজ ছাড়া আর কিছুই করলেন না। হাতে ধরে শেখাতে পারলেন না। নতুন কিছু করে দেখাতে পারলেন না। বনবিহারী দু তিন দিন বের্গম্যানের কাজ দেখতে এসেছিল। বলেছিল, "সাহেবের রিলিফের কাজের চেয়ে রামকিঙ্করবাবুর হাতের কাজ অনেক সুন্দর।"

রামকিঙ্কর হাসেনি। লজ্জায় মুখ পর্যন্ত তুলতে পারেনি। কী ভাগ্য! সাহেব বাংলা একটুও বুঝতেন না। তারপরে শান্তিনিকেতনে বসন্ত এসেছিল। বের্গম্যানও চলে গিয়েছিলেন। দূর বিদেশের শীতের পাখিরা যেমন আসে, শীত শেষে আবার চলে যায়, সেইরকম। বের্গম্যান চলে গেলেও, রামকিঙ্কর রিলিফের কাজ বন্ধ করেনি। সবাই যখন বাইরে যাবার জন্য ডাকাডাকি করেছে, সে ডাক ও শুনতে পায়নি। ওর সহপাঠীরা স্কেচ করার ঝোলা নিয়ে কোনোদিন চলে যেতো গোয়ালপাড়ায়, সুপুরে, বল্লভপুরে, কোপাইয়ের ধারে। ও তখন পশ্চিম তোরণের দোতলায় সেই পূর্ণাঙ্গ কঙ্কালটিকে দেখতো। কেবল চোখ দিয়ে দেখা না। হাতে ছুঁয়ে দেখতো। লাইব্রেরি থেকে চেয়ে নিয়ে আসতো, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির বই "ম্যানোসক্রিপ্ট"টি। রবীন্দ্রনাথ সদ্য নিয়ে এসেছিলেন ইটালি থেকে। মুসোলিনির নিজের সংগ্রহ থেকে দেওয়া উপহারের বই। সে বই তিনি তুলে দিয়েছিলেন নন্দলালের হাতে। মাস্টারমশাই সে বই দেখে, জমা করেছিলেন লাইব্রেরিতে। সে বই ও লাইব্রেরি থেকে চেয়ে নিয়ে আসতো। মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্কেচগুলো দেখতো। সিম্নোো সিম্নেনির বই থেকে অন্য শিল্পীদের স্কেচ অনেকবার যা ও নকল করেছে, তা আবার আঁকতো দ্য ভিঞ্চির বই থেকে। সেই কঙ্কালের হাড় মেপে কাগজে আগে আঁকতো। আঁকা হাড়ের ওপর মাংসপেশি আঁকতো। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির বইটির ছবিতে সবচেয়ে নতুন করে শেখার ছিল হাড়কে জড়িয়ে মাংসপেশির ভাঁজের সংস্থান।

শীতের শেষে, বসন্তে সবাই যেতো মাঠে ঘাটে স্কেচ করতে।

রামকিঙ্কর পশ্চিম তোরণের দোতলায় ওর মূর্তি গড়ার কাজের আঁকা লেখায় মগ্ন ছিল। উত্তরের খোলা জানালায় বসে কতো পাখি ডেকে গিয়েছিল। শোনেনি। বাইরে বদ্ধস্বর খুলে যাওয়া কুহুস্বর কানে আসেনি। কাগজের সঙ্গে কাগজ জুড়ে, এক মানুষ সমান শোবার মতো লম্বা চওড়া তৈরি করেছিল। কাঠের লম্বা বাকসো থেকে সাবধানে তুলেছিল পুরো কঙ্কালটিই। শুইয়েছিল সেই

কাগজের ওপর চিত করে। এঁকেছিল সেই কঙ্কাল। তার গায়ে এঁকেছিল ভাঁজে ভাঁজে মাংসপেশি। চোখ নাক ঠোঁট এঁকেছিল। কিন্তু সেই মূর্তি হয়ে উঠেছিল অনেকটা মহিষাসুরের মতো। দোষটা কোথায়, প্রথম বুঝতে পারেনি। ইটালি ভাষায় বইয়ের, দা ভিঞ্চির আঁকা স্কেচের অনুকরণ করেই, হাড়ের ওপরে এঁকেছিল মাংস বেশি। ও যেমনটি চায়নি, কঙ্কালের আঁকা মানুষের মূর্তিটি হয়েছিল তেমনি। অথচ কঙ্কালের উপর আঁকা সেই মানুষের চোখমুখ এঁকেছিল সুন্দর করে। ডাগর চোখ। চোখা নাক। মানানসই সামান্য মোটা ঠোঁট। কঙ্কালটি বাকসে তুলে শুইয়ে দিয়ে, এঁকেছিল বুক পেট। কেন যে মাথার চুল ঘাড় অবধি লম্বা এঁকেছিল, নিজেই জানতো না। ধন্দে পড়েছিল একবার। কঙ্কালের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখেছিল। মনে জিজ্ঞাসা জেগেছিল, কঙ্কালটি কার ? স্ত্রী না পুরুষের ? আগে কোনোদিন এ জিজ্ঞাসা ওর মনে আসেনি। অন্য কেউও জিজ্ঞেস করেনি। ও ধরেই নিয়েছিল, কঙ্কালটি পুরুষের। হাসপাতালের ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতে যায়নি। ও উঠে দাঁড়িয়ে যখন সেই কাগজের ওপর রেখায় আঁকা ছবির দিকে তাকিয়েছিল, দেখেছিল, সেটা যেন রান্নাঘরের পাচক কুস্তিগীর ভোজপুরি খালি গায়ে শুয়ে আছে।

রামকিঙ্কর কয়েক মুহূর্ত সেই রেখায় আঁকা মূর্তিরটির দিকে তাকিয়েছিল। নিজের আঁকা দেখে নিজেকেই ধিক্কার দিয়েছিল। একটা আস্ত কঙ্কালকে শুইয়ে তার শরীরে মাংস জুড়ে দেওয়া মূর্তিটা ওর দিকে তাকিয়ে যেন মসকরা করছিল। এতো খারাপ ! আহ, কী খারাপ ! দু হাতে সেই মস্ত কাগজটি তুলে এক টানে মাঝখান থেকে ছিঁড়ে ফেলেছিল। আর সেই মুহূর্তেই নন্দলালের অবাক আহত স্বর শোনা গিয়েছিল, "এ কি করলে কিঙ্কর ? ছিঁড়ে ফেললে ?"

"আজ্ঞা !" রামকিঙ্করও চমকে উঠেছিল। মাস্টারমশাই কখন এসে দাঁড়িয়েছিলেন ও কিছু টের পায়নি। তাঁর স্বর শোনার আগেই, কাগজে আর একটা ফালা দিয়েছিল। হাত থেকে ফেলে দিয়েছিল সেই কাগজ, "হ্যাঁ, ছিঁড়ে ফেললাম। ওটা কিছু হয় নাই। খারাপ..."

তখন বসন্তের বিকাল। নন্দলাল নিচু হয়ে ফালা দেওয়া কাগজ মেঝেয় পেতেছিলেন। আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছিলেন, "মুণ্ডু থেকে নাই কুণ্ডু, আর এদিকে বুকের মাঝখানটা পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলেছো। জোড়াতালি দিয়ে এ শরীর আর খাড়া করা যাবে না। তুমি জানো না, আমিও জানি না, এ কঙ্কাল যার, সে দেখতে কেমন ছিল। তুমি যে রকম এঁকেছিলে, হয় তো এরকমই সে দেখতে ছিল।"

"ছিল না।"

"কেমন করে জানলে, ছিল না ?"

"মাস্টারমশাই, সেটা জানি না।"

"অথচ বলছো, এরকম ছিল না ?"

"আজ্ঞা।"

নন্দলাল রামকিঙ্করের ছেঁড়া কাগজের আঁকার দিকে দেখেছিলেন। সরে বসেছিলেন হাঁটুর ওপর দু হাত রেখে। তাঁর চশমার কাঁচে অবাক জিজ্ঞাসা, "রামকিঙ্কর, তুমি সুধীরের সুন্দর, একেবারে যেন জীবন্ত দেখতে মাটির মূর্তি ভেঙে ফেলেছিলে। আজ এই কষ্ট করে জোড়া লাগানো মানুষসমান মাপসই কাগজে কঙ্কালের ছবি আঁকলে। ছিঁড়ে ফেললে। তোমার এই ভাঙা-ছেঁড়া দেখলে আমার ভয় লাগে। হাতে গড়া আঁকা জিনিস ভাঙতে ছিঁড়তে তোমার মায়া হয় না ?"

"আজ্ঞা না।"

"তুমি আজ আমাকে সত্যি করে বল, কেন তুমি সুধীরের বাস্ট ভেঙে ফেলেছিলে ?"

"আপনাকে সত্য বলেছি, ভাল হয় নাই।"

"সবাই বলেছিল ভালো হয়েছে।"

"সুধীরের হাসিটি ফুটে নাই।"

"সুধীরের হাসি ফোটেনি ?"

"আজ্ঞা না। সুধীরের মনটি যেমন হাসি খুশি, তেমনটি হয় নাই।"

"কিন্তু ওটি সুধীরের অবিকল জ্যান্ত চেহারা হয়েছিল !"

"সুধীর হয় নাই।"

নন্দলালের চশমার কাঁচে বিদ্যুচ্চমকের মতো বারে বারে অবাক ঝিলিক দিয়েছিল, "আর এই ছবিটাও কিছু হয় নাই, তাই ছিঁড়ে ফেললে ?"

"আজ্ঞা।"

"কেন হয় নাই ?"

"অই বইয়ের ছবির স্কেচ নকল করেচি। ওতেই ওটা ওরকম খারাপ হয়েচে।"

"নকল না করলে কি ভালো হতো ?"

"আজ্ঞা। কঙ্কালটার উপর মন থেকে আঁকা করলে ভাল হত।"

"শোন কিঙ্কর একটা কথা বলি। জানবে, ছবির ওপরে ছবি আঁকা যায়। মূর্তির ওপরে মূর্তিকে বদলানো যায়। তুমি কি বিশ্বাস কর ?"

"করে দেখি নাই।"

"কিঙ্কর, কোনো কিছু নষ্ট করে ফেলার আগে একবার ভেবো। দেখে ভেবো, ওটার ওপরেই কাজ করলে, তুমি যা চাও, তা পাও কিনা।"

"দেখব আজ্ঞা।"

"তবে এ কথাও বলি, যে ভাঙে, সে গড়তে পারে। যে ছিঁড়তে পারে, সে আঁকতেও পারে। দু দিন দুটি ব্যাপার দেখলুম। মূর্তিতে তুমি তোমার সুধীরকে পাও নাই। ভেঙে দিয়েছো। ছবিতে তুমি তোমার মনের মূর্তিটি পাও নাই। ছিঁড়ে ফেলেছো। তুমি চাও রিয়ালিস্টিক। অথচ কাজে খোঁজো ভেতরের প্রাণ। তাই তোমার কোনো মোহ নাই। তোমার সিদ্ধাই হবে, এই আমার বিশ্বাস।"

নন্দলাল উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ছেঁড়া কাগজের দিকে আর একবার দেখেছিলেন। কিন্তু কোনো হতাশা বা নৈরাশ্য তাঁর মুখে ছিল না। সিঁড়ির দরজার দিকে পা বাড়াবার আগে রামকিঙ্করের দিকে তাকিয়েছিলেন। তখনও তাঁর চোখে অবাক ঝিলিক, "আমার কথাটাও মনে রেখো।" তিনি চলে গিয়েছিলেন। তখনও তাঁর নিচু স্বর শোনা গিয়েছিল, "আমি তোমাকে আশীর্বাদ করার কে ? তোমাকে যাঁর আশীর্বাদ করার তিনিই করবেন। তাঁর নজর..."

ঘরের মধ্যে ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল। রামকিঙ্করের কানে ভেসে এসেছিল ঢাকের শব্দ। ঢাকের বাদ্যি ! কয়েকবার বেজেই থেমে গিয়েছিল। ও ছুটে গিয়েছিল উত্তরের খোলা জানালার কাছে। মুখ বাড়িয়ে তাকিয়েছিল শালবীথির দিকে। ঝরা পাতা আর ঝরে পড়া শালফুলের অজস্র কণা ছড়িয়েছিল মাটিতে। কুহু ডাক শুনেছিল। কিচেনের উত্তরে ঝরা পাতা গাছে বসেছিল দুটি বসন্ত-বউরি। ওর চোখে ভেসে উঠেছিল বায়েনপাড়ার কালীবায়েন আর বায়েন বউ অন্নপূর্ণার মুখ। পরের দিন থেকেই ও রঙ তুলি পেন্সিল খাতা কাগজের ঝোলা নিয়ে সকলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল। খোঁজ করে গিয়েছিল গোয়ালপাড়ার এক পাশে বায়েনপাড়ার কালীবায়েন কোথায় ভাই ? আর ব্যালেরিনা অন্নপূর্ণা ? ঢাকের শব্দ কেন শোনা যায় না ? চৈত্র মাস চলছে যে !

দু বাড়ির মাঝখানের টকটকে শিমুলের আগুনের আঁচে দাঁড়িয়েছিল বায়েন বউ অন্নপূর্ণা, "এস্য গ আস্‌শমের বাবু আমি তুমার সেই ব্যালেন্টিনা !"

ব্যালেরিনা না। ব্যালেন্টিনা ! বেরিয়ে এসেছিল কালীবায়েন। রামকিঙ্করকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাড়ির ভিতরে। সেই যে মেতে গিয়েছিল, রামকিঙ্করের আর খেয়াল ছিল না, কবে বসন্ত চলে গিয়েছিল। গ্রীষ্মও এসে চলে গিয়েছিল। ও বাইরে বাইরে ঘুরে দোল এঁকেছে। স্কেচ করেছে। রঙে এঁকেছে। তারপরে কবে একদিন ঘণ্টাতলার ঘণ্টা স্তব্ধ হয়েছিল। পাখিদের ডাক বদলেছিল। ঝর ঝর ঝড় পাথর কাল কাটিয়ে, কবে একদিন আকাশ হয়ে উঠেছিল মেঘমেদুর। রামানন্দ গ্রীষ্মের সময় বাইরে ছিলেন। তিনি ফিরে আসতেই, রামকিঙ্কর ঘুরনচৌকি নিয়ে হাজির।

(ক্রমশ)

পূর্ব-পশ্চিম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তরপর্ব : ৫

কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুর কতখানিই বা দূর। ছেলেবেলায় অলিরা অনেকবার বহরমপুর হয়ে মুর্শিদাবাদ, খোসবাগ দেখতে গেছে, একবার সেই মেম কাকিমার সঙ্গে হাজারদুয়ারী দেখতে গিয়ে ছবি তোলা হয়েছিল, ফ্রকপরা অলির সেই ছবি এখনো আছে অ্যালবামে। তখন অবশ্য অভিভাবক শ্রেণীর কেউ না কেউ সঙ্গে থাকতেন, এখন অলি অনায়াসেই একলা যেতে পারে, লালগোলা প্যাসেঞ্জারে চাপলে দু' আড়াই ঘন্টার পথ।

কিন্তু বাড়িতে আগুন লাগার পর বিমানবিহারী মেয়েদের বাইরে বেরুতে বারণ করে দিয়েছেন। তাঁর মন ভেঙে গেছে। তিনি তক্ষুনি কলকাতায় ফিরতে পারলে খুশী হতেন, কিন্তু বসতবাড়ির পেছন দিকের পোড়া অংশগুলো কিছু মেরামত না করলে একেবারে ভেঙে পড়বে। তিনি মিস্ত্রি খাটাচ্ছেন।

প্রত্যেকবার অলি-বুলি ঘূর্ণীতে নানারকম মাটির পুতুল কিনতে যায়, পুতুলের শখ বুলিরই বেশী, বাড়ি থেকে একটা রিকশা নিয়ে যাওয়া আর সেই রিকশাতেই ফিরে আসা, কিন্তু বিমানবিহারী বললেন এবারে পুতুল কিনতে যেতে হবে না। একই রকম তো পুতুল, পরে অনেক পাওয়া যাবে।

মানুষজনকে দেখলে বোঝাই যায় না যে সেখানে কিছু ঘটনা ঘটেছে।

বহরমপুরে কল্যাণীর ছোট ভাই থাকেন, তিনি ডাক্তার, সদ্য একটি নার্সিং হোম খুলেছেন বাস স্ট্যান্ডের কাছেই। অলি-বুলিদের সেই শান্তিমামা ও রীতা মামীমা গাড়ি নিয়ে এলেন কৃষ্ণনগরে, এখানকার রোমান ক্যাথলিক চার্চের ফাদার শান্তিমামার পেসেন্ট, সেই ফাদার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলেই আসতে হয়েছে শান্তিমামাকে, সেই সঙ্গে তিনি দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গেও দেখা করে যাবেন।

বৃহস্পতিবার দিন এই শান্তিমামা ও রীতা মামীমা যেন দৈব প্রেরিত। অলি সাধারণত কারুর কাছে কিছু চায় না, অনুরোধ করে না, কিন্তু রীতা মামীমার কাছে সে বাচ্চা মেয়ের মতন আবদার ধরলো, আমাকে তোমাদের সঙ্গে বহরমপুরে নিয়ে চলো, বাবাকে একটু বুঝিয়ে বলো।

গাড়িতেই যাওয়া, তবু বিমানবিহারী খুব পছন্দ করলেন না। অলি ফিরবে কার সঙ্গে? শান্তিমামা বললেন, বহরমপুর থেকে তাঁর চেনা কতলোক প্রত্যেকদিন কলকাতায় যায়, একজন কারুর সঙ্গে অলিকে ট্রেনে তুলে দেবেন সকালবেলা, কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে রিকশা ধরে অলি বাড়ি চলে আসবে। দিনেরবেলা

ঘূর্ণীতেই যাওয়া হচ্ছে না, তা হলে বহরমপুর যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। অলি একবার সে প্রসঙ্গ তুলতেই বিমানবিহারী উড়িয়ে দিলেন।

অথচ বহরমপুরে শুক্রবার বিকেলবেলা অলিকে একবার যেতেই হবে।

বাবা কোনো কাজেই প্রায় বাধা দেন না, সুতরাং বাবা কোনো ব্যাপারে একবার না বললে আর তর্ক করা যায় না। কৃষ্ণনগর থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটা ইস্কুল বাড়িতে বোমা মারামারি হয়েছে বুধবার দুপুরে, সেই খবর পাবার পর বাবা-মা আরও সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। কিন্তু এই সব বোমা, খুন, আগুন লাগানোর ঘটনা সাধারণ মানুষের গা-সহা হয়ে গেছে। জীবনযাত্রা তো থেমে নেই। ট্রেনে-বাসে একই রকম ভিড়। যে-রাস্তায় বোমাবাজি হয়, সেখানে দোকান পাটগুলো দ্রুত ঝাঁপ ফেলে দেয়। ঘন্টা দু' এক বাদেই আবার খুলে যায় সবকিছু। যে-পাড়ায় খুন হয়, পরের দিন সে পাড়ার

ভয়ের কী আছে? ছেলে ছোকরারা মারামারি খুনোখুনি করছে বটে, কিন্তু মেয়েদের গায়ে কোথাও হাত দিয়েছে, এমন তো শোনা যায়নি।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া হতেই বিমানবিহারী তাঁর শ্যালককে তাড়া দিলেন, এবার তোমরা বেরিয়ে পড়ো, গাড়িতে কম সময় তো লাগবে না! সন্ধে হয়ে গেলে···রাস্তায় যদি কোথাও গাড়ি খারাপ হয়ে যায়?

বিমানবিহারী আগে এরকম ভীতু ছিলেন না। বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনার পরেই খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

গাড়িতে বেশ গল্প করতে করতে আসা হচ্ছিল। পলাশীর কাছে উঠলো কালবৈশাখীর ঝড়। ফাঁকা রাস্তার দু' পাশে মাঠ, বিকেলবেলাতেই এমন মিশমিশে কালো আকাশ অলি কখনো দেখেনি। সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে ঠিক যেন সমুদ্রে জাহাজ যাওয়ার মতন। হাওয়ার দাপটে মনে হচ্ছে যেন গাড়িটা

দুলে দুলে উঠছে, যে-কোনো সময়ে উল্টে যাবে। সমস্ত কাচ তুলে গাড়িটা এক জায়গায় থামিয়ে রাখা হলো। বড় গাছপালা থেকে অনেক দূরে। একটু আগেই ওরা রাস্তার ওপর একটা শিরীষ গাছের ডাল ভেঙে পড়তে দেখেছে।

শান্তিমামা বেশ মজার মানুষ। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাবার বদলে তিনি স্টিয়ারিং হুইল চাপড়ে চাপড়ে গান ধরলেন, ঝড় নেমে আয়, ওরে আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে ডালে....

রীতা মামীমা চোখ গোল গোল করে বললেন, এখন কী হবে? এই ঝড় যদি সহজে না থামে?

শান্তিমামা বললেন, তাতেই বা কী এমন হবে? আমরা সারা রাত এখানে থেকে যাবো!

রীতা মামীমা বললেন, যদি গাড়িটা শুদ্ধু উড়িয়ে নিয়ে যায়?

শান্তিমামা হেসে উঠে বললেন, সেটা হবে একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড! আকাশ পথে অ্যাম্বাসেডর গাড়ি! বিড়লার অপূর্ব কৃতিত্ব! একই সঙ্গে গাড়ি ও এরোপ্লেন! তোমার মাথাও খেলে বটে, ঝড়ে কোনদিন গাড়ি উড়ে গেছে এমন শুনেছো?

ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে এখন পড়ছে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা। গাড়ির ছাদে যেন অনেকগুলো কাক একসঙ্গে দৌড়চ্ছে। রাস্তায় আর একটাও গাড়ি নেই।

আরও একটা গান গাইতে গাইতে হঠাৎ মাঝপথে থেমে গিয়ে শান্তিমামা বললেন, অলি, তোদের বাড়িতে আগুনটা কে লাগালো বল তো? আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা পলিটিক্যাল নয়। কৃষ্ণনগরে কোনো ছেলের সঙ্গে তোর প্রেম ট্রেমের ব্যাপারে কোনো ঝগড়া হয়নি তো?

অলির বদলে রীতা মামীমাই বললেন, যাঃ, কৃষ্ণনগরে আবার কার সঙ্গে ওর প্রেম হতে যাবে?

শান্তিমামা ভুরু কুঁচকে বললেন, আবার মানে? অলির কী একটা প্রেম অল রেডি হয়ে গেছে নাকি?

—জামাইবাবুর এক বন্ধু, সাব জজ, তাঁর ছেলে অতীনের সঙ্গে অলি তোর খুব ছিল না? সেই ছেলেটি এখন কোথায় রে, অলি?

—অলি এবার মৃদু গলায় বললো, সে এখন অ্যামেরিকাতে।

—কী করতে গেছে রে? চাকরি করছে, না পড়াশুনো?

—কেমিস্ট্রিতে পি এইচ ডি করছে।

শান্তিমামা বললেন, কেমিস্ট্রিতে পি এইচ ডি করার জন্য আমেরিকায় যাবার দরকারটা কী ছিল? সে যাকগে, অলির আর একটা বন্ধু থাকলেও কৃষ্ণনগরের কোনো ছেলে ওর প্রেমে পড়তে পারে না? একবার আমার নার্সিং হোমে একটা কেস এসেছিল, বুঝলি অলি, বহরমপুরের একটা ছেলে এক উকিলের মেয়েকে ভালোবাসতো, ছেলেটা একটু মাস্তান টাইপের, উকিলবাবু তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তো রাজিই নয়, মেয়েকে মিশতেও বারণ করে দিলেন, তারপর সেই ছেলেটা একদিন উকিলবাবুকে মিস করে তার প্রেমিকার মামার মুখে অ্যাসিড বাল্‌ব ছুঁড়ে মারলো! সেই মামা ভদ্দরলোকের একটা চোখ তো বাঁচানোই গেল না। বুঝে দ্যাখ ব্যাপারটা অলি, তোর প্রেমে কেউ ব্যর্থ হয়ে আমার পেটে বসিয়ে দিল ছুরি! দিনকাল হয়েছে এই রকম!

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলো শান্তিডাক্তার।

তারপর বললো, ঝড় অনেকটা কমেছে, নাও লেট্স স্টার্ট এগেইন।

খুব তোড়ে বৃষ্টি পড়ছে বলে রাস্তার সামনের দিকটা প্রায় কিছুই দেখা যায় না। গাড়ি চলছে খুব আস্তে। পেছনের সীটে বসেছে অলি আর রীতা মামীমা। গাড়ির মালিক নিজে গাড়ি চালালে বাড়ির কোনো লোককে সামনের সীটে বসতে হয়, এটাই নিয়ম, কিন্তু সামনের সীটে রাখা আছে একগাদা পেঁয়াজ কলি আর গোটা তিনেক লাউ, গাড়ির পেছনেও ভরে দেওয়া হয়েছে অনেকগুলো ঝুনো নারকোল। এসব অলিদের কৃষ্ণনগরের বাড়ির বাগানের ফসল।

রীতা মামীমার ছেলেমেয়ে কিছু হয়নি, তাঁর চেহারা অল্পবয়েসী তন্বীর মতন। শান্তিমামা মোটাসোটা ভারিক্কী ধরনের মানুষ, যদিও স্বভাবটা অনেকটা ছেলেমানুষের মতন। অলি তাকে কক্ষনো গম্ভীর সুরে কথা বলতে শোনেনি।

রীতা মামীমা এক সময় বললেন, অলি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছো, খুব ভালো লাগছে, কিন্তু তুমি হঠাৎ বহরমপুরে আসার জন্য জেদ ধরলে কেন? এখানে কি তোমার বিশেষ কোনো কাজ আছে? কারুর সঙ্গে দেখা করতে হবে?

শান্তিমামা বললেন, এই রে, তুমি ওকে একটা পার্সোনাল ব্যাপার জিজ্ঞেস করে ফেললে? মেয়েটাকে তো আমি বাচ্চা বয়েস থেকে দেখছি, মিথ্যে কথা বলতে গেলেই ওর চোখ মুখ লাল হয়ে যায়। তোতলাতে শুরু করে। খুব প্রাইভেট কিছু হলে তোকে বলতে হবে না রে, অলি!

অলি বললো, ছোটমামা, তোমাকে আর মামীমাকে আমি বলবো ঠিকই করেছিলুম। কিন্তু তোমরা প্লীজ বাবাকে কিছু জানিও না। বহরমপুর জেলে একজনের সঙ্গে আমাকে একটু দেখা করতে হবে।

—বহরমপুরের জেলে....তার মানে পলিটিক্যাল প্রিজনার....কে?

—আমার এক বন্ধু।

—আমাদের বন্ধু মানে? আমরা কি তাকে চিনি?

—না, তোমরা ঠিক চেনো না।

রীতা মামীমা বললেন, সেই অতীনের কোনো বন্ধু। তার মানে নকশাল। অতীন তো কী একটা বড় রকম চার্জে পড়েই আমেরিকায় পালিয়ে গেছে না?

অলি চমকে রীতা মামীমার দিকে তাকালো। আজকাল আর কারুকে কিছু বলার দরকার হয় না। সবাই সব কিছু জেনে যায়। শান্তিমামা রীতা মামীমারা মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন, হয়তো বাবলুদাকে দু' একবার দেখেছেন তাদের বাড়িতে, যদিও বাবলুদার বিষয়ে ওদের সঙ্গে অলির কোনোদিন কোনো কথাই হয়নি!

শান্তিমামা বললেন, নকশাল প্রিজনারের সঙ্গে দেখা করবি, সে তো আগে থেকে পারমিশান করাতে হয়। এমনি এমনি তো দেখা করতে দেবে না!

অলি বললো, আমার পারমিশানের চিঠি আছে। শুক্কুরবার বিকেল সাড়ে চারটে....তোমরা যদি হঠাৎ চলে না আসতে কৃষ্ণনগরে, তা হলে বাবাকে না বলে আমাকে একাই আসতে হতো।

—অলি, তুই বুঝি পার্টি করিস? তোর মতন এরকম নরম সরম মেয়েও যে ভেতরে ভেতরে

—না। আমি পার্টি করি না। বিশ্বাস করো। একজন আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছে।

গাড়ির ড্যাস বোর্ড থেকে একটা রামের পাঁইট বার করে গলায় ঢালবার আগে শান্তিমামা বললেন, আমি একটু খাচ্ছি, অলি, তুই কিছু মনে করবি না তো?

রীতা মামীমা তাড়না দিয়ে বললেন, এই, তুমি ড্রিংক করছো যে এক্ষুনি? নার্সিং হোমে যেতে হবে না?

—আজ পৌঁছোতে পৌঁছোতে রাত নটা বেজে যাবে। আজ আর নার্সিং হোমে যাওয়া যাবে না। শুভংকরের ডিউটি আছে, ও ম্যানেজ করবে।

গলায় খানিকটা রাম ঢেলে শান্তিমামা বললেন, তোকে একটা ঘটনা বলি, অলি! রীতা, সেই যে, সেই ডিসেম্বরের শনিবার রাত্তিরের ব্যাপারটা!

রীতা মামীমা বললেন, ওঃ, ভাবলে এখনও আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়!

—ওরা কিন্তু ব্যবহার খারাপ করেনি, যাই বলো! শোন, অলি, সেটা এই তো মাস তিনেক আগের ঘটনা। ডিসেম্বরের শেষ শনিবার। ডি এম-এর বাংলোয় আমি তাশ খেলতে গেসলুম। বেশ শীত পড়েছিল সে রাতে। তাশ খেলা ভাঙলো যখন, তখন রাত পৌনে বারোটা। রীতাকে বলা ছিল, ফিরতে দেরি হবে। তাশ টাশ খেলে আমি গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছি, তারপর পাঁচ মিনিটও হয়নি, হঠাৎ আমার কাঁধে ঠেকলো একটা পাইপগানের নল। ওরা দু'জন গাড়ির পেছনের সীটের তলায় শুয়ে ছিল। ভাব তুই ওদের সাহস, ডি এমের বাংলোর সামনে গাড়ি পার্ক করা, সেখানে সেন্ট্রি ফেন্ট্রি থাকে, তারই মধ্যে ওরা কী করে গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে শুয়ে ছিল। কতক্ষণ ধরে শুয়ে ছিল তাই বা কে জানে। ওদের ঐ সাহসের জন্যই আমি মনে মনে বললুম, জিতা রহো বেটা!

রীতা মামীমা বললেন, বাজে কথা বলো না। তোমার নিশ্চয়ই তখন ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল!

শান্তিডাক্তার বললেন, হ্যাঁ, ভয় পেয়েছিলুম ঠিকই। একবার ভাবলুম,

এবারে রীতা বিধবা হলো। অপারেশন টেবলে আমার হাতে কত লোক খতম হয়েছে, এবারে আমিও খতম। কিন্তু মনে মনে ছেলেগুলোর সাহসেরও তারিফ করেছিলুম। এটাও ঠিক। ওদের মধ্যে একজন বেশ ভদ্রভাবেই বললো, ডাক্তারবাবু, আমাদের একজন পেশেন্টকে দেখতে যেতে হবে। কিছু মনে করবেন না, আপনার চোখটা আমরা বাঁধবো, আপনি সরে বসুন! আমরা গাড়ি চালাবো।

রীতা বললেন, না, তুমি ভুল বলছো! ওরা তোমার চোখ বাঁধলো গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে।

—ও হ্যাঁ। প্রথমে ওদের একজন আমার গাড়িটা চালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই সময় আমার গাড়িটার যখন তখন স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। গাড়িও তো অনেকটা ঘোড়ার মতন, ঠিক চেনা হাতের ছোঁয়া ছাড়া চলতে চায় না। গঙ্গার ধার পর্যন্ত আমিই চালিয়ে নিয়ে গেলুম। তারপর গাড়ি থেকে নামিয়ে আমার চোখ বাঁধলো একটা কালো কাপড়ে। সেখান থেকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল প্রায় পনেরো মিনিট। অত রাতে, শীতের মধ্যে ওদিকে আর লোক নেই তো একটাও। আমি তখন কী ভাবছি বল্ তো? এরা সাধারণত একেবারে শেষ সময়ে ডাক্তার ডাকে। অনেক সময়ই সে রুগীর আর আশা থাকে না। ডাক্তারের হাতে রুগী মারা গেলে ডাক্তারের দোষ নয়। ওদের হাতে বন্দুক পিস্তল আছে, রাগে ঝড়াপ করে গুলি চালিয়ে দেবে আমার পেটে। আজ রীতার বিধবা হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। আমি তখন মনে মনে আমার টাকা পয়সা উইল করে যাচ্ছি, আর মনে মনে বলছি, রীতা, তুমি আবার বিয়ে করো। তোমার চেহারা এখনও সুন্দর আছে।

—অ্যাই বাজে কথা বলো না! এই সবগুলো তুমি বানাচ্ছো।

—সত্যিই এই সবই ভাবছিলুম। চোখ বন্ধ থাকলে তো কিছু দেখার উপায় নেই, শুধু ভেবে যেতে হয়! একটা পড়ো বাড়িতে ঢুকিয়ে তো আমার চোখ খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন একজন বললো, এত দেরি করে ফেললি, সব শেষ! রীতার কপালে দ্বিতীয় বিয়ে নেই। আমি তার কী করবো? আমি পৌঁছোবার আগেই ওদের পেশেন্ট মারা গেছে। তখন আর আমাকে দোষ দেয় কী করে? আমাকে বললো, ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিতে। লিখলুম। যে মারা গেছে, তার নাম মানিক ভট্চাজ। সে ওদের একজন বড় গোছের লীডার!

অলি ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলো, কী নাম বললেন? চেহারাটা মনে আছে আপনার?

—আমি শুধু হাতটা তুলে ছুঁয়ে দেখেছি। মুখ দেখার দরকার হয়নি। ওরা সবাই মানিকদা, মানিকদা বলে খুব কান্নাকাটি করছিল। অবশ্য একজন আমাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। ওফ, সেই একখানা রাত্তির গেছে বটে! আগে অতটা ভয় পাইনি বোধ হয়, কিন্তু ওরা যখন গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল, বুঝলুম যে আমি এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেছি, আর কোনো ভয় নেই, তখনই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সে এক পিকিউলিয়ার ফিলিং। গাড়ি আর স্টার্ট দিতেই পারি না।

গাড়ির মধ্যে অন্ধকার। তাতে অলির চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। তার কান্নায় কোনো শব্দ নেই। অলি স্টাডি সার্কেলে বেশীদিন যায়নি, ওদের দলের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখেনি, কিন্তু মানিকদাকে সে সত্যিই শ্রদ্ধা করতো। শুধু শ্রদ্ধাই নয়, মানিকদাকে দেখলেই কেমন যেন মায়া লাগতো। মানিকদা নেই? অত নরম মনের একজন মানুষ, অতীন-কৌশিকরা প্রায়ই বলতো, মানিকদা যেন ওদের মায়ের মতন!

সারা পথ অলি আর কোনো কথা বলতে পারলো না।

পরদিন যথা সময়ে সে গেল কৌশিকের সঙ্গে দেখা করতে।

একটা ছোট ঘরের মাঝখানটায় আগে ছিল শুধু লোহার গরাদ, এখন জাল দিয়েও ঘিরে দেওয়া হয়েছে। কোনো জিনিস দেবার বা নেবার উপায় নেই। জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অলি যে চিঠি পেয়েছিল, তাতেও লেখা ছিল যে প্রিজনারের জন্য কোনো উপহার আনা চলবে না।

সেই ঘরেরও দরজার কাছে একজন লোক দাঁড়িয়ে, সে কথাবার্তা শুনবে।

এক মুখ দাড়ি হয়েছে কৌশিকের, মাথায় এত বড় বড় চুল যে নিশ্চয়ই উকুন আছে। চোখ দুটো ও টিকোলো নাক দেখে চেনা যায় কৌশিককে। কপালের রংটাও যেন কালো হয়ে গেছে।

ঘরে ঢুকে কৌশিককে দেখা মাত্রই অলির চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। কিন্তু তাকে হাসি মুখে কথা বলতে হবে।

অলির খুব অভিমান হলো বাবলুদার ওপর। বাবলুদা যেন স্বার্থপরের মতন একা পালিয়ে গেছে। যে দেশটাকে সে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করতো, সেই দেশে সে এখন টাকা রোজগার করছে, লাল রঙের গাড়ি কিনেছে, উইক-এন্ডে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যায়। আর তার প্রাণের বন্ধু কৌশিক এই বহরমপুরের জেলে.....

কৌশিকই প্রথমে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো অলি?

অলি কিছু না বলে মাথাটা হেলালো শুধু।

কৌশিক আবার জিজ্ঞেস করলো, বুলুদির কাছ থেকে চিঠিপত্র পাও? বুলুদির ছেলে খুব অসুস্থ শুনেছিলুম।

বুলুদি নামে কেউ নেই। অলিকে সব আন্দাজে বুঝে নিতে হবে। হয়তো বুলুদি মানে বাবলুদা!

—হ্যাঁ, চিঠি পেয়েছি। এখন ভালো!

—তোমাদের বাগানে লাল গোলাপ ফুল ফুটেছে এবার? ইস, কতদিন যে লাল গোলাপ দেখিনি। একটা আনতে পারলে না?

লালগোলাপ মানে লালবাজার। পমপমকে লালবাজারে নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন জেরা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে শারীরিক অত্যাচার। মাঝখানে রটে গিয়েছিল যে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পমপম পাগল হয়ে গেছে। সেই খবরটা দিতেই অলির এখানে আসা। পমপমের অসম্ভব মনের জোর। পমপম ফিটের রুগী হবার ভান করে হাসপাতালে গিয়েছিল। পি জি হাসপাতালে পমপমের সঙ্গে অলি দেখা করেছিল একদিন। পমপম ভালো আছে। পমপমই অলিকে অনুরোধ করেছিল যে-কোনো ভাবে হোক একবার কৌশিকের সঙ্গে দেখা করতে।

—সে বললো, না, এবার সব লালগোলাপ ফুরিয়ে গেছে। সাদা ফুটেছে কয়েকটা।

গেটের সামনে দাঁড়ানো লোকটির ঠোঁটে মৃদু হাসি। সে জানে যে এসব অর্থহীন কথার অন্তরালে অন্য কোনো অর্থ আছে। হয়তো মনে মনে টুকে নিচ্ছে কথাগুলো। পরে ডি-কোড করবার চেষ্টা করবে!

দু' একটা সাধারণ কথা বলার জন্যই অলি জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে এরা কী খেতে টেতে দেয়? পেট ভরে?

কৌশিক বললো, আমরা তো এখানে রান্না করে খাই, জানো না?

—তোমাদের কি শিগগিরই কোর্টে প্রোডিউস করবে?

—সেরকম কিছু শোনা যাচ্ছে না।

অলি আর একটা কথা চিন্তা করলো। ছোটমামা বলেছিলেন, জেলের ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর চেনা আছে। তিনি তাঁকে বলে কৌশিককে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিতে পারেন। তা হলে ও স্পেশাল ডায়েট পাবে। কিছুটা আরামে থাকবে। কিন্তু অলির ধারণা, সেরকম চেষ্টা করা হলেও কৌশিক একা নিজের জন্য আলাদা কোনো সুযোগ নেবে না।

তবু সে জিজ্ঞেস করলো, তোমার যে পেটে ব্যথা হতো খুব? আলসার কিনা দেখিয়েছো?

কৌশিক সেটা উড়িয়ে দিয়ে বললো, এখন ভালো আছি। ব্যথা-ট্যাথা কিছু নেই। ওসব সেরে গেছে।

তারপর অলির চোখের দিকে চোখ রেখে কৌশিক জিজ্ঞেস করলো, আমার মা কেমন আছে? মায়ের সঙ্গে তুমি কি দেখা করে এসেছো?

অলি জানে, কৌশিক তার মাকে হারিয়েছে অনেকদিন আগেই। তবে এখন সে কার কথা জিজ্ঞেস করছে? বাবলুদা, কৌশিক যাঁর সম্পর্কে বলতো আমাদের মায়ের মতন!

এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে অলি? সে কি মিথ্যে কথা বলবে? তার চোখে আবার জল আসছে। কিন্তু কৌশিকের সামনে কিছুতেই দুর্বলতা দেখালে চলবে না।

এমনও তো হতে পারে, অলি প্রশ্নটা বুঝতে পারলো না। মা মানে পার্টির হেড মনে করাও সম্ভব। চারু মজুমদার এখনও ধরা পড়েননি।

অলি জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, ভালো আছেন। তোমার মা ভালো আছেন!

(ক্রমশ)

অঙ্কন : অনুপ রায়

বিছা বনাম বিছানা

অমরেন্দ্রনাথ গুহ

বিছা আর বিছানা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত না হলেও, সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। যেখানে বিছানা সেখানে প্রায়ই বিছা বা বিছে বর্তমান। ছেলেবেলায় বিছা এবং বিছানা নিয়ে একটা ধাঁধা শুনতাম। "বিছানার" একটি অক্ষর বাদ দিলে, একটি প্রাণী হয়। এরকম অনেক প্রাণীই আছে যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। আমাদের বাড়ীর চারপাশে, এমন কি আমাদের ঘরের মধ্যে বিছানা বা জামাকাপড়ে এদের দেখা মেলে মাঝে মাঝে। এরা যে খুব বাঞ্ছিত বা এদেরকে দেখে আমরা খুব খুশি হই তা নয়, তবুও উপায় নেই, এরাও আছে আমরাও আছি, এ পর্যন্ত বলা চলে। এই সব প্রাণীদেরকে এড়ান খুবই মুশকিল। এই তো দেখুন না অধুনা বিলুপ্ত "ভারতবর্ষে"র সম্পাদক জলধর সেন হিমালয় ভ্রমণ করতে গিয়ে সেখানেও তাঁর কম্বলের মধ্যে বিছের অযাচিত উপস্থিতিতে কি রকম বিব্রত হয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের "সোনার কেল্লা" ডিটেকটিভ ছবিতে ফেলুদা ও তপসেকে মারার জন্যে নকল ডাক্তার ও তাঁর সহকর্মী তাঁদের বিছানাতে বিছে ছেড়ে দিয়েছিল। সম্প্রতি টেলিভিশানে একটা বাংলা ছবিতে দেখেছিলাম এক বাড়ীর চাকরের বসন্ত হলে মালিক বসন্তের ভয়ে চাকরকে সিঁড়ির নিচে বিছানা করে শুতে বলাতে ছেলে প্রতিবাদ জানায়। পিতা বলেন "মাত্র একটা রাতের তো

তেঁতুলে বিছে, গৃহস্থের ঘনিষ্ঠ সহবাসী

ব্যাপার কালই অন্যত্র চলে যাবে।" পুত্র অনড়—"আজই রাতে যদি ও বিছের কামড়ে মারা যায় ?"

বিছে, সে কাঁকড়া বিছেই হোক আর তেঁতুলে বিছেই হোক, আমাদের নিত্যসঙ্গী হলেও মানুষ এদেরকে দেখলেই শিউরে ওঠে। মানুষ এদের ভয় পেয়ে এসেছে স্মরণাতীত কাল থেকে। অনেক গল্পে ও উপকথায় এই প্রাণীগুলিকে অমঙ্গলের অগ্রদূত বলেও মনে করা হয়। আমরা যদিও "কাঁকড়া" বিছে এবং তেঁতুলে বিছেকে বিছে বলেই সাধারণভাবে জানি, কিন্তু গ্রীক এবং ভারতীয় দার্শনিক এবং জ্যোতির্বিদগণ এদের দৈহিক গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখে রাশিচক্রের চতুর্থ রাশিকে "কর্কট" বা "ক্যানসার" এবং অষ্টম রাশিকে "বৃশ্চিক" বা "স্করপিও" নাম দিয়েছেন। "কর্কট" অনেকটা আবছা, খানিকটা অস্পষ্ট, খানিকটা মানুষের কল্পনানির্ভর একটি রাশি। সেদিক থেকে "বৃশ্চিক" রাশির তারামণ্ডলের প্রকাশ আমাদের কাছে অনেক স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট। আর "বৃশ্চিকে"র তারামালার মাঝখানে যে লাল তারকাটি আমরা দেখতে পাই সেটি হল বৃশ্চিকের হৃৎপিণ্ড। কাঁকড়া বিছের অনেক প্রজাতি আছে তবে সব প্রজাতিরই দেহের শেষ প্রান্তে বাঁকানো বিষাক্ত ল্যাজ থাকে যা দিয়ে অন্য প্রাণী এমন কি মানুষকেও আঘাত হানে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, এরা নাকি মাকড়সা ও এঁটেলির সমগোত্রীয়। বর্তমানে এদের প্রায় ৮০০ প্রজাতি আছে। প্রায় অধিকাংশই উষ্ণ ও নাতিউষ্ণ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণভাবে এদেরকে মরুভূমি অঞ্চলের প্রাণী বলেই গণ্য করা হয়। তবে অনেক প্রজাতি উষ্ণমণ্ডলের বনে-জঙ্গলেও দেখতে পাওয়া যাওয়া যায়। মরুভূমির কাঁকড়া বিছে দেখতে হলদে বা হালকা বাদামি রঙের, আর স্যাঁতসেঁতে ও উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলের কাঁকড়া বিছেগুলি দেখতে গাঢ় বাদামি অথবা কালো রঙের হয়।

জন্তনতি বাচ্চাকে পিঠে নিয়ে চলেছে মা-কাঁকড়া বিছে

বিজ্ঞানীরা এই প্রাণীকে "জীবন্ত জীবাশ্ম" বলে চিহ্নিত করেন এবং বলেন যে স্থলচর উর্ণনাভ (এরাকনিড) গণের মধ্যে প্রাচীনতম প্রাণী। বিগত চল্লিশ কোটি বছরের মধ্যে এদের দৈহিক পরিবর্তন খুব সামান্যই হয়েছে। এরা বর্তমানে অবলুপ্ত বৃহদাকার জলজ কাঁকড়া বিছে থেকে এসেছে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। আসল ধারাটি কবে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার অঙ্গার যুগের শিলীভূত যে অল্প কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তাতে জানা যায় যে এরা প্রায় ৩৫ কোটি বছর আগে সত্যিকার স্থলচর প্রাণী বলে নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বিজ্ঞানীরা বলেন ঠিক এই সময়ই এই প্রজাতির প্রাণীর স্থলে বেঁচে থাকবার উপযোগী বইয়ের পাতার মত বিন্যস্ত ফুস ফুস, বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে "বুক লাংস" এবং বাইরের ফুলকা উদ্ভূত হয়। যাতে করে জলচর প্রাণী থেকে স্থলচর প্রাণীতে বিবর্তিত হতে সাহায্য করে।

মজার ব্যাপার এই যে যদিও বৃহদাকার জলজ কাঁকড়া বিছে অনেক কোটি বছর আগেই অবলুপ্ত

হয়ে গিয়েছে তবুও এরই এক ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি ভাই "হর্স সু ক্র্যাব" বা "রাজ কাঁকড়া" আজও বেঁচে আছে। নাম "রাজ কাঁকড়া" হলেও এরা কিন্তু কাঁকড়ার জাত ভাই নয়। দেখতে অনেকটা ঘোড়ার ক্ষুরের মত তাই নাম "হর্স সু ক্র্যাব"। গত কুড়ি কোটি বছরে এদের বিশেষ কোনও দৈহিক পরিবর্তন হয়নি। আগে ইউরোপীয় দরিয়ায় এদের পাওয়া যেত কিন্তু ছ'কোটি বছর থেকে এরা পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে। আজ আর এদেরকে ইউরোপের সমুদ্রে পাওয়া যায় না। আজ এই "রাজ কাঁকড়ার" মাত্র পাঁচটি প্রজাতি পৃথিবীতে বেঁচে আছে। ভারতবর্ষের দরিয়ায় যে দুটি প্রজাতি পাওয়া যায়, তারমধ্যে একটিকে পশ্চিমবঙ্গের বহতা নদীর, সমুদ্রের মুখ থেকে ১৪৫ কিলোমিটার উজানেও দেখতে পাওয়া যায়। দেখেছি কলকাতার অনেক বাজারের ফুটপাথে। এর তেল মালিশ করলে নাকি বাত সারে। এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না জানি না। তবে এই আদিম প্রাণীর চোখের স্নায়ুতন্ত্রীর ব্যবহারের পদ্ধতি অনুকরণ করেই নাকি ছবির ও ছায়ার বৈপরীত্য এবং তীক্ষ্ণতা সুস্পষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। সম্ভব হয়েছে "রাডার" পদ্ধতি উন্নত করা। যদিও এতদিন এই প্রাণীকে অধিক সংখ্যায় বিনা কারণে নিধন করা হয়েছে, তবে সম্প্রতি এই প্রাণীর রক্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'ব্যাকটিরিয়ার' শরীরের বাইরের আবরণে যদি সামান্য পরিমাপেও বিষ থাকে তা জানবার জন্য ব্যবহার করা হয়। কাজেই এই প্রাণীর ব্যবহার এখন বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে স্থান পেয়েছে। এদের দৈহিক সংগঠনের সামঞ্জস্য দেখে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা যে কুড়ি কোটি বছর আগে স্থলচর কাঁকড়া বিছে আর "রাজ কাঁকড়া" ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব ছিল।

এবার আবার কাঁকড়া বিছের কথায় আসা যাক। সারা পৃথিবী জুড়েই এদের দুর্নাম এদের বিষাক্ত ল্যাজের জন্য। এই প্রাণীকে পৃথিবীর বন, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত, মরুভূমি, প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি দক্ষিণ আমেরিকার আন্দেজ পাহাড়ের ১৬০০০ ফুট উঁচুতেও দেখতে পাওয়া গিয়েছে। মনে হয় যুক্তরাজ্য এবং স্ক্যান্ডেনেভিয়ার দেশগুলি ছাড়া এই প্রাণী পৃথিবীর সর্বত্রই আছে। এরা নিশাচর প্রাণী এবং একা একা থাকতেই পছন্দ করে। তবে দেখা যায় যে অনেক সময় যৌনমিলনের তাগিদে বা নির্মম আবহাওয়ার হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করবার জন্য ছাড়াছাড়ি ভাব ছেড়ে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকে। আবর্জনার স্তূপ, মাটির ফাটল, ভাঙ্গা দেওয়াল, গাছের ছাল, বাড়ীর স্যাঁতসেঁতে জায়গা, পাপোশের নিচে বা পরিত্যক্ত কাপড় চোপড়, বস্তা, কম্বল ইত্যাদির মধ্যে এরা বেশ নিশ্চিন্তভাবে বসবাস করে। কোন কোন প্রজাতি আবার সারা বছর লোকালয়ের বাইরে থাকলেও গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে লোকালয়ে হানা দেয়। এদের মধ্যে মেক্সিকোর "সেন্টুরয়ডিস্ লিম্পিডাস্" প্রজাতির বিষাক্ত কাঁকড়া বিছে বিশেষ কুখ্যাত। কোন কোন প্রজাতির কাঁকড়া বিছে দিনের বেলায় বালির নিচে লুকিয়ে থাকে। মরুভূমির কোন কোন প্রজাতি বালু ছিটিয়ে নিজেদেরকে কবর দিয়ে রাখে। কোন কোন প্রজাতির চোখ নেই এবং গায়ের ওপর কোনরকম রঞ্জন কণিকা নেই, আলো সহ্য করতে পারে না তাই চিরতরে মাটির গর্তে অন্ধকারেই জীবন কাটায়।

এরা একান্তভাবেই মাংসাশী প্রাণী। এরা ছোট ছোট মেরুদণ্ডহীন প্রাণী, পোকামাকড়, ছোট ইঁদুর, ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু দীর্ঘ দিন কিছু না খেয়েও বাঁচতে পারে। জলের চাহিদা খুবই কম, কাজেই কোন কোন প্রজাতি নিরম্বু উপবাসও করতে পারে। এদের জলের চাহিদা যেমন কম তেমনি অক্সিজেনের প্রয়োজনও কম। এদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের প্রত্যঙ্গ অনেকটা বইয়ের পাতার মত, বলে "বুক লাংস"। শিকার ধরবার জন্য এক জায়গাতে চুপ করে অপেক্ষা করে। শিকার কাছাকাছি এলে চিরুনির দাঁতের মত সংবেদনশীল-স্পর্শ অনুভবকারী যে প্রত্যঙ্গ আছে তা দিয়ে স্পর্শ করে ও গন্ধ গ্রহণ করে নেয়। যদি মনে হয় যে এটা খাদ্য তবে তাকে আঙুলের মত প্রত্যঙ্গ দিয়ে আঁকড়ে ধরে এবং প্রয়োজন হলে যুগপৎ বিষাক্ত লেজ দিয়ে আঘাত করে অসাড় করে দেয়। এমন কি বিষাক্ত লেজের আঘাত হেনে নিজের জাত-ভাইকেও মেরে ফেলতে ছাড়ে না। তবে দেখা গিয়েছে শিকার একবার পালিয়ে গেলে সেটাকে আর অনুসরণ করে না। যদিও এরা বিষাক্ত অঙ্গ দ্বারা সুসজ্জিত কিন্তু এদের শত্রুর অভাব নেই। পাখি, টিকটিকি, বাঁদর ইত্যাদি এদের শত্রু। এরমধ্যে দেখেছি বাঁদর খপ করে ধরে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিষাক্ত লেজটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বেমালুম খেয়ে নেয়।

সঙ্গমের পরবর্তী বিয়োগান্তক দৃশ্য। স্ত্রী কাঁকড়া বিছের হাতে শিকার হচ্ছে পুরুষসঙ্গী

সমুদ্রতীরে রাজ-কাঁকড়া, একটি জীবন্ত জীবাশ্ম

কাঁকড়া বিছে নিম্ন বর্গের প্রাণী হলে কি হবে এদের যৌনমিলন বেশ জটিল। মিলনের আগে বেশ অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে পূর্বরাগ। পুরুষ কাঁকড়া বিছে স্ত্রী কাঁকড়া বিছের চেয়ে দেখতে সুঠাম এবং দীর্ঘতর বিষাক্ত লেজের অধিকারী। যৌনমিলন পর্ব পুরুষটির দ্বারাই সূচিত হয়। পুরুষ অংশীদার স্ত্রী সঙ্গিনীকে আঙুলের মত প্রত্যঙ্গ দিয়ে খুব জোরে ধরে তার পেটের দিকটা মাটিতে ঠেসে ধরে। নিজের লেজ দিয়ে বার বার সঙ্গিনীর লেজ জড়িয়ে নেয় আবার ছেড়ে দেয় এবং দুটি প্রাণীই পাশাপাশি ও সামনে পিছনে সমানে দুলতে থাকে। এই প্রক্রিয়াতে পুরুষ সঙ্গীটিই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। একেই বলে "কাঁকড়া বিছের নৃত্য"। এরকমভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ না মিলনের উপযোগী একটা স্থান পাওয়া যায়। এইবার সে আস্তে আস্তে সঙ্গিনীর শুক্রকীট গ্রহণ করবার ছিদ্রটি নিজের প্রত্যঙ্গের কাছাকাছি এনে মিলন সম্পূর্ণ করে। তারপর? এতক্ষণ যে ছিল নায়ক, এখন সেই বেচারা বীর্যহীন গো-বেচারা হয়ে চুপ করে এককোণে বসে থাকে। এবার বিজয়িনীর বীর্য নিয়ে সঙ্গিনী এসে তাকে মেরে খেয়ে ফেলবে। যৌন মিলনের পর এটাই তার প্রথম ভোজ। সার্থক মিলনের পর প্রায় বছর ঘুরে এলে সাদা পর্দায় মোড়া অনেকগুলি জীবন্ত বাচ্চা দেয় স্ত্রী বিছা। বাচ্চাগুলি জন্মেই ঐ মোড়কের বন্ধন ছিন্ন করে সবকটা গিয়ে মার পিঠে চড়ে বসে। বাচ্চাগুলির

ওঠবার সুবিধের জন্য মা তার অঙ্গুলির মত প্রত্যঙ্গগুলি মাটিতে নামিয়ে দেয়। বাচ্চাগুলি যৌনসক্ষম হবার আগে প্রায় ৭/৮ বার এদের দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। যৌনসক্ষম হতে যেমন সময় নেয় তেমনি বাঁচে অনেকদিন।

কাঁকড়া বিছের, শুধু কাঁকড়া বিছের কেন, বিছে মাত্রেরই পরিচয় তার দংশনবিষে। শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা পৃথিবীময় এদের কুখ্যাতি এদের বিষের জন্য, কিন্তু এর খানিকটা সত্যি, বেশীটাই কল্পনা প্রসূত। বিষ দংশন-আক্রমণের চেয়ে আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিছেকে পা দিয়ে না মাড়ালে তেড়ে গিয়ে কাউকে কামড়েছে এমন শোনা যায়নি। তবে অনেক সময় বিছে জুতোর ভেতর, বিছানার মধ্যে, কাপড়ের ভাঁজে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে এবং মানুষ বিছেকে অজান্তে আঘাত করলে সেও তড়িৎগতিতে বিষাক্ত ল্যাজ দিয়ে আঘাত হানে। সব কাঁকড়া বিছের বিষক্রিয়া সমান নয়। অধিকাংশই নির্বিষ আর কিছু প্রজাতির বিষক্রিয়া খুবই হাল্কা ধরনের। দু-চারদিন একটু জ্বালা, যন্ত্রণা করতে পারে বা সামান্য জ্বরও হতে পারে। তবে কোনও কোনও প্রজাতির বিষ বেশ উগ্র। এই শ্রেণীর সবচেয়ে বড় প্রজাতি, লম্বায় প্রায় আট ইঞ্চি। পশ্চিম আফ্রিকার "প্যানডিনাস ইমপারেটর" প্রজাতির বিষ মানুষের শরীরে তিন-চার দিনের জন্য জ্বালা ধরিয়ে রাখতে পারে কিন্তু মৃত্যু ঘটাবার মত উগ্র নয়। পক্ষান্তরে, ছোট্ট "বুথাইডি" প্রজাতির বিছের বিষ প্রায় গোখরো সাপের বিষের মত উগ্র। এর বিষক্রিয়া স্নায়ুর ওপর হয়। কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাক রোধ হয়ে, নাক এবং মুখ থেকে গাঁজলা বেরিয়ে মানুষ মারা যেতে পারে। মানুষের পক্ষে দক্ষিণ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার "বুথাস অকসিটেনস", উত্তর আফ্রিকা এবং উত্তর আমেরিকা ও ব্রাজিলের কয়েকটি প্রজাতি খুবই বিষাক্ত। সৌভাগ্য বশত আমাদের দেশে ঐ উগ্র বিষধর প্রজাতির কাঁকড়া বিছে আছে বলে শোনা যায়নি। তবে যে সব অঞ্চলে মারাত্মক বিষধর বিছে আছে সেখানে সাপের "অ্যান্টিভেনমের" মত বিছের "অ্যান্টিভেনমও" তৈরি হয় তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য।

কাঁকড়া বিছের মত অন্য এক জাতের বিছেও আমাদের দৈনন্দিন সহচর। আমরা বলি "তেঁতুলে বিছে"। ইংরেজিতে বলে "সেনটিপেড"। বা "স্কলপিণ্ড"। আমাদের বাড়ীর আশে পাশে, এমনকি বাড়ীর মধ্যে, বাথরুমে, দরজার পিছনে, কোথায় না এদের দেখা মেলে। এরা অযাচিত অবাঞ্ছিত হলেও এদের এড়ান সম্ভব নয়। কোন ফাঁকে কোথা দিয়ে যে সোজা শোবার ঘরে, পাপোষের নিচে বা তোশকের ধারে বা ঝোলান ম্যাকিনটসের পকেটে আশ্রয় নিয়েছে কে জানে। কোনও উপকারে তো লাগেই না অথচ ঝামেলা বাড়ায় প্রচুর। তেঁতুলে বিছের দেহটা চাপ্টা। দেহ তেঁতুলের বিচির গাঁথা মালার মতো। তাই নাম তেঁতুলে বিছে। সারা পৃথিবীতে প্রায় ২৮০০ প্রজাতির তেঁতুলে বা চ্যাপ্টা ফিতের মত বিছে দেখতে পাওয়া যায়। সব প্রজাতিই

সঙ্গমরত যুগল কেন্নো

মেরুদন্ডহীন। কোনও কোনও প্রজাতির চোখ নামক প্রত্যঙ্গটি নেই কাজেই অন্ধ। আবার কোনও কোনও প্রজাতির চোখের বদলে খুব খুদে খুদে চোখ আছে একে বলে "অসেলাই"। দেহের দৈর্ঘ্য প্রজাতি ভেদে সাধারণত প্রায় তেইশ সেন্টিমিটার। সমস্ত দেহটা বিভিন্ন অংশে বিভাজিত। দেহের প্রতি অংশে এক জোড়া করে পা থাকে। প্রথম পদ-যুগল বেশ বলিষ্ঠ এবং অনেকটা রূপান্তরিত সাঁড়াশির কাজ করে। চলবার সময় পাগুলির মধ্যে তেমন একটা সামঞ্জস্য নেই। একবার একদিকের পা মাটিকে স্পর্শ করে পরে আবার বিপরীত দিকের। অনেকটা দাঁড় টানা নৌকার ছন্দ। এদিকে ওদিক কাৎ হতে হতে চলে। স্কুটিগেরা প্রজাতির বুনো তেঁতুলে বিছে সেকেন্ডে মাত্র কুড়ি ইঞ্চি পথ অতিক্রম করতে পারে। মাথায় চুলের মত সূক্ষ্ম এক জোড়া শুঁয়ো থাকে। তা দিয়ে স্পর্শ, গন্ধ ও অবস্থান ঠিক করতে পারে। দেখা গিয়েছে যে, যদি এই শুঁয়ো কেটে দেওয়া হয় তাহলে এরা খাদ্যাখাদ্য বিচার করতে পারে না ফলে না খেয়ে মারা যায়।

তেঁতুলে বিছের মধ্যে "জিওফাইলাস" বিছেই সর্বাপেক্ষা বড় ও সর্বাধিক পরিচিত। এদের দেহে ৩৭ থেকে ১৭৭টি বৃত্তাংশ আছে। প্রতিটিতে এক জোড়া করে খুদে খুদে পা, মাথার পাশে এক জোড়া বিষাক্ত নখ থাকে। কিন্তু চক্ষুহীন। এরা দেখতে সাধারণত হলদে। মাটিতে গর্ত করে থাকতে ভালোবাসে।

নিকষ তেঁতুলে বিছে অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ হয়। গায়ের রং লালচে বাদামি থেকে শুরু করে কালো বাদামি বা সবজে হতে পারে। ২১ থেকে ২৪ জোড়া পায়ের অধিকারী। আলো বিচ্ছুরণকারী বিছে ছাড়া এর সব প্রজাতিই খুব দ্রুত চলতে পারে। এছাড়া আছে "লিথো বায়োমরফ" জাতের খুদে বিছে। লম্বা মাত্র চার সেন্টিমিটার। এরাও খুব দ্রুত ছুটতে পারে এবং সাধারণত ইঁটের নিচে বা পাথরের নিচে আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রায় সব বিছেই নিশাচর। দিনের বেলায় অন্ধকারে বিশ্রাম নেয়। তেঁতুলে বিছে, কাঁকড়া বিছের মত বংশ বিস্তার করবার জন্য সঙ্গম করে না। এদের বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া সোজাসুজি না হয়ে একটু ঘোরান পথে হয়। এখানে পুরুষ বিছে একটা মাকড়সার জালের মত জাল তৈরি করে সেখানে একদলা শুক্র কীট রেখে দিয়ে যায়, পরে কোন স্ত্রী বিছে এসে এটাকে তুলে নেয়। এরা সব ডিমই এক সঙ্গে পাড়ে এবং মাঝে মাঝে এসে ডিমগুলির তদারক করে। কোন কোন বিজ্ঞানীদের মতে এদের কিছু প্রজাতি আছে যারা চলতে চলতে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। তেঁতুলে বিছে দেখতে ভয়ঙ্কর হলেও কাঁকড়া বিছের চেয়ে এদের বিষের উগ্রতা কম। এই বিষ সাধারণত কীট, পতঙ্গ বা ছোট ছোট মেরুদন্ডবিহীন প্রাণীকে অবশ করবার জন্য ব্যবহৃত হয়, কারণ এগুলিই প্রধানত এদের খাদ্য। মানুষকে কামড়ালে খুব সাময়িক জ্বালা করে, তবে মৃত্যু ঘটিয়েছে বলে শোনা যায়নি। নানা উজ্জ্বল বর্ণে বিচিত্রিত গায়ের আবরণ কেবল মাত্র ভয় দেখাবার জন্য। প্রাণিজগতে এরকম কলাকৌশল হামেসাই দেখা যায়।

অন্য এক সন্ধিপদ বর্গের প্রাণী আমাদের গৃহস্থালীর নিত্যসহচর, বাংলায় বলে কেন্নো। এদেরকেও প্রায় বাড়ীর বাইরে এবং ভিতরে সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। অতি নিরীহ এবং শ্লথগতিসম্পন্ন প্রাণী। বিজ্ঞানীরা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যান, এই নিরীহ প্রাণী যা দ্রুত পালিয়ে যেতে পারে না, যার আত্মরক্ষার কোন অস্ত্র নেই বা কৌশল জানা নেই তারা কী করে আজও পৃথিবীতে টিকে আছে।

যদিও ইংরেজিতে বলে "মিলি পেড" অর্থাৎ লক্ষপদ বিশিষ্ট প্রাণী। বস্তুত এটা কিন্তু একটু অতিকথন। এদের দেহ ছোট ছোট বৃত্তের সমষ্টি। প্রতি বলয়তে দুই জোড়া করে পা থাকে। শেষের দিকের বলয়গুলিতে কোন পা থাকে না। লক্ষপদ নয়, দেখা গিয়েছে প্রায় তিনশ'র কাছাকাছি অর্থাৎ দেড়শো জোড়া পা থাকে। এতগুলি পা থাকা সত্ত্বেও দ্রুত চলতে অক্ষম। চলবার সময়ে গতি বেশ সুন্দর তরঙ্গায়িত হয়। সাধারণত স্যাঁতসেঁতে জায়গায়ই এরা পছন্দ করে। একেবারেই নিরামিষ ভোজী। এরা বিবর্তিত হয়েছিল (প্যালিওজয়িক) পুরাজীব যুগে। কোন কোন প্রজাতি অবশ্য অঙ্গার যুগেও বিবর্তিত হয়। বর্তমানে এই গণের প্রায় ৮০০০ প্রজাতি আছে। এদের চোখ নেই, তবে চোখের বদলে "অসেলাই" বা খুদে খুদে অনেক চোখ আছে তা দিয়ে দেখে। মাথার সামনের দিকে মুগুর আকৃতির এক জোড়া শুঁয়ো থাকে তা দিয়েই এরা মাটিতে গর্ত করে আত্মগোপন করে। এরা সাধারণত নিশাচর। গা স্পর্শ করলেই সমস্ত দেহ কুঁকড়ে গোল হয়ে একেবারে নিশ্চল হয়ে থাকে। এটাই আত্মরক্ষার পদ্ধতি। কোন কোন প্রজাতির কেন্নোর আবার দুর্গন্ধ যুক্ত তরল পদার্থ শরীর থেকে বেরোয়। গায়ে এই তরল পদার্থ লাগলে জ্বালা করে। প্রজননসক্ষম হতে বেশ কয়েক বছর লেগে যায়। তার আগে বেশ কয়েক বার দৈহিক ক্রমবিকাশ ঘটে। প্রজননের সময় পুরুষ কেন্নো তার সপ্তম বলয়ে অবস্থিত ছিদ্রটি কুঁকড়ে স্ত্রী কেন্নোর তৃতীয় বলয়ে অবস্থিত ছিদ্রের ওপর এনে শুক্র কীট ছেড়ে দেয়। স্ত্রী কেন্নোর গ্রহণের সুবিধের জন্য। কোন কোন প্রজাতি আবার আলোকোজ্জ্বল। ■■

আত্মহত্যা প্রসঙ্গে

সমরজিৎ কর

মানুষ কখন আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়? আত্মহত্যা কি আত্মকেন্দ্রিকতার এক চরম অভিব্যক্তি? নাকি আত্মরক্ষার চূড়ান্ত উদ্যোগ? নিজের ব্যক্তিত্বের কাছে যখন কেউ পুরোপুরি হার স্বীকার করে, তখন মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবেই কি সে আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যায়? নাকি জন্মসূত্রেই তার মধ্যে থাকে আত্মহত্যার প্রবণতা, পরিবেশ অথবা পরিস্থিতি শুধু তাকে বাস্তবায়িত করে মাত্র? কেউ কেউ আশঙ্কার ইঙ্গিত পেয়েও ব্যাপারটা হাল্কা ভাবে দেখেন। বাস্তব দৃষ্টান্ত সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও বিচিত্র এক যুক্তির জাল বুনে ব্যাপারটা এড়িয়ে যান। মনোবিজ্ঞানীরা যাকে বলে থাকেন 'সেল্‌ফ ডিসেপ্‌সন' বা আত্মপ্রবঞ্চনা। ক্ষেত্র বিশেষে এটা কতটা বিপজ্জনক? কখনো কখনো বিপদের কথা জেনেও নিজেদের আমরা প্রবোধ দিয়ে বিপদকে ভুলে থাকার চেষ্টা করি। এটাও এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা। অবশ্য তাতে সব সময় যে খারাপ ফল হয়, তাও নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা আত্মহত্যারই কি সামিল হয়ে ওঠে না? "যারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, আত্মহত্যার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাদের মধ্যে কাজ করে অদ্ভুত এক ধরনের চিন্তাভাবনা এবং যুক্তিবোধ। এ সব আগে থেকে জানা গেলে আত্মহত্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব।" সম্প্রতি এই মন্তব্যটি করেছেন লস অ্যাঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবণতাবিষয়ক মৃত্যুবিদ্‌ বা 'থ্যানাটোলজিস্ট' অধ্যাপক এবং আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অভ্‌ সুইসাইডোলজি-র প্রতিষ্ঠাতা এডুইন স্নাইডম্যান।

চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা। এই দীর্ঘ সময়ে আত্মহত্যার প্রবণতা ছিল এমন শতশত মানুষের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে গবেষণা করেছেন অধ্যাপক স্নাইডম্যান। এদের মধ্যে অনেকে আত্মহত্যার কথা ভেবেছিল। করেনি। অনেকে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। সফল হয়নি। আবার অনেকে সফলও হয়েছে। ঘটনা যাই হোক, এ পথ যারা বেছে নেয়, দেখা গেছে তাদের সবারই মানসিক প্রস্তুতির কিছু কিছু সূত্র, চিঠিপত্র এবং রোজনামচায় বিধৃত হয়। পরিবারের লোকজন এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকেও কিছু সূত্র পাওয়া যায়। এই সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করার পর অধ্যাপক স্নাইডম্যানের ধারণা হয়েছে, আত্মহত্যা আত্মহননের একটি চরম পথ। অনেকে মনে করেন, উদ্ভট এবং অস্বাভাবিক মানসিকতাই এর জন্যে দায়ী। সেটা ঠিক নয়। বরং আত্মহত্যার পথটি যারা বেছে নেয়, তাদের মধ্যে কাজ করে

এক ধরনের বিশেষ যুক্তি এবং চিন্তাভাবনা। তার উপর নির্ভর করেই আত্মহত্যা করার মত চরম সিদ্ধান্তটি তারা মেনে নেয়। সেই যুক্তি এবং চিন্তাভাবনার প্রতিটি পর্যায় যদি আমরা বুঝে উঠতে পারি, কাউকে আত্মহত্যা থেকে বিরত করাটা তখন আর অসম্ভব হয়ে ওঠে না।

ব্যাপারটা বিশদ করতে গিয়ে দু'জনের বিবৃতির কথা উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক স্নাইডম্যান। একজন মহিলা এবং একজন পুরুষ। মহিলাটি আত্মহত্যার জন্যে একটি উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে ঝাঁপ দেয়। আর পুরুষটি রিভলবারের সাহায্যে নিজেকে গুলি করে। বিধি বাম হওয়ার দরুন শেষ পর্যন্ত উভয়েই কিন্তু বেঁচে যায়। কিছুদিন হাসপাতালে থাকার পর যখন তারা দৈহিক দিক থেকে সুস্থ হয়ে ওঠে, তখন শুরু হয় তাদের মানসিক চিকিৎসা। ওই সময় অধ্যাপক স্নাইডম্যানের কাছে তারা যে বিবৃতি দেয়, এখানে তা উল্লেখ করলাম।

মহিলার বিবৃতি: "আমি সত্যিই তখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছি। সিদ্ধান্তে পৌঁছানর ঠিক পূর্বমুহূর্তে মনে হল, এ কাজ সত্যিই কি আমার দ্বারা সম্ভব হবে? আমার চিন্তাভাবনা তখন যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। মনের মধ্যে বইছে ঝড়। প্রচণ্ড ঝড়। বেশ বিহ্বল হয়ে পড়েছি সেটাও বুঝতে পারছি। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, এটা কী আর এমন শক্ত কাজ। শুধু আমার অনুভূতিটি হারিয়ে ফেলতে হবে। ঘটনাটি তো একটিই। একটাই কাজ। নিজের বাহ্য শক্তি হারিয়ে ফেলা—এই তো কাজ। কোন উঁচু জায়গা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেই তো তা করা যায়।

"বুঝতে পারলাম কাজটি বাড়িতে সম্ভব নয়। হয়ত কেউ দেখে ফেলবে। তাই অন্য কোথাও যাওয়া ভাল।

"....কিছু দূরেই ছিল একটি উঁচু অফিস বাড়ি। এ পথ ও পথ ঘুরে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। আমাকে যাতে কেউ না দেখতে পায়, মানে পরিচিত কেউ, তার জন্যেই ঘুর পথে যাওয়া। তবু ভয় হচ্ছিল আমার। বহুতল বাড়ি। দেওয়াল ভরা কাচের জানালা। ভাবছিলাম এই বুঝি কেউ আমাকে দেখে ফেলল।

"নিজেকে শক্ত রেখে এগিয়ে গেলাম। এলিভেটার নয়, সরাসরি হাজির হলাম সিঁড়ির কাছে। বিশেষ প্রয়োজন না হলে আজকাল এলিভেটার ছাড়া সিঁড়ি কেউ একটা ব্যবহার করে না। তাই কারোর চোখে পড়ারও ভয় নেই।

মানুষ কখন আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়? আত্মহত্যা কি আত্মকেন্দ্রিকতার চরম অভিব্যক্তি? নাকি আত্মরক্ষার চূড়ান্ত উদ্যোগ ছবি . বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

সিদ্ধান্তের পূর্ব মুহূর্তে
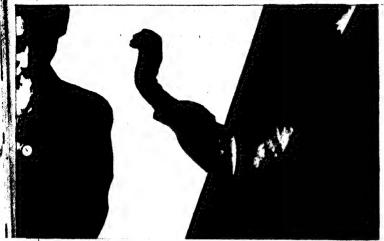
একমুহূর্ত দেরি না করে আমি সিঁড়ি দিয়ে সোজা পাঁচতলায় উঠে গেলাম। সেখানে যেতেই হঠাৎ মনে হল আমার চারদিক যেন গাঢ় অন্ধকার। একমাত্র ব্যালকনি ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। মনে হল, ব্যালকনিটার চার ধারেও অন্ধকার। যেন একটি বৃত্ত। যার চারপাশে অন্ধকার বেষ্টনী।

"ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন আমি আরো বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠেছি। তবে শুধুই বেপরোয়া। অদ্ভুত রকমের ভয়ঙ্কর, অথচ শান্ত। মনে হল চারদিক নিস্তব্ধ। এতটুকু শব্দ নেই কোথাও। ধীর পদে ব্যালকনির শেষ প্রান্তে এগিয়ে গেলাম। তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়া। তখন মনে হচ্ছিল, আমি যেন বাতাসে ভাসছি। দু চোখে অন্ধকার। পতনশীল অবস্থার কোন মুহূর্ত আমার মনে নেই। ঝাঁপ দেওয়ার পরমুহূর্তের কোন ঘটনাই আমি মনে করতে পাচ্ছি না।"

পুরুষের বিবৃতি : "শেষের দিকে একটি কথাই আমার মনে হচ্ছিল। বেঁচে থাকার জন্যে যা করা দরকার, সবই তো করলাম। যথাসাধ্য করেছি। তবু আমি ডুবে যাচ্ছি। কোথায় যেন ডুবে যাচ্ছি। উত্তরটি পাওয়ার জন্যে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রইলাম। আমার চারপাশে অদ্ভুত এক স্তব্ধতা। পৃথিবী এত নৈঃশব্দময়? এক সময় উত্তরটি আমার মাথায় এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেল সব। মৃত্যু! এটাই একমাত্র উত্তর।

"পরদিন এক বন্ধু বলল, তার কাছে একটি পিস্তল আছে। সেটা সে বিক্রি করতে চায়। ইচ্ছে করলে সেটা আমি কিনতে পারি। ·৩৫৭ ম্যাগনাম পিস্তল। আমি কিনে ফেললাম। কেনার পরমুহূর্তে মনে হল, বস্তুটি যে কি সাংঘাতিক কাজ করতে চলেছে, কেউ জানে না। সেইদিনই আমি আমার আত্মীয়পরিজন এবং বন্ধুবান্ধবদের উদ্দেশে বললাম, বিদায় সব। অবশ্য মনে মনে।

"আমার চারপাশেই অজস্র বন্ধু এবং পরিচিতজন। কিন্তু আমার মধ্যে কি হচ্ছে, মুহূর্তের জন্যেও তাদের কাছে আমি তা প্রকাশ করিনি। তারা যাতে আমাকে বাধা না দিতে পারে এর জন্যেই এমন নিশ্চুপ হয়ে থাকা। সারাক্ষণ আমার মন তখন 'লক্ষ্যের' উপর নিবদ্ধ। একমাত্র চিন্তা : এই তো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। আর তারপরই আসবে অনন্ত শান্তি? যার জন্যে আমার অনিবার্য প্রতীক্ষা? আমার অবস্থাটা তখন রণাঙ্গনের সেই সেনাপতির মত। শত্রু যাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। ভয়, ঘৃণা, আত্মগ্লানি এবং হতাশায় ক্ষতবিক্ষত। এ ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সেনাপতি যেমন পরাজয় স্বীকার না করে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক করলাম আমিও তাই করব।

"তখন আমার সমস্ত অনুভূতির মধ্যে একমাত্র আমি এবং আমার 'প্রতিশ্রুতি'। মনে হল, পিস্তলের ঘোড়া টানার আগেই মৃত্যু আমাকে গ্রাস করেছে। পৃথিবী আমার কাছে অস্তিত্বহীন। ঘোড়ায় শেষ চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, পৃথিবীটাকে শেষ করে দিলাম। জীবনের সমস্ত আশা যখন নিঃশেষিত হয়, তখন সব কিছুই মনে হয় বিবর্ণ।

"বন্দুকটির নল মাথায় সেঁটে ধরলাম। তারপর, যতটুকু মনে পড়ে, একটা আগুনের ডেলা। এত উজ্জ্বল? চারদিকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ। অজস্র আতশবাজির মত। রক্তে ভেসে যাচ্ছি। যন্ত্রণা। তবু মনে হল, ব্যাপারটা সত্যিই যেন রাজকীয়। এক সময় অনন্ত অন্ধকারে আমি ডুবে গেলাম।"

দুটি বিবৃতিই রোমহর্ষক, সন্দেহ নেই। তবু এই বিবৃতি দুটির মধ্যে এমন দশটি সূত্র রয়েছে, যা আত্মহননকারীদের মনের মানচিত্র রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করে। অধ্যাপক স্নাইডম্যান মনে করেন, জনসাধারণ এবং মনঃচিকিৎসকরা এই দিকগুলি সম্পর্কে যদি সচেতন হন, তাহলে বহু আত্মহত্যার ঘটনা রোধ করা সম্ভব।

অধ্যাপক স্নাইডম্যানের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে এই রকম :

॥ এক ॥ অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা : আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেউ আত্মহত্যা করে না। এক্ষেত্রে জীবনের একমাত্র শত্রু যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেই মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। যেমন ধরুন, মহিলাটি বলেছেন, "...আমার চিন্তাভাবনা তখন যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। মনের মধ্যে বইছে ঝড়।" অথবা পুরুষটির উক্তি : "অল্পক্ষণের মধ্যেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। তারপরই আসবে অনন্ত শান্তি। যার জন্যে আমার অনিবার্য প্রতীক্ষা।" এক্ষেত্রে মনঃচিকিৎসক, মানসিক-উপদেষ্টা এবং সাধারণ মানুষেরও প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত যে ভাবেই হোক, যারা প্রবল আত্মহনন-প্রবণতার শিকার, তাদের মানসিক যন্ত্রণা দূর করার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া। মানসিক যন্ত্রণার পেছনে নানারকম কারণ থাকতে পারে—কর্মক্ষেত্রে ব্যর্থতা, বেকারত্ব, পারিবারিক অশান্তি, ব্যর্থ প্রেম, শোক, দুরারোগ্য ব্যাধি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাসের পরীক্ষায় খারাপ ফল ইত্যাদি। এ ধরনের ঘটনায় কেউ মানসিক কষ্ট পেয়েছে বলে মনে হওয়া মাত্র ব্যাপারটা যাতে সে লঘুভাবে নিতে পারে তার চেষ্টা করা দরকার। দেখা যায়, এতে করে তার মানসিক চাপ যদি সামান্যতমও কমে, সেক্ষেত্রে সে আত্মহত্যার পথ ত্যাগ করে। সে বেঁচে থাকাটাই বেছে নেয়।

॥ দুই ॥ হতাশ মানসিকতা নিরাময়ে যা প্রয়োজন : আমাদের অন্তর্মুখী জীবনের জন্যে চাই নিরাপত্তা, সাফল্য, বিশ্বাস এবং বন্ধুত্ব। অনেক মৃত্যু অর্থহীন হতে পারে, কিন্তু অকারণে কেউ কখনো আত্মহত্যা করে না। মানসিক কারণ অথবা যে সব কারণের জন্যে কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, তাকে তার সত্যিকারের প্রয়োজনের কথা বলুন, দেখবেন সে ক্ষেত্রে আত্মহত্যার পথ থেকে সে সরে এসেছে। সেই মহিলা এবং পুরুষের উদাহরণ দিই। মহিলাটি চেয়েছিল নিরাপদ একটি জীবন, তার আবেগ এবং দৈহিক আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি। পুরুষটি চেয়েছিল, সে যা করবে, নিজেই করবে। তার উপর কারোর খবরদারি চলবে না। তার মানসিক জগৎটি যাতে তার প্রতি সমালোচনা এবং দোষারোপ থেকে মুক্ত থাকে সেদিকে ছিল তার সজাগ দৃষ্টি। বিশ্বাস এবং বন্ধুত্বের জন্যে সে ছিল লালায়িত। নিজেকে মনে করত রাজা। ব্যাপারটা যেন, ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু তার নির্দেশেই চলবে। অর্থাৎ ওই মহিলা এবং পুরুষটির ছিল বিশেষ বিশেষ আকাঙ্ক্ষা। অথবা বলা যায় প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মেটাতে না পারায় তাদের জীবনে নেমে আসে প্রচণ্ড হতাশা। যা তাদের আত্মহননের দিকে ঠেলে দেয়।

এ ক্ষেত্রে মনঃচিকিৎসকের সবচেয়ে বড় কাজ হবে একটি প্রশ্ন করা : কষ্টটি পেলেন কোথায়? অর্থাৎ জানতে চাওয়া আত্মহত্যার কারণ কী? অবশ্য প্রশ্নটির কায়দাটা কেমন হবে, সেটা নির্ভর করছে রোগীর উপর। এ ব্যাপারে রুটিন বা ছকে বাঁধা প্রশ্নে কাজ হয় না, ব্যক্তিবিশেষে সমস্যা ভিন্নতর হয় বলে।

॥ তিন ॥ সমাধানের ব্যাপারে অনুসন্ধান : আত্মহত্যা কোন তাৎক্ষণিক ঘটনা নয়। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়াও কেউ আত্মহত্যা করে না। কোন

সমস্যা, কোন সঙ্কট অথবা অসহনীয় কোন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতেই লোকে আত্মহত্যা করে। এ যেন বিহ্বলতা থেকে মুক্তির চেষ্টা। আত্মহত্যাকারীর নিজের কাছে শুধু একটিই প্রশ্ন, কাজটা কি ভাবে করব ?" এটা ওই মহিলা এবং পুরুষটির জবানবন্দী থেকেই বোঝা যায়। মহিলা বলেছেন : "...এ কাজ সত্যিই কি আমার দ্বারা সম্ভব হবে ? আমার চিন্তা ভাবনা তখন যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে।" অথবা পুরুষটির উক্তি : "বেঁচে থাকার জন্যে সবই তো করলাম। তবু আমি ডুবে যাচ্ছি, কোথায় যেন ডুবে যাচ্ছি। উত্তর পাওয়ার জন্যে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রইলাম।"

॥ চার ॥ **নিজস্ব অনুভূতি বিলুপ্ত করার উদ্যোগ :** যন্ত্রণা এবং মানসিক অনুভূতি থেকে চিরমুক্তিই আত্মহত্যার মূল লক্ষ্য। মহিলাটির উক্তি : "একটিই কাজ। নিজের বাহ্যশক্তি হারিয়ে ফেলা—এই তো কাজ।" পুরুষটিও এ কাজ করতে গিয়ে যা কষ্ট তা ভুলতে চেয়েছিল। তার উক্তি থেকেই তা স্পষ্ট হয় : "ব্যাপারটা সত্যিই যেন রাজকীয়। এক সময় অনন্ত অন্ধকারে আমি ডুবে গেলাম।"

॥ পাঁচ ॥ **অসহায়তা এবং নৈরাশ্য :** লজ্জা, অপরাধী মনোভাব, অক্ষমতা, হতাশার আগ্রাসন এবং এ ধরনের আরো কিছু কিছু অনুভূতিই আত্মহত্যার পেছনে কাজ করে। মনোবিজ্ঞানীদের কথায়, "তারাই আসল কারণ। যখন কেউ মনে করে এ থেকে কেউ তাকে মুক্তি দিতে পারে না ; এবং নিজেকে মুক্ত করার ক্ষমতা তার নিজেরও নেই, তখনই সে বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। পরিস্থিতিটি পুরুষের উক্তিতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : "জীবনের সমস্ত আশা যখন নিঃশেষিত হয়, তখন সব কিছুই মনে হয় বিবর্ণ।"

॥ ছয় ॥ **কোন বিকল্প পথ ভাবার মত ক্ষমতা থাকে না :** যাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা থাকে, দেখা যায় নিজের সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে যে নানা রকম বিকল্প পথ থাকতে পারে, সে কথা সে যেন ভাবতেই পারে না। তার মধ্যে কেবলমাত্র দুটি ভাবনাই কাজ করে : একটি পরিপূর্ণ সমাধান, অথবা সমাপ্তি। এ ব্যাপারে একটি লক্ষ্যের দিকেই সে এগিয়ে যায়। যেমন মহিলাটি বলেছিল, "আত্মহত্যাই একমাত্র সমাধান, এবং ঝাঁপিয়ে পড়াই তার একমাত্র পথ।" যাঁরা আত্মহত্যা-প্রবণ রোগীর চিকিৎসা করবেন, তাঁদের প্রধান কাজ হওয়া উচিত যে-কোন সমস্যার যে একাধিক সমাধান থাকে সে সম্পর্কে তার মধ্যে প্রত্যয় সৃষ্টি করা।

'যেমন ধরুন, একবার কলেজের একটি মেয়ে এল আমার কাছে।' বলেছেন অধ্যাপক স্নাইডম্যান। 'বিবাহিত নয়। সুন্দরী এবং সুন্দর স্বাস্থ্য। এক কথায় খুবই আকর্ষণীয়া। পেটে তার সন্তান। অবিবাহিত অবস্থায় মা হতে যাওয়া—এমন অবস্থা সে কোন মতেই গ্রহণ করতে পারছিল না। তাই সে বেছে নিয়েছিল আত্মহত্যার পথ। আমি তাকে একাধিক বিকল্প পথের কথা বললাম। তাকে বললাম, ক্ষতি কি ?

সমাপ্তির প্রান্ত মুহূর্তে এসেও কি মানুষ বাঁচার স্বপ্ন দেখে ?

বাচ্চা হোক, তারপর তাকে কারোর পোষ্য করে দিও। সে রাজি হল না। বেশ, যে যুবকটির জন্যে তোমার এমন হাল, দেখি না, এ ব্যাপারে সে কোন দায়িত্ব নেয় কি না ? বুঝিয়ে বলি, তুমিও আমার সঙ্গে থাকবে। তা হলে নিশ্চয় সে তোমার বাচ্চার পিতার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। মেয়েটি তাতেও রাজি নয়। তা হলে তুমিই বাচ্চাটাকে মানুষ কর। আজকাল এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তবু সে রাজি নয়। তা হলে আর একটি কাজও করা যায়। গর্ভপাত। "না, না। সেটা আমি সহ্য করতে পারবো না, ডাক্তার।" মেয়েটি বলল। এইভাবে পরপর বিকল্প পথ নিয়ে কথা বলতে বলতে এক সময় বোঝা গেল আত্মহত্যা করতে সে চায় না। যদি সুষ্ঠু সমাধান পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যা করেওনি।'

॥ সাত ॥ **সত্যিই কি কেউ মরতে চায় :** স্ত্রী, পুত্র, পিতামাতা এবং বন্ধুবান্ধবদের ঘৃণা করলেও, আত্মহত্যার মত চরম পথে এগিয়ে যাওয়ার সময়ও মানুষ যেন বাঁচতে চায়। তাই দেখা গেছে, নিজের গলায় খুর চালানর পর, আত্মহত্যাকারী চিৎকার করে জানান দেয়, ওগো, আমি নিজেকে খুন করলাম।

॥ আট ॥ **আগাম ইঙ্গিত :** যারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশই আভাস ইঙ্গিতে তার পরিবার-পরিজনদের জানিয়ে দেয় তারা এমন একটি কিছু করতে যাচ্ছে যা খুবই বিপজ্জনক। নিজেদের অসহায়তা তারা বারবার প্রকাশ করে, কথায় এবং আচরণে। কেউ কেউ মনে করে আত্মহত্যা বুঝি বা অপরের প্রতি প্রতিহিংসা নেওয়ার চেষ্টা। এ কথা ঠিক নয়। আত্মহত্যার পেছনে কোন প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব কাজ করে না। বরং তারা চায়, "এই তো আমার হাল। এ কষ্ট থেকে আমাকে কেউ তোমরা রক্ষা কর।" তাদের বলতে শোনা যায় : "আর আমি পারছি না। এবার নিজেই নিজেকে শেষ করবো।" এ ধরনের কথাবার্তা। আত্মহত্যা-প্রবণদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবরা এ ধরনের আচরণের দিকে একটু নজর দিলে এবং নিজেদের সাহচর্যে বিকল্প পথ যোগালে বহু ক্ষেত্রেই আত্মহত্যা প্রতিরোধ করা যায়।

॥ নয় ॥ **পলায়ন :** বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া অথবা চাকরি ছেড়ে দেওয়া—এ সব পলায়ন-প্রবণতা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু আত্মহত্যা সম্পূর্ণ রকমে পরিসমাপ্তির পথে পা বাড়ায়। কেউ যখন পালিয়ে বেড়ায় তার দিকে সহানুভূতিসুলভ নজর রাখা দরকার।

॥ দশ ॥ **নকল করার প্রবণতা :** আত্মহত্যা প্রবণ যারা তাদের দৈনন্দিন আচরণের উপর নজর রাখা দরকার। কেউ বিমর্ষ হয়ে বসে থাকে। অফিস কামাই দেয় অহেতুক। কারোর সঙ্গে ভালভাবে কথা বলে না। সবাইকে এড়িয়ে চলে। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে। আত্মহত্যাকারীরা যে সব পদ্ধতি কাজে লাগায়, অজান্তে কখন সে সব নকল করার চেষ্টা করে। নিকটজনরা এদিকে নজর রাখলে এবং মনঃচিকিৎসকের সাহায্য নিলে আত্মহত্যার চরম পথ থেকে কাউকে ফেরানো অসম্ভব হয় না। এ সব ব্যাপার কখনোই হাল্কাভাবে দেখা ঠিক নয়। কখনো ভাবা উচিত নয়—ও কিছু না, দু দিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। এ ভাবে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে নিজেকে হয়ত ভুলিয়ে রাখা যায়, কষ্ট থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যায়, কিন্তু মূল সমস্যার কোন সমাধানই হয় না। ■

কোনো ঘটনায় কেউ মানসিক কষ্ট পেয়েছে বলে মনে হওয়া মাত্র ব্যাপারটা যাতে সে লঘুভাবে নিতে পারে তার চেষ্টা করা দরকার। এতে যদি তার মানসিক চাপ সামান্যতমও কমে, সে আত্মহত্যার পথ ত্যাগ করে।

দানব ও দেবতা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

॥ বিয়াল্লিশ ॥

লন্ডনে অদ্যই শেষ রজনী। আফ্রিকা পর্ব শেষ। বৃহৎ রাষ্ট্রগোষ্ঠী কী করেন দেখা যাক। অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে দক্ষিণ আফ্রিকায় নবযুগ যদি আনা যায়। এই ফাঁকে নেলসন মন্ডেলার দিকে একবার তাকানো যাক। সর্বত্যাগী এই বিপ্লবীর বয়স হল ৬৯ বছর। আজ থেকে ২৫ বছর আগে ১৯৬২ সালে মন্ডেলার কারা জীবনের শুরু। প্রথমে ছিলেন রোবেন দ্বীপের কারাগারে। ১৯৮৩ সালে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে কেপটাউনের পোলসমুর কারাগারে। যুবক মন্ডেলা এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। চুল অল্প অল্প পেকেছে। যখন যুবক ছিলেন তখন তাঁর গায়ের রঙ ছিল কফি বীজের মতো। এখন সেই রঙ আর নেই। গায়ের রঙ এখন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

১৯৫০ সালে মন্ডেলা ছিলেন জোহানেসবার্গ মেজিস্ট্রেটের কোর্টে সবচেয়ে ব্যস্ত আইনজীবী। সেই ব্যস্ত, সদাজাগ্রত, প্রখর মানুষটি দীর্ঘ কারাবাসে বয়েসের ভারে কিঞ্চিৎ শ্লথ হয়েছেন। হাঁটাচলায় ধীর। সোজা তাকিয়ে থাকেন সামনে। সব সময়েই গভীর কোনও চিন্তায় মগ্ন। তবু দীর্ঘকায় মন্ডেলা এখনও শক্তিশালী, সক্ষম একজন মানুষ। হয়তো সামান্য একটু সামনে ঝুঁকে চলেন, কিন্তু শরীরে সামান্যতম বয়সের মেদভার নেই। অন্যান্য সহবন্দীদের মতো দেহের মধ্যভাগ স্ফীত হয়নি। যৌবনে, বন্দীদশা শুরুর আগের জীবনে, সামনে টেরি কেটে সমান দু'ভাগ করে চুল আঁচড়াতেন। আমরা সাধারণত তাঁর সেই ছবিই দেখি। এখন আর সেইভাবে চুল আঁচড়ান না।

রাজনৈতিক জীবন, ব্যবহারজীবী জীবন ছাড়াও নেলসনের খোলামেলা একটা সামাজিক জীবন ছিল। 'গ্রুপ এরিয়া অ্যাক্ট' আইন হবার আগের কাল পর্যন্ত জোহানেসবার্গে কালা আদমিদের ব্যবসা করার অধিকার ছিল। তখন ওখানে একটি অভিজাত রেস্তোরাঁ ছিল—ব্লু-লেগুন। মালিক ছিলেন একজন অশ্বেতাঙ্গ। এই রেস্তোরাঁটি ছিল নেলসনের বড় প্রিয় জায়গা। দিনান্তে ব্লু-লেগুনে এসে বসতেন। মেলামেশা, আলাপ আলোচনা সবই হত ওখানে। ওইখানেই বসে তৈরি হত আন্দোলনের ব্লু-প্রিন্ট। পার্লামেন্টে গ্রুপ এরিয়া অ্যাক্ট পাস হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্লু-লেগুনকে ব্যবসা গোটাতে হল।

জেলে অন্যান্য বন্দীরা মন্ডেলাকে তাঁর গোষ্ঠীর নামেই ডাকেন। সেই নামটি হল মাধিবা। দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে ওয়ার্ডাররা কয়েদীদের নম্বর

নেলসন মন্ডেলা

ধরে ডাকেন। একমাত্র ব্যতিক্রম নেলসন। নেলসনকে তাঁরা মন্ডেলা বলে ডাকেন। রোবেন দ্বীপের জেলে কোনও কোনও সার্জেন্ট তাঁকে মিস্টার মন্ডেলাও বলতেন। দক্ষিন আফ্রিকার কারাগারে যা ভাবা যায় না। আগে কখনও কারুর ক্ষেত্রে হয়নি। কারারক্ষী, কারা পরিচালকরা মন্ডেলাকে শ্রদ্ধা করেন। এ এক অসম্ভব ব্যাপার। মন্ডেলা একজন নিপাট ভদ্রলোক। ধীর মৃদু কথাবার্তা, সুভদ্র ব্যবহার। অসাধারণ তাঁর ইংরেজি বাচনভঙ্গি। জায়গায় জায়গায় সামান্য 'খোসা' জাতীয় উচ্চারণ। মায়ের দেওয়া জিভটাকে তো পুরোপুরি বিদেশী ভাষাকে দান করা যায় না।

বিশুদ্ধ ইংরেজি ও ১৯৫০ সালে ইংরেজির শহুরে রূপান্তর, অর্থাৎ রকের ভাষা বা 'ফ্লাইতাল', দুটোতেই তিনি সমান অভ্যস্ত। একটি কথা তিনি প্রায় প্রত্যেককেই বলে থাকেন, সেইটাই তাঁর অভ্যাস, 'ওকে বয়।'

রোবেন দ্বীপের কারাগারে কড়া বিধিনিষেধ ও পাহারা থাকা সত্ত্বেও তিনি অন্যান্য বন্দীদের সমস্ত খবরাখবর রাখতেন। যার সঙ্গেই দেখা হত তাকেই জিজ্ঞেস করতেন তার পরিবারের কথা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংগ্রহ করতেন পরিবারের ইতিহাস। প্রায় সব বিষয়েই মন্ডেলার জ্ঞান। বিশ্ব রাজনীতিতে তিনি সুপণ্ডিত। তাঁর রাজনৈতিক স্বপ্ন হল শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলা। স্বাধীন

শৃঙ্খল ছিঁড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষরা নবযুগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে

ক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি নতুন সমাজের জন্ম দেখতে চেয়েছিলেন। অ্যাফ্রিকান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের 'ফ্রীডাম চার্টার' তাঁর কাছে এখনও একটি জীবন্ত দলিল। এই দলিলে প্রতিফলিত হয়েছে সমগ্র জাতির ইচ্ছা। এই সনদ শেষ কথা য়। লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার একমাত্র পথ।

মাধিবা অনেক পড়েছেন। তাঁর সবচেয়ে প্রাণের বিষয় হল রাজনৈতিক অর্থনীতি আর স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস। কিউবাই হোক আর নিকারাগুয়াই হোক সংগ্রামের ইতিহাস সংগ্রহ করে, তাঁর পড়া চাই। জেলের গ্রন্থাগার তাঁর দখলে। সমস্ত সংবাদপত্র তিনি খুঁটিয়ে পড়েন। উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের ভক্ত; বিশেষ ভক্ত হ্যান্ডেলের'। কনসার্ট কন্ডাক্টারের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নেড়ে তিনি প্রায়ই হ্যান্ডেলের সেই গানটি আপন মনে গেয়ে থাকেন, 'আনটু আস এ চাইল্ড জ বরন্'।

পরিধানে জেলখানার পোশাক, ফন ট্রাউজার, গ্রীন শার্ট অথবা হাসপাতাল থেকে পাওয়া নীল রঙের টাওয়েলিং গাউন। খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করে স্কিপিং করেন। যৌবনে বকসিং করতেন। এখনও মাঝে মধ্যে 'শ্যাডো বকসিং' করেন। মাধিবাকে কখনো শুয়ে বা বসে থাকতে দেখা যাবে না। প্রায় সারাটা দিনই তিনি জেলখানার উঠোনে পায়চারি করেন। 'রিভোনিয়াট্রায়ালে' আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্যান্য অভিযুক্ত সদস্য, যেমন ওয়াল্টার মিসুলু, রেমন্ড মাহলাবা, আহমেদ কাথরাডা, উইলটন মকোয়াই, সকলেই মাধিবার সঙ্গে একই জেলে রয়েছেন। মাধিবা পায়চারি করেন আর এঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন নানা বিষয় নিয়ে।

কারাগারেও মাধিবার আইনজ্ঞ জীবন অব্যাহত আছে। বন্দীদের অসংখ্য সমস্যায় আইনের পরামর্শ দেন। হয়তো কোনও বন্দীর সঙ্গে তাঁর আত্মীয় স্বজনদের দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না, মাধিবা তাঁদের চিঠির বয়ান লিখে দেন। বাইরের আইনজ্ঞ, যাঁরা বন্দীদের হয়ে আইনের তরোয়াল চালাচ্ছেন মাধিবা জেলখানা থেকে তাঁদের যথোচিত আইনের পরামর্শ পাঠিয়ে দেন।

মাধিবা সারাটা দিন এত ব্যস্ত যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলে আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়। এই দেখা করার নির্দিষ্ট কোনও জায়গা নেই। জেলখানার উঠোনে দেখা হতে পারে, এমন কি স্নানঘরেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যায়। তিনি ডায়েরি রাখেন না, মনই তাঁর ডায়েরি।

তাঁর সেলে গেলে কেউ শুধু মুখে ফেরে না। জেলখানার দোকান থেকে বাদামের টিন কিনে এনে রেখে দেন। দর্শনপ্রার্থীকে সেই বাদাম দিয়ে অভ্যর্থনা করেন। আর নিজে চিবোন শুকনো রুটি। ধূমপান করেন না ; তবে ধূমপায়ীর জন্যে বিছানার তলায় একটা ছাইদান রাখেন।

কথায় কথায় তাঁর অতীত জীবন বেরিয়ে আসে। শহরজীবনের কথা, কারাজীবনের কথা। ১৯৬১ সালে কীভাবে তিনি দেশ ছেড়ে পালালেন। এ এন সি-র ইউথ লিগের সদস্য জীবনের কথা। আবদুল নাসের ও আলজিরিয়দের প্রশংসা করেন। মাধিবার আফ্রিকা-সফরের সময় তাঁরা 'এ এন সি'কে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। ১৯৬৪ সালে আদালতে আসামীর কাঠগড়া থেকে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণের স্মৃতি আজও অম্লান তাঁর মনে।

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের কী কাণ্ড! ৬২ সালে তাঁকে জেলে ভরা হল, আর ৬৪ সালে, মানে দু'বছর পরে তাঁকে ধরানো হল যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাদেশ। মাধিবার কণ্ঠস্থ হয়ে আছে সেই ভাষণ। মাঝে মাঝেই আবৃত্তি করেন অংশবিশেষ। 'রিভোনিয়া ট্রায়াল জাজমেন্টের' একটি কপি নিজের কাছে রেখেছেন সযত্নে।

মাঝে দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্রে একটি আষাঢ়ে খবর ছাপা হয়েছিল। খবরটি সংগৃহীত হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার গুপ্তচর গর্ডন স্পাইয়ের

সকন্যা উইনি মন্ডেলা : বিপ্লবের প্রতীক

গ্রন্থ থেকে। সংবাদটি পড়ে মাধিবা হাসতে হাসতে তাঁর সহবন্দীদের বলেছিলেন, 'দেখো কি উদ্ভট জিনিস ছেপেছে। লিড নিউজ। রোবেন দ্বীপ থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। এক সাহসী মহিলা

নেলসন মন্ডেলার মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ

পাইলট হেলিকপ্টার চেপে এসেছিল। হেলিকপ্টার থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল দড়ি। কারাগারের ছাদ থেকে সেই দড়ি ধরে হেলিকপ্টারে উঠে পালাতে গিয়ে আমি ধরা পড়ে গেছি।'

শ্রোতাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, 'সত্যিই এইরকম একটা পরিকল্পনা হলে, আপনি মুক্তির চেষ্টা করতেন ?'

'কমরেড, তোমার মাথাটা পরীক্ষা করাও। পালানো মানে আত্মহত্যা। আমি কি কাপুরুষ যে সংগ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাবো!'

রোবেন আইল্যান্ডে মাধিবা যে কারাকক্ষে থাকতেন তা দৈর্ঘ্যে ছিল মাত্র ৮ ফুট। ৬৪ বর্গফুট এলাকায় একটি মানুষের বসবাস। ঘরের বাঁদিকে একটি কাবার্ড। তার তিনটি পাল্লা। একটা খোপে তাঁর জামাকাপড়। ওপরের দুটি শেলফে ঠাসা বই। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নিখুঁত। প্রতিটি বই,

অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

কাগজপত্র সুচারু সাজানো। অত পরিষ্কার সেল রোবেন দ্বীপে আর দ্বিতীয় ছিল না। দেয়ালে ঝুলছে তাঁর পরিবারের সাদা-কালো একটি ছবি। তার পাশে ঝুলছে নিজের তৈরি একটি ক্যালেন্ডার। পড়ার রুটিন, ছোট ঘর, নিখুঁত সাজানো। সব ওলটপালট হয়ে যাবার ভয়ে খাবারঘরের ডাইনিং টেবিলে বসে চিঠিপত্র লেখালিখির কাজ করতেন।

মাঝে মাঝেই তাঁর মনে পড়ে যায় স্ত্রী ওয়াইনির কথা। ছেলেমেয়েদের কথা। স্ত্রীকে তিনি জামি বলে ডাকেন। স্ত্রীর আসল নাম নোমজামো থেকে জামি এসেছে। হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছিল, জেলে যাঁদের যাবজ্জীবন থাকতে হবে, তাঁদের ছেলেমেয়েরা বাইরে থেকে কাঁচের জানালা দিয়ে বাবাকে দেখে গেলে তারা বড় হবে কি করে! সপ্তাহে একবার বাবাকে তারা যদি ছুঁতে না পায় তাহলে তাদের মনের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে! মনে হওয়া মাত্রই তিনি আন্দোলন শুরু করলেন। এই কয়েক বছর আগে কারাকর্তৃপক্ষ তাঁর আন্দোলনে সাড়া দিয়ে ব্যবস্থার পরিবর্তন করেছেন।

নেলসন হয় তো গীতা পড়েন নি; কিন্তু গীতার সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগে তাঁর জীবনের সুর বেঁধে ফেলেছেন। তাঁর ক্রোধ নেই। কেউ কখনও তাঁকে রাগতে দেখেনি। তিনি সকলকেই আত্ম-সংযমের পরামর্শ দেন। যে কোনও সঙ্কটে তিনি মানুষকে আত্মস্থ থাকতে বলেন। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ো না। ভেবেচিন্তে কাজ করাই ভাল। উত্তেজনা প্রশমিত হবার পর ব্যবস্থা নাও। নেলসন নিজে একজন বড় আত্মসমালোচক। নিজের ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমা চাইবার সৎসাহস তাঁর আছে। ধর্মবিশ্বাসী না হলেও তিনি প্রায়ই গির্জায় যান; হয় তো পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশার জন্যে। এই হল নেলসন মন্ডেলা। দেশের মানুষ যাঁকে মাধিবা বলে ডাকতে ভালবাসেন। তাঁর স্ত্রী ওয়াইনি হলেন,দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের প্রতীক। বিশ্বের সমস্ত মানুষ আজ নেলসনের মুক্তি চায়। বোথা সরকারের কানে সে দাবি ঢুকছে না। কমনওয়েলথ শেষ হয়ে গেল।

ছেলে ঘুমলো। পাড়া জুড়লো। আমরা অবশ্য কেউই ঘুমোলুম না। লন্ডনে অদ্যাই আমাদের শেষ রজনী। শহরটাকে আমরা ভালোবেসে ফেলেছি। যেন পরীর দেশ। একসময় কলকাতাও ছিল দ্বিতীয় লন্ডন। জুয়েল অন দি ক্রাউন। বোম্বাইকে বলা হত নেকলেস। মধ্যরাত। বিগবেনে ঘন্টা কি বাজছে! বাইরে আলোকিত আকাশ। লন্ডনের রাত পুরোপুরি অন্ধকার হয় না।

কুমকুমের ঘরে ফোন করলুম। জেগে বসে আছে। 'কি হল তোমার?'

'মন খারাপ। কাল সকালেই তো চলে যেতে হবে। ওই অক্সফোর্ড স্ট্রিট। পিকাডেলি সার্কাস। পলমল। হাইড পার্ক। বাকিংহাম কোর্ট। সব পড়ে থাকবে পেছনে।'

'আমারও ভীষণ মন খারাপ।'

'চলে এস আমার ঘরে।'

আমাদের দলের আর কে কোথায় আছে জানি না। আমরা দু'জনে এই সিদ্ধান্তে এলুম, আজ আর ঘুম নয়। প্রথমে সারা হোটেলটা ঘুরে দেখবো। তারপর বেরিয়ে পড়ব পথে। একটাই ভয়, লন্ডন ববিরা না ধরে! দু'নম্বর ভয় সাদা আদমিরা কালো চামড়া দেখে পিটিয়ে না দেয়। পুলিসে ধরলে ছাড়পত্র বুকে ঝোলানোই আছে।

প্রথমে আমরা হোটেলের চাইনিজ রেস্তোরাঁয় গেলুম। কোণের দিকে। যেন গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে। রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গেছে। ঘুরতে ঘুরতে আমরা ড্যানসিং ফ্লোরে চলে এলুম। ফাঁকা। অন্ধকার। নর্তকীরা চলে গেছে। কোণের দিকে প্ল্যাটফর্মের ওপর বাদ্যযন্ত্ররা ঘুমোচ্ছে।

আমাদের সাহস বেড়ে গেছে। যেদিকে খুশি সেইদিকে চলে যাচ্ছি। আজ শেষ রাত। একটা কাঁচের দরজায় ওপর লেখা, ফ্রেঞ্চ রেস্তোরাঁ। ভেতরে একটি মাত্র আলো জ্বলছে। সব ফাঁকা। কুমকুম বললে, 'কনজারভেটিভ জায়গা। এদেরই তো উপদেশ, আরলি টু বেড অ্যান্ড আরলি টু রাইজ। চলো দাদা রাস্তায় যাই।'

লবিতে রিসেপশানে একটি ছেলে রয়েছে। সে বললে, 'গুড মরনিং।'

তার মানে সকাল হয়ে গেছে। নির্জন রাজপথ এদিকে গেছে, ওদিকে গেছে। লোক নেই, জন নেই। দোকানপাট সব বন্ধ। কলকাতা হলে পথে কিছু কুকুর থাকতো। ছাইগাদায় সাদা একটা বেড়াল। ফুটপাথে শুয়ে থাকতো সারি সারি মানুষ। কলকাতার চোখে ঘুম নেই। লন্ডন শুয়ে পড়েছে। মোটর সাইকেলে একজন পুলিস সার্জেন্ট চলে গেল। আমাদের দেখেই মনে হয় থামবো থামবো করছিল। থামল না চলে গেল। বাকিংহাম প্যালেস গেটে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন নিশ্চল প্রহরী। রাস্তাঘাটে ঝাড়ু দেওয়া শুরু হয়ে গেছে।

আমার সেই সুন্দর, সুরম্য ঘরে সকাল হল। ড্রেসিং টেবিলের ডান দিকে, রঙীন টিভির পর্দায় বিবিসি'র সংবাদপাঠক। ফলের ঝুড়িতে একটা আপেল আর এক থোলো র‍্যাম্প বেরি পড়েই রইল। ঘরের যেখানে যা কিছু ছড়ানো ছিল, সব ভরে ফেললুম। ঘর আমাকে বিদায় জানাবার জন্যে প্রস্তুত। এই ঘরে আর কোনওদিন আসা হবে না। ভাবতেই কেমন যেন লাগছে। বেশ করে স্নান করলুম। শেষ স্নান। পর্দা সরিয়ে বাইরের নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকালুম। একটাও পাখি নেই।

নিচের লবিতে সবাই জড়ো হয়েছেন। সকলেই অল্পবিস্তর বিবশ্ন। হোটেলের পাওনা মেটাবার জন্যে রিসেপশান কাউন্টারে হুড়োহুড়ি। মেয়ে দুটি অনভিজ্ঞ। সামাল দিতে পারছে না। পিনাকসায়েব দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর ছ'ফুট লম্বা শরীর নিয়ে। আমাদের মালপত্র সিকিউরিটি চেকিং-এ নিয়ে যাবার জন্যে ভারতীয় হাইকমিশানের আর এক অফিসার এসেছেন। আমার সেই বন্ধু, যাকে আমি ভূত দেখিয়েছিলুম, সে নেই। হাইকমিশান থেকে একটা অপূর্ব পোর্টফোলিও দিয়েছিল, রিসেপশানের মেয়েটির হাতে দিয়ে বললুম, আমার বন্ধুকে দিও।

রোদ ঝলমলে দিন। লন্ডন ওয়ালের পাশ দিয়ে, চারপাশ দেখতে দেখতে হিথ্রো এয়ারপোর্ট। মনে হচ্ছে, আরও সাতটা দিন থাকতে পারলে বেশ হত। শীত শীত করছে। এয়ারপোর্টের কিছু আগে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল ব্রিটিশ সিকিউরিটি। পিনাকসায়েব নেমে গিয়ে গলগল করে বিস্তর ইংরিজি বললেন। ব্যারিকেড সরে গেল।

কথায় বলে, ওস্তাদের মার শেষ রাতে। এয়ারপোর্টের টারম্যাকে নেমে মনে হল, কোটের ডান পকেটটা ভারিভারি লাগছে। হাত ঢুকিয়ে নিজেই অবাক, সর্বনাশ! হোটেলের ঘরের চাবি আমার পকেটে। দিয়ে আসতে ভুলে গেছি। কি হবে! চাবিটা পিনাকসায়েবের হাতে দিতেই, তিনি আমাকে বললেন, 'এ কি? দেখালেন বটে! আপনি আমাকে মারবেন মশাই।'

আমি বললুম, 'ভাগ্যিস ভূমিতেই ধরা পড়েছে। আকাশে হলে কি হত!'

(ক্রমশ)

"When I have a lunch appointment, there's only one suiting I can trust to make the right impression... one suiting that matches the atmosphere and sets the tone for the meeting perfectly. Gwalior Suiting! This international – quality fabric in a vast range of superb textures, designs, colours and weaves has the quiet sophistication that stands out even in the most exclusive places. I certainly recommend Gwalior Suiting to every man who cares about what he wears."

M.A.K. PATAUDI

IN A CLASS OF ITS OWN

A PRODUCT OF GRASIM INDUSTRIES LTD.

MAPP-GR-87-383-ENG

> *ভারতীয় সংবিধান দিয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিরঙ্কুশ প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ যাতে ব্যক্তিস্বার্থ খর্ব করতে না পারে তাই ভারতের সংবিধানের সেই সুপরিচিত 'টুটুয়েন্টি সিক্স'। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যার প্রয়োগ, আদালতে রিট আবেদনের মাধ্যমে।*

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষে মানুষে সম্পর্ক যত জটিল হচ্ছে আদালতের ভূমিকা ততই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিতে সংঘাত বাধছে। যাঁরই স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তিনিই যাচ্ছেন ধর্মাধিকরণে। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অতিরিক্ত অধিকার সচেতনতা, যা নাকি আধুনিকতারই অঙ্গ তাও প্রতিদিন জন্ম দিচ্ছে অজস্র মামলার। আজকের পৃথিবীতে কেউই আর ললাটের লিখন বলে কিছু মেনে নিতে চাইছেন না, চাইছেন প্রতিকার। নারী ও ভূমির অধিকার নিয়ে আদি যুগ থেকে যে দ্বন্দ্ব চলছে তাও আজ আদালতে প্রতিফলিত হচ্ছে নতুন রূপে। সব মিলিয়ে মামলার পাহাড় জমছে।

এই অবস্থার মধ্যেই রাষ্ট্রও হয়ে উঠছে সর্বব্যাপক। জীবন ও সমাজের সর্বস্তরে সে বাড়িয়ে দিয়েছে তার দীর্ঘ বাহু। রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির অধিকারের দ্বন্দ্ব বেড়েছে। এরই সঙ্গে এসেছে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় চেতনা। রচিত হয়েছে নতুন নতুন আইন। আগে যে-সব ক্ষেত্রে আইনের বা নীতির কঠোরতা ছিল না এখন সে-সব বিষয়েও আইনের জাল বিস্তৃত হয়েছে। এবং প্রায় সর্বত্রই সরকার এখানে প্রতিপক্ষ। সে ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে। চাকরি, ন্যূনতম মজুরি শ্রমিক কল্যাণের নতুন আইন হয়েছে। মামলা আরও বাড়ছে। তার মোকাবিলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই।

ভারতীয় সংবিধান দিয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিরঙ্কুশ প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ যাতে ব্যক্তিস্বার্থ খর্ব করতে না পারে তাই ভারতের সংবিধানের সেই সুপরিচিত 'টু টুয়েন্টি সিক্স'। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যার প্রয়োগ, আদালতে রিট আবেদনের মাধ্যমে। সুপ্রিম কোর্টও বলেছেন রিট আবেদনই আজকের মামলায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ।

যাঁরা যেখানে ক্ষমতায় থাকেন তাঁরাই চান বল্গাহীন অধিকার।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আনীত বহু অভিযোগেই সরকার পক্ষে দাঁড়ান সি পি এম নেতা সোমনাথ চ্যাটার্জি। তাঁর সঙ্গে এ প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল ২৫ জুলাই, দিল্লিতে। তিনি বলেন, কলকাতা হাইকোর্টে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন আবেদনের বিরোধিতার সময় তিনি বলেছেন, আজ তো দেখছি আদালত বাসের পারমিটও দিতে চান। কোন রুটে বাস চলবে কতটা চলবে তাও ঠিক করে দিতে চান। দেখতে চান জল সরবরাহ ব্যবস্থা। এসবই তো প্রশাসনের কাজে হস্তক্ষেপের শামিল।

আবার দিল্লিতে সুপ্রিম কোর্টে এই সোমনাথবাবুই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বলেছেন বার্লির ট্যাক্স কত হবে তা ঠিক করার প্রসঙ্গে। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ট্যাক্স ধার্য করার কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারের উপর আদালতের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা।

এখানে বিষয়টির অবতারণায় সোমনাথবাবু উপলক্ষ মাত্র। আসলে বলতে চাইছি যেখানে যাঁর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তিনিই আদালতের শরণাপন্ন হচ্ছেন। ফলে আদালতে মামলা বাড়বেই।

প্রশাসন বনাম আদালতের ক্ষমতার সীমানা নিয়েও বিতর্ক বাধছে। মাঝে মাঝেই সুপ্রিম কোর্টে আসছে সাংবিধানিক ব্যাখ্যা ও সাংবিধানিক সমস্যা সংক্রান্ত আবেদনও। এভাবেই একদিকে আদালতের ভূমিকা যতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে তত বাড়ছে মামলার চাপ। সাধারণ মানুষ বিচার প্রার্থী হয়ে কোর্টে কোর্টে ঘুরছেন।

তাও তো আমাদের দেশে পশ্চিমী দুনিয়ার মতো আধুনিকতা ও ব্যক্তিমনস্কতা এখনও ততটা প্রবল হয়নি। রাস্তার খানাখন্দে পড়ে লোক মরলেও এখানে মামলা হয় না। ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণের জন্য এক্ষেত্রে টর্টের বিধান আছে। কিছুকাল আগে মির্জাপুর স্ট্রিটে একটি গাড়ি যাবার সময় রাস্তার গর্তে জমা জল ছিটকে এক পথচারীর স্যুটে কাদা ছিটকে দেয়। স্যুট নষ্ট করার অভিযোগে তিনি মামলা দায়ের করেন। সেই কেসে নোটিস আসে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে।

লন্ডনে এক ভদ্রলোক ট্রামে এক মহিলার গায়ে হেঁচে দিয়েছিলেন বলে ওই মহিলা ক্ষতিপূরণের মামলা এনেছিলেন। বৃটেনে প্রফুমো কেলেঙ্কারির অন্যতম বিচারক লর্ড ডেনিং-এর বয়স এখন ৮৪ বছর ৬ মাস। এই বয়সে তিনি নিজে দাঁড়াচ্ছেন হ্যাম্পশায়ার কাউন্টি কাউন্সিলের বিরুদ্ধে তাঁর নিজের ও প্রতিবেশীদের পক্ষে। কেসটা কি? কৃষিখামারে ভারী যন্ত্রপাতি যাওয়ায় কিছুটা ফুটপাথ ভেঙেছে। ছ'টি বাড়ির লোকের সেজন্য অসুবিধা। ওই ফুটপাত তাঁরা কাউন্টি কাউন্সিলকে মেরামত করতে বলেছিলেন। কাউন্সিল করেনি। তাই ফুটপাত সারানোর দাবিতে এই মামলা। ডেনিং বলেন, "আমি কোনও ফি নেব না। ওদের উকিল দেওয়ার পয়সা নেই আমি ওদের সাহায্য করতে চাই।" আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে অ্যাপ্রোভার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলাটি ওঠার তারিখ পড়তেই দেখি ৩১ জুলাই থেকেই সমস্ত অ্যামব্রিজ এই সবুজ পথের কেস নিয়ে উত্তপ্ত।

এখানে কিছুদিন আগে হাওড়ায় রাস্তার গর্তে পড়ে এক ব্যক্তি মারা গেলেন। আজও কেউ এক পয়সা পাননি। রাস্তার গর্তে পড়ে মানুষের হাত পা জখম হওয়া, গাড়ির অ্যাক্সেল ভাঙা তো লোকের গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। অথচ এখানেও আছে ক্ষতিপূরণের আইন। মোটর বা ট্রেন দুর্ঘটনা কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরকার একটা থোক টাকা দেন সাহায্য হিসাবে। কিন্তু মূল দোষীর শাস্তিবিধান ঝুলেই থাকে।

আদিকাল থেকেই মানুষের বিরোধের যে দুটি মূল ইস্যুর কথা আগে বলেছি সেই নারী ও ভূমির কি অবস্থা? সভ্য হবার আগে নারী ছিল বীর ভোগ্যা। যে পেরেছে গায়ের জোরে ভোগ

ব্যাঙ্কশাল কোর্ট চত্বর। ফৌজদারি মামলায় আসামীকে দেখার জন্যে জনতার ভিড়। ছবি : অশোক চক্রবর্তী

করেছে। এখন আমরা সভ্য হয়েছি বলছি। কিন্তু অবস্থাটা কি খুব একটা পাল্টেছে? প্রতিদিন অন্তত পঞ্চাশটি করে ধর্ষণের অভিযোগ আসছে এই পশ্চিমবঙ্গেরই বিভিন্ন থানায়। পুলিস রিপোর্টই একথা বলছে। কিন্তু তো ডাইরিই হচ্ছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অত্যাচারিতার অভিযোগ পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মেডিক্যাল পরীক্ষা হয় না। তদন্তও হয় না ঠিক মত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত ছাড়া পেয়ে যায়। আলিপুর আদালতে দেখেছি একটি অত্যাচারিতা মেয়ে ভয়ে তার উপর উৎপীড়নকারীদের চিনিয়ে পর্যন্ত দিল না। ভয়, পরে তার এবং তার পরিবারের উপর আরও বেশি অত্যাচার হবে। পুলিস বা সমাজ তাকে বাঁচাতে পারবে না। তাই একটা মেয়ের জীবনের সর্বস্ব হারিয়েও সে চুপ করে গেল। আদালত এ সম্পর্কে মন্তব্যও করেছে। কিন্তু কী হবে তাতে। কে শুনছে আদালতের কথা!

তারপরও তো এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন: ওই তো ওরা, সব বর্বর। উত্তর প্রদেশ, বিহারে কি না হচ্ছে সেখানে? পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তো সব থেকে ভাল। সত্যিই আজ চম্বলের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের বলতে হচ্ছে এরাজ্য খুব ভাল চলছে।

অথচ পুলিস রেকর্ডই বলছে, এখানে মেয়েদের উপর অত্যাচার বেড়েছে, বেড়েছে সাজা না হওয়া কেসের সংখ্যা। আগে দেওয়ানি মামলায় দেরি হত, এখন ফৌজদারি মামলাও ঝুলছে বছরের পর বছর। কেন? বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই বহু ক্রিমিন্যাল কেস তুলে নেন আদালতে আবেদন করে। সেই সময় তাঁরা তুলে নেন বহু রেপ কেসও। তখনই আইনজীবীরা বলেছিলেন এর ফল ভয়াবহ হবে। হয়েছেও তাই। আদালত সমাজের দর্পণ। আজ সে দর্পণে পশ্চিমবঙ্গের সেই রক্তাক্ত মুখটিই প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। বক্তৃতার তুবড়িতে যতই ফুল ফুটুক না কেন!

অন্যদিকে বৃটেনের ওল্ড বেইলির সেন্ট্রাল ক্রিমিন্যাল কোর্টে ২৮ জুলাই দেখছিলাম একটি কেস। সঙ্গে ছিলেন লিভারপুলের সাম্মানিক ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীমতী বারবারা এইচ ফেনলন। কেসের চাপ কমাতে এঁরা এখনও রেখে দিয়েছেন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ। অভিযোগটা ছিল একটি কালো মেয়েকে একটি কালো ছেলে ধর্ষণ করেছে। মাইকের সামনে অকুতোভয়ে মেয়েটি বলে যাচ্ছে তাকে ছুরি দেখিয়ে কাবু করা হয়েছিল ইত্যাদি। সামনেই অভিযুক্ত। সাদা পরচুলা পরে দুই আইনবিদ। জজের মাথায়ও সাদা পরচুলা। বারোজন জুরি। তার তিন জনই ভারতীয়। কোর্টে আর লোক ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আমরা ঢুকেছি পুলিসের অনুমতি নিয়ে।
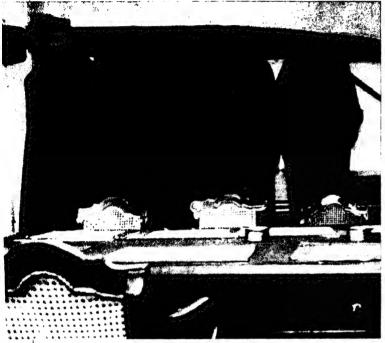
একটু পরেই আদালত শুরু হবে। আইনজীবীরা কালো গাউন পরে সওয়ালে নামবেন। ছবি: তারাপদ ব্যানার্জি

বারবারা বলেন, আমি কিন্তু আইন জানি না। বিচার করি সাধারণজ্ঞানে। আইন বুঝিয়ে দেন সামনের ওই কোর্ট অফিসার। তবে এ মেয়েটি বোধ হয় সত্য বলছে না।

আমাদের আইনকানুন প্রায় সবই বৃটেনেরই মতো। ব্রিটেনের মতোই এখানেও অভিযোগ প্রমাণের আগে অভিযুক্তকে নির্দোষ বলেই ধরে নিতে হবে। অভিযোগ যিনি আনবেন প্রমাণের দায়িত্বও তাঁর। তবে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও জুরির বিচার তুলে দেওয়া হয়েছে এদেশে। আইনবিদরা বলেন, ভালই হয়েছে। দ্রুত বিচারের নামে অবিচার ভালো নয়। আর বিচারের ভার আইন জানা লোকের হাতে থাকাই উচিত।

ওখানে বেশকিছু আদালত দেখলাম, অনেকটাই পরিচ্ছন্ন। আমাদের দিল্লি বা ত্রিশ হাজারি কোর্টের মতো। "আসামী হাজির" বলে পেয়াদার সেই পরিচিত হাঁক নেই। তার বদলে আসে মাঝে মাঝে মাইকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে এক একটি নামে ডাকার আওয়াজ। তবে সবই ওদেশে ভালো আমাদের খারাপ একথা বলব না। আমাদের এখানে কাউকে গ্রেফতারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করতেই হবে। ওখানে সেই বাধ্যবাধকতা নেই। থানা জামিন দিতে পারে। নইলে ন্যূনতম সময়ে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করবে। এদিক দিয়ে আমাদের পুলিসের ক্ষমতা কম। ব্যক্তির স্বাধীনতা বেশি।

অসহিষ্ণুতাও ওখানে খুবই বেশি। এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা স্বামী স্ত্রী দীর্ঘকাল থাকেন একত্রে। দুজনেরই ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বোধ প্রবল। একদিন সকালে "হ্যালো ডার্লিং" বলে বৃদ্ধা যথারীতি স্বামীর সামনের টেবিলে চায়ের কাপ ও খবরের কাগজ রেখে দিলেন। বৃদ্ধ রেগে আগুন। বলেন: ৪৫ বছর ধরে আমি তোমাকে বলছি বাঁ দিকে চায়ের কাপ ও ডান দিকে খবরের কাগজ দেবে। তা না করে তুমি সেই ডান দিকে চায়ের কাপ ও বাঁ দিকে খবরের কাগজ দিলে। এই বলে কথা কাটাকাটি। প্রহার ও বৃদ্ধার মৃত্যু। এদেশে বধূহত্যার বহু কেসই হচ্ছে। এরকম নজির আমাদের দেশে আজও নেই। এই কেসটা অবশ্য ওদেশেও সাধারণ ব্যাপার নয়। যাঁর সঙ্গেই আলাপ করেছি তিনিই বলেছেন ওটা পাগলের কাণ্ড। সমাজের যথাযথ প্রতিফলন নয়। যাহোক তবুও আসামী ছাড়া পাবে না।

আমাদের দেশে দেবযানীকে হত্যা করা হল। ঘরে তার রক্তাক্ত লাস পাওয়া গেল। ১৯৮৩-র জানুয়ারি মাসের ঘটনা। বিচার শেষ হতে লাগল সাড়ে চার বছর। সুপ্রিম কোর্ট দেবযানীর শ্বশুর ও স্বামীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ মাফ করে দিলেন। মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিতেই হবে তা বলছি না। বহু দেশেই মৃত্যুদণ্ডাদেশ তুলে দেওয়া হয়েছে। বলছি বিচারে বিলম্বের কথা। সুরূপা গুহ মারা গেলেন ১৯৭৬ সালের মে মাসে। দায়রা বিচারে রায় দেওয়া হল তাকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু হত্যাকারীকে চিহ্নিত করা গেল না। তবে তাঁর স্বামীকে প্রমাণ লোপের দায়ে দায়রা আদালত দোষী সাব্যস্ত করল। এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হয়েছে। আজও তার ফয়সালা হয়নি। ১২ বছর একটি ক্রিমিন্যাল কেস যদি চলে, রাজ্য সরকারই বা কি জবাব দেবেন? কারণ এ মোকদ্দমা পরিচালনার দায়িত্ব তো বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকারের।

এ প্রসঙ্গেই ওদেশের আর একটি নজির দিই। ইয়ান উড একজন সম্মানিত সলিসিটর। কিন্তু স্ত্রীকে ছেড়ে থাকে প্রেমিকার সঙ্গে। একদিন সে তার সেই মিসট্রেস এবং তার তিন বছরের

মেয়েকে খুন করে বলে অভিযোগ। পাঁচ বছরের ছেলেকে খুনের চেষ্টা করে। পুলিসের আসতে ২১ ঘণ্টা দেরি হয়। অপরাধী পালায়। এক সপ্তাহ পুলিস তাকে ধরতে পারে না। তারপর বলতে গেলে সে নিজেই ধরা দেয়। ইনার লন্ডনের ক্রাউন প্রসিকিউটর ডেভিড ম্যাগসন ৩১ জুলাই খুব গর্বের সঙ্গে এই কেসটির উল্লেখ করে বলেন, বছর আড়াইয়ের মধ্যে কেসটিতে শাস্তি হল। প্রশ্ন করি, এখন, আপিল তো করতে পারে? ম্যাগসন বলেন, মনে হয় করবে না। পুলিসই বা দেরি করল কেন? আসামী পালালোই বা কী করে? এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। শুধু জবাব—দুটো স্যুটকেস নিয়ে পালিয়েছিল।

সুতরাং গাফিলতি সর্বত্রই আছে। ওখানেও বহু মামলায় দেরি হয়। মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বাবার মৃত্যুর পর ছেলে মামলা লড়ছে এমন অভিযোগও আছে। এ প্রশ্নটি তুলতে প্রসিকিউটর বলেন ইন্সিওরেন্স কেস নিয়ে হয়ত দেরি হতে পারে। এখানে বলার কথা হল, একটি খুনের মামলা যদি দীর্ঘকাল অমীমাংসিত থাকে, তদন্তের অভাবে একটি খুনীর যদি শাস্তি না হয়, তাহলে তা খুনের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়। অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে যায়। মেরে দাও, কোনও শাস্তি হবে না। পশ্চিমবঙ্গে এখন খুব কম কেসেই সাজা হয়। খুনের কেসে ছাড়া পাওয়ার ঘটনা তো অনেকই আছে। তারমধ্যে আছে রাজনীতিও।

বর্ধমানে সাঁইবাড়িতে মায়ের সামনে ছেলেকে খুন করে সেই ছেলের রক্ত মায়ের জিহ্বায় লেপে দেওয়া হয়েছিল। এ কথা সবারই জানা। এও জানা যে, তারপর কলকাতার ময়দানে জনসভায় সি পি এম নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন, যা করেছি বেশ করেছি। সি পি এম মিছিলে আক্রমণ করলে এরকম শিক্ষাই দেওয়া হবে। যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে এই সাঁইবাড়ির মামলাও তিনবারের চেষ্টায় তুলে নেন। প্রথমে আলিপুরে দায়রা আদালতে রাজ্য সরকার আবেদন করেন মামলা প্রত্যাহার করার জন্য। অতিরিক্ত দায়রা জজ গীতেশরঞ্জন ভট্টাচার্য সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। রাজ্য সরকার এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যান। হাইকোর্ট দায়রার আদেশে হস্তক্ষেপ না করেও রাজ্য সরকারকে ওই আদালতেই আবার আবেদন করার অনুমতি দেন। রাজ্য সরকার আবার মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেন। শুনানির সময় জজ ভট্টাচার্য বদলি হয়ে যান। (এটা অবশ্য স্বাভাবিক বদলি।) আসেন জজ রবীন্দ্রকমল কর। এবার দায়রা আদালত সাঁইবাড়ির মামলা প্রত্যাহারের অনুমতি দেয়। রাজ্য সরকার নিজেই যদি রাজনৈতিক কারণে, অভিযুক্তকে শাস্তি দিতে চেষ্টা না করেন, তাদের মুক্তির জন্য সচেষ্ট হন তবে সাধারণ মানুষের আইন আদালতের উপর আস্থা থাকে কী করে?

পুলিস প্রায়ই সাফাই গায়, আদালত আসামীকে জামিন দিয়ে দেন। কিন্তু পুলিস যদি ঠিক মতো তদন্ত না করে, আদালতের সামনে মামলা তুলে না ধরে তবে হাকিম কি করবেন? আলিপুর আদালতে এখনও এমন বহু মামলা

মামলার কারণ দূর করতে হবে

চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়

বিলম্বিত বিচার কেন? কীভাবে বিচারপ্রার্থীর হয়রানি বন্ধ করা যায় এ নিয়ে কথা বলছিলাম কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি বলেন, এত মোকদ্দমা সীমিত সংখ্যক বিচারক দিয়ে সামলানো যায় না। মামলা বেড়েছে দারুণ। মামলার কারণ দূর করতে হবে। কিন্তু কিছু আইন সরলীকরণ করা দরকার। আবার দ্রুত বিচার করতে গিয়ে, না শুনে তো রায় দেওয়া যায় না।

তাঁকে বলি বিচার চাইতে এসে প্রায়ই মানুষ নাস্তানাবুদ হন। মামলা টানতে টানতে শেষ হয়ে যান। এর কি কোনও সুরাহা করা যায় না?

তিনি বলেন, আদালতের পক্ষে মামলা দেরি করিয়ে কী লাভ? অবশ্য আদালতে আইনের বিভিন্ন ধারার সুযোগে প্রতিপক্ষকে কী করে পর্যুদস্ত করা যায় আইনজীবীরা অনেকে প্রায়ই সে চেষ্টা করে থাকেন। আইনের কাঠামোর মধ্যেই বিচারপতিদের বিচার করতে হয়। সুবিচারের জন্য উভয় পক্ষকেই বলার সুযোগ দিতে হবে। দিতে হবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ। সে-জন্য আদালতকে সব কথা শুনতে হবে। মানুষ যাতে সুবিচার পান, তাঁদের বক্তব্য যাতে ঠিক মতো শোনা হয় সেজন্যই আইনে নানা ধারা রাখা আছে। একথা ঠিক অনেক সময় কোনও কোনও পক্ষ সেই সুযোগের অপব্যবহার করেন। তাতে মামলা নিষ্পত্তিতে দেরি হয়। তা ছাড়া বেশির ভাগ মামলায় অস্থায়ী আদেশ দিতে হচ্ছে। ফলে একাধিকবার করে বিচার করতে হচ্ছে। শুধু তাড়াতাড়ি করে মামলার পাহাড় শেষ করা যাবে না।

আছে যেখানে কেস ডাইরি পাওয়া যাচ্ছে না। বছরের পর বছর অনেক খুনের মামলাও এভাবে পড়ে আছে বিনাবিচারে। কলকাতা হাইকোর্টের তালিকায় ১৯৬৬ সালের মামলাও আছে। বিশ বছরে মামলার ফয়সালা হয়নি, গত শতাব্দীর মামলা এ শতকেও চলে এসেছে এমন দৃষ্টান্ত আছে।

এ ছাড়া রাজনৈতিক কারণে পুলিস প্রভাবিত হলে তার ফল আদালতেও পড়বে। মানুষ সুবিচার পাবে না। হয় অভিযুক্ত খালাস হবে, নয় মামলা পড়ে থাকবে, রেকর্ডই মিলবে না। একাধিকবার আদালত এ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু প্রশাসন শোনেননি সে কথা।

রাজনৈতিক প্রভাবের একটি নিদর্শন তুলে ধরি। পুলিস ওমরকে ধরে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরালো। ঘটা করে রিপোর্টার ডেকে তা বলল। ওমরের হেনস্তায় আপত্তি করছি না। কিন্তু ভাল্লুক বা বরাহনগরের পরিচিত সমাজ বিরোধীদের পুলিস ধরছে না কেন? তারা শাসক দলের আশ্রয় পুষ্ট বলে? এ অবস্থায় পুলিসের উপর বিশ্বাস হারিয়ে অনেক সময় 'অপরাধী'কে লোকে আজকাল পিটিয়েই মেরে ফেলে। বড়বাজারে তো দুজনকে হুক দিয়ে খুঁচিয়েই মেরে ফেলা হল। মধ্যযুগীয় অন্ধকারের কথা এরপর আর বলি কোন মুখে? তবুও বড়বাজারের ঘটনার পর শাসক দলের এক অতি অনুগত পদস্থ পুলিস অফিসার ফাইলে নোট লেখেন: ভগবানকে ধন্যবাদ, কোনও কালো গাউন এই দুই সমাজবিরোধীর জামিনের জন্য দাঁড়াবেন না। এখানে পরোক্ষে আদালতের ঘাড়েই দোষ চাপানোর চেষ্টা হল। পুলিস নিজের তদন্তের অক্ষমতা ও অসম্পূর্ণতা ঢাকতে মানুষকে নিজের হাতে আইন তুলে নিতে প্ররোচিত করলেন। এটাকেই কি জঙ্গলের আইন বলে না? ওই পুলিস অফিসারের প্রমোশন হয়েছে। কারণটা রাজনৈতিক।

এভাবেই পুলিসি তদন্তের গাফিলতিতে ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে গাদা গাদা আসামী ছাড়া পেয়ে যায়। ফলে যে লোক আগে একটা চড় মারতে সাহস করত না, সেও অনায়াসে ছুরি চালিয়ে দেয়। সমাজে অপরাধ বাড়ে। এজন্যই নিষ্পত্তিহীন মামলার শতকরা হার বেড়েছে অসম্ভব।

বৃটেনেও এখন ফৌজদারি মামলা পরিচালনার ভার পুলিসের হাত থেকে নিয়ে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস করা হয়েছে। আমাদের দেশে আগেই পিপিদের হাতে এসেছে মামলা পরিচালনার ভার। লন্ডনে এক স্কাই স্ক্র্যাপারের ২৫ তলায় ওদের অফিসে গিয়েছিলাম। সবই কম্পুটারে চলছে। তবুও সর্বশেষ পরিসংখ্যান নেই। প্রশ্ন করেছিলাম, "কেন এই নতুন সার্ভিস করলেন? পুলিস ঠিকমতো কাজ করছে না? কেসে দেরি হচ্ছিল কি?" ক্রাউন প্রসিকিউটর বলেন, "ঠিক তা বলব না। তবে ইংলন্ডে এক এক জায়গায় এক এক রকম নিয়ম চলছিল। সব কেন্দ্রীভূত করা হল। কেসে চার্জ দেবার আগে পুলিস যদি আমাদের কাছে আসে তবে আমরা

বলে দিই কোন কেস একেবারে বাজে। ওসব বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।"

অর্থাৎ কেস কমানোর জন্য ওরাও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কারণ অতিরিক্ত কেসের চাপে বৃটেনও খুব বিব্রত। ১৯৮৫-৮৬-তে ইংলন্ড এবং ওয়েলসে ৩৪ লক্ষ ফৌজদারি মামলা হয়েছে। তার মাত্র শতকরা ৩৫ ভাগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। বাকিটা এখনও অমীমাংসিত।

পশ্চিমবঙ্গে খুন, ছিনতাই, ডাকাতির কেস বেড়েছে। এই মুহূর্তে এ রাজ্যে ষোল লক্ষ মামলা ঝুলছে। তার অধিকাংশই ক্রিমিন্যাল কেস। সব থেকে বেড়েছে পেটি কেস। যার একটি কারণ বেকার সমস্যা। কোনও কাজকর্ম না পেয়ে ছোটখাট অপরাধ করে বাঁচার চেষ্টা ক্রমেই বাড়ছে। সমস্ত ভারতের মধ্যে ছোটখাট মামলায় পশ্চিমবঙ্গই সবার শীর্ষে। গোটা ভারতে যত ছোটখাট কেস হয় তার শতকরা ১৬ ভাগই পশ্চিমবঙ্গে। অথচ মহারাষ্ট্রে সকাল সন্ধ্যায় আদালত ছুটির সময় স্পেশাল জজ দিয়ে অল্পকালের মধ্যে দু লক্ষ পেটি কেসের ফয়সালা করেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও রাস্তা নিলই না। বড় কেসে সবার উপরে উত্তর প্রদেশ। সমগ্র দেশের মোট যত বড় কেস হচ্ছে তার শতকরা ৩৮ ভাগই উত্তর প্রদেশে। বকেয়া মামলাও সেখানেই বেশি। তারপর কলকাতা। কলকাতায় বড় কেসের সংখ্যা সমগ্র দেশের শতকরা ২·৮ ভাগ।

সমগ্র ভারতে নতুন কেসের সংখ্যা ভয়াবহ ভাবে বেড়ে গিয়েছে একথা সব আইনবিদই বলছেন। বলছেন বিচারপতিরাও। কিন্তু কি করে কমানো যাবে কেস? আদালতের দরজা তো লোকের কাছে বন্ধ করে দেওয়া যায় না। তাই সবাই বলছেন—মামলার কারণগুলি দূর করুন। প্রতি মাসে ভারতে এখন সাত লক্ষ করে নতুন মামলা হচ্ছে। ১৯৮০-র জানুয়ারি-মার্চ তিনমাসে হয়েছিল ১৯ লক্ষ। তারমধ্যে বড় কেসের সংখ্যাই আড়াই লক্ষ। যত বিচারপতি আছেন তাদের পক্ষে এ মামলা সামলানো সম্ভব নয় একথা দেশের বহু হাইকোর্ট বলেছেন।

অশোক সেন যখন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী ছিলেন তখন বলেছিলেন, কলকাতা হাইকোর্টে ৫০ জন বিচারপতি করা হবে। কিন্তু এখন বিচারপতি আছেন ৪২ জন। রাজ্যের প্রাক্তন বিচারমন্ত্রী মনসুর হবিবুল্লাহ বলেছিলেন, বিচারপতির সংখ্যা বাড়িয়ে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করা যাবে বলে তিনি মনে করেন না।

তবে কি করা যাবে? প্রতি বছর শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধেই মামলা হচ্ছে ১৫ হাজার। ৭ হাজার কেসের নিষ্পত্তি হয়, বাকি বকেয়া পড়ে থাকে। ১৯৮০ সালে যে মামলা দায়ের হয়েছে ১৯৮৭ সালেও সরকারের পক্ষে তার উত্তর যায়নি।

বকেয়া মামলার নিষ্পত্তির জন্য বিশটি নতুন আদালতের সুপারিশ করা হয়েছিল। রাজ্য অর্থ দফতর তাও নামঞ্জুর করেছেন। অথচ রাজ্যের হয়ে মামলা লড়তে রাজ্য সরকার তার তালিকাভুক্ত আইনজীবীদের বছরে ফি দিচ্ছেন ষাট লক্ষ টাকা।

নিম্ন আদালতে ত্রিশটিরও বেশি মুন্সেফ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের পদ খালি পড়ে আছে। নতুন আদালতও হচ্ছে না। মামলা এগোবে কি করে? আগে এক একজন ম্যাজিস্ট্রেটের ফাইলে গড়ে ছয় শ মামলা থাকত। এখন থাকছে পাঁচ হাজার। ফলে একটি দিনে শুনানি না হলে পরবর্তী তারিখ পড়তে চার মাস। ফলে মামলা ঝোলে।

মামলা ঝুলিয়ে ইনজাংশন নিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা বৃটেনেও আছে। প্রেসের সঙ্গে সরকারের দীর্ঘ লড়াই চলছে স্পাই কেস নিয়ে। প্রাক্তন এক ব্রিটিশ স্পাই তার জীবনকথা লিখেছেন। সে বই আটকানোর জন্য বৃটেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মামলা করে যাচ্ছেন। ওখানকার প্রেসে এ নিয়ে দারুণ হৈ চৈ।

শুরুতেই যা বলেছিলাম বিরোধের একটি প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হল নারী। মধ্যযুগে পাশ্চাত্যে ডুয়েল লড়ে এ সমস্যার সমাধান হত। এদেশে যখন ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে তখনও দুই সাহেব এই কলকাতায় ডুয়েল লড়েছেন এক ইংরেজ প্রেয়সীর অধিকার কামনায়। এখন তো আর তা সম্ভব নয়। তাই একদিকে যেমন আছে বাড়ি থেকে পালানো, ছেলেমেয়ে নিয়ে ঝামেলা, অপ্রাপ্ত বয়স্কা বলে অভিভাবকদের কেস, অন্যদিকে অত্যাচারিতাদের কাহিনী। ব্যক্তি সচেতনতা বৃদ্ধি ও সহিষ্ণুতা কমার সঙ্গে সঙ্গে হালে ডিভোর্স খুব বেড়েছে। আগের মতো অনেকেই পারিবারিক সামঞ্জস্য বিধান করতে পারছেন না। আলিপুরেই জমেছে অজস্র ডিভোর্স কেস। বিচ্ছেদ চাই। স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে থাকতে পারছি না। আলিপুরে নিজে দেখেছি একটি ডিভোর্স কেস ১৩ বছর চলছে। কোনও মানে হয়। যাঁরা একসঙ্গে থাকবেনই না, জোর করে ধরেবেঁধে কি রাখা যায় তাঁদের। পরিত্যক্তা স্ত্রীকে খোরপোষ দেবেন না, এ নিয়েই যত গোলমাল। যত শাহবানুর মামলা। শুধু ওই শাবহবানুই আলোড়ন তুলল। খোঁজ করে দেখুন, কত ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি, বসু তাঁদের স্ত্রীকে খোরপোষ না দেবার জন্য বছরের পর বছর আইনের কূট ধারার সাহায্যে লড়ে যাচ্ছেন। এভাবেই তো মামলা জমছে।

সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি বলেছেন, স্বামী স্ত্রী যদি ছয় মাস আলাদা থাকেন ও বিচ্ছেদ চান তবে তা দিতেই হবে। এখন দিনে আলিপুরেই দু তিনটি ডিভোর্সের মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে।

এবার আসি দ্বিতীয় প্রসঙ্গ অর্থাৎ জমির ব্যাপারে। আদিকালে মানুষের যাত্রাই শুরু হয়েছিল জমির অধিকার নিয়ে। এ থেকেই রাজ্য জয়। তারপর প্রজাবর্গের পরস্পরের জমি দখল। মাটি নিয়ে লাঠালাঠি। কোথায় আইন, কোথায় আদালত। তারপর সেই হানাহানির দিন গেল, এল আইনের শাসন। সেখানেও কিন্তু জমির ব্যাপারে বল প্রয়োগের ব্যাপারটা একেবারে উঠে গেল না। লেঠেলের জোরে জমি রাখা, সেরেস্তার জোরে আইন ঠেকানো—এই নিয়েই তো চলল জমিদারতন্ত্র।

স্বাধীনতার পর জমিদারি প্রথা উঠে যেতে লোকে বলতে শুরু করলেন এইবার মামলা একেবারেই কমে যাবে। আইনজীবীরা না খেয়ে মরবেন। জমিদারই নেই আর মামলা লড়বে কে? কিন্তু জমিদারি প্রথা উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলো ভূমি সংস্কার আইন, জমি সিলিং আইন। বর্গা রেকর্ড এবং শহর সম্পত্তির সীমা নির্ধারণ আইন। মামলায় মামলায় আদালত ভরে গেল।

জমি সিলিং আইন কার্যকর করতে গিয়ে সরকার পড়লেন মামলার মুখে। সরকারে ন্যস্ত জমি নিয়ে মামলা শুরু হল হাজারে হাজারে। জমি পড়ে রইল। দখল হল। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট আমলে সেই জমি দখল নিয়ে শুরু হল রক্তাক্ত সংঘর্ষ। লাসের পর লাস পড়ল ফসলের ক্ষেতে। এদিকে জমি দখল আদেশের বিরুদ্ধে জমা হতে লাগল রিট আবেদনের পাহাড়। গ্রামের সাধারণ চাষীও বুঝে গেলেন সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ কি জিনিস!

তারপর এলো পশ্চিমবঙ্গে বর্গা অপারেশন। মামলা আরও বাড়ল। বর্গা রেকর্ড হলে তার বিরুদ্ধে রিট আবেদন ও স্থগিতাদেশ নেওয়া হয় প্রায়ই। যতদিন সেই আবেদনের নিষ্পত্তি না হয় ততদিন তো আইনত মালিকই জমির ভোগ দখল করেন। ইনজাংশন দিয়ে বারো বছর এভাবে জমি দখলে রাখার ঘটনাও আছে। মূল মামলার বিচারই হয় না। শুধুই ইনজাংশন। আর ইনজাংশন তুলতেই প্রাণান্ত। কালক্ষয়।

হাইকোর্টের আদেশ না মেনে জমির দখল নেওয়া ও গায়ের জোরে বর্গাদার বসানোর নজিরও এরাজ্যে বড়ই বেশি। সেই গায়ের জোরের আইন। আইনের রাজত্বের এবং প্রতিষ্ঠানগত কর্তৃত্বের বিরোধী একটি ধারা। বৈপ্লবিক ধারা নামেই পশ্চিমবঙ্গে যার পরিচিতি। বিচারালয়ের অধিকার খর্ব করাই যেন এর উদ্দেশ্য। মনে পড়ে ১৯৭১ সালে এসপ্লানেড ইস্টে প্রায়শই শোনা যেত একটি স্লোগান: হাইকোর্টে কামান দাগো। অর্থাৎ হাইকোর্টের কর্তৃত্বকে খর্ব কর। জোর করেই জমির দখল নাও। সেই আদিম ও মধ্যযুগীয় 'লাঠি যার মাটি তার' নীতির পুনরাবির্ভাব।

কলকাতা হাইকোর্টে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যত রিট আবেদন জমা পড়েছে তার অধিকাংশই বর্গা রেকর্ডে আপত্তি জানিয়ে। এর জমি ওর নামে বর্গা। জোর করে অপরের জমিতে বর্গা। জমি বাঁচাতে মানুষ ছুটে আসছেন হাইকোর্টে। এর সঙ্গে এসেছে শহরে জমির মূল্য বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া। কলকাতায় তীব্র বাসস্থান সংকট। বাড়ির ভাড়া বাড়ছে হু হু করে। জমির দর বৃদ্ধির কোনও সীমা নেই। শহরে ফাঁকা জমিও নেই। সুতরাং যে কোনও উপায়ে জমি বা বাড়ি থেকে লোককে উচ্ছেদ করে সেখানে তুলতে হবে স্কাই স্ক্র্যাপার। অর্থাৎ গগনচুম্বী পায়রার খোপ। সরকার ভাড়ার জন্য প্রয়োজনীয় ফ্ল্যাটও বানাতে পারছে না। চাহিদার তুলনায় সরকারি প্রচেষ্টা নগণ্য। সুতরাং বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলেছে বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটের প্রবল সংঘাত। সমাজের এই সংঘাতও এসে আছড়ে পড়ছে আদালতে।

আদালতকে সবার কাছে সহজলভ্য হতে হবে

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

এক শ্রেণীর ধনী ব্যক্তি বিচারব্যবস্থার সুযোগ নিচ্ছেন বলে সি পি এম নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় এম পি মনে করেন। তিনি বলেন, সমাজব্যবস্থাই এমন হয়েছে যে যাঁদের সাহায্য দরকার তাঁরা সাহায্য পাচ্ছেন না। ওদিকে বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে কর-ফাঁকি আটকানো যাচ্ছে না। যে-সব গরিব ব্যক্তির সত্যিই আইনগত সাহায্য দরকার তাঁরা দেখছেন সে রাস্তা বন্ধ। কারণ বিচার প্রার্থনাই এক ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গরিব মানুষ সুপ্রিম কোর্ট দূরস্থান অন্য আদালতেই যে যাবেন তার পয়সা কোথায়। কাজেই অনেক সময়ই বর্তমান বিচার-ব্যবস্থা এক শ্রেণীর সুবিধাভোগীর স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ব্যক্তিগতভাবে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। তাঁরা সঠিক। কিন্তু দেশের এক ছোট্ট অংশই ধনী। আইন আদালতের সাহায্য পাওয়ার মতো আর্থিক অবস্থা তাঁদেরই আছে। তাঁরাই সুযোগ পান। সঙ্গতিহীনদের আইনগত সাহায্য দেওয়ার যে কথা কেন্দ্রীয় সরকার বলে থাকেন সে পদ্ধতি এত জটিল যে যথার্থই দরিদ্র ব্যক্তির কাছে সে সহায়তার হাত সম্প্রসারিত হয় না। প্রায়ই গরিবদের আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু ওই পদ্ধতি এত জটিল ও সময় সাপেক্ষ যে তাঁরা কোনও সুযোগই পান না।

লোক-আদালতেও তেমন কাজের কাজ কিছু হবে বলে তিনি মনে করেন না। বড় লোকের সঙ্গে যখন গরিবের মামলা হবে তখন ধনীরা সেই লোক-আদালতের বিচার মানবেন কেন? তাঁরা তো সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত চলে যাবেন। গরিব মানুষ সুপ্রিম কোর্টে আসবেন কি করে? অন্য কথা ছেড়েই দিলাম—দিল্লি এসে তাঁরা থাকবেন কোথায়?

সোমনাথবাবু বলেন, চাকরি সংক্রান্ত ও বাড়িভাড়া সম্বন্ধীয় হাজার হাজার মামলা সুপ্রিম কোর্টে জমে যাচ্ছে। ভাড়াটে-বাড়িওয়ালার মামলা ক্রমেই বাড়ছে। গরিব বিধবা বাড়িওলার মামলাও তো আছে। অথচ সে-সব মামলার নিষ্পত্তিই হয় না। তাঁরাও তো কষ্ট পাচ্ছেন।

তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস সুবিচার করতে হলে আদালতকে সবার কাছে সহজলভ্য করতে হবে। বিশেষ করে দেখতে হবে সাধারণ মানুষও যাতে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের সুযোগ পেতে পারেন।

মোকদ্দমার অস্বাভাবিক সংখ্যা বৃদ্ধিও মামলায় দেরি হওয়ার একটি কারণ একথা সোমনাথবাবুও মনে করেন। তাঁর ধারণা, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষে মানেরও অবনতি হয়েছে। মামলায় ভিড় কমাতে চাকরির ব্যাপার, ট্যাক্স, কাস্টমস এসব কেসকে হাইকোর্টের বাইরে নিয়ে আসা উচিত বলে তিনি মনে করেন। পশ্চিমবঙ্গে বিক্রয়করকে তাঁরা বের করে এনেছেন।

তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে রিট আবেদন বড় বেশি হয়। দিল্লি হাইকোর্টে যেখানে দিনে রিট আবেদন আসে দুটি কি তিনটি, কলকাতায় তার সংখ্যা হবে দু শ থেকে তিন শ। তা ছাড়া কলকাতা হাইকোর্টে তো বাস এসপ্লানেড থেকে বক্রেশ্বর যাবে না অন্যত্র, সে রুট ঠিক করে দেবার আবেদনও আসে। ইনজাংশনও হয়। মামলায় দেরির এও একটা কারণ।

যত মামলা জমেছে তার একটা বড় অংশই বাড়িওয়ালা বনাম ভাড়াটে। পশ্চিমবঙ্গ বাড়ি ভাড়া আইন এতো জটিল যে সেজন্য উচ্ছেদের মামলা ঝুলে থাকে। বাড়িওয়ালা শুধু নিজের প্রয়োজনে ভাড়াটে উচ্ছেদ করে বাড়ি পেতে পারেন। বাড়িওয়ালার যে সত্যিই অতিরিক্ত জায়গা দরকার তা তাঁকে প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু ভাড়াটে যদি কম ভাড়ায় থেকে নিজে অন্যত্র বাড়িও করেন তবুও তাঁকে উচ্ছেদ করা চলবে না। এই আইনের প্রতি ধারায় এতো জটিলতা যে একটু তৎপর হলেই কম করেও বারো বছর ঝুলিয়ে রাখা যায় মামলা।

এমন কেসও আছে যেখানে ভাড়াটে হাইকোর্ট থেকে একতরফা ইনজাংশন নিয়েছেন। সেদিন তাঁর উল্লাসের অন্ত নেই। বাড়িওয়ালা সলিসিটারকে ফোন করতে তিনি পরিহাস করে বলেন ও আদার সাইড ইনজাংশন পেয়ে গিয়েছেন। তাহলে ভাই কত বছর ঝুলতে হবে বলতে পারি না। নাতির বয়স কত? তাঁকেই বলে যাবেন। মামলা লড়বে।

এই আইনটি যে অতি জটিল তা রাজ্য সরকার জানেন। সেজন্যই রাজ্য সরকার তাঁর নিজেদের কর্মীদের যে কোয়ার্টার দেন সেখানে তাঁদের এই আইনের রক্ষাকবচ দেওয়া হয় না। বামফ্রন্ট সরকার এজন্য নতুন আইন করেছেন। যাতে অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি কর্মীকে পুলিস দিয়ে বের করে দিতে পারবেন। তাহলে বাড়িভাড়ার অন্য আইনটি এভাবে সরল করা হয় না কেন? টেনান্ট অ্যাসোসিয়েশন, বলেন তাহলে বাড়িওয়ালার জুলুমে অস্থির হতে হবে। হরদম কথায় কথায় ভাড়াটে উচ্ছেদ করে তাঁরা বেশি ভাড়ায় নতুন ভাড়াটে বসাবেন। এমনিতেই তো জলকল বন্ধ করা গুণ্ডা লাগানো লেগেই আছে।

আবার এই শতকের বিশের দশকে মাসে হাজার দুয়েক টাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেই সাবলেট করেছেন। মাসে প্রায় আধ লাখ টাকা ভাড়া কমাচ্ছেন। বাড়িওয়ালা তাকে তুলতে পারছেন না।

ছেলের বিয়ে দেবেন তাই জায়গা চাই। কিন্তু মামলা করে ভাড়াটে ওঠেন না। গৃহকর্তা মারা যান। অতএব এখন সে ঘরেই তো ছেলে বউ থাকতে পারবেন। বিধবা মা পাশের ছোট বারান্দা ঘিরে থাকবেন। সুতরাং ঘরের প্রয়োজনই তো চলে গেল, আর কেন ভাড়াটে উচ্ছেদ?

আবার ভাড়াটে উচ্ছেদের জন্য জীর্ণ বাড়ি মেরামত করা হচ্ছে না। বাড়ি ভেঙে পড়ছে। ভগ্নস্তূপে চাপা পড়ে লোক মরছেন এমন নজিরও আছে।

১৯৬৮ সালে কুমিল্লার এক কলেজ অধ্যক্ষ কলকাতার পার্ক সার্কাসে একটি বাড়ি কিনেছিলেন। তাঁর মেয়ে এখানে থাকেন। ভাড়াটে বলে দিলেন—তাঁরা ভারতের নাগরিক নন। বাড়িটি শত্রু সম্পত্তি বিভাগে বর্তাক। ভাড়া দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ১৮ বছরে আজও সে মামলার ফয়সালা হয়নি। বৃদ্ধ অধ্যক্ষের স্ত্রী মারা গিয়েছেন। ছেলে বিলেতে। মেয়ে এখনও বাড়ির অধিকার পাননি।

এত বিশদে এই মামলার কথাগুলি লিখছি কোনও ভাড়াটেবিরোধী মনোভাব নিয়ে নয়। শহর কলকাতায় এই সমস্যাটি এখন অতি তীব্র এবং আদালতে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেই এতো কথার অবতারণা। আদালতে গিয়ে ভাড়াটে উচ্ছেদ হবে না, এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। তা থেকেই জন্ম নিয়েছে বহু মস্তান বাহিনী। হচ্ছে বোমবাজি। কখনও খুনখারাপি। সেসব কেসও আসছে আদালতে। মামলা বাড়ছে। বিচারে বিলম্ব হচ্ছে। এ এক পাপচক্র। তাই অনেকেই এখন বলছেন বাড়িভাড়া আইনটি বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশোধিত হোক। নইলে কলকাতায় নতুন বাড়ি হবে না। বাড়ি ভাড়া সমস্যা আরও বাড়বে। আদালতেও এরকম মন্তব্যও হয়েছে। কিন্তু কেউ কর্ণপাত করেননি।

অধুনা সরকারের বহু ঠিকদারি নিয়েও গোলমাল দেখা দিয়েছে। সে-সব মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সালিশি হচ্ছে। অথচ প্রায় পাঁচ কোটি টাকা জড়িত আছে এমন সালিশি ঝুলছে। একটি দৃষ্টান্ত : ১৯৭৫-৭৬ সালে রাজ্য সরকার ঠিক করেন মুণ্ডেশ্বরী নদীতে বাঁধ দেবেন। সেই অনুসারে ঠিকা বিলি হয়। ঠিকাদাররা কিছু কাজও করেন। বামফ্রন্ট এসে বললেন—ওই বাঁধের দরকার নেই। তাঁরা ঠিকা বাতিল করে দিলেন। ঠিকাদাররা অভিযোগ করলেন তাঁরা বহু টাকা খরচ করে ফেলেছেন। ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আজও এই সালিশির ফয়সালা হয়নি। ১২ আগস্টও একটি বৈঠক হয়ে গেল।

১৯৭৪-৭৫ সালে এক বিভাগীয় পোস্টমাস্টার ৯ হাজার টাকা খাজনা জমা নেন বলে এক ব্যক্তিকে রসিদ দেন। ওই ব্যক্তি বলেন টাকাটা এখনই এনে দিচ্ছি। সে টাকা আর জমা পড়েনি। অডিটে ধরা পড়তে পুলিস ওই পোস্ট-মাস্টারের বিরুদ্ধে একটি কেস করেন। ইতিমধ্যে ওই পোস্ট মাস্টার চাকরি ছেড়ে দেন। টাকাও জমা দেন। পুলিস মামলাও করে না। মাঝে মাঝে এসে খালি শাসায়। এর বিরুদ্ধে ওই পোস্ট-মাস্টার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। পুলিস কেসটির ফয়সালা করুক। নইলে কেস তুলে নিক। আজও পুলিস সে কেস ঝুলিয়ে রেখেছে।

সমাজ বদলেছে। সেই সঙ্গে বদলেছে আইন। রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে গ্রামের সুদূর কোণেও। আগে বহু গ্রাম্য বিবাদই সালিসীতে মিটে যেত। কিন্তু আজকাল আর তা সম্ভব নয়। কারণ পঞ্চায়েতিরাজের দয়ায় আজ প্রতিটি গ্রাম রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত। বিভক্ত বহু পরিবারও। ছেলে মেয়ের বিয়ে নিয়েও দেখা যাচ্ছে গ্রাম্য কলহ ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক সংঘর্ষের রূপ নিচ্ছে। কে মেটাবে ওই বিরোধ? এক পক্ষ এসে বলছেন আমরা কংগ্রেস, অন্যপক্ষ দাবি করছেন আমরা সি পি এম। সুতরাং লড়ে যাব।

লড়াইটা হবে কোথায়? গ্রামের মাঠ থেকে চলে এলো আদালতে ও উকিলের সেরেস্তায়। তারপর ঘোর। সংবিধান মানুষকে দিল ব্যক্তিস্বাধীনতার মৌলিক অধিকার। কিন্তু সেই অধিকারের সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য করল না উপযুক্ত

ব্যবস্থা। দিল না উপযুক্ত সংখ্যক বিচারক। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখেছি আদালতগুলির সেই একই রকম জীর্ণ অবস্থা। বটগাছের ঝুরি নেমেছে। নথিপত্রও সেই বটগাছের মতোই প্রাচীন। আলিপুরে প্রশাসনের বাড়ি হল ঝকঝকে। তার পাশেই আদালত পড়ে রইল সেই পুরানো টিনের চালায়। যে খাঁচার মতো ঘরে বসে হাকিমরা বিচার করেন সেখানে দু ঘণ্টা দাঁড়ালে হাঁফ ধরে যায়। তাঁদের স্টেনো নেই। নেই বসার ও রেকর্ড রাখারও সুষ্ঠু ব্যবস্থা। অথচ প্রশাসনিক কর্তাদের সুবন্দোবস্তের অন্ত নেই। আলিপুর, ব্যাঙ্কশাল বা শিয়ালদহ কোর্টে গেলে প্রায়ই শুনি, কোনটি ছিল আলিবর্দির নাচঘর, কোনটি সিরাজউদ্দৌলার আস্তাবল। কিন্তু আজও তাদের আস্তাবল করে রেখে তাঁদের কাছে সুবিচার চাইতে হবে এটাই বা কোন বিচার? একই বাসে হাকিম ও বিচারাধীন অভিযুক্ত চলেছেন, আদালতের পর। ওই হাকিমই হয়ত কিছুক্ষণ আগে অভিযুক্তটির বিচার করেছেন কোনও গুরুতর অপরাধে। এখানে হাকিমের জীবনের ঝুঁকি কে নেয়?

বিচার বিভাগকে দেখে মনে হয় যেন দুয়োরানীর ছেলে। ভাগ্যের পরিহাসে রাজা তার কাছেই চাইছেন ন্যায়বিচার। প্রজারা সর্বত্র অত্যাচারিত হয়ে ছুটে আসছেন তারই দ্বারে। স্বাধিকারবোধ মানুষকে এতো বেশি আদালতমুখী করেছে। কারও চাকরি গিয়েছে, কেউ বদলি হয়েছেন দূর গ্রামে, কেউ হয়েছেন সাসপেন্ড, কারও জমি গিয়েছে, কেউ পেয়েছেন উচ্ছেদের নোটিস, কারও বাবা মারা যেতে ভাই ঠকিয়ে নিয়েছে পৈতৃক সম্পত্তি, কোথাও বিধবার বাড়ি দখল করেছে দুঁদে ভাড়াটে, কোথাও বিধবা ভাড়াটেকে উচ্ছেদের নোটিস দিয়েছে দুর্দান্ত বাড়িওয়ালা—এইসব অশান্তি, এইসব অশান্ত অবস্থা থেকেই মামলার উৎপত্তি। সবাই আসেন আশু বিপদটা ঠেকিয়ে বর্তমান অবস্থানটা বজায় রাখতে। এত মামলা সামলাবার মতো আদালত নেই। সেই সুযোগে একদল সুযোগ সন্ধানী, আইনের ফাঁক ফোকর ও মারপ্যাচে অজগরের মত জড়িয়ে ফেলে মক্কেলকে। মামলা আর শেষ হয় না। মক্কেল শেষ হয়ে যায়। আদালতের উপর অতিরিক্ত আস্থাই যেন আজ বিচার ব্যবস্থার এই দুরবস্থার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদল উকিল থেকে মুহুরী পর্যন্ত এক বিরাট চক্র। লোকে বলতেই বলেন, আদালতের দেওয়ালগুলিও যেন হাঁ করে আছে। কিছু না ঢাললে মামলা এগোবেই না। ফাইল হাকিমের টেবিলে উঠলে তবে না বিচার। তা ছাড়া প্রায়ই নিম্ন আদালতের যে কোনও আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট থেকে ইনজাংশন নিয়ে মামলা আটকে রাখা হয়। মূল মামলার শুনানিই হয় না। ইনজাংশন তুলতেই প্রাণ যায়।

এ সত্ত্বেও যে বিপন্ন মানুষ আদালতে এসে দাঁড়ান, তাতে কিন্তু ইনস্টিটিউশন হিসাবে বিচারালয়ের উপর আস্থাই প্রকাশ পায়। বিচারের

জরাজীর্ণ শিয়ালদহ কোর্ট

আশায় আদালতে ঢুকে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত মানুষগুলি যখন নিরাশায় ভেঙে পড়েন তখন সেই আস্থাই টলে যায়। গোটা বিচার ব্যবস্থার উপরই মানুষ আস্থা হারায়। বিপদটা এখানেই।

এই বিপদ সম্পর্কেই সুপ্রিম কোর্ট, বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্ট, বিচার-মন্ত্রী, বার লাইব্রেরি, জুডিসিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন সবাই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন, আইনের সরলীকরণ ও মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির কথা। অকারণে মামলা না করে আদালতের বাইরে বিরোধ নিষ্পত্তির কথা। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আইন সরল তো হয়ইনি বরঞ্চ ধারা উপধারার প্যাচে আরও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে—বিচার প্রার্থীদের। তোর ঘরে মামলা ঢোকার, অভিশাপটি যেন আজ আক্ষরিক অর্থেই সত্য হয়ে উঠেছে। আদালতে একবার ঢুকলে আর বেরোবার পথ নেই।

মানুষের এই দুর্ভোগ ও হয়রানির কথা রেখেছিলাম কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জির কাছে। তিনি বলেন, আইনের কাঠামোর মধ্যেই আমাদের বিচার করতে হয়। আইনের বিভিন্ন ধারা উপধারার অপব্যবহার করে অনেকেই অনেক সময় প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করেন। এত মোকদ্দমা সীমিত সংখ্যক বিচারপতি নিয়ে সামলানো সম্ভব নয়।

রাজ্যের লিগাল রিমামব্রান্সার অবনীমোহন সিংহ বলেন, যেখানে যত টাকার জোর সেখানে মামলা চলে তত বেশিদিন। তাঁর বাবা কালীপ্রসন্ন সিংহ, ছিলেন অ্যাডভোকেট। তাঁকে এক মুহুরী এসে বলেছিলেন, বাবু আপনি হেরে হেরে মামলাটা জিতিয়ে দিন তো। অর্থাৎ প্রতিপক্ষ গরীব। যিনি মামলা করেছেন তিনি বড়লোক। জানেন মামলায় হার হবে। তারপর আপিল। সেখানে হার। আবার আপিল। ততদিনে প্রতিপক্ষ ঘটিবাটি বেচে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে। আর মামলা করবে কি করে?

আলিপুরের জি পি পৃথ্বীশ বাগচী মনে করেন, মামলায় বিলম্বের একটি বড় কারণ দারিদ্র্য। কারণ টাকার অভাবে কোর্টগুলিকে আধুনিক করা যাচ্ছে না। প্রত্যেক কোর্টে স্টেনো পর্যন্ত নেই।

বহু আইনবিদই বলেন, মামলা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে স্থিতাবস্থা বজায় রেখে সুবিধাভোগী শ্রেণীর সুবিধা ভোগ করার এক হাতিয়ার।

কিন্তু সাধারণ মানুষ যাবেন কোথায়? তাঁদের তো এই ব্যবস্থার মধ্যেই বেঁচে থাকতে হবে। অবিচার হলে সুরাহার জন্য কোথাও তো তাঁরা যাবেন, প্রতিকারের আশায়।

সেই সুরাহা পেতে গিয়ে কি রকম অবস্থা হয় তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে দিই। বচ্চন সিং চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস-এর এক কর্মী। ২১-৯-১৯৬৩ চাকরি থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল। ১৯৬৩-তে তিনি এই আদেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। নভেম্বর ১৯৬৪-তে সেই কেস শুনানির জন্য উঠল। সরকার পক্ষে দাঁড়ালেন কলকাতার শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টার এলিয়াস মেয়ার। তিনি বললেন, আবেদন ত্রুটিপূর্ণ। আবেদনে সই আছে তারিখ নেই। আবেদন ডিসমিস হয়ে গেল। বলা হল নতুন করে আবেদন করতে। বচ্চন সিং-এর পক্ষে দাঁড়াল ব্যারিস্টার গোপাল চক্রবর্তী। ১৯৬৫-র এপ্রিলে নতুন আবেদন হল। সেটিও খারিজ হয়ে গেল। এই সময় আবেদনকারী তাঁর স্ত্রী ছটি ছেলেমেয়েকে কলকাতায় তাঁর আইনবিদের বাড়িতে রেখে দেশে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে হাইকোর্টে একটি আপিল ফাইল করে যান। ১৯৭১-এ একবার উঠল মামলা। আদেশ হল আবার সরকারের উপর কারণ দর্শাবার নোটিস জারি কর। সেই মামলা উঠতে উঠতে বচ্চন সিং মারা গেলেন।

ইতিমধ্যে তিনি ছেলেমেয়ে স্ত্রীকেও দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবার স্বামীর বদলে স্ত্রী মামলা লড়তে এলেন। সেই মামলা ঘুরতে ঘুরতে ১১-১০-৮৫ বিচারপতি অজিত সেনগুপ্তর সামনে আসে। শুনানি শেষ হয়েছে। অর্থাৎ ২২ বছর চলেছে এই মামলা।

চাকরির সুযোগ সুবিধার জন্য বহু আইন হয়েছে। সেই আইনের সুযোগ পেতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কতটা সময় লাগতে পারে এটা তারই নিদর্শন। মামলা করে রিলিফ পাবার আগে আবেদনকারী মারাই গেলেন। এখনও তাঁর স্ত্রী স্বামীর পেনশন গ্র্যাচুইটির আশায় দিন গুনছেন। এর মধ্যে এ ধরনের মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে সরকার একটু নড়ে চড়ে বসছেন।

দুর্নীতির দায়ে বহু সরকারি কর্মী ও সরকারের সঙ্গে লেনদেনে রত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সি বি আই হানা দেয়। সি বি আই-র কেসগুলি যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেজন্য ব্যাঙ্কশাল কোর্টে আছে বিশেষ আদালত। এই আদালতের অন্যতম বিচারক এ কে চক্রবর্তী বললেন, সেখানে শতকরা নব্বইটি কেসই সি বি আই-র। সেখানেও পুরোন কেস জমে গিয়েছে। আইন সরলীকরণের কথা তিনিও বললেন।

বিশেষ আদালতে ১৯৬৮ সালের ফৌজদারি মামলা এখনও চলছে। সরকারের সঙ্গে ট্রাকটারের ঠিকাদারি নিয়ে কয়েক কোটি টাকা জড়িত থাকার অভিযোগে। একাধিক ব্যক্তি অভিযুক্ত। প্রায়ই হাইকোর্ট থেকে স্থগিতাদেশ নেওয়া হচ্ছে। ২৩৫ জন সাক্ষী। সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে মাত্র ৩৫ জনের। ১৯ বছর যদি একটি ক্রিমিন্যাল কেস চলে তাহলে তার অবস্থা কি দাঁড়ায় আইনবিদরা সহজেই তা বুঝে যান।

এভাবেই পশ্চিমবঙ্গে আজ ষোল লক্ষ মামলার পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। তারমধ্যে ১৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ২৪১টিই নিম্ন আদালতে। কলকাতা হাইকোর্টে জমা মামলার সংখ্যা ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৭। ১৯৭৫ সালের মামলাও বাকি। হাইকোর্টে জমা মামলার মধ্যে বিরানব্বই হাজারই রিট আবেদন। সাধারণ মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে এইসব আবেদন করে আশায় আশায় দিন গুনছেন বছরের পর বছর। কিছুই পাননি। শুধুই নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে চলেছেন।

গোটা বিচার ব্যবস্থার উপর কি মানুষ আস্থা হারাচ্ছে! ছবি : রাজীব বসু

এখানে খুনের মামলারও ফয়সালা হয় না। এ প্রসঙ্গে বৃটেনের একটি সামাজিক ব্যবস্থার উল্লেখ করলে অবান্তর হবে না। সেখানে যদি কেউ কাউকে আঘাত করে, ছুরি মারে, এমনকি ঘরের বিবাদেও যদি কেউ আহত হন তবে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। মামলা চলতে সময় লাগবে। অপরাধী যতদিনে শাস্তি পায় পাক। কিন্তু নাগরিকের ধন-প্রাণ সম্পত্তি রক্ষা করার প্রাথমিক কর্তব্যে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। তাই আক্রান্তকে টাকা দেওয়া হবে এই মুহূর্তে। ১৯৮৪-৮৫ সালে বৃটেনে এরকম ১৯ হাজার ৭৭১টি ক্ষেত্রে মোট ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে সাড়ে তিন কোটি পাউন্ড।

এই সময় আমাদের দেশে ষোল লক্ষ পরিবার অপেক্ষা করে আছেন—কবে তাঁরা বিচার পাবেন সেই আশায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্ষতিপূরণ দেননি বটে, তবে বিচারপ্রার্থীর জন্য কোর্ট ফি বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিচার চাইতে গেলে এবার থেকে বিচারপ্রার্থীকে এরাজ্যে সরকারকে বেশি টাকা দিতে হবে। ■

ফাঁসির মঞ্চ

কিশলয় ঠাকুর

রাত ভোর হলেই ব্রহ্মহত্যা ঘটবে কলকাতায়। আতঙ্কিত, অগণিত ধর্মপ্রাণ নাগরিক আগের রাতেই কলকাতা পাপভূমি পরিত্যাগ করে নৌকোয় গঙ্গা পাড়ি দিয়ে হাওড়া চলে যান। সকালে ঘটল সেই নক্ষত্রপাত। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হল। শনিবার পাঁচ আগস্ট, সতের-শ' পঁচাত্তর সাল।

ফাঁসি তার আগেও হয়েছে অনেক এ-শহরে। জোব চার্নকের আমলে ফাঁসির মঞ্চ ছিল প্রকাশ্য রাস্তার পাশে ফাঁসি (ফ্যানসি) লেন-এ। ফাঁসির মঞ্চ আজ সেখানে নেই। ফাঁসিকাঠ আজও আছে, কারান্তরালে। আছে ফাঁসুড়েও। আছে খুনির জন্য ফাঁসির বিধান। খুনি আছে, খুন হচ্ছে, হচ্ছে না শুধু ফাঁসি। সম্প্রতি উপর্যুপরি কতকগুলি হত্যাকাণ্ড, বিশেষ করে নৃশংস বধূহত্যার ঘটনা এবং এর দায়ে কারও ফাঁসি না হওয়ায় জনচিত্ত প্রবলভাবে আলোড়িত। এই পটভূমিতে ফাঁসি প্রসঙ্গ আলোচনায় সঙ্গতকারণেই পিছন থেকে, নন্দকুমার থেকে শুরু করছি।

এসপ্ল্যানেডের দিক থেকে খিদিরপুর ব্রিজে উঠবার আগে ডানদিকে নন্দকুমার (বিদেশি রেকর্ডে নানকোমার)-এর ফাঁসির জায়গাটি ঘিরে রাখা হয়েছে। ফাঁসির সময় অবশ্যই ঘেরা ছিল না। ফাঁসি হল প্রকাশ্যে, হাজার হাজার লোকের চোখের সামনে। চতুর্দিকের জনবিক্ষোভ, চিৎকার, কান্নার সাগর কল্লোলের মধ্যে। এখন খুনেও ফাঁসি হয় না। সেদিন নন্দকুমারের ফাঁসি কিন্তু খুনের দায়ে নয়। অতি তুচ্ছ কারণ, ওয়ারেন হেস্টিংস-এর দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই নির্ভীক ব্রাহ্মণ দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিলেন, তাঁর স্বপক্ষে যে সব সাক্ষীর স্বাক্ষর ছিল তাদের একটি স্বাক্ষর নাকি জাল, এই অভিযোগ। এই সামান্য অভিযোগ প্রমাণ হলেও তখনকার ব্রিটিশ আইনে ফাঁসি হয় না। কিন্তু হল, নন্দকুমারকে পৃথিবী থেকে সরাতে। ছয় মে তারিখে তাঁকে গ্রেফতার করে রাখা হল সদর স্ট্রিটের এক বাড়িতে। বিচার করতেও আজকের মতো বারো বছর কেন, বারো মাসও লাগল না, মাত্র বারো দিন। ছয় জুন থেকে আঠারো জুন পর্যন্ত শুনানি সাঙ্গ এবং মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত। না, তদানীন্তন আইন মোতাবেক দণ্ডাদেশ প্রিভি কাউন্সিলের অনুমোদনের জন্যও পাঠানো হল না। তড়ি ঘড়ি পাঁচ আগস্ট ফাঁসি দেওয়া হল মহারাজ নন্দকুমারকে। বিচারের নামে এটি রাজনৈতিক হত্যা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রয়াস। এ ব্যাপারে জনমতের তোয়াক্কা করা হয়নি।

প্রতিহিংসা চরিতার্থ ছাড়া দণ্ডদাতাদের কোন উদ্দেশ্যই পূর্ণ হল না। ফাঁসি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল কলকাতার সেরিফ আলেকজাণ্ডার ম্যাক্রাবির ওপর। তাঁর ব্যক্তিগত নোট থেকে জানা যায়, ফাঁসির আগের দিন, চার আগস্ট সন্ধ্যায় তিনি মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁর কথাবার্তা এতো সহজ স্বাভাবিক ছিল যে ম্যাক্রাবির সন্দেহ হয়, মহারাজা বোধ হয় তাঁর আসন্ন ভবিতব্য সম্পর্কে সচেতন নন। তিনি তাঁর দোভাষিকে ব্যাপারটা ওঁকে বুঝিয়ে দিতে বলেন। দেখা গেল, মহারাজা দোভাষির কথাকে আমলই দিলেন না। তিনি হেসে বললেন, কাল সকালে কী হবে তা তিনি জানেন। ওসব নিয়ে তাঁর কোন চিন্তা নেই। ভাগ্যে যা আছে ঘটবে। তার দায় ঈশ্বরের।

টিকেন্দ্রজিৎ

ক্ষুদিরাম বসু

পরদিন সকাল সাতটায় বধ্যভূমে ম্যাক্রাবি যখন পৌঁছন তখন দূরে লোকারণ্য, চিৎকার। মহারাজা নিজের প্রার্থনা পর্ব সেরে যখন বলবেন, আমি প্রস্তুত তখনই ফাঁসির রজ্জু পরানো হবে। কিন্তু চতুর্দিকের চিৎকারে তো মহারাজার কথা শোনাই অসম্ভব হবে। তাঁকে ব্যাপারটা বলতে তিনি বললেন, আমি হাত তুলে ইঙ্গিত করব। কিন্তু ম্যাক্রাবি জানালেন, প্রথামতো তাঁর হাতদুটি যে রুমাল দিয়ে পিছনে বেঁধে রাখতে হবে। মহারাজা বললেন, তা হলে আমি পা তুলে ইশারা করব। মহারাজাকে জানাতে হল, আপনার ইশারা পেলে রজ্জু পরাবার আগে কাপড় দিয়ে আপনার মুখ ঢেকে দেবে আমাদের লোক। এতে কেবল তিনি আপত্তি জানালেন। মহারাজের পায়ের কাছে সর্বক্ষণ তাঁর এক ভৃত্য বসেছিল। মহারাজা তাকে দেখিয়ে বললেন, ও কাজটা আমার লোক করবে। ম্যাক্রাবি এতে সম্মত হন এবং তাঁর নোটে লেখেন, 'অন্তিম কাজ সহজেই হয়; এবং যে-বলিষ্ঠতার সঙ্গে তিনি ফাঁসির রজ্জু পরলেন, তেমন ঘটনা আর আমি কখনো দেখিনি বা শুনিনি।'

পরিষ্কার, রাজার মতোই চলে গেছেন নির্ভীক মহারাজ নন্দকুমার। এবং বিদেশী শাসকের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ব্যর্থ। কারণ তিনি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ফাঁসির রজ্জুভীতিকে মিথ্যে করে দিয়ে গেলেন।

এরও এগারো বছর আগে সিপাহি বিদ্রোহের নায়কদের ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা, তার পরের বছর, সতেরো শ পঁয়ষট্টিতে বেঙ্গল আরমির পঞ্চদশ ব্যাটালিয়নের বিদ্রোহীদের কামানের মুখে গোলা দাগিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা আছে। সেদিকে যাচ্ছি না। তবে নন্দকুমারের ফাঁসির অনেক পরে আর এক রাজার ফাঁসিও বিক্ষোভে আলোড়িত করেছিল দেশবাসীকে। সেও আগস্ট মাস। তেরো আগস্ট, আঠারো শ একানব্বুই। মণিপুরনৃপতি টিকেন্দ্রজিৎকে স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টার অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হয়। এ-ক্ষেত্রেও খুনের অপরাধ নেই।

আগস্ট মাসটাকে কী বলব ? এই মাসেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করে, আবার এই মাসেই এতো ফাঁসি। ক্ষুদিরামের ফাঁসিও আগস্ট মাসে। উনিশ-শ' আটের এগারো আগস্ট। এবার অবশ্য হত্যার অভিযোগ। বিচারের জন্য সময় ব্যয় করা হয়নি। আট জুন শুনানি শুরু, তেরো জুন শেষ এবং মৃত্যু দণ্ডাদেশ। আপিল হয়েছিল এর বিরুদ্ধে ছয় জুলাই, আপিলের শুনানিও এক সপ্তাহে সাঙ্গ। দণ্ডাদেশ বহাল। ক্ষুদিরামও ভীত

হয়নি ফাঁসির রজ্জু পরতে। বিচারপতি যখন রায় দিয়ে প্রশ্ন করেন—আদেশের অর্থ বুঝেছ? সে সহজ হেসে মাথা কাত করেছিল। সে বলেছিল, দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছি, আমি গীতা পাঠ করি, আমি নির্ভীক। নির্দোষ দাবি করার প্রয়োজন নেই। তবে কিংসফোর্ডের বদলে দুই নিরপরাধ মহিলার মৃত্যুতে আমি দুঃখিত, আর দুঃখিত যে আমার লক্ষ্য ওই কিংসফোর্ড এখনও বেঁচে আছে।

এগারো আগস্ট সকাল ছ'টায় ফাঁসি হয়। আর বিকেলে সান্ধ্য দৈনিক 'এম্পায়ার' ফাঁসির খবর ছাপিয়ে বলে, 'অকম্পিত পায়ে এই তরুণ সোজা ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ায়। শেষ মুহূর্তেও তাকে উৎফুল্ল ও হাসিখুশি দেখাচ্ছিল।'

ফাঁসির আদেশ দণ্ডিত বা তার দেশবাসী কাউকেই ভীত, বেপথু করতে পারে নি। অর্থাৎ একটি প্রাণসংহার ছাড়া দণ্ডদাতার দূরবিসর্পি লক্ষ্য এক্ষেত্রে সম্পূর্ণই ব্যর্থ। অবশ্য এ সব ক্ষেত্রে একটি মহৎ আদর্শ ছিল অনির্বাণ আর গণমানস ছিল দণ্ডের বিপক্ষে, দণ্ডিতের পক্ষে।

ঘটনাগুলি পরাধীনতার আমলের। পরিবর্তিত পটভূমিতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রয়োগেরও ক্ষেত্র বদল হয়েছে বহুলাংশে। বর্তমান আইনে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাযোগ্য অপরাধের মধ্যে আছে, হত্যা, নাবালক বা বিকৃতমস্তিষ্ককে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা, মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে কোনও ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা, ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা বা বিদ্রোহে সহায়তা করা ইত্যাদি। পৃথিবীর অন্যত্রও মোটামুটি এই ধরনের অপরাধগুলি প্রাণদণ্ডযোগ্য বলে গণ্য। ভারতে মৃত্যুদণ্ডে ফাঁসি হলেও অন্যত্র এর প্রকরণভেদ আছে। যেমন, গিলোটিন, গ্যাস চেম্বার, ইলেকট্রিক চেয়ার, সায়ানাইড ইনজেকশন, গুলি করা, পাথর ছুড়ে মারা ইত্যাদি। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শোভনতার প্রশ্ন ওঠে প্রাণদণ্ডের প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে। ব্রিটিশ রয়াল কমিশন প্রশ্নটি নানাদিক থেকে বিবেচনা করে পৃথিবীতে প্রচলিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে ফাঁসিকেই অনুমোদন করেন। এটাই তাঁদের বিবেচনায় অধিকতর মানবিক, জটিলতাহীন, কম যন্ত্রণাদায়ক এবং অব্যর্থ। তাঁরা দেখেন, ফাঁসিতে দণ্ডিতের মৃত্যুযাতনাবোধ প্রায় হয়ই না বলা চলে। রজ্জুতে ঝোলানোর নয় থেকে পঁচিশ সেকেন্ডের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। আর গ্যাস চেম্বারে লাগে অনেক বেশি সময় চল্লিশ সেকেন্ড। ইলেকট্রিক চেয়ারে আরও বেশি—একশ' কুড়ি সেকেন্ড। গ্যাস চেম্বারের মৃত্যুদণ্ড পরিচালকের মুখোশ ঠিক মতো ব্যবহৃত না হলে পরিচালকেরও ক্ষতি হতে পারে। তার ওপর গ্যাস চেম্বারে এমন বিভ্রাট ঘটতে পারে যখন দণ্ডাদেশপ্রাপ্তর মৃত্যুই হল না। গিলোটিন বা অন্যান্য পদ্ধতিগুলিকে তাঁরা পাশবিক নৃশংস বলে বাতিল করেন।

ভারতীয় ল' কমিশন গ্যাস চেম্বার, ইলেকট্রিক চেয়ার ও ফাঁসি—এই তিনটে নিয়ে বিবেচনান্তে কোনও বিশেষ একটি যে ভালো একথা বলতে পারেন নি, তবে এতে মৃত্যুদণ্ডে ফাঁসির ভূমিকাও অস্বীকৃত হল না। উনিশ-শ' তিয়াত্তরে ফাঁসির সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে এক রিট আবেদন হয়। আবেদনের স্বপক্ষে বিভিন্ন আইনজ্ঞ বলেন, ফাঁসি অতি যন্ত্রণাদায়ক, নিষ্ঠুর পদ্ধতি। সভ্য সমাজের মানবিকতার খাতিরেই ওই পদ্ধতি রদ হওয়া আবশ্যক। তুলনামূলকভাবে তাঁরা ইলেকট্রিক চেয়ার ইনজেকশন প্রভৃতিকে বেশি সহনীয় মনে করেন। আবেদনটির শুনানি চলছিল প্রধান বিচারপতি ওয়াই. ভি. চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে। ইনজেকশনের ভেজাল প্রসঙ্গ ছাড়াও প্রধান বিচারপতি প্রসঙ্গত বলেছিলেন, দিল্লি, কলকাতায় যে রকম বিদ্যুৎবিভ্রাট তাতে ইলেকট্রিক চেয়ারের ওপর আর নির্ভর করা ঠিক নয়। অবশ্য অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও আইনগত যুক্তি দিয়ে ডিভিশন বেঞ্চ অপর সব পদ্ধতির প্রস্তাব খারিজ করে দেন এবং প্রাণদণ্ডাদেশ প্রাপ্তকে 'হ্যাঙ্গিং বাই নেক টিল হি ইজ ডেড'-অর্থাৎ ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থাই বহাল রাখেন। এখানে একটা কথা পরিষ্কার, প্রশ্নটা প্রাণদণ্ড প্রয়োগের পদ্ধতি হিসাবে ফাঁসি নিয়ে উঠেছিল, কিন্তু মূল মৃত্যুদণ্ডের বৈধতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। এবং সুপ্রিম কোর্টও রায় দেন মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগের পদ্ধতি হিসাবে ফাঁসি বৈধ।

এখন বিতর্ক উঠেছে মূল মৃত্যুদণ্ড নিয়েই। পৃথিবীর সতেরোটি দেশ থেকে মৃত্যুদণ্ড উঠে গিয়েছে। আংশিকভাবে উঠে গিয়েছে আরও ছাব্বিশটি দেশে। আংশিক বলছি কারণ, সেসব দেশে হত্যার অপরাধে আর মৃত্যুদণ্ড হয় না। হয়, রাষ্ট্রদ্রোহ বা দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করার ষড়যন্ত্র জাতীয় অপরাধে। আর ভারতের মতো কয়েকটি দেশ আছে যেখানে আইনে প্রাণদণ্ডের বিধান থাকলেও প্রাণদণ্ডের আদেশ বিরল ঘটনা হয়ে উঠছে। যেজন্য ইন্টারনেশনাল ল অ্যাসোসিয়েশনের মানবিক অধিকার রক্ষা সাব কমিটি মন্ট্রিলে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করলেও ভারতের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়নি তাতে। বলা হয়েছে ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রো-এশীয় দেশগুলিতে যে স্বৈরতন্ত্রী নির্যাতন ও মৃত্যুদণ্ডের নামে কার্যত হত্যাকাণ্ড চলছে তা অবিলম্বে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু ভারত এই দণ্ড প্রয়োগে এতোটা সংযত যে সেখানে এই বিধান থাকলেও আন্তর্জাতিক সংস্থা চিন্তিত নন।

ল্যাটিন আমেরিকা বা আফ্রো-এশীয় দেশগুলিতে যা চলছে তা আমাদের ইংরেজ শাসনের যুগের মতো, নন্দকুমারের ফাঁসির মতো বা স্বাধীনতাকামী বিভিন্ন বিদ্রোহ দমনের জন্য আইনের নামে হত্যাকাণ্ডের মতো। সে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাধীন ভারতে প্রাণদণ্ড দান হচ্ছে নীতিগত ভাবে 'রেয়ারেস্ট অব দ্য রেয়ার কেসেস'।

তবু পৃথিবীর নানা দেশের মতো এখানেও এই অতি সংযত, বিরলতম আদেশের যৌক্তিকতা

বিদেশের অপরাধ জগৎ। এই লোকটি জঘন্য অপরাধী, খুনী। বিচারের পর এর মৃত্যুদণ্ড হবে কি?

নিয়ে বারেবারে প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্নটি বেশ জোরালো হয়ে ওঠে বিল্লা-রঙ্গার ফাঁসির পরে। এক পক্ষ বলতে লাগলেন, রাষ্ট্র কেন আইনের সুযোগে খুনের বদলে খুন করবে। খুন যতো অন্যায়ই হোক খুনিকেও খুন করে তার প্রতিবিধান হতে পারে না।

অপর দিকে তদানীন্তন উপরাষ্ট্রপতি হিদায়েতুল্লা দিল্লিতে আইনজ্ঞ সম্মেলনে বলেন, মৃত্যুদণ্ডের বিধান অবশ্যই থাকা কর্তব্য। এমনকি সুপ্রিম কোর্ট যে এই দণ্ডটির বিরলতম প্রয়োগের নীতি নির্দেশ দিয়েছেন তার সঙ্গেও একমত হতে পারেন নি উপরাষ্ট্রপতি। তিনি প্রশ্ন করেন, 'রেয়ারেস্ট অব দ্য রেয়ার' মানে কী ? জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডে ফাঁসি দিতে হবে। একজন দায়রা জজ-এর কাছে যদি এক ডজন খুনের মামলা আসে, তবে তিনি কী করবেন ? বিরল বা 'রেয়ারেস্ট' করতে গিয়ে সব কটি ক্ষেত্রে দণ্ডদানে তিনি সমদৃষ্টি দেখাতে পারবেন কী করে ? উপরাষ্ট্রপতির আরও কথা,—সীমিত ব্যবহারে এই দণ্ডাদেশটি তার অন্যায় প্রতিরোধ-ক্ষমতাও

সুরূপা গুহ মামলার রায় শুনতে সেদিন কোর্টে বহুলোক উপস্থিত ছিলেন। ছবি : দেবীপ্রসাদ সিংহ

হারিয়ে ফেলছে।

বিশিষ্ট আইনজ্ঞ রাম জেঠমালানি'র অভিমত, মৃত্যুদণ্ডের বিধান অবশ্যই থাকা উচিত এবং তার যথার্থ প্রয়োগও প্রয়োজন। এটা কেবল অপরাধ প্রতিরোধ করার উপায় হিসাবেই রাখতে হবে তা নয়, কোনও জঘন্য অপরাধের প্রতি সমাজের তীব্র ঘৃণার এক দৃষ্টান্ত, প্রকাশ-বিন্দু হিসাবেও এর সামাজিক প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

এই সমাজের ঘৃণা বা সামাজিক মনোভাব এটিকে বিচারের ক্ষেত্রেও অনেকে সবিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। বিচারপতি ঠক্কর প্রাণদণ্ড ঘোষণার ক্ষেত্রে আইনের বিধান ছাড়াও বিচার করতে বলেছেন 'কালেকটিভ কনসেন্স অব দ্য কমিউনিটি'। তাঁর কথা আইন, বিশেষ করে ক্রিমিনাল ল কখনো 'ভেক্যুয়াম'এ অপারেট করে না। 'ইট মাস্ট ব্রডলি হারমোনাইজ উইথ দ্য ফিলিং অব দ্য সোসাইটি।'

ব্রিটিশ রয়াল কমিশনের সামনে মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কিত প্রশ্নে এই প্রসঙ্গটি আরও সুন্দর করে বলেছেন লর্ড ডেনিং তাঁর সাক্ষ্যে। প্রাণদণ্ডের মূল লক্ষ্য তিনি বলেছেন—'দ্য এমফেটিক ডিনান্সিয়েশন অব দ্য ক্রাইম বাই দ্য কমিউনিটি।' এর স্বীকৃতি দেখা যায় ইংলন্ডে মৃত্যুদণ্ড বলবৎ থাকাকালীন কয়েকটি প্রথায়। যেমন, কোনো প্রাণদণ্ডাদেশ রহিত করার জন্য 'মার্সি পিটিশন' হলে হোম সেক্রেটারি একটি নোট পাঠাতেন সেই সঙ্গে জনচিত্তের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে।

ফরাসি দেশে অবশ্য জনমত অগ্রাহ্য করেই মিতেঁরা প্রাণদণ্ড বিলোপ করে দিয়েছেন। নির্বাচনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, জিতলে দেশ থেকে প্রাণদণ্ড তুলে দেবেন। তাই-ই করেন। অবশ্য জনমত তখন ছিল প্রাণদণ্ডের পক্ষে।

ইংলন্ডে আজ প্রায় কুড়িবছর হল প্রাণদণ্ড বিধি উঠে গিয়েছে। তবু এটাকে সবাই স্বস্তির সঙ্গে মেনে নিয়েছে বলা যাবে না। মার্গারেট থ্যাচার প্রধানমন্ত্রী হয়ে দু-দু বার চেষ্টা করেছেন পুনরায় প্রাণদণ্ড চালু করতে। পার্লামেন্টে এ-নিয়ে বিতর্কে অবশ্য তিনি কোনও দলীয় হুইপ দেন নি, বিবেক অনুযায়ী ভোট দিতে বলেন। বিপক্ষেই দেখা যায় বেশি ভোট। ফলে ফের প্রাণদণ্ড চালু করা যায় নি সেখানে। থ্যাচার কেন চেয়েছিলেন ওই চরমদণ্ড ফিরিয়ে আনতে ? তাঁর বক্তব্য ছিল, উত্তর আয়ারল্যান্ডের সন্ত্রাসবাদীদের শায়েস্তা করতে হলে ঐ চরমদণ্ড অত্যাবশ্যক।

কিন্তু সন্ত্রাসবাদীকে মৃত্যুভয় দেখিয়ে নিরস্ত্র করা যাবে, এমন কথা বেশির ভাগ সদস্যই মানতে পারেন নি। তাঁদের অভিমত, খুন যার রক্তে চেপে যায় সে আর খুনকে ভয় পায় না, আত্মনিধনেও সে প্রস্তুত। মাঝখানে বিচারে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হলে সে সেটাকে বীর সাজার সুযোগ বলে উৎসাহী হতে পারে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারনেশনাল বিশ্বব্যাপী প্রাণদণ্ড বিলোপের জন্য লড়ছেন। তাঁদের বক্তব্য এতে মানবাধিকার হরণ করা হচ্ছে।

আগেই বলেছি, এরকম অভিযোগ অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও কয়েকবার উঠেছে। সাতের দশকে তিন-তিনটে খুনের দায়ে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত এক আসামীর পক্ষে ফাঁসির আদেশ সংবিধান-সম্মত নয় বলে এক রিট-আবেদন হয় সুপ্রিম কোর্টে। আরও কয়েকটি রিটের সঙ্গে এর শুনানির পর উনিশ শ আশির নয় মে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে, ফাঁসি সংবিধান-সম্মত। পেনাল কোড-এর ৩০২ ধারায় চরম দণ্ড দেওয়ার যে-বিধান আছে তাও সংবিধান-বিরোধী নয়। এবং এতে কোনও ক্রমেই মানুষের মর্যাদা কলুষিত হতে পারে না।

কেউ কেউ নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মৃত্যুদণ্ড এবং বিকল্পে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান থাকায় ফাঁসিকে সংবিধান-বিরোধী বলে যে ব্যাখ্যা তুলেছিলেন, সুপ্রিম কোর্ট তাও নাকচ করে দেন এবং বলেন, এই দণ্ডবিধি সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী নয়।

এই রায় অবশ্য সর্বসম্মত ছিল না। প্রধান বিচারপতি, ওয়াই, ভি, চন্দ্রচূড়, বিচারপতি আর, এস, সারকারিয়া, বিচারপতি এ, সি, গুপ্ত এবং বিচারপতি এন, এল, আনতোয়ালিয়া একমত হলেও অন্যতম বিচারপতি পি, এন, ভগবতী ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তিনি মৃত্যুদণ্ডকে সংবিধান-বিরোধী বলে পৃথক মত দেন।

নরহত্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গবেষণায় মারকিন মনস্তাত্বিক ডেন আর্চার বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি রোজমারি গার্টনার নামে তাঁর এক সহকর্মীকে নিয়ে দশ বছর ধরে বিশ্বের একশ' দশটি দেশের বিশেষ করে চুয়াল্লিশটি মহানগরীর খুন ও খুনিদের নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা করেন। 'ভায়োলেন্স অ্যান্ড ক্রাইম ইন ক্রসনেশনাল পারসপেকটিভ' নামে তাঁর গবেষণাগ্রন্থ বেরিয়েছে ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে। তাঁর বিচার্য প্রশ্ন ছিল মৃত্যুদণ্ড কি খুনিকে নিরস্ত্র করার সহায়ক ? দ্বিতীয় প্রশ্ন : ছোট শহরগুলি থেকে বৃহৎ নগরীগুলিতেই কি হত্যাকাণ্ড বেশি হয় ? আর্চারের সিদ্ধান্ত—'না, মৃত্যুদণ্ড খুনের প্রতিবেধক নয়, হত্যাকারী এই দণ্ডের ভয়ে নিরস্ত্র হয় না। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তাঁর সিদ্ধান্ত একই দেশে, ছোট শহরের তুলনায় বৃহৎ নগরীতে হত্যাকাণ্ড বেশি ঘটে। আরও একটি সিদ্ধান্ত তাঁর—সদ্য যুদ্ধক্লান্তদেশে, বিশেষ করে সেই দেশ যদি যুদ্ধে বিজয়ী হয় তাহলে সেখানে হত্যাকাণ্ডের হার অনেক বেশি বেড়ে যায়।

যা-হোক, ডেন আর্চার এবং অন্য কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অভিমত, মৃত্যুদণ্ড, হত্যার প্রতিরোধক নয়। পৃথিবীর যেসব দেশ প্রাণদণ্ড তুলে দিয়েছে সেসব জায়গায় আগের তুলনায় নরহত্যা বাড়েনি। কোথাও কোথাও বরং হ্রাস পেয়েছে।

ভারতের দু'টি দেশীয় রাজ্যে চল্লিশের দশকে কয়েক বছরের জন্য মৃত্যুদণ্ড ছিল না। দেখা গিয়েছে ওই সময়কালে ওই দুই রাজ্যে নরহত্যা বা অন্য ধরনের অপরাধ অনেক কম ঘটেছে।

ভারতে প্রাণদণ্ড বিধান থাকলেও এর প্রয়োগ খুবই সীমাবদ্ধ। গোটা ভারতে উনিশ শ' তিয়াত্তর থেকে ফাঁসির আদেশ কমে আসছে। আবার দণ্ডাদেশের পরেও দণ্ডমার্জনাও হচ্ছে। যেমন উনিশ শ' পঁচাত্তরে সারা দেশে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয় চুরাশি জনকে, পরের বছর চৌষট্টিজনকে, তার পরের বছর পঞ্চাশ জনকে। আর যথার্থ ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয় ওই তিনবছরে যথাক্রমে তেত্রিশ, তেইশ এবং বারোজনকে। অর্থাৎ ওই তিন বছরে মোট ফাঁসি হয় আটষট্টি জনের। অথচ ওই সময়কালে দেশে কুড়ি হাজারেরও বেশি মানুষ খুন হন।

পশ্চিমবঙ্গে তো উনিশ-শ' পঁয়ষট্টি সালের পর আর কোনও ফাঁসিই হয়নি। অবশ্য মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল সতের জনকে। আর এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক হাজার মানুষ খুন হয়েছেন।

এতেই প্রমাণ খুনের তুলনায় ফাঁসির সংখ্যা কতো নগণ্য। হাইকোর্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজনের কথা, সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে এই চরম দণ্ডাদেশ কখনই উচ্চারিত হয় না। প্রথমে দায়রায় অভিজ্ঞ বিচারক খুনের বিচার করেন। তাঁর দণ্ডাদেশ অনুমোদনের জন্য যায় হাইকোর্ট। সেখানে আপিল হয়। দেখা যায় প্রায় সত্তর শতাংশ মৃত্যুদণ্ডাদেশই রদ হয়ে যায়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এরও উপরে আছে সুপ্রিম কোর্টে আপিলের সুযোগ। তারপরেও সুযোগ আছে রাষ্ট্রপতির কাছে মার্জনা ভিক্ষার। একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ চরম দণ্ড যেন বিরলতম ক্ষেত্রেই উচ্চারিত হয়—'রেয়ারেস্ট অব দ্য রেয়ার কেসেস।'

এজন্যই স্বাভাবিকভাবে ফাঁসিও হয়ে উঠেছে বিরল। তার ওপর আছে অন্য সমস্যা। খুনি চিহ্নিত করণ। এ কাজটির প্রাথমিক দায়িত্ব পুলিসের । অপরাধী যদি ধরাই না পড়ে, ফাঁসি দেওয়া হবে কাকে।

সুরূপা গুহ নিহত হলেন। দায়রা বিচারে ঘটনাটি হত্যাকাণ্ড বলে রায় হল। কিন্তু হত্যাকারীকে এখনও চিহ্নিত করা গেল না। সে মামলা আজও চলছে।

দেবযানী বণিক নিহত হন তিরাশির জানুয়ারিতে—সারা রাজ্য তা নিয়ে তোলপাড় হয়। চারবছর ধরে মামলা চলে। হাইকোর্ট থেকে দুজনকে হত্যাকারী বলে চিহ্নিত করে ফাঁসির আদেশও হয়। তারপরে আপিল হয় সুপ্রিম কোর্টে। নিঃসন্দেহে খুনি চিহ্নিত না হওয়ায় সেখান থেকে ফাঁসির আদেশ রদ হয়ে, নির্দেশ হল আসামীদ্বয়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের।

সমাজে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে এতে। কেউ কেউ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যাখ্যা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ দীর্ঘকাল এদেশে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলে অনেকেই মানবিক বিচারে ক্ষমা পেয়ে কুড়ি বছর পরেই মুক্ত হয়ে আসতেন। পরবর্তী কালে এই মেয়াদ আরও হ্রস্ব হয়ে চোদ্দ এবং পরে বারো বছরে দাঁড়ায়। ফলে অনেকেরই ধারণা যাবজ্জীবন মানে বারো বছর। অপরাধী ধরা পড়লেও প্রমাণ অভাবে খালাস হচ্ছে, ফাঁসি হচ্ছে না, বা কয়েকবছর পরেই জেল

ফাঁসির আসামী চন্দ্রনাথ বণিক সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিত

থেকে বেরিয়ে সমাজের বুকে বুক ফুলিয়ে চলছে, এসব দেখে এক শ্রেণীর লোক আইনকে নিজেদের হাতে নিয়ে কোনও অভিযুক্তকে ধরে গণবিচারের নামে পিটিয়ে মারছে। এ প্রবণতাও ভয়াবহ। এক্ষেত্রে একটা কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার যে বর্তমানে আমাদের দেশে যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান আছে সেটি দশ বারো বা চোদ্দ বছরের ব্যাপার নয়, যাবজ্জীবন তো যাবজ্জীবনই। দণ্ডপ্রাপ্তর স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত বন্দী-জীবনই কাটাবে। যেমন ঘটনা সম্প্রতি ঘটল হিটলারের ডেপুটি রুডলফ হেস-এর। ন্যুরেমবুর্গ বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। উনিশ শ একচল্লিশ সালে সেই যে তিনি স্প্যান্ডাউ কারাগারে সাত নম্বর বন্দী হিসাবে ঢুকলেন আর এই সাতাশির আগস্টে সেখানেই তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আগে পর্যন্ত মুক্তি পাননি। হেসের পুত্রের কাছে তাঁর মৃতদেহ সমর্পণের পর আত্মীয়েরা বলেছেন, হতভাগ্য মানুষটা এতদিনে মরে বাঁচল। পুত্র বলেছেন, তাঁর পিতার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি,—তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। জেল-কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলছেন, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। সব মিলিয়ে এটা প্রমাণ হয়, যাবজ্জীবন যদি যথার্থই হয় তা সারা জীবনের যন্ত্রণা। অবশ্য প্রয়োজনবোধে সরকার দণ্ডকাল হ্রস্ব করে দিতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে গণমানসের প্রতিক্রিয়া বিচার করে তার প্রয়োগ করা উচিত বলে অনেকে মনে করেন।

দেখা যাচ্ছে ফাঁসির চাইতে কম নয় এ শাস্তি। ফাঁসি থাক,বা উঠে যাক ফাঁসির মঞ্চ, অপরাধীর শাস্তি সবারই কাম্য। এবং সে ক্ষেত্রে সমাজের প্রতিক্রিয়াও মূল্যহীন নয়। প্রকরণ-পদ্ধতি যাই হোক শাস্তির, সমাজের মানসিকতার প্রতিফলন তাতে নিশ্চয়ই মূল্যবান। ■

এখনই তো শরীরকে
রাখতে হবে
সম্পূর্ণ সুস্থ...
এখনই তো চাই
কমপ্লান®

একমাত্র কমপ্লানেই আছে একান্ত প্রয়োজনীয় ২৩ টি খাদ্যগুণ,
বাড়তি পুষ্টির জন্য ওর যা এখন দরকার।

সাধারণত : ১৫-১৬ বছর বয়সের মধ্যে ছেলেমেয়েরা সবদিকথেকে পুরোপুরিভাবে·বেড়ে ওঠে, তাই তাদের পুষ্টিপ্রয়োজনও হয় বিশেষ ধরণের। আর যখন পরীক্ষার চাপ থাকে তখন তো কথাই নেই। সেইজন্য মায়েরা জানেন যে পরীক্ষার সময় মানেই কমপ্লানের সময়।

বাচ্চাদের শরীর গড়ে তুলতে যে-পুষ্টি সরাসরিভাবে সাহায্য করে সেটা হল প্রোটিন। কমপ্লানে প্রোটিন তো আছেই (২০%), আছে মিল্কপ্রোটিন, যা বাচ্চাদের জন্য সেরা। তাছাড়া আছে বাইশটি অন্যান্য খাদ্যগুণ, যেমন কার্বোহাইড্রেট, খনিজ ও স্নেহ পদার্থ এবং নানান ভিটামিন। বাড়ন্তবয়সের ছেলেমেয়েদের এগুলি বিশেষ দরকার।

আপনার ছেলেমেয়েদেরও দিনে দুবার করে কমপ্লান খাওয়ান।

কমপ্লান-পাবেন বাচ্চাদের মনের মত চকোলেট, স্ট্রবেরি, আইস্ক্রীম ও এলাচ-জাফরান স্বাদে। প্লেন-ও পাবেন।

কমপ্লান®–সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

GX/22/244 BEN

'সমাজের মত
রূপান্তর প্রয়োজন'
মুখোপাধ্যায়

প্রশ্ন : জনস্বার্থ মামলাগুলির উপযোগিতা কতখানি ?

বিচারপতি মুখোপাধ্যায় : অনেকখানি। আমি মনে করি, "Public interest litigation is an instrument of great potentiality and prospects"। বিশেষ করে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটাতে জনস্বার্থ মামলা একটা মস্ত বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। ন্যায়বিচার ও সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত "egalitarian" সমাজ কায়েম করাই আমাদের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের জন্য দেশে অনেক আইন আছে। There are laws beneficial to the community, laws which implement and enhance the directive principles of our constitution. কিন্তু আইন থাকাটাই শেষ কথা নয়। তা ছাড়া আইন নিজে নিজেই বলবৎ হয় না। বরং অধিকাংশ আইনই বলবৎ হওয়ার বদলে লঙ্ঘিত হয়। সেটাই আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। এবং এ ক্ষেত্রে জনস্বার্থ মামলাগুলি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। করছেও।

প্রশ্ন : আগের তুলনায় জনস্বার্থ মামলাগুলি এখন অনেক বেশি জনপ্রিয়। এটা সম্ভব হল কীভাবে ?

বিচারপতি মুখোপাধ্যায় : আগে ইচ্ছে করলেই এ ধরনের মামলা আনা যেত না। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিল আবেদনকারীর অধিকারের প্রশ্নটি। অর্থাৎ "What is the right of the individual who brings about the action in the court to bring that action." আইনের ভাষায় আমরা যাকে বলি "the question of locus." আগে রীতি ছিল, যিনি আবেদন করছেন ব্যক্তিগতভাবে তিনি ভুক্তভোগী বা ক্ষতিগ্রস্ত না হলে আদালত সেই আবেদন গ্রাহ্য করবেন না। এই রীতি এখন বদলে গিয়েছে। আমেরিকা ও ইংলন্ডে অনেক আগেই। ভারতবর্ষে সম্প্রতি। এখন জনস্বার্থ বিপন্ন বা বিঘ্নিত হওয়ার অভিযোগ এনে যে কেউ মামলা করতে পারেন। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। "Really speaking, the theory of locus has now been completely transformed."

এই প্রসঙ্গে এস পি গুপ্ত বনাম ভারত সরকারের মামলাটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবেদনকারীর অধিকার বা "Locus"-এর প্রশ্নে এই মামলার রায় ভারতের বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাইলফলক। এই মামলায় আবেদনকারীর বক্তব্য ছিল, দেশের হাইকোর্টগুলিতে বহু বিচারপতির পদ শূন্য থাকায়, সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয় তা হল, এই ধরনের অভিযোগ আনার অধিকার আবেদনকারীর সত্যিই আছে কি না, কারণ ব্যক্তিগতভাবে তাঁর স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত নয়। সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি পি এন ভগবতীর নেতৃত্বে বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতি এই মর্মে রায় দেন যে দেশের নাগরিক হিসেবে এই অধিকার আবেদনকারীর আছে। অর্থাৎ "Anybody who is interested in the administration of justice and thereby upholding the constitutional provisions has a locus though individually he might not

have been affected by action or in action, involved in this case."

পদ্ধতির সরলীকরণ ঘটিয়ে, আবেদনকারীর অধিকারের সীমা প্রসারিত করার ক্ষেত্রে পি এন ভগবতী খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জনস্বার্থ মামলা আজ যদি দেশে জনপ্রিয় হয়ে থাকে তা হলে তার পিছনে ভগবতীর অবদান স্বীকার না করে উপায় নেই। যদিও এক্ষেত্রে তিনিই পথিকৃৎ সে কথা বোধ হয় বলা যায় না।

প্রশ্ন : পদ্ধতির সরলীকরণ বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন ?

বিচারপতি মুখোপাধ্যায় : জনস্বার্থ মামলা আনার জন্য আদালতে এখন আর বিস্তারিত আবেদন করার প্রয়োজন হয় না। কোথাও আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে দেখে কেউ যদি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটা চিঠি লেখেন তা হলে সেটিকেই আবেদন বলে গ্রাহ্য করা হয় এবং আদালত তদন্তের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। মোটামুটি বিচারপতি ভগবতীর আমল থেকেই সুপ্রীম কোর্টে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এবং সত্যি কথা বলতে কি, এর পর থেকেই আদালতের কাছে অসংখ্য আবেদন আসছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনস্বার্থের সঙ্গে জড়িত আইন লঙ্ঘনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলাও হয়েছে। ভগবতী প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন এ ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী ছিলেন। লোকে তাঁর কাছে সরাসরি চিঠি লিখত। পরবর্তী প্রধান বিচারপতি আর এস পাঠক পরে অবশ্য এ সম্পর্কে সাবধানবাণী শুনিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, "You can not in this loose fashion manage such a kind of litigation." আপনি হয়ত জানেন, আদালতে আবেদন করার একটা নিয়ম আছে। One should address to Chief Justice and his companion judges। অর্থাৎ বিশেষ একজন বিচারপতির কাছে নয়, সাধারণভাবে গোটা আদালতের কাছে আবেদন করাটাই রীতি। বিচারপতি পাঠক সেই রীতির কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

প্রশ্ন : জনস্বার্থ মামলার অপব্যবহার হতে পারে কি ?

বিচারপতি মুখোপাধ্যায় : অবশ্যই হতে পারে। আমি আগেই বলেছি, জনস্বার্থ মামলা সামাজিক বিপ্লব সম্ভব করার কাজে মস্ত বড় হাতিয়ার। কিন্তু একই সঙ্গে কয়েকটি বিপদের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। তার মধ্যে একটি বড় বিপদ হল এই হাতিয়ারের অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা। মানুষের অভিযোগের কোনও শেষ নেই। এবং এত অভিযোগের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা নেই আদালতের। দেশের আদালতগুলিতে কত মামলা জমে আছে, সে কথা সকলেই জানেন। সুপ্রীম কোর্টে আমরা এখন সেই সব মামলার নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করছি যেগুলি দশ বছরের পুরোনো। সুপ্রীম কোর্টে দশ বছরের পুরোনো মামলার অর্থ আসলে মামলাটি বিশ পঁচিশ বছরের পুরোনো। সত্যি কথা বলতে কি, সাধারণ মানুষের কাছে মামলা আজ প্রায় সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়েছে। আমার সম্পত্তি বা কর সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি হতে যদি পঁচিশ বছর সময় লাগলো তা হলে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে আমার লাভ ? এবং এজন্যই আজ মানুষ বিচারব্যবস্থার উপরে আস্থা হারাচ্ছেন।

"At the same time, there has been tremendous

erosion in the intrinsic sense of fairness in man ।" এই ধরুন, আগে যদি আমার স্কুল শিক্ষক পরীক্ষার খাতায় আমাকে কম নম্বর দিতেন আমি কিছু মনে করতাম না । তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করতাম না । কিন্তু আজ আমরা তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করি । বলি, তাঁর সিদ্ধান্তের পিছনে হয় ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে । গুরুজন সম্পর্কে, শিক্ষকদের সম্পর্কে, সরকার সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস দিন-কে-দিন কমছে । আগে চাকুরিজীবীরা সরকারি সিদ্ধান্ত বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতেন । They would think that their superiors have decided and that is good enough । এবং শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রে সেই সিদ্ধান্ত সঠিকই হত । আমার বাবা settlement officer ছিলেন । তখন দেখেছি, তিনি যে রায় দিতেন সকলেই তা ভাল মনে স্বীকার করে নিত । কেউ এ কথা বলত না যে তিনি কোনও ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে রায় দিয়েছেন । কিংবা তিনি যে রায় দিয়েছেন সেটা ভুল । কিন্তু আজ মানুষ অনবরত এই ধরনের প্রশ্ন তুলছেন । দুর্ভাগ্যের কথা, বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে তাঁদের সেই সব প্রশ্ন সঠিক, অভিযোগ ভিত্তিহীন নয় । আজ আমরা মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি । হারিয়ে ফেলেছি মানুষের বিচারবুদ্ধির উপরে আমাদের আস্থা । Today we do not ask ourselves, is it fair? Is it right? Is it just? There are various factors that motivate us. এবং সেজন্যই আদালতে আদালতে আজ রীতিমত মামলার বিস্ফোরণ ঘটেছে ।

আগে অনেক মানুষ ভগবানে বিশ্বাস করতেন । অনেক কিছুকেই মনে করতেন ভগবানের দান । কিন্তু এখন লোকের আর সেই অন্ধ বিশ্বাস নেই । সকলেই আইনের বিচার চায় । এ কথা জেনেও,যে মামলা করাটা এখন কী ভীষণ রকম ব্যয়বহুল । অবস্থাটা এখন এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ছাড়া কিংবা কালো টাকা ছাড়া আপনি এ দেশে মামলা করতে পারবেন না । বলা যায় মামলা এখন এ দেশে অন্যতম

সকলেই আইনের বিচার চায় । এ কথা জেনেও, যে মামলা করাটা এখন কী ভীষণ রকম ব্যয়বহুল । অবস্থাটা এখন এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ছাড়া কিংবা কালো টাকা ছাড়া আপনি এ দেশে মামলা করতে পারবেন না । বলা যায়, মামলা এখন এ দেশে অন্যতম বিলাসসামগ্রী ।

বিলাসসামগ্রী । যে কোনও আইনজীবীকে প্রশ্ন করুন, জানতে পারবেন, মামলায় কত খরচ হয় ।

এ কথা ঠিক জনস্বার্থ মামলায় আবেদনকারীকে তেমন খরচ করতে হয় না । আদালত যদি আবেদনকারীর আবেদন গ্রাহ্য করে এবং যদি দেখে সত্যিই জনস্বার্থের প্রশ্ন জড়িত আছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জন্য কৌঁসুলির ব্যবস্থা করা হয় । সুপ্রীম কোর্টে তো বটেই, হাইকোর্টগুলিতেও লিগাল এইড কমিটিগুলির মাধ্যমে এই সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে । তবুও বলব, জনস্বার্থ মামলাগুলি অবাধ্য ঘোড়ার মত । "as some critics say, public interest litigation is an unruly horse. One must be able to ride it."

ইংরেজরা মনে করতেন (লর্ড মেকলে বিশেষ করে) আমরা ভারতবাসীরা খুব মামলাপ্রিয় জাতি । এই ধারণা যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত ছিল তাও বোধ হয় বলা যায় না । সামান্য প্ররোচনাতেই আমরা আদালতের দ্বারস্থ হই । অতএব আমাদের হাতে জনস্বার্থ মামলার মত একটা মোক্ষম অস্ত্র এলে, তার অপব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায় ।

এবং এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার সাধ্য আদালতগুলির নেই । বিচারপতি হিদায়েতুল্লা এই জন্যই জনস্বার্থ মামলাগুলির সমালোচনা করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন, "You have not been able to meet so many thousands of cases pending. By indulging in public interest litigation, you keep these people deprived of their houses, pensions, salary, home inheritance and you go on litigating on somebody's figment of imagination." অতএব কোথাও একটা বোধ হয় ভারসাম্যের প্রয়োজন আছে । মামলা জমছে, কিন্তু বিচারপতি নেই ।

জনস্বার্থ মামলা কীভাবে দৈনন্দিন বিচারকার্যে ব্যাঘাত ঘটায় সে কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের মামলায় আমরা জেলা জজদের অনুসন্ধান করে দেখার দায়িত্ব দিই (প্রশাসনিক তদন্ত

মনঃপূত হয় না বলে)। সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ পেলে নিজেদের কাজ ছেড়ে জেলা জজদের তদন্তের কাজে নামতে হয়। এইভাবে তাঁর নিজের এজলাসে মামলার স্তূপ বাড়ে। অতএব প্রতিকারের যে উপায়ই আপনি বের করুন না কেন, গোটা ব্যবস্থাটা যদি তার উপযুক্ত না হয় তা হলে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। একদিন সব কিছুই ভেঙ্গে পড়বে। এবং এখন ঠিক তাই হচ্ছে।

প্রশ্ন : তা হলে করণীয় কি ?

বিচারপতি মুখোপাধ্যায় : সেটাই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। We must make justice effective, meaningful and quick। বিচারে বিলম্ব ইদানীং হচ্ছে তা নয়,এটা বহু পুরোনো ব্যাধি। শেক্সপীয়রও "suffers the law's delay"-র কথা বলেছিলেন। এখন এই সমস্যায় যেন নানা ধরনের মাত্রা যুক্ত হয়েছে। আইনের কাছে মানুষের প্রত্যাশা বেড়ে গিয়েছে অনেকগুণ। বেড়েছে সমাজের কাছে প্রত্যাশা। বেড়েছে জনসংখ্যা। আজ সবাই মামলা করেন— প্রতিটি শিক্ষক, ছাত্র, চাকুরিজীবী করদাতা, বাড়িওয়ালা, ভাড়াটে, ধনী, নির্ধন সবাই। আদালতে না এসে যেন কোনও বিরোধেরই নিষ্পত্তি হওয়ার উপায় নেই। আসল কথা হল, দেশে যেসব আইন আছে, সেগুলো যদি ঠিকমত রূপায়িত হয়, তা হলে এমনিতেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে যাবে। আর কিছুর প্রয়োজন নেই। নতুন কোনও আইনেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু আইন যদি যথেষ্ট না হয় সে ক্ষেত্রে কি আদালত প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের জন্য আইনসভাকে নির্দেশ দিতে পারে ? Can the public interest litigation come in that form?

প্রশ্ন : পারে কি ?

বিচারপতি মুখোপাধ্যায় : পারে না। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাকে দুটি মামলার উদাহরণ দিচ্ছি। একটি মামলায় বিচারপতি ভগবতী রায় দিয়েছিলেন, অন্যটিতে আমি।

ভগবতীর বিচারাধীন মামলাটি ছিল হিমাচল প্রদেশের মেডিকেল কলেজে ছাত্রদের উপর র‍্যাগিং সংক্রান্ত। সিমলা মেডিকেল কলেজের জনৈক ছাত্রের অভিভাবক সে রাজ্যের হাইকোর্টে এই মামলা করেছিলেন। হাইকোর্ট তার রায়ে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন র‍্যাগিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে একটি আইন প্রণয়ন করার কথা ভেবে দেখতে। পরে সুপ্রীম কোর্টে মামলাটি এলে বিচারপতি ভগবতী রায় দিয়েছিলেন, আদালত এমন নির্দেশ বা অনুরোধ করতে পারে না। আমাদের সংবিধানে খুবই স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করে ক্ষমতার বন্টন করে দেওয়া আছে। আমরা এইটুকু বলতে পারি যে আইন বলবৎ হওয়া উচিত। এমন কি জনস্বার্থ মামলাগুলিতেও আমরা আইন যাতে বলবৎ হয় তার ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু কোন আইন প্রণয়ন করা উচিত তা আমরা বলতে পারি না। সেটা আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে। আমরা সুপারিশ করতে পারি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আমাদের সংবিধান এই অধিকার দিয়েছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের।

অপর একটি মামলাতে আমি নিজেও অনুরূপ একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলাম। এই মামলাটিও ছিল হিমাচল প্রদেশের। একটি পার্বত্য রাস্তা সংক্রান্ত। আবেদনকারীর দাবি ছিল পাহাড়ে রাস্তা বানাতে হবে। তিনি বলেছিলেন, পাহাড়ের বাসিন্দা হিসেবে রাস্তা তাঁর জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য, তাঁর মৌলিক

আমাদের আজকের আইনগুলি রয়েছে গতকালের প্রয়োজন মেটাতে। অতএব সমাজের মত আইনেরও রূপান্তর প্রয়োজন। সেটা অবশ্যই জনমতের প্রশ্ন। তবে জনমত জাগ্রত করার ব্যাপারে আদালতের একটা বড় ভূমিকা আছে। থাকবেও।

অধিকার। রাজ্য সরকার জানান, অর্থের অভাবে তাঁরা সেই রাস্তা তৈরি করতে পারছেন না। হাইকোর্ট তখন হিমাচল প্রদেশ সরকারকে ওই রাস্তা বানাতে নির্দেশ দেয় এবং বলে এর জন্য বাজেট-বরাদ্দ নির্ধারণ করা হোক। এর পর হিমাচল প্রদেশ সরকার হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করেন। আমি আমার রায়ে জানাই, এই ধরনের নির্দেশ আদালত দিতে পারে না। কারণ কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ হবে বা হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করার সাংবিধানিক ক্ষমতা আছে একমাত্র রাজ্য বিধানসভার।

এই রায়ে বিখ্যাত মার্কিন বিচারপতি বেঞ্জামিন কার্ডোজোকে উদ্ধৃত করে আমি বলেছিলাম, "The judge, even if he is free, is not wholly free. He is not to innovate at pleasure. He will not be a knight errand roaming at will in pursuit of his own ideal of beauty or of goodness. He is to draw his inspiration from the concentrated principle. He is not to yield to spasmadic sentiment of vague and unregulated benevolence. He is to exercise a discretion informed by tradition and disciplined by system and subordinated by primodal necessity of order in social life."

অতএব মূল সমস্যাটি হল, সাংবিধানিক আদর্শগুলি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক আইন প্রণয়নে আইনসভাগুলিকে আমরা কত দূর প্রভাবিত করতে পারি কিংবা আদৌ পারি কি না। Whether public interest litigation will go to that direction or not is another question.

প্রশ্ন : আপনার অভিজ্ঞতায় কোন জনস্বার্থ মামলাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে ?

বিচারপতি মুখোপাধ্যায় : 'ভাগলপুর ব্লাইন্ডিং কেস।' এই মামলার বিষয়বস্তু আজ সকলেই জানেন। অভিযোগ উঠেছিল পুলিশী অত্যাচারে ভাগলপুর কয়েদখানায় কয়েকজন বন্দী অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। সুপ্রীম কোর্টের গোচরে ব্যাপারটা এসেছিল একটি চিঠির মাধ্যমে। আদালতের আদেশে যে তদন্ত হয় তাতে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। এটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলা। এ ছাড়া অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। যেমন ধরুন, পরিবেশ দূষণ, ন্যূনতম মজুরি আইন লঙ্ঘন, ডাক্তারদের বেতন। কলকাতার আলিপুর জেলে মহিলা বন্দিনীদের মামলাটির উল্লেখও করা যেতে পারে। সামাজিক বিপ্লব সম্ভব করার জন্য এই জনস্বার্থ মামলার কথা ভাবা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "এই সব ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা, এইসব শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।" কিন্তু একে সম্ভব করে তুলতে হলে দুটো জিনিস করা দরকার। One is implementation of laws and the other is to make the laws conform to the social norms. কারণ আমাদের আজকের আইনগুলি রয়েছে গতকালের প্রয়োজন মেটাতে। অতএব সমাজের মত আইনেরও রূপান্তর প্রয়োজন। সেটা অবশ্যই জনমতের প্রশ্ন। তবে জনমত জাগ্রত করার ব্যাপারে আদালতের একটা বড় ভূমিকা আছে। থাকবেও।

সুমন চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্ন

ছবি : রাজেশ কুমার

আপনার অঙ্গসজ্জায়
জাপানী কলা
আর কারুকার্য্যের
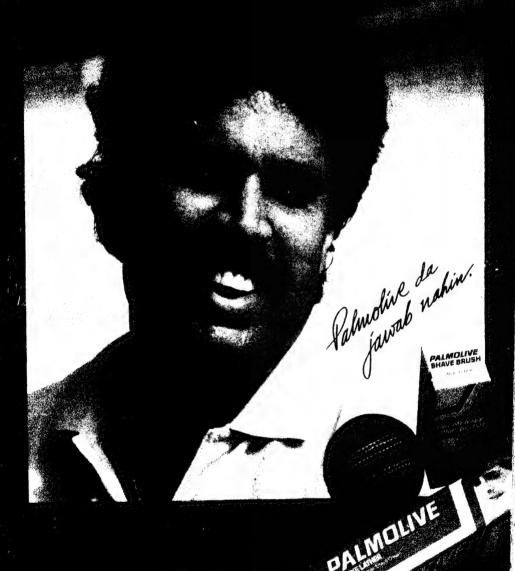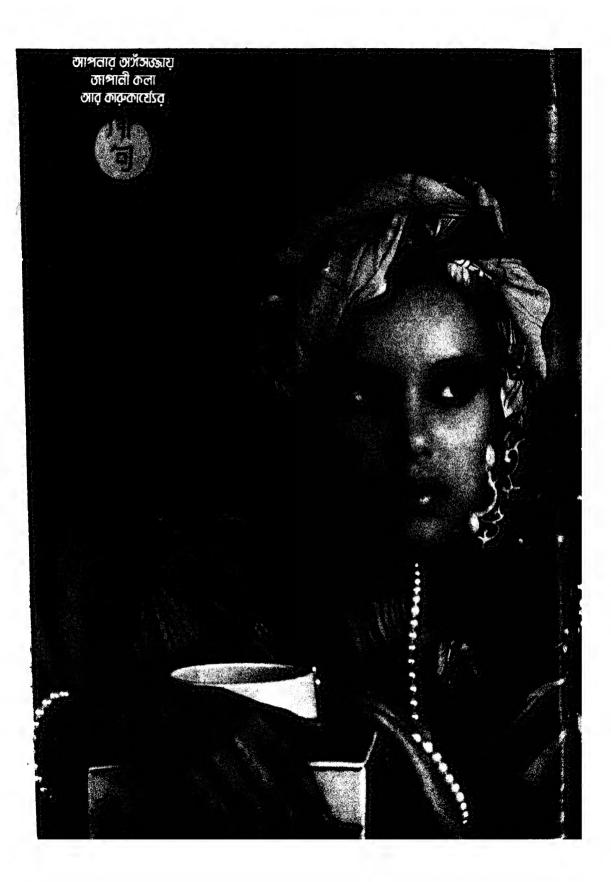
উন্মুখ। নিষ্প্রাণ তথ্য ও ঘটনা এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে নিয়েছে। ধারণাগতভাবে হাইকোর্ট ব্রিটিশ হলেও ভারতীয় জনসাধারণের সার্বিক উপস্থিতি তাকে নেহাত কম বদলায়নি। বস্তুত ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটিই এক এবং একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা ভারতীয় জনসাধারণের অংশ হতে শুরু করেছে বহু আগেই।

একশ পঁচিশ বছরের এই পূর্ণ যুবক দুটি বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, দাঙ্গা এবং উনিশ শতকের জাগরণ প্রত্যক্ষ করেছে। হয়ত কালের অনন্ত মাত্রায় তাকে অংশ নিতে হবে সমষ্টির জীবনের আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে। গভীর ও ব্যাপক মানবিক আচরণ এবং ভাবধারার সঙ্গে সে বিজড়িত। সাধারণ নাগরিকের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত। সংগ্রাম, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাসনা ও সংক্ষোভে আলোড়িত মানবিক সম্পর্ক তার বিবেচনাধীন, মামলার রসদ। মনস্তাত্ত্বিক উপাদানে পূর্ণ এই রসদ যান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করা যায় না।

মামলাবাজি

'মহারাজা নবকৃষ্ণ ঔরসপুত্রের প্রতি পক্ষপাতী হওয়ায় পোষ্যপুত্র ও ঔরসপুত্রের মধ্যে মামলা হয় ও উহার নিষ্পত্তি আদালতে পরস্পরের সম্মতিক্রমে সমানাংশে বিভাগ করার ডিক্রি ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে সুপ্রীম কোর্ট করিয়াছিলেন। এই মামলা নিষ্পত্তির সম্বন্ধে এইরূপ শোনা যায় যে ভ্রাতারা মামলা করিয়া ফির টাকা কম হওয়ায় উকিলেরা ঐ থলে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দেয়, উহাতে রাজকৃষ্ণের প্রাণে আঘাত লাগে ও সেই থলে উঠাইয়া লইয়া স্বয়ং ভ্রাতার প্রার্থিত অর্দ্ধেক সম্পত্তি দিয়া তৎক্ষণাৎ গিয়া মামলা নিষ্পত্তি করে।... উকিল কৌন্সলিগণ রাগান্বিত হইয়া মহারাজ নবকৃষ্ণের খঞ্জনী ও বিলাস নাম্নী দুই পত্নী দ্বারা খোরপোষের দাবী করিয়া পুত্রদের নামে নালিশ করে। (সচিত্র কলকাতার কথা— প্রমথনাথ মল্লিক)।'

উইলিয়াম পামার কোম্পানি উনিশ শতকের শুরুতে একটি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত ও সফল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। যদিও কোম্পানির প্রাণপুরুষ জন পামার শেষ পর্যন্ত দেউলিয়া হন। ১৮৩০-৩৪ এই সময়ের মধ্যে ওই প্রতিষ্ঠানের কলকাতার ছ-টি অফিস দেউলিয়া হয়ে যায়। এর ফলে কলকাতার গৌরচরণ মল্লিকের ছেলে রূপলাল মল্লিক আর্থিকভাবে প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। পামার কোম্পানিতে তাঁর বিস্তর টাকা খাটত। এই বিপর্যয়ে ক্রুদ্ধ রূপলাল সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। জন পামারের দান ধ্যান তাঁকে প্রায় কিংবদন্তীর নায়ক করে তুলেছিল। দরিদ্র প্রতিপালক হিসেবে পামারের খ্যাতির অন্ত ছিল না। টাউন হলে তাঁর হাফবাস্ট মূর্তি এজন্যেই সংরক্ষিত হয়। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি চার্লস এডয়ার্ড গ্রে পামারের আর্থিক দুরবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। এডয়ার্ডের কাছে পামারের দেনাদাররা একটি দরখাস্ত করেছিলেন। ওই দরখাস্তে তাঁরা পামারের ব্যবসা ও অফিস রক্ষার্থে অর্থ সাহায্যের অঙ্গীকার করেন। এই দরখাস্তটিই এডয়ার্ড গ্রেকে বিচলিত করেছিল। পোস্তার রাজবংশের মামলার সঙ্গে পামার সমস্যাটির কোনও যোগসূত্র নেই। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই আদালতের সুস্পষ্ট উপস্থিতি আছে। আদালত সমাজজীবনে প্রবিষ্ট হচ্ছে, আবার সমাজও তাকে নিজের মতো করে নিতে চাইছে, প্রভাবিত করছে।

কলকাতার বাবুদের কাছে তবু সাধারণভাবে আদালত সর্বস্বান্ত হওয়ার একটি ক্ষেত্র হিসেবেই গণ্য হতো। আদালত সম্পর্কে ভীতি ও অবিশ্বাস এতখানি গভীর ছিল যে, উইলপত্রে আদালতে মামলা করার প্রশ্নে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞাও দেখা যায়। গোকুলচন্দ্র কারফরমা তাঁর উইলে, (যা সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা হয়) ১৭৯৮ সালের ২০ নভেম্বর সাক্ষরিত, এইরকম নির্দেশ দিয়েছিলেন। নিজেদের মধ্যে বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য তাঁর ছেলেরা যেন গৌর মল্লিকের সাহায্য নেন, বা অন্য কোনও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির দ্বারস্থ হন। এরপর সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'You will never resort to the Court on your own private disputes. The person who attempts to resort to the Court is not fit for to remain in my Surcar but will receive from it the sum of current (500) five hundred rupees for subsistence and clothing...'

সুপ্রিম কোর্টের ওপর সেকালে সাধারণের কতটুকু আস্থা ছিল গোকুলচন্দ্র কারফরমার উইল থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। গৌরচরণ মল্লিকের ছেলে জগমোহন মল্লিকের নামে কলকাতার লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর একটি উইল তৈরি করেন। এই উইলটি নিয়ে আদালতে এক কালক্ষয়ী মামলার সূচনা ঘটেছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের জীবিত তিন পত্নী ছিলেন ; তারামণি, ভগবতী ও দিগম্বরী। ১৮১৪ সালের ৭ নভেম্বর লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হয়। জগমোহন মল্লিক তাঁর মৃত্যুকালে বৈষ্ণবদাস মল্লিককে একজিকিউটর করে যান। ১৮১৮ সালে লক্ষ্মীনারায়ণের পত্নী (ছোট) দিগম্বরী বৈষ্ণবদাস মল্লিক ও অপর দুই পত্নীর নামে আদালতে নালিস করেন। দীর্ঘকাল এই মামলা চলে। শেষ পর্যন্ত মামলাটি আদালতে 'ডিসমিস' হয়ে গেলেও, এ বাবদ যে অর্থ ব্যয় ও ভোগান্তি হয়েছিল তা একটি নেতিবাচক দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিল।

'নালিশ কিয়া তাগাদা ছুটা,
ঘরঘর রুপেয়া বাটে,
বড়ে ভাগমে ডিক্রি হুয়া,
কাগজ লেকে চাটে।'

১৮৩০ সালে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন ছাড়া ভিন্ন একটি আলোড়নও সৃষ্টি হয়েছিল, কোম্পানির কাগজ জাল এবং দেউলিয়া সমস্যার সুবিধার্থে ইনসলভেন্সি আইন জারি করা হয়। এর দ্বারা কোম্পানি বিশেষ লাভবান হয়েছিল, কলকাতায় ২২ লাখ টাকার জাল কাগজ ধরা পড়ে। রাজা বৈদ্যনাথ রায় কোম্পানির নির্দেশে কাগজ (কোম্পানির) জমা দেন। এবং প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। রাজা বৈদ্যনাথের আর্থিক বিপর্যয় লক্ষ্য করে অন্য অনেকেই কোম্পানির সন্দেহজনক কাগজ (যা তাঁদের কাছে ছিল) জমা না দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন। এই বিষয়ে বাঙালা ব্যাঙ্কের সঙ্গে কোম্পানির দীর্ঘকালব্যাপী এক মামলা চলে। ওই মামলায় শেষপর্যন্ত কোম্পানিই জয়ী হয়েছিল। প্রাণকৃষ্ণ হালদার এবং রাজকিশোর দত্তের বিরুদ্ধে কাগজ জাল করার অভিযোগ প্রমাণিত হলে দুজনের দণ্ড হয়েছিল। চুঁচুড়ার প্রাণকৃষ্ণ হালদার বাবুগিরির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কথিত আছে, কোম্পানির নোটে তিনি চুরুট ধরিয়ে খেতেন। পশ্চিমী মানুষরা (ব্যবসায়ী গোষ্ঠী) দেউলিয়া আইনকে ভাল নজরে দেখেননি। তারই নমুনা এই ব্যঙ্গ কবিতা। অন্যদিকে তেজারতি ব্যবসায় গণেশ উল্টে দিতে তারা বাধ্য হন এই ডিক্রির পর।

বাণিজ্যের স্বার্থে আদালত

মাদ্রাজ, ফোর্ট উইলিয়াম এবং বোম্বাই, এই তিনটি স্থানে একজন করে মেয়র এবং ন-জন করে অল্ডারম্যানের নিয়োগের দ্বারা যে কোর্টের পত্তন করা হয়েছিল, এদেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থার, আদালতের বীজ হিসেবেই তাকে গণ্য করতে হবে। ১৭২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মেয়র'স কোর্টকে আখ্যা দেওয়া হয়, কোর্টস অফ রেকর্ড। কোম্পানির সুপরিচালনা, তার বিকাশ এবং বাণিজ্যকে নির্বিঘ্ন করে তুলতেই ব্রিটিশ রাজশক্তি কোম্পানিকে আইন ও বিচার সম্বন্ধীয় কিছু ক্ষমতা দিয়েছিল। এই কর্তৃত্ব শুধু ইংরেজ কর্মচারীদের উপরই প্রযোজ্য। রানী এলিজাবেথের চার্টার অনুসারে কোম্পানি এই অধিকারটুকু পেল।

পরবর্তীকালে প্রথম জেমস, দ্বিতীয় চার্লস এবং তৃতীয় উইলিয়ামের অনুমোদনে কোম্পানির হাতে আইন ও বিচার সম্বন্ধীয় ক্ষমতায় কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি ঘটে। দ্বিতীয় চার্লসের চার্টার বলে কোম্পানির গভর্নর এবং বিভিন্ন এলাকার কাউন্সিল কোম্পানির অধীনস্থ সকল ব্যক্তির বিচার অধিকার অর্জন করে। সাম্রাজ্যের আইন অনুসারে সিভিল, ক্রিমিনাল উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা এই বিচার করতে পারবেন। ১৬৮৩-তে দ্বিতীয় চার্লস এই ব্যবস্থাকে আরেকটু আনুষ্ঠানিক করে তুললেন, 'কোর্ট অফ জুডিকেচার' গঠনের অনুমোদন করে। মেয়রস্ কোর্ট এবং কোর্ট অফ রিকোয়েস্টস পর্যন্ত পৌঁছতে ১৭৫৩ সাল হয়ে যায়। আইন ও বিচার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক, প্রাথমিক একটা অবয়ব গড়ে তুলতেই এক শতাব্দীরও বেশি সময় কেটে যায়। সাম্রাজ্যের কানুনের এই শম্বুকগতির কারণ অবশ্যই রাজনীতি এবং অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্তরে আধিপত্য সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে, কী করেই বা একটি বিশেষ বিচার ব্যবস্থার মধ্যে ভারতবর্ষকে নিয়ে আসা সম্ভব। মেয়র'স্ কোর্ট গঠিত হওয়ায় কোম্পানির নিজস্ব কোর্ট বাতিল হয়ে গিয়েছিল এমন নয়। দুটি কোর্টই আলাদা

ভাবে বেশ কিছুকাল সক্রিয় ছিল।

মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিভূ হিসেবে স্থানীয় জমিদারদের বিচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ন্যায্য বিচারের অধিকার নিশ্চিতভাবেই যথেষ্ট অসাম্য এবং অন্যায়ের স্তম্ভ হিসেবে কাজ করত। কিন্তু মেয়র'স্ কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এই ছিল বিচারের একমাত্র ক্ষেত্র। গ্রামজীবনের নিপুণ ভাষ্যকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'গণদেবতা' উপন্যাসটির এগারো পরিচ্ছেদ থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাক:

'তাহার বাল্যকালে জমিদারবাবুরা বাকী খাজনা আদায়ের জন্য একবার তাহার বাবাকে সমস্ত দিন কাছারিতে আটক রাখিয়াছিল। আতঙ্কিত দেবু তিনবার বাবুদের কাছারিতে গিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুধু কাঁদিয়াছিল; দুইবার চাপরাশীর ধমক খাইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। শেষবার বাবু তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিল—এবার যদি আসবি ছোঁড়া, তবে কয়েদখানায় বন্ধ করে রেখে দেব। চাপরাশীটা তাহাকে টানিয়া আনিয়া একটা অন্ধকার ঘরও দেখাইয়া দিয়াছিল। বাবুদের অবশ্য কয়েদখানার জন্য স্বর্গধাম কি বৈকুণ্ঠজাতীয় কোন মহল বা ঘর কোনদিনই ছিল না। ... দেবুকে নিছক ভয় দেখাইবার জন্যই ও-কথাটা বলা হইয়াছিল— সেটা দেবু আজ বোঝে।'

এই উদ্ধৃতির ফলে সময় নিয়ে একটি বিপর্যয়ই ঘটে গেল। কারণ দেবুর ভয় পাওয়ার ঘটনাটির বহু আগেই ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত বিচার ব্যবস্থা সর্বাত্মক এবং দৃঢ় ভিত্তি পেয়েছিল। তথাপি সমান্তরাল বিচার, কাছারি বাড়ির কয়েদ ভীতির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটেনি। ওই ঘটনাটির কিছুটা জের টানলে আমরা আদালতের সীমার মধ্যেও চলে আসতে পারি।

'জমিদারের ওই বাকি খাজনা শোধের জন্য তাহার বাপ কঙ্কণার মুখুজ্জেবাবুদের কাছে ঋণ করিয়াছিল। তাহারা তিন বৎসর অন্তে হ্যান্ডনোটের নালিশ করিয়া অস্থাবর ক্রোকী পরোয়ানা আনিয়া, গাই-বাছুর- থালা-গেলাস ও অন্যান্য জিনিষপত্র টানিয়া রাস্তায় যেদিন বাহির করিয়াছিল— সেদিনের সেই লাঞ্ছনা-বিভীষিকা দেবু কিছুতেই ভুলিতে পারে না। তাহার পর অবশ্য ডিক্রীর টাকা আসল করিয়া তমসুক লিখিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিলে বাবুরা অস্থাবর ছাড়িয়া দিয়াছিল।... এই বাবুরা অবশ্য বে-আইনী কখনও কিছু করে না, হিসাবের বাইরে একটি পয়সা অতিরিক্ত লয় না।'

বাংলা ১৩২৯, ইংরেজী ১৯২২ সালের ঘটনা। ন্যায্য বিচার ততদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত, বস্তুত তার অনেক আগেই। লক্ষণীয়, এর দ্বারা সম্পত্তির অধিকার সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ করা সম্ভব হয়েছে। গোকুলচন্দ্র কারফরমার আমল থেকে আমরা বহুদূরে এখন, বাবুগণ নিরাপদ। আইনের অতিরিক্ত বা আইনবহির্ভূত ব্যবস্থা সম্পর্কে অনীহা বেড়েছে। মন্থর অথচ নিশ্চিত প্রক্রিয়ায় কোর্টের বিজয়রথ প্রতিরোধের চেষ্টা এরপর কেবলমাত্র প্রজা বিদ্রোহ, অগ্নিযুগের বিপ্লব এবং মহাত্মাজীর অসহযোগে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবয়ব গ্রহণ করেছিল। চণ্ডীমণ্ডপ ও কাছারি বাড়ির, মোড়ল ও গ্রামপ্রধানের মারফত বিচারকার্য আঞ্চলিক স্তরেও আর বেশিদিন চালানো যায়নি। এই পরিবর্তন সাম্রাজ্যের ন্যায়নীতি ও দেশজ ঐতিহ্যের সংঘর্ষ ও সম্মিলন জারিত। কেবল একটি ফর্মের পরিবর্তন নয়, তার প্রাণ-বস্তুও যথেষ্ট গভীর।

কলিকাতা বিচারালয়

'কলকাতা হাইকোর্ট' শব্দটির ব্যঞ্জনা শুধু এই নয় যে বাংলাদেশ তথা বাংলা এলাকার হাইকোর্টটির ভৌগোলিক অবস্থানকেই সে সুনির্দিষ্ট করছে। শব্দটিকে এভাবেও দেখা দরকার, কলকাতার হাইকোর্ট। কোম্পানির আদি বিচারালয়ের বিবর্তন ও বিকাশের চতুর্থপর্বে তার আবির্ভাব। প্রথম দুটি পর্বের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, এখন তৃতীয় পর্ব। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট।

কলকাতা হাইকোর্টে আপীল-আবেদন নথিভুক্ত করতে এসেছেন অনেক ব্যক্তি — ছবি : সুধীর চ্যাটার্জী

দ্বিতীয় পর্বের সময় পরিধি যদি ১৭২৬-১৭৭৪ বলে গণনা করা হয়, তাহলে তৃতীয় পর্বের সময় কাল হল ১৭৭৪-১৮৬২। এই নিবন্ধে কলকাতার ধনী সম্প্রদায়ের মামলা প্রসঙ্গে উল্লিখিত সুপ্রিম কোর্ট তখন কলকাতাতেই অবস্থিত। সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের অনুমতি ও নির্দেশ পাওয়া গিয়েছিল বিলেতে ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছ থেকেই। সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ারের পরিধি সংক্রান্ত নির্দেশও পাওয়া গিয়েছিল সরাসরি বিলেত থেকেই।

১৮৬২ থেকে ১৯৫০-কে চতুর্থ পর্ব বলা যেতে পারে। কলকাতা হাইকোর্টের স্থাপনা ও তার বিকাশের এটি আদি যুগ। যদিও তখন তার পরিচয় ভিন্ন 'হাইকোর্ট অফ জুডিকেচার অ্যাট ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল।' ১৮৬২ সালের পর থেকে কোম্পানির নিজস্ব ও পৃথক কোর্টের অস্তিত্ব মুছে ফেলা হয়। সামাজিক ভাবে এর অর্থ শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের বিচারের ক্ষেত্রে আর কোনও স্বাতন্ত্র্য, তারতম্য রইল না। প্রশাসনের দিক থেকে কোম্পানির দায়দায়িত্বকে সরাসরি ব্রিটিশ ক্রাউনের সঙ্গে যুক্ত করা হল। বা, সাম্রাজ্যকে একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্নের মধ্যেই নিয়ে আসা হল।

এর দ্বারা বিচার ব্যবস্থা এবং আইনের প্রশ্নে, এদেশে আনুষ্ঠানিক ভাবে এবং কার্যত একটি নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের মধ্যে জনসাধারণকে এনে ফেলা সম্ভব হল। অনেক আগেই যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, ধীরে তা ভারতীয় সমাজের প্রত্যন্ত গ্রামকেও টেনে আনতে সক্ষম হল নিজের ন্যায় বিচারের আওতায়। হাইকোর্ট তথা হাইকোর্ট অফ জুডিকেচার যখন কলকাতাবাসীর বিবাদ বিসংবাদের নিষ্পত্তি করার অধিকার অর্জন করে, তখন মফস্বলের জন্য তৈরি হয়েছে ডিস্ট্রিক্ট এবং সাব অর্ডিনেট কোর্ট। এইসব আদালতও রাজশক্তির কাছ থেকে সরাসরি অনুমোদন লাভ করায়, প্রশাসনের দিক থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিশাল এই দেশটিকে একটি একক ব্যবস্থার শৃঙ্খলায়ও বেঁধে ফেলতে পারল।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার তিন বছরের মাথায় 'ফোর্ট উইলিয়াম' এবং 'জুডিকেচার' শব্দ দুটি পরিত্যাগ করা সম্ভব হয়। ১৯৫০ সাল হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক সময় যখন প্রাচীন এই বিচারালয়টি 'হাইকোর্ট অ্যাট ক্যালকাটা' বা কলকাতা হাইকোর্ট নামে পরিচিত হল। সেই সময় এর বিচার এলাকা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সীমিত ছিল না। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জও তখন কলকাতা হাইকোর্টের পরিধির অন্তর্গত।

ঐতিহ্যময় ও ঘটনাবহুল এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে আলাপে সময় অতীতগামী হবেই। বা এ প্রসঙ্গে এক সুদীর্ঘ সময়ের স্কেলে আমাদের হঠাৎ হঠাৎ পিছিয়ে যাওয়াকে সমর্থন করবে। মেয়র'স কোর্ট তুলে দিয়ে ১৭৭৪ সালে ফোর্ট উইলিয়ামে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। গভর্নর জেনারেল ইন

কাউন্সিল এবং সুপ্রিম কোর্ট একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল, দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে বহু মুখরোচক ঘটনা এবং গল্প আছে। কথিত আছে, একবার এই দুই প্রতিষ্ঠানের প্রধানই পরস্পরের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে পেয়াদা পাঠান। দুটি কর্তৃত্বের কাজের মধ্যকার সীমারেখা খুবই অস্পষ্ট থাকার ফলেই এ ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রশ্রয় পেতে থাকে। বেঙ্গল প্রভিন্সে সুপ্রিম কোর্ট, কাউন্সিল এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সংঘাতে নাগরিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির লক্ষণীয় অবনতি ঘটে ওই সময়। বলা যায় প্রায় সাত বৎসর কাল এই অবস্থা টিকে ছিল। ১৭৮১ সালে পার্লামেন্টে অ্যাক্ট অফ সেটেলমেন্ট পাস করে বিবাদের ক্ষেত্রগুলিকে নির্দিষ্ট কর্তৃত্বের হাতে অর্পণ করা হয়। এরপর স্ব স্ব এলাকায় প্রতিষ্ঠানগুলি ভিত্তি প্রস্তর রূপে গণ্য করা যেতে পারে। মহারাজ নন্দকুমারের বিচার এলিজার বিচারপতি জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মামলা। পাঠক জানেন ওই মামলায় দলিল 'জাল'এর অপরাধে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়েছিল।

আইন প্রণয়ন নিশ্চিতভাবেই বিচারবিভাগের কাজ নয়, সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট আইনের প্রয়োগগত দিকটি নিয়ে ব্যস্ত ছিল। হাইকোর্টের ধীর বিবর্তনের মধ্যে, আইনের প্রয়োগগত সূত্র ধরেই তবু ঢুকে পড়েছিল সমাজ জীবনেরও নানা দিক। কলকাতা হাইকোর্টে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য, বিচারপতি এবং উকিল ব্যারিস্টারের ক্ষেত্রে এতখানি প্রবল ছিল যে দেশীয় ব্যারিস্টাররা নিজেদের এক কোণে গুটিয়ে রেখে, ওই কুণ্ডলীটিকে 'এশিয়া মাইনর' বলেও উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে ইংরেজ আইনকে এদেশের হয়েছেন। ন্যায় বিচারের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব। শ্লেষ বিদ্রূপ এক ধরনের ভেন্টিলেশন মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। এখন কতিপয় দৃষ্টান্ত সহযোগে আমরা দেখার চেষ্টা করব হাইকোর্টের ধর্মাবতার এবং ব্যারিস্টাররা ওই গথিক কাঠামোটির অভ্যন্তরে কী রূপে শিক্ষিত বাঙালির অন্যতম সেরা জীবিকার পত্তন করলেন। হৌস ও বেনিয়ানগিরির পরে এই অধ্যায়টি নিরপেক্ষ, সাদা-কালো রঙে ঢাকা। যুক্তির আধিপত্যের এলাকায় বাঙালির প্রবেশ। ফলে হাইকোর্ট এক অর্থে নব্য বাঙালির আতুরঘরও বটে।

প্রায় টানা একুশটি বছর জাস্টিস জন হাইড সুপ্রিম কোর্টে পুসনে (Puisne) জজ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। হাইডের নিয়োগের প্রশ্নে এলিজা ইম্পের কিছুটা হাত ছিল। যদিও এলিজা হাইডের খুব একটা প্রশংসা করতে পারেননি পরবর্তীকালে। ইম্পের বর্ণনায়, 'লোকটা সৎ কিন্তু আত্মস্পর্ধী। জিভ সব সময় চলছে। আর জাঁকের তো শেষ নেই।'

কলকাতাবাসীর জন্য, ভবিষ্যতের গবেষক ও কৌতূহলী নাগরিকের জন্য হাইড বিপুল সম্পদের একটি ভাণ্ডার রেখে গিয়েছেন : হাইড'স নোটস বা হাইড'স পেপার্স। সর্বমোট ৭৩টি ভল্যুম। এতে শুধু যে কোর্টের কাজের বিবরণই আছে এমন নয়। তৎকালে হিকি ও হেস্টিংসের বিবাদ, নন্দকুমারের ফাঁসি, ফিলিপ ফ্রান্সিসের প্রণয়োপাখ্যানসহ বহু মূল্যবান তথ্যই এই ৭৩টি ভল্যুমে সংরক্ষিত। ব্যভিচারের অভিযোগে চিফ জাস্টিস ফিলিপকে পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করলে, জাস্টিস হাইড চিফ জাস্টিসের কানে ফিসফিস করে বলেন, 'Siccas, brother Impey, siccas not rupees.'

১৮৬২-তে হাইকোর্ট অফ জুডিকেচার অ্যাট ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল-এর চিফ জাস্টিস হয়ে এলেন স্যার বার্নেস পিকক। অসীম অধ্যবসায় এবং আইনের গভীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ পিককেক আজও স্মরণ করা হয়ে থাকে তাঁর রায়দানের নৈপুণ্যের জন্য। আইনের ধারা উপধারা তার তাৎপর্য পিককের রায়ে যেন-বা জীবন্ত হয়ে উঠত। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের খসড়া সংশোধনের কাজটি পিককের উপরই ন্যস্ত হয়। নিরপেক্ষ হিসেবেও পিককের খ্যাতি যথেষ্টই, ইংরেজ ব্যারিস্টার এবং অ্যাডভোকেটদের (নেটিভ) মধ্যে কোনও তফাত করতেন না। জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্রের রায়কে কেন্দ্র করে ইংলিশম্যান কাগজে একবার বিরূপ মন্তব্য করা হলে, টেলারের বিরুদ্ধে তিনি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। টেলার একজন ইংরেজ, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্য। যেদিন এই পরোয়ানা জারি করা হয়, সেদিন টেলারের লন্ডন ফিরে যাবার কথা, সেইভাবে জাহাজের টিকিটও কাটা ছিল। সকাল বেলাতেই পেয়াদা ছুটল।

ঐতিহ্যই সমাজকে ধীরে সামনে ঠেলতে থাকে। আইনের ক্ষেত্রে তা বিশেষ করে আত্মপ্রকাশ করে ছবি : সুদীপ চ্যাটার্জী

নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখায় একটা ভারসাম্য ফিরে আসে।

১৭৮১ সালের অ্যাক্টের পর সুপ্রিম কোর্ট অ্যাট ক্যালকাটার আয়ু ছিল ৮০ বছর। এই দীর্ঘ সময় আইন ও বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ও তাকে জনপ্রিয় করার এক গৌরবজনক অধ্যায়। এই সময়ই ভারতের জন্য উন্নত সরকার, কোম্পানির সম্পত্তি ও আনুগত্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে সমর্পণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। কলকাতার চাঁদপাল ঘাটে নেমেছিলেন সুপ্রিম কাউন্সিলের (গভর্নর জেনারেলের সুপ্রিম কাউন্সিল) তিনজন সদস্য, চতুর্থ সদস্য রিচার্ড বারওয়েল, কলকাতাতেই ছিলেন। স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস, লেঃ জেঃ ক্লাভারিং ও কর্নেল মনসনের সঙ্গেই ওই চাঁদপাল ঘাটে অবতরণ করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ স্যার এলিজা ইম্পে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিন সহকারি— জজ—জন হাইড, রবার্ট চেম্বার্স ও স্টিফেন সিজার লেমেস্তার। ১৭৭৪ সালে দুপুর বারোটার সময় এলিজার পদার্পণকে আইনের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ বাসনার এক জল-হাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য, কিংবা ভারতের পক্ষে এই আইনের শুধু প্রাসঙ্গিক দিকগুলি গ্রহণের জন্য ভারতীয়রা আইনের রাজত্বেও কিছু কম সংগ্রাম করেননি। নেটিভ-বিরোধী মনোভাব এবং আইনের চোখে সকলে সমান এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গীর সংঘাত শ্বেতাঙ্গ বিচারপতিদের মধ্যেও কাজ করেছে দীর্ঘদিন।

ধর্মাবতার

'বিদায় হও মা ভগবতি! এ সহরে এসো নাকো আর,
দিনে দিনে কলিকাতার মর্ম দেখি চমৎকার।
জস্টিসেরা ধর্ম অবতার কায়মনে করেন সুবিচার
এদিকে ধুলোর তরে রাজপথেতে চেঁচিয়ে চলা ভার।'

হুতোমের নকশা গানে 'পথে হাগা মোতা চলবে না' বলেও আক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু এই আপত্তির সুর আলাদা, শ্লেষই তার আশ্রয়। জাস্টিস ততদিন প্রকৃতই ধর্মের অবতার

এপ্রিল ১৮৭৫-এ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হলেন রিচার্ড গার্থ। বিচারপতি নিয়োগের প্রশ্নে শ্বেতাঙ্গ পক্ষপাতিত্ব থেকে রিচার্ড মুক্ত ছিলেন না। ভারতীয়-বিরোধী রিচার্ডের এই মনোভাব শেষের দিকে বদলে যায়। এমনকি

তিনি সদ্যগঠিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের এক জোরদার সমর্থক হয়েছিলেন। ফ্রান্সিস ম্যাকলীন প্রধান বিচারপতি হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন ব্যারাকপুর মার্ডার কেসের মামলায় মদ্যপ সৈন্যদের শাস্তিদান প্রসঙ্গে। জনৈক ভারতীয় ডাক্তারকে ওই সৈন্যরা খুন করেছিল। ১৯০৯ সালে ফ্রান্সিস অবসর নিলে প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেন লরেন্স হ্যাগ জেনকিনস। লরেন্স ১৯১৫ পর্যন্ত ওই পদের দায়িত্ব পালন করেন গৌরবজনকভাবে। সময়টিও তখন বেশ সঙ্কটাপন্ন, বেঙ্গল পার্টিশনের ফলে বাংলা তখন উত্তাল। সংস্কার ও আবেগমুক্ত নিরপেক্ষ সুবিচারের বহু দৃষ্টান্ত রেখেছেন লরেন্স। হাওড়া গ্যাঙ কেস, বারীন ঘোষ মামলা, প্রভৃতি অগ্নিযুগের রাজনৈতিক গন্ধযুক্ত ফৌজদারি মামলায় তাঁর রায় ব্রিটিশ জাস্টিসের নিরপেক্ষতার প্রশ্নে যুবমানসে আস্থা সৃষ্টি করে। প্রধান বিচারপতি ক্লস রানকিন ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান আইন বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ১৯১৯-এ তিনি হাণ্টার কমিশনের সদস্য হন। এই কমিশন বসানো হয়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে।

ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থা ও আইন সম্পর্কে কিছুটা আস্থা ও শ্রদ্ধা আগেই গড়ে উঠেছিল। নিরপেক্ষ বিচারের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ভারতবাসীর সন্দেহ দূর করে চলে একদিকে, অন্যদিকে আইনের ব্যাখ্যা, রায়দান, সে সম্পর্কে সংবাদপত্রের রিপোর্ট, তর্ক ও বিতর্কে গড়ে উঠেছিল আইন চর্চারও একটি ক্ষেত্র। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ও বাবু বাঙালির পেশা হিসেবে ওকালতি-জজিয়তি জনপ্রিয়তা অর্জন করার ফলে, আইনের রাজ্যের সম্পূর্ণ ও নির্বিঘ্ন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হল।

রাজা রামমোহনের পুত্র

হাইকোর্টের পুসনে জজের নিয়োগপত্র প্রথম যে ভারতীয়ের নামে ইস্যু করা হয়েছিল, তিনি রমাপ্রসাদ রায়। মহান সমাজ সংস্কারক, চিন্তাবিদ ও সুলেখক রাজা রামমোহন রায়ের ছেলেই রমাপ্রসাদ রায়। সদর দেওয়ানি আদালত এবং পরে হাইকোর্ট গঠিত হলে সেখানেও সিনিয়র সরকারি উকিলের কাজ যোগ্যতার সঙ্গে নিষ্পন্ন করেন। রমাপ্রসাদ রায়ের বিপুল প্র্যাকটিস ছিল, আইনজীবীর পেশা যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন। তাঁর জীবনযাপন ছিল জাঁকজমকপূর্ণ, বিলাসিতার তুঙ্গে থেকেও সম্পদে কোনওদিন টান পড়েনি। সেকালে বিচারপতির নিয়োগপত্র ইস্যু করা হত ইংল্যান্ড থেকে। রমাপ্রসাদের নিয়োগপত্রটি সমুদ্রপথে আসতে স্বাভাবিক কারণেই দীর্ঘ সময় লেগেছিল। নিয়োগপত্রটি যখন কলকাতায় পৌঁছল, রমাপ্রসাদ তখন আর বেঁচে নেই।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র মিত্র, চন্দ্রমাধব ঘোষ, মন্মথনাথ মুখার্জি প্রমুখ দেশীয় আইনজ্ঞ ও বিচারপতিগণের ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি ও ভাষণের সৌন্দর্য সম্পর্কে সাহেবরাও বিস্তর সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এহ

আলোচনারত মহিলা আইনজীবীরা — ছবি : সুধীর চ্যাটার্জী

বাহ্য। এইসব বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ আইনের দিক থেকে কার্যত এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করলেন। এক তো ব্রিটিশ বিচারের ইতিবাচক দিকগুলি এঁদের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হওয়ায় তা আরও বিশ্বাস্য হল। এছাড়া শম্ভুনাথ পণ্ডিত যেমন মনে করতেন, ইংলিশ ল-কে অদলবদল করে নিতে হবে ভারতীয় পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে। এর দ্বারা ভারতবর্ষও এই আইনের উপর ক্রিয়া করতে শুরু করে। বাংলার বাঘ আশুতোষ আদর্শ বিচার বিভাগীয় প্রশাসন অর্জন করায় যে নিষ্ঠা দেখিয়েছেন তা তুলনারহিত। ১৮২৫ সালে গঠিত হয়েছিল বার লাইব্রেরি ক্লাব। সে সময় ব্যারিস্টারের সংখ্যা ছিল মাত্র দশ। অন্যদিকে সি আর দাশ যখন প্র্যাকটিশ শুরু করেন (১৮৯৪) তখনও ভারতীয় ব্যারিস্টারের সংখ্যা নগণ্য। রাজনৈতিক গোত্রের ফৌজদারি মামলায় সি আর দাশের সাফল্য তো এক কিংবদন্তী। বাঙালি বুদ্ধিজীবীর গোড়াপত্তন, তার জন্ম ও বিকাশে যে কটি ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ ও উর্বর ভূমিকা পালন করেছিল, কলকাতা হাইকোর্ট তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। আইন, শিক্ষা ও প্রশাসনের মাধ্যমে একটি শাসন ব্যবস্থার ধীরে গড়ে ওঠা, ও মজবুত ভিত্তি অর্জনের যে উপাখ্যান বহু মানবিক গল্প ও নাটকীয় ঘটনার নকশায় বন্দী—আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাস তার থেকে খুব একটা দূরের নয়। ১২৫ বছর অতি কম সময়, আইনের ইতিহাস, সমাজের আত্মজীবনীর দীর্ঘ সময়ের তুলনায় তো বটেই, প্রার্থনার দিক থেকেও। ন্যায় ও সমান অধিকারের জন্য আমাদের খিদে প্রজ্বলিত অগ্নি। হাইকোর্টের প্রাচীন, গৌরবময় স্তম্ভ এবং খিলান জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডব্লিউ সি ব্যানার্জি প্রমুখের স্পর্শে ব্যাপ্তি ও বিকাশের এমন এক সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে রাখে যার সবটা আমাদের জানাও নেই। দুর্নীতি ও অনাচারের কুণ্ডলীর পাক একদিন খুলে যাবে, ন্যায় বিচারের শান্ত দুটি ডানার আড়াল পাবেন ব্যাপক সংখ্যক মানুষ। এই সম্ভাবনা এবং আরও অজস্র সম্ভাবনার ইঙ্গিত আইন আমাদের দিতে পারে। ■

আধুনিক সাহিত্যের সেরা সম্ভার

রবীন্দ্রনাথের শতাধিক পত্রাবলী

উপন্যাস

ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর ☐ সত্যজিৎ রায়
প্রকৃতি ☐ সমরেশ বসু
মুক্তির স্বাদ ☐ শংকর
গ্রন্থি ☐ বিমল কর
শেষ দেখা হয়নি ☐ নীললোহিত
তিন নম্বরের সুধারানী ☐ সমরেশ মজুমদার
ফুলবউ ☐ আবুল বাশার

বড় গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ভ্রমণকাহিনী

তপোভূমি মায়াবতী
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : গণিতের উপেক্ষিত
প্রতিভা ☐ দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
দণ্ডকারণ্যে—নির্বাসন না পুনর্বাসন ?
পান্নালাল দাশগুপ্ত
পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর
বসন্তগোবিন্দ পোতদার
'দেবী চৌধুরানী' : অগ্রন্থিত পাঠ—অজ্ঞাত
কাহিনী ☐ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
গোলন্দাজ পঞ্চম ☐ রূপক সাহা
(অতীতের পাঁচ সেরা ফুটবলারের কাহিনী)

কবিতা

অরুণ মিত্র ☐ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
শামসুর রাহমান ☐ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
রাজলক্ষ্মী দেবী ☐ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
কেতকী কুশারী ডাইসন
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ☐ অরবিন্দ গুহ
তারাপদ রায়
সুনীল বসু এবং আরও অনেকে ।

অনুবাদ কবিতা

গাথা সপ্তশতী ☐ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গল্প

মতি নন্দী ☐ বুদ্ধদেব গুহ ☐ আনন্দ বাগচী
অরুণকুমার সরকার ☐ দিব্যেন্দু পালিত
দুলেন্দ্র ভৌমিক এবং আরও অনেকে ।

রঙিন চিত্র

শ্রীশ্রীদুর্গা (বাংলার প্রাচীন চিত্র)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ☐ রামকিঙ্কর

দাম : ৩৬·০০ টাকা

সময় বেশ বুঝতে পারা যায় এবার ট্রেন আসবে। অনেকজন মানুষের একমুখী অপেক্ষা ততক্ষণে বেশ ঘন হয়ে ওঠে।

দূরত্ব কম বা বেশী যাই হোক না কেন, ট্রেনের কামরার ভেতরকার সময়কে কখনোই মারাত্মক দুঃসহ লাগে না ভেতরে অনেক জীবন্ত উপস্থিতি চারপাশে সবসময় আছে বলে। থাকে বলে। তাদের ভেতর থেকে নিরন্তর কেউ-না-কেউ বার বার নেমে যায়, কেউ-না-কেউ কেবলই উঠে উঠে আসতে থাকে। তারা তবু, আসলে, প্রথম থেকে শেষ অবধি সব মিলিয়ে এক ধরনের নিঃসঙ্গতাভেদী জীবন্ত উপস্থিতি হয়ে জেগে থাকে। এমনকি, এই যে আমি এখন সেই সম্মিলিত জীবন্ত সত্তাটাকে আমার থেকে আলাদা করে দেখছি, অন্য কেউ যদি এইভাবে ভাবে তখন তার ভাবনার মধ্যেকার আলাদা জীবন্ত উপস্থিতির মধ্যে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়বো আমি। আমি যে চোখে এখন আমার চারপাশের লোকজনকে দেখছি, তারাও কিন্তু একই ভঙ্গিতে আমাকে দেখছে। লোকাল ট্রেনের অল্প দুলুনিতে সে-ও দুলছে। দুলছি আমিও।

বসার জায়গা না পেলে আমি সাধারণত গেটে ঝুলতেই ভালোবাসি। একটু ধাক্কাধাক্কি করতে হয় ঠিকই, বেশ খানিকটা শারীরিক শ্রমও যে হয় না তা নয়। সবচেয়ে বড় কথা, দুর্ঘটনার ভয় থাকে। তবু, ভেতরে বসতে না পেলে, ভিড়-গাদাগাদির মধ্যে শ্রীচৈতন্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে ঝুলে ঝুলে যেতেই বেশী ভালো লাগে। তাতে ভেতরেও থাকা হয়, আবার বাইরেটাও পাওয়া যায় কিছুটা। সারা দিন পরে ফেরার সময় তো এই হাওয়াটুকু নিজের প্রাণের চেয়ে বেশী দামী।

ভেতরে বসে থাকলে ট্রেন ছাড়তে যখন বেশ লেট হয় তখন একটা প্রাণান্তকর অবস্থা। আর গাড়ি ধরার সময় প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে ঠিক উল্টো কথা মনে হয়—যদি আর একটু লেটে ছাড়ে!

দিয়াড়া পেরোবার সময় মাঠের ধারের মজা পুকুর থেকে পানিফল তোলার ফাঁকে কোনো কিশোর হয়তো ছুটন্ত ট্রেনের দিকে 'হাই হাই' করে হাত তুলে চেঁচায়। কেন চেঁচায়? যে দূর শেষ অবদি দূরেই চলে যাবে, তাকে হঠাৎ একটুখানি কাছে পাওয়ার আনন্দে? নাকি তার বৈচিত্র্যহীন কাজের মধ্যে একটা শব্দময় গতিকে চোখের সামনে কিছুক্ষণের জন্যে দেখতে পেয়ে? পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো বালক হয়তো আর কিছু না পেয়ে একটা ঢিল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দেয়। কেন দেয়? যে দূর কাছে আসবে বার বার অথচ ধরা দেবে না কখনো—তার ওপর অক্ষম বিক্ষোভ জানাতে চায় সে! ট্রেনে চড়ে কোথাও যাবার যখন বয়েস হবে তার, তখন হয়তো আর ছুঁড়বে না সে ঢিল কিংবা পাথর। তখন সে নিজেই হয়তো অন্য কোনো চঞ্চল অস্থির বিক্ষুব্ধ বালকের পাথর ছোঁড়া দেখে বিরক্ত হবে আর ভাববে—কেন যে ছোঁড়ে!

শেওড়াফুলিতে জংশন। গাড়ি বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়াবে। কয়েকজন নেমে দাঁড়িয়ে পায়চারি করবে অকারণে। অনেকেই বসার জায়গা খুঁজে নেবার চেষ্টা করবে নতুন করে। প্ল্যাটফর্ম জুড়ে এরই মধ্যে, চারপাশের অনেক ট্রেনের আসা আর চলে যাওয়ার মাঝখানে—অনেকেই রান্না করছে কিংবা মাথার উকুন বেছে দিচ্ছে কারো। কেউ হয়তো স্রেফ শুয়ে আছে। ভারী ভালো লাগে তার এই নির্মম উপেক্ষার দৃশ্য। চারপাশের অন্তহীন ব্যস্ততার মধ্যে সে ভারী নির্লিপ্ত ও নির্বিকার। জন্ম-জন্মান্তর ধরে এরা প্ল্যাটফর্মের অধিবাসী। যেন চোখের সামনে চব্বিশ ঘন্টা ব্যতিব্যস্ত মানুষের ছোটাছুটি দেখতে দেখতে এরা বুঝে গেছে পৃথিবীতে আসলে ব্যস্ত হওয়ার মত কিছু নেই। কোথা থেকে যে আসে এরা। এই প্ল্যাটফর্মেই এদের রান্নাঘর, ড্রইংরুম, হনিমুন, রোগশয্যা, আঁতুড়ঘর, অফিস, অবসর যাপন! এই প্ল্যাটফর্মেই এরা জন্মায় জানি। কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মেই কি এরা মরে যায়! কে জানে।

ঘরের টুকিটাকি কাজকর্ম করতে করতে হঠাৎ এক একদিন ধরিত্রী বলে ওঠে—'ধুর! আজ কিন্তু ভাল্লাগছে না! রোজ যেরকম হয় আজ সেরকম হবে না! আজকে অন্যরকম হবে।' যেসব দিন ধরিত্রী এইরকম বলে, সেইসব দিনগুলো আমার খুব আনন্দের দিন। বাড়িতে রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়ার বদলে সেদিন যে খাওয়া-দাওয়া বাইরে হবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। হঠাৎ কোথাও বেড়াতে যাওয়া হতে পারে। সিনেমা যাওয়া হতে পারে। কোনো বন্ধুবান্ধবের কাছে আড্ডা দেওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে। একদম কোনোকিছু না-ও হতে পারে। তবে—অন্যরকম কিছু একটা হবেই।

আজকাল বড় একটা ওরকম কিছু বলে না ধরিত্রী। বোধহয় এই মফস্বল শহরে আলাদা করে সেরকম কিছু করার নেই বলেই। একদিন সন্ধেবেলা হঠাৎ বলল—'চলো, বেড়িয়ে আসি।'

হরিপালে বেড়াতে যাবার মতন কোনো বিশেষ জায়গা আছে বলে আমার জানা নেই। বললাম—'কোথায়?'

'কোথায় সেটা কোনো বড় কথা নয়। বেড়াতে যাবার ইচ্ছে করছে এইটাই আসল।'

এরপর আর কোনো কথা চলে না।

সন্ধ্যা নামতে অল্প দেরী আছে। বর্ষা ছাড়া বাকি সব ঋতুতেই এই সময়টা ভারী মনোরম। এখন গ্রীষ্ম আর বর্ষার মাঝামাঝি একটা সময়। তেমন গরম নেই। আকাশে অল্পস্বল্প মেঘ। সিনেমাতলা থেকে ডানদিকে গেলে বিডিও অফিসের পরে আর ঘরবাড়ি নেই। দুপাশের ধানক্ষেত, লোকে যাকে দিগন্ত বলে, সেই পর্যন্ত ছড়ানো। রাস্তার দুধারে গাছ। কোনো কোনো গাছ রাস্তার দুধার থেকে ডালপালা বাড়িয়ে এত ঝুঁকে এসেছে যে দূর থেকে দেখলে তোরণদ্বার বা আর্চ বলে মনে হয়। ধরিত্রী বলল—'নামধাম ইতিহাস মুছে দিলে এই রাস্তাটাই যথেষ্ট ভ্রমণযোগ্যতা পেয়ে যেতে পারে।' একশো বা দুশো বছর আগে এই সব রাস্তা কেমন ছিল কে জানে। রাজা হরিচরণ পাল এই সব রাস্তা দিয়ে প্রাতঃভ্রমণে যেতেন। হরিচরণ সেই রকম রাজা যিনি ইতিহাসেও জায়গা পাননি। তাঁর নামের অনুষঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এই ছোট্ট মফস্বল শহরের নাম হয়েছে হরিপাল। সঙ্গে জুড়ে গেছে একটি গ্রাম্য প্রবাদ—সব দুঃখ হরিপাল দিয়ে চলে গেল! পৃথিবীর আর কোনো জায়গা নিয়ে এমন অসামান্য তিমিরবিলাসী প্রবাদ নেই। কেন যে নেই! সব দুঃখ প্যারিস দিয়ে চলে গেল—কেউ বলে না! অন্যমনস্কতা কাটিয়ে উঠে ধরিত্রীকে বলি—'অ্যাসোসিয়েশন ভুলে যাওয়া অত সোজা নয়। পকেটে ঘরের চাবি নিয়ে বাসদেবপুরের রাস্তাকে খুব মোহময় ভাবা যায় না।'

'ময়না, ময়না, ওই দ্যাখো—ফিঙে, দেখেছ কেমন মানুষের মতন পেছন ফিরে বসে আছে, যেন কত দার্শনিক', আমাকে আদৌ পাত্তা না দিয়ে ধরিত্রী বলল—'যাঃ, ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। এক মিনিট স্থির হয়ে থাকতে পারে না। ভালো করে দেখাই হল না!'

'আমি বকে দেব।'

'তাহলে তোমাকে ওর পেছন পেছন উড়ে উড়ে যেতে হবে।'

'যাবো।'

'ইঃ। অফিস কামাই করে বাড়িতে শুয়ে থাকে—সে আবার'...

'সে তো ট্রেনের ভয়ে।'

'হাজার হাজার লোক যাচ্ছে আসছে তাদের তো কই কোনো অসুবিধে হয় না।'

'তাদের অভ্যেস আছে।'

'অভ্যেস করলেই অভ্যেস হয়ে যায়। কোনো অভ্যেসই আকাশ থেকে পড়ে না। করতে হয়।'

'ছোটবেলায় আশপাশের লোকজনদের দেখতে দেখতে অনেক অভ্যেস তৈরি হয়ে যায়। আমাদের ফ্যামিলিতে সাতজন্মে কেউ কোনদিন ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেনি।'

'অনেকেই অনেক কিছু করেনি, এখন করছে। মায়েদের টাইমে কেউ চাকরি করত? এখন কত মেয়ে চাকরি করে!'

'জহর একটা অদ্ভুত কথা বলে—'

'কে জহর?'

'আমার বন্ধু। কর্পোরেশনে কাজ করে।'

'কি বলে?'

'বাঙালীরা তো কলকাতা থেকে ক্রমশ মফস্বলের দিকে সরে যাচ্ছে। শান্তিপ্রিয় হিজড়ে প্রজাতি। বলে—হাতে হলুদ কার্ড তোমায় ধরতেই হবে!'

'হলুদ কার্ড মানে? সে তো খেলার সময় রেফারিরা দেখায়।'

'মাস্থলি। মাস্থলি।'

মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল ধরিত্রী। একটা ভিড় বোঝাই বাস টানা হর্ন দিতে দিতে চলে গেল। বাসটাকে সাইড দেবার জন্যে ধরিত্রীকে রাস্তার ধারে টেনে আনতে হল বেশ খানিকটা। ধরিত্রী তখনো হাসছে।

সাতটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেনে আমাকে রোজ পাবেন, এই ভেণ্ডারের আগের কামরায়।' ভট্টচাজ হাসে। বিশাল টাকের ওপর একগাছি চুল আড়াআড়ি পড়ে আছে। গায়ত্রী, ধরিত্রীর বোন,

এই ধরনের টাকের নাম দিয়েছে 'স্মৃতিটুকু থাক'। আর যাদের একেবারেই চুল নেই, মানে দুপাশে অল্প চুল আছে—তাদের নাম দিয়েছে 'অবাক পৃথিবী'। এসব কথা ভট্চাজকে বলে ফেলতে ভারী দরাজ গলায় হেসেছিল ভট্চাজ্। হাসি থামলে বলেছিল—'আপনাকে কি নাম দিয়েছে?' কিছুতেই বলতে চাইছি না দেখে খুব পীড়াপীড়ি করেছিল ভটচাজ। বলতেই হল। 'জাম্বু।' 'সে কি! আপনাকে শালীরা জাম্বুবান বানিয়ে দিল?' আমি একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলি—'ধরতে পারলেন না। 'জামাইবাবু' থেকে সংক্ষেপে ওই জাম্বু!' ভট্চাজ্ আবার হাসে। তার হাসিতে দরজা খুলে যাওয়ার শব্দ।

যেসব দিন সাতটা পঁয়তাল্লিশে ফিরি সেসব দিনে ভট্চাজকে খুঁজতে ইচ্ছে করে শুধু তার হাসির শব্দ শুনবো বলে। নিজে ওভাবে হাসতে না পারলেও অন্য কাউকে হাসতে দেখলে অভাবটা বেশ পুষিয়ে যায়। কথাটা বলেওছি ভট্চাজকে। 'আপনি বেশ হাসেন।' শুনে বেশ নিঃশব্দে হেসেছিল ভট্চাজ্। 'আর কি আছে বলুন জীবনে! চুলগুলো তো সব উঠেই গেল। যখন গেল, তখন দুঃখ করে আর কি করবো। হেসে ফেললেই হয়!' বলেই হাসে ভট্চাজ্। এবারে আমিও হেসে ফেলি। 'আমার মেয়ে কি বলে জানেন? একদিন দিল্লির টিকিট পাইনি, অথচ যেতেই হবে—বেশ মেজাজ খারাপ করে বাড়ি ফিরছি—মেয়ে বলল, 'বাবা, তোমার কাজ হয়নি বুঝতে পেরেছি আমরা, কিন্তু এই হনুমানের মেসোমশাইয়ের মতন মুখখানা আমরা দেখতে চাই না!' বুঝুন ব্যাপারটা। সব সময় হাসি হাসি মুখ করে বসে থাকতে হবে!' শুনে মিট মিট করে হাসতে হাসতে বলি—'আপনারই মেয়ে তো।' কি যেন ভেবে নেয় ভট্চাজ্—হঠাৎ বলে, 'মাঝে মাঝে এমন পাকা পাকা কথা বলে না? কি বলবো। একদিন বেশ মেঘ করেছে, সারাদিন গুমোট গরম, অফিস থেকে ফিরে গায়ে ভিজে গামছা জড়িয়ে বসে আছি, বৃষ্টি হবো হবো ভাব, অথচ কিছুতেই বৃষ্টি হচ্ছে না। মেয়ে এসে বলল—বাবা, আকাশটার ফাইভ-প্লাস-টু হয়েছে। আমি কিছু বুঝতে না পেরে বললাম—সেটা আবার কী? মেয়ে বলে কি— তুমি জানো না? একটা জায়গায় জল খুব খারাপ ছিল। সবাইয়ের পেটের রোগ। ডাক্তার মোটে একজন। সে একদিন বৌকে নিয়ে সিনেমা গেছে। কম্পাউণ্ডারকে বলে গেছে—যার পেট আটকেছে তাকে পাঁচ নম্বর শিশি থেকে দু-দাগ ঢেলে দিবি, আর যার পেট ছেড়েছে তাকে দু-নম্বর থেকে দু-দাগ। কম্পাউণ্ডার তাই করে যাচ্ছে। শেষ দিকে ওষুধ বেশী নেই দেখে একজনকে এটা একটু আর ওটা একটু মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে। মানে ফাইভ প্লাস টু। তো সেই লোকটার কি হল জানো? একবার করে বাথরুমের দিকে যায় আর মাঝরাস্তা থেকে ফিরে আসে! একবার করে বাথরুমের দিকে যায় আর মাঝ রাস্তা থেকে ফিরে আসে। আকাশটার সেই অবস্থা!'

নিজের অজান্তেই, ভট্চাজের চেয়েও জোরে হেসে উঠি।

হঠাৎ গেটের দিকে থেকে একটা 'গেল গেল' 'পালিয়ে গেল' 'ও মাগো' এইসব আওয়াজ উঠলো। কলরব একটু থিতিয়ে এলে জানা গেল—ট্রেন ছাড়ার মুখে, কোলে বাচ্চা নিয়ে ট্রেনে উঠছেন এক ভদ্রমহিলা—এই অবস্থায় তাঁর কানের দুল ছিঁড়ে নিয়ে কে পালিয়েছে! ভদ্রমহিলার কানের লতি ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। বাচ্চাটা তারস্বরে কাঁদছে। অনেকেই বলছে—'আপনি পরের স্টেশনে নেমে আগে হাসপাতালে যান।'

একটা বিড়ি পকেট থেকে বের করে ধরিয়ে ভট্চাজ্ বলল—'কার মুখের হাসি কখন যে মিলিয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না।' অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে ভট্চাজ্—'মাটি কাটলেই তো পয়সা পাওয়া যায়, কান কাটার কি আছে!'

ভট্চাজ্ গম্ভীর থাকলেও আমি আর গম্ভীর থাকতে পারি না। বলেই ফেলি—'সে নিজে দু-কান-কাটা কিনা!'

অনেক গুণের মধ্যে ধরিত্রীর একটা দোষ, এক একদিন অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে ধরিত্রী ভয়ংকর ক্ষেপে যায়। বেঁচে থাকার খুঁটিনাটি ধারাবাহিক অপমান, অনেকদিনের অবদমিত গ্লানি, দিনের পর দিন যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে বিস্ফোরক মানসিকতা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা—হঠাৎ হঠাৎ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। অনেক না-পাওয়ার মাছ দু-একটা সামান্য পাওয়ার শাক দিয়ে ঢেকে রাখতে আর পারে না তখন। একদিন, এক শনিবারে, শনি রবি আমার ছুটি—অন্য দিন ছুটির পরে আড্ডা ফাড্ডা দিয়ে রোজই বাড়ি ফিরতে আমার বেশ দেরী হয় বলে ছুটির দিনগুলো কিছুতেই ছাড়তে চায় না আমাকে ধরিত্রী। অথচ নিজের একটা কাজে কলকাতা না গেলেই নয়; অনেক বোঝালো আমাকে—'এমনি দিনে অফিসেই যেতে চাও না, আজ ছুটির দিনে তোমার কি এত কাজ পড়লো?'

'এত কৈফিয়তের কি আছে? আসলে তোমার হাফ-ডে বলে আমাকে বাড়িতে বসে থাকতে হবে তাই বলো।'

কোনো বিতর্কে যায় না ধরিত্রী। সরাসরি বলে—হ্যাঁ, তাই থাকতে হবে। সারা সপ্তাটা আমি যে বোর হই একা একা। কোনদিন তো তাড়াতাড়ি ফেরো না। যাদের দূরে বাড়ি তারা শহর থেকে সবাই তাড়াতাড়ি ফিরে আসে।'

'তাদের ঘরবাড়ি আছে। মা বাবা ভাই বোন আছে। পাড়া আছে। আমার আছে?'

এই জায়গাটা খুব দুর্বল, মোক্ষম, ভঙ্গুর, সূক্ষ্ম, অকৃত্রিম, আবিল এবং অসহ্য। এসব শুনলে ধরিত্রী তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। আমাকে অনেকবার পাড়া পাল্টাতে হয়েছে জীবনে, তাই আমার কোনো পাড়া হয়নি। আমাকে অনেকবার বাড়ি পাল্টাতে হয়েছে জীবনে, তাই আমার কোনো বাড়ি হয়নি। আমাকে অনেকবার বন্ধু পাল্টাতে হয়েছে জীবনে, তাই আমার কোনো বন্ধু হয়নি। এসব ব্যাপারে ধরিত্রীর তেমন কোনো ভূমিকা নেই, সহানুভূতি আছে। শুধু বিয়ের পর সেই আদি ও অস্বস্তিকর, অনিবার্য ও অশ্লীল, অকারণ অথচ অপ্রতিরোধ্য শাশুড়ি-বৌয়ের সমাধানহীন দ্বন্দ্ব শুরু হল, যেমন হয়, সাধারণত। উত্তর কলকাতার ঘুপচি, স্যাঁতসেঁতে, সূর্যহীন গলির ঘরের জটিল, জান্তব, যতিহীন, চিৎকারময় জীবনযাপন শেষ করে দিয়ে ধরিত্রী আমাকে নিয়ে এল খোলামেলা, সবুজ, প্রকাশ্য, অপরিমিত নীলের কাছাকাছি—যেখানে খবরের কাগজ, চায়ের দোকান আর হিন্দি সিনেমা জীবনকে শাসন করে না; বাড়ি ফেরা ক্লান্তিকর নয় যেখানে; বাড়িতে জায়গা কম বলে বাইরে বেরোতে বাধ্য হতে হয় না যেখানে; মন যেখানে দমচাপা অস্বস্তির মধ্যে হাঁফিয়ে না মরে গিয়ে ডানা মেলে উড়ে যেতে পারে।

উত্তর কলকাতার ত্রস্ত ও তটস্থ জীবনে কোনো ট্রেন ছিল না। এখানকার এই অনন্ত নীলের নীচে, ছড়ানো সবুজের মধ্যে অনেক ট্রেন আছে, যে ট্রেন গ্রাম থেকে শহরে যায়, যে ট্রেন চলে যায় অভাব থেকে প্রাপ্তির ইশারার দিকে; যে ট্রেন রাস্তার ধারে গাছতলায় হ্যারিকেন জ্বেলে যাত্রার রিহার্সাল থেকে কাউকে টেনে এনে তুলে নিয়ে যায় বর্ণময় স্বপ্নের আলোঝলমল হাততালির মধ্যে, যে ট্রেন স্বপ্ন থেকে পথ চলা শুরু করে সম্ভাবনার দিকে বিস্তৃত হতে চায়। যে চাওয়া, মানুষেরই মজ্জাগত, রক্তাক্ত অস্তিত্বের মূল সুর, স্বরলিপির সা, মানুষের প্রধান ও প্রাকৃতিক ইতিহাসলিপি, জেগে থাকার বীজমন্ত্র, বিকাশের সিঁড়ি।

একবার জেদ চাপলে আমি আর সমঝোতায় আসতে পারি না। জামাকাপড় পরতে দেখে ধরিত্রী বলে ফেলল—আমিও তাহলে যাবো। রোজ রোজ একা একা ফাঁকা ঘরে বসে থাকতে পারবো না।'

আমার এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে ধরিত্রীকে নিয়ে যাওয়া যায় না। কাজটাও এমন কিছু জরুরী নয় যে আজ না করলে চলবে না। ছুটির দিন আমি হরিপাল থেকে কলকাতা যাবো, ধরিত্রী আমার সঙ্গে যেতে চায়, এতে তো আমার আনন্দিত হওয়াই উচিত। তবু মনে হল, ধরিত্রীর ইচ্ছেগুলোকেই মেনে নিতে হবে চিরকাল, আমার ইচ্ছেগুলোর কোনো দামই সে দেবে না? আমি তো আগে থেকেই বলে রেখেছি শনিবারে বেরোবো। তখন তো বলতে পারতো—আমিও যাবো। এখন হঠাৎ এই অহেতুক গোঁ ধরার মানে কি? তার নিঃসঙ্গতা যে আমি অনুভব করি না তা তো নয়! আমি বেশ দৃঢ় স্বরে জানালাম—'না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে না।'

ছুটির দিনের শেষ দুপুরের ট্রেন বেশ ফাঁকাই। জানলার ধারে একটা জায়গাও পেয়ে গেলাম। ঘন্টাখানেক বসে থাকতে হবে। জানলা পেলে ভালো লাগারই কথা। অথচ কিছুই ভালো লাগছে না আজ। আমাদের ভালো লাগা এত বাইরের ঘটনার ওপর নির্ভরশীল! ভেতরকার স্বতোৎসারিত ভালো লাগাকে তারা গলা টিপে মেরে ফেলে।

ক্রসিং ছিল। আপ ট্রেন যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ডাউনের গাড়ি। ধরিত্রীর

জন্যে বেশ খারাপ লাগছিল। অকারণে অতখানি খারাপ ব্যবহার না করলেই পারতাম। যে অহং মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব হতে শিখিয়েছে, সেই অহংই যে কি নিকৃষ্ট ঝামেলার মধ্যে ফেলে দেয় মানুষকে! পারিবারিক আবহাওয়া থেকেই মানুষের যাবতীয় উন্নতির সূত্রপাত। পারিবারিক পরিবেশেই আবার মানুষের তাবৎ পতনের উৎস!

আপ ট্রেন ঢুকেছে। ওটাই আগে ছাড়বে। স্টেশনে যে আগে ঢোকে সে আগে ছাড়ে না। একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই কাঠিটা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলতে যাবো, হঠাৎ দেখি জানলার বাইরে ধরিত্রী। আর একটু হলে কাঠিটা ওর গায়ে পড়তো।

আপ ট্রেন ছাড়ল। এবার আমার ট্রেনটা ছাড়বে। অত্যন্ত দ্রুততায় তৈরি হয়ে নিয়েছে ধরিত্রী, তাই তার চেহারায় সেজেগুজে বেরোনোর সযত্নচর্চিত পালিশটা একদম নেই। বড় বড় চোখে চেয়ে আছে, যে চোখে রাগ, দুঃখ, অপমান, অভিমান, বিস্ময়, আঘাত ও আবেদন। চুলটা এলোমেলো করে খোঁপা করা। আমার আর ধরিত্রীর মাঝখানে ট্রেনের জানলা। ভেতরে বসেই বুঝতে পারছি সিগন্যাল দিল। ট্রেন ছেড়ে দেবে। ধরিত্রী তবু কিছু বলল না। কিছু বলতে পারলাম না আমিও। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই জানলা থেকে হঠাৎ সরে গেল ধরিত্রী। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

এই মুহূর্তে ট্রেনটাকে কত অভিশাপ যে দিচ্ছে ধরিত্রী, ট্রেন কি তা জানে! নেহাৎ জেদের বশে উঠে পড়েছি বলেই এই ট্রেন আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দূরে, অথচ প্রাণ মন আত্মা যে পড়ে আছে ট্রেনের বাইরে, ট্রেন কি তা জানে! তবু চলতে শুরু করার পর প্রত্যেক ট্রেনেরই নিজস্ব কিছু ছন্দ, গতি ও শব্দময় অনুষঙ্গ আছে, যা প্রভাবিত করে সব যাত্রীকেই। কিছুক্ষণ পরে সামনের দুজন যাত্রীর তন্ময় রাজনীতি-আলোচনা ইচ্ছার বিরুদ্ধে শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম আমিও।

কত রকমের কথাই যে বলে মানুষ। সামনের সিটে যেখানে একটু আগে রাজনীতির পরম মতবিনিময় হচ্ছিল এখন সেখানে এক বৃদ্ধ আর এক বৃদ্ধকে পাত্রীর গুণপনা জানাতে ব্যস্ত। একটা বয়সের লোকেদের এটা একটা চমৎকার প্যাসটাইম। বিষয় যে কিভাবে পাল্টে যায়! ট্রেনে দেখেছি, বয়স অনুপাতে মানুষজনের আলোচনার কিছু বেশ নির্দিষ্ট বিষয় আছে। কমবয়সের অত্যুৎসাহী ছেলেরা সাধারণত সিনেমা আর মেয়েদের কথাই বলাবলি করে। তার চেয়ে একটু যাদের বয়েস বেশী তারা বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা বা পিকনিকের আয়োজন বা কোনো বিয়েবাড়িতে কে কত খেয়েছে বা কোনরকম মজার কথা বলতে বা ফেনিয়ে রসিয়ে শোনাতে ভালোবাসে। তার চেয়ে একটু বেশী বয়সের লোক হলেই রাজনীতি। এই বয়েসটা বেশ অনেকদূর পর্যন্ত লম্বা। তারপর একটা বিশেষ বয়সে অব্যবস্থার বর্ণনা—দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে। ছেলে মানে না বা মেয়ের বিয়ের জন্যে উপযুক্ত পাত্র পাচ্ছি না। তারপর একটা বয়স আছে যখন আর কিছুই বলে না কেউ। শান্তভাবে অন্য যাত্রীদের অযাচিত করুণা কুড়োতে ভালোবাসে। শুধু চুপচাপ যাতায়াত করলেই মানুষের মনোযোগ পাল্টে যাওয়ার এই ধারাবাহিক বিবর্তন বেশ লক্ষ করা যায়।

সামনের সিটে এখন এক মাঝবয়েসী দম্পতি। এরা বেশ রসিক। ভদ্রমহিলার চেহারা বেশ স্থিত ও সম্পূর্ণ গৃহিণীর মতো। ভদ্রলোকের ভঙ্গিতে একটা কৃত্রিম আদুরেপনা আছে। এ রকম স্বামী-স্ত্রী গঙ্গার ওপারে কলকাতায় দেখা যায় না সহজে। তারা এত স্মার্ট হয়ে থাকে যে তাদের চেতনার ভেতরকার সরসতার অভিক্ষেপ বাইরে থেকে বোঝা যায় না কিছুতেই। আনন্দের অভিব্যক্তি শরীরে মনে ফুটে ওঠাকে বোধহয় আধুনিকতা বলে না।

ভদ্রলোক বললেন, লজেন্স খাবো। লজেন্সওয়ালাকে দেখে কোনো এই বয়সের লোক যে লজেন্স খেতে চাইতে পারেন, তাও তাঁর স্ত্রীর কাছে, ভাবাই যায় না। মৃদু আপত্তির গুণগুণ জানিয়ে ভদ্রমহিলা কিনেও দিলেন। 'তুমিও খাও, লজ্জা কি'। বলে ভদ্রলোক খেতে লাগলেন। 'তোমার ইচ্ছে হয়েছে তুমি খাও না, আমার তো ইচ্ছে হয়নি!' মহিলার উত্তর শুনে ভদ্রলোক বললেন—'দেখেও তো অনেক সময় ইচ্ছে হয়।' মহিলা বললেন—'আমার হয় না।' 'আসলে তুমি পরে খাবে। কিম্বা টুম্পাকে দিয়ে দেবে।' বলেই কড়মড় করে চিবিয়ে ফেললেন ভদ্রলোক মুখের লজেন্স। মহিলা একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে বললেন—'একটা লজেন্স মুখে ফেলেই কড়মড় করে চিবিয়ে ফেলার মধ্যে কোনো ক্রেডিট নেই। কে কতক্ষণ ধরে চুষে চুষে একটা লজেন্স খেতে পারে সেইটেই ব্যাপার।' বলেই মুখটা ফিরিয়ে নিলেন জানলার দিকে। ভদ্রলোক বেশ শান্তভাবে বললেন—'মোটেই না। তাড়াতাড়ি চিবিয়ে ফেললে তবেই তো আর একটা পাওয়া যাবে।' শুনে বেশ সরু চোখে তাকালেন ভদ্রমহিলা।

হাওড়ায় ট্রেন ঢোকার পর ওঠানামার সময় যে ব্যাপারটা হয় সারা পৃথিবীতে অন্য কোথাও তা হয় না। দুদল লোক একইসঙ্গে একই দরজা দিয়ে উঠতে চায় এবং নেমে যেতে চায়; দুপক্ষই অপেক্ষায় অপেক্ষায় অতিষ্ঠ; যারা উঠতে চায় তারা আবার বসতে পাবার জায়গার জন্যে অতিরিক্ত উৎসাহী, ফলে এক অবিশ্বাস্য অমানুষিক ধাক্কাধাক্কির চিরন্তনতা তৈরি হয় এবং অনেকেই ব্যাপারটা না মিটে যাওয়া পর্যন্ত না নেমে নিজের নিজের জায়গায় বসে থাকে। রেশনের দোকান থেকে সিনেমার টিকিট অবদি সব জায়গায় লাইন দেওয়ার নিয়ম চালু হলেও ট্রেনে ওঠা বা নামার ব্যাপারে কেউ সে নিয়ম মানতে চায় না। সারা দিনের পরে জানলার ধারে একটা বসার সিট যে নিজের জীবনের চেয়েও বেশী মূল্যবান।

যে হাওড়া স্টেশনে পা দিলেই মন কেমন উদাস হয়ে যেতো, মনে হত কোথায় যেন যাবার কথা আছে, এক্ষুনি একটা ট্রেন আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে, আমার আর কোনো চিন্তা নেই তাহলে—সেই হাওড়া স্টেশনটা কেমন ঘরবাড়ি হয়ে গেল আস্তে আস্তে। কোন প্লাটফর্ম থেকে কোন ট্রেন কখন ছাড়বে সব মুখস্ত। গাড়ি দেরিতে ঢুকলে কোথায় গিয়ে লেট স্লিপ নিতে হবে, কেউ মাথা ঘুরে পড়ে গেলে তাকে কোথা থেকে এনে দিতে হবে ওষুধ, গাড়ির গোলমাল থাকলে কোথায় গিয়ে টেবিল চাপড়াতে হবে, এই স্টেশনের ভেতরেই কোথায় সবথেকে সস্তায় খাবার পাওয়া যায় সবথেকে ভালো, কোন দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট কিভাবে কোথায় কত সহজে পাওয়া যায়, সব জানা হয়ে গেল। এখন মনে হয়, না জানলেই ভালো হত। হাওড়া স্টেশনে পা দিয়েই ছোটবেলার সেই গা ছমছম করা রোমাঞ্চ, সেই অকারণ ভালো লাগা, এখন আর কিছুতেই পাওয়া যাবে না। অবশ্য শুধু হাওড়া স্টেশন নয়; অন্য সব ব্যাপারেই এরকম হয়েছে। জানা শেষ হয়ে গেলে পাল্টে যায় সব ভালো লাগা।

ফেরার সময় দেখি স্টেশন ভর্তি কালো কালো মাথা। গিস্ গিস্ করছে লোক। তার মানে অনেকক্ষণ কোনো ট্রেন নেই। বেশ গণ্ডগোল। ভালো করে হাঁটা তো দূরের কথা, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাও যাচ্ছে না।

অভিজ্ঞতা থেকে জানি, কোনো দুরবস্থাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ভিড় ঠেলে ঠেলে ঘুরে বেড়াই এদিক ওদিক। কেউই সঠিক কিছু জানাতে পারে না। কেউ বলে, তার ছিঁড়ে গেছে। কেউ বলে, ডিরেলড্ হয়ে গেছে গাড়ি। কেউ কেউ কিছুই বলে না। ভিড়ের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখি, বিদ্যুৎপর্ণা। গম্ভীর মুখে বুকের কাছে হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে আছে একধারে।

'কি ব্যাপার, আটকে পড়েছো দেখছি।'

আমাকে দেখে চারপাশের এই বিভ্রান্তির মধ্যেও বেশ হাসে বিদ্যুৎপর্ণা। 'আজ হয়ে গেল।'

'কিছু হয়নি। একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'সবাই তাই ভাবছে বটে।'

'মজার ব্যাপার কি বলো তো, ট্রেনের ভেতর লোকে যেমন অপরিচিত সব লোকের সঙ্গে কেমন অনেক দিনের চেনার মতন কথাবার্তা বলে, আবার যে যার জায়গায় এলে টুক করে নেমে যায়, এখন এই গোলমালের মধ্যেও অনেক লোক অচেনা সব লোকের সঙ্গে বেশ চিরচেনার ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলছে—'

আবার হাসল বিদ্যুৎপর্ণা। 'সবায়েরই যে এক প্রশ্ন। কখন যাওয়া যাবে।'

'যাওয়া যদি নাই যায়! ক্ষতি কি'—কথাটা গলার কাছে উঠে এলেও চেপে যেতে হয় দ্রুত। খুব খারাপ শোনাবে। বিদ্যুৎপর্ণা আমার বন্ধুর বউ। এখন ডিভোর্সী।

হঠাৎ 'গাড়ি আসছে' 'গাড়ি আসছে' বলে একটা উত্তেজনা প্রকট হয়ে ওঠে চারপাশে। চার নম্বরে ব্যাণ্ডেল ঢুকছে। খানিকটা হাল্কা হয়ে যাবে ভিড়।

বিদ্যুৎপর্ণা 'আচ্ছা—' বলে মিশে যায় ভিড়ে।

অঙ্কন : দেবাশিস দেব

আশ্রয়

গৌতম গুহ

আমার ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে আমি কিছু লজ্জায় পড়ি। মাথাটা আপনি হতে নেমে আসে। অস্ফুট স্বরে বলি—যোধপুর পার্ক।

অ্যাঁ বলেন কি ? যোধপুর পার্ক ? তারপরেই প্রশ্নকর্তা কেমন এক বিস্ময়মেশানো দৃষ্টিতে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক মুহূর্তে অনুধাবন করেন, কী যেন খোঁজেন। আমি বুঝি কী খোঁজেন তিনি। অনেক সাধারণ বেশভূষার মানুষ আছে যাদের চেহারায় অনেক সময় পারিবারিক বিষয়সম্পত্তির ঔজ্জ্বল্য অল্পস্বল্প ফুটে ওঠে। আমার চেহারায়, বেশভূষায়, এমনতর কিছুর ছিটেফোঁটা আছে কি না তাই বোধহয় প্রশ্নকর্তা সন্ধান করছেন, বুঝি।

স্বাভাবিক কারণে আমি অস্বস্তি অনুভব করি। আমতা আমতা করে বলি বহুদিন ধরে আছি, যখন উগ্রপন্থীদের উপদ্রবে এসব অঞ্চলে বিশেষ কেউ আসতে চাইত না, সেই সুবাদে আমি বাড়ি ভাড়া পেয়েছিলাম। বাজারদর অনুযায়ী তখন আমাকে চড়া ভাড়াই দিতে হয়েছিল। আজ হয়ত ভাড়াটা যৎসামান্য—চারশো টাকা। বাড়ি ছেড়ে দিলে, নিমেষে দু'থেকে আড়াই হাজার ভাড়া ঝনাৎ করে ফেলে দেবে বাড়িওয়ালার কোলে—এ কথা ঠিক। কিন্তু আমি কী করব ? বাজারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি কেমন করে ভাড়া বাড়িয়ে যাব। দিতে না পারলে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে, কোথায় বা যাবো। যেখানে যাবো সেখানেও তো একই প্রশ্ন দেখা দেবে ? এসব ভেবেই তো ভাড়াটিয়া আইন তৈরি হয়েছে এ-দেশে। তাছাড়া যাবই বা কেন ? গরীব বলে ছেড়ে চলে যেতে হবে ?

এতসব কথা অবশ্য প্রশ্নকর্তাকে বলি না আমি। সামান্য কয়েকটা কথা বলে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলি। এ-আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রশ্নকর্তার চুলচেরা সালিশীর জবাব দেবার আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।

প্রশ্নকর্তা নিশ্চয় থেমে যান, কিন্তু আমি নিজেই থামি না। কথাটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। অনেকদিন প্রশ্নটার মুখোমুখি আমি হয়েছি। এই শেষবার, একটু আগে কথাটা উঠেছিল খোদ সরকারী একটা অফিসে। অফিসের কাজে গিয়েছিলাম সেখানে।

জয়দেববাবু, যিনি কথাটা পেড়েছিলেন, দপ্ করে আগুন জ্বেলে দিয়েছিলেন মগজের কোষে, পরে তিনিই মধুর হেসে হেসে সে-আগুন নেভাবার যতটা সম্ভব চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমিই কথাটা নাড়াচাড়া করে উল্টোতে পাল্টাতে লাগলাম ফুটপাতে নেমে।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ির দুয়ারে পা দিয়ে বিমর্ষ বোধ করলাম। বি· বা· দী বাগে এই বিমর্ষতার বীজ বপন হয়েছিল। চৌকাঠে পা দেয়া মাত্র প্রশ্নটা, সেই আমার অনধিকার চর্চার প্রশ্নটা, কাঁটার মত খচ্ করে বুকে বিঁধে গেল।

আমার বাড়িতে আলোর তেমন ঝলমলানি নেই, সামান্য চল্লিশ পাওয়ারের বাতি জ্বলে, তা-ও যতটা সম্ভব কম সংখ্যক। কারণ ইলেকট্রিক বিল মেটাবার ক্ষমতা আমার সীমিত। নিওন বাতি জ্বালাই না কারণ নিওন-বাতি কিনতে হলে একসঙ্গে বেশি টাকা লাগে। তাই আমার বাড়ি পড়শীদের তুলনায় নিষ্প্রভ। আমার চারপাশে আলোর ফোয়ারা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। আলোয়, বাজনায়, টি· ভি স্টিরিও ইত্যাদির শব্দস্বর্গের মাঝখানে আমার ভাড়াটে বাড়িটা নেহাতই করুণ এবং বেমানান।

তবু এই তথ্য এতদিন এরকম সুতীব্রভাবে আত্মমর্মে অনুভব করিনি আজ যেমন আচমকা করলাম।

বাড়িওয়ালা মামলা করেছেন, লাভ হয়নি। মুনসেফ সাহেব মামলা খারিজ করে দিয়ে সদয় দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েছিলেন আমার মুখের দিকে। দীনাতিদীনের মতো আমিও দাঁড়িয়েছিলাম তাঁর দিকে চেয়ে দু'চোখে প্রার্থনার দীপ জ্বেলে—আমার অবস্থা তিনি উপলব্ধি করেন এই আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে। ওনার ব্যক্তিগত করুণার প্রয়োজন অবশ্য হয়নি, কারণ দেশের আইন পুরোপুরি আমার স্বপক্ষে ছিল। আমি জিতেছিলাম।

তবে অন্যান্য ক্লেশ, বাধাসৃষ্টি যা বাড়িওয়ালার অনায়াস ক্ষমতার মধ্যে, তা একের পর এক আমার পরিবারের উপর ছুঁড়ে দেয়া হল। জল কল প্রায় বন্ধ হ'য়ে গেল। জানলার পাল্লা খুলে আলগা হয়ে যায় আমাকে সারাতে হয়। যে অংশে বাড়ির মালিক থাকেন (দোতলায়) বাড়ির সেই অংশের কলি ফেরান, গ্রীল রং করেন, আমার অংশ স্পর্শ করেন না। ফলে, আমার অংশ মলিন থেকে মলিনতর হয়—বুঝি বা আমার সামগ্রিক চেহারার সঙ্গে পূর্ণ সংগতি রেখেই। প্রতিবেশীরা আমার অবস্থা জানেন বা অনুমান করেন, কারণ তাঁরা আমার ঘরে না ঢুকলেও আমার দুই ছেলে পিকু আর বাবুকে বাড়ির বাইরে সকালে বিকালে দেখতে পান। ওদের বেশভূষায় আমাদের অবস্থার স্পষ্ট স্বাক্ষর। তাতে ওরা অর্থাৎ আমার ছেলেরা কিংবা আমরা কেউ-ই গ্লানিবোধ করি না। পিকু আর বাবু সহজেই মেলামেশা করে পাড়ার সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে। সমাজ-জীবনের বৈষম্য অত স্পষ্ট করে ওরা এখনো বোঝে না।

পিকু আর বাবুর মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছ'বছর। পিকু কিছুটা সেয়ানা, কিন্তু বাবু একান্তই শিশু। বাড়ির উঠোনে একটা শিউলি গাছ আছে। শীতের শুরুতে ঐ গাছে ফুল ফোটা দেখেই আমরা শীতের সূচনা বুঝি, নইলে কলকাতায় শীত বোঝা বা গাওয়া ঘিয়ে ঘিয়ের গন্ধ পাওয়া এদুই-ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাড়িউলি উনিই প্রকৃত মালিক কারণ ওনার স্বামীকে সর্বক্ষেত্রে উনিই পরিচালনা করেন—ভোরবেলা পূজার থালা হাতে একটি একটি করে ফুল তোলেন—হীরের ফুল। বাবু ছুটে গিয়ে ফুল কুড়োতে যায়। অশুদ্ধ কোনো ইতর জীবকে তাড়াচ্ছেন এমন ভাব করে উনি যাঃ যাঃ বলে চেঁচিয়ে ওঠেন চাপাস্বরে। বাবু বিব্রত মুখে (যাকে ও 'দিদা' বলে) সেই 'দিদা'র মুখের দিকে হাবার মত তাকিয়ে থাকে।

এরপরেও আছে আরেকটা উপদ্রব। যেটা আসে ঐ দিদার ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে, সুদূর কানাডা থেকে। দিদার ছোটভাই অমল রায় এক মাল্‌টি ন্যাশানাল কোম্পানীর চাকরিতে কানাডায় থাকেন। সেখান থেকে ট্রাঙ্ককলে কথা বলেন দিদির সঙ্গে।

—নিচের ভাড়াটে উঠেছে ? (আনুমানিক)

—না, উঠছে কোথায়। নাক কান কাটা বাঙাল। (এটা শোনা [illegible])

—লাথি মেরে তাড়াও (আনুমানিক)

—তাই করতে হবে।

আলোচনা সেদিন রাত্রে না-জানি কেন পুরোপুরি মোলায়েম রইল না। একটু উত্তাপের সৃষ্টি হ'ল স্বামী-স্ত্রীর দু' জনার মনেই। স্ত্রীর কথা জানি না, আমার ঘুম চটে গেল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত দু' চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। শুয়ে শুয়ে পুরানো দিনের অনেক কথাই মনে পড়তে লাগল। নানান বিদ্‌ঘুটে শব্দ কানে এল, ঘরের ভিতর বোধহয় ইঁদুরের উপদ্রব বেড়ে গেছে। সবচেয়ে ন্যক্কারজনক যা, তা হ'ল একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ ঘরের ভেতর ভরিয়ে ফেলল। নাক চাপা দিয়ে অনেকক্ষণ এ পাশ ওপাশ করলাম। সিলিং ফ্যান ফুল্ স্পীডে চালিয়ে দিলাম, তাতেও দুর্গন্ধের সবটুকু গেল না। ভোরে সেই কথা স্ত্রীকে বলতে, ও বলল—হবে না ? ড্রেনের ছুঁচো এখন ঘরে ঢোকে। কী করব, বাথরুম, রান্নাঘরে ঝাঁঝরি ভেঙে গেছে যে।

ঝাঁঝরিগুলো একবার পরখ করে এলাম। ঝাঁঝরি ভেঙে গর্ত বড় হয়ে গেছে। এখন সারাতে হলে আমাকেই সারাতে হবে। সারানোর ব্যাপারে নিয়ম আছে বাড়িওয়ালার অনুমতি নিতে হয়। অনুমতি তিনি দেবেন না। অতএব ঐ দুর্গন্ধ উপদ্রবের দিকে চোখ বুঁজে থেকে যেমন জীবন কাটাচ্ছো তেমনি করে দিনাতিপাত করে যাও।

স্ত্রীকে বললাম—এবার মুন্নির বেড়ালটা এলে ওটাকে আর তাড়িও না। ওটাই সমস্যা মিটিয়ে দেবে। পিকু শুনেছিল কথাক'টা। ফস্ করে ওর মা'র হয়ে জবাব দিল—ওটা আর আসবে না বাবা!

—কেন ?

—ওটাকে বাবু লাঠি দিয়ে এমন মেরেছে যে ও আর ভয়ে এদিকে ঘেঁষে না।

—তাই বুঝি। বলে চুপ করে রইলাম। বুঝলাম সমস্যাটা পুরনো ঘায়ের মত জিইয়ে রইল।

চোখ-কান-নাক বুজে রইলাম আরও কিছুদিন। দু' একটা থান ইঁট পেলে গর্তগুলো বন্ধ করা যেত। কিন্তু এ-এলাকায় এ-সবের দোকানপাট নেই। আনতে হলে বড় রাস্তার ওপারে সেলিমপুর পেরিয়ে ট্রেনলাইনের ওধারে একটা দোকান আছে। সেখান থেকে রিক্সা করে রাতের আঁধারে সংগোপনে কাজটা সারতে হবে। পাড়ার অনেকেই জাতে বাড়িওয়ালা, তাদের চোখকেও ফাঁকি দিতে হবে।

বাড়ির পুবদিকে কয়েকটা বাড়ি ছাড়িয়ে প্রাক্তন চীফ-ইঞ্জিনীয়ারের বিশাল অট্টালিকা—প্রাসাদ বলাও চলে। রাত্রি দিন ডিস্‌কো বাজছে। এ রকম অনুপম প্রভাতবেলাতেও তারস্বরে হ্লাম্বো—হ্লাম্বো চিৎকার ভেসে এল। —মনুষ্যকণ্ঠ না পশুকণ্ঠ ঠিক বোঝা যায় না। সবে স্ত্রীকে ইঁটের সমস্যাটা একটু প্রাঞ্জল করছি। পিকু, বাবু, পাশেই বসেছিল। নিশ্চয় শুনেছে। নইলে খানিকবাদে যখন রবিবারের কাগজের পাতায় মন দিয়েছি বাবু কী করে একটা আস্ত থান ইঁট নিয়ে আসবে।

দারুণ একটা কাজ করেছে এরকম ভাব করে থান ইঁটটা ওর ছোট্ট হাতে ট্রফির মত উঁচুতে তুলে ধরল—বাবা, ইট।

এবার ফোন ধরেন ফণীবাবু, আমার বাড়িওয়ালা।

—কেমন আছো অমল ?

এরপরেই মূল প্রসঙ্গটা শোনা যায়। ফণীবাবু বলেছেন—তোমার মেজদা আরেকটা কোর্ট কেস করবেন বলছেন, এবার নাকি উঠতেই হবে, বেগার্স কতদিন ফাইট করবে। প্রসঙ্গত, এই মেজদাই ছিলেন মামলায় বাড়িওয়ালার পক্ষের উকিল।

এইসব কথোপকথন তারস্বরে রাত্রির নির্জন ক্ষণে আমাদের অর্থাৎ আমার, আমার স্ত্রীর, আমার বৃদ্ধ বাবা মা'র কর্ণকুহরে বর্ষণ হতে থাকে। পাড়ার আর পাঁচজনেও শোনে কারণ ট্রাঙ্ককল। আস্তে বললে চলে না। পরিণামে

আমার এবং আমাদের পরিবারের অবস্থা আরও করুণ এবং শোচনীয় হয়।

কানাডা থেকে মাঝে মধ্যে ঐ ছোটভাই অমল রায় চলে আসেন কলকাতায়। কখনো বছরে একবার, কখনো দু'বছরে একবার। দিদির সঙ্গে দেখা করতে এলে উঠোন দিয়ে যাবার সময় আমাদের ঘরের দিকে কটমটিয়ে তাকান। সে চাউনিতে শুধু ক্রোধ নয় তার চেয়েও অপমানজনক অনেক কিছু ফুটে ওঠে।

মুহূর্তে অন্তরে একটা তীব্র দংশন অনুভব করি। মানুষের দারিদ্র্য কি ঘৃণার বস্তু ? তা-ও কোনো বঙ্গসন্তানের কাছে, যে সন্তান কানাডায় পা দেবার আগে বঙ্গসংস্কৃতিতে অন্তত কিছু-না-কিছু তালিম দিয়েছিল নিশ্চয়। সবাই দেয়, দিয়ে থাকে, কী মূর্খ, কী বুদ্ধিমান, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই। বাংলার মাটিতে জন্মালে এর থেকে রেহাই নেই। কিন্তু হায়, অমল রায়ের তবে এই দশা কেন ? হয়ত এমন হতে পারে, যে এরা এক ভিন্ন জাত, এদের কোনো দেশ নেই। সর্বদেশেই এরা এক। উদ্ধত, চক্ষুহীন। এক দুর্মর গর্ব অন্ধ করে রাখে এদের, জ্ঞান লোপ পায়।

অমল রায়ের গাড়ির দুটো চোখ গেটের বাইরে থেকে আমাদের ঘরের অন্দরের দিকে নোংরা পশুর দৃষ্টিতে যেন তাকিয়ে থাকে। যুক্তির বেড়া ডিঙিয়ে একটা শীতল সংকোচ হৃদয়ে প্রবেশ করে। যন্ত্রের মতো উঠে গিয়ে দু'হাতে দরজা বন্ধ করে দিই।

আর পাঁচজনের মতো জীবনযাপন করলেও অন্তরের ভিতরে সদাই আমি স্পর্শকাতর ও ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি। জয়দেববাবুর মতন কেউ কিছু বললে প্রশ্নটা ঘুরে ফিরে আমাকে অনেকক্ষণ জ্বালায়। অধিকারের সাহস নিয়ে বাড়ির ভিতর সহাস্যে ঘোরাফেরা করি, কিন্তু ঘরের বাইরে পথে পা বাড়ালেই মনে হয় এই বাড়ি আমার অধিকারের বাইরে। রাতে যখন ফিরি তখন যেন চোখকান বুজে এক লাফে বাড়িতে ঢুকে পড়ি, পাছে অনধিকারীকে কেউ দেখে ফেলে। এতটা হীনমন্যতার তেমন অবশ্য কিছু কারণ নেই, তবে বোধহয় অন্যদের তুলনায় আমি বেশি স্পর্শকাতর অপমানবোধ হয়ত আমার মাত্রাতিরিক্ত।

রাতে বিছানায় শুয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সংসারের নানান আলোচনা হয়। যেমনটা স্বাভাবিক। স্কুলে যাওয়ার জন্য ছেলেদের আরো এক সেট জামাপ্যান্ট চাই। বাবু একটা বল কেনা নিয়ে বড্ড বায়না করছে। অঙ্ক, ইংরেজির জন্য পিকুর একজন মাস্টারমশাই রাখা দরকার—এমনতর সব কথা।

অ্যাঁ ! একসঙ্গে এতগুলো বিস্ময় কখনো একত্র হয়নি বোধহয় এর আগে। আমি বললাম—করেছিস কি ?

ছ' বছরের ছেলের হাতে কতটুকুই বা শক্তি। ইঁটটা উঁচু করে ধরায় ওর ডানা কাঁপছিল, কচি কচি পাঁচটা আঙুল যা কোনমতে থানইঁটের প্রস্থ চেপে ধরেছিল, সেই আঙুলকটার দিকে নিমেষে সন্ধানী আলোর মত আমার দৃষ্টি দ্রুত বুলিয়ে গেল।

—কোথা থেকে আনলি ওটা। নিচু গলায় শুধোলাম। প্রশ্ন শেষ হবার আগেই ও জানালো সাধ্যমত ভাষায় আর ভঙ্গিতে, দিদার পাঁচিলের দক্ষিণ কোণে দুটো ইঁট আলগা হয়েছে—সেখান থেকে।

ওর মুখের দিকে, ওর ছোট্ট দেহটার দিকে দুর্বার আগ্রহে তাকিয়ে রইলাম। এটুকু বুকে কত সাহস রাখে, নাকি এর পিছনে আছে ওর অবিমিশ্র অজ্ঞতা। অজ্ঞতাই হবে। ও তো জানে না এ-বাড়ির এতটুকু চুন খসাবার অধিকার আমার নেই। যখন বাড়িওয়ালার সঙ্গে সদ্ভাব ছিল তখনও একটা পেরেক পুঁততে দেননি তিনি। কয়লা ভাঙতে বাড়ির ঝিকে রাস্তায় যেতে হয়েছে। গোটা হলুদ ভাঙার সময় শিলের উপর নোড়ার দুম্ দুম্ শব্দ শুনে ছুটে এসেছিলেন পিকু ও বাবুর ঐ দিদা। বাবু বলল—ইঁটটা নাও—

ওকে নির্ভার করতে হাত পেতে থান ইঁটটা নামালাম। ওর মাকে ডাকলাম। কিন্তু বাবুকে তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করলাম না। ওকে ভর্ৎসনা করবার কোনো অর্থই হয় না। একান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত ওর কাজ। আর যে বিশদ জ্ঞান ওর অজ্ঞতা মুছে দিতে পারে তা অর্জন করতে ওকে আরো অন্তত দশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। ছ' বছরের বাবুর দিকে তাকিয়ে শুধু অনুভব করলাম পিতার ভূমিকায় আমি কত অক্ষম, অনুপযুক্ত, স্ত্রী ইতিমধ্যে সংসারের কাজে অন্য ঘরে চলে গিয়েছিল, তাকে ডাকলাম। বাবুর কর্মকাণ্ড সকৌতুকে ঘনিষ্ঠভাবে সবিস্তারে বর্ণনা করছি, বারান্দার পাঁচিলের দিকে একপলক তাকিয়ে ও আঁতকে উঠল—ও মা ! সবাই দেখবে যে গো। পাঁচিলের দক্ষিণদিকেই এ বাড়ির রাস্তা, সেটাই আমাদের অংশের সম্মুখ দিক। চোখ ফিরিয়ে দেখলাম সেদিকে। সত্যিই তাই। অপকর্মটা আমাদের অর্থাৎ আমার পুত্রের। আর পাঁচিলের ভগ্ন শূন্য জায়গাটা সেই অপকর্মটিকে নিয়ত প্রচার করে চলেছে নিঃশব্দে, কিন্তু অতি প্রকট আর স্পষ্টভাবে। ফণীবাবুর নজরে আসতে আর দু' এক মিনিট। জানি না উনি বা ওনার স্ত্রী বাবুকে দেখেছেন কিনা ইতিমধ্যে। সম্ভবত দেখেননি, দেখলে তৎক্ষণাৎ তাঁর বা তাঁর স্ত্রীর সগর্জিত সিংহবিক্রম শুরু হয়ে যেত। কিন্তু তাতেই বা কি ? ব্যাপারটা অনুমান করতে কতক্ষণ ? অনুমান করা এমন কিছু শক্ত নয়। তাই পাঁচিলের সেই ইট-খসা খালি জায়গাটার দিকে তাকিয়ে আমরা স্বামী-স্ত্রী অন্তরে প্রমাদ গণতে শুরু করলাম। একটু ভেবে পরে স্ত্রীকে বললাম, রাত্রে ব্যবস্থাটা সারতে হবে। চুপচাপ ইঁটটা বসিয়ে রেখে আসব জায়গা মত। বাবু তার আগেই খেলতে বেরিয়ে গেছে।

ইঁটটা পায়ের কাছে পড়ে ছিল। ইট তো নয় যেন বড় সাইজের হাত বোমা। বিকট বিস্ফোরণের অপেক্ষায়। একটু আগে এই হাত বোমা আমার ছ' বছরের ছেলেটা কেমন নির্বিকার চিত্তে ওর ছোট দুই হাতে শূন্যে তুলে দাঁড়িয়েছিল সেই দৃশ্য মনের পর্দায় ভেসে উঠল।

মনে মনে তারিফ করতে লাগলাম আমার সন্তানকে—হয়ত তাকেও ঠিক নয়—আগামী দিনের অনাগত কোনো বীর প্রজন্মকে যার প্রতীক বা প্রতিনিধি হয়ত আমার কনিষ্ঠ পুত্র 'বাবু', যে একটু আগে এইখানে সহাস্যে দাঁড়িয়েছিল। এ ভাবেই তো আমাদের লড়াই এগুবে ধীরে ধীরে—এক প্রজন্ম হতে আরেক প্রজন্মে—এ ভাবেই আমরা বাঁচব। হেঁট মাথা ধীরে ধীরে উঁচু হবে। আজ নয়, হয়ত কালও নয়, আগামীর কোনো এক সুন্দর সকালে।

এবার থান ইঁটটা ঘরের এক কোণে সরিয়ে রাখলাম। স্ত্রীকে বললাম, দেখো, খেলাচ্ছলে কেউ না ভেঙে ফেলে। পিকু, বাবু ছাড়াও দু' একটা ছেলেমেয়ে বাড়িতে যাতায়াত করে, গৃহপরিচারিকার পুত্র-কন্যা। সে কথা ভেবে স্ত্রী থান ইঁটটাকে পূজার বিগ্রহের মত ভাঁড়ারের এক কোণে সযত্নে রেখে এল।

রাত যখন গভীর, একটা তীব্র আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। স্ত্রী-ও জেগে উঠল। আওয়াজটা আবার হতে স্ত্রী আমার গা-ঘেঁষে বসল। যে আশংকা আমি করেছিলাম ওর-ও তাই। —মনে হচ্ছে ইঁদুর ধরেছে —সাপ ! আর্তস্বরে নিচু গলায় ও বলল। চাপা গম্ভীর স্বরে বললাম—মনে হচ্ছে তাই। শব্দটা আসছে হেঁসেল থেকে, ওর পাশের পচা ড্রেন থেকেই রোজ ইঁদুর ছুঁচো উঠে আসে।

—দাঁড়াও।

ইতিমধ্যে আবার একটা ইঁদুর ধরার শব্দ। এবার শব্দটা অন্য জায়গা থেকে, মনে হ'ল বাথরুম থেকে।

চট্ করে খাট থেকে নামতে সাহস হ'ল না। চতুর্দিক থেকে যদি এইভাবে ঘরের ভিতরে ঐ বিষাক্ত জীবগুলো ঢুকতে শুরু করে ? সর্বনাশ !

ভাঁড়ার ঘরের থান ইঁটটা এখন সত্যি বিগ্রহের মতই জেগে উঠেছে যেন। ওঁর কৃপা সাহায্য ব্যতীত আমরা বাঁচব না, কেউ—না। স্ত্রী-পুত্র সহ সবংশে মরতে হবে।

মনে মনে আমরা দুজনা স্বামী-স্ত্রী ভাঁড়ার ঘরের বিগ্রহের পূজা-বন্দনা শুরু করে দিলাম।

স্ত্রী বলল—একটা ইঁদুর-কলও কিনতে পার না।

—তাতো পারি। কিন্তু গর্ত বোজাবো কী দিয়ে।

—তাই তো।

অন্ধকারে আমাদের পারস্পরিক কথোপকথন চলতে লাগল।

তীব্র আওয়াজটা বন্ধ হতে আমি বললাম, যাক বাঁচা গেল।

স্ত্রী বলল—বাঁচা গেল। কি গো, ও গুলো এতক্ষণে ঘরের ভিতরে এসে ঢোকেনি তো ?

খাট থেকে এবার নামতেই হলো। আলো জ্বাললাম। স্ত্রী আমার পিছু পিছু এল। ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে থান ইঁট হাতে নিয়ে অতি সন্তর্পণে হেঁসেলের দিকে রওনা হলাম। স্ত্রী হেঁসেলের আলো জ্বালল। মুহূর্তে হেঁসেল ফাঁকা। এক গণ্ডা ছুঁচো, ইঁদুর গর্ত দিয়ে হুড়মুড়িয়ে পালাল। মনটা মুহূর্ত মধ্যে যেন অনেকটা নির্ভয়, নির্ভার হয়ে গেল। ইঁটটা ভেঙে টুকরো করতে যাবো, স্ত্রী পিছন থেকে টেনে ধরল। কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল—ওটা এখন পাঁচিলের জায়গা মত রেখে এলে হয় না।

থমকে দাঁড়ালাম। নির্জন মলিন হেঁসেল ঘরে দাঁড়িয়ে থেকে ন্যায় অন্যায়ের দোদুল্যমান বিচারপর্ব শেষ করতে করতে হৃদয়ঙ্গম হ'ল—স্ত্রী মন্দ বলে নি। বরং এ—কাজটাই আমার পক্ষে সোজা।

বললাম ঠিক বলেছ। চল ইট-টা রেখে আসি। একটু পরে বললাম চিন্তা ক'রো না। কালই আমি যা হ'ক একটা ব্যবস্থা করছি।

বারান্দার আলো আর জ্বাললাম না। আমরা দু'জনে স্বামী-স্ত্রী অতি উৎসাহে থান ইটটা বয়ে এনে পাঁচিলের জায়গা মত বসিয়ে দিলাম। বড়লোকের বিশাল পাড়াটা তখন ঘুমন্ত। তবু একবার চারিদিকে নজর বুলিয়ে নিলাম। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে দিলাম। বন্ধ করবার ঠিক আগে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত কর্মের একমাত্র সাক্ষী ঐ থান ইটটাকে দুজনে সবকটা ইন্দ্রিয় একত্রিত করে শেষবারের মত দেখে নিলাম একবার। আমাদের দু'জনের বুক হ'তে একটা সুদীর্ঘ স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। ভিতরে ঢুকে এবার মনে হ'ল ঘরের অন্দর—যাকে হয়ত অন্তর বলা চলে—সেই অন্দরটুকু আগের মত আমাদের সম্পূর্ণভাবে আমাদের —যা আমরা কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। কানাডার থেকে মাঝে-মাঝে আসা ঐ অসভ্য লোকটা যতই গর্জাক, ভয় দেখাক, আমাদের কারো ছায়াও স্পর্শ করতে পারবে না। মুহূর্তের জন্যেও না।

বোধহয় সেদিন শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী ত্রয়োদশী ছিল। জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। দক্ষিণ থেকে মৃদু মন্দ হাওয়া দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। ছেলেরা খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী নির্জনতার সুযোগ নিয়ে বাড়ির বারান্দায় একটু গা-ঘেঁষে বসেছি। বয়স যথেষ্ট হলেও এ রকম লুকিয়েচুরিয়ে নির্জনতার সুযোগ পেলে আমরা বসি। দুই ছেলের ভবিষ্যতের ছবি আঁকি।

সেদিন সে রকম বসেছিলাম। সামনে বাঁ দিকে পাঁচিল। প্রথমে স্ত্রী-ই দেখেছিল। আঁতকে উঠল যেন ও, বলল, কী গো, ইটটা তো নেই!

—নেই!

সেদিকে তাকাতে দেখলাম, সত্যি ইটটা নেই। জায়গাটা ফাঁকা। ভাবনা চিন্তা করে লঘু স্বরে বললাম—পড়ে গেছে হয়ত। সামনে এগিয়ে গেলাম। —না, নিচে কোথাও পড়ে নেই।

ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসলাম। মন অন্যদিকে যতই ফেরাই না কেন, ঐ ফাঁকা জায়গাটুকুর দিকে বারবার দু'জনেরই নজর চলে যায়। সব চিন্তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে ঐ শূন্যস্থানটুকু আমাদের কেমন আনমনা করে তুলছে বারবার। দু'জনেই বুকের মধ্যে কেমন একটা বোবা শূন্যতা, ব্যথার ঘূর্ণি ক্রমাগত অনুভব করতে থাকি, হাত-পা-কাটা-মানুষের স্থবিরতা আমাদের উপর যেন চেপে বসতে থাকে।

এই ইটটা নিয়ে আমরা কত কাণ্ডই না করেছি, একদিন কত কিছুই না ভেবেছি। আজ ইটটা নেই, যেন আমাদের কত কিছুই নেই—।

অঙ্কন : সুব্রত চৌধুরী

ভারতীয়দের সন্ধানে ত্রিনিদাদে

সুতপা সেনগুপ্ত

খোলা বাজারে বেচাকেনা দেখে দেশের কথা মনে পড়ে যায়
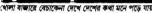
হিন্দু ভারতীয়দের গ্রামের বাড়ির সামনে ধর্মীয় পতাকা উড়ছে

ত্রিনিদাদের সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ি

ক্যারিবিয়ান সাগরের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে আমাদের প্লেন। চলেছি কানাডার টরোণ্টো শহর থেকে ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগোর রাজধানী পোর্ট-অফ-স্পেনের উদ্দেশে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ থেকে অন্যতম ক্ষুদ্রতম দেশের দিকে। মানচিত্রে যেখানে কানাডা জুড়ে থাকে এক বিরাট অংশ, ত্রিনিদাদের ভাগ্যে একটা বিন্দুর বেশী জায়গা জোটে না। তবে ছোট্ট দ্বীপ হলে হবে কি, ত্রিনিদাদ সম্বন্ধে আমার কৌতূহল স্বাভাবিক। জানতাম বহু বছর আগে কিছু ভারতীয় কোনো কারণে এখানে এসে পৌঁছেছিল। ভারত থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের এই ভারতীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুবই ভাসা ভাসা। বিশ্ববিখ্যাত লেখক ভি এস নইপল এসেছেন এই ভারতীয় সম্প্রদায় থেকেই। এছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট টিমেও

সমুদ্রতীরে টুরিস্টের থেকে স্থানীয় লোকদেরই ভীড় বেশী

কিছু ভারতীয় খেলোয়াড় দেখেছি। কানাডায় থাকাকালীন প্রচুর ত্রিনিদাদবাসী ভারতীয়র সংস্পর্শে আসি। ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও হয় অনেকের সঙ্গে। চেহারা ভারতীয়, কিন্তু সাজগোজ এবং ভাষা পুরো পশ্চিমের। কিছু খ্রীষ্টান হলেও ধর্মে বেশীর ভাগই হিন্দু বা মুসলমান। আচার-আচরণে কিছু ভারতীয় বৈশিষ্ট্য এখনও টিকে আছে কিন্তু ভাষাটা একেবারেই হারিয়ে গেছে। এদের সবারই মাতৃভাষা ইংরিজি। আমার ত্রিনিদাদ যাত্রা এমনই এক ত্রিনিদাদবাসী ভারতীয় বন্ধুর নিমন্ত্রণে। এর আগেও গিয়েছি ত্রিনিদাদে তবে এবার লম্বা ছুটি নিয়ে এসেছি। বেড়ানো প্রধান উদ্দেশ্য হলেও, এই ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে কিছু কৌতূহল নিবারণ করা অবশ্যই অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আমার।

প্লেনের যাত্রী বেশীর ভাগই ত্রিনিদাদবাসী। কৃষ্ণাঙ্গ ও ভারতীয়ই বেশী। তবে কিছু শ্বেতাঙ্গও আছে। শ্বেতাঙ্গর দল বেশীর ভাগই নেমে গেল আন্তিগা দ্বীপে। আন্তিগা ও সেন্ট কিটস্ ছাড়িয়ে প্লেন উড়ে চলল ত্রিনিদাদের দিকে। নামবার আর অল্পই দেরি। এমন সময় শুনি প্লেন-এর পাইলট ক্যাপ্টেন মোহাম্মেদের গলা। তিনি জানালেন, পশ্চিমদিকে হারিকেন ড্যানিয়েলির (Danielli) অবস্থানের কথা। ড্যানিয়েলির কেন্দ্রবিন্দুকে পাশে রেখে আমাদের প্লেন নির্বিঘ্নেই উড়ে চলল। যে এয়ারলাইন্স নিয়েছি তা ত্রিনিদাদের জাতীয় এয়ারলাইন্স। নাম B. W. I. A. বা ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স। ত্রিনিদাদের কিছু স্থানীয় লোক ব্যঙ্গ করে এর পুরো নাম দিয়েছে "But Will It Arrive" আমার প্লেন কিন্তু ঠিক সময়েই নামল পিয়ারকো এয়ারপোর্টে। ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস্-এর ঝামেলা চুকিয়ে বাইরে এসে দেখি সন্ধ্যা নেমে গেছে আর ড্যানিয়েলির কিছু ছোঁয়াও এখানে এসে পৌঁছেছে। ছোঁয়াচমাত্র লেগেছে কিন্তু তাতেই অবস্থা বেশ কাহিল। গাড়িতে কোনোরকমে ওঠা গেল বটে কিন্তু বৃষ্টি আর ঝড়ের তোড়ে গাড়ি চালানো দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল। আর তার ওপর আবার হাইওয়েতে অফিস ফেরতা গাড়ির ভীড়। রাজধানী পোর্ট-অফ-স্পেন থেকে কাজ করে ফিরছে সব নিজের নিজের শহরে। হাইওয়ের আশা ছেড়ে ছোট রাস্তায় নামানো হল আমাদের গাড়িকে। মাইলের পর মাইল আখের খেত এদিকটাতেও। খেতের মাঝখান দিয়ে পিচের রাস্তা। আখের খেতসহ এসব রাস্তার মালিক হল কারোনি সুগার কোম্পানি। তবে রাস্তা দিয়ে সাধারণ গাড়ির যেতে বাধা নেই। রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তার ওপর বৃষ্টিটার ঝাপটা আর ঝড়ের তোড়। যে রাস্তা আধ ঘণ্টায় আসা যায় ড্যানিয়েলির দৌলতে আমাদের লাগল প্রায় দুঘণ্টা। বেশ ভালোই অভ্যর্থনা জানাল ত্রিনিদাদ আমাকে। তবে আশ্চর্য। পরের দিন সকালে উঠে দেখি ঝলমল করছে রোদ চারিদিকে আর তার সঙ্গে মন ভরিয়ে দেওয়া সমুদ্রের হাল্কা হাওয়া।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মাঝামাঝি ক্যারিবিয়ান সাগরে ছোট বড় মিলিয়ে বেশ কিছু দ্বীপ। দু-একটি ছাড়া প্রত্যেকটিই এখন ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন দেশ। পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে এদের রাজনৈতিক গুরুত্ব কতটা তা তর্কসাপেক্ষ, তবে ঠাণ্ডা ও বরফের হাত থেকে কিছুদিনের জন্য রেহাই পেতে শীতকালে অসংখ্য ট্যুরিস্ট পাড়ি জমায় এদিকে। এরা আসে প্রধানত আমেরিকা ও কানাডা থেকে। শীত এলেই জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল বাহামা না বারবাডোস অথবা আরুবা না সেন্ট লুসিয়া। কম-জানা ছোট দ্বীপগুলিতে যাওয়া হল হালের ফ্যাশন। তবে অন্যান্য দ্বীপগুলি থেকে ট্যুরিস্ট ইণ্ডাস্ট্রিতে অনেক পেছিয়ে আছে ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগো। ট্যুরিস্ট আসুক বা না-আসুক খুব একটা যায় আসে না এদের। এই নির্লিপ্ততার প্রধান কারণ ত্রিনিদাদের পেট্রোলিয়াম। এই তেলের দৌলতে ত্রিনিদাদ-টোব্যাগো অর্থনৈতিক অবস্থা শুধু যে অন্যান্য দ্বীপগুলি থেকে ভালো তাই নয়, ইয়োরোপের পশ্চিমে এ ব্যাপারে আমেরিকা ও কানাডার পরেই স্থান হল এই ছোট্ট দ্বীপরাজ্যের। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের অবস্থান মন্দা পড়ায় ত্রিনিদাদের অবস্থা বেশ খানিকটা কাহিল হয়ে পড়েছে। চাপ এসেছে ট্যুরিস্ট ইণ্ডাস্ট্রিকে উন্নত করবার জন্য।

উত্তর-দক্ষিণে আশি কিলোমিটার আর পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ষাট কিলোমিটারের এই দ্বীপটি আয়তনে ছোট হলেও বৈচিত্র্যে কম যায় না। পাহাড়, সমতল, সমুদ্র মিলিয়ে ত্রিনিদাদের সৌন্দর্য প্রচুর। ছোট্ট এই দ্বীপটিতে আছে তিনটি পর্বতমালা। উত্তরে সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে গেছে সবচেয়ে উঁচু নদার্ন রেঞ্জ। সর্বোচ্চ শিখরটির উচ্চতা প্রায় তিন হাজার ফুট। এছাড়া আছে সেন্ট্রাল ও সাদার্ন রেঞ্জ। হিমালয়ের তুলনায় কিছু না হলেও এই ছোট দ্বীপটির সৌন্দর্য বাড়াতে এই পাহাড়গুলির অবদান যথেষ্ট। ত্রিনিদাদের উত্তর-পূর্ব কূলে রয়েছে টোব্যাগো। সৌন্দর্যে ত্রিনিদাদকে টেক্কা দিয়ে যায়। ত্রিনিদাদের মুষ্টিমেয় ট্যুরিস্ট সব টোব্যাগোর দিকেই পাড়ি জমায়।

প্রথম দর্শনে ত্রিনিদাদকে কেমন জানি চেনা চেনা লাগে। অবশ্যই তার কারণ ত্রিনিদাদের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে ভারতের বহু জায়গার মিল। তাছাড়া রাস্তা-ঘাটে বহু ভারতীয় চেহারার উপস্থিতি ভারতেরই এক-প্রদেশের অনুভূতি দেয়। তবে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ত্রিনিদাদে অভাব ও দারিদ্র্য খুবই কম চোখে পড়ল। চারিদিকে মোটামুটি সচ্ছলতার হাওয়া দেখলাম। জীবনযাত্রায় আমেরিকার প্রভাব সুস্পষ্ট। দ্বীপটি আমেরিকান স্টাইলের ডিপার্টমেন্ট স্টোরস, সুপারমার্কেট আর শপিং মল দিয়ে ভর্তি। প্রয়োজনের থেকে সরবরাহ প্রচুর বেশী। হাইওয়ের গাড়ির ভীড় আমেরিকা বা কানাডাকেই মনে করিয়ে দেয়। তবে পশ্চিমের অন্যান্য দেশের তুলনায় যাত্রার গতি এখানে অনেক মন্থর। আধুনিক চোখ ঝলসানো ডিপার্টমেন্ট স্টোরস আর সুপারমার্কেটের মধ্যে দেখা যায় দেশী কায়দার দোকানপাট। রাস্তার ধারে ধারে নানান রকমের দেশী পদ্ধতিতে তৈরি পেঁয়াজি-ফুলুরী ("সাহিনা", "ডাব্‌ল্‌স", "রোটী" "বরফি") বা ফলের দোকান। টাটকা তরি-তরকারি ও ফল সাজিয়ে হাট বাজারও বসে আমাদের দেশের মতন। অনেকে সুপারমার্কেট ছেড়ে এই সব বাজারেই জিনিস কিনতে পছন্দ করে। আমেরিকার প্রভাব সত্ত্বেও চারিদিকে দ্বীপ-জীবনের বেশ একটা ঢিলেঢালা আবহাওয়া ও মনোভাব দেখলাম। পশ্চিমী প্রভাব অনেকটাই ওপর ওপর।

ত্রিনিদাদের রাস্তায় বেরোলেই পরিষ্কার বোঝা যায় ত্রিনিদাদের অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এর কস্‌মোপলিটান চেহারা। পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে লোক এসে জুটেছে এই ছোট্ট দ্বীপটিতে। ভাবতেও অবাক লাগে। পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলি থেকে এসেছে কৃষ্ণাঙ্গরা। শ্বেতাঙ্গরাও প্রধানত এসেছে স্পেন, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স থেকে। ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছে ভারতীয়রা। এছাড়া এশিয়ার অন্যান্য প্রান্ত থেকে গিয়েছে বেশ কিছু সিরিয়ান ও চাইনীজ। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন কারণে এরা এই দ্বীপে এসে থাকলেও আজকের ত্রিনিদাদে সবাই যে যার নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছে। শুধু হারিয়ে গেছে ত্রিনিদাদের পুরনো বাসিন্দারা। কলম্বাসের পা পড়বার আগে যারা বাস করত এই সব দ্বীপগুলিতে। সেই কারিব ও আরাওয়াকরা। এদিককার ভাষায় যাদের বলে নেটিভ ইণ্ডিয়ান বা অ্যামেরিণ্ডিয়ান। কারিবদের নামেই এই কারিবিয়ান সাগর। কারিব ও আরাওয়াকদের প্রায় পুরোই ধ্বংস করে দেয় শ্বেতাঙ্গরা এই দ্বীপে। শুনেছি এদিক ওদিক কিছু কারিব ছড়িয়ে আছে এখনও ত্রিনিদাদে, তবে মিশ্র-বিবাহের দৌলতে তাদের আর কারিব বলা যায় কিনা সন্দেহ। আটানব্বই বছর বয়স্কা শেষ জীবিত "কারিব কুইন"কে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। খুঁজে খুঁজে এক ভাঙ্গা বাড়িতে পেলাম "কুইন" ও তাঁর মেয়েকে। দ্রষ্টব্য বস্তু তিনি ত্রিনিদাদের। সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকেরা এসে দেখা করে যায় ওনার সঙ্গে। চোখে দেখেন না ভালো করে, কানেও শোনেন না। তবে মিষ্টি গলায় গান করে শোনালেন আমাদের। সরকার ও চার্চের দয়ায় অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটছিল তাঁর। কিন্তু কোনো কিছু প্রচারের দরকার হলে তাঁকে ব্যবহার করতে ছাড়ে না এরা। জানি না বেঁচে আছেন কি না তিনি এখনও। তাঁর বিবাহ হয়েছিল আর্জেন্টিনা থেকে আসা স্প্যানীশের সঙ্গে আর তাঁর মেয়ের বিবাহ হয়েছে ত্রিনিদাদীয় এক কৃষ্ণাঙ্গের সঙ্গে। এভাবেই হারিয়ে গেছে বা যাচ্ছে ত্রিনিদাদের কারিব জাতির অবশিষ্টাংশ। আর আরাওয়াকরা পুরো হারিয়ে গেছে ত্রিনিদাদ থেকে।

তবে ত্রিনিদাদের অ্যামেরিণ্ডিয়ানদের খুঁজে না পাওয়া গেলেও তাঁদের স্মৃতিচিহ্ন কিন্তু এদিক ওদিক প্রচুর ছড়িয়ে আছে। বিশেষ করে বহু জায়গার নামে। আরিমা, শাগুয়ারামা, শাওয়ানা, নাপারিমা, কারোনী, কুভা, পিয়ারকো, টুনাপুনা, কিউরেপ—এসব শহর বা জায়গার নাম ওদেরই ভাষার স্মৃতি বহন করে আসছে। এছাড়া ত্রিনিদাদের খাবার-দাবারেও ওদের প্রভাব

অনস্বীকার্য।

এই দ্বীপে যেখানে এককালে অ্যামেরিন্ডিয়ানরা অবাধে বিচরণ করে বেড়াত সেখানে প্রায় দেড়শো বছর আগে হঠাৎ কিছু এশিয়ার ইন্ডিয়ান কিভাবে এসে পড়ল তার কারণ জানতে গেলে ত্রিনিদাদের ইতিহাসের কিছু পাতা ওলটাতে হয়। আসলে ত্রিনিদাদের ইতিহাস আমেরিকার ইতিহাসেরই প্রতীক। ১৪৯৮ সালের তিরিশে জুলাই কলম্বাসের জাহাজ যখন এই দ্বীপে এসে ভিড়ল তখন ত্রিনিদাদের নাম ত্রিনিদাদ ছিল না। ত্রিনিদাদ কলম্বাসেরই দেওয়া নাম। উত্তরের পাহাড়ের তিনটি চূড়ার দিকে লক্ষ রেখেই সম্ভবত এই নামটি রেখেছিলেন তিনি। ত্রিনিদাদের বাসিন্দা তখন কারিব ও আরাওয়াকরা। কারিবরা এই দ্বীপে পৌঁছনোর আগে আরাওয়াকদেরই বসতি ছিল এখানে। চাষবাস করে, তাঁত বুনে শান্তিতেই ছিল তারা। দুর্ধর্ষ কারিবদের আগমনে সে শান্তিতে খানিকটা ছেদ পড়েছিল। তবে স্প্যানিয়ার্ডদের পা পড়ার পর ত্রিনিদাদের নতুন ইতিহাস আরম্ভ হল। আরাওয়াক ও কারিবদের বাগে আনতে ওদের কোনো বেগই পেতে হল না। ত্রিনিদাদ অবিলম্বে রূপান্তরিত হল স্পেনের অধীন এক উপনিবেশে আর কারিব ও আরাওয়াকরা পরিবর্তিত হল ক্রীতদাসে। ঔপনিবেশিকতা, ক্রীতদাসত্ব—এ-সব শব্দ অ্যামেরিন্ডিয়ানদের ভাবাতেও ছিল না, জানতও না এগুলো কি বস্তু! মুক্ত জীবনে অভ্যস্ত এই অ্যামেরিন্ডিয়ানদের দল ক্রীতদাসের জীবন মেনে নিতে পারল না। কিছু পালিয়ে অ্যামেরিকার এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল আর বেশীর ভাগের মুক্তি এল মৃত্যু বা আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে। তবে এ তো শুধু ত্রিনিদাদে ঘটেনি, এ হল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সব অ্যামেরিন্ডিয়ানদের ইতিহাস। এদের মধ্যে শান্তিপ্রিয় যারা ছিল তারা তবু এখনও টিকে আছে। যদিও রিজার্ভেশনের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে ধুঁকছে বেশীর ভাগই। আর যত স্বাধীনতচেতা, মুক্তিপ্রিয়, দুর্ধর্ষ ট্রাইবেরা যারা শ্বেতাঙ্গ কলোনিয়াল মাস্টারদের মেনে না নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল, তারাই সব বিলীন হয়ে গেছে।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার যে কোনো জায়গায়—তা সে ছোটো ত্রিনিদাদেই হোক বা বিশাল কানাডাতেই হোক—খোলা প্রান্তরের দিকে তাকালেই আমার চোখে ভেসে ওঠে

কারোনি কাউন্টিতে মাইলের পর মাইল আখের খেত

চেরোকী, এপাচী, নাভাহো, কারিব বা আরাওয়াকদের ছবি। কলম্বাস তখনও এসে পৌঁছননি এ প্রান্তে। কোনো রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক গণ্ডীতে বাঁধা ছিল না এরা। যেখানে যখন চেয়েছে তাঁবু ফেলেছে, শিকার করেছে, মাছ ধরেছে বা মেতে উঠেছে উৎসবে। কলম্বাসের জাহাজ এসে ভিড়ল আর বদলে গেল এদের জীবন। সব কিছু ছিনিয়ে নেওয়া হল ওদের থেকে। কোথায় গেল তাদের জীবন আর কোথায়ই বা গেল তাদের নাচ, গান আর উৎসব! স্প্যানীয়ার্ডরা হয় এদের মেরে ফেলেছে, নয়ত মিশে গিয়ে নতুন জাতির জন্ম দিয়েছে। কিন্তু ইংরেজরা ছিল আরও নিষ্ঠুর ও চালাক। না মেরে তারা এদের পুরে দিয়েছে রিজার্ভেশনের গণ্ডীতে, দিয়েছে কিছু মাসোহারা আর হাতে ধরে দিয়েছে মদের বোতল। উত্তর আমেরিকায় 'রিজার্ভেশন' হল শ্বেতাঙ্গদের তৈরি করা অ্যামেরিন্ডিয়ানদের জন্য গণ্ডী-কাটা গ্রাম। এর বদলে শ্বেতাঙ্গরা নিয়ে নিয়েছে পুরো মহাদেশটা। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের মতো 'অ্যাপার্থয়েড' নাম দেয়নি বটে, তবে যা করেছে তা অ্যাপার্থয়েড ছাড়া আবার কি? আজ দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের কান্না পৃথিবীর সব প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে, কিন্তু উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের উপর যে কি অবিচার হয়েছে তা খুব কম লোকেরই কানে পৌঁছেছে। অথচ এরা এখনও ধুঁকছে।

দুশো নিরানব্বই বছরের রাজত্বে বিশেষ কিছুই করেনি স্প্যানীশরা ত্রিনিদাদে। ওদের নজর ছিল সোনা বা রুপোর উপর। দুটোর একটাও ত্রিনিদাদে পাওয়া না যাওয়াতে ত্রিনিদাদ মোটামুটি অবহেলিত উপনিবেশই থেকে যায়। ১৭৯৩ সালে স্পেনের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় ত্রিনিদাদকে ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল অ্যাবারকম্বি।

স্প্যানীশ কলোনি থেকে ব্রিটিশ কলোনি। এই ছোট্ট দ্বীপগুলি নিয়েও কম কাড়াকাড়ি হয়নি। ইংরেজরা ব্যস্ত হল তামাক, আখ ইত্যাদির ফলন বাড়াতে। এর আগেই স্প্যানীয়ার্ডরা ক্রীতদাস হিসেবে অ্যামেরিন্ডিয়ানদের ব্যবহার করতে ব্যর্থ হওয়াতে আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস আমদানি শুরু করেছে। বৃটিশ আমলে এই আমদানি ও দাসদের যন্ত্রণা চরমে উঠল। এই যন্ত্রণা চলল ১৮৩৪ সাল অবধি। এই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতীয়দের ত্রিনিদাদে আগমন।

১৮৪৫ সালে তিরিশে মে ত্রিনিদাদে "ফতেল রজ্জাক" নামে এক জাহাজ এসে ভিড়ল। জাহাজ থেকে নামল শ'খানেক ভারতীয়। নতুন দেশে নতুন জীবনের আশ্বাসে। ভারত থেকে বারো হাজার মাইল দূরে জীবিকার আশায় পাড়ি জমানোর নজির সেই সময়ে বোধ হয় এই প্রথম। ক্রমে ক্রমে কয়েক হাজার ভারতীয় এসে পৌঁছল ত্রিনিদাদে। আমেরিকা বা কানাডাতে তখন ক'জন ভারতীয়রই বা পা পড়েছে!

ভারতীয়দের ত্রিনিদাদে আনানোর পেছনে সুবিধাবাদী ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ স্বার্থ ছিল। ১৮৩৪ সালে সমস্ত ব্রিটিশ রাজত্বে দাসত্ব প্রথার অবসান হয়। আমেরিকা তখন স্বাধীন দেশ। তাই ক্রীতদাস-প্রথা তখনও আমেরিকায় তুঙ্গে। ত্রিনিদাদে দাসত্ব প্রথার অবসানে স্থানীয় সরকার মহা অসুবিধের সম্মুখীন হল। আখ, কোকো, কফি ইত্যাদির খেতে কাজ করবার লোকের দারুণ অভাব পড়ল। মুক্তি পেয়ে পুরোনো দাসেরা শহরের দিকে পাড়ি দিয়েছে স্বাধীন জীবিকার সন্ধানে। বিপাকে পড়ে ব্রিটিশ সরকারের নজর পড়ল গরিব ভারতীয় চাষীদের ওপর। এত গরিব এরা যে লোভ দেখিয়ে দূরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধেই হবে না। তার ওপর দুই দেশের জলবায়ুর মধ্যে মিল প্রচুর। তাতে এদের খাটা-খাটুনিতেও কোনো অসুবিধে হবে না। শুধু ত্রিনিদাদে নয়, দক্ষিণ আমেরিকার তৎকালীন ব্রিটিশ গায়নাতেও (বর্তমান গায়না) ভারতের বেশ কিছু গ্রামীণ লোককে লোভ দেখিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হল। প্রধানত উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের গ্রাম থেকেই আনা হল এদের কন্ট্রাক্ট বা ইনডেনচারড (indentured) মজুর হিসেবে। সরকার কথা দিল উপযুক্ত মাইনে ছাড়াও থাকবার জায়গা ও ডাক্তারের খরচ আর

চুক্তির শেষে ভারতে ফেরার খরচ দেওয়া হবে। শোনা যায় অনেক কথাই শেষ পর্যন্ত রাখেনি তারা। তবু ১৮৪৫ সাল থেকে ১৯১৭ সাল অবধি প্রচুর ভারতীয় এল ত্রিনিদাদের খেত-খামারে কাজ করতে। ১৯১৭ সালে চুক্তির শেষে অনেক ভারতীয়ই যখন ওখানে থেকে যাওয়া স্থির করল, সরকার তাদের কিছু জমিজমা দিয়ে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করল। সে সময়ে ভারতীয়দের পরিচয় ছিল প্রধানত "কেন কাটার" (Cane Cutter) বা আখের খেতের মজুর হিসেবে। সে নাম এখনও পুরো ঘোচেনি। পশ্চিম ত্রিনিদাদের কারোনি কাউন্টি যেখানে মাইলের পর মাইল আখের খেত সেখানেই বসবাস ছিল এই "কেন কাটার"-দের। সেই খেতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি অমানুষিক পরিশ্রম করেছে এরা।

এর মধ্যে বহু বছর কেটে গিয়েছে। যে ত্রিনিদাদ আমি দেখছি সে ত্রিনিদাদ অনেক বদলেছে এই সত্তর বছরে। আর তার সঙ্গে বদলেছে ওখানকার ভারতীয়দের অবস্থাও। নতুন জীবনের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছিল যে কয়েক হাজর ভারতীয় তাদের সঙ্গতি ছিল খুবই সামান্য। তবে কায়িক পরিশ্রমে এদের হারানো দুঃসাধ্য ছিল। চাষের কাজের জন্যই আনা হয়েছিল এদের। কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেনি এরা। ব্রিটিশ সরকারের আশ্বাস বাণীর অনেকটাই ছিল ফাঁকা। অনেক দুঃখ, কষ্ট, দুর্দশা, অপমানের মধ্য দিয়ে এদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। 'কুলি' নাম দিয়ে, ধর্মকে ব্যঙ্গ করে এদের কত না লাঞ্ছনা দেওয়া হয়েছে। আমার ত্রিনিদাদীয় বন্ধুরা গল্প করেছে ছোটবেলায় রাস্তাঘাটে তাদের 'কুলি' বলে আওয়াজ দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। শ্বেতাঙ্গরাও করেছে, কৃষ্ণাঙ্গরাও করেছে এই অপমান। তবে এদের দমানো কঠিন ছিল। অসম্ভব পরিশ্রম করে অবস্থা ফেরানোর এমন নজির সত্যিই বিরল। অবশ্য শ্রমের মূল্য পাওয়া যায় আধুনিক ত্রিনিদাদে। তৃতীয় বিশ্বের অংশ ত্রিনিদাদের শ্রমিক শ্রেণী, চাষী বা জেলেদের অবস্থা প্রথম বিশ্বের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ত্রিনিদাদের ভারতীয় সমাজের একটি বিশেষত্ব বিশেষ করে প্রশংসার যোগ্য। অবস্থা ফিরে যাবার পরও প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে ছোট দোকান সাজিয়ে বাগানের তরি-তরকারি বা ফলমূল বিক্রী করতে এরা লজ্জা পায় না। অথবা বাবা-মা খেতে বা ফ্যাক্টরিতে ঘন্টার পর ঘন্টা হয়ত কাজ করে আর ছেলেমেয়েরা স্কুলের শেষে বা ছুটির দিনে বাগানের তরকারি বেচে বাবা-মাকে আর্থিক সাহায্য করে। আমার বাঙালি দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে হতো বাড়ি-গাড়ি থাকা সত্ত্বেও এত কষ্ট করবার কি দরকার? পরে বুঝেছিলাম এ হল ত্রিনিদাদের ভারতীয় সমাজের বিশেষত্ব। এটাকে ওরা কষ্ট বলেই মনে করে না। আর্থিক অবস্থা ফেরানোর সংগ্রাম ওদের জীবনযাত্রার অংশ হয়ে গিয়েছে। অবস্থা ফিরে গেলেও সংগ্রাম চলতে থাকে। তবে অবস্থা ফেরানোরও কি আর শেষ আছে?

ত্রিনিদাদে আর একটি ব্যাপার লক্ষ করে অবাক হলাম। ভারত সম্পর্কে ত্রিনিদাদের ভারতীয়দের গর্বও নেই, কৌতূহলও খুব একটা নেই। স্থানীয় বন্ধু-বান্ধবেরা আমাকে কানাডা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছে বেশী। ভারত সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য বিশেষ কিছুই তাদের ছিল না। ধর্ম নিয়ে এখানে প্রচুর মাতামাতি চলে বলে যেটুকু কৌতূহল ধর্ম নিয়েই। সাঁইবাবার প্রচুর ভক্ত এখানে। প্রচুর মধ্যবয়স্ক ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা জিজ্ঞেস করেছে সাঁইবাবাকে অমি চাক্ষুষ দেখেছি কিনা! দেখিনি শুনে নিরাশ হয়েছে। এছাড়া হিন্দি সিনেমা দেখা বা হিন্দি সিনেমার গান শোনার চল আছে প্রচুর। স্থানীয় কিছু গায়ক-গায়িকা বা গানের দলও আছে যারা হিন্দি গান রেডিওতে, টি ভিতে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করে থাকে। ভাষা না জানলেও খুব একটা যায় আসে না। ভারতীয় মার্গ-নাচের নামে যে নাচ দেখলাম তা হিন্দি সিনেমার নাচেরই অনুকরণ। ভারতীয় সংস্কৃতিচর্চা ঐটুকুই হিন্দি সিনেমা বা হিন্দি গান ছাড়া ভারতীয় সংস্কৃতির আর কিছুর সঙ্গে একাত্মতা বোধ অনুভব করে না এরা। এখানে এক নতুন ভারতীয় সংস্কৃতি জন্মলাভ করেছে। ধর্মচর্চার রূপও একটু আলাদা। তবে খাবার-দাবার মোটামুটি ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করেই তৈরি করে এরা। কানাডায় দেখেছি ত্রিনিদাদবাসী ভারতীয়দের ভারতের ভারতীয় বলে ভুল করলে মহা আপত্তি করে এরা। এর কারণ খানিকটা হয়ত ওদের দেশাত্মবোধ হতে পারে। এখন ত্রিনিদাদই তো ওদের দেশ। তবে আমার মনে হয় আসল কারণ অন্য। ভারতের ভাবমূর্তি পশ্চিম দুনিয়াতে দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশ হিসেবে। কিছু ভাববাদী আদর্শবাদী লোক আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ছাড়া ত্রিনিদাদের সাধারণ মানুষ তাতে গর্ববোধ করার কিছু পায় না। এদের যেটুকু ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তা নিয়ে এদের প্রচুর ব্যঙ্গ করা হয়েছে ও হীনমন্যতা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্ম, সাজপোশাক, খাবার-দাবার সবই ব্যঙ্গের বস্তু ছিল। এখনও চলে সে সব নিয়ে রসিকতা। তাই হয়ত ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করার খুব একটা কিছু পায় না এরা।

বাজারে সব্জী বিক্রি করছে ছুটির দিনে এক তরুণী। অন্যান্য দিনে সে টাইপিস্ট হিসেবে কাজ করে

উত্তর-আমেরিকার দ্বিতীয় প্রজন্মের কিছু ভারতীয় ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও এ লক্ষণ দেখেছি আমি।

ত্রিনিদাদের মোট জনসংখ্যা ১২ লক্ষের মধ্যে ৪০.৭ শতাংশ হল ভারতীয়। কৃষ্ণাঙ্গদের সংখ্যা ভারতীয়দের সমানই (৪০.৮ শতাংশ)। এছাড়া শ্বেতাঙ্গ, চাইনীজ, সিরিয়ান ও কিছু সঙ্কর জাতি নিয়ে বাকি লোকেরা। উত্তরে ও দক্ষিণে কৃষ্ণাঙ্গদের ভিড়। বেশী আর মধ্য ত্রিনিদাদে আখের খেতের রাজ্যে ভারতীয়দের ভিড়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে ভারতীয় ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে যে গোপন বিরূপতা আছে সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। এক-এক সময়ে এই বিরূপতা বাইরেও প্রকাশ পেয়েছে। তবু বলব সারা ত্রিনিদাদে বর্ণ-বিদ্বেষের বীভৎস রূপ দেখা যায় না। ইংল্যান্ডে বা আমেরিকায় বর্ণ-বিদ্বেষের যে হিংস্র রূপ প্রায়শই ফুটে বেরোয় সেই রূপ এখানে অনুপস্থিত। মোটামুটি শান্তিপ্রিয় সহাবস্থান এখানে। তবে অভিযোগ যে নেই তা নয়। ভারতীয়দের অভিযোগ স্বাধীনতার পর শ্বেতাঙ্গদের হাত থেকে দেশের অনুশাসন পুরো চলে যায় কৃষ্ণাঙ্গদের হাতে। তাই দেশ স্বাধীন হলেও ভারতীয়দের অবস্থা খুব একটা বদলায়নি। রাজনৈতিক ব্যাপারে বা দেশের সরকারী চাকুরিতে ভারতীয়দের ঢোকা অত্যন্ত কঠিন। প্রতীক হিসেবে এদিক ওদিক কিছু ভারতীয় রেখে দেওয়া হয়েছে মাত্র।

ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখলে কারণ বোঝা যায়। ত্রিনিদাদে ভারতীয়দের পা পড়ার সময় থেকেই ভারতীয়রা ছিল গ্রামবাসী অর্থাৎ আখের খেতের শ্রমিক। আর কৃষ্ণাঙ্গরা ছিল শহরবাসী। গ্রামের দিকে শিক্ষা ব্যবস্থার মান ছিল অত্যন্ত নীচু। কৃষ্ণাঙ্গরা শহরে অনেক উন্নত শিক্ষার সুযোগ সুবিধে পায়। শহরে থাকার দরুন তারা যে ভাবে রাজনৈতিক জগতে প্রবেশের সুবিধে পায় গ্রামবাসী ভারতীয়রা সে সুযোগে বঞ্চিত হয়। এছাড়া ধর্মের দিক থেকেও কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের শাসক সম্প্রদায়ের ধর্ম অনুসরণ করে অ্যাংলিকান বা ব্যাপটিস্ট। ভারতীয়রা সেখানে মুসলিম বা "প্যাগান" হিন্দু। সবচেয়ে বড় কথা এদেশে আগে এসেছে বলে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকারবোধ ছিল অনেক বেশী। তারাও অনেকে শ্বেতাঙ্গদের অনুসরণে ভারতীয়দের আখের খেতের "কুলি" ছাড়া কিছু ভাবতো না। তাই ব্রিটিশ সরকার যখন তার উপনিবেশ ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গরা স্বাভাবিক ভাবেই তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হয়।

ত্রিনিদাদের গ্রামবাসী ভারতীয়দের শিক্ষার মানের উন্নতি হয় প্রধানত কিছু কানাডিয়ান প্রেসবেটিরিয়ান (Presbyterian) মিশনারিদের উদ্যোগে। এদের উদ্দেশ্য ছিল ত্রিনিদাদের গ্রামের শিক্ষার মান উন্নত করা ও শিক্ষার সুযোগ গ্রামের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া। এই মিশনারিদের প্রভাবেই কিছু হিন্দু ও মুসলমান ভারতীয় খ্রীষ্ট ধর্মে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ধর্মান্তরিত না হলেও ত্রিনিদাদের ভারতীয় সম্প্রদায় শিক্ষার সুযোগের ব্যাপারে এখনও এই কানাডিয়ান মিশনারি সম্প্রদায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। উচ্চ শিক্ষার সুযোগের দরজা খুলে যাওয়া মাত্র ভারতীয়দের মধ্যে নতুন জীবনের হাওয়া বইতে শুরু করল। রাজনৈতিক জগতে বা সরকারি চাকরিতে বিশেষ সুবিধে করতে না পারলেও ভারতীয়রা ক্রমেই চিকিৎসক, শিক্ষক, উকিল, ইত্যাদি হয়ে বেরোতে আরম্ভ করল। অবশ্যই তার সঙ্গে চলল রাজনৈতিক জগতে ঢোকার সংগ্রাম।

১৯৫৬ সালে ত্রিনিদাদ তখনও ব্রিটিশ কলোনি তবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এরিক উইলিয়ামস-এর নেতৃত্বে যে জাতীয় রাজনৈতিক পার্টি তৈরি হয় তার নাম পিপ্‌লস্ ন্যাশনাল মুভমেন্ট বা পি এন এম। ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানেই গণতন্ত্রের পত্তন হয় এবং নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে পি এন এম ২৪টি আসনের মধ্যে ১৩টি আসন লাভ করে সরকার গঠন করে। এরিক উইলিয়ামস হন মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৬২ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর অবধি এই পি এন এম পার্টি একনাগাড়ে দেশ চালিয়ে যায় ও এরিক উইলিয়ামস তাঁর মৃত্যু অবধি অর্থাৎ ১৯৮১ সাল অবধি ছিলেন এই পি এন এম পার্টির অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ও দেশের প্রধানমন্ত্রী।

এই উৎসবের আনন্দে মেতে থাকার পিছনের প্রধান কারণ অবশ্যই ছোট্ট দ্বীপের একঘেঁয়ে জীবন। একঘেঁয়েমির হাত থেকে বাঁচার এইরকমই কিছু উপায় বেছে নিয়েছে এখানকার বাসিন্দারা। যেমন বয়স্কদের মধ্যে দেখা যায় ধর্মচর্চার আতিশয্য ও অল্পবয়সীদের মধ্যে ফ্রি-সেক্সের আধিক্য।

ত্রিনিদাদের অধিকাংশ ভারতীয়ই এই পি এন এম পার্টিকে কোনদিনই নিজেদের পার্টি বলে মনে করেনি। আরম্ভে এই পার্টির সমর্থক ছিল প্রধানত শহরবাসী কৃষ্ণাঙ্গরা ও দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। পরে কিছু ভারতীয় এই পার্টিতে ঢোকে ও মন্ত্রী ইত্যাদির পদ পর্যন্ত পৌঁছোয়। কিন্তু আখের খেতের শ্রমিক ভারতীয়রা কোনোদিনই এদের ঠিক নিজেদের প্রতিনিধি বলে মেনে নিতে পারেনি। তাদের নেতা হলেন বাসদেও পাণ্ডে—ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির নেতা। বেশীর ভাগ ভারতীয়ই ছিল এই পার্টির সমর্থক। এ পার্টি সংসদে বিরোধী দল গঠনেই শুধু সক্ষম ছিল কারণ পি এন এম ছিল ত্রিনিদাদের অবিজেয় পার্টি। কিন্তু সে ইতিহাস পালটে গেল ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। সে কথায় পরে আসছি।

সত্তর দশকে পেট্রোলিয়ামের দৌলতে ত্রিনিদাদের অর্থনৈতিক অবস্থা চড়ে তুঙ্গে। টাকা নিয়ে কিছু ছিনিমিনি খেলা হলেও প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচুর উন্নতি হয় এ সময়ে। তেলের টাকার কল্যাণে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মানের প্রচুর উন্নতি ঘটে—যা প্রথম বিশ্বের সঙ্গে তুলনীয়। আমেরিকান স্টাইলের জীবনযাত্রার অনুকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ত্রিনিদাদ। হাইওয়েতে গাড়ির প্রাচুর্য দেখা যায়। সুপারমার্কেট, ডিপার্টমেন্ট স্টোরস্ আর ফাস্ট-ফুড আউটলেটে দেশটা ভরে যায়। তবে উন্নতি ঐটুকুতে এসেই থেমে যায়। কোনো উন্নতি দেখা যায় না চিকিৎসা ব্যবস্থার বা হাসপাতালের অবস্থার, কিংবা ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা বা পাবলিক লাইব্রেরি ইত্যাদির সুযোগের। এসব ব্যাপারে আমেরিকা বা কানাডাতে যে সুযোগ-সুবিধা দেখেছি ত্রিনিদাদবাসীর কাছে সেসব কল্পনার বাইরে। অথচ সরকারের যে টাকা ছিল না তাই নয়। এরই মধ্যে প্রায়ই খবর বেরোতে শুরু করে কোনো মন্ত্রী বা সরকার সচিব লক্ষ লক্ষ ডলার পকেটস্থ করে দেশের বাইরে আমেরিকা বা কানাডাতে পাড়ি দিয়েছে। বিদেশী মুদ্রা পরিবর্তনের উপর কড়াকড়ি নিয়ম না থাকাতে দেশের বাইরে টাকা পাচারে আরও সুবিধে হয়। ১৯৮১ সালে এরিক উইলিয়ামসের মৃত্যুর পর টাকা নিয়ে ছিনিমিনি আরো বেড়ে যায়। এই সময় তেলের দাম পড়তে শুরু করার দরুন ত্রিনিদাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও অবনতির দিকে এগোতে থাকে। জনগণের ক্ষোভ বেড়েই চলে। এই ক্ষোভের উত্তর পাওয়া যায় ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে। এই নির্বাচন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছিল।

পি এন এম-এর জনপ্রিয়তা এই সময়ে কমতির দিকে হলেও একা কোনো বিরোধী পার্টির সাধ্য ছিল না পি এন এমকে হারিয়ে সরকার গঠন করে। চমৎকার এক স্ট্র্যাটেজি নিল চার বিরোধী পার্টি। কোয়ালিশন নয়, মিলিত হয়ে তৈরি করল নতুন এক পার্টি। নাম দিল ন্যাশনাল অ্যালাইড রিকন্‌স্ট্রাকসন (National Allied Reconstruction) বা এন এ আর। নেতা হলেন অন্যতম বিরোধী পার্টি অরগ্যানাইজেশন ফর ন্যাশনাল রিকন্‌স্ট্রাকশন-এর নেতা রবিনসন আর উপনেতা হলেন ডেমক্র্যাটিক লেবার পার্টির নেতা, ভারতীয়দের মধ্যে অসীম জনপ্রিয়, বাসদেও পাণ্ডে। এ নির্বাচনে এন এ আর শুধু যে জয়ী হল তা নয়, ৩৬টি আসনের মধ্যে ৩৩টি পেল তারা। তিনটি পেল পি এন এম। ১৯৮১ সালে পি এন এম-এর দখলে ছিল ৩৩টি আসনের মধ্যে ২৬টি আসন। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনের ফল দেখে সারা দেশ ফেটে পড়ে আনন্দে। আর ভারতীয়রা? তাদের আনন্দের যেন কোনো সীমাই ছিল না। এই প্রথম দেখল তারা তাদের পছন্দের নেতাদের মন্ত্রীসভা গড়তে। তারা হাজারে হাজারে গাড়ি নিয়ে শোভাযাত্রা করে ঘুরে বেড়াল সারা দ্বীপ। তাদের গাড়ি সব আখের কঞ্চি দিয়ে সাজানো। নির্বাচন জয়ের আনন্দের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আমি ভারত ছাড়া আর কোথাও এমন দেখিনি। পশ্চিমের বেশীর ভাগ দেশ এভাবে তাদের আনন্দ বা আবেগ প্রকাশে

জকম। মন্ত্রীসভা গঠন করে প্রধানমন্ত্রী রবিনসন, বাসদেও পাণ্ডেকে দিলেন বিদেশমন্ত্রী বা Minister of External Affairs-এর পদ। পি এন এম তিনজন সদস্য নিয়ে গড়ল তাদের বিরোধী দল। ত্রিনিদাদ কেন—বহুদেশের ইতিহাসে এমনটি ঘটেনি।

ত্রিনিদাদের এই নির্বাচন-ফল আরও একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। এ পর্যন্ত ত্রিনিদাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি জাতি বা বর্ণে বিভক্ত ছিল। পি এন এম-এর সমর্থক ছিল প্রধানত কৃষ্ণাঙ্গরা আর ডেমক্র্যাটিক লেবার পার্টিকে চিরকাল ভারতীয়দের রাজনৈতিক পার্টি বলেই ভাবা হত। এন এ আর-এর সৃষ্টিতে এসব বাধা দূর হয়ে গেল। এই প্রথম পার্টি—যাকে ত্রিনিদাদের সত্যিকারের জাতীয় পার্টি বলা চলে। কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ, ভারতীয়—সব জাতির প্রতিনিধি রয়েছে এই রাজনৈতিক দলটিতে ও নতুন মন্ত্রীসভাতে।

ত্রিনিদাদের নির্বাচন-জয়ের আনন্দ দেখে পুলকিত না হয়ে উপায় ছিল না। তবে ত্রিনিদাদের সমাজও সর্বদাই উৎসবের আনন্দে মেতে আছে। এখানকার আকাশে বাতাসে লেগে থাকে উৎসবের হাওয়া। যে কোনো উৎসবকে অজুহাত করে হৈ চৈতে মেতে উঠতে দ্বীপের লোকদের জুড়ি নেই। তা সে দেওয়ালীই হোক বা কার্ণিভালই হোক। ত্রিনিদাদের কার্ণিভালের মত বর্ণাঢ্য উৎসব খুব কমই আছে পৃথিবীতে। বর্ণ বা ধর্ম নির্বিশেষে এখানকার প্রত্যেকটি মানুষ মেতে ওঠে এ উৎসবে। ১৭৮৪ সনে ফরাসীরা ত্রিনিদাদে শুরু করে এ উৎসব। আরম্ভে ক্রিশমাস থেকে অ্যাশ ওয়েড়নেসডে (Ash Wednesday) অবধি ঘরে ঘরে পার্টি, নাচ, গান ইত্যাদির মাধ্যমে চলত এই উৎসব। ১৮৩৪ সনে ত্রিনিদাদের কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসেরা এই উৎসবকে টেনে আনে ঘরের বাইরে। রাস্তায়, হাটে, মাঠে, ঘাটে শুরু হয়ে যায় নাচ গান। বর্তমান ত্রিনিদাদে অ্যাশ ওয়েড়নেসডের ঠিক আগের সোম ও মঙ্গলবারে হয় এই উৎসব। তবে এর প্রস্তুতি চলে সারা বছর ধরে। এতদিন পর্যন্ত ত্রিনিদাদের ভারতীয় সমাজ দূরে দূরেই থাকত এ উৎসব থেকে। উৎসবের কিছু অঙ্গ ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। তবে আজকাল ভারতীয়দের উৎসাহেরও কিছু কমতি দেখা যায় না। এছাড়া ভারতীয়দের নিজস্ব উৎসব পালন ত আছেই। দেওয়ালী চমৎকারভাবে পালন করা হয় এখানে। আখের খেতের রাজ্য কারেনি কাউন্টি আলোয় আলোয় ভরে যায় এই সময়ে। সরু বাঁশের কঞ্চি বেঁকিয়ে নানা গড়নের ফুল, পিরামিড ও আরো বিভিন্ন আকারের আলো দেবার মঞ্চ প্রস্তুত করে এরা। আর তার ওপর সাজিয়ে দেয় ছোট ছোট মাটির প্রদীপ। দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আমেরিকান প্রতিবেশী হয়েও মাটির প্রদীপকে ছাড়েনি এরা। বাগান, রাস্তা, বাড়ি ভরে যায় এই বাঁশের মঞ্চে সাজানো প্রদীপের আলোতে। এছাড়া আরো নানারকম উৎসবে মেতে থাকতে ভালোবাসে ত্রিনিদাদবাসীরা।

ত্রিনিদাদের সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ি

হাইওয়ের পাশে ফলের দোকান

এই উৎসবের আনন্দে মেতে থাকার পিছনের প্রধান কারণ অবশ্যই ছোট্ট দ্বীপের একঘেঁয়ে জীবন। একঘেঁয়েমির হাত থেকে বাঁচার এইরকমই কিছু উপায় বেছে নিয়েছে এখানকার বাসিন্দারা। যেমন বয়স্কদের মধ্যে দেখা যায় ধর্মচর্চার আতিশয্য ও অল্পবয়সীদের মধ্যে ফ্রি-সেক্সের আধিক্য। নিজেকে ভুলিয়ে রাখার সহজ উপায়। আর এর সঙ্গে অবশ্যই আছে ড্রাগের সমস্যা। বহুদিন পর্যন্ত এখানকার ভারতীয় সমাজের পারিবারিক গঠন, সামাজিকতা বা মানসিকতা ভারতবর্ষের ঐতিহ্য অনুযায়ী ছিল। কিন্তু তেলের টাকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে আমেরিকান প্রভাব আর তার সঙ্গে ভাঙতে শুরু করেছে পারিবারিক গঠনের বুনিয়াদ। অথচ সামনে নেই কোনো বড় আদর্শবাদ। আর এখানে ছোট সমস্যা প্রায়ই বড় আকার ধারণ করে। ছোট দ্বীপে জীবনের প্রসারতার সুযোগ কম, তাই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতাও সীমাবদ্ধ থেকে যায়। এই জন্যই নইপলকে ছাড়তে হয়েছিল ত্রিনিদাদ। অভিমান করে ত্রিনিদাদও ত্যাগ করেছে তাঁকে।

তবে বহু সমস্যা সত্ত্বেও কোনো সন্দেহ নেই ভারতীয় সম্প্রদায় ত্রিনিদাদে এক স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত সমাজ গড়তে সমর্থ হয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থা ছাড়াও প্রতিবেশী বহু দ্বীপ থেকে ত্রিনিদাদের রাজনৈতিক জীবন শান্তিপূর্ণ। অধিবাসীদের মধ্যেও গণতন্ত্রপ্রীতি পুরো বিদ্যমান। তাই ত্রিনিদাদের ভারতীয় সমাজ সুখেই আছে।

এর কৃতিত্ব সমস্ত ত্রিনিদাদবাসীরই প্রাপ্য। ■

বিজ্ঞান-প্রতিভার সন্ধানে

সোমক রায়চৌধুরী

"শ্রদ্ধাস্পদাসু, আপনি শুনে খুশী হবেন যে আমি এ বছরের (১৯৮৭-৮৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ তরুণ বিজ্ঞানী হিসেবে রাষ্ট্রপতির পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছি। এই পুরস্কার দেওয়া হয় 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে অধ্যাপনা এবং গবেষণায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে।' জুন মাসে হোয়াইট হাউসে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট রেগন আমায় এই সম্মানে ভূষিত করবেন। আমি স্বীকার করি যে আমার এই কৃতিত্বের মূলে রয়েছে আমার আই আই টি খড়্গপুরে পড়াশোনা, এবং অবশ্যই আমার জগদীশ বসু ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ স্কলারশিপ অর্জন"— **পৃথ্বীরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়**। অ্যাসিসটান্ট প্রফেসর, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়।

কল্যাণ বিধান সিনহা। নতুন দিল্লীর ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক। রচেস্টারে ডক্টরেট, আই আই টি মাদ্রাজ ও জিনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। ওঁর কোয়ান্টামতত্ত্বে বিচ্চুরণ-এর ওপর লেখা বই অনূদিত হয়েছে একাধিক ভাষায় সারা পৃথিবীতে ওই বিষয়ে নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক।

এস· অনন্তকৃষ্ণণ। প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক, টাটা ইনস্টিটিউটে গবেষণা, ক্যালিফোর্নিয়ায় অধ্যাপনা। ভারতীয় বিজ্ঞানের গৌরব উটির (Outy) রেডিও-টেলিস্কোপ, যা এখন বিশ্বব্যাপী যৌথ ইন্টারফেরোমেট্রির (VLBI)অপরিহার্য অঙ্গ, তার অন্যতম নির্মাতা। এখন পুনের কাছে মিটারওয়েভ টেলিস্কোপ নির্মাণের কাজে অন্যতম বিধায়ক।

অমিতাভ বাগচি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিও-ফিজিক্স্। তারপর ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আই আই টি খড়্গপুরে অধ্যাপনা। বর্তমানে কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট-এর অধ্যাপক, কম্পিউটার-তত্ত্ব আর আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স-এর ক্ষেত্রে জগৎজোড়া খ্যাতি।

রঞ্জনকুমার ভৌমিক। প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক, মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা। কলকাতার সাইক্লোট্রোনের প্রথম যুগের কর্ণধার। বর্তমানে দিল্লীতে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পারমাণবিক গবেষণার প্রধান।

তিলককৃষ্ণ মৈত্র। দিল্লীর অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকাল সায়েন্সের এম· এস, একদা সফদরজং হাসপাতালে রেজিস্ট্রার। তারপর বিলেতে এফ· আর· সি· এস· পাস করে লন্ডনের বিখ্যাত হাসপাতালে ডাক্তারি করার পর এখন কলকাতার অন্যতম প্রসিদ্ধ ইউরোলজিস্ট।

সুজিতকুমার বিশ্বাস। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, বাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস-এ গবেষণা। ১৯৮৭ সালে ইনি ভারতের সর্বপ্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কংগ্রেসে শ্রেষ্ঠ গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন।

কলকাতার জগদীশ বসু ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ স্কলারশিপের ছাব্বিশ বছরের সাফল্যের তালিকা এখানেই শেষ নয়। এঁরা এই বৃত্তির প্রথম যুগের প্রাপক—প্রায় সবাই বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী, অনেকে খ্যাতির শিখরে। এবং সর্বোপরি উল্লেখ্য, যে-যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতির দৌড় পাশ্চাত্য ধনী দেশগুলিরই একচেটিয়া আধিপত্য, যে-যুগে স্কুলের চৌকাঠ পেরিয়েই শহরের ছেলেমেয়েরা আমেরিকায় চাকরি স্বপ্ন দেখে, সে-যুগে এঁদের অধিকাংশেরই শ্রেষ্ঠ গবেষণার ক্ষেত্র এবং বর্তমান অবস্থান ভারতবর্ষে।

এঁদের একজন বর্তমান বৃত্তিপ্রাপককের কথাই ধরা যাক।

আঠার বছর বয়স বড় সাংঘাতিক বয়স। এই

মেধাবী গবেষকদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নুরুল হাসান

বয়সে হয়তো প্রত্যেক বাঙালী ছেলের নীললোহিত হতে ইচ্ছে হয়। তবু অনেকের ক্ষেত্রে এ-বয়স পাড়ার লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে কবিতা লেখা ছেড়ে চোখ তুলে নিজের ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর বয়স। এ-সময়ে চারপাশের জীবনটা বড়ো বেশি বাস্তব ঠেকে, সবার মধ্যে একটা অদৃশ্য প্রতিযোগিতার টেনশন, বইয়ের তাকের কোণে ধুলোপড়া স্পোর্টসের থার্ড-প্রাইজ স্কুল-জীবনের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার কথা মনে করিয়ে দেয় শুধু। হঠাৎ মুছে যায় চোখের মায়া-অঞ্জন। আঠারো বছর বয়স বড় অনিশ্চয়তার বয়স ; নিজেকে মনে হয় একতাল মাটি, আর চতুর্দিক থেকে ছুঁড়ে দেওয়া উৎসাহ, উপদেশ, অনীহা, আতঙ্কের ভারে বড় বিভ্রান্ত লাগে।

কী করা উচিত ? আর সকলে যা করছে তাই। আর সকলে কী করছে ?

প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞান পড়তে আসে যারা, তাদের প্রায় সকলেরই প্রথম বছরের শেষে অবসর সময় কাটে পার্ক স্ট্রীট কবরখানার পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে ওদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের রঙিন ক্রোড়পত্র উলটিয়ে। তাদের শতকরা পঞ্চাশ থেকে আশিভাগ তিন কিংবা পাঁচ বছরের শেষে সাগরপাড়ি দেয়—অনেক সময় সে দেশের গহন কোণে অনামা কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বৃত্তি পেয়ে। তাদের অনেকেই পড়াশোনার শেষে হারিয়ে যায়। মিল্‌ওয়াকি বা মায়ামিতে লক্ষ প্রবাসীর ভিড়ে। সচ্ছল জীবনযাত্রা, দুটো গাড়ি, সন্ধ্যায় টি ভিতে ডালাস বা ডিনাস্টি, সপ্তাহান্তে শহরের অন্য ভারতীয়দের বাড়িতে কাঁচালঙ্কা দিয়ে ইলিশ মাছের আস্বাদ, মুখার্জি কোত্থেকে একটা উত্তম-সুচিত্রার ভিডিও জোগাড় করেছে, রবীন্দ্রজয়ন্তী বা হোলিতে তন্দুরি চিকেন অথবা ডিস্কো, মিঃ মিত্রর কাছ থেকে গত মাসের 'দেশ'টা ধার নিতে হবে। ছেলেমেয়েকে বাঙলা আর শেখানো গেল না দাদা, তবু কী ভালো ইংরিজি বলে দেখুন, দেশে থাকলে পারতো ?

অথচ দেশের এই অগ্রগতির যুগে এঁদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন,এঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অবদানের অবকাশ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। উর্বর ক্ষেত্রে বীজ ছড়াবার লোকের অভাব, কারণ সবাই সমুদ্রে জল ঢালতে গেছে। তবু নাড়ীর সম্পর্ক ছেড়ে দূর দেশে দ্রুতগতি জীবনের ভিড়ে একটা বিন্দু হয়ে হারিয়ে যেতে যেতে 'জীবতারা যদি খসে এ দেহ আকাশ হতে, নাহি খেদ' তাতে।

যার কথা বলছিলাম, সে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিরাট সিঁড়িটার পাদদেশে দাঁড়িয়ে শিহরিত হত ; সেইসব জ্যোতির্ময় পুরুষদের মনশ্চক্ষে দেখতো ওই সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করতে। একদিনও সে ওই সিঁড়িতে বসে আড্ডা দিতে পারেনি, যদিও কারণটা বললে হিস্ট্রির মেয়েরা হাসত। সে কলেজ ফেস্টিভ্যালে নাটক করে, দেয়ালপত্রিকায় প্রেমের কবিতা লেখে, ছাত্র-রাজনীতির ধোঁয়ায় তার সামনে প্রমোদের ফোটানো চা ঠাণ্ডা হয়, অথচ সে বিজ্ঞানের ছাত্র। মা চেয়েছিল ডাক্তার হোক, বাবার ইচ্ছে তিন

দেশের অগ্রগতির যুগে এঁদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন, এঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অবদানের অবকাশ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। উর্বর ক্ষেত্রে বীজ ছড়াবার লোকের অভাব, কারণ সবাই সমুদ্রে জল ঢালতে গেছে। তবু নাড়ীর সম্পর্ক ছেড়ে দূর দেশে 'জীবতারা যদি খসে এ দেহ আকাশ হতে, নাহি খেদ' তাতে।

পুরুষের আইনব্যবসায় নামুক, সব বন্ধুই গেল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, প্রাক্-তিরিশ মেদ, পাঁচসংখ্যার মাইনে আর কোষ্ঠী মেলানো ফরসা বউয়ের লোভে। সে ভেবেছিল পদার্থবিদ্যায় গবেষণা করবে, আজকাল ব্ল্যাকবোর্ডে যখন নিরুৎসাহ গলায় সার্ফেস টেনশন পড়ানো হয়, তখন সে জানলা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মিছিলে মুখ খোঁজে।

গবেষণা কাকে বলে ? কারা করে গবেষণা ? স্কুলে আচার্য জগদীশচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ বা মেঘনাদ সাহার জীবন নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছে সে। কলেজের গবেষণাগারে বীকারে রঙবেরঙের জল নিয়ে খেলা করতে করতে কানে আসে অধ্যাপকদের ইনক্রিমেন্ট-মহার্ঘভাতা-বোনাস নিয়ে আলোচনা—তাঁদের একজনকে ক্লাস না নিয়ে কলেজের দেয়ালে স্লোগান লিখতে দেখেছে সে। কে জি মজুমদারের বই দেখে প্র্যাকটিক্যাল খাতা তৈরি করে সে—আজ সারাদিন ধরে গত শতাব্দীর কোনও ইংরেজের করা একটা এক্সপেরিমেন্ট খুব সতর্কভাবে নিজের হাতে করেছে সে, বই দেখে। পিসতুতো দাদা আট মাস হল পার্ট টু পরীক্ষা দিয়েছে, কেমিস্ট্রিতে, সেও গবেষণা করবে বলেছিল, রেজাল্ট না বেরোলে এম এস-সি শুরু হবে না ; এখন সকাল বিকেল টিউশনি করে আর দুপুরের শোয়ে মালায়লম সিনেমায় লাইন দেয়। মাসতুতো দাদা সাগরপারে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে ; আজ মা বলল, মাসি বলছিল ভলভোটা বেচে ও একটা জাগুয়ার কিনবে ভাবছে ; অনেকদিন ধনেপাতা দিয়ে ঝাল খায়নি বলে লিখেছে, বেচারা !

আঠার বছর বয়স মরীচিকা ধরতে চাইবার বয়স।

বইপত্তরের খরচ জোগাতে টিউশনি খুঁজছিল সে—আর সবার মতো একটা স্কলারশিপের পরীক্ষায় বসে গেল তাই। বাপ্‌রে সে কী পরীক্ষা, দুদিন ধরে হাজার প্যাঁচের অঙ্ক কষা। তারপর দু মাসের বিরতি। পরবর্তী পর্যায়ে ডাক পেল তিরিশজন—দশজন বৃত্তি পাবে। একদিন সাইকোলজি টেস্ট—নানা রকমের ধাঁধা, বেশ মজার ব্যাপার। তারপর একটা ইন্টারভিউ—যেমন হয়, তবু টেবিলের চারপাশ ঘিরে দশজন বাঘা বিজ্ঞানী, হাত-ঘেমে যাওয়া ব্যাপার। শেষ পরীক্ষা বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতার পরীক্ষা—সকালবেলায় একটা কাগজ ধরিয়ে দেওয়া হল—তাতে নানা বিষয়ে দশখানা বৈজ্ঞানিক সমস্যা। তার যে-কোনও একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে তাকে—সময় রয়েছে সারা দিন ; অঢেল বই চারপাশে, বই থেকে দরকারী

বাঙালোরে ই সি জি সুদর্শনের সঙ্গে তরুণ তাত্ত্বিক গবেষকবৃন্দ

তথ্য নেওয়া চলবে। প্রত্যেকটা সমস্যাই গবেষণার ক্ষেত্র থেকে নেওয়া, মুক্তচিন্তার অবকাশ রয়েছে অনেক। আর রয়েছেন প্রতি বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা। একই হলে সারাদিন থাকবেন তাঁরা, থেকে থেকে ওই তিরিশজন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে তাঁরা কথা বলবেন, আলোচনা করবেন তাদের চিন্তা কোন্ দিকে এগোচ্ছে যাচাই করার জন্য, দরকার হলে উপদেশ দেবেন। এরকম পরীক্ষার কথা জন্মেও শোনেনি সে; 'গবেষণা' ব্যাপারটা যে কী তার প্রথম আভাস পেল সে সেদিন। প্রথম রক্তের আস্বাদ।

তাছাড়া প্রত্যেকে ইচ্ছে করলে নিজের তৈরি কোনও নতুন ধরনের কার্যকরী যন্ত্র বা মৌলিক বৈজ্ঞানিক পত্র জমা দিতে পারে—তার জন্যও পুরস্কার আছে, আর আছে বার্ষিক প্রদর্শনী, পুরস্কারপ্রাপ্ত মডেলগুলোকে নিয়ে।

জগদীশ বসু বিজ্ঞান-বৃত্তি পাওয়া মানে যদি নিছক মাস গেলে কটা টাকা পাওয়ার মামলা হত, তাহলে হয়তো গল্পটার এখানেই শেষ হত—আর টাকাটার গতি হত বইমেলার ধুলোয়, বৈরাগীর পানের দোকানে কিংবা পার্টির তহবিলে। কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করে তারপর থেকেই।

বৃত্তির মেয়াদ পাঁচ বছর। ডিসেম্বর মাসে প্রতি বছর বর্তমান বৃত্তিপ্রাপকদের ভারতের নানা প্রান্তে নানা গবেষণাগারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকেন্দ্রে বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গবেষণা বিভাগে নিয়ে গিয়ে দেশের প্রথম সারির বিজ্ঞানী আর তাঁদের কাজের সঙ্গে পরিচিত করানো এ-প্রকল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং কার্যকরী পর্যায়। এর ফল সাধারণত হয় সুদূরপ্রসারী—গবেষণার জগতে মৌলিক কাজের অবকাশ রয়েছে কী কী বিষয়ে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় যতোটা উদ্দীপনা আর উৎসাহের সঞ্চার করতে পারে, আর কিছুতে তা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সরাসরি মোলাকাত জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে অনেক সুযোগ নিয়ে আসে।

যার কথা হচ্ছিল তার প্রথম ভ্রমণ ছিল দক্ষিণ ভারতের বেশ কিছু গবেষণা-প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। এক সঙ্গে কুড়িজনের দলে হৈচৈ করে বেড়ানোর মজা তো আছেই; এই তার প্রথম দক্ষিণ-দর্শন, মহাবলীপুরম আর মেরিনার তীরে তার প্রথম সমুদ্র দেখা, মহীশূর রাজবাড়ি বা চামুণ্ডী পাহাড়ের আকর্ষণের পাশাপাশি কল্পাক্কমের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বা উটকামণ্ডের রেডিয়ো-টেলিস্কোপ দেখতে যাওয়ার রোমাঞ্চও কোনও অংশে কম নয়। বাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস-এ বিস্ফারিত নেত্রে ঘুরেছে সে, একএক জায়গায় একএকটা দরজা খুলে গেছে তার চোখের সামনে, দিগন্তের পারে চোখ তুলে নতুন জগৎ সব। রমন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের দোতলার সংগ্রহশালায় তার সামনে উন্মোচিত হয়েছে পঞ্চাশ বছর আগেকার কলকাতারই এক সফল গবেষণাগার। সেখানে একদিন বিকেলে দুজন বিজ্ঞানীর মুখে সে শুনেছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা, নিউট্রন তারাদের কথা, সৃষ্টিকর্মকাণ্ডের গোড়ায় কী ছিল তা খুঁজতে চাইবার কথা, মহাবিশ্বের প্রান্ত থেকে ছুটে আসা

জগদীশচন্দ্র বসু-ট্যালেন্ট-সার্চ-এর অনুষ্ঠানে ই সি জি সুদর্শন

আলোকসংবাদ বুঝতে শেখার কথা।

তারপর থেকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। প্রেসিডেন্সি কলেজে দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের কাছে প্রাথমিক বিজ্ঞানের পাঠ তার, পরীক্ষার শেষে সে ফিরে গেছে বাঙ্গালোরে, সেখান থেকে অক্সফোর্ডে, কেমব্রিজে জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণায়, এক সাধনার প্রারম্ভে নতুন বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে কয়েক বছরের প্রবাস। বিদেশে প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা কম নয়—সচ্ছলতার হাতছানি। তবু সে জানে—দেশে তার স্থান আছে, সে নিজের চোখে দেখে এসেছে। সে জানে সে ফিরবে।

কী প্রয়োজন এ-দেশে বিজ্ঞানচর্চার, যেখানে অধিকাংশ পরিবারের কাছে দু'বেলা খেতে পাওয়া স্বপ্নসমান? যে-দেশে অর্ধেকের বেশি ছেলেমেয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায় না, সে-দেশে কলেজ-ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞান-প্রতিভা খুঁজে তাদের বিশেষভাবে লালনপালনের দরকার কী? যে-দেশের অধিকাংশ মানুষ চন্দ্রগ্রহণকে এখনও অশুভ মনে করে, সে-দেশের ছেলেমেয়েরা বিদেশে গিয়ে বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভ করে তাত্ত্বিক গবেষণা করে কার উপকার করছে?

যে-কোনও উন্নয়নশীল দেশে অগ্রগতির প্রধান হাতিয়ার হল দেশের প্রতিভা আর জনবলকে ঠিকমতো কাজে লাগানো। তারজন্য স্কুল বা কলেজজীবনে সম্ভাবনাময় প্রতিভাকে খুঁজে বের করে তাদের ঠিকমত উৎসাহ দেওয়া, আত্মসচেতন করে তোলা, তাদের সঠিক বিকাশের পথ সুগম করে দেওয়া আর ঠিক পথে চালিত করার প্রয়োজন দেশের স্বার্থেই। গত দু হাজার বছরের ইতিহাসেও এর প্রমাণ রয়েছে প্রচুর। প্রাচীন গ্রীসে, এমনকি সুলেমানের অটোমান রাজত্বেও প্রতিভাধর ব্যক্তিদের আবিষ্কার করে বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। আজকের দুনিয়ায় পুঁজিবাদী আমেরিকার প্রতি রাজ্যে যেমন এর প্রচলন, সমাজবাদী সোভিয়েত রাশিয়াও তেমনি মেনে নিয়েছে যে অন্তত বৈজ্ঞানিক প্রতিভা-বিকাশের ক্ষেত্রে সবাইকে এক সুযোগসুবিধা দেবার কথা বলা মূর্খতা—সেখানে দশজোড়া অলিম্পিয়াডের মাধ্যমে সেরা ছাত্রদের বেছে তাদের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে জড়ো করা হয়, যেখানে আসেন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকেরাও। Novosibirsk এর বিজ্ঞান-শহর এমনই এক উদাহরণ

যে-কোন উন্নয়নশীল দেশে অগ্রগতির প্রধান হাতিয়ার হল দেশের প্রতিভা আর জনবলকে ঠিকমতো কাজে লাগানো। তার জন্য স্কুল বা কলেজজীবনে সম্ভাবনাময় প্রতিভাকে খুঁজে বের করে তাদের ঠিকমত উৎসাহ দেওয়া আত্মসচেতন করে তোলা আর ঠিক পথে চালিত করার প্রয়োজন দেশের স্বার্থেই।

বিশেষত ভারতের ক্ষেত্রে এর প্রযোজ্যতা হয়তো আরও বেশি। বিজ্ঞান এগিয়ে চলে সম্মিলিত গবেষণার স্রোতে ঠিকই, তবু ভারতের বিজ্ঞান-ইতিহাসে দেখা যায় যে অগ্রগতি ঘটেছে কয়েকজন একক ব্যক্তিবিশেষের কাঁধে ভর রেখে। তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানীদের সমৃদ্ধির পথ সুগম করার জন্য সারা জীবনের প্রচেষ্টা যাঁর সেই নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম প্রায় কুড়ি বছর আগে মন্তব্য করেছিলেন, "উন্নতিশীল দেশে বিজ্ঞান-গবেষণার উন্নতির জন্য দরকার একক পাহাড়প্রমাণ ব্যক্তিত্বের, যাঁদের ঘিরে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে, যাঁরা 'ট্রাইবাল লীডার' হয়ে থাকবেন দেশের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে..."।

এ শতাব্দীর ভারতে, বিশেষ করে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে, এরকম 'ট্রাইবাল লীডার'রাই প্রতিষ্ঠা করেছেন গবেষণার ক্ষেত্র। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে মহেন্দ্রলাল সরকার কলকাতায় শুরু করেন ক্যালকাটা জার্নাল অফ মেডিসিন, এবং গোড়াপত্তন করেন ভারতের প্রথম আধুনিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স-এর, যাকে ঘিরে এ-শতাব্দীর প্রথমভাগে গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর অন্যতম প্রধান গবেষণাকেন্দ্র। যেসব ব্যক্তিদের ঘিরে গড়ে উঠল প্রতিষ্ঠান তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আচার্য জগদীশচন্দ্র, মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের গবেষণায় আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম ভারতের নাম উজ্জ্বল করলেন। বোস-ইনস্টিটিউট স্থাপিত হল লন্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের ধাঁচে। প্রেসিডেন্সি কলেজেই রসায়ন-গবেষণা গড়ে উঠল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে ঘিরে। পরবর্তী পর্যায়ে কোয়ান্টামতত্ত্বের যুগে মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সি ভি রমনকে ঘিরে কলকাতায়, এলাহাবাদে, ঢাকায় আর বাঙ্গালোরে শুরু হল পদার্থবিদ্যায় গবেষণা। কোয়ান্টামতত্ত্বের প্রবক্তা ডিরাকের ছাত্র ছিলেন হোমি ভাবা। তিনি কেমব্রিজ থেকে ফিরে টাটাদের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালোরে, পরে বোম্বাইয়ে গড়ে তুললেন টাটা ইনস্টিটিউট। হার্ভার্ড থেকে

ফিরলেন ভৈনু বাপ্পু। ভারতের জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত আধুনিক প্রতিষ্ঠান আর টেলিস্কোপ একা তাঁর প্রচেষ্টায় গড়া। যেমন ভাবার হাতে গড়া ট্রম্বের পরমাণু-গবেষণাকেন্দ্র।

ভারতের বিজ্ঞানকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিতে গেলে এরকম 'ট্রাইবাল লীডার' তৈরি করতে হবে অদূর ভবিষ্যতে। তারজন্য আমাদের তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিতে হবে, সুযোগ করে দিতে হবে। শৈশবে বা কৈশোরে প্রতিভার লক্ষণ নানাভাবেই প্রকাশ পায়। মানুষ চিরকালই সঙ্গীত-নৃত্য-শিল্পকলায় বা সাহিত্যে প্রতিভাকে সম্মান দিয়ে এসেছে। তবু, উদাহরণস্বরূপ, খেলাধুলোর ক্ষেত্রে প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের সমাজ এখনও পেছনে পড়ে—তাই আমরা বিশ্বের পাঁচভাগের একভাগ জনসংখ্যা নিয়েও অলিম্পিক থেকে খালি হাতে ফিরি।

আজকের যুগে, চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরমনের ভাষায়—"ভারত কখনই কোনও নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে চলতে সক্ষম হবে না, যতোদিনে না তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব যথার্থভাবে অনুভূত হচ্ছে। ...ভারতের আর্থনীতিক সমস্যাবলীর একমাত্র সমাধান বিজ্ঞান। আরও বিজ্ঞান এবং আরও আরও বিজ্ঞান।"

পঁচিশ বছর আগে সে কথা বুঝেছিলেন এক ক্রান্তদর্শী পুরুষ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তাঁর উৎসাহে আর স্যর জাহাঙ্গীর গান্ধীর উদ্যোগে আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীতে এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম, রাজ্য সরকার আর শিল্পসংগঠনের যুগ্ম প্রকল্প হিসেবে। প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে এ-প্রকল্পের কাজ শুধু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তার চার বছর বাদে যখন জাতীয় পর্যায়ে ভারতসরকার আর ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (NCERT) -এর যুগ্ম প্রচেষ্টায় দেশজোড়া বিজ্ঞান-প্রতিভা-সন্ধান প্রকল্প গড়ে উঠল, তাকে রূপায়িত করতে ডাক পড়ল জগদীশ বসু বিজ্ঞান-মেধা-সন্ধানের প্রথম ডিরেক্টর ডঃ মিত্রর।

বর্তমানে এ সংস্থার মূলমন্ত্র "promotion of excellence"। শিক্ষাতত্ত্বে এ ধরনের প্রতিভা-সন্ধান পরীক্ষার নানা পর্যায় চিহ্নিত করা আছে। প্রথমত নানা ধরনের অ-গতানুগতিক পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভাবনাময় প্রতিভা খুঁজে বের করা। এ ধরনের পরীক্ষা জ্ঞানের বহর পরীক্ষা করবে না, অর্জিত জ্ঞান কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ক্ষমতা যাচাই করবে। জগদীশ বসু বৃত্তির পরীক্ষাপদ্ধতি নির্ধারিত করেন দেশের অগ্রগণ্য বিজ্ঞানীরা, তার সঙ্গে Westinghouseএর মতো বিদেশের সমভাবাপন্ন প্রতিভা-সন্ধান-সংস্থাদের কাছ থেকেও আহরণ করা হয় এসব পরীক্ষার বিষয়বস্তু। তারপর আসে কলেজের শিক্ষার চৌহদ্দির বাইরে নানা সম্ভাবনার সঙ্গে পরিচিত করানোর পর্যায়। ভবিষ্যৎ জীবনের পথ বেছে নিতে তার সহায় হন এ-প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত অগ্রজ বিজ্ঞানীরা, যাঁরা সে সব পথে অনেকদূর এগিয়েছেন। প্রতি বছর নির্বাচন পরীক্ষায় এবং বিজ্ঞান-মেলায় সব দিক মিলিয়ে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব যে দুজন দেখায় তাদের পাঠানো হয় লন্ডনের বিশ্ব-যুব-বিজ্ঞান-সম্মেলনে, দু সপ্তাহের জন্য। সেখানে তারা ঘুরে দেখে নানা গবেষণাকেন্দ্র, আর মিলিত হয় নানা দেশের সমবয়সী সদ্য-আবিষ্কৃত প্রতিভাদের সঙ্গে। অনেকের ক্ষেত্রে এখান থেকেই জীবনের প্লেনটা মাটি ছাড়ে।

তবে এ-ধরনের কোনও প্রকল্পের সবচেয়ে দরকারী অঙ্গ হ'ল সঠিক উপদেশ দান আর পরিচালনা, এক কথায় কাউন্সেলিং। প্রত্যেক বৃত্তিপ্রাপককে আলাদা করে করা, তার ব্যক্তিগত সমস্যা বা বিভ্রান্তির মধ্যে সহায় হওয়া, তাকে সঠিক নির্দেশক বা প্রতিষ্ঠানের সন্ধান দেওয়া এবং কলেজজীবনের অবশ্যম্ভাবী হতাশার মধ্যে উৎসাহের কথা শোনানো—এর গুরুত্বই সবচেয়ে বেশী। আর এ-কাজে এ সংস্থার বর্তমান ডিরেক্টর, বৃত্তিপ্রাপকদের মতে, ফুল মার্কস্ পেতেই পারেন।

অনুষ্ঠানে সঞ্জয় সেন এবং দীপবতী সেন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের ওপর বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে ঢুকেই বাঁ দিকে দেওয়ালে প্রদীপ হাতে এক রমণীর মূর্তি চোখে পড়ে—এককালে এ মূর্তির সঠিক পরিচয় নিয়ে পত্রিকায় কম জল্পনা হয়নি। হয়তো এ প্রতিমূর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বারান্দার অন্য প্রান্তে 'জগদীশ বসু জাতীয় বিজ্ঞান মেধা-সন্ধান'-এর যে ছোট্ট অফিস, তার কর্ণধারের নাম শ্রীমতি দীপবতী সেন, ছাত্রদের সার্বজনীন 'মাসিমা'। গত দশ বছর দেড়খানা ঘরের অফিসে একজন কেরানী, দুজন টাইপিস্ট আর 'চণ্ডীদা'কে নিয়ে তাঁর এই কর্মকাণ্ড চালানো।

কাজের বহর ? প্রতি বছর পরীক্ষা চালানো, তারজন্য প্রশ্নপত্র তৈরি করানো ভারতের নানাপ্রান্তের বিজ্ঞানীদের সাহায্যে, এবং পশ্চিমবঙ্গের নানাপ্রান্তে নানা স্কুলে গিয়ে প্রতি বছর এ প্রকল্প সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের বিশদ জানানো এ-সব তো আছেই। আরও আছে এ-সব বৃত্তির স্পনসরশিপ জোগাড় করা, তারজন্য ঘনঘন দিল্লী ছোটা কিংবা নানা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাছে আর্জি—যে অন্তত সরস্বতী পুজোর চাঁদা তুলেছে সে খানিকটা জানে এ-কাজ কতোটা শক্ত হতে পারে। অন্য সময়ে পঞ্চাশজন ছাত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ, পুরনো বৃত্তিপ্রাপকদের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখা, ডিসেম্বরের ভ্রমণ আয়োজন, আরও কতো কী। এতে অবশ্য সবচেয়ে বেশী সাহায্য পান স্বামী অধ্যাপক সৌরীন সেনের কাছ থেকে। সংস্থার সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, আর বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীসঞ্জয় সেন—এঁদের সাহায্য ছাড়া সাতাশ বছর এ প্রকল্প টিকতো না।

এ প্রতিষ্ঠান যাঁর নামে, সেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের নানা শাখার বিদ্যাকে একত্র সমন্বিত করেছিলেন ; পদার্থবিদ্যার প্রয়োগ করেছিলেন উদ্ভিদবিদ্যা আর প্রাণিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। আধুনিক বিজ্ঞানে নানা শাখার সমন্বয়ে গড়ে উঠছে নতুন গবেষণার ক্ষেত্র, এই আন্তর্বিভাগীয় বিজ্ঞানের প্রথম যুগের অন্যতম প্রধান চরিত্র ছিলেন তিনি। জগদীশ বসু বৃত্তিপ্রাপকদের বার্ষিক সম্মেলন অথবা শীতকালীন গবেষণাকেন্দ্র-ভ্রমণের সময় প্রাণিবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা বা চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতিভাধর তরুণ ছাত্রেরা একসঙ্গে আসার সুযোগ পায়। এ প্রকল্পের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ হল এটা নানা শাখার তরুণ বিজ্ঞানীদের ভাব-আদানপ্রদানের একটা প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে।

১৯৮৫তে জগদীশ বসু বিজ্ঞান প্রতিভা সন্ধানে রজত জয়ন্তী পালনের জন্য সরকার আর সংস্থার পক্ষ থেকে নানা ধরনের অনুষ্ঠান আর বিজ্ঞান-সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। আয়োজিত অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আকস্মিক মৃত্যু এবং তার সঙ্গে জড়িত নানা কারণে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়, এ বছর তা পালিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় যে-কটা সফল প্রতিষ্ঠান আছে তারমধ্যে এটা একটা—আসুন আমরা এর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

প্রেম

"মালতীর একবার কুষ্ঠরোগ হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর বাচ্চার স্বাস্থ্য চমৎকার

জানেন তো, কুষ্ঠরোগ বংশগত নয়"

"মালতী যখন প্রথম আমার কাছে আসে, তখন তাঁর বয়স ছিল ১০ বছর। হাতে দেখা দিয়েছিল তাঁর একটা ফ্যাকাশে মত দাগ, তাতে সাড় ছিল না। শুরুতেই আমার চোখে ধরা পড়লো এটা কুষ্ঠরোগ। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু হলো। চল্‌লো কয়েক বছর। মালতী কিন্তু আগাগোড়াই স্বাভাবিক জীবন যাপন ক'রে এসেছে। বলতেই হবে, মালতী অত্যন্ত ভালো মেয়ে, কখনও সে নির্ধারিত দিনে আমার ক্লিনিকে আসতে অন্যথা করেনি। যথাসময়ে তাঁর হাতের সেই দাগ মিলিয়ে গেল। মালতীকে জানানো হলো, সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

"বন্ধু হিসেবে মালতীর পরিবারের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আমার রয়েই গেল। মিষ্টি, প্রাণবন্ত এক তরুণী হিসেবে মালতীর বড় হয়ে ওঠা, প্রেমে পড়া এবং তারপর বিয়ে করা — এ সব কিছুর মধ্যেই আমি একধরণের গর্ব অনুভব করতাম। মালতীর শ্বশুর বাড়ীর পরিজনদের কাছে তাঁর কুষ্ঠরোগের অতীত ইতিহাসের কথা বলা হয়। বলা হয় তাঁর সম্পূর্ণ সেরে ওঠার কথাও। তাঁদের নিশ্চিন্ত করা হয় যে, মালতীর কাছ থেকে এই রোগ তাঁর স্বামীর হতে পারে না এবং তাঁর সন্তান সন্ততিরও নয়। কারণ কুষ্ঠরোগ বংশগত নয়।

"আজ মালতী তাঁর মেয়েকে নিয়ে এসেছিল আমাকে দেখাতে। ফুটফুটে, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেয়ে। সময়মত চিকিৎসা এবং পরিবারের স্নেহ ভালোবাসা ও সহমর্মিতা পেলে একটি কোরক কিভাবে সৌন্দর্যের শতদল হয়ে উঠতে পারে, এ তারই নজীর।"

কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায় — ভয় পাবেন না, চিকিৎসা করান

- গোড়াতে রোগ ধরা পড়লে এবং নিয়মিত চিকিৎসা করালে কুষ্ঠরোগে অঙ্গ বিকৃতি ঘটে না। চরম অবস্থায় অঙ্গ বিকৃতি ঘটলে সব সময় ভালো নাও হতে পারে।
- অন্যান্য সব সংক্রামক রোগের তুলনায় কুষ্ঠরোগ সব থেকে কম সংক্রামক।
- যে কোনো ব্যক্তিরই কুষ্ঠরোগ হতে পারে। তবে বেশীর ভাগ লোকেরই আছে নিজস্ব প্রতিরোধক ক্ষমতা।
- কুষ্ঠরোগের যেসব নতুন ঘটনা ধরা পড়ছে, তারমধ্যে ৩০% শিশু। তবে হ্যাঁ, কুষ্ঠরোগ বংশগত নয়।

প্রাথমিক লক্ষণসমূহ

- ত্বকে ফ্যাকাশে বা লাল্‌চে দাগ — মসৃণ, চকচকে অথবা শুষ্ক।
- দাগের অংশটুকু সম্পূর্ণ অসাড়।
- লোম উঠে যাওয়া অথবা ঐ অংশতে ঘাম না হওয়া।
- দাগের কাছে বা চারপাশে কাঁটা বেঁধার মত বা পিঁপড়ে হাঁটার মত অনুভূতি।

আপনার সমর্থন মূল্যবান

কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য আপনার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবগণ যে জানেন — এবিষয়ে সুনিশ্চিত হন এবং কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণের জাতীয় কর্মসূচীকে সমর্থন করুন। শুরুতে রোগ নির্ণয় করাতে এবং সরকারী ক্লিনিক ও হাসপাতালে নিয়মিত চিকিৎসা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করুন। স্বাভাবিক জীবনযাপনে কুষ্ঠরোগীদের সাহায্য করুন যাতে সমাজে তাঁরা নিজেদের স্থান খুঁজে নিতে পারে।

Ready/0775/87/BEN

নিরাময়ের প্রকৃত পরশ আসবে আপনার কাছ থেকেই

টাটা স্টীল

আরো বিবরণের জন্য লিখুন :
কুষ্ঠরোগ চেতনা অভিযান ইউনিসেফ তথ্য সেবা কেন্দ্র
৭৩, লোদী এস্টেট, নতুন দিল্লী-১১০০০৩

কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রনের জন্য ভারত সরকারের কর্মসূচীর প্রতি সমর্থনসূচক এক যুক্ত জনসেবা

সমষ্টিগত সমর্থনের অভাবে কুষ্ঠরোগীদের প্রকৃত পরিচয় গোপন থেকে যায়

বায়োপ্‌সি

অমিতাভ ভট্টাচার্য

বায়োপ্‌সি—চার অক্ষরের এই শব্দটার সঙ্গে আমরা সবাই আজকাল পরিচিত। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের অহেতুক আতঙ্ক আর আশঙ্কা। কাউকে বায়োপ্‌সি করার কথা বললেই তার হৃৎকম্প শুরু হয় যায়। 'ডাক্তারবাবু কোন খারাপ সন্দেহ করছেন নাকি, মানে ক্যান্সার ট্যানসার!' কিংবা 'কী দরকার ডাক্তারবাবু খোঁচাখুচি করে। বেশ তো আছি। যে ক'দিন বাঁচি এভাবেই চলুক। খুঁচিয়ে দিলেই তো ক্যানসার!' আবার এমনও শুনি, 'সেকি ডাক্তারবাবু! রিপোর্ট নেগেটিভ, আর আপনি বলছেন ক্যানসার, আবার বায়োপ্‌সি করতে হবে?' অথবা, 'বায়োপ্‌সি না করে অন্য কোনভাবে চিকিৎসা শুরু করা যায় না, দেখুন না ডাক্তারবাবু?' চার অক্ষরের শব্দ নিয়ে এমন শ'চারেক প্রশ্ন সহজেই তোলা যায়। আর এ সবের পিছনে কাজ করে বায়োপ্‌সি সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা। অধিকাংশ মানুষেরই ধারণা বায়োপ্‌সি মানেই তো ক্যানসার আর ক্যানসার মানেই তো মৃত্যু। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

লিভার থেকে অ্যাসপিরেশন বায়োপ্‌সি করা হচ্ছে

বায়োপ্‌সি কথাটা একটা ল্যাটিন শব্দ। ভাঙলে পাওয়া যায় 'বায়োস' যার অর্থ হল, জীবিত কলা আর 'অপসি' মানে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা। আজকে যে পদ্ধতিতে বায়োপ্‌সি করা হয় সেই ধ্যানধারণা কিন্তু একদিনে গড়ে ওঠেনি। ১৮৫৬ সালে ভিরকোস (Virchows) নামে এক চিকিৎসাবিজ্ঞানী প্রথম এ ব্যাপারে আলোকপাত করেন, তিনি টিসুকে সেকশন করে তার সেলুলার প্যাথোলজি নিয়ে কাজ করেন। তখনও স্টেইনিং পদ্ধতি অর্থাৎ দ্রবণের সাহায্যে টিসুকে রঙ করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি।

১৮৬২-তে বেনকি (Bencke), ১৮৭৯-তে এরলিক (Ehrlich), ১৮৯৬-তে হিডেনহেন (Heidenhain) এবং ১৯০৪-এ ইগার্ট (Weigert) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় 'স্টেইনিং' পদ্ধতির অনেক উন্নতি হয়। বর্তমানে হেমাটোক্সিলিন নামক যে 'ডাই'য়ের সাহায্যে টিসু স্টেইন করা হয় তা পাওয়া যায় এক ধরনের গাছের কাঠ থেকে, যার নাম হেমাটোক্সাইলন ক্যাম্পিচিয়ানাম (Haematoxylon Campechianum)।

জন্মকথা থাক, এবার আসি বায়োপ্‌সি ব্যাপারটা কী সেই আলোচনায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগ নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। যেমন, 'এক্সরে', 'রক্ত', 'মল', 'মূত্র' পরীক্ষা, 'স্ক্যান' ইত্যাদি। এসব নানান পরীক্ষা ডাক্তারবাবুদের রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। বায়োপ্‌সিও এরকম এক বিশেষ ধরনের পরীক্ষাপদ্ধতি। কোন জীবদেহের বিশেষ কোন অংশ নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করার নামই হোল বায়োপ্‌সি। অবশ্য যত সহজে ব্যাপারটা বলা গেল অত সহজে কিন্তু করা যায় না।

প্রথমত জীবদেহের যে অংশে কোন সন্দেহজনক ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে সেখান থেকে ক্ষতযুক্ত কলা বা টিসু সংগ্রহ করতে হয়। তারপর সেটাকে 'ফরম্যালিন' নামক এক রাসায়নিক তরলে ডুবিয়ে রাখতে হয়, যাতে ল্যাবোরেটরিতে পাঠাবার আগে তা নষ্ট না হয়ে যায়। এই ফরম্যালিন ক্ষতযুক্ত কলাকে শুধু যে বিকৃত বা নষ্ট হতে বাধা দেয় তাই নয়, তাকে শক্তও করে, যাকে বলে 'হার্ডেনিং'। এরপর ল্যাবরেটরিতে একে ছোট ছোট অংশে কাটা হয়। যে অংশ সবচেয়ে বেশি সন্দেহজনক সেটাকে এরপর প্যারাফিন বা মোমের ব্লক করে রাখা হয়। এই ব্লকগুলোকে আবার বিভিন্ন সূক্ষ্ম অংশে স্লাইস করে কাটা হয়। এই স্লাইসগুলো থেকে মোমের অংশ ঝেড়ে ফেলে তাকে এবার বিভিন্ন রাসায়নিক

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে বায়োপ্‌সি স্লাইড
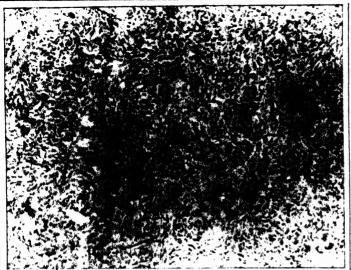
দ্রবণের সাহায্যে স্টেইন করা হয়, যেকথা আগে বলেছি। স্টেইন করা অংশগুলোকে অবশেষে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে দেখা হয় যে ঠিক কি ধরণের কোষ তাতে রয়েছে। আমরা জানি যে, জীবদেহ অসংখ্য কোষ দিয়ে তৈরি। দেহের বিভিন্ন জায়গায় এই কোষের চরিত্র বিভিন্ন রকম। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা হয় যে, কোষে কোন অস্বাভাবিকতা রয়েছে কিনা, থাকলে সেই অস্বাভাবিকতা কোন ধরনের এবং কতটা। এর সাহায্যে প্যাথোলজিস্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে কি ধরনের পরিবর্তন কোষের মধ্যে হয়েছে এবং অসুখটা কি ধরনের।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বায়োপ্‌সির স্থান সবার ওপরে। খালি চোখে বা এক্সরেতে যা ধরা পড়ে না অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই সেই পরিবর্তন, তা যত সামান্যই হোক না কেন তা ধরা পড়ে। অনেক কর্মকাণ্ড করে এই বায়োপ্‌সি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হয়। তাই রিপোর্ট তৈরি হতে চার-পাঁচদিন সময় লেগে যায়। এবার আসি নানা ধরনের বায়োপ্‌সি পদ্ধতির আলোচনায়। প্রথমে বলি, ফাইন নিড্‌ল অ্যাসপিরেশন বায়োপ্‌সির কথা। সংক্ষেপে যাকে বলে FNAB.

এটা একটা বিশেষ ধরনের বায়োপ্‌সি পদ্ধতি। একটা নিড্‌লের সাহায্যে করা হয়। পরিশ্রম, সরঞ্জাম, সময় ও খরচ সবই কম পড়ে। পশ্চিমী দেশগুলোতে ১৯৩০ সাল থেকে এই পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। দেহের বিভিন্ন উন্মুক্ত স্থানের কোন ফোলা বা দলা পাকানো অংশ যেমন কোন ব্রেস্ট লাম্প, থাইরয়েড ন্যডিউল, বিভিন্ন লিম্ফ গ্ল্যান্ড, স্যালিভারি গ্ল্যান্ডের টিউমার এছাড়া দেহের ভিতরে লিভার, কিডনি, প্লীহা ও ডিম্বাশয়ের কোন টিউমারের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতিতে বায়োপ্‌সি করা যেতে পারে। এই পদ্ধতির সুবিধে হল খুব অল্প সময়ে (২-৩ মিনিট) হাসপাতালের আউটডোরে কোন অ্যানাসথেসিয়া ছাড়াই করা যায়। ব্যথা খুব কম লাগে, রক্তপাত হয় না, কাটাকাটির ব্যাপার নেই, খরচ কম, রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই এবং কয়েকঘণ্টায় রিপোর্ট পাওয়া যায়। এছাড়া পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য খুব কম লাগে। শুধু প্রয়োজন হল একজন ভালো টেকনিসিয়ানের। কিন্তু অসুবিধে হল, এই পদ্ধতিতে দেহের ভেতরের কোন জটিল স্থানের বায়োপ্‌সি করা যায় না। তাছাড়া সবসময় সঠিক স্থান থেকে অর্থাৎ সন্দেহজনক অংশ থেকেও বায়োপ্‌সি এই পদ্ধতিতে করা যায় না। সেজন্য আমাদের সাহায্য নিতে হয় অন্যান্য পদ্ধতির।

'ইনসিশনাল বায়োপ্‌সি' এমন একটি পদ্ধতি যেখানে সন্দেহজনক স্থান থেকে কিছুটা অংশ কেটে নিয়ে পরীক্ষায় পাঠানো হয়। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি। ধরা যাক, কারও দেহের বাইরে বা ভেতরে কোন টিউমার বা আলসার হয়েছে। চিকিৎসকের সন্দেহ হলো। তিনি বায়োপ্‌সি করতে বললেন। এক্ষেত্রে ঐ টিউমার বা আলসারের কিছুটা অংশ অপারেশন করে কেটে নেওয়া হলো। এবং তা বায়োপ্‌সিতে পাঠানো হলো। পুরোটা সন্দেহজনক অংশ কিন্তু এক্ষেত্রে বাদ দেওয়া হচ্ছে না।

পুরো অংশটাই যদি বড় অপারেশন করে বাদ দিয়ে তারপর তা বায়োপ্‌সিতে পাঠানো হয় তাকে আমরা বলি 'একসিশনাল বায়োপ্‌সি'। অনেক সময় ইনসিশনাল বায়োপ্‌সি করে রিপোর্ট পাবার পর একসিশন করা হয়, মানে কেটে বাদ দেওয়া হয়। যেমন, কোন ব্রেস্ট লাম্প বা স্তনের গুটলি। অ্যাসপিরেশন বা ইনসিশনাল বায়োপ্‌সি করার পর পুরো স্তন কেটে বাদ দিতে হয় অনেক সময়। অবশ্য সেটা নির্ভর করে বায়োপ্‌সি রিপোর্ট এবং চিকিৎসকের সিদ্ধান্তের ওপর। এছাড়া থাইরয়েড ন্যডিয়ুল, জিহ্বায় সন্দেহজনক ক্ষত, চামড়ায় কোন ঘা বা ফোলা অংশ এসব নানা ক্ষেত্রেও একসিশনাল বায়োপ্‌সি করা হয়। এই পদ্ধতির সুবিধেটা হলো এখানে সন্দেহজনক দেহাংশকে প্রথমেই সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে তারপর তাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু এই পদ্ধতিও সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। সেক্ষেত্রে অন্য পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়।

'ব্রাশ বায়োপ্‌সি' এবং 'পাঞ্চ বায়োপ্‌সি'র কথা এবার বলি। যেখানে সন্দেহজনক স্থান থেকে কেটে নেবার মত অংশ থাকে না সেখানে ঐ স্থান জল দিয়ে ধুয়ে, সেই জল পরীক্ষায় পাঠালে অনেক সময় অস্বাভাবিক কোষ পাওয়া যায়। শ্বাসনালী এবং খাদ্যনালীতে নল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে (যাকে আমরা 'ব্রনকোসকোপি' ও 'ইসোফেগোসকোপি' বলি) যদি কোন সন্দেহজনক স্থান পাওয়া যায়, সেখান থেকে 'ব্রাশ বায়োপ্‌সি' বা 'পাঞ্চ বায়োপ্‌সি' করা হয়। এখানে 'পাঞ্চ' কথাটার অর্থ হলো ছিঁড়ে বা খুবলে নেওয়া। শুধু যন্ত্র দিয়ে দেখে নয় যদি খালি চোখেও কোন অস্বাভাবিক স্থান দেখা যায়, যেমন ঠোঁটের কোণ, জিহ্বা বা মুখগহ্বর, সেক্ষেত্রেও অতি সহজেই এই পাঞ্চ বায়োপ্‌সি করা যায়।

'ফ্রোজেন সেকশন বায়োপ্‌সি'র কথা না বললে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কোন অপারেশন চলাকালীন সন্দেহজনক স্থানের কতটা অংশ বাদ দিতে হবে কিংবা সম্পূর্ণটাই কেটে বাদ দিতে হবে কি না এ সিদ্ধান্ত এই 'ফ্রোজেন বায়োপ্‌সি'র সাহায্যেই নেওয়া হয়। প্রথমে সন্দেহজনক স্থানের অল্প অংশ নিয়ে, তাকে নাইট্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে 'ফ্রোজেন' করে 'স্টেইন' করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে দেখা হয়। সময় লাগে ২০-২৫ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে রিপোর্ট পেয়ে সার্জন অপারেশনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন অর্থাৎ কতটা অংশ তিনি বাদ দেবেন বা রাখবেন। স্তনের ক্যানসারের ক্ষেত্রে এই 'ফ্রোজেন সেকশন বায়োপ্‌সি' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আরও কয়েক ধরনের বায়োপ্‌সি পদ্ধতি আছে। কাজের সুবিধার্থে পদ্ধতির রকমফের হয়। সে সব বিশদ আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।

প্রবন্ধের শুরুতেই আমি একটা প্রশ্ন তুলেছিলাম যে বায়োপ্‌সি মানেই কি ক্যানসার? অর্থাৎ শুধুমাত্র ক্যানসার নির্ণয়েই কি বায়োপ্‌সি করা হয়। আগেই বলেছি যে, জটিল রোগ নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে বায়োপ্‌সি একটি। কাজেই শুধুমাত্র ক্যানসার নির্ধারণের জন্য বায়োপ্‌সি করা হবে কেন? ধরা যাক দেহের কোন অংশে কোন টিউমার বা আলসার দেখা দিল—প্রাথমিক কিছু পরীক্ষানিরীক্ষায় (এক্সরে, রক্ত ইত্যাদি) কোন সিদ্ধান্তে আসা গেলো না, সে সব ক্ষেত্রে ঐ সন্দেহজনক স্থানের কিছুটা অংশ নিয়ে বায়োপ্‌সি করে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, তাতে কোন অস্বাভাবিক কোষ আছে কিনা—থাকলে তার ধরন কি আর বিস্তৃতিই বা কতোটা। অর্থাৎ এই বায়োপ্‌সির সাহায্যে সঠিকভাবে আমরা রোগের গতিপ্রকৃতি বুঝতে পারি। এই যে টিউমার বা আলসারের কথা বললাম, সেটা কোনো প্রদাহ বা ইনফ্লামেশনের জন্য হতে পারে, যেমন, টনসিলাইটিস,

ফ্যারেঞ্জাইটিস। গলায় ঘা হয়েছে, সঙ্গে গ্ল্যাণ্ড ফুলেছে—এমনটা আমরা হামেশাই দেখি আবার টিউবারকিউলোসিসের জন্যও হতে পারে। এই বায়োপ্সির সাহায্যে আমরা সন্দেহজনক স্থান থেকে টি-বির কারণ 'জায়েন্ট সেল' পেতে পারি। চিকিৎসাও সেইমত হবে। আবার প্রদাহের কারণও পেতে পারি। একটা প্রদাহজনিত গ্ল্যান্ড, টি-বি গ্ল্যান্ড বা ক্যানসার গ্ল্যান্ড প্রত্যেকের চিকিৎসাপদ্ধতি ভিন্ন। কাজেই বায়োপ্সি মানেই ক্যানসার নয়। লিভার বায়োপ্সি করে হয়তো 'সিরোসিস' পাওয়া গেল, দীর্ঘদিন হাড়ের ঘা শুকোচ্ছে না, অস্টিওমাইলাইটিস পাওয়া গেল। ক্যানসার পাওয়া যেতেই পারে আবার ক্যানসার ছাড়া অন্য রোগও পাওয়া যেতে পারে। মোদ্দা কথা হলো, জটিল কোন রোগ নির্ণয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বায়োপ্সির আজ অপরিসীম গুরুত্ব।

অনেক সময় একটা কথা আমরা শুনে থাকি যে, অমুকের বায়োপ্সি রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে, তবু ডাক্তারবাবু আবার বায়োপ্সি করতে বলছেন। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে, বায়োপ্সির রিপোর্টের ক্ষেত্রে আবার পজিটিভ নেগেটিভ কি? যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞানে এমনভাবে ভাগ করা নেই। আসলে রিপোর্টে কোন অস্বাভাবিকতা (ক্যানসার, টি-বি ইত্যাদি) পাওয়া গেলে চলতি কথায় সে রিপোর্টকে অনেকে পজিটিভ বলেন। আর দেহের স্বাভাবিক কোষের প্রদাহ পাওয়া গেলে সে রিপোর্ট নেগেটিভ। নেগেটিভ রিপোর্ট পাবার পরও অনেকসময় আবার বায়োপ্সির প্রয়োজন হয়, যদি বায়োপ্সি স্থানটিকে সন্দেহযুক্ত মনে হয়। এমন হতেই পারে যে, প্রথমবার সন্দেহজনক স্থান থেকে ক্ষতযুক্ত কলা ঠিকমতো সংগৃহীত হয়নি। আসলে ব্যাপারটা ডাক্তার ও রোগী উভয়েরই পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে। কাজেই নেগেটিভ বা স্বাভাবিক বায়োপ্সি রিপোর্ট পাবার পরও যদি ডাক্তারবাবু সন্দেহমুক্ত না হন, তবে তিনি আরেকবার বায়োপ্সি করতে বলতেই পারেন।

বায়োপ্সি কি এবং কেন আলোচনা করতে গিয়ে ক্যানসার শব্দটা বারেবারেই এসে যাচ্ছে। কাজেই এবার এই অবাঞ্ছিত রোগটা নিয়ে দু'চার কথা বলা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের দেহকোষ একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে বিভাজিত হয়ে বৃদ্ধি পায় এবং এই বিভাজন দেহের প্রয়োজনে লাগে। যদি দেহের কোন স্থানের কোষ অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দেহের ক্ষতিসাধন করে তবে তাকেই আমরা ক্যানসার বলি। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে দেহের কোন অংশ ফুলে উঠতে পারে, যাকে আমরা টিউমার বলি, ঘা হতে পারে, যাকে আমরা আলসার বলি। রক্তকোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে রক্তের বিভিন্ন অসুখ হতে পারে, যেমন লিউকোমিয়া। তবে টিউমার বা আলসার মানেই, সবসময় ক্যানসার নয়। ক্যানসার ছাড়া অন্যান্য কারণেও এমন হতে পারে। সঠিক কারণ নির্ণয় করার জন্য দরকার বায়োপ্সির এবং অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষার।

বায়োপ্সি করে আমরা যে শুধু কোষের

থাইরয়েড গ্রন্থির ক্যানসারে আক্রান্ত রোগী

অস্বাভাবিকতা বুঝতে পারি তাই নয়, অস্বাভাবিক হবার আগের অবস্থাও ধরতে পারি। ক্যানসারের ক্ষেত্রে ম্যালিগনান্ট কোষ—কতটা তার বিভাজন হয়েছে, সেই বিভাজন কি ধরনের এসব দেখে কি ধরনের চিকিৎসা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সেটাও বুঝতে পারি। ডাক্তারি পরিভাষায় প্রিম্যালিগনান্ট কন্ডিশন বলে একটা ব্যাপার আছে। অর্থাৎ ক্যানসার হবার আগের অবস্থা। রোগটা এমন একটা পর্যায়ে এসেছে যার থেকে যে কোন সময় সেটা ক্যানসারে পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন, ঠোঁটের কোণে ঘা, যা ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, যাকে আমরা লিউকোপ্লাকিয়া বলি। এর থেকে ক্যানসার হতেই পারে। বায়োপ্সি করে যদি সন্দেহজনক মনে হয় তবে আমরা সহজেই সেটা অপারেশন করে আগেভাগেই বাদ দিতে পারি। অর্থাৎ বায়োপ্সির সাহায্যে কোন মারাত্মক অসুখ হবার আগেই সে সম্বন্ধে সাবধান হতে পারি।

এমন একটা কথা আমরা হরদম শুনে থাকি যে, বায়োপ্সি করলেই নাকি ক্যানসার বেড়ে যায়। অনেকেরই অভিযোগ 'গ্ল্যান্ড ফোলা নিয়ে ভালোই ছিলাম, যেই খোঁচাখুঁচি হলো (বায়োপ্সি) অমনি বাড়তে শুরু করলো।' কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সবাই এ ব্যাপারে একই মত পোষণ করেন। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে অনেক 'প্যাথি' আছে। যদিও এক 'প্যাথি'র ওপর আরেক 'প্যাথি'র সিমপ্যাথি খুবই কম, কাজেই এ প্রচার চলছেই যে বায়োপ্সি করলেই নাকি ক্যানসার হু-হু করে বাড়তে থাকে। ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা নয়। এমনিতেই ক্যানসার কোষ সুযোগ পেলেই দেহের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। যাকে আমরা ডাক্তারি পরিভাষায় বলি 'মেটাসটেসিস'। সরাসরি ভাবে কিংবা রক্ত, লসিকা নালী বাহিত হয়ে ক্যানসার সহজেই দেহের বিভিন্ন গ্ল্যান্ডে, ব্রেনে, লিভারে, লাংসে ও অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বায়োপ্সি না করে বসে থাকার অর্থ হলো এই ছড়িয়ে পড়াকে ত্বরান্বিত করা। আর বায়োপ্সি করলে প্রথমে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে যে, রোগটা কী? ক্যানসার না অন্য কিছু? তারপর সেই মত দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে। ক্যানসারেরও আজকাল চিকিৎসা বেরিয়েছে। সময়মতো রোগ ধরা পড়লে রেডিও থেরাপি বা বিকিরণ চিকিৎসা, সাজারি বা শল্য চিকিৎসা এবং কেমোথেরাপি বা ওষুধের দ্বারা চিকিৎসার সাহায্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহজেই এ রোগ সারিয়ে তোলা সম্ভব। যদি বায়োপ্সিতে ক্যানসারই ধরা পড়ে, তবে তার ধরনটা কি, বিস্তৃতিই বা কতোটা অর্থাৎ রোগটা কোন স্টেজে—এসবও জানতে পারি, চিকিৎসাপদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

সোজা কথায় বলতে গেলে এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসার ব্যাপারে সঠিক বৈজ্ঞানিক গাইড লাইন দিতে পারে একমাত্র বায়োপ্সি। আর আগেই তো বলেছি যে বায়োপ্সি না করলে রোগই ধরা পড়ছে না, কাজেই চিকিৎসাও শুরু করা যাচ্ছে না। এবার তাহলে আপনিই বেছে নিন যে, রোগ পুষে রেখে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবেন, অথবা তাড়াতাড়ি করে বায়োপ্সি করে রোগনির্ণয় করে চিকিৎসা শুরু করবেন। আর আগেই তো বললাম ক্যানসার মানেই মৃত্যু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে ক্যানসার সারে। কিন্তু বায়োপ্সি ছাড়া কে আপনাকে দিব্যি দিয়ে বলবে যে রোগটা ক্যানসার অথবা ক্যানসার নয়। বায়োপ্সি সম্বন্ধে সাফাই গাওয়া কিন্তু আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য একটাই আর তা হলো বায়োপ্সি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে অহেতুক ভীতি আছে তা দূর করা। বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতির যুগে তার সাহায্য নিয়ে সবাই সুস্থভাবে বেঁচে থাকে এ আশা তো আমরা করতেই পারি। ■

ভারতীয় দলে আমার বন্ধুরা

অরুণলাল

অনেকে প্রায়ই ভারতীয় দলে আমার সহ-ক্রিকেটারদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন আমাকে করেন। অর্থাৎ, আমার খেলোয়াড় বন্ধুরা কে কেমন লোক, তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ কী, অন্যের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার কীরকম—এই সব। এটা খুবই স্বাভাবিক। মাঠের বাইরে প্রিয় খেলোয়াড়দের দেখার বা জানার সুযোগ তো দর্শকদের বিশেষ হয় না, তাই কৌতূহল থেকেই যায়। এই বিষয়টি নিয়েই এখানে আমি কিছু লিখবো। আশা করি জিজ্ঞাসুদের খিদে কিছুটা অন্তত মিটবে।

> *আমার চোখ দিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের দেখাবার চেষ্টা সাধ্যমত আমি করছি। ভবিষ্যতে এইসব নামী খেলোয়াড়দের সঙ্গে কখনো আপনাদের আলাপ হলে দেখবেন আপনাদেরও এ-কথাই মনে হবে যে, কত কিছু জানা বাকি ছিল এবং আরও কত বাকি থেকে যাবে।*

অন্যেরা থাকা সত্ত্বেও প্রথমেই মনে পড়ছে কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের নাম। দিলখোলা, সপ্রতিভ, সুন্দর। তার উপস্থিতিতে আমাদের প্রতিটি সন্ধ্যাই আনন্দ-সন্ধ্যা। সব সময়েই সে মজা খুঁজে বেড়াচ্ছে। অন্যদের ফূর্তিতে রাখতে নিজেকে নিয়ে মজা করতেও সে পিছপা নয়। ওর রসিকতা আমরা সবাই খুব উপভোগ করি, কারণ সেগুলো একেবারে নির্দোষ রসিকতা। শুধু আনন্দ দেওয়ার জন্যই বলা, তা কাউকে আঘাত করে না। শ্রীকান্ত কখনো দমে যায় না। ব্যাটে ব্যর্থ হলেও না। সাময়িক হয়তো একটু বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু পরক্ষণেই যে-কে সে-ই! আসলে এটাই ওর মানসিকতার ধরন, কিংবা ওর চরিত্রও বলা যায়। ওর খেলোয়াড়ি দক্ষতার সঙ্গে এই চরিত্রের বেশ-একটা মিল আমি খুঁজে পাই। সেই জন্যেই খেলতে নেমে শ্রীকান্ত দর্শকদের মনোরঞ্জন করে খেলাটাকে অসম্ভব উপভোগ্য করে তুলতে পারে। অবশ্য, এই বেপরোয়া স্বভাবের জন্যেই কিন্তু ধৈর্যশীল গুছিয়ে খেলার শিল্পটা ওর অজানাই থেকে গেল।

একেবারে উল্টো স্বভাব মহিন্দর অমরনাথের। ওয়ার্ল্ড কাপের প্রথম টিমে ওর নাম না দেখে অবাক হয়েছি। অবশ্য এটা নির্বাচকদের বিচার। স্থিতধী, শৃঙ্খলাপরায়ণ, খুব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ সে। ষোলো বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি তাকে চিনি, এবং এ-যাবৎ কখনো কোনো ব্যাপারে তাকে একটুর জন্যেও উত্তেজিত হতে দেখিনি। সাফল্য ও হতাশা দুইয়েরই স্বাদ সে বহুবার পেয়েছে, কিন্তু যেটা আমাকে অবাক করেছে তা হলো ওর নির্বিকার মনোভাব এবং সব কিছুকেই শান্তভাবে গ্রহণ করার বিরল ক্ষমতা। ব্যবহারে সে নিপাট ভদ্রলোক, খেলোয়াড় হিসেবেও খুব পরিশ্রমী। শরীরকে ফিট রাখার জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে না। এ-সবের জন্যেই তো সে আজ প্রায় কুড়ি বছর ধরে এই খেলার শীর্ষে বিচরণ করছে। বহু বছর ধরেই মহিন্দর আমার উৎসাহের উৎস এবং পরম বন্ধুও বটে। আমার বেশ মনে আছে, কলকাতা টেস্টে আমার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে ও রান আউট হয়ে যায়। সিরিজে পর পর দু'বার ওর ভাগ্যে এমন ঘটনা ঘটল। কিন্তু আমি ড্রেসিংরুমে ফিরে আসার পরে মহিন্দর একবারও আমাকে রান আউট প্রসঙ্গে একটি কথাও বলেনি। নিজের ওপর এতটাই ওর নিয়ন্ত্রণ। মহিন্দরের এই গুণের আমি সব সময়েই তারিফ করি।

রবি শাস্ত্রী একজন মারকুটে খেলোয়াড়, আত্মবিশ্বাসী, পুরোপুরি পেশাদারি মনোভাবের। বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে সে রাজি নয়। একজন অত্যন্ত সচেতন ক্রিকেটার হিসেবে সে তার দুর্বলতাগুলো খুব ভালোই বোঝে, তাই কখনও নিজের সীমার বাইরে যায় না। খেলোয়াড় রবিকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি, ওর বিরুদ্ধপক্ষে যত কম খেলা যায় ততই মঙ্গল! অতীতের এ-রকম দুটো ঘটনার কথা আমার বেশ মনে আছে যখন রবি আমাদের পূর্বাঞ্চল দলকে দারুণ জব্দ করে ফেলেছিলো। রবি জানতো, সে খুব দুঃসাহসী স্টোক মেকার নয়; তাই এমনভাবে প্ল্যানমাফিক খেলতে লগলো যে, ওকে আউট করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। মাঠের বাইরে ওর স্বভাবও ঠিক সেইরকম—দৃঢ়চেতা, অনমনীয়। রবি নিজেই নিজেকে তুলে ধরার পক্ষে যথেষ্ট, ওর কোনো খুঁটির দরকার পড়ে না। বয়সে সে আমার চেয়ে ছোট, কিন্তু খেলায় সিনিয়র। তাই মাঝে মাঝেই সে আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দেয়। কলকাতা টেস্টে তো আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করেছে।

সম্প্রতি কম্পিউটারের খুব নেকনজরে এসেছে দিলীপ বেঙ্গসরকর। কিন্তু একদিন আমরা একই সঙ্গে খেলা শুরু করেছি। মনে পড়ে, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট ও বাইশ বছরের কম বয়সীদের সি কে নাইডু টুর্নামেন্টে আমরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম। সেটা উনিশশো চুয়াত্তর সাল। আর এখন তো দিলীপ তার দক্ষতার তুঙ্গে পৌঁছে গেছে। কম্পিউটার আর কী বলবে, বহু বিদগ্ধ জনের মতে দিলীপ এখনকার সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। গত বারো বছর ধরে ওর স্কোর এবং মনঃসংযোগ বিচার করে এ-কথা মানতেই হবে যে, যাবতীয় প্রশংসা ও উচ্ছ্বাস ন্যায়সঙ্গতভাবেই ওর প্রাপ্য। আমার ধারণা, দিলীপের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ওর মনের জোর। নিজের ওপরে এতটাই আস্থা যে, তার জোরেই দিব্যি এগিয়ে চলে। কে কী ভাবলো, গ্রাহ্যই করে না। দিলীপের মনঃসংযোগ, সেই সঙ্গে সঠিক

ব্যাটের দাপটে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারে শ্রীকান্ত ছবি : নিখিল ভট্টাচার্য

মুহূর্তে নিজের দক্ষতাকে সুন্দরভাবে কাজে লাগানোর গুণই ওকে আজ এত বড় খেলোয়াড় করেছে। আমি ওর গুণমুগ্ধ, আমাদের সম্পর্কও খুবই ভালো। দিলীপ শান্ত স্বভাবের, নিরিবিলি থাকতেই ভালোবাসে। আত্মমগ্ন বলতে আমরা যা বুঝি, সে ঠিক তা-ই।

আজহারউদ্দিনের কতই বা বয়স, কিন্তু আবির্ভাবেই ক্রিকেট-বিশ্বকে চমকে দিয়ে সবার সমীহ আদায় করে নিয়েছিলো সে! প্রথম সিরিজ অমন দুর্দান্ত খেলার পর সবাই আজহারের কাছ থেকে শুধু সেঞ্চুরিই আশা করে যেতে লাগলো। আমি বলবো, এটা সঙ্গত নয়। এর ফলে একজন তরুণ খেলোয়াড়ের ওপর যে কী নিদারুণ চাপ পড়ে, তা বলে বোঝানো যায় না। তবে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে এখন সে এই চাপকে অতিক্রম করে ক্রমেই আত্মস্থ হয়ে উঠছে এবং একজন নিয়মিত খেলোয়াড় হিসেবে পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এটাই সুখের কথা। স্বভাবের দিক দিয়ে আজহার বিনয়ী, সাদাসিধে ও বন্ধু-মনোভাবাপন্ন। ওর সঙ্গে আলাপে প্রথমেই চোখে পড়ে ওর সলজ্জ মুখভঙ্গিটি, যে-জন্যে ওকে ভালো না-বেসে পারা যায় না।

আমাদের এখনকার অধিনায়ক কপিলদেব এক আদ্যন্ত তুখোড় খেলোয়াড়। ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা যদি বলতেই হয় তো, সে কপিলদেব। এমন সহজ তার চলাফেরা আর খেলাধুলো যে, দেখে মনে হয় কপিলের কাছে সবকিছুই যেন খুব সহজে ধরা দিয়েছে। একেবারে ন্যাচারাল ক্রিকেটার বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা-ই। তার খেলা সম্পর্কে নতুন কী আর বলবো, আপনারা সবাই জানেন। কিন্তু অনেকেই যেটা জানেন না সেটা হলো, মানুষ কপিলের কথা। খুবই কোমলপ্রাণ, ভদ্র স্বভাবের মানুষ এই কপিলদেব। তার সঙ্গে বন্ধুতা হলে সে-সখ্য বহুদিন টিকে থাকবেই। কপিলকে যবে থেকে চিনি, সে একটুও বদলায়নি। খ্যাতির শিখরে পৌঁছেও তাকে স্বাভাবিক সৌজন্য থেকে মুহূর্তের জন্যেও বিচ্যুত হতে দেখিনি। এটা অসাধারণ গুণ, এ-জন্যেই কপিলের সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন তাঁরা কপিলকে একজন প্রিয় মানুষ হিসেবে ভালোবেসে ফেলেছেন।

'অসম্ভব' শব্দটা জানা নেই বলেই ক্রিকেটের রাজ্যপাটে সুনীলের একচ্ছত্র আধিপত্য

কপিল চট করে উত্তেজিত হয়ে পড়ে না, খেলায় হারজিতের ব্যাপারটা বেশ শান্তভাবেই নেয়। কপিলকে হতাশ হতে দেখাটা খুবই বিরল। এটাও একটা প্রশংসনীয় ব্যাপার। বিশ্বকাপের খেলায় দেশের অধিনায়ক হিসেবে কপিলকে নির্বাচন তাই সবচেয়ে আদর্শ নির্বাচন।

ভারতীয় দলে বয়সের দিক দিয়ে সবচেয়ে ছোট খেলোয়াড়টি হলো মনিন্দর সিং। প্রচুর পরিশ্রম করে ওকে জায়গা করে নিতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আজ সে শুধু একজন পরিণত খেলোয়াড়ই নয়, অন্যতম সেরা স্পিনার হিসেবেও খ্যাত। আমার কোনো সন্দেহ নেই মনিন্দর আরও বিরাটভাবে নিজেকে প্রকাশ করবে এবং একদিন অনেকের কীর্তিকেই ছাপিয়ে যাবে। আমাদের মধ্যে বয়সের বেশ ফারাক, তবু মনিন্দর আমার খুবই বন্ধুলোক। একটা কারণ অবশ্য, বহুবার আমরা একই ঘরে থেকেছি রুম মেট হিসেবে। মনিন্দর খুব বন্ধুবৎসল, প্রাণোচ্ছল স্বভাবের। সহজেই সবার সঙ্গে মিশে যেতে পারে। সবাইকেই সে ভালোবাসে। ওর ব্যবহারের মধ্যে মজার ব্যাপারটা খুবই আছে। খোলামেলা স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাব আর রসবোধের জন্য মনিন্দর সকলের কাছেই প্রিয়পাত্র। এই পরিচিতির ইতি টানতে চাই সুনীল গাওস্করকে

কপিলদেব

দিলীপ বেঙ্গসরকর

দিয়ে, রিলায়েন্স কাপের পর যাঁকে আর কোনোদিনই খেলতে দেখা যাবে না। কী দুঃখজনক এই অবসরের সিদ্ধান্ত। এক শূন্যতা, যা সহজে পূরণ হবার নয়। সুনীলকে জিনিয়াস ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। আমার ধারণা, সুনীলের উঁচুমানের ইনটেলেক্ট তাঁকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত সবকিছুতেই সাফল্য এনে দিয়েছে। অসম্ভব বলে ওঁর কাছে কোনো শব্দ নেই, তাই আজ ক্রিকেটের রাজ্যপাটে ওঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। খুবই সংবেদনশীল মানুষ এই সুনীল। ওঁর সান্নিধ্যে যাঁরাই এসেছেন সকলেই জানেন কীভাবে ধীরে-ধীরে আড়ষ্টতা কেটে গিয়ে আগন্তুকের সহজ ভাবটা ফিরে আসে। টেস্টে আমার অভিষেকের সময় ওঁর সঙ্গে ইনিংস শুরু করার অভিজ্ঞতার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। সুনীল সেদিন আমাকে তাঁর সমমর্যাদায় বন্ধুর মতন ব্যবহার করেছিলেন। ফলে, আমার আত্মবিশ্বাস প্রচণ্ড বেড়ে গিয়েছিল, খুব উৎসাহিত বোধ করছিলাম। কারণ ওঁর ব্যবহারে একটুও মুরুব্বিয়ানা ছিলো না। সুনীল এত ব্যস্ত মানুষ, তবু সহ-খেলোয়াড়দের পরামর্শ দিতে বা অন্যভাবে সাহায্য করতে ওঁর কখনও সময়ের অভাব হয় না। এমনকি লক্ষ লক্ষ অনুরাগীর চিঠির জবাব দেওয়াটাও তাঁর পক্ষে অত ব্যস্ততার মধ্যেই সম্ভব হয়। সত্যিই সুনীল সব দিক দিয়ে অসাধারণ।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়-পর্ব এখানেই শেষ করছি আপাতত। যদিও জানি, এইসব খ্যাতিমান ক্রিকেটারদের সম্পর্কে এত অল্প কথায় সব বলা যায় না। তবু আমার চোখ দিয়ে আপনাদের দেখাবার সাধ্যমতো চেষ্টা আমি করেছি। ভবিষ্যতে এইসব নামী খেলোয়াড়দের সঙ্গে কখনো আপনাদের আলাপ হলে দেখবেন আপনাদেরও এ-কথাই মনে হবে যে, কত কিছু জানা বাকি ছিল এবং আরও কত বাকি থেকে যাবে। আমি শুধু এই বলে শেষ করবো যে, দেশের হয়ে ওদের সবার সঙ্গে খেলাটা আমার কাছে এক বিরাট সম্মানের ব্যাপার, একই সঙ্গে অপরিসীম আনন্দেরও উৎস।

অনুলিখন : দেবাশিস বসু

ও যে স্টেগির পিঠে চাপতে পারে, এইটে দেখাচ্ছে !

হিজ !
এখনও রপ্ত হয়নি !

স্বর্গোদ্যানের প্রাণীরা উত্তেজিত। আগে তাদের শান্ত করি।

অরণ্যদেব এই প্রাণীদের একেবারে শৈশব থেকে শিখিয়েছেন, পরস্পরের সঙ্গে কীভাবে শান্তিতে বসবাস করতে হয়...
গরর, গরর...
চি, চি...
ক্লিক ক্লিক

বাঘ-সিংহ এখানে খাঁড়ির থেকে মাছ ধরে খায়...সোলোমন আর নেফার নামের শুশুক দুটি তখন দূরে-দূরে থাকে...

হ্যাঁ, এইবারে সবাই ডিঙি থেকে নামতে পারো।
5/18

ওঃ, স্বর্গোদ্যানে এসে কী আনন্দই না হচ্ছে !
ইয়া !
ইয়া !
ইয়া !

ওদিকে...সমুদ্রের বেলাভূমিতে এসে আছড়ে পড়েছে এ কে ?
ক্রমশ ● ৩

প্রাপ্তিযোগ অনেক। দিতে পেরেছি সামান্যই। এখন রবীন্দ্রনাথের বয়স একশ ছাব্বিশ। এর মধ্যে গত চল্লিশ বছর ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পূজারিণী সুচিত্রা মিত্র। আজকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে জনপ্রিয়তা, তার অনেকখানি জুড়ে আছেন সুচিত্রা মিত্র।
সারথি যখন রবীন্দ্রসদনে সুচিত্রা মিত্রের সান্নিধ্যে অনুষ্ঠান করেন, তখন সকলেই সশ্রদ্ধ হয়ে আসেন শিল্পী-সান্নিধ্যে স্মরণীয় সন্ধ্যার অংশীদার হওয়ার জন্যে। কিন্তু অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সেই অনুষ্ঠান শুধুই পরিকল্পনাহীন বিচিত্রানুষ্ঠান হয়ে যায়।
সংবর্ধনার পর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণা করেন। আশুতোষ কলেজে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে অর্জুনের গান সুচিত্রা মিত্রের কাছে শিখেছিলেন। সলাজভঙ্গিতে সুচিত্রা মিত্র বাধা দিতে গেলে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—তখন তিনি আধুনিক গানের শিল্পী, অনেক গানের প্রেরণাই সুচিত্রা মিত্রের কাছে। এরকম অকপট স্বীকারোক্তি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পক্ষেই সম্ভব। ঘটনা ছোট, কিন্তু বড় মাপের শিল্পী এইভাবেই গড়ে উঠতে পারে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, চল্লিশের দশকে যুদ্ধ, মন্বন্তর, বন্যা, দাঙ্গায় যখন সকলেই জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল, তখন বরাভয় ছিল সুচিত্রা মিত্রের রবীন্দ্রসঙ্গীতে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, তিনি সুচিত্রা মিত্রকে শুনেছেন, দেখেছেন, আপ্লুত হয়েছেন, কিন্তু খুব কাছে আসতে পারেননি। একটি মূল্যবান সূত্র তিনি ধরিয়ে দিয়েছেন। গণনাট্যের সঙ্গে সুচিত্রা মিত্রের যোগাযোগ। উদ্যোক্তারা কিন্তু এই দিকটিতে নজরই দেননি। যে সময়ে সুচিত্রা মিত্র গান আরম্ভ করেন—তখন উদ্দীপনা সঞ্চারের প্রয়োজন ছিল। শান্তিদেব ঘোষের কাছ থেকে গায়নভঙ্গীর উত্তরাধিকার সত্ত্বেও—মিছিলের গান— তাঁর গানে অন্য একটি মাত্রা যোগ করে। সম্ভবত সুভাষ মুখোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন, আগে গণনাট্যের গানে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, স্নেহাংশু আচার্য সকলেই অংশগ্রহণ করতেন, পরে সুচিত্রা মিত্র প্রমুখ গানের শিল্পী আসায়, তাঁরা গানের দল থেকে বাদ পড়লেন। এই উক্তিতে দুটি সত্য প্রমাণিত। প্রথম শুধু শ্লোগান নয়,

সং গী ত

গানের ভেলায়, বেলা অবেলায়

সুচিত্রা মিত্র

ভাল গান ও সুরের দরকার এটা যেমন গণনাট্য সঙ্ঘ অনুভব করেছিলেন, তেমনি সুচিত্রা মিত্রও অর্জন করেছিলেন মানুষের কাছে পৌঁছানর মন্ত্র। ঠিক সেই সময়ে যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ছিলেন তাঁদের সঙ্গে তুলনা করলেই এই বৈচিত্র্য ধরা পড়বে। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে সুচিত্রা মিত্র ১৯৪৫ সালে রেকর্ড করলেও প্রায় দশ পনের বছর পর্যন্ত যে রেকর্ড করেছেন, সেখানে বাউলাঙ্গ, কীর্তনাঙ্গ গান বেশি এবং দেশাত্মবোধক গানে তাঁর গায়নভঙ্গি শ্রোতাকেও উদ্দীপ্ত করে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে গানটির কথা উল্লেখ করলেন সেই 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গানটি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত। ঠিক পরের বছরই 'সন্দীপন পাঠশালা' ছবিতে আবার তিনি গানটি করেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকলি'র রোমান্টিকতা ছাড়িয়ে যে অন্য ছবিও আসতে পারে, সেই গান তাঁকে রোমাঞ্চিত করেছিল। সলিল চৌধুরীর কথা ও সুরে 'সেই মেয়ে' গানটির প্রকাশকাল ১৯৫০। আর রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকলি' সুচিত্রা মিত্র রেকর্ড করলেন ১৯৬১ সালে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় 'ঝকঝকে খোলা তলোয়ারের' মত সুচিত্রা মিত্র অনেকক্ষেত্রেই বেপরোয়া। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কয়েকটি আসরের স্মৃতিচারণ করলেন। আমার মনে আছে বালিগঞ্জে একটি গানের আসরে জহর রায় কমিক করলেন, তারপর ভি বালসারা হিন্দী গানের সুর বাজানোয় দর্শকরা উত্তাল। সেই মুহূর্তে ঘোষণা হল পরবর্তী অনুষ্ঠান সুচিত্রা মিত্রের রবীন্দ্রসঙ্গীত। আমরা সন্ত্রস্ত হয়তো সমগ্র আসর বিক্ষুব্ধ হবে—রবীন্দ্রসঙ্গীতের অপমান নিয়েই আমাদের সংশয় ছিল। রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তবলা সহযোগে দৃপ্তভঙ্গিতে সুচিত্রা মিত্র বসলেন; এবং কোন বাউলাঙ্গ গান দিয়ে আসর জমানো নয়, প্রথম গান ধরলেন চৌতালে 'তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন' সমস্ত আসর যেন ধমক খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।" এই বেপরোয়া ভঙ্গির আর এক নাম সুচিত্রা মিত্র। কোন একটি কয়ার গানের মহড়ায় তিনি সলিল চৌধুরীর 'ধন্য আমি জন্মেছি মা' গাইবার আগে সহশিল্পীদের আগাম ধমক দেন 'এ-গানগুলির সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ, এখানে চাপা গলা আমি সহ্য করব না'। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-কেও আধুনিক গাইতে হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে প্রথম রেকর্ডের পরে, সুচিত্রা মিত্রকে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে 'তোমার সময় ক্ষণেক' এবং 'ফিরে তুমি আসবে না' দুটি আধুনিক গান গাইতে হয়েছিল—কিন্তু তারপর গ্রামোফোন কোম্পানিতে কয়েকটি অতুলপ্রসাদ, গণনাট্য সঙ্গীত, ব্রহ্মসঙ্গীত ছাড়া প্রতি বছরেই নানাভাবে শুধুই রবীন্দ্রসঙ্গীত। এই থেকেই প্রমাণিত হয় সুচিত্রা মিত্র ঠিক সেই সময় রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য কতটা অনিবার্য ছিলেন।

সারথির আসরে সুচিত্রা মিত্র কোনও প্রতিভাষণ দেননি। দ্বিতীয়পর্বে শুধুই বিচিত্রানুষ্ঠান। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, 'পুরানো সেই দিনের কথা'—গানটি করেন অনুষ্ঠানের কথা মনে রেখেই। 'এমন দিনে তারে বলা যায়' গানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আবারও কথাকে ছবি করে তোলেন।
বাণী ঠাকুর নির্বাচন করলেন এমন চারটি গান, যা মধ্যসপ্তকেই বাঁধা। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগে 'আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু'। এই গানে জহর দে-র সঙ্গতও নতুন মাত্রা যোগ করে। সুচিত্রা মিত্রের প্রথম রেকর্ড করা গান দুটি তিনি স্মৃতিচারণ করে গাইলেন—তার মধ্যে ভাল লাগে 'হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়'।
দুটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান ছিল। তার মধ্যে 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায় ধৃতরাষ্ট্রের কণ্ঠ অক্ষম অনুকরণ। জানা গেল গান্ধারী খুবই লাজুক—এবং আবৃত্তিকে শিল্প হিসেবে নিয়েও—মহিলা শিল্পী। মাইকের ব্যবহার জানেন না। সারথি সুচিত্রা মিত্রকে সামনে রেখে শুধুই একটি অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলেন,—নইলে তাঁরা বিষ্ণু দে

এবং আরও অনেকে সুচিত্রা মিত্রের গান শুনে যে কবিতা লিখেছিলেন সেই কবিতাগুলিই আবৃত্তি করতে পারতেন। সুচিত্রা মিত্র তিনটি গান গাইলেন। অস্বীকার করে লাভ নেই কণ্ঠ গানের মত সতেজ নয়—তবু তিনি যখন 'আসা যাওয়ার মাঝখানে' গানটি করেন, তখন সঞ্চারীতে 'শুকনো পাতা ধূলায় ঝরে, নবীন পাতায় শাখা ভরে' কথাটি পরম মমতায় উচ্চারণ করেন। হয়তো এইটাই তাঁর প্রতিভাষণ। গানটির রূপ পূরবী—আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। পূরবী আবার বিভাসে মিলে যাবে। হিসাব মিলাতে তাঁর মন রাজী না হলেও আমাদের ঋণ বেড়েই যাক, কারণ কেন যে মন ভোলে, তা মনই জানে।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

তোমার মহাবিশ্বে

বড় অসময়ে হঠাৎ একদিন পৃথিবী ছেড়ে অন্য লোকে পাড়ি দিয়েছিলেন শিল্পী দিলীপ চক্রবর্তী। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জন্মবার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়মিত প্রতিবছর করে

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

আসছেন তাঁরই একদা প্রতিষ্ঠিত সংস্থা 'শিল্পীদল'। এবারের অনুষ্ঠানটি ছিল গিরীশ মঞ্চে। শিল্পীদল গোষ্ঠীর সম্মেলক কণ্ঠে তিনটি গানে উদ্বোধন। গান তিনটি প্রয়াত শিল্পীকে নিয়েই। নানা ধরনের গান গাইলেও দিলীপ চক্রবর্তী মূলত নজরুলগীতিশিল্পী ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই সেদিনের অনুষ্ঠানেও নজরুলগীতিরই প্রাধান্য, সঙ্গে অবশ্য রবীন্দ্রসংগীত কিংবা অন্যান্য গানও কিছু ছিল।

রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিলেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু তাঁর পরিবেশন সেই গভীরতা ছুঁতে পারে না। নজরুলগীতি শুনিয়েছিলেন বহুজন। বন্দা কুণ্ডুর গলাটি ভাল, শুধু উচ্চারণে চাই আরও স্পষ্টতা। এই ধরনের অনুষ্ঠানে 'তুমি নাই পরিলে খোঁপায়' প্রগলভ বেঠিক নির্বাচন—গেয়েছিলেন বিপুল চক্রবর্তী। তাঁর প্রথম গানটি অবশ্য সুনির্বাচিত কিন্তু পরিবেশন মামুলি। কণ্ঠস্বরটি ভাল মাম মিত্রের তবে অকারান্ত উচ্চারণ মাঝে-মধ্যেই ওকারান্ত হল। যেমন—'চরণ' বললেন 'চোরোণ'। সুতরাং উচ্চারণে সতর্ক হতে হবে আর অবশ্যই প্রয়োজন আরও অনুশীলনের। গৌরাঙ্গ সাহা সাধারণ মানের। মন্দ নয় তৃপ্তি মিত্রের গান। বিতান চক্রবর্তীর গান-নির্বাচন সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি ওপরের দিকে যতটা স্বচ্ছন্দ নীচের দিকে ততটা নন। তাঁর গাওয়া- 'ঝরল যে ফুল ফোটার আগে' গানের কথায় গভীরতার আভাস, সুর বা সুরের চলনটি কিন্তু বড় হাল্কা, চপল। এক সম্ভাবনাময় নবীনা সুস্মিতা গোস্বামী। তবে ইদানীং তাঁর পরিবেশনে বহিরঙ্গের আয়োজন বেড়েছে। একজন অতিরিক্ত হার্মোনিয়াম বাদক থাকছেন তাঁর সঙ্গে—এটা ভাল লাগছে না। তাঁর গান দুটি অবশ্য তাঁর যোগ্যতারই পরিচায়ক। অসীমা মুখোপাধ্যায়ের সঠিক চয়ন-'তোমার মহাবিশ্বে'। তিনি গাইলেনও পরিচ্ছন্ন। বিমান মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন একটি নজরুলগীতি আর সুবল দাশগুপ্তের সুরে সেই সুদূর চল্লিশের দশকের একটি বাংলা

দিলীপ চক্রবর্তী

আধুনিক 'যদি ভুলে যাও মোরে'। দুটি গানেই আবেদন ছিল। নজরুলগীতি ছাড়াও রামকুমার চট্টোপাধ্যায় শুনিয়েছেলেন বাংলা পুরাতনী। এই সত্তর-পেরুনো বয়সেও তাঁর কণ্ঠে সুর কত সহজে খেলা করে। আর তাঁর গায়নভঙ্গীও তো স্বভাবতই স্বতন্ত্র। সুতরাং সংগীতরসে আকণ্ঠ নিমগ্ন হওয়া গেল। সুকুমার মিত্রের কণ্ঠে নজরুলগীতি কখনই স্বেচ্ছাচারিতায় আক্রান্ত নয়। সাংগীতিক নিপুণতা ও অলংকরণের সংযমী প্রয়োগ : এই দুইয়ের সুমিত সমন্বয়ে তাঁর গান বিশিষ্ট।

স্বপন সোম

শিশুদের আশ্চর্য অরকেস্ট্রা

সেন্ট জন্স চার্চে এমনিতেই যেতে বেশ ভাল লাগে। কলকাতার সৃষ্টিকর্তা চারনক যেখানে শুয়ে, কলকাতাবাসীদের সেখানে যেতে কেনই বা ভাল না লাগবে? কিন্তু এই দু-শ' বছরের পুরনো চার্চে যখন হান্ডেল বা ভিভাল্দির সঙ্গীত বেজে ওঠে তখন মনে হয় আমরা যেন এক অন্য জগতে চলে গিয়েছি।

জুন মাসে অকসফোর্ড মিশনের থিয়োডোর মাথিশন যে কনসারট আমাদের শোনালেন এই সেন্ট জনস চার্চে তা আমি চট করে ভুলব না। মাথিশন কলকাতায় নতুন নন। প্রায় ১৯৪৮ সাল থেকে তিনি কলকাতায় আছেন। দলে দলে সঙ্গীত বাদক তৈরি করেছেন ও নিজে কনডাকটার ও চেলো বাদক হিসাবে অনেক কনসারট আমাদের উপহার দিয়েছেন। কিন্তু সেদিন মাথিশনের এক নতুন রূপ দেখলাম। উদ্দাম উৎসাহে তিনি আবার একটি নতুন অরকেস্ট্রা সৃষ্টির কাজে নেমেছেন। সেদিন তার সঙ্গে যারা বাজাল তাদের বয়েস বেশির ভাগ দশের নিচে। মাথিশানের কনডাকটিং দেখে আমার মনে হল যে শিশু পাখিদের তাদের বাবা মা যেভাবে আকাশকে চিনিতে শেখায় ঠিক তেমনি ভাবে থিয়োডোর মাথিশন এই শিশুগুলিকে বাখ, ভিভাল্দি অথবা আলবিনিনির সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়ে দিচ্ছেন। শিশু হলে কি হবে, তারা আলবিনিনি ও ভিভাল্দি বা হাণ্ডেলের বারনিস ওভারচার যেভাবে বাজাল তাতে মনে হল যে মাথিশন এই শিশু-কিশোরদের

থিয়োডোর মাথিশনের পরিচালনায় শিশুদের অর্কেষ্ট্রা

ছনে যথেষ্ট সময় দিয়েছেন।
াদের বাজনার মধ্যে চর্চার অভাব
ল না।
ামার আলবিননিটাই সবচেয়ে ভাল
গেছে। এই কাজটি একটি স্ট্রিং
রকেস্ট্রা ও অরগ্যানের জন্য লেখা।
রগ্যান বাজালেন নোয়েল সেন।
াশ্চর্য হয়ে গেলাম এই বাজনা
নে। মনেই হল না কয়েকজন
শ-বারো বছরের শিশু-কিশোরেরা
াজাচ্ছে। ভিভালদির কনচেরটো ও
াখের কনচেরটোও বেশ সুরে বেজে
ঠল। আনকোর হিসেবে ওরা
বাজাল হাণ্ডেলের 'বারনিস' ওস্তাদচার। আশা করছি এবং শুধু আশা নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস অকসফোরড মিশানের এই শিশু অরকেস্ট্রা আমাদের অনেক আনন্দ দেবে। সেন্ট জনসের দুশ' বছর পূর্ণ হবার জন্য এই কনসারটের আয়োজন করা হয়েছিল। পুরাতনকে অভিনন্দিত করল সঙ্গীতের নতুন যুগের অরকেস্ট্রা। জোর চারনক যদি শুনে থাকেন তাহলে খুশিই হয়েছেন নিশ্চয়ই।

কিশোর চট্টোপাধ্যায়

থিয়েটার-এর অনেক প্রতিভা। একটি যুগ পার হয়ে গেলেও, দর্শক এখনও প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেন। একটা যুগের মধ্যে অনেক কিছু বদল হলেও নাটকটি এখনও আকর্ষণীয়। হয়তো নাট্যকার মনোজ মিত্র ও নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তীর প্রবীণ অভিজ্ঞতার ফসল বলেই এই স্থায়ীত্ব।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

তিয়াসা মিটিয়ে

'তিয়াসার' বার্ষিক অনুষ্ঠানে দর্শকের তিয়াসা মিটেছে, উদ্যোক্তাদের মিটেছে কিনা জানা নেই। রবীন্দ্রসদনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কবি অরুণ মিত্র জানালেন, আঞ্চলিক প্রতিভার অভাব নেই, তাঁদের দিয়েই অনুষ্ঠান করে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলা যায়। এই গড়ে তোলার জন্য সুস্থ অনুষ্ঠান দেখাটাও জরুরী। আমরাও বিশ্বাস করি, প্রতিটি অঞ্চলেই প্রতিভার অভাব নেই। কিন্তু সপ্রতিভতার অভাব আছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই অনুষ্ঠানের ঘোষণায়।
প্রথমপর্বে গান শোনালেন শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায়। শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায়কে আগন্তুক শিল্পী বলা যাবে না ; কারণ ইতিমধ্যেই তাঁর বেশ কিছু গান রেকর্ডে প্রকাশিত। শ্রীনন্দার গানে একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। ইদানীংকালে যেমন শিল্পীদের বিভিন্ন ঘরানায় ভারাক্রান্ত হতে দেখা যায়, তিনি সেই রকম নন। দ্বিতীয়ত, তাঁর বৈশিষ্ট্য খোলা গলায় গান গাওয়া। রেকর্ডে সব গানে তিনি প্রাণবন্ত নন, হয়তো নির্বাচনের জন্য। কিন্তু এই আসরে তিনি যে ক'টি বর্ষার গান গাইলেন, তার সব ক'টিই প্রাণ ঢেলে গাওয়া। সেগুলি গানই। স্বরলিপি আবৃত্তি নয়। সত্য হয়ে ওঠে 'আমার অঙ্গে সুর তরঙ্গে ডেকেছে বান'। কোন কোন গানে কেউবা নিষ্প্রাণ, কেউবা ছন্দের প্রলোভনে উচ্ছল। দেবব্রত বিশ্বাসের অক্ষম অনুকরণে বিপদ ডেকে আনেন। শ্রীনন্দা গেয়েছেন একাকী বর্ষার অনুভব নিয়ে। অনেক গানে কেউবা ছন্দের প্রলোভনে আসর জমানো গান করে গেলেন, কেউবা বিলম্বিত লয়ে শুধু দীর্ঘশ্বাস স্থায়ী করে গেলেন। শ্রীনন্দা এক্ষেত্রেও সজাগ সীমান্তরক্ষী। 'পুব হাওয়াতে দেয় দোলা' গানটিতে অনেক সময় মীড়ের অপরিমিতি অহেতুক করুণ করে তোলে। শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায় সেক্ষেত্রেও পরিমিত। এই অনুষ্ঠানে গান শোনার পর মনে হয়, শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায়ের গান নির্বাচনের সময় সেই গানই বাছা উচিত, যে গান তাঁর হৃদয়ের অনুভব, তবেই সেই গান সকলের হৃদয় ছুঁতে পারে। একজন শিল্পী যাঁর সম্ভাবনা আছে, তাঁর প্রথম থেকেই গান নির্বাচন সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে শ্রীরঙ্গম প্রযোজনা করলেন, 'নরক গুলজার'। ১৯৭৬ সালে থিয়েটার ওয়ার্কশপ এই নাটক প্রথম প্রযোজনা করেন। এর পর বোধ হয় পাড়ার ক্লাব, মফস্বলের থিয়েটার সব জায়গাতেই এই নাটকের প্রযোজনা হয়েছে। অতঃপর 'ওয়ান ওয়াল' ফর্মে এই প্রযোজনা। এবারে শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে, শ্রীলা মজুমদার, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, নির্মল ঘোষ, দুলাল লাহিড়ী, অশোক মিত্রের মত পেশাদারি মঞ্চের শিল্পীর সঙ্গে গ্রুপ

শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায়

কঙ্কণার বার্ষিক অনুষ্ঠান

উত্তর কলকাতার অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা কঙ্কণার সপ্তম বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে দুদিনব্যাপী এক আকর্ষণীয় সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল নজরুল ইসলামের গান এবং দ্বিতীয় দিনে 'ভিন্ন স্বাদের গান' শিরোনামে বিচিত্র গানের সম্ভার।
প্রথম দিনটিতে যে-সব শিল্পী নজরুল গীতি পরিবেশন করলেন তাঁদের মধ্যে প্রবীণ এবং জনপ্রিয় রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার মিত্রের কথা বাদ দিলেও এমন একজনও ছিলেন না যিনি মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার অনুপযুক্ত, এই বিষয়টি বর্তমান প্রতিবেদকের কাছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে। তৃপ্তি সেনের কণ্ঠে দুটি গান অকৃত্রিম গায়নভঙ্গি ও উচ্চারণের স্পষ্টতায় উজ্জ্বলন্ত—যদিও মন্দ্রসপ্তকে কণ্ঠস্বর আরো পরিচ্ছন্নতা দাবী করে। শ্যামলী সেনের 'পরাণ প্রিয় কেন এলে অবেলায় যেমন আবেদনে গভীর তেমন 'ফিরিয়া যদি সে আসে' ক্রিয়াপরতায় প্রাণবন্ত—স্মরণীয় নিবেদন। সুরঞ্জনা বসুর গান আঙ্গিকগত নৈপুণ্যে নিখুঁত হয়েও আবেদন সৃজনে অসম্পূর্ণ। তাঁর 'র' এবং 'ড়'-র উচ্চারণ বিভ্রান্তিকর। এ বিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। তাঁর কণ্ঠের তানগুলিতে সাবলীলতার অভাব।
কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় চমৎকার গেয়েছেন। সুরঋদ্ধ চর্চিত কণ্ঠ। তাঁর গাওয়া তিনটি গানের মধ্যে গজল

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্গের 'কেন দিলে এ কাঁটা'-য় তুলনামূলকভাবে বিশেষ মাত্রা যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। কঙ্কণা মিত্রের কণ্ঠের উপযোগী গান নির্বাচন

শ্যামলী সেন

তাঁর অনুষ্ঠানসাফল্যের সহায়ক হয়েছে। 'কথা কইবে না বউ মান করেছে' গানের গায়কীটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। 'কেন আসিলে'-র লয়ের মজাটিও ধরেছেন এবং প্রকাশও করেছেন সাবলীল ভঙ্গিতে। যথেষ্ট প্রত্যাশা জাগালেন তিনি। সুস্মিতা গোস্বামীর গাওয়া তিনটি গানের মধ্যে 'শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে' গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে রণিত হল। এমন গান শুনলে মুগ্ধ হতেই হয়। এখানে সুর তাল ছাপিয়ে প্রাপ্তির ঘরে আরো কিছু জমা পড়ে। এদিনের আসরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিলেন কঙ্কণার প্রাণপুরুষ সুকুমার মিত্র। ন খানি গান করলেন ভিন্ন রসের। গানগুলি প্রধানত রাগাশ্রয়ী। নজরুল ইসলামের এইসব গানে তিনি একটি বিশেষ রসসৃষ্টি করতে সক্ষম হন। মেঘ রাগে নিবদ্ধ 'এসো হে সজল' জৌনপুরীতে 'মম মধুর মিনতি শুন' বা ছায়ানটে 'শূন্য এ বুকে'-এসব গানে অনায়াসে একটি বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেন তিনি। সুকুমার মিত্রের গানে পেশাদারী নৈপুণ্যও আছে কিন্তু পেশাদারী কৃত্রিমতা নেই—এখানে তিনি স্বমহিম। অতিথি শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর, স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কয়েকটি ভিন্ন

রস্যগ্রাহী নজরুলগীতি পরিবেশন করে তৃপ্ত করেন।

দ্বিতীয় দিনের আসরে শিল্পী সংখ্যা ছিল অত্যধিক। দেবল মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে নজরুলগীতি দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা। এঁর গানের মধ্যে আন্তরিকতা আছে কিন্তু তারসপ্তকে কৃত্রিম কণ্ঠস্বরচালনা গানের মাধুর্য নষ্ট করে। মৌসুমী বিশ্বাস দুখানি ভজন পরিবেশন করলেন। কণ্ঠ তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা না করায় তাঁর গান তেমনভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারেনি। অর্চনা বসুর কণ্ঠে দুখানি নজরুল গীতি মোটামুটিভাবে চলনসই। স্বপ্না হালদার দুখানি আধুনিক গানে প্রাণ ভরিয়ে দিয়েছেন বললে অত্যুক্তি করা হবে না। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা নীতা সেনের সুরে বাঁধা 'আজো বসন্তে' প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন সাবলীল গায়ন ভঙ্গিমায়। সুকুমার মিত্রের সুরে গাওয়া গানটিও উল্লেখযোগ্য পরিবেশন। সুকুমার মিত্রেরই সুরে সুদেষ্ণা ভট্টাচার্যের গাওয়া গজল অত্যন্ত আকর্ষণীয় তবে এর গানে যতখানি গভীরতা তারচেয়ে বেশি প্রদর্শনভঙ্গি, দৃষ্টিকটু। তৃপ্তি মিত্র দুখানি গান পরিবেশন করলেন। চৈতী রায় চলনসই। ভাস্বতী বিশ্বাসের কণ্ঠের গজল গান উল্লেখযোগ্য পরিবেশন—সুরকার সুকুমার মিত্র। পৃথা গুপ্তর কণ্ঠের তিনখানি গানের মধ্যে আধুনিক গানটি স্বাতন্ত্র্য দাবী

সুস্মিতা গোস্বামী

করে। নজরুল গীতি পরিবেশন করলেন দেবাশিস সরকার। তাঁর কণ্ঠস্বরটি বেশ আকর্ষণীয়। শম্পা ঘোষ গজল পরিবেশন করলেন। সন্ধ্যাশ্রী মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দর ভজন পরিবেশন করলেন। অপূর্ব গায়নভঙ্গি। ভজন গানের ভক্তিভাবটি অক্ষুণ্ণ ছিল বরাবরই। উচ্চারণে সামান্য ত্রুটি আছে যা সংশোধনের অপেক্ষা রাখে। অনুষ্ঠান অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় শেষ দু-একটি গান শোনার সুযোগ হয়নি। সামগ্রিকভাবে কঙ্কণার অনুষ্ঠান থেকে প্রাপ্তি : সুরকার সুকুমার মিত্রের একটি পূর্ণ পরিচয়। শিক্ষক সুকুমার মিত্রের কৃতির সামগ্রিক মূল্যায়ন। একজন সৃজনশীল শিল্পীশিক্ষকের এর চেয়ে আর কি পাওয়ার থাকতে পারে? কঙ্কণার সাংগঠনিক শৃঙ্খলার জন্যও তাঁরা বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

সুভাষ চৌধুরী

'যাত্রাপথের আনন্দ গান'

শৈলজারঞ্জন মজুমদার

তাঁকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখেছিলেন : 'বিজ্ঞানের রসায়ন রাগরাগিণীর রসায়নে/ পূর্ণ হলো তোমার জীবনে'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এসসি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী তিনি, নামজাদা আইনজীবীর পুত্র হিসেবে তাঁকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রথমে বেছে নিতে হয়েছিল ওকালতি পেশা। কিন্তু তারপরই পট পরিবর্তন। আমন্ত্রণ পেয়ে চলে এসেছিলেন একদিন শান্তিনিকেতনে রসায়ন পড়াতে, ক্রমশ রবীন্দ্রসংগীতের প্রত্যন্তে প্রবেশ, আর তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। এইভাবেই একদিন তিনি হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম সংগীতগুরু—শৈলজারঞ্জন মজুমদার। ৮৭ বছর পূর্ণ হল তাঁর এ-বছরের ৪ঠা শ্রাবণে। সেই জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে মিলিত হয়েছিলেন তাঁর ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য সংগীতরসিক মানুষজন শিশির মঞ্চে। মঞ্চ উন্মুক্ত হতেই চোখ পড়েছিল পেছনের পর্দায় যেখানে লেখা ছিল : 'জন্মদিন এল তব আজি/ ভরি লয়ে সঙ্গীতের সাজি...'। বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই জন্মদিনের কবিতাটি উপহার দিয়েছিলেন।

তাঁর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের সম্মেলক কণ্ঠে বেদগান 'তমীশ্বরাণাং' দিয়ে সেদিন অনুষ্ঠানের শুরু। অতঃপর 'সুরের গুরু দাও গো সুরের দীক্ষা' পাঠ করে শোনালেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর দীপ্ত দরাজ কণ্ঠে—ভঙ্গীতে। সঙ্গে সঙ্গেই এল এর গীতিরূপটি সমবেত কণ্ঠে। তারপর শৈলজাবাবুকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, মায়া সেন, অরবিন্দ বিশ্বাস, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, গোরা সর্বাধিকারী প্রমুখ এবং রবিরঞ্জনী ও সুরঙ্গমা সংগীত সংস্থা। কথায় শ্রদ্ধা জানালেন নিমাইসাধন বসু ও দেবীপদ ভট্টাচার্য। তাঁদের বক্তব্য জুড়ে ছিল শৈলজাদা আর রবীন্দ্রসংগীতেরই কথা। 'বাংলাদেশের অজস্র মানুষের ভালবাসা শ্রদ্ধা নিয়ে এসেছি এই অনুষ্ঠানে' : বললেন বাংলাদেশের শ্রীওয়াহিদুল হক। আর বাংলাদেশের 'জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন পরিষদ', 'ছায়ানট' প্রভৃতি সংস্থা প্রেরিত শ্রদ্ধাবনত চিঠিও তিনি পড়ে শোনালেন। জন্মদিনে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন শান্তিদেব ঘোষ। গুরুকে প্রণাম নিবেদন করেছেন আর একটি চিঠিতে সুচিত্রা মিত্র। চিঠি পাঠিয়েছেন অজিত পাঁজা, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও। চিঠিগুলি পাঠ করলেন অমলেন্দু সাঁই। অমিতা ঠাকুরের পাঠানো স্মৃতিচারণমূলক চিঠিটিও পড়ে শোনানো হল।

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসংগীতে এম মিউজ-এ প্রথম স্থানাধিকারীকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতি পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন শৈলজাবাবু। পুরস্কারটি দেওয়া হল অতঃপর গানে-গানে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ।

মায়া সেন গেয়েছিলেন 'হৃদয়বাসনা পূর্ণ হল'। আমাদের হৃদয়ও পূর্ণ হয়েছিল, তৃপ্ত হয়েছিল। আবেদন ছিল অরবিন্দ বিশ্বাসের গানে। নিরাভরণ সহজরূপে এল কমলা বসু 'হৃদয় আমার প্রকাশ হল'। নীলোৎপল সাধ্য, মহীউজ্জমান চৌধুরী কিংবা বুলবুল ইসলাম : বাংলাদেশের এই তিন শিল্পীর গানে কিছু দুর্বলতা থাকলেও আন্তরিকতায় ঘাটতি ছিল না। প্রসাদ সেন বড় মগ্ন হয়ে গেয়েছিলেন : 'আজি গোধূলিলগনে এই বাদল গগনে'। আর এই পটভূমিকায় তারপর এল 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে' নীলিমা সেনের কোমল কণ্ঠ ছুঁয়ে। 'এসে দাঁড়াল আমাদের হৃদয়ে। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন 'সঘন গহন রাত্রি'—সেও শ্রুতিরম্য একক গানের পর শৈলজাবাবু স্বল্প ভাষণে ছাত্রছাত্রী ও উপস্থিত সকলকেই তাঁর অন্তরের শুভেচ্ছা জানালেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে শিখেছিলেন তিনি 'পথহারা তুমি পথিক', গানটি গাইতে বললেন মঞ্চের শিল্পীদের, এমনকি শ্রোতাদেরও। শ্রোতৃআসনে উপবিষ্ট কনক দাশ, অরুন্ধতী দেবী, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখরাও গলা মেলালেন। এরপর গীত হল একইভাবে 'তুমি খুশী থাক' ও শেষে 'আমাদের শান্তিনিকেতন'। পরিসমাপ্তি ঘটল মিলন সন্ধ্যার।

স্বপন সোম

না ট ক

হাঁসজারু

কোনো কোনো গল্পের মৌল চরিত্রটি জমা থাকে তাঁর পাঠ্যরূপের মধ্যেই অর্থাৎ সুখপাঠ্য বলতে যা বোঝায় তাই-ই। বোধ হয় তেমনই একটি গল্প সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'সোনার বালা'। গল্পটির মধ্যে কৌতুকের যে আভা ছড়িয়ে আছে তা সম্প্রতি তপন থিয়েটারে নাট্যালয় প্রযোজিত নাট্যরূপে একেবারেই ধরা পড়েনি। খুবই সমতল চেহারা পেয়েছে। নাট্যরূপকার ও নির্দেশক প্রদীপ সাহা দ্বিতীয় ভূমিকাতেও সফল হতে পারেননি। তারিফযোগ্য কোনো মুহূর্তই তৈরি হয়নি নাটকটিতে। শ্রীসাহার অভিনয়ও বিশ্বাসযোগ্যতার কাছাকাছি পৌঁছয়নি। প্রদীপ মুখোপাধ্যায় ও চিত্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়খুব চেঁচামেচি করে অভিনয় করেছেন এবং দেখে মনে হচ্ছিল রিহার্স্যাল বিশেষ হয়নি। স্কুলে পড়া না পারা ছাত্রের মতই আচরণ ছিল তাঁদের।

দ্বিতীয় নাটকের নাম 'মোনালিসা'। এটির কাহিনী, নাট্যরূপ, নির্দেশনা

ং প্রধান চরিত্রে অভিনয় করার ছিল প্রদীপ সাহার। নায়ক রূপোপজীবিনীর বাড়িতে এসে ভালোবাসা চায়, কারণ সম্প্রতি প্রেমে ব্যর্থ হয়েছে। তারপরে সে রূপোপজীবিনীটির অর্থাৎ নাটকের নায়িকার গলা টেপে। তারপর মদ্যপান হয় ও পরস্পরে অতীব দুঃখে নিজেদের দুঃখের কথা বলাবলি করে। এর মধ্যে একটাই চমক হল ২৭ লক্ষ টাকার লটারী পেয়েছে। কাহিনীটি কত সালে লেখা এরকম প্রশ্ন উঠে পড়লেও কাহিনীকারকে স্বয়ং মূল চরিত্রে অভিনয় করতে দেখে অবশ্যই তা ঘুমিয়ে পড়ে। বাস্তবে সহজে না হলেও মঞ্চের মাতালরা প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় সহজেই। এদিক থেকে দেখলে এই নাটকে শ্রীসাহা অভিনয়ে কিছুটা সার্থক। সঙ্গীতা বন্দোপাধ্যায় অতি অভিনয়ে দড় কিন্তু স্বাভাবিক অভিনয়ের পাঠ তাঁকে আরো কিছুদিন নিতে হবে। দুটি নাটকের ক্ষেত্রেই আলো আবহ ও মঞ্চসজ্জা অনেক পেছনে পড়ে আছে। নাট্যালয় দলটির পোস্টার ঘোষণায় লক্ষ্য করা গিয়েছিল চিত্রাভিনেতা ও চিত্রাভিনেত্রীকে চিহ্নিত করে দেওয়ার প্রবণতা, আবার প্রযোজনার অপটুত্ব দেখে কমার্শিয়াল থিয়েটারের দলভুক্তও করা গেল না—তাই এই গোষ্ঠীটির যে ঠিক কোন জায়গায় অবস্থান সেটাই আগে তাঁদের ঠিক করে নেওয়া দরকার।

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

যদি

রবীন্দ্রসদনে কারেন্ট থিয়েটারের "যদি কোনদিন" প্রযোজনা যে-কোন মানুষকেই ভাবাবে নানা দিক দিয়ে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের অমানবিক অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। প্রত্যেকেরই সচেতন থাকতে হবে, আগামী পৃথিবীতে যেন কোনদিন ইতিহাস পুনরাবৃত্ত না হতে পারে। 'যদি' শব্দটাই গোলমেলে। এরকম শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রযোজনার জন্য সমীর মজুমদারকে অভিনন্দিত করা যেত, যদি কিছু বিদেশী নাটক এবং বাংলায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের "দ্বীপের রাজা" নাটক আগে না লেখা হত। প্রত্যেকের অভিনয় ক্ষমতা আছে, তবে প্রায় সবটাই দত্তক নেওয়া। নরম্যান ফ্রাস্কের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেন, তার মুদ্রাদোষ, ভুল শব্দ ব্যবহারে হাসির যোগান দেওয়া,—সবই উৎপল দত্তের প্রযোজনার ফরমুলা। সমীর মজুমদার নির্দেশক বা নাট্যকার হিসাবে গল্পের সাসপেন্স বজায় রাখতে পেরেছেন। কিন্তু গোলমাল অন্য জায়গায়। সমীর মজুমদার যাত্রার সঙ্গেও যুক্ত। যদি থিয়েটারের মধ্যে যাত্রা আক্রমণ না করত, তবে প্রযোজনায় অন্য মাত্রা যোগ হত। প্রথমেই টাইটেল মিউজিকের সঙ্গে ঘোষণা, যাত্রার ইঙ্গিত দেয়। যাত্রা এবং থিয়েটার দুই মাধ্যমেরই ভালো মন্দ আছে। কিন্তু যদি মাত্রাবোধ না থাকে তবে উভয় ক্ষেত্রেই বিপত্তি ঘটতে পারে। হ্যারি ব্রাউনের ভূমিকায় সমীর মজুমদার চুটিয়ে অভিনয় করেন, কিন্তু কোন সময়েই ফেলে আসা দিনগুলোকে মুছতে পারেন না। সেই দিনগুলি যদি সুবর্ণ অধ্যায় হয়ে থাকে, তবে অবশ্য ভোলা শক্ত। সুলতা চৌধুরীর মত অভিনেত্রী খুব কম আছেন। সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি চলাফেরা করেন। প্রতিটি ডিটেলের কাজে, নিচু স্বরে কথা বলায় তাঁর আভিজাত্য স্বপ্রকাশ। কিন্তু যেই তিনি চিৎকার করেন, তখন তিনি কদর্থে যাত্রাশিল্পী। সতীকান্ত ঘোষ, নিখিল ভট্টাচার্য কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধারায় অভিনয় করেন। যদি সর্বতোভাবে অভিনয় প্রথার কোন ঋণ স্বীকার না করতে হত, তবে প্রযোজনার মান বাড়তে পারতো আরও। অন্য নারী চরিত্রও যখন-তখন যদি চিৎকার না করতেন তবে প্রত্যেক চরিত্র আলাদা হয়ে উঠত।

বিমল দেব একজন শক্তিশালী অভিনেতা হয়েও ক্রমশ কমেডিয়ান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর অভিনয় ও সংলাপে যদি তিনি বিশেষ শব্দে জোর না দিতেন তবে একঘেয়েমি আসত না।

সমীর মজুমদার ও সুলতা চৌধুরী

যদি টেলিফোন ধরবার পরেও বেজে না যেত, যদি বিকৃত চেহারা মানেই "উদ্ধার" পরিবর্তিত সংস্করণ না হোত, যদি কুকুরের মাংস খাওয়ার প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা না থাকতো এবং যদি প্রায় সর্বক্ষণ আবহ না বাজত, তবে টেকনিক্যাল কাজ একটি উদাহরণ হয়ে থাকতে পারত। অবাক করে দিয়েছেন বাহাদুর খাঁ। তিনি সম্পূর্ণ অন্য রাজ্য জয় করেছেন। যদি তিনি রিদ্‌ম বক্সের ব্যবহার অত বেশি না করতেন তবে অন্য মাত্রায় সঙ্গীত চিহ্নিত হতে পারত। গিটার সহযোগে প্রশান্ত পালের গান অপূর্ব। সাম্প্রতিককালে এইভাবে গানের দক্ষ প্রয়োগ প্রায় অভাবনীয়। আমরা 'কারেন্ট থিয়েটার'-এর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতাম যদি মঞ্চসজ্জা, নেপথ্য গান বা মূল কাহিনীর কাছে উৎসভূমি এবং ব্যবহৃত বিদেশী গানের কথাগুলি দেওয়া থাকত। একবার পরিচিত "ওয়ান তানা মেরা" গানটির প্রয়োগ ভাল লাগে। তাপস সেনের আলোকসম্পাতে মুডটাকেই ধরতে চাওয়া হয়েছে বেশি। বিস্ফোরণের সময়, পিছনে সমুদ্রের ঢেউয়ের জায়গায় শুধু বিস্ফোরণের আভাস, পরিমিতির প্রশংসনীয় নজির। প্রথম থেকে মঞ্চ দেখে মনে হয়েছিল, বোধ হয় কিছু আলোর খেলা দেখা যাবে, কিন্তু তাপস সেন আক্ষরিক ভাবে শিল্পী তাই ম্যাজিক করতে চাননি। 'কারেন্ট থিয়েটার'-এর প্রযোজনা, তার বিষয় বৈশিষ্ট্য, প্রয়োগ নৈপুণ্যে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা, কিন্তু গোল বাধায় অনেকগুলি "যদি"।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

ন ৃ ত্য না ট্য

নবরস এবং

শিশির মঞ্চে 'হৃদিরঞ্জন'-এর সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল একক রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যনাট্য। প্রথমার্ধে একক রবীন্দ্রসঙ্গীত । আশিস সেনগুপ্তের রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনে একটা সৌখিন ভাব আছে। গলাটি তাঁর ভাল। তবে উচ্চারণে চাই আরও পরিচ্ছন্নতা ।আর স্বরলিপি নির্দেশিত হসন্তযুক্ত-ওকারান্ত উচ্চারণ নিয়েও কিছু গণ্ডগোল আছে। যেমন-'আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল' গানে অন্তরায় 'যূথীর বনে' এবং আভোগে 'সকল ভুলি' ওকারান্ত উচ্চারণ করলেন। স্বরলিপি অনুযায়ী 'যূথীর কিংবা 'সকল' উচ্চারিত হওয়া উচিত হসন্তযোগে। সময়টা তখন সজল ঘন মেঘের, সঘন বর্ষার। সুতরাং গৌতম মিত্রের চয়নে ছিল কয়েকটি বর্ষাকেন্দ্রিক রবীন্দ্রসঙ্গীত । মূল সম্পদ তাঁর মাধুর্যময় কণ্ঠস্বর। কিন্তু পাশাপাশি রয়েছে কিছু অবাঞ্ছিত প্রবণতা এবং দুর্বলতা। যেমন : অল্পস্বল্প ট্রেমেলো, একটু আড়ে গাওয়া কখনও বা আবার অতি নাটকীয়তা। ফলত কণ্ঠলাবণ্য থাকা সত্বেও সব রবীন্দ্রসঙ্গীত সমান ভাবে রসোত্তীর্ণ হয় না। তবু তারই মধ্যে উল্লেখযোগ্যতা পেয়ে যায় সেদিন 'মোর ভাবনারে' কিংবা 'যেতে দাও গেল যারা'। সঙ্গী তবলা মাঝে-মধ্যেই অসংযমী। 'বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে' গানে পর্যায়ক্রমে তবলা ও খোল বাজল। কোন নতুন মাত্রা যোগ হলকি ? রুমেলা মিত্রের একক নৃত্য সহযোগে সম্মেলক সংগীত 'সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি' গানে সকলের কণ্ঠ ছাপিয়ে গৌতম মিত্রের কণ্ঠ বেশি শোনা গেল যদিও তিনি ছিলেন নেপথ্যে । নৃত্যটি মন্দ নয়। এ সময় আবার এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখা গেল। মঞ্চের সামনে রাখা একটি মেশিন থেকে হঠাৎ রঙীন বুদবুদ বেরোতে শুরু করল। এতে নৃত্য দৃশ্যের কি সৌন্দর্যবৃদ্ধি হল কে জানে!

নৃত্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চেয়েছেন 'হৃদিরঞ্জন', আর তারই ফলশ্রুতি নৃত্যনাট্য-'নবরস'। এক নৃত্য-শিক্ষার্থিনী সুতকণার নৃত্যকলাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করার কাহিনী নৃত্যনাট্যটির উপজীব্য। নৃত্যনাট্যে বিভিন্ন রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহৃত। মোটামুটি ভাবে সুনির্বাচিতই বলা চলে। তবে নেপথ্য গান-পরিবেশন সবক্ষেত্রে আশানুরূপ নয়। সংগীত-পরিচালক গৌতম মিত্র সম্ভবত মাইক্রোফোনের বড্ড সামনে ছিলেন, তাঁর 'গহন ঘন ছাইল' ভয়ানক কানে লাগল। মোটামুটি পরিচ্ছন্ন শর্মিষ্ঠা রায়, উৎপলা বসুর গান। কৌশিকী মজুমদার চলনসই ।অন্যান্য একক গান

পরম কৃতিত্ব অর্জন আমাদের লক্ষ্য...সেবা আমাদের প্রতিশ্রুতি

৩১শ-তম বার্ষিকীতে এলআইসি নতুন ক'রে জাতির প্রতি সেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

“জীবন-বীমা ভারতের মুখ্য সরকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর লক্ষ্য হবে ব্যক্তিগত সেবার সাথে সাথে সরকারকেও সাহায্য করা। লাভের থেকেও সেবার দিকটায় বেশী প্রাধান্য দেওয়া হ'চ্ছে।”

জওহরলাল নেহেরু
২৪শে আগষ্ট ১৯৫৬

জীবন-বীমা,জাতির জীবনে প্রাণ সঞ্চার করে।
লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

অনুল্লেখ্য। সম্মেলক গান দুটিও নয় তেমন উজ্জ্বল। নৃত্যাভিনয়ে শুরু (সঞ্চিতা দাস) সাবলীল। মন্দ নয় নটরাজ (সুতপা গুপ্ত)। সুতকণাবেশী মৌরী মজুমদার নৃত্যে পটু ও চরিত্রানুগ। একক নৃত্যে শর্মিষ্ঠা দে প্রশংসনীয়, বাকীরা মোটামুটি একটা মান রক্ষা করেছেন। সম্মেলক নৃত্যে সবাই সমান স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। ভাষ্যপাঠে সুবীর মিত্র অগ্রগণ্য, মোহবিস্তারী তাঁর কণ্ঠ। পাশে ঝুমা চ্যাটার্জী সাধারণ। যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন রঞ্জন মজুমদার, বিষ্ণু সাধুখাঁ, ঘনশ্যাম পাইন প্রমুখ। কাহিনী ও নৃত্যনাট্য পরিচালনা মীরা দাশগুপ্তের। নৃত্যনাট্যরূপ দিয়েছেন বাসন্তী বাগচী।

স্বপন সোম

গিয়েছিলেন পার্থসারথি চৌধুরী। আবৃত্তিকারের সঠিক ভূমিকাটি এই সন্ধ্যায় কী হওয়া সঙ্গত, অকপটভাবে ব্যক্ত করলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। শক্তিকে নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'আমি এসেছি কবিতা শুনতে।' এই সন্ধ্যায় প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকাটি ভুলে-ভরা। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ নেই শক্তির গ্রন্থপঞ্জীতে। 'মিষ্টি কথায় বিষ্টিতে নয়।' 'দাঁড়াবার জায়গা' ও 'এই তো মর্মরমূর্তি'। আর-একটা ব্যাপারও বিস্ময়জনক। শিশির মঞ্চ এমনিতেই ছোট প্রেক্ষাগৃহ। সেই প্রেক্ষাগৃহেরও এত দর্শক আসন খালি রইল কেন?

প্রণব মুখোপাধ্যায়

আ বৃ ত্তি

কবির পাঠে কবিতা

অনেকদিন বাদে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি সন্ধ্যার আয়োজন হল। উদ্যোক্তা, আবৃত্তিলোক। উপলক্ষ, সংস্থার দ্বাদশবর্ষপূর্তি। মূল পরিকল্পনাটা চমৎকার ছিল। একক কবিতাপাঠ আর সেই সঙ্গে নিজস্ব কবিতার নির্মাণ, উৎস ও কাব্যভাবনা প্রসঙ্গে কবির স্বকথন। উদ্যোক্তারা কেন যে এর উপরেও রেখেছিলেন অন্য কণ্ঠে শক্তির কবিতাপাঠের আয়োজন, বোঝা দায়। এর কোনও দরকারই ছিল না। শক্তিকে দম নেবার অবসর করে দেওয়া যদি একটা কারণ হয়, তাহলে, বিরতি দিলেই বেশি ভাল হত। এমন কি, তিনবার বিরতি দিলেও মহাভারত অশুদ্ধ হত না। কেননা, এই জাতীয় অনুষ্ঠানে শ্রোতারা একটু খোলামেলা, ঢিলেঢালা ভাবটাই আশা করেন। তার বদলে এ সন্ধ্যায়, মাঝে-মধ্যেই দম-আটকানো পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, বিশেষত শক্তির কবিতার কবিকৃত অকৃত্রিম ভাষ্যের পাশাপাশি যখন চলছিল অধ্যাপক-সুলভ ব্যাখ্যায় কবির জীবনচেতনা, মৃত্যুচেতনা, প্রেমচেতনা এইসব নিয়ে তত্ত্ব শোনাবার চেষ্টা। প্রশ্নোত্তরের জন্য নির্ধারিত ছিল কিছু সময়।

সাধারণ শ্রোতারা প্রশ্ন করবেন, শক্তি যথাসাধ্য উত্তর দেবেন, এটাই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু মঞ্চে বসেই তাপস বসু—যাঁর উপর ভার ছিল সূত্রধারের পোশাকে মুখ্যত ঘোষণার—বেশ লাগসই উদ্ধৃতি সহযোগে প্রশ্ন ছুঁড়তে শুরু করলেন। ব্যাপারটা একইসঙ্গে কৃত্রিম, গম্ভীর ও অসঙ্গত মনে হচ্ছিল। যাঁর নিজেরই এত প্রশ্ন, তিনি কেন কবির সঙ্গে একাসনে? ধর্মে ও জিরাফে যুগপৎ না থেকে শ্রোতাদের আসনে নেমে এলেই ভাল দেখাত। কেননা, তিনিই 'শ্রোতাদের' প্রশ্ন করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

অথচ শক্তি বেশ ভাল বলছিলেন সেদিন। 'ঘোর' ব্যাপারটার ব্যাখ্যা যে-ভাবে করলেন তিনি, তা মুগ্ধ বিস্ময়ে শোনার মতো। কবিতাও কম শোনাননি। তিন পর্বে ভাগ করে নিয়েছিলেন কবিতাপাঠের আয়োজন। 'হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য', থেকে 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান' থেকে 'সুন্দর এখানে একা নয়' এবং শেষ পর্বে 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব' থেকে 'এই তো মর্মরমূর্তি'। কিছু কাব্যগ্রন্থ সময়াভাবেই বাদ গেছে। তাতে খুব-একটা ক্ষতি হয়নি। বরং, উল্লেখযোগ্য যে, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এ-সন্ধ্যায় 'অবনী বাড়ি আছো'র মতো 'অবশ্য' কবিতাও বর্জন করেছিলেন। প্রথম দিকের লেখা সম্পর্কে তাঁর আবেগ যে কমে এসেছে, পাঠেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। 'সে বড়ো সুখের সময় নয়...' থেকেই শক্তির কণ্ঠে জমছিল প্রার্থিত আবেগ। শেষ 'একা গেল' পর্যন্ত তা বজায় ছিল। 'প্রাককথন'-এ শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর সামগ্রিক একটি মূল্যায়ন ভারী সহজ ও অন্তরঙ্গভঙ্গিতে করে দিয়ে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বি বি ধ

পাঠভবনের রজতজয়ন্তী

উদো আর খোকা

'পাঠভবন' বিদ্যায়তন পঁচিশ বছর পূর্ণ করল। প্রতিষ্ঠাদিবসের উৎসব পালিত হল রবীন্দ্রসদনে। প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তিনি বললেন, এখানে যাঁরা শেখান এবং যারা শিক্ষার্থী, দু-তরফেরই নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও আন্তরিকতার সমন্বয়ে এই প্রতিষ্ঠান বড় হয়ে উঠেছে। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাই যে শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত, রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতের উল্লেখ করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বললেন, দেখতে হবে, শিক্ষা যেন পড়ুয়াদের কাঁধে বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। বিদ্যার দেবী সরস্বতী, হংস তাঁর বাহন। হংসের মতোই সার ও অসারকে আলাদা করে চিনতে হবে, তবেই শিক্ষা সার্থক।

সম্মেলক কণ্ঠের 'সবারে করি আহ্বান' গানটি দিয়ে এই সকালের অনুষ্ঠান সূচনা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এক পর্বে ছোটরা মঞ্চস্থ করল 'হযবরল'র নাট্যরূপ। শেষ পর্বে ছিল জর্জ বার্নার্ড শয়ের 'পিগম্যালিয়ান' অবলম্বনে নাটক—'মাই ফেয়ার লেডি', ইংরেজী বিভাগের নিবেদন। সুকুমার রায়ের জন্মশতবর্ষে 'হযবরল' মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনাটাই প্রশংসার যোগ্য। ছোটরা সকলেই যে খুব অবাক করার মতো অভিনয় করেছেন তা নয়, তবু সূক্ষ্ম কৌতুকরসে জারিত সংলাপের সুবাদে আদ্যন্ত বজায় ছিল স্বতঃস্ফূর্ত সরসতা। দু-একজন ক্ষুদে অভিনেতা অবশ্য খুবই জবরদস্ত। যেমন, হিজিবিজবিজ। তার 'সাংঘাতিক রকম' হাসির দীর্ঘ রেশ ও অভিনয়, সাবলীল নৈপুণ্যের পরিচায়ক। কাক ও বিড়ালকেও ভাল লেগেছে। কম্পোজিশন চমৎকার, পোশাক পরিচ্ছদও চোখ-টানা। আবহসঙ্গীতে মাত করে রেখেছিল ছাত্র-বাজিয়েদের দলটি। হলে 'কাক্কেশ্বর কুচকুচের হ্যান্ডবিল বিতরণের পরিকল্পনাটিও অভিনব। 'মাই ফেয়ার লেডি', সময়াভাবে, সবটা দেখা হয়নি। কিন্তু যেটুকু দেখেছি, বেশ পরিণত মনে হয়েছে।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার

প্রমথ চৌধুরীর সবুজ পত্রের প্রভাবে আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যে সবুজগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল। এই সবুজবাদী যুগের অন্যতম লেখক ছিলেন অন্নদাশঙ্কর, কালীচরণ, বৈকুণ্ঠনাথ, সচ্চিদানন্দ কবিলেখকের দল। নব্য প্রতীকীবাদ ও বৈপ্লবিক চেতনার এক নতুন ধারা এনেছিলেন রাউথ রায়। ব্রিটিশ আমলে বেশ কয়েকবার আগুনঝরা লেখার জন্য এবং স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব নেবার অভিযোগে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

এ বছর ১৯৮৬ সালের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাচ্ছেন ওড়িশার অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক ডঃ সচ্চিদানন্দ রাউথরায়। সচী রাউথরায় বাঙালী কাব্যানুরাগীদের কাছে সুপরিচিত হয়েছিলেন চল্লিশের দশকে তাঁর বাজী রাউত গ্রন্থটির সুবাদেই। অনেকেরই মনে আছে নিশ্চয় যে ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত তাঁর বাজী রাউত বইটির প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষ হবার আগেই বঙ্গানুবাদের তিনটি সংস্করণ বেরিয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের তরুণ শহীদ বাজী রাউতের জীবনআখ্যান অবলম্বনে লিখিত এই মর্মস্পর্শী কাব্যকাহিনীটি বাঙালীর মনপ্রাণকে সেদিন প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য আর এক বিশিষ্ট কবি এবং নাট্যকার, উত্তরজীবনে স্মরণীয় অভিনেতা, (সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা) হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সে সময়ে এই গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন।

আধুনিক ওড়িয়া কবিতার অগ্রদূত সচী রাউথরায়ের জন্ম ওড়িশার খুরদায়, ১৯১৬ সালের ১৩ মে তারিখে। তাঁর বাবা ছিলেন পুরী জেলার অন্তর্গত খুরদার খ্যাতনামা আইনজীবী। সচীবাবু পনের বছর বয়সেই কিছুকালের জন্য পড়াশোনা স্থগিত রেখে জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ওই সময়েই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পাথেয়' প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত রাউথরায় ১৯৩৯ সালে কটকের র‍্যাভেনশ কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ব্রিটিশ আমলে তিনি বেশ কয়েকবার তাঁর আগুনঝরা লেখার জন্যে এবং স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব নেবার অভিযোগে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'রক্তশিখা' ১৯৩৯ সালে তৎকালীন সরকার বাজেয়াপ্ত করে। ওই গ্রন্থের ছাপাখানাটিরও জরিমানা হয় এক হাজার টাকা। রাউথরায় ওড়িয়া, বাংলা এবং ইংরেজী এই তিন ভাষাতেই পারদর্শী এবং তিন ভাষাতেই লিখতে শুরু করেছিলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। তাঁর কলমটি বহুমুখী। কবিতা ছাড়াও ছোটগল্প, উপন্যাস এবং সমালোচনা-গবেষণামূলক নিবন্ধের জন্যও তিনি সুবিদিত এবং জনপ্রিয় হয়েছেন। ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে একটা সময়কালকে রাউথরায় পর্ব বলা হত। কলকাতার এক বিখ্যাত বস্ত্রশিল্প সংস্থা কেশোরাম কটন মিলসের একজিকিউটিভ অফিসার ছিলেন দীর্ঘকাল।

স্বাধীন দেশের সরকার তাঁকে সোসাল সার্ভিস সেমিনারে যোগ দেবার জন্যে ১৯৫২ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠান। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, শ্যাম, শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে ভ্রমণকালে বহু সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং সাহিত্যিকের আন্তরিক অভিনন্দন পেয়েছিলেন তিনি। ১৯৪৫ সালে অন্ধ্রের গোল্লাপল্লীর জমিদার কন্যা শ্রীমতী ভূদেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়।

১৯৬২ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ১৯৬৪ সালে সাহিত্য অকাদেমি এবং ১৯৬৫ সালে সোভিয়েত ল্যান্ড পুরস্কার পেয়েছিলেন শ্রীরাউথরায়। ১৯৬৮ সালে রাউরকেলায় তাঁকে 'মহাকবি' উপাধি দেওয়া হয়।

ওড়িয়া ভাষায় তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাথেয় (১৯৩২), পূর্ণিমা (নাটক ১৯৩৩), প্রেম ও পানীয় (রচনা ১৯৩৫), চিত্রাঙ্গদা (উপন্যাস ১৯৩৬), অভিযান (কবিতা ১৯৩৮), পল্লীশ্রী (কবিতা ১৯৪০), রক্তশিখা (কবিতা ১৯৩৯), বাজী রাউত (১৯৪২), পাণ্ডুলিপি (কবিতা ১৯৪৭), মতিরা তাজ (ছোটগল্প ১৯৪৭), ভানুমতীর দেশ (কবিতা ১৯৪৮), অভিজ্ঞান (কবিতা ১৯৪৯), ছাই (ছোটগল্প ১৯৪৯), হসন্ত (হাসির কবিতা ১৯৪৯), আধুনিক ওড়িয়া কবিতা ও উপাধী বিচার (প্রবন্ধ ১৯৫১), সাগরতলের ঢেউ (উপন্যাস), তলে মাটি উপরে আকাশ (উপন্যাস)।

বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সচ্চিদানন্দের প্রাথমিক প্রেরণা এসেছিল স্বভাবতই তাঁর পিতার জীবন থেকে। বাবা প্রসন্নকুমার ছিলেন এক কট্টর কংগ্রেস নেতা। কবিখ্যাতি ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের নজরও তাঁর দিকে পড়তে যাচ্ছে এই আশঙ্কায় ১৯৩৪ সালে সচ্চিদানন্দ মাইগ্রেসন সার্টিফিকেট নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইন্টারমিডিয়েট পড়তে সিটি কলেজে ভর্তি হন। কলকাতায় বসেই তিনি চিত্রাঙ্গদা উপন্যাসটি লেখেন এবং প্রকাশ করেন তারপর পরীক্ষার ঠিক আগের রাত্রে এক ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হন এবং নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় পরের সকালে সোজা জেলখানা থেকে পরীক্ষার হলে পৌঁছান। আই এ পাশ করার পর বি এ পড়তে কটকে ফিরে যান। প্রমথ চৌধুরীর সবুজ পত্রের প্রভাবে আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যে সবুজগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল। এই সবুজবাদী যুগের অন্যতম লেখক ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, কালীচরণ, বৈকুণ্ঠনাথ, সচ্চিদানন্দ প্রমুখ কবিলেখকের দল। নব্য প্রতীকীবাদ ও বৈপ্লবিক চেতনার এক নতুন ধারা এনেছিলেন রাউথ রায়।

বাংলা ও বাঙালীর সঙ্গে ডঃ রাউথ রায়ের সম্পর্ক কেবল প্রতিবেশীসুলভ সৌজন্যে আবদ্ধ নয়। অন্তরঙ্গ সহোদরের মতই। কলকাতা শহর তাঁর বহু রচনার শুধু অন্তর্বর্তী প্রেরণামাত্র নয়, জন্মস্থানও বটে। দশ বছর বয়স থেকে যিনি লিখতে শুরু করেছিলেন আজ তাঁর বয়স বাহাত্তর। এই দীর্ঘ ষাট বছরের সাহিত্য সাধনা তাঁকে এক সর্বভারতীয় সাম্যবাদী ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। তিনি বিশ্বাস করেন লেখক মাত্রেই দায়িত্ব ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটানো। ওড়িয়া আধুনিক সাহিত্যের পথিকৃৎ সচী রাউথরায়ের এই পুরস্কারে আমরা আনন্দিত।

সংক্রান্ত সংবাদ

প্রবাসী শিকড়ে দেশের মাটির র[illegible] পৌঁছে দিতে পারে একমাত্র জাতির ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। পারে সমাজের নিবিড় অনুষঙ্গে ভরা তার সাহিত্য। ইউরোপে-আমেরিকায় যাঁরা স্থায়ী অথবা অস্থায়ী ভাবেও বসতি পেতেছেন তাঁদের জীবনে পশ্চিমী রোদবৃষ্টিবাতাসের তলায় চাই সেই নিগূঢ় জীবনরস, সেই চিরন্তন আত্মচৈতন্যের ধারা যা জাতীয় বৈশিষ্ট্যে অবিকৃত থাকার শক্তি যোগাবে। যে নিঃশ্বাস, যে মাতৃভা[illegible] তাঁরা বুকে এবং মুখে করে নিয়ে গিয়েছিলেন এখান থেকে তার অবিচ্ছেদ সঞ্জীবন কত জরুরী এক[illegible] তাঁরা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। আমাদের এক প্রবাসিনী প্রতিবেদি[illegible] অনামিকা গুপ্ত এরকমই একটি স্মরণ-উদ্‌যাপনের খবর পাঠিয়েছে[illegible] পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গ থেকে। "১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসের চল্লিশতম পুনরাগমন উপলক্ষ্যে সবিতা রায়ের পরিচালন[illegible] হামবুর্গের ইন্ডিয়ান-কালচারাল ফোরাম 'সংস্কৃতি' পরিবেশন করে[illegible]

...রতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ...তিহাস সমকালীন ও সময়োপযোগী ...ান ও কবিতা সহযোগে। এক ঘন্টা ...া কিছু বেশী সময়ের সংক্ষিপ্ততায় ...থারীতি ইতিহাসও সংক্ষিপ্ত। পর ...র বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পর্যায়গুলো ...্য়ে ছুঁয়ে যাওয়া।
...দেশ চেতনার প্রথম উন্মেষ ...ঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠে' অ্যাংলো ...ণ্ডিয়ান সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ...ন্ন্যাসী ভবানন্দের কণ্ঠে যে 'বন্দে ...াতরম গান, তাই দিয়ে অনুষ্ঠানের ...চনা।
...াধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ...টভূমিকার আলোচনায় বিশেষভাবে ...ান পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'ওদের ...াঁধন যতই শক্ত হবে', 'বিধির বাঁধন ...াটবে তুমি এমন শক্তিমান', 'যদি ...তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে ...কলা চল রে'। বিদ্রোহী কবি ...জরুলের 'কারার ওই লৌহকপাট ...ভেঙে ফেল কররে লোপাট'। ...জনীকান্ত দাসের 'বন্ধন ভয় তুচ্ছ ...রেছি', আজাদ হিন্দ ফৌজের ...খ্যাত গান 'দিল্লী চল' ও 'কদম ...দম বাঢ়ায়ে যা' ইত্যাদি মোটামুটি ...টি দেশাত্মবোধক গান।
...তিহাসিক গ্রন্থনায় ছিলেন সূর্য বসু ...ঙ্গীতাংশে ছিলেন সবিতা রায়, গৌরী ...খোপাধ্যায়, তপন সেন ও দেবব্রত ...য়।
...দের উদাত্ত জোরালো ও ...ন্দর গান পরিবেশন শ্রোতাদের ...শপ্রেমে অনুপ্রাণিত করেছে। ...বলায় সহায়তা করেন সৌমব্রত ...য়।

...তিহাসিক গ্রন্থনা জার্মান ভাষায় ...বং প্রত্যেকটি গানের আগে জার্মান ...নুবাদ দেবার ফলে জার্মান ...শ্রাতাদের কাছে অনুষ্ঠানটি খুবই ...র্মগ্রাহী হয়েছে।
...ব শেষে ভারতের ইতিহাসে ...র্বজাতি সমন্বয়ের ঐতিহ্যকে স্মরণ ...রে রবীন্দ্রনাথের 'ভারত তীর্থ' ...বিতাটি আবৃত্তি করলেন অমল ...খোপাধ্যায় ও সম্মিলিত কণ্ঠ।

...াধীনতা সংগ্রামের খ্যাত অখ্যাত ...গণিত শহীদদের স্মৃতিতে উৎসর্গিত ...নুষ্ঠানটির প্রারম্ভে এক মিনিট ...রবতা পালন করা হয়— ...রণসাগর পারে তোমরা অমর, ...তামাদের স্মরি', সামগ্রিকভাবে ...নুষ্ঠানটি 'সংস্কৃতি' সংস্থাকে তার ...মের যোগ্য করে তুলতে ...রেছে।"

প্রিয়তম নবী

শিশির দাস ডায়মণ্ডহারবার স্কুলের শিক্ষকতা করেন। আদর্শবাদী মানুষ। প্রথম জীবনে সমাজজীবনের বৈষম্য তাঁকে পীড়িত করত।
স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হলেন সাম্যবাদে। পার্টিও করেছেন বহুদিন। মার্ক্সবাদে আস্থা থাকলেও বর্তমানে আর সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেন না। যুবসমাজের নৈতিক অবনতি এবং মানুষে মানুষে ধর্ম নিয়ে হানাহানি তাঁকে আহত করে বেশি করে। তিনি মনে করেন পরধর্মসহিষ্ণুতার অভাবের কারণ অপরের ধর্ম সম্পর্কে নিজেদের অজ্ঞতা। তাই তিনি নিজে উদাহরণ সৃষ্টির জন্য ইসলাম ধর্ম নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন চর্চা ও আলোচনা করে আসছেন। তাঁর বিশ্বাস ভারতবাসী যদি বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে পড়াশুনা করে তাতে ধর্ম নিয়ে বিরোধের অবসান ঘটবে। এর দ্বারা অনৈক্যের অবসান ঘটিয়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো সম্ভব। ধর্মের ব্যাপারে তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণের কারণ তাঁর পিতৃদেব। পিতা জগন্নাথ দাস বাবাজী ছিলেন একজন সাধক মানুষ। তিনি ছিলেন বর্ধমানের মানুষ। শিষ্যদের আগ্রহে পরবর্তীকালে ডায়মণ্ডহারবারে এসে বসতি স্থাপন করেন। সাধক পিতার গভীর প্রভাব আছে শিশিরবাবুর উপর। ইসলাম ধর্ম নিয়ে চর্চার ফলে এই ধর্মের কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল। ইসলাম একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। হিন্দু ধর্মও তাই—'একমেবাদ্বিতীয়ম নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান ও মননই হিন্দু ধর্মের বিধান, মূর্তিপূজা অবিধেয় মূর্খতা'। তিনি মনে করেন ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধ্যানগৃহ থাকবে। যেখানে থাকবে না কোন মূর্তি, ছবি ইত্যাদি কিছু। যে কোন সম্প্রদায়ের মানুষ

সেখানে ধ্যানমগ্ন থাকবে। এর দ্বারা ভারতের আত্মা আবার উদ্বোধিত হবে। 'ঔপনিষদিক ভারতবর্ষ জ্ঞানে-শক্তিতে নবভারতে পুনরুজ্জীবিত হবে।'
ইসলাম ধর্ম নিয়ে চর্চার ফলশ্রুতি হিসেবে হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর একটি প্রামাণ্য জীবনী রচনায় হাত দিয়েছেন। সম্প্রতি তাঁর রচিত 'প্রিয়তম নবী' (১ম খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য এটিকে মৌলিক সৃষ্টি না বলে, লেখকের ভাষায় বলতে হয় যে, গ্রন্থটি হচ্ছে 'উদ্ধৃতির সমষ্টি'। তাঁর কৃতিত্ব কেবল 'অসংখ্য উদ্ধৃতির মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় কথাগুলি বেছে নিয়ে সজ্জিত করায়।' এই গ্রন্থের উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন মূলত পবিত্র কোরান ও বোখারী শরীফ থেকে। অবশ্য এই দুই গ্রন্থ অবলম্বনে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) -এর জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায় না বলে সীরাত ও তারিখ গ্রন্থেরও সাহায্য নিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিশিরবাবু কিন্তু আরবী ভাষা জানেন না। তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে মূলত বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ইসলামী ধর্মগ্রন্থের বাংলা অনুদিত গ্রন্থের উপর।
মূল জীবনী শুরু করার আগে ভূমিকা হিসেবে আরবের ভৌগোলিক বিবরণ, তৎকালীন আরবের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় অবস্থার কথা বিবৃত করেছেন। এরপর জীবনী শুরু হয়েছে। প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে নবুয়ত (ঈশ্বর প্রাপ্তি) লাভ ও ইসলামের পরিচয়ে। একটি বিরাট কাজ করেছেন শিশিরবাবু। এর জন্য তিনি সাধুবাদ পাবেন সর্ব সম্প্রদায়ের মানুষের কাছ থেকে। মৌলবী গিরীশচন্দ্র সেন যে ধারা সৃষ্টি করেছিলেন, শিশিরবাবু তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরী। কেশবচন্দ্র সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বধর্মসমন্বয়ে বিশ্বাসী ভাই গিরীশচন্দ্র কঠোর পরিশ্রমে আরবী ভাষা শিক্ষা করে এবং ছ'বছরের পরিশ্রমে (১৮৮১-৮৬) করেন কোরান শরীফ অনুবাদ। তাঁর জীবিতাবস্থায় বইটির তেরোটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এর দ্বারা বইটির জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়। শতবর্ষ পরে শিশিরবাবুর 'প্রিয়তম নবী'ও অনুরূপ জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। পরবর্তী খণ্ডটির জন্য সকলেই আমরা অপেক্ষায় থাকব। গুপ্ত

'আর্তের সেবাকারী যতক্ষণ পর্যন্ত আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন না করে, সে পর্যন্ত সে বেহেশতের মধ্যে মধ্যে চলতে থাকে।' —হাদীস (মুসলিম)

'যে ব্যক্তি নিজে পেট ভরে আহার করে শুয়ে থাকে, কিন্তু তার নিকটেই তার প্রতিবেশী অনাহারী অবস্থায় পড়ে থাকে, সে ব্যক্তি আমার উপর ঈমান আনে নাই।' —হাদীস (তেবরাণী)

'মিষ্টভাষী হওয়া দান-খয়রাত করার সমান ছোয়াবের কাজ।' —হাদীস (বোখারী)

রসসিক্ত মনোজাত মনসিজ

গৌতম নিয়োগী

আপন মনের মাধুরী মিশায়ে/ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত/
বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ/ কল-১৭/৩০·০০

ইতিহাসের কারবারী হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের আসর-জাগার পালা বরাতে জুটেছে অনেকবার। মনে পড়ে শৈল শহরে তেমনি এক সান্ধ্য জিন-জলাশ্রয়ী আলোচনার আঙিনায় আমাদের কয়েক বন্ধুর আলোচ্য ছিল বাংলায় রম্য-রচনা, এবং আমি ঐ ক্ষেত্রে দ্বিধাহীনভাবে আমার প্রিয় তিন লেখককে বেছে নিয়েছিলুম ; সৈয়দ মুজতবা আলি, নিরঞ্জন এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। রমণীয় রচনার বরণীয় লেখক এই তিনজন বেছে নেওয়ার অর্থ আর কেউ প্রিয় নন তা নয়। প্রিয় অনেকেই—আমার মাস্টারমশাই বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় থেকে আমার বন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত। তবু, রম্য-রচনার নামে লঘু থেকে লঘুতর হতে হতে জলজ স্রাব পর্যন্ত সাহিত্যস্রোতে যখন মিশেছে, তখন আলি সাহেব, নিরঞ্জনবাবু এবং ইন্দ্রজিতের কথাই যেন প্রথম মনে হয়। আর বুদ্ধি, রম্য বা রমণীয় রচনার প্রত্যেকে লেখক নন, কেউ কেউ লেখক। আমরা যখন কৈশোর থেকে যৌবনে সাহিত্য পড়তে পড়তে বড়ো হলাম, সবে দু-চার বার দাড়ি কামিয়েছি তার আগে থেকেই হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশাই ইন্দ্রজিতের আসর বসিয়ে রসিক বাঙালিদের মাত করে দিয়েছেন। আমাদের ভাগ্য প্রসন্নই বলতে হয়, 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' আজও তিনি, এই বয়সে, আমাদের সামনে হাজির হন। তাঁর মন যা দেখে, মন যা শোনে, মন যা ভাবে তারই খানিকটা যখন মন থেকে উছলে পড়ে লেখার পাতায়, তাই দিয়ে ভরে নিই আমরা রসের পাত্রটি। বইটি প্রকাশ করে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ উপযুক্ত সম্মান করেছেন, তাদেরই বিদ্যায়তনের বরেণ্য অধ্যাপককে। বিশ্বভারতীর সহজ নিরাভরণ অথচ সুরুচিশীল ছাপার ব্যাপার সর্বজনবিদিত ; এই বইয়ের ক্ষেত্রেও সেই মান বজায় আছে। ভালো লাগলো সুবিমল লাহিড়ীকৃত প্রচ্ছদটি।
'মনোজাত মনসিজ' কথাটিও স্বয়ং হীরেন্দ্রবাবুর। নাতিদীর্ঘ 'নিবেদন' রচনায় তার কলমে স্বচ্ছন্দ স্বীকারোক্তি : "লোকে বলে রম্য-রচনা। আমি বলি মনোজাত মনসিজ। একের মন অপরের মন কেড়ে নেয়। অবশ্য রম্য-রচনা বা রমণীয় রচনা, নামটাও কিছু নিন্দনীয় নয়, রমণীদেহের ন্যায় এ-জাতীয় রচনাকেও আদরে সোহাগে—মনের মাধুরী দিয়ে—সাজিয়ে পরিয়ে নিতে হয়। সেজন্য কবির কাছ থেকে কথা ধার করে নিয়ে আমার রম্য রচনাকে উদ্দেশ করে বলেছি—আমি আপন মনের

মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা।"
এই বইতে একটা 'সূচী' যে কেন যুক্ত করা হলো না তা বোধগম্য হয়নি ; এমন তো হতেই পারে, হবেই, কোন রচনা কিছুদিন পরে আবার পড়বার ইচ্ছে, তখন বসে বসে পাতা ওল্টাতে হবে। আর একটা কথা। এই রচনাগুলি তো আগে ছাপা হয়েছে পত্র-পত্রিকায়, সেগুলির নির্দেশ দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপরিচয় দেওয়া যেতে পারত। হীরেন্দ্রবাবুর বই, তায় বিশ্বভারতীর ছাপা, সামান্য হলেও খুঁত থাকবে কেন ? বইয়ের স্পাইনে নাম ছাপা কি উচিত নয় এগারো ফর্মার বইতে ?
সূচী না থাকলেও গুণে দেখছি মোট একত্রিশটি রচনা রয়েছে বইতে। প্রথমেই 'রম্য-রচনা' শীর্ষক লেখাটিকে 'টাইটেল এসে' আখ্যা দেওয়া যায়। এই জাতীয় রচনা সম্বন্ধে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নিজস্ব একটি সংজ্ঞা আছে। তা হলো : নিজের মনের কথা, ভাবনা বা কল্পনাকে মনের মতো সাজিয়ে মূর্তি রচনা, অর্থাৎ 'মানস-সুন্দরী'। কবির কাছে যা কল্পনায় গড়া রূপসী নারীমূর্তি, ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পসরা সাজাতে ইচ্ছুক গদ্যকারের হাতে তাই হয়েও ঘাসের শিষ-এ শিশিরবিন্দুর মতো নিটোল রম্য-রচনা। এদের হাতে প্রকৃষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ যুক্তি তথ্য জাল ঠাসবুনুনির সামগ্রী হয়ে ওঠে না, হয় না পাণ্ডিত্যের বাহন, এদের লেখনী হালকা সুরে গভীর কথা বলে ফেলে। তবে সব ব্যক্তিগত প্রবন্ধই কিন্তু ফরাসী রম্য-রচনা গোত্রীয় নয়।
হীরেন্দ্রবাবু বলেন : "আমাদের দেশে এখন অসংখ্য ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে এদের মধ্যে যে-সব রচনা রসের বিচারে উত্তীর্ণ হবে তারাই একদিন রম্য-রচনা নামের অধিকারী হবে।" রচনা মাত্রেই যেমন রম্য-রচনা নয়, প্রবন্ধ মাত্রেই তেমনি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নয়—হীরেন্দ্রবাবুর এই যুক্তিও সঠিক। এই যেমন আমার প্রিয় প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু উজ্জ্বল ব্যক্তিগত রচনা লিখতে জানতেন কিন্তু রম্য-রচনাকার নন।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইয়োরোপীয় বিশেষত ইংরিজি সাহিত্যে পারঙ্গম, তাঁর ব্যুৎপত্তির ছটা প্রতিটি লেখায় উদ্ভাসিত, যদিও রসসিক্ত মন এবং আপন দৃষ্টিজাত সুষমা এক সৌন্দর্যরসে বিদ্যাকে জাড়িয়ে নিয়েছে। 'নাইটিঙ্গেলের গান' বা 'সেক্রেটারিয়েট টেবিল' প্রভৃতিতে তার পরিচয়। আমাদের সাহিত্যে ডক্টর জনসন তিনি হলেও হতে পারতেন তার প্রমাণ 'আমার জীবনচর্চা', 'আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথ', 'যা দেখেছি যা পেয়েছি' ইত্যাদি রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে। লঘুস্বরে হালকা হাসির অন্তরালে অনন্য রচনা 'হ্রস্বকুন্তলা'—আজকাল বধূ অমিতাই বা কোথায়, সুমুখে স্বর্ণমুকুর রেখে দীর্ঘ চিকুর কেই বা বাঁধে, তবু হীরেন্দ্রবাবুর পক্ষপাত স-কুন্তলাদের প্রতি। ভারি সুন্দর লাগে 'দু-আলমারি বই' কিংবা 'এ শুধু অলস মায়া'। বই সম্পর্কে এতো চমৎকার ব্যক্তিগত নিবন্ধ বাংলায় বিরল। প্রতিটি লেখা পড়তে পড়তে ভাবছি আজীবন রাবীন্দ্রিক লেখককে রবীন্দ্রনাথ কিরকম ইনফ্লুয়েন্স করেছেন। হয়তো এই ঋণ প্রতি বাঙালিরই থাকবে। আবার 'শূন্য গর্ভ কলকাতা' কিংবা 'পান্তির মাঠ' পড়ে পড়ে স্মৃতির শহরের পরিবর্তন নতুন করে হৃদয়ে অনুভব করি। একান্ত আপন দৃষ্টি সকলের দৃষ্টি হিসেবে ধরা পড়ে 'বানপ্রস্থ' বা 'কামিনীকাঞ্চন' রচনায়। দুর্দান্ত রচনা 'বাঙালির আড্ডা'। স্মরণ করতে পারি এটি 'দেশ' পত্রিকার 'আড্ডা' সংখ্যায় ছাপা হয়েছিলো এবং এই অনুষঙ্গে স্মরণ আরো করতে পারি সৈয়দদার (আলি) সেই প্রফেটিক ট্রুথ : বাঙালি কৃষিজীবীও নয়, শিল্পজীবীও নয়, বাঙালি আড্ডাজীবী। 'রমণী ও রমণীয় রচনা', 'প্রেম ও প্রেমালাপ' এক মেজাজের, যেমন একধর্মী 'জনসন'-এর লন্ডন ও 'ইন্দ্রজিতের কলকাতা' এবং 'সক্রেটিস, জনসন ও ইন্দ্রজিৎ'। এবং ইন্দ্রজিৎ জানেন 'জিহ্বাগ্রে যত সহজে কথা আসে লেখনীর অগ্রে তত আসে না'। আসে ইন্দ্রজিতের হাতে। যে ইন্দ্রজিতের জন্ম হয় ১৯৪৩-এ রূপদক্ষ বীরবলের সহায়তায় 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য়, কবি কান্তি ঘোষের সাহায্যে। সেই শুরু, আমাদের ইচ্ছে তা যেন শেষ না হয়। ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়ালে যুদ্ধ করতেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পূর্বপল্লীর নিভৃত গৃহে গুটিয়ে থাকুন না। ছদ্মনাম

নেওয়া তো ভালোই হয়েছিলো, নতুবা সুধীন দত্তের পিতৃদেব দার্শনিক প্রবর গুরুগম্ভীর প্রবন্ধকারের সঙ্গে তফাত বোঝা যেত না যে। অবশ্য 'শান্তিনিকেতনে একযুগ'-এর লেখক স্বনামেও মহীয়ান। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে প্রবন্ধকার নন, তা প্রমাণ করার জন্য প্রবন্ধ লিখতে থাকুন।

বাবুদের থিয়েটার

দেবাশিস দাশগুপ্ত

বাবু থিয়েটার/বিষ্ণু বসু/
প্রতিভাস/কল-২/ ১৮.০০

এমন কোনো বাঙালী আছেন, যিনি জীবনে মঞ্চে একবারও অভিনয় করেননি? একজন বলেছিলেন বাঙালী প্রবাসী হলে, সেই জায়গায় দুটি ব্যাপার ঘটবে—এক থিয়েটার, দুই কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা। সম্ভবত দর্শক হিসেবে বাঙালী নিজেকেই নানাভাবে দেখতে চায়—তাই থিয়েটার সে অগ্রাহ্য করতে পারে না। বিষ্ণু বসু 'বাবু থিয়েটার' নামে গ্রন্থে বাঙালীর আদি থিয়েটার নিয়ে আলোচনা করেছেন। এরকম আলোচনা খুব কম পাওয়া যায়। যদিও এই রচনাগুলি একটি পত্রিকায় পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত—ফলে শেষ করার তাগিদে, প্রথম দিকে যতটা সবিস্তার শেষ দিকে প্রায় ততটাই তথ্যের সালতামামি।

বই-এর নাম 'বাবু থিয়েটার' সঠিক ইঙ্গিত দিয়ে যায়। সতের শ পঁচানব্বই সালে লেবেদফ তাঁর বেঙ্গলী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করলেন পঁচিশ নম্বর ডোমতলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রীট)। ১৭৯৫ সালে চাল, তেল, ঘি-এর দাম কত ছিল? সেই তুলনায় কলকাতায় প্রথম থিয়েটারে টিকিটের দাম আট টাকা আর চার টাকা। তখনকার দিনে এক টাকার যা মূল্য আট টাকার থিয়েটারে নিশ্চয়ই বাবুরা যেতেন। দর্শকের ভিড় কিন্তু কমেনি। পরবর্তী কালে, এমন কি এই ১৯৮৭-তে ঐ দামের টিকিটে হল অনেক সময় ফাঁকা যায়। যদিও দশ টাকা এখন এক কেজি পটলের দাম। সেই সময়ে মাত্র দুটি অভিনয়ে মেয়েদের ভূমিকায় মেয়েরাই অভিনয় করেন। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হল হোরেস হেম্যান উইলসনের ইংরেজি অনুবাদে উত্তররামচরিতের কিছু অংশ এবং জুলিয়াস সীজার নাটকের পঞ্চম অঙ্ক। লেবেদফ নাটক করেছিলেন বাংলায় আর প্রসন্নকুমার ঠাকুর করলেন ইংরেজীতে। সেই সময় বাবুদের সেইটাই রেওয়াজ। বেলেঘাটায় রাজবাড়িতে সেদিন বাবু থিয়েটার জমজমাট। এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো, সেখানে ছিল আর এক বাবু নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ি। তিনি বিদ্যাসুন্দর অভিনয় করলেন। এই অভিনয়ের নানা মজাদার ঘটনা লেখক দিয়েছেন।

ইংরেজ প্রথম এসেছিল ভারতের দক্ষিণে। অথচ ভারতবর্ষে বাঙালী প্রথম গ্রহণ করল ইংরেজের থিয়েটার। বাঙালীবাবুদের সম্পর্কে নানারকম কাহিনী শোনা যায়। যার মধ্যে অমিতাচার, অপব্যয়ের কেচ্ছাকাহিনীই বেশি, কিন্তু পাশাপাশি বাবুদের যদি নেশা না থাকত, তবে আজ হয়ত থিয়েটারকে এভাবে পেতাম না। বিদ্যাসুন্দর মঞ্চস্থ করতে নবীনচন্দ্র বসু প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। প্রায় দুই তিন লাখ টাকার ঋণ। পায়রা ওড়ানোর চটকদার কাহিনীগুলোর পাশে এই কাহিনীগুলো অনুচ্চারিত থেকে যায়। আর একটি জিনিসের সূচনা হল—যাঁরা বারনারী, প্রত্যেকের ঘৃণার পাত্র, তাঁরা নতুন প্রেরণা পেলেন। এর উদাহরণ বাংলা মঞ্চে বারবার দেওয়া যাবে। এখানকার থিয়েটার হয়তো শ্রেণিসংগ্রামে উজ্জীবিত করতে চায়, কিন্তু থিয়েটারের প্রথম থেকেই যে বিপ্লব ঘটেছিল সেটা নিয়ে আমরা খুব কম ভাবি। বিচিত্র চরিত্র বাবুদের।

দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত মাতৃশ্রাদ্ধে খরচ করেন দশ লক্ষ টাকা—আর তাঁর নাতি রাধাকান্ত দেব (পোষ্যপুত্রের সন্তান) এক দিকে সতীদাহ রোধের বিরোধী, ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়নের নায়ক, আবার হিন্দু ছাত্রদের শব-ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে অগ্রণী। দুটি ভিন্ন মেরু একই সঙ্গে কাজ করতে থাকে। যিনি আট খণ্ডের শব্দকল্পদ্রুম লিখে যান চল্লিশ বছরের পরিশ্রমে, তিনি শোভাবাজারে নাটকও করেন। যিনি সতীদাহের পক্ষে, তিনি অভিনেত্রী-অভিনেতাদের কঠোর মহলা দিয়ে অভিনয় প্রযোজনা করেন। যিনি ডিরোজিওকে তাড়ান, তিনি পরিচালনার জন্যে ডেকে আনেন সাঁসুসি থিয়েটারের ম্যানেজার সস্ত্রীক মিঃ ব্যারিকে। ১৮৫৩ সালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্ররা চাঁদা তুলে 'ওথেলো' অভিনয় করলেন। চাঁদা উঠল আট শ টাকা। সম্ভবত চাঁদা তুলে এই প্রথম থিয়েটার হল। বাবুদের থিয়েটার নিশ্চয় অনুপ্রাণিত করেছিল, নইলে চাঁদা তুলে ছাত্ররা থিয়েটার করার কথাই বা ভাববে কেন? কেননা সেইসময় ফূর্তি করার নানারকম ব্যবস্থা ছিল। 'হরকরা'য় একটি মন্তব্য' "এ রাতের জন্য দেসডিমোনার ভূমিকায় মহিলা সেজেছিলেন এক যুবক, কিন্তু তিনি 'ওথেলো' ছাড়া কারো হাতেই খুন হননি।" ওরিয়েন্টাল থিয়েটার উঠে গেল, দল ভাঙাভাঙিতে। ঠিক বর্তমানে যেভাবে দল ভাঙে সে ভাবে নয়—বরঞ্চ পরবর্তী সময়ে দল ভেঙেছে, ব্যক্তিগত রেষারেষিতে। ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ভেঙে যায় একটি বিতর্ক নিয়ে, নাটক ইংরেজিতে হবে না বাংলায়? আদর্শগত মতান্তরে। তখন স্বাদেশিকতার উন্মেষ ঘটেছে—কে বলে নাটক সমাজের বা চেতনার দ[…] নয়।

অনেক দিন পর্যন্ত কেউ কাপ্তেনি করলে বলা হত 'সাতুবাবু, লাটুবাবু'। এই সাতুবাবু অর্থাৎ আশুতো[…] দেব মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষের সময় টাউন হলের মিটিং[…] দিয়েছিলেন এক লক্ষ টাকা, হিন্দু কলেজের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা, কাশীতে মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য সোয়া দুই লক্ষ টাকা। সব মিলিয়ে যা দানের পরিমাণ, সে যুগের অর্থমূল্যের হিসাব ধরলে এ যুগের বোম্বাই চিত্রতারকাদের নিয়ে 'হোপ '৮৬'র অর্থমূল্যকে ছাড়িয়ে যাবে। তাঁর নিজের শ্রাদ্ধে খ[…] হল পাঁচ লক্ষ টাকা। এই সাতুবাবুই বাড়িতে নন্দকুমার রায়ের অনুবাদে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' অভিনয় প্রযোজনা করেন। সাতুবাবুর পৌত্র শকুন্তলার রানী বেশে সজ্জিত হলেন বিশ হাজার টাকার অলঙ্কার গায়ে দিয়ে। মজার ব্যাপার হল [...] বিশ হাজার সালঙ্কারা শকুন্তলার বিবরণ পাওয়া যায়। তপোবনে শকুন্তলার নয়। অর্থাৎ কোনোভাবে অর্থের অহমিকা উঁকি দেবেই। সেইজন্যই তৎকালীন বিবরণে জানা নয়, পোশা[ক] দেখে আসনের ব্যবস্থা করা।

মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যু হয় কালীপ্রসন্ন সিংহের। এই সামান্য বয়সের মধ্যে তিনি ব্যাসদেবের মহাভারতের অনুবাদের নেতৃত্ব দেন, নীলদর্পণ মামলায় এগিয়ে আসেন—এবং আরো অনেক কিছু বিস্ময় জাগায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভা। জোড়াসাঁকোয় বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে 'বেণী সংহার' বিক্রমোর্বশী—অভিনীত হয়। স্ত্রী ভূমিকায় অভি[নয়] করলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—পরবর্তী কা[লে] জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি।

পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপ সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিং[হ] বেলগাছিয়ার নাট্যশালায় স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের পরিক[ল্পনা] করলেন। সাহেব দর্শকদের জন্য রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরাজি অনুবাদের জন্য খোঁজ পড়ল মাইকেল মধুসূদন দত্তের। আ[...] দুএকজনের নাম উল্লেখযোগ্য—সঙ্গীত পরিচাল[নায়] মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ভাগ্যিস সাহেব দর্শকরা ছিলেন, তাই মধুসূদন এলেন। অনুবাদে[র] জন্য মধুসূদন পেয়েছিলেন পাঁচ শো টাকা। প্রথ[ম] দিনের অভিনয়ে খরচ দশ হাজার টাকা। গৌরদা[স] বসাকের কাছে চিঠিতে মধুসূদন লিখলেন, 'ওয়েস্টেজ অব মানি' প্রত্যেকে অবাক—রামনারায়ণের মত নাট্যকার। মধুসূদ[ন] চটজলদি জবাব। 'গ্রামার ইজ নট ড্রামা'। জে[...]

শে তিনি লিখে ফেললেন 'শর্মিষ্ঠা'। মধুসূদন
বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্যই লিখেছিলেন 'বুড়ো
শালিকের ঘাড়ে রোঁ', এবং 'একেই কি বলে
সভ্যতা'—কিন্তু বেলগাছিয়া নাট্যশালায় সে দুটি
অভিনীত হয়নি। দর্পণে নিজেদের চেহারা দেখে
হয়তো উদ্যোক্তারা আতঙ্কিত। মধুসূদন নিজেই
জানাচ্ছেন, "নাটক রচনার ব্যাপারে আপনারা আমার
ডানা ভেঙে দিয়েছেন।" এই সব দেখেই মনে হয়,
রাজারা নাটক থেকে কি চেয়েছিলেন—আনন্দ, না
আমোদ।
ঠাকুরবাড়ির দুটি শাখা—'পাথুরিয়াঘাটা ও
জোড়াসাঁকো। একেই কী বলে সভ্যতা
জোড়াসাঁকোয় অভিনীত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
নেতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথকে লিখছেন,
কবিত্বরসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ
করিয়াছে। নির্দোষ আমোদ আমাদের দেশের রসে
একটি অভাব তাহা এইপ্রকারে দূরীভূত হইবে।'
তাঁর আশা সঠিক। পাঁচ নম্বর বাড়িতে হিন্দু প্রথায়,
ছয় নম্বর ব্রাহ্মপন্থী। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক
নতুন হাওয়া। পরবর্তী ইতিহাস—সকলের জানা।
১৮৬৫ সালে নাট্যরচনার প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন
প্রকাশিত হয়। বিষয় হিন্দু মহিলা ও তাঁদের অবস্থা
ও অসহায়তা এবং গ্রাম্য জমিদারগণ—পাঁচ শো
টাকার পুরস্কার পেলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন।
রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার পাঠশালা এই
জোড়াসাঁকো থিয়েটারেই। বাংলা থিয়েটার যেন
দেওয়াল ভেঙে নতুন জানলা খোলা হল—হাওয়া
এল নব্যরীতির মঞ্চসজ্জায় সঙ্গীত ও অভিনয়ের।
পরবর্তী কালে পেশাদার মঞ্চে বিপরীত হাওয়া।
গিরিশচন্দ্র জনসাধারণের চাহিদা মনে রেখে অন্য
ধরনের নাটক করলেও ক্ষোভ ছিল। গিরিশচন্দ্রের
একটি আলোচনায় পাওয়া যায় "এগুলি থিয়েটার?
সম্রাট অশোক যে সিংহাসনে বসে, ঔরঙ্গজেবও
তাই। এখানে বীররস মানে চেঁচানো। প্রম্পটার
একবার চেঁচায়, অভিনেতা আর একবার
আসে—রাজার সাজ আসে পোটো পাড়া থেকে।
রাজা কাকে বলে দেখে আয় জোড়াসাঁকোর
থিয়েটারে। হাতে একটি পদ্ম নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
ঢোকেন—মনে হয় রাজদর্শন ঘটল।" মাত্র এক শ
ষোল পৃষ্ঠায় বিষ্ণু বসুর বাবু থিয়েটারের একটি
নিখুঁত মানচিত্র। একই সঙ্গে রাজনৈতিক,
অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক সব কিছুর খবর। ভূমিকায়
জানলাম, তিনি আরও দুইটি গ্রন্থ লেখায় উদ্যোগী
'সাহেব পাড়ার থিয়েটার' ও 'বাঙালী মধ্যবিত্তের
থিয়েটার'। আশা করি মানচিত্রটি সম্পূর্ণ হবে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

দিলীপকুমার মিত্র

হিস্টরি অভ মডার্ন বেঙ্গলি লিটারেচার/
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/
মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ/ কল-৭৩/ ৮৫·০০

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা রূপে
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ খ্যাতিমান।
বাংলাভাষায় রচিত এই গ্রন্থগুলি বাঙালী পাঠক
সমাজে বহুল পরিচিত। কিন্তু যাঁরা বাংলা ভাষা
জানেন না অথচ আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে
কৌতূহলী তাঁদের জন্য প্রামাণ্য ও সাহিত্য
বিশ্লেষণাত্মক একটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা সকলেই,
অনুভব করেন। সেদিক থেকে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়
রচিত History of Modern Bengali Literature
গ্রন্থটি একটি মূল্যবান কৃতি রূপে পরিগণিত হবে।
ইংরেজী ভাষায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অবশ্য
অনেক আগে থেকেই লেখা হয়ে আসছে।
কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১৮৩০ সালের The Calcutta
Literary Gazette-এ বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে
(রামমোহন পর্যন্ত) ইংরেজীতে প্রবন্ধ লেখেন।
সম্ভবত এটি ইংরেজীতে বাংলা সাহিত্যের প্রথম
আলোচনা। এরপর Calcutta Review পত্রে এ
সম্পর্কে ছোট-বড় অনেক আলোচনা প্রকাশিত
হয়েছিল। পরে রমেশচন্দ্র দত্ত ঈষৎ বিস্তারিত ভাবে
ইংরেজীতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক
পর্বের ইতিহাস লিখেছিলেন। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের
ক্ষুদ্র প্রবন্ধও উল্লেখ্য। এ যুগে অন্নদাশঙ্কর রায় ও
লীলা রায় বাংলা সাহিত্যের ধারা নিয়ে সংক্ষেপিত
আলোচনা করেছেন। ডঃ সুকুমার সেনের সাহিত্য
অকাদেমি প্রকাশিত History Of Bengali
Literature-এ একটু বিস্তারিতভাবে বাংলা
সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক কালের পরিচয়
আছে। য়ুরোপ থেকে ডঃ শুসান জবাভিটেল ও জে.
সি ঘোষ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন।
আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটিতে বাংলা সাহিত্যের
আধুনিক কালের (উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী)
আনুপূর্বিক বিবরণ ও রসগ্রাহী বিশ্লেষণ আছে যা
বিদেশী ও ভারতীয় সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে
সমাদৃত হবে।
গ্রন্থটি বিভিন্ন কারণেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এটি
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রামাণ্য ইতিহাস; শুধু
ইতিহাস নয়, সাহিত্য বিচার ও রস বিশ্লেষণ এতে
আছে। বাংলা সাহিত্যের অজস্র উদ্ধৃতি লেখক গ্রন্থে
দিয়েছেন—মূল বাংলা, রোমান হরফে তার লিপ্যন্তর
এবং ইংরেজীতে তার অনুবাদ যা নিঃসন্দেহে অতীব
মূল্যবান, এতে খ্যাতনামা লেখকদের অনেকগুলি
লিপিচিত্র মুদ্রিত আছে (দেবেন লাহার আঁকা
স্কেচগুলো সত্যিই সুন্দর)। বঙ্কিমচন্দ্রের
'বন্দেমাতরম' গানের ইংরেজী অনুবাদ এবং
রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা সহ 'জনগণমন
অধিনায়ক' গানের কবিকৃত ইংরেজী অনুবাদ ইত্যাদি
অনেক মূল্যবান দলিল এতে সংযোজিত হয়েছে।
এছাড়া বাংলাদেশের সাহিত্যের ওপর সংক্ষিপ্ত অথচ
নিপুণ বিশ্লেষণ এতে আছে। বইটির সুন্দর মূল্যবান
ভূমিকা লিখেছেন সাহিত্য অকাডেমীর সভাপতি
বিনায়ককৃষ্ণ গোকক।
বইটির সামান্য কিছু স্খলনও চোখে পড়ে।
পরিসরের স্বল্পতার জন্য সাম্প্রতিক লেখকদের
আলোচনা ঠিকমত হয়নি, অথচ এ বিষয়েই
পাঠকের আগ্রহ বেশী; লেখকদের জন্ম বা মৃত্যুর
তারিখ অনেক ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়নি; বেশ কিছু
বাংলা বইয়ের নামের ইংরেজী অনুবাদ নেই;
লেখকদের আরো কিছু ছবি থাকা উচিত ছিল।
আশা করি লেখক এ সম্বন্ধে অবহিত হবেন।
বইটির ছাপা বাঁধাই খুব ভাল। নিতান্তই ছাত্রপাঠ্য

বইয়ের দীনতা এর অবয়বে নেই। বিদেশী বইয়ের মতোই এর গ্রন্থন ও সাজসজ্জা। অথচ দাম সে তুলনায় বেশী নয়। প্রকাশককে এজন্য ধন্যবাদ। বইটির একটি পেপার ব্যাক সংস্করণ হওয়াও দরকার।
বইটি বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এক মূল্যবান সংযোজন। বাংলা সাহিত্যকথাকে ভারতীয় ও বিদেশী পাঠকদের কাছে তুলে ধরার এ প্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।

তারকা পরিচিতি

অরূপরতন ভট্টাচার্য

নক্ষত্র পরিচয়/ বিমান বসু/
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ/ কল-৯/১০.০০

বাংলাভাষায় নক্ষত্র সংক্রান্ত চর্চা সাম্প্রতিককালে যে বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে শান্তিনিকেতনে বসে জগদানন্দ রায় কিশোর উপযোগী নক্ষত্র পরিচয় বিষয়ে চিত্রবহুল একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। সেটির নাম 'নক্ষত্র চেনা'। তারপর থেকে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে দীর্ঘ এক সময়ের ইতিহাসে মহাকাশের বিভিন্ন তারকামণ্ডলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মত ছোট-বড় তেমন কোনো বই নজরে আসেনি, এমন কি ষাটের দশকে মহাকাশ যুগ শুরু হওয়ার কালেও নয়। অথচ বিদেশে বিভিন্ন ভাষায় তারকামণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, এমন গ্রন্থের সংখ্যা অনেক।
একেবারে দেশজ বিষয় ছাড়া বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমাদের মূলধন এবং অবলম্বন এই সব বিদেশী বই।
বর্তমানে বাজারে তারকামণ্ডল পরিচিতি বিষয়ে যে সব গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তারমধ্যে বিমান বসুর 'নক্ষত্র পরিচয়' কিশোর উপযোগী এ ধরনের অধিকতর তথ্যবহুল একটি গ্রন্থ।
শ্রীবসু কেন এরকম এক প্রচেষ্টায় ব্রতী হলেন? এ সম্পর্কে লেখক বলেছেন, 'এই চেষ্টায় যে অভাবটা সবচেয়ে বেশি মনে হয়েছে, তা হল উপযুক্ত গাইড বইয়ের'। বাজারে এ বিষয়ের একাধিক বই এখন পাওয়া যায়। তবে সে সব বইয়ের বেশির ভাগ সম্পর্কেই লেখকের ধারণা, এরা 'ভারতীয় ভূখণ্ডের অক্ষাংশে ব্যবহারের উপযোগী নয়।'
আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে, আকাশে যত তারা দেখতে পাওয়া যায় তাদের মোট ৮৮টি তারকামণ্ডলে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে ১২টি রাশি। এই সব তারকামণ্ডলকে চেনার জন্যে আকাশের মানচিত্র বা স্টার চার্ট আছে। গ্রন্থটিতেও কয়েকটি স্টার চার্ট সন্নিবেশিত হয়েছে।
সাধারণভাবে এই সব মানচিত্র অবলম্বনেই আকাশপটের বিভিন্ন তারকামণ্ডলের সঙ্গে কৌতূহলী আকাশ পর্যবেক্ষকদের পরিচয় ঘটে থাকে।
এই সব আকাশপটের সাহায্যে তারকামণ্ডলকে চেনার জন্যে প্রথমে তারকাপটটিকে উলটিয়ে মাথার উপরে তুলে ধরতে হয়—এই হল প্রথম কাজ, কিন্তু পটের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের মর্ত্যলোকের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম মেলে না। সেইজন্যে মাথার উপরে উলটানো তারকাপট ধরে মর্তের দিকের সঙ্গে তা মিলিয়ে নেওয়া দরকার। তারকামণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে এটি পরবর্তী কর্তব্য। এইভাবে না এগোলে সম্পূর্ণ তারকাপটের চিত্ররূপ অর্থহীন, তা কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ করে না।
লেখক অবশ্য তারকামণ্ডলের সঙ্গে এইভাবে পরিচয়ের ব্যাপারটাকে অসুবিধাজনক বলে উল্লেখ করে একটা সোজা পথের নির্দেশ দিয়েছেন। 'তা হল প্রথমে কয়েকটা বিশেষ তারামণ্ডল ভালভাবে চিনে নেওয়া এবং পরে সেগুলিকে কেন্দ্র করে বাকি তারামণ্ডলগুলিকে খুঁজে বের করা।' কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে এক একটি তারকামণ্ডল ধরে হোক বা তারকাপট অবলম্বনে সামগ্রিকভাবে হোক প্রচলিত পদ্ধতিতে দিক মিলিয়ে নেওয়া অতি অবশ্য প্রয়োজন। তা না হলে তারকামণ্ডলের অঙ্কিত চিত্রটি আকাশের গায়ে মেলানো যায় না। লেখক এই দিকের প্রসঙ্গটি তাঁর গ্রন্থে একেবারে গুরুত্ব দেননি।
লেখক তাঁর বইটিতে কোনো কোনো তারকামণ্ডল প্রসঙ্গে বাংলা নাম ব্যবহার করেছেন। LYRA মণ্ডলকে তিনি বাংলায় বলেছেন বীণামণ্ডল, Cygnus-কে হংসমণ্ডল, Corona Borealis-কে কিরীটমণ্ডল—এই রকম আরো কিছু কিছু দৃষ্টান্ত বইয়ের পাতায় ছড়িয়ে আছে। এই সব নামকরণের উৎস কি? ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে সূর্যসিদ্ধান্তে ও পরবর্তীকালের কোনো কোনো গ্রন্থে তারকামণ্ডলের যে নামগুলি লক্ষ করা যায়, সেই সব নামই আমরা ব্যবহার করে আসছি। কল্পনাকে উর্বর করে বিদেশী নামকে ইচ্ছেমতো বাংলায় অনুবাদ করে তার রূপ পরিবর্তন সমীচীন বলে মনে হয় না।
কিন্তু এই সব সামান্য অসঙ্গতি ছাড়া একটা কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, বইটি যাদের কথা ভেবে শ্রীবসু লিখেছেন, সেইসব অল্পবয়স্ক পাঠক-পাঠিকা এই বইটি থেকে অবশ্য উপকৃত হবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই

পার্থসারথি চক্রবর্তী

লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ/ তারকমোহন দাশ ও সীমা সেন/
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ/কল-৭৩/১০.০০/

স্টুডেন্টস নলেজ গাইড (১ম ও ২য়)/ অমরনাথ রায়/
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ/কল-৭৩/প্রতি খণ্ড ১২.০০

সুকুমার রায় আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে কবিতা লিখেছিলেন—'আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, আয় দেখি ফুটোস্কোপ দিয়ে, দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে।' আজকাল পণ্ডিতরা মগজের বুদ্ধি-বৃত্তিকে যাচাই করবার জন্য ফুটোস্কোপের মতো নানা ধরনের সব কায়দা বের করেছেন। আই কিউ (intelligent quotient) পরীক্ষা করে কার বুদ্ধি কত—তা যাচাই করা হচ্ছে। এই আই কিউ টেস্ট পদ্ধতিকেই সংক্ষেপে বলা চলে ফুটোস্কোপ, যদিও বুদ্ধিবৃত্তির প্রাণ রাসায়নিক চরিত্রটা আসলে যে কি তা এখনও আমরা টের পাইনি—সম্ভবত সেটা বিজ্ঞানীদের মগজের হয়ে মগজস্থ হয়ে আছে এবং যথাসময়ে ধীরে প্রকাশিতব্য।
বুদ্ধির তুলনামূলক বিচার করতে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন ফরাসী মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনে। বিনে চেয়েছিলেন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক বিকাশ ঘটাতে। আই কিউ হচ্ছে একধরনের পরীক্ষা—এটা বের করা হয় মানসিক বয়সকে আসল বয়স দিয়ে ভাগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে একশো দিয়ে গুণ করে। 'বুদ্ধির ব্যাপারে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জেনেটিক মেকআপ, উত্তরাধিকার, পরিবেশের প্রভাব—কোনটা যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে তা বলা খুবই মুশকিল। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাটা ঠিক যে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর একটি বিশেষ পরিবেশে [illegible] দিতে পারল না হয়ত ভিন্নতর পরিবেশে সেই শিশু তার চাইতে আরও বেশি উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারে। তাই অনেক বিজ্ঞানীরই আই কিউ-এ বিচার পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ নিয়ে ঘোর মতপার্থক্য রয়েছে, এ বিষয়ে নানা মুনির নান মত, এ নিয়ে তর্কও সহসা ফুরোবার নয়।
সে যাই হোক অধ্যাপক তারকমোহন দাশের 'লাই[illegible] সায়েন্স ক্যুইজ' ও তার যাবতীয় সমাধান জেনে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ কতটা ঘটবে তা বলা শক্ত, তবে সাধারণ জ্ঞানের পরিধি বাড়বে—একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।
ক্যুইজ-এর প্রশ্ন করে শিশুকে সাধারণত একটি সমস্যার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। মানুষ সমস্যাহী[illegible] ছিল না কোনওদিন সত্যি কথা বলতে কি আজও তার সমস্যার অন্ত নেই। তর্কশাস্ত্রের between t[illegible] horns in a dilemma--এর মতো উভয়সংকট অথবা কথার মারপ্যাঁচে ফেলে যে কোনও ব্যক্তি[illegible] হতবুদ্ধি করে দেওয়া যায়।
তারকমোহন দাশের লাইফ সায়েন্স ক্যুইজে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিশুরা জীবন বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য শিখে ফেলবে, এ বিশ্বাস আমা[illegible] আছে। মোট ৭২৫টি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে গ্রন্থে, ত[illegible] দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন—দুটি প্রাণীর না[illegible] কর যারা ফুলকো দিয়ে শ্বাস নেয়, ফসলের শত্রু এমন কতকগুলি উদ্ভিদের নাম কর, কোন মাটিতে ভাল ধান চাষ হয়, D N A-এর সম্পূর্ণ নাম কি, হিউমাস কি,—এইসব। অনেকগুলো উত্তরের ম[illegible] আসল উত্তরকে খুঁজে বের করার মতো Objecti[illegible] টাইপের প্রশ্নও গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

অমরনাথ রায়-এর লেখা 'স্টুডেন্টস নলেজ গাইড' (১ম ও ২য়) যথাক্রমে দশ থেকে চৌদ্দ ও চৌদ্দ থেকে ষোল বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য রচনা করা হয়েছে। প্রতিদিনই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ন[illegible] নতুন আবিষ্কার হচ্ছে—তাই তার মধু ভাণ্ডের আয়তনও যে বেড়ে যাবে তাতে আর বিচিত্র কি! গ্রন্থে ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, খেলাধুলো, জীববিদ্যা, মহাকাশ, রসায়ন ইত্যাদি যাবতীয় বিজ্ঞান সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে স্বাদু প্রশ্নমালা ও তার সমাধান দেওয়া হয়েছে। মূল্যায়নের প্রশ্নটি যেহেতু বিতর্কিত বিষ[illegible] কাজেই ৭০টি প্রশ্নের উত্তর ঠিক হলে 'ক', ৫৫টি ঠিক হলে মান 'খ' এবং ৪০ টি ঠিক হলে মান 'গ'—এইগুলো গ্রন্থ থেকে বাদ দিলেও বিশেষ কোনও ক্ষতি ছিল না।

ম

নীশ ঘটক
পরিমল গোস্বামী ৪৩, ৪৪, ২৮ আ ১৯৭৬ : ৩১০, ক
বিষ্ণুঋষির্মহালক্ষ্মীর্দেবতা ৩৫, ৩২, ৮ জুন ১৯৬৮ : ৬৪২, ক
বৈশাখ ৩২, ২৬, ১ মে ১৯৬৫ : ১২২৪, ক
মহামায়া ৩১, ৪১, ১৫ আ ১৯৬৪ : ১১২, ক
মাঝে রাত ২৯, ২৯, ১৯ মে ১৯৬২ : ৩১৯, ক
সামোন চাভবন কেশা ৩২, ৩৮, ২৪ জু ১৯৬৫ : ১২২৫, ক
সেদিন অকুণ্ঠ প্রেম ২৯, ১৮, ২৪ ফে ১৯৬২ : ৪১৬, ক
রাজসী ৩১, ৩৩, ২০ জুন ১৯৬৪ : ৬৮০, ক
রেফ্যুজি ক্যাম্পে শা ১৯৬১ : ২৪, ক
সংশয় ২৮, ৩৬, ৮ জু ১৯৬১ : ৮৬৭, ক
সন্ততি ৩৩, ৪৯, ৮ অ ১৯৬৬ : ৯৬৩, ক
সে মেয়েটি ২৫, ৪৭, ২০ সে ১৯৫৮ : ৫২৫, ক
নীশ ঘটক,অনু
হাফিজের কবর ৩১, ১৮, ৭ মা ১৯৬৪ : ৪২৩, ক
নীশ ঘটক ৪৭, ১০
নীশ মৌলিক
টেবিল টেনিসে কেন আমরা পিছিয়ে পড়েছি ৪৭, ১৬, ১৬, ফে ১৯৮০ : ৬৯-৭০, স
হানিফের সেই ৪৯৯ রান করার কাহিনী ৫০, ৫১, ২২ অ ১৯৮৩ : ৫৭-৫৮, স
নীশ সিংহরায়
কুয়াশা ৫০, ২৯, ২১ মে ১৯৮৩ : ১২, ক
ৎস্য ২১, ৩২ ; ২১, ৩৯ ; ২৬, ৩১ ; ২৮, ৪৫ ; ৩১, ৬ ; ৩১, ১৬ ; ৪২, ১৬ ; ৪৩, ৪০ ; ৪৯, ৪৯
ৎস্য কন্যা। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২, ১৩
ৎস্যগর্ভা চিন্তা। শিশির রায়চৌধুরী ৪৭, ১৬
ৎস্যচাষ, চিন্তা ৪৭, ১৬
ৎস্য চিন্তা ২৮, ৪৫, ৯ সে ১৯৬১ : ৪৮৯
ৎস্য প্রদর্শনী ২১, ২৯
ৎস্য সামুদ্রিক ২৫, ৪৩
তবাদের প্রগতি ৪৩, ৩৮, ১৭ জু ১৯৭৬ : ৮০৫, সম্পা
তি ডাক্তারের গল্প। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ৪৯, ২৪
তি ঝিল। চিত্তপ্রিয় মিত্র ৩০, ৫২
তি নন্দী
আত্মভুক ২৪, ৫১, ২৬ অ ১৯৫৭ : ৮৩৩-৮৩৭, গ
আমরা গাছের মতো পাশাপাশি সা ১৯৬৯ : ২৯৭-২৯৯
একবিংশ শতাব্দী এবং বি ১৯৭৬ : ১৯০-১৯১
কপিল নাচছে শা ১৯৮২ : ২৫৫-২৫৮, গ
কার্ডাস শিল্পের কিরণে পঙ্কজ বি ১৯৭৫ : ১৪৯-১৭১, স
কিছু অযথা বিভ্রম বি ১৯৭৩ : ৯৪-১২০, উ
ক্রিকেট ও এটিকেট বি ১৯৭২ : ১৬৭-১৬৮, স
খেলা আর খেলোয়াড় নিয়ে গল্প উপন্যাস বি ১৯৭০ : ২৫৫-২৫৯, স
গাভাসকরের দল ও বল ৪৬, ২০, ১৭ মা ১৯৭৯ : ৬১-৬৩, স
চল্লিশ বছর পরে ৩৪, ৯(বি), ৩১ ডি ১৯৬৬ : ৮৮১-৮৮৪, স
ছাদ ২৪, ৭, ১৫ ডি ১৯৫৬ : ৪৫৭-৪৬৪, গ
জলের ঘূর্ণি এবং বকবক শব্দ ৫০, ৪২, ২০ আ ১৯৮৩ : ২৩-২৬, গ
জীর্ণ পাতার সেই উত্তেজনাগুলি বি ১৯৭৪ : ১৭৯-১৯৬
তাক লাগাতে ওস্তাদ এই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানরা বি ১৯৭৮ : ১২৭-১৩২, স
দ্বাদশ ব্যক্তি সা ১৯৭৬ : ১৩৫-১৪০, স
ভালো ছেলে শা ১৯৮৩ : ৩৬৯-৪১৯, উ
রাজপুত্রেরা মৃগয়ায় যাচ্ছেন ৪৬, ২৭, ৫ মে ১৯৭৯ : ৬১-৬৩, স
শবাগার ৩৮, ৪, ২৮ ন ১৯৭০ : ৩৪৩-৩৫৩, গ
স্কোরবোর্ডের সীমার বাইরে ৩৭, ৯(বি), ২৭ ডি ১৯৬৯ : ৯২৯-৯৩৩
মতি নন্দী, অনু
এবার হিসাব-নিকাশের পালা ৩৩, ৮, ২৫ডি ১৯৬৫ : ৮০৩-৮০৪
মতি নন্দী—আত্মকথা সা ১৯৭৬
মতিভ্রম। বনফুল ৩২, ১
মতি মুখোপাধ্যায়
একটু সময় দিতে হয় ৪৫, ৩৭, ১৫ জু ১৯৭৮ : ৩৯, ক
কাছাকাছি থেকো ৪৭, ৩০, ২৪ মে ১৯৮০ : ৫৩, ক
পাথর ভাঙছে ৪৮, ২, ৮ ন ১৯৮০ : ৬, ক
প্রতিদিন স্বর্গ ভাঙে প্রতিদিন স্বর্গ রচনা ৫০, ২৯ ২১ মে ১৯৮৩ : ১২, ক
ফুল পুড়লে ৪৯, ১৪, ৬ ফে ১৯৮২ : ৯, ক
ব্রত ছিল ৪৬, ৩৬, ৭ জু ১৯৭৯ : ৩৯, ক
মোমবাতি ৪৯, ৪১, ১৪ আ ১৯৮২ : ১৯, ক
যাবো যাদুঘরে ৫০, ১০, ৮ জা ১৯৮৩ : ১৯, ক
রহস্যবাড়ি ৪৭, ১৩, ২৬ জা ১৯৮০ : ৫৭, ক
সুন্দর মরে না ৫০, ৪১, ১৩ আ ১৯৮৩ : ১১, ক
স্থিতাবস্থা ভাঙো ৪৫, ১১, ১৪ জা ১৯৭৮ : ৩৯, ক
মতিলাল পাদরী। কমলকুমার মজুমদার ২৫, ২৪
মথুরাকাঠির মাস্টার। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ২৩, ১৪
মদন ঘোষ
লড়াই না খেলা ২৭, ৬, ১২ডি ১৯৫৯ : ৪৫১-৪৫২, স
মদন দাশ
নদীবাস ৪৪, ২৩, ২এ ১৯৭৭ : ৬৫৮, ক
মদন বন্দ্যোপাধ্যায়
অনুলেখা ২৩, ১৯, ১০ মা ১৯৫৬ : ৪৩৯-৪৪৬, গ
পান্থপাদপ ২৪, ১১, ১২ জা ১৯৫৭ : ৭৬১-৭৬৩, গ
মদনভস্ম। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৭, ২
মদনগোপাল
প্রেমচাঁদ ৩৪, ৩৯, ২৯ জু ১৯৬৭-৩৪, ৪০, ৫ আ ১৯৬৭
মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়
সেই গল্পের মতো ৫০, ৪৪, ৩ সে ১৯৮৩ : ১১, ক
মদনলাল ৪২, ১৩
মদি গলিয়ানী। শান্তনু লাহিড়ী ২১, ৫০
মদি গলিয়ানী, আমেদিও ২১, ৫০
মদ্যপান ৪৭, ৩৩
মধুকানের গান। সুবোধ চৌধুরী ৪১, ১০
মধু খাঁড়ির নিঃসঙ্গ মাতাল। মঞ্জুভাষ মিত্র ৪২, ১৫
মধুগঞ্জের সুমতি। সুবোধ ঘোষ শা ১৯৭৭
মধুচন্দ্রিমা। সুনীল চট্টোপাধ্যায় ২৫, ২৫
মধুজিৎ মুখোপাধ্যায়
সাগরবিকাশ ও ব্লোআউট ৫০, ১৭, ২৬ ফে ১৯৮৩ : ৩৯-৪১, স
মধুপুর। কার্তিক মোদক ৪৯, ৫১
মধুবনী চিত্রকলা। রামচন্দ্র রায় ৪৭, ২২
মধুবনী চিত্রকলা *দেখুন* লোকচিত্র—মধুবনী
মধুবনীর কথা। সরলাবালা সরকার ২৩, ১৯
মধুমতী। শিবরাম চক্রবর্তী ২১, ২৯
মধুমিতা মুখোপাধ্যায় ৪১, ২৯
মধুমেহ ২৫, ২০ ; ৪৪, ৪৪ ; ৪৭, ২৩
মধুমেহ। অতুলানন্দ দাশগুপ্ত ২৫, ২০
মধুসূদন ও দেশাত্মবোধ। প্রমথনাথ বিশী ৩০,২৮(সা)
মধুসূদন ও লা ফঁতেন। সতীনাথ ভাদুড়ী ২৮, ১১
মধুসূদন কেন নীরবে পুরুলিয়া ছেড়েছিলেন। শান্তি সিংহ ৪৬, ২
মধুসূদন খ্রীস্টান হলেন কেন। অমিতাভ গুপ্ত ২৬, ১০
মধুসূদন চক্রবর্তী
উদিত সূর্যের রাজ্য—অরুণাচল ৪২, ২৬, ২৬ এ ১৯৭৫ : ৯৫১-৯৬৬, স
কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে নেহরু ৩৩, ২, ১৩ ন ১৯৬৫ : ১৫৩-১৫৫, স
ধ্যানমগ্ন হিমালয়:ধ্যানাসন মায়াবতী ৪৫, ৪৬, ১৬ সে ১৯৭৮ : ৫১-৫৮
বেনারসী জোড় ২৮, ২৬, ২৯ এ ১৯৬১ : ৯৮৫-৯৮৮, গ
সহাবস্থান ২৮, ১৮, ৪ মা ১৯৬১ : ৩৭৯-৩৮১, গ
মধুসূদন দত্ত *দেখুন* মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মধুসূদন পাঠের ভূমিকা। অমিয় দেব ২৫, ১১
মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়
আভিধানিক রাজশেখর বসু ৪৯, ২১, ২৭ মা ১৯৮২ : ৯-১১, স
মধুসূদনের বাসগৃহ। সুশীল রায় ২২, ১১
মধুসূদনের লন্ডন প্রবাস। অমিতাভ গুপ্ত ২৪, ৩৬
মধুহীন কোরো না। কবিতা সিংহ ২৯, ৩৪
মধ্য তিরিশে। প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় শা ১৯৭১
মধ্যদিন। রঞ্জিতকুমার সরকার ৪৭, ৪
মধ্যদিনের গান। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ২১, ২৩
মধ্যদুপুর। শঙ্খ ঘোষ ২৯, ৩
মধ্যদুপুরের ষড়যন্ত্র। কবিতা সিংহ ৪৫, ৮
মধ্যপ্রদেশ—বিবরণ ও ভ্রমণ ২৩, ২৪—২৩, ২৯ ; ২৪, ৩২ ; ২৬ ৯ ; ২৮, ১৪ ; ৩০, ৩৮—৩১, ৯ ; শা ১৯৫৯
মধ্যপ্রাচ্য *দেখুন* পশ্চিম এশিয়া—রাজনৈতিক পরিস্থিতি
মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিরে। তারাপদ রায় ৪২, ৩৯
মধ্যপ্রাচ্য—বিবরণ ও ভ্রমণ ২৪, ৩—২৪, ২৬
মধ্যপ্রাচ্য সংকটের প্রতিকারের পথ। যোগনাথ মুখোপাধ্যায় ২৫, ৪৩
মধ্য ফাল্গুনে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২২, ১৯
মধ্য বয়সে এসে। সাধনা মুখোপাধ্যায় ৩৫, ২৪
মধ্যবর্তী নির্বাচনে আহ্বান ৪৬, ৪৪, ১ সে ১৯৭৯ : ৯, সম্পা
মধ্যবিত্ত এক ঋতু। সাধনা মুখোপাধ্যায় ৪৩, ৯
মধ্যবিত্ত জীবনসংকট ৩০, ৪১, ১০ আ ১৯৬৩ : ১১৯
মধ্যবিত্ত ধূর্ত সুখ। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ৪৮, ২৪
মধ্যবিত্তশ্রেণী, বাঙালী ২৯, ২৬-৩০, ৪১ ; ৩১, ২৬ ; ৪৪, ৫১ ; ৪৮, ৫
মধ্যবিত্তের জীবনসংকট ২৯, ২৬, ২৮ এ ১৯৬২ : ১১৬৫
মধ্যবিন্দু। নবনীতা দেবসেন ৪৪, ২৩
মধ্যবৃত্ত। অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় ২৬, ৪৩
মধ্যবেলায়। সুনীলকুমার নন্দী ৩১, ৩৯
মধ্যযুগীয় ইউগোস্লাভ ফ্রেসকো। সন্দীপ সরকার ৪৬,

৩১
মধ্যযুগের সংগ্রাম গীতের রাগরূপ। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৩০, ১৮
মধ্যরাতের মেলায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৪২, ১৭
মধ্যরাত্রির কবিতা। বিজয়া মুখোপাধ্যায় ৩৭, ২৪
মধ্যরাত্রে। অরুণকুমার সরকার শা ১৯৫৪
মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ সংস্কার ২৭, ২৪, ১৬এ ১৯৬০ : ৮০৯
মধ্য শ্রাবণ। প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ৩৪, ৪০
মধ্যিখানে, হঠাৎ। আনন্দ বাগচী ৫০, ১৬
মন ও প্রাণ : এত অন্তহীন বিতর্কের অংশ। বুদ্ধদেব বসু ৩০, ২৬
মনকণিকা। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ২২, ২৭ (সা); ২৫, ২৮ (সা)
মনকন্যা। সাধনা মুখোপাধ্যায় ২৭, ১৫
মন কি তোমার। সৌগত চট্টোপাধ্যায় ৪৯, ৫১
মন কেমন করে। পূর্ণেন্দু পত্রী ৪৬, ৪৩
মন জানাজানি। শিবতোষ মুখোপাধ্যায় ২৫, ১৩
মন : তোমাকে। পরিতোষ খাঁ ২২, ৯
মন থেকে মনে। কমল তরফদার ৩৯, ৩৮
মন বলে চলো। শক্তি চট্টোপাধ্যায় শা ১৯৬৪
মন ভালো নেই। প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় শা ১৯৭৫
মন যদি না চায়। দুলাল সরকার ৫০, ৩২
মনকুমার সেন
আমেরিকায় কালো-মুসলিম আন্দোলন ৩২, ৪, ২৮ ন ১৯৬৪ : ৩১৩-৩১৬, স
কাঞ্চন-শৃঙ্গে ভারতীয় সৈনিক ৪৪, ৪২, ১৩ আ ১৯৭৭ : ৫৫, স
মুক্তিপাগল বিজয়লাল ৪১, ১৯, ৯ মা ১৯৭৪ : ৪৪৩-৪৪৫, স
সীমান্ত গান্ধী বাদশা খান ৩৭, ৫, ২৯ ন ১৯৬৯ : ৪৭৯-৪৮৫, স
মনজিৎ দুয়া ৪১, ১৪
মনজিৎ সিং ৪৬, ৩১
মনজুরে মাওলা
অবসর মুহূর্তের চিন্তা ২৬, ৩, ১৫ ন ১৯৫৮ : ১৬৮, ক
ঘুম এলে ২৫, ৪১, ৯ আ ১৯৪৮ : ১০৪, ক
মনট্রিলের মোমের পুতুল। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪৩, ৪২
মনতালে, ইউজেনিও
দুপুরে কাটানো অনু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩, ১১, ১৫ জা ১৯৬৬ : ১০৬০, ক
বানমাছ অনু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩, ১১, ১৫ জা ১৯৬৬ : ১০৬০, ক
মনতালে, ইউজেনিও ৪৩, ৩
মনন মিথুন। হীরালাল দাশগুপ্ত ২৯, ৩৪
মনসা *দেখুন* লৌকিক দেবতা, মনসা
মনসা জগৎগৌরী। নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ২৯, ৪
মনসা পূজা। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪, ৪৫
মনসা মথুরাং। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শা ১৯৫৭
মনসিজ। সন্তোষকুমার ঘোষ ২৫, ৩৫
মনসিজ মজুমদার
একচল্লিশ নং হেয়ার ফিল্ডস্ অক্সবোর্ড ৪৭, ১২, ১৯ জা ১৯৮০—৪৭, ১৩, ২৬ জা ১৯৮০, স
মনসিজ মজুমদার অনু
বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শা ১৯৭৯ : ১৩১-১৩৩, স
মনসুর আলি, পতৌদি বি ১৯৭৩
মনসুর আলি মাঠে ও মাঠের বাইরে। রাজনবালা বি ১৯৭৩
মনসুর-এর মল্লিকার্জুন। বসন্ত পোদ্দার ৪৭, ২৪
মনস্তত্ত্ব। আনন্দ বাগচী ২৪, ৪৩
মনস্তত্ত্ব ও রঙের প্রভাব। শৈলেনকুমার দত্ত ২৮, ৩৩
মনস্তত্ত্ব *দেখুন* মনোবিদ্যা
মনস্বী সম্মেলনে ভয়ঙ্কর আগন্তুক। সুজিতকুমার সেনগুপ্ত ৪৩, ১৪
মনস্বী রাখালদাস। খগেন্দ্রনাথ মিত্র ২৪, ৪৪
মনিপুর নৃত্য ২২, ২
মনিপুরী মহারাস নৃত্যাভিনয়। শান্তিদেব ঘোষ ২২, ২
মনিরা খাতুন
মিশরের মহিলা সত্যাগ্রহী ২১, ২৩, ১০ এ ১৯৫৪ : ৬২৯-৬৩০, স
মনীষাকে। বিজয়া মুখোপাধ্যায় ৩৬, ১৭
মনীষার দুই প্রেমিক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৬, ১১
মনীষী। বিদেশী কোষগ্রন্থ *দেখুন* কোষগ্রন্থ, বিদেশী
মনীষী যোগেশচন্দ্র স্মরণে। ভাগবতদাস বরাট ২৩, ৪১
মনীষী স্যামুয়েল জনসন। সুরঞ্জন ২৬, ৪৭
মনুজেন্দ্র ভঞ্জ
অভিনয় ৩৬, ৯(বি), ২৮ ডি ১৯৬৮ : ৯৮২-৯৮৩, স
চলচ্চিত্রে শরৎচন্দ্র ৪৩, ৪৭, ১৮ সে ১৯৭৬ : ৬২৭-৬৩১
বাংলা রঙ্গালয় : সেকালের স্মৃতি একালের কথা বি ১৯৭২ : ১১৩-১১৫, স
মনুজেন্দ্রলাল চৌধুরী
পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ২৬, ৬, ৬ ডি ১৯৫৮ : ৩৭৩-৩৭৬, স
বিজ্ঞান কংগ্রেস ২৬, ১৬, ১৪ ফে ১৯৫৯ : ১৫৫-১৬০, স
মনুজেশ মিত্র
আমার ক্লান্তিকে ৩৩, ৩, ২০ ন ১৯৬৫ : ২২৭, ক
আমি অমল আঁধারে ৩০, ৩৯, ২৭ জু ১৯৬৩ : ১২৬০, ক
এ ভাবেই ৪৮, ৩০, ১৫ আ ১৯৮১ : ৫১, ক
এক একটি ফুল ৪৭, ৪৫, ৬ সে ১৯৮০ : ৩৩, ক
এখন ভিতরে ৪৮, ১৭, ৯ মে ১৯৮১ : ৭ সম্পা
কেউ তা নেই ৩১, ২৬, ২ মে ১৯৬৪ : ১২০৪, ক
ছায়ার মত ৪৭, ২৯, ১৭ মে ১৯৮০ : ৪৯, ক
জংশন স্টেশন ৩৪, ২৩, ৮ এ ১৯৬৭ : ৯৭২, ক
তোমার মুখ ৩২, ২১, ২৭ মা ১৯৬৫ : ৭৩৬, ক
নির্বেদ শা ১৯৬৪ : ১১০, ক
পাতারা কোথায় যায় ৩১, ৭, ২১ডি ১৯৬৩ : ৬৪২, ক
পাহাড় এখন ৪৯, ৪৫, ১১ সে ১৯৮২ : ৪৯, ক
বিষণ্ণ গোধূলি ৩৪, ১৩, ২৮ জা ১৯৬৭ : ১২৭২, ক
যৌবন ৩৭, ২২, ২৮ মা ১৯৭০ : ৮৪২, ক
রাজার কথা ৫০, ১৩, ২৯ জা ১৯৮৩ : ৪৫, ক
স্মৃতি বড় দুঃখ দেয় ৩২, ১৯, ১৩ মা ১৯৬৫ : ৫১৬, ক
মনুষ্যধর্ম। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শা ১৯৫৬
মনুষ্যালোক। বিনয় মজুমদার ৪১, ৪০
মনুষ্য সমাজ ও পেশাগত ব্যাধি। শ্রীকুমার রায় সা ১৯৮১
মনুষ্যত্ব ৩৬, ২৬ ; ৫০, ২৮
মনে আছে। বিমল দত্ত ২৫, ১১
মনে আছে, কলকাতা। তারাপদ রায় ৩৭, ২
মনে আমার। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৩১, ১৯
মনে এল। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৩৯, ৯
মনে এলো। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২২, ৪৬-২৩, ৩৪
মনে থাকা। বীতশোক ভট্টাচার্য ৫০, ১৩
মনে না পড়লেই ভাল হত। হিমানীশ গোস্বামী ৪৬, ৩৩
মনে নেই। তারাপদ রায় ৪২, ১
মনে পড়লো তোমায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় শা ১৯
মনে পড়ে। আঙুরবালা দেবী বি ১৯৭০
মনে পড়ে। তারাপদ রায় ৩২, ৩৩
মনে পড়ে। রত্নেশ্বর হাজরা ৩৭, ২৭
মনে পড়ে মনে পড়ে যায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৩৬, ২
মনে মনে। অরুণকুমার সরকার ২৪, ৯
মনে মনে। গোবিন্দ চক্রবর্তী ২৬, ১০
মনে মনে। দিনেশ দাস শা ১৯৫৪
মনে মনে। মানস রায়চৌধুরী ২৬, ১১
মনে মনে। স্বদেশরঞ্জন দত্ত ২৬, ৪
মনে রেখো। প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় শা ১৯৭
মনে রেখো, বিষ। কালীকৃষ্ণ গুহ ৪৮, ৯
মনে হয়। শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় ২২, ১২
মনে হল। পরেশনাথ সান্যাল ২৪, ২
মনের অরণ্য। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৩১,
মনের আয়নায়। বটকৃষ্ণ দে ২২, ২৪
মনের ঘরদোর। মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ২২,
মনের ছায়া। প্রফুল্ল গুপ্ত ৩০, ২১
মনের মানুষ। দুর্গাদাস সরকার ২৪, ১৩
মনের শরিফ ৪৯, ৩৫
মনের শরিফ। কল্পনা চৌধুরী ৪৯, ৩৫
মনের সীমানা। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৩৪,
মনোজ ঘোষ
ঝড় থামার পর ৩৮, ৫১, ৩০ অ ১৯৭১ : ১১
ক
মনোজ বসু
আমার ফাঁসি হল ২৫, ৪০, ২ আ ১৯৫৮—
৫১, ১৮ অ ১৯৫৮, উ
আমি সত্যাগ্রহী শা ১৯৫৬ : ১০১-১০৬, গ
কান্নার গাড়ি ৩১, ২০, ২১ মা ১৯৬৪ : ৬১৭-৬২
গ
খাই খাই শা ১৯৬২ : ১৫১-১৫৬, গ
খেলাঘর সা ১৯৮২ : ৪৭-৫৬, গ
গরু কথা বলে না শা ১৯৫৮ : ৪৯-৬২, গ
জর্মনীর 'শকুন্তলা' শা ১৯৫৭ : ৩৯-৪৪, স
দয়াময় ২৮, ৪৭, ২৩ সে ১৯৬১ : ৭০৩,
দাঙ্গার দাগ শা ১৯৫৯ : ২৪, গ
ধূমবতী শা ১৯৫৪ : ৮৩-৮৬, গ
নিশিকুটুম্ব ২৯, ৩৬, ৭ জু ১৯৬২—৩০, ৩৯, ২৭
১৯৬৩, উ
নোঙর শা ১৯৫৫ : ৮৩-৮৫, গ
ফুলরার পতিগৃহে যাত্রা ৩৫, ২, ১১ ন ১৯৬
১২৫-১৩২, গ
বখরা ২৯, ৮, ২৩ ডি ১৯৬১ : ৬৮৯-৬৯২,
বাঘিনী বউ ৩৬, ১, ২ ন ১৯৬৮ : ২১-৩০,
ভেজালের উৎপত্তি শা ১৯৬৬ : ১১৫-১১৮,
শিল্পীর স্বাধীনতা ৩০, ২৯, ১৮ মে ১৯৬
৩২১-৩২৩, স
সেকাল শা ১৯৬১ : ১৩১-১৩৪, গ
হিন্দু মুসলমান শা ১৯৬০ : ১৩৩-১৩৪, গ
মনোজ বসু ২৬, ২৮ (সা)
মনোজ ভট্টাচার্য
ডিলান টমাস ২৪, ১, ৩ ন ১৯৫৬ : ১৪,
মনোজ মিত্র
অলীক সুনাট্য রঙ্গে ৪৪, ৪৪, ২৭ আ ১৯৭
৫৭-৬২, স
রাজদর্শন শা ১৯৮১ : ২১৩-২৩৫, না
মনোজ রায়
নভোরশ্মি ৩১, ৯, ৪ জা ১৯৬৩ : ৮৮৩-৮৮৫,
মনোতোষ চক্রবর্তী
অন্ধকার ৪৩, ৭, ১৩ ডি ১৯৭৫ : ৪৭২, ক
এই বাড়ি ৪১, ২৭, ৪ মে ১৯৭৪ : ১৪, ক

ট্র্যাক্টর রঙের আভায় উজ্জ্বল কী

সাধের এই রঙ কিন্তু সবার

Tractor
ACRYLIC

Tractor
DISTEMPER

ট্র্যাক্টর। দেয়ালের যে পেণ্টের কদর ভারতের ঘরে ঘরে।
মসৃণ, বহুদিন নতুন উজ্জ্বল থাকে, ধুয়ে পরিষ্কার করা যায়।
আর দাম সবার সাধ্যের মধ্যে।

ট্র্যাক্টর। সবার রুচি ও মেজাজ অনুযায়ী বিচিত্র রঙের বাহার।
হাল্‌কা কোমল প্যাস্টেল রঙ থেকে গাঢ় বর্ণাঢ্য সম্ভারে।

ট্র্যাক্টর সিন্থেটিক এবং অ্যাক্রিলিক ডিস্টেম্পার।
অন্দরের দেয়ালে আপনার অন্তরের রঙ ফুটিয়ে তুলতে অতুলনীয়।

দেয়াল দেখলে চোখ জুড়োয়,
অথচ সবার সামর্থে কুলোয়!

দেশ

উৎসবের আঙিনায়

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত □ কিশলয় ঠাকুর

সুধীর চক্রবর্তী □ বারীন রায়

তুর নিপুণ শিল্পী

লোকরঞ্জন দাশগু

বিচিত্র

দেশ

১ আশ্বিন ১৩৯৪ □ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ □ ৫৪ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা

প্র চ্ছ দ নি ব ন্ধ

বি জ্ঞা ন

এ ই দে শ এ ই বি শ্ব

বি দে শে র চি ঠি

বি শে ষ নি ব ন্ধ

খে লা

গ ল্প

ক বি তা

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

ধা রা বা হি ক র চ না

নি য় মি ত

প্র চ্ছ দ

সুহাস রায়

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক
৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ২০ পয়সা পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা

৫১

দুর্গোৎসবের বোধন মানেই বাঙালিজীবনের বিচিত্র উৎসব-মরসুমের উদ্বোধন। প্রয়োজনকে প্রদক্ষিণ করা জীবন অকস্মাৎ প্রাত্যহিকের বৃত্ত ভেঙে আনন্দের আঙিনায় এসে দাঁড়ায়। শারদ-সুনীল আকাশের নিচে সর্বজনীন হয়ে ওঠে তার মিলন-অঙ্গন। এই উৎসব-বিচিত্রাই এবারকার প্রচ্ছদ-নিবন্ধমালা। সূচনা যখন দুর্গোৎসবে, দুর্গাপূজার সূচনা, বিশেষ করে শহর কলকাতায়, তার আদি রূপটিও উপস্থাপিত হয়েছে। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণর দুর্গাপূজারও তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে কোন দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার পূজার আড়ম্বরে ঝলসে দিতেন সারা শহরকে!

প্রতিমা সেখানে হলুদ রঙে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা হয় না। নিপাট সোনায় মোড়া অঙ্গ। রুপোর মঞ্চে সমাসীনা। এক-একখানি চল্লিশ-পঞ্চাশমণি নৈবেদ্য। হাজার ব্রাহ্মণের তৈজস-বস্ত্রপ্রাপ্তি এবং মণ্ডপে জ্যান্ত দেব-দেবীর আগমন বৃত্তান্ত। তাছাড়া আছে বঙ্গের নানা প্রান্তে পাহাড়তলায়, শাল-মহুয়ার ছায়ায় ছায়ায় লোকায়ত উৎসব মেলা। আছে শান্তিপুরের জ্যান্ত 'রাইরাজা'র রাসোৎসব। এবং পুরীধামের রথযাত্রার বর্ণাঢ্য বহিরঙ্গের পাশাপাশি তার অন্তরঙ্গ রূপ এবং অন্তর্লীন আধ্যাত্মিক স্বরূপ উন্মোচন। সব নিয়ে এই নিবন্ধনিচয় যেন সাজানো উৎসবের আসর।

৪০

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের আগস্টের গোড়ার দিকে হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপরে 'লিটল বয়' ও 'ফ্যাটম্যান'-এর প্রয়োগ এক হিসেবে ছিল পারমাণবিক বোমার বাল্যলীলা। তারপর হাইড্রোজেন বোমার স্তর পেরিয়ে পরমাণু অস্ত্রকে এক জটিল বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় করে তোলা হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত ব্রহ্মাস্ত্রের মত। এই পারমাণবিক আধুনিকীকরণের রূপরেখার বিষয়ে আতঙ্কজনক নিবন্ধটি রয়েছে এবারের বিজ্ঞান বিভাগে।

২৭
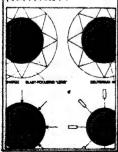
এবারের বিদেশের চিঠি— জার্মানির চিঠিতে আছে রাভেনসবুর্গে আগত নাট্যকার ইউজেন ইয়োনেস্কোর সাক্ষাৎভিত্তিক আলোচনা তাঁর এক রাশ ছবি আর কবিতা নিয়ে।

৩১

ভারতের কাছে চীনা সমস্যা এখনও ঠিক চেনা সমস্যা নয়, অন্তত জনসাধারণের কাছে তো নয়ই। এর জন্যে দায়ী ভারত সরকারের দ্বিধামন্থর চালটি। সীমান্ত সমস্যাকে যতটা সপ্রতিভতার সঙ্গে মোকাবিলা করা এবং অবস্থাটিকে জনমানসে পরিস্ফুট করে তোলা উচিত ছিল তা হয়নি, এখনও হচ্ছে না।

৩৩

দামোদর এক আশ্চর্য নদ। দুর্দান্ত পৌরুষে ভরপুর এ নদী একদিকে ধ্বংস অন্যদিকে সৃষ্টির ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই দামোদরের কল্যাণে পাওয়া যাচ্ছে বিদ্যুতের আলো আবার এরই বানভাসিতে হাজার হাজার লোক বিপন্ন— কেন হচ্ছে এই বন্যা, ডি· ভি· সি এবং অন্যান্য সরকারী প্রচেষ্টাই বা কতটা সক্রিয় দামোদর সংক্রান্ত নানা সমস্যা সমাধানে— এই সব বিষয় আলোচিত এখানে।

যতীন মুখার্জি ও মানবেন্দ্রনাথ

গত ১৩ জুন সংখ্যা 'দেশ'-এ প্রকাশিত আমার "যতীন মুখার্জি ও মানবেন্দ্রনাথ" নিবন্ধ প্রসঙ্গে ১৮ জুলাই সংখ্যা 'দেশ'-এ দুটি পত্র এবং ৮ ও ১৫ অগাস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত তিনজন পাঠকের চিঠি দেখলাম। নর্টন-সাহেব আলিপুর বোমার মামলায় মুখ্য উকিল হলেও আশুতোষ বিশ্বাস (পাবলিক প্রসিকিউটর) বিশেষভাবে ভার পেয়েছিলেন কানাইলাল ও সত্যেনকে জড়িয়ে জোরদার কিছু খাড়া করবার অভিপ্রায়ে। এ-কথা ঠিকই—আশুবাবুকে হত্যা করা হয় আলিপুর সাব্‌ আর্বান পুলিশ কোর্টে, অর্থাৎ দক্ষিণ কলকাতার ফৌজদারী মামলার কোর্টে।

দ্বিতীয় পত্রের লেখক সৌরেন বসু তাঁর জ্যাঠামশাই বোসের সার্কাস-খ্যাত মতিলাল বসুর সঠিক বাসস্থানের উল্লেখ করে প্রকৃতই একটি প্রচলিত ভ্রান্তির নিরসন করলেন, জনশ্রুতি ছাড়িয়ে আমি যে গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছিলাম এই বিষয়ে, সেটি "জাগরণ ও বিস্ফোরণ" (পৃঃ ১০৭): লেখক কালীচরণ ঘোষ স্বয়ং কোদালিয়া-চাংড়িপোতা-হরিনাভি অঞ্চলের কর্মী এবং অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন বলেই একটু বিস্মিত হচ্ছি কিভাবে এই তথ্য তাঁর গ্রন্থে স্থান পেল।

প্রসিত রায়চৌধুরী তাঁর চিঠির গোড়াতেই আমার উক্তি, "যোগেন্দ্রনাথ (বিদ্যাভূষণ) পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের আশিস" একেবারেই ভিত্তিহীন বলে রায় দিয়েছেন। অথচ শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে ("আত্মচরিত", কলিকাতা, ১৩২৫, পৃঃ ১১৪-১১৫) লিখেছেন যে ১৮৬৮ সালে তাঁর মুখে বিধবা "মহালক্ষ্মীর সহিত যোগেনের বিবাহের সংবাদ পাইয়া তিনি (বিদ্যাসাগর) আনন্দিত হইয়া উঠিলেন এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ দিবেন বলিলেন।... বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহের সমুদয় ব্যয় দিলেন, এবং আমার যতদূর স্মরণ হয়, কন্যাকে কিছু কিছু গহনা দিলেন।" বিনয় ঘোষ তাঁর "বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ" গ্রন্থেও (ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭৩, পৃঃ ২৭১) এই উদ্ধৃতি প্রকাশ করেছেন। একবছর বাদে ওলাউঠা রোগে মহালক্ষ্মীর মৃত্যু হয়; বিদ্যাসাগর তখনো যোগেন্দ্রনাথের প্রতি সহানুভূতিপরবশ পাশে ছিলেন, লিখছেন, যোগেন্দ্রনাথের পৌত্র নীরেন বাঁড়ুজ্যে তাঁর "যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ" পুস্তকে (কলকাতা, ১৯৭৭, পৃঃ ১০) এবং বিদ্যাসাগরের বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা মালতীমালার সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথের "বিবাহ দিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। সেটা ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ," লিখেছেন নীরেনবাবু। সুতরাং আমার উক্তিকে "একেবারেই ভিত্তিহীন" ঘোষণা করাটা কতদূর সমীচীন, জানি না। যোগেন্দ্রনাথ বীরপূজায় বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: "... আমার মতে মহাপুরুষগণের চরিত্রের উজ্জ্বল অংশটুকুই লোকসাধারণের গোচর করা উচিত।" সেই পন্থাই আমি অবলম্বন করেছি।

পরবর্তী অভিযোগে পত্রলেখক "মিত্র সাহেবের সঙ্গেও (যতীন) বাঁড়ুজ্যের তখন তাল রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠায় তিনি চলে গেলেন উত্তর ভারতে"—আমার এই উক্তিতে রায় দিয়েছেন, সম্পূর্ণ সত্য নয় বলে। অথচ আমার প্রবন্ধেই এ-পরিস্থিতি বিশদতররূপে প্রাঞ্জল আছে, তিনি কি দেখেননি? বারীনে-বাঁড়ুজ্যেয় টক্করের কাহিনী সুবিদিত হলেও এবং সেটি প্রধান কারণ হলেও পটভূমির সম্যক পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি আমি।

আরেকটি তথ্যগত ত্রুটির যে উল্লেখ পত্রলেখক করেছেন— নরেনের মামাবাড়ি চাংড়িপোতা নয়, কোদালিয়া গ্রামে— সে বিষয়ে V. B. Karnik লিখিত মানবেন্দ্রনাথের ইংরেজি জীবনী (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮০, পৃঃ ৫) বলে যে দীনবন্ধু চাংড়িপোতায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন এবং ১৯০৫ সালে তাঁর মৃত্যুকাল অবধি সেখানেই ছিলেন; নরেনের ছোটভাই ললিত ভট্টাচার্যের মতে চাংড়িপোতাই তাঁদের মামাবাড়ি (দ্রঃ সমরেন রায়ের The Restless Brahmin, পৃঃ ১৮); Dictionary of National Biography, Vol. III (কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ৫৪৬) যদিও এ-বিষয়ে অন্যমত।

> ## দুঃখ প্রকাশ
>
> **প্রচ্ছদ কাহিনী: মহররম**
>
> **দেশ (৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭) পত্রিকায় প্রকাশিত মহররম বিষয়ক রচনাবলীর অংশবিশেষ ও চিত্র আমাদের পাঠকবর্গের একাংশের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করেছে। শ্রদ্ধেয় খলিফা হজরত আলীর চিত্রটি 'টাইম' পত্রিকার ১৭ আগস্ট সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। সম্পূর্ণ অনবধান ও অনুদ্দেশ্যপ্রসূত এই প্রকাশনার জন্য আমরা মর্মাহত ও দুঃখিত।**
>
> *সম্পাদক*

আমার মারাত্মক তথ্যগত ভুল বলে পত্রলেখক তুলে ধরেছেন দ্বারকানাথ ইংরেজি শেখান বিদ্যাসাগরকে, এই উক্তি। এবং বলেছেন যে এঁরা দু'জনেই ইংরেজি শিক্ষা করেছেন রাজনারায়ণ বসুর কাছে। কিন্তু পত্রলেখকের এই উক্তিও আংশিক সত্য: চণ্ডীচরণ বাঁড়ুয্যে তাঁর গ্রন্থ "বিদ্যাসাগর" (১৮৯৫, পৃঃ ৭৭-৭৮)-এ লিখেছেন হেয়ার স্কুলের শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইংরেজি শেখেন বিদ্যাসাগর। আমার উক্তির সঙ্গে অন্য দুটি উক্তির কোনও বিরোধ না থাকাই স্বাভাবিক: প্রাথমিক শিক্ষায় দ্বারকানাথ; তারপরে দুর্গাচরণ, তারপরে সে-যুগের অসাধারণ ইংরেজি-বিশারদ রাজনারায়ণ এঁদের শিক্ষা দেন—১৮৫০ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা শুরু করবার পরবর্তী সময়ে।

তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে দ্বারকানাথের যোগাযোগ ছিল— কথাটি ঠিক নয়, জানিয়েছেন পত্রলেখক। Dictionary of National Biography, Vol. IV (কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ৪১৬) আমার উক্তির সমর্থন করে বিপিনচন্দ্র পালের উদ্ধৃতি দিয়ে: "I think, like Pandit Iswar Chandra Vidyasagar, Dwarkanath Vidyabhusan was also a member of the Tattvabodhini Sabha." স্মরণে রাখতে হবে, ১৮৭০ সালে বিপিনচন্দ্র, সুন্দরীমোহন দাস ও তারাকিশোর চৌধুরী (পরে সন্তদাস বাবা)— তিনজনেই দ্বারকানাথের ভাগ্নে শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে এক গুপ্তসমিতি গঠন করেন।

ফণী চক্রবর্তী ও হরিকুমার প্রসঙ্গে কোন্‌ সুবাদে পত্রলেখক সিদ্ধান্ত নিলেন "দূর সম্পর্কের" জ্ঞাতিভাই হতে পারেন? আপন মাসতুতো ভাইও তো হতে পারেন তাঁরা? Dictionary of National Biography, Vol. I (কলকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ২৪৯) হরিকুমারের পৈতৃক নিবাস বলছে কোদালিয়া (চাংড়িপোতা) গ্রামে। দুটির কোন্‌টি—সঠিক প্রমাণিত হয় না এ থেকে।

এরপরেই পত্রলেখকের দাবি—ভূষণ মিত্র ছিলেন "কোদালিয়া- সোনারপুর শাখার" সভ্য, এটি আরেকটি ভ্রমাত্মক তথ্য, কারণ ওই নামে বিপ্লবীদের কোন কেন্দ্র ছিল না নাকি, পুলিশ রিপোর্টে "চাংড়িপোতা গ্রুপ"কে সাংঘাতিক দল বলা হয়েছে। আমার সবিনীত অনুরোধ: পত্রলেখক একটিও পুলিশ-রিপোর্টের নাম (রেফারেন্স) দিতে পারবেন কি তাঁর এই প্রত্যয়ের স্বপক্ষে? পুলিশ রিপোর্টের সঙ্গে যথেষ্ট দীর্ঘকালীন পরিচয়ের জোরে আমি জানাই— "কোদালিয়া-সোনারপুর" দল বলেই উক্ত শাখাটিকে অভিহিত করা হয়, "Howrah-Sibpur Political Dacoity Gang Case: Polit. Aug. 1911, Nos. 23-36 (A): Notes in the Criminal Intelligence Office. From the I. G. of Bengal Police to E. V. L. April 25, 1910" শীর্ষক নথিপত্রে। প্রসিতবাবুর দেওয়া তথ্যের আশায় থাকছি।

পত্রলেখক প্রশ্ন তুলেছেন—ফণীর বিবৃতি কতদূর নির্ভরযোগ্য? সংশয়ের মূল কারণ, হরিকুমার সম্পর্কে ফণীর অশ্রদ্ধাপ্রসূত বিবৃতি। হরিকুমারের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে পত্রলেখক বিচলিত হয়েছেন শ্রদ্ধাভাজনের মহিমায় কলঙ্কক্ষেপ দেখে; আমিও বিশেষ যে কারণে হরিকুমারের স্নেহ পেয়েছি এবং ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা পোষণ করেছি, তার জোরেই ফণীর বিবৃতিকেও অত্যন্ত অকপট দলিলরূপে গ্রহণ করি। এই দলিলে আত্ম-প্রসঙ্গে যেসব কথা কবুল করেছেন ফণী, তা বহুলাংশেই কম শ্লাঘনীয় নয় কি? ধনীর ঘরে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ির টাকায় আমেরিকা চলে যাওয়ার পরিকল্পনা; একটি মেয়ের সঙ্গে প্রণয়ে ব্যর্থ হয়ে, সেই মেয়েটির আত্মহত্যাতেও অবিচলিত থেকে অন্যত্র বিয়ে করা ইত্যাদি অপ্রিয় সংবাদ অম্লানবদনে শুনিয়েছেন তিনি— হাওড়া মামলা থেকে যতীন্দ্রনাথের সদলবলে নিষ্কৃতি পাবার পরবর্তী দু-তিন বছর নিষ্ক্রিয় জীবন যাপনে অনভ্যস্ত এই অসমসাহসিক যুবকদের মানসিক দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তিরূপেই। কে বলতে পারবে হরিকুমারও এই সাময়িক দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েছিলেন কিনা? বিদেশ বিভুঁইয়ে গ্রেপ্তার হয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ফণী

চক্রবর্তী সমস্ত ভেঙে যাবার হতাশায় হয়তো বা সান্ত্বনা পেতেন আত্মহননে ; সে-সুযোগে বঞ্চিত হয়ে তারই বিকল্প বেছে নিয়েছেন তিনি বেপরোয়া, এই বিবৃতিতে। ভয়ঙ্কর শেষ-মুহূর্ত সমাসন্ন জেনে যে-পরিস্থিতিতে ফণী মুখ খুলেছেন, সচরাচর সেখানে মিথ্যা ভাষণের বা প্রবঞ্চনার প্রবৃত্তি জাগে না। ইংরেজ পুলিশ এই শ্রেণীর স্বীকৃতিকে যথার্থই making a clean breast নামে অভিহিত করে। প্রসিতবাবু এই বিবৃতিতে হরিকুমারের প্রতি অশ্রদ্ধায় যেমন মর্মাহত হয়েছেন, তেমনি মর্মাহত হতে পারেন যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণকে যাঁরা শ্রদ্ধা করেন—এ-কথা স্মরণ করাই তাঁকে : গায়ে পড়ে 'অকৃতজ্ঞ', 'কৃতঘ্ন' প্রভৃতি বিশেষণে যোগেন্দ্রনাথকে ভূষিত করা কি অপরিহার্য ?
বিপিন গাঙ্গুলি ও নরেন ভট্টাচার্যের বৈরিতার প্রমাণ পকেটে নিয়েও ফণী বিদেশে পাড়ি দেননি বলে তাঁকে হেয় করেছেন পত্রলেখক। একটু মন দিয়ে সমসাময়িক ঘটনাবলীর ইতিবৃত্ত যদি তিনি ঝালিয়ে নেন, কিছু প্রমাণ নির্ঘাত তাঁর চোখে পড়বে।
যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মতো সতর্ক লেখকও ক্ষীণ আভাস দিয়েছেন একটিমাত্র প্যারাগ্রাফে : "বিপিনদা তো ফেরারী ছিলেন। ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে যতীনদাও ফেরারী হয়ে যান। কলকাতায় দুজনকে একটা আশ্রয়ে রাখা হয়। রায়ও তখন ফেরারী। ... একদিন গিয়ে শুনি বিপিনদা না-বলেক'য়ে সকালে বাসা ছেড়ে চলে গেছেন। অনুসন্ধানে জানলাম, রায়ের কথা বলার রূঢ় ভঙ্গীই এর কারণ। বিপিনদাকে খুঁজেপেতে ধরে আনি। আবার যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই। যতীনদা খুব মিষ্ট স্বভাবের লোক ছিলেন।" ("বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি", ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৫১৩)
Two Great Indian Revolutionaries (পৃঃ ১৮৪) গ্রন্থেও দেখি বেলেঘাটা ডাকাতির বাইশ হাজার টাকা উধাও হয়ে যাবার ইঙ্গিতপূর্ণ উল্লেখ। মহাভারত-রামায়ণে পুষ্পক রথ শ্রেণীর যান-বাহনের উল্লেখ থাকা মানেই আজকের সুপারসোনিক জেট তাঁরা উদ্ভাবন করেছিলেন বলা যেমন চলে না, তেমনি চণ্ডীদাসের কবিতা পড়লেই মানবেন্দ্রনাথের 'নয়া মানবতাবাদ' জানা হয়ে যাবে, এমন পরামর্শ আজ তেহরানে বাহবা পেলেও, কলকাতায় কল্কে পাবে কি ?
৮ অগাস্ট সংখ্যাতেই রঘুনাথ হালদার যে পত্র লিখেছেন, তার জবাবে জানাই যে, যোগানন্দজীর বা তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম মুকুন্দলাল ঘোষের কোনও উল্লেখ বাংলার তথা ভারতের বিপ্লব আন্দোলন সংক্রান্ত কোনও নথিপত্রে পাইনি এবং নির্ভরযোগ্য কারও মুখে শুনিনি। যোগানন্দের গুরুদেবের পূর্বাশ্রমের নাম প্রিয়নাথ কড়ার শুধুমাত্র বাংলার আন্দোলনেই বিশিষ্ট নয়, বিহার-উড়িষ্যার ফাইলেও বিদ্যমান। তবে যোগানন্দজীর যে উক্তি পত্রলেখক তুলে দিয়েছেন, তা থেকে কেমন যেন সন্দেহ হয়—আন্দোলনের আওতা সম্বন্ধে তাঁর বড় একটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল কি ? হুট করে একদল প্রাক্তন কলেজ সহপাঠী এসে ধরে বসল, "তোমায় বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা হতে হবে।" এটা সে-যুগের নীতি ও দর্শনের সঙ্গে খাপ খায় না। আঞ্চলিক কর্মীরা এক আঞ্চলিক নেতার অধীনে শরীরচর্চা ও গীতাপাঠের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধক আদর্শের নাগাল পেতেন ; দলের নিয়মানুবর্তিতা পালন করতেন ; বিভিন্ন অঞ্চলের নেতাদের সম্মিলনে নেতারা উল্লেখযোগ্য কর্মীদের কথা আলোচনা করতেন ; স্বীয় স্বীয় কৃতিত্ব ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী জাতীয় সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন তাঁরা। প্রবীণ বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা আজও এ-বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন—শ্রদ্ধেয় জীবনতারা হালদার, নলিনীকিশোর গুহ, পঞ্চানন চক্রবর্তী—তাঁদের সঙ্গে পত্রলেখক আলোচনা করেছেন কি ?

সবিনয় নিবেদন

পুজোর ছুটি উপলক্ষে আমাদের পত্রিকার দপ্তর বন্ধ থাকবে। এই জন্যে ৩ অক্টোবর ১৯৮৭ তারিখে 'দেশ' (৫৪ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা) প্রকাশিত হবে না।

সম্পাদক

১৫ আগস্ট সংখ্যায় অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় যে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন সেটি প্রণিধানযোগ্য। আলোচ্য নিবন্ধে আমি চেয়েছি জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশের বিশেষ এক সন্ধিক্ষণে বিশিষ্ট দুজন দেশপ্রেমিকের গতিপথ অনুসরণ করতে ; যতীন মুখার্জির ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি নজর রেখে ধারাবাহিক 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকায় ১৯৬৫-৬৬ সালে যে-রচনা আমি প্রকাশ করেছি, তাতে শোভাবাজারের বাড়ি ও যতীন্দ্রনাথের মামা ডাঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখ করেছি। শৈশবে-কৈশোরে যতীন্দ্রনাথের দিদি বিনোদবালা দেবী, ছোটমামা ললিতকুমার, মামাতো ভাই অমূল্যকুমার ("রাঙাদাদু" আমাদের), মোহিতকুমার প্রভৃতির মুখে শোনা বহু কাহিনীই তাতে লিপিবদ্ধ আছে। শোভাবাজারের জীবন নিয়ে যতীন্দ্রনাথের উপর অমলকুমার যদি লেখেন, মহাভারত হলেও তাতে অরুচি হবে কি?

পৃথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্যারিস

সমুদ্রে অশরীরী

২৫ জুলাই ৮৭, বহুল প্রচারিত "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমুদ্রে অশরীরী' লেখা পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। ১৯৫৬ সালে আই· এ· পরীক্ষার পরে আমি বিশাখাপত্তনম যাই এবং ওখানকার ট্রেনিং জাহাজ "মেখলা"য় তিন মাসের ডেক নাবিক শিক্ষা শেষ করে কলকাতায় ফিরে সি ডি সি (নলী) সংগ্রহ করে তৎকালীন বি আই এস এন কোম্পানির জাহাজ এম ভি 'মেঘনায়' যোগ দিয়ে এক বছরের বেশি সময়ের জন্য এক অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিই। আমার ওই স্বল্পকালীন সামুদ্রিক জাহাজী জীবনে অনেক অলৌকিক বা অশরীরী ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। এবং প্রতিবারেই বিচিত্রভাবে কোনো এক অদৃশ্য শক্তির শুভ বলে প্রাণে বেঁচে যাই।
অতীনবাবুর লেখায় পুরাতন সন্দীপ নোয়াখালির অনেক সহৃদয় মুসলিম সারেং ও টিন্ডালের কথা মনে পড়ে গেলো এবং আমার মতো অনেক প্রাক্তন নাবিকই ওই সব ঘটনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাক্ষী হয়ে রইলেন।
লেখক এবং আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এমন একটি অবহেলিত বিষয় নিয়ে সচিত্র আলোকপাত করার জন্য।

প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য
হাওড়া-৬

দেখি নাই ফিরে

৮ আগস্টের 'দেশ' পত্রিকায় সমরেশ বসুর 'দেখি নাই ফিরে' ধারাবাহিক উপন্যাসে নন্দলাল বসুর মুখে অবনবাবু/ অবনীন্দ্রবাবু (পৃঃ ২৬) পড়ে অবাক লাগলো। কারণ নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতেই পুত্ররূপে প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং প্রধানত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগেই নন্দলাল বসুর শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা ও বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাই পুত্ররূপে প্রতিপালিত নন্দলাল বসু অবনীন্দ্রনাথকে "বাবামশাই" বলে ডাকতেন।

নীরা বসু (ঠাকুর)
কলকাতা

স্মৃতির 'মৌচাক'

১৫ অগস্টের 'দেশ' পত্রিকার 'সাহিত্য' বিভাগে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'কৈশোরের সেরা সঙ্গী' শিরোনামে যে রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে সেটি পড়ে বড় আনন্দ লাভ করলাম। তাঁর এই রচনা আমার স্মৃতির মৌচাকেও খোঁচা দিয়েছে। মৌচাক পত্রিকাটি যখন বের হয় তখন শিশুদের পত্রিকা জগতে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল সন্দেশের কাল শেষ হওয়ায়। আমার তখন বয়স এগারো, প্রবাসীর মধ্যে 'ছোটদের পাততাড়ি' বলে যে-কয়টি পৃষ্ঠা আলাদা ভাবে থাকতো আমরা তা নিয়েই খুশি

ছিলাম এবং প্রবাসী যে আমাদেরও তা ঘোষণা করে আনন্দ পেতাম। এই প্রবাসীর পাতাতেই মৌচাকের বিজ্ঞাপন দেখে আমাকে গ্রাহক করে দেওয়া হয় এবং প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যা থেকেই আমি গ্রাহক হই। এই সময় আমরা থাকতাম সাঁওতাল পরগণার মধ্যে একটি গণ্ডগ্রামে—শহর থেকে দূরে। মৌচাকের প্রথম সংখ্যা যেদিন হাতে পাই সেদিনের উত্তেজনা এখনো যেন মনে করতে পারি। প্রথমেই ছিলো সত্যেন দত্তের একটি কবিতা 'মৌচাক' নামে ('ঝরছে মৌচাকের মধু')। পত্রিকাটির নামকরণও তিনি করেছিলেন এবং তিনি ওই বছরই মারা যান, সেজন্য মৌচাকের প্রথম সংখ্যা তিনি দেখে যেতে পারেননি। আশাকরি, এ ব্যাপারে স্মৃতি আমাকে প্রতারণা করছে না।

মৌচাকে তখন লিখছেন খ্যাতনামা অনেকেই—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এবং আরো অনেকে। বুদ্ধদেব বসুর নামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে এই মৌচাকের পাতাতেই, তাছাড়া আর যাঁদের পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম তাঁদের মধ্যে ছিলেন মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। মৌচাকে মাঝে মাঝে পাঁচ-দশ টাকার পুরস্কার দেওয়া হতো গ্রাহকদের ছোট গল্প লেখায় উৎসাহিত করার জন্য। মীরা চৌধুরী নামে একটি মেয়ে একবার 'বুদ্ধির দৌড়' গল্পটির জন্য প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলো। গল্পটি এখনো আমার মনে আছে। এই মীরা চৌধুরী পরে জাহানারা বেগম নামে সাধারণ্যে পরিচিত হন এবং ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে খ্যাত হন।

মাসের পয়লা-দোসরা তারিখের মধ্যে মৌচাক হাতে এসে না পৌঁছলে আমাদের অস্থিরতার শেষ থাকতো না। একবার এইরকম একটু দেরি হওয়াতে মৃত্যুঞ্জয় বরাট নামে একজন গ্রাহক একটি রাগী মুখের ছবি এঁকে সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলো এবং ছবির নিচে লিখে দিয়েছিলো 'I am as angry as this picture!' সম্পাদক মহাশয় সেটি ছেপেছিলেন মৌচাকে। মৃত্যুঞ্জয় বরাটকে ভুলতে পারিনি কারণ আমারই এবং আমার মতো অনেকেরই মনের কথা সে সরাসরি বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলো।

আমি বড় হয়ে গেলে আমার ভাইয়ের নামে এবং পরে এইভাবে বোনের নামে মৌচাক তার সেই জন্মলগ্ন থেকে আমাদের বাড়িতে আসতো। একদিন তাকেও কালের নিয়মে ছেড়ে দিতে হয়। আমরা বড়দের জগতে প্রবেশ করলাম বটে কিন্তু ছোটদের জগতে যে আনন্দ মৌচাক আমাদের দিয়েছিলো তা আজও আমরা ভুলতে পারিনি।

রবীন্দ্রনাথ সেন

কলকাতা-২৯

স্বাধীনতার সত্যমিথ্যা

১৫ আগস্টে দেশ-এ হর্ষ দত্ত মহাশয়ের প্রচ্ছদ নিবন্ধের টেকনিক ও আঙ্গিক খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছে। ছোট ছোট আকর্ষণীয় শীর্ষকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তির সাক্ষাৎকার এই নিবন্ধকে অনেকটা অনুসন্ধিৎসু নিবন্ধের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এই সঙ্গে পরিসংখ্যান তালিকা থাকলে পুরোপুরি গবেষণা নিবন্ধ হিসাবে সর্বাঙ্গ সুন্দর হত।

এ প্রসঙ্গে দু একটি সামান্য অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ৮৭ পৃষ্ঠায় স্বপন সাহার সাক্ষাৎকারে একস্থানে বলা হয়েছে নোয়াখালীর দাঙ্গা হয়েছে ১৯৪৭ সালে। প্রকৃতপক্ষে নোয়াখালীর দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজার দিনে—দেশ বিভাগের অন্তত দশ মাস পূর্বে। বাণী সরকারের সাক্ষাৎকারেও এক জায়গায় তার জবানীতে বলা হয়েছে "মুসলমানরা পাকিস্তান তৈরী করেছিল।" মুসলমানরা সকলেই পাকিস্তান চাননি। কিন্তু মুষ্টিমেয় ধর্মান্ধ দ্বিজাতিতত্ত্বের মাধ্যমে ব্রিটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারত ভাগে সমর্থ হয়েছিল। আজকের প্রজন্মের অনেকেই প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে সজাগ নন। কিন্তু এখানে ঐতিহাসিক সত্য সম্বন্ধে নিবন্ধকারের সতর্কতা অবশ্যই কাম্য।

অজিতকুমার শূর

কলকাতা-৭০০০৬৩

॥ ২ ॥

১৫ আগস্ট, ১৯৮৭ তারিখে 'দেশ' পত্রিকায় হর্ষ দত্তের 'সত্যি স্বাধীনতা, মিথ্যে স্বাধীনতা' নতুনভাবে আমাদের ভাবাল। এটা সত্যিই দুঃখের যে আজকের ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিনটি আমাদের শুভ স্মৃতিচারণার অবকাশ না দিয়ে অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় উদ্বেলিত করে। এই জ্বলন্ত ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে আমরা এ নিষ্ঠুর সত্যকে উপলব্ধি করি যে—এ স্বাধীনতা, পরাধীনতার চেয়েও ভয়ঙ্কর। সমগ্র চিত্রের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা বুঝি এবার আত্মবিশ্লেষণের সময় এসেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা অর্থাৎ "মুক্তিপথের অগ্রদূতেরা" যা চেয়েছিলেন—ভারত মাত্র চল্লিশ বছরের মধ্যে ক্লেদের ঊর্ধ্বে পঙ্কিলতার ঊর্ধ্বে থেকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারেনি—পারেনি নিজেকে রক্ষা করতে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ভারত হয়েছে ব্যর্থ, কলুষিত। এবং সেখানেই ট্যাজেডি। নতুবা মাত্র চল্লিশ বছর আগে পরাধীন ভারতবর্ষে যে বঙ্গভঙ্গ ও ভারতভঙ্গের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশবাসী একযোগে বিদ্রোহ করেছিল, আজ চল্লিশ বছর বাদে স্বাধীন ভারতে এই একই সমস্যার সম্মুখীন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারতকে হতে হত না।

বিচ্ছিন্নতাকে শক্ত হাতে প্রতিহত করবার জন্য যে দায়িত্ব আমরা জনগণের ওপর বর্তাই—তারা সেই জনগণ যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়—এরা কঙ্কালসার—ফসিলরূপী জনগণ, নৈরাশ্যের শিকার শিক্ষিত বেকার যুবসমাজ। ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অশিক্ষা দুর্নীতি—অরাজকতা, সংস্কৃতির নামে উচ্ছৃঙ্খলতা, অশিক্ষার অন্ধকার—এইমাত্র পুঁজি নিয়ে ভারত বিচ্ছিন্নতা রুখতে যাচ্ছে—এ এক ব্যঙ্গাত্মক হাস্যকর প্রহসন ছাড়া আর কি হতে পারে! নতুবা ৭০ কোটি জনগণ একযোগে লড়লে 'বিচ্ছিন্নতা' শব্দটা কি কোন সভ্যসমাজে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে? নিদেনপক্ষে 'বিচ্ছিন্নতা' শব্দটা কোনও ত্রাস সৃষ্টি করতে পারত না। এটা রূঢ় সত্য যে ভারতবর্ষ মানে গুটি কয়েক স্কাইস্ক্র্যাপার নয়—ভারতবর্ষ মানে বস্তিতে—ঝুপড়িতে অনাহারে জর্জরিত-ক্লিষ্ট- অভুক্ত শীর্ণ জনগণেরা—এরা প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে

যায় অস্তিত্ব রক্ষার্থে।
অথচ একদিন এই 'স্বাধীন ভারত' শব্দটা কত আবালবৃদ্ধবনিতাকে আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ করেছে। আজকের ভারতবর্ষকে পেতে আমাদের কম মূল্য দিতে হয়নি। আজ চল্লিশ বছর পর উপলব্ধি করি যে যথার্থ স্বাধীনতা পেতে আমাদের অনেক ত্যাগ—অনেক মূল্য দিতে হবে।

শুভশ্রী দত্ত
শিলচর, আসাম

বিভূতিভূষণ প্রসঙ্গে

২৯ আগস্ট ১৯৮৭-তে প্রকাশিত "দেশ" পত্রিকায় "শতাব্দীর মৃত্যু" নামীয় লেখাটিতে তথ্যগত দিক থেকে দু'টি বিচ্যুতি আছে। প্রথমত, লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় "পীতাম্বরী বিদ্যালয়" নামে যে স্কুলটির উল্লেখ করেছেন, সেটির নাম "দি পীতাম্বরী বেঙ্গলি মিড্‌ল স্কুল"। দ্বিতীয়ত, তিনি লিখেছেন—"১৮৯৪ সালে তাঁর জন্ম। জুন মাসে।" (পৃঃ ১০১)।
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ২৪ অক্টোবর ১৮৯৪।
বিভূতিভূষণের মৃত্যু প্রসঙ্গে শীর্ষেন্দু লিখেছেন—"সঠিক কি হয়েছিল তা বিস্তারিত আমরা জানি না এখনো।" বিভূতিভূষণের মৃত্যুর খবরটি যে-ভাবে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তাতে এ সংশয় স্বাভাবিক। এ-প্রসঙ্গে জানাই, গত ২৪ জুলাই, কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের এক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য তিনি ২০ তারিখে দ্বারভাঙ্গা থেকে পাটনায় আসেন। সেখান থেকে ২৩ জুলাই রাত্রে তাঁর কলকাতায় পৌঁছবার কথা ছিল। হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় কলকাতায় আসা হয়নি, থেকে গিয়েছিলেন পাটনাতে, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে। সেখানেই বিছানা থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত পান এবং সেই অবস্থায় তাঁরই আগ্রহে তাঁকে দ্বারভাঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হয় ২৮ তারিখে। ৩০ জুলাই বেলা ১টা ১০ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর আগে অবশ্য সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত অগ্রিম অর্থ প্রত্যর্পণের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন বিভূতিভূষণ. তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের।
বিভূতিভূষণকে নিয়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি গবেষণাপত্র ইতিমধ্যেই সাফল্য লাভ করেছে, আরো কয়েকজন বর্তমানে গবেষণারত। সুতরাং তাঁর সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং সংবাদ যথাযথ হওয়া বিশেষ জরুরী বলে মনে হয়।

সরোজ দত্ত
কলকাতা-৬

'যদি' প্রসঙ্গে

১৮ জুলাই 'দেশ'-এ প্রকাশিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'যদি' গল্পটি পড়ে খুবই ভাল লাগল।
সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বুজরুকীর বিরুদ্ধে ও নাস্তিকতা প্রচারে (ইতিবাচক ভাবে বললে 'প্রকৃত মানবিকতা' প্রচারে) তাঁর উদ্যোগ ও জেহাদ অভিনন্দন যোগ্য। গত ২৫ এপ্রিল 'দেশ'-এ 'ধর্ম ও ঈশ্বর' সংক্রান্ত প্রশ্নে তাঁর সোজাসুজি স্পষ্ট বক্তব্যও অত্যন্ত প্রশংসনীয়।
সুনীলবাবুর লেখার খুব একটা ভক্ত আমরা নই। অতি অল্প কয়েকটি গল্প উপন্যাস বা কবিতা ছাড়া বেশির ভাগই পাঠযোগ্য নয় বলে আমরা ব্যক্তিগতভাবে মত পোষণ করি। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে তার চিন্তা-ভাবনার শরিক আমরাও। এক্ষেত্রে তাঁর পশ্চাতে আমাদের সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ সমর্থন থাকল।

সুস্নাত দাশ
ফুরকন আলি খান
জঙ্গিপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ

হিন্দু মহাসভা

৬ জুনের (৮৭) 'দেশ' পত্রিকায় এম. জে. আকবর "বিচ্ছিন্নতার প্রেক্ষাপট" শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে লিখেছেন, "লোক ভুলে যায় যে, কংগ্রেসীদেরই একটা অংশ 'হিন্দুমহাসভার' প্রতিষ্ঠাতা ; ১৯১০ সালে—কংগ্রেসের ২৬তম অধিবেশনে—এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।"
(খ) ২০ জুনের (৮৭) 'দেশ' পত্রিকায় "ইসলাম ও মৌলবাদী প্রসঙ্গে" শীর্ষক প্রতিবাদমূলক চিঠিতে জনাব সিদ্দিকুল্লাহ্ সাহেব একস্থানে লিখেছেন, "বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হল। ইংরেজ প্রমাদ গণল। বিভেদ নীতি চালানো হল পুরোদমে। ১৯০৬ সালে 'হিন্দু মহাসভা' ও 'মুসলিম লীগ' নামক দুটি বিষবৃক্ষ রোপিত হল।"
(গ) আর ১৩৯৩ সালের চৈত্র সংখ্যা 'কাফেলা' নামক পত্রিকায় "দলিত ভয়েস" পত্রিকা হতে ভি. টি. রাজশেখরের লেখা একটি প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন জনৈক সাংবাদিক জহর আলী। ভি. টি. রাজশেখর উক্ত প্রবন্ধের এক স্থানে লিখেছেন, "অল ইন্ডিয়া 'মুসলিম লীগ' গঠিত হয়েছিল ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে, 'হিন্দু মহাসভা' (যা গঠন হয়েছিল ঐ একই বছরের প্রথম দিকে) গঠনের প্রতিক্রিয়া রূপে।" বলাবাহুল্য, ভি. টি. রাজশেখর তাঁর এ কথার হাওলা দিয়েছেন, ডি. পি. মেনন লিখিত 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া' (ওরিয়েন্ট লংম্যান) নামক পুস্তকের ৯ম পৃষ্ঠা।
এখন আমার আগ্রহ এবং প্রশ্ন হচ্ছে যে,—"হিন্দু মহাসভা" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইংরাজী কত সালে এবং কোন মাসের কত তারিখে ? এম. জে. আকবর এবং ভি. টি. রাজশেখর অথবা সিদ্দিকুল্লাহ্—এঁদের মধ্যে কার কথা আমরা গ্রহণ করবো ? এ বিষয়ে দয়া করে 'দেশ' পত্রিকার মাধ্যমে, কোন সহৃদয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রমাণসহ আলোকপাত করলে, আমরা একান্ত অনুগৃহীত হবো।

সৈয়দ আবদুর রহমান ফেরদৌসী
গোকর্ণ, মুর্শিদাবাদ

কায়েদ-ই-আজম ও ভারতভাগ

১৫ আগস্ট 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীমতী কৃষ্ণা বসুর 'কায়েদ-ই-আজম জিন্না ও ভারতভাগ' নামক প্রবন্ধে ভারত ভাগের প্রধান দায় জিন্নার ছিল কিনা এই বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি জিন্নার ব্যক্তিত্বের এবং কার্যকলাপের বিশ্লেষণের চেয়ে সহায়ক পুস্তক হিসাবে এমন কয়েকখানি পুস্তকের কথাই বারবার বলেছেন যার লেখকগণ নিরপেক্ষ তো নন উপরন্তু জিন্নার প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল। এবং জিন্নার কুকীর্তিগুলি আড়াল করবার জন্য সদাই সচেষ্ট। লেখিকাও জিন্নার প্রথম জীবনের অসাধারণত্ব এবং যুক্তিবাদী মন কেন পরবর্তী জীবনে অন্য রকম হল এই কথা ভেবে তার ব্যক্তিসত্তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। মনস্তত্ত্বের সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা দিয়ে চিরে চিরে বিশ্লেষণই এই ধাঁধার উত্তর দিতে পারে।
জিন্না যে একজন অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন সে বিষয়ে কারও কোনও সন্দেহ নাই। প্রথম জীবনে তাঁর ভূমিকা হল দাদাভাই নৌরজীর ব্যক্তিগত সচিব। তিনি কট্টর জাতীয়তাবাদী, জাতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট সদস্য ও নেতা। ১৯১০ সালে এলাহাবাদ কংগ্রেসে হিন্দু-মুসলমানের পৃথক নির্বাচনীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিসিদ্ধ বক্তৃতা। তাঁর ক্রমবর্ধমান প্রভাব এমন অবস্থায় এসে দাঁড়াল যে সরোজিনী নাইডু তাঁকে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের শ্রেষ্ঠ দূত বলে অভিহিত করলেন। ১৯১৯ সালেও রাওলাট আইনের প্রতিবাদে জিন্না মুখর। অমৃতসর কংগ্রেসে দেশবন্ধুর আনা প্রস্তাব সমর্থনে বক্তৃতা করলেন। লেখিকা বলেছেন, ১৯২০ সালে তালভঙ্গ হল।

কিন্তু কেন এই তালভঙ্গ। শ্রীমতী বসু ঠিকই বলেছেন এই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব হয়েছে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে। কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে আদর্শগত সঙ্ঘাত তাঁকে অন্য দিকে নিয়ে গেল বলে লেখিকা প্রশ্ন করেছেন। না। এই পটভূমিকাতে মনস্তাত্ত্বিকের ব্যাখ্যাই সর্বাপেক্ষা যুক্তিসহ। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন দেশকে নাড়া দিয়েছে, জনজাগরণ শুরু হয়েছে। জনগণ চিনতে পারছে তাদের সত্যিকার নেতা কে? স্যুট-টাই শোভিত বিলাস ও আরামের মধ্যে বসে অভ্যস্ত পাকা সাহেব জিন্না—যিনি ব্রিটিশ শাসকের কাছে কথার মারপ্যাঁচ খাটিয়ে আবেদনপত্র নিয়ে নতজানু হন? না দেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানুষকে জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে গোটা ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলনের অস্ত্র প্রয়োগ শেখালেন সেই কটিবাস পরিহিত মহাত্মা গান্ধী। জিন্না বুঝতে আরম্ভ করলেন এই জনজাগরণের জোয়ারে হাল ধরবার ক্ষমতা তাঁর নেই। নাগপুর কংগ্রেসে বক্তৃতা দিতে উঠে তার হাতেকলমে প্রমাণ হয়ে গেল। বুঝলেন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে তাঁকে আর কেউ জাতির নেতৃত্ব দিতে ডাকবে না। প্রবল ঈর্ষার অনল জ্বলে উঠল জিন্নার মনোভূমিতে। অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন জিন্না। তিনি নাগপুর কংগ্রেসে অপমানিত বোধ করলেন। ঈর্ষার ধর্মই এই যে ঈর্ষাকাতর ব্যক্তির অপমানিত বোধ করবার অন্তরালে নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা গোপন থেকে নিজের মর্যাদা বোধকে আকাশচুম্বী করে তোলে।

এই অবস্থায় প্রতিপক্ষকে প্রত্যাঘাত করবার একটা তীব্র বাসনা সৃষ্টি হয়। এখানেও তাই হল, আদর্শগত সংঘাত নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তি সর্বস্ব ঈর্ষাই তাঁকে অন্য পথে নিয়ে গেল। জিন্না বুঝলেন যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে থেকে গান্ধীজীকে পরাস্ত করা বা আঘাত করা বা জব্দ করবার ক্ষমতা তাঁর নেই। তখন সুচতুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ জিন্না, বিমূঢ় মুসলমান সমাজকে তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়াররূপে ব্যবহার করতে অগ্রসর হলেন। যদিও মুসলমান সমাজের উপরে তাঁর বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা ছিল না। তার প্রমাণ দেখেছি পরবর্তীকালে অখণ্ড বঙ্গদেশে একবার ট্রেনযোগে তিনি যাচ্ছিলেন, একটি বড় স্টেশনে পাঁচ মিনিট ট্রেন থামায় হাজারে হাজারে মুসলমান জনতা ঐ স্টেশনে ভীড় করেছিলেন—জিন্নার বাণী শুনবেন বলে। এই লেখকও সেই ভীড়ের মধ্যে ছিল। ট্রেন স্টেশনে দাঁড়াবার পরে জনতার জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে ট্রেন ছাড়বার তিন মিনিট আগে স্পেশ্যাল কামরার দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তিনি কিন্তু "বেরাদারে মুসলিমিন" বলে জনতাকে সম্বোধন করলেন না। উর্দুতে শুধু বললেন, মুসলমানগণ শোন আমি কায়েদ-ই-আজম জিন্না, আমি বলছি আমি যদি বলি তোমরা আমার হাতের এই লাঠিটাকে ভোট দেবে তাহলে তোমরা তাই করবে। এর অন্যথা যেন না হয়। ব্যস দরজা ছেড়ে ভিতরে গিয়ে বসলেন। এমনই ছিল তাঁর দম্ভ, এমনই অশ্রদ্ধা স্বসম্প্রদায়ের প্রতিও। এমনই অশ্রদ্ধা জনতার প্রতি। তিনি বুঝেছিলেন এইভাবে তিনি ব্রিটিশ শাসকদের সহায়তা পাবেন এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র নেতৃত্ব নিয়ে গান্ধীজীকে প্রত্যাঘাত করতে পারবেন। এই ঈর্ষা বর্ধিত হয়ে তাকে প্যারানোইয়ার (ভ্রমবাতুলতা) শিকার করেছিল। প্যারানোইয়া রোগীর ভিতরে যে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে সহস্র যুক্তিতেও তার থেকে টলানো যায় না। জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে তাঁর নির্গমনের কারণস্বরূপ গান্ধীজীকে আঘাত করতে হলে যত অন্যায় কৌশল হোক তাঁকে নিতেই হবে। নাহলে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ (গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং) বা নোয়াখালি কিলিং-এর মত হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ করতে পারে না।

আয়ুর্বেদে মনোবিজ্ঞানে বলা হয়েছে মূলত অসুর সত্তার মানুষ ভ্রমবাতুলতা রোগে আক্রান্ত হলে আসুরিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল।

অবশ্য দেশ বিভাগের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত জহরলাল, সর্দার প্যাটেল প্রমুখ নেতৃগণ এমনকি গান্ধীজীরও উপরে বর্তায়। গান্ধীজী যদি তাঁর বহু পরীক্ষিত অস্ত্র অনশন করে বলতেন দেশ বিভাগের আগে আমার মৃত্যু হোক—তবে হাজার জহরলালেরও সাধ্য ছিল না সে আদেশ অমান্য করে। জিন্নার গান্ধী বিদ্বেষ এই স্তরে নেমেছিল যে গান্ধীজীকে পরাভূত করে দেশ বিভাগের পরেও তাঁর মৃত্যুর সংবাদে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ ভিন্ন সুরে কথা বলছে তখনও তিনি বললেন, তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। শ্রীযুক্তা বসু প্রবন্ধের শেষ ভাগে বলেছেন "শেকসপিয়ারের ট্র্যাজেডির নায়ক হিসাবে নিয়তি ছাড়াও অন্তর্নিহিত কোনও দুর্বলতাই ট্র্যাজেডির কারণ।" সেই দুর্বলতা হল ঈর্ষা যা বর্ধিত হয়ে প্যারানোইয়াতে পরিণত হয়েছিল। জিন্নার কিছু ভক্ত হয়ত তাঁর দোষ স্খালনে অগ্রসর হয়েছেন কিন্তু সত্য যা চিরকালই সত্য।

বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী
রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর

শিশুশ্রমিক প্রসঙ্গে

দেশের ১৮ জুলাই সংখ্যার বিশেষ দুটি নিবন্ধ "শিশু ভোলানাথেরা" ও "শিশু শ্রমিকরাও পড়তে চান" পড়ে আমাদের দেশের শিশু শ্রমিকদের সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। এই দুটি নিবন্ধের জন্য লেখক ও দেশের সম্পাদক মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ। নিবন্ধের বিশেষ আকর্ষণ এর ছবিগুলি। আমাদের সমাজে কয়েক কোটি অসহায় উপেক্ষিত শিশু শ্রমিককে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য স্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। সপ্তাহে একদিন ছুটিও জোটে না। আচ্ছা, পুলিশের সহায়তায় এদের কাজের সময়সীমা কি দিনে আট ঘণ্টার মধ্যে বেঁধে দেওয়া যায় না? এবং সপ্তাহে অন্তত একদিন ছুটি। এত পরিশ্রমের পরেও পড়াশুনার প্রতি যে এদের আগ্রহ দেখা যায় এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

সমীক্ষায় লেখক দেখেছেন বেশিরভাগ শিশু শ্রমিকের ভাই-বোনের সংখ্যা পাঁচ সাত এবং তাদের পিতামাতার রোজগার দারিদ্র্যসীমার অনেক নীচে। অর্থাৎ পরিবার পরিকল্পনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এই শ্রেণীর লোকগুলি দেশকে উপহার দিচ্ছে বিরাট সংখ্যক নিঃস্ব, অপরিপুষ্ট ও উপেক্ষিত নাগরিক যারা বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কেউ হয় শিশু শ্রমিক, কেউ হয় ভিখারী, আবার কেউ হয় সমাজবিরোধী।

স্বভাবতই সমাজে এই অবাঞ্ছিত সংযোজন উদ্বেগজনক। বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রক কি বাধ্যতামূলকভাবে এই শ্রেণীর লোকেদের প্রজনন ক্ষমতা বিলোপ করতে পারেন না ? আমরা চাই সুস্থ সবল শিক্ষিত নাগরিক।
দ্বিতীয় নিবন্ধের সঙ্গে শিশু শ্রমিকের যে একটি সারণী দেওয়া হয়েছে তাতে প্রথমে দেখানো হয়েছে এদের শিক্ষার হার। ঠিক তার নিচেই দেওয়া হয়েছে "শিক্ষিতের হার"। দুরকমের দুটি পরিসংখ্যান দেওয়ার উদ্দেশ্য বোধগম্য হল না।

বেণীমাধব ভৌমিক
ব্যারাকপুর

মুস্তাক আলী প্রসঙ্গে

সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার মুস্তাক আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার পড়লাম। সাক্ষাৎকার লেখাটি খুবই চমৎকার ও আকর্ষণীয় হয়েছে। এই সুদূর কানাডার বৃহত্তম শহর টোরন্টো, শহরের কেন্দ্রীয় পাঠাগারে আমি মাঝে মাঝে যাই 'দেশ' পত্রিকা পড়ার জন্য। আমি 'দেশ' পত্রিকার আজীবন ভক্ত ও অনুরাগী। ছেলেবেলায় কলকাতায় থাকাকালে ফুটবল ছাড়া ক্রিকেটের খুবই অনুরাগী ছিলাম। সেই সময় মার্চেন্ট, মুস্তাক ও মানকড়ের যুগ ছিল। এঁরাই ছিলেন আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলোয়াড়। এঁদের ছবি ও জীবনী কেটে আমার ক্রিকেট অ্যালবামে সাজিয়ে রাখতাম। এছাড়া আমার অ্যালবামে ছিল সে-যুগের প্রখ্যাত টেস্ট ক্রিকেটারদের ছবি যেমন রে, লিন্ডওয়াল, অ্যালেক বেডসার, জিম লেকার, ডন ব্রাডমান, বাংলার পি. সি. সেন, সুটে ব্যানার্জী পঙ্কজ রায়—ইত্যাদি। আমার সবচেয়ে পছন্দময় খেলোয়াড়রা ছিলেন মার্চেন্ট, মুস্তাক ও মানকড়। এঁদের ছবি ও খেলার বিবরণ আমার অ্যালবামে তারকার মত উজ্জ্বল হয়ে থাকত। কিন্তু দুঃখের বিষয় মার্চেন্ট, মুস্তাক ও মানকড় এর খেলা দেখার কোনদিন সুযোগ হয়নি। কারণ তখন আমি খুবই ছোট ছিলাম। শুধু খবরের কাগজে ও রেডিওতে ধারাবিবরণীর মাধ্যমে তাঁদের খেলা মনে প্রাণে উপভোগ করতাম।
কানাডায় আসি ১৯৭৫ সালে। তারপর কোন এক ভরা গ্রীষ্মের বিকাল বেলায় আমার স্ত্রীর সঙ্গে এক শিশুপার্কে আলাপ হলো এক উজ্জ্বল, শ্যামবর্ণ, সদাহাসাময়ী ভদ্রমহিলার সঙ্গে। কথায় কথায় তিনি জানতে পারলেন যে আমাদের বাড়ি হলো কলকাতায়। ভদ্রমহিলার নাম পারভীন। তিনি

মুস্তাক আলীর বড় মেয়ে। পারভীন আমার স্ত্রী পুতুলকে বললেন "নিশ্চই আপনার স্বামী আমার বাবা মুস্তাক আলীর নাম শুনে থাকবেন। তিনি একজন প্রাক্তন ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটার। বিশেষ করে কলকাতার ইডেনউদ্যান তাঁর সবচেয়ে ফেবারিট মাঠ ছিল।" আমার স্ত্রী বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার অফিসে আমাকে ফোনে জানালেন যে মুস্তাক আলীর মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। আমি শুনে আনন্দে মুখরিত হয়ে পড়লাম। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে যাঁর খেলা দেখার জন্য আমি এককালে এত আগ্রহী ছিলাম, তাঁরই মেয়ের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। সেই সপ্তাহে আমি সস্ত্রীক এবং দুই ছোট মেয়েসহ তাঁদের বাসায় গেলাম দেখা করতে। তাঁদের প্রাচীন ও আধুনিক কারুকার্যে সুসজ্জিত ড্রইংরুমে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল মুস্তাক আলীর ছবি সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো কালো সাদায় তোলা ছবি পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে—মুস্তাক আলী যে সময় জাতীয় পুরস্কার পদ্মশ্রী পেয়েছিলেন সেই সময়কার ছবি। তাঁদের বিরাট বসবার ঘরে ঐ ছবিটি অপূর্ব শোভা পাচ্ছিল। তাদের কাছ থেকে নিয়ে আমি পড়লাম মুস্তাক আলীর স্মৃতিকথা— ইংরেজীতে (লেখা "Delightful Cricket") মুস্তাক আলীর জামাই জিয়া সিদ্দিকি খুবই উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক। তিনি পেশায় Entomalogist পি এইচ ডি করেছেন আমেরিকার—এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বাড়ি তাঁর উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ শহরে। ভারত থেকে এম এস সি পাস করার পর স্কলারশিপ পেয়ে আমেরিকায় আসেন ডক্টরেট করতে। গৌতমবাবুর মুস্তাক আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারটি ফোটো কপি করে নিয়ে আসি লাইব্রেরি থেকে। তারপরের দিন আমি ফোন করে পারভীনকে জানাই। তিনি এই খবর শুনে খুবই উৎসাহিত। তিনি জানতে চান, তাঁর বাবার সাক্ষাৎকারের বিষয় বস্তুটা। আমি ইংরাজীতে তরজমা করে তাঁদের দিয়ে আসি পড়ার জন্য। পারভীন ও তাঁর স্বামী জিয়া ওঁর লেখা পড়ে খুবই আনন্দিত হয়েছেন। তাঁর মেয়ের মতে এর আগে এত সুন্দর ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর বাবার সাক্ষাৎকার লেখা তাঁর চোখে পড়েনি। এরজন্য পারভীন ও তাঁর স্বামী লেখককে তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মোহাম্মদ রফিকউল্লাহ
কানাডা

সম্পাদকীয়

'শহরের দৃশ্য, অনেকগুলি হাত' সম্পাদকীয়র (১৫/৮) প্রথম পরিচ্ছেদের ছেলেগুলোর সঙ্গে লম্বা পাল্লার ট্রেনে হাত মিলিয়েছি, অবসরে। এখানেও এদের নিয়ে চলছে একই খেলা। ট্রেনগুলি ইজারা নেওয়া থাকে। থাকে এদের সর্দাররা। হয়তো তারাও যূথবদ্ধ। তারা জমা নেয় সমস্ত রোজগার। পরিবর্তে খাওয়া বা খাবারের পয়সাটুকুই পায় ওরা। এবারে শেষ পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে। ভিখারিদেরও একটু আশ্রয় চাই। রাতে। তা যতো ছোট যতো নোংরাই হোক না কেন। এই আশ্রয়গুলো ভরাট বা বন্ধ করে দিতে পারলেই যে কোনো শহরই ভিখিরিমুক্ত করা সম্ভব। তার জন্য দরকার পশ্চিমি-ধাঁচের চাঁছাপোছা গ্রীল গেট বাড়ি বা স্বাস্থ্যবান দরওয়ান। ফলে শুধু কলকাতা নয় সব শহরেই মুক্ত আশ্রয়গুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আগে আমরা হাসপাতাল- স্টেশন- অফিস- স্কুল ছাউনি এমনকি বাড়ির বারান্দাতেও এদের গভীর রাতের আনাগোনার বিষয়ে একটু উদার ছিলাম। এখন বুঝেছি যে এই সব কোটি টাকার সিমেন্ট কংক্রিট রঙ একটু 'বুদ্ধি' করে খরচ করলেই এই 'ইমেজ' হানিকর আগন্তুকদের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।
এর জন্য কোনো বামপন্থী সরকার বা আন্তর্দেশীয় খেলাধুলার উৎসবের প্রয়োজন হয় না।

বিবেকজ্যোতি চক্রবর্তী
নিউ কদমতলা, কোচবিহার

সংশোধন

২৫ জুলাইয়ের শিল্প সংস্কৃতি বিভাগে 'দারু চারু কারু' রচনায় ভাস্কর্য প্রদর্শনীর শিল্পীর নাম দেবপ্রসাদ মিত্র। দেবীপ্রসাদ নয়।
১ আগস্টের শিল্প সংস্কৃতি বিভাগে 'প্রবাহিনীর বার্ষিক অনুষ্ঠান' শীর্ষক প্রতিবেদনের শেষাংশে উল্লেখিত জাহ্নবী পুরকায়স্থ নামটির শুদ্ধরূপ হবে চান্দ্রেয়ী পুরকায়স্থ।

সম্পাদক

মা আসছেন

বছরের যে ক'টা উৎসবের দিনের জন্য বাঙালী আবালবৃদ্ধবনিতা অপেক্ষা করে সেই পুজো এসে গেল। পুজো বলতেই দশভুজা দুর্গা, পায়ের নিচে উদ্যত সিংহ ও উদ্ধত অসুর, গণেশ-কার্তিক-লক্ষ্মী-সরস্বতী সিদ্ধি পৌরুষ সমৃদ্ধি ও জ্ঞানের চার প্রতীক নিয়ে বাঙালীর এই মৃন্ময়ী মা ভঙ্গ বঙ্গদেশে যেন রঙ্গের বন্যাই নিয়ে আসেন। আজকাল আর বাঙালীরই নয়, দুর্গা ভাষাধর্মনির্বিশেষে এক যথার্থ সার্বজনীনত্ব পেয়েছেন। এমন কি নাস্তিকেরও অরুচি নেই পুজোর আনন্দে। আর এই পুজো এখন তো বিশ্বব্যাপী।

বাঙালীর ভাবমূর্তিতে দুর্গা শিবের জায়া, কার্তিক গণেশের জননী, আবার অসুরদলনী। স্বয়ং চণ্ডিকা সৃষ্টি হয়েছিলেন বিভিন্ন দেবতার সম্মিলিত নানা গুণাবলী নিয়ে। চামুণ্ডা পাহাড়ে মহিষাসুরের সঙ্গে দশ সহস্র বৎসর তাঁর যুদ্ধ চলেছিল। তারপর তাঁর কাজ শেষ হয়ে যায় এবং তিনি দেবদেবীর শ্রেণীতেই উন্নীত হয়ে কালাতিপাত করতে থাকেন। শিবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ-কল্পনা বাঙালীই করে নিয়েছে। শাস্ত্রের ফাঁক সর্বদাই লৌকিক কল্পনায় ভরাট হয়ে ওঠে। শাস্ত্রে দুর্গা যাই হোন, বাঙালীর তাতে তেমন কিছু যায় আসেনা। আর দুর্গার সঙ্গে অসুরের লড়াইটা যদিও হয়েছিল দক্ষিণ ভারতের মহীশূরে তবু তিনি সমাদৃতা ভারতের পূর্বাঞ্চলের এই অংশটুকুতে। এসব কেমন করে হয় কে বলবে, কিন্তু দুর্গা যে সম্পূর্ণ বাঙালীরই দেবী তাতে সন্দেহ নেই।

দেবী বললে কিছুই বলা হয় না। বারোয়ারি পুজোর এই রবরবার দিনে আজকাল কল্পনা করতেই কষ্ট হয় যে, কিছুকাল আগেও দেবী দুর্গার পুজো ছিল ঘরোয়া পুজো। আর ঘরোয়া পুজোর পরিবেশটাই আলাদা। মৃন্ময়ী দুর্গা কখন যে প্রবাসী মেয়ের রূপ ধরে বাড়ির একজন হয়ে যায় তার সীমারেখাটাই নির্দেশ করা মুশকিল। চণ্ডীমণ্ডপে বা চাঁদোয়ার তলায় প্রতিমা পাটে বসলেন কি শুরু হল বাড়ির লোকেদের এক আবেগ বিহ্বল বোধন। ভক্তি আছে, বিশ্বাসও থাকতে পারে, কিন্তু সব ছাপিয়ে ওঠে এক গভীর মানবিক ভালবাসা। প্রতিমা কথা বলে না, চোখের পাতা কাঁপে না, বুক ধুকপুক করে না, তবু চারটে দিন ওই প্রতিমায় সত্যিই যেন প্রাণ সঞ্চার হয়।

বাঙালীর এই ঘরোয়া পুজো প্রায় উঠে যেতে বসেছে। কারণ অর্থনৈতিক। তার চেয়েও বড় কথা, এখনকার ভাঙা ভাঙা পরিবারে লোকবলেরও একান্ত অভাব। কে যাবে ঝামেলা ঘাড়ে করতে ? সেই ভক্তি আর ভয়ও তো নেই, নেই কুলাচার রক্ষা করবার তগিদ বা বংশগৌরব। দেশভাগের আগে যাও বা ঘরোয়া পুজোর চল ছিল তাও গেল দেশভাগের পর।

কে না স্বীকার করবে যে, ষড় ঋতুর মধ্যে শরতের কোনো তুলনাই নেই। এই এক ঋতু যা সমস্ত প্রকৃতির মধ্যেই সঞ্চার করে দেয় এক ম্যাজিক। যাদুদণ্ডের স্পর্শে পৃথিবী অপরূপা হয়ে ওঠে। তার হলুদ বোঁটার শিউলি, তার আদিগন্ত কাশফুল, তার রোদমেশানো হীরেকুচি বৃষ্টি, তার স্ফটিক স্বচ্ছ নীলাকাশ নিয়ে শরৎ তুলনারহিত। প্রকৃতিহীন কলকাতাতেও শরতের সঞ্চার টের পাওয়া যায় তার আকাশে মেঘের খেলায়, তার আলোয়, তার অন্ধকারে।

আগমনীর গান কলকাতায় তো শোনা যায় না। কিন্তু গ্রামবাংলায় বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে আগমনী আর বিজয়ার গান ছিল এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

সত্য বটে এই ডেকোরেশন আর লাউডস্পিকার-প্রধান পুজোয় বারোয়ারির আসর ছাড়া বাঙালীর আর গত্যন্তর নেই। তবু তাকে ঘিরেও তো উত্তাল হয়ে ওঠে বাঙালীর হৃদয়।

এই চারটে দিনকে লক্ষ্য করে জমে ওঠে পুজোর সাহিত্যসম্ভার। ফুলে ফেঁপে ওঠে ব্যবসা বাণিজ্য। এই চারদিনকে লক্ষ্য করেই ছুটির নানা আয়োজন, উল্লাস।

মা ডাক বাঙালীর বড় প্রিয়। এখনো তার স্বভাবে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব। টুকরো হওয়া ভাঙা দেশ, সমস্যায় জর্জর, আন্দোলনে থরো থরো, বন্যায় ডুবুডুবু, খরায় জর্জর, তবু তার মধ্যেই মা আসেন। বাঙালীর মলিন মুখে এক স্বর্গীয় হাসির ছোঁয়া ঠিকই লাগে।

দেশ

হাজার মাছির মধ্যিখানে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আষ্টপ্রহর কাছাকাছি
ভনভনাচ্ছে হাজার মাছি
তোর সেদিকে না-দিয়ে কান
সব সময়ে সিধে-সটান
দাঁড়িয়ে এখন থাকতে হবে।
তেমনভাবে দাঁড়িয়ে আমি থাকলুম কই।

পাল্লা যখন যেদিক ঝোঁকে
সেইদিকে ব্যাং-লাফায় লোকে,
লাফাক গে, তুই শক্ত থাকিস,
সব সময়ে মনে রাখিস
নিজের শপথ রাখতে হবে।
কিন্তু আমি সকল শপথ রাখলুম কই।

বর্ষা কাটছে, এখন আকাশ
বলছে, আসছে আশ্বিন মাস।
হিসেবপত্র ফেলে রেখে
ফিরছে সবাই বিদেশ থেকে—
এই ছবিটাই আঁকতে হবে।
কিন্তু আমি তেমন ছবি আঁকলুম কই।

সতী ছিলে

অসিত চট্টোপাধ্যায়

সতী ছিলে অথবা রাক্ষসী যা মায়া যা সর্বনাশী টানে
ভালোবাসলে, ভালোবেসে জ্বরে পুড়লে, ঘরণী হলে না।
চিতার আগুনে হাত সেঁকে হৃদয় পুড়েছে তার : বালক
তোমাকে ফেরানো তাই বড়ই কঠিন ছিলো কেননা বয়েস।

উজান গঙ্গায় তার নিত্য যাতায়াতে তুমিও সঙ্গে ছিলে
কঠিনে কোমলে ঋতু, যেন ফুল, পেঙ্গুইন মাঝপথে
বিসর্জন অসম্ভব ছিলো বলে অসহায় কে বা কারা
সঙ্গে যাবে ভেবেও ভাবেনি তার ভাববার সময় ছিলো না

জেনে তুমি মরীচিকা, গ্রামে গঞ্জে নগরীর প্রত্যন্ত প্রদেশে
তোমার বাজুতে সেও ভিখিরি গোপাল, চাতুরীতে মোহে অন্ধ—
হাত ধরে নিয়ে গ্যাছো, তুমিই বলেছো হাত রাখো স্থানে বা অস্থানে।
হাত পুড়লো, আলো বা আঁধারে তুমি, অনামী বন্দরে তার ছায়া।

সতী ছিলে কিংবা রাক্ষসী বা মায়া যা সর্বনাশী টানে
ভালোবাসলে, ভালোবেসে জ্বরে পুড়লে, ঘরণী হলে না

প্রতিধ্বনি বিন্দু, মহাবালেশ্বরে দাঁড়িয়ে

অভী সেনগুপ্ত

রুক্ষ, নির্লোম পাহাড়ের যূথবদ্ধতা পার হয়ে আমরা উঠে এলাম
সবুজের স্তব্ধতায়, এখানে
পাখি, ঝরাপাতা আর ভ্রমরের ডাক কানে মধু ঢেলে দেয়—
এখানে এই পাহাড়চূড়ার খুব কাছে অবনতমস্তক ঝুঁকে আছে
সারি সারি পাহাড়
আছে ঝকঝকে রাস্তাঘাট, নিজেরই বাগানে পা ডুবিয়ে ব'সে-থাকা
উঁচু নীচু বাংলো-মার্কা বাড়ি
যুবতীদের পিঠে নিয়ে সাহসী ঘোড়াগুলি চড়াই ভাঙতে ভাঙতে
হুবহু পক্ষীরাজের মতন কামনাবাসনার ঊর্ধ্বে মিলিয়ে গেল
সুন্দরের এই বিশাল সমারোহে হঠাৎ-ই 'হাহাকার' শব্দটি আমার
বুকের খাঁচা-খুলে প্রকাশ্যে খুব ওড়াউড়ি শুরু করেছিল—
করাতের দাঁতের মতন ট্যাক্সিওয়ালাদের অর্থলোভ কিছুটা ভোঁতা করে দিয়ে
একসময় আমরা পর্যটকের চেহারায় মহাবালেশ্বরের শরীরের অভ্যন্তরে
ঢুকে যেতে শুরু করেছিলাম
প্রতিধ্বনি-বিন্দুতে দাঁড়িয়ে চোখের সামনে খাড়া দেয়ালের মতন শূন্যতা,
মেঘের পশমে গা-ঢাকা শীতকাতুরে পাহাড়, পাহাড়ের গাল বেয়ে নেমে
আসা
শুকনো অশ্রুর মতন ঝরনার দাগ
—স্মৃতি এসে শিহরণ এনে দেয় এমন পরিবেশে বন্ধুরা কিছুটা
পরীক্ষা করার ছলে শুরু করেছিল তাদের প্রিয় নাম-ধরে ডাকা
সেই সব প্রিয় নামগুলি মিলিয়ে যাবার আগেই সহসা ফিরে আসছিল
গহ্বরের মতন শূন্যতার খুব অন্তর থেকে যখন
সমস্ত পশ্চিমঘাট পর্বতের স্তব্ধতা মুখ-টিপে হাসছিল এই ছেলেমানুষীতে
আমার যখন পালা এলো আমি স্তব্ধতাকে ডেকে বললুম—তুমি যাও

'তুমি যাও' এই উচ্চারণ ঐখানে, ঐ প্রতিধ্বনি-বিন্দু থেকে
ঘুরপাক খেতে-খেতে আমাকে লক্ষ্য ক'রে ফিরে আসছিল বারবার।

হে নিষাদ

উদয় চট্টোপাধ্যায়

কে কার রক্ষাকর্তা ? হে নিষাদ, তুমি
ক্রৌঞ্চ কিংবা আমাকেই বধ করো।
একই পরিণতি—
কিছু তাৎক্ষণিক শোক, পঞ্চভূতে
কিছুটা ইন্ধন ;
বধ্য আর ঘাতকের একই নিয়তি।

হে নিষাদ, জঠরাগ্নি তাড়া করে ফেরে
তোমাকে আমাকে—
তোমার আমার ভোক্তা সেও তো শিকার
বৃহত্তর আগুনের,
প্রতিষ্ঠা দুরভিলভ্য, মৃত্যু পিছু ডাকে।

ঋণশোধ

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

যে ফিরে দাঁড়িয়েছিলো, সে এখন মুখ তুলে কাছে আসতে চায়।
আমরা কি ভাবতাম, একে একে অন্ধকার জানলাগুলো আস্তে খুলে যাবে।
এক চিলতে রোদ এলো ঘরে, যেন ভের্মিয়েরের কোনো ছবি, পাশে সাজানো পিয়ানো
আনো কি আনোনি সেটা বড়ো কথা নয়, আমরা কিছুটা দেখেছি।
যে ছিলো অনেক দূরে, সে এখন কিছুটা কাছে, আর যারা কিছু দূরে ছিলো
তারা এতো কাছে এসে গেছে যে মনে হয় ডালপালা বুকে আছড়ে পড়ে।
শহরে আছি না কোনো গ্রামে, রাত্রে না দিনের ভেতরে—
পরে সে সমস্ত বোঝা যাবে, এখন যেভাবে বাঁচি তা-কে উস্‌কে দিই।
একটু একটু ক'রে আলো জ্বলছে, আঁধার-মেশানো আলো, গুহার ভেতরে কোনো শিবলিঙ্গের মতন—
মন কি একটা থাকে ? টুকরো টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে।
তাকে জড়ো করো যদি ফুল হবে, আর যদি না-ও হয়, কিছু একটা হবে।
এখন সিলিং ফ্যানের নিচে ব'সে ঠাণ্ডা না গরম লাগছে বুঝতে পারি না
কারা করিডরে পাখির মতন কিচ্‌মিচ্‌ করছো সারাদিন ?
ঋণ একটা ছিলো, আমরা তা শোধ ক'রে দিয়েছি, তুমিও
পোষা বেড়ালের মতো ব'সে আছো খাটের ওপরে।

ধুলোর কার্পেট ছিঁড়ে

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

জিওল মাছের মত কবে
হাত থেকে ফসকে গেছে শৈশববয়স ?
সে জানে না
চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে যে মেয়েটি
না-বালিকা একা।

রাস্তা পার হল যারা
তাদেরই একজন ওই জাদুকর
কোনদিন এসে, হেসে
ফিরোজা আলোর নিচে, খেলাচ্ছলে
দিয়ে যাবে চাবি
দিয়ে যাবে কাঠকুটো ঘর বানাবার
দিয়ে যাবে নুড়ি-শিল আগুন জ্বালার
দেবে আঁকশি—খাদ্যসংগ্রহের ঈহা।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, একা
চৌমাথায় চলে গেল যে যুবক, একা
পাথরের পঙ্‌ক্তি ভেঙে
স্তূপ ভেঙে
শালবল্লী সরিয়ে নড়িয়ে—
ওদের পাংক্তেয় করতে
উড়ে আসবে কোনদিন এক উঠোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেঘ
ধুলোর কার্পেট ছিঁড়ে খুড়ে
শিলাবৃষ্টি হবে।

হস্তীদন্তদরজার অলসস্বপ্ন এবং অতঃপর

মঞ্জুভাষ মিত্র

হস্তীদন্তদরজা তোমার বুকের ভিতর নগ্নগোলাপ যা একমাত্র
নারীদের নিজস্ব ; তোমার বুকের ভিতর মহাসংকেত সত্য এবং
সৌন্দর্যের। মিলনকালীন কুমারীর মত সমস্ত আলো কম্পমান
'গোলাপের দুটি চোখ' এই নামে অভিহিত যুগলভগিনী কবে যেন
চলে গেছে কানন কান্তার থেকে ; মনে হয় তোমার ভিতর প্রবেশ
করলে তাদের দেখা পাব। ধাবমান তীক্ষ্ণতা কুচি কুচি করে কাটে
উৎফুল্ল স্বপ্নকে, সমুদ্রের বুকের উপর বিদায়গোধূলি ; আমার
প্রত্যয় অগ্নিবর্ণ অক্ষররূপে ওইখানে ভাসমান। অক্ষর বলে
একদিন চলে যাব আকাঙ্ক্ষার দেশে....অতঃপর আকাঙ্ক্ষার দেশে
এসে আমি প্রথমেই লিখলাম : এই দেশ আমার স্বদেশ। আমি যেন
বহির্গত হয়েছি ভুবনবিজয়ে, আমার অশ্ব কোন বাঁধা মানে না
তরোয়াল নয় শুধু ভাষার উপর আমার অধিকার আমি যা চেয়ে-
ছিলাম পেয়েছি ; অদ্ভুত ফল ও কুসুমের মুখ চুম্বন করলাম
এবং মিলিত হলাম দীর্ঘদীপিতদেহা কুমারীগণের সঙ্গে
আমার সম্বল ছিল শুধু ভাষা, বিদায়গোধূলির মত বিষণ্ণ
একগুচ্ছ ভাষাকুসুম !

গলুই

স্বপন চক্রবর্তী

যেদিকে আগুন তার বিপরীতে জল।
গভীরে সব এক। শুধু রূপ, মন-মাতালের
অহংকার।
একও যা, বহুও তাই।
চরাচরের সব কিছুই
শ্যাম রাইয়ের কূট কচাল।

বাউলের একতারা যার জন্য কেঁদেছে
চার দেওয়ালের সেই তো
রক্ত মাংসের দেহ।
যে ভিখিরী তার পায়েই না
উপচে পড়েছে
মণিকাঞ্চন।

তীর্থও যা, সংসারও তাই।
গাঙের সব নাওয়েরই তো
দুটি গলুই।

দানব ও দেবতা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

॥ তেতাল্লিশ ॥

লন্ডন থেকে মেকসিকো দীর্ঘপথ। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান এক পেট ভি আই পি নিয়ে সকাল এগারোটা নাগাদ হিথরো ছেড়ে আকাশে উঠে পড়ল। লন্ডনে যা সবচেয়ে অস্বাভাবিক তাই হয়েছে। চচ্চড়ে রোদ উঠেছে। আকাশের অল্প উচ্চতা থেকে দেখতে পাচ্ছি, নিচে পড়ে আছে ছবির মতো লন্ডন শহর। বিদায় শ্রীমতী থ্যাচার। বিদায় কুইন এলিজাবেথ। শেকসপীয়ার, চসার, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বেন জনসন, কীটস, শেলি, বায়রন, ব্রাউনিং। সব বিদায়। এই উদার, অকৃপণ রোদ দেখে গ্রাউচো মার্কসের মতো বলতে ইচ্ছে করছে, I am leaving because the weather is too good. I hate London when it is not raining. সত্যিই তাই, বৃষ্টি না হলে লন্ডন যেন বেমানান। যে সবসময় কাঁদে, সে যদি হঠাৎ হাসতে থাকে, ভালো লাগে কি?

কুমকুম এক কাণ্ড করেছে। দলছাড়া হয়ে ইলেকট্রনিক্স মার্কেটে গিয়েছিল কমপুটারাইজড টাইপরাইটার কিনতে। প্লেন যখন ছাড়বো ছাড়বো করছে, সিঁড়ি যখন সরিয়ে নোবো নোবো করছে, তখন দিদিমণি, চতুর্দিকে ঝোলাঝুলি ঝুলিয়ে হুড়মুড়িয়ে উঠতে গিয়ে পড়েছে। অ্যালুমিনিয়ামের সিঁড়ির ধারালো ধারে লেগে পা ক্ষতবিক্ষত। কনুই কেটেছে। চতুর্দিকে রক্তারক্তি অবস্থা। পরিধানে টাইট শালোয়ার। সরিয়ে ওষুধ লাগাবে, সে উপায়ও নেই। নীরবে অশ্রুপাতের মতো রক্তপাত।

এ যাত্রাতেও আমাদের আসন পাশাপাশি। এবার আমি জানালার ধারে। প্লেন আকাশে উঠে বাতাসে সুস্থির হওয়া মাত্রই, পান ভোজনের আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। যতক্ষণ পারা যায় খাইয়ে-দাইয়ে ওড়ার একঘেঁয়ে ক্লান্তি ভুলিয়ে রাখা। দুই আসনের সারির মাঝের পথ দিয়ে একের পর এক ট্রলি বিমানের লেজের দিক থেকে মুণ্ডের দিকে চলেছে। মাথার দিকে প্রধানমন্ত্রীর এলাকা। সপার্ষদ অনেকেই আছেন। আড়চোখে দেখছি। চলেছে সুদৃশ্য কাপ ডিশ। কারুকার্য-করা রুপোর থালা, বাটি, কাঁটাচামচ, পানীয়ের পাত্র, ফল, সুখাদ্য। বিমানসেবিকাদের যিনি হেড, তাঁর চেহারা অতিশয় গম্ভীর। মুখে হাসির ছিটেফোঁটাও নেই। পরনে লম্বা ফ্রক। পিঠের দিকে ঝুলছে লম্বা চুল। পিকপিক করে ইংরেজি বলছেন। তাঁর নির্দেশে এক ঝাঁক শাড়ি-পরা সুন্দরী বিমানসেবিকা সামনে পেছনে ছোটাছুটি করছেন। করতেই হবে। প্রধানমন্ত্রী আহারে বসেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বিমানে যাঁরা বিমানসেবিকা হন তাঁরা অবশ্যই অত্যন্ত সুদক্ষ, সুন্দরী ও সেবাপরায়ণা।

বিমানের ভেতরের পরিবেশ যেন রবিবারের রকের আড্ডা। এত সব ভারি ভারি, নামী নামী মাথাঅলা লোক দিনের এইরকম একটা সময়ে কেমন আয়েস করে বসে আছেন! চেয়ারে টাইট। নড়াচড়ার উপায় নেই। বিমান একটা দ্বিমুখী ব্যাপার। চলাফেরা অতি কষ্টে এদিক থেকে ওদিক।

পানীয়ের প্রভাবে, বিমানের দুলুনিতে সবাই কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়লেন। সেবিকারা বিমানের লেজের দিকে পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়েছেন। আমার বাঁ পাশে আহত কুমকুম চোখ বুজিয়ে ব্যথা ভোলার চেষ্টা করছে। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে চলেছি ইসতাফায়। জায়গাটি মেক্সিকোয়। সমুদ্রের ধারে একটি পর্যটন কেন্দ্র, যেমন আকাপুলকো। ইসতাফায় শুরু হবে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন।

প্রথমে আমিও একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। ঘুম এল না। হঠাৎ ওয়াইনি মন্ডেলার কথা মনে পড়ল। আমরা সব ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছি। সভা-সমিতি করছি। বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে। স্বামী আজ পঁচিশ বছর হয়ে গেল জেলে। আর ওয়াইনি নির্বাসিত হয়েছেন ব্র্যাণ্ডফোর্টে। দশ বছর হয়ে গেল। ব্র্যাণ্ডফোর্ট ওয়াইনির কাছে যেন এক ছোট্ট সাইবেরিয়া। ওয়াইনি রসিকতা করে বলে থাকেন, I am the most unmarried married

আকাশের অল্প উচ্চতা থেকে দেখতে পাচ্ছি নিচে পড়ে আছে ছবির মতো লন্ডন শহর
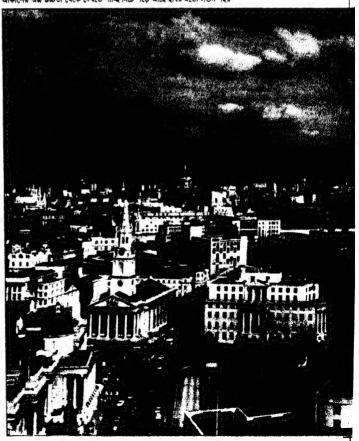
woman. কারণ বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যেই নেলসন চলে গেলেন কারাবাসে। বিপ্লবীদের জীবনেও প্রেম আসে।

ওয়াইনির বাবা ছিলেন স্কুলশিক্ষক। ওয়াইনিরাও জাতিতে 'খোসা'। ট্রানস্কেয়ি জেলার পোন্ডোল্যান্ডে জন্ম। পিতা ছিলেন ইতিহাসের শিক্ষক। স্কুলের সামান্য উপার্জনে নয়জনের একটি পরিবারকে টানতে হত। হঠাৎ মা মারা গেলেন, তখন ওয়াইনিকে যেতে হল গ্রামের খামারে। 'চাষ-বাস, গরু, ভেড়া, ছাগল'-এর জগতে। ওয়াইনি এখন রসিকতা করে মাঝে মাঝে বলেন, 'সেইজন্যেই আমার এমন স্বাস্থ্য।' বাবা ছেলেবেলা থেকেই মেয়েকে ইতিহাসমুখী করে তুলেছিলেন। দিনের সব কাজ সাঙ্গ হয়ে যাবার পর, মা-হারা মেয়েকে নিয়ে বাবা বসতেন দাওয়ায়। সামনে চাঁদের আলোয় ঝিমঝিম করছে আফ্রিকার অরণ্য, প্রান্তর। আকাশের গায়ে পাহাড়ের অস্পষ্ট রেখা। ওয়াইনির সামনে উন্মোচিত হচ্ছে তাদের জাতির অতীত ইতিহাস। বাবা মেয়ের সামনে খোসা যুদ্ধের বীরত্ব কাহিনীর ছবি এঁকে যেতেন রাতের পর রাত। ইংরেজের লেখা ইতিহাসে খোসা যুদ্ধের তেমন কোনও গুরুত্ব নেই। তবে ওয়াইনির মুখে শুনলে বোঝা
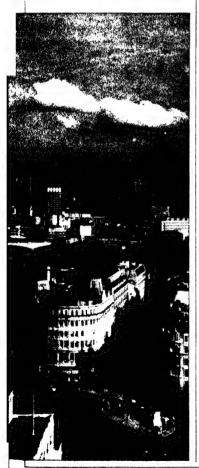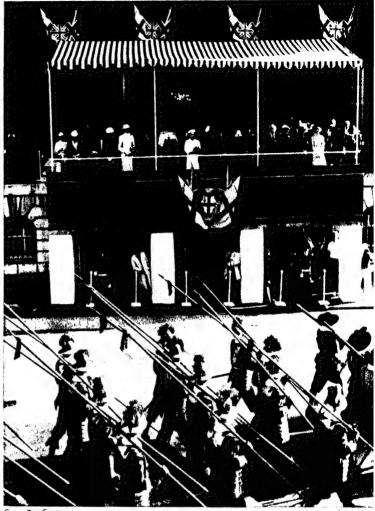
বিদায় কুইন এলিজাবেথ

যায় খোসাজাতির জীবনে খোসা যুদ্ধের কি মূল্য। ন'বার এই যুদ্ধ হয়েছিল। শ্বেতাঙ্গদের হানাদারি ঠেকাতে কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্ঘবদ্ধ রুখে দাঁড়ানো। শ্বেতাঙ্গরা দলবদ্ধ হয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের খামারে হানা দিয়ে গরু, বাছুর নিয়ে পালাত। ফেরত দেবার দাবি জানালে ফল হত উল্টো। তারা শাস্তি হিসেবে দখল করে নিত জায়গা জমি, বসতবাড়ি। 'খোসা যুদ্ধে'র কথা বলতে গিয়ে ওয়াইনি এখন বলেন, 'সেই শৈশবেই আমরা বুঝে গিয়েছিলুম, শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের মানুষ বলেই মনে করে না। স্কুলে আমার বাবার অবস্থা দেখে অত্যন্ত দুঃখ হত। তখন শিশু। এমন কিছু বোঝার বয়েস হয়নি, তবু সব শিশুই বাবাকে সম্মানের আসনে দেখলে গর্বিত হয়। আমার বাবা শিক্ষক হিসেবে শ্বেতাঙ্গদের স্কুলে কোনও সম্মান পেতেন না। ঢলঢলে পোশাক। সাধারণ চালচলন। সকলের উপেক্ষা। আমার কেমন যেন লাগত। আমি তখন নিজেকে ডেকে বলতুম, খোসা যুদ্ধে বাবারা বারে বারে হেরেছেন। ন'টি যুদ্ধই পরাজয়ের মালা। আমাদের গরু বাছুর তুলে নিয়ে গেছে। জমিজমা কেড়ে নিয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা একতরফা মার খেয়েছে। খোসারা তাদের সংগ্রাম যেখানে ছেড়েছে, আমি সেইখান থেকেই শুরু করব। আমি আমার জমি ফিরে পেতে চাই।

গ্রামের মেয়ে ওয়াইনি মেডিকেল ওয়ার্কার হয়ে এলেন জোহানেসবার্গের মতো শহরে। কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েরা আগে কখনও এই সুযোগ পায়নি। ওয়াইনি ছিলেন যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি তড়িৎ-চঞ্চল। এই জোহানেসবার্গের আসরেই ওয়াইনি নেলসনকে দেখেন। নেলসন ততদিনে তাঁর দেশের মানুষের চোখে নায়ক। সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। বাঘা আইনজীবী। ওয়াইনি তাঁকে প্রথম দেখেন আদালতে। লম্বা লম্বা পা ফেলে, ঋজু ভঙ্গিতে আদালত কক্ষে প্রবেশ করছেন। সবাই প্রায় তটস্থ। যাঁর পক্ষে দাঁড়াবেন, জয় তাঁর সুনিশ্চিত। প্রথম দর্শনে ওয়াইনির খুব ভয় হয়েছিল। মনে হয়েছিল বিশাল এক রাশভারি

পুরুষ, যাঁর সামনে দাঁড়াবার সাহস তার কোনওদিনই হবে না।

নেলসন ওয়াইনির চেয়ে বয়সে অনেক বড়। এরপর যা কিছু ঘটে গেল সবই যেন আকস্মিক। হঠাৎ নেলসনের সঙ্গে ওয়াইনির পরিচয় হয়ে গেল। নেলসন একদিন ওয়াইনিকে নিয়ে এক ভারতীয় রেস্তোরাঁয় খেতে গেলেন। ওয়াইনি নেলসনের পাশে বসে আছেন অভিভূত হয়ে। কিছুই খেতে পারছেন না। দু চোখ বেয়ে হুহু করে নেমে আসছে জলের ধারা। নেলসনের কোনও খেয়াল নেই। তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত। ওয়াইনির দিকে একবার মাত্র ফিরে তাকালেন। দেখলেন, ওয়াইনির চোখে জল। ওয়াইনি যে কাঁদছে, সে-কথা তাঁর মনেই এল না। তিনি বললেন, 'তোমার যদি খুব ঝাল লেগে থাকে তা হলে একচুমুক জল খেয়ে নাও। সামলে যাবে।'

অতীতের কথা বলতে গিয়ে ওয়াইনি এই প্রথম দিনটির স্মৃতি ভুলতে পারেন না। 'নেলসন স্কোয়্যার"। মাঝে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পল ক্রুগারের মূর্তি। চারপাশে অসংখ্য মানুষ। বিচারের রায় শুনতে এসেছেন। তাঁরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখলেন অপরাজিতার উজ্জ্বল হাসি।'

ওয়াইনির চিন্তা মন সরিয়ে দিল। প্রকৃতিতে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে। বিমান ছেড়েছিল সকালে। সূর্য ডুবতে ডুবতেও ডুবলো না। রাতের আঁধার নামতে নামতেও নামল না। আকাশ লাল করে সূর্যোদয় হল। এ কোন আকাশ! আমার মনে হতে লাগল, আমি একটা বাসের টিকিট। মহাবিশ্বে ভাসছি, যার এক আকাশে উদয় আর এক আকাশে অস্ত পাশাপাশি চলেছে। মৃত্যুর কোল থেকে লাফিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জন্মের কোলে। আকাশ যেন সূর্য নিয়ে খেলা করছে।

আমার ডানপাশে ভোর হচ্ছে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিমানসেবিকারা রাতের খাবার পরিবেশন শুরু করলেন। এ যেন এক মস্ত ধাঁধা। খাবার পরই ঘুমোবার চেষ্টা করতে হবে। আমরা যে

গ্যাটউইক বিমানবন্দরে যাত্রীদের জন্যে মনোরেল
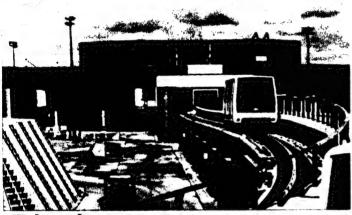
না জেনেই যেন ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেলেছিলেন। আমার বিয়ে হয়েছিল ঝড়ের সঙ্গে।' নেলসন যখন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন সেই সময় ১৯৫৮ সালে হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল দু'জনের। ঠিক ছ' বছর পরে 'রিভোনিয়া ট্রায়ালে' নেলসনের যাবজ্জীবন হয়ে গেল। কঠোরতম সাজা। সারা জীবন জেলে কাটাতে হবে। মুখোমুখি কারোর সঙ্গে দেখা করা যাবে না। শরীর স্পর্শ করা চলবে না। কি সাংঘাতিক দণ্ড! লন্ডনের অবজারভার পত্রিকার সাংবাদিক অ্যালিস্টেয়ার স্পার্কস এই দণ্ডাদেশ দানের দিনটির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছেন, 'আমি ভেবেছিলুম শ্রীমতী মন্ডেলা যখন আদালত থেকে বেরিয়ে আসবেন, তখন দেখবো তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এক মহিলা। কিন্তু না। ওয়াইনি ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়ালেন। তাঁর ঠোঁটে ঝলসে উঠল ঝকঝকে হাসি। তাঁকে মনে হতে লাগল, যেন এক সম্রাজ্ঞী। পরাজিতার হাসি নয়। জয়ের হাসি। ঘটনাটি ঘটে গেল আফ্রিকানারদের খোদ রাজধানীতে, ওয়াইনির সবচেয়ে দুঃখের দিনে। সামনেই "চার্চ

দেশের মানুষ, সে-দেশের ঘড়ির নিয়মে এখন মাঝরাত। খাওয়া-দাওয়া আর একদম ভালো লাগছে না। বিমানের আহারাদি বড় একঘেয়ে। তার ওপর আমার যেমন দুর্মতি, হঠাৎ চেয়ে বসেছি মাশরুম আর অ্যাসপারাগাস দিয়ে তৈরি কি এক বস্তু। গরুর খাবারের মতো বিস্বাদ। আমি কোনওদিন খড়, বিচিলি, খইল, ভুসি প্রভৃতি সুখাদ্য খাইনি। যে প্রেপারেশানটি পরিবেশিত হয়েছে তা অভ্যাস না থাকলে খাওয়া যায় না।

রাতের খাওয়া শেষ, এদিকে বিমানের ছোট্ট জানালা দিয়ে চড়াইপাখির মতো ছোট ছোট রোদের টুকরো ঢুকেছে। পড়ে গিয়ে কুমকুমের শরীর খুব গোলমাল করেছে। কপালে হাত দিয়ে দেখলুম, জ্বর এসেছে। কুমকুমের শরীরটা ঠিক থাকলে এতক্ষণ জমিয়ে গল্প করা যেত। ভেতরে সারিসারি মাথা, বাইরে অচেনা আকাশ। হরেক বর্ণের, হরেক রকমের মেঘপুঞ্জ। সব পড়ে আছে তলায়। পৃথিবীটা মেঘের কম্বলে মোড়া। আমি মনে মনে নানারকম গ্রিল তৈরি করার চেষ্টা করছি। কল্পনা করার চেষ্টা করছি, যে আকাশে আছি তার নিচে কোন দেশ পড়ে আছে! মানুষের ঘর সংসার, সর্পিল রাস্তা, বাগানঘেরা বাড়ি, সুবেশা তরুণী। এই মুহূর্তে জীবনের কত খেলাই চলেছে! আর আমরা কয়েক ডজন মানুষ আকাশের মাথায় দুলছি।

বিমান মাঝে মাঝে এয়ার পকেটে পড়ছে। তখন বেশ ভয়ই করছে। পেছন দিকে আকাশ সরে সরে যাচ্ছে। কোনও কোনও আকাশে ঘনীভূত দুর্যোগ। মেঘের ঘোর কালো রঙ দেখলেই বোঝা যায় নিচে অঝোর ধারায় ঝরছে। সকাল থেকে আবার ধীরে ধীরে সময় বিকেলের দিকে চলেছে। বিমান নামছে। ঘোষণা, আমরা বারমুডা ছুঁতে চলেছি। বারমুডা নামটা শুনলেই রোমাঞ্চ হয়। রহস্য ঘেরা একটি দ্বীপ। বারমুডা ট্র্যাংগল। জাহাজ ফোর্থ ডাইমেনসানে হারিয়ে যায়। বিমান আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

পোর্টহোল দিয়ে তাকালুম। নিচে অ্যাটলান্টিক। সমুদ্রের বুকে চকচকে মাছের মতো কি ভেসে যাচ্ছে! ওই কি সেই পিরহানা মাছ। ভালো করে দেখে বুঝলুম, জাহাজ। বিভিন্ন লাইনার-এর ঝকঝকে সুরম্য জাহাজ জল ফালা করে চলেছে। যেন জলে লাঙল দিচ্ছে।

বিমান যত নিচে নামছে সমুদ্র ও দ্বীপ তত স্পষ্ট হচ্ছে। জাহাজ মাপে আরও বড় হয়েছে। সমুদ্রে জাহাজের দাপট বিমানের যুগেও কিছুমাত্র কমেনি। মনে রহস্য রয়েছে বলেই দ্বীপটিকে রহস্যময় মনে হচ্ছে। সমুদ্র জায়গায় জায়গায় স্থলভাগের ভেতর ঢুকে এসেছে। সেই সব খাঁড়িতে স্পিডবোট ঘুরছে। গেরাল্ড ডারেলের বই পড়ে ধারণা হয়েছে এই সব খাঁড়িতে অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণী কিলবিল করছে। দ্বীপটা যখন বারমুডা তখন প্রাণীরাও হবে কেউকেটা। অক্টোপাস, সি-লায়ন, সি-হর্স, মুক্তভরা ঝিনুক। কোরাল। স্টার ফিস।

আকাশ থেকে দেখছি, নিচে একটা জায়গায় এক গাদা ব্যারেল ডাম্প করা রয়েছে। সেখানেও আমি রহস্য দেখতে পাচ্ছি। রাস্তায় তেমন লোক চলাচল নেই, একটা দুটো মোটরগাড়ি হুসহাস ছুটছে। আমার মনে হচ্ছে মাফিয়ারা ব্যবসায় বেরিয়েছে। সমুদ্রের ধারে ধারে নারকোল গাছ, রোদে ঝিলমিল করছে।

বিমান এবার ভূমি স্পর্শ করবে। খুব একটা জাঁকজমকঅলা সাংঘাতিক এয়ারপোর্ট নয়। তবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধের সময় জমজমাট হয়ে উঠবে। রানওয়েতে বেশ কিছু নিগ্রোকে দেখতে পেলুম। জায়গাটার বেশ একটা লোকাল কলার আছে।

বিমান বারমুডায় নেমে পড়ল। এখানে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াবে। তেল নেবে। খাবার নেবে। বাইরে চড়চড়ে রোদ। বিমানসেবিকারা যাঁরা দিল্লি থেকে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা একে একে বিদায় নিলেন। বারমুডা থেকে সব পালটে গেল। ক্যাপটেন, হোস্টেস, স্টুয়ার্ড, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার।

একদল নিগ্রো মহিলা, ঝাঁটা, ব্রাশ, বাকেট হাতে মার্চ করে এগিয়ে আসছেন। বিমান সাফা হবে। এতক্ষণে মনে হচ্ছে আমেরিকার চৌকাঠে পা রেখেছি। (ক্রমশ)

দেখি নাই ফিরে

সমরেশ বসু

চিত্র □ বিকাশ ভট্টাচার্য

টাঁইনাড়া) আটকায়নি। সকলেরই তখন একটাই ভাবনা ছিল। কে আর কার্যা সবচেয়ে ভালো ঘরটি দখল করবে। কেবল একটি ঘর নিয়েই সকলের মন কষাকষি হয়েছিল। ঘরটি ছিল মোটামুটি বড়। পুব-দক্ষিণ খোলা। সম্ভবত ঘরটি ছিল হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর। সবাই ছিল সেই ঘরের দাবিদার। সেটাই ছিল গোলমাল। সংসারে ঐটিই সংকট। রামকিঙ্কর ঐ ঘরের দাবিদার ছিল না। একলা একটা ঘর পাবার সৌভাগ্যই অনেকখানি। ও উত্তর-পশ্চিমের একটা ছোট ঘর নিজের জন্য বেছে নিয়েছিল। অন্যদিকে সংকটমোচনের উপায়ও স্থির হয়েছিল। লটারি। লটারি করে যার নাম উঠবে, সে পাবে সেই ঘর। লটারি হয়েছিল। নাম উঠেছিল বনবিহারী ঘোষের। কোথায় বনবিহারী। সে তো তখনও বাঁকের ছুটি কাটিয়ে ফেরেনি। তা বললেই বা কী যায় আসে। লটারিতে নাম যখন উঠেছে, ঘর থাকবে বনবিহারীর জন্যই। সেই না-পাওয়ার দুর্ভাগ্য যারা মেনে নিতে পারেনি, তারা বড়ো বাটা যুক্তি জঞ্জাল আর নানা আবর্জনায় ঘরটাকে নোংরা করে রেখেছিল। বনবিহারী যখন এসেছিল, তখন বর্ষা নেমেছে। নিশিকান্ত তাকে প্রথম অভ্যর্থনা করেছিল। লটারিতে পাওয়া সবচেয়ে ভালো ঘরের সংবাদ দিয়েছিল। বনবিহারী খুব খুশি। কিন্তু ঘরে উঁকি দিয়েই থ। আলো-ভরা সুন্দর বড় ঘরটার কী দুরবস্থা। রামকিঙ্কর এসে কাছে দাঁড়িয়েছিল, ঠোঁট টিপে হেসেছিল, "একটু হাত লাগাতে হবে।"

"তা হোক।" বনবিহারী একটুও দমেনি। তার ফরসা মুখে, উজ্জ্বল চোখে হাসি ঝিলিক দিয়েছিল, "ঘরের অবস্থা যা-ই করে রাখুক, ভাগ্যটাকে তো কেউ নিতে পারেনি। ঘর আমি এখুনি সাফ-সুরত করে ফেলছি।"

নিশিকান্তর সঙ্গে বনবিহারীর গত বছর প্রথম আসা থেকেই ভাব জমেছিল। বনবিহারীর কথা শুনে তার কৃষ্ণ মুখে সাদা দাঁতে হাসি ঝলকে উঠেছিল, "চলো বনবিহারী, আমিও তোমার সঙ্গে হাত লাগাই।"

"বললেন তো আমিও লাগাতে পারি ।" রামকিঙ্কর বিড়ি টেনে ধোঁয়া ছেড়েছিল ।
বনবিহারী তাজা প্রাণের টগবগে তরুণ । মাথা নেড়ে হেসেছিল, "কারোর সাহায্য করতে হবে না । নিজের ঘর আমি নিজেই পরিষ্কার করবো । আপনারা দেখুন ।"
"যারা ঘরটাকে নোংরা করে রেখেছে, তারাই বরং দেখুক ।" রামকিঙ্কর ওর মোটা ঠোঁটের ফাঁকে ঝিনুক ঝলকে হেসেছিল । তাকিয়েছিল নিশিকান্তর দিকে ।
নিশিকান্ত এদিক ওদিকে তাকিয়ে দেখেছিল । মুখে ছিল তার সেই হাসি, "তা হলে লেগে পড়ো । যারা ঘর নোংরা করে রেখেছে তারা একটু মজা দেখবে । তা দেখুক । আমি বরং কাজের লোক নবকে ডেকে দিই, সে তোমাকে সাহায্য করবে ।"
"কারোকে ডাকতে হবে না । যাদের দেখবার তারা দেখুক আমি ঘর পরিষ্কার করতে পারি কিনা ।" বনবিহারী ঘরে ঢুকে, এক কোণে রেখেছিল হাতের প্যাঁটরা । ঘর পরিষ্কারে হাত লাগিয়েছিল ।
নিশিকান্ত নিমন্ত্রণ করেছিল, "শোনো বনবিহারী, আজ তোমার খাবার নিমন্ত্রণ আমার কিচেনে । সকালে পারুলডাঙার ওদিক থেকে একজন ঝাঁকায় করে নিয়ে এসেছিল একশোর ওপরে মুরগির ডিম । এক টাকাতেই সে সব ডিম দিয়ে দিতে রাজি ছিল । তা প্রায় একশো পঁচিশটার কম ছিল না । মুরগির ডিম হাঁসের ডিমের চেয়ে ছোট বটে । এক টাকা খরচও করতে পারতাম । তা বলে এতগুলো ডিম । এ সময়ে হঠাৎ হঠাৎ গুমসোনি গরম পড়ে । ডিম পচে যাবার ভয় । ডিমওয়ালা আমাকে চার আনায় আটাশটা ডিম দিয়ে গেছে । আমি স্টোভ জ্বালিয়ে খিচুড়ি চাপাচ্ছি ।"
"সবগুলো ডিম যেন খিচুড়িতে দিয়ে দিও না ।" বনবিহারী তখন গায়ের জামা খুলে, ধুতি তুলে হাঁটুর ওপর গুঁজেছিল, "চারটে খিচুড়িতে দিও । আর আমাকে একটা ভেজে দিলেই হবে ।"
নিশিকান্ত হেসে বাঁচেনি, "একটা ডিম ভাজা ? তাও আবার মুরগির ডিম ! আর এই ঘর সাফের খাটুনির পরে ? বুঝলে কিঙ্কর, বনবিহারীটার কোনো আন্দাজ নেই ।"
"ডিমের আন্দাজ তোমার থেকে কেউ বেশি জানে না ।" রামকিঙ্কর ঝাকড়া চুল মাথা ঝাঁকিয়ে হেসেছিল, "মাস্টারমশাই তেজেশবাবু, নেপালবাবু, এমনকি জগদানন্দবাবুও জানেন না । আকাশে মেঘ করে রয়েছে । বিষ্টিও নামতে পারে । আটাশটা ডিমই রান্না কর ।"
বনবিহারী তখন ঘরের মধ্যে ঝুড়ি কোদাল হাতে তুলে নিয়েছে । তার চোখে কপট উদ্বেগের সঙ্গে, ফরসা মুখের হাসির ঝিলিক ছিল, "দোহাই রামকিঙ্করবাবু, পাগলকে সাঁকো নাড়া দিতে বলবেন না । পেট পুরে খেয়ে, পেট খারাপ করতে পারবো না ।"
"আটাশটা নয়, কুড়িটা ডিম রান্না হবে ।" নিশিকান্ত বনবিহারীকে সান্ত্বনা দিয়ে, হিসেব শুনিয়েছিল, "মুরগির ডিম ছোট । আটটা ভেঙে দেওয়া হবে খিচুড়িতে । বারোটা ভাজার মধ্যে, ছ'টা আমার, তিনটে তিনটে করে তোমার আর কিঙ্করের । দুদিন পরে আজ আমার স্টোভ জ্বলবে । এর কমে কী করে হবে ?" সে রামকিঙ্করের দিকে তাকিয়েছিল ।
নিশিকান্ত মিথ্যা কথা বলেনি । নিতান্ত প্রাকৃতিক কাজের দরকার ছাড়া দু'দিন সে ঘর থেকে একবারের জন্যও বেরোয়নি । রামকিঙ্করই তাকে দুদিনের মধ্যে একবার দু মুঠো মুড়ি আর চা জুগিয়েছিল । আর, সে সর্বক্ষণ একটা ছবিই এঁকেছিল । সোনালী আর লাল রঙে আঁকা সেই ছবির নাম সে আগেই বলে দিয়েছিল, 'স্বর্ণসিন্দুর মেঘ' । রামকিঙ্কর নাম শুনে ছবিটা বোঝবার চেষ্টা করেছিল । কিন্তু দুদিন না খেয়ে থাকাটা নিশিকান্তর দোষ না গুণ, ভেবে পায়নি । ঘটনাটা নতুন ছিল না । তাকে একদিন প্রচুর খেয়ে দুদিন গা মাথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছে । কবিতা মাথায় চাপলে কথাই ছিল না । ঘরে বসে বসে কেবল পা নাচায়, আনমনে ভাবে, আর ঝুঁকে পড়ে লেখে । কবিতা যে সে ভালো লিখতে পারে, নোবেল পুরস্কার পাওয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তা মেনে নিয়েছিলেন । তিনি তার নামই দিয়েছিলেন চাঁদকবি । প্রভাতমোহনের ভাষায়, "গুরুদেব একটু ভুল করেছেন । চাঁদকবি বটে । তবে কালাচাঁদ বললেই ঠিক হতো ।" অবিশ্যি নিশিকান্ত যতো কবিতাই লিখুক, গুরুদেবকে না জানিয়ে কবিতা কোথাও ছাপতে দেবার অনুমতি ছিল না । রামকিঙ্কর অবাক মানে নিশিকান্তর যতো খাওয়া, ততো উপোস দেখে । তার সব কিছুতেই মাতামাতি । খাওয়ায়, কাজে, উপোসে । এমন কি গানেও । নিশিকান্ত দু বিষয়ে ওর গুরু । গানে আর খাওয়ায় । নিশিকান্তর খাওয়ার ডাক শুনলে থাকতে পারে না । গানের ডাকেও সাড়া দিয়েই আছে ।

নিশিকান্ত ছিল রবীন্দ্রনাথের 'চাঁদকবি' । অবনীন্দ্রনাথের 'মাই আর্টিস্ট' । অথচ নিশিকান্তর দাবি ছিল, ছবি আঁকাতে ও গুরুদেবের শিষ্য । কিন্তু 'স্বর্ণসিন্দুর মেঘ' ছবিটার মানে কী ? আর ঐরকম গাঢ় রঙই বা কেন লাগিয়েছিল । শরতের শুরুতে সূর্যাস্তের আকাশে, ফাটল ধরা মেঘের ভিতর থেকে যখন রোদের ছটা ঝলক দেয়, মেঘের রঙ তখন যতো গাঢ়, ততোই বাহারি । নিশিকান্তর ছবিতে সোনালি রঙটা তো যেন লাল রঙের কয়েকটা ড্রাগনকে ঘিরে রেখেছিল । এতো সোনালি কেন ? নিশিকান্ত কি একটুখানি হালকা নীলের কথা ভুলে গিয়েছিল । আলতো ছোঁয়ায় একটুখানি এলা ? ছবিটা আর একটু লম্বা কাগজে এঁকে নিচে গিরিমাটির রঙের পোঁচ দিয়ে, আকাশ মাটি একাকার করলে কি খারাপ হতো ?
রামকিঙ্করের নিজের মনের জিজ্ঞাসা মনেই ছিল । কোনো দিনই জিজ্ঞেস করতে পারেনি । অবনীন্দ্রনাথ যাকে 'মাই আর্টিস্ট' বলেন, তার আঁকায় আবার জিজ্ঞাসা কী ? মাস্টারমশাই ছবিটা দেখেছিলেন । ছবির বিষয়ে বলেননি কিছুই । কেবল পরামর্শ দিয়েছিলেন, "ছবিটা গুরুদেবকে দেখিও । আর কলকাতায় যখন যাবে, জোড়াসাঁকোয় গিয়ে, অবনবাবুকেও দেখিয়ে নিয়ে এসো । তবে এখন মাউন্টটা অন্তত করে রাখো ।"
মাস্টারমশাই নন্দলালের কথাগুলো রামকিঙ্করের ভাবনাচিন্তাকে গুলিয়ে তুলতো । রামকিঙ্কর শুনেছিল, বিনায়ক মাসোজীদের পরের দলের ছাত্র ছিল নিশিকান্ত । তখন সে অন্যান্যদের মতোই আঁকতো । তারপরে কবে থেকে সে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখে, তারই অনুকরণে লেগেছিল । মাস্টারমশাই তখন বলেছিলেন, "যাঁর ছবির স্টাইল তুমি ধরতে যাচ্ছো, তাঁর পেছনে কতো ঐতিহ্য আছে, সেটা ভেবেছো ? তাঁর নাগাল তুমি পাবে কেমন করে ? বরং হাতেখড়িটা চলুক আর সকলের মতো । তারপরে তোমার নিজের কেরামতি দেখিও ।"
নিশিকান্ত নন্দলালের কথা শোনেনি । সে তার নিজের পথেই চলেছিল । রামকিঙ্করের ধন্দ লাগতো অন্য কারণে । মাস্টারমশাই বলেন, তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথ । কথাটা বলেন তিনি কথায় কথায় । অথচ যে-নিশিকান্তর ছবি নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা ছিল না, সে-নিশিকান্তর ছবি ছিল তাঁর গুরু অবন ঠাকুরের প্রিয় । নিশিকান্তর সম্পর্কে মাস্টারমশাইয়ের নিজের কথা, "আঁকা নিয়ে ওকে আমি কিছু বলতে পারি নে । ওকে আমার ছাত্র বলা ঠিক হবে না ।" কিন্তু নিশিকান্তর আঁকা ছবি দেখে, জোড়াসাঁকোয় গিয়ে অবনবাবুকে দেখাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন । কোনো দিন দেখা যায়নি, নিশিকান্তকে তিনি আঁকার বিষয়ে কিছু বলছেন । রামকিঙ্কর এসে অবধি দেখেনি । নিশিকান্ত ওর আঁকা ছবি কি গুরুদেবকে কোনোদিন দেখাতো ? রামকিঙ্কর জানে না । নিশিকান্ত সকলের সঙ্গে স্কেচ করতে বেরোলেও, স্কেচ বিশেষ করতো না । গাছপালা আঁকলেও, প্রাণীদের ছবি বিশেষ আঁকতে দেখা যেতো না । প্রাণীদের মধ্যে মানুষের ছবি আঁকা হলো সবচেয়ে বড় কথা । গরু মহিষ পশু পাখি তারপরে । নিশিকান্ত বিশ্বাস করে না, মানুষ পশু পাখির ছবি স্কেচ করতেই হবে । আকৃতিগত শিক্ষার প্রয়োজনে তার বিশ্বাস নেই । কেন ? রামকিঙ্কর আশ্চর্য হয় । কিন্তু নিশিকান্ত যে সে দায় মানে না । না মেনেই, নিশিকান্ত সকলের থেকে আলাদা ।
বনবিহারীর সঙ্গে নিশিকান্ত রামকিঙ্করকেও নিমন্ত্রণ করেছিল । ঘটনাটি নতুন কিছু ছিল না । নিশিকান্ত রামকিঙ্করকে প্রায়ই তার

নিজের কিচেনের রান্না খাওয়ায়। নিশিকান্তর দাদা সুধাকান্ত রায়চৌধুরি আশ্রমেই আছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র। নিশিকান্তর পয়সার অভাব তেমন ছিল না। অভাব পড়লেও, ভুবনডাঙার ভজুদাসের দোকানের দরজা কোনোদিন বন্ধ হয় না। কিন্তু ধার যখন বেড়ে যায়, রামকিঙ্করের নিমন্ত্রণ খেতে অস্বস্তি হয়। খাবার লোভ সামলানোও যে ভারি দায়! ডিম দেওয়া খিচুড়ির সঙ্গে গাওয়া ঘি মেখে বাঁকুড়ার জীবনে কোনোদিন খায়নি। নিশিকান্তর ছবি ওর চোখে অদ্ভুত। কবিতা চমৎকার। বিশেষ করে সে-কবিতা যখন শান্তিময়ের সুরে গান হয়ে ওঠে। কিন্তু তার রান্নার হাতেরও যে কী স্বাদ! যারা খায়নি, তারা বুঝবে না।

বনবিহারী আসার দু দিন আগেই জয়পুর থেকে এসেছিলেন নরসিংহলাল। কেবল কলাভবন না। নরসিংহলাল আসায়, সমস্ত ভবনে ভবনে সাড়া পড়ে গিয়েছে। তিনি যেদিন প্রথম এলেন, বেলা তখন পড়ন্ত। রামকিঙ্কর 'গৈরিক' বাড়ির পুবে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। রাস্তার ওপারে, ছোট ছোট জাম গাছের বনের ওপারে সন্তোষ মজুমদারের বাড়ি। কলকাতায় তিনি গত হবার পর বাড়িটার দরজা জানালা ছিল বন্ধ। হয় তো চাবি ছিল গুরুপল্লীর বাড়িতে, সন্তোষদার মায়ের কাছে। ও দেখছিল, নুটুদি আর রেখাদি সেই বাড়ির ভিতর থেকে দরজা জানালা খুলছেন। শৈলবৌঠান কি ছেলেদের নিয়ে ফিরেছেন? মজুমদার বাড়ির দিকে তাকিয়ে যখন মনে ওর জিজ্ঞাসা, তখনই চোখে পড়েছিল মস্ত পাগড়ি মাথায় একটি লোককে। ঐ রকম মস্ত পাগড়ি আর পাগড়ির গড়ন আগে কখনও চোখে দেখেনি। লোকটির পাগড়ি যেমন মস্ত, গোঁফ জোড়াটি ছিল তেমনি বিরাট। গায়ে ছিল মোটা কাপড়ের আধ ময়লা পাঞ্জাবি। মালসাট দেওয়া ধুতিরও তেমনি মোটা জমি। দু হাতে দুটো বড় বোচকা। ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে আসছিলেন দক্ষিণ থেকে। দেখেই মনে হচ্ছিল, মানুষটি এ দেশে নতুন এসেছেন। তাঁর মোটা ভুরু জোড়া ছিল কোঁচকানো। মুখ ক্লান্ত আর ব্যাজার। অন্তত দুদিনের খোঁচা দাড়ি ছিল তাঁর গালে আর চিবুকে। তখন ও জানতো না, ঐ লোকটিই নরসিংহলাল। তাঁর আসার খবর নন্দলাল আগাম জানিয়ে রেখেছিলেন। কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের মনে ছিল খুব কৌতূহল।

জয়পুরের নরসিংহলাল আসবেন দেওয়ালে আরায়েসের কাজের জন্য। আরায়েস! সেটা আবার কী? সেটা হলো দেওয়াল চিত্রের কাজ। আরায়েস হলো পারসিক শব্দ। পারস্য দেশের। বাঙলা আরশি শব্দ এসেছে ঐ আরায়েস থেকে। আয়না। আরায়েসের কাজ হলো আয়নার মতো। "আমাদের দেশের পঙ্খের কাজ দেখনি?" নন্দলালের ব্যাখ্যা, "দেখেছো তো, পঙ্খের কাজ কেমন আয়নার মতো চকচকে। আরায়েসের কাজ অনেকটা সেইরকম। যেন আয়নার মতো জমির ওপরে আঁকা ছবি। তারই শিল্পী কারিগর নরসিংহলাল আসছেন আমাদের সেই কাজ শেখাতে। মনে রাখবে, আমরা সবাই তাঁর ছাত্র। আমিও। উনি যেন কিছুতেই জানতে না পারেন, আমি তোমাদের মাস্টারমশাই। তোমাদের মতো আমিও তাঁর কাছে কাজ শিখবো। একবার যদি তিনি আমার পরিচয় পান, আর হয় তো আমাকে শেখাতে চাইবেন না।"

রামকিঙ্কর পরের দিন ভোরবেলা লাইব্রেরির দোতলায় সেই মস্ত পাগড়ি নরসিংহলালকে দেখেছিল। ঘরে তখন ছিলেন নন্দলাল, সুরেন কর, মাসোজী। নরসিংহলাল তখন হিন্দিতে যা বলছিলেন, তার মানে হলো, কলকাতা থেকে যে এ জায়গা এতো দূর, তাঁর ধারণা ছিল না। ইস্টিশন থেকে যে তাঁকে এতোটা পথ হেঁটে আসতে হবে, তাও তিনি জানতেন না। কথা বলবার সময় বোঝা যাচ্ছিল, তিনি বিরক্ত। তা ছাড়া তিনি ভাবতে পারেননি, এ জায়গা এমন একটা গ্রাম। ভেবেছিলেন, হবে হয় তো একটা ছোটখাটো শহর। রাম রাম! এমনকি এখানকার একটা লোকও তাঁর কথা বুঝতে পারেনি। তিনি যতবার যাকে শান্তিনিকেতনের কথা জিজ্ঞেস করেছেন, সকলেই তাঁকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। মুখে কিছুই বলেনি। হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেই তো আর সব বোঝা যায় না। তিনি তো 'আংরেজি' বা 'আরবি' বুলিতে কথা বলেননি। রাজস্থানি বুলিতেও কথা বলেননি। বাজার চলতি হিন্দুস্থানি বুলিতেই কথা বলেছেন।

নন্দলাল এক রকম করজোড়ে বসে মাথা ঝাঁকাচ্ছিলেন। বিহারের মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরে তাঁর জন্ম। হিন্দি ভাষাটা তাঁর জানা আছে। ছেলেবেলায় হিন্দিতে লেখাপড়া শিখেছেন। দেবনাগরি অক্ষরে লিখতে পারেন ভালো। তিন নরসিংহলালের সব কথাতেই মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিচ্ছিলেন। নরসিংহলাল কথা থামিয়েছিলেন। নন্দলাল হিন্দিতে বলেছিলেন, "গুরুজি, আপনি যা বলেছেন, সব ঠিক বলেছেন। আপনার বহুত কষ্ট হয়েছে। আপনি একজন আর্টিস্ট মানুষ। ক্ষমাঘেন্না করে দেবেন। আমরা আপনার সেবাযত্ন করবো'। আপনি আমাদের জয়পুরি আরায়েসের কাজ শেখান। আমরা সবাই আপনার ছাত্র।"

নন্দলালের আচরণে,বিনয়বাক্যে নরসিংহলাল তুষ্ট হয়েছিলেন। তবে তিনি মানুষটি যে একটু খিকতুড়ি গোছের তা বোঝা গিয়েছিল আরও পরে। রামকিঙ্করের মনে ছিল মাস্টারমশাইয়ের নির্দেশ। ও দুহাত কপালে ঠেকিয়ে, নত হয়ে নমস্কার করেছিল নরসিংহলালকে। ওর পর পরেই আরও যারা এসেছিল, সবাই নরসিংহলালকে ভক্তি ভরে নমস্কার করেছিল। নরসিংহলাল অনেকগুলো বিনীত ভক্ত ছাত্র দেখে খুশি হয়েছিলেন কি না বোঝা যায়নি। তিনি কেবল একটুখানি মাথা ঝাঁকিয়েছিলেন।

রামকিঙ্কর সিগ্লোয়া সিগ্লোয়ের বইয়ে দেওয়াল চিত্রের ছবি দেখেছে। সে-ছবি বিদেশের দেওয়ালের ছবির নকল। ও এ দেশের দেওয়াল চিত্রের ছবিও দেখেছে। অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল, আর সুরেন কর নকল করে এনেছিলেন বাগগুহার দেওয়ালের ছবি। বাগগুহার ছবি নকল করে আনার গল্প আছে অনেক। রাণী চন্দ নাকি মাস্টারমশাইয়ের মুখ থেকে শুনে, সে-ঘটনার কথা 'প্রবাসী' পত্রিকায় লিখেছিলেন। রামকিঙ্কর তা পড়েনি। শুনেছে। আলোচনা প্রসঙ্গে দু চার কথা শুনেছে নন্দলাল আর সুরেন করের মুখে। গোয়ালিয়রের কোন্ এক কর্তাব্যক্তি শান্তিনিকেতনের কলাভবনের জন্য গুহার ছবির নকল আনতে দিতে চাননি। অথচ কথা ছিল, কলাভবনের জন্যও এক কপি করে আনতে দেওয়া হবে। সেই কর্তাব্যক্তি বাদ সেধেছিলেন। আসলে তিনি আরও ওপর মহলের অনুমতির কথা বলে চালাকি করেছিলেন। মাস্টারমশাইরা কী করবেন? কলা ভবনের জন্য, লুকিয়ে ট্রেস করে নিয়ে এসেছিলেন। চুরি করেই বলা যায়। চুরিতেও পুণ্য হয়। অসৎ ব্যক্তিরা ঐরকম জবাব পায়। সেই ট্রেস করা ছবিতে রঙ করা হয়েছিল। রাখা আছে কলাভবনেই। রামকিঙ্কর দেখেছে সেই ছবি। বইয়ে ছাপা অজন্তা গুহার ছবি দেখেছে। সবই যেন জীবন্ত অথচ স্বপ্নের মতো। পুরনো সেই সব গুহার ছবির নারী পুরুষ, সবই সুন্দর। ঘটনাগুলো মনে হয় বাস্তব। অথচ কী একটা অবাস্তবতাও যেন রয়েছে। মনে হয় ছোঁয়া যাবে। কিন্তু যায় না। তখন সেই কথা মনে পড়ে। মন থেকে আঁকা। মনের ভিতরে যে-ছবি আঁকা হয়। মনের ভিতর থেকে যে-ছবি, ছবিতে ফুটে ওঠে। নন্দলালের শিব যেমন। যামিনী রায়ের পটেও যেন অজন্তার দূর ছায়া পড়েছে কেমন একরকম ভাবে। কোথায় যেন আঁকা দেখেছে, জৈন দেওয়াল ছবির মুখ। সেই মুখেরই ছায়া যামিনীর রায়ের ছবিতে। আজ পর্যন্ত একটা জিজ্ঞাসা ওর মনেই থেকেছে। জবাব পায়নি কারোর কাছ থেকে। অন্ধকার গুহায় কেমন করে ছবি আঁকা হতো।

রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনে আসার আগে, সাঁওতাল মাঝিদের বাড়ির মাটির দেওয়ালে আঁকা ছবি দেখেছে। দেব দেবতা মানুষ না। কেবল পশু পাখির ছবি। শান্তিনিকেতনে এসেও দেখেছে। দেখেছিল শালবীথির আদিকুটিরের মাটির ঘরের দেওয়ালে। মা আর ছেলে ভিক্ষা চাইছে বুদ্ধের কাছে। মাটির দেওয়ালের সেই রঙিন ছবি দেখতে ছিল অবিকল অজন্তার ছবির মতো। এঁকেছিলেন সুরেন কর। কিন্তু রঙ রেখা সবই অস্পষ্ট হয়ে

উঠেছিল। যেমন নন্দলাল এঁকেছিলেন দ্বারিক বাড়ির দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দু পাশে। ওর যেন বিশ্বাসই হতে চায়নি, মাস্টারমশাই ঐ ছবিগুলো এঁকেছিলেন। সে-ছবিও অজন্তা গুহার ছবির মতোই। অস্পষ্ট রেখা আর রঙ। ভালো লাগেনি। তখন নাকি প্যাট্রিক গেডিস বলেছিলেন, রঙ যদি পাকা নাও হয়, কয়লা দিয়ে আঁকো। তোমার সেই ছবি একজন দেখলেও তুমি সার্থক। প্যাট্রিক গেডিসকে রামকিঙ্কর দেখেনি। তাঁর ছেলে আর্থারকে দেখেছে। প্যাট্রিক সাহেবের কথাটা রামকিঙ্কর কোনোদিন ভুলতে পারবে না। ভাবলেই মনে আর কোনো অহংকার থাকে না।
নরসিংহলাল এসেছিলেন দেওয়াল ছবির জয়পুরি ঘরানা নিয়ে। নন্দলাল দুরকম বলেছিলেন। জয়পুরি আরায়েসের শিল্পী নরসিংহ। আবার বলেছিলেন কারুশিল্পী নরসিংহলাল। রামকিঙ্কর ফ্রেসকোর ছবি দেখেছে। কথা শুনেছে। ফ্রেসকো ছবি যে আসলে কী, নরসিংহলাল সেটাই হাতে কলমে শেখাতে এসেছেন। তিনি এসে পৌঁছোতেই সকলের সব আঁকা গড়া মাথায় উঠেছে। সকলের মুখে মুখে এক কথা ফ্রেসকো। জয়পুরি ফ্রেসকো। কেবল কলাভবনে না। আশ্রমের সব ভবনে ভবনে সেই কথা আর কৌতূহল। লাইব্রেরির দোতলায় কলাভবনের অবকাশ সময়ে ঘরে বারান্দায় বসে যাঁরা নানা আলোচনা করেন, সেই শাস্ত্রীমশাই, ক্ষিতিমোহন, জগদানন্দ, সকলেরই বিশেষ কৌতূহল। মুখে মুখে নানা আলোচনা। তর্ক বিতর্কও। জয়পুরি ফ্রেসকো আগে, না ইটালিয়ান ফ্রেসকো? অথবা পারসিক? কেউ বলেন, জয়পুর থেকে পারস্য হয়ে রোমে গিয়েছিল ফ্রেসকোর কাজ। কেউ বলেন, ইটালি থেকেই ঐ দেওয়াল চিত্র শিখেছে পারসিক আর রাজস্থানের শিল্পীরা। রামকিঙ্করের কাছে ঐসব তর্ক যেমন জটিল, তেমনি কুটিল। কেউ যে কারোর যুক্তি মানতে রাজি নন! ওর মাথায় ঐ সব তর্কের চাপান উতোর অর্থহীন। জটিল হলো পণ্ডিতের ভাবনা আর মন। কুটিল ওই কারণে, যখন দেশাভিমান চড়া গলায় হাঁকে। যে-শিল্প যেখান থেকেই আসুক, আর যেখান থেকেই যেখানে যাক, সবচেয়ে বড় কথা কি সেইটি? নাকি দেওয়াল চিত্র? কিন্তু দেওয়াল চিত্রেরও যে নানান রূপ! রামকিঙ্কর নন্দলালের মুখে শুনেছে," কেউ যদি ভাবে দেওয়াল চিত্র মানেই ফ্রেসকো, তা হলে ভুল হবে। ফ্রেসকো একটা আলাদা জাতের দেওয়াল ছবি। তার মিল আছে মধ্য য়ুরোপের কিছু দেশের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কাজের। ঠিক ঠিক ঐ ঘরানার কাজটি, আর কোথাও দেখা যায়নি। কিন্তু কোথায় রোম, আর কোথায় জয়পুর! কী করেই বা দু দেশের কাজের এতো মিল হয়েছিল? আমরা কিছু বলতে চাইনে। য়ুরোপের দেশের পণ্ডিতরাই বলেছেন, ঐ দেওয়াল চিত্রের কারিগরি শিল্প এসেছে ভারত বা পারস্য থেকে। যাকে বলে ফ্রেসকো।"
অনেকটা বোঝা গেল বটে। জয়পুরের কাজের সঙ্গে ইটালির পম্পের কাজের মিল আছে। আসল ঘরানা কার, তা নিয়ে যাঁদের তর্ক তাঁরা করবেন। ঐ যে কী সব খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ আর খ্রীষ্টাব্দের সঙ্গে শিল্পের কী যোগ? এক মাথায় চার মাথা সমান পাগড়ি, আর মস্ত ধূসর গোঁফ নরসিংহলাল হিন্দিতে বলেন, "ঐ সব ইটালি রোম আমি জানি না। আমাদের দেশে ঘরে ঘরে পুরুষানুক্রমে এই আরায়েসের কাজ চলে আসছে। আমাদের কেউ কোনোকালে সে দেশে গিয়েছিল কি না, কোনোদিন শুনিনি। আমাদের কেউ ঐ দেশে গিয়েছে বলেও বাপ ঠাকুর্দা বলেনি। এ সব বিচার ছাড়ো। কাজে হাত লাগাও।"

লাগলো কাজে হাত। নন্দলাল অনেক আগেই, রামকিঙ্করের করা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবক্ষ মূর্তিটি সরিয়ে এনেছিলেন নিজের আশ্রয়ে। রামকিঙ্করেরই প্লাস্টার অব প্যারিসে নেওয়া ছাঁচটিও রেখেছিলেন নিজের জিম্মায়। ওর ভাঙা ছেঁড়াকে বিশ্বাস ছিল না। তিনি অবাক যতো, ভয়ও তাঁর ততো।
কলাভবনের তাবৎ ছাত্রছাত্রীর সামনে এখন জয়পুরি কারুশিল্পী নরসিংহলাল, নন্দলালসহ সব শিক্ষকরাও ঘিরে আছেন তাঁকে। নরসিংহলাল জানতে চাইলেন, কোন্ দেওয়ালে কাজ হবে।

নন্দলাল দোতলার কলাভবনের সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। মুখ তুলে দেখলেন বারান্দার লম্বা দেওয়াল আর দরজার মাথা। তাকালেন নরসিংহলালের দিকে। নরসিংহলাল কিছুই বললেন না। দেওয়ালের গায়ে হাত দিলেন। ঠুকে ঠুকে দেখলেন। তাঁর গোঁফ জোড়ায় ফুটলো হাসি, "শক্ত আছে দেওয়াল। পলেস্তারা খসাতে হবে না। শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষলেই হবে। কাজ শুরু করে দাও জলদি।"
"এখন আপনি বাতলে দিন কী কী মালমশলা লাগবে।" নন্দলালের চশমার কাঁচে লাগলো এক নয়া ঝলক। বাতচিত্ বিলকুল হিন্দিতে চলছে। তাকালেন সুরেন করের দিকে।
নরসিংহলালের বিরাট ধূসর গোঁফজোড়ায় বহুত বড় হাসি ছড়িয়ে পড়লো। তিনি বারান্দার দক্ষিণে রেলিং-এর ধারে বসলেন। সকলের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন, 'মাল মশলা চাই বহুত। যন্ত্রপাতিও কিছু কমতি নেই। আমি বাতলে দিচ্ছি, সব লিখে নাও।"

"আমি লিখে নিচ্ছি।" সুরেন ব্যস্ত হয়ে ঘরের দরজার দিকে গেলেন। অতি উৎসাহী বিনোদ আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে দরজায় পা বাড়ালো, "কাগজকলম আমি নিয়ে আসছি।"
কাগজকলম আসবার আগেই, নরসিংহলাল দাঁতে বিড়ি কামড়ে ধরলেন। বিনোদবিহারী কাগজ-কালির দোয়াত আর কলম এনে রাখলো, সুরেন করের সামনে। নরসিংহ ফস্ করে জ্বাললেন দেশলাইয়ের কাঠি। রামকিঙ্করের ভয় হলো, তাঁর মস্ত গোঁফ জোড়ায় না আগুন ধরে যায়। জয়পুরের প্রৌঢ় শিল্পী জায়দা হুঁশিয়ার। জ্বলন্ত কাঠি ধরলেন ডান হাতে। বাঁ হাতে চেপে ধরলেন বিড়ির গোড়া। এক টানেই বিড়িতে অঙ্গার জ্বললো। ধোঁয়া ছাড়লেন এক মুখ। দুদিন ধরে দেখা গিয়েছে, উনি ধূম্রপান করেন। আবার সময়ে খৈনিও চোষেন। তাকালেন সুরেন করের দিকে। বাতলাতে শুরু করলেন।
রামকিঙ্কর যতোই শুনছিল, ততোই অবাক মানছিল। রাজ মিস্তিরির কাজের যন্ত্র, ওলন কর্নিক নানা আকারের। তিন চার রকমের মাপের। কয় সুতো পুরো আর মোটা, তারও মাপ বললেন। লোহার জালের চালুনি মিহি হওয়া চাই। গজ পাটা। উসো দু তিন রকমের। কোণা মাটাম। বোতল। বোতল? "হাঁ হাঁ, যা বলছি, তা লিখে নাও। কিন্তু দেখবে বোতলে যেন কোনো ছাপ মারা উঁচু নিচু স্ট্যাম্প বা লেখা না থাকে। রুটি পাকাবার বেলুনের মতো বিলকুল সমান হওয়া চাই।"... জল ছেটাবার জন্য বড় কুশের কুঁচি। ওটা খড়ের হলেও চলবে। মশলা বাটবার শিলনোড়া। চুন হলো সবচেয়ে জরুরি। পাথুরে ঘুটিং-ঝিনুক, যে-কোনোটার চুন হলেই হবে। ঝিনুকের চুন সবচেয়ে ভালো। দাম বেশি, যোগাড়ের অসুবিধা। পাথুরে বা ঘুটিং চুনেও কাজ ভালো হবে। চুনের মশলা বানাবার ফিকির আসছে পরে। চুন রাখার জন্য চাই গোটা কয়েক মাটির হাঁড়ি। মশলা রাখবার জন্য গোটা কয় মাটির গামলা। গামলা চাই জল রাখবার জন্যও। রঙ রাখবার পাত্র মাটির চেয়ে কলাই করা বাটিই ভালো। না জুটলে মাটির পাত্রেই রাখা যাবে। হাঁ, ভিজা তোয়ালে একটা দরকার। আর ছেঁড়া মিহি পাতলা কাপড়ের ন্যাকড়া।
"আরায়েস কি কাম কিসকো কহতে হ্যায়?" নরসিংহ গোঁফ বাঁচিয়ে বিড়িতে টান দিলেন।" তোমরা যাকে বল 'ফ্রেসকো'। দেওয়ালে বালি আর চুনের পলেস্তারা ভিজে থাকতে থাকতে তার ওপর যে ছবি আঁকা হয়, তাকেই বলে আরায়েসের কাজ। আংরেজি বোলি মে ফ্রেসকো। খুব জায়দা আগুনে কি ভুট্টা পোড়ানো যায়? যায় না। পুড়ে যাবে। খেতে পারবে না। বিস্বাদ লাগবে। এমন আগুন রাখো, ভুট্টা সেঁকা হবে। পুড়বেও না। সেঁকার মতো আঁচ থাকতে থাকতে ভুট্টা পুড়িয়ে নিতে হয়। আরায়েসের কাজ সেইরকম। এমন ভেজা থাকতে থাকতে রঙ দিয়ে আঁকবে, যাতে চট পট পলেস্তারায় ধরে যায়। এ কাজ মুখের বুলিতে শেখানো যাবে না। হাতেকলমে কাজ করতে করতে শিখতে হবে।
হাঁ,নারকেল তেল একটু দরকার। মাল মশলার কথা সব বলা হয়নি। লিখে নাও। আমরা জয়পুরিয়ারা নারকেল তেল লাগাই না। নারকেল চিবিয়ে, দুধটা গিলে, মুখ থেকে ছিবড়ে ছড়িয়ে দিই আঁকা ছবির ওপরে। তার পরে, সেটা আস্তে আস্তে মুছে দিই। ওতেই নারকেল তেলের কাজ হয়ে যায়। কোণা মাটাম লিখেছো? "হাঁ আংরেজি মে যিস্কো সেট স্কোয়ার কহতে হ্যায়।"... উটের লোমের তুলি। মোটা সরু নানান রকম। শনের আঁশের তুলি। কেয়া-ডাঁটির তুলি। অথবা খেজুরের সেই ডাঁটি, যে-ডাঁটিতে খেজুর ধরেছিল, বালি চুনের কথা লেখা হয়েছে। এবার দরকার শ্বেত পাথরের গুঁড়ো। খুদের মতো। তার মধ্যে অবশ্যি ভাগ আছে। মোটা, মিহি, খুব মিহি। সব আলাদা আলাদা করে ভাগ করে রাখতে হবে।
"আমার মাথা ঘুরছে।"
নন্দলাল মুখ তুলে তাকালেন। কে বললে কথাটা? ঠিক মুখের দিকেই তাকালেন। নিশিকান্ত নির্বিকার, হাসছে। যেন কথাটা সে বলেনি। নন্দলালের ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো। মুখ তাঁর গম্ভীর। স্বরে বিরক্তি, "মাথা ঘুরলে দাঁড়িয়ে থাকার দরকার কী? ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো গে।"
রামকিঙ্কর আর বনবিহারী ছিল নিশিকান্তর পাশে। নিশিকান্তর পাশে দাঁড়ানোও বিপজ্জনক। কখন কী বলে উঠবে, কেউ বলতে পারে না। নিশিকান্ত নিজেও কি পারে? রামকিঙ্করের মনে ধন্দ লাগে। কিন্তু ফ্রেসকো কাজটি যে বেশ বড় রকমের ভজোকটো, সেটাও বুঝতে পারছে। তবু কৌতূহলের অন্ত নেই। যে-কারণে নিশিকান্তর মাথা ঘুরছিল সেই কারণেই ওর মাথায় তখন নানা চিন্তা।
নরসিংহলাল তখনও কাজের জিনিসের ফিরিস্তি দিচ্ছেন। সুরেন কর লিখছেন। নন্দলাল ভুলে গিয়েছেন নিশিকান্তর কথা। নতুন কাজের নতুন বিষয় তাঁর চশমার কাঁচে দিচ্ছে উত্তেজনার ঝিলিক। রামকিঙ্কর ভাবছে, বালি চুনের পলেস্তারা ভিজে থাকতে থাকতেই রঙে আঁকতে হবে? ভেজায় আঁকা বলতে ও জানে 'ওয়াশ'-এ আঁকা ছবি। 'ওয়াশ' শব্দটা ও কলাভবনে এসে শিখেছে। এঁকেছে অনেক আগেই। কেবল জানতো না, ভেজা কাগজ শুকিয়ে উঠতে উঠতেই রঙে আঁকা ছবির নাম 'ওয়াশ'। এখানে এসে শিখেছে, গোটা কাগজটা জলে ভিজিয়ে কাঠের পাটায় পিন এঁটে দিতে হয়। আর ও বাঁকুড়ায় জলে তুলি ডুবিয়ে গোটা কাগজটাকে ভিজিয়ে নিয়ে, ভেজা থাকতে থাকতে রঙ লাগিয়েছে। আদর্শটা ছিল 'প্রবাসী' পত্রিকার চিত্রসম্ভার। ভেবে অবাক হতো, শুকনো কাগজে রঙ লাগিয়ে ঐরকম ছবি কেমন করে আঁকা যায়? ও চেষ্টা করতে গিয়ে, রঙের শ্রাদ্ধ করেছে। আর ছবিটা রঙে রঙে ছয়লাপ হয়ে, দেখাতো খানিকটা জবরজঙ ময়লা। বিশেষ করে ওর আদর্শ চিত্রকর ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ওকে নিজের মতো করে পদ্ধতিটা আয়ত্ত করতে হয়েছিল। কিন্তু ভেজা বালি চুনের পলেস্তারায় ছবি? তার ওপরে কি গোড়া থেকেই টেনে রঙে এঁকে যেতে হবে? পেন্সিল বা কোনো কিছু দিয়ে আগে আঁকা করতে হবে না?
"আরে তোমাদের বহুঠান প্রতিমা দেবী তোমাদের কী শিখিয়েছেন, তা আমি বুঝবো কী করে?" নরসিংহলাল পিকভূরি গলায় খেকিয়ে বাজলেন, "আরায়েসের কাজ লিখে বোঝানো যায় না। হাতেকলমে না করলে, তুমি আন্দাজ পাবে কেমন করে? গুরুমুখি বিদ্যে বলে একটা কথা তোমরা শোনোনি? বলছো, পলেস্তারায় রঙে রঙ মিলে গুলে যায়। রঙটা কি তুমি গঁদে গুলে মধুর মতো মোটা করে নিয়েছিলে?"
মাস্টারমশাই যেন চোখে চশমা পরা এক অবাক জিজ্ঞাসু বালক। তিনি ঘাড় নাড়লেন, "না তো লালজী।"
"তা হলে তো রঙের গায়ে রঙ মিলেই যাবে।" খেকতুড়ি গুরুজীর মুখে হাসির ঝলক লাগলো। ধূম্রপান শেষ হয়েছে আগেই। মস্ত গোঁফে তা দিলেন মেজাজি ঢঙে, "শোনো, কাজ শুরু কর। মাল মশলাগুলো সব যোগাড় কর। কাজে লাগো। কাজ করতে করতেই সব জানতে পারবে। তবে হাঁ, এখনই একটা কাজ বহুত জরুরি। দেওয়ালের কতোটা জায়গা জুড়ে কাজ হবে, সেটা মেপে ফেলতে হবে। তা হলে কতো মাল মশলা রঙ লাগবে, আমি তার একটা হিসাব দিতে পারবো। কে দেওয়াল মাপতে পারে? গজ ফিতে আছে?"
সুরেন করের পাশে দাঁড়িয়েছিল বিনোদবিহারী। তিনি তার হাতে তুলে দিলেন কাগজকলম। উঠে দাঁড়ালেন, "আমার কাছে আছে গজ ফিতে। আমি মাপতে পারি।"
"তা হলে মেপে ফেল।" নরসিংহ মুখ তুলে তাকালেন বারান্দার সবদিকে। ঘাড় ঝাঁকালেন, "পুরা বারান্দার ওপর দেওয়ালেই কাজ হতে পারে। তোমরা তো দেখছি, অনেক লোক আছো। কয়েকজনকে আজই শিরিষ কাগজ ধরিয়ে দাও। দেওয়াল ঘষে সাফ করবে।" তিনি উঠে দাঁড়ালেন।
ঘন্টাতলা থেকে ঘন্টার শব্দ ভেসে আসছিল। ঢঙ্ ঢঙ্ ঢঙ্ ঢঙ্....
(ক্রমশ)

জা র্মা নি

মৃত্যুর নিপুণ শিল্পী

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

রাজা ॥ রাজাদের অন্তত অমর হওয়া উচিত।
রানী ॥ তাদের অমরতাও নিতান্ত সাময়িক।
রাজা ॥ কিন্তু আমাকে যে জানানো হয়েছে, আমি ইচ্ছামৃত্যু।
রানী ॥ আসলে ভুলভাবে ধরে নেওয়া হয়েছিল, তুমি স্বেচ্ছায় অনেক আগেই মৃত্যুবরণ করবে, তাই। কিন্তু তুমি যে পদাধিকারের স্বাদ পেয়েছ। এখন, এখনই তুমি তোমার পালা সাঙ্গ করো। জোর করেই তোমাকে এটা করতে হবে। জীবনের কবোষ্ণ কর্দমে তুমি আজ ডুবে আছ। (নিরুত্তাপ গলায়) আর এখুনি তুমি জমে হিম হয়ে যাবে।
রাজা ॥ আমাকে নিয়ে একটা চক্রান্ত চলছে। আমাকে আগে থেকে জানানো উচিত ছিল যে আমাকে নিয়ে একটা চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে।
রানী ॥ তোমাকে অনেক আগেই তো সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।
রাজা ॥ বহুকাল আগে তুমি আমাকে সচেতন করেছ। কিন্তু অনেক দেরিতে স্পষ্ট জানান দিয়েছ। না, আমি মরতে চাইনে···কিছুতেই মরতে চাইনে। আমাকে পরিত্রাণ করা হোক। আমি নিজে থেকে আমাকে ত্রাণ করতে পারব না আর।
রানী ॥ এটা তোমারই দোষ, যে তুমি এখন আতকে উঠছ। এ নিয়ে তোমার অনেকদিন আগে থেকেই তৈরি হওয়া উচিত ছিল। কখনোই সময় পাওনি তুমি, কখনোই সময় হয়নি তোমার। তোমার এই ছিল শাস্তি। আসলে প্রথম দিন থেকেই তোমার এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত ছিল। প্রতিদিন। প্রত্যেকদিন পাঁচ মিনিট। সেটা এমন-কি আর বেশি সময়। প্রত্যেকদিন পাঁচ মিনিট। তারপর দশ মিনিট। তারপর মিনিট পনেরো, তারপর আধঘণ্টা করে। এভাবেই তো মানুষকে তৈরি হতে হয়।
রাজা ॥ আমি এ বিষয়ে ঠিকই ভাবনাচিন্তা করেছি।
রানী ॥ না, কখনোই তেমন মন দিয়ে ভাবোনি, চিন্তা করোনি তোমার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে।
আরেক রানী ॥ ও কিন্তু খুব বেঁচেছিল।
রানী ॥ খুব বেশি বেঁচেছিল। (রাজার দিকে তাকিয়ে) তোমার আর-সব ভাবনার পিছনে এই চিন্তাটাই কেন্দ্র হওয়া উচিত ছিল।
ডাক্তার ॥ ইনি কখনোই দূরদর্শী ছিলেন না। আর পাঁচজনের মতোই ইনি এক-একটা দিন ধরেই বেঁচেছেন।
রানী ॥ সব কিছুই তুমি কালকের জন্য স্থগিত রেখেছ। তোমার যখন বিশ বছর বয়েস, তখন তুমি বলেছ চল্লিশে তৈরি হওয়ার ব্যাপারটা শুরু করে দেবে। চল্লিশে যখন পড়লে····
রাজা ॥ কিন্তু আমার স্বাস্থ্য যে ছিল দারুণ ভালো, আমার তো তখন কিছুই বয়েস

রাভেন্‌সবুর্গে ইউজেন ইয়োনেস্কো

হয়নি।
রানী ॥ চল্লিশে তোমার মনকে বুঝ দিলে পঞ্চাশে প্রস্তুত হবে। পঞ্চাশ বছরে যখন পড়লে····
রাজা ॥ আমি যে জীবনে পরিপূর্ণ ছিলাম। কী করে এমন হয়েছিল যে এত জীবন্ত ছিলাম আমি!
রানী ॥ পঞ্চাশ বছর বয়সে তুমি ষাট বছরের জন্য অপেক্ষা জুড়ে দিলে। তারপর তোমার হলো ষাট বছর, নব্বুই বছর, একদিন তোমার বয়েস হলো একশো পঁচিশ, তারপর দুশো, তারপর একদিন চারশো বছর সময় তোমার পিছনে ফেলে এলে। তখন থেকে আর প্রস্তুত হওয়ার জন্য দশ বছরের অছিলা দ্যাখাওনি তুমি, টপকে গিয়ে পঞ্চাশ বছরের কথা বলেছ। আর তারপর থেকে বলেছ, পরের শতাব্দীতে—এভাবে শতাব্দী থেকে শতাব্দী।
রাজা ॥ আসলে আমি এইমাত্তর শুরু করতে চেয়েছিলাম। আহ্, এখন যদি আর একশোটা বছর সময় পেতাম। তাহলে হাতে একটু সময় পাওয়া যেত।

সাহিত্যের অন্যমনস্ক পাঠককেও বোধ হয় মনে করিয়ে দেওয়া ধৃষ্টতা হবে, এই সংলাপ কার কোন্ নাটকের চূর্ণাংশ। যাদের এ মুহূর্তেই মনে পড়ছে না, তাঁদের কাছে কৈশোরের সুলভ উল্লাসে তবু জানাই, নাট্যকার ইউজেন ইয়োনেস্কো, মূল উচ্চারণ : এউজেন ইয়োনেস্কু— নাটকের নাম 'রাজামশাই মরেন' (Le Roi se meurt)। কোনোদিনই বীরপূজারী নই, বিরাট প্রতিভার সান্নিধ্যে কোনোক্রমে এসে পড়লে কুঁকড়ে মরি কিংবা পালিয়ে গিয়েই বাঁচি, কিন্তু ইয়োনেস্কো স্বয়ং রাভেন্‌সবুর্গে তাঁর একরাশ ছবি আর কবিতা নিয়ে উপস্থিত, ওই সংবাদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট স্বাক্ষরশিকারীর দশা হলো। আমরা সেদিন লেক অফ কনস্টান্সের কূলবর্তী একটি পল্লীতে রবীন্দ্রভক্ত এক বর্ষীয়ান দার্শনিকের অতিথি। তাঁরই এক প্রাক্তন ছাত্র হঠাৎ খবর দিলেন রাভেন্‌সবুর্গে ইয়োনেস্কো দিন কয়েকের জন্য এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে ইয়োনেস্কো আয়োজন দুস্তরের ব্যাপার। তবু রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা অপরাহ্নের জন্য স্থগিত রেখে রাভেন্‌সবুর্গে পাড়ি দিলাম।

গ্যালারিটির নাম আরেস। ইরানের কার্পেটপসারী আলি রাসেক নতুন এই গ্যালারি খুলেছেন। সেখানেই এই পার্বণের উদ্বোধন। গ্যালারির প্রান্তে একটা ছোট্ট টেবিলের কিনারে ঝুঁকে বসে আছেন, নিজেই নিজের জীবন্ত জাদুঘরের ধরনে, ইয়োনেস্কো (মস্ত এই ধ্বনিময় নাম বারবার মন্ত্রের মতো না আউড়ে, প্রথাগত চুক্তিপত্রের নিয়মে এখন থেকে সংক্ষেপে 'শিল্পী' নামেই চিহ্নিত করা হবে), স্যামুয়েল বেকেট ও আদামভের সঙ্গে যিনি অ্যাবসার্ড নাটকের অন্যতম স্রষ্টা বলে গণ্য। এমন তো কিছু বয়েস হয়নি, বড়ো জোর ছিয়াত্তর। এযুগে এ বয়সে তাঁকে তরুণতর দেখালে অবাক হতাম না। সেই সঙ্গে সবিনয়ে একথাও কবুল করি, তাঁর এই স্বকালবার্ধক্য দেখেও এতটুকু স্তম্ভিত হইনি। রুমানিয়ার এই শিল্পী সাতাশ বছর বয়সে প্যারিসে এসে শাখাপত্তনের আগে থেকেই তাঁর সৃষ্টিকাজে বার্ধক্যবিলাস প্রবলভাবে প্রদর্শন করে এসেছেন। এমন কি বয়ঃসন্ধিক্ষণে লেখা অত্যন্ত নরম সুরের কবিতাগুলিতেও ছিল জীবনানন্দীয় প্রতীক্ষা : 'স্থবিরতা কবে তুমি আসিবে বলো তো ?' আজ যখন তাঁর সেই প্রস্তুতির পরিণতি ঘনিয়ে এল, তাঁকে এত

ফ্রীডরীশহাফেনে হাতলওয়ালা লোহার গেণ্ডুয়া নিয়ে খেলার ছায়ানাট্য

ব্যাকুল দেখাচ্ছে কেন ? কিছুতেই তিনি জরা এবং মৃত্যুর সঙ্গে সন্ধিস্থাপনে রাজি নন যেন । পুরু চশমার আড়ালে ঝাপসা তাঁর চোখে বুঝি জলের আভাস পাবেন সন্ধানীরা । তাঁর হাবভাবে অসন্তোষ আর অসহায়তার বিমর্ষ মিশ্রণ । একটি ভক্ত যুবা তাঁকে দেহরক্ষীর ধরনে আগলে আছে । সেই রক্ষীর রচিত কৃত্রিম কর্ডন ভেদ করে যাঁরাই তাঁর কাছে যেতে পারছিলেন তাঁদের কাছে শিল্পীকে মনে হচ্ছিল আত্মরচনার পুনরাবৃত্তিময় এক মন্থর প্রতিষ্ঠানের মতো । প্রকৃতপক্ষে কোনো অভিনীত নির্বেদ নয়, নিজের কাছে সত্যবান থাকবার প্রবণতা বোধ হয় তাঁর কাছে এখন ধর্মের জায়গা নিয়ে থাকবে । তাই এক-এক বার তিনি তাঁর দিনপঞ্জি বা নাটক-নকশা থেকে এক-একটা অংশ, স্মৃতি থেকেই, শোনাচ্ছিলেন । তাঁর স্ববারি মর্মে অলীক কিছু কিংবদন্তী শুনে বোকার মতন বিশ্বাস করেছিলাম আগে । অথবা এমনও হতে পারে, বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অনিবার্য সংবেদনশীলতার শিকার হয়েছেন তিনি । বিচ্ছিন্নতা নামক বিপর্যয় থেকে বাঁচবার তাড়নায় মানুষজনের সঙ্গে সামান্যতম ভাবনাবিনিময়ের, অথবা উৎসুক শ্রোতার কাছে নিজের কথাগুলো ধ্রুবপদের ধাঁচে বলে ফেলবার, গরজ অনুভব করছেন তিনি । এমনিতেই তো তাঁর নাটকে দেখা যায় ব্যক্তিরা নিজেদের পরিসরে দাঁড়িয়ে কথা বলে চলেছে, সহ-নশ্বর শুনুক বা না শুনুক, তাতে কিছুই এসে যায় না । এক-একবার তাঁর আর্তিময় আবৃত্তির মুদ্রা দেখে মনে হচ্ছিল, মৃত্যুর আগে তাঁকে সেরকমই বেপরোয়া মুখরতায় নিজের একদা-উচ্চারিত সমস্ত কথা পুনর্বার বলতে হচ্ছে । ঘটনাটা আসলে ঠিক তা নয় । তিনি শ্রোতাদের মুখচ্ছবি ঠিকই পরীক্ষা করে নিচ্ছিলেন । এবং রক্ষী যুবাকে একাধিকবার প্রশ্ন করে যখন এই মর্মে নিশ্চিত হতে পারছেন যে দর্শনার্থীরা ফরাসি জানে, তখনই তাঁদের উদ্দেশ করে মনের জমে ওঠা কথা পড়ে চলছিলেন ।

সচরাচর এরকমই হয়, প্রস্থানোন্মুখ স্রষ্টার মুখ থেকে নির্গত যে-কোনো উচ্চারণকেই লোকে আশীর্বাণী বলে ধরে নিয়ে ভুল করে । এই আসরেও ঠিক অনুরূপ ভ্রান্তিবিভ্রম ঘটছিল কোনো-কোনো ভক্তের । শিল্পী যখন ভয়াবহ মৃত্যুর কথা বলছিলেন, ভক্তজন তার মধ্যে কোনো দিব্য চিন্ময় উন্মোচনের আভা লক্ষ করে থাকবেন হয়তো । সেটাই স্বাভাবিক । তবু আপ্লুত মানুষজনের সাত্ত্বিক অভিভাব, আর কিছু না হোক নন্দনতত্ত্বের নিরিখে, বড়ো সুন্দর লাগছিল ! এরকম একটি নিবিষ্ট ভক্তের নাম হ্বের্ণের হ্বালতাসার—তিনিই দর্শনার্থীদের প্রথম সারির প্রহরাব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন, এবং মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার এলাকায় তিনি শোয়েরিয়া অঞ্চলে একটি বিদিত নাম—তাঁর সঙ্গে শিল্পী স্বযাচিতই কথা বলে উঠেছিলেন । সেদিন স্বগতোক্তির ধরনে নিজের লেখা থেকে শিল্পীর পড়ে শোনানো কয়েকটি অংশ :

১· আপনি জানতে চাইছেন তো আমার কেন মৃত্যু সম্পর্কে এত অস্বস্তি ? সত্যি কথা বলতে সমস্যাটা নিতান্ত ব্যক্তিগত আর সূক্ষ্ম । মানুষ তো সূক্ষ্ম, এমন-কি ক্ষুদ্র, তাই না ? মরার সমস্যাটা আসলে মানবিক । গরু কখনো তার মরার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না । গরু সূক্ষ্ম নয়, ক্ষুদ্র নয় ।

২· না, একমুহূর্তের জন্যও আমি এই মৃত্যু আর যন্ত্রণার জগতে সুস্থির বোধ করতে পারিনি । একমাত্র বৌদ্ধরাই নাকি এমতাবস্থায় প্রসন্ন বোধ করতে পারেন । এমনকি শুনেছি শবযাত্রার মুহূর্তে নাকি তাঁরা আপ্লুত হয়ে থাকেন [নিবন্ধকারের বিনীত টিপ্পনী : কোথা থেকে শুনেছেন সেই উৎস যাচাই করে নিতে বড়োই ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু শিল্পীর ব্যক্তিত্বের সামনে সেই দুঃসাহস জাহির করার স্পর্ধা হয়নি] ।

আমার কিন্তু মনে হয়েছে আমি কোনোক্রমেই এই মরজীবনের গ্রন্থি খুলতে পারব না । এটুকুই তো আমি জানি । এবং আমার এই জানার ভিত্তি আদৌ যদি সত্যি হয়, তাহলে আমাকে কবুল করতেই হবে, কোনো অতীন্দ্রিয় আশাবাদে ভরসা রাখা আমার পক্ষে অনৈতিক হবে । যতোই দিন চলে যাচ্ছে, আমার নৈরাশ্য বেড়ে চলেছে । তাহলে আপনারাই বলুন, আমি কী করব ?

আমি এই অবস্থায় একমাত্র যা আমার পক্ষে করণীয়, সেটাই করে চলেছি : অর্থাৎ আমি লিখে চলেছি । অনিঃশেষ উদ্দীপনায় আমি লিখে চলেছি । এর-ওর মনে হবে, যা লিখছি, সেটা খুবই কৌতুকবহ । হয়তো তাই । হয়তো ঠিক তা নয় । কেননা লিখতে খুব মজা লাগে, এটা ঠিকই । কিন্তু যতোই লিখে চলেছি, আমার নিজস্ব নিয়তির দুর্দশায় ততোই নির্জিত হয়েছি আমি । কমেডি লেখা আমার কাছে এক অসম্ভব প্রস্তাব । অতএব আমি যাকে বলে কালো নাটক লিখতেই বাধ্য হয়েছি । বিষাদবিধুর এসব নাটকের মাধ্যমেই আমি কিছু হালকা মুহূর্ত গড়তে পারব, এ ধরনের কোনো চিন্তাই বুঝি আমাকে প্রলুব্ধ করে থাকবে । তাই তো আমি আতঙ্ক আর যন্ত্রণার সমাচার লিখতেই শুরু করেছি । যদি কারো এটা জানা থাকে যে সে একদিন মরে যাবে, তাহলে আর অন্য কোন থীম নিয়ে লিখবে সে । মৃত্যুভয় আর মৃত্যুর প্রতি ক্রোধই মানুষকে মানুষ বানিয়েছে । মর্ষকামনা, নৃশংস পরিতৃপ্তি, ধ্বংসস্পৃহা, যুদ্ধ, উপপ্লব– সবই তো সচেতন বা নিগূঢ় অর্থে আসন্ন মৃত্যুর বিরুদ্ধে অথবা প্রেক্ষিতে খামখেয়ালি কিছু কার্যকলাপ । যতোদিন না অমরতার প্রতিশ্রুতি মানুষকে দেওয়া হচ্ছে ভালোবাসার ইচ্ছে সত্ত্বেও মানুষ কী করে ভালোবাসবে ?

শিল্পী ও প্রবক্তার মধ্যে বোধ হয় একজাতীয় আমেরু বৈরিতা আছে । আমাদের শিল্পী এসব কথা যখন বলছিলেন, কোথাও তাঁর অনুভাবে বিভাবে ভাবিকথক বা বাগ্মীর নৈপুণ্য কিংবা সপ্রতিভতা ছিল না । তা সত্ত্বেও, কিংবা বুঝি সেজন্যই, তাঁকে, তাঁর প্রস্বরের অন্তর্মুখিতায়, অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল । তাঁর স্বকপোলকল্পিত নির্বেদের দুর্গে যে একরাশ জীয়নজোনাকি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছিল খুবই, সেকথা এখানে কবুল না করলে গর্হিত অপরাধ হবে । তিনি এতদিন ধরে লিখে চলেছেন, অতএব তিনি যা-ই বলুন তার স্বয়ংসম্পূর্ন মর্যাদা স্বীকার করে নিতে হবে, এই মূল্যবোধ সত্ত্বেও দুর্মর অভিমান জেগেছিল, তাঁর উপপাদ্য বিতর্কপরায়ণতায় খারিজ করে দিই । কিন্তু ভাগ্যিস নিজের সীমা অতিক্রম করিনি । তা না হলে দেখতে পেতাম না সেদিন শিল্পীর, সেই সহজ অথচ দুর্জ্ঞেয়, তর্কাতীত ছেলেমানুষির পারমিতা । সুবিশাল জ্ঞানশিশুর মতোই মনে হচ্ছিল তাঁকে, এক-একটা সিলেব্‌লের উপর অকারণ জোর দিচ্ছিলেন, তাঁর অর্জিত ফরাসি ভাষার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল মাতৃভাষার কিছু অপরূপ অনুষঙ্গ । এসব নিয়েই তাঁর উপস্থিতি সর্বতোভদ্র ও সর্বজনগ্রাহ্য হতে পেরেছিল ।

আমাদের অনুরোধে, প্রাথমিক প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও, সাম্প্রতিকতম স্বরচনা থেকে পড়ে শোনালেন শিল্পী । সেসব রচনারও অধিকাংশই ধূসরিমঃ এক মৃত্যু থেকে আরেক মৃত্যুর দিকে যাবার বৃত্তান্ত । প্রদর্শনীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল তাঁর রচনাবলি । তিনি তাঁর প্রায় প্রতিটি রচনা তাঁর সাম্প্রতিক আবাসনগরী সাংক্‌ট্‌ গালেন থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন । প্যারিসের উন্মথিত জীবনযাত্রা তিনি তাঁর স্নায়ব মানসিকতায় আর গ্রহণ করতে পারেন না, তাই একরকম পালিয়ে এসেছেন সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যযুগীয় ঐ শহরে, যেখানে সন্ন্যাসীরা ছবি আঁকতে ভালোবাসেন । আর এখানেই তিনি, বছর কয়েক হলো, পরমানন্দে আঁকতে আরম্ভ করে দিয়েছেন । রাভেন্‌স্‌বুর্গের গ্যালারিতে তাঁর আঁকা ছবিগুলো দেখতে-দেখতে

জেলা গড়িয়ে গেল। না, এসব ছবির মধ্যে কোথাও নেই রবীন্দ্রপ্রতিভার ছাপ। এই নির্ধারণও অবশ্যই আমার নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। কেননা, তিনি তো সম্পূর্ণই আরেক মানসিকতার প্রতিভূ। কেনই-বা তিনি রাবীন্দ্রিকতার পরিচিতি তাঁর চিত্রাবলিতে ধরে রাখবেন। ঈষৎ পুনর্বিবেচনার পর একথা মেনে নিতে আমার অসুবিধে হলো না, এই শিল্পীর মেধার মূল্যাঙ্কনে আমার সহজাত প্রাদেশিকতার কোনো মূল্যই নেই।
এ সমস্ত ছবির অন্তরঙ্গে লেগে রয়েছে দেশকালহীন এমন এক আয়োজন যার গতিপ্রকৃতির মর্মার্থের সঙ্গে আমাকে নতুন করে, সহমর্মিতার আলোয় যুঝতে হবে।
ছবিগুলির নাম দিয়েছেন শিল্পী: 'হাত আঁকছে' (La main peint)। এই নামকরণ আপত্তিকর ঠেকল না। এই সমস্ত গ্রাফিক আলেখ্য শুধুমাত্র সৃষ্টির প্রক্রিয়ার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, শেষ পর্যন্ত কোনো অতিচিত্রিত পরমার্থের বৈভব জাগিয়ে তোলে না। এ পর্যন্ত বলেই থেমে যেতে পারতাম, এবং সেই যতির ভিতরে নিঃসন্দেহে শিল্পীর প্রতিভা বরবাদ করে দেবার অবচেতন ঝোঁক লুকিয়ে থাকত হয়তো-বা। কিন্তু এটুকু জানিয়েই থমকে গেলে অন্যায় হতো। যেহেতু প্রদর্শিত এই যাবতীয় গ্রাফিকশিল্পায়নে শিল্পী, বিশেষত তাঁর লিথোগ্রাফের কাজগুলিতে, ধরে রেখেছেন নির্মীয়মাণ সত্তাকে। এক-একটি আলেখ্যে কোনো রমণী আচম্বিতে তুলির আঁচড়ে শিশুর পরিণতি পেয়েছে। কোনো-কোনো রেখাঙ্কনে প্রতিমূর্ত হয়েছে অনামিক উৎকণ্ঠা ('আঁকা ব্যাপারটা আমার কাছে থেরাপি। আঁকবার সময় আমার মনের বহুধাবিচিত্র ভয় পুঞ্জীভূত হয়, আঁকতে-আঁকতেই আবার সেই ভয় বুঝি-বা মিলিয়ে যায়'—শিল্পীর উক্তি)। স্বভাবচিত্রীর কাছে তিনি দস্তুরমতো ছবি আঁকতে শিখেছেন কিনা সেই প্রশ্ন করতেই তিনি বলে উঠলেন (রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় এভাবে বলতে পারতেন): 'না, সেসবের সময় আবার পেলাম কখন।

কিন্তু তোমরা এত প্রশ্ন করছ কেন, দ্যাখো, দ্যাখো, দেখার মাধ্যমেই ছবির রহস্য ঠাহর করতে পারবে।' কালো রঙের প্রতিসাম্যে স্তূপীকৃত হয়েছে চরিতার্থ হলুদ, লাল, উদ্দীপ্ত নীল আর তৃণসবুজ। প্রথম দৃষ্টিপাতে মনে হয়, শিল্পী সম্ভবত তাঁর অভ্যস্ত নৈরাশ্য থেকে প্রাণান্তকর স্বতঃস্ফূর্তির ছন্দোময়তায় এগিয়ে যেতে চাইছেন।

রাজেনসবুর্গে প্রদর্শিত শিল্পীর সদ্য-আঁকা কিছু ছবি

কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকালেই বুঝতে পারা যায়, তিনি তাঁর নিখিল নিহিলবাদ থেকে একতিলও সরে আসেননি ('আমার আঁকিবুঁকিতে দৈত্যদানবেরা গ্রোটেস্ক চেহারা পরিগ্রহ করে'—শিল্পীর উক্তি)। সিলুয়েৎ ফিগারগুলোর হাত-পা সংবদ্ধ, মাথাগুলি এর-ওর সঙ্গে প্রায় যেন সমীকৃত হয়ে আছে। কোথাও-কোথাও জীবজন্তুর প্রতীকের মধ্যবর্তিতায় জেগে উঠছে শিল্পীর অনারব্ধ ইন্দ্রজালের চিহ্নভাষা। আপাতসহজ ঐ ভাষা অনিবার্যতই পাউল ক্লে অথবা মিরো-র কোনো-কোনো অনন্য আলেখ্যের কথা মনে করায়। কখনো-কখনো অভূতপূর্ব খেয়ালে শিল্পী রঙের চাপ তৈরি করে ছবির অন্তর্ভুক্ত ফিগারগুলির মধ্যে এক মরমী, যদিচ হয়তো আরোপিত, মৈত্রী চাপিয়ে দেন; দর্শকের মনে হতে পারে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সামান্যতম দূরত্ব কোনোমতো তাঁর পছন্দসই নয়।
তাহলে কি তিনি এমন কোনো দার্শনিকতার মুখাপেক্ষী যা মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে সেতুর তিয়াষী? এই প্রশ্নটি সংজ্ঞায়িত করার মুহূর্তেই বুঝতে পেরেছিলোম, এরকম জিজ্ঞাসা ঠিক নন্দনতত্ত্বের এলাকায় পড়ে না। শিল্পী উত্তর করলেন: 'এখন পর্যন্ত মানুষের স্বীকৃতিই আমার কাছে ঈশ্বরের প্রতিকল্প। অথবা বলতে পারেন, রং এবং রেখার এই সন্ধানই আমার ঐশ্বরিকতা। তবে কি ধরে নিতে হবে, এই প্রক্রিয়ায় বিধাতা লুপ্ত হয়ে যান? জানি না। তবে এটা ভাবতে ভালো লাগে, আমার যতো বন্ধু আর পুরোহিতেরা আমার হয়েই প্রার্থনা করেন, আমার জন্যে। তাঁদের উপর নির্ভর করেই আমি আমার খেয়ালখুশির ডিজাইনগুলি নির্মাণ করে যেতে থাকি।'

এত বড়ো কথার উপরে আর কোনো কথা নেই। তাঁকে রবীন্দ্রনাথের ছবি বিষয়ে দু-একটি কথা সন্তর্পণে জানাতেই তিনি তাঁর অপরিসীম ঔৎসুক্য ব্যক্ত করলেন। রবীন্দ্রনাথের নাম তিনি শুনেছেন, যদিও হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের মাত্রাগত বিভাজন হিসেবে তাঁর কোনো দৃঢ় ধারণা থাকবার কথা নয়, এই ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করলাম ('তিনি কি হিন্দু ছিলেন, না বৌদ্ধ? তাঁর দু-একটা কবিতা আঁদ্রে জীদের তর্জমায় পড়েছি'—শিল্পীর উক্তি)।

ফিরে আসবার মুখে একটি সদ্য প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ কিশোরের সঙ্গে পরিচয় হলো। তার নাম ডানিয়েল। প্রজ্ঞাপ্রবীণ বিন্যাসে ডানিয়েল বলল: 'আগে যখন আমি জেগে উঠতাম, মনে হতো আমি জিতে গেছি। এখন আমি আর জেগে উঠি না।' তাকে স্বভাবজাত শিক্ষকতার বশে বকুনি দিয়ে বললাম: শিল্পীর 'কর্দম' (La Vase) নাটক থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছো তো? এভাবে কোনো পরীক্ষা কখনো ভালোভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।' ডানিয়েল শিক্ষার্থী হলেও তুখোড়, জানাল: 'আপনারা আসুন, আমাদের নাটকের দল এই নাটকটা আজ সন্ধ্যায় অভিনয় করছে। সেই সঙ্গে তাঁর "নির্বিচারে সমূহ বিনাশ" (Jeux de Massacre)। খুব ভালো অভিনয় হবে।'

স্বাক্ষর শিকারীদের বাসনা মেটাচ্ছেন শিল্পী

কিশোরের আমন্ত্রণ সেদিন গ্রহণ করা সহজ ছিল না, কেননা বৃদ্ধ রবীন্দ্রব্রতী দার্শনিকের কাছে কথা দেওয়া ছিল, বিকেলের দিকে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কবিতা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথঞ্চিৎ বাদবিসংবাদ হবে। ডানিয়েলকে বললাম : 'দ্যাখো, দুটো নাটক ভালোভাবেই পড়েছি, কিন্তু কোনটা দেখেই আজ চিত্ত ভরবে না। প্রথম নাটকটাতে, ভেবে দ্যাখো, তোমার বয়েসেরই একটি তরুণকে প্রথমে দেখা যাচ্ছে। কাজেকর্মে সে বেজায় নিপুণ, সক্ষম। কিন্তু যতোই বয়েস বাড়তে থাকল, সে তার ক্ষমতা খুইয়ে বসল। জাগা থেকে ঘুমিয়ে-পড়ার সময়টুকুর মধ্যে সময় কেবলই কমে যেতে থাকে, আর, সেই তরুণের সামর্থ্যও, সমান্তরাল মাত্রায়।' ডানিয়েল আমার আক্রমণে এতটুকু দমল না, বরং নাটকের শেষ অংশ স্মৃতি থেকে তুলে বলে উঠল : 'কিন্তু আমি তো গোড়া থেকেই সবটা আবার শুরু করতে চাই...সব-কিছুই জন্ম থেকে, অঙ্কুর থেকে আবার সূচিত হবে। আমি আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করব।' ডানিয়েলের ওই অপরাজেয় আশাবাদ খুব মনোরমা লাগলেও বিশেষ করে তার প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় নাট্যরূপকটি দেখতে হবে, এই আশঙ্কায় তাকে নিরস্ত করলাম ; 'ঐ নাটকে মৃত্যুরই জয় বড়ো শোচনীয় দশায় আঁকা হয়েছে।

হোলবাইনের আঁকা ছবিতে দ্যাখোনি, মৃত্যুকে ঘিরে মুমূর্ষদের প্রলয় নৃত্য। অবিকল সেই আদলে তৈরি হয়েছে এই বিতিকিচ্ছিরি নাটক'। সদ্যই প্রবেশিকা পেরিয়ে গেছে ডানিয়েল, তাই কণ্ঠস্থ বিদ্যার উপর ভর করে আমাকে জানিয়ে দিল : 'ড্যানিয়েল ডিফো-র জার্নল অফ দি প্লেগ ইয়ার অবলম্বন করে আলব্যের কাম্যু মহামারী [La Paste] উপন্যাস লিখে খুশি হতে পারেননি— তাই একই থীম নিয়ে আপৎকালীন পরিস্থিতি [L'etat de siege] নাটক লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কাম্যুর নাটকে অ্যাবসার্ডত্ব পেরিয়ে গিয়ে মানুষের অস্তিত্বকে নৈতিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য উপহার দিতে। সেটা কি আজগুবি নয় ? কাম্যুর এই ধারণাটাই যে আজগুবি সেটা প্রতিপন্ন করবার জন্যই ইয়োনেস্কো তাঁর এই নাটকটা লিখেছেন।' এতক্ষণে তর্কযুক্তিময় কবচকুণ্ডলের আড়ালে ডানিয়েলের অসহায়তা শনাক্ত করতে পারলাম। সে আমাদের আজকের শিল্পীর মতোই, উক্তি উদ্ধৃত করে নিস্তার

প্যারিসের উন্মথিত জীবনযাত্রা তিনি তাঁর স্নায়ব মানসিকতায় আর গ্রহণ করতে পারেন না, তাই একরকম পালিয়ে এসেছেন সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যযুগীয় ঐ শহরে, যেখানে সন্ন্যাসীরা ছবি আঁকতে ভালোবাসেন। আর এখানেই তিনি, বছর কয়েক হলো, পরমানন্দে আঁকতে আরম্ভ করে দিয়েছেন।

পরীক্ষার্থীর ভূমিকায়, এরকম বিমূঢ় অবস্থায় সচরাচর পর্যুষিত হতে দেখা যায়। এদেশের পরীক্ষকদের মধ্যে তাই স্বাস্থ্যকর এই মনোভঙ্গি প্রবল, যে-পরীক্ষার্থী উৎকলনের সাহায্যেই তার বক্তব্যকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করবে, তাকে ততোটা আমল না দেওয়া। দীর্ঘকাল শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, ডানিয়েলের সঙ্গে বিতর্কিকায়, ঘাড় থেকে আমিও তো অকাতরে নামিয়ে দিতে পারি না। তাকে মেদুর ভর্ৎসনা করে বললাম, 'দ্যাখো, অতো কোটেশন দিলেই কি শিল্পীর সার্থকতা প্রমাণিত হয় ? ঠিক আছে, শিল্পী আদৌ কী চেয়েছিলেন সেটা তলিয়ে দেখা যাক। তিনি চেয়েছিলেন দর্শককে প্রথমে ভয় পাওয়াতে ও পরে হাসাতে। কোনো-কোনো বৌদ্ধ শ্রমণ মৃতদেহ দেখে হাসেন। কেন হাসেন ? মৃত্যু কৌতুককর হতে পারে বলে। এই নাটকটা অস্তিত্বসংক্রান্ত পরিস্থিতির কৌতুকী অসারত্ব হাতে-কলমে দেখিয়ে দেবার জন্য লেখা হয়েছে। হিউমার সাহায্য করে সহজ বুদ্ধির আলোয় গোটা ব্যাপারটা বুঝে নিতে, এমন-কি মৃত্যুভয় থেকে মানুষকে বাঁচায়। এরকমই তো একটা ফন্দি ছিল শিল্পীর। সেটা কি তিনি রূপ দিতে পেরেছেন ? পারেন নি। ফলত এটা না হয়েছে অতিনাট্য, না হয়েছে প্রহসন'। আমি যখন ডানিয়েলকে এই কথা বললাম, তখনও কিন্তু ইচ্ছে করেই ঐ নাটকে শিল্পীর প্রদত্ত ভূমিকা থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে বললাম, যেন সে আমার অগভীর চাতুর্য ধরে ফেলে। কিন্তু সে-বেচারা ধরতে পারল না। তখন তার উপর

আমাদের খুব মায়াই হলো। তাকে কথা দিলাম, তাদের নাটক দেখতে আসব। গৃহকর্তা দার্শনিকের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে আলোচনা মুলতুবি রেখে সেদিন সন্ধ্যায় তার আমন্ত্রণ রক্ষা করতেও গেলাম।

যাবার পথে দেখি লেক অফ কনস্টান্সের ফ্রীডরীশহাফেনের বলাভূমির কাছে একটা জায়গায় দর্শক আর ফোটোগ্রাফারের ভিড় জমেছে।

পালা করে এক-একজন স্বাস্থ্যান্বেষী—এ অঞ্চলে সারা জগৎ থেকে স্বাস্থ্যসন্ধানী ট্যুরিস্টরা আসেন—হাতলওয়ালা লোহার কন্দুক বরফজমাট জলের উপর ছুঁড়ে দিচ্ছে। এই লৌহদণ্ডক্ষেপ (Eisstockschuetzer) খেলায় যেন ডিসক্যাস ও গলফ খেলার সমন্বয় আছে। ঘর্ষণের তাপে বরফ গলিয়ে দেবার এ খেলা নিয়ে অনেক কিংবদন্তী আছে। দেখে ভালো লাগল। কেন জানি না, হিম তাড়ানোর এই খেলার মধ্যে স্বভাব-মৃত্যুঞ্জয় মানুষের দুর্দমনীয় সত্তার চ্যালেঞ্জ দেখে প্রাণিত বোধ করেছিলাম। অ্যাবসার্ড নাটকের শিল্পী যতো ক্ষমতাবানই হোন, এই দ্যুতিময় স্পর্ধা দেখাতে চাননি, পারেনওনি। সেজন্য তাঁর উপর অভিমান করে বসে থাকার অর্থ হয় না। ডানিয়েল প্রতিশ্রুত ভালো অভিনয়ের অনুষ্ঠানটি শিল্পীর আগ্রহের বিশ্বস্ত অনুবাদ হিসেবে নিঃসন্দেহে উতরে গিয়েছিল ঠিকই, তার চেয়ে অতিরিক্ত কোনো মাত্রা তার মধ্যে ফোটেনি। মন্থর সেই শোকালেখ্য দেখতে দেখতে

এখন পর্যন্ত মানুষের স্বীকৃতিই আমার কাছে ঈশ্বরের প্রতিকল্প। অথবা বলতে পারেন, রং এবং রেখার এই সন্ধানই আমার ঐশ্বরিকতা। তবে কি ধরে নিতে হবে, এই প্রক্রিয়ায় বিধাতা লুপ্ত হয়ে যান ? জানি না। তবে এটা ভাবতে ভালো লাগে, আমার মতো বন্ধু আর পারাতিতেরা আমার হয়েই প্রার্থনা করেন,

ভাবছিলাম, শিল্পীর বিরুদ্ধে আমার অভিমানের ভিত্তি কতোটুকু। তিনি তো নিজের জীবনের কাছেই সৎ থাকতে চেয়েছেন। 'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই কথা বলে/ আমি যাব চলে', এমন অজেয় উচ্চারণ যিনি করেছিলেন, তাঁর চিত্রাবলিতেও কি মৃত্যুভয় বিধুনিত হয়ে ওঠেনি ? 'রাজা মরে যায়' নাটকের শেষ দৃশ্যে আমরা কিন্তু দেখতে পাই, রাজা মৃত্যুর প্রাক্-মুহূর্তে পরিপূর্ণ শিল্পী হয়ে উঠেছেন, তাঁর চোখের সামনে নীল রঙের অপরূপ আধিপত্য, তাঁর কাছে বর্ণালি তখন স্মৃতির প্রতিশব্দ হয়ে উঠেছে, তাঁর কল্পনাশক্তি হয়ে উঠেছে আগের চেয়েও যেন জীবনমুখী, দৃষ্টিধর্মী (ঠিক এই অভিমুখিতায় শিল্পী রাভেন্সবুর্গের ঐ প্রদর্শনীতে আমাদের বলেছেন : 'আমার ছবি-আঁকাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আঁকতে না পারলে কবে মরে যেতাম')। এরকমই এক পূর্ণতার মুহূর্তে রানীর উপর তাঁর মরজীবনের দায়ভাগ রেখে তিনি সিংহাসনে উঠে যান। সিংহসদনের দরজা জানলা দেয়ালগুলো খুব আস্তে আস্তে তখন মিলিয়ে যেতে থাকে। শিল্পী আমাদের এই বিলম্বিত প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করিয়ে দেন। মঞ্চের উপরে শুধুমাত্র দেখা যায় রাজাকে আর ধূসরিম তাঁর সিংহাসনটাকে। শেষ পর্যন্ত সিংহাসন সমেত রাজাও মিলিয়ে যান। ক্রমান্বয়ে সব-কিছুর এই অদৃশ্য হয়ে যাবার বাঁকে আরেকবার হয়তো সিংহাসনে আরূঢ় রাজাকে দর্শকরা দেখতে পান। কিন্তু তা-ও শুধুই মুহূর্তের পরিসরে। পরিশেষে এক ধরনের 'কুয়াশা'র মধ্যে রাজাকেও আর দেখা যায় না।

ঐ এক ধরনের কুয়াশার দ্যোতনা কী ? কোনো-কোনো সমালোচক যে মনে করেন শিল্পী তাঁর এই মার্কা-মারা অ্যাবসার্ড নাটকেও আসলে রাজার অনিবার্য মৃত্যুর মাধ্যমে গণতন্ত্রের উপরেই জোর দিয়েছেন, সেই ব্যাখ্যাটা কি ঠিক ? শিল্পী সে রাত্তিরেও আমাদের কাছ থেকে দু-তিন কিলোমিটার করস্পর্শী দূরত্বের মধ্যেই ছিলেন, জানতাম। ডানিয়েলের দল তাঁকে দিয়ে তাঁর বইপত্তর সই করিয়ে আনবে, এই কার্যক্রমের অংশীদার করে নিতে চাইছিল আমাদেরও। কিন্তু আমরা যাইনি। শিল্পীকে তাঁর নিজের রচনার তাৎপর্য বুঝিয়ে বলার অনুরোধ-উপরোধ করার মতো অ-নান্দনিক আর কীই-বা হতে পারে ? ■

বৈ দে শি কী

হিন্দি চিনি ভাই ভাই ? আগে আকুপাংচার চাই

অরুণ বাগচী

ভারতস্থ চীনা রাষ্ট্রদূত সম্প্রতি এই ধরনের একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক অদূর ভবিষ্যতেই আরও ভাল হবে। সীমান্ত নিয়ে যে ভুল বোঝাবুঝি আছে তার অবসান ঘটবে। রুশ-চীন সীমান্ত সমস্যা মেটাবার ব্যাপারে সোভিয়েত নেতারা যে মনোভাব দেখাচ্ছেন, ভারতীয় সরকারকেও তা দেখাতে হবে। পশ্চিম সীমান্তে চীন কিছু আপস করবে, পূর্ব সীমান্তে ভারত কিছু ছেড়ে দেবে। অরুণাচল নিয়ে চীনের সাধারণ মানুষ মোটেই মাথা ঘামায় না। তবে ন্যায়ত যা চীনের, তা চীন ফিরে পাক এই দাবিটা তাদের আছে। এই সমস্ত কথা বলেছেন চীনা রাষ্ট্রদূত।

সবাই জানেন, চীন সীমান্ত সমস্যা মেটাতে যতটা আগ্রহী ভারত তার চাইতে কম নয়। আর চীনা জনসাধারণ কী চান বা চান না সেটা ওদেশের সরকার কতটা বোঝে, কীভাবে বোঝে, সেটা বাইরের কেউ সহজে বুঝতে পারবেন না। ভারতের মানুষজনকে নিয়ে ভারত সরকারের কিন্তু অসুবিধে আছে। যে 'উদার ছাড়' স্পষ্টত এখনও ভারতের কাছে চীন প্রত্যাশা করে, সেটা সাধারণ ভারতীয় এক ধরনের জুলুম বলেই ধরে নেবে। চীনাদের সেই প্রত্যাশা বা দাবি মেটাতে গেলে শুধু রাজীব গান্ধী নন, যে কোনও ভারতীয় সরকারই বিপদে পড়বে। কারণ, সীমান্তের পশ্চিম এলাকায়, অর্থাৎ আকসাই চিন অঞ্চলে, ভারতের ৩৮,০০০ বর্গ মাইল এলাকা চীন বেআইনীভাবে দখল করে আছে এই ধারণা সর্বত্র বর্তমান। নেহরুর আমলে তদানীন্তন সরকারের অজ্ঞাতে এবং অসতর্কতাবশত চীন ভারতের জমির উপর দিয়ে রাস্তা তৈরি করেছে নিজের দেশের দুই প্রদেশকে যুক্ত করার জন্য, যোগাযোগ অব্যাহত রাখবার জন্য। ভারতীয় দৃষ্টিতে, কট্টর চীনাপন্থী ছাড়া সমস্ত ভারতীয়ের কাছে, এটা একটা বেআইনি কাজ, সমর্থনের অযোগ্য কাজ। মধ্য অঞ্চল নিয়ে কোনও বিবাদ নেই সেটা চীনও স্বীকার করে। পূর্বাঞ্চলে সমস্যা বিতর্কিত ম্যাকমেহন লাইন নিয়ে। এই লাইনটি যে গায়ের জোরেই মানচিত্রের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ শাসকরা, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে খুব একটা মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু ম্যাকমেহন লাইন নিয়ে আলোচনার দ্বিতীয় বৈঠক বর্জন করলেও প্রথম বৈঠকে চীন সরকারের প্রতিনিধিরা ছিলেন। চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যখন অন্তত ওপর ওপর খুবই ভাল, তখন ভারত সরকার তিব্বত সম্পর্কিত চীনা সার্বভৌমত্ব বিনাশর্তে স্বীকার করে নেয়। ইদানীং একদল বিশেষজ্ঞ বলছেন যে, ওই সময় দিল্লির উচিত হত বেজিংকে দিয়ে ম্যাকমেহন লাইনের বৈধতা স্বীকার করিয়ে নেওয়া। অন্তত তা করবার জন্য চাপ দেওয়া। দিল্লি সে চেষ্টা না করে বোকামি করেছে। কারণ, ভারতের জায়গায় চীন থাকলে সে ঠিক তাই করত। বন্ধুত্বের কামনায় ভারত যা করেছে তখন, চীন তার কোনও দামই শেষ পর্যন্ত দেয়নি, আজও দিতে প্রস্তুত নয়।

দুঃখের বিষয় এই, ভারতীয় নেতারা ভারতের মানুষকে পুরো ছবিটা কখনও দেননি। ফলে ১৯৬২-তে যখন চীনের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে সংঘর্ষ হল তখন সাধারণ মানুষ থতমত খেয়ে গেল। 'হিন্দি চিনি ভাই ভাই' স্লোগানে তখনও আকাশ বাতাস সুরভিত। সেই শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ সীমান্তে গোলাগুলির গর্জন! ব্যাপার কী তা বুঝতে অনেক সময় লেগে গেছে সাধারণ মানুষের। এবং জাতীয় অপমানে জনচিত্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। সেই ক্ষোভে ইন্ধন জুগিয়ে তাকে ক্রোধে পরিণত করেছেন রাজনীতিকরাই। আজ আর বাষট্টির সেই উগ্র ক্রোধ ও তিক্ততা তেমন করে নেই, কিন্তু রেশ রয়ে গেছে। আজ ভারতীয় মানুষও সুখী বোধ করবেন যদি সীমান্ত সমস্যা মিটে যায় এবং চীনের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের পথ বন্ধ হয়। কিন্তু জাতীয় স্বার্থ বা সম্মানের বিনিময়ে সেটা ঘটুক তা কেউ চাইতে পারেন না। ওই স্বার্থটা কী, তার চৌহদ্দি কতটুকু, কতটুকু ছেড়ে দিলে সম্মান নষ্ট হবে না অথচ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, সেটা জনসাধারণ হয়তো ভালভাবে বুঝতে পারছেন না। সেটা তাদের বোঝাতে হবে। বেশ স্পষ্ট ভাষায়, সহজভাবে বোঝাতে হবে। অর্থাৎ জনমত গঠন করতে হবে। এদেশের পক্ষে এটা পরম জরুরী। এটা আগে না করে যে কোনও মূল্যে সমঝোতায় আসতে ভারত সরকার আগ্রহী এই ধরনের ছবি গড়ে উঠলে সাধারণ নাগরিক. মনে করবে যে তাদের ঠকানো হল। এ বছর গোড়ার দিকে কিছু আলাপ আলোচনার আয়োজন হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে সরকার জনমতকে প্রস্তুত করতে যাচ্ছে। সেটা উচিত কাজই হয়েছে, কারণ সবারই জানা দরকার সীমান্ত সমস্যার মূল ব্যাপার কী, বাস্তবসম্মত সমাধান কী হতে পারে। কতটা পর্যন্ত ছেড়ে দিতে পারা যায় চীনকে। দেবার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। কিন্তু ইদানীং সরকার এবং বিরোধীপক্ষের কাছে বফর্স, ফেয়ারফ্যাক্স, সাবমেরিন চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ই তো গুরুত্ব পাচ্ছে। আর কোনও দিকে কি কারও মন আছে? তর্কবিতর্ক চালিয়ে যেটুকু দম সরকারের থাকছে, যুগপৎ খরা ও বন্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে তাও নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এই তো অবস্থা!

তাছাড়াও সমস্যা আছে। এতদিন ভাবা হচ্ছিল সমাধান সহজেই সম্ভব এটুকু মেনে নিলে যে, যার যার দখলে যে এলাকা আছে, যাকে বলে area of actual Occupation সেই সব এলাকার ওপর "জবরদখলকারী"রই স্বত্ব বর্তাক। দুইপক্ষই

চীন ভারত সমস্যা মেটাতে নেহেরু খুবই আগ্রহী ছিলেন

দেং পরিচালিত চীনের বিদেশনীতি অনেকে পছন্দ করছেন না

এটা মেনে নিলে আর সমস্যা থাকে না। একদা প্রয়াত ঝু এন-লাই এ ধরনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন যা তদানীন্তন ভারত সরকার দুর্ভাগ্যবশত মেনে নেয়নি জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে এই ভয়ে। এই মুহূর্তে ওই প্রস্তাবটাও বিবেচ্য নয়, কারণ, বেজিংই তা আর মানছে না। চীনা রাষ্ট্রদূতও বলছেন যে, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ঝু ঠিক ওই কথা বলেননি। তাহলে বর্তমান প্রস্তাব কী?

চীনারা বলছে, পশ্চিম সীমান্তে চীন কিছু ছাড় দেবে, পূর্ব সীমান্তে ভারত। কথাটা নতুন শোনা গেল, যদি অবশ্য চীনা রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য সঠিক বিবৃত হয়ে থাকে। এতদিন ধারণা ছিল পশ্চিম সীমান্তে আকসাই চিনের দখলীকৃত জমির মালিকানা ভারত ছেড়ে দেবে, অর্থাৎ জোর করে হোক,ভুল করে হোক, চীন যে জমি দখল করে আছে সেটা তার হয়ে যাবে। পরিবর্তে পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ অরুণাচল-তিব্বত সীমান্ত বর্তমানে যে অবস্থায় আছে সেটাকেই বৈধ বলে মেনে নেবে চীন। এখন উল্টো কথা চীনের তরফে আসছে। চীন পশ্চিমে ছাড় দেবে, ভারত পূবে! এটা কি 'Heads you Lose, tails I win' জাতীয় ব্যাপারে দাঁড়াচ্ছে না? যদি সত্যি সত্যি এটাই চীন বলে থাকে তবে ভারত সরকারের সমস্যা বাড়বে বই, কমবে না। আকসাই চিনের ওপর দখল ছেড়ে দেওয়াই কঠিন, যদিও তা ছেড়ে দিতে দিল্লি প্রস্তুত। সেইভাবে সাধারণ মানুষের মনকে তৈরি করতে হবে। যুক্তিতর্ক অবশ হয়ে আছে, আকুপাংচার চিকিৎসা করে স্নায়ুর চেতনা ফিরিয়ে আনতে হবে। এর ওপর আবার পূর্ব সীমান্তেও ভারতকে উদার ছাড় দিতে বলা উটের পিঠের ওপর, মেরুদণ্ডভাঙা বোঝার ওপর, আরও বোঝা চাপানো। এটা খুব বাস্তবিক হবে না। বিশেষজ্ঞরা কেউ কেউ অবশ্য বলছেন, শেষ পর্যন্ত ঝু এন-লাই যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেটাই চীনের প্রস্তাব হবে, দরাদরি করে বাড়তি কিছু আদায় করা যায় কিনা সেটাই পরখ করে দেখছে বেজিং। দরাদরি করতে চীন বেশ পটু, ভারত ওই ক্ষেত্রে একেবারে নাবালক। কাজেই খেলা কতখানি জমবে তা বলা শক্ত।

বিদেশী কিছু পত্র-পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সীমান্ত আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ফলে বেজিং খুব আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। তার তর্কের গলা বেশ জোরালো শোনাচ্ছে তাই। ভারত এই নবার্জিত দৃঢ়তা ও শক্তির প্রতিফলনই চীনের কথাবার্তায় হয়তো খুঁজে পাবে। ভারত ও রাশিয়াকে একদিকে রেখে অন্যদিকে চীন- পাকিস্তান-আমেরিকাকে দড়ি টানাটানির খেলায় যাঁরা নামাতে চান, তাঁদের কাছে এই সব যুক্তি খুবই চিত্তগ্রাহী হবে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে চীনের বিরুদ্ধে মদত আশা করে ভারত কি তার এশীয় বিদেশনীতি স্থির করে? চট করে ভারতকে একলা ফেলে রেখে সোভিয়েত ইউনিয়ন সরে যাবে, এই ধরনের সম্ভাবনা কি চীনকে আবার অনমনীয় করে তুলছে?

ঠিক ওই ধরনের যুক্তি মানা শক্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ রইল না তার কারণ কেবলমাত্র সীমান্ত সমস্যা নয়। অন্য গুরুতর হেতুও ছিল, যার অনেকগুলি এখনও

রাশিয়া পেয়েছে গর্বাচভের মতো উদ্যমী নেতা

আছে। সীমান্ত সমস্যা এখনও মেটেনি, যদি পুরোপুরি মিটেও যায় তাহলেই যে চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক সেই প্রথম আমলের মতো প্রাণবন্ত হবে এটা জোর করে বলা চলে না। চীনের ভিতরেই নেতৃত্বের পর্যায়ে, দলীয় কাঠামোতে নানা ধরনের জটিলতা আছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন গোর্বাচেভের মতো অপেক্ষাকৃত তরুণ ও উদ্যমে ভরপুর একজন নেতা পেয়েছে। পক্ষান্তরে দেং শিয়াও পিঙের সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। আজও তিনি কর্মঠ, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় তৎপর, অতি শ্রদ্ধেয় নেতা। তাঁকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাবার মতো কেউ নেই। কিন্তু তাঁর বয়স বেড়েছে, তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। প্রবল সাহসের সঙ্গে দেশকে তিনি দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখেছেন এবং সেই স্বপ্নকে কাজে পরিণত করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশে বা দলীয় স্তরেও যে তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা নেই, তা নয়। দেং পরিচালিত চীন যেভাবে নিজেকে বিদেশের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছে সেটাও অনেকের পছন্দ নয়। দেং ক্ষমতার রশি ছেড়ে দিলে পর আসল পরীক্ষা হবে যে তাঁর প্রভাব আজ কতখানি, শিরা ও শিকড়ে কতখানি তা ব্যাপ্ত। তার আগে এটা মাপা শক্ত হবে। দেং-এর বড় ছেলে পলিটব্যুরোতে নির্বাচিত হতে পারলেন না, অতএব দেং ইতিমধ্যেই রাহুগ্রস্ত ইত্যাদি অঙ্ক কষতে শুরু করেছেন যাঁরা তাঁরা ভুল করছেন। রাশিয়া বা চীনে এখনও সেই পরিস্থিতি রচিত হয়নি যা নাকি উত্তর কোরিয়ায় সম্ভব। দেং নিজে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় অপমান ও বিস্মৃতিতে ছিলেন। সেটা নিশ্চয় খুবই গ্লানিকর দশা। কিন্তু জুনিয়র দেং ওই বিপ্লবের সময় রীতিমত শারীরিক নির্যাতন সহ্য করেছেন। তেতলার জানলা থেকে তাঁকে বিপ্লবী ছাত্ররা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। প্রাণে বেঁচে গেলেও পঙ্গু হয়ে গেলেন দেং তনয়। বিকলাঙ্গদের জন্য বিরাট সংগঠন তিনি গড়ে তুলেছেন। ডেলিগেট হিসাবে তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয় দলীয় স্তরে। আপন প্রভাবে, পিতার দৌলতে নয়। বৃদ্ধ দেং-এর তাতে হাত ছিল না। আবার পুত্রের ব্যর্থতা থেকে পিতার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এই হিসাবটাও আসে না।

চীনের সঙ্গে সংঘর্ষ যাতে না হয় সেই পরিস্থিতি নির্মাণের দায়িত্ব অবশ্যই ভারতেরও আছে। সেই কারণে ভারতকে অগ্রসর হয়ে সীমান্ত বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে হবে। পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা তথা কাশ্মীর সমস্যা মেটাবার উপায় হল ওই দখল করা জমিকে দখলদারের হাতেই বৈধভাবে তুলে দেওয়া। ভারতে এবং পাকিস্তানে অনেকেই সেটা বোঝেন, কিন্তু দেশে প্রতিক্রিয়া কী হবে সেটা ভেবেই সবাই চুপ। তবে নিশ্চল বসে থেকে কে কবে সমাধান খুঁজে পেয়েছে? পাকিস্তানের ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া যত কঠিন চীনের ক্ষেত্রে তত নয়। কিন্তু কিছু তৎপরতা ভারতকে দেখাতে হবে। নত হয়েও যেমন ফললাভ হয় না, মেজাজ দেখিয়েও তেমনই লাভ ঘটবে না। চুপচাপ বসে থাকলে, ক্ষতি হবে। ক্ষতি হচ্ছে। গুপ্ত

এক বিচিত্র নদ

কুন্তলা লাহিড়ি

দামোদর এক আশ্চর্য নদ। নামেই প্রকাশ, এ নদীর মত কমনীয় ও লালিত্যময় নয়, বরং দুর্দান্ত পৌরুষে ভরপুর। অবিশ্রান্ত বর্ষণে ফুলে-ফেঁপে ওঠা দামোদরের কিন্তু আরও একটা রূপ আমরা দেখি শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে, যখন তা পরিণত হয় ক্ষীণকায় এক ম্রিয়মাণ জলধারায়। ঘন বর্ষার রাতে যার উদ্দাম জলরাশি পার হবার সাহস রাখে মাত্র দুয়েকটি মানুষ, গ্রীষ্মে তারই হাঁটুজল ভেঙে স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যায় মানুষ—পশু নির্বিশেষে। ভয়ংকর ও শান্ত এই দুই পরস্পর-বিরোধী ছবি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে কেবল দামোদরই।

দামোদর জাগিয়ে তোলে মনের মধ্যে নানা পরস্পরবিরোধী আবেগ। 'ধ্বংসের নদ', 'দুঃখের নদ'—এই পরিচয়ে তাকে জেনে ভয় পাই, মনে দেখা দেয় নানা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া। আবার সেই দামোদরই গ্রামে গ্রামে আনন্দের সাড়া তোলে যখন মঙ্গলের স্মারক হিসেবে বয়ে আসে দামোদরের খালের জল। শহরে শহরে জ্বলে ওঠে দামোদরের কল্যাণে পাওয়া বিদ্যুতের আলো, যেন তাকে দীপাবলীর অর্ঘ সাজিয়ে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যেই। একদিকে ধ্বংস ও সংহার, অন্যদিকে সৃষ্টি ও পালন—দামোদরের এই দ্বৈত ভূমিকা আমাদের নাড়া দেয়, আপ্লুত করে আবেগে।

এ এক এমন নদ যাকে ঠিক একটা বিশেষণে ভূষিত করা চলে না, যার জন্যে কোনো একটা নির্দিষ্ট বর্ণনাই যথেষ্ট নয়। দামোদর যেন বৈচিত্র্যের প্রতীক। এ নাম অবহেলাভরে শুনে অগ্রাহ্য করা যায় না, সজাগ হয়ে নড়েচড়ে বসতেই হয়। শুধু ভারত নয়, সত্যি কথা বলতে কি, গোটা পৃথিবীর অতি অল্পসংখ্যক নদ-নদীর ক্ষেত্রে এই কথা বলা চলে। অন্যান্য যেসব নদী এরকম আবেগ জাগায় মানুষের মনে, তারা প্রত্যেকেই আয়তনে অনেক বড়, নিজের নিজের দেশের প্রধান নদী তারা। আমাদের দামোদর তো সেই তুলনায় নেহাতই বামন।

দামোদরের এও আরেক আশ্চর্য দিক। দৈর্ঘ্যে নিতান্তই ছোট এই নদী, উৎস থেকে মোহানা পর্যন্ত মাত্র পাঁচশ চল্লিশ কিলোমিটার। নদীমাতৃক ভারতের বিপুলায়তন গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মহানদী গোদাবরীদের কাছাকাছি আসে না দামোদর। ছোটনাগপুরের মালভূমির ১০৬৭ মিটার উঁচু খামারপত ও বীরজংগা পাহাড়ের বৃষ্টির জল সৃষ্টি করেছে একটি শীর্ণকায় ঝরণার। এই ঝরণার স্থানীয় নাম 'সোনাসাথী'। এরকম আরও অসংখ্য নদী ও ঝরণা ক্রমশ একসঙ্গে মিলিত হতে হতে সৃষ্টি করেছে যে নদীর তার স্থানীয় নাম 'দেওনদ'। হিন্দুদের যেমন গঙ্গা, খ্রিস্টানদের জর্ডন—ছোটনাগপুরের আদিবাসী উপজাতিদের চোখে এই নদীটিও তেমনি পবিত্র। হাজারিবাগ জেলায় পৌঁছে এর নাম হয়েছে দামোদর। নামটি কীভাবে এসেছে তাই নিয়েও নানারকম মত আছে। কেউ কেউ বলেন 'দাম' ও 'উদর' এই দুটি শব্দের সন্ধি করে নাম হয়েছে 'দামোদর'। গ্রীষ্মকালে নদীখাতে যখন জল প্রায় থাকে না, তখন গজিয়ে ওঠে অজস্র দাম বা জলজ

গ্রীষ্মের দামোদর অনায়াসে পার হয়ে যায় গরুর পাল

আগাছা। আবার তিরকি সাঁওতালদের চলিত ভাষায় 'দহ' ও 'মোদর'—অর্থাৎ 'জল' ও 'পাত্র'—এই দুটি শব্দ থেকে। এই অর্থে দামোদর হল 'জলপাত্র'। আবার অন্যান্য সাঁওতাল গোষ্ঠীর ভাষায় দামোদর হল 'জলের আবাস'।

দামোদরের অববাহিকা :

দামোদরের মোট অববাহিকার আয়তন ২৪, ২৩৫ বর্গ কিলোমিটার। এর দুই তৃতীয়াংশই পড়ে বিহারে, ছোটনাগপুর মালভূমিতে। নিম্নগতিতে পড়ে কেবলমাত্র এক তৃতীয়াংশে—বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলি জেলায়। দামোদরের গুরুত্বের অনেকখানিই উদ্ভূত হয়েছে এই অববাহিকা অঞ্চলের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের থেকে। উচ্চ অংশে দামোদর বইছে কঠিন সুপ্রাচীন শিলার ওপর দিয়ে, অসংখ্য পাহাড় ও টিলার মধ্যে দিয়ে। ফলে উৎসের কাছাকাছি দামোদরের খাত খুবই অসমান ও উঁচুনিচু, কোথাও কোথাও ছোটোখাটো জলপ্রপাত সৃষ্টি করে বয়ে চলেছে। পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে এই অংশে দামোদর ও তার উপনদীদের ঢাল বেশি, দুই পাড়ও নদীবক্ষ থেকে খাড়া উঠে গেছে। এখানে দামোদর উপত্যকা বেশ উঁচু, প্রায় ১৫৫ মিটার। উৎস থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে দামোদর নেমে এসেছে ৬৩০ মিটারে। প্রায় ছ' কিলোমিটার চলার পর এর উচ্চতা মাত্র ৫০০ মিটার, আর শ' দেড়েক কিলোমিটার পর উচ্চতা আরও কমে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২২৫ মিটারে।

উচ্চগতিতে দামোদরে এসে মিশেছে অজস্র ছোটোবড় নদী—হাহারো, জামুনিয়া, কাট্‌রি, খুদিয়া, উশ্রি, বেল পাহাড়ি প্রভৃতি। এদের বৈশিষ্ট্য হল এই যে এরা সকলেই পাহাড়ি, বর্ষার জলে পুষ্ট। ফলে বর্ষাকালে ছাড়া এদের খাতে জল প্রায় থাকেই না, শুকনো বালির ওপর দিয়ে হয়তো কোথাও কোথাও সামান্য জল এঁকেবেঁকে বয়ে চলে। কোনো কোনো নদী বইছে শক্ত ক্ষয় প্রতিরোধক শিলার ওপর দিয়ে, ফলে সৃষ্টি হয়েছে জলপ্রপাত ও খরস্রোত। এরকম এক সৌন্দর্যময় জায়গা হল রাজারাপ্পা, এর কাছেই আছে ছিন্নমস্তার মন্দির ও রামগড়। এখান থেকে কিছুদূর উত্তরমুখে বয়ে চলার পর বেরমোর কাছে দামোদরে মিশেছে বোকারো ও কোনার নদী। আরও বেশ কিছুটা চলার পর দিশেরগড়ের কাছে মিশেছে দামোদরের প্রধান উপনদী—বরাকর। এরপরেই দামোদর ঢুকে পড়ছে পশ্চিমবঙ্গে, আর বইতে শুরু করেছে পূর্বমুখে। এই অংশেই বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার সীমা নির্দেশ করছে দামোদর।

নিম্নগতিতে দামোদর বইছে পুরু পলিগঠিত প্রায় সমতল, ঢালবিহীন ভূমির ওপরে। এখানে পৌঁছে নদীরও ঢাল গেছে কমে। ফলে পাহাড় থেকে বয়ে আনা বালি ও পলিকে টানতে না পেরে নদী তাকে সঞ্চিত করছে খাতের উপরে, সৃষ্টি করছে চরের। এসব বালিচরের ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে বেণীর মতো বইছে দামোদর। বর্ষার প্রবল বন্যার সময়ে মাঝে মাঝেই নিজের খাত ছেড়ে দামোদর ছুটে যায় পাশের কৃষিখেতের ভেতরে। তৈরি করে নতুন নতুন চলার পথ, স্থানীয়ভাবে যার নাম 'হানা'।

আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল পেরিয়ে এসে দামোদর পৌঁছিয়েছে বর্ধমান শহরের দক্ষিণসীমায়। এর কুড়ি-পঁচিশ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে চাঁচাই গ্রামের কাছে দামোদর হঠাৎ সমকোণে বাঁক নিয়ে দক্ষিণে চলতে শুরু করেছে। এটাই দামোদরের তথাকথিত বদ্বীপের শীর্ষবিন্দু। এখানে রয়েছে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বয়ে চলা বেশ কয়েকটি নদী, যেগুলি অতীতে ছিল দামোদরেরই প্রাচীন খাত। কিন্তু আজ এদের সঙ্গে দামোদরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন। অনেকক্ষেত্রে নদীগুলোর উৎসমুখ অবস্থান করছে দামোদরের বর্তমান খাত থেকে কিছুটা দূরে, কোনো জলায়। সর্পিল গতিতে বাঁক সৃষ্টি করে, পুরু পলিস্তরে

দুর্গাপুর ব্যারেজ : উদ্দাম দামোদরকে বাঁধা হয়েছে বাঁধ দিয়ে

সংকীর্ণ ও গভীর খাত কেটে বয়ে শেষ অবধি তারা এসে মিশেছে হুগলি নদীতে। উত্তর থেকে দক্ষিণে ঘড়ির কাঁটার অনুসারে নদীগুলির নাম খড়ি, বাঁকা, বেহুলা, গাঙ্গুর, ধুসড়ি আর নয়াসেরাই শাখা। ভ্যান ডেন ব্রুকের আঁকা ১৬৬০ সালের ম্যাপে বাঁকাকে দেখা যায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি নদী হিসাবে। তখন মূল দামোদরের বেশ কিছুটা জল বইত বাঁকার খাত দিয়ে। এমনকি ১৭৮০ সালে প্রকাশিত পেরোঁ-র ম্যাপেও বাঁকাকে বছরের অধিকাংশ সময়েই নাব্য বলে দেখানো হয়েছে। হয়তো বর্ধমান শহরের সমৃদ্ধির পেছনেও এই নদীর অবদান অনেকখানি। আজকের বাঁকা জলের অভাবে মৃতপ্রায় এক বুজে আসা নদী, যার উৎসের সঙ্গে আর বিন্দুমাত্র যোগ নেই। সম্ভবত গত শতাব্দীতে রেলপথ ও সড়কপথের ব্যাপক প্রসার ঘটানোর সময়ে এদের স্বাভাবিক জলনিকাশ ব্যাহত হয়েছে। দামোদরের বন্যার উদ্বৃত্ত জল এসে এদের খাত পরিষ্কার করতো, কিন্তু এসব রেল ও রাজপথের উঁচু-উঁচু বাধা তাতে প্রতিবন্ধক হয়েছে।

আরও দক্ষিণের নিম্নগতিতে রয়েছে দক্ষিণ বা দক্ষিণপূর্বে প্রবাহিত অসংখ্য 'কানা' ও 'মজা' নদী—এগুলো দামোদরের শাখা নদী বা ডিস্ট্রিবিউটারি। এদের মধ্যে বেগুয়ার হানা দিয়ে মুণ্ডেশ্বরীর পথেই দামোদরের তিন-চতুর্থাংশ জল পৌঁছায় রূপনারায়ণে। এসব শাখানদীগুলোর আচার ব্যবহার উত্তরের খড়ি বা বাঁকা নদীর থেকে অন্যরকম। দামোদরের এই অসংখ্য পরিত্যক্ত খাত ও শাখানদীর মধ্যে মূল খাতটিকে খুঁজে বার করা মুশকিল। যে শাখাটি ফলতার কাছে হুগলিতে এসে পড়েছে তার মাধ্যমে বর্তমানে খুব কমই জলনিকাশ হয়। এই সব শাখানদীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঘিয়া, কানা নদী, কুন্তী, কানা দামোদর, রাণা বাঁধ খাল, কানা খাল (শেষের দুটি মিলে তৈরি করেছে মাদারিয়া খাল), কেদো খাল প্রভৃতি। এই নদীগুলোর নাম ও উৎপত্তি নিয়েও আলোচনার শেষ নেই। কারুর কারুর মতে এগুলি আসলে সেচের সুবিধার জন্য মূল দামোদরের গতিপথ বদলিয়ে কাটা খাল। তাঁরা বলেন, 'কানা' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'canal' থেকে। তবে ভৌগোলিকেরা মনে করেন এসব নদী দামোদরের ছেড়ে আসা পুরনো খাত ছাড়া আর কিছুই নয়। হানা-পথে দামোদর এমনি অজস্রবার খাত বদলেছে—আর ফেলে গেছে অসংখ্য মজা ও কানা নদী। এখানে 'কানা' শব্দটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। প্রচলিত অর্থে কানা হল যার একটি চোখ নেই। কানা গলির যেমন একপ্রান্ত বন্ধ, কানা নদীরও তেমন এক দিকের খাত বুজে গেছে। পুরনো ম্যাপ ও বিবরণ থেকে জানা যায় এককালে এসব খাত ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ, সক্রিয় নদী। অতিরিক্ত পলিসঞ্চয়ের ফলে এদের খাতগুলো আর জল ধরে রাখতে পারে না। বছরের পর বছর ধরে পলি ও বালি জমে জমে এদের খাতগুলো হয়ে উঠেছে ভরাট, আর নদীর খেয়ালি গতি পরিবর্তনের ফলে তাতে

যথেষ্ট পরিমাণে জলেরও অভাব ঘটেছে। ফলে নদীগুলো মৃতপ্রায়, কোনো মতে ধুঁকছে। আবার একথাও সত্যি যে এদের মধ্যে দু'একটি নদীর খাতে সারা বছরই কিছু না কিছু জল থাকে। যেমন, কুন্তী নদী ইডেন খাল থেকে পাওয়া জলে প্রতিবছরই ধুয়ে যায়।

নিম্নগতিতে পৌঁছে দামোদর পরিণত হয়েছে এক চওড়া, ধীরবহ, বদ্বীপীয় নদীতে। জায়গায় জায়গায় বন্যার আক্রমণ ঠেকাতে নদীর দু তীরে গড়ে তোলা হয়েছে কৃত্রিম পাড়। এই সব পাড়গুলো বন্যার জলকে দুই পাশের সমৃদ্ধিশালী গ্রামাঞ্চল ও চাষের ক্ষেতে ঢুকতে বাধা দিয়ে যেমন একদিকে উপকার করেছে, অন্যদিকে পলিযুক্ত জলকে খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পলিসঞ্চয়ের কারণ ঘটিয়ে তেমন পরোক্ষ অপকারও করেছে। ফলে নদীর স্বাভাবিক জীবনচক্র ব্যাহত হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় নদীবক্ষ হয়ে উঠেছে আশপাশের জমি থেকেও উঁচু। আবার চড়াপড়া নদীখাতের মধ্যে মধ্যে রয়েছে অল্প একটু গভীর জলে ভরা 'দহ'। নিম্ন দামোদরের খাতে এরকম দহ অজস্র দেখা যায়। এগুলোর আবার স্থানীয় নামও রয়েছে, যেমন বিশালাক্ষীদহ। সাধারণভাবে হুগলি জেলার আমতা পর্যন্ত দামোদর ও তার নানা শাখায় জোয়ার ভাঁটার প্রাধান্য খুবই বেশি।

দামোদর বদ্বীপ

এর আগে বলেছি যে দামোদর সৃষ্টি করেছে এক 'তথাকথিত' বদ্বীপ। এখন দেখা যাক প্রকৃত ভৌগোলিক অর্থে দামোদর সত্যিই বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে কি না।

ভৌগোলিকেরা সাধারণত 'বদ্বীপ' আখ্যা দেন নদীসঞ্চিত পলি দিয়ে গঠিত এমন এক তিনকোণা ভূমিখণ্ডকে যার এক প্রান্তে রয়েছে সমুদ্র বা হ্রদ, অন্যান্য প্রান্তে শাখা নদী। মূল নদীটি যেখান থেকে ভাগ হতে শুরু করে, তা হল বদ্বীপের শীর্ষবিন্দু বা অ্যাপেকস। এই সংজ্ঞা অনুসারে গঙ্গা বা নীল নদের বদ্বীপের থেকে কিছুটা পৃথক দামোদরের বদ্বীপ। প্রথমত দামোদর সোজাসুজি সমুদ্রে এসে পড়েনি, পড়েছে নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে রূপনারায়ণ বা হুগলি নদীতে। এই নদীগুলোতে জোয়ার-ভাঁটা খেললেও মূলত তার জন্যেই বদ্বীপের সৃষ্টি হয়নি। দামোদরের বদ্বীপ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অনেকটা আগেই, এমন এক জায়গায় যেখানে পাহাড় থেকে ক্ষয় করে আনা বোঝা বইতে না পেরে নদী সেই ভার নামিয়ে দিচ্ছে। খাতের গভীরতা ও জলধারণের ক্ষমতা কমে গেলে নদী দুই পাড় ভেঙে অসংখ্য শাখায় সমভূমিতে নেমে আসছে। এরই ফলে নদী এক বদ্বীপের আকার ধারণ করছে। অর্থাৎ খাড়াপাড় শেষ হওয়া, এবং সমতলে নামার সঙ্গে সঙ্গে দামোদরের বদ্বীপ গঠনের কাজ শুরু হচ্ছে। হুগলি নদী যেন এখানে সমুদ্র মুখ হিসাবে কাজ করছে। এসব কারণে দামোদরের বদ্বীপকে এক 'অভ্যন্তরীণ বদ্বীপ (ইনল্যাণ্ড ডেল্টা) বলা যায়। বর্ধমানের শীর্ষবিন্দু থেকে উত্তরে কালনা এবং দক্ষিণে গেঁওখালি পর্যন্ত এই বদ্বীপ বিস্তৃত। সপ্তদশ শতাব্দীতেও দামোদরের প্রধান গতিপথ ছিল কালনার পাশের শাখা দিয়ে, অথচ বর্তমানে দামোদরের মূল শাখাটি এসে পড়েছে দক্ষিণে, রূপনারায়ণে।

গত দু'এক শতাব্দী যাবৎ মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে দামোদরের বদ্বীপ সৃষ্টির স্বাভাবিক কাজ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। এর দুই ধারের কৃত্রিম পাড়গুলো নদীর বাড়তি জলকে উপচে পড়তে দেয় না—ফলে বাঁকা, খড়ি, কানা প্রভৃতি শাখা নদী তাদের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দামোদরের অধিকাংশ জল প্রবাহিত হচ্ছে মুণ্ডেশ্বরীর মধ্যে দিয়ে—খাতে এসে পড়ছে দামোদরের দক্ষিনাংশের জলও। এর ওপর ডি ভি সির বাঁধগুলো জলের পরিমাণই কমিয়ে দিচ্ছে ফলে ভবিষ্যতেও দামোদর বেওয়া হানার নীচে স্থায়ী খাত সৃষ্টি করবে, যদি না জোয়ারের তাড়নায় শাখাটি আলাদা আলাদা খাতে ভাগ হয়ে যায়।

দামোদরের বন্যা

দামোদর কুখ্যাতি লাভ করেছে তার বিধ্বংসী বন্যার জন্যে। হতে পারে যে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী, জনপদপূর্ণ ও ঘনবসতিযুক্ত অঞ্চল বলে, এবং কিছুটা কোলকাতার নৈকট্যের কারণেও, এই বন্যার তীব্রতা যেন বহুগুণে বর্ধিত হয়ে লোকের চোখে ধরা পড়েছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ এই মতও প্রকাশ করেছেন যে সব ব্যাপারটাই খবর কাগজের বাড়ানো, অর্থাৎ 'মিডিয়া হাইপ'। কিন্তু এ বোধহয় একান্তই একপেশে মতামত

কারণ তাহলে আমাদের আলোচনা করতে হয় ভূগোলের কতকগুলো মূল প্রশ্ন নিয়ে—বন্যা কি, তাকে আদৌ প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলবো কি না—ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যি কথা বলতে কি, এসব প্রশ্নের সর্বজনীন উত্তর আজও কেউ দিতে পারেন নি। তাই এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। তবে মানতেই হবে যে ১৮২৩, '৪৮, '৫৬, '৫৯, '৬৩, '৮২, '৯০, '৯৮ এবং ১৯০১, '০৫, '০৭, '১৩, '১৬, '২৩, '৩৫ ও '৪৩ সালের বন্যাগুলোতে দামোদর মারাত্মক রকমের ক্ষতিসাধন করেছিল। আমাদের মূল প্রশ্ন হচ্ছে কেবল দামোদরেই এত বন্যা হয় কেন?

এর উত্তর পাওয়া যাবে দামোদর অববাহিকার কতকগুলো ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। প্রকৃতির আশ্চর্য খেয়ালে এই অববাহিকা দু'টি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত—উচ্চ ও নিম্ন। উচ্চ অববাহিকার আয়তন অনেক বড়, মোটের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। উচ্চ অববাহিকার ভূপ্রকৃতিও অসমতল, যেখানে পাহাড়ী নদীগুলো মালভূমির খাড়া ঢালে প্রবল স্রোতের বেগে নেমে আসছে। অপরপক্ষে দামোদরের নিম্ন অংশ আয়তনে ছোটো, এই সমতলভূমিতে নদীগুলোর ঢাল কম, ফলে স্রোতোবেগও কম। কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত ছোট অংশ দিয়েই নিষ্কাশিত হচ্ছে পুরো উচ্চ অববাহিকার জল।

এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের ধরন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সারাবছরের মোট বৃষ্টির প্রায় নব্বই শতাংশই ঘটছে জুন থেকে সেপ্টেম্বরের কয়েকটি মাসের মধ্যে। এই মৌসুমী বৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হল এই যে তা পরপর কয়েকটি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আকারে আসতে থাকে। এই ঘূর্ণিঝড়গুলো সাধারণত দিন দুয়েক, আবার কখনও কখনও চার পাঁচদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এক বা দু'দিনের বৃষ্টিতে বন্যা হবার মত জল সঞ্চিত না হলেও, তিন-চার দিনের একটানা বৃষ্টি মাঝারি ধরনের বন্যা ঘটাতে পারে। আর যদি বৃষ্টির পরিমাণ বেশি এবং চার-পাঁচ দিন একটানা ঘটে তবে মারাত্মক রকমের বন্যা হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন যে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে বয়ে চলা দামোদরের পতিপথ অধিকাংশ মৌসুমী ঘূর্ণিঝড়ের সমান্তরাল, কিন্তু ঠিক বিপরীতে। এটাই সমস্যার অন্যতম প্রধান উৎসব। ঘূর্ণিঝড়গুলো এসে প্রথমেই বৃষ্টি ঘটাচ্ছে নিম্ন দামোদর অববাহিকায় যেখানে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নদীগুলো ফুলে-ফেঁপে উঠছে। কিন্তু জমির ঢাল কম বলে এই জল চট করে সরছে না, নদীখাতেই বয়ে যাচ্ছে। নিম্ন অববাহিকায় বৃষ্টি ঘটানোর পর ঘূর্ণিঝড়গুলো উত্তর পশ্চিমে সরে গিয়ে বৃহত্তর উচ্চ অববাহিকায় বৃষ্টি ঘটাচ্ছে। এই অংশের ঢাল অনেক বেশি, সেজন্যে বিশাল এক অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ বৃষ্টির জল দামোদরের উপনদীগুলোর মাধ্যমে নীচের অংশে নেমে আসছে। এর ফলে নিম্ন অংশের অতিরিক্ত জল সরার আগেই উচ্চ অংশের জল এসে পড়ছে, সুতরাং বন্যার তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে বহুগুণে।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে দামোদরের বন্যা শুধু অবশ্যম্ভাবীই নয়, অপরিহার্যও, তাঁরা বলেন দামোদরের বন্যার জল ভাগীরথী হুগলী নদীর পলি স্বাভাবিকভাবে সরায়, এ কারণে এই বন্যা বিশেষ উপকারী। তাঁরা দামোদর উপত্যকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রকল্পের বিষয়েই সন্দেহবাচক মতামত পোষণ করেন: তাঁদের মতে কোলকাতা বন্দরের অধঃপতনের অন্যতম কারণ হল দামোদর প্রভৃতি পশ্চিমের মালভূমি থেকে নেমে-আসা নদনদীর ওপরের বাঁধগুলো।

নিম্ন দামোদর অববাহিকার বন্যার আর একটি দিক হল এই যে, উচ্চ অংশে ছাড়াও শুধু নিম্ন অংশেই যদি ঘূর্ণিঝড়ের ফলে প্রবল বৃষ্টি হয়, তাহলেও বন্যা ঘটতে পারে। কখনো কখনো ঘূর্ণিঝড়গুলো আসে খুব দ্রুত, একের পর এক। সেক্ষেত্রে দামোদর ও তার শাখানদীগুলোয় প্রতি সেকেন্ডে ৫০,০০০ ঘনফুটের বেশি জল বেরোনোর অবস্থা হলেই বন্যা সৃষ্টি হয়। এরকম বৃষ্টি উচ্চ অববাহিকাতেও হতে থাকলে বাঁধগুলো বিপন্ন হয়ে পড়ে। এদেরকে বাঁচাতে তখন নিম্ন অংশে বন্যার প্রাবল্য না কমা সত্ত্বেও জলাধারগুলো থেকে জল ছেড়ে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে নিম্ন দামোদর অববাহিকার বন্যা হয়ে ওঠে এক অর্থে মানুষের সৃষ্টি।

দামোদর উপত্যকা প্রকল্প

আবার একথাও সত্যি যে আগের মত ঘন ঘন এবং প্রবল বন্যা দামোদরে তেমন আর দেখা যায় না। দামোদর এখন আর তেমন বিধ্বংসী রূপ নিয়ে দেখা দেয় না, একসময়ের বাঁধনহারা এই নদ আজ অনেকটাই শান্ত। সমস্ত অববাহিকায় এখন কল্যাণ ও উন্নতির স্মারকচিহ্ন রূপে দামোদরের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। এ সব কিছুই সম্ভব হয়েছে 'দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন' (সংক্ষেপে ডি ভি সি)-এর সার্থক রূপায়ণের ফলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। সেই সময়ে ১৯৪৩ সালে, কোলকাতা ছিল মিত্র শক্তির দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান ঘাঁটি। সে বছর খেয়ালি মৌসুমী বাতাসের একটানা বর্ষণে দামোদরের জল ফুলে-ফেঁপে উঠে নদীর পাড়ে ভাঙন ধরালো। প্রবল বেগে জলের স্রোত ছুটে গিয়ে ভেঙে দিল জি টি রোড, গলিয়ে দিল পূর্ব রেলওয়ের লাইনের তলার উঁচু মাটির পাড়। ক্ষয়ক্ষতি যা হবার তা তো হলই, কিন্তু গোটা পৃথিবীর থেকে কোলকাতা শহর বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল বেশ কয়েকদিনের জন্যে। স্বভাবতঃই এই নিয়ে সোরগোল উঠলো—এই সর্বনাশা

দামোদরের নিম্নপ্রবাহ
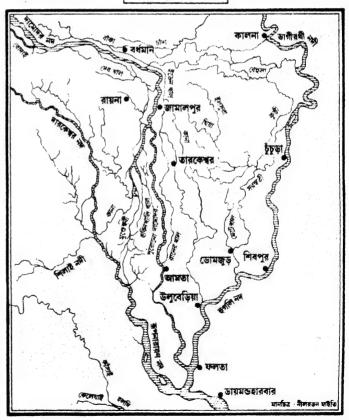
দামোদরকে যে কোনো উপায়ে বাঁধতেই হবে। গঠিত হল দশ সদস্যবিশিষ্ট এক টেকনিক্যাল কমিটি। নানান আলাপ আলোচনার পর কমিটির সদস্যরা রায় দিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'টেনিসি ভ্যালি অথরিটি'-র অনুসরণে দামোদর উপত্যকার জন্যেও একটি বহুমুখী প্রকল্প গড়ে তুলতে হবে। সেইমত তৎকালীন সরকারের ভাইসরয়, লর্ড ওয়াভেল ডেকে আনলেন টেনিসি ভ্যালির অন্যতম প্রধান রূপকার, ইঞ্জিনিয়ার ডবলিউ এল ভুরডুইন সাহেবকে। ১৯৪৬ সালে তিনি দাখিল করলেন 'দামোদর উপত্যকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কার্যপ্রস্তাব'। এরপর বাকিটুকু আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। ১৯৪৮ সালের সাতই জুলাই সংসদের এক আইনের মাধ্যমে সৃষ্টি হল 'দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন'। বলা হল, এর দায়িত্বভার সমানভাবে বইবে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকার।

দামোদরকে বাঁধার প্রস্তাব কিন্তু এই প্রথম ওঠে নি। ১৭৩০ সালের পর থেকেই নানান উপায়ে দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে। ১৮৬৪ সালে লেফটেনান্ট গার্নস্ট এবং ১৮৬৬ সালে লেফটেনান্ট হয়ওয়ার্ড চেষ্টা করেছিলেন দামোদরের ওপরে একটি জলাধার নির্মাণের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের। ১৯০২ সালে সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার অন স্পেশাল ডিউটি মিঃ হর্ন সুপারিশ করেন দামোদরের সঙ্গে মিলনের ঠিক আগে বরাকর নদীর ওপরে একটা জলাধার নির্মাণের। হয়তো বা এটিই ছিল পরবর্তীকালের মাইথন জলাধারের পূর্বাভাস। ১৯১৩ সালের বন্যার পরে মিঃ অ্যাডাম উইলিয়াম প্রস্তাব করেন এই সঙ্গে বরাকরের উচ্চগতিতে আরও একটি জলাধার নির্মাণের (সম্ভবত বর্তমানের তিলাইয়া বাঁধের কাছাকাছি কোথাও) ১৯১৮-১৯ সালে মিঃ গ্লাস সুপারিশ করেন দামোদরের ওপরে পারজোরি, বরাকরের ওপরে পালকিয়া, এবং উশ্রির ওপরে চিত্র—এই তিনটে জায়গায় বাঁধ দেবার।

ভুরডুইনের মূল পরিকল্পনায় আটটা জলাধার ও বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব ছিল—বরাকরের ওপরে তিলাইয়া, দেওলহরি (বলপাহাড়ি) ও মাইথনে, দামোদরের ওপরে আইয়ার, সোনোলাপুর (পাঞ্চেতের কাছে) ও বেরমোতে, বোকারো নদীর ওপরে বোকারোতে, এবং কোনার নদীর ওপরে কোনারে। এই সব কটা জলাধারে ধরে রাখা সম্ভব হত এক বিপুল পরিমাণ বন্যার জল—যা দিয়ে আটকানো যেত নিম্ন অববাহিকার বন্যা, সৃষ্টি করা যেত প্রচুর বিদ্যুৎ এবং খালগুলোর মাধ্যমে শুখা মরশুমে চাষের ক্ষেতে পাঠানো যেত প্রচুর জল।

ভাগ্যের পরিহাস এমনই, যে শুরু থেকেই ডি ভি সির তিন অংশীদার সরকারে টানাপোড়েনের এক খেলা শুরু হল মূলধনের যোগান দেওয়া নিয়ে। উপযুক্ত পরিমাণ মূলধনের অভাবে গড়ে তোলা • হল মাত্র চারটে বাঁধ ও জলাধার—তিলাইয়া, মাইথন, পাঞ্চেত (সোনোলাপুরের বদলে)এবং কোনার। পরবর্তীকালে বিহার সরকার নিজেই নির্মাণ করলেন আর একটি জলাধার—তেনুঘাট, প্রধানত বোকারো ইস্পাত কেন্দ্রে জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে। এই বাঁধ থেকে সেচ, জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন বা বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা নেই। এখন আবার কথা হচ্ছে বলপাহাড়িতে আরও একটি জলাধার নির্মাণের। এসব বাঁধ ও জলাধার তৈরির ফলে নিম্ন অববাহিকার বন্যা পুরোপুরি বন্ধ না হলেও, তাঁর তীব্রতা ও সংখ্যা যে বেশ কিছুটা কমেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ডি ভি সি-র সেচ খালগুলোর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার প্রায় ৬ লক্ষ হেকটর জমিতে সেচের জল পৌঁছে দিচ্ছে এরা। এরাই সম্ভব করেছে নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে দুই বা ততোধিকবার ফসল ফলানো, ফুটিয়ে তুলেছে চাষীর মুখে হাসি।

আজ পর্যন্ত ডি ভি সি খরচ করেছে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে মোট প্রায় ৮২৮ কোটি টাকা, সেচের ব্যবস্থায় ৬৭ কোটি এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে ২১ কোটি টাকা। এর মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অংশই বেশি। আজ এই ডি ভি সি হয়ে উঠেছে কর্মসংস্থানের এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। এখানে কর্মরত অফিসার ও নানান ধরনের কর্মচারিদের মোট সংখ্যা প্রায় সতেরো হাজার। কিন্তু দুঃখের বিষয় ডি ভি সি তার উদ্দেশ্য থেকে অনেকটাই সরে এসেছে। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করছে বটে। কিন্তু তার অধিকাংশই তাপবিদ্যুৎশক্তি। অথচ ডি ভি সি-র মূল অ্যাক্টে একথা পরিষ্কার বলা আছে যে এর অঞ্চলের মধ্যে কোনোরকম তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন চলবে না। অথচ ডি ভি সি স্থাপনের কিছুদিনের মধ্যেই বিহার সরকার স্থাপন করেন পত্রাতু, চন্দ্রপুরা ও দুর্গাপুরে ডি ভি সি নিজেই গড়ে তোলে দুটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, দুর্গাপুর ও ব্যাণ্ডেলে আরও দুটি আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে। জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে কেবলমাত্র তিলাইয়া, পাঞ্চেত ও মাইথনে। এদের মধ্যে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টা জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যয় সর্বনিম্ন পাঞ্চেতে—মাত্র ১০·৪৬ পয়সা, তিলাইয়ায় সর্বোচ্চ—৩১·৭২ পয়সা। তা সত্ত্বেও বলাই বাহুল্য, তাপবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যয়ের চেয়ে এ অনেক কম। অথচ সেই গোড়া থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে ডি ভি সি জলবিদ্যুতের তুলনায় তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে বেশি মনোযোগী। গত বছরে ডি ভি সি উৎপন্ন করেছে ৬০৫৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা তাপবিদ্যুৎ। অথচ মাত্র ৪০৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা জলবিদ্যুৎ। ডি ভি সি-র বিদ্যুতের প্রধান ক্রেতা বিহার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, বোকারো ইস্পাত কেন্দ্র, টাটা লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, সি ই এস সি, দিশেরগড় বিদ্যুৎ কোম্পানি, ও রেলওয়েজ।

বর্তমানে ডি ভি সি-র অন্যতম প্রধান সমস্যা উচ্চ অববাহিকা অঞ্চলে ব্যাপক অরণ্যনিধনের ফলে যে বিপুল ভূমিক্ষয় শুরু হয়েছে তার মোকাবিলা করা। ভূমিক্ষয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে জলাধারগুলোতে—এদের আয়ু কমে আসছে দ্রুত। ডি ভি সি এই ভূমিক্ষয় রোধে সঠিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণে সজাগ হয়ে উঠেছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে দামোদর উপত্যকা হয়ে উঠবে ভারতের অন্যতম উন্নত অঞ্চল। ■

দামোদরের খালগুলি এনেছে কৃষিক্ষেত্রে প্রাণের সাড়া

উনিশশো পঁয়তাল্লিশের ৬ অগাস্ট হিরোসিমায় যে বোমাটি নিক্ষেপ করা হয়, তার নাম 'লিট্‌ল বয়' ।এতে ছিল ৬০ কিলোগ্রামের মত ইউরেনিয়াম-২৩৫ । এই ৬০ কিলোগ্রামের মাত্র ৭০০ গ্রাম পারমাণবিক বিভাজনের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটায় । 'লিটল বয়'-এর বিস্ফোরণ ক্ষমতা ছিল ১২৫০০ টন 'টি এন টি' বা ট্রাইনাইট্রোটল্যুইনের বিস্ফোরণ ক্ষমতার সমান । এই ঘটনার মাত্র তিনদিন পর, ৯ অগাস্ট, নাগাসাকি শহরের উপর নিক্ষেপ করা হয় আরো একটি পরমাণু বোমা । নাম 'ফ্যাট ম্যান' । এতে ব্যবহার করা হয়েছিল ২০ কিলোগ্রামের মত প্লুটোনিয়াম-২৩৯ । এ ক্ষেত্রেও দেখা যায়, ওই পারমাণবিক বিস্ফোরক প্লুটোনিয়াম-২৩৯-এর সবটাই বিভাজিত হয়নি । বিভাজিত হয়েছিল মাত্র ১·৩ কিলোগ্রাম । কিন্তু ওই সামান্য প্লুটোনিয়াম-২৩৯ সেদিন সৃষ্টি করেছিল ২২০০০ টন 'টি এন টি'র সমতুল্য বিস্ফোরণ শক্তি । বলা বাহুল্য, 'লিটল বয়' এবং 'ফ্যাট ম্যান' দুটিই 'বিভাজন বোমা' । ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'ফিশন বোম' (fission bomb) । দুটি ক্ষেত্রেই নিউট্রন কণার আঘাতে ইউরেনিয়াম-২৩৫ এবং প্লুটোনিয়াম-২৩৯ পরমাণু বিভাজিত হয়ে সৃষ্টি করে নানারকম আইসোটোপ । এবং ওই সময় নির্গত হয় প্রচণ্ড পরিমাণ তাপশক্তি । এক্স-রশ্মি, গামা-রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি এবং তেজস্ক্রিয় পারমাণবিক কণা । ফিশন বোমাকে বলা হয় প্রথম প্রজন্মের পরমাণু বোমা ।

নাগাসাকির পর তৈরি করা হয় আর এক ধরনের বোমা—হাইড্রোজেন বোমা । এ ক্ষেত্রে পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্যে কাজে লাগান হয় সংযোজন (fusion) পদ্ধতি । চরিত্রে এই পদ্ধতিটি ফিশন বা বিভাজন পদ্ধতির বিপরীত । ফিশন পদ্ধতিতে পরমাণু ভেঙে দেওয়া হয় । আর সংযোজন পদ্ধতিতে ঘটান হয় একাধিক পরমাণুর মিলন । বলা অনাবশ্যক, এই মিলন ঘটানর জন্যে দরকার প্রচণ্ড উত্তাপ । এ ক্ষেত্রে সেই উত্তাপের জন্যে কাজে লাগান হয় ইউরেনিয়াম-২৩৫ অথবা প্লুটোনিয়াম-২৩৯-এর বিভাজন । এর ফলে যে তাপ সৃষ্ট হয়, তার সাহায্যে এবং প্রচণ্ড চাপে হাইড্রোজেনের ভারী আইসোটোপ ডয়টেরিয়াম এবং ট্রিটিয়াম পরমাণু পরস্পর মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে হিলিয়াম পরমাণু । এই মিলনকেই বলা হয় পারমাণবিক সংযোজন । সংযোজনের সময় সৃষ্ট হয় প্রচণ্ড পরিমাণ তাপশক্তি । এই তাপশক্তিও সংযোজন ঘটাতে সাহায্য করে । বিস্ফোরণ শক্তির জন্যে হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় বলেই এ ধরনের বোমাকে বলা হয় হাইড্রোজেন বোমা । পরে এ ধরনের বোমার কিছুটা সংস্কারও করা হয় । দেখা যায় সংযোজন-অস্ত্রকে যদি ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর আবরণে ঢেকে দেওয়া হয়, তখন সংযোজন পদ্ধতিতে উৎপন্ন প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন নিউট্রন কণা অতিরিক্ত সেই ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর স্তরে গিয়ে আঘাত করে । এর ফলে ইউরেনিয়াম-২৩৮ এর এক একটি নিউক্লিয়াস এক একটি নিউট্রন কণা দখল করে সৃষ্টি করে এক একটি প্লুটোনিয়াম-২৩৯ নিউক্লিয়াস । এই প্লুটোনিয়াম-২৩৯ বিভাজিত হয়ে সৃষ্টি করে অতিরিক্ত পরিমাণ শক্তি । পদ্ধতিটি কাজে লাগিয়ে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতা বহুগুণ বাড়ান সম্ভব হয়েছে । উল্লেখ্য, এ ধরনের বোমাকে বলা হয় 'fission-fusion-fission device' বা 'বিভাজন-সংযোজন-বিভাজন' বোমা । এই উদ্ভাবনা পারমাণবিক অস্ত্রের দ্বিতীয় প্রজন্মের সূচক । ১৯৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত দেশ এ নিয়ে নানা রকম পরীক্ষানিরীক্ষাও চালিয়েছে ।

এবার তৃতীয় প্রজন্মের সূচনা । পারমাণবিক অস্ত্রবিষয়ক গবেষণা এবং উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে ১৯৮০-র দশকে গবেষণা হয়েছে বিস্তর । এখনো চলছে । বিশেষজ্ঞরা এখন নতুন প্রজাতির পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছেন । এই অস্ত্রে ব্যবহার করা হবে বিশেষ বিশেষ আকারের পারমাণবিক বিস্ফোরক । বোমার ছকে প্রচুর হেরফেরও ঘটান হবে । ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে অন্যরকম । প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের পর তাদের

এক্স-রশ্মির সাহায্যে ধ্বংসলীলা
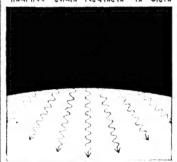
যাবতীয় বিকিরণ এবং আয়নকারী কণা অনিয়ন্ত্রিত ভাবে যেমন বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটবে না । পরিবর্তে বিস্ফোরণ-পদ্ধতির উপর থাকবে নিয়ন্ত্রণ । যেমন ধরুন, কোন অস্ত্র থেকে নির্গত হবে শুধুমাত্র বিকিরণ ; কোন অস্ত্র থেকে ধাতুর টুকরো অথবা ছররার মত গুলি । প্রয়োজন মত তাদের নিক্ষেপ করা হবে ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত কোন ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপক কেন্দ্রের উপর ; কখনো বা তাদের লক্ষ্য হবে আকাশে ধাবমান ক্ষেপণাস্ত্র, অথবা কোন সামরিক কৃত্রিম উপগ্রহ । অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াবে রাইফেলের মত । রাইফেলের গুলির লক্ষ্যস্থল যেমন নির্দিষ্ট থাকে, ঠিক তেমনি নতুন প্রজন্মের এই পারমাণবিক অস্ত্রেরও লক্ষ্য হবে নির্দিষ্ট । বিস্ফোরণ কেন্দ্রের আশপাশের বিস্তৃত অঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতি না ঘটিয়ে তাদের সাহায্যে সামরিক সাজসরঞ্জাম, অস্ত্র এবং সামরিক কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করাই হবে একমাত্র লক্ষ্য ।

চার রকম পারমাণবিক বিস্ফোরক

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন, তাঁরা আপাতত চার রকম পারমাণবিক বিস্ফোরকের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন সব চেয়ে বেশি । এগুলির মধ্যে তিনটিতে কাজে লাগান হবে বিভাজন পদ্ধতি । একটিতে সংযোজন পদ্ধতি । প্রথম তিনটির গঠন হবে এইরকম : (এক) এ ধরনের পরমাণু বোমার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে থাকবে ইউরেনিয়াম-২৩৫ অথবা প্লুটোনিয়াম-২৩৯ । তার চারপাশে রাসায়নিক বিস্ফোরকের আবরণ । সেই আবরণটি ঘিরে থাকবে আর একটি আবরণ । ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর তৈরি । বিশেষ পদ্ধতিতে বোমার রাসায়নিক বিস্ফোরকে বিস্ফোরণ ঘটান হবে । সেই বিস্ফোরণ এক মাইক্রো সেকেন্ডের (বা এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের) মধ্যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে । সেই চাপে কেন্দ্রস্থিত খণ্ড খণ্ড ইউরেনিয়াম-২৩৫ বা প্লুটোনিয়াম-২৩৯ পরস্পর সরে এসে জমাট অবস্থায় কেন্দ্রীভূত হবে । মুহূর্তে শুরু হবে পারমাণবিক বিভাজন । বিভাজনের সময় সৃষ্ট নিউট্রন কণা ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর আবরণের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তাকে রূপান্তরিত করবে প্লুটোনিয়াম-২৩৯-এ । অতঃপর প্লুটোনিয়াম-২৩৯-এ ঘটবে বিভাজন (a) । (দুই)

ধ্বংস করা হবে সামরিক কৃত্রিম উপগ্রহ

এ ক্ষেত্রে বোমার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে থাকবে কিছু পরিমাণ হাইড্রোজেনের আইসোটোপ—ডয়টেরিয়াম এবং ট্রিটিয়াম । বাকি অংশটি হবে আগের বোমারই মত । ইউরেনিয়াম-২৩৫ অথবা প্লুটোনিয়াম-২৩৯-এর বিভাজন চলা কালে উৎপন্ন হয় প্রচণ্ড পরিমাণ উত্তাপ শক্তি । তাপমাত্রা ওঠে কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও উপরে । এই তাপমাত্রায় ডয়টেরিয়াম এবং ট্রিটিয়াম নিউক্লিয়াস সংযোজিত হয় । সৃষ্টি করে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এবং প্রচুর পরিমাণ উত্তাপ এবং নানা রকম বিকিরণ শক্তি, নিউট্রন কণা, প্রভৃতি । অতিরিক্ত এই নিউট্রন কণা ত্বরান্বিত করে পারমাণবিক বিভাজন (b) । (তিন) এ ধরনের বোমার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে থাকবে লিথিয়াম ডয়টেরাইড তার বহিরাংশটি ঢাকা থাকবে ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর আবরণে । নিউট্রন কণার বিকিরণে লিথিয়াম ডয়টেরাইড থেকে সৃষ্ট হয় ট্রিটিয়াম । এই বোমার ভেতরের অংশে পারমাণবিক বিভাজন ঘটিয়ে সৃষ্টি করা হয় প্রচণ্ড উত্তাপ । সেই উত্তাপে চলে ট্রিটিয়াম নিউক্লিয়াসের সংযোজন । সংযোজনের ফলে সৃষ্ট হয় প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি এবং নিউট্রন কণা ।
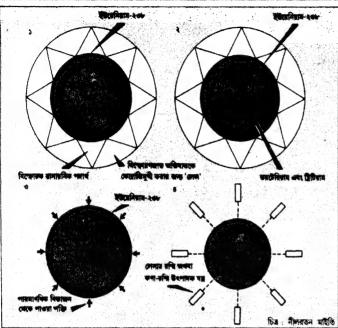
চার রকমের পরমাণু বোমা

আগের বোমাগুলির মত এ ক্ষেত্রেও নিউট্রন কণা ইউরেনিয়াম-২৩৮-কে প্লুটোনিয়াম-২৩৯-এ রূপান্তরিত করে বিভাজন ঘটায়। এ ধরনের বোমার বিস্ফোরণ-ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি (c)। (চার) এটিকে বলা চলে আদর্শ সংযোজন বোমা। এই বোমায় থাকবে হাইড্রোজেনের আইসোটোপ। লেজার, ইলেকট্রন অথবা আয়ন রশ্মির সাহায্যে সৃষ্টি করা হবে প্রচণ্ড তাপশক্তি। সেই তাপশক্তির প্রভাবে হাইড্রোজেনের আইসোটোপ সংযোজিত হয়ে সৃষ্টি করবে প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি এবং নিউট্রন কণা (d)।

বোমার ডিজাইনেই যে শুধু বৈচিত্র্য আনা হয়েছে, তা নয়। সেই সঙ্গে বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতারও উন্নতি ঘটান হয়েছে। গোড়ায় যে ধরনের বোমা নিয়ে পরীক্ষা চালান হয় সেই সব বোমার প্রতি কিলোগ্রামের বিস্ফোরণ ক্ষমতা ছিল অনেক কম। সংযোজন বোমার ক্ষেত্রে এখন তা এসে দাঁড়িয়েছে প্রতি কিলোগ্রামে ০·০০০৫ থেকে ০·১ কিলোটনের মত। এক কিলোটন বিস্ফোরণ ক্ষমতা বলতে ১০০০ টন 'টি এন টি'র বিস্ফোরণ ক্ষমতাকে বোঝায়। তাপ সংযোজন বোমার ক্ষেত্রে এই বিস্ফোরণ ক্ষমতা অবশ্য অনেক বেশি। প্রতি কিলোগ্রামে ৬ কিলোটনের মত। তবে মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মতে, তত্ত্বের দিক থেকে বিভাজন এবং সংযোজন বোমার বিস্ফোরণক্ষমতা যথাক্রমে ১৭ এবং ৫০ কিলোটন হওয়ার কথা।

নতুন পরিকল্পনা

বিস্ফোরণের মুহূর্তেই পারমাণবিক বোমা থেকে নির্গত হয় অকল্পনীয় পরিমাণ শক্তি। মুখ্যত উত্তাপ। ফলে বিস্ফোরণ-মুহূর্তে পুরো অস্ত্রটিই বাষ্পীভূত এবং আয়নিত হয়ে যায়। সৃষ্ট হয় প্লাজমা। অর্থাৎ বিশেষ এক ধরনের গ্যাস। যার উপাদান পজিটিভ আধান সমন্বিত আয়ন এবং নিগেটিভ আধান সমন্বিত ইলেকট্রন কণা। এ ছাড়াও সংযোজন এবং বিভাজনের সময় উপজাত উপাদান হিসেবে নির্গত হয় প্রচুর পরিমাণ গামা-রশ্মি এবং নিউট্রন কণা। পারমাণবিক বিস্ফোরণের অব্যবহিতকাল পর যে তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়, সেই তাপমাত্রায় প্লাজমা থেকে বিকীর্ণ হয় একস-রশ্মি। বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে দেখেছেন, বিস্ফোরণের এক মাইক্রোসেকেণ্ড পর নির্গত শক্তির ৭০ শতাংশই একস-রশ্মি হিসেবে প্রকাশ পায়। একস-রশ্মির পরিমাণ যত বাড়ে,

> *পৃথিবীব্যাপী 'শান্তি চাই' ধ্বনি উঠলেও পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে গবেষণা থেমে নেই। বিবর্তনের দুটি ধাপ পেরিয়ে পরমাণু-বোমা এখন তৃতীয় ধাপের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এর বিধ্বংসীক্ষমতা এখন আরো বেশি, আরো সুনিয়ন্ত্রিত।*

পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণজনিত অবশেষ এবং প্লাজমার গতিশক্তি সেই অনুপাতে কমে যায়। সংযোজন বোমার ক্ষেত্রে এর ফলে প্লাজমার গতি গিয়ে দাঁড়ায় সেকেণ্ডে ১০০০ কিলোমিটারের মত। বিস্ফোরণের এক সেকেণ্ড পর গামা-রশ্মির পরিমাণ দাঁড়ায় মোট বিস্ফোরণ শক্তির ৩·৫ শতাংশ।

বোমায় বিশেষ ধরনের বস্তু এবং ডিজাইন কাজে লাগিয়ে একস-রশ্মির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই ভাবে সংযোজন বোমা থেকে গামা-রশ্মির উৎপাদন বৃদ্ধিরও চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে একটি পদ্ধতির কথাও শোনা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, এই পদ্ধতিতে সংযোজন-বোমাটিকে বিশেষ এক ধরনের আইসোটোপের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হবে। বিস্ফোরণের দরুন নির্গত হবে প্রচুর পরিমাণ নিউট্রন কণা। সেই নিউট্রন কণা ওই চাদরে গিয়ে যখন আঘাত করবে সেখান থেকে নির্গত হবে প্রচুর পরিমাণ গামা-রশ্মি। বিশেষ ব্যবস্থাপনায় এই একস এবং গামা-রশ্মি নিক্ষেপ করা হবে লক্ষ্য-বস্তুর উপর। ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। এমন পরিকল্পনাও করা হচ্ছে, পরমাণু বোমার এক পাশে থাকবে ধাতব চাকতি। বিস্ফোরণের দরুন যে উত্তাপ সৃষ্ট হবে তার সাহায্যে সেই চাকতি গলে গিয়ে ফোয়ারার রূপ নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে আছড়ে পড়বে শত্রুপক্ষের ছাউনি, বিমানবন্দর অথবা প্রতিরক্ষামূলক গবেষণাগারের উপর। ব্যাপারটা দাঁড়াবে শক্তিশালী কামান থেকে ছররা ছোঁড়ার মত।

ধরা যাক, বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বাকাশে এমন এক জায়গায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটান হল, যা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে। ওই অবস্থায় প্লাজমার গ্যাস চৌম্বক রেখার সঙ্গে লম্ব বরাবর ধাবিত হবে এবং সেই সঙ্গে বিকৃত করবে ওই অঞ্চলের চৌম্বক ক্ষেত্র। এই অবস্থায় প্লাজমার গতিশক্তির একটি বড় রকম অংশ তড়িৎচৌম্বক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। সৃষ্টি করবে বিশেষ এক ধরনের 'বিকিরণ স্পন্দন' বা 'রেডিয়েশন পালস'; ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পালসও (E M P) বলা যায়। এ ধরনের স্পন্দন অন্যভাবেও সৃষ্টি হতে পারে। যেমন ধরুন, বিস্ফোরণের পর সৃষ্ট হয় গামা এবং একস-রশ্মি। এই রশ্মি ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুকণার সঙ্গে বিক্রিয়া করে বাতাসের গ্যাসীয় অণু থেকে মুক্ত করবে ইলেকট্রন। সেই ইলেকট্রন সেখানে সৃষ্টি করবে বিদ্যুৎ প্রবাহ। বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করবে ক্ষণস্থায়ী চৌম্বক ক্ষেত্র। তা থেকে সৃষ্ট হবে EMP'র মতই তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ। প্রযুক্তিগত কৌশল খাটিয়ে এ ধরনের বিকিরণকেও নিয়ন্ত্রণ করে শত্রুপক্ষের প্রতিরক্ষামূলক সাজসরঞ্জাম, অস্ত্র এবং ঘাঁটি ধ্বংসের কথাও ভাবা হচ্ছে।

উদ্যোগের পূর্ণ বিবরণ জানা অবশ্য সম্ভব নয়। তবে রকম দেখে মনে হয়, যে ভাবে পারমাণবিক অস্ত্র প্রস্তুতির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তাতে আগামী দিনের পারমাণবিক যুদ্ধ হবে আরো ব্যাপক, আরো ধ্বংসাত্মক।

স্থির পরমাণু

সাধারণ অবস্থায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পরমাণুই এক অস্থির, গতিশীল অবস্থায় বিরাজ করে। কঠিন যে বস্তু তার পরমাণুও গতিশীল। গতির পরিমাণ অবশ্য কম। তরল অবস্থায় পরমাণুর গতি বৃদ্ধি পায়। গ্যাসীয় অবস্থায় আরো বাড়ে। মুখ্যত উত্তাপ শক্তিই এই গতির কারণ বলে এই গতিকে বলা হয় পরমাণুর তাপীয় গতি (thermal velocity). সাধারণ তাপমাত্রায় (room temperature) সোডিয়ামের ক্ষেত্রে এই গতি গিয়ে দাঁড়ায় সেকেণ্ডে ৫০০ মিটার। মজার ব্যাপার এই, বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু নিয়ে হাজারো পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালেও একটি ব্যাপারে কিন্তু কোন দিনই তাঁরা সফল হতে পারেননি। সেটা হল পরমাণুকে গতিহীন করে তোলা। তাপমাত্রা কমালে পরমাণুর গতি কমে। কিন্তু দেখা গেছে, নিম্নতম তাপমাত্রাতেও তা কিছুটা গতিশীল থেকেই যায়, পুরোপুরি স্থির অবস্থায় থাকে না। ফলে স্থির অবস্থায় পরমাণুর চরিত্র কেমন দাঁড়ায় তা নিয়ে কোন গবেষণা চালানোই সম্ভব নয়। সম্প্রতি কয়েকজন মার্কিন এবং ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এ কাজে কিছুটা সফল হয়েছেন। এর জন্যে তাঁরা ব্যবহার করেন লেজার রশ্মি। দেখা গেছে, বিশেষ পদ্ধতিতে লেজার রশ্মি নিক্ষেপ করলে সোডিয়াম পরমাণু স্থিতিশীল হয়। এই ভাবে সোডিয়াম পরমাণুকে আড়াই মিনিটের মত স্থির অবস্থায় রাখা সম্ভব হয়েছে। পরমাণু ক্ষুদ্রাকার চুম্বকের মত আচরণ করায় চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে তাদের বন্দীও করা যায়। গবেষকরা মনে করেন, এই পরীক্ষা পরমাণুর চরিত্র সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য যোগাতে সাহায্য করবে।

মঙ্গলের পথে সোভিয়েত দেশ

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ১৯৮৮ সালের জুন মাসে মঙ্গল গ্রহের উদ্দেশে একটি মহাকাশযান পাঠানর পরিকল্পনা করেছেন। মহাকাশযানটি মঙ্গলের উপগ্রহ ফোবোসের পৃষ্ঠতল থেকে মাত্র ৫০ মিটার ঊর্ধ্বাকাশে অবস্থান করে উপগ্রহটির উপর পর্যবেক্ষণ চালাবে। এ ছাড়াও তার পৃষ্ঠতলে নামিয়ে দেবে একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। যন্ত্রটি ফোবোসের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য পাঠাবে। এই পরীক্ষায় সফল হলে, তাঁরা ১৯৯২ সালে পাঠাবেন তাঁদের দ্বিতীয় মঙ্গলযান। মানবআরোহীহীন এই যানটির সাহায্যে মঙ্গলের বুকে নামিয়ে দেওয়া হবে একটি স্বয়ংচালিত গাড়ি। বলা হয়েছে, গাড়িটি তার অবতরণ ক্ষেত্র থেকে ১০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত বিচরণ করবে। সেই সঙ্গে
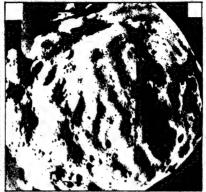
মঙ্গলের দুটি উপগ্রহের একটি—ফোবোস

সংগ্রহ করবে মঙ্গলের আবহাওয়া এবং নানারকম ভূতাত্ত্বিক তথ্য। এ ছাড়াও গাড়িটিতে একটি গর্ত করার যন্ত্র থাকবে। যন্ত্রটি মঙ্গলের ভূস্তরে ২০ থেকে ৩০ মিটার সুড়ঙ্গ খুঁড়ে মাটির নমুনা পরীক্ষা করবে। মূল যানটির সাহায্যে পাঠান হবে একটি বেলুন। রাতের দিকে মঙ্গলের আবহাওয়া শীতল হয়। ওই সময় বেলুনটি তাই তার ভূপৃষ্ঠে নেমে এসে তার মধ্যেকার যন্ত্রের সাহায্যে সেখানকার মাটি পরীক্ষা করবে। দিনের দিকে আবহাওয়া উষ্ণ। ওই সময় বেলুনটি যন্ত্রসহ বাতাসে ভেসে কিছুটা দূরে পাড়ি জমাবে। সূর্যাস্তের পর আবার মঙ্গলের বুকে নেমে এসে শুরু করবে পরীক্ষার কাজ। পরীক্ষার ফলাফল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রই পাঠিয়ে দেবে পৃথিবীর গবেষণাগারে। এর পর ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬-এর মধ্যে তাঁরা পাঠাবেন তৃতীয় মঙ্গলযান। এতে থাকবে আর একটি গাড়ি। গাড়িটি অবতরণ ক্ষেত্র থেকে ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ভ্রমণ করবে। ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮-এর মধ্যে পাঠাবেন চতুর্থ যান। এই যানের সাহায্যে মঙ্গলের মাটির নমুনা পৃথিবীতে নিয়ে আসা হবে।

উল্লেখ্য, এই প্রকল্পে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যে সব সাজসরঞ্জাম পাঠাবেন তাদের মোট ওজন ৪৫০০০ কিলোগ্রামের মত। অর্থাৎ মার্কিন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গ্রহ অনুসন্ধানে এ পর্যন্ত যতটা মোট ওজন পাঠিয়েছেন এই ওজন তাদের ওজনের দ্বিগুণ। খবর, সোভিয়েত মহাকাশ সংস্থা এক ধরনের মহাকাশযান তৈরি করেছে। নাম 'প্রোটন'। এই যানের ওজন বহনের ক্ষমতা ৪৫০০ কিলোগ্রাম। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা একটি যানে এ পর্যন্ত সব চেয়ে বেশি যতটা ওজন বহন করেছে, এই পরিমাণ তার চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি। তাঁদের ধারণা ১৯৯৮-এর আগে তাঁদের পক্ষে এমন কোনো প্রকল্প বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়।

মনঃসংযোগ প্রসঙ্গে

কাজের সময় হঠাৎ মনঃসংযোগ হারিয়ে ফেলার মত বড় শাস্তি বুঝি আর কিছু নেই। বই পড়ছেন, হঠাৎ মনের তার গেল ছিঁড়ে। অভিনিবেশ করার মত অবস্থা রইলো না। মন চঞ্চল হয়ে উঠল। লিখতে বসলেন। একই ব্যাপার। শতেক চেষ্টায় কলমের ডগায় একটি অক্ষরও পড়ে না। হয়ত কোন গবেষণার কাজে হাত দিলেন। দিলে কি হবে? চিন্তাভাবনা করার মত মানসিক অবস্থা থাকলে তবে তো গবেষণা। ইঞ্জিনিয়ার, গাড়ি বা প্লেনের চালক—সবার ক্ষেত্রেই চাই মনঃসংযোগ। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'কনসেনট্রেশন'। মানসিক চাঞ্চল্যের দরুন ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনায় মনঃসংযোগ করতে পারে না, পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়। এ ব্যাপারে কিছুটা আশার কথা শুনিয়েছেন পশ্চিম জার্মানির উলম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অভ্ থিওরেটিকেল মেডিসিনের অধ্যাপক ডঃ জান বর্ন। অধ্যাপক বর্ন-এর বক্তব্য, আমাদের পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নির্গত হয় এক ধরনের হরমোন—অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন (adrenocorticotropic hormone) আমরা যখন মানসিক চাপে ভুগি, হরমোনটি তখনই নির্গত হয়ে থাকে। এই হরমোন আমাদের শরীরে গ্লুকোজ উৎপাদনে সাহায্য করে কোষকলাগুলিকে অতিরিক্ত কর্মক্ষম অবস্থায় রাখতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে

যোগায় মানসিক ক্ষমতা। মেজাজ, স্মৃতিশক্তি এবং তৎপরতার উপর তার প্রভাব কতটা সে সম্পর্কে তেমন কিছু জানা না গেলেও, এই হরমোনটি মানসিকসংযোগ দৃঢ় করতে সাহায্য করে। ডঃ বর্ন তার প্রমাণ পেয়েছেন। ■

বহতা

অশোক বিশ্বাস

সময়টা সন্ধে সওয়া সাতটা হতে পারে, সাড়ে সাতটা হতে পারে, আবার আটটাও হতে পারে ; কিন্তু সাড়ে আটটার পরে কখনই নয়। পাখির বিশেষ বন্ধু রিকু বলেছে, গানের স্কুল থেকে তারা পৌনে সাতটা নাগাদ বেরিয়েছিল ; তারপর সে অন্য জায়গায় চলে যায়, নাহলে তাদের একসঙ্গেই ফেরার কথা ছিল। অন্য জায়গায় মানে, ভিলাই থেকে রিকুর দিদি-জামাইবাবু এসেছে, ওরা ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। রিকুরও যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সপ্তাহে একদিনই মাত্র গানের ক্লাশ বলে সে আর কামাই করতে চায়নি ; তাছাড়া ছবিটাও তার দেখা। সে বলে দিয়েছিল, সিনেমা ভাঙার সময় সে লবিতে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর সবাই ফিরবে একসঙ্গে।

সিনেমা ভাঙে সওয়া সাতটায়। পৌনে সাতটার স্কুল থেকে বেরিয়ে পাখি আর সে মিউনিসিপ্যালিটির মোড় অবধি একসঙ্গে আসে। পাখিকে সে সঙ্গে যেতে বলেছিল, কিন্তু পাখি যায়নি। সে যেমন একটু চাপা, একটু অভিমানী, বলেছিল, যাব কেন? তুই একদিনও জামাইবাবুকে আমাদের বাড়িতে এনেছিস?

—আজ সত্যিই নিয়ে যাব তোর গা ছুঁয়ে বলছি।

—আমার ভাগ্য!

—গান শোনাবি?

—দেখি—।

—গান শুনে তারপর যদি আর উঠতে না চায়?

কোথায় যে পাখি চোখ দুটো পেয়েছিল। মুখে ও হাসে না, ওর চোখ হাসে। সেই চোখে দৃষ্টি ঘন করে রিকুর হাতে চাপ দিয়েছিল, জোর করে তুলে দেবো।

পাখি যদি ফরসা হতো, তাহলে কি ওকে এমন লাগতো। ভোরের নরম আলোর মত রঙ ; কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে এমন এক দ্যুতি ছড়ায়, মনে হয় সারা গায়ে মেখে নিই। বাড়িতে ও মিডি পরে, ম্যাকসি পরে, কিন্তু বাইরে শাড়ি ছাড়া না। তাঁত বোধ হয় ওর মত শরীরের জন্যই। রিকু যদি ছেলে হতো, পাখির জন্য সে হয়ত সবকিছু ছাড়তে পারতো।

এরপর দুজনের আর বিশেষ কথা হয়নি। সামনে টুয়েলভ-এর পরীক্ষা অথচ পড়াশুনা তেমন কিছু হচ্ছে না, এরকম দু-একটি কথা, তারপর ঘড়ি দেখেছিল রিকু, সাতটা পাঁচ —সে সিনেমার দিকে চলে গিয়েছিল।

একটি মেয়ে যদি মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে হাঁটে, মিউনিসিপ্যালিটির মোড় থেকে হাই-স্কুল রোড দিয়ে পশ্চিমদিকে পাঁচ মিনিট হাঁটলে বস্তিতলার মোড়ে আসবে। সেখান থেকে ডানদিকে গঙ্গার ধার বরাবর উত্তরমুখো মিনিট দশেক হাঁটলেই পাখিদের পাড়া। অর্থাৎ খুব বেশি দেরি হলে মিউনিসিপ্যালিটির মোড় থেকে বস্তিতলার মোড়ে আসতে পাখির সাতটা দশের বেশি লাগার কথা নয়। এরপর সে ডানদিকের রাস্তায় কতখানি গিয়েছিল, কি আদৌ যায়নি, সেটা জানা যায় না।

দু লাখেরও কিছু বেশি লোক বাস করে এ শহরে। উত্তর দক্ষিণ দু-প্রান্তে দুটো চটকল, পশ্চিমে গঙ্গা, আর পূব সীমায় রেলের ইয়ার্ড। আয়তন হিসাবে ছোটই বলা যায়। রিকু ছাড়া তাকে আর কেউ কেউও দেখে থাকতে পারে, কিন্তু মাত্র একজন ছাড়া আর কেউ সেকথা বলেনি।

রাত নটায় রিকু যখন জামাইবাবুকে সঙ্গে নিয়ে পাখিদের বাড়িতে যায়, তখন ওদের বাইরের বারান্দায় আলো জ্বলছিল। পাখির মা রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞেস করেন, ও রিকু পাখি কোথায় গেছে জানিস?

—ও বাড়ি নেই। রিকু যেন একটু রুষ্টই হয়েছিল।

পাখির মা বললেন এখনও তো স্কুল থেকেই ফেরেনি। কেন, তুই আজ যাসনি?

—কি বলছেন, আমরা একসঙ্গে বেরিয়েছি, তখন সাতটাও বাজেনি। রিকুর বুকের মধ্যে কিরকম কাঁপতে শুরু করেছিল। সে কথা শেষ করতে পারেনি, দু-হাতে গ্রীল চেপে ধরে কোনরকমে বলেছিল আপনারা এখনও খোঁজ করেননি।

—তোর কাকাবাবুর বি-শিফ্ট, দশটায় ছুটি হবে। পাখির মা আরও কি-সব বলেছিলেন রিকুর সেসব মনে নেই।

জেলের মন ভাল ছিল না।

এবারে ইলিশের মরসুম ভাল নয়। তার উপর জুটেছে এক নতুন গেরো। একটু আগেই ওরা এসেছিল ; টাকা নিয়ে গেল।

তাদের মত বদনরাও এই একই প্যাঁচে পড়েছে।

গঙ্গায় আসা নতুন নয়। আসা-যাওয়ায় অনেক জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু এবারে হুস, আক্কেল।

এ-শহরের মাঝখান দিয়ে একটা খাল এসে পড়েছে গঙ্গায়। খালের দক্ষিণ হাতার দিকে যেমন তারা রয়েছে, বদনরা রয়েছে উত্তরে, ভিড়ছেও ওদিকের পাড়ে। সেদিন জাল তুলে ফেরার পথে নৌকো নিয়ে এল।

জেলে বদনকে দেখে উঠে দাঁড়াল। ও এল তাই, নাহলে সে-ই আজ ওর কাছে যেতো। এক দেশের মানুষ সব, বিদেশ এসে দায়ে-দড়ায় যুক্তি করতে হয়...কিন্তু বদনের মুখ এমন থমথমে কেন!

নিজের নৌকো থেকে উঠে এল বদন।

—এ কী বিপদ হল খুড়ো!

—বিপদ! জেলের মুখ কালো হয়ে গেল। এ ঘাটে আর নৌকো ভেড়াবে না, মনে মনে এরকম এঁচে রেখেছিল ; বদনের কাছে এই কথাটাই বলতে যেতো, কিন্তু একি শোনাচ্ছে বদন। লোকগুলো যে কারা, জেলে জানে না। এমন কি মুখ পর্যন্তও বলতে গেলে দেখেনি। সন্ধেয় পাড়ে নৌকো রাখলেই উঠে আসে। ওঠে একজনই বাকিরা দাঁড়িয়ে থাকে তফাতে। সে দলে চারজনও থাকতে পারে, আবার দশজনও থাকতে পারে।

নৌকো ভিড়ছে এ ঘাটে ছ-খানা। নৌকো পিছু দশটাকা রোজ। রেট ওরাই করে দিয়েছে। নৌকোয় গিয়ে গিয়ে আদায় করতে পারবে না। যার নৌকোয় আগে পা দেবে, সবায়ের হয়ে তাকেই মিটিয়ে দিতে হবে টাকাটা। পাড়ে যদি জল কাদা থাকে, নৌকো পর্যন্তও আসবে না—ছইয়ের উপর ঢেলা ফেলবে, তখন যেকোন একজনকে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

প্রথম যে-দিনকে ওরা আসে, তেড়ে উঠেছিল ফকির। লাফ মেরে-একজন ফকিরের নৌকোয় উঠে গলায় গামছা চেপে ধরল—টুঁটি কেটে ফেলে দোব হারামজাদা, কোন বাবায় রুখতে

পারবে না। কথার কথা নয়, সে সত্যিই ফকিরের কণ্ঠার উপর চাকু খুললো।

পিনাবাবু গঙ্গার বড় মহাজন। শুধু মহাজন নয়, অনেক কালের চেনাজানা। বাজারের ভিড় কাটলে, একটু বেলার দিকে দেখা করতে গেল জেলে, সঙ্গে কাবুলও গেল। ওদিকে বদনকেও বলা ছিল, সেও গেল। সব শুনে পিনাবাবু বললে, দিতে হবে, কি আর করবে বল?

কথা আটকে গেল জেলের গলায়।

রাগে গসগস করে উঠল বদন, দিতে হবে!

—না দিয়ে উপায়? পাঁচদশ টাকার জন্যে ওরা মানুষ খুন করে ফেলে...দেশে বউছেলে রেখে এসেছো এখেনে মরবে বলে?

এল শ্যামবাবু। এল ললিত সিং। এল আরও সব মহাজন। বললে, তবু তো দশে ছেড়েছে, পঁচিশ বললে কি করতে?

ভানুবাবু বললে, বাজারে কাপড়ের দোকান, জুতোর দোকান, সব জায়গা থেকেই যখন ইচ্ছে জিনিস নিয়ে যায়, কারুর মুরোদ আছে একটা কথা বলে!

শেষে পিনাবাবু বললে, তোমাদের যখন করে খেতেই হবে, এনিয়ে আর বেশি গ্যাঁজলাই কোরো না বাপু, বরং বলি শোন কথাটা, আরও বেশি করে খামচাও গঙ্গাকে।

খইফোটা আকাশটায় মেঘটুকু নেই। গুমোট। নৌকোয় বসে শহরটাকে দেখায় যেন বড়লোকের বেটি। কত রঙ বাহার। হাসির মত আলো। ঠেকারে যেন কলকল করছে।

আর তার নিচেই পাড়ের কোলে অন্ধকার। গঙ্গার গহিনে অন্ধকার। ঢোল-কলমীর বনে অন্ধকার। সেখানে জোনাকি ফুটছে। জোনাকি ফুটছে গঙ্গার ঢেউয়েও।

আর পাঁচ নৌকো এখনও জলে। বিড়ি ধরিয়ে মাধাইকে জিজ্ঞেস করল জেলে, ওরা কি করছে বলদিনি?

—মনে লিচ্ছে গঙ্গার সব মাছ নিয়ে ফিরবে। থেবড়ে বসে মাধাইও বিড়ি ধরাল...আর ঠিক তখনই পরপর এসে পড়ল জলের উপর তিন চারটে ঢেলা।

আবার ঢেলা ছোঁড়ে কারা। একটু আগেই তো টাকা নিয়ে গেল। তাহলে কি বদনদের ওদিকে যেমন আর একটা দলও আছে, এরাও কি তমনধারা কিছু! জেলে পাড়ের দিকে তাকাল। মাধাইও তাকাল। থকথকে অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হয় না... ব্যাপারখানা কি বলদিনি খুড়ো? মাধাই ফিসফিস করে বলল।

মাধাইয়ের কচি চোখ যদি হদিশ না পায়, সে বুঝবে কি করে। তবু তার চোখ যেন কিছু একটা লক্ষ্য করল...ঘাটের সিঁড়িতে কিছু একটা হচ্ছে... পাশের ঢোল-কলমীর বনে কিছু একটা হচ্ছে। কিন্তু সেটা যে কী বোঝা যায় না। কিন্তু কিছু একটা হচ্ছে... এতে ভুল নেই। গাঁ-ঘরে হাঁস মুরগীর ডোব-এ বনবেড়াল হানা দেয়, নিঃসাড়ে ধরে নিয়ে যায় শিকার, তবু যেমন একটু শব্দ হয়ই, এও যেন তেমনি, যেন ডানা ঝাপটাচ্ছে

মুরগীটা, যেন ডাকল… ।

আবার এসে পড়ল ঢেলা । শুধু ঢেলা নয় এবারে । খুব কাছে থেকে, যেন জল ফুঁড়ে কে বলে উঠল, নৌকো তোল ।

সারাদিনের পর নৌকো লেগেছে পাড়ে, এখন কোথায় তুলে নিয়ে যেতে বলে ।

—কিরে ব্যাটারা শুনতে পাস না ।

সেই গলা, যে ফকিরের নলিতে চাকু ধরেছিল… । জেলের খড়ি-ওঠা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল । লাফ মেরে নামল জলে । ভাঁটিতে জল নিচেয় নেমে গেছে । হাঁটু অবধি দেবে গেল কাদায় । মনে হল, কোমরটা খচ্ করে উঠল । হাতড়ে দড়ি ধরল নৌকোর । নোঙর টেনে তুললো এক হ্যাঁচকায় । তারপর টিকটিকির মত উঠে এল নৌকোয় ।

—মাঝ গঙ্গায় ভেসে যা, এক ঘণ্টার এদিকে আসবি না ।

কথাটা শোনার আগেই জেলে হাল তুলে নিয়েছিল হাতে—জ্বলন্ত উনুন টাল খেয়ে গেল । পাথরের মত বসে ছিল মাধাই…বলল, আস্তে বও খুড়ো ।

প্রফেসর ঘড়ির দিকে তাকালেন, সাতটা তিন । আজ কি কি নোট নিলেন, একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বইটা বন্ধ করে উঠে পড়লেন ।

লাইব্রেরিয়ান ছেলেটি এগিয়ে এল, উঠছেন স্যার, এখনও তো দেরি আছে ।

হাসলেন প্রফেসর, আজ একজন জিওলজিস্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার আছে । লাইব্রেরিয়ানের হাতে বই ফেরত দিয়ে ডায়েরি ব্যাগে ভরে ফেললেন । ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে বুক ভরতি করে শ্বাস নিয়ে বললেন, রিডিং-রুমটি আপনাদের বেশ । কালেকশানও ভাল ।

খুশি হল লাইব্রেরিয়ান, আপনার আর কি কি বই লাগবে যদি রিকুইজিশনটা দিয়ে দেন… গুছিয়ে রাখতে পারি ।

সমাহিত চোখে দেওয়ালে সাজানো আলমারিগুলো দেখছিলেন প্রফেসর… হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরল, বললেন আপনাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউণ্টস অফ বেঙ্গল বইটা আছে, হাণ্টারের ?

—আছে ।

—কাল দেবেন ।

একটু সঙ্কুচিতভাবে তাকাল লাইব্রেরিয়ান ছেলেটি, কিছু যদি মনে না করেন স্যার কয়েকদিন ধরেই ভাবছি একটা কথা জিজ্ঞেস করবো…

—করুন না স্বচ্ছন্দে… । উজ্জ্বল চোখে তাকালেন প্রফেসর ।

—আপনার গবেষণার বিষয়বস্তু কি ?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন প্রফেসর যেন নিজের ভিতরে তলিয়ে গেলেন তারপর মৃদু হাসলেন, আমি একটি সভ্যতাকে খুঁজছি, একটি স্রোত, যা হারিয়ে গিয়েছে—

—সেটা কি স্যার ?

বুকের উপর হাত ভাঁজ করে কিছুক্ষণ জানলার বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকলেন প্রফেসর তারপর বললেন, লাইব্রেরির এই পিছন দিক দিয়েই যে নদী গেছে, হুগলী নদী, কেউ কেউ গঙ্গাও বলেন এর তীরে আজকের এই যে শহর দেখছেন যা মূলত পাটশিল্পকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে, এরও আগে যখন হয়ত এই জনপদ হয়ওনি, অন্য একটি নদী এখানকার খুব নিকট অঞ্চল দিয়ে বয়ে যেতো, তার নাম ছিল সুতি । সুতি যমুনা থেকে প্রবাহিত হতো হুগলীতে । সে সময়ে একমাত্র জলপথেই চলাচল করত দেশ দেশান্তরের বাণিজ্যবহর । আপনি তো জানেন, নদীকে কেন্দ্র করেই চিরকাল গড়ে ওঠে শহর সভ্যতা মানুষের কর্মকীর্তি । সুতিকে কেন্দ্র করেও একদিন তেমনি গড়ে উঠেছিল সবকিছু আমি তাকেই খুঁজছি… ।

ঠং করে একটা শব্দ হল ছাদের উপর, যেন ধাতব কিছু ইটের গায়ে ঠোক্কর খেলো । কথা থামিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন প্রফেসর, ছাদের উপর কি কেউ ওঠে ?

লাইব্রেরিয়ান চোখের কোণ দিয়ে খোলা দরজার দিকে তাকাল । দরজার পাশে কাউন্টার । সেখানে ভিড় নেই । দু-চারজন মেম্বার ক্যাটালগ দেখছে । ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কিছু লোক ছাদে ওঠে স্যার । সিঁড়ি নেই পিছনের ওই গাছ দিয়ে ওঠে । আমি তো লোকালম্যান নই, চিনি না । আবার দরজার দিকে তাকাল লাইব্রেরিয়ান ছেলেটি । ফাঁকা রিডিং-রুমে অন্য কোন লোক নেই । একটু কাছে সরে এল । জানেন স্যার নেহাত চাকরি, নাহলে এখানে আমার একটুও ভাল লাগে না । দুপুরে এই টেবিলটায় এসে ওরা ঘুম দেয়…আরও কত কি যে ব্যাপার… । বলতে বলতে থেমে গেল সে, কেমন ছটফট করে উঠল, কত মেম্বার কমে গেছে জানেন, মহিলারা তো আসেনই না… একদিন একজন এসে টেপ বাজাচ্ছিল তার সঙ্গে দুজন টেবিল বাজাচ্ছিল, আমি আপত্তি করেছিলাম, আমায় মারল, দরজার ওই কাঠের বাটামটা দিয়ে একজন মাথায় মারতে এসেছিল, তখন বিকেল পাঁচটা, অনেক মেম্বার ছিলেন, কেউ একটা কথাও বললেন না । মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান লাইব্রেরির সভাপতি, আমি নিজে গিয়ে তাঁকে একটা ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম, কিছুই হয়নি । অল্প হাসল লাইব্রেরিয়ান ছেলেটি, এত মূল্যবান একটা লাইব্রেরি, আমি আজ আছি, কাল থাকব না, আমার কি— !

দুটো ছেলে শিস দিতে দিতে ঢুকল দরজা দিয়ে । লাইব্রেরিয়ানকে দেখে এগিয়ে এল—দুটো মোমবাতি ছাড়তো চাঁদু ।

—মোমবাতি ! মোমবাতি কোথায় পাব ?

—লাইবেরিতে মোমবাতি নেই ! পেঁয়াজি হচ্ছে ?

বেঁটে ছেলেটা সরে এল, লাইবেরির জিনিস দেবে না, শালা, কোন বাপের আইন দেখাচ্ছ । দেবে কিনা বলো, নাহলে নিজেরাই নিয়ে যাই— ।

অন্য ছেলেটা লম্বা পা তুলে দিল চেয়ারে আর শোন, এখান থেকে ঢ্যামনাদের বই চেবানো হটাও—টেবিলটায় আমরা বিকেলে পাত্তি খেলবো বুঝলে—

তার কথার মাঝখানেই আরও একটি ছেলে খুব ব্যস্তভাবে ঘরে এসে ঢুকল—তারপর এদের দেখে হাতে তালি দিল দূর থেকে, কিরকম একটা সঙ্কেতের মত : এরা ফিরে তাকাতেই আঙুল তুলে ডেকে ছুটে বেরিয়ে গেল । এরাও চলে গেল ওর মতই গতিতে ।

ছেলেগুলো একদম গায়ের উপর এসে দাঁড়িয়েছিল—এতক্ষণ যেন শ্বাস নিতে পারেননি, ওরা চলে যেতে এবার শ্বাস নিলেন । ওরা চলে গেছে, কিন্তু বাতাসে তবু গন্ধটা রয়ে গেছে । সাদা রুমালে মুখ মুছলেন প্রফেসর । উঃ, ড্রাক্স । ঘড়িতে সাড়ে সাতটা ।

হাইস্কুল রোডে সদানন্দ পালের উল, ব্লাউজ, ব্রা, শাড়ি ফলসের দোকান । দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে সে দেখল শিবতলার মোড়ের কাছে জটলা । দশ পনেরো জন ছেলে কিছু বয়স্ক লোক, সবাই উত্তেজিতভাবে কথা বলছে । কি ব্যাপার, মারামারি হল নাকি ! একটু দূরত্ব রেখে সে সাইকেল থেকে মাটিতে পা ফেলে দিল । সবাই মিলে এমন হৈচৈ করছে, কি যে হয়েছে, কিছুই বোঝার উপায় নেই । সদানন্দ দেখল, দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে একদিকে । তার যা ব্যবসা, তাতে করে সে মেয়েদের যত চেনে, ছেলেদের ততো নয় । দুজন মেয়ের মধ্যে একজনকে তো তার খুবই চেনা লাগল । সামান্য প্যাডেলে সে মেয়েটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল । —কি হয়েছে দিদিভাই ?

যাকে কথাটা জিজ্ঞেস করল সদানন্দ, সে রিকু । তার চোখ ফোলা, গলা ভাঙা, সদানন্দর দিকে পলকের জন্য তাকিয়ে সে বলল, একটা মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না ।

সাইকেলের সিট থেকে দ্রুত নেমে পড়ল সদানন্দ । পাওয়া যাচ্ছে না মানে ! কতবড় মেয়ে, কখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না… কথাগুলো একসঙ্গে তার গলায় তালগোল পাকিয়ে গেল, কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না, শুধু জিজ্ঞেস করল, কোন্ মেয়ে ?

এবার তার কথার জবাব দিল রিকুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি, কোন্ মেয়ে কি করে আপনি বুঝবেন ?

খুব আহত হল সদানন্দ । ঈ শহরে কোন মেয়েকে সে চিনবে না, হয় নাকি ! তার দোকানে যায়নি, এমন মেয়ে এ তল্লাটে আছে কেউ ? নাম সে হয়ত না জানতে পারে, কিন্তু মুখ চিনবে না এ কিরকম কথা । সে হাতে হাত ঘষল, তারপর তার কথাটা যেন আর কেউ শুনতে পেলে খুব কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে এমনিভাবে খাটো গলায় জিজ্ঞেস করল, কিরকম দেখতে বলুন তো ?

এ কথারও কি কোন জবাব হয় । হতাশভাবে রিকুর সঙ্গে মেয়েটা তাকাল ।

চোখ মুছছিল রিকু মুখ তুলে বলল, আমার বন্ধু পাখি, আপনি চেনেন তাকে ?

—হ্যাঁ…হ্যাঁ… । মাথা নেড়ে সায় দিল সদানন্দ, আপনার সঙ্গেই তো আমার দোকানে যায়, একলাও অনেকবার গেছে, একটু লম্বা মত… । বলতে বলতে লাফিয়ে উঠল, আরে, আমি তো

তাকে দেখেছি…।

—দেখেছেন ! রিকু সদানন্দর সাইকেলের হ্যান্ডেল চেপে ধরল।

রিকুর দাদা সুজয় সবাইকে ঠেলে সদানন্দর সামনে চলে এল—কখন দেখেছেন ? কোথায় ?

সাইকেলের সিটে আঙুল বাজাল সদানন্দ—আমার দোকানের সামনে। সন্ধের পরে।

—কোনদিকে যাচ্ছিল ?

—কোনদিকে আবার। এইদিকে আসছিল।

সদানন্দকে ঘিরে ধরল সবাই।

কান্তি ঘোষ বললেন, তার মানে পাড়ার একেবারে কাছেই আপনি তাকে দেখেছেন।

সদানন্দর জানার কথা নয়, এই পাড়াটাই ওই মেয়েটির পাড়া। সে চুপ করে রইল।

রিকুর দিকে ফিরল সুজয়, আর কোথাও ওর যাওয়ার কথা ছিল জানিস ?

ঠোঁট কামড়ালো রিকু, কোথায় যাবে ! তাহলে আমায় বলতো না ?

মল্লিকার বাবা বললেন বাড়িতে কোন ঝগড়াঝাটি হয়নি তো ? রাগ করে হয়তো কোথাও গিয়ে বসে আছে।

জ্বলন্ত চোখে তাকাল রিকু, কাকাবাবু কাকীমার সঙ্গে ঝগড়া করবে পাখি, তারপর বাইরে গিয়ে বসে থাকবে। ও সেরকম মেয়েই নয়। আপনারা কেন যে এসব ভাবছেন…। গলা ধরে এল তার।

রঞ্জনবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, না মানে ব্যাপারটা নানা দিক থেকে ভেবে দেখা আর কি…।

রিকুর সঙ্গের মেয়েটি বলল, আপনি যা বলছেন সেটা হলে ও সদানন্দবাবুর দোকান পর্যন্ত আসতে যাবে কেন, স্টেশানের ওইদিক দিয়েই তো চলে যেতো।

স্টেশানের কাছে ডাক্তার ব্যানার্জীর চেম্বার। রিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন। কাল সারা রাত ঘুম হয়নি। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছিল। ভেবেছিলেন আজ আর চেম্বারে যাবেন না, কিন্তু ডাক্তারদের ইচ্ছে করলেই সবকিছু করা যায় না।

কালরাত্রে যা ঘটল, তিনি নিজেও এখন তা বিশ্বাস করতে পারেন না ; কিন্তু ঘটল।—রাত্রে বাইরের কল-এ তিনি যান না। কিন্তু পাড়া ঘরে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে যেতেই হয়। আর বাইরে থেকে কেউ যদি পেশেন্টকে তাঁর বাড়িতেই এনে হাজির করে, তিনি নিচেয় এসে দেখেন।

কাল কলকাতায় একটা কনফারেন্স ছিল। সেখান থেকে ফিরে সোজা চেম্বার। চেম্বার থেকে রাত দশটায় বাড়ি। খাওয়াদাওয়ার পর কিছুক্ষণ জার্নাল নেড়েচেড়ে যখন শুতে গেলেন, তখন সাড়ে এগারটা বেজে গেছে। রাত একটায় কলিং বেল বাজল। প্রথমে ঘুম ভেঙেছিল বেণুর। পাশ থেকে উঠে টর্চ নিয়ে জানলা দিয়ে দেখে বলল, কয়েকজন ছেলে তোমায় ডাকছে।

—চেনা মনে হল ? ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

বেণু বলল, গেটের বগনভেলিয়ার ঝোপের নিচেয় এমন দাঁড়িয়ে আছে, বোঝা গেল না।

—কোথা থেকে আসছে জিজ্ঞেস করতো।

বেণু জানলা থেকে বলল, আপনারা কোথা থেকে আসছেন ?

—কাছাকাছি থেকেই। ডাক্তারবাবুকে একটু ডেকে দিন।

—উনি তো রাত্রে বাইরে যান না।

—আমরা পেশেন্টকে এনেছি।

ডাক্তার উঠলেন। জানলায় এসে টর্চ ফেলে বললেন, এদিকে সরে আসুন তো।

একজন টর্চের ফোকাসের মধ্যে এল। ডাক্তার দেখলেন, ছেলেটাকে আগে দেখেছেন। বললেন, কার কি হয়েছে ?

—সামান্য চোট। আমাদের এক বন্ধুর। আপনাকে একটু দেখতে হবে।

—কিভাবে লাগলো ? পেশেন্ট কই ?

—পড়ে গিয়েছিল। ওরা চাদর মুড়ি দেওয়া একজনকে আলোর সামনে ধরে এনে দেখাল।

ডাক্তার নিচেয় নেমে এলেন। বাড়ির নিচের তলায় দুখানা ঘর নিয়ে রেসিডেন্সিয়াল চেম্বার। এখানে সকাল বেলাটায় তিনি রোগী দেখেন। ছোটখাট অপারেশনের জন্যও একটা ব্যবস্থা করা আছে। কোলাপ্‌সিবল গেটের ভিতরে দাঁড়িয়ে বললেন, পেশেন্টকে আমার সামনে আনুন। গেটের মাথার বড় আলোটা জ্বেলে দিলেন।

দুজন ছেলে এগিয়ে এল, আলোটা নেবান ডাক্তারবাবু।

—আলো নেবাবো ! কেন ?

চাপা গমগমে গলায় একজন বলল, যা বলছি করুন। আলোটা নেবান।

মুখ শক্ত হয়ে গেল ডাক্তারের, কি হয়েছে আপনাদের পেশেন্টের ?

—সামান্য ইনজুরি।

—কিরকমের ইনজুরি ?

—দেখাবার জন্যেই তো এনেছি। আলোটা নেবান। গেট খুলুন।

কড়া গলায় ডাক্তার বললেন, পেশেন্ট না দেখে আমি গেট খুলি না। আপনারা অন্য জায়গায় যান। ডাক্তার ফিরেই যাচ্ছিলেন, এমন সময় সেই গমগমে গলা বলল, দেখতে চান তো পেশেন্টকে ? বেশ, এই দেখুন—। আলোর সামনে টেনে নিয়ে এল সে চাদর ঢাকা লোকটাকে, গায়ের চাদর সরিয়ে দিল।

চমকে উঠলেন ডাক্তার। লোকটার সারা শরীরে রক্ত। গামছার টুকরো, ন্যাকড়ার ফালি, এসব দিয়ে কোথাও বাঁধা, কোথায় বাঁধা না। আঙুলসমেত একটা হাত জামা দিয়ে জড়ানো।

লোকটার গায়ে চাদর চাপা দিয়ে ছেলেটি বলল, গেট খুলুন ডাক্তারবাবু। আলোটা নেবান।

—এ কেস আমার এখানে হবে না। আপনারা হসপিটাল যান।

—আমরা কোথাও যাব না। যা করার আপনাকেই করতে হবে।

—এ অন্যরকমের কেস।

—ঠিক, অন্যরকম। ওর হাতে পেটো লেগেছে, গায়ে ক্ষুর খেয়েছে—।

—এ কেসে আমি হাত দিতে পারি না। আমায় পুলিশকে জানাতে হবে।

—পুলিশ ! কোলাপসিবল গেটের লোহা দু-হাতে চেপে ধরে নিঃশব্দে হাসল ছেলেটা—গেট খুলবেন না কি বলেন। আচ্ছা আপনি কি মনে করেন গেট বন্ধ করে রেখে আপনার সবকিছুকে আটকে রাখতে পারবেন ?

ডাক্তার ব্যানার্জী এরপরে গেট খুলেছিলেন। একটির পর একটি স্টিচ করেছিলেন। ইনজেকশন দিয়েছিলেন। ব্যান্ডেজ করেছিলেন। ওরা খাড়া দাঁড়িয়ে থেকেছিল। তারপর কাজ শেষ হলে লোকটিকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। যখন তিনি শোবার ঘরে ফিরে এলেন, দেখলেন বেণু অঘোরে ঘুমোচ্ছে, রাত আড়াইটে। বাকি রাতটা চোখে আর ঘুম আসেনি।

সকালে বেণু জিজ্ঞেস করেছিল, তিনি কিছু বলতে পারেননি। হয়ত বলাও যাবে না। বললে সে হয়ত অনেক কিছু বলবে। অন্য কেউ শুনলেও বলবে। কি বলবে, তা তিনিও জানেন। কিন্তু তিনি নিজে যেটা সবচাইতে বেশি বোঝেন তা হল, তিনি একজন মানুষ ; পরিবার পরিজন নিয়ে জড়িয়ে-পড়া একজন মানুষ।

পাড়ার মোড়ে এসে ডাক্তার ব্যানার্জীর রিকশা ভিড়ে আটকে গেল।

ব্যাপার কি ! কেউ অসুস্থ নাকি ? রিকশার হুডের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি তোমাদের ?

ঘুরে তাকাল রিকু, তারপর দৌড়ে গেল পাখিকে পাওয়া যাচ্ছে না কাকাবাবু।

—পাখিকে। সেকি !

সুজয় এগিয়ে এল, সাতটায় গানের স্কুল থেকে বেরিয়েছে, এখনও বাড়ি ফেরেনি।

—গানের স্কুল মানে তো 'বিতান'… সে তো এই নাকের ডগায় ! অন্য কোথাও যায়নি, ভাল করে খোঁজ নিয়েছো ?

মুখ কালো করে সুজয় বলল, আমরা এতক্ষণ সাইকেল নিয়ে সব ঘুরে এলাম ; কোথাও নেই।

ডাক্তার ব্যানার্জী খাড়া হয়ে বসলেন।

রিকু তাঁর হাঁটুতে মুখ চেপে ধরল, ও কোথায় গেল কাকাবাবু ?

কিছুক্ষণ ডাক্তার কিছুই বলতে পারলেন না। তাঁর হাঁটুর উপর রিকু ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। আলতো করে তার পিঠে হাতটা রাখলেন, তারপর গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, ওর বাবা কোথায় ?

—কারখানায়। সন্তু খবর দিতে গেছে।

রিকশা থেকে নেমে পড়লেন ডাক্তার, তোমরা কখন জানতে পারলে ?

—নটার সময়, রিকু ওর বাড়িতে গিয়েছিল…। সুজয় বলল।

—ও কি স্কুল থেকে একা আসছিল ?

রিকু চোখ মুছল, মিউনিসিপ্যালিটি অবধি আমি সঙ্গে ছিলাম, তারপর অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিলাম।

ডাক্তার রিকুর দিকে ফিরলেন, আচ্ছা তোমার কি এরকম মনে হয়েছিল, ওর মনটা খারাপ আছে, একটু অন্যমনস্ক ?

—না না।

—কিংবা ধর, ওর যা স্বাভাবিক ব্যবহার তার

চাইতে বেশি বেশি স্ফূর্তিভাব দেখাচ্ছিল ?

এবারও জোর জোর মাথা নাড়ল রিকু। ডাক্তার দু-হাত মাথার পিছনে জড়ো করে কিছুক্ষণ অন্যমনস্কের মত একদিকে চেয়ে থাকলেন···তারপর জিজ্ঞেস করলেন, রিকু ছাড়া এরপর আর কে কে তাকে দেখেছে ?

—আমি। সদানন্দ পাল সাইকেল দাঁড় করিয়ে রেখে এগিয়ে এল।

—ক'টার সময় ?

—তখন ধরুন এই সাতটা বাজে···তার একটু আগে বা পরেও হতে পারে।

ডাক্তার ঘড়ির দিকে তাকালেন··· ন'টা পঁয়তাল্লিশ।

আট দশখানা সাইকেল, অন্তত জনা পঁচিশেক লোক তাঁর চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে···বললেন, তোমরা থানায় খবর দিয়েছ ?

—থানায়! যেন চমকে উঠল সবাই। থানায় যে খবর দিতে হবে, আশ্চর্য, ব্যাপারটা যেন কারও এতক্ষণ মনেও আসেনি।

জেলে যখন আবার ঘাটের কাছে ফিরে এল, তখন চটকলে রাত ন'টার হুটার বাজছে। এসে দেখল, ঘাটে একখানাও নৌকো নেই। মাধাইকে জিজ্ঞেস করল, কি হল বলদিনি ওদের ?

মাধাইও কম অবাক হল না। পাড় থেকে তাড়া খেয়ে চটকলের জেটি পেরিয়ে আরও দক্ষিণের দিকে ভেসে গিয়েছিল তারা। সেই গিয়ে এই ফিরছে। ওদের সঙ্গে দেখাও হয়নি। এতক্ষণ তো জলে থাকার কথা নয়। তাহলে ওরা এসে আবার তাদের মতই ফিরে গেছে। মাধাই ভেবে পেল না।

ঘাটের পর থেকে চটকলের পাঁচিল। পাঁচিলের উপর কাঁটাতারের বেড়া। তারপর জেটি। কোম্পানি জেটিতে নৌকো রাখতে দেয় না। তবু জেলে সেইদিকেই দেখছিল। পাঁচ পাঁচখানা নৌকো তো আর বাতাসে উবে যেতে পারে না, নাকি কোন বিপদ বাধিয়ে বসল ওরা, যা মাথা গরম ফকিরটার।

মাধাই এতক্ষণ ঠায় লগি ধরেছিল, এবার জিজ্ঞেস করল, কি করবে খুড়ো ?

জেলে ভেবে পেল না কি করা যায়। এই রাত এই অন্ধকার, জলে জলে এখন কোথায় খোঁজা যাবে ওদের, তবুও বুকটা খচ্‌খচ্‌ করে। নৌকোর গলুইয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিল সে, নৌকো বাঁধ মাধাই, তারপর দেখা যাবে—।

নৌকো বাঁধতে মাধাই নামল।

বর্ষার ভরভরন্ত গঙ্গা। জল এসে ঠেকেছে সিঁড়ির কোলে। জোয়ার এলে আরও তিনখানা ধাপ ডুবে যায়। সিঁড়ির দুপাশ দিয়েই উপর থেকে নেমে এসেছে ইট বাঁধানো গড়ান।

সিঁড়ির একদিক থেকে চটকলের পাঁচিল, অন্যদিকে খাড়া পাড়, জল পাড়ের কোল অবধি চলে যায় বলে, নোঙর করার সুবিধে মিলের দিকটাতেই। কোম্পানির পাঁচিলের তলা বরাবর অনেকখানি উঁচু ডাঙা। সেখানে ঢোল-কলমীর জঙ্গল হয়ে আছে; মাটি নরম। সিঁড়ি আড়াআড়ি পেরিয়ে নোঙরের দড়ি নিয়ে সেইদিকেই যাচ্ছিল মাধাই, যেতে যেতে হঠাৎ 'অ খুড়ো ই কী কাণ্ড' বলে চেঁচিয়ে উঠেই একেবারে চুপ মেরে গেল।

জেলে হাঁক দিল, কি হল রে ?

মাধাইয়ের সাড়া নেই। অতবড় জোয়ান ছেলেটা বোবা হয়ে গেছে যেন। জেলে পাটার উপর দাঁড়িয়ে উঠে দেখল, সিঁড়ির ধারের গড়ানের কাছে মাধাই থম্‌ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খেঁকিয়ে উঠল জেলে, কথাটা বলবি তো শুয়োটা !

হুড়মুড় করে ছুটে এল মাধাই, একটা মেয়ে পড়ে আছে খুড়ো, একদম উদোম।

—বলিস কি। জেলে চোখ খোঁজ করে গড়ানের দিকে তাকাল।

তাহলে কি জোয়ারে ভেসে এসে আটকে ছিল, আগে নজর হয়নি। তা-ই বা কি করে হবে! জোয়ার চলে গেছে বিকেলে, সন্ধের ঘনাঘন মাধাই দোকানে সওদা করতে নেমেছিল, নোঙরও করতে গিয়েছিল ওইখানেই তখন দেখতে পেতো না।

জেলে নৌকো থেকে নামল।

রাস্তার আলো এতদূরে এসে পৌঁছয় না। একটা আবছায়ার মত···তবু দেখতে অসুবিধা হল না। একটা মেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। বেঁচে আছে না মরে গেছে বোঝা যায় না। দেহটার খানিক তফাতেই গঙ্গা জিভ বাড়াচ্ছে।

—একবার আলোটা আনতে পারিস ?

মাধাই ছুটে গিয়ে হ্যারিকেনটা নিয়ে এল।

আলোটা কাছে নিয়ে যেতে কেঁপে উঠল জেলে। সে যা ভেবেছিল, এতো তা নয়। একেবারে টাটকা দেহ। মাথার পাশ দিয়ে গড়িয়ে এসেছে রক্ত। গালে, বুকে, পেটে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। কচি মেয়ে। হাত দুটো কিরকম যেন একটু উপর দিকে তোলা। গোঙানির মত গলা দিয়ে বেরিয়ে গেল, সব্বোনাশ, এ কি!

দেখছিল মাধাইও। এবার সে চমকে উঠল।

জেলে বলে উঠল, হা মধুসূদন এমন সব্বোনাশ কার হল।

খাড়া হয়ে দাঁড়াল মাধাই। চারিদিকে তাকাল। ডাকল—খুড়ো !

জেলে তাকাল মাধাইয়ের দিকে।

দুজনে দুজনের দিকে সামান্যক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপরই হ্যারিকেনের পলতে নামিয়ে দিল মাধাই। জেলের হাত ধরে টান দিল—চল—।

জেলেকে টানতে টানতে মাধাই উঠে এল নৌকোয়। তারপর জোরে হাল টেনে ভেসে গেল জলে।

এতক্ষণ যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল জেলে···নৌকোর নড়ন দেখে বলে উঠল, অ মাধাই, চলে যাবি ?

মাধাই কথা বলল না। শুধু আরও জলের দিকে নেমে যেতে লাগল। জেলে উবু হয়ে বসে পাড়ের অন্ধকারের দিকে তাকাল, যদি মেয়েটা এখনও বেঁচে থাকে, হ্যারা ?

—আঃ, তুমি চুপ করদিনি।

কোথায় যাবে, মাধাই যেন দিশা পাচ্ছিল না। ঘোর কালো আকাশ। আকাশের ছায়ায় জল ততোধিক কালো। হালের আগায় জল ভাঙার শব্দ শুধু। আর কিছু নেই। যেন সমস্ত পৃথিবীটাই জলে বুড়ে গেছে। একটা ছোট আলোও দেখা যায় না। গুমোটে বাতাসের নড়ার শক্তিও যেন রহিত। হালে বাঁধা দড়ির কটকটে আওয়াজে নৌকো দুলছে···আর, দম চেপে আসছে মাধাইয়ের, যেন এই অন্ধকারটা হাঁ-গালে কটকট করে চিবিয়ে ফেলবে নৌকোসুদ্ধু তাদের—হঠাৎ—উত্তরে, একটা ঝুপড়ি গাছের তলায় যেন এক ছিটে আগুনকে দেখতে পেল মাধাই। বিড়ির আগুন না ? ওই তো নৌকো—গলাটাকে দুহাতে ছিঁড়ে দূরে ছুঁড়ে দিল মাধাই—ফ—কি—র—

সাড়া এল।

এ যে বদনের গলা।

কী আশ্চর্য, বদনদের কথাটাই এতক্ষণ মনে আসেনি। মাধাই নৌকো বাড়াল।

বদনদের চার নৌকো, তার পাশে পাঁচ নৌকো ভিড়েছে ফকিরদের।

নৌকোর কানায় এসে নৌকো লাগল।

বদনের নৌকোতেই বসেছিল ফকির, ডাকল, আয়।

মাধাই উঠে এল বদনের নৌকোয়।

বদন বলল, খুড়ো এস। তোমাদের কথাই ভাবছিলুম আমরা।

জেলে উবু হয়ে বসল, দেখিছিস ফকির ?

—না দেখলে এখেনে আসব কেন ? বিড়িটা ফেলে দিল ফকির।

তারপর সবাই চুপ হয়ে গেল। ওই কথার পর যেন সব কথাই ফুরিয়ে গেল সবায়ের। কেবল নৌকোর খোলের নিচেয় জল ঝাপটা দিচ্ছে। এমন সময় বাতাস কাঁপিয়ে সাড়ে ন'টার হুটার বাজল। রাত ডিউটিতে যারা যাবে, তাদের সজাগ করে দিল কোম্পানি। এতক্ষণে যেন কথা খুঁজে পেল জেলে, তোর কি মনে হয় মেয়েটা মরে গেছে ?

—মরে যাবে না তো কি জ্যান্ত থাকবে। চাপা শ্বাস নিল ফকির।

কিছুক্ষণ উর্ধ্বমুখ হয়ে বসে থাকল জেলে তারপর ফকিরের মুখের কাছে মুখটা নিয়ে এল, কিন্তুক ধর, এখনও যদি মরে না গিয়ে থাকে ? বদন তুই-ই বল। মহাপ্রাণী এখনও থাকলেও তো থাকতে পারে।

—খুড়ো, তোমার যত আনকথা। দাঁড়িয়েছিল মাধাই, ঝড়াং করে বসে পড়ল, আমি দেখিছি মরে গেছে, জ্যান্ত মানুষ ওরকম থাকে ?

—জ্যান্ত হোক মরা হোক আমাদের অত মাথাব্যথা কিসের! ঝাঁঝিয়ে উঠল বদনও।

মুখ কাঁচুমাচু করে বসে থাকল জেলে।

গলা ঝাড়া দিল ফকির, তা আমাদের কি করতে বল তুমি, লোককে খবর করবো, না থানায় যাব ? তোমার কি ভীমরতি হয়েছে, মেয়েটাকে রেখে গেছে আমাদের নৌকো বাঁধার জাগায়, এখন আমরা কিছু করতে গেলে লোকে যদি বলে এ কাজ তোমরাই করেছো ?

শব্দে বোঝা যায় নৌকোর তলায় চাপ বাড়ছে জলের।

আলো ছিটকিয়ে একটা রেলগাড়ি গেল ব্রীজ

দিয়ে। এক চাপড়া কচুরিপানা ভেসে যাচ্ছে নৌকোর ডগা দিয়ে। গতি দেখে মনে হয় জোয়ার আসতে দেরি নেই।

কাবুল বিড়ি দিল।

ছুটি হল নাকি মিলের? এতসব লোক যায় কোথায়। ঘাড় উঁচিয়ে পাড়ের দিকে দেখল জেলে।

একসঙ্গে দু-তিন গাছা ব্যাটারি বাতির আলো এসে ঝাঁপ খেয়ে পড়ল নৌকোয়। ক-জনা দাঁড়িয়েও গেছে।

—ও কত্তা!

চাপা গলায় ফকির বলল, কেউ সাড়া দেবে না।

আবার ডাক এল।

—এদিকে একটা মেয়েকে দেখেছ ভাই...একটা মেয়ে...?

ছই ধরে উঠে দাঁড়াল জেলে।

—তুমি আবার উঠছো কেন এখুন? গরগর করে উঠল ফকির।

সে কথায় কান নেই জেলের, চেঁচিয়ে বলল, দখিনদিকের ঘাটে যান বাবুরা, মিলের ধারে—।

কথাটা শুনে পাড়ের উপরের ওরা যেন থমকে গেল। তারপর ছুটল সবাই।

জেলের মনে হল, তার এই শরীরখানার সব শক্তি যেন জল হয়ে গেছে।'

ফুঁসে উঠল বদন। ফকির। সবাই। বলে দিলে।

ছই আঁকড়ে ধরে যে শুধু দম নিল, বাপেরা, ধম্মখ বলছি রে, বলতে আমি চাইনি, কিন্তুক—

একটি যুবতী মেয়ে বাড়ি ফিরতে দেরি করছে—পুলিশ এ ব্যাপারটায় প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু থানায় ডায়েরি হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই খবর এল, মেয়েটি গঙ্গার ঘাটে পড়ে আছে।

যে অফিসার ডায়েরি নিয়েছিলেন ততক্ষণে তাঁর ডিউটি বদল হয়ে গেছে। চার্জে এসেছেন নতুন অফিসার। তিনি তোড়জোড় করে থানা থেকে বেরিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে অকুস্থলে পৌঁছলেন।

এই মেয়েটিই যে সেই পাখি নামের মেয়েটি, তা শনাক্ত করল তার এক বন্ধু, বন্ধুর দাদা, পাড়ার একজন চিকিৎসক এবং স্থানীয় লোকজনেরা।

মেয়েটির দু-পাটি জুতোর মধ্যে একপাটি সিঁড়ির এক কোণায় পড়েছিল, আর এক পাটি পুলিশ খুঁজে পেল না। মেয়েটির সঙ্গে একটি গানের খাতা থাকার কথা, পুলিশ সেটিও পেল না। তার শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ, ব্রা সিঁড়ির নিচের ঝোপে পাওয়া গেল। এই অবস্থায়, এবং বিশেষত মেয়েটি যখন মারা গেছে, পুলিশের এক্ষেত্রে বিশেষ করণীয় কতকগুলি কাজ থাকে। প্রথমত বডি যেখানে যে অবস্থায় আছে, সেইভাবে কতগুলি ছবি নেওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত ডোমের বন্দোবস্ত করা; কারণ, ডেডবডি ডোমরাই তোলাতুলি করে। শুধু ডোম নয়, এরপর লাশ থানায় নিয়ে যেতে একটি রিকশাভ্যানেরও দরকার। সুতরাং একজন সিপাইকে পাহারায় রেখে ডিউটি অফিসার থানায় ফিরে এলেন।

থানার পুলিশ ব্যারাকের খোলা রোয়াকে কয়েকজন রিকশাওয়ালা রাত্রে ঘুমোয়। তাদের একজনকে ডেকে ডোম ধাওড়ায় পাঠিয়ে দিলেন। পুলিশ কেসের যে ফটো তোলে তাকে ডাক পাঠালেন আরেক জনকে দিয়ে। রাত বেশি হয়ে যাওয়ায় বাজার পাড়াতেও রিকশাভ্যান পাওয়া গেল না। বিরক্ত হলেন গ্যারেজের উপর—থানার মোটরভ্যানটি যদি এসময় বিকল হয়ে ওখানে না পড়ে থাকতো তাহলে এতো ভাবতে হতো না। শেষে প্ল্যান করলেন, সাইকেল রিকশার পাদানিতে শুইয়েই লাশটাকে থানায় নিয়ে আসবেন। ব্যাপারটাকে সেইভাবে বুঝিয়ে দিয়ে একজন সিপাইয়ের সঙ্গে একটা রিকশা পাঠিয়ে দিলেন। তারপর ফটোগ্রাফার আসতে, তাকে জীপে তুলে নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব জায়গাটায় আবার ফিরে এলেন। কিন্তু লাশ ততক্ষণে আর সেখানে নেই। জোয়ার এসে গিয়েছিল। জল বাড়ছিল দ্রুত। সিপাই পোস্টিং ছিল মাত্র একজনই। ঘাটে অবশ্য অনেক লোক ছিল এবং তারা সবরকম সাহায্য করার জন্য প্রস্তুতও ছিল, কিন্তু সিপাইটির একা মাথায় কুললো না পুলিশ এসে যাওয়ার পর, লাশে পাবলিককে আদৌ হাত দিতে দেওয়া ঠিক কিনা। গঙ্গা পাখিকে নিয়ে চলে গেল।

সেই রাত্রেই পুলিশের লঞ্চ নামল গঙ্গায়। তিন চার মাইল এলাকা জুড়ে সার্চের আলোয় খোঁজা হতে লাগল গঙ্গার প্রতিটি ঢেউ।

স্থানীয় খেয়াঘাটে যে প্রাইভেট সার্ভিস আছে তাদের একটি লঞ্চকেও অনুসন্ধানের কাজে লাগানো হল। তোলপাড় হতে লাগল গঙ্গা।

রাত তিনটের সময় দুটি লঞ্চ যখন কাছাকাছি হল, দেখা গেল কারও কাছেই কোন খবর নেই।

ভোর চারটের কিছু পরে জুটমিলের জেটির হ্যাঙার থেকে ক্রেনে ম্যানেজারের ক্ষুদ্র অথচ অতিরিক্ত শক্তিসম্পন্ন প্লেজার বোটটিও নামল। জল ছুঁয়েই লঞ্চটি ছোট মাছের মত ছুটল—তারপর সেই সমস্ত জায়গা, নদীর খাঁড়ি, ভাঙন, রন্ধ্র, যেখানে বড় লঞ্চের পক্ষে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব ঠুকরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু কোথায় কি, পাখি নেই।

গঙ্গার ঘোলা জল কেটে তিনখানা লঞ্চ যখন ফিরে এল তখন দিনের আলো ফুটে গেছে, ঘাটে ঘাটে দাঁড়িয়ে গিয়েছে অসংখ্য লোক।

পুলিশ মেসেজ পাঠাল এ এলাকার গঙ্গার দুপারের অনেকগুলো থানায়। তন্নতন্ন করে খোঁজা হতে লাগল একটি দেহ। শুধু পুলিশের লঞ্চই নয়, গঙ্গার জেলেদেরও কাজে লাগানো হল। তারা জালপাটা নিয়ে খুঁজতে লাগল তাদের মত। স্থানীয় ছেলেরাও বসে রইল না।

জোয়ার এল, গেল, ভাঁটা পড়ল। তারপর আবার জোয়ার। কিন্তু পাখির দেহ পাওয়া গেল না।

দিন গড়িয়ে গেল রাত্রিতে।

পরের দিন সকালেই খবর ছড়িয়ে পড়ল...দেহটা পাওয়া গিয়েছে—এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটা কারখানার জেটিতে আটকিয়ে ছিল, একজন জেলে দেখতে পায়, সে-ই খবর দিয়েছে পুলিশকে।

ভোরে গঙ্গায় মাছ নিতে এসে আড়তের একটি ছেলে প্রথম শুনল খবরটা। সে গিয়ে খবর দিল মাছের বাজারে। মাছের বাজার থেকে খবর গেল তরকারি বাজারে। সেখান থেকে দোকানে। দোকান থেকে রাস্তায়। রাস্তা থেকে রিকশা স্ট্যান্ডে। তারপর স্টেশানে। বেলা সাতটার ভিতরেই শহরের প্রত্যেকটি লোক জেনে গেল খবরটা।

একজন দুজন করে লোক জমতে লাগল থানার সামনে। ক্রমে দশ বিশ পঁচিশ...পঞ্চাশ।

বেলা দশটার মধ্যে সমস্ত শহর ভেঙে পড়ল থানায়। ঠেলাওয়ালা, রিকশাওয়ালা, বাজারের মুটে, ফড়ে জেলে, মিস্ত্রি মজুর, হকার, দোকানদার, ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, ভিখিরি...কে নেই।

থানার পশ্চিমদিকে ঢালু জমি গঙ্গায় নেমে গেছে। প্রান্তে একটি নিমগাছ। পাখিকে রাখা হয়েছে সেখানে। তার গায়ের উপর ঢাকা দেওয়া একটি কোরা থান। সারা শরীরটাই ঢাকা। তবু বোঝা যায়, তার পা দুটি গোটানো, হাত দুটি কিছুটা উঁচু। গঙ্গা তার চুল খুলে দিয়েছে। সেই খোলা চুলের গোছা লুটিয়ে রয়েছে নিচেয়।

একটু দেরিতে পৌঁছলেন প্রফেসর।

তাঁকে দেখে এগিয়ে এলেন ডাক্তার ব্যানার্জী।

মুখে আঁচল চেপে রিকু দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে, তার মাথায় হাত স্পর্শ করে প্রফেসর এগিয়ে গেলেন পাখির বাবার কাছে। পাখির বাবা চোখ তুলে তাঁকে দেখলেন, তারপর মুখটা নামিয়ে নিলেন। তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন প্রফেসর।

দুজন পুলিশ অফিসার বাইরে বেরিয়ে এলেন।

চঞ্চল হয়ে উঠল জনতা।

একজন অফিসার এগিয়ে এসে পাখির বাবাকে ডাকলেন।

এবার জনতা আর কোন বাধাই মানল না। তারাও এগিয়ে যেতে চাইল। পুলিশ আটকে দিল তাদের। তবু দুদিক থেকে পাখির দিকে তারা অনেকখানি এগিয়ে গেল।

একজন ডোমকে ডাকলেন অফিসার।

ডোম এসে সন্তর্পণে খুলে দিল পাখির মুখের ঢাকা। অনাবৃত হল হাতদুটিও।

বর্ণহীন ধুসর মুখ। চোখ বুজে আছে পাখি। ঘাড় ঈষৎ তির্যক, যেন বাঁক নিতে চেয়েছে। উত্থিত হাত ঢেউয়ের মত। আঙুলগুলি ছড়ানো; বাঁকা। প্রখর সূর্যে দূরের মাটি বালিয়াড়ির মত চিকচিক করছে। অনন্ত আকাশের নিচেয় পাখি শুয়ে আছে, তার বিস্রস্ত চুলের মধ্যে দিয়ে বইছে গঙ্গা, গঙ্গার রঙে গায়ের কোরা থান মিশে গেছে...

কি যেন বললেন ডাক্তার ব্যানার্জী, প্রফেসর শুনতে পেলেন না।

তাঁর সামনে নিরেট মানুষের ভিড় দাঁড়িয়ে আছে দুধারে, আর তার মাঝে শুধু একটি স্রোত; একটি জলধারা।

অঙ্কন : সুব্রত চৌধুরী

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
গোবিন্দরামের
দুর্গাপূজা
রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

আমাদের দেশে ঐতিহাসিক নথিপত্তর, কোন শহর বা মৌজা বিষয়ক দলিল দস্তাবেজ, পারিবারিক ইতিহাস ইত্যাদির এমনই অভাব যে বলা যায় না। ফলে ছোট বড় যেকোন ব্যাপারের তারিখ ইত্যাদি নিয়ে লাঠালাঠি লেগেই আছে যা বেশির ভাগই ইউরোপীয় দেশে ভাবাই যায় না। ইউরোপের দেশে দেশে সামান্য ছোট শহর বা গঞ্জের সামাজিক জীবন নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে "সরকারি" তথ্য এমন ভাবে পাওয়া যায় তা ভিত্তি করে জগদ্বিখ্যাত বইপত্তরও লেখা হয়েছে।

অথচ কলকাতার কোন বড়লোকের বাড়িতে প্রথম শারদীয় পুজো হয় তার তর্কের এখনও সমাধান হয়নি। অন্তত এটা বলতে পারি যে, তা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

আমি এই লেখায় এই তর্কের মধ্যে না গিয়ে কলকাতার এক প্রাচীনতম বনেদি বাড়ির পুজোর কথা বলবো। আমরা সবাই মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের শোভাবাজারের রাজবাড়ির দুর্গোৎসবের কথা জানি। নবকৃষ্ণ কোথায়, আর ঠিক কবে জন্মেছিলেন সেটি ঠিক জানা যায় না। তবে তাঁর ইংরিজিতে জীবনীর লেখক এন এন ঘোষ মনে করেন যে তাঁর জন্মস্থান গোবিন্দপুর আর তিনি হেস্টিংসের মতন ১৭৩২ সালে জন্মান। কলকাতার এই দেবপরিবারে নবকৃষ্ণর আমল থেকে মহা সমারোহে দুর্গাপুজা শুরু হয় আর এখনও এই পরিবারের দু'তরফে নবকৃষ্ণর আমলের সাবেকি দশভুজার মূর্তি আগেকার তুলনায় টিম টিম করে হলেও সেই পুরনো দিনের মতন শাস্ত্রসম্মতভাবে শুদ্ধাচারে হয়ে আসছে। এখনও পুজোর একপক্ষ কাল আগে থেকে কাশীর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা প্রতি বছর রোজ ভোরে বেদ পাঠ করে থাকেন। স্থানীয় বাঙালি পণ্ডিতরা চণ্ডী পাঠ করেন। শোভাবাজারের রাজবাড়ির দুর্গাপুজো তাই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দু-শ বছরের ওপর ধরে হয়ে আসছে। রাজা নবকৃষ্ণর পুজোয় হয়ত প্রথম সাহেবরা নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন যাঁদের মধ্যে অন্য ইংরেজদের কা কথা স্বয়ং লর্ড ক্লাইভ আর ওয়ারেন হেস্টিংসও ছিলেন। আমি "হয়ত" কথাটা কেন বললাম সে কথায় পরে আসব। তবে এই শক্তির আরাধনা উপলক্ষে সবাই জানেন যে বাগবাজার, চিৎপুর, শোভাবাজার, শ্যামবাজার অঞ্চলের এমন চকমেলানো করিন্থিয়ান, ডরিক বা আয়োনিক থামওয়ালা বাড়ি ছিল না যে সবের মালিক রায়, মল্লিক, দেব, ঠাকুর, মিত্তির ইত্যাদিরা ১৮শ' শতাব্দীর শেষ থেকে ১৯শ' শতাব্দীর বিশ তিরিশ সাল অবধি, সাহেব-বিবিদের আমন্ত্রণ করে ষোড়শোপচারে তাঁদের পুজোও করতেন না।

আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময় গুপ্তিপাড়া বা উলো এ দুটোর কোন একটা জায়গায় বারোইয়ারির শুরু হয়নি আর হুতোমের অমর ভাবে বর্ণিত বারোইয়ারি পুজো কলকাতায় ছড়ায়নি। তবে নবকৃষ্ণর পুজো তাঁর জীবনীকার এন এন ঘোষ লিখেছেন :

The Durga Puja was celebrated in a style which made it a public rather than a private ceremony. It was for the whole town. And the genuinely religious character of the performance was not lost in mere grandeur, in a display of the vanities of the world.

দেবেদের দুর্গা পূজার কথা এতখানি পাড়ার আমার মতলবটা, এটাকে অন্য আর এক বনেদি বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা আর তাঁর প্রতিষ্ঠিত পুজোর কথার চালচিত্র বা ভণিতার মতন ব্যবহার করা। আমি কুমোরটুলির সুবিখ্যাত কালাজমিদার বললেই চলে। ১৮৬৯ সালে "বাই এ মেম্বার অফ দি ফ্যামিলি" নামে তাঁর একজন বংশধর নিজেদের পরিবারের লোকজনের জন্য লাইফ অফ গোবিন্দরাম মিটার অফ কুমারটুলি বলে একটি চটি বই লেখেন যার মধ্যে মাত্র সাত পাতা তাঁর সম্বন্ধে লেখা। সুবল দেবের অভিধানে গোবিন্দরামের কোন হদিশ নেই। স্টার্নডেল সাহেব তাঁর 'অ্যান হিস্টোরিক্যাল এ্যাকাউন্ট অফ দি ক্যালকাটা কালেকটোরেট' বইয়ে এই প্রচণ্ড প্রভাবশালী কর্মিতকর্মা কলকাতার কালাজমিদার

হলওয়েলের বইয়ে মুদ্রিত দুর্গা
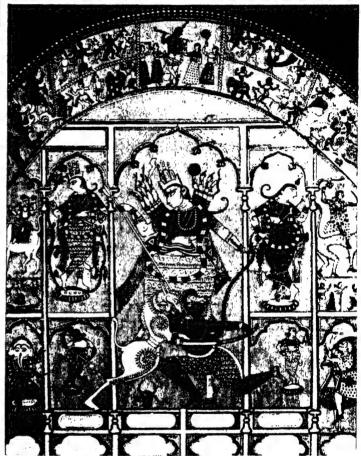
গোবিন্দরাম মিত্তিরের কথা বলছি। সময়ের দিক থেকে গোবিন্দরামের পুজো নবকৃষ্ণর পুজোর চেয়ে অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের বেশি পুরনো।

মহারাজা নবকৃষ্ণর তুলনায় গোবিন্দরাম মিত্র অনেক কম আলোচিত পুরুষ। নবকৃষ্ণর পূর্ণাঙ্গ জীবনী ছাড়া তিনি বড়লাটের মুনশি, সমাজপতি, পণ্ডিত সভা, কবি, তরজাওয়ালা, যাত্রাদলের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে লোকমুখে আর মৃত্যুর পর বহু বিতর্কিত এবং আলোচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর তুলনায় গোবিন্দরাম সম্বন্ধে লেখা বা আলোচনা তাঁর অর্থ, প্রভাব-প্রতিপত্তির তুলনায় নগণ্য সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিয়েছেন যা অত্যন্ত মূল্যবান। পুরনো কাগজপত্রে কলকাতার পুরনো ইতিহাসে তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু জানতে পারা যায়। খুবই আশ্চর্যের কথা গোবিন্দরাম মিত্তিরের নামে কোন রাস্তা নেই। তবে আপার সার্কুলার রোডের ধারে পূর্ব দিকে মানে ২৪ পরগনার দিকে তার নন্দনবাগান বলে একটা বিরাট বাগানবাড়ি ছিল উমিচাঁদের বাগানবাড়ির পাশে, যে বাগান বাড়ির নামে নন্দন বাগান স্ট্রিট বলে একটা রাস্তা আজও গোবিন্দরামের স্মৃতি বহন করছে। তবে তিনি বেঁচে আছেন এক বিখ্যাত ছড়ায় যা তখন

লোকের মুখে মুখে ফিরত। সেটা হল :

বনমালী সরকারের বাড়ি,
গোবিন্দরামের ছড়ি,
উমিচাঁদের দাড়ি,
হুজুরীমলের কড়ি।

আঠারো শতকের কলকাতায় গোবিন্দরামের ছড়িকে ভয় করত না এমন লোক বোধহয় কেউ ছিল না। এছাড়া তাঁর তৈরি কুমারটুলির বিখ্যাত নবরত্ন মন্দির এখনও দাঁড়িয়ে আছে যার আদত ছবি টমাস আর উইলিয়াম ড্যানিয়েল তাঁদের বিখ্যাত 'টুয়েলভ ভিউস অফ ক্যালকাটা'তে 'গোবিন্দরাম মিটারস্ প্যাগোজ' বলে অমর করে রেখেছেন। তাঁরা ছবিটা ১৭৮০-র দশকের শেষের দিকে আঁকেন।

গোবিন্দরামের দুর্গাপুজোর কথা বলার আগে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত আর জীবনকথা সংক্ষেপে বলা দরকার। গোবিন্দরামের জন্মতারিখও নবকৃষ্ণর মতন রহস্যাবৃত। তাঁর যে বংশধর তাঁর জীবনী নমো নমো করে ছুঁয়ে গেছেন তা ভুলে ভর্তি। তিনি লিখেছেন যে গোবিন্দরামের নামে গোবিন্দপুর গ্রামের নাম হয়। দ্বিতীয়ত, যে ১৬৮৬-৮৭ সালে গোবিন্দরাম জোব চার্নকের নজরে পড়ে বারাকপুরের কাছে চার্নক গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় কুমোরটুলিতে এসে কোম্পানির চাকরি নেন। স্টার্নডেল সাহেব এই ব্যাপারটাকে একেবারে আজগুবি বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কারণ তাঁর মতে যদি ১৬৮৬-৮৭ সালে গোবিন্দরামের বয়স পঁচিশও হত তা হলে তিনি যখন (স্টার্নডেলের মতে) ১৭৭৩ সালে মারা যান তখন তাঁর বয়েস হয়েছিল ১১২। তাছাড়া তাঁর জীবনীকারের মতে তিনি যদি ১৭৬৬ সালে মারা যেতেন তা হলেও তাঁর বয়স তখন হত ১০৩। রাধারমণ মিত্র মশাই লিখেছেন যে, গোবিন্দরাম ১৭৭৩ অবধি বেঁচে ছিলেন তার 'প্রমাণ আছে।' কিন্তু প্রমাণটা কি তা অবশ্য বলেননি।

এইবার গোবিন্দরামের চাকরি জীবনের কথায় আসা যাক। ১৭২০ সালে কলকাতায় জমিদার পদের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ কলকাতার খাজনা আদায়ের জন্যে একজন কালেক্টার বা জমিদার বহাল করা হয়। রাধারমণবাবু লিখেছেন যে স্টার্নডেল বলেছেন কাগজপত্তর নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যে কে প্রথম কলকাতার ইংরেজ জমিদার হন তা তিনি জানতে পারেননি। তবে মিত্তির মশাই বলেননি যে স্টার্নডেল এই সব কথা বলার পর অনুমান করেন যে প্রথম সাহেব জমিদারের নাম ছিল ফ্রিক।

গোবিন্দরাম ১৭২০ সাল, মানে একেবারে প্রথম থেকে ১৭৫৬ সাল অবধি ডেপুটি জমিদার বা কালাজমিদারের কাজে বহাল ছিলেন। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। কারণ 'অন্ধকূপ হত্যা কুখ্যাত' হলওয়েল তাঁকে ১৭৫৩ সালে চাকরি থেকে খারিজ করেন। তবে তারপর কাউন্সিল তাঁকে আবার ১৭৫৬ সাল অর্থাৎ সিরাজের কলকাতা আক্রমণ পর্যন্ত চাকরিতে বহাল করেন। তারপর সিরাজের বিতাড়নের পর গোবিন্দরাম ডেপুটি ফৌজদার বা পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন।

মহিষাসুরমর্দিনী। বেলুর : ১২শ শতাব্দী

প্রায় ৩৬ বছর কালাজমিদার আর তারপর ডেপুটি ফৌজদার থাকার সময় গোবিন্দরামের প্রতিপত্তির কথা ভাবা যেত না। অতএব তাঁর নাম শুনলেই লোকে ভিরমি খেত বললে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। নবকৃষ্ণ, নকুধর, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেবী সিংহ, কান্ত মুদী ইত্যাদি ওয়ারেন হেস্টিংসের পঞ্চপাণ্ডব আর পলাশীর আগে তিনিই বাংলা দেশে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম করার একজন প্রধান দেশি পুরুষ ছিলেন।

বলার দরকার নেই যে ইংরেজদের তাঁবেদারির পেছনে এইসব লোকদের দুটি মতলব ছিল। সে দুটি হল : ক্ষমতা আর টাকা। স্টার্নডেল সাহেব তাঁর উপরোক্ত 'অ্যান হিস্টোরিক্যাল এ্যাকাউন্ট অফ দি ক্যালকাটা কালেকটোরেটে' গোবিন্দরাম সম্বন্ধে লিখেছেন যে, কালাজমিদার গোবিন্দরাম মিত্র এত দীর্ঘদিন ধরে এই রকম ক্ষমতার জোরে বিশাল টাকা করেন। তবে তিনি বলেছেন যে, এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে তাঁর মহামান্য সাদা মনিবদের বিশেষ ফারাক ছিল না। যদিও সাহেবদের তুলনায় গোবিন্দরামের টাকা করার সুযোগ সুবিধে বেশি থাকায় সে সবের আরও সদ্ব্যবহার করেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় মন্দির তৈরি আর জাঁকজমক করে পুজো আর নানারকম ধর্মানুষ্ঠান করে অপরিমিত টাকা খরচ করতেন। স্টার্নডেল লিখেছেন যে, তাঁর মতন বিরাট আড়ম্বরে পুজো-পার্বণ কলকাতায় আগে কেউ বোধ হয় দেখেন নি। আমরা এর আগেই তার কুমোরটুলির ১৭৩০ সন নাগাদ তৈরি 'নবরত্ন' মন্দিরের কথা বলেছি যার আসল চুড়োটা ১৬৫ ফুট উঁচু অক্টারলোনি মনুমেন্টের (যতীন চক্রবর্তীর এখনকার লাল টুপি পরা শহিদ মিনার) চেয়ে উঁচু ছিল। সেই উঁচু চুড়োটা ১৭৩৭ সালের বিখ্যাত ঘূর্ণিঝড় আর ভূমিকম্পের সময় ভেঙে যায়।

গোবিন্দরামের দুর্গাপুজোর যেটুকু বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে পুজার একপক্ষ কাল আগে থেকে বোধন হত। বোধন ব্যাপারটা বিশেষ করে এর আনুষঙ্গিক সঙ্গীত আগমনী গান কলকাতা কেন সারা বাংলার গ্রামগঞ্জ থেকে আজ বহুদিন হল উঠে গেছে বলে এখানে এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে দু চারটে কথা বলা দরকার।

আমরা সবাই জানি শারদীয়া পুজাকে অকাল বোধন বলা হয় যার সঙ্গে রামের নামও চিরকালের জন্যে যুক্ত হয়ে আছে। এর পেছনকার তত্ত্ব সহজভাবে হল এই—শরৎকালে সূর্য দক্ষিণায়নে থাকেন। এটা দেবনিদ্রার কাল। এই সময়ে দেব-দেবীগণকে জাগ্রত করবার জন্য বোধন করতে হয় যার নাম অকালবোধন। তন্ত্রমতে এই দেবীকে জাগানোর সঙ্গে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শক্তির সঙ্গে এক করা ইত্যাদি গুহ্য তত্ত্বের মধ্যে যাওয়া আমাদের সাধ্যাতীত। অতএব শারদীয়া পূজার পেছনে যে নানান সাধারণ প্রচলিত কাহিনী আছে আমি তারই মধ্যে নিজেকে নিবদ্ধ রাখব।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শারদীয়া পূজা নামে সুবিখ্যাত প্রবন্ধে নানান গূঢ় ও গভীর দার্শনিক আলোচনার পর বলেছেন, "মা"-কে জাগাই ভাব দিয়া— তাই মাকে আগমনী গান শুনাইতে হয়; মাকে কন্যারূপে আহ্বান করিতে হয়।...কন্যাকে ডাকিবার কালাকাল নাই, যখন ইচ্ছা, তখন মেয়েকে ডাকিতে পার, আর সেই সময়ে জনকের ডাকে নাচিতে নাচিতে সোহাগে আদরে গলিয়া ঢলিয়া বাপের কোলে আসিয়া উপবেশন করেন ...তাই শরতের আগমনী কন্যার পিতৃগৃহে আগমন বিশেষ..."

বলা বাহুল্য আমরা বাঙালিরা শারদীয় পুজাকে বৎসরান্তে মেয়ের বাপের বাড়ি আসার মতন করে দেখি। তাঁর আসার এক পক্ষকাল আগে থেকে সারা বাংলার আকাশ বাতাস আগমনী গানে মুখরিত হয়ে থাকত। আগমনী গান যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কত গ্রাম্য কবি নাড়ির টানে কত হাজার হাজার লিখেছিলেন তার কোন হিসেবে নেই। পাঁচকড়ি সত্যিই বলেছেন যে, "এই আগমনীর মধ্যে বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের একটি

অতি সুন্দর ছবি ফুটান আছে ; ঝি জামাইয়ের আদর ; ঝিয়ের বাপের বাড়ীর প্রতি মমতার বোধ, মায়ের কন্যার প্রতি পরবল স্নেহ—বাঙ্গালীর বাঙালীত্বের ইহাই বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতাকে পুরাণের গল্পের সহিত মিশাইয়া বাঙ্গালী কবিরা এক অপূর্ব, অতুল্য কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই অপূর্ব্ব কাব্য—আগমনী।"

এক সময় ছিল যখন এমন কোন বাঙালি পাওয়া শক্ত ছিল, লোকে বাঙালি মা-র এই অনবদ্য হৃদয়ের ভাবের কথা জানতেন না :

"এবার আমার উমা এলে
আর আমি পাঠাব না,
বলে বলবে লোকে মন্দ
কারু কথা শুনব না।
আমি শুনেছি নারদের মুখে
উমা আমার থাকে দুঃখে,
শিব শ্মশানে মশানে ঘোরে
ঘরের ভাবনা ভাবে না।
যদি আসেন মৃত্যুঞ্জয়
উমা নেবার কথা কয়,
তখন—মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া,
জামাই বলে মানবো না।"

গোবিন্দরামের বোধন আগমনী সঙ্গীতের কথার থেকে আমরা বাঙালির দুর্গাপূজার বিশিষ্টতা ইত্যাদি অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। এখন গোবিন্দরামের কথায় ফিরলে বলতে হয় যে তাঁর পূজার বোধন দেবীপক্ষের আগের কৃষ্ণপক্ষের নবমীর দিন থেকে শুরু হত। এই বোধনের সময় গোবিন্দরাম হাজার জন ব্রাহ্মণ আর পণ্ডিতদের কাপড় রূপো আর তামার জিনিস দান করতেন। পুরনো কলকাতার পূজো সম্বন্ধে যাঁরা কৌতূহলী তাঁরা জানেন গোবিন্দরামের মতন পরের সমস্ত বনেদি বাড়িতে পুজোটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া একটা বিরাট সামাজিক আর আনন্দোৎসব ছিল। গোবিন্দরামের জীবনীকার লিখেছেন—বোধনের শুরুর দিন থেকে এক পক্ষকালের জন্যে তিনি পরবর্তী যুগের নিকি, মুন্নু, উসরুন বাঈদের মতন নামজাদা আর নৃত্যগীতলীলা পটিয়সী বাঈজিদের ভাড়া করে নিমন্ত্রিত আর রবাহুতদেরও আনন্দ বর্ধন করতেন। আমি এর আগে নবকৃষ্ণের পুজোর উপলক্ষে লিখেছি যে তিনিই "বোধ হয়" প্রথম পুজোয় সাহেব তোষণের রীতি চালু করেন। "বোধ হয়" কথাটার ব্যবহার করেছিলাম এই জন্যে যে গোবিন্দরামের জীবনীলেখক এ সম্বন্ধে কিছু লেখেননি। তবে এটা অসম্ভব নয় যে তাঁর মতন পাকা লোক পুজোর মতন একটা বিরাট উপলক্ষে জ্যান্ত দেবদেবী সাহেব-বিবি 'পুজো' করার সুযোগ ছেড়ে দেবেন তা ভাবা একটু শক্ত। তাই প্রথম দিকের সাহেব জমিদার থেকে গোবিন্দরামের শেষ মনিব হলওয়েল পর্যন্ত সকলেই পুজোতে তাঁর বাড়িতে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। এরপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমি হলওয়েল আর গোবিন্দরামের পুজোর কথায় ফিরে যাব।

গোবিন্দরামের পুজোর দেবী মূর্তির কথা বলার আগে আমরা আজ কয়েকশো বছর ধরে বাংলায় যে দেবী মূর্তির আরাধনা করে আসছি তার বিশিষ্টতার কথা বলা দরকার। সবাই জানেন যে আমাদের দুর্গাপূজার সময় আসমুদ্র হিমাচলের নানান জায়গায় কাশ্মীর থেকে তামিলনাড়ুতে যে নবরাত্রি উৎসব হয় তাতে কোন প্রতিমা থাকে না। তবে মা দুর্গার মহিষমর্দিনী মূর্তি বহু পুরাতন। আমি এখানে কয়েকটি বিখ্যাত মহিষাসুরমর্দিনীরূপিণী ভাস্কর্যের কথা বলছি। যেমন বাদামির কাছাকাছি ষষ্ঠ শতাব্দীর আইহোলের মন্দিরের দুর্গামূর্তি, ৭ম শতাব্দীর মহাবলীপুরমের সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী দেবী, বেলুড়ের ১২শ শতাব্দীর দুর্গা আর জাভার ১৩শ শতাব্দীর লাইডেন দুর্গা ইত্যাদি।

বাংলার মাদুর্গার সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী রূপটি এইসব দুর্গার সঙ্গে মূলত এক। কিন্তু বাঙালির শিল্পী—কবি, দরদী মন এই মূর্তিকে স্নেহময়ী কন্যারূপে দেখে তাঁদের কল্পনা দিয়ে আরও কয়েকটি মূর্তি যোগ করে এক অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি করেছেন যার তুলনা বিরল। দুর্গা যখন মা-বাবার কাছে বাপের বাড়ি যাচ্ছেন এটা কল্পনা করা অসম্ভব যে তিনি তার ছেলেমেয়ে কার্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী-সরস্বতীকে সঙ্গে করে আনবেন না। ইংরিজিতে একটা কথা আছে মানুষ তার কল্পনার দেব দেবীকে নিজেদের আদলে গড়ে। বাঙালির দুর্গামূর্তি তার একটা প্রমাণ। কিন্তু দুর্গার শক্তিরূপী মহিষমর্দিনীর ঐতিহ্য থেকে সরে গিয়ে (সঙ্গে বাঙালিরা যে মা দুর্গার ছেলেমেয়েদের ঢুকিয়ে) এই যে নতুন আইকোনোগ্রাফি করলেন তা প্রতিমার বিশুদ্ধতা আর শিল্পসুষমার এক অপরূপ সমন্বয়। কিন্তু আজকের কলকাতার বারোয়ারি 'আর্টের' ঠাকুর সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই সব মূর্তি বর্বরতার প্রতীক। গোবিন্দরাম মিত্তিরের বাড়ির দুর্গার কিন্তু এই এক মেড়ে দুর্গা আর অন্যান্য প্রতিমার উপরোক্ত চেহারা থেকে খানিকটা তফাত ছিল। তিনি দুর্গা আর অন্যান্য দেব দেবীর মূর্তিগুলিকে একেবারে

জাভার সিঙ্গসারিতে অবস্থিত দুর্গামূর্তি

শাস্ত্রসম্মতভাবে তৈরি করাতেন। কিন্তু অন্যান্য দুর্গার মতন হরতুকীর হলদে রঙে প্রতিমাদের রঙ না করিয়ে তিনি সোনা আর রূপোর পাত দিয়ে তাঁদের গা মুড়িয়ে দিতেন।

তার চেয়ে বড় কথা গোবিন্দরামের বংশধর লিখেছেন যে, তাঁর পুজোয় অসুরকে ধরলে সাতটি মূর্তি থাকত। অর্থাৎ দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ আর মহিষাসুর ছাড়া গোবিন্দরামের পুজোয় এঁদের সঙ্গে মহাদেবের বিগ্রহও থাকত। একথা অবশ্য ঠিক যে সাধারণ সাবেকি দুর্গামূর্তিতেও মহাদেব থাকেন। তবে সেটা চালচিত্রের ছবিতে মা দুর্গার মাথার ওপর। গোবিন্দরাম কেন শিবের মূর্তি তাঁর পুজোয় ঢোকাতেন তা বোঝা শক্ত। কিন্তু আমাদের দেশে যেকটি অকাল বোধনের প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী আছে তা দিয়ে মহাদেবের দর্গাপুজোয় বিগ্রহরূপে উপস্থিত থাকার কথা নয়। আমার মনে আছে যে ছেলেবেলায় কটকে দুর্গাপুজোর সময় যে অজস্র ঠিক হুবহু বাংলাদেশের মতন ঠাকুর তৈরি হত তবে তার মধ্যে দু-একটা মণ্ডপে কি কারণে জানি না মহাদেবের মূর্তি গড়ে তাঁর পুজো হত। কিন্তু সেখানেও কোথাও মা দুর্গার সঙ্গে এক মেড়ে মহাদেবের মূর্তি কখনও দেখিনি। অবশ্য পুরনো বাংলা লিথোগ্রাফ ইত্যাদিতে দুর্গার নানারকম ছবি দেখেছি যেমন দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা, কিংবা কোলে কাঁখে ছেলেমেয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

দুর্গাপুজোয় শিবের বিগ্রহ কেন থাকত তা নিয়ে গোবিন্দরামের বংশধর কোন কথা লেখেন নি। এর পেছনে কী শাস্ত্রীয় অনুমোদন ছিল তা বলা বাহুল্য আমার বিদ্যের বাইরে।

গোবিন্দরামের প্রতিমাশিল্পীরা প্রথমে প্রত্যেকটি মূর্তি আলাদা আলাদা করে তৈরি করে রাখতেন। তারপর পুজোরআগে পাঁচ ভাগে ভাগ করা একটা বড় রূপোর সিংহাসনে এক মেড়ের তলায় মূর্তিগুলিকে সাজানো হত। পাঁচটা কামরায় বাহনসমেত এই সাতটা মূর্তিকে কি ভাবে সাজানো হত তার কোন লিখিত বর্ণনা গোবিন্দরামের ক্ষুদ্রাকৃতি জীবনীতে নেই।

তবে এই সাজানোর ব্যাপারে আমি একটা ছবির ওপর নির্ভর করে গোবিন্দরামের দুর্গার সামগ্রিক মূর্তির বর্ণনা দেব, যা বিতর্কের বিষয় হলেও—আমার অনুমান গোবিন্দরাম মিত্তিরের দুর্গার ছবি। সেই ছবিটি এই লেখার সঙ্গে ছাপানো হল যার জন্যে আমি আমার বন্ধুবর বিভাস গুপ্ত মহাশয়ের কাছে ঋণী। এই ছবিটি হলওয়েলের বিখ্যাত হিন্দুধর্ম আর হিন্দুদের বিষয়ে ছাপা বই থেকে নেওয়া। আমি আগেই লিখেছি এটা খুবই সম্ভব হলওয়েল হয়ত গোবিন্দরামের আগের সাহেব কলকাতার জমিদার মনিবদের মতন নিমন্ত্রিত হয়ে গোবিন্দরামের বাড়ির পুজো দেখতে গিয়েছিলেন। এটাও ঠিক যে হলওয়েল সাহেবের হিন্দুধর্ম, দেবদেবী ইত্যাদি সম্বন্ধে গভীর উৎসাহ ছিল। তাই এই লেখার সঙ্গে ছাপা ছবিটির আঁকার ধরনে মনে হয় যে হলওয়েল কোন বাঙালি পোটোকে দিয়ে গোবিন্দরামের দুর্গার ছবি আঁকিয়ে বিলেতে

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের একটি লিথোগ্রাফে মহিষাসুরমর্দিনী

খোদাই করে ছাপান। এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, ওটা গোবিন্দরামের বংশধরবর্ণিত সবকটি বিগ্রহ আর এক মেড়ের তলায় পাঁচ কামরায় প্রতিমাগুলোকে সাজানো বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। কেবল একটি ব্যাপার ছাড়া. সেটা হল যেমন লক্ষ্মীর বাঁ পাশে রূপোর সিংহাসনের একদম বা কামরায় গণেশের ওপর মহাদেবের মূর্তি আছে তেমনি এই সিংহাসনের একেবারে ডান পাশের কামরায় কার্তিকের ওপর রামের মূর্তি আছে। এই রামের মূর্তির কথা গোবিন্দরামের বংশধর তাঁর কয়েক লাইনের মিত্তির বংশের দুর্গার বর্ণনায় বলেননি। অর্থাৎ তাঁর মতে দুর্গাকে নিয়ে সবশুদ্ধ বিগ্রহ ছিল সাত, আটটি নয়। তাঁর কথা

দুর্গা ও মহিষাসুরের যুদ্ধ। মামল্লপুরম। ৭ম শতাব্দী

অভ্রান্ত ধরলে অবশ্য হলওয়েলের বইয়ের দুর্গামূর্তি যে গোবিন্দরামেরই দুর্গার মূর্তি এই অনুমানটা নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু এই লেখক গোবিন্দরামের অন্যান্য বংশধরদের কথা বাদ দিলেও স্বয়ং গোবিন্দরাম সম্বন্ধে কয়েক পাতায় এত মোটা মোটা ভুল করেছেন আর এত ঘটনা বাদ দিয়েছেন যে তাতে তাঁর দুর্গার বর্ণনাকে নিখুঁত আর সম্পূর্ণ বলে না মনে করলেও, সে অনুমানটা খুব ভিত্তিহীন হবে না। সে যাই হোক আমরা যদি হলওয়েলের বইয়ের দুর্গার ছবিটি গোবিন্দরামের দুর্গার মূর্তির কাছাকাছিও বলে ধরি তা হলে পুজো মণ্ডপে তাঁর সামগ্রিক চেহারাটা কি রকম জ্বলজ্বলে, ঝলমলে আর রাজকীয় হত তা ভাবতে বিশেষ কষ্ট হয় না। গোবিন্দরামের বংশধর ঠিকই লিখেছেন যে, 'গোবিন্দরামের দুর্গা ছিলেন বিউটিফুল, ব্রিলিয়ান্ট অ্যান্ড ডিভাইন ইন অ্যাপিয়ারেন্স।'

এটা বড় আফসোসের কথা গোবিন্দরামের পুজোর জাঁকজমকের কথা তাঁর জীবনীকার তাঁর 'বোধন' প্রসঙ্গে ছুঁয়ে গেলেও আর বিশেষ কিছু লেখেন নি। তা করলে গোবিন্দরামের পুজোর সামাজিক মিলন আর আনন্দোৎসবের দিকটার সঙ্গে পরবর্তীকালের নবকৃষ্ণ আর অন্যান্য বড়লোক বাড়ির এই দিকগুলোর ধুমধামের সঙ্গে একটা বেশ তুলনামূলক বিশদ ছবি পাওয়া যেত। তবে আমি আগে যা বলেছি তা থেকে মনে হয় যে দুর্গোৎসবে মুসলমান বাঈজী আর তয়ফাওয়ালি, সাহেব আমন্ত্রণ ইত্যাদি রীতির গোবিন্দরামই একজন আদি প্রবর্তক ছিলেন।

তবে ধুমধাম আর আমোদপ্রমোদ যতই হোক না কেন সব পারিবারিক পুজোর মতন গোবিন্দরামের বাড়িতেও একেবারে শুদ্ধাচারে শাস্ত্রসম্মতভাবে পুজো হত তাতে পান থেকে এতটুকু চুন খসবার অবকাশ থাকত না। তবে ধনকুবের গোবিন্দরামের বাড়িতে পুজোর আড়ম্বরটা ছিল বিশাল। যেমন যে তামার থালায় গোবিন্দরামের দুর্গার নৈবেদ্য সাজানো হত তার এক একটায় তিরিশ থেকে পঞ্চাশ মণ করে চাল ধরত। এর থেকে গোবিন্দরামের পুজোর অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের বহরের একটা আঁচ পাওয়া যায়। গোবিন্দরামের বংশধর লিখেছেন যে, তাঁর সময়ে অর্থাৎ গোবিন্দরামের আমলের প্রায় দেড়শ বছর বাদে এই সব দৈত্যাকৃতি থালাগুলোর কিছু কিছু তিনি মিত্তিরবংশের এ তরফ ও তরফের আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে দেখেছেন।

তারপর পুজো শেষ হয়ে বিসর্জনের সময় এলে মা দুর্গা আর অন্যান্য প্রতিমাগুলিকে আলাদা আলাদা করে ঝলমলে পাল্লাঝালর দেওয়া মহাপায়া চান্দোল, পালকি, নালকি ইত্যাদি করে মহাসমারোহ করে গঙ্গায় ভাসান দিতে নিয়ে যাওয়া হত। গ্যাসের আলো আসারও একশ বছরের আগে সেই বিসর্জনের গীতিবাদ্যমুখর শোভাযাত্রা নিশ্চয়ই বিস্ময় আর সজল চোখে হাজার হাজার লোক ভক্তিভরে হাত জোড় করে দেখতেন।

রথযাত্রা

বারীন রায়

রথের রশিতে পড়েছে টান। ছবি : লেখক

যে কোন উৎসবের মূল কথাটি হল আনন্দ। একান্ত পারিবারিক উৎসব থেকে জাতীয় উৎসব পর্যন্ত ওই একই কথা আনন্দ— আনন্দোৎসব। আনন্দের আবেগে মানুষ নিজেকে খুলে দেয়, মেলে দেয়— মিলতে চায় অপরের সঙ্গে। মানুষে মানুষে এই মিলনেই উৎসব সার্থক। উৎসবের বহিরঙ্গটি আমরা দেখতে পাই মেলার ভিড়ে। অনেক মানুষ একত্র মেলে বলেই মেলা বসে।

যখন মনে করি গোটা ভারতবর্ষটা আমার দেশ, আমি ভারতবাসী তখন ত কই পুরনো ঐতিহ্য নিয়ে এমন একটা কোন উৎসবকেও মনে করতে পারি না যাকে বলতে পারি আমাদের জাতীয় উৎসব। তবে উৎসব আছে বৈকি। বড় বড় উৎসব, আছে বড় বড় মেলা। ভারতের সর্বত্রই কোথাও না কোথাও বছরের কোন না কোন সময়ে উৎসব পালিত হচ্ছে। এ সমস্ত উৎসব মোটামুটি প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক এবং বেশীর ভাগই মূলত ধর্মীয়।

দেবতাকে নিয়ে অথবা ঈশ্বরীয় কোন লীলাকে স্মরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ উৎসব করে। যে দেবতা অথবা যে ধর্মীয় ভাবটি যত সর্বজনীন— উৎসবের সার্বজনীনতা তত বেশী।

বাঙালীর সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গা পুজোকে ঘিরে— আজ যা প্রায় বাঙালীর জাতীয় উৎসবের চেহারা নিয়েছে—বলা চলে যেখানেই বাঙালী সেখানেই দুর্গোৎসব —তা সে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই হোক। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী আরও কয়েকটি উৎসব করে আজও যেগুলো অনেকদিন থেকে চলে আসছে যেমন দোল, যেমন রথযাত্রা।

রথের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি শৈশবেই। মনে পড়ে সেদিন সকালটা ছিল মেঘলা। এক রাশ ফুল হাতে করে বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে মাকে সামনে পেয়ে বাবা বলল, নদীর ধারের গাছটায় ফুটেছিল, ভেঙে আনলুম। অতগুলো সুন্দর ফুল দেখে আমাদের সে কি আনন্দ, আর ফুলগুলোর হালকা কেমন একটা মন কেমন কেমন করা গন্ধ। বাবা বলল আজ যে রথ। কদম ফুলেই আজ নারায়ণের পুজো হবে।

বেশির ভাগ পুজোর জন্যে রেখে কিছু ফুল নিয়ে বাবা বসল রথ বানাতে আমাদের জন্যে। আমরা বসলুম বাবাকে ঘিরে। নতুন নারকোল কাঠিতে ফুল গেঁথে গেঁথে কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হল সুন্দর একটি রথ। রথের চূড়োয় একটি

কাঠিতে রঙিন কাগজ আটকে ধ্বজাও তৈরি হল। সেই রথে দড়ি বেঁধে বাবা দেখিয়েও দিল কেমন করে রথ টানা হয়। এর পর ভাই-বোন মিলে পালা করে করে আমাদের চলল রথটানা,লম্বা দালানের এধার থেকে ওধার আবার ওধার থেকে এধারে। ফুল আর কাঠির রথ কতক্ষণ আর সইবে অত্যাচার। খানিক পরে রথ গেল ভেঙে— আমাদের খেলাও শেষ। আমার স্মৃতিতে রথটানার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এইভাবে। এর পর কয়েক বছর বাদে ঠাকুমার হাত ধরে মাহেশের রথ দেখতে যাই। কি বিশাল রথ, আর রথের সেই মেলা— কোথায় লাগে আমাদের গ্রামের চড়কের মেলা— তখনও পর্যন্ত মেলা বলতে ওই চড়কের মেলা দেখারই অভিজ্ঞতা ছিল আমার। কত রকম জিনিসের বড় বড় সাজানো দোকান— কোথাও শুধু বেতের ধামা, কোন দোকানে শুধু পাথরের বাসন, তারপর গাছ ফুল পাখি সব এলাহি কাণ্ড। তবে এখানেও সেই একটা জিনিস আছে যা চড়কের মেলাতেও

পুরীর রথযাত্রা উৎসবে বাংলার বাউল। ছবি : দেবাঞ্জন সুর

দেখেছি— গোল গোল বড় বড় পাঁপড় ভাজা সাজিয়ে রেখেছে এমনভাবে ইচ্ছে করে একটা কিনে খাই। ছোটবেলার রথের মেলা দেখার সেই স্মৃতি আজও মোছেনি মন থেকে। ভিড়ের চাপে পিষে যাবার ভয়ে সেবার রথটানা পর্যন্ত আর অপেক্ষা করেনি ঠাকুমা।

মাহেশের এই রথ আজকের নয়, বেশ পুরনো। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় পাওয়া যায়, 'রাধারানী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল।' মাহেশের রথযাত্রা আজও সমান সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। মহিষাদলের রথও শুনেছি বেশ বড় আর অনেকদিন থেকে চলে আসছে।

পশ্চিমবঙ্গে ইদানীংকালে রথযাত্রা উৎসবের থেকেও রথের মেলার দিকটাই বড় হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের কাছে। অনেক জায়গায়ই ছোট-বড় মেলা বসে রথের। কলকাতাতেও অনেকগুলি ছোট ছোট রথের মেলা প্রতি বছরই বসে বিভিন্ন জায়গায়, তবে সেখানে রথ টানার ব্যাপারটা নেহাৎই গৌণ। রথের দিন পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখা যায় কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে ছোট্ট টিনের রথ টেনে টেনে নিয়ে যেতে। ভেতরে ছোট্ট জগন্নাথ মূর্তিও থাকতে দেখেছি, ফুল দিয়ে সাজানো।

বছর কয়েক হল, কলকাতায় রথযাত্রা নিয়ে নতুন একটা হাওয়া এনেছে ইস্কনের সায়েবদের রথ। রথের বেশ কয়েকদিন আগে থেকে কলকাতার ভিন্ন ভিন্ন রাস্তার মোড়ে বিরাট বিরাট বিজ্ঞাপন দিয়ে সর্বসাধারণকে জানাবার চেষ্টা হয় কোথা থেকে বেরিয়ে কোন রাস্তা দিয়ে রথ কোথায় গিয়ে পৌঁছবে কোথায় হবে এবার মাসীর বাড়ী। রথও শুনেছি অভিনব। যখনই প্রয়োজন নিচু করে ফেলা যায় হাতে কল ঘুরিয়ে। বড় বড় রঙিন পুতুলের মাধ্যমে মহাপ্রভুর বা শ্রীকৃষ্ণের

'পহণ্ডি' অনুষ্ঠান। ছবি : দেবাঞ্জন সুর

বিশেষ বিশেষ লীলাকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়— এই পুতুলগুলি রথের সঙ্গে সঙ্গে চলে লম্বা লম্বা গাড়িতে সাজিয়ে। রথাগ্রে চলে নাম সঙ্কীর্তন শ্রীখোল করতাল সহযোগে। ইস্‌কনের এই রথযাত্রা দেখবার জন্যে পথের দুধারে লোক ভেঙে পড়ে।

শুধু কলকাতায় নয়, ইস্‌কনের কল্যাণে আজ পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তেও বড় বড় শহরের রাস্তায় জগন্নাথের রথ চলে সমারোহে।

ইস্কুলে পড়তে বন্ধুদের সঙ্গে বার দুয়েক সেই যে মাহেশে রথ টানা দেখেছিলুম তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। মনটাই পালটে গিয়ে থাকুক অথবা কাজের জগতে আটকা পড়েই হোক রথ দেখতে যাওয়ার কথা মনেই হয়নি এ যাবৎ। জানি প্রতি বছরই রথযাত্রা হয়— সোজা রথ উল্টো রথ কিন্তু সে সবই ক্যালেন্ডারের পাতায়।

বহুকাল পরে আবার রথ দেখার সুযোগ এলো আকস্মিকভাবে। আমার বন্ধু অজান্ত একদিন সন্ধ্যেয় আমাদের বাড়ি এল। কথায় কথায় প্রকাশ পেল স্বামী-স্ত্রী ওরা পুরী যাচ্ছে। সব ছুটিছাটা শেষ। এমন সময় পুরী ? বলল রথ দেখতে যাচ্ছে।

রথের কথা শুনে আমার মনে পড়ল রাধাকান্ত মঠের পণ্ডিত শ্রীহেমাঙ্গপ্রসাদ দাসশাস্ত্রী, সবাই ডাকে পণ্ডিতমশাই বলে সেবার বলছিলেন,আপনি এতবার পুরী আসেন। একবার রথের সময় আসুন না। রথের সময় কত যে আনন্দ হয় তা বলে শেষ করা যায় না।

আমি বললুম অত ভীড়ে আমার ঠিক আনন্দ জমে না। পণ্ডিত মশাই তবু বললেন, ভীড় ত আপনার কি ? আপনি ত থাকবেন আমাদের সঙ্গে। যদি আসেন তাহলেই বুঝতে পারবেন পুরীতে এসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব দেখতে পাওয়া বড় ভাগ্যে হয়। আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু যে বিশেষ লীলা প্রকাশ করতেন এই রথযাত্রার সময়। বড় আনন্দ, আহা বড় আনন্দ।

এই মুহূর্তে পণ্ডিতমশাই-এর সেদিনকার কথাগুলি যেন জোরে জোরে বাজতে লাগল আমার কানে আর মনে মনে এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলুম। অজান্তকে আমরা ডাকি অজু বলে। অজুকে বলেই ফেললুম তোমাদের সঙ্গে আমাকেও নিয়ে চল না। শুনে ও লাফিয়ে উঠল আনন্দে 'সে ত খুব ভাল কথা, আমি ত ভাবতেই পারিনি। আপনি কাজকর্ম ফেলে যেতে পারবেন এত শর্ট নোটিশে।' ঠিক হয়ে গেল ওরা আগে রওনা হয়ে সব ব্যবস্থাদি করে রাখবে। তারপর রথের চারদিন বাকি থাকতে আমি গিয়ে পৌঁছব।

আমি রথ দেখতে পুরী যাচ্ছি শুনে সঙ্গী হল ভাগনে অরুণ আর আমার ছোট ভাই-এর মত দেবাঞ্জন— ডাক নাম ভজু। আমার যেমন ওরও তেমনি ছবি তোলার শখ প্রচণ্ড। শুধু ত রথ দেখলেই হবে না, সেই সঙ্গে ছবিও তুলে আনতে হবে। আমার স্ত্রী মঞ্জুলা ইস্কুল থেকে ছুটি নিতে চাইল না। ও সঙ্গে যেতে পারবে না তাই আমার দেখাশোনার ভার দিয়ে সঙ্গে দিল গোবিন্দকে।

মহা উৎসাহে সব গোছগাছ করে নিয়ে তিনটে ক্যামেরা আর টেপ্ রেকর্ডার ঘাড়ে করে আমরা চারজন জগন্নাথ এক্সপ্রেসে চড়ে বসলুম। ভোরবেলা পুরী স্টেশনে পা দিয়েই চারিদিক তাকিয়ে টের পেলুম রথের ভিড় কাকে বলে। টিকে নেওয়ার সার্টিফিকেট সঙ্গে ছিল। তাই স্টেশন থেকে বেরুতে বিশেষ হুজ্জোত হল না। পথে রিক্সার মিছিলে আমরা সামিল হলুম অন্য সময়ের থেকে প্রায় ডবল ভাড়া কবুল করে। 'রথের টাইমে বাবু আমরাও ত দুটো পয়সা কামাব' রিক্সাওয়ালার বক্তব্য।

পথের দু পাশে শুধু মানুষ আর মানুষ। হবেই ত। ভারতবর্ষের কোথা থেকে না লোক আসে— ধনী দরিদ্র সবাই জগন্নাথকে একটিবার রথের ওপর দেখবে বলে, একবারটি শুধু রথের দড়িতে হাত লাগিয়ে জন্ম সার্থক করবে বলে। শাস্ত্রে যে আছে পুরীতে জগন্নাথের রথযাত্রা দর্শন করলে যে

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে পুণ্যস্নান

যা চায় তাই পায়। চাই কি, সাক্ষাৎ স্বর্গলাভ, সাক্ষাৎ মোক্ষলাভ। 'রথেচ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।'

আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। মনের মত জায়গা মিলল। হোটেলের ঘর প্রায় ভর্তি শুধু তিনতলার ছাদের এককোণে দু-খানা চলনসই ঘর, কেউ চট করে নিতে চায় না বলেই এখনও খালি পড়ে ছিল। দেখেশুনে বুঝলুম— সবই প্রভুর ইচ্ছা। আমাদের জন্য ইহাই সর্বোত্তম। রথ দেখতে এসে থাকার জায়গা এমনটি না হলে কি চলে। বিশাল ছাদের সবটাই আমাদের দখলে। এই তিনতলার ওপর কেউ বড় একটা ওঠে না। তাছাড়া ছাদে দাঁড়িয়ে ওদিকে চাইলে একেবারে প্রায় সোজাসুজি শ্রীমন্দিরের চুড়োটি দেখা যাচ্ছে। লাল ধ্বজা হাওয়ায় উড়ছে ঢেউ খেলিয়ে। মাথার ওপর অনন্ত আকাশ আর দক্ষিণে আকাশে সাগরে মেশামেশি দূর দিগন্তে। চিত্রা আর অজু এই হোটেলেরই দোতলায় ওদের মনোমতো সবচেয়ে ভাল ঘরখানা দখল করে আছে। ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বেশ জমে উঠল। গোবিন্দ ঘর গুছতে ব্যস্ত হল। ততক্ষণে আমরা এক এক করে স্নান সেরে তৈরি হয়ে নিলুম। ক্যামেরায় ফিল্ম ভরাই ছিল। টেপ রেকর্ডারে একটা নতুন ক্যাসেট ভরে নিয়ে গোবিন্দ রেডি হতেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম পথে। চিত্রা আর অজু ঘরেই রইল আপাতত। পুরীতে এই সময়টা খানিকটা গুমোট গরম চলে। এখন বেশীর ভাগ সময় সমুদ্রের সেই প্রাণ মাতানো হাওয়ার অভাব। তবু আকাশ মেঘলা থাকায় রোদের ঝাঁঝ তেমন লাগছে না। আমরা ধীরে ধীরে স্বর্গদ্বারের দিকে এগোতে লাগলুম।

পথের ডানদিকে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে বড় বড় অজস্র লাক্সারি বাস— যাত্রী বোঝাই করে এনেছে দূর দুরান্তের থেকে। এমনিতেই আজকাল নাকি রেলপথে যত মানুষ পুরীতে আসে তার থেকে অনেক বেশি আসে সড়ক পথে। রথের সময় ত কথাই নেই। হোটেলগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে তিল ঠাঁই নেই। তবু এখনও রথের তিন দিন বাকি।

স্বর্গদ্বারের কাছে পৌঁছতে দেখা গেল অসংখ্য স্নানার্থী সমুদ্র স্নানের আনন্দ উপভোগ করছে। দোকান পাটের চাকচিক্যে কেনাকাটার ভিড়ে এইখানটায় প্রায় সব সময়ই একটা মেলার চেহারা। ভারত সেবাশ্রমের পাশ দিয়ে এবার আমরা মন্দিরের পথ ধরলুম। যা দেখছি যা শুনছি সব কিছুতেই কেমন যেন নেশা লাগছে। পথের দু পাশে ভিখারীর লাইন চলে গেছে যতদূর দেখা যাচ্ছে। কত রকমের ভিখারী—অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগী। সাধুবেশধারী। কেউ বা কাঁটার বিছানায় খালি গায়ে অম্লান বদনে শুয়ে কেউ হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ, গলা পর্যন্ত মাটির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। কেউ গাইছে গান—জগন্নাথের ভজন। কেউ শুধুই নাম করে যাচ্ছে খঞ্জনি বাজিয়ে। ভজু আর অরুণের হাতে ক্যামেরা, ওরা ছবি তুলে যাচ্ছে যেখানে যেমন বুঝছে। আমার হাতে টেপ রেকর্ডার। চলতে চলতেই রেকর্ড হয়ে

যাচ্ছে সব কিছু যা আমাদের কানে হয়ত সব সময় ধরা পড়ে না। দূরের কোন মঠ থেকে লাউডস্পীকারে নাম গান ভেসে আসছে, ভেসে আসছে শ্রীখোলের আওয়াজ। তার সঙ্গে পথ পাশের ভিখারীর কণ্ঠ মিশে গিয়ে একটা অপূর্ব ঐকতান টেপ রেকর্ডারে ধরা পড়ছে। পথের দুধারে চোখ রেখে চলতে চলতে আজ আমার মনে কেবলই দাদাভাই-এর গানের লাইন দুটি ফিরে ফিরে বাজছে 'আতুর খঞ্জ জীবন চাহিছে তোমায় ভালবাসবে বলে'।

রাস্তায় স্রোতের মত মানুষ চলেছে উভয় মুখেই। চলেছে গৃহী, চলেছে গৈরিক বসন-পরা সন্ন্যাসী। বেশভূষায়, চেহারায় বোঝা যাচ্ছে নানান জাতের মানুষ, বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ, চেনা যাচ্ছে কেউ ধনী কেউ দরিদ্র। এখানে সবাই এসেছে। এরা সবাই জগন্নাথের। জগন্নাথ এদের সবাকার।

ঘড়িতে প্রায় এগারটা বাজে দেখে আমরা আর না এগিয়ে এখান থেকেই হোটেলে ফিরে এলুম।

আহারাদি সেরে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া গেল। কাল রাতে ভিড়ের ঠেলাঠেলি চেঁচামেচিতে ট্রেনে ঘুমটা ঠিক জমে নি। তিনটে নাগাদ উঠে পড়ে তৈরি হয়ে আবার বেরিয়ে পড়লুম আমরা।

এবার অন্য পথে পুরী হোটেলের পাশ দিয়ে অপেক্ষাকৃত নির্জন পথ ধরে দোল মণ্ডপ সাহী দিয়ে একেবারে মন্দিরের সিংহ দরজার সামনে এসে হাজির হলুম। ওখান থেকেই দেখা গেল দূরে প্রায় রাজার বাড়ির সামনাসামনি একপাশে পর-পর দাঁড়িয়ে আছে তিনখানা রথ।

মন্দিরে যাবার কোন তাগিদ ছিল না। জানতুম এখন শুধু পটে দরশন। স্নানযাত্রার পর থেকে পরের অমাবস্যা পর্যন্ত পনের দিন জগন্নাথের 'অনসর' বা 'অনবসর'। সোনাকূপের ১০৮ কলসী জলে স্নান করেই জগন্নাথ জ্বরে পড়ে যান। কেউ তাঁকে দেখতে পাবে না। এই সময় জগন্নাথ আর ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পুজো নেন না। এখন তিনি দৈতাপতি এবং আরও সব সম্পূর্ণ ঘরের লোকের হাতের শুশ্রূষা নেন। নতুন করে রঙ হয় প্রতিটি বিগ্রহের। এরপর নেত্রোৎসব হবার পর 'নবযৌবন দর্শন' দিয়ে প্রস্তুত হন রথযাত্রার জন্যে।

পায়ে পায়ে রথের কাছে এসে দাঁড়ালুম। তিনটি রথেই তখন পুরোদমে কাজ চলছে। তখনও শুধুই কাঠের কাঠামো। একবার মনে হল শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠবে ত! আর ত মাত্র দুদিন বাকি। তারপর মনে হল আমাদের কুমারটুলিতে গেলেও পুজোর দুদিন আগে ঠিক এমনিই দেখা যায়, তখনও অধিকাংশ প্রতিমার রং সাজ কিছুই হয়নি। যাই হোক্ রথের এই অবস্থার কয়েকটা ছবি নিয়ে স্বর্গদ্বারের পথ দিয়েই ফিরতে লাগলুম। আজ আর গম্ভীরায় ঢুকলুম না। ওখানে গেলে অনেকটা সময় লাগবে পণ্ডিতমশাই-এর সঙ্গে কথাবার্তায়। কাল সকালে আসব ঠিক করে নিয়ে একটু তাড়াতাড়িই পা চালালুম হোটেলের উদ্দেশে। হয়ত আজই সন্ধ্যেবেলা বরেন্দ্র আসতে পারে ভুবনেশ্বর থেকে। বরেন্দ্র আমাদের একজন বিশেষ বন্ধু সাংবাদিক। সরকারী বেসরকারী সব মহলেই ওর খুব জানাশোনা। তাই আসার আগে কলকাতা থেকেই ওকে ফোনে জানিয়েছিলুম পুরী আসার কথা—এই ভেবে যাতে ও কিছু বিশেষ সুবিধে সুযোগ করে দিতে পারে রথ দেখার এবং ছবি তোলার। অজুর কথা মত হোটেলের নামটা বলাই ছিল।

ঠিকই ভেবেছি, হোটেলে ফিরতেই দেখি ও ইতিমধ্যে এসে গেছে একটু আগেই। সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক যাঁকে আগে কখনও দেখিনি।

বরেন্দ্র সঙ্গীকে দেখিয়ে বলল, আমার এই কবি বন্ধুকে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে এলুম। আলাপ পরিচয় হলে আপনাদের দুজনেরই ভাল লাগবে। আপনি রথ দেখতে এসেছেন। তা রথ সম্পর্কে যদি কিছু জানতে চান ওর কাছে জেনে নিতে পারেন। কবি সবিনয়ে জানালেন আমি তেমন বিশেষ কিছু জানি না। বরেনদা ভালবাসেন তাই বলেন অমনি করে। তবে যা জানি আপনাদের সামনে বলতে পারলে আমার খুব আনন্দ হবে'।

আমি কবুল করলুম, নেহাৎই জগন্নাথের টানে হঠাৎ এসে পড়েছি ভাই। পুরীতে বহুবার এলেও রথে এই প্রথম। রথের ব্যাপারস্যাপার আমার বিশেষ কিছুই জানা নেই। আপনার মত একজনকেই ত খুঁজছিলাম। অন্ততঃ কোনটা কি দেখার জানার সেটা ত জানা চাই না হলে আমরা যে ছবি তুলব বলে এসেছি না জানলে আসল জিনিসগুলোই হয়ত বাদ পড়ে যাবে।

নিচে থেকে চা পাঠাতে বলে ওপরের ঘরে গিয়ে বসা হল। অরুণ আর গোবিন্দ গেল সমুদ্রের ধারে। চিত্রা অজু ঘরে নেই। অতএব শ্রোতা আমরা দুজন—ভজু আর আমি।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে কবি শুরু করার আগেই বরেন্দ্র জানিয়ে দিল সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থাই ও করতে পারবে আশা করছে, তবে তিনজনের। তিনটের বেশী কর্ডন পাস যোগাড় করা অসম্ভব। এবারে কর্ডন পাসের বড় কড়াকড়ি। অনেক বিদেশী বিদেশিনী এসেছেন রথ দেখতে দিল্লীর তদ্বির নিয়ে, দিল্লী থেকেও ছবি তোলবার জন্যে একটা বড় দল এসেছে। কবি বললেন, খুব ভাল হয়েছে পহণ্ডিই রথযাত্রায় সবচেয়ে দর্শনীয় অনুষ্ঠান—শ্রীমন্দির থেকে যখন পায়ে পায়ে এসে বলভদ্র, জগন্নাথ রথে আরোহণ করেন। কাছ থেকে এর ছবি তুলতে পারলে খুবই সুন্দর হবে। দূর থেকে ভিড়ের জন্য এর ত বিশেষ কিছু দেখাই যায় না, ছবি তোলা ত দূরের কথা।

কর্ডন পাস পাওয়া যাবে শুনে খুব নিশ্চিন্ত হয়ে বসা গেল কবির কথা শুনতে।

কবি শুরু করলেন, দেখুন, যেমন পুরীর শ্রীমন্দিরের তিন মূর্তিকে নিয়ে তেমনি পুরীতে জগন্নাথের রথযাত্রা নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত আছে। অনেকেই এই রথযাত্রায় দেখেছেন বৌদ্ধ রথযাত্রার অনুকরণ। বৌদ্ধ মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের হাতে আছে বিরাট প্রমাণ পত্র—পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের লিপিবদ্ধ বিবরণ। সবার কথাতেই একটা যুক্তি আছে, কোনটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আজকের মানুষের মনে এই উৎসবের কি তাৎপর্য। হৃদয়ের কত গভীরে এর শেকড় এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই দেখা ভাল নয় কি! ইতিহাস অবশ্যই চাই। ইতিহাস সবেরই একটা কিছু থাকে, সে থাক্ গবেষকদের জন্যে, ইতিহাসের ছাত্রদের জন্যে। আপনার আমার—এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ সারা ভারত কেন সারা পৃথিবী থেকে আসে তাদের কি কাজ অতশত ইতিহাস জেনে।

আমি বললুম ঠিকই বলছেন। একথা ত ভুললে চলবে না ইতিহাসটা ইতিহাসই, বর্তমান নয়। আমাদের গৃহদেবতা শালগ্রাম শিলাটি কোন্ নদীর বুকে কিংবা কোন্ পাহাড়ের কোলে একদিন শুধু মাত্র একটি প্রস্তর খণ্ডরূপে কতকাল ধরে পড়েছিল, খুঁজে পেলে তার একটা ইতিহাস অবশ্যই আছে, কিন্তু আজ সে ত পাথর নয়। সে আমার বাবা, পিতামহ প্রপিতামহের পুজো করা গৃহদেবতা—নারায়ণ। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে কবি বললেন, আপনি যা বললেন আমারও ত সেই কথা। শ্রীমন্দিরের এই যে ত্রিমূর্তি এর গোড়ার কথাটা যাই হোক—একদিন তিনি শবরদের দারু দেবতা ছিলেন, প্রাচীন বৈষ্ণবদের তিনিই কৃষ্ণ। জৈনদের দাবি যদি হয়ও এই ত আমাদের সেই কৈবল্য লাভের জন্যে যা চাই—সম্যক জ্ঞান, সম্যক চরিত্র, সম্যক দৃষ্টি—এই তিনের প্রতীক।

বৌদ্ধমতে যদি বা হয় ত্রিরঙ্গের প্রতীক এই তিন মূর্তি—সংঘ, উম্ম আর বুদ্ধ তাতে কি আসে যায়? ইতিহাস যাই বলুক না এ কথা ত সত্য আজ সব মত, সব পথ, সকলের সব দেবতাকে আত্মসাৎ করে আজকের মানুষের মনে তিনি জগন্নাথ—জগতের নাথ, জগদ্বন্ধু পতিতপাবন দয়াল দীননাথ। জগন্নাথ আজ ত শুধুমাত্র শ্রীমন্দিরেই পূজিত নন, আজ তিনি প্রতিটি ঘরে গৃহদেবতা। উৎকলের মানুষের প্রাণের ঠাকুর।

আমি বললুম সত্যিই এটা আমার অনেকবারই মনে হয়েছে। একজন দেবতাকে ঘিরে একটা গোটা জাতি তার শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্মীয় চেতনা নিয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে এমনটা খুব বেশী দেখা যায় না। যেখানেই যাই, বাড়িতে কিংবা দোকানে, সরকারী অফিসে এমন কি হোটেলে অথবা নৃত্যগীতের আসরে সর্বত্র সর্বাগ্রে জগন্নাথ। এর কোন তুলনা হয় না।

আমার কথা শুনতে শুনতে কবির চোখ দুটি চক্ চক্ করছে লক্ষ করলুম জানিনা সে গর্বে কি আনন্দে না কি প্রভুর প্রতি ভালবাসায়! কবি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন বাধা দিয়ে আমি বললুম, তবু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি—যিনি জগতের নাথ তাঁর মন্দিরে প্রবেশে এত বিধিনিষেধ কেন, কেন এত জাতি ধর্মের বেড়া। ভাবতে অবাক লাগে ভারতের অন্যত্র কোথাও কোথাও যেখানে অস্পৃশ্যতার মহাপাপ সমাজের ঘাড়ে চেপে আজও বসে আছে, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে সেই কবে থেকে এখানেই ত জাতপাতের বেড়া ভেঙে ব্রাহ্মণ আর চণ্ডাল একসঙ্গে আনন্দবাজারে বসে জগন্নাথের ভোগ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছে'। আপনার মত কি এ

ব্যাপারে।

কবি হয়ত এত কথার পর এই প্রসঙ্গটা আশা করেন আমার কাছে। মনে হল আমার কথাটা ওঁকে হয়ত আঘাত করে থাকতে পারে—কেননা একটু থেমে কবি বললেন, দেখুন এতকাল ধরে যা চলে আসছে তার পরিবর্তন করার সাধ্য ত আমার নেই, তবু আমার কথা বলতে বললেন, তাই বলি।

বিগ্রহকে মানুষ দেখে তার নিজের ভাব আরোপ করে। এই ভাবটি আসে মানুষের মনের গভীরে জন্মজন্মান্তরের সংস্কার থেকে। বিধর্মী মন্দিরে গিয়ে কি দেখবে—এটা ত আর মিউজিয়াম নয়!

অন্য ধর্মের মানুষের কি অধিকার আছে এই ভগবৎ বিগ্রহ দর্শন করার। তার ত সংস্কারই আলাদা। তাছাড়া মন্দিরের যাঁরা সেবা করেন তাঁদের ত উচিতই নিষ্ঠার সঙ্গে সব নিয়ম নীতি যাতে রক্ষা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। ভাবের শুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষা করার জন্যে যা করার তা করাই ঠিক নয় কি?

আমি বললুম, আপনার কথা যুক্তিযুক্ত। তবে অধিকারের কথা যদি বলেন, ঠিক ঠিক অধিকার হিন্দুমাত্রেরই কি আছে? আর ঠিক তেমনি জন্মগত ভাবে খ্রীষ্টান বা মুসলমান হলেই যে তার সংস্কার নেই সেই বা কে বলবে? তাঁকে দর্শন করার অধিকার যে কার আছে বা কার নেই সে বলার অধিকারই কি আমার আছে? সে ত জানেন কেবল তিনিই।

আরও দুজন যে আমাদের পাশে রয়েছে তাদের কথা যেন আমাদের খেয়ালই ছিল না। চমক ভাঙল বরেন্দ্রর কথায়। ভজু তখনও নীরবে বসে রইল। বরেন্দ্র বলল—তোমাদের বেশ জমেছে দুজনের, কিন্তু তোমরা কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছ যে খেয়াল নেই। কথা ছিল রথের কথা হবে।

আমি লজ্জিত হয়ে বললুম, দেখেছ এই আমার এক বদ রোগ, কথা বলতে আরম্ভ করলে আর জ্ঞান থাকে না। সত্যিই এবার রথের কথা বলুন। কবি বলতে শুরু করলেন আবার, আজকে এই যে রথ আমরা দেখছি, তা তিন মূর্তির তিন রথ। এর প্রায় সব কিছুই স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে মহর্ষি জৈমিনির মুখ দিয়ে বলানো আছে। সেই অনুযায়ীই রথ তৈরী শুরু হয় অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যদিনে বনযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে।

বলা আছে, রাজা এই দিন সঙ্কল্প করে আচার্যকে ঠিক করবেন। উপযুক্ত তিনজন সূত্রধরকে নির্বাচন করে নিয়ে বনযজ্ঞে যাবার জন্যে নানা দ্রব্যাদি ও অলংকার দান করা হয়, তারপর সেই সূত্রধর তিনজনকে নিয়ে আচার্য বনে যাবেন। শুভমুহূর্তে পবিত্র তিনটি গাছের মধ্যস্থ কোন স্থানে অগ্নি জ্বালানো হবে। সেই অগ্নিতে বনস্পতির উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হবে ১০৮ বার ঘৃত, ১০০ বার চাউল আর দুগ্ধ। এইবার আচার্যদেব হাতে কুঠার নিয়ে মনে মনে গরুড়ধ্বজ চিন্তা করে মন্ত্র উচ্চারণ করে ঘৃতাহুতি দিয়ে যে স্থানটি পবিত্র করা হয়েছে সেখানে কুঠারের আঘাত করবেন। এরপর, সূত্রধরদের কাজ

রাঘবের ঝালি নিয়ে গৌড়ের ভক্তরা

বুঝিয়ে দিয়ে গীত বাদ্য সহকারে আচার্য বাড়ি ফেরেন। রথের জন্যে কাঠ সংগ্রহের পর সংস্কার বিধি অনুযায়ী কাঠ শুদ্ধি করা হবে। এই অনুষ্ঠানে আগুন জ্বালানো হয় না। কিন্তু অন্তরে অগ্নির ধ্যান করতে হয়।

কবির বিবরণ শুনতে শুনতে যেন অন্য কোথায় পৌঁছে গেছি—আমাদের পরিচিত কোলাহলের পরিবেশ থেকে সে যেন অনেক দূরে—যেখানে শ্রদ্ধা, ভক্তি, পবিত্রতা এ-সব খুব সহজ কথা—যেখানকার বাতাসে সব সময়েই একটা পুজো পুজো গন্ধ। তবু আধুনিক শিক্ষিত মনের কৌতূহল যায় না।

জিজ্ঞেস করি, যা বললেন, এখনও কি এ-সব ঠিক এমনিভাবেই মানা হয়? উত্তরে কবি বললেন, সেটা আপনাকে আমি সঠিক বলতে পারব না, তবে একেবারে মিলিয়ে মিলিয়ে না হলেও রথের ব্যাপারে এখনও যা কিছু হয় সবই মোটামুটি জৈমিনির বিধান অনুযায়ী। রথ তৈরি প্রসঙ্গে বলা আছে, রথে ৩২টি অংশ থাকা চাই। জগন্নাথের রথে মোট ৭৪২, বলভদ্রের রথে ৭৩১ এবং সুভদ্রার রথে ৭১১টি কাষ্ঠ খণ্ড ব্যবহার করতে হবে। বিধান অনুযায়ী জগন্নাথের গরুড় ধ্বজ, বলভদ্রের লাঙ্গলধ্বজ ও সুভদ্রার পদ্মধ্বজ বানানোর জন্যে চাই যথাক্রমে রক্তচন্দন, সপ্তপর্ণী (ছাতিম) ও পদ্মকাষ্ঠ (এক ধরনের সুগন্ধি কাঠ)।

রথ কতটা উঁচু হবে সেও বলা আছে। যেমন, জগন্নাথের গরুড়ধ্বজ বা নন্দী ঘোষ হবে ২২ হাত, বলভদ্রের তালধ্বজ ২১ হাত এবং সুভদ্রার রথ দেবদলন বা দর্পদলন মাটি থেকে ২০ হাত উঁচু হবে। বরেন্দ্র এতক্ষণ চুপ করেই বসেছিল। এই কথার পর কণ্ঠে প্রতিবাদের সুর না লাগিয়েই বলল—মন্দিরের কাজ সবই ত বংশপরম্পরায় হয়ে আসছে, যারা বংশপরম্পরায় এই রথ তৈরির

গুণ্ডিচার দরজায় প্রবেশ

কাজ করে চলেছে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলুম, আজকাল নাকি নন্দী ঘোষে ৮৩২ খানা কাঠ ব্যবহার করা হয়। আর মাটি থেকে রথের উচ্চতা হয় তেত্রিশ হাত পাঁচ আঙুল। চাকার ব্যাস হচ্ছে দশ হাত পাঁচ আঙুল। এইভাবে বলভদ্রের রথ বত্রিশ হাত দশ আঙুল আর সুভদ্রার রথ হল একত্রিশ হাত। তবে চাকার সংখ্যা বরাবর একই আছে। যেমন, ষোল, চোদ্দ আর বারো।

কবি বললেন—এই যে চাকার সংখ্যা এরও মানে আছে। নন্দী ঘোষের ষোল চাকা—ষোড়শ কলা। অন্যমতে ষোলটি মূলতন্ত্রের প্রতীক। তালধ্বজের চোদ্দ চাকা চতুর্দশ ভুবনের, কারও মতে চতুর্দশ মন্বন্তরের প্রতীক। সুভদ্রার দেবীরথের বারটি চাকা—বারমাসের প্রতীক।

কবির কথার মধ্যেই আমি বললুম, আপনার বর্ণনা থেকে আমি একটা জিনিস ভাবছি। ওড়িশার কারিগরি শিল্পের যে নৈপুণ্য, তার ঐতিহ্য কত সুপ্রাচীন।

বরেন্দ্র বলল, খুব ঠিক কথা। এ ত চাকার সংখ্যা শুনলেন। কাল যদি ভাল করে গিয়ে লক্ষ করেন বুঝতে পারবেন চাকার সংস্থান এবং সন্নিবেশের পেছনে কতখানি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিল আছে।

কবি বলতে শুরু করলেন। রথের সম্পর্কে আরও যে কত খুঁটিনাটি জিনিস জানার আছে তা বলে শেষ করা যায় না। আপনাদের এ-সব শুনতে ভাল লাগে ত বলি।

একটু থেমে কবি শুরু করলেন, ভাববেন না তিনটি রথে শুধু তিন ঠাকুর উঠে একা একা রথযাত্রায় যান। প্রতিটি রথে থাকেন নয়জন করে পার্শ্বদেবতারা, থাকেন ঋষি, থাকেন রথাধীপ, দুজন করে দ্বারপাল। সঙ্গে চলেন রথের রক্ষাকর্তা, রথশক্তি। প্রতি রথে জোড়া থাকে চারটি করে অশ্ব, একজন সারথি। এছাড়াও সঙ্গে চলেন বহু দেবদেবী, এমনকি দেবদাসীও। পুরাণে প্রত্যেকটির নাম লেখা আছে। কাঠের তৈরি এই সমস্ত মূর্তিতেই যখন যাবেন দেখতে পাবেন ওড়িশার দারুশিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় আছে। পটশিল্পের প্রভাব লক্ষ করবেন রঙের ব্যবহারে। কাঠ খোদাই-এর অপূর্ব সূক্ষ্ম কাজ দেখবেন—সমস্তই ওড়িশার মন্দির ভাস্কর্যের রীতিতে করা।

ভজু এবার একটু নড়েচড়ে বসল। ও বিজ্ঞানের ছাত্র এবং অধ্যাপক হলেও ওর মনটা আসলে শিল্পীর।

লক্ষ করলুম বরেন্দ্র ঘড়ির দিকে দেখছে। এবার ওঁরা উঠবেন, যাবার সময় হয়ে গেছে। ওদের গাড়িতে তুলে দিয়ে এলাম আমি আর ভজু।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল নাম-সংকীর্তনের শব্দে। তাড়াতাড়ি ছাদে বেরিয়ে এলুম। মনে হল চারদিক থেকেই শ্রীখোল করতাল আর নামগান ভেসে আসছে। ভোরের আলো আঁধারিতে দেখা যাচ্ছে সি বিচে অসংখ্য মানুষ—মেঘের ফাঁকে যদি সূর্যি ঠাকুর দেখা দেন—হয়ত সেই আশায়। দেখতে পাচ্ছি, লাল নিশান উড়িয়ে রাস্তা দিয়ে ছোট একটি দল পুব মুখে চলেছে নাম করতে করতে। দূরে জলের কিনার দিয়ে আর একটি দল শ্রীখোল করতাল বাজিয়ে নেচে নেচে সংকীর্তন করে চলেছে পশ্চিমে।

ওরা এখনও কেউ ওঠেনি। আমি ডাকতেও চাইলুম না। ছাদে একা দাঁড়িয়ে নামগানমাখা এই অপরূপ ভোরের আলোটি উপভোগ করতে লাগলুম।

খানিক পরেই দেখি ভজু উঠে এসেছে একেবারে ক্যামেরা হাতে। বললে, কখন উঠেছেন? ডাকেননি কেন?

বললুম, এই মেঘে ঢাকা আলোয় তোমার ক্যামেরা কি দেখতে পাবে কিছু?

ঘড়িতে সাতটা বাজে। স্নানাদি শেষ করে আমরা প্রায় তৈরি। এমন সময় চিত্রা আর অজু উপরে উঠে এল।

অজু বলল, পহন্ডি দেখার জায়গা রিজার্ভ করতে গিয়েছিলুম। ফিরতে একটু দেরী হয়েছিল। এসে দেখি আপনারা কেউ ঘরে নেই। ম্যানেজারবাবুর কাছে শুনলুম, আপনার সেই ভুবনেশ্বরের বন্ধু এসেছিলেন।

অরুণ সোৎসাহে জানাল, তিন তিনটে কর্ডন পাসের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

কী আশ্চর্য, চিত্রা বলল, কি মনে করে ঠিক একটাই একস্ট্রা টিকিট ও কেটে রেখেছে। অরুণ সঙ্গে সঙ্গে বলল, ভালই হয়েছে। ওই টিকিটটায় তোমাদের সঙ্গে আমি যাব। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা অ্যাঙ্গল থেকে ছবি তুলে যাব।

আর দেরি নয়, চটপট বেরিয়ে পড়তে হবে। রথ দেখতে এসে যতটা পারা যায় রথের চিন্তায় থাকাই ভাল, এই ভেবে যেতে যেতেই আমি একটা কথা তুললুম। আচ্ছা, বাঙালির সঙ্গে জগন্নাথের রথযাত্রার এই সম্পর্ক কবে থেকে। এ সম্বন্ধে তোমরা কি কেউ কিছু জান?

চিত্রা হাসতে হাসতে বলল, এখানে এসেও আপনার পরীক্ষা নেওয়ার কামাই নেই। যাই হোক, শুরু ঠিক কবে, একথা বলা ভারি শক্ত। তবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচলে আসার সময় থেকেই রথযাত্রা নিয়ে উদ্দীপনার কথা জানা যায়। এরপর থেকেই ব্যাপারটা চলে আসছিল। একশ বছর আগে, যেমন ধরুন বঙ্কিম জীবনীকার লিখেছেন, গৃহ-বিগ্রহ রাধাবল্লভজীউর রথযাত্রা প্রতি বছর মহাসমারোহে সম্পন্ন হত। ১২৮২ সালে রথযাত্রার সময় ছুটি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ি আসেন। রথ দেখতে বহু লোকসমাগম হয়েছিল এবং সেই ভিড়ে একটি ছোট মেয়ে হারিয়ে যায়। এই ঘটনার দু'মাস পরে 'রাধারাণী' লেখা হয়।

মন্দিরের পথ ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। গতকালের মত একই ছবি তবে ভিড়টা আজ কিছু বেশি। কিছুটা এগিয়ে ডানদিকে তাকিয়ে দেখি রাস্তা থেকে একটু নেমে গিয়ে সেই বিশাল ফাঁকা জায়গাটা আজ আর ফাঁকা নেই। বাউলের দল সেখানে ভিড় করেছে ছোট ছোট নানা দলে ভাগ হয়ে। একদল উনুন জ্বালিয়ে মস্ত এক মাটির হাঁড়ি চাপিয়েছে। একদল নেচে নেচে গেয়ে চলেছে—

'বনমালী গো আমার মত তুমি হয়ো
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম বদনে বলিও
বুকে লয়ে অনলের চিতা'—

কি আশ্চর্য। গম্ভীরায় চলেছি—এই ত সেই গম্ভীরানাথের কথা। মনে পড়ছে দাদাভাই-এর কথা—এ জগতে সবই আছে, মানুষের দুঃখ আছে ব্যথা আছে। আবার ব্যথাহারীও আছেন, তিনি যেটি দেখান সেটিই শুধু দেখতে পাই। ভাবছি পুরী এসে অবধি আমি এই যে দেখছি শুধু আনন্দ, দেখছি সবাইকে—এই সহস্র সহস্র নরনারী জগন্নাথের রথযাত্রাকে ঘিরে এক মহোৎসবে মেতে উঠেছে—এ তবে কি তাঁরই ইচ্ছায়।

সবাই মিলে গম্ভীরায় প্রবেশ করে দেখি সেখানে একটি দল উদ্দাম কীর্তনে মেতেছে—
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধা গোবিন্দ।

অল্পক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে মহাপ্রভু ও কীর্তনের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে হাজির হলুম পণ্ডিতমশাইয়ের স্বল্পপরিসর ছোট্ট ঘরটিতে।

সঙ্গীসাথী নিয়ে আমাকে দেখে পণ্ডিত মশায়ের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—কবে এসেছেন?

—গতকাল।

—এত পরে দর্শন পেলুম। তা বেশ বেশ, রথযাত্রায় এসেছেন খুবই আনন্দ।

হাতের ক্যামেরার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, ওগুলি কি, ক্যামেরা? ছবিও তুলবেন! বেশ! তা কাল ওড়িশায় গৌড়ীয় মিলনের ছবি তুললেন?

আমরা মুখ চাওয়া-চায়ি করছি দেখে পণ্ডিত মশাই বললেন, ও জানেন না বুঝি! রথযাত্রায় এসে মহাপ্রভুর লীলাগুলি স্মরণ করবেন। দেখবেন, আনন্দ হবে।

আমি বললুম, সেইজন্যেই ত আপনার কাছে আসা। বলুন শুনি।

পণ্ডিতমশাই অর্ধশায়িত হয়ে ছিলেন। এবার উঠে বসে বলতে শুরু করলেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন:
অনবসরে জগন্নাথের না পাইঞা দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিল গমন।

স্নানযাত্রার পরে জগন্নাথের অদর্শনের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বিরহে ব্যাকুল মহাপ্রভু ছুটে যান আলালনাথে। সেখানে পৌঁছে 'হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন' এইভাবে বিলাপ করতে করতে পাষাণভূমিতে লুটিয়ে পড়েন। বিরহ তাপে পাষাণও গলে যায়।

পুরী থেকে কিছু দূরে আলালনাথ মন্দিরে যদি যান দেখতে পাবেন পাষাণের কঠিন বুকে ধরা আছে গৌরাঙ্গের সর্বাঙ্গ চিহ্ন। মহাপ্রভু সেইখানেই থাকেন। অতঃপর গৌড় থেকে রথযাত্রা উপলক্ষে ভক্তবৃন্দ পুরীতে এসেছেন সংবাদ পেয়ে ফিরে আসেন। এই লীলাটি স্মরণ করে হয় ওড়িশি গৌড়ীয় মিলন। ঝাঁঝপিঠা মঠ থেকে কীর্তন করতে করতে আসেন গৌড় ভক্তবৃন্দ আর এই রাধাকান্ত মঠ থেকে কীর্তন

যায়। মন্দিরের সিংহ দরজার সামনে উভয়ের মিলন হয়। খুবই আনন্দ হয়।

আমি বললুম, এটি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হল না। তবে আজ থেকে এরপর যেগুলি আছে আমাদের বলুন। আর ঠকতে রাজি নই। পণ্ডিত মশাই বললেন,

ভক্ত সাধারণের মধ্যে মহাপ্রভুর লীলা স্মরণে নতুন করে উদ্দীপনা আনার জন্যে রামদাস বাবাজী মশায় নিজে কীর্তনের মাধ্যমে এই অপার্থিব লীলাগুলির পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। সেই অবধি চলে আসছে।

আজ হবে ঝালি সমর্পণ উৎসব। এটি হল রথযাত্রায় গৌড় থেকে ভক্তবৃন্দ আসার সময় সঙ্গে আনতেন প্রভু যে সব জিনিস খেতে ভালবাসতেন—যেমন নানান আচার, কাসুন্দি, থোড়, মোচা ইত্যাদি—হাজারো সামগ্রী। এর মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল পানিহাটির রাঘব পণ্ডিতের ঝালি। সেই থেকে রাঘবের ঝালি বলেই এটি প্রসিদ্ধ।

বেলা তিনটে নাগাদ আমরা হাজির হলুম শ্রীমন্দিরের নিকটবর্তী অপরিচ্ছন্ন এক সরু গলির মধ্যে ঝাঁঝপিঠা মঠের সামনে। বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। ভেতরে প্রবেশ করতেই দেখি এ এক অন্য জগৎ। মঠের চত্বরে বেশ অনেকটা জায়গা, বোধকরি কয়েকশ' ভক্ত সেখানে জমায়েত হয়েছেন। অল্প পরেই শুরু হল কীর্তন, তুলসী মঞ্চকে ঘিরে মঠের শ্রীবিগ্রহের সামনে।

চারটে নাগাদ নানাবর্ণের ধ্বজা হাতে সরু গলি পথে এঁকেবেঁকে ঝালি মাথায় ভক্তের মিছিল চলতে শুরু করল। মুহুর্মুহু হরিধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল পথ। মাঝে কীর্তনের দল। সঙ্গে বহু সংখ্যক শ্রীখোল আর করতাল। মুহূর্তে যেন একটা রূপান্তর ঘটে গেল আমাদের চোখের সামনে। আমরা যেন কোন দূর অতীতে পৌঁছে গেছি। শঙ্খধ্বনি করতে করতে পথের দুপাশে ঘর থেকে মানুষেরা বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। পথে লুটিয়ে প্রণাম করছে কত মানুষ—শতকণ্ঠে দিচ্ছে উলুধ্বনি। গলি পার হয়ে ভক্তের সেই অপরূপ মিছিল এসে পড়ল বড় রাস্তায়।

সামনেই ঠিক কালকে যেখানে দেখেছিলুম, রথ তিনখানি আজও সেইখানে দাঁড়িয়ে। কাজ চলছে পূর্ণোদ্যমে। এখনও রঙচঙ কিছুই চোখে পড়ল না। কীর্তনের পাশে পাশে আমি চলেছি—হাতে টেপ রেকর্ডার। খুব সতর্ক আছি, ভাবের আবেগের তুলে নিতে কিছু ভুল না হয়।

উচ্চকণ্ঠে কীর্তনে মাতন লাগে—

"যায় রাঘব কেঁদে কেঁদে ঝালিমাথে নীলাচল পথে
'হা গৌর' বলে রাঘব কাঁদে।"

দেখছি গাইতে গাইতে অনেকের চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

মন্দিরের সামনে এসে কীর্তন দাঁড়ালো—
আসি রাঘব সিংহদ্বারে
প্রণমিয়া শ্রীমন্দিরে
যারে দেখে শুধায় তারে—

মূল গায়ক বুকফাটা আর্তনাদে আখর দিচ্ছেন—'কোন পথে যাব গো! বলে দাও ওগো নীলাচলবাসী'।

ঝালি নিয়ে দীর্ঘ মিছিলের অনেকটাই ততক্ষণে রাধাকান্ত মঠে পৌঁছে গেছে। আমার সঙ্গীসাথীরা কে কোথায় জানি না। 'যাব কাশী মিশ্রের ঘরে দেখিব সেই প্রাণ গোরারে'— কাশী মিশ্রালয়ের সামনে পৌঁছে গেছে কীর্তন। রাধাকান্ত মঠের অধিকারী মশায় মালা চন্দন দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন ঝাঁঝপিঠা মঠের প্রতিনিধিবৃন্দকে। স্বাগত জানালেন কীর্তনকে।

ঝালি সমর্পণের পর গম্ভীরার সামনে শুরু হবে পাঠ। অনেকক্ষণ চলবে। সঙ্গীসাথীদের খুঁজে নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

বেয়ারা এসে খবর দিল। ম্যানেজারবাবু বললেন, ভুবনেশ্বর থেকে টেলিফোন এসেছিল—আপনার বন্ধু যিনি এসেছিলেন সেদিন, ঘণ্টাখানেক পরে আসবেন, আপনাদের হোটেলে থাকতে বলেছেন। বুঝলুম, কর্ডন পাস আজই এসে যাচ্ছে।

ঠিক ঘণ্টাখানেক পরেই বরেন্দ্র হাজির হল। কবিও এসেছেন সঙ্গে। নমস্কার জানিয়ে বললুম—আমার মন বলছিল আপনিও নিশ্চয়ই আসবেন। বরেন্দ্র বলল, যা জমিয়েছেন—আমি না এলে ওই নিয়ে আসত আমাকে।

চিত্রার দৌলতে আজ ওদের আপ্যায়ন ভালই হল। রথ প্রসঙ্গে আজও কবির কাছে অনেক তথ্য পাওয়া গেল।

কবি বললেন, "সারা বছরে জগন্নাথের মোট উৎসবের সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে আটান্নটি। মূল দ্বাদশযাত্রার অন্যতম এই রথযাত্রা। গুণ্ডিচাযাত্রা কথাটিরও এখানে চল আছে। পুরাণে বলা আছে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জগন্নাথ কথা দিয়েছিলেন তাঁর আদি জন্মস্থান এই মহাবেদী বা জনকপুরীতে এসে এই সময় সাতদিন থাকবেন। বলা হয় ইন্দ্রদ্যুম্নের রানী গুণ্ডিচাদেবীর অনুরোধেই রাজা এই রথযাত্রার প্রচলন করেন। রানী চেয়েছিলেন, যে জগন্নাথকে দর্শন করলে মানুষের পরমপ্রাপ্তি পরমাগতি হয় তাঁকে সবাই দেখুক—প্রাণভরে দেখুক। অথচ তা কেমন করে হবে? যারা সমাজের চোখে পাপীতাপী যারা অস্পৃশ্য তাদের ত মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ! তাই মন্দিরের সমস্ত নিয়মনীতির বেড়া ভেঙে তিনি বছরে অন্তত একটিবার নেমে এসে উঠুন রথে—ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ চণ্ডাল রাজা প্রজা সবাই একসঙ্গে ধরুক তাঁর রথের রশি। রথযাত্রার এই হল মূল তাৎপর্য।

একমাত্র পুরীতেই সম্ভবত প্রতি বছর নতুন করে তৈরি হয় তিনটি রথ। আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়া গতে যদি পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হয়, আরও ভাল রথযাত্রার পুণ্যতিথি।

প্রাচীনকালে তিনটি করে দুই প্রস্থ ছটি রথ ছিল, কারণ মন্দির আর গুণ্ডিচা বাড়ির পথে মাঝখানে ছিল একটা নদী। সে নদী শুকিয়ে যাবার পর থেকে তিনটি রথের চল হল।

রথের দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুজো শুরু হবে। মন্দিরের রন্ধনশালায় হোম করা হবে। দ্বারপাল পূজা করে তারপর ষোড়শোপচারে পুজো হবার পর মন্দিরের সমস্ত কর্মচারী মিলে মঙ্গলার্পণ অনুষ্ঠান করবেন।

বলা আছে রাজা, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব শুদ্ধভাবে থেকে শুদ্ধচিত্তে প্রার্থনা করবে—অতীতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে রক্ষা করেছিলে এইরূপে অবতীর্ণ হয়ে এসো, রথে আরোহণ কর—তোমার শুভ দৃষ্টি দশদিক পূর্ণ করুক। পবিত্র করুক।

মন্দির থেকে বড়দন্ডা অর্থাৎ Grand road ধরে গুণ্ডিচাবাড়ি এই দেড় মাইল পথ অতিক্রম করে তিনটি রথের পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যায়।

পুরাণে বর্ণনা আছে—রথ চলার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পথ ধূপের গন্ধে ভরে থাকবে। কর্পূর আর চন্দন জলে মিশিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হবে চতুর্দিকে।

অপরাহ্ণে দখিনা বাতাস বইবার সঙ্গে সঙ্গে রথের গতি মন্থর হবে। সূর্য অস্ত গেলে হাজার বাতি জ্বালিয়ে বাকি পথ নিয়ে যাওয়া হবে রথগুলিকে।

রথ পৌঁছবার পর দশাবতার বেশ হবে। তারপর ষোড়শোপচারে পুজো। পরের দিন পহণ্ডি করে গুণ্ডিচাবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে তিন ঠাকুরকে। এই অনুষ্ঠান হয় প্রায় অনেক রাত পর্যন্ত। দীপ জ্বালানো হয়। বাজি পোড়ানোও হয়।

রথযাত্রা উৎসব শেষ হয় বাহুড়াযাত্রা করে। এর মধ্যেও আর একটি অনুষ্ঠান আছে। হেরাপঞ্চমী বলা হলেও এই উৎসবটি হয় আসলে ষষ্ঠীর দিন। এটি একটি অদ্ভূত মানবী লীলা ঠাকুরের। জগন্নাথ মন্দির ত্যাগ করে আসার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর মানের পালা শুরু হয়। রাজরানীর আসন ছেড়ে তিনি আশ্রয় নেন ভাঁড়ার ঘরে। রাজভোগ ত্যাগ করে শুধুমাত্র দরিদ্র সাধারণ ওড়িশাবাসীর খাদ্য একটু ডাল ভাত আর কলমীশাক গ্রহণ করেন। এইভাবে ক'দিন থাকার পর ষষ্ঠীর দিন স্নান করে রত্নালংকার পরে ভোগ সেবা করে পালকিতে চেপে হাজির হন গুণ্ডিচাবাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা জগন্নাথের রথের অদূরে। মন্দির সেবায় নিযুক্ত পতিমহাপাত্র লক্ষ্মীঠাকরুন এসেছেন দেখে এগিয়ে যান অভ্যর্থনা করতে। কাঠের ঘোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে বাতাস করতে থাকেন লক্ষ্মীদেবীকে। ইতিমধ্যে গুণ্ডিচাবাড়ির ভিতরে মধ্যাহ্ন আরতি ভোগ হবার পর পতিমহাপাত্র যাবেন জগন্নাথের 'আজ্ঞামাল' আনতে।

এই মালা আসার পর মালা পরে জগন্নাথের রথে উঠবেন লক্ষ্মীদেবী। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্মীদেবীর লোকজন ইচ্ছে করে রথের কিছুটা ক্ষতি করে দিয়েই লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে ফিরে যাবে অন্য পথে 'হেরাগোহিরী সাহী' দিয়ে।

গুণ্ডিচাবাড়িতে সাতদিন কাটিয়ে নবমীর দিন হয় উল্টোরথ বা বাহুড়া যাত্রা। এবারও সেই পহণ্ডি অনুষ্ঠানের পর রথটানা হবে এবং মন্দিরের সামনে এসে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। পরের দিন মন্দিরে প্রবেশ করা আর হয়ে ওঠে না, বড়া একাদশী পড়ে যায়। এইদিন জগন্নাথের 'সোনা বেশ' হয়। সোনার হাত-পা মুকুট সব পরানো হয় আর একটি হল 'অধরপনা ভোগ'। ওড়িশার মানুষের কাছে এই দিনটি অতি পবিত্র। তাই

ওড়িশার নানা অঞ্চল থেকে দলে দলে অসংখ্য ভক্ত আসেন এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

পরের দিন দ্বাদশীতে আবার পহণ্ডি করে জগন্নাথ নিজের মন্দিরে প্রবেশ করতে গিয়ে বাধা পান। লক্ষ্মীদেবীর প্রতিনিধি দেবদাসীদের সঙ্গে জগন্নাথের সেবক দৈতাপতিদের অনেক মধুর বাদানুবাদ চলে। শেষে জগন্নাথের অনেক অনুনয়ে লক্ষ্মীদেবীর মানের পালা সাঙ্গ হয়। জগন্নাথ আপন রত্নবেদীতে গিয়ে অধিষ্ঠিত হন। এইখানে রথযাত্রা উৎসবের শেষ। কবির কথা শুনতে শুনতেই আমার মনে হচ্ছিল জগন্নাথ এঁদের শুধু প্রাণের দেবতাই নন জগন্নাথ এখানে এঁদের একান্ত আপন—যেন ঘরের মানুষ। আমাদের বাংলায় ঠিক এমনি করেই আমরা আগমনী গান গাই উমাকে নিয়ে।

এত কথা আমাদের কারুরই জানা ছিল না। কবিকে অনেক ধন্যবাদ জানালুম সকলে মিলে। চিত্রা আগেভাগেই কলকাতা যাবার নেমন্তন্ন করে রাখল ওদের দুজনকেই। বরেন্দ্র পকেট থেকে সযত্নে রাখা একটা খাম বার করে আমার হাতে দিল। আমাদের তিনজনের কর্ডন পাস। কাল আর আসছে না জানিয়ে এবার উঠল ওরা।

আমরাও নিচে নেমে ওদের বিদায় দিয়ে আহারাদি সেরে নিলুম। এতক্ষণে বেশ ক্লান্ত লাগছে। কাল সকালে উঠেই আবার যেতে হবে গম্ভীরায়—পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে।

রথের আর একদিন বাকি। খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই সবাইকে তুলে দিলুম বিছানা থেকে। আকাশ আজ অনেকটা পরিষ্কার। এখনও তারারা নিভে যায়নি। আলো ফুটতে দেরী আছে। রাস্তায় না বেরোলে হোটেলে এখন চা পাওয়ার কোন আশা নেই।

এ এক নতুন দৃশ্য। সমুদ্রের তীরে দেখি শ'য়ে শ'য়ে মানুষ বালির ওপর শুয়ে আছে। রাত্তিরে নিশ্চয়ই এখানেই ঘুমিয়েছিল। দূরে স্বর্গদ্বারের কাছে দেখা যাচ্ছে প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করছে পুণ্যার্থীর দল। এখানেও ওরা বলে গঙ্গার আরতি। যেমন নুলিয়াদের একবার নানা অদ্ভুত অনুষ্ঠান করে পুজো করতে দেখেছিলুম বালির ওপর। ছাগ বলি দিতেও দেখেছিলুম সেবার। জিজ্ঞেস করে উত্তর পেয়েছিলুম এটা ওদের গঙ্গাপুজো। ভারতের সব জলধারাই বোধহয় গঙ্গা—ভক্তের চোখে। গঙ্গা বলতে তাই একটা বিশেষ নদীকে বোঝায় না। পবিত্রতার আর এক নাম গঙ্গা।

কোথা থেকে উলুধ্বনি আসছে অজস্র কণ্ঠের। একটার পর একটা নাম-সংকীর্তন যাচ্ছে আসছে আমাদের এপাশ ওপাশ দিয়ে। আকাশটা দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠল। সব মিলিয়ে এক স্বর্গীয় মুহূর্ত। জীবনে এমন ক'টা মুহূর্ত পাব জানি না। আশ্চর্য সমুদ্রতীরে যারা রাত কাটিয়েছে দেখছি অনেকেরই ঘুম ভাঙেনি এখনও। ভাবছি চিত্রারা কি এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠেছে। এই সময় থাকলে জগন্নাথের এই মঙ্গল আরতিটি আকাশজোড়া মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেত।

গম্ভীরার পথে আজ শুধু জনস্রোত নয় বলা চলে কীর্তনের মিছিল। নানা মঠের নানা রঙের পতাকা শোভা পাচ্ছে প্রত্যেক একজনের হাতে। গৃহীও চলেছে। পরিপাটি তিলক আঁকা ভক্তের দলও চলেছে। চলেছে গৈরিকধারী সন্ন্যাসী অল্পসংখ্যক দু'চারজন অনুগামী নিয়ে। সবাই চলেছে একের উদ্দেশে—ভিন্ন ভিন্ন নাম গেয়ে।

গম্ভীরায় অখণ্ড নাম চলেছে। সেদিনের সেই উদ্দাম নৃত্যের দলটি আজ নেই। মহাপ্রভুর উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ জানিয়ে ওপরে উঠলুম আমরা। ঘড়িতে এখন সাতটা। পণ্ডিতমশাই বোধহয় মনে মনে আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। ঘরে ঢুকে প্রণাম জানাতে প্রথম জানতে চাইলেন কাল ঝালি সমর্পণ ভাল করে দেখেছি কিনা।

বললুম কিভাবে আমরা ঝালির সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলুম এতটা। খুশী হলেন খুব।

আমি জিজ্ঞেস করলুম রথ ত কাল, আজ সকাল থেকেই আসতে আসতে দেখলুম—এত লোক কীর্তন করতে করতে মন্দিরের দিকে কোথায় চলেছে।

পণ্ডিতমশাই বললেন, আপনারাও যাবেন। সেইটিই বলব।

কাল আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে লীলাটি দেখেছেন, সেটির অনুষ্ঠান করেন শুধুমাত্র ঝাঁঝপিঠা মঠ আর এখানকার রাধাকান্ত মঠ। আজ কিন্তু দেখবেন সহস্র সহস্র ভক্ত এটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন। আজ হল 'গুণ্ডিচা মার্জন লীলা'।

আমি বললুম, তার আগে আমার একটি বিষয় আপনার কাছে শোনার ইচ্ছে আছে। জগন্নাথ মন্দিরের এই যে তিন বিগ্রহ— গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে এর ব্যাখ্যা কি? মহাপ্রভু জগন্নাথের দিকে চেয়ে কি দেখতেন, কাকে দর্শন করতেন—যে এমন আত্মহারা হয়ে পড়তেন। মধুর হেসে পণ্ডিত মশাই বললেন, ঠিক প্রশ্নটি করেছো। এইটি জানলেই আজকের গুণ্ডিচা মার্জন লীলা বা রথাগ্রে মহাপ্রভুর উদ্দণ্ড নর্তন কীর্তনের কারণ সবই জানা যাবে।

প্রথম কথা হল মন্দিরের মূর্তি তিনটি নয়। আসলে চারটি। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, আর আছেন সুদর্শন। যিনি শুধুই একটি কাষ্ঠদণ্ডের মূর্তি নিয়ে আছেন এই তিন শ্রীমূর্তির পাশে।

জগন্নাথের দিকে চেয়ে চেয়ে মহাপ্রভু নিজেকেই দেখতেন। রাধাভাবেভাবিত হয়ে আস্বাদন করতেন কৃষ্ণের স্বরূপটি। জগন্নাথের শ্রীমূর্তির ইতিহাসটি তবে শুনুন। কৃষ্ণ বলরাম তখন দ্বারকায়। রূপবতী অনন্যা মহিষী সকল পরিবৃত হয়ে থেকেও কৃষ্ণের অবস্থাটি যে সদাসর্বদা উন্মনা। প্রধানা মহিষী রুক্মিণী সত্যভামা কিছুতেই স্থির করতে পারেন না কিসের অভাব? এত রূপগুণ থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণকে কিছুতেই বশীভূত করতে পারেন না তাঁরা— কৃষ্ণ স্বপ্নে ডেকে ওঠেন 'রাধে' বলে, জাগ্রতাবস্থায়ও অন্যমনে কখনও সম্বোধন করেন 'রাধে' বলে সত্যভামা-রুক্মিণী-চন্দ্রাবলীকে। এ রহস্য জানা ছিল রোহিণী মা'র যিনি ব্রজে কাটিয়েছেন কিছুকাল।

সুভদ্রাকে দ্বারে রেখে বন্ধ দরজার ভেতরে বসে রোহিণী মা শোনাচ্ছে ব্রজের কথা। রোহিণী মার নিষেধ রুক্মিণী সত্যভামা শোনেনি। যা হবার তাই হল। রাধা-প্রেমের কথা কৃষ্ণের দুর্বার আকর্ষণের বস্তু। সহজেই আকৃষ্ট হয়ে বলরামকে নিয়ে কৃষ্ণ বহির্বাটী থেকে দ্রুত অন্দরমহলে এসে হাজির হলেন সুভদ্রার সামনে। ভেতরে যাওয়া রোহিণী মার নিষেধ শুনে আর অগ্রসর হতে না পেরে দুই ভাই দাঁড়িয়ে গেলেন সুভদ্রার দুপাশে। ভিতর থেকে ভেসে আসতে লাগল রোহিণী মার কণ্ঠস্বর। আপন ব্রজলীলা—রাধা-প্রেমের কাহিনী শুনতে শুনতে কৃষ্ণের শরীর বিকারপ্রাপ্ত হতে লাগল। স্বয়ং মহাপ্রভুর এই দশা হতে দেখা গেছে। হস্তপদাদি কখনও সঙ্কুচিত হয়ে যেত, কখনও দীর্ঘাকৃতি লাভ করত। কৃষ্ণকে এই অবস্থায় দেখে বলরাম সুভদ্রারও একই অবস্থা, আর সুদর্শন ত কৃষ্ণের সঙ্গেই থাকে—সেও প্রেমের প্রভাবে বিগলিত। এমন সময় সেখানে দেবর্ষি নারদ এসে উপস্থিত। স্বয়ং প্রভুকে এইভাবে দর্শন করে নারদ বিমোহিত। জিজ্ঞেস করলেন এমত অবস্থা আপনার কে করল। কৃষ্ণ উত্তর করলেন, রাধা-প্রেমরূপ-শিল্পীই আমাকে আজ এমনভাবে গড়ে নিয়েছে। আজ আমার বড় সুখের দিন। তুমি বর নাও।

নারদ বললেন, অন্য বর চাই না আজ সৌভাগ্যক্রমে আমি যা দর্শন করলুম আপনার এই শ্রীমূর্তি যেন জগতের মানুষ দেখতে পায় এমন করুন। কৃষ্ণ বললেন, তাই হবে নীলাচলে দারুব্রহ্মরূপে আমি এই মূর্তিতে প্রকাশ হব।

এই হল চতুর্ধা মূর্তি—জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা আর সুদর্শন। প্রেমে বিগলিত তনু। মহাপ্রভুর আকর্ষণ এইখানে—রাধা ভাবে ভাবিত হয়ে নিজের মূর্তি দর্শন করতেন আর বিহ্বল হয়ে পড়তেন।

রথযাত্রা হচ্ছে দ্বারকা থেকে কৃষ্ণের ব্রজে আগমন। তাই কুঞ্জ সাজাতে হবে। কুঞ্জসেবা ভাবে গুণ্ডিচামার্জন করতেন সপার্ষদ মহাপ্রভু। রাজার সেবকরাই আগে এ কাজ করত। মহাপ্রভু এই সেবাটি রাজার কাছে চেয়ে নেন। উদ্দাম নর্তন কীর্তন সহযোগে মহানন্দে মহাপ্রভুর হাতে সম্মার্জনী আর কলসীতে জল নিয়ে বারবার মার্জনা করতেন গুণ্ডিচাবাড়ি আর রত্নবেদী।

"চারিপাশে শতভক্ত সম্মার্জনী করে
আপনে শোধয়ে প্রভু শিখায় সবারে।"

গুণ্ডিচামার্জনের পর মহাপ্রভু যান ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে।

"তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া।
সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লইয়া।"

পণ্ডিতমশাই বড় ভাবের সঙ্গে বলে চলেছেন মহাপ্রভুর লীলার কথা। বললেন আজ আপনারা এখান থেকেই চলে যান। এই লীলাগুলি দর্শন করুন। এসেছেন যখন যতটা পারেন আনন্দ নিয়ে যান।

সত্যিই তাই। বড়দণ্ড ধরে অগণিত মানুষের স্রোত গুণ্ডিচাবাড়ি অভিমুখে। মাঝে মাঝে ভিন্ন ভিন্ন পতাকা বলে দিচ্ছে বিভিন্ন সম্প্রদায় বা মঠের কথা।

পথেই পেয়ে গেলুম আমরা ঝাঁঝপিঠা মঠের

নানাবর্ণের পতাকা শোভিত দীর্ঘ মিছিল। কালকের মত আজ সঙ্গে চলেছে কীর্তন। ওঁরা গাইছেন—

'চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া
আসবে আমার প্রাণ বঁধুয়া।'

ওঁরা যে উন্মত্ত আবেগে দৌড়ে চলেছেন। হেঁটে পাল্লা দেওয়া শক্ত। গুন্ডিচাবাড়ির কাছাকাছি পথটাকে যেন নতুন করে আরও চওড়া করা হয়েছে। এইখানটায় দু পাশে নতুন নতুন দোকানে মেলার চেহারা। গুন্ডিচাবাড়ির দরজার কাছেই ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল সরু সরু ঝাঁটা বিক্রি করছে। সঙ্গে রেখেছে ছোট ছোট মাটির কলসী।

অগণিত ভক্ত সেই ঝাঁটা আর কলসী কিনে নিয়ে হরিধ্বনি দিতে দিতে প্রবেশ করছে গুন্ডিচাবাড়ির ভেতরে। আমাদের প্রবেশ নিষেধ। ক্যামেরা বা টেপ্ রেকর্ডার নিয়ে ভেতরে ঢোকা চলবে না। অতএব আমি আর অজু বাইরেই রইলুম আপাতত। ওরা ফিরলে আবার আমরা যাব ওদের কাছে এ সব রেখে। অনেকগুলি সাধু বৈষ্ণবের আখড়ায় নামকীর্তন চলছে নেচে নেচে নানান ছন্দে নানা লয়ে। আমাদের মত আর একজনেরও ভেতরে প্রবেশ নিষেধ,তার কাঁধে ক্যামেরা নেই। মুণ্ডিত মস্তক হাল্কা গৈরিক বসন কিন্তু গায়ের চামড়া আমাদের মত নয়। ইস্কনের বিদেশী ভক্ত—দরজার বাইরে থেকে মার্জনা লীলাটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছে। মূল দরজার অদূরে অনেকটা জমি ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করছেন নিপুণভাবে খালি পায়েই। আজ রোদের তেজ কতটা আসবার সময় হাওয়াই চটি পরেই বুঝতে পারছিলুম। ইস্কনের বৈষ্ণব সাধুটি কিন্তু নির্বিকার প্রসন্নচিত্ত। কে যে কোথায় প্রাণের রস খুঁজে পায় কে বলবে?

ওঁরা ফিরতে গোবিন্দ আর অরুণের হাতে আমাদের জিনিসগুলো দিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকলুম খালি হাতে। শুধুই দর্শন। হা প্রভু। এ অভিমান কবে যাবে? আর কিছু নয়, ভক্তি নয়, ধর্ম নয়। এতগুলি মানুষের মধ্যে আমিও যে তাদেরই একজন এ আত্মীয়তা অনুভব করার সুখ—সেও কি কম। না, পারিনি পণ্ডিত মশাই-এর অত কথা শোনার পরও মহাপ্রভুর লীলার রস হৃদয়ের গভীর থেকে গ্রহণ করতে পারিনি।

মন্দির প্রাঙ্গণ, মন্দির অভ্যন্তর ভক্তের ভিড়ে ঠাসা। যে যার আপন মনে ঝাঁটা আর কলসীর জল দিয়ে ধুয়ে চলেছে। জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। অনেক ভক্ত সেখানে গড়াগড়ি দিয়ে প্রায় স্নান করছে। কেউ কেউ দেখছি চরণামৃতের মত পান করছে হাতে করে নিয়ে। ভাল করে ঘুরে দেখে আমরা বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখি ঝাঁঝপিঠা মঠের সেই দলটি চলেছে বিপরীতমুখে। আমরাও সঙ্গ নিলুম।

অনতিদূরে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। বিশাল সরোবরের প্রশস্ত ঘাট ভক্তের কোলাহলে মুখর। ঝাঁঝপিঠা মঠের কীর্তনের দল শ্রীখোল করতাল উপরে রেখে হাঁটু জলে গোল হয়ে দাঁড়াল।

রথোৎসবে কীর্তনানন্দে

ওঁদের স্মরণে নিশ্চয়ই সেই প্রেমাবতার গৌরসুন্দরের লীলা তাঁদের অক্রান্ত করেছে এমন করে।

"ইন্দ্রদ্যুম্ন হেরি গোরা শ্রীযমুনা উদ্দীপনে।
আনন্দে জলকেলি করে নিজ গণ-সনে।"

জলে বহু ভক্ত বিচিত্র ভঙ্গীমায় সাঁতার দিচ্ছে। জল ছোঁড়াছুড়ি করে আনন্দে মেতে উঠছে।

জলে দাঁড়িয়ে কীর্তন শুরু হল:

"গৌরপ্রেম সরোবর, কি অপরূপ মনোহর।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমবিকারের বারি।
উঠতেছে ঢেউ নিরন্তর।"

স্নানান্তে তিলকসেবা করার পর ভক্তবৃন্দ আবার কীর্তন করতে করতে গুন্ডিচাবাড়িকে বাঁদিকে রেখে সোজা রাস্তা ধরে এগুতে লাগলেন।

আমরাও পিছু নিলুম। এখন বেলা প্রায় বারটা। মাথার ওপর চড়া রোদ। তবু হেঁটেই

রথটানার প্রাক্-মুহূর্তে অস্থির প্রতীক্ষা

চললুম কীর্তনের সঙ্গে।

বড়দণ্ডা ধরে একটু যেতেই আইটোটার বাগান। আই অর্থে মাসী, টোটা—বাগান। মাসীর বাড়ির পর মাসীর বাগান। এখানে পাকাল ভোগ গ্রহণ করেছিলেন। পাকাল অর্থে আগের দিনের বাসি পান্তা।

"আইটোটায় আসি আমার শ্রীশচীনন্দন।
নিজগণ লইয়া করেন প্রসাদ ভোজন॥"

কয়েকশ' ভক্ত নরনারী লাইন করে বসে গেছে মাটির ওপর বাগানের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। মহাপ্রভুকে স্মরণ করে উচ্ছ্বসিত আনন্দে গ্রহণ করছেন সেই পাকাল ভোগ শালপাতায়।

খেতে খেতেও হরিধ্বনি হচ্ছে। জয়ধ্বনি উঠছে। জয় মহাপ্রসাদ কী জয়!!

আজ রথ। পুরীর অলিগলি রাজপথ সবই আজ সকাল থেকেই মন্দিরমুখী হয়েছে।

সাড়ে সাতটার মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেছি। তিনখানি সুসজ্জিত রথ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। সিংহ দরজার সামনে মন্দিরসংলগ্ন লাল হলুদ রঙের রথখানিতে উঠবেন জগন্নাথ অর্চাবিগ্রহ মদনমোহনকে সঙ্গে নিয়ে।

মধ্যের লাল কালো রঙের রথ সুভদ্রার। আর একেবারে এদিকের রথখানি জ্যেষ্ঠ বলরামের। রঙ শুনেছিলুম লালের সঙ্গে থাকবে নীল,তবে আমার চোখে লাগল যেন সবুজ।

চিত্রা, অজু আর অরুণ নিজেদের জায়গায় দখল নিয়ে বসেছে কোনমতে। এখন থেকেই আশেপাশের বাড়ির ছাদে বারান্দায়, নিচের সারি দেওয়া দোকানগুলিতে মানুষ ঠাসা। আমরা চারিদিক দেখে নিচ্ছি—কোনখানে দাঁড়ালে ছবি নেওয়া সহজ হবে 'পহণ্ডি'র। রথে ঢালু সিঁড়ি লাগানো রয়েছে। আস্ত তাল গাছ লম্বালম্বি আধখানা করে চেরাই করে শক্ত করে বেঁধে তৈরি

হয়েছে সিঁড়ি। রথের এদিকে ওদিকে এখনও খুটখাট করে কাজ চলছে শেষ মুহূর্তের। রথের চূড়ার কলস ধ্বজা এখনও লাগানো হয়নি। বহু মানুষ রথে উঠছে। রথকেই প্রণাম করছি। আমরাও উঠলুম মাঝখানে রাখা সুভদ্রার রথের ওপর উঁচুতে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার জন্যে। চোখের সামনে দ্রুত ছবি পালটে যাচ্ছে। ভিড় বাড়ছে ক্রমশ। এখনও দড়ি দিয়ে কর্ডন করা হয়নি। সর্বত্র সকলের অবাধ যাতায়াত। লাউড স্পিকারে গান বাজছে—জগন্নাথের মহিমা।

দেখতে দেখতে ঘড়িতে নটা বেজে গেল। পুলিসের তৎপরতা বাড়ছে। ব্যস্ত হয়ে যাতায়াত করছে স্বেচ্ছাসেবীর দল। ঘোড়াগুলো নিচে রথের একপাশে রাখা আছে। সারথিরা দৃপ্ত ভঙ্গিমায় বসে আছে দূরে রথের দিকে মুখ ফিরিয়ে।

আকাশে আজ মেঘ ছায়া দিচ্ছে মাথার ওপর।

প্রায় এগারটা নাগাদ অকস্মাৎ মুহূর্তের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবক, পুলিস তৎপর হয়ে উঠল। এতক্ষণে যতদূর দৃষ্টি যায়, যেদিকে চোখ ফেরাই মন্দিরের সিংহদ্বারের চূড়ায় মন্দিরের সংলগ্ন গাছের মাথায় শুধু মানুষ আর মানুষ। জলস্রোতের মতই জনস্রোত ঢেউ-এর মত আছড়ে পড়তে চায় রথের সামনে।

স্বেচ্ছাসেবকদের ঘন ঘন বাঁশি বাজছে। স্ট্রেচার নিয়ে দৌড়াদৌড়ি। ভিড়ের চাপে অচৈতন্য হয়ে গেছেন এক বৃদ্ধা। এবার হাতে হাতে মোটা দড়ি ধরে রথের চারপাশে খানিকটা ঘিরে ফেলল পুলিশবাহিনী। সামনের দিকটা হাতেই ধরা রইল, দুপাশে আর রথের পেছন দিকটা মোটা মোটা শালের খুঁটিতে বাঁধা হল দড়ি। কর্ডনের ভেতরে যাকে দেখে তাকেই তাড়িয়ে বাইরে নিয়ে যেতে চায়। পকেট থেকে বার করে পাস দেখাতে বলল জামাতে আটকে রাখুন, যাতে দেখা যায় বাইরে থেকে। আমরা সেফটিপিন দিয়ে জামার সঙ্গে আটকে নিলুম। ভাবছি এও কি সম্ভব? মাত্র ক'দিন আগে জানতুম না যে পুরীতে আসছি রথ দেখতে। এলুম, ভালভাবে থাকলুম। আবার বিনা আয়াসে বাড়িতে বসে পাস পাওয়া গেল। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট সব কিছু হয়ে চলেছে। একি শুধুই ঘটনা পরম্পরা! মনে পড়ছে পণ্ডিত মশাই বলেছিলেন—'ভিড় ত আপনার কি?' রথের চূড়ায় কলস ধ্বজা লাগানোর কাজ সম্পূর্ণ। মন্দিরের লাল নিশানটি কোন মন্ত্রবলে আজ পীত হয়ে গেছে।

রথের সামনে সমস্ত ঘেরা জায়গাটা এবার ঝাঁট দেওয়া হচ্ছে। বালতি করে চুনের জল ছড়িয়ে দেওয়া হল। লাউডস্পিকারে এখন আর গান নয়। ধারাবিবরণী দেওয়া হচ্ছে ক্রমাগত। সবটা না বুঝলেও বুঝতে পারছি আবেগময় ভাষায় বক্তা বলে যাচ্ছেন ওড়িশার ঐতিহ্য, জগন্নাথের মহিমা, স্তব, স্তুতি।

কর্ডনের মধ্যেও ক্রমশ মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। পাণ্ডা, পুলিস, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছাড়া বেশির ভাগই ফটোগ্রাফারের দল।

লাউডস্পিকারে এবার ঘোষণা শোনা গেল। প্রভুর পহণ্ডি হতে আর দেরী নেই। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠের হরিধ্বনিতে যেন আকাশ বিদীর্ণ হল। দূরে বড়দণ্ড ধরে সোজা যতটা দেখা যায় বিপুল জনস্রোতের মাঝখান দিয়ে আর একটি শীর্ণরেখা দেখা যাচ্ছে নানা বর্ণশোভিত পতাকার। এক একটি কীর্তনের দল নাম করতে করতে এগিয়ে কর্ডনের কাছ পর্যন্ত এসে উদ্দাম নৃত্য করতে করতে আবার পেছিয়ে যাচ্ছে, আবার কাছে আসছে নতুন একটি দল।

অকস্মাৎ মন্দিরের ভেতর থেকে দ্রুত ছন্দে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠল। লাউডস্পিকারে উত্তেজিত ঘোষণা—পহণ্ডি শুরু হয়ে গেছে আপনারা হরিধ্বনি দিন। অমনি সহস্র কণ্ঠের হরিধ্বনি যেন বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে দিল। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ফোটোগ্রাফারের দল—যার মধ্যে বহু বিদেশি ও বিদেশিনী, উন্মত্তের মত দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে চলেছে কেমন করে কোথা থেকে দাঁড়িয়ে এই উৎসবের যতটা পারা যায় ক্যামেরায় ধরে রাখা যায়। ওদের হাতে ভিডিও ক্যামেরার ছড়াছড়ি। কাঁসর-ঘণ্টার ধ্বনি, হরিধ্বনি সবই ধরা পড়ছে ওদের যন্ত্রে।

এবার প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এলো দু-সারিতে প্রায় জনা পনের ষোল লোক নতুন কাঁসর হাতে। ওঁদের পরনে নতুন ধুতি আর কোমরে বাঁধা নতুন গামছা। মাঝে যে দেবতাকে প্রায় জনাকয়েক মিলে কোলে করে নিয়ে বলভদ্রের রথ পরিক্রমা করে সুভদ্রার রথে আরোহণ করালেন তিনিই সুদর্শন।

এরপর এলেন বলভদ্র। মন্দিরের দরজার ভিতর দিয়েই দেখা যাচ্ছে পায়েপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, তালে তালে বাজছে কাঁসর, আর মাদল। মন্দিরের সিংহ দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছেন তিনি। বিশাল ফুলের মুকুট মাথায়। অপূর্ব ভঙ্গীতে আসছেন রাজকীয় চালে। এটি করা হয় সুকৌশলে মুকুটের নিচেই বিশেষভাবে তৈরি সুন্দর দড়ি বেঁধে। নিচের দিকে বাঁধা থাকে আর একটি দড়ি। বলভদ্রকেও রথে আরোহণ করতে সাহায্য করল ভক্তবৃন্দ রথের পিছন দিক দিয়ে প্রদক্ষিণ করে।

ঘন ঘন হরিধ্বনিতে, উলুধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। বলভদ্র রথে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সুদর্শনের মতই ভক্তবৃন্দের হাতের ওপর শুয়েই সুভদ্রা রথে আরোহণ করলেন। এইবার আসবেন রাজার রাজা জগন্নাথ। এই সহস্র মানুষের আকুল আগ্রহ কখন দর্শন দেবেন তিনি। উঠলেন রথে। অবশেষে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভক্তবৃন্দের সামনে আবির্ভূত হলেন জগন্নাথ। সিঁড়ির কাছে এসে পৌঁছতেই মাথার সুন্দর ফুলের মুকুট ছিঁড়ে নেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। এরপর যা দেখা গেল তাকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছু দিয়েই মিলিয়ে নেবার সাধ্য নেই আমার। সিঁড়িতে প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় জগন্নাথ স্থাণুবৎ হয়ে গেলেন। চোখের সামনে দেখছি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সকলে। কিন্তু এতটুকু নাড়ানোর সাধ্য কারও নেই মনে হল। লাউডস্পিকারে ঘন ঘন আবেদন ভক্তবৃন্দের কাছে, আপনারা প্রার্থনা করুন, আপনারা হরিধ্বনি দিন। প্রভু বিরূপ হয়েছেন কোন কারণে। প্রভুকে রথে অধিষ্ঠিত না করতে পারলে ত সবই বৃথা। মনে হল বিষাদের একটা ছায়া নেমে এলো এই বিপুল জনতার মধ্যে। মাথার ওপর দিয়ে একটা হেলিকপ্টার চলে গেল। ও কি পুষ্পবৃষ্টি করে গেল, জানি না। অবশেষে সহস্র কণ্ঠের হরিধ্বনির মধ্যে কাঁসরের ধ্বনিতে মাদলের বাদ্যে প্রভু উঠলেন রথোপরি সিংহাসনে। এবার পাল্কিতে চড়ে এলেন পুরীর রাজা। স্বর্ণমণ্ডিত সম্মার্জনী হাতে একে একে মার্জনা করলেন তিনটি রথ। সুগন্ধি জল ছিটিয়ে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সমাপন করলেন ছেরা পহরা অনুষ্ঠান। এরপর সারথিদের বসানো হল নিজ নিজ জায়গায়। মাতলি বসলেন জগন্নাথের রথে। সুদ্যুম্ন উঠলেন বলভদ্রের রথে আর অর্জুন সুভদ্রার রথে। সারথিদের আরোহণের পর রথ থেকে সিঁড়ি খুলে ফেলা হল। এবার অশ্বযোজনা হল। জগন্নাথের রথের অশ্ব শ্বেতবর্ণ, বলভদ্রের রথে কৃষ্ণবর্ণ ও সুভদ্রার রথে বাদামী রঙের অশ্ব, বর্ণনায় যদিও লোহিতবর্ণ বলে উল্লেখ করা আছে।

সময় দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এখন আর কোথাও এতটুকু জায়গাও বাকি নেই। সমস্তই পরিপূর্ণ ভক্তের ভিড়ে। ভক্তের হৃদয়ও বুঝি পূর্ণ হতে চলেছে।

রথের দড়ি লাগানো হয়ে গেছে। এবার কাঁসর-ঘণ্টা, ভেরী আরও নানা বাদ্যযন্ত্রে মুখর হয়ে উঠল। রথের রশিতে টান পড়েছে বুঝি—এগিয়ে চলেছে বলভদ্রের রথ।

কিছুদূর এগিয়ে বলভদ্রের রথ থামল। এবার সুভদ্রার রথ এগিয়ে চলল। সব শেষে জগন্নাথ। জগন্নাথের জয়ধ্বনি, হরিধ্বনি মুহুর্মুহু ভক্তবৃন্দের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়ে উঠল। আর প্রতীক্ষা বুঝি ধরে রাখা যায় না। ব্যাকুল আবেগে জীবন বিপন্ন করেও এগিয়ে আসে ভক্তপ্রাণ একটিবার রথের রশিতে হাত দেবার জন্যে। সেই মুহূর্তটি অবশেষে এলো। বেজে উঠল বাদ্য, বেজে উঠল শঙ্খ, কাঁসর-ঘণ্টা। হরিধ্বনি আর উলুধ্বনি দিয়ে দুহাত আকাশে তুলে জয়ধ্বনি ঘোষণা করল দিকে দিকে। জগন্নাথের রথের রশিতে পড়ল টান। জগন্নাথের রথ এগিয়ে চলল।

দ্রুত রঘুনন্দন লাইব্রেরির ছাদে উঠে গেলুম ক্যামেরা নিয়ে। বহুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে বলভদ্রের রথ। তারপর সুভদ্রার। শেষে চলেছে জগন্নাথের রথ।

ওইখানে দাঁড়িয়ে আমার সমস্ত প্রাণ উজাড় করে একটি প্রণাম রাখলুম। মনে হল সার্থক হল আমার এ উৎসবে আসা। মনে হল সত্যিই 'উৎসব ত ভক্তির, উৎসব ত ভক্তেরই। সে তো মতের নয়, প্রথার নয়, অনুষ্ঠানের নয়। এ চিরদিনের উৎসব, এ লোক-লোকান্তরের উৎসব।'

"তাই তো, প্রভু, হেথায় এল নেমে
তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে
মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে॥"

ছবি : লেখকের সৌজন্যে

শান্তিপুরের রাসোৎসব
সুধীর চক্রবর্তী
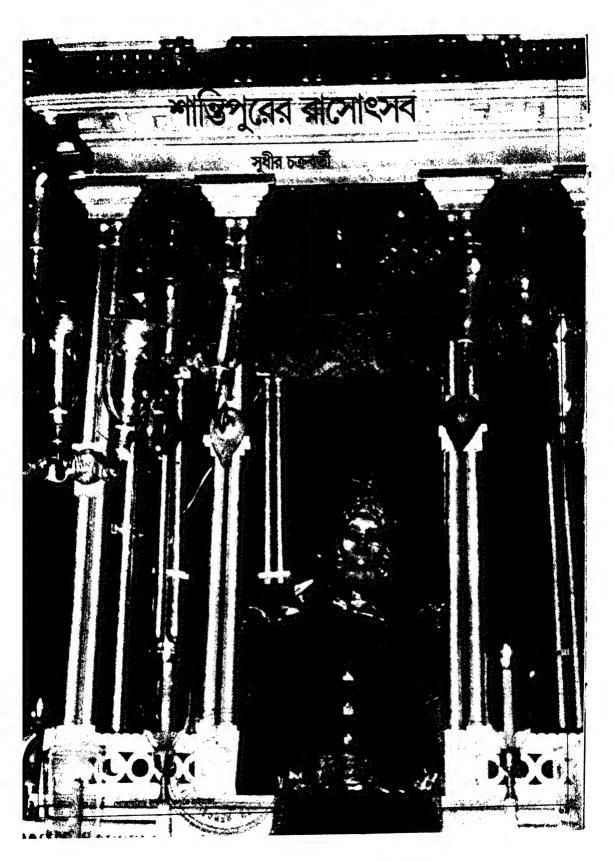
আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁর 'শান্তিপুর পরিচয়' বইতে লিখেছিলেন : 'মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ বলিতেন যে শান্তিপুরের রাসযাত্রা, ঢাকার জন্মাষ্টমী ও বৃন্দাবনের ঝুলন দেখিবার মত জিনিস।' তারও চুয়াল্লিশ বছর আগে, অর্থাৎ ১৮৯৩ আসে কবি নবীনচন্দ্র সেন মহকুমা-প্রশাসক হিসাবে শান্তিপুরের রাসের শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং লিখেছিলেন এক সরেজমিন বিবরণ। সেই বিবরণে তিনি কবি ভারতচন্দ্র কথিত ('নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব/নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব') খেউড় গানের অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ ক'রে মন্তব্য করেন : 'শান্তিপুরে এ হেন রসের খেঁড়ু লুপ্ত। বোধহয় আমার আগমনের পূর্বে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ সময়ে সময়ে গাইতেন।...শান্তিপুরের রাস বঙ্গবিখ্যাত। পূর্বে শান্তিপুর-সীমন্তিনীদের অন্তঃপুর-কপাট ও হৃদয়-কপাট উভয়ই রাসের সময় খুলিয়া যাইত। তাঁহারা পালে পালে রাসদর্শনোপলক্ষে নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়া রাসপৌর্ণমাসীর শিশিরম্লান কৌমুদীকে তাঁহাদের উচ্ছ্বরিত রূপজ্যোৎস্নায় ও হাসির ঝলকে সমুজ্জ্বল করিতেন এবং "রসের" ছড়াছড়ি হইত। বোধহয় সে "রস"ও লুপ্ত, কিম্বা তাহা অনুভব করিবার আমার অবসর ও সুযোগ ঘটে নাই।'

নবীনচন্দ্রের বিবরণে 'খেঁড়ু' ও 'রস' উপভোগ না-করার জন্য ঈষৎ ক্ষোভ থাকলেও রাসের শোভাযাত্রা দর্শনজনিত আনন্দ ও উচ্ছ্বাস পরবর্তী অংশে আছে। কিন্তু সে অংশ এখানে অবান্তর। উৎসাহী পাঠক 'আমার জীবন' বই পড়লে সেই বিবরণ পাবেন। উপরের উদ্ধৃতি দুটি থেকে আমার বলবার কথা এইটাই যে, শান্তিপুরের রাসোৎসব কতদিনের পুরানো তা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব না হ'লেও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও নবীনচন্দ্রের মন্তব্য ও বিবরণ থেকে এই অনুষ্ঠানের জাঁকজমক এবং ব্যাপকতার খুব পুরানো পরম্পরা মেলে।

রাস একটি বৈষ্ণবীয় উৎসব, যদিও তার চরিত্রে কিছুটা লৌকিক ছাঁচ আছে। বৈষ্ণবদের মধ্যে এমন বিশ্বাস আছে যে, কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের নিয়ে রাসমণ্ডলে নাচ গান করেছিলেন। তার উল্লেখ আছে শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। পরম রসবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রে মণ্ডলাকারে গোপীগণের যে নৃত্যগীতের উদ্‌যাপন তাকেই বলে রাস। উৎপ্রেক্ষা অলংকার দিয়ে বলা হয়েছে, যেন মণিগ্রন্থিত স্বর্ণহারের মধ্যে মহামরকতমণি। হরিবংশে রাস কথাটি নেই, আছে 'হল্লিশ'। হল্লিশ মানে নরনারীর হাত ধরাধরি ক'রে নাচ। এই রাসের স্মরণে প্রতিবছর নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবরা পারিবারিকভাবে রাসোৎসব করেন দীর্ঘদিন থেকে। কিন্তু ব্যাপক সমারোহ, অগণিত নরনারীর অংশগ্রহণ এবং প্রদর্শনীয়তার দিক থেকে শান্তিপুরের রাসের নামডাক বেশ পুরানো। এখানে বলে রাখা ভাল, শান্তিপুরের রাস যে-কার্তিকী পূর্ণিমায় হয় তাকে বলা হয় 'পটপূর্ণিমা' এবং একই তিথিতে নবদ্বীপেও হয় ব্যাপক ও বিচিত্র রাসোৎসব। তবে নবদ্বীপের রাস হ'লো মূলত শাক্ত রাস আর শান্তিপুরের বৈষ্ণবীয় রাস। তাছাড়া নবদ্বীপের রাসের পরদিন শান্তিপুরের উৎসব শুরু ও শেষ হয়, কেননা গোস্বামীমতে সব কিছুই পরাহে করবার বিধি। পটপূর্ণিমা শব্দটি সম্ভবত এই তথ্য প্রমাণ করে যে, এককালে রাসপূজায় মূর্তির বদলে পটপূজার প্রচলন ছিল। শান্তিপুরের রাসোৎসবে এখনও পটে-আঁকা এক বৃহৎ কালীপ্রতিমা পূজা হয় এবং অত্যন্ত সমারোহ সহকারে সেই পটপ্রতিমার শোভাযাত্রা হয় ভাঙারাসের রাতে।

বৈষ্ণবদের রাসোৎসবের বিবিক্ত লগ্নে কেন শান্তিপুরে অনেক শক্তিমূর্তি একই সঙ্গে পূজিত হয় তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে না গিয়ে অনেকেই এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন শ্যাম-শ্যামা অভেদতত্ত্ব অথবা হিন্দুধর্মের সমন্বয়বাদের আদর্শ। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শান্তিপুরে রাসের মূল অনুষ্ঠানগুলি বরাবর হয়ে আসছে গোস্বামী পরিবার ও ভক্তিমান বৈষ্ণব তন্তুবায় পরিবারগুলিতে আর শক্তিপূজার পরম্পরা গড়ে উঠেছে বারোয়ারি ভিত্তিতে। সর্বানন্দী, মুক্তকেশী, ভদ্রকালী এইসব নামের বিচিত্র কালীমূর্তি, এমনকি ভারতমাতা ও সন্তোষী মা-র পূজাও চালু হয়েছে। শুদ্ধাচারী গোঁসাই বাড়ির জনৈক সদস্য জানালেন, বারোয়ারির দাপটে তাঁদের গৃহদেবতার রাসোৎসবের শান্ত ও সংযত শোভাযাত্রা অধুনা বিপন্ন।

শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত 'প্রতিবাদী চেতনা' পত্রিকায় ১৯৮৩ সালের ৫ ডিসেম্বর (পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা) 'এই রাস এই ঐতিহ্য' নিবন্ধে শ্রীমিণ্টু মুখোপাধ্যায় এক সমীক্ষা ও সারণী সহ জানিয়েছেন রাস উপলক্ষে সেখানকার মাত্র ৯টি বারোয়ারি পূজায় ১,০৯,০০০ টাকা খরচ হয়েছে। প্রসঙ্গত উদ্ধৃতিযোগ্য কিছু অংশ :

কিসের প্রেরণায় এত ব্যয়বহুল উৎসব করেন ? আমার এ প্রশ্নের উত্তরে একজন বললেন— আমরা ওপার বাংলা থেকে এসে এপারে যখন জঙ্গল কেটে বসতি করলাম তখন স্থানীয় বাসিন্দারা এসে চাঁদা চাইতো আর বলতো এ দেশের রাসের কথা। তাদের কথার মধ্যে ওপার বাংলার মানুষদের প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল। তাই এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে স্থানীয় লোকেরা বলে—হ্যাঁ বাঙ্গালদেরও হিম্মত আছে রাস করবার— এরকম মানসিকতা থেকে প্রথম সমস্ত

গোস্বামী বাড়িতে কুঞ্জভঙ্গের যুগল নাচ

উদ্বাস্তুদের পুজো হয়ে এল ভদ্রাকালী। পরে ব্যক্তিত্বের সংঘাত থেকে আরো অনেক বারোয়ারি জন্ম নিল স্টেশন এলাকায়।

ইতিহাসের কি বিচিত্র কৌতুক! কেননা শান্তিপুরের রাস প্রবর্তনের গৌরব যাঁদের সেই অদ্বৈত বংশ আর তাঁদের শিষ্য-শাখা খাঁ চৌধুরীরা তো এখনকার হিসাবে ওপার বাংলার মানুষ। একটি তথ্যে দেখা যাচ্ছে অদ্বৈত মহাপ্রভুর পিতা কুবের মিশ্র শান্তিপুরে এসেছিলেন শ্রীহট্ট থেকে এবং খাঁ চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ গোবিন্দ দাস এসেছিলেন কুবের মিশ্রের সঙ্গে। গোবিন্দ ছিলেন জাতে তন্তুবায়। কুবের মিশ্রের সংস্পর্শেই তাঁর ভক্তিধর্মে দীক্ষা ও শান্তিপুরের সংসারপত্তন। কালক্রমে তাঁর উত্তরপুরুষরা ধনসম্পদে গরীয়ান হ'লে বাংলার নবাব তাঁদের 'খাঁ চৌধুরী' উপাধি দেন। কালক্রমে এই খাঁ চৌধুরীরা সাতটি কৃষ্ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ ও নিজসেবার ব্যবস্থা করেন। সেই সব বিগ্রহের নাম শ্রীশ্রীগোপীকান্ত, শ্রীশ্রীকালাচাঁদ, শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়, শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদ, শ্রীশ্রীরাধাকান্ত, শ্রীশ্রীগোপালরায় ও শ্রীশ্রীমদনগোপাল।

১৬৪৯ শক অর্থাৎ ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে খাঁ চৌধুরী বংশ ২ লাখ টাকা ব্যয়ে বিশাল আট চালা রীতির শ্যামচাঁদ মন্দির গড়েন (তথ্যসূত্র : David J. Mecutchion, Late Mediaval Temples of Bengal, pp-33)। 'শান্তিপুর পরিচয়' বইয়ের লেখক কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মনে করেন : '১৬৪৯ শক হইতে খাঁ চৌধুরীরা রাসের শোভাযাত্রার বিরাট আয়োজন করেন।' এই তথ্য মেনে নিলে বলতে হয় শান্তিপুরের অতি প্রসিদ্ধ ভাঙারাসের বয়স ঠিক ২৬১ বছর। কিন্তু সে সম্পর্কে সানুপুঙ্খ বিবরণ বা সম্প্রসারণে যাবার আগে বুঝে নেওয়া দরকার নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের শাক্তরাস আর বৈষ্ণবরাসের সমাজ-পটভূমিগত পার্থক্য ও বিশেষত্বের কথা।

বিচার করলে দেখা যাবে গত পাঁচশো বছর ধরে নবদ্বীপে ভক্তিধর্ম ও জ্ঞানচর্চার যুগলধারা বয়ে গেছে। এখানে নব্যন্যায় চর্চা ছিল ভারতখ্যাত, পরে শ্রীচৈতন্য আনেন ভক্তিধর্মের উৎসার। নবদ্বীপের চারজন পুরুষ আজপর্যন্ত গৌড়বঙ্গের সংস্কৃতি ও সমাজ গঠনে বহুমান্য। ন্যায়ের ক্ষেত্রে বাসুদেব সার্বভৌম, ভক্তিসাধনায় শ্রীচৈতন্য, তন্ত্রপ্রণয়নে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, স্মৃতিশাস্ত্রে স্মার্ত রঘুনন্দন। এঁদের মধ্যে রঘুনন্দন স্মৃতিশাস্ত্রের সংকলক এবং তাঁর ব্যাখ্যা মতই আমাদের বঙ্গসমাজের আচার অনুষ্ঠানের বহতা। শোনা যায় তন্ত্রসার প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশই নাকি আমাদের সাকার কালীমূর্তির উদ্ভাবক ও পরিকল্পক। নবদ্বীপে রাসের সময়ে যে-বিপুল ও বিচিত্র ধরনের শক্তিমূর্তি গঠিত হয় তার মূর্তি পরিকল্পনা ও ধ্যানমূর্তি শ্লোক রচনায় আজো সেখানকার স্মার্ত পণ্ডিতদের প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা চলে নবদ্বীপের শক্তিমূর্তিগুলির নাম যা বিভিন্ন পাড়ায় মহাসমারোহে পূজিত হয় পটপূর্ণিমায়। শক্তিমূর্তিগুলির নাম : শ্যামা, ভদ্রকালী, এলানো কালী, মুক্তকেশী, বামাকালী, রণকালী, শবশিবা,

শোভাযাত্রায় রাইরাজা
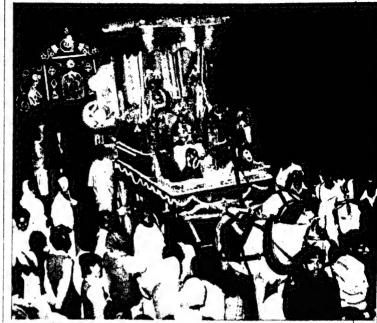
নৃত্যকালী, কৃষ্ণকালী, শ্মশানকালী, ছিন্নমস্তা। দুর্গামূর্তির রূপভেদ : অন্নপূর্ণা, গণেশজননী, গৌরাঙ্গিনী, গোঁসাইগঙ্গা, কাত্যায়নী, রণচণ্ডী, মহিষমর্দিনী, ডম্বুরেশ্বরী, বিন্ধ্যবাসিনী। বিচিত্র শক্তিমূর্তিগুলির নাম : ভারতমাতা, সন্তোষী মা, বিশ্বজননী, বিজয়মাতা।

এত রকম যে শক্তিমূর্তি নবদ্বীপে রাসের সময় পূজা হয় তার কারণ কি? একটা কারণ তো স্পষ্ট। নদীয়ার রাজবংশ নিঃসন্দেহে ছিলেন শাক্ত। শুধু তাই নয়, রাজবাড়ির দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর 'ক্ষিতিশ-বংশাবলি-চরিত' (১৮৭৫) বইতে লিখেছেন : 'নবদ্বীপের রাজা বা পণ্ডিতগণ চৈতন্যকে অবতারের মধ্যে কখন গণ্য করেন নাই।... তৎকালে এ প্রদেশস্থ প্রায় যাবতীয় লোক শক্তি উপাসক ছিলেন। তম্মধ্যে অনেকে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানোপলক্ষ্যে পানাসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইতেন।' এই বইতেই দেখা যায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাংলায় জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পূজা প্রবর্তন করেন। এই সূত্রে নবদ্বীপের রাসের সময় শক্তিপূজায় রাজশক্তির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও আনুকূল্য বিষয়ে যে তথ্য পাওয়া যায় তা উদ্ধৃতিযোগ্য। কান্তিচন্দ্র রাঢ়ি তাঁর 'নবদ্বীপ

শোভাযাত্রায় রাধাকৃষ্ণ বেশে বালকনাচ

মহিমা' (১২৯৮) বইতে লিখেছেন :

বহুদিন হইতে নবদ্বীপে রাসপূর্ণিমার দিন বার-ইয়ারী পূজা হইয়া থাকে। ঐ সময়ে আদ্যাশক্তি ভগবতীদেবীর নানা মূর্তি পূজিত হইয়া থাকে এবং পূজার পরদিবস ঐ প্রতিমাসমূহ মহারাজকে (মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র) দেখাইবার নিমিত্ত পোড়ামাতলায় সোৎসাহে আনীত হইত। মহারাজ ঐ সকল মূর্তির গঠননৈপুণ্য, চিত্রের বিচিত্রতা, সাজের পারিপাট্য ইত্যাদি পরীক্ষা করিতেন ; এবং যে শিল্পী যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তিনি যথোচিত পারিতোষিক পাইতেন।

বিবরণ থেকে বোঝা যায়, নবদ্বীপে রাসপূর্ণিমাকে পটপূর্ণিমায় রূপান্তর করার পশ্চাদপটে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের খুব বড় ভূমিকা ছিল এবং সেখানকার শক্তিরাস নিঃসন্দেহে অন্তত দুশো বছরেরও পুরানো। এই পূজার প্রধান উদ্যোক্তা স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্মার্ত ব্রাহ্মণবর্গ। সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও রুচিদুষ্টতা এই উৎসবের সর্বস্তরে দেখা যায় এবং শান্তরসাস্পদ বৈষ্ণব রাসের বাতাবরণে একটা বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ও তামসিকতার আবহ রচনাই যে এর আদ্য উদ্দেশ্য ছিল এতে অনেকের কোন সন্দেহ নেই। নবদ্বীপের শক্তিরাস পূজা দুদিনের। প্রথম দিন পূজা, দ্বিতীয়দিন প্রতিমা নিরঞ্জন। এই নিরঞ্জন হয় ভরদুপুরে শোভাযাত্রা সহকারে। প্রমত্ত ভক্তদের উদ্দীপনা, অভব্য নৃত্যভঙ্গী ও অশ্লীল খ্যামটা গান একদশক আগেও উত্তাল ছিল, এখনও অনেকটাই আছে। বিপুল ও ব্যাপক এই শক্তিরাসের আয়োজনে শাক্ত রাজন্য এবং বৈষ্ণববিরোধী ব্রাহ্মণদের এক মিলিত উন্মাদনা কেউ কেউ যে লক্ষ্য করেছেন তাতে ভুল নেই। অবশ্য এর পাশে, অন্তত বর্তমানে, শ্রীবাস অঙ্গনের কাছে সমাজবাড়িতে, রাসলীলা মঠে, পোড়ামাতলার হরিসভায়, নতুন আখড়া ও বড় আখড়ায় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা অনুষ্ঠানও নিরুপদ্রবে হয়ে থাকে। কল্পনা করতে বাধা নেই, এই বৈষ্ণবীয় রাসলীলাঅনুষ্ঠান এককালে খুব নিরুপদ্রব ছিল না সম্ভবত।

নবদ্বীপের রাসের আয়োজনে যে স্পষ্ট শাক্ত প্রাধান্য তা শান্তিপুরে দৃশ্যত গৌণ। রাসপূর্ণিমার উপলক্ষে গঠিত নবদ্বীপের প্রতিমাগুলি পরদিন সমারোহ সহকারে বিসর্জন হয় সন্ধ্যার মধ্যে। তাকেই বলে ভাঙারাস। শান্তিপুরের ভাঙারাস তার পরের সন্ধে থেকে সারারাতব্যাপী। এর একটা কারণ শান্তিপুরের রাসের মূল উদ্যোগ থাকে গোস্বামীপরিবারগুলির নেতৃত্বে এবং গোস্বামী মতে সব তিথি ও উৎসব পরাহে অনুষ্ঠিতব্য। আর একটা কারণ সামাজিক ও আর্থিক ; কেননা নবদ্বীপের ভাঙারাসের যাত্রীসাধারণই চলে আসেন পরদিন শান্তিপুরের ভাঙারাসে। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ভৌগোলিক সংযোগ পাঁচশো বছরেরও পুরানো। আগে সংযোগ ছিল গঙ্গার জলপথে। শ্রীচৈতন্য ও অদ্বৈতাচার্য সেই পথেই যাতায়াত করতেন। এখন মূল সংযোগ ট্রেন ও
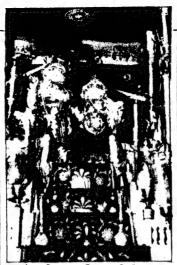
ঝাড়লণ্ঠন-শোভিত হাওদায় শ্রীরাধারমণ-শ্রীমতী

বাসরাস্তার।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আশ্বিন-কার্তিক মাসে হৈমন্তী ফসলের সুবাদে নদীয়া - বর্ধমান - হুগলী - মুর্শিদাবাদের এক পরস্পর সন্নিহিত বিস্তৃত অঞ্চল ও জনপদ থাকে সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন। হয়তো সেই কারণেই দুর্গা ও কালীপূজার অব্যবহিত পরে দীর্ঘদিন ধরে উৎসবমুখর হয়ে উঠছে এই জনপদে অন্যান্য অনেকগুলি পূজানুষ্ঠান। যেমন— কৃষ্ণনগর ও চন্দননগরের জাঁকালো জগদ্ধাত্রীপূজা এবং সেইসঙ্গে শান্তিপুরসংলগ্ন ব্রহ্মশাসন গ্রাম এবং মুর্শিদাবাদের কাগ্রামের বিশিষ্টরকম জগদ্ধাত্রীপূজা। এর পাশে দেখা যায় নবদ্বীপ - শান্তিপুর - দাঁইহাটের ব্যাপক রাসের উৎসব। কার্তিকী অনুষঙ্গের এমন উৎসব শেষ হয় চুঁচুড়া-বাঁশবেড়িয়া এবং কাটোয়ার অতিপ্রসিদ্ধ কার্তিকপূজায়। এ জাতীয় উৎসবগুলির সূচনা ও সমৃদ্ধি ঘটেছে গত দুশো আড়াইশো বছর ধরে এবং এর পরিপোষক প্রধানত রাজন্য - সামন্ত - ব্রাহ্মণ - মোহান্তবর্গ হলেও এখন এগুলি পরিণত হয়েছে জন উৎসবে। মূলত গঙ্গাতীর সংলগ্ন এইসব অঞ্চল ও তার গ্রামীণ পরিমণ্ডলের মিশ্র

পটে আঁকা কালীমূর্তি পটেশ্বরী

জনসমাজ কয়েকশো বছর ধ'রে উল্লিখিত পূজাপার্বণ ও মেলায় ব্যাপকভাবে অংশ নেন ও ঘুরে বেড়ান। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে শান্তিপুর নবদ্বীপের রাস, কাটোয়ার কার্তিকের লড়াই এবং কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রীপূজার জনসমারোহের বৃহদংশ গ্রাম থেকে সমাগত এবং তাদের মধ্যে ধর্মপ্রাণ নারীসমাজের ব্যাপক উপস্থিতি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। বৃহত্তর জনসমাজের এই ব্যাপক সমাগমের (তাঁদের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ও থাকেন) জন্য এই জাতীয় উৎসবগুলিকে আমার শাক্ত বা বৈষ্ণবঅনুষঙ্গে জড়িত করতে আপত্তি আছে। হয়তো মূলে তাই ছিল এবং সংগঠনে আজও তাঁরাই অগ্রণী কিন্তু অংশগ্রহণে, আনন্দমত্ততায়, বিপণনে ও সমারোহে সাধারণ অগণন মানুষের উৎসাহ আর উদ্দীপনা সবচেয়ে দর্শনীয়। এই সব উৎসব যে-নগরকে ঘিরে হয় সেখানকার স্থানীয় মানুষজনের বাসগৃহ এসময়ে আত্মীয় পরিজনে ভরে যায়। শোভাযাত্রার নির্ধারিত পথের দুপাশের রাস্তা ও বাড়ির ছাদ ভরে যায় দর্শক-দর্শিকায়। অনেকে এই সুবাদে কিছু রোজগার করে নেন জায়গা ভাড়া দিয়ে। শান্তিপুরের স্থানীয় এক পুরানো বাসিন্দা জানান যেখান দিয়ে ভাঙারাসের শোভাযাত্রা যায় সেই প্রসেশন রোডের দুপাশের জমির দাম শান্তিপুরে সর্বোচ্চ। ভদ্রলোক সখেদে এ কথাও জানালেন যে, শান্তিপুরের খোদ বাসিন্দারাই ভাল ক'রে ভাঙারাস দেখতে পান না। রাস্তার দুধার আর ছাদ ভরে যায় বহিরাগত দর্শনার্থীর ভীড়ে। দেশ বিভাগের পর জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ এবং হুজুগ এইসব শুদ্ধ অনুষ্ঠানে আজকাল যে-খানিকটা তামসিকতা বা প্রদর্শনপ্রবণতা জাগিয়েছে তা সবাই মানেন। ১২৭০ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ সংখ্যার 'সোমপ্রকাশ' পত্রের একটি প্রতিবেদনে পাওয়া যায় এমত বিবরণ যে :

'পূর্বে শান্তিপুরে রাসের বড়ই জাঁক ছিল। বৃদ্ধদের মুখে এ বিষয়ে এমন লম্বা লম্বা জাঁকাল গল্প শুনিতে পাওয়া যায় যে, দুদিনেও ফুরায় না। এক্ষণে অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহা দেখিলেও বৃদ্ধদের কথার একপ্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৩/৪ বৎসর পূর্বে দেখা গিয়াছে, রাসের সময় শান্তিপুরের প্রতি গলিতে যাত্রীর কলরব, আমবাগানের প্রতি গাছে ভাতের হাঁড়ী টাঙান, এবং পুকুরের পাড়ে বিষ্ঠা ছড়ান।

এই বিবরণ থেকে ১২৫ বছর আগেকার শান্তিপুর-রাসে বিপুল গ্রামীণ যাত্রীদের অংশগ্রহণের সত্য পরিচয় মেলে। এর পাশে দেখা যেতে পারে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের, ১ অগ্রহায়ণের এক প্রতিবেদন 'সাপ্তাহিক বসুমতী'-র ৭৬ বর্ষ ২১ সংখ্যা থেকে।

ভাঙারাসের শোভাযাত্রা দেখার জন্য দলে দলে লোক এসে উপস্থিত হয় শান্তিপুর শহরে। এখানকার প্রায় প্রতিটি বাড়ি আত্মীয় বন্ধুবান্ধবে ভরপুর হয়ে ওঠে। তাছাড়া পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে, রাস্তার ধারের খোলা জায়গায় ইঁটের উনুন তৈরি করে বহু পরিবারকে রান্না করতে দেখা যায়।

পৌরসভার পুকুরে স্নান করে চিঁড়ে-মুড়ির পোঁটলা খুলে ছেলেমেয়ে নিয়ে দুপুরের আহার শেষ করতেও অনেককে দেখা যায়। গ্রামের কৃষক রমণীগণ ডাকঘরের মোড়ে, সিনেমার সম্মুখে, প্রসেশন রোডের দুদিকে পরস্পরের শাড়ির আঁচল বেঁধে নিয়ে বসে থাকেন দুপুরের পর থেকেই। সহরের সীমাহীন ভীড়ে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে ওদের এ সতর্কতা।

শান্তিপুরের রাসোৎসবের সাফল্য ও জনপ্রিয়তার কয়েক শতাব্দী এইসব গ্রামীণ জনসমাজের উৎসাহ তিতিক্ষা ও ত্যাগস্বীকারের মুখাপেক্ষী হয়ে আছে। উদ্‌যোক্তা যাঁরাই হোন, আনন্দ আর উদ্দীপনা সব রকম মানুষেরই। গঙ্গাধারা যে-ভগীরথই আনুন তা এখন সকলের।

॥ দুই ॥

কিন্তু সবকিছুরই তো একটা উপলক্ষগত সূচনা থাকে। তেমনই শান্তিপুরের রাসোৎসবের একটা সূচনা-পর্ব অনেকে খুঁজেছেন। যেমন কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে লিখেছেন, 'প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে শান্তিপুরের রামগোপাল, রামজীবন, রামচরণ ও রামভদ্র খাঁ চৌধুরী "গোপীকান্ত দেবকে লইয়া রাসোৎসব বা মেলার প্রবর্তন করেন। বোধহয় তাহার পূর্বে হিন্দুর নিয়মরক্ষা হিসাবে রাসপর্বের সমাধা হইত। যাহা হউক, ১০/১৫ বৎসর মধ্যে ১৬৪৮ শকে তাঁহারা "শ্যামচাঁদের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং তৎপর বৎসর হইতে রাজপথে রাসের শোভাযাত্রা বহির্গমনের বন্দোবস্ত করেন। তাঁহারা ক্রমে বড় গোস্বামী মহাশয়দিগকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে পুরোভাগে রাখিয়া নিজেরা তাঁহাদিগকে অনুগমন করেন। ক্রমে অন্য গোস্বামীরা আসিয়া যোগ দেন, এবং খাঁ চৌধুরীদিগের অনুগমন করেন।'

এইসব ব্যাপার ভাল ক'রে বুঝতে গেলে আগে শান্তিপুরের গোস্বামীদের পরিচয় জেনে নিতে হবে। শান্তিপুরের বয়ঃপ্রবীণ লেখক শ্রীসুবলচন্দ্র মৈত্র 'শ্রীধাম শান্তিপুর' নামে স্মারকপুস্তিকার (১৯৮৬) এক নিবন্ধে লিখেছেন: শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের প্রপিতামহ নরসিংহ মিশ্র সুদূর শ্রীহট্ট থেকে শান্তিপুরে এসে বাস করেন।' এদিকে শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'Vaisnavism in Bengal' (1985) নামক তথ্যনিষ্ঠ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখেছেন: It is said that Advaita Acarya was fifty-two years of age when Caitanya was born... He came to Navadvipa from Laud in Sylhet when he was a boy of twelve...He married Sri Devi and Sita Devi two daughters of one Nrsimha Bhaduri. He had six sons. They were Acyutananda, Krsnadasa, Gopaladasa, Balarama and the twins, Svarupa and Jagadisa...In about 1452-1453 Advaita is said to have visited numerous holy places...returned to Santipur and then married the above mentioned ladies.

দুজনের দুটি তথ্য থেকে মনে হয় অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে শান্তিপুরের যোগাযোগ পিতৃপিতামহক্রমে অথবা বৈবাহিকসূত্রে। যাইহোক, সে-বিতর্ক এড়িয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত করতে বাধা নেই যে, অদ্বৈত থেকেই শান্তিপুরের গোস্বামীসমাজের সূচনা। অদ্বৈতের চতুর্থপুত্র বলরামের সন্তান মথুরেশ গোস্বামী থেকে রাসযাত্রার সূচনা তাতেও বিতর্ক নেই। এই মথুরেশের পরিবারের নাম বড় গোস্বামী বাড়ি। তাঁদের বিগ্রহের নাম শ্রীরাধারমণ। রাসের শোভাযাত্রার সর্বপ্রথমে যাবেন এই রাধারমণ বিগ্রহ। এই রাধারমণের আবার একটু পূর্ব ইতিহাস আছে। রাধারমণ বিগ্রহের আগেকার নাম ছিল শ্রীদোলগোবিন্দ। তিনি ছিলেন পুরীধামে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের একক কৃষ্ণমূর্তি, অর্থাৎ পাশে রাধা ছিলেন না। অদ্বৈতের নাতি মথুরেশ ছিলেন দোলগোবিন্দের পূজারীর গুরু। পরে বসন্ত রায় দোলগোবিন্দকে প্রতিষ্ঠা করেন যশোহরে। মুঘল আক্রমণে যশোহর বিপন্ন হ'লে পূজারীগুরু দোলগোবিন্দকে নিয়ে পালান। মথুরেশ গোস্বামী তাঁর 'রাধারমণ' নামান্তর ঘটিয়ে স্থাপন করেন নিজের বাড়িতে। কিন্তু তখনও তাঁর পাশে রাধাবিগ্রহ ছিল না। এরপরের জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী শোনা যাক বড় গোঁসাইবাড়ির এখনকার উত্তরপুরুষ শ্রীসত্যনারায়ণ গোস্বামীর লেখা থেকে, যা বেরিয়েছিল ১৯৮৭ সালের ১৮ জানুয়ারির 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য়, 'শান্তি-ভাঙারাসের রাইরাজা' নামে।

'প্রায় তিনশো বছর আগে গোস্বামীদের এই গৃহদেবতা একবার চুরি হয়ে গেলে তৎকালীন গোস্বামীবংশের লোকেরা মন্দিরের দরজার সামনে প্রায় তিনদিন ধরনা দেবার পর স্বপ্নে ঐ বিগ্রহ মূর্তির খোঁজ পেয়ে কিছু দূরে মাটির নিচ থেকে রাধারমণকে উদ্ধার করে আনেন। এরপর গোস্বামীরা চিন্তা করেন রাধারমণ একা আছেন বলে হয়ত কোন ত্রুটি হচ্ছে। তাই রাধারমণের জন্য রাধিকামূর্তির প্রয়োজন, সেই কথামত... অষ্টধাতু নির্মিত বহুমূল্যের এক রাধিকা মূর্তি আনা হয়। ঐ রাধিকা মূর্তির নাম দেওয়া হয় শ্রীমতী। এরপর কার্তিক পূর্ণিমার দিন অর্থাৎ বর্তমানে রাসের দিন মহা ধুমধাম করে রাধারমণ-শ্রীমতীর বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ঐ বিবাহ অনুষ্ঠানে সেদিন শান্তিপুরের সব বাড়ির গোস্বামীরা রাধারমণের বরযাত্রী হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। বিবাহের পরের পরদিন (অর্থাৎ বর্তমানে যেদিন ভাঙা রাসের মিছিল বের হয় সেদিন) রাধারমণ-শ্রীমতীর যুগলমূর্তি নগরবাসীকে দর্শন করানোর জন্য সমস্ত গোস্বামীরা এক হয়ে রাধারমণ-শ্রীমতীকে সামনে রেখে পেছনে তাঁদের বিগ্রহ নিয়ে বাদ্যভাণ্ডসহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে নগর পরিক্রমা করেছিলেন। শান্তিপুরে ভাঙা রাসের মিছিলের শুরুও সেই থেকেই।'

গোস্বামী বাড়িতে বিগ্রহ নিয়ে 'ঠাকুর নাচানো' উৎসব

কিংবদন্তীটি চমৎকার কিন্তু এই বর্ণনায় শান্তিপুরের রাসের শোভাযাত্রা সংগঠনে খাঁ চৌধুরী পরিবারের অগ্রণী ভূমিকার অনুল্লেখ দৃষ্টিকটু। এখানে উল্লেখযোগ্য 'শ্রীধাম শান্তিপুর' স্মারক পুস্তিকা'-র (১৯৮৬) অন্তর্গত শ্রীসুবলচন্দ্র মৈত্রের মন্তব্য। তিনি পরিষ্কার লিখেছেন: "শ্যামচাঁদ মন্দির ও বিগ্রহ ১৬৪৮ শকে প্রতিষ্ঠার পর শান্তিপুরের খাঁ চৌধুরীরা এই রাসযাত্রার প্রচলন করেন। এখানে মথুরেশ পরিবার বড় গোস্বামী নামে পরিচিত, তাঁদের শ্রীবিগ্রহ রাধারমণ প্রথমে একক পূজিত হতেন। পরে রাধাষ্টমীর দিন শ্রীরাধিকা মূর্তির সহিত লৌকিক বিবাহ অনুষ্ঠানে খাঁ চৌধুরীরা উক্ত যুগলমূর্তি নিজব্যয়ে

প্রতিদিন সকাল সকাল বাচ্চারা যখন স্কুলে যায়, তখন আপনি তো জানেন সারাদিনে ওদের কত পরিশ্রম করতে হয়। এই সময়ে আপনার সাহায্য ওদের দরকার।

তাই তো আপনি ওদের ভিভা খেতে দেন। ওদের চাঙ্গা ও সুস্থসবল রাখতে ভিভার পুষ্টিগুণের ওপরেই আপনি ভরসা করেন।

ব্যস্, দুধ কিংবা জলে ভিভা মিশিয়ে নিন। ঠাণ্ডা অথবা গরম যেমন ইচ্ছে খান—খাওয়ান। ভিভা খেতে যেমন স্বাদ তেমনি হজমও হয় সহজে। গম আর যবের মণ্টে ভরপুর ভিভায় ভিটামিন আছে সঠিক অনুপাতে।

ভিভা দিনে দুবার। আপনারা সবাই যখন শরীর ও মনে এত খাটেন দিনে রাতে তখন ভিভার শক্তিই থাকে সবার সাথে।

প্রতিদিন মডার্ণ ম্যাথস, কম্প্যুটার ক্লাস আর খেলাধুলার ক্লান্তি। তার ওপর আছে হোমওয়ার্ক—এতেই তো রাত নটা বাজে...

ওদের চাই আপনার যত্ন।

VITAMINISED

ViVA

Builds up Stamina

ভিভার শক্তি আপনাকে রাখে চাঙ্গা ও সুস্থসবল।

জগতজিৎ ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেডের এক উন্নত মানের উৎপাদন

শোভাযাত্রায় বার করেন এবং তাঁরা নিজ বিগ্রহ 'শ্যামচাঁদ নিয়ে শোভাযাত্রার অনুসরণ করেন। দীর্ঘদিন এইভাবে চলে কোন অজ্ঞাতকারণে বর্তমানে 'শ্যামচাঁদ বার হন না।' 'শান্তিপুর পরিচয়' দ্বিতীয় ভাগে (১৯৪২) একই বিবরণ আছে তবে সেখানে শ্যামচাঁদের বদলে গোপীকান্তের নাম আছে এবং শেষে বলা হয়েছে 'তৎপর বৎসর হইতে বড় গোস্বামীগণ মহাসমারোহে রাস করেন।'

এসব কূটকচালি ছেড়ে এবারে একটা সার কথা বুঝে নেওয়া যাক যে, আড়াইশো বছর আগে যা-ই হয়ে থাক এখন শান্তিপুরের ভাঙারাসের শোভাযাত্রার গোড়ায় থাকেন বড় গোঁসাইবাড়ির রাধারমণ-শ্রীমতী। তাঁর অনুগমন করেন খাঁ চৌধুরীদের গোপীকান্তবিগ্রহ। তারপরে শোভাযাত্রায় থাকেন গোস্বামীদের অন্যান্য বংশের গৃহবিগ্রহ। বড় গোস্বামী বংশের কথা আগে বলা হয়েছে। অন্যান্য গোস্বামী বংশ হ'লো অদ্বৈতের পৌত্র দেবকীনন্দনের 'আতাবুনিয়া গোস্বামী', পৌত্র কুমুদানন্দের 'পাগলা গোস্বামী', পৌত্র মধুসূদনের 'গোস্বামী ভট্টাচার্য', প্রপৌত্র ঘনশ্যামের 'হাটখোলা গোস্বামী', প্রপৌত্র রামেশ্বরের 'চাকফেরা গোস্বামী', প্রপৌত্র যাদবেন্দ্রের 'মদনগোপাল গোস্বামী', বৃদ্ধ প্রপৌত্র সন্তোষের 'বাঁশবুনিয়া গোস্বামী'। এইসব গোস্বামী পরিবার নিজেদের বাড়ির সংলগ্ন মন্দিরে তাঁদের গৃহবিগ্রহের নিত্যপূজা ও সংবৎসরের উৎসব অনুষ্ঠান করেন এবং যোগ দেন রাসের শোভাযাত্রায়। সেই বিগ্রহগুলির নাম শ্রীশ্রীকেশব রায়, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায়, শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীশ্রীশ্যাম রায়, শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীশ্রীগোকুলচাঁদ, শ্রীশ্রীনৃত্যগোপাল, শ্রীশ্রীমদনমোহন। এছাড়া মিছিলে থাকেন বিশ্বেশ্বর খাঁ-র শ্রীশ্রীকালাচাঁদ, কুঠিরপাড়ার শ্রীশ্রীনন্দদুলাল, আশানন্দ ঢেঁকির শ্রীশ্রীরাধাবল্লব, মহাভারত দে-র শ্রীশ্রীমদনগোপাল। কৃষ্ণমূর্তির পিছনে থাকেন পটেশ্বরী কালী এবং অন্যান্য শক্তিমূর্তি যা প্রধানত বারোয়ারি।

এবারে আমরা সরাসরি চলে আসতে পারি ভাঙারাসের শোভাযাত্রার বর্ণনায়। তার আগে অবশ্য বলে নিতে হয় যে ভাঙারাসের দুদিন আগে বড় গোস্বামীবাড়ি এবং অন্যান্য বাড়ির বিগ্রহগুলিকে অলংকারে সাজিয়ে বসানো হয় রাসমণ্ডপে। নাটমন্দিরগুলি চন্দ্রাতপ আর ঝাড় বাতিতে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকে। বেজে ওঠে নহবতের রাগিনী। সারাদিন চলে পর্যায়ক্রমে মঙ্গলারতি, পূজাপাঠ, ভোগরাগ, শয়ন, উত্থান, সন্ধ্যারতি, বৈকালীশয়ন এবং আরতির পর শয়ন। রাতে শাস্ত্রমতে হয় বিশেষ রাসপূজা। দর্শনার্থীদের জন্য যথাসময়ে বিগ্রহের আবরণ উন্মোচন করা হয়। দুদিন ধ'রে এইরকম পূজার্চনা চলে। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় হাওদায় ঝাড়বাতি সাজিয়ে বিগ্রহকে তোলা হয় নগর পরিক্রমার জন্য। ধূপ দীপ ফুলে মণ্ডিত থাকে মনুষ্যবাহিত হাওদা।

সেই মিছিলের বর্ণাঢ্য সমারোহে কী কী থাকে এবং কার পর কি তার গদ্যমার্কা বর্ণনার আগে উদ্ধৃত করা যাক শান্তিপুরের বহুপুরুষের অধিবাসী শ্রীবটকৃষ্ণ প্রামাণিকের পয়ারে লেখা এক পদ্যাংশ। তাঁর বিবরণে দেখা যায় :

> প্রথমে ঢাকের সারি শতাধিক চলে।
> সর্বাগ্রে গ্যাসের আলো 'গেট' যারে বলে ॥
> অতঃপর ময়ূরপঙ্ক্ষী বড় পরিপাটি।
> বালকনাচ তারপরে নাচে দুই জুটি ॥
> রাধাকৃষ্ণ সেজে তারা নাচে ছন্দে ছন্দে।
> দর্শকের চিত্ত হরে প্রাণের আনন্দে ॥
> রামায়ণ মহাভারত ভাগবত আর।
> উপাখ্যান কাহিনীর সমৃদ্ধ ভাণ্ডার ॥
> মৃত্তিকার সংয়ে সংয়ে রূপায়িত ক'রে।
> বিগ্রহের অগ্রে অগ্রে যায় পরে পরে ॥
> রাইরাজা হয়ে সোজা বসে সিংহাসনে।
> সর্বশেষে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সাকার।
> ভক্তের হৃদয়ধন আনন্দ অপার ॥

পদ্য ছেড়ে গদ্যে একটু খোলামেলাভাবে রাসের শোভাযাত্রার বর্ণনা দিতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় সন্ধ্যের কিছু পর থেকে শুরু ক'রে এর সমাপন ঘটতে প্রায় ভোর হয়ে যায়। সুনির্দিষ্ট পথ পরিক্রমা করতে লাগে ৬/৭ ঘণ্টা। কারণ প্রত্যেকটি বিগ্রহের অনুষঙ্গী বর্ণময় আয়োজন বেশ বিস্তারিত, শোভাযাত্রার হাওদাগুলি মনুষ্যবাহিত ব'লে ধীরগতি এবং পথপাশের দ্রষ্টাদের প্রচণ্ড ভীড়ে সামনে এগোনো হয়ে ওঠে খুবই কঠিন। শোভাযাত্রার সবচেয়ে যা প্রশংসনীয় তা হলো সকলের শালীনতা ও সংযম। নবদ্বীপের ভাঙারাসকে এই দিক দিয়ে বরাবর টেক্কা মারতে পারে শান্তিপুর। শান্তিপুরের শোভাযাত্রার আরেক গর্ব ও গৌরব তার আলোকসজ্জার নিজস্বতা। দীর্ঘপূজিত পারিবারিক মূর্তি ও অন্যান্য দ্রষ্টব্যবিষয়গুলিতে কখনই নিয়ন আলো বা হ্যালোজেন বিচ্ছুরিত উগ্রতা দেখা যায় না। বরং ঝাড়বাতি ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহিত আলোকব্যবস্থার বেলোয়ারি সম্পন্নতা একটা আলাদা সৌন্দর্য মেলে ধরে। খুব বেশি হ'লে গ্যাসের আলো এখানে ব্যবহার হয়। হাওদাগুলিতেও দারুতক্ষণশিল্পের একটা নান্দনিক প্রাচীনতা চোখে পড়ে। অবশ্য এই স্নিগ্ধ মিছিলের অন্তঃপর্বে বেয়ারা বা লরিবাহিত নানা বারোয়ারি শক্তিপ্রতিমার আধুনিক আলোকসম্পাত ব্যবস্থা খানিকটা রসহানি ঘটায়। এমন দিনের কল্পনা অসম্ভব নয় যখন শান্তিপুরের রাসে প্রাধান্য পাবে বারোয়ারি ধনাঢ্যতা ও চোখ ধাঁধানো জলুস। অর্থনৈতিক চাপে হৃতগৌরব গোস্বামীবাড়িগুলির আয়োজনে দীনতার বেদনা একদিন হয়ত চাপা থাকবে না।

কিন্তু আপাতত সে শোচনা থাক। এখনও তো শোভাযাত্রার একেবারে সূচনায় গুরু গুরু শব্দে বেজে ওঠে আগেকার মত ১০৮ না হোক তবু অজস্র ঢাক। তার চলমান আওয়াজে দর্শনার্থীরা সচকিত হয়ে ওঠেন। তাহলে শুরু হয়ে গেল ভাঙারাসের মিছিল। ঐ ঐ আসছে। পথপাশের শ্রান্ত ক্লান্ত অপেক্ষাতুর মানুষগুলি সহসা চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। ঘুমন্ত শিশুগুলি চোখ রগড়ে তাকায়। পর্যায়ক্রমে এবারে সারারাত শুধু দেখে যাওয়া একটার পর একটা বিগ্রহকে পেছনে রেখে ধারাবাহিক দ্রষ্টব্যের চলমানতা। যেন দৃষ্টির উৎসব। একটা নমুনা দেওয়া যাক। শুধু বড় গোঁসাইবাড়ির শোভাযাত্রা কেমনতর। প্রথমে ঢাকের বাদ্যি চলে গেলে এসে যাবে ময়ূরপঙ্ক্ষী। এ জিনিস মফস্বল বাংলায় নতুন নয়। তবে শান্তিপুরে এর অভিনবত্ব এইখানে যে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী বেশে ছ'জন লোক সমসাময়িক সমাজপ্রসঙ্গ নিয়ে হাল্কা ঢঙে বাঁধা কিছু গান করে চলেন, যার গোড়ায় একটা টান থাকে 'আরে ঐ' ব'লে। দর্শকরা সে গানে মজে যান একেবারে। গানগুলি সংগ্রহ করলে সমাজবিজ্ঞানীরা উপকৃত হবেন নিঃসন্দেহে। শোভাযাত্রায় এরপরে আসে রামায়ণ- মহাভারত - পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে মাটি দিয়ে গড়া সঙ, সঙ্গে বাজনা। তারপরে আসে বালক-বালিকার হাওদা। রাধাকৃষ্ণ সেজে বালকবালিকা হাতে হাত ধ'রে নাচতে থাকে। সবশেষে আসে বিগ্রহের হাওদা কিন্তু তার ঠিক আগেই আসে শোভাযাত্রার মূল আকর্ষণ 'রাইরাজা'।

এই রাইরাজার বৃত্তান্ত একটু আলাদা করে বলা দরকার। রাইরাজা মানে ব্রাহ্মণবংশের একটি সুন্দরী কুমারী মেয়েকে চমৎকারভাবে রাইয়ের বেশে সাজিয়ে তোলা হয় ঝাড়বাতি শোভিত হাওদায়। ব্যস, যতক্ষণ চলবে শোভাযাত্রা অর্থাৎ ৬/৭ ঘণ্টা একেবারে স্থিরমূর্তি হয়ে থাকতে হবে। এখনকার কালে বিভিন্ন রাইরাজার মধ্যে প্রতিযোগিতা চালু হয়েছে। সেরা রাইরাজা পুরস্কার পান। শুধু এই একটা নয়। শান্তিপুর রাসোৎসব কমিটি বছর বছর আরো দুটি পুরস্কার দিচ্ছেন শ্রেষ্ঠ শোভাযাত্রা ও শ্রেষ্ঠ মণ্ডপসজ্জার। সে যাই হোক বর্তমানে শান্তিপুরে রাইরাজা নিয়ে খুব বিতর্ক উঠেছে। অনেকে এমনও ভাবতে শুরু করেছেন যে, ভবিষ্যতে হয়ত বিগ্রহ দর্শনের চেয়ে রাইরাজা দর্শনই হয়ে পড়বে মুখ্য। এটা ঠিক যে রাসের শোভাযাত্রায় রাইরাজা কবে থেকে এবং কী ভাবে অংশ নিচ্ছে তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেন না। তবে রাসোৎসবের পুরানো বিবরণে রাইরাজার কোনো বিশেষ উল্লেখ নেই। অবশ্য এখন জানা যায়, আগে রাইরাজা সাজতো নিতান্ত বালিকা কেউ। তাকে নিয়ে তাই বাড়তি উচ্ছ্বাস বা হৈ চৈ তেমন হয়নি কখনও। তবে অতিসম্প্রতি যুবতী মেয়েরাই রাইরাজা সাজে। তার একটা কারণ এই হতে পারে যে অল্পবয়সিনী বালিকা অচঞ্চলভাবে বসে দীর্ঘ সময়ের ধকল নিতে পারে না। বড়োরাও ততটা পারে না। উদ্‌যোক্তারা বলেন, শোভাযাত্রার শেষে রাইরাজাবেশিনী মেয়েরা লুটিয়ে পড়ে শ্রান্তিতে। তথ্য হিসাবে এমন খবরও আছে যে পঞ্চাশের দশকে রাইরাজা সাজবার মত মেয়েদের এতই অভাব হয় যে দুবার কমবয়সী ছেলেদের রাইরাজা সাজানো হয়। শ্রীসত্যনারায়ণ গোস্বামী লিখেছেন : 'বর্তমানেও রাইরাজা সাজানোর মত মেয়ে যখন ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হচ্ছে, তখন আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তার পুরস্কার প্রথা প্রবর্তন করে এক শ্রেণীর লোক প্রাচীন এই ধর্মীয় কৃষ্টিকে সুন্দরী প্রতিযোগিতার পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে বেশ

কয়েকটি গোস্বামী বাড়ি থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।' গোস্বামী বাড়ি থেকে এই অভিযোগের কারণ অবশ্য অনেকটা এই জন্য যে, তাঁরা ব্রাহ্মণ কন্যা ছাড়া রাইরাজা সাজান না। অন্যান্যদের এই জাতি বিচার নেই ফলে তাঁদের কাছে সুন্দরী মেয়েই প্রধান বিচার্য। অনুমান করা যায়, প্রতিযোগিতায় ও দর্শক আকর্ষণে জিতছেন তাঁরাই।

শান্তিপুরের যেসব মেয়ে রাইরাজা সাজবার আহ্বান পায় তাদের একটা আলাদা সামাজিক কদর হয়। কেননা ভক্তিমান দর্শকদের কাছে রাইরাজা খুব সম্ভ্রম ও উদ্বেলতা জাগাতে পারে। তাই শোভাযাত্রায় রাইরাজা আবির্ভাব হওয়ামাত্র রাস্তার সবদিকের নারীবৃন্দ উলুধ্বনি দিতে থাকেন, কেউ কেউ গড় হয়ে প্রণাম করে বসেন। তাই নিছক সৌন্দর্য বা শারীরিক সক্ষমতা নয় রাইরাজা যারা সাজে তাদের ভেতরে ভক্তিভাব ও উন্নত মানসতা খুবই দরকার। এই রাইরাজা নিয়ে শান্তিপুরে কিছু লোকবিশ্বাস আর মুখ চলতি কথা শোনা যায়। যেমন অনেকে মনে করেন গোস্বামী বাড়ির রাইরাজা যে সাজে এক বছরের মধ্যে তার বিয়ে হয়ে যায়। কথাটি অনেকাংশে সত্য এবং তার কারণ অনুমেয়। তবে সত্তর দশকে রাইরাজা প্রতিযোগিতা চালু হবার পর শান্তিপুরের কোন কোন সমাজসচেতন মানুষ তার প্রতিবাদ করেন। মুদ্রিত প্রতিবাদের নমুনা পাচ্ছি ১৯৭৪ সালের ৫ ডিসেম্বর সংখ্যা স্থানীয় 'জনতার মুখ' কাগজে। সেখানে বলা হয়েছে: 'জানা গেল, শ্রেষ্ঠ রাই-রাজার জন্য এবার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এটা একটা প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য প্রতিযোগিতারই নামান্তর। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা নারীদেহ নিয়ে পণ্য ব্যবসা বলে সুস্থ চিন্তার মানুষের কাছে ধিকৃত হচ্ছে। শান্তিপুরে ধর্মের আচ্ছাদনে সেই ব্যাপারটারই সূত্রপাত হতে চলছে না?' হয়ত প্রতিবাদের ধরন একটু ঝাঁঝালো, কিন্তু অন্য এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে: 'এই পুরস্কার প্রচলন করার পর থেকে শান্তিপুরে ভাঙারাসে রাইরাজার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।' রাইরাজা বিতর্কের ইতি টেনে এখানে সবশেষে উল্লেখযোগ্য ১৯৮৬ সালের ১৪ নভেম্বর সংখ্যা 'সমাজের প্রতিচ্ছবি' কাগজের একটি আবেদন। তাতে বলা হয়েছে: 'শান্তিপুরের রাসে শ্রেষ্ঠ রাইরাজা পুরস্কার বন্ধ হোক।'

বন্ধ অবশ্য হয়নি। বরং ভবিষ্যতে রাসযাত্রার এই অংশই ক্রমশ জাঁকালো হয়ে উঠতে পারে। এখানে অবশ্য উল্লেখনীয় যে, রাসের শোভাযাত্রায় ধর্মপ্রাণ নরনারী এখনও পর্যন্ত খুব উৎসুক থাকেন বিগ্রহ দর্শনে এবং অবশ্যই পটেশ্বরী কালীমূর্তি দর্শন এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই মূর্তির বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জা অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। রাসের মিছিল এই রকম নানা বৈচিত্র্যে ও রমণীয়তায় মণ্ডিত হয়ে এক সময় ভোরের দিকে শেষ হয়। শ্রান্ত ক্লান্ত দর্শকদের অনেকেই শুয়ে পড়েন পথে প্রান্তরে, ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েন। শোভাযাত্রার অংশগ্রহণকারী মানুষজন, হাওদাবাহকদের দল লুটিয়ে পড়েন পথশ্রমে। বিগ্রহগুলিকে বসিয়ে দেওয়া হয় নির্দিষ্ট
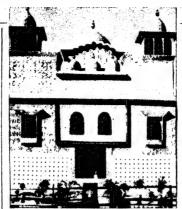
রাসপ্রতিমার প্যাণ্ডেল। অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের আদলে

রাসমণ্ডপে। সারাদিন ধরে ভক্তরা তাঁদের দর্শন করেন মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে। অতঃপর বিকালে শুরু হয় রাসের সমাপন উৎসব। তার নাম 'ঠাকুর নাচ' বা 'ঠাকুর নাচানো'। সব গোস্বামী বাড়ির রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এবারে রাসমঞ্চ থেকে মূল মন্দিরে আনা হয়। গোঁসাই বাড়ির ছেলেরা শুদ্ধবস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাধা আর কৃষ্ণের বিগ্রহ নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাজনার তালে তালে নাচতে থাকে। এই নর্তন উৎসব সাঙ্গ করে রাসমঞ্চ থেকে মন্দিরের সামান্য পথ পরিক্রমা করতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যায় ভক্তদের অপরিমেয় ভীড়ে এবং নর্তনকারীদের আমগ্ন উদ্বেলতার কারণে। সন্ধ্যালগ্ন ঘনিয়ে আসার আগেই সব বিগ্রহ বসে যান মন্দিরের স্বস্থানে। এবারে এক বছরের বিশ্রাম আর ভক্তদের শুরু আরেক বছরের উদগ্রীব প্রতীক্ষার।

॥ তিন ॥

কিন্তু আমাদের বলবার বা ভাবনার কথা কিছু থেকে যায়। প্রথম কথা, শান্তিপুরে যে এমন এক জন-উৎসব (অথচ যার অন্তর্মূলে রয়েছে বৈষ্ণব রিচুয়াল) এতদিন ধরে চলছে তার গতিপ্রকৃতি কোনদিকে? তার পরে ভাবা দরকার শান্তিপুরের জনবিন্যাসে আর সমাজ গঠনে কী এমন উপাদান আছে যার ফলে এমন এক প্রাচীন ধরনের উৎসব এত সমারোহে আজও চলছে? বিশেষ করে প্রশ্নটা জরুরী এইজন্য যে গত তিনটি সাধারণ নির্বাচনে শান্তিপুরে ধারাবাহিকভাবে বামপন্থী দল জিতেছে এবং সেখানকার যুব সমাজে প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা করবার মত মানুষ কম নেই।

একটা কথা অবশ্য স্পষ্টই শান্তিপুরের সবাই স্বীকার করেন যে, জায়গাটা বড়ই রক্ষণশীল। রক্ষণশীলতার একটা বড় কারণ দীর্ঘদিন শান্তিপুরের জন-সমাজে স্মার্ত ব্রাহ্মণ ও 'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদে'র প্রাধান্য। জেমস লঙ উনিশ শতকে লিখে গেছেন, শান্তিপুরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পাদপীঠরূপে তিরিশটি সংস্কৃত টোল ভালভাবে চালু ছিল এবং ১৮১৬ সালে নদীয়া জেলায় যে ছাপ্পান্নজন নারী পতির সহমৃতা হয়েছিলেন তার মধ্যে কুড়িজন সতী ছিলেন শান্তিপুরের। লঙ আরো জানিয়েছিলেন শান্তিপুরের মোট বাসিন্দার একের তিন অংশ ছিল বৈষ্ণব। শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন: The movement of Advaita in Santipur failed to curb the influence of the local Brahmanas। রমাকান্তবাবু তাঁর লেখায় অদ্বৈতপন্থী জনৈক কুঞ্জবিহারী গোস্বামীর লেখা 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্যবিষয়ক সিদ্ধান্ত' বই থেকে তথ্য নিয়ে মন্তব্য করেছেন শান্তিপুরের সমাজে ও ধর্মাচরণে স্মার্ত ব্রাহ্মণদের অগ্রচারিতা ও একাধিপত্যের বিষয়ে। এই সবের যোগফল থেকে বলা চলে শান্তিপুরের রাসোৎসব দীর্ঘদিন চলবে। তার আরও বড় কারণ এই যে, সেখানকার প্রধান উপজীবিকাধারী তন্তুবায় শ্রেণীর বিপুল অংশই বৈষ্ণবধর্মাশ্রিত এবং দেশ ভাগের পর যে সব উদ্বাস্তু সেখানে এসেছেন তাঁদের একটা গরিষ্ঠ অংশ মৌলিকভাবে গৌরগঙ্গার অনুরাগী। এ সব কারণ ছাড়াও সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে বাঙালীর নানা মূর্তিপূজার উৎসব গত একদশকে খুবই জাঁকালো হচ্ছে। দেশের অনাহার-বেকার সমস্যা-জনবিস্ফোরণ আর রাজনৈতিক স্ববিরোধিতার জন্য যুব সমাজ কোন সুস্থির আদর্শের বদলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ক্ষণ-উন্মাদনায় ও ধর্মীয় হুজুগে। ধর্মসাধনার আন্তরিকতার বদলে জাঁকজমক, প্রসেশ্যন ও প্যাণ্ডেলের দিকে ঝোঁক, চিৎকৃত গান বাজনার তালে আত্মহারা নাচ এবং বিশাল কালীমূর্তি অর্চনা এখনকার জনপ্রিয় যুব সংস্কৃতি। শান্তিপুরের রাসেও তার ছোঁওয়া লাগছে।

শান্তিপুরের রাসের যে বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠান তার অনেকটাই স্থানীয় কিংবদন্তীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। রাইরাজার পরিকলপনাও বেশ চটকদার। তবে স্বীকার করা ভাল যে, নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের আচারগ্রন্থ 'হরিভক্তি বিলাস' এমনতর রাসোৎসব করবার নির্দেশ দেয়নি। বোঝা যায় রাসের অনেকটাই লোকায়ত ও গ্রামীণ ভাবনা থেকে তৈরি। এ অনুষ্ঠান চলবে নিঃসন্দেহে কেননা শান্তিপুরের মানুষজন আন্তরিকভাবে মনে করেন যে রাস তাঁদের সংস্কৃতি ও ধর্মধারণার এক সুষ্ঠ ও সংহত আত্মপ্রকাশ। রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে অধিবাসীদের অধিকাংশই এ উৎসবে জড়িত। তবে ধীরে ধীরে উৎসবের রাশ গোস্বামীদের হাত থেকে জনগণেশের হাতে চলে যাচ্ছে। কেননা গোস্বামীদের আর্থিক সমৃদ্ধি তো বাড়ছে না। তাঁদের এখন প্রথা রাখতে প্রাণান্ত। তাই গোস্বামী পরিবার ও তাঁদের রাসোৎসবে দীয়তাং ভুজ্যতাং বিষয়ে মীথ এখন বেশ নাড়া খাচ্ছে। এখন আর এমন বলা যাবে না, যেমন বলেছিলেন শান্তিপুরের পুরানো এক কবি, যে—

রাসের কদিন নবীন প্রবীণ ঐরা সর্বজনে।
অন্নদানে অতিথিগণে দর্শকে আহ্বানে॥

তবে গোস্বামীদের রাসে সবটাই ভরতুকি বাজেট নয়। ধর্মপালন, সমাজনেতৃত্ব, জনপ্রিয়তা তো আছেই। একজন শান্তিপুরবাসী জানালেন, 'খরচও হয় গোঁসাইদের, তবে কি জানেন? শিষ্য সেবকদের দক্ষিণা আর যাত্রীদের প্রণামীতে রোজগার হয় অনেক বেশি।'

কৃতজ্ঞতা ● সুবলচন্দ্র মৈত্র। বটকৃষ্ণ প্রামাণিক। মিণ্টু মুখোপাধ্যায়। সত্যনারায়ণ গোস্বামী।
আলোকচিত্র ● সত্যেন মণ্ডল।
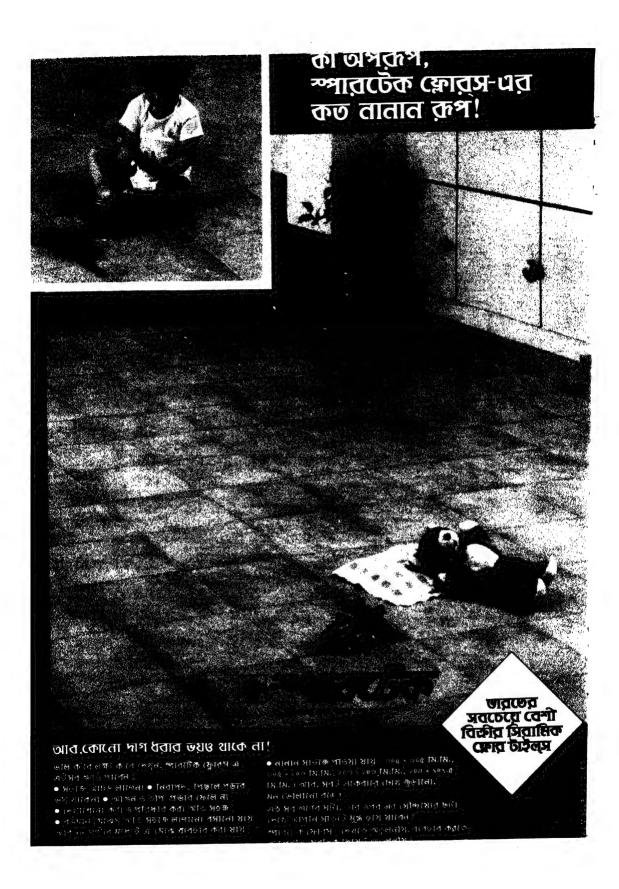
কী অপরূপ,
স্পারটেক ফ্লোরস্-এর
কত নানান রূপ!
ভারতের
সবচেয়ে বেশী
বিক্রীর সিরামিক
ফ্লোর টাইলস্
আর কোনো দাগ ধরার ভয়ও থাকে না!

উৎসবের লোকায়ত আঙিনায়

কিশলয় ঠাকুর

প্রয়োজনকে প্রদক্ষিণ করা প্রাত্যহিক জীবন মাঝে মাঝে ব্যক্তি-বৃত্তের বাইরে আবেগের আঙিনায় এসে দাঁড়ায়। সেই দিন তার আনন্দ, সেইখানে তার উৎসব।

শাস্ত্রীয়, সামাজিক, লৌকিক, পারিবারিক শতরূপ উৎসবের উৎস কিন্তু লোকায়ত, লোক-উৎসব। সেখানে মন্দির নেই, মূর্তি নেই, মন্ত্র নেই; নেই সংহিতার শাসন, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেখানে, 'প্রেমই উৎসবের দেবতা, মিলনই তাহার সজীব সচেতন মন্দির।'

খোলা আকাশের তলায়, নদীতীরে, পাহাড়ে, কখনো মহুয়া বা শালতরু ঘিরে, কিংবা পল্লীর পথে পথে ঘুরে নাচে-গানে, নিষ্ঠায়, প্রার্থনায় পরব পালন। কালের বিবর্তনে কিছু কিছু বিকৃতি হয়তো ঘটছে, ঘটছে কিছুর বিলুপ্তিও। তবু যা আছে তাও বিপুল। লোক-উৎসবের প্রায় সবকটির সঙ্গেই যোগ আছে মেলার। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সারা বছর আজও তিন হাজারের বেশি মেলা হয় পশ্চিমবঙ্গে। এই উৎসব মেলাগুলি কেবল আমাদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক পরিচয় বহনই করে না, আমাদের নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক পরিচয়সহ সুপ্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস এর শরীরে।

আমাদের সভ্যতা কৃষিভিত্তিক। লোক উৎসবের মূলেও রয়েছে কৃষি। কৃষি-কৃষ্টির শ্রেষ্ঠ দান— ধান। এই ধান কৃষি সভ্যতায় বঙ্গের প্রধান অবদান। ধান বাঙালির প্রাণ, ধানই তার ধন। ধন্য সে যার ধান্য আছে। লোকায়ত উৎসবে-পরবে তাই প্রকৃতির সবকিছু এলেও ধানের স্থান অবশ্যই বেশি।

লোক-উৎসবকে নগর সভ্যতার মণ্ডলে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পেতে হলে যেতে হবে পল্লী বাঙলায়, কৃষকদের আঙিনায়, যেখানের অরণ্যপর্বত আজও আগলে রেখেছে অতীতকে, ঐতিহ্যকে, সেই আদিবাসী ওঁরাও, কোরা, মগ, মাহালি, মেচ, মুণ্ডা, রাভা, লেপচা, লোধা, চাকমা,

শিকার উৎসব: এর একটি অংশ শিকার, অপরটি যৌবনে দীক্ষা

মকর সংক্রান্তির দিন সকালে মকরস্নান

তিন-চারদিন ধরে চলে সাঁওতালদের নাচ আর গান—বর্ণাঢ্য, মুখর লোকোৎসব ছবি : দেবীপ্রসাদ সিংহ

ছবি : সত্যেন সেন

গারো, খেরিয়া, হো, হাজং, সাঁওতালদের অঞ্চলে। এবং প্রায় সংবৎসর ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে টুসু, বিহু, গরাম, বড়াম, বাহ্য, বিধা, ঘেঁটু, ভেঁপু, ভাদু, সয়লা, সহরুল কিংবা ইঁদ, ইতু, জিতিয়া, মাঠাবুরু, মারাংবুরু, ফাগুয়া, চাপাকিয়ার উৎসবমেলা।

সব চাইতে ব্যাপক, পল্লীর প্রাণমাতানো উৎসব হল টুসু পরব। এরই এক রূপ তুষ-তুষালি। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে শুরু হয়ে সারা পৌষমাস চলে উৎসব। দামোদর, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, রূপবতী, কুমারী নদীর তীরে তীরে, উঁচু নিচু পাহাড়ে, কাঁকরের লালপথে, শাল-মহুয়া, কেন্দ-পলাশের ছায়ায় ছায়ায়, লোধা, খেড়িয়া, শবর, বাগাল, হো, মাহাতো, বাউড়ি, মুণ্ডা, সাঁওতালেরা নাচে, গানে, আনন্দে মাতাল করে তুলবে নতুন ধান ঘরে তোলার টুসু পরবের দিনগুলিকে।

অগ্রহায়ণ বা অঘ্রাণ সংক্রান্তি, ওরা বলে আঘন সাঁকরাত। গোবরের দুটি ঢেলা কুলুঙ্গিতে তুলে রাখবে মেয়েরা। ওই ঢেলা দুটি হল টুসু আর টুসি। ঢেলা দুটির ওপর তুষ ছড়িয়ে, মরসুমি ফুল দিয়ে রাখা হয়। তারপরে সন্ধ্যায় শুরু হয় টুসুর বন্দনা। যেমন—

সাধের টুসু আইলা ঘরে, পূজব তোমার চরণ গো।
আইলসা আঘন হইলা শুরু, আনন্দে গান করব গো ॥

এমনি অজস্র গান, যেমন গাইবে মেয়েরা, তেমনি ছেলেরাও হাটে-মাঠে, কাজের মাঝে, মোষ চরাতে গান করবে টুসু-টুসির। প্রতি সন্ধ্যায় বিশেষ করে মেয়েদের চলে টুসু জাগানো গান।

তারপরে পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন হবে চাউড়ি-বাউড়ি। চাউড়ির দিনে খামার থেকে সব ধান নিয়ে আসতে হবে। আর বাউড়ি হল, ধান গোলায় ভরে কিছু বীজ বেঁধে রাখা পৃথক করে।

পৌষ বা মকর সংক্রান্তির আগের দিন গানে গানে চলবে টুসু জাগরণ। মেয়েরা উঠোনে তুষ দিয়ে আগুন জ্বালবে, তাকে ঘিরে নাচবে, গাইবে। নানা রকম পিঠে হবে সেদিন। পরদিন, মকর সংক্রান্তির সকালে সবাই জড়ো হবে নদী বা জলাশয়ের ধারে। স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নেবে। কেউ কেউ তখনই টুসুর বিসর্জন দেয়। স্নানযাত্রা কালে তাদের অনেকে গান বেঁধে গায়—

তরা কন ঘাটে সিনাবি বল
মকরগঙ্গা জল।

আবার অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা স্নান করে টুসু নিয়ে দল বেঁধে চলে চাঁচরা মেলায়। মেয়েরাই টুসু বয়ে নেয়। ছেলের দল সঙ্গে চলে ধামসা, মাদল, বাঁশি নিয়ে। পথে পথেই নাচ-গান জমে। বেশ কৌতুকের গানের ঝগড়াও জমে একদলের সঙ্গে অপরদলের। অন্য দলের টুসুর চাইতে নিজের দলের টুসুর গুণ গায়। যেমন—

হামার টুসু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝলমল করে।
তুঁয়ার টুসু হছরা মাগী আঁচলা পেতে ধরে ॥

এসব চাপান-উতোরে, মাদলে, ঢোলে উতরোল হয়ে ওঠে শাল-মহুয়ার লাল বীথিপথ, মেলার আনন্দ। কারণ, ওসব কপট ঝগড়া। আসলে এ

কেন্দুলির বাউল মেলায় ছবি : অলক মিত্র

মেলা, মিলনের আনন্দের। মেলায় টুসুর মালা বদল হয়। একে অপরের খোপায় পরিয়ে দেয় টুসুর ফুল। হয় টুসু-সই-পাতানো।

আগে টুসুর কোনও মূর্তি হোত না, এখন কোথাও কোথাও প্রতীক তৈরির ঝোঁক দেখা দিচ্ছে। তবে প্রতীক মূর্তি যাই হোক, টুসু শস্যোৎসব। মাসের পর মাস পরিশ্রম করে অঘ্রাণে ওঠে, তাই আর শ্রম নয়, 'আইলসা আঘান' এসেছে। এখন আলস্য, বিশ্রাম, আনন্দ-উৎসব।

ভাদু পরবেও এরকম গানে গানে ছড়া কেটে কপট কলহ হয়ে থাকে। ভাদুও ধানের উৎসব। আউশ ধান ঘরে তোলার মরসুম। ভাদুরানীকে কল্পনা করা হয় রাজকন্যা রূপে। পুরো একমাস পরব পালন করে সংক্রান্তিতে ক্ষান্তি। এই একমাস কুমারী মেয়েরা নাচে-গানে সোনার ধানের ঢেউ এনে দেয় গ্রামের বাতাবরণে। প্রতি সন্ধ্যায় তারা মিলিত হয় গাঁয়ের মধ্যে কোনও বিশেষ জায়গায়। 'আদরিনী ভাদুরানী আজ এলো ঘরকে'—জাতীয় অনেক অনেক গান আছে ভাদু জাগরণের। আবার টুসুর মতো ঝগড়ার গানও আছে। যেমন—

ওপাড়াতে দেখে এলেম চিপসে ভাদু গড়ে
নড়েনা চড়েনা সান্নিপাতে মরে।

এই ভাদু ছাড়া ভাদ্রে আর এক পরব ঘেঁটু। ঘেঁটু ষষ্ঠীতে হয় ভাঁজোর বোধন। নতুন সরায় বীজ লাগানো অনুষ্ঠান। অনেক মজার মজার গান আছে ভাঁজোর। যেমন কোনও মেয়ে গায়—

তোমার বাড়ি আমার বাড়ি আট পাঁচিলে ঘেরা।
হাত বাড়িয়ে দিলেম পান দেখলে দেওর ছোঁড়া।

ভাদ্রের আর এক পরব ইঁদ পূজা, কোথাও কোথাও বলে ইন্দি পূজা। দুটিই ইন্দ্রপূজা অর্থাৎ সূর্যপূজা। ভাদ্রের পচা দিনগুলিতে সূর্যকে কামনা করাই হচ্ছে এই পরবের বৈশিষ্ট্য। তবে ভাদ্রের বড় পরব করম উৎসব। ব্যাপক সাড়া জাগে গ্রামবাংলায় এই উৎসবে। মুণ্ডা সম্প্রদায় এই করম পরবের পরেই করে ইন্দি পূজা। 'পূজা' শব্দটির সঙ্গে একটা শাস্ত্রগন্ধ আছে বটে, তবে মনে রাখতে হবে এর কোনও পূজাতেই সংস্কৃত মন্ত্র বা ব্রাহ্মণপুরোহিত নেই। আর উৎসগুলিও শস্যোৎসব। করম পরবও শস্যরক্ষার পরব। ভাদ্রের শুক্লা একাদশীতে এই পরব হয়। প্রতি পল্লীতে কুমারী মেয়েরা নাচ-গান করতে করতে কাছের বনে যায়। সেখান থেকে করম গাছের ডাল এনে আঙিনায় পুঁতে দেয়। তারপর তাকে ঘিরে নাচে গায়। এই উৎসবে বিধবাদের যোগদান বারণ।

ভাদ্রে আর একটি বড় উৎসব হয় দার্জিলিঙ জেলার পাহাড়িদের। শ্রাবণ তাদের কষ্টের কাল। শ্রাবণ শেষ তো মনে জ্বলে সুদিনের আশার আলো। শ্রাবণ সংক্রান্তি যেই উত্তীর্ণ, শুরু হল ঘরে ঘরে পাহাড়ে পাহাড়ে আলো জ্বালানো উৎসব। এই উৎসবের নাম মারুনী। গো-মহিষের কপালে তিলক পরানো হয়। বেলা পড়ে এলে বড় কোনও গাছের তলায় জড়ো হবে মেয়েরা। গাইবে ভৈল গীত।

নাচে ছেলেরা। তারা প্রথমে যাবে গুরুগৃহে। সেখানে উপোস করে শুদ্ধ হবে। তারপর গুরু ওদের মেয়েদের মতো সাজিয়ে দেবে। তারপর মাদল নিয়ে বেরোবে ওরা নাচতে। দিকেদিকে দীপাবলি, মেয়েদের গান, ছেলেদের নাচ। পাহাড়ের গায়ে মাদলের প্রতিধ্বনি ফেরে। শুক্লা একাদশী পর্যন্ত পাহাড়গুলি পাগল হবে মারুনী উৎসবে।

ভাদ্রের আর এক পরব বেরা পরব। এই অনুষ্ঠানটি মুরশিদাবাদে শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে আনে এক নৌকো বিহারের আনন্দ। জলে, কলার ভেলা ভাসিয়ে তারা খাঁজা খিজির-এর নামে তা উৎসর্গ করে। পরে নিজেরা ভাসে সাজানো নৌকোয় আলোর মালা দিয়ে। বাজি পোড়ানোও হয়। তবে আগের নবাবি আমলের সে রূপ জৌলুস আর নেই বেরা পরবের। তখন লাখ লাখ টাকা নাকি উড়ে যেতো বেরা রাতের উৎসবে। নৌকোয় বাইজি নাচেরও ব্যবস্থা করতেন নবাবেরা। সেই সঙ্গে চলত খানা-পিনা। নবাবি হুল্লোড় না হলেও সাধারণ মানুষ নেহাৎ আলোয় সাজানো নৌকো বিহারের নির্দোষ আনন্দ সেখানে আজও উপভোগ করে। নৌকোবাইচও হয় কোথাও কোথাও এই উপলক্ষে।

ভাদ্রের আগের মাস আষাঢ়ে বিরহড়দের হয় সামবোঙ্গা পরব। মহুয়া খেয়ে মাদলের তালে তালে নেচে-গেয়ে তরুণ-তরুণীরা উদযাপন করে এই সামবোঙ্গা পরব।

শ্রাবণের পূর্ণিমায় শবরদের আছে ডোমনাচ।

ভাদ্রের পরের মাস আশ্বিন। এই আশ্বিনে

টুসু পরব : নাচে গানে আনন্দে মাতাল করে তোলার উৎসব

ছবি : সত্যপ্রিয় সরকার

কৃষকদের আছে ধানডাকা পরব। মাঠে গিয়ে আতপচাল ছড়িয়ে মাঠ ভরতি ফলনের জন্য ধানকে ডাকার অনুষ্ঠান।

এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর একটি অনুষ্ঠান— মুট আনা। এটি হয় অগ্রহায়ণে। এখানে আছে আতপচাল ছড়ানো। চাষী একমুঠো ধানগাছ নিয়ে আসে বাড়িতে। ধান থাকে লক্ষ্মীর হাঁড়িতে। আর খড়গুলি মকর সংক্রান্তিতে জলে ফেলে দিয়ে স্নান করে ফেরা। এই স্নান করাকে বলা হয় বাউড়ি স্নান।

এই ধান আনাকে কোথাও কোথাও ডেনি বা দেনি আনাও বলা হয়। অনুরূপ অনুষ্ঠান হালকাটা। অঘ্রানের শেষে এটি হয়। ধানের গোছা কেটে এনে ধূপ-ধুনো দিয়ে পূজা হয় ঘরে। এ পূজায় কোনও শাস্ত্রীয় মন্ত্র বা ব্রাহ্মণ পুরুত নেই।

উত্তরবঙ্গের অনেক এলাকায় কার্তিকমাসে আর এক পরব আছে, পাটকাঠিতে আগুন দিয়ে পল্লীবাসীর গ্রাম পরিক্রমা।

এই কার্তিকেই আর এক পরব বাঁধনা। গো-ধন বন্দনার উৎসব এটি।

কার্তিকের বাঁধনা পরবের মতোই পৌষ মাসেও গো-ধন বন্দনা করা হয় সোহরায় উৎসবে। গরুর পা-ধুয়ে কপালে শিং-এ সিঁদুর পরিয়ে পিঠে খাওয়ানো হয়। সারা বছর তাকে দোহন করি। এই মরসুমে বিশেষ করে অনেক কিছু চাই তার কাছে, এই অনুষ্ঠান, আনতচিত্তে সেই ঋণ, সেই কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি।

এ সময়ের আর এক উৎসব বিধা। শুনতে অনেকটা বাঁধনার কাছাকাছি হলেও এটি পশুবন্দনা নয়। পশু শিকারের পরব।

লোধা সম্প্রদায় এই শিকারে যাবার মুখে কিছু কোনও উৎসব করবে না। তাদের উৎসব শিকার থেকে নির্বিঘ্নে ফেরার পর। হয়তো শিকার মানে জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে প্রাণান্তক লড়াই হতে পারে। তাই প্রথা হল, শিকারে যাত্রার সময়

রক্তে ঢেউ তোলা ছন্দে বাঁধা আছে আদিবাসী-উৎসবের প্রাণ

ছবি : তিমির দত্ত

মরদেরা স্ত্রীদের হাতের নোয়া খুলে দিয়ে যায়। বধূরা এ সময় সিঁদুরও পরে না। মরদেরা ফিরে এসে নোয়া পরায়, সিঁদুর পরায়, তখন আনন্দ উৎসব।

এমনি বারো মাসে তের নয় তিন-শ পার্বণেও শেষ নেই উৎসবের। অঘ্রান থেকে শুরু করে একের পর এক অন্তহীন উৎসব আনন্দের ঢেউ গড়িয়ে পড়ে ফাল্গুন-চৈত্রে, যখন বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।

বনে বনে পলাশের রঙ। মুকুলিত শালবীথি। হাওয়া মহুয়ার গন্ধে মাতাল। হৃদয়ও তখন চায় তারই সঙ্গে ছন্দ মিলাতে। এ-সময়ের সবচাইতে আকর্ষণীয় উৎসব ফুলের উৎসব, যার নাম বাহা পরব। ফুলের উৎসব আদিবাসী সমাজের সহজাত। তবে এই বাহা প্রধানত সাঁওতালদের পরব। উৎসবের শুরু ফাল্গুনের শুক্লা দ্বাদশীতে। চলে তিনদিন। এই সময়ে ছেলেমেয়েরা শালের মঞ্জুরী, মহুয়ার ফুল দিয়ে সাজে। নাচে, গান করে যূথবদ্ধ হয়ে। এই উৎসবের আগে কোনও সাঁওতাল ফুল পাড়বে না, ফুলের ডালে হাত পর্যন্ত ছোঁয়াবে না। বছর দু'য়েক আগে ঠিক এই পরবের দিন পনের আগে পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে গিয়েছিলাম সাঁওতালদের এক চাপাকিয়া উৎসবে অতিথি হয়ে। চাপাকিয়া হল প্রেমের উৎসব। বনপথে ঘুরতে ঘুরতে প্রথম যেদিন এক সাঁওতাল তরুণ আর সাঁওতাল তরুণী পরস্পরকে দেখল, নিজেদের অজান্তেই প্রেম জাগ্রত হল এবং পরিণামে মিলিত হল দু'জনে, তারই স্মরণ অনুষ্ঠান চাপাকিয়া। যাওয়ার পথে শাল মহুয়ার মঞ্জরী আমাকেও নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। পথে অনেককে বলেছি কয়েকটি মঞ্জরী পেড়ে দিতে। কেউ দেয়নি। উৎসবের অঙ্গনে পৌঁছে আমার পরিচিত দুটি আধুনিক শিক্ষিত তরুণকেও ওই মঞ্জরীর বাসনা প্রকাশ করি। ইচ্ছে কলকাতায় নিয়ে আসব। তারাও দেখলাম মুখে হাঁ-না কিছু বলল না। আমি হাল ছেড়ে দিলাম। পরদিন কলকাতার পথে যাত্রাকালে দেখলাম একটা মোড়কে লুকিয়ে কিছু মঞ্জরী তারা আমার ঝোলায় ভরে দিল।

এ অঞ্চলে তো এখন ফুলের বন্যা চলছে। হাজার মঞ্জরী ভাঙলেও কিছু এসে যায় না। তবে কেন এমন অনীহা দিতে। কেন দিয়েও এতো লুকোচুরি।

আমার তরুণ বন্ধু মহাদেব হাঁসদা যখন আস্তে করে শোনালো, ফুলের পরবের আগে মঞ্জরী ভাঙা বারণ, তাই এই লুকোচুরি, তখন নিজেকেই অপরাধী মনে হল। ছি ছি, এ কাজটা ওকে দিয়ে কেন করালাম। তবে জানতেম না বলে বনদেবতা মার্জনা করবেন, মার্জনা করবেন প্রকৃতির সন্তান সাঁওতালরাও হয়তো।

সাঁওতালদের বাহারের মতো এ-সময়কার আর একটি উৎসব সহরুল, বা সরহুল। ভূমিজ সম্প্রদায়ের এটাই বড় উৎসব। ফাল্গুনে শুরু হয় শাল-মহুয়ার ফুল দিয়ে। বৈশাখ পর্যন্ত নানা দিনে, নানা নামে চলে এর ঢেউ। মুণ্ডাদেরও সরহুল পরব ফাল্গুনে।

তিনদিন ধরে নৃত্য-গানে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে

আদিবাসীদের নববর্ষ উৎসব

ফেরা। এই উৎসব ওঁরাওদের আছে। তাদের উৎসব চৈত্র মাসে। কোনও কোনও সম্প্রদায় এই উপলক্ষে শালবনের শালুই থানে জমা হয়, শালুই থান বলতে বাছাই করা কোনও শাল গাছ। এই গাছকে বন্দনা করা হয় উৎসবে।

তবে চৈত্রের সঙ্গে সঙ্গে রোদ যেমন চড়তে থাকে উৎসবেরও কিছু কিছু রঙ সুর বদলে যেতে থাকে। চড়ক, গাজন, নীল, বোলান শুরু হয়ে যায়। বাণ বেঁধা, বড়শি ফোঁড়া, চড়ক ঘোরা, আগুন নিয়ে খেলা করার পরব। এরমধ্যে গাজন যেমন বেশি হয় বাঁকুড়ায়, বোলান তেমনি মুরশিদাবাদে। রাঢ় বঙ্গে সূর্যের প্রতীক হিসাবে ধর্ম ঠাকুরেরও উৎসব হয়। দীর্ঘ লৌহ শলাকা জিভের এক দিক দিয়ে ভরে আর এক দিক দিয়ে টেনে বার করে নেয়। বা ফুঁড়ে দুপাশে দুমড়ে ধরে নাচে, এতে আশ্চর্য, এদের জিভের কোনো ক্ষতি হয় না। কোনও এক পাতার রস চিবোলেই রক্তপাত বন্ধ। ক্ষতও দুদিনে শুকোয়। বোলানও গাজনের মতো চৈত্র সংক্রান্তিতেই হয়। এর বৈশিষ্ট্য মুণ্ড নৃত্য। মুখোশ পরে নাচ হয়।

মালদায় গম্ভীরাতেও মুখোশ ব্যবহৃত হয়। মুখোশ আছে পুরুলিয়ার ছৌ নাচেও।

বাঁকুড়ায় গাজন উৎসবের অঙ্গ জিভে বাণ-ফোঁড়

ছবি : শ্যামলেন্দু গরাই

গাজনে যেমন আছে আগুন নিয়ে খেলা, আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, ধর্ম ঠাকুরের পরবেও হাতে জ্বলন্ত আগুন নিয়ে খেলা আছে। টকটকে আগুনকে ওরা বলে লাল ফুল। খেলাকে বলে লাল ফুল খেলা। এত অবাক কাণ্ড, হাতের তেলোয় আগুন নেয়, অথচ হাত পোড়ে না।

আগুন ঢালা চৈত্র দিনের এই রুদ্র নাচন উৎসবের মধ্যেও আর এক ধরনের উৎসব চলে কিন্তু গ্রামবাংলায়। কোচবিহারে হয় বাঁশ উৎসব। এর আর এক নাম মদনোৎসব। উৎসবের কাল চৈত্র মাসের মদন চতুর্দশী। বাঁশের ডগায় চামর বেঁধে লাল শালুতে বাঁশটিকে ঢেকে তাকে পুঁতে দেওয়া হয় মাঠের মধ্যে। তাকে ঘিরে আদি রসাত্মক অনুষ্ঠান এই মদনোৎসব।

সবটাকেই নেহাৎ যৌন ব্যাপারের প্রতিভাস ভাবা ঠিক হবে না। এর মধ্যেও এক ফসল সৃজনের বাসনা রয়েছে। একটি আছে মেয়েদের মদননৃত্য। সে নাচ হয় মেয়েদের এলোচুলে। এই এলোচুলে নাচের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল শস্যও যেন এলোচুলের মতো রাশি রাশি ছড়িয়ে পড়ে মাঠ জুড়ে।

শস্য কামনায় আর একটি নৃত্য গানের পরব আছে হুদুমদেও। উৎসবটি রাজবংশী সমাজের। হুদুম বর্ষার দেও বা দেবতা। অনাবৃষ্টি চললে তো আর মাঠভরা ফসল মিলবে না, তাই বর্ষার দেবতাকে আবাহন এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এই উৎসবে অংশ নেন রাজবংশী কুমারী মেয়েরা, বধূরাও যোগ দিতে পারেন। তবে পুরুষরা নয়। এমনকি তাদের এই অনুষ্ঠান দেখাও বারণ। হয়ত এর একটা কারণ এই অনুষ্ঠানে মেয়েরা যে নৃত্য করেন তা পুরো নগ্ন হয়ে। অমাবস্যার রাতে শস্যক্ষেতের মধ্যে তারা নগ্ন হয়ে দেবতাকে ডেকে ডেকে নেচে বেড়ায়। তাদের বিশ্বাস দেবতা এতে খুশি হয়ে বর্ষণ করবেন। কোথাও কোথাও পরের দিন গ্রামের কোনও গোপন জায়গায় যোনিপূজারও ব্যবস্থা হয়। সমাজতাত্ত্বিকেরা এরমধ্যে যৌন -আচারের আভাস লক্ষ করেন। আভাস বা ইঙ্গিত যাই হোক, বাস্তবে এই অনুষ্ঠানে কোনও যৌন আচরণ নেই, এবং এটিও শস্য কামনারই উৎসব রূপে গণ্য।

এ সময়ে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে হয় যৌবনোৎসব। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এমনকি দুমকা পাহাড় থেকেও সাঁওতালরা চলে আসে এই উৎসবে যোগ দিতে। এর একটি অংশ শিকার, অপরটি যৌবনে দীক্ষা। তীর ধনুক নিয়ে পথে পথে ওরা বন্য জীবজন্তু যা যেমন পায় শিকার করবে। কিছুই যে শিকার করতে পারল না তার কাছে ম্লান হয়ে গেল উৎসব। তবে অতি নগণ্য কোন ক্ষুদ্র জীব মেরেও সে তার মান বাঁচায়।

আর দ্বিতীয় অংশ যৌবনে দীক্ষা। বয়স্করা এখানে এই পাহাড়ে বনফুলের বাসরে তাদের শিক্ষা দেয় যৌবনের ধর্ম, নারী-পুরুষ সম্পর্ক ইত্যাদি।

গ্রামাঞ্চলে এছাড়াও আছে ছোট খাটো অনেক পরব। যেমন হাট ঘুরনি। গ্রামে যাতে কোনও অমঙ্গল না আসে, প্রচুর ফলন এবং প্রয়োজনীয়

সামগ্রী সুলভ হয় তার কামনায় মেয়ে পুরুষ সবাই সাতবার হাটটিকে প্রদক্ষিণ করে ও চাল ছিটিয়ে দেয় চারদিকে। এরপর মাঠে গিয়ে উলঙ্গ হয়ে নাচবার প্রথাও ছিল আগে। এসব কিছু কিছু প্রথা এখন উঠে যাচ্ছে। নৃত্য ছাড়া প্রকৃতি খুশি হবে না। বিশেষ করে নগ্ননৃত্যে বর্ষণ হবে, বসুমতী রসবতী হবে, ফলন বাড়বে এসব সুপ্রাচীন প্রত্যয় আদিবাসী সমাজের। আধুনিক শিক্ষা এর ওপর কিছু কিছু পালিশ লাগাচ্ছে। যেমন ঝিলমিলে আমার পরিচিত এক তরুণকে প্রৌঢ় কাল পর্যন্ত বিয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয় এক সামাজিক প্রথা মানবে না বলে। সে সমাজ সংস্কারক। ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। সাঁওতালদের বিয়েতে প্রথমত পণ দিতে হয় ছেলেকে, দ্বিতীয়ত মহুয়া, হাড়িয়া ইত্যাদি প্রচুর মদ খাওয়াতে হয় গোটা গ্রামের মানুষকে। সারারাত তারা মদ খাবে, বেহুশ হবে তবে উৎসব শেষ। এই তরুণ নেশাবিরোধী। পণ বিরোধী, ফলে শিক্ষিত, চাকুরিরত ছেলে হওয়া সত্ত্বেও কোনও মেয়ের বাপ সামাজিক প্রথা ভেঙে তার কাছে মেয়ে দিতে সাহস করছে না।

আবার সাঁওতাল সমাজে মেয়ের বাবা কখনো ছেলের বাড়ি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাবে না। ফলে এ সমাজে মেয়েদের আইবুড়ো থাকতে হয় দীর্ঘকাল, কবে কোন ছেলের বাবা প্রস্তাব নিয়ে আসবে সেই ভরসায়। আমার পরিচিত বেশ কিছু মেয়ে এইজন্য আইবুড়ো আছে।

খেড়িয়া সম্প্রদায় বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় অন্যভাবে। ছেলের বাবা ছাতা বা লাঠি পাঠায় মেয়ের বাপের বাড়ি। লাঠি-ছাতা দু'চারদিন মেয়ের বাপ রাখলে বোঝা গেল মেয়েপক্ষ এ প্রস্তাবে রাজি। তারপরে বিয়ের আগে মেয়ের একবার বিয়ে হবে মহুয়া গাছের সঙ্গে, ছেলের হবে আম গাছের সঙ্গে।

লোধা সম্প্রদায়ের বিয়ের দিন বর এসে আগে হবুশালার সঙ্গে মালা বদল করে। মুণ্ডা তরুণ-তরুণী মেলায় গিয়ে গান্ধর্ব বিয়ে করবে আমগাছকে সাক্ষী করে।

মেলায় মালাবদল সাঁওতালদেরও হতে পারে, তা ছাড়া পথে কোনও মেয়েকে কোনও ছেলে সিঁদুর পরালে বা খোঁপায় 'শিলি' অর্থাৎ লাল ফুল পরালেই বিয়ে হয়ে যায়। মেয়ের না-পছন্দ হলেও উপায় নেই। কিছুদিন আগে ঝিলমিলের এক ডাক্তারবাবুর স্কুলে পড়া মেয়েকে একটি চাষী তরুণ এমনি করে হঠাৎ পথে সিঁদুর ছিটিয়ে দেয়। ডাক্তার এবং তাঁর কন্যা কেউই এ বিয়েতে রাজি নয়। কিন্তু সমাজ ক্ষমা করল না। প্রথমে ডাক্তারকে এক ঘরে করে। পরে শুরু হয় হামলা। লোকটি ঘরবাড়ি ছেড়ে বান্দোয়ানের বাজারে এক গাছতলায় আশ্রয় নেয়। থানার সাহায্য চাইলেও থানা বেশি এগোচ্ছে না সমাজের ভয়ে। এ দৃশ্য আমি নিজে দেখে এসেছি।

মেলায় কনে বাছাই শুধু আদিবাসী অঞ্চলেই নয়। বাউল-বৈষ্ণবদের মেলাতেও হয়। যেমন নবদ্বীপের পোড়ামাতলার মেলায় বৈষ্ণব পরিবারের কুমারী বা বিধবা বা স্বামী বদলাতে ইচ্ছুক সধবারাও মুখ ঢেকে কড়ে আঙুল বাড়িয়ে দেয়, বৈষ্ণবী গ্রহণে ইচ্ছুক বৈষ্ণব আন্দাজে যার করে আঙুল ধরবে, রূপ-গুণ যাই হোক তাকেই অন্তত এক বছরের জন্য গ্রহণ করতে হয়। প্রথাটি এখন আইন করে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে আইন ফাঁকি দিয়ে এখনও এ ব্যাপার সেখানে ঘটে বলে শোনা যায়।

এরকম ঘটনার নজির আছে মালদহর রামকেলির মেলায়। সেখানেও আইনের বেড়া ভেঙে এখন ব্যাপারটা ঘটে গোপনে। রামকেলির মতো এত বিরাট বৈষ্ণব মেলা আমি দেখিনি। জেলার সরকারি অফিস পর্যন্ত ছুটি থাকে এই উপলক্ষে। আপাতভাবে একে ধর্মীয় মেলা মনে হলেও এটি সম্পূর্ণ লোক-উৎসবে পরিণত। চৈতন্যদেব বৃন্দাবনের পথে যাবার সময় এখানেই রূপ-সনাতনকে দীক্ষা দেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর পায়ের ছাপ এখানে রক্ষিত। সেই পদচিহ্ন ঘিরে হাজার হাজার বৈষ্ণব জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি, ফজলি

পুরুলিয়ার ছৌ নাচ ছবি : অশোক বসু

আমের মরসুমে এখানে কদিনের জন্য এক আশ্চর্য পরিবেশ রচনা করে।

যেমন পরিবেশ রচিত হয় মকর সংক্রান্তিতে কেঁদুলির জয়দেবের মেলায়। সেটি বাউল মেলা। এবং মেলাটি নিঃসন্দেহে লোক উৎসবের অন্তর্গত। সারা রাত একের পর এক আখড়ায় বাউলেরা ঘুরে ঘুরে গান করে আর শ্রোতারা ঘুরে ঘুরে তা শোনে। খাওয়ার ব্যবস্থাও আখড়ায়। শোয়ার তো প্রশ্নই নেই। আর বাউলের গানে তো ধর্মের গন্ধ নেই, সবই মানব ধর্মের গান। জীবনদেবতার কথা।

যেমন কালীপূজার সময় দেখেছি পাকুড়ের সাঁওতাল উৎসব। উপলক্ষ হয়তো কালীপূজা। কিন্তু রাজার নির্মিত সে কালীমন্দিরে সাঁওতালদের অবাধ প্রবেশাধিকার। এবং সেখানে পূজা নগণ্য ব্যাপার, দূর দূর পাহাড় থেকে সাঁওতাল তরুণ-তরুণী নেমে আসে সমতলের এই শহরে, কালীপূজার আগেরদিন থেকে টানা তিনদিন শহরের সবকটি রাস্তা আদিবাসীদের দখলে, হাজার হাজার তরুণ-তরুণী বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত হাত-ধরাধরি করে নেচে নেচে শহরটাকে হিল্লোলিত করে তোলে। এই উপলক্ষে মেলা হয়।

এমনি অনেক উৎসব আছে যার মূল লোকায়ত কোন কারণ, পরে ধর্মীয় রূপ নিয়েছে, যারমধ্যে দোল-দুর্গোৎসব, নবান্ন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। আবার অনেক উৎসব রয়েছে যার সূচনা হয়তো কোনও ধর্মীয় চেতনা থেকে কিন্তু কালে পরিণতি ঘটেছে লোকায়ত উৎসবে। শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বঙ্গের সর্বত্র এই উৎসব হচ্ছে না, তবু এই উৎসব অঙ্গনেই মিলিত হয় সারাবঙ্গ। গ্রামজীবনের সঙ্গে এখানেই ঘটে নগরজীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। লেনাদেনা হয় গ্রামসংস্কৃতির সঙ্গে নগরসংস্কৃতির। যথার্থই সকল লোকের এক মিলন মেলা এই পৌষমেলা। মহর্ষি

রামকেলির বৈষ্ণব মেলা ছবি : অলক মিত্র

দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা গ্রহণের দিনটিকে কেন্দ্র করে সাতই পৌষের এই উৎসবটি শুরু হলেও, এটি ক্রমে বঙ্গসংস্কৃতির এক সার্থক মিলনমেলা হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'তাঁর (মহর্ষিদেবের) সেই সত্যদীক্ষার দিনটি ধনী ও দরিদ্রকে, বালক ও বৃদ্ধকে, জ্ঞানী ও মূর্খকে বর্ষে বর্ষে আনন্দ উৎসবে আমন্ত্রণ করে আনছে।'

এই সকলকে এক জায়গায় আনন্দের আমন্ত্রণে মেলানোই লোক-উৎসবের শাশ্বত বাণী। এই মেলাগুলির অন্তর্নিহিত রূপটিকে সুন্দর করে তোলা, তার সহযোগী হওয়া— জাতীয়সংহতির সমস্যার দিনে সব চাইতে জরুরি। সাঁওতালরা দেখেছি তাদের উৎসবের শেষে জয়ধ্বনি দেয় 'তাহেন মা,' 'তাহেন মা'। —জয় হোক, এই উৎসবের, জয় হোক। তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও যেন বলতে পারি বাংলার লোক-উৎসব—তাহেন মা, তাহেন মা। ■

বুনোকথা

অরণি চক্রবর্তী

মন্থরভাবে জিপটা গেট দিয়ে ঢুকে অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল। বিভাস দেখল, উঁচু কাঠের প্ল্যাংকিং-এর ওপর লম্বা অফিস, সামনে টানা বারান্দা রেলিংঘেরা। পেছনে খোলা মাঠের পর শরতের বনভূমির ওপর দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝকঝক্ করছে। দেখেশুনে মনটা খুশী হল তার।

বিদায়ী রেঞ্জ অফিসার দত্তবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন বারান্দায়। "আসুন, আসুন"। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে উঠে আসে বিভাস। "রাস্তায় অসুবিধা হয়নি তো ?"

"না, কিছু না।"

অফিসঘরগুলোর ভেতর থেকে কৌতূহলী একগুচ্ছ দৃষ্টিকে সাঁতরে দত্তবাবু বিভাসকে নিয়ে আসেন তার ঘরে। "আপনার তো খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। বসুন, কিছু খাবার আনতে বলি।"

"কোন দরকার নেই। আমি স্টেশনে…"

"আরে থামুন মশাই। ইয়ং ম্যান, আপনাদের তো ঘন্টায় ঘন্টায় খিদে পাওয়ার কথা। বাহাদুর…আচ্ছা না থাক। আপনি বরং আমার কোয়ার্টারে চলুন। বিশ্রাম-টিশ্রাম নিয়ে বিকেলে কাজে লাগা যাবে 'খন।"

একরকম জোর করেই বিভাসকে কোয়ার্টারে নিয়ে চললেন দত্তবাবু। বড় রাস্তার উল্টোদিকে ঘেরা কম্পাউণ্ডে রেঞ্জার'স্ কোয়ার্টার। এদিকে ওদিকে আরও কয়েকটা ফরেস্ট কোয়ার্টার, নিশ্চয়ই অফিসের বাবুদের জন্য। কম্পাউণ্ডটার পেছন দিয়ে রেল লাইন। বিস্মিত বিভাসের চোখের সামনে দিয়েই একটা অদ্ভুত ট্রেন চলে যাচ্ছে। অদ্ভুত মানে, ট্রেনটাতে রয়েছে একটা কয়লার ইঞ্জিন, আর শুধু একটা বগি—দৈর্ঘ্যের অর্ধেক ইঞ্জিন, অর্ধেক বগি। দত্তবাবু বিভাসের বিস্ময় বুঝে বলেন, "এটা যাচ্ছে ফকিরগ্রাম। দিনে একটা ট্রেন যায়, একটা আসে। কোন সময়ে চড়ে দেখতে পারেন। থ্রিলিং এক্সপেরিয়েন্স।"

"আপনি চড়েছেন ?"

"হ্যাঁ দু-তিনবার। আসুন—" কোয়ার্টারে ঢোকেন দত্তবাবু।

"স্নান-খাওয়া সেরে দুপুরবেলা কোয়ার্টারের সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসেছিলেন দু'জন। সূর্য হেলে পড়েছে কিছুটা পশ্চিমে। সোনালী রোদের বন্যায় মেতে উঠেছে পুবদিকের ঘন সবুজ জঙ্গল। পাখির ডাক আর মাঝে মাঝে রাস্তা থেকে গাড়ির শব্দই শুধু ভেঙে দিচ্ছে গম্ভীর স্তব্ধতা। সদ্যস্নাত শরতের ভিজে ঘাসের গন্ধ পেতে পেতে বিভাস ভাবছিল মন্ত্রীমশাই'এর

কথাগুলো, 'চোরা কাঠ-কারবারী র‍্যাকেটের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি ওই রেঞ্জটা। সেই জন্যই আপনাকে পাঠাচ্ছি ওখানে। যেকোন সাহায্য দরকার হলে আমাকে জানাবেন…'।

"কি ভাবছেন ?"

চমকে বর্তমানে ফিরে আসে বিভাস। "না, কিছু না, এই জায়গাটা খুব সুন্দর তো!"

"আরে মশাই, ডুয়ার্সের মত জায়গা আছে নাকি ? থাকুন না কিছুদিন, দেখবেন যেতে ইচ্ছে করবে না এখান থেকে।"

"আচ্ছা, এই ফরেস্ট থেকে কাঠ-টাঠ চুরি হয় ?"

"কোন ফরেস্ট থেকে হয় না বলতে পারেন ? আপনি সুন্দরবনে ছিলেন, সেখানেও তো দেখেছেন।"

"সুন্দরবনে তো সবদিকে নজর রাখাটাই সমস্যা। কিন্তু এই রেঞ্জটা তো যতদূর জানি বেশ কমপ্যাক্ট। নদী-নালারও ব্যাপার নেই। বড় বড় গাছ—রাস্তা দিয়েই বার করতে হবে। এখানে চুরি আটকাবার অসুবিধা কি ?"

"হ্যাঁ, একদিক থেকে আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু কাকে নিয়ে আটকাবেন বলুন তো ? আমাদের ফরেস্ট গার্ড তো দেওয়া হয় গোনাগুনতি। এতবড় রেঞ্জ, এই ক'জন গার্ড কি করবে ? তাদের আর্মস বলতে লাঠি। গোটা রেঞ্জে বন্দুক দেওয়া হয়েছে দশটা, সাতটা বিট অফিসে একটা করে রাখলে বাকি থাকে তিনটে। কাঠ যারা চোরাই করে, তাদেরও তো আর্মস আছে। বোঝেন না, একটা বড় টিক কাটতে পারলে কুড়ি/পঁচিশ হাজার। রিস্ক নেবে না কেন ? আর তাছাড়াও, গার্ড থেকে শুরু করে মন্ত্রী পর্যন্ত সব কোরাপ্টেড। সমস্ত পলিটিকাল পার্টিগুলো টাকা খাচ্ছে। কাকে নিয়ে কি করবেন ?"

এসব বিভাসের অজানা নয়, তবুও তার আবার একটু অবসন্ন লাগল। কঠিন ব্যাপার !

দত্তবাবু একটু চুপ করে থেকে বলেন, "যাকগে, এসব পরে আলোচনা করা যাবে। আজ বিকেলেই চার্জ বুঝে নেবেন তো ?"

"আপনার যদি অসুবিধা না হয়…"

"না, না, অসুবিধা আবার কি ? একটা কথা ছিল। কোয়ার্টারটা আমি কিন্তু কাল ছাড়তে পারছি না। পড়শু সকালে ছেড়ে দেব। আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে। অবশ্য আজ আর কাল আপনি আমার গেস্ট হয়েই থাকবেন।"

"আপনার যতদিন খুশী থাকুন না।"

"বিয়ে-থা করেন নি ?"

হাসল বিভাস। "না, এখনও হয়ে ওঠেনি।"

"করে ফেলুন, করে ফেলুন। জঙ্গলে একা একা কাটাবেন কি করে ?" হঠাৎ অস্বস্তির ছায়া পড়ল দত্তবাবুর মুখে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বিভাস দেখল, কোয়ার্টারের গেট ঠেলে একজন মাঝবয়সী নাদুস-নুদুস ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন। ধপধপে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি, চোখে রোদ-চশমা, ব্যাক-ব্রাশ করা কাঁচা-পাকা চুল।

"মাধব রায়। কিং অফ দিস্ লোকালিটি।" নীচুস্বরে বললেন দত্তবাবু। দত্তবাবুর এই অস্বস্তিটা লক্ষ করে বিভাস একটু অবাক হল, কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু ভাববার আগেই মাধব রায় উঠে এলেন সিঁড়ি দিয়ে।

"আরে, মাধব বাবু যে ! আসুন, আসুন।"

"শুনলাম নতুন রেঞ্জ অফিসার এসেছেন, তাই দেখা করতে এলাম স্যার। আপনাদের অসুবিধা করলাম না তো ?"

"না, না, অসুবিধা আবার কি ? আচ্ছা, পরিচয় করিয়ে দিই। ইনিই হচ্ছেন নতুন রেঞ্জার, বিভাস দাশগুপ্ত। আর ইনি হচ্ছেন মাধব রায়, এখান থেকে কিছুদূরে একটা বড় গঞ্জ আছে—শালকেগুড়ি—সেখানে থাকেন।"

নমস্কার বিনিময়ের পর মাধব রায় বিভাসকে বললেন—"নতুন জায়গায় আপনার কোনও অসুবিধা হলে আমাদের বলবেন স্যার। এদিকে কি আপনি এই প্রথম ?"

"না। ছোটবেলায় আমি জলপাইগুড়িতে থাকতাম। ফণীন্দ্রদেব স্কুলের ছাত্র আমি।"

"ও। তবে তো আপনি আমাদের আত্মীয়ই। এদিকে গুছিয়ে বসার পর একবার আমার বাড়িতে

কিন্তু পায়ের ধুলো দিতে হবে স্যার।"

"সে হবে'খন। সবে তো এলাম। আপনি কি ব্যবসা-ট্যাবসা করেন?"

"এই ছোটখাটো একটা কাঠের বিজনেস আছে। আর কনট্রাক্টরি। সেটা অবশ্য বড়

ছেলেই চালায়। আপনার কথা শ্যামলবাবু বলছিলেন।"

"কোন শ্যামলবাবু?"

"শ্যামল মজুমদার। বনমন্ত্রী হয়েছেন না? উনি তো আমাদের এদিককারই লোক।"

"ও!"

"খুব ডেডিকেটেড্ লোক স্যার। সাধারণত দেখা যায় না। উনি মন্ত্রী হবার পর এদিককার ফরেস্টগুলোর খুব উন্নতি হয়েছে। মিস্টার দত্ত আরও ভাল জানেন অবশ্য।"

টুকটাক কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে মাধব রায় উঠে পড়লেন। "ধুরন্ধর লোক", অস্ফুট স্বরে কথাটা বলে দত্তবাবু ভেতরে গেলেন চায়ের তাগাদা দিতে। আর বিভাস বসে রইল মুখের মধ্যে একটা তিক্ত আভাস নিয়ে। মাধব রায়ের বিনয় তার ভালো লাগে নি। মনের মধ্যে কে যেন বলছে, জায়গাটা কঠিন হবে।

তিনদিন পর সমস্ত বিট অফিসারদের ডেকে মিটিং করে বিভাস তার পলিসিটা বুঝিয়ে দিল। ফরেস্টের আর সব কাজকর্ম যেমন চলছে চলুক, সে কনসেনট্রেট করতে চায় কাঠ চুরির ব্যাপারটাতে। আশপাশের লোকরা যে সামান্য ডালপালা ভাঙ্গে বা শুকনো ডাল নিয়ে যায় জ্বালানির জন্য, সে ব্যাপারে এখনই কিছু না করলেও চলবে। কিন্তু কাঠ ব্যবসায়ীরা যে বড় গাছ কেটে নেয়, যেভাবে হোক সে চুরি আটকাতেই হবে। একটি ছেলে অনেক প্রশ্ন করছিল, জিজ্ঞেস করে বিভাস জানল যে সবচেয়ে বড় আর ভালনারেব্‌ল বিটটার দায়িত্বে রয়েছে ছেলেটি। কলকাতার ছেলে, নাম বিশ্বরূপ। বিভাস তাকে বলল মিটিং-এর পর কিছুক্ষণ থেকে যেতে।

মিটিং'এর পর সবাই চলে গেলে বিশ্বরূপের সঙ্গে কথা বলছিল বিভাস। চটপটে সপ্রতিভ ছেলে। কিন্তু কোন কাজে না বুঝে নামতে রাজি নয়। বাহাদুর'কে দিয়ে আরেকবার চা আনাল বিভাস। তারপর কথাবার্তা শুরু করল।

"আপনি তো আমার থেকে বয়সে ছোট। আমি যদি আপনাকে 'তুমি' বলি, তাহলে কি রাগ করবেন?"

"না স্যার।"

"আচ্ছা বিশ্বরূপ, তুমি তো বেশ কিছুদিনই এখানে আছো। আমাকে একটু বোঝাও তো এখানে কাঠ চুরি বন্ধ করার সমস্যাটা কি।"

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল বিশ্বরূপ। তারপর যেন আস্তে আস্তে জেগে উঠল ঘুম থেকে, "আসলে কি জানেন স্যার? এটা কেউই বন্ধ করতে চায় না!"

"কিন্তু বনমন্ত্রী আমাকে বলেছেন যে এ ব্যাপারে তিনি সবরকম সাহায্য করবেন।"

"কিছু মনে করবেন না স্যার। আপনার সঙ্গে কি তাঁর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা আছে? মানে...এদিকে সেরকমই গুজব।"

"আমি কলেজ লাইফে ঐ পার্টিই করতাম। সেই সূত্রে তিনি আমাকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন হয়তো।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। তারপর বিশ্বরূপ বলল, "উনি যদি আপনাকে সাহায্য করেন, তাহলে আমি খুশী হব স্যার!"

"না, না, তুমি আমার সঙ্গে এরকম ডিপ্লোম্যাটিকালি কথা বলো না। লেট্‌স্ ডিস্কাস্ দ্য প্রবলেম ফ্র্যাঙ্কলি। তোমার মনে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ আছে? সেটা কেন, আমাকে খুলে বল।"

"আপনি যখন বলতে বলছেন...। দেখুন স্যার, এতবড় ফরেস্ট পাহারা দেওয়ার পক্ষে আমাদের লোকজন, আর্মস সবই কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা অনেকটাই এফেকটিভ হতে পারতাম, যদি চেক্‌পোস্টগুলো ঠিকমতো ফাংশান করত, তিনটে থানা এলাকার মধ্যে আমরা আছি—থানাগুলো যদি কো-অপারেট করত। আর পলিটিকাল পার্টিগুলো যদি কাঠ ব্যবসায়ীদের আড়াল না করত। কিন্তু এগুলোর কোনটারই সহযোগিতা আমরা পাবো না!"

"হুঁ। ঠিকই বলেছো তুমি, কঠিন ব্যাপার। যাই হোক, দেখা যাক, কতদূর কি করা যায়। তুমি তোমার এলাকায় রাত্রে রাউণ্ড বাড়িয়ে দাও। আর গেটগুলোতে বেশী করে নজর রাখো। যেকোন প্রব্লেম হলেই আমাকে জানাবে।"

"আচ্ছা স্যার, তাহলে আমি উঠি?" বিভাস মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই বিশ্বরূপ উঠে পড়ল। বেরিয়ে যেতে গিয়ে দরজার সামনে ঘুরে দাঁড়াল সে, একটা সরল হাসি ফুটে উঠল তার মুখে, "আমি আপনার সঙ্গে থাকবো স্যার।"

জানলা দিয়ে বিভাস বিশ্বরূপের চলে যাওয়াটা দেখতে পাচ্ছিল। কাছাকাছি কোথাও নিম্নচাপ হয়েছে। দমকা হাওয়ার সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টির কুয়াশা ক্রমশ জড়িয়ে নিল বিশ্বরূপের খোলা শরীরটাকে।

শালকেগুড়িতে মাধব রায়ের কাঠ চেরাই কারখানায় রেইড্ করল বিভাস। সঙ্গে শালকেগুড়ি থানার পুলিশ—একজন সাব ইনস্পেক্টর আর দুজন কনস্টেবল। বেশ বড় 'স' মিল। তিনটে ইলেকট্রিক করাত, প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন লেবার কাজ করে।

কাঠের গুড়িগুলো পরীক্ষা করতে করতে বিভাস প্রশ্ন করল, "এই লগগুলোর মার্কিং নেই কেন, মাধববাবু?"

ঘর্মাক্ত ও বিব্রত মাধব রায় একটু থতমত খেলেন, "স্যার, মার্কিং'এর দিকটা এবড়ো-খেবড়ো ছিল, তাই কেটে ফেলতে হয়েছে।"

"কাটা টুকরোগুলো?"

"সে কি আর রেখে দেওয়া হয়? কোথায় চলে গেছে! এরকম তো সকলেই করে স্যার।"

"ওটা কি কোন যুক্তি হল? এ কাঠ তো ভাল করে পাকেনি এখনও, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এ কাঠ বিক্রি করবে কেন? এর কাগজপত্র আছে আপনার?"

"আছে স্যার, আনছি।"

মাধববাবু তাড়াতাড়ি অফিসঘরের দিকে যান। বিভাস কাঠের লগগুলো ভাল করে দেখে। শিশু কাঠ—বেশ কয়েক হাজার টাকা দাম হবে চেরাই'এর পর। একজন শ্রমিককে প্রশ্ন করে বিভাস, "এগুলো কতদিন আগে এসেছে?"

"ঠিক বলতে পারবো না স্যার!"

"হুঁ!"

চেরাই কলের সামনে কিছু উৎসুক জনতার ভিড় জমেছে। কয়েকটা টুকরো কথা কানে এল বিভাসের, 'আরে এসব হচ্ছে লোক দেখানো ব্যাপার', 'পয়সাকড়ির ভাগটা ঠিক হয়নি বোধহয়', 'সব রেঞ্জারই প্রথম এসে একটু কাজ দেখায়'...। কান লাল হয়ে উঠছিল বিভাসের। অনেক কষ্টে লোকগুলোর মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছেটাকে দমন করল সে।

অফিস থেকে মাধববাবুকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল, হাতে কয়েক টুকরো কাগজ। "এই যে স্যার..."। কাগজগুলো বিভাসের হাতে দেন তিনি।

বিভাস ওগুলো দেখে। আড়াই মাস আগে আপার দালং রেঞ্জ থেকে শিশু কাঠ কেনার ডকুমেন্ট, চেকপোস্ট পাস, ইত্যাদি। চোখ তুলল সে। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে মাধব রায় ও বিভাস পরস্পরের চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর ভীষণ মৃদুস্বরে বিভাসের গলা শোনা গেল, "এর মধ্যে আপনি শিশু কাঠ বিক্রী করেন নি? আপনার সেল্‌স্ রেজিস্টার কোথায়?"

মাধববাবু আমতা আমতা করতে লাগলেন। তার মুখে স্পষ্ট অস্বস্তির ছাপ পড়েছে। বিভাস ঘুরে পুলিশ অফিসারকে বলল, "মিষ্টার ভদ্র, এই 'স' মিলের সব কাগজপত্র আমি নিয়ে যাচ্ছি, ফর চেক-আপ। ধনঞ্জয়, আসলামকে ডেকে নাও, অফিসের আলমারি টেবিল সবখান থেকে যত কাগজপত্র পাও, দড়ি দিয়ে বেঁধে জিপে তোল।"

আধঘন্টার মধ্যে সমস্ত নিয়মকানুন মিটিয়ে রেঞ্জ অফিসের দিকে রওনা হল বিভাস।

রেঞ্জ অফিসে অনেকখানি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল বিভাসের জন্য। বিশ্বরূপ বসে আছে। দেখেই বোঝা যায়, বেশ উত্তেজিত। বিভাসের বসার অপেক্ষা না করেই সে বলতে শুরু করল, "স্যার, কাল শেষরাতে একটা বিগ্ ক্যাচ ধরেছি!"

"কি ব্যাপার?"

"গাছ কাটছিল স্যার। মাধব রায়ের লোক। আর্মস ছিল সঙ্গে। শেষ রাতের দিকে কি মনে হল একবার রাউণ্ডে বেরিয়েছিলাম। তিন নম্বর সেক্টরে গাছ কাটার আওয়াজ শুনে এগিয়ে দেখি একেবারে ট্রাক ঢুকিয়ে ফেলেছে। চ্যালেঞ্জ করতেই গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। তবে লাকিলি গুলি কম ছিল ওদের। আটকে ফেলেছি, ট্রাক, ফায়ার আর্মস, সব সমেত। আমাদের একজন গার্ডের পায়ে গুলি লেগেছে। চারজনকে আটকেছি, জনা দুয়েক পালিয়ে গেছে।"

"মাধব রায়ের লোক?"

"হ্যাঁ, স্যার, স্বীকার করেছে।"

বিভাস উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মাধব রায়কে এবার বেশ কব্জার মধ্যে পাওয়া গেছে। এই লোকটাকে শায়েস্তা করতে পারলেই ব্যাপারটা দৃষ্টান্তমূলক হয়ে দাঁড়াবে এ যাবৎ তো

সবই ভালো। থানার হেল্পও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু মাধব রায় কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছে? এই প্রশ্নটাই খচ্‌খচ্‌ করছিল বিভাসের মনে।

টেবিলের কাছে গিয়ে টেলিফোন তুললো সে, "হ্যালো, মাদারপুর থ্রি-সেভেন-ফাইভ।" মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে বিশ্বরূপকে বলল, "তুমি ততক্ষণে এফ, আই, আর-টা লিখে ফেলো। পুলিশে দিয়ে দেওয়া যাক।...হ্যালো, কে? মাদারপুর পি, এস? আমি রেঞ্জ অফিসার দাশগুপ্ত বলছি। আমরা কাল রাতে একটা গ্যাংকে ধরেছি। রেড হ্যাণ্ডেড। ট্রাক, ফায়ার আর্মস সমেত। চলে আসুন। আমি এফ, আই, আর, রেডি করে রাখছি।...কি বললেন...হ্যাঁ, হ্যাঁ, গোলাগুলি চলেছে। আমাদের একজন গার্ড ইনজিওরড্‌।...আচ্ছা, ঠিক আছে।"

রিসিভারটা নামিয়ে রাখল বিভাস। "তোমার লেখা হলে চলো লোকগুলোর সঙ্গে একটু মোলাকাত করে আসি।"

"হ্যাঁ স্যার, এই একটু..."

সারাদিনের প্রচণ্ড ব্যস্ততার পর সন্ধ্যের মুখে মুখে রেঞ্জ অফিসের পেছন দিকের জঙ্গলের ভেতরের রাস্তায় মন্থরপায়ে পায়চারি করছিল বিভাস। তার ভুরু কুঁচকে আছে। ডুয়ার্সের হেমন্তশেষের আভাস ঝোপে-ঝাড়ে যে রঙের পরিবর্তন এনেছে, তাকে সে লক্ষ্য করছিল না। দূর থেকে হনুমানের একটানা ডাক শোনা যাচ্ছিল, হয়তো কোন চিতা জল খেতে যাচ্ছে, কিন্তু এসবদিকে মনোযোগ ছিল না বিভাসের। একটা চন্দ্রবোড়া তার কয়েক হাত সামনে দিয়ে রাস্তাটা পেরোল, কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে আবার মন্থরভাবে এগোল বিভাস।

ভুরু কুচকে সে ভাবছিল মাদারপুর থানার ও, সি-র কথা। তিনি তাকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন এফ, আই, আর-এ মাধব রায়ের নামটা উল্লেখ না করার জন্য। করলে নাকি কেসটা 'নরম' হয়ে যাবে। বিভাস তখন বলছিল যে চুনোপুঁটিরা শাস্তি পেল কি পেল না, তাতে সে মোটেই চিন্তিত নয়, তার উদ্দেশ্য চাঁইগুলোকে ধরা—তখন ও, সি-র মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ তার চোখ এড়ায়নি। পুলিশের সঙ্গে মাধব রায়ের নিশ্চয়ই লেন-দেন আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে পুলিশের হাত-পা কিছুটা বাঁধা। কেসটা বিভাসই সাজাবে। কিন্তু থানা সম্পূর্ণ অসহযোগিতা করলে তো চলাই মুশকিল হবে। রুলিং পার্টির লোকাল সেক্রেটারি বিকেলে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। নানারকম ধানাই-পানাই—যার মোদ্দা কথা হলো কাঠ-ব্যবসায়ীদের এতটা না ঘাঁটানো। এই পার্টিরই সদস্য ছিল সে, ছাত্রফ্রন্টে মোটামুটি নাম-ডাকও ছিল। ভেবে হাসি পেল তার।

পেছনে গাড়ির শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল বিভাস। একটা সাদা অ্যামবাসাডার জঙ্গলের ধারে এসে থামল। গাড়ি থেকে নেমে বিভাসের দিকে এগিয়ে এলেন মাধব রায়। একটু ইতস্তত করে বললেন, "স্যার, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।"

"বলুন!"

"স্যার, আমরা এইসব ছোটখাটো ব্যবসা করে খাই। বোঝেনই তো, সমস্ত আইন-কানুন তো আর সবসময় মেনে চলা যায় না, একটু এদিক-ওদিক হয়েই থাকে। আপনি দয়া করে কেসগুলো তুলে নিন স্যার। আর এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই তো নিশ্চয়ই আপনার কিছু খরচ-খরচা হয়ে গেছে, সেটা যাতে আপনার ক্ষতি না হয়, সেজন্য আমি সেটা দিয়ে দেব। তিন হাজার আমি সঙ্গেই এনেছি..."

—"আর যে গার্ডটা ইনজিওরডও হয়েছে?"

"তার চিকিৎসা আর কমপেনসেশনের সব দায়িত্ব আমার স্যার।"

বিভাসের তীব্র চিৎকার হতভম্ব করে দিল রাধব রায়কে, "ইউ গেট আউট অব মাই সাইট্‌, ইমিডিয়েটলি, আই সে! আপনার সাহস তো কম নয়! আপনি আমাকে ঘুষ দিতে এসেছেন? এই ফরেস্টে ঢুকবার পারমিশান আপনাকে কে দিল আপনি চলে যান, নইলে আপনাকে পুলিশে হ্যাণ্ড ওভার করতে আমি বাধ্য হবো।" উত্তেজনায় কাঁপছিল বিভাস।

লাল হয়ে উঠেছিল মাধব রায়ের মুখ। ভীষণ জোরে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন তিনি। প্রাণপণে কয়েক মুহূর্তের চেষ্টায় আত্মসংবরণ করলেন। "আপনার অভিজ্ঞতা কম! আমি দুঃখিত আপনার জন্য। তবে আমার করার আর কিছুই থাকল না, এটা মনে করবেন না।" গটগট করে হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন মাধব রায়।

অপস্রিয়মাণ অ্যামবাসাডার'টার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বিভাস দেখতে পেল ধনঞ্জয় আসছে।

"কি ব্যাপার ধনঞ্জয়?"

"আপনার টেলিফোন স্যার। ডি, এফ, ও সাহেব।"

"ও চলো যাচ্ছি।"

বিভাসের পেছনে হাঁটতে হাঁটতে ধনঞ্জয় বলল, "একটা কথা বলব স্যার?"

"বলো।"

"এভাবে একা একা জঙ্গলের ভেতরে আসবেন না স্যার।"

বিদ্যুৎঝলকের মত বিভাস অনুভব করল, সে একা নয়। ধনঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়লো সে, "আচ্ছা!"

মাসখানেক পরে। বিট অফিসারদের মিটিং'এ ডেকেছে বিভাস। প্রায় সবাই এসে গেছে, শুধু বিশ্বরূপ ছাড়া। তার আসার পথটা খারাপ বলে তাকে সাইকেলে আসতে বারণ করেছিল বিভাস। বলেছিল জিপ পাঠাবে। জিপটা গেছে, ফেরেনি এখনো।

সবার কাছ থেকে টুকটাক্‌ খবর নিচ্ছিল বিভাস। বেআইনী কাঠ কাটা বা পোচিং প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন গাছ লাগাবার কাজও সন্তোষজনক। ভেড়াচরা ফরেস্ট বাংলোতে ট্যুরিস্টদের থাকার বন্দোবস্ত আরও ভাল করা গেছে। পোচিং বন্ধ হবার ফলে বাঘ আর গণ্ডারের সংখ্যা কমেনি, হরিণ তো বেড়েইছে। বেশ খুশী হয়ে উঠেছিল বিভাসের মনটা। একজনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে সে, "আপনার নার্সারীর খবর কি?"

"খুব একটা ভালো নয় স্যার। পুকুরটা প্রায় শুকিয়ে গেছে, এবার বৃষ্টি কম হল তো।"

"হুঁ, জলের সমস্যাটার যে কি করা যায়..."

জিপটা ফিরে আসার শব্দ শোনা গেল। তারপরেই দ্রুত পদশব্দ, উদ্‌ভ্রান্তের মত আসলাম ঢুকলো, "স্যার বিশ্বদা খুন হয়েছে..."

ঘরে যেন বজ্রপাত হল, "কি বলছো কি!"

"হ্যাঁ স্যার। আসার রাস্তায়। সাইকেল নিয়ে আসছিল।"

"সাইকেল নিয়ে! আমি যে..." বলতে বলতেই দৌড়ে ঘর থেকে বেরোয় বিভাস। আসলাম পেছন পেছন আসে। "শিগগীর চলো! মিষ্টার চ্যাটার্জী, মাদারপুর পি, এস এ, ফোন করুন। আমি বেরোচ্ছি।"

টপ্‌ গিয়ারে জিপটা ছুটতে থাকে বিশ্বরূপের বিটের দিকে।

রেঞ্জ অফিস থেকে মাত্র এক কিলোমিটার যেতেই চোখে পড়ল জায়গাটা। কয়েকজন ফরেস্ট গার্ড ইতিমধ্যে এসে গেছে। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে বিভাস এগিয়ে যেতেই দৃশ্যটা নজরে এল। চাপ বাঁধা রক্তের মধ্যে পড়ে রয়েছে ওর দেহ। হাত দুটো ছড়ানো, মাথাটা লম্বালম্বিভাবে চিরে গেছে। টাঙ্গির কোপ। সাইকেলটা পড়ে রয়েছে কয়েক গজ দূরে। একটা প্রবল চীৎকার কোনমতে ঢোক গিলে নামাল বিভাস। কয়েক মুহূর্ত লাগল ওর ধাতস্থ হতে। না, কিছুতেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লে চলবে না। এখন আর চ্যালেঞ্জটা শুধু কর্তব্য নয়, ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"প্রথম কে দেখেছে?"

"আমি স্যার।" আসলাম বলল। "আমি জিপ্‌ নিয়ে যাবার পথে দেখতে পেয়ে ঘুরে রেঞ্জ অফিসে যাচ্ছিলাম খবর দিতে, পথে এদের দেখতে পেয়ে এখানে আসতে বলি।"

"আচ্ছা, তোমরা এখানে থাকো পুলিশ না আসা পর্যন্ত। আসলাম, চলো।"

জিপ নিয়ে বিশ্বরূপের বিটে এসে খবরটা দিল বিভাস। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, তৈরি হয়ে বিশ্বরূপ অপেক্ষা করছিল জিপের জন্য। এমন সময় কালীপদ বলে একজন সাইকেলে চড়ে সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বিশ্বরূপকে বলে জিপের অপেক্ষায় না থেকে তার সঙ্গে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে। বিশ্বরূপ ইতস্তত করলে তাকে ভীতু বলে খোঁটাও দেয়। এতে লজ্জিত হয়ে বিশ্বরূপও সাইকেল নিয়ে বেরোয় তার সঙ্গে।

মনে মনে ঘটনাগুলোকে সাজিয়ে নিতে থাকে বিভাস। এখান থেকে রেঞ্জ অফিস পর্যন্ত রাস্তাটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সোজা চলে গেছে। অন্য কোন রাস্তা বেরোয়নি এটা থেকে। তার মানে ঘটনার সময় কালীপদ ঘটনাস্থলেই ছিল। অথচ সামান্য দূরে রেঞ্জ অফিসে সে খবর দেয়নি। পুরো ব্যাপারটাই পূর্ব-পরিকল্পিত।

জিপ নিয়ে ঘটনাস্থলেই ফিরে আসতে দূর
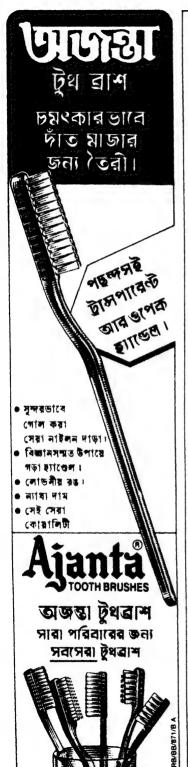
থেকেই দেখা গেল, পুলিস এসে গেছে।

ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে বনমন্ত্রী শ্যামল মজুমদার এলেন ভেড়াচরা বাংলোয়। সমস্ত লোকজন তটস্থ হয়ে উঠল। দৌড়োদৌড়ি করে তার আপ্যায়নের সমস্ত ব্যবস্থা করল বিভাস। হাতিতে চড়িয়ে জঙ্গলে ঘুরোবার ব্যবস্থা হল। গোটা দিনের হৈ-হট্টগোলের পর সন্ধ্যেবেলা বাংলোর দোতলার বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে কথাবার্তা চলছিল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মন্ত্রী ডি, এফ, ও-র দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার ডিভিশন্ কেমন চলছে মিস্টার মল্লিক ?"

"মোটামুটি ভালই স্যার। আর বিভাসবাবু তো একাই জমিয়ে রেখেছেন।"

মন্ত্রী বিভাসের দিকে ফিরলেন। "কিরকম ?"

বিভাস একটু অস্বস্তি বোধ করল। তার কেমন যেন মনে হল এ বিষয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে ডি, এফ, ও-র আগে কোন কথা হয়েছে। মাধব রায়ের ব্যাপারে আর বিশ্বরূপের খুনের ব্যাপারেও সে যে কড়া লাইন ধরে এগোচ্ছে, তা নিয়ে ডি, এফ, ও-র সঙ্গে তার মতবিরোধের কথা ডিপার্টমেন্টে কারও অজানা নয়। সে ঠিক করল, সোজাসুজি কথা বলবে।

"ও কিছু নয় স্যার। ডি, এফ, ও, সাহেব ঠাট্টা করছেন। তবে স্যার, আমার রেঞ্জের ঝামেলাগুলোর কথা তো জানেন।"

"হ্যাঁ, কিছু কিছু শুনেছি। এখন কি অবস্থা ?"

"কেসগুলো প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলেছি স্যার। মাধব রায়ের কাগজপত্র থেকেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে সে কাঠের চোরাকারবার করে। বিশ্বরূপের খুনীদের মধ্যেও দু'জন ধরা পড়েছে। 'কনফেস্'ও করেছে। এব্যাপারেও মাধব রায় যে পেছনের মাথা, তার স্ট্রং সারকামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স আছে। পুলিস অবশ্য তেমন গা লাগাচ্ছে না, কিন্তু, এভিডেন্সগুলো আমাদের হাতেও আছে। আর এখানকার পি, পি, লোক ভাল, আমার সঙ্গে কিছুটা হৃদ্যতাও আছে। এভিডেন্সগুলো সাপ্লাই করলে তিনি কেসটা ভালোই লড়বেন বলে মনে হয়।"

"পি, পি, মানে অনিল তো ? তার সঙ্গে আপনার চেনাশোনা হল কিভাবে ?"

"আমি ছোটবেলায় জলপাইগুড়িতে ছিলাম। একই পাড়ার লোক আমরা।"

"ও।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। দূরে রায়না নদীর ওপার থেকে একঘেয়ে ডেকে যাচ্ছে একটা চিতল। চাঁদের আলো ভাসিয়ে দিচ্ছে স্থির, গম্ভীর বনভূমিকে। হঠাৎ চিতলটা ডাক থামানোতে অপার্থিব, প্রায় অসহ্য হয়ে এলো নির্জনতাটা।

বেশ খানিকটা সময়ের পর মুখ খুললেন মন্ত্রী, "এই ব্যাপারে আপনার কি মনে হয় মিস্টার মল্লিক ?"

"এমনি সবই ঠিক আছে স্যার। মিস্টার দাশগুপ্ত ঠিক লাইনেই এগোচ্ছেন। তবে আমার মনে হয় আমাদের আর একটু ধীরে-সুস্থে কাজ করা উচিত।"

"কেন ?"

"কাঠের চোরাকারবার তো আছেই। একদিনে তো সেটা বন্ধ করা যাবে না। কিন্তু হুড়মুড় করে কিছু করতে গেলে পাবলিক রিপারকেশন হতে পারে। এই কাঠ ব্যবসার সঙ্গে বহু লোকের রুজি-রোজগার জড়িত তো। তাই ধীরে ধীরে এটা করতে হবে। আমার মনে হয় স্যার, ঐ 'স্লো বাট্ শিওর' পলিসিটাই ভালো।"

"হুঁ।"

মন্ত্রীমশাইয়ের এই নীরবতায় অবাক হয়ে গেল বিভাস। এই লোকটাই না তাকে বলেছিল, 'মিস্টার দাশগুপ্ত, কাঠ চুরি বন্ধ করাই হবে এখানে আপনার প্রধান কাজ। সরকারী রেভিনিউ'এর কথা বাদই দিন, কিন্তু জঙ্গল সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। যে করে হোক এটা বন্ধ করুন।' ভালো করে চেয়ে দেখল বিভাস, এই লোকটাই সে তো ? গলার তিক্ততা চেষ্টা করেও লুকাতে পারল না সে, "তাহলে কি করা উচিত এখন ?"

তিক্ত স্বরটা মন্ত্রীকে নাড়িয়ে বসিয়ে দিল, "না, না, আপনি যা যা করছেন করে যান। তবে সব দিকগুলোই একটু নজরের মধ্যে রাখবেন। মিস্টার মল্লিকও রয়েছেন, দরকার হলে আমাকেও জানাবেন।"

"আর একটা কথা স্যার। আপনার পার্টির লোকাল ইউনিট এব্যাপারে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছে না। বরং বিরোধিতাই করছে। এটা যদি স্যার আপনি একটু দ্যাখেন..."

"তাই নাকি ? ঠিক আছে, আমি কথা বলব। ওরা কি কোন খারাপ ব্যবহার করেছে আপনার সঙ্গে ?"

"খারাপ ব্যবহার বলতে, স্যার, এখানকার লোকাল সেক্রেটারি আমাকে বলেছিলেন কেসগুলো খুব পারস্যু না করতে। আমি সেটা মানতে পারিনি। তার কিছুদিন পর ওঁরা মল্লিক সাহেবের কাছে আমার বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দেন যে আমি নাকি খুব হাই-হ্যানডেড ম্যানারে এখানকার কাজকর্ম চালাচ্ছি !"

"ও। আচ্ছা আমি দেখছি।"

"ধন্যবাদ স্যার।...আমি তাহলে নিচে গিয়ে খাবারের কি হল একটু দেখি ?"

মন্ত্রীর সম্মতি পেয়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যায় বিভাস। বাংলোর বাউণ্ডারি ট্রেঞ্চের ওপারে জঙ্গল থেকে একটা বুনো শুয়োরের ক্রুদ্ধ ডাক ভেসে আসে।

কোলকাতায় ডিপার্টমেন্টাল কনফারেন্স সেরে ফিরে আসছিল বিভাস। মনটা খুশী হয়ে আছে। 'চীফ্ কনজারভেটর্ অফ ফরেস্ট' নিজে তার কাজকর্মের প্রশংসা করেছেন। করারই কথা। তার রেঞ্জ থেকে বছরে কয়েক লক্ষ টাকার কাঠ চুরি যেত, রেভিনিউ লস্। সেটা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু একটা কাঁটা তার মনে খচ্খচ্ করছে। সি, সি, এফ, ব্যক্তিগত আলোচনার সময়ে তাকে বলেছেন সব দিক বুঝে শুনে কাজ করতে! এ কথার মানে কি ? তিনি পরিষ্কারও করেননি কথাটা। হয়তো সাধারণ উপদেশ হিসাবেই কথাগুলো বলেছেন তিনি।

সে ঠিক করল, জলপাইগুড়ির ওপর দিয়েই যখন ফিরতে হবে, তখন একবার পি, পি, অনিলদার সঙ্গে দেখা করে যাবে।

জলপাইগুড়ি কদমতলা বাসস্ট্যাণ্ডে নেমে একটা রিক্সা নিলো বিভাস। শহরটা তেমন কিছু বদলায়নি। কিছু বাড়িঘর আর দু'-একটা পার্ক হয়েছে শুধু। হঠাৎ হাসি পেল তার। বদলায়নি কিরকম? জলপাইগুড়ি শহরের সবচেয়ে সুন্দর টান যেটা ছিল, শহরের মাঝ দিয়ে গভীর, টলটলে করলা নদী, সেটাই তো ক্রমশ পচা নালায় পরিণত হচ্ছে।

কোর্ট বিল্ডিং-এ অনিলদার ঘরে ঢুকতেই সোৎসাহে অভ্যর্থনা জানালেন অনিলদা, "আরে আয় আয়, তুই তো এখন হিরো। চা খাবি তো?"

"আওয়াজ দিচ্ছো?"

"না রে, সত্যিই। জেলা সম্পাদক পর্যন্ত তোকে নিয়ে চিন্তিত!"

"কিরকম?"

"প্রবীরদা বলছিলেন তুই নাকি খুব মাথা গরম করে এগোচ্ছিস।"

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে চা খেল বিভাস। তারপর যেন স্বপ্নের ভেতর থেকে জেগে উঠল, "তোমার কি মনে হয় অনিলদা? আমি ভুল করছি?"

অনিলদা চেয়ার থেকে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিস্তার বাঁধের ধারে ট্রেজারি কম্পাউণ্ডের কদম গাছটায় কুঁড়ি দেখা দিয়েছে। অন্যমনস্কভাবে সেদিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, "কি জানিস বিভু, উত্তরবাংলায় এই বড় কাঠ ব্যবসায়ীদের প্রভাব বিরাট। এই যে লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ চুরি হয়, তুই কি ভাবিস, এটা শুধু এদের পকেটেই যায়। মোটেই না। এর ভাগ হয়! যাদের মধ্যে ভাগ হয়, তারা কেউ চায় না এ জিনিস বন্ধ হোক। প্রশ্নটা তো শুধু মাধব রায়কে নিয়ে নয়, এই গোটা অংশটাই তোর বিরুদ্ধে।"

"তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না!"

"হ্যাঁ, তুই ভুল করছিস কি না।" আস্তে আস্তে বিভাসের চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রাখলেন অনিলদা, "তোর জায়গায় থাকলে এটা করার সাহস আমার হতো কিনা জানি না, তবে করতে পারলে আমি গর্বিত হতাম।"

চোখদুটো ঝাপসা হয়ে এল বিভাসের। এই হচ্ছে অনিলদা, ছোটবেলায় যাকে দেখেছে প্রচণ্ড সততা নিয়ে পার্টি করতে। এখন বয়স হয়ে গেছে, কিছু পরিমাণে হতাশও, তবুও ভেতরের সেই প্রিয় অনিলদা শেষ হয়ে যায়নি।

"আমার যেটুকু করার, সে বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত থাক বিভু।"

তিনদিন পরেই একটা দুর্ঘটনা থেকে কোনমতে বেঁচে গেল বিভাস। রাত্রে মাঝে মাঝেই বারোটা-একটার সময় জিপ নিয়ে সে বেরোত হাইওয়ের ধারে জঙ্গলে ঢুকবার গেটগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা, বা কোথাও অস্বাভাবিক কোনও কিছু হচ্ছে কি না দেখতে। রাত্রের এই রাউণ্ডে জন্য তিনেক আর্মস গার্ড আর ড্রাইভার আসলাম থাকতো। তার নিজের সঙ্গে থাকতো বন্দুক।

সেদিন রাতেও সোওয়া বারোটা নাগাদ বেরোল তারা। রাতের জঙ্গলের একটা আলাদা রহস্যময় রূপ আছে। এত দিন অভ্যাসের পরও মুগ্ধ হয়ে যায় বিভাস। চাকরির আর সমস্ত কাজের চেয়ে রাত্রিবেলা এই জঙ্গলে রাউণ্ডটাই সবচেয়ে উপভোগ করে ও।

রাউণ্ড শেষে হাইওয়ে দিয়ে ফিরবার পথে দেখা গেল উল্টোদিক থেকে একটা ট্রাক আসছে। আসলাম আলোর সঙ্কেত দিলেও ট্রাকটা দিল না। বিভাস বিরক্তভাবে মন্তব্য করল, "কোন নিয়মকানুন মানে না এই..."

তার কথা শেষ হল না। ট্রাকটা প্রচণ্ড গতিতে হঠাৎ বেঁকে জিপের মুখোমুখি চলে এসেছে! চুরমার হয়ে যাবার আগের মুহূর্তে অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আসলাম স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে রাস্তার ডানদিক দিয়ে বেরোতে চাইল। মুখোমুখি সংঘর্ষটা এড়ানো গেলেও ট্রাকের বাম্পারটা লাগল জিপটার পাশে। উল্টে রাস্তার পাশে জঙ্গলের ধারের ট্রেঞ্চে পড়ে গেল জিপটা। ট্রাকটা সগর্জনে বেরিয়ে গেল।

সাত দিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কোয়ার্টারে ফিরল বিভাস। তার চোটটাই সবচেয়ে বেশী হয়েছিল। অনেক লোকজন এসে দেখা করে গেল, এমন কি মাধব রায়ও। বিশেষ কথাবার্তা বলল না বিভাস। সবাই চলে গেলে সে ধীরে ধীরে হেঁটে এসে বসল কোয়ার্টারের পেছনে জঙ্গলের ধারে একটা গাছের কাটা গুঁড়ির ওপর। পুবালী বাতাসে ঝিরঝির করে কাঁপছে পাতাগুলো। জঙ্গলের একটা ফাঁক দিয়ে দূরে ভুটান পাহাড়ের নীলচে স্বপ্ন দেখা যাচ্ছে। অন্যমনস্কভাবে সেদিকে তাকিয়ে রইল বিভাস।

এখন কি করা উচিত?

ঝিম মেরে বসে রইল বিভাস। অনেকক্ষণ পর উঠে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা পায়ে-চলা রাস্তা ধরে এগোতে লাগল। অন্যমনস্ক না থকলে সে বুঝতে পারত, দু'জন ফরেস্ট গার্ড তাকে অনুসরণ করছে। মিনিট দশেক হেঁটে বিভাস এসে দাঁড়াল একটা ইটের বেদীর সামনে। এইখানেই খুন হয়েছিল বিশ্বরূপ। চুপচাপ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল বিভাস। কোন শব্দ সে উচ্চারণ করল না। দেবদারু গাছের ফাঁক দিয়ে একফালি রোদের টুকরো এসে পড়েছে বেদীটার নীচে। বাতাসে সরসর করছে শুকনো পাতা। নিস্পন্দ বিভাসের দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে মাঝে মাঝে দু'-একটা বুনো টিয়া ডেকে উঠছে, কর্কশ ডাকে তারা ভরে দিচ্ছে বিস্তীর্ণ বনভূমি। আসন্ন বর্ষার জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে ডুয়ার্সের পাতাঝরা জঙ্গল।

প্রায় আধঘণ্টা পর মন্থর পায়ে কোয়ার্টারের দিকে রওনা দিতেই চোখে পড়ল ফরেস্ট গার্ড দু'জনকে, সামনের বাঁকটার মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তারা। কাছে গিয়ে বিভাস প্রশ্ন করলো, "তোমরা?"

"স্যার, আপনি একা একা আসছিলেন, তাই..."

এটা এদের ডিউটির মধ্যে পড়ে না। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল সে। "চলো, যাওয়া যাক।"

সব গুছিয়ে এনেছে বিভাস। গত মাসখানেক প্রচণ্ড খাটা-খাটনি করে সমস্ত প্রমাণগুলো সাজিয়ে ফেলেছে। বেরোতে পারবে না মাধব রায়। অফিসে বসে মনে মনে আগামী কাজগুলোকে ঠিক করে নিচ্ছিল সে। প্রমাণগুলো থানাকে দিতে হবে, সেগুলোর একটা লিস্ট আবার দিতে হবে অনিল'দাকে। কয়েকদিনের মধ্যেই পুলিস চার্জশীট্ ফ্রেম করবে। থানা যদিও এখনও নিস্পৃহ, তবুও এটা না করে বেরোতে পারবে না তারা। ডি, এফ, ও, এবং পলিটিক্যাল পার্টিগুলোও চুপচাপ হয়ে গেছে ইদানীং। বেশ খুশী খুশী লাগছে বিভাসের। এক বছরেরও কম সময়ে একটা শক্তিশালী চক্রকে ভেঙ্গে দিতে পারছে সে।

আর কি কঠিন দিনগুলোই না গেছে। নিজের মনেই একবার পেছনে তাকিয়ে দেখল বিভাস। কত কি হয়ে গেল! বিশ্বরূপের প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল মুখটা মনে পড়ল। আজকে তুমি নেই বিশ্ব! কি খুশীই না হতে তুমি!

মনে মনে ঠিক করে ফেললো বিভাস, কোর্টে হিয়ারিং'এর দিনগুলোতে হাজির থাকতে হবে। সবরকম সাহায্য করতে হবে অনিলদাকে। আর এসব চুকে-বুকে গেলে একটা টানা ছুটি নিতে হবে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। বিয়ে-থার ব্যাপারটাও কি ভাববার সময় এসেছে? একা একা ভালো লাগে না!

থানা থেকে একবার ঘুরে আসা দরকার। আসলামকে ডাকলো বিভাস, "গাড়ি ঠিক আছে তো? চলো, মাদারপুর যেতে হবে।"

একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘর থেকে বেরোতে যাবে, এমন সময় বাহাদুর সেদিনের চিঠিপত্রগুলো নিয়ে এল। একবার চোখ বুলিয়ে যাই, ভাবলো বিভাস। একটা চিঠি এক কাঠ ব্যবসায়ীর। তার চেকপোস্ট পাস হারিয়ে গেছে, নতুন পাশের জন্য আবেদন। দ্বিতীয় চিঠিতে ডি, এফ, ও, জানাচ্ছেন হিসাবপত্র তৈরি রাখতে, আগামী মাসে অডিট আসছে।

সিগারেটে টান দিয়ে তৃতীয় চিঠিটা খুলে স্তম্ভিত হয়ে গেল বিভাস। আবার পড়ল। আবার পড়ল। কি জঘন্য, নোংরা ষড়যন্ত্র! কি করে হতে পারে এটা? খাম-টাম উল্টে-পাল্টে দেখল, না ঠিকই আছে, পরিষ্কার সরকারি চিঠি। কতখানি অসম্ভব, অসম্ভব নীচতা। হতভম্ব, ক্রুদ্ধ বিভাস দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে রইল। সামনে টেবিলের ওপর হাওয়ায় পত্ পত্ করে উড়তে লাগল চিঠিটার প্রান্ত। অত্যন্ত সংক্ষেপে তাকে জানানো হয়েছে যে রেঞ্জ অফিসার বিভাস দাশগুপ্তকে বাঁকুড়ার কোণ্ডা রেঞ্জে বদলি করা হয়েছে। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

মাথার মধ্যে যেন একটা মেল ট্রেন চলে যাচ্ছে, দাপিয়ে যাচ্ছে তার সমস্ত শব্দ আর ভার নিয়ে। চুলগুলো টেনে ধরে মুখ গুঁজে বসে রইল সে। আসলাম এসে দরজার সামনে দাঁড়াল, একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, "যাবেন না স্যার?"

অঙ্কন : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ক্রমশ

বিতর্কিত লীগ জয় সম্পর্কে

বিকাশ মুখোপাধ্যায়

সাধারণ ভারতীয়দের কাছে সাতচল্লিশের আগে অবধি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে সূর্য উঠত না। তাই সে সময়ের বাৎসরিক খেলসমাচারে ভারত এবং 'হোম'-এর ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা হত। উনিশ'শ এগারোর রাগে কিনা জানি না, উনচল্লিশ সালের খেলার খবর দিতে গিয়ে, সেই বছরে ভারতীয় ফুটবলে এক বিশেষ ঘটনা মোহনবাগানের লীগ বিজয় সম্পর্কে একটা অক্ষরও খরচ করা হয় না। সেখানে জানানো হয়, 'ইংল্যান্ডের ফুটবল লীগে প্লেয়ারদের জার্সিতে নম্বর লাগানো চালু, ক্রিকেট পিচে জল দেওয়া আইনানুগ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে গ্রেট বৃটেনে সমস্ত ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বাতিল এবং আই· এফ· এ-তে দ্বিতীয় বৃহত্তম 'সকার-স্প্লিট'।

সে সময় সাহেবরা স্বীকার না করলেও আজকের দিনে শতবর্ষের প্রাচীন ক্লাবের প্রথম লীগ বিজয় অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। আবার লীগ বিজয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলোর অর্থাৎ যে কারণে 'সেকেন্ড গ্রেটেস্ট 'সকার-স্প্লিট' তারও ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সে সমস্ত বিষয়ে ইদানীং কালের পাঠককুলকে ফেলে আসা ফুটবল-সময়কে পিছন ফিরে দেখাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

একটু অবাক হতে হয় একথা ভেবে ঠিক বাইশ বছর বয়সে যে ক্লাব শীল্ড জয় করে ইতিহাস গড়ে, সেই দলের লীগ জিততে লেগে যায় আরও আটাশ বছর। অথচ এরমধ্যে মোহনবাগানে কিংবদন্তী খেলোয়াড়গণ যথা গোষ্ঠ পাল, শরৎ সিনহা, উমাপতি কুমার, বলাই চ্যাটার্জি, বাঘা সোম, মনা দত্ত, আব্দুল হামিদ প্রমুখ খেলে গেছেন। অবশ্য শুধু লীগের ক্ষেত্রেই নয়, এই আটাশ বছরের মধ্যে মোহনবাগানের উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলতে প্রথম খেলার সুযোগেই উনিশ'শ তেইশে রোভার্স কাপ রানার্স হওয়া ঐ বছরই অবশ্য তারা আই· এফ· এ শীল্ড রানার্স হয়। লীগ রানার্সের বছরগুলো হ'ল ১৯১৬, ২০, ২১, ২৪, ২৯, ৩৪। প্রতিষ্ঠান যখন শতবর্ষের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে তখনই ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধতা এড়ানো উচিত নয়, তাই কারুকে ছোট না করেই বলা যায় কিংবদন্তী খেলোয়াড়গণ নিজেরা ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন মোহনবাগানে খেলার সুবাদে কিন্তু মোহনবাগানকে কখনই বিজয় মাল্য পরাতে পারেননি। উনচল্লিশ সালে মোহনবাগানের শিরে ওঠে লীগ বিজয়ের মুকুট, যদিও কোন কোন মহল তাদের সে বছরের সেরার শিরোপা দিতে নারাজ ছিল। এই গররাজি হওয়ার কারণ পূর্বোল্লিখিত 'সকার-স্প্লিট'। যা হোক আরও পিছিয়ে গিয়ে পাতা ওল্টানো যাক

উনিশ'শ এগারোয় যখন মোহনবাগান আই· এফ· এ শীল্ড জেতে তখন তারা লীগ খেলার

১৯৩৯-এর লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান দল

যোগ্যতাই অর্জন করেনি। লীগ খেলার সুযোগ পায় উনিশ'শ চোদ্দয় সেকেন্ড ডিভিসনে। একই সঙ্গে এরিয়ান্সকেও লীগ খেলতে দেওয়া হয়। তার আগে অবধি লীগ ইউরোপীয়ানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মোহনবাগান পরের বছরেই ফার্স্ট ডিভিসনে উঠে আসে যদিও লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নয়। সেবার সেকেন্ড ডিভিসন চ্যাম্পিয়ন হয় নাইনটি ফার্স্ট হাইল্যান্ডার, মোহনবাগান ও মেসারার্স যুগ্ম রানার্স। হাই ল্যান্ডারের 'এ'টীম তখন প্রথম বিভাগে—তাই সে সময়ের নিয়ম অনুযায়ী তারা সুযোগ পায় না। ক্যালেডোনিয়ান গ্রাউন্ডে অর্থাৎ বর্তমানের পুলিশ গ্রাউন্ডে মোহনবাগান বনাম মেসারার্সের দুদিন প্লে অফ ম্যাচ হয়। প্রথমদিনের ফল (০-০), দ্বিতীয় দিনে মোহনবাগান (১-২) গোলে হারে। মেসারার্স ফার্স্ট ডিভিসনে ওঠে, কিন্তু মোহনবাগানের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, আর· জি· এ টীম ফার্স্ট ডিভিসন থেকে নাম প্রত্যাহার করে। নাম তুলে নেওয়ার কারণ প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ। তারপর ক্যালকাটা ক্লাবের টি সি কর্ফোডের ঐকান্তিক চেষ্টায় মোহনবাগান বদলী দল হিসাবে ফার্স্ট ডিভিসনে খেলার সুযোগ পায়। অর্থাৎ লীগ জিতে প্রমোশন পাওয়া নয়, ওয়েটিং লিস্টে থেকে জায়গা পাওয়া। এ প্রসঙ্গে একটা কথা জানানো প্রয়োজন মোহনবাগান ক্লাবের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অন্য দুই দল মহামেডান এবং ইস্টবেঙ্গলও সেকেন্ড ডিভিসন লীগ জিতে নয়, নলচের আড়াল দিয়েই ফার্স্ট ডিভিসনে খেলার সুযোগ পায়। ইস্টবেঙ্গলের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রথমবার কথাটা ব্যবহার করতে হবে কেননা তারা পরে 'রেলিগেটেড' হয়ে সেকেন্ড ডিভিসনে নেমে গিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরে আসে। যাহোক উনিশশো চব্বিশে সেকেন্ড ডিভিসনে তৃতীয় হয় ইস্টবেঙ্গল। পুলিস লীগ চ্যাম্পিয়ন, রানার্স ক্যামেরন্স 'বি'। পুলিস দল ফার্স্ট ডিভিসন খেলতে রাজি হয় না। ক্যামেরন্সের 'এ' টীম থাকায় তারাও সুযোগ পায় না। তখন রেঞ্জার্সের এ· বি· রোসার ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের পঙ্কজ গুপ্তের গভর্নিং বডিতে দেওয়া জোরালো যুক্তিতে ইস্টবেঙ্গল 'প্রমোশন' পায়।

জহর গঙ্গোপাধ্যায়

বিমল মুখার্জী

প্রতিবাদে ক্যালকাটা ফুটবল লীগ ও আই· এফ· এর সেক্রেটারি পদত্যাগ করেন। আবার উনিশশো তেত্রিশ সালে সেকেন্ড ডিভিসন রানার্স হয় মহামেডান স্পোর্টিং। চ্যাম্পিয়ন কিংস রয়াল রাইফেলস্ এর 'বি' টীম। এখানেও সেই 'এ' টীম 'বি' টীমের ব্যাপার। মহামেডান ফার্স্ট ডিভিসনে ওঠে। পরে অবশ্য পরপর পাঁচবছর ফার্স্ট ডিভিসন লীগ পায়। সে প্রসঙ্গেও এই নিবন্ধের চাহিদাতেই আসতে হবে। তার আগে আরেকটা সংক্ষিপ্ত খবর দিই। উনিশ'শ আটাশ এবং উনত্রিশ পরপর দুবছর মহামেডান সেকেন্ড ডিভিসন লীগে সর্বনিম্ন স্থান পায়, কোন কারণে তাদের নামিয়ে দেওয়া হয়নি। সে প্রসঙ্গ এখানে অনালোচিত থাক।

এমন একটা কথা ইদানীং অহরহ বলা হয়ে থাকে, সেই বিখ্যাত সকার-স্পলিটের ফলে মহামেডান না খেলার জন্যেই উনচল্লিশে লীগ পেয়েছিল মোহনবাগান কিংবা উনচল্লিশে মহামেডানের মাঝ পথে নাম প্রত্যাহার করার জন্যেই পরপর ছ'বছর লীগ জয়ের রেকর্ড ইস্টবেঙ্গলের দখলে। কথাটা সত্যের অপলাপ। মহামেডান ও তিন সঙ্গী দেশীয় দল ইস্টবেঙ্গল, কালিঘাট ও এরিয়ান্স ক্লাব যখন লীগ বয়কট করে তখনকার লীগ তখন প্রথম ও ফিরতি লীগ খেলা হত। ইস্টবেঙ্গল সেবার প্রথম লীগে (২-১) গোলে হারে। কালিঘাটের সঙ্গে ড্র হয় (১-১) মহামেডানের সঙ্গে দুটো খেলাই হয়, দুবারই ড্র যথাক্রমে (১-১), (০-০)।

যদি ধরে নেওয়া যায় মহামেডান না খেলা পাঁচটা ম্যাচই জিতত এবং মোহনবাগান শেষ দুটো খেলায় হারত, তাহলে বড়জোর প্লে অফ খেলা হতে পারত। মোহনবাগান কিন্তু সেবার বাইশটি ম্যাচে খেয়েছিল সাত গোল, মহামেডান উনিশটি ম্যাচে পনেরো গোল। সুতরাং উনচল্লিশ সালে মহামেডান লীগের মাঝপথে (?) খেলা বন্ধ করে দিয়ে এমন কিছু হারায়নি। অর্থাৎ আই· এফ· এ· সম্পাদকের সম্পাদকীয় বিবরণীতে ১৯৩৯-সুভ্যেনির) 'টু বিলিট্‌ল দ্য অ্যাচিভমেন্ট অব মোহনবাগান' টেবিলের অবস্থাটা দেখা যাক।

১৯৩৯ সালে লীগের অবস্থা

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	স্বপক্ষে গোল	বিপক্ষে গোল	পয়েন্ট
মহামেডান	১৯	১০	৫	৪	৩১	১৫	২৫
ইস্টবেঙ্গল	১৯	৮	৮	৩	২৩	১০	২৪
কালিঘাট	১৯	৯	৫	৫	৩১	১৯	২৩

মোহনবাগান যখন লীগ শেষ করে, তখন তার অবস্থা

খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	স্বপক্ষে গোল	বিপক্ষে গোল	পয়েন্ট
২৪	১৬	৭	১	৩১	৭	৩৯

এরিয়ান্স পরে অবশ্য বয়কটের সিদ্ধান্ত পাল্টায়। মহামেডান সে অবধি খেলেছিল উনিশটা ম্যাচ, ইস্টবেঙ্গল ও কালিঘাটও তাই।

মোহনবাগান যখন লীগ শেষ করে, তখন তার অবস্থা মোহনবাগানের যোলটা জয়ের মধ্যে দুটো ওয়াক ওভার পাওয়া। ইস্টবেঙ্গল ও কালিঘাট খেলেনি। মহামেডান, ইস্টবেঙ্গল, কালিঘাট রণে ভঙ্গ দিয়েছিল, এ জাতীয় মন্তব্যের সঙ্গে একমত না হয়েও বলা যায় মহামেডানের সেদিনের পশ্চাদাপসরণে তারা এমন কিছু ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি।

তবে মহামেডানের সেবারে খেলা উনিশটি ম্যাচের সার্বিক ফলাফল অনুকূল না হওয়ার জন্যে তারা শতকরা সত্তর ভাগ দায়ী। বাকী ত্রিশ ভাগের দায়িত্ব নিতে হবে রেফারিদের। উনচল্লিশের শীল্ড গাইডের 'ক্রাইসিস ইন ক্যালকাটা ফুটবল' নিবন্ধের দু এক লাইন তুলে দিচ্ছি। কোন বাঙালীর লেখা নয় 'পারমেনিয়ান' সাহেবের। 'লেট মি গো ব্যাক টু দ্য কজ অব দ্য ট্রাবল। দ্য ফার্স্ট রিজন ইজ ব্যাড রেফারিং। দ্য সেকেন্ড রিজন ইজ ব্যাড রেফারিং এন্ড দ্য থার্ড রিজন ইজ ব্যাড রেফারিং। এন্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট এনি মোর রিজনস, আই

এ রায়চৌধুরী (নন্দ)

মনমোহন মুখার্জী

উইল আনহেসিটেটিংলি সে ব্যাড রেফারিং।'

পারমেনিয়ান নামটি ছদ্মনাম হতে পারে, তবে নিবন্ধে তিনি বারবার 'হোম' এর কথা বলেছেন, আর এদেশের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রেফারিং-এর দোষ দিয়েছেন। যে খেলার রেফারির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মহামেডান ইস্টবেঙ্গল, কালিঘাট ও এরিয়ান্স জেহাদ ঘোষণা করে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নেয়, সে খেলাটিতে কিন্তু এই চার দলের কোনদলই অংশগ্রহণ করেনি। ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বছর বাদে এই ব্যাপারটা নিয়ে কেউ নাক কুঁচকে অন্য রকম গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করলে তাঁকে খুব একটা দোষ দেওয়া যাবে না। খেলাটি ছিল মোহনবাগান বনাম ক্যামেরন্স। ক্যামেরন্স একগোলে হারে, গোলটি করেন নন্দ রায় চৌধুরি এবং সেটি হাত দিয়ে, যেটা রেফারির নজর এড়িয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয় সামান্য কিছু তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ ছাড়া ক্যামেরন্স কিন্তু 'রিবেল'দের দলে ভেড়েনি।

কিন্তু ফেটে পড়ল মোহনবাগানের চার দেশি ভাই। কালিঘাটের সঙ্গে আই· এফ· এর আগেই ঝগড়া চলছিল ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সঙ্গে একটি ম্যাচ নিয়ে। 'জন'-এর শবযাত্রার জন্যে কালিঘাট খেলাটি স্থগিত রাখার আবেদন করে। আই· এফ· এ তাতে কর্ণপাত করেনি। তার ওপর কালিঘাটের খেলার দিনগুলোও যথেচ্ছ পরিবর্তন করা হচ্ছিল।

মহামেডান দু একটি খেলায় রেফারির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট ছিল না ঠিকই কিন্তু সে বছর তারা খেলতেও পারছিল না। যে পারমেনিয়ান সাহেব লীগের গোলমালের জন্যে রেফারিংকে দায়ী করেছেন তাঁরই একই সময়ে লেখা 'আ রিভিউ অব ইয়ার ১৯৩৯' নিবন্ধ থেকে মহামেডান অসাফল্যের কারণ সম্পর্কিত দু লাইন তুলে দিচ্ছি "দ্য চিফ রিজন ইজ দ্যাট মহামেডান হ্যাজ প্র্যাকটিক্যালি নো নিউ প্লেয়ার্স। ম্যান হু হ্যাভ প্লেড গ্র্যান্ড ফুটবল ফর ইয়ারস্ অ্যান্ড ইয়ারস্ ফ্রিকোয়েন্টলি রাইট থ্রু দ্য ইয়ারস্ উইদাউট আ ব্রেক, ক্যান নট বি এক্সপেক্টেড টু লাস্ট ফর এভার।"

প্রেমলাল

পারমেনিয়ান এখানেই থেমে থাকেননি। জুম্মা খান, নুর মহম্মদ (বড়), রহিম, সাবু, মাসুম প্রমুখের বয়সের ভারে ক্লান্ত বলে ছেড়ে দিলেও, কিংবদন্তী হাফিজ রসিদ সম্পর্কে তাঁর নিষ্করুণ মন্তব্য "ইট ওয়াজ আ সিরিয়াস মিসটেক প্রিজারভিং উইথ হাফিজ রসিদ অ্যাট সেন্টার ফরোয়ার্ড। দিজ্ গ্র্যান্ড সেন্টার ফরোয়ার্ডস্ ডেজ আর ডেফিনিটলি ওভার অ্যান্ড দ্য সুনার দ্য মহামেডান স্পোর্টিং এক্সিকিউটিভ রিয়েলাইজ ইট দ্য বেটার ফর দ্য ক্লাব।" মহামেডান সম্পর্কে শেষ মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন তারা আগামীবার সমস্ত 'হ্যাভ বীনস'দের ছেড়ে দিয়ে 'নিউ ব্লাড' নেবে।

মহামেডানের মত ইস্টবেঙ্গলও হতাশায় ভুগছিল। কারণ সে বছর তারা যখন শুরু করে তাদেরও চ্যাম্পিয়নশীপের অন্যতম দাবীদার হিসাবে ধরা হয়েছিল। মহামেডানকে তারা প্রথম লীগে হারিয়ে আরও আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু সেই খেলায় মুর্গেশ আহত হয়ে মাঠ ছেড়ে বেশ কিছুদিনের জন্যে সাইড লাইনে চলে যান। আর মুর্গেশের জুটি লক্ষীনারায়ণ ব্যক্তিগত কারণে মহীশূর চলে যান। তারপরই চাকা উল্টো ঘোরে—ইস্টবেঙ্গল সেবার মোহনবাগানের কাছে প্রথম লীগে (২-১) গোলে হারে, যে কথা আগেই বলা হয়েছে। আর যে দলের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের সন্দেহজনক জয় নিয়ে ইস্টবেঙ্গল 'রিবেল'দের দলে ভেড়ে, সেই ক্যামেরন্সের কাছে তারা প্রথম এবং ফিরতি লীগে হেরে গিয়ে নিজেদের রানার্স হবার সম্ভাবনাও হারিয়ে ফেলে। অবশ্য মুর্গেশ আহত না থাকলেও কতখানি কি করতে পারতেন সেটা অনুমানের বিষয়। পারমেনিয়ান সাহেব তাঁকে 'চ্যাম্পিয়ন মিসার অব গোলস ইন দ্য কান্ট্রি' বলে অভিহিত করেছেন। যাহোক সমস্ত সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাবার পর তারা জেহাদ ঘোষণা করেছিল।

কালিঘাট আই· এফ· এর সঙ্গে লড়াই করছিল ঠিকই, কিন্তু সেবছর তাদের রক্ষণভাগ অত্যন্ত খারাপ ছিল। তাই আক্রমণভাগে আম্পালারাও জোসেফ এবং রামালু থাকা সত্ত্বেও তারা জয় ধরে রাখতে পারছিল না। তবে যেহেতু চ্যাম্পিয়নশীপ লড়াই-এ তারা ছিল না তাই হতাশ হয়ে বয়কট করেছিল এই বদনাম তাদের দেওয়া যায় না।

এরিয়ান্সের খেলা সম্পর্কে বলতে গিয়ে পারমেনিয়ান সাহেবকে আবার স্মরণ করা যাক: "দ্য এরিয়ান্স হ্যাভবিন লাইক দ্য কিউরেটস এগ, গুড অ্যান্ড ব্যাড ইন পার্টস।" সাহেব অবশ্য এখানেই থেমে থাকেননি, এরিয়ান্সের অন্য তিনদলকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া প্রসঙ্গ স্মরণ করে তিনি বলেছেন, 'ইট ইজ নট গুড স্পোর্ট টু লেট ওয়ানস ফ্রেন্ডস ডাউন ইন দেয়ার টাইম অব ট্রাবল'।

একটা কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন—ক্লাবগুলো যে পরিস্থিতিতে বয়কটে শামিল হয় তারজন্যে আই· এফ· এ-রও কিছু দায় ছিল। বাজে রেফারিং ছাড়াও পরিচালন ব্যবস্থাতেও ছিল যথেষ্ট গলদ।

যাহোক ক্যামেরন্সের সঙ্গে বিতর্কমূলক জয়ের পরপরই আগেকার সমস্ত ক্ষোভ নিয়ে চার দল আই· এফ· একে চরমপত্র দেয় এবং জানায় তাদের ক্ষোভগুলোর যথাযথ মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তারা কোন খেলায় অংশগ্রহণ করবে না। তারা এই চিঠির কপি বিভিন্ন সংবাদপত্রকে দেয়। ফলে আই· এফ· এ সেটিকে 'প্রেস্টিজ ইস্যু' করে। তদানীন্তন আই· এফ· এ সভাপতি নিকোলাসসাহেব ক্লাবগুলিকে চিঠি প্রত্যাহার করতে বলে। এরিয়ান্স রাজি হলেও বাকীরা হয় না। ফলত আই· এফ· এ ঐ তিন ক্লাবকে পুরো সিজন অর্থাৎ একত্রিশ ডিসেম্বর অবধি সাসপেন্ড করে। মহামেডানরা পাল্টা বি এফ এ তৈরি করে এবং লর্ড ব্রার্বোন কাপ চালু করে। দলে বেশি ক্লাব না পাওয়ার জন্যে অবশ্য তাদের পরিকল্পনা 'ফ্লপ' করে এবং পরের বছরই সমস্ত বিবাদ বিসংবাদ দূর হয়ে লীগ শুরু হয়ে যায়।

এবার আসে সেই লাখ টাকার প্রশ্ন। মোহনবাগান কি কর্তৃপক্ষ এবং রেফারিদের আনুকূল্যে প্রথমবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল? এর উত্তরে বলা যায়, মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হবার মতই সেবার খেলেছিল।

ক্যামেরন্সের সঙ্গে হাত দিয়ে দেওয়া গোলে জয় একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। মারাদোনার হাত দিয়ে দেওয়া গোলে আর্জেন্টিনা, ইংল্যান্ডকে হারালেও কেউ কি অস্বীকার করতে পারবে তারাই যথেষ্ট যোগ্যতার কারণে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন?

উনচল্লিশ সাল ছিল মোহনবাগানের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। সে কথা মনে রেখে তারা যথেষ্ট সম্ভাবনাময় তরুণ খেলোয়াড়দের দলে নিয়েছিল। উমাপতি কুমার ছিলেন ফুটবল সেক্রেটারি। বলাইদাস চ্যাটার্জি ছিলেন টীমের 'ট্রেনার'। তখন কোচ নয় ট্রেনার বলা হত। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী 'বলাই নার্সড দ্য টীম টু দ্য বেস্ট অব এবিলিটিস'। দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন কিন্তু প্রবীণ একজন, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী সন্মথ দত্ত। সন্মথের সে বছর মহামেডানের বিরুদ্ধে খেলা একটি ম্যাচের স্মৃতিচারণ করেছেন উমাপতি কুমার, "স্বয়ং ভগবানকে সেদিন আটকে ছিল সন্মথ দত্ত। যেন গোষ্টবাবু খেলছেন এমন দৃঢ়তা।" উমাপতি কুমারের ভগবানকে আটকানোর কথা বলার পেছনে একটা গল্প আছে। সেবার মহামেডানের ফরোয়ার্ডরা ভাল

খেলতে পারছিল না তাই সেই বিশেষ ম্যাচের জন্যে মহামেডান রহমতকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল। ম্যাচের আগে উৎফুল্ল মহামেডান সমর্থকদের মুখে শোনা গিয়েছিল 'খোদা কি রহমত আগিশ।' সন্মথ দত্ত খেলোয়াড়দের পেছনে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় বল কেড়ে নিতেন। সেসময়ই তিনি ওভারল্যাপ করতেন, যদিও শেষের দিকে সময়মত ফিরতে পারতেন না। উনচল্লিশের মহামেডানের বিরুদ্ধে সেই খেলায় সন্মথ দত্ত 'গেভ সাম লেসন্‌স্ টু দ্য ইয়স্টারস্। টাইম অ্যান্ড এগেন হি সেভ্‌ড হিজ টীম ফ্রম ভেরি মেনি টাইট কর্নারস্ অ্যান্ড ইট ওয়াজ মোহনবাগানস্ লাক দ্যাট দত্ত স্ট্রাক ওয়ান অব হিজ বেস্ট গেমস্।' [অমৃতবাজার পত্রিকা], সে বছরের সন্মথ দত্ত সম্পর্কে আরেকটা তথ্য দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যাব। মোহনবাগান সে বছর একটি মাত্র ম্যাচ হারে সেটি ভবানীপুরের বিরুদ্ধে (২-১) গোলে, এবং সেদিন সন্মথ দত্ত খেলেননি। এই সুযোগে আরেকটা তথ্য দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। ভবানীপুরের হয়ে সেদিন দুটি গোলই করেন কিংবদন্তীর খেলোয়াড় ছোনে মজুমদার, যিনি এরিয়ান্সে সাময়িক মনোমালিন্য হওয়ায় সে বছরই ভবানীপুরে এসেছিলেন। উজ্জ্বল অতীত উদ্ধার করার সুযোগে আরেকটু প্রসঙ্গান্তরে যাই। তেত্রিশে লীগ রানার্স হয় ইস্টবেঙ্গল, সেবছর চ্যাম্পিয়ন হতে পারত যদি শেষ খেলায় এরিয়ান্সকে হারাতে পারত। শেষ খেলায় হেরে গেল ইস্টবেঙ্গল ছোনে মজুমদারের একক কৃতিত্বে। ময়দানী গল্প, ছোনে মজুমদারকে চটিয়ে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের এক খেলোয়াড়, খেলার আগের দিন তাঁকে এবং পল্টু গাঙ্গুলিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল 'এবার চড়িয়ে লীগ নেব।' উত্তরে ছোনে বলেছিলেন 'পল্টু ভাল করে কুইনাইন ঠেসে রাখিস।' পল্টু গাঙ্গুলি খুব ম্যালেরিয়ায় ভুগতেন। যাহোক এরিয়ান্স সেবার জিতেছিল মাত্র চারটে খেলায় তার একটি ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে।

উনচল্লিশ সালে মোহনবাগানের গোলকিপার ছিলেন কে দত্ত। তাঁর সম্পর্কে কাগজের প্রতিবেদন 'হি ইজ দ্য বেস্ট গোলকিপার নাউ প্লেয়িং ইন ক্যালকাটা।' সেই কে দত্ত যাঁকে পরের বছর অর্থাৎ চল্লিশের শীল্ড ফাইনালে এরিয়ান্সের কাছে চার গোল খাওয়ার জন্য বদনাম নিতে হয়। চল্লিশ সালের সেই ঘটনার জন্য অন্য যাকে দায়ী করা হয় সেই পরিতোষ চক্রবর্তী উনিশ'শ উনচল্লিশে 'দ্য বেটার ম্যান, পজিশ্যানাল প্লে ইজ ভেরি সাউন্ড, আ ভেরি ইউজফুল ব্যাক।'

তিন নিয়মিত হাফ ছিলেন প্রেমলাল, বেণীপ্রসাদ ও বিমল মুখার্জি। একটু ইতিহাস ছোঁয়া যাক। উনিশশো এগারোয় শীল্ড জেতা দলে ছিলেন মনমোহন মুখার্জি। আর প্রথম বারের লীগ জেতা দলের ক্যাপ্টেন বিমল মুখার্জি। কাগজের ভাষায় "দ্য হাভ্‌স অব মোহনবাগান রিভেল্‌ড ইন দেয়ার ফিডিং জব সো দ্যাট দ্য ফ্রন্ট র‍্যাঙ্কস হ্যাড মেনি ওপেনিংস।" প্রকৃত পক্ষে বেণীপ্রসাদ প্রেমলাল জুটি ছিলেন অসাধারণ। অথচ এই বেণীপ্রসাদ-কলকাতায় পা রাখেন বদলী খেলোয়াড় হিসাবে। সমর্থকদের জিজ্ঞাসা ছিল একি পারবে গুফো চ্যাটার্জির জায়গা নিতে। ত্রিশ দশকের মোহনবাগানের দুর্ধর্ষ হাফ গুফো ওরফে এস চ্যাটার্জি এক সাহেবের সঙ্গে, আশি সালের বিদেশ- দিলীপ পালিতের মত, এক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তিন বছর সাসপেন্ড হয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় আসেন বেণীপ্রসাদ।

সে বছরের নিয়মিত পাঁচ ফরোয়ার্ড এস গুই, এস মিত্র (ল্যাংচা), এ রায়চৌধুরি (নন্দ), মোহিনী ব্যানার্জী, এস চৌধুরি (সতু)। মোহনবাগানের সেবারের দেওয়া একত্রিশ গোলের মধ্যে এঁরা করেন সাতাশ গোল।

সবচেয়ে বেশি গোল নন্দ রায়চৌধুরির, একটি হ্যাটট্রিকসহ এগারো গোল। হ্যাটট্রিকটি হয় শেষ খেলায় এরিয়ান্সের বিরুদ্ধে।

সন্মথ দত্ত

এস চৌধুরী

সেই খেলা ও তারপরের কিছু বিবরণ দিয়ে এ নিবন্ধ শেষ করব।

সেদিন মাঠে কেমন ভীড় হয়েছিল? তিনজন সত্তরোর্ধ্ব সমর্থক যাঁরা সেদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের হিসাবের গড় দাঁড়ায় ষাট হাজার। এই সংখ্যাকে ধ্রুব না ভাবার কোন কারণ নেই। কেননা সেসময়ে মোহনবাগানের খেলা মানে মাঠমুখো হাজার হাজার মানুষ। উনিশ'শ পনেরোয় যেবার মোহনবাগান প্রথমবার প্রথম ডিভিসনে খেলে, সে বছরের প্রথম ম্যাচই ছিল চ্যারিটি, ওয়ার ফান্ডের জন্যে সেই খেলায় প্রতিপক্ষ ছিল ক্যালকাটা, অর্থাৎ নবোন্নীত একটি দল প্রথম ম্যাচই খেলছে চ্যারিটি। কর্তৃপক্ষ জানত ভিড় হবেই। তাঁদের অনুমান মিথ্যা হয়নি।

উনিশ'শ পনেরোতে লীগের প্রথম খেলায় তাদের যে উৎসাহ, 'দ্য ক্রাউড হ্যাড স্টার্টেড্ পোরিং ইন লং বিফোর দ্য কমেন্সমেন্ট অ্যান্ড ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট টু রিয়েলাইজ দ্যাট ওয়াজ আ লীগ ম্যাচ অ্যান্ড নট আ শীল্ড [দ্য ইংলিশম্যান: সোমবার ১৭ মে ১৯১৫], উনিশ'শ উনচল্লিশে লীগ জয়ের পর 'এভরি মেম্বর অব দ্য টীম ওয়াজ গারল্যান্ডেড অ্যান্ড টেকেন ইন আ প্রসেশান টু দ্য ক্লাব টেন্ট হুইচ ওয়াজ সারাউন্ডেড বাই থাউজেন্টস অফ অ্যাডমায়ারার।' [অমৃতবাজার পত্রিকা: শুক্রবার ১৪ জুলাই ১৯৩৯] পঁচিশ বছর না জিতেও তাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি। পনেরোয় শুরু করা লড়াই শেষ হল উনচল্লিশে। উনিশ'শ এগারোর শীল্ড জয়ের সঙ্গে উনচল্লিশের লীগের শেষ লড়াই-এর মিল একজায়গায়। উভয় ক্ষেত্রেই মোহনবাগান প্রথমে গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ে। তবে প্রথম ক্ষেত্রে দিয়েছিল দু গোল, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গোলের সংখ্যা তিন। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোলটি হয় অবশ্য পেনাল্টি থেকে, করেন প্রসাদ। তার আগেই মোহনবাগান একটি পেনাল্টির সুযোগ অপচয় করেছিল, বারপোস্টে বল মেরেছিলেন সতু চৌধুরি। সেই সতু চৌধুরি যাঁর গোলার মত শট আটকেও একবার তদানীন্তন কালের বিখ্যাত গোলকিপার কাস্টমসের জার্ডিন বলশুদ্ধ গোলের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলেন।

তেরোই জুলাই উনিশ'শ উনচল্লিশের বিকালে সেই ম্যাচ শেষ হবার পর এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গিয়েছিল, যা কিনা উনিশ'শ এগারোর শীল্ড জয়ের পরও দেখা যায়নি। ফুটবলার, কর্মকর্তা এবং হাজার হাজার সমর্থকদের রাজপথে মিছিল। যার শুরু তদানীন্তন ক্যালকাটা গ্রাউন্ড থেকে, তখনকার মোহনবাগান তাঁবু ছুঁয়ে কালীঘাটের কালীমন্দিরে শেষ। উমাপতি কুমার, নন্দ রায়চৌধুরি বিমল মুখার্জিকে নিয়ে মিছিলে নাচছেন তখনকার দিনের সিনেমার সুপারস্টার জহর গাঙ্গুলি। ভাবা যায়!

অথচ প্রথমবারের লীগ জয় নিয়ে পরবর্তীকালের মোহনবাগানীদের তেমন কোন উচ্ছ্বাস নেই। সম্ভবত তাঁরাও বাজার চালু কথা 'মহামেডানরা সরে গেল বলে মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন', এরকম কথা বিশ্বাস করেন।' নতুবা মোহনবাগানের পঁচাত্তর বর্ষ পূর্তি সুভেনীরে সেই লীগ জয়কে 'ব্রেকিং দ্য আইস' বলে এক লাইনে শেষ করে দেওয়া হত না। আশা রাখা যাক্ একশবছর পূর্তিতে প্রথম বারের লীগ জয় সম্পর্কে নতুন মূল্যায়ন হবে।

উৎসাহী পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে, মোহনবাগানের প্রথমবারের লীগ জয়ের সঙ্গে 'সেকেন্ড গ্রেটেস্ট সকার-স্প্লিটের কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে 'ফার্স্ট-স্প্লিট'টা কবে হয়েছিল।

তার উত্তরে জানাই, প্রথমটি হয় উনত্রিশ সালে যার ফলে পরিণতিতে প্রথম কোন ভারতীয় [ডি· এন· বসু] আই· এফ· এ সহ সভাপতি হতে পারেন। খেলায় ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সে আর এক যুদ্ধ জয়। ■

এই হয়তো ভালো

"টেনিস ল যত সুখ দিয়েছেন তার অর্ধেকও যদি তুমি আগামী দশবছরের মধ্যে আমাকে দিতে পারো আমি বিশ্বের সুখীতম স্বামী হবো।" বিয়ের ঠিক পরে নববিবাহিতা স্ত্রীকে একথা বলেছিল জনৈক অন্ধ টেনিস ল সমর্থক। ইংরেজ এই তরুণটিকে নিশ্চয়ই আমরা কেউ চিনি না। তবে এরকমই এক অত্যুৎসাহীকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। বিয়ের পর স্ত্রীকে যে ঠিক এই একই কথা বলেছিল। সামান্য পার্থক্য—টেনিস ল'র জায়গায় নাম করেছিল সুনীল গাওস্করের।
মনে পড়ে যাচ্ছে গরচা সেকেণ্ড লেনের সেই ছেলেটির কথাও গাওস্করের চৌত্রিশ সেঞ্চুরির প্র-তি-টি যে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছে। অধিকাংশই রেডিও শুনে কিংবা টি ভি দেখে। পাঁচ-ছটি সশরীরে মাঠে উপস্থিত থেকে। নব্বইতে আধঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা সানির সেঞ্চুরি শোনার জন্য যে সি এ বি লিগ ম্যাচে টু ডাউন না নেমে ফাইভ ডাউনে গেছিল। এবং পরের ম্যাচে এরকম করা যাবে না ক্লাব কর্তৃপক্ষের এই কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ার পরের দিন আর মাঠেই আসেনি। প্রসঙ্গত পরের ম্যাচের দিন ভারতের পরবর্তী টেস্টম্যাচ শুরু, কিন্তু প্রথম দিন গাওস্কর ব্যাট করবেন অবশ্যই এমন কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। তবু ছেলেটি কোনও ঝুঁকি নেয়নি।
আমি নিশ্চিত মধ্য কলকাতার এই ব্যাঙ্কর্মীর মতো অনেকের সঙ্গেই আপনাদের আলাপ আছে গাওস্করের রিটায়ারমেণ্ট সংক্রান্ত জল্পনাকল্পনা শুরু হবার অনেক আগেই যারা দৃঢ় অথচ সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত

নিয়ে ফেলেছেন, গাওস্কর চলে গেলে আর ক্রিকেটই দেখবো না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে পাগলামি। হয়তো বা তাই। কিন্তু একবার যদি ভেবে দেখা যায় সেই অসামান্য প্রতিভার কথা সম্পূর্ণ সুস্থ লোকদের যে এইভাবে নাড়া দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে।

প্রবীণরা হয়তো কেউ কেউ এখনও বলবেন, মার্চেণ্ট কিছু কম বড় ব্যাটসম্যান ছিল না। নেহাত্ত অত সুযোগ পায়নি…। ফাস্ট উইকেটে বিশ্বনাথের রেকর্ড আরও ভালো এই মন্তব্যও উঠে পড়তে পারে। এদিয়ে আর তর্ক বাড়ানোর কোনও অর্থ হয় না।
গোটা বিশ্ব যাকে ভারতের সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে তাঁর কি এল গেল যদি দেশের মুষ্টিমেয় কিছু লোক অন্য কথা বলে? গাওস্করকে ভারতের সর্বকালের সেরা বলতে যদি বা আপত্তি থাকে সর্বকালের সফলতম বলতে নিশ্চয়ই আপত্তি থাকবে না। আপত্তি থাকা সম্ভব নয়, গাওস্করের যা রেকর্ড। ব্যক্তিগতভাবে মানুষটাকে অপছন্দ করতে পারেন কিন্তু কিছুতেই অশ্রদ্ধা রাখা সম্ভব নয় তাঁর কীর্তি সম্পর্কে। যাঁরা অনেক দেখেছেন, অনেক পড়েছেন, অনেক জানেন, তাঁরা এই বিচারটা করার পক্ষে উপযুক্ত লোক। অতি ক্ষুদ্র এই সাংবাদিকের নিজস্ব ধারণা, সুনীল গাওস্কর শুধু সেরা ক্রিকেটারই নন ভারতের সর্বকালের সেরা ক্রীড়াবিদও। বিজয় অমৃতরাজ থেকে মিলখা সিং, পি টি উষা থেকে প্রকাশ পাড়ুকোন এই অসাধারণ মানসিকতা কারুর নেই। গাওস্করের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ম্যাচের আগের দিন দুপুরে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটানোর অভিজ্ঞতা এই লেখকের আছে। প্রথমটি শারজায় রথম্যানস চ্যালেঞ্জ কাপে। যে ম্যাচে অধিনায়ক চেয়েছিলেন তিনি মিডল অর্ডারে খেলুন কিন্তু জেদ করে সানি ওপেন করেছিলেন। দ্বিতীয় আমেদাবাদে এবছর ভারত-পাক টেস্টে। জয়পুরে আগের টেস্টে গাওস্কর প্রথম বলে আউট হয়েছেন, তার আগের টেস্ট কলকাতায় খেলেননি এবং দশ হাজার রান এই সিরিজে পূর্ণ হবে কি না তা রীতিমতো অনিশ্চিত। শেষটি মাস দেড়েক আগে লর্ডসের বাই সেন্টিনারি টেস্টে। এর প্রতিটিতেই গাওস্কর একইরকম সফল, এবং শুধু সেটাই বড় কথা নয়, কিভাবে 'বড় ম্যাচের' জন্য মনকে প্রস্তুত করতে হয়, কিভাবে ভীড়ের মধ্যে সারাক্ষণ থেকেও মনকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়, কিভাবে আস্তে আস্তে একটা সংকল্প মনে এবং ক্রমশ মুখে-চোখে-কথাবার্তায় বিস্তার লাভ করতে করতে পরের দিন মাঠে ছড়িয়ে পড়ে তা পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি (নিজে বলেন পাঁচ ফুট চার) দৈর্ঘ্যের এই ভদ্রলোকের সঙ্গে না কাটালে জানা হত না।

গাওস্করের ক্রিকেটকে জানতে হলে গাওস্করকে বুঝতে হবে, গাওস্করের মানসিকতাকে জানতে হবে। মনকে তৈরি করলে নাকি স্বপ্নকে ছাপিয়ে যাওয়া যায়। গাওস্কর স্বপ্নকে ছাপিয়ে গেছেন কারণ তিনি মনকে সেভাবে গড়েছেন। তাঁর মানসিকতার আর একটা বড় দিক—জীবনের কোনো পর্যায়েই ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস রাখেননি। বিশ্বাস রেখেছেন পরিশ্রমে। 'ডোণ্ট পুশ ইওর লাক টু ফার, ইটস নো ইউজ', এই এক কথা তাঁর অন্তত চার পাঁচটি স্যাক্ষাৎকারে পড়েছি এবং দেখেছি গাওস্কর সত্যিই এতে মনেপ্রাণে বিশ্বাসী। ইমরান খাঁ থেকে লেন হাটন সবাই আশ্চর্য, কেন গাওস্কর এখনই অবসর নিয়ে নিচ্ছেন।' যেখানে টপফর্মে আরও অন্তত দু'বছর অনায়াসে খেলতে পারতেন। গাওস্করের দিক দিয়ে ব্যাপারটা দেখলে অবশ্য মনে হবে এই হয়তো ভালো, যে লোকের প্রমাণ করার মতো আর কিছু অবশিষ্ট নেই, 'যে দেশে দু একটি শূন্য আওয়াজ তুলিয়ে দিতে পারে, বুড়োটা কেন খেলা ছাড়ছে না, সেখানে এত ঝুঁকি নিয়ে দশ হাজার একশ বাইশকে এগারো বা বারো হাজারে নেবার সত্যিই কোনও অর্থ হয় না।'
এখনই কেন, ভক্তদের মধ্যে এই আকুলতা থাকা স্বাভাবিক, তা থাকছেও। গাওস্কর মানে তো শুধু একটা ক্রিকেটার নয় গাওস্কর মানে একটা যুগ, একটা আদর্শ, একটা চেতনা। একটা যুগ শেষ হয়ে যাক, হারিয়ে যাক আমাদের মুগ্ধতার ফুরিয়ে যাক আমাদের নিজেকে উন্নততর মনে করার অনুভূতিটুকু তা কি আমরা কখনও চাইতে পারি? গাওস্করের সেঞ্চুরির আনন্দ তো গাওস্করের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি তার বড় ভাগ নিয়েছি তো আমরাও। আইডেণ্টিফাই করে নিতে পারি এমন বিজয়ী আর আমাদের সামনে নেই। আসবে কি না তাও ঘোরতর অনিশ্চিত।

তোলপাড়টা সেজন্যই। এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে আমাদের প্রাণের আকুতি, আঁকড়ে ধরার অন্তিম প্রচেষ্টা।

গৌতম ভট্টাচার্য

ONIDA

স্বর্গোদ্যানে···পুরনো বন্ধুদের সাক্ষাৎকার···
কেমন আছ টাকু ?
চি চি···
ওরে বাঘু !
ওরে সিঙ্গি !
বাঘ, সিংহ···আর তাদের বাচ্চা বাংহ···

কিট, হেলোয়াজ আর অর্জ···
হিজ !
হার্জ !
অর্জ···অর্জ···
অর্জ !

মা, আমরা কি বাঘু আর সিঙ্গির পিঠে চড়ব ?
বাবা বললেই চড়বে । ··· আঃ, কী শান্তি !

ছোট্ রে বাঘু !
অত জোরে ছোটাস না !

চল্, মাছ ধরতে যাই !
চলো ! চলো !

খাঁড়িতে খালি-হাতেই মাছ ধরা যায় !

সোলোমন আর নেফারটিটি যেন উত্তেজিত ! কিছু বলতে চায়···
ক্রমশ ● ৪

এমন তাজা, এমন মন-কাড়া...পাবেন কোথায়– প্রকৃতি ছাড়া?

এক ট্যাল্ক অনন্য
আপনারই রুচির জন্য

Orbit/MP-LM/169-87 BN

চি ত্র ক লা

যাদু জানে সেই ঘর

শিল্পকলা একমাত্র শিল্পকলাকেই...ঢালের মতো আড়াল দিয়ে আমরা দিনগত অস্তিত্বের গ্লানির বিপন্নতার হাত থেকে বাঁচতে পারি (ইট ইজ থ্রু আর্ট এ্যান্ড আর্ট...ওনলি দ্যাট উই কেন শিলড আওয়ার সেলভস ফ্রম দ্য সরডিড পেরিলস অফ অ্যাকচুয়াল একসিসটেনস)—অসকার ওয়াইলড।

একথা পড়েছি বলেই ওয়াইলডকে আমার কখনই কলা কৈবল্যবাদী মনে হয়নি।

ভারতীয় যাদুঘরে অগাস্ট ১৪-২৩ অন্যরকম প্রদর্শনী দেখলাম। আশুতোষ শতবার্ষিকী দর্শনীশালায় যেন একটা ছোট্ট যাদুঘর তৈরী হয়েছিল। উপলক্ষ চল্লিশ বছরের স্বাধীনতা উদ্‌যাপন। স্বাধীনতা পরবর্তী চল্লিশ বছরে সংগৃহিত শিল্পসুকৃতির নমুনা দেখানো হল। একটা যাদুঘর যে বেঁচে আছে, এ যেন তারই প্রমাণ। যাদুঘর (মিউজিয়াম) এবং সংগ্রহশালা (গ্যালারি)-র বোধহয় সামান্য তফাত আছে। প্রথমটি ইতিহাসকে নন্দনতত্ত্বের ওপরে গুরুত্ব দেয়। দ্বিতীয়টিতে নন্দনতত্ত্বই বিবেচ্য। বৃটিশ ম্যুজিয়ামের সঙ্গে লন্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারি বা টেটের এই পার্থক্য। কলকাতায় কিন্তু ভারতীয় যাদুঘর থাকলেও ভারতীয় চিত্রভাস্কর্যশালা নেই। ওয়াইলড যদি জীবিত থাকতেন এবং কলকাতায় আসতেন, তাহলে বলতেন, 'নন্দন' চিত্রভাস্কর্যের সংগ্রহশালার বিকল্প নয়, তাই জানাতে পারলাম না অভিনন্দন।

পাঁচমিশালি প্রদর্শনী। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেতে একটু ঝাঁকুনি লাগে। বৈচিত্র্য যত, নান্দনিক মান সর্বক্ষেত্রে সমান নয়। যাদুঘরে পুরাকীর্তির সঙ্গে নৃকীর্তির সংগ্রহের প্রবণতা থাকে। থাকা উচিতও। ললিতকলার সঙ্গে কারুকৃতি জমানো হয়ে থাকে। থাকা উচিতও। কিন্তু সব কিছু, বিরতি না দিয়ে দেখালে, দর্শকের পক্ষে উপভোগ করা শক্ত হয়। ছৌ বা গম্ভীরার আশ্চর্য মুখোশ, নেপালের বিষ্ণু-কমলা চিত্র (রথের মধ্যে অষ্টভুজ বিষ্ণু পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান এবং চারপাশের খোপে তাঁর কীর্তিমালা), বা ছাগমুণ্ডি মাতৃকামূর্তির অপরূপ রূপারোপের অবাক ভাস্কর্য, মথুরার গুরুস্তনী গুরুনিতম্বিনী ক্ষীণমধ্যা ত্রিভঙ্গ শালভঞ্জিকা, চীনদেশের জেডের কৌটো, জাপানের হাতির দাঁতে করা

মীরা বাঈ : ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

পিতাপুত্রের কারুমূর্তি, লোহিত ভারতীয়দের পাখি এবং পশুর নকশীকাটা পোড়ামাটির বাসনকোসনের টুকরো, কণিষ্ক থেকে মুসলমান আমলের মুদ্রা, পাহাড়ী কলমের "কৃষ্ণের দাবাগ্নি ভক্ষণ", চম্বা রুমালে "রাসলীলা", বর্মি বস্ত্রে রঙিন সীবনীশিল্প, মুঘলরীতির নূরজাহানের আশ্চর্য চিকণ পরতিকৃতি, বা ঢের আগেকার মিশরী ছোট্ট দেবীমূর্তি। খ্রীষ্টপূর্ব এবং খ্রীষ্টাব্দ ঘুরে ঘুরে তখন কারো যদি মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে, আমি ক্লান্ত প্রাণ এক। তাহলে কে তাঁকে দোষ দেবে?

তারপর ছিল অনতি অতীতের ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের বিধৌত জলচিত্র "রূপ গোঁসাই এবং মীরাবাঈ"। একটু সবুজ, নীল আর লালের ছোপে অনবদ্য। অবনীন্দ্রনাথের "বাতায়নবর্তিনী" রচনার বাঁধনের জন্য বেশ একটা মেজাজ তৈরী করে দেয়। গগনেন্দ্রনাথ যদি আরেকটু পেশাদারী শিল্পী হতেন এবং পুরো সময়টা দিতে পারতেন তাহলে কি হতে পারতেন, তা ভাবলে রোমাঞ্চ হয়। বস্তুত তিনি "সেরা অপেশাদার শিল্পী"ই থেকে গেলেন আপন কর্মদোষে। "স্বপ্নমায়ার বনের" মতো কল্পলোকের ছবির পাশে ছাপাই ছবিতে বাদামী সাহেব বিবির "বলডান্স" পর্যন্ত তাঁর পরিধি ছিল অনেকখানি। মনটাও ছিল আধুনিক। যামিনী রায় বা নন্দলাল বসুর প্রদর্শিত কাজ দুটি উল্লেখযোগ্য নয়। মুঘল পাহাড়ী ছোট-ছবির সুন্দর উদাহরণ ছিল।

পুরাতত্ত্ব বিভাগের মূর্তির আরও নানা নমুনা ছিল। চিত্রবিভাগের ছবি নানা শতাব্দীর। কিন্তু সে আলোচনার জন্য প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের জায়গা। একশ পদের ভোজ্য এবং পঞ্চাশরকম দ্রাক্ষাসবের আসরে পানভোজনের অসুবিধা একটু হয়। নিমন্ত্রিত হলে কিছু কিছু অসুবিধার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়।

ম্যাজিক লণ্ঠনের অভ্যন্তর

এক একটা প্রদর্শনী সম্বন্ধে কিঞ্চিত দ্বিধা থেকে যায়। প্রসঙ্গ : ভাল ছবি, মন্দ ছবি নয়। দ্বন্দ্ব অন্যত্র। একই ছবির জায়গায় জায়গায় বেশ, আবার এখানে ওখানে এলোমেলো। কখনও রচনা বা রঙের খেলাটা জমেছে, কিন্তু বিষয়টি ব্যবহৃত। তবু মলয় রায়ের প্রদর্শনী থেকে খুব একটা অতৃপ্তি নিয়ে ফিরতে হয় না। কারণ আঁকার অভিজ্ঞতার অনটনের মধ্যেও আন্তরিকতা আছে। আকাদমি অফ ফাইন আর্টস ২৫-২৮ জুলাই। "আত্মপ্রতিকৃতি" ছবিটি ছোট, কিন্তু রচনা জমাট। তিনি নিজের মুখটা দমবন্ধ যন্ত্রণায় বিকৃত করে এঁকেছেন। গলার দিকে এগিয়ে আসছে দুটি হাত। নিজের কিংবা অন্যের, ঠিক ধরা যাচ্ছে না। উসকো খুসকো চুল। রাঙা ভাঙা মেঘ। তেল রঙ লাগানো মন্দ নয়, কিন্তু একটু রক্ষণশীল। মনে হয় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক রঙ বেছে নিয়ে চাপালে এবং বাদামী, মেটে রঙ এবং কালো বাদ দিয়ে বর্ণের দ্বন্দ্ব এবং সমন্বয় করলে মন্দ হবে না। রঙের বাছাইতে একটু গোঁড়ামি রয়েছে। "মুখোমুখি" নামের অনুভূমিক ছবিতে বাঁ পাশে এক... এবং

মুখোমুখি : মলয় রায়

ডানপাশে ওপরে রয়েছে একটা পেঁচা। হিংসার সামনে নিরীহের অপ্রস্তুত অবস্থানের চমৎকার চিত্রকল্প। বাঁধনটা আঁটসাঁট। অথচ খোলামেলা। হাওয়া বাতাসের জায়গা রয়েছে।

মাঠের মধ্যে পাতা ঝোপের ফাঁক থেকে একটা উদোম নেংটো বাচ্চার দূরের আকাশে ছোট্ট একটা ঘুড়ি দেখার নিষ্পাপ বিস্ময়ের ভাবটা দর্শকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন মলয়। গাছের পাতাগুলো একটু ক্যাটক্যাটে সবুজ বেশি।

একটা ছবি আঁকার মুনশিয়ানা স্বীকার করতেই হয়। দিগম্বরী নারী উত্তেজনায় অবসন্ন বসে আছে। আর তার জঘনের জঙ্গলে, একটি উলটানো কাক তার তীক্ষ্ণ চঞ্চুর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। ছবির নাম "তেষ্টা"।

এক্ষেত্রে আদিরস একটু বেশি বলে মনে হল।

আরেকটি ছবিতে দুজন সার্জন ওপন-হার্ট সার্জারি করে হৃৎপিণ্ডের জায়গায় একটা চারাগাছে একটা ফোটা ফুল পাচ্ছেন। এখানে ছবির শর্ত মেনেছেন বলে, রঙের ত্রুটি সত্ত্বেও নিহিত যুক্তি তৈরি হয়েছে।

একটি সবুজ আধশোয়া মেয়ের নাভি থেকে ফুল গজানোটা কিন্তু যাচ্ছে না। বা বেয়াড়া গরুর পিঠে নাজেহাল মালা পরা নেতা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য করা যায়নি। দেখলে মনে হয় প্রদর্শনীর জন্য তাড়াহুড়ো করে কয়েকটা ছবি নামানো হয়। প্রতিশ্রুতি আছে বলেই এত কথা বলা।

সন্দীপ সরকার

রেখাচিত্রে স্বাধীনতা সংগ্রাম

চল্লিশতম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে জলসাঘরের উদ্যোগে পঞ্চাশটি রেখাচিত্রের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের আঁকা এই সাদা-কালো ড্রয়িংগুলিতে বিবৃত হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাবলী। বিশেষত বিদেশী শাসকের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক, শ্রমিক ও উপজাতি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ ও সংগ্রামের নানা দৃশ্য ছিল অধিকাংশ ছবিতে।

উদ্বোধনের দিন দেবব্রতবাবু নিজের পরিচয় দিলেন জনগণের শিল্পী বলে। 'জনগণের শিল্পী' কথাটির মধ্যে একটি মতাদর্শের গন্ধ আছে। অত্যাচার, শোষণ, দারিদ্র্য, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষে জর্জরিত সাধারণ মানুষের দুঃখ, যন্ত্রণা, নৈরাশ্য ও অন্ধকারের ছবি এঁকেছেন গোইয়া, দমিয়ের, কোথে কোলভিৎস, ভান গখ, পিকাসো এবং আরও অনেকে। আমাদের দেশে গগনেন্দ্রনাথ, জয়নাল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোড়—যাঁদের নাম চট করে মনে আসে। শিল্পগুণ ও বক্তব্যের মণিকাঞ্চন মিলনের ফলে তাঁদের শিল্পকৃতির মানবিক আবেদন আমাদের মনে প্রশ্ন তোলে না—তাঁদের কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল কিনা। এই প্রশ্ন জাগে যখন ছবিতে সচিত্রণের ঝোঁক থাকে প্রবল, শিল্পগুণ ছাপিয়ে বক্তব্য বড় হয়ে ওঠে, প্রত্যক্ষ বাস্তবতার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারকে কোন মতাদর্শে আলোকিত করার প্রয়াস থাকে এবং ছবির বিষয়বস্তুর নির্বাচনও সেই আদর্শে প্রভাবিত হয়।

দেবব্রতবাবুর তুলি পোষমানা পাখির মত ওড়ে। যেমন ওস্তাদের গলায় সুর। তুলির চকিত আঁচড়ে আঁকা সে রেখায় তিনি রূপবন্ধ সৃষ্টি করেন তাতে থাকে গতি, ব্যঞ্জনা, বলিষ্ঠতা আবার লোকায়ত শিল্পের সজীব, সরল সংবেদন। ছবির জমি সাদা-কালোয় ভাগ হয়ে যায় অনায়াস নৈপুণ্যে, বিষয়ানুগ জমাট কম্পোজিশনে, যা চিত্রকল্পকে দেয় বাঙ্ময় অভিব্যক্তি। কখনো কালোর পিঠে সাদা, কখনো সাদার পিঠে কালো বিদ্রোহ ও সংগ্রামের ভাষায় সোচ্চার হয়ে ওঠে। নিরেট কালো জমি হয়ে ওঠে পরাধীনতার গ্লানির অন্ধকার বা বিদেশী শাসনের নির্মমতার প্রতীক। ফলে উৎকৃষ্ট কিছু ছবিতে সচিত্রণের অতিরিক্ত শিল্পগুণান্বিত অভিব্যক্তিধর্মী ব্যঞ্জনার অভাব থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত রূপকগুলি অতিব্যবহারে জীর্ণ। যেমন, দুর্ভিক্ষের শকুন, বিপ্লবের অগ্নিশিখা, বিক্ষোভের কালো মেঘ, প্রতিরোধের লৌহকঠিন পেশী। কিন্তু রেখার সাবলীলতায়, স্পন্দিত অনুভবে আবেগে, চিত্রায়ণের গুণে চারণ কবিতার ভাষার মত সেগুলি সাধারণের সুবোধ্য হয়, নিছক ক্লিশে হয়ে ওঠে না।

তেজ, অপার উদ্দীপনা ও অমেয় শক্তিতে। এই আদর্শায়ন মতাদর্শগন্ধী জনগণের শিল্পকলার সামান্য লক্ষণ। কিন্তু ছবির বিষয় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেই এই আদর্শায়ন মতাদর্শ-দুষ্ট হয়নি। দুর্বারতম বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধের সৈনিক সেই সব সাধারণ মানুষের কথা স্মরণ করে আমরা যে জাতীয় গর্বে ও গৌরবে উদ্দীপ্ত হই তাতেই উদ্ভাসিত হয়েছে শিল্পীর সংবেদনা।

কিন্তু শিল্পী রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারেননি। তার পরিচয় ছিল ছবিগুলির বিষয় নির্বাচনে। তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনীতে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা নামমাত্র স্থান পায়নি। কাস্তে-হাতুড়ি লাঞ্ছিত পতাকা আছে তেভাগা আন্দোলনের দৃশ্যে। কিন্তু বিয়াল্লিশের আন্দোলনের কোনও উল্লেখ নেই।

খুব দায়সারা গোছের উল্লেখ আছে গান্ধীজীর। তাঁর একক ছবিটি নন্দলালের বিখ্যাত গান্ধী-প্রতিকৃতির অতি দুর্বল কপি। বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ ও সুভাষ একটি একটি ছবিতে ঠাঁই পেয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নেই কোথাও যদিও বঙ্গভঙ্গ ও জালিয়ানওয়ালাবাগের দৃশ্যাবলী চিত্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে ভারতের

সাঁওতাল বিদ্রোহ

কোম্পানি শাসনের অত্যাচারে ক্লিষ্ট নরনারী বা প্রবল ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামী কৃষক-শ্রমিকদের চেহারা শিল্পী ভরে দিয়েছেন অমিত

স্বাধীনতা আন্দোলনের ছবি কল্পনা করেছিলেন একমাত্র রিচার্ড অ্যাটেনবরা তাঁর 'গান্ধী' চলচ্চিত্রে।

মনসিজ মজুমদার

স ং গী ত

রবিতীর্থের দু-সন্ধ্যা

রবীন্দ্রসদন মঞ্চের সামনের দিক জুড়ে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছেন সম্মেলক গানের শিল্পিদল, দৃশ্য হিসেবে নতুন নয়। কিন্তু লাল পাড়

সাদা শাড়ির উপরের যে-মুখগুলি সেদিন ছিল দৃশ্যমান, তার দিকে তাকিয়ে একটু বিস্ময় জাগে বই কী। একক আসরে বহুবার দেখা, কিন্তু সম্মেলক-গানের দলে এমন নক্ষত্রপ্রতিম সমন্বয় যেন এই প্রথম। হারমোনিয়ামে সুমিত্রা রায়, কণ্ঠ মেলাচ্ছেন পূর্বা দাম, সুমিত্রা বসু, রুনা মতিলাল। পিছনে মন্দিরা হাতে যিনি, তাঁকেও যেন চিনি। তুষার ভঞ্জ না? হ্যাঁ, তুষার ভঞ্জই তো। ততক্ষণে সমস্বরে শোনা যাচ্ছে গান, 'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী।' এ-গান শেষ হল। পরেরটিতে গমগম করে উঠল প্রেক্ষাগৃহ— 'গানের ঝরনাতলায়'। ঝকঝকে, মহলামণ্ডিত নিবেদন।

'রবিতীর্থ'র ৪১তম বর্ষপূর্তি-অনুষ্ঠানের শুরুতে গানের ঝরনাতলায় এভাবেই জড়ো হয়েছিলেন এই শিক্ষায়তনের কৃতবিদ্য ছাত্র-ছাত্রীরা 'রবিতীর্থ-প্রাক্তনী' নামে। এঁদের উপস্থিতিতেই যেন এই শিক্ষায়তনের সাফল্যের উজ্জ্বল প্রতিফলন। দু-দিন জোড়া অনুষ্ঠানের এটাই ছিল প্রথম দিন।

এই সন্ধ্যার মূল অনুষ্ঠান ছিল তিন পর্বে। স্বাগতভাষণে সে-কথা জানালেন সুচিত্রা মিত্র, এই সংস্থার প্রধান কর্ণধার। প্রথম পর্বে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন। সুরচিত মানপত্রটি পাঠ করে শোনালেন সুবীর মিত্র। তার একাংশে লেখা—'হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শুধু একজন গায়ক নন, তিনি একাই একটি প্রতিষ্ঠান। এই নাম আর প্রিয় গান যেন অবিচ্ছেদ্য। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একজন অসাধারণ মানুষ।"

মানপত্রটি হাতে তুলে দিলেন সুচিত্রা মিত্র। রবিতীর্থের ছাত্রছাত্রীরা হাতে তুলে দিল শ্রদ্ধাসম্পৃক্ত উপঢৌকন। সংবর্ধনার প্রতিভাষণে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় জানালেন, অনেক সংবর্ধনা পেয়েছি, তবু আজকের আনন্দ ঢের বেশি। কেননা, এ-সংবর্ধনা দিচ্ছেন এক বহুদিনের বন্ধু। রবিতীর্থ মানেই সুচিত্রা। প্রধান অতিথিরূপে এসেছিলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র। তিনি বললেন, আজকের দিনটি আনন্দের, কৃতজ্ঞতার, চরিতার্থতার দিন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র ও দেবব্রত বিশ্বাস এই তিন শিল্পী রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারটিকে উন্মুক্ত করেছেন আপামর জনগণের কাছে। গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁদের কাছে তাই

রমা মণ্ডল

অশেষ কৃতজ্ঞতা। এই আনন্দসন্ধ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাই কৃতার্থ। বিমান ঘোষের ধন্যবাদজ্ঞাপনের পর শুরু হল দ্বিতীয় পর্ব। সমাবর্তন। শুরুতে ও শেষে ছিল দুটি সম্মেলক। সুচয়িত 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ' ও 'মোরা সত্যের পরে মন'। ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতিত্বের স্মারক পুরস্কারাদি হাতে তুলে দিলেন বিমান ঘোষ। বললেন, যে শিক্ষা শেষ হল, তা প্রস্তুতি। শিক্ষার শুরু। কেননা, শিক্ষার শেষ নেই।

প্রথম দিনের তৃতীয় ও শেষ পর্বে নিবেদিত হল নৃত্য ও গীত সহযোগে 'ঋতুরঙ্গ'। সুচিত্রা মিত্র ও সুবীর মিত্রের যুগ্মকণ্ঠের আবৃত্তি, 'ডেকেছ আজি' বিশেষ করে, চমৎকার। বাকীটুকু ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের নাচ-গানের উৎসাহ-যোগানো নিবেদন। যা দেখে মুখ্যত তৃপ্ত হন অভিভাবকেরা, মুগ্ধ হন শুনে।

পরের দিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান-সূচনা করলেন স্বয়ং সুচিত্রা মিত্র। দীর্ঘদিন পরে দীর্ঘস্থায়ী একক আসরে পাওয়া গেল তাঁকে। সব উৎকণ্ঠা-প্রতীক্ষার

পলি গুহ ও শুভাশিস ভট্টাচার্য

অবসান ঘটিয়ে সুচিত্রা মিত্র যে-মুহূর্তে ধরলেন তাঁর প্রথম গান—'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা/ বিপদে আমি না যেন করি ভয়'— সারা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে নেমে এল সূচীপতন স্তব্ধতা। স্কেল একটু নীচু, কিন্তু সেই পুরনো দৃপ্ত ভঙ্গি। সেই প্রেরণা-যোগানো উচ্চারণ। ঈশ্বরের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ কথোপকথনের আদলে এল পরের গানগুলি—'আঘাত করে নিলে জিনে', 'এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার', 'আজি বিজন ঘরে,' 'তোমার কাছে শান্তি চাব না', 'প্রাণে গান নাই', 'দুঃখ যদি না পাবে' ও 'নয় নয় এ মধুর খেলা'। মূলত গীতাখ্য গ্রন্থমালা থেকে নির্বাচন, মূল সুরটিও অব্যক্ত থাকেনি। নির্বাচনে বরাবরই সমীহ আদায় করে নেন এই শিল্পী।

নৃত্যনাট্য থেকে একটি গানকে জায়গা বদল করে এনে অন্যত্র বসিয়ে কৌতূহলকর উপস্থাপনার পরিকল্পনা যে করেছিলেন পরিচালিকা সুচিত্রা মিত্র, এ-তথ্যটি প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। গানটি হল, 'সব কিছু কেন নিল না, নিল না, নিল না, ভালোবাসা'—শেষদিকের এই গানটির মধ্যেই ছিল এই নৃত্যনাট্যের মর্মার্থ নিহিত। এটিকে একেবারে শুরুতে ব্যবহার করে অন্য মাত্রা যোজনা করতে চেয়েছিলেন পরিচালিকা। সন্দেহ নেই, পেরেছেনও। 'শ্যামা'র এই নিবেদনে অসামান্য গান গেয়েছেন রমা মণ্ডল। শ্যামার আবেগ-অভিব্যক্তি ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে শুধু কণ্ঠস্বরেই জীবন্ত করে তুলেছিলেন তিনি। 'কোটাল'-এর গানে তুষার ভঞ্জও

সংবর্ধনা নিচ্ছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

এ-দিনও নিলেন। সব কটি গানকেই করে তুললেন নিজের গান। গূঢ়, গভীর, বিশ্বাসযোগ্য উচ্চারণ দিয়ে ভরিয়ে তুললেন আসর।

পনের মিনিট বিরতির পর নিবেদিত হল 'শ্যামা'। সামগ্রিক পরিচালনা দায়িত্বে ছিলেন সুচিত্রা মিত্র, নৃত্য পরিকল্পক রামগোপাল ভট্টাচার্য। মূল যথোচিত। তুলনায় বজ্র সেন ও উত্তীয়ের গান দুর্বল। মূল দুই চরিত্রে পলি গুহ ও শুভাশিস ভট্টাচার্য, এককথায় অনবদ্য। যদিও বয়সে বেমানান লেগেছে। কোটাল-এর ভূমিকায় অসিত ভট্টাচার্য বেশ স্বকীয়তাপূর্ণ।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

বর্ষণগীতে- ছন্দে-আনন্দে

এক অনাড়ম্বর সান্ধ্য-অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষক শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাসকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন 'কৃষ্ণকলি'। শিশির মঞ্চে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে কিছু বলতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস ফিরে গিয়েছিলেন দূর অতীতে, শ্রোতাদের লাভ হয়েছিল স্বাদু স্মৃতিচারণ। অমিতাভ চৌধুরী, যাঁর সঙ্গে শ্রীবিশ্বাসের বহুদিনের পরিচয়, উপস্থিত ছিলেন সেদিন। ডাক্তারী পড়া ছেড়ে শান্তিনিকেতনে গান শিখতে এসেছিলেন 'রবিদা' মানে অরবিন্দ বিশ্বাস, আবার গানের সুরও ভাল করতে পারতেন তিনি। এইসব নানা কথাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল অমিতাভ চৌধুরীর সুভাষণে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অনিবার্যরূপে ছিল রবীন্দ্রসংগীত- রবীন্দ্র কবিতাপাঠ-আবৃত্তির আয়োজন। শ্যামল সাহা পরিবেশন করেছিলেন ঋতু পর্যায়ের কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত। গলার আওয়াজটি তাঁর শুনতে ভাল কিন্তু

অন্যান্য কিছু সাংগীতিক দুর্বলতা অপ্রকাশ্য থাকেনি। যেমন, অল্পস্বল্প ট্রেমেলো আছে, দু-এক জায়গায় সুর কম লাগল আর অলংকরণও নয় তেমন পরিচ্ছন্ন। সুতরাং তাঁর গাওয়া 'নীল নবঘনে', 'কিছু বলব বলে' কিংবা 'মেঘের কোলে কোলে' গানে বরষার সেই সজল শ্যামল ঘন রূপটি অধরাই রইল। পরিবেশ অবশ্য ঘন হল অতঃপর পূর্বা দামের গানে। প্রথমে 'আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার' গানেই তৈরি হল সেই প্রার্থিত আবহ। ওই পটভূমিকায় সহজে আসতে পারল 'বাদল মেঘে মাদল বাজে' আর 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' গানে সেই গহন প্রাণের আকুলতাকেও বড় নিপুণ হাতে বোনা হল। শেষে 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই

পূর্বা দাম

প্রদীপ ঘোষ

বলি'—সেও রম্য।
রবীন্দ্ররচনা-কবিতা পাঠে প্রদীপ ঘোষের সযত্ন চয়নে— আন্তরিক নিবেদনে বরষার সেই ছবিটিই গাঢ় হয়ে রইল। অন্তরে তার পরশ লাগল।
পরিশেষে অরবিন্দ বিশ্বাসের রবীন্দ্রসংগীতেও সেই শ্যামল সঘন নববরষার কিশোর দূতটির দেখা মিলেছিল। সংগীত শিল্পীদের যন্ত্রানুষঙ্গে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিলেন সুকেশ জানা ও সমর বন্দ্যোপাধ্যায়।
সেদিন অনুষ্ঠানের একেবারে গোড়ায় 'কৃষ্ণকলি' গোষ্ঠী পরিবেশন করেছিলেন দুটি গান। নেপথ্যে মাইক্রোফোনের সামনে এক পুরুষ সম্ভবত কণ্ঠ দিয়েছিলেন ফলত কণ্ঠের ভারসাম্য ছিল না সম্মেলক গানে।

স্বপন সোম

জ্যোতির বেহালায় সুরের মায়াজাল

আমরা সেদিন যারা কলামন্দিরে জ্যোতি শংকরের বেহালা শুনতে গিয়েছিলাম, তারা এক বাক্যে স্বীকার করেছি যে জ্যোতির বেহালা শুধু সুরেই বাজে না, সে সঙ্গীত রচয়িতাদের মুড বেশ ভাল ধরতে পারে। যেমন ধরুন শুবার্ট, হান্ডেল বা বেটোফেন। জ্যোতির বেহালা এঁদের জগতের প্রাণের পরশ আমাদের দিতে পেরেছিল সেদিন। জ্যোতির সঙ্গে সমান তাল রেখে বাজিয়েছে তার ভাই দেব শঙ্কর। আরও উল্লেখ করা দরকার স্যাম এনজিনিয়ারের : তার পিয়ানো সূক্ষ্ম। তবলিয়া যেমন গায়কদের সাহায্য করে তেমনি, এই দুই যুবক, বিশেষ করে জ্যোতি শঙ্করকে প্রেরণা দিয়েছিল : সনাটা, বা রোমান্স এমনকি [illegible] বাজনার সঙ্গী হিসেবে যে কোনো বেহালা বাদকের কনসারটে পিয়ানিস্টের এক বিশেষ

জ্যোতিশংকর

স্থান আছে। জ্যোতির সঙ্গে স্যাম এনজিনিয়ারের জুটি, বেশ জমিয়ে তুলেছিল সেদিনকার কনসারট্। স্যাম বরাবরই এই দুই ভাইয়ের সঙ্গে বাজান এবং সেদিনও নিজের সমস্ত প্রাণমন ঢেলে এই যুবক-যুগলকে তিনি সাহায্য করেছেন।
জ্যোতির এই কনসারটে বেহালায় ছোট কাজের এক ঐতিহাসিক রূপ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস ছিল। একদিকে যেমন ছিলেন বেঠোফেন, ভিভালদি ও হাণ্ডেল তেমনি, ভি মোনটি, সোপাঁ মসকোভিসকি ও ক্রাইস্‌লারের বাজনাও পেশ করেছিলেন জ্যোতি। বেশ লম্বা কনসারট এবং জ্যোতির আত্মবিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা যে কত বেড়েছে, তার এই কনসারটে সে বেশ বুঝিয়ে দিল আমাদের। কলকাতায় অনেকেই বেহালায় পাশ্চাত্যসঙ্গীত বাজান। আগেও বাজিয়েছেন। তাছাড়া অরকেস্ট্রা তো আছেই। জ্যোতি শঙ্কর বা দেব শঙ্করের বাজনা খুব একটা শোনা যায় না, যে দুবার শুনলাম, আমার মনে হয় জ্যোতির স্বরের মধ্যে এক ধরনের স্টাইল বা কলাকৃতি আছে। এবং যেটা একটু আলাদা মনে হল, সঙ্গীত-প্রেমের আবেগ আছে তাঁর বাজনায়। আমার মনে হয় ভাল গুরু পেলে জ্যোতি কিছুদিনের মধ্যেই বেশ পাকা বেহালাবাদক হতে পারবেন। আমরা যারা বাঙালী এবং বেঠোফেন-মোটজারট প্রেমিক তাদের এ যুবকের বাজনা নিয়ে চিন্তা করা উচিত। জ্যোতি ও দেবের পিতাও বেহালা বাজান। সুতরাং তালিমের অভাব নেই। যেটা দরকার ঠিক সময় পশ্চিমের জানলা খুলে দেওয়া সেই সময় এখন এসেছে।

কিশোর চট্টোপাধ্যায়

অধরা শ্রাবণ

যে কোন শিক্ষায়তনের বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করার একটা প্রথা আছে। আর তা যদি নৃত্য-গীত শিক্ষায়তন হয় তবে তো কথাই নেই। শিশু বিভাগ থেকে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদেরও অংশগ্রহণে সুযোগ করে দেওয়া যায়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সুরঙ্গমা চোদ্দই আগস্ট রবীন্দ্রসদনে তাঁদের ত্রিশ বৎসর পূর্তি উৎসব পালন করলেন। অনুষ্ঠান পরিকল্পনার জন্য তাঁরা প্রশংসনীয়—কিন্তু নিষ্ঠার অভাবে তা কার্যত ব্যর্থ। সেদিনের অনুষ্ঠান সভাপতি শৈলজারঞ্জন মজুমদার শুরু থেকে সুরঙ্গমার সঙ্গে তাঁর যে আত্মিক যোগ তার জন্য কৃতার্থ বোধ করেন এই বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর ভাষণ শুরু করলেও তাঁর মূল বক্তব্য ছিল রবীন্দ্রনাথের গানের ব্যাপক প্রসার ও পরিবর্তন প্রসঙ্গে। এবং আশা প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথের নাচ ও গানের প্রসারে সুরঙ্গমা রবীন্দ্রধারাকেই অক্ষুণ্ণ রাখবেন যা তাঁরা রেখে চলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রধারা বলতে যা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন তা সুরঙ্গমার প্রযোজনাতে ছিল না। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যে সংবর্ধনা দেওয়া হয় তার জন্য অবশ্যই তাঁরা অভিনন্দনযোগ্য।
যে প্রতিষ্ঠানের ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হল শ্রাবণগাথা থেকে মনে হয় তাদের শৈশবাবস্থা। প্রয়োগকল্পনার দৈন্যে সমগ্র প্রযোজনায় কোথায়ও নির্দিষ্ট মান রক্ষা হয়নি। তবু সহ্য করা যেত—যদি গানগুলি নির্জীব পদার্থে পরিণত না হয়ে প্রাণের সঞ্চার করত। বাইশটি গানের মধ্যে দুটি ছাড়া সবই সম্মেলক কণ্ঠে গীত হয়েছে। কিন্তু পরিবেশনে দুর্বলতা থেকে গেছে। আবার সব গানই যে সম্মেলক কণ্ঠের নয় সে কথাও চাপা থাকেনি। অভাব ছিল তালিমের—আর গানের লয়—সে তো যেমন খুশী তেমন চল গোছের। ব্যতিক্রম 'ওই কি এল আকাশ পারে' এবং 'ও শ্রাবণের পূর্ণিমা আমার।' মহিলা কণ্ঠের তুলনায় পুরুষ কণ্ঠ প্রায়শই ম্লান। আর একটি ব্যাপারে পরিচালকের (নাম ছিল না) দৃষ্টি

পূর্ণিমা ঘোষ

শিল্পিকাকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন শৈলজারঞ্জন

আকর্ষণ করি, অনুষ্ঠান চলাকালীন মঞ্চে যখন অন্য সম্মেলক কণ্ঠগুলি গান করছেন তখন প্রথম সারিতে উপবিষ্ট কতিপয় শিল্পীর কথা বলা বা উইংসের দিকে তাকিয়ে হেসে ইশারা করা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। এই ধরনের আচরণ অন্তত তাঁদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। উর্মিলা ঘোষ গীত 'ঝরে ঝর ঝর' যদিও সুরে তালে ঠিক ছিল, সঙ্গতের কারণে লয় বিধ্বস্ত হল। তাঁর নিবেদনেও বড় প্রাণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। নৃত্যাংশে একমাত্র পূর্ণিমা ঘোষ অনায়াস দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর পরিবেশিত মণিপুরী নৃত্যাংশে ও 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে'র সংগীত সহযোগে নৃত্যের মাধ্যমে। বাকি যাঁরা নৃত্যে অংশ নিয়েছিলেন কি পদসঞ্চালনে, কি অভিব্যক্তিতে এবং মুদ্রার পুনরাবৃত্তিতে তাঁদের প্রতিটি নাচই একঘেয়েমির সৃষ্টি করে। নাট্যাংশে রাজা, নটরাজ ও সভাকবি সকলেরই নাট্যানুভূতি অত্যন্ত কম।

এই ধরনের অনুষ্ঠান পরিবেশনের আগে তাঁদের আরও একটু সচেতন থাকা প্রয়োজন ছিল।

বারীন মজুমদার

ন ৃ ত্য

নৃত্যভারতী-র নৃত্যানুষ্ঠানে

সংস্থার নাম যখন 'নৃত্যভারতী', তখন তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যে থাকবে নৃত্যেরই আয়োজন সে তো জানাই কথা। বিড়লা অকাদেমী মঞ্চে নৃত্যভারতী-র নৃত্যানুষ্ঠানে পরিবেশিত হল সমবেত ও একক কথক। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন স্বনামধন্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। বহুদিনকার এই প্রতিষ্ঠানের নানা অবদানের কথা উল্লেখ করে শুভেচ্ছা জানালেন জ্ঞানপ্রকাশবাবু। আর কথকের সেই পুরনো ট্র্যাডিশন বজায় রাখার প্রয়াসের কথাই ছিল সংস্থা-কর্ণধার প্রহ্লাদ দাস মশায়ের বক্তব্যে। অতঃপর নৃত্যানুষ্ঠান। সমবেত কথকে অংশ নিল কয়েকজন কমবয়সী ছাত্রী—প্রতিষ্ঠানেরই।

এদের সহায়তা দিলেন নাজিম আলি খান তবলায়, রামলাল মিশ্র সারেঙ্গীতে এবং রতন ভট্টাচার্য হার্মোনিয়ামে।

দ্বিতীয়ার্ধে আর এক কমবয়সী ছাত্রী সুদেষ্ণা মৌলিক পরিবেশন করল একক কথক। প্রহ্লাদ দাস ও চিত্রেশ দাসের কাছে তার শিক্ষা। বয়স অল্প, সুতরাং অভিজ্ঞতাও কম। তবে তার সেদিনকার নৃত্য-পরিবেশনে যে প্রতিশ্রুতির চিহ্ন ছিল তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। প্রদর্শিত বিভিন্ন নৃত্যপদের মধ্যে বিশেষ করে ভাল লাগল ঠাট, কবিতাপরণ কিংবা ফরমায়েসী চক্রধা। আর এই সব নিবেদনে চিত্রেশ দাসের অনিবার্য প্রভাব লক্ষণীয় তবে তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তার দেহ-সঞ্চালন সাবলীল। তৎকার-এ বোঝা যায় পায়ের কাজও বেশ পরিচ্ছন্ন।

যথাবিহিত আকর্ষক ভূমিকা ছিল অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের, তবলায়। আর ছিলেন সারেঙ্গীতে রামনাথ মিশ্র, কণ্ঠে বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত, হার্মোনিয়ামে রতন ভট্টাচার্য। পরিশেষে সেদিনের অনুষ্ঠান অন্তত এই আশ্বাসটুকু দিয়েছিল যে চর্চা অব্যাহত রাখলে বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদেষ্ণা ক্রমশ পরিণতি লাভ করবে।

স্বপন সোম

না ট ক

হে পান্থ, হে প্রিয়

সব স্রষ্টার জীবনই নাটকীয় নয়, কারও কারও নাটকীয়। কিন্তু সংবর্ত স্রষ্টার জীবনের প্রতিটি পর্ব নিয়ে ম্যাক্সমুলার ভবনে প্রযোজনা করেন। তাঁরা অবশ্য এই প্রযোজনকে নাটক বলতে নারাজ, সংকলক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত একে 'নাট্যময় কোলাজ' নামে অভিহিত করেছেন। এই স্বীকারোক্তি অর্থবহ। এ পর্যন্ত সংবর্ত তিনজনের জীবন নিয়ে 'কোলাজ' রচনা করেছেন। বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়েই পূর্ণাবয়ব। এবারে ছিল জার্মান নাট্যকার গেরহার্ট হাউপ্টম্যানের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে। 'পান্থশালায় জন্ম নিলে পথিক।' এই ধরনের কাজ বোধ হয় বাংলায় হয়নি। আবার সংবর্ত প্রযোজনাও ক্রমশ ভিন্ন জীবন নিয়ে হলেও একই চেহারা নিচ্ছে।

শুধু নাট্যগোত্র নিয়ে দ্বিধা। হয়তো অভিনয় ক্ষমতা নিয়েও, তাই 'কোলাজ' নামের আড়ালে আত্মগোপন। কিন্তু এবার হাউপ্টম্যানের জীবন নিয়ে যে সংকলন সেখানে শক্তিশালী অভিনেতার অভাব ছিল না। ফলে, আর একটু সযত্ন হলে হয়তো নাটক হতে পারত। নাটকীয় বলতে যা বোঝায় তার উপাদান হয়তো ছিল না—কিন্তু স্রষ্টার জীবনের নাটকে বহির্জগত থেকে অন্তর্জগতের দ্বন্দ্বই যেখানে মূল উপাদান—সেটা যথেষ্টই ছিল। শিল্পীরাও অন্যবারের তুলনায় ক্ষমতাবান ছিলেন। মূল চরিত্রে অনিমেষ গঙ্গোপাধ্যায়ের কণ্ঠটি সুন্দর, একবার আলফ্রেডকে নিজের নাম 'গেরহার্ট' বলে সম্বোধন ছাড়া তিনি স্বচ্ছন্দ ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ভাল, কিন্তু ওঠাপড়া কম—হয়তো নির্দেশক সুনীল দাস তাই চেয়েছিলেন। যদিও নিস্তরঙ্গ জীবন হাউপ্টম্যানের ছিল না। সমগ্র প্রযোজনা, ধারাভাষ্য বা আবৃত্তির মেজাজ রেখে তৈরি, ফলে শুভাশিস মুখোপাধ্যায় প্রথম অংশে যখন নাটক করতে যান তখন সুঅভিনয় সত্ত্বেও কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটে, পরবর্তী অংশগুলিতে কিছু খাপ খেয়ে যায়। ঈশিতা মুখোপাধ্যায়ের দায়িত্বও সঠিক পথ নির্বাচন করে নেয়। গেরহার্ট হাউপ্টম্যানের বয়স রবীন্দ্রনাথের থেকে এক বছর বেশি, ফলে পোশাক এবং রূপসজ্জার দিকে আরও নজর দেওয়া উচিত ছিল। শেষের দিকে গেরহার্টের মেকআপে চিন্তাশক্তি আছে। শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় স্বল্প অবকাশেও স্থায়ী হয়ে থাকেন। শুভাশিস ভট্টাচার্যের নৃত্যপরিকল্পনা এবং স্বপ্নদৃশ্যে নিজের নাচটি বেশ ভাল। সুস্মিতা ভট্টাচার্য আমাদের কাছে নৃত্য শিল্পী হিসাবেই পরিচিতা; কিন্তু অভিনয়েও তিনি বেশ নজর কাড়েন। 'তাঁতিয়া' নাটকের অংশটি বেশ ভাল। শিল্পী কখনও একজায়গায় বাঁধা নন। স্রষ্টা মানুষের ব্যথার পাশাপাশি,—প্রেমে এবং বিপ্লবে। হাউপ্টম্যানের এই সত্য সংকলনে সপ্রকাশ। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সেই সত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন দুই নারী তত্ত্ব। মৈত্রেয়ী ও গার্গী। অবশ্য ততটা স্পষ্টরেখ নয়—সে কি প্রযোজনার সময়ের কথা ভেবে? দুই নারীর নাচের

অনিমেষ গঙ্গোপাধ্যায়

কম্পোজিশনটি ভাল, কিন্তু নাচটি আমাদের বৈদিক যুগে নিয়ে যেতে সাহায্য করে না। স্টুটবার্টা দাশগুপ্তের স্লাইড নির্বাচন বেশ ভাল। শুধু পরিবেশ নয়, ভাবনাগুলিও চিহ্নিত করে, যদিও প্রথম দিন স্লাইড প্রক্ষেপন কিছুটা এলোমেলো। সুনীল দাসের আবহ বিরামহীন। এ জাতীয় সংকলনে দর্শককেও কিছু ভাববার অবকাশ দিতে হয়। সর্বক্ষণ যদি আবহে মানচিত্র আঁকা হয়—তবে দর্শক নিজের মনকে ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করাতে পারেন না। যখন নাট্যকার পান্থশালার পথিক, তখন দর্শক আবহের জন্য নিজের ভাবনাকে ভ্রাম্যমান করতে পারে না।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

লালবিহারী দে

চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান।

CHANDRAMUKHEE.

A TALE OF BENGALI LIFE.

REPRINTED FROM THE "ARUNODOY" WITH SOME IMPROVEMENT AND ADDITIONS.

SERAMPORE:

লালবিহারী দে একজন অবিস্মরণীয় আপাতবিস্মৃত অধুনাবিস্মৃত প্রতিভা—বাঙালীর শৈশবের অগ্রদূত। রূপকথা-উপকথা আর বঙ্গপল্লীর নাবাল জীবনের পথিকৃৎ। স্বধর্মের সংস্কার তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি বটে তবে দেশপ্রেম নিবিড়ভাবেই জড়িয়ে রেখেছিল তাঁর অন্তরকে।

ফলে ফুলে পত্রপল্লবে শোভিত বৃক্ষের জীবনীশক্তির নেপথ্যে থাকে ঝরা পাতার গান। তার বাস্তুমৃত্তিকায় ঐশ্বর্যে আপাত পচনশীল পত্রাবলীর অবদান অনস্বীকার্য। বাংলার জলে-মাটিতে একাকার হওয়া এরকম কিছু উত্তমর্ণ প্রতিভা নিজেকে বিলীন করে পরবর্তীকালের যাবতীয় সম্ভাবনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছেন। সাহিত্যের মূল্যায়নের বেলায় ইতিহাসের কোষ্ঠী বিচারে এরকম তাৎপর্যপূর্ণ মানুষের কথা তাই বারেবারেই ফিরে ফিরে আসে। লালবিহারী দে এরকম একজন অবিস্মরণীয় আপাতবিস্মৃত অধুনাবিস্মৃত প্রতিভা, বাঙালীর শৈশবের অগ্রদূত, রূপকথা-উপকথা আর বঙ্গপল্লীর নাবাল জীবনের পথিকৃৎ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক অসামান্য মানুষ। বাংলার লোককথা ও লোকগীতি নিয়ে একালে অনেক হৈচৈ হচ্ছে অনেক গবেষণাচর্চা চলেছে কিন্তু আজ থেকে একশো বছরেরও আগে প্রথম এই বঙ্গকথাকে যিনি স্বদেশে ও বিদেশে পরিচিত করেছিলেন তিনি লালবিহারী দে। বাংলা সাহিত্যের বহুকাল উপেক্ষিত এই একাংশের বনেদ পাকা রেখে গিয়েছিলেন তিনি তাঁর ফোক টেলস অব বেঙ্গল এবং বেঙ্গল পেজেন্টস্ লাইফ গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে দেশজ মাটির সোঁদা গন্ধে জারানো সরল সংবেদনী ইংরেজিতে লেখা এই বইদুটি একদা ছাত্রপাঠ্য হয়েছিল।

বাংলা দেশকে জানা এবং ভাল ইংরেজী শেখার আদ্যকর্ম সম্পন্ন হত এই পঠন সুবাদে। কিন্তু তাঁর ইংরেজীতে গল্প লেখার আগে সেই ১৮৫৮-৫৯ সালে বাংলায় লেখা চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান প্রকাশিত হয়েছিল এ খবর জানতে একালের মানুষের অনেকদিন লেগে গেল। সে সময় কি কারণে সাধারণ বাঙালির কাছে চন্দ্রমুখী উপেক্ষিত হয়েছিল তার স্পষ্ট কোনও প্রমাণ নেই কেবল অনুমান করা যায় মাত্র। এই গ্রন্থের প্রায় সমকালে প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকের মাঝখানে নিরুত্তেজক এই বইটি একজন খ্রীষ্টানের রচনা হিসেবে হয়তো বাঙালির কাছে অনাস্বাদিতই থেকে গেছে। অথচ বিগত শতাব্দীর বাংলা দেশের এমন উপভোগ্য চিত্রমালা এমন কৌতুকোজ্জ্বল পর্যবেক্ষণী ও খণ্ড খণ্ড মানবচরিত্রের অকৃত্রিম পোর্ট্রেট —দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পল্লীচিত্রের প্রাক্‌খসড়ার রসটুকু বাঙালির মর্মে পৌঁছালো না এটা পরিতাপের বিষয়। চন্দ্রমুখী হারিয়ে গেল তবু একেবারে হারালো না প্রায় শতবর্ষ পরে, শ্রীরামপুরের 'তমোহর' যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত (১৮৫৯) এই গ্রন্থটিকে আবিষ্কার করা গেল ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগার থেকে। সম্প্রতি এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে দেবীপদ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায়।

রেভারেন্ড লালবিহারী দে-র জন্ম হয়েছিল বর্ধমানের সোনাপলাশী গ্রামে ১৮২৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর। পিতা রাধাকান্ত ছিলেন সৎচরিত্রের মানুষ, নিরামিষাশী, নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। কলকাতায় সামান্য কাজ করতেন। ন' বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করে ইংরেজী স্কুলে বিদ্যালাভের আশায় লালবিহারী বাবার হাত ধরে কলকাতায় এসেছিলেন। কিন্তু দরিদ্র পিতার সাধ্য ছিল না ইংরেজী স্কুলের অত বেতন দেবার। মাসিক ৩ টাকা থেকে ৫ টাকা তখনকার দিনে খুব সামান্য ব্যাপার ছিল না। ফলে খ্রীষ্টান স্কুলে পড়ানোর অনিচ্ছা এবং আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও রাধাকান্ত অনেক সুপারিশ ধরে ডাফ সাহেবের ইস্কুলেই ছেলেকে ভর্তি করে দিলেন। বিনে মাইনেতে পড়ার সুযোগ মিলল। কিন্তু লালবিহারীর বাসনা ছিল হিন্দু কলেজে পড়ার।

১৮৩৭ সালে বাবার মৃত্যুর পরে লালবিহারী তাঁর এক জ্ঞাতি ভাইয়ের বাড়িতে থেকে বহুকষ্টে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে থাকেন। পাঠ্যপুস্তক কিংবা অন্য সহায়ক বইপত্র কেনার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। বই ধার করে, চেয়েচিন্তে, নকল করে নিয়ে কোনক্রমে তাঁর বিদ্যাভ্যাস চালিয়ে গেছেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে হিন্দুধর্ম ছেড়ে যাঁরা খ্রীষ্টধর্ম নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর রেভারেন্ড লালবিহারী দে-র নাম উল্লেখযোগ্য। তিনজনই স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি আমৃত্যু অনুরাগী ছিলেন। স্বধর্মের সংস্কার তাঁদের বেঁধে রাখতে পারেনি বটে তবে দেশপ্রেম নিবিড়ভাবেই জড়িয়ে রেখেছিল তাঁদের অন্তরকে। লালবিহারী জন্মেছিলেন মধুসূদনের সঙ্গে (১৮২৪) এবং মারা গিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর খ্রীষ্টান হবার কারণ কেবল দারিদ্র্য মোচনের উপায় মনে করলে অবিচার করাই হবে। কারণ সুবর্ণ বণিক সমাজে এবং দরিদ্র পরিবারে জন্মালেও তার জন্যে তাঁর গর্বই ছিল। হিন্দু সমাজের হৃদয়হীনতা এবং অসম ও অসমীচীন আচরণ ও অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্যেই লালবিহারী হয়তো খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টান হলেও শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের ফারাকটি মেনে নিতে পারেননি ওই মিশনারীদের ক্ষেত্রেও। লালবিহারী ছিলেন নির্ভীক নির্লোভ ও জেদী পুরুষ, কখনো কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করেননি। ১৮৪৩ সালের ২ জুলাই তিনি ধর্মান্তরিত হন। ১৮৪৬ সালে ডাফ সাহেবের চার্চে ধর্ম-উপদেশকের কাজ করেন, পরে মতান্তর ঘটায় ১৮৫১ সালে অম্বিকা-কালনায় তাঁর কর্মক্ষেত্র স্থানান্তরিত করেন। ১৮৫৫ সালে কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে (বর্তমানে হেদুয়া) ফী চার্চে ধর্মযাজক নিযুক্ত হন। পরে ১৮৬৭ সাল থেকে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত সরকারী শিক্ষা বিভাগে কাজ করেন। এই পর্বেই কয়েক বছর তিনি বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে এবং হুগলী মহসীন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৪ তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বটি চরম দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়েই কেটেছে। রোগে শোকে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। পক্ষাঘাত এবং অন্ধত্বে নিদারুণ বিপর্যস্ত হয়ে দিন কাটিয়েছেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' সম্পাদনা লালবিহারীর অন্যতম কৃতিত্ব। ইতিপূর্বে কালনায় থাকাকালে 'অরুণোদয়' নামে একটি বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করে বাংলা ভাষাচর্চা ও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে জনমনকে আকর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন।

কবি ও কালপুরুষ

বনেদী কলকাতার শেষ বৈঠকখানায় এক আধুনিকতম বুধগোষ্ঠীর অন্যতম মধ্যমণি ছিলেন কবি ও সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রবীণ ও নবীন কালের, পাশ্চাত্য ভাবনার সঙ্গে প্রাচ্য ভাবনার সেতু-বন্ধন ঘটিয়েছিলেন তিনি। বাঙালীর সারস্বত সমাজে তিনি ছিলেন এক অভিজাত ও ধ্রুপদী ব্যক্তিত্ব। সুকণ্ঠ, সুদর্শন, খাঁটি

রাগপ্রধান বাঙালীর শেষ নিদর্শন বলতে রবীন্দ্রনাথের পরে সুধীন্দ্রনাথকেই বোঝায়। সুসংস্কৃত তৎসম ঐতিহ্যকে তিনি মূর্ত করে তুলেছিলেন তাঁর দৃঢ়পিনদ্ধ কবিতায়, তাতে যোগ করেছিলেন দার্শনিক সপ্রতিভতা আর অন্তরঙ্গ উচ্চারণ, ধীর এবং উদাত্ত একটি ভঙ্গিমা। সুধীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল কলকাতার হাতীবাগানে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ অক্টোবর তারিখে। বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বিতীয় সন্তান এবং জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীন্দ্রনাথ। তাঁর মা ইন্দুমতীর পিতা ছিলেন কেমব্রিজের প্রথম বাঙালী ছাত্র, ব্যারিস্টার মন্মথনাথ মল্লিক। এই মাতৃকুলের সূত্রে রাজা সুবোধ মল্লিকের সঙ্গে তিনি যেমন সম্পর্কিত ছিলেন তেমনি তাঁর পিতৃকুলও ছিল ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এক কায়স্থ পরিবার। উভয় পরিবারের কয়েকটি বিচিত্র প্রতিভূ চরিত্রের প্রগাঢ় ছায়াপাত ঘটেছিল তাঁর স্ববিরোধী স্বভাবের আবর্তের মধ্যে।
সুধীন্দ্রনাথের কর্মজীবনের মতই শিক্ষাজীবনও নানা স্তরপরম্পরায় নাটকীয়। ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত বারাণসীতে অ্যানি বেসান্তের থিয়োজফিক্যাল হাইস্কুলে শিক্ষালাভের পর কলকাতায় ফিরে এসে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হন। ১৯১৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে ভর্তি হন স্কটিশ চার্চ কলেজে। কিশোর বয়সেই ডুমা থেকে ডিফেন্স তক গদ্যপাঠে মনোযোগী হয়েছিলেন, সেই সঙ্গে সংস্কৃত কথ্যহিন্দী এবং ইংরেজী ভাষার চর্চা চলছিল। গৃহশিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পিতা স্বয়ং। 'আত্মজীবনীর খসড়া'-তে সুধীন্দ্র লিখেছিলেন, 'তাঁর কাছে শেকসপীয়র পাঠ আমার কাছে কৈশোরের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা...'

বি-এ পাসের পর ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে এম-এ ও আইন ক্লাসে ভর্তি হন। সেই সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের কাছে অ্যাটর্নিশিপে শিক্ষানবীশী শুরু করেন। এই সময় থেকেই ফরাসী ভাষা শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু এম-এ কিংবা আইন কোন পরীক্ষাই শেষ পর্যন্ত দেননি। ১৯২৪ সালে তাঁর বিবাহ হয়।
সুধীন্দ্রনাথের কবিতা লেখার সূত্রপাত হয়েছিল একুশ বছর বয়সে ১৯২২ সালে। মধুসূদনের সাহিত্যিক উত্তরাধিকার ভিন্নরূপে সুধীন্দ্রনাথে বর্তালেও তাঁর কাব্য রচনার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা এসেছিল রবীন্দ্রনাথ থেকেই। পিতৃ পরিচয়ের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছে যাতায়াত শুরু হয়ে গিয়েছিল ততদিনে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী' (১৯৩০) প্রকাশের আগেই ১৯২৯ সালে তাঁর প্রথম বিদেশ যাত্রা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। কর্মজীবন, আগেই বলা হয়েছে, ব্যস্ত বিচিত্র এবং নাটকীয়। বছরখানেক ফরোয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে অবৈতনিক কর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন ১৯২৮-২৯ সালে। তারপর এক ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩, যুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষা বিভাগে, স্টেটসম্যান পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৯, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের প্রচার সচিব ১৯৪৯-৫৪, ইনস্টিটিউট অব পাব্লিক ওপিনিয়ন-এর কলকাতা শাখার পরিচালক ১৯৫৪-৫৬ এবং ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৯-৬০ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক।
ইতিমধ্যে ১৯৪৩ সালে প্রমথা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটার পর লাহোরের সুগায়িকা রাজেশ্বরী বাসুদেব-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বাংলা ১৩৩৭ থেকে ১৩৬৩-র মধ্যে তাঁর সাতটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তন্বী (১৩৩৭), অর্কেস্ট্রা (১৩৪১), ক্রন্দসী (১৩৪৪), উত্তর ফাল্গুনী (১৩৪৭), সংবর্ত (১৩৬০), প্রতিধ্বনি (১৩৬১) ও দশমী (১৩৬৩)। নাভানা থেকে তাঁর কাব্যসংগ্রহ বেরিয়েছিল মৃত্যুর প্রায় দুবছর পরে ১৩৬৯ সালে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আলোচনা-নিবন্ধের সংগ্রহটিও তিনি দেখে যেতে পারেননি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই সুমুদ্রিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৯০ সালে। তবে তাঁর দুটি প্রবন্ধগ্রন্থ স্বগত (১৩৪৫) এবং কুলায় ও কালপুরুষ (১৩৬৪) তাঁর জীবদ্দশাতেই বেরিয়েছিল।

কবি সুধীন্দ্রনাথের আর একটি বড় পরিচয় জড়িয়ে আছে ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে। এই পত্রিকা প্রকাশের একটা মজার ইতিহাস আছে। কবিতার বিষয় কি হতে পারে এবং পারে না তা নিয়ে এক প্রকাশ্য সভায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার ফলে সুধীন্দ্রনাথ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মোরগের ওপরে একটি কবিতা লিখে ফেলেছিলেন ঝোঁকের মাথায়। 'কুক্কুট' নাম এই কবিতাটি আশ্বিন ১৩৩৫ 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হবার পর 'শনিবারের চিঠি' এটাকে তাঁদের প্রতি কটাক্ষ হিসেবে বিবেচনা করে কবিতাটির একটি প্যারডি প্রকাশ করেছিলেন। অনেকেই জানেন শনিবারের চিঠির প্রচ্ছদে সে সময়ে মোরগের ছবি প্রতীক হিসেবে ছাপানো হত। এ থেকেই উভয়পক্ষে ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হয়।
এই ঘটনাই সুধীন্দ্রনাথকে নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯৩১ সালে ধূর্জটিপ্রসাদ, সত্যেন বসু, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, শাহীদ সুরাবর্দি প্রমুখ বন্ধুদের উৎসাহে, সমর্থনে ও সহযোগিতায় এই অসামান্য পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করল। এই 'পরিচয়'-এ বেশ কিছু লেখক এবং অলেখক বিদ্বজ্জনকে, বহু চিন্তাশীল বিদগ্ধ পণ্ডিতকে এমন এক নিবিড় বন্ধুত্বের বন্ধনীর মধ্যে টেনে এনেছিলেন যে পরিচয়কে কেন্দ্র করে সাহিত্যপত্রের এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। সম্পাদক হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ যে কত নিরপেক্ষ নির্মম এবং নিপুণ নির্বাচক ছিলেন, গভীর ও আধুনিক ছিলেন তা পরিচয়ের প্রবন্ধাবলী ও পুস্তক সমালোচনা থেকেই অনুমান করা যাবে।
১৯৬০ সালের ২৫ জুন তারিখে এই কিংবদন্তী প্রতিম কবির অকাল এবং আকস্মিক প্রয়াণ ঘটে।

কয়েকটি নতুন বই

শতবর্ষের আলোকে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত/ (সং) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীলকান্তি সেন/ ক্যালকাটা পাবলিশার্স/ ২৫·০০
মরুচারী কবি যতীন্দ্রনাথের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত এই সংকলন-গ্রন্থে তাঁর সাহিত্যকৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন চব্বিশজন লেখক।
তৃতীয় নয়ন/ (সং) সিদ্ধার্থ ঘোষ/ গ্রন্থালয়/ ২০·০০
বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের সংকলন। ১৮৮২ সালে 'বিজ্ঞান-দর্পণ' মাসিক পত্রে প্রকাশিত প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প হেমলাল দত্তের 'রহস্য' থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাইশটি কাহিনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলায় সায়েন্স ফিকশন-চর্চার ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে একটা ধারণা দেবার সম্পাদকের এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। গ্রন্থ

মধুসূদনের সাহিত্যিক উত্তরাধিকার ভিন্ন রূপে সুধীন্দ্রনাথে বর্তালেও তাঁর কাব্যরচনার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা এসেছিল রবীন্দ্রনাথ থেকেই। সম্পাদক হিসেবে তিনি যে কত নির্মম ও নিপুণ নির্বাচক ছিলেন, গভীর ও আধুনিক ছিলেন তা পরিচয়ের প্রবন্ধাবলী ও পুস্তক সমালোচনা থেকেই অনুমান করা যায়।

ইংরেজিতে সুকুমার রায়

শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত

দ্য সিলেক্ট ননসেন্স অব সুকুমার রায়/ (অনু) সুকান্ত চৌধুরী/
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস/ ৪৫·০০

অনুবাদতত্ত্বের বিভ্রান্তিকর জটিলতার মধ্যে না গিয়েও, translation এবং transcreation-এর সূক্ষ্ম পার্থক্যের চুলচেরা হিসেব না করেও, দাবী করা যায় যে সাহিত্যকর্মের উৎকৃষ্ট ভাষান্তর মূলত দুটি শর্তপালনে সক্রিয়। এক, নিষ্ঠাবান অনুবাদক আপ্রাণ চেষ্টা করেন মূল রচনার প্রতি অনুগত থাকতে ; দুই, অনূদিত লেখাটিতেও তিনি মূলের অভিন্ন সৃজনের মাত্রা যোজন করতে সচেষ্ট হন। এক এবং দুই-এর সম্পর্ক অধিকাংশে ক্ষেত্রেই অমিত্রসুলভ এবং সমস্যার শুরু এই বৈরিতা থেকেই। তবু, এই বিপত্তি অতিক্রম করা অসম্ভব নয়। অনেক অনুবাদই এক দিকে আনুগত্য এবং অন্যদিকে target language বা লক্ষ্যভাষায় সৃজনের বিপ্রতীপ দাবি দুটির পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। লুই ম্যাকনীস্ যখন গ্যোয়েটের 'ফাউস্ত' অনুবাদ করতে গিয়ে লেখেন, "The impossibility of knowledge !/It is this that burns away my heart" বা বিষ্ণু দে শেক্সপীয়ারের চতুর্দশপদীর বিধুর স্পন্দন প্রকাশ করেন এই ভাষায়, "কীর্তন আঙিনাশূন্য মধুস্বরা পাখী গেছে বনে," তখন তাঁরা সার্থক অনুবাদক। কিন্তু ফাউস্ত-এর অনুবাদ এডওয়ার্ড লিয়ার-এর ননসেন্স ভার্সের বাংলা তর্জমা বা সুকুমার রায়ের আবোলতাবোলের ইংরেজি অনুবাদের চেয়ে কম দুরূহ, কারণ দ্বিতীয় পর্যায়ের সৃষ্টি অদ্বিতীয় এক পরিবহ গড়ে তুলেছে, একান্তভাবে ভাষানির্ভর পরিবহ, যার সত্তা ও বৈশিষ্ট্য অন্য একটি ভাষার আশ্রয়ে বিম্বিত হতে বাধ্য। তাই সুকান্ত চৌধুরী কৃত সুকুমার রায়-এর অনুবাদ পড়বার সময় প্রথমেই মনে রাখতে হবে 'আবোলতাবোল' এবং 'হযবরল'-র অতুলনীয় পরিবেশের কতটা তিনি ইংরেজিতে মূর্ত করতে পেরেছেন। সেই উদ্ভট, যুক্তিহীন খেয়ালখুশির, মজার পৃথিবীটি কি অন্যভাষায় ফুটে উঠেছে ?

এ প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যই মূলের অপ্রতিরোধ্য স্মৃতিকে যতটা সম্ভব দূরে রেখে আমি ভাষান্তরটি পাঠ করি এবং পঠনের সময়ই থেকে থেকে আপনমনে হেসে উঠি। হুকোমুখো হ্যাংলার ইংরেজি ঠিক lug headed loon হবে কিনা, এই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করেও অনুবাদের প্রতি আমার ঐকান্তিক প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করি। প্রতিক্রিয়া নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক এবং এখানেই অনুবাদকের সাফল্য। আমারই এক ক্ষুদে আত্মীয় যে কোনওদিন 'আবোলতাবোল' পড়েনি সেও এই 'মূল' ইংরেজি কবিতাগুলি পড়ে হেসে উঠেছিল, বিস্মিত বোধ করেছিল ? এবং তার প্রতিক্রিয়াও

প্রমাণ করে যে অদ্ভুত পরিবহ নির্মাণের কাজে সুকান্ত সফল।

এবারে (এক) পূর্বশর্ত অর্থাৎ মূলের প্রতি আনুগত্যের বিচার করা যাক। কুমরোপটাশের ইংরেজি Pumpkin Puff হওয়া উচিত নয় বা অন্যকিছু হলে আরো ভাল হত বলে যাঁরা সোচ্চার হবেন তাঁরা কি কোন বিকল্পের সন্ধান দিতে পারবেন ? পারবেন না, কারণ এগুলি আভিধানিক শব্দ নয়। সুকান্ত এদের নির্যাসটুকু ছেঁকে নিয়ে ইংরেজি শব্দ নির্মাণ করেছেন যেগুলি যথাযথ। আর শব্দ ছেড়ে বাক্য পরম্পরার বিষয়টি যদি তোলা হয় তাহলে এ দুটি অনুবাদ অংশেই প্রমাণ করবে যে, সুকুমার রায়-এর অনবদ্য diction or syntax বা flow of verse-এর প্রতি সুকান্ত বিন্দুমাত্র অবিচার করেননি। "And one assumed the noble mission/ of forging notes and went to prison./The youngest plays a set of drums/ In music halls for modest sums."/ "Hullo there ! Is it true you said/ The other day that white was red ?/ And also that last night at three/ You snored completely out of key ?"

এবং সবচেয়ে বড় কথা, মূলের পঙক্তিবিন্যাসের প্রতি যত্নবান থাকার ফলেই ভাষান্তরেও মূলের সেই ছন্দবৈচিত্র্য,ওঠানামা, গতিবেগ, স্পন্দন এমন কি দুলুনি অক্ষত রয়ে গেছে। অথচ অনুবাদক যখন জানান ' I have adhered closely as possible to the original metres and rhyme-schemes ' তিনি কোন বেমক্কা দাবি করেন না এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি লাইনের উদ্ধৃতি যথেষ্ট, "Now here's a lark, and here's a spree /that roll up if you'd like ts see/ cry 'Presto' and sing 'Fiddle-dee'/ To charm the bird from off the tree/ So pot." বলাবাহুল্য, এ কয়েকটি লাইন আমাদের অনিবার্যভাবে একটি মাত্র কবিতার দিকেই নিয়ে যায় যার উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর অনুবাদও সাহিত্য কিনা, অর্থাৎ (দুই) পূর্বশর্তটির সম্পর্কে যে-কোন মন্তব্য পুনরায় টেক্সট নির্ভর হবে। অন্তত সমালোচকের মতে এই তর্জমা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বনির্ভর সাহিত্য। হাঁসজারুর একেবারে উদ্ভট জগৎ থেকে হেডঅফিসের বড়বাবুর খ্যাপাটে বিশ্ব, 'পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই'-এর অনাবিল আনন্দ থেকে পাখি শিকারের মধুরঅম্ল নিষ্পত্তি, সবকিছুই প্রশংসনীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে দক্ষ ভাষায়। লক্ষণীয়, অনুবাদক portmanteau শব্দ তৈরির ক্ষেত্রেও বুদ্ধিদীপ্ত নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন। porcochard or whalephant ইংরেজি ভাষায় কোনদিন গৃহীত হবে না, তার প্রয়োজনও নেই, কিন্তু 'আবোলতাবোল'-এর অনুবাদের কাজে এগুলি অপরিহার্য। যে ভাষার কঠোর রক্ষণশীলতা এখনও পর্যন্ত হপকিন্স আর ডিলান টমাস-এর অনবদ্য compound word গুলিকে মূল প্রবাহ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, সে ভাষায় এ ধরনের শব্দনির্মাণের প্রয়াসই প্রশস্তির যোগ্য।

সত্যজিৎ রায়-এর মুখবন্ধের প্রাঞ্জল অনুবাদও এ গ্রন্থের একটি সম্পদ। শুধু একটি প্রশ্ন, 'হযবরল'র অনুবাদ তিনি একসময় অসম্ভব মনে করেছিলেন কেন, জানি না। তুলনায়, "আবোলতাবোল"-এর অনুবাদ তো আরও অনেক দুষ্কর। এবং সে কাজেই অনুবাদ সফল। এমনকি, বিচিত্র হাসির ভুবন থেকে সুকুমার রায় যখন এক নিমেষে "মেঘমুলুকে ঝাপসা রাতে"-র স্বপ্নময় জগতে প্রবেশ করেন, তাঁর কথার ফাঁকে ফাঁকে যখন আসন্ন বিদায়ের বেদনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তখনও অনুবাদক ভিন্ন সেই সুরের প্রতি অনুগত। "A keen primordial lunar chill/ The nightmare's nest with bunchy frill-/ My drowsy brain such glimpses steep, /And all my singing ends in sleep." যে লিরিকাল ভাবময় রেশকে সম্বল করে আমরা আবোলতাবোল পড়া শেষ করি, সেই একই রেশ অটুট এই ভাষান্তরে।

চলচ্চিত্রের দশজন

সোমেন গুহ

নিজের কথা/ (সং) ধীমান দাশগুপ্ত/ শ্যামলী প্রকাশনী/কল-২৯/১৬.০০

'ছবি বানানো বই লেখার চাইতে আলাদা। ফ্লবেয়ার বলেছিলেন, বেঁচে থাকাটা তাঁর পেশা নয়, তাঁর পেশা হল লেখা। ছবি বানানো মানে, কিন্তু, বেঁচে থাকাই ; অন্তত আমার পক্ষে।' সিনেমার কথা প্রসঙ্গে মাইকেল এঞ্জেলো আন্তনিওনি এই ভাবেই তাঁর লেখা শুরু করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের যে দশজন ছবি করিয়ের কথা সম্পাদক এখানে তুলে ধরেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বিংশ শতাব্দীর প্রায় শুরু থেকে আরম্ভ করে অনেক দশক ধরে ছবির জগতে বিচরণ করছেন। এর মধ্যে অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন, অনেকে অবসর নিয়েছেন, আবার অনেকে অবসর নেওয়ার কথা ভাবছেন। সেই দশজন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নাম হল যথাক্রমে চার্লি চ্যাপলিন, সের্গেই আইজেনস্টাইন, লুই বুনুয়েল, ইঙ্গমার বার্গম্যান, মাইকেল এঞ্জেলো আন্তনিওনি, ফেদেরিকা ফেলেনি, ফ্রঁসোয়া ত্রুফো, জঁ-লুক গদার, সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন। চার্লি চ্যাপলিন, সের্গেই আইজেনস্টাইন, লুই বুনুয়েল, আন্তনিওনি, ত্রুফো আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। বার্গম্যান, ফেলেনি অবসর নিয়েছেন। গদার সুপার এইট নিয়ে কাজ করেছেন কিছুদিন আগেও। সত্যজিৎ রায়ও প্রায় অবসর নেওয়ার মুখে। মৃণাল সেন যদিও প্রকাশ্যে ঘোষণা করেননি, তবুও অন্তরঙ্গ আলোচনায় তাঁর অবসর নেওয়ার কথা শোনা গেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সমস্যাসঙ্কুল জীবনকে সিনেমায় প্রতিফলিত করতে সর্বদাই ব্যস্ত থেকেছেন এই সমস্ত পরিচালকেরা। আইজেনস্টাইন ও চ্যাপলিনের কাজকর্ম আর একটু আগে থেকে। ছবি বানানোর মত বই লেখাতেও এঁরা অক্লান্ত। নিজের সাফল্যে এঁরা সবাই গর্বিত। তাই নির্ভীকভাবে বার্গম্যান বলতে পারেন, 'আমার সমকালীনদের অথবা পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের সমালোচনার কথা ভেবে কখনই বিচলিত হব না। আমার প্রথম ও শেষ নাম আমার সৃষ্টির গায়ে কোথাও খোদাই হয়ে থাকবে না, আমার মৃত্যুর সাথে সাথে নামও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আমার আত্মার একটি ছোট অংশে বেঁচে থাকবে অজ্ঞাত ও জয়যুক্ত সম্পূর্ণতায়। যা সৃষ্টি করলাম তা ড্রাগন অথবা শয়তান, কিংবা এক দিব্যজ্যোতি মহাপুরুষের কিনা, তাতে কি আসে যায়।' যুদ্ধবাজরা যদি আর একটা বিশ্বযুদ্ধের আয়োজন না করেন তাহলে আর্কাইভে রাখা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সিনেমা সম্পদ ও তাঁর স্রষ্টারা চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন।

এই পুস্তকের প্রায় প্রত্যেক পরিচালকই সমালোচকদের এক হাত নিয়েছেন। পাঠক ও সমালোচকেরা শুনে হয়ত আনন্দ পাবেন যে পরিচালক হবার আগে 'ত্রুফো' প্যারিসের বিখ্যাত সিনেমা পত্রিকা 'কাহিয়ে দ্য' ম্যাগাজিনে চার বছর সমালোচকের দায়িত্ব পালন করেন। গদারও এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ত্রুফোই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি অন্যের নিন্দায় মুখর নন। অন্যের কাজের প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। ত্রুফোর ব্যক্তিত্ব দ্বারা যদি আমরা প্রভাবিত হই তাহলে আমাদের মত ক্ষুদ্রমনা মানুষেরা অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া থেকে বিরত থাকব। আমাদের দেশের সিনেমা পরিচালকরা অন্য পরিচালকদের সঙ্গে বন্ধুর মত আচরণ করেন না, করেন শত্রুর মত।

ঋত্বিক ঘটক নিজেকে চলচ্চিত্র পরিচালক বলতেন না, বলতেন চলচ্চিত্র শ্রষ্টা। এই তালিকায় সম্পাদক কিভাবে ঋত্বিক ঘটককে বাদ দিলেন সেটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। বিশেষ করে তাঁর গুরুদেব বুনুয়েলের দুটি বিবৃতি যখন তিনি তুলে ধরেছেন। ঋত্বিকের জীবিতকালে তাঁকে অনেকে ভারতবর্ষের লুই বুনুয়েল বলতেন। যদিও মারি সীটন একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, ঋত্বিক বার্গম্যানের সমকক্ষ হয়ে উঠবেন। সমালোচক সিদ্ধার্থ সেন 'চিত্রকল্প' পত্রিকায় এক মূল্যবান প্রবন্ধে লেখেন যে, 'বুনুয়েলের চলচ্চিত্রের প্যাশনের মতই ঋত্বিকের চলচ্চিত্রের প্যাশনও মানুষকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল। ঋত্বিকের মেলোড্রামা তাঁকে বিশ্বচলচ্চিত্রের একজন হয়ে উঠতে বাধা দিল।' এই সংকলনে সত্যজিতের পাশাপাশি ঋত্বিক ঘটকই থাকতে পারতেন, মৃণাল সেন নন। যদিও সম্পাদক অন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের নিয়ে ভবিষ্যতে আর একটা বইয়ের পরিকল্পনার কথা আমাদের জানিয়েছেন। তবুও এই সংকলনে ঋত্বিক ঘটকের অন্তর্ভুক্তিটা জরুরী ছিল। তেমন জরুরী ছিল সত্যজিতের গুরুদেব জঁ রেনোয়ার অন্তর্ভুক্তি। সত্যজিতের সাক্ষাৎকারটি নেন জেমস ব্লু। মৃণাল সেনেরটি অজয় বসুর নেওয়া। দুটিই পুরনো সাক্ষাৎকার। এঁরা যেহেতু আমাদের চোখের সামনেই আরিফ্লেক্স ক্যামেরায় চোখ রেখে নির্দেশ দিচ্ছেন সেহেতু এঁদের আরও কথা পরবর্তী সংকলনে যুক্ত হলে পাঠকদের ভাল লাগবে। বসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রী সেন জানিয়েছিলেন, পুনা ইনস্টিটিউটের মত দুটো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ভারতে সম্ভব নয়। কিন্তু সম্প্রতি জানা গেছে যে, রবীন্দ্রভারতীতে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিল্ম ইনস্টিটিউট তৈরির তোড়জোড় চলছে। ভারতীয় সেন্সরশিপকে নীতিবাগীশ বলে অভিহিত করা হয় কিনা জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীসেন বলেন, 'ভারতীয় সেন্সর বোর্ডকে নীতিবাগীশ না বলে শুচিবায়ুগ্রস্ত হিন্দু বিধবার মনোভাবসম্পন্ন বলা উচিত। তবে বর্তমান পরিবর্তনের কিছু লক্ষণ প্রধানত বিদেশী ছবির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। আশা করি ভবিষ্যতে সেন্সর বোর্ডের মনোভাব আরও বাস্তব এবং rational হবে। বাস্তবে কিন্তু তা হয়নি। রাজনৈতিক সিনেমার প্রতি সেন্সর বোর্ডের মনোভাব আরও কঠোর হয়েছে। আজকের সমাজসচেতন চলচ্চিত্র পরিচালকদের একজোট হওয়ার একটা সময় এসেছে। ১৯৮৫-র শেষে ভারতবর্ষে মোট ৯১২টি ছবি নির্মিত হয়। তাতে দেখা গেছে হিংসা ও যৌন আবেদনমূলক ছবির প্রতিই ঝোঁক বেড়েছে। মাত্র ৭টি ভারতীয় কাহিনীচিত্র এবং ১১টি বিদেশী চলচ্চিত্রকে সেন্সর বোর্ড সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করেছেন। দক্ষিণ ভারতীয় ও বোম্বের প্রযোজক সংস্থারা সবসময়েই সেন্সর বোর্ডকে কলা দেখাতে ব্যস্ত

বাংলা লেখা বা বলার সময় অনেক ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করেন শ্রীসেন। মনে হয় শ্রীসেন এ ত্রুটি কাটিয়ে উঠবেন বিশেষকরে মাতৃভাষাকে তিনি যখন শ্রদ্ধা করেন। অবশ্য মৃণালবাবু নিজেও স্বীকার করেন যে আমরা এখনও ঔপনিবেশিকতার দায়ভাগ বহন করে চলেছি (কলোনিয়াল লিগাসি)। রঙিন ছবি তৈরি সম্পর্কে শ্রীসেনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,"রঙ সম্পর্কে আমার এলার্জি আছে। রঙকে আমি মেনে নিতে পারিনি..." শ্রীসেন ওড়িয়া ছবি 'মাটির মানুষ' তৈরি করার পর এই সাক্ষাৎকারটি দিয়েছিলেন। স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে শ্রীসেন যদি আজ আমাদের একটা সাদা-কালো ছবি উপহার দেন তাহলে নিজেকে আর বিচ্ছিন্ন বোধ করবেন না। সত্যজিৎবাবুরও রঙের প্রতি প্রথম প্রথম এত মোহ ছিল না, এখন যতটা হয়েছে।

মৃণাল সেনকে বাংলা দেশের সাধারণ দর্শক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি তাঁর একজন পরিচিত ভদ্রলোকের কথা বলেছিলেন, যিনি একটা ব্যবসায়িক সাফল্য পেয়েছে এমন একটা ছবি দেখে বলেছিলেন 'আর বলবেন না, ছটা টাকা জলে গেল। প্লাস ট্যাক্সি ভাড়া।' কাটোয়া শহরে মৃণাল সেনের 'একদিন প্রতিদিন' দেখে জনৈক মধ্যবিত্ত ভদ্রমহিলাকে বলতে শুনেছিলাম, 'টাকাটা জলে গেল'। সুতরাং মৃণালবাবু, সত্যজিৎবাবুরা আরও বেশি দর্শককে কি করে কাছে টানবেন সেটা বোধ হয় ভাবার সময় এসেছে। বিশেষ করে তরুণ চলচ্চিত্রকাররা ব্যাপকহারে অশিক্ষিতদের দেশে সিনেমাকে কিভাবে সার্বজনীন রাখবেন সে সম্পর্কে

যেন চিন্তাভাবনা করেন। বামফ্রন্টের 'সুস্থ সংস্কৃতি'র প্রচার ব্যাপারটা একেবারেই ধোঁয়াশার ব্যাপার। তাদের আংশিক অর্থ সাহায্যে তোলা 'কঁহা কঁহাসে গুজর গয়া' কি একটি যৌন আবেদনমূলক ছবি নয়? যে ছবি দেখে ১৬ বছরের ছেলেরা দলে দলে বিপথগামী হলে দায়ী করবেন কাদের? সেইজন্যই শিক্ষা রাজনীতি প্রমোদ (বিশেষ করে এখনও যখন প্রমোদকর দিচ্ছি আমরা) এই তিনটেই সিনেমার বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।
রায়মশাই উত্তমকুমারকে নিয়ে একটা ছবি করার সময় ব্লুকে এই সাক্ষাৎকারটি দিয়েছিলেন। সাম্প্রতিককালে, শ্যাম বেনেগালের ছবিতে সাক্ষাৎকার দেওয়া ছাড়া এত দীর্ঘ সংলাপ আর কখনও বলেননি বোধ হয়। মূলত পথের পাঁচালিকে কেন্দ্র করেই আলোচনাটি সীমাবদ্ধ ছিল। অপু-ত্রয়ীর সেই সত্যজিৎ কবেই আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছেন।
অনুবাদের ভাষা বেশ স্বচ্ছন্দ, একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে উপায় নেই। একমাত্র আইজেনস্টাইনের লেখাটি সোমেশ্বর ভৌমিকের আড়ষ্ট অনুবাদে কিছুটা ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিল। সাধারণ পাঠকের কথা মনে রেখে সিনেমার টেকনিক্যাল শব্দের একটু ব্যাখ্যা রাখলে ভাল হয়। সত্যজিৎ ব্লুকে বলেছিলেন, আমার ছবি ওঠে চার এক অনুপাতে। কি কলকাতা কি মফস্বল শহরে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই যখন সিনেমাকে এখনও পর্যন্ত 'বই' বলেন তখন লেখক অনুবাদকদের আরও একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অন্যান্য অনুবাদকদের মধ্যে আছেন ঈশ্বর চক্রবর্তী, সুস্মিতা ভট্টাচার্য, সত্যব্রত সান্যাল, পবিত্র বল্লভ, ধীমান দাশগুপ্ত, রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখেরা।
সিনেমা বিষয়ক লিটল ম্যাগাজিনে অধিকাংশ লেখাই আগে প্রকাশিত। তার থেকেই ধীমানবাবু এই বইটি সংকলনের দায়িত্ব নিয়েছেন। এবং বেশ কিছু লেখাই নতুন অনুবাদ। শুধু সিরিয়স সিনেমার প্রেমিকেরাই নন, 'ভালবাসা ভালবাসা' জাতীয় সিনেমার দর্শকেরাও এই বই পাঠে আগ্রহ দেখাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা এই বই উপহার হিসেবে পেলে আনন্দে আত্মহারা হবে। প্রণবেশ মাইতির প্রচ্ছদ রুচিশীল নয়, ছাপা প্রায় নির্ভুল। পরবর্তী সংকলন অফসেটে ছাপা হলে আরও ভাল লাগবে। পরিচালকদের নিজস্ব ছবি নেই, সিনেমার তালিকা নেই, তাঁদের ছবির অন্তত একটা করে স্থির চিত্র নেই, তাঁদের লেখা সিনেমা সংক্রান্ত অন্যান্য বই-এর কোন তালিকা নেই। এসব কি সম্পাদকের কাজ ফাঁকির নমুনা নয়?

বিদেশী সাহিত্য

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে/অরুণ মিত্র/
প্রমা প্রকাশনী/কলকাতা/১৪·০০

দা রোমান্টিক ট্র্যাডিশন/(সং) বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী/
যাদবপুর ইউনিভার্সিটি/কল-৩২/২২·০০

উপরোক্ত দু'টি বই সাহিত্যের আলোচনা, প্রথমটি বোদলের-উত্তর ফরাসী সাহিত্য সম্পর্কিত; অপরটি ইংরাজী সাহিত্যের রোমান্টিক আন্দোলন বিষয়ক। প্রথমটি দিয়ে শুরু করি। শ্রদ্ধেয় অরুণ মিত্র মহাশয় যুগপৎ কবি এবং ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের অল্পদিন পরেই তিনি প্যারিসে সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যান, সেখান থেকে ডিগ্রী নিয়ে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের কর্ণধার পদে কাজ করতেন এবং বাংলা ভাষায় কবিতা ও সাহিত্যচর্চা করতেন, বর্তমানে অবসর নিয়ে তিনি এই কলকাতাতেই সাহিত্যচর্চা করছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে তাঁর লেখা বোদলের-পরবর্তী ফরাসী সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলি একত্রিত করে বই হিসাবে প্রকাশ করবার জন্য প্রকাশক আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ভূমিকায় অরুণ মিত্র মহাশয় বিনয় করে বলেছেন: "এ গ্রন্থে যেসব বিবরণধর্মী রচনা আছে তারা আমার নিজস্ব সঙ্কলন ও মূল্যায়নের ফসল, এমন দাবী আমার নেই। তথ্য সবই সাহিত্য-ইতিহাসের অন্তর্গত, এবং ভাষ্যের নানা জায়গায় ফরাসী আলোচকদের অভিমত প্রতিধ্বনিত। তবে আমার বিচার অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য ও ভাষ্য থেকে নির্বাচনের এবং তা উপস্থাপন ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমি নিয়েছি।" কথাটা মেনে নিয়েও পড়বার সময়ে মিত্র মহাশয়ের গভীর অনুভূতি ও সাহিত্য-প্রেম আমাদের মুগ্ধ করে। তথ্য সর্বদাই এবং সকল ক্ষেত্রেই অপরিবর্তনীয়, কিন্তু সেই তথ্যের ব্যাখ্যা হল লেখকের ব্যক্তিগত মননের প্রতিফলন। অরুণ মিত্র মহাশয় প্রধানত কবি, ফলে কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর যে প্রেম, সেই প্রেম বা সমানুভূতির রং-এ রঞ্জিত হয়েছে শুষ্ক ও নির্বিকার তথ্যগুলি তাই তার থেকে তিনি যে সিদ্ধান্তে এসেছেন সেগুলি একান্তভাবে কবি অরুণ মিত্রের সিদ্ধান্ত। একদিক থেকে এগুলি যেমন বাঙালী পাঠককে ফরাসী সাহিত্যের বিভিন্ন দিকগুলি বুঝতে সাহায্য করবে, তেমনি সাহায্য করবে কবি অরুণ মিত্রের কবিতা ও মননকে বুঝতে—এই বিচারে সংগ্রহটির মূল্য অপরিসীম। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক, সংকলনটির প্রথম প্রবন্ধ: "কাব্যের মুক্তি: ফরাসী প্রয়াস" প্রবন্ধটিতে বোদলের এর গদ্য কবিতার কথা বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন, "...তাঁর আগে অবশ্য কয়েকজন রোমান্টিক এ চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু বোদলেরের poemems enprose এ তার প্রথম সংগঠিত রূপ..."। এ হল তথ্য কিন্তু তার পরেই আমরা পাই কবি অরুণ মিত্রের ভাবনা; দেখা যাক, কিভাবে তিনি এই তথ্যকে ব্যবহার করেছেন: "...কাব্য ও পদ্যের মধ্যে এই পৃথকীকরণ আধুনিক সাহিত্যের এক প্রধান ঘটনা। এ যেন লিরিক আচরণের ওপর এক সজাগ সমালোচক মনের খবরদারি, রোমান্টিক উর্ধ্ববিহারে বুদ্ধির হস্তক্ষেপ, পৃথিবীর মাটিতে তাকে ছুঁইয়ে রাখার চেষ্টা।" তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অনুজ সমকর্মীর এই উক্তিটি তথ্যের চেয়েও বেশী মূল্যবান, কারণ তা কাব্য রচনার গূঢ় উপায়টির প্রতি ইঙ্গিত করে। অন্যান্য সমস্ত রচনাতেই তথ্যকে সাজানো ও তাকে ব্যবহার করার মধ্যে কবি অরুণ মিত্র সদা-উপস্থিত। তাই বলা যায় যে এই প্রবন্ধ-সংগ্রহটি শুধু মাত্র উত্তর-বোদলেরীয় ফরাসী সাহিত্যকে জানতে ও বুঝতে সাহায্য করবে তাই নয়, কবি অরুণ মিত্র ও তাঁর কবিতাকে বুঝতেও সাহায্য করবে।

সমালোচকের অন্যান্য কর্তব্যের মধ্যে একটি হল সংশোধন যোগ্য ত্রুটিকে তুলে ধরা। তাই, মনে করিয়ে দিচ্ছি যে প্রবন্ধগুলি সাজানোর ক্ষেত্রে, হয় রচনাকাল না হয় বস্তুর পারম্পর্য ধরে এগুলিকে সন্নিবেশিত করলে পাঠকের সুবিধা হত। এ ছাড়া, আর একটি কথা শ্রদ্ধেয় অরুণ মিত্র মহাশয়কে নত মস্তকে নিবেদন করছি: ফরাসী J যেমন Jeen -এর উচ্চারণ বাংলায় যেভাবেই লেখা হোক না কেন, যে বাঙালী অনেকদিন ধরে ফরাসী ভাষার চর্চা করেনি সে তা উচ্চারণ করতে পারবে না কাজেই প্রচলিতভাবে Jean কে 'জঁ' বা genet কে 'জেনে' লিখলে বোধ হয় মহাভারত অশুদ্ধ হবে না—কারণ, পাঠক তাতেই অভ্যস্থ—অন্য কিছু লিখলে পাঠক গোলে পড়তে পারে।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত "The Romantic Tradition"-এর বেশির ভাগ প্রবন্ধই ১৯৮২ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী উৎসবে আয়োজিত ইংরাজী বিভাগের 'সেমিনারে' পঠিত প্রবন্ধ—যার মূল বস্তু ছিল ইংরাজী সাহিত্যের রোমান্টিক আন্দোলন। প্রতিটি প্রবন্ধই সুচিন্তিত ও সুলিখিত, এগুলি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রচিত, বিশেষজ্ঞ বা ভবিষ্যৎ বিশেষজ্ঞদের জন্য লিখিত।

অন্যান্য সুলিখিত রচনাগুলির মধ্যে মধুসূদন পতি রচিত "Wordsworth ;an Indian View রচনাটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কারণ প্রবন্ধটিতে ভারতে Wordsworth এর জনপ্রিয়তার কারণ নির্ণয়ের সুন্দর প্রচেষ্টা হয়েছে। বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের: Shelley's Adonais;A Romantic transmutation of elegic tradition প্রবন্ধটিতে লেখকের কাব্যবোধ ও গভীর মননের পরিচয় পাওয়া যায়। রণজয় কার্লেকারের: T.E.Hulm and T.S.Eliot;crisis and tradition নামক প্রবন্ধটি পড়ে মন খারাপ হয়ে যায়—কারণ রণজয় আজ ইহজগতে নেই, তার গভীর পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যবোধ দিয়ে সে আর কাউকে উদ্বুদ্ধ করবে না, তার এই ছোট পনের পাতার রচনাটিকে একটি পাঁচশ পাতার বইয়ের বীজ বলে মনে হয়; সে যদি ইহজগতে থাকত তাহলে সে আজ্ঞার তার কাছে করা যেত। প্রমা

ম

বহুজন হিতায়

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

ALL INDIA WOMEN'S CONFERENCE
EAST CALCUTTA CONSTITUENCY

ভি আই পি রোড ধরে চলতে চলতে গীতি সেন, সকলের গীতিদি, বললেন, 'দেখব আপনি কত ঘুরতে পারেন, জল কাদা ভেঙে হাঁটতে হবে কিন্তু'। পাশে বসা মায়া দত্ত মুখ মটকে হাসলেন। ভাবখানা এই, 'এইবারে বাছাধন জব্দ। ভেবেছিল বাড়িতে বসে বসেই গল্প লিখবে ওঁরা হেন করছেন তেন করছেন, ব্যস, কেল্লা ফতে, সেটি হচ্ছে না।' ওঁরা মানে নিখিল ভারত মহিলা সমিতির পূর্ব কলকাতা শাখা। বি ২৪৮ লেক টাউন ফরেস্ট নার্সারিতে যাঁদের সদর কার্যালয়।
সমিতির জিপেই চলেছি আমরা। সামনের আসনে চালক এবং গৌতম নামে একটি উৎসাহী কর্মী। পেছনের আসনে মায়াদি, গীতিদি এবং অধম স্বয়ং। গীতিদি সমিতির সভাপতি এবং মায়াদি কার্যকর্ত্রী সমিতির সদস্য। জিপ লেকটাউন থেকে উল্টোডাঙার দিকে যাচ্ছিল। এবার ডানদিকে ফিরে খালের পাশ দিয়ে গড়িয়ে চলল নীচে, খালকে বাঁদিকে রেখে। সামনে বেশ উঁচুতে দেখা যাচ্ছে রেল লাইন।উল্টোডাঙা স্টেশন। জিপ একটু এদিক ওদিক করে এক জায়গায় এসে থামল। গৌতম নামল প্রথমে।দুপাশের দরজা খুলে ক্রমশ আমরা।আশপাশ থেকে কয়েকজন যুবক এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্ক পুরুষ এসে দাঁড়ালেন। কিছু কুচো কাঁচাও। চারপাশের বাড়ি ঘর দোর দেখেই ছিন্নমূলদের শিকড় গাঁথার যুদ্ধের ছাপ পাওয়া যায়। কোনও বাড়িতে দরমার বেড়া, টিনের বা টালির চাল। কোনটির বা একটি দেওয়াল পাকা। এরই মধ্যে টুকিটাকি সবুজ। কখনও চালে লাউ বা কুমড়ো লতা। কাঁচা রাস্তা কয়েক দিন আগের বৃষ্টিতে স্যাঁতসেতে। কিছু জল জমে নেই। এটি দক্ষিণ দমদমের সবচেয়ে উঁচু কলোনী।

১৯৫০ সাল থেকে অপরিকল্পিতভাবে বসে যাওয়া পরিবারগুলোর প্রাকৃতিক কাজ কর্মে দরমা চটের একটু ঘেরই যথেষ্ট ছিল। পয়ঃনিষ্কাশনেরও কোন বন্দোবস্ত ছিল না। এখনও অনেকাংশে সেরকমই। আমার ডানপাশেই একটি নালা—খুব পুরোনো নয়। এটি বাঁধানো। গীতিদি বললেন, 'এই যে, এই নালাটা আমরা বানিয়ে দিয়েছি।' এই যে, বলা বাহুল্য, আমাকে সম্বোধন। মায়াদি বললেন, 'চারশ ফুট নালা।' ইতিমধ্যে গীতিদি সামনে দাঁড়ানো স্থানীয় প্রতিনিধিদের জেরা করতে লেগে

গেছেন ; নালা পরিস্কার নেই কেন ? যাঁদের জেরা করা তাদের মধ্যে একজনের উত্তর, 'কেন ? বেশ পরিস্কারই তো আছে। কলকাতার নালা কি এর থেকে পরিস্কার থাকে ?' উঁকি মেরে নালাটা দেখি, সত্যিই তলায় আবর্জনা কিছু রয়েছে সেখানে। তবে কলকাতার সঙ্গে তুলনাটা খুব ভাল লাগল না। কলকাতা আর যাই হোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আদর্শ হতে পারে না। গীতিদির মুখে যেন একটা দুঃখের ছাপ। সমিতি বিনা স্বার্থে খরচ করে যা বানাচ্ছে তার রক্ষণাবেক্ষণে উৎসাহের অভাব দেখে। ইতিমধ্যে এই নেহেরু কলোনীর আরও কিছু বাসিন্দা জুটে গেছেন। সবাই মিলে ঢুকলাম আর একটি তস্য গলিতে। জলে কাদায় প্যাচপেচে রাস্তা কাম উঠোনে বসে বাসন মাজা চলছে নিঃসঙ্কোচে। অচেনা আমাকে দেখে বাসন মাজতে মাজতেই কনুই দিয়ে একটু আঁচল ঠিক করা। তার পাশ দিয়েই একটি পাকা ল্যাট্রিনের সামনে হাজির আমরা। দিদিদের কথায় জানতে পারলাম এটি তাঁদের সমিতির বানানো পাইলট স্যানিটেশন প্রজেক্টের অঙ্গ হিসাবে। একটু উঁচু জায়গা দিলে অস্বাস্থ্যকর খাটা পায়খানা বা তার চেয়েও খারাপ ব্যবস্থা যে সব অঞ্চলে সেখানকার বাড়িতে দু পিটের ল্যাট্রিন বানিয়ে দেন সমিতি। পাঁচজন ব্যবহার করলে একটি পিঠ ভর্তি হয় দু বছরে। তখন সেটি বুজিয়ে দ্বিতীয়টির ব্যবহার। দ্বিতীয়টি ভরতে ভরতে প্রথমটির ভেতরের নাইট সয়েল শুধু সয়েলে পরিণত। তা সার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। শুনলাম সমিতি সবশুদ্ধ পনেরটি এ জাতীয় ল্যাট্রিন বানিয়ে দিয়েছেন তাঁদের এলাকায়। এলাকা বলতে দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির উদ্বাস্তু কলোনি, ঝুপড়ি ইত্যাদি।

এখান থেকে বেরিয়ে আবার নালার ধার ধরে চলা। পাশেই একটি বাড়ির উঠোনে লাল এবং ঈষৎ হরিদ্রাভ কিছু চূর্ণ শুকোচ্ছে। জানা গেল সেটি একটি সিঁদুর কারখানা। মহাতীর্থ কালিঘাট সিঁদুর। বাড়ির একপাশে পাতকুয়ো। মালিক এসে একটি কৌটো উপহার দিলেন বহু আপত্তি অগ্রাহ্য করে। মালিক জানালেন দশজনের সংসার চলে যায় এই ব্যবসা থেকে। আর একটু এগোতেই একটি গেঞ্জির কারখানা—বি এন হোসিয়ারি। এটিও জীবন সংগ্রামীর সফলতার প্রথম ধাপের চিহ্ন বহন করছে। সেখান থেকে আর একটু এগিয়ে ডান পাশে একটি গাছের তলা দিয়ে উঠলুম একটি চালাঘরে। সেখানে তখন হোমিও ক্লিনিক চলছে জোর কদমে ডাঃ কুণ্ডুর তত্ত্বাবধানে। এটি একাশি সালের নভেম্বরে চালু করা মা ও শিশু প্রকল্পের অংশ বিশেষ। এই প্রকল্পে তিনটি শিশুকল্যাণ কেন্দ্র, তিনটি জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং পাঁচটি হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে একজন করে ডাক্তার এবং একজন করে সহযোগী এই হোমিও ক্লিনিকগুলিতে। ডাঃ কুণ্ডুর কাছে জানতে পারা গেল রোগীর সংখ্যা দৈনিক পঞ্চাশ ষাট। কিংবা তারও বেশি। আগে এখানে শুধুই রোগের চিকিৎসা হত। এখন প্রতিরোধের ব্যবস্থাও করা হয়।
মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছেন দুই দিদি। আসলে চর্কির মত ঘুরছেন। ডাঃ কুণ্ডুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে দেখি গীতিদি এক বধূকে রীতিমত তিরস্কার করছেন। তিরস্কার করার কথাই বটে। বাসনপত্র মাজা ধোয়া চলছে রাস্তার ধারের জমা জলে। নর্দমার জল উপচে তাতে জমেছে ও হয়ত।

এদিকে পাশের টাইমের জল পড়ছে নল থেকে। গীতিদির ধমকে একটু লজ্জা পেলেন বধূটি। তাড়াতাড়ি ঘরে চলে গেলেন। এবার বাঁশ বাঁখারির বেড়া দিয়ে বাঁধানো পুকুর পাড় ধরে এগিয়ে চলা। এই বাঁধানোর কাজটাও সমিতি করে দিয়েছেন। তৎপরে রেল লাইন পার হলুম। এ লাইনটি চক্ররেলের পরিবর্ধনে যুক্ত হবে। লাইন পার হয়ে বি ব্লক। সেখানকার রাস্তায় ইতস্তত ঘেঁস ছড়ানো। আগের দিনই পাঁচ না সাত লরি ঘেঁস ফেলা হয়েছে সমিতির খরচে। সেই রাস্তার ডানপাশে শিশু কল্যাণ কেন্দ্র। জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রও বটে। যদিও দুটির কার্যকাল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আজ একই সঙ্গে চালু বিশেষ কারণে। সেই বিশেষ কারণ নাকি আমার উপস্থিতি। আমার এ কদর বাড়ির লোকের অজানা রয়ে গেল সেই ভেবে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললুম।

ঢোকা মাত্রই সারিবদ্ধ জনা চল্লিশেক তিন থেকে পাঁচ বয়সী শিশু সমবেত কণ্ঠে নমস্কার বলে হাত জড়ো করলো। সঙ্গে পরিচালিকা প্রভাবতী পাল এবং দুজন স্থানীয় সহযোগী। একই ভঙ্গীতে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম বি বি এস চিকিৎসক ডাঃ সোহিনী ভট্টাচার্যও। এই সাড়ম্বর অভ্যর্থনায় হতচকিত আমাকে ধাতস্থ হতে দেবার আগেই ঘরের কোণে রাখা রেকর্ড প্লেয়ারে বেজে উঠল গান, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।তৎসঙ্গে শিশুরা সুন্দর অঙ্গভঙ্গী করে নাচতে লেগে গেছে। সঙ্গে পরিচালিকা। মুহূর্তে একটি স্বর্গীয় পরিবেশ রচিত হয়ে গেল। আমি এতই বিমুগ্ধ যে শিশুদের প্রতিনিধি কেউ কখন যে তাদের বানানো একটি কাগজের ফুল এবং একটি মাটির সিঙাড়া ধরিয়ে দিয়ে গেছে আমার হাতে খেয়ালই করিনি। সঙ্গে লিলিপুট সাইজের প্লাসটিকের চা কাপ এবং সসার। ছড়া সহযোগে নৃত্য শেষ

নেহেরু কলোনী : সমস্যা নিয়ে আলোচনা

স্বাস্থ্যকেন্দ্র

হতে শিশুরা বসে পড়ল। গীতিদি তাদের ডেকে বললেন, 'বলতো আজ তোমরা কী খাবে?' সমস্বরে উত্তর—'পায়েস'। 'কার জন্য আজ পায়েস খাচ্ছ জান? এঁর জন্য', বলে আমাকে দেখিয়ে দেন তিনি। আমি বললুম,'গীতিদি,এমন জানলে রোজ আসব।'গীতিদি বললেন,'আসলে এদের কোনদিন দেওয়া হয় দুধ রুটি, কোনদিন কলা বিস্কুট—এই রকম আর কি! আজ পায়েস।' 'একটু চেখে দেখুন না,' বললেন পরিচালিকা একটি বাটি সামনে ধরে। দেখলুম তাতে কিশমিশ রয়েছে। বলা বাহুল্য আমি ক্ষুধার্ত ছিলুম না। অতএব অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনি। এদিকে দেখছি শিশুদের চোখমুখ উৎসাহে জ্বলজ্বল করছে। তাদের পাণ্ডুর মুখে অসাধারণ তৃপ্তির হাসি। কানের কাছে ফিসফিসিয়ে গীতিদির গলা, "ওদের এই তৃপ্তির হাসি দেখলে কাজের উৎসাহ ভীষণ ভাবে বেড়ে যায় আমাদের।" মনে পড়ল আগের দিন সমিতির আপিসে বসে জেনারেল সেক্রেটারি শিখা মিত্র বলেছিলেন,"আসলে আমরা লক্ষ করেছি তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুরাই নিম্নবিত্তের গৃহে বেশি অবহেলিত হয়। মোটামুটি তিন বছর পর্যন্ত সন্তান মার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। আর পাঁচ বছরের পর নিজেরাই এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে পারে। তাই আমাদের প্রতিটি শিশুকল্যাণ কেন্দ্রে তিন ঘণ্টা করে চল্লিশটি ঐ বয়সের বাচ্চাদের প্রাইমারিতে ভর্তি হবার মত লেখাপড়া, খেলাধুলো ইত্যাদি শেখানো হয়। খাবার দেওয়া হয়। একজন করে পরিচালিকা এবং দুজন করে স্থানীয় সহযোগী থাকেন। মাসে একদিন করে বাচ্চাদের মার সঙ্গে আলোচনা। এদের নানারকম রোগ প্রতিষেধণের ব্যবস্থাও করা হয় এখানে। যেহেতু আসন সংখ্যা সীমিত তাই নিজেরাই ইন্টারভিউ নিয়ে বাছাই করি শিশুদের।"

এবারে ডাক্তারবাবুর দিকে ফিরি। ডাঃ ভট্টাচার্য মহিলা। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন দুজন সমাজসেবিকা এবং দুজন কমিউনিটি স্বাস্থ্য সহযোগী। প্রত্যেকেই সাম্মানিক পেয়ে থাকেন এখানে। সহযোগীরা স্থানীয় কমিটি কর্তৃক প্রেরিত। এঁরা স্থানীয় লোক এবং সমিতির মধ্যে যোগসূত্র। ডাঃ ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করি, 'এখানে সমস্যাটা কি?' ভারী চশমার ভেতর দিয়ে তাঁর চোখ যেন একটু চিন্তান্বিত মনে হল।'সবচেয়ে বড় সমস্যা এখানকার পরিবেশ। কলকারখানার ধোঁয়া, বদ্ধ জলার বিষ বাষ্প এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব এখানকার অধিবাসীদের বেসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে দেয়। তাই নিঃশ্বাসের কষ্ট, চর্মরোগ, পেটের রোগ সবই রয়েছে এঁদের সঙ্গী হিসেবে।'গীতিদি খেই ধরলেন,'এগুলো আমরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে সমীক্ষা করে দেখেছি। শুধু রোগের চিকিৎসা করে স্থায়ী ফল ফলবে না বলে প্রতিষেধের দিকেও জোর দিয়েছি। টিউবওয়েল বসিয়েছি জায়গায় জায়গায়, মুক্ত বাতাসের জন্য শিশু উদ্যান করেছি, ইমিউনাইজেশন এবং ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা রেখেছি— ডাবল অ্যান্টিজেন ট্রিপল অ্যান্টিজেন, পোলিও ভ্যাকসিন ইত্যাদির মাধ্যমে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে আসি আমরা। পরিবার পরিকল্পনার ওপর জোর দি। এখন তো পরিবার শাসনে রীতিমত সাড়া পাওয়া যাচ্ছে!" ডাঃ ভট্টাচার্য যোগ করলেন, 'তবে পরিবার শাসনের উৎসাহ হিন্দুদের মধ্যে যতটা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ততটা নয়। দ্বিতীয় পক্ষ আসেন সাধারণ তিন চার বাচ্চার পর। এখানে সাময়িক এবং চিরন্তন দু প্রকার বন্ধ্যাকরণই হয়। এ ব্যাপারে আর্থিক অনুদানও মায়েদের মধ্যে উৎসাহের অন্যতম কারণ। স্থায়ী বন্ধ্যাকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারী পরিকল্পনানুযায়ী মায়েদের দেওয়া হয় একশ ষাট টাকা করে। [illegible] দরগা রোডের কেন্দ্র থেকে আসে।" এবারে আবার গীতিদি,'বুঝলেন চারটি ক্যাম্পে [illegible] দেড় বছরে ছিয়াশিটি এ জাতীয় কেস করেছি। এছাড়া ওরাল কনট্রাসেপটিভ বিলিতো আছেই'। আর সাময়িক বন্ধ্যাকরণ করেছি একশ তেইশটি। ক্রমশ আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। এত বিভিন্নমুখী কর্মধারা এমন সুষ্ঠুভাবে করে যাচ্ছেন শুধু মেয়েরা মিলে। আর আমরা বিশেষ করে আমি কি করছি। মনের ভেতরে ছোট্ট ধিক্কার নিজের প্রতি। চেয়ে দেখি মায়াদির মুখে সেই কেমনতরো হাসি, উদ্ধার পেলুম গীতিদির তাড়ায়। 'চলুন, চলুন অনেক জায়গায় যেতে হবে।' তাঁর চলন ক্ষিপ্র। মুহূর্তে অদৃশ্য হলেন। সমবেত শিশু কণ্ঠের পুনরায় 'নমস্কার' ধ্বনির মধ্যে বেরিয়ে এলুম। বাইরে এসে দেখি গীতিদি পাকড়াও হয়েছেন স্থানীয় এক যুবকের দ্বারা। তাদের ক্লাবঘর বানিয়ে দিতে হবে। ঝটিতি আশ্বাস দিয়ে আমাকে প্রায় বগলদাবা করেই জিপে উঠলেন তিনি। ইতিমধ্যেই জিপ ঘুরপথে এসে গেছে সেখানে। উঠেই শুনলাম 'আমরা ক্লাবঘরও বানিয়ে দি জমি পেলে। আর শিশু কল্যাণ কেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিও, হয় স্থানীয় জমিতে আমাদের বানিয়ে দেওয়া, অথবা স্থানীয় ক্লাব ঘর ইত্যাদিতে স্থান করে নেওয়া। জিপ চলেছে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা ধরে। পথে পড়ল পল্লীশ্রী শিশু উদ্যান। তাতে স্লিপ থেকে শুরু করে টুকিটাকি খেলার সরঞ্জাম। গৌতম বলল,'এরকম চারটি পার্ক আছে, টিউবওয়েল বসানো হয়েছে পঞ্চান্নটা। সেখান থেকে নিবেদিতা কলোনী। সেখানেও চিকিৎসা চলছে। চলছে শিশুদের ক্লাস। এখানকার ডাক্তারবাবু জানালেন অপরিপুষ্টি এবং রাতকানা রোগ প্রায় পঞ্চাশ ভাগ শিশুরই। ভিটামিন ট্যাবলেট, সিরাপ ইত্যাদি দিয়ে যতটা পারা যায় পরিপূরণ করার চেষ্টা হয়।' শিশুরা এখানেও পায়েস পেয়েছে। তাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক করে রাখা বাটিতে তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে। এবারে জিপ অলিগলি দিয়ে এসে পড়ল যশোর রোডে। যেখান থেকে বাঁয়ে মোড় নিয়ে বেলগাছিয়ার দিকে একটু এগিয়েই মাথার ওপর রেল পুল। তাকে ডাইনে রেখে বাঁয়ে বাঁকা। পাহাড়ের নীচের অংশ যেন এ অঞ্চলটি। বিধান কলোনী। রেল লাইন এবং মূল রাস্তা বাদে সবটাই জলে থৈ থৈ সেজল বাড়ি ঢুকে ঘর ছাড়া করেছে একশ চল্লিশটি পরিবারকে। জিপ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় প্রতিনিধি এলেন। খালি গায়ে গামছা পরে তিনি নালা পরিষ্কার করছিলেন। বাঁধানো নালাটা সমিতির করে দেওয়া। এসে বললেন, 'আসলে আমাদের এলাকা হচ্ছে সবচেয়ে নীচু। তাই জল হলেই সব অঞ্চল থেকে নেমে আসে ঢল। আমরা ভেসে যাই। আকাশে মেঘ ডাকলেই ছুটি সমিতির কাছে জল সরাবার পাম্পের ব্যবস্থা করতে। ঐ দেখুন না পাম্প বসিয়ে রেখেছি। কিন্তু চালাতে পারছি না। জলটা ফেলবো যেখানে সেখানেও তো এখন জল।'

সমিতির ঘরে ঢোকা গেল না। সেখানে জল। সমিতির বাঁধানো পুকুর পাড় রাস্তা সব একাকার। টাইমের কল জলের তলায় অদৃশ্য। সমিতির গড়ে দেওয়া পার্ক এখন পুকুর। ডাক্তারবাবু ঘুরঘুর করছেন বসবার জায়গা না পেয়ে। গীতিদি তাঁকে নির্দেশ দিলেন এ সময়ে কামাই না করার জন্য। এখনই তো সাহায্য সবচেয়ে বেশী দরকার। কয়েকটি বাড়ি দেখালেন অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সেগুলো গত বারের বন্যায় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে সমিতি থেকে। সমিতির এলাকায় সর্ব সমেত বাহাত্তরটি বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এ পর্যন্ত। প্রতি বার চিঁড়ে, গুড়, দুধ এবং ওষুধপত্র বিতরণ করা হয় বন্যায়।

আবার জিপ। আড়চোখে দুই মহিলা দেখছেন আমি কতটা কাৎ হয়েছি। জিপে আমি এবার মধ্যমণি। গীতিদি বললেন,'বলরাম সুভদ্রা জগন্নাথ এই অর্ডারে বসা হয় জানি। মাঝে ভাই দু পাশে বোন

সমিতির বাঁধানো পুকুর পাড় সমিতির কল

সমিতির বানানো ল্যাট্রিন

আরেকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র
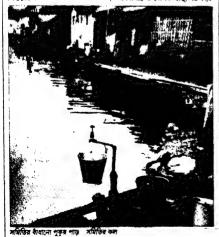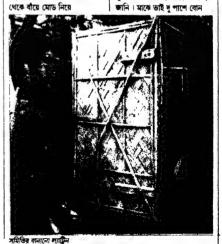
এমন তো দেখিনি !'আমি বললুম, 'সুন্দরবনের নিয়মে কিন্তু মাঝে গেলে বাঘে খায় । সুন্দর বোনদের মাঝখান থেকে এই ভাইকেই খাবে ।'গীতিদি হাসলেন । মনে হল বলতে চাইছেন 'বালাই ষাট ।' ইতিমধ্যে হাজির আমরা আজাদগড়ে । যশোর রোডের অপর পার্শ্বে । এখানে টাইমের জল আসে না । সমিতি চারটে টিউবওয়েল বসিয়েছেন আর মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি করে আসে জল । তাও গলিতে ঢোকে না । এখানে ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ক্লাবের ঘরে চিকিৎসা কেন্দ্র । বহু নারী শিশু লাইন দিয়ে বসে । ডাক্তার দেখছেন তাঁদের । স্থানীয় লোকেরা বললেন, 'খুব সাহায্য পাচ্ছি আমরা সমিতির কাছে । সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকলে আমাদের আর জি করে দৌড়তে হত । তবে একটা আর্জি । রক্ত মলমূত্র ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য আমাদের বাইরে বহু পয়সা খরচ হয়ে যায় । সমিতি যদি তার একটা বন্দোবস্ত করতে পারেন ।'আমার পথ প্রদর্শিকা দুজনেই দেখলুম চিন্তা করছেন গভীর ভাবে, । আমি বললুম,'লায়ন্স ক্লাব বা রোটারি ক্লাব এঁদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন না । হয়তো কোনও ব্যবস্থা হয়ে যাবে ।' ওঁরা গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বললেন হুঁ ।

সেখান থেকে বসাক বাগান । এ কেন্দ্রটি এখানে এসেছে সাতই এপ্রিল থেকে । এখানকার শিশুরাও নাচ দেখালো । তাদের ভাগ্যেও আজ পায়েস । স্থানীয় কিছু উৎসাহী যুবক আমাদের ধরে নিয়ে গেলেন । তাঁদের পাড়ায় । সেখানেও নোংরাপুকুরে চান করছে লোকে । টাইমের জল অত্যন্ত ঘোলা । সমিতির কাছে আর্জি পুকুর বাঁধাবার এবং কল বসানোর জন্য । গীতিদি বললেন,'একটা জায়গা দাও । বয়স্ক মেয়েদের পড়াশুনোর ব্যবস্থা চালু করি ।'আর তোমরা যা বললে তারও চেষ্টা করছি । ছেলেরা বড় রাস্তা অব্দি এগিয়ে দিল উৎসাহ ভরে ।

একটু এগিয়ে গোয়ালা বাগান । আটাত্তরের বন্যায় সমিতির করা বাড়ি এবং কমিউনিটি সেন্টার আছে এখানে । ক্লাব ঘরে কমিউনিটি হেলথ সেন্টার । পল্লীবাসীদের উৎসাহ এখানেও । একাশির নভেম্বর থেকে চালু হয়েছে এটি । পঞ্চাশ থেকে সত্তর জন রোগী প্রত্যহ । বৃহস্পতিবার বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে । ইমিউনাইজেশনে ভিড় বেশ হয় । তবে পরিবার পরিকল্পনায় এখনো অনেক বোঝাতে শোঝাতে হয় ।

জিপে চড়ে হাজরা পাড়ার মোড়ে । আগে এখানে হাজরারা বর্ধিষ্ণু ছিলেন । এখন এ অঞ্চল নানান কারখানায় এবং গ্যারেজে ভর্তি । অধিবাসীরা অধিকাংশই দিন মজুর । এ পাড়ায় কোন নালা নেই । সুতরাং যাবতীয় আবর্জনা গিয়ে পড়ছে একটি বড় পুকুরে । সেই পুকুরেই চলছে চান করা, বাসন মাজা, মুখ ধোয়া । অথচ পুকুরের ধারেই রয়েছে সমিতির বানানো টিউবওয়েল, পুকুরের চারপাশ বাঁধিয়েও দিয়েছে সমিতি । রাবিশ ফেলেছে রাস্তায় । ইদ্রিস চৌধুরি স্থানীয় প্রতিনিধি । বললেন, 'এই পুকুর থেকে চোত-বোশেখ মাসে যা গ্যাস ওঠে । একটা নালা আপনারা করে দিন না ।'গীতিদি বললেন, নালা টানতে হলে তো রাস্তা ছাড়া মেলাবার জায়গা নেই । বড় রাস্তার ড্রেন আবার অনেক উঁচু আপনাদের জায়গার থেকে । মিউনিসিপালিটির অনুমোদনও তো দরকার ।'ইদ্রিস সাহেব বললেন,'মিউনিসিপ্যালিটির স্যাংশন আছে ।'গীতিদি আশ্বাস দিলেন । আমরা বেরিয়ে বড় রাস্তায় এলুম ।

দুই মহিলা এবার আর আড় চোখে নয় সোজাসুজিই দেখছেন আমার পায়ের নড়া খুলে গেল কিনা ! এদিকে আমি ভাবছি উল্টো কথা । কোন প্রাণশক্তিতে এঁরা এমন কাজ করে চলেছেন । আমার নয় একদিন । এঁদের তো প্রতিদিনি । গীতিদি বললেন, 'কি যাবেন নাকি আরও কয়েক জায়গায় ? না এখানেই শেষ করব ?' আমি বললুম ' ঘোরাতে আমার আপত্তি নেই ।' মনে মনে বললুম, সাক্ষাৎ শক্তিময়ীরাই তো সঙ্গে আছেন । গৌতম বলল,'এবার যাব বেদিয়াপাড়া । এখানকার লোকেরা আগে পাখির ব্যবসা করে জীবন ধারণ করত । এখনও কিছু কিছু আছে । তবে এই মুসলমান প্রধান অঞ্চলে বেশির ভাগই বেকার ।'শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল । একটা সম্প্রদায় তাদের বংশগত জীবিকাচ্যুত হয়ে নিরালম্ব জীবন যাপন করছে । সমাজে অস্থিরতা আসবে না কেন ? এখানে ঢুকে দেখলাম ছোটখাটো নরক । রাস্তা প্যাচপেচে । পুকুরের জল উপচে সেখানে জল এসেছে । সমিতি পুকুর বাঁধিয়েছেন বটে, টিউবওয়েলও বসিয়েছেন । রাস্তায় ফেলেছেন ঘেঁস । কিন্তু তাতেও যেন শানাচ্ছে না । গীতিদি বললেন দুঃখিত মুখে, 'গৌতম,এখানে যে সেন্টার খুলবার জন্য জায়গার ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম তার কি হল ?' গৌতম বলল,'জায়গা এখানে নেই ।'সত্যিই তো উদ্বৃত্ত জায়গা এখানে কোথায় ? বাড়িগুলোর একের মধ্য দিয়ে অন্যের রাস্তা । দরজায় আব্রু নেই । থাকলেও চটের । শরীরের আব্রুর তো প্রশ্নই নেই ।

এবারে প্রগতি পল্লী । এখানে সেন্টার নেই । তবে আছে বন্যাত্রাণ মঞ্চ । বেশ উঁচু করে বাঁধানো । ভিত আর ছাদ সমিতির করার কথা । দেয়াল স্থানীয় লোকেদের। পুরো ভিত এবং দেয়ালের অর্ধেক শেষ । বাকী অর্ধেক হলেই ছাদ হবে । বন্যায় ঘর বাড়ি ভেসে গেলে

ছড়া সহযোগে পাঠ

এখানে আশ্রয় নেয়া চলবে । গৌতম বলল চিৎপুরের লক গেট ভেঙে গেছে বলে আমরা খুব শঙ্কায় ছিলুম । যাক জল এদিকে আসেনি । রক্ষে ।

এবার আমার জন্য সারপ্রাইজ । আজকের মত ঘোরায় ক্ষান্তি । যাত্রা তাই সমিতির সদর কার্যালয়ে । লেক টাউনে দু তিনটে গলির গোলকধাঁধা পেরিয়ে হাজির হল জিপ । একটি বড় পুষ্করিণীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাড়িটি । চার কাঠা লিজ জমির ওপরে । দোতলা পর্যন্ত সরকারি সাহায্যে । তিনতলাটা নিজেদের টাকায় । পাশের মশলা-বাড়িটিও নিজেদের অর্থে । এসব গাড়িতে বসেই শুনেছি । আপাতত গাড়ি থেকে নেমে শিখা মিত্রর হেফাজতে । শিখার জিভের ধার খুব । শুনিয়ে দিলেন প্রথমেই, 'এখন বিশ্রাম নেওয়া চলবে না । দেখুন আগে ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ।'সেই সাত সকাল থেকেই এঁদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে আছি । কর্ত্রীদের ইচ্ছেয় আমার কর্ম । সেটাও নির্লিপ্ত দেখা । সাংখ্যের পুরুষ যেন । দেখলুম একটি ঘরে কিছু মেয়ে ইলেকট্রিক বা ইলেকট্রনিকের জিনিসপত্র বানাচ্ছেন । শিখা জানালেন, এঁরা কিটস অ্যালাইনমেন্টের কাজ শিখছেন । বললুম 'মোটা মাথা আমার একটু বুঝিয়ে বলুন ।'শিখার চোখে তিরস্কার । যেন এই সামান্য ব্যাপারটা না বোঝা গর্হিত অপরাধ । বললেন,'রেডিও ট্রানজিস্টার ইত্যাদিতে অনেক খুঁটিনাটি যন্ত্রপাতি লাগে । তারপরে এলিমিনেটর, ইলেকট্রনিক কলিং বেল ইত্যাদি তৈরি এখানে শেখানো হয় । এগুলোর বাজারে খুব চাহিদা । আর ওদিকে সেলাই এবং দরজির কাজ । সবশুদ্ধ চল্লিশজন মেয়েকে আমরা বেছে নিই তাদের যোগ্যতা এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে । স্থানীয় কমিটি নেতা এবং গুরুত্বপূর্ণ লোকেদের সুপারিশ নিয়ে আসেন অনেকেই। তবে বাছাইটা হয় আমাদের নর্ম অনুযায়ীই । এই দুঃস্থ চল্লিশজনকে শিক্ষাকালীন ভাতাও দেওয়া হয় পঁচাত্তর টাকা করে মাসে । ছ মাস অন্তে ট্রেনিং শেষ । তখন পুনর্বাসনের জন্য এককালীন পাঁচশ টাকা । ক্ষুদিরাম পল্লীতে অনেক মেয়ে জামাকাপড় সেলাই এর কাজ করে এখন দিন চালাচ্ছে । হরি শার মার্কেট থেকে তাদের কাপড় দিয়ে যায় । এরা সেলাই করে দেয় । চেষ্টা চলছে এদের দিয়ে সমবায় চালু করার । অথবা নিজেদের ব্যবসা চালু করানোর ।'আমি বলি,

দ্রৌপদী : প্যাকেট বন্দিনী

ইলেকট্রনিক্সের কাজ শেখানো

মশলা : মেশিনে

'আমরা তো জানি শিখতে গেলে মাইনে দিতে হয়। এরা দেখি এখানে উল্টে পায়।' শিখা বললেন, 'স্টাইপেন্ড না দিলে কেউ আসবে ভেবেছেন? ওদের দারিদ্র্য চোখে দেখে এলেন না?' আর কথা না বাড়িয়ে বললুম, 'তা বটে'। শিখার কথার ফুলঝুরি আবার ছুটলো। 'আসলে এদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে অর্থনৈতিক একটু উন্নতি না হলে, পেটে ভাত না থাকলে কেউই শিক্ষায় উৎসাহ বোধ করে না। কি ছোট কি বড়। আমরা দুটি বয়স্ক শিক্ষার প্রকল্পও চালু করেছি যে, বসাক বাগানে যান নি, সেখানেও আছে। দু ঘন্টা করে ক্লাস। আঠারো বছরের ওপরের মেয়েরা পড়ে সেখানে।' আমি জিজ্ঞাসা করি, 'এই ভোকেশনাল ট্রেনিং-এর টাকা আসে কোত্থেকে?' শিখা বললেন, 'পঁয়তাল্লিশ পয়তাল্লিশ দশ। পঁয়তাল্লিশ ভাগ কেন্দ্র, পঁয়তাল্লিশ রাজ্য আর বাকি দশ আমরা। আসলে আমাদের আরও অনেক বেশিই যায়। চলুন ওপরে সবাই অপেক্ষা করছেন।' আমার চোখে বোধহয় প্রশ্ন ফুটে থাকবে। শিখা বললেন, 'আমাদের কার্যকরী কমিটির সদস্যারা।' আমরা সিঁড়ি ধরলুম।

দোতলায় উঠতেই চোখে পড়ল সংস্কৃত একটি বাণী—বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়চ।প্রাণভূতাম এবেহ জন্ম সাফল্যম। সেখান থেকে বাঁয়ে ঘুরতেই বিশাল হল ঘর। তার শেষ প্রান্তে কনফারেন্স টেবিল ঘিরে বসে আছেন সদস্যারা। প্রাথমিক পরিচয় বিনিময়ের পর আলোচনার মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করি সমিতির ইতিবৃত্ত। দক্ষিণ দমদম অঞ্চলে লেকটাউনের মত স্বচ্ছল অংশের আশে পাশেই যে দারিদ্র্যের দগ্ধ বিকাশ সেটাই বিচলিত করেছিল কিছু মহিলাকে। তাঁদের প্রচেষ্টাতেই বাহাত্তর সালে জন্ম নিল নিখিল ভারত মহিলা সমিতির পূর্ব কলিকাতা শাখা। সরোজিনী নাইডু এবং মার্গারেট কুসিনের উৎসাহে সমাজকল্যাণে নারী নেতৃত্বের যে জোয়ার এসেছিল অর্ধশতাব্দী পূর্বে তাতেই নিখিল ভারত মহিলা সমিতির সৃষ্টি। যাঁরা পূর্ব কলকাতা শাখার স্থাপনা করলেন তাঁরা হলেন কল্যাণী সেনগুপ্ত, অশোকা রায়, মায়া সেনগুপ্ত, গৌরী বসু, কল্পনা চ্যাটার্জি, সুশীলা বাচোয়াত, গীতা ভট্টাচার্য, দীপ্তি ব্যানার্জি মণীষা মজুমদার এবং মিনতি গুপ্ত। কল্যাণী সেনগুপ্ত বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবলের অপর প্রান্ত থেকে এগিয়ে এলেন কাছে। তিনি হচ্ছেন প্রথম সভাপতি। 'তখন শুরু করি একটা হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় আর একটা নন-ফর্মাল স্কুল (ন থেকে চোদ্দ বছরের মেয়েদের জন্য) দিয়ে লেক টাউনের একটি গ্যারেজে। টাকাও নিজেদের থেকেই দিতে হত মোটামুটি,' বললেন তিনি। এই ভাবেই চলছিল। রিলিফ গ্রান্টও বন্টন করা হত বস্তি বা উদ্বাস্তু কলোনীগুলোতে। চুয়াত্তরে মহান মহিলা দিবসে শিখা মিত্র এঁদের কর্মধারায় উৎসাহিত হয়ে যেচে নেন সদস্য পদ। আটাত্তর সালে মিনতি গুপ্ত, যিনি ছিয়াত্তর থেকে সহকারী সভাপতি হয়েছিলেন, ব্যবস্থা করলেন একটি ঘরের। সেটি ছিল একটি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রের গুমটি। এই আটাত্তরেই যোগ দিলেন গীতাদি। ওঁর স্বামী অমিয় সেন তখন দিল্লী থেকে বদলি হয়ে কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব পদে যোগ দিয়েছেন। গীতাদি যোগ দিয়েই বুঝতে পারলেন এভাবে চলে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন সরকারি বেসরকারি সাহায্যেরও। সরকারি এবং বেসরকারি অনুদান পেতে গেলে সমিতিকে রেজিস্টার্ড হতে হবে। তাই কাঠ খড় পুরিয়ে দাতব্য সংস্থা হিসবে পশ্চিমবঙ্গ সমিতি আইনানুযায়ী রেজিস্ট্রি করা হল তাকে। তার পরেই দুঃস্থদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নানান কাজে নেমে পড়া। ঠেকে ঠেকে শেখা। গীতাদির কথায়, 'আমরা চার রকমের ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করেছিলাম। মেশিন নিটিং তাঁত বোনা, সেলাই এবং পোশাক তৈরি আর শোলা, জরি ইত্যাদির কাজ। মেশিন নিটিং এর অসুবিধে হল,

টিউবওয়েল।

সবচেয়ে কম দামী মেশিনের দামই দু হাজার টাকা। আমরা ট্রেনিং অন্তে দিতে পারি পাঁচশ টাকা মাত্র। তাছাড়া বাকি টাকার জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি চাওয়া হয়। তা এই সব দুঃস্থ মেয়েরা সে সব জোগাড় করবে কি করে? তাঁত বোনা শিক্ষার পর বাড়িতে বসে থাকতেই হয় মেয়েদের। যাদের ঘরে ভাল করে শোয়া বসার জায়গা নেই তাদের ঘরে কি তাঁত বসানো যায়? শোলা বা জরির কাজের এ অঞ্চলে তেমন চাহিদা নেই আজকাল। তাই আমরা মার্কেট সার্ভেতে নেমে পড়লাম। দেখলাম সুযোগ রয়েছে ইলেকট্রনিক কিটের ক্ষেত্রে। তার ট্রেনিং চালু করলাম। পঁচাশির সেপ্টেম্বরে এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে।' আমার জানবার ইচ্ছে কত জন মহিলার উদাম বর্তমানে এই সমিতিকে শক্তি জোগাচ্ছে। সহসভাপতি অর্চনা রায় বললেন "আমাদের সদস্য সংখ্যা দেড়শ। কার্যকরী সমিতিতে আছেন একুশজন। নির্বাচনের মাধ্যমেই পদপূরণ হয়। মিসেস সেন আটাত্তর সাল থেকেই সভাপতি।" 'আমাদের আর একটা শাখাও খুলেছি নবীনা সদস্যদের জন্য,' বললেন ইন্দ্রানী মুখার্জি, 'চোদ্দ থেকে একুশ বয়সসীমা। ষোল জন সদস্য এখানে। খেলাধুলো লাইব্রেরি ইত্যাদির ব্যবস্থাদ থাকছে। আসলে নতুনরা এতে উৎসাহিত হবে। সমিতির কাজেও পরবর্তী কালে একাত্মবোধ করতে পারবে।' ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা পানীয় এসে গেছে। সেটা শেষ হতে না হতেই গীতিদির তাড়া, মশলা বিভাগ দেখতে চলুন। মশলার ঝাঁঝেই বোধহয় প্রায় বিষম খেয়ে উঠে পড়লুম। গীতিদির নির্দেশে মায়াদি সঙ্গে চললেন। নীচে নেমে পাশেই মশলা বাড়ি। এটি সমিতির নিজেদের অর্থে বানানো। মেঝেতে দেখলুম ধোয়া মশলা শুকুচ্ছে রোদে। আর একদিকে চলছে ঝাড়াই বাছাই। জিরের থেকে একগাদা ধুলো বেরিয়েছে। সেগুলো পরিষ্কার করছেন একজন। আর একজন লংকা বাছছেন, বোঁটা ছাড়াচ্ছেন। ঘরে ঢুকে দেখি মেশিন চলছে। মশলার গুঁড়ো একদিক দিয়ে বেরিয়ে আসছে। এবার দোতলায়। মায়াদি বললেন, 'জুতো খুলতে হবে।' আমার অস্বস্তি। মোজার সামনে একটা ফুটো। একটু আড়াল করে কর্মটি সমাধা করলুম। দোতলায় মেয়েরা নিক্তিতে মেপে প্যাকেট জাত করছেন গুঁড়ো মশলাকে। মায়াদি একটি প্যাকেট তুলে দিলেন হাতে। নাম দেখলাম দ্রৌপদী। রন্ধন পটিয়সী দ্রুপদ কন্যার নামানুসারেই নামকরণ। যাঁরা কাজ করছিলেন তাঁরা সকলেই জানালেন এ মশলা পরিমাণে লাগে অনেক কম। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের রান্নায় দ্রৌপদীরই ব্যবহার।

কার্যকরী সমিতি

নেমে এসে একটু আড়াল করে জুতো পায়ে দিলুম। মূল বাড়িতে একতলার অফিস ঘরে যেতে দুটি ঘরের মধ্য দিয়ে শর্ট কার্ট করতে হল। একটি ঘরে সেলাই এবং পোশাক তৈরির পরীক্ষা চলছে। অপরটিতে চলছে ইলেকট্রনিক কিটস এলাইনমেন্টের কাজ শেখানো। এখান থেকেই বিদায় নেবার পালা। গীতিদি এবং শিখা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। শিখা বললেন, 'এই সমিতি যে আজ এত কাজ করতে পারছে তার কৃতিত্বটা কিন্তু গীতিদির। উনিই এ প্রতিষ্ঠানের প্রাণ স্বরূপ'। গীতিদি বললেন, 'সবাই মিলে কাজ না করলে কি কিছু হত? এই তো আমি কতদিন ছিলাম না। সমিতি তো ঠিক চলেছে। আমার এটাই শান্তি আমার অভাবে এর কাজ ব্যাহত হবে না।' শিখা নীচু গলায় বললেন, 'দাদা মানে মিস্টার সেন পেছন থেকে যে কত সাহায্য করছেন তা আমরাই জানি। গীতিদির কাজেরও প্রেরণা দিতেন উনি সর্বদা। উনি হঠাৎ চলে যাবার পর গীতিদি একদম ভেঙে পড়েছিলেন। এখন আবার কাজে ফিরে এসেছেন। ছেলেরা বিদেশে ওঁর চিন্তা এবং কর্মধারা এখন সমিতিকে ঘিরেই শুধু।' গীতিদির দিকে তাকিয়ে দেখি ওঁর চোখ দুটি যেন দূরে কোথায় দূরে দূরে। মুখে বিষাদ মাখানো। রাস্তা নির্জন। মাঝে মাঝে কাক ডেকে

সেলাই শিক্ষা

উঠছে। সমস্ত পরিবেশেই যেন ছোঁয়া লেগেছে সেই বিষাদের। হঠাৎই সব কিছু থেকে নিজেকে জোর করে মুক্ত করে নিয়ে গীতিদি সেই সকালের শাসনের গলায় বলে উঠলেন, 'দেখে তো গেলেন সব, শেষকালে লিখবেন তো এইটুকু।" বলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনির সাহায্যে একটি মাপ বোঝাবার মুদ্রা দেখালেন। চোখে সেই তিরস্কারের ভঙ্গী। আমি বললুম, 'এত কাজ এটুকুর মধ্যে লিখব এত বড় প্রেসি রাইটিং এর ক্ষমতা ঈশ্বর আমাকে দেবনি।'

অফিসের গাড়ির চালক দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি ভেতরে সেঁধিয়ে গেলুম। চালক তার জায়গায় বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়ি এগিয়ে চলল। পেছনে তাকিয়ে দেখি দুই মহিলা তখনও হাত নাড়ছেন।

আরও যা হচ্ছে

- সমিতি দরিদ্র এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য বছরে ১০টি বৃত্তির বন্দোবস্ত করেছেন
- প্রতি বছর দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র এবং কম্বল বিতরণ করেন।
- দুটি কেন্দ্রে ষাটজন ছাত্রছাত্রীকে (ন থেকে চোদ্দ বছরের মধ্যে) নন ফর্মাল স্কুলে শিক্ষা দেন।

সমিতির বাঁধানো নালা।

ক্ষয়ক্ষতি রোধ করার শক্তি পালিশের কতটুকু! কিন্তু টাচ উড আপনার সখের কাঠের ফার্নিচার সব ধকল থেকে বুক দিয়ে আগলে রাখে!

ফের পালিশ করার দুর্ভাবনা নেই।
টাচ উড-এর পলিইউরেথেন ফিল্ম দেয় আঁচড় বা ময়লা ছোপ পড়া অথবা বাচ্চাদের দৌরাত্ম থেকে ষোলআনা সুরক্ষা।

পালিশ যথেষ্ট মজবুত ঘাতসহ নয়

পালিশ করার পর কাঠের ফার্নিচার ঝকঝকে সুন্দর দেখায় বটে কিন্তু চা-দুধ বা অন্য কোন তরল পদার্থ চলকে পড়লে এমন ময়লা ছোপ ধরে যে আবার পালিশ-না করা পর্যন্ত সেগুলো চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যাপারটা হচ্ছে, পালিশ যে আস্তরণ ফেলে সেটা যেমন পাতলা তেমনি পলকা, তাই ময়লা ছোপ বা আঁচড়ের দাগ পড়া ঠেকাতে পারে না।

ফলে দু'এক মাসেই আপনার সাধের ফার্নিচারে ময়লা ছোপ আর আঁচড়ের দাগ প'ড়ে খুব বিশ্রী দেখায়।

টাচ উড ঃ পলিইউরেথেনের প্রচণ্ড শক্তি

টাচ উড-এ আছে সুদৃঢ় প্লাস্টিক — পলিইউরেথেন, এটি যে শক্ত পুরু আস্তরণ ফেলে তা কাঠের গায়ে দারুণ ভাবে সেঁটে থাকে।

এই আস্তরণ গরম বা ঠান্ডা চলকে-পড়া তরল পদার্থের ছোপ এবং আঁচড়-পড়া দীর্ঘকাল প্রতিরোধ করতে পারে।

শুধু তাই নয় কাঠের নিজস্ব স্বাভাবিক জৌলুষ ধরে রাখে বছরের পর বছর। অথচ পালিশ করালে ক'দিন আর থাকত জেল্লা, পালিশ চটে-ফেটে দু'দিনেই ম্যাড়মেড়ে কুশ্রী দেখাত।

মনের সুখে টাচ উড লাগান! শুকোতে একটু সময় নেয় বটে কিন্তু সুরক্ষাও যে দেয় অনেক বেশি!

রঙের মতই টাচ উড একাধিক কোট লাগাতে পারেন — আর এ কাজ যে-কোন রঙের মিস্ত্রির কাছে কিছুই না। একবার পালিশ করার বদলে টাচ উড লাগিয়ে দেখুন, আপনার ফার্নিচার বছরের পর বছর কী দারুণ সুন্দর দেখায় — ঝকঝকে একেবারে নতুনের মত।

টাচ উড পুরু, সুদৃঢ়, সুরক্ষাকারী আস্তরণ ফেলে যা পালিশ পারে না। তাই এটা শুকোতে একটু সময় নেয়, কিন্তু সেটা কোনমতেই দরজা-জানালা রঙ করার চেয়ে বেশি নয়।

টাচ উড সুরক্ষা ফার্নিচারের প্রতিটি খাঁজ-খোঁজে এমনকি ফাঁক-ফোকরে, আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।

টাচ উড এর গোড়ার খরচটা পালিশের চেয়ে সামান্য বেশি পড়ে বটে, কিন্তু পালিশের চেয়ে ঢের বেশি কাল ধরে সর্বাঙ্গীণ সুরক্ষা ও সৌন্দর্য আপনার সাধের কাঠের ফার্নিচারগুলো ধরে রাখে বলে আখেরে অনেক বেশি গুণ পুষিয়ে যায়।

গ্লসি অথবা ম্যাট ফিনিশ

পালিশের বেলায় আপনার পছন্দের কোন সুযোগ নেই কিন্তু টাচ উড পাবেন দু'রকম — গ্লসি অথবা ম্যাট ফিনিশ, আপনার যেমন পছন্দ। আর অনন্য টাচ উড স্টেনার-এর ছোঁয়ায় সাধারণ কাঠও দেখাবে বনেদী দামী কাঠের মত।

সহজে পাওয়া যায়

টাচ উড যে-কোন এশিয়ান পেন্টস ডীলারের কাছে পাবেন।

একবার টাচ উড লাগালেই বুঝবেন আপনার সাধের কাঠের ফার্নিচার কী সুন্দর ঝলমলে দেখায়, আপনার ঘর আলো করে রাখে।

TOUCH WOOD

মনের সুখে লাগান, কাঠে নতুন প্রাণ জাগান!

এশিয়ান পেন্টস

১০ অক্টোবর ১৯৮৭ পাঁচ টাকা

দেশ

"গোবিন্দের যখন কুষ্ঠরোগ হয়েছিল, আমরা তাকে ভরসা দিলাম যে, ভয় ছাড়া তার আর কিছুই হারাবার নেই"

"গোবিন্দ ভয়ে এবং লজ্জায় ফিস্ ফিস্ ক'রে উচ্চারণ করলো, 'আমার কুষ্ঠরোগ হয়েছে। ডাক্তারবাবুও তাই বলেছেন। আমি জানি, এবার আমার চাকরীটা গেল। চুরমার হয়ে গেল আমার ঘর সংসার, আমার জীবন। কেউ-ই আমায় আর চাইবে না। আমার দেহে দেখা দেবে বিকৃতি····' ওর দু'চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো নীরব অশ্রু। এখন আমি বুঝলাম, কেন গোবিন্দ কাজে ক্রমশই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল এবং অন্যান্য কর্মীদের কাছ থেকে কেন ও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতো। আশ্বস্ত ক'রে আমি বললাম, 'শোনো গোবিন্দ, কুষ্ঠরোগ যদি তোমার হয়েই থাকে, পরিচালন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সমর্থন ও সাহায্য থেকে তুমি বঞ্চিত হবেনা। তোমার চাকরী যাবার তো কথাই ওঠেনা।'

গোবিন্দের সমস্যার কথা জানাতেই পরিচালন কর্তৃপক্ষ একবাক্যে সমর্থন ও সাহায্য দিতে রাজী হন। ডাক্তারের পরামর্শমত ওর রোগ যাতে অসংক্রামক করা যায়, তার জন্য চিকিৎসা করাতে গোবিন্দ ছুটি পেল। আমরা ওর পরিবারকে বোঝালাম, কুষ্ঠরোগ আর পাঁচটা রোগের মতই। ওর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের মধ্যে তা সংক্রামিত হবার কোনো আশঙ্কা নেই। লক্ষ্য রাখলাম, গোবিন্দ তার স্বাভাবিক জীবনযাপন যাতে ঠিকমত করে। মাঝে মাঝে যখন ও বিমর্ষ হয়ে পড়তো, আমরা ওকে দিতাম সাহস, মনোবল ও আশা।

ওর রোগ অসংক্রামক হবার পর গোবিন্দ আবার কাজে ফিরে আসে। সহকর্মীরাও তাকে উৎসাহিত করে।

কিছুদিন আগে ডাক্তারবাবু গোবিন্দকে সুখবর দেন যে, আর কয়েকমাসের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে। আমি খুশী এই ভেবে যে, কিছুই সে হারায়নি — চাকরী নয়, পরিবারের ভালবাসা নয়, সামাজিক মর্যাদা নয়। বলতে গেলে, অহেতুক ভয় ছাড়া আর কিছুই সে হারায়নি।"

কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায় — ভয় পাবেন না, চিকিৎসা করান

- গোড়াতে রোগ ধরা পড়লে এবং নিয়মিত চিকিৎসা করালে কুষ্ঠরোগে অঙ্গ বিকৃতি ঘটে না। চরম অবস্থায় অঙ্গ বিকৃতি ঘটলে সব সময় ভালো নাও হতে পারে।
- অন্যান্য সব সংক্রামক রোগের তুলনায় কুষ্ঠরোগ সব থেকে কম সংক্রামক।
- যে কোনো ব্যক্তিরই কুষ্ঠরোগ হতে পারে। তবে বেশীর ভাগ লোকেরই আছে নিজস্ব প্রতিরোধক ক্ষমতা।
- কুষ্ঠরোগের যেসব নতুন ঘটনা ধরা পড়ছে, তারমধ্যে ৩০% শিশু। তবে হ্যাঁ, কুষ্ঠরোগ বংশগত নয়।

প্রাথমিক লক্ষ্মণসমূহ

- ত্বকে ফ্যাকাশে বা লাল্‌চে দাগ — মসৃণ, চকচকে অথবা শুষ্ক।
- দাগের অংশটুকু সম্পূর্ণ অসাড়।
- লোম উঠে যাওয়া অথবা ঐ অংশতে ঘাম না হওয়া।
- দাগের কাছে বা চারপাশে কাঁটা বেঁধার মত বা পিপড়ে হাঁটার মত অনুভূতি।

আপনার সমর্থন মূল্যবান

কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য আপনার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবগণ যে জানেন — এবিষয়ে সুনিশ্চিত হন এবং কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণের জাতীয় কর্মসূচীকে সমর্থন করুন। শুরুতে রোগ নির্ণয় করাতে এবং সরকারী ক্লিনিক ও হাসপাতালে নিয়মিত চিকিৎসা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করুন। স্বাভাবিক জীবনযাপনে কুষ্ঠরোগীদের সাহায্য করুন যাতে সমাজে তাঁরা নিজেদের স্থান খুঁজে নিতে পারে।

নিরাময়ের প্রকৃত পরশ আসবে আপনার কাছ থেকেই

আরো বিবরণের জন্য লিখুন :
কুষ্ঠরোগ চেতনা অভিযান
ইউনিসেফ তথ্য সেবা কেন্দ্র
৭৩, লোদী এস্টেট, নতুন দিল্লী-১১০০০৩

কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রনের জন্য ভারত সরকারের কর্মসূচীর প্রতি সমর্থনসূচক এক যুক্ত জনসেবা।

সমষ্টিগত সমর্থনের অভাবে কুষ্ঠরোগীদের প্রকৃত পরিচয় গোপন থেকে যায়।

দেশ

১০ অক্টোবর ১৯৮৭ □ ৫৪ বর্ষ ৫০ সংখ্যা

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

বিজ্ঞান

বিশেষ নিবন্ধ

গল্প

কবিতা

ধারাবাহিক উপন্যাস

ধারাবাহিক রচনা

নিয়মিত

প্রচ্ছদ

বিমল দাস

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

১৯

ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে এখন বিশ্ব ক্রিকেটোৎসবের উদ্দাম হাওয়া। ভারত-পাক ভ্রাতৃত্ববন্ধনের ঐতিহাসিক সম্মিলিত আয়োজনে উনিশ-শ' সাতাশির এই রিলায়েন্স কাপ নামক বিশ্বকাপ একদিনের ক্রিকেট ইতিহাসে এক স্মরণীয় সংযোজন হয়ে থাকবে। একাত্তর সালে এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে মেলবোর্নের মাঠে এই একদিনের ক্রিকেটের সূচনা। শুরুর সংশয় পেরিয়ে আজ সে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। এবারের একদিনের বিশ্বকাপে বিশেষভাবে সৌভাগ্যবান এ-রাজ্যের ক্রীড়ামোদীরা। এই ইডেনেই তাঁরা সুযোগ পাবেন বিশ্বকাপের ফাইনাল তথা বর্তমান বিশ্বের

সেরা ক্রিকেটারদের খেলা দেখবার। ওই শারদোৎসবের সঙ্গে সঙ্গেই তারা মেতে উঠেছেন ক্রিকেটোৎসবের উন্মাদনায়। বিশেষ করে হয়তো তাঁরা আবার পাবেন টেস্ট ক্রিকেট থেকে সদ্য বিদায় নেওয়া তাঁদের প্রিয় গাওস্করকে। অবশ্য যদি ভারত ফাইনালে উঠে আসতে পারে। কে এবার ফেবারিট? ভারত, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ না অস্ট্রেলিয়া? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা? এই নিয়ে বিশ্বের প্রবীণ, নবীন সেরাদের সাক্ষাৎকার, অভিমত, আলোচনা এবং তারই পাশাপাশি বিশ্বক্রিকেটের আদ্যোপান্ত তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে সাজানো হয়েছে এবারকার প্রচ্ছদনিবন্ধগুচ্ছ।

৮৭

সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আবার শীর্ষে। কিসে? রুগ্ন শিল্পে। বর্তমানে পৌনে উনিশ হাজার রুগ্ন শিল্প রয়েছে এই রাজ্যে। তার ওপর দেড়শতাধিক বড় কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবছর। উঠে যাচ্ছে কারখানা একে একে অন্য রাজ্যে। এক কথায় দারুণ ধস নামছে রাজ্যের অর্থনীতির। এর উদ্ধার ভাবনা এখানে।

২৫

বেপরোয়া, আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে সিদ্ধহস্ত প্রাক্তন ক্রিকেটার মুস্তাক আলি হতেন একদিনের ক্রিকেটের পক্ষে আদর্শ খেলোয়াড়। এক একান্ত সাক্ষাৎকারে ও নানা প্রসঙ্গে তিনি এখানে প্রচণ্ড অফেন্সিভ।

৯৯

ভূমিকম্প, সমুদ্রঝড় বা অগ্নিগিরির উদ্‌গীরণের পূর্বাভাস এখনও বিজ্ঞানের অনায়ত্ত হলেও খরা-বন্যার আগাম খবর দিতে সক্ষম কৃত্রিম উপগ্রহ, ইলেকট্রনিক্স। দশ বছর আগেই এই খরা-বন্যার হুশিয়ারি দিয়েছিল 'ফাও'। তবু প্রাক্-প্রতিরোধ নেই। খরার আগুন না জ্বললে, বানে সব না ভাসলে ত্রাণের পর্ব শুরু হয় না। কেন এমন

৩৯

এম. সি. সি-র দ্বিশতবার্ষিকী ম্যাচের মধ্যেই গাওস্কর ঘোষণা করলেন এটিই তাঁর শেষ পাঁচ দিনের ম্যাচ এবং আমরা জেনেও গেছি বিশ্বকাপই তার শেষ বড় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। অর্থাৎ মাঠ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে আরও একটি আকর্ষণ। ক্রিকেট উৎসবে তাই তাঁকে নিয়েই একটি রচনা।

“প্রকৃত মহরম”

ডাঃ মাওলানা ছৈয়দ মহাসিন রাজা
হুগলি এমামবাড়া, হুগলি

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক “দেশ” পত্রিকা তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, যাহাতে মহরমকে আবুল বাশার কাল্পনিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত প্রবন্ধ হইতে অনুমান করা যায় যে, যে-সমস্ত বিষয়ের উপর প্রবন্ধ রচনা, তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। তাঁহার রচনায় যাহা বর্ণিত হইয়াছে এমন প্রকারের বর্ণনা কোন হাদিছ এমন কি কোর-আন-এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। যাঁহারা প্রবন্ধ পড়িতেছেন তাঁহারা জানিতে পারিতেছেন না যে, লেখক কোন মাজহারের (ধর্মের) ব্যক্তি। প্রবন্ধটি এমনভাবেই রচিত হইয়াছে যাহার উপর কোন শিক্ষিত ব্যক্তি (যাঁহার ধর্ম জ্ঞান আছে) ইহার উপর গুরুত্ব দিতে পারে। এই প্রবন্ধে ইস্‌লামিক ঘটনাকে অস্বীকার করা হইয়াছে আর ইহার সঙ্গেও কিছু মিথ্যা ঘটনা সংযুক্ত হইয়াছে। আর এই ভুল প্রবন্ধ সংশোধন করিবার জন্য মহরমের সত্য ঘটনা বর্ণনার বিশেষ প্রয়োজন।

দুনিয়ার প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহের শেষ নবি হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সঃ)-এর উপর অন্তর দিয়া বিশ্বাস রাখে এবং তাঁহার রীতি-নীতির উপর সবাই বিশ্বাস রাখে। তাঁহাকে প্রকৃত খোদার প্রেরিত দূত বলিয়া মান্য করে। আর আল্লাহর কেতাব কোর-আন হইতে পয়গম্বরে ইসলাম যে-কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক মুসলমান যাহা অন্তরদ্বারা বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন তাহা করিয়া থাকে। আর যাহা কর্মের মাধ্যমে তাহা কর্মের দ্বারাই করিয়া থাকে। যেমন, নামাজ, রোজা ইত্যাদি। আর যে-সমস্ত বিষয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা করিয়াছেন তাহা করে না। হঃ মোহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনে প্রকাশ্যভাবে যে-ঘটনাগুলি ঘটিয়া ছিল সেই সমস্ত ঘটনাবলীর অমান্যকারিগণকে রাছুলের শত্রু বলা যাইতে পারে। অনুরূপ একটা ঘটনা যাহাকে মেরাজ বলা হয়। এই ঘটনার প্রমাণ কোর-আন পাকের ভিতরে সারাহ বানি ইস্‌রাইল-এর প্রথম আয়াত (স্তবক)-এর মধ্যে বর্ণিত আছে, আল্লাহতয়ালা নিজের প্রিয় (রসুল)কে আসমান ভ্রমণ করাইয়াছেন। এই ঘটনাকে অস্বীকার করা কোন মুস্‌লমানের পক্ষে সম্ভব নহে।

লেখক মহাশয় আমেরিকার বৈজ্ঞানিক উন্নতিকে চোখ বন্ধ করিয়া স্বীকার করিয়া নেন এবং আমেরিকা যাহা বলে তাহাতেও কোন সন্দেহ করেন না। কিন্তু হুজুর (সঃ)-এর মেরাজ উনি সন্দেহ করেন। অবশ্য এই সন্দেহ হওয়াও উচিত, কেন না তাহার মালিক আমেরিকা, সউদি বাদশাহদের দ্বারা যে-মত পৃথিবীতে প্রচার করিতেছেন তাহার আদেশ ঠিক এইরূপ যে হুজুর (সঃ)-কে মানো আর না মানো সৌদি বাদশাহদের অবশ্য মানো। যাহা হউক হুজুর (সঃ)-এর মেরাজ এর ঘটনা এমনই এটা সত্য আছে। যাহা জ্বলন্ত সূর্য হইতে আরও উজ্জ্বল। লেখক হুজুরের (সঃ) বড় মোজেজা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ড করাকে অস্বীকার করিয়াছেন। যাহার দলিলে কোর-আন্-এর সুরাহ কামার আছে। এবং কোর-আন্-এর বক্তব্য অনুসারে মোজেজার অস্বীকারকারি কাফের হয়। হযরত আলি (আঃ)-এর জন্য সূর্য ফিরে আসাকেও তিনি অস্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যেইরূপ মহরম একটা মিথ্যা ঠিক সেইরূপ ইহাও এক মিথ্যা। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সক্ষম এবং তিনি নিজের প্রিয় বান্দার জন্য নিজের কুদরতের দ্বারা সূর্যকে পাল্টাইতেও সক্ষম এবং নিরক্ষর ব্যক্তিরা ইহা বুঝিতে অক্ষম। হযরত আলি (আঃ)-এর জন্য সূর্য ফিরিয়া আসার ঘটনা প্রমাণস্বরূপ অনেক পুস্তকের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। যথা রওজাতুলএহবাব খণ্ড ১ম, পৃষ্ঠা ৩৯৪, সিরাতুল হালবিয়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৬, সিরাতুল নববিয়া ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৩৫, মানাহেজুন নবুওয়াত পৃষ্ঠা ৩৫৭, মোবাহেবুল লাদুনিয়া কাছতালানি ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৮, তারিখে খামিছ ইত্যাদি এই সকল পুস্তককে প্রথমে অস্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইলেই হযরত আলি (আঃ)-এর মোজেজাকে অস্বীকার করা যাইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে লেখক হাজারে আস্‌ওয়াদকে অপমানিত করিয়াছেন। হাজারে আসওয়াদ মুসলমানদের নিকটে অতি সম্মানের বস্তু।

কেন না হাজারে আসয়াদ বেহেস্ত হইতে আগত পাথর যাহার জন্য মুসলমানেরা ইহাকে চুম্বন দিয়া থাকেন এবং হুজুরে (সঃ)-ও চুম্বন দিতেন। উক্ত সমস্ত সত্য ঘটনাবলিকে অস্বীকার করিবার পরে জানি না লেখক মহাশয় ওহাবি আছেন, ইহুদি আছেন, ইছায়ি আছেন বা কাফের আছেন। আবুল বাশার সাহেব রছুলের প্রিয় কন্যা: হযরত ফতেমারও ঐ প্রকার সম্মান হানি করিয়াছেন এবং নিজমতে ইহার প্রকাশ করিয়াছেন।

যে এমামে হাসান (আঃ)-ও এমামে হোসেন (আঃ) দুই ব্যক্তিরই শাহাদাৎ মায়ের অভিশাপের ফল—ইহা এমন একটি প্রকাশ্য মিথ্যা যাহার কোন প্রমাণ কোন পুস্তকে বর্ণিত নাই। ইহা অবশ্যই সত্য যে, মহান আল্লাহ হযরত ফতেমাকে এত সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছেন যে তিনি যখন মদিনায় এবাদত করিতেন তখন সমস্ত মদিনা তাঁহার রূপের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। ইহা কখনই কি হইতে পারে যে, হযরত ফতেমার স্বামী হযরত আলি (আঃ)-ও জানিবেন না যে তাহার স্ত্রী কিরূপ আছেন এবং তাহার পুত্রগণ “মা” সম্পর্কে আলি (আঃ)-কে জ্ঞাত করাইলে তিনি অভিশাপ দিবেন যে এক জনের মৃত্যু জহরের দ্বারা হউক, অপর জনের মৃত্যু কাহরের দ্বারা? কোনও বিবেক ইহা কি গ্রহণ করিতে পারে? রসুলের (সঃ) প্রিয় কন্যা যাঁহার সম্মানে বহু হাদিছ আছে, নিজের প্রিয় পুত্রদের অভিশাপ দিবেন! যদি এমাম হাসান (আঃ) এবং এমাম হোসেন (আঃ)-এব অভিশাপের ফল হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গের বাচ্চাদেরও কি অভিশাপ দিয়াছিলেন? রছুলের (সঃ) হাদিছে কোন ঘরে পুরিবেন? এমাম হাসান (আঃ)-ও এমাম হোসেন (আঃ)-এর শত্রুতায় মনোমত কথা পেশ করা খুবই সহজ কিন্তু তাহার প্রমাণ দেওয়া খুবই মুশকিল—যেমন এই যুগের বহু লেখক ও বক্তাগণের অভ্যাস আছে।

রসুলের (সঃ) যুগে মোনাফেকগণ হাত বাঁধিয়া নামাজ পড়িত এবং হাতের মধ্যে ছোট ছোট পৌত্তলিক লুকাইয়া রাখিত, আল্লাহের আদেশে রসুলের (সঃ) হাত খুলিতে বলিয়াছেন, যাহার ফলে ঐ সমস্ত পৌত্তলিক হাত হইতে পড়িয়া যায়। ইহার ফলেই মোনাফেকদের পরিচয় পরিষ্কার হইয়া যায়। মোনাফেকদের উক্ত আমল এত অপমান জনিত ছিল, যাহার পরিপ্রেক্ষিতেই এমামে মালিক (রাঃ) নিজের ভক্তদের হাত খুলিয়া নামাজ পড়িবার হুকুম দিয়াছেন। শিয়ারা নামাজ পড়িবার সময়ে পাক মাটির সেজদা গাহ এই উদ্দেশ্যে রাখে যে তাহারা নিজের পাক ও পবিত্র খোদার সিজদাহ পাক ও পবিত্র স্থানে করিতেই ইচ্ছুক। লেখকের মতো নহে যে যেখানে সেখানে সেজদাহ করিয়া নিলেন। ইহা দেখিবারও প্রয়োজন না যে সেই স্থান পাক আছে কি না আছে।

যাহা হউক ইসলাম একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধর্ম। ইহাতে কোনরূপ ত্রুটি নাই। এই পাক ও পরিচ্ছন্ন ধর্মকে আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) বড় কষ্ট সহ্য করিয়া সমস্ত মুসলমানদের তুলিয়া দিয়াছেন। রছুলুল্লাহের (ছঃ) পরে হযরত আলি (আঃ) ও হযরত এমাম হোসেন (আঃ) নিজ দিগের জীবন দিয়ে এই পাক মাজহাবকে রক্ষা করিয়াছেন। এই জন্য দুনিয়ার মুসলমানগণ এমাম হোসেন (আঃ) আত্মত্যাগের স্মৃতি পালন করিয়া থাকেন। কেবল মাত্র তাহাই নহে, বহুজাতির আমাদের এই ভারতবর্ষে মুসলমানদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ভাই স্বরূপ অতি পবিত্রতা ও সম্মানের সঙ্গে মহরম পর্ব পালন করিয়া থাকেন। কেননা তাঁহারা এমাম হোসেন (আঃ)কে সত্যের পতাকা উত্তোলনকারী মনে করিয়া থাকেন। আজ পর্যন্ত কোনও মানুষ হোসেন (আঃ)-এর মতন আত্মত্যাগ করিতে পারিবেন না এবং হোসেন (আঃ)-এর মত জীবনের উদাহরণ দিতে পারেন নাই। এই জন্য পৃথিবীর সমস্ত মানুষ হোসেনের (আঃ) দুঃখে শরিক হইয়া থাকেন অবশ্য লেখক যাঁহাদের মানেন, তাঁহাদের চরিত্র এত ভ্রান্ত ছিল যে কিছু মুসলমান তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। মহরম মাসে হোসেন (আঃ) স্মৃতিকে জানিতে হইলে কতকগুলি ঘটনা অবশ্যই জানিতে হইবে। রসুলুল্লাহের (সঃ) পরে এজিদ ও এজিদের বংশধর রাজত্বের অহংকারে মানুষকে নিজের দাস মনে করিয়া নিয়াছিল। দুর্বল শ্রেণীর উপর অত্যাচার, অধিকার, লুঠ, মিথ্যার সম্প্রসারণ এজিদের সময়ে সম্পূর্ণভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এমাম হোসেন (আঃ) নিজের নানার মাজহাবকে

নিজের চক্ষের সম্মুখে ধ্বংসকে সহ্য করিতে পারেন নাই—ইহাই এজিদের নিকট বড় বিপদ ছিল। এই জন্য যখন এজিদ বাদশাহ হইল তখন সর্ব প্রথম আদেশ ইহাই জারি করে, "হোসেন (আঃ)-এর মাথা কাটিয়া আমার সম্মুখে পেশ করা হউক।" এমাম হোসেন (আঃ)-এর সমস্ত ঘটনার উপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি ছিল ; অতএব মদিনাকে যুদ্ধ থেকে রক্ষা করাইবার জন্য মদিনা ত্যাগ করিয়া মক্কায় আসেন এবং হজ্ব করিতে চাহেন। এজিদ সেখানেও হাজিদের ছদ্মবেশে ইমাম হোসেন (আঃ) কাতেল করাইবার জন্য লোক পাঠান। এমাম হোসেন (আঃ) বুঝতে পারেন এবং মক্কা ত্যাগ করেন। এজিদ নিজের গভর্নর ইবনে জিয়াদের দ্বারা ইমাম হোসেন (আঃ)-কে বন্দী করিতে চাহেন কিন্তু হোসেন (আঃ) অপমানিত জীবনকে সম্মানিত মৃত্যুর উপর ত্যাগ করেন।

এজিদের সৈন্য কারবালায় হোসেন (আঃ)কে ঘিরিয়া ফেলেন ও এমামের (আঃ) উপর অত্যাচারের এমন ইতিহাস রচনা করেন যাহার জন্য সমস্ত ধর্ম মতাবলম্বীগণ এজিদীদের আজও ঘৃণার চক্ষে দেখেন। ছোট ছোট বাচ্চারা ক্ষুধা ও পিপাসায় আছড়াইতে থাকে এবং তাহাদের হত্যা করে। এমন কি ছয় মাসের বাচ্চাকেও পানি দেয় নাই ও হত্যা করে। এমাম হোসেন (আঃ) এজিদওয়ালাদের বুঝাইতে থাকেন ও মনুষ্যত্বের পথের সন্ধান দেখাইতে থাকেন। কিন্তু তাহারা কিছুতেই শোনে না এবং অত্যাচার করিতেই থাকে। অসুস্থদের উপর চাবুক দ্বারা প্রহার করে, রসুলের (আঃ) ঘরের নারীদের বন্দী করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে তামাশা প্রদান করে এবং পূর্ণ এক বৎসর যাবৎ কাল বন্দী অবস্থায় রাখে। ইমাম হোসেন (আঃ) নিজের আত্মত্যাগের দ্বারা মনুষ্যত্বকে এত উর্ধ্বে তুলিয়া দিয়াছেন যে আজ প্রত্যেক ধর্মের লোক খুবই সম্মানের সহিত উচ্চারণ করেন। কিন্তু লেখক, যাহার নাম তো মুসলমানের মতোই আছে, তিনি হিংসার আগুনে পুড়িতেছেন। এমাম হোসেন (আঃ) এবং ভীমের আত্মত্যাগ একইরূপ হইতে পারে না। এমাম হোসেন (আঃ) মনুষ্যত্বের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এবং ধর্ম অবলম্বীদের জীবিত করিবার জন্য আত্ম-উৎসর্গ করিয়াছেন এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহের ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন। এই জন্য হোসেন (আঃ)-কে সমস্ত শহীদগণের সর্দার বলা হয় এবং কোর-আন্‌এও আল্লাহ হোসেনের প্রশংসা করে। মহরম মাসে হোসেন (আঃ)-এর উপর এই জন্য কাঁদা হয় যে কারবালার ঘটনার পূর্বের রছুল (ছঃ) ঐ ঘটনার জন্য কাঁদিয়াছেন এবং কারবালার মাটিকে চুম্বন দিয়াছেন। যাহার প্রমাণ অনেক পুস্তকের মধ্যে আছে। জিব্রাইল (আঃ) কারবালায় মাটি আনিয়াছেন। এবং কারবালায় ঘটনা বর্ণনা করেন। যাহার জন্য রসুল (সঃ) কাঁদেন (রওজাতুছ্‌ছাফা ৩য় খণ্ড)। উম্মোল ফাজল বিনতে হারিছ হইতে বর্ণিত যে তিনি এমাম হোসেন (আঃ)কে হুজুর (সঃ) -এর নিকটে গিয়া হুজুরের ক্রোড়ে হোসেন (আঃ)-কে রাখিয়াছেন। তিনি বলেন, তখন আমি দেখি রসুল (সঃ) কাঁদিতেছেন।

উম্মোল ফাজল কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা, করেন তখন রসুল (সঃ) বলেন জিব্রাইল (আঃ) বলিয়াছেন আমার উম্মত এই সন্তানকে হত্যা করিবে (দেখুন মেশকাদ শরিফ)। মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ দেহলাবি ছাহাব নিজ পুস্তক ছিররুস শাহাদাতাইনে লিখিয়াছেন, যখন এই শাহাদাতের ঘটনা ঘটে তখন আল্লাহের তরফ হইতে উক্ত ঘটনার প্রচার শুরু হয়। মাটি হইতে রক্ত ওঠে, আকাশ হইতে রক্তের বৃষ্টি হইতে থাকে, অদৃশ্য আওয়াজ মরছিয়া পাঠ করে, জিন্নাতগণ নওহা পাঠ করে। আল্লাহ এই উম্মতের মধ্যে এই প্রচেষ্টা বর্তমান রাখিয়াছেন। যে-লোক সর্বদা ইহার উপর কাঁদে ও মাতম করিতে থাকে। ইহার দ্বারা পরিষ্কার হইয়া যায় যে হোসেন (আঃ)-এর কান্না, মাতম আল্লাহ জারি করিয়াছেন। নতুবা মাটি আকাশ পশু পক্ষী ও জেন্নাত কখনই হোসেনের (আঃ) শোক পালন করিত না। বড় পীর হযরত গওছুল আজম আব্দুল কাদের জিলানি ছাহাব নিজ পুস্তক গুনিইয়াতুত তালেবিন-এ বর্ণনা করিয়াছেন যে হযরত এমাম হোসেন (আঃ)-এর কবরের উপর আশুরার দিন সত্তর হাজার ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয়, যাহারা কেয়ামতে অবধি হোসেন (আঃ)-এর জন্য কাঁদিতে থাকিবে।

এখন আমি আবুল বাশার সাহেবের কাছে প্রশ্ন করিতেছি, আর ওঁর মতো প্রবন্ধ লেখকদের কাছে আমার প্রশ্ন, যে-সকল ব্যক্তিরা মুসলমানদের ধোঁকা দিবার জন্য এবং হোসেন (আঃ)-এর দুঃখে কান্না-কাটির জন্য যে সমস্ত উল্টা-পাল্টা কথা লিখিয়াছেন সত্যই কি রসুল (সঃ)-এর এই রকম তারিকা ছিল ? প্রবন্ধ লেখক বড় চাতুর্যের সঙ্গে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাজিয়া এবং আলমের বিরুদ্ধে না-প্রকাশ্যভাবে এ কথাও লিখিয়াছেন যে এমাম হোসেন (আঃ)-এর দুঃখের দিনে আনন্দ করো কেন না সমস্ত মুসলমান এজিদি বলিবে এবং উহার পিছনে লাগিবে, যাইবে। এবং ইহারার শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করে যাহাতে মানুষ ইসলাম ও সমস্ত বড় আত্মত্যাগ ভুলিয়া ফেলে ও এজিদিদের সন্তুষ্ট করিবার পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। উক্ত কার্যের জন্য যে বড় বড় অংক টাকার উপরে তাহারা পায় সেটাও বরবাদ না হয়ে যায় কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, কেন না খোদার নিকটে কাহারও কোন চেষ্টা চলে নাই এবং আমেরিকার অনুরাগীরা নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের মধ্যেই সীমিত হইয়া যায়। কেননা পৃথিবীর সমস্ত ন্যায়পরায়ণ লোক, যদিও তাহারা মুসলমান হউন বা অমুসলিম, ইমাম হোসেন (আঃ)-এর স্মৃতিপালনকে নিজের সম্মান মনে করিয়া থাকেন। মহরম মাসে ইমাম হোসেন (আঃ)-এর স্মৃতিপালনে সমস্ত মানুষ অংশ গ্রহণ করেন যাহা বিজ্ঞলেখকের নিকট অপছন্দ। তিনি চাহেন রসুলের (সঃ) সন্তান-এর স্মৃতি কেন পালন করা হইবে এবং তাঁহার পূর্বপুরুষ এজিদের স্মৃতি কেন পালিত হইবে না। এবং তাহার ইহাও অভিযোগ যে হিন্দুরা কেন এই স্মৃতি পালন করিয়া থাকেন। মনে হয়, বোধবিজ্ঞ লেখক মহাশয় এইটুকুও জানেন না, যে হিন্দুমতাবলম্বীরা রসুলুল্লা (সঃ), হযরত আলী (আঃ) ও এমাম হোসেন (আঃ)-কে বড় ভালোবাসেন এবং সম্মানের চক্ষে দেখেন এবং সম্মান করেন, ও মহরমে খোদার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন—যাহা পূর্ণ হইয়া থাকে। অবশ্য বিজ্ঞ লেখক মহাশয় যে মুসলমান বাদশাহদের নিকট হইতে ভিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাঁহাদের নিকট রসুলুল্লা (সঃ)-এর যখন কোন সম্মান নাই, তাঁহারা এমাম হোসেন (আঃ) কে কি সম্মান করিবে ? খোদা যেন ঐরূপ ব্যক্তিদের ভ্রান্তি হইতে সমস্ত মুসলমানদের রক্ষা করেন।

সংস্কৃতের ভূমিকা ও পণ্ডিতসমাজ

২০ জুন ১৯৮৭ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় "পণ্ডিতসমাজ" শীর্ষক নিবন্ধগুলি পত্রলেখকদের মধ্যে তেমন সাড়া জাগায়নি দেখে ক্ষুণ্ণমনেও কথঞ্চিৎ বিলম্বে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাইছি।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের রচনাটি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে। কিছু পরিমাণে হয়তো এর কারণ হল যে পারিবারিক বন্ধুতাসূত্রে তাঁকে জেনেছি আর প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, লক্ষ্মণ শাস্ত্রী 'দ্রাবিড়', হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ প্রমুখ মহাভাগকে দেখেছি আমাদের গৃহে। আরও কারণ হল রচনার প্রাঞ্জল বিশুদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে লেশমাত্র বিদ্বৎসুলভ অহঙ্কার ও অসূয়া-বিবর্জিত বিবৃতি। অপর রচনাগুলিও মূল্যবান এবং স্বাদু। শুধু বলতে চাই যে, পরিমিতিবোধ হারিয়ে রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর বিষয়ে সংস্কৃত সম্পর্কে তাঁদের সুগভীর অনুরাগ ও আবেগ ব্যাপারে সংশয়প্রকাশকে গর্হিত মনে করি। "সংস্কৃত হ্যয় কূপজল, ভাষা বহ্‌তা নীর",/ মহাত্মা কবির-এর এ-কথা নিয়ত শিরোধার্য। ভুলতে পারা যায় না যে কৃত্তিবাস-কাশীদাসকে তৎকালীন

পণ্ডিতবৃন্দ "সর্বনেশে" আখ্যা দিয়েছিলেন আর শাসিয়েছিলেন যে সংস্কৃতের মাতৃভাষায় অনুবাদ শুনলেই রৌরব নরকভোগ নিশ্চিত। ইতিহাস বলে যে মুসলমান শাসকদের অনুকম্পাতেই বঙ্গভাষার সমাদরের প্রারম্ভ। কিন্তু সংস্কৃতকে অতীতের এক 'মৃত' ভাষা মনে করার মতো মূঢ়তা যদি আজকের অগ্রসর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে তো তা হবে অপরিমেয় অভিশাপ। "হিমবৎ-সেতু-পর্যন্তং" বিস্তৃত আমাদের "গঙ্গা-মৌক্তিক-ধারিনী" "দেবনির্মিত" এই দেশের সংহতি সাধনে সংস্কৃতের ভূমিকা বিস্মৃত হবার মতো প্রত্যবায় থেকে আমাদের মুক্ত হতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'ছান্দসিক' আখ্যা দিয়েছিলেন সেই প্রবোধচন্দ্র সেন যথার্থই বলেছিলেন যে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা, কালিদাসের কাব্য, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতবর্ষকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করার যে প্রোজ্জ্বল প্রয়াস তার চিহ্নমাত্র নেই আধুনিক ভারতের আঞ্চলিক সাহিত্যে—অবশ্য যেমন সর্বত্র, তেমন এখানেও রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম। সংস্কৃতকে বিস্মৃত হলে শুধু দেশের সংহতি বিপন্ন নয়, সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষাকে গভীরভাবে আত্মস্থ করার পথেও অন্তরায় ঘটছে। কেমন করে ভুলি মাইকেল মধুসূদনের দর্প যে "সংস্কৃতের দুহিতা" আমাদের মাতৃভাষার বৈভবের তো অন্ত নেই?

আমার মতো ব্যক্তির কাছ থেকে এ কথাটাকে "ভূতের মুখে রামনাম" বলে হয়তো রহস্য শোনা যাবে। যে-মার্কসবাদে আমার প্রত্যয় তাকে বিদেশাগত বলে প্রায়ই নিন্দিত যাঁরা করেন, তাঁরা জানেন না যে জগতের কোনো বিশেষ প্রান্তে নয়, সর্বত্র "বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ" (সোভিয়েট দেশ সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থের নাম) যে বোধিপ্রাপ্তি ও কর্মযোগের প্রতিশ্রুতি তাই হল মার্কসবাদের অভিষ্ট। স্বয়ং কার্ল মার্কস্ বুঝি শেষজীবনে চেয়েছিলেন সংস্কৃত শিখতে, কিন্তু এ হল ভিন্ন প্রসঙ্গ।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত (আরবী, ফারসী, প্রভৃতি ধ্রুপদী ভাষার মতো) অবশ্যপাঠ্য ছিল। বর্তমানে বিদ্যার্থীদের উপর যে-প্রকার চাপ, তাতে শিক্ষাকে সুসমঞ্জস রেখে সংস্কৃতের সমাদর রক্ষা করা সহজ কর্ম নয়। কিন্তু সন্দেহ নেই যে সংস্কৃত চর্চার সম্ভাবনাকে বিকশিত করার দিকে দৃষ্টি দিতেই হবে। 'পণ্ডিতসমাজ'-এর অধুনাতন দুর্গতি মোচনও সহজ নয় কিন্তু তাও আজ আশু কর্তব্য। 'দেশ' পত্রিকা এ ব্যাপারে সুষ্ঠু ভূমিকায় নামলে সুখী হব। আবাল্য সংস্কৃত বিষয়ে অনুরাগ আর আবেগ অনুভব করেছি। লেশমাত্র সাম্প্রদায়িক কলুষ-স্পৃষ্ট না হয়ে উল্লসিত হয়েছি বেদমন্ত্র-সহ সংস্কৃতের অনন্তপার ভাণ্ডার থেকে উদ্ধৃত রত্নরাজির শব্দৈশ্বর্যে আর অর্থগৌরবে। স্কুলে 'হেড পণ্ডিত' বিজয়কৃষ্ণ কাব্যতীর্থের শুধু শিক্ষণপ্রতিভা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তেজস্বিতা, চারিত্র্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কলেজে দেখেছি কী স্বচ্ছন্দ সাবলীলভাবে রঘুবংশ পড়াচ্ছেন শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শুধু কালিদাসের শ্লোক নয় মল্লিনাথের কঠোর টীকাও কণ্ঠস্থ। পরে জেনেছি প্রায়-শ্রুতিধর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতো কোবিদ্‌কে। হয়তো এর একটা মায়াময় দিক আছে। যে-বিষয়ে অবহিত না থাকলে বিপদের আশংকা। বলছি এজন্য যে মনে পড়ে যাচ্ছে কিছুকাল আগে দিল্লীতে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর নামাঙ্কিত সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে ভাষণ দেবার পর আমার এক বন্ধু (রাজনীতি ক্ষেত্রে যশস্বী) কৌতুকচ্ছলেই বললেন যে ব্রাহ্মণাধিপত্য দেশকে কেমনভাবে বিমুগ্ধ করে রেখেছে তার আভাসও যেন পাওয়া গেল!

লোকসভায় চিন্তামন দেশমুখ, অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার প্রমুখ প্রকৃত সংস্কৃতপ্রেমিকের সাহচর্যে মাঝে মাঝেই সংস্কৃত উদ্ধৃতি দিতে পারি বলে পরিচিত হয়ে উঠেছিলাম। একটু হ্রস্ব স্বরে না হয় অহঙ্কারই করলাম যে মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকা একবার মন্তব্য করে বসে যে চোস্ত ইংরিজি বোলনে-ওয়ালা হয়েও আমার সংস্কৃত উচ্চারণে দক্ষিণী ব্রাহ্মণেরাও খুঁত খুঁজে পায় না। পঞ্চাশের দশকে একবার সংস্কৃত বিষয়ে দিবসব্যাপী আলোচনা, সংস্কৃত শ্লোকের ছড়াছড়ি। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকজন গুণগ্রাহীর শিরঃসঞ্চালন! বহু বৎসর লোকসভায় সহকর্মী আমার বন্ধু চপলাকান্ত ভট্টাচার্য (আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক) ছিলেন পারঙ্গম, উচ্চারণে কথঞ্চিৎ 'বঙ্গীয়' হলেও অজস্র শ্লোক তাঁর জিহ্বাগ্রে। তাঁর কাছে জেনেছিলাম মোরাদাবাদে কাংস্যপাত্রে উৎকীর্ণ শ্লোক খোদাই করেছে অক্ষরজ্ঞানহীন মুসলমান কাংস্যকার: "লক্ষ্মীঃ কৌস্তুভপারিজাতক সুরা/ ধন্বন্তরীশ্চন্দ্রমা/ গাবঃ কামদুঘা সুরেশ্বরগজো/ রম্ভাদি দেবাঙ্গনাঃ/ অশ্বঃ সপ্তমুখো বিষম্ হরিধনুঃ/ শঙ্খোমৃতম্ চাম্বুধেঃ/ রত্নানীহ চতুর্দশ প্রতিদিনং/ কুর্যুঃ সদামঙ্গলম্"। এটাকে 'সেকুলর' মঙ্গলাচরণ আখ্যা দিয়ে সংস্কৃতপ্রেমী কমলাপতি ত্রিপাঠী আর কর্ণ সিংকে শোনাতে তাদের কী উল্লাস!

স্কুলে সংস্কৃত 'অ্যাডিশনাল' নিয়ে পড়ত আমার দুই সহপাঠী বন্ধু, আবদুল বুরহান আর গোলাম মহীউদ্দীন। কে না জানে অলবরুনি থেকে আবুল ফজল, কাশ্মীররাজ জৈনুল আবেদিন থেকে শাহ্‌জাদা দারা শিকোহ্ সংস্কৃতের গভীর গুণগ্রাহী ছিলেন। অধুনাতন কালে বেদ অধ্যয়নে বিশ্বিত হয়েও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাঙালী আচার্যদের শিরোমণি ছিলেন। স্বাধীন স্বতন্ত্র বাংলাদেশে দেখি

আহমদ শরীফ্-এর মতো মুক্তমতী মনস্বী যার চিন্তায় ও রচনায় সংস্কৃত বিষয়ে শুধু আগ্রহ নয় অনুরাগও সুস্পষ্ট । আর, বাংলাদেশের লেখায় সংস্কৃত শব্দাবলীর অবাধ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার । সংস্কৃতের নামে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ সৃষ্টি করে শুধু যারা নিছক অনর্থকারী ।

যাদের সহায়তায় আমার মার্কস্‌বাদী প্রত্যয় দৃঢ়ীভূত হয়েছে তাদের মধ্যে নাম করে বলব শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের ভাগিনেয়, আমার বহুদিনের সুহৃৎ অধ্যাপক জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য (কিছুকাল বিধান পরিষদ সদস্য) । আরও উল্লেখ করব প্রয়াত ভারতরত্ন মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামণ কাণে-র নাম—তাঁকে জেনেছি সংসদ সদস্যরূপে এবং ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক মহাগ্রন্থ রচয়িতারূপে । স্বয়ং কালিদাস বলে গেছেন : "পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং" । কিন্তু অপর পক্ষে প্রাচীন বলে সংস্কৃত সাহিত্যকে (যার পরিধি পরিমাপ করা যায় না) প্রগতিবিরোধী মনে করা অবাচীন অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যমাত্র ।

বৈদিক ঋষি বলতে কুণ্ঠিত হননি : "অয়ং লোকঃ প্রিয়তমঃ", আর "পশ্যেম শরদঃ শতম্, ভূয়োপি শরদঃ শতম্" বলে দীর্ঘজীবন চেয়েছেন । বহু যুগ পূর্বে শ্রেণীসমাজ আবির্ভূত হয়েছে, তাই আজও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বর্ণহিন্দুর প্রার্থনা : "যা চিতারশ্চ নঃ সন্তু, মা চ যাচিস্ম কম্‌চন" (ভাবার্থ : "এমন যেন হয় যাতে অনেকে আমাদের কাছে চাইবে আর আমরা দিতে পারব, কারও কাছে যাচ্‌ঞা যেন করতে না হয় !") । মহাভারতে চিরজীবী বলে বর্ণিত বকঋষির কথা যে সবচেয়ে বড়ো সুখ হল দিনান্তে নিজগৃহে শাকান্ন গ্রহণ করার মতো আত্মমর্যাদা আর সবচেয়ে বড় দুঃখ হল উদ্ধত ধনীর কাছে সেই আত্মমর্যাদা হারানো । শম্বর মুনি প্রশ্নোত্তরে বলেন, পতিপুত্রহারা হয়ে থাকার চেয়েও "পরম দুঃখ" হল দারিদ্র্য, যা হল "পর্যায়মরণম্" (তিলে তিলে মৃত্যু) । বালক ধ্রুব তপস্যার বর কি চায় জিজ্ঞাসা করে ব্রহ্মাকে শুনতে হয়েছিল : "বিশ্বের স্বস্তি হোক, বর চাই না !" একই সঙ্গে 'বৈরাগ্যশতক' আর 'শৃঙ্গারশতক'-এর রচয়িতা হলেন ভর্তৃহরি যার সম্বন্ধে জার্মান মনীষী হেরমান্ হেস্‌স্য-এর (Hermann Hesse) উক্তিঃ "হে আমার অগ্রজ সহোদর, তোমার মতো আমিও আজীবন চলেছি স্বভাবের তাড়না আর অধ্যাত্মচিন্তার আঁকা-বাঁকা পথে ; আজ আমি জ্ঞানী আর কাল আমি নির্বোধ, আজ আমি ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ আর কাল আমি ইন্দ্রিয়ভোগে বিভোর," এই ভর্তৃহরিই বলেছেন যার বিত্ত আছে সেই কুলীন, সেই হল পণ্ডিত, যশস্বী আর গুণবান, কারণ "সর্বেগুণাঃ কাঞ্চনমাশ্রয়ন্তি" । উদ্ধৃতি বাহুল্যে কণ্টকিত পত্রকে সমাপ্ত এখন না করলেই নয়, তবে একটা কথা না বলে পারছি না । মার্কস্-এর 'Capital' গ্রন্থের ঐতিহাসিক পরিচ্ছেদে 'ধনিকের আবির্ভাব' আখ্যায় অভিহিত অধ্যায় শেষে রয়েছে : "যদি ওজিয়ে-র কথা অনুসরণ করে বলা যায় যে টাকার জন্ম যখন হয় তখন তার গালে থাকে রক্তের জন্মগত চিহ্ন, তাহলে বলা যেতে পারে যে মূলধনের যখন আবির্ভাব ঘটে তখন তার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর প্রতি লোমকূপ থেকে রক্ত আর ক্লেদ ঝরতে থাকে ।" এরই প্রাগুক্তি রয়েছে মহাভারতের শান্তিপর্বে : "ন ছিত্ত্বা পরমর্মানি ন কৃত্বা কর্ম দুষ্করম,/ ন হত্বা মৎস্য ঘাতীয়ম প্রাপ্নোতি মহতীম্ শ্রিয়ম্" । অর্থাৎ মহতীশ্রী (Big Money) অর্জন সম্ভব নয় যদি পরের মর্ম ছিন্ন না করা হয়, যদি দুষ্ট কর্ম না করা হয়, যদি মৎস্যজীবী যেমন করে মাছকে মারে, তেমনই হত্যা করতে না পারা যায় । কী অপূর্ব সৌসাদৃশ্য উভয় চিন্তায় !

আজ দেশের দুর্দিনে নব প্রবোধন কামনায় সংস্কৃতের অবদানকে সুবুদ্ধি ও সৌষ্ঠবের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের প্রয়াস হবে না কেন ? এদেশের অজর আহ্বান কেন শুনব না সবাই : "সর্বস্তরতু দুর্গানি সর্বোভদ্রানি পশ্যতু/ সর্বস্তদ্‌বুদ্ধিমাপ্নোতু সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু" ? যখন আমরা "দেবতারে নর করি নরেরে দেবতা", তখন 'দেবভাষা' আখ্যা দিয়ে সংস্কৃতকে দূরে রাখি কেন ? "ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ"—এ তো সংস্কৃত মহাকাব্যেরই বাণী । সংস্কৃত চর্চা আজকের ভারতবর্ষে যেন কিছুতেই স্তব্ধ হয়ে না পড়ে ।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কলকাতা-১৯

বিয়াফ্রার ইতিহাস

"বিয়াফ্রার রক্তলেখা ইতিহাস" প্রসঙ্গে (দেশ, ৮ আগস্ট, '৮৭) আমার কিছু বক্তব্য আছে ।

(১) "সপ্তদশ শতকে এল ইংরেজ । দাস ব্যবসা বন্ধ করল" (পৃষ্ঠা ৮০) । এরকম একটি বাক্য থেকে মনে হতে পারে লেখকের বক্তব্য সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজরা এসেই কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি পরম দরদে দাস ব্যবসা নাইজেরিয়াতে বন্ধ করে দিল । প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে দাস ব্যবসা এ অঞ্চলে সবচেয়ে রমরমা ছিল এবং সে ব্যবসা থেকে প্রধান লাভবান ছিল ফরাসী ও ইংরেজরা । সে ব্যবসা থেকেই বর্তমান লিভারপুল ও ব্রিস্টলের সমৃদ্ধি । উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে দাস ব্যবসা রদ করা হয় তাতে অন্য দেশও অংশ নেয় । ইংরেজরা নেতৃত্ব দেয় । তার কারণ বেশ জটিল । আফ্রিকার ইতিহাস নিয়ে সরলীকরণকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল ।

(২) ফুলানিরা উত্তর নাইজেরিয়াতে ইসলাম আনেনি । তাঁদের আগমনের বহু আগেই একাদশ শতাব্দীতেই আরব বণিকদের প্রভাবে হাউনাদের মধ্যে ইসলাম এসে গিয়েছিল ।

(৩) ইবোদের দেশ ইজরায়েলের সঙ্গে তুলনীয় বলার আগে সাবধান হওয়া উচিত । পাশ্চাত্য আলোক প্রাপ্ত বাঙালীরা চাকরি ক্ষেত্রে বহুকাল অন্যান্য প্রদেশে প্রতিপত্তি বজায় রেখেছে । ইবোদের মত । তারপর বঙ্গাল খেদা হয়েছে । যেমন উত্তর নাইজেরিয়াতে ইবো খেদাও হয়েছিল । তাই বলে কি আমরা বাঙালীদের 'ইহুদী' বলব এবং কথার কথা বলছি পশ্চিমবঙ্গ যদি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখন বিয়াফ্রাতুল্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে নিজেকে তবে তাকে কি ইজরায়েলতুল্য বলব ? পরের দেশের বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আহা উহু করব আর নিজের দেশের জাতীয় ঐক্যর শ্লোগান তুলে গলা ফাটাবো ?

(৪) নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মোইংকা বিয়াফ্রা আন্দোলন সমর্থন করেন বলেই গৌয়ন ইবোদের ওপর অত্যাচার করেন বলেই হঠাৎ আজ 'ইবো জাতীয়তা' নিয়ে চোখের জল ফেলার আগে ভেবে দেখা উচিত অনেক কথা । ওজুকুওর পেছনে শেষ পর্যন্ত কারা ছিলেন ? কেন তাঁকে কুখ্যাত শ্বেতকায় ভাড়াটে সৈন্যদের সাহায্য নিতে হয় ? তিনি পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর তাঁবেদার আইভরি কোস্টে পালালেন কেন ? এসব প্রশ্ন ভাল করে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করে তারপর রবীন্দ্রকাব্য নিয়ে আবেগ প্রকাশ করলে ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করা হবে ।

ধ্রুব গুপ্ত

কলকাতা-৪৫

সম্পাদকীয়

বহু ব্যর্থ সন্ধানের পর হঠাৎ জয়পুর বাজারে পেয়ে গেলাম "দেশ" । গভীর আগ্রহে পড়তে শুরু করেই থমকে গেলাম "এ আঁধারে এ আলোকে ।" (২৯/৮/৮৭) একজন বিদেশী ভারত-প্রেমী লেখকের জন্মদিবস স্মরণে এইরকম সম্পাদকীয় বিস্ময়কর, বিরল । আপনাদের জানাই অজস্র সাধুবাদ । ঈশারউড যদি একমাত্র Ramakrishna & his disciples লিখতেন, তাহলেই ভারতে তিনি অমর হয়ে থাকতেন । কিন্তু এ গ্রন্থ লেখা এতো সহজ ছিল না । এজন্য লেখকের প্রস্তুতিপর্ব ছিল দীর্ঘ তিন দশক ।

প্রায় মাস দুই আগে হায়দ্রাবাদ রামকৃষ্ণ মিশন থেকে এই গ্রন্থটি ক্রয় করার পর এমন দিন যায় নি, আমি এ গ্রন্থটি পাঠ করি নি । এরোপ্লেনে, ট্রেনে, বাসে সর্বত্র । হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই, পাটনা, পূর্ণিয়া, দিল্লী আর এখন জয়পুর । সর্বত্র এটি আমার চিরসঙ্গী । যে যাই ভাবুক, তবে এত সহজ সরল, প্রাণের

ভাষায় এর আগে কোন বিদেশী রামকৃষ্ণদেবকে জগত সভায় তুলে ধরতে পারেন নি।
ঠাকুর রামকৃষ্ণকে সর্বপ্রথম লেখার মাধ্যমে বাইরে প্রচার করেন Indian Mirror এ কেশবচন্দ্র সেন। বিদেশে ভারত-প্রেমী ম্যাক্সমূলার ১৮৯৮ সালে রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে সর্বপ্রথম লেখেন। আর ১৯২৯ সালে লেখেন রোমাঁ রোলাঁ। কিন্তু উভয়েই ছিলেন ভারতবর্ষ থেকে বহু দূরে এবং খ্রীশ্চান ধর্মে গভীর বিশ্বাসী। বেদান্ত ও হিন্দু জীবন সম্বন্ধে তাঁদের ছিল গ্রন্থ পাঠ করা জ্ঞান। সেদিক থেকে দুবার ভারত ভ্রমণ করে, বেদান্ত চর্চায় গভীর মগ্ন ঈশারউড ছিলেন অনেক নিকটের মানুষ।
তবে রামকৃষ্ণদেবকে অবতার হিসেবে বিশ্বাস করার মধ্যেই ঈশারউডের সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা। তাঁর গ্রন্থে খ্রীশ্চানধর্ম বিশ্বাসী ম্যাক্স মূলারের মতামতকে তিনি খণ্ডন করেছেন বারবার। আপনারা সম্পাদকীয়তে যথার্থই লিখেছেন "ভগিনী নিবেদিতার পরে এমন ভারতআত্মায় নিবেদিত প্রাণ সৃজন প্রতিভা" আমরা আর দেখিনি।
ঈশারউডের গ্রন্থ ভাষা ও ভাবে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর লেখা পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থের কথা বারবার মনে করিয়ে দেয়।
পাটনা মগধ মহিলা কলেজের পরলোকগতা ইংরাজীর অধ্যাপিকা শ্রীমতী রঞ্জিতা কুণ্ডু ১৯৭৮ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঈশারউড সম্বন্ধে D. Litt করেন।

সুবল গাঙ্গুলী
জয়পুর-৩০২০০৩

উদ্ভিদ উদ্যান

১ আগস্ট ১৯৮৭ তারিখে আপনার 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রণব লালা মহাশয়ের 'দুশ বছরের তরুণ ভারতীয় উদ্ভিদ-উদ্যান' শীর্ষক নিবন্ধটি একটি মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ লেখা সন্দেহ নেই।
নিবন্ধটিতে ডাঃ নাথানিয়েল ওয়ালিচের জন্মস্থান তথা নাগরিকত্ব নিয়ে ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। ডাঃ ওয়ালিচ ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের ড্যানিশ উপনিবেশের শল্য চিকিৎসক হিসেবে ভারতে তাঁর আগমন ঘটে। এর এক বছর পরেই ইংরেজরা ঐ উপনিবেশ দখল করায় তিনি বন্দী হন, কিন্তু কোম্পানি বাগানের তৎকালীন অধ্যক্ষ উইলিয়ম রক্সবার্গের চেষ্টায় মুক্ত হয়ে চিকিৎসক হিসেবে শ্রীরামপুরে ফিরে যান। অসুস্থতার জন্য কিছুদিন বিশ্রাম নেবার পর তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির উন্নতির জন্য কাজ করেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বোটানিকাল গার্ডেনের অস্থায়ী অধ্যক্ষ হিসেবে কাজে যোগ দিয়ে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ ফ্রান্সিস (বুকানন) হ্যামিলটন সাহেবের উত্তরসূরী হিসেবে স্থায়ী অধ্যক্ষ মনোনীত হন এবং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশ্য মাঝে দুবার অর্থাৎ ১৮২৮ থেকে ১৮৩২ এবং পুনরায় ১৮৪২ থেকে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্রুত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ইংলন্ডে যান। ডাঃ ওয়ালিচের আন্তরিক আগ্রহে এবং নেতৃত্বে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আসামের জঙ্গল থেকে বুনো অবস্থার চা গাছ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় এবং তিনি নিজে গাছপালার যে তালিকা প্রস্তুত করেন—তা 'ওয়ালিচের ক্যাটালগ' হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

সুভাষ গুহ নিয়োগী
কলিকাতা-৭০০ ০৬৩

অনেক গান এক শিল্পী

৮ আগস্ট ১৯৮৭-র 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় "অনেক গান এক শিল্পী" শিরোনামায় রামানুজ দাশগুপ্তর সঙ্গীত সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রয়াত গোপাল দাশগুপ্তের সঙ্গীত রচনার উল্লেখ করা হয়েছে। লেখকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "প্রখ্যাত বা জনপ্রিয় হয়ত নন গোপাল দাশগুপ্ত…"। একথা কী ঠিক? না। গোপাল দাশগুপ্ত প্রখ্যাত এবং জনপ্রিয় নিশ্চয়ই।
একেবারে ছেলেবেলা থেকেই সুকণ্ঠ গোপাল দাশগুপ্তর সঙ্গীত প্রতিভা অনেকের বিস্ময় সৃষ্টি করত। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিভা উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে। চট্টগ্রামে (গোপাল দাশগুপ্তর জন্মস্থান) আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন সুরু করলেও, তরুণ গোপাল দাশগুপ্তকে সঙ্গীতের আবেদন, বেশিদিন আইন ব্যবসায় লিপ্ত থাকতে দেয়নি। দেশ বিভাগের পূর্বে, অল ইন্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হলেন। দেশ বিভাগের পরে, অল ইন্ডিয়া রেডিও, কলকাতা কেন্দ্রে যোগদান করেন। গোপাল দাশগুপ্ত নিজে গান গাইতেন, গান লিখতেন, গানে সুর দিতেন। তাঁর রচিত এবং সুরারোপিত গান এখনও অনেক শিল্পীর কণ্ঠে শোনা যায়। কণ্ঠসঙ্গীত— আধুনিক, কাব্য সঙ্গীত, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতে গোপাল দাশগুপ্তর কুশলতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। এছাড়াও একাধিক যন্ত্রসঙ্গীতে, যেমন বেহালা, এস্রাজ, বাঁশী ইত্যাদিতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। পূর্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশ) এবং পশ্চিমবঙ্গে গোপাল দাশগুপ্তের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও অনেক। তাই মনে হয়, "প্রখ্যাত বা জনপ্রিয় নন গোপাল দাশগুপ্ত…" এ উক্তি যথার্থ নয়।

রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
কলকাতা-৭০০০৩৩

কবিতাপ্রেমির অভিনন্দন

৮ আগস্টের 'দেশ' সংখ্যাটি কবিতা প্রেমিকদের কাছে আদরণীয় হয়ে থাকবে। 'কবির অন্তরে তুমি কবি' এই প্রচ্ছদের তলায় ছটি প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতা পড়ার বিরল সৌভাগ্য হল—'দেশ' পত্রিকার পাঠকদের। সবচেয়ে মন কাড়ল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সংলাপ-কাব্য 'রাজসভায় মাধবী'। এমন সাবলীল ভাবা ও ছন্দের ব্যবহার সচরাচর দেখা যায় না। যারা কবিতার খুব ভক্ত নয় তাদেরও এই কবিতাটি নিঃসন্দেহে ভাল লাগবে। সুনীল যেন ক্রমশই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছেন। অসম্ভব ভাল লাগল নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'জঙ্গলে এক উন্মাদিনী'। তাঁর সুপরিচিত গল্প বলার ঢঙে কবিতাটি লেখা। অকারণ দুর্বোধ্য

না করেও যে কবিতা লেখা যায় এই কবিতাটি তার প্রমাণ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়ার ছন্দে লেখা নস্টালজিয়া মেশানো কবিতাটি মন্দ লাগল না। শামসুর রাহমানের 'পড়েছে শীতের হাত' এই শ্রাবণের শেষেও এনে দিল এক বিষণ্ণ শীতের দিনের অনুভূতি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় সেরকম বজ্রপাত ঘটাতে পারলেন কই ?
পরিশেষে জয় গোস্বামীর 'ভূতুম ভগবান' কবিতাটি সম্বন্ধে কিছু না লিখলে এই চিঠি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। জয় গোস্বামীর এই কবিতাটি দুর্বোধ্যতার এক চরম নিদর্শন। কবিতাটি আমি নানাভাবে পড়বার চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এর অর্থোদ্ধার এবং ভাবানুষঙ্গের পাঠোদ্ধার করতে অক্ষম হয়েছি।

পার্থসারথি ঘোষদস্তিদার
কানপুর ২০৮০১৬

গীতিকার প্রসঙ্গে

১৫ আগস্ট সংখ্যায় শিল্পসংস্কৃতি বিভাগে 'ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় স্মরণে' অনুষ্ঠানের আলোচনায় বিনতা মৈত্র অনুষ্ঠানের শিল্পী বিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গানের সমালোচনার শেষে লিখেছেন—তিনি সবশেষে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় রচিত 'শেষের গানটি ছিল তোমার লাগি'—এই রাগপ্রধানটি গেয়ে তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন।
এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হোল 'শেষের গানটি ছিল তোমার লাগি'—এই বিখ্যাত রাগ প্রধান গানটির রচয়িতা ভীষ্মদেব নন, এই গানটি রচনা করেছেন আমার স্বামী স্বর্গীয় গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য। এই গানটি ও 'ফুলেরি দিন হোল যে অবসান'—অজয় ভট্টাচার্য রচিত আরেকটি বিখ্যাত রাগপ্রধান গান ভীষ্মদেব তাঁর সুললিত অপরূপ কণ্ঠে রেকর্ড করেন। এই গান দুটি ভীষ্মদেবের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বহু অনুষ্ঠানেই তিনি এই গান দুটি গেয়েছেন, বিদগ্ধ শ্রোতারা নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন।

রেণুকা ভট্টাচার্য
কলকাতা-২৯

তুষারদেশে শীতের উৎসব

১৫ অগাস্ট 'দেশ' সংখ্যায় তপতী ঘোষের "তুষার দেশে শীতের উৎসব" পড়ে খুব ভাল লাগল। লেখিকাকে ধন্যবাদ একটি সুন্দর ভ্রমণকাহিনী উপহার দেবার জন্যে। রচনাটিতে দুটি সামান্য তথ্যগত ভুল চোখে পড়ল। প্রথমত 'শাত্যো ফ্রঁতেনাক' (Chatean Frontenac(একটি বিখ্যাত

হোটেল, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে নির্মিত, ঐতিহাসিক দুর্গ নয়। অবশ্য হোটেলটি এইভাবে অবস্থিত যে অনেকেরই দুর্গ বলে ভ্রম হতে পারে। অবশ্য ক্যেবেক(Quebec) শহরে একটা ঐতিহাসিক দুর্গও আছে সেটির নাম 'লা সিতাদেল' (La Citadelle)। দ্বিতীয়ত নদীতে বরফ ভেঙে যে মাছ ধরা হয় সেটা সাধারণতঃ ট্রাউট (Trout) নয়, স্মেল্ট (Smelt) জাতীয় মাছ।
পরিশেষে ক্যেবেক সম্বন্ধে আরেকটি তথ্য জানাই, এটিই উত্তর আমেরিকার একমাত্র প্রাচীরে ঘেরা শহর।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়
অটোয়া, কানাডা

ধনধান্য পুষ্প ভরা

৮ আগস্ট তিমিরবরণের স্মৃতিচারণার সূত্রে সমর রায়ের লেখা চিঠি প্রসঙ্গে অভিজিৎ মিত্রের চিঠি

ছোট গল্প বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি আমাদের দপ্তরে গল্প আসার পরিমাণ যেমন অনেক গুণ বেড়েছে তেমনি বহু ফেরত পাঠানো গল্পও শেষ পর্যন্ত লেখকের হাতে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে না। এই দুঃখজনক ঘটনার দরুন লেখকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাই লেখক-লেখিকার কাছে অনুরোধ, এখন থেকে গল্পের নকল রেখে তবেই সেটি পাঠাবেন। অমনোনীত রচনা আর ফেরত দেওয়া হবে না। চার মাসের মধ্যে মনোনয়নের চিঠি না পেলে বুঝে নিতে হবে গল্পটি ছাপা হবে না। গল্প কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা তিন থেকে চার হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পড়লাম। একটি গানের তথ্য চেয়ে তিনি অন্য একটি গানের ভুল পাঠ উল্লেখ করেছেন, লিখেছেন—'আমাদের সংগ্রহে ঐ রেকর্ডের কভারে ডি কে রায়-এর কণ্ঠে গীত বন্দেমাতরম রেকর্ড আছে। রেকর্ড নং এইচ টি ৮০ তবে তার অন্য পিঠে আছে "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা" গানটি। দিলীপকুমার রায় তাঁর পিতার রচিত "ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" গানটি "ধনধান্যে পুষ্পেভরা" এই ভুল উচ্চারণে গেয়েছিলেন বলে বিশ্বাস হয় না। গানটি এই ভুল উচ্চারণ দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতে অনভিজ্ঞ গায়কের গানে শোনা যায়, কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার বিশিষ্ট লেখকদের রচনায় "ধনধান্যে পুষ্পেভরা" এই ভুল উদ্ধৃতিও দেখা যায়। গানটির উৎস শাজাহান নাটকের ৩য় অঙ্কে ৬ষ্ঠ দৃশ্যে যশোবন্ত সিংহ, জয়সিংহ ও মহামায়ার সামনে দরবার কক্ষে চারণ বালক বালিকাগণের গান রূপে লিখিত। বহু পাঠ্যপুস্তকে 'জন্মভূমি' শীর্ষক কবিতা হিসাবেও সংকলিত।

রবীন্দ্রনাথ রায়
কৃষ্ণনগর
নদীয়া

নিউটন প্রসঙ্গে

২২ আগস্ট-এর 'দেশ' পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় পার্থ ঘোষ মহাশয়-এর "তিন শ' বছর পরেও নিউটন" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম। প্রবন্ধটির এক জায়গায় ক্লাউসিয়াসের 'এনট্রপি'-র ধারণায় "যে সমস্ত প্রক্রিয়া কেবলমাত্র একদিকেই ঘটতে পারে তাদের ক্ষেত্রে 'এনট্রপি' বাড়ে" -এর উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়াই উভমুখী। তবে সব প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উভমুখিতা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না।—এখানে একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়।

$2KCLO_3 \longrightarrow 2KCL + 3O_2$
(পটাশিয়াম-ক্লোরেটের তাপ বিয়োজন)।

উক্ত বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে একদিকের গতি অপর দিকের বিক্রিয়ার গতির তুলনায় এত বেশী যে বিপরীত বিক্রিয়া অর্থাৎ বিক্রিয়াজাত পদার্থ থেকে বিক্রিয়ক পদার্থের উৎপত্তি নগণ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি বিক্রিয়ার উপযুক্ত পরিবেশ বা অবস্থা সৃষ্টি করা যায় তবে বিক্রিয়াটির বিপরীত ক্রিয়া সংঘটিত হবে অর্থাৎ একমুখী বিক্রিয়া উভমুখী বিক্রিয়ায় রূপান্তরিত হবে।
সুতরাং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ক্লাউসিয়াসের 'এনট্রপি'-র ধারণা কি যথোপযুক্ত হবে ?

অনিন্দ্যকান্তি সিংহ
মুরারই : বীরভূম

বিশ্বকাপ ক্রিকেট

শীতের দুপুরে মন্থর মায়াবী ক্রিকেট। কবোষ্ণ রোদে সবুজ মাঠের ওপর ফ্লানেলে মোড়া ছিপছিপে শিকারীরা ওত পেতে আছে। ছুটছে বোলার। উদ্যত ব্যাটসম্যান। যারা এই খেলা বোঝে বা ভালবাসে তাদের কাছে এর চেয়ে উপভোগ্য এবং মনোরম আর কিছু নেই। ক্রিকেট নিয়েই কত লোক জীবন কাটিয়ে দিল।

সত্তর দশকের গোড়ায় আচমকাই এক অঘটনের ভিতর দিয়ে সূত্রপাত ঘটেছিল লিমিটেড ওভার ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক প্রথম ম্যাচটি। তার আগে এই খেলা প্রচলিত হয়েছিল ইংল্যান্ডের ঘরোয়া আসরে। আন্তর্জাতিক ম্যাচটি হয়েছিল বৃষ্টিতে ধোয়া ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার একটি টেস্ট ম্যাচের বিকল্প হিসেবে, নিতান্তই দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য। আর সেই খেলা দেখে লোকে মাত হয়ে গেল। বাঃ, এ তো চমৎকার ক্রিকেট। সুতরাং একদিনের ক্রিকেটের জাতে উঠতে সময় লাগল না। দশক না ঘুরতেই এই খেলার জনপ্রিয়তা উঠে গেল তুঙ্গে। শুরু হয়ে গেল বিশ্বকাপও।

সত্য বটে, ক্রিকেটপ্রেমীরা একদিনের ক্রিকেটকে সুনজরে দেখেন না। তাঁদের আশঙ্কা, টেস্ট ক্রিকেটের বারোটা বাজাতেই এই নতুন নিয়মের খেলার আবির্ভাব। এই হিসেব-কষা, ঝোড়ো-মার এবং আক্রমণাত্মক ক্রিকেট তাঁদের মতে শিল্পসম্মত বা বিজ্ঞানসম্মতও নয়। এই সব মতামত উড়িয়ে দেওয়ার মতোও নয়। কারণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি, টেস্ট খেলার জন্য যাঁরা নির্বাচিত হন তাঁরা সকলেই আবার একদিনের খেলার জন্য নির্বাচিত হন না। দুই মেজাজের দুই খেলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের খেলোয়াড়দের শ্রেণীবিন্যাস ইতিমধ্যেই ঘটতে শুরু করেছে। যাঁরা একদিনের খেলায় পোক্ত তাঁরা হয়তো টেস্টে অচল, আবার টেস্টের বীর হয়তো একদিনের ম্যাচে অপাংক্তেয়।

যাঁরা প্রথাসিদ্ধ ক্রিকেটের ভক্ত তাঁরা সুনজরে না দেখলেও বিংশ শতকের শেষ ভাগের আবিষ্কার এই একদিনের আন্তর্জাতিক যে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়ে গেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। দেশে দেশে টেস্ট খেলার আসরে আজকাল দর্শকাসনে লোকাভাব অত্যন্ত প্রকট। পাঁচ দিনের গড়িমসি খেলা দেখার ধৈর্য বা সময় এই ব্যস্ততার যুগে আশা করা যায় না। কিন্তু একদিনের আন্তর্জাতিক খেলায় ভীড়ের অভাব নেই। উৎসাহেরও অভাব নেই। এই টান টান উত্তেজনায় ভরা রোমহর্ষক ক্রিকেটকে সেলাম না জানিয়ে উপায় নেই। টেস্ট ক্রিকেটের পাকা সিংহাসন যদি টলোমলো হয়েই থাকে তাহলেও আর একদিনের সীমিত ওভারের খেলাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়ানো যাবে না। ক্রিকেটে, বিশেষ করে টেস্ট ক্রিকেটে খেলা থেকে হারজিতের উত্তেজনা প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। খতিয়ান দেখলে বোঝা যাবে এযাবৎ যত টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে অমীমাংসিত ম্যাচের সংখ্যা সর্বাধিক।

তুলনায় একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এক অঙ্ক কষা, হিসেব কষা খেলা। অমীমাংসিত থাকার সম্ভাবনা এ খেলায় নেই বললেই হয়। উপরন্তু এই খেলায় আছে সূক্ষ্ম কৌশলগত নানা মারপ্যাঁচ এবং অধিনায়কের বুদ্ধিমত্তার ভূমিকাও এতে অনেক বেশী।

বিগত বিশ্বকাপে ভারত মোকাবিলা করেছিল অনেকগুলো দেশের সঙ্গে। দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে পাল্লা টানতে হয়েছিল তিন তিনবার। ভারতীয় দলে দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার বা ঝোড়ো মারকুট্টা ব্যাটসম্যান তেমন কেউ না থাকলেও গ্রুপের খেলায় ভারত জিতেছিল হিসেবী খেলার কৌশলে। দ্বিতীয়বার ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুরন্তপনায় ভারতকে হারতে হয়েছিল বটে, কিন্তু ফাইনালে ভারত জিতে গিয়েছিল নিতান্তই ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্নায়ুদৌর্বল্যের সুযোগে। লো স্কোরিং সেই খেলায় জিতে ভারত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হল। বহুকাল পরে ক্রিকেটে একটি অঘটন।

এবার বিশ্বকাপ সরে এল পুবের দুনিয়ায়। ভারত-পাকিস্তান জুড়ে এই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসরে বিগত বিশ্বকাপের অনেক তারকাই অনুপস্থিত থাকবেন। দেখা যাবে অনেক নতুন মুখ। তৃতীয় বিশ্বের এই দুটি দেশে আয়োজিত বিশ্বকাপে খেলতে অনেকেই তেমন উৎসাহী নন। এদেশের জল, খাবার, দর্শক, পরিবেশ নিয়ে নাসিকাকুঞ্চন অতীতেও ছিল, এখনো আছে।

কে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবে ? দল থেকে, তুলনামূলক শক্তির বিচার করে ভবিষ্যদ্বাণী করা প্রায় অসম্ভব। যে-কেউ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। যারা ধীর স্থির হিসেব-কষা বুদ্ধির খেলার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারবে, জয় তাদের করায়ত্ত। পাল্লাটা ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা পাকিস্তানের দিকেই একটু ভারী। কিন্তু সেটা তেমন কিছুই নয়। একদিনের আন্তর্জাতিক সব হিসেব ওলটপালট করে দিতে পারে, যেমন দিয়েছিল গত বিশ্বকাপে।

এই জন্মে

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

চুল নিয়ে লীলার বিষম ঝঞ্ঝাট—
একবার খোঁপা করে বাঁধে
একবার এলিয়ে দেয় পিঠের ওপর ;
একবার হলুদ রঙে ছোপায়
একবার কালো দিয়ে মাজে ।
এখন অনেক কৌশল শিখে নিয়েছে ও
আগে কিছুই জানত না ।

রাস্তার লোকগুলো কেমন অসভ্য চোখে তাকায় !
যে-কোনো ছুতোয় গা ঘেঁষে চলে যায়,
ওতেই ওদের আনন্দ !
পরের জন্মে
লীলা আর মেয়ে হয়ে জন্মাবে না ।
টুলুর বাবা বলে, "এবার পুজো-আচ্চায় মন দাও,"
—ওর বয়ে গেছে ।

টুলু বলে, "এত সেন্ট মাখো কেন ?"
—বেশ করে, মাখে ।
টুলু খোঁটা দেয়, "শ্যাম্পু করেছ বুঝি ?"
—ওর তাতে কী ।
টগবগে মেয়েটা যা ঠোঁটকাটা
কোনদিন টুকে দিলেই হল :
'বাবা আইন অমান্য করে জেল খেটেছিল,
মানুষের করা আইন,
তুমি বলতে, বৃথাই,
আর এখন তুমি নিজে
তার চেয়ে বড় আইন অমান্য করে জেল খাটছ
কী জন্যে ?'

বলে না, কারণ মেয়েটা মাকে ভালোবাসে
মায়ের জন্য ওর কষ্ট হয় ।

অতর্কিত পদ্য

রাজকুমার রায়চৌধুরী

হ্যারিকেনের আলোয় রাস্তায় হারানো মেয়েটি কে—
খুঁজে পেতে চাই আবার ।
অনেক রাত্রির পেরিয়ে, আমি শুধু খুঁজি অস্পষ্ট পায়ের দাগ
ও আমাদের রঙিন স্বপ্নগুলি...
ওগো রাত্রির আঁধার দাও না ফিরিয়ে—
সেই নীল বালিকার ভালোবাসার দয়াময় প্রীতি ।
২
শান্ত ফুলগুলি ঝ'রে পড়ে,
মনে পড়ে, কে যেন ডেকেছিলো অদ্ভুত ইশারায়
ভালোবাসার সঙ্কুল শিরার অতলে ।

কে গো তুমি, অরণ্য ফুলের কেতকী ?

যেমন দুঃখ

কমল দে সিকদার

ঠিক দুঃখ নয়
অনেকটা দুঃখের মত
আসলে তেমন করে
দুঃখ কি কেউ দিতে পেরেছে

জানি সবাই
নিজেকে বহনের মত
কিছু কিছু অলঙ্কার
যেমন দুঃখ
অহঙ্কারের মত অঙ্গে জড়ায়

কেউ কেউ আগুন জ্বালে
কারো বা বুক জুড়ে
বর্ষা বারোমাস
তবু তেমন করে
দুঃখ কি কেউ পেয়েছে

রাতের মত দুঃখ
সোহাগীর অপেক্ষমান
কুপীর মত
বুক জ্বলে যাওয়া দুঃখ

আসলে যা দিয়েছো
ঠিক দুঃখ নয়
আকারে ইঙ্গিতে
অনেকটা দুঃখেরই মত ।

অশরীরী ভাস্কর্য

উজ্জ্বল সিংহ

শুধু প্রতীক্ষা, শুধু প্রতীক্ষা ; অন্ধকারের অবয়ব ঘিরে
ভ্রান্তির কণা জ্বলে নেভে আর আমার দু'চোখে
ঢল নেমে আসে আদিম ঘুমের ।

বেত্রবতীর স্রোতের মদিরা ছুঁয়ে আসে ভাঙা মন্দিরচূড়া,
দেয়ালের গায়ে সুরসুন্দরী, দু'স্তন জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে মুক্তার মালা ।

নিচের গভীর খাদ জেগে ওঠে, 'হে ভাড়াটে খুনী
তোমার হাতের ভারী বাটালির প্রতিটি আঘাত
চূর্ণ করুক ঘন তমসাকে ।'

অন্ধকারের আকৃতিহীন অবয়বে রাখি উদ্যত নখ,
ফিকে কুয়াশার আবছা প্রবাহ জড়ো হয় এক
ক্রমস্ফুটিত নারীশরীরের ঢালু নিতম্বে ।
ঝরে পড়ে তার আপাতকঠিন উরুসন্ধিতে কপালের ঘাম ;
অন্ধকারের অদৃশ্য নারী, এ কোন জারজ রেখেছো তোমার কুমারী গর্ভে !

৮টা ২৯

বিশ্বজিৎ পাণ্ডা

ভাসমান বিজ্ঞাপনে ওই মুখ ডুবে গেছে তার
চারদিকে এখন্ন পুকুর, শিশুজল, পুকুরের মাঝখানে
জলের বলয় ছাড়া অন্য কিছু নেই ; তবু একা পেলে
কিছুক্ষণ একা পেলে তাকে, কপালে আকবো কৃষিকাজ
মাটি খুঁড়ে তাকেও নামাব নিচে, জলের তলায়
তখন ও মেয়ে তুমি কথা কি বলবে ঠিক আগের মতন ?
তখন ও মেয়ে তুমি অন্য মেয়ে লোকে বলে অন্য কার মেয়ে
রুমালে মুছবে ঠিক কপালের ঘাম ? দু'হাত পেছনে রেখে
গোছাবেই চুল ? জলের তলায় পা ছুঁয়েছিলে বলে
বুক থেকে হাত তুলে ছোঁবে কি কপাল ? শিশুজল নয়
কপালের কৃষিকাজ ছাড়া তোমার শহরে আজ অন্য কিছু নেই
যেমন শহরে নেই যথেষ্ট শহর, সামান্য পুকুর ছাড়া
যা রয়েছে ছেঁড়াখোঁড়া ঋতুবিজ্ঞাপন, ডুবে যাওয়া
কী ক্ষুদ্র স্টেশান, সহসা কপাল ছুঁয়ে সিঁথি বরাবর
সোজা ছুটে যাবে ৮টা ২৯-এর ট্রেন, আর তুমি !
তুমি তো থাকবে না তখন, অন্য মেয়ে লোকে বলে
অন্য কার মেয়ে, আমি শুধু ভাসমান বিজ্ঞাপনে
ওই মুখ ডুবে যাওয়া দেখব ।

যায়

অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়

কুটুস কুটুস কাটিস্
কতই না তুই খাটিস্
কাঁথাটা যায়
কাপড়টা যায়
আঁচলটুকু রাখিস্ ।

লজ্জা শরম ভরম
সবই আছে চরম
বাঁচতে হবে
লড়তে হবে
সাচ্চা রেখে ধরম ।

ইচ্ছে যা হয় নিস্
দাঁতের ধারে দিস্
গাঁ গিয়েছে
মা গিয়েছে
পুড়ছি অহর্নিশ ।

অচির সখা

কৃষ্ণা বসু

কিসের জন্য জেগে রয়েছি কেউ আসবে ? কারা ?
আসবে যদি যাবেও তবে অচির সখা তারা !
নিজের দিকে চোখ পড়তে দেখি মস্ত খাদ,
গভীর তল অনন্ত হাঁ শুকনো খরা স্বাদ,
ভিতর দিকে ঝুঁকে রয়েছে ঐ নাছোড় তৃষা
টানছে খুব বলছে যেন 'আমায় ছাড়িস না' ।
কিসের জন্য ? স্নেহের জন্য, প্রেমের জন্য জাগা ?
জানি না ঠিক কাঙাল আছি কিসের ভিখ মাগা !
কেবল বুঝি বুকের মধ্যে জমেছে হাহা ঢের,
কেউ কি আছ নিকট দূরে বাসবে ভালো ফের ?
চিরকালের সখাটি কৈ ? অচির সখা সব !
দুদিন যেতে দুদিন নিতে প্রেমের পরাভব,
ফিরে তো গেছে নিজের কাছে চিরদিনের যাওয়া,
একলা ভাঙা পুরোন ঘর হু হু করছে হাওয়া ।

অস্পষ্ট ডাক

চিরপ্রশান্ত বাগদী

জোৎস্নার উজ্জ্বল স্রোতে কে তুমি মায়াবিনী
শিথিল হাতের ইশারায় ডাকো আমাকে ?
তুমি কী চাও তোমার বৃত্ত কোমল উরসিজে
আল্পনা-অক্ষরে মেহেদি পাতার রঙে দুটি কবিতা ?

আমি পারি, সব পারি ।

এখনো কিছু কিছু পুরুষ সংযমী আছে
পারে যে শুধু তার কল্পনার বর্ণাঢ্য লীলাখেলা খেলতে
কিন্তু মায়াবিনী, সেই সাধ কী মিটবে সম্ভোগ বর্জনে ?

বস্তুত এই বিধ্বংসী খেলায় মত্ত এই পৃথিবীতে
মৃত সব সবুজ ঘাস, ফড়িং, দোয়েল পাখি
এবং স্বেদ রক্তের বিনিময়ে স্পন্দন রাখা
তারি মাঝে ছদ্মবেশ বাস্তবিকই অমানুষিক !

ফুটছে বনে কুসুম, শৈলে থাকুক তুষার
তবু তুমি আর ডেকো নাকো ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে
সম্ভাব্য কবিতা ও স্থান জানি ভাষার উৎস
যেহেতু প্রসঙ্গ উরসিজের ।

তুমি ডাকো সেইভাবে এবং নাও সেই স্তুতি
যখন সৃষ্টি-প্রবাহিনীর উৎসে দেবো ফুল চন্দন
আমার মাথা তাতে দেবে ঐহিক-অতিক্রান্ত স্পর্শ
ভেবো না ভেবো না পশ্চাচার, আমি তাতে দেবো সাড়া ।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সাতাশির বিশ্বকাপ

ডেনিস লিলি

Excalibur/Akay/1 (Bg)

মুস্তাক আলির মুখোমুখি

রূপক সাহা

জগতে এমন কিছু ব্যক্তি আছেন, যাঁদের কাছে সর্বদাই অপ্রত্যাশিত কিছু প্রত্যাশা করা যায়। প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার সৈয়দ মুস্তাক আলি হলেন তেমনই এক ব্যক্তি। সম্প্রতি ইন্দোরে তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। বয়স এখন ৭৩ বছর। প্রথম দর্শনে অবশ্যই যাঁকে পঞ্চাশের অধিক মনে হয় না। ছয় বছর আগে ইডেন গার্ডেন্সে, সি এ বি-র সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমার মতই অবাক হয়েছিলেন কি ফ্রেডি ট্রুম্যান? যখন তাঁর সঙ্গে মুস্তাক আলিকে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় মাধব মন্ত্রী বলেছিলেন—এই ভদ্রলোকের বয়স ৬৭ বছর!

নিজের বাসভবন 'আলি মঞ্জিলে'র ফটকে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে সেদিন অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন মুস্তাক। অপ্রত্যাশিতভাবেই। "ইয়ে হামলোগোঁ কো মেহমান্ হ্যায়"—অটোওয়ালাকে বলেছিলেন, "কলকাত্তাসে, জ্যাদা মাত লেনা।" আর ত্রি-চক্র যানের সেই চালকটি সশ্রদ্ধ আদাব্ জানিয়ে বিদায় নেবার ফাঁকেই আমি উপলব্ধি করেছিলাম, শুধু কলকাতার নয়, আলি মঞ্জিলের মালিক যিনি, ইন্দোরেও তিনি সমানভাবে শ্রদ্ধেয়। ছয় ফুটের অধিক উচ্চতার, মেদহীন, ঋজু কাঠামোর শরীরটি এখনও যে কোনও যুবকের ঈর্ষা উদ্রেককারী। ঘিয়ে রঙের হাফসার্ট আর ট্রাউজারসে—এখনও তেমনই ধোপদুরস্ত, তেমনই রোমান্টিক। স্টাইলিশ মুস্তাক আলি একটুও বদলাননি।

"জানেন, কলকাতার সঙ্গে আমার আত্মীয়তার টান," মুস্তাক সাক্ষাৎকার শুরু করেছিলেন এই কথা বলে, "প্রথম টেস্ট খেলি ওই শহরেই। কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীদের কি ভুলতে পারি? টেস্ট ক্রিকেটে ওঁরাই আমায় ফিরিয়ে আনেন। এই পোস্টার দিয়ে নো মুস্তাক, নো টেস্ট। কলকাতার যে কোনও লোকই আমার আপনজন।" ড্রয়িংরুমের দেয়ালে বিরাট অয়েল পেন্টিং। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আমার মুস্তাক। শাড়ি পরিহিতা এক বঙ্গললনা। আংশিক অনাবৃত তাঁর ভরন্ত যৌবন। "লস্ট লাভ"। বললেন মুস্তাক, "এটা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, একজন বাঙালী আর্টিস্ট। সযত্নে রেখেছি।" সাক্ষাৎকারের সময় তাঁর বাঙালীপ্রীতির আরও কয়েকবার নমুনা দিলেন মুস্তাক এই বলে, "ফিরে গিয়ে কলকাতার সেই আমলের লোকদের জিজ্ঞাসা করবেন মুস্তাক আলি কেমন ক্রিকেটার ছিলেন।"

কোন জাতের ক্রিকেটার ছিলেন মুস্তাক আলি? মাত্র এগারোটি টেস্ট ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে সাড়ে বারো হাজারের অধিক রান ও তিরিশটি সেঞ্চুরি ছাড়াও তাঁর কৃতিত্ব—ভারতের হয়ে ইংলন্ডের মাটিতে টেস্টে প্রথম সেঞ্চুরির দুর্লভ সম্মান অর্জন। ওল্ড ট্রাফোর্ডে ওই সেঞ্চুরিটি দেখার পরই সি বি ফ্রাই লেখেন, "হিয়ার ইজ অ্যানাদার জাগলার ফ্রম দ্য কান্ট্রি অফ রঞ্জি অ্যান্ড দলীপ।" নেভিল কার্ডাস মন্তব্য করেন, "মুস্তাক ব্যাটটি আগাগোড়া ব্যবহার করে গেলেন জাদুদণ্ডের মতই। তাঁর মত স্ট্রোক প্লেয়ার দুর্লভ।"

ইংরেজদেরই নয়, মুস্তাকের বেপরোয়া, আক্রমণাত্মক ব্যাটিং চমৎকৃত করেছিল অস্ট্রেলিয় এবং ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদেরও। দিল্লিতে একবার

মুস্তাক আলি

অবিশ্বাসে চোখ কচলে ছিলেন কীথ মিলার। অফ স্টাম্পের বাইরে পড়া তাঁর একটি বল যখন মুস্তাক স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারিতে পাঠান। "নির্ঘাত ক্রস ব্যাটে খেলছে। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।" গজরাচ্ছিলেন মিলার। দুর্দান্ত ফাস্ট বোলার। তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগারই কথা। কিন্তু ক্রমে ক্রমেই তিনি বুঝতে পারলেন, বল করছেন একজন চ্যাম্পিয়ন ব্যাটসম্যানকে, যিনি প্রচলিত ক্রিকেটের নিয়মকানুনকে তোয়াক্কা করেন না। আর যিনি ভয়ঙ্কর বাউন্সারকে নিমেষে পাঠিয়ে দিতে পারেন ফেন্সের বাইরে, উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসে যে কোনও লেংথের বল নির্দয়ভাবে পেটাবার ঝুঁকি নিতে পারেন।

ড্রয়িংরুমে মিলারের সঙ্গে তাঁর ছবিটি টাঙিয়ে রেখেছেন মুস্তাক। ওই বিরাট ঘরটিতে অতীত যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। বত্রিশ সাল থেকে ছিয়াশি পর্যন্ত। গুরু সি কে নাইডু থেকে প্রিয়পাত্র সুনীল গাওস্কর পর্যন্ত—ওইসব ছবিগুলি মুস্তাক আলি আমাকে ঘুরিয়ে একবার দেখাচ্ছেনও। নাইডু ছিলেন তাঁর আদর্শ। তাঁর মতে, "একদিনের ক্রিকেটে যিনি হতে পারতেন আশ্চর্যরকম সফল।" জ্যাক হবস্ তাঁকে ব্যাটিং শেখাচ্ছেন—এমন একটি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মুস্তাক আলি বললেন, "ব্যাটের হ্যান্ডেলটা দেখুন। কত বড় হ্যান্ডেল নিয়ে আমি খেলতাম। বড় হ্যান্ডেলের ব্যাটে খেলার সুবিধা কেন যে এখনকার ছেলেরা নিতে চায় না, বুঝতে পারি না। শ্রীকান্ত যদি এই রকম হ্যান্ডেলের ব্যাটে খেলত, তাহলে আরও বেশি সফল হত।"

সাক্ষাৎকার দেবার সময় সেদিন দুবার টেপ রেকর্ডার বন্ধ করতে বলেছিলেন মুস্তাক আলি। গাওস্কর-ব্র্যাডম্যানের তুলনার সময় প্রথমবার। দ্বিতীয়বার শ্রীকান্তের ব্যাটিং সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে। গাওস্কর অবশ্যই তাঁর স্নেহের পাত্র। কিন্তু কোনও পরিস্থিতিতেই তিনি তাঁকে ব্র্যাডম্যানের উচ্চে স্থান দিতে রাজি নন। শ্রীকান্ত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, ছেলেটির ক্রিকেট জীবন সুদীর্ঘ হতে পারে না। নিজেকে আন অর্থডক্স প্রমাণিত করার জন্যও যেটুকু ক্রিকেট ব্যাকরণ জানা দরকার—শ্রীকান্তের মধ্যে তারও অভাব রয়েছে। বলেছিলেন মুস্তাক, "আমাকে সবাই আন অর্থডক্স বলতেন। বলতেন আমি সব হিসাব-নিকাশের নিয়ম কানুনের বাইরে। কিন্তু আমার মতে হিসাব-নিকাশ, নিয়মকানুনের বাইরে যাওয়া তখনই যায়—যখন তা আপনার পুরো আয়ত্তে।"

এখনকার ক্রিকেটারদের সম্পর্কে মুস্তাক আলি তাঁর ধারণা গোপন করেননি। তীব্র কয়েকটি মন্তব্যও করেছেন বোর্ড কর্তাদের সম্পর্কে। মধ্যাঞ্চল থেকে জাতীয় নির্বাচক কমিটিতে কোনওদিন যেতে পারেননি, খুব সতর্ক ও বিনম্রভাবে সে আক্ষেপও করেছেন। মধ্যাঞ্চল থেকে রাজ সিং গিয়েছেন। গিয়েছেন সরবটে, এমন কি জগদলে—যিনি একটিও টেস্ট খেলেননি। অথচ মুস্তাক আলি বাদ!

ফের দেওয়ালের দিকে সেসময় চোখ চলে যাচ্ছিল। আর্মি ক্যাপ পরা তাঁর যুবক বয়সের একটি ছবির দিকে। চাকুরি করতেন হোলকার আর্মিতে। পদ মর্যাদায় ক্যাপ্টেন। এখনও নেম প্লেটে লিখে রেখেছেন "ক্যাপ্টেন এস মুস্তাক আলি"। আমার মুগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে উনি হাসলেন। বললেন, "ওই বয়সে খুব খারাপ দেখতে ছিলাম না, কি বলেন? এই যে, একটা কথা আছে না—নাবিকদের প্রত্যেক বন্দরে একটা করে বউ থাকে। আমারও ছিল। তবে প্রত্যেক টেস্ট সেন্টারে একটা করে গার্লফ্রেন্ড।" বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন। তাঁকে হাসতে দেখে ছয় বছর বয়সী নাতি অসীম কৌতূহলে তাঁর দাদুর দিকে তাকিয়ে রইল।

সত্তর-অধিক কোনও পুরুষকে এত সজীব, এত প্রাণবন্ত আগে দেখিনি। কয়েকমাস আগে ভারতীয় ক্রিকেটের আরেক কিংবদন্তী প্রফেসর ডি বি দেওধরের ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম। দেওধর যদি বিশাল পর্বতসম হন, মুস্তাক আলি তাহলে জলপ্রপাত। তাঁর দীর্ঘ দেহটি ব্যাট হাতে ক্রিজ থেকে দুরন্ত ছন্দে বেরিয়ে আসছে, একটি লাল গোলককে নির্মমভাবে প্রহারের জন্য—এখনকার মুস্তাক আলিকে দেখে তা কল্পনা করে নিতে মোটেই অসুবিধা হয় না। এই দুর্দান্ত ভদ্রলোক কিভাবে বিজয় মার্চেন্টের সঙ্গে ওল্ড ট্রাফোর্ডে ওপেনিং জুড়িতে সেই ২০৩ রানের রেকর্ডটি করেছিলেন, মেলাতে পারছিলাম না। রে রবিনসন সঠিক মূল্যায়ন করে লিখেছিলেন, "The pair was as disimilar as curry and rice, but just as effective in combination."

বিনু মাঁকড় ছিল দিকপাল

তন্ময়তা ভাঙলেন মুস্তাক এই সময়। "চিনতে পারেন, এই তিন জনকে?" আমার কাছে জানতে চাইলেন, শো-কেসের ওপর রাখা একটি ছবি দেখিয়ে। তিনজনের মধ্যে দু'জন মুস্তাক আর ভুট্টো। জুলফিকার আলি ভুট্টো। তৃতীয়জনকে চিনতেই পারলাম না। মুস্তাক বললেন, "ঘরের লোকটাকেই চিনতে পারলেন না? ও তো ধীরেন দে। আপনাদের মোহনবাগান ক্লাবের। তিনি আমাকে আর জুলফিকারকে নিয়ে গিয়েছিলেন একবার হাজারিবাগে। প্রদর্শনী ম্যাচ খেলাতে। জুলফিকার ভালো ক্রিকেট খেলত। তখন থাকত বোম্বাইতে। ওর বাবা সে সময় মন্ত্রী ছিল। শেষ দেখেছি সাতান্নতে, পাকিস্তানে। বেচারীর কি বিশ্রীভাবেই না ফাঁসি হল!"

সোফা থেকে উঠে গেলেন মুস্তাক আলি। "দাঁড়ান, আমার একটা প্রিয় জিনিস আপনাকে দেখাই।" মিনিট খানেকের মধ্যেই ফিরে এলেন তিনি। হাতে একটা সবুজ-মেরুন ডোরা কাটা টাই। বললেন মুস্তাক, "এটা প্রেজেন্ট করেছিল আমায় মোহনবাগান ক্লাব। খুবই ব্যবহার করি এই টাই। নটটা ঠিক মানানসই।" হাসলেন তিনি। "ওরা আমায় ক্লাবের মেম্বারশিপও দিয়েছে। শুনলাম, এ বছর শতবার্ষিকী করছে। ধীরেন দে-কে বলবেন, যেন ডাকে। কলকাতার জন্য আমি মুখিয়েই আছি।"

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "ক্রিকেট জীবনে সব থেকে স্মরণীয় দিন আপনার কোনটি?" কলকাতায় সেই সেঞ্চুরি করার দিন, যেদিন ইডেন গার্ডেন্সের প্রায় পঞ্চাশ হাজার দর্শক টগবগ করে ফুটছিলেন তাঁর ১০৬ রানের ইনিংসটি দেখে? অথবা স্মরণীয় কি সেই দিনটিই, শারজায় যেদিন লক্ষাধিক টাকা পেয়েছিলেন সশ্রদ্ধ উপহার হিসাবে? প্রত্যাশিত দুটি উত্তরের কোনওটাই কিন্তু উনি দিলেন না। অপ্রত্যাশিতভাবেই বললেন, "সাতষট্টিতে যেদিন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের হাত থেকে পদ্মশ্রী খেতাব নিয়েছিলাম সেই দিনটির কথা আজীবন মনে রাখব। ক্রিকেট খেলার জন্যই রাষ্ট্রীয় খেতাব পেয়েছি, আর আমার কি চাই?"

খুব আত্মতৃপ্ত মনে হচ্ছিল সে সময় মুস্তাক আলিকে। পরদিন খাণ্ডোয়া যাবেন, বাচ্চাদের একটা অনুষ্ঠানে পুরস্কার দিতে। বাচ্চাদের কোচও করেন, বছরে তিন চারবার রেনুকোট গিয়ে। "খুব আনন্দ পাই জানেন। কার মধ্যে কি প্রতিভা আছে, কে বলতে পারে? ইন্দোরের এরা (ক্রিকেট কর্তারা) আমাকে ডাকে না। বিড়লারা ডাকেন। ওঁদের ফ্যাক্টরি আছে রেনুকোটে। সেখানে যেতে তাই ভালো লাগে। দেখুন, নিজে টেস্ট টিমে প্রথম ঢুকি বোলার হিসাবে। ব্যাট করেছিলাম এগারো নম্বরে। সেখান থেকে একেবারে এক নম্বরে। সি কে নাইডুর সংস্পর্শে না এলে, আমি কি ক্রিকেটার হতে পারতাম? স্ত্রী, দুই পুত্র, পুত্রবধূ আর পৌত্রদের নিয়ে মুস্তাক আলির এখন ভরাট সংসার। পুত্র গুলরেজ আলি একসময় রঞ্জি খেলেছেন। ছয় বছরের পৌত্র নজর আলিকে ঘিরেই মুস্তাক এখন স্বপ্ন দেখছেন। চলে আসার আগে ছবি তোলার জন্য আমি ক্যামেরা বার করতেই মুস্তাক আলি ডাকলেন নজরকে, "বাচ্চে আও। আঙ্কল্ ফটো খিচেঙ্গে। সাথমে তুমহারা ব্যাট ভি লে আও।" এর পরই মুস্তাক আলি নামক জলপ্রপাতের সামনে উদ্ভাসিত হতে হল।

প্রশ্ন : আপনি নিজে কখনও একদিনের ক্রিকেট খেলেননি। টেস্ট ক্রিকেট থেকে সীমিত ওভারের ক্রিকেট—হঠাৎ এই পরিবর্তনকে আপনি কেমন ভাবে নিয়েছেন?

মুস্তাক : দেখুন, আমার মতে পাঁচ দিনের টেস্ট ক্রিকেট ধীরে ধীরে তাঁর আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে। পাবলিক এখন রেজাল্ট চায়। যা তাঁরা পায় একদিনের ক্রিকেট থেকে। এই ধরনের খেলাটা এমনই, যে রেজাল্ট হবেই। এই কারণেই একদিনের ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা হু হু করে বাড়ছে। এই পরিবর্তনকে তো মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

প্রশ্ন : এটা কি ক্রিকেটের পক্ষে ভালো হয়েছে বলে আপনি মনে করেন ?

মুস্তাক : অবশ্যই। পাবলিক খেলার মধ্যে উত্তেজনা চায়, আনন্দ চায়। একদিনের ক্রিকেট তা দিতে পেরেছে। এটাই ভালো-মন্দের শেষ কথা।

প্রশ্ন : একদিনের ক্রিকেট আপনি নিজে পছন্দ করেন ?

মুস্তাক : নিশ্চয়ই পছন্দ করি। একদিনের খেলায় আপনি নানা স্ট্রোক দেখতে পাবেন। এটাই পজিটিভ ক্রিকেট। কেননা রেজাল্ট পাচ্ছেন।

প্রশ্ন : আপনি যে সময়ে খেলেছেন, টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটের মধ্যে—কোনটাকে বেশি পছন্দ করতেন ?

মুস্তাক : অবশ্যই একদিনের ক্রিকেট। কেননা পাবলিককে আরো বেশি খুশি করতে পারতাম। আরো বেশি উত্তেজনার খোরাক জোগাতে পারতাম। আপনারা আমার বা কর্নেল সি কে নাইডুর খেলা দেখার সুযোগ পাননি। বাবা অথবা ঠাকুর্দার বয়সীদের জিজ্ঞাসা করে দেখবেন ; আমরা টেস্ট ক্রিকেটই একদিনের ক্রিকেটের ঢঙে খেলতাম। প্রথম বল থেকেই আমরা পিটোতে শুরু করতাম। এর জন্য খেলায় রেজাল্টও পেতাম। তখন ওরা তৈরিও করত স্পোর্টিং উইকেট ! এখন টেস্টের জন্য এমন উইকেট তৈরি করে, রেজাল্টই হয় না। তবে এর মধ্যে ব্যাপার আছে। যেন বিভিন্ন সংস্থাগুলো পারফেক্ট উইকেট তৈরি করে, তাও দেখতে হবে। ক্রিকেট কর্তাদের এখন গ্যারান্টি মানি বাবদ বহু টাকা বোর্ডকে দিতে হয়। দশ-বারো লাখ—ঠিক কত জানি না। এখন স্পোর্টিং উইকেট করার জন্য যদি ম্যাচ তিনদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে তো অ্যাসোসিয়েশনগুলো গ্যারান্টি মানির পুরোটা তুলতেই পারবে না। এই কারণেই ওরা বিলিয়ার্ডস টেবলের মত উইকেট বানায়। যাতে ম্যাচটা পাঁচদিন গড়ায়। উচিত কী জানেন, গ্যারান্টি মানির চাপটা যথাসম্ভব কমিয়ে দেওয়া। বোর্ড এটা করতে পারে।

প্রশ্ন: আপনি এইমাত্র বললেন, আপনি বা সি কে নাইডু টেস্ট ম্যাচ একদিনের ম্যাচের মত খেলতেন....।

মুস্তাক : আমরা দুজনই নয়, আরো অনেকে ছিলেন। যেমন লালা অমরনাথ....।

প্রশ্ন : এমন কোনও ম্যাচের উদাহরণ দিতে পারেন, যেখানে একদিনের ঢঙে খেলেছেন ?

মুস্তাক : (হো হো হাসির পর) একটা কেন, অনেক নজির দেখাতে পারি। ছত্রিশ সালের ট্যুরে সেকেণ্ড টেস্ট—ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের কথাই ধরুন। ফলো অনের পর আমি আর মার্চেন্ট ব্যাট

সি কে নাইডুর মতো অল রাউন্ডার কমই আছেন

করতে নেমেছিলাম। ওইদিনের খেলা শেষ হবার আগেই আমি সেঞ্চুরি করে ফেলেছিলাম। মার্চেন্ট সম্ভবত ৭৫ রান। পরের দিন মার্চেন্টও সেঞ্চুরি করে। যাই হোক, ওই ম্যাচে আমরা ১৭৫ মিনিটে ২০৩ রান করেছিলাম। রানের গতি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কতটা দ্রুত ছিল !

প্রশ্ন : গতির কথা তুললেন বলেই জিজ্ঞাসা করছি, এখনকার একদিনের ক্রিকেটের সঙ্গে আপনি নিজেকে কি মানিয়ে নিতে পারতেন ?

মুস্তাক : কেন পারতাম না ? এখনও ওপেন করতে নামতাম। এখনকার প্লেয়াররা যেভাবে খেলে, সেই ভাবেই খেলতাম। আমি বরং অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় খেলতে পারতাম। বরাবরই আমি খেলতাম বড় হ্যান্ডেলের ব্যাটে। স্ট্রোক প্লেয়ার—যে ধরনের হ্যান্ডেলের ব্যাট খুবই সহায়ক। আমি বুঝতে পারি না, একদিনের ম্যাচে এখনকার প্লেয়াররা সবাই কেন লং হ্যান্ডেলের ব্যাটে খেলে না। ছোটো হ্যান্ডেলের ব্যাটে খেললে শরীর অনেকটা ঝুঁকিয়ে রাখতে হয়। ফুট ওয়ার্ক তত দ্রুত করা সম্ভব হয় না, যাঁরা লং হ্যান্ডেলে খেলে তাঁদের মত। আমার তো মনে হয়, শ্রীকান্ত যদি লং হ্যান্ডেলের ব্যাটে খেলত, অনেক বেশি সফল হত।

মার্চেন্ট খুব সলিড খেলত

প্রশ্ন : একটু আগে আপনি বলেছেন, টেস্ট ম্যাচ ওয়ান ডের মত করে খেলেছেন। তখনকার দিনে এটা কিছুটা আন-অর্থডক্স ছিল। আপনার ক্যাপ্টেন বা সহ-খেলোয়াড়রা ওই ধরনের মারকুটে খেলা কেমনভাবে নিতেন ?

মুস্তাক : আমার ক্যাপ্টেন কোনওদিনই আমাকে বারণ করতেন না। শুধু বলতেন, নিজের খেলা খেল। নির্দেশ টির্দেশ দিয়ে কাউকে কি খেলানো যায় ? বিজয় হাজারে-কে কি বলে বলেও আমাদের মত ফাস্ট খেলানো যেত ? ওর খেলার ধরনই ছিল আলাদা। ফুট ওয়ার্ক ছিল কম। হাফ ভলির জন্য অপেক্ষা করত। পেলে বেছে বেছে তারপর মারত। আমরা তো গুড লেন্থ বলকে হাফভলি করে নিয়ে মারাতাম। পিটিয়ে রান তোলাই তো একদিনের ক্রিকেটের শেষকথা।

প্রশ্ন : আপনার সময়কার ভারতীয় দল কি

গাওস্কর : ভারতের সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যান

এখনকার ছেলেদের মত একদিনের ক্রিকেটে সাফল্য পেত ? আপনি কি মনে করেন ?

মুস্তাক : দেখুন, আমাদের সময়ে বিশ্ব ক্রিকেটের মান এখনকার থেকে অনেক উঁচুতে ছিল। বিশেষ করে বোলিং। লারউডের মত বোলার এখন কোথায় ? কিথ মিলার ? ব্যাটিংয়েও দেখুন, ব্র্যাডম্যান, ওয়েস্ট ইন্ডিজের জোন্স বা ওরেল—এদের মত ব্যাটসম্যানই বা কোথায় ? তাই আমাদের সময়কার টিমের সঙ্গে এখনকার তুলনাটা....বিশ্ব ক্রিকেটের মান এখন তো খুবই খারাপ।

প্রশ্ন : ভারতের মত দেশের পক্ষে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আয়োজন করাটা কি আপনি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন ? যে দেশের কোনও খেলোয়াড় আজ পর্যন্ত একটিও অলিম্পিক সোনা জিততে পারেননি সেই দেশের এত টাকা খরচ করে....।

মুস্তাক : (প্রচন্ড অবাক হয়ে) কী বলতে চাইছেন আপনি ? টাকা খরচ হচ্ছে ! টাকা যা খরচ হচ্ছে,

তা তো উঠেই আসবে ! একথা যদি বলেন তো কোনও খেলার আয়োজন করাই আমাদের উচিত নয়। বিশ্বকাপ ক্রিকেট করে আর যাই হোক, গুড উইল তো বাড়বে। বিভিন্ন দেশ থেকে কতো লোক আসবে। সাংবাদিকরা আসবেন। এটাও একটা বড় দিক। আর তাছাড়া টাকা খরচ করছে তো বোর্ড বা তাঁর ইউনিটরা। সরকারী টাকা কি খরচ হচ্ছে ? বলতে পারেন, কিছু বিদেশী মুদ্রা খরচ হবে। তবে ক্রিকেট দলও তো বিদেশী মুদ্রা আনে। আমাদের কেউ অলিম্পিক সোনা পায়নি বলে, এত বড় টুর্নামেন্ট করব না, এই ধারণাটা ঠিক নয়। তাছাড়া দেখুন, ক্রিকেটের মতো আর কোন খেলা এত জনপ্রিয় ? ইন্দোরের রাস্তায় রাস্তায় এখন দেখি তো ছেলেরা প্লাস্টিক বল দিওে ক্রিকেট খেলছে।

প্রশ্ন : আপনার মতে একদিনের ক্রিকেটে এখন বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় কে ?

মুস্তাক : এভাবে বলা মুশকিল। মিঁয়াদাদ আছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভিভ রিচার্ডস। বোম্বের সেই ছেলেটা....,"সদ্য রিটায়ার করল, কি যেন নাম....পাটিল আছে। এদের মতই শ্রীকান্ত....আজহারুদ্দিন—এরা সবাই একদিনের ক্রিকেটে দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়।

প্রশ্ন : এদের মধ্যে সেরা কে ?

মুস্তাক : মিঁয়াদাদ।

প্রশ্ন : এই মুহূর্তে একদিনের ক্রিকেটে বিশ্বের সেরা টিম ?

মুস্তাক : পাকিস্তান। ওদের দলে অধিকসংখ্যক অলরাউন্ডার আছে। সত্যিকারের ভালো বোলার আছে ইমরানের সঙ্গে ওপেন করার মত....যেমন আক্রম। আছে লেগব্রেক গুগলি বোলার আবদুল কদির....তাঁকে সাহায্য করার মত আরো বোলার। নামগুলো চট করে মনে আসে না। আমার এটাই দোষ। আরও দেখুন, ওদের টপ ব্যাটসম্যানরা যদি ব্যর্থ হয়, আট-নয় নম্বররাও উইকেটে ঠিক দাঁড়িয়ে যায়। ওদের ফিল্ডিংও চমৎকার।

প্রশ্ন : আর টিম স্পিরিট ?

মুস্তাক : সে তো আছেই। দেখুন, টিম স্পিরিট আমাদেরও আছে। ওদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কোথায় জানেন—বোলিং শক্তিতে। আমাদের টিমে বোলার নেই। এই বিভাগটাতেই আমাদের ঘাটতি প্রচণ্ড।

প্রশ্ন : তিরাশির প্রুডেনশিয়াল ওয়ার্ল্ড কাপ আর পঁচাশির বেনসন হেজেস কাপে ভারতীয় দলের চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা, আপনি কি ফ্লুক বলে মনে করেন ?

মুস্তাক : না, আমি তা মনে করি না। ভিক্টরি ইজ ভিক্টরি। প্রুডেনশিয়াল কাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আমাদের টিম দারুণ বল করেছিল। সেবার আমাদের বোলিং সাইড এখনকার মত ছিল না; কপিল টপ ফর্মে ছিল। মহিন্দরও সেবার ভালো বল করেছিল। ফ্লুক বলাটা তাই উচিত হবে না।

প্রশ্ন : এই মুহূর্তে ইংলিশ ও অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা কি ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান বা ইন্ডিয়ানদের তুলনায় সাব-স্ট্যান্ডার্ড ?

মুস্তাক : দেখুন, এই মুহূর্তে যদি ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের সম্মিলিত দলের সঙ্গে ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান আর শ্রীলঙ্কার বাছাই দলের খেলা হয়—শেষোক্ত দল একবার দুবার নয়, বারবার জিতবে।

প্রশ্ন : ক্রিকেট-বিশ্বকে যদি সাদা, কালো আর বাদামী দলে ভাগ করি, তাহলে সাদা বনাম বাদামী দলের, অর্থাৎ ভারত শ্রীলঙ্কা পাকিস্তানীদের খেলার ফল কি হতে পারে ?

মুস্তাক : ম্যাচটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে। হাড্ডাহাড্ডির লড়াই হবে।

প্রশ্ন : আপনার সময়ে একদিনের ক্রিকেট চালু থাকলে কে সেরা বিবেচিত হতেন ?

মুস্তাক : কর্নেল সি কে নাইডু। ওর মত হার্ড হিটার খুব কমই দেখেছি। একদিনের খেলায় আপনাকে স্রেফ বল পেটাতে হবে। দ্যাটস অল। কর্নেল নাইডুর মত দক্ষ অলরাউন্ডার ভারতীয় ক্রিকেটে ক'জনই বা এসেছেন ! উনি ছাড়া ছিলেন রঙ্গনেকর। কে এম রঙ্গনেকর...বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান। দারুণ ফাস্ট। কয়েকজন আরো ভালো ক্রিকেটার অবশ্যই ছিলেন। অফ কোর্স, বোম্বে ঘরানার ক্রিকেটাররা ছিলেন তুলনায় স্লো। মার্চেন্ট...অথবা মোদি....যদি মোদি ছিলেন অন্যদের তুলনায় কিছুটা ফাস্ট....।

প্রশ্ন : আপনি তাহলে নিজেকে এদের মধ্যে ফেলবেন না ?

মুস্তাক : নিজেকে আমি কি করে রাখব ! আপনারাই তা করতে পারেন।

প্রশ্ন : বছরখানেক আগে পুনেতে প্রফেসর দেওধর আমার কাছে সি কে নাইডু সম্পর্কে আপনার মতই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

মুস্তাক : মুশকিলটা হচ্ছে কী জানেন, আপনারা সি কে নাইডুর খেলা দেখার সুযোগ পাননি। কলকাতায় ফিরে গিয়ে বয়স্কদের জিজ্ঞাসা করবেন। ওঁরা বলবেন। আমি তো কর্নেল নাইডুকে বলি, শাহেনশা অফ ক্রিকেট। কিং অফ কিংস। উনি এতো বড়মাপের ক্রিকেটার ছিলেন। ছাব্বিশ সালে আর্থার গিলিগানের টিম যেবার ভারতে খেলতে এসেছিল, মরিস টেট-এর মত বোলার সঙ্গে এনে, তাঁদের বিরুদ্ধে একটা ম্যাচে কর্নেল নাইডু বারোটা ছয় আর চৌদ্দটা বাউন্ডারি মেরেছিলেন। ভাবুন তো ! বারোটা ছয় ! হি ওয়াজ গ্রেট। ওর হাইট, রিচ, ফিজিক্যাল ফিটনেস—সব কিছু মিলিয়েই। একদিনের ক্রিকেটে দুর্দান্ত সফল হতেন। আপনাকে তো আগেই বলেছি—সে সময় কর্নেল নাইডু বা আমরা টেস্ট ম্যাচ খেলতাম একদিনের ক্রিকেটের ঢঙে।

প্রশ্ন : আপনার সময়কার কোন বোলারকে একনম্বর স্থানে রাখবেন ?

মুস্তাক : অমর সিং ওয়াজ গ্রেট। তারপর বিনু মাঁকড়, ...মহম্মদ নিসার...সুভাষ গুপ্তে।... একটা কথা আগে বলতে ভুলে গেছি... কর্নেল নাইডুকে আমি সেরা বলি...আমরা অনেকে রঞ্জি-দলীপ-পতৌদির নাম একবাক্যে উচ্চারণ করি...ব্যাপারটা কি জানেন, ওরা তিনজন দিকপাল হয়েছেন টার্ফ উইকেটে খেলে। রিয়েল ফাস্ট টার্ফ উইকেটে। অন্যদিকে কর্নেল নাইডুকে খেলতে হয়েছে ম্যাটিং উইকেটে। ম্যাটিং উইকেটে খেলা খুব...খুবই কঠিন। এখনকার সেরা ক্রিকেটারদের ম্যাটিং উইকেটে খেলতে বলুন...সবাই পালাবে। আমার বক্তব্য, কেন রঞ্জি-দলিপ-পতৌদির সঙ্গেই কর্নেল নাইডুর নাম উচ্চারিত হবে না। আমাদের সময়ে বোম্বে, কলকাতা আর মাদ্রাজেই টার্ফ উইকেট ছিল। বাকি প্রায় সব জায়গাতেই ম্যাটিং উইকেট। ফায়ার। বুঝতে পারাই কঠিন ছিল, বল অফ ব্রেক করবে, না লেগ ব্রেক। বুক উঁচু লাফাবে, না হাঁটুতে।

প্রশ্ন : আমি আপনাকে বোলার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

মুস্তাক : ও হ্যাঁ। বললামই তো অমর সিং। ওর লেন্থ, ডাইরেকশন...হাইটও ছিল ছয় ফুট দু ইঞ্চি। পেস ? মিডিয়াম। নতুন বলে মিডিয়াম পেস...তারপর অফ ব্রেক। বিগ অফ ব্রেক। ওর পর আসবে বিনু মাঁকড়, সুভাষ গুপ্তে....আরও অনেকে। অনেকের নাম এখন ভুলেও গেছি। দাত্তু ফাদকড়....সুটে ব্যানার্জি...এরা সবাই একদিনের ক্রিকেটে নিশ্চয়ই এখন সফল হত।

প্রশ্ন : আপনার সময়ের কথা তো বললেন, এখনকার ক্রিকেটারদের মধ্যে....।

মুস্তাক : সেরা ব্যাটসম্যান, বোলার...ফিল্ডার... (হা হা হাসি) ব্যাটসম্যান অবশ্যই গাওস্কর....।

প্রশ্ন : একদিনের ক্রিকেটের নিরিখেও ?

মুস্তাক : (ইতস্তত করার পর) শ্রীকান্ত.....হ্যাঁ, বেঙ্গসরকরও খুব রিলায়েবল্ ...তারপর... আজহারুদ্দিন।

প্রশ্ন : এক, দুই, তিন করে বলুন।

মুস্তাক : এক নম্বর শ্রীকান্ত, দুই গাওস্কর, তিন আজহারুদ্দিন, চার বেঙ্গসরকর—এরা চারজন তো বটেই....তা' ছাড়া রয়েছে কপিল। জিম্বাবয়ের বিরুদ্ধে ওর ইনিংসটা মনে আছে ? ওর দিনে....ওকে রোখা মুশকিল।

প্রশ্ন : আর বোলার ?

মুস্তাক : দেখুন, আমাদের এই টিমের বোলারদের সম্পর্কে আমার ধারণা খুব উঁচু নয়। একটা সময়ে কপিল দুর্ধর্ষ ছিল। এখন পড়তি। আর দুই বাঁ হাতি শাস্ত্রী ও মনিন্দর....অতি সাধারণ। আমাদের টিমে দেখুন, অলরাউন্ডারের সংখ্যা কিভাবে কমে গেছে। একদিনের ক্রিকেটে অথচ যাঁদের সবথেকে বেশি প্রয়োজন। কপিল আর রবি শাস্ত্রী ছাড়া তো অলরাউন্ডারই নেই।

প্রশ্ন : এটা কি স্বীকার করবেন, আপনাদের সময়কার টিমের থেকে এখনকার টিম অনেক বেশি সফল ?

মুস্তাক : বলা কঠিন....। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, আমাদের সময়ে আমরা ভালো ক্যাপ্টেন পাইনি। ছত্রিশে ক্যাপ্টেন ছিলেন ভিজি, ছেচল্লিশের ট্যুরে পতৌদির নবাব....যিনি কী না তখন ছিলেন অসুস্থ....। শুধু চৌত্রিশ সালে আমরা পেয়েছিলাম কর্নেল নাইডুকে। ক্যাপ্টেন হিসাবে যিনি ছিলেন তুলনাহীন। ইদানীং ইন্ডিয়া টিম তুলনায় ভালো ক্যাপ্টেন পেয়েছে। সেজন্য ভালো ফলও করছে।

প্রশ্ন : তার মানে আপনি বলতে চান কপিল

ক্যাপ্টেন হিসাবে যোগ্য ?

মুস্তাক : অবশ্যই। এখন অনেকে ওকে সরাতে চাইছেন। আমি কিন্তু এতে রাজি নই। ওর দোষ কোথায়। ওকে ভালো বোলার দিন, ভালো রেজাল্ট করে আসবেই। আমি একটা কথা বলি····এই ভারতীয় টিম ইমরান খাঁনের হাতে তুলে দিয়ে দেখুন তো! আপনি কী মনে করেন, দারুণ রেজাল্ট করবে? নিশ্চয়ই না। উল্টোদিকে, পাকিস্তান টিমটা কপিলের হাতে তুলে দিন। দেখবেন, ওরা এখন যেরকম সফল হচ্ছে, সেই রকমই সফল হবে। আসলে, আবার বলছি আমাদের বোলিংয়ে ডেপথ নেই। উল্টোদিকে পাকিস্তানের এই টিমটা পারফেক্ট টিম। ক্যাপ্টেনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লাভ কী? এই····যেভাবে বিশ্বকাপ টিমের প্রস্তুতি নেওয়া হল···ব্যর্থ হলে সবাই কপিলের ওপরই দোষ চাপাবেন···নয় কি?"

প্রশ্ন : আপনি কি কোচিং ক্যাম্পের কথা বলছেন?

মুস্তাক : ক্যাম্পের জন্য কত লাখ টাকা খরচ হচ্ছে বলুন তো? প্রথমে উদয়পুরে হল····তারপর দিল্লিতে। আপনিই বলুন, গাওস্কর···কপিলের মত টপ প্লেয়ারদের কেন ক্যাম্পে আসতে হবে? আমি একজন টেস্ট প্লেয়ার, আমি তো জানি কী করে নিজেকে ফিট রাখতে হবে। এও জানি, ফিজিক্যালি ফিট না থাকলে টিম থেকে যখন-তখন বাদ পড়তে হবে। নিজের তাগিদ তাই থাকবেই। এই সব ক্যাম্প-ট্যাম্প সব শো। আমি তো বলব, ক্যাম্পে ডেকে গাওস্কর-কপিলদের অপমান করা হচ্ছে। একজন সাধারণ কোচ, যে কী না কোনওদিন টেস্ট ম্যাচই খেলল না, সে গাওস্করদের কি কোচ করবে?

প্রশ্ন : ওটা তো ফিজিক্যাল কন্ডিশনিং ক্যাম্প····

মুস্তাক : কী আসে-যায় বলুন। এই ধরনের ক্যাম্পে এন আই এস থেকে একজন ইন্সট্রাক্টার আসে····এটা করতে হবে····ওটা করতে হবে ···এসব শেখায়। সব নাটক, অল ড্রামা····পাবলিককে দেখানোর জন্য যে কিছু একটা হচ্ছে। এর পর যদি টিম হেরে যায়, তাহলে কী কৈফিয়ত দেবে? কই, আমাদের সময়ে তো কোনও ক্যাম্প কখনও হয়নি! সব কিছু এতো ঢিলে ঢালা চললে, আসল খেলায় ভালো ফল হবে কী করে!

প্রশ্ন : এটা আপনি ঠিকই বলেছেন, প্রস্তুতি খুবই ঢিলে ঢালা হয়েছে। কপিলও তো বলেছেন, প্লেয়ার ক্যাম্পে ডাকা নিয়ে তাঁর কোনও মতামত জানতে চাওয়া হয়নি।

মুস্তাক : অবশ্যই নির্বাচকদের উচিত ছিল, ওর পছন্দ জানতে চাওয়া। আরে, নির্বাচক কমিটি গড়া নিয়েও তো ড্রামা হয়ে গেল। আমার তো মনে হয়, কমিটি গড়ার পদ্ধতিটাই ঠিক নয়। পাঁচটা অঞ্চল থেকে পাঁচজন নির্বাচক যে নিতেই হবে, এর অর্থ কী। প্রত্যেক অঞ্চলের নির্বাচক তো চাইবেনই, তার অঞ্চলের প্লেয়ার টিমে ঢোকাতে! আমাদের দেশে প্রাক্তন ক্রিকেটারের সংখ্যা কি খুব কম? পতৌদির নবাব আছে, ওয়াদেকর আছে, উম্রিগড় আছে····জয়সীমা····সো

ভালো ক্যাপ্টেন ছিলেন লালা অমরনাথ

মেনি গ্রেট ক্রিকেটার্স আর দেয়ার। ওদের মধ্যে থেকেই তো পাঁচজনকে বেছে দায়িত্ব দেওয়া যায়। প্রত্যেক অঞ্চল থেকে একজন নিতে হবেই বা কেন? এই পদ্ধতিটাতেই তো যত গন্ডগোল। আমাদের সময় তো এসব ছিল না। দু'জন পার্শি, তিনজন ইংরেজ মিলে টিম বেছে নিতেন।

প্রশ্ন : আপনি ঠিক কী বলতে চান, ওয়ার্ল্ড কাপের টিম ঠিকমত বাছা হয়নি?

মুস্তাক : না, আমি সেটা বলতে চাই না। বলছি, এই সব ক্যাম্প-ট্যাম্প সব ফার্স। হ্যাঁ, তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য এই ক্যাম্প হলে আমার

বিশ্বকাপে আমাদের দল দারুণ খেলেছিল

আপত্তি ছিল না। টপ ক্রিকেটারদের আবার ডাকা কেন?

প্রশ্ন : ক্যাম্পে একসঙ্গে থাকলে তো টিম স্পিরিটও বাড়ে, তাই না?

মুস্তাক : বাজে কথা। ওসব কথার কথা। ইন্ডিয়া টিমে যাঁরা খেলছে, তাঁদের মধ্যে আপনা থেকে টিম স্পিরিট আসবে। আসতে বাধ্য। এই দেখুন না, গাওস্কর আর বেঙ্গসরকর—এরা দু'জন তো পরস্পরের সঙ্গে কথাও বলে না। বলে কি? কিন্তু যখন দেশের জন্য খেলে, তখন একজন নিশ্চয়ই অন্য জনকে রান আউট করে না। বিশ্বে কোন টিমে প্লেয়ারদের মধ্যে ব্যক্তিগত রেষারেষি নেই বা ঈর্ষা নেই—দেখান তো? পাকিস্তান টিমে নেই? কিন্তু আপনারাই তো আবার লেখেন, ওদের টিম স্পিরিটের তুলনা নেই। গাওস্কর আর কপিলকে নিয়ে তো কম গল্প ছড়ায়নি····মাঠে কি তার ছায়া পড়েছে? মোটেই না। মাঠে গাওস্কর·····সেই অনবদ্য গাওস্করই।

প্রশ্ন : গাওস্কর সম্পর্কে তো দেখছি, শুরু থেকেই আপনি খুব উচ্ছ্বসিত····।

মুস্তাক : হব না? বলেন কী? যে ছেলেটা দশ হাজারের বেশি রান করেছে····অতগুলি সেঞ্চুরি করেছে····

প্রশ্ন : কর্নেল নাইডুর থেকেও বড়মাপের····?

মুস্তাক : গাওস্কর ইজ দ্য গ্রেটেস্ট। হ্যাটস্ অফ টু হিম। নাইডু অবশ্য ওর মত টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি। দু'জনের খেলার স্টাইলেও অনেক তফাত। কিন্তু গাওস্করের অতগুলি ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের কথা যখন ভাবি, তখন ভারতীয় হিসাবে আমার গর্ববোধ হয়। বিশেষ করে ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড। গাওস্কর নিঃসন্দেহে ভারতের সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যান।

প্রশ্ন : ডন ব্র্যাডম্যানকে আপনি দেখেছেন?

মুস্তাক : না, দুর্ভাগ্য আমারই, না। অস্ট্রেলিয়া ট্যুরে সেবার যেতে পারিনি, নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও। একটা কথা, অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেন গাওস্কর আর ব্র্যাডম্যানের কথা। তুলনা করতে বলেন। ব্যাপারটা কী জানেন, ব্র্যাডম্যান ইজ ব্র্যাডম্যান। অত অল্প টেস্ট ম্যাচে ওই গড়····তাকে কেউ ছুঁতে পারবে না। তাছাড়া কী সব দুর্ধর্ষ বোলারদের বিরুদ্ধেই না তিনি খেলেছেন! লারউড····ভোস····হোয়েস····স্পিনার ভেরেটি, রবিন্স, ফ্রিম্যান···সব টপক্লাস বোলার। উইকেটও সে সময় ছিল টার্নিং উইকেট। এখন তো হার্ড সারফেসে খেলা হয়, বোলারদের কারিকুরিও কম। টেপটা বন্ধ করুন····আরও বলছি ·····। ব্র্যাডম্যান যদি এবার কলকাতায় আসেন, তাহলে অবশ্যই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা তাঁকে জানাব।

প্রশ্ন : ব্র্যাডম্যান কলকাতায় আসছেন না।

মুস্তাক : আমারই দুর্ভাগ্য। আর হয়ত তাঁকে দেখার সুযোগ পাবো না।

প্রশ্ন : আপনি যদি এখন ইন্ডিয়া টিমের ক্যাপ্টেন হতেন, গাওস্করকে কি দলে রাখতেন?

মুস্তাক : অবশ্যই রাখতাম। একবার ও রান পেতে শুরু করলে, কার সাধ্য ওকে রোখে? একদিনের ম্যাচেই হোক বা টেস্টে। ওর

কনসেনট্রেশন···উইকেটে টিকে থাকার ইচ্ছা, দৃঢ়তা···এসবই ওর বিরাট গুণ। কখনই উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে আসার খেলা ও খেলে না। শারজার টুর্নামেন্টের সময়কার একটা ঘটনা বলি। হোটেলের লবিতে একদিন দাঁড়িয়ে আছি। ও এসে আমাকে বলল, স্যার কাল আমি আপনার মত খেলব। আমি বললাম, আমাকে তুমি খেলতে দেখেছ ? ও বলল, না, তবে আপনার কথা মামা মাধব মন্ত্রীর কাছে খুব শুনেছি। পরদিন, দুটো ছয় মেরে আমাকে কমপ্লিমেন্ট দিল। সব সময়ই ও আমাকে স্যার বলে সম্বোধন করে। প্রচন্ড শ্রদ্ধা করে।

প্রশ্ন : গাওস্করকে প্রথম কবে দেখেন ?

মুস্তাক : ঠিক মনে পড়ছে না। সম্ভবত ইন্দোরেই। একটা ঘটনা বলি। ও ওর বইতেও সেটা লিখেছে। রঞ্জির খেলা মধ্যপ্রদেশ আর বোম্বাইয়ের। এই ইন্দোরেই। সেদিন গাওস্কর দারুণ খেলল। ও যখন আউট হয়ে ফিরল, প্যাভিলিয়নে ফেরার পথে হাত বাড়িয়ে ওকে অভিনন্দন জানালাম। বললাম, ওয়েল প্লেড বয়। ওর গ্রেটনেস দেখুন, গ্লাভস পরে ছিল। সেটা খুলে তারপর আমার সঙ্গে শেকহ্যান্ড করল। এটুকু সম্মান আমাকে সেদিন দিয়েছিল।

প্রশ্ন : সেই সেদিন ওকে দেখেছিলেন এবং শেষবার শারজায়। খেলায় বা খেলার বাইরে ওর মধ্যে কী কোনও পার্থক্য দেখেছেন ?

মুস্তাক : খেলায় নিশ্চয়ই দেখেছি···আত্মবিশ্বাস। এতদিন পোড় খেয়ে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে ব্যাটিং-এ। দেখে ভালো লেগেছে।

প্রশ্ন : মনে করুন, এবারের বিশ্বকাপে ভারতের অধিনায়ক আপনিই। কাকে দলে নেবার কথা বলতেন ?

মুস্তাক : আমার পছন্দ···কপিল, গাওস্কর, শ্রীকান্ত, শাস্ত্রী, মনিন্দর, বেঙ্গসরকর···উইকেটকিপার পণ্ডিত····এরা ছাড়াও কীর্তি আজাদ, সন্দীপ পাটিল আর মহিন্দর অমরনাথ। মহিন্দর অলরাউন্ডার····যে কোনও পার্টনারশিপে দাঁড়িয়ে যেতে পারবে। এই আমার টিম।

প্রশ্ন : তাহলে বোলিং সাইড শক্তিশালী করার কি হল ?

মুস্তাক : পাটিলকে দিয়ে কিছু করাতাম, অফ ব্রেকে আজাদ···তা ছাড়া টিমে তো দু'জন বাঁ হাতি বোলার আছেই। ও হ্যাঁ, কপিলের সঙ্গে ওপেন করার জন্য আমার একজন বোলার দরকার। ভাবতে হবে। সে রকম বোলার অবশ্য এখন নেই। শর্মা মুড ভালো থাকলে খারাপ বল করে না। তবে রিলায়েবল নয়।

প্রশ্ন : শারজায় ওর সেই শেষ বলটার কথা আপনার মনে আছে ? মিয়াঁদাদকে ?

মুস্তাক : (হেসে) ঘাবড়ে গিয়েছিল। ওর উচিত ছিল, অফ স্ট্যাম্পে বল করা। অফে বল ফেললে মিয়াঁদাদ কী করতে পারত। বড় জোর চার মারত। ওই পরিস্থিতিতে হয়ত আমি বল করলে, অমন ভুলই করতাম।

প্রশ্ন : একটু আগে আপনি সুনীল-কপিলের কথা বললেন। এখনকার টিমে এই দু'জনই অপরিহার্য। দু'জনই বড় মাপের ক্রিকেটার····।

মুস্তাক : নিশ্চয়ই বড় মাপের ক্রিকেটার। সুনীল যদি অত রান না করত, কপিল যদি অত উইকেট না নিত—লোকে তাহলে ওদের দেখার জন্য নিশ্চয়ই এমন পাগল হয়ে উঠত না। দেখুন, ওদের মত ক্রিকেট আমি খেলিনি। তা সত্ত্বেও বাংলার লোকে কেন আমাকে মনে রেখেছে। নিশ্চয়ই আমার মধ্যে কিছু ছিল। আমার স্টাইল হয়ত পছন্দ হয়েছে, কিংবা আমার ড্রেস। নিশ্চয়ই কোনও কিছু।

প্রশ্ন : যেটা জানতে চাইছিলাম, সুনীল-কপিলকে দেখে ক্রিকেটার হিসাবে দু'জনের মধ্যে কোনও পার্থক্য কি আপনার চোখে পড়েছে ?

মুস্তাক : দেখুন, একজন উত্তরের, অন্যজন পশ্চিমের। প্রকৃতিগত কারণেই দু'জনের টেম্পারামেন্টে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। পশ্চিমের ক্রিকেটাররা লক্ষ্য করবেন সোবর, ক্যালকুলেটিভ এই ধরনের। আর উত্তরের ক্রিকেটাররা অনেক বেশি খোলামেলা স্বভাবের।

প্রশ্ন : এই যে উত্তর আর পশ্চিম ঘরানার ক্রিকেটারদের স্বভাবগত বৈপরীত্যের কথা আপনি বলছেন, এটা কি আপনাদের সময়েও ছিল ?

মুস্তাক : হ্যাঁ ছিল। বিজয় মার্চেন্ট বা লালা অমরনাথের কথাই ধরুন না কেন ? এদের দু'জনকার মধ্যেই এখনকার সুনীল বা কপিলকে খুঁজে পাবেন। দেখুন, একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে বলে নেওয়া সমীচীন বোধ করছি। আমাদের সময়কার ক্রিকেটের সঙ্গে এখনকার ক্রিকেটের অনেক অদল বদল ঘটে গেছে। সাধারণ কথা বলি, আমাদের সময়ে ব্লেজার গায়ে না চাপিয়ে লাঞ্চে যাওয়ার কথা আমরা ভাবতেও পারতাম না। ক্রিকেট মাঠে ইংরেজদের দেখে এই আদব কায়দা আমরা শিখেছি। সিল্কের শার্ট, ফ্লানেলের ট্রাউজার্স, টুপি—কলকাতার সে আমলের লোকেদের জিজ্ঞাসা করে দেখবেন—একেবারে ওয়েল ড্রেসড ক্রিকেটার হয়ে আমরা থেকেছি। এখন তো টি শার্ট পরেই ক্রিকেটাররা মাঠে নামছে। ব্লেজার পরা তো দূরের কথা। ক্রিকেট খেলাটাও বদলে গেছে। খেলাটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। আপনি বলবেন মুস্তাক আলি এ কী বলছে ! ডন ব্র্যাডম্যান যখন ক্রিকেট খেলেছেন, তখন লেগ সাইডে ন'জন ফিল্ডারও রাখা যেত। কেউ অপোজ করতে পারত না। আর এখন ? বিহাইন্ড দ্য উইকেট দু'জনের বেশি রাখা যাবে না। তাহলে হলটা কী বলুন। খেলাটা কী আরও সহজ হয়ে গেল না ?

প্রশ্ন : আপনার সঙ্গে সে সময় যাঁরা খেলতেন, তাঁদের মধ্যে কী ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং-এ কেউ এখনকার পরিস্থিতিতে, এখনকার টিমে মানিয়ে নিতে পরতেন ?

মুস্তাক : ফিল্ডিংটা সে সময় আমাদের খুবই দুর্বল ছিল। এখনকার ছেলেদের তুলনায়। এখনকার ছেলেদের মধ্যে আউটস্ট্যান্ডিং ফিল্ডার যেমন আজহারুদ্দিন, আমাদের সময়েও তেমন ছিলেন সি এস নাইডু। বিশেষ করে গালিতে। আমিও আউট ফিল্ডে ভালো ফিল্ড করতাম। তবে সার্বিকভাবে এখনকার ছেলেরা ফিল্ডিং-এ সত্যিই ভালো।

প্রশ্ন : এর কারণ কি ? ফিজিক্যাল ফিটনেসের ওপর তাঁরা বেশি জোর দেয় বলে, না অন্য কিছু ?

মুস্তাক : আমার তো মনে হয়, কিছুটা বোলিং স্ট্রাইক এর কারণ। কিছুটা ব্যাটিংয়ের শটও পাল্টে গেছে বলে। আগে কী হত, ব্যাটসম্যানরা লিফট করতেন। অত্যন্ত জোরে। এখন শট নেন অ্যালং দ্য গ্রাউন্ড, তুলনায় ধীর গতিতে। ফিল্ডারদের পক্ষে বল অ্যাডজাস্ট করা এতে অনেক সহজ হয়। তবুও বলছি, আমাদের সময়ে তিন-চারজন এমন ফিল্ডার ছিলেন, যাঁরা এখনকার সমতুল্য। আর বোলিংয়ে ? আমাদের সময়ের বোলারদের সঙ্গে এখনকার তুলনা না করাই ভালো। অমর সিং, মহম্মদ নিসার, সুভাষ গুপ্তে, আমির ইলাহি, বিনু মাঁকড় আর কত নাম করব।

প্রশ্ন : আপনি কিছুক্ষণ আগে একদিনের ক্রিকেটের তিন বিশ্বসেরার নাম করেছেন—মিয়াঁদাদ, শ্রীকান্ত আর ভিভ রিচার্ডস। এঁদের মধ্যে তুলনায় কে কার থেকে কেন ভালো, বলুন।

মুস্তাক : ব্যাপারটা হল কি জানেন····শ্রীকান্তের স্টান্স···যদিও ও খুব বড় প্লেয়ার, ওকে অ্যাডভাইস করা আমার সাজে না····।

প্রশ্ন : কেন সাজে না ? আপনি এত সিনিয়র····।

মুস্তাক : ইয়ে, হ্যাঁ····স্টান্স···ও বড্ড পা ফাঁক করে দাঁড়ায়। এটা মুখে বুঝিয়ে বলা একটু কঠিন। আমি দাঁড়িয়ে আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, কি বলতে চাইছি। (উঠে দাঁড়িয়ে, শ্রীকান্তের মত স্টান্স নিয়ে) এই দেখুন, শ্রীকান্ত এই বাঁ পায়ের ওপর শরীরের ভর রেখে দাঁড়ায়। পুরো ভার বাঁ পায়ের ওপর পড়ে। এই পা-টা তাই মুভ করতে পারে না। আমরা স্টান্স নিতাম, দেখুন এইভাবে (দেখালেন)···শরীরের ভার থাকত ডান পায়ে···আর তাই বাঁ পা-টা বলের লাইনে সহজে নিয়ে যেতে পরতাম। তো, এটা শ্রীকান্তের প্রথম গলদ। দু' নম্বর হল, শ্রীকান্তকে কখনই বলের কাছে যেতে দেখলাম না। এই···দাঁড়িয়েই ও অফ বা লেগের বাইরের বল মারার জন্য ব্যাট চালায়। এইবার····পাকিস্তানের মিয়াঁদাদ····ওর স্টান্স যদি ভালো করে লক্ষ্য করেন, দেখবেন····ওটা টু আইজ স্টান্স····ও এমনভাবে দাঁড়ায়, দুটো চোখেই বল দেখতে পারে। এই স্টান্স ইনসুইং আর অফব্রেক বল খেলার পক্ষে দারুণ ভালো। ও এমন মাস্টার ব্যাটসম্যান···অফের দিকে প্রচন্ড স্ট্রং। ফুট ওয়ার্ক ভালো, অ্যাডজাস্টমেন্টও দারুণ···

প্রশ্ন : ভিভ রিচার্ডস ?

মুস্তাক : ওকে আমি দেখিনি। টি ভি-তে দেখেছি····ও হার্ড হিটার···বলের খুব কাছে এসে খেলে। যে বলের ক্লোজ থেকে খেলতে পারে, সে-ই তো বড় ব্যাটসম্যান।

প্রশ্ন : এই তিনজনের মধ্যে এক নম্বরে কে আসবেন ?

মুস্তাক : এমনিতে তো রিচার্ডস আসে। একদিনের ক্রিকেটে পাঁচ হাজারের বেশি রান···কিন্তু আমার চোখে ওই স্থান পাবে মিয়াঁদাদ। শ্রীকান্ত তৃতীয় স্থানে।

প্রশ্ন : একদিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যত কতটা উজ্জ্বল ?

মুস্তাক : ভীষণ উজ্জ্বল। টেস্ট ক্রিকেটে ম্যাচের সংখ্যা কমে যাবে। কিন্তু একদিনের ক্রিকেট থাকবেই। বরং আরো প্রবলভাবে থাকবে। টেস্ট ক্রিকেটকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে নিয়ম বদলাতে হবে। ওভার বেঁধে দিতে হবে। নব্বুই ওভার অথবা ওই ধরনের অন্য কিছু। নাহলে টেস্ট ক্রিকেট বন্ধ হয়ে যাবে। টেস্টে দর্শক কত কমে গেছে দেখেছেন। অথচ একদিনের ম্যাচে গ্যালারি ফুল।

প্রশ্ন : আপনার মত এই একই কথা প্রফেসর দেওধর কিছুদিন আগে আমাকে বলেছিলেন, টেস্ট ম্যাচ ওয়ান-ডের ঢঙে খেলানোর ব্যবস্থা হোক। খেলাটা চারদিনের হোক। একদিন একেকটা টিম ব্যাট করবে···ওভার নির্দিষ্ট করা থাকবে···।

মুস্তাক : দেওধর ঠিকই বলেছেন। টেস্টে কিছু নিয়ম বদলানো দরকার। নইলে টেস্ট ক্রিকেট মুছে যাবে। ধরুন, একে লোকের অত সময় নেই। তারপর, প্রচুর টাকা পয়সা টেস্টে এখন লেগে যাচ্ছে···লোকের টাকা নেই ম্যাচ করার। তারপর দেখুন···ঠুকুস ঠুকুস করে পাঁচ দিন খেলার পর রেজাল্ট হল ড্র। দর্শকদের ভলো লাগবে কেন ? পপুলারিটি তো কমবেই।

প্রশ্ন : লিমিটেড ওভারের ক্রিকেট যে কোনওদিন হতে পারে—কোনওদিন আপনারা ভাবতে পেরেছেন ?

মুস্তাক : না···কোনও ধারণাই ছিল না। তিনদিনের ম্যাচ হত। রঞ্জি আর টেস্ট। একদিনের ক্রিকেট যে হতে পারে, কোনদিনই তা ভাবিনি।

প্রশ্ন : যেদিন শুনলেন, একদিনের ম্যাচ হবে বা হচ্ছে, সেদিন কেমন লেগেছিল ?

মুস্তাক : প্রথম প্রথম তেমন কিছু মনে হয়নি···কিন্তু পরে জনপ্রিয়তা এমন বাড়তে থাকল···যে বুঝতে পারলাম···লিমিটেড ওভার ক্রিকেট থেকে যাবে। প্রত্যেক ক্রিকেট সংস্থাই পয়সা কামাতে চায়। এই ইন্দোরেই···আপনি টেস্ট ম্যাচ করে দেখুন, স্টেডিয়াম ভর্তিই হবে না। আর ওয়ান ডে করুন···টিকিট বেচে কুলোতে পারবেন না। আমাদের সোসাল লাইফটাই এখন ফাস্ট লাইফ হয়ে গেছে। লোকে দ্রুত বা তাৎক্ষণিক আনন্দ চায়। যেটা ওয়ান ডে ম্যাচে পায়। কোত্থেকে এটা শুরু হয়েছিল, বলুন তো ? অস্ট্রেলিয়ায় ?

প্রশ্ন : না, ইংল্যান্ডে···।

মুস্তাক : হ্যাঁ, হ্যাঁ···ওখানে এখন টেস্ট ম্যাচে লোক হয় না বলে···আমাদের মতই অবস্থা।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন, টেস্ট দল আর একদিনের ম্যাচের দল···আলাদা ঢঙের খেলা বলে আলাদা আলাদাভাবে বেছে নেওয়া উচিত ?

মুস্তাক : না সেটা আমি মনে করি না। মহিন্দর অমরনাথকে দলে নেব না···কেননা ও শুধু টেস্ট প্লেয়ার···ওয়ান ডে-তে ভালো নয়···এভাবে বাছাবাছি করা ঠিক নয়। ওর কাছে পাঁচদিনের ম্যাচও যা, একদিনের ম্যাচও তাই। খেলার কথা, খেলে দেবে। আলাদ হবে কেন ?

মহিন্দরকে বাদ দেওয়া ঠিক নয়

প্রশ্ন : আমি বলতে চাইছি, একদিনের ম্যাচের টেম্পারামেন্ট অন্যরকম। সব প্লেয়ার তাতে মানানসই নাও হতে পারে।

মুস্তাক : তা ঠিক। নিশ্চয়ই ঠিক। এই দেখুন না, বিজয় হাজারের মত কোনও প্লেয়ারকে যদি ওয়ান ডে-তে নামান, তাহলে কি সে সফল হবে···না মোটেই না। তাঁকে ওয়ান ডে থেকে বাদ দিতেই হবে। কিন্তু আবার বলছি, মহিন্দরের মত প্লেয়ারকে আবার বাদ দেওয়া ঠিক নয়। এক্সট্রা বোলার হিসাবেও তাঁকে ব্যবহার করতে পারবেন। এখন ইন্ডিয়া টিমে আরও অলরাউন্ডার দরকার। একটা নাম ক্যাম্পের পঁচিশজনের মধ্যে এবার দেখলাম না···ভালো প্লেয়ার···হায়দ্রাবাদের···কি যেন নাম···আর্শাদ আইয়ুব···ওকে নেওয়া উচিত ছিল।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আপনি নিজে একদিনের ক্রিকেটে কতটা সফল হতেন বলে মনে করেন ?

মুস্তাক : আগেই তো আপনাকে বলেছি, আমি টেস্ট ম্যাচই খেলতাম এখনকার ওয়ান ডে-র ঢঙে। সফলও হয়েছি। আপনাদের ইডেনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হানড্রেড করেছি। আপনার বাপ-ঠাকুর্দার বয়সীদের জিজ্ঞাসা করবেন কেমন খেলেছিলাম। ওই ইডেনেই লর্ড টেনিসনের টিমের বিরুদ্ধে আবার সেঞ্চুরি করেছিলাম। ওয়েস্ট ইন্ডিজের রামাদীনকে কি পিটিয়ে ছিলাম, জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। ওর বল পিচে পড়তেই দিইনি। বেরিয়ে গিয়ে মেরেছি। একদিনের ক্রিকেটে তো এটাই দরকার।

শ্রীকান্ত খুব বড় প্লেয়ার

প্রশ্ন : এতো বেশি অ্যাডভেঞ্চারাস হতে গিয়ে কখনও ভুল করেননি ?

মুস্তাক : ক্রিকেটার তো ভুল করবেই। যে ক্রিকেটার একবার শূন্য রানে আউট হয়নি, সে ক্রিকেটারই নয়।

প্রশ্ন : তিরাশির ওই বিশ্বকাপে ভারতের চ্যাম্পিয়ন হওয়া সম্পর্কে আপনি বলেছেন···দলে অনেক বেশি অলরাউন্ডার ছিল···।

মুস্তাক : অলরাউন্ডার তো বেশি ছিলই, কিন্তু আমাদের জেতার আরও কারণ, অপোনেন্টের ওভার কনফিডেন্স। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভেবেছিল, আরে ১৮২ রান···তুড়ি মেরে তুলে নেব। ওটাই ওদের কাল হল। উইকেট পড়তে শুরু করল···আমদের বোলাররাও টপ্‌ চলে গেল···।

প্রশ্ন : একটা কথা অনেকক্ষণ ধরেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছি···কেউ কেউ নিজের রেকর্ড করার জন্য অজকাল ক্রিকেট খেলেন, আবার কেউ কেউ টিমের কথা ভেবে···আপনার পছন্দ কোনটি ?

মুস্তাক : আমি তো স্রেফ দর্শকদের কথা ভেবে খেলতাম। নিজের জন্য খেলিনি···এই মনোভাব নিয়ে খেলতে যেতাম, আজ ইডেন গার্ডেন্সে পঞ্চাশ হাজার লোক এসেছে···সকাল থেকে রোদ্দুরে বসে আছে···কর্নেল নাইডু বা মুস্তাক আলির খেলা দেখবে বলে···ওদের ভেতর ক্রিকেটার আছে, ক্রিকেটপ্রেমীরা আছে···এই আশা নিয়ে যে খেলাটা দেখে আনন্দ পাবে···আজকালকার প্লেয়াররা হাফভলির জন্য ওয়েট করে, ফুলটস পেলে তবেই মারে···আমরা কি করতাম জানেন···গুড লেংথ বলকে হাফ ভলি করে নিয়ে, প্লেস করে মারতাম। তা চেষ্টা করতাম, দর্শকদের আনন্দ দিতে। খেলার শেষে লোকেরা যখন চৌরঙ্গি দিয়ে ফিরত, তখন এই আলোচনাই করতে করতে ফিরত···আঃ, কি খেলাই না মুস্তাক আলি খেলল !

আপনি আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, ভালো কথা। সেই সঙ্গে সে আমলের লোকেদের কাছেও আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তাহলেই এই ইন্টারভিউ কমপ্লিট হবে।

প্রশ্ন : আচ্ছা, শ্রীকান্তকে কি নিজের উত্তরসূরী বলে কখনও আপনার মনে হয়েছে ?

মুস্তাক : না··· সেভাবে কখনও ভাবিনি। আমি আরও বেশি অ্যাডভাঞ্চারাস ছিলাম। শ্রীকান্তের থেকে অনেক বেশি স্ট্রোক নিয়ে খেলতাম। আমি অফের বল লেগ সাইডে খেলতাম। বোলার বিনু মাঁকড়ই হোক অথবা কীথ মিলার। বিনুর কথাই ধরুন, অফের দিকেই যত ওর ছিল কারিকুরি। ফিল্ড সাজাতও সেরকম। আমাকেও তো রান তোলার জন্য কিছু করতে হবে। তাই অন সাইডে ঘোরাতাম।

প্রশ্ন : খেলার সময় ব্যাটসম্যান আর বোলারের মধ্যে একটা সাইকোলজিক্যাল ওয়ার চলতেই থাকে। একজন অপরজনকে টেক্কা মারার চেষ্টা করে। তা, এরকম কোনও বোলার আপনাকে টেক্কা মারতে পেরেছে ?

মুস্তাক : বুঝতে পেরেছি, কী জানতে চাইছেন। একটা ব্যাপার, বোলার কেন আপনার ওপর প্রভাব বিস্তার করবে ? (উঠে দাঁড়িয়ে স্টান্স নিয়ে) ধরুন বোলার ছুটে আসছে··· ঠিক যখন ডেলিভারিটা করবে, তার আগে যদি শরীরটা দ্রুত একবার ঝাঁকুনি দেন, তাহলে বোলার ঘাবড়ে যাবেই। যে-প্ল্যান নিয়ে ও বল করতে আসছে··· তা খাটাতেই পারবে না। আমি এভাবে অনেকবার সফল হয়েছি। আমার কথা, বোলারকে আমি ডিকটেট্ করব। তুমি এখানে বল ফেল, ওখানে বল দাও··· আমার ইচ্ছেমত। একবার যদি ভদ্রলোকের মত খেলে বোলারকে ডিকটেট করতে দেন, তো আপনি গেলেন ···। আসলে কী জানেন, আমরা খেলে উঠেছি ম্যাটিং উইকেটে। ম্যাটিংয়ে খেলার জন্যই ভদ্রলোকের মত খেলা··· পুতুপুতু খেলা শিখিনি। অস্ট্রেলিয়ার লকস্টন আর ইংল্যান্ডের লোডার যখন কমনওয়েলথ দলের হয়ে এখানে খেলতে এল, আমার স্টাইল দেখে অনেক বাজে কথা বলেছিল। বলেছিল এটা ক্রিকেটই নয়। পুনে থেকে খেলা শুরু হল, আমি ওদের পেটাতে শুরু করলাম··· ওরাও টেস্ট প্লেয়ার··· স্বভাবতই রেগে গেল। তা, সেবার আমেদাবাদে খেলা··· ম্যাটিং উইকেটে। আমি মনে মনে বললাম, তোমাদের ওস্তাদি ঘোচাচ্ছি। সে ম্যাচে আমি ক্যাপ্টেন। ওপেন করতে গিয়ে তিনটে স্টাম্প ছেড়ে··· স্টান্স নিলাম। একেবারে লেগে। লোডার ক্ষেপে গেল। বড় বোলার··· ডাবল উইকেট খোলা, স্রেফ বোল্ড করবে। কিন্তু ওর হাত থেকে বল বেরোনো মাত্রই আমি নিজের জায়গায় পৌঁছে গেলাম। প্রত্যেকবার। ও খুব হতাশ হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনি যে ধরনের রিস্ক নিতেন, এখন তেমন কে খেলেন ?

মুস্তাক : (প্রশ্নটি ভুল বুঝে) এখন তো আজাহারুদ্দিন রিস্টের ওপর খেলে। ওর আগে খেলত বিশ্বনাথ। গাওস্কর পুরো সোল্ডার লাগিয়ে খেলে···।

প্রশ্ন : না, আমি জানতে চাইছি, আপনার মত রিস্কি খেলা এখন কে খেলেন ?

মুস্তাক : সরি। বুঝতে পারিনি। আমার মত ঝুঁকি এখন আর কেউ নেয় না। ওই যে আগে বললাম, টাকা পয়সা ইনভলভ্‌ড হয়ে গেছে। হাঃ হাঃ হাঃ।

প্রশ্ন : শারজায় ওরা আপনাকে সম্মান জানাল, হঠাৎ··· অবাক হননি ?

মুস্তাক : হয়েছি। খেলা দেখতে পেয়েছি, টাকা পেয়েছি, সম্মান পেয়েছি। অবশ্যই খুশি। আসিফ ইকবাল যে এই ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছে··· ভালো। ভারত আর পাকিস্তান বোর্ডেরও এটা করা উচিত। অবশ্য ভারতীয় বোর্ড করছে। এই তো টেস্ট পিছু হাজার টাকা পেয়েছি। আমি প্রায় চুয়ান্ন হাজার টাকা পেয়েছি।

প্রশ্ন : এখনকার ক্রিকেটে টাকা এত বেড়ে গেছে, অথচ প্লেয়ারদের মর‍্যালিটি এত কমে গেছে কেন ?

মুস্তাক : ঠিকই বলেছেন··· এরা এত টাকা পাচ্ছে··· সো মাচ মানি··· তবুও··· এদের বিজ্ঞাপনে নামা আমার একেবারে ভালো লাগে না। জানি না, ভুল বলছি কী না··· পতৌদির নবাবের কথাই ধরুন। কোনদিকে ওর কম আছে ? সুটিংয়ের বিজ্ঞাপনে নামার কি দরকার ? এইরকম কপিল, গাওস্কর··· সবাই পাল্লা দিচ্ছে। আমার ভালো লাগে না। ওদের তো এমনিতেই প্রচুর টাকা আছে।

প্রশ্ন : প্রফেসর দেওধরও আমাকে প্রায় এই কথা বলেছিলেন··· খেলার সময়ও যদি কাউকে বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে বিজ্ঞাপনের পোজ দিতে হয়, তাহলে সে খেলার কথা ভাববে কখন ?

মুস্তাক : দেওধর ঠিকই বলেছেন।

প্রশ্ন : আবার দেখুন, এই টাকাপয়সা নিয়ে আকচাআকচিই যত সর্বনাশের মূল। প্লেয়ারদের সম্পর্কও খারাপ করে দেয়। সুনীল-কপিলের গন্ডগোলও তো শুরু টাকা নিয়ে।

মুস্তাক : আমি বলছি··· এটা হিউম্যান নেচার··· এই যে আপনি ইন্দোরে এসেছেন, আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন··· আপনার অফিসে নিশ্চয়ই কেউ এমন আছে··· যে ঈর্ষায় ফেটে পড়ছে। এটা তো হবেই। দুই বড় ডাক্তারের মধ্যে এটা হয়, টাটা-বিড়লার মধ্যে এটা হয়।

প্রশ্ন : আচ্ছা, 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' পুরস্কার কি দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ? টিম জিতলে তো সবারই কৃতিত্ব। একজনকে বেছে পুরস্কার দিলে তো মন কষাকষির সম্ভাবনাই বেশি।

মুস্তাক : পুরস্কার দেওয়াটার সমালোচনা করছি না। তবে সেটা একজন না নিয়ে সবাই মিলে ভাগাভাগি করে নেওয়াই বোধ হয় ভালো। অবশ্য সেটা যদি আর্থিক পুরস্কার হয়। আর সিলভার প্লেট বা গাড়ি দিলে, তা কেমন করে ভাগাভাগি হবে বলুন। এখন শুনেছি··· ওরা ভাগ বাঁটোয়ারা করে না। এটা খারাপ। ধরুন, একজন বোলার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হল। বোলারের একার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই নয়। উইকেট-কিপার আর ফিল্ডারের মদত না পেলে কি করে সে উইকেট পাবে ?

প্রশ্ন : আপনাদের সময়ে কি ওই ধরনের পুরস্কার ছিল ?

মুস্তাক : না, না, সেরকম কিছু ছিল না। ব্যক্তিগত পছন্দে কেউ কেউ কিছু দিতেন না, তা নয় ! ধরুন, কোনও একটা ম্যাচ জিতলাম··· কেউ এসে বললেন··· মুস্তাক তোমার কি চাই বল ? স্যুট লেংথ হয়ত দিয়ে গেলেন··· এরকম কখনও কখনও হয়েছে বটে। টাই, জামা, ট্রাউজারস··· কি ব্যাটও কেউ কেউ প্রেজেন্ট করেছেন। গিলিগানের টিমের বিরুদ্ধে কর্নেল নাইডুর খেলা দেখে একজন একবার একটা মোটর সাইকেল তাঁকে প্রেজেন্ট করেছিলেন। উনি পাওয়ার যোগ্য ছিলেন। এরকম উপহার নেওয়া যায়। এতে কোনও দোষ নেই।

প্রশ্ন : এই যে এখনকার ক্রিকেটাররা এত বেশি ম্যাচ খেলেন, সেটা কি ভালো ? সারা বছরই তো কিছু না কিছু লেগে রয়েছে···

মুস্তাক : আমরাও তো এত ম্যাচ খেলতাম। হ্যাঁ, এত টেস্ট নিশ্চয়ই নয়। তবে সারা দেশ ঘুরে সে সময় প্রচুর ম্যাচ আমরা খেলতাম। ওই যে বলত না··· কর্নেল নাইডুর সার্কাস··· খেলেছি··· অনেক খেলেছি। একজিবিশন ম্যাচ, রিলিফ ফান্ডের ম্যাচ··· এইসব তো লেগেই থাকত। টাকাপয়সার জন্য নয়, ক্রিকেটের জন্যই খেলতাম।

প্রশ্ন : এত ম্যাচ তো প্লেয়ারদের খেলোয়াড় জীবন টেনে ছোট করে দেয়···।

মুস্তাক : ঠিকই বলেছেন। ফাস্ট বোলারদের তো বটেই। আর তা'ছাড়া দিনরাত ক্রিকেট ক্রিকেট করলে কোনও চার্ম থাকে ? বিশ্রাম দরকার। বছরে তিন চার মাস ক্রিকেট থেকে দূরে থাকা দরকার। ফ্যামিলির সঙ্গে থাক, রিল্যাক্স কর। তবেই তো আবার খেলার ইচ্ছা জাগবে।

প্রশ্ন : ভারত-পাকিস্তান দু'দেশের ক্রিকেটের উন্নতির জন্যই, আপনি কি মনে করেন আরো বেশি ম্যাচ নিজেদের মধ্যে খেলা দরকার ?

মুস্তাক : উন্নতি তো কিছু হবে না ! দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হতে পারে। খেলায় উন্নতি হবে না। ক্রিকেট ওদের দেশে যেমন চলবে, তেমন আমাদের দেশেও। হ্যাঁ, পাবলিক কিছু বেশি খেলা দেখতে পাবে, এই যা।

প্রশ্ন : দু'দেশের খেলোয়াড়দের নিয়ে যদি একটা দল আপনাকে করতে বলি, তাহলে কাদের বেছে নেবেন ?

মুস্তাক : ভাবতে হবে। চট করে এভাবে বলা··· কপিল, আর ইমরান বল ওপেন করবে। অধিনায়ক অবশ্যই ইমরান। তারপর, ওপেনিং ব্যাটসম্যান··· গাওস্কর··· আপনাকে তো লিখতে হবে··· না হলে ১১ জন এভাবে··· আজহারুদ্দিন, মিয়াদাদ, বেঙ্গসরকর। ওদিক থেকে গুগলি বোলার কদির··· ইমরানের সঙ্গে যে ছেলেটা ওপন করে··· আক্রম আসবে, আর কে আসতে পারে ? শ্রীকান্ত আসবে। ভারত থেকে শ্রীকান্ত, কপিলদেব, গাওস্কর, বেঙ্গসরকর, শাস্ত্রী··· এদিক থেকে পাঁচজন হয়ে গেল। ওদিক থেকে ইমরান, কদির, মিয়াদাদ, সেলিম মালিক··· পাকিস্তানের উইকেট-কিপারটা ভালো ওকে নেওয়া যেতে পারে। দশজন হয়ে গেল, ব্যস। আর একজন··· যে কোনও দল থেকে নেওয়া যেতে পারে। পাঁচ অথবা ছয়—দু' দেশ থেকে টিমে এরকমই থাকবে।

প্রশ্ন : লোকে বলে, ভারতীয়দের থেকে পাকিস্তানীদের মধ্যে জেতার আগ্রহ বা ইচ্ছাটা বেশি···।

মুস্তাক : এটা কিন্তু আমি মনে করি না। লোকে এটা বলে বটে। ফের ওই একই কথা এসে পড়ে। পাকিস্তানীরা টিম স্পিরিটে খেলে, আমাদের ছেলেরা খেলে না। এটা ঠিক নয়। আমাদের ছেলেরাও ওই একই স্পিরিট নিয়ে খেলে, যেভাবে ওরা খেলে। আসলে আমরা যখন হেরে যাই, তখনই টিম স্পিরিট নেই বলে কথা ওঠে। মোদ্দা ব্যাপার হল, আমাদের টিমে সেরকম বোলার নেই। সেজন্যই আমরা হেরে যাই।

প্রশ্ন : পাকিস্তানীরা ইংলিশ কাউন্টিতে বেশি খেলে বলেই কি···

মুস্তাক : না, না। আমাদের ছেলেরাও তো অনেকে কাউন্টি খেলে। ওদের সংখ্যাও কম

নয়।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আপনি গাওস্করকে দেখছেন, হানিফ মহম্মদকেও দেখেছেন। ওপেনার হিসাবে এদের দু'জনরে মধ্যে তুলনা করুন।

মুস্তাক : হ্যাঁ, দু'জনকেই দেখেছি… হানিফের তলনায় সুনীল অনেক বেশি স্ট্রোক নিয়ে খেলে। ওর খেলায় গ্রেস বেশি, ক্রীজে এসেও খেলে। হানিফ কিছুটা স্লো… মানে হানিফের অ্যাপ্রোচ কিছুটা স্লো ছিল। ম্যাচ টেম্পারামেন্ট দু'জনেরই সমান… উইকেটে টিঁকে থাকার প্রবণতায় দু'জনই সমান।

প্রশ্ন : একইভাবে যদি কপিল, ইমরান আর ফজল মামুদের মধ্যে তুলনা করতে বলি…।

মুস্তাক : এই তিনজন আলাদা আলাদা টাইপের বোলার। ফজল মামুদ ছিল মিডিয়াম ফাস্ট কাটার। অফ ব্রেক লেগ ব্রেক… ও বল কাট করত। ইমরান আর কপিল দু'জনই ফাস্ট বোলার। ওরা বল মুভ করায় ইনসুইং আর আউট সুইংয়ে। ফজল মামুদ ছিল অনেকটা ইংল্যান্ডের বেডসারের মত। বেডসারের মত কাট করত। তবে ও গ্রেট বোলার… দারুণ হ্যান্ডসামও ছিল, এই ফজল।

প্রশ্ন : ইমরান আর ফজলের মধ্যে কাকে ওপরে স্থান দেবেন ?

মুস্তাক : ইমরানকেই… যদি বিচার করেন কে বেশি উইকেট পেয়েছে… যে বেশি উইকেট পেয়েছে, সে নিশ্চয়ই বড় বোলার। তবে হ্যাঁ, ফজল হেল্পিং উইকেট পেলে যে কোনও দলের ইনিংস মুড়িয়ে দিতে পারত।

প্রশ্ন : কপিল আর ইমরানের তুলনা তো করলেন না ?

মুস্তাক : দেখুন, দু'জনেই বড় মাপের বোলার। দু'জনেই তার দিনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। যদি কপিল ইংল্যান্ডের মাটিতে বল করে তাহলে সফল বেশি হবে। আপনাদের ইডেন গার্ডেন্সে … মানে যেখানে বল মুভ করে… সেখানে কপিল খুব সফল হবে। একই কথা ইমরান সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তবে পেসের দিক থেকে আর কপিলের তুলনায় ইমরান আবার এগিয়ে। ইমরানের ইনসুইং একটু বেশি এবং তা জোরে আসে।

প্রশ্ন : বুদ্ধি করে বল করার বিচারে… ?

মুস্তাক : দু'জনই সমান। এটা বলছেন… আসলে কি জানেন, যাঁর মেটিরিয়াল থাকে, সে বুদ্ধি করে বল করার চেষ্টা করবেই। এই যে লোকে কপিল সম্পর্কে বলে, কপিল বোলার চেঞ্জ ভালো করতে পারে না। আবার সেই প্রশ্নটাই ঘুরে ফিরে আসবে। বোলার কই ? চারজন তো মাত্র বোলার। সেই শর্মা, শাস্ত্রী, মনিন্দর আর সে নিজে। বুদ্ধি করে চেঞ্জ করার প্রশ্নটা আসে কোত্থেকে ?

প্রশ্ন : একদিনের ক্রিকেটে, বেলারদের এই যে ওভার সংখ্যা বেধে দেওয়া হয়, সেটা ভালো না মন্দ ?

মুস্তাক : সেটা বিচার করা… ঠিক এখনই মুশকিল। একদিনের ক্রিকেট আর কতদিনই বা শুরু হয়েছে। একটা কথা, আপনার বক্তব্য হচ্ছে,

আজহার একদিনের ক্রিকেটে দুর্ধর্ষ

বোলারদের ওভার সংখ্যা বেধে দিলে সেই বোলারের দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় না। দল সাফার করে…।

প্রশ্ন : হ্যাঁ। যেমন ধরুন কপিল… যদি ও পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচে কুড়ি ওভার বল করার সুযোগ পেত… অন্তত চেতন শর্মার থেকে তো এফেকটিভ হত ? কিন্তু সে দশ ওভারের বেশি বল করতে পারছে না। তাও প্রথম দিকে কিছু বা শেষের দিকে কয়েক ওভার। ভারতীয় দল সাফার করছে।

মুস্তাক : কথাটা ঠিক। নিয়মটা বদলানোর কথা ভাবাও যেতে পারে। তবে এও ঠিক, ওভার সংখ্যা বেধে দেওয়ার জন্য এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কিন্তু বাড়ছে।

প্রশ্ন : আপনি তো নিজে ওপেনিং ব্যাটসম্যান ছিলেন। তা, পার্টনার বেছে নিতে বললে কাকে নেবেন ?

মুস্তাক : বিনু মাঁকড়।

প্রশ্ন : সে কি! গাওস্কর, মার্চেন্ট বা শ্রীকান্ত—কেউ নয় ?

মুস্তাক : না। আমার আর মাঁকড়ের সমঝোতা ছিল চমৎকার। একটা ম্যাচের কথা বলি। ইংল্যান্ডে। আমি আর মাঁকড় খেলছিলাম। একটা বল উইকেটকিপারের হাতে পৌঁছবার মাঝেই আমরা একটা রান নিয়ে ফেলেছিলাম। এমনই আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল আমাদের মধ্যে। আপনি যাদের কথা বললেন, তাঁদের সঙ্গে এমন সমঝোতা আমার হত না। মার্চেন্ট খুব সলিড খেলত। তবে বেশি ঝুঁকি নিত না। গাওস্করও… এমন ঝুঁকি নিত বলে আমার মনে হয় না।

প্রশ্ন : আপনার সেরা ইনিংস কোনটি ?

মুস্তাক : সেরা ইনিংস ? ম্যাঞ্চেস্টারের সেই সেঞ্চুরি। ওটাই স্মরণীয় ইনিংস। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। বোলার কে ছিল জানেন… রবিনস, হ্যামন্ড, ভোস আর ভেরেটি। আমরা ফলো অন করেছিলাম। প্রথম ইনিংসে ভালো রান পাইনি। সেজন্য দ্বিতীয় ইনিংসে রান তোলার দিকে জোর দিয়েছিলাম। ৩০-৪০ রান করার পর ভাবলাম যথেষ্ট হয়েছে। ওই সময় তো আমার ধারণাই ছিল না টেস্ট সেঞ্চুরির মূল্য কী। রান তুলতে তুলতে নব্বুইয়ের ঘরে পৌঁছে গেলাম। তখন হ্যামন্ড আমার কাছে এলেন। ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন এসে বললেন, সেঞ্চুরিটা করে নাও। জীবনে বিরাট একটা সুযোগ সামনে পেয়ে গেছ। যাই হোক, সেঞ্চুরি তো করে ফেললাম। তারপর ড্রেসিং রুমে যখন ফিরে এলাম তখন জ্যাক হবস, জার্ডিন… আরো যত বড় বড় প্লেয়ার সেসময় ছিলেন, আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। তারপরই টেলিগ্রাম আসতে শুরু করল। প্রথম টেলিগ্রামটা পেলাম বোর্ড প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে। এইসব হবার পর হঠাৎ বুঝতে পারলাম, টেস্ট হান্ড্রেডের মূল্যটা কী ! এরপর অবশ্য সেঞ্চুরি পাই এগারো বছর পর। কলকাতায়… কী তারিফই না কলকাতায় পেয়েছিলাম ! আগের দুটো টেস্ট থেকে বাদ পড়েছিলাম। দিল্লি আর বোম্বাইতে। কলকাতায়ও টিমে ছিলাম না। দত্তরায় তখন চেয়ারম্যান। আপনাদের দত্তরায়। তা, কলকাতায় সেবার কর্তাদের মুখের ওপর জবাব দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : আপনার চোখে সেরা ক্যাপ্টেন কে ? মানে যাদের সঙ্গে আপনি খেলেছেন…।

মুস্তাক : সি· কে· নাইডু। ওর ফাইটিং কোয়ালিটি ছিল দারুণ। ম্যাচ হেরে যাচ্ছি তখনও বলে যেতেন… পরোয়া কোরো না, লড়ে যাও। এখনও তো ম্যাচ হারিনি। কখনও হয়ত ক্যাচ মিস করেছি। ভাইটাল ক্যাচ। দৌড়ে এসে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতেন… নেভার মাইন্ড। হোলকার টিমে ওর ক্যাপ্টেনসিতে অনেক ম্যাচ খেলেছি। কর্নেল নাইডু ছাড়া ভাল ক্যাপ্টেন ছিলেন ওয়াজির আলি… লালা অমরনাথ।

প্রশ্ন : ক্রিকেট থেকে চরিত্র গঠনের একটা ব্যাপার আপনাদের সময় ছিল। দেওধর আমাকে বলেছিলেন। আজকাল আর ওসব…।

মুস্তাক : হ্যাঁ, এখনকার ছেলেরা একটু রাফ। দেওধরের সঙ্গে কথা বলবেন, মার্চেন্টের সঙ্গে এখন কথা বলবেন। আপনার ভালো লাগবে। এখনকার ছেলেরা… তবে এরা যখন রিটায়ার করবে, তখন এরাও আবার অনেকে পলিশড হয়ে যাবে। এরা এখন স্টার। আমরাও ছিলাম। তবে অন্যরকম। কেউ কথা বললে বলতাম, কেউ ডাকলে যেতাম। এখন এরাও যায়। তবে কী পাওয়া যাবে, সেটা আগে বিচার করে।

প্রশ্ন : কলকাতায় বিশ্বকাপ ফাইনাল হচ্ছে, আপনি কি যাবেন ?

মুস্তাক : নিশ্চয়ই। দেখুন, একটা কথা বলি। ক্রিকেট আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। সুনাম, অর্থ, সব কিছু। আর কিছু আমার চাওয়ার নেই। আমি খুব সুখী। আমার জীবৎদশায় দেশে বিশ্বকাপ ক্রিকেট হচ্ছে। এটা অভাবনীয়। তার ওপর ফাইনাল ম্যাচটা আবার কলকাতায় ! কলকাতা ছাড়া ফাইনাল হবার মত যোগ্য জায়গা কোথায় ? এই সুযোগ কি ছাড়া যায় ? একটা জিনিস বোর্ড অবশ্য করতে পারে, দেশের যেসব জায়গায় বিশ্বকাপের ম্যাচ হচ্ছে, সেখানে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পুরস্কার দেবার জন্য প্রাক্তন ক্রিকেটারদের ডাকতে পারে। জানি না, এটা বলা আবার ঠিক হচ্ছে কী না ! ■

আমি একমত নই

দিলীপ বেঙ্গসরকর

'ইন্ডিয়া ? কি বলছেন মশাই ? না, না ওয়ার্ল্ড কাপে আপনাদের কোনও চান্সই নেই। হ্যাঁ, বিদেশে খেলা হলে তবু বা একটা সম্ভাবনা ছিল।' আমি আশ্চর্য, ইদানীং দেশি-বিদেশী যেসব ক্রিকেট রসিকের সঙ্গেই দেখা হচ্ছে তাঁরা সবাই এই এক কথা বলছেন। আমি কিন্তু একমত নই। এবং আপনাদের বিস্মিত করে দিতে চাই এই বলে যে, রিলায়েন্স কাপে ফেবারিট দলগুলোর মধ্যে ভারত অবশ্যই একটা দল। তবে এমন ভাববেন না যে ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক বলেই আমার আশাটা একটু বেশিরকম পাখনা মেলছে। তা নয়। একদমই নয়। কেন এমন ভাবছি তা যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করব। তার আগে একটা মজার কথা জানিয়ে রাখি। এই লেখাটা তৈরি করেছি তিনটি বিভিন্ন সময়ে। প্রথম, গত ফেব্রুয়ারিতে ইডেনে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ শুরু হবার আগে। দ্বিতীয়, এপ্রিলে শারজা কাপ শুরুর আগে এবং তৃতীয়—লর্ডসে বাইসেন্টিনারি ম্যাচ চলাকালীন। যখন লেখাটা শুরু করি আমার তৈরি ফেবারিটদের তালিকা ছিল এরকম : (১) ওয়েস্ট ইন্ডিজ, (২) ইংল্যাণ্ড, (৩) ভারত। পাকিস্তানের কাছে ১—৫ সিরিজ হারলাম বলেই শুধু নয়, ওদের সঙ্গে খেলতে খেলতে উপলব্ধি করলাম কি দারুণ তৈরি হয়ে গেছে ইমরানের টিম। পরের ফেবারিট তালিকা হল ১) ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২) পাকিস্তান, ৩) ভারত। বাইসেন্টিনারি ম্যাচের সময় শুনলাম, শুধু মার্শাল বা গার্নারই নয় আমার বিচারে এখন বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান গর্ডন গ্রিনিজও বিশ্বকাপে আসছেন না। সেক্ষেত্রে কাগজে কলমে ফেবারিট হয়ে শুরু করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নয়—পাকিস্তান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ হয়তো দ্বিতীয় কিন্তু আমরাও থাকছি খুব কাছাকাছি। হয়তো বা যুগ্মভাবেই দ্বিতীয় স্থানে।

কেন ভারতের সম্ভাবনাকে এত বড় করে দেখছি ? দেশের মাঠে আমাদের শোচনীয় ওয়ান-ডে রেকর্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এতটা আশাবাদী হওয়া কি মূর্খামি নয় ? আমার মতে নয়, তবে আমার এই বিচারটা আগাগোড়াই একটা শর্তসাপেক্ষে যে, খেলা হবে সামান্য আণ্ডারপ্রিপেয়ার্ড উইকেটে। সবে বিশ্বকাপের এক আধটা ম্যাচ হয়েছে। এখনই সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে আমি আশা করব, ভারত যেসব জায়গায় খেলবে সেইসব কেন্দ্রগুলিতে যেন উইকেট পুরোপুরি তৈরি না করা হয়। এছাড়া আমাদের বাঁচার আর কোনও রাস্তা নেই। যদি তা করা হয় তাহলে সুবিধেটা কী জানেন ? আমাদের স্পিন আক্রমণ হচ্ছে সবকটা দেশের মধ্যে সেরা। টার্নিং উইকেটের সুবিধে মনিন্দর ও শাস্ত্রী সব থেকে বেশি নিতে পারবে। আবার ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা স্পিন খেলে খেলে এত পোক্ত যে এ ধরনের উইকেটে খুব সমস্যায় পড়বে না।

ভারতের মতো দুজন স্পিনার নিয়ে একদিনের ম্যাচ খেলে পাকিস্তানও। এটা অনেকের মনে হতে পারে যে টার্নিং উইকেট পেলে তো কদির আর তৌসিফেরও সুবিধে। হ্যাঁ সুবিধে, কিন্তু ততটা সুবিধে কী, যতটা আমরা পাব ? যদি আমাদের বিরুদ্ধেই পাকিস্তান পড়ে, সামান্য আণ্ডারপ্রিপেয়ার্ড উইকেটে কদির কি আমাদের নাচাবে ? আমার তো মনে হয় না। স্পিন বোলিং খেলে খেলে আমরা এত অভ্যস্ত যে কদির কোনসময়ই আমাদের কাছে সমস্যা নয়। বরং চন্দ্রশেখরের মতো কেউ যদি পাকিস্তান টিমে থাকতো আমরা ভয় পেতাম। চন্দ্র কদিরের চেয়ে অনেক জোরে বল করতো। সহায়ক ট্র্যাক পেলে ব্যাটসম্যানকে খেয়ে ফেলার ক্ষমতা ছিল ওর। সেই ক্ষমতা কদিরের কোথায় !

তবে পাকিস্তানের পেস বোলিং আক্রমণ অবশ্যই সমীহ করার মতো, ইমরান বা আক্রমই তো শুধু নয় সলিম জাফরও যথেষ্ট ভাল। যে কোনও পরিবেশে ওরা মানিয়ে বল করার ক্ষমতা রাখে। পাকিস্তানের দুর্ভাবনাটা ওদের পঞ্চম বোলার নিয়ে। মনজুর ইলাহি এই কাজটা ঠিকমতো করতে পারছে না। ব্যাটিং একটু মিয়াঁদাদনির্ভর হলেও চাপের মুখে যথেষ্ট ভাল। একদিনের ম্যাচ জিততে যেটা সব থেকে বেশি দরকারি সেই স্পিরিট তো এখন ওদের তুঙ্গে।

আমাদের সেমি ফাইনালে যেতে অসুবিধে হওয়া উচিত নয়। জিম্বাবুয়ে বাদে গ্রুপে যে আরও দুটো টিম আছে তারাই আমাদের গ্রুপ লিগে প্রধান প্রতিপক্ষ। এবং এই প্রধান প্রতিপক্ষদের আমি খুব একটা সমীহ করছি না। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে গত বছর রীতিমতো লড়ে আমাদের একদিনের সিরিজ জিততে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু মনে রাখবেন প্রায় সবকটা ম্যাচই খেলা হয়েছিল ভাল, ব্যাটিং উইকেটে। অস্ট্রেলিয়ার যা ব্যাটিং লাইনআপ খারাপ উইকেটে ওরা দাঁড়াতে পারবে না। গ্রেগ, ম্যাথুজ না থাকায়

১৯৮৩-এর লর্ডসের এই দৃশ্য কি আবার দেখা যাবে না ইডেনে ?

এবার অস্ট্রেলিয়া আর একটু দুর্বল এই ধারণা অবশ্য আমার নয়। ম্যাথুজ তো গতবারের সফরে আহামরি কিছু করেনি।

নিউজিল্যান্ড টেস্টে হোক, ওয়ান-ডে-তে হোক, সবসময়ই চেয়ে থাকে রিচার্ড হ্যাডলির মুখের দিকে। হ্যাডলিই বলতে গেলে ওদের একমাত্র বোলার। সেই হ্যাডলি বিশ্বকাপ খেলতে আসছে না। নিউজিল্যান্ডের কি অবস্থা এতে দাঁড়াচ্ছে সহজেই অনুমেয় ব্যাটিং-এ ওরা খুব বেশিরকম নির্ভরশীল থাকবে মার্টিন ক্রোর ওপর। ক্রো সমারসেটের হয়ে এ মরসুমটা দারুণ ফর্মে আছে। কিন্তু ওয়ান-ডে ম্যাচে একা একটা টিমকে টেনে নিয়ে যাওয়া কি ওর পক্ষে সম্ভব? মনে তো হয় না।

ইংল্যাণ্ডকে প্রথম তিনটি দলের মধ্যে রাখছি না ঠিক কথা কিন্তু ওরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলে আমি অন্তত আশ্চর্য হব না। ইংরেজ বোলাররা প্রকৃত পেশাদার। পাকিস্তান ও ভারতে সুইং বা সিম বোলিং-এরআদর্শ পরিবেশ ওরা পাবে না। কিন্তু তাতেও অসুবিধে নেই। লাইন-লেংথের ওপর জোর দিয়ে ওরা রান কমিয়ে রাখতে জানে। বথাম না থাকায় অবশ্য ইংল্যাণ্ডের ব্যাটিং কিছুটা দুর্বল হয়ে গেল।

নিউজিল্যাণ্ড খুব বেশিরকম নির্ভরশীল থাকবে মার্টিন ক্রোর উপর

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আমি হয়তো ফেবারিটদের তালিকায় রাখতামই না যদি 'নো বল' সংক্রান্ত ওই আইনটা এবারের বিশ্বকাপে থাকতো (ব্যাটসম্যান স্বাভাবিক স্টান্সে থাকাকালীন তার কাঁধের ওপর দিয়ে বল গেলে 'নো')। গত মরসুমে অস্ট্রেলিয়ায় এই নিয়মটা ক্যারিবিয়নদের মারাত্মক রকম ভুগিয়েছিল। কারণ ওদের আসল অস্ত্রই তো ওই শর্টপিচড ডেলিভারি। যতদূর জানি বিশ্বকাপে এই নিয়মটা নেই। থাকা উচিত ছিল। কারণ সারাক্ষণ ওই বুকের ওপর, কাঁধের ওপর শর্টপিচ বল ফেলাটাকে নিশ্চয়ই ক্রিকেট বলে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব খুশি যে 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ অপরাজেয়' এই ধারণাটা অস্ট্রেলিয়ায় চুরমার হয়ে গেছে। এতে ক্রিকেটের মঙ্গল হবে। মঙ্গল হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোরও। লয়েড চলে যাওয়ায় এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ছ' নম্বর ব্যাটসম্যান নেই। ভিভ রিচার্ডসের ওপর খুব বেশি চাপ পড়ে যাচ্ছে। তবে ফিল্ডিং-এর বিচারে এখনও ওরা এক নম্বরে। ফিটনেস অসম্ভব ভাল।

কাগজে কলমে ফেবারিট হয়ে শুরু করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নয়—পাকিস্তান

মার্জনা করবেন এবার কিঞ্চিৎ নিজের কথায় আসছি। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন গত দু-এক বছর যাবত আমার এই ধারাবাহিকতার পেছনে রহস্য কী? আমি তাঁদের সামান্য সংশোধন করে বলেছি, গত দু-এক বছর কেন, গত পাঁচ-ছ বছর আমার পারফরমেন্স বিচার করুন। দেখবেন, মোটামুটি একটা ধারাবাহিকতা আমি সবসময়ই রেখে গেছি। বিশেষত চাপের মুখে, বিপদের মুখে আমার পারফরমেন্স সর্বদাই ভালো। কারণ আমি চ্যালেঞ্জ ভালোবাসি। পরিস্থিতি কঠিন হলে আপনা থেকে আমার সেরা খেলাটা বেরিয়ে আসে। তবে একদিনের ক্রিকেট এসে যাবার পর থেকে যে কোনও টেস্ট ব্যাটসম্যানের কাজই এখন অনেক কঠিন হয়ে গেছে। দুটো বিভিন্ন ধরনের খেলা একসঙ্গে খেলতে গেলে চূড়ান্ত ইম্প্রোভাইজেশনের প্রয়োজন। ব্যাটিং-এর ছাঁচটা প্রতিনিয়ত ভাঙতে হয়, পড়তে হয়। আমার ইদানীং ব্যাপারটা মোটামুটি রপ্ত হয়ে এসেছে। আসলে ফাস্ট বোলারদের যেমন সেরা সময়টা ২২—২৭ বছরের মধ্যে তেমনি একজন ব্যাটসম্যান তার সেরা সময়ে থাকে ২৮—৩২ বছরের মধ্যে। আমার এখন সেই সময়টা চলছে।

অনুলিখন—গৌতম ভট্টাচার্য

ওয়ার্ল্ড কাপে অধিনায়কের ভূমিকায়

রাজু মুখোপাধ্যায়

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, যে কোন খেলার ফল নির্ধারণে খেলাটির পরিচালনায় কৌশলগত পরিকল্পনার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণত ফুটবল কিংবা হকির মতো অল্পস্থায়ী অথচ দ্রুতগামী খেলাগুলির প্রতিরোধ এবং আক্রমণের ছক কোচ কিংবা টেকনিক্যাল ডাইরেক্টাররা খেলা শুরুর আগেই কষে ফেলেন। খেলা চলাকালীন এই পরিকল্পিত ছকটির পরিবর্তনের সুযোগ প্রায় আসে না বললেই চলে। সেক্ষেত্রে এই সমস্ত খেলার অধিনায়কদেরকে, দ্রুত ফুরিয়ে আসা সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলাটিকে পূর্ব পরিকল্পিত আঙ্গিকে শেষ বাঁশি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে হয়।

দীর্ঘস্থায়ী ক্রিকেট খেলায় কিন্তু এ ভাবনা কাজ করে না। একটি পাঁচ দিনের ক্রিকেট ম্যাচ দুই মুখোমুখি অধিনায়কের কাছে সূক্ষ্ম বুদ্ধির কাটাকুটির এক প্রশস্ত ও আদর্শ মঞ্চ। কারণ এই রচনার শুরুতেই সময় সমস্যার প্রসঙ্গ তুলেছি। পাঁচ দিনের একটি টেস্ট ম্যাচে সময়ের প্রাচুর্য এত বেশি যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক সময়ের গড়ানে খেলার চকিত টানাপোড়েন লক্ষ্য করতে পারেন। প্রয়োজনমতো খেলার অন্তর্লীন ক্রিয়াশীল কৌশলটির পরিবর্তনের অঢেল সময় পেয়েও থাকেন। এবং এই সমস্ত কারণেই ক্রিকেটের অধিনায়কত্ব অনান্য খেলা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এক কথায় এটা যেন, উঁচুস্তরের মস্তিষ্কের কায়িক শ্রম। এই কথাটা অনেকের কাছেই আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে। অনেক অভিজ্ঞ ক্রিকেটারই খেলা পরিচালনায় তাঁদের প্রয়োজনীয় ব্যুৎপত্তির ঝলক প্রকাশে ব্যর্থ হন। তার কারণ একটাই। সবাই ভাল কিংবা যথাযোগ্য ক্রিকেট অধিনায়ক হবার যোগ্য নন।

পরিপূর্ণ পরিণত ক্রিকেটার না হয়েও যে দলকে প্রথম শ্রেণীর অধিনায়কত্বে পরিচালিত করা যায়, বিশ্ব ক্রিকেটে তার দুটি তরতাজা দৃষ্টান্ত ডগলাস জার্ডিন এবং রিচি বেনো। এই দুই সফল অধিনায়কের ক্রিকেটীয় অনভিজ্ঞতাকে উতরোতে সাহায্য করেছিল চরম বুদ্ধিমত্তা ও সঠিক এবং সময়মাফিক সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং ক্রিকেট সম্বন্ধীয় এক বিস্তীর্ণ প্রজ্ঞা। এ কথাটা যথার্থই সত্যি যে জার্ডিন তাঁর 'বডিলাইন' সূত্রটিকে বাস্তবায়িত করতে এক দঙ্গল যথাযোগ্য ক্রিকেট লড়াকু পেয়েছিলেন। তাঁর ক্রিকেট অধিনায়কত্বের চরম উৎকর্ষ সেখানেই, যেখানে ব্র্যাডম্যানের বিছানো প্রশস্ত ছকটির মধ্যে তিনি এমন একটি সরষে সম ছিদ্রের সন্ধান পান যার ফাঁক গলে ঢুকে পড়ে প্রতিপক্ষের কাঙ্ক্ষিত জয়কে ছিন্নভিন্ন করে দিতে

রিচি বেনো: অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক

নিজ দক্ষতাতেই দলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে রিচার্ডস

পেরেছিলেন। অথচ কি আশ্চর্য এই একই দল বিভিন্ন অধিনায়কের তত্ত্বাবধানে পূর্ববর্তী পর পর দুটি সিরিজে ব্র্যাডম্যানের আক্রমণের মুখে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

রিচি বেনোর দলে নীল হার্ভে এবং অ্যালান ডেভিডসন ছাড়া বিশ্বমানের তেমন আর কোন ক্রিকেটারের চলাফেরা নজরে পড়ে না। কিন্তু এখানেও সেই একই কথা বলতে হয় বেনোর অধিনায়কত্বের ইতিবাচক গুণগুলো খেলার জয় ছিনিয়ে নেবার জন্যে এতই মুখিয়ে ছিল যে টেড ডেক্সটার-এর ইংল্যান্ড এবং ফ্রাঙ্ক ওরেলের পরাক্রমশালী ওয়েষ্ট ইন্ডিজকে মাথা পেতে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার জ্যাক চি থ্যাম অথবা ইংল্যান্ডের মাইক ব্রেয়ারলিকে ক্রিকেটার হিসেবে মোটেই খুব উঁচু স্তরে রাখি না। কিন্তু সেই বিরল অধিনায়কত্বের প্রকাশ ঘটিয়ে দুটো সাধারণ দলকে তাঁরা জেতার ইচ্ছের স্বাদটা কেমন যেন চাখিয়ে দিয়েছিলেন। আসলে ক্রিকেটের অধিনায়কত্বের কথা উঠলেই সর্বকালের যে শ্রেষ্ঠ কীর্তিমান মানুষটিকে আমাদের মনে পড়ে সেই ব্র্যাডম্যান সম্পর্কে বলতে হয়: প্রতিপক্ষের কাছে তাঁর উপস্থিতিই একটা বিভীষিকা।

এই সমস্ত অধিনায়কদের মধ্যে একমাত্র ব্রেয়ারলিই এক দিনের ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৭৯ সালে ইংল্যান্ডকে প্রুডেনসিয়াল কাপের ফাইনাল পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও তাঁর দল পরিচালনাগত দক্ষতার প্রতি পুরোপুরি সুবিচার করতে পারেননি। তার কারণ এই একদিনের ম্যাচগুলি ফুটবল অথবা হকির মতো সময়-সমস্যায় বাঁধা পড়ে গেছে। অধিনায়কের কৌশল প্রয়োগের সুযোগ এখানে সীমিত। মাঠে খেলোয়াড়দের দাঁড় করানোর ব্যাপারে কিছু বিধিনিষেধ মানতেই হয়। এবং সর্বোপরি রয়েছে বোলিং ওভারের সীমাবদ্ধতা। এই সবকিছু মিলিয়ে একজন যথার্থ ক্রিকেট অধিনায়ক এক দিনের খেলায় তাঁর সামগ্রিক বুদ্ধিমত্তার অতি সামান্য অংশকেই কাজে লাগাতে পারেন অথবা কাজে লাগানোর সুযোগ পেয়ে থাকেন। তাই বলতেই হয় একদিনের ক্রিকেটের অধিনায়কত্ব এবং তিন অথবা পাঁচ দিনের টেস্ট ক্রিকেটের অধিনায়কত্বের মধ্যে দুই মেরুর ব্যবধান। একাধিক দিনব্যাপী ক্রিকেট ম্যাচগুলির প্রধানতম আকর্ষণ হলো সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায় খেলার এবং পিচের অবস্থাও দ্রুত পরিবর্তনশীল। এবং এই পরিবর্তনশীল অবস্থাকে

সামাল দিতে ক্রিকেট অধিনায়কদের নিত্য নতুন বুদ্ধি এবং কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। খেলার মাঠের এই নব নব অগ্নি পরীক্ষাই প্রমাণ করে দেয় সাধারণ অধিনায়কই বা কে এবং প্রতিভাবান অধিনায়কই বা কোন জন।

ক্রিকেটের ভারতীয় পটভূমিকায় প্রায় সব ক্রিকেট বোদ্ধারাই একমত যে সি কে নাইডু এবং লালা অমরনাথ বিশেষ প্রতিভাবান অধিনায়ক। এর পরবর্তীকালে মনসুর আলি খান পতৌদি এবং অজিত ওয়াদেকারের মধ্যে প্রতিভাবান অধিনায়কের সেই দ্যুতি লক্ষ্য করা গেছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাস করি সময়োপযোগী সুযোগ দিতে পারলে অশোক মানকাদ সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দুনিয়ায় এক সফল অধিনায়ক হতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা হয়নি। ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়কদের মধ্যে সম্ভবত অশোকই একমাত্র অধিনায়ক যে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, একদিনের ক্রিকেটের অজস্র সীমাবদ্ধতার মধ্যেও একজন বিচক্ষণ অধিনায়ক খেলার কৌশলগত পরীক্ষা নিরীক্ষার অনেকখানি প্রমাণ রাখতে পারেন

বিশ্ব ক্রিকেটে পাকিস্তান মানীর আসন লাভ করেছে ইমরানেরই কৃতিত্বে

ছবি : প্যাট্রিক ইগারের সৌজন্যে

এক দিনের ক্রিকেট খেলায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কারণ সীমিত সময়ের মধ্যে খেলায় অতি হঠাৎই এমন ঘটনা ঘটতে পারে যাকে তৎক্ষণাৎ অধিনায়ককে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ের পরিকল্পনা দ্রুত ছকে ফেলতে হবে। মূলত একদিনের ইতিবাচক ক্রিকেটে সিদ্ধান্ত সঠিক না হলে বিপদ। তার কারণ পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ সেখানে প্রায় নেই। ৮৩ সালের আগে পর্যন্ত ভারতীয় অধিনায়কদের মধ্যে এক দিনের ক্রিকেটের প্রতি তেমন অনুরাগ চোখে পড়েনি। খেলার শুরুতে এক হতাশার শিকার হয়ে তারা ফিল্ডিংই প্রথম বেছে নিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটে কপিলদেবের আবির্ভাবের পরেই এক দিনের ক্রিকেট সম্বন্ধে নেতিবাচক ধারণাটা সম্পূর্ণভাবে দূর হয়। খেলার জয়টা আমাদের, পরাজয় বিপক্ষের এই অদম্য অনমনীয় মনোভাবই ভারতীয় ক্রিকেটকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। এটা সত্যি কপিল খুব চিন্তাশীল অধিনায়ক নন। অথবা ক্রিকেটের প্রতিষ্ঠিত সূত্রগুলির ওপর তিনি খুব আস্থাশীল নন। তিনি সেই শ্রেণীর খেলোয়াড় যিনি নিজের ব্যক্তিগত কার্যকলাপকে দৃষ্টান্ত করে সহ খেলোয়াড়দের উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত করতে সচেষ্ট হন। তাই একদিনের খেলাগুলিতে কপিলের রেকর্ডের ছড়াছড়ি।

চিন্তায় নয়, কাজে বিশ্বাসী অধিনায়ক কপিলদেব

সমসাময়িক ক্রিকেট অধিনায়কদের মধ্যে ইমরান খান যথার্থই আর পাঁচজনের থেকে আলাদা। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন জন্মগত অধিনায়কোচিত অজস্র গুণ তাঁর মধ্যে রয়েছে। শুধু যে একটা ভয়ংকর লাগাম ছাড়া দলকে তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন তাই নয়, বিশ্ব ক্রিকেটে তার হৃত সম্মানকে পুনরুদ্ধার করতেও পুরোপুরি সক্ষম হয়েছেন। তাই আসন্ন রিলায়েন্স কাপ ক্রিকেটে পাকিস্তান ইমরানের মুখ চেয়ে আছে।

ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মনসুর আলি খান পতৌদি

কৌশল প্রয়োগের দিক দিয়ে সফল অধিনায়ক ব্রিয়ারলি (ইং)

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট নিয়ে ভাবলে অ্যালান বর্ডারের নাম মনে আসে। বর্ডারি একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার নিঃসন্দেহে। কিন্তু আগেই বলেছি অভিজ্ঞতাই ক্রিকেট অধিনায়কত্বের শেষ কথা নয়। যদিও তিনি অনেকদিন ধরে একটানা সাফল্য পাচ্ছেন কিন্তু সহ খেলোয়াড়দের ঠিকমতো নাড়া দিতে পারছেন না। এইখানে তাঁর অধিনায়কত্বের একটা দুর্বলতা রয়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়ান টিমের মধ্যে বার বার খেলোয়াড় বদল এবং একটা অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা দলটাকে ঠিকমত জমাট বাঁধতে দিচ্ছে না। এবং বর্ডারের কাজটাও তাই অধিকতর জটিল হয়ে উঠেছে। অ্যালানের চরিত্রের আর একটা দিক হলো সে তার ব্যক্তিগত খেলার ব্যাপারে যতটা আগ্রহী এবং মনোযোগী, সহখেলোয়াড়ের ওপর ব্যক্তিগত আস্থা ততটা গভীর নয়। তাই আমার বিশ্বাস সেই আস্থা ফিরে না এলে আসন্ন বিশ্ব কাপে অস্ট্রেলিয়া কতটা কি করতে পারবে বলা শক্ত।

নিউজিল্যান্ডের জেফ ক্রো এবং জিম্বাবোয়ের ট্রেকস অনেকদিন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেললেও খুব সম্প্রতি অধিনায়ক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। গত বছর ক্রো-এর নেতৃত্বে নিউজিল্যান্ড শ্রীলঙ্কা সফর শুরু করলেও রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্যে নিউজিল্যান্ড সফর ছাঁটকাট করে দেশে ফিরে আসে। যার ফলে ক্রো-এর নেতৃত্ব পরীক্ষিত হবার সুযোগ পেল না। হলে ভাল হত। তার কারণ রিলায়েন্স কাপে রিচার্ড হ্যাডলীর অনুপস্থিতি ক্রো-কে বড় বেশি

অভিজ্ঞ অধিনায়ক বর্ডার কি পারবেন অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের আস্বাদ দিতে ?

কঠোর দায়িত্বের সামনাসামনি দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। কিন্তু রিলায়েন্স কাপে অপেক্ষাকৃত কমজোরী গ্রুপে থাকার দরুন নিউজিল্যান্ডের সেমি-ফাইনালে পৌঁছুনোর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। হয়ত অস্ট্রেলিয়া এবং জিম্বাবোয়েকে এই দৌড়ে নিউজিল্যান্ডের পিছনে পড়ে থাকতে হতে পারে যদি তৃতীয় বিশ্বকাপে ডানকান ফ্লেচারের নেতৃত্বে জিম্বাবোয়ে উজ্জীবিত ক্রিকেট খেলেছিল এবং অধিনায়ক হিসেবে ফ্লেচার সবার প্রশংসা কুড়িয়ে নেন। অন্যদিকে ট্রেকস জিম্বাবোয়ের হয়ে সদ্য অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন। যদিও ঘরোয়া ক্রিকেটে পূর্ববর্তী অধিনায়ক ফ্লেচারের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি জয় করায়ত্ত হয়েছে তবুও আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে অধিনায়কের দায়িত্ব কেমন পালন করেন ট্রেকস আগামী দিনগুলোয়।

মাইক গ্যাটিং, দলীপ মেনডিস এবং ভিভিয়ান রিচার্ডস সবাই অভিজ্ঞ এবং খেলার জয় ছিনিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু অধিনায়ক হিসেবে কেউই বিরল প্রতিভার অধিকারী নন। এঁরা প্রত্যেকেই খেলার ধারাটা বোঝেন এবং সুযোগের সদ্ব্যবহারে পারঙ্গম। অধিনায়কত্বের বিচারে দলীপ মেনডিস খুব একটা সফল নন। এখনও তাঁর কাছ থেকে আরও পরিণত অধিনায়কত্ব দেখার ইচ্ছে আছে। দলীপের তত্ত্বাবধানে একদল তরুণ প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে ঠিকই কিন্তু প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করে দিতে পারে এমন আশা করাটা বাতুলতা হতে পারে। মাইক গ্যাটিং অনেকদিন ধরে ক্রিকেট খেলছেন। কখনো তাঁর খেলা অনবদ্য আবার কখনো বা সাধারণ আর পাঁচ জনের মতো। খেলার মধ্যে হয়তো একটা ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পাকিস্তানের মতো দলকে বড় ধাক্কা দিতে গেলে গ্যাটিংকে তার সহ খেলোয়াড়দের সেইমত বোঝাতে হবে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট রেকর্ডে চোখ চালালে বোঝা যায় রিচার্ডসের অধিনায়কত্বের চেয়ে পূর্ববর্তী অধিনায়কদের অধিনায়কত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অনেক বেশি সোনা ঝরাতে পেরেছিল। এর থেকে সহজেই অনুমেয় ভিভিয়ানের অধিনায়কত্বকে চুলচেরা বিচার করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে স্বয়ং ভিভিয়ান অথবা তাঁর দলকে খাটো করে দেখলে ভুল করা হবে। কপিলের সঙ্গে ভিভিয়ানের মিলটা হল উভয়েই আপন আপন সামর্থ্যকে তুলে ধরে দলকে উদ্বুদ্ধ করতে চান কিন্তু সেই সামর্থ্যে টান পড়লেই দুজনেই খুব অসহায় বোধ করেন এবং দল পরিচালনায় একটা শৈথিল্য বা এলোমেলো ভাব এসে পড়ে। তাই যখন সীমিত ওভার ক্রিকেটে কোন ক্রিকেট অধিনায়কের অধিনায়কত্ব পরিচালনার অবকাশ কম সেক্ষেত্রে আমি আশা করব এই সমস্ত অধিনায়কদের কেউ কেউ আমাদের একদিনের ক্রিকেটে অধিনায়কত্বের এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবেন। আমি সেইটে দেখার জন্যে খুবই উৎসাহী এবং আগ্রহী।

অনুলিখন—সুব্রত চট্টরাজ

লবঙ্গ তেলের গুণগানে ডেন্টিস্টরাও পঞ্চমুখ!

আয়ুর্বেদে বলুন বা অ্যালপ্যাথিতেই ধরুন, লবঙ্গ তেলের গুণগান সর্বত্র। ডেন্টিস্টের কাছে থাকে অপরিহার্য রূপে।

একদা এমন যুগ ছিল, যে দাঁতের কষ্ট হ'ল তো, শুধুমাত্র লবঙ্গ তেলের কথাই মনে পড়তো। নতুন যুগে সেই লবঙ্গ তেলকেই সঠিক মাত্রায় প্রমিস টুথপেস্টে মেলানো হয়েছে। আর সেই কারণেই, প্রমিস দিয়ে দাঁত ব্রাশ করলেই, ঐ তেল আপনার দাঁতের কোণে-কোণে ঢুকে, সেইসব জীবাণুর করে নির্মূল, যাঁরা দাঁতকে কুরে-কুরে করে সর্বনাশ। আর এই দন্তক্ষয়ের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকার ফলে, আপনার দাঁত থাকে মজবুত, সুস্থ-সবল আর মুক্তোর মত ঝলমলে ··· কিন্তু এ তো হ'ল লবঙ্গ তেলের কেবল একটাই চমৎকার।

আরেক চমৎকারের কথা বলি, প্রমিস-এর অদ্বিতীয় ফর্মূলার কারণে, এই লবঙ্গ তেল, মুখের দুর্গন্ধ ছড়ানোর জীবাণু নির্মূল করে আর আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসকে মনোরম সুগন্ধে ভরে। আপনার দাঁতকে রাখুন সুস্থ-সবল, মুক্তোর মত উজ্জ্বল, মুখের শ্বাসকে করুন মনোরম, নির্মল — এসবই হ'ল নিয়মিত প্রমিস টুথপেস্ট ব্যবহারের সুফল।

প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের অর্ধেক মালিক সুনীল গাওস্করের সিণ্ডিকেটেড কলামে কিছু কৌতূহল জাগানো তথ্য পাওয়া গেল পাঁচদিনের খেলা থেকে তাঁর অবসর নেওয়া সম্পর্কে। এম সি সি দ্বিশতবার্ষিকী ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে অপরাজিত আশি রান নিয়ে ফিরে এসে লর্ডসের প্রেসরুমে গাওস্কর জানালেন, এটিই তার পাঁচদিনের শেষ ম্যাচ খেলা, জীবনে আর খেলবেন না। ১৯৭১ থেকে লর্ডসে ষোলটি ইনিংস খেলে তার সর্বোচ্চ রান ছিল ৫৯। গড় ৩৪·২০ রান। সাহেবদের ক্রিকেট সমাজে গাওস্করের মুখ দেখাবার মত ব্যাপারটা নয়। সুতরাং বিরাট ক্রিকেটার গণ্য হবার জন্য বা রেকর্ড বইয়ে এই ফাঁকটা পূরণের জন্য, একটা কিছু করা দরকার। অন্তত একটা শতরান ক্রিকেটের এই বারাণসীতে তাঁর চাইই।

চাইলেই তো আর সব জিনিস পাওয়া যায় না, বিশেষত ক্রিকেটে! এজন্য লোকটিকে চাওয়ার যোগ্য হতে হয়। কঠোর অধ্যবসায়, নিরলস অনুশীলন, গভীর চিন্তা, শৃঙ্খলাবদ্ধ দিনযাপন, একমুখিনতা, পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, সর্বোপরি ভাগ্যের আশীর্বাদ—সবগুলিই এজন্য দরকার হয় সেই যোগ্য লোকটির। গাওস্কর এর সবকটিই পেয়েছেন। সুতরাং তিনি লর্ডসে জীবনের শেষ পাঁচদিনের ম্যাচটিতে শতরান করবেনই স্থির করে, শত থেকে কুড়ি রান দূরে এসেই জানালেন, অবসর নেব তিন দিন পরেই। নিজের উপর অগাধ আস্থা থেকেই, আগাম একটা পাষাণ ভার মনের উপর চাপিয়ে নিজেকে তীক্ষ্ণ করে তোলার এই সাহসটা তিনি পেয়েছেন। পরদিন আশিটাকে তিনি একশ অষ্টআশিতে নিয়ে গেলেন। লর্ডসে ১৭ ইনিংসে ৭০১ রান (গড় ৪৩·৮১) এবং শতরানটিও পাওয়া হল। গাওস্কর হাঁফ ছাড়লেন এবং আমরাও উৎকণ্ঠামুক্ত হলাম। সুনীল গাওস্কর এখন এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছেন যেখানে তাঁর মানসম্মান ভারতের মর্যাদার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

কিন্তু এত জায়গা থাকতে লর্ডসে এই অবসর ঘোষণাটা অনেকের পছন্দ হয়নি। দেশে থেকেই তো তিনি কথাটা জানাতে পারতেন এবং এজন্য ভাল একটা পরিস্থিতিও এসেছিল পাকিস্তানের সঙ্গে এইবছর বাঙ্গালোরে শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলার সময়ই। এ সম্পর্কে গাওস্কর তাঁর কলামে কিছু কথা বলেছেন যা থেকে অপরিচ্ছন্ন কিছু প্রশ্ন তৈরী হয়ে যায়।

বিষাণ সিং বেদি বলছেন, এমন নয় যে দ্বিশত বার্ষিকী ম্যাচ মারফত সংবাদ মাধ্যমগুলিকে ভাঙিয়ে আরো কিছু প্রচার নিজের জন্য যোগাড় করে নেবার দরকার সুনীল বোধ করেছিল, তবে ক্রিজে এবং তার বাইরেও এই 'লিটল ক্র্যাফটম্যানের' সময়জ্ঞান সম্পর্কে যা জানি তাতে কল্পনা করে নিতে পারি ওর এই শেষ হুররা বহু ভেবেচিন্তেই এবং নিখুঁত ভাবে সম্পাদিত। ডিনামাইট তুল্য প্রচণ্ড এই মস্তিষ্ক তরঙ্গের প্রতি আমাকে গ্লাস তুলে 'চীয়ারস' বলতেই হবে।

এইভাবে কটাক্ষ করেও বেদি বলেছেন, এমন ধরনের অবসর ঘোষণা দুশো বছরে মাত্র একবারই

মার্চ, ১৯৮৫ মেলবোর্ন: বেনসন ও হেজেস কাপ হাতে গাওস্কর

সম্ভব। যদি কেউ সুনীলের নিখুঁত সময়জ্ঞান এবং বলাবাহুল্য তাঁর দশ হাজার রানের বিশাল তহবিলকে ছাপিয়ে যেতে ইচ্ছুক হয় তাহলে আগামী দুশো বছরের দিকে তাকিয়ে তাকে দশ হাজার টেস্ট রান পার হবার জন্য প্ল্যান ভাঁজতে হবে তারপর, ঠিক এই ধরনের ঘোষণার জন্য তাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে চতুঃশতবার্ষিকী ম্যাচটার জন্য, অবশ্যই লর্ডসে (আর কোথায়!) সেটা খেলা হবে।

চৌখস অলরাউণ্ডার ইমরান খাঁ

অবাক করে দিয়ে আচমকাই ঘটল, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ছিল না, গাওস্করের বিদায় নেবার সিদ্ধান্তটা। গতবছর ইংল্যাণ্ড সফরের শেষ থেকেই বাতাসে ভাসছিল, এবার তিনি টেস্ট খেলা থেকে অবসর নেবেন। আমেদাবাদে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টেই তিনি ইঙ্গিত দেন বাঙ্গালোরেই হবে তার শেষ টেস্ট খেলা। পঞ্চম টেস্ট শুরুর আগের দিন সাংবাদিকরা অধীর হয়ে মাঠে অপেক্ষা করেছিলেন, কখন গাওস্কর তাদের ডেকে প্রতিশ্রুত অবসর গ্রহণের খবরটি দেবেন। গাওস্কর নেট প্র্যাকটিস সেরে ড্রেসিংরুমে চলে গেলেন এবং লোক মারফত জানালেন এখনই অবসর নিচ্ছেন না।

তাহলে কবে নেবেন? জবাবে একটা ৯৬ রানের ইনিংস খেললেন এবং তার সেই খেলাটার বিশ্লেষণ থেকে প্রশ্নাতীত ভাবে বেরিয়ে এল—টেকনিক্যাল দক্ষতা ও মানসিক ক্ষমতা (৩২৩ মিনিট, প্রবল টার্নিং উইকেট, ২৬৬ বল) ষোল বছর ধরে টেস্ট এবং একুশ বছর ধরে (অক্টোবর, ১৯৬৬ থেকে শুরু) প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলে যতটা ক্ষয়ে যাওয়ার কথা, ঠিক ততটাই বেড়ে গেছে। বড় ইনিংস খেলতে দৈহিক কষ্ট নিশ্চয়ই হয় উনচল্লিশের দিকে এগিয়ে যাবার সময়, মনকে একমুখিন করে তোলার কাজটাও বারবার করা আর সম্ভব নয় নানান বৈষয়িক কাজে

জড়িয়ে গিয়ে, তবু ওই ৯৬ দেখে আমার মনে হয়েছে আরো কুড়িটা টেস্ট ম্যাচ বা চারটে বছর চালিয়ে যাওয়া ওর পক্ষে মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়।

এমন একটা ধারণা বাঙ্গালোরে পাঁচ মাস পরই, বিদেশে আচমকা অবসর নেবার কথা ঘোষণা তাহলে কেন?

গাওস্করের একটা অভ্যাসের কথা জানি, সবাইকে হতভম্বকারী রহস্যের মধ্যে রেখে দেওয়ার লোভ তিনি সামলাতে পারেন না। মাঝে মাঝে সেটা বিরক্তিকরও হয়ে ওঠে। অবসর নেবার কথা লর্ডসে জানালেও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে তিনি সেটা লিখে জানাননি এবং কখনো জানাবেনও না। কারণটা কি? আবার ফিরে আসার পথটা কি খোলা রেখে দিতে চান? গাওস্কর অদ্ভুত উত্তর দিয়েছেন: টেস্ট ম্যাচ খেলে খেলে যে অভ্যাসটা তৈরী হয়ে গেছে সেটা থেকে মুক্তি পাবার জন্য, না-খেলার চিন্তা ভাবনায় সড়গড় হয়ে নেবার পর লিখিত যা জানাবার জানাবেন। অবোধ্য যুক্তি, কিন্তু গাওস্করের কাছ থেকে এমনটা অপ্রত্যাশিত নয়।

নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে, ১৯৭৪-এ প্রথম বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচে, লর্ডসে, ইংল্যান্ডের সঙ্গে খেলায় গাওস্কর ৬০ ওভার খেলে ৩৬ অপরাজিত ছিলেন। এখন ভাবতে পারেন কি, গাওস্করের এমন ব্যাটিংয়ের কথা? কিন্তু তখন তাঁর যুক্তিটা ছিল: বোলার যখন বল করতে ছুটছে তখন মনে মনে ভেবে নিয়েছি ব্যাট চালাবই কিন্তু যেই সে বলটা করল আমার পা চলে গেল ডিফেন্সিভ শট নেবার পোজিশনে। দর্শকদের চীৎকারে মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল, চিন্তার খেই পাচ্ছিলাম না। একটা রান নিয়ে অপর ব্যাটসম্যানকে স্ট্রাইক দেবার চেষ্টাও ব্যর্থ হচ্ছিল। পুরোপুরি মানসিক প্রতিবন্ধকতা ঘটে গেছল। শেষদিকে যান্ত্রিকভাবে খেলছিলাম।

চুয়াত্তরে গাওস্কর যে বিভ্রান্তিকর যুক্তি দিয়েছিলেন, তেরো বছর পরও তার তেমনি মানসিকতা অটুট রয়ে গেছে। সেদিন বলেছিলেন মানসিক প্রতিবন্ধকতা আর এখন সেটাই "ওয়ান্ট টু মিস দ্য টেস্টস অ্যান্ড গেট ইউজড টু দ্য আইডিয়া বিফোর আই ফাইনালি পুট ইট ডাউন অন পেপার।" তবে আমরা অপেক্ষায় রইলাম দেখার জন্য, টেস্ট বিহীনতায় নিজেকে অভ্যস্ত করতে কতদিন তার সময় লাগে!

এমন আচমকা অবসর নেওয়া কেন?

গাওস্কর বলছেন, গতবছর মরসুমের মাঝামাঝিই তিনি সিদ্ধান্তটি নিয়ে ফেলেছিলেন। এবছরও মরসুমের শেষ অর্থাৎ এপ্রিল পর্যন্তও তিনি বলে গেছেন রিলায়েন্স কাপের পর আর খেলতে চান না। এমনকি 'দশ হাজার রান' সেলিব্রেট করার জন্য বাঙ্গালোরে তিনি এক সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের ডেকে খাইয়েছিলেন যখন তখনই নাকি সবাই বুঝে গেছলেন গাওস্করের কথায়, তিনি "গুডবাই অ্যান্ড থ্যাঙ্কস" জানাচ্ছেন। যদি কেউ তখন তা না বুঝে থাকেন তাহলে তার বুদ্ধিসুদ্ধি কমই আছে বুঝতে হবে।

মাঠ এবং মাঠের বাইরে সর্বদাই শিরোনামে ইয়ান বোথাম

গাওস্করের সেই পার্টিতে আমি ছিলাম এবং সত্যি কথা বলতে, একদমই বুঝতে পারিনি এতদ্বারা তিনি টেস্ট ক্রিকেটকে গুডবাই জানাচ্ছেন। সুতরাং বুদ্ধিসুদ্ধি কমেদের দলেই পড়ে গেলাম এবং তখন অন্যান্যদের দেখে মনে হয়েছিল, তারাও জানেন না এটা গুডবাই পার্টি। ওরাও নিশ্চয় বোকা। মনে পড়ছে পার্টিটা হয়েছিল সেই সন্ধ্যায় যখন গাওস্কর ৫১ নট আউট। শতরান পাবেন কি পাবেন না, সে সম্পর্কে একেবারেই অনিশ্চিত। যদি শতরানটা এসে যেত, আমার কমবুদ্ধিতে মনে হচ্ছে,

অসাধারণ অলরাউন্ডার রিচার্ড হ্যাডলি

বাঙ্গালোরেই তিনি অবসর ঘোষণা করতেন।

তাহলে লর্ডসে কেন ৮০ রানের মাথায় ঘোষণা করলেন ? কারণ, তাঁর অসাধারণ অনুমান ক্ষমতা। মার্শাল বা হ্যাডলি কিছু শক্ত ব্যাপার তৈরী করবে ঠিকই কিন্তু রোদ ঝলমলে প্রথম তিনটি দিনে, স্বপ্নেই সম্ভব এমন এক ব্যাটিং উইকেটে, আশিটা রান করে নেবার পর সুনীল গাওস্কর ততক্ষণে জেনে গেছেন এখানে তিনি কি পারবেন এবং পারবেন না। এরসঙ্গে যুক্ত করুন লর্ডসে শতরান পাবার প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা এবং গাওস্কর যখন বোধ ও বিচারের গভীরে সেঁধিয়ে যান, মনপ্রাণ ঢেলে দেন, তখন কাজটি সম্পূর্ণ না করে তিনি থামেন না। অসাধারণ চরিত্র! নিজের উপর স্বেচ্ছায় ভার চাপিয়ে একমুখিন হবার এই প্রবণতা তাঁর টেস্ট জীবনের শুরু থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। বাঙ্গালোরে এই চেষ্টাটা প্রায় সফল হয়েছিল, লর্ডসে সম্পূর্ণ হল। লর্ডসের এই ম্যাচে বোলাররা তাকে কোনরকম দাক্ষিণ্য করেনি। দ্বিতীয় ইনিংসে অন্ধকার প্রায় পরিবেশে ব্যাট করতে নামার সময় গাওস্কর আম্পায়ার ডিকি বার্ডের কাছে গজগজ করেছিলেন, এটা অন্যায়

ভয়ংকর বোলার ম্যালকম মার্শাল

এমন আলোয় খেলতে নামা। গাওস্কর আবার কি একটা শতরান চেয়েছিলেন ? হতে পারে। এটা বোধহয় দৃষ্টি খিদে কেননা এর আগেই তিনি বলে রেখেছেন, অনেক খেয়ে এখন পেটটা টাইট, আরো খাবার ইচ্ছেটা ফুরিয়ে গেছে।

গাওস্কর বলেছেন, অবসর নেবার কথাটা তিনি হঠাৎই বলে ফেলেছিলেন। সেদিন খেলার শেষে সর্বোচ্চ রানকারী গ্যাটিং (১৭৯) এর সঙ্গে গাওস্করকেও (৮০ নট আউট) প্রেসরুমে যেতে হয়েছিল। নিজে থেকে স্বেচ্ছায় যাননি। কেননা ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায়, দিনের সেরা পারফরমারদের খেলাশেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাটাই রীতি। তখন, লর্ডসে শতরান পাওয়াটা তার পক্ষে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ? এই প্রশ্নের জবাবে গাওস্করের মুখ থেকে স্বতস্ফূর্তই নাকি (তাঁর কথায়) বেরিয়ে আসে, "ম্যাচটা কোথায় হচ্ছে তাই দিয়ে কিছু যায় আসে না। তবে যেহেতু এটাই হয়তো আমার শেষ পাঁচ দিনের ম্যাচ তাই আমি ভাল কিছু করতে চাই, তা যেখানেই খেলাটা হোক না।" গাওস্কর একটা

একদিনের ক্রিকেটে গাওস্করের অন্যতম সাফল্য অধিনায়ক হিসেবে বেনসন ও হেজেস কাপ জয়

ছবি : প্যাট্রিক ইগারের সৌজন্যে

"হয়তো" রেখেছিলেন তার বাক্যে।

এম সি সি দ্বিশতবার্ষিকী ম্যাচে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়রা এবং বহু প্রাক্তনরা জমায়েত হচ্ছেন তাই ক্রিকেট দুনিয়া ভেঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের লোকেরা এসেছিলেন। গাওস্কর এই সুযোগটা ভাঙ্গিয়ে বড় রকমের প্রচারের ফয়দাটা তুলে নেবার জন্যই এই ম্যাচে অবসর নেবার কথা জানিয়েছেন, এমন অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু বাউন্সারটায় তিনি মাথা বাঁচিয়ে নীচু হয়েছেন একদমই খেলতে পারেন নি। বলেছেন, ভারতে তো খবরের কাগজের অভাব নেই, যদি বড় রকমের প্রচারই চাইতাম তাহলে তো তাদেরই মুখাপেক্ষী হতাম। এটা একেবারে নিছকই তাৎক্ষণিক উত্তর ছিল একটা প্রশ্নের, যেটা মনে মনে বহুদিন আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম।

তাহলে বহু আগেই কেন ঘোষণাটা করেননি ? ওঁর জবাব : কারণ সর্বাগ্রে আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম। ঠাসা একটা মরসুম কাটিয়েছি তাই সেই জন্যই হয়তো খাটুনির কষ্টটা তখন বোধ করছিলাম। যদি খেলা থেকে কিছুকাল সরে গিয়ে আবার শুরু করি তাহলে তখনই নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারব আর খেলার ইচ্ছেটা এখনো আছে কিনা, আর সেটাই ঘটল। আমার শেষ

গাওস্করের সময়ে অন্যতম সেরা বোলার ডেনিস লিলি

আন্তর্জাতিক খেলা এপ্রিলে তারপর লর্ডসে মধ্য-অগাস্টে। এর মাঝে দেখলাম ব্যাট হাতে নেবার কোন ইচ্ছাই হল না। নিশ্চিত প্রমাণ পেলাম আমার ভিতর থেকে বাসনা চলে গেছে। লর্ডস ম্যাচের আগে ওয়ার্ম-আপ ম্যাচগুলো থেকেও বুঝলাম মন যা জেনে গেছে সেটাই ঠিক। গাওস্কর কোনরকমে ইয়র্কারটাকে সামলেছেন কিন্তু সেজন্য তাকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হল।

মনের কোণে সুপ্ত কামনা সবারই থাকে, কেউ কেউ তা পূর্ণ করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে অর্জন করেন, অধিকাংশই তা পারেন না। গাওস্কর পেরেছেন, সেজন্য কিছু কিছু দুর্বলতাও দেখিয়েছেন কিন্তু তার অর্জনের পাশে এগুলো মনে রাখার মত কথা নয়। শুধু মজা পাওয়া, বৃহৎ মানুষদের ছোটখাট ব্যাপার দেখে। আর জেনে নেওয়া আর একবার—দৈত্য দানব বা দেবতাও নয়, এরা মানুষই। ভারতের খেলার জগতে গাওস্করের মত বড়মাপের মানুষ, এমন অসাধারণ মানসিকতা এখনো আসেনি। এরা ক্ষণজন্মা।

বিষাণ বেদীর মত অকুণ্ঠে বলতে দ্বিধা নেই—আই স্যালুট ইউ সানি বয়। দ্য নেশ্যন ইজ প্রাউড অফ ইউ। ■

নানা নজরে বিশ্বকাপ

গৌতম ভট্টাচার্য

আপনার কাছে পেশাদারিত্বের সংজ্ঞা কী ? গত নভেম্বরে শারজায় এই প্রশ্ন করায় খুব গর্বিতভাবে উত্তর দিয়েছিলেন ম্যালকম মার্শাল, "ব্যাপারটা কি জানেন ? যেভাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টিমকে ব্যাট, বল বা ফিল্ড করতে দেখেন সেটাই হচ্ছে পেশাদারিত্ব।" মার্শালরা তখন গর্ব করতেই পারেন। সদ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজ শারজা কাপ জিতেছে। এবং গোটা বিশ্বকে আবার স্বীকার করিয়েছে একদিনের ক্রিকেটে তারাই অবিসংবাদী চ্যাম্পিয়ান।

বিশ্বকাপ কে জিততে পারে এই প্রশ্নটা তখন লোকে খুব বেশি করতো না। করছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অস্ট্রেলিয়ায় ওইরকম নাকানিচোবানি খাবার পর। গ্রিনিজ-মার্শাল-গার্নার না থাকায় ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে সম্ভ্রম আর একটু কমেছে। এর পাশাপাশি বেড়েছে পাকিস্তান সম্পর্কে শ্রদ্ধা। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর একটি পত্রিকা সমীক্ষা করে দেখেছে কলকাতার লোকেরা পাকিস্তানকেই ফেবারিট ধরছেন, লায়ন্স রেঞ্জেরও নাকি ওই এক ভাষ্য। তবে যেভাবে ফেবারিট হয়ে এর আগের তিনটি বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলা শুরু করেছিল এবার পাকিস্তানের রমরমা কিন্তু অতটা নয়। জন এমবুরি, ফিলিপ ডেফ্রাইটাস, অব্দুল কদির আর ক্লাইভ লয়েডের মন্তব্য পড়ুন। তাহলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

শেষ কথা হচ্ছে একদিনের ক্রিকেট তো ! কে বলতে পারে ভারতই চমকে দেবে না ?

জন এমবুরি (ইংল্যাণ্ড) : ইদানিং ওদের পারফরমেন্স যতই খারাপ হোক, যতই গ্রিনিজ-মার্শালরা না থাকুক একদিনের ক্রিকেটে তবু সেরা দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শুধু এখন যেটা লক্ষ্য করছি ওদের একদিনের ম্যাচে ধারাবাহিকতাটা যেন একটু খারাপ হয়ে গেছে। গত অস্ট্রেলিয়া সফরে ইংল্যান্ড টিমের ভাইস ক্যাপ্টেন ছিলাম আমি। পাঁচবারের সাক্ষাতের মধ্যে চারবার আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের হারাই। প্রথম যে ম্যাচে ওদের হারালাম সেটা হয়েছিল পার্থে। আমার এখনও বেশ মনে আছে খেলার পর কয়েকজন ক্রিকেটার বলেছিল তাহলে সত্যিই আমরা ওদের হারালাম ! ক্যারিবিয়ানদের কাছে ক্রমাগত হারতে হারতে আমাদের মনের কী অবস্থা হয়েছিল এর থেকে তা বুঝবেন। আসলে আমাদের গোড়ার দিককার ব্যাটসম্যানরা কিছুতেই ওদের বিরুদ্ধে রান পাচ্ছিল না। অস্ট্রেলিয়ায় আমাদের ওপেনাররা রুখে দাঁড়ানোয় হিসেবটা পুরো উল্টে গেল।

এখানে অবশ্য আমাকে সত্যি কথা বলতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে যে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোলারদের বিপক্ষে সাধারণ অবস্থায় ওরা এত ভাল খেলতে পারতো কিনা সন্দেহ। মার্শাল-হোল্ডিংরা ভীষণ মুষড়ে পড়েছিল ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাপে ওই নিয়মটা থাকায় (ব্যাটসম্যান স্বাভাবিক স্ট্যান্সে থাকাকালীন তার কাঁধের ওপর দিয়ে বল পেলেই 'নো')। ওরা ওভারে তিনটে করে শর্ট পিচ বল দিতে অভ্যস্ত। সেখানে এই নিয়মের জন্য মোক্ষম অস্ত্রটাই প্রয়োগ করতে পারছিল না। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই নিয়মকে সমর্থন জানাই। সারাক্ষণ কাঁধ সমান উঁচু বল একদিনের ক্রিকেটে কেন করতে দেওয়া হবে ? এভাবে কি কখনও খেলা উপভোগ্য হয় ? অবশ্যই না। রানই যদি বন্ধ করে রাখা হল, তাহলে আর একদিনের ক্রিকেটের রইলটা কী !

ওয়েস্ট ইন্ডিজের খারাপ পারফরমেন্সের আর একটা কারণ রিচার্ডস বাদে ওদের ব্যাটসম্যানরা একদম রান পায়নি। আমার নিজের ধারণা, হেনেস ও রিচার্ডসন অস্ট্রেলিয়ার বাউন্সভরা, দ্রুত উইকেটের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যায় পড়েছিল। ভারত পাকিস্তানের মরা ঘাসের পিচে যে অসুবিধেটা ওদের হবে না। তাছাড়া ওদের এখন ছ'নম্বরে ব্যাট করতে আসছে দুজোঁ। (আগে এজায়গাটা বাঁধা ছিল লয়েডের) সাত নম্বরে হার্পার। ফলে ল্যাজটা অনেক বেশি। তবে আমার মনে হয় গত মরসুমের এই হারটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিতে পারে। এরকম একটা ধাক্কা ওদের প্রয়োজন ছিল। এতে আবার ওরা বাস্তবে ফিরে এল।

আমরা যে গত মরসুমে অত ভাল ফল করেছিলাম তার মূলে ছিল দুর্দান্ত টিম স্পিরিট। এবার ওই টিম স্পিরিটকে ভাঙিয়েই আমাদের খেতে হবে। সবাই এবারের বিশ্বকাপে আমাদের আগে পাকিস্তানকে বসাচ্ছেন। আপত্তি নেই। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে শেষ যে-কবার খেলা

এবারে 'কালো ঘোড়া' না হলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সর্বদাই অন্যদের কাছে ভীতিজনক
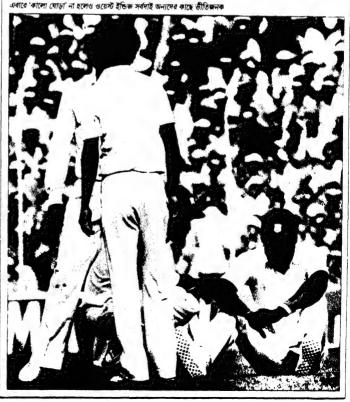
বর্ডারের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া দলও এবার প্রস্তুত হয়েই আসছে — ছবি : প্যাট্রিক ইগারের সৌজন্যে

হয়েছে, তার হিসেব কিন্তু ভুলে যাবেন না—বেনসন হেজেস চ্যালেঞ্জ কাপ ফাইনালে ওদের হারিয়েছি (এবং খুব সহজে) হারিয়েছি ওই ভাঙা টিম নিয়ে শারজা কাপে এবং সব শেষ বার—ইংল্যান্ডের মাঠে একদিনের সিরিজে।

ফিলিপ ডেফ্রাইটাস (ইংল্যান্ড) : অনেকেই দেখছি খুব নৈরাশ্যে ভুগছেন, আমার কিন্তু ধারণা, এবার বিশ্বকাপ জেতার খুব ভালো সুযোগ ইংল্যান্ডের রয়েছে। গাওয়ার, বথাম নেই তো কী হয়েছে ? বাকিরা তো আছে, একটা টিম দুজনকে নিয়ে হয়, না এগারজনকে নিয়ে ? আর একটা কথা শুনছি, পাকিস্তানের এই আবহাওয়ায়—আমরা ইংরেজ পেসাররা নাকি অসুবিধেয় পড়ব। বল ওখানে সিম করবে না, সুইং করবে না। এটাও আমি মানি না। পেশাদার বোলাররা যে-কোনও উইকেটেই লাইনলেংথ ঠিক রেখে বল করতে জানে। আর, বোলিং-এর আসল কথা তো সেটাই। ফেবারিট কে ? আমার মনে হয়, আমাদের ছাড়াও খুব ভালো সম্ভাবনা রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের। এই ইন্টারভ্যু যখন দিচ্ছি তখনও জানিনা বিশ্বকাপে ওই অদ্ভুত নিয়মটা থাকবে কিনা। ব্যাটসম্যান স্বাভাবিক স্ট্যান্সে থাকার সময় তার কাঁধের ওপর দিয়ে বল গেলে 'নো'। এই নিয়মটা গতবছর ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাপে ছিল। সবাই বলল, গত মরসুমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের খারাপ পারফরমেন্সের মূলে এই নিয়ম। আমি মানি না। বাউন্সারটা কি ওয়েস্ট ইন্ডিজ পেস বোলারদের একচেটিয়া সম্পত্তি নাকি ? আমরাও গত বার অস্ট্রেলিয়ায় বহু শর্ট পিচ দিয়েছি এবং আম্পায়ার আমাদেরও 'নো' ডেকেছেন। আশা করব এই জঘন্য নিয়মটা বিশ্বকাপে থাকবে না। আর যদি বা থাকে, এর কোনও প্রভাব চ্যাম্পিয়নশিপের ওপর পড়বে না। যারা চ্যাম্পিয়ন হবার, তারা এমনিতেই হবে। ওইসব নিয়মটিয়ম করে তাদের আটকানো সম্ভব নয়।

অব্দুল কদির (পাকিস্তান) : সবাই বলছে আমরা নাকি এবার ফেবারিট। হ্যাঁ, এটা ঘটনা। আমাদের টিম স্পিরিট এখন তুঙ্গে। ইমরানের মতো ক্যাপ্টেন আমাদের ! সে জানে কখন কাকে দিয়ে কী করাতে হবে। জবেদ মিয়াঁর মতো ব্যাটসম্যান আছে পাকিস্তান টিমে। বিশ্বকাপ তো এর আগে আমরা কখনও পাইনি। ইনশাল্লা, এবার যেন পাই, আর ইমরান তো চলেই যাচ্ছে। বিশ্বকাপটাই ওর শেষ টুর্নামেন্ট। ইমরানকে যদি সবাই মিলে এই একটা শেষ উপহার দিতে পারি, তার চেয়ে ভালো কিছু হয় না।

তবে একদিনের ক্রিকেট ব্যাপারটা এত অনিশ্চিত যে, কাগজে-কলমের হিসেবটা আসলে কোনও হিসেবই নয়। খুব কঠিন গ্রুপে পড়েছি আমরা। সেমিফাইনালে যেতে হলে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুটো টিমের যে কোনও একটাকে হারাতেই হবে। আর সেটা মোটেই সহজ কাজ নয়। ইংল্যান্ড কিন্তু খুব ভাল টিম। গাওয়ার-বথাম থাকুক আর না থাকুক। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কথা তো নতুন করে কিছু বলার নেই। ওরা যদি ওদের দেশের যুব দলকে বিশ্বকাপ খেলার জন্য পাঠাতো তাও আমি অন্তত তাচ্ছিল্য করতাম না। ভারতকেও আমরা যথেষ্ট সমীহ করছি। যদিও মুখোমুখি হলে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে কিন্তু আমরাই এগিয়ে থাকব, কেন ? ভারত-পাকিস্তান একদিনের ম্যাচের গত দশটা ফল বার করে দেখুন। তাহলেই বুঝবেন।

ক্লাইভ লয়েড (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) : হ্যাঁ, আমি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে একমত যে গ্রিনিজ- মার্শাল- হোল্ডিং- গার্নার বাদে এবার ভিভ রিচার্ডসের কাজটা ভীষণ শক্ত। তবে আমাদের বিশ্বকাপ জেতার সুযোগ কম একথা যাঁরা বলছেন, তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। নতুন চারজন পেসার নিয়ে ভিভকে নামতে হবে ঠিকই কিন্তু এই পেসারদের কাজটা কি তাদের পূর্বসূরীদের তুলনায় অনেক সহজ নয় ? কী করতে হবে সে-সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা তো এদের হয়ে গেছে। যে শুরু করে তার কাজটাই বেশি কঠিন থাকে। যে অনুসরণ করে তারটা নয়। গ্রে ওয়ালস-প্যাটারসন- বেঞ্জামিনদের তো অনুসরণ করার কাজ। পারবে না কেন ? ওরা প্রত্যেকেই ট্যালেন্টেড। আমার সম্পূর্ণ আস্থা ওদের ওপর আছে। বিশেষত কোর্টনি ওয়ালসের ওপর। মিলিয়ে নেবেন আমার কথা, এই ছেলেটি বহুদূর যাবে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিজয়রথের চাকা থেমে গেছে এমন কথা মানতেও আমি রাজি নই। এখনও তো কোনও টেস্ট সিরিজে আমরা হারিনি। বিশেষজ্ঞরা এত অধৈর্য হয়ে পড়ছেন কেন ? আরও কিছুদিন আমাদের পারফরমেন্স দেখুন না। তারপর না-হয় টিম সম্পর্কে শেষ কথা বলবেন।

হ্যাঁ, তবে এটা ঘটনা, একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেট। এই কঠিন সময়ে আমার নিজেরই ইচ্ছে করছে লড়াইতে নেমে যেতে। যদি ভিভের পাশে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে পারতাম। কী দারুণই না হত। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেবার সাধ্য আমার নেই। ■

বথাম-গাওয়ার ছাড়াও ইংল্যান্ডের শক্তি যে উপেক্ষণীয় নয় তা প্রমাণের দায়িত্ব গ্যাটিংয়ের

কাপ ঘিরে আশা ও সংহতি

তপন ঘোষ

শান্তির পায়রা উড়িয়ে ক্রিকেট মেলা! অশান্তি কিন্তু চারিদিকে। নাম থেকেই শুরু করা যাক। ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট বললে উদ্যোক্তাদের গোঁসা হচ্ছে। ওঁরা চান, বলা হোক রিলায়েন্স কাপ। ক্রিকেটের এক নম্বর দেশগুলো যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তখন 'ওয়ার্ল্ড' বা 'বিশ্ব' গোছের কিছু জোড়া না থাকলে একান্তই বেমানান লাগছে। রিলায়েন্স বাদ দিয়ে শুধু ওয়ার্ল্ডকাপ লেখার জন্যে সংশ্লিষ্টজন আসল জায়গা থেকে কড়কানি খেয়েছে। লোকের মুখে মুখে ফিরছে ওয়ার্ল্ড কাপ, ওয়ার্ল্ডকাপ। বলা মুখে সরা চাপা দেবে কে? আসলে রিলায়েন্স কাপের উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের পাশে ঠিক খাপ খায় না। বেনসন হেজেসের মতো তালেবররাও কিন্তু ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাপ পরিচয় দিলে কাউকে ধমক টমক দেননি। প্রুডেনসিয়াল কাপও ওয়ার্ল্ডকাপের নামাবলী পেয়েছে। এমনকি ওদের সুভেনিয়ারেও এই পরিচয় গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। উদ্যোগীদের গায়ে তো এ নিয়ে কোনো ফোস্‌কা পড়েনি।

নামে কি এসে যায়। পরেপশ্চাতে এই রিলায়েন্স কাপ নিয়ে একটা প্রসঙ্গ বারবার উঁকিঝুঁকি দিতেই পারে। মার্শাল, বথাম, হেডলি, গাওয়ার, গ্রিনিজ, গার্নার খেলেনি তবু একে ওয়ার্ল্ডকাপ-৪ বলা ঠিক হবে কি? ওরা না থাকায় কাপের রমরমা একটু কমেছে। কিন্তু যে কারণে ওরা আসেনি তার প্রধান হেতু এই উপমহাদেশে কাপ আয়োজকদের ব্যর্থতা অথবা খোদ বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবকদের অবিবেচকতা। টাকা-পয়সার ঢালাও ছড়াছড়ির মাঝে ক্রিকেট প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঐতিহ্য আর ওই সব পোড় খাওয়া ক্রিকেট প্লেয়ারদের তেমন নাড়া দেয় না। ওরা সার্কাসের প্লেয়ারদের মতোই একটেরে। যেখানে পয়সা বেশি, সেখানেই ওদের যত ঘোরাঘুরি। রিলায়েন্স কাপের সময় হংকংয়ে আর এক বিরাট প্রাইজ মানির অলরাউণ্ডার ক্রিকেটারদের প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা। উপমহাদেশের ওয়ার্ল্ডকাপ থেকে নাম তুলে নেওয়া খ্যাতিমানরা চুপিচুপি হংকং-এর মাতব্বরদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে এ লেখা তৈরী হওয়ার সময়ও এটাই খবর। ওয়ার্ল্ডকাপকে অপমানিত করার দায়ে ওদের পায়ে বেড়ি পরানোর আস্পর্ধা দেখানো কিন্তু ক্রিকেট অভিভাবকের পক্ষে সম্ভব হল না। রিলায়েন্স কাপের চলকে পড়া দুঃখ এটাই।

এত দিন ইংরাজ ভূমিতে তিনটি ওয়ার্ল্ডকাপ

একদিনের ক্রিকেটের পক্ষে মত দিয়েছেন ব্র্যাডম্যানও

হওয়ার গৌরব ওদেশের কাগজে দারুণভাবে ফলাও হয়ে এসেছে। ওদের ধারণা ছিল, এমন জিনিস অন্য কোনো দেশের পক্ষে করা সম্ভব না। ভারত-পাকিস্তানের জোড়া উদ্যোগের এই আয়োজনকে খুব একটা সাদা মনে ওরা নিয়েছে বলে তো মনে হয়নি। তাহলে দঃ আফরিকায় মৃগয়া সেরে আসা ক্রিকেটারদের ভারতে খেলতে দিতে হবেই, এমন গোঁ আঁকড়ানোর ছেলেমানুষিতে ওদের পেত না।

বথাম ক্লান্ত বলেই কি আসছেন না?

উপমহাদেশের তরফে একটু বুকে হাত দিয়ে ব্যাপারটার অনুমান করা যাক। উপমহাদেশের বড় আর মেজ দুই তরফ মিলেমিশে এমন বড় কাজে নামার কোনোদিন সাহস করেনি। ক্রিকেটকে মাঝে রেখে ভৌগোলিক বেড়া উপড়ে ফেলে পাক-ভারত দুই রাজনৈতিক ভূমি এখন সেই মান্ধাতার ভারতবর্ষে একাকার। ধরুন এমনি একটা ক্রীড়া উদ্যোগের উপলক্ষে যদি সারা উপমহাদেশের উপর শান্তির জল ছেটানো যেত। জিন্না-নেহরু হাত ধরে হাঁটছেন। কল্পনার বিলাসিতায় ওলিম্পিয়াডের পাশে ক্রিকেটিয়াডটি শ্রদ্ধা পেত বিশ্ব মৈত্রীর শীলমোহরে। অতঃপর ব্যাট-বল-উইকেট বা ক্রিকেটিকসে দারুণ মাথা ঘামাত পাকা রাজনীতিকরা। ওয়ার্ল্ডকাপ শেষে ইমরান ওদেশের রাজনীতিতে নামছেন। এটাই ক্রিকেটের বড় খবর।

ক্রিকেট-সেতু গড়া নিয়ে এ যাবৎ তেমন কেউ মাথা ঘামায়নি। নভেম্বরের দশ তারিখটা ভালয় ভালয় উৎরালে, এই উপমহাদেশের উদ্যোগীরা সার্টিফিকেট পেয়ে ওলিম্পিকস অথবা ফুটবল ওয়ার্ল্ডকাপ আয়োজনের জবরদস্ত বায়না ধরবে। রিলায়েন্স কাপে চাঁদ-তারা আর অশোক চক্র বড় কাছাকাছি রয়েছে। একমাস অন্তত এই উপমহাদেশ জুড়ে ধর্মনিরপেক্ষ হাওয়া বইবে। আওয়াক্‌স আর মিরাজের গুরু গুরু আওয়াজ আর কানে আসে না। কোন্ মহান প্লেয়ার এল কি এল না, এ নিয়ে মগজে ঘাম ঝরানোর কোনো মানে হয় না। ঘরোয়া পরিবেশে দুটো দেশের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগটা আলাদা। ওয়ার্ল্ডকাপ কি দিয়ে গেল—এর আগাম হিসাব এভাবেই করেছি।

খেলার যোগ্যতার ওজন-দাঁড়িতে এক-দিনের ক্রিকেটে সফলতার হারে পর পর দেশগুলো এইভাবে সাজান হচ্ছে—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ইংল্যাণ্ড, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ভারত, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে, বাংলাদেশ, কানাডা ও পূর্ব আফ্রিকা। সফলতার শতকরা হারে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যেখানে ৭৫·৭১, সেখানে পাকিস্তান ৪৮·০৭ আর ভারত ৪৩·৩৮। ভারত গত ওয়ার্ল্ডকাপের বিজয়ী। সাহেবরা ব্যঙ্গ করে বলেছে এটা পাক-ভারত ওয়ার্ল্ডকাপ। ঠাট্টা-তামাসা অথবা খেলার ফল এড়িয়েও এই যৌথ উদ্যোগই দেশের নীট প্রাপ্তি—শান্তির ক্রিকেট পরিবেশে দু-দেশই হাতে হাত ধরে চলেছে। আর ক্রিকেট শক্তি ধরা বা রাখার প্রশ্নে ক্রিকেট-দুনিয়া এখন ভারত-পাকিস্তানকে
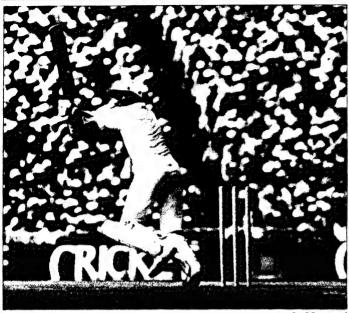
উত্তাল হওয়ার অপেক্ষায় দর্শক ভরা ইডেন *ছবি : নিখিল ভট্টাচার্য*

রীতিমত ভয় পায়। এক দিনের ক্রিকেটে পাকিস্তানী প্লেয়াররা একদশকাবধি সুনাম পাচ্ছে, এর পাশে ভারতের উদিত গৌরবরবির বয়স চার। এই চার বছরের দামাল শক্তিকে টনি গ্রেগের মত লোকও সমীহ করে বলেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই চটজলদি ক্রিকেটের এক নম্বর দেশ। কিন্তু ভারতীয় প্লেয়াররা একবার মন দিয়ে তেতে উঠলে রোখা দায়।

হঠাৎ এই বেপরোয়া টিমটা জেগে উঠবে কি না সেটাই রহস্যময়। এদের দর্শকরা কিন্তু টিমের ছেলেগুলোকে দেবদূত মনে করে, আবার সেই ডার্ক-হর্স ভারতীয়দলকে হারিয়ে অধিনায়ক ইমরান দেশে ফিরলে তাকে মার্কিন তারকা সিলভেস্টার স্ট্যালনের আদলে সাজায়। তবুও অন্তঃসলিলা ইচ্ছার নদীটা বইতেই থাকে—এই ওয়ার্ল্ডকাপেও কপিলরা কী জ্বলে উঠবে না! অস্ট্রেলিয়া থেকে এক সময় টি ভি মারফৎ দেশে পৌঁছালে ওদের চেহারাগুলো আক্রমণাত্মক ভূমিকায় নেহাতই দেবদূত বলে মনে হত। এরাই আবার কখনো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, ভুল বোঝাবুঝিতে থেকে টিমের আত্মসম্মান খোয়ায়, আবার কখনও জেগে ওঠে। ভারতীয় সমর্থকরা আশা করছে, কপিল-সুনীল যেন ভাই ভাই ভাবে মশগুল। বেঙ্গসরকর কপিলের জায়গাটা নেবার জন্য দৈত্যাকার ব্যাট হাতে জেগে উঠবে। রবি শাস্ত্রীর ক্ষোভের তুষে সবে একটু আগুন ধরেছে। মণীন্দর এখন সীমিত ক্রিকেটের চাহিদা অনুযায়ী সত্যিই কঞ্জুষ বোলার। বেশি রান দিয়ে উইকেট কিনতে রাজি নয়, একটা ফুরফুরে হাওয়া বইছে ভারতীয় টিমে। রিলায়েন্স কাপ ঘরেই থাকবে?

এই বড় আকাঙ্ক্ষায় অফিসবাবুরা কিছু আর্নড, ক্যাজুয়াল অথবা নিদেন পক্ষে মেডিকেল ছুটি জবাই করে খেলা দেখবেই। পরে একটা হিসেব করলে জ্যান্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে যে, এই উপমহাদেশের সাতাশির অক্টোবর-নভেম্বরে অফিসে কাজের গতি যেন শামুকের পিঠে চড়ে এগোচ্ছিল, কাপ-চিন্তায় মানুষগুলো সকালে তাজা আনাজের মতো থাকলেও যত দিন গড়াবে মানসিক টানাপোড়েনে এদের কিছুটা আয়ুক্ষয় হবে। স্কুল কলেজে বিদ্যেদেবীর আরাধনায় ভাঁটা পড়ছে। আসলে খেলায় পাগল ছেলে বুড়োর বয়স মাপা ভার। এ সময়ে বিদেশী আক্রমণের সম্ভাব্য ভয়টা কমই। চীন ছাড়া আপাত প্রতিবেশীর সকলেই তো ক্রিকেটে ডুবে থাকবে। পুজোর মরশুমে এই ক্রিকেট পাগলামি মানুষজনকে ছাপাবে। বোঝা দায় হবে, পুজোটা ক্রিকেটারদেব না দেবতার। ইডিয়ট বক্স টি· ভি·র সামনে দিনরাত বসার তাগিদে একদিকে ক্রিকেট-একমুখিনতায় বুদ্ধিনাশ, অন্যদিকে

গর্ডন গ্রিনিজও রিলায়েন্সে অনুপস্থিত

দৃষ্টিশক্তির ক্ষয়। এরপর পাঁচ দিনের টেস্ট দেখতে দর্শকদের মাঠে নিয়ে যাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই বদ্ধ ক্রিকেট ক্ষ্যাপামি অন্য খেলার দিক থেকেও ক্ষতিকর।

এই ক্রিকেটকে রসিয়ে উপভোগ করার ভূমিকাটা কেমন হতে পারে? তাহলে ব্র্যাডম্যানের চোখে আশির দশকের ক্রিকেট কোথায় গেছে, তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় নজর দেওয়া যাক। টাকা পয়সার শীতল তথ্য থেকে চোখ ফিরিয়েও ব্র্যাডম্যান এমন ঘনিষ্ঠ অবসর বিনোদন মাধ্যমে ক্রিকেটের প্রতি ভালবাসা রেখেও চিন্তায় পড়েছেন, অতঃপর ভবিষ্যতে ক্রিকেট কোথায় যেতে পারে? জেল্লাদার উত্তেজক ক্রিকেটের হু হু করে প্রচারের পরেও ওঁর মনে হয়েছে যে, হয় ক্রিকেট অনাকর্ষণীয় হচ্ছে অথবা এর অন্য ধরনের আমোদটুকু লোকের মনে ধরছে। খেলোয়াড় এবং পরিচালক দু-পক্ষের এটা গভীর ভাবনার বিষয়। ইংল্যাণ্ডের মাঠে ঢিমেতালে এখনো ক্রিকেটের পরিচালনভঙ্গী ব্র্যাডম্যানকে খুশি করেছে। সাম্প্রতিক চলতি ক্রিকেটের আধুনিক মেজাজের মধ্যে গতিময় আমেরিকান রীতির ধাঁচটা ওঁর ভাল লাগে না, বর্তমানের চেয়ে ক্রিকেটের কল্যাণে ভবিষ্যতের কথা ভেবেই ব্র্যাডম্যানের চোখে এই রীতি পদ্ধতি ভাল ঠেকেনি। উনি টেস্ট অথবা একদিনের ক্রিকেটের দুটো রীতিই ভাল চোখে দেখেছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ১৯৬১ ব্রিসবেনের টাই-টেস্ট তাঁর কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বড় ক্রীড়া-ঘটনা বলে মনে হয়েছে। এই ম্যাচটি স্পিন-স্পিড-অনবদ্য ব্যাটিং ও ফিল্ডিংয়ে সমৃদ্ধ হয়ে দু-তরফের জেতার চেষ্টা প্রতিফলিত করেছে। নঞর্থক রক্ষণাত্মক বোলিং এবং নেতিবাচক ও রক্ষণাত্মক ফিল্ডিংয়ের গুরুত্বে সীমিত ওভারের দুর্বলতাকে উদ্ঘাটিত করেছে। ব্র্যাডম্যান দু'ধরনের খেলার তুলনামূলক বিশ্লেষণে দর্শক ঠাসা পপ মিউজিকের জলসার পাশে দর্শকহীন বীঠোফেন সংগীতসন্ধ্যার কথা বলেছেন। সরলভাবে বিনোদনের দিকেই লোকের ঝোঁক বেশি। সীমিতওভারের ক্রিকেট এজন্য ব্র্যাডম্যানের চোখে সত্যি আনন্দদায়ক।

"নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্রিজ-আঁকড়ে খেলার অপরিবর্তনীয় একঘেয়েমি থেকে এই খেলা রেহাই দেয়। ক্ষিপ্র ফিল্ডসম্যানের দ্রুত হাতে ছোঁড়ার জোরে উৎকর্ষের প্রয়োজন রয়েছে। এতে ফিল্ডিংয়ের সর্বস্তরেই দারুণ উন্নতি হয়েছে। একটা নতুন ধারা এসেছে রানিং বিটউইন দ্য উইকেটেও। প্রয়োজনীয় রানের হার বজায় রাখতে ঝুঁকি নিতেই হয়।"

এক দিনের ক্রিকেট ব্যাটিং টেকনিকের ক্ষতি করেছে এমন প্রশ্নে ব্র্যাডম্যানের বক্তব্যের হয়তো কিছুটা যৌক্তিকতা থাকলেও প্রয়োজনানুগ দিক থেকে সত্য নয়। সাধারণ মেজাজের খেলার সঙ্গে ডিফেন্সিভ ফিল্ডিংকে এড়িয়ে খেলার তাৎক্ষণিক তৎপরতাকে আমরা গুলিয়ে ফেলি। নিজের ব্যাটিং টেকনিকের মৌলিকত্বকে কোনোভাবে বাদ না দিয়েও ভিভিয়ান রিচার্ডস ও ক্লাইভ লয়েডের

"When the occasion calls for dressing up, I'm never caught on a sticky wicket"

"You know how it is! During any given year, there are so many occasions to celebrate. In our country there are festivals and festivals. Then there are birthdays, anniversaries and any excuse to treat lunch and dinner as festive occasions too. Times when one must eat well and dress well. And what could be better than to be seen in suiting from Gwalior!"

M. A. K. PATAUDI

A PRODUCT OF GRASIM INDUSTRIES LTD.

-GR-87-380

রান বাঁচানোর অসাধারণ প্রচেষ্টা একদিনের ক্রিকেটকে আকর্ষণীয় করে তোলে

পক্ষে দু-ধরনের খেলায় দক্ষতা প্রদর্শনই এর পরম দৃষ্টান্ত।

কিছু ক্রিকেট আইনের প্রয়োগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক থেকে ব্র্যাডম্যান ওয়ান-ডে ক্রিকেটের উপযোগিতা মেনে নিচ্ছেন। যেমন বাউন্সার ব্যবহারের সীমিতকরণ দ্রুত ক্রিকেটের সর্বস্তরেই চালু হওয়া উচিত।

প্রশ্নাতীতভাবে বাউন্সারের ব্যবহার যৌক্তিক ও বাস্তবের আশ্রয়েই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। পরীক্ষামূলক অনেকগুলোই। চালু করা না করা যে তার প্রয়োগ ও প্রথমশ্রেণীর খেলায় গ্রহণযোগ্যতার উপরই নির্ভরশীল তা একদিনের খেলায় প্রমাণিত। আজকের ক্রিকেটে আম্পায়ারের উপর গভীর মানসিক চাপ সম্পর্কে ব্র্যাডম্যান আলোকপাত করেছেন। "ওরা নিজেদের কৃতিত্বে বেশ সক্রিয়ভাবেই নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়েছেন। কোনো কোনো আউটের ব্যাপারে বক্সের সুপারিশ মেনে নেওয়ায় আম্পায়ারের মুখ চুন হওয়ার কথা নয়। এল· বি· ডবলিউ আউটের ক্ষেত্রে এটা অচল হলেও রান আউট অথবা বিদঘুটে স্টাম্পিং এবং বিতর্কিত ক্যাচের ক্ষেত্রে এই সালিশী মেনে নেওয়াটা মনে হয় আইনানুগ হতে পারে।"

ব্র্যাডম্যানের দেওয়া এমন সুচিন্তিত ব্যাখ্যাকে মাথায় রেখেও লোকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে এই ঠাস-বুনোটের ওয়ার্ল্ডকাপ ক্রিকেট দেখতে। এই ম্যাচের লক্ষ্যটা নেহাতই ইতিবাচক—হার-জিৎ হবেই, সেকেণ্ড ইনিংসের কোনো বালাই নেই, যা হবে একটা ইনিংসেই।

খেলার শেষ দিকটায় দর্শকরা আর আরাম করে বসতে নারাজ। সকলেই আগ-পায়ে দাঁড়িয়ে। কী হয় কী হয় অবস্থা দেখতে। প্লেয়ার দর্শক কোনো পক্ষেই ঠাট্টা মশকরার বালাই নেই। মুখ্যমন্ত্র—হারাও। কিংবা হেরে যাও। শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলায় সারা ম্যাচ ঘিরে রহস্যে, থমথমে অবস্থা।

ম্যাচের শুরুতে হেড আর টেল, এটাই আসল খেলা। একটা রানের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার আলাদা সুবিধা। দুর্বল বোলিং আক্রমণ পরে ব্যাটের দাপটে সামলে নেওয়া যায়। শুরুতে ব্যাটসম্যান বিপক্ষের বোলিংয়ের ঝাঁজ সামলে দিলে পরের দিকে তেড়েফুঁড়ে জেগে ওঠা সহজ। উইকেট না খোয়ানোর এটা পরম সুবিধা। শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা। একটা ভদ্রস্থ রান-রেট রেখে ঠুকুস ঠুকুস করাই বিধেয়।

আত্মরক্ষার পদ্ধতিটা ফিলডিং সাইডকেও তটস্থ রাখে। সীমার চায় ব্লক-হোলে বল করে ব্যাটসম্যানকে বেঁধে রাখব আর ফিল্ডার চায় প্রাণপণে চার বাঁচাতে। আবার খেলার শুরুতে বিপক্ষের শিবিরে এসে ত্রাস সৃষ্টি করে টসে হার। দলও নিশ্চিন্ত থাকে। ব্যাপারটা ব্যাটসম্যানের দিক থেকে বেপরোয়া ব্যাটচালনার ঝুঁকিতে শেষ হয়। শুরুতে ফিল্ডিং সাইড চায় সময় নষ্ট করে যতটা কম ওভারে পারা যায় খেলাটা বাঁধতে। ভারি ব্যাট এখন তাড়ু ব্যাটসম্যানের কাছেও হালকা আয়ুধ। সবই উত্তেজনার তোড়ে ঘটে যায়। একটি একদিনের ম্যাচের ধকল পাঁচদিনের

শিল্পী গাওয়ারকেও দেখা যাবে না এই বিশ্বকাপে

টেস্টের পাশে নেহাতই খুচখাচ কাজের সামিল। গতি ও মন্থরতা দুদিকে তাল রাখতে গিয়ে অত্যন্ত পটু প্লেয়ারও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—উঃ কি উত্তেজনায় না নাচার হচ্ছি। সবই ফার্স্ট লাইফের অবদান। ফলদায়ী ক্রিকেট খেলতে খেলতে ক্রিকেটার বুঁদ হয়ে যাচ্ছে। যারা টেস্টম্যাচের পরিবেশে শিল্প ও সূক্ষ্মতা খুঁজতে যান তাঁরা এই সীমিত ওভার ক্রিকেটে নিরাশ হবেন। খেলার ঘটনাবলীর সঙ্গে দর্শক ও প্লেয়ারের আত্মীয়তা অনেক বেশি। প্লেয়ারের অ্যাড্রেনালিন গ্ল্যান্ডে ক্ষরণ এবং দর্শকদের সঙ্গে তার মাখামাখিই এই ক্রিকেটের মূল উৎস।

গতির কনকর্ডে চাপার জন্যই ব্যাকরণ হারায় সীমিত ওভার ক্রিকেটের ব্যাটসম্যান। পিঠোপিঠি বোলারের লেংথ বন্দী বল ফেলার কাজকে ডিফেন্সিভ বলতেই হয়। ফিল্ডারও প্রাণ বার করে রান বাঁচায়, তবু সীমাবদ্ধ ওভারের ক্রিকেট নঞর্থক নয়। আসলে সবই ঝুঁকির খেলায় বাঁধা। চমক পাই ক্ষণে ক্ষণে। সময়মত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মারকুটে স্বভাবে নবীন জিম্বাবোয়েকেও পেয়ে বসে। ঘরানা একটাই, দর্শককে খুশি করে জেতার লক্ষ্যে চলে যাওয়া।

মাসাবধি কাল এই চটপটে ক্রিকেটের উত্তেজনার তরঙ্গে সারা উপমহাদেশ ভাসবে। দল নয় খেলাটাই হবে মুখ্য। যদি ভারত পা পিছলোয় তবে আমরা যে কোনো দলের সাপোর্টার হতে পারি। এখানে খেলার দোষগুণই দর্শকের মনকে নাচাবে। সুনীল বা ইমরানকে বিদায় দিতে এই দর্শকেরা কষ্ট পাবে। ক্রিকেটে যারা আসেনি বা না আসার জন্যই আসবে না বলেছিল তাদের আফসোস হতেই পারে। ভারতবর্ষের মানুষ ক্রিকেটকে তলিয়ে উপভোগ করতে জানে এটাও প্রমাণিত হবে। সবই রজত চক্রের তাগিদে, এ অপবাদ জোলো মনে হবে। এই উপমহাদেশে ক্রিকেট ঐতিহ্যের শুরু হবে ওই গর্বের ফলক থেকেই।

প্রেম
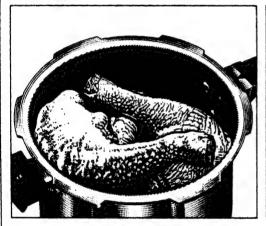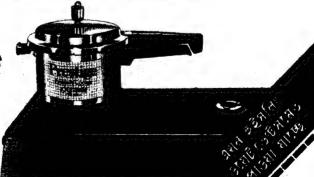
পরিসংখ্যানে বিশ্বকাপ

কৃশানু ভট্টাচার্য

ক্রিকেট রেকর্ড ক্ষণে ক্ষণে জন্মায়। অন্য কোনো খেলায় অঙ্কের এত কারিকুরি নেই। অঙ্কের তাৎপর্য ক্রিকেটারের মহিমাকে অন্যভাবে আলোকিত করে। সীমিত ওভারের নিশ্চিত ফলদায়ী ক্রিকেট চালু হওয়ার পর থেকে এই হিসেব-নিকেশের মাত্রা দারুণভাবে বেড়ে গেছে। টেস্ট ম্যাচের স্কোর কার্ড আর সীমিত ওভারের ম্যাচের স্কোর-দর্পণ দুটো পাশাপাশি রাখলেই অঙ্কের বাহুল্যে ইনস্ট্যান্ট ক্রিকেট যে কতটা ওজনদার তা ভালভাবে টের পাওয়া যায়। সীমিত ওভারের ক্রিকেটকে উপভোগ করতে সংখ্যা-তত্ত্বের

১৭৫ নট আউট : সর্বোচ্চ রানের পথে কপিলদেব

মুৎসুদ্দি একটু বাড়তি হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। ভিভ রিচার্ডসের মতে ওয়ান-ডে ক্রিকেট "নাম্বারের" সমাহার বিশেষ। যার পদে পদে এত অঙ্কের ছড়াছড়ি তাকে অনুসরণ করতে হলে একটু রেকর্ড-বাতিক হওয়া স্বাভাবিক। তিনটি ওয়ার্ল্ড কাপে তাই এই রেকর্ডের ছড়াছড়ি। টেস্ট ক্রিকেটে রোমাঞ্চের পদার্থগুণ কম, কিন্তু ওয়ান-ডে অথবা সীমিত ওভারের ক্রিকেটে রোমহর্ষকতা কিন্তু সব সময়েই মজুত। অন্তত প্রচারবিদের চোখে এটাই আলাদা। শীতল অঙ্কের মধ্যেও এত রোমাঞ্চময়তা। সীমিত ওভারের শুরুর ঘটনা দিয়ে শুরু করা যাক।

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তারা সেদিন কল্পনাও করতে পারেননি যে তাঁদের

যে কাপ নিয়ে এবারের লড়াই

একটি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কি বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছে। ১৯৭০-৭১ সিরিজে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে মেলবোর্নের তৃতীয় টেস্ট বৃষ্টিতে ধুয়ে গেলে সংগঠকরা আর্থিক সংকটে পড়ে। দর্শকদের খুশী করার জন্য দুই দলের মধ্যে একটি ৪০ ওভারের ম্যাচ হয়। দিনটি ছিল পাঁচ জানুয়ারি, ১৯৭১। প্রায় ছেচল্লিশ হাজার দর্শক সেদিনের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হতে মেলবোর্নে হাজির হয়েছিলেন। টসে জিতে অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করতে পাঠায় ইংল্যান্ডকে। একদিনের সেই প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রথম বলটি করেন গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি জিওফ বয়কটকে। অস্ট্রেলিয়া পাঁচ উইকেটে এই ম্যাচে জেতে। একদিনের এই ম্যাচটির ৯৪ বছর আগে এই একই মাঠে ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম টেস্ট ম্যাচটিও খেলা হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীদেরও অদ্ভুত মিল। এমনকি সে ম্যাচেও বিজয়ী হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া।

পঞ্চাশ দশকের শেষ থেকেই টেস্ট ক্রিকেটের জনপ্রিয়তায় ভাঁটার টান শুরু হয়। টেস্ট ম্যাচের ঘুমপাড়ানি খেলা ও ক্রমাগত ড্র দেখতে দেখতে দর্শকেরা টেস্ট ক্রিকেটের ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ইংল্যান্ডের কাউন্টিগুলির অবস্থাও তখন শোচনীয়। ক্রিকেটকে বাঁচানোর রাস্তা খুঁজে বের করার জন্য এম সি সি ১৯৫৬-তে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে। এই কমিটিই এম সি সি-র কাছে একদিনের ক্রিকেট

প্রথম বিশ্বকাপ হাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিজয়ী অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড

আবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিজয়ী ঃ ১৯৭৯ এ জয়ের পর লর্ডসে দর্শকদের অভিনন্দন

জয় পরাজয়

তিনটি বিশ্বকাপে প্রত্যেকটি দেশের জয়-পরাজয়ের পরিসংখ্যান

	ম্যাচ	জয়	পরা
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৭	১৫	২
ইংল্যান্ড	১৬	১২	৪
অস্ট্রেলিয়া	১৪	৬	৮
নিউজিল্যান্ড	১৪	৭	৭
পাকিস্তান	১৪	৬	৮
ভারত	১৪	৭	৭
* শ্রীলঙ্কা	১২	২	১০
জিম্বাবোয়ে	৬	১	৫
কানাডা	৩	—	৩
পূর্ব আফ্রিকা	৩	—	৩

* ১৯৭৯-র বিশ্বকাপে ওয়েস্ট-ইন্ডিজ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচটি এই হিসেবে ধরা হয় নি

চালু করার প্রস্তাব রাখে। ফলে ১৯৬৩-তে ইংল্যান্ডে চালু হয় একদিনের ক্রিকেটের প্রথম টুর্নামেন্ট—জিলেট কাপ। নিশ্চিত ফলদায়ী এই ক্রিকেট দর্শকদের ইনস্ট্যান্ট কফির মতই উত্তেজক স্বাদে ভরিয়ে দেয়। টেস্ট ক্রিকেট থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা দর্শকরা তখনই একদিনের খেলা দেখতে মাঠে আসতে শুরু করে।

একদিনের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচটি আন্তর্জাতিক স্তরে ক্রিকেটকে নবজন্ম দেয়। ১৯৭৩-এ একদিনের ক্রিকেটের অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে ইংল্যান্ডের টেস্ট অ্যান্ড কাউন্টি ক্রিকেট বোর্ড-এর (টি সি সি বি) মাথায় আসে প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা চালু করার। লর্ডসে ১৯৭৩-এর ২৪ ও ২৫ জুলাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্সের বার্ষিক সভায় টিসিসিবি প্রস্তাবটি পাস করিয়ে নেয়।

ওই সভায় ঠিক হয় ভারত, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া এই ছ'টি পূর্ণ সদস্য দেশ ছাড়াও আই সি সি-র দুটি সহযোগী সদস্য-দেশকেও আমন্ত্রণ করা হবে।

ক্যাচেস উইন দ্য ম্যাচেস

বিশ্বকাপে যাঁরা সর্বাধিক ক্যাচ ধরেছেন (উইকেটকিপার বাদে) তাঁদের পরিসংখ্যান

	ম্যাচ	ক্যাচ
লয়েড	১৭	১২
জাহির আব্বাস	১৪	৭
কপিলদেব	১১	৭
হেনেস	১৩	৭
রিচার্ডস	১৭	৬
বথাম	১২	৬
ল্যাম্ব	৭	৬
কালীচরণ	১০	৫
মিয়াদাদ	১২	৫
ডায়াস	৮	৫

সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীলঙ্কা ও পূর্ব আফ্রিকা আমন্ত্রিত হয়। ওই সভাতেই ঠিক হয় ১৯৭৫-এর সাত থেকে ২১ জুন এই প্রতিযোগিতা চলবে।

বিশ্বকাপ ক্রিকেট কিন্তু ইংল্যান্ডে কোন নতুন ব্যাপার নয়। ত্রি-দলীয় মিনি বিশ্বকাপের আয়োজন করা হয়েছিল ১৯১২-তে ইংল্যাণ্ডে। রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে ১২টি তিনদিনের টেস্ট ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা হয়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য নটির বেশি ম্যাচ খেলা সম্ভব হয়নি। ছ'টি ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়েছিল এবং তিনটির কোনও মীমাংসা হয়নি।

আই সি সি যখন বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখনও ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ভারত একটিও একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেনি। ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বরে অবশ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইংল্যান্ডের সঙ্গে প্রথম একদিনের ম্যাচ খেলে লিডসে। গ্যারি সোবার্স দেশের হয়ে একমাত্র আন্তর্জাতিক ম্যাচে শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছিলেন। সে ম্যাচে মাত্র ৩১ রানে একটি

সেরা ব্যাটসম্যান

তিনটি বিশ্বকাপের সেরা দশজন ব্যাটসম্যানের পরিসংখ্যান

	ম্যাচ	ইনিংস	নট আউট	রান	সর্বোচ্চ	শতরান	অর্ধ-শতরান	গড়
ভিভ রিচার্ডস	১৭	১৫	৫	৬২২	১৩৮*	২	২	৬২.২০
গ্লেন টার্নার	১৪	১৪	৩	৬১২	১৭১	২	২	৫৫.৬৩
ডেভিড গাওয়ার	১২	১১	৩	৪৩৪	১৩০	১	১	৫৪.২৫
মজিদ খান	৭	৭	—	৩৫৭	৮৪	—	৫	৫১.০০
জাহির আব্বাস	১৪	১৪	২	৫৯৭	১০৩*	১	৪	৪৯.৭৫
ক্লাইভ লয়েড	১৭	১১	৩	৩৯১	১০২	১	২	৪৮.৮৭
গর্ডন গ্রিনিজ	১৫	১৫	২	৫৯১	১০৬	১	৪	৪৫.৪৬
কপিলদেব	১২	১২	৩	৩৫৬	১৭৫*	১	—	৩৯.৫৫
জেফ হাওয়ার্থ	১১	১১	১	৩৭৪	৭৬	—	৪	৩৭.৪০
হেনেস	১২	১২	১	[illegible]	৮৮	—	২	[illegible]

* নট আউট

ভিভিয়ান রিচার্ডস

উইকেট পান। ১৯৭৪-এ ইংল্যান্ড সফরের সময় ভারত প্রথম দু'টি একদিনের ম্যাচ খেলে। দু'টিতেই ভারত হেরেছিল।

প্রথম বিশ্বকাপের আগে ক্রিকেট দুনিয়ায় মাত্র ১৮টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা হয়েছিল। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে ইংল্যান্ড ১৫টি, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সাতটি করে, পাকিস্তান তিনটি, ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুটি করে একদিনের ম্যাচ খেলে।

প্রথম বিশ্বকাপকে স্পনসর করতে এগিয়ে আসে ইংল্যান্ডের প্রুডেন্সিয়াল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি। সারা বিশ্বে একদিনের ক্রিকেটের যে জনপ্রিয়তা ও সাফল্য তার সিংহভাগই দাবী করতে পারে এই কোম্পানি। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৩ অবধি ইংল্যান্ডে যত একদিনের ম্যাচ খেলা হয়েছিল তার সব কটিই স্পনসর করেছিল প্রুডেন্সিয়াল সংস্থা।

১৯৭৫-এর সাত জুন ইংল্যান্ডে শুরু হয় প্রথম বিশ্বকাপ। এ গ্রুপের প্রথম খেলাতেই ইংল্যান্ড ভারতের বিরুদ্ধে চার উইকেটে ৩৩৪ রান তোলে। একদিনের ক্রিকেটে প্রথম ৩০০ রান। বিশ্বকাপের প্রথম সেঞ্চুরিটি বেরিয়ে আসে ডেনিস অ্যামিসের ব্যাট থেকে। কারসন ঘাউড়ি ১১ ওভারে ৮৩ রান দিয়েছিলেন। একদিনের ম্যাচে এর আগে এমন বেহিসাবী বোলার দেখা যায়নি। ভারত ২০২ রানে এই ম্যাচে হারে মূলত সুনীল গাওস্করের একটি ধীরতম বিরক্তিকর ইনিংসের জন্য। ৬০ ওভারে তিনি ৩৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। গাওস্কর যেন ম্যাচটি ড্র রাখতেই চেয়েছিলেন। একদিনের ক্রিকেটে আজ অবধি এমন সৃষ্টিছাড়া ইনিংস আর কেউ খেলেননি। পূর্ব আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে ভারত অবশ্য আশাতীত ভাল খেলে দশ উইকেটে জেতে। মনে দাগ কাটার মত বোলিং করেছিলেন বিষেণ সিং বেদী। ১২-৮-৬-১। একদিনের ক্রিকেটে বেদীর মতো এমন মিতব্যয়ী বোলিং আজ অবধি দ্বিতীয় কোন বোলারের হাত থেকে হয়নি।

প্রথম বিশ্বকাপের সেরা ম্যাচটি খেলা হয়েছিল বি গ্রুপে পাকিস্তান ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে। তিনটি বিশ্বকাপের কোন ম্যাচে এমন দম আটকানো লড়াই দেখা যায়নি। এজবাস্টনে পাকিস্তানের ২৬৬ রানের জবাবে ৪৬ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান তখন নয় উইকেটে ২০৩। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শেষ জুটি ডেরেক মারে ও অ্যান্ডি রবার্টস অমূল্য ৬৪ রান যোগ করে দলকে এক উইকেটে জয়ী করেন। খেলা শেষ হতে তখন বাকি ছিল মাত্র দু' বল। বিশ্বকাপে এক উইকেটে জয়ের নজীর এই একটিই।

ওভালে শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে লাঞ্চের আগে ৩৪তম ওভারে সেঞ্চুরি করেন অ্যালান টার্নার। এই ম্যাচেই টমসনের বলে শ্রীলঙ্কার মেন্ডিস ও ওয়েত্তিমুনি আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এটিও একটি বিরল ঘটনা।

প্রথম বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া সেমি-ফাইনালটি গিলমোরের ম্যাচ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁ-হাতি

সেরা বোলার

তিনটি বিশ্বকাপের সেরা দশ বোলারের পরিসংখ্যান

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়	সেরা
ক্রিস ওল্ড	৯০·৩	১৮	২৪৩	১৬	১৫·১৮	৪- ৮
অশান্ত ডিমেল	৬৬	১৩	২৬৫	১৭	১৫·৫৮	৫-৩২
বব উইলিস	১০৯·২	২৭	৩০৬	১৮	১৭·০০	৪-১১
রিচার্ড হ্যাডলি	১৫৬	৪২	৪২৪	২৪	১৭·৬৬	৫-২৫
রজার বিনি	৮৮	৯	৩৩৬	১৮	১৮·৬৬	৪-২৯
মদনলাল	১১৬·২	১৬	৪২৬	২২	১৯·৩৬	৪-২০
অ্যান্ডি রবার্টস	১৭০·১	২৯	৫৫২	২৬	২১·২৩	৩-৩২
মাইকেল হোল্ডিং	১৬৫·৫	৩৬	৪৭৯	২২	২১·৭৭	৫-২৫
মহিন্দর অমরনাথ	১০৫·৩	৮	৪৩১	১৬	২৬·৯৩	৩-১২
সরফরাজ নওয়াজ	১১৮·৫	১৫	৪৩৫	১৬	২৭·১৮	৪-৪৪

বব উইলিস

বিশ্বকাপ, ১৯৮৩ : রিচার্ডস আউট, বোলার ভারতের সাঁধু

ফাস্ট মিডিয়াম বোলার লিডসের বৃষ্টিভেজা সবুজ পিচে সীম ও সুইংয়ে ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের নাকালের একশেষ করেন। ইংল্যান্ড ৩৬·২ ওভারে মাত্র ৯৩ রানে সব উইকেট হারায়। গিলমোরের বোলিং গড় ছিল— ১২-৬- ১৪-৬। একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে গিলমোরের আগে ছ'টি উইকেট কেউ পাননি। পরবর্তী ১৭০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচেও তাঁর এই রেকর্ড অটুট থেকেছে। গিলমোরের অপরাজিত ২৮ রানের জন্য অস্ট্রেলিয়া প্রথম ছ'টি উইকেট ৩৯ রানে হারিয়েও জয়ী হয়।

অবশেষে লর্ডসে ফাইনাল। ২৬,০০০ দর্শক সেদিন শেষ বল অবধি একদিনের ক্রিকেটের চরম উত্তেজনার প্রতিটি মুহূর্ত তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছেন। ক্যারিবিয়ান ওপনার ফ্রেডেরিকস লিলিকে হুক করে লং লেগ বাউন্ডারির ওপর উড়িয়ে দেন, কিন্তু পরমুহূর্তে পা পিছলে পড়ে যান। গিলমোর এই ম্যাচেও তাঁর ইনসুইংয়ের ফাঁদে কয়েকজনকে বিপদে ফেলেছেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। লয়েডের ঝোড়ো ইনিংসের মুখে খড়কুটোর মতো উড়ে যান লিলি, টমসন, ওয়াকাররা। ৮২ বলে ১০০ রান করেন লয়েড (বারটি চার, দুটি ছক্কা)। একেই কী বলে অধিনায়কের ইনিংস?

উইকেটকিপাররা

বিশ্বকাপে উইকেটকিপারদের পরিসংখ্যান

	ম্যাচ	ক্যাচ	স্টাম্প	মোট
বারি (পাক)	১৪	১৯	৩	২২
মার্শ (অস্ট্রে)	১১	১৭	১	১৮
মারে (ওঃ ইন্ডিজ)	১০	১৬	—	১৬
দুজোঁ (ঐ)	৮	১৫	১	১৬
কিরমানি (ভা)	৮	১২	২	১৪
গোল্ড (ইং)	৭	১১	১	১২
স্মিথ (নিউজি)	১০	১০	—	১০
হাউটন (জিম্বা)	৬	৭	—	৭
রাইট (অস্ট্রে)	৩	৫	—	৫
ডি অলউইস (শ্রীলঙ্কা)	৬	৫	—	৫

সৈয়দ কিরমানি

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৯১ রানের উত্তরে অস্ট্রেলিয়া দ্রুত রান তুলতে গিয়ে বিপাকে পড়ে। রিচার্ডসের ছোঁড়া বল দু'বার সরাসরি স্টাম্প ভেঙে দেয়। মোট পাঁচজন রানআউট হন। শেষ জুটি লিলি-টমসন অমূল্য ৪১ রান যোগ করেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। মাত্র ১৭ রানে হেরে যায় অস্ট্রেলিয়া। বছরের দীর্ঘতম দিনটির পড়ন্ত আলোয় ডিউক অব এডিনবার্গ লয়েডের হাতে তুলে দেন সুদৃশ্য প্রুডেন্সিয়াল ট্রফি।

প্রথম বিশ্বকাপ চলাকালীন ইংল্যান্ডে এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। মাঠে হাজির হয়েছিল এক লক্ষ ষাট হাজার দর্শক। টিকিট বিক্রি হয়েছিল ১,৮৮,০০০ পাউন্ড। ইংল্যান্ড মোট লাভের দশ শতাংশ পায়, বাকি সাতটি দেশের প্রত্যেকে ৭½ শতাংশ লাভ করে।

প্রথম বিশ্বকাপে আটটি দেশের ভূমিকার তুলনা করলে দেখা যাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিক হারে (৪·৪২), পাকিস্তান (৪·৬৩), ইংল্যান্ড (৪·৫৫), ও অস্ট্রেলিয়ার (৪·৪৬) থেকে পিছিয়ে ছিল। এই প্রতিযোগিতায় ভারত সবথেকে কম ১৩টি উইকেট খোয়ায়, অস্ট্রেলিয়া হারায় সর্বাধিক ৩৮টি।

অস্ট্রেলিয়াই একমাত্র দেশ যারা প্রথম বিশ্বকাপে হাজারের বেশি রান তোলে (১১৬৬)। বিপক্ষের উইকেট দখলের শীর্ষে থাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৪৭ উইঃ) ও নীচে পূর্ব আফ্রিকা (১০ উইঃ)।

প্রথম বিশ্বকাপের আশাতীত সাফল্যের রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই ক্রিকেটকে ঘিরে জমে উঠেছিল কালো মেঘ। অস্ট্রেলিয়ার ধনকুবের কেরি প্যাকারের একটি দাবিকে ঘিরে ১৯৭৭-এ। ক্রিকেট দুনিয়া দু' টুকরো হয়ে গিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ডের কাছে প্যাকারের দাবী ছিল অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টসহ প্রথম শ্রেণীর ম্যাচের টিভি কভারেজের একমাত্র অধিকার থাকবে তাঁর চ্যানেল নাইন-এর। এরজন্য অবশ্য তিনি বোর্ডকে পাঁচ লক্ষ ডলার দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। বোর্ড প্যাকারের শর্তে রাজি না হওয়ায় তিনি ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেট নামে নিজস্ব দল গঠন করেন। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানের সেরা ৫১ জন ক্রিকেটার মোটা টাকার লোভে প্যাকারের দলে নাম লেখান।

প্যাকারের দৌলতে দর্শকরা প্রথম পরিচিত হন ফ্লাডলাইট ক্রিকেটের সঙ্গে। এ ব্যাপারে প্যাকারের বক্তব্য ছিল 'বিগ বয়েস প্লে অ্যাট নাইট'। ক্রিকেট খেলাকেও যে কত চিত্তাকর্ষক করা যায় তা দেখিয়েছিলেন তিনি। রাতের ক্রিকেটের জন্য ক্রিকেটারদের রঙিন পোশাক, সাদা বল, কালো সাইটস্ক্রীন দর্শকদের মাতিয়ে রেখেছিল। আর এসবের সঙ্গে বাড়তি পাওনা হিসেবে ছিল নটি ক্যামেরার সাহায্যে প্রতিটি ম্যাচের নিখুঁত টিভি কভারেজ।

নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দু' বছরে ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেট মোট ৫৮টি একদিনের ম্যাচ খেলে। ক্যারিবিয়ান ও নিউজিল্যান্ড সফরে আরও ১৫টি ম্যাচ খেলা হয়। প্যাকারের দলের খেলা দেখার জন্য দর্শকদের উন্মাদনায় ঘাটতি ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বকাপের আগে প্যাকারের দাবী অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড মেনে নেয়। এই জয়ে বিশ্বক্রিকেটে নতুন আদি শুরু হয়। প্যাকারের 'নাইট ক্রিকেট' একদিনের ক্রিকেটকে ফুটবলের মত জনপ্রিয়তার পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বকাপকে আরও আকর্ষণীয় ও তীব্রতায় ভরে দিতেই আই সি সি একটি নতুন নিয়ম চালু করে। ওদের উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্বকাপ ফুটবলের মতই প্রাথমিক পর্যায়ে যেন সব দেশই খেলার অধিকার পায়, সেই একই ধারণায় ১৫টি সহযোগী সদস্য দেশের জন্য আই সি সি নিজের নামে একটি ট্রফি চালু করে। পাঁচটি করে দেশ তিনটি গ্রুপে ভাগ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে খেলার পরে প্রত্যেক গ্রুপের বিজয়ী দেশ ও তিনটি গ্রুপের সেরা রানার্সকে নিয়ে আবার খেলা হয়। সহযোগী দেশের প্রাথমিক খেলায় কানাডা ও শ্রীলঙ্কা ফাইনালে ওঠার ফলে সুযোগ পায় মূল পর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার। কানাডাকে হারিয়ে প্রথম বছর আই সি সি ট্রফি জেতে শ্রীলঙ্কা। এই ট্রফিটি দিয়েছিলেন সহযোগী সদস্য দেশসমূহের সচিব জন গার্ডনার।

১৯৭৯-র নয় জুন ইংল্যান্ডে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বকাপ। এ গ্রুপে ছিল ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা, বি গ্রুপে পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও কানাডা।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে অস্ট্রেলিয়া প্যাকারের দলে যোগ দেওয়া সব ক্রিকেটারকে বাতিল করে সম্পূর্ণ নতুন দল পাঠায়। ইংল্যান্ড টনি গ্রেগ, আন্ডারউড, নট, উলমার ও অ্যামিসকে বাদ দেয়। এবারের বিশ্বকাপ জয়ের প্রধান দাবীদার ছিল ক্যারিবিয়ানরা। এরপর পাকিস্তান।

প্রথম বিশ্বকাপে যেমন ঝকঝকে আবহাওয়ায় খেলা হয়েছিল, এবারে তেমনি বিপরীত দৃশ্য দেখা গেল। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া দ্বিতীয় বিশ্বকাপকে প্রায় মাটি করে ফেলেছিল। প্রবল বৃষ্টির জন্য শ্রীলঙ্কা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে গ্রুপ লিগের ম্যাচে মাঠে একটি বলও পড়েনি। বাতিল হওয়া ম্যাচের সংখ্যা বিশ্বকাপে এই একটিই।

নবাগত দেশ কানাডা তাদের দলে সাতজন কৃষ্ণকায় ক্রিকেটারকে রেখেছিল। দলের সব থেকে উল্লেখযোগ্য ক্রিকেটার ছিলেন বাঁ-হাতি

ম্যান অফ দি ম্যাচ

তিনটি বিশ্বকাপে ৫৭টি ম্যাচে ৫৩ জনকে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার দেওয়া হয়। কানাডা ও পূর্ব আফ্রিকার কোনও ক্রিকেটার কখনো এই পুরস্কার পাননি। আর চারজন ক্রিকেটার তাঁদের দলের পরাজয় সত্ত্বেও দারুণ পারফরমেন্সের জন্য বিজিত দলের পক্ষে এই পুরস্কার পান। এঁরা হলেন সরফরাজ নওয়াজ (৪-৪৪) ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে '৭৫; আবদুল কাদির (৪-২১) নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে, '৮৩; জাহির আব্বাস (অপরাজিত ১০৩) ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে '৮৩; ও ডেভিড হাউটন (জিম্বা ৮৪ রান) অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে '৮৩। উল্লেখ্য, আর দুজন উইকেটকিপার, ইঞ্জিনিয়ার ও হাউটন 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' হয়েছেন।

তিনটি বিশ্বকাপের ৫৩ জন 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ'-এর পরিসংখ্যান—

ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১৫ বার)
রিচার্ডস তিনবার, গ্রিনিজ তিনবার, লয়েড দুবার, কালীচরণ দুবার, ফাউদ বাক্কাস, উইনস্টন ডেভিস ও মুরিয়ে একবার করে।

ইংল্যান্ড (১১ বার)
গুচ দুবার, অ্যামিস, গ্রেগার, ফাউলার, গাওয়ার, হেনড্রিকস, ল্যাম্ব, ওল্ড, লো ও উইলিস একবার করে।

পাকিস্তান (৯ বার)
মাজিদ দুবার, জাহির দুবার, আসিফ ইকবাল, ইমরান, মহসিন, সাদিক ও সরফরাজ একবার করে।

ভারত (৭ বার)
মহিন্দর অমরনাথ দুবার, বিনি, ইঞ্জিনিয়ার, কপিল, মদনলাল ও যশপাল শর্মা একবার করে।

নিউজিল্যান্ড (৬ বার)
গ্লেন টার্নার দুবার, কোনি, এডগার, হ্যাডলি, হাওয়ার্থ একবার করে।

অস্ট্রেলিয়া (৫ বার)
ট্রেভর চ্যাপেল, গিলমোর, হার্স্ট, লিলি, অ্যালান টার্নার একবার করে।

শ্রীলঙ্কা (২ বার)
অশান্ত ডিমেল, দিলীপ মেন্ডিস একবার করে।

জিম্বাবোয়ে (২ বার)
ডানকান ফ্লেচার, ডেভিড হাউটন একবার করে।

অল আউট

একদিনের ক্রিকেটে সাধারণত একটা দলের সবাই আউট হয় না। বিশ্বকাপের ৫৭টি ম্যাচে [illegible] [illegible] অল আউট হয়েছে। ব্যতিক্রম ছিল ভারত

দেশ	অল আউট হয়েছে	অল আউট করেছে
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২	১০
ইংল্যান্ড	৪	৬
নিউজিল্যান্ড	৫	[illegible]
অস্ট্রেলিয়া	৫	[illegible]
ভারত	৭	[illegible]
পাকিস্তান	৪	[illegible]
শ্রীলঙ্কা	[illegible]	[illegible]
পূর্ব আফ্রিকা	[illegible]	—
কানাডা	[illegible]	—
জিম্বাবোয়ে	[illegible]	—

[illegible]			
	খেলোয়াড়	বিপক্ষে	সাল
৭-৫১	ডেভিস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)	অস্ট্রেলিয়া	১৯৮৩
৬-১৪	গিলমোর (অস্ট্রে)	ইংল্যান্ড	১৯৭৫
৬-৩৯	কেন ম্যাকলিয়ে (অস্ট্রে)	ভারত	১৯৮৩
৫-২১	অ্যালান হার্স্ট	কানাডা	১৯৭৯
৫-২৫	হ্যাডলি (নিউজি)	শ্রীলঙ্কা	১৯৮৩
৫-৩২	ডি. মেল (শ্রীলঙ্কা)	নিউজিল্যান্ড	১৯৮৩
৫-৩৪	লিলি (অস্ট্রে)	পাকিস্তান	১৯৭৫
৫-৩৮	গার্নার (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)	ইংল্যান্ড	১৯৭৯
৫-৩৯	মার্কস (ইং)	শ্রীলঙ্কা	১৯৮৩
৫-৩৯	ডিমেল (শ্রীলঙ্কা)	পাকিস্তান	১৯৮৩
৫-৪৩	কপিলদেব (ভার)	অস্ট্রেলিয়া	১৯৮৩
৫-৪৪	কাদির (পাকঃ)	শ্রীলঙ্কা	১৯৮৩

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৬	—	[illegible]	[illegible]
ইংল্যান্ড	৭	৩	[illegible]	[illegible]
অস্ট্রেলিয়া	৪	৩	২	[illegible]
নিউজিল্যান্ড	[illegible]	৩	৫	[illegible]
ভারত	৫	৩	[illegible]	[illegible]
পাকিস্তান	৪	৪	১	[illegible]
শ্রীলঙ্কা	—	৪	২	[illegible]
পূর্ব আফ্রিকা	—	১	—	[illegible]
কানাডা	—	৩	—	—
জিম্বাবোয়ে	১	৩	—	২
মোট	২৯	২৭	২৭	[illegible]

মিডিয়াম পেসার ভ্যালেনটিন। ইনি ছিলেন এক ধর্মযাজকের পুত্র। মন্ট্রিলের এক স্কুলে ফরাসী পড়াতেন। তিনটি দেশের তিনজন ওপনারকে আউট করে তিনি বোলিংয়ে নৈপুণ্য দেখান। এই তিনজন হলেন মজিদ খান (বোল্ড), ব্রিয়ারলি ও ডারলিং (এল বি ডবলিউ)।

বৃষ্টিভেজা পিচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪৫ রানে কানাডার সবাই আউট হয়ে যায়। এটিই বিশ্বকাপ ও একদিনের আন্তজাতিকের সবচেয়ে কম রান। মাত্র ৩ ঘন্টা ৩৫ মিনিটে ম্যাচটি শেষ হয়ে যায়।

শ্রীলঙ্কা ভারতকে হারিয়ে সহযোগী সদস্য দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে প্রথম জয়ী হয়েছিল। নিউজিল্যান্ড গ্রুপ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ও সেমি-ফাইনালে ইংল্যান্ডের সঙ্গে প্রতিবারই নয় উইকেটে ২১২ রান করে। আবার তৃতীয় বিশ্বকাপে দুটি ম্যাচে ২৩৮ করে তোলে। একই সংখ্যক রান দু'বার আর কোন দল করেনি।

প্রুডেনশিয়াল কাপ

দ্বিতীয় বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ড চারজন স্পেশালিস্ট বোলার নিয়ে খেলতে নেমেছিল। গ্রিনিজ, হেনেস, কালীচরণ ও লয়েডের উইকেট হারিয়ে শুরুতেই ক্যারিবিয়ানরা বিপাকে পড়ে। কিন্তু মাত্র ৭৭ মিনিটে ১৩৯ রান যোগ করে খেলার মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেন রিচার্ডস-কিং জুটি। মাত্র ৬৭ বল খেলে কিং করেন ৮৬ রান। আর ১৫৭ বলে রিচার্ডসের সংগ্রহ ১৩৮। বয়কট, গুচ ও লারকিন্সের ১২ ওভার থেকে আসে ৮৬ রান। দলে পঞ্চম বোলার না থাকায় ইংল্যান্ডকে এইভাবে খেসারত দিতে হয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৮৬ রানের জবাবে ইংল্যান্ড শুরুতেই রান-রেটে পিছিয়ে যায়। দশ রান করতে বয়কট ১৭টি অমূল্য ওভার নষ্ট

আলগা বোলিং

একদিনের ক্রিকেটে আঁটসাঁট বোলিংয়ের পাশে থাকে অগোছালো বোলিংয়ের নিদর্শন। একজন বোলারের আলগা বোলিং বিপক্ষকে জিতিয়ে দিতে পারে। বিশ্বকাপে এ ধরনের বোলিংয়ের কয়েকটি নমুনা।

খেলোয়াড়	বোলিং	কার বিরুদ্ধে
	১৯৭৫	
[illegible] (ভা)	১১-১-৮৩-০	ইংল্যান্ড
[illegible] (পূঃ আ)	১২-০-৭১-০	নিউজিল্যান্ড
[illegible] (নিউজি)	১২-২-৬৬-১	ইংল্যান্ড
[illegible] (অস্ট্রে)	১২-০-৬৬-১	ওয়েস্ট ইন্ডিজ
	১৯৭৯	
[illegible] (ইং)	৬-০-৩৮-০	ওয়েস্ট ইন্ডিজ
[illegible] (ঐ)	৪-০-২৭-০	ঐ
[illegible] (ঐ)	২-০-২১-০	ঐ
	১৯৮৩	
[illegible]	১২-১-১০৫-২	ইংল্যান্ড
[illegible]	১২-০-৮২-১	শ্রীলঙ্কা
[illegible]	১২-০-৭১-৩	ওয়েস্ট ইন্ডিজ

আঁটসাঁট বোলিং

একদিনের ম্যাচে উইকেট নেওয়ার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আঁটসাঁট বোলিং করে বিপক্ষকে বেঁধে রাখা। বিশ্বকাপে এ ধরনের বোলিংয়ের কয়েকটি নমুনা।

খেলোয়াড়	বোলিং	কার বিরুদ্ধে
	১৯৭৫	
বেদি (ভা)	১২-৮- ৬-১	পূর্ব আফ্রিকা
স্নো (ইং)	১২-৬-১১-৪	ঐ
রবার্টস (ওঃ ইন্ডিজ)	১২-৫-১৬-২	শ্রীলঙ্কা
রাজা (পাক)	৭-৪- ৭-১	ঐ
	১৯৭৯	
মজিদ (পাক)	১১-৪-১১-১	কানাডা
ওল্ড (ইং)	১০-৫- ৮-৪	ঐ
	১৯৮৩	
উইলিস (ইং)	৯-৪- ৯-১	শ্রীলঙ্কা
বথাম (ঐ)	৯-৪-১২-২	ঐ
কাদির (পাক)	১২-৪-২১-৪	নিউজিল্যান্ড
হ্যাডলি (নিউজি)	১২-৩-১৬-১	শ্রীলঙ্কা

করেন। অধিনায়ক হিসেবে ব্রিয়ারলি যে কত কাঁচা ছিলেন তার প্রমাণ গুচকে ওপেন করতে না পাঠিয়ে তিনি সঙ্গী হিসেবে বয়কটকে বাছেন এবং ম্যাচ হারেন। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় তাড়াতাড়ি রান তুলতে গিয়ে ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা গার্নারের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পন করেন। এক সময়ে গার্নার ১১ বলে চার রান দিয়ে তুলে নেন পাঁচটি উইকেট।

খারাপ আবহাওয়ার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বকাপে দর্শক সংখ্যা ছিল ১,৩২,০০০। প্রথম বিশ্বকাপের থেকে আটাশ হাজার কম। টিকিট বিক্রি বাবদ আয় হয়েছিল ৩,৫৯,৭০০ পাউন্ড। এর মধ্যে ৩,৫০,০০০ পাউন্ড আটটি দেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারতই একমাত্র দেশ যারা ১৯৭৯-তে তিনটি ম্যাচের সব কটিতেই অল আউট হয়েছিল। এ রেকর্ড আর কোন দেশের নেই।

১৯৮২-তেই জানা যায় তৃতীয় বিশ্বকাপের পর প্রুডেন্সিয়াল আর একদিনের কোন ম্যাচকে স্পনসর করবে না। অথচ পরপর তিনবার ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপের আসর বসবার পিছনে ছিল স্পনসরার হিসেবে এই কোম্পানির কাছ থেকে পাওয়া মোটা অর্থ। অবশ্য অন্য কারণও ছিল। যেমন ইংল্যান্ডে রাত নটা অবধি দিনের আলো থাকায় একদিনেই ম্যাচ শেষ করার সুবিধা। ক্রিকেট খেলার উপযোগী প্রথম শ্রেণীর মাঠের সমাবেশ। বাসে করে এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে যাওয়ার সহজ উপায় এবং তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের ইংল্যান্ডে বসবাসের সুযোগ। ফলে ইংল্যান্ডের খেলা না থাকলেও মাঠে পর্যাপ্ত দর্শকের অভাব কখনোই ঘটেনি।

তৃতীয় বিশ্বকাপের আগে সারা বিশ্বে একদিনের ক্রিকেট আরও জাঁকিয়ে বসে। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৩-র বিশ্বকাপের আগে সারা বিশ্বে ১২১টি ম্যাচ খেলা হয়েছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাবার ক্ষমতা প্রায় কোন দেশেরই ছিল না। ফলে তৃতীয় বিশ্বকাপেও ওরাই ছিল 'হট ফেভারিট'। আই সি সি ট্রফি জিতে জিম্বাবোয়ে মূল পর্বে খেলার অধিকার পায়। প্রতিযোগিতাকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য ঠিক হয় গ্রুপ লিগে প্রত্যেক দেশকে দুবার করে একই দেশের সঙ্গে খেলতে হবে। তৃতীয় বিশ্বকাপেও ভারত ও পাকিস্তানকে এক গ্রুপে রাখা হয়নি। বিশ্বকাপে ভারত ও পাকিস্তান কখনো মুখোমুখি হয়নি।

তৃতীয় বিশ্বকাপে ভারত বিজয়ী হলেও ভারতের জয়কে কোন ইংরেজ সাংবাদিক ভাল মনে গ্রহণ করতে পারেননি। ভারতীয় ক্রিকেটারদের কৃতিত্বের থেকেও একটানা বৃষ্টি, ইমরান খানের চোট আঘাত ও অস্ট্রেলিয়ার হার (জিম্বাবোয়ের কাছে) ভারতকে বিজয়ী হতে নাকি সাহায্য করেছিল।

তৃতীয় বিশ্বকাপ রেকর্ড ভাঙা-গড়ার বিশ্বকাপ। আগের দুটি বিশ্বকাপের ২৯টি ম্যাচে যত বিশ্ব রেকর্ড হয়েছিল তৃতীয় বিশ্বকাপের পরে তা প্রায় সবই তছনছ হয়েছে। সোয়ানসি-তে পাকিস্তান শ্রীলঙ্কার মধ্যে ম্যাচটিতে তিনটি রেকর্ড হয়। এক, পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করে পাঁচ উইকেটে ৩৩৮ রান তোলে। বিশ্বকাপে ওটিই সর্বোচ্চ স্কোর। দুই, জবাবে শ্রীলঙ্কা নয় উইকেটে ২৮৮ রান করে। পরে ব্যাট করে বিশ্বকাপের কোন ম্যাচে আর কোন দল এত রান তুলতে পারেনি এবং এত রান তুলে ম্যাচে আর কোন দলকে হারতেও হয়নি। তিন, দু' ইনিংসে মিলিয়ে এই ম্যাচে রান ওঠে ৬২৬। একটি ম্যাচে এত বেশি রান ওঠার নজীর আর নেই।

জিম্বাবোয়ে তাদের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ১৩ রানে হারায়। জিম্বাবোয়ের অধিনায়ক ডানকান ফ্লেচার এই ম্যাচে চার উইকেট ও ৬৯ রান সংগ্রহ করেন। বিশ্বকাপে একই ম্যাচে অর্ধ-শতরান ও চার উইকেট নেওয়ার দ্বিতীয় নজীর নেই এবং একদিনের ম্যাচে মাত্র তিনজনের এই কৃতিত্ব আছে—ফ্লেচার, রিচার্ডস ও ওয়েগ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপে টানা নয়টি জয়ের পর ম্যানচেস্টারে ভারতের কাছে প্রথম পরাজিত হয়। সোয়ানসি-তে শ্রীলঙ্কা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২৮৮ রান করেছিল। টনটনে আবার তারা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৮৬ রানের একটি লড়াকু ইনিংস খেলে। ১৯৭৫-এ ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তারা তোলে ২৭৬ রান। পরে ব্যাট করে তিনটি সর্বোচ্চ রানের ইনিংসের পাশে এইভাবে লেখা হয়ে আছে শ্রীলঙ্কার নাম। হিংসা করার মত রেকর্ডই বটে। কিন্তু প্রতিবারই তারা পরাজিত হয়।

পরে ব্যাট করে সর্বোচ্চ রান তুলে জয়ের রেকর্ডটি আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দখলে। লর্ডসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পরে ব্যাট করে তিন উইকেটে ২৭৬ রান তুলে জয় ছিনিয়ে নেয়।

বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত রেকর্ডের কথায় এবার আসা যাক। বিশ্বকাপে সেরা ইনিংসটি কে খেলেছেন? নিঃসন্দেহে কপিলদেব নিখঞ্জ। টার্নব্রিজ ওয়েলস-এ জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থাটি একটু কল্পনা করা যাক। মাত্র ১৭ রানে ভারত পাঁচ পাঁচটি উইকেট হারিয়ে বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পথে। এমন সময়ে ব্যাট হাতে রঙ্গমঞ্চে কপিলের প্রবেশ। ১৮১ মিনিট ধরে জিম্বাবোয়ের বোলারদের ঔদ্ধত্যের সঙ্গে শাসন করে ১৭টি চার ও ছ'টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ভারতকে পৌঁছে দেন জয়ের দরজায়। কপিলের অপরাজিত ১৭৫ রানের ওই ইনিংস বিশ্বকাপের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড।

তিনটি বিশ্বকাপে ১৫টি ইনিংসে ছ'বার অপরাজিত থেকে রিচার্ডস ৬২২ রান সংগ্রহ করেছিলেন। বিশ্বকাপে তিনিই ব্যক্তিগত মোট রানে সবার ওপরে রয়েছেন। কিন্তু ১৯৮৩-র বিশ্বকাপে ৩৮৪ রান করে একটি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহের রেকর্ডটি দখলে রেখেছেন ডেভিড গাওয়ার।

বিশ্বকাপে মোট সেঞ্চুরি হয়েছে ১৬টি। ভিভ রিচার্ডস, গ্রেন টার্নার ও গর্ডন গ্রিনিজ দু'টি করে, কপিলদেব, ডেনিস অ্যামিস, গাওয়ার, অ্যালান ল্যাম, কিথ ফ্লেচার, অ্যালান টার্নার, ট্রেভর চ্যাপেল, ইমরান খান, জহির আব্বাস ও ক্লাইভ লয়েড প্রমুখ একটি করে সেঞ্চুরি করেন।

এ তো গেল ব্যাটিংয়ের বিশ্ব রেকর্ড। এর পাশে বোলিংয়ের রেকর্ডে নিউজিল্যান্ডের মার্টিন স্নেডেন একটি বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী। রেকর্ডটি অবশ্য গর্ব করে বলার মত নয়। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওভালে স্নেডেন ১২ ওভারে ১০৫ রান দিয়েছিলেন। একদিনের আন্তর্জাতিকে এত রান আজ অবধি কোন বোলার দেননি। মিতব্যয়ী বোলিংয়ের রেকর্ডটি বেদির সে কথা তো আগেই বলেছি। এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট নেওয়ার রেকর্ডের পাশে লেখা আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইনস্টন ডেভিস-এর নাম। লিডসে জীবনের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বকাপে ডেভিস ৫১ রানে সাতজন অস্ট্রেলিয়ানকে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠান। প্রথম বিশ্বকাপে গড়া গ্যারি গিলমোরের ছ'টি উইকেট নেওয়ার রেকর্ডটি ভেঙে যায়।

একটি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট (১৮) দখলের রেকর্ডটি রজার বিনির দখলে। ১৯৮৩-র বিশ্বকাপে বিনি এই রেকর্ডটি গড়েছিলেন। তিনটি বিশ্বকাপে ১৭টি ম্যাচে ২৬টি উইকেট পান অ্যান্ডি রবার্টস। এটিও একটি রেকর্ড। আব্দুল কাদিরই একমাত্র স্পিনার যিনি দু'বার বোলিংয়ের জন্য 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' পুরস্কার পান।

বিশ্বকাপে উইকেটকিপারদের কি ভূমিকা? বিশ্বকাপে সর্বাধিক শিকার সংগ্রহের তালিকায় প্রথমেই রয়েছেন জেফ দুজোঁ। তৃতীয় বিশ্বকাপে তাঁর সংগ্রহে ছিল ১৫টি ক্যাচ ও একটি স্টাম্পিং শিকার। লিস্টারে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে কিরমানি পাঁচটি ক্যাচের সুবাদে এক ইনিংসে সর্বাধিক শিকার সংগ্রহের রেকর্ডটি ধরে রেখেছেন। সর্বাধিক ১৭টি ম্যাচ খেলার রেকর্ডটি লয়েড ও রিচার্ডসের দখলে।

তৃতীয় বিশ্বকাপে হাজারের ওপর রান তোলায় সব দেশই কৃতিত্ব দেখায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৭৫৬ রান তুলে সর্বাধিক রান সংগ্রহের দলগত রেকর্ডের অধিকারী হয়। তৃতীয় বিশ্বকাপে ভারত বিজয়ী হলেও ওভার পিছু রান রেটে ইংল্যান্ড (৪·৮৭) ছিল সবার আগে। এরপরই ভারত (৪·৫২)।

তৃতীয় বিশ্বকাপের পুরস্কার মূল্য আগের দুটির তুলনায় অনেক বেশি ছিল। বিজয়ী ভারত পায় বিশ হাজার পাউন্ড, রানার্স ওয়েস্ট ইন্ডিজ আট হাজার পাউণ্ড, সেমি-ফাইনালিস্ট পাকিস্তান ও ইংল্যান্ড চার হাজার পাউণ্ড করে ও প্রত্যেক ম্যাচের বিজয়ী দেশ এক হাজার পাউণ্ড করে। এছাড়া প্রত্যেক দেশকে গ্যারান্টি অর্থ বাবদ ৫৩,৯০০ পাউন্ড দেওয়া হয়।

রিলায়েন্স কাপে পুরস্কার মূল্যের পরিমাণ আরও ৫০ভাগ বৃদ্ধি পাবে। প্রতিটি দেশের ক্রিকেটারদের নজর থাকবে এই অর্থের দিকে। ফলে ম্যাচ জেতার জন্য সংগ্রাম আরও তীব্র ও আকর্ষণীয় হবে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। একথা মনে না করার কোন কারণ নেই যে চতুর্থ বিশ্বকাপ সবদিক দিয়ে আগের তিনটি বিশ্বকাপকে ছাড়িয়ে যাবে।

স্কুটারের দুনিয়াতে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য

এখন প্রবর্তন করছে আরো বেশী জনগনের প্রয়োজন মেটাতে বিভিন্ন স্কুটার সম্ভার।

এল এম এল ভেস্পা এন ভি

সদা জনপ্রিয় এন ভি। ভারতের রাস্তার এটি প্রথম স্কুটার, যেটি আপনাকে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট দিয়েছে, যাকে অভূতপূর্ব বলা যায়। তা'ছাড়া, এন ভি হ'ল প্রথম যেটি বাজারে বেরোবার এক সপ্তাহের মধ্যে পথে চলার সাফল্য অর্জন করেছে।

এল এম এল ভেস্পা এন ভির প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে তিনটি নতুন মডেল বাজারে আসছে, যেগুলি ভারতীয় সড়কপথে সুনিশ্চিত আসর জমিয়ে বসবে — প্রত্যেকটি বৈশিষ্টে নিজস্ব শ্রেণীর — নিজস্ব বিশিষ্টতায় প্রতিটি স্কুটার খরিদ্দারকে বেছে নেওয়ার অবাধ ও আরো বেশী সুযোগ দেবে। দামে, সুবিধায়, দেখতে আর স্টাইলে। এল এম এল ভেস্পা সিটিজেন রেঞ্জ। নিকটতম এল এম এল স্বীকৃত শো-রুমে এগুলির সপ্রতিভ উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করুন। এর আগে কখনও স্কুটারে ব্যাপক সম্ভারে এত গুণাবলীর সংযোজন হয়নি।

এল এম এল ভেস্পা 4 ডবল্যু
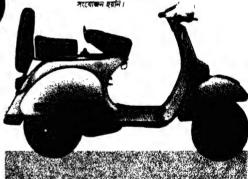
প্রথম চার-চাকা স্কুটার! যাঁরা দু-চাকার স্কুটার চালাতে অসুবিধা বোধ করেন, তাঁদের জন্য আদর্শ মেশিন। মনে করুন চার-চাকার স্থিতিশীলতা আর সঙ্গে দু-চাকার অবাধ গমনকৌশল।

একমাত্র এল এম এলই এই ধরণের কাজের একটি মেশিনের কথা চিন্তা করে।

এল এম এল ভেস্পা আল্ফা

পকেট মেপে যাঁরা চলেন, দামের ট্যাগ লাগানো এই স্কুটার তাঁদের পক্ষে ভাল। কিন্তু তা'সত্বেও এই শ্রেণীর স্কুটারের মধ্যে এটি দেয় আরো শক্তি, আরাম, নিরাপত্তা ও ব্যয়সঙ্কোচ।

এল এম এল ভেস্পা টি 5

এল এম এল ভেস্পার নানান সম্ভারে এটি এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। টি5 তাঁদের জন্য যাঁরা একটি স্কুটারে একান্ত বৈশিষ্ট কিছু চান। এটি এমন একটি মেশিন যাতে একটি বড় চতুষ্কোণী হেডলাইট, বৃহত্তর ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলে সুস্পষ্ট নতুন স্পীডোমিটার কন্‌সোল, একটি সুঠাম উইন্ডশীল্ড আর প্রশস্ত আসনের মত বিশ্বপ্রচলিত উন্নত শ্রেণীর সংশ্লিষ্ট জিনিষগুলি দিয়ে একে দেখতে ও স্টাইলে সর্বাগ্রণী স্কুটারে পরিণত করেছে।
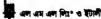
এল এম এল ভেস্পা সিটিজেন রেঞ্জ

ভেস্পা কার কোম্পানী লিঃ, এল এম এল লিঃ* ও ইটালীর পিয়াজিওর যৌথ উদ্যোগ।

দেখি নাই ফিরে

সমরেশ বসু

চিত্র □ বিকাশ ভট্টাচার্য

॥ চল্লিশ ॥

লাইব্রেরির দোতলায় শুরু হয়েছে এক শিল্প-যজ্ঞ। উদয়নগৃহে যাঁর কাছে যা খবর পৌঁছুবার, তা পৌঁছেছে। কোন অনুমতি আসেনি। অনুমতির সঙ্গে এসেছে পরম উৎসাহ! টাকা আসবে কোথা থেকে? কেন, 'সহজপাঠ' বইয়ের রয়্যালিটি থেকে। তবে তো মা ভৈঃ! এদিকে কলাভবনের ঘর আর বারান্দায় জমেছে বিস্তর মালমশলা। নরসিংহলাল আগেই বলে দিয়েছিলেন, রাজমিস্তিরি যেন ডাকা হয়। ঘরাঞ্চি আর মইয়ের ওপর উঠে, ছাত্রদের দেওয়াল ঘষা দেখেই, তিনি বুঝেছিলেন, সব কাজ সকলের জন্য না। শিল নোড়ায় বাটা হচ্ছে শ্বেতপাথরের গুঁড়ো আর চুন। বাটছে রোজ মজুরির লোক। দেখ্ ভাল করছেন নরসিংহলাল। সঙ্গে নন্দলাল আর সুরেন কর আছেন। নরসিংহ তাঁদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন কোন্ চুন আর কোন্ শ্বেতপাথরের গুঁড়ো কতোটা মিশিয়ে বাটতে হবে। দেখ্ ভাল করলেও, তদারকির দায়িত্ব প্রধানত নন্দলাল আর সুরেন কর নিয়েছেন। দুজনে মামাতো পিসতুতো ভাই। সেই কারণে দুজনে সব দায়িত্ব নেননি। নন্দলালের পিসতুতো ভাই সুরেনও একজন

ভালো শিল্পী । মাটির দেওয়ালে দেওয়াল-ছবি তিনি আগেই এঁকেছেন । তা ছাড়া তিনি একজন স্থপতিও বটেন । এঁদের সাহায্যে [illegible] । হরিহরণ, বিনোদবিহারী, প্রভাতমোহন, রামকিঙ্কর, বনবিহারীও পেছিয়ে নেই । হাত লাগিয়েছে নিশিকান্ত । অন্যান্য রোজ মজুরির রাজ মিস্তিরি আর অন্যান্য মজুররাও আছে । সাত দিন আগে থাকতে নরসিংহলালের নির্দেশে, ছাত্রদের কাজ ছিল চুনপাথর জলে জারিয়ে, ফুটিয়ে ছেঁকে নেওয়া । ছাঁকা হয়েছিল খদ্দরের মোটা কাপড়ে । ছাঁকার কাজে হাত দিয়েছিলেন নন্দলাল সুরেন দু'জনেই । ছাঁকবার সময় হাত লাগাবার উপায় ছিল না । হাত লাগালে চুনে জ্বলে যাবে । কাঠি লাগালে কাপড় ছিঁড়ে যাবে । দু পাশ থেকে দুজন ধরে, ছাঁকবার কাপড় উঁচু নিচু করে ঝাঁকলেই চুন ছেঁকে পড়তো হাঁড়িতে । মন দিয়ে কাজটা করতে গেলেও গল্প চলতো নিজেদের মধ্যে । বেশি গল্প হাসাহাসি হলে, ছাঁকবার কাপড় ঝাঁকতে ঝাঁকতে হাত-ছাড় হয়ে পড়বার সম্ভাবনা ছিল । বিশেষ করে নিশিকান্ত যখন থাকতো । কখন কি বলে উঠবে, আর হেসে উঠবে বাকিরা, তার কোন ঠিক ছিল না । মাস্টারমশাই সুরেনদা সামনে থাকলেও তাঁকে বিশ্বাস ছিল না । নিশিকান্তর ঐরকম এক কথায়, বনবিহারীর হাত থেকে ছাকবার কাপড় খসে পড়েছিল । সে হেসে উঠেছিল । কিন্তু বনবিহারী খুব হুঁশিয়ার ছেলে । খসেপড়া কাপড় তুলে ধরেছিল চোখের পলকে ।

[illegible] দই মেশানো হয়েছিল । সামান্য দই । দশ সের চুনে দেড় [illegible] দই মিশিয়েছিলেন নন্দলাল আর সুরেন । সুরেন প্রথম দিন [illegible] ফেলেছিলেন বেশি । নরসিংহলাল তাঁর খেকতুড়ি স্বরে [illegible] দিয়েছিলেন, "বুদ্ধু হ্যায় তুম । আন্দাজ নহি হ্যায় ক্যায়া ? দেড় ছটাক কো তুম পৌয়া ভর ডাল দিয়া ? ফেকো ওহ্ চুনা । খরাপ হো গয়া ।"

সুরেনের ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠেছিল । তাঁকে ঐ ভাবে ধমকে বুদ্ধু বলা । যিনি কেবল বিশ্বভারতীর একজন বিশিষ্ট শিক্ষক বা ব্যক্তি নন । রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় । তাঁর সঙ্গে গত বছরই ঘুরে এসেছেন বিলেত থেকে । সুরেন তাকিয়েছিলেন নন্দলালের দিকে । নন্দলালও তাকিয়েছিলেন সুরেনের দিকে । নন্দলাল মাথা ঝাঁকিয়ে হেসেছিলেন । কী ভেবে সুরেনও হেসেছিলেন । নন্দলাল নরসিংহলালের দিকে তাকিয়েছিলেন । বিনয় ছিল তাঁর স্বরে, "গলদ্ হো গয়া লালাজী । এ চুনা অভি ফেক দেগা ।"

নরসিংহলালের ভাবটা ছিল, তিনি একজন দেখভাল্ করার সেরা মিস্তিরি । বাকি সব যোগাড়ে । কথাটা একরকম সত্যি ছিল । জয়পুরি দেওয়াল ছবি আঁকা শেখাতেই তিনি এসেছেন । প্রতিমা দেবীর লেখা থেকে, আগে যেমন ইটালিয়ান ফ্রেসকোর কাজ হয়েছিল, তার চেয়ে এটা আলাদা । স্বয়ং একজন জয়পুরি শিল্পী-মিস্তিরি হাতে কলমে শেখাচ্ছেন । নন্দলাল গোড়া থেকেই সবাইকে বলে রেখেছিলেন, কে মাস্টার কে ছাত্র, কোনো পরিচয় যেন না দেওয়া হয় । সবাই নরসিংহলালের ছাত্র । তা হলে সুরেনও তো একজন যোগাড়ে কারিগর ছাড়া কিছুই নন । আর নরসিংহলালজীকে গোড়া থেকেই বোঝা গিয়েছে । মানুষটি গুণী বটেন । মেজাজটা রুক্ষ ।

সুরেন নিজেই একতলায় গিয়ে, হাঁড়ি থেকে চুন ফেলে, জলে ধুয়ে সাফ করে এনেছিলেন । কেউ তাঁকে সাহায্য করবার জন্য ওঠবার উদ্যোগ করার আগেই নন্দলাল বলেছিলেন, "যে যার কাজ কর ।"

দই মেশানো চুন হাঁড়িতে হাঁড়িতে জল মিশিয়ে রাখা হয়েছিল সাতদিন আগেই । অবিশ্যি রোজ জল বদলে নতুন জল হাঁড়িতে ঢালতে হতো । ঢেলে ঘেঁটে রাখা হতো । কাজটি করার দায়িত্ব ছিল ছাত্রদের ওপর । দেখা শোনা করেছেন নন্দলাল আর সুরেন । নরসিংহলালও হাঁড়িতে উঁকি মেরে দেখতেন । কলকাতা থেকে ইতিমধ্যে আনা হয়েছিল সাদা পাথরের গুঁড়ো । খুদের মতো গুঁড়ো । তিন রকমের । মোটা, মিহি, আরও মিহি । এখন রোজ-মজুর শিলনোড়ায় বাটছে সেই চুন আর পাথরের গুঁড়ো । মজুরদের হাত চলেছে দ্রুত । এখন ছাত্রদের এই কাজে কিছু করার নেই । নরসিংহলাল ঘুরে ঘুরে দেওয়ালের দিকে দেখছেন । দেওয়ালের অবস্থা ভালোই ছিল । শক্ত ছিল পলেস্তারা । সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষার পরে জল ছিটিয়ে ধোয়া হয়েছে । কিন্তু এখনও

ছাগলের শিরদাঁড়া কালো। কালোর টান কপাল পর্যন্ত। কানের ডগায় আর লেজে কালোর রেখা। এঁকে মনে হলো ভালোই এঁকেছে। ওদের কাজ চলছে ঘরের মধ্যে। নন্দলাল আর সুরেনের বারান্দায়। রামকিঙ্কর বাঁ হাতে টালি নিয়ে ওর আঁকা ছাগ-মাতার ছবি একবার দেখছে সামনে এনে। একবার দূরে সরিয়ে। জন্ম থেকে ঐরকম দুধেল বাটওয়ালী ছাগ-মাতা দেখেছে বিস্তর। তবু অই কিঙ্কর! কী ভুল তোর।
"এই মশাই, করেছেন কী?" কাছ থেকে বনবিহারী প্রায় আঁতকে উঠলো, "ছাগলির চারটে বাট!"
বনবিহারীর গলা ছিল চড়া। নজর পড়লো আরও কয়েকজনের। নিশিকান্ত হেসে বাঁচে না, "অ্যাঁ, কিঙ্কর, ছাগলির চার বাট! তুমি তো ভাই শহর থেকে আসোনি।"
"তবু ভুল হয়েচে।" রামকিঙ্কর টালিটা রেখে দিল উপুড় করে। মুখে অস্বস্তি আর লজ্জার হাসি, "ঐ ছাগল একটু দুধ দেবে বেশি। এই আর কী।"
কথাটা ছড়ালো মুখে মুখে। সেই সঙ্গে হাসি। রামকিঙ্কর দোতলা থেকে নামলো নিচে। দক্ষিণের বাঁশ ঝাড়ের আড়াল নির্জন, ও পকেট থেকে বিড়ি আর দেশলাই বের করলো। বিড়ি ধরালো একটা। কী করে ঐরকম একটা ভুল করলো? কথাটা ভাবতে, নিজেরই হাসি পেলো। আর তখনই সামনে এসে দাঁড়ালো নিশিকান্ত আর বনবিহারী। তিনজনেই গলা খুলে আর এক দফা হাসলো। বনবিহারী বললো, "আমি রামকিঙ্করবাবুর ছবিটা দেখছি, আর ভাবছি। ভাবছি, সত্যি দেখছি না ভুল দেখছি। তারপরে দেখি, সত্যি চারটে বাট! তবে, একটু বেশি চেঁচিয়ে বলে ফেলেছি।"
"তাতে কী হয়েচে।" রামকিঙ্কর হাসলো, "জানাজানি হয়ে ভালই হয়েচে। অইরকম ভুল যে কী করে করলাম, কে জানে!"
নিশিকান্ত রামকিঙ্করের কাঁধে চাপড় মারলো, "আরে ভগবানেরও ভুল হয়। তুমি তো মানুষ। কিন্তু তোমার খোঁজে কেন এলাম জানো?"
রামকিঙ্কর মাথা নাড়লো। শিক্ষকরা কেউ আনাগোনা করছেন কিনা নজর রেখে বিড়ি টানছে। নিশিকান্ত বনবিহারীর দিকে হাসলো, "বনবিহারী কথাটা চেঁচিয়ে বলে খুব লজ্জা পেয়েছে। তুমি যেন ওর ওপর রাগ করো না।"
"না না, রাগ কেন করব?" রামকিঙ্করের মুখে অস্বস্তির হাসি। ও বনবিহারীর দিকে তাকালো, "আমি আপনার উপর একটুও রাগ করি নাই! এখানে এসে নিজেই হাসছিলাম।"
নিশিকান্ত আবার রামকিঙ্করের কাঁধে একটা চাপড় মারলো, "কিঙ্কর, আমি তোমার চেয়ে বয়সে একটু ছোটই হবো। তবু তোমাকে নাম ধরে ডাকি। বনবিহারী আর তুমিও কেন দুজনকে তুমি বলে ডাকবে না?"
রামকিঙ্কর তাকালো বনবিহারীর দিকে। বনবিহারী তাকালো রামকিঙ্করের দিকে। দুজনেই হেসে উঠলো। বনবিহারীই হাত এগিয়ে দিল, "আমারা আজ থেকে তুমি।"
"আর তোমার ঘরে বসে আমি ছবি আঁকা করব।" রামকিঙ্কর বনবিহারীর হাত ধরলো, "তোমার ঘরে সব চেয়ে বেশি আলোবাতাস।"
বনবিহারীর ফরসা মুখে খুশির হাসি ফুটলো, "শুধু আঁকবে কেন। তুমি আমার সঙ্গে ঐ ঘরে এসে থাকতেও পারো। ও-ঘরে দু জনে অনায়াসেই থাকা যায়। তবে দেখেছি, তুমি আঁকার সময় খুব সিরিয়াস!"
"সেটা কী?" রামকিঙ্করের ভুরু কুঁচকে উঠলো।
নিশিকান্ত হাসলো, "সিরিয়াস মানে আবার কী? গম্ভীর হয়ে যাও। যাকে বলে বেশি মনোযোগ।"
"বেশি মনোযোগ দিয়ে ছাগলের চার বাট এঁকেছি।" রামকিঙ্কর হেসে উঠলো।
নিশিকান্ত আর বনবিহারী, রামকিঙ্করের সঙ্গে গলা মেলালো।

নিশিকান্ত রামকিঙ্করের হাত ধরে টানলো, "চলো, ভুবনডাঙার ভজুদাসের দোকান থেকে সওদা করে আসি। আমি গিয়ে এখন রান্না চাপাবো।"
রামকিঙ্কর নিশিকান্তর রান্না খেতে খুবই ভালবাসে। একটু-বা বেশিই। কিন্তু ওর মনটা পড়ে আছে কলাভবনের দোতলার বারান্দায়। আজ সকালে মাস্টারমশাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা আঁকছেন অক্ষরমালায়। লেখার কাজটা একটানা শেষ করতে হবে। দেওয়ালছবির কাজ যতোটুকু একদিনে করতে হবে, তা একেবারেই শেষ করতে হয়। কিছুটা করে মাঝখানে থামা যায় না। পলেস্তারা শুকিয়ে যায়। শুকিয়ে গেলে তারপরে আর রঙ ধরবে না। নষ্ট হবে আঁকাটাও। ও বিড়ির শেষাংশ মাটিতে ফেলে হেসে বনবিহারীর দিকে তাকালো, "তুমি যাও নিশিকান্তর সঙ্গে। মাস্টারমশাই আজ গুরুদেবের পাঠানো প্রথম কবিতাটা দেয়ালে লিখছেন। সেটা দেখব।"
"তা হলে তো কোনো কথাই নেই।" বনবিহারী হাসলো, "তুমি যাও। আমি নিশিকান্তর সঙ্গে যাচ্ছি।"
রামকিঙ্কর গেল লাইব্রেরির দোতলায়। সেখানে ভারায় বসে নন্দলাল তখন লেখা শেষ করেছেন। দেখছেন শাস্ত্রীমশাই আর ক্ষিতিমোহন। দরজার মাথায় ছবি। সেই ছবিতে আছেন রবীন্দ্রনাথ, শাস্ত্রীমশাই, পিয়ারসন আর গোঁসাইজী। রামকিঙ্কর কবিতাটি পড়লো: "হে দুয়ার, তুমি আজ মুক্ত অনুক্ষণ,/রুদ্ধ শুধু অন্ধের নয়ন।/ অন্তরে কী আছে তাহা বোঝে না সে, তাই/ প্রবেশিতে সংশয় সদাই।"
রামকিঙ্কর পড়লো, কিন্তু বলতে পারবে না, সব কথাগুলোর মানে ঠিক ঠিক বুঝেছে। অথচ মনে হয়, বুঝতে পেরেছে। দরজাকেই বলা হয়েছে। যে-দরজার ভিতরে কি বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ, শাস্ত্রীমশাই, পিয়ারসন আর গোঁসাইজী? তাঁরা বসে আছেন গাছতলায়। শুকনো পাতা ঝাঁটিয়ে পরিষ্কার করছে একটি ঘোমটা খোলা বউ। আরও দুজন মেঝেন যেন এক পাশে গাছের গোড়ায় বসে কথা বলছে। উত্তরের উঁচু দেওয়ালে সুরেন এঁকে শেষ করেছেন চীনে আম্মা ড্রাগন। শুরু করেছেন পার্সিয়ান রিক্ত যৌবনের মেয়ের ছবি। নন্দলাল আর সুরেনকে প্রধানত সাহায্য করছে বিনোদবিহারী আর হরিহরণ। মাসোজীও আছে। যখন যাকে দরকার হচ্ছে, ডাকা হচ্ছে তখনই। নরসিংহলাল পলেস্তারার তদারকি করছেন। বারান্দার মেঝে ভিজে আছে জলে। প্রথম দেওয়াল ভালো ভাবে ভিজিয়ে নিয়ে, মশলা লাগানো হয়েছে। তারপরে অল্প ভিজিয়ে গজপাটা দিয়ে, পলেস্তারার জমি সমান করা হয়েছে। এই পর্যন্ত কাজ করেছে রাজমিস্তিরি। দ্বিতীয় পটে হাত দিতে হয়েছে শিল্পীদেরই। এক সপ্তাহের বেশিদিন মিস্তিরিদের লাগানো পলেস্তারা প্রায় শুকিয়ে ওঠবার মুখে, কুঁচি করে অল্প জল ছিটিয়ে, তার ওপর বেলেপাথর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জমি মাজা হয়েছে। নরসিংহলালের রুক্ষ হিন্দি বচন, "খবরদার, জাদা জল মেশাবে না। মশলা উঠে যেতে পারে।"
শিল্পীরা কাজ করছেন। নরসিংহলালের প্রত্যেকটি কথা শুনছেন। কুঁচিতে জল ছিটিয়ে যখন দেখা গিয়েছে, সাদা জল আর বেরোচ্ছে না, তখন জমি তৈরি। তারপরে খুব মোলায়েম চুন, যা হাঁড়িতে ভেজানো ছিল সেই প্রথম দিন থেকে, তার সঙ্গে খুব মিহি শ্বেতপাথরের গুঁড়ো সমান ভাগে মিশিয়ে, কেয়া ডাঁটির নরম তুলি দিয়ে লাগানো হয়েছে। আবার বেলেপাথর ঘুরিয়ে ঘষে সমান করে, পরিষ্কার ভাঁজ করা পুরু কাপড় চেপে শুষে নেওয়া হয়েছে শেষ জলটুকুও। এই পলেস্তারার ওপরে শণের তুলি দিয়ে, আবার পরতে পরতে চুন লাগানো হয়েছে। কর্নিক ধরে তা পালিশ করতে হয়েছে, রাজমিস্তিরিদের মতোই। তারপরেই সেই রেখায় আঁকা, ছুঁচে ফুটো করা কাগজ সাবধানে চেপে, তার ওপরে ন্যাকড়ার পুটলির রঙ থুপে ছবির আদরা মিলেছে। কাগজ ধরবার জন্য ঘরাঞ্চিতে উঠেছে লম্বা মাসোজী। কাগজটা পলেস্তারায় লাগালে, পলেস্তারায় দাগ পড়বে। ইতিমধ্যে বিনোদবিহারী আর হরিহরণ বোয়েমের রঙ বের করে

বাটিতে রেখে সিরিশ ঘষে ঘষে, মধুর মতো ঘন করে তুলেছে। রামকিঙ্কর দেখেছে। দেখছে। দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছে, টের পায় না। ঘণ্টাতলার ঘণ্টা শুনতে পায় না। মাঝে মাঝে বিনোদবিহারী আর হরিহরণের সঙ্গে রঙে আঙুল দিয়ে সিরিশ ঘষেছে। কিন্তু দুই শিল্পীর তুলিতে রঙ লাগানো দেখতে দেখতে ওর যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। রঙ লাগাতে হবে সাবধানে। কমবেশি হলে চলবে না। যতোটা পরিমাণ পলেস্তারার শেষ পট তৈরি আছে, সেই পর্যন্ত একটানা এঁকে যেতে হবে। এখন ওর বেশির ভাগ সময়টা কাটছে এই কাজ দেখতে দেখতে। শিল্পী কেবল বসে আঁকে না। গড়েও না। সেটা ওর জানা হয়েছে, বুক সমান ঘুরনচৌকির সামনে দাঁড়িয়ে। মূর্তি গড়ার সময়ে। তারও আগে জেনেছে বাঁকুড়ায় দুর্গাতলায় প্রতিমা গড়ার সময়। ও দেখছে, মাস্টারমশাই আর সুরেনদার কাজ।

আষাঢ় শ্রাবণের ধারা শেষ। ভাদ্রের আকাশে এখনও মেঘ। সে-মেঘের রঙ গাঢ় কালো না। সে অনড় হয়ে, আকাশ জুড়ে দখল রাখছে না। মেঘের রঙ হয়ে আসছে ফ্যাকাসে। কোদাল কুড়োল খোঁচানো মাটির মতো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীলকান্তমণির ঝিলিক ফুটেছে। ফুটতে ফুটতে, সেই কোদালে কুড়োলে খোঁচানো মেঘ, উড়ে চলেছে উত্তর পশ্চিমে। নীল আকাশ ক্রমে বাড়ছে।

রৌদ্র-ছায়া লুকোচুরি খেলছে। শিউলির গন্ধে ভোরবেলা নিশ্বাস ভরে যায়। গন্ধ লেগে থাকে ঘ্রাণে,ভাদ্র শেষ হবার আগেই, গাছের পাতায় পাতায় ভোরে শিশির জমছে। গাছপালা হয়েছে নিবিড় সবুজ। পথে বেরোলে মাঝি মেঝেনদের হাতে পদ্মফুল দেখা যায়। কোথায় কোন্ জলাশয় থেকে নিয়ে আসে। গ্রামের হত দরিদ্র মানুষ, আশ্রমের ঘরে ঘরে পদ্মফুল বিক্রি করতে নিয়ে আসে।

কলাভবনের বারান্দায় কাজ চলছে। রামকিঙ্কর জানে না, কবে থামবে। ইতিমধ্যে দরজার মাথায় নন্দলাল আরও কবিতা লিখেছেন। সব কবিতারই শুরু 'হে দুয়ার' দিয়ে। আরও দুটি কবিতা তাঁর লেখা হয়েছে দ্বিতীয় আর তৃতীয় দরজায়। "হে দুয়ার, নিত্য জাগে রাত্রি দিনমান/সুগম্ভীর তোমার আহ্বান।/সূর্যের উদয় মাঝে খোল আপনারে, তারকায় খোল অন্ধকারে।" আরও একটা দরজার মাথায় লেখা হয়েছে, "হে দুয়ার, বীজ হতে অঙ্কুরের দলে/ খোল পথ ফুল হতে ফলে।/যুগ হতে যুগান্তর কর অবারিত/মৃত্যু হতে পরম অমৃতে।"

রামকিঙ্কর কবিতাগুলোর মানে সব বুঝতে পারে না। কিন্তু ছবির মানুষদের সবাইকেই চিনতে পারে। চিনতে পারে না কেবল উঠোনে, গোয়ালে কাজ করা বউ বেটিদের। সেগুলোতে আছে অনেক কল্পনা। কল্পনা নেই গাছে। ছাতিম চিনিয়ে দেয় নিজের চেহারায়। কদম তার আপন পাতা আর ফুলে। আর আতুর কালো ডাগর চোখ গাভী। কবিতাগুলোর মানে সব ঠিক মতো বুঝতে না পারলেও, সেগুলো যেন গানের মতোই ওর প্রাণে বাজে। দুয়ারের ভিতর থেকে ওর কানে ডাক ভেসে আসে। একটি বন্য প্রাণী যেমন ঋতু বদল বোঝে না, অথচ আনন্দে মত্ত হয়ে ওঠে, ওর মনের অবস্থাটা এখন সেইরকম। ও যে শান্তিনিকেতনে আছে, দেখছে এই কাজ, শুনছে সকলের কথা, এ সবই যেন এক স্বর্গীয় আনন্দধামে বাসের মতো।

এই কাজ দেখতে দেখতে, টালিতে ও এঁকেছে নতুন একটি ছবি। এক মেঝেন দিচ্ছে একজনকে একটি লম্বা ডাঁটিসুদ্ধ পদ্ম ফুল। রামকিঙ্কর কয়েক দিন আগে গিয়েছিল পুবের রেল লাইনের ধারে উঁচু পাড়ে। যখন দূরান্তরের দিগন্ত ওকে হঠাৎ ডাক দেয়, ছুটে যায় সেখানে। গোয়ালপাড়া কোপাইয়ের ধারে ছুটে যাওয়া হয় না। দেখেছিল সেই দূরের আকাশের গায়ে ঠেকে থাকা ধান ক্ষেত। গোছা গোছা সবুজ ধানে দুধ জমতে শুরু করেছে। কার্তিকের মধ্যেই বিশাল সবুজে লাগবে হলুদের ছোঁয়া। সেই দেখে ফেরবার সময় এক মাঝিন যাচ্ছিল উত্তরের পথে। তার হাতে ছিল দুটি পদ্মফুল। ও তাকিয়ে দেখেছিল সেই পদ্মফুলের দিকে। মেঝেন একটি কথাও জিজ্ঞেস না করে, লম্বা ডাঁটি পদ্মফুল বাড়িয়ে দিয়েছিল, "নে। দেখছিস ক্যানে?"

রামকিঙ্কর টালিতে সেই ছবিটাই ধরে রাখতে চেয়েছে। মেঝেনকে এঁকেছে মেঝেনের মতোই। নিজেকে এঁকেছে এক খালি গা যুবক মাঝি। যার ঝাঁকড়া চুল মাথায় বাঁধা গামছা। আর এই কি প্রথম ও চোখ মুখ আঁকলো, অনেকটা অজন্তার গুহা ছবির মতো? কেন যে এঁকেছে, ও জানে না। অথচ এঁকেছে সেই রকম।

কলাভবনের দেওয়ালছবির কাজ চলছে। রামকিঙ্কর দেখছে। তার মধ্যেই ও পশ্চিমতোরনের দোতলায় গিয়ে, মাটি দিয়ে একটি মুখ গড়বার কাজ করেছে। মুখটি যে কার, তা যেন ওর নির্ঘাৎ জানা নেই। তবে মুখটি হচ্ছে এক পুরুষের। মাথার সামনে কপালটা মস্ত চওড়া। সেই কপালে অনেকগুলো রেখা। ডাগর দুই চোখের নিচের কোলেও পড়েছে ভাজ। না দেখে ও কার আবক্ষ তৈরি করছে? নিজের কাছে ওর কোনো জবাব নেই। কিন্তু ওর ভিতরে যেন মূর্তির মানুষটি ঘুরে ফিরে বেরাচ্ছেন।

কলাভবনের কাজ শুরু হয়েছিল আষাঢ়ের মাঝামাঝি। ভাদ্রের শেষে, সারা আশ্রম জুড়ে পুজোর ছুটির হাওয়া লেগেছে। পুজো আসছে। শিউলি পদ্ম কুন্দ ফুলের গন্ধে, গাঢ় সবুজ গাছে গাছে সোনার মতো রোদ, আর সাদা মেঘভাসি নীল আকাশে পুজোর ছুটির ডাক সবার মনকে উতলা করছে। সুরেন কর উত্তরের উঁচুতে যে ছবি এঁকেছেন, তার মধ্যেও এসেছে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা। "শেষ বসন্তের রাত্রে/ যৌবন-রস রিক্ত করিনু/বিরহ বেদন পাত্রে॥/"

রামকিঙ্করের মনটা হঠাৎ হঠাৎ কেমন ছাঁত ছাঁত করে ওঠে। আনমনে চমক লাগে। মনে হয়, কারা যেন ওকে ডাকছে। যারা ওকে ডাকছে তারা ওর চেনা। তবু যেন চেনা যায় না।

কলাভবনের বারান্দায় মাস্টারমশাই আর সুরেনদার দেওয়ালে আঁকা ছবি দেখছে। বিনোদবিহারী হরিহরণের সঙ্গে, তাঁদের যতোটা পারছে সাহায্য করছে। আর নিজের আঁকা গড়াও চলছে। সেই কাজে ডুবে থাকার মধ্যেই, হঠাৎ হঠাৎ মূর্তি ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে যায়। আকর্ণ বিস্তৃত তার চোখের ফাঁদ, অথচ তার চোখে নেই দৃষ্টি। কিন্তু মুখখানি সুন্দর। তারপরে একদিন গৈরিকের বনবিহারীর ঘরে, ওর তক্তপোশের ওপর দেখা গেল একখানি পোস্টকার্ড। হাতের লেখা দেখেই চিনতে পারলো। অতুলের হাতের লেখা। কিন্তু তলায় পত্র লেখকের নাম "চণ্ডীচরণ বেজ" অতুলের লেখায় বাবার কথা, "শ্রীমান রামকিঙ্কর বেজ, বাবা তোমার কল্যাণ হউক। আশা করি তুমি ভাল আছ। দুর্গাতলার প্রতিমা গড়িতে আসিলে না। ইহাতে তোমার জন্য সকলের মনে খুব চিন্তা হইয়াছে। কিন্তু আশ্বিন মাস পড়িয়া গেল। তুমি না আসিলে, কে প্রতিমার চক্ষুদান করিবে। তোমার অনন্ত জ্যাঠা বলিয়া গিয়াছে, তুমিই প্রতিমার চক্ষুদান করিবে। পত্রপাঠ না আসিলে আমরা ভাবিত হইব, তোমার অসুখ করিয়াছে। না আসিলে সত্বর পত্রের জবাব দিবে। আমরা সকলে কুশলে আছি…।"

রামকিঙ্কর পত্র পড়া শেষ করার আগেই বুঝতে পারলো, কেন ওর বুক হঠাৎ হঠাৎ ছাঁত ছাঁত করে উঠছিল। বুঝলো কারা ওকে ডাকছিল। আর সেই দৃষ্টিহীন কানটানা চোখ। দেবী কি ওকে নিজেই ডেকেছেন। অথবা ওরই মনের অতলে তিনি ডুবেছিলেন? ও তা জানে না। কেবল মনে এই সাব্যস্ত করলো, ওকে যেতে হবে বাঁকুড়ায়। প্রতিমার দৃষ্টিদান করতে হবে। দৃষ্টিহীন প্রতিমার মুখের সঙ্গে, মনে পড়লো অনন্তজ্যাঠার মুখ। যেন বড় আশা করে চেয়ে আছে রামকিঙ্করের দিকে।

পুজোর ছুটি শুরু হয়ে গিয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা ঘরমুখো। কিন্তু কলাভবনের বারান্দায় দেওয়ালছবি আঁকার কাজ শেষ হয়নি। বিনোদবিহারী হরিহরণ কেউ কাজ শেষ না করে যাবে না। বনবিহারী নিশিকান্ত দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত। রামকিঙ্করকে সে নিমন্ত্রণ করলো, "চলো বালিতে, আমাদের বাড়ি।"

"আমাকে ভাই বাঁকুড়ায় যেতে হবে।" রামকিঙ্কর ওর বাবার চিঠি

দেখালো।
বনবিহারীই চিঠি ডাকঘর থেকে এনে রেখে দিয়েছিল। পড়েনি। রামকিঙ্করের হিসাবের কড়ি ছিল গোনাগাঁথা। ওর সেই পিঁপড়ের জমানো খাবার। ও রওনা হবার আগেই, একটা ঘটনা ঘটলো।
বনবিহারীও তখন রয়েছে। বড় ছাত্ররা কেউই প্রায় যায়নি। প্রভাতমোহন বনবিহারী বিনোদবিহারী, শিক্ষা ভবনের সুজিত, আরও কয়েকজন দুপুরের ভাতের প্যাঁটরার তলা ফাঁসানো কাঁকর মেশানো ভাত নিয়ে চললো উদয়নবাড়িতে। সঙ্গে নিল আলুনি বিস্বাদ ডাল তরকারি। নালিশ জানাতে হবে গুরুদেবের কাছে। ওদের ডাকে রামকিঙ্করকেও যেতে হলো। কিন্তু যাবার ইচ্ছা একটুও ছিল না। যে-খাদ্য ও বিনা পয়সায় পায়, তার জন্য কি নালিশ চলে? সেই খাদ্যেই ও বেঁচে আছে। নিশিকান্তর যাওয়ার কোনো কারণই ছিল না। ও নিজের হাতে রেঁধে খায়।
পাত্রে পাত্রে ভাত ডাল তরকারি নিয়ে সবাই উদয়ন গৃহে উপস্থিত। দুপুরের খাবার সময় তখন। কিন্তু তিনি তখনও ছিলেন তাঁর কাজে। অবাক চোখ তুলে তাকালেন। রামকিঙ্করের বুকের মধ্যে ঢেঁকি ধান ভানছে। খাবার নালিশ নিয়ে ওঁর কাছে? কিন্তু তাঁর ভুরুজোড়া একটুও কোঁচকালো না। তাঁর রুপোলি শ্মশ্রুমুখে ঈষৎ হাসি, "কী হয়েচে? অবেলায় সব এখানে কেন?"
"দেখুন গুরুদেব, আমাদের কী খেতে দেয়।" প্রভাতমোহনই থালা নিয়ে দু পা সামনে এগিয়ে গেল, "আপনিই দেখুন, দিনের পর দিন এরকম খাওয়া যায়?"
কোথা হতে এলো এক ঝলক বাতাস। কেঁপে কেঁপে উঠলো তাঁর শ্মশ্রু আর দীর্ঘ কেশ। শ্মশ্রুতে তাঁর প্রচ্ছন্ন হাসি, "বৌমা! বৌমা কি এদিকে আছো?"
"কিছু বলছেন বাবা?" প্রতিমা দেবী এসে দাঁড়ালেন ভিতরে যাবার দরজার সামনে।
তিনি ফিরে তাকালেন সেদিকে। তারপরে মুখ ফিরিয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দিলেন, "আজ আমাদের কী কী রান্না হয়েছে, একটু এনে এদের চাখাও তো।"
"আচ্ছা বাবা।" বউমা চলে গেলেন বাড়ির ভিতরে।
অভিযোগকারী দলের সব মুখে অস্বস্তি। যেন কী বিপাকেই পড়েছে। তাকাচ্ছে এ ওর মুখের দিকে। রামকিঙ্কর পালাবে কি না ভাবছে। উনি তখন টেবিলের ওপর মাথা নিচু করে কিছু লিখছেন। বউমা এলেন এক থালা তরকারি নিয়ে। তুলে দিলেন সামনে প্রভাতমোহনের হাতে। প্রভাতমোহন নিজের থালা নামিয়ে সেই থালা হাতে নিল। বাড়িয়ে ধরলো সকলের দিকে। হাতে তুলে নিজে মুখে দিল। মুখে দিল সবাই। সবাইয়ের মুখগুলো বিস্বাদে ভরে উঠলো।
"দেখলি তো, আমার ঘরের খাওয়া।" তিনি মুখ না তুলেই কলম চালিয়ে যাচ্ছেন, "তোদের মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, কীরকম খেলি। তবে আমাদের অল্প কয়েকজনের খাবার রান্না হয়। একটু যত্নে হয়। তোদের অনেকের রান্না এক সঙ্গে হয়। তাই আরও বিস্বাদ। কিন্তু ভাতটা তা বলে এতো কাঁকর ধুলো মেশানো কেন? তোরা যা। আমি দেখচি। এখানে খেতে হলেই যে এরকম খেতে হবে, এমনতো কোনো লেখা জোখা নেই।"
সকলের মুখেই হাসি ফুটলো। একজন এগিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নেবার চেষ্টা করতেই, পা গুটিয়ে নিলেন, "এই দ্যাখ, সব এঁটো হাতে আমার পা ছুঁয়ে দিচ্ছে।" প্রণাম না করেই সবাই, নাটকের দৃশ্যের মতো 'দ্রুত প্রস্থান করিল'।
রামকিঙ্কর দুর্গাতলার প্রতিমার চক্ষুদান করে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে পুজোর ছুটি শেষ হওয়ার আগেই। ও যখন বাঁকুড়ায় পৌঁছেছিল, সকলেই ব্যগ্র হয়ে ওর পথ চেয়েছিল। বন্ধুদের সঙ্গে কাটিয়েছিল পূজার দিনগুলো। বিশ্বনাথ অতুলের সঙ্গে রাত্রে ঘুরে বেড়িয়েছে শহরে। শহরের বাইরে নানা জায়গায়। ওর হাতে এবার এমন টাকা ছিল না, যা বাবার হাতে তুলে দিতে পারে। হয় তো বাবা মা'র প্রত্যাশা ছিল। প্রত্যাশা করতেই পারে। ওর অবস্থা বাবা মা জানবে কী করে। ও নিজেও কিছু বলেনি। বাঁকুড়ায়ও কোনো কাজ জোটেনি। ওর হাতটানের অবস্থা বিশ্বনাথ আর অতুল কিছুটা বুঝেছিল। বন্ধুরা কেউ ওকে টাকা দেয়নি। যখন যা পেয়েছে, খরচ করেছে। বংশগত পেশায় বন্ধুরা সারা বছরই কিছু কামায়। রামকিঙ্করের মতো তাদের কাজের জীবন অনিশ্চিত না। তারা রামকিঙ্করকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছে। আর নিজেদের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসিয়েছে। বাবা মাকে লুকিয়ে, বউদের ডেকে, বন্ধুর হাতে পানের খিলি তুলিয়ে দিয়েছে। বিশ্বনাথ অতুল, দুজনেরই বউয়ের মাথায় ছিল মুখ ঢাকা লম্বা ঘোমটা। হলোই বা স্বামীর বন্ধু। তবু পরপুরুষ না। মুখ দেখানো যায় নাকি? যায় না। তবে বিশ্বনাথের মতো স্বামী কি মানতে চায়। সে পিছন থেকে বউয়ের মাথার ঘোমটা খুলে দিয়েছিল, "কিঙ্কর মুখখানি দেখ্যে রাখ। আমাকে আঁকা করে দিতে হব্যাক।"
বিশ্বনাথের বউ শ্বেতবরণী পালিয়ে বাঁচেনি। টসটসে মুখখানিতে কী লজ্জা! মাথার ঘোমটা সরতেই আনখা চমকে রামকিঙ্করের দিকে তাকিয়েছিল। অচেনা মুখ না। চেনা মুখ। কড়গা বাড়িতে থিয়েটারের সিন আঁকার সময়, বিশ্বনাথ কতোদিনই দোতলার জানালা দিয়ে আঁকিয়ে বন্ধুকে দেখিয়েছে। তা বলে এতো সামনে থেকে? চোখ বন্ধ না করে উপায় ছিল না। আর পিছন ফিরেছিল ঝটিতি। চকচকে কাল কেউটে জড়ানো খোঁপা দেখা গিয়েছিল। সেই খোঁপায় ছিল সাপের চোখের মতোই নিষ্পলক লাল গোল ফুলের কাঁটা। আর একটু কি ভারি দেখিয়েছিল বন্ধু পত্নীকে? "কিঙ্কর উয়ার বিটা হব্যাক।" বিশ্বনাথের স্বরে বেজেছিল গর্বিত সুখের ঝঙ্কার। রামকিঙ্করের গলা জড়িয়ে ধরেছিল।
বউয়ের ছেলে হবে। বলতে সুখ। ভেবে গর্বিত ভবিষ্যতের পিতা! রামকিঙ্করের মনকে বন্ধুর সুখ ও গর্ব স্পর্শ করেছিল। বন্ধুর সুখে সুখ, গর্বে গর্ব বোধ করেছিল। কিন্তু এমন ছবি দিন কি আসবে, বন্ধু পত্নীর ছবি ও আঁকবে? ও জানতো না। আর ওর নিজের বিয়ে বউ সন্তানের কথা একবারও মনে আসেনি। ও পূজা মিটে যেতেই শান্তিনিকেতনে ফিরতে ব্যস্ত হয়েছিল। পয়সার অভাবটা বড় বেশি করে মন ছেয়েছিল।
পূজার ছুটির আগে মহালয়ার দিন আনন্দবাজারের মেলা হয়, ঘণ্টাতলায় পশ্চিমের প্রাঙ্গণে। সেখানে সবাই মিলে বাজার বসায় নানা রকম খাবার দাবারের। ছবি বা কার্ড এঁকে সাজাতে পারলে, আর চোখে ধরলে, তাও বিকোয় আনন্দবাজারে। ও কয়েকটা ছবি আর আঁকা কার্ড দিয়ে এসেছিল হরিহরণের কাছে। বাবার হাতে টাকা দিতে পারবে না, অথচ দু বেলা খাবে ভেবে মন বড় খারাপ হতো। অথচ বাবা মা একবারও টাকার কথা তোলেনি। বরং যতোটা পেয়েছে, ডাগর বিটাকে তুষে বেসে খাইয়েছে। দাদা হয়ে গিয়েছে আরও পর। বউদি যুঝছে সকল যন্ত্রণা আর অপমানের বিরুদ্ধে। দিবাকর যেন রোজ একটু করে মাথা চাড়া দিচ্ছে। বউদির ধাত পেয়েছে। চওড়ায় বাড় নেই। লম্বায় বাড়ছে।
রামকিঙ্কর কি কেবল পয়সার অভাবের দুশ্চিন্তায় পুজোর ছুটি শেষের আগেই ফিরে এলো। কতকটা বটে। কিন্তু 'গৈরিক' হস্টেলে ঝোলা রেখেই, ও আগে গেল লাইব্রেরির দোতলায়। কলাভবনের বারান্দায়। দেওয়ালছবির কাজ শেষ। বারান্দা পরিচ্ছন্ন। বিকালের এই সময়ে, শাস্ত্রীমশাই, ক্ষিতিমোহন বা জগদানন্দ কেউ নেই। ও দেখলো সব ছবি। গোটা বারান্দার রূপ বদলে গিয়েছে। চতুর্থ দরজায় দুয়ার-বাণী পড়লো: "হে দুয়ার, জীব লোক তোরণে তোরণে/করে যাত্রা মরণে মরণে।/ মুক্তি সাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে/মাভৈঃ বাজে বৈরাগ্য নিশীথে।"
দেওয়ালের উত্তর কাঁধে সুরেন করের ইজিপশিয়ান বীণাবাদক আর রমণীর ছবির লেখাও পড়লো: "আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।/তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে/কোরো না বিড়ম্বিত তারে।/ আজি খুলিয়ো হৃদয় দল খুলিয়ো।/ আজি ভুলিয়ো আপনপর ভুলিয়ো,/এই সঙ্গীত মুখরিত গগনে/তরঙ্গ রঙ্গিয়া তুলিয়ো...।"

(ক্রমশ)

বিনামূল্যে
তাড়াতাড়ি করুন। স্টক সীমিত

Nestle
Cerelac
Wheat
Nestle
Cerelac
Wheat-Apple
NEW

পূর্ব-পশ্চিম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তর পর্ব : ৬

অতীনের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সিদ্ধার্থ তাকে প্রায় জোর করেই নিয়ে গেল শান্তাবৌদির বাড়িতে।

শান্তাবৌদি ইলিশ মাছ খাওয়াবার নেমন্তন্ন করেছেন, ইলিশ মাছের নাম শুনেও যেতে রাজি হয় না, অতীন কি এমনই পাষণ্ড? বিছানায় কাৎ হয়ে শুয়ে থাকা অতীনের গায়ে একটা জামা ছুঁড়ে দিয়ে সিদ্ধার্থ বললো, আর কিছুদিন থাক তারপর বুঝবি। এদেশে আমাদের বাঙালীত্ব বলতে টিঁকে থাকে শুধু ইলিশ মাছ, দুর্গা পুজো আর রবীন্দ্রনাথ। এই নিউ ইয়র্কে একমাত্র শান্তাবৌদির বাড়িতেই ঐ তিনটে জিনিস পাবি!

বাঙাল পরিবারের ছেলে হলেও অতীনের ইলিশ মাছের প্রতি লোভ নেই। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কোনোরকম মাছ না খেলেও তার কিছু আসে যায় না, ভাতের বদলে স্যাণ্ডুইচ কিনে হ্যামবার্গার খেয়ে সে দিব্যি চালিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া নতুন কারুর সঙ্গে আলাপ করতে সে একেবারেই আগ্রহ বোধ করে না। শান্তাবৌদি নামে এক অচেনা মহিলার বাড়িতে সে কেন যাবে?

সিদ্ধার্থ এসব ওজর আপত্তিতে কানই দিল না। শান্তাবৌদিকে সে জানিয়ে দিয়েছে যে তার সঙ্গে একজন বন্ধু থাকে, শান্তাবৌদি বিশেষ করে বলে দিয়েছেন সেই বন্ধুটিকে নিয়ে আসতে।

ফর্মাল ইভনিং ড্রেস পরি না, গলায় কালো বো বাঁধি না। তুই ইচ্ছে করলে তোর পাজামা পাঞ্জাবির ওপর ওভারকোটটা চাপিয়ে নিতে পারিস।

সিদ্ধার্থ অবশ্য একটু বেশী সাজ পোশাকই করলো। একটা সিল্কের সার্টে লাগালো ঝুটো মুক্তোর কাফ লিংক। টাইয়ের বদলে গলায় কায়দা করে জড়িয়ে নিল একটা বাটিকের কাজ করা স্কার্ফ।

রাস্তায় বেরিয়ে সিদ্ধার্থ অতীনকে দশটা ডলার দিয়ে বললো, কারুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেলে সঙ্গে কিছু নিয়ে যাওয়া উচিত। তুই লিকার স্টোর থেকে এক বোতল ওয়াইন কিনে নিয়ে আয়, আমি সামনের দোকান থেকে কিছু ফুল কিনে নিচ্ছি।

অতীন পেছন ফিরে পা বাড়াতেই সিদ্ধার্থ ডেকে বলল, এই, কী ওয়াইন আনবি বল তো? অতীন নির্বিকার মুখে জিজ্ঞেস করলো, কী ওয়াইন? দশ-ডলারের মধ্যে যা পাওয়া যায়!

সিদ্ধার্থ হেসে বললো, বাঙাল আর কাকে বলে! এতদিন ইংলণ্ডে কাটিয়ে এলি, ওখানে ওরা তোকে কিছু শেখায়নি? একটা যে-কোনো ওয়াইন নিলেই হলো? ইলিশ মাছের নেমন্তন্ন না? সাদা আমিষের জন্য সাদা মদ। এক বোতল বোর্দো হোয়াইট ওয়াইন নিয়ে আয়।

সিদ্ধার্থ কিনলো এক গুচ্ছ লালগোলাপ। ওয়াইনের বোতলের চেয়েও তার দাম বেশী। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ালো এইট্থ স্ট্রিটের মোড়ে। সিদ্ধার্থের এক বন্ধু সমীর তাদের এখান থেকে তুলে নেবে।

অতীন একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোর ঐ শান্তাবৌদির স্বামী কী করেন?

সিদ্ধার্থ বললো, শান্তাবৌদির হাজব্যান্ড হলেন পাঁচুদা। একেবারে নিপাট ভালোমানুষ। পাঁচুদা আমাদের শিবপুর থেকে পাস করা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু আমি প্রায়ই ভাবি, ঐ গোবেচারা মানুষটি শিবপুরের হোস্টেলে পাঁচটি বছর কাটালেন কী করে! পাঁচুদা এক ঘণ্টায় একটার বেশী কথা বলেন না। ওদের বাড়িটাকে কেউ পাঁচুদার বাড়ি বলে না, সবাই বলে শান্তাবৌদির বাড়ি। শান্তাবৌদি গান গাইতে পারেন। এখানে বাঙালীদের

গজগজ করতে করতে উঠে বসে অতীন বললো, শনিবার দিনটা শুধু শুয়ে শুয়ে কাটাবো তারও উপায় নেই? গাদা গুচ্ছের প্যান্ট-শার্ট-কোর্ট-জুতো-মোজা পরে বেরুতে কারুর ভালো লাগে?

সিদ্ধার্থ হাসতে হাসতে বললো, তুই গ্যেটের 'পোয়েট্রি অ্যান্ড লাইফ' পড়েছিস?

—না, আমি কবিতা টবিতা কিছু পড়িনি।

—এটা কবিতা নয়, প্রবন্ধ। তাতে গ্যেটে এক জায়গায় বোরডমের একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, একজন ইংরেজ একদিন ঝোঁকের মাথায় আত্মহত্যা করে ফেললো, তার কারণ প্রত্যেকদিন নিয়মমাফিক জামা-কাপড় পরা আর খোলা তার সহ্য হচ্ছিল না। সভ্যতার এই তো এক জ্বালা ভাই? তাও তো আমরা ইংরেজদের মতন নেমন্তন্ন বাড়ি যেতে হলে

থিয়েটার হলে শান্তাবৌদি বাঁধা হিরোইন। আবার লোককে ডেকে ডেকে খাওয়াতেও ভালোবাসেন। ওঁদের বাড়ি তো কুইন্‌স-এ, শান্তাবৌদিও এখানকার বাঙালীদের কুইন, মক্ষিরানীও বলতে পারিস।

—আমি ওখানে গিয়ে কী করবো বল তো, সিদ্ধার্থ? নিশ্চয়ই আরও অনেক লোক থাকবে, কারুকে চিনি না

—এইভাবেই তো চেনাশুনো হয়।

—আমার শরীরটা সত্যি ভালো লাগছে না রে! আমি বাড়ি ফিরে যাই। আমার শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে।

—একটা থাপ্পড় খাবি, অতীন। বলছি না, শান্তাবৌদির ওখানে গেলেই তোর জড়তা কেটে যাবে।

অতীন সিদ্ধার্থর চোখের দিকে চোখ রেখে অদ্ভুতভাবে হাসলো। কলকাতার কফি হাউসে তার বন্ধুদের মধ্যে সে ছিল স্বাভাবিক নেতা গোছের, তার মেজাজের জন্য সবাই তাকে ভয় পেত, এই সিদ্ধার্থ কোনোদিন তার মুখের ওপর একটাও কথা বলেনি।

সিদ্ধার্থ অতীনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো, চিয়ার আপ মাই বয়!

সমীর এসে পৌঁছলো কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটায়। দরজা খুলে দিয়ে বললো, চটপট উঠে পড়ো, চটপট, টিকিট দিয়ে দেবে!

নো পার্কিং এলাকায় গাড়ি কয়েক মুহূর্ত থামানোই দারুণ অপরাধ, সিদ্ধার্থ দৌড়ে উঠে পড়লো সামনের সীটে, অতীন পেছনে।

আরও খানিকটা দূরে এসে সমীর একটা ড্রাগ স্টোরের সামনে থেকে তুললো তার স্ত্রী বাসবীকে। অতীনের সঙ্গে বাসবীর দেখা হয়নি আগে। সিদ্ধার্থ পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, আমার বন্ধু অতীন, ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, কয়েক মাস আগে এসেছে···

অতীন শুধু একটা শুকনো নমস্কার করলো, সারা রাস্তা একটাও কথা বললো না অন্যদের সঙ্গে।

শান্তাবৌদিদের বাড়িটা একটা সুন্দর নির্জন রাস্তায়, সামনে এক টুকরো বাগান। গাড়ি থেকে নেমে অতীন প্রথমেই লক্ষ করলো, সেই বাগানে অনেকগুলো বেশ বড় বড় গোলাপ ফুটে আছে। সিদ্ধার্থও গোলাপ ফুলই এনেছে।

বেল বাজাবার পর দরজা খুললেন শান্তাবৌদি নিজে। বেশ লম্বা ও বড় চেহারার মহিলা, মাথায় অনেক চুল, দেবী প্রতিমার মতন মুখের গড়ন। প্রথমেই তিনি বকুনির সুরে বললেন, তোমরা এত দেরি করলে, সমীর নিশ্চয়ই লেট করেছে? এই বাসবী, তোমায় বলেছিলুম না আগে এসে আমায় একটু হেল্প করবে।

বাসবী বললো, আমার যে আটটায় ছুটি, তবু আমি পনেরো মিনিট আগে অফ নিয়েছি!

অতীনের দিকে চেয়ে শান্তাবৌদি বললেন, আপনিই বুঝি সিদ্ধার্থর বন্ধু? এ কী, আপনি ওয়াইন এনেছেন কেন? প্রথম দিন আমার বাড়িতে···না না এটা খুব অন্যায় হয়েছে, এত ওয়াইন জমে গেছে আমাদের···

সিদ্ধার্থর হাত থেকে গোলাপের গুচ্ছ নিয়ে তিনি বললেন, আঃ কী সুন্দর! ঠিক এই পারপ্‌ল কালারটা আমার বাগানে কিছুতেই ফোটাতে পারি না!

শান্তাবৌদিকে দেখেই অতীনের মনে হলো, এই মুখখানা যেন তার পরিচিত। কোথায় দেখেছে আগে?

ড্রয়িংরুমে ছ'সাতজন নারী পুরুষ আগে থেকেই উপস্থিত। পুরুষরা বাসবীর জন্য উঠে দাঁড়ালো, শান্তাবৌদি বললেন, তোমরা নিজেরা পরিচয় করে নাও, আমি চট করে একবার কিচেন থেকে ঘুরে আসছি। বাসবী, একটু এসো না আমার সঙ্গে!

এ বাড়িতে ফায়ার প্লেস আছে, তারমধ্যে কাঠের আগুনের বদলে জ্বলছে একটা ইলেকট্রিক হীটার। তার এক পাশে সাদা পাঞ্জাবি ও পাজামা পরে বসে আছেন এই পরিবারের কর্তা পাঁচুদা, মুখে পাইপ। সিদ্ধার্থ বসলো একটি কিশোরী মেয়ের পাশে। একজন মাঝবয়েসী ভদ্রলোক অতীনকে ডেকে বসালেন নিজের কাছে। হাত তুলে নমস্কার করে তিনি বললেন, আমার নাম অমিয় মিত্র। আপনি দেশ থেকে নতুন এসেছেন বুঝি? দেশের খবর কী বলুন?

উল্টোদিক থেকে সিদ্ধার্থ বললো, অমিয়দা ও হচ্ছে আমার কলেজের

বন্ধু অতীন, এখানে আসবার আগে বছর দু'এক ইংল্যান্ডে কাটিয়ে এসেছে।

অমিয় মিত্র বললেন অ, ইংল্যান্ড! আমিও সেখানে ছিলাম, সেভেন ইয়ার্স, ওখানকার ওয়েদার আমার সুট করলো না, রোদ্দুর এত কম দেখা যায়, এত ঠান্ডা...বরফ তো এখানেও পড়ে, কিন্তু ইংল্যান্ডে একেবারে ওয়েট কোল্ড...তা ছাড়া ব্রিটিশ জাতটা এখনো এত কনসিটেড, ওদের সঙ্গে মানিয়ে চলা...

সিদ্ধার্থ বললো, আসল কথাটা বলছেন না কেন অমিয়দা? ইংল্যান্ডের চেয়ে এখানে টাকা রোজগারের স্কোপ বেশী। অনেকেই এখন চান্স পেলে আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছে।

অমিয় মিত্র বললেন, জব স্যাটিসফ্যাকশান এখানে অনেক বেশী। ইফ ইউ ক্যান প্রুভ ইয়োর মেরিট অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি, এখানে তুমি কাজ করার অনেক সুযোগ পাবে। রিসার্চের কাজ করতে গেলেও এখানে এতরকম সুবিধে আছে...

সিদ্ধার্থ আবার বললো, জব স্যাটিসফ্যাকশনের চেয়েও বড় কথা হচ্ছে টাকা! আমি অন্তত তাই বুঝি! পাউন্ডের থেকে ডলার অনেক স্ট্রং টনিক!

সমীর এসেই বার টেন্ডারের দায়িত্ব নিয়েছে। কার কী লাগবে, কার গেলাস খালি, এই সব দেখতে দেখতে সে অতীনের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে কী দেবো? স্কচ না বার্বন?

অতীন বললো, কিছু না।

কিশোরী মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে চমকে মুখ তুলে সিদ্ধার্থ তাকালো তার বন্ধুর দিকে। কয়েক সপ্তাহ ধরে অতীন খুব বেশী মদ্যপান করছে, বাড়িতে একা একা বসে বোতল শেষ করে, তার হঠাৎ মদ্যপানে অরুচি! পাঁচুদার বাড়িতে সিভাস রিগ্যাল থাকে, ঐ বোতল কেনার সাধ্য তার বা অতীনের নেই। পাঁচুদার বাড়িতে যত ইচ্ছে খাওয়া যায়।

সিদ্ধার্থ বললো, অতীন তুই বীয়ার নিবি? হাইনিকেন আছে।

অতীন আবার দু'দিকে মাথা নাড়লো। এমনকি কোকাকোলা নিতেও সে রাজি হলো না। তার ইচ্ছে করছে না। এই সব পার্টিতে মদই হোক বা ঠান্ডা নরম পানীয়ই হোক, হাতে একটা গেলাস ধরে থাকাই রীতি, অতীন শুধু সিগারেট টানতে লাগলো। কারুর সঙ্গে আলাপ করার বদলে সে টেবিল থেকে তুলে নিল নিউজউইক।

সব পার্টিতেই একজন কেউ প্রধান বক্তা থাকে। এখানে সেই ভূমিকা নিয়েছেন অমিয় মিত্র। ইনি অন্যদের কথা বলার বিশেষ সুযোগই দেন না। এঁর কায়দাটি বিচিত্র। ইনি অন্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা কিছু প্রশ্ন করেন, তারপর উত্তরটি শোনার আগেই সে বিষয়ে নিজে বলতে শুরু করে দেন।

এখন তিনি বলতে শুরু করেছেন প্রবাসীদের একটি অতি প্রিয় বিষয় নিয়ে: দেশের নিন্দে! অমিয় মিত্র দু'বছর আগে মাত্র তিন সপ্তাহের জন্য দেশে ঘুরে এসে এমনই শিহরিত হয়েছেন যে সেই সম্পর্কেই বলে যাচ্ছেন অনবরত। কলকাতায় গেলে ইংরিজি উচ্চারণ পর্যন্ত ভুলে যেতে হয়। ওখানকার ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ফ্যারস্ট হয় না, ফাস্ট হয়! অমিয় মিত্রর এক খুড়তুতো ভাই হিস্ট্রি অনার্স পড়ে, তার যা ইংরিজি উচ্চারণের বহর! কলকাতার রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, শিক্ষারও সেই একই রকম দুরবস্থা। নকশাল ছেলেরা স্কুল-কলেজ পোড়াচ্ছে, মাস্টারদের মারছে। লেখাপড়ার আর দরকার নেই।...কলকাতার বাতাসে নিশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হয়...

সিদ্ধার্থ দু'একবার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে তারপর কিশোরী মেয়েটির প্রতি বেশী মনোযোগ দিল। অন্য মহিলারা এক পাশে উঠে গিয়ে সুপার মার্কেটে কী কী জিনিসের সেল দিচ্ছে সেই বিষয়ে আলোচনা করছেন। পাঁচুদা পাইপ টানতে টানতে হাসছেন মুচকি মুচকি।

অতীন কোনো কথাই শুনছে না। সে যেন পৃথিবীর লাজুকতম ব্যক্তি।

শান্তাবৌদি আবার এ ঘরে এসে ঢুকতেই অতীনের মনে পড়লো, এই মুখখানা সে দেখেছিল অনেকদিন আগে, দেওঘরে। তখন অতীন খুব ছোট, একটা বেশ বড় বাড়িতে থাকতেন বুলামাসি, শান্তাবৌদির মুখখানা অবিকল সেই বুলামাসির মতন। কিন্তু সেই বুলামাসিই এই শান্তাবৌদি হতে পারেন না, এতদিনে বুলামাসির অনেক বয়েস হয়ে যাবার কথা...একবার চিত্রকূট পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে দেখা হয়েছিল বুলামাসিদের সঙ্গে। অতীনের মনে পড়ে যাচ্ছে, দাদা খুব মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকতো বুলামাসির মুখের দিকে,
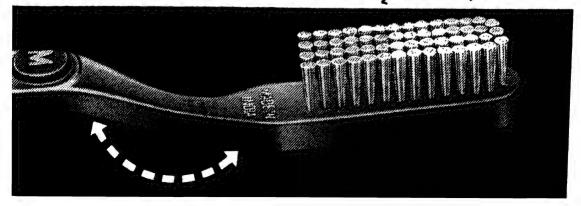
তখন বুঝতে পারেনি, অতীন এখন বুঝতে পারছে, দাদা বুলামাসির প্রেমে পড়ে গিয়েছিল, দাদার কবিতার খাতায় দেওঘরের পটভূমিকায় দুটো কবিতা বোধ হয় বুলামাসিকে নিয়েই··· । কোথায় গেল সেই কবিতার খাতা ? মানিকদার বাড়িতে ছিল, মানিকদা নিশ্চয়ই সে খাতা যত্ন করে রেখে দেবেন···

শান্তাবৌদি বললেন, খাবার কিন্তু রেডি । তোমরা গরম গরম খেয়ে নাও, ঠান্ডা হলে একেবারে ভালো লাগবে না ।

অমিয় মিত্র তখন একটা লম্বা গল্পের মাঝখানে, তাঁকে থামিয়ে দেওয়া হলো প্রায়-জোর করে । ডাইনিং রুমে চলে এলো সবাই । টেবিলে এক সঙ্গে এতজন বসতে পারবে না, প্লেটে তুলে নিতে হবে । ধপধপে সাদা গরম ভাত থেকে ধোঁওয়া উড়ছে । ইলিশ মাছ ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি পদ টেবিলে সাজানো ।

এদেশে এই ইলিশের নাম শ্যাড মাছ । সাহেবদের দেশে সব কিছুই বড় বড়, পদ্মা-গঙ্গার ইলিশের চেয়ে এই শ্যাডও আকারে বড় হয়, তিন কেজি সাড়ে তিন কেজি ওজনেরও পাওয়া যায় । শান্তাবৌদি জানালেন যে একটি ইটালিয়ান মাছওয়ালা তার দোকানে এই শ্যাড মাছ এলেই শান্তাবৌদিকে ফোন করেন । এই মাছ যে বাঙালীদের অতি প্রিয় তা ইটালিয়ানরাও জানে ।

ভাতের সঙ্গে খানিকটা ডাল নেওয়ার পর হঠাৎ অতীন ঠিক করে ফেললো, সে ঐ মাছ খাবে না !

শান্তাবৌদি একটু পরেই অতীনের প্লেটের দিকে নজর দিয়ে বললেন, এ কী, আপনি মাছ নিলেন না ? দাঁড়ান আপনাকে আমি পেটির মাছ তুলে দিচ্ছি ।

অতীন প্লেটটা সরিয়ে নিয়ে বললো, আমি ইলিশ মাছ খাই না । আমার গন্ধ লাগে ।

শান্তাবৌদির মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল । তাঁর নিজের হাতে রান্না করা মাছকে প্রত্যাখ্যান করা যেন তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত অপমান ।

তিনি সিদ্ধার্থর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ কী, সিদ্ধার্থ, তুমি একথা আমাকে আগে বলোনি ? আমি ইচ্ছে করে আজ মাংস করিনি, উনি কী দিয়ে খাবেন ? ফ্রিজে স্যামন্ মাছ আছে, একটু দাঁড়ান, কয়েকখানা ভেজে দিচ্ছি !

সিদ্ধার্থও অবাক হয়ে গেছে । কলকাতায় অতীনদের বাড়িতে সে তিন-চারদিন ভাত খেয়েছে, অতীনকে সে ইলিশ মাছ খেতে দেখেছে । তবু অতীনের হঠাৎ মত পরিবর্তনে সে কোনো জোর করলো না । সে বললো, শান্তাবৌদি, আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম । অতীন নিরামিষ খাওয়া প্র্যাকটিস করছে । ঐ তো ফুলকপির তরকারি, বেগুন ভাজা, পটল ভাজা রয়েছে, ওতেই ওর হয়ে যাবে । আপনি পটল কোথা থেকে জোগাড় করলেন ?

অন্যদের চেয়ে আগে খাওয়া শেষ করে প্লেট নামিয়ে রেখে অতীন চলে এলো লিভিংরুমে । তাড়াতাড়ি সে একটা সিগারেট ধরালো, সে বুঝতে পারছে, কারুর সঙ্গে আলাপ না করা, কথা না বলা, খাওয়ার জায়গায় দাঁড়িয়ে গল্প-হাসি-ঠাট্টায় যোগ না দেওয়া, শান্তাবৌদির রান্নার প্রশংসা না করে চলে আসা, এসবই অস্বাভাবিক ও অভদ্রতা । তবু কিছুতেই সে মন খুলতে পারছে না ।

খাওয়ার ঘরে হঠাৎ সব শব্দ থেমে গেছে । বোধ হয় সিদ্ধার্থ ফিসফিস করে অতীন সম্পর্কেই ওঁদের বলছে অনেক কিছু । যা খুশী বলুক ।

···বাবা একদিন অনেক রাত্তিরে একজোড়া ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছিলেন বাড়িতে । তা নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল মায়ের সঙ্গে । অতীনের তখন পরীক্ষা চলছে, না, পরীক্ষা আরম্ভ হয়নি বোধ হয়, দু'একদিন বাকি ছিল, কিন্তু অত রাতে ইলিশ টিলিশ খেতে একদম ইচ্ছে করেনি তার, সে রাগারাগি করেছিল···বাড়িতে ফ্রিজ নেই, সেই মাছ রেখে দেবার উপায় ছিল না, বাবা সব ফেলে দিয়েছিলেন···বাবা মনে দুঃখ পেয়েছিলেন···এখনও তো বাড়িতে ফ্রিজ নেই, বাবা অনেক টাকা ধার করেছেন, তারজন্য···তিন-চার শো ডলার পাঠাতে পারলে একটা ফ্রিজ কেনা যায়···যতদিন না কলকাতার বাড়িতে একটা ফ্রিজ কিনে দেবার ক্ষমতা তার হবে, ততদিন সে ইলিশ মাছ কেন, আর কোনো মাছই খাবে না ।

হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা পড়ে গেল নরম পুরু কার্পেটে । তক্ষুনি নিচু হয়ে সিগারেটটা তুলে নেওয়া উচিত, কিন্তু সে তুলছে না, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেদিকে । কার্পেটে আগুন ধরে যেতে দেরি হলো না, ধোঁয়া উঠছে, এক্ষুনি যে-কেউ এঘরে এসে পড়তে পারে, ধোঁয়া দেখে আঁতকে উঠবে, এদেশে সাংঘাতিক আগুন-ভীতি । শান্তাবৌদিকে খারাপ লাগেনি অতীনের, পাঁচুদার মুখেও একটা স্নিগ্ধ ভাব আছে, তবু কেন সে এদের বাড়ির দামি কার্পেট পোড়াচ্ছে ?

পাশের ঘরে হঠাৎ সবাই একসঙ্গে হেসে উঠতেই অতীন চমকে উঠলো । এবারে সে তাড়াতাড়ি সিগারেটটা তুলে পা দিয়ে নেবাতে লাগলো আগুন । অনেকটা পুড়েছে, একটা আধুলির সাইজের কালো গোল গর্ত হয়ে গেছে । চোখে পড়বেই । অতীন তার সোফাটা টেনে এনে পোড়া জায়গাটা চাপা দিল । তারপর নিজে গিয়ে বসলো উল্টো দিকে ।

সবচেয়ে আগে এ ঘরে এলেন পাঁচুদা । একেবারে অতীনের কাছে এসে নরম গলায় বললেন, এখনও হোম সিকনেস কাটেনি ? আমারও মাঝে মাঝে···

অতি সাধারণ একটা কথা । তবু অতীনের মাথায় দপ্ করে জ্বলে উঠলো রাগ । বাড়ির কথা মনে পড়া, নিজের দেশের কথা মনে পড়া একটা অসুখ ? সিকনেস ?

কিছু উত্তর দিতে গেলেই অতীনের মুখ দিয়ে কঠিন কথা বেরিয়ে আসবে, তাই সে চুপ করে চেয়ে রইলো । পাঁচুদাও যেন উত্তর চাননি, চলে গেলেন নিজের আসনে ।

অন্যরা এসে বেশ কিছুক্ষণ ধরে প্রশংসা করতে লাগলো মাছ রান্নার ও স্বাদের । শান্তাবৌদি ছাড়া আর কেউ অতীনের সঙ্গে যেচে কথা বললো না । অন্য মাছ বা মাংস রান্না করেনি বলে শান্তাবৌদির আফসোসের শেষ নেই, তরকারিও সেরকম কিছু ছিল না । অতীন যদি নিরামিষ পছন্দ করে তাহলে তিনি আর একদিন অতীনকে শুধু নিরামিষই রান্না করে খাওয়াবেন । অতীনকে আবার আসতেই হবে ।

এরপর শান্তাবৌদি পরপর তিনখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন সকলের অনুরোধে ।

অতীন খুব একটা গানের সমঝদার নয়, তবু সে বুঝতে পারলো, মহিলা ভালই গান জানেন । অনেকটা রাজেশ্বরী দত্তের মতন গলা । গান শুনতে শুনতে হঠাৎ অতীনের একটা কথা মনে পড়ে গেল । খাবার শেষ করার পর সে তার প্লেটটা টেবিলের নিচে রেখে দিয়েছিল । সেটা একটা অপরাধ হয়েছে । এ দেশে খাওয়ার পর নিজের বাসনটা মেজে দেওয়াই নিয়ম । ঝি-চাকর তো নেই, কে অন্যের এঁটো বাসন মাজবে ?

তার প্লেটটা কি এখনো টেবিলের নীচে রয়ে গেছে ? তাহলে এই বেলা মেজে দেওয়া উচিত । গানের মাঝখানে অতীন উঠে গেল ডাইনিং রুমে, না টেবিলের নিচে তার প্লেটটা নেই, এমনকি সিংকেও নেই । কে ধুয়েছে, শান্তাবৌদি না সিদ্ধার্থ ?

ডাইনিং রুমটা বেশ গরম । পাশের ঘরে গিয়ে গান শোনার বদলে এই ঘরে থাকাটাই তার কাছে আরামপ্রদ মনে হলো । এ বাড়িতে বসবার ঘরের বাইরে জুতো খুলতে হয় । সেই সময় অতীন মোজাও খুলে ফেলেছে বলে তার পায়ে শীত লাগছে ।

খানিকবাদে বাসবী এসে দেখলো, সেই ঘরের ঠিক মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে অতীন । সোজা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ।

বাসবী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখানে কী করছেন ?

অতীন কড়াগলায় বললো, দেখতেই তো পারছেন, এমনিই দাঁড়িয়ে আছি ।

বাসবীর ভুরু কুঁচকে গেল । এরকম উত্তর পেতে সে অভ্যস্ত নয় । সে বললো, আমরা এখন বাড়ি যাবো, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যেতে চান—

শুধু মাত্র যদি কথাটার জন্যই অতীন বললো, না, আমি আপনাদের সঙ্গে যাবো না । পরক্ষণেই সিদ্ধার্থ দরজার কাছ থেকে মুখ বাড়িয়ে বললো, এই অতীন, চল ।

সিদ্ধার্থর কাছে অবশ্য জেদাজেদি করতে পারলো না অতীন, তাকে সমীরের গাড়িতেই উঠতে হলো । এবার সে বসলো সামনের সীটে । কিশোরীর মতন চেহারার মেয়েটি ঠিক কিশোরী নয়, তার নাম নীতা, সে পি এইচ ডি'র ছাত্রী । তাকেও পথে নামিয়ে দিতে হবে, সিদ্ধার্থ বাসবী আর নীতার সঙ্গে পেছনে বসেছে, শিভাস রিগ্যাল অনেকটা পান করে বেশ ফুরফুরে নেশা হয়েছে তার । সে নীতার কাঁধে মৃদু চাপড় দিতে দিতে গান

গাইছে, দেয়ার ইজ আ গোল্ড মাইন ইজ দা স্কাই ফার অ্যাওয়ে, উই উইল ফাইন্ড ইট··· । অন্যসময় সিদ্ধার্থ নানারকম বাংলা গান গায় কিন্তু বিলিতি মদের নেশা হলেই তার গলা দিয়ে ইংরিজি গান ছাড়া অন্য কিছু বেরোয় না।

নীতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার দরকার হলো না, সে নিজে থেকেই অতীনকে বললো, আপনি খুব অহংকারী, তাই নয় ? কারুর সঙ্গে কথা বলছিলেন না !

সিদ্ধার্থ নীতার কাঁধে চাপ দিয়ে ইঙ্গিত করলো চুপ করতে। নীতা তবু বললো, আপনি সবার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিলেন, আপনার চোখ দেখে মনে হচ্ছিল , আমরা সবাই বোকা, আপনিই একমাত্র বুদ্ধিমান !

সিদ্ধার্থ বললো, আরে, তুমি জোর করে আমার বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া বাধাচ্ছো কেন ? লিভ হিম অ্যালোন !

নীতা ফস্ করে ঝেঁঝে উঠে বললো, হি হ্যাজ নো রাইট টু ইনসাল্ট শান্তাবৌদি ? সাচ্ আ নাইস লেডি, এত যত্ন করে খাওয়ান···আপনার বন্ধুটি খাবার নামে একটা ফার্স করলেন, তারপর শান্তাবৌদির গানের মাঝখানে ঐ ভাবে উঠে যাওয়া···কেউ কখনো যায় ? শান্তাবৌদি দুঃখ পেলেও মুখে কিছু বললেন না !

বাসবী বললো, উনি গানের মাঝখানে ডাইনিং রুমে উঠে চলে গেলেন, আমি ভাবলুম, বুঝি আবার খিদে পেয়ে গেছে। যদি ওকে কিছু হেল্প করতে পারি, সেইজন্যে গিয়ে দেখি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি কেন দাঁড়িয়ে আছেন, জিজ্ঞেস করতেই এমন ধমকে দিলেন আমাকে !

সিদ্ধার্থ বললো, হ্যাঁরে অতীন, তুই অতক্ষণ ডাইনিংরুমে কী করছিলি ? সত্যি খিদে পেয়েছিল নাকি ?

সমীর জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমাদের সঙ্গে এসেছো, ফেরার সময় আমার গাড়িতে যাবে না বলছিলে কেন ?

অতীনের মনে হলো, এই গাড়ির অন্য চারজন এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে। তাকে উত্তর দিতেই হবে ? ডাইনিংরুমে সে কেন গিয়েছিল তার মনে পড়ছে না এখন। কোনো ঘরের মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাটা কি অপরাধ ? সে উত্তর না দিলে এরা তাকে ছাড়বে না। সারা রাস্তা প্রশ্নবাণ দিয়ে তাকে খোঁচাবে। সত্যি সত্যি যেন ঐ চারজনের হাতে ধারালো অস্ত্র, তারা অতীনকে খোঁচাচ্ছে, অতীনের হাত-পা বাঁধা···

ঝট করে অতীন খুলে ফেললো সীটবেল্ট, তারপর গাড়ির দরজাটাও খুলে এক লাফ দিল রাস্তায়।

মেয়েদুটি আর্তনাদ করে উঠলো !

সিদ্ধার্থ পাংশু মুখে, ফ্যাসফেসে গলায় বললো, মিরাক্‌ল ! মিরাক্‌ল !

অতীন গাড়ির দরজার হ্যান্ডেল খোলার চেষ্টা করতেই সমীরের পা যান্ত্রিকভাবেই চলে গিয়েছিল ব্রেকে। দরজাটা খুলে যেতেই সে পুরো ব্রেকে চাপ দেয়।

এরপর অনেকগুলি দৈবাৎ যোগাযোগে তারা বড় রকম দুর্ঘটনা থেকে বেঁচেছে। এরকম হঠাৎ ব্রেক কষায় গাড়ি উল্টে যেতে পারতো, তা না করে খানিকটা এদিক ওদিক বেঁকেছে মাত্র। সমীরের গাড়ির ঠিক পেছনেই কোনো গাড়ি ছিল না, থাকলে সেই গাড়ি নির্ঘাৎ এসে ধাক্কা মারতো তাকে।

অতীন গড়িয়ে গেছে পাশের লেনে। সেখানে পর পর তিনটি গাড়ি, চাপা পড়ে ছাতু হয়ে যাবার কথা ছিল তার। কিন্তু প্রথম গাড়িটি শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষেছে, দ্বিতীয় গাড়িটা কিছুটা দূরত্বে ছিল। সে ব্রেক কষলেও সামান্য ধাক্কা মেরেছে এসে প্রথম গাড়িতে, তৃতীয় গাড়ি মেরেছে তাকে।

সিদ্ধার্থ আর সমীর দু'জনেই দৌড়ে গেল অতীনের কাছে। একটা ক্যাডিলাক গাড়ির সামনের চাকা থেকে মাত্র দু'হাত দূরে পড়ে আছে অতীন। তার কোনো অঙ্গেরই কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি। সমীর ঠিক সময় ব্রেকে পা দিয়ে গতি কমিয়ে দিয়েছিল, নইলে ষাট-সত্তর মাইল গতিতে চলন্ত গাড়ি থেকে পড়ার আঘাতেই সে মরে যেতে পারতো।

সিদ্ধার্থ তার বন্ধুকে হাত ধরে টেনে দাঁড় করালো, কপালের একটা পাশ সামান্য ছড়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয়নি অতীনের।

ক্যাডিলাক গাড়ির ড্রাইভার নেমে এসে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করলো, কী হলো ব্যাপারটা ? আমি প্রথমে ভাবলাম, তোমরা বুঝি একটা ডেডবডি ডিসপোজ অফ করছো !

সমীর তাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, আমাদের গাড়ির সামনের দরজাটা হঠাৎ খুলে গিয়েছিল, সেইজন্যই এই দুর্ঘটনা।

ক্যাডিলাক গাড়ির প্রৌঢ় ড্রাইভার এপাশে এসে সমীরের সেকেন্ড হ্যান্ড ফোর্ড গাড়িটা দেখলো। সামনের দরজার লকটা পরীক্ষা করলো তিন চারবার। পুরোনো গাড়িতে একটু লড়ঝড়ে ভাব থাকেই। সে অতীনের দিকে তাকিয়ে বললো, ঈশ্বর আজ আমাকে খুনী হওয়ার দায় থেকে বাঁচালেন। তোমাকে মারলে আমার কোনো শাস্তি হতো না, কিন্তু মনে একটা দাগ তো থেকে যেত !

রাত পৌনে বারোটা হলেও রাস্তায় পর পর জমে যেতে লাগলো গাড়ি। পুলিশের গাড়িও এসে গেল অবিলম্বে। কোনো রকম চ্যাঁচামেচি, রাগারাগি, অন্যকে দোষারোপের ব্যাপার নেই, সবাই চুপচাপ। সমীরের গাড়ির ইনসিওরেন্স কম্পানির নাম ও নম্বর টুকে নিল পুলিশ। সমীর মাত্র দু'পেগ হুইস্কি খেয়েছে, তাকে ড্রাংক ড্রাইভারও বলা যাবে না, অতীনের মুখেও মদের গন্ধ নেই। অতীনের বয়েসী একটি যুবক ইচ্ছে করে চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে লাফ মারবে, এটা ওদের কাছে অকল্পনীয়। একটুবাদেই পুলিশ ওদের ছেড়ে দিল।

মেয়ে দুটি আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। গাড়ি ছাড়ার পরও কেউ কোনো কথা বললো না।

একটু বাদে সিদ্ধার্থ বললো, তুই কী করে বেঁচে গেলি, অতীন, সেটাই মহা আশ্চর্য ব্যাপার ! মিরাকুলাস এসকেপ ছাড়া আর কী বলা যায় ? নেক্সট টাইম তোর যখন এরকম নাটক করার ইচ্ছে হবে, তুই ওয়াশিংটন ব্রীজ থেকে ঝাঁপ দিস, আমাদের এরকম বিপদে ফেলিস না।

সমীর বললো, এখন এসব কথা থাক, প্লীজ।

সিদ্ধার্থ তবু বললো, আমার মাথা গরম হয়ে গেছে ! পুলিশ দেখলেই আমার···অতীন, তোকে আর একটা কথা বলে দিচ্ছি, এই সবার সামনে। আমি তোকে সাত দিনের নোটিস দিলাম, তুই আমার অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে অন্য জায়গা খুঁজে নিবি। অনেক ঝঞ্ঝাট সহ্য করেছি ভাই, আর না। তোকে আর আমি জায়গা দিতে পারবো না।

অতীন মুখ ঘুরিয়ে সিদ্ধার্থের দিকে চেয়ে হাসলো। *(ক্রমশ)*

অঙ্কন : সুব্রত চৌধুরী

ডাকাডাকি

সোমঋতা গঙ্গোপাধ্যায়

শিয়ালদা স্টেশনে এসেই ঋতেনদার খেয়াল হলো কৃষ্ণার সঙ্গে কোন হোল্ডল নেই। শুধু বিশাল একটা বিলিতি ফাইবারের স্যুটকেশ। কৃষ্ণা সেটাই ঋতেনদাকে দেখিয়ে বললো, ওর ভেতরেই মশারি চাদর সব আছে। তোমার কোন চিন্তা নেই—মাত্র তো চারটে দিন, কেটে যাবে।

ঋতেনদার চোখে মুখে এক ঝলক রাগ। সেটা দ্রুত মিলিয়ে গিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, একটা জলের বোতল পর্যন্ত নাওনি তুমি? ওঃ আমি না তোমার জন্যে···তোমাকে নিয়ে আর সত্যি···

ঋতেনদা প্রায় লাফাতে লাফাতে ছুটে গেলেন জলের ফ্লাস্ক কিনতে। কৃষ্ণা তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে সামান্য সঙ্কোচ বোধ করে। একটা পুরো ফিলম ইউনিট স্যুটিং করতে যাচ্ছে মুর্শিদাবাদের লালবাগে। ছবির ডাইরেক্টর সুভাষ চক্রবর্তী। বয়স বাষট্টি-তেষট্টি। এই ভিড়ে গরমে ঘামতে ঘামতে তিনি কার একটা বেডিংয়ের ওপর বসে পড়েছেন। সৌম্য মুখ। ভারি চেহারা। কিন্তু শশব্যস্ত ভাব। বার বার ঘড়ি দেখছেন। কখন ট্রেন আসে।

কৃষ্ণা সামান্য হাসলো। বয়স হলে কি মানুষ এত ব্যস্তবাগীশ হয়। ছাপ্পান্ন বছর বয়সে ঋতেনদা কিরকম আঠারো বছরের কিশোরের মতন দৌড়লেন।

ওদিকে ফিলমের লোকজন সবাই। সঙ্গে নানান জিনিস। সবই স্যুটিংয়ের। ক্যামেরাম্যান সমীর মিত্রকে গাঢ় চোখে দেখলো কৃষ্ণা। খুব নাম ডাক ভদ্রলোকের। পুরস্কার পেয়েছে বেশ কয়েকবার। বয়েসে যুবক। রোগা পাতলা তীক্ষ্ণ চেহারা। চোখ দুটি সব ছাপিয়ে উজ্জ্বল। সরু পাতলুনের ওপর গভীর নীল পাঞ্জাবি পরেছে। খুব সম্ভ্রম জাগে কৃষ্ণার।

প্রোডাকশন ম্যানেজার কার্তিক বসু বার বার পকেট ডায়েরিতে কি লিখে রাখছেন। চালাকচতুর ভাবভঙ্গী। ছোটখাটো চেহারা। মধ্যবয়সী মানুষটির ঠোঁটের কোণে বুদ্ধিমানের মতন হাসি।

একটু গলা তুলে অ্যাসিসট্যান্ট ডাইরেক্টরকে বললেন, হিরোইনই যে এখন পর্যন্ত এলো না। ওদিকে লালগোলা প্যাসেঞ্জার এলো বলে। তখনই আমি বলেছিলাম, আমি নিজে সঙ্গে করে···। তা আমার কথায় কেউ কর্ণপাত পর্যন্ত করলে না।

সুভাষবাবু রুমাল দিয়ে টাক মুছে বললেন, কি বলছো হে কার্তিক? এই ভিড়ে হিরোইন এলে

রক্ষা আছে? সব সমেত ফ্যানেদের চাপে মারা পড়বো যে? সোহিনীকে পৌঁছবার দায়িত্ব নিয়েছেন সেনবাবু নিজে। সোহিনী বাই রোড যাবে। আমরা পৌঁছবার আগেই সে পৌঁছে যাবে।

কৃষ্ণা শিহরিত হলো। এ ছবির নায়িকা তাহলে—শেষপর্যন্ত সোহিনী মুখার্জি? বাব্বাঃ! কত বড় হিরোইন। দেখতে দেখতে তো একেবারে মার মার কাট কাট। ঋতেনদার মুখেই শুনেছে সোহিনীকে হিরোইন হবার জন্যে সাধাসাধি করা হচ্ছে। বাংলা হিন্দি তামিল নিয়ে একরাশ ছবি। তার খুবই হিমসিম অবস্থা। সে শেষ পর্যন্ত তাহলে রাজি হয়েছে।

কৃষ্ণা রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো। এই ছবিটাতে সে নায়িকার দিদির রোল করবে। খুব বেশি কাজ নেই। কিন্তু যেটুকু আছে সবই হিরোইনের সঙ্গে। দুচারটে শট হিরোর সঙ্গেও। হিরো সম্পূর্ণ নতুন। সে আগামীকাল আসবে।

কৃষ্ণার মনটা হঠাৎ খুব খুঁত খুঁত করে। হিরোইনের যতই নামডাক রূপের বাহার থাক, বয়সটা অনেক বেশি। কৃষ্ণার মায়ের বয়সী বললেই চলে। কৃষ্ণা তো জন্ম থেকেই ওর নামডাক শুনছে। কৃষ্ণার বয়স চব্বিশ চলছে। না হয় একটু গোলগাল চেহারা, তা বলে মায়ের বয়সী একজনের দিদি? না বলবারও উপায় নেই। তাহলেই চালটা কেঁচে যাবে। সুভাষবাবু ছাড়া বাংলা ছবিতে এখন নতুনদের কেউ নিতেই চায় না। নিলেই রিস্ক—শেখানো পড়ানো, সে এক মহাঝামেলা। ঋতেনদা বারবার মিনতি করে বলেছে, অ্যাওয়ার্ড পাওয়া মস্ত বড় ডাইরেক্টর সুভাষ চক্রবর্তী। ক্যামেরাম্যানও তাই। ছবির হিরোইন পর্যন্ত টপ ফর্মে। সব মিলিয়ে ছবি হিট করবেই। আর তাহলেই বুঝছো— তোমাকে আর কে পায়? পেছন ফিরে তাকাবার আর দরকার হবে না। যা সিনেমা সিনেমা করে মাথা খারাপ করেছ। তবে তোমাকে শুধু একটু রোগা হতে হবে। বেশি না, বুঝলে না ক্যামেরায় রোগা না হলে মুশকিল। বেশি ফ্যাটি দেখায়।

কৃষ্ণা নিজের সুগোল ভরাট হাত দুখানি দেখে মনে মনে রেগে ওঠে। নিজের ওপর। এত কম খাওয়া। এত কৃচ্ছ্রসাধন। তবু এই বেলুনের মতন গোলগোল হাত পা? এত বিচ্ছিরিরকম ভারী বুক। সত্যি আর ভাল্লাগে না।

দামী সিল্কের শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে কৃষ্ণা সোজা হয়ে দাঁড়ালো। মেয়েদের অনুপাতে সে বেশ লম্বা। গায়ের রঙ ফরসা। খুবই ধপধপে। টিকোলো নাক। লম্বাটে মুখ। চোখ দুটি টানা। বাঙ্ময়।

এ ছবির ডাইরেক্টর সুভাষবাবুও বলেছিলেন, আপনার চোখ দুটি তো ভাই ভারী চমৎকার। আরে বাবা আসল অভিনয়টা তো চোখেই। টপ হিরোইনরা টপে ওঠে কি করে? রঙের জোরে না শরীর দেখিয়ে? সব এই চোখের কারসাজিতে। শুধু চোখটাকে প্লে করাতে হবে। রাগ বলো ঈর্ষা বলো প্রেম বলো সব ওই চোখের কারসাজি। কাজ করতে করতেই হবে। আমরা ডাইরেক্টররা আছি কি করতে? সব শিখিয়ে দেব।

গতরাত্রে কৃষ্ণা সিদ্ধার্থকেও বলেছিল। খুব হাসি হাসি মুখে। সুভাষবাবুর মতন ডাইরেক্টর আমাকে এই কথা বলেছে। দেখো তোমার বউও একদিন অ্যাকট্রেস হয়ে যাবে। কি তখন তুমি খুশি হবে না?

সিদ্ধার্থ মৃদু হাসিমাখা মুখে চুপ করে ছিল। কেন? ও কি ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না কৃষ্ণা কোনো কাজ ঠিক ঠিক করে উঠতে পারবে?

সিদ্ধার্থকে তখন যেন পাউডার মাখার নেশায় ধরেছিল। পাউডার মাখছে তো মাখছেই। ও অবশ্য খুবই পরিপাটি মানুষ। শৌখীন। একটু যেন বেশি বেশিই। কৃষ্ণা ওকে টানা আট বছর দেখছে। কোন পরিবর্তন নেই। তেত্রিশ বছর বয়সেও শৌখিনতা এতটুকু কমেনি।

কৃষ্ণার বুকের মাঝখানটায় হঠাৎ একটু ব্যথা। ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়েছে। আজ রাত্রেও সিদ্ধার্থ প্রতি রাতের মতন অমনি পাউডার মেখে ঘুমাবে? ঘুমাতে পারবে? কৃষ্ণার কথা মনে পড়বে না? কষ্ট হবে না?

একলা রাত্রে ঘুমাতে গিয়ে মন কেমন করে উঠবে না ? অবশ্যই সিদ্ধার্থর খাওয়া দাওয়া আরামের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হবে না। বাড়িতে দু-দুটি কাজের লোক। খুড়তুতো ভাই সমুকেও রেখে এসেছে বলে কয়ে। অসুবিধেটা কি ? বাড়িতে তো কোন ঝুট ঝামেলা নেই। একটা মাত্র ছেলে পাঁচ বছরের টুবলাই। সেও তো বেশিরভাগ সময়ই কৃষ্ণার বড়মাসির কাছে থাকে। কৃষ্ণা ছেলের ঝক্কি সামলাতে পারে না। বড় মাসি মাঝে মাঝেই টুবলাইকে সঙ্গে করে ভবানীপুর নিয়ে যায়। ওদের বাড়িতে দুটি তিনটি বাচ্চার সঙ্গে বেশ থাকে। পড়াশুনো করে। স্কুলে যায়। ছবি আঁকে। কোন সময়ই মুখ ভার করে না টুবলাই। এবার কেন টুবলাইকে রাখতে যাবার সময় ওর চোখ ছল ছল করছিল, কিরকম মা মা করে কোল থেকে নামতেই চাইছিল না ?

বড়মাসি অবশ্য হেসে হেসে এ কথা ও কথা বলে ছড়া কাটছিলেন। হেসে গড়িয়ে বললেন, তোর ছেলের মজাটা জানিস, ছবি আঁকতে বললেই গাড়ি না ঘোড়া না পাখি না ফুল কার ছবি আঁকলিরে টুবলো ? না মার ছবি বাবার ছবি। মা বাবা ছাড়া আমরা কি তোর কেউ নইরে ? বড়মাসির হাসির রোগ। হাসতে হাসতে বলে। তা হ্যাঁরে আমার একখানা ছবি আঁকাতে পারলাম না তোর ছেলেকে দিয়ে ?

বড়মাসির কথার ধরন শুনে কৃষ্ণাও তখন হেসেছিল। এখন বুকের ভিতর ধক ধক করে ওঠে। ছেলেটা কেন শুধু বাবা মায়ের ছবি আঁকে ? আর কোন ছবি ওর পেনসিলের ডগায় কেন আসে না ?

কৃষ্ণা সিদ্ধার্থকেও বলেছিল, জানো, টুবলাই কেমন তোমার আমার ছবি এঁকেছে ? আমার কপালের টিপটা কেমন বড় করেছে দেখো ? দেখো ছেলেটা আমার মতন শিল্পী হবে, তুমি তো জানো না আমিও একসময় ছবি এঁকেছি। ছবি নিয়ে কত ভাবনাচিন্তা। তারপর তো বিয়ে ছেলে সংসার। কোথায় সব তলিয়ে গেল।

সিদ্ধার্থ টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাচ্ছিল। হঠাৎ থমকে বললো, তোমার সব তলিয়ে গেছে না কৃষ্ণা ?

সিদ্ধার্থর মুখ চোখে কেমন একটা অদ্ভুত হাসি ফুটেছিল। যেটা দেখে কৃষ্ণার আর কিছু বলতে ইচ্ছে করেনি। অবশ্য সিদ্ধার্থকে অত বোঝাবার দরকারও হয় না। রাগারাগি করার মতন মানুষ সিদ্ধার্থ নয়। এটা কৃষ্ণা তার সেই কিশোরী বেলা থেকেই জানে। নিজের মত অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া বা তার মতে কাউকে চলতে বাধ্য করা কোনোটাই সিদ্ধার্থ পছন্দ করে না। তবে কৃষ্ণা যে হিরোইন হবার জন্যে লড়াই করতে চায় তার জন্যেও সে কৃষ্ণাকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। অথচ কত হোমড়া-চোমড়া লোকজনের সঙ্গে তার জানাশুনো। ফিলমের অনেককে সে ব্যক্তিগতভাবেই চেনে। আসলে সিদ্ধার্থ কোনভাবেই কৃষ্ণাকে কোন সাহায্য করবে না। এটা সে জানে। অবশ্য ঋতেনদাও সিদ্ধার্থর খুব জানাশুনো। ওদের সঙ্গে লতাপাতায় কি একটা আত্মীয়তাও আছে। কিন্তু সিদ্ধার্থ কখনও ঋতেনদাকে বলেনি, আপনি কৃষ্ণার জন্যে কিছু করুন।

ঋতেনদাই কৃষ্ণার হতাশা, কৃষ্ণার আগ্রহ দেখে এগিয়ে এসেছেন। খুবই মহৎ মানুষ ঋতেনদা। নিজের চাকরি ঘর সংসার ছেলে মেয়ের দিকে যত না দৃষ্টি দেন তার হাজারগুণ ভাবনা কৃষ্ণার কেরিয়ার নিয়ে। এই বয়সে কম ছুটোছুটি করছেন কৃষ্ণার জন্যে ? এর একভাগও যদি সিদ্ধার্থ করতো ?

আজকাল সিদ্ধার্থ যেন নিজেকে নিয়েই বড় বেশি ব্যস্ত। দ্রুত চাকরিতে উন্নতি চাই, পর পর এতগুলো প্রমোশনেও সিদ্ধার্থ যেন খুশি নয়। এমন কি বাড়িঘরের ব্যাপারেও ও যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। তাদের সাবেক কালের শ্যামবাজারের বাড়িখানা বিক্রি করে দিতে তৎপর। এই সেদিনও বললো, চলো কৃষ্ণা এই পুরোনো বাড়িটা বিক্রি করে ঝকঝকে একটা ফ্ল্যাট কিনি। বেশ নতুন ধরনের, সাজানো গোছানো হবে। তোমার জন্যে একটা আলাদা ড্রেসিং রুমই করে দেব।

কৃষ্ণা তার শ্বশুর বাড়ি বিক্রি করতে রাজি না জেনে শ্যামবাজারের এই পুরোনো বাড়িখানাই নানাভাবে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করছে সিদ্ধার্থ।

দরজা জানলায় রঙ লাগাচ্ছে। পুরোনো মেঝে ভেঙে মোজাইক হচ্ছে। দেওয়ালে দামী পেন্ট। রঙ মিলিয়ে পর্দা। আসবাবপত্র। সাজায় আর হৈ হৈ করে সিদ্ধার্থ।

কৃষ্ণা চুপ করে থাকে। কোন আগ্রহ দেখায় না। দেখাতে ইচ্ছেও হয় না। যার নিজের জীবনটাই এই চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত এলোমেলো অগোছালো হয়ে আছে, যে নিজের জীবনই এখনও পর্যন্ত গড়ে তুলতে পারলো না, সে পুরোনো বাড়িতে নতুন পেন্ট লাগিয়ে কি করবে ?

সিদ্ধার্থ ওর অনাগ্রহ দেখে রাগ না করে হেসেছিল। শাণিতভাবে বলেছে, এ সব তোমার নিজের জীবন থেকে একেবারেই আলাদা তাই না কৃষ্ণা ?

কৃষ্ণা নামটা শুনে ও চমকে উঠেছিল। তার গায়ের রঙ দুধেআলতা বলে কৃষ্ণা বলে সিদ্ধার্থ ওকে কোনদিনই ডাকেনি। বরাবর বলে এসেছে, মধুরা। মিষ্টি। মিষ্টুন।

কৃষ্ণা ভাবে, হঠাৎ সেদিন ও আমাকে কৃষ্ণা বলে ডাকলো কেন ? আমার গায়ের রঙ কি কালো হয়ে গেছে। হবেও বা। যা সারাদিন রোদ্দুরে ঘুরি। গাড়িতে চড়তেও ভাল লাগে না। সাত তাড়াতাড়ি গাড়ি কিনবারই বা কি প্রয়োজন ছিল সিদ্ধার্থর। ওকি ভেবেছিল কৃষ্ণা আয়েস করে বোকা মেয়ে-বউদের মতন গাড়ি চড়ে ঘুরে ঘুরে শপিং করবে ? হাওয়া খেতে সকাল বিকেল গঙ্গার ধারে যাবে ? না। রোদ্দুরে পুড়ে ঘুরে বেড়িয়ে এখান-সেখান করে কৃষ্ণা তার নিজের জীবন নিজের মতন করে গড়ে নেবে।

খুব রোদ উঠেছে আজ। তার তাপ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। এই ভিড় ভাট্টা গরম। এত লোকজন। কৃষ্ণা দেখে। হঠাৎ মনে পড়ে তাদের শোবার ঘরের জানলাগুলো খোলা। হাহা রোদ্দুরে গরম হচ্ছে। বন্ধ করেনি। পর্দা টেনে আসতে ভুলে গেছে। যদিও কাজের লোকদুটো সব দিকে খেয়াল রাখে। কিন্তু দরজা জানলা বন্ধ করে ঘর ঠাণ্ডা করার কথাটা তাদের মনেই আসে না।

আজ একটু সকাল সকাল ফিরবে সিদ্ধার্থ। বাড়ি ফিরে ও একখানি পর্দা ঢাকা মায়াবী ঘর চায়।

কৃষ্ণার ভুরু কুঁচকে যায়। শুধু চাইলেই তো হবে ? ওর দেওয়ার কিছু নেই ? একটা বুদ্ধিমতী সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেই যেন তোমার দায়িত্ব শেষ। তার কোন উত্তরণের দায় তোমার নেই ?

যাদের সঙ্গে এক স্কুলে পড়েছে, যারা কৃষ্ণার চেয়েও অনেক বেশি সাধারণ ছিল তারা কেউ অধ্যাপিকা। কেউ স্কুলে পড়াচ্ছে। কেউ গানটান গেয়ে বেশ নাম করে ফেলেছে। মৃত্তিকা ঘোষ বলে সেই রোগা টিকটিকে কালো চেহারার মেয়েটা পর্যন্ত নাচের স্কুল খুলে এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাগজে সেদিন ওর ছবি দেখে কৃষ্ণা হতবাক।

সিদ্ধার্থকে বলতেই ও কৃষ্ণার গালে মুখ ঘসে বললো, চলো মিষ্টুন, আমরাও কোথাও চলে যাই। কোথায় যাবে বলো ? লন্ডন না নিউইয়র্ক ? বিশ্বাস করো আমার কাছে এরকম অফার মাঝে মাঝে এখনও আসে, চাকরিটা তোমার বর কিন্তু খারাপ করেনা মিষ্টুন।

কৃষ্ণা ছিটকে সরে এসেছিল। আশ্চর্য। সবসময় নিজেকে নিয়ে ভাবছে সিদ্ধার্থ। সেই নিজের চাকরি। লন্ডন। প্যারিস। নিজের টাকা। নাম। উন্নতি। কৃষ্ণা যে নিজের কিছু করতে চায় সেটা মাথায় আসে না। স্বার্থপর। স্বার্থপর পুরুষ।

কৃষ্ণা দেখলো হাঁপাতে হাঁপাতে ভিড় ঠেলে ঋতেনদা ছুটে আসছেন। হাতে মস্ত একটা জলের ফ্লাস্ক। ঋতেনদার শার্টের হাতায় জল পড়ে ভিজেছে। বোধ করি জল ভরতে গিয়ে এই কাণ্ড। রোগা পাতলা লম্বা মানুষটা উত্তেজনায় তিরতির করে কাঁপছে। কৃষ্ণার বড় মায়া হয়। এই মানুষটা তার তেমন কেউই নয়। কিন্তু কেমন জীবন পণ করে কৃষ্ণার জন্যে ভাবছে। নিশ্চয়ই কৃষ্ণার মধ্যে এমন কিছু দেখেছে যার জন্যে ঋতেনদার এত উৎসাহ। অথচ সে যার স্ত্রী সেই সিদ্ধার্থ এত বছরে একদিনের জন্যেও কোন কিছুতে কখনো কোন উৎসাহ দেখালো না।

ঋতেনদা বেশ খুশি মনে, ফিলমের লোকজন বিশেষ করে ছবির ডিরেক্টর সুভাষবাবুর সঙ্গে গল্প করছেন। আলাপ পরিচয় তো ছিলই। সেই সূত্র ধরেই এ কথা সেকথা। অবশ্য সবই প্রায় সিনেমা লাইনের গল্প। কৃষ্ণা কান পাতলো।

গাড়ি ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে দুটি অল্প বয়সী মেয়ে সমেত দুজন প্রৌঢ়া এসে হন্তদন্ত হয়ে দাঁড়ালেন। কার্তিক বোস প্রায় খেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করে, দেখলে তো তোমাদের কাণ্ড ? আমি জানি তোমাদের রীতিপ্রকৃতিই এই, ট্যাকসিভাড়া দেওয়া সত্ত্বেও তোমরা সেই বাসে ঝুলতে ঝুলতে এসেছ তো ?

প্রৌঢ়া দুটি কোন কথা বলেন না। অল্পবয়সি মেয়ে দুটি আড়িমুড়ি ভাঙে। যেন একটু আগে ঘুম থেকে উঠে এসেছে। এরা সিনেমার কোন কাজে লাগবে ? কৃষ্ণা ভেবে পায়না। এদের পোশাক আশাক দেখে খুবই হতাশ বোধ করে কৃষ্ণা। চেহারাতেও কোন চাকচিক্য নেই। বিবর্ণ। পোড়া। গরীব গরীব দেখতে। অল্প বয়সী মেয়ে দুটির মুখের গড়ন কিন্তু মন্দ নয়। তবে চোখের নিচে বড় ক্লান্তি। পাঁশুটে। রুগ্ন। রুক্ষু লালচে চুল হাওয়ায় উড়ছে। কম দামী নাইলনের ঝ্যালঝ্যালে পাতলা শাড়ি পরেছে মেয়ে দুটি। হাতকাটা লাল ব্লাউজ।

প্রৌঢ়া দুজনের হাতে অবশ্য শাঁখা লোহা আছে। কপালে সিঁথিতে সিঁদুর। ওরা কৃষ্ণাকে হাঁ করে দেখছে তো দেখছেই। ওরা কি ভাবছে কৃষ্ণা এ ছবির হিরোইন ? না। হিরোইনের দিদির রোল করবে। আর এইরকম টুকটাক করতে করতেই তো একদিন ঠিক হিরোইনের চান্স এসে যাবে।

আঁচল লুটিয়ে কিছুটা ভঙ্গীতে আয়েস এনে কৃষ্ণা ভিড় ঠেলে ট্রেনে উঠছিল। ঋতেনদা মৃদু ধমক দিলেন, আঃ কৃষ্ণা ! শাড়ির আঁচল সামলে নাও…।

বার বার বোঝাতে লাগলেন, সামনে গঙ্গা, বাহাদুরি করে যেন সাঁতার কাটতে যেও না, কি মনে থাকবে তো ?

গাড়িতে উঠবার সময় হঠাৎ যেন পায়ে কাপড় জড়িয়ে গেল কৃষ্ণার। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করে ওঠে। টুবলাইটা সবসময়ই মা বাবার ছবি আঁকে কেন ? হঠাৎ মনে হয় কাছে কোথায় সিদ্ধার্থ দাঁড়িয়ে আছে। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে তাকে ? কৃষ্ণা মুখ লুকিয়ে ভিড়ের ভেতর সিদ্ধার্থকে খোঁজে। ঋতেনদাকেই দেখতে পায়। হাত নাড়তে নাড়তে ঋতেনদা জোরে বলে উঠলেন, সাধানে থেকো কৃষ্ণা। গঙ্গায় চান… …।

সন্ধের দিকে লালবাগে পৌঁছে গেল দলবল। ছোটখাটো স্টেশন। পাড়া গাঁ। তবে কাছে পিঠে বহরমপুর শহর থাকায় বেশ একটা শহুরে ভাবসাবআলা লোকও চোখে পড়ে।

স্টেশনটা ফাঁকা ফাঁকা। গাছগাছালি। ধু ধু মাঠ। মাঠ পেরিয়ে ভেতরের দিকটায় ঘর বাড়ি আছে। খুব কাছে মুর্শিদাবাদের নবাব প্যালেস। সিরাজদ্দৌলার হাজার দুয়ারি। একবার দেখে এলে কেমন হয় ?

আগে থেকেই সব বন্দোবস্ত ছিল। স্টেশনে গাড়ি মজুত। লোকজন সব ঠিকঠাক। কৃষ্ণা তার মস্ত স্যুটকেশটা নামাবার চেষ্টা করতেই কার্তিক বোস হাঁ হাঁ করে উঠলো, আরে রাখুন রাখুন। ছেড়ে দিন, আমরা আছি কি করতে ? কিছুতে হাত দিতে হবে না। সামনের জিপখানায় উঠে পড়ুন দেখি। এই যে মেয়েরা, আপনারা ভাই ওই বড় জিপটায় উঠুন, হ্যাঁ হ্যাঁ…

সঙ্গের মেয়েরা গুটি গুটি পায়ে জিপের ভিতরে বসে। কৃষ্ণা হাঁটতে হাঁটতে থমকে যায়। রাগী মেজাজী বিরক্ত কণ্ঠস্বরে চমক লাগে—। ছোটখাটো একটা ছেলেদের দল,উঠতি বয়সের ছোকরা। তাদের মধ্যেই কেউ বলছে। মাইরি নেপু, তোর জন্যে শালা এই ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে বসে বসে সেই দুপুর থেকে ভাপাচ্ছি। হিরোইন আসছে , সোহিনী মুখার্জি আসছে ! শালা বসে থেকে থেকে হাড় পাঁজরায় ব্যথা হয়ে গেল মাইরি। কটা শুঁফো ব্যাটাছেলে আর কটা হুমদো মেয়েছেলে ছাড়া কেউ নামলো না। ফরসা মতন ওই মেয়েছেলেটা ? ছোঃ !

কৃষ্ণা গায়ে কাপড় জড়িয়ে জিপে ওঠে।

বেশ বড় দোতলা একখানি বাড়ি নেওয়া হয়েছে। পুরোনো আমলের বাড়ি। সামনে পেছনে নানারকম গাছ। নারকেল বাতাবী আম লিচু পেয়ারা। পূর্ণিমার আলোয় চারদিক আলোময়। চামেলি ফুলের তীব্র গন্ধ আসছে। বেল জুঁইও ফুটেছে বোধহয়। কৃষ্ণা জোরে জোরে শ্বাস নিল।

দোতলায় থাকবে মেয়েরা। পর পর অনেকগুলো ঘর। একেবারে কোণের ঘরটায় সুভাষবাবু, ক্যামেরাম্যান।

নিজের ঘরখানিতে গিয়ে কৃষ্ণা একটু অবাক হলো। তকতকে ঝকঝকে ধোয়া মোছা ঘর। ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই। খাট বা চৌকি জাতীয়ও কিছু নেই। কৃষ্ণার সঙ্গে কোন বিছানাপত্র এমনকি একখানা চাদরও নেই। এসব আনার কথা ছিল। ইচ্ছে করেই কৃষ্ণা আনেনি।

ঘরের কোণে হারিকেনের মৃদু আলো। এ বাড়িতে লাইট নেই। কৃষ্ণার গাটা একটু ছমছম করে উঠলো। এরকম একেবারে একা আত্মীয়পরিজন শূন্য পরিবেশে সে কখনও আসেনি। সামনে খোলা ছাদ। ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে ? হঠাৎ যেন মনে হয় বৃষ্টি আসবে। চাঁদ ছায়াচ্ছন্ন। বাতাসে কেমন ভিজে গন্ধ। যা গরম পড়েছে, বৃষ্টি আসতেই পারে। শন শন হাওয়া। হারিকেনটা দপ করে নিভে গেল। পাশের ঘরে মেয়েদের কথা শোনা যাচ্ছে। জলের আওয়াজ। ওপরে কেউ জল টেনে তুলছে। কেউ বোধহয় চান করতে গেল। ওই তো সুভাষবাবুর গলা শোনা যাচ্ছে। আলোর ভালো ব্যবস্থা নেই দেখে সুভাষবাবু রেগে গেছেন। বেশ মেজাজের সঙ্গে কার্তিক বোসকে বলছেন, ঘরে একখানা তক্তপোষ পর্যন্ত নেই হে, আমি আমার জন্যে বলছিনে, কিন্তু মেয়েদের অসুবিধে হবে। সেটাই আমার লজ্জা। আমার দোষ আমাকেই তো বলবে।

একখানা বড় বাতি নিয়ে ঘরে ঢুকলো দুজন। তাদের সঙ্গে সুভাষবাবু। খুবই লজ্জিতভাবে মাথা নিচু করে কৃষ্ণার ঘরের সামনে দাঁড়ালো, দেখুন দেখি ভাই কী কাণ্ড ! কার্তিকটা আমাকে একেবারে ডোবালে। ঘরে একখানা চৌকি টৌকি চেয়ার নেই…শুধু মেঝেতে…। এই নাড়ু বিছানাপত্র সব পেতে দে। এককুঁজো জল…

ক্যামেরাম্যান হেসে বললেন, সুভাষদা অত ভাবছেন কেন ? আউটডোর স্যুটিং, ধারে কাছে কোন হোটেল নেই। আর আউটডোর স্যুটিং এরকমই হবেই। মনে নেই আপনার সেই 'সকালের দিকে' ছবিটা করার সময় মাঘ মাসে খড় জড়িয়ে আমি আর আপনি…হা হা হা

সুভাষবাবুও হা হা করে হাসলেন, সে একটা আলাদা জমানা। তবে ঋত্বিক আমার পুরোনো বন্ধু সে যদি শোনে তার বোনকে আমি…খড়ের হা হা সে আমাকে ফাঁসিকাঠে…

ওই দ্যাখো বৃষ্টি এসে গেল। ওঁরা দ্রুত নিজেদের ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করতে চলে গেলেন।

কৃষ্ণা ভিজে হাওয়া, বৃষ্টির মধ্যে নিশ্চুপ

দাঁড়িয়ে থাকে। বৃষ্টির ছাঁট ঘরে ঢুকছে। জানলা দরজা বন্ধ করতে ইচ্ছে হয় না তার। অদ্ভুত ছায়ামাখা মেঘলা পরিবেশে কৃষ্ণার মনে হয়, জীবনটা যেন হঠাৎই কেমন পালটে গেল। এইরকম একা সে কখনও ঘরের বাইরে আসেনি। আসবার তাগিদও অনুভব করেনি। তবে কিছুদিন থেকেই মনের ভেতর একটা ক্লান্তি অনুভব করছিল সে। কি করবে বুঝতে পারছিলো না। তবে বুঝতে পারছিল একটা কিছু করা দরকার। একটা কিছু করতে হবে। নিজস্ব একটা পরিচয় তার নিজের মতন করে তৈরি করে নিতে হবে। ছবিতে অভিনয় করার কথাটা তার মাথাতে ছেলেবেলা থেকেই ছিল। কিন্তু সাততাড়াতাড়ি স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ঢুকতেই বিয়ে হয়ে গেল। তারপর তো শুধু সংসার আর সংসার। ইদানীং ছবি আঁকার কথাটা ও ভাবছিল খুব। কিন্তু সিদ্ধার্থ যেই বললো, ছবি আঁকাটায় তোমার হাত ছিল, ওটাতে মন দিলে…

অমনি কৃষ্ণা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। সিদ্ধার্থর কোন পরামর্শ তার ঠিক গ্রহণ করতে ইচ্ছে করে না। কিসে মন দিলে কি হয় সেটা ও নিজেই ভেবে নেবে। সে বুদ্ধিটুকু কৃষ্ণার আছে।

মা-মাসিদের মতন ছকে বাঁধা জীবনও তার আর ভাল্লাগেনা। হঠাৎ কোন নতুন পরিবেশ নতুন কিছুর জন্যে মন আনচান করে। আর এটাও ঠিক যা কিছু করতে ইচ্ছে করে একেবারে একলা। সেইজন্যেই ও সঙ্গে কারুকে আনেনি। আজকাল নির্জনতার জন্যে মনটা বড় কাঙাল হয়ে থাকে। এই নিরিবিলি একাকিত্বের ভিতরে সবার থেকে আলাদা করে নিজেকে খুঁজে নিতে ইচ্ছে করে।

একটা সাত আট বছরের ছেলে দরজায় টুকটাক আওয়াজ করছে। কৃষ্ণা খোলা ছাদে যেতেই দেখতে পায়। কৃষ্ণা সাড়া দিতে ছেলেটা ঘরে ঢোকে। একে একে সব রাখে। এক কুঁজো জল। চা। এক প্লেট নিমকি। চিঁড়েভাজা। বড় বড় সন্দেশ। রসগোল্লা।

ছেঁড়া হাফপ্যান্ট পরা গোলমুখ একটু গোলগাল চেহারার ছেলেটার কাজের নিপুণতা দেখে কৃষ্ণা অবাক হয়। কোন চায়ের দোকানে কিংবা কারুর বাড়িতেও এত ছোট বাচ্চা ছেলেকে ও কখনও কাজ করতে দেখেনি। কৃষ্ণা জানতে পারে ওর নাম নাড়ু। বাপকে কোনকালেই দেখেনি। মা আছে। ওর মা এখন পুরী-তে। গরমের পরেই তো বর্ষা। আষাঢ় মাস। জমজমাট রথযাত্রা। এই রথযাত্রার সময় ওর মা পুরীতে একাজে ওকাজে দুটো পয়সা পায়।

নাড়ু হাসে। ঢিলে প্যান্টটা বুকের ওপর পর্যন্ত তুলে বাঁধার চেষ্টা করে বলে, মা বলে এখন এদিক ওদিক দুটো খুঁটে খাবি, মোটে তো দুটো তিনটে মাস, তারপরেই আমি এসে তোকে ভালো মন্দ এটা ওটা খাওয়াবো। তারপর আমি মানুষ হয়ে গেলে… কৃষ্ণা হাসে, তুই মানুষ হয়ে গেলে কি করবি? তোর মাকে আর কাছছাড়া করবি না, না রে?

নাড়ু জোরে মাথা নাড়ে। না কখনো না। মা তখন আর খাটবে না।

নাড়ু দ্রুতহাতে ঘরের মেঝে পরিষ্কার করে। বিছানা না পেয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার বেডিং কোথায় গো, বিছানা নেই?

কৃষ্ণা হাসবার চেষ্টা করে বলে, ও আমি সব ঠিক করে নেব রে নাড়ু, তুই এখন যা, আর এত কে খাবে রে? আমি কি রাক্ষস নাকি?

ঝিম ধরা বৃষ্টি। বোধ করি সারা রাত চলবে। কৃষ্ণা পায়ে চটিটা গলিয়ে বাথরুমের দিকে যেতে গিয়েই থমকে গেল। তার সঙ্গে আসা মেয়ে বউগুলি বেশ জমিয়ে বসেছে। কৃষ্ণার চোখে চোখ পড়তেই হাসলো। কিন্তু ডাকলো না। কৃষ্ণা ঘরে ঢুকতেই ওরা যেন কিছু শঙ্কিত। কৃষ্ণা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এরই মধ্যে কেমন গুছিয়ে বসেছে এরা। শতরঞ্চি কাঁথা ছড়িয়ে বিছানা পাতা হয়েছে। দড়ির আলনায় ছাপা শাড়ি দুচারখানা। পাট পাট ঝুলছে। একরাশ মুড়ি খবরের কাগজে ঢেলে কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ দিয়ে খাচ্ছে। আর হুসহাস করছে।

কৃষ্ণাকে ওরা বসতে বললো না, আবার একমুঠো মুড়ি তুলে নেবার অনুরোধও করে না। কৃষ্ণা বুঝতে পারে ওরা কৃষ্ণাকে নিজেদের সমগোত্রীয় ভাবছে না বলেই কোন অভ্যর্থনা নেই।

মুড়ি চিবুতে চিবুতে বয়স্কা বউ দুটির একজন বললো, অনেক দিন এ লাইনে আছি তো ভাই, তাই স্টুডিয়োর বাইরে আনাচকানাচ যেতে গেলেই আমরা বাপু মুড়ি প্যাঁজ বেঁধে ছেঁদে আনি। কে কখন কোন্‌কালে খেতে দেবে তার ঠিক আছে? মুক চেয়ে বসে থাকতে পারিনে।

অল্প বয়সী নীল ছাপা পরা বেণী ঝোলানো রোগা পাতলা মেয়েটা তিরতির করে হেসে বললো, আপনাকে বেশ একখানা বড় ঘর দিয়েছে না? আর আমাদের পাঁচজনের জন্যে এই ছোট্ট ঘরখানা…। সোহিনী মুখার্জিকে তো বাংলোয় রেখেছে।

কাঁচা লঙ্কায় মোক্ষম একটা কামড় লাগিয়ে বয়স্কা বউটি বললো, আমরা হলুম গিয়ে একস্ট্রা বুঝলিনে মায়া, আমরা কি হেরোইন? তবু যদি আমাদের ছাড়া সিনেমা হোত? মেয়ে দুটি কলকল করে ওঠে, মাইরি দিদি, তুই গোরু দুইতে ভাগ্যি করে শিকেছিলি, কোন্ হিরোইন পারবে? লাথি মেরে গোরু এমন পা ঝাড়া দেবে হিরোইন উলটে কোন্ দিকে?

ওরা হাসে। মুখে আঁচল চাপা দেয়।

বয়স্কা বউটি হাসে না। থমথমে মুখে বললো, গয়লার মেয়ে। এ বাড়ি, ও বাড়ি নিজের বাড়ি গাই দুইয়ে গোরুর যত্ন আত্তি করে সংসার করিচি। গোরু না, মা ভগোবতী। তেনার দুধ খেইছি, বাছাদের খাইয়েছি। ঘুঁটে গোবর করে পয়সা এসেছে, ওতে কাপড়টা শায়াটা—বললে বিশ্বেস যাবি না তোরা গলায় এক ভরির বিছে হার পর্যন্ত গড়িয়েছিলাম, তখন সস্তা সস্তার বাজার ছেল তো। গোরুও গেল। আমিও গেলাম। এখন হন্যে হয়ে এ স্টুডিয়ো ও স্টুডিয়ো। দ্যাক না আসবার সময় বড় খুকিটার গায়ে জ্বর দেকে এসিচি। খুব জ্বর, চোকে মুকে আকার বিকার নেই। কিন্তু কি করবো বল ডুমুরদ ছেড়ে যেদিন কলকাতা শহর বাজারে এসিচি সেদিন আমার শরীলটা থেকে মায়া মমতাও গিয়েচে। এখন শুধু পয়সার জন্যে—দুটো পয়সার জন্যে এই ঝড়বাদলার দিনে…।

ওদের কথা বলার মধ্যে নাড়ু আসে। চা জলখাবার। ওরা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো নাড়ুর ওপর, কি রে এত দেরি করলি কেন রে ছোঁড়া? চিঁড়েভাজা? বাঃ বেশ গরম আছে এখনও, মায়া, সন্দেশটা পরে খাবো। নিমকি দিয়ে চা খাই আয়।

অল্প বয়সী মেয়ে দুটি হাসে। বাব্বাঃ কতদিন পর সন্দেশ। তা বাপু এই সুভাষ চক্রবর্তীর ছবিতে কাজ করে সুক আছে। খাবার দাবার ভালো দেয়। আর ধরো কেন টাকাটাও কম নয়—অন্যেরা যেখানে পঁচিশ টাকা দিতেই গাঁইগুঁই করে এ সেখানে পঞ্চাশ টাকা, মানে চারদিনে দুইশত, তাই না?

আমি বাপু স্টেশানে নেমেই আগে একখান শাড়ি কিনবো।

—কিনিস, কিনিস, এখন তো খা, নিমকিগুলো খুব মুচমুচে হয়েচে।

কৃষ্ণা যে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে যেন ওদের লক্ষ্যই নেই। খুবই অপ্রস্তুত মুখে কৃষ্ণা আস্তে আস্তে নিজের ঘরে আসে। আর ঘরে ঢুকেই অসম্ভব চমকে ওঠে। বীভৎস চেহারার কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। কে? কে? কে?…

অল্প আলোয় দেখতে পায় একটা মেয়ে। সারা মুখে গায়ে শাদা কালো খয়েরি ছোপ ছোপ। চুলগুলোও শাদা। শ্বেতী। শ্বেতী হয়েছে মেয়েটার। রোগটা এমন যে বয়সটা কত ঠিক বোঝা যায় না। মেয়েটা হেসে বললো, আমার নাম ভবানী। নাড়ুর মুখে শুনলাম, আপনার ঘরে জল ঢুকেছে। তাই মুছে দিয়ে গেলাম। আপনার বিছানা কই? দিন না পেতে দিয়ে যাই? আপনি চা-টা কিছুই খাননি কেন? রাত্রে কি খাবেন? লুচি? না ফ্রায়েড রাইস?

মেয়েটা দেখতে বীভৎস হলেও কথাটি চমৎকার। রিনরিনে। আর কলকল করে কথাও বলতে পারে খুব। কিন্তু কৃষ্ণার এখন কারুর সঙ্গেই কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কার ওপর যেন প্রচণ্ড অভিমানে অন্ধ রাগে ও দিশেহারা হয়ে আছে। কৃষ্ণা কোন কথার উত্তর দিল না। দরজাটা বন্ধ করে দিতে দিতে বলে, রাত্রে আমি কিছুই খাবো না। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আমি খুব ক্লান্ত। আমি এখন ঘুমুবো।

ভিজে হাওয়া। স্যাঁতসেঁতে মেঝে। কৃষ্ণা দুরন্ত অভিমানে মেঝের ওপর শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগলো। কাঁদতেই লাগলো—যতক্ষণ না বুকের ভার কমে ততক্ষণ পর্যন্ত। বারবার মনে হতে লাগলো একবারও সিদ্ধার্থ ওকে আসতে বারণ করেনি। ও যে একলা কোনদিন কোথাও এরকম এক অচেনা পরিবেশে আসেনি সেটা কি সিদ্ধার্থ জানে না?

হঠাৎ কৃষ্ণার কান্না থেমে গেল। বুকের মাঝখানটায় রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে ওঠে। টুবলাই

সবসময়—মা বাবার ছবি আঁকে কেন ? হাত উলটে ঘড়িটা দেখলো, রাত একটা প্রায়। ছেলেটা কি ঘুমুচ্ছে ? সিদ্ধার্থর ঘুম আসছে ? ওখানে কি আজ সন্ধেতে বৃষ্টি হয়েছে ?

পরের দিন অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙতেই কৃষ্ণা চমকে উঠলো। আজ খুব ভোর ভোর স্যুটিংস্পটে যাওয়ার কথা। কিন্তু কই কেউ তো আসেনি। ডাকেওনি তাকে। তবে কি ওর কোন ব্যবহারে ওরা অসন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণাকে আর সিনেমাতে নেবেই না। কৃষ্ণা সন্ত্রস্ত পায়ে আগে পরিচালক সুভাষবাবুর ঘরের দিকে যায়। খুবই অপ্রস্তুত হয়ে গেল কৃষ্ণা। সুভাষবাবুর ঘরে মেঝেতে টুলের ওপর বসে আছে নতুন ছবির নায়িকা সোহিনী মুখার্জি। কথা বলছে হাসিমুখে। বেশ চান টান করে খোলা চুল পিঠে ছড়ানো। ঘিয়ে রঙের লালফুল ছড়ানো শাড়ি। আকুলভাবে কয়েক ঝলক দেখলো কৃষ্ণা। ছবিতে যেরকম চোখ ধাঁধানো সুন্দরী মনে হয় তেমন নয়। তবে চোখ মুখ হাসি, কথা বলার ধরন এমনই যে বারবার দেখতে ইচ্ছে করবে। শরীরের গড়নটিও বড় চমৎকার। কোথাও কোন অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে না।

কৃষ্ণা অবাক হয়ে দেখছে তো দেখছেই। সুভাষবাবু আলাপ করাবার আগেই সোহিনী হাসি মুখে বলে, নতুন মেয়ে, এরই কথা আপনি বলছিলেন না দাদা ? বাঃ! বেশ। আমার সঙ্গেই এর কাজ ? তা ভাই দেখছেন তো বৃষ্টির দাপট। এখনও ঝিরঝির। কি করে যে কি হবে ? আমি আর চুপচাপ হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারলাম না। চান টান করে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এসে দেখি দাদা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন।

খুবই স্নিগ্ধ আন্তরিক কথাবার্তা। কৃষ্ণার ভালো লাগছিল। সুভাষবাবু মুখটুখ ধুতে উঠে গেলে সোহিনী কৃষ্ণাকে একথা ওকথা জিজ্ঞেস করে। ঘর সংসারের কথা। ছেলেমেয়ে আছে কিনা, কত বড়।

কৃষ্ণারও খুব জানতে ইচ্ছে করে। সোহিনীর বাড়ি ঘরদোর সম্পর্কে ও তো কিছু জানে না। শুধু কাগজেপত্রে যেটুকু জেনেছে। তা কি জানবার মতন কথা ? স্ক্যাণ্ডাল আর স্ক্যাণ্ডাল। ডজনখানেক বিয়েই নাকি করেছে সোহিনী। যদিও আইনত ও কারুরই বউ, নয়।

সোহিনীকে ঢকঢক করে এক জগ জল খেতে দেখে আরো একটা কথা মনে পড়লো কৃষ্ণার। সোহিনী নাকি মদ ছাড়া জল খেতেই জানে না, এরকম কথাও কোন্ কাগজে একবার যেন ফলাও করে লিখেছিল।

কৃষ্ণা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সেও কিশোরীর লাবণ্যে টলটল করছে শরীর। কারুর মনে এত বিষাদ, এত বিচ্ছিন্নতা, অত ভাঙচুর থাকলে তার শরীর কখনও এমন হতে পারে। শুদ্ধ তপস্বিনীর মতন বসে আছে সোহিনী। কৃষ্ণা মুগ্ধভাবে দেখতে লাগল।

সোহিনী বললো, তোমার বয়স অল্প, আমি তোমাকে তুমিই বলবো, আপত্তি নেই তো ? দেখো, তোমাকে দেখেই আমার খুব ভালো লেগেছে। এক একজনকে এরকম লাগে। আর আমার এটা একটা বাজে অভ্যেসও বলতে পারো। কি মেয়ে কি পুরুষ হুট করে মানে যখন তখন কারুকে না কারুকে ভালো লেগে যায়। তাই বলছি, এ লাইনে এসেছ, মন চেয়েছে, কাজ করবে। ভালো কথা। নাম হবে। যশ পাবে। প্রতিপত্তি হবে, সব হবে। কিন্তু কখনো লোভে পা ডোবাবে না। তাহলেই তুমি শেষ। মেয়েমানুষের লোভ ভালো নয় কৃষ্ণা। কোন প্রলোভনেও পড়বে না। সবসময় তেজ রাখবে। তেজী মেয়েকে সবাই পুজো করে। তার কাছে পাপ ঘেঁষতে ভয় পায়। আর তুমি তো আমার মতন ঝাড়া হাত পা নও। এর মধ্যেই তোমার ছেলে হয়েছে। তুমি সংসার নষ্ট করো না কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা থর থর করে কেঁপে উঠে বললো, কেন সংসার নষ্ট হবে কেন ?

সোহিনী হাত তুললো, কিছু গড়ে তুলতে গেলে খুব সময় লাগে কৃষ্ণা। কিন্তু ভেঙে ফেলতে ? এক মুহূর্ত ? এই একটা দেশলাইয়ের কাঠি।

কৃষ্ণা কিছু বলবার আগেই ক্যামেরাম্যান প্রোডাকশন ম্যানেজার হৈ হৈ করে খবর দিলেন, স্যুটিং হবে। আকাশের যা অবস্থা তাতে আর বৃষ্টি হবে না বলেই মনে হয়। সোহিনী খুব খুশি হয়ে বললো, তাহলে এক্ষুনি স্পটে পৌঁছে যাওয়া যাক, মেক আপে বসে পড়ি দাদা ? কসটিউমতো আমার সঙ্গেই আছে।

নিজের ঘরে এসে কৃষ্ণা কাপড় জামা গুছিয়ে নিচ্ছিল। চান করতে ইচ্ছে করছে না। সারারাত মেঝেতে শুয়ে গায়ে ব্যথা। মাথা ভার। জ্বরও আছে অনেকটা।

—আপনাকে আর এক কাপ চা দেব দিদিমণি ?

কৃষ্ণা চমকে তাকালো। সেই মেয়েটি। শ্বেতী রোগে ওর চোখ মুখ রাত্রের অন্ধকারে যতখানি বীভৎস দেখাচ্ছিল দিনের আলোতেও তার কোন হেরফের নেই।

কৃষ্ণা মাথা নাড়ে। নাড়ু এসে চা দিয়ে গেল। মুখখানা হাসি হাসি করে কৃষ্ণাকে দেখলো কয়েকবার। নাড়ুর মা গেছে রথের মেলায় কাজ করতে। বাবা জগন্নাথের রথ সারতে সুরতে এখনও অনেক দেরী। সেই বর্ষা কেটে গেলে তবে ফিরবে ওর মা। ততদিন এখানে ওখানে খুঁটে খেয়ে বড় হবে নাড়ু।

ভবানী দিদি, তুমি চা খাবে ?

ভবানী ঘর মুছতে মুছতে ন্যাতা হাতে উঠে দাঁড়ায়—এখানে মাটির ভাঁড়তো নেই রে নাড়ু, চা কিসে খাবো ?

নাড়ু নিচে যায় ভাঁড় আনতে।

ভবানী ওর শাদা ঠোঁট মেলে হাসিমুখে বলল, ওর মা গেছে কাজের খোঁজে সেই জগন্নাথ ধাম, পুরী —

তা ছেলেটা আমার খুব ন্যাওটা, রাতদিন আমার পেছু পেছু ঘোরে।

নাড়ু এক ভাঁড় চা দিয়ে গেলে পা ছড়িয়ে বসে ভবানী চা খায়। কৃষ্ণাকে এটা ওটা জিজ্ঞেস করে। মেয়েলী প্রশ্ন। আবার নিজের কথা বলতেও ছাড়ে না। খুব ছলবলে স্বভাবের মেয়ে ভবানী। বয়স আর কত হবে ? আঠারো চলছে। মোটামুটি ভদ্রঘরেরই মেয়ে। রোগবালাই না হলে এতদিন বিয়ে থা হয়ে যেত কবে। তবে সংসার টংসার হয়নি বলে সেরকম কোন দুঃখ নেই ভবানীর। আর একটা জিনিস একেবারেই নেই, সেটা হোল ভয়। ভয় কাকে বলে ভবানী জানে না।

কলকল করে বললো, আমি ভয় পাবো কি দিদিমণি, লোকেই আমাকে ভয় পায়, সারারাত বনে বাদাড়ে পড়ে থাকলেও আমার কোন ভয় নেই। আমার শরীল একেবারে ধোওয়া তুলসীপাতা হয়ে আছে গো দিদিমণি, ঘরে বাইরে বেটাছেলের মতন খাটি, কেউ একবার চাইবে না—বয়স্কা মেয়ের কেমন সুবিধে বলো দেখি ? শুধু ওই ছেলেটা, নাড়ু, রাত্তিরবেলা আঁকুটির মতন আমাকে জড়িয়ে ঘুমুবে। কিছুতে ছাড়াতে পারবে না।

ভবানীর চোখ ছলছল হয়ে উঠলো। কৃষ্ণার মনে হলো একটা কুমারী তৃষ্ণার্ত মা তার সামনে বসে আছে। টুবলাইয়ের মুখটা মনে পড়তেই কৃষ্ণা আর নিজেকে সামলে নিতে পারে না। হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো।

ভবানী চমকে উঠে বললো, একি কাঁদছেন কেন ? কি হয়েছে ? চুপ করুন, চুপ করুন, এক্ষুনি স্যুটিং হবে, নিন, কি খাবেন বলুন তো ? কাল থেকে খাওয়া নেই ঘুম নেই একখানা চাদর পর্যন্ত আনেননি আপনি ? আমাকে বলতে কি হয়েছিল ? শুধু শুধু ইচ্ছে করে কষ্ট। কাল যেমন হিরোইনের ঘর পরিষ্কার করতে গেছি, ওমা সেও দেখি বিছানায় উপুড় হয়ে সমানে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। আমি তো একেবারে থ। কি বলবো ভেবে পাই না—আজ সকালে দেখি হাসতে হাসতে পুকুর পাড় দিয়ে এ বাড়ি এলো। কি জানি বাবা—কিসের দুঃখে অমন মানুষের অত কান্না আসে।

কৃষ্ণাও থমকে গেল। অত সুখী সফল পরিতৃপ্ত সোহিনী মুখার্জিও তাহলে সত্যি সত্যি কাঁদে ? কিন্তু কেন ?

স্যুটিং স্পটে গিয়ে কিন্তু ভারী খুসি হলো কৃষ্ণা। বেশ সাজ সাজ ভাব। গোছগাছ হয়ে গেছে। ক্যামেরাম্যান আলো দেখছেন বার বার। সুভাষবাবুও ঘুরছেন ফিরছেন। বার বার দেখছেন পর পর দুটো শট সোহিনীর। সুভাষবাবু হাত তুলে বললেন, ওকে সোহিনী, কমপ্লিটলি ওকে। আই অ্যাম হ্যাপি সোহিনী—

সোহিনী চুপ করেই আছে। কথা বলছে না। আপনমনে কি যেন বলছে। খুবই আত্মস্থ ভাব। পাড়াগাঁয়ের কুমারী মেয়ে সেজেছে। গাছ কোমর করে শাড়ি পরা। ডুরে শাড়ি। কোমরে আঁচল জড়ানো। উঁচু করে খোঁপা বেঁধেছে। কপালে কালো টিপ। খোঁপায় বুনো ফুল। সোহিনীর বয়স যেন আরো কম দেখাচ্ছে। নাকে নোলক পরে অল্প অল্প শরীর দোলাচ্ছে সোহিনী। ভাঙা মন্দিরে

পুজো দিতে এসেছে। চারদিকে গাছগাছালি। সবুজ গন্ধ। সোহিনীর চোখে জলের আভাস।

সুভাষবাবু কাছে ডেকে কৃষ্ণাকে ডায়লগ পড়ালেন। আগে থেকে ডায়লগ দেওয়াটা, বিশেষ করে নতুন যারা কাজ করতে আসে তাদের তিনি স্যুটিং-র পূর্বমুহূর্তে বলে দেন। একেবারে নিজস্ব ভাবটি ধরে রাখার চেষ্টা করেন সুভাষবাবু।

ডায়লগ শুনে খুশি হলেন। কিন্তু শটটা নিতে যাবার সময়ই গোলমাল।

ক্যামেরাম্যান সমীর মিত্র বললেন, সুভাষদা মেকআপ ঠিক করতে হবে কৃষ্ণার। ও তো সোহিনীর দিদি, কিন্তু ক্যামেরা দেখুন, ওকে কি দিদি বলে মনে হচ্ছে? খুবই কম বয়স মনে হচ্ছে।

সুভাষবাবু বিব্রত। অল্পবয়সী মেয়ে। আমি তো সে কথা ঋতেনবাবুকে বারবার বলেওছিলাম তিনি শুনলেন না।

সমীর মিত্র বললেন, এই যে বকসিবাবু, এতদিন তো মেকআপে আছেন, কিন্তু একজন বয়স্কা বিধবার মেকআপ কেমন হবে জানেন? এঁর নোখে এখনও নেলপালিশ রয়ে গেছে। টোন ডাউন করান। চোখের কোল গালটাতে খয়েরি—তবে তো এফেক্ট আসবে। কালোপাড় শাড়ি ঠিক আছে,থান পরাতে হবে না। চোখে মুখে বেশ ভাঙচুর চাই—

কৃষ্ণার দিকে চেয়ে সমীর মিত্র অপ্রস্তুতভাবে বললেন, নিজের মেকআপের কথা শুনে খারাপ লাগছে তো আপনার? কিন্তু উপায় নেই, ক্যামেরা বড় সূক্ষ্ম জিনিস, সে কারুকে রেহাই দেয় না—সোহিনীদিকে দেখুন, এখন আর ওনার হিরোইনের রোল করা ঠিক না। ক্যামেরায় মুখ খুব ভারি আসছে—বয়স ঢাকতে ক্যামেরার কারসাজি আর কত করতে পারি? কিন্তু এসব ব্যাপার ঠিক বলাও আমার পক্ষে···।

ছোট্ট আয়নায় মুখখানা দেখে অসম্ভব চমকে উঠলো কৃষ্ণা! এ কে? এ কাকে দেখছে কৃষ্ণা? এ কি সেই সুন্দর উজ্জ্বল চেহারার সুখী সম্পন্ন মেয়ে কৃষ্ণা? চোখ মুখ কালি ঢালা। বিষণ্ণ। বেদনার্ত। নিরন্ন অসহায় বিধবাবেশ! কপালে টিপ নেই। হাতে কানে গলায় কোথাও কোন সৌভাগ্য চিহ্ন নেই। শরীর থেকে যৌবন মুছে নিয়ে এ কাকে এরা দাঁড় করিয়েছে?

বেশ কয়েকদিন ধরে মানসিক ক্ষত-বিক্ষত জ্বরো শরীরে কৃষ্ণার যেন হঠাৎ জ্বর এলো। চোখ মুখ অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কৃষ্ণা। তার মাথা টলছে। দুহাতে মুখ ঢেকে কৃষ্ণা বসবার জায়গা খুঁজতে লাগলো।

সমীর মিত্র বললেন, সুভাষদা মনে হচ্ছে ওনার শরীরটা ঠিক নেই, উনি কি শট দিতে পারবেন?

সুভাষবাবু চিন্তিত মুখে এগিয়ে এসে কৃষ্ণার পিঠে হাত রাখলেন, বলো তো ভাই, কি অসুবিধে হচ্ছে? খুলে বলো, লজ্জা কি? এই তো আমরা তোমার পাশে সবাই আছি। কি হয়েছে কি?

কৃষ্ণা তাকালো। হঠাৎ যেন খুব রোদ্দুর উঠেছে চারদিকে। বৃষ্টির পর মিঠে রোদে চারদিক ভাসছে। ভাঙাচোরা গরীব জীর্ণ বাড়িটাও কেমন আলোময়। কাছাকাছি খুপড়ির নিচে বসে আছে সেই মেয়েবউগুলি। ওদের আঁচল ভর্তি ডুমুর আর বকফুল। সুভাষবাবু ওদের মধ্যেই সবচেয়ে বয়স্কা মেয়েটিকে ডাকলেন, তুমি ওই বিধবা বউটির রোলটা করতে পারবে?

বউটি আঁচলের ডুমুরগুলো ঢাকবার চেষ্টা করতেই সমীর মিত্র বললেন, সুভাষদা, একেবারে ফিট। ওগুলো আঁচলে যেমন আছে থাকুক না, সুভাষবাবু বললেন, কোন মেকআপ লাগবে না, শুধু কাপড়টা বদলে আসুন। বক্সিবাবু আপনি···ওনাকে···

নিজের ঘরে অনেকক্ষণ একা বসে আছে কৃষ্ণা। ভবানী এসে বার দুই খোঁজ নিয়ে গেছে। কৃষ্ণা কোন কথা বলেনি। কি বলবে? কোন কথাই ঠিক মনে আসছে না। সে শুধু ভাবছে মাথাটি ওর হঠাৎ ওরকমভাবে ঘুরে গেল কেন? চোখে কেন কিছু দেখতে পাচ্ছিল না? সত্যি কী লজ্জার ব্যাপার? সবাই কি ভাবছে ওর সম্বন্ধে। এত বলা কওয়া। সিনেমা হবে। এই হবে। ওই হবে। শেষে কিনা এই? ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতেই পারলো না।

প্রোডাকশন ম্যানেজার কার্তিক বোস আমতা আমতা মুখ করে কৃষ্ণার দরজার কাছে এসে ডাক দিলেন। দিদিভাই এটা আপনার···এক হাজার আছে। একটা সই করে দিন তো ভাই···।

খামটা হাতে না নিয়েই কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করে, কিসের টাকা? কিসের কি? আমি তো কিছুই···

কার্তিকবাবু বুদ্ধিমানের মতন হাসি দিয়ে বললেন, এটা আপনার পারিশ্রমিক। ধরুন।

কৃষ্ণা তখনও অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখে কার্তিক বললেন, কাজ না হলো তো কি হলো? আপনি এসেছেন, সময়ের দাম নেই? সুভাষদা আমাকে বললেন, আচ্ছা আপনি সকালের ট্রেনেই যেতে চান, না বিকেলের দিকে···?

কৃষ্ণা আঙুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে বললো, সে আমি সুভাষদাকে সব বলে আসবো। উনি সন্ধেবেলা চলে আসবেন তো?

খাম থেকে টাকার গোছাটা বার করলো কৃষ্ণা। যদিও কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেনি তবু কাজে আসার জন্যেই টাকা। পারিশ্রমিক। নিজস্ব রোজগার। তবু টাকাটা হাতে নিতে ভালো লাগছে না। এই সেদিন পর্যন্ত নিজের রোজগারের জন্যে কী মোহ কী দুর্বলতাই না ছিল। রোজগেরে মেয়ে দেখলেই হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছে। ওরা রোজগার করে বলেই ওদের চালচলনের মধ্যে কেমন একটি আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করে কৃষ্ণা মুগ্ধ হয়েছে। মুগ্ধ হতে হতে কৃষ্ণা মরিয়া হয়ে উঠেছিল একসময়। সিদ্ধার্থর টাকা নিতে, কি খরচ করতে খুবই সঙ্কোচ বোধ করতো। মনে হত অন্যের টাকায় যেন সে ভাগ বসাচ্ছে, যেখানে তিলমাত্র নিজের গৌরব নেই। পরিশ্রম নেই। শুধু ওর স্ত্রী হয়ে স্ত্রী হবার গৌরবে সারাজীবন মাথা নিচু করে থাকতে হবে?

টাকাটা নেড়েচেড়ে সব কিছু বড় ছেলেমানুষি মনে হচ্ছে কৃষ্ণার। এটা সন্ধেবেলায় সুভাষবাবুর হাতে দিয়ে ক্ষমা চাইবে। ঋত্বিকদার কাছেও খুব ভালো করে ক্ষমা চাইতে হবে।

শুধু সিদ্ধার্থকে ও কিছু বলতে পারবে না। বুকের পাঁজরে হাড়ে মজ্জায় রক্তে মাংসে যে মানুষটা একাকার হয়ে থাকে তার কাছে কি ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়?

তবে একটু রাত হলেই জিজ্ঞেস করবে, সবচেয়ে জরুরী সেই প্রশ্নটা, টুবলাই কেন শুধু মা বাবার ছবি আঁকে।

আজকেও খুব বড় চাঁদ উঠেছে। ঝড় বৃষ্টির পর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সন্ধ্যাবেলা। কম বয়সি মেয়ে দুটি বোধহয় হাসিঠাট্টা করে চাঁদ ডাকাডাকি করছে।

বয়স্কা বউ দুটির গলা শুনতে পেল কৃষ্ণা, জানিস শ্যামলী, যাবার সময় একঝাড় লাউডগা নিয়ে যাবো, কচি কচি লাউ। আহা ডালবাটা দিয়ে রাঁদলে যা লাগে না। একেবারে অমিত্তী। একথাল ভাত উঠে যাবে।

কৃষ্ণা হাসে মনে মনে। অদ্ভুত ব্যাপার স্যাপার এদের। কয়েক পয়সার লাউশাক ডুমুর কলমীপাতার জন্যে হাঁকপাঁক করে মরছে সবসময়। তাও আবার বেঁধে নিয়ে যাবে। সঙ্গে করে। পারেও।

হঠাৎ কৃষ্ণা চমকে ওঠে। শুধু কি জিভের স্বাদ আর দুটো পয়সার জন্যে এরা হন্যে হয়ে লাউ কলমির জঙ্গল হাতড়ায়। বকফুল তোলে? ডুমুর জঙ্গলে ঘোরে। মনে হয় ওখানে কে যেন ওদের একান্ত আপনজন চুপ করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। সে ক্রমাগত ওদের ডাকে। হাতছানি দেয়। ওরা চুপ করে থাকতে পারে না। এই কাজ করতে আসার মধ্যে যত গ্লানি, যত উপেক্ষা অপমান দারিদ্র্য আছে সব সেখানে ওরা ধুয়ে মুছে দিয়ে আসে।

নইলে শাক ভর্তি আঁচলে গরু আর গোয়ালের গল্প বলতে গেলে ওদের চোখ অত ছলছলে হয়ে ওঠে? একটুখানি থাকার মতন মাটি, একটু শালপাতা একটা পোষা শক্ত অবোলা জীবের বেশি ওরা তো কিছু চায়নি। সেটুকুও যে কেন পায়না সেটা কৃষ্ণা বুঝতে পারে না।

কৃষ্ণার কানে আসে গাড়ির আওয়াজ। বোধহয় সোহিনীর গাড়ি। আজ স্যুটিং-র সময় কারুর সঙ্গে কোনও কথা বলেনি সোহিনী মুখার্জি। খুব তন্ময়তার মধ্যে বিড় বিড় করছিল। কাকে যেন খুঁজে পেতে চাইছিল সোহিনী। কটা গ্রাম্য গাছকোমর করে ডুরে শাড়ি পরা কোন যুবতীকে ডাকছিল সোহিনী? শুধু পোশাকে নয় ভিতরে বাইরে একেবারে এক হয়ে মিশে যাবার জন্যেই ওই ডাকাডাকি?

মা মা গো···। নাড়ু ডাকছে। ভবানীকে ও মাঝে মাঝে ভুল করে মা ডেকে ফেলে। ভবানীই হাসতে হাসতে বলছিল। কুমারী মেয়ে। মা ডাকে লজ্জা পায় না কেন? তখন কৃষ্ণার খারাপ লেগেছিল একটু।

এখন কানে বড় মিঠে লাগছে। চারদিকেই বড় ডাকাডাকির শব্দ। অনেক দিন এমন করে সমস্ত শরীর ধরে রক্তরা কৃষ্ণাকে ডাকেনি কেন? নাকি ডেকেছিল? কৃষ্ণা শুনতে চায়নি।

অঙ্কন : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

শুধু দেখতেই নয় খাসা,
স্পারটেক ফ্লোর্স নানা
গুণেও ঠাসা!
স্পারটেক
৫২, চ্যামিয়ারস্ রোড, মাদ্রাজ-৬০০ ০২৮
ভারতের
সবচেয়ে বেশী
বিক্রীর সিরামিক
ফ্লোর টাইল্স
আর, এতে পিছলে পড়ার ভয়ও থাকে না!

পশ্চিমবঙ্গের রুগ্‌ণশিল্প

অশোক সেনগুপ্ত

রুগ্ন শিল্পের সর্বভারতীয় তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ এবারও রয়েছে প্রথম স্থানে। ১৯৮৫ সালের ৩০ জুন সারা দেশে মোট রুগ্নশিল্পের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৭৮৩। এক বছর বাদে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৬০৬। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আছে ১৮ হাজার ৬২০টি রুগ্নশিল্প। তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লির ক্ষেত্রে সংখ্যাগুলি যথাক্রমে ১৫ হাজার ১৭১, ১২ হাজার ০৩৬ এবং ২ হাজার ২৭১। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী পি এ সাংমার সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে জানা গিয়েছে এইসব তথ্য। ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি রাজীব কলের হিসাবে দেশের মোট রুগ্নশিল্পের ২২ শতাংশ এই রাজ্যে অবস্থিত। 'ন্যাশনাল সোসাইটি ফর প্রিভেনশন অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকনেস'-এর সভাপতি ডি পি আচার্যের মতে, দেশের রুগ্নশিল্পগুলিতে আটকে আছে ২০ হাজার কোটিরও বেশি টাকা। 'মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স-এর একটি সমীক্ষাতে দেখা গিয়েছে একই চিত্র। ওই সমীক্ষায় বলা হয়েছে ১৯৮৫ সালের শেষ পর্যন্ত দেশে বড়, মাঝারি ও ছোট রুগ্নশিল্পের সংখ্যা যথাক্রমে ৬৩৭, ১১৮৬ ও ১,১৭,৭৮৩। 'কনফেডারেশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিজ' -এর একটি সমীক্ষায় প্রকাশ, দেশের ৮০ শতাংশ রুগ্ন শিল্পই সাতটি শিল্পোন্নত রাজ্যে অবস্থিত। মোট সংখ্যার এক পঞ্চমাংশ এই রাজ্যে। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশে, তামিলনাড়ু, গুজরাত, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ রুগ্ন বড় শিল্পের সংখ্যা যথাক্রমে ১১২, ১০০, ৫৪, ৪৪, ৪৫, ২৯, ও ১৯। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদফতর সূত্রে জানা যায়, ১৯৮০ সালে এই রাজ্যে ধর্মঘট ও লক-আউটের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৮ ও ১৩০। নষ্ট হয় ৬ ১,৮১, ০৫৬ শ্রমদিবস। গত বছর ধর্মঘট ও লক-আউটে নষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২, ৭৩, ৮৬৪ ও ১,৪৫, ৬১, ১৫৫। এ বছর জুন মাস পর্যন্ত সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১,২৫, ৮০৯ ও ৯২, ৮৮, ৭৬৭।

১৯৮৬-৮৭ সালের রাজ্যসরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখা যায়, এই রাজ্যে বন্ধ কারখানার সংখ্যা ১০৫টি। সবচেয়ে বেশি বন্ধ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা। সংখ্যা ৩৩। কেমিক্যাল, তাঁতবস্ত্র, চা ও বিবিধ শিল্পে বন্ধ কারখানার সংখ্যা যথাক্রমে ৩, ৩, ৩ ও ৩৩টি। এইসব কারখানার সঙ্গে জড়িত আছেন মোট ১০,৪৯১ জন শ্রমিক। ওই সমীক্ষা অনুসারে ১৯৮৫ সালে রাজ্যের কলকারখানায় লক-আউটের সংখ্যা ছিল ১,৪৫,৭৫৫। ছাঁটাই হন ২৪৯ জন। অথচ

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী পি এ সাংমা এরাজ্যে রুগ্‌ণ শিল্পের দুরবস্থা ব্যক্ত করেছেন

১৯৮৪ থেকে ১৯৮৬ সালে—এই তিন বছরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্রুভালের দরখাস্ত আসে একশর বেশি। শ্রমদফতরের 'লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' বইতে প্রকাশ, ১৯৮৬ সাল রাজ্যে মোট শিল্পবিবাদ হয়েছে ৩, ৪৭০টি। তারমধ্যে 'সিটু' জড়িয়ে আছে ৪১২টি ক্ষেত্রে। আই এন টি ইউ সি এবং এ আই টি ইউ সি-র সংযোগ ছিল যথাক্রমে ৪১২ ও ১৭৮টি ক্ষেত্রে। ১৯৮৬ সালে ১৯টি বন্ধ কারখানার মধ্যে খুলেছে তিনটি। চারটি বন্ধ হয়েছে স্থায়ীভাবে। ১২টি এখনও বন্ধ। ১৯৮০ সালে ৯১টি ক্ষেত্রে ছাঁটাই হন ১০৪৩ জন। সংখ্যাটি এখন এক-চতুর্থাংশেরও কম। রাজ্যের বন্ধ ২১টি চটকল ও সাতটি সূতাকলে কর্মহীন হয়েছেন প্রায় ৭০ হাজার শ্রমিক। লক-আউটের কবলে পড়েছেন প্রায় লাখখানেক শ্রমিক। দীর্ঘ ও সাময়িক মিলিয়ে ক্লোজার চলেছে ৪৫৩টি সংস্থায়। সেগুলির কর্মীসংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ হাজার।

রুগ্ন শিল্পে রাজ্যের কেন এই হাল—তার উত্তর খোঁজার জন্য দেখা করেছি শ্রমমন্ত্রী শান্তি ঘটকসহ শ্রম ও শিল্প দফতরের একাধিক অফিসারের

পশ্চিমবঙ্গে রুগ্‌ণ শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম—চা শিল্প

সঙ্গে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, ব্যবসায়ী ও পেশাদার প্রশাসকদের মতামত পর্যালোচনা করেছি এই প্রতিবেদনে। সব মিলিয়ে আশাবাদের লক্ষণ খুব বেশি প্রতিফলিত হয়নি। বিস্তারিত আলোচনার আগে সামান্য আলোচনা করা যাক রুগ্ন শিল্পের সংজ্ঞা নিয়ে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সার্কুলার অনুযায়ী 'এনি কোম্পানি হুইচ হ্যাড ডিফলটেড ফর থ্রি কনসিকিউটিভ ইয়ার্স ইন রিপেইং দ্য লোনস অ্যান্ড ইন্টারেস্টস টু দ্য কনসার্নড ব্যাংকস, অলসো শোইং লসেস ফর থ্রি ইয়ার্স অর মোর ইন সাকসেসন, রেজালটিং ইন এরোশন অফ ইটস অ্যাসেটস, শুড বি ডিমড অ্যাজ এ "সিক ইউনিট"।'

১৯৭৬-৭৭ সালে রাজ্যের রুগ্ন শিল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। সে-বছর বাজেটে মোট বরাদ্দ করা হয়েছিল ১৬৬৩ কোটি টাকা। এক দশক বাদে অর্থাৎ ১৯৮৬-৮৭ সালে রুগ্ন শিল্পের জন্য বাজেটে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। দশ বছরে বৃদ্ধি হয়েছে সাড়ে তিন গুণের কিছু বেশি। এই আর্থিক বছরে বাজেটে মোট বরাদ্দ করা হয়েছে ৯৬১৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে এক দশকে বৃদ্ধির হার প্রায় ছয় গুণ। এদিকে শিল্পের উৎপাদন এরাজ্যে কমেছে অতি দ্রুত হারে। সারা ভারতে যে পরিমাণ শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয়, ১৯৭০ সালে মূল্যের দিক থেকে এরাজ্যে তার পরিমাণ ছিল দেশের মোট উৎপাদনের ১৪·৪ শতাংশ। ১৯৭৭ সালে সেটা নেমে দাঁড়ায় ১০·৯ শতাংশে। ১৯৮০-৮১, ১৯৮২-৮৩ ও ১৯৮৫-৮৬ সালে হিসেবগুলি ছিল যথাক্রমে ৯·৮ শতাংশ, ৯·২ শতাংশ ও ৭ শতাংশ।

রাজ্যের কলকারখানায় ধর্মঘট ও লক-আউটে নষ্ট শ্রমদিবস

	১৯৮৬			১৯৮৭ (জুন মাস পর্যন্ত)		
	সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কর্মী	নষ্ট শ্রমদিবস	সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কর্মী	নষ্ট শ্রমদিবস
ধর্মঘট	৩০	২৩,১৩০	২,৭৩,৮ ৬৪	২০	৩,৩৩১	১,২৫,৮০৯
লক-আউট	১৭৯	১,২৩,৭৭৮	১,৪৫,৬১,১৫ ৫	১৪৪	১,২৩,৭৫০	৯২,৮৮,৭৬৭

শিল্পে উৎপাদন কমলেও রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দফতরের রিপোর্টে দেখা যায় এ রাজ্যের কলকারখানায় বিনিয়োগকারী সংস্থার ঋণ বাড়ছে। ১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮৫-৮৬ এই পাঁচ বছরে এ রাজ্যের ২২ হাজার ৩০০টিরও বেশি ক্ষুদ্র শিল্পে 'প্রজেক্ট কস্ট' হিসাবে বিনিয়োগ করা হয়েছে ৩০৬ কোটি টাকার মত। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী ১৯৮৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নে খরচ করেছে ২৩৫ টাকা ২৭ পয়সা। গুজরাত, হরিয়ানা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ও তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে হিসেবগুলি যথাক্রমে ৬২৯ টাঃ ৪০ পঃ, ৪০৯ টাঃ ৯৪ পঃ, ৩৯৫ টাঃ ৮২ পঃ, ৪৯৫ টাঃ ৩৩ পঃ, ৩৭৯ টাঃ ১১ পঃ ও ৩৮৫ টাঃ ৯১ পঃ।

আশীর দশকে পশ্চিমবঙ্গে ক্লোজার

(সারণী-১)

বছর	কারখানার সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কর্মী
১৯৮০	৬৩	৬৭৫৬
১৯৮১	৪৯	৭৩৮৮
১৯৮২	৪৪	৪২৫৭
১৯৮৩	৫৯	৮৪৮৩
১৯৮৪	৪১	৩৪৭২
১৯৮৫	২৬	৫৩৪৩
১৯৮৬	১৯	৭৮০
১৯৮৭ (জুলাই পর্যন্ত)	১৫	২১৯

রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী শান্তি ঘটককে প্রশ্ন করেছিলাম রুগ্ন ও বন্ধ শিল্পের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ কেন সবার ওপরে? শান্তিবাবু জানান, দীর্ঘদিনের ঘটনা এটি। এর মূল কারণ তিনটি : (১) আই আর বি আইসহ বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও বিনিয়োগকারী সংস্থার অসহযোগিতা ; (২) কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ভ্রান্তনীতি এবং (৩) কল-কারখানার অধিকাংশ মালিকের অসাধুতা। কারণের সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি দেখান তিনি। তাঁর বক্তব্য, আই আর বি আই ব্যাঙ্কে পরিণত হওয়ার আগে যখন সেটি একটি কর্পোরেশন ছিল, বেশ কয়েকটি কারখানা তারা পরিচালনা করত। পরবর্তীকালে দেখা যায় পরিচালনায় গলদ থাকার জন্য কারখানাগুলির হাল অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। তাদের অদূরদর্শিতার ফলে বেঙ্গল পটারি, ন্যাশনাল ট্যানারি, শ্রীকৃষ্ণ রাবার, সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টারসহ বেশ কয়েকটা কারখানা বন্ধ হয়ে যায় বলে মন্ত্রী অভিযোগ করেন। তিনি জানান, দমদমের একটি অ্যালুমিনিয়মের কারখানা রুগ্ন হয়ে যাওয়ায় আই আর বি আই বিড়লাদের কাছ থেকে নেয়। ক্রমে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। সেটি খোলার জন্য আই আর বি আই রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা নেয়। কারখানাটি খোলা হলেও কিছুদিন বাদেই আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন আবার সরকারী উদ্যোগে সেটি খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। পুজোর পরেই উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

শান্তিবাবু অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় শিল্পনীতি এ রাজ্যের শিল্পে রুগ্নতার একটা বড় কারণ। এ রাজ্যের শিল্পপতিরা যাতে অন্য রাজ্যে গিয়ে ব্যবসা করেন সে কারণে কেন্দ্রীয় সরকার নানাভাবে তাঁদের প্রলোভন দেখাচ্ছেন। চাপ সৃষ্টি করছেন অন্যত্র বিনিয়োগের জন্য। খোদ দুর্গাপুর অঞ্চলেই দু'শর বেশি সহায়ক শিল্প ছিল কেন্দ্রীয় অধিকৃত সংস্থাগুলিকে যন্ত্রাংশ সরবরাহের জন্য। এখন ওইসব সংস্থা অধিকাংশই যন্ত্রাংশ আমদানি করছে বাইরের দেশ বা অন্য রাজ্য থেকে। ফলে সহায়ক শিল্পগুলি মার খাচ্ছে। রাজ্য সরকার এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বহুবার এ ব্যাপারে দরবার করা হয়েছে। কোনও ফল হয়নি। গ্র্যানুয়েল-এর তৈরি বস্তার প্রচলন বেড়ে যাওয়ায় চটকলগুলি মার খাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন গরিব পাটচাষীরা। এ ব্যাপারেও কঠোর কোনও আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে না। দুর্গাপুরের এসিসি-ব্যবকক লিমিটেড (এ বি এল)-এর কারখানাকে ভারত হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড ('ভেল')-এর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে দেওয়া হয়েছিল প্রথমোক্ত সংস্থাটিকে বাঁচাবার জন্য। কেন্দ্র তাতে রাজি নয়। এ রাজ্যের তিনটি কাগজের বড় কারখানা বন্ধ হয়ে আছে। সেগুলিকে চালু করার জন্য কেন্দ্রের সঙ্গে বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত তিনটি ব্যাঙ্ককে নিয়ে একারণে একটি 'কনসোর্টিয়াম'ও তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক উপযুক্ত সুযোগসুবিধা দিতে নারাজ। টিটাগড় পেপার মিলের কাঁকিনাড়ার কারখানা আই ডি বি আই বিক্রি করে দিতে বলছে। সব মিলিয়ে রাজ্যের কাগজ শিল্পের অবস্থা মোটেই ভাল না। বাধ্য হয়ে লোকসান সত্ত্বেও সরকারী উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প' চালাতে হচ্ছে।

মালিকদের দুর্নীতি এবং অসুবিধার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রমমন্ত্রী জানান, বহু কলকারখানার মালিক এই রাজ্যে বংশ পরম্পরায় ব্যবসা করে আজ তাঁদের মুনাফা বিনিয়োগ করছেন অন্য রাজ্যে। কেন্দ্রের পরোক্ষ হস্তক্ষেপও এর পেছনে কাজ করছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর অভিযোগ, বহু ব্যবসায়ী শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, এমপ্লইজ স্টেট ইনসিওরেন্স (ই এস আই) প্রভৃতি খাতে প্রদেয় টাকা উপযুক্ত জায়গায় জমা দিচ্ছেন না। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে এটা একটা ফাটল তৈরি করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম মন্ত্রক বা কেন্দ্রীয় প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে একাধিকবার। ১৯৫২ সালের এমপ্লইজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যান্ড মিসেলিনিয়াস প্রভিশন অ্যাক্ট-এর ১৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী গণ্ডগোল থাকার সন্দেহে আগের তুলনায় আরও বেশি মাত্রায় 'কেস' বিবেচনার জন্য উপযুক্ত জায়গায় পাঠানো হচ্ছে। এগুলির সুরাহাও হচ্ছে আগের তুলনায় অনেক বেশি (সারণী ৪)। রাজ্যের শ্রম দফতর এ কারণে রাজ্যের বিচারবিভাগীয় দফতর ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় একটি বিশেষ আদালত তৈরির কথা বিবেচনা করছেন। বিভিন্ন তহবিলে শ্রমিকদের প্রদেয় টাকা তছরুপের দায়ে

এ বছর ৩১ মার্চ পর্যন্ত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬/৪০৯ ধারা অনুযায়ী পুলিশের কাছে ২৫৭৪টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সম্প্রতি ১৬ জন মালিককে এ কারণে গ্রেফতার করেছে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের বকেয়া 'কেস'গুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য রাজ্য সরকার একজন ডব্লিউ বি সি এস পাস করা অফিসারকে বিশেষ পদে নিয়োগ করেছেন। এতে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে অনেকটা (সারণী ৫)।

এ রাজ্যের বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের কারণ হিসাবে মন্ত্রী কোনওভাবে শ্রম অসন্তোষকে দায়ী করতে রাজি নন। তিনি বলেন, কলকারখানার মালিকরা শ্রমিকদের টাকাপয়সা দেবেন না আর তার প্রতিবাদ করতে গেলেই শ্রমিক উচ্ছৃঙ্খলতার অভিযোগ ওঠে। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব দেখিয়ে তিনি বলেন, ১৯৮৬ সালে রাজ্যের মোট নষ্ট শ্রমদিবসের ৬৪·২২%-এর মূল কারণ আর্থিক সমস্যা, উপযুক্ত বাজার বা বিপননের সমস্যা প্রভৃতি। শ্রমিক সংকট, উচ্ছৃঙ্খলতা, গুণ্ডামি, শ্রমিকদের ঔদ্ধত্য প্রভৃতি কারণে ওই বছর শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে মোট দিবসের ৭·৫৭%। এ বছর পরিস্থিতির আরও উন্নতি হয়েছে। প্রথমোক্ত কারণে নষ্ট হয়েছে ৭৪·৪১%। শ্রমমন্ত্রী বলেন, মালিকরা তাঁদের সমস্যার যে কারণ দেখিয়েছেন তাতেও কিন্তু শ্রমিক অসন্তোষকে প্রাধান্য দেননি। ওই তালিকাতেই প্রমাণ হয়েছে আর্থিক বা অর্থনৈতিক সঙ্কটই কারখানাগুলিকে সমস্যায় ফেলেছে (সারণী ২)। তিনি বলেন, এবছর জুন মাস পর্যন্ত মোট নষ্ট ৯৪,১৪,৫৭৬ শ্রমদিবসের মধ্যে শ্রমিক ধর্মঘটের জন্য নষ্ট হয়েছে মাত্র ১·৩৪% অর্থাৎ ১,২৫,৮০৯ শ্রমদিবস। অন্যদিকে লক-আউটের জন্য নষ্ট হয়েছে ৯২,৮৮,৭৬৭ দিন। তিনি অবশ্য স্বীকার করেন এ বছর জুলাই মাসে তিনটি শিল্পের সম্মিলিত ধর্মঘটের ফলে ওই হিসেবের সামান্য পরিবর্তন হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে রুগ্নশিল্পের কারণ ও চরিত্র জানার জন্য দেখা করেছিলাম এ রাজ্যেরই এক সম্ভাবনাময় মেধাবী উদ্যোগী অশোক মুখার্জির সঙ্গে। 'সোনোডাইন' ইলেকট্রনিক দ্রব্যসম্ভার তৈরির মাধ্যমে গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে তিনি শিল্পপতিমহলে পরিচিতি পেয়েছেন। কোনও শিল্প রুগ্ন হওয়ার পেছনের কারণগুলিকে তিনি মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করেন। এগুলি হল: (১) উদ্যোগীর দক্ষতা বা ক্ষমতা; (২) অর্থনৈতিক বিষয় এবং (৩) পরিবেশ অর্থাৎ সরকারী নীতিতে পরিবর্তন, শ্রমিক সমস্যা, বিদ্যুৎ সমস্যা প্রভৃতি। তিনি বলেন, বৃহৎ শিল্পগুলির ওপর নির্ভরশীল ৮০ শতাংশ ক্ষুদ্রশিল্প রুগ্ন হয়ে পড়ে বৃহৎ শিল্পের নীতি বা রুগ্নতার ফলে। ছোট কল-কারখানাগুলি যন্ত্রাংশ সরবরাহ করার পরে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে টাকা পায় বড় শিল্পগুলির কাছ থেকে। ছোট অনেক উদ্যোগীকে এর ফলে সঙ্কটে পড়তে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতিগুলিও ছোট উদ্যোগীদের নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে উদাসীন। ব্যাঙ্ক বা বিনিয়োগকারী সংস্থা ঋণ শোধের ক্ষেত্রে ছোট উদ্যোগীদের সুবিধা সহজে দিতে চান না। বুঝতে চান না, বৃহৎ শিল্পের কর্তারা ক্ষুদ্র শিল্পের পাওনা টাকা না দিলে ঋণ শোধ করা কষ্টকর। 'মডভ্যাট' করা হয়েছিল ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের জন্য। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার 'মডভ্যাট'-এ শুল্ক নীতির কিছু পরিবর্তন করেছেন যার ফলে ছোট শিল্পগুলিকে বড় শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে।

পাট-শিল্প ক্রমশ ধুঁকতে ধুঁকতে এখন অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নের মুখোমুখি — ছবি: শৈবাল দাস

এ রাজ্যের শ্রমিক সমস্যা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কম বলে অশোকবাবু মানতে রাজি নন। তিনি বলেন, অনেক ক্ষেত্রে মালিক নিজের ব্যবহার বা দূরদৃষ্টি দিয়ে শ্রমিকদের অনুপ্রেরণা যোগাতে পারেন এটা ঠিক, তবে শ্রমিকদেরও বোঝা উচিত একজন উদ্যোগী একদিনে শিল্পপতি হন না। বহু ঝুঁকি, বহু পরিশ্রম ও অনিশ্চয়তার

কাঁচামালের জন্য বাড়তি খরচ এই রাজ্যে বস্ত্রশিল্প ও সুতা কলগুলির উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে

পর কেউ ব্যবসায় সফল হন। বহু কারখানায় শ্রমিক-মালিক চুক্তি শ্রমিক নেতারা যথাযথভাবে প্রয়োগ করেন না। ফলে শিল্প রুগ্ন হয়। উদাহরণ হিসাবে বলেন, ৬০-এর দশকে 'ইন্ডিয়া ফ্যান'-এর গুণগত মান এবং বাজার সবকিছু তুঙ্গে থাকা সত্ত্বেও ওই ফ্যান তৈরির কারখানাটি উঠে যায় শ্রমিক অশান্তির জন্যই। আর জঙ্গি শ্রমিকদের নেতৃত্ব দেন সি পি এম-এর এক প্রবীণ নেতা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের অধিকাংশই বহিরাগত লোক। এখন অবশ্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার এসব দিকে উপযুক্ত নজর না দিলে শিল্পের রুগ্নতা দূর করার কাজটা কঠিন হয়ে উঠবে। নতুন কারখানা তৈরি করতে গেলে বহু ক্ষেত্রে স্থানীয় যুবকরা চাকরির দাবিতে কাজে বাধা দেয়। বেকার যুবকদের অসহায়তা বা ক্ষোভের যুক্তি আছে ঠিকই, তবে নতুন একটা ছোট কারখানায় কজনকেই বা কাজ দেওয়া সম্ভব। অশোকবাবুর মন্তব্য, কিছু ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে রুগ্নশিল্পগুলিতে হাল ফেরানো সম্ভব।

রাজ্য সরকারের শিল্পমন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানান, রুগ্ন শিল্পগুলিকে কেন্দ্রের অধিগ্রহণের ব্যাপারে ঢিলেমির জন্য রাজ্য সরকারকে প্রতি বছর প্রচুর মাশুল দিতে হচ্ছে। প্রতি বছর শ্রমিকদের বেতন এবং আনুষাঙ্গিক খরচের জন্য রাজ্য সরকারকে অতিরিক্ত ৫-৬ কোটি টাকা দিতে হচ্ছে। কেন্দ্র-রাজ্যের মূল বিরোধ অধিগ্রহণের পর বকেয়া দায়গুলি মেটানো নিয়ে। রাজ্যের শিল্পমন্ত্রকের এক অফিসার জানান, ১৯৫১ সালের 'ইন্ডাস্ট্রিজ (ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট' অনুযায়ী রুগ্ন শিল্পগুলি অধিগ্রহণের পর সেগুলি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থাকে রাজ্য সরকারের ওপর। ১৯৮৫ সালে কেন্দ্র এ ব্যাপারে নতুন আইন প্রণয়ন করে। তাতে রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিগুলি মার খায় প্রচণ্ডভাবে। রাজ্য সরকারের মুখপাত্রটি জানান, প্রয়োজন ও সময় অনুযায়ী ভারতীয় শিল্প পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক (আই আর বি আই)-এর ঋণ পাওয়া গেলে প্রতিটি রুগ্নশিল্পের দুর্দশা কাটিয়ে তোলা যেত। ১৯৭১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার রুগ্ন শিল্পগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য তৈরি করে ভারতীয় শিল্প পুনর্গঠন কর্পোরেশন (আই আর সি আই)। পরে সেটিকে ব্যাঙ্কে পরিণত করা হয়। আই আর বি আই-এর অনুদানে ইন্ডিয়া রাবার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, কার্টার পুলার এবং কন্টেনার অ্যান্ড ক্লোজার ভালভাবে চলছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ওই তিনটি সংস্থা আর না চালাবার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় নতুন করে বেশ কয়েক হাজার শ্রমিক বেকার হন বলে অভিযোগ। বিষয়টি বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের কাছে রাজ্য সরকারের তরফে আবেদন করা হয়েছে।

এদিকে আই আর বি আই-এর বক্তব্য, একমাত্র লাভের সম্ভাবনাতেই তাঁরা রুগ্ন শিল্পে বিনিয়োগ করতে পারেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারকে কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছেন। এগুলি হল (১) প্রতিটি রুগ্ন
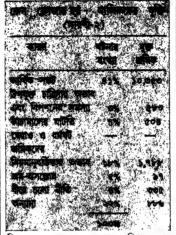
শিল্পসংস্থাকে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করার জন্য সুসংহত পরিকল্পনা গ্রহণ ; (২) উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান ; (৩) সুদের হার কমানো ; (৪) কার্যকরী মূলধন সরবরাহে সুনিশ্চিত করা ; (৫) উৎপাদন যাতে বাড়ে তার জন্য অতিরিক্ত কার্যকরী মূলধন যোগান ; (৬) 'ক্যাশ লস' হলে তা পূর্ণ করা ; (৭) অতিরিক্ত ঋণ পাওয়ার সুযোগ ; (৮) কারিগরী দক্ষতার মানোন্নয়ন ; (৯) অধিগৃহীত সংস্থাগুলিতে দৃঢ় প্রশাসনের ব্যবস্থা করা এবং (১০) অনুদান দেওয়ার পর তার সঠিক ব্যয় হচ্ছে কিনা, সেদিকে নজর দেওয়া প্রভৃতি। লোকসভায় প্রশ্নোত্তরের তথ্যে (১৯৮৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত) দেখা যায় আই আর বি আই দেশজুড়ে ২০৫টি সংস্থায় আর্থিক সাহায্য দিয়েছে, তারমধ্যে ১১৬টিই এই রাজ্যে।

কেন্দ্রীয় বস্ত্রদফতরের মন্ত্রী রামনিবাস মির্ধা কলকাতায় এলে তাঁকে রুগ্ন পাটশিল্পের আধুনিকীকরণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ণের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। গতবছর সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী কলকাতায় ঘোষণা করেছিলেন, কেন্দ্র এ রাজ্যের পাটশিল্পের উন্নয়নের জন্য ২৫০ কোটি টাকা অনুদান দেবেন। বস্ত্রমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ওই অনুসারে বাস্তবায়নে কেন যথেষ্টরকম কেন্দ্রীয় উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না? তিনি জানান, এই টাকা দেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে যেসব কমিটি করা হয়েছিল, তাদের প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। সব খতিয়ে দেখা হয়েছে। শীঘ্রই হয়ত এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু করা সম্ভব হবে। মন্ত্রীর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পের পুনর্বিন্যাসের জন্য রাজ্য সরকারেরও অনেক কিছু করার আছে অথচ বহু ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকার তাদের দায়িত্ব এড়াতে গিয়ে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন কেন্দ্রের ঘাড়ে।
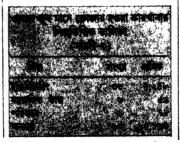
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই অভিযোগ অবশ্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মন্তব্য করেন রাজ্যের শিল্পদফতরের এক প্রশাসক। তিনি জানান, এ বছর ১৮ জুন রাজ্যের পাটশিল্পের সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বস্ত্রদফতরের ও শ্রমদফতরের মন্ত্রীদের কলকাতায় আমন্ত্রণ জানান সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা নাকি ব্যস্ততার জন্য আসতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। 'জুট প্যাকেজিং' বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তার কোনও প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। সরকারি তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে রাজ্যের ৫৬টি চটকলের মধ্যে ১৯টিতে লক-আউট ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২টিতে লক-আউট হয়েছে এ বছরই। এ বছর জুন মাস পর্যন্ত এই শিল্পে নষ্ট হয়েছে ৫৩,৮২,৭৫৪ শ্রমদিবস। পরিমাণটি সারা রাজ্যে নষ্ট শ্রম দিবসের ৫৭·১৭%।

গত চার বছরে বিতর্কিত 'কেস'-এর নিষ্পত্তি (সারণী-৫)

বছর	বিবেচনার জন্য পাঠানো 'কেস'	নিষ্পত্তি হওয়া কেসের সংখ্যা
১৯৮৩-৮৪	২৬১০	৬৮৪
১৯৮৪-৮৫	১৯৩৫	৭৩৪
১৯৮৫-৮৬	২৩৭৯	৪৭১
১৯৮৬-৮৭	২৬১৬	৬৬৫

শিল্পদফতরের ওই প্রশাসক জানান, চটকল শিল্পের এই দুরবস্থার মূল কারণ আধুনিকীকরণের নামে বা ব্যাঙ্ক-ঋণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে মালিকরা সমানে কর্মী ছাঁটাই করতে চাইছেন। ফলে সঙ্কট তৈরি হচ্ছে। সিন্থেটিক ব্যাগের প্রচলন বেড়ে যাওয়া এবং আনুষাঙ্গিক কিছু সমস্যার জন্য মালিকরাও পড়েছেন খুব মুশকিলে। তবে কোনও পরিস্থিতিতে কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার মেনে নেবে না। আধুনিকীকরণ করতে হবে শ্রমিকদের স্বার্থ মাথায় রেখে। ক্রমাগত লক-আউট চালিয়ে যাওয়া, শ্রমিকদের বেতন না দেওয়া প্রভৃতির জন্য অভিযুক্ত মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইনগত দিকগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্রশিল্পের হালও যথেষ্ট সঙ্কটের মুখে। এই শিল্পে ৩৯টি কারখানায় এ রাজ্যে শ্রমিকের মোট সংখ্যা ৫৯ হাজারের মত। এরমধ্যে ৮টি কারখানার ১৯ হাজার কর্মী লক-আউটের আওতায় পড়েছেন। রাজ্যের শিল্প দফতরের এক পদস্থ অফিসার জানান—মহারাষ্ট্র,

গুজরাত, হরিয়ানাসহ বেশ কয়েকটি রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে তুলো আমদানি করতে হয়। ফলে এই রাজ্যে কাঁচামালের জন্য বাড়তি খরচ হয় বস্ত্রশিল্পে। মাশুল সমীকরণ নীতির একটা ন্যায্য সিদ্ধান্ত জাতীয় স্তরে নেওয়া গেলে পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হত। বহুবার বহুভাবে এই নীতির যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেও কোনও সুরাহা হয়নি। কাঁচামালের দামও বেড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে সিন্থেটিক কাপড়ের চাহিদা বাড়ছে। জটিলতর হচ্ছে বিপণনের প্রশ্ন। একমাত্র বস্ত্রশিল্পেই ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে মজুরির কোনও নীতি রূপায়িত হয়নি। অথচ চুক্তি অনুযায়ী মালিকেরা এই শিল্পে শ্রমিকদের পদ এবং বেতনবিন্যাসের

একনজরে আই আর বি আই-এর অনুদানের রাজ্যওয়ারি হিসেব (সারণী-৬)

রাজ্য	ক	খ
অন্ধ্র	৮	১
আসাম	১	০
বিহার	৫	৩
দিল্লী	৬	৩
গুজরাত	৮	৩
হরিয়ানা	২	১
কর্ণাটক	৪	৪
কেরল	৫	০
মধ্যপ্রদেশ	১	১
উত্তরপ্রদেশ	১১	২
মহারাষ্ট্র	১৬	৯
ওড়িশা	২	০
পণ্ডিচেরী	১	০
পঞ্জাব	১	১
রাজস্থান	৬	৩
তামিলনাড়ু	১২	৫
পশ্চিমবঙ্গ	১১৬	৩৭
	২০৫	৭৩

(ক) সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থার সংখ্যা ; (খ) সফল সংস্থার সংখ্যা

পরিমার্জন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (আই এন টি ইউ সি) সভাপতি সুব্রত মুখার্জি এ রাজ্যের রুগ্ন শিল্পের অন্যতম কারণ হিসাবে দায়ী করেছেন রাজ্য সরকারের ব্যর্থতাকে। তিনি জানান, রাজ্যের শিল্পদফতর বা সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রয়োজনে লক-আউটকে বেআইনী বলে ঘোষণা করতে পারেন। অথচ গুটিকয়েক চটকল বাদে কোথাও তা হয়নি। এ ব্যাপারে সরকারের নির্দিষ্ট কোনও নীতি নেই। তাঁর হিসাবে এই রাজ্যে ২২টি চটকল লক-আউট হয়ে আছে, বকেয়া হয়ে আছে শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ৫৩ কোটি টাকা। গতানুগতিক উৎপাদন রীতির পরিবর্তন করে আধুনিকীকরণ করতে গেলে সঙ্কট দেখা

রাজ্যের বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের হালচাল (সারণী-৪)

সময়সীমা	কালেকটরের কাছে পাঠানো 'কেস'-এর সংখ্যা		নিষ্পত্তি হওয়া 'কেস'-এর সংখ্যা	
১৯৮৬	সংখ্যা	পরিমাণ (টাকা)	সংখ্যা	পরিমাণ (টাকা)
এপ্রিল-জুন	২৪১	২০৪·৬৫ লক্ষ	৯৮ (আংশিক)	১৯·১৬ লক্ষ
জুলাই-সেপ্টেম্বর	৩০৫	২৭৭·১৪ লক্ষ	৮০ (আংশিক)	৩৪·০০ লক্ষ
অক্টোবর-ডিসেম্বর	২২৮	৩২০·৮১ লক্ষ	১০৯ (আংশিক)	৫৫·৯০ লক্ষ
১৯৮৭				
জানুয়ারি-মার্চ	১৯৬	১৩২·৯৯ লক্ষ	৫০ (সম্পূর্ণ)	১৯·৫৮ লক্ষ
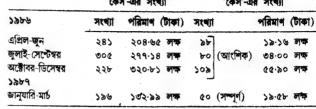
বর্তমানের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে ধর্মঘট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের কাছে বিলাসিতার শামিল। অথচ... ছবি : রাজীব বসু

একনজরে রাজ্যের লক-আউট হওয়া কটন মিল (সারণী-৮)

কারখানার নাম	লক-আউটের তারিখ	শ্রমিক
১। কেশোরাম ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, কলকাতা	১৫-২-৮৭	৯,০০০
২। বঙ্গোদয় কটন মিল, পানিহাটি	২১-১-৮৪	৭০০
৩। শ্রীহনুমান কটন মিল, ফুলেশ্বর (হাওড়া)	২-৭-৮৪	১,৫০০
৪। দানবর কটন মিল	৩০-৫-৮৭	৩,৪০০
৫। বাসন্তী কটন মিল	৩০-৫-৮৭	১,৯০০
৬। শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড ওয়েভিং মিলস	১৪-৭-৮৬	৯০০
৭। ময়ূরাক্ষী কটন মিলস	সেপ্টেম্বর '৮৬	৬০০
৮। ইন্ডিয়া কটন মিল	২৯-৬-৮৭	১,১০০

সূত্র : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদফতর

দেবে কিন্তু উপযুক্ত সরকারী পদক্ষেপের সাহায্যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে সেই সঙ্কট কাটিয়ে তোলা সম্ভব বলে সুব্রতবাবু মন্তব্য করেন। তিনি জানান, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আধুনিকীকরণ অবশ্যই দরকার। সেটা না পারার জন্য ধুঁকছে টায়ার এবং জুতো তৈরির বেশ কয়েকটি কারখানা। বিপণনের যথেষ্ট সুযোগ এ রাজ্যে নেই বলে সমস্যায় পড়েছে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি। 'সিটু'র কিছু নেতার মত তিনিও বিশ্বাস করেন, বর্তমানের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে ধর্মঘট শ্রমিকদের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'বিলাসিতা'র শামিল। আর ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের অপ্রিয় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

'সিটু'র সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন রায়

এবছর জুলাই মাস পর্যন্ত লক-আউট হওয়া চটকলের তালিকা (সারণী-৭)

চটকলের নাম	শ্রমিক সংখ্যা	লক-আউট হওয়ার দিন
১। নর্থব্রুক	৩,৭০০	২৭-১-৮২
২। এম্পায়ার	১,৯০০	১৭-৩-৮৫
৩। মেঘনা	৬,১০০	১৫-৪-৮৫
৪। অম্বিকা	৩,৮০০	২৫-৮-৮৬
৫। ক্যালকাটা	৯০০	৩-১০-৮৬
৬। বরানগর	৪,৬০০	১১-১১-৮৬
৭। টিটাগড়	৫,০০০	১৭-১১-৮৬
৮। নফরচাঁদ	১,৬০০	২৪-৩-৮৭
৯। ফোর্ট উইলিয়াম	৩,২০০	২৭-৩-৮৭
১০। ডেলটা	৪,৫০০	২-৫-৮৭
১১। গৌরীপুর	৫,০০০	২-৫-৮৭
১২। আগরপাড়া	৩,৫০০	২-৫-৮৭
১৩। প্রবর্তক	১,৯০০	১২-৫-৮৭
১৪। হাওড়া	৩,৫০০	২১-৫-৮৭
১৫। ফোর্ট গ্লস্টার	৪,০০০	২৫-৫-৮৭
১৬। বজবজ	৩,৩০০	৭-৬-৮৭
১৭। শ্রী হনুমান	৩,৮০০	৭-৬-৮৭
১৮। ইন্ডিয়া জুট	৪,১০০	১৯-৬-৮৭
১৯। রিলায়েন্স	৪,৮৬০	২৯-৭-৮৭

সূত্র : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদপ্তর

স্বীকার করেন, শ্রমিকদের দাবি আদায়ের ক্ষমতা আগের তুলনায় কমেছে। পারিপার্শ্বিক ঘাত প্রতিঘাতেই হয়েছে এই অবস্থা। তবে এই রাজ্যের শ্রমিকদের লড়াকু মনোভাব কমেনি। তিনি বলেন, অধিকাংশ লক-আউটের পেছনে মালিকদের উদ্দেশ্য শ্রমিক-সঙ্কোচনের মাধ্যমে খরচ কমানো এবং শ্রমিকদের ওপর কাজের চাপ বাড়ানো। মালিকদের এই উদ্দেশ্য মেনে নিলে বেশ কয়েকটি লক-আউট এখনই তুলে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু শ্রমিকরা এই শর্ত মানতে রাজি নন। তিনি বলেন, ১৮টি চটকল লক-আউট অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও ১৯৮৬ সালে রাজ্যের চটকলগুলিতে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টন উৎপাদন হয়েছে এবং এটি একটি রেকর্ড।

রমাপ্রসাদ গোয়েঙ্কা ছবি : রাজীব বসু

কারখানাগুলিতে আর্থিক সঙ্কট, প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং বিপণনের—সমস্যা সব মিলিয়ে এমন একটা প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে যে রাজ্য সরকারের পক্ষে খুব বেশি কিছু করা মুশকিল। মনোরঞ্জনবাবু জানান, শিল্পে রুগ্নতার একটা বড় কারণ কেন্দ্রের উদার আমদানি নীতি। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র শিল্পগুলি মূলত বৃহৎ শিল্পের দাক্ষিণ্যে বেঁচে থাকে। কোনও বড় শিল্প রুগ্ন হয়ে গেলে তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে বেশ কয়েকটি ছোট শিল্পও রুগ্ন হয়ে পড়ে। এ রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে এধরনের সঙ্কট দেখা দিয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি রাজীব কল কিন্তু এ রাজ্যে লক-আউটের সংখ্যা বাড়ছে এই কথাটা মানতে রাজি নন। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ভাল। মূলত পাটশিল্পেই লক-আউটের সংখ্যা বেশি। তবে ধর্মঘটের সংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে লক-আউটের সংখ্যাও কমছে। তিনি বলেন, চটকলগুলির আধুনিকীকরণের জন্য বিশেষ

রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী শান্তি ঘটক ছবি : শৈবাল দাস

তহবিল তৈরি হলেও ওই শিল্পে আধুনিকীকরণ হয়নি। কারণ পাটশিল্প একেবারে রুগ্ন হয়ে যাওয়ার পরে সেই ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ খুবই কষ্টকর। এ রাজ্যে শিল্পে রুগ্নতার একটা বড় কারণ শ্রমিকদের কম উৎপাদন ক্ষমতা (লো লেবার প্রোডাকটিভিটি) ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে এ কারণে উৎপাদনভিত্তিক মজুরির বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। শ্রমিকদের নতুন বেতনহার নিয়ে আলোচনার সময় এসব প্রস্তাব মালিকদের পক্ষ থেকে করা হলেও "শ্রমিক শোষণ"-এর সম্ভাবনায় ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এ-ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নন। কলের মতে, শিল্পে রুগ্নতা দূর করার জন্য সরকার, ব্যাঙ্ক, বিনিয়োগকারী সংস্থা, কর্মী এবং মালিকপক্ষ—সকলের যৌথ প্রচেষ্টা দরকার। আমেরিকার মত 'ফেডারেল আন এমপ্লয়মেন্ট কমপেনশেসন ফান্ড'-এর সুযোগ এখানে চালু করা গেলে রুগ্ন শিল্পে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা উপকৃত হবেন। বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার শ্রমিকদের নতুন কারখানায় কাজ দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, শিল্পে রুগ্নতার মূল কারণগুলি হল : মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি, দুর্বল পরিকল্পনা, বিদ্যুৎ বিপর্যয়, কাঁচামালের ঘাটতি এবং বাণিজ্যিক 'ইনটিগ্রিটি'র অভাব। তবে ব্যাঙ্ক বা বিনিয়োগকারী সংস্থার সাহায্য পেলে দক্ষ প্রশাসনের সাহায্যে বহু ক্ষেত্রে শিল্পে রুগ্নতা দূর করা সম্ভব।

শিল্পপতি রমাপ্রসাদ গোয়েঙ্কার মতে, রাজ্যের ১৬ হাজার রুগ্নশিল্প এখনই বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এগুলিতে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে ব্যাঙ্ক এবং বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলি একেবারেই অনিচ্ছুক। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের এই প্রাক্তন সভাপতি বললেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন দরকার 'সানরাইজ ইণ্ডাস্ট্রিজ'। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করতে হবে এগুলি। জেলায় জেলায় কলকারখানা তৈরির জন্য বিশেষ কয়েকটি সরকারী নীতি গ্রহণ করার গুরুত্বের উল্লেখ করেন তিনি। এক একটি নির্দিষ্ট জেলায় নির্দিষ্ট কিছু শিল্প তৈরি করলে তার সুফল সহজে মিলবে। উদাহরণ হিসাবে পঞ্জাবের অমৃতসর-লুধিয়ানা অঞ্চলের পশম বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ করেন তিনি।

রাজ্য সরকারের মন্ত্রী ও আমলা এবং ট্রেড ইউনিয়নের কিছু নেতা রুগ্ন শিল্পের জন্য ব্যাঙ্ক বা বিনিয়োগকারী সংস্থার সমালোচনা করলেও শিল্পপতি এবং সুপরিচিত পেশাদার পরিচালক ডঃ অভিজিত সেন তা মানতে রাজি নন। তাঁর মতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা কোনও সংস্থায় না থাকলে আর্থিক সহযোগিতায় কাজ হবে না। তিনি জানান, রাজ্যের রুগ্ন শিল্পগুলিতে ব্যাঙ্কের ৫ হাজার কোটি টাকা আটকে আছে। রুগ্ন শিল্পের মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে 'বোর্ড ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ফিনানসিয়াল রিকনস্ট্রাকশন'। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণদান নীতিতে সাম্প্রতিক কিছু পরিমার্জন শিল্পের রুগ্নতা দূর করার পক্ষে সহায়ক হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ■

দানব ও দেবতা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

॥ চুয়াল্লিশ ॥

বিমান থেকে শেষে নামতেই হল। ঝাড়পোঁছের ঠেলায়। যাঁরা পরিষ্কার করতে এসেছেন তাঁদের মধ্যে একজন একটু বয়স্কা। বিশাল তাঁর চেহারা। তিনিই হলেন লিডার অফ দি টিম। বাকি সবাই তরুণী। একদিকে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চলেছে। আর একদিকে চলেছে বুরুশ। ভেতরটাকে এঁরা একেবারে নতুন করে ছেড়ে দেবেন।

বাইরে মানে এয়ারপোর্টের বাইরে যাবার উপায় নেই। বিমানের ডানার ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালুম।অ্যাভিয়েশন ফুয়েল লেখা একটা দুধ-সাদা গাড়ি এসেছে। এয়ারোপ্লেনের তেলতেষ্টা পেয়েছে। কুমকুম ধপাস করে টারম্যাকে বসে পড়ল।

'তোমার জন্যে ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা দেখবো!'

'নাঃ, দরকার হবে না। রক্ত জমে গেছে। আমি একটু বসি দাদা।'

'বোসো।'

ঝোড়ো বাতাস বইছে সমুদ্রের গন্ধমাখা। দেশ থেকে কত দূরে এই দ্বীপপুঞ্জ। ভাবলেই রোমাঞ্চ হচ্ছে। উত্তর অ্যাটলান্টিকে ভাসছে কোরাল দ্বীপমালা। মোট দ্বীপের সংখ্যা ৩৬০। এর মধ্যে কুড়িটি দ্বীপমাত্র মনুষ্য অধ্যুষিত। প্রায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মতো। এই দ্বীপে জল দাঁড়ায় না। প্রবালের ত্বক বেয়ে সব জল গলে পড়ে যায়। পানীয় জলের কি ব্যবস্থা কে জানে! আন্দামানের মতো বৃষ্টির জলই হয় তো ধরে রাখা হয়। এখানে ইংরেজ আর আমেরিকানদের বিরাট নৌ আর বিমানঘাঁটি আছে। শীতকালে আমেরিকান ভ্রমণার্থীদের বড় প্রিয় জায়গা। করমুক্ত অঞ্চল বলে শিল্প আর ব্যবসা খুব জাঁকিয়ে উঠেছে।

কুমকুমের পাশে আমিও বসে পড়লুম। 'হুডু সি'-র নাম শুনেছি। 'গ্রেভইয়ার্ড অফ দি অ্যাটলান্টিক'। অথবা 'ডেভিলস ট্র্যাঙ্গল'। সব চেয়ে পরিচিত নাম হল, 'বারমুডা ট্র্যাঙ্গল'। পশ্চিম অ্যাটলান্টিকে বারমুডা আর ফ্লোরিডাকে নিয়ে সমুদ্রের ত্রিকোণ অংশে ৪৫ সাল থেকে প্রায় একশোটি বিমান আর জাহাজ অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রায় হাজার মানুষ বেপাত্তা। নানা ভাবে চেষ্টা হয়েছে, এই রহস্যের কোনও কূলকিনারা করা যায়নি। বিজ্ঞানীরা ব্যর্থ, ব্যর্থ সেনাবাহিনী, বিফল সাহসী অনুসন্ধানীরা।

উত্তরে বারমুডা, দক্ষিণে ফ্লোরিডা এই হল ত্রিভুজের একটি বাহু। আর একটি বাহু পুবে বাহামা দ্বীপের ভেতর দিয়ে ৪০° ওয়েস্ট লঙ্গিচিউড বরাবর পুয়েটোরিকো অতিক্রম করে আবার ঘুরে গেছে বারমুডায়। অ্যাটলান্টিকের এই ত্রিভুজ জাহাজ আর বিমানের চলার পথে এক ভয়ের জায়গা। গত বিয়াল্লিশ বছরে জাহাজ আর বিমানে মিলে একশোটিরও ওপর অদৃশ্য হয়ে গেছে। এক হাজারেরও বেশি যাত্রী নিখোঁজ। ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন মেলেনি। একটি মৃতদেহও ভাসতে দেখা যায়নি। ৪৫ সালের পর থেকে ত্রাণব্যবস্থা আরো বৈজ্ঞানিক হয়েছে। উদ্ধারকার্যে অজস্র নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। ত্রাণকারীদের দক্ষতাও বেড়েছে। তবু কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়নি। যেন জল আর আকাশের ফুটো গলে সব ফোর্থ ডাইমেনসানে পড়ে গেছে।

অদৃশ্য হয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে কোনও কোনও

ফ্লাইট নাইনটিন টি বি এম অ্যাভেঞ্জার। এই রকম ছটি বিমান অদৃশ্য হয়েছিল

প্রলোভিত লাভের জুয়ার ফাঁদে কখনোই আটকে পড়বেন না

হাজার হাজার ব্যক্তি সন্দেহজনক ভিত্তিহীন পরিকল্পনায় মূলধন লাগিয়ে তাঁদের সঞ্চিত অর্থ খুইয়েছেন।
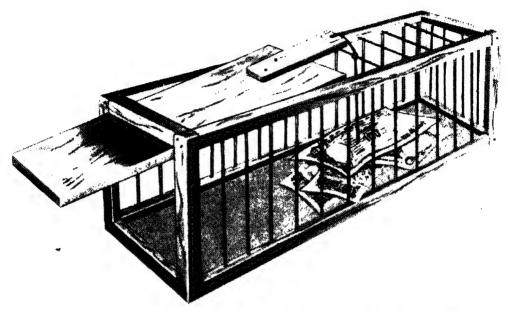
সরকারী ক্ষেত্রর ব্যাঙ্কের আমানত যোজনায় আপনার টাকা সঞ্চয় ক'রুন।

সেখান থেকে পাবেন আপনার কষ্টোপার্জিত টাকার জন্য ভাল লাভ আর পুরোপুরি নিরাপত্তা।

টাকা খাটানোর ব্যাপারে সব সময়ের জন্যই উত্তেজনাপূর্ণ বড় রকমের লোভে ভরা অনেকরকম যোজনা থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তার জন্য প্রতারিত হ'তে হয় যেটা কষ্টোপার্জিত টাকাপয়সার জন্য খুবই সংকটপূর্ণ ঝুঁকি।

সরকারী ক্ষেত্রর ব্যাঙ্কগুলোয় আপনার টাকা শুধু যে ভাল লাভ পায় তাই-ই নয়—সেটা সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ থাকে। আর অন্যান্য সুবিধেগুলোর দিকেও বিচার ক'রে দেখুন :

- নিশ্চিন্ত আর সময়মত ফেরত।
- যদিও সুদের হার শতকরা ১০ ভাগ, দীর্ঘ সময়ের পুনঃ-জমা যোজনায়, লাভের পরিমাণ ১৬.৮ ভাগের মত বেশী।
- প্রয়োজনে মেয়াদকাল পূর্বে টাকা তোলা যায়।
- কর সুবিধা---বছরে সুদ থেকে উপার্জিত ৭,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়করে ছুট।
- অন্যান্য ব্যাঙ্কিং সার্ভিস এবং সুবিধের বিবিধ পরিকল্পনা আপনাদের-ই জন্য।

সরকারী ক্ষেত্রর ব্যাঙ্কগুলো থেকে পাওয়া যায় নানারকম আকর্ষণীয় আমানত যোজনা যেমন, পুনঃ-জমা যোজনা, স্থায়ী আমানত, রেকারিং ডিপোজিট স্কীম, ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানবার জন্য সরকারী ক্ষেত্রর ব্যাঙ্কগুলোর যে কোন শাখায় যোগাযোগ ক'রুন।

পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কসমূহ

জনগণের জীবনের সঙ্গে ওত-প্রোত ভাবে জড়িত।

জয়েণ্ট
পাবলিসিটি
কমিটি
পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কসমূহ

২৮ সদস্য ব্যাঙ্ক সমূহ

- এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক
- অন্ধ্র ব্যাঙ্ক
- ব্যাঙ্ক অব বরোদা
- ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
- ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র
- কানাড়া ব্যাঙ্ক
- সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
- করপোরেশন ব্যাঙ্ক
- দেনা ব্যাঙ্ক
- ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
- ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক
- নিউ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
- ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কমার্স
- পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
- পাঞ্জাব এ্যাণ্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক
- স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
- স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানীর এ্যাণ্ড জয়পুর
- স্টেট ব্যাঙ্ক অব হায়দ্রাবাদ
- স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্দোর
- স্টেট ব্যাঙ্ক অব মহীশুর
- স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাতিয়ালা
- স্টেট ব্যাঙ্ক অব সৌরাষ্ট্র
- স্টেট ব্যাঙ্ক অব ত্রিবাঙ্কুর
- সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক
- ইউকো ব্যাঙ্ক
- ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
- ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
- বিজয়া ব্যাঙ্ক

Imageads/JPC/87280 BN

বৈমানিক বা নাবিক তাঁদের অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার কথা বেতার মারফত তাঁদের যাত্রা-বন্দর বা গন্তব্য-বন্দরে জানাবার চেষ্টা করেছেন, তারপর সকলকে বিভ্রান্ত করে চিরতরে হারিয়ে গেছেন রাডার স্ক্রিন থেকেই নয় ভূমণ্ডল থেকে। তাঁদের পাঠান ছেঁড়া ছেঁড়া সঙ্কেত থেকে যেটুকু জানা গেছে, তা হল, কোনও যন্ত্রই কাজ করছে না। কম্পাসের কাঁটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। পরিষ্কার মেঘমুক্ত দিন, তবু চারপাশ কুয়াশায় ঘিরে এলো। হলুদ আলো। শান্ত সমুদ্র শুধু উত্তাল হল না, তার চেহারাই পালটে গেল। যে কোনও একদিকে কাত হয়ে গেল জলতল। এর পরে সমস্ত অনুসন্ধানই ব্যর্থ। কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না সেই বিমান অথবা জাহাজটিকে।

ব্রিটিশ সাউথ অ্যামেরিকান এয়ারওয়েজের বিমান স্টার এরিয়েল-এর হঠাৎ মধ্য আকাশ থেকে হারিয়ে যাবার ঘটনা মনে পড়তেই ভেতরটা কেমন করে উঠল। মনে হতে লাগল বারমুডার আকাশটা একটু অন্য রকমের। রোদ আছে, তবু যেন ঘোলাটে। নীল আলো নয় চারপাশে হলুদ আলো চুঁইয়ে পড়ছে। এত বড় আকাশ কোথাও একটা পাখি নেই। কোথা থেকে যেন অশুভ একটা ছায়া এসে পড়েছে।

স্টার এরিয়েল আমাদের বিমানের মতোই যাচ্ছিল লন্ডন থেকে জ্যামাইকা। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৪৯ সালের, ১৭ জানুয়ারি। বিমানটিতে ছিলেন সাতজন নাবিক ও তেরজন যাত্রী। রুট, লন্ডন থেকে সান্টিয়াগো, চিলি। পথে বারমুডায় অবতরণ, আমাদের মতোই। তেল নেবার জন্যে। সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে স্টার এরিয়েল যখন বারমুডার আকাশে উঠল, তখন আবহাওয়া অতি পরিষ্কার, সুন্দর। সমুদ্র শান্ত। ফ্লাইট ক্যাপ্টেন আকাশে ওঠার পঞ্চান্ন মিনিট পরে বারমুডায় বেতারযোগে জানালেন, "ক্যাপ্টেন ম্যাকফি 'এরিয়েল' থেকে জানাচ্ছি। আমাদের যাত্রাপথ হল বারমুডা থেকে কিংস্টন, জ্যামাইকা। আমরা 'ক্রুইজিং অলটিচ্যুডে উঠেছি। সুন্দর আবহাওয়া। কিংস্টনে যথাসময়েই পৌঁছতে পারবো। আমি আমার বেতারতরঙ্গ পরিবর্তন করে কিংস্টন বিমান বন্দর ধরার চেষ্টা করছি।"

এর পর 'স্টার এরিয়েল' থেকে আর কোনও খবর কেউ কখনও পায়নি। পুরো বিমানটিই আকাশ থেকে উবে গেল। ঠিক এক বছর আগে এই এয়ারলাইনসের আর একটি বিমান অনুরূপ ভাবেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সেই বিমানটির অনুসন্ধানে তখন অ্যাটলান্টিকের বিশাল এলাকা জুড়ে অনুসন্ধান চলছিল। সেই অনুসন্ধান আর গুটানো হল না, তা ছাড়া সেই সময় ওই এলাকায় ব্রিটিশ আর আমেরিকান নৌবাহিনীর মহড়া চলছিল। এই সমস্ত বাহিনী একসঙ্গে মিলে অ্যাটলান্টিকের এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে অদৃশ্য বিমান 'স্টার এরিয়েলে'র অনুসন্ধানে নেমে পড়ল। বাহাত্তরটা অনুসন্ধানী বিমান প্রায় ডানায় ডানা লাগিয়ে, যেখান থেকে শেষ বেতার বার্তা ভেসে এসেছিল, সেই এলাকা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে জ্যামাইকা পর্যন্ত গোটা এলাকা ঘুরে এল। সমুদ্রের কোথাও বিমানটির সামান্যতম ধ্বংসাবশেষও খুঁজে পাওয়া গেল না। জানুয়ারির ১৭ তারিখে বিমানটি অদৃশ্য হয়েছিল, ১৮ তারিখ রাতে একটি ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিমান বেতারে অনুসন্ধানকারীদের জানাল সমুদ্রের বিশেষ একটি জায়গা থেকে অদ্ভুত একটি আলোর আভাস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধানকারীরা সেই অঞ্চলে ছুটে গেল। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। ২২ জানুয়ারি সবাই হাল ছেড়ে অনুসন্ধানের কাজ গুটিয়ে নিল।

'স্টার এরিয়্যাল'-এর আগে যে বিমানটি রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়েছিল, সেটি একটি ডিসি-থ্রি বিমান। সান জুয়ান থেকে যাচ্ছিল মিয়ামি। যাত্রী ও বিমানকর্মী মিলিয়ে সংখ্যা ছিল ছত্রিশ। ক্যাপ্টেনের নাম ছিল রবার্ট লিনকুইস্ট। রাত সাড়ে দশটার সময় বিমানটি যখন আকাশে উঠল, তখন আবহাওয়া পরিষ্কার। শ্যাম্পেনের মতোই ফুরফুরে। ক্যাপ্টেন লিনকুইস্ট বেতারে জানালেন, 'তোমরা কি জানো, আমরা এখন কি করছি ? আমরা সবাই সমস্বরে খ্রিস্টমাস ক্যারল গাইছি।' ভোর চারটে তের মিনিটে বিমানটি থেকে শেষ বেতার বার্তা ভেসে এল, 'আমরা অবতরণ ক্ষেত্রর দিকে এগিয়ে চলেছি। দক্ষিণে আর মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে মিয়ামি বিমানবন্দর। আমরা মিয়ামি শহরের আলোকমালা দেখতে পাচ্ছি। সব ঠিক আছে। কোনও গোলমাল নেই। অবতরণের নির্দেশের অপেক্ষায় রইলুম।' শেষ বার্তা পাঠিয়ে বিমানটি অদৃশ্য হয়ে গেল। মিয়ামি থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল। কোনও বিস্ফোরণ নেই। আকাশে আগুনের হল্কা নেই। বেতারে এস ও এস বা মে ডে বার্তা নেই। তাছাড়া বিমানটি যে জায়গায় অদৃশ্য হতে পারে, সেই জায়গাটিকে বলা হয় 'ফ্লোরিডা কি'। সমুদ্রের গভীরতা মাত্র কুড়ি ফুট। স্বচ্ছ জল। বিমান ভেঙে পড়লে, সহজেই ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া উচিত। কিছুই কিন্তু পাওয়া গেল না।

একে একে আরও বহু ঘটনার কথা মনে হতে লাগল। ক্যারোলিন ক্যাসসিয়ো। লাইসেন্সধারী পাইলট। হাল্কা একটি বিমানে একজন মাত্র যাত্রী নিয়ে, নাসাউ থেকে উড়েছিলেন বাহামার গ্র্যান্ড টার্ক দ্বীপে যাবেন বলে। গ্র্যান্ড টার্কের কাছাকাছি এসেছেন মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, বেতারে জানালেন, 'আমি কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছি না। দুটি অজানা দ্বীপের চারপাশে চক্কর মারছি। অথচ নিচে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।' সব শেষে ভেসে এল করুণ আকুতি, 'এই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার কোনও উপায় আছে কি ?' সেই সময় গ্র্যান্ড টার্ক দ্বীপে ঘটনার যাঁরা সাক্ষী তাঁদের বিবরণ হল, একটি হাল্কা বিমান প্রায় আধঘণ্টা ধরে দ্বীপের চারপাশে ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। পরিষ্কার মেঘমুক্ত আকাশ। আমরা সবাই বিমানটিকে দেখতে পাচ্ছি, অথচ বিমানচালক গ্র্যান্ড টার্ক দ্বীপের ঘর বাড়ি কিছুই দেখতে পেলেন না, তা কেমন করে হয়।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের পাঁচ তারিখে যে ঘটনা দিয়ে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল রহস্যের সূত্রপাত, সেই রহস্যের সমাধান আজও হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলেও, বিমান আর নৌমহড়া তখনও সমানে চলছে। পৃথিবীতে শান্তি এসেছে,

রহস্যঘেরা বারমুডা ট্র্যাঙ্গলের একাংশ

তবে শান্তির ভারসাম্য তখনও আসেনি। যে কোনও মুহূর্তে নতুন কোনও শত্রুর আবির্ভাব আশঙ্কায় পৃথিবী তটস্থ। ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেল ন্যাভাল এয়ার স্টেশান থেকে নৌবাহিনীর ছটি বিমান আকাশে উঠল। পুবে ১৬০ মাইল গিয়ে, উত্তরে ৪০ মাইল হয়ে, দক্ষিণ পশ্চিম পথে আবার ফিরে আসবে ফোর্ট লডারডেলে।

ছটি বিমানই ছিল 'নেভি গ্রামম্যান টিবিএম-থ্রি অ্যাভেঞ্জার টরপেডো বম্বারস'। প্রতিটি বিমানে হাজার মাইলেরও বেশি পথ ওড়ার মতো জ্বালানি ছিল। প্রতিটি বিমানেই সুশিক্ষিত পাইলট অফিসার। বিমানগুলির পরিচালনায় ছিলেন লেফটেন্যান্ট চার্লস টেলার। বেলা দুটোর সময় বিমানগুলি যখন আকাশে উঠছে, তখন আকাশ পরিষ্কার, রোদ ঝলমল করছে, ছেঁড়া ছেঁড়া, টুকরো টুকরো, এক আধ খণ্ড মেঘ। উত্তাপ ৬৫ ডিগ্রি। উত্তর পুবে বয়ে চলেছে ধীর বাতাস। দুটো দশ মিনিটের মধ্যে ছটি বিমানই বিশাল

এতদ্বারা আপনার বাড়ির সব আরশোলা আর মশাদের জানানো হচ্ছে যে—বেগন স্প্রে এখন ২৫০ মি. লি. মিনি প্যাকেও পাওয়া যাচ্ছে!

বেগন স্প্রে—আপনার বাড়িকে আরশোলা, ছারপোকা আর মশা থেকে মুক্ত রাখার অতি কার্যকরী উপায়! আর এটি এখন আপনার জন্যে ২৫০ মি.লি. প্যাকে।

আপনার রান্নাঘরে সপ্তাহে একবার নিয়মিত ভাবে বেগন স্প্রে করুন।

তাছাড়া সিংক, আবর্জনাপাত্র, নালা-নর্দমা ইত্যাদি কয়েকটি জায়গায় রোজই স্প্রে করা দরকার। আর, যেসব জায়গায় আরশোলা বাস করে বা ডিম পাড়ে সেখানে পুরোপুরি স্প্রে করে একেবারে ভরিয়ে দিন যাতে তারা আর বেরিয়ে না আসতে পারে।

বেগন স্প্রে—মশা নিয়ন্ত্রণেও সমান কার্যকরী।

ঐগুলি থেকে রেহাই পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হল—সূর্যাস্তের পরেই আপনার বসার ঘর বা শোয়ার ঘরে স্প্রে করে দেওয়া আর সব দরজা-জানলা ১০-১৫ মিনিট বন্ধ রাখা।

নিয়মিত বেগন ব্যবহার করেন যাঁরা—পোকা- মাকড়মুক্ত বাড়িতে বাস করেন তাঁরা।

তাই, আপনি যদি এখনও বেগন ব্যবহার শুরু না করে থাকেন তো আমাদের নতুন ২৫০ মি.লি. প্যাকটি পরখ করে দেখুন।

এর পরেও যেন কোনো অভিযোগ না ওঠে যে— আপনার বাড়ির পোকামাকড়দের ঠিকমত সতর্ক করা হল না!

Trikaya BS 3.87 BEN

ত্রিভুজ তৈরি করে আকাশের শিখরে উঠে পড়ল। চলেছে বিমিনির উত্তরে 'চিকেন শোলস' নামক সমুদ্রের বিশেষ একটি অঞ্চলে। সেখানে রাখা আছে পরিত্যক্ত একটি জাহাজ। সেই জাহাজের ওপর বোমা ফেলার মহড়া শেষ করে, তারা গোটা এলাকাটা চক্কর মেরে ফিরে আসবে ফোর্টলডারডেলে। এই ছটি বিমান নেভি এয়ার ফোর্সের কোডে 'ফ্লাইট নাইনটিন'।

ঠিক তিনটে পনের মিনিটে এমন একটা কিছু ঘটে গেল যার ব্যাখ্যা আজও মেলেনি। তিনটে পনের মিনিটের কিছু আগেই বিমানগুলি লক্ষ্যবস্তুর ওপর বোমা ফেলা শেষ করে পূর্ব দিকে যখন এগিয়ে চলেছে, তখন ফোর্ট লডারডেল ন্যাভাল এয়ার স্টেশান টাওয়ার বেতার গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ল ফ্লাইট নাইনটিনের কম্যান্ডার লেফ্‌টন্যান্ট চার্লস টেলারের গলা:

টেলার: টাওয়ার, টাওয়ার। কলিং টাওয়ার। এমারজেনসি। এমারজেনসি। আমরা আমাদের নির্ধারিত পথের বাইরে চলে এসেছি। আমরা জমি দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের চোখে কিছুই পড়ছে না।

টাওয়ার: তোমার অবস্থিতি জানাও।

টেলার: বলতে পারবো না, আমরা কোথায় আছি। নিশ্চিতভাবে জানাতে পারছি না, আমাদের অবস্থিতি। আমরা হারিয়ে গেছি।

টাওয়ার: মনে হচ্ছে, তোমরা পশ্চিমে চলেছ।

টেলার: বলতে পারছি না পশ্চিম কোনটা। আমাদের সব কিছু বিগড়ে গেছে। সবই এখন রহস্যময়। কোনদিকে চলেছি তাও জানি না। সমুদ্রকে যেমন দেখানো উচিত সেরকমও দেখাচ্ছে না।

তিনটে তিরিশ মিনিটে ফোর্ট লডারডেলের সিনিয়ার ফ্লাইট ইনস্ট্রাকটারের বেতার গ্রাহক যন্ত্রে আর একটি কণ্ঠস্বর ধরা পড়ল। ফ্লাইট নাইনটিনের আর একটি বিমানের একজন শিক্ষানবীশের গলা: 'পাওয়ারস বলছি, পাওয়ারস। আমার বিমানের কম্পাসের রিডিং-এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। দয়া করে বলতে পারেন! বুঝতে পারছি না, কোথায় ভাসছি। শেষবার পাক মারার পরই আমরা হারিয়ে গেছি।' সিনিয়ার ফ্লাইট ইনস্ট্রাকটার অনেক চেষ্টা করে টেলারকে ধরলেন। টেলার উৎকণ্ঠিত গলায় বললেন, "আমার দুটো কম্পাসই কাজ করছে না। আমি ফোর্ট লডারডেল খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। আমার মনে হচ্ছে, সমুদ্রের যে অঞ্চলটাকে 'কি' বলে আমি সেই অঞ্চলে ঢুকে পড়েছি, তবে কতটা নিচে নেমে এসেছি বলতে পারবো না।"

সিনিয়ার ইনস্ট্রাকটর বললেন, 'আপনার বাঁ দিকে সূর্য, এইবার আপনি উত্তর দিকে যাবার চেষ্টা করুন। তাহলেই ফোর্ট লডারডেলে এসে পড়বেন।' নির্দেশ যাবার কিছুক্ষণ পরেই ভেসে এল কণ্ঠস্বর। টেলারের উদ্বিগ্ন গলা, 'আমরা এইমাত্র ছোট্ট একটা দ্বীপ পেছনে ফেলে এলুম। আমাদের চোখের সামনে আর কোনও স্থলভাগ নেই। মহাশূন্য। অচেনা অজানা মহাশূন্য।'

সিনিয়ার ইনস্ট্রাকটার বুঝলেন, টেলারের ফ্লাইট নাইনটিন 'কি' ধরে এগোচ্ছে না। অন্য কোথাও গিয়ে পড়েছে। কারণ 'কি' ধরে এগোলে দু ধারেই স্থলভাগ নজরে পড়ত। নীরবতা। ও প্রান্তে আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ বেলা চারটে নাগাদ, টাওয়ারের বেতারযন্ত্র সক্রিয় হয়ে উঠল। অস্পষ্ট বার্তা। মাঝে মাঝে বিঘ্নিত। লেফ্‌টন্যান্ট টেলার অজ্ঞাত কারণে পরিচালন ভার ক্যাপটেন স্টিভারের হাতে তুলে দিয়েছেন। স্টিভার বলছেন, 'আমরা কোথায় আছি বলতে পারব না। আমার মনে হচ্ছে বেস থেকে আমরা ২২৫ মাইল উত্তরপূর্বে আছি। আমরা নিশ্চয়ই ফ্লোরিডার ওপর দিয়ে উড়ে এসে গাল্‌ফ অফ মেকসিকোয় ঢুকে পড়েছি।'

ফ্লোরিডার ওপর ফিরে আসার জন্যে ফ্লাইট লিডার মনে হয় ১৮০° একটা বাঁক নিলেন, ফলে বেতারে তাঁর কণ্ঠ আরও ক্ষীণ হয়ে এল। তার মানে ভুল বাঁক নিয়ে বিমানগুলি ফ্লোরিডা থেকে বহু দূরে পুবের দিকে সরে যেতে লাগল খোলা

তারিখ তাও বলা যাবে না। আমার আবার ডিজিটাল ঘড়ি। সময় বা তারিখ বদলাতে হলে বেশ ঝামেলা করতে হবে। মেকসিকোয় পৌঁছে মেলানো যাবে। এক লাফে বিমান বারমুডা বন্দর ছেড়ে অ্যাটলান্টিকের আকাশে উঠে পড়ল। আমাদের পথও অনেকটা ফ্লাইট নাইনটিনের পথের মতোই। উড়ে চলেছি গাল্ফ অফ মেকসিকোর দিকে। এই অঞ্চলে আজ থেকে পনের কুড়ি বছর আগে ফ্লাইং সসারের উপদ্রব হয়েছিল। ফ্লাইট নাইনটিন অদৃশ্য হবার আগে নাগাড়ে বেতারবার্তা প্রেরণ করেছিল। তার কিছু ধরা পড়েছিল ফোর্ট লডারডেলের টাওয়ারে। কিছু ধরা পড়েছিল হ্যাম রেডিওতে। ব্যক্তিগত কিছুকিছু রেডিও স্টেশান সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে, হবি সেন্টারের মত। সেই রকম একটি হ্যাম রেডিও স্টেশানে ফ্লাইট নাইনটিনের একটি বার্তা ধরা পড়েছিল। টেলারের গলা, Don't come after me। এ কথা কাকে বলছিলেন টেলার? কিছু পরেই শোনা গিয়েছিল, টেলার

মেক্সিকো

সমুদ্রে। ফ্লাইট নাইনটিন থেকে শেষ অস্পষ্ট যে সংবাদ এসেছিল, পরে বিশেষজ্ঞরা তার মর্মোদ্ধার করেছিলেন, 'চারপাশ দেখে মনে হচ্ছে, আমরা অদ্ভুত এক সাদা জলরাশির ভেতর প্রবেশ করছি।' 'ইট লুকস লাইক' শব্দ তিনটি তবু স্পষ্ট বাকিটা অনেক চেষ্টায় বোঝা গিয়েছিল, 'এন্টারিং হোয়াইট ওয়াটার। উই আর কমপ্লিটলি লস্ট।'

যে আকাশের তলায় বিমানের ডানার ছায়ায় বসে আছি, আমরা দুজন, এই একই আকাশ ১৯৪৫ সালে ছিল। ১৯৬৮-তে ছিল, ৭২-এ ছিল। রহস্যময় আকাশ। বিজ্ঞানীরা জানেন এই ট্র্যাঙ্গেলের একটি বিন্দুতে, ফ্লোরিডা থেকে বাহামার মধ্যে একটি অঞ্চলকে বলা হয়, 'রেডিও ডেড স্পট'। যেখানে বেতার তরঙ্গ প্রবেশ করে না, নির্গতও হয় না। এমন একটি বিন্দু আছে যেখানে কম্পাস অচল হয়ে যায়।

আমাদের ডাক পড়ল। বিমান এবার ছাড়বে। বারমুডা থেকে মেকসিকোর ইস্তাফা। ঘড়ি আর দেখে কি হবে! সময়ের আর হিসেব নেই। কত

বলছেন, 'দে লুক লাইক দে আর ফ্রম আউটার স্পেস।'

বিমানে নতুন সেবিকারা এসেছেন। সেবিকাপ্রধানা অবশ্য সেই একই মহিলা। তাঁর ডিউটি বদলায় নি। আবার খাওয়া। প্রশ্ন করলুম, 'এটা কি?'

অত্যন্ত হাসিমুখ, প্রসন্ন বিমানসেবিকা বললেন, 'এটা হল ব্রেকফাস্ট।'

তার অর্থ ভোর হল। বিমান ছাড়াড় হিসেবে। যে অঞ্চল দিয়ে উড়ে চলেছি, সেই হিসেবে নয়। পোর্ট হোলের গা বেয়ে শিবের জটাজালের মতো পিঙ্গল বর্ণের অদ্ভুত এক ধরনের মেঘ পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এল। বুক গুড়গুড় করছে। অলৌকিক কোনও অভিজ্ঞতা হবে না কি! এই তো এখন আমরা পরোপুরি সেই ডেভিলস ট্র্যাঙ্গেলের ওপর দিয়ে চলেছি। আকাশের ফুটো গলে অন্য কোনও ডাইমেনসান, অন্য কোনও কালের জগতে হারিয়ে গেলে কেমন হয়!

(ক্রমশ)

প্রকৃতির যা করার সাধ্য নাই
প্রাকৃতিক স্বস্তিক শিকাকাই সাবান করে তাই-ই
চুলের সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে দেয় অনেকটাই
স্বস্তিক শিকাকাই সাবান আবার পাওয়া যাচ্ছে।

খরা এবং বন্যা প্রসঙ্গে

সমরজিৎ কর

এ বছর ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে যে ধরনের খরা এবং বন্যার তাণ্ডব ঘটে গেল, স্মরণযোগ্য কালে তার কোন নজির নেই। বন্যা এবং খরা এ দেশে এমন কোন নতুন ঘটনা নয়। আসামের ব্রহ্মপুত্র প্রতিবছরই নিয়ে আসে বন্যা। বিগত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে উত্তরবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা এবং দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি অঞ্চল বর্ষার মরসুমে প্লাবিত হচ্ছে। কোন কোন অঞ্চলে অতিরিক্ত খরাও যে আসে না, তাও নয়। কিন্তু এ বছর যা ঘটল—একদিকে খরা, আরেকদিকে প্লাবন—এ যেন এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। খরায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন উত্তরপ্রদেশ এবং বিশেষ করে রাজস্থানের মানুষ। রাজস্থান এবং সন্নিহিত এলাকার আবহাওয়া এমনিতেই চরম। স্বাভাবিক অবস্থাতেই ওই অঞ্চলে বৃষ্টি হয় কম। এ বছর গোড়া থেকেই, বলতে গেলে সেখানকার মাটি এক ফোঁটাও বৃষ্টি পায়নি। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ। তাপমাত্রা কখনো উঠেছে ৪৪ থেকে ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। চাষের ক্ষেত ফেটে চৌচির। গাছপালা লতাগুল্ম থেকে ঘাস—উদ্ভিদ বলতে যা বোঝায়, সূর্যের দহন এবং জলের অভাবে মৃত। পানীয় জলের উৎস কুয়ো এবং অগভীর নলকূপ শুকিয়ে গেছে। জল নেই, তাই চাষের ক্ষেত ঊষর মরুভূমির মত। নালা এবং অন্যান্য জলাশয় জলহীন। আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ। এই বুঝি বৃষ্টি এল। কিন্তু সে মেঘ যেন মরীচিকা। এই আসে, এই অদৃশ্য। পশুখাদ্য নেই। তার অভাবে অজস্র গৃহপালিত পশু—গরু ছাগল, ভেড়া, ইত্যাদি, মারা গেছে। মারা গেছে মানুষ। খরার স্পর্শ থেকে রেহাই পেতে ঘরবাড়ি ক্ষেত খামার ছেড়ে চলে গেছে অনেকে—অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ-কে সম্বল করে। হাহাকার! শুধুই হাহাকার।

ওদিকে বিহারের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের অবস্থাও সঙ্গীন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ওই সব অঞ্চলে নামল প্রচণ্ড বর্ষা। বর্ষার জলে মাত্র দুই একদিনের মধ্যেই ফুলে ফেঁপে উঠল নদনদী। ছোট ছোট নালা অথবা খাল, তারাও হয়ে উঠল রাক্ষসীর মত। দেখা দিল প্লাবন। ভাসিয়ে নিয়ে গেল ঘরবাড়ি, মানুষ এবং গৃহপালিত পশু। প্রথম পর্বে প্লাবন কিছুটা

প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি নিয়ে আসে অপরিসীম দুর্দশা। কিন্তু, বিজ্ঞানীরা এর থেকেই পেতে পারেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ইঙ্গিত। আমরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি কি?

ছবি: শৈবাল দাস

ঘটল। অনেকে ভাবলেন, এই বুঝি শেষ। কিন্তু কয়েক দিন যেতেই, আবার অতিবৃষ্টি। আবার প্লাবন। তারপর আবার গোদের উপর বিষফোঁড়া। বিভিন্ন বাঁধের জলাধারগুলির জল উঠল ফুলে ফেঁপে। জলের অতিরিক্ত চাপের হাত থেকে বাঁধগুলিকে বাঁচানর জন্যে জলাধার থেকে ছাড়া হল অতিরিক্ত জল। সেই জল নিয়ে এল আর এক প্রস্থ বন্যা। আবার ভেসে গেল ঘরবাড়ি। ধান গমের জমি প্লাবিত হল। বন্যার তোড়ে ভেসে গেল রেল এবং মোটর পথ। যানবাহন স্তব্ধ। পরিবহণ ব্যবস্থা হল বিকল।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার ব্যাপারে মানুষ যে কত অসহায় এবারকার বন্যা এবং খরা তার বড় রকমের একটি উদাহরণ। তবু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এখন যে অগ্রগতি, তা থেকে অনেকের মনেই নানা রকম প্রশ্ন উঠেছে। মোটামুটিভাবে প্রশ্নগুলি এই : এ ধরনের খরা যে ঘটতে পারে, সে কথা আবহাওয়াবিদ্‌রা কি আগে থেকে জানতে পারেননি? গত প্রায় দুই দশক ধরে আমরা দীর্ঘমেয়াদী আবহাওয়া বিষয়ক পূর্বাভাস (long range weather forecast) সম্পর্কে আমরা অনেক কথাই শুনে আসছি। আমাদের আবহাওয়া দপ্তর 'মৌসুমী' নিয়ে বছর কয়েক আগে ঘটা করে নানা রকম পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণার কাজে হাত দিয়েছিলেন। আবহাওয়ার মতিগতি জানার জন্যে তাঁদের উদ্যোগে একদল বিজ্ঞানী আবহাওয়ার পূর্বাভাস যোগানর ব্যাপারে 'গাণিতিক মডেল' তৈরির চেষ্টা করছেন। ইলেকট্রনিকসের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়ায় আবহাওয়াসংক্রান্ত অনেক অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কারের যন্ত্রপাতিও তৈরি হয়েছে বিস্তর। বিমান এবং কৃত্রিম উপগ্রহে ওই সব যন্ত্রপাতি বসিয়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণেরও কাজ চলছে। এ ধরনের উদ্যোগ বহুক্ষেত্রেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস যোগাতে সমর্থ হয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, ১৯৭৫ সালে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বা 'ওয়ার্লড ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অরগ্যানাইজেসন (FAO) এই সময়ে ভারত যে এমন অভূতপূর্ব এক খরা পরিস্থিতির সামনে পড়তে পারে, সে সম্পর্কে পূর্বাভাস জুগিয়েছিল। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০-এর মধ্যে পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে প্রচণ্ড খরা দেখা দিতে পারে সে ব্যাপারে একটি মানচিত্রও এই সংস্থা তখন প্রকাশ করেছিল। তাই প্রশ্ন জাগে, আবহাওয়া সংক্রান্ত এমন একটি ঘটনার কথা আমাদের আবহাওয়া দপ্তর কি জানতেন না? না জানার কোন কথা নেই। আবহাওয়াবিজ্ঞানের ব্যাপারে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যে এখন শীর্ষস্থানীয়, সে কথা অনেকেই জানেন। তবু কেন ঘটল এমন বিপর্যয়?

অতএব ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই, খরার পূর্বাভাস সম্পর্কে আবহাওয়া দপ্তর আগে থেকেই অবহিত ছিলেন। হয়, সে খবর তাঁরা বিশদভাবে যে সব দপ্তরের উপর ত্রাণের দায়িত্ব ন্যস্ত, তাঁদের সময় মত জানাননি। অথবা, তাঁরা হয়ত ঠিক সময়েই জানিয়েছিলেন, কিন্তু এদেশে যা হয়, মাথার উপর ছাদ ভেঙে না পড়লে কেউ ছাদ মেরামতিতে হাত দেন না, কতকটা সেইরকম। ব্যাপারটা জানা সত্ত্বেও ত্রাণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি প্রয়োজন মত আগাম ব্যবস্থাদি নেওয়ার ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। এবং তা যে তাঁরা করেননি, পরিস্থিতির দিকে চাইলেই সহজে তা বোঝা যায়। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যা করা যেত তা হল : আবহাওয়া দপ্তর খরার ব্যাপারটা সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে জানিয়ে দিলেন, আগাম। এই সব দপ্তরগুলির মধ্যে পড়ে, সেচ, স্বাস্থ্য, কৃষি, সমাজকল্যাণ, পরিবহণ, খাদ্য, প্রভৃতি। খবরটি জানার পর সেচ দপ্তর জলের ব্যাপারটা নিয়ে একটি পরিকল্পনা রচনা করে সেই মত কাজ করতে পারতেন। খরা কবলিত অঞ্চলে রয়েছে অজস্র ছোট বড় জলাশয়, নালা প্রভৃতি। সেগুলির উন্নতি ঘটিয়ে অতিরিক্ত জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা যেত। কোন অঞ্চলের কূপ এবং অগভীর নলকূপ শুকিয়ে যেতে পারে এ তথ্য তাঁদের না জানার কথা নয়। সে ক্ষেত্রে ওই ওই অঞ্চলে গভীর নলকূপ বসিয়ে জল সমস্যার মোকাবিলার জন্যে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া যেত। কিন্তু তা করা হয়নি। কিন্তু পরিবর্তে কি দেখলাম আমরা। খরার গ্রাসে যখন সব বিপর্যস্ত তখন কিছু কিছু গভীর নলকূপ বসান হল। ট্যাঙ্কারে জল ভরে সুদূর অঞ্চল থেকে এসে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হল। এতে সময় গেল, কাঁড়িকাঁড়ি অর্থ ব্যয় হল, যা দিয়ে আগেই বসান যেত অনেকগুলি গভীর নলকূপ। সে টাকা জলে যেত না, এবং ওই সব অঞ্চলে স্থায়ী জল সরবরাহের ব্যবস্থাটা পাকাপাকিভাবে সারা যেত—আগে থেকে ব্যবস্থা নিলে। এতে করে মানুষ এবং গৃহপালিত পশুপাখির জলের সুরাহা হত যেমন, সেই সঙ্গে কিছু কিছু সেচ ব্যবস্থা চালিয়ে হয়ত চাষবাসও চালান যেত, পশুখাদ্য উৎপাদন করা যেত।

পরিবহণের ব্যাপারটা যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার মত বন্দোবস্ত করা যেত। খরা যে হবে, অনেকেই জানতেন। এ সময় খরা কবলিত এলাকায় খাদ্যসামগ্রী পৌঁছাতে হবে, পৌঁছাতে হবে আরো নানারকম রসদ। কেউ হয়ত অসুস্থ হল, তাকে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্যে উপযুক্ত সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা উচিৎ ছিল আগাম। খরার জন্যে খাদ্যদপ্তর উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য আগাম মজুত করতে পারতেন সম্ভাব্য খরা-প্রবণ গ্রামগুলিতে। এ কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহায্য নেওয়া যেত। এটা করা যেত খরার আগেই। তাতে করে গ্রামবাসীদের খাদ্য এবং অন্যান্য রসদ সুষ্ঠুভাবে যোগানো যেত যেমন, তেমনি অসামাজিক এবং রক্তপিপাসু দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা যেত। এটা বন্যা কবলিত এলাকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু দেখেশুনে যা মনে হয়েছে, আমাদের সরকারী দপ্তরগুলির মধ্যে কোন সমন্বয় নেই। সবই চলছে খামখেয়ালিভাবে। দেখে শুনে মনে হয়, সব কাজেই আমরা দারিদ্র্যের দোহাই দিই। এটা ঠিক নয়। সুষ্ঠু সমন্বয় এবং দূরদর্শী পরিকল্পনার অভাবেই এ ধরনের সমস্যা মোকাবিলার মস্ত বড় অন্তরায়।

ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ অথবা টর্নেডোর মত আগ্রাসী প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা সম্পর্কে আগাম পূর্বাভাস যোগানর মত পারঙ্গমতা পৃথিবীর কোন দেশের বিজ্ঞানীই এখনো পর্যন্ত অর্জন করতে পারেনি। এ সব ঘটনা ঘটে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিকভাবে, পূর্বাভাস না দিয়ে। কিন্তু খরার অথবা বন্যার ব্যাপারটা তো ভিন্ন। খরা তাৎক্ষণিকভাবে হয় না। তার আভাস বহু আগে থেকেই জানা যায়। যে সব অঞ্চলে এবার প্রচণ্ড খরা গেল, ওই সব অঞ্চলে প্রতিবছরই খরা হয়ে থাকে—কম বা বেশি। এ বছর প্রাবল্যটা ছিল মারাত্মক। অতএব ওই সব অঞ্চলে ত্রাণ কাজ চালানর মত সময় ছিল না—আগে থেকে করা যেত না, এ ধরনের ওজর সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন কোন মানুষ মেনে নেবেন, এটা বলা যায় না। প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর আগে থেকে তৎপর হয়ে ব্যবস্থা নিলে ওই সব মানুষদের দুর্ভোগের হাত থেকে বাঁচাতে পারতেন। এ কথা বন্যাপ্লাবিত এলাকার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেত। অতিরিক্ত বর্ষণে কোথায় কোথায় বন্যা হতে পারে, সে কথা আগে থেকে অনুমান করা এমন কোন শক্ত ব্যাপার নয়। পরিচালনা ব্যবস্থা যদি সুষ্ঠু থাকে—তার মোকাবিলা করাও সম্ভব হয়।

সর্বনাশা খরা

এ প্রসঙ্গে আরো একটা কথা আছে। এক সময় দেখতাম, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলি ত্রাণের কাজে ঝটিতি ঝাঁপিয়ে পড়তেন। গত দুই দশকে রাজনৈতিক কারণে বহু সেবাপ্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক আখড়া।

ধাপে ধাপে রয়েছেন কত সরকারী অফিসার, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ—কত সব। মন্ত্রীর চেয়ে সমস্যাদি সম্পর্কে তাঁরা অনেক বেশি বিচক্ষণ। সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করলে, ত্রাণের কাজ তো তাঁরাই চালাতে পারেন? এর জন্যে প্রচুর খরচ করে মন্ত্রীদের বিহারের কোন দরকার হয় না। ওই

আবহাওয়াবিদরা আগেই ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তবু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হল না কেন?

অর্থ ত্রাণের কাজেও লাগান যায়। এখানেও সেই 'হিরো ওয়ারশিপ'। মন্ত্রী না এলে কাজ চলে না। অবশ্য এ ব্যাপারে আমলাদের ভয় রয়েছে। তাঁদের উপরও থাকে প্রচণ্ড রাজনৈতিক চাপ। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের ভাবতে হয়, কোথায় কিভাবে কাজ হবে (রাজনৈতিকভাবে মন্ত্রীদের নিরাপদ করতে) মন্ত্রীদের মর্জিমত। এর অন্যথা করলে বিপদ। একটু এদিক ওদিক হলেই যথেষ্ট প্রাজ্ঞ আমলাকেও তাঁদের হাতে অপদস্থ হতে হয়, অনেক সময় অপরের সামনে, কারণ নেতারা অনেক সময় ভব্যতার নর্ম মেনে চলতে পারেন না বলে। তাই আত্মসম্মান বজায় রাখতে গিয়ে আমলারা তাঁদের পারঙ্গমতার পরিচয় দিতে পারেন না, প্রয়োজনের সময় দেশের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত সামর্থ্য কাজে লাগানর ব্যাপারে, বলা বাহুল্য, এটা বড় রকমের একটি অন্তরায়।

কথাটার সত্যতা এবার যেভাবে খরা এবং বন্যার মোকাবিলা চলল, তা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একথা ঠিক, বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে খরা একটি জটিল ঘটনা। বিভিন্ন মানুষ ব্যাপারটা দেখে থাকেন বিভিন্ন দৃষ্টিতে। তবে মোটামুটিভাবে খরাকে তিনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এক, আবহাওয়া সম্পর্কিত খরা বা 'মেটিওরোলজিক্যাল ড্রাউট'। দুই, কৃষিসম্পর্কিত খরা বা 'এগ্রিকালচারাল ড্রাউট' এবং তিন, জলসম্পর্কিত খরা বা 'হাইড্রোলজিক্যাল ড্রাউট।' প্রথমটি নির্ধারিত হয় মুখ্যত আবহাওয়ার আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে। অনেক জায়গায় সূর্যের উত্তাপ তত নেই, বরং অত্যন্ত শীতল পরিবেশ। অতিরিক্ত আর্দ্রতার দরুন সেখানে খরা দেখা দেয়। যখন উপযুক্ত পরিমাণ জলীয় বাষ্পের অভাবে কোন অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয় গাছপালা বাড়তে পারে না এবং শুকিয়ে যায়, সে ধরনের খরাকে বলা হয় কৃষিসম্পর্কিত খরা। নদীনালা জলাধারে সারা বছর গড়ে যতটা জল থাকা দরকার যখন তা থাকে না—সে ধরনের খরাকে বলা হয় জলসম্পর্কিত খরা। ভারতে এই তিন ধরনের খরাই ঘটেছে। অনাবৃষ্টি, জলীয় বাষ্পবাহী বাতাসের অভাব এমন অনেক কিছুই এই সব ঘটনার জন্যে দায়ী। বন কাটা, জমির মাটির অবক্ষয় এ সবও খরা সৃষ্টির ব্যাপারে কাজ করে। এ ছাড়াও রয়েছে আরো নানান কারণ। তার কিছুটা প্রাকৃতিক, কিছুটা মনুষ্যকৃত।

দূরদৃষ্টির অভাবে মানুষের নিজস্ব ক্রিয়াকলাপও অনেকাংশে এই বিধ্বংসী বন্যার জন্য দায়ী?   *ছবি: দেবকুমার কর্মকার*

প্রাকৃতিক ছাড়াও বন্যার পেছনেও কাজ করে মনুষ্যকৃত ঘটনা। উন্নয়নের প্রয়োজনে গড়ে তোলা হয়েছে অজস্র বাঁধ, নালা এবং জলাধার। এর ফলে বহু জায়গায় জলের স্বাভাবিক গতিপথ বন্ধ হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে, এক সময় যেখানে জল জমত না, এখন জমে; কখনও প্লাবন সৃষ্টি করে। পরিচালনার অভাবে নিকাশি ব্যবস্থা পর্যুদস্ত। এর জন্যেও ঘটে প্লাবন। এই সব কারণে একটু বেশি বৃষ্টি হলেই দেখা যায় বন্যা। এটা ঘটতেই পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এত বড় খরা এবং বন্যা ঘটে গেল—সেই ঘটনার সময় সেই ঘটনার প্রেক্ষিত এবং পরম্পরা জানার ব্যাপারে কতটা তৎপর হয়েছিলেন আমাদের বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ্‌রা, দুটিই সর্বনাশা ঘটনা সন্দেহ নেই। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত পর্যবেক্ষণ করার জন্যে অতিবর্ষণ এবং বন্যাপ্লাবিত এলাকায় ক'জন বিজ্ঞানী অকুস্থলে গিয়েছিলেন? খরা আক্রান্ত এলাকায় গিয়ে খরা চলার সময় তথ্য অনুসন্ধানে কতটা উদ্যোগী হয়েছিলেন, আমাদের আবহাওয়া এবং কৃষি বিজ্ঞানীরা? জানি, এর জন্যে যথেষ্ট কষ্ট এবং ঝক্কি নিতে হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক মতিগতি জানতে গেলে এ ছাড়া আর পথ কোথায়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাগারগুলিতে এ সব বিষয় নিয়ে অনেকেই গবেষণা করছেন। প্রকৃতি বন্যা এবং খরাআক্রান্ত এলাকায় তাঁদের জন্যে গবেষণার যে সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যে গবেষণা ভবিষ্যতে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারত, সে সুযোগ ক'জন বিজ্ঞানী নিয়েছিলেন? এ ধরনের প্রসঙ্গ তোলার একমাত্র কারণ, এই ঘটনাগুলি মারাত্মক হলেও এ ধরনের উদ্যোগ ঘটনাগুলি সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানতে সাহায্য করে। বলা বাহুল্য, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবেই এ ধরনের প্রশ্ন তোলা হল।

চি ত্র ক লা

লক্ষ্মী সরস্বতী

যামিনী রায়ের পাঁচটি ছবির রঙীন প্রতিচিত্র প্রকাশ করেছে দুটি সংস্থা, কিংস পাবলিসিটি অ্যান্ড সেলস প্রমোশান এবং দ্য পিয়ারলেস জেনারেল ফিনান্স অ্যান্ড ইনভেসটমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড। এর জন্যে ঘটা করে একটা উদ্বোধন অনুষ্ঠান হল। বিশ্বভারতীর উপাচার্য নিমাইসাধন বসু সভায় পৌরোহিত্য করেন। কল্যাণকুমার গাঙ্গুলি ছিলেন প্রধান অতিথি। স্থান বিড়লা অকাদমির প্রেক্ষাগৃহ। সময় সন্ধ্যা ছ'টা। উপলক্ষ যামিনী রায়ের শতবর্ষ। তারিখ ১৬ অগাস্ট। উদ্বোধনী ভাষণে উপাচার্য বললেন যে, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান শিল্পীর রঙীন প্রতিচিত্র ছেপে বের করে সাধারণ মানুষের কাছে শিল্পীদের পরিচিত করতে যত এগিয়ে আসবে ততই মঙ্গল। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছবির রঙীন প্রতিচিত্র বিশ্বভারতীর অনুমত্যানুসারে প্রকাশ করেছেন একটি ব্যবসায়ী সংস্থা। এ ব্যাপারে যাঁরা আপত্তি করেন, তাঁরা ঠিক করেন না। কল্যাণকুমার গাঙ্গুলি যামিনী রায়ের মনোজ্ঞ স্মৃতিচারণ করে প্রমাণ করলেন স্মৃতি সততই সুখের। ছাই রঙের সুন্দর বিরাট খাম, তার মধ্যে যামিনী রায়ের পাঁচটা ছবির প্রতিচ্ছবি রেশমী ছাঁচি ছাপাই পদ্ধতিতে তোলা (সিল্ক স্ক্রিন)।

কাগজেও একটা ছায় (টোন)-এর কাজ প্রতিচিত্রের ছাপ তোলার সঙ্গে ছেপে নেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে ইদানীং রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রতিচিত্র ছেপেছেন একটি বহুজাতিক টায়ার কোম্পানি। বোম্বাইয়ের ভকিল কোম্পানি, ললিতকলা অকাদমি এবং ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মর্ডান আর্ট কিছু বিখ্যাত শিল্পীর প্রতিচ্ছবি ছাপেন। সে সব প্রতিচ্ছবির সঙ্গে তুলনা করলেও যামিনী রায়ের পাঁচটি ছবির এই মুরাক্কা (অ্যালবাম) চমৎকার। আসল ছবির সঙ্গে প্রতিচিত্রণের একটা তফাত থেকেই যায়। বিশেষত রঙের ক্ষেত্রে ঔজ্জ্বল্য কমে যায়। তুলির কাজের সূক্ষ্ম টানটোন মুছে যায়। যামিনী রায় যেখানে বিস্তৃত সমতল রঙ ব্যবহার করেছেন, সেখানেও রঙ যবনিকার মতো গাঢ় অন্তরাল নয়। বরং তার ভেতর দিয়ে যেন হাওয়া বাতাস ঢুকতে-বেরুতে পারে। তা ছাড়া, রঙের সমবেত ঐকতান গড়ার দিকে ঝোঁক ছিল বলে, প্রতিটি রঙ হতো সমুদ্ভাসিত (যাকে বলে ইভেন লুমিনিয়ের)। প্রতিচ্ছবি খুব যত্ন করে

গণেশ জননী

ছাপা বলে সুন্দর হয়েছে। কিন্তু সমতল রঙ নিশ্ছিদ্র যবনিকার মতো হয়েছে এবং কোনও কোনও রঙ বেশিমাত্রায় উজ্জ্বল হয়েছে। বিশেষত লাল। নীল সবুজও কিছুটা। মেটে লাল (ইন্ডিয়ান রেড) খয়েরি হয়েছে। এই যে ত্রুটি তা প্রতিচ্ছবির ক্ষেত্রে হবেই। প্রতিচ্ছবি প্রতিচ্ছবিই, মৌলিক ছবি নয়। কিন্তু মাত্র পঞ্চাশ টাকায় এমন ছবি, একটা নয়, দুটো নয়, পাঁচটা— এ বাজারে ভাবাই যায় না। যাঁর সামর্থ্য আছে তাঁরই কেনা উচিত।

পাঁচটি ছবির প্রতিচ্ছবির দাম পঞ্চাশ টাকা। কমই। তবে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরে শহরের কোন শ্রেণীর এবং শতকরা কতজন এই মুরাক্কা কিনতে পারবেন, সেই সহজ পরিসংখ্যানে গেলাম না। প্রতিচিত্র সম্বন্ধে আমার আপত্তি রয়েছে। কারণ, যাঁরা মৌলিক ছবি কিনতে পারেন, তাঁরাই সস্তায় নামী প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর মুদ্রিত ছবি পেলে, উদীয়মান শিল্পীর ছবি না কিনে, বরং সেই প্রতিচিত্র বাঁধিয়ে, মৌলিক ছবি কিনবেন না। আর মৌলিক ছবি যাঁরা কিনতে পারেন না, প্রতিচিত্র কেনার সামর্থ্য দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের নেই। আর শিল্পীযশপ্রার্থীর মৌলিক ছবি কিন্তু মৌলিক ছবিই। যশস্বী চিত্রকরের প্রতিচিত্র প্রতিচিত্রই। এই ছবির একটিতে গণেশ কোলে দুর্গাকে দেখি বসে থাকতে। দুপাশে লক্ষ্মী সরস্বতী দাঁড়িয়ে আছেন। উভয়ের গায়ের রঙ মেটে বাদামী। পরেছেন সবুজ এবং নীল শাড়ি। দুর্গা গৌরী। কাঁচা সোনার বরণ। পরনে লাল শাড়ি। গণেশের গায়ের রঙ কমলা। সবুজ কাপড়ে কোমর জড়ানো। মুখখানি নীল। দ্বিতীয় ছবিতে নীল বালগোপাল মা যশোদার কাছে ননী চেয়ে খাচ্ছেন। তৃতীয় ছবির বিষয় শ্রীচৈতন্যকে ঘিরে খোল-কত্তাল নিয়ে কীর্তনীয়ার দল। চতুর্থ ছবির বিষয় ঘোড়ার পিঠে রানীমা। দুপাশে দুই সৈনিক। পঞ্চম ছবিটির বিষয় বাটালি হাতুড়ি হাতে এক শ্রমিক। দ্বিমাত্রিক হলেও রচনা আটসাঁট। পাত্রপাত্রী যামিনী রায়ের লোকায়ত-শৈলী রূপারোপিত। যামিনী রায়ের ছবির বৈচিত্র্যের দিকে নজর দিলে পাঁচটা ছবি আরেকটু অন্য রকম হতে পারত। মুরাক্কার পাঁচটা ছবির মধ্যে চারটে ছবি ধর্মমূলক। তাঁর মায়ে-পোয়ে, সাঁওতাল-সাঁওতালনী, নিসর্গচিত্র (গঙ্গার ঘাট বা বাগবাজারের গলি), প্রতিকৃতি (গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ) এবং খ্রীষ্ট জীবনী থেকে বাছলে যামিনী রায়ের মানসিকতা ফুটত ভাল। সে হত এক ধর্মনিরপেক্ষ শিল্পীর মেজাজমর্জির সঙ্গে আলাপ। যামিনী রায়ের "ছুতোর মিস্ত্রি" ছবিটা (যার অন্য নাম "শ্রমিক") বাদ দিলে অন্যগুলি পৌরাণিক। একটা কেমন সন্দেহ হয় যে নন্দনবোধ নয়, ধর্মবোধের প্রতি আবেদন করা হয়েছে।

তবু বলব এ সব ত্রুটি সামান্য। বোঝা যায় সদুদ্দেশ্যে নিছক যামিনী রায়ের ছবি ভালবেসেই করা। ছবি সম্বন্ধে বাঙালির অজ্ঞতা অসীম। সেদিক থেকে বিচার করলে যদি একজন শিল্পীকে নিয়েও কেউ কোনও কাজ করেন, তবে সেও ভাল। কাজ যিনি করেন তাঁরই ভুল হয়। যাঁর কোনই ভুল হয় না তিনি নিষ্কর্মার ঢেঁকি। যামিনী রায়ের ছবি প্রধানত দ্বিমাত্রিক সমতল। রেখার বাঁক দিয়ে তিনি ভাস্কর্যের বস্তুপুঞ্জ এবং আয়তনের ভাবটা আনতেন, সীমারেখা কিন্তু সমুন্নত (কনটুর) রেখা হিসাবে ব্যবহার করে রেখার ভেতরে সমান্তরাল ছায় তৈরি করতেন। ফলে ভাস্কর্যের গুণে গুণান্বিত হত তাঁর ছবি। পটের প্রান্ত থেকে প্রান্ত যেভাবে বাইজেনটাইনীয় মোজেইক দেওয়ালচিত্রের রীতিতে ভরে ফেলতেন, তা অনেক সময় ইজেলে আঁকা ছবির প্রেক্ষিতের নিয়ম লঙ্ঘন করত। অর্থাৎ চোখ-বরাবর ছবি (আই-লেভেল পেনটিং-এর) যে প্রেক্ষিতগত সমস্যা তার তোয়াক্কা তিনি করেননি। এইখানে তিনি সমকালীন। তেমনি বিষয়ের লৌকিকতার দিকটা তাঁর ছবিকে জনপ্রিয় করেছিল। তাঁকে "যামিনী পটো" বলে আড়ালে বাবুরা অনেকে আনন্দ পেয়েছেন। কিন্তু এটা যে তাঁর ছদ্মবেশ সেটা ধরতে পারেননি।

তিনি যে পিকাসো, ব্রাখ, মাতিস, লেগারের সগোত্র তা ধরতে পারেননি। আমি কিন্তু মনে করি না, তিনি নব্যভারতীয় কলমের বেশির ভাগ শিল্পীদের মতো ছিলেন। বরং, রবীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীদের মতো ছিলেন আন্তর্জাতিক শিল্পী। বেশির ভাগ বাঙালি—বুদ্ধিজীবী —ছবি বোঝেন না বলে, যামিনী রায়ের গম্ভীরতা মেপে উঠতে পারেন না।

"স্বপ্নে দেখা ছবি"

তাঁর পুরো নাম মানসকমল বিশ্বাস। তিনি কি করেন, কোথায় থাকেন জানতাম না। শুধু জানতাম ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের স্নাতক। তিনি প্রদোষ দাশগুপ্তের ছাত্র অধ্যাপক সুভাষ রায়ের কাছে ভাস্কর্যের তালিম নিয়েছেন। দু একটা সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে, বা যৌথ প্রদর্শনীতে, তাঁর একটা কি দুটো কাজ কৌতূহল তৈরি

করেছিল। মৃণাল সেনের "খণ্ডহর" এবং "জেনিসিস" এবং শ্যাম বেনেগেলের "মাণ্ডি" এবং "ত্রিকালে", শিল্প নির্দেশক নীতিশ রায়ের অধীনে মানসকমল কাজ করছেন, কার মুখে যেন শুনেছিলাম। মানসকমল স্রোতে কুটোর মতো ভেসে যাবেন এমন একটা ধারণা হয়েছিল। ফলিত ললিতকলা তো প্রলোভনের চোরাবালি।
তারপর দুম করে, আকাদমি অফ ফাইন আর্টসের তিনটি ঘর জুড়ে জলরঙ মিশ্র মাধ্যম এবং পোড়ামাটির রকমফেরের ভাস্কর্য নিয়ে বিরাট একক প্রদর্শনী (১৯-৩১ আগস্ট)। সাত বছরের কাজ। উত্তর, পশ্চিম আর নতুন দক্ষিণ গ্যালারি জুড়ে। সাত বছর অনুপস্থিতির পর "হাজির" বলে বড় গলায় জাহির করা।

স্বপ্নে দেখা ছবি : মানসকমল বিশ্বাস

প্রথমে ছবির কথা। "বুকের মধ্যে এক টুকরো মেঘ/ তাকে বলি, বৃষ্টি হয়ে ঝরো/ স্বচ্ছ হোক আমার আকাশ"—ভাবখানা অনেকটা এমনই। "বন" "মানব" এবং "প্রতিকৃতি" পর্যায়ের চিত্রমালা ছাড়াও অন্যান্য বিষয় নিয়ে ছবি ছিল। দীঘল গাছগুলো এক দিকে সামান্য হেলে উঠে গেছে জটলা পাকিয়ে। মাটি আর আকাশের অবকাশ যেন তারা ঝাঁকড়া ডালপালা পাতা দিয়ে দখল করেছে। স্বচ্ছ জলরঙে শূন্যতার অবসরকে স্থানচ্যুত করে। পট জুড়ে এই ছবি। কোনও ফাঁক নেই। ফলে অরণ্যের ঘন গাছগাছালিতে আলো অন্ধকার তৈরি হলেও, মনে হয় রচনার সমস্যা আদপে নেই। মানসকমল যদি বলেন, ঘন বন আমার প্রতিপাদ্য, তাহলে বলব ছবির অভিব্যক্তির ভাষা হয়েছে সাদামাটা। উপস্থাপনের সমস্যা রইলটা কি?
মানুষ জনের ছবিতে আদিম আরণ্যক চিত্রভাস্কর্যের টোটেম-দণ্ড, দেব-দানব, পূর্বপুরুষের প্রতিমূর্তির রূপারোপিত সরল অথচ জোরালো প্রকাশ রয়েছে তাঁর কাজে। প্রাগক্ষর পৃথিবীর উপজাতির সেই উৎসের সন্ধানে তাঁর মানসযাত্রা। স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত দ্বিমাত্রিক ভূমিতে তাঁর ঈষৎ বিকৃত উপজাতিক ধরনের রূপবন্ধের প্রকাশ। আকারের বিকার নিয়ে খেলা। হয়তো কুশীলবের মাথাটা লাউয়ের মতো, আর গা বৃষকাষ্ঠের মতো। তারপর রঙ নিয়ে নানা খেলা। ফুটিফাটা বুনোট। সফেন গড়িয়ে যাওয়া কখনও রঙের চলন। কখনও ঘন থেকে পাতলা ছায়ের খেলা। কখনও আবার কাগজের ওপরের স্তরটা উঠিয়ে দিয়েছেন। বিদেশে নৃতাত্ত্বিক যাদুঘরে, আফ্রিকা, দক্ষিণ সাগরিকা দ্বীপমালা, প্রাক-কলম্বাস আমেরিকা মহাদেশিক মুখোশ, মূর্তি, পুতুল প্রতিমা দেখেছি। সেগুলোতে যৌথ নিশ্চেতনার আদিম বিশ্বরূপের বিষয়-ধারণার প্রকাশ হয়েছে। তাই যেন মানসকমলের ছবিতেও এসেছে। এবার হয়তো অভিব্যক্তির এই সরল রূপবন্ধের জন্যে তিনি মানানসই রচনার কায়দা খুঁজবেন। ছবিতে রূপ এসেছে। কিন্তু এ যেন পটকে জবর দখল করা। গৃহনির্মাণ এবং গৃহপ্রবেশ এখনও বাকি।
ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও মানসকমলের পোড়ামাটি কিন্তু আলাদা রকমের। জল আর মাটির সঙ্গে পোড়ামাটির গুঁড়ো (ফায়ার ক্লে), গ্রোকদানা পা দিয়ে রুটির ময়দার মতো মাড়িয়ে, তারপর মাটির ইটের মতো স্লাব বানিয়ে নেওয়া হয়। মূর্তি বানাবার সময় এটা হয় কাঁচামাল। জল দিয়ে এটাকে নরম করে, কাঠামো (আরমেচার) বেঁধে, তারপর সেটা চাপিয়ে মূর্তি বানানো হয়। সুরকি, গ্রোকদানা, মাটি মেশানো থাকে বলে এতে নোনা লাগে না। ফলে ১০৫০-১২৫০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড তাপ, ফার্নেসে সহ্য করতে পারে এই মূর্তি। সাধারণ পোড়ামাটির চেয়ে শক্ত পোক্ত হয়। লাল দানাদার বুনোটও তৈরি হয়। মানস উপবিষ্ট এবং অর্ধশায়িত রূপবন্ধের বস্তুপুঞ্জের তলে তলে ঘূর্ণায়মান যে খেলা, দেহের নানা ভঙ্গের ভঙ্গী, চড়াই উৎরাই খাড়াই, তাই নিয়ে করেছেন কাজ। দেহ ধরে দেহাতীতে যাবার সহজিয়া পন্থা। ভাস্কর্যের আয়তন এবং বস্তুপুঞ্জের সমন্বয়ের মাত্রা তাঁর জানা আছে বলে, মানসকমলের পোড়ামাটির ভাস্কর্য পুতুল বা প্রতিমার স্তরে নেমে যায়নি।
কলম্বাস-পূর্ব নতুন বিশ্বের আজটেক টলটেক ভাস্কর্যের ভাবরূপেরই বিমূর্ত ছায়া।
অতিকায় প্রদর্শনীর আতিশয্য তখনই মানানসই হয়, যখন শৈলী এবং রূপবন্ধের বিবর্তনের যৌক্তিক ধারাবাহিকতা স্পষ্ট হয়।
মানসকমলের ভঙ্গীতে অভিযাত্রীর দুঃসাহসই প্রধান। আরেকটু বাছাই করলে প্রদর্শনীটি নিখুঁত হতে পারতো।

সন্দীপ সরকার

সং গী ত

সুধাসাগরতীরে

সান্ধ্য এক সঙ্গীতানুষ্ঠান। ইমন আশ্রিত 'এ মোহ আবরণ খুলে দাও'—এই একান্ত প্রার্থনা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রাজ্ঞ বর্ষীয়ান শিল্পী সুবিনয় রায়। মুক্তছন্দে নয়, তালের আঁটোসাঁটো বাঁধনে গাইলেন, অথচ কি অপরূপ সুরসুষমায় ভরে গেল চারদিক! তারপর তো গাওয়া হল কত না গান। কিন্তু সব ছাপিয়ে জেগে রইল নিভৃত অন্তরের সেই আকুল প্রার্থনা : এ মোহ আবরণ খুলে দাও। সুবিনয়বাবু দ্বিতীয় গানটি বেছেছিলেন ইমনকল্যাণে বাঁধা ধ্রুপদাঙ্গ—'সংসারে কোনো ভয় নাহি নাহি'। এই অভয়বাণী সঠিক পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন তিনি শ্রোতাদের হৃদয়ে। তবে ধ্রুপদাঙ্গ বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ছোঁয়া মাখা রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাঁর সহজাত বুৎপত্তির কথা তো জানাই আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেসব গানে স্রষ্টা হিসেবে স্বমহিম সেসব রাবীন্দ্রিক গানেও যে তিনি গভীরে যেতে পারেন, ছুঁতে পারেন সেই অতলান্ত, তারই নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকছে তাঁর ইদানীংকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। সেদিন যেমন—পূজা পর্যায়ের 'কে গো অন্তরতর সে', প্রেম-এর 'ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী' কিংবা 'শ্রাবণের পবনে আকুল' গানে। আর প্রকৃতি পর্যায়ের 'ঝরে ঝরঝর

সুবিনয় রায়

ভাদরবাদর'—যেন নিপুণ তুলির টানে আঁকা এক সজল ছবি। সবশেষে 'এরা পরকে আপন করে'। কতবারই তো শোনা তাঁর কণ্ঠে, তবু বারে বারে ফিরে ফিরেই নতুন সে। এইভাবে সেদিন রবীন্দ্রসদনে বেহালা সবুজ স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গীতসন্ধ্যার প্রথম পর্বে হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ছাপিয়ে গেল সঙ্গীতসুধারসে। দ্বিতীয়ার্ধে নির্দিষ্ট ছিল সুপ্রভা সরকারের নজরুলগীতি। একথা স্বীকারে দ্বিধা নেই যে মেজাজে রবীন্দ্রসঙ্গীত আর নজরুলগীতির বিস্তর ফারাক। কথা-সুরের সেই গভীরতা নজরুলগীতিতে বিশেষ সুলভ নয়। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনন্য আবেদন যখন চারিদিকে ব্যাপ্ত, ঠিক তারপরই, শিল্পী সুপ্রভা সরকার হলেও, নজরুলগীতি খুব একটা মানানসই হয় না। প্রথম দু-তিনটি গানের পর অবশ্য কিছুটা সহজ হয়ে এসেছিল পরিবেশ। তখন শুনতে ভালোই লাগল 'এস হৈমন্তিকা এস', 'প্রিয়তম হে বিদায়' কিংবা 'ছলছল নয়নে'। 'কাবেরী নদীজলে' গানে কথাকে নিয়ে খেলা করলেন শিল্পী অবাধ নাটকীয়তায়, অন্তর্লীন ছবিটা এতে স্পষ্টতা পেল না, তবে ওই গায়নের একটা অন্য স্বাদ আছে। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর তাঁর বয়স-অতিক্রম করা কণ্ঠ। যেমন সুরময় মসৃণ তেমনই দাপটী। অলংকরণও পরিচ্ছন্ন। অনুষ্ঠানের শেষার্ধে কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়। রজনীকান্ত-দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুল-প্রসাদের গানে তিনি নিবেদিত। নিশিকান্ত হিমাংশু দত্ত বা দিলীপকুমার রায়ের গানও তিনি গেয়ে থাকেন। সেদিন অবশ্য তাঁর নিবেদনে ছিল রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্র-লালের গান। প্রথমে রজনীকান্তের 'তোমারি দেওয়া প্রাণে' গানেই প্রথমার্ধের সেই পরিবেশ আবার ফিরল। মূর্ত হল নিভৃত অন্তরের আকুলতা। রজনীকান্তের অন্য দুটি

গানেও সেই অনুভবী আত্মনিবেদন। মুক্তছন্দে গাইলেন অতুলপ্রসাদী 'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে', অন্য রূপ উন্মোচিত হল। শেষে দ্বিজেন্দ্রগীতি। দ্বিজেন্দ্রগীতিতে সুরের চলনে, বিভিন্ন স্বরের সংস্থাপনে এক অন্য দিগন্তের আভাস। কথায় সুর মিশেছে অবলীলায়। আর যোগ্য শিল্পীর কণ্ঠেই তো এই বিশিষ্টতার সহজ প্রকাশ। সুতরাং 'আমি চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্য গগনে/ ধীরে দিবা হয় অবসান' —নিপুণ ছবি হয়ে ফুটল। হৃদয়ে পরশ রেখে গেল 'আমি সারা সকালটি বসে বসে'। পরিসমাপ্তি 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানে। প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে মেশানো এ এক চমকপ্রদ সৃষ্টি দ্বিজেন্দ্রলালের। তিন শিল্পীকে যন্ত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিলেন রমেশ চন্দ্র, বাবলু ভট্টাচার্য, গৌতম রায়, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন বড়াল, সমীর খাসনবীশ প্রমুখ। পরিশেষে উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ, দুঃস্থ মানুষজনের সাহায্যার্থে এমন একটি সুন্দর সংগীতসন্ধ্যা উপহার দেবার জন্যে।

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়

স্বপন সোম

রাগ-পঞ্চমের বার্ষিক অনুষ্ঠান

৪ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে কণ্ঠ, যন্ত্র ও নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশিত একটি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান নিবেদন করলেন রাগ-পঞ্চম মিউজিক কলেজ। ঐন্দ্রিলা রায়চৌধুরীর গাওয়া উদ্বোধনী ভজন গানের পরে ত্রিতালে তবলা লহরা বাজিয়ে শোনান অনিল রায়চৌধুরী। এঁর সঙ্গে হারমোনিয়াম সহযোগিতায় ছিলেন রতন ভট্টাচার্য। পরবর্তী শিল্পী ডঃ সন্তোষ মুখোপাধ্যায় কেদার রাগের বিলম্বিত একতাল ও দ্রুত ত্রিতালে একটি সুসংবদ্ধ খেয়াল পরিবেশন করেন। খাম্বাজ ও ভৈরবী রাগাশ্রিত দু'টি ঠুংরী গেয়ে তিনি তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন। শিল্পীকে তবলা, হারমোনিয়াম, সারেঙ্গীতে সহায়তা করেছেন অনিল রায়চৌধুরী, বিষ্ণু চক্রবর্তী ও কানাইলাল মিশ্র। বিপাশা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুশৃংখল ও সনিষ্ঠ প্রস্তুতি তাঁর প্রথানুসারী কথক নৃত্যের অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ্য করে তোলে। তবলায় ও কণ্ঠে শিল্পীকে যথাসাধ্য সহায়তা করেছেন অনিল পালিত ও পল্লব ঘোষ। এরপরে সরোদে দেশ রাগ বাজিয়ে শোনান শিবেন্দ্র দাশগুপ্ত। সীমিত পরিসরের মধ্যে রাগরূপের সুপ্রতিষ্ঠা ও সুষম পারম্পর্যে প্রকরণগত বিন্যাস পরিকল্পনার সার্বিক বিচারে তাঁর উপস্থাপনরীতি প্রশংসনীয়। তবে সুর পরিবেশনার প্রার্থিত মেজাজটি সঠিকভাবে সঞ্চারিত না হওয়ায় অনুষ্ঠানের ভারসাম্য একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। শিল্পীকে তবলায় যথার্থ সহযোগিতা করেছেন সুজিত সাহা। এই অধিবেশনের সর্বশেষ শিল্পী ছিলেন সমরেশ চৌধুরী। ইনি মিঞামল্লার রাগের বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল গেয়ে শোনান। রাগরূপের ভাবগম্ভীর ব্যঞ্জনা ও মেজাজের সঙ্গে তিনি রূপায়ণরীতির সাযুজ্য সুসংরক্ষিত করেছেন স্বরপ্রয়োগের বলিষ্ঠ ও সুগভীর বিন্যাসে। সুরবিস্তৃতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও মৌলিকত্বের উল্লেখযোগ্য কোন পরিচয় না থাকলেও যথোচিত অলঙ্করণে ও সুদক্ষ অভিব্যক্তিতে অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। শিল্পীকে তবলায় ও হারমোনিয়ামে সহায়তা করেছেন মলয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও রতন ভট্টাচার্য। পরিশেষে উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে একটি বক্তব্য : বিশেষত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে অনুষ্ঠানের সময়সীমার কথা মনে রেখে শিল্পীসংখ্যা নির্দিষ্ট করা বাঞ্ছনীয় ; সময় অনুপাতে অংশগ্রহণকারী বেশী হলে শিল্পী-শ্রোতা, কারো প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয়না।

বিপাশা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনতা মৈত্র

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

সমরেশ চৌধুরী

দেবব্রত বিশ্বাস স্মরণসন্ধ্যা

গত ছ' বছরের মতো এ বছরও দেবব্রত বিশ্বাস মেমোরিয়াল কমিটি শিল্পীর তিরোধান দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। আঠারো অগস্ট সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে এবারের অনুষ্ঠানটি ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার সেন্টার অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার হোমের সাহায্যার্থে আয়োজিত। সমগ্র পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনুষ্ঠানসূচী বিন্যস্ত হয়েছিল। সূচনায় সংস্থার সহ-সভাপতি চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় এবং সাউণ্ড উইং-এর অন্যতম বিশিষ্ট সহকর্মীর মৃত্যুর জন্য নীরবতা পালন করা হয়। মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষে সভানেত্রী কনক বিশ্বাস রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম মিউজ এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি নিউজ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য (১৯৮৭) যথাক্রমে দেবারতি সোম এবং দময়ন্তী মুখোপাধ্যায়ের হাতে দেবব্রত বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার (যার অর্থমূল্য এক হাজার টাকা) অর্পণ করেন। অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশের মধ্যে সুচিত্রা মিত্র ডাঃ সরোজ গুপ্তের হাতে সংস্থার পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ অর্থ

দময়ন্তী মুখোপাধ্যায়, কনক বিশ্বাস ও দেবারতি সোম

তুলে দেন। এই পর্বের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রদীপ ঘোষ। বিরতির পর শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। প্রথমে দেবারতি সোম এবং পরে দময়ন্তী মুখোপাধ্যায় দুখানি করে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। দেবারতি ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রসংগীত জগতে পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর কণ্ঠের গোলাকার ধ্বনির বিশিষ্টতা ছাড়াও সুরঋদ্ধ মুক্ত কণ্ঠের দৃপ্ত গায়ন ভঙ্গিমার একটি স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে। এ দিনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দময়ন্তীর কণ্ঠটিও সুরেলা। গায়নভঙ্গিমায় ও উচ্চারণে শান্তিনিকেতনের ছাপ সুস্পষ্ট।

পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠান। এঁদের গানের পর টেপ রেকর্ডে ধৃত দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে পাঁচখানি রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান শোনানো হল। সেই পরিচিত বিশিষ্ট কণ্ঠ। আপন মনের আনন্দে গাওয়া গানের অন্য আকর্ষণ।

বিরতির পর সুচিত্রা মিত্র ও প্রদীপ ঘোষ গান ও রবীন্দ্র রচনার সংকলনে এক স্মরণীয় নিবেদন উপহার দিলেন। 'ছুটি' শিরোনামে মৃত্যুর অনুষঙ্গে গাঁথা এই সংকলনে হয়ত নতুন বক্তব্য ছিল না কিন্তু সূত্রে গাঁথা গানগুলি যেন নতুন মাত্রায় উজ্জ্বলন্ত হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে যেখানে শিল্পী সুচিত্রা মিত্র—এ ক্ষেত্রে আজও তিনি অনন্যতম—একথা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর সমগ্র রচনা, সমগ্র জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে যে তাৎপর্য নিয়ে বিভাসিত হয় তার অনুভবে জারিত হওয়া এবং শ্রোতার মনে তা সঞ্চারিত করা কেবল শিল্পীর কাজ। কেবলমাত্র নামী গায়ক-গায়িকার তা সাধ্যাতীত। প্রদীপ ঘোষ ছিলেন যথেষ্ট সংযমী ও আন্তরিক। কেবল দু-একটি ক্ষেত্রে পাঠের অংশে দীর্ঘ মনে হয়েছে। সংকলকের নাম জানা যায়নি। সামগ্রিকভাবে দেবব্রত বিশ্বাস মেমোরিয়াল কমিটির অনুষ্ঠানে যে শৃঙ্খলা ও আকাঙ্খিত পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল তার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে সম্পাদক আলো কুণ্ডু বিশেষ ধন্যবাদার্হ হবেন।

সুভাষ চৌধুরী

যখন একই ছন্দে

বাঁশি ও গিটার যখন একই ছন্দে বেজে ওঠে তখন মনে একটা বেশ হালকা ঝিরঝিরে মেজাজ এনে দেয়। অনেকটা সন্ধ্যেবেলায় গঙ্গার ধারে বেড়াবার মতন। তাই সেদিন (বৃহস্পতিবার সাতাশে অগস্ট কলামন্দিরে) জুডিথ হলের বাঁশি ও টিমোথি ওয়াকারের গিটার শুনে মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। জুডিথ ও টিমোথি—ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ক্যালকাটা স্কুল অফ

জুডিথ হল ও টিমোথি ওয়াকার

মিউজিকের সৌজন্যে কলকাতায় বাজাতে এসেছিলেন। ওয়াকার সঙ্গীত রচনা করতেও বেশ পারদর্শী যদিও আমি তাকে ঠিক সঙ্গীত রচয়িতা বলতে পারি না। তবে তাঁর রচনা গিটারে বাজানো 'আফ্রিকান হিম' বেশ ভাল লাগল।

সেদিনের কনসার্টটাকে চার ভাগে ভাগ করলে বোধহয় আপনাদের উপভোগ করতে সুবিধে হবে। জুডিথ ও টিমোথি খুব মাথা খাটিয়ে এই প্রোগ্রাম তৈরি করেছিলেন মনে হল। তাই অনেকদিন পরে একটা কনসারট মনে দাগ কাটল। প্রথমেই উল্লেখ করি জুডিথ হলের একক বাঁশির কাজগুলি। তার মধ্যে ছিল ডেবুসির বিখ্যাত 'সিরিঙ্কস'—যা শুনলে এলিজাবেথ ব্যেরেট ব্রাউনিং-এর "প্যান" কবিতাটি মনে আসে। সেই একই পৌরাণিক ঘটনা নিয়ে সুইটজারল্যান্ডের সঙ্গীত রচয়িতা আরথার হনেগার (১৮৯২-১৯৫৫) লিখেছিলেন তাঁর 'ডানস'। এই দুটি কাজই সুরের তুলি দিয়ে আঁকা দুটি ছবি এবং তার মুড জুডিথ চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। টিমোথি ওয়াকারের একক গিটারে বাজানো তাঁর নিজস্ব রচনা ছাড়া ছিল এই যুগের দুই ব্রিটিশ সঙ্গীত রচয়িতাদের কাজ। পিটার মেক্সওয়েল ডেভিসের "ফেয়ারওয়েল" ও ডেভিড বেডফোরডের "ইউ আস্কড ফর ইট" দুটো কাজের মধ্যেই আমি মনে ধরে রাখার মতন কোন উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত খুঁজে পাইনি।

বেডফোরডের কাজে ইংরেজি ভাষায় যাকে গিমিক বলা হয় তার প্রাচুর্য একটু বেশি মাত্রায় পেলাম। বেডফোরডের সঙ্গীত ফোটাতে টিমোথিকে, গিটারের তারের উপর চামচ মারতে হয়েছে, কাগজ রাখতে হয়েছে, কাঠের খোলসটাকে প্রচুর পিটতে হয়েছে। টিমোথির হাবভাব দেখে মনে হল এটা কৌতুক রস ফোটানোর চেষ্টা। আমার তো মনে হল গিটার বুঝি গেল ভেঙ্গে। আর টিমোথির আঙুলগুলোর কি অবস্থা হয়েছিল আমি জানিনা—আমি তো ভাবলাম ওকে কিছু ব্যান্ড এইড এনে দি।

বাঁশি ও গিটারের জুটির জন্য পাশ্চাত্য সঙ্গীত রচয়িতাদের অনেকেই কিছু না কিছু সৃষ্টি করেছেন। জুডিথ হল ও টিমোথি ওয়াকারের জুটি তার মধ্যে থেকে আমাদের জন্য বাজালেন বাখ জুইলিয়ানির একটি সনাটা, এবং ব্রেজিলের সঙ্গীত রচয়িতা ভিলা লোবসের একটি সেরেনেড জাতীয় কাজ। এই বছরে ভিলা লোবসের জন্ম শতবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে। তাঁর তিনটে কাজ এঁরা আমাদের সেদিন শোনালেন। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত ছিল জুইলিয়ানির সনাটা (জুইলিয়ানি বেঠোফেনের সমসাময়িক সঙ্গীত রচয়িতা। ও এ যুগের সঙ্গীত রচয়িতা জোনাথান লয়েডের "ফাইভ সেনসেস" বলে একটি রচনা। এর মধ্যে আমি ভারতীয় সঙ্গীতের প্রভাব পেলাম। সেটা হাল ফ্যাসানের মিশ্রণ ধরনের ব্যাপার নয়। এ যেন কোন আরব্য উপন্যাসের সেরেজাদের হারেমের সুরপথ ভুল করে সেদিন কলামন্দিরে এসে পৌঁছল। আনকোর হিসাবে জুডিথ ও টিমোথি বাজালেন ফ্রানসেসকে মোলিনোর একটি রন্ডো উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গীতকারের ছন্দে কোথায় যেন মোটজারট লুকিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিলেন। সন্ধ্যাটা বেশ জমিয়ে তুলেছিল এই জুটি।

কিশোর চট্টোপাধ্যায়

ন ত্য না ট্য

সুরধুনী-র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সমাবর্তন

'সুরধুনী' সঙ্গীত সংস্থার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হল সম্প্রতি গিরীশ মঞ্চে। প্রারম্ভিক পর্বে সমাবর্তন, বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি। পৌরোহিত্য করার কথা ছিল শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের, কিন্তু অসুস্থ থাকায় তিনি আসতে পারেননি। সমাবর্তন উপলক্ষে ছিল সংগীত-নৃত্যানুষ্ঠান। স্নাতকরা গেয়েছিলেন 'মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ', তবে এই অঙ্গীকারে সেই দৃঢ়তা ছিল না। ছোটদের সম্মেলক গান তিনটি একেবারে নিখুঁত হয়ত নয় কিন্তু সপ্রাণ। সে তুলনায় বড়দের সম্মেলক গান দুটি মাঝারি মানের। উপভোগ্য হয়েছিল শিশুদের ব্রতচারী ছড়া ও নৃত্যানুষ্ঠানটি। নৃত্যসহ রবীন্দ্রনাথের বর্ষাসংগীতে তুলনামূলকভাবে নৃত্যাংশ বেশি পরিপাটি, সংগীতাংশ মন্দ নয়। অতঃপর লোকসংগীত 'দেখেছি রূপসাগরে' আর রবীন্দ্রসংগীত 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি' পাশাপাশি পরিবেশিত হল, সঙ্গী ছিল নৃত্য। গান দুটির সুরে একটা মিল আছে তবে 'দেখেছি রূপসাগরে' ভেঙেই যে রবীন্দ্রনাথ 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি' রচনা করেছিলেন এমন কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। উপরোক্ত গান দুটি ও তার নৃত্যরূপায়ণ দুই-ই উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ যে কয়েকটি গীতিনাট্য লিখেছিলেন তা কি শুধুই ছাপার অক্ষরে বন্দী হয়ে থাকবে? গীতিনাট্যের মঞ্চায়ন ইদানীং আক্ষরিক অর্থে বিরল। সহজ পথে গীতিনাট্য রূপান্তরিত নৃত্যনাট্যে। মঞ্চে একই সঙ্গে গান ও নৃত্যাভিনয় করার নিপুণ মানুষের অপ্রতুলতাই কি এর কারণ কেবল? না কি, সেই শ্রম স্বীকারে আর আমরা রাজী নই? প্রথম কারণটির বাস্তবতা অস্বীকার না করেও বলা যায় দ্বিতীয় কারণটিই বেশি সত্য। এইভাবে একটা সম্পদ আমরা হারিয়ে ফেলছি। এখনও সচেতন হবার সময় আছে। যাই হোক, বর্তমান অনুষ্ঠানে গীতিনাট্য 'কালমৃগয়া' যথারীতি নৃত্যনাট্যরূপে নিবেদিত হল। নৃত্যাভিনয়ে সুধৃতি সরকার (ঋষিকুমার) চরিত্রানুগ। সুদক্ষিণা মুখোপাধ্যায় (লীলা) সাবলীল। রুনা মাইতির দশরথ যথাযথ। শালিনী নাথের (বিদূষক) অভিনয় সরস। মন্দ নয় সুতপা রায় (অন্ধ ঋষি)। সমবেত নৃত্যে সবাই সমান স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। নৃত্য পরিচালনা বিজয়া রায়ের।

সংগীতাংশে সংগীত পরিচালক কাশীনাথ রায় দশরথের নেপথ্য গানে এবার অনেকটাই সফল। অরুণ ঘোষালের (অন্ধ ঋষি) একটু অসুবিধে ছিল স্কেলের ব্যাপারে। রীতা চট্টোপাধ্যায় (ঋষিকুমার) মন্দ নয় তবে কথা সর্বত্র স্পষ্টতা পায়নি। মালবিকা রায় (লীলা) একটা মান রক্ষা করেছেন। নারীকণ্ঠের গানে— যেমন বনদেবীগণের কোন কোন গানে পুরুষ কণ্ঠও শোনা গেল। এ বিষয়ে সতর্কতা বাঞ্ছনীয় ছিল। যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন দেবীদাস ভট্টাচার্য, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই মুখোপাধ্যায়, গৌর পাল ও দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনন্য নয়, তবে আন্তরিক

বিজন থিয়েটারে 'অনন্য' আয়োজিত নজরুল প্রণাম যে অনুষ্ঠান হিসেবে সার্বিকভাবে অনন্য হয়ে উঠতে পেরেছিল তা নয়, তবে তাঁদের আন্তরিক প্রয়াসটুকু স্বীকার করে নিতেই হবে। অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল একক নজরুলগীতি, আবৃত্তি-কবিতা পাঠ ও নৃত্যনাট্য। দুটি সম্মেলক কণ্ঠের নজরুলগীতি দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠান শুরু। একক গানে প্রথম শিল্পী সুমিতা শেঠ। তাঁর গাওয়া 'রুমঝুম রুমঝুম' গানটির সুরের চলনে একটা অভিনবত্ব, একটা আধুনিকতা আছে যা গানটিকে স্বতন্ত্র মেজাজ দিয়েছে। সুমিতা গানটির প্রতি সুবিচার করেছেন, অন্য গান দুটির পরিবেশন অবশ্য সাধারণ স্তরের।

এগোতে গেলে চাই আরও নিবিড় অনুশীলন। রবীন নন্দী চর্চা করেন বোঝা যায়, কণ্ঠটিও সুরে, পরিবেশনেও ছিল সেই স্বাচ্ছন্দ্য, তবে কণ্ঠস্বরটি যে বিশেষ শ্রুতি-আকর্ষক তা নয়। বাংলা আধুনিক—নজরুলগীতির জগতে এখনকার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হৈমন্তী শুক্লা।

তাঁর নিপুণ কণ্ঠে সুরের অপরিমেয় দাক্ষিণ্য, সাংগীতিক অলঙ্করণ প্রয়োগও নিখুঁত, নিটোল অথচ সংযত। ইদানীং অনেকেই নজরুলগীতি গাইতে গিয়ে গলার কাজ দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, হৈমন্তী শুক্লা কিন্তু কখনই মাত্রা ছাড়িয়ে যান না। আর তাই তাঁর কণ্ঠে বহুবার শোনা 'আমার নয়নে নয়ন রাখি', 'খোলো খোলো খোলো গো দুয়ার' কিংবা 'পরজনমে দেখা হবে প্রিয়' আবার শ্রুতিকে তৃপ্তি দেয়। অনেক দিন আগেকার 'সাপুড়ে' ছায়াছবির 'আকাশে হেলান দিয়ে' প্রায়শই গেয়ে থাকেন হৈমন্তী শুক্লা। সেদিনও গাইলেন। বলতে দ্বিধা নেই গানটি শুধুই সংযোজন হয়ে থাকেনি তাঁর কণ্ঠে। দীপক ভট্টাচার্যের আবৃত্তি- কবিতাপাঠের অনুষ্ঠান

প্রদীপ্ত নিয়োগী ও অনুরাধা নিয়োগী

ভালোয়-মন্দয় মেশানো। গলা দরাজ, উচ্চারণও এমনিতে পরিষ্কার, তবে একেবারে ত্রুটিমুক্ত নয়। যেমন 'বজ্র' উচ্চারণটি 'বজ্জর' হিসেবে এল। দ্বিতীয়ার্ধে নজরুলগীতি অবলম্বনে নৃত্যনাট্য : 'শ্রাবণের শেষ নিশীথে'। রাজকন্যা রূপশ্রী, ব্রহ্মচারী সুভদ্র ও তাদের সহচর-সহচরীবৃন্দদের নিয়ে নৃত্যনাট্যের কাহিনীটি মামুলি।

নৃত্যাভিনয়ে অনুরাধা নিয়োগী (রূপশ্রী) উল্লেখযোগ্য, পাশে প্রদীপ্ত নিয়োগী (সুভদ্র) মন্দ নয়।

সহচর-সহচরীবৃন্দ একটা মান রক্ষা করেছেন। নজরুলগীতিগুলি মোটামুটি সুপ্রযুক্ত। নেপথ্য গানে সঙ্গীত পরিচালক প্রণব ঘোষের কণ্ঠটি শ্রবণসুখকর। সংগীতা সাহা সাধারণ। সম্মেলক গানগুলি অনুজ্জ্বল। ভাষ্যপাঠে দীপক ভট্টাচার্য উল্লেখ্য। যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন ডলি চন্দ, ঘনশ্যাম পাইন, সুপ্রভাত দাস ও স্বপন দত্ত। নৃত্যনাট্য রচনা ও সংকলন রবীন নন্দীর।

স্বপন সোম

ক্যাসেট

'যে তান দিয়ে অবাক্ কর'

ব্যক্তির অস্তিত্বের যন্ত্রণাময় জটিলতার স্বরূপ উন্মোচনের জন্য তিনি প্রয়াসী হয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। ব্যক্তির মুক্তির তট অন্বেষার ঘাত-প্রতিঘাতের আলেখ্য রইল তাঁর নাটকে। আর তাঁর মানবিক বাস্তবতা পর্যবেক্ষণের নির্দেশ বয়ে নিয়ে চলেছে তাঁর ছোটগল্প। কিন্তু তাঁর নিজের মুক্তির জন্য রইল তাঁর জ্যেষ্ঠা মানসদুহিতা— তাঁর গান, আর তাঁর কনিষ্ঠা মানসদুহিতা— তাঁর ছবি। ষোল বছর বয়সেই তিনি এমন গান লিখেছেন, যে গান তাঁর অন্তরতমের অভিব্যক্তিতে ভাস্বর। অন্যসব ফর্ম তাঁকে নতুন করে গড়ে নিতে হয়েছে, কোনো কোনো ফর্মের তিনিই স্রষ্টা। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে তাঁর স্বাধীনতা ব্যাখ্যাত হয় একটি বিশিষ্ট উপমানে। একটি টেবিলে একগাছি তার পড়ে আছে। দুই প্রান্তেই সে মুক্ত। কিন্তু সে কিছু সৃষ্টির বাহন নয়। তাকে যখন দুই প্রান্তে শক্তভাবে টান টান করে বাঁধা হল তখনই সে সত্যমুক্তি পেয়ে গেল— সংগীতসৃষ্টির যোগ্য হল। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও দেখা যায় সাংগীতিক ঐতিহ্য ও আধুনিক ভাবাকৃতি এই দুয়ের সংযোগে সমন্বয়ে তিনি গানের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই নিজস্ব অভিজ্ঞানের স্রষ্টা। ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের অশেষ বৈভব সম্বন্ধে তিনি অবহিত থেকেই তাকে তিনি মানবায়িত করে তুলেছেন আধুনিক ব্যক্তির প্রত্যক্ষ আবেগে। সে জন্যই অরুণকুমার বসু সংকলিত এচ এম ভি-র চার খণ্ডের আটটি ক্যাসেটে সম্পূর্ণ রবীন্দ্রসংগীত প্রবাহের প্রথম খণ্ডের গানগুলির মধ্যে কিশোর কবির 'তোমারি তরে, মা, সঁপিনু এ দেহ' গানটি শুনবো আশা করেছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গানে ছিল সমষ্টিগত আবেগের আবাহন। রবীন্দ্রনাথের এই গানটিতে ব্যক্তিগত দেশাত্মবোধের আধারে ব্যক্তিগত আবেগের অভিব্যক্তি ঘটেছে। এই মানবীয় আবেগের ভাবাত্মক রূপসৃষ্টি তাঁর সকল শ্রেণীর গানের মূল বৈশিষ্ট্য।

এচ এম ভি বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির সহযোগিতায় চার জোড়া ক্যাসেটে ১৮৭৭ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত সুরকার রবীন্দ্রনাথ ও গীতিকার রবীন্দ্রনাথের একটা কীর্তিরেখার পরিচয় উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন। সাধুবাদ অবশ্যই তাঁদের প্রাপ্য। আড়াই হাজার গান থেকে একশো তিরিশখানি গান বেছে নিয়ে কয়েক খণ্ডের ক্যাসেট সংকলন প্রস্তুত করার মধ্যে অনিবার্য ঝুঁকি আছে। কিন্তু যাঁদের হাতে এই সংকলনের এবং বিন্যাসের দায়িত্ব ছিল তাঁরা অবশ্যই সে ঝুঁকি নেবার সম্পূর্ণ যোগ্য। প্রথম খণ্ডের (১৮৭৭—১৯০৪) সংকলয়িতা ও বিন্যাসক অরুণকুমার বসু রবীন্দ্রসংগীত গবেষণাক্ষেত্রে কৃতী ব্যক্তি। দ্বিতীয় খণ্ডের (১৯০৫—১৯১৪) দায়িত্ব পালন করেছেন সুভাষ চৌধুরী। তিনি একটি বিশিষ্ট সংগীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মর্মে ও কর্মের যোগে যুক্ত তো বটেই, সংগীত জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রেও যিনি সতত জাগ্রত। তৃতীয় খণ্ডের

(১৯১৫—১৯২৭) গীতি-নির্বাচনে ও উপস্থাপনায় রয়েছেন শঙ্খ ঘোষ— আধুনিক রবীন্দ্রবীক্ষায় অগ্রণী আধুনিক কবি। আর চতুর্থ খণ্ডের (১৯২৮—১৯৪১) জন্য রয়েছেন— আরেকজন প্রধান আধুনিক কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রবীন্দ্ররসজ্ঞতায় অকুতোসঙ্কোচ। কালবিভাগের পরিকল্পনাটিও প্রমাণ করে বিন্যাসকর্তাদের অবধানতা। সুতরাং এ সংকলনে স্থূল অভিযোগের কারণ কিছু থাকবে না এটাই প্রত্যাশিত। সূক্ষ্ম ক্ষেত্রে দু-একটা অনুযোগ হয়তো পেশ করা চলে। যেমন, 'ঝরাপাতা গো আমি তোমারি দলে' গানটি কেন বাদ গেল? সাহানা দেবীর 'তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়'-এর নির্বাচনে কোনো মতানৈক্য নেই। কিন্তু 'এখনো গেল না আঁধার' কি যথানির্ধারিত কাল খণ্ডে সন্নিবেশিত হওয়া একেবারেই দুঃসম্ভব ছিল? বুঝি, এগুলি একান্তই ব্যক্তিগত পক্ষপাতের প্রশ্ন। বুঝি বৃহত্তর প্রেক্ষিতে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের পক্ষে কতকগুলি অলঙ্ঘনীয় বিধিনির্দেশ থাকেই। তাই তুচ্ছ অনুযোগ স্তব্ধ রেখে দেখা যাক সংকলয়িতারা নির্দিষ্ট কালখণ্ডে গীতগত বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে কে কোন পন্থায় সফল হয়েছেন, কে কেমন করে তাঁর উপরে ন্যস্ত সময়ের সমস্যাকে ধরতে চেয়েছেন। এবং সব মিলিয়ে একটা পূর্ণায়ত প্রতিচ্ছবি সৃষ্ট হয়েছে কিনা।

প্রথম খণ্ডে অরুণকুমার বসুকে নিবিষ্ট হতে হয়েছে একেবারে কিশোর রচনার প্রাণিন সাবেগ সরলতা থেকে রবীন্দ্রনাথের গান কেমন করে ধ্রুপদী গাম্ভীর্যের কাঠামোকে আয়ত্ত করতে করতে ব্যক্তিগত কবিতার প্রলেপে বিশেষ গান হয়ে উঠল। 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে'-তে যে কিশোর হৃদয়ের গুঞ্জরণ তা চৌষট্টি বছর পরে 'ঐ মহামানব আসে'-তে গিয়ে পৌঁছবে। হৃদয়নদী মানবসিন্ধুর সংগম সন্ধানে ছুটবে। অরুণবাবু যে কালখণ্ডের দায়িত্ব নিয়েছেন তা এক হিসাবে গীতিকার ও সুরকার রবীন্দ্রনাথের প্রস্তুতিপর্ব। কিন্তু একথাও সত্য যে ধ্রুপদী গাম্ভীর্যের বিশুদ্ধ স্ট্রাকচার চর্চার মাঝেই কবি যে বেরিয়ে পড়তে চাইছেন তাঁর ব্যক্তিগত ভাবের খোলা অঙ্গনে, যেমন— 'ওই জানালার কাছে বসে আছে' গানটি, অরুণবাবু সেদিকে খর দৃষ্টি রেখেছেন। 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই' গানটিতে ভাব আর নির্বস্তুক নয়। সুদূর কীর্তনের আভাসে আখরে বোঝা যায় তাঁর পালে নতুন হাওয়া লেগেছে। 'এ পরবাসে রবে কে হায়' বা 'এ মোহ আবরণ' জাতীয় গান অথবা ভারতীয় মার্গীয় পরিকাঠামো চর্চা ও তৎসংক্রান্ত প্রভাব আত্মীকরণের পাশেই রয়েছে 'বড় আশা করে এসেছি'-র মতো গান। এখানে গানকে তিনি বাঁধতে চাইছেন যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ ও স্পর্শগম্য আবেগের সংযোগে। 'তোমারি তরে, মা, সঁপিনু এ দেহ' গানটি সংকলনে থাকলে দুয়ে মিলে বিষয়টি আরেক মাত্রা পেত। তবে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না 'বড়ো বেদনার মতো বেজেছ আমার প্রাণে' গানটির অনুপস্থিতি। বত্রিশ বছর বয়সে রচিত এই গান বাণীর স্বাতন্ত্র্যে— 'বেদনা' শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়— ও সুরের প্রয়োগে শুধু যে একটি অন্যতম রচনা তাই নয়— কবির একান্ত ব্যক্তিগত পছন্দের গান বলেও এর একটা আলাদা দাবি আছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা'-র মতো গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি থেকে নির্বাচন যেমন তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে একটি প্রসাদী সুরের গান বেছে, 'মায়ার খেলা' ঠিক ততটা আমাদের আশ মেটায় না— 'তারে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ' এক্ষেত্রে বহুশ্রুত হলেও সংকলয়িতার উদ্দেশ্যের আরো বেশি স্বার্থবহ হত। নির্ভুল নির্বাচন 'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে' কাব্যগীতিটি।

দ্বিতীয় খণ্ডের সংকলনে সংকলয়িতার সমস্যা ছিল কঠিনতর। কেননা ১৯০৫ থেকে ১৯১৪—এই দশটা বছর সমগ্র রবীন্দ্রজীবনে তারকাচিহ্নিত দশক। বাইরের ও ভিতরের আঘাতে সংঘাতে বেড়ে যাচ্ছে অভিজ্ঞতার পরিধি ও অনুভবের গভীরতা। সংগীতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। স্বদেশী আন্দোলনে যেমন সে গান আয়ুধ হিসাবে ব্যবহৃত হল, ব্যক্তিগত বেদনার নীলকমলে তেমনি সে গানের অন্তরঙ্গ মূর্তিটি গড়ে উঠল। দেখা গেল, সে গান বাইরের প্রচণ্ড প্রতিকূলতার প্রতিস্পর্ধী ভূমিকার সহায়ক, তেমনি সে গান ব্যক্তিগত আর্তির অশেষত্বের মাঝে এক পরম প্রত্যয়কে খুঁজেছে। সে গান এই দশকেই আর রবীন্দ্রগীতি মাত্র থাকল না, থাকল না কেবল রবিবাবুর গান— হয়ে উঠল 'রবীন্দ্রসংগীত'। 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' গানে সাহানা ও বাগেশ্রীর মিশেল আছে। কিন্তু গানটি সাহানা বাগেশ্রী নয়। মধুসূদনের প্রমীলার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যে লভ্য নানা বীরাঙ্গনার উপাদান আছে। কিন্তু প্রমীলা আছে মধুসূদনেই। রবীন্দ্রসংগীতও তাই। রাগমিশ্রণ ঘটেছে। ঘটবার পরে যেটা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। কেমন করে এটা হল তার ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়েছে বটে, তবে শেষ কথাটা বোধ হয়, এর সবটাই সেই অলৌকিক জাদুকরের শৈল্পিক কুহক।

সুভাষ চৌধুরী এই কালখণ্ড সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ থেকে সংকলন ও বিন্যাস সম্পন্ন করেছেন। স্বদেশী যুগের গান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে তিনটি গান— 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'ও আমার দেশের মাটি'। তাদের চেয়ে কোনো গানের দাবি অবশ্য অগ্রতর গণ্য নয়, তাদের সমকক্ষ কেউ কেউ হতে পারে বটে। তারপরেই শুরু হয়েছে গীতাঞ্জলি-পর্বের গান। কবি সুধীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'-তে কবির ভাবপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় সচেতনতার কথা বলেছিলেন। এই পর্বের সংকলকও গানগুলি নির্বাচনে যেন সেদিকে দৃষ্টি রেখেছেন। বিনম্র আত্মনিবেদনে, প্রতীক্ষার প্রগাঢ় প্রত্যয়ে, আবার প্রেমের সঙ্গে পূজার ব্যবধানরেখা মুছে দিয়ে গানগুলি এ সময়ের যথার্থ প্রতিনিধি। সংকলক লক্ষ্য রেখেছেন নির্বাচন যেন রসবৈচিত্র্য সম্পাদনে সক্ষম হয়। কেবল একটা জায়গায় আমার একটু আপত্তি আছে। 'আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়' গানটির পরেই বিন্যস্ত হয়েছে 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' —অব্যর্থ বিন্যাস বটে। কিন্তু তারপরেই 'সন্ধ্যা হল গো— ওমা' গান হিসাবে, শিল্পী নির্বাচনে নির্ভুল নির্বাচন, কিন্তু বিন্যাসে অব্যর্থতা থাকল কি? এক্ষেত্রে কালানুক্রম ঈষৎ খণ্ডিত করেও যদি গানটিকে চার নম্বরের প্রথমেই স্থান দেওয়া হত তাহলে আপত্তির কারণ থাকত না। এই খণ্ডের সংকলক কিন্তু 'রাজা' নাটক থেকে দুটি চমৎকার গান নির্বাচন করেছেন— 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' আর 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী'। সংকলনের সূচীতে এরা যে 'রাজা' থেকে গৃহীত হয়েছে সেকথা উল্লেখ করা হয়নি, যেমনটা 'শ্যামা' বা 'বাল্মীকি প্রতিভা'-র বেলায় করা হয়েছে। অর্থাৎ সংকলক নিশ্চিত যে, এই লিরিকগুলির নাটক নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত হবার অধিকার আছে। কিন্তু এই সূত্র যে সকল খণ্ডে রক্ষিত হয়নি সেটা আমরা পরে দেখেছি। এই খণ্ডের সংকলনে 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ' এই গানটিতে বাউল ভাটিয়ালীর মিশ্রণ ঘটল, অথচ বাণী এবং ভাবের ক্ষেত্রে তা মধ্যযুগীয় বাতাবরণ থেকে মুক্ত হল। অব্যর্থ নির্বাচনে সংকলক দেখিয়েছেন আলোচ্য কালসীমায় রবীন্দ্রসংগীত ক্রমপরিণামী বিকাশের কোন্ বিশিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

তৃতীয় খণ্ডের সংকলন ও বিন্যাস ঘটেছে শঙ্খ ঘোষের হাতে। যে কালখণ্ড এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, ১৯১৫ থেকে ১৯২৭, সে কালখণ্ডের প্রধান বৈশিষ্ট্য সংকলনের এই অংশে মূর্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, তাঁর প্রথমদিকের গানে ভাব বাংলানো ছিল প্রধান কথা। শেষের দিকের গানে রূপ বাংলানো। তৃতীয় খণ্ডের গানগুলি থেকে রবীন্দ্রসংগীতের সেই লাবণ্য গাঢ় হতে থেকেছে। সংকলক সেই বিষয়টি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত। এখানে 'রূপ বাংলানো' কথাটির

গানের সুরের ধারা

A treasurehouse of Tagore Songs, Vol. 4 (1928–1941)

তাৎপর্য আমরা ভালো করে বুঝে নেবার অবকাশ পাই। কল্পনারই রূপের কথা বলা হচ্ছে। একেকটি ভাব একেকটি সমুদ্র। কিন্তু কল্পনার আলোয় তাতে রূপের ঢেউ উঠে তাকে দেয় অশেষত্ব। একটা বিষয় লক্ষ করে আমরা একটু বিস্মিত হই। 'ওরে আগুন আমার ভাই' গানটি রচিত হয়েছে ১৯০৯-এ, তথাপি গানটি তো 'মুক্তধারা'-য় ব্যবহৃত হয়েছে। সুভাষ চৌধুরী দ্বিতীয় খণ্ডে গানটিকে সংকলনস্থ করেননি। অতএব শঙ্খ তো গানটি ব্যবহার করতেই পারতেন। 'তোমায় গান শোনাবো' তৃতীয় ক্যাসেটে নির্ধারিত কালখণ্ডের মধ্যেই পড়ে। এ গানটিও সংকলনে নেই। সুতরাং 'ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার'-এ গানটি আর আশা করাই গেল না। এমনি ভাবেই তৃতীয় সংকলনে বাদ গেছে 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা'। দু-জনেরই পরিবর্জনের মধ্যে একটা প্যাটার্ন লক্ষ করা যাচ্ছে। ক্যাসেট ডিস্ক নয়।

ডিস্কের কভারস্লিপে সংকলকদের নিজ নিজ সংকলনপদ্ধতি ব্যাখ্যাত হতে পারত। এখানে সে অবকাশ নেই। সুতরাং আমাদের অনুমান এখানে প্রশ্রয় পাবেই। মনে হয় নাট্য পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত এবং সেই সকল নাট্যপরিস্থিতির স্মৃতিবহ গানগুলিকে যথাসম্ভব পাশ কাটানো হয়েছে। গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্য প্রসঙ্গে অবশ্য সে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। যে-কালখণ্ড তৃতীয় ক্যাসেটে গ্রহণ করা হয়েছে তা কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের মাহেন্দ্রক্ষণ। ঐতিহ্যে অবহিত থেকেই তিনি এখন পৌঁছে গেছেন ভাবের অভিব্যক্তির নতুন সম্পদের যুগে। দুঃখের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়— 'আমার সকল দুখের প্রদীপ' এবং 'পাত্রখানা যায় যদি যাক', প্রতীক্ষার গান— 'এতদিন যে বসেছিলেম', গানের গান— 'গানের ঝরনা তলায় তুমি' এবং 'আমার ঢালা গানের ধারা' ঋতুসংগীত যার মধ্যে রয়েছে পূজার গানের দিব্য আকৃতি, 'বন্ধু রহো রহো সাথে', পরম নিবেদনের গান— 'এবার উজাড় করে লও হে আমার' এবং জীবন রহস্যের গভীরে যাবার আকৃতির গান— 'আঁধার রাতে একলা পাগল' এই সংকলনে সন্নিবেশিত হয়েছে। আরো লক্ষ করি যে, যাকে আমরা খাঁটি পূজার গান বলি, তা এই সংকলনে নেই বললেই হয়। সংকলনকর্তা ঠিক ধরিয়ে দিয়েছেন— রবীন্দ্রসংগীত জীবনের সম্পদ। এবং তা জীবনেরই সম্পদ, অতিজীবন বা জীবনোত্তরের সম্পদ নয়।

চতুর্থ খণ্ডে নীরেন্দ্রনাথের সমস্যা এ ছিল না, কোন্ গানটিকে রাখব, সমস্যাটি বরং এই ছিল যে, কোনোটিই বাদ দেওয়া যায় না। এই এক সম্পদের সংকটের মধ্যে সুস্থিরে কবি নীরেন্দ্রনাথ তাঁর নির্বাচনকে তাৎপর্য দিয়েছেন, এটাই বড়ো কথা। বোঝা যায়, নীরেন্দ্রনাথের পক্ষপাত ঋতুসংগীতের দিকে। অন্তত আটখানি বসন্ত বর্ষার গান এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। অব্যর্থ সে সংকলন। শুধু একটা অনুযোগ আর স্বগত রাখতে পারছি না। 'ঝরা পাতা গো' গানটি নেই আগেই সেকথা বলেছি। বসন্ত বিদায়ের গান বলে বলছি না। এ যুগের প্রধান আধুনিক কবিদের অন্যতম নীরেন্দ্রনাথের কান এড়িয়ে গেল কী করে 'বসন্তের এই চরম ইতিহাসে'-র মতো আধুনিকতম শব্দবন্ধ। সুরের নিশ্বাসের যোগে কলিটি হয়ে উঠেছে অসামান্য। 'আগুন রঙের' কথাটিও ভাবায় বৈকি। নীরেন্দ্রনাথও প্রথানুগামী নাটকের গান বাদ দিয়েছেন। দিতে গিয়ে পরিহৃত হল একটি অপরিহার্য প্রেমের গান— 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা'। যার রচনাকাল ১৯১৪, কিন্তু যা 'শোধবোধ' (১৯২৯) নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে নলিনীর গান হিসাবে। এটা কিন্তু আমার অভিযোগ নয়। পদ্ধতি সূত্র যদি গৃহীত হয়ে থাকে, তবে তা অনুসৃত হওয়াই ভাল। অভিনিবিষ্ট হয়েই সংকলক রবীন্দ্রনাথের শেষ রাগিনীর বীণার রঙ ও রস ধরে নিতে চেয়েছেন। প্রেমের গানের বিরহদীপ্তি, দুঃখের সাধন নিবেদনের নম্রতা, 'শ্যামা' নাটকের শেষ গানের জটিল আত্মমোচন, 'চিনিলে না আমারে কি' গানের নিজস্ব অন্তর্গূঢ় নাট্যরস শেষ সংকলনে সংহত হয়েছে। 'মম দুঃখের সাধন' গানটির চয়ন সার্থক। 'সাধন' আছে, 'নিবেদন'ও আছে, তবু এতে আর গীতাঞ্জলির প্রথম গানটিতে কত পার্থক্য! পার্থক্য ভাবে, বাণীতে এবং সুরে। তারপর কম্পমান যবনিকার দিকে তাকিয়ে রচিত হয়েছে— 'ওই মহামানব আসে'। এতদিনে বৃত্তটি সম্পূর্ণ হল— সে জ্যোতির্ময় বৃত্ত এবার স্মরণের মহাকাশের সামগ্রী।

পরিশেষে শিল্পীদের প্রসঙ্গে আসি। চারটি খণ্ডের আটটি ক্যাসেট শুনতে শুনতে রবীন্দ্রনাথের গানের জগতের খ্যাতকীর্তি শিল্পীদের সম্বন্ধেও একটা সামগ্রিক ধারণা অবশ্যই সঞ্চারিত হবে— যদিও এ গীতিসংকলনের

রবীন্দ্রনাথ : শিল্পী : মুকুল দে

লক্ষ্য ছিল আলাদা। গায়কীর বিবর্তনের জন্য আমরা নিশ্চয় আলাদা সংকলনের প্রত্যাশী হব। তবু অলক্ষ্যে আমরা তিন দলকেই পেয়ে যাই। প্রথমে আছেন তাঁরা যাঁদের রবীন্দ্রসংগীতাকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডল বলতে পারি। দিনেন্দ্রনাথ, অমিতা সেন, সাহানা দেবী থেকে শান্তিদেব; অমলা দাশের গান আগে শুনেছি, বিজয়া রায়ের গানও শোনার সুযোগ হল। দ্বিতীয় জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীতে আছেন তাঁরা যাঁরা রবীন্দ্রপরিমণ্ডলে সরাসরি দীক্ষিত হয়েছেন, সুবিনয়-সুচিত্রা-কণিকা-রাজেশ্বরী এবং এই রকমই আরো কেউ কেউ। তৃতীয় দলে রয়েছেন সেই সব শিল্পীরা যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে শান্তিনিকেতনী গায়কীদ্বারা ততটা প্রভাবিত নন, কিন্তু সাধারণ রবীন্দ্রভক্ত মনে করেন রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তার ইতিহাসে এঁদের গুরুত্ব কারো চেয়ে ন্যূন নয়। এঁরা হলেন পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্তকুমার, অবশ্যই দেবব্রত— যিনি মোটেই ব্রাত্য নন, বরং তাঁর গণতান্ত্রিকতার মধ্যেই রয়েছে তাঁর অকৃত্রিম আভিজাত্য; এবং কাননদেবীও বটে। এখানে একটা কথা সবিনয়ে স্বীকার করি— যে আলোচনায় সংগীত শিল্পীদের যোগ্যতার নম্বর কষে দেওয়া হয়, কণিকা টপ্পাঙ্গে সূক্ষ্মতায় অথবা সুচিত্রা সরল দাপটে কোথায় কত বড়ো তা দেখিয়ে দেওয়া হয়, সে আলোচনার যোগ্যতা আমার নেই। মা দুর্গার দুই পাশে দাঁড়ানো লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে কে বড়ো এ নিয়ে বালসুলভ তর্ক করার বয়সও আমার নেই। আমি শুধু জানি যেসব শিল্পী এখানে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের গান শুনতে শুনতে আমারও মনে হয়েছে 'ক্ষুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে রব মরি'।

কেবল কখনো কখনো মনে হয়েছে শিল্পী নির্বাচন নির্ভুল বটে, গীতি নির্বাচনেও ত্রুটি নেই বটে, কিন্তু শিল্পীর কণ্ঠে ঠিক গানটি তুলে দেওয়া হয়নি। সঠিক তুলে দেওয়া হয়েছে এমন উদাহরণই বেশি। বিশেষ করে মনে পড়ছে 'আঁধার রাতে একলা পাগল' গানটি। সুচিত্রার গলায় রেকর্ডে এ গান আমরা শুনেছি। অবশ্যই প্রশংসনীয় কাজ। তথাপি এই গানটিতে 'আমি যে ওর আলোর ছেলে' এই কলির বিমিশ্র প্রত্যয় কৃষ্ণচন্দ্রের গলাতেই আকুল হয়ে ওঠে। কৃষ্ণচন্দ্রের গাইবার ভঙ্গিতে শান্তিনিকেতনী পরিশীলন নেই। থাকার কথাও নয়। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের যে 'মুড' তার প্রাণ, কৃষ্ণচন্দ্রের গলাতেই তা এসেছে। কিন্তু এমন কথা বলতে পারব না সংকলনের প্রথম খণ্ডের 'বড় আশা করে এসেছি' গানটি সম্বন্ধে। আশা ভোঁসলের কণ্ঠসম্পদ অতুলনীয়, রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাকরণও তাঁর অধিগত। কিন্তু এক একটা গানের এক একটা কণ্ঠাশ্রয় থাকে। এ গান দেবব্রতেরই গান। এখানে দ্বিতীয় শিল্পী বাছা বেঠিক হয়েছে। যেখানে সঠিক হয়েছে সেখানে কী কাণ্ড ঘটে, তার আর এক প্রমাণ সংকলনের প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশে ঋতু গুহের গান— 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই'। শুনতে শুনতে সমস্ত মন স্থির হয়ে যায় সুধাসিন্ধুর তীরে। আর, একথা কি আজ আলাদা করে আমার বলার দরকার আছে যে, শান্তিদেবের গলায় আলো ফোটায় শান্তিনিকেতনের টোপোগ্রাফি, সেখানকার আকাশবাতাশ, খোলা মাঠ— বোঝা যায় এ গান কেয়ারি করা বাগানবাড়ি নয়, শ্রাবণের ধারায়, বসন্তের হাওয়ায় ফুটে ওঠা স্বভাবজ ফুল্ল। একথা আলাদা করে আজ আর বলার দরকার আছে কি 'এ পরবাসে রবে কে হায়' মানেই মালতী ঘোষাল, 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' মানেই রাজেশ্বরী অথবা 'যে দিন সকল মুকুল গেল ঝরে' আর শৈল দেবী কিংবা 'চিনিলে না আমারে কি' আর অমিতা সেন একাকার! বরং পৃথকভাবে উল্লেখ্য সন্‌জীদা খাতুনের গান, সুপূর্ণা চৌধুরীর গান। সব শেষে হঠাৎ মনে পড়ে বিষণ্ণ হই অমিয়া ঠাকুর নেই দেখে—কেন? কোরাস গানগুলি ইন্দিরা গোষ্ঠীর উচ্চাদর্শে বাঁধা একনিষ্ঠ সাধনার সাক্ষী। সব মিলিয়ে এই সংগীত প্রবাহ এক অঞ্জলি সুধা সমুদ্রের স্বাদ দিতে পেরেছে— এটাই আসল কথা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজের অন্তর্লোক যে-চিঠিপত্রে উদঘাটিত

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠিপত্র (১২শ খণ্ড)/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(সং) ভবতোষ দত্ত/
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ/ কল-১৭/ ৩৬·০০

'চিঠিপত্র'-এর দ্বাদশ খণ্ডে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১৬৯টি চিঠি এবং রামানন্দের রবীন্দ্রনাথকে লেখা ৬৩টি চিঠি আছে। এছাড়া কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়, রমা দেবী, ঈপ্সিতা দেবী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, শান্তা দেবী, কালিদাস নাগ, সীতা দেবী এবং সি· এফ· এনড্রুজকে লেখা মোট ৭৩টি চিঠি। কেদারনাথ থেকে সি· এফ· এনড্রুজ পর্যন্ত লিখিত ৭৩টি চিঠি কেন সংযোজিত হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই বলেননি সম্পাদক। কারণটা হয়তো এই যে কেদারনাথ থেকে কালিদাস নাগ পর্যন্ত সকলেই রামানন্দের সঙ্গে কোন না কোন রকমে সম্পকান্বিত ছিলেন। দীনবন্ধু এনড্রুজকে ইংরেজীতে লেখা চিঠিটি মুসোলিনির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করবে।

বয়সে রামানন্দ রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা ৪ বৎসরের ছোট ছিলেন, কিন্তু বেঁচে ছিলেন ২ বৎসর বেশি। লেখক ও সম্পাদকের মধ্যে যোগসূত্রের মধ্য দিয়েই তাঁদের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। রামানন্দ যখন কলকাতার কলেজে পড়তে আসেন তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় ২২ বৎসর। ইতিমধ্যেই তাঁর কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে এবং বাংলার যুবসমাজে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে। রামানন্দও ছিলেন তাঁর একজন গুণগ্রাহী পাঠক। রামানন্দ লিখেছেন, "রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে কখন প্রথম দেখা হয় মনে নাই। আমরা যখন কলেজে পড়ি, তখনই তিনি বিখ্যাত। বোধ হয় তাঁহারই কোন বক্তৃতা পাঠের সময়ে বা প্রকাশ্য সভায় তাঁহার গানের সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া থাকিব। Scot[illegible]rches [illegible]lege-এর হলে, Science Ass[illegible] (১২৯৪), Emerald The[illegible] মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁহার বক্তৃতা পাঠের কথা অস্পষ্ট মনে হয়। কিন্তু কোথায় তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছি মনে নাই। কবে থেকে তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব হয় তাহাও মনে নাই।"

রামানন্দ শুধু নীরব গুণগ্রাহী পাঠক ছিলেন না। 'দাসী' পত্রিকায় ১৮৯৬ সালে তিনি কবির 'নদী' কবিতাটির একটি সুচিন্তিত সমালোচনা লেখেন। বিগত শতকের শেষ ভাগে রামানন্দ এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষরূপে যোগ দেন। কিছুদিন পরে নিজের সম্পাদনায় 'প্রদীপ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় লেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে চিঠি দেন। লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পাদক রামানন্দের ঘনিষ্ঠ

রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ। মাঝখানে সি· এফ· এনড্রুজ

যোগাযোগের সূত্রপাত এই থেকে। রামানন্দ 'প্রদীপ'-এর সম্পাদনা ভার ত্যাগ করে 'প্রবাসী' (১৯০১) ও 'মডার্ন রিভিয়ু' (১৯০৭) পত্রিকা দুটি প্রকাশ করেন। পরে এলাহাবাদ ত্যাগ করে তিনি কলকাতায় আসেন। কবি যখন 'বঙ্গদর্শনে'র (নব পর্যায়ের) সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করলেন, তখন রামানন্দ তাঁকে নিয়মিত 'প্রবাসী'তে লেখার জন্য অনুরোধ জানান। 'প্রবাসী'তে তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) উল্লেখযোগ্য সর্বপ্রথম রচনা 'মাস্টার মহাশয়' প্রকাশিত হয় ১৩১৪ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে। শুধু 'প্রবাসী' নয়, 'মডার্ন রিভিয়ু'তেও নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন লেখার জন্য সম্মানমূল্য তিনি প্রথম রামানন্দের কাছ থেকেই পান। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা সরলাদেবী যখন লেখার বিনিময়ে অর্থমূল্য দেওয়া সম্বন্ধে কটাক্ষ করেছিলেন সেই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "সরলা যখন আপনার সম্পাদকের কার্য্যকে ব্যবসাদারী বলেছিল তখন সেটাকে আপনার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাবশত ভুল বলে মনে করতে পারতুম। কিন্তু লেখার মধ্যে অসম্মানকর শ্লেষ ছিল বলেই আমি তা ভাবতে পারিনি এবং সেটাকে অপরাধ বলে গণ্য করেই আত্মীয়মণ্ডলীকে বেদনা দিয়ে প্রকাশ্যে তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি।···" (৭৯ সংখ্যক চিঠি)।

রামানন্দ যে শুধু 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায় কবির রচনা প্রকাশ করতেন তা নয়। তিনি অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রবাসী 'কষ্টিপাথর' বিভাগে উদ্ধৃত করে তাঁর রচনার প্রচার করতে সাহায্য করেছেন।

একবার রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে অগ্রিম তিনশত টাকা পাঠিয়ে অনুরোধ জানালেন তিনি যেন 'প্রবাসী'র জন্য ধারাবাহিকভাবে একটি উপন্যাস লেখেন। এই উপন্যাসের জন্য সম্পাদক তাঁকে কোন সময় নির্দেশ করেননি অথবা তাগিদও দেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিবেকবান লেখক হিসাবে নিজেই 'গোরা' উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন। সময়মতো উপন্যাসের কিস্তি পাঠাতে তিনি কখনও খেলাপ করেননি। এমনকি শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও তাঁর কিস্তি যথাসময়ে 'প্রবাসী'র দপ্তরে পৌঁছেছে। এই নিষ্ঠা এবং কর্তব্যপরায়ণতা রামানন্দকে কবির প্রতি বিশেষরূপে শ্রদ্ধান্বিত করেছিল। 'গোরা' আড়াই বৎসর চলেছিল। 'প্রবাসী'তে লেখা দেওয়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লিখেছেন, "আপনি আমার কাছ থেকে প্রবাসীর প্রবন্ধ আদায় করার জন্যে নানা কৌশলে চেষ্টা করে থাকেন এরকম জনশ্রুতি আমার কানে পৌঁছয়নি। কিন্তু যদি করতেন তাতে আমার দুঃখিত হবার কারণ থাকত না। আমি যদি প্রবাসীর সম্পাদক হতুম তাহলে রবীন্দ্রনাথকে সহজে ছাড়তুম

না—ভয়, মৈত্রী, প্রলোভন প্রভৃতি নানা উপায়ে লেখা বেশী না পাই ত অল্প, অল্প না পাই ত স্বল্প আদায় করে নিতুম। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের দোষ হচ্ছে এই যে খেজুর গাছের মত, উনি বিনা খোঁচায় রস দেন না। আপনি যদি আমাকে সময় মত ঘুষ না দিতেন তাহলে কোনমতেই 'গোরা' লেখা হত না। নিতান্ত অতিষ্ঠ না হলে আমি অধিকাংশ বড় বা ছোট গল্প লিখতুম না।" (৫২ সংখ্যক চিঠি)।

'মডার্ন রিভিয়ু'তে রবীন্দ্রনাথের গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতার অন্যকৃত ইংরেজী অনুবাদ অনেক প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু রামানন্দ তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

তিনি বারবার কবিকে তাগিদ দিয়ে নিজের লেখা নিজেই অনুবাদ করুন এই আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কবি যদিও ইংরেজী লেখা তাঁর আসে না বলে বারবার আপত্তি করেছেন, তথাপি সম্পাদক ছিলেন নাছোড়বান্দা। এর ফলে রবীন্দ্রনাথ অনেক রচনা নিজেই অনুবাদ করেছেন। রামানন্দ কোথাও কোথাও যে সামান্য সংশোধন করে দিতেন একথা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। রামানন্দের এরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ না থাকলে 'গীতাঞ্জলি'র স্বকৃত অনুবাদ সম্পন্ন হত কিনা সন্দেহ। সুতরাং বলা চলে রামানন্দই অনুবাদের মাধ্যমে কবিকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পরিচিত করিয়েছিলেন এবং নোবেল পুরস্কার লাভের পথ সুগম হয়েছিল।

'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায় কবির রচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে দেশে ও বিদেশে তাঁর সাহিত্যসাধনাকে যেমন প্রচার করতে সাহায্য করেছে এমন আর কোন পত্রিকা তা করেনি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মসাধনা সম্পাদক বিবিধ প্রসঙ্গে এবং নোটস্-এ প্রকাশ করেছেন নিয়মিতভাবে।

'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' যে কবির সাহিত্য-বিষয়ক রচনাই শুধু প্রকাশ করেছে তা নয়। তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনার প্রচারও এই কাগজ দুটির মধ্য দিয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি হয়েছে। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'ছোটো ও বড়ো', 'সত্যের আহ্বান' প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রবন্ধ যা সে যুগে প্রকাশ করা আশঙ্কাজনক ছিল, সম্পাদক তা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা 'চিঠি' কবিতাটির প্রকাশ (ফাল্গুন, ১৩৩১)। দক্ষিণ আমেরিকার বুয়োনোস্ আইরিস্ থেকে রেগুলেশন অ্যাক্ট সম্বন্ধে (১৯২৪) তিনি লিখেছিলেন, "ঘরের খবর পাইনে কিছুই, গুজব শুনি নাকি/ কুলিশপাণি পুলিশ সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।/ শুনছি নাকি বাংলাদেশের গান হাসি সব ঠেলে/ কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।"

সরকারের সমালোচনামূলক এইসব প্রবন্ধ লেখার জন্য শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, সম্পাদককেও রাজরোষে পড়তে হয়েছিল। রামানন্দের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য গোয়েন্দা পুলিশ সর্বদা 'প্রবাসী' অফিসে ঘোরাফেরা করত। তাঁর স্ত্রী মনোরমা দেবী স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপরও পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁর চিঠিপত্র সেন্সার করা হত এবং সরকারী কর্মচারীদের ছেলেমেয়েরা যাতে শান্তিনিকেতনে না পড়ে তার জন্য সরকারী নির্দেশও জারি করা হয়েছিল।

কবি যে শুধু সরকারের সমালোচনা করতেন তাই নয়। দেশের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতাদের সমালোচনাও তিনি করেছেন অকুতোভয়ে। গান্ধীজীর নামে যখন সমগ্র দেশ উন্মত্তপ্রায়, তখনও কবি তাঁর চিন্তাধারার সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। গান্ধী-ভক্তদের কাছ থেকে এজন্য তিনি সভা-সমিতিতে বিরূপ অভ্যর্থনাও পেয়েছেন।

১৩১৪ সাল থেকে আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু'র সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। শুধু ১৩২১ সালে 'সবুজপত্র' বেরোবার পর প্রায় একবছর তাঁর পক্ষে 'প্রবাসী'তে কিছু লেখা সম্ভব হয়নি। এই সময়ে রামানন্দও তাঁকে লেখার জন্য তাগিদ দেননি। তাগিদ দিয়ে লেখা আদায় করা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। 'প্রবাসী'তে কেন লিখতে পারেননি এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখেছেন, "প্রবাসীর প্রতি আমার মমতা কিছুই কমে নাই। আমার মুস্কিল এই যে সবুজপত্রে ঢাকা পড়িয়াছি। ওটা আত্মীয়ের কাগজ বলিয়াই যে কেবল উহাতে আটকা পড়িয়াছি তাহা নহে। ঐ কাগজটা আমাদের দেশের বর্তমান কালের একটা উদ্দেশ্য সাধন করিবে বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে।... সবুজপত্রের একটা বিশেষ ভাবের আকৃতি ও প্রকৃতি যাহাতে ক্রমে দেশে পাঠকদের মনকে ধাক্কা দিয়া বিচলিত করে সম্পাদকের সেইরূপ উদ্যম দেখিয়া আমি নিতান্তই কর্তব্যবোধে এই কাগজটিকে প্রথম হইতেই খাড়া করিয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।... এদিকে আজকাল আমার ক্ষমতার মধ্যে প্রাচুর্য্য জিনিষটা নাই তাই যেটুকু রচনা করি তাহাতে একটি কাগজের পেট কোনমতে ভরে, উদ্বৃত্ত থাকে না। নহিলে প্রবাসীকে কদাচ বঞ্চিত করিতাম না—প্রবাসীর জন্য আমার মন উদ্বিগ্ন থাকে ইহা নিশ্চয় জানিবেন।"

রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দের মধ্যে শুধু সম্পাদক ও লেখকের সম্পর্কই ছিল না। তাঁদের মধ্যে ধীরে ধীরে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কবি বলেছেন, "জানি না, কি কারণে সংসারে আমার বন্ধুত্বের সীমা, অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। আমার মধ্যে একটা কোনো গুরুতর অভাব নিশ্চয়ই আছে। আমার বিশ্বাস, সেই অভাবটা হচ্ছে, আমার হৃদ্যতা-প্রকাশের প্রাচুর্যের অভাব। শিশুকাল থেকে অত্যন্ত একলা ছিলুম, লোকসঙ্গ না পাওয়াতে লোক-ব্যবহারের শক্তি সম্ভবত আমার আড়ষ্ট হয়ে গেছে। এই জন্যেই এ জীবনে বন্ধুসমাজে আমার বাস করা ঘটেনি। শিশুকালের মতো আজো বস্তুত আমি একলাই আছি। সেটাতে আমার অনেক ক্ষতিও হয়েছে, তাছাড়া একটা স্বাভাবিক আনন্দের বরাদ্দ আমার ভাগ্যে চিরদিন কম পড়ে গেছে।

"যখন বয়স হয়েছে পরিচিত লোকদের মধ্যে যাদের আমি কোনো না কোনো কারণে শ্রদ্ধা করতে পেরেছি তাদেরই আমি মনে মনে বন্ধু বলে গণ্য করেছি। তাদেরও সকলকে আমি রক্ষা করতে পারিনি। ঐদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। জগদীশ, আপনি, যদুবাবু ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এই চারজনের নাম [মনে] পড়ছে।..."

রবীন্দ্রনাথ নানা উপায়ে রামানন্দের সহায়তার কথা স্মরণ করে আরও বলেছেন, "পরম দুঃখের দিনে তিনি আমার প্রবন্ধকে অর্থমূল্য দিয়েছেন—এমন সময়ে দিয়েছেন, যখন দাবি করলে বিনামূল্যেই পেতেন। সে কথা আজ মনে আছে। তখন আমার বিদ্যানিকেতনের ক্ষুধা মেটাবার জন্য 'হিতবাদী'র তৎকালীন ধনশালী কর্তৃপক্ষের কাছে আমার চার-পাঁচটি বইয়ের স্বত্ব বন্ধক রেখে সামান্য কিছু টাকা সংগ্রহ করেছিলাম। প্রায় পনেরো বৎসরেও তা শোধ হয়নি। আমার অন্য বইয়ের আয়ও তখন বাধাগ্রস্ত ছিল। অর্থাৎ সেদিন দান পাওয়ার পথে দয়া ছিল না, উপার্জনের পথে বৃদ্ধির অভাব, সম্পত্তির উপর শনির দৃষ্টি। অথচ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নামে সরস্বতীর দাবি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এমন সময় 'প্রবাসী'-সম্পাদক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার প্রবন্ধের মূল্য দিয়েছিলেন। মাসিকপত্র থেকে এই আমার প্রথম আর্থিক পুরস্কার।" (শান্তা দেবী। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা। পৃঃ ১৬৭ থেকে উদ্ধৃত)।

অপরদিকে রামানন্দও বলেছিলেন, "আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব লাভ।"

রামানন্দের বন্ধুত্ব সর্বদাই সক্রিয়ভাবে প্রকাশ পেত। তিনি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। নিজের কাগজে সেই আদর্শ সর্বদাই প্রচার করেছেন। নিজের পুত্র মুলুকে বিশ্বভারতীতে পড়বার জন্য ভর্তি করেছিলেন এবং শান্তিনিকেতনে বাস করেছিলেন বেশ কিছুকাল। রবীন্দ্রনাথেরও তাঁর বিচক্ষণতার উপর আস্থা ছিল। বিদেশে যাবার সময় রামানন্দকেই বিশ্বভারতীর দায়িত্ব দিয়ে যেতেন। কবি যখন কলকাতা আসতেন তখন সুযোগ পেলে রামানন্দের কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িতে যেতেন এবং পরিবারের সকলের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রামানন্দের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ বেশ কয়েকটি চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে। দুটি পত্রিকার সম্পাদক হলেও রামানন্দের আর্থিক অবস্থা যে খুব সচ্ছল ছিল না, রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন। তাই একবার রামানন্দ যখন বিশ্বভারতীর জন্য একশত টাকা সাহায্য হিসাবে পাঠিয়েছিলেন কবি তা এমনিতে গ্রহণ করতে পারেননি। বিদেশী পত্রিকা থেকে নানা প্রবন্ধ বাংলায় সংকলন করে 'প্রবাসী'র জন্য পাঠাতেন তিনি।

রামানন্দের সঙ্গে কবি রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের পূর্বে পরামর্শ না করে কিছু করতেন না। নাইটহুড ত্যাগের পূর্বেও মতামত চেয়েছিলেন রামানন্দের কাছে। এবং রামানন্দ কবির অনুকূলেই মত দিয়েছিলেন। যেসব রাজনৈতিক রচনা তখনকার দিনে কোন সম্পাদক প্রকাশ করতে সাহসী হয়নি, রামানন্দ বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তাদের প্রকাশ করেছেন নির্দ্বিধায়

এছাড়া রামানন্দের [illegible] সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, লন্ডন থেকে [illegible] কাশিত হোম য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরি সিরিজের মতো সাধারণের জন্য গ্রন্থমালা প্রকাশ; ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত কবির কোন গ্রন্থ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় রামানন্দ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। রামানন্দের অনুরোধে কবি 'পাঠসঞ্চয়' পুস্তকটি সংকলন করে দেন এবং রামানন্দ তা নিজে ছাপিয়ে পাঠ্য করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। রামানন্দ আরও ক্ষুব্ধ ছিলেন এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করা সত্ত্বেও তাঁকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সহ-সভাপতির পদ থেকে পদোন্নতি করে কখনও সভাপতি হবার জন্য আমন্ত্রণ জানাননি। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কবিকে

রামানন্দ লেখেন, "আপনাকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর উপাধি দিবার পর আমি সে বিষয়ে প্রবাসীতে একটি নোট লিখি যে, আপনার সম্মানের অভাব নাই, সম্মানপ্রার্থীও আপনি নহেন, কিন্তু ইহা বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় যে, বিদেশে যিনি এত সম্মান পাইয়াছেন অযাচিত ভাবে, তাঁহাকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ একবারও সভাপতি করেন নাই। আমার এই নোটটি প্রেসে কম্পোজ করা হইয়াছিল, ছাপা হইতে যাইতেছিল, এমন সময় পরিষদের সেক্রেটারি ও প্রবাসীর অন্যতম সহকারী সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কেদারের মারফৎ আমাকে অনুরোধ করিলেন যেন ঐ নোটটি ছাপা না হয়। কারণ বোধ হয় এই যে, ওটি ছাপা হইলে লোকে ব্রজেন্দ্রবাবুর মুরুব্বি যদুবাবু ও হীরেন্দ্রবাবুকে দোষ দিবে যে তাঁহারা আপনাকে কখনও সভাপতি করেন নাই।..." (৪৮ সংখ্যক রামানন্দের চিঠি)।

বিশ্বভারতীকে সাহায্য করবার জন্য রামানন্দ নিজব্যয়ে 'মুক্তধারা' ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কবির ইংরেজী রচনার অনুবাদের জন্য রামানন্দ বিশেষ তৎপর ছিলেন। ভিন্ন প্রদেশবাসী দেশের লোকের নিকট যাতে তাঁর সাহিত্যের প্রচার হয় সেই উদ্দেশ্যে 'বিশাল ভারত' প্রেস থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনার হিন্দি অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সেসব বইয়ের বিজ্ঞাপনের জন্য যে ব্যয় হয়েছিল, বই বিক্রয়ের দ্বারা সেই টাকা পাওয়া যায়নি।
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম ও জীবন সম্বন্ধে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু'তে নানা প্রবন্ধ ছাপিয়ে রামানন্দ প্রচারের সহায়তা করেছেন। তাছাড়া তিনি নিজেও অনেক জায়গায় তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন। কবির ৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যে সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল তার পশ্চাতেও ছিলেন রামানন্দ। 'গোল্ডেন বুক অফ ট্যাগোর' সম্পাদনার দায়িত্বও ছিল তাঁর। সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের যে একদিন প্রতিষ্ঠা হবেই, এ বিষয়ে রামানন্দের ছিল অবিচল আস্থা। ১৯১২ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পূর্বেই তিনি লিখেছিলেন, "যাঁহারা তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) গ্রন্থাবলী নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের এবং বহুভাষাভিজ্ঞ কোন কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তির মত এই যে, তিনি বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং জগতের শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের মধ্যে আসন পাইবার যোগ্য।..."
যদিও কবির সঙ্গে রামানন্দের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তবুও সেই সুযোগ নিয়ে তিনি নিয়ম লঙ্ঘন করেননি। রবীন্দ্রনাথ যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন ডাক্তারের নিষেধ ছিল তাঁর কাছে যাবার। রামানন্দ তাই নিয়ম কখনও ভঙ্গ করেননি। তিনি দূর থেকে তাঁর সম্বন্ধে খবর নিয়ে চলে আসতেন। শোক-বিহ্বল রামানন্দ কবির মৃত্যুর পরে শুধু লিখেছিলেন, "আকাঙ্ক্ষা ছিল, কবির আগে আমার মৃত্যু হবে। রবীন্দ্র-বিহীন জগতের কল্পনা কখনো করি নাই। ভাবি নাই রবীন্দ্র-বিহীন জগৎ দেখতে হবে।"
রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিগুলির বিশেষ মূল্য আছে। জীবনী-গ্রন্থ থেকে কবির বহির্জীবনের ঘটনাবলী বেশি করে জানা যায়। কিন্তু এখানে বন্ধুকে লেখা চিঠির মধ্যে নিজের অন্তর্লোককে উদ্‌ঘাটন করেছেন। এ চিত্র অন্যত্র এমনভাবে পাওয়া যায় না। তাঁর নিঃসঙ্গতা, অর্থের অনটন এবং জীবনের নানাবিধ সমস্যা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেছেন পত্রাবলীর মধ্যে। রামানন্দ কিন্তু এতটা উন্মুক্ত হৃদয়ে নিজের কথা বলতে পারেননি।
কেদারনাথকে লেখা একটি চিঠিতে কবি তাঁর সাংসারিক অবস্থা খোলাখুলি ভাবে বলেছেন, "দেশে ফিরে এসে দেখলুম আমাদের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। জমিদারীর আয় বন্ধ, দেনার সুদ বাড়ছে, জোড়াসাঁকোর বাড়ি বিক্রি করবার বা ভাড়া দেবার চেষ্টায় রথী প্রবৃত্ত, দিন খরচের মার্জিন ছাঁটা চলছে। এই অবস্থায় পারস্য ভ্রমণের লেখাটা 'বিচিত্রা' হাজার টাকা দিয়ে কিনতে চাচ্ছে। আমাদের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি. তাই ধরা দিতেই হবে।

"তোমার বাবার জন্যে দেনা-পাওনার সম্পর্ক রাখতে চাই নে সে কথা তাঁকে বারবার বলেচি—প্রবাসীতে মাঝে মাঝে কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি যদি পাঠাই সেজন্যে আমাকে কিছু দেবার প্রস্তাব কোরো না। একেবারেই সে আমার ভালো লাগে না। বড়ো কোনো লেখা যার বড়ো দাম আছে সে আমাকে বিক্রি করতেই হবে। বিশ্বভারতীর জন্যে লিখে উপার্জ্জনের পথ করব এমন কথা মাঝে মাঝে মনে হয়েছে কিন্তু নিজের সংসারের জন্যে জীবিকার সন্ধান করতে হবে এই পরিণামে আজ এসে ঠেকেছি। লেখা ছাড়া আর কোনো রাস্তা আমার নেই, তাই কোমর বাঁধতে হোলো।..." (কেদারনাথকে লেখা ২ নম্বর চিঠি)।

পাঠকের মনে একটি প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে এই পত্র সংগ্রহে কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি এবং কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেনযোগে সংবর্ধনাকারীদের সম্মুখে কবি যে ভাষণ দেন তা নিয়ে বিক্ষোভের সূত্রপাত সম্পর্কে কোন পক্ষই চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করেননি।
চিঠিপত্রের কয়েকটি খণ্ড টীকা-বিহীন হয়ে বেরুবার পর দ্বাদশ খণ্ডটির সটীক সংস্করণ পেয়ে আমরা স্বভাবতই আনন্দ পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দ প্রসঙ্গটি আর একটু বিস্তৃত হলে পাঠকের পক্ষে চিঠিপত্রের পটভূমি উপলব্ধি করা সহজতর হত। পত্রের প্রসঙ্গগুলিতে অনেক তথ্য আহরণ করে সম্পাদক ডঃ ভবতোষ দত্ত পরিবেশন করেছেন, এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু প্রসঙ্গ রচনায়, তথ্যবিন্যাসে এবং রচনাশৈলীতে সমীকরণের অভাব লক্ষণীয়। তাছাড়া প্রসঙ্গ নির্বাচনেও সর্বত্র এক রীতি অবলম্বন করা হয়নি।

কোথাও কোথাও প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের উপরে টীকা পাওয়া যাবে না। যেমন, ব্যক্তি পরিচয়ের ক্ষেত্রে 'নেপালবাবু' যে কে, তা বলা হয়নি। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই তাঁর নাম হয়তো জানেন না। নেপালচন্দ্র রায় অ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এলাহাবাদে। অ্যান্টি পার্টিশন সভায় যোগ দেবার ফলে তাঁর চাকরি চলে যায়। রামানন্দের সুপারিশেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করেন। ব্যক্তিপরিচয় বিভাগে কেদারনাথ আছে, অশোক নেই; সীতা দেবী আছে, শান্তা দেবী নেই; অরুন্ধতী, ঈবিতা ও রমা নেই। সংযুক্তা দেবী কে সে কথাও সম্পাদক বলেননি। কেদারনাথ, সীতা ও শান্তা দেবী এবং আরো অনেককে লেখা গান ও আশীর্বাদী কবিতা রমা দেবী ও ঈবিতা দেবীকে লেখা চিঠি হিসেবে চালানো কতটা সঙ্গত তা নিয়ে অনেকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে।
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ব্যক্তিগত আলোচনা চিঠি থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিলে চিঠিত্ব চলে যায়—সেই সহজ ভাবটি রাখবার জন্যে অন্য হিসাবে অনাবশ্যক হলেও কিছু কিছু ঘরের কথার আমেজ থাকা ভালো।..." (৮৩ সংখ্যক চিঠি)

অথচ চিঠি সম্বন্ধে
রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শ সম্পাদক (বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষও) উপেক্ষা করে কোথাও কোথাও ব্যক্তিনাম উহ্য রেখেছেন। রাজ্য সরকার-কেন্দ্রীয় সরকারের মহাফেজখানায় নিয়ম আছে যে কোন দলিল বা চিঠিপত্র ৩০ বছর পর থেকেই সাধারণত দেখতে দেওয়া হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রায় ৯০ থেকে ৪৬ বছর কালখণ্ডের মধ্যে লেখা থেকে ব্যক্তিবিশেষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। লেখক এবং এই সকল ব্যক্তির প্রায় সকলেই এখন পরলোকগত। চিঠিগুলি যেখানে সংরক্ষিত আছে সেখানে গেলে দেখা যায়, সুতরাং বাদ-দেওয়া নামগুলিও জানা যাবে। আর অধিকাংশ চিঠিতে এমন কোন মারাত্মক নিন্দাবাদ নেই যে ব্যক্তিনাম প্রকাশের অযোগ্য। যেমন, ৬৩ নম্বর চিঠিতে যে নামটি বাদ গেছে, সেটি লাবণ্যলেখা চক্রবর্তীর। ৭৯ নম্বর চিঠিতেও ক্ষুদু বা অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নাম বর্জিত হয়েছে। অথচ এই নামটি জানা বিশেষ অসুবিধাজনক নয়। ঐ চিঠিতেই বাদ দেওয়া হয়েছে শান্তা দেবী ও কালিদাস নাগের নাম। বোধ হয় এই কারণেই লাবণ্যলেখা চক্রবর্তী, শান্তা দেবী ও অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নাম ব্যক্তি-পরিচয় থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে।

নাম উল্লেখ না করবার রীতিও সম্পাদক সমান ভাবে পালন করেননি। যদুনাথ সরকার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেরূপ তীব্র সমালোচনাত্মক চিঠি (৯২) লিখেছিলেন তেমন চিঠি তিনি আর বেশি লোক সম্বন্ধে লেখেননি। আবার যেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন (১২৯), "আমাদের দেশের একজন সাহিত্য অধ্যাপক প্রমাণ করে দিয়েছেন যে আমার লেখায় যথার্থ হাস্যরস নেই, দৃষ্টান্ত স্থলে চিরকুমার সভার-ও উল্লেখ করেছেন।..." কিন্তু কবি উল্লেখ না করলেও সম্পাদক সেই জীবিত অধ্যাপকের নামটি টীকায় প্রকাশ করে দিয়েছেন।

অরুন্ধতী দেবীকে লেখা (৪) নম্বর চিঠি কী হল সম্পাদক তা বলেননি। কালিদাস নাগের চিঠি সাজানোতেও গোলমাল দেখা যায়।
রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ ছাড়া অন্যান্য চিঠি প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় টীকা প্রায় নেই। রবীন্দ্রনাথ কালিদাস নাগকে (৫) নম্বর চিঠিতে লিখেছিলেন, "তুমি তোমার সিংহদের সঙ্গ ত্যাগ করে কিছুক্ষণ নরসিংহ নরশার্দুলদের সালোক্য ও সামীপ্য উপভোগ করতে এস।" 'সিংহদের সঙ্গ' কথাটির অর্থ কি সে সম্বন্ধে কোনো টীকা নেই। কেউ মনে করতে পারেন ডঃ নাগ হয়তো কোন এক সময় সার্কাসের সিংহদের নিয়ে লেখা দেখাতেন। আসলে কালিদাস তখন চিড়িয়াখানায় তাঁর এক আত্মীয়ের কোয়ার্টারে থাকতেন। কবি যখন তাঁকে চিঠি লিখতেন, ঠিকানা দিতেন—'আলিপুর জুলজিক্যাল গার্ডেন, প্রযত্নে হিউম্যান সেক্‌শান'। তাঁর তৎকালীন বাসস্থান প্রসঙ্গেই সিংহের প্রসঙ্গ এসেছে। ■

মহাদেবী বর্মা

একাশী বছর বয়সী মহাদেবী বর্মা ছিলেন আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের অভিভাবিকাপ্রতিম। দৈবভাবনা ও মানবার্তি বিগলিত প্রবীণা কবির জীবন ছিল আমৃত্যু এক তপোব্রতচারিণীর জীবন। ভারতীয় নারীসমাজের নিগ্রহ ও অমর্যাদার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি।

বাংলো সাহিত্যের নিকটতম প্রতিবেশী, বাঙালীর নিকটাত্মীয়া মহাদেবী বর্মা ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭র রাত্রে এলাহাবাদে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। একাশী বছর বয়সী এই প্রবীণা কবি ছিলেন আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের অগ্রবর্তিনী ভাবুক এবং অভিভাবিকাপ্রতিম। ছায়াবাদী গোষ্ঠীর প্রতিভূ মহাদেবী তাঁর অপর তিন অনুসঙ্গী সমকালীন কবি জয়শঙ্কর প্রসাদ, সুমিত্রানন্দন পন্থ ও সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী ওরফে 'নিরালা'র মতই অধ্যাত্ম চেতনার সঙ্গে লোকরীতিকে কবিতায় রূপায়িত করেছিলেন। উপভাষা খাড়িবোলি তাঁর হাতে স্বচ্ছন্দ সমৃদ্ধ এবং নিগূঢ় ভাববাহী হয়ে উঠেছিল। এক কথায় তিনি ছিলেন এই উপভাষার এক নিপুণ ও কীর্তিমান শিল্পী। দৈবভাবনা ও মানবার্তি বিগলিত মহাদেবীর জীবন ছিল আমৃত্যু এক তপোব্রতচরিণীর জীবন। দুঃখময় কিন্তু নিখাদ। এই কারণেই সম্ভবত তিনি আধুনিক হিন্দী সহিত্যের 'মীরা' নামে আখ্যাত হয়ে থাকেন।

স্পষ্টভাষী মহাদেবীর পরিচয় কেবল কবি হিসেবেই নয় গদ্যরচয়িতা, চিত্রশিল্পী এবং সুবক্তা হিসেবেও সুখ্যাত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে, তাঁর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে প্রকাশিত দীপশিখা কাব্যসংকলনটি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। পাতায় পাতায় জলরঙের ওয়াশের কাজের সঙ্গে জোড় মিলিয়ে হস্তাক্ষরে মুদ্রিত কবিতাগুলি রীতিমত অভিনবত্বের দাবি রাখে। মহাদেবীর জন্ম হয়েছিল ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের ফারাক্কাবাদে। অতি বাল্যকাল থেকেই তাঁর কবিচেতনার উন্মেষ ঘটেছিল মাতৃকণ্ঠে সুরদাস ও মীরার ভজনের সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে। বাল্যে নয় দশ বছর বয়সেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার সূত্রে পিতৃগৃহেই তাঁর বিবাহোত্তর জীবন কেটে গেছে। সেই সঙ্গে দশ বছর বয়স থেকে শুরু হয়েছে রীতিমত কাব্যচর্চা। দেহকেন্দ্রিক দাম্পত্যজীবনে ক্রমশ অনীহা জন্মেছে, তাঁর স্বাধীন মানসিকতা আর সাংসারিক শর্তে বন্দী হতে রাজী হয়নি। অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও তিনি আর স্বামীর ঘর করতে যাননি।

ছাত্রী হিসেবে মহাদেবী ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। মিডল স্কুল ও হাইস্কুলের পরীক্ষায় ১৯২১ ও ১৯২৫ সালে তিনি প্রথম হয়েছিলেন। ভগবদমুখী মনের আবেগে ১৯২৯ সালে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর জীবন বরণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে নৈনিতালে তাঁর সাক্ষাৎকার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। দীনদরিদ্রের সেবায় এবং তাদের অশিক্ষার অন্ধকার দূরীকরণের ব্রতে গান্ধীজী তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে ১৯৩৩ সালে সংস্কৃতে এম এ পাস করার পরে প্রয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠে প্রথমে শিক্ষকতা, পরে ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এবং ১৯৬০ সালে উপাচার্যের পদে বৃত হন।

যৌবনে যোগিনী মহাদেবীর আন্তরিক বাসনা ছিল বেদ অধ্যয়নের। এই উদ্দেশ্যে তিনি কাশীতে ঋগ্বেদ পড়তে গিয়েছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতরা কোন স্ত্রীলোককে বেদপাঠে অনুমতি দেননি। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময়েও স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষ সমাজের এই উপেক্ষা ঔদাসীন্য এবং অবমূল্যায়নের সম্মুখীন হয়েছিলেন কিছু বিচিত্র ঘটনার সূত্রে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ঋগ্বেদ পাঠের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল তাঁর।

কেবল ধর্মশাস্ত্রই নয় রস সাহিত্যেরও তিনি ছিলেন আগ্রাসী পাঠিকা। রবীন্দ্র ও শরৎ সাহিত্যের তিনি ছিলেন অনুরাগী। ১৯৩৩-এ এলাহাবাদে তিনি গুরুদেবের সান্নিধ্যে এসেছিলেন—তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় শান্তিনিকেতনের মধুর স্মৃতিকথা।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে নীহার, রশ্মি, নীরজা, সন্ধ্যাগীত, দীপশিখা এবং যম অন্যতম। নীরজা ১৯৩৫ সালে সাসকারিয়া পুরস্কার পেয়েছিল। অনেক পুরস্কারই পেয়েছেন তিনি জীবনে। তাঁর গদ্যরচনা স্মৃতির রেখার জন্য দেওয়ালী পদক, চল্লিশের দশকে মাঙ্গাপ্রসাদ পারিতোষিক এবং ১৯৮৩ সালে তাঁর বহুল প্রচারিত যম গ্রন্থটির জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কার তার মধ্যে অন্যতম। ১৯৬৮ সালে পদ্মভূষণ-এ ভূষিতা মহাদেবী ১৯৫২ সালেই উত্তরপ্রদেশ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যা এবং ১৯৫৪ সালে সাহিত্য অকাদেমীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। অনেক বছর একটানা বিখ্যাত হিন্দী সাময়িক পত্রিকা চাঁদ সম্পাদনা করেছেন। সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর ওপরে তাঁর সুচিন্তিত সম্পাদকীয়গুলি বহুপঠিত ও আলোচিত হত। ভারতীয় নারী সমাজের নিগ্রহ ও অমর্যাদার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পরবর্তীকালেও নারীজাগৃতির সমর্থক মহাদেবী কিন্তু নারীপ্রগতি ও নারীমুক্তি আন্দোলনের অসার ভানকে ক্ষমা করতে পারেননি। স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, Woman today is not a mother, a sister, a daughter, she is merely a female species, like in the animal world. Besides, they talk of liberation, but do they have any concept of the kind of liberty they want? They have made it a big farce.

গ্রন্থবার্তা

গত কয়েক দশকের প্রতিকূল পরিস্থিতি পশ্চিমবাংলার বইবাজারকে ক্রমশ কোণঠাসা করে ফেলেছে। তার ভূগোল সীমিত হয়ে এসেছে দ্রুতহারে। সেই সঙ্গে প্রায় প্রতিবছরই প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিছু ক্ষয়ক্ষতি করে চলেছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এবং উৎসাহ মন্দীভূত হয়ে এসেছে নানা কারণে। গ্রন্থের নিম্ন মান, নির্বিচার প্রকাশনা এবং উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি তার অন্যতম কারণ সন্দেহ নেই। এত বইমেলা এবং সরকারী অর্থের বিপুল বরাদ্দ সত্ত্বেও কিছু রহস্যজনক কারণে সৎ প্রকাশক এবং উল্লেখযোগ্য বইগুলি মার খাচ্ছে। অর্থপূর্ণ অর্থ বন্টনের গূঢ় রহস্যে না গিয়েও বলা যায় বিজ্ঞাপনের মূল্যবৃদ্ধি বহু স্বল্প পুঁজির প্রকাশককে আত্মগুপ্তির দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। উপযুক্ত প্রচারের অভাবে সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থগুলির জ্ঞাপন ও পরিচায়ন ঘটছে না। অনবধানবশত উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে অনেক আকর্ষক গ্রন্থও। এভাবেই পাঠকে লেখকে প্রকাশকে একটা ব্যবধান সূচিত হচ্ছে। সম্প্রতি আমাদের কাছে কিছু নতুন বই এসেছে যে-গুলির মূলসূত্র ইতিহাস। নিছক গল্প উপন্যাসের চেয়ে গবেষণাধর্মী রচনার দিকে বাঙালীর ঝোঁকটা যে বেড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ বইগুলো মনের খোরাক যোগায় এবং পাঠান্তেই ফুরিয়ে যায় না। সংরক্ষণ-যোগ্যতা এই দুর্মূল্যের বাজারে নিশ্চয়ই বিবেচনা সাপেক্ষ ব্যাপার। কয়েকটি বইয়ের কথা জানাই।

প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য/সুকুমারী ভট্টাচার্য/ আনন্দ পাবলিশার্স/ ২৩৫ পৃঃ, ৩০·০০

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির এক

বিশাল অধ্যায় ছড়িয়ে রয়েছে বেদ-উপনিষদ থেকে শুরু করে বিপুল সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে। অথচ আজকের বাঙালী পাঠক চোখ থাকতেও জন্মান্ধের মত তার ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। ভাষাই এখন তার চোখের সবচেয়ে কাছের দেওয়াল। সংস্কৃত ভাণ্ডারের চাবিকাঠি চর্চার অভাবে হারিয়ে গেলেও তার ক্ষতিপূরণ ঘটেছে কিছু বিদগ্ধ বাঙালী লেখকের সৌজন্যে। সুকুমারী ভট্টাচার্য তেমনই এক কৃতী লেখিকা। বর্তমান গ্রন্থের সুনির্বাচিত নিবন্ধমালায় তিনি আলোকিত করে তুলেছেন একটি বিগত যুগের রূপ ও চরিত্র। সাহিত্যের রসাস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে খ্রীষ্টপর পঞ্চম দর্শক কালসীমার এক দিশারী অন্বেষণ আছে এই গ্রন্থে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : জীবন ও সাহিত্য/ (সং) ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়/ পুস্তক বিপণি/ ৩৪০ পৃঃ, ৬০.০০

ত্রিশজন বিশিষ্ট নিবন্ধকারের নানামুখী আলোয় কবি সম্পাদক ও মানুষ সুধীন্দ্রনাথের কেবল প্রোফাইলই নয়, পূর্ণাঙ্গ সচল চিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে।

আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ/ অনিমা মুখোপাধ্যায়/ সাহিত্যলোক, ১৬২ পৃঃ, ৩০.০০

পুঁথি আর ছাপা বই দুয়ের মধ্যে ফারাক শুধু কাগজে আর কালিতে নয়। লিপিমালার এবং ভাষার তির্যকতার মধ্যেও। পুঁথি পড়া বিদ্যে তাই একটু আলাদা। বাংলা পুঁথিতে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস অনেকখানি প্রকীর্ণ প্রোথিত অবস্থায় আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের জীবাশ্মের মত সেই ভগ্নাংশমালাকে শনাক্ত করার প্রয়াস রয়েছে এই গ্রন্থে।

নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড/ বরেন্দ্রসুন্দর চট্টোপাধ্যায়/ দে বুক স্টোর/ ৩৪৭ পৃঃ, ৪০.০০

হ্যালহেড সাহেব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক সুপরিচিত নাম। বাংলা ব্যাকরণ রচনার দুঃসাধ্য কর্মটি এই বঙ্গবন্ধু বিদেশীর অসামান্য কৃতিত্ব। বর্তমান গ্রন্থটি একই সঙ্গে ইতিহাস এবং অনুমানসিদ্ধ জীবনায়ন। গল্পরসে মজানো একটি তথ্যবহুল আলোচনা।

বাংলার খাবার/ প্রণব রায়/ সাহিত্যলোক/ ১৩৮পৃঃ, ২৫.০০

প্রাচীন যুগ থেকে অন্তমধ্যযুগ পর্যন্ত জনপ্রিয় খাদ্যের এই মুখরোচক ইতিহাসটি বাঙালীর রসনায় বৈচিত্র্য আনবে। সামাজিক পটভূমিতে এই ভোজ্যশিল্পের যে ঘরানা গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন অঞ্চলে তার অনুপুঙ্খ বিবরণ উদ্ধার করেছেন লেখক।

বিদ্যালঙ্কারা নারী

'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ ইত্যাদি' — শাস্ত্রে অনেক ভাল ভাল কথা থাকে এবং হিন্দু শাস্ত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। গার্গী-মৈত্রেয়ীর কথা মনে রেখেও বলতে হচ্ছে অতীতের মত বর্তমানেও মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে পুরুষকুল বেশ উদাসীন। এই উদাসীনতা কেবল গ্রামাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়। শহরাঞ্চলে, অতটা ব্যাপক না হলেও, শিক্ষিত পরিবারেরও তা বর্তমান।
গার্গী-মৈত্রেয়ীকে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা উচিত। অদূর অতীতের এই রকম দুই ব্যতিক্রমী নারী হলেন হটী বিদ্যালঙ্কার ও হটু বিদ্যালঙ্কার। নামের মধ্যে আপাতসাদৃশ্য থাকলেও এঁদের মধ্যে কোন রকম রক্তের সম্বন্ধ ছিল না। যদিও দু'জনে প্রায় সমসাময়িক। প্রথম জনা (হটী) ব্রাহ্মণকন্যা, অপরপক্ষে দ্বিতীয় জনা (হটু) ছিলেন অব্রাহ্মণকুলের মেয়ে। দু জনেরই জন্মভূমি বর্ধমান জেলা। হটীর বাড়ি সোঞাই গ্রামে আর হটুর কলাইঝুটিতে।
সে-যুগের রীতি অনুযায়ী কুলীন ঘরের মেয়ে হটীর বিবাহ হয় অতি অল্প বয়সে এবং বিয়ের কিছুদিন পরেই পতিবিয়োগ হয়। অবশ্য বিবাহের পরও তিনি তৎকালীন আর সব বিবাহিতা কুলীন কন্যার মত পিতৃগৃহেই ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রের একজন সুপণ্ডিত। তিনি উদ্যোগী হয়ে নিজেই কন্যাকে ব্যাকরণ ও কাব্যে সুশিক্ষিত করে তোলেন। পিতার মৃত্যুর পর নানারকম অসুবিধার জন্য তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়। তিনি চলে যান বেনারসে। সেখানে তিনি নবন্যায় অধ্যয়ন করেন এবং এই শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। নিজের চেষ্টায় তিনি কাশীতে একটি আশ্রম ও টোল স্থাপন করেছিলেন। তিনি স্বয়ং নিয়মিত তাঁর টোলে ছাত্রদের নবন্যায় পড়াতেন। খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় দূর দূর স্থান থেকে ছাত্ররা আসত তাঁর কাছে নবন্যায় অধ্যায়ন করতে। বিদ্যাবত্তার জন্য তিনি 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি লাভ করেন। তিনি নিয়মিত পণ্ডিতসভায় তর্কাদিতে অংশগ্রহণ করতেন এবং তৎকালীন রীতি অনুযায়ী পুরুষ পণ্ডিতদের ন্যায় পণ্ডিত-বিদায় অর্থাৎ দক্ষিণা আদায় করতেন। এই কীর্তি এ-যুগের মাপকাঠিতেও শ্লাঘার বিষয়।
হটুর পিতা নারায়ণ দাস ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। হটু বিদ্যালঙ্কার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তাঁর পিতামাতার অন্যান্য সন্তানের জন্মের অনতিকাল পরে পরেই মারা যেত বলে এই কন্যার নাম অনাদরে রাখা হয়েছিল হটু। হটুর পোশাকী নাম রূপমঞ্জরী। অল্প বয়সেই হটুর মাতৃবিয়োগ হয়। পিতা আর দার পরিগ্রহ করেননি। কন্যাকে তিনি অতি যত্নের সঙ্গে মানুষ করেন। বার্ধক্যে কন্যাই তাঁর একমাত্র অবলম্বন ছিল। বিষয়-আশয় বিশেষ কিছু না থাকায়, প্রচুর অবসর ছিল তাঁর। তিনি কন্যাকে গৃহে লেখাপড়া শেখাতে থাকেন। অল্প বয়সে কন্যার প্রতিভা দেখে পিতা তাঁর কন্যাকে পাশের গ্রামের টোলে পাঠান ব্যাকরণ শেখার জন্য। সে যুগে ব্যাপারটি ছিল রীতিমত বৈপ্লবিক। এই রকম এক 'বিজাতীয়' আচরণ এক বৈষ্ণবের পক্ষে কি করে সম্ভব হয়েছিল তা ভাবতে অবাক লাগে।

রূপমঞ্জরী যখন গুরুগৃহে যান তখন তাঁর বয়স ছিল ষোল-সতের। অধ্যয়নকালীন অবস্থায় তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার শ্রাদ্ধ-শান্তি করে আবার গুরুগৃহে ফিরে আসেন। ব্যাকরণপাঠ শেষ করে তিনি কাব্যে মনোযোগ দেন। হটীর ন্যায় তিনিও বেনারসে যান, অবশ্য স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য নয়—উচ্চশিক্ষার্থে তিনি বেনারসে অবস্থান করেন। পাঠ সমাপনান্তে স্বগৃহে ফিরে আসেন। এই সময় থেকেই তিনি 'হটু বিদ্যালঙ্কার' নামে পরিচিতা হন। তিন কেবল কাব্য-ব্যাকরণ পাঠেই ক্ষান্ত হননি। প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রেও পারঙ্গম ছিলেন। খ্যাতনামা কবিরা যারা তাঁর কাছে আসতেন পরামর্শ গ্রহণের জন্য।
রূপমঞ্জরী ছিলেন খুব ডাকাবুকো মেয়ে। পোশাকে-আসাকে ছিলেন প্রায় পুরুষের মত। পুরুষের মত তিনি উত্তরীয় ব্যবহার করতেন। মুণ্ডিত মস্তক। এমন কি ভট্টাচার্য পণ্ডিতদের মত তাঁর শিরে শোভা পেত একটি টিকি। চিরকুমারী শতায়ু (১৭৭৫-১৮৭৫) এই বিদ্যোৎসাহিনী নারী আজীবন জ্ঞানের সাধনা করে গেছেন। প্রেম

হটী বিদ্যালঙ্কার নিয়মিত পণ্ডিতসভায় তর্কাদিতে অংশগ্রহণ করতেন এবং পুরুষ পণ্ডিতদের ন্যায় পণ্ডিত-বিদায় আদায় করতেন। হটু বিদ্যালঙ্কার ছিলেন ডাকাবুকো মেয়ে। পোশাকে-আসাকে ছিলেন প্রায় পুরুষের মত। মুণ্ডিত মস্তকে শোভা পেত ভট্টাচার্য পণ্ডিতদের মত টিকি।

ম

মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা—যুগান্তরে রূপান্তর। তারণকুমার বিশ্বাস ৪৭, ৪৬
মহিষাসুর মর্দিনীর সন্ধানে। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সা ১৯৮৩
মহীউদ্দীন খান ডাগর ৩৩, ১৫
মহীয়সী। সুশীল রায় শা ১৯৫৯
মহীয়সী মহিলা ২৯, ৬, ৯ ডি ১৯৬১ : ৪৯১, স
মহীশূর বিজ্ঞান কংগ্রেসে নতুন পদক্ষেপ। সমরজিৎ কর ৪৯, ১৪
মহুয়া ঘোষ
নবজাগরণে ভিজয়ে ওমান ৪৮, ৩৬, ২৬ সে ১৯৮১ : ৩৪-৩৯, স
মমির পৃথিবী পিরামিড ৪৮, ১৮, ১৬ মে ১৯৮১ : ১৭-২০, স
মহুয়া মাদল। আশাপূর্ণা দেবী ২৮, ৩২
মহেনজোদাড়ো—প্রত্নতত্ত্ব ৪৫, ১৪
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৪৯, ২৩
মহেন্দ্রনাথ সেন
বিপদ ও বিস্ময় ৩২, ২৫, ২৪ এ ১৯৬৫ : ১১৭৩-১১৮৩, স
মহেন্দ্রলাল সরকার ৩১, ২৭ (সা)
মহেশচন্দ্র ঘোষ
গোতমের তপস্যা ২৩, ৩০, ২৬ মে ১৯৫৬ : ৩০৫-৩০৭, স
মহেশ্বরবাবু। বিমল মিত্র ৩৭, ২৮ (সা)
মা। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ২৯, ২১
মা। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্ ৪১, ৩৭
মা। যশোদাজীবন ভট্টাচার্য ২৬, ১২
মা। শান্তনু দাস ৪৪, ২৯
মা। সামসুল হক ৩৯, ৪৫
মা আমার। জীবিতেশ চক্রবর্তী ৪১, ৪২
মা আম্রফলেষু। সতীনাথ ভাদুড়ী শা ১৯৬৪
মা ও ভ্রমরকে। বিজিতকুমার ভট্টাচার্য ৩৭, ১৬
মা জননী। বিমল দত্ত ৩৪, ১৩
মা টেরেসা। সুদেব রায়চৌধুরী ৪৬, ৫১
মা ডাক। সুনীল সরকার ২১, ৪৯
মা তুই পাপীর স্পর্শ ধুয়ে ফ্যাল। সামসুল হক ৩৮, ২৪
মা তোমারই নিয়তি। রথীন্দ্র মজুমদার ৩৭, ৪০
মা নিষাদ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শা ১৯৬২
মা নিষাদ। রণজিৎ দাশ ৪৭, ৮
মা ভৈঃ। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ২৪, ২০
মা যশোদা গোষ্ঠে যাবো। অমিতাভ দাস ৪৯, ২০
মা শিশু খাদ্য। সমরজিৎ কর ৪৯, ১৩
মা সন্তানের জন্য। আরতি দাস ২৬, ৪৯
মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স। বিষ্ণু দে ২৭, ১৩
মাইকেল ও নীলদর্পণ। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ২২, ১৪
মাইকেল ও বিদ্যাসাগর। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ২৩, ১৩
মাইকেল মধুসূদন দত্ত
কবি ভিক্তর হ্যাগো ২২, ৩৭, ১৬ জু ১৯৫৫ : ৮৯৪, ক
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ২১, ৩৪ ; ২২, ১১ ; ২২, ২৩ ; ২২, ২৯ ; ২৩, ১৩ ; ২৪, ৩৬ ; ২৫, ১১ ; ২৬, ১০ ; ২৭, ১৩ ; ২৮, ১১ ; ৩০, ২৮ (সা) ; ৩১, ১৫ ; ৩১, ২২ ; ৪০, ৩৫ ; ৪২, ২৩ ; ৪৬, ২ ; ৪৯, ১৮
মাইকেল মধুসূদনের এক অল্প পরিজ্ঞাত বন্ধু। নারায়ণ দত্ত ৪০, ৩৫
মাইকেলের একখানি বিস্মৃত গ্রন্থ। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ২২, ২৩
মাইকেলের তারা ও রবীন্দ্রনাথের দেবযানী। মলয়া গঙ্গোপাধ্যায় ২৫, ৩
মাইথন। পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য ২৬, ৫২
মাইথন বাঁধ নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়। মণীন্দ্রনাথ দাস ২১, ৩৪
মাইনে যোগাই। হরপ্রসাদ মিত্র শা ১৯৭০
মাউদযাদুং *দেখুন* মাও সে তুং
মাউন্ট আবু *দেখুন* আবু পাহাড়
মাউন্ট এভারেস্ট *দেখুন* এভারেস্ট শৃঙ্গ
মাউন্ট এভারেস্ট *আরও দেখুন* হিমালয় অভিযান
মাউন্ট এভারেস্ট। অনুসন্ধানী ২১, ৩৩
মাউমাউ আন্দোলন, কেনিয়া ২১, ১৬
মাউমাউ প্রসঙ্গ। কল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২১, ১৬
মাও সে তুং (মাউদযাদুং)
কোয়ান লুন হিমগিরি *অনু* বিষ্ণু দে ২৫, ১৩, ২৫ জা ১৯৫৮ : ৮৮৮, ক
থালি পাহাড় বা নিউ পান পর্বত *অনু* বিষ্ণু দে ২৫, ১৩, ২৫ মা ১৯৫৮ : ৮৮৮, ক
মাও সে তুং (মাউদ যাদুং) ৩১, ২৬ ; ৪৭, ২৮
মাও সে তুংএর যুদ্ধতত্ত্ব। জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১, ২৬
মাওৎসু আণ্ডারগ্রাউণ্ড। অসীম রায় ৪৫, ৪৭
মাংসের দোকান। দিনেশ দাস শা ১৯৭২
মাকড়সার গৃহশিল্প। অশোক মুখোপাধ্যায় ২৮, ৪০
মাকারিওস (আর্চবিশপ) ৩১, ২০
মাকালজয়ী এক ফরাসী। গৌরকিশোর ঘোষ ২২, ৩৭
মাকে একটু খবর দিও। গৌরকিশোর ঘোষ ৩২, ৩৬
মাকে ভুলে গেলে। স্বদেশরঞ্জন দত্ত ৪৫, ১
মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার ২৩, ৮, ২৪ ডি ১৯৫৫ : ৬০৯-৬১০
মাখনলাল সেন ৩২, ২৯
মাগো তুই জ্বালায়ে রাখিস। জসীম উদ্দীন ৩৬, ১৩
মাচাদো, আনতোনিও
একটি বসন্তের ভোর আমায় ডেকে বললো *অনু* সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩, ৩০, ২৮ মে ১৯৬৬ : ৪৬৪, ক
কাল রাতে ঘুমের ভিতরে *অনু* সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩, ৩০, ২৮ মে ১৯৬৬ : ৪৬৪, ক
মাচি ও পাগলা হাতি। নিতাই ধর ৫০, ৩০
মাছ। চণ্ডী মণ্ডল ৪৭, ৩২
মাছ ও ম্যালেরিয়া। হিমাংশুলাল সরকার ২১, ৩৯
মাছ খাওয়ার কথা। সুরেশচন্দ্র সাহা ২৬, ৩১
মাছটা দেখো পাথর হল। অরুণ বাগচী শা ১৯৮১
মাছধরা। প্রভাত দেব সরকার ২৬, ১৭
মাছ ধরা। বুদ্ধদেব বসু ৩৪, ১৭
মাছ নিয়ে খেলা। সমীর মুখোপাধ্যায় ৪৪, ৩৭
মাছরাঙার মত। কল্পনা সেন ৪৬, ২৬
মাছ রাঁকা। নলিনী বেরা ৫০, ২৩
মাছি। উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৪১, ৪২
মাছি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী শা ১৯৬৫
মাছি। বিমল কর শা ১৯৭২
মাছি মাছি। মানসী দাশগুপ্ত ৪৮, ২৭
মাছের দাম। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ২২, ২৮
মাঝখান থেকে। শেখর বসু ৪৫, ২২
মাঝ গঙ্গায় ইলশে নাও। সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯, ৪৯
মাঝগাঁও স্টেশনে। অরুণকুমার সরকার শা ১৯৭০
মাঝ দরিয়া। নরেন্দ্রনাথ মিত্র ৩৩, ২
মাঝ দুপুরের জ্যোৎস্না। স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯, ৫২
মাঝ রজনীর অবিরল জোছনায়, সুনীল বসু ৩৬, ২৫
মাঝরাতে। শান্তনু দাস ৪৭, ১
মাঝরাতে ভোর। দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায় ৪৪, ৫০
মাঝি। প্রফুল্ল রায় ২১, ৩২
মাঝ রাত। মনীশ ঘটক ২৯, ২৯
মাঝে নদী। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৪৭, ৩৩
মাঝে মাঝে। কল্যাণী ঘোষ ৪৮, ৩৭
মাঝে মাঝে। জীবনানন্দ দাশ ২৭, ২৮
মাঝের লোক। অরুণ সরকার শা ১৯৫৫
মাটি আর মানুষের কাছাকাছি। সূত্রধার বি ১৯৭১
মাটিতে চালানো তীর। জয় গোস্বামী ৪৯, ৫২
মাটির পুতুল। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ২৭, ১০
মাটির প্রেম। রাধামোহন সামন্ত ২৭, ২৫
মাটির মত হে হৃদয়। স্নেহাকর ভট্টাচার্য ২২, ৩১
মাটির হৃদয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২১, ১১
মাঠে। বিনয় মজুমদার ৪৮, ৮
মাঠের বড়বাবু নিঃশব্দে চলে গেলেন। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪৩, ১০
মাঠের সন্ধ্যা। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২৫, ৮
মাড়ানো পথ। বিকাশ বসু ৩৩, ৩২
মাণিক্য থেকে অঙ্গার। দেবাশিস দাশগুপ্ত ৫০, ২৩
মাৎস্যস্রোতে। প্রতিভা বসু শা ১৯৬১
মাৎস্য ন্যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ২৯, ৩
মাৎস্য ন্যায়। মিহির মুখোপাধ্যায় ৩৩, ১৪
মাতঙ্ক। জ্যোৎস্নাময় ঘোষ ৪৯, ২০
মাতা সাক্ষাৎ ক্ষিতেস্তনুঃ। সঞ্জয় ভট্টাচার্য শা ১৯৬৪
মাতাল। নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ২৯, ২৮
মাতাল। সুশীল রায় ৩২, ৩৯
মাতিস, অঁরি ২২, ৪ ; ৩৭, ৩২
মাতৃকা। সমরেশ মজুমদার ৪৬, ৩১
মাতৃগর্ভে নেমে যায় ঘুণ। পূর্ণেন্দু পত্রী ৪৮, ১২
মাতৃত্ব। কণা বসুমিশ্র ৪৩, ১৬
মাতৃত্ব। মিহির মুখোপাধ্যায় ৫০, ২৫
মাতৃত্বের জন্যে। সমরজিৎ কর ৪৭, ৮
মাতৃপূজা শা ১৯৫৪ : ৫ ; শা ১৯৫৫ ; ৫ ; শা ১৯৫৬ : ৯ ; শা ১৯৫৭ : ৯ ; শা ১৯৫৮ : ৯ , শা ১৯৬০ : ৯ ; শা ১৯৬১ : ৩ ; শা ১৯৬২ : ১৭ ; শা ১৯৬৩ : ১৭ ; শা ১৯৬৪ : ১৭ ; শা ১৯৬৫ : ১৪ ; শা ১৯৬৬ : ১৩ ; শা ১৯৬৭ : ৯ ; শা ১৯৭০ ; ১৭ ; শা ১৯৭১ : ১১ ; শা ১৯৭২ : ১ ; শা ১৯৭৫ : ১৩ ; শা ১৯৭৬ : ১১ ; শা ১৯৭৭ : ১১ ; শা ১৯৭৮ : ১১ ; শা ১৯৭৯ : ১০ ; শা ১৯৮১ : ১৭
মাতৃপূজায় ভাবের বিকাশ। বঙ্কিমচন্দ্র সেন শা ১৯৬৭
মাতৃভাষা ও জীবিকা। অমল মুখোপাধ্যায় ২৬, ৪৬
মাতৃভাষা ও সাহিত্য। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪৩, ৪৭
মাতৃভাষার মাধ্যমে গ্রন্থপ্রকাশ, বাংলাদেশে ৩৮, ২৪
মাতৃভাষার মাধ্যমে গ্রন্থপ্রকাশ—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ৩১, ২৭ ; ৩৩, ২৩
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ২৪, ৯ ; ২৪, ৪৯ ; ২৬, ৪৬ ; ২৯, ২০ ; ৩৪, ৩৯ ; ৩৫, ১৭ ; ৩৬, ৩২ ; ৪০, ২২ ; ৪৩, ৪৭ ; ৪৯, ৪৯
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, প্রাথমিক স্তরে—পশ্চিমবঙ্গ ৪৭, ৪৯
মাতৃমন্ত্রের সাধনা। বঙ্কিমচন্দ্র সেন শা ১৯৬৩
মাতৃয়ার্কি। নবনীতা দেবসেন সা ১৯৮২
মাতৃরূপা মাতা শ্রীশ্রীকালী। সরলাবালা সরকার ২৪,

১
মাতৃহন্তা। অতুলানন্দ দাশগুপ্ত ২৪, ৪৮
মাত্র এই এক জীবনে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৪৯, ৪
মাত্র একবার। শান্তিকুমার ঘোষ শা ১৯৬৭
মাথা খারাপ মেয়ে। আবু কায়সার ৪০, ৪৪
মাথুর। অরুণকুমার সরকার শা ১৯৬১
মাথুর। নবনীতা দেবসেন ২৬, ১৩
মাথুর। রাজলক্ষ্মী দেবী শা ১৯৮০
মাদক দ্রব্য ৫০, ১২
মাদমোয়াজেল গতিয়ে। প্রতিভা বসু শা ১৯৬২
মাদলের শব্দ। বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ৪৩, ১১
মাদাম গ্র্যাণ্ড ৩১, ৩
মাদাম তুসোর মোমের ঘর। সরিৎ দাস ৫০, ৩৫
মাদাম নু *দেখুন* ত্রাণ লে জুয়ান ৩০, ৪৪
মাদার টেরেসা ৪৩, ৫; ৪৬, ৫১; ৪৮, ২৪
মাদার তেরেসার বাল্য ও কৈশোর। খগেন দে সরকার ৪৮, ২৪
মাদ্রাজ থেকে মহাবলীপুরম। সুরেশচন্দ্র সাহা ২৯, ৩১
মাদ্রাজের বিজ্ঞান কংগ্রেস। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫, ১৪
মাধবী। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮, ৮
মাধবী মুখোপাধ্যায়
পেরিয়ে এলেম শা ১৯৬৬ : ৩১৮-৩২০, স
মাধবী মুখোপাধ্যায় (চক্রবর্তী) আত্মকথা শা ১৯৬৬
মাধবীর জন্য। বিনোদ বেরা ৪৮, ৩১
মাধবীর জন্যে। পূর্ণেন্দু পত্রী ৩৩, ৪৫
মাধবেন্দ্রনাথ পাল
আয়ুর্বেদীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সারকথা ৩৪, ৩৮, ২২ জু ১৯৬৭ : ১৩২৫-১৩২৮
আয়ুর্বেদের ধ্যান ও সংস্কৃতি ৩৫, ৬, ৯ ডি ১৯৬৭ : ৬০৩-৬০৬
মাধুরীলতা দেবী শা ১৯৮০
মাধ্যমিক পরীক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ ৩১, ৩৯
মাধ্যমিক পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্র রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ। আদিত্য ওহদেদার ৪৯, ৩৯
মাধ্যমিক বিজ্ঞানের বই-এ অসংলগ্নতা এবং প্রচুর ভুল। সমরজিৎ কর ৪২, ১৯
মাধ্যমিক শিক্ষায় নতুন ব্যবস্থা ৪০, ২৯, ১৯ মে ১৯৭৩ : ২৩৩, সম্পা
মান, টমাস ২২, ৪৩; ২৪, ৩৮; ৪২, ৪১
মানচিত্র। সুধেন্দু মল্লিক ৩৬, ২
মানচিত্রের রাস্তায়। নীরদ রায় ৪৯, ৩
মানডে ক্লাব, কলিকাতা ২৪, ৫১
মানভূ—বিবরণ ও ভ্রমণ ২৩, ২৫—২৩, ২৯
মানব কল্যাণে রসায়নের ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ। দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সা ১৯৮১
মানব খরায়। সামসুল হক ৪০, ৩৮
মানব জমিন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৪৬, ৩১—৪৮, ১৪
মানবতীর্থ। গৌরকিশোর ঘোষ ২১, ১২
মানবদেহের কলকব্জা—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কৃত্রিম ২৮, ২২; ৪৫, ২৮; ৪৯, ৬
মানবদেহের কলকব্জা বদল। অতুলানন্দ দাশগুপ্ত ২৮, ২৩
মানব ঠাকুর
নবনীদাস বাউল ৩১, ৫০, ২৪ অ ১৯৬৪ : ১০৪৭-১০৪৯, স
মানব মিত্র
দূরের জানালা ৪৯, ৩৬, ১০ জু ১৯৮২ —৫১, ২৬-৩৮, ২১ জু ১৯৮৪
(অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে)
মানব সভ্যতা ২৬, ৮; ৪৪, ২৮
মানবসভ্যতা ও বিজ্ঞান। প্রিয়দারঞ্জন রায় ৪৪, ২৮
মানব সম্পদ ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। জগদিন্দ্র মণ্ডল সা ১৯৮১
মানব সাগর সঙ্গমে। নবকুমার বসু ৪৯, ১৫
মানবতা ও মানবেতর প্রাণী ৪২, ২৬, ২৬এ ১৯৭৫ : ৯৩৫, সম্পা
মানবতাবাদ ৪৫, ১৩
মানবিক অধিকার ৪৬, ৭
মানবিক অধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা। অমল চট্টোপাধ্যায়, অনু ৪৬, ৭
মানবিকী। প্রদ্যুম্ন মিত্র ৪৯, ২৯
মানবীয় কল্যাণে মনোবিজ্ঞান ৪৭, ১০, ৫ জা ১৯৮০ : ৯, সম্পা
মানবেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও নিতাইচন্দ্র দত্ত
গ্রামের গরীব কারা ৪৬, ৩৬, ৭ জু ১৯৭৯ : ৪৫-৪৭, স
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
এডোয়ার্ড লিয়র ৩০, ৩৩, ১৫ জুন ১৯৬৩ : ৭০৫-৭১৫, স
চীৎকার ২৯, ৪৪, ১ সে ১৯৬২ : ৪১৬, ক
চৈত্রের হাওয়া ২৯, ৪০, ৪ আ ১৯৬২ : ৭৭, ক
ডাবলিনের ওডিসিয়ুস ২৯, ২২, ৩১ মা ১৯৬২ : ৮৩১-৮৩৮ স
তাই শুধু অন্ধকার ২৮, ১৭, ২৫ ফে ১৯৬১ : ২৫০, ক
দূরযান ৪৬, ৫১, ২৭ অ ১৯৭৯ : ২১, ক
নিশির ডাক ২৯, ৫, ২ ডি ১৯৬১ : ৪১০, ক
পরির দেশের বন্ধ দুয়ার ২৯, ২৭ (সা), ৫ মে ১৯৬২ : ১৮৩-১৯০
বাঁচাকাহিনী ৪২, ২৬, ২৬এ ১৯৭৫ : ৯৪০, ক; ৪৩, ৩, ১৫ ন ১৯৭৫ : ১৬৮, ক
বিচ্ছেদ ২৮, ৪০, ৫ আ ১৯৬১ : ১০, ক; ২৮, ৪৫, ৯ সে ১৯৬১ : ৪৯৬, ক; ৩০, ২২, ৩০ মা ১৯৬৩ : ৮০০, ক
যে পালায় ৩০, ৩৯, ২৭ জু ১৯৬৩ : ১২৬৯-১২৭৬, গ
শুধু কিছু হাওয়া আর ২৮, ২৩, ৮এ ১৯৬১ : ৭৪৪, ক
মানবেন্দ্রনাথ রায় ২২, ১৩; ২৩, ১৩
মানবেন্দ্রনাথ রায়। সরলাবালা সরকার ২২, ১৩
মানভূমী চিত্রকলা। তপন কর ৪৯, ২১
মান রাখছে মেয়েরা। চিত্ত বিশ্বাস বি ১৯৭৮
মানস গুহ
পুরুষবৃত্ত ৪২, ২১, ২২ মা ১৯৭৫ : ৫৪৫-৫৫৩, গ
মানস দাশগুপ্ত
গ্রাম ও বেকার সমস্যা ৪৪, ৩২, ৪ জুন ১৯৭৭ : ১১-১৫
চা-শিল্পে বাঙালীর উত্থান ও পতন ৪৫, ১২, ২১ জা ১৯৭৮ : ৪১-৪৪
সমস্যা-সঙ্কুল সিকিম ৪৪, ৪১, ৬ আ ১৯৭৭ : ৯-১৬, স
মানস ভট্টাচার্য ৪৪, ৪৫
মানস ভ্রমণ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৪৪, ২৮—৪৪, ২৯
মানস রায়চৌধুরী
অধম ৪৭, ৪২, ১৬ আ ১৯৮০ : ১৪, ক
অনিদ্র গোলাপ ২৯, ২০, ১৭ মা ১৯৬২ : ৫৯৮, ক
অনুলিখন ৩২, ১৮, ৬ মা ১৯৬৫ : ৪২৮, ক
অবেলা ৪৬, ৬, ৯ডি ১৯৭৮ : ৩৯, ক
অসুখ ৪৪, ৩৫, ২৫ জুন ১৯৭৭ : ১৩, ক
আচ্ছন্ন শূন্যতা ২৬, ২৫, ১৮এ ১৯৫৯ : ৮২২, ক
উৎসর্গ ৫০, ১০, ৮ জা ১৯৮৩ : ১৮, ক
এইভাবে যাত্রা শুরু ৩১, ২২, ৪এ ১৯৬৪ : ৮২০, ক
কল্প কল্পনা ৩৫, ৩৮, ২০ জু ১৯৬৮ : ১২৬৬, ক
কার্নিশ পার হলে ২৭, ৪৩, ২৭ আ ১৯৬০ : ২৬৫-২৭৩, গ
কুয়াশা ৪৫, ১৬, ১৮ ফে ১৯৭৮ : ৩৯, ক
ক্ষুধার আমিষে ৪৪, ৯, ২৫ডি ১৯৭৬ : ৬০৮, ক
গার্হস্থ্য ৩৩, ৩, ২০ ন ১৯৬৫ : ২২৭, ক
ছন্দোহীন ৫০, ২৮, ১৪ মে ১৯৮৩ : ৩৩, ক
তার স্বপ্ন ৪৩, ২৭, ১মে ১৯৭৬ : ১৪, ক
তোমার মুখের দিকে ৩৪, ১৫, ১১ফে ১৯৬৭ : ১২৪, ক
দিনযাপন শা ১৯৬৩ : ৬৯, ক
দেশান্তর ৪৯, ৪০, ৭ আ ১৯৮২ : ১৮, ক
নিসর্গ আমার চোখে ৩৭, ৪১, ৮ আ ১৯৭০ : ১২৬, ক
পুনর্মিলন শা ১৯৬২ : ৭৮, ক
বিষ ৩৯, ৪৫, ৯ সে ১৯৭২ : ৫৪৬, ক
বুকের মাঝখানে ৪৯, ৯, ২ জা ১৯৮২ : ২৩, ক
বীক্ষণ ৩২, ২৮, ১৫ মে ১৯৬৫ : ২১৬, ক
ভয় ৪৬, ২১, ২৪ মা ১৯৭৯ : ৩৯, ক
ভাঙাচোরা কবিতা ৪৫, ৩, ১৯ ন ১৯৭৭ : ৩৯, ক
মনে মনে ২৬, ১১, ১০ জা ১৯৫৯ : ৭৪৮, ক
মিথ্যা ৪৪, ১৩, ১২ মা ১৯৭৭ : ৮৭৪, ক
শরতের পরে ৪৫, ১৬, ১৮ ফে ১৯৭৮ : ৩৯, ক
শিল্পী ২৮, ৩৯, ২৯ জু ১৯৬১ : ১১১৪, ক
সন্নিধান ৩৪, ১৩, ২৮ জা ১৯৬৭ : ১২৭২, ক
সাঙ্কেতিক শা ১৯৬০ : ৬৪, ক
স্থায়িত্ব ৩৮, ৪৭, ২৫ সে ১৯৭১ : ৮২৯, ক
স্মৃতি থেকে ২৮, ৩০, ২৭ মে ১৯৬১ : ৩৭৭, ক
হৃৎপিণ্ড ৪৫, ৪০, ৫ আ ১৯৭৮ : ৩৯, ক
মানসম্মান। শংকর শা ১৯৮১
মানসাঙ্ক। বিমল কর ২৬, ২৬
মানসিক প্রতিবন্ধী ৪৮, ৩৩
মানসিক ব্যাধি ৫০, ২৯
মানসিক ব্যাধি কি মহামারী আনছে। সমরজিৎ কর ৫০, ২৯
মানসিক হাসপাতাল। সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ২১, ১৬
মানসী দাশগুপ্ত
ওয়াশিংটনের চিঠি ২৯, ১৫, ১০ ফে ১৯৬২—২৯, ২৫, ২১এ ১৯৬২, স
দক্ষিণ পূর্বাচলের পথে ৪৮, ১৪, ১১ এ ১৯৮১ : ৩৯-৪৩, স
নিরুদ্ধ ৪৭, ১৬, ১৬ ফে ১৯৮০ : ৫৯-৬৪, গ
পারস্পরিক ৪১, ৩৮, ২০ জু ১৯৭৪ : ৮৯৭-৯০৫, গ
ভয় ৪০, ৩৮, ২১ জু ১৯৭৩ : ১২৫৯-১২৬২, গ
ময়না ৪২, ২২, ২৯ মা ১৯৭৫ : ৬২৩-৬৩১, গ
মাছি মাছি ৪৮, ২৭, ২৫ জু ১৯৮১ : ১৭-২৪, গ
ভারতেন্দু-মল্লিকা ৪১, ৪৪, ৩১ আ ১৯৭৪ : ৩৬৭-৩৭০, স
মানসী মুখোপাধ্যায়
ভারতেন্দু—মল্লিকা ৪১, ৪৪, ৩১ আ ১৯৭৪ : ৩৬৭-৩৭০, স
মানসী রায়
পৃথিবীর চুম্বকত্ব সম্পর্কে দু'চার কথা ৩৯, ২৩ জু ১৯৭৭ : ৩৪, স
মানসেন্দু সমাজপতি
ফিরে এসো, জন্মেজয় ৪৯, ২০, ২০ মা ১৯৮২ : ৪১, ক
মানা গুম্বা। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৪০, ১৫
মানাল শাহ্ আলকাদেরী, সৈয়দ
গত তিরিশ বছরের উর্দু সাহিত্য অনু উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সা ১৯৭৯ : ১১৩-১১৪, স ক্রম

পালিশের জেল্লা আর কেরামতি কদিন থাকে? কিন্তু টাচ উড-এর সুরক্ষা আপনার সখের কাঠের ফার্নিচার বহুদিন ছিমছাম সুন্দর রাখে!

এবার এলো টাচ উড পলিইউরেথেন ক্লিয়ার উড ফিনিশ।
এটি কাঠের ফার্নিচারের ওপর স্বচ্ছ কঠিন আস্তরণ ফেলে।
এ আস্তরণ পালিশের চেয়ে হাজার গুণ ভালো ভাবে
আঁচড় বা ময়লা ছোপ-পড়া প্রতিরোধ করে।

পালিশ যথেষ্ট মজবুত ঘাতসহ নয়

পালিশ করার পর কাঠের ফার্নিচার ঝকঝকে সুন্দর দেখায় বটে কিন্তু চা-দুধ বা অন্য কোন তরল পদার্থ চলকে পড়লে এমন ময়লা ছোপ ধরে যে আবার পালিশ-না করা পর্যন্ত সেগুলো চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যাপারটা হচ্ছে, পালিশ যে-আস্তরণ ফেলে সেটা যেমন পাতলা তেমনি পলকা, তাই ময়লা ছোপ বা আঁচড়ের দাগ পড়া ঠেকাতে পারে না।

ফলে দু'এক মাসেই আপনার সখের ফার্নিচার ময়লা ছোপ আর আঁচড়ের দাগ পড়ে খুব বিশ্রী দেখায়।

টাচ উড : পলিইউরেথেনের প্রচণ্ড শক্তি

টাচ উড-এ আছে প্রচণ্ড প্লাস্টিক-পলিইউরেথেন, এটি যে স্বচ্ছ পুরু আস্তরণ ফেলে তা কাঠের গায়ে দারুণ ভাবে সেঁটে থাকে।

এই আস্তরণ গরম বা ঠাণ্ডা চলকে-পড়া তরল পদার্থের ছোপ এবং আঁচড়-পড়া দীর্ঘকাল প্রতিরোধ করতে পারে।

শুধু তাই নয় কাঠের নিজস্ব স্বাভাবিক জৌলুষ ধরে রাখে বছরের পর বছর। অথচ পালিশ করালে কদিন আর থাকত জেল্লা, পালিশ চটে-ফেটে দুদিনেই ম্যাড়মেড়ে কুশ্রী দেখাত।

মনের সুখে টাচ উড লাগান শুখোতে একটু সময় নেয় বটে কিন্তু সুরক্ষাও যে দেয় অনেক বেশি!

রঙের মতই টাচ উড একাধিক কোট লাগাতে পারেন — আর এ কাজ যে-কোন রঙের মিস্ত্রির কাছে কিছুই না। একবার পালিশ করার বদলে টাচ উড লাগিয়ে দেখুন, আপনার ফার্নিচার বছরের পর বছর কী দারুণ সুন্দর দেখায় — ঝকঝকে একেবারে নতুনের মত।

টাচ উড পুরু, স্বচ্ছ, সুরক্ষাকারী আস্তরণ ফেলে যা পালিশ পারে না। তাই এটা শুখোতে একটু সময় নেয়, কিন্তু সেটা কোনমতেই দরজা-জানালা রঙ করার চেয়ে বেশি নয়।

টাচ উড সুরক্ষা ফার্নিচারের প্রতিটি খাঁজ-খোঁজ আসল ফাঁক-ফোকরে, আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।

টাচ উড এর গোড়ার খরচটা পালিশের চেয়ে সামান্য বেশি পড়ে বটে, কিন্তু পালিশের চেয়ে ঢের বেশি কাল ধরে সর্বাঙ্গীণ সুরক্ষা দেয়। যেহেতু আপনার সখের কাঠের ফার্নিচারগুলো ভাল রাখে বলে আপনার অনেক বেশি খরচ পুষিয়ে যায়।

গ্লসি অথবা ম্যাট ফিনিশ

পালিশের বেলায় আপনার পছন্দের কোন সুযোগ নেই কিন্তু টাচ উড পাবেন দু'রকম — গ্লসি অথবা ম্যাট ফিনিশ, আপনার যেমন পছন্দ। আর অনন্য টাচ উড স্টেনার-এর ছোঁয়ায় সাধারণ কাঠও দেখাবে বনেদী দামী কাঠের মত।

সহজে পাওয়া যায়

টাচ উড যে-কোন এশিয়ান পেন্টস ডীলারের কাছে পাবেন।

একবার টাচ উড লাগালেই বুঝবেন আপনার সখের কাঠের ফার্নিচার কী সুন্দর ঝলমলে দেখায়, আপনার ঘর আলো করে রাখে।

TOUCH WOOD

মনের সুখে লাগান, কাঠে নতুন প্রাণ জাগান!

এশিয়ান পেন্টস্

১৭ অক্টোবর ১৯৮৭ পাঁচ টাকা

জরায়ু ক্যানসার এখন রোধ করা যায়! কিভাবে-পড়ুন:

যাবতীয় ক্যানসারের মধ্যে জরায়ু-র মুখে (সার্ভিক্স) ক্যানসার-পুরোপুরি রোধ করার সম্ভাবনাটা অতি উজ্জ্বল। এক দ্রুত অথচ সহজ প্যাপ্ পরীক্ষার দ্বারাই ধরা পড়ে-'ক্যানসারের দিকে ঝোঁক'···আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্যানসারের কবলে পড়ার বহু বছর আগেই ! অতএব, অনেক আগে থেকেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে ক্যানসার প্রতিরোধ করা যায়।

প্যাপ্ পরীক্ষা সহজও যেমন-যন্ত্রনারহিতও তেমন ! শুধু তুলো দিয়ে চটপট্ ভেতরটি মুছে দেওয়া, ব্যস্ !

সময়মত রোধ না করলে পরে কিন্তু নানান বিপজ্জনক নতুন লক্ষণ দেখা দিতে পারে-যেমন অনিয়মিত রক্তস্রাব অথবা যোনিদ্বার থেকে জলীয় পদার্থ বেরোনো, মাসিকের সময় বেশী রক্তস্রাব আর রজোনিবৃত্তি (মেনোপজ্)-র পরেও রক্তস্রাব।

এসব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে অতি সহজ পথটি ধরুন না ! বছরে অন্ততঃ একটি বার প্যাপ্ পরীক্ষা করান না ! কোনো যোগ্য স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে অথবা ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটির যেকোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে (ডিটেকশন্ সেণ্টারে) চলে আসুন !

এখন, ক্যানসার-বীমা !

ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটি প্রবর্তন করলো ভারতের একমাত্র বীমা পলিসি, যা ক্যানসার রোগ ধরা বা তার চিকিৎসা বাবদ যাবতীয় খরচ [illegible] কিছু টাকা দিন আর আপনি ও আপনার স্ত্রী/স্বামী দুজনেই ৪০,০০০ টাকার আওতায় থাকুন ! আরো জিগ্যাসা থাকলে ফোন করুন বা লিখুন।

অন্যান্য কেন্দ্রে দেখা করার জন্য যোগাযোগ করুন:

- পাতিয়ালা মেডিক্যাল সেন্টার, ৪৮, বাবর রোড, বেঙ্গলি মার্কেট, নিউ দিল্লী-১১০ ০০১, ফোন: ৩৮১৩১৩
- ৯৫/এ শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০, ফোন: ৪০৩৮১২
- ১২৭, [illegible] স্ট্রীট, মাদ্রাজ-৬০০ ০০১, ফোন: ৩১৪৪৪

ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটি

ন্যাশনাল হেডকোয়ার্টার্স: লেডি রতন টাটা মেডিক্যাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, এম. কার্ভে রোড, কুপারেজ, বম্বে-৪০০ ০২১। ফোন: ২০২১৪১৭

তাড়াতাড়ি ধরা মানে তাড়াতাড়ি সারা।

daCunha/ICS/13487 BEN R

৪৯

অষ্টম-দশম শতকে স্লাভদেশীয়দের যুদ্ধবন্দী হিসাবে জার্মানিতে নিয়ে গিয়ে করা হোত ক্রীতদাস। এই স্লাভ থেকেই নাকি স্লেভ শব্দের উৎপত্তি। শব্দটির উৎপত্তি যেখান থেকেই, যখন থেকেই হোক, এই অমানবিক প্রথাটি কিন্তু আমাদের মানবসভ্যতারই সমবয়সী, সহযাত্রী। বেদ-এ দাস-এর উল্লেখ পাই। ক্রীতদাসের সন্ধান মেলে মিশরে খ্রিস্টপূর্ব আড়াইসহস্র অব্দে, ব্যবিলনে একবিংশতি খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এবং আজ এই একবিংশতি খ্রিস্টাব্দেও আমরা প্রবেশ করতে চলেছি এই বর্বর সামাজিক অভিশাপটিকে সঙ্গী করেই। আজকের ক্রীতদাসদের জীবন সবসময়

আক্ষরিক অর্থে শিকলবাঁধা নয়, হাতে হয়তো উল্কি করে খোদাই করা থাকে না প্রভুর নাম। কিন্তু আজ তারা বন্দী নিপীড়নের দিশেহারা অন্ধকারে, ঋণের রজ্জুতে। তাদের ললাটে আজ অনন্ত দুঃখের অদৃশ্য উল্কি। আজ একদিকে স্বাধীনতার শপথ, মানবাধিকারের ঘোষণা, আর একদিকে উদ্ধত প্রভুত্বের প্রাচীর রচনা, দরিদ্র মানুষের দাসত্বের দুর্বিষহ যন্ত্রণা। এবারকার প্রচ্ছদ নিবন্ধাবলীতে সেই বর্বরতার যবনিকা উত্তোলন। সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত, ব্যবিলন থেকে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সাইবেরিয়া, বর্তমানের ব্রাজিলের স্বর্ণখনি অথবা আমাদের কয়লাখনি থেকে তুলে আনা সব মর্মস্পর্শী কাহিনী।

৩৫

এই শীতেই আবার বিশ্বের দুই শিবিরের দুই প্রধান শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হতে পারেন। শোনা যাচ্ছে এবার মিখাইল গোর্বাচেভই যাচ্ছেন রোনাল্ড রেগনের কাছে। পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর হেলমুট কোলের কোনও সিদ্ধান্তই কি দুই মহাবলীকে অস্ত্র নামিয়ে রাখতে সাহায্য করবে?

১৫

কালীমূর্তির বর্তমান রূপটি কি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের কাল থেকে প্রচলিত? না, এরও তিনশ বছর আগেই পেয়েছি শক্তিময়ীর এই প্রতিমা। যুগে যুগে কালীর বিবর্তন নিয়ে এই নিবন্ধ।

২৪

মহারাষ্ট্রের পাহাড়ি শহর পুনে। এখানে মনোরম পরিবেশে রয়েছে বিখ্যাত পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউট। বম্বে ফিল্মের গ্ল্যামারের পরিপূরক হয়ে [illegible] এই সংস্থা গত ছাব্বিশ-সাতাশ বছর ধরে বহু উজ্জ্বল তারায় খচিত করেছে ভারতের চলচ্চিত্রাকাশ। ভিতরকার এই সব কার্যকলাপের তথ্যচিত্র এই রচনা আমাদের যেন অভিনয়ের সাজঘরে নিয়ে যায়।

৭৭

একদা সব রাস্তা রোমে পৌঁছলেও আজ শত দিক-দেশে শতপথ ধাবমান। রোমের অনেকটাই আজ ইতিহাস : তবু তা জীবন্ত ইতিহাস। বিমানবন্দর থেকে বেরোতেই মাইকেল এঞ্জেলোর মূর্তি দিয়ে সে বিস্ময়লোকের উন্মোচন শুরু। তারপরে একে একে র‍্যাফেল, প্যানথিয়ান মন্দির, কলোসিয়াম, টিভোলি গার্ডেনস এবং ভেটিকান আর জলপুরী ভেনিস—এক আশ্চর্যলোকে ভ্রমণকথা।

মহরমের তথ্য পর্যালোচনা

(দেশ ; ৫-ই সেপ্টেম্বর, ৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত, হোসেনুর রহমান, আবুল বাশার, বাহারউদ্দিন প্রমুখ লেখকদের প্রবন্ধাবলীর সমালোচনা)।

মানব-ইতিহাসের সূচনা থেকে অদ্যাবধি প্রচলিত ঘটনা-প্রবাহের আলোকে ইহা সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত যে কতিপয় মর্মস্পর্শী 'অতি সত্য ঘটনা' এমনও আছে, যা যুগে যুগে সমগ্র মানব-হৃদয়কে গভীর এবং তীব্রভাবে আকর্ষণ করে ; বিশেষত ঘটনাটি যদি দ্বীন (ধর্ম) সংক্রান্ত হয় ; কেন না ধর্মের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক দেহের সঙ্গে মস্তকের ন্যায়। কোন ঘটনা বা ঘটনাবলী কোরান, হাদিস-কর্তৃক সমর্থিত হলে বিশ্বাসীদের নিকট যে কোন সমস্যা সমাধানের মানদণ্ড-স্বরূপ বিবেচ্য ও গৃহীত হয়। কিন্তু, সূচনা থেকে লক্ষ রাখতে হবে যে, ঘটনা বা ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত দুষ্ট-পক্ষ বা তৎ-পক্ষে উত্তরসূরীগণ, সংঘটিত অপকর্ম হতে পূর্বসূরীদের মর্যাদা রক্ষাকল্পে অতি সুকৌশলে ঘটনাটিতে নানা মিথ্যা, কল্পনা, লোকগাথা, রূপক-কাহিনী, স্থানীয় বিশ্বাস-বোধ-পুষ্ট কল্প-কাহিনী, প্রভৃতির সহায়তায় ঘটনাটিকে গুরুত্ব ও মূল্যহীন প্রমাণে তৎপর আছে কিনা !

৬১ হিঃ সনের পবিত্র মহররম মাসে কারবালা মরুপ্রান্তরের হৃদয়-বিদারক ও মর্মস্পর্শী ঐতিহাসিক ঘটনাটিও কালের অমোঘ আচরণ থেকে মুক্ত নয়। তাই, দেখা যায়, প্রতি বৎসর মহরম মাসে মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী আচরণের প্রতিফলন। একপক্ষে, নবী (দঃ) প্রবর্তিত একটি মহোত্তম আদর্শ রক্ষার্থে, ত্যাগ, ধৈর্য, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, কৃচ্ছ্রতা, সহনশীলতা, দৃঢ়তা প্রভৃতি সকল মানবীয় গুণের মূর্ত প্রতীক মহানবী (দঃ)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসায়েন (আঃ) কর্তৃক অনুসৃত কারবালার ঘটনাপুঞ্জি যার প্রতিফলন প্রতি বৎসর একই নিয়ম ও পদ্ধতিতে সর্বত্র শিয়াদের আচরিত শোকানুষ্ঠান পালনের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তাই মহরম কোন অর্থেই শিয়াদের নিকট 'উৎসব' নয় বরং শোকানুষ্ঠান। শিয়াদের ধর্মীয়-জীবনে এর স্থান একটি ফুলের সঙ্গে তার সৌরভের তুল্য।

অপরপক্ষে, ইসলামের চিরশত্রু আবু সুফিয়ানের পুত্র শঠ, প্রবঞ্চক, ক্ষমতা-লোভী, নবী (দঃ)-এর জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র ইমাম হাসান (আর)-এর বধকারী, শরিয়ত-বিকৃতিকারী মোয়াবিয়ার তনয়, যে, মদিনা লুণ্ঠনকারী মসজিদে নববী-সহ নারীদের বে-ইজ্জতকারী, কাবা অসম্মানকারী, ইসলাম তথা মানবতার জবাহকারী নরাধম এজিদের বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা প্রভৃতি পশুসুলভ আচরণের ধারক ও বাহক তৎ-উত্তরসূরীগণ-কর্তৃক বিভ্রান্তিকর প্রশিক্ষণের প্রতিফলন যা, প্রতি বৎসর যথেচ্ছা লাঠি, ছুরি, তলোয়ার, বর্শা, ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্র-সহ মহড়া প্রদর্শনের মাধ্যমে 'মহরম উৎসব' প্রদর্শিত ও অনুষ্ঠিত হয়।

দীর্ঘকাল পূর্বের এ-হেন ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের সন্ধান, ঘটনার কারণ নির্ধারণ, তার গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও ফলাফলের মূল্যায়ন করা সুধী, সমাজ-দরদী বুদ্ধি জীবীগণের পরম কর্তব্য সন্দেহ নাই। তবে, এ কঠিন দায়িত্ব পালনে বিবাদ-সিন্ধুর ন্যায় যাঁনি গুরুত্বহীন উপন্যাস, বটতলায় প্রাপ্তব্য পাঁজি, পুঁথি, অজ্ঞ মূর্খদের কল্পিত লোকগাথা বা রূপকথা যাঁদের অভিজ্ঞতা লাভের একমাত্র উৎস, তাঁরা কতখানি কর্তব্য-পরায়ণ সমাজ-দরদী ও বুদ্ধিজীবী পদবাচ্য হতে পারেন বা তাঁদের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যই বা কি—তা সুধী পাঠকবর্গের বিবেচ্য বিষয়। যে ঘটনার সঙ্গে সম্প্রদায়গত প্রশ্ন নিবিড়ভাবে জড়িত সে-ক্ষেত্রে উল্লিখিত লেখক-ত্রয়ের ঐ-রূপ অখ্যাত ও গুরুত্বহীন পুস্তক পুস্তিকার আলোকে প্রচারণায় অংশগ্রহণ ধিক্কারজনক নয় কি ?

কারবালার ঘটনা কোন অখ্যাত বা গুরুত্বহীন ঘটনা নয়। লেখক ত্রয়ের যদি সত্য-সন্ধানী দৃষ্টি, সমাজ-দরদী মন ও জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণের আগ্রহ থাকত, তা হলে তাঁদের জ্ঞানের পুঁজি স্ফীত হতে স্ফীততর হয়ে উঠত। ৬১ হিঃ সনের ঘটনার তথ্যে-ভরা ইতিহাসের সূচনা, ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার বহু বৎসর পূর্ব থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি প্রলম্বিত। একটি ঘটনার এমন দীর্ঘ ইতিহাস মানবেতিহাসে বিরল। কিন্তু, পরিতাপের বিষয়, তাঁরা তা হতে চোখ সরিয়ে নিয়েছেন।

লেখকত্রয় তাঁদের পরিবেশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে যত্রতত্র মহররমের অনুষ্ঠানকে ইসলাম বহির্ভূত রীতি ও শিয়া মতবাদপুষ্ট বিধানরূপে প্রমাণ করতে যেয়ে সমগ্র মুসলমানের আকীদা-বিশ্বাসে আঘাত হেনেছেন। আবার "কারো ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়" ঘোষণার দ্বারা কপটতার নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত রেখেছেন। বস্তুত শোকানুষ্ঠানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ, ইসলামের নীতি-বিধান, তার বৈধতা অবৈধতা সম্পর্কে ফতোয়া দেওয়ার পূর্বে দ্বীন-ইসলামের প্রামাণ্য সুদীর্ঘ ইতিহাসের গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন। যে ইসলাম হজরত বিশ্বনবী (দঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত কিন্তু ঐ-ইসলাম নয় যা মৌঃ মহঃ সাবির-সহ লেখকত্রয়ের আকাঙ্ক্ষিত তথাকথিত আধুনিক ও প্রগতিশীল সৌদি-শাহী ইসলাম। তাঁদের উলিল-আমর তথা প্রভু আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি তাগুতী শক্তি যাদের মনোরঞ্জনের জন্য মুসলমানের প্রথম কিবলা 'বায়তুল মোকাদ্দস'কে ভেট দেওয়া হলো, তাঁদের বিরুদ্ধে মুর্দাবাদ ধ্বনি উচ্চারণ, ইসলামী ঐক্যের ডাক দেওয়া, প্রভৃতি অপরাধের (?) শাস্তিস্বরূপ গত ৩১ জুলাই, ৮৭ তারিখে পবিত্র কাবায় এহরাম পরিহিত, নিরস্ত্র ইরানী হাজীদের উপর নির্বিচারে মেশিনগান ও শ্বাসরোধকারী গ্যাস ব্যবহার করে প্রায় ৮০০ হাজীকে হত্যা করা হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শাহের আমলে ইরান মদ, জুয়া যথেচ্ছা নারী-সম্ভোগ, অশ্লীল সিনেমা-প্রদর্শন, ক্যাবারে প্রভৃতি অনৈসলামিক ভাবধারায় পরিপূর্ণ ছিল। তদস্থলে, বর্তমান ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরান হজরত বিশ্বনবী (দঃ)-এর পরিপূর্ণ ইসলামিক বিধানানুসারে আয়াতুল্যা খোমায়েনীর মহান ও সফল নেতৃত্বে পরিচালিত। ফলশ্রুতিতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত অবস্থায়ও শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-স্বাস্থ্যে উন্নত বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রযুক্তি, প্রভৃতি বিষয়ে অন্যান্য সকল মুশলিম-শাসিত দেশ অপেক্ষা অগ্রগামী। উপরন্তু, বর্তমান ইরানের সঙ্গে ইসলামী ভাবধারার কোন বিরোধ পরিদৃষ্ট হয় না। হোসেনুর রহমান প্রদর্শিত প্রগতির নমুনা-স্বরূপ ঈদ উৎসব অনুষ্ঠানে একটি নারী ও একটি পুরুষের আলিঙ্গন-দৃশ্যের কোন স্থান নেই। প্রমাণ স্বরূপ, "স্পেনের শ্রী ল্যাদার এক মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে সেলিম সামাদ করমর্দনের জন্য হাত বাড়াতেই সে হাত গুটিয়ে বলল—তোমার সাহস তো কম নয়। ইরানে এসে মহিলার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে চাও।" সাংবাদিকের চোখে ইসলামী বিপ্লব ; পৃঃ ৫৮ দ্রষ্টব্য। ইহাই তাগুতী-সমর্থক রাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের প্রভেদের একটি অন্যতম নমুনা।

লেখকগণ কফিন, তাজিয়া ও সেজদাগার মধ্যে পৌত্তলিকতার আঁচ পাওয়ায় পূর্ব-প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করা বাঞ্ছনীয় বিধায় বলা যায় কোন কিছুকে খোদার প্রতিকৃতি মনে করে বা খোদার নৈকট্য লাভের বাসনায় তাঁর উপাসনা করাই হলো পৌত্তলিকতা। যেমন, শহীদ-দিবসে শহীদ-বেদীতে মাল্যদান করত শ্রদ্ধা-নিবেদনকে পৌত্তলিকতা বলা হয় না। তদ্রূপ, মহরমের শোকানুষ্ঠানে ব্যবহৃত কফিন, তাজিয়া প্রভৃতি শ্রদ্ধার নিদর্শন—ইলাহী-অভিজ্ঞান। কোরান করিমে এ জন্য কোরবাণীর উটকে, ছাফা-মারোয়া পাহাড়কে 'শায়ারুল্যাহ্' বলা হয়েছে। আর এ সবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াকে হৃদয়ের পরহেজগারী হিসাবে প্রশংসা করা হয়েছে। সেজদাগা প্রসঙ্গেও এ কথা বলা যায় যে কোন জিনিসের উপর সেজদা করলে যদি সেটা টোটেম হয়ে যায়, তা হলে নিবন্ধকার-বর্ণিত সুন্নিগণ কি টোটেম পূজারী পৌত্তলিক নন ? তাঁরা তো বায়ুমণ্ডলে সেজদা না করে কাপড়, চট, প্রভৃতি বস্তুতে সেজদা করেন। কোন বস্তুর উপর সেজদা করলে সেই বস্তুকে সেজদা করা
হয় না কারণ কোন বস্তুকে সেজদা করা আর সেই বস্তুর উপর সেজদা করার মধ্যে অনেক প্রভেদ। তদ্রূপ, মহরমের শোকানুষ্ঠান মেসোপোটেমিয়ার অ্যাডোনিস-তামুস কাল্ট-এর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নয়। ইহা সম্পূর্ণত ইসলামী ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্যশীল। "একদা হজরত আলী (আঃ) হুজুর (দঃ) সমীপে উপস্থিত হন। সে সময় হুজুর (দঃ)-এর চক্ষুদ্বয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। কারণ জিজ্ঞাসায় তিনি বলেন কিছুক্ষণ পূর্বে জীবরাইল (আঃ) বলে গেছেন যে হোসায়েনকে ফোরাত কিনারায় হত্যা করা হবে। অতঃপর, নিদর্শনস্বরূপ জীবরাইল (আঃ) তথাকার মাটি আঘ্রানের জন্য হুজুর (দঃ)-কে প্রদান করেন। (আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী —এ মাস শাআবীর ছনদ ও মসনদে আমহদ-বিন হাম্বলের রেওয়াত অনুসরণে)।

এ সম্পর্কে হজরত আমীর হামজা (রাঃ)-এর শাহাদত পরবর্তী ঘটনাও পথ-নির্দেশক। মহানবী (দঃ) হজরত হামজা (রাঃ)-এর শাহাদতে এরূপ শোকাভিভূত হন যে তাঁহার জানাজায় দণ্ডায়মান অবস্থায়ও বিলাপ ও ক্রন্দন-সহ বেহুঁশ হয়ে যান…। অতঃপর মদিনা প্রত্যাগমন করে হজরত হামজা (রাঃ)-এর কোন নিকট আত্মীয় না থাকায় আক্ষেপ করেন। তখন মদিনাবাসী আনসারগণ স্ব স্ব স্ত্রীদের হজঃ হামজা (রাঃ)-এর গৃহে শোক-প্রকাশের নিমিত্ত প্রেরণ করেন এবং তাঁদের এই আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে দোওয়া করেন যে আল্লাহ তোমাদের প্রতি

তোমাদের সন্তানদের প্রতি ও তাদের সন্তানদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। —(মেদারেজুন নবু'য়ত, মেয়াজুন নবু'য়ত, প্রভৃতি কেতাব)।
হজঃ গওসে আজম (বড় পীর) তাঁর গুনিয়াতুত্তালেবীন গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"যেদিন ইমাম হোসায়েন (আঃ) শহীদ হয়েছেন, সেদিন থেকে প্রলয়দিন পর্যন্ত ৭০,০০০ ফেরেস্তাকে আল্লাহ-তায়ালা তাঁর সমাধিতে শোক প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেছেন।" অপর একটি বর্ণনায় প্রকাশ যে, "হজরত ইসলামই (আঃ) ও হজরত মহম্মদ (দঃ) উক্ত রওজা-মোবারক জিয়ারতের জন্য তথায় উপস্থিত হয়েছেন।"
বুজুর্গানে দ্বীনদের রওজার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে কবর-পূজার ধুয়া তুলে নিবন্ধকারগণের মননশীলতায় বিশ্বাসী সৌদি সরকার অসংখ্য রওজাকে মরুর বালুতে মিশিয়ে দিয়েছেন। তদ্রূপ, কারবালার ঐতিহাসিক ঘটনাটি কাল্পনিক, নারীঘটিত বিরোধের বা রাজনৈতিক বিরোধের পরিণতি নয় বরং ইহা ছিল ইসলামের অবক্ষয়রোধে ইসলামের দুশমনের সঙ্গে নায্য মোকাবিলা। কোন সন্দেহ নাই যে, পাপাত্মা এজিদই কারবালা হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত নায়ক। অথচ, আজও এক শ্রেণীর মুসলমান কূট কৌশলের আচ্ছাদনে এজিদকে আবৃত রেখে সম্মানীয়, মহামান্য প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করার অপ-প্রয়াস সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান ইরাক-ইরান যুদ্ধে কে আক্রমণকারী তা নির্ণয়ে কূট-কৌশলের আশ্রয় লওয়া হচ্ছে। কারবালা ঘটনার প্রকৃত তথ্য-উদ্‌ঘাটনে ও মহরমের শোকানুষ্ঠানবিষয়ক প্রমাণাবলী অবগত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ইসলামী কেতাবসমূহ অধ্যয়নের অনুরোধ রাখি। যথা মকতলে খারজমী, তাবারী, তারিখুল খোলাফা (আল্লামা সউতী), মিফ্‌তাহুন নাজা, ওসীলাতুন নাজাত, সুররুল আলামিন (ইমাম গাজ্জালী), তারিখে ইয়াকুবী, তারিখে আছম কুফী, তাজকেরাতুল খাস (ইবনে জোজী), তারিখে ইবনে আসাকর, মকতল আবি মখনব, মরুরুজ-জহব, আল্‌-হেদায়া-ওয়ান নাহায়া (ইবনে কাসির), সেররুস শাহদায়াতেন (শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবী), ছাওয়ায়েকে মোহরাকা, মেশকাত, তিরমিজি, রওজাতুল আহ্বাব, রওজাতুস ছাফা ইত্যাদি।

নিবন্ধকার বাহারুদ্দিনের অপরিপক্ক গবেষণার ধারণায় শিয়াদের ইমামত্ববাদে অবতারবাদ তত্ত্বের আবিষ্কারে স্তম্ভিত হতে হয়। শিয়াগণ মহানবী (দঃ)-এর পরবর্তীকালে বারোজন ইমামের নির্দেশিত পন্থার অনুসারী এবং ধর্মীয় বিষয়ে তাঁদের রায়কে চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত বলে গণ্য করেন। তদ্রূপ সুন্নিগণ হজরত মহম্মদ (দঃ)-এর তিরোধান-পরবর্তীকালে খলিফাত্রয়, কতিপয় শাসক বা খলিফার এবং বিভিন্ন ইমাম, মোহাদ্দেস, বুজুর্গানে দ্বীন, প্রভৃতির অনুসরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। তাঁদের প্রদর্শক বা নির্দেশ-দাতাগণ যদি অবতার না হন, তবে কোন অপরাধে শিয়াগণ তাঁদের ইমামগণকে অবতার মান্যকারী রূপে আখ্যায়িত হবেন ? লেখকের এবংবিধ মন্তব্য ইচ্ছা প্রণোদিত জ্ঞান-স্বল্পতা-লব্ধ কেয়াসের ফল ?
নামের আক্ষরিক অর্থ নিয়ে কেউ কি মাথা ঘামায় ? পয়গম্বর (দঃ), নবী (দঃ) এমন কি আল্লাহর নাম মুসলমানগণ নিজেদের জন্য নির্ধারণ করেন। ইহাতে কোন ব্যক্তি নবী বা আল্লাহ বনে যান না। খোমায়েনী সাহেবের প্রকৃত নাম 'রুহুল্যা'। আমরা প্রায়শই রুহুল আমীন, রুহুল কুদ্দুস, ইত্যাদি নাম নিজেদের জন্য নির্বাচন করি। এরূপ নির্বাচন কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। শিয়া আকীদায় রাজতন্ত্রের কোন স্থান নেই। তাঁদের নিকট সর্বক্ষমতার আধার মহান আল্লাহ—যিনি একমাত্র উপাস্য। আল্লাহ ও মহানবী প্রদত্ত মানব-সমাজের কল্যাণকর বিধান একতার বন্ধনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করণের নিমিত্ত নেতৃত্বের প্রয়োজন বিধায় নবী (দঃ) ঘোষিত বারজন ইমাম যাঁদের মধ্যে দ্বাদশজনের সাময়িক অবর্তমানে জাতির নেতৃত্ব-দানের জন্য সুনির্দিষ্ট গুণ-বিশিষ্ট আলিম (অতিজ্ঞানী)-এর নেতৃত্বে আস্থাবান হওয়া শিয়াদের বিশ্বাসের অন্যতম একটি দিক। যোগ্য নেতৃত্বের অধীনে একতাবদ্ধ হওয়ার সুফল আজ একমাত্র ইরানেই পরিস্ফুট।
পরিশেষে, আমাদের বক্তব্য হল আল্লাহ-প্রদত্ত, মহানবী (দঃ) প্রচারিত ইসলাম একটি চিরন্তন, মৌলিক ও বাস্তব জীবন-বিধান। এরমধ্যে কল্পনা, অবাস্তবতা, লোকগাঁথায় কথিত আচার-আচরণ, পরজাতীয়দের অনুকরণ-প্রিয়তার কোন সংস্থান নেই।

হায়দার আলী
নুরপুর, উঃ ২৪ পরগনা

আমাদের চোখে ইংরেজ

১৫ আগস্ট '৮৭ সংখ্যা 'দেশ'-এ রাধাপ্রসাদ গুপ্তের "ভারতে ইংরেজ : আমাদের চোখে" লেখাটির বিষয়বস্তু খুবই আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই। ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে খ্যাত-অখ্যাত নানা শ্রেণীর ভারতীয়দের মতামত বয়ন করতে গিয়ে লেখক অবশ্য অনেক বিষয় একটু স্পর্শ করেই প্রসঙ্গান্তরে সরে গেছেন, যা আর একটু বিশদ করলে রচনাটির তথ্যগৌরব নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেত। যেমন ধরা যাক ৬৪ পৃষ্ঠায় লেখকের মন্তব্য—ইংরেজের প্রতি ঘৃণার তীব্রতায় টিপু সুলতানের সঙ্গে একজন স্বাধীনতাপ্রেমী ভারতীয়ই তুলনীয় হতে পারেন, তিনি সুভাষচন্দ্র। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী নেতাজী সুভাষ সম্পর্কে এরকম মন্তব্য মেনে নিতে অনেকেরই হয়তো আপত্তি হবে না। কেবল নিবন্ধটি আরও চমৎকার হতো যদি টিপুর ব্রিটিশ-বিষয়ক ধারণার পাশাপাশি সুভাষচন্দ্রেরও অনুরূপ ধারণার কিছু ছবি দেওয়া যেত। আমরা এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের কিছু উপাদেয় মন্তব্য হাজির করতে পারি। যথা : "পাখীদের মধ্যে কাক, পশুদের মধ্যে শেয়াল আর মানুষের মধ্যে ব্রিটিশ কূটনীতিকরা সবচেয়ে ধূর্ত।" এরকম আর একটি : "...যে ব্যক্তি আজীবন ব্রিটিশ রাজনীতিকদের সাথে বোঝাপড়া করেছে ও যুঝেছে, তার পক্ষে পৃথিবীর অন্য কোনো রাজনীতিকের দ্বারাই প্রতারিত হওয়া সম্ভব নয়।...আর যদি ব্রিটিশ সরকারের হাতে দীর্ঘ কারাযন্ত্রণা, কঠোর শাস্তি ও শারীরিক নির্যাতন আমাকে নীতিভ্রষ্ট করতে না পেরে থাকে, তবে আর কোনো শক্তিই তা করতে পারবে না।" বোঝা যায়, শঠতা, নিষ্ঠুরতা আর অসাধুতায় সুভাষচন্দ্র ইংরেজ কূটনীতিকদের প্রথম স্থান

দিয়েছিলেন।
সুভাষচন্দ্রের ভাবগুরু স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজ বিষয়ক একটি নেতিবাচক ধারণার কথা শ্রীগুপ্ত ৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ তো সাধারণ ইংরেজ চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য—এ নিয়ে স্বামীজীর অনেক ইতিবাচক মন্তব্যও অনায়াসে সংকলন করা যায়। এর চেয়ে প্রাসঙ্গিক হচ্ছে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে বিবেকানন্দের জ্বলন্ত মন্তব্যগুলো, যেগুলো মুখরোচকও বটে। ইংরেজ শাসন, স্বামীজীর মতে, "তিনটি 'ব'-এর সমাহার—বাইবেল, বেয়নেট ও ব্রাণ্ডি।" আমেরিকায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে বিবেকানন্দের অকুণ্ঠ চিত্রণ : "...ভারতের দিকে চেয়ে দেখো—হিন্দুরা কি রেখে গেছে ? সর্বত্র অপূর্ব মন্দির। মুসলমানেরা কি রেখে গেছে ? সুন্দর সব প্রাসাদ। আর ইংরেজরা ? মন মন ভাঙা ব্রাণ্ডির বোতল ছাড়া আর কিছু নয়।..." ১৮৯৯ সালে মেরী হেলকে লেখা এক চিঠিতে বিবেকানন্দ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নগ্ন ছবি খুলে ধরেছেন, যেখানে দেশীয়রা অর্থনৈতিকভাবে শোষিত, নিরস্ত্রীকৃত, শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা নেই, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপহৃত, যেটুকু স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছিল, তা দ্রুত কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সামান্য সমালোচনার জন্যও দেওয়া হয় দ্বীপান্তর বা কারাবাস। স্বামীজীর মতে ব্রিটিশ শাসন ভারতের যে একমাত্র উপকারটি করেছে (তা'ও সদুদ্দেশ্যে নয়) তা হচ্ছে ভারত বিশ্বসভায় উপস্থিত হতে পেরেছে।

সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে ভারতবাসীর যে সাত্ত্বিক ভক্তির বিবরণ লেখক দিয়েছেন (পৃঃ ৬৮) সে প্রসঙ্গেও উল্লেখ করা যায় যে, ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ 'সাম্রাজ্যেশ্বরী' শীর্ষক এক রচনায় বলেছিলেন "...সেই ভারতেশ্বরী মহারানী যে পরমপুরুষের নিয়োগে এই পার্থিব রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন..." ইত্যাদি। আবার ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উৎসব উপলক্ষে রামকৃষ্ণ সংঘের প্রস্তাবিত অভিনন্দনপত্র সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে যে নির্দেশাবলী পাঠান তার অন্যতম ছিল : "অতিরঞ্জিত না হয়, অর্থাৎ 'তুমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি' ইত্যাদি nonsense, যাহা আমাদের native-এর স্বভাব" ইত্যাদি। কালিফোর্নিয়ায় ১৯০০ সালে এক মহিলা সাংবাদিকের কাছে ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে স্বামীজী কঠোর মনোভাব প্রকাশ করলে ঐ সাংবাদিক রানী ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে যখন মন্তব্য করেন, "কিন্তু তিনি স্বাধীনতার দূতী", তখন বিবেকানন্দ অস্বীকার করে বলেন, "না, ব্রিটিশ শাসিত ভারতে স্বাধীনতা নেই, আছে আইন-শৃঙ্খলার শান্তি—যা সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় শ্মশানে।" স্পষ্টতই, মহারানীর ভারত সাম্রাজ্যের সুশাসন সম্পর্কে বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের মতো অতটা উচ্চ ধারণা পোষণ করেননি।
ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথও মোহমুক্ত অনেকটাই হয়েছিলেন—'সভ্যতার সঙ্কট' ভাষণেই তা যথেষ্ট প্রকটিত। তবে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে আমাদের অনেকেই তাঁর মতো 'বড়ো-ইংরেজ' ও 'ছোট-ইংরেজ' জাতীয় শ্রেণীকরণে বিশ্বাস করতেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি কবিতায়ও এভাবেই ভিক্টোরিয়া এসেছেন আরও অনেক 'বড়ো ইংরেজের' সঙ্গে—"...কার্জনেরে কেউ দেবে না লর্ড ক্যানিঙের প্রাপ্য কভু—/ লর্ড সাহেবের মর্যাদা কি লুটবে জিন্দো পাদ্রী প্রভু ?/হৈমবতী উমার অর্ঘ্য কাড়বে ওলাইচণ্ডী কি হায় ?/বেসান্ট সে নৈবেদ্য নেবে অর্পিত যা নিবেদিতায় ?/ রং দেখিয়েই জড়কে দেবে ? তেমন শিশু নাই দুনিয়া,/ ভিক্টোরিয়ার প্রাপ্য নেবে ভায়ার প্রেমী হিসটিরিয়া ?..."

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী
জামশেদপুর-১

রূপমুগ্ধ ঔরংজেব : লেখকের জবাব

৪১ সংখ্যার দেশ পত্রিকায় 'রূপমুগ্ধ ঔরংজেব' নিবন্ধটিতে 'দুটি ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাদ' দেখিয়ে মিহির মুখোপাধ্যায় এবং বেগম উদিপুরীর বয়সের অসঙ্গতি দেখিয়ে সুশীলকুমার নায়েক যে চিঠি লিখেছেন, সেই চিঠির জবাবে লেখকের এই সংযোজন। মিহিরবাবুর বক্তব্যের শেষাংশের সঙ্গে সুশীলকুমারের অভিযোগ অভিন্ন।—সুতরাং আলাদাভাবে তাঁর জবাব দেবার দরকার হচ্ছে না। আমার লেখার একাংশে লিখেছিলাম, 'শাহাজাদা মুরাদ এবং শিপির শুকোকে অন্ধ এবং বুদ্ধিহীন জড়ে পরিণত করবার জন্য যেমন আফিমের বিষ খাওয়ানো হত, ঐ একই ব্যবস্থা বাদশা বরাদ্দ করলেন নিজের ছেলের জন্য। কেননা, ছেলেকে তিনি মুরাদ ও শিপির মতনই শত্রু মনে করেন। মনে করেন, তাঁরা কেড়ে নিতে পারেন তাঁর সিংহাসন। সুতরাং এঁদের জীইয়ে রেখে লাভ কী !'—লেখার এই অংশগুলি পড়ে মিহিরবাবু লিখেছেন, 'শিপির শুকো নয়, তাঁর বড় ভাই সুলেমান শুকোকে (দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র) আফিমের বিষ খাওয়ানো হয়েছিল।' শ্রী মুখোপাধ্যায় এই সঙ্গে আরো যা বলেছেন, তা হল, 'আওরঙ্গজেবের ক্রোধ থেকে শিপির শুকো রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়নি, কিংবা অন্ধ এবং বুদ্ধিহীন জড়ে পরিণত করার জন্য বিষ প্রয়োগ করা হয়নি। মনে হয়, দারা মুরাদের অন্যান্য পুত্রগণের সঙ্গে জাহানারার তত্ত্বাবধানে শিপির নিরাপদেই ছিলেন' ইত্যাদি।
সবিনয়ে জানাই শ্রী মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য ও অনুমান কোনোটাই ইতিহাস সমর্থিত নয়। কেবল মুরাদ ও সুলেমান শুকো নন, আফিমের বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল শিপির এবং মুরাদের প্রিয় পুত্র এজিদকেও। এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল যে তাতে অনেকের ধারণা ছিল যে ওঁরা বুঝি মারাই গেছেন ! আমার বক্তব্যের সমর্থনে ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের আমি শরণ নিচ্ছি। বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের তাঁর সুবিখ্যাত Travels in the Mogul Empire, A.D. 1656-68, গ্রন্থে আফিম-পানীয়ের ভয়াবহ বিবরণের সঙ্গে শিপির-এজিদ্ সম্পর্কে যা বলেছেন, তা হল এইরকম : 'This drink emaciates the wretched victims who lose their strength and intellect by slow degrees, become torpid and senseless, and at length die. It is said that it was by this means, that Sepe-Chekouh, the grand child of Morad Bakche and Soliman-Chekouh, were sent out of the world.' (p. 107)—এখানে উল্লিখিত, মুরাদ বক্সের 'গ্র্যাণ্ড চাইল্ড' হলেন, এজিদ বক্স।—বার্নিয়ের যে এই শাহাজাদাদের মৃত বলে মনে করেছেন, তার কারণ হল, ঐরা প্রায় গোটা জীবনটাই কাটিয়েছিলেন কারাগারের ভেতর। কখনো গোয়ালিয়র দুর্গে, কখনো সালিমগড়ের নির্জন কয়েদখানায়। ঔরংজেবের কাছ থেকে একটি অনুগ্রহ ঐরা পেয়েছিলেন, সেটি হল তাঁর দুই কন্যাকে বিবাহ করার। 'মাসির্-ই-আলমগিরি' সূত্রে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায় শাহাজাদা এজিদ এবং শাহাজাদা শিপিরকে ঔরংজেবের দুই কন্যা বিবাহ করেছিলেন যথাক্রমে ১৬৭২ এবং ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রবেশ করতে হয়েছিল সালিমগড়ে—'Apartments were prepared for them in Salimgarh.'—ইতালির পর্যটক Niccolao Manucci তাঁর সুবিখ্যাত Storia do Mogor (1653-1708)—গ্রন্থে ঐ শাহাজাদীদের প্রসঙ্গ তুলে লিখেছেন, 'Upto this day they live with their husbands in the fortress of Salimgarh'—এখানে upto this day বলতে অষ্টাদশ শতকের সূচনার কথাই সম্ভবত লেখক বলতে চেয়েছেন। শিপির শুকোকে বাদশা প্রাণে মারেননি, কিন্তু মৃত্যুর বাড়া শাস্তি তাকে দিয়েছিলেন। মানুচি লিখেছেন, 'Sultan Sipir Sukoh was married to a daughter of Aurangajib and was kept as prisoner in the fortress of Salimgarh.'—শিপিরকে সেদিন কেন মৃত বলে অনেকে জানতেন, তার সূত্রও মানুচির লেখায় পাওয়া যায়,—'In these days

nothing is said of him, and it is not known whether he is alive or dead.'—এইসব বৃত্তান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা কী বলা সম্ভব যে 'পিপিরকে আফিমের বিষ খাওয়ানো হয়নি,' 'আওরঙ্গজেবের ক্রোধ থেকে পিপির শুকো রক্ষা পেয়েছিলেন,' এবং 'জাহানারার তত্ত্বাবধানে পিপির নিরাপদেই ছিলেন' ইত্যাদি ?

এবার দ্বিতীয় বক্তব্যের প্রসঙ্গে আসা যাক।—উদিপুরীর বয়স কত ছিল ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেবের মৃত্যুর সময়ে ?—সুশীলবাবুর মত হল উদিপুরী সেদিন 'কমপক্ষে ৬৪', এবং মিহিরবাবু যদিচ এমনভাবে স্পষ্ট করে বয়সটা বলেননি, তবে ঐ ৬৪-কে আরো কিছু বাড়িয়ে দিতে যে তাঁর আপত্তি নেই, তা খুবই স্পষ্ট। কেননা, এই 'ক্রীতদাসীর রূপ-লাবণ্যে তাঁর প্রথম প্রভু দারা শুকো মুগ্ধ ছিলেন।'—সবিনয়ে জানাই, ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উদিপুরী যদি ভরা যৌবনে থাকেন, ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দেও কী তাঁর পক্ষে সে যৌবন রক্ষা করা সম্ভব ? অর্থাৎ যৌবনের বিস্তৃতিটা দাঁড়ায় পঞ্চাশ বছরের মতন, এবং সেই সঙ্গে বয়সটা নিশ্চয় সত্তরের কাছাকাছি।—১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের সময় উদিপুরীর যৌবন কতখানি বিকশিত ছিল, ঐতিহাসিকরা আমাদের তা জানাননি। তবে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেবের মৃত্যুর সময় তিনি 'retained her youth' এবং তখনও ছিল তাঁর 'spell of beauty'. —এই লাস্যময়ী উদিপুরী তাঁর যৌবনের জন্য বাদশার কাছে ছিলেন 'darling'. এ ব্যাপারে স্যার যদুনাথ সরকার সচেতন ছিলেন বলেই ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উদিপুরী যখন জননী হন, তখন তাঁকে কিশোরী হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন এবং উদিপুরী সম্পর্কে লিখেছেন : 'She seems to have been a very young woman at the time, as she first became a mother in 1667, when Aurangajeb was verging on fifty. She retained her youth and influence over the emperor till his death and was the darling of his old age. Under the spell of her beauty, he pardoned the many faults of Kambaksh' etc.—উদিপুরী সম্পর্কে ইতিহাসের এই ইঙ্গিতকে মেনে নিয়েই লিখেছিলাম, 'বাদশা ঔরংজেব দেহ রাখলেন নব্বই বছর বয়সে। সতেরোশ' সাত খ্রীষ্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারি। শুক্রবার। —বেগম উদিপুরী মৃত্যুশয্যায় রইলেন তাঁর পাশাপাশি।...তখনো তাঁর দেহে আটকে আছে যৌবনশ্রী। চোখে তখনো আলো খেলে।'—এরই মাঝে উল্লেখ করেছি তাঁর বয়স। 'যৌবনশ্রী' এবং spell of beauty-র কথা ভেবে লিখেছি, 'তখনো তিনি পঞ্চাশে পৌঁছননি।' —দশ বছরের কিশোরীকে জননী করার হিসেব নিয়েই এই বয়স গণনা করা হয়েছে।—ইতিহাসের সত্যকে স্বীকার করে নিলে এর পর কী এক কদমও এগোনো যায় ? —৬৪ বা ৭০ বছরের 'যুবতী' উদিপুরী কী হাস্যকর ব্যাপার নয় ? —সবিনয়ে জানাই ঐ হাস্যকর ব্যাপারটি এড়িয়ে যাবার জন্যই পঞ্চাশের নীচে উদিপুরীকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে। এবং ইতিহাসের নির্দেশ পালন করে।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বর্ধমান,

যোড়শীর নাট্যরূপ

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সংখ্যার দেশ পত্রিকায় শৈবাল বসু তাঁর "ষোড়শী নাটক প্রসঙ্গ" শীর্ষক পত্র মারফত শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রকৃত কে দিয়েছিলেন তা জানতে চেয়েছেন। শ্রীবসু শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথকে লেখা যে চিঠির উল্লেখ করেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে শরৎচন্দ্র স্বয়ং এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক কারও কারও উক্তি থেকে জানা যায় যে এই উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রথমে শিবরাম চক্রবর্তী দিয়েছিলেন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য' নামক গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন, 'আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে সরলাদেবী দিলেন আমার হাতে শিবরাম চক্রবর্তীর কৃত দেনাপাওনার নাট্যরূপ। ষোড়শী নামে তিনি নাট্যরূপ দিয়েছেন। সরলাদেবী বললেন—শরৎ চাটুয্যের লেখা পেয়েছি—ছাপাবো ? আমি বললুম—বহু বাধা আছে। ষোড়শীর মালিক শরৎচন্দ্র...এ নাট্যরূপ তাঁর বিনানুমতিতে ছাপালে কপিরাইট আইন লঙ্ঘনের জন্য দায়ী হতে হবে—Infringement of copyright—সেজন্য ক্রিমিনাল কেস এবং হাইকোর্টে ড্যামেজ সুট।...উপায় ? আমি বললুম...তা ছাড়া তাঁর গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ অপরের দেওয়া...এর কমার্শিয়াল মূল্য কতই বা। আমি বললুম—শিবরামের সামনেই বললুম—শরৎ যদি এ লেখা দেখেশুনে দেন এবং তাঁর নামে ছাপতে দেন, তা হলে ছাপা হতে পারে। তখন সে ছাপার দাম অনেকখানি। পরের দিন শিবরাম এসে জানালেন, শরৎচন্দ্র রাজী। তবে টাকা চান। তখন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে শিবরাম এবং আমি দেখা করি এবং কথা হয়, শরৎচন্দ্র সে-লেখাটি ভালো করে দেখে সংশোধন এবং পরিমার্জনা করে দেবেন এবং এ নাট্যরূপ তাঁর দেওয়া বলে ছাপা হবে—শিবরামের নাম এতে থাকবে না এবং এর জন্য পাছে কেউ কখনো বলে, শরৎচন্দ্রের দেওয়া নাট্যরূপ নয়—সেজন্য to safe-guard ভারতীর reputation তিনি লেখা স্বীকৃতি দেবেন যে তাঁর দেওয়া নাট্যরূপ, এর জন্য তাঁকে দেওয়া হবে তিন শো টাকার চেক। এই প্রস্তাবমতো কাজ হলো। শরৎচন্দ্র সে-লেখা আগাগোড়া দেখে পরিমার্জনা করে দিলেন এবং তাঁর নামেই ষোড়শী ছাপা হলো ভারতীর এক সংখ্যাতেই সমগ্রভাবে।'

আশা করি এর পর ষোড়শীর নাট্যরূপ নিয়ে আর কোন 'ধাঁধা' থাকতে পারে না। শরৎচন্দ্রের আর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু হেমেন্দ্রকুমার রায়ও তাঁর 'সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ষোড়শীর নাট্যরূপ শিবরাম চক্রবর্তীরই দেওয়া।

অজিতেন্দ্র সিংহ

নতুন দিল্লি-৩

অদ্বিতীয় শিবরাম

৫ সেপ্টেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় অজিতেন্দ্র সিংহ মহাশয়ের চিঠিটি পড়ে অবাক হলাম।

শিবরাম অনেক কিছুই করতে পারতেন। মিতব্যয়ী হতে পারতেন, সঞ্চয়ী হতে পারতেন, প্রতিষ্ঠানের দরজায় দরজায় ঘুরতে পারতেন। অনেক কিছুই করতে পারতেন। তিনি করেননি। আর করেননি বলেই তিনি অজিতেন্দ্র বা পাঁচু না হয়ে শিবরাম হয়েছিলেন। মুক্তারামে মুক্ত আরামে থাকা শিবরাম। সত্যিকারের বোহেমিয়ান কোনও বাঙালি সাহিত্যিকের অনুসন্ধান করলে শিবরামের অনিন্দ্য চিত্রটিই মানসপটে ভেসে ওঠে। উপায়হীনভাবেই এসে যায়।

আমার আশঙ্কা হচ্ছে এরপর 'দেশ'-এর পাতায় বিশ্বের অন্যতম বোহেমিয়ান ভিনসেন্ট ভ্যান গগকে নিয়ে যদি আলোচনা হয় তবে কেউ হয়ত অভিভাবকের মতন মন্তব্য করে বসবেন, কি দরকার ছিল ভিনসেন্টের প্যারিস ছেড়ে আসার ? কেন তিনি সম্পর্ক রাখলেন না পরিবারের সঙ্গে ? একটু হিসেবী হয়ে চললে ভিনসেন্টকে হয়তো সাঁইত্রিশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করতে হত না।

পাঁচু রায়

কলকাতা-৬

জরা : ভিন্ন চিন্তা

৮ আগস্ট 'দেশ'-এ শ্রীসমরজিৎ করের লেখা 'জরা : ভিন্ন চিন্তা' সম্পর্কে কিছু নিবেদনের আগে প্রথমেই শ্রীকরকে ধন্যবাদ জানাই জরা সম্পর্কে নতুন তথ্য পরিবেশনের জন্য।

জরা সম্পর্কে অনেকদিন ধরেই ক্রস-লিংকেজ (Cross-Linkage) মতবাদ চালু ছিল। জরাতে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড অণুর আড়াআড়িভাবে সংযুক্তি বহুল পরিমাণে বেড়ে গিয়ে বিভিন্ন কোষে,
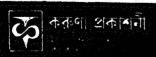
কলায় বা অঙ্গে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। সংক্ষেপে এটাই এই মতবাদ। কিন্তু জরাকালীন যে ব্যাপক শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হয় এই মতবাদের সাহায্যে তার সব কিছু ব্যাখ্যা করা যায় না। এখানে উল্লেখ বাহুল্য হবে না যে সেই ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বার্ধক্যে শরীরের যে বাহ্যিক লক্ষণগুলো দেখা যায় তা নিবিড়ভাবে অনুশীলন করেছিলেন। শুধু তাই নয় জরাতে যকৃত, অন্ত্র প্রভৃতি অঙ্গের যে আকৃতিগত পরিবর্তন হয় তা তিনি শব ব্যবচ্ছেদ করে দেখেছিলেন।

বর্তমানে জরা সম্বন্ধে অনেক মতবাদই চালু রয়েছে। শ্রীকরও তিনটির উল্লেখ করেছেন। অনুল্লিখিত একটি মতবাদের কথা বলা দরকার। শারীরবৃত্তীয় অনেক কাজকর্মই ঘড়ি-ঘণ্টা মিলিয়ে চলে। দিনে জেগে থাকি, রাত্তিরে ঘুমোই আমরা।

বেশ কয়েকটি হর্মোন একটি বিশেষ সময়ে বেশি পরিমাণে নিঃসৃত হয়, অন্য সময়ে ক্ষরণের পরিমাণ কমে যায়। ভাবা হয়ে থাকে আমাদের মস্তিষ্কের খুব সম্ভবত হাইপোথ্যালামাস নামক অঞ্চলে একটি 'জৈব ঘড়ি' এ সমস্তকে নিয়ন্ত্রিত করে। জরার ব্যাপারে এই জৈব ঘড়ির কথাও অনেকে বলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন হর্মোনের নিঃসরণকে নিয়ন্ত্রিত করে এই জৈব ঘড়ি জরাকে ডেকে আনে।

তবে একজন বিখ্যাত জরাবিজ্ঞানীর (বার্নার্ড এল স্ট্রেহলার) মত হল : জরাতে যে বিপুল পরিমাণে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো আসে তা কোন 'একটি মতবাদ' দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। কাজেই তিনি একাধিক মতবাদকে একসঙ্গে (সিনথিসিস্ অব এ ভ্যারাইটি অব থিয়োরিজ) করে জরাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

সবশেষে কয়েকটি বিভ্রান্তিকর বাক্য ও তথ্যের উল্লেখ করি। 'বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে জিনের বৈক্লব্য ঘটে।' জিনের বৈক্লব্য—সেটা কি? বিজ্ঞান লেখায় ভাষার এতটা স্বাধীনতায় বিজ্ঞান তরল হয়ে যায়। বোধ করি শ্রীকর জিনের বৈক্লব্য বলতে জিনের পরিব্যক্তি (মিউটেশন) বোঝাতে চেয়েছেন। এর ঠিক পর পর চারটি বাক্য এমন লিখেছেন যার থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় ফ্রি র‍্যাডিক্যাল আইওডিন একটি প্রোটিন যৌগ। আর 'এনজাইম' বোঝাতে গিয়ে 'এক শ্রেণীর রাসায়নিক বস্তু, যারা বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া চালাতে সাহায্য করে' বলার চাইতে সংক্ষেপে জৈব-অনুঘটক বললে শুধু সংযমই প্রকাশ পায় না, সঠিক ও বোধগম্যও হয়। তবে মারাত্মক ধন্দে পড়ে গিয়েছি Nucleic Acid (নিউক্লিক অ্যাসিড)কে নিউক্লেয়িক অ্যাসিড লেখা দেখে। সেই সঙ্গে বিস্মিত হই যখন দেখি শ্রীকর লেখেন 'নিউক্লেয়িক অ্যাসিড ডি এন এ'র অন্যতম উপাদান'। দেশের পাঠক হয়তো জানেন ডি এন এ (ডি-অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) এক ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড।

প্রণবেশ নাথ

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

স্টেইনড্ গ্লাস

২৯ আগস্ট সংখ্যায় সন্দীপ সরকারের আলোচনা 'মনপবনের নাও'-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্টেইনড্ গ্লাস এবং গ্লাস পেইন্টিং চিত্র রচনার দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মাধ্যম। এই দুই অঙ্কন-মাধ্যমের করণকৌশলই শুধু আলাদা নয়, ছবির নান্দনিক আবেদনও স্বকীয় ধর্মে ভাস্বর। এমন কি ছবি দেখানোর পদ্ধতিও ভিন্ন। স্টেইনড্ গ্লাসে ছবির পেছন থেকে আলোর প্রক্ষেপণ আবশ্যিক। আলো পেছনে থাকার ফলে কাচের রঙ স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। গীর্জার দেওয়ালের যে অংশে স্টেইনড্ গ্লাসের ছবি করা হতো তার পেছনে যেন প্রচুর সূর্যালোক পড়ে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হতো। বেশ কিছু বছর আগে অ্যাকাডেমিতে ফরাসিদের আধুনিক স্টেইন্ড গ্লাসের কিছু কাজ প্রদর্শিত হয়েছিল। সে কাজগুলোর পেছনে বৈদ্যুতিক আলো লাগানো হয়েছিল। কোন কোন গীর্জায় রাতের জন্য স্টেইন্ড গ্লাসের পেছনে বৈদ্যুতিক বাতির স্তম্ভ লাগানো আছে, দেখেছি। কিন্তু গ্লাস পেইন্টিং দেখার সময় অন্যান্য ছবির মত আলো সামনেই থাকে। তাই এই দুই রীতির ছবির অভীষ্ট লক্ষ্য বা ফল এক হতে পারে না। বর্তমানে এদেশে গ্লাস পেইন্টিং নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন তাঁরা কাজ করার সময় অবশ্যই স্টেইন্ড গ্লাসের কথা ভেবে করছেন না। প্রাচীন গ্লাস পেইন্টিং তাঁদের কাজের উৎস। তাঁরা ভঙ্গুর সাধারণ কাচের পরিবর্তে কৃত্রিম কাচ (সন্দীপ যাকে প্রেকসি কাচ বলছেন। এই নামটা একটি কোম্পানির কৃত্রিম কাচের ব্যবসায়িক নাম) ব্যবহার করছেন এবং নিজের সুবিধানুযায়ী কেউ তেল রং (সুহাস রায় তেল রং ব্যবহার করেন। সন্দীপ অ্যাকরালিক লিখেছেন) কেউ অস্বচ্ছ জল রং, কেউ অ্যাকরালিক। এখানে স্টেইনড গ্লাসের কথা আসতেই পারে না। এসব কথা সন্দীপ সরকারের অজানা থাকার কথা নয়। জেনেশুনেও তিনি কেন লিখছেন—'রঞ্জিত কাচচিত্রে (স্টেইনড্ গ্লাসে) নান্দনিক যে জায়গায় পৌঁছানো যায়, প্রেকসি কাচে সেটা সম্ভব নয় বলে মনে হয়'? এতে দর্শক ও পাঠকদের মনে বিভ্রান্তিই সৃষ্টি হচ্ছে শুধু।

ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত

হাওড়া-৭১১ ১০১

সুচিত্রা-কণিকা প্রসঙ্গ

সাহানা দেবী'র সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে আশিস লাহিড়ী মহাশয়ের ১৫ অগাস্টের চিঠিটি পড়লাম।

সাহানাদেবী'র আলোচনায় সুচিত্রা মিত্রের পাশাপাশি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত একটি উজ্জ্বল নাম অনুচ্চারিত থাকায় আশিসবাবু'র ক্ষোভ খুব সঙ্গত বলেই মনে করি। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে পরিণতি'র শীর্ষে নিয়ে গেছেন যেসব মহিলা শিল্পীরা, তাঁদের মধ্যে কণিকা ও সুচিত্রাই শীর্ষস্থানীয়া, একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত সত্য।

ব্যক্তিগতভাবে আশিসবাবু'র পক্ষপাত, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের প্রতি—এটা তাঁর চিঠি থেকে পরিষ্কার এবং তাতে অস্বাভাবিকতাও কিছু নেই। কিন্তু তাঁর পক্ষপাতকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, তিনি অন্যায়ভাবে শ্রীমতি মিত্রের গায়ন প্রতিভা ও কৃতিত্বকে সীমাবদ্ধ করেছেন। এটা খুবই দুঃখজনক যে শ্রীলাহিড়ী'র সুচিত্রা গীত গানের অভিজ্ঞতা 'কৃষ্ণকলি' বা 'নৃত্যের তালে তালে'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গত চার দশক ধরে যে বিচিত্র রসের গান তিনি পরিবেশন করে এসেছেন সুর-ছন্দ ও ভাবের দাবীকে পরিপূর্ণভাবে মিটিয়ে, যদি তার মধ্যে শ্রীলাহিড়ী নিজের অভিজ্ঞতাকে একটু প্রসারিত করে নিতেন, তবে বোধ করি তিনি 'তাঁর গানে শুধুই সরল দাপটের প্রাধান্য' বা 'তাঁর গানে সূক্ষ্ম জটিল চলনের সুর অনুপস্থিত' এই ধরনের মন্তব্য সযত্নে পরিহার করতেন। সুচিত্রা মিত্র-গীত নিম্নলিখিত গানগুলি আমার বক্তব্যকে প্রমাণিত করবে। এর মধ্যে বেশ কিছু গান শ্রীমতি মিত্রের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

টপ্পা অঙ্গের—'মেঘের পরে মেঘ জমেছে', 'সকল জনম ভরে', 'এরা পরকে আপন করে' বা 'দিন যায়রে বিষাদে' এর মত কঠিন গান।

গভীর ও গম্ভীর রাগাশ্রয়ী গানের মধ্যে, কেদারে বিধৃত 'ডাকে বার বার ডাকে' বা 'কে দিল আবার আঘাত' 'যোগিয়ায়' 'নিশিদিন বেজে রে', 'শঙ্করায়'—'জাগিতে হবে রে' 'সোহিনী'তে 'তব প্রেমসুধা রসে' বা 'বেহাগে' বিস্তৃত 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে' বা 'সন্ধ্যা হল গো ওমা'র মত মগ্ন গভীর গান। 'সখী আঁধারে একেলা ঘরে' গানটি সুচিত্রা মিত্রও গেয়েছেন 'শাপমোচন' নাটকে। এটি গায়নরীতিতে কণিকা-গীত গানটির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বমহিমায় ভাস্বর।

জটিল ও সূক্ষ্ম সুরের গান কণিকা ও সুচিত্রা দুজনেই গেয়েছেন। তবে দুজনের গায়নরীতি'র প্রভেদ অনস্বীকার্য। কণিকার ঝোঁক তালছাড়া, ধীর লয় বিশিষ্ট বিস্তৃত কাজের প্রতি কিন্তু সুচিত্রার কাজ ঘনসংবদ্ধ, মিহি ও দানাদার এবং তালের কঠিন শাসনে শৃঙ্খলাবদ্ধ।

সুচিত্রা ও কণিকা দুজনেই আমাদের গর্ব, আমাদের সৌভাগ্য। রুচি ও পছন্দের বিভিন্নতা সত্ত্বেও দুজনের গানই আমাদের কাছে আদৃত, আমাদের বাঙালী মন, মনন ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব ও অপরিহার্য সম্পদ।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন তাঁর আপন প্রতিভা বলেই, সুচিত্রা মিত্রের প্রতিভাকে খর্ব করে নয়।

পার্থপ্রতিম ঘোষ

জগাছা, হাওড়া

চটকলচিত্র

'দেশ'-এর ১ আগস্ট ১৯৮৭ সংখ্যায় অজিত মুখোপাধ্যায়-এর লেখা গল্প 'মানুষের অস্তিত্ব' পড়লাম। তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানাই—সাহিত্যের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার অগণিত চটকল কর্মীদের বর্তমান সামাজিক, আর্থিক ও মানসিক অবস্থা, দেশ পত্রিকার শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী পাঠকসমাজের কাছে তুলে ধরার জন্য।
সংবাদপত্রে, তথ্য হিসেবে চটকলের বর্তমান অবস্থা প্রায়ই পরিবেশিত হয়। উদাহরণ—বন্ধ হয়ে যাওয়া নর্থব্রুক জুটমিলের অসংখ্য শ্রমিকের দুর্দশার কাহিনী, ১৯৮৩তে এংগাস জুটমিলের ম্যানেজার-হত্যার ঘটনা, কাঁচা পাটের মহাজনদের কাছে ভিক্টোরিয়া জুটমিলের প্রায়-বিকিয়ে যাবার সংবাদ ইত্যাদি। কিন্তু তথ্য মানুষের মনকে ততটা নাড়া হয়তো দেয় না যতটা দেয় সাহিত্যের নানা রসের জারকে সমৃদ্ধ হয়ে, সেই তথ্য যখন উপন্যাস বা ছোটগল্পের রূপ নিয়ে পাঠকের কাছে পরিবেশিত হয়। তখন তা পাঠকের সুখদুঃখের অনুভূতিকে আরও একটু বেশী মাত্রায় জাগিয়ে তোলে। সাহিত্যের মাধ্যমে, কত না দেখা ঘটনা আমাদের মনে গভীর দাগ কেটে যায়।
পঞ্চাশের দশকের সুরু থেকেই ইংরেজদের কাছ থেকে দেশীয় ব্যবসায়ীদের হাতে চটকলের মালিকানা ও পরিচালনা বিক্রিত হচ্ছে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি মুখ্যত ডিভ্যালুয়েশনের জন্য ইংরেজ ও স্কটিশ সাহেবরা, যাঁরা চটকলের ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থা এবং দৈনন্দিন উৎপাদনে নিযুক্ত

...তাই লেখক-লেখিকার কাছে অনুরোধ, এখন থেকে গল্পের নকল রেখে তবেই সেটি পাঠাবেন। অমনোনীত রচনা আর ফেরত দেওয়া হবে না। চার মাসের মধ্যে মনোনয়নের চিঠি না পেলে বুঝে নিতে হবে গল্পটি ছাপা হবে না। গল্প কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা তিন থেকে চার হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
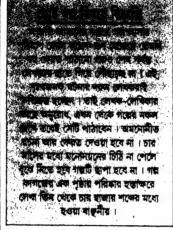
ছিলেন, দলে দলে ভারত ছেড়ে চলে গেলেন। ফাঁকা জায়গাগুলি দেশীয় বণিকদের আত্মীয় পরিজন দ্বারাই প্রধানত ভর্তি হয়ে গেল। এই সময় স্কটল্যাণ্ডের Dundee, কলকাতার Institute of Jute Technology ও ভারতের অন্যান্য Textile Institute-এর ডিগ্রিধারী স্বল্পসংখ্যক কিছু শিক্ষিত ভারতীয় পরিচালনা ও উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর দিকের জায়গায় অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেলেন। কিন্তু তাঁরা চাকুরিজীবি। অবাঙালী মালিকদের স্বার্থেই তাঁদের কাজ করে যেতে হয়েছে। সেই স্বার্থসিদ্ধিতে, তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থও অবশ্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। এই সময় থেকেই যে নিয়মশৃঙ্খলা সাহেবী আমলে ছিল, তা ক্রমশ অবহেলিত হতে লাগল। শুরু হল নানা বেনিয়মী কাজ।
সরকার পক্ষ থেকে পাটচাষী ও চটকল শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য, ইতিমধ্যে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। চালু হয় নানা নতুন আইন ও নিয়মের। কিন্তু আইনের ফাঁক সব সময়ই থাকে। তার সুযোগে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, মহাজন এবং কলকারখানা পরিচালনায় অপারদর্শী, মুনাফালোভী মালিকপক্ষ, নানা নিয়ম ও বেনিয়মের সাহায্যে পাটচাষী, চটকল শ্রমিক, কেরানীকুল ও শিক্ষিত টেকনোলজিস্টদের—তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে শুরু করলেন। প্রতিবাদ করার মত সঙ্ঘবদ্ধতা এই সব শোষিত শ্রেণীর থাকলেও, আর্থিক বল থাকে না বলে, মনোবলও বেশীদিন থাকে না মালিকপক্ষের সঙ্গে যুঝবার। অল্পদিনের মধ্যেই তাদের নতিস্বীকার করতে হয় ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে।
কী অসহায়, কী নিরুপায় যে চটকলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীগোষ্ঠী—তা দেশ পত্রিকার সাধারণ পাঠকের জানবার কথা নয়। তবুও মনে হয় শ্রীমুখোপাধ্যায়-এর গল্পটির মাধ্যমে তাঁরা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন সুদেশ, রাখহরি, ইসমাইল, ছবি বৌদির দৈনন্দিন জীবনের টানাপোড়েন। চোখের সামনে, গত তিরিশ বছরের ওপর ধরে একটি একদা-সম্ভাবনাপূর্ণ বিরাট এক শিল্পের অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করে চলেছি। কত রাজনীতি এই 'সোনালী সুতো'কে ঘিরে! কিছুদিন থেকেই দাবী উঠেছে চটকল জাতীয়করণের। কিন্তু সেটা করা উচিত ছিল ষাটের দশকের গোড়াতেই। এখন যে শিল্পের নাভিশ্বাস উঠেছে, তাকে 'কোরামিন' দিয়ে আর কতদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে? চটকলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খেটে খাওয়া 'মানুষের অস্তিত্ব' সত্যিই আজ বিপন্ন। সে কথা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার যে প্রয়াস অজিত মুখোপাধ্যায় করেছেন—সে জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সুনন্দা চট্টোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন

বন্দেমাতরম্

৮ আগস্ট '৮৭ দেশ পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে তিমিরবরণ প্রসঙ্গে অভিজিৎ মিত্রের পত্রে কিছু তথ্য জানা গেল। এই প্রসঙ্গে জানাই দিলীপকুমার রায় নিজ সুরে বন্দেমাতরম্ গানটি রেকর্ড করেছিলেন। গানটির স্বরলিপি ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অপর পিঠে ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা গানটিতে দিলীপকুমারের সহশিল্পী ছিলেন সম্ভবত শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী।
আনন্দবাজার হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার উদ্যোগে তিমিরবরণ বন্দেমাতরম্ গানে সুর দিয়েছিলেন এবং সমবেত কণ্ঠে রেকর্ড করিয়েছিলেন। উক্ত সুরের স্বরলিপি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল মনে পড়ছে। আকাশবাণীতে প্রত্যহ সকালে যে সুরে বন্দেমাতরম্ গান শোনা যায় সেই সুরারোপ করেছিলেন রবিশঙ্কর।
শ্রীমিত্র ডঃ আর এন্ টেগোর অর্থাৎ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় বন্দেমাতরম্ ও জনগণমন গান দুটির যে রেকর্ডের উল্লেখ করেছেন তাতে বন্দেমাতরম্ গানটিকে সঠিকভাবেই জাতীয় সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কারণ তখন এই গানই জাতীয় সঙ্গীত বিবেচিত হত। জনগণমন জাতীয় সঙ্গীত হয়েছে অনেক পরে। উক্ত রেকর্ডটিতে জনগণমন গানটির স্বদেশী সঙ্গীতরূপে উল্লেখ নিঃসন্দেহে একটি প্রামাণ্য ও মূল্যবান সংবাদ, কারণ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত জনগণমন গানটি নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা ও অযথা বিতর্ক এখনও মাঝে মাঝে শোনা যায়।

সুশীল চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-৭০০ ০২৩

রসগোল্লার জন্ম

'দেশ' ২২ আগস্ট, '৮৭ সংখ্যায় চিঠিপত্র স্তম্ভে ১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'রসগোল্লার জন্ম' চিঠির প্রতিবাদ করছি। পত্রলেখক মাধববাবু 'নদীয়াকাহিনী' তৃতীয় সংস্করণ আদৌ পড়েছেন কী না সন্দেহ জাগে। ৩য় সং-এর সম্পাদকের সংযোজন অংশে নদীয়ার মিষ্টান্নশিল্প অধ্যায়েই রসগোল্লার জন্মকথার বিবরণ আছে, কুমুদনাথ মল্লিক লেখেননি। তিনি লিখবেনই বা কী করে? কারণ, নদীয়াকাহিনী ১ম ও ২য় সং প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩১৭ ও ১৩১৯ সনে আর ইন্দ্রনাথের রসগোল্লার জন্মকথা-সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশিত হয় ১৩৩২ সনে।

দিলীপকুমার কুণ্ডু
কল্যাণী

সংসারে এবং জ্বলন্ত চিতায় নারী

রাজস্থানের দেওরালায় রূপ কানোয়ার নাম্নী এক সুন্দরী অষ্টাদশী তরুণী তার মৃত স্বামীর সঙ্গে সশরীরে স্বর্গে যাবার বাসনায় জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করেছে। হাজার হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে সেই দৃশ্য, সতীর মহিমায় জয়ধ্বনি দিয়েছে, কেউ প্রতিবাদে একটিও অঙ্গুলি তোলেনি। দর্শকদের চিৎকারে, নানারকম বাদ্যধ্বনিতে ও চিতার ধোঁয়ায় বোঝা যায়নি যে শেষ পর্যন্ত এই রূপ কানোয়ার ভয়ে আর্তনাদ করেছিল কি না কিংবা লেলিহান আগুন থেকে উঠে আসার চেষ্টা করেছিল কি না। এ তথ্যও জানা যায় নি যে ঐ তরুণীকে সেদিন জোর করে মাদক সেবন করানো হয়েছিল কি না কিংবা চিতার কাঠ সাজাবার সময় তাকে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা ছিল কি না। তবে জানা গেছে এবং সংবাদপত্রে এ ছবিও প্রকাশিত হয়েছে যে রাজপুতানায় রানা প্রতাপের বংশধর তলোয়ারধারী যুবকেরা সেই চিতাস্থল পাহারা দিয়েছে। তারপর দিনের পর দিন সেখানে চলেছে উৎসব, সেই চিতা হয়ে উঠেছে তীর্থক্ষেত্র, সেই সতীর সম্মানে একটি মন্দির গড়ার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

এই রোমহর্ষক ঘটনাটি বেদনাদায়ক কিন্তু কতটা বিস্ময়ের? সতীদাহ আইনত নিষিদ্ধ হলেও এই প্রথা কি সত্যিই বন্ধ হয়েছে? দু'চার বছর অন্তর অন্তরই এরকম এক একটি ঘটনা সংবাদপত্রে চাঞ্চল্য ঘটায়। এবং সব ঘটনাই কি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা পর্যন্ত পৌঁছোয়? দুর্মুখে এমন কথাও বলে যে রূপ কানোয়ার রূপসী এবং যুবতী বলেই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এতখানি স্থান পেয়েছে, কোনো কুরূপা প্রৌঢ়া হলে দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অষ্টম কলমে অবহেলিতা হতো। গত বৎসর মধ্য প্রদেশের এক গ্রামে অনাবৃষ্টির প্রতিকারের আশায় এক মন্দিরের সামনে একটি বালিকাকে বলি দেওয়া হয়েছিল। দৈবাৎ এক সাংবাদিক সেই খবরটি প্রকাশ করে দেওয়ায় সরকারি মহলে কিছু তরঙ্গ উঠেছিল। পরে জানা যায়, এরকম নরবলি দেওয়ার ঘটনা ঐসব অঞ্চলে মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে।

এ দেশে অনেক নারীই গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়ে মরে, অনেকে বছরের পর বছর অপমান, অবহেলার আগুনে ধিকিধিকি করে জ্বলে। উত্তর ভারতের কোনো কোনো গ্রাম্য হাটে এখনও স্ত্রীলোক বিক্রয় হয়, দিল্লির এক সাংবাদিক সেরকম একটি স্ত্রীলোক ক্রয় করে রাজধানীর এক থানায় এনে হাজির করেছিলেন। এ ছাড়াও নারী মাংস বিক্রিত হচ্ছে দেশের সর্বত্র। কন্যা সন্তান জন্মালে বহু পরিবারে এখনও কান্নার রোল পড়ে যায়। গর্ভের সন্তান পুত্র না কন্যা তা এখন জন্মের আগেই জেনে নেওয়া সম্ভব, তাই অজাতকন্যাকে গর্ভের মধ্যেই হত্যা করার অনুরোধ আসে চিকিৎসকদের কাছে। এক কন্যার বিবাহের ব্যয়ের জন্য অর্ধেক জমি বিক্রয় করতে হয়েছিল বলে কিছুদিন আগে বিহারের এক কৃষক তার বাকি দুই মেয়েকে স্বহস্তে গলা টিপে মেরেছে। এদেশে শতকরা নব্বইটি নারীর জীবনই জন্ম থেকে বিড়ম্বিত। প্রাচীন শ্লোকে আছে যে রমণীরা শৈশবে পিতার, যৌবনে পতির এবং বার্ধক্যে পুত্রের ওপর নির্ভরশীল। এই বিংশ শতাব্দীতেও সেই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। এমনকি গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চল্লিশ বছর পরেও নারী ও পুরুষ যেন দুটি পৃথক জাতি, যাদের মধ্যে সম্পর্ক নিপীড়িত ও নিপীড়কের। ধর্মীয় কাহিনীতে, কাব্যে, শাস্ত্রে নারীকে নিয়ে নানারকম আদিখ্যেতা থাকলেও, দেবতাদের বদলে দেবীদের পূজা বেশী জনপ্রিয় হলেও হিন্দুরা বাস্তব জগতে নারীদের প্রাপ্য সম্মান দেয় না। মুসলমান সমাজেও নারীর স্থান বিশেষ উন্নত হয়নি। কলকাতা শহরের ভিখারিণীরা অধিকাংশই স্বামী পরিত্যক্তা মুসলমান রমণী।

রূপ কানোয়ার স্বেচ্ছায় কিংবা কারুর প্ররোচনায় জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করেছিল, সেটা বড় প্রশ্ন নয়। শোকের অধীরতায় কিংবা নকল আদর্শের উন্মাদনায় কোনো অষ্টাদশী তরুণীর পক্ষে হঠাৎ আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয় হয়তো। কিন্তু তার চিতা ঘিরে যারা জয়ধ্বনি দিয়েছিল, যারা সতী মাহাত্ম্য রক্ষার জন্য খোলা তলোয়ার হাতে প্রহরা দিয়েছে, তারা পুরুষ সমাজের নিকৃষ্টতম জীব। তাদের কোনো শাস্তি দেবার ব্যবস্থা এখনো এদেশে নেই। তার কারণ কি এই যে এইসব পুরুষরাই এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ?

বৃদ্ধি-বিকাশের সুস্বাদু রীতি- ফ্যারেক্সের® রীতি!

আপনার শিশুর উচ্চতা আর ওজন* পরীক্ষা করুন	শিশু পুত্র		শিশু কন্যা	
	ওজন	উচ্চতা	ওজন	উচ্চতা
৩ মাসে	৫.২ কেজি.	৫৯.১ সেমি.	৪.৯ কেজি.	৫৮.৪ সেমি.
৬ মাসে	৬.৭ কেজি.	৬৪.৭ সেমি.	৬.১ কেজি.	৬৩.৭ সেমি.
৯ মাসে	৭.৩ কেজি.	৬৮.২ সেমি.	৬.৯ কেজি.	৬৭.০ সেমি.
১২ মাসে	৮.৪ কেজি.	৭৩.৯ সেমি.	৭.৮ কেজি.	৭২.৫ সেমি.

* ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ দ্বারা প্রকাশিত।
এ হল ভারতীয় শিশুর গড়পড়তা হিসেব মাত্র। শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের হার দেখে ডাক্তারবাবু খুশি থাকলে, নির্ভাবনায় থাকুন।

বিনামূল্যে শিশুর যত্ন সম্বন্ধে রঙীন পুস্তিকার জন্যে এই ঠিকানায় লিখুন: গ্লিণ্ডিয়া লিঃ, (FPD/26), ডাঃ অ্যানী বেসান্ত রোড, ওআর্লি, বম্বে-৪০০ ০২৫।

সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্যে আপনার শিশুকে পুষ্টিতে ভরপুর ফ্যারেক্স খাওয়ান।

ফ্যারেক্স®
বৃদ্ধি-বিকাশের সুস্বাদু রীতি

কালীদেবীর মূর্তিতত্ত্ব

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দেবী কালীর নাম আমাদের মনে এক ভয় মেশান ভক্তির ভাব আনে। আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে শায়িত শিবের উপরে দাঁড়ান এক বিবসনা বা স্বল্প পরিচ্ছদ পরিহিতা মুক্তকেশী ও মুণ্ডমালিনী কাল বা শ্যামবর্ণের নারীর ছবি। দেবীর চার হাতের মধ্যে এক হাতে খড়্গ ও আর এক হাতে মানুষের মাথা, যার থেকে রক্ত ঝরছে। তাঁর রক্তলোলুপ জিভ মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। অনেক সময় তাঁর কোমরের চারিপাশে মানুষের কাটা হাতের মালা দিয়ে সাজান এক ধরনের আচ্ছাদন দেখা যায়। অন্য দিকে দেখি দেবীর দেহে নানা অলঙ্কার, হাসি হাসি মুখ, এক হাত অভয়দান ও আর এক হাত বরদানের ভঙ্গিমায় (চিত্র নং ১)।

কালীর এই মূর্তি তাঁকে এক দিকে ধ্বংস ও অশুভনাশের এবং অন্যদিকে সৃষ্টি ও সৌভাগ্যের দেবীরূপে চিহ্নিত করে। শবের মত শায়িত শিব যেন জীবনের সব কিছুর সমাপ্তির বা ক্ষয়ের ইঙ্গিত করছেন, তাঁর রুদ্ররূপের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। আবার শিবরূপে তিনি মঙ্গলময়। ধ্বংসের মধ্যেই থাকে সৃষ্টির বীজ, লয়ের পরেই জীবনের জন্ম। এই বিপরীত ভাবের সমন্বয়ের অপূর্ব প্রকাশ দেবী কালীর মূর্তি।

কালী মূর্তির এই কল্পনা কতদিনের? কিংবদন্তী এই যে সপ্তদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর শ্রী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নাকি এই কালীরূপের কল্পনার আদি স্রষ্টা।[১] কিন্তু আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর **বৃহদ্ধর্ম পুরাণে**[২] কালীর প্রায় অনুরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখানে কালী স্বাস্থ্যবতী, শ্যামবর্ণা, দিগম্বরী ও মুক্তকেশী; শবরূপ মহাদেবের উপরে তাঁর আসন। তাঁর জিভ মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। চার হাতের মধ্যে দুই বাম হাতে অসি ও মানুষের মাথা। তিনি সংহারকালের মত ঘন সংহারী মূর্তি নিয়ে কোটিরও বেশী পাপ বিনাশ করছেন। অন্যদিকে তাঁর দেহে নানা অলঙ্কার, মুখে হাসি, দুই ডান হাতে অভয় ও বরদানের ইঙ্গিত।[৩] অর্থাৎ আজকাল কার্তিকের অমাবস্যার রাত্রিতে কালীর যে মূর্তি পূজা করা হয়, প্রায় সেই প্রতিরূপেরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বইটিতে। এই বইটিতে কালীর এই পূজা কোজাগরী পূর্ণিমার পরবর্তী (অর্থাৎ কার্তিকের) অমাবস্যার রাত্রিতে অনুষ্ঠানের যোগ্য বলে বলা হয়েছে। এই পূজার আগে "দীপান্বিতা" অমাবস্যা তিথির প্রদোষকালে পার্বণ বিধি অনুযায়ী শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের এবং এই

চিত্র নং ২। দশম-একাদশ শতাব্দীর এক কালী (?) মূর্তি

উৎসব উপলক্ষ্যে দীপমালা, নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদির ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে,[৪]—ঠিক যেমন আজকের কালীপূজার সময়ে দেখা যায়।[৫]

বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মতে কালী অসুরদের বধের জন্য ধরাতলে আগত অম্বিকা অর্থাৎ দেবী দুর্গা মাতৃকা। তাঁর ভার ধারণের শক্তি একমাত্র শিবের। দেবী শিবা অর্থাৎ মঙ্গলময় শিবের শক্তি বা পরম মুক্তির প্রতীক।[৬]

কালীর এই ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপের দুটি দিক আছে। একদিকে তিনি ধ্বংসের প্রয়াসী, অন্যদিকে তিনি বর ও অভয়দাত্রী মঙ্গলময়ী। এই দুই ভাবের মেলবন্ধনে রয়েছে তাঁর মাতৃরূপ।

যে শবাসনা ভয়ঙ্করী মাতৃকা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে প্রাচীনকাল থেকে পরিচিতা তার নাম চামুণ্ডা। প্রেতাসনা চামুণ্ডার ক্ষুধা সর্বগ্রাসী। তিনি রুধির ও মাংসলোলুপ। চামুণ্ডার কল্পনার উৎসে কিছু অব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারার প্রভাব থাকলেও[৭] একথা মানতেই হবে যে গুপ্তযুগের মধ্যেই ইনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিশ্বাসে সপ্তমাতৃকার এক মাতৃকারূপে গৃহীত হয়েছিলেন।[৮] এই দেবীর এক প্রাচীন প্রতিরূপে দেখা যায় যে ইনি প্রেতের বা শবের উপরে বসে চারহাতে কর্তরী, কপাল, ত্রিশূল ও খড়্গ ধরে আছেন। তাঁর শুষ্ক দেহ সর্বগ্রাসী ক্ষুধাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৯] অনেক সময় তাঁর পেটে বিছের ছবি দিয়ে ক্ষুধার জ্বালার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে[১০] এবং দেবীর গলায় দেওয়া হয়েছে মুণ্ডমালা।[১১]

এই চামুণ্ডাকে **মার্কণ্ডেয় পুরাণে** কালী থেকে অভিন্ন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। চণ্ড ও মুণ্ড পরিচালিত দৈত্যদের দেখে দেবী অম্বিকার (চণ্ডীর) রাগান্বিত কাল মুখের কপাল থেকে কালীর আবির্ভাব।[১২] এই দেবীর বীভৎস মুখ, হাতে খড়গ, পাশ ও মাথার খুলিসমেত খট্বাঙ্গ, পরনে ব্যাঘ্রচর্ম, গলায় মুণ্ডমালা। দেবীর শুষ্ক শরীরের মুখ থেকে জিভ বেরিয়ে আসছে।[১৩] অসুর নিধনকারিণী দেবীকে অম্বিকা "চামুণ্ডা" বলে সম্বোধন করেছেন মার্কণ্ডেয় পুরাণে।[১৪] কালীর এই বর্ণনার সঙ্গে চামুণ্ডার সমধিক পরিচিত মূর্তিগুলির অদ্ভুত মিল।[১৫]

মহাভারতের বর্তমান রূপ গ্রহণের পূর্বেই অর্থাৎ আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে[১৬] দুর্গার সঙ্গে কালীর অভিন্নতা স্বীকৃত হয়েছিল।[১৭] এরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় **মার্কণ্ডেয় পুরাণে** লিখিত কাহিনী পাঠের সময়। শিবের স্ত্রী দুর্গার সঙ্গে কালের (অর্থাৎ শিবের) শক্তিরূপে যাঁকে কল্পনা করা যায় সেই কালীর একাত্মতায় বিস্মিত হবার কিছু নেই। অম্বিকা ও চামুণ্ডার সঙ্গে কালীর অভিন্নতার কল্পনা তাঁকে মাতৃদেবীরূপেও স্বীকৃতি দিয়েছিল। অসুর নিধনের ভূমিকায় কালী কেবলমাত্র ধ্বংসের দেবী নন, তিনি অশুভশক্তি বিরোধী এবং সেই অর্থে মঙ্গলময়ী।

কালীর মঙ্গলময়ী রূপের এক প্রকাশ ভদ্রকালী। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থ **বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে**[১৮] ভদ্রকালীর মনোহররূপের ও তাঁর চার সিংহ বাহিত রথের কথা বলা হয়েছে।[১৯] এখানে দুর্গার ন্যায় ভদ্রকালীর বাহন সিংহ। অন্যদিকে চামুণ্ডার সঙ্গে মঙ্গলময়ী কালীর সম্পর্ক স্থাপনের ফলে কারো কারো কল্পনায় চামুণ্ডার কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে। **বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে** যে-চামুণ্ডার উল্লেখ তিনি লম্বোদরী; সুতরাং শুষ্ক দেহধারিণী নন।[২০]

চিত্র নং ৫। আনুমানিক দশম শতাব্দীর এক কালী মূর্তি

এখানে উল্লেখযোগ্য যে **বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ** অনুযায়ী চামুণ্ডা **সর্বসত্ত্ববশঙ্করী**[২০ক] অর্থাৎ সকল জীবকে বশ করবার শক্তির অধিকারিণী। তাঁর এই ক্ষমতা বোধহয় তন্ত্রসাধনার সঙ্গে তাঁর যোগের ইঙ্গিত দেয়। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কৃত (বিক্রম) অব্দের ৪৮০ বৎসর অতীত হবার পর অর্থাৎ ৪২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ গংধর লেখতে এক "অত্যুগ্র" ভবনের কথা আছে যা ডাকিনী এবং আনন্দে উচ্চ কলরবকারিণী, ও তন্ত্রোদ্ভূত প্রবল বায়ু দ্বারা সমুদ্র আলোড়নকারিণী মাতাদের (অর্থাৎ মাতৃকাদের) দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।[২১] এই তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে মাতৃকাদেবী হিসাবে চামুণ্ডার সঙ্গে তন্ত্র সাধনার সম্পর্ক গুপ্ত যুগের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। **বৃহৎ সংহিতাতে** মাতৃকা-দিগকে তন্ত্রসাধনাতে পরিচিত "মণ্ডল" ক্রমে পূজা করার ইঙ্গিত করা হয়েছে।[২২]

চিত্র নং ৩। পাল যুগের এক চামুণ্ডা বা চামুণ্ডা-কালী

গুপ্তোত্তর যুগে বা মধ্যযুগের প্রথম ভাগের গোড়ার দিকের মধ্যে যখন চামুণ্ডার সঙ্গে কালীর অভিন্নতা কল্পনা করা হল, তখন কালীও তন্ত্রের দেবী হয়ে উঠলেন (যদি তার পূর্বে এই বৈশিষ্ট্য তাঁর না থেকেও থাকে)। আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর **কালীকা পুরাণে**[২৩] মহামায়ার (এক্ষেত্রে কামাখ্যা দেবীর বা কালীর) "শিব-প্রেতের" সঙ্গে রমণের কথা লেখা হয়েছে।[২৪] পরবর্তীকালের **কালীতন্ত্রে** মহাকালের অর্থাৎ শিবের সঙ্গে কালীকার এই ধরনের আচরণের উল্লেখ আছে।[২৫]

কালী, দুর্গা বা অম্বিকা ও চামুণ্ডার মধ্যে সংযোগ এইভাবে একের বৈশিষ্ট্য অন্যকেও দিয়েছে। দশম-একাদশ শতাব্দীর কয়েকটি রচনায় এবং পাল-সেন যুগের কিছু সংখ্যক মূর্তিতেও এই অনুরূপ আদান প্রদানের লক্ষণ স্পষ্ট। আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর **কালীকা পুরাণে** কালীর এক চারুরূপের বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, মুক্তকেশী দেবী বসে আছেন সিংহের উপরে চার হাতের মধ্যে দুই হাতে খড়্গ ও নীলপদ্ম নিয়ে।[২৬] এ যেন সিংহবাহিনীর দুর্গার এক প্রতিমূর্তি। একই আসনে এক দেবীকে দেখান হয়েছে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান ম্যুজিয়ামে রক্ষিত আনুমানিক দশম একাদশ শতাব্দীর এক ভাস্কর্যে (নং MS 15/A25122)। এখানে দেবীর হাসিমুখ, কিন্তু চার হাতের তিন হাতে কপাল, মাথার খুলি লাগান খট্বাঙ্গ ও পূর্ণ মানুষের বা শিশুর দেহ (যার মাথা নিচুর দিকে) (চিত্র নং ২)। এই মূর্তিতে দেখি দুর্গা ও কালীর বা চামুণ্ডার বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়। একই জাদুঘরের একটি কাল পাথরের প্রতিমায় (নং 3943) দেবী ললিতাসনের ভঙ্গিমায় পদ্মাসনা, গলায় মুণ্ডমালা, তাঁর শুষ্কদেহ, পেটের ক্ষুধার সংকেত করছে এক বিছার ছবি এবং চার হাতের দুটিতে কর্তরী ও কপাল এবং একটি বাহু ও হাতের সংযোগস্থলে ধরা ত্রিশূল। দেবীর ডান পা বাঁ দিকে কাত ফিরে শোয়া এক নগ্ন পুরুষের দেহের উপরে (চিত্র নং ৩)। শোবার ভঙ্গি দেখে হঠাৎ দেহটি কোনও মৃত পুরুষের বলে মনে নাও হতে পারে। এখানে কি চামুণ্ডার আসন শবের মধ্যে শিবের ভাবনার অনুপ্রবেশ দেখতে পাচ্ছি? অন্তত এই দেবীর রূপের সঙ্গে **মার্কণ্ডেয় পুরাণে** ও **দেবী ভাগবতে** বর্ণিত কালীর চেহারার খুব মিল।[২৭] **দেবী ভাগবতে** আরও বলা হয়েছে যে কালিকার "উদর শুষ্ক বাপীর তুল্য"।[২৮] সুতরাং আলোচ্য মূর্তিটিকে আমরা চামুণ্ডা বা কালী বা চামুণ্ডা-কালীর এক প্রতিমা হিসাবে ধরতে পারি। স্পষ্ট হাড়, শির এবং ক্ষুধার্ত ও ক্রূর মুখসহ দেহের বাস্তবোচিত রূপায়ণের দাবিদার বিহারে আবিষ্কৃত এই ভাস্কর্যটি পাল শৈলীর এক নিদর্শন।

বিহারে আবিষ্কৃত এবং এখন লণ্ডনে ব্রিটিশ ম্যুজিয়ামে প্রদর্শিত একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর এক ভাস্কর্যে (নং 1872/7-1/85) এক দেবীকে মন্দিরের মধ্যে নাচতে দেখা যায়। তাঁর শুষ্ক দেহ, গলায় মুণ্ড (হাড় ও ফুলের ?) মালা, ও ছয়

হাত। ডানদিকের হাতগুলিতে কপাল, কর্তরী এবং ঢাল সমেত শূল। শূলের উপরে বিদ্ধ এক মানুষের দেহ। বাঁদিকের হাতগুলিতে ত্রিশূল (?), ঘণ্টা ও মানুষের মাথা। ত্রিশূল এক মানুষের দেহের পিছনদিক থেকে বিদ্ধ করছে। মানুষের মাথা চুঁইয়ে পড়া রক্ত পান করছে এক শিয়াল। দেবী নিজে মুখে কিছু (মাংস ?) চর্বণ করছেন। তাঁর এক (বা দুই) কানের কুণ্ডল হচ্ছে দুটি শিশুর শব। দেবীর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে শোয়া এক পুরুষের দেহ। দর্শকের দিকে ফেরান ও মাটির থেকে একটু উঁচুতে ও ডান হাতের তালুতে রাখা মুখ দেখে পুরুষটিকে জীবন্ত বলে মনে হতে পারে। মন্দিরের যে রেখাচিত্র ভাস্কর্যে উৎকীর্ণ তার এক কুলুঙ্গিতে শিবলিঙ্গ দেখে দেবীর সঙ্গে শিবের যোগ অনুমান করা যায়। সেক্ষেত্রে উনি চামুণ্ডা-কালী বা প্রেত-শিব সমেত কালীর এক আদিম রূপ (চিত্র নং ৪)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অষ্টম শতকে ভবভূতি[১৯] রচিত **মালতীমাধবে** চামুণ্ডার ভয়াবহ নৃত্যের বর্ণনা দিয়ে প্রার্থনা করা হয়েছে ত্র্যম্বকের অর্থাৎ শিবের আনন্দদানকারী এই তাণ্ডব "আমাদের ইচ্ছাপূরক ও আনন্দদায়ী হউক"।[২০] চামুণ্ডার নৃত্য এখানে কল্যাণকর বলে কল্পিত। নবম-দশম শতাব্দীর লেখক রাজশেখর[২১] চামুণ্ডাকে কালী বলে সম্বোধন করে কালের অর্থাৎ শিবের সামনে কপাল থেকে অসুরদের রক্তপান করতে করতে কালীর "কল্পান্ত" নৃত্যের উল্লেখ করেছেন।[২২] এই বর্ণনাগুলি এবং **মার্কণ্ডেয় পুরাণে** চিত্রিত কালীর রূপ মনে করলে আলোচ্য দেবীমূর্তিটি কালীর প্রতিরূপ বলে মনে করা যেতে পারে।

ইণ্ডিয়ান ম্যুজিয়ামের কাল পাথরের আর একটি প্রতিমা (নং ৩৯৪১) এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটিও বিহারে পাওয়া গেছে। দেবীর ছন্দোময় দেহরেখা, নমনীয় সাবলীল ভঙ্গিমা, শরীরের নতোন্নত দিকগুলির সুন্দর প্রকাশ এবং মুখের স্নিগ্ধ নরম ডৌল ভাস্কর্যটিকে আনুমানিক দশম শতাব্দীর পাল শৈলীর নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করে।[২৩] দেবী পদ্মর (?) বা এক ধরনের বেদীর উপর ললিতাসনে বসে আছেন, তাঁর গলায় মুণ্ডমালা, চার হাতের ডানদিকের দুটিতে ধনু ও ত্রিশূল (?) আর বাঁদিকের একটি ধরে আছে কপাল ও অন্যটি তূণীর থেকে বার করছে একটি তীর। শ্রীময়ী দেবীর হাসি মুখ। তাঁর ঝুলন্ত ডান পা এক নগ্নশায়িত পুরুষের জানু ছুঁয়ে আছে। পুরুষটি বাঁদিকে কাত করে শুয়ে থাকলেও তার মাথা দেহের অন্য অংশ থেকে বেশ কিছুটা উপরে ও বাঁহাতের তালুর উপরে ন্যস্ত (চিত্র নং ৫)। এটি একটি জীবন্ত পুরুষের দেহ যাকে আমরা শিবের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করতে পারি। অর্থাৎ এই দেবী ভয়ঙ্করী মুণ্ডমালিনী হলেও মঙ্গলময়ী ও শিবের সঙ্গিনী,—যা কালী সম্পর্কে পরিচিত ধারণার মূল কথা। সুতরাং দেবী দাঁড়িয়ে না থাকলেও তাঁকে কালী বলেই শনাক্ত করতে হবে। পূর্ব ভারতের বিশেষত বাঙালীদের, পরিচিত কালী প্রতিমার (চিত্র নং ৬) এটি একটি বিকাশোন্মুখ বা প্রাথমিক রূপ, যার তারিখ আনুমানিক দশম

চিত্র নং ১। কালিঘাটের পটে আঁকা কালীদেবীর ছবি

> কালীর এই মূর্তি তাঁকে একদিকে ধ্বংস ও অশুভনাশের এবং অন্যদিকে সৃষ্টি ও সৌভাগ্যের দেবীরূপে চিহ্নিত করে। শবের মত শায়িত শিব যেন জীবনের সব কিছুর সমাপ্তির বা ক্ষয়ের ইঙ্গিত করছেন, তাঁর রুদ্ররূপের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। আবার, শিবরূপে তিনি সঙ্গলময়। ধ্বংসের মধ্যেই থাকে সৃষ্টির বীজ, লয়ের পরেই জীবনের জন্ম। এই বিপরীত ভাবের সমন্বয়ের অপূর্ব প্রকাশ এই কালী দেবীর মূর্তি।

শতাব্দীর। শিবের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা দেবীর পরিচিত মূর্তির প্রচলন হয় **বৃহদ্ধর্ম পুরাণ** রচনার সময়ের মধ্যে অর্থাৎ আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দী নাগাদ বা তার আগে।

॥ খ ॥

এই সিদ্ধান্ত কালীদেবীর বর্তমান রূপ ও তাঁর সম্পর্কিত ধ্যানের উপর বৌদ্ধ প্রভাবের কোনও ইঙ্গিত করে না। কোনও কোনও পণ্ডিত কালীকে বৌদ্ধ দেবী নৈরাত্মার আর এক সংস্করণ বলে মনে করেন।[২৪] কিন্তু দুই দেবীর মূর্তি ও জ্ঞাত ধারণার প্রাচীনত্ব বিচার করলে প্রেতের উপরে দাঁড়ান নৈরাত্মার উপরে চামুণ্ডা বা কালীর প্রভাবই বেশী বলে মনে হতে পারে। সেইরূপ একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ দেবমণ্ডল থেকে (বিশেষত বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবমণ্ডল থেকে) ব্রাহ্মণ্য মণ্ডলে কালীর প্রবেশ হয়েছিল বলে যে অনুমান করা হয়[২৫] তার পিছনেও কোনও অকাট্য যুক্তি নেই। একথা অনস্বীকার্য যে ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের দেবদেবীর উপরে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষণীয়।[২৬] কিন্তু

৬ নং চিত্র মেদিনীপুর জেলার মাধবপুরে আবিষ্কৃত মধ্যযুগের এক কালী প্রতিমা।

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে কালীর ভয়ঙ্করী কিন্তু অশুভনাশিনী ও মঙ্গলময়ী রূপ এবং শিব-প্রেতের সঙ্গে তাঁর তান্ত্রিক বিধিসম্মত সম্পর্কের ভিত্তি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরিমণ্ডলে খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল। পরে এই কালীচিন্তার আরও বিস্তৃতির সময় ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের সঙ্গে বৌদ্ধ তন্ত্রের যোগাযোগের মাধ্যমে কিছু বৌদ্ধ ধারণা অনুপ্রবেশ করে থাকতে পারে।[৩৭]

কালীদেবীর সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তির একটা কারণ বোধ হয় বিভিন্ন অর্থে নামটির ব্যবহার। মুণ্ডকোপনিষদে কালী অগ্নির সপ্তজিহ্বার একটি।[৩৮] এগুলিতে যজ্ঞের যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয় তা সূর্যরশ্মিরূপে স্বর্গে পৌঁছে যায় বলে কল্পনা করা হয়েছে।[৩৯] প্রকৃত প্রস্তাবে অগ্নির জিহ্বা ধ্বংস করতে পারে, পুড়িয়ে কাল করে দিতে পারে, আবার শুদ্ধও করতে পারে। এই বৈশিষ্ট্য কালী সম্পর্কিত পরবর্তী ধারণাগুলির মধ্যেও খানিকটা খুঁজে পাওয়া যায়। কালী নামটি কাল বা ধ্বংসের ভয়ঙ্কর দেবতা রুদ্রের (যে আখ্যায় অগ্নিও পরিচিত)[৪০] স্ত্রীর নাম হিসাবে এবং রুদ্রের বা শিবের[৪১] স্ত্রী অসুর ধ্বংসে কারণী দুর্গা রূপেও কল্পনা করা যায়। এই ভাবনার ফলে অম্বিকা দুর্গার মত কালীরও জগন্মাতা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।[৪২] অন্যদিকে তান্ত্রিক মাতৃকা চামুণ্ডার ভয়াবহতা তাঁর যোগ ঘটিয়েছে কালীর সঙ্গে এবং তাঁদের অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হবার পর কালীও তান্ত্রিক দেবী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে অম্বিকা, চামুণ্ডা ও কালী যখন অভিন্নরূপে চিহ্নিত তখন থেকে কালী অসুর শক্তি ধ্বংসকারিণী, অশুভনাশিনী, মঙ্গলময়ী। এই ভাব সমপূর্ণভাবে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বা দেবী ভাগবতে কালীর রূপের বর্ণনায় ফুটে ওঠেনি, কিন্তু একে উপলব্ধি করা যায় উপরে বর্ণিত দশম শতাব্দীর মূর্তিটি দেখলে।[৪২ক]

তান্ত্রিক মাতৃকাদের সঙ্গে শিবের যোগ গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে কিছু ভাস্কর্যে সুস্পষ্ট। এগুলিতে শিবের প্রতিরূপ মাতৃকা মূর্তিগুলির পাশে উৎকীর্ণ।[৪৩] সুতরাং মাতৃকা দেবী চামুণ্ডার সঙ্গে কালীর এবং কালীর সঙ্গে অম্বিকার অভিন্নতা কল্পিত হলে শিবকে কালীর সঙ্গী হিসাবে পেতে কোনও অসুবিধা হয় না। এই ধারণা চামুণ্ডার সঙ্গী শায়িত প্রেতকে ক্রমশ শিবে পরিণত করেছে। এরপরে পুরুষ শিবের সঙ্গে তাঁর শক্তি কালীর তান্ত্রিক বিধিমতে আচারের চিন্তা করতে কোনও বাধা নেই। এই চিন্তা একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বা আগেই করা হয়েছিল।[৪৪]

"কাল" কথাটির এক অর্থ "সময়", সেই অর্থে কালী[৪৫] সময়ের দেবী। মহাকাল বা শিব তাঁর স্বামী।[৪৬] সময়ে সব কিছুর ধ্বংস হয়, আবার সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হয়। এই মহাজ্ঞানের অধিকারিণী কালের শক্তি সনাতনী কালী। তাই একাদশ শতাব্দীর কালিকা পুরাণে মহামায়া কালীকে "বিদ্যা" বলে সম্বোধন করা হয়েছে।[৪৭]

তন্ত্রে কালী দশমহাবিদ্যার তালিকায় প্রথম।[৪৮] বিভিন্ন তান্ত্রিক রচনা থেকে জানা যায় যে তান্ত্রিক মতে তাঁর সাধনা করলে সব কামনা পূর্ণ হয় ও সমৃদ্ধি লাভ করা যায়,[৪৯] শত্রুদের দমন করা যায়,[৫০] মুক্তি লাভ করা যায়।[৫১] বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে তিনি "কেবলা" (অর্থাৎ কেবল বা সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারিণী) ও "শিবা" (বা "পরম মুক্তি")[৫২]।

কালীকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে স্থানে রূপ কল্পনায় পূজা করা হয়েছে! কাজেই তাঁর নামের সঙ্গে বিভিন্ন অর্থময় শব্দের ব্যবহার (যেমন শ্মশান কালী, গুহ্যকালী, দক্ষিণা কালী, শ্যামা, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী, ডাম্বরকালী, জীবকালী, ইন্দিবর কালিকা, ধনদকালিকা, রমণীকালিকা, ঈশান কালিকা, সপ্তার্ণ কালী ইত্যাদি।[৫৩]

চিত্র নং ৪। একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর চামুণ্ডা-কালী

॥ গ ॥

কার্তিকের অমাস্যার রাত্রিতে যে কালীর পূজা আমরা করি[৫৪] তাঁর পূজার উৎসব উপলক্ষ্যে আরও কিছু পূজা ও আচার পালন করা হয়। এগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট প্রথা হচ্ছে দীপমালা দিয়ে পূজামণ্ডপ; গৃহাদি দর্শনীয় বিষয়গুলি সজ্জিত করা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বৃহদ্ধর্ম পুরাণে এই অমাবস্যাকে তাই দীপান্বিতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৫৫] কার্তিক অমাবস্যার রাত্রিতে দীপ জ্বালান এক অতি প্রাচীন রীতি। জৈন কল্পসূত্র অনুযায়ী এই রাত্রিতে মহাবীরের মহাপ্রয়াণ হয়েছিল, জৈন মতে তিনি পরম "মুক্তি" লাভ করেছিলেন।[৫৬] বিভিন্ন দেবতারা সেই রাত্রিতে দীপ জ্বালিয়েছিলেন।[৫৭] (এই স্মরণীয় ঘটনা মনে রাখবার জন্য, না কি মহাবীরের "মুক্তির" পথ আলোকিত করবার জন্য?)। অন্যদিকে আঠারজন শাসক দীপের আলো জ্বালিয়েছিলেন এই ভেবে যে "প্রজ্ঞার আলো যখন নিভে গেছে, তখন এস আমরা জাগতিক বিষয়গুলিকে আলোকিত করি"।[৫৮] কালক্রমে জৈন সম্প্রদায়, বিশেষত ব্যবসায়িক সম্প্রদায়, এই দিনটিতে জাগতিক বিষয় বা সম্পদের পূজার প্রচলন করেন। মধ্যযুগের প্রথম ভাগে পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে ও মধ্য ভারতের, পূর্ব ভাগে বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত ব্যবসায়ীদের মধ্যে, এই দীপোৎসব জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয়।[৫৯] বর্তমান শতাব্দীতেও লক্ষ্য করা গেছে যে এই উপলক্ষ্যে চারদিনব্যাপী উৎসব শ্বেতাম্বর জৈনরা পালন করেন। এর প্রথম দিনে গহনা প্রভৃতি সম্পদ পরিষ্কার করা হয়; দ্বিতীয় দিনে "ভূত প্রেতেদের" সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে তাদের উদ্দেশে খাদ্য নিবেদন করা হয়; তৃতীয় দিনে অর্থাৎ অমাবস্যার দিন সন্ধ্যাবেলায় হিসাবের খাতার উপরে 'শ্রী' কথাটি লিখে ও একটি টাকা রেখে এবং তার সামনে দীপ জ্বালিয়ে "লক্ষ্মী" পূজা করা হয়, চতুর্থ দিনে আর্থিক বৎসরের আরম্ভ, ব্যবসায়ীদের হাল খাতা লেখা শুরু।[৬০] জৈনদের মতে কার্তিকের অমাবস্যার অর্থাৎ মহাবীরের নির্বাণের পরের দিন থেকে বীর-নির্বাণ অব্দের আরম্ভ।[৬১] তাই জৈনদের, ঐ ধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ীদের এবং ক্রমশ বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক বৎসর গণনের এই রীতি প্রচলিত হয়েছে।

দীপাবলীর উৎসবের রাত্রে অনেক ক্ষেত্রে ধনবানদের জুয়া খেলে অর্থলাভের চেষ্টা করতে দেখা যায়। ধনের উপাসকদের এই বিশেষ রাত্রিকে ধনদেব কুবেরের পরিচারক যক্ষদের নামে যক্ষরাত্রি বলা হয়। দীপাবলী উৎসব তাই যক্ষরাত্রি নামেও খ্যাত।[৬২]

এখানে লক্ষণীয় যে কালীপূজার দিন সন্ধ্যাবেলায় লক্ষ্মীর পূজার ও দীপান্বিতা শ্রাদ্ধ

উম...ম...ম... কি ভালো...

“ভালো তো লাগবেই!
আর কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল
তোমার পক্ষে তো খুবই ভালো!”

ভিটামিন এ, ডি আর ই-র উপকারিতা মেশানো কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল দিয়ে আপনার শিশুকে মালিশ করুন—দেখুন ও কেমন আহ্লাদে খিল খিল করে হাসে।

কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল আপনার শিশুকে রিকেট থেকে রক্ষা করে

রোজ কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল দিয়ে মালিশ করলে ভিটামিন ডি-র অভাবজনিত হাড়ের অস্বাভাবিকতা থেকে আপনার সন্তান সুরক্ষিত থাকবে।

কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল ভিটামিন ই-র অভাব ঘটতে দেয় না

ভিটামিন ই-র অভাব ঘটলে "মাসক্যুলার ডিসট্রোফি" জাতীয় অসুখ করে। রোজ আপনার শিশুকে কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল দিয়ে মালিশ করলে, সে ভয় থাকে না।

কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল ভিটামিন এ-র অভাব রোধ করে

শরীরে ভিটামিন এ-র ঘাটতি হলে শিশু ও বাড়ন্ত বাচ্চাদের ত্বকের নানা অসুখ করে। কিন্তু রোজ কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল মালিশ করলে ভিটামিন এ-র চাহিদা পূরণ হয় ও ত্বকের অসুখও সেরে যায়।

কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল চন্দন ও নিম তেলের গুণেও ভরপুর

চন্দন, নিমতেল ও অন্যান্য উপাদানের গুণে কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল ভরপুর বলে, শিশু ও বাড়ন্ত বাচ্চাদের পক্ষে এটি অত্যাবশ্যকীয়। আজই এক বোতল কিনে ব্যবহার করুন, দেখবেন আপনার সন্তান কেমন সারা বছর সুস্থ শরীরে থাকে।

কেয়ো-কার্পিন বেবী অয়েল

Dey's® দে'জ মেডিক্যাল
যাদের যত্নই আপনার আস্থা

ভিটামিনযুক্ত এই তেলের মালিশ আপনার সন্তানের পক্ষে অপরিহার্য

* এটি কোন প্রসাধন সামগ্রী নয়।

CLARION C-DMBO-1

যে গৃহিনী হাল্কা
ভাজেন এক প্যানে, কড়া
ক'রে ভাজেন অন্যটিতে,
সাঁতলান তৃতীয়তে এবং
প্রেশারে রান্না করেন
চতুর্থ পাত্রে,
তাঁর জন্য তিনটি পরামর্শ...
প্রেস্টীজ
প্রেশার প্যান
দেখুন কত দ্রুত
এটি করতে পারে
কতরকমের কাজ।
এটিতে হাল্কা ভাজা যায়।
এটিতে কড়া
ক'রে ভাজা যায়।
জি.আর.এস
১০০% নিরাপত্তার
জন্য
Prestige
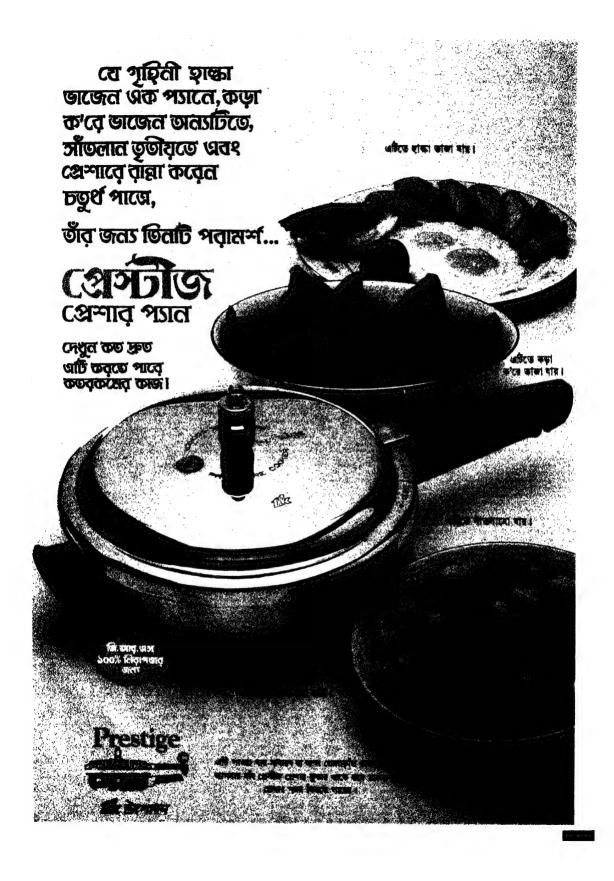
নামের পার্বণ শ্রাদ্ধের প্রচলন আছে।[৬৩] সর্বকামনা সিদ্ধির দেবী কালীর পূজার দিন ধনের দেবীর আরাধনা করা অনুচিত নয়, কিন্তু কার্তিকের অমাবস্যার সন্ধ্যায় লক্ষ্মীকে আবাহনের রীতির প্রচলনে হয়ত কিছু জৈন প্রভাব থাকতে পারে।

কার্তিকের অমাবস্যায় যে কালীর পূজা আমরা করি তাঁর সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা ও রূপকল্পনা মূলত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত, অবশ্য মধ্যযুগে এই সম্বন্ধীয় চিন্তাধারায় কিছু বৌদ্ধ প্রভাব হয়ত পড়েছিল। দীপান্বিতা অমাবস্যার উৎসবে জৈনদেরও দান থাকতে পারে।[৬৪]

দীপান্বিতা কালী শিবের উপরে দাঁড়িয়ে বিশ্বকে বরাভয় দিচ্ছেন। এখানে শিব শব, যা জীবনের সমাপ্তির বা ক্ষয়ের প্রতীক, আবার শিব নিজে মঙ্গলময়, "তাঁর মধ্যে সবাই শায়িত"।[৬৫] কালের শক্তির ধ্বংসলীলার মধ্যে আছে সৃষ্টির বীজ। তিনি অশুভনাশিনী ও মঙ্গলময়ী। কালের বা সময়ের মধ্যে ধ্বংস ও সৃষ্টির যে খেলা চলছে তা তিনি পরিমাপ করতে পারেন, তাই কালের দেবী কালী কালোত্তীর্ণা, সনাতনী।[৬৬]

টীকা

১। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **পঞ্চোপাসনা**, কলিকাতা, ১৯৬০, পৃঃ ২৭৬; প্রতাপাদিত্য পাল, **হিন্দু রিলিজিয়ন অ্যান্ড আইকনোলজি**, লস এঞ্জেলেস, ১৯৮১, পৃঃ ৩।

২। নানা যুক্তি দিয়ে ডাঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা এই পুরাণের তারিখ ত্রয়োদশ শতাব্দী বলে অনুমান করেছেন (**স্টাডিজ ইন দি উপ-পুরানস**, কলিকাতা, ১৯৫৮, খণ্ড নং ২, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ৪৪৮-৪৬১; আর সি মজুমদার **এনসেন্ট হিস্ট্রী অফ বেঙ্গল**, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ৪৮৬-৪৯০)। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে গ্রন্থটির তারিখ ত্রয়োদশ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ পরে (**এ এইচ বি**, পৃঃ ৪৯০)।

৩। **বৃহদ্ধর্ম পুরাণ**, ১, ২৩, ১২-১৪ ও ১৬।

৪। **ঐ**, ১, ২৩, ৪-৫ ও ১০।

৫। **গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা**, ১৩৮৭, পৃঃ ১৮২। এখানে উল্লেখযোগ্য যে যে গণনায় মাস অমান্ত অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশীতে শেষ, সেই গণনা অনুযায়ী দীপান্বিতা অমাবস্যার তিথি আশ্বিন মাসে (ডি সি সরকার, **ইন্ডিয়ান এপিগ্রাফি**, নয়াদিল্লি, ১৯৬৫, পৃঃ ২৫৮)।

৬। **বৃহদ্ধর্ম পুরাণ**, পূর্ব খণ্ড, ১, ২৩, ৬-৮ ও ১৫।

৭। বাণভট্টের **কাদম্বরী গ্রন্থে** আর এক মাতৃদেবী চণ্ডিকার সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে বিন্ধ্যাঞ্চলের শবররা তাঁকে নরমাংস উৎসর্গ করত (পি ডি কানে সম্পাদিত সংস্করণ, খণ্ড নং ১, পৃঃ ২০)। এই সম্পর্কে দেবী চামুণ্ডার উদ্দেশে নরবলি দেবার রীতির বিষয়ে ভবভূতি রচিত **মালতী মাধবের** পঞ্চম অঙ্ক দ্রষ্টব্য।

৮। **ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট**, ১৯৭১, খণ্ড নং ২১, সংখ্যা ১-২, পৃঃ ৮৪-৮৭, চিত্র নং ১১ ও ২৪; পঞ্চোপাসনা, পৃঃ ২৬৪। মধ্যপ্রদেশের বিদিশার নিকটবর্তী পঠারীতে আবিষ্কৃত পঞ্চম শতাব্দীর এক লেখসহ পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ সপ্তমাতৃকা মূর্তিগুলির একটি চামুণ্ডা। এগুলির পাশে উৎকীর্ণ শিবের প্রতিরূপ। চামুণ্ডা সমেত সপ্ত মাতৃকাকে দেখা যায় নাহারঘাটিতে আবিষ্কৃত গুপ্তযুগের লেখ উৎকীর্ণ পাথরের গায়ে (ঐ, পৃঃ ৮৫-৮৬)। সপ্ত মাতৃকার এই দুটি প্রাচীন নিদর্শনে বা তাঁদের সমধিক পরিচিত তালিকায় (জে এন ব্যানার্জী, **ডেভেলপমেন্ট অফ হিন্দু আইকনোগ্রাফি**, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫৬, পৃঃ ৫০৩-৫০৫) আর এক ভয়াবহ মাতৃকা চর্চিকার স্থান নেই (**অগ্নি পুরাণ**) ৫০, ১৭-২১)। তবে যেখানে মাতৃকা সংখ্যা আট বলে কল্পনা করা হয়েছে সেখানে কখনও কখনও ভয়ঙ্করী চর্চিকার উল্লেখ আছে (দীনেশচন্দ্র সরকার, **শিলালেখ—তাম্রশাসনাদি প্রসঙ্গ**, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ৮৯ ও ৯৩)।

৯। **ডি এইচ আই**, পৃঃ ১৮৬-১৮৭; চিত্র পত্র ১০, নং ১১।

১০। **ঐ**।

১১। **ঐ**, পৃঃ ৫০৭; চিত্র পত্র ৪৪, নং ৫।

১২। **মার্কণ্ডেয় পুরাণ**, ৮৭, ৪।

১৩। **ঐ**, ৮৭, ৫-৮।

১৪। **ঐ**, ৮৮, ৫৩।

১৫। এই সম্পর্কে **ডি এইচ আই**, চিত্র পত্র ৪৪, নং ৫; **অগ্নি পুরাণ**, ৫০, ২১-২২; ও **দেবী ভাগবত**, ৫, ২৬, ৩৯-৪০ দ্রষ্টব্য।

১৬। আর সি মজুমদার (সম্পাদক), **দি এজ অফ ইম্পিরিয়াল ইউনিটি**, বোম্বাই, ১৯৫১, পৃঃ ২৫১।

১৭। **মহাভারত**, ভীষ্মপর্ব, ২৩, ৩-৪।

১৮। প্রিয়বালা শা, (সম্পাদক), **বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ**, খণ্ড নং ১, ভূমিকা, পৃঃ ২৬।

১৯। **বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ**, ৩য় খণ্ড, ৭১, ৮।

২০। **ঐ**, ৩য় খণ্ড, ৭৩, ২৭-২৮।

২০ক। **ঐ**।

২১। জে এফ ফ্লিট, **কর্পাস ইনস্‌ক্রিপশিওনুম ইন্ডিকারুম**, খণ্ড নং ৩, কলিকাতা, ১৮৮৮, পৃঃ ৭৫-৭৬।

২২। বরাহমিহির, **বৃহৎ-সংহিতা**, (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত), ৬৭, ১৯; **পঞ্চোপাসনা**, পৃঃ ১৪ ও ৬৪-৬৬।

২৩। বিষ্ণুনারায়ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), **কালিকা পুরাণম**, বারানসী, ১৯৭২, পৃঃ ২৬।

২৪। **কালিকা পুরাণ**, ৫৮, ৪৮, ও ৫৬-৫৮।

২৫। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ **বৃহৎ তন্ত্রসার**: (উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত), কলিকাতা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩১০-৩১১।

২৬। **কালিকা পুরাণ** ৫, ৫২।

২৭। **মার্কণ্ডেয় পুরাণ**, ৮৭, ৫-৮; **দেবী ভাগবত** ৫, ২৬, ৩৯-৪০।

২৮। "শুষ্কবাপীসমোদরা" (**দেবী ভাগবত**, ৫, ২৬, ৪০)।

২৯। ভি ভি মীরাশী। **ভবভূতি**, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ১১।

৩০। ভবভূতি, **মালতীমাধব**, ৫ম অঙ্ক, ২২-২৩।

৩১। এস কোনো ও সি আর লানম্যান, **রাজশেখরস কর্পূর মঞ্জরী**, ২য় সংস্করণ, দিল্লী, ১৯৬৩, পৃঃ ১৭৮-১৭৯।

৩২। রাজশেখর, **কর্পূর মঞ্জরী**, ৪র্থ অঙ্ক, ১৯।

৩৩। এস কে সরস্বতী, **এ সার্ভে অফ ইন্ডিয়ান স্কালপ্‌চার**, ২য় সংস্করণ, দিল্লী, ১৯৭৫, পৃঃ ১৮৯।

৩৪। **পঞ্চোপাসনাতে** উদ্ধৃত বৃন্দাবন ভট্টাচার্যের মত (পৃঃ ২৭৭)। এই সম্পর্কে ২৭৬ নং পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য। "নৈরাত্মা" মানে "আত্মাহীন" অর্থাৎ "শূন্য" যার সঙ্গে বৌদ্ধমতে নির্বাণ পেলে লীন হওয়া যায়। (বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, **দি ইন্ডিয়ান বুদ্ধিস্ট আইকনোগ্রাফি**, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃঃ ২০৩-২০৪)।

৩৫। উদাহরণ স্বরূপ আমরা প্রতাপাদিত্য পালের মতের উল্লেখ করতে পারি (প্রতাপাদিত্য পাল, **উপরোক্ত গ্রন্থ**, পৃঃ ৬৫-৬৭।

৩৬। এই সম্পর্কে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের **বৃহৎ তন্ত্রসার** দ্রষ্টব্য। দশমহাবিদ্যার তালিকার অন্তর্গত তারার উপরে বৌদ্ধ প্রভাব সুস্পষ্ট (প্রতাপাদিত্য পাল, **উপরোক্ত গ্রন্থ**, পৃঃ ৭০)।

৩৭। **বৃহদ্ধর্ম পুরাণে** কালীকে "নিষ্কলা" (১, ২৩, ১৫) অর্থাৎ "কলহীনা" বা "নিরাকারা" (এম মনিয়ের উইলিয়ামস, **এ সংস্কৃত ইংলিশ ডিকশনারী**, পুনর্মুদ্রণ, অক্সফোর্ড, ১৯৬০ পৃঃ ৭১৬) বলা হয়েছে (১, ২৩, ১৫)। এর অর্থ যদি দেবীকে "শূন্যের" প্রতীক বলে চিহ্নিত করে, তবে তা বৌদ্ধ প্রভাবের ইঙ্গিত করতে পারে। তবে কালী সম্পর্কিত মূল ধারণাগুলির উপর বৌদ্ধ প্রভাব নেই। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য কুলের কিছু দেবদেবীও বৌদ্ধ দেব-দেবী মণ্ডলে গৃহীত হয়েছিলেন (বি ভট্টাচার্য, **দি ইন্ডিয়ান বুদ্ধিস্ট আইকনোগ্রাফি**, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃঃ ৩৪৪ ইত্যাদি)।

৩৮। **মুণ্ডকোপনিষদ**, ১, ২, ৪। অগ্নির সপ্তজিহ্বার নাম কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচী।

৩৯। **ঐ**, ১, ২, ৫।

৪০। এম মনিয়ের-উইলিয়ামস, **উপরোক্ত গ্রন্থ** পৃঃ ৮৮৩।

৪১। **ঐ**।

৪২। **কালিকা পুরাণ** ৫, ৫০।

৪২ক। "যামল" শ্রেণীর দ্বাদশ শতাব্দীর বা তার পূর্বের এক গ্রন্থে তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধনার আলোচনায় কালিকা ও বিভিন্ন রূপের কালীর উল্লেখ করা হয়েছে (পি সি বাগচী, **স্টাডিজ ইন দি তন্ত্রজ**, ১ম, ভাগ কলিকাতা, ১৯৩৯, পৃঃ ১০৯-১১৩; এন এন ভট্টাচার্য, **হিস্ট্রী অফ শাক্ত রিলিজিয়ন**, নয়া দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ১২৩)।

৪৩। **ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট**, ১৯৭১, খণ্ড নং ২১, পৃঃ ৮৪-৮৬ ও চিত্র নং ১১ ও ১৬।

৪৪। টীকা নং ৪২ক ও ৫৩ দ্রষ্টব্য।

৪৫। এম মনিয়ের-উইলিয়ামস্‌, **উপরোক্ত গ্রন্থ**, পৃঃ ২৭৮।

৪৬। **ঐ**, পৃঃ ৭৪৫। "মহাকালী" নামটি সাধারণত দুর্গার প্রতি প্রযুক্ত হয়। তবে মহাকালের স্ত্রী দুর্গার সহিত এক হিসাবে অভিন্না কালীকেও এই নামে অভিহিত করা যেতে পারে (এই সম্পর্কে **বৃহৎ তন্ত্রসারঃ**, পৃঃ ৪০৮ দ্রষ্টব্য)।

৪৭। **কালিকা পুরাণ** ২৩, ৫৬। **দেবী ভাগবতে** কৃষ্ণবর্ণা পার্বতীকে কালী ও কালরাত্রি নাম দেওয়া হয়েছে (৫, ২৩, ১-৫)। এই নামকরণের পিছনে **মার্কণ্ডেয় পুরাণে** কথিত কালীর আবির্ভাবের কাহিনীর প্রভাব আছে। রাত্রিকে দেবীরূপে কল্পনা সুপ্রাচীন **ঋগ্বেদে** করা হয়েছে (১০, ১২৭)।

৪৮। **পঞ্চোপাসনা**, পৃঃ ২৭৭।

৪৯। কালীতন্ত্র, **বৃহৎ তন্ত্রসারঃ**, পৃঃ ৩০৮-৩০৯।

৫০। **বৃহৎ তন্ত্রসারঃ**, পৃঃ ৩৬৭।

৫১। **ঐ**, পৃঃ ৩২৪।

৫২। **বৃহদ্ধর্ম পুরাণ**, ১, ২৩, ১৫; এম মনিয়ের-উইলিয়ামস্‌, **উপরোক্ত গ্রন্থ**, পৃঃ ৩১০ ও ১০৭৫।

৫৩। এই সম্পর্কে **বৃহৎ তন্ত্রসারঃ**, পি সি বাগচী, **উপরোক্ত গ্রন্থ** (পৃঃ ১১২-১১৩) ও এন. এন. ভট্টাচার্যের **উপরোক্ত গ্রন্থ** (পৃঃ ১২৩) দ্রষ্টব্য। মধ্য যুগের তন্ত্র আলোচনায় কালীর উপরে অতীতের এমন কিছু ধারণার প্রভাবের রেশ লক্ষ্য করা যায়, যেগুলি থেকে কালী মোটামুটিভাবে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন **বৃহদ্ধর্ম পুরাণ** রচনার সময়। যেমন ভদ্রকালীর এক ধ্যানে তাঁর সর্বগ্রাসী ক্ষুধার ও শুষ্ক দেহের চিন্তা করা হয়েছে (বৃহৎ-তন্ত্রসারঃ, পৃঃ ৩৬৭)। এখানে চামুণ্ডা চর্চিকা বা কালীর আদিম রূপের প্রভাব অনুমান করা যেতে পারে।

৫৪। টীকা নং ৫ দ্রষ্টব্য।

৫৫। **বৃহদ্ধর্ম পুরাণ**, ১, ২৩, ৪।

৫৬। **জৈন কল্পসূত্র**, ১২৩; এইচ জ্যাকবি, **জৈন সূত্রস্‌**, খণ্ড নং ১, অক্সফোর্ড, ১৮৮৪, পৃঃ ২৬৪।

৫৭। **জৈন কল্পসূত্র**, ১২৪; এইচ জ্যাকবি, **উপরোক্ত গ্রন্থ**, পৃঃ ২৬৫।

৫৮। **জৈন কল্পসূত্র**, ১২৮; এইচ জ্যাকবি, **উপরোক্ত গ্রন্থ** , পৃঃ ২৬৬।

৫৯। **এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা**, খণ্ড নং ৩২, পৃঃ ৬০; ভি ভি মীরাশী, **কর্পাস ইনসক্রিপশিওনুম ইন্ডিকারুম**, খণ্ড নং ৪, উটাকামুণ্ড, ১৯৫৫, পৃঃ ১৬০; খণ্ড নং ৬; নিউ দিল্লী, ১৯৭৭, পৃঃ ২৪৪; ইত্যাদি।

৬০। জে হেস্টিংস, **এনসাইক্লোপেডিয়া অফ রিলিজিয়ান অ্যান্ড এথিকস**, ৩য় পুনর্মুদ্রণ, এডিনবার্গ, ১৯৫৫, পৃঃ ৮৭৭।

৬১। ডি সি সরকার, **উপরোক্ত গ্রন্থ**, পৃঃ ৩২১।

৬২। এম মনিয়ের-উইলিয়ামস্‌, **উপরোক্ত গ্রন্থ**, পৃঃ ৮৩৮।

৬৩। **গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা**, ১৩৮৭, বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৮২।

৬৪। **বৃহদ্ধর্ম পুরাণে** কালীকে কেবল জ্ঞানের অধিকারিণী নিষ্কলা বা শূন্যের প্রতীক (?) (টীকা নং ৩৭) এবং শিবা অর্থাৎ পরমা মুক্তির প্রতীক বলে বর্ণনার মধ্যে (১, ২৩, ১৫) আমরা দেবীভাবনায় জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য বিশ্বাসের এক ধরনের একাত্মীকরণের প্রচেষ্টার সন্ধান পেতে পারি।

৬৫। এম মনিয়ের-উইলিয়ামস্‌, **উপরোক্ত গ্রন্থ**, পৃঃ ১০৭৪।

৬৬। এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য এ ডানিএলু, **হিন্দু পলিথিজম**, লন্ডন, ১৯৬৪, পৃঃ ২৭০-২৭৪।

প্রব্রজ্যা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

হাওয়া বলল : নেলসন মান্ডেলা....

আমরা ক'জন দীঘার সৈকতে
গিয়েছিলাম, অনিন্দ্য বলছিল
'মূল্যবোধ থেকেও মাঝেমাঝে
ছুটি নেওয়ার দরকার আছে হে'
বলতে-বলতে হৃদয় থেকে দেহে
ছড়িয়ে গেল পঞ্চমে ধৈবতে,
শুগমুগ্ধ আমরাও এব্রাজে
তুলে নিলাম জয়শ্রী আর তার
সিন্ধুবালুগহ্বরে সেই মিলন।

এমন সময় ডম্বরু বাজিয়ে
হাওয়া বলল 'নেলসন মান্ডেলা',
এক ঝট্‌কায় বালির গুহা থেকে
বেরিয়ে এসে জয়শ্রী নিজেকে
সরিয়ে নিল, আমরা ছুটে গেলাম
যেন প্রলয়সূর্যাস্তের বেলায়
অথৈ জলে তলিয়ে যায় না সে :
হাওয়াই জানে কিসের মন্ত্র নিয়ে
তন্বী সেদিন যোগ দিল সন্ন্যাসে।

পৃথিবীতে কত লোক

রঞ্জন ভাদুড়ী

'পৃথিবীতে কত লোক!' একটি বালিকা বলে ওঠে
যেন-বা আপন মনে। বয়স তিন কি সাড়ে-তিন—
দেয়ালা করার শিশু, কিন্তু বেশ বিজ্ঞ-বিজ্ঞ ভাব,
সুসমঞ্জ স্বরক্ষেপে স্পষ্ট উচ্চারণ—
বাবার সঙ্গিনী হয়ে হাতে হাত ধরে
বেড়াতে বেরিয়েছিল পার্কে খুব সকালবেলায়।
চলতে চলতে আলটপকা বলে উঠেছিল ওই কথা।

অথচ তেমন-কিছু লোকজন ছিল না তখন
পার্কে কিম্বা পরিপার্শ্বে—যা ছিল আঙুলে গোনা যায়
কোথা থেকে কত লোক পেল সেই বিমুগ্ধ বালিকা!
'...কত লোক!' এই কথা বলতে সে কী বোঝাতে চায়!
সংখ্যায় শঙ্কিত, না কি বৈচিত্র্যে বিস্ময়বোধ তার!
আজকাল শিশুরাও দার্শনিক ভারী কথা বলে!

বুড়োরা অতীত দ্যাখে শিশুদের লক্ষ্য ভবিষ্যৎ,
যেখানে অনেক লোক গায়ে গা লাগিয়ে ঠাসাঠাসি
ভিড়ে ভারাক্রান্ত হয়ে ভুলে যাচ্ছে ভালবাসাবাসি,
তাই কি শিশুর কণ্ঠে স্বতোৎসার স্বগতোক্তি এই—
'পৃথিবীতে কত লোক!'? আর
বাকিটা চিন্তার মতো চিরায়ত—থাকে অনুচ্চার।

কিছুই নেবো না আমি

শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুই নেবো না আমি এমনি ফিরে যাবো—
আবার কখনও এলে সব দেখে শুনে শুনে গেঁথে নিতে হবে
এই ভরসায় সমস্ত মাধুরী ও মেধা
বিগত শিল্প চিহ্নগুলির গায়ে জড়িয়ে দিলাম
যে নেবে সে নিতে পারে
না নিলেও দু খ নেই আর নেই

এক জীবনে বহু জ্বালা একলা সয়েছি
যত অবহেলা তর্জনীর তীরে তীরে রক্তে বিঁধে আছে
কালকেউটে ছোবলের বিষ দাঁতে জ্বালা জ্বালা জ্বালা
এত রক্তক্ষরণ আমার প্রাপ্য ছিল না তব...
দুটি নয়নতারায় হয়তো বা ফুটেছিল
নারী হয়ে ওঠার তীব্র অহঙ্কার
এক ঢাল এলো চুলে যাজ্ঞসেনীর মতন
খুব নাকি ক্রোধ জ্বলে ছিল?

কিছুই নেবো না আমি এমনি ফেরত যাবো
স্বামী পুত্রের সংসারে বড় মায়া মুখ তুলে আছে
জলের লতায় জড়িয়ে নিজেকে
শুধু মাগো! তোর মুখখানি একবার দেখে নিতে হবে
কাঁচা কিশোরী ফুলের মতন তোর দুটি চোখ
কুমারী রৌদ্রের ঘ্রাণে ভরা বুকের ওমটুকু ছাড়বো না কিছুতেই

চরৈবেতি

হিমাংশু জানা

বাগানে কার স্বর্ণচাঁপা থাকতো ফুটে,
ছিলো গোলাপ ঊর্ধ্বমুখী,
'পেলে তোমায় হতাম সুখী'
কবে যে কাকে বলেছিলাম,
ভুলেই গেছি।

আঠারো সন নগরবাসী।
নকল হাসি অধরে আহা,
কী তোফা আছি—আপিস করি
জিন্দাবাদ-মুখর পথে!
হাঁকে সময়, 'চরৈবেতি,
চরৈবতি।'

নদীর স্মৃতি লোপাট। চাঁদ
ওঠে তো বটে, কে খোঁজ রাখে!
'পেলে তোমায় হতাম সুখী'
কাউকে যদি বলেই থাকি,
মনে কি পড়ে?

ভালোবাসা পেতে পারি

সুব্রত রুদ্র

একটা জীবন চলে যাচ্ছে, ভালোবাসা
তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো না

শুধু ভালোবাসার জন্যে পড়ে আছি ধুলোয়
যদি দয়া না করো ও রাধাবর্ণ,
আমি মৃত্যু স্পর্শ করি।

ভালোবাসা পেতে পারি এই ভেবে ক্ষুধা তৃষ্ণা
বোধ নেই
এক মাস না-খেলে কী হয়? ভালোবাসা পেতে পারি যদি
একটা জীবন চলে যাচ্ছে, একটা গভীর মায়া
মৃত্যুর আগে জোরে ধাক্কা দিতে শুরু করেছে

ভালোবাসা পেতে পারি যদি চোখ দুটি তুলে
পায়ের নোখে রাখি?
যদি হৃদয় রাখো ততক্ষণ এখানে থাকো...

ভালোবাসা পেতে পারি এই ভেবে মুখে কালি
শিকল পরেছিলাম দু পায়ে
ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ালো বিরহ
আবার সন্ধেবেলা বললো চলো,
দীর্ঘশ্বাস ফেলে এ-মাঠ ছেড়ে, অনন্তকাল আসেনি।

বিষফুল

রতনতনু ঘাটী

একদিন রাত্রে আমি অন্ধকারে দেখি বিষ ফুল ফুটছে,
দেখা মাত্র তার পাপড়িতে জড়িয়ে নিলাম রাত্রি,
দেখে ফেলল একটা ঝিঁঝিঁপোকা—এই ভয়ে
রেণুতে মিশিয়ে নিলাম আমার রঙিন নিশ্বাস।

মৃত্যু-রাত এসে দাঁড়াল মাথার পাশে, আমি
তখন কুয়াশা-শরীর নিয়ে করোটি উপুড় করে খেয়ে নিচ্ছি মদ।
জানি, একটু পরেই তুমি গঞ্জনা মিশিয়ে ডাকলেই
আমি ব্রহ্মাণ্ডটা ছুঁড়ে দেব তোমার ও-মুখে।

আমি বাতাস-ঋতুর স্রোতে ভাসিয়ে দেব তোমার বাগান,
জানতেই দেব না ক'টা বিষ ফুল ফুটেছে কীভাবে!
অভাগীর ছেলে আমি, একটু-আধটু দুঃখ খেতে জানি,
জানি তাই, তোমাকে জানতে দেব না কত বিষ পরাগে জড়ানো!

পরাগ মানেই কিন্তু তোমার দিদির বন্ধুর কথা আসছে না এখানে,
এখন ভীষণ হিম শীত রাতে, বিষে নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম।
দূর গ্রামে কোনো বউ ঘুম-চোখে বাজাল লক্ষ্মী-জাগানো শাঁখ
এইবার রাত্রির কেশরে জড়িয়ে নিলাম আমি বিষ ফুলটিকে!

ভেদসারাৎসার

সৌম্য দাশগুপ্ত

ওটা লেহ্য, এটা পেয়, ওটি শুষ্ক ধূম
অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইনি, উনি লক্কানুন
এখানে পুলি-পায়সান্ন, ওখানে নিমডাল
ইহা ত্যক্ত পরিত্যাজ্য, উহা ভোগের চাল

ইনি তো নারী, উনি রমণী, দোঁহেই মেয়েছেলে
ইহা ভোগ্য, উহা পূজ্য—ঘোষে কি সরখেলে
এটা ভাণ্ড, ওটা পাত্র—ভাণ্ডো—খোলামকুচি
নাহি প্রেম নাহি কাম নিত্য এ-অশুচি

উনি জানেন নিয়ম, ইনি আদবে কৌশলী
ওঁরা সবাই শহুরে হন, ওঁরা মফস্বলী।
এটা চড়বে চিতায়, ওটা বৈদ্যুতিক কলে
নাচের শেষে দুটোরই হাড় যাবে গঙ্গাজলে।

আমার বাড়ির নাম

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

অভিমানী বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা আমার বাড়ির
চলনপথটি আগাছার অপরাধে ঢাকা
রুগ্ন দেয়ালের ফাঁকে দেখা যায় উদাসীন ঘর
বাতাসের মুখঝামটায় খসে গেছে জীর্ণ ক্যালেন্ডার
উঠোনে প্রিয় স্মৃতির পাতা মাড়িয়ে তোমরা যে কেউ
চলে যেতে পারো বেদনার কুয়োতলা, তুলে নিতে পারো
ছায়াম্লান মালতীমাধবী
কোনো গাছ থেকে চুঁইয়ে পড়ে না আর স্নেহমমতার জলবিন্দু
সকালে সন্ধ্যায়
উপেক্ষার দ্বার ঠেলে যদি উঁকি মারো ঘরে
চোখে পড়বে ভাবনার ধুলো জ'মে
প্রতীক্ষায় মৌন এক সাধের আসন

আমার বাড়ির নাম আত্মগোপন
আমি এখানেই জন্মজন্মান্তর ধরে
ঘুমিয়ে রয়েছি।

পুনের ফিল্ম ইন্সটিট্যুট

অরূপরতন ঘোষ

শুটিং-এর আগে ক্যামেরা অ্যাডজাস্টমেন্ট

শত্রুঘ্ন সিনহা, রেহেনা সুলতান, নবীন নিশ্চল—এই সব অভিনেতা-অভিনেত্রী পুনের ফিল্ম ইন্সটিট্যুটের শিক্ষার্থী ছিলেন। বম্বে ফিল্মের লামার আর ফিল্ম ইন্সটিট্যুট যেন পরস্পরের পরিপূরক। পশ্চিমবঙ্গের অনেক মানুষ এই রকমই ভেবে থাকেন। কলকাতা থেকে প্রায় দু হাজার কিলোমিটার দূরে মহারাষ্ট্রের পাহাড়ী শহর পুনে। হিন্দি শব্দ 'পুনা'র বদলে মারাঠি শব্দ 'পুনে'ই এখন প্রচলিত। বড় বড় গাছ, সবুজ ছোট বন, খাদ, পাহাড়, সুইমিং পুল, পুরনো প্রভাত স্টুডিও আর নতুন কিছু বাড়ি এবং চড়াই-উৎরাই পিচের রাস্তা বুকে নিয়ে মনোরম ইন্সটিট্যুট ক্যাম্পাস। দেখতে দেখতে ২৫ বছর বয়স হয়ে গেল এই প্রতিষ্ঠানের। অনেক রূপ ও চিন্তাধারার বদল হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। এখনকার ইন্সটিট্যুট বেশ অন্যরকম। তারকা-নির্মাণ এখন আর করা হয় না। নাসিরুদ্দিন শাহ, শাবানা আজমী, স্মিতা পাতিল এঁরা সব অভিনয় পাঠক্রমের ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন। সাত বছর হলো অভিনয় পাঠক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 'এই ইন্সটিট্যুট থেকে অনেক স্টার বেরিয়েছে'— ইন্সটিট্যুট-এর ডিন (ফিল্মস) শঙ্করমঙ্গলম আমাকে বললেন, পরে একসময় ডিরেকশনের ছাত্র সাগরসঙ্গম সরকার বলল, 'স্টার তো বেরিয়েছে কিন্তু এদের মধ্যে অ্যাক্টর ক-জন ?'

কীভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ শেখানো হয়

ইন্সটিট্যুট-এর কাজকর্ম, পাঠক্রম অনেকটা মস্কোর ফিল্ম ইন্সটিট্যুট এবং 'ইদেক' অর্থাৎ ফরাসী ফিল্ম স্কুলের আদলে তৈরি। ১৯৬০ সালে ফিল্ম এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী পুনে-র 'প্রভাত স্টুডিও'-কে অধিগ্রহণ করে ইন্সটিট্যুট তৈরি করা হলো। ১৯৬১ সাল থেকে এই ইন্সটিট্যুটের কার্যক্রম শুরু হলো। এই ইন্সটিট্যুট করা হলো বম্বের চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক পরিবেশ থেকে একটু দূরে পুনেতে। চলচ্চিত্র নির্দেশনা, চলচ্চিত্র সম্পাদনা, মোশান পিকচার ফোটোগ্রাফি আর সাউণ্ড রেকর্ডিং অ্যান্ড সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং—এই চারটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। তিন বছরের 'ডিপ্লোমা ইন সিনেমা' পাঠক্রমটি। কেবল এডিটিং পাঠক্রমটি দু বছরের। যে কোনো বিভাগের ছাত্রকেই এর প্রতিটি বিষয়ে প্রাথমিক ভাবে জানতে হয় প্রথম এবং দ্বিতীয় সেমিস্টার পর্যন্ত। এটিকে বলা হয় ইনটিগ্রেটেড কোর্স। ফিল্ম মিউজিক, ফিল্ম অ্যাক্টিং এবং ফিল্ম এপ্রিসিয়েশন এই সব বিষয়েও ক্লাস হয়, ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা আছে।

ইনটিগ্রেটেড কোর্সের পর শুরু হয় স্পেশালাইজেশন। তার মানে নির্দেশনার ছাত্র নির্দেশনাই শিখতে থাকে বিশেষভাবে, 'সম্পাদনা'র ছাত্র—সম্পাদনা। প্রতিটি বিভাগ থেকে একজন করে ছাত্র নিয়ে এক একটি ইউনিট গঠন করা হয় ৩য় সেমিস্টার থেকে। এই ইউনিট পারস্পরিক সহযোগিতায় ছোট ছোট ফিল্ম তৈরি করতে থাকে, যেমন—mise en scene এক্সারসাইজ। এই ফরাসী পরিভাষাটির অর্থ সকলেই জানেন—চারদিকের সবকিছু নিয়ে ফুটে ওঠা নাট্যের একটি দৃশ্য বা ফিল্মের একটি ফ্রেম। রাশিয়ান চলচ্চিত্র ঘরানার 'মন্তাজ' তত্ত্বে যেমন দেখা যায় পর পর সাজানো ফ্রেমে তৈরি সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব বেশি, তেমনি। উদাহরণস্বরূপ আইজেনস্টাইনের 'ব্যাটেলশিপ পটেমকিন' ছবিটি লক্ষ্য করলে এটা দেখা যাবে। মিস অঁসিন-এ তেমনই যা কিছু নিয়ে প্রতিটি ফ্রেম তৈরি তার ওপরই গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়েছে। এখন কোনো পরিচালক তাঁর ক্যামেরা-শৈলী তৈরি করার সময় এই দুই মতের যে কোনো একটিতে সাধারণত চলে যান না। প্রয়োজনে দুটির ব্যবহার করে থাকেন। তবে ইন্সটিট্যুটে এই অনুশীলনীতে কেমন করে ছাত্র-ছাত্রীরা দৃশ্যগুলি সাজিয়ে এক একটি ফ্রেমে তিন মিনিটের ছবিটিতে নিটোল ধারাবাহিকতা রাখে তা দেখা হয়। তারপর প্লে-ব্যাক এক্সারসাইজ। একটা প্রচলিত রেকর্ডের গান অথবা কোনো গান কম্পোজ করে সেই গানটিকে নিয়ে চার মিনিটের একটা ফিল্ম তৈরি করতে হবে সাদা-কালো ১২০০ ফুট ৩৬ মি মির-স্টকের মধ্যে থেকে। সাধারণত ছেলেরা জনপ্রিয় হিন্দি গান নিয়েই ছবি করে।

'আঁখো কি আঁখো মে ইশারা হো গয়া/
বৈঠে বৈঠে জিনা সাহারা হো গয়া'।

—'এই গানটাকে নিয়ে আমি ছবি করেছিলাম'। কলকাতার মেয়ে ডিরেকশনের ছাত্রী মন্দিরা মিত্র বলছিল। 'আঁখো কি আঁখো মে ইশারা…' এখানে একটি চোখ ক্যামেরার লেন্স আর একটি চোখ

ইন্সটিট্যুটের ছাত্রের। দুটির মধ্যে যেন কি এক ইশারা হয়ে যায় এখানে এলে। ছবির প্রথমে দেখা যাচ্ছে এক নবাগত ছাত্র অবাক হয়ে ইন্সটিট্যুটের বিরাট গেট দেখছে। তারপর কিছু দিনের মধ্যেই তাকে দাড়ি রাখতে দেখা গেল। হাল-চাল পোশাকে সে আদর্শ FTII-র (ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিট্যুট অব ইন্ডিয়া) ছাত্র হয়ে গেল। সে উইজডম ট্রি-র (একটি আমগাছ) নিচে বসে, ইন্সটিট্যুট-এর জীবন তার কাছে নেশার মতো লাগে। মাঝখানে তাকে একদিন সব যন্ত্রপাতি পুনে থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়। আরো দূর নিয়ে যেতে গেলে সব ব্যবস্থা নিজেকে করতে হবে। সাধারণত সবাই বম্বে পর্যন্ত যায় তবে শশী আনন্দ কলকাতায় এসে শুটিং তুলেছিলেন কলকাতার রিকশা চালকদের নিয়ে তাঁর ডিপ্লোমা ফিল্ম -'ম্যান ভারসেস ম্যান'-এর। ছবিটি ওবেরহাউসেন পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৮১ সালে। পরে রাজন খোসার 'বোধিবৃক্ষ' নামে ডিপ্লোমা ফিল্মটিও 'ওবেরহাউসেন' পুরস্কার পায়। জার্মানির ওবেরহাউসেন গ্রামে শর্ট ফিল্মের প্রতিযোগিতা হয়—পুরস্কারটা ওখানকারই। পৃথিবীর বিভিন্ন ফিল্ম স্কুলের ডিপ্লোমা ফিল্ম, দেখা গেছে কখনো কখনো ছাত্রসুলভ ছায়াছবি ছেড়ে অসাধারণ হয়ে উঠেছে।

ইন্সটিট্যুটে ছাত্ররা ফিল্ম, ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে সরাসরি কাজ করতে পারে। অথচ কলকাতায় ইনডাসট্রিতে টেকনিশিয়ান হয়ে ঢোকা, টিকে থাকা, দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর ঐ সব জিনিসে হাত দেবার প্রশ্ন ওঠে। তাও কতো সাধ্য-সাধনা, একে

দূরদর্শন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ন্ত্রণ-কক্ষ

চিত্র সম্পাদনার কাজ চলছে

জেলে যেতে হয়। (১৯৮৪ সালে FTII-র সব ছাত্র-ছাত্রীকে একদিন পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ)। দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে যাবার পর সে ইন্সটিট্যুটের বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবে—তার জীবনটা কেমন যেন হয়ে গেল।'

এই প্লে-ব্যাক অনুশীলনের বদলে অবশ্য অ্যাড ফিল্ম তৈরি করতে পারে যে কোনো ছাত্র। তারপর একটি ১০ মিনিটের ভিডিও ডকুমেন্টারি করতে হয় ডিরেকশনের ছাত্রদের একই ভাবে একটি ইউনিটের সহায়তায়। শেষ পর্যন্ত এক একটি ইউনিট এক একটি ডিপ্লোমা ফিল্ম তৈরি করে। ৩০ মিনিট সময়ের ৩৬ মি মি সাদা-কালো ছবি অথবা ২০ মিনিটের ১৬ মি মি রঙিন ছবি। সাদা-কালো ৯০০০ ফুট র-স্টক ফিল্মের সঙ্গে ২৮০০/ ৪৩০০ টাকা দেওয়া হয় শিল্পীদের পারিশ্রমিক, যানবাহন, সুটিং-এর স্থান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের জন্য। রঙিন ছবি হলে ২৪০০ ফুট রঙিন র-স্টক এবং প্রায় সাদা-কালো ছবির মতোই অন্যান্য খরচ পায় ছাত্ররা। দু'লক্ষ টাকা দামী 'নাগরা' (শব্দগ্রহণ যন্ত্র), 'অ্যারিফ্লেক্স' ক্যামেরা থেকে আরম্ভ করে শুটিং-এর প্রয়োজনীয়

টিভি ডিসপ্লে-এর সামনে

তাকে ধরা-ধরির ব্যাপার থাকে। এদিকে ইন্সটিট্যুটে ঢুকেই নবীন ছাত্ররা একটা স্লাইড প্রোজেক্ট করে। পুনে শহরের ছবি তুলে ৪০টি ফ্রেমের মধ্যে তারা একটা কনটিনিউইটি বজায় রাখার চেষ্টা করে। পরে দ্বিতীয় সেমিস্টারে এদের একটা কনটিনিউইটি এক্সারসাইজও করতে হয় মুভি ফিল্মে। ফ্রেম থেকে ফ্রেমে কনটিনিউইটি রেখে তা সারা ছবিতে বজায় রাখা যে কি ব্যাপার তা ভালো ছবি না দেখলে বোঝা যায় না। FTII-র এডিটিং-এর ছাত্র শ্যামল কর্মকার বলল, ভারতে একজনই কনটিনিউইটি বজায় রাখতে পারেন তিনি হচ্ছেন সত্যজিৎ রায়।

সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটক

সারা ইন্সটিট্যুটে সত্যজিৎ রায়ের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা; কিন্তু ভালবাসা রয়েছে ঋত্বিক ঘটকের প্রতি। ঋত্বিক ঘটক ১৯৬৪-৬৬ সালে এই ইন্সটিট্যুটের অধ্যাপক ছিলেন। মণি কাউল, কুমার সাহানি, রেহেনা সুলতান, শত্রুঘ্ন সিন্‌হা এদের তিনি পড়িয়েছিলেন। তাঁর কোনো কোনো ছাত্র এখন ইন্সটিট্যুটে পড়াচ্ছেন যেমন চিত্রনাট্যের

চলচ্চিত্র ও দূরদর্শন প্রতিষ্ঠানের ১নং স্টুডিও
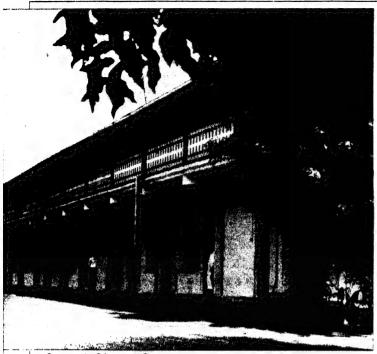
অধ্যাপক সাগির আহমেদ, শঙ্করমঙ্গলম। আমি ইন্সটিট্যুটে থাকাকালীন, গেস্ট লেকচারার হয়ে আসা মণি কাউলকে বলেছিলাম, 'ঋত্বিক ঘটক তাঁর লেখায় আপনাদের ছাত্র হিসেবে পাওয়ার কথা তৃপ্তির সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।' মণিও শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে বললেন, 'আমি ওঁর মতো মানুষ কখনো দেখিনি।' ইন্সটিট্যুটের অ্যাকটিং ডিরেক্টর লাল যশোবানি, স্মৃতিচারণ করতে করতে বললেন, 'আমি ঘটকের ক্যামেরাম্যান ছিলাম। ভোর রাতে তাঁর সঙ্গে কখনো ক্যামেরা কাঁধে করে গেছি পাহাড়ে (ইন্সটিট্যুটের পিছনেই একটা পাহাড় আছে—যার পাদদেশের কিছুটা অংশ ইন্সটিট্যুটের ক্যাম্পাস জুড়ে চড়াই-উৎরাই-এর সৃষ্টি করেছে) ঋত্বিক মাখন রঙের ভোরবেলা তুলবেন ছবিতে। তার জন্য প্রতীক্ষা। ঋত্বিক খুবই প্রতিভাবান ছিলেন কিন্তু এত মদ্যপান করা, ক্লাসে গিয়ে—'রায় কিছু নয়, বার্গম্যান কিছু নয়, কুরোসাওয়া কিছু নয় এই সব বলা, ফিল্ম স্কুলে সিলেবাসের প্রয়োজন নেই।' এমন চিন্তাধারা—এসব নিয়ে শিক্ষক হিসেবে বেশিদিন থাকা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। শিক্ষক ঋত্বিক এখন অতীতের গল্প। কিন্তু তাঁর ছবিগুলি ইন্সটিট্যুটের ছাত্রদের মাতিয়ে দিয়েছে। বম্বের ছেলে অনুপ সিং। বিদায়ী তৃতীয় বর্ষের ডিরেকশানের ছাত্র। শিভিলোভার 'ডেইজিস' দেখার পর FTII students' Hostel-এর তিনতলার বারান্দাতে রাত্রি একটার সময় ওর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ও বলল, ঘটকের ছবির আলো, টেকনিক্যাল কাজকর্ম অপূর্ব, কিন্তু ইন্ডিয়ান সেনসিবিলিটি ওঁর ছবিতে এমন সুন্দর ফুটে উঠেছে যে ভাবা যায় না। তাঁর পথ ধরেছেন মণি কাউল, কুমার সাহানি। আমিও। তারপর ঋত্বিকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল সে। 'সুবর্ণরেখা' সুপারব্। মনে আছে সেই জায়গাটা? ভাঙা বাংলায় ও বললো—'রাত কতো হলো উত্তর মেলে না।' আমরা দু'জনে কিছুদিন আগে পুনর্বার দেখা 'সুবর্ণরেখার' দৃশ্যগুলি মনে করতে লাগলাম। অনুপ মিলিয়ে বলল, 'মাঝে মাঝে ভোরের গান আছে। পুরভৈঁয়া। দুর্দান্ত।'

—সত্যজিৎ রায়ের চেয়েও ঋত্বিক কি তোমার কাছে বড় পরিচালক?

—না, পরিচালক হিসেবে রায়কেই আমি প্রেফার করব কিন্তু ঘটকই ভারতীয় চলচ্চিত্রের ঐতিহ্য বহন করছেন।

ডিরেকশানের ছাত্রদের—একজন অসাধারণ পরিচালককে বেছে নিয়ে তাঁর চলচ্চিত্র শৈলী ও পদ্ধতি সম্পর্কে অধ্যয়নলব্ধ একটা পেপার জমা দিতে হয়। মন্দিরা মিত্র ঋত্বিক এবং বার্গম্যান দুজনকেই বেছেছিল। মন্দিরা বলল, 'ঘটক সিনেমার টেকনিকাল দিকটা জানতেন না, এটা ঠিক নয়, তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন।' ঘটকের ইন্ডিয়ান সেনসিবিলিটির কথাও ও বলল।

ঋত্বিক ঘটককে আমার ভালো লাগে না। অত ইমোশান নিয়ে ছবি করা যায় না। সরাসরি বললো বাংলাদেশের চট্টগ্রামের ছেলে পঙ্কজ পালিত। মোশান পিকচার ফোটোগ্রাফির ছাত্র। বাংলাদেশে 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর শুটিং হচ্ছে। মদ খেয়ে কোথায় পড়ে আছেন ঋত্বিক। একসময় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে এইটা শুট্ করে আনতে পারেনি শুয়োরের—।'

ফিল্ম এডিটিং-এর ছাত্র অর্ধকমল মিত্র একদিন আমায় বলেছিল, ইন্সটিট্যুটের ছেলেরা কথায় কথায় বড় বড় ফিল্ম ডিরেক্টরদের বা তাঁদের ছবিকে নস্যাৎ করে দেয় এটা একদিক থেকে ভালো, আবার একদিক থেকে খারাপ। এই মনোভাবটা অবশ্য ইন্সটিট্যুটে থাকাকালীন বেশ ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম। এদিকে, যশোবানি বললেন, 'পৃথিবীতে তিনজনকে প্রকৃত অর্থে ফিল্মম্যান বলা যায়, এঁরা ফিল্মের সব কিছু বোঝেন। তাঁরা হলেন, বার্গম্যান, রায় ও কুরোসাওয়া।

'পথের পাঁচালী'

১৯৮৬-র ফিল্ম এপ্রেসিয়েশন পাঠক্রমে যোগ দিতে আমি FTII-তে গিয়েছিলাম। পাঁচ সপ্তাহের এই ফিল্ম এপ্রেসিয়েশন পাঠক্রমে গোদারের 'উইক এন্ড' এবং সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' দুটি ছবিকে টেক্সট করে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হলো। ঘটকের 'সুবর্ণরেখা'ও একটু নির্বাচিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। ভারতে ফিল্ম এপ্রেসিয়েশন মুভমেন্টের পথিকৃৎ সতীশ বাহাদুর নিষ্ঠা, দক্ষতা ও ঝরঝরে স্মৃতির সাহায্যে 'পথের পাঁচালী'র বিশ্লেষণ করতে লাগলেন ক্লাস রুম থিয়েটার বা C.R.T-তে—একটু করে ছবি দেখিয়ে, থামিয়ে, মন্তব্য করে। ব্লাকবোর্ডে ছবি এঁকে, ছবির সেমিওলজি বুঝিয়ে। তাঁর করা 'পথের পাঁচালী'র ইংরেজিতে অনূদিত চিত্রনাট্য নোট সহকারে আমাদের প্রত্যেককে দেওয়া হলো। পুস্তিকার ওপরে লেখা 'আর্কাইভ মেটিরিয়াল ফর প্রাইভেট সার্কুলেশন ওনলি'। আর্কাইভ বলতে ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ অফ ইন্ডিয়া, পুনে। ইন্সটিট্যুটের কাছেই তার অফিস। এই আর্কাইভ এবং ইন্সটিট্যুট-এর যৌথ উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত ফিল্ম এপ্রেসিয়েশন কোর্স চলে আসছে। এই নিয়ে বারো বছর হলো এই কোর্স জুন-জুলাই মাসে যখন ইন্সটিট্যুটের গরমের ছুটি থাকে তখন চালানো হয়। ফিল্মের প্রায় সমস্ত দিক সম্পর্কে পাঁচ সপ্তাহে যতখানি বেশি সম্ভব ততখানি জ্ঞান ও উপলব্ধি দেবার চেষ্টা করা হয় অংশগ্রহণকারীদের। এরা যেন সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে সিনেমার সমস্ত কিছু শিখিয়ে দিতে চায়। সতীশ বাহাদুর সুন্দর বোঝাচ্ছিলেন কিন্তু মাত্র দুটি ক্লাসে মোট তিন ঘন্টায় তিনি বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ করলেন। ছোট কোর্স। সময় কম। ডিপ্লোমার ছাত্ররা বলল, আমরা সাতদিন ধরে 'পথের পাঁচালী' বুঝি। বাহাদুর একসময়ে বললেন, সৈয়দ মির্জা ছবির দীর্ঘ নাম দেয়, যেমন 'অ্যালবার্ট পিন্টো কা গুসসা কিউ আতা হ্যায়'। তেমনি এই পথের পাঁচালীরও নাম দেওয়া যেতো। হরিহর রায় মে গাঁও কিউ ছোড়া। হাও ডিড হরিহর রায় কাম টু অ্যাবানডান হিজ ভিলেজ হোম-এরই সূত্র ধরে আমরা 'পথের পাঁচালী'কে বুঝতে চেষ্টা করবো। সতীশ বাহাদুরের শেষ মন্তব্যগুলির মধ্যে একটি ছিল, 'পথের পাঁচালী' ইজ এ

পলিটিক্যাল ফিল্ম। তাঁর বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে ছবিটির ইমেজগুলি, গঠনের সৌন্দর্য ক্রমশ যেন উন্মোচিত হচ্ছিল।

ফিল্ম এপ্রেসিয়েশন

এই ফিল্ম এপ্রেসিয়েশন বা এফ এ কোর্স ছবির আরো নানা দিক সম্পর্কে ধারণা দেয়। যে ক্লাসগুলি হয়েছিল এবার তার বিষয়গুলি হলো বেসিক কনসেপ্টস, কাইণ্ডস অফ ফিল্মস, হিস্টরি অফ সিনেমা, হিস্টরি অফ ইন্ডিয়ান সিনেমা, এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্মস, ডকুমেন্টারি ফিল্মস, হিস্টরি অফ ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টারি, কালার ইন সিনেমা, ফিল্ম মিউজিক, টি ভি সিরিয়ালস, টি ভি ডকুমেন্টারি, ভিডিও ডকুমেন্টারি, পলিটিক্যাল সিনেমা, ফিল্ম ইকোনমিক্স, অ্যানিমেশন ফিল্মস, অ্যাড-ফিল্মস, ফিল্ম সেন্সরসিপ, সিনেমা অ্যান্ড আদার আর্টস, ফিল্ম থিয়োরি ইত্যাদি।

সকাল সাড়ে নটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত ক্লাস চলতো। মাঝখানে আড়াই ঘন্টার বিরতি। চা ও মধ্যাহ্নের আহারের জন্য। আবার বিকেল পাঁচটা থেকে রাত বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ফিল্ম দেখানো হতো বড় প্রেক্ষাগৃহে। একটি ফিচার ছবি ও একটি শর্ট। মাঝে একঘন্টা তিরিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বিরতি। ওই সময়ে নৈশভোজ। পরেই আবার শুরু একটি ফিচার ও একটি শর্ট—বেশির ভাগই বিদেশী, বিশ্ববিখ্যাত সব ছবি—যেগুলি চলচ্চিত্রের বিদেশী বইতে প্রায়ই উল্লেখিত হতে দেখা যায়। কিন্তু কলকাতায় বসে বিশেষ চোখে দেখা যায় না, এত ফিল্ম সোসাইটি থাকা সত্ত্বেও।

ছবিগুলি পাঠক্রমের বা প্রতিদিনের ক্লাসের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে দেখানো হতো। চলচ্চিত্রের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যে সব ছবি দেখা দরকার সেগুলি দেখানো হলো। যেমন মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট-এ ফিল্ম লাইব্রেরির সংগ্রহ থেকে বিশ্ব চলচ্চিত্রের বিবর্তনের ওপর (সেই লুমিয়ের ব্রাদার্সের সময় থেকে) তোলা একটি ছবি, আইজেনস্টাইন-এর ব্যাটেলশিপ পটেমকিন, ইভান দি টেরিবল (রঙিন অংশটি সহ), সিটিজেন কেন পরিঃ অরসন ওয়েলস), ভিইনে-র দি ক্যাবিনেট অফ ডঃ ক্যালিগারি, ডি সিকার বাইসাইকেল থিভস, জন ফোর্ড-এর স্টেজ কোচ ইত্যাদি।

পরীক্ষামূলক ছবি বোঝাতে যা দেখানো দরকার দেখানো হলো। বুনুয়েল-এর আঁ সিয়েন আঁদালু, ম্যাকলারেনের—পা দ দু, হরাইজনটাল লাইনস ভারটিকাল লাইনস, জেমস ব্রো গোলস্টন-এর দি বেড, মায়াডারেনের মেশেস অফ সি আফটারনুন ইত্যাদি।

বিখ্যাত পরিচালকদের শৈলী ও তত্ত্বের পরিচয়সূচক ছবি দেখানো হলো যেমন বার্গম্যান-এর স্মাইলস অফ এ সামার নাইট। ইয়ান চো-র দি রাউণ্ড আপ রেড স্লাম, আন্তোনিওনি-র রেড ডেসার্ট, ফেলিনির এইট অ্যাণ্ড এ হাফ, কুরোসাওয়ার সেভেন সামুরাই, থ্রোন অফ ব্লাড, তার্কোভস্কি-র সোলারিস,

স্টুডিওর ভিতরে সেট সাজিয়ে শ্যুটিং চলছে

মিরর, জানুসি-র ইলুমিনেশন, সোলাস-এর লুসিয়া, ব্রেসোঁ-র উইজারড বালথাজার, ক্যারল কাচিনা-র এ ফানি ওল্ড ম্যান, গোদারের ব্রেথলেস, উইক এণ্ড, পিয়ের লো ফু, ত্রুফোর জুল এ জিম, ফোর হানড্রেড ব্লোজ ইত্যাদি। কিছু ডকুমেন্টারি দেখানো হলো যেমন বেসিল রাইট-এর সঙস অফ সিলোন, সুখদেব-এর ইন্ডিয়া সিক্সটি সেভেন, সত্যজিৎ রায়ের রবীন্দ্রনাথ, এস এন এস শাস্ত্রী-র আই অ্যাম টোয়েনটি, হানসট্রা-র গ্লাস ভ্যার ইত্যাদি।

আর অসাধারণ শর্টগুলো তো আছেই, অ্যালবার্ট ল্যামোরিসের, দি রেড বেলুন, ম্যাকলারেনের এ চেয়ার টেল, লিণ্ডেল-এর বিগ সিটি ব্লুজ, ত্রুফো-র লে মিসণ্ড, হুমজারিক-এর এলিজি ইত্যাদি। C.R.T.-তে ক্লাশগুলির মধ্যেও অজস্র বিশ্ববিখ্যাত ছবির টুকরো টুকরো অংশ, ছোট ছবি হলে গোটাটাই কখনো একবার, প্রয়োজনে দু'বার তিনবারও দেখানো হতো।

এছাড়া কয়েকজন ভারতীয় পরিচালককে তাঁদের সাম্প্রতিক ছবিগুলির প্রদর্শন ও বক্তৃতার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সবাই যাননি। যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা হলেন, জানু বড়ুয়া—পাপড়ি (অসমিয়া ছবি), কেতন মেহেতা—মির্চা মসাল্লা (হিন্দি), বিজয়া মেহেতা— রাও সাহেব (হিন্দি), প্রদীপ কিষেণ—মাসে সাহেব (হিন্দি), কল্পনা লাজমি—এক পল (হিন্দি), কে জি জর্জ—এরাকল (মালয়ালম), শ্যাম বেনেগাল—ত্রিকাল (হিন্দি) এবং আনন্দ পট্টবর্ধন—বম্বে হামারা শহর, প্রিজনার অফ কনসেন্স। ছবিগুলি এক একদিন সন্ধ্যায় দেখানো হতো, পরদিন সকাল সাড়ে ন'টায় শুরু হতো দেড় ঘণ্টা সময়ের 'ফেস টু ফেস উইথ দি ডিরেক্টর'। কখনো কিছু ছদ্ম-বিজ্ঞ প্রশ্ন, কিছু বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন, কখনো প্রায় চুপচাপ ক্লাসরুম, ভালোই লাগেনি ছবি, কী প্রশ্ন করা হবে আর! কখনো ক্ষোভে ফেটে পড়া—যেটা হয়েছিল কেতন মেহেতার বেলায়, সকলে ভেবেছিলো—যে কেতন F.T.I.I.-র প্রাক্তন ছাত্র (জানু বড়ুয়া ও কে জি জর্জও তাই), যে 'ভবানী ভাওয়াই'-এর মতো ছবি করেছে সে নিশ্চয়ই 'মির্চা মসাল্লা'য় একটা ভালো কিছু দেখাবে। কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসের ওপর স্টাডি থাকা সত্ত্বেও 'মির্চা মসাল্লা' একটা ফর্মুলা ফিল্মের বেশি কিছু হয়ে উঠল না শেষ পর্যন্ত। আবার এফ এ কোর্সের ছাত্ররা শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে উঠেছিলো শ্যাম বেনেগালের মুখোমুখি হয়ে। আর্কাইভের ডিরেক্টর পি কে নায়ার হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়ান সিনেমার ক্লাস নিতেন। দাদা সাহেব ফালকে থেকে শুরু দস্ত হয়ে রাজকাপুর পর্যন্ত অজস্র ছবির টুকরো আর স্লাইড ফিল্মোগ্রাফি দেখানো হলো।

সতীশ বাহাদুর ১৯৬৩ সাল থেকে ইনস্টিট্যুটে ফিল্ম এপ্রেসিয়েশন পড়াচ্ছেন এখন রিটায়ার করেছেন। বললেন, 'ভাল সিনেমা সম্পর্কে একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করছি এই কোর্সে। ডিপ্লোমার ছাত্ররা এই এপ্রেসিয়েশন ব্যাপারটা আরো বিশদভাবে পড়ে, বিশেষ করে ডিরেকশনের ছাত্ররা।' বর্তমান প্রফেসর অফ ফিল্ম এপ্রেসিয়েশন সুরেশ ছাবরিয়া, হিস্টরি অফ সিনেমার ক্লাস নিতেন, বললেন, 'সিনেমা সম্পর্কে

একটা বিরাট ইম্পুট দেওয়া হচ্ছে এখানে। এবার নিজেরা চর্চা করে এই জ্ঞান বাড়িয়ে তুলতে পারে। ডিপ্লোমা কোর্সের ফিল্ম এপ্রেসিয়েশনের চেয়ে এই এফ এ কোর্স অনেক ব্যাপক। যেমন ফিল্ম সেন্সরশিপ বা এরকম কিছু বিষয়ের ওপর এমন করে ক্লাস নেওয়া হয় না ডিপ্লোমা কোর্সে।'

অনেকের মতে এ কোর্সে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এত ভালো ভালো ছবি দেখা। প্রায় ১৫০টি ছবি দেখলাম আর ওই রকম সংখ্যক টুকরো ছবি। গম্ভীর ও গভীর চলচ্চিত্রের পাশাপাশি জনপ্রিয় মনোরঞ্জনের চলচ্চিত্র সম্পর্কেও একটু জানা দরকার। জনপ্রিয় চলচ্চিত্র কেন জনপ্রিয়? তাই 'পপুলার এন্টারটেনমেন্ট সিনেমা'র ওপর দুটো ক্লাস হয়েছিল আমাদের। ক্লাসের আগের দিন রাতে সেজন্য 'রাম তেরি গঙ্গা মৈলি' ছবিটি দেখানো হলো। ছবিতে একজায়গায় নরেন্দ্র (নায়ক) নায়িকাকে বলছে, 'গঙ্গা, ইতনে আচ্ছে বড়ি বড়ি বাতে তুমহে শিখাতা কৌন?' গঙ্গা কিছু বলার আগেই দর্শকদের মধ্যে থেকে কে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল—'রাজকাপুর।'

পুনের স্কুল অফ ফিল্ম ক্রিটিসিজম

ফিল্ম এপ্রেসিয়েশন পাঠক্রম ফিল্ম সম্পর্কে যে ভাবে ধারণা করে দেয়, ডিপ্লোমার ছাত্রদের যে রকম ব্যাপকভাবে ধারণা হয়, আর ফিল্ম পঠন-পাঠন পদ্ধতি—সব মিলিয়ে যে স্কুল অফ ফিল্ম ক্রিটিসিজম গড়ে উঠতে পারে বা গড়ে ওঠে তার সঙ্গে বাংলা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হওয়া সমালোচনার মূলত কোনো মিল নেই। ফিল্মের গঠনের দিক থেকে দেখার কোনো চেষ্টা বা ক্ষমতাই নেই তথাকথিত সমালোচকদের। বাংলো কাগজে মুহুর্মুহু নাম ছাপা হয় এমন এক চলচ্চিত্র সমালোচক সম্পর্কে ছাত্র শ্যামল কর্মকার মন্তব্য করলো, 'ওর লেখা পড়ে মনে হয় ওগুলো যেন গোবর। কলকাতার সমালোচকরা ফিল্মের সোসিওলজি নিয়ে মাতামাতি করতে শুরু করে। কিন্তু টেকনিক্যাল ব্যাপারে একদম নয়। কারণ ওটা ওরা জানে না।

ইন্সটিট্যুটে ভর্তির নিয়ম

ইনস্টিট্যুট ফিল্ম মেকার তৈরি করছে। চলচ্চিত্র নির্মাণের কৌশলটা রপ্ত করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বয়সের কোনো বাধা নেই—যে কোনো গ্রাজুয়েট প্রার্থী এখানে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে পারেন তবে একটা লিখিত ভর্তির পরীক্ষা দিতে হবে। কলকাতা, বম্বে, দিল্লি, এলাহাবাদ, গুয়াহাটি, বাঙ্গালোর ও ত্রিবান্দম—এই সাতটি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়। ১ম পত্রে সাধারণ জ্ঞান ও ছোট ছোট গাণিতিক প্রশ্ন থাকে। ২য় পত্রে কিছু সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্রের নাম দেওয়া হয়—যার পরিচালকদের নাম লিখতে হবে। এ ছাড়া রং, শব্দ, দৃশ্য সম্পর্কে কেমন নান্দনিক বোধ আছে তার পরীক্ষা করা হয়—যা খুব প্রাথমিকভাবে চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত। এলোমেলো কিছু ছবি—ঠিক মতো পরপর সাজিয়ে গল্প তৈরি করা। চলচ্চিত্রের কিছু পরিভাষা সম্পর্কে জানতে চাওয়া এই রকম সব প্রশ্ন ঘুরে ফিরে এ পর্যন্ত এসেছে। প্রায় পাঁচশো জন পরীক্ষা দেন। চারটি শাখায় মোট আসন চল্লিশটি। তার মধ্যে আবার প্রতিটি শাখার দুটি করে আসন এশিয়া ও আফ্রিকার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রাখা আছে। কাজেই প্রতিযোগিতা তীব্র। লিখিত পরীক্ষায় সফল এমন ১০০ বা তার কিছু বেশি প্রার্থীকে পুনের ইনস্টিট্যুট ক্যাম্পাসে দুটি অ্যাপটিচ্যুড টেস্ট ও ইন্টারভিউ-এর জন্য ডাকা হয়। প্রার্থীকে পুনেতে গিয়ে থাকতে হবে সম্পূর্ণ নিজের খরচে ও ব্যবস্থায়। অ্যাপটিচ্যুড টেস্টে সাধারণত ফিল্মের অংশ দেখিয়ে কিছু প্রশ্ন রাখা হয়। বিশেষ অ্যাপটিচ্যুড টেস্ট ও একইভাবে হতে পারে আবার বিশেষায়ণ অনুসারে কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে হতে পারে। পরীক্ষার ধরন সম্পর্কে যা বলা হলো তা সবই প্রার্থীদের মুখে শোনা এবং অতীতের। ভবিষ্যতে কী ধরনের হবে তা বলা যায় না। যেমন অ্যাপটিচ্যুড টেস্ট ব্যাপারটা মাত্র দু বছর চালু হয়েছে, ইন্টারভিউ-এর পর ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। সাউণ্ড রেকর্ডিং অ্যাণ্ড সাউণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং শাখায় পড়তে গেলে প্রার্থীকে ফিজিক্স ও ম্যাথমেটিক্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট অথবা ইলেকট্রনিকসে বি এসসি হতে হবে। আর মোশান পিকচার ফোটোগ্রাফির জন্য বিজ্ঞান

বিষয়ে বারো ক্লাস পর্যন্ত পড়া থাকা চাই, গ্র্যাজুয়েশন ছাড়াও।

স্ট্রাইক—ইন্সটিট্যুটের বিষণ্ণ স্মৃতি

ইন্সটিট্যুটের এই বিশাল আয়োজনের মধ্যেও একটা বিষণ্ণ আবহাওয়া ঘুরে বেড়ায়। স্ট্রাইক। ১৯৮৪-র আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে যে স্ট্রাইক হয়েছিল তা এখন ইন্সটিট্যুটের ছেলেরা কথায় কথায় উল্লেখ করে চাপা ক্ষোভের সঙ্গে

'তখন এন ভি কে মূর্তি ডিরেক্টর। গভর্নিং কাউন্সিলের মিটিং হচ্ছে। চেয়ার পারসন মৃণাল সেন উপস্থিত রয়েছেন, আর আছেন তিনজন সদস্য—অশোক আহুজা, কে কে মহাজন, হরিহরণ। এঁর FTII-র প্রাক্তন ছাত্র। এছাড়া তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের জয়েন্ট সেক্রেটারি জাফা এবং গিরিশ কারনাড বলছিলেন, স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অনীক ঘোষ। —আমাদের ছাত্রদের যা দাবি ছিল তা কিছুই মেনে নেওয়া হল না। অনেক দাবি ছিল। তার মধ্যে একটা ছিল, ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা-র মতো আমাদের স্কুলকে পুরোপুরি স্কলারশিপের টাকায় পড়বার সুযোগ দিতে হবে। আর একটা ছিল, ছাত্রছাত্রীরা যে কোনো বিভাগে ভর্তি হয়ে অন্য কোনো বিভাগে চলে যেতে পারবে যদি সিট খালি থাকে। (যেমন কেউ ফিল্ম এডিটিং-এ ভর্তি হয়ে, ফিল্ম ডিরেকশনে পরিবর্তন করে নিল) এ নিয়মটা আগে চালু ছিল কিন্তু হঠাৎ বন্ধ করে দিল এই সুইচ ওভার করাটা। ইত্যাদি আরো অনেক দাবি ছিল। কোনোটাই মেনে নিল না। আমরা মিটিং-এ উপস্থিত দু-জন ছাত্র প্রতিনিধি বললাম, 'আপনারা ছাত্রদের সামনে বলুন। আমরা দুজন ওদের মুখোমুখি হয়ে আপনাদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানাতে পারব না। ওঁরা রাজী নন। বাইরে করিডোরে দাঁড়ানো ছাত্ররা ওঁদের ঘিরতে লাগল। কর্তৃপক্ষ পুলিশে ফোন করলেন। ইন্সটিট্যুটের ইতিহাসে সেই প্রথম পুলিশ ঢুকল এবং আমাদের জেলে নিয়ে গেল। ছেলেমেয়ে সবাইকে। মেয়েদের জন্য পরে এল মেয়ে পুলিশ। খোঁচা মেরে মেরে নিয়ে যাচ্ছিল ওদের। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না একজন মেয়ে এবং মেয়ে পুলিশের মধ্যে কী ভীষণ তফাত। আর কর্তৃপক্ষরা সকলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন গোটা ব্যাপারটা। রাতে আমাদের সকলকেই পুলিশ ছেড়ে দিয়েছিল। পরদিন থেকে আমরা স্ট্রাইক ডেকেছিলাম। একমাসেরও বেশি চলেছিল।

তুলে নিলেন কেন? ওঁরা দাবি মেনে নিলেন?

না। দেখলাম স্ট্রাইক চালিয়ে কোনো লাভ নেই।

স্ট্রাইক তো আগেও হয়েছে এই ইন্সটিট্যুটে?

হ্যাঁ, আগে যারা স্ট্রাইক ডেকেছিলেন তাঁরা আবার পরবর্তী কালে এখানকারই অধ্যাপক হয়েছেন। যেমন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ ডিরেকশান সুরেন্দ্র চৌধুরী, ডিরেকশনের লেকচারার(অ্যাডহক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন) অনিল জাঙ্কর। তাই আমাদেরও ছাত্ররা মাঝে

ক্লাস রুম থিয়েটারে ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন পাঠক্রমে ক্লাস নিচ্ছেন সুরেন্দ্র চৌধুরী

মাঝে সে কথা মনে করিয়ে দেয়। একটু হেসে অনীক বললেন।

গতানুগতিক জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন?

অনীক ডিরেকশনের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ব্যাঙ্গালোরের বাসিন্দা। তরুণ বিবাহিত। বিবাহিতদের হস্টেলে থাকেন। খড়্গপুর আই. আই. টি থেকে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি. টেক., এম. টেক., আমেরিকা থেকে এম. এস.। কিছুকাল চাকরি করার পর ছেড়ে দিয়ে অনীক ইন্সটিট্যুটে ভর্তি হয়েছেন।

ভর্তির সময় ইন্টারভিউ-তে আপনার এই ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড ও চাকরি ছেড়ে আসার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কিছু বলেনি?

বলেনি আবার। আমাকে কুড়ি মিনিট ধরে ওরা বলতে লাগল, তুমি এত ইনসিকিওরড লাইনে আসতে চাইছ কেন?

বলেছিলাম, আমি নাটক করি যে পোটেনসিয়ালিটি নিয়ে তা নিয়ে সিনেমা করলে সাকসেসফুল হব না কেন?

প্রসঙ্গত অনীকের স্ত্রী-ও ব্যাঙ্গালোরে তাঁর ইংরেজি অধ্যাপনার চাকরিটি ছেড়ে দিয়ে পুনেতে এসে এম ফিল পড়ছেন।

আমাদের সমাজে খুব কম মানুষই গতানুগতিক জীবন থকে বেরোনোর কথা চিন্তা করেন। আরো কম মানুষ বেরোতে পারেন। চারপাশের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষকে অতি-সাধারণ ও নিষ্ক্রিয় করে তোলে—এ রকম একটা যুক্তি ও আপাত সত্য বেশির ভাগ মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অনীকের জীবন্ত উদাহরণ তাঁদের কাছে চাবুকের মতো লাগবে।

এডিটিং শেখানো

পশ্চিমবাংলা বা কলকাতার যে সব ছেলে FTII-তে আছে তাদের বেশির ভাগই এডিটিংএর ছাত্র। ডিরেকশনের ছাত্ররা অবশ্য আড়ালে বলাবলি করে FTII-তে ঢোকা সহজ হবে বলে এডিটিং নিয়ে পড়ছে। আসলে ছবি বানানোর ইচ্ছে। এডিটিং-এর লেকচারার ওয়াই কে মাথুর বললেন, প্রথমে আমরা ধরে নিই ছাত্রটির জ্ঞান 'জিরো' লেভেলে আছে—হোয়াট ইজ এ স্টোরি থেকে শুরু করে দু' বছরের শেষে এদের প্রচুর ইম্পুট দেওয়া হয়। এডিটিং-এর অনুশীলনীগুলির মধ্যে একরকম হলো জনপ্রিয় ছবি বা ডিপ্লোমা ছবির এডিটিং-এর জোড় খুলে বা এডিট না করা রাশ প্রিন্ট দিয়ে এডিট করতে বলা হয়। স্টিনবেক, পিক সিঙ্ক, মুভিওলা—এই সব যন্ত্রে ছবি দেখতে দেখতে থামিয়ে আবার চালিয়ে বুঝতে হয় কোথায় ফিল্ম কাটতে হবে আবার জুড়তে হবে। জিজ্ঞেস করলাম, গত দু বছর হলো এডিটিং পাঠক্রম দু বছরের করা হয়েছে আগে তিন বছর ছিল। এটা কেন? মাথুর বললেন,

দেখা যাচ্ছে, দু বছরেই শিখিয়ে দেওয়া যায়, তিন বছর আর লাগে না।

সাউন্ড ডিপার্টমেন্ট

কলকাতার ছেলে চিন্ময় নাথ সাউন্ড রেকর্ডিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র, আমাকে একটা সাউন্ড স্টুডিওতে নিয়ে গিয়েছিল। বাইরে জুতো খুলে ভেতরে ঢুকতে হয়। চিন্ময় ওদের ডিপ্লোমা ফিল্মের শব্দগ্রহণ ও শব্দ প্রয়োগ করছে। মিক্সার মেশিনে বসে ও নাগরা-য় তোলা কিছু sysch শব্দ দুটি পার্টিশানের পিছনের ঘরে রাখা ডাবার মেশিনে জড়ানো ম্যাগনেটিক ইমালশান মাখানো ফিল্মে তুলছিল। শুকনো পাতা মাড়িয়ে যাবার শব্দ হচ্ছিল এক সময়—চিন্ময় বলল—'এটা পাপোষে ঘষে তৈরি করেছি।' ছোট্ট শব্দ-গ্রহণের মেশিন নাগরা। আউট ডোর ও ইনডোর শুটিং-এ প্রাথমিক রেকর্ডিং-এর জন্য নাগরাই ব্যবহার করা হয়। চিন্ময় বলল—'ওইটুকু মেশিনটার দাম কিন্তু দু' লক্ষ টাকারও বেশি। এদিকে এই এতবড় মিক্সারটার দামও ওই রকম।'

'ছেলেরা শুটিং-এর সময় নাগরা নিয়ে সমুদ্রের তীরে, যেখানে ইচ্ছে চলে যায়। এমনও হয়েছে গাড়িতে নাগরাটা ভুলে ফেলে এসেছে পরে কেউ ফেরত দিয়ে গেছে'—বলছিলেন প্রফেসর অফ সাউন্ড রেকর্ডিং অ্যান্ড সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সতীশ কুমার। ইন্সটিট্যুটের প্রাক্তন ছাত্র। ইন্সটিট্যুটে এখন যাঁরা অধ্যাপনা করছেন তাঁদের শতকরা ৮০ ভাগই এখানকার প্রাক্তন ছাত্র। 'যখন ছাত্র ছিলাম তখন এই ল'কলেজ রোড ছিল না। (প্রসঙ্গত FTII এই রাস্তার ওপর অবস্থিত, ঠিকানা—ল' কলেজ রোড; পুনে ৪১১০০৪) কাঁচা রাস্তা ছিল। সাপ ঘুরত'।

চিন্ময় আরো একদিন আমাকে স্টুডিওতে নিয়ে গিয়েছিল। একটা কনসার্টের রেকর্ডিং হচ্ছিল তখন। বড় স্পিকার থেকে খুব চড়া স্বরে আওয়াজ বেরোচ্ছে। কাঁচের পার্টিশানের ওপারে, ফ্লোরে যেখানে বাদকরা বাজাচ্ছেন এবং দূরে—মিক্সার মেশিনের মধ্যে দিয়ে শব্দ গৃহীত হচ্ছে—সেখানে গেলাম আওয়াজটা যেন পাল্টে নম্র স্বভাবের হয়ে গেল। চিন্ময় বলল, 'একদম অন্যরকম শোনাচ্ছে না?' বোঝা গেল স্পিকারে আওয়াজটা বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল, একটু পরেই কনসার্টটা শেষ হয়ে গেল। ড্রাম, অর্গান ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রগুলো ইতস্তত পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে। কোনোটার সামনে মনো-কার্ডিয়াল, কোনোটার সামনে বাই-কার্ডিয়াল কিংবা ওমনি মাইক্রোফোন রাখা, যেগুলি যথাক্রমে একদিক, দু'দিক ও চারপাশ থেকে শব্দ গ্রহণ করতে পারে। এক একটি যন্ত্রের শব্দ এক একটি মাইক্রোফোনের মধ্যে দিয়ে মিক্সারে চলে যাচ্ছে। যেখানে শব্দগুলিকে উঁচু-নিচু করে মিলিয়ে রেকর্ড করার ব্যবস্থা হচ্ছে পিছনের ঘরে রাখা ডাবার মেশিনে। বাদ্যযন্ত্রগুলির মাঝখানে একটি ওমনি মাইক্রোফোন পরিবেশগত একটা সুর ধরবার জন্য দাঁড় করানো রয়েছে। একটু দূরে একটা ছোট কাঠের পার্টিশানের আড়ালে রয়েছে স্যাক্সোফোন। চিন্ময় বলল, 'স্যাক্সোফোন আলাদা একটা চেম্বারে নিয়ে গিয়ে বাজানো উচিত। এর আওয়াজটা এত জোর! কিন্তু এখানে সে রকম ব্যবস্থা নেই।' কাঁচের পার্টিশানের আড়ালে এসে একটা যন্ত্র দেখিয়ে চিন্ময় বলল, 'এটা একটা সফিসটিকেটেড মিক্সার—ই এন কনসোল মেশিন। আলাদা চেম্বারে স্যাক্সোফোন না বাজালেও এ যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ডিং করতে অসুবিধে হবে না। সেক্ষেত্রে প্রথমে স্যাক্সোফোনের শব্দ রেকর্ড করা হবে না। এবং এই রেকর্ডিংটা পরে স্যাক্সোফোনিস্ট তাঁর কানে লাগানো হেড ফোনের মধ্যে দিয়ে শুনতে শুনতে একা একাই স্যাক্সোফোন বাজাবেন। এই মেশিনের সাহায্যে তা আগের রেকর্ডিং-এর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া যাবে সুন্দর ভাবে।

একসময় চিন্ময় অর্গানের ঢাকনাটা খুলে একটা সুর বাজাতে লাগল মনে মনে। ভেসে উঠল অপু-দুর্গার মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটে যাবার দৃশ্য। হরিহর রায়ের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার শেষ দৃশ্য। ও বাজাচ্ছিল 'পথের পাঁচালী'র। থিম মিউজিক।

সতীশ কুমারকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের সাউন্ড স্টুডিও কি সাউন্ড প্রুফ? সতীশ মাথা নাড়লেন না-সূচক ভাবে। তারপর বললেন, 'পুরনো প্রভাত স্টুডিও-র এই সব বাড়িগুলো আর ব্যবহারের উপযুক্ত নেই বলে রিপোর্ট হয়েছে। কিন্তু আমরা এখানেই আছি। যন্ত্রপাতিগুলো যে কত বছরের হয়ে গেল! নতুন যন্ত্রপাতি দরকার।'

মিনি সাউন্ড থিয়েটারে ডাবিং

টিভি কমপ্লেক্স-এর ভেতরেও কিছু ঝকঝকে চকচকে স্টুডিও আছে যেগুলি মূলত টেলিভিশন বিভাগের জন্য। ওখানে মিনি সাউন্ড থিয়েটারে নিয়ে গিয়েছিল এডিটিং-এর ছাত্র অর্ঘকমল মিত্র। তখন ডাবিং-এর কাজ চলছে একটা ডিপ্লোমা ফিল্মের। ছবিটির একটা অংশ বারবার পর্দায় ফুটে উঠছে। সারাদিনের শেষে রাতে বাড়ি ফিরে স্বামী, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে। 'ও ম্যায়নে এক বাত নেই বতায়া, মুঝে গরাজমে নোকরি মিলা'। স্ত্রী বলছে 'সাচ্'। অমল গুপ্তে স্ক্রিপ্ট দেখে দেখে লাইনটা বলছে। অমল গুপ্তে অল্প বয়েসী একটি ছেলে আমাদের সঙ্গে এফ এ কোর্স করতে এসেছিল, কেতন মেহেতার 'হোলি', 'মির্চ মসাল্লা' ছবিতে অভিনয় করেছে। কয়েকবার রিহার্সালের পর ফাইনাল টেক করা হলো। মেয়েটির সংলাপ আগেই টেক করা হয়েছে। সতীশ কুমারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সাউন্ডের ছেলেদের কি তুলনামূলকভাবে জব প্রসপেক্ট বেশি?' সতীশ বললেন, 'সবচেয়ে বেশি ক্যামেরা স্টুডেন্টদের তারপর সাউন্ডের।

মোশান পিকচার ফোটোগ্রাফি

'জব প্রসপেক্ট তুলনামূলকভাবে সাউন্ডের ছেলেদেরই বেশি' মোশন পিকচার ফোটোগ্রাফির লেকচারার অসিজিৎ গাঙ্গুলি বললেন। অসিজিৎ বয়সে তরুণ। ইন্সটিট্যুটের প্রাক্তন ছাত্র—১৯৮১ সালে পাস করেছেন। গোবিন্দ নিহালনির সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যামেরাম্যান হয়ে কাজ করেছেন কয়েকটি ছবিতে। রাতের ছবি দেখার পর সাড়ে বারোটা নাগাদ আমাদের কথা বলবার সময় হলো। 'এখানে যা সুযোগ সুবিধে পায় ছাত্ররা তা পৃথিবীর আর কোনো ফিল্ম স্কুলে পাওয়া যায় না। বিদেশের ফিল্ম স্কুলগুলোয় র-স্টক ফিল্ম, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য ছাত্রদের অনেক টাকা দিতে হয়। অনেক জায়গায় ৩৬ মিমি ফিল্ম ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। ১৬ মিমি বা ভিডিও ক্যাসেটে কাজ সারতে হয়। সিনেমাটোগ্রাফির নানা রকম কাজ ছেলেরা এখানে শেখে। দ্বিতীয় সেমিস্টারে কনটিনিউইটি এক্সারসাইজে, আলোর ধারাবাহিকতা রাখা (পঙ্কজ পালিত ওর কনটিনিউইটি ছবি 'এ সামার আফটার নুন'-এ ভালো কাজ করেছে। আমাকে একদিন এডিটিং রুমে নিয়ে গিয়ে 'সিনবেক' মেশিনে চালিয়ে দেখাল) তারপর ইনডোর লাইটিং, আউট ডোর লাইটিং, বিভিন্ন মুড, যেমন বিষণ্ণ দৃশ্য। খুব ভোর বেলা কিংবা সূর্যাস্তের আলো, নানা রকম স্পেশাল এফেক্ট, আগুনের দৃশ্য, তুষার পাতের দৃশ্য, ঝড়ের দৃশ্য, রাত্রিবেলা, ট্রিক শট, ফ্রন্ট প্রোজেকশন, সাদা-কালো, রঙিন, ৩৬ মিমি, ১৬ মিমি সবই ওরা শেখে।' 'তুষার পাতের দৃশ্য কী ভাবে করা যায়?' 'কিছু গাছ দিয়ে একটা দৃশ্য তৈরি করতে হবে, গাছের পাতায়, ডালে ও অন্যান্য জায়গায় অ্যাডেসিভ লাগাতে হবে। তার ওপর থার্মোকোল জাতীয় হালকা, সাদা কিছু ওড়াতে হবে। এগুলো উড়ে উড়ে পড়ে গাছে ও অন্যত্র আটকে আটকে যাবে। ক্যামেরায় তুষারপাতের দৃশ্য উঠবে। তবে এটা যে এখানে খুব করা হয় তা নয়। তবে ফ্রন্ট প্রোজেকশানটা এখানে ছেলেরা করে। এখন প্রফেসরের পদটি খালি যাচ্ছে তাই অসুবিধে হচ্ছে কাজ করতে। এর মধ্যেই যতটা পারি করি।' অসিজিৎ ছাত্রদের সঙ্গে খুব মেশেন, ছাত্রদের হস্টেলেই থাকেন চারতলার একটা ঘরে।

পৃথিবীর অন্যান্য ফিল্ম স্কুল এবং FTII

তুলনামূলকভাবে এই ইন্সটিট্যুটের সুযোগ সুবিধের কথাটা সত্য। বছরে দুশো টাকা বেতন। তার বদলে হাজার হাজার ফুট ফিল্ম, কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ। তার ওপর চারশো টাকার স্কলারশিপ (সংখ্যা পাঁচটি) পেলে তো কথাই নেই। ডিরেক্টর লাল যশোবানি বললেন, 'আমি ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম। আমাদের ফিল্ম ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য টাকা দিতে হতো।' হাঙ্গেরির ফিল্ম স্কুল থেকে ইয়ানচো মতন পরিচালক বেরিয়েছেন আর এখান থেকে?

—'এই ইন্সটিট্যুটের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য ফিল্ম স্কুলের গুণগত মানের তুলনা?' যশোবানি না বাচক ভাবে মাথা নাড়লেন যেন নানা কারণে তুলনায় যাওয়াটাই ঠিক নয়।

'এই ইন্সটিট্যুট আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এখানে ইউরোপ, আমেরিকা থেকে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র আসে কিন্তু আমরা নিতে পারি না, কারণ এটা এশিয়া ও আফ্রিকার ছাত্রদের জন্য।' শঙ্করমঙ্গলম বললেন।

FTII-র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

'কয়েক বছর আগে প্রস্তাব হয়েছিল এটিকে এশীয় ও আফ্রিকীয় চলচ্চিত্র শিক্ষা কেন্দ্র করে তোলার। তাতে ৬০ জন ভারতীয় ও ৬০ জন বিদেশী ছাত্রের আসন থাকবে। টেলিভিসনের ওপর একটা ডিপ্লোমা পাঠক্রম থাকবে। আরো দশটি ছোট ছোট পাঠক্রম থাকবে। যেমন এনিমেশন ফিল্মের ওপর একটা ছোট পাঠক্রম। এই পরিকল্পনায় ১০ কোটি টাকা করে ইউনেস্কো ও ভারত সরকারের দেবার কথা'—শঙ্করমঙ্গলম বললেন।

—কী হলো এ পরিকল্পনার?

—আমরা চেষ্টা করছি। বললেন উনি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলাম তা হলে তো ভালোই হয়। এখন তো উল্টো কথাই শুনি। প্রশাসনিক সমস্যায় ইন্সটিট্যুট জর্জরিত। ফিল্ম ইন্সটিট্যুট বন্ধ করে দিয়ে একে পুনের টেলিভিসন কেন্দ্র করা হবে—এ রকম আতঙ্কও ছড়িয়ে পড়েছে কিছু ছাত্রের মধ্যে। অধ্যাপক সুরেন্দ্র চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করতে বললেন, না, আর সে চেষ্টা করলেও বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হবে না।

টেলিভিসন বিভাগে

ইন্সটিট্যুটে একটি ছাত্রের জন্য বছরে খরচ হয় এক লক্ষ টাকা। বছরে মোট খরচ এক কোটি টাকা—জানালেন ডিরেক্টর যশোবানি। এই মোট খরচ কিন্তু ফিল্ম এবং টেলিভিসন দুটি শাখার জন্যই।

এই ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিসন ইন্সটিট্যুট অফ ইন্ডিয়া ভারত সরকারের একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা। টেলিভিসন শাখাটি দিল্লি থেকে ১৯৭৪ সালে অক্টোবর মাসে পুনে-র ফিল্ম ইনস্টিট্যুটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। FTII-র টেলিভিসন শাখার জন্য সুন্দর ঝকঝকে লাল সাদা রঙের টেলিভিসন কমপ্লেক্সে টিভি-তে কর্মরতদেরই কেবল ১০০ দিনের ট্রেনিং দেওয়া হয়। বাইরের কাউকে নয়। সেখানে নানা সমস্যা দেখা দেয়। যশোবানি বলতে লাগলেন, এই যে আপনি আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, ছোট ছোট প্রশ্ন করে আমাকে বলতে উদ্বুদ্ধ করছেন। নিজে বেশির ভাগ সময় শুনছেন। টি ভি-তে ইন্টারভিউ নেবার সময়েও যে দর্শক যার ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে তাকেই বেশি দেখতে-শুনতে চায়, যিনি ইন্টারভিউ করছেন তাঁকে নয়।—এ সব শেখাতে গেলে কিংবা টিভি প্রোগ্রাম প্রস্তুত করার অন্যান্য কিছু কিছু ব্যাপার শেখাতে গেলে শিক্ষার্থী টি ভি কর্মীরা আপত্তি করেন। বলেন, 'আমরা এতদিন টি ভি-তে চাকরি করছি। আমরা জানি না টি ভি প্রোগ্রাম কী করে করতে হয়?'

নিশ্চয়ই জানেন। তাই তো ভারতীয় টি ভি

ইনডোর শুটিং

প্রোগ্রামের আজ এই রকম চেহারা। যশোবানি বললেন, 'টেলিভিশনের দিন আসছে। কেবল টি ভি সিনে ভিসন আরো টি ভি-র নানা রূপ জন-মাধ্যম এবং জন-শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ভারতে আসছে। যশোবানি ডিরেক্টরের কার্যভার নেওয়ার আগে টি ভি শাখার 'ডিন' ছিলেন।

কালার ল্যাব

FTII-তে একটা কালার ল্যাব-এর বাড়ি আছে। সরকার অনুমতি দিয়েছিলেন তাই নতুন বাড়িটি তৈরি হয়েছে। কিন্তু সরকার আর টাকা দিচ্ছেন না ল্যাব-এর সরঞ্জাম কেনার জন্য শঙ্করমঙ্গলম, মাথুর দুজনেই বললেন। এখনও FTII-র রঙিন ছবি প্রসেস বম্বে থেকে করে আনতে হয়।

প্রভাত স্টুডিও

পুনে স্টেশন থেকে সাত কিলোমিটার দূরে বহু ছবি প্রস্তুত করা এক কালের 'প্রভাত স্টুডিও'। যেখান থেকে গুরু দত্তের ছবিগুলি তৈরি হতো। স্টুডিও একটি চরিত্র হয়ে উঠত ওঁর ছবিতে। 'কাগজ কে ফুল' ছবিতে যেমন—সিনেমার নায়ক গুরু দত্ত। প্রভাত স্টুডিওতে তাঁর নানান ছবির শুটিং হচ্ছে। জুটি হয়ে এসেছেন ওয়াহিদা রেহমান। তারপর নায়কের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ পতন। অর্থকষ্ট। এদিকে ওয়াহিদার জয়-জয়কার। অবাঞ্ছিত, প্রবেশ অধিকারহীন নায়কের প্রভাত স্টুডিওতেই মৃত্যু। সেই প্রভাত স্টুডিওর পরবর্তী রূপ FTII-তে বসে প্রভাতে তৈরি ছবিগুলি দেখতে দেখতে গত পঁচিশ বছরে ফিল্ম ইন্সটিট্যুট চলচ্চিত্র চর্চার যে ঐতিহ্য তৈরি করেছে তার সঙ্গে একটা ইতিহাসের ছায়াপথ যেন দেখা যায়।

যোগাযোগ অবশ্য আর এক ভাবেও আছে। অনেকগুলি কুকুর আছে FTII-তে। সুরেশ ছাবরিয়া বলেন, এগুলি প্রভাতের আমল থেকে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। একটি কুকুরের নাম 'সফ্‌টি'। সে প্রায় প্রতিটি ছবি দেখানোর সময়ই প্রেক্ষাগৃহে ঢুকে পর্দার সামনে চলে যেত। তারপর...হয়তো 'গ্রেট ডিকটেটর' ছবিতে চ্যাপলিন 'হিটলারে'র ভূমিকায় প্রচুর বক্তৃতা দিচ্ছেন তখনই সফ্‌টি চিৎকার আরম্ভ করে দিল। ও একদিন মণি কাউলের ফিল্ম থিয়োরির ক্লাসে ঢুকে পড়েছিল। মণি বললেন, 'আমার বক্তৃতার আকর্ষণেই ও এসেছে।'

'ডাবার মেশিন'-এ শব্দ গ্রহণের প্রস্তুতি

ইন্সটিট্যুটের আবহাওয়া

ইন্সটিট্যুটের ভেতরে কোনো ধুলো নেই। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া (যখন গিয়েছিলাম—জুন-জুলাই মাসে) মাঝে মাঝে সকালবেলা এমন সুন্দর হাওয়া দিত যে কারুর সঙ্গে দেখা হলে আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করাই ঠিক মনে হতো। একদিন এমন সকালে দুই বাঙ্গালোরের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতেই, সুপ্রভাত বলে আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করলাম। ওরা বলল, 'এখন সত্যিই যেন বাঙ্গালোরের আবহাওয়া; হাওয়ায় একটা আমগাছের পাতা কাঁপছিল, নড়ছিল। এই আমগাছটি মিউজিক রুমের সামনে আছে, নিচেটা সান বাঁধানো গোল। এর নাম 'বোধিবৃক্ষ' বা 'উইজডম ট্রি'। FTII-র ছাত্রদের প্রাণকেন্দ্র। শিক্ষকদেরও মাঝে মাঝে দেখি এসে বসছেন, ছাত্রদের সঙ্গে গল্পসল্প করছেন, অথবা চুপচাপ। সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের এখানে দেখা যায় গল্প, আলোচনা, বইপড়া, শুয়ে থাকা বা বাজনা শুনতে ব্যস্ত। বিশেষত রাতের দিকে পিছনের মিউজিক রুম থেকে প্রচণ্ড জোরে বাজান হয় নানান পশ্চিমী যন্ত্রসঙ্গীতের সুর।

ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে সম্পর্ক এখানে খুবই সহজ অথবা 'ফ্রি'। ছেলেদের ও মেয়েদের হস্টেল যদিও একটু দূরে তবুও পরস্পরের হস্টেলে, ঘরে খাওয়া বা থাকা এখানে নিষিদ্ধ ব্যাপার নয়। বাইরে থেকেও বন্ধু বান্ধবীরা এসে থাকে। অর্ঘ বলল, 'এই ফ্রি-নেসটা খুব স্বাস্থ্যকর। মন্দিরা বলল, 'আমরা একসঙ্গে মিলে কাজ করি, ফ্রি-নেস তো দরকার। স্বাভাবিক।'

একদিন রাতের ছবি শেষ হবার পর সাড়ে বারোটা নাগাদ আখতাব বাসা এসে আলাপ করল। ও FTII থেকে ডিরেকশন নিয়ে ১৯৮১ সালে পাস করেছে। বলল, 'এখন তো ছেলে-মেয়েরা স্বাভাবিক ভাবে আছে। আমাদের সময় কী দিন গেছে! ফিলিপাইনস থেকে একটি ছেলে ও মরিসাস থেকে একটি মেয়ে এখানে পড়তে এসেছিল। এখানে থাকতে থাকতে তাদের বিয়ে হলো, একটি ছেলে হলো। ছেলের নাম "প্রভাত" রেখে তারা পাঠক্রম শেষ করে বেরিয়ে গেল।'

শ্যামল একদিন ইন্সটিট্যুটের গেটের কাছে বিরাট গাছটি দেখিয়ে বলল, 'এখানে নাসিরুদ্দিন কে র‍্যাগিং করা হয়েছিল। ও বলেছিল এন এস ডি থেকে ও এসেছে। কী নাটক করেছো ওখানে? হ্যামলেট। গাছে ওঠো, তারপর গোটা হ্যামলেটটা করিয়েছিল ওকে দিয়ে। এখন আর তেমন র‍্যাগিং নেই। সম্ভবত এ বছরে আমি র‍্যাগিং-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবো।'

FTII-র যে কজন ছাত্রী আমার চোখে পড়ল সকলেই খুব সিগারেট খায়। চারজন ছাত্রকে খুঁজে পেলাম যারা ধূমপান করে না। ক্লাসের ভেতরে সিগারেট ধরানো কোনো ব্যাপার নয়। সমাজবিজ্ঞানে যাকে বলে 'একালচারাইজেশন' এখানে তাই হয়েছে। অথবা কসমোপলিটন কালচারও বলা যায়—অর্থাৎ নিজস্ব সংস্কৃতি সরিয়ে একটা মিলিত সংস্কৃতি গড়ে তোলা। কারুর চোখে হয়তো মনে হবে এ সংস্কৃতি পশ্চিম ঘেঁষা।

FTII-তে প্রতিদিন একাধিক ছবি দেখানো হয়। সারা পৃথিবীর ছবি। শুধু পশ্চিম পৃথিবীর নয়। জাপান, ল্যাটিন আমেরিকার ছবিও তাঁর মধ্যে আছে। ফিল্মের ছাত্ররা। ছবি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে। ছবির নান্দনিক টেকনিক্যাল দিক খুঁটিয়ে লক্ষ করতে করতে ছবির পাত্র পাত্রীদের জীবন প্রণালী, সমাজ-এর প্রভাব তো মিশবেই ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সঙ্গে। তার ওপর FTII ক্যাম্পাসের ভেতর ও বাইরেটা যেন দুটো আলাদা পৃথিবী। দুই পৃথিবীর মানুষ সম্পূর্ণ অন্যরকম চিন্তা ভাবনা করে। গোদারের 'উইক এণ্ড' ছবিতে দেখানো ক্যানিবালিজম, বার্গম্যানের ঈশ্বরতত্ত্ব, আন্তোনিওনির চরিত্র রূপায়ণ, ফরাসি নোভেল ভাগ বা নিউ ওয়েভ, ইনটেলেকচুয়াল মন্তাজ, ওয়াইড লেন্সের কায়দা, ওবেরহাউসেন আর কান্ ফেস্টিভালে পুরস্কার পাওয়া—এই সব চিন্তা ভাবনা নিয়ে যাদের রাত ভোর হয়, ছাত্র অবস্থায় থাকাকালীন বাইরের সঙ্গে তাদেরও মাঝে মধ্যে সংঘাত হয়। যেমন একটা উদাহরণ ইনস্টিট্যুটে গিয়ে দেখলাম পাঁচটি ছেলে নেড়া হয়ে গেছে তার মধ্যে চারজন কলকাতার। কারণ হিসেবে ওরা বলল, 'এমনি, আসলে বাড়ি ফিরে তো আর নেড়া হওয়া যাবে না।' আসল কারণ—ওদের কোর্স শেষ, ডিপ্লোমা ফিল্ম জমা দিয়ে ইন্সটিট্যুট ছাড়তে হবে, ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে বাইরের বাস্তবে অথচ মনের মধ্যে ইন্সটিট্যুটের পরিবেশ স্বপ্নের মতো হয়ে উঠছে। ইন্সটিট্যুটে যেমন ভাবে ফিল্ম, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেত বাইরে তেমনভাবে যাবে না। আরো অনেক সমস্যার সামনে পড়তে হবে বাইরে গেলেই। তাই সাংঘাতের আশঙ্কা—যা এই ব্যবহারের পেছনে অর্ন্তলীন বলে মনে হয়।

ফিল্ম ইন্সটিট্যুট ও ফিল্ম ইনডাসট্রি

দু ধরনের স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে FTII-র ছেলেরা প্রথমটি আইজেনস্টাইন, বার্গম্যান হয়ে ওঠার। দ্বিতীয়টি হচ্ছে এমন ছবি করার যা বাজারে খুব চলবে, যার ফলে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা যাবে। অনেক ছাত্ররা এই দ্বিতীয় স্বপ্নটিকে বাস্তবায়িত করে তুলছেন FTII থেকে বেরিয়ে, কেউ ইচ্ছে করে, কেউ বাধ্য হয়ে কারণ শিল্পকে পণ্য করে তোলার জন্য ফিল্ম ইনডাসট্রির লোকেরা এমন উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। 'এরাকল' (মালয়ালম) ছবিটি দেখানোর পর তার পরিচালক কে জি জর্জ তাই আমাদের সঙ্গে 'ফেস টু ফেস'-এ প্রথমেই বলে নিলেন, 'আমি পেশাদার চিত্র নির্মাতা। ইন্সটিট্যুটে থাকাকালীন ভালো ভালো ছবি দেখতে দেখতে মনে হতো ঐ রকম ছবি তৈরি করা খুব সহজ কিন্তু ইন্সটিট্যুট থেকে বেরিয়ে ইনডাসট্রিতে যোগ দিয়ে বাস্তব কী জিনিস বুঝলাম।'

শ্যামল ছেলেটি হাসিখুশি, উৎসাহী, ইন্সটিট্যুট সম্পর্কে গর্বিত। ইন্সটিট্যুট থেকে বেরিয়ে যাঁরা নাম করেছেন—এমন কিছু নাম ও বলছিল। বলল, 'মিঠুন, আসরানি, এমন কি ড্যানিও এখানকার ছাত্র। আমরা অবশ্য মিঠুনকে রিকগনাইজ করি না। নাসিরুদ্দিন, শাবানা আজমী এখনো ভালো ছবির জন্য লড়ে যাচ্ছেন। জানি না আমি কী করব? হয়তো কমার্সিয়াল সেটআপেই কাজ করব।'

শ্যামল এডিটিং-এর ছাত্র কিন্তু ওর ইচ্ছে ছবি পরিচালনা করা। FTII-র অধিকাংশ ছাত্রেরই ইচ্ছে কোনো না কোনোদিন ছবি পরিচালনা করার তা সে এডিটিং, ফোটোগ্রাফি যে শাখারই ছাত্র হোক না কেন। একদিন ফিল্ম ইকনমিক্সের ক্লাস নিতে এসেছিলেন প্রযোজক গুল আনন্দ। বললেন, 'আপনারা যাই ফিল্ম করুন না কেন মনে রাখবেন টাকাটা যেন ফেরত আসে। টাকা ফেরত না এলে আপনি পরবর্তী ছবির জন্য প্রযোজক পাবেন না। যদি ১৬ মি মি-এ ছবি করেন তো খুব সাবধান। আমাদের দেশে ১৬ মিমি টেকনোলজি ভাল নেই। তবে বিদেশে শর্ট ফিল্মের প্রচুর চাহিদা আছে।' পঙ্কজ পরাশর পরিচালক ওঁর কাছে ছবি করছেন। ওঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। ভিডিও-তে তাঁর করা একটা ছবির ট্রেলার দেখালেন। দেখলাম চিরাচরিত নায়কদের মতো নাসিরুদ্দিন আজগুবি সব লাফ দিচ্ছেন, মারপিট করছেন। পঙ্কজ FTII-র প্রাক্তন ছাত্র। বললেন, 'পাস করার পর আমাকে হন্যে হয়ে প্রোডিউসার খুঁজতে হয়েছিল। গুল আনন্দ বলেছিলেন, FTII-র ছেলেরা ইডিয়ট। ওদের ছবি সম্পর্কে আকাশ কুসুম ধারণা থাকে। তারপরে উনি ছবি করতে দিলেন। আনন্দ বললেন, 'আমি অমিতাভ বচ্চনের চামচা হতে চাই না। তাই নাসিরকে নিয়েই ছবি করছি। তাঁর ছবির নমুনা দেখলাম।

দীপ্তি নাভালকে নিয়ে একটি সিকোয়েন্স

প্রসঙ্গত গুল আনন্দ একটি ঘটনা বললেন। বিদেশে কোনো একটা উৎসবে পোলিশ পরিচালক রোমান পোলানস্কি 'এক বার ফির' ছবিটা দেখতে দেখতে বললেন, 'মেয়েটি (দীপ্তি নাভাল) তার প্রেমিকের কাছে যেতে এত দেরী করছে কেন?' শেষ পর্যন্ত তিনি ধৈর্য হারিয়ে প্রেক্ষাগার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। বিদেশে 'এক বার ফির' একদম চলল না।

দীপ্তি নাভালের মুখটা একটু ম্লান হয়ে গেল। ক্লাসে বসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে এফ এ কোর্স করতে এসেছিলেন দীপ্তি। ওঁর স্বামী প্রকাশ ঝা FTII-তে কয়েক মাস পড়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এফ এ কোর্সের অনেকেই অবাক দীপ্তি এসেছেন দেখে। দীপ্তি খোলাখুলিই বললেন, 'ফিল্ম সম্পর্কে আমি সিরিয়াসলি বিশেষ জানি না। এখানকার এই কোর্স খুব ভালো লাগল। সামনের বছর আমি আবার আসব। প্রত্যেকেরই এই কোর্সে আসা উচিত।'

প্রোডিউসারদের?

প্রোডিউসারদের তো বটেই। স্রেফ কিছু টাকা আছে, আর বম্বেতে এসে প্রোডিউসার হয়ে

বসেছে।

দীপ্তিকে নিয়ে FTII-র ছেলেরা হাসাহাসি করত। বলত, 'ও বোলা অরসন ওয়েলস কোন হ্যায় ? রাইটার ? ও অরসন ওয়েলস এইচ জি ওয়েলস কো সাথ এক কর দিয়া।'

সিনেমা ফর দি পিউপিল

আমরা যখন এফ এ কোর্স করতে যাই (২৩শে জুন—২৬শে জুলাই) তখন গরমের ছুটি চলছিল ইন্সটিট্যুটের। বিদায়ী তৃতীয় বর্ষের কিছু ছেলেমেয়ে থেকে গিয়েছিল ওদের ডিপ্লোমা ফিল্ম তৈরি সম্পূর্ণ করে জমা দেবার জন্য। দ্বিতীয় বর্ষের কয়েকজনও অবশ্য ছিল। এদের ভিড়ে একটি ছেলেকে অন্যরকম লাগত। ছোট ছোট চুল। কিছুদিন আগেই নেড়া হয়েছিল। একটা জীর্ণ জ্যাকেট পরা। খুব লম্বা, হাঁটতে কষ্ট হয় একটা অ্যাক্সিডেন্টের জন্য। বললেন, আমার নাম সিদ্ধার্থ চিত্ত। আমার গুরু চিত্ত প্রসাদ। তাঁর নাম আমি গ্রহণ করেছি। পৈতৃক পদবী 'দত্ত'। সিদ্ধার্থ ১৯৭৬ সালে এডিটিং নিয়ে পাস করেছেন। 'পুনশ্চ পর্ব' নামে একটা ছবি করেছেন ১৬ মিমি-তে। তাতে শ্রীলা মজুমদার অভিনয় করেছেন। সিদ্ধার্থ বললেন, 'গত ফেস্টিভালের জন্য ইন্ডিয়ান প্যানোরামায় ইন্ডিয়ান মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন আমার ছবিটা দেখলো না পর্যন্ত ১৬ মি মি বলে। কী বলুন তো ? অথচ কান্ থেকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে তাদের ছবিটা ভালো লেগেছে, তবে তারা আমার পরবর্তী কোনো ছবি সম্পর্কে আগ্রহী।

—এ ছবিটা কান্-এ দেখানো হলো না কেন ?

—এতে টেকনিক্যাল ফিনিস এর একটু অভাব ছিল। সিদ্ধার্থ বললেন, দেখুন সত্যিকারের ভালো ছেলেরা কিন্তু ছবি করছে না। চাপা দুঃখের সঙ্গে বললেন, আমরা চিরকাল আণ্ডারগ্রাউণ্ড ফিল্ম মেকার হয়েই থাকব, ওভারগ্রাউণ্ডে কোনোদিনই আসব না। ওসব 'নন্দন' করে সত্যিকারের সিনেমার উন্নতি কোনোদিনই হবে না। সিদ্ধার্থ এখন ফিল্ম আর্কাইভে ভারতীয় ছবির ডকুমেন্টেশন ও নাইট্রেট বেস ফিল্মের ওপর রিপোর্ট করে ফ্রি লান্সার হিসেবে। FTII-র হস্টেলেই থাকে। ওঁর বাবা বিমল দত্ত বম্বেতে থাকেন, ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত। নাট্যকার। 'আমি উপন্যাস লিখি। ছড়া লিখি। আবার একটা ছবি তৈরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। তবে আমরা আণ্ডারগ্রাউণ্ডেই থাকবো।' এবার আর গলায় দুঃখের ভাবটা নেই। বরং কিছুটা গর্ব ও প্রত্যয় আছে।

আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকবেন বলছেন, আবার কান্-এ ছবি পাঠাচ্ছেন কেন ? কী উদ্দেশ্যে ? ওখান থেকে স্বীকৃতি বা প্রশংসা পেয়ে ওভারগ্রাউণ্ডে আসবেন বলেই তো ?

ঘাড় নাড়তে লাগলেন সিদ্ধার্থ। বললেন, কানে ছবি আমি পাঠাইনি NFDC পাঠিয়েছে।

—NFDC পাঠালেও আপনার অনুমতি নিশ্চয়ই তাতে ছিল ?

সিদ্ধার্থ বললেন, দরজাটা বন্ধ করুন একটু। হস্টেলের সিঙ্গল সিটেড রুমের দরজাটা বন্ধ
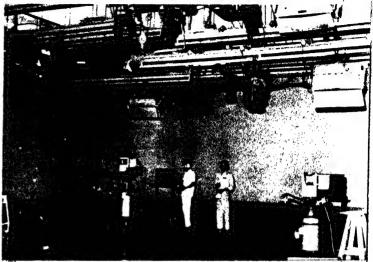
টেলিভিশন বিভাগের একটি স্টুডিও

করলাম। সিদ্ধার্থ বললেন, 'আমি ঠিক করেছি একটা ছবি করব। তাতে পর্দায় আমাকে দেখা যাবে। আমি সেখানে ঘোষণা করব 'দিস ইজ দি সিনেমা ফর দি পিউপিল'।

সিদ্ধার্থর ছবিটা আমার দেখা হয়নি। আর্কাইভে রাখা আছে। কলকাতায় 'শিশির মঞ্চে' আর্কাইভের প্রদর্শনে একবার দেখানো হয়েছিল।

FTII-এর স্টুডিও

ফোটোগ্রাফি ও এডিটিং-এর স্টুডিও-তে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে পঙ্কজ পালিত আমাকে নিয়ে যেত স্টুডিও দেখাতে। স্টিনবেক মেশিন, পিক সিঙ্ক, মুভিওলা, রক অ্যান্ড রোল সিস্টেম, ফিল্ম প্রসেসিং-র ব্যবস্থা এই সব রয়েছে। এক নম্বর ও দু' নম্বর স্টুডিও-র ভেতরে পরিত্যক্ত সেট—হয়তো একটা ড্রয়িং রুম কিংবা বাড়ির ঠিক সামনেটা। বড় ছোট অজস্র আলো চুপচাপ

ডিজাইন এন্ড গ্রাফিক্স—এখানকার শিল্পীরা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের প্রয়োজনীয় ছবি এঁকে দেন

দাঁড়িয়ে আছে। কোনোটির ক্ষমতা ১০ হাজার কে (কিলোওয়াট) অর্থাৎ তার আলো দিনের আলোর সমান। ক্রেন, ট্রাক, স্টুডিওতে যা যা থাকা দরকার সবই আছে FTII স্টুডিওগুলিতে। তবে বেশির ভাগই মান্ধাতার আমলের। একবার কেনা হয়েছে তো তাই-ই চলছে। রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো হয় না। শুটিং-এর সময় ক্যামেরা চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়।

স্টুডিও-র ভেতরে ছবির টাইটেল শ্যুট করার সময় আরিফ্লেক্স ক্যামেরার ভিউ-ফাইণ্ডারে চোখ রাখলাম। পঙ্কজ জুম ইন জুম আউট করে দেখাল। খুবই সাধারণ ব্যাপার।

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ?

এই যন্ত্রপাতি, ফিল্ম, প্রশিক্ষণের এত সুযোগ সুবিধে পায় এখানকার ছেলেমেয়েরা, লক্ষ লক্ষ টাকা এদের প্রত্যেকের জন্য খরচ হয়। তারপর এরা কোথায় যায় ? আমরা পরিচালনার ক্ষেত্রে নাম শুনতে পাই, মণি কাউল, কুমার সাহানি, আদুর গোপালকৃষ্ণন, সৈয়দ মির্জা, অশোক আহুজা-র। এখন শোনা যাচ্ছে কেতন মেহতা, সি· অরবিন্দন, নচিকেত পট্টবর্ধন, এডিটিং-এ রেণু সালুজা, ফটোগ্রাফিতে কে· কে· মহাজন, অভিজিৎ গাঙ্গুলী, ব্রজ কর্মকার ইত্যাদি।

শ্যামল বলল, বম্বের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে FTII-র ছেলেমেয়ে ভরে গেছে। FTIIকে ওরা পছন্দ করে। শ্যাম বেনেগাল পছন্দ করেন। ওর অ্যাড এজেন্সিতে অনেকে কাজ করে। অর্ঘ বলল, কলকাতার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আমাদের পাত্তা দেয় না তবে আমরা কলকাতার ছেলেরা ঠিক করেছি কলকাতাতেই গিয়ে কাজ করব। চাকরি করতে চাই না, ফ্রি লান্স করব। ফিল্মস ডিভিসন, এন· এফ· ডি· সি, টেলিভিসন-এ চাকরি আছে তবে খুব বাধ্য না হলে এখানকার ছেলেরা চাকরি করে না।

শঙ্করমঙ্গলম বললেন, এখানকার বেশির ভাগই

প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তবে সবাইকে ফিল্ম মেকার হতে হবে কেন ? কেউ কেউ ফিল্ম টিচিং (বম্বে ও বাঙ্গালোরে খুব সামান্য ব্যবস্থায় চলচ্চিত্রের দু'একটি দিক সম্পর্কে শেখানোর ব্যবস্থা আছে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা ও নাটক বিভাগের পাঠক্রমে রয়েছে চলচ্চিত্রের সামান্য ছোঁয়া), ফিল্ম ক্রিটিসিজম, ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্ট করবে। সুরেন্দ্র চৌধুরি বললেন, যত দূর জানি, সব ছাত্রই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাসা বলল, অনেক ছাত্রই এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার মতো দুএকজন বাদে।

আপনি কী করেন ?

আমি ঠিক প্রোডিউসারদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারি না, আমার একটু ইগো প্রবলেম আছে। আমি এখনো তাই ফিল্ম নিয়ে কিছু করছি না। অবশ্য আর্কাইভে কিছু কাজ করার কথা ভাবছি।

যশোবানি বললেন, অনেকের নাম শোনা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রের নামই আর শোনা যায় না। সরকারের উচিত ইন্সটিট্যুট থেকে বেরোনোর পর ছাত্র-ছাত্রীদের দেখা। নইলে ইন্সটিট্যুটের সাফল্য ঠিকমতো হবে না।

FTII-র অবদান

ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ তাঁদের পয়সা দিয়ে ইন্সটিট্যুটের ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন। আর শিক্ষার্থীরা বিনা পয়সায় হাজার হাজার ফুট ফিল্ম ফুরিয়ে কী শিখছে ? যা শিখছে তা অনেকেই কাজে লাগাতে পারছে না। অথবা সিনেমাকে পণ্য করে তোলার কাজে তাদের জ্ঞানকে আরো সক্রিয় ভাবে লাগাচ্ছে। সরকারের নিশ্চয়ই দেখা উচিত, সমাজমুখি চলচ্চিত্রের সঙ্গে নতুন ভাবে পরিচিতি ও উপলব্ধির জন্য নির্মিত এই ইন্সটিট্যুট-এর আদর্শটা যেন থাকে। পঁচিশ বছর বয়স হয়ে গেল ইন্সটিট্যুটের। এদিকে ভারতীয় জন-মানসিকতায় চলচ্চিত্র এখনো হাল্কা, মনোরঞ্জনের উপকরণ। প্যারালাল সিনেমার যে ঢেউ এসেছে তাতে ইন্সটিট্যুটের অবদান প্রকৃত অর্থে কতটুকু ? FTII ভারতবর্ষকে কী দিয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করা দরকার।

শিক্ষার্থীদের ভর্তি কি বিজ্ঞানসম্মত ?

যেভাবে ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে তা কি বিজ্ঞানসম্মত ? ডিন (ফিল্মস) না-বাচক ভাবে ঘাড় নাড়লেন। বললাম, আপনারা ইদেক-এর মতো করে ভর্তি করেন না কেন ?

এখানে ওভাবে সম্ভব নয়, নানান অসুবিধে। এখানে পড়ার জন্য এদেশে এত বেশি ডিমান্ড।

ফরাসী ফিল্ম স্কুল ইদেক-এ প্রায় ছ-মাস ধরে নানারকম টেস্টের মাধ্যমে ছাত্রদের ভর্তি করা হয়। এমনকি ভর্তির আগে তাদের ফিল্ম তৈরি করতেও হয়। সাগির আহমেদ এখানকার প্রাক্তন ছাত্র এবং এখন প্রফেসর অফ স্ক্রিন-প্লে রাইটিং এবং FTII টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বললেন, এখানে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির আগে একটা প্রস্তুতি পাঠক্রম করতে হবে ছাত্রদের। আরো অনেক প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীকে জানাব আমি।

শিক্ষার্থীদের যদি ঠিকমতো বাছাই না করা হয় তাহলে FTII-র উদ্দেশ্য ব্যর্থ এবং দেশের প্রতি অপরাধ করা হয়। ভারতবর্ষে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী আছে যারা ইনস্টিট্যুটে সুযোগ পাওয়া কিছু সাধারণ শিক্ষার্থীর জায়গায় গেলে সবারই ভাল হতো।

FTII তে সমস্যা—ক্ষোভ

একটি ভাল লাইব্রেরি আছে FTIIতে। লাইব্রেরিয়ান বললেন প্রায় ১০ হাজার চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বই ও পত্র-পত্রিকা আছে এখানে। আর্কাইভেরও একটি বড় লাইব্রেরি আছে। আখতাব বাসা বলল, 'FTIIতে দুটো বিরাট সুবিধে। এক, লাইব্রেরি ; দুই, এর ছবি দেখানো। এই দুটোই আমি করতাম। ক্লাস বিশেষ করতাম না। যশোবানি একসময় বলেছিলেন, ছেলেরা ক্লাস করতে চায় না। কোনো কোনো অতিথি-অধ্যাপক এলে ছাত্রদের বাইরে থেকে ডেকে ধরে আনতে হয়। একটি ছাত্রী বলল, এখানে শিক্ষকরা বছরের পর বছর পড়িয়ে পড়িয়ে আবদ্ধ হয়ে গেছেন। তাঁরা বাইরে কোনো ছবির কাজ করেন না। যাঁরা কাজ করেন ইনস্টিট্যুটে তাঁদের ডেকে আনা উচিত। সুরেন্দ্র চৌধুরী বললেন, 'আমি কাজ করব কী করে ? আমার ডিপার্টমেন্টে প্রফেসর, লেকচারার পদে কেউ নেই। ইনস্টিট্যুট ছেড়ে ছুটি নিয়ে যাব কী করে ? সাগরসঙ্গম একবার বলেছিল, এই ইনস্টিট্যুট তো আর মস্কো ফিল্ম ইনস্টিট্যুট নয়, যে এখানে আইজেনস্টাইন, কি তারিকোভস্কি এসে পড়াবেন।

ডিরেকশন, সিনেমাটোগ্রাফি, মিউজিক-এর প্রফেসর নিয়োগ হচ্ছে না কেন ? ডিরেক্টর যশোবানি বললেন, যাঁরা ছিলেন তাঁদের কেউ সাসপেণ্ডেড হয়েছেন, কারুর চাকরি গেছে—মামলা করছেন। ভাল যোগ্য লোক এই মাইনেতে নিজেদের ছবির কাজকর্ম ছেড়ে আসতে চান না। কাকে নেব ! ছাত্ররা অভিযোগ করছে, এদিকে প্রশাসনিক বিভাগে লোক নিয়োগ হয়ে চলেছে। ছাত্রদের স্বার্থের চেয়েও প্রশাসনিক দিকটা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষক এবং অ-শিক্ষক এই দুটো গোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না বলে অভিযোগ। শিক্ষকরা বলেন, এখানে স্থায়ী ডিরেক্টর চাই। এন· ভি· কে· মূর্তির পর স্থায়ী পদে ডিরেক্টর হয়ে আসতে চাইছেন না কেউ। এটা নাকি একটা ভয়ের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্ররা বলে, আমাদের গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যানও যদি একটু মাঝে মাঝে আসতেন, দেখতেন ব্যাপারটা। অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর অফ ফিল্ম অ্যাক্টিং গুলশন কাপুর বললেন, আপনি এমন সময়ে আমাদের সম্পর্কে লিখছেন, যখন ইনস্টিটিউট খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।'

FTII-র চলচ্চিত্র শিক্ষার এত বিরাট আয়োজনের দিকে চেয়ে এরকম গণ্ডগোলের আভাস যেন ভাবাই যায় না। এটা ঠিকই যে ইনস্টিট্যুট তার চলচ্চিত্র শিক্ষার প্রবাহটিকে খুব ধীরে হলেও এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

অভিনয় পাঠক্রম উঠে গেল কেন ?

গুলশন কাপুরকে জিজ্ঞেস করলাম, অভিনয় পাঠক্রমটা উঠে গেল কেন ?

বললেন, সিরিয়াস চলচ্চিত্র তৈরি শেখানোর উদ্দেশ্য এই ইন্সটিট্যুটের —আলাদা করে এখানে অভিনয় শেখানোর দরকার নেই। অভিনয় শেখার জন্য তো দিল্লিতে এন·এস· ডি ও আলাদা জায়গা আছে। ইন্সটিট্যুট একটু দেরিতে বুঝেছে। তাছাড়া অভিনয়ের ছাত্রদের মানসিকতার সঙ্গে অন্য ফিল্ম স্টুডেন্টদের মানসিকতা খাপ খায় না। ফলে অশান্তি হতো। এখন ছাত্রদের অভিনয়ের মূল কিছু নিয়ম বলা হয়, ডিরেকশানের ছাত্রদের অভিনেতা-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বলা হয়। ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করা হয়। এই তো সেদিন নাসিরুদ্দিন শাহ কয়েকদিনের ওয়ার্কশপ করে গেলেন। বাদল সরকারও করে গেলেন। ডিপ্লোমার একটি ছাত্রকে কিছুদিন বিকেলে হাফ প্যান্ট পরে FTII ক্যাম্পাসে আস্তে আস্তে দৌড়োতে দেখা যেত। ওকে দেখে একটি ছেলে বলল, কি নাসিরুদ্দিন এফেক্ট নাকি ?

এখানকার ফিল্ম কালচার

প্রতিক্রিয়ার কথায় সাগরসঙ্গম সরকারের কথা মনে পড়ে, বলেছিল, এখানে প্রতিদিন এত ভাল ভালো ছবি দেখতে দেখতে আমি মাঝে মাঝেই পাল্টে যাই। তারপর একটা ছেলের যে কী হতে পারে তা দেখার কেউ নেই এখানে। এখানে কিছুদিন থাকলে আপনার ধারণারও ক্রমশ পরিবর্তন হবে।

ডিরেকশান, এডিটিং, ফোটোগ্রাফি এবং সাউন্ড এই চারটি শাখার ছেলেমেয়েদের সাধারণত তাদের বিষয় অনুযায়ী ছবি দেখার দৃষ্টি গড়ে ওঠে। তবে এরা যে ভাবে ছবি দেখে কোনো তথাকথিত সমালোচক সেভাবে ছবি দেখেন না। নিয়মিত ছবি দেখা ও তার সমালোচনা করা যদি ফিল্ম-কালচার হয় তাহলে এখানকার মতো ফিল্ম কালচার ভারতে আর কোথাও নেই।

কলকাতায় ফিল্ম ইন্সটিট্যুট

কলকাতায় যদি এরকম কোনো ফিল্ম স্কুল হতো তাহলে ছবিটা অন্যরকম হতো। তামিলনাড়ুতে রাজ্য সরকার পরিচালিত একটি ফিল্ম স্কুল আছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিকাশে কলকাতা ফিল্ম স্টুডিওগুলোর অগ্রণী ভূমিকার ইতিহাস (ম্যাডান, অরোরা, এন· টি·) প্রথম এবং ব্যাপক ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্ট আর ভারতবর্ষকে নেতৃত্ব দেবার মতো পরিচালকরাও কলকাতার। কিন্তু কলকাতাতেই কোনো ফিল্ম এডুকেশনের ব্যবস্থা নেই। করা যায় না ?

বৈ দে শি কী

এই বছরেই শীর্ষ বৈঠক

অরুণ বাগচী

আবার দুই মহাবলীর শীর্ষ বৈঠকের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অক্টোবরের শেষাশেষি অথবা নভেম্বরের গোড়ার দিকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মহাসচিব মিখাইল গোর্বাচেভ সম্ভবত আসছেন আমেরিকায়, প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। ক্রেমলিনের গোপন খবর রাখেন বলে যাঁরা দাবি করেন, তাঁরা বলছেন পয়লা নম্বর সোভিয়েত নেতা সহযোগীদের নাকি বলে দিয়েছেন যে, অক্টোবরের শেষ সপ্তাহটা আমার টেবিলে কাজটাজ রেখো না হে, আমি একটু ফাঁকা থাকতে চাই। আবার ওয়াশিংটনের বড় তরফের সঙ্গে যে সব সাংবাদিকের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তাঁরা বলছেন, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ মার্কিন প্রেসিডেন্টের ডায়েরিতে ফাঁকা দেখানো আছে। দুই আর দুই মিললে উত্তরটা সহজ হয় না কি? মনে রাখতে হবে যে ওই দুই নেতার সাক্ষাৎকার ঘটাবার জন্য যেমন একদল মানুষ সচেষ্ট, ওটাকে বানচাল করার ফিকিরে থাকবেন এমন ধুরন্ধরও সংখ্যায় কম নন, তাঁদের ক্ষমতাও যথেষ্ট। অতএব বৈঠকটা সত্যি সত্যি না ঘটা পর্যন্ত বাকি দুনিয়াকে দম বন্ধ করে থাকতে হবে।

বৈঠকের বাতাবরণ কিছুদিন থেকেই তৈরি হচ্ছিল। গোর্বাচেভের খোলা কূটনীতি, রেগনের সাম্প্রতিক কথাবার্তা (বিশেষত লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে প্রদত্ত বক্তৃতা) লক্ষণীয় ভাবে আবহ থেকে উত্তেজনা কমিয়ে এনেছে। তবে পেরশিং (IA) ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার হেলমুট কোলের নাটকীয় ও সাহসী সিদ্ধান্ত এই ব্যাপারে পরম সহায়ক হয়েছে। তাঁকে সাধুবাদ দিতেই হবে। বস্তুত কোলের চীনভ্রমণ, পূর্ব জার্মানীর অবিসংবাদী নেতা হোনেকরের বন্ আগমন এবং তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে চ্যান্সেলার কোলের পূর্ব জার্মানী ভ্রমণের আমন্ত্রণস্বীকার—এ সবই তাৎপর্যপূর্ণ কূটনৈতিক পদক্ষেপ। তবে পেরশিং ক্ষেপণাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি যে ছাড় দিতে রাজি হয়েছেন সেটা নিঃসন্দেহে শীর্ষবৈঠকের সম্ভাবনা শুধু যে দৃঢ়তর করেছে তা নয়, ১৯৮৫ থেকে জিনিভায় যে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক চলছে তার সাফল্যের পথ থেকে মস্ত একটা বাধা সরিয়ে দিয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকার মধ্যে ওই 'আর্মস লিমিটেশন টক্‌স' শুরু হয়েছে ১৯৮৫-র মার্চ মাস থেকে। তার আগে জানুয়ারি মাসে তদানীন্তন দুই বিদেশ দফতরের প্রধান আঁদ্রে গ্রোমিকো এবং শুলৎজ একত্রে বৈঠক করে জিনিভা আলোচনার লক্ষ্যগুলি ঠিক করে দেন। তাঁরা স্থির করেন যে এমন একটি চুক্তিতে পৌঁছবার চেষ্টা হবে যা মহাকাশে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ঠেকাতে পারে, যা পৃথিবীতে অস্ত্র-প্রভুত্বের দৌড় বন্ধ করতে পারে এবং পরমাণু অস্ত্রসংখ্যা সীমিত করতে সক্ষম ("The two parties are to try to draft effective agreements aimed at preventing an arms race in outer space, at ending the arms race on earths and at limiting and reducing the number of nuclear weapons.") আলোচনার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ হয়েছে ত্রিধারায়। এক, মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রসংখ্যা সীমিত করা এবং হ্রাস করা। (INF বা ইন্টারমিডিয়েট নিউক্লিয়ার ফোর্সেস।)

দুই, যে অস্ত্রাদিকে বলা হয় স্ট্রাটেজিক তার সংখ্যা সীমিত করা এবং কমানো (SALT বা স্ট্র্যাটেজিক আর্মস লিমিটেশন টকস।)

তিন, মহাকাশে অস্ত্র প্রতিযোগিতা যাতে আদৌ না হয় তার ব্যবস্থা করা। প্রেসিডেন্ট রেগনের মনপসন্দ SDI বা স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ বা স্টার ওয়র প্রকল্প এর মধ্যে পড়ে।

উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর সোভিয়েত এবং মার্কিন উভয় পক্ষই প্রস্তাব ও পালটা প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু একমাত্র INF বা মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রেই উভয়পক্ষ অনেকখানি কাছাকাছি আসতে পেরেছে। অপর দুটি ক্ষেত্রে নয়। রেগন ও গোর্বাচেভের মধ্যে যে রিকজাভিখ বৈঠক বসেছিল সেটা নানা ক্ষেত্রে সমঝোতার পথ রচনা

পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর হেলমুট কোল

আবার দুই মহাবলীর শীর্ষ বৈঠকের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পয়লা নম্বর সোভিয়েত নেতা নাকি সহযোগীদের বলে দিয়েছেন যে, অক্টোবরের শেষ সপ্তাহটায় আমি একটু ফাঁকা থাকতে চাই। আবার শোনা যাচ্ছে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ মার্কিন প্রেসিডেন্টের ডায়রিতে ফাঁকা দেখানো আছে। দুই আর দুই মিললে উত্তরটা সহজ হয় না কি?

পূর্ব জার্মানীর নেতা এরিক হোনেকর

করেও এসডিআই প্রকল্পে গিয়ে ডুবে গেল। সোভিয়েত পক্ষ কোট ধরে থাকল যে ওই মহাকাশ প্রকল্প বাতিল না করলে কোনও ফলপ্রসূ আলোচনা সম্ভব নয়। মার্কিন পক্ষ বলল, শর্ত হিসাবে ওটা ধরে থাকলে আলোচনা করা নিরর্থক। একটা জিদের সঙ্গে আর একটা জিদ ঠোক্কর খেল, আশু সমঝোতার ভরসাটা দপ্ করে জ্বলে উঠে ঝপ করে নিভে গেল।

সেই সময়েই রিকজাভিখ শীর্ষ বৈঠকের বিস্তৃত বিবরণ আলোচনা করে বিশেষজ্ঞরা অনেকেই বলেছিলেন যে ওই বৈঠককে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ধরে নেওয়া ভুল হবে। বস্তুত উভয়পক্ষই বিভিন্ন বিষয়ে পূর্বেকার অনমনীয় মনোভাব বর্জন করে এতখানি এগিয়ে এসেছে যে প্রাথমিক হতাশা বা উত্তেজনা কমে এলে তারা দেখতে পাবে আবার আলোচনা চালাবার পরিবেশ বেশ অনুকূল হয়েই আছে। এখন কাউকে না কাউকে উদারতা দেখাতে হবে এবং আবার শীর্ষ বৈঠক বসাবার প্রস্তুতি নিতে হবে। এটা সবাই মানবেন যে জিনিভা নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা খুবই জরুরী বিষয়, কিন্তু শীর্ষ বৈঠকের গুরুত্ব আলাদা। জিনিভা আলোচনাকে অর্থপূর্ণ এবং গতিযুক্ত করার জন্যও শীর্ষ বৈঠক প্রয়োজন। প্রেসিডেন্ট রেগন বা মহাসচিব গোর্বাচেভ মিলে যতখানি কর্তৃত্বের সঙ্গে যে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, যত দ্রুত তা নিতে পারবেন, জিনিভা বৈঠকে আলোচনাকারী প্রতিনিধিরা তো আর তা পারবেন না!

জুলাই মাসের শেষাশেষি মিখাইল গোর্বাচেভ এক বক্তৃতায় বলেন যে তাঁর দেশ এশীয় অঞ্চলে যত এস এস-২০ ক্ষেপণাস্ত্র রেখেছে সেগুলি প্রত্যাহার করে নিতে সম্মত আছে। এই প্রস্তাব সত্যই চমকপ্রদ এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর ফলে ৫০০ থেকে ৫০০০ কিলোমিটার পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সারা দুনিয়া থেকে হটিয়ে দেবার, যাকে বিশেষজ্ঞরা বলেন 'জিরো সলিউশন' তাতে পৌঁছবার পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। এই প্রথম পরমাণু-সম্পর্কিত একটা যথার্থ নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি সম্ভবপর হবে। অনেক বড় বড় কথা, স্লোগান, কৃতিত্বের দাবি দুনিয়া শুনেছে। এই প্রথম একটা সত্যকার শুভ সূচনা মানুষ দেখতে পাচ্ছে।

জিনিভায় মার্কিন পক্ষও উদারতা দেখাতে প্রস্তুত হয়েছে। এতদিন তারা দাবি জানিয়ে এসেছে যে চুক্তির শর্তগুলো ঠিকমত মানা হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য, পরীক্ষা করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই। চুক্তি করা সহজ, কিন্তু শুধু মুখের কথায় আস্থা স্থাপন করলে আখেরে পস্তাতে হতে পারে। কাজেই মার্কিন দাবি ছিল "Stiff onsite inspection, strictest possible verification procedures", এই বিষয়ে প্রেসিডেন্ট রেগন কোনও আপস করতে রাজি ছিলেন না। তাঁর মতে সোভিয়েত পক্ষকে অতটা বিশ্বাস করা সম্ভবই নয়। এখনও সোভিয়েত ইউনিয়নে বহু জিনিসই সাধারণ দৃষ্টির আড়ালে রাখা থাকে, আমেরিকার মতো সব খোলামেলা নয়। কাজেই আমেরিকা কিছুই

আমেরিকার বিদেশ দফতরের প্রধান জর্জ শুলৎজ

গোপন করতে না পারলেও রাশিয়া তা পারবে। এই সংশয়ের মাঝখানে চুক্তি স্থায়ী হতে পারবে না। তাঁর উপদেষ্টারা কেউ কেউ অবশ্য প্রেসিডেন্ট রেগনকে বলেছেন যে, ওই খবরদারির ওপর খুব জোর দেওয়া হয়তো বা মার্কিন স্বার্থের অনুকূল হবে না। আমেরিকার পরীক্ষকরা সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবার আগেই চুক্তির সুযোগ নিয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা সব আমেরিকায় এসে এখানকার গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি, কারখানা এবং সমর সম্ভার পরীক্ষা করতে শুরু করবে। পেন্টাগনের সামরিক কর্তারা কি সেটা ভাল চোখে দেখবে? যাই হোক, এইসব হাস্যকর জুজুর ভয় দেখিয়ে রেগনকে দমানো যায়নি। জিনিভায় মার্কিন পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয়েছে যে নজরদারির পূর্বশর্ত তাঁরা শিথিল করে দিচ্ছেন। এর ওপর প্রসন্ন মন্তব্য করে সোভিয়েত সরকারের মুখপাত্র জেন্নাদি গেরাসিমভ বলেছেন: পরীক্ষা ও নজরদারির ব্যাপারে আমেরিকা আগেকার মনোভাব ত্যাগ করার ফলে জিনিভায় আমাদের প্রতিনিধিদের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে।

এছাড়া অন্য একটা ব্যাপারেও আমেরিকা উদারনীতি গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে। মধ্যমপাল্লার যে সব মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র ইয়োরোপে বা অন্যত্র আছে তাদের 'ক্যারিয়ার সিস্টেম' বা অস্ত্র ক্ষেপণ বা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 'তৃতীয়' দেশের হাতে তুলে দেবার

রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী আঁদ্রে গ্রোমিকো

প্রস্তাব স্থগিত করে দিতে আমেরিকা রাজি হয়েছে। বর্তমান অস্ত্র বা যন্ত্রপাতির নবীকরণ করার জন্য কোনও ব্যবস্থাও আমেরিকা নেবে না। অর্থাৎ পুরানো পেরশিং ক্ষেপণাস্ত্রগুলি পালটে দেওয়া হবে না। অথবা ক্রুইজ ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ডাঙ্গা থেকে জাহাজে নিয়ে বসানো হবে না।

এইখানেই মুশকিল বেধে গিয়েছিল পশ্চিম জার্মানীতে স্থাপিত ছয় ডজন পেরশিং (IA) ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে। ওগুলি প্রায় তেইশ বছর আগে বসানো হয়েছিল। এখন বলতে গেলে সবই বড্ড সেকেলে হয়ে গেছে। মার্কিন সরকার প্রতিশ্রুত, যে ওই 'বৃদ্ধ' যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বদলে নতুন করে দেওয়া হবে। পশ্চিম জার্মান সরকার সম্মতি না দিলে ওগুলো এখন বাতিল করে দেওয়া আমেরিকার পক্ষে কথার খেলাপ এবং চুক্তিভঙ্গের সামিল হয়ে যায়। কাজেই আমেরিকা যুক্তি দিচ্ছিল যে ওই ৭২টি পেরশিং ওয়ান-এ ক্ষেপণাস্ত্র বাদ দিয়েই চুক্তি হোক। পশ্চিম জার্মানীর মনোভাব যা জানা গেছে তাকে মার্কিন সরকার কীভাবে উপেক্ষা করতে পারে? একথা ঠিক যে মাত্র ক্ষেপণাস্ত্রের কাঠামোগুলোই পশ্চিম জার্মান সরকারের হাতে। আসল অস্ত্র বা পরমাণু বোমা (Warlead) যা নিক্ষিপ্ত হবে তা ছিল মার্কিন সরকারের তালাচাবি দেওয়া গুদামে। সেগুলি কাজে লাগাবার সুযোগ বন্-এর ছিল না, এখনও নেই। তবু জার্মান সরকারের অনুমতি না নিয়ে পেরশিং সংক্রান্ত কোনও চুক্তিতে যাবার ইচ্ছে ওয়াশিংটনের আদৌ ছিল না। এবং সেই কারণে আমেরিকা বলছিল, আমরা আর তৃতীয় কোনও দেশের হাতে পেরশিং ইত্যাদি বস্তু দেব না। কিন্তু এর আগেই যা দেওয়া হয়েছে তা নবীকরণ না করে, একেবারে সরিয়ে নেওয়াটা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট দেশের সম্মতির ওপর।

সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে চ্যান্সেলার হেলমুট কোল সেই সমস্যাটা মিটিয়ে দিলেন। লস অ্যাঞ্জেলস যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হোর্স্ট তেলৎসচিক প্রেসিডেন্ট রেগনের নির্দেশে, হঠাৎ তাঁর বিশেষ ফোনটি বেজে উঠল। হোর্স্ট ফোন তুললেন। বন থেকে পশ্চিম জার্মানীর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ফ্র্যান্ক কালুচ্চির ফোন। তিনি জানালেন, চ্যান্সেলার কোল স্থির করেছেন যে পুরানো ৭২টি পেরশিং (IA) ক্ষেপণাস্ত্রের আধুনিকীকরণের জন্য তিনি আর মার্কিন সরকারকে চাপ দেবেন না। উৎফুল্ল হোর্স্ট সঙ্গে সঙ্গে শুভ বার্তা প্রেসিডেন্ট রেগনকে জানিয়ে দিলেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর প্রকাশ্য ভাষণে যদিও মহাসচিব গোর্বাচেভকে উদ্দেশ্য করে অপ্রিয় কিছু কথা বললেন—যেমন: মিঃ গোর্বাচেভ, আপনি এত গ্লাসনস্টের কথা তুলছেন, আপনার সামরিক নীতির ক্ষেত্রে কিছু উদারতা দেখান। মিঃ গোর্বাচেভ, ওই কুৎসিত (বার্লিন) দেওয়ালটা ভেঙে ফেলুন। ইত্যাদি—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই আশাবাদী স্বগতোক্তিটাও করলেন: তাহলে কি আমরা সত্যিই একটা যথার্থ পূর্ব-পশ্চিম সমঝোতার পরিবেশ তৈরি করে তাতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি? ■

আর সুরেনদার স্টেজ সাজানো দেখছিলাম। অভিনেতাদেরও ভাল সাজিয়েছিলেন। কিন্তু একজনকেই আননেচারেল লেগেছিল।"
রামকিঙ্করের কথায় আজকাল ইংরেজি শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যায়। নিশিকান্তর ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠলো, "কাকে আননেচারেল লেগেছিল বলো তো ?"
"অন্ধ বাউলকে।" রামকিঙ্কর হাসলো, "অন্ধ বাউল যে অন্ধ নন, তাঁর পা ফেলা দেখে বোঝা যাচ্ছিল। মানিয়েছিল সুন্দর। আর গান শুনতে শুনতে তো আমি সব ভুলে গেছলাম।"
নিশিকান্তর কৃষ্ণ মুখে শাদা হাসির ঝলক লাগলো, "তার মানে তুমি চন্দ্রাকে দেখ নি। তা হলে বোধহয় তুমি ছাড়া আর সবাই চন্দ্রাকে দেখেছিল।"
"আমি কেন শুধু শুধু চন্দ্রাকে দেখব ?" রামকিঙ্করের মুখে আবার অস্বস্তির হাসি ফুটলো। ও ছবিটা আবার উলটে রাখলো, "আমি নাটক দেখছিলাম।"
নিশিকান্ত ছবিটা আবার সোজা করে রাখলো। হাসির ঝলক তার মুখে লেগেই ছিল, "ছবিটা উলটে দিলেই তো আর চন্দ্রা হারিয়ে যাবে না। নাটকের শেষে শালবীথির জ্যোৎস্নার আলো ছায়ায় চন্দ্রার সঙ্গে একজনকে চলে যেতে দেখেছিলাম। একলা আমি না, বনবিহারীও দেখেছিল। চাঁদের আলোর শালবীথির ছবিটাই আঁকা হয়েছে দিনের আলোয়। তা তোমার এত লজ্জা কিসের ? চন্দ্রা তো ভাই বেপরোয়া।"
"বেপরোয়া ? সিটা আবার কী ?" রামকিঙ্করের অবাক স্বরে অবাক জিজ্ঞাসা, "চন্দ্রা বেপরোয়া মানে, কী ?"
নিশিকান্তর চোখে মুখে টেপা হাসির রহস্য। "বুঝতে পারলে না ? তোমার সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে, চন্দ্রা বেশ বেপরোয়া। একটু ইয়ে মেয়ে তো…"
"কী ? কী মেয়ে ?" রামকিঙ্করের মুখে এ[illegible] আর লাজুক বা অস্বস্তির হাসি নেই। ওর চোখে ফুটে উঠ[illegible] কৌতূহল।

নিশিকান্তর ঢুলুঢুলু চোখে কৌতুকের হাসি, গায়ে পড়া, তোমার সঙ্গে। বুঝতে পারো না ?"
রামকিঙ্কর আর নিশিকান্তর সামনে, গৈরিক বাড়িতে ছিল না। প্রথমে দেখলো ওর আঁকা ছবির দিকে। তারপরে অন্য আর একটা ছবি ভেসে উঠলো চোখের সামনে। শীত প্রায় শেষ। লাল কাঁকর মাটির পথে পথে, ঝরা পাতা উড়ছে। পাতা ঝরা শিমূলে পলাশে ফুল ফুটছে। শিরীষের সোনালী ফলগুলো দুলছে। গলা খুলে গিয়েছে সেই পাখির, কুয়ু কুয়ু। কলাভবনের আরও পশ্চিমে, নতুন কলাভবনের পাকা বাড়ি উঠছে ও পশ্চিমের শাল বন থেকে একলা ফিরছিল। কাঁধে একটা ব্যাগ। ব্যাগে কাগজ পেন্সিল। পাচিলের লাল আকাশ ওর পিছনে। কাছে পিঠে কেউ নেই। নতুন কলাভবন বাড়ির কাজের রাজমিস্তিরিরা কাজ শেষ করে চলে গিয়েছে। যোগাড়ে মাঝিনরা সব গুছিয়ে ত্বরায় চলেছে ঘরে। ক্লান্তি নেই। কাজের শেষে ঘরে ফেরার আনন্দে, গলায় তাদের গুণগুণ গান। ও গলা খুলে গেয়ে উঠেছে, ক্লারা বাট-এর ইংরেজি গান। ডেম ক্লারা বাট। তিনি নাকি পৃথিবীর সেরা গায়িকা। এখানে গত মাসে এসেছিলেন। কথা বোঝার কোনো দরকার ছিল না। তাঁর সেই গলা খুলে কাঁপানো টানা সুর মনোমুগ্ধকর। আর কারোর না হোক। ওর মনোহরণ হয়েছিল। ভালো লাগলে কী করবে ? সুর কিছু মাথার কোষে গাঁথা ছিল। কিন্তু তা থাকলেই হয় না। প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে। ও প্রাণ খুলে গলা চড়িয়ে ক্লারা বাট-এর সুর তুলেছে। সেই গলা কাঁপানো চড়া সুর শুনে বোধহয় ও নিজেই মুগ্ধ হচ্ছিল। হঠাৎ প্রথমে কানে এসেছিল একটা আঁতকে ওঠা আঁক শব্দ। সে শব্দটাই খিলখিল শব্দে বেজে উঠেছিল।
কে ? নিশ্চয়ই ক্লারা বাট হেসে ওঠেন নি ! রামকিঙ্কর দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তিনি তো কবেই শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গিয়েছেন। গোটা কয়েক জাম, শিরীষ ছাতিম গাছ আশেপাশে। রামকিঙ্কর মুখ ফিরিয়ে এদিক ওদিক দেখেছিল। কারোকেই চোখে পড়ে নি। হঠাৎ বেজে উঠেই হাসিটা কি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ? তা যায় নি। সে হাসি থামবার ছিল না। বাজছিল আর বাজছিল। শেষ দলের এক মাঝিনকে চোখে পড়েছিল। সে দেখছিল একটা গাছতলার দিকে তাকিয়ে। গাছের দিকে, আর রামকিঙ্করের দিকে। তারপরে মুখে আঁচল চেপে দৌড় দিয়েছিল উত্তরে। আর ও দেখেছিল, এক মস্ত জাম গাছের আড়াল থেকে উড়েছিল মাদার লাল শাড়ির আঁচল। বেরিয়ে এসেছিল একজন। পূর্ণিমার চাঁদের মতো যার গায়ের রঙ। চোখের কালো মনি দুটোয় ছিল বিদ্যুচ্ছটা। জামাটা ছিল সোনালি। হাতা দুটো অনেকটা ঘটির মতো। শাড়ি মাদারের মতো লাল। পাড় বোধহয় ছিল বেগুনি কিংবা নীল। লম্বা বেণি পিঠে ঝুলছিল। আর বেণিটা টেনে ধরেই সে খিলখিল হাসির মুখে চেপেছিল। তবু সে-হাসি সহজে থামছিল না। "ওটা, ওটা কী..."
এই পর্যন্তই সে প্রথমে বলতে পেরেছিল। রামকিঙ্কর বেজায় চমকে উঠেছিল। তারপরে সেই হাসির নিঃশব্দ ছোঁয়া লেগেছিল ওর মুখে। আর অবিশ্যিই অস্বস্তি ছিল সেই হাসিতে, "ওটা গান। অই..."
"গান !" পূর্ণিমা চাঁদ ফরসা মুখে হাসির ছটায় রক্তাভা ফুটেছিল। খিলখিল শব্দে বেজে উঠেছিল আবার। বেণি চেপে ধরেছিল মুখে, "গান ? ওটা... আর আমি কী ভয় পেয়ে গেছিলাম। কী গান ওটা শুনি ? কী গান।"
সে ঘাড় কাত করে তাকিয়েছিল। কালো লম্বা বেণি চেপেই যেন হাসি আটকে রেখেছিল। রামকিঙ্করের জবাব দিতে কথা ফুটছিল না। অথচ হাসছিল। হাসিও যে কতো অসহায় হয়। কথা কোথায় ? ও যেন নিজের ভিতরে একটা শক্তি দিয়ে কথা ঠেলে দিয়েছিল, 'অই, অই যে উনি এসেছিলেন না ? মাঘ মাসে ! আপনি তখনও বোধহয়—"
"আপনি ? আপনি কে ?" সে নিজের বুকে হাত ঠেকিয়েছিল, "আমাকে আপনি বলছেন আপনি ? আমি কি আপনার চেয়ে বড় নাকি ? আমার এখন আঠারো বছর বয়স। আপনি আমাকে দেখেন নি আগে ? এই তো সেদিন এসেছি। শিক্ষাভবনে পড়তে এসেছি..."

রামকিঙ্কর নিশ্চিত হয়ে ঘাড় কাত করতে পারেনি। যাকে দেখেছিল, সে গোরোচনা গৌরী নবীনা কিশোরী না। গোরোচনা গৌরী নায়িকাটি ছিল অষ্টাদশী তরুণী। সে,তার নিজের মুখেই বলেছিল, আঠারো তার বয়স। তার লম্বা বেণি ঘন কালো চুল মাথার সিঁথি ছিল শাদা। তা হলে সে কুমারী। ঐ বয়সের আরও অনেক কুমারী ও এখানে দেখেছে। প্রথম দেখে অবাক হয়েছিল। বাঁকুড়ায় ঐ বয়সের আইবুড়ো বিটি কেউ কোনো দিন চোখে দেখেনি। বাঁকুড়া শহর। গ্রাম থেকে শান্তিনিকেতন অনেক দূরে। পথের দূরত্ব দিয়ে তার বিচার হয় না। সে দূরত্ব ভাবে ভাবনায়, বিদ্যায় চিন্তায় মননে। এ আশ্রম বিদ্যালয়ের স্বরূপ আলাদা। এমনিতে কি আর হয়েছে ? এখানেও নাকি পৌষ মেলার বাজি পোড়ানো দেখতে আসতে পারতেন না তরুণী বধূ কন্যারা। সমাজের ভুরু কুঁচকে ওঠার ভয় ছিল। তাই নিষেধও ছিল। কিন্তু সন্তোষ মজুমদার আমেরিকা থেকে ফিরে সেই নিষেধকে উপড়ে ফেলেছিলেন। কী দোষ করেছেন সেই সব বধূ কন্যারা ? কেন সকলের সঙ্গে, মেলা উৎসব আনন্দের ভাগ পাবেন না ? তা হলেই বুঝ ক্যানে, আঠারো বছরের আইবুড়ো মেয়ে কেন পড়াশোনা করবে না ? সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গেই তাঁরা পড়বে।
রামকিঙ্করের মন সজাগ হয়েছিল। দৃষ্টি ছড়িয়েছিল দূর হতে দূরে। শান্তিনিকেতনে ওর জন্মান্তর ঘটেছিল। জন্মান্তর বাঁকুড়ার দোলতলার আজন্ম ভাবনার। কিন্তু ঐ গৌরীকে কি ও আগে দেখেছিল ? বসন্তের নিষ্পত্র শিমূল পলাশের মতোই যার শরীরে ছিল আঠারোর উদ্ধত প্রকাশ। বর্ষার দুরন্ত কোপাইয়ের মতো সর্বনাশী বান ছিল যার খিলখিল হাসিতে। ও কি তাকে আগে দেখেছিল ? দেখেছে কি দেখে নি, মনে করতে পারছিল না। হয় তো এক পলকে কোথাও দেখেছিল। মন্দিরে ? শালবীথিতে ? ডাকঘরের কাছে ? শেষ পর্যন্ত ও অসহায় ভাবে মাথা নেড়েছিল, "মনে করতে পারছি না।"
"কিন্তু আমি আপনাকে দেখেছি।" সে বেণি হাতছাড়া করে ঘাড়ে একটা ঝাটকা দিয়েছিল, "আপনি তো কলাভবনের ছাত্র। ভোরে বৈতালিকে লাইব্রেরির সামনে জড়ো হয়ে সবাই গান করে। আপনিও তো করেন। শাস্ত্রীমশাই থাকেন। গানের পরে তাঁকে প্রণাম করে সবাই ক্লাসে যায়। আপনি আমাকে সেখানে দেখেন নি ?"
দেখে নি ? রামকিঙ্কর মনে করবার চেষ্টা করেছিল। দেখেছে ? মনে পড়ে নি। কিন্তু ও মাথা নাড়ে নি। হেসেছিল, "বোধহয় দেখেছি।"
"নুটুদির ওখানেও দেখেন নি ?" সে ঘাড় কাত করে তাকিয়েছিল। চোখের কালো তারায় চিকুর হেনেছিল, "আপনি তো ওঁর কাছে গান শিখতে যান..."
রামকিঙ্করের তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল। "এই উদাসী হওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে ; আমি কুড়িয়ে নিয়েছি, তোমার চরণে দিয়েছি। লহো লহো করুণ করে !"... মনে পড়ে গিয়েছিল, অষ্টাদশী তন্বি গৌরীকে দেখেছিল নুটুদির বাড়িতে। নুটুদির গানের আসরে সকলের ডাক ছিল। যে শিখতে চায়, সে-ই তাঁর আসরে যেতে পারে। নুটুদি নিজে গান শেখেন দিনেন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ ওঁর গান শুনে মুগ্ধ। যে-পারে এস্রাজ বাজাতে সে যেন নিয়ে যায় গান শোনা আর শেখার আসরে। বাঁশি যে বাজাতে পারে, সে যেন আসে বাঁশি হাতে। যার গানের গলা আছে, গান শিখতে চায় সে যেন আসে গান শিখতে। সে-আসরে মাঝে মাঝে দিনেন্দ্রনাথও থাকেন। শান্তিময় থাকে। মাসোজী থাকে তার মস্ত এস্রাজখানি নিয়ে। বনবিহারীও এস্রাজের তারে নতুন ছড় বুলাচ্ছে। সুধীর যায় তার বাঁশি নিয়ে। সাবিত্রী আর ইন্দুলেখা থাকে। রামকিঙ্করের কি গানের গলা আছে ? ও তা জানে না। কেবল জানে, গাইবার বড় শখ। শেখবার বড় সাধ। তার কথা শুনেই ওর দু চোখে ঝিলিক দিয়েছিল। মোটাঠোঁটের হাসিতে কোনো অস্বস্তি ছিল না। "হ্যাঁ,

দেখেছি তো ! নুটুদির ওখানে ।"
"এত বলতে তবে মনে পড়লো ?" তার ঠোঁট দুটি যেন অভিমানে ফুলে উঠেছিল । কপট অভিমান । চোখে ছিল বিদ্যুচ্ছটা, "আমার নাম চন্দ্রা । কিন্তু কী গাইছিলেন আপনি , ওটা কী গান ? কে এসেছিলেন মাঘ মাসে ? ঐ রকম গান গাইতে ? ঐরকম গলা কাঁপিয়ে চিৎকার ! আমি তো ভয় পেয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিলাম ।"
চন্দ্রা ভয় পেয়ে লুকিয়ে পড়েছিল ? ভয় পেলে মানুষ ঐরকম খিলখিল করে হাসতে পারে ? কিন্তু রামকিঙ্কর যে সত্যি ক্লারা বাট-এর সুরই ধরেছিল । চন্দ্রার কথায় ওর মুখের হাসিতে আবার অস্বস্তির ছায়া পড়েছিল, "ওটা তো ডেম ক্লারা বাট-এর গানের সুর । উনি তো এসেছিলেন মাঘের গোড়ায় । পৃথিবীর নাম করা সেরা গায়িকা । আপ—তুমি..."
"আপনি বলো না যেন ।" চন্দ্রা অনায়াসে যেন শাড়ির আঁচলের ঝাপটায় নিজেই 'আপনি-টাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল,' তুমি । আমিও তাই বলছি । কে তোমার ডেম ক্লারা বাট, আমি জানি না । দেখিনি । কী ভাগ্য, গানও শুনিনি ! ঐরকম চিৎকার করে গলা কাঁপিয়ে ? মেম সাহেবের গান আলাদা । তাঁরা অন্যরকম গাইতে পারেন । তা বলে তুমিও গাইবে ? তুমি না গুরুদেবের গান শেখো নুটুদির কাছে ?"
রামকিঙ্কর যে কী মুশকিলে পড়েছিল । রবীন্দ্রনাথের গান শিখলে কি ক্লারা বাট-এর গানের সুর ভাজা যায় না ? চন্দ্রার কথায় কেমন একটা টান ছিল । বাঁকড়ি বীরভূমি বর্দ্ধমেনে না । মণীন্দ্রভূষণের কাছাকাছি। অথচ পুরোপুরি না । তা হোক । কিন্তু বেচারি কথা খুঁজে পাচ্ছিল না । যেন বকুনি খাওয়া হেঁট মাথা ছেলের মতো দাঁড়িয়েছিল । অবিশ্যি মুখে হাসি লেগেছিল । সেই অসহায় হাসি, "আমি তো এমনি...ভাল লেগেছিল কি না । তাই এমনি একটু সুর ভাজছিলাম ।"
আবার সেই গলার কাছে 'আঁক' শব্দ । তারপরেই খিলখিল হাসি বেজে উঠেছিল । ঝড় লেগেছিল বসন্তের শিমুল পলাশে । চন্দ্রার আঁচল উড়েছিল । বেণি দুলেছিল । বুকে হাত চেপেছিল । দোয়েল পুরুষের বউকে ডাকা আচমকা থেমে গিয়েছিল । আর চন্দ্রার হাঁফিয়ে পড়া নিশ্বাসের শব্দ শোনা গিয়েছিল, "ভাল লেগেছিল । কী করে , কেন ? তোমার গলা তুমি শুনতে পাও নি ?"
"পেয়েছি তো ।" রামকিঙ্করের স্বীকারোক্তি ছিল অকপট । চন্দ্রা রামকিঙ্করের কাছে দু পা এগিয়েছিল । তাকিয়েছিল রামকিঙ্করের চোখের দিকে । তারপরে খিলখিল হেসে, আঁচল উড়িয়ে দৌড় দিয়েছিল," "আমি যাচ্ছি নুটুদির কাছে । তুমি আসবে তো ?"
রামকিঙ্কর দেখেছিল, ছুটে চলা একটা ছবি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল । মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল । ও মাথা ঝাঁকিয়েছিল, যাব ।"
"এসো । এসো কিন্তু ।" উড়ন্ত আঁচলের সঙ্গে চন্দ্রা হাত তুলে যেন শপথ করিয়ে নিয়েছিল । ঝরা পাতার সঙ্গে মাদার রঙ বাতাস উড়ে গিয়েছিল দক্ষিণ পুবে ।
রামকিঙ্কর নুটুদির সন্ধ্যার গানের আসরে যেতোই । সারা দিন আঁকা গড়ার পর, নুটুদির কাছে গান শিখতে যাওয়া একটা নিয়মে দাঁড়িয়েছিল । শুধু তো শোনা না । ওটা একটা আনন্দের আসরও বটে । দিনদা এসে পড়লে তো কথাই নেই । দিনদা দিনেন্দ্রনাথ । চন্দ্রা না বললেও ও যেতো । হস্টেলে ফিরে, কাঁধের ঝোলা রেখে হাত মুখ ধুয়েছিল । বিকালের জল খাবার খেয়েছিল । বনবিহারীদের চা খাওয়া শেষ । চায়ের অভাব হয় নি । জুটেছিল নিশিকান্তর [illegible] । [illegible] ঘড়ি এস্রাজ বাজিয়ে বনবিহারী তার এস্রাজ হাতে তুলে নিয়েছিল । নুটুদির আসরে পৌঁছানো মাত্রই, চন্দ্রা মুখ তুলে তাকিয়েছিল । নুটুদিও তাকিয়েছিলেন । শ্যাম রঙ, দোহারা রমা মজুমদার । ডাগর দুই চোখ । হাসি তাঁর স্বভাবগত । নুটুদির চোখে কৌতুকের ছটা ছিল । "রামকিঙ্কর, তুমি যে ক্লারা বাট-এর গানের সুর ভাজো, তা তো জানতুম না । শোনাতে হবে আজ ।"
রামকিঙ্করের কানে বাজছিল ভিন্ন এক গানের সুর । "এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে..." ঘুরে ফিরে । ঐ গানটাই কয়েকদিন বিশেষ করে গাওয়া হচ্ছিল । অথচ নুটুদি শুনতে চেয়েছিলেন ক্লারা বাট-এর গানের সুর । কেন, ও তা জানতো । নুটুদির পাশে দুটি কালো চোখের তারায় দ্যুতি ছড়াচ্ছিল । চাঁদের আলোয় কি হাসির ছটা ! বনবিহারীর ফিসফিস স্বর শোনা গিয়েছিল, "ধরা পড়লে কেমন করে ? ওটা তো মাঠে ঘাটেই ভাজতে ।"
কেমন করে ধরা পড়েছিল, সে-কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না । ও ভাবতে পারে নি, নুটুদি ওকে ঐরকম বিপদে ফেলবেন । দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন না । সেটা একটা বড় স্বস্তি ছিল । শান্তিময় থেকে শুরু করে বাকি অনেকেই ছিল । অথচ নুটুদির কথা অমান্য করার উপায় ছিল না । তবে নুটুদি ওকে আশ্বস্ত করেছিলেন, "ক্লারা বাট-এর গান আমিও শুনেছি । খুব সুন্দর তাঁর গান আর গলা । তোমাকে ওঁর মতো গলা চড়িয়ে গাইতে হবে না । তুমি একটু নিচু পর্দায় ধর ।"
রামকিঙ্করের মনে হয়েছিল, সে তো আর এক বিপদ ! ক্লারা বাট-এর গানের সুর নিচু পর্দায় গাওয়া যায় কেমন করে ? গলা কাঁপিয়ে চড়িয়ে না গাইলে, সেই গানের সুর ভাজা যায় না । অথচ নুটুদির মতো সবাই উৎসুক চোখে, ওর দিকে তাকিয়েছিল । গানও যদি ঐরকম করে গাইতে হয়, তা হলে মুশকিল । তবু ও গলা খুলেছিল । ক্লারা বাট-এর অনুকরণে, গলা চড়িয়ে, কাঁপিয়ে সুর ধরেছিল । আর তৎক্ষণাৎ নানা স্বরের হাসির বন্যার ঢল নেমেছিল । কয়েক মুহূর্ত হাসির শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায়নি । ও গান থামিয়েছিল ।
"চুপ কর সবাই ।" নুটুদির স্বর শোনা গিয়েছিল, "রামকিঙ্কর তো কিছু ভুল করেনি । ওর গলায় যদি ক্লারা বাট নকল করতে হয়, তবে ঐরকমই শোনাবে । এর জন্য হাসির কী আছে ? আমার মনে হচ্ছে, এর পরে রামকিঙ্কর আর ঐ সুর শোনাতে চাইবে না ।"
রামকিঙ্করও হাসছিল । তবে বাজেনি । লজ্জা আর অস্বস্তি ছিল ওর নীরব হাসিতে । নুটুদির দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়েছিল "না । আপনি শুনতে চাইলেন, তাই..."
"বেশ করেছো ।" নুটুদি তাঁর হাসি মুখে গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু তাঁর ডাগর চোখে কৌতুকের ছটা গোপন ছিল না, "ইচ্ছে করলে কেন গাইবে না । গুরুদেব তাঁর গানে পাশ্চাত্য সুর দেন । তিনি এ দেশের গানের রাগ-রাগিণী যেমন জানেন, পাশ্চাত্যের গানও তেমনি জানা আছে তাঁর । দিনদা থাকলে তোমাদের ভালো করে বুঝিয়ে দিতেন । গুরুদেবের নিমন্ত্রণে ক্লারা বাট শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন । এর থেকেই বোঝা যায়, তাঁর গানের সঙ্গে গুরুদেবের কতোখানি পরিচয় আছে । গুরুদেবের কোনো গান শুনে কি আমরা ক্লারা বাট-এর সেই চড়ানো কাঁপানো সুর শুনতে পাই ? পাইনে । গুরুদেবের সুর-জ্ঞানের তল আমরা পাবো না । তিনি কোন্ গানে কেমন করে কী সুর মিলিয়ে দেন, তিনি ছাড়া কারোর পক্ষে বোঝা মুশকিল । তবে রামকিঙ্করের নকল করাটা—ওর গলায় ঐরকম হুবহু সুর ভাজা কঠিন । সুরটা তো কঠিন । গাইবার খুব শখ হলে, মাঠে ঘাটে গাওয়াই ভালো ।"
সকলের মুখেই ছিল হাসি ও কৌতুকের ছটা । নুটুদির কথা শেষ হবার আগেই, আবার "আঁক" শব্দটা শোনা গিয়েছিল । কিন্তু খিলখিল শব্দে বেজে ওঠেনি । মুখের ওপর বেণী আর শাড়ির আঁচল চাপা পড়েছিল । বিজলি বাতির আলোয় মাদার-লাল শাড়িতে ঢেউ লেগেছিল । কালো চোখের দৃষ্টি ছিল রামকিঙ্করের দিকে । রামকিঙ্কর তাকিয়েছিল সেই দিকেই । হাসির ঘটনা কিছু ঘটলে সাবিত্রীও চন্দ্রার মতোই ঝরনায় বাজে । রামকিঙ্করের বিলিতি সুর ভাজা শুনে, সে তেমন করে হাসে নি । শান্তিময় গলা খাকারি দিয়েছিল, "আমিও ক্লারা বাট-এর গানের সুর খানিকটা তুলেছি । তবে গলার স্বরটা ক্লারা বাট-এর মতো সরু করতে হবে । নইলে সুরটা ঠিক শোনাবে না । ওঁর গলাটা তো বাঁশির মতো সরু..."
"শান্তি, তুমি কি ক্লারা বাট-এর সুর ধরবে নাকি ?" নুটুদি ঠোঁট টিপে হেসেছিলেন । চোখে ছিল সেই কৌতুকের ছটা ।

শান্তিময় নুটুদির দিকে তাকিয়েছিল। তার চোখে ছিল জিজ্ঞাসা। সহজ ব্যাপার। নুটুদির অনুমতি পেলেই সে গলা সরু করে সুর ধরবে। আর একটা পাগলা হাসির বন্যার তোড় ফেটে পড়বার অপেক্ষায় ছিল সকলের চোখে মুখে।

"থাক।" নুটুদি মাসোজীর দিকে ফিরেছিলেন, " এস্রাজ বাজছে না কেন? গান যেখানে থেমেছিল সেখান থেকেই ধরো। আমরা আমাদের গান নিয়েই থাকি।" তাঁর চোখে আর তখন কৌতুকের ছটা ছিল না। ঠোঁটে লেগেছিল তাঁর সহজাত হাসি।

নুটুদি মাঝে মাঝে খুব গম্ভীর হয়েও উঠতে পারেন, তখন তাঁকে রাশভারি আর কঠিন দেখায়। এস্রাজ বেজে উঠেছিল। বনবিহারী ওর এস্রাজ নিয়ে মাসোজীর কাছাকাছি বসেছিল। সুধীরের হাতে বাঁশি। সে দাঁড়িয়েছিল এক পাশে। নুটুদির সঙ্গে শান্তিময় গলা মিলিয়েছিল, "যখন যাব চলে ওরা ফুটবে তোমার কোলে/তোমার মালা গাঁথার আঙুলগুলি মধুর বেদন ভরে। যেন আমায় স্মরণ করে..."

রামকিঙ্কর সেই সন্ধ্যায় সহজে গানে গলা দিতে পারেনি। পূর্ণিমার চাঁদের মতো রঙ মুখে, সেই কালো চোখের দ্যুতি মাঝে মাঝেই ওকে দেখছিল। দেখার আগে সেই চোখ নুটুদি আর আশেপাশে মুখগুলোর দিকে ঘুরে আসছিল। রামকিঙ্কর প্রথমে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। চন্দ্রা ওকে লুকিয়ে দেখছিল। চোখে চোখ পড়লেই যেন সেই কালো চোখের দ্যুতিতে বিজলি চমকাচ্ছিল। কিন্তু রামকিঙ্কর ঐরকম লুকোতে শেখেনি। গান হয়ে যাচ্ছিল। ওর সব মনটাকে টেনে রেখেছিল চন্দ্রা। গানে গলা দিতে পারেনি। কোনো মেয়ে তো কোনো দিন ঐরকম করে তাকায়নি। হাসেনি। চন্দ্রা কি সেই গানের কথা ভুলতে পারছিল না? ভেবে ভেবে কেবলই মসকরা করছিল? লুকিয়ে চোখে চোখে মসকরা? চন্দ্রা কি ওর সঙ্গে পট আঁকতে চাইবে নাকি?

রামকিঙ্করের মন না, প্রাণ-চমকে উঠেছিল। আর একটি মুখ মনে পড়েছিল। প্রতিমার মতো মুখ। কানটানা চোখ। তার হাসিতে ছিল একটা হাতছানি। সেই চোখ দুটি প্রায়ই নানা জায়গায়, নানা ভাবে ওর সামনে ভেসে উঠতো। ডাক দিতো, ওর সঙ্গে বসে সে একদিন পট আঁকা করতে চায়। তার কালো চোখে ছিল যেন একটা গুপ্ত মন্ত্র। যে-মন্ত্র ওকে মুগ্ধ করতো। কিন্তু সে খিলখিল করে হেসে বাজতো না। হাসি থাকতো তার ঠোঁটে। চোখে। আর সে মাঝে মাঝেই হঠাৎ হঠাৎ ভেসে উঠতো।

চন্দ্রাও সেইরকম হঠাৎ ভেসে উঠেছিল। কিন্তু অন্যরকম ভাবে। না, চন্দ্রার সঙ্গে তার মিল নেই। রামকিঙ্কর মনে মনে মাথা নেড়েছিল। সে ছিল নিঃশব্দ। কেবল তার সেই কালো চোখের ঝলক ছিল চন্দ্রার চোখে। মন্ত্রও কি ছিল? তাকে ঘিরেছিল একটা অপার রহস্য। চন্দ্রার যেন সবটাই লুকোচুরি খেলা। কিন্তু ওর তেইশ বছরের মনটা আনচান করে উঠেছিল। বাতাস বাতাস। ঝড় তুলেছিল ওর ভিতরের কোথায়। চন্দ্রা নিজেকে অতি মাত্রায় সামনে ধরে রেখেছিল। আঠারোর ঔদ্ধত্যের কী একরোখা দাপট! সে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে দিতে চায়নি। রামকিঙ্করের জীবনে চন্দ্রার উদয় হয়েছিল, এক নতুন পথের বাঁকে। অজানা সেই বাঁকের পথ কোরো পাহাড়ের খাড়া উৎরাইয়ের মতো। ও দামোদর নদের মতোই সেই উৎরাইয়ে বেগে ছুটে গিয়েছিল।

বসন্ত গত। গ্রীষ্ম এলো তার দুঃসহ দাহ নিয়ে। নিচু বাংলার দক্ষিণে পুকুরের জল ঠেকেছে গিয়ে সেই কোন্ তলায়। সেই জলে গিয়ে গা ডুবিয়ে বসে থাকে ভুবনডাঙার গরু মহিষরা। দারুণ তাপে গৃহস্থের বন্ধ ঘরের ছেঁচ তলায় তাদের কুকুরগুলো ছায়া পায় না। ছুটে আসে সেই পুকুরের তলানিতে। জলে গা ডুবিয়ে জিভ বের করে হাঁপায়। আকাশে একটা পাখিও উড়তে দেখা যায় না। একটু বেলা হলে, রোদের দিকে তাকানো যায় না। বিকালে যখন ছায়া নামে, তখনও গাছপালা নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় খোয়াই জ্বলছে। আকাশ জ্বলছে। অথচ গাছপালা সকল প্রাণী যেন আকাশের দিকেই তাকিয়ে আছে।

ঘণ্টাতলার ঘণ্টা স্তব্ধ। শিশুবিভাগ' থেকে শুরু করে, শমীন্দ্র সতীশ মোহিত সত্য কুটির ছাত্রাবাসগুলোয় গলার স্বর শোনা যায় না। ঘণ্টাতলার প্রাঙ্গণে ওড়ে শুকনো পাতা। তারই খড় খড় শব্দ শোনা যায়। নতুন এক পাকাবাড়ি মাথা তুলেছে তোরণ ঘরের মাঝখানে। তার নাম হয়েছে সিংহসদন। লর্ড সিংহ দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকায় উঠেছে এই বাড়ি। নকশা করেছেন সুরেন কর। সিংহসদন নাম দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

সিংহসদনের বড় ঘরটা বৈশাখে ভয়ংকর রোদে নিঃশব্দে হা করা। ঘরটা দরবার ঘরের মতো। সভাঘরও বলা যায়। বর্ষার সময় শালবীথি বা আম্রকুঞ্জের ক্লাসে হঠাৎ বৃষ্টি নামলে, সেখানে যাওয়া যাবে। নাটক করা যাবে। এই লর্ড সিংহের দৌলতেই সন্তোষ মজুমদারের পুবের মাঠের জমি বিশ্বভারতীর খাসে আনা গিয়েছে। সন্তোষদার স্ত্রী শৈল বৌঠান ব্যাপারটিকে মোটেই ভালো ভাবে নেননি। সন্তোষদা একশো বিঘা বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। তাঁর অকালে নিদানের পর শিক্ষাসত্র চলে গিয়েছিল শ্রীনিকেতনে। তাঁর বাড়ি আর কয়েক বিঘা জমি বাদে সবই বিশ্বভারতীর দখলে এসেছিল। শৈল বৌঠানের আপত্তি সত্ত্বেও আটকাতে পারেন নি। মন কষাকষিও তাই স্বাভাবিক ছিল।

জীবন এইরকম। সন্তোষদা থাকতে সম্পর্ক ছিল একরকম। তিনি গত হবার পর সম্পর্ক আর একরকম হয়েছিল। শৈল বৌঠান বঞ্চিত হয়েছিলেন, অথবা বিশ্বভারতীর উন্নতির কাছে সে-বঞ্চনার মূল্য ছিল না, কে তার বিচারক? সন্তোষদার মা বা নুটুদি রেখাদি বিষয়টিকে কী চোখে দেখেছিলেন, কে জানে? রামকিঙ্কর জানে না। ওর মনে হয়, যা কিছু ঘটতে দেখছে, সবই যেন এক অনিবার্য অমোঘ নিয়মের দ্বারা চালিত হচ্ছে।

রামকিঙ্কর দেখেছে সিংহসদন মাথাতুলে দাঁড়ালো। পশ্চিমে নতুন কলাভবনের পাকা বাড়ি উঠছে। সব বাড়ির নকশাদার একজন। সুরেন কর। অবিশ্যি কলাভবনের নকশা করার সময়ে, তিনি তাঁর নতুনদা নন্দলালের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়েছিলেন। সবই বদলাতে থাকে। হঠাৎ চোখে পড়ে না। এখন এই গ্রীষ্মের ছুটির নিরালায় যখন কাকপক্ষীও যেন কোথায় গা ঢাকা দেয়, তখন হঠাৎ ছাত্রাবাস কুটিরগুলোর দক্ষিণে সিংহসদন নতুন করে চোখে পড়ে। পুবের মাঠে সন্তোষদার বাড়িটার দরজা জানালা বন্ধ। বাড়িটার দিকে তাকালে গোটা পরিবারের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এমন কি উঠোনের ধানের মরাইটাও।

রামকিঙ্কর গ্রীষ্মের ছুটিতে বাঁকুড়ায় যায়নি। কেন যায়নি? চন্দ্রা দেশে যায়নি। সে কলকাতায় আত্মীয় ঘরে গিয়েছে। কিছুদিনের জন্য। অল্প দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। বলে গিয়েছে নিজের মুখে। রামকিঙ্করের জীবনে চন্দ্রার স্থান কোথায়, দুজনের কেউ জানে না। দুজনের ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। রামকিঙ্কর যেন একটা ঘোরের মধ্যে। অজানা পথের উৎরাইয়ে ছুটেছে। কিন্তু কী একটা ভয়াল ভয় ওকে ঘিরে আসছে। অজগরের মতো তার উদ্যত গ্রাস ক্রমেই এগিয়ে আসছে। এখন এই রুদ্রতাপে ও মাঝে মাঝে পশ্চিম তোরণের দোতলায় মাটি নিয়ে কিছু গড়বার চেষ্টা করে। গড়বার চেয়ে আঁকার দিকেই ঝোঁক বেশি। পশ্চিম তোরণের দোতলায়, গৈরিকের ঘরে গড়তে গড়তে, আঁকতে আঁকতে, ও চমকে চমকে ওঠে। কী একটা ঘিরে আসছে ওকে। বাইরে তার কোনো চিহ্ন নেই। সে ভয়াল ভয়টা যে কোথা থেকে হা মুখ নিয়ে ঘিরে আসছে ও দেখতে পায় না। অথচ চমকে চমকে ওঠে। কাজ থেকে মুখ তুলে চায়।

ঝড় এলো পর পর কয়েকদিন। ছাত্রাবাসের কুটিরগুলোর চালা উড়লো কিছু কিছু। ভুবনডাঙার ঘরের চাল উড়লো আকাশে। বৃষ্টির ঝোড়ো ঝাপটায় মাটির দেয়াল মুখ থুবড়ে পড়লো। অথচ ঝড় বৃষ্টি থেমে গেলেই, আবার সেই গুমোট গরম। গাছপালা স্থির।

"কিঙ্কর তুমি ছুটিতে বাড়ি যাও নাই?"

মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত—মণিদার সঙ্গে একদিন দেখা হলো বিকালে। গোয়ালপাড়ার রাস্তার ধারে। সে ত'র কাজের নির্দিষ্ট সময় পার করে আবার ফিরে এসেছে। রামকিঙ্কর দাঁড়িয়ে দেখছিল সন্তোষদার ভেঙে পড়া গোয়াল। গরু এখনও কয়েকটি আছে। তাদের দেখাশোনোর জন্য উত্তর প্রদেশের লোকও আছে। কিন্তু দুধ যোগাতে পারে না। গরুর খাবারই নাকি জোটে না। কেন যে বিকালের সেই সময়ে ও দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল, জানে না। ও মণীন্দ্রর দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নাড়লো, "না।"

"তোমার চলছে কেমন করে?" মণীন্দ্রর স্বরে সাগ্রহ কৌতূহলের সুর।

কয়েকটি শব্দের উচ্চারণে, সেই অজ্ঞাত-ভয়াল ভয়টা একটা বিকট মূর্তিতে ওকে গ্রাস করতে উদ্যত হলো। গ্রীষ্মের ছুটিতে ও কেন বাঁকুড়ায় যায় নি, তৎক্ষণাৎ জবাবটা ওর কানে ফিসফিস ফোঁসানির মতো বাজলো, ওর পিঁপড়ের বাসার জমার ঘরটা প্রায় শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। গত পুজোর ছুটির আগে আনন্দবাজারের জন্য যে ছবি কয়েকটা হরিহরণের কাছে রেখে গিয়েছিল, তা থেকে পেয়েছিল মাত্র দু টাকা। তখনই ওর খুদকুড়োয় ভালো রকমে টান ধরেছিল। সে দু টাকা অনেকখানি! তারপরে কিছুই ওর জমার, ঘরে আসেনি। কেন ও বাঁকুড়ায় যায়নি? কী করে ও ঘরের খাবার খাবে? এখানে ওর সে সঙ্কোচ ছিল না।

মন এই রকম। ঘরের যে-অন্ন ও চিরকাল অসঙ্কোচে খেয়েছে, কয়েক বছর আগেই, সে-অন্ন মুখে তুলতে গিয়ে থমকে গিয়েছিল। তবু খেতো। তারপরে এই শান্তিনিকেতন ওকে নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছে। আর ওর ভাগ্যও প্রসন্ন ছিল। কিছু টাকা পেয়েছিল। বাবার হাতে তুলে দিতে পেরেছিল। তারপরে যেন জীবনে নেমে এসেছিল খরা। গত পৌষমেলায় ওর সর্বসাকুল্যে জুটেছিল এক টাকা। গ্রীষ্মের ছুটিতে ঘরে যায়নি যে-ভয়ে সে-ভয়টার আড়ালে ছিল তার চেয়েও ভয়াল কিছু। সামনের বর্ষার পরেই ওর এখান থেকে ছুটি। তিন বছর পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন ও আর অবৈতনিক ছাত্র থাকবে না। চন্দ্রা এসেছিল এক দরজা দিয়ে। আর এক দরজা দিয়ে জীবনের হতাশা আর ভয় অজগরের উদ্যত গ্রাসের মতো এগিয়ে আসছিল। মণীন্দ্রর জিজ্ঞাসা, সেই ভয়ংকরটাকে আর সরিয়ে রাখতে পারে নি। মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল। মাথা নেড়েছিল।

"মণিদা, চলছে না। সামনের বর্ষার শেষে আমি আর ছাত্রও থাকব না।"

"তার তো এখনো দেরি আছে।" মণীন্দ্রর মুখে যেন বরাভয়ের হাসি, "বর্ষাকালের মধ্যে কী হইতে কী হইব কওয়া যায় না। কথায় কয় পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীলোকের চরিত্র। তাদের কথা কিছু কওয়া যায় না। কথাটা আমি মানি না। প্রবাদ আছে। তুমি জগদানন্দবাবুর বিজ্ঞানের বইয়ের কিছু ছবি আঁকতে পারবা?"

রামকিঙ্করের মনে হলো ওর গলার স্বর বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চোখ ঝাপসা হয়ে উঠবে। আর ও হয়তো গুঙিয়ে চিৎকার করে উঠবে। কয়েকবার ঢোঁক গিললো, "পারব।"

"তা হইলে তুমি তোমার বন্ধু প্রভাতমোহনের সঙ্গে কথা কও। এই সব কাজতো সে-ই করে।" তিনি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

রামকিঙ্কর কোনো জবাব দিতে পারলো না। ও জানে, প্রভাতমোহন অনেকের বইয়ের ছবি এঁকে ভালো টাকা পায়। জগদানন্দ, নেপাল রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, এঁদের বইয়ের ছবি সে আঁকে। কিন্তু ওকে কোনোদিন আঁকতে বলেনি। ও নিজের থেকে বলতে পারেনি।

মণীন্দ্র হাসলেন। সেই বরাভয়ের হাসি, "প্রভাতকে যা কওয়ার আমিই কইব। এখন সে ছুটিতে আছে। আমি কইব জগদানন্দবাবুকে। আমি আসব কাল সকালে। এই কাজে টাকা কিছু পাইবা। কাল সকালে…"

রামকিঙ্করের চোখ তখন ঝাপসা। মণীন্দ্র উত্তরে চলেছে। দক্ষিণ থেকে ডাক ভেসে এলো, "রামকিঙ্কর আমি কলকাতা থেকে ফিরে এলাম।"

চন্দ্রার স্বর। রামকিঙ্কর মুখ ফিরিয়ে গৈরিকের ঘরে ঢুকলো। *(ক্রমশ)*

পূর্ব-পশ্চিম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তরপর্ব : ৭

দরজা খোলার জন্য ওভারকোটের বিভিন্ন পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে চাবি খুঁজতে লাগলো সিদ্ধার্থ। অতীনের কাছেও চাবি থাকে, কিন্তু সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে। যেন ধরা-পড়া চোরের মতন মুখচোখ, তার দাড়িতে লেগে আছে রাস্তার ধুলো।

প্যান্ট-সার্ট-জ্যাকেট ও ওভারকোট মিলিয়ে দশ-বারোটা পকেট, সব কটা পকেট খুঁজে চাবিটা পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। ভেতরে এসে, আলো জ্বেলে রাগে গরগর করতে করতে সিদ্ধার্থ বললো, এমন দামি নেশা, শালা চৌপাট হয়ে গেল একেবারে। ভেবেছিলুম রাত্তিরটা থানায় কাটাতে হবে!

ওভারকোটটা খুলে সে ছুঁড়ে ফেললো বিছানার ওপর। তারপর উগ্রমূর্তিতে অতীনের দিকে ফিরে বললো, এবার বল, কেন ঐ কাণ্ডটা করতে গেলি? গাড়িতে দুটো মেয়ে ছিল, নইলে তোকে তখনই এমন পেটাতে ইচ্ছে করছিল আমার!

অতীন চেয়ারে বসে পড়ে ফ্যাকাসে গলায় বললো, কেন তুই আমাকে ঐ পার্টিতে নিয়ে গেলি। আমি যেতে চাইনি, তুই জোর করে

সিদ্ধার্থ এগিয়ে এসে অতীনের চুল খামচে ধরে বললো, তোকে আমি শান্তা বৌদির বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অন্যায় করেছি। তোকে ইংল্যান্ড থেকে এখানে ডেকে আনাটাও আমার অন্যায় হয়েছে? আমার অ্যাপার্টমেন্টে তোকে থাকতে দিয়েছি, সেটাও আমার অন্যায়? তুই যদি মরতেই চাস, দেশে থেকেই মরতে পারতি না? এখানে একা একা যেখানে খুশী গিয়ে মর না! মরার জায়গার অভাব আছে? আমাদের জড়াতে চেয়েছিলি কেন?

অতীন বললো, আমি চেষ্টা করলেও মরতে পারি না।

অতীনের চুল ধরে টানতে টানতে জানলার কাছে নিয়ে এসে, জানলাটা খুলে দিয়ে, সিদ্ধার্থ বললো, লাফা, এখন থেকে নীচে লাফিয়ে পড়। দেখি শালা, তুই মরিস কি না।

সিদ্ধার্থর হাতটা ধরে অতীন বললো, ছাড়, আমার লাগছে! সত্যি, তোদের ওরকম বিপদে ফেলা আমার অন্যায় হয়েছে। গাড়ির মধ্যে হঠাৎ যেন আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল, সবাই আমাকে অপমান করছে, আমার বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না।

—কেউ তোকে অপমান করেনি। শান্তাবৌদি কত ভালো ব্যবহার করছিলেন, তুই-ই তাদের অপমান করেছিস।

—হয়তো আমারই ভুল। শান্তা বৌদির কাছে এখন টেলিফোন করে মাপ চাইবো?

অতীনের চুল ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধার্থ বললো, এত রাত্তিরে আর ন্যাকামি করতে হবে না! দ্যাখ অতীন, মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা আছে। আমি আর তোকে ট্যাক্‌ল করতে পারছি না। আমি কি সব সময় তোকে পাহারা দিয়ে থাকবো? তুই এখানে আছিস বলে আমার কোনো বান্ধবীকে এই অ্যাপার্টমেন্টে ডাকি না, উইক এন্ডে ডেট করি না, আর কত স্যাক্রিফাইস করবো তোর জন্য?

অতীন একটা সিগারেট ধরিয়ে ম্লান গলায় বললো, তুই আমাকে সাতদিনের নোটিস দিয়েছিস, তার আগেই আমি তোর অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে যাবো।

—আমার অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে টিউব স্টেশানে গিয়ে শুবি? হারামজাদা ছেলে, গাড়ির দরজা খুলে, যখন ঝাঁপ দিলি, তখন তোর মা-বাবার কথা একবারও মনে পড়লো না? আচ্ছা, মা-বাবার কথাও না হয় বাদ দিলুম, ঐ শর্মিলা বলে মেয়েটির কথাও একবারও ভাবলি না!

—আমি এমন একটা ক্রাইসিসের মধ্যে পড়েছি, তাতে মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব কেউ আমাকে কোনো হেল্প করতে পারবে না। আমি এমন একটা বিরাট অন্যায় করে ফেলেছি, যার থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায়ই নেই। সেইজন্যই ভাবি যে আমার এখন মরে যাওয়াই ভালো।

—অন্যায় আর অন্যায়! তোর এই একটা অবসেশান তুই মুছে ফেলতে পারছিস না? যুদ্ধ করতে গেলে মানুষ মারতে হয়। যুদ্ধ ব্যাপারটাই একটা অন্যায় হতে পারে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল যুদ্ধে নেমে পড়লে মানুষ মারা অন্যায় নয়। নইলে নিজেকে মরতে হবে। তুইও একটা আদর্শের জন্য যুদ্ধে নেমেছিলি

অতীনের চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠলো, শক্ত হয়ে গেল চিবুক, সে ঘাড় সোজা করে বললো, না, না, না, না, নর্থবেঙ্গলে আমি যে একজনকে

মেরেছি, সেটা আমি মোটেই অন্যায় করিনি। বেশ করেছি মেরেছি! সেটা ছিল একটা সমাজবিরোধী, জোতদারের দালাল, ভাড়াটে গুণ্ডা, আমাদের দিকে আগে বোমা ছুঁড়েছিল, মানিকদা ইনজিওরড হয়েছিলেন, তারপরেও লোহার রড নিয়ে তেড়ে এসেছিল আমাদের দিকে। আমি তাকে গুলি না করলে সে-ই আমার মাথা ছাতু করে দিত। নট ওনলি ফর সেলফ-ডিফেন্স, তাকে শাস্তি দেবার মরাল রাইট ছিল আমার হান্ড্রেড পারসেন্ট! বেশ করেছি তাকে মেরেছি! ওরা আমার নামে মিথ্যে কেস সাজিয়েছিল, কিন্তু আমি জানি, আমি কোনো অন্যায় করিনি।

সিদ্ধার্থ বললো, তুই যদি নিজেকে এত স্টাউটলি ডিফেন্ড করতে পারিস, তা হলে আর লজ্জা পাবার কী আছে? চোর-চোর ভাব করে থাকিস কেন? লোকজনের সঙ্গে মিশতে পারিস না। দিনদিন তুই মরবিড হয়ে যাচ্ছিস। কাল তুই ঘুমের মধ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলি!

অতীনের শরীরটা আবার শ্লথ হয়ে গেল, নুয়ে গেল মুখ। মেঝের দিকে তাকিয়ে সে বললো, পালিয়ে থাকার সময় আমি এমন একটা কাজ করে ফেলেছি··· প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে··· মাথার ঠিক ছিল না··· তারপর থেকে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না! অন্য কারুকে সে কথা বলতেও পারি না, কী যে করবো এখন তা বুঝতেও পারি না

—ইডিয়েট, তুই সে কথা আমাকেও বলতে পারিস না? আমি তোর বন্ধু নই? একা একা ব্রুড করে তুই দিন দিন যে একটা ওয়ার্থলেস হয়ে যাচ্ছিস, তাতে কোনো লাভ আছে?

—কোনো বন্ধুই আমাকে সাহায্য করতে পারবে না।

—আমি আজই সব শুনতে চাই। ইটস হাই টাইম···

সেই এক ঘোর বৃষ্টিময় বিকেলে অতীন একটা লোককে গুলি করার পর দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটেছিল। কোথায় যাবে সে? মানিকদার আস্তানায় যাওয়া যাবে না, ওরা মানিকদাকে চিনে ফেলেছে। কলকাতার বাড়িতেও ফেরা যায় না এখন, পুলিশ নির্ঘাৎ খোঁজ পেয়ে যাবে সে বাড়ির। কয়েক মিনিট আগেও অতীন জানতো না যে সে একটা লোককে খুন করবে। কিন্তু ওরাই আগে আক্রমণ করেছে, প্রায় বিনা কারণে, বিনা প্ররোচনায়··· পুলিশ ওদেরই তাঁবেদার··· পুলিশের হাতে ধরা পড়লে অত্যাচার করবে, বালির বস্তা দিয়ে পেটাবে, কানু সান্যাল- খোকন মজুমদারের সন্ধান জানবার জন্য জেরা করবে··· তারপর কি ওরা অতীনকে ফাঁসী দেবে? কিছুতেই ধরা দেবে না অতীন, বিপ্লবীরা কখনো ধরা দেয় না, শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায়!

প্রথম রাতটা অতীন কাটালো মাদারিহাটের কাছে একটা জঙ্গলে। সারা রাত তার চোখে একফোঁটা ঘুম আসেনি। মাত্র দু'এক মিনিটের একটা ঘটনায় তার জীবনটা বদলে গেছে। সে এখন অন্য মানুষ। সে আর মমতা-প্রতাপ মজুমদারের ছেলে নয়, তাঁদের কাছে অতীন কী করে আর মুখ দেখাবে? অলির সঙ্গেও আর সম্পর্ক থাকবে না কিছু। অলির বাবার চোখে সে এখন অস্পৃশ্য, একটা ক্রিমিন্যাল।

সেই রাতেই অতীন বুঝেছিল যে জঙ্গলে একা একা লুকিয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মানিকদা একবার বলেছিলেন বর্ডার ক্রস করে নেপালে চলে যাবার কথা। কিন্তু নেপালে গিয়ে সে কোথায় থাকবে? তার কাছে টাকাকড়ি নেই, নেপালে কোনো কনট্যাক্ট নেই। যদি সঙ্গে আর একজন কেউ থাকতো, তাহলে দু'জনে মিলে বুদ্ধি করে একটা কিছু করা যেত। তপনটা কোথায় গেল? কাপুরুষের মতন পালিয়েছে আগেই···

পরদিন সন্ধের অন্ধকারে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে অতীন মাদারিহাটে এসে রঞ্জিতকে খুঁজল। এই রঞ্জিত এখানে একটা ইস্কুলে পড়ায়, কয়েকবার এসেছে শিলিগুড়িতে মানিকদার বাড়িতে। সে তাদের মতে বিশ্বাসী।

রঞ্জিতরা খুবই গরিব, দু'খানা মাত্র টিনের ঘরে মা-বাবা- ভাই-বোন মিলিয়ে সাতজন থাকে। সেখানে অতীনকে আশ্রয় দেবে কী করে? তা ছাড়া মাদারিহাটের মতন একটা ছোট জায়গায় একজন নতুন লোক দেখলেই জানাজানি হয়ে যাবে। ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকবেই বা ক'দিন! রঞ্জিতদের বাড়ির গা ঘেঁষাঘেঁষি অনেকগুলো বাড়ি, সবই প্রাক্তন রিফিউজিদের, এক বাড়ির লোক অন্য বাড়িতে যখন তখন আসে।

খুনের কথা এর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। রঞ্জিতের কাছ থেকেই অতীন খবর পেল যে মানিকদা ধরা পড়েননি। যে-ছেলেটি মারা গেছে, ফরোয়ার্ড ব্লকে তার নাম লেখানো থাকলেও সে ছেলেটি আসলে একটি গুণ্ডা। এর আগে সে বেশ কয়েকটা খুন করেছে। কিন্তু এখানে রটেছে যে সি পি এম-এর উগ্রপন্থীদের হাতে খুন হয়েছে ফরয়ার্ড ব্লকের একজন কর্মী। তাই নিয়ে একটা মিছিল বেরিয়ে গেছে কুচবিহারে।

রঞ্জিত পরামর্শ দিল অতীনকে বিহারে চলে যেতে, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের আওতার বাইরে। খুনের আসামী হিসেবে অতীনের নাম এখনো জানাজানি হয়নি, সে কয়েকমাস বিহারে কাটিয়ে আসতে পারলে ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে যাবে। কাটিহারে রঞ্জিতের এক মামাতো ভাই থাকে, সে যথাসাধ্য সাহায্য করবে অতীনকে।

রঞ্জিতের অত টানাটানির সংসার, তবু সে পঞ্চাশটা টাকা জোগাড় করে দিল অতীনকে। নিজের একটা জামা দিল এবং তার মামাতো ভাইয়ের নামে একটা চিঠি।

কিষানগঞ্জ দিয়ে অতীন ঢুকে পড়লো বিহারে। তারপর বাস ধরে পূর্ণিয়া, সেখান থেকে কাটিহার। বিহারে এসেই অতীন অনেকটা স্বাভাবিক বোধ করলো, যেন তার বিপদ কেটে গেছে, এখানে কেউ তাকে চেনে না।

এর মধ্যে কলকাতায় ফেরার কথা ছিল অতীনের। মাকে সে চিঠিটা যে কেন লিখতে গেল! ঠিক দিনে অতীন না পৌঁছোলে মা উতলা হয়ে উঠবেন। সোমবার দিন নিশ্চয়ই তার জন্য রান্না করে রেখেছিলেন মা। এখন অতীনের কাছ থেকে কোনো সাড়া শব্দ না পেলে মা-বাবা কী করবেন? প্রথমে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবেন শিলিগুড়িতে। কোনো উত্তর পাবেন না। তারপর? মা বাবাকে জোর করে পাঠাবেন শিলিগুড়িতে? কিংবা কৌশিকও আসতে পারে। কৌশিক পমপমেরা কি সব জেনে ফেলেছে? মানিকদা কোথায় গেলেন?

দার্জিলিং থেকে ফেরার পথে অলিরা নিশ্চিত খোঁজ করবে অতীনের। আর কিছুদিন যাক, অলিকে সব কথা বুঝিয়ে একটা চিঠি লিখতে হবে।

কাটিহারে রঞ্জিতের মামাতো ভাইয়ের নাম পরাণ, একটা ছোট মনিহারি দোকান আছে তার। এরাও রিফিউজি কিন্তু ক্যাম্পে না থেকে কোনোক্রমে জীবনযাপনের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। শুকনো, চিঁড়ে-চ্যাপ্টা গোছের চেহারা এই পরাণের, বছর তিরিশেক বয়েস, সে রাজনীতির ধার ধারে না। কিন্তু রঞ্জিতের চিঠি পেয়ে সে কোনো প্রশ্ন করলো না, অতীনকে তার দোকানের কাজে লাগিয়ে দিল।

দাড়ি কামানো বন্ধ করে দিয়েছিল অতীন, এবারে তাকে আরও কিছু ছদ্মবেশ নিতে হলো। প্যান্টের বদলে ময়লা ধুতি ও খালি গায়ে সে দোকানে বসে, স্নান করে না, চুল আঁচড়ায় না। তার চেহারা থেকে শহুরে পালিশটা একেবারে মুছে ফেলা দরকার। পারতপক্ষে খদ্দেরদের সঙ্গে কথাও বলে না অতীন। পরাণ দরদাম করে, অতীন জিনিসপত্র বেঁধে দেয়। স্টেশানের কাছে, রেলেরই জমি জবরদখল করে, টিনের ছাউনির দোকান, রাত্তিরে অতীন সেই দোকানেই শোয়। পরাণদের বাড়িতেই দু'বেলা খাওয়া, শুধু ডাল-ভাত আর একটা তরকারি, অধিকাংশ দিনই ঝিঙে বা ঢ্যাঁড়শের।

কাটিহারে পৌঁছোবার কয়েকদিন পরেই অতীন স্টেশানের খবরের কাগজে দেখলো যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের খবর। উত্তরবঙ্গে নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে ভূমি দখলের আন্দোলন একেবারে থিতিয়ে গেছে, কিন্তু কলকাতায় ছাত্রসমাজ সশস্ত্র কৃষক-বিপ্লবের সমর্থনে মিছিল বার করছে প্রায়ই।

টানা সাড়ে তিনমাস অতীন কাটিহারে রয়ে গেল সেই মনিহারি দোকানের বোকা সোকা কর্মচারীর ছদ্মবেশে। বাড়িতে সে চিঠি লেখেনি, অলিকেও সে চিঠি লেখেনি। এই অজ্ঞাতবাস তার বেশ পছন্দই হয়ে গিয়েছিল। ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়ে যাবার ফলে পুলিশ এখন লাগামছাড়া। প্রতিদিন ডজন ডজন গ্রেফতারের খবর।

রঞ্জিত এর মধ্যে চিঠি লিখে জানিয়েছিল যে অতীন যেন অন্য কোথাও চলে না যায়। মানিকদার সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে, মানিকদা অতীনকে আপাতত কাটিহারে থাকতেই নির্দেশ দিয়েছেন।

পুরো শীতকালটা তার কাটলো বিহারের ঐ ক্ষুদ্র শহরে।

তারপর চৈত্রমাসে এক ঝড়-বৃষ্টির সন্ধ্যায় অতীন আর পরাণ যখন দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ উপস্থিত হলো এক আগন্তুক। গায়ে বর্ষাতি, মাথায় টুপী, মুখে চাপ দাড়ি, সে প্রায় ঝাঁপটা তুলে জোর করে দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়তেই অতীন একটা আড়াইসেরী বাটখারা তুলে নিয়েছিল হাতে। না লড়াই করে সে ধরা দেবে না।

ঐ বিচিত্র পোশাকের জন্য কৌশিককে চিনতে পারেনি অতীন। হঠাৎ এতদিন বাদে কৌশিককে দেখে তার কান্না পেয়ে গিয়েছিল। কৌশিক যেন তার সত্তার অপর একটি অংশ, কৌশিকের চেয়ে প্রিয় তার কেউ নেই।

পরাণকে প্রচুর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেই রাতেই ওরা দু'জন রওনা হলো রাজমহলের দিকে। তারপর সেখান থেকে ধানবাদ, রাঁচী ঘুরে জামসেদপুর।

কৌশিকের কাছ থেকেই অতীন জানলো চারু মজুমদারের আদর্শে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি মোটেই থেমে যায়নি, বরং সংগঠন গোপনে গোপনে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কানু সান্যাল- মানিকদারা আশা করেছিলেন যে সি পি এম পার্টি ক্যাডারদের মধ্যে একটা বিরাট ভাঙন ধরবে, তারা অবলম্বন করবে চারুবাবুর প্রদর্শিত পথ। তা হয়নি অবশ্য। সি পি এম দল থেকে প্রায় হাজারজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তারপর তাদের পার্টির মধ্যে আর কোনো প্রকাশ্য মতবিরোধ নেই। কিন্তু ছাত্রসমাজ থেকে প্রচুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, এই আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের নানা প্রান্তে, তৈরি হয়েছে একটা অল ইন্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি। একদিকে অন্ধ্র প্রদেশ অন্যদিকে পঞ্জাব, এর মধ্যে শুরু হয়েছে মাওপন্থীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়, খুব শিগগিরই একটা আলাদা পার্টি ফর্ম করা হবে। এখন অনেক কাজ!

কিন্তু অতীন এই সব কাজে এখন কোনো অংশ নিতে পারবে না। তপন ধরা পড়েছে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পুলিশের কাছে সে অতীন ও মানিকদার নাম জানিয়ে দিয়েছে। ওয়ারেন্ট আছে এই দু'জনের নামে। এখন অন্তত এক বছর পশ্চিমবাংলায় অতীনের ঢোকা চলবে না। তারপর দিকে দিকে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলে পুলিশের ঐসব হুলিয়া টুলিয়া তুচ্ছ হয়ে যাবে।

কৌশিক খানিকটা ভর্ৎসনার সুরে অতীনকে বলেছিল, এই সময়টায় আমাদের গোপনে গোপনে সংগঠন জোরদার করার কথা, এর মধ্যে তোরা এমন একটা বেমক্কা কাজ করে ফেললি! এখন খুন জখমের মধ্যে যাবার কী দরকার ছিল?

অতীন উত্তর দিয়েছিল, আমরা কি প্ল্যান করে কিছু করেছি নাকি? হঠাৎ হয়ে গেল! মানিকদা চারুবাবুর কাছ থেকে একটা গোপন মেসেজ নিয়ে যাচ্ছিলেন খোকন মজুমদারের কাছে, মাঠের মধ্যে ওরা হঠাৎ আমাদের অ্যাটাক করলো...

—মানিকদা বলেছেন, তুই মাথা গরম করে হঠাৎ গুলি চালিয়ে দিলি! ওকে একেবারে প্রাণে মেরে না ফেললে চলতো না?

—মানিকদা বলেছেন এই কথা? আমি না মারলে ওরা নির্ঘাৎ আমাদের মেরে ফেলতো। ওরা মারতেই এসেছিল। মানিকদার গায়ে বোমা ছুঁড়েছিল, তারপর লোহার রড নিয়ে তেড়ে এসেছিল! তুই জানতি, কৌশিক, মানিকদার সঙ্গে রিভলভার থাকে?

—সেই রিভলভারটা নিয়ে তুই কি ওদের ভয় দেখাতে পারতি না?

—ওরা কি ভয় পাবার মতন মানুষ? মানিকদার হাতে রিভলভার দেখেও ওরা বোমা ছুঁড়েছিল। খুন করতে ওদের হাত কাঁপে না। জানিস কৌশিক, দু'এক মুহূর্তের এদিক ওদিক, আমার গুলি যদি লোকটার গায়ে না লাগতো, ও আর একটা বোমা ছুঁড়লেই আমরা শেষ হয়ে যেতুম। হ্যাঁরে, তপন ধরা পড়ে সব বলে দিল? হারামজাদা বাঙালটা এত ভীতু?

—জেলের মধ্যে আমাদের অন্য ছেলেও আছে। তাকে দিয়ে তপনের ওপর ওয়াচ রেখেছি। তবে আমার মনে হয় ও রাজসাক্ষী হবে না। অনেকে সহ্য করতে পারে না, বুঝলি, প্রথমটায় ভেঙে পড়ে, তারপর আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে ওঠে। মানিকদা এখনও তপনকে অবিশ্বাস করেন না।

—মানিকদা কোথায়?

—সেকথা তোকে বলা যাবে না। বাই চান্স তুই যদি ধরা পড়িস, তাতে টর্চারের মধ্যে তুই যাতে বলে না ফেলিস, সেই জন্য এই প্রিকশান। তুই না জানলে আর বলবি কি করে? আরে, না না, তোকে অবিশ্বাস করছি না। তুই তপনের মতন উইক সেকথাও বলছি না, তবে এই রকমই একটা সিস্টেম করা হয়েছে। আর মানিকদার সেফটির ওপর আমরা ম্যাক্সিমাম জোর দিয়েছি। মানিকদার শরীর খারাপ।

—আমার বাড়ির কোনো খবর জানিস?

—হ্যাঁ, সবাই ভালো আছেন। আমি মেসোমশাইয়ের সঙ্গে কোর্টে দেখা করে বলেছি, আপনারা চিন্তা করবেন না। বাবলু ভালো আছে। তুই কোথায় আছিস সে কথা জানাই নি অবশ্য।

—বাবা কী বললেন তোকে?

—অত্যন্ত স্ট্রেঞ্জ ব্যবহার করলেন। আমার কথাগুলো সব শুনলেন মন

দিয়ে, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না, একটা কথাও বললেন না আমাকে। সব শোনার পর চুপ করে রইলেন, সিগারেট টানতে লাগলেন। এবার তোর হাতের লেখা দু' লাইন চিঠি নিয়ে গিয়ে তোর মাকে দেখাবো।

—আর অলি ? তোর সঙ্গে অলির দেখা হয়েছিল এর মধ্যে ?

—না, অলির সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে খবর পেয়েছে নিশ্চয়ই। তুই কিন্তু পোস্টে কোনো চিঠি পাঠাস নি বাবলু ! স্ট্রিক্টলি নিষেধ !

জামসেদপুরে সতীশ মিশ্র নামে একজন ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে তোলা হলো অতীনকে। ভদ্রলাক কিছুদিন আগে বিপত্নীক হয়েছেন, দুটি অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে আছে। অতীন তাদের গৃহশিক্ষক। সতীশ মিশ্র মুঙ্গেরের লোক হলেও যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনো করেছেন, মোটামুটি বাংলা জানেন। ভদ্রলোক কথা বলেন কম, কিন্তু বেশ সাহসী মানুষ। অতীনের পটভূমিকা তিনি জানেন, তিনি অতীনকে বলে দিয়েছেন, দিনের বেলা বিশেষ বেরুবেন না, তাহলে আর ভয়ের কিছু নেই।

জামসেদপুরে অতীনকে ঠিকঠাক ভাবে স্থিতি করিয়ে দিয়ে কৌশিক ফিরে গেল।

এই সতীশ মিশ্রের বাড়ির পাশেই থাকে একটি বাঙালী পরিবার। সেই পরিবারে দুটি মেয়ে এ বাড়ির মাতৃহীন ছেলেমেয়েদুটির জন্য মাঝে মাঝেই নানারকম খাবার ও খেলনা নিয়ে আসে। অতীনের মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁপ থাকলেও বড় মেয়েটি তাকে দেখেই চিনতে পারলো। এই মেয়েটির নাম শর্মিলা, জলপাইগুড়ির এক চা-বাগানে এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল অতীন আর কৌশিকদের। শর্মিলার সব মনে আছে।

জামসেদপুরে ঐ বাড়িতে অতীনের কাটতে লাগলো মাসের পর মাস। এখানে অতীন নিয়মিত ইংরিজি খবরের কাগজ পায়। সে জানতে পারলো, কানু সান্যাল ধরা পড়ে গেছেন। মানিকদার কোনো খবর নেই। রাষ্ট্রপতির শাসন তুলে দেবার দাবিতে জোরদার আন্দোলন চলছে কলকাতায়। বামপন্থীরা অন্তবর্তী নির্বাচন চাইছে।

কৌশিক সেই যে গেল আর তার আসার নাম নেই। তবে তার কাছ থেকে খবর নিয়ে এর মধ্যে আরও দু'জন এসেছিল, তারা কেউই অতীনের চেনা নয়। তাদের একজনের হাতে অতীন পেয়েছিল তার মায়ের চিঠি। অতীনও তাদের হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল দুখানা।

জামসেদপুরে বাঙালীর সংখ্যা অনেক, দুর্গাপুজো হয় বেশ কয়েকটা। সাকচিতেই প্রায় পাশাপাশি দুটো প্যান্ডেল। এই সময় সবকিছুই ঢিলেঢালা। তাই অতীন ঘোরাঘুরি করতে শুরু করলো দিনের বেলায়। পুজো প্যান্ডেলে যাওয়ার যে খুব আগ্রহ আছে তার তা নয়, কিন্তু সে স্বাধীনতা ভোগ করতে চাইছিল।

নবমী পুজোর দিন ভোরবেলা এক গাড়ি পুলিশ এসে বাড়ি ঘিরে ধরলো এবং অতীন গ্রেফতার হলো প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায়। পাঁচদিন পর তাকে নিয়ে আসা হলো আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।

পরে অবশ্য অতীন জেনেছিল যে তাকে ধরিয়ে দিয়েছেন অলির বাবা বিমানবিহারী।

এত গোপনীয়তার মধ্যেও কী করে যেন জানাজানি হয়ে গিয়েছিল অতীনের অজ্ঞাতবাসের ঠিকানা। প্রতাপ-মমতা জেনেছিলেন, অলি জেনেছিল। অলি কৌশিককে ধরে ছিল, সে একবার অতীনের সঙ্গে দেখা করতে জামসেদপুরে যাবে। সে উদ্যোগ নেবার আগেই বিমানবিহারী প্রতাপের কাছ থেকে জানতে পেরে গেলেন জামসেদপুরের কথা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুলিশ কমিশনরের কাছে গিয়ে সব ঘটনা জানিয়ে এলেন।

বিমানবিহারী আসলে একটা সূক্ষ্ম বুদ্ধির চাল চেলেছিলেন।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। বামপন্থীদের নির্বাচনী শ্লোগানের মধ্যে আছে যে, ক্ষমতায় এলে তারা সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেবেন। বিমানবিহারী হাওয়া দেখে বুঝেছিলেন যে বামপন্থীদের যুক্তফ্রন্টের আবার জয়ী হয়ে ফিরে আসার সম্ভাবনাই খুব বেশী। অতীন আত্মগোপন করে থাকলে তার নামে ওয়ারেন্ট রদ করা সহজ হবে না। বরং কিছুদিন রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে জেল খাটলেই নির্বাচনের পর তার মুক্তি পাওয়ার সুযোগ খুব উজ্জ্বল।

বিমানবিহারীর অনুমান প্রায় নির্ভুল। মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয় হলো, জ্যোতি বসু হলেন হোম মিনিস্টার এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিলেন, তাঁদের ঘোষিত শত্রু কানু সান্যালরাও ছাড়া পেয়ে গেলেন। কিন্তু অতীনের কেসটা আটকে গেল। নথীপত্রে দেখা গেল অতীন রাজনৈতিক বন্দী নয়, তার নামে ক্রিমিন্যাল কেস, সে সাধারণ একটা খুনের আসামী।

এদিকে অতীনকে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা সব পাকা হয়ে গিয়েছিল। প্রতাপ ত্রিদিবকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন ইংল্যান্ডে অতীনকে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিতে। ত্রিদিব রাজি হয়েছিলেন সাগ্রহে। উঁচু মহলের বিভিন্ন ব্যক্তিকে ধরে অতীনের পাশপোর্ট এবং টিকিটেরও বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল, শেষ মুহূর্তে সব আটকে যাবার উপক্রম হলো।

কানু সান্যাল সমেত পরিচিত অন্যান্যরা সবাই ছাড়া পেয়ে গেলেও অতীন যখন মুক্তি পেল না, তখন সে খুবই ভেঙে পড়েছিল। বিমানবিহারী কিন্তু হাল ছাড়েননি। একটা প্রবল ঝুঁকি নিয়ে তিনি অতীনকে পাঁচ হাজার টাকার জামিনে খালাস করে আনলেন। তারপর জামিন ভঙ্গ করে তিনি অতীনকে তুলে দিলেন বিদেশের জাহাজে।

অতীন বিদেশে যেতে একেবারেই রাজি ছিল না। বাবা এবং বিমানকাকাকে সে অনেকবার বলেছে যে মুক্তি পেলেও সে লন্ডনে যাবে না। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা সে যখন পেল না, সাধারণ ক্রিমিন্যাল হিসেবে কয়েকদিনের জন্য মাত্র জামিনে ছাড়া পেয়ে তার দিশেহারা অবস্থা। আবার তাকে জেলে যেতে হবে। বিচারে তার ফাঁসী না হলেও চোদ্দ বছর অন্তত জেল খাটতে হবে, কৌশিকই তখন বলেছিল, অলির বাবা ঠিক পথই বাৎলেছেন। কিছুদিনের জন্য অন্তত বিলেতে থেকে আয়, এর মধ্যে তার কেসটাকে পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল দিতে হবে। বিমানবিহারী জ্যোতিবাবুকে বোঝাবেন, স্নেহাংশু আচার্যের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে...

কলকাতার ময়দানে যে দিবসে কানু সান্যাল প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন নতুন এক রাজনৈতিক দলের জন্মের। দলটার নাম সি পি আই (এম এল) এবং এই দল পরিচালিত হবে মাও সে তুং-এর চিন্তাধারায়। মাও সে-তুং-এর একটি রেড বুক আন্দোলিত করে তিনি বললেন, এই দলই ভারতে প্রথম সঠিক বিপ্লবী দল।

ঐ দিনই ময়দানের অন্য প্রান্তে আর এক বিশাল সভায় জ্যোতি বসু বললেন, তাঁর সরকার একদিনে নকশালদের দমন করতে পারে কিন্তু তিনি জনসাধারণের হাতেই সে ভার ছেড়ে দিতে চান ! নকশালদের রাজনৈতিক বক্তব্য মোকাবিলা করা হবে রাজনৈতিক ভাবে, কিন্তু তাদের খুন-জখমের ক্রিয়াকর্মগুলো সাধারণ অপরাধীদের মতন বিচার করা হবে আইনের চোখে।

তার পরদিনই অতীন জাহাজে ভেসে পড়লো।...

সিদ্ধার্থ বললো, তোর বিলেতে থাকার অভিজ্ঞতাগুলো আমি শুনেছি। কিন্তু জামসেদপুরে কী হয়েছিল ? এখন বোস্টনে যে শর্মিলা থাকে, তার সঙ্গে তোর আলাপ জামসেদপুরে ? সেখানেই প্রেম হয়েছিল ?

অতীন চুপ করে রইলো। সিগারেট ধরাতে গিয়ে তার হাত কাঁপছে। সে আর কথা বলতে পারছে না। শর্মিলার সঙ্গে কি তার প্রেম হয়েছিল ? না বন্ধুত্ব ? মাসের পর মাস সেই অজ্ঞাতবাসে শর্মিলাই ছিল তার কথা বলার একমাত্র সঙ্গী। সঙ্গিনী নয়, সঙ্গীই। অতীন প্রথম বেশ কিছুদিন শর্মিলাকে মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করেনি, সহজ বন্ধুর মতন ছিল সে, শর্মিলাকে সে অলির কথাও বলেছে। অলি ছাড়া আর কোনো মেয়েকে ভালোবাসার কথা সে চিন্তাই করেনি।

কিন্তু পরপর কতকগুলো নির্জন দুপুর, অতীনের তখন প্রায়ই জ্বর হতো, শর্মিলা এসে সেবা করতো তাকে, এমন চমৎকার মেয়ে শর্মিলা, সরল, ভুলোমনা, পবিত্র। তার হাতের ছোঁয়ায় জাদু ছিল, প্রবল জ্বরের ঘোরে অতীনের একদিন মনে হলো শর্মিলাই অলি, সে তাকে জড়িয়ে ধরলো, বুকের কাছে টানলো, শর্মিলা জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল নিজেকে। সে তো অলি নয়, সে শর্মিলা।

তিনদিন পর অতীন শর্মিলার জানু ধরে বললো, আমি তোমাকেই চাই !

শর্মিলাকে রাজি করাতে আরও সাতদিন লেগেছিল অতীনের। সেদিন একশো চার জ্বর, সে কিছুতেই ডাক্তার ডাকবে না, সে শুধু শর্মিলাকে চায়। শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ ভেঙে পড়লো শর্মিলার। সে অতীনের বুকে এলো। তারপর একটা প্রবল জোয়ার উঠলো, সে জোয়ারে ছেঁড়া চিঠির টুকরোর মতন অতীন ভাসিয়ে দিল অলিকে।

(ক্রমশ)   অঙ্কন : সুব্রত চৌধুরী

একটি ক্রীতদাসের মৃত্যু

পুষ্পেন্দু লাহিড়ী

সংগ্রাহক হিসেবে কোনো নতুন ডাকটিকিট হাতে এলে আনন্দ পাবারই কথা। কিন্তু ডাকটিকিট যে কখনো বেদনার কারণ হতে পারে, সে অভিজ্ঞতা হলো যখন ক্রীতদাসের ওপর মুদ্রিত ডাকটিকিট আমার হাতে এসে পড়ল হঠাৎ-ই। জানি দাসপ্রথার বিলোপকে স্মরণে রেখে, মুক্ত ক্রীতদাসের প্রতি ভালবাসা জানাতেই এই ডাকটিকিট প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমারও যে ক্রীতদাসের বেদনাবিদ্ধ ইতিহাস মনে পড়ে যায়।

প্রভুত্ব করার বাসনা মানুষের মধ্যে আদিম। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিজের সুখের জন্যে ও পরিশ্রম লাঘবের মানসে অপরকে নিয়োগ। বিশেষ করে যদি তার প্রতি দায়িত্ব থাকে কম। একসময় প্রভুর অধিকার ছিল ক্রীতদাসকে নিজের লাভের জন্যে উৎপাদনের কাজে লাগাতে পারা কিংবা নিজের পরিচর্যার জন্যে নিযুক্ত করা। "দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে"—এই প্রশ্ন যেমন মানুষের চিরন্তন, তেমনি সারা পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাস জুড়েই চলেছে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার। জন্ম নিয়েছে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'র মতো অমানবিক প্রবাদ বাক্য।

প্রাচীন যুগেই দাসত্বের উদ্ভব হলেও, মৃগয়াজীবী মানবসমাজে দাস রাখার চলন ছিল না; কারণ যেখানে শিকার পাওয়া অনিশ্চিত, সেখানে বাড়তি মুখের খাদ্য জোগাবে কে? পশু-পালক জন-গোষ্ঠীতেও দাসের বড় একটা প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কৃষি ও শিল্পের কিছুটা বিকাশের পরই দাসত্বের সূচনা। জমির ধনী মালিক যখন অনেকটা জমিতে চাষ করে, তখনই ক্রীতদাস প্রয়োগের লাভজনক দিকটা বোঝা যায়। প্রথম যুগে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলাকালীন যুদ্ধবন্দীদের প্রাণনাশ করারই রীতি ছিল; কিন্তু কৃষিযুগে এসে মানুষ বুঝল যে, যুদ্ধ-বন্দীদের কঠোর কায়িক শ্রমে নিয়োগ করলে একদিকে নিজের শ্রম বাঁচে, অপরদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

তাই দাসত্ব প্রথার প্রাপ্ত ইতিহাসও বেশ প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ অব্দে মিশরে এবং খ্রিস্টপূর্ব ২১০০ অব্দে ব্যাবিলনে দাসত্ব প্রথার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। এমন কি যাতে পালিয়ে না যায়, সে জন্যে পরবর্তীকালে ব্যাবিলনে ক্রীতদাসের হাতে উল্কি করে প্রভুর নাম লেখা হতো। ক্রীতদাসীদের অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ। হয় তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জনপদবধূ হতে বাধ্য করা হতো, নয় তাদের ওপর প্রভুর

ক্রীতদাসী

উপপত্নী হয়ে থাকার অভিশাপ নেমে আসত।

হোমারের কাব্যে দাসের উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ১ম সহস্রকে দাসের অবস্থা কীরকম ছিল। আদিম গ্রিস ও রোমে, ঋণের দায়ে বহু মানুষকে তার উত্তমর্ণের কাছে ক্রীতদাস হিসেবে বন্ধক দিতে হয়েছে। অবশ্য সেদিন দাস সংগ্রহের প্রধান উৎস ছিল যুদ্ধ, জলদস্যুতা ও অপহরণ, ক্রীতদাসীর পুত্র কন্যা গ্রহণ এবং অন্য দেশ থেকে আমদানি।

দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটল এবং সিসেরোর উক্তি উদ্ধৃত করে বলা চলে, সেকালীন গ্রিক ও রোমানরা কৃষিকাজ ছাড়া অন্যান্য কায়িক শ্রমকে নিচু নজরেই দেখত। তাদের মতে শারীরিক মেহনত দাস মানুষেরই যোগ্য। ডাকটিকিট হাতে

মার্টিন লুথার কিং ও নির্যাতিত মানুষ; (ডানদিকে) দাসমুক্তি আন্দোলনের নেতা হ্যারিয়েট টাবম্যান

নিয়ে এসব কথা মনে এলে কার ভাল লাগে!

শুধু বিদেশে নয়, ভারতের মাটিতেও আবহমান কাল থেকে দাস ব্যবস্থা চালু ছিল। বোঝা যাচ্ছে দাস-প্রথা মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র বিশ্বে। সিন্ধু সভ্যতার আমলে ক্রীতদাস ছিল; বেদে, ব্রাহ্মণে, উপনিষদে দাসের উল্লেখ রয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে দাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সর্বত্রই সুবিধেভোগী মুষ্টিমেয়কে নানাভাবে সেবা করার জন্যে আর একদল মানুষকে জোর করে নিয়োগ করা হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব ২য় ও ১ম শতকে রোমে ক্রীতদাস প্রথা চরমে উঠেছিল। সে সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জলদস্যুতার কারণে ক্রীতদাস হয়ে উঠেছিল সুলভ ও সহজলভ্য। উপরন্তু রোমের উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও প্রভূত সম্পদের মালিক হয়ে পড়েছিল। ফলে, সেকালীন ক্রীতদাসকুল মনিবের ইচ্ছাকৃত নৃশংসতার শিকার বলে গণ্য হতো।

বস্তুত দাসদাসী ব্যবস্থা একটি সর্বজনীন স্বাভাবিক সামাজিক প্রথা রূপে স্বীকৃত হওয়ায় মনিব ও ভৃত্যের মধ্যে সম্পর্কটা সহজ হয়ে উঠেছিল। ক্রীতদাস তার দাসত্বকে বড় জোর দুর্ভাগ্যজনক মনে করত এবং অত্যন্ত দুর্ব্যবহার না পেলে তার অবস্থানকে অমর্যাদাপূর্ণ বোধ করত না। পরবর্তীকালে রোম সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যদিও দাস প্রথার চলন কমে এসেছিল, তথাপি পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে ক্রীতদাস রাখার রেওয়াজ দেখা যায়।

বিশ্বের ধর্মগুলির অনুশাসনে যদিও ক্রীতদাসের প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ ছিল, কিন্তু কোনো ধর্মেই দাসত্ব-ব্যবস্থাকে নিন্দা করা হয়নি। এতেই বোঝা যায় দাস প্রথা সমগ্র মানব সমাজে কীভাবে শিকড় গেড়েছিল। ৬ষ্ঠ শতকে দাস রাখার চলন ছিল আরব ভূমিতে। ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে এশিয়া, উঃ আফ্রিকা, পূঃ ও দঃ ইউরোপে বহু যুদ্ধ-কয়েদি গোলামি করতে বাধ্য হয়েছে।

দাস ব্যবসার দ্বিতীয় উত্থান ঘটল ইউরোপে ৮ম ও ১০ম শতকের মধ্যে, যখন প্রচুর স্লাভ দেশীয় মানুষকে যুদ্ধবন্দীরূপে জার্মানিতে নিয়ে এসে ক্রীতদাসে পরিণত করা হলো। 'দাস' অর্থে 'স্লেভ' কথাটির সূত্রপাত সম্ভবত এখান থেকেই হয়।

পরে পর্তুগিজরা গিয়ানা থেকে এবং স্পেনীয়রা দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য স্থান থেকে ক্রীতদাস চালান দিত নিজ নিজ দেশে। কিন্তু

দেখা গেল ল্যাটিন আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা ক্রীতদাস হিসেবে অলাভজনক। কিছুদিনের মধ্যেই পরিষ্কার হলো যে, তারা সহজে বশ মানে না ; প্রায়শই বিদ্রোহী হয়ে পড়ে এবং কাছেপিঠের জঙ্গলে পালিয়ে যায়। উপরন্তু তাদের দৈহিক শক্তিও কম। মাঝে মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে, আফ্রিকার নিগ্রো অধিবাসীদেরই ক্রীতদাস হিসেবে ব্যবহার করা হতে লাগল। যারা দৈহিক শক্তিধর এবং বশে থাকে।

বাগিচা শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাস প্রথাও ব্যাপক হয়ে পড়ল। অবশ্য ক্যাথলিক গীর্জাগুলি বাগিচা শিল্পে ক্রীতদাস নিয়োগের ব্যাপারে সব সময়ই বাধা দিত। পর্তুগীজরা যখন ব্রেজিল দখল করে, তখন অবস্থা আরও চরমে ওঠে। ব্রেজিলের আদিবাসীদের জোর করে ক্রীতদাসে রূপান্তরিত করা হতে থাকে। এবং অত্যাচারও চলতে থাকে অত্যন্ত অমানবিকভাবে। এইভাবে বাগিচা অর্থনীতির বিস্তারের সঙ্গে তাল রেখে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাতে এবং পরে উত্তর আমেরিকাতে দাসপ্রথা ছড়িয়ে পড়ল। এবং পরবর্তী কালে দেখা গেল পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আমেরিকাতে ক্রীতদাস চালান দেওয়া একটি চমৎকার লাভজনক ব্যবসা। এই ব্যবসা ছিল ত্রিমুখী এবং এই ব্যাপারে চরম পরাকাষ্ঠা দেখাল ইংরেজরা। স্বদেশ থেকে পশ্চিম আফ্রিকার অতলান্তিক উপকূলে ইংরেজের যে-জাহাজ যাত্রা করল, তাতে নেওয়া হলো মদ, আগ্নেয়াস্ত্র, সুতি কাপড় ও সস্তা মনোহারী দ্রব্য। দালালরা এগুলির বদলে সংগ্রহ করে দিত ক্রীতদাস। ক্রীতদাস বোঝাই জাহাজ তারপর এসে ভিড়ত হয় পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, নয় উত্তর আমেরিকার কোনো কূলে। এই সব জাহাজে দাস মানুষদের জাহাজের খোলে গাদাগাদি করে নিয়ে আসা হতো, কখনো বা শৃঙ্খলিত করে—পাছে তারা বিদ্রোহ করে বা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওদের জন্যে খাদ্য-পানীয়ও থাকে অপ্রতুল। জাহাজের খোলে বায়ুরন্ধ্র ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অতীব শোচনীয়। বোঝা যাচ্ছে ক্রীত গোলামদের অবস্থা পশুদের চেয়ে উন্নত ছিল না। যদি কখনো জাহাজ কোথাও আটকা পড়ত, তাহলে মর্মস্পর্শী অনুপাতে মারা পড়ত মনুষ্যপণ্য! মধ্যপথে ঝড় উঠলে সমুদ্রপোতের ভার কমাবার কারণে জীবন্ত ক্রীতদাসদের জলে ছুঁড়ে দেওয়া হতো। এইভাবে ক্রীতদাসের অন্তত শতকরা বিশভাগ আর বেঁচে থাকত না। তারপর সহজ ইতিহাস। জলজ্যান্ত মানুষদের নানাভাবে বিক্রী করা হতো। এইবার জাহাজের তৃতীয় বা শেষ যাত্রা। যে জাহাজের খোলে ছিল সজীব পণ্য, সেই খোলেই এবার ভরে দেওয়া হলো বাগিচাজাত নানাপ্রকার মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্য। এই বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান দ্রব্য ছিল গুড়, যা থেকে চোলাই হতো 'রাম' নামক মদ। এই মদ খেয়ে, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ভাষায়, "না জানি সেখানে হেসে খুন কোন্ রসখোর তাড়িখোর।" অবশিষ্ট রামটুকু কাজে লাগবে আরও ক্রীতদাস আনতে। এবং সব কিছু ঠিকঠাক চললে, মুনাফা দাঁড়াত অপর্যাপ্ত!

চিরদিন কারুর সমান যায় না। উনিশ শতকের প্রথমেই গ্রেট ব্রিটেন ও পরে ইউরোপীয় অন্যান্য দেশে প্রবল জনমতের চাপে দাস ব্যবসা বিলুপ্ত হতে শুরু করল এবং আইন তৈরি হলো। কিন্তু এই সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরের দেশগুলিতে দাসত্ব বিরোধী জনমত জাগ্রত হলেও, অর্থনৈতিক কারণে দক্ষিণের অংশে ব্যাপক ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল। এমন সময় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতী হ্যারিয়েট বিচার স্টো রচনা করলেন নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী, দাসপ্রথার আলেখ্য—"আঙ্কল টমস কেবিন।" ক্রীতদাস টমের জীবন কথা।

টমের জীবনকে ঘিরে আমেরিকার ক্রীতদাসদের যে অমানুবিক জীবন কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে গা শিউরে ওঠে। অত্যাচারের কবলে পড়ে ক্রীতদাস খ্রিস্টান জর্জ এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্বেও সন্দিহান হয়ে উঠেছে। দাসী এলিজার একমাত্র পুত্র বালক হ্যারিকে ধনী হ্যালি দেনার দায়ে আবদ্ধ সেলবির কাছ থেকে কিনে নিতে চাইল। বড় নাদুস নুদুস গড়ন। বড় হলে কাজের হবে। ওকে বেচলে ভাল দাম পাওয়া যাবে। অতএব হ্যারিকে চাই। ওদিকে টম তার মনিব সেলবির কাছ থেকে হাত ফেরতা হয়ে বাজারে এল। দাসদাসী কেনাবেচার হাট। সারি সারি মানুষগুলিকে শিকল দিয়ে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। সম্ভাব্য ক্রেতারা সিগারেট টানতে টানতে ঘুরে ঘুরে দেখছে। দর দাম করছে।

বেঁটে মোটা একটি লোক এসে দু হাত দিয়ে টমের চোয়ালটা চেপে ধরল, মুখখানা ফাঁক করে দাঁতগুলি দেখে নিল। জামার আস্তিন গুটিয়ে পরীক্ষা করল তার হাতের পেশী। খানিকটা হাঁটিয়ে নিয়ে বুঝে নিল সে খোঁড়া কিনা। প্রায় পশু কেনার মতো টমকে কিনে নিল সাইমন লিগ্রি। তারপর অমানুবিক পরিশ্রম ও অকথ্য অত্যাচারের বেদনা-বিদ্ধ কাহিনী। আর সহ্য হলো না টমের। মৃত্যুর শান্তি নেমে এল তার জীবনে। তার কবরের পাশে বসে নাস্তিক জর্জ ক্রোধে প্রার্থনা জানাল ঈশ্বরের কাছে। প্রতিজ্ঞা করল ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের।

এরপরই আমার মনে পড়ে যায় দক্ষিণ আমেরিকার গিয়ানার একদা রাজরোষে কারারুদ্ধ প্রবীণ কবি মার্টিন কার্টারের একটি কবিতা, ডেথ অব এ স্লেভ—একটি ক্রীতদাসের মৃত্যু।

সবুজ বেতের ফলা—ওপরে আকাশ
সবুজ বেতের নিচে ধূসর ধরণী,
দাসত্বের শববস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ ঘোর
নদীর ওপরে আর
বনের ওপরে আর
মাঠের ওপরে।

আহা! কৃষ্ণবর্ণ ত্বক!
আহা! হৃদয় রক্তাভ!
চক্রাকারে দেখা যায়
পৃথিবী ওপরে আর
অরণ্য ওপরে আর
সূর্য ওপরে।

অন্ধকার এই পৃথিবীতে
হিমকৃষ্ণ এই ধরণীতে
সময়, ক্রোধের বীজ বোনে।

এখানে অপর এক নতুন জগৎ
অথচ ওপরে সেই এক নীলাকাশ
সেই এক সূর্য আর
নিচে একই হৃদয় বেদনা।

সবুজ বেতের ক্ষেত, গাঢ় হরিতের
সবুজ নিজের প্রাণে—একান্ত আপন,
দাসের হৃদয় লাল, অতীব রক্তাভ,
রঙীন নিজের প্রাণে—একান্ত আপন।

দিন চলে যায় দীর্ঘ কশান্বিত যেন
ভৃত্যের পিঠের ওপরে ;
দিন যেন জ্বলন্ত চাবুক
ক্রীতদাস স্কন্ধ ঘিরে দংশন করে।

বৃদ্ধের মতন কিন্তু সূর্য নেমে আসে
নদীটির তীর ঘেঁষা অস্পষ্ট ওপারে।
আর সাদা পাখীগুলি
উড়ে আসে ডানা মেলে
হাওয়ায় বাতাসে,
সাদা পাখি স্বপ্নের মতন
নিচে নেমে আসে।

নিচে-নামা নদীটির মাঝখান থেকে
রাত্রি আসে চোরের মতন—
রাত্রি আসে গভীর অরণ্য হয়ে
শব্দহীন তরী বেয়ে ;
শবঢাকা অন্ধকার,
রাত্রি আচ্ছাদন,
নদীর ওপরে আর
অরণ্য ওপরে।

ক্রীতদাস টলে ওঠে, পড়ে যায়
মৃত্তিকায় মুখ গুঁজে—
শান্ত তার দুন্দুভির স্বর,
নিঃশব্দ রাত্রির মতন ;
দুঃখের জোয়ারে যেন নৌকার গহ্বর।
অন্ধকার এই সমতলে
হিমকৃষ্ণ এই ধরণীতে
সময়, ক্রোধের বীজ বোনে।

হাজার হাজার ক্রীতদাস টমের মৃত্যুতে যে ক্রোধের বীজ উপ্ত হয়েছিল, তারই ফলশ্রুতিতে দেশে দেশে ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ সাধন হলো। এখন আর দালালরা মদ কিংবা মনোহারী জিনিসের বদলে ক্রীতদাস বানাতে প্রাণময় মানুষকে কারুর হাতে তুলে দেবে না। ক্রীতদাসের সন্তান সন্ততি এখন বিভিন্ন দেশের স্বাধীন নাগরিক। স্মরণিকা ডাকটিকিট নিয়ে সেই সান্ত্বনাই মনে মনে খুঁজছিলাম। তাই শেষে মনে হলো ক্রীতদাসের ওপর প্রকাশিত ডাকটিকিটও আমার কাছে মূল্যবান সম্পদ।

গুলাগ দ্বীপপুঞ্জের রাশিয়া

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

লেবার ক্যাম্পের প্রাক্তন বন্দী ওলেগ শুলুবিন রোগাক্রান্ত, মুমূর্ষু। প্রাক্তন বলশেভিক শুলুবিন এখন তার ফেলে আসা জীবনের পতিতজমি সম্পর্কে বিষণ্ণ ভাবনায় ডুবে আছে। কোনওক্রমে সে নিজের পিঠ বাঁচিয়েছে, কিন্তু হাজার হাজার মানুষ নিঃশব্দে হারিয়ে গিয়েছে। হা পার্জ! কী ভয়ঙ্কর এক শুদ্ধি অভিযান! একান্তে একবার মুখ খুলেছিল শুলুবিন :

'জানেন, গৃহযুদ্ধে আমি লড়েছি। রেড আর্মির শ্রমিক কৃষকরা, আমরা লড়েছি। আর আমাদের জীবন রক্ষার্থে রেড আর্মি কিছুই করেনি।…আমি হতবাক হয়ে যাই ভেবে, ইতিহাসের এই পরিবর্তিত অধ্যায়ের ধাঁধা-টা কী? মাত্র দশ বছরের মধ্যে গোটা দেশের জনসাধারণ বিস্মৃত হল তার সামাজিক ভূমিকা, সাহসের উৎস ও উদ্যোগ সম্পর্কে।'

কেন কসাক মায়েরা এক গোষ্ঠীগত আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হন। কারণ তাঁরা জানতেন শ্রমশিবিরে ধীরে, সময় তাঁদের হাড় মাংস পৃথক করে ফেলবে। তাঁদের মৃত্যুর স্বাধীনতাটুকু অন্তত মঞ্জুর করা হয়েছে, কিন্তু কী হবে এই শিশুদের! শিশুহত্যার এক মড়ক দেখা দিল কসাক জাতির মধ্যে। জনৈক কসাক প্রথমে তার স্ত্রীকে গুলি করে মেরে ফেলে, এরপর একে একে তিনটি শিশু সন্তানকে হত্যা করে নিজে আত্মঘাতী হয়। ১৯৪৫ সালে ৫০,০০০ কসাক নারী পুরুষ ও শিশুকে নাৎসী জার্মানিতে পাওয়া গিয়েছিল। পরে জোর করে এদের রাশিয়ায় ফেরত পাঠাবার চেষ্টা করলে তাদের মধ্যে অনেকে আত্মহত্যাকেই শ্রেয় মনে করেছিল।

কেন এমন হল, কসাকরা একটি জাতি হিসাবে মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব অনুসারে অপরাধী জাতি বা গোষ্ঠী নয়, রাশিয়ার মাটির সন্তান তারা। নিজস্ব বিচিত্র ঐতিহাসিক ঝোঁক-ই তাদের জারের পক্ষে ঠেলে দিয়েছিল, নব মানবতাবাদ এই বীর জাতিকে কেন আলিঙ্গন করতে ব্যর্থ হল, সে কি কেবলই বৈপ্লবিক বাড়াবাড়ি।

নেতার (লেনিন) প্রতি ছোটখাটো সমস্ত ব্যাপারে যাঁরা বিশ্বস্ত ছিলেন, বৃহত্তর বিষয়েও কি তাঁরা লেনিনের প্রতি সমান আনুগত্য দেখাতে পেরেছেন? যতক্ষণ তিনি বেঁচে আছেন ততক্ষণ পার্টির সদস্যরা তাঁর প্রতি খুবই অনুগত। কিন্তু নেতার অনুপস্থিতির সময়ে নিজেদের প্রতিটি কাজে তাঁরা কি একইরকম আনুগত্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারবেন? সেরকম কোনও নিশ্চয়তা আছে কি? প্রশ্ন আরও আছে, লেনিনবাদ কি কেবল আনুগত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ?… সতর্ক থাকা দরকার একটি বিষয়ে, আমলাতন্ত্র এবং বলশেভিকবাদকে সমার্থক করার স্পর্ধা যেন কারও না হয়। কেউ যেন ঐতিহ্যকে অফিসতন্ত্র করার স্পর্ধা না দেখান।

'ঐতিহ্য এবং বৈপ্লবিক নীতি' প্রবন্ধে বলশেভিক বিপ্লবের বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব ট্রটস্কি যে প্রশ্নটি রুশ কমিউনিস্ট এবং জনসাধারণের সামনে রেখেছিলেন, খ্রুশ্চেভের মৃত স্তালিনকে শাস্তিদান থেকে ১৯৮৭ সালে গর্বাচেভের উদারনীতি গ্রহণের চেষ্টা, আদতে এই প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতাই নিষ্ক্রিয়ভাবে, দায়ে পড়ে মেনে নেওয়া মাত্র। স্পর্ধার ইতিহাসের পরিসমাপ্তি এখনও বহুদূর; অত্যাচার ও দমন নিজেও সোভিয়েত ভূমিতে এতখানি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, ভয় এমন সংক্রামক হয়ে উঠেছে, যে আশঙ্কা হয় উদারনীতির এই

প্রাচীন রাশিয়ায় দৈন্যের চেহারা ছিল প্রকট। শাসকশ্রেণী এই বৈষম্য বজায় রাখতেই তৎপর ছিল

ব্যাপক প্রচারের আড়ালে প্রকৃতই কী কোনও শুভ ইচ্ছা কাজ করছে। যদি তা করত তাহলে কেনই-বা শুধু অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু চুনকামের কথা বলা হচ্ছে। মানবাধিকার, শ্রমশিবির, ইহুদি সমস্যা, সাইবেরিয়া, গুলাগ দ্বীপপুঞ্জের নারকীয় জীবনের প্রশ্নে রুশ নেতার মুখে কেন একটিও কথা নেই। এ নিবন্ধে আমরা চলমান স্পর্ধার, অর্ধশতাব্দীরও বেশি পুরনো সেই পীড়ন অত্যাচারের একটি রূপরেখা তুলে ধরব। অত্যাচারিতকে স্মরণে রাখার স্বার্থে, আমলাতন্ত্র এবং অফিসতন্ত্রের নির্দয় সিস্টেমটিই যে এখনও কাজ করে চলেছে, তা যাতে বিস্মৃত না হই সে কারণে এবং স্বাধীনতার ব্যাপ্তির জন্যও এই স্মরণ।

সাইবেরিয়া

এখান থেকে প্রত্যাবর্তনের কোনও রূপকথায় কেউ বিশ্বাস করবে না। নির্বাসন শব্দটি এই তুষারভূমিতে আক্ষরিকভাবে মুদ্রিত। এতোটাই, যে 'সাইবেরিয়া' নামটি অনায়াসেই বদলে নেওয়া যায়, মৃত্যু শব্দটির সঙ্গে। চূড়ান্ত নির্বাসনের সঙ্গে।

জারতন্ত্রের রাশিয়ায় সীমান্তে লৌহ স্তম্ভের মত কসাক, সোভিয়েত বিরোধী কার্যকলাপের দায়ে অভিযুক্ত বলশেভিক, এবং রেড আর্মির সদস্য থেকে সাধারণ কৃষক, শ্রমজীবীসহ সোভিয়েতের পক্ষে বিপজ্জনক, এক বিপুল জনসাধারণকে এই মৃত্যুভূমিতে পাঠানো হয়েছিল। সমগ্র রাশিয়ার জনসংখ্যার তুলনায় তারা শতাংশের হিসেবে ২ বা ৩, এরকম একটি যুক্তি দিয়ে অত্যাচারকে লঘু করার এক প্রবণতা দেখা যায়। ওই ২ বা ৩ শতাংশের অর্থ যখন লক্ষের ঘরও অতিক্রম করে তখন শতাংশের হিসেবের কারসাজিতে এই অন্যায় প্রশ্রয় পেতে পারে না। ইতালীয় যুদ্ধবন্দী কার্লো সিলভা সাইবেরিয়া থেকে শেষপর্যন্ত ফিরতে পেরেছিলেন। বন্দী জীবনের অভিজ্ঞতা তিনি 'সাইবেরিয়া থেকে ফেরা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

'আমার বাঁ পা কাটা গিয়েছে। সেখানে মাংসের ডেলা তুষারদংশনজনিত কারণে টাটানি শুরু হয়েছে। বরফাবৃত রাশিয়ার স্তেপের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময়ই এটা হয়। সেনারা আমাকে একটা ঘুপচি ঘরে এনে মেঝের ওপর শুইয়ে দিল। সদ্য অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে আরও কয়েকজন সেখানে ছিল।'

এ হল রাশিয়ানদের হাতে পড়ার আগের অবস্থা। পঙ্গু, ক্লান্ত, অথচ বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ কার্লো এবং তার সঙ্গীরা রাশিয়ানদের মার্চিং সঙ শোনা মাত্র, নিজেদের দেহগুলি বাইরে অর্ধনগ্ন অবস্থায় মেলে রাখে। করুণার এই সমবেত আবেদনের পরিণতি অবশ্য তিক্ত ফল প্রসব করেছিল।

কিছুদিন পরে যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত, হাত পা খোয়ানো ইতালীয় যুদ্ধবন্দীদের মালগাড়িতে ঠেসে ফেলা হয়। মালগাড়ি চলতে শুরু করার আগে, বন্দীরা জানতে চায়, 'তাভারিস্ক (আমরা কোথায় যাচ্ছি)? বাইরে প্লাটফর্ম থেকে এর জবাবে উদাসীন উত্তর ভেসে এল, 'সাইরিবস্ক (সাইবেরিয়া)।'

মধ্য মার্চের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। শরীরে অজস্র ছুঁচ বিঁধছে, নীল হয়ে যাচ্ছে চামড়ার রঙ। এর মানে সাইবেরিয়া। মাঝরাতে সেখানে পৌঁছোয় যুদ্ধবন্দীরা। দক্ষিণ সাইবেরিয়ার একটা ছোট শহর শুমিখা। এখান থেকে আর কোনও পাকা রাস্তা নেই। ওয়াগনের দরজা খুলে দেওয়া মাত্র মাইনাস ৪০ ডিগ্রী উষ্ণতা গ্রাস করল। এর মধ্যে কে বাইরে পা ফেলবে! অন্ধকার রাস্তা, ঘুমন্ত শহরের নির্জনতার মধ্য দিয়ে বন্দীদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতাল নামাঙ্কিত এক নরকে।

কার্লো আমাদের সাহায্য করলেন সাইবেরিয়ায় পৌঁছোতে। অতঃপর এই হিমশীতল ভূখণ্ড ছেড়ে আমরা ফিরে যাব মূল রাশিয়ায়, পার্টি অফিস, কড়া নিয়ম ও দাসত্বের উৎপাদন যন্ত্রের কাছাকাছি। সেখানে সাইবেরিয়া উৎপন্ন হচ্ছিল। সংক্রামক ব্যাধির মতই, করমর্দন এবং চুম্বনের মধ্য দিয়ে তা ছড়িয়ে যাচ্ছিল জনসমষ্টির মধ্যে। ভীতি হয়ে উঠছিল মানুষের প্রধান ও একমাত্র আবেগ। সোলঝিনিৎসেনের লেখার সঙ্গে পরিচয় এখন এতই সর্বজনীন যে, সাইবেরিয়ার কষ্ট ও অত্যাচারের বিবরণে যেতে চাই না পুনরাবৃত্তি দোষ এড়াতে। এবং তা যথেষ্ট ক্লান্তিকরও হবে।

প্রমপার্টির বিচার চলাকালীন ক্রাইলেঙ্কো বলেছিলেন, 'চারদিক শত্রু ঘিরে রেখেছে, মাথার ওপর একনায়ক, সেই আমলে আমরা খামোকাই দয়া আর প্রীতির পরিচয় দিয়েছি।' ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি: ভয়ঙ্কর এক ঝড়ে ইউক্রেইন এলাকা বিপর্যস্ত হয়ে গেল। দুর্ভিক্ষ এবং অগপুর (O. G. P. U-১৯২২-৩৪-এ সোভিয়েত গোয়েন্দা পুলিশ) অত্যাচার সত্ত্বেও যে গ্রামগুলি টিকে ছিল এখন সেগুলিও ধূলিকণার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। মৃত্যুর সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি, তবে গোটা রাশিয়ায় এই সময় দুর্ভিক্ষ ও অত্যাচারের বলি হয়েছিল প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ। কট্টর বলশেভিক নিকোলাই স্ক্রিপনিক (১৯১৭ সালে বিপ্লবীদের সামরিক কমিটির সদস্য ছিলেন) রুখে দাঁড়ান। ফলে ১৯৩৩-এ তাঁর নামে সমন জারি হল: সোভিয়েত রিপাবলিকের থেকে ইউক্রেইন নিয়ে একটু বেশি মাথা ঘামাচ্ছো। স্ক্রিপনিক অবশ্য অগপু গোয়েন্দারা কবে গ্রেফতার করতে আসবে তার জন্যে দিন গোনেননি। নিজের কপালে রিভলবারের স্পর্শ পেতে উন্মুখ হলেন। নলটি কপালে ঠেকালেন, ট্রিগারে চাপ দিলেন স্ক্রিপনিক।

যৌথখামার আন্দোলনের যুগে মনিন নামক এক কৃষককে তার 'প্রগতিশীল অর্থনৈতিক' ভূমিকার জন্য পুরস্কৃত করা হল একটি পদক দিয়ে। মনিন পদকটি পেয়ে পার্টি সম্পাদকের কাছে জানতে চেয়েছিল, 'পদকের বদলে এক বস্তা ময়দা পাওয়া যায় কি না।' সরল কৃষক তার প্রয়োজনের কথা জানিয়ে এমন এক অপরাধ করে ফেলল যে তাকে দশ বছরের জন্য যেতে হল কুখ্যাত লুবিয়াঙ্কার গারদে।

অপমান আর মৃত্যুর এই ঢেউ ছিল বিরামহীন (এটাই বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার একমাত্র বাস্তবতা নয়, কিন্তু অত্যাচার, পীড়ন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বাধীনতার বিপক্ষে ক্রমেই এক সীমাহীন লৌহদুর্গ গড়ে তুলছিল আমলাতন্ত্রী, অফিসতন্ত্রী পার্টি নেতৃত্ব—যা আজ পর্যন্ত ধারাবাহিক)। বহু মানুষের কাছেই শ্রমশিবির, তুষার, মৃত্যু উপত্যকায় সাইবেরিয়াই হয়ে উঠল রাশিয়া। তথ্য গোপন করায় নিষ্ঠাবান, লৌহ-গরাদের এই দেশটি সম্পর্কে অত্যাচারের অভিযোগ নির্দিষ্টভাবে

সামরিক শক্তির উপর কম্যুনিস্ট পার্টির নজর বরাবরই কড়া: অফিসারের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকরা

উপস্থিত করা কঠিন। সে-কারণেই অত্যাচারিত, নির্বাসিত, মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিতদের সামান্য সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা দেওয়া হল ৫৪ পৃষ্ঠায়, নচেৎ কয়েক লক্ষ মানুষের দুর্দশার উপাখ্যানে ১০-১৫ জনের তালিকা দেওয়া হাস্যকর।

বিপন্ন বিপ্লব

এই ঘোর অন্ধকারের সমুদ্রের একটি ইতিহাস থাকা স্বাভাবিক। নোঙর খুইয়ে, দিগ্‌দিশার ধারণাহীন, অন্ধভ্রমণের অজস্র গল্প সভ্যতার ভাঁড়ারে সঞ্চিত আছে। এমন এক পরিস্থিতি দৃষ্টি আচ্ছন্ন করল কতবার, যখন জানা নেই, আশ্রয় হিসেবে কী বেছে নেওয়া হবে, বা কোথায় থামতে হবে; সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পরিচয় বিপ্লবীরা মঞ্চে অবতীর্ণ তখন যারা সাহস ধর্মটিকে তার অন্তিমে, এক উন্মাদ-স্তরে পৌঁছে দিচ্ছে। বলশেভিক বিপ্লবের সঙ্গে এই উন্মত্ত আচরণের তেমন গভীর যোগসূত্র থাকার কথা নয়, এবং তা ছিলও না। দুনিয়া কাঁপানো ওই দশটি দিন ছিল শুধু শিকল ভাঙার শব্দ।

ইতিহাসে কোনও ধারাবাহিকতারই সূক্ষ্ম ক্ষয়ের হাত থেকে রেয়াৎ নেই। পরিবর্তন এবং ধারাবাহিকতার সংঘর্ষের এই দিনলিপির আওতায় থেকে যেতে হয় এমনকি মহান প্রলেতারিয়েত বিপ্লবকেও। ইতিহাস-ধর্মই সমস্ত বিপ্লবের কাছে নির্দেশ পাঠাতে পারে, বিপ্লবের অস্তিত্ব শতাধীন, তাকে বাঁচতে হবে এক চলমান বিপ্লবের মধ্যে।

সমস্যাসঙ্কুল, দারিদ্র্যের স্বৈরাচারে নিগৃহীত রুশ জনসাধারণের প্রাথমিক জাগৃতির দিন (নভেম্বর বিপ্লব) থেকে অনেক দূর সরে এলে, আমরা ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণে পলিটব্যুরোর থেকে সহস্রগুণ ক্ষমতাশালী সেক্রেটারিয়েটের অতিকায় ডায়নোসর রূপটিই দেখতে পাই। পার্টি এবং

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

সোভিয়েতের নিসর্গে তা ছিল ধারাবাহিকতার ক্ষয়েরই এক বীভৎস রূপ। অন্যভাবে দেখলে, দাসত্বের সক্রিয় সমর্থক জারতন্ত্রের কবরভূমি থেকে উঠে আসার এক নিঃশব্দ ইঙ্গিতও এতে ওতপ্রোত ছিল। সিস্টেমের সর্বগ্রাসী একনায়কত্ব 'ডি-স্ট্যালিনাইজেশনে'র (১৯৫৬ সালে খ্রুশ্চেভের বিবৃতি ও তৎপরবর্তী কার্যকলাপ) খাপছাড়া কিছু প্রয়াস এই বিষবৃক্ষ নির্মূল করতে অপারগ হয়। ১৯৬৮ সালেই আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে পীড়নযন্ত্র।

সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি রক্ষার্থে ধর্মীয় জিগির আজ নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। শিশু সমাজতন্ত্র এখন এক মধ্যবয়স্ক সাবালকও নয়, সত্তরটি শীত বসন্ত সে অতিক্রম করেছে। খোলাখুলি সমাজতন্ত্রের সমালোচনার অধিকার পেয়ে গিয়েছেন এ বিশ্বের সকল সমাজতন্ত্রীরাই, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় ব্যক্তিক স্বাধীনতার সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করছেন। দাসত্বের অবসানকল্পে এখনও যে এক দীর্ঘ যাত্রার অপেক্ষায় বিশ্ববাসী দিন গুণছেন, সে সত্য ক্রমে স্বীকৃতিও পেয়েছে।

জিনাইদা গ্রিগোরেঙ্কোর আবেদন

'বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য ফেডারেশনের প্রতি: আমার স্বামী পিওতর গ্রিগোরেভিচ গ্রিগোরেঙ্কোর জীবনকাহিনী এটি। যাঁকে দু-দুবার আদালতের নির্দেশে বিশেষ ধরনের মানসিক হাসপাতালে জোর করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। কার্যত যা জেল-হাসপাতাল।

জাপোরোঝস্কি অঞ্চলের বোরিসোভকা গ্রামে পিওতরের জন্ম (১৯০৭ সালে)। মাত্র ১৫ বছর বয়স থেকেই সে মেহনত করতে শুরু করে। একটি ডিপোয় মেটালওয়ার্কারের কাজ নেয়।'...

জিনাইদার আবেদনপত্রটি থেকে জানা যায় শ্রমিকের ঘরের ছেলে, মেটালওয়ার্কার পিওতর নিজের চেষ্টায় পড়াশুনো চালিয়ে যেতে থাকেন। মিলিটারি একাডেমি থেকে স্নাতক হন। পরে মেজর জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। বহু পদক, খেতাব এমনকি অর্ডার অফ লেনিন অর্জন করা সত্ত্বেও পিওতর রাষ্ট্রের রোষের শিকার হলেন। ১৯৬১ সালে পার্টি কনফারেন্সে তিনি স্তালিনের বিরুদ্ধে দুচার কথা বলেছিলেন। ১৯৬১-৬৩ পর্যন্ত চাকরিতে বদলি থেকে শুরু করে, নানারকম হেনস্থা চলল। শেষপর্যন্ত ১৯৬৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তাকে গ্রেফতার করা হল।

১৯৬৪ সালের ১৭ এপ্রিল ফরেনসিক সায়েকাট্রিক কমিশন পিওতর সম্পর্কে রায় দিল,

গুণ টেনে চলেছে ভোলগা নদীর মাঝিরা। উনবিংশ শতকের রাশিয়ায় এদের থেকে দুর্দশাগ্রস্ত হয়তো কেউ ছিল না। শিল্পী রেপিন অঙ্কিত চিত্র

সে আর স্বাভাবিক নেই। এই কমিশনে বলা হল : পিওতরের ব্যক্তিত্বে প্যারানোইয়ার প্রকোপ বেড়েছে। ব্যক্তিত্বে দেখা দিচ্ছে সংস্কারের ধ্যানধারণা… ইত্যাদি, ইত্যাদি। জিনাইদা তখন কে জি বি-র তদন্তকারী অফিসার কুজনেৎসভ এবং কান্টভকে জিজ্ঞেস করেন :

'মনের হাত থেকে আমার স্বামী কবে রেহাই পাবেন ?'

উত্তর : 'অসুখটা বেশ সূক্ষ্ম ধরনের, তবে বাইরে থেকে প্রায় কারও চোখেই রোগটা ধরা পড়ার কথা নয়। কিন্তু এর (তোমার স্বামীর) ধ্যান-ধারণাগুলি সামাজিকভাবে ভয়ঙ্কর।…'

আত্মকরুণারও কোনও সুযোগ নেই আর। গোটা রাশিয়া দাবি করতে থাকে আরেকজন আলবেয়র ক্যামু। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার

আলবেয়ের কামু

লেবার ক্যাম্পের বন্দী এবং শুদ্ধি অভিযানের বলি হয়েছেন এমন ব্যক্তিবর্গের এক অতি সংক্ষিপ্ত তালিকা

নাম	অত্যাচারের ধরন	সাল
অসর্গিন মিখাইল আন্দ্রেয়েভিচ	নির্বাসিত	১৯২২
আইখেনভাল্‌ত ইউলি ইসায়েভিচ	নির্বাসিত	১৯২২
ইলিন, আইভান আলেকজান্দ্রোভিচ	নির্বাসিত	১৯২২
ইজগোয়েভ আলেকজান্দার সালামনোভিচ	রাশিয়া থেকে বহিষ্কৃত	১৯২২
কুস্কোভা ইয়েকাতেরিনা দিমিত্রিয়েভনা	নির্বাসিতা	১৯২২
ইমেগনিথ সের্গেই আলেকজান্দ্রোভিচ	আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়	১৯২৫
আইভানভ বাজমুনিক ভাসিলেভিচ	শ্রম শিবিরের বন্দী	১৯৩০
কুইবিশেভ ভ্যালেরিনা ভ্লাদিমিরোভিচ	রহস্যজনক মৃত্যু	১৯৩৫
আলেকজান্দ্রভ এ আই	বন্দী	১৯৩৫
কামেনেভ লেভ বরিসোভিচ	প্রাণদণ্ড	১৯৩৬
অর্দোমিকিদাজ গ্রিগরিকনস্তান্তিনোভিচ	আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন	১৯৩৭
কোজিয়েভ নিকোলাই আলেকজান্দ্রোভিচ	বন্দী	১৯৩৭-৩৮
কাইলেঙ্কো নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ	প্রাণদণ্ড	১৯৩৮
কাজাকভ ইগনতি নিকোলায়েভিচ	হত্যা করা হয়	১৯৩৮
কাতানিয়ান রুবেন পাভলোভিচ	বন্দী	১৯৩৮

প্রতীক উপন্যাস প্লেগের সমান্তরাল সমাজতান্ত্রিক সমাজের একটি প্রতীক উপন্যাসের জন্ম দিতেই যেন এই গণক্ষয়, মৃত্যু, ভীতি ও হতাশা।

জীবন মৃত্যু বিজেতা, অতীতকে জয় করে নেয় ভবিষ্যত। ফার্স্ট সার্কল কিংবা ক্যানসার ওয়ার্ড কিংবা গুলাগ আর্কিপিলেগোয় এই সত্যই বিধৃত। ফার্স্ট সার্কলের কেন্দ্রীয় চরিত্র গ্লেব নেরঝিন। নেরঝিন লক্ষ্য করেছে, 'কীভাবে পার্টির ঐতিহাসিক পরম্পরায় ভেজাল ঢোকানো হয়েছে… তারপর শত শত বৃদ্ধ বলশেভিক [শ্রমিক সন্তান], যাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিপ্লবের সংঘটক ছিলেন, যাঁদের জীবন বিপ্লবের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে লাগলেন…যখন মৃত্যুর আগে মানুষ নিজের বিরুদ্ধে কুৎসা করে চলল [জোর করে আদায় করা জবানবন্দী]। এসবই এমন বিপুল আয়তন ও মাত্রায় ঘটে চলল, এতটাই স্থূল ছিল, যে মিথ্যের শব্দ ও ধ্বনির হাত থেকে বাঁচতে

সলঝেনিৎসেন

মানুষের পাথরপ্রতিম বধির হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকল না।

খীস্টিমে যা ঘটেছিল

চের্নোবিলে সংঘটিত পারমাণবিক দুর্ঘটনার বহু আগে, ১৯৫৭ সালে রাশিয়ার দক্ষিণ উরালের খীস্টিমে ঘটেছিল এক ভয়ঙ্কর পারমাণবিক দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনার কথা প্রকাশ করেন নির্বাসিত সোভিয়েত বিজ্ঞানী ডঃ ঝোরেস মেডভেডেভ। মেডভেডেভ তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তথ্য সংগ্রহ করতে প্রথম স্তরের একটি অ্যাকাডেমিক গোয়েন্দা অভিযান চালিয়েছিলেন বলা যায়।

দুর্ঘটনার পর সমগ্র এলাকাটির তেজস্ক্রিয় দূষণ রোধে যাঁরা এগিয়ে এলেন, সেই হতভাগ্য মানুষজন-ই এই নিবন্ধের প্রসঙ্গ। দুর্ঘটনার পর অঞ্চলটি প্রাথমিকভাবে জনমানবহীন করতেও বেশ কিছুটা সময় লেগে গিয়েছিল। সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করতে দেরি হওয়াই এর কারণ।

পরবর্তী কার্যক্রম অবশ্য বেশ সামরিক ক্ষিপ্রতায় পালিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার জেলগুলি তখন বন্দীশূন্য নয়, বরং কোথাও কোথাও বন্দীর আধিক্যে জেলগুলি উপচে পড়ছিল। বন্দীদের অপরাধ ও শাস্তির ধরন অনুসারে সব থেকে বিপজ্জনক, রাষ্ট্র যাদের বেঁচে থাকার বিরুদ্ধে, বেছে নেওয়া হল এমন বন্দীদেরই।

এই নির্বাচনটি লক্ষ করলে বিমূঢ় হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র এক্ষেত্রে বর্জ্য পদার্থ হিসেবে যেসব মানুষকে বেছে নিয়েছিল তার মধ্যে অনেকেই ছিলেন সাচ্চা শ্রমিকের সন্তান। কী এঁদের অপরাধ তা আজও জানা যায়নি। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্যরা শক্তিশালী সোভিয়েত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জেলে তখন মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণে চলেছেন।

সোভিয়েত সরকার এইরকম অজস্র বন্দীকে খীস্টিমে পাঠালেন। দুর্ঘটনার এলাকাটি বালি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। নেহাৎই এক শারীরিক পরিশ্রম। তেজস্ক্রিয় দূষণের পর অঞ্চলটির কাছাকাছি থাকাই যখন বিপজ্জনক, তখন দিনের পর দিন যাঁরা একাজ করে যাবেন অবধারিতভাবে তেজস্ক্রিয়তার শিকার হবেন তাঁরা। এবং সেটা এমন এক মাত্রায় যে তাঁদের পরবর্তী দিনগুলি রাতগুলি সংক্ষিপ্ত হতে থাকবে। এ এক মারণযজ্ঞ। নাৎসী গ্যাস চেম্বারে প্রবেশেরই নামান্তর মাত্র। যে অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে মানুষের বসবাসের চিহ্ন, উরালের কৃষকদের, সেখানেই এক যৌথ আত্মহত্যায় বাধ্য করা হল রুশ বন্দীদের একাংশকে। যাঁরা আবার ঘটনাচক্রে শ্রমিকের ঘরের সন্তান।

উরালের বুকে গভীর ক্ষতচিহ্নটি তাই শুধুমাত্র তেজস্ক্রিয়তার স্মৃতি নয়, ঘৃণ্য, নির্দয়তম এক দাসত্বেরও সাক্ষ্য বহন করছে এখানকার নিসর্গ। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা এই এলাকাটি এখন ব্যবহৃত

জার-শাসিত রাশিয়ায় ব্যক্তিস্বাধীনতার যে মূল্য ছিল আধুনিক রাশিয়ায় তা কতটা পরিবর্তিত হয়েছে !

হচ্ছে সামরিক বাহিনীর রেডিওলজিক্যাল প্রশিক্ষণের জন্য।

মিনস্ক ট্রাক্টর ফ্যাক্টরি

শিল্প শ্রমিকদের সম্পর্কে সোভিয়েত সরকারের প্রচার সর্বদাই উচ্চগ্রামে বাঁধা। বীরত্বের এক সেন্টিমেন্টাল গালগল্পের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে লেনিনগ্রাদ এবং মস্কো দীর্ঘকাল যাবৎ একইরকম কোলাহলপূর্ণ থেকে গিয়েছে। এই প্রচার মাহাত্ম্য সত্যকে যতখানি সম্ভব খর্বাকৃতি এবং গোপন করে তুলেছে।

মাত্র কয়েক বছর আগে (১৯৭৯) ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক স্তরে এক বেসরকারি ট্রাইবুন্যাল বসে। এই ট্রাইবুন্যালে রাশিয়ার অভিবাসীরা সোভিয়েত রাশিয়ায় শ্রমজীবীদের হাল হকিকত সম্পর্কে যে চিত্রটি তুলে ধরেন তার সঙ্গে সোভিয়েত সরকারের প্রচারের দূরত্ব আযোজন।

স্থূল অর্থে দাসত্ব ও পীড়নের তথ্য এই ট্রাইবুন্যালের টেবিলে একটি পাহাড় গড়ে তুলেছিল কি না তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন; মানবাধিকার লঙ্ঘনের অজস্র তথ্য সেদিন বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে। 'লৌহমানব' স্তালিনের বিসর্জন যতখানি ঘটা করে সারা হয়েছিল, ন্যায়বিচার এবং নাগরিকের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে ঠিক ততোটাই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

শ্রমিক বিপ্লব সংঘটিত হয়নি, এরকম দেশে শ্রমজীবীরা যেসব সমস্যায় জর্জরিত, মহান সমৃদ্ধশালী রাশিয়ায় সেইসব সমস্যাও ডাস্টার দিয়ে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। বিশাল, বিপুল শ্রমবাহিনী এবং তার ক্রমান্বয় স্ফীতি অর্থনীতির দিক থেকে ভয়াবহ হয়ে উঠছে। কম মজুরির কাজ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে অনেকে। কাজের পরিবেশ লাল তারকার নিচে এমন কিছু একটা স্বর্গীয় রূপ তো নিতে পারেইনি। অন্যদিকে আছে উৎপাদন বৃদ্ধির এক আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চাপ। আরও কাজ, আরও উৎপাদনের প্রত্যক্ষ চাপ, রুশ শ্রমিকের এক অর্থনৈতিক দাসত্ব। পেট ভরে খেতে পাওয়ার গল্পটির এই করুণ পরিণতি, বিপ্লবের ইতিহাসের উত্তরাধিকারীদের ক্রমেই ক্লান্ত ও বিষণ্ণ করছে।

টাইম পত্রিকার সাংবাদিক গবেষক জন কোহানকে পাঠানো হয় মিনস্ক ট্রাক্টর ফ্যাক্টরিতে। বলাবাহুল্য তথ্য গোপনের লৌহ প্রাচীরের এই দেশে কোহানের যাত্রা ছিল আনুষ্ঠানিক। ফলে অনেক কিছুই তিনি জানতে পারেননি, শুনতে পাননি। তবু এই আনুষ্ঠানিক সফরের মধ্য দিয়েও রাশিয়ায় কারখানা সংগঠন ও পরিচালনের এমন কিছু পদ্ধতি তাঁর নজরে পড়ে, যে-জন্য তিনি বলতে পারেন 'ইউনিয়নের ভূমিকা মোটামুটি রাষ্ট্রের এজেন্টগিরিতে'ই সমাপ্ত।'

রাশিয়ার এই কারখানাটি বছরে ৯০,০০০ ট্রাক্টর উৎপাদন করে। সোভিয়েত রাশিয়ার যে কোনও কারখানা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে কাজে রূপান্তরিত করার দায়িত্বে আবদ্ধ। প্রতিটি কারখানা উৎপাদনের টার্গেট পূরণ করবে এরকম আগাম প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। কোহানকে একথা জানান মিনস্ক প্ল্যান্টের ডেপুটি ডাইরেক্টার সেরাফিম ডেডকভ।

কারখানার দেয়ালে সাদা এবং লাল অক্ষরে বিশাল বিশাল ব্যানার ঝুলছে। প্রতিটি ব্যানারের বক্তব্য : আরও কাজ করো, উৎপাদন বাড়াও। 'প্রিসাইজ রিদম, হাই টেম্পো, একসেলেন্ট কোয়ালিটি' হচ্ছে একটি ব্যানারের বিষয়। এহ বাহ্য। এর উপর আছে 'থারটিনস পে', ফ্যাক্টরির নিজস্ব 'ফাণ্ড ফর ইকনমিক স্টিমুলেশন'। বারো মাসের বছরে থারটিনস, বা তেরোতম মাসের অর্থ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই দেওয়া হয়ে থাকে।

যদি কোনও শ্রমিক মনে করেন বাড়তি কাজের জন্য তাঁকে মজুরির দিক থেকে ঠিকমত পুষিয়ে দেওয়া হচ্ছে না সেক্ষেত্রে তিনি ইউনিয়নের কর্তাব্যক্তির কাছে নালিশ করতে পারেন। ইউনিয়নের এই পদটি যিনি অলঙ্কৃত করেন তাঁকে প্রফসোইয়ুজ (profsoycz) বলা হয়ে থাকে। ইউনিয়ন কতখানি সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে তার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রাক্তন কে জি বি প্রধান আলেকজান্দার শেলিপিন সুদীর্ঘকাল সোভিয়েত রাশিয়ার ট্রেড ইউনিয়নে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মিনস্ক ফ্যাক্টরির প্রফেশন্যাল ইউনিয়নের ডেপুটি চেয়ারম্যান কাজিমির কাসপিরোভিচ বলেন, 'ম্যানেজমেন্ট এবং প্রফসোইয়ুজের ভূমিকা এক্ষেত্রে একইরকম।' যদিও তিনি বলতে একথা ভুলে যান না যে, 'ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আমাদের বড় ধরনের কোনও মতপার্থক্য নেই।' উৎপাদনের মাত্রা চড়া রাখতে ইনসেনটিভের স্কিম সর্বদাই চালু রাখা হয়। ডেডকভ বলেন, আলোচনাই কখনও এখাতে বইতে দেখা যায় না—শ্রমিকরা টার্গেট উৎপাদনে পৌঁছতে পারবেন কিনা। বরং কী করে এই টার্গেটের বেশি উৎপাদন সম্ভব সে ব্যাপারেই কথাবার্তা চলে।

বিদায়, পিতৃভূমি

১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে সিমাস

কুদিরকাকে গ্রেফতার করা হল। লিথুয়ানিয়ান জেলে নৌকোর রেডিও অপারেটর কুদিরকার জন্ম ১৯২৯ সালে। ১৭-২০ মে কুদিরকার বিচার চলল। এস কুদিরকা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু জেরার মুখে একবারও তিনি একাজকে দোষণীয় মনে করে কোনও স্বীকারোক্তি দেননি। বরং বলেছেন, 'লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে আমি কোনওরকম বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আমার পিতৃভূমি লিথুয়ানিয়া, রাশিয়া নয়।' আত্মপক্ষ সমর্থন করে কুদিরকা চার ঘন্টা টানা বক্তব্য রাখেন।

বক্তব্যের সারমর্ম এইরকম : অতি দরিদ্র এক পরিবারে কুদিরকার শৈশব অতিবাহিত হয়েছে। ১৯৪০ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় লিথুয়ানার অন্তর্ভুক্তির ফলে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুক্ত হল জাতীয় পীড়ন। ১৯৪১ সালে লিথুয়ানার দরিদ্র কৃষকদের যে অবর্ণনীয় পরিস্থিতির মধ্যে সাইবেরিয়ায় দ্বীপান্তরিত করা হয়, সেইসব করুণ, অমানবিক উপাখ্যানের বর্ণনা দিয়ে চলেন কুদিরকা। ১৯৪৪ সালে তিনি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখেছেন, সাইবেরিয়া অভিমুখী এক বিষণ্ণ গণযাত্রা। নির্বিচারে গণহত্যা।

সেই দুঃসময়ে কুদিরকা ভিলনিউসে যেতেন স্কুলের পাঠ নিতে, ক্লাশ এইটে উঠেই সিদ্ধান্ত নিলেন, নাবিক হবেন। বার্ষিক পরীক্ষান্তে এই উদ্দেশ্য সাধনেই নিযুক্ত করলেন নিজেকে। যে ৫০,০০০ দেশপ্রেমী লিথুয়ানিয়ান (কে জি বি-র নিজস্ব ভাষ্য অনুসারেই) স্বাতন্ত্র্যের সংগ্রামে প্রাণ দেন, কুদিরকা তাঁদের কথা মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারেনি। এভাবেই কুদিরকার বালক শরীরে এক নাবিকের আর্বিভাব ঘটে। ভেসে পড়ে যে অতিক্রম করতে চেয়েছিল এই মৃত্যু মিছিল। শেষপর্যন্ত কুদিরকা নিজেও মৃত্যু মিছিলেরই উচ্ছিষ্ট হলেন, ১০ বছরের কঠোর শ্রমের কারাদণ্ডের মুকুটটি পরিয়ে, এই নাবিককে পাঠিয়ে দেওয়া হল শ্রমশিবিরে।

ইভান কোভালেভের উপর নেমে এল রুশী বিচারের মস্ত ওজনদার দণ্ড। সোভিয়েত রাশিয়ায় মানবাধিকারের সংগ্রামীদের ক্ষেত্রে এই দণ্ডের খবর এক বজ্রপাত বিশেষ। প্রায় এরকম মন্তব্য করেছেন শাখারভ। ইভান কোভালেভের সমর্থনে ১৯৭৪ সালের ৩ এপ্রিল শাখারভ একটি চিঠি লিখেছিলেন। 'এ ক্রনিক্যাল অফ কারেন্ট ইভেন্টস'-এর ৬৪তম সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। চিঠিটির একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাক :

'আবার এক অবিশ্বাস্য, নির্দয় কাজ সংঘটিত হল। এবং তা হল সুন্দরতম কোভালেভ পরিবারের বিরুদ্ধে। পরিবারটির ক্ষেত্রে এটি অবশ্য তৃতীয় আঘাত। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্রেফতার করা হয় ইভানের পিতা সের্গেই কোভালেভকে। ১৯৮০ সালের মে মাসে গ্রেফতার করা হয় ইভানের স্ত্রী তাতিয়ানা ওসিপোভাকে।... ইভান এবং তার স্ত্রী পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হল এক সুদীর্ঘ এবং হিসাব বহির্ভূত সময়ের জন্য। অলৌকিক কিছু না ঘটলে তারা পরস্পরের দেখা পাবে না।'

প্যাসিফিস্ট গ্রুপের নেতা সের্গেই বাতোভরিন মানসিক হাসপাতালে মুক্তির প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন

আবর্জনা

সের্গেই কোভালেভ গ্রেফতার হওয়ার পর ইভান মস্কো হেলসিঙ্কি গ্রুপে যোগ দেন। 'আমাকে কেন গ্রেফতার করা হল' এই শিরোনামে ক্রনিক্যালের ৬৩ সংখ্যায় ইভানের একটি নাতিদীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হয়। ইভান কোভালেভ সেখানে বলেছেন,—'...কাজকে আমি গণ্য করেছি...একটি জরুরি আবর্জনা হিসেবে এবং চেষ্টা করেছি এমন কাজ খুঁজে নিতে যাতে আমি যতখানি বেশি সম্ভব অবাধ সময় পেতে পারি। লোকে অবশ্য মনে করতে পারে আমি সমাজে জায়গা করে নিতে পারিনি এবং "দলত্যাগীদের সঙ্গে ভিড়ে পড়েছি" কিন্তু তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনাকে আমি একটি পেশাদার কাজ বলেই গণ্য করি।... এবং এই মুহূর্তে আমি সমাজে নিজের স্থানাঙ্ক সম্পর্কে মনে করি, আমি আমার যোগ্য জায়গাটিই খুঁজে পেয়েছি।'

মিনস্ক ফ্যাক্টরির ফ্লোরে যে কাজের উপাখ্যান শুরু হয়েছিল ইভান কোভালেভের মন্তব্যে তার পরিসমাপ্তি। উৎপাদন, উৎপাদন এবং উৎপাদনে নিঃশেষিত মানবাত্মার এক গভীর সংকট-ই সোভিয়েত সাম্রাজ্যে দাসত্বের প্রকৃত স্বরূপ।

উনবিংশ শতকের সাইবেরিয়ায় লেবার ক্যাম্পের এই নিদর্শনগুলি কি এখন কেবলই স্মৃতি ?

এবং এই একটি ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক পবিত্র ভূমি ধনতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

ইনিসিয়েটিভ গ্রুপের সদস্য ভ্যালেরি ফেফেলভ রাশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম, পলিটব্যুরো এবং আন্দ্রোপভের কাছে একই বয়ানের তিনটি চিঠি পাঠান। 'য়ুরিয়েভ পোলস্কির সেলেনার্গো এন্টারপ্রাইজের প্রশাসনের অবহেলায়...আমি প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ি। মাত্র সতের বছর বয়সে আমি চিরতরে পঙ্গু হয়ে যাই। আশ্চর্যের ব্যাপার তারপর থেকে আমি প্রকাশ্যে উপহাস এবং অবমাননার বস্তুতে রূপান্তরিত...।

যে সংস্থা আমাকে পঙ্গু করে দিল আমার প্রতি তারা সবরকম দায়দায়িত্ব মুহূর্তের মধ্যেই ঝেড়ে ফেলে। এর দ্বারা তারা 'কর্মরত অবস্থায় শ্রমিক কর্মচারীদের আঘাত লাগা সংক্রান্ত আইনটি অবলীলায় লঙ্ঘন করে। প্রায় ছমাস হয়ে গেল আমাকে অ্যালাউন্স দেওয়া তারা বন্ধ করে দিয়েছে। বেশ কয়েক বছর যাবৎ আমি চেষ্টা করেছি আমার সাধ্যে কুলোয় এমন কোনও কাজ খুঁজে পেতে।'

দারিদ্র্য, দুর্দশা এবং অন্যান্য সামাজিক অবমাননায় ডুবে যেতে যেতে ফেফেলভ উপলব্ধি করেছেন, রাশিয়ায় প্রতিবন্ধী হওয়ার অর্থ চর্তুগুণ বিড়ম্বনা। ১৯৭৯ সাল নাগাদ ফেফেলভের বিড়ম্বিত জীবনে কে জি বি হানা হল ট্রাজেডির শেষ পর্ব। ওই বছর তাঁর ফ্ল্যাটে কম করে পাঁচবার তল্লাসি অভিযান চালানো হয়। ১৯৮২ সালে তদন্তকারী অফিসার আলেকজান্দ্রভ ফেফেলভকে শুধু প্রহার করতে বাকি রেখেছিল। এবং এখন আইনের ১৯১ ধারায় এই প্রতিবন্ধীর বিরুদ্ধে খাড়া করে হচ্ছে অভিযোগ মামলা ও বিচারের এক প্রহসন।

দাসত্ব, মানবাধিকার লঙ্ঘন, শুষ্ক তথ্য ও পরিসংখ্যানের বিষয় নয়। মর্যাদা এবং স্বাধীনতার এই প্রশ্নটি কিছু সূক্ষ্মতা দাবি করে। সোভিয়েত রাশিয়ায় বিগত কয়েক বছরে, বিশেষ করে অতিসম্প্রতি, কিছু পরিবর্তনের আভাস দেখা যাচ্ছে। যদিও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে অবস্থাটি এখনও একপা আগে দুপা পিছনের মতই থেকে গিয়েছে। আন্দ্রে শাখারভকে মস্কোয় ফিরে আসার অনুমতি দেওয়াটা যেমন এক উজ্জ্বল ঘটনা তেমনি সোভিয়েত জেলে আনাতোলি মারচেঙ্কোর মৃত্যু এক ঘোর অন্ধকারেরই ইঙ্গিত দেয়। ১৯৮৬ সালে ১০০০ ইহুদিকে রাশিয়া ত্যাগের অনুমতিদান-ও এক দুঃখজনক ঘটনা।

ঘটনা পরম্পরা গর্বাচেভকে যে যথেষ্ট মাত্রায় উদ্বিগ্ন করেছে, তার সাক্ষ্য নানাভাবেই পাওয়া যাচ্ছে। পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতার মধ্যে আবার সংঘর্ষের এক সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। বলশেভিক বিপ্লবে বিপ্লবের এক দ্বারোদ্‌ঘাটন সম্ভব হয়েছিল, রাশিয়া বিপ্লবের গর্ভ হিসেবে এখনও যথেষ্টই সম্ভাবনাময়। একটি শৃঙ্খল ভেঙে পড়ে পুনরায় হাত দুটি শৃঙ্খলিত হবে বলে, এই বাক্যবন্ধ সম্পূর্ণ নয়। স্বাধীনতা মানুষের অস্তিত্বের সমবয়স্ক বলে, অনিবার্য শর্ত বলে—এর কোনও সীমা নেই, এই আশা দীপশিখা হয়ে থাকে। ■

দাসত্ব যাদের চিরসঙ্গী

দেবাশিস চন্দ

'কলরব করতে করতে শ্রমিকরা খনি থেকে একে একে বেরোতে লাগল। প্রত্যেকের আপাদমস্তক কালো কালিতে মাখা, ঘোর অন্ধকার থেকে বাইরের আলোতে আসাতে প্রত্যেকেই চোখে দু'হাত চাপা দিচ্ছে। তাদের সর্বাঙ্গে দারিদ্র্য আর অপুষ্টির চিহ্ন প্রকট। ভিনসেণ্ট বুঝতে পারল চারদিক এতক্ষণ এত জনশূন্য আর নির্জন বলে মনে হচ্ছিল কেন? সমস্ত প্রাণশক্তি এই কয়লাখনির ভেতরে কেন্দ্রীভূত হয়—পৃথিবীর গর্ভে প্রায় সাত শো মিটার নিচে।'

বর্ণনাটা আরভিং স্টোনের লেখা শিল্পী ভিনসেণ্ট ভ্যান গখের জীবনী 'লাস্ট ফর লাইফ' (ঈশানী রায় চৌধুরী অনূদিত) থেকে নেওয়া। জীবনের শুরুতে ভ্যান গখ বেলজিয়ামের দক্ষিণে মনসের কাছে বরিনেজের কয়লাখনি অঞ্চলে শ্রমিকদের সঙ্গে কিছুদিন ছিলেন। গখের তখনকার অভিজ্ঞতা দেখে তরুণ ভিনসেণ্টের মনে হয়েছিল, 'বাড়ি তো নয়, কোনওরকমে মাথা গুঁজে থাকবার মত দায়সারাভাবে তৈরি।...মাটির মেঝে, শ্যাওলা ভর্তি ছাদ, নোনাধরা দেওয়াল। ঘরের কোণে একটাই খাট, তাতে তিনটে রুগ্ণ চেহারার বাচ্চা ঘুমোচ্ছে।'... খনি-শ্রমিক ডিক্রুক ভিনসেণ্টকে বলে, 'এই বরিনেজে আমরা শুধু দাসত্বই করি না, আমাদের জীবনযাত্রা পশুরও অধম।'

ভিনসেণ্টের দেখা কয়লাখনি শ্রমিকদের এই অবর্ণনীয় দুর্দশা অনেক অনেক অনেক আগের। তারপর বহু কাল কেটে গেছে। অনেক চড়াই-উৎরাই শ্রমিকরা পার হয়ে এসেছেন। কিন্তু আজও ভারতবর্ষের কয়লাখনি শ্রমিকদের দুরবস্থার সঙ্গে ভিনসেণ্টের অভিজ্ঞতার কি ভয়ানক সুন্দর মিল রয়ে গেছে। এই ১৯৮৭ সালেও যখন সারজু আলম বলে, 'বাবু খনিতে কাজ করা পশুর অধম। এ শুধু দাসত্বই নয়, পুরো জীবনটাই বিকিয়ে গেছে। চাইলেও এখান থেকে আর বেরনোর উপায় নেই। দেনা, ঋণ—এসবের চাপে মৃতপ্রায় হয়ে আছি। আর তাই দারিদ্র্যের এই কঠোর যন্ত্রণা ভুলতে কাজ থেকে বেরিয়েই মদ, শুধু মদ খাই, খেয়ে ভুলতে চাই এ মরণযন্ত্রণা।' তখন ভিনসেণ্টের অভিজ্ঞতা কি সুন্দরভাবেই না এক স্রোতে মিলে যায় দেশ-কাল-জাতি ভেদের গণ্ডী পেরিয়ে। তখন হরেকরকম প্রচার, খাতাপত্র, শ্রমিককল্যাণের হাজার ফিরিস্তির চৌয়া ঢেকুর আর প্রতিশ্রুতির মায়াজালের মধ্যে থেকে যে ধ্রুব সত্যটি উদ্ঘাটিত

কয়লা শ্রমিকের জীবন পরিণতি : অপুষ্টি ও ব্যাধির শিকার

দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি নেই কি এই শিশুটিরও ?

শ্রমিকদের স্ত্রীদের অধিকাংশকেই কাজ করতে হয় বাবুদের

হয় তা হল কয়লাখনি শ্রমিকরা আজও দাসত্বের কঠিন কঠোর অ-ছিন্ন শৃঙ্খলের নিগড়ে বাঁধা যার একমাত্র অবসান মৃত্যুতে। বাংলা সাহিত্যেও বিপিনচন্দ্র পাল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অনেকের কলমেই পৃথিবীর অন্যতম আদিম এই জীবিকা ও তাদের শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার কথা বারবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে কিন্তু খনি শ্রমিকদের বাস্তব অবস্থার কোনও বিশেষ হেরফের হয়নি। অথচ কয়লার উৎপাদন বেড়েছে, কয়লাশিল্প জাতীয়করণ হয়েছে, কয়লাশিল্প প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে।

কিন্তু শ্রমিকরা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই আছে। ১৯৪৬ সালে কে সি মহীন্দ্র কমিটি ভারতীয় কয়লা ক্ষেত্র সম্বন্ধে তাঁদের রিপোর্টে বলেছিলেন, 'Over much of the industry, the conditions of labour are still in a shocking state, living accomodation is inadequate and deplorable; educational and medical facilities are scant and few amenities exist to relieve the strain and tedium of work underground.' এই রিপোর্টের পঁচিশ বছর পরের চিত্রটা কেমন ? কতটুকু পরিবর্তন, কতটুকু উন্নতি ঘটেছে বাস্তব অবস্থার ? অবস্থা যে প্রায় অপরিবর্তিত তার একটা ছবি পাওয়া যায় কয়লাশিল্প জাতীয়করণের অন্যতম প্রধান পুরোধা এস· মোহন কুমারমঙ্গলমের লেখা 'Coal Industry in India—Nationalisation and Task Ahead" বইতে। কুমারমঙ্গলম লিখছেন : 'Under the law the workers were to be provided with medical facilities. This was violated by constructing ramshackle huts styled as hospitals, with neither doctors nor nurses and hardly any drugs or equipment. The so-called creshes meant for children were never occupied. Housing was extremely inadequate, poor in construction and never maintained. While the workers lived in such miserable and sub-human conditions, the owner of the collieries and top management lived in palatial building and enjoyed the best comforts'. কুমারমঙ্গলম বেঁচে থাকলে তাঁর সাধের জাতীয়করণের এত বছর পরেও একই কথার পুনরাবৃত্তি করতেন। এটা ঠিক যে জাতীয়করণের পর উন্নতি কিছুটা ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে হয়েছে কিন্তু তা সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর মত। যত টাকা ব্যয় হয়েছে অফিসারদের বাড়িঘর, ক্লাব, আমোদপ্রমোদের উপকরণ তৈরিতে তার এক-চতুর্থাংশও যে শ্রমিককল্যাণে হয়নি, এটা যে কোনও খনিতে গেলেই চোখে পড়বে। আর তাই আজও ডিক্রুকের মতই অধিকাংশ শ্রমিকদের মুখেই প্রতিধ্বনিত হয় একটাই কথা, 'একটা রাস্তার কুকুরের মত আমরা মরি।'

ভারতে কয়লা খননের ইতিহাস শুরু হয় ১৭৭৪ সালে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হিটলী ও সামার পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জে কয়লা খনন শুরু করেন। তবে ১৮২৮ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্তৃক কার, টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হবার পরই কয়লা খনন ভারতবর্ষে প্রকৃত ব্যবসায়িক উদ্যোগে পরিণত হল। দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৩৬ সালের ২ জানুয়ারি রানীগঞ্জ কয়লা খনিটি সত্তর হাজার টাকায় কেনেন। এই খনিটি ছিল ভারতবর্ষের বৃহত্তম। তখন রানীগঞ্জ অঞ্চলের মোট কয়লা উৎপাদন হত দৈনিক ১১৫ টন। পরে কার, টেগোর কোম্পানি ও নারায়ণকুলীর একটি খনি মিলে তৈরি হয় বেঙ্গল কোল কোম্পানি।

ভারতবর্ষে প্রথম সরকারী কয়লা সংস্থা গঠিত হয় ১৯২১ সালে যার নাম সিঙ্গারেনি কোলিয়ারিস কোম্পানি লিমিটেড। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ১৯৫৬ সালে গঠিত ন্যাশনাল কোল ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন (এন সি ডি সি)। ১৯৭১ সালে কোকিং কয়লার এবং ১৯৭৩ সালে নন-কোকিং কয়লাশিল্পকে জাতীয়করণ করা হল। জন্ম নিল কোল মাইনস অথরিটি লিমিটেড। ফলে টিসকো ও ইসকো-র নিজস্ব কয়লাখনি ছাড়া, সমস্ত কয়লাখনি চলে এল সরকারী তত্ত্বাবধানে। তারপর দেশের কয়লাশিল্পকে পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনের জন্য ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে স্বত্বাধিকারী হিসেবে কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে ভারতবর্ষে মোট ৪২৫টি কয়লাখনিতে ৬ লক্ষ ৭৭ হাজার কর্মী কাজ করেন। কর্ম সংস্থানের দিক থেকে কোল ইণ্ডিয়া বর্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম সংস্থা। এত বিপুল সংখ্যক কর্মী কোনও সংস্থাতেই নেই। এটা ঠিকই যে জাতীয়কণের প্রভাব কয়লা উৎপাদনে কিছুটা পড়েছে। গত দশ বছরে কোল ইণ্ডিয়ার উৎপাদন ৫০ শতাংশেরও বেশী বেড়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে উৎপাদন যেখানে হয়েছিল ৮৮·৯৮ মিলিয়ন টন সেখানে ১৯৮৫-৮৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৪·১১ মিলিয়ন টনে। ১৯৭৬-৭৭ সালের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ১৪৪·৭৭ মিলিয়ন টন। ২০০০ সালে উৎপাদন মাত্রা ৩১৭ মিলিয়ন টনে পৌঁছবে বলে কোল ইণ্ডিয়ার আশা। প্রতি জন শিফট (আউটপুট পার ম্যানশিফট) হিসেবে আমাদের কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ০·৮৯ টন, যা খুব সম্ভবত পৃথিবীতে সবচেয়ে কম। ষষ্ঠ

বাড়িতে

কঠিন শ্রমের বিনিময়ে কি পাচ্ছে এই শ্রমিকেরা ?

ছবি : অলক মিত্র

পরিকল্পনাকালে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছিল ১·০৩ টন প্রতি জন শিফটে কিন্তু তা পূরণ হয়নি। সপ্তম পরিকল্পনায় এর পরিমাণ ধার্য করা হয়েছে ১·২১ টন।

কিন্তু জাতীয়করণের পরেও শ্রমিকদের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না। আজও শ্রমিকরা, বিশেষ করে হরিজন, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা মাফিয়া গ্যাং ও রাজনীতিবিদদের হাতে শোষিত হচ্ছে। কয়লাখনি অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতির নামে চলে কেবল শোষণ, নানা উপায়ে শোষণ। উৎপাদনের বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্রমিকদের সমৃদ্ধি ভারতবর্ষে আজও হয়নি। কোনো দিন হবে কি না কেউ জানে না। কোল ইণ্ডিয়ার ভাষ্য অনুযায়ীই মোট গৃহ-চাহিদার মাত্র ৪৫·০২ শতাংশ এখন পর্যন্ত পূরণ করা হয়েছে যা জাতীয়করণের সময় ছিল মাত্র ২০ শতাংশ। জাতীয়করণের সময় মোট বাড়ির সংখ্যা ছিল ১,১৮,৩৬৬। চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৫৮,৩৮২টি। শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করলে এই বৃদ্ধি খুবই অপ্রতুল। আর বাড়ি মানে তো খুপরি ঘর। স্যাঁতসেঁতে এই ঘরগুলিতে সূর্যকিরণও লজ্জায় ঢোকে না—মুখ লুকিয়ে ফেলে। রক্ষণাবেক্ষণ তো হয়ই না। তার

মধ্যে আবার বহু শ্রমিকই বাড়ি পান না। এমন খনি খুব বিরল নয় যেখানে শ্রমিকদের প্রাপ্য বাড়ি দখল করে আছে অবাঞ্ছিত স্বার্থান্বেষী ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা। মহাজনী শোষণ, রাজনীতির জটিল-কুটিল আবর্ত, মদ, মেয়ে মানুষ, গুণ্ডাবাজি—এসবের এক অন্ধকার চক্রব্যূহে আবদ্ধ কয়লাখনি শ্রমিকদের জীবন—যে জীবন থেকে নিষিদ্ধ পল্লীর মতনই হাজারো ইচ্ছে থাকলেও একবার ঢুকলে আর বেরনো যায় না।

একজন খনি শ্রমিককে রোজ আট ঘণ্টার কাজ করতে হয়। দু ধরনের শ্রমিক রয়েছে। প্রথম শ্রেণীর শ্রমিকরা মাস হিসেবে মাইনে পান যার পরিমাণ গড়ে প্রায় ১২০০ টাকা। আরেক শ্রেণী রয়েছেন যাঁরা দৈনিক হিসেবে মজুরি পান ৪২ টাকা করে। দৈনিক মজুররা চিকিৎসা, গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স, অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ ছাড়া যদিও কোল ইণ্ডিয়া কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন না যে চুক্তিসাপেক্ষ কাজ শ্রমিকদের করানো (contract labour) হয়, কিন্তু ১৯৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজহারা কোলিয়ারিতে শ্রমিকদের ওপর গুলি চালানোর পর এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রথা উঠে গেছে শুধুমাত্র কাগজে কলমে, বাস্তবে নয়। এই ঘটনার পর জনতা মজদুর সংঘ এবং বিহার কোলিয়ারি কামগর ইউনিয়ন অভিযোগ করেছিলেন যে, প্রায় সব কোলিয়ারিতেই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রথা (contract labour) রয়েছে। তৎকালীন শক্তিমন্ত্রী গণি খান চৌধুরী ১৯৮১ সালের নভেম্বরে বি সি সি এল কোম্পানিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ৭৫ দিনের মধ্যে সমস্ত শ্রমিককে স্থায়ী করার কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। রাজহারা কর্তৃপক্ষ ওয়াগন লোডিং-এর জন্য সুরাট পাণ্ডে অ্যাণ্ড সন্স বলে একটি ঠিকাদার
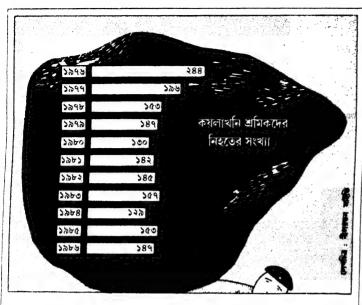
সংস্থাকে নিয়োগ করলে পর ঠিকাদার পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে ৬২০ জন শ্রমিককে কাজের জন্য নিয়ে আসে। এর ফলে বাঁধে সংঘর্ষ। ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ তারিখে আঞ্চলিক শ্রম কমিশনার ও খনি কর্তৃপক্ষের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী ৪৩৩ জনকে স্থায়ী করা হয়। ছাটাই করা হয় বাকি ২০০ জনকে। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ১৭ তারিখ ওয়াগন ভর্তি করার সময় বিক্ষোভ দেখানো শুরু করলে গুণ্ডা ও পুলিশবাহিনী নির্বিচারে শ্রমিকদের পেটায়। পুলিশের বুলেটে কুন্তি ও জঙ্গলি চামার বলে দু'জন আহত হয়। যদিও পরের দিন পুলিশ সুপার ও জেলা শাসক গুলি চালানোর কথা অস্বীকার করেন। এই ঘটনা খনি শ্রমিকদের শোষণের দিকটায় নতুন করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আলোড়ন ওঠে। দৈনিক মজুরদের সংখ্যা কত তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না তবে একটি হিসেব অনুযায়ী মোট শ্রমিকসংখ্যার পঁয়ত্রিশ শতাংশ তো বটেই।

কয়লাখনিতে কাজ পেতে গেলেও এইসব অনুন্নত গরীব লোকদের বিরাট অঙ্কের টাকা বিশেষ বিশেষ চক্রের হাতে দিতে হয় যার পরিমাণ পাঁচ হাজার থেকে পঁচিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার পর্যন্ত। এই টাকা দিতে না পারলে চাকরি পাওয়া যায় না। বি সি সি এল—সিজুয়া কয়লাখনিতে এরকম দুটি চক্র ১৯৮৪ সালে ধরা পড়েছিল। জানা যায় একটি চক্রের একজন গুণ্ডা এভাবে ৩০০ জনের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা জনপ্রতি আদায় করেছিল, যার মধ্যে থেকে সে নিজে পেয়েছিল ৫ লক্ষ টাকা, বাকিটা অফিসার, ঠিকাদারদের হস্তগত হয়েছিল। এ ধরনের চক্রের কথা মন্ত্রী থেকে আমলা সবাই জানেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার আশ্বাস দেন কিন্তু ওই আশ্বাসটুকুই সার। চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে ভাগাবন্দ খনি শ্রমিকরা খনির নিচে অবস্থান ধর্মঘটের অভিনব কায়দা নিয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁদের স্থায়ী করার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা ওপরে উঠে আসেন।

নিয়ম রয়েছে যে কোনও শ্রমিক চাইলে অবসর গ্রহণের নির্ধারিত বয়সের চার পাঁচ বছর আগে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত প্রথা হল নিজের ছেলে বা জামাইকে চাকরিটি দেওয়া যায়। এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েও এক শ্রেণীর লোকেরা গরীব অশিক্ষিত শ্রমিকদের ভয় দেখিয়ে, প্রয়োজনে শারীরিক অত্যাচার চালিয়ে ভুয়া লোক নিয়োগ করে টাকা লুটছেন। এইসব শ্রমিকদের দিয়ে কাগজে সই করাচ্ছেন ওদেরই ছেলে বা জামাই বলে। ধানবাদে এলে কাগজপত্র দেখলে যে কোনও সমাজ সংস্কারক এই ভেবে খুশী হবেন যে জাতপাতের বেড়াজাল ডিঙিয়ে শ্রমিকদের সমাজে অসবর্ণ বিবাহ চালু হয়েছে। খাতায়-কলমে দেখা যাবে বহু হরিজন বাড়ির মেয়ের সঙ্গে উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ ছেলের বিয়ে হয়েছে যা বিহারে কল্পনাই করা যায় না। এই কাগজে-কলমে বিয়ের জন্য প্রত্যেক জামাইকে দিতে হয় পাঁচ থেকে কুড়ি হাজার টাকার মত। তার বদলে তাঁরা পেয়ে যান চাকরির ছাড়পত্র। অনেক সময় টাকার অঙ্ক পঁয়ত্রিশ হাজার পর্যন্ত পৌঁছয়। ১৯৮৪ সালে একটি মজার ঘটনা খুব আলোড়ন তুলেছিল। বি সি সি এল-এর তাতুলমারি খনির তেরোজন শ্রমিক এক মাস ছুটি কাটানোর পর কাজে যোগ দিতে এসে দেখে যে তাদের জায়গায় তাদের মেয়ের স্বামী পরিচয়ধারী তেরোজন কাজ করছেন। শ্রমিকরা নাকি স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করে এঁদের চাকরির সুযোগ করে দিয়েছেন। অন্তত কাগজপত্র তাই বলে। হতভম্ব শ্রমিকরা হইচই শুরু করলেন। ধরা পড়ল জালিয়াতির ঘটনা। এরকম ভূরি ভূরি ঘটনা আছে। কর্তৃপক্ষের নাকের ডগাতেই সব হয়। বহু কর্মচারী ও অফিসার এই সব চক্রের সঙ্গে জড়িত এটা অনেকবারই প্রমাণিত হয়েছে। কয়লাখনিতে চাকরি ঘুরপথ বা বাঁকাপথ ছাড়া হয় না। এঁরা চাকরির বিনিময়ে টাকা হাতান। এবং এ ব্যাপারে সব দলই সমান পারদর্শী যদিও কেউই তা স্বীকার করে না। বরঞ্চ একে অন্যের দোষারোপ করে থাকেন। এ ছাড়া অনেক সময় শ্রমিকরা স্বেচ্ছায় চাকরি বিক্রিও করেন। মহাজন আর তথাকথিত নেতার হাতে শোষিত হতে হতে মৃতপ্রায় হয়ে মহাজনের লাইসেন্সহীন বন্দুকের তাড়ায় দিশেহারা হয়ে মহাজনকে চাকরি বিক্রি করে 'দেশে' চলে যান বা বলা ভাল পালিয়ে বাঁচেন। স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণের জন্য প্রয়োজন ডাক্তারদের 'আনফিট' সার্টিফিকেটের। মহাজন প্রথমে শ্রমিককে নিয়ে যান ডাক্তারের কাছে। মহামান্য

ডাক্তারবাবু তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে একটা 'আনফিট' সার্টিফিকেট দেন। এই সার্টিফিকেট হাতে পাবার পর মহাজন তাঁর কাছে ঘুরঘুর করা বেকারকে ওই শ্রমিকের আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে চাকরির আবেদন করান। ধরা যাক স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণকারী শ্রমিকের নাম শিবু সোরেন। তাঁর আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে চাকরির আবেদন জানালেন ছাপরার সুলতান সিং। কর্তৃপক্ষ তা মানবেন না। তখন কোর্টে অ্যাফিডেবিট করে শিবু সোরেন বলবেন সুলতান তাঁর দত্তক পুত্র বা কন্যার স্বামী। এবং এর পরেই প্রার্থিত চাকরি পেয়ে যাবেন সুলতান যার জন্য তাকে হয়ত বিপুল অঙ্কের টাকা, সময়ে সময়ে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা, মহাজনের হাতে তুলে দিতে হবে।

কিছু শ্রমিক আবার মহাজনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অন্য এলাকার খনিতে বদলির জন্য সচেষ্ট হন। বদলি হয়ত কর্তৃপক্ষ মঞ্জুরও করেন। কিন্তু মহাজনী শোষণের অসীম ক্ষমতা বদলি হওয়া খনিতেও শ্রমিকের জীবন ব্যতিব্যস্ত করে তোলে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই শ্রমিককে তাঁর পুরনো এলাকায় ফিরে আসতে বাধ্য করেন। প্রতিটি খনিতে অগাধ ক্ষমতাশালী চক্র এভাবে কোটি কোটি টাকা লুটছেন। জাতীয়করণের পর কয়লা-খনি শ্রমিকদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যা বেড়েছে তার বিন্দুমাত্র শ্রমিকদের নিজেদের কাজে লাগছে না।

সুদের শোষণ কয়লাখনি শ্রমিকদের অক্টোপাসের মত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যার কঠিন কঠোর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া শ্রমিকদের কাছে দিবাস্বপ্নের মত। কয়লাখনি অঞ্চলে মহাজনী কারবার একটা বিরাট পেশা। বহু মহাজন গাড়ি বাড়ি লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। একটা বিরাট মাফিয়া চক্র এই ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত করছে খনির এক শ্রেণীর কেরানী ও অফিসারদের সহযোগিতায়। অভিযোগ আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক শ্রেণীর নেতারাই মহাজনের কাজ করেন। নেতা ছাড়া আর যাঁরা যুক্ত তাঁরাও ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় লালিতপালিত ও পরিপুষ্ট। সুদের হার গগনচুম্বী—মাসিক শতকরা ত্রিশ টাকা পর্যন্ত হয়। অনেক শ্রমিকেরই বার্ষিক শতকরা তিন শ থেকে চার শ টাকা হার সুদে চাকরি বাঁধা পড়ে আছে মহাজনের কাছে। শ্রমিকদের ঋণ কখনো শোধ হয় না। বছরের পর বছর মৃত্যু পর্যন্ত চলে শোধ দান তবু ঋণ শোধ হয় না। অশিক্ষিত শ্রমিকরা মহাজনের হাতের পুতুল। ঋণের কোনও কাগজপত্র থাকে না। অনেক শ্রমিক শেষ পর্যন্ত চাকরি বেচে দিয়ে পালিয়ে যান। মহাজন-কাম- ওই নেতারাই সেই চাকরি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেন। অনেকবার অনেক মহাজনী কারবারে লিপ্ত ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে চার্জশিটও দেওয়া হয়েছে। তাঁরা যথারীতি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এ ধরনের শোষণ দাসত্বপ্রথারই নামান্তর। নজিরবিহীন এই শোষণ সম্পর্কে সবাই অবগত। প্রকাশ্য দিবালোকে এই কারবার চলে তবু আজ পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না। স্বার্থান্বেষী চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে হচ্ছে সবাইকে। বুঝতে পারেন না কত টাকা দিচ্ছেন। আর দু-একজন বুঝলেও ভয়ে চুপ করে যান। খনি অঞ্চলে গেলে দেখা যায় ভয়ে ত্রাসে কেউ কিছু বলতে চায় না। শ্রমিকদের মুখে একটাই কথা কিছু বললে, 'ও লোগ জান সে মার দেগা'।

শ্রমিকদের অধিকাংশই বাড়ি পান না ; যাও পাওয়া যায় তা স্যাঁতসেঁতে খুপরি ঘর

একমুঠো ভাত, তাও পাবে না কয়লা শ্রমিকের পুত্র ?

এমন বহু শ্রমিক আছেন যাঁরা দু' হাজার টাকা ধার নিয়ে দশ হাজার টাকা দেবার পরও ঋণগ্রস্ত রয়ে গেছেন। ঋণী শ্রমিকদের পে কার্ড বন্ধক থাকে মহাজনের কাছে। পে কার্ড হচ্ছে খাতক শ্রমিকের গ্যারাণ্টি। মাইনের দিন ক্যাশ অফিসের সামনে মহাজনের লোক পে কার্ডটি শ্রমিকের হাতে তুলে দিয়ে অপেক্ষা করে। শ্রমিক টাকা ও কার্ড ওই লোকটির হাতে তুলে দেয়। মহাজনের লোক ইচ্ছেমত টাকা কেটে নিয়ে বাকিটা শ্রমিককে দিয়ে কার্ড নিয়ে চলে যায়। আবার অনেক খনি আছে যেখানে কেরানীদের কাছে পে কার্ড জমা থাকে। এই পে কার্ড জমা রেখে তারা মহাজনের কাছে পাঠায় ঋণের টাকার জন্য। এর জন্য কেরানীরা নাকি মোট ঋণের শতকরা দু টাকা পান। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। অনেক ক্ষেত্রে মহাজনের লোক ভুয়া টিপসই দিয়ে পে কার্ড দেখিয়ে পুরো মাইনেটাই তুলে নেয়। শ্রমিক মহাজনের গদি থেকে কিছু টাকা নামমাত্র পান। এই জাল টিপসই বন্ধ করার জন্য অনেক কয়লাখনিতেই থাম্ব ইমপ্রেসন টেস্ট বক্স বসানো হয়েছে। কর্মীদের টিপসই পরীক্ষা করার ব্যাপারে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সর্ষের মধ্যে ভূত থাকলে কি কাজ হয় ! বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই টিপসই পরীক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মীরা মেশিনটিকে কোনও কাজে না লাগিয়ে পাশে সরিয়ে রাখেন, কারণ মহাজনী কারবারের সঙ্গে তারও তো গাঁটছড়া বাঁধা। ফলে মেশিন বসিয়েও

কর্তৃপক্ষ জাল সই দিয়ে মাইনে তোলার ব্যাপার বন্ধ করতে পারছেন না। শ্রমিকদের অভিযোগ, কিছু প্রভাবশালী নেতা বিভিন্ন চিট ফাণ্ডে টাকা জমা করার জন্যও পীড়াপীড়ি করেন। ইউনিয়ন নেতারা ও খনি কর্তৃপক্ষ মুখে বলেন অশিক্ষাই এসবের প্রধান কারণ। লোক দেখানো বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রও রয়েছে কয়েকটি, কিন্তু তাতে 'ছাত্র' নেই। নেতা বা অফিসারদের কোনও মাথাব্যথাও নেই তার জন্য। কারণ প্রকাশ্যে যাই বলুন না কেন তাঁরা চান অশিক্ষিতই থাকুক শ্রমিকরা। কারণ তাতে শোষণ চালাতে সুবিধা হয়। খনি অঞ্চলের সর্বত্র স্কুল খোলা হয়েছে এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, স্কুলে শতকরা চল্লিশ ভাগ ছাত্রছাত্রী আসবে খনি শ্রমিকদের পরিবার থেকে। কিন্তু

প্রতিশ্রুতির মায়াজালে কতদিন কাটবে কয়লা শ্রমিকদের জীবন!

প্রকৃত অবস্থা হল শ্রমিক পরিবারের দশ শতাংশ ছেলেমেয়েও স্কুলে আসে না। এসব স্কুলে খনির কর্মচারী, আধা অফিসার, কোনও কোনও ক্ষেত্রে অফিসারের ছেলেমেয়েরাই পড়ে। শিক্ষাক্ষেত্রও দুর্নীতির করাল গ্রাসে নিমজ্জিত। খাদরাতে 'খাদরা কলেজ' নির্মাণের জন্য ইস্টার্ন কোলফিল্ডস জমি ও পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা দিয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র লিন্টেলঢালাই করতেই নাকি চলে গেছে পুরো টাকা। কলেজ আর হয়নি। কোল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক খনিতে একটি করে খেলার মাঠ থাকা চাই। কিন্তু তা অধিকাংশ খনিতেই নেই। চিকিৎসা ব্যবস্থা তো খুবই খারাপ। কিছুই পাওয়া যায় না। অধিকাংশ সময়েই বাইরে চিকিৎসা করাতে হয়। শতকরা ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ বসতি অঞ্চল এখনও জল সরবরাহের আওতায় আসেনি। বর্তমানে প্রতি হাজারে হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা ২·৩। লক্ষমাত্রা হচ্ছে ছটি।

জীবনের যেমন নিরাপত্তা নেই, তেমনি নিরাপত্তা নেই কাজের ক্ষেত্রেও। খনির নিচের অবস্থা তো প্রাগৈতিহাসিক বলা চলে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিয়ম হল খনির ভেতরে কয়লা কেটে কেটে সুড়ঙ্গ তৈরি করে এগোনর মুহূর্তে যতটুকু এগোন গেছে ততটুকু লোহার জাল দিয়ে আটকে দেওয়া। আমাদের এখানে তা কাঠ ও বাঁশের খুঁটির ঠেকা দিয়ে আটকে রাখা হয় যা খুবই বিপজ্জনক। এটা সত্যি যে, সাম্প্রতিক কালে খনি দুর্ঘটনা কমেছে কিন্তু মাঝে মাঝেই তা বেড়ে যায় যা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। শ্রমিকদের অভিযোগ কোনও কোনও খনিতে আঘাতের সংখ্যা বেড়ে গেছে। অনেক খনিতে এলোপাথাড়ি খনন, অধিক মুনাফার লোভে অতিরিক্ত খনন বিপদ বাড়িয়ে দিচ্ছে। শ্রমিকদের বক্তব্য অধিকাংশ খনিই বিপদের সীমায় দাঁড়িয়ে আছে। বেশির ভাগ খনিতেই গৃহীত হয়নি নিরাপত্তার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। শ্রমিকদের জান হাতের মুঠোয় নিয়ে কাজ করতে হয়। কোল ইণ্ডিয়ারই বক্তব্য হল মৃত্যুর হার কমেছে মাত্র চল্লিশ শতাংশ এবং মারাত্মক আঘাত পঞ্চাশ শতাংশ। প্রতি পদে পদে জীবনের ঝুঁকি। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অবশ্য সব ব্যবস্থা নেওয়া আছে। ভয়ের কিছু নেই।

ভয়ের কিছু না থাকলে প্রায়ই এদিক সেদিক দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের প্রাণ হারাতে হত না। তবু ওরা কাজ করে। কারণ পেট ভরাতে হয়।

বউ-বাচ্চা নিয়ে খেতে হবে। অশিক্ষিত অনুন্নত ম্লানমুখ এই শ্রমিকেরা জানে না, বোঝে না তাদের কঠিন শ্রমের বিনিময়ে টাকার পাহাড় জমা হচ্ছে অন্য শ্রেণীর হাতে। শ্রমিকরা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই আছে। কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ হয় না।

সামাজিক অবক্ষয়ের সমস্ত উপাদান কয়লা খনি অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছড়ানো রয়েছে।

রয়েছে নানা প্রলোভন ফাঁদে পা দেবার। প্রকাশ্যে শান্তি রক্ষার ধ্বজাধারী পুলিসের সামনেই ঘটে নানা অসামাজিক কার্যকলাপ। অনেক ক্ষেত্রে মাফিয়ারা প্রকাশ্যে বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায় যার আবার কোনও লাইসেন্স নেই। ১৯৮৩ সালে একটি ছবির শুটিং চলাকালীন নায়ক শত্রুঘ্ন সিন্হার একটি দেশী পিস্তলের প্রয়োজন পড়ে, তখন কম করেও চল্লিশ জন তাদের পিস্তল এগিয়ে দিয়ে, 'আমারটা নিন 'আমারটা নিন' বলে অনুরোধ করতে থাকেন। খোঁজ নিলে জানা যেত এঁদের একজনেরও লাইসেন্স নেই। অবক্ষয় শ্রমিকদের এমনভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে যে, এরা ভাবতেই পারে না যে, এই জীবনের বাইরে, এই দাসত্বের বাইরে অন্য জীবন, সুন্দর জীবন হয়, হতে পারে। তাই খাদরার রমেন মাঝি বলে, 'কাজের পর মদ না খেলে পরের দিন কাজ করব কি করে।' যে কিছুটা বোঝে সেও উপায়হীন, যেমন খাদরারই সরজু আলম। 'বুঝি মদ খাওয়া খারাপ অভ্যাস। কিন্তু এই 'গরীবী' ভুলে থাকার জন্য খেতেই হয় বাবু। যতদিন বাঁচব ততদিন খেতেই হবে। কোনও উপায় নেই।' মদে টং হয়ে গিয়ে বউ-বাচ্চা পেটানো, ঘরে অশান্তি, বাইরে অশান্তি—এই তো জীবন—কুৎসিত অমানবিক এক জীবন। শ্রমিকদের স্ত্রীদের অধিকাংশ বিভিন্ন বাবুর বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে, কারণ তাতে দুটো পয়সা আসে। সব কয়লাখনিতেই রয়েছে এক বিরাট মাফিয়া চক্র। খনির জন্মকাল থেকেই যার জাঁতাকলে শোষিত হচ্ছে শ্রমিক, আর শ্রমিকের রক্তের বিনিময়ে সমৃদ্ধ হচ্ছে এই চক্র। প্রাণের ভয়ে শ্রমিকরা তাদের ধাওড়াতে এই দাস-জীবন কাটায় আর মুক্তির দিন গোনে। স্পার্টাকাসের (যিনি কিছুদিনের জন্য খনিশ্রমিকের কাজও করেছিলেন) দাস বিদ্রোহের পর পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে, ভারতীয় সংবিধান থেকে দাস-শ্রমিক প্রথার অবলুপ্তি ঘটেছে, জাতীয়করণের পর তিনবার মাইনে বেড়েছে কয়লা শ্রমিকদের, তবু তাঁদের দাসত্ব প্রথা আজও ঘুচল না। কোনও দিনই হয়ত ঘুচবে না, যদি না খনি অঞ্চলের মাফিয়াদের চক্রব্যূহ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়। ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
সেরা পেলাডার সোনা
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সমস্ত শরীর ভিজে, কর্দমাক্ত : হাতে কেটে বসে যাচ্ছে শক্ত দড়ি : বোঝার ভারে অবনত শরীর : সেরা পেলাডার খনিশ্রমিক

নরক যদি কোথাও থাকে, তা এখানে। সোনার লোভে আমাজনের জঙ্গলে এক স্বল্পপরিসর গহ্বরে হাজার হাজার মানুষ যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সেভাবে কোনও মিষ্টির দোকানের কাঁচ-ভাঙা আলমারির তাকে সাজানো রসগোল্লার ওপর কালো পিঁপড়েরাও ঝাঁপিয়ে পড়ে না। কয়েক বিন্দু সোনা পাওয়ার উদগ্র বাসনায় যেভাবে এখানে কয়েক হাজার মানুষ চারপাশ হাতড়ে বেড়াচ্ছে, এবং তার জন্য যে শোচনীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা এক কথায় নারকীয়। কিংবা হয়তো নরকও এতটা নরক নয়!

আমাজনের দক্ষিণ-পূর্বে ন্যাড়া পাহাড় সেরা পেলাডা। বছর সাতেক আগের ঘটনা। হঠাৎ রটে গেল, ওই ন্যাড়া পাহাড়ের পাথর সরালে নাকি সোনা পাওয়া যাবে। জীবিকার সন্ধানে এক চাষী ওখানে বসবাস শুরু করেছিল। একদিন সে তার হারানো গরুর খোঁজে বেরিয়ে যা হাতে পেয়েছিল, তা থেকেই এই রটনার সূত্রপাত। সে নাকি পেয়েছিল সোনার আকর। অন্তত খবরটা এভাবেই রটেছিল। তারপরই ঝাঁক ঝাঁক মানুষ সেখানে গিয়ে ভিড় জমাল। সেরা পেলাডার প্রাগৈতিহাসিক, জমাট পাথর সরাতে সরাতে তারা খুঁড়ে ফেলল বড় একটা গর্ত। কিন্তু খনি হিসেবে সেটা নিতান্তই স্বল্পপরিসর। খাড়া পাহাড়ের গায়ে ঠেস-দেওয়া কাঠের কয়েকটা মই বেয়ে কোনওরকমে যদিও বা নিচে পৌঁছনো যায়, কিন্তু এক সঙ্গে এত মানুষের পা রাখার জায়গা আর হয় না। তার উপর আবার দিনে দিনে ভিড় বাড়ছে তো বাড়ছেই।

পা রাখার সামান্য একটু জায়গার অধিকার নিয়েই বেধে গেছে কত মারপিট। কিংবা মই দিয়ে কে আগে নামবে বা উঠবে, তা নিয়েও হাতাহাতি, ধস্তাধস্তি লেগেই আছে। গর্তের মধ্যে পোকমাকড়ের মতো থিক থিক করছে শুধু মানুষ আর মানুষ।

সকাল থেকে সন্ধে তারা মাটি ও পাথর বস্তায় ভরছে। প্রায় ষাট কেজি ওজনের প্রতিটি বস্তা। এরপর মাথায় বা ঘাড়ে নিয়ে তাদের ওপরে উঠে আসতে হচ্ছে। নড়বড়ে মই। অসংখ্য মানুষের পায়ের চাপে যে কোনও মুহূর্তে সেগুলো ভেঙে পড়তে পারে। ভেঙে পড়ছেও। সুতরাং যতটা সম্ভব সাবধানেই ওঠার কথা। কিন্তু সেটুকুও হবার উপায় নেই। পেছনের লোকটি এক ঝটকায় সামনের লোকটিকে নিচে ফেলে দিয়ে ওপরে উঠে যাবে। কে কত তাড়াতড়ি মাটি কেটে বস্তা ভর্তি করে সেই বস্তা নিয়ে ওপরে উঠে আসতে পারে, এ তারই প্রতিযোগিতা। পাতাল থেকে ওপরে উঠে এসে কিছুক্ষণ যে বিশ্রাম নেওয়া যাবে, তাও নয়। কারণ বস্তা পিছু মজুরি ধরা আছে। যে যত বস্তা ওপরে আনতে পারবে, সে তত মজুরি পাবে। কম হলে কম, বেশি হলে বেশি। শোষণের ইতিহাসের বর্ণপরিচয় যাঁদের হয়েছে তাঁরাও জানেন, এ ধরনের পরিশ্রমের জন্য পৃথিবীতে কোথাও ভালো মজুরি ধার্য হয়নি। পৃথিবীতে মানুষের শ্রমের মূল্য এখনও এত শস্তা! এবং সোনা যেহেতু মনুষ্যত্বের চেয়েও দামি, তাই সেরা পেলাডার মহাজনরা নির্বিচারে শ্রমিকদের শোষণ করে যাচ্ছেন।

নাইলনের সরু সরু দড়ি দিয়ে বস্তার মুখ বেঁধে দিতে হয়। না হলে মই বেয়ে ওপরে ওঠার সময় বস্তার মাটি যে কোনও মুহূর্তে ঝর ঝর করে নিচে পড়ে যেতে পারে। সেরা পেলাডা কেন, পৃথিবীর কোনও জায়গার কোনও শ্রমিকই এটা হতে দেবে না। যারা স্বর্ণতৃষাতুর তারা তো আরও সাবধানী, আরও সতর্ক। নিদারুণ বঞ্চনার মধ্যে এটুকু অন্তত জানতে তাদের অসুবিধা হয়নি যে, সভ্যতার দেকানপাট চালু রাখার পক্ষে সোনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অথচ সেরা পেলাডায় সোনা যে বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে, তাও নয়। যেটুকু-বা পাওয়া যাচ্ছে, তা এই অমানুষিক পরিশ্রমের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। শ্রমিকরাও এটা জানে। কিন্তু তারা এটাও জানে যে, সোনার হরিণ এখানে দেখা দিয়েছে বলেই তো তাদের রুজিরোজগারের একটা হিল্লে হয়েছে। ঘাম ও রক্ত-ঝরানোর থেকেও দারিদ্র্যের কামড় আরও ভয়ঙ্কর। তাই সোনা পাওয়া যাক বা না যাক, তারা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এখানে এভাবে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যাবে। দেবে দরিদ্র হয়ে জন্মানোর খেসারত। যদি কোনওদিন সচেতন হয়, সময় পায় সব কিছু তলিয়ে দেখবার, তা হলে বুঝতে পারবে, ওদের এভাবে দরিদ্র রেখে দেওয়ার মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। তাদের ওরা একেবারে মেরে ফেলবে না, আধমরা করে বাঁচিয়ে রাখবে, আর তাতেই তাদের লাভ। সমস্ত রকম সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত, দুর্বল করে-রাখা এই মানুষদের যদি সত্যিই মানুষের মতো বাঁচতে দেওয়া হত, তা হলে পৃথিবীর চেহারা অনেক আগেই যেত বদলে। ব্যবসায়ী ও ধনিক শ্রেণীর লোকেরা ওদের দাসে পরিণত করেছে। আধুনিক পৃথিবীর কূটকৌশল অনেক সূক্ষ্ম। তাই আজকের দাসদের হাতে পায়ে শিকল থাকে না, থাকে ক্ষিধে, যা তাদের পরাধীন করে রাখে।

সেরা পেলাডার শ্রমিকদের সুযোগসুবিধা বলতে যে কিছুই নেই তার একটু বড় প্রমাণ, সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকুও নেই। বস্তা-বাঁধা নাইলনের দড়ি, মই বেয়ে ওপরে ওঠার সময় অনেকেরই হাত কেটে বসে যায়। রক্ত ঝরে। সেই অবস্থাতেই বস্তা নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। গর্তের ওপরে বস্তা পৌঁছে দিয়েই আবার নিচে নেমে এসে বস্তা ঘাড়ে তুলে না নিলে সভ্যতার প্রহরীদের রক্তচক্ষু ওদের বিদ্ধ করবে। ওরা আধুনিক সিসিফাস! ঘাড় থেকে পাথর ওদের নামবে না।

সেরা পেলাডার এই নরকের ভৌগোলিক অবস্থান ব্রাজিলে। নানা চেহারায়, নানা ভাবে এ ধরনের সেরা পেলাডা পৃথিবীতে আরও অনেক আছে। ব্রাজিলের খবরটা সবে আমাদের কানে এসে পৌঁছেছে। পৌঁছেছে বলেই শুধু ফুটবলের ভেলকি দেখানোর জন্য দেশটিকে আমরা তারিফ করতে পারছি না। ব্রাজিল সরকার অবশ্য নিজেও এ নিয়ে বিব্রত। তাঁরা চান, গর্তটিকে বন্ধ করে দিয়ে ভাগ্যান্বেষী লোকদের হটিয়ে দিতে। ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও ১৫ হাজার লোক সেখানে ভিড় করে। আর আবহাওয়া ভাল থাকলে তো কথাই নেই। ১৫ হাজার বেড়ে দেড় লক্ষ হতে পারে।

গর্তের মধ্যে পোকামাকড়ের মত থিক থিক করছে শুধু মানুষ আর মানুষ। অথচ, কারো দিকে তাকাবার, এক মুহূর্ত থামবারও ফুরসৎ নেই

তবে মানবিক কারণে ব্রাজিল সরকার তথাকথিত ওই খনিটিকে বন্ধ করে দিতে চান না। তাঁরা চান তাঁদের নিজেদের খনি দফতরের লোকদের সেখানে পাঠিয়ে সোনা লুটে নিতে। ব্রাজিল সরকারেরও ধারণা, সেরা পেলাডায় সোনা আছে। আকরের আকারে তাল তাল সোনা।

সোনা-উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রাজিলের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও বৃটেনের বহু কোম্পানি সোনার খোঁজে ইতিমধ্যেই সেখানে কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বের বাজারে সোনার দাম এখন তুঙ্গে। এই সুযোগে ব্রাজিল চাইছে, চড়া দামে সোনা বিক্রি করে আন্তর্জাতিক বাজারে তার ধার-দেনা মিটিয়ে ফেলতে। ধার-দেনাটাও বিরাট—১০৮ বিলিয়ন ডলার।

কিন্তু ব্রাজিল সরকারের সব পরিকল্পনা ও রঙিন স্বপ্ন বানচাল করে দিতে বসেছে ভাগ্যান্বেষীরা। জীবিকার খোঁজে হাজার হাজার মানুষ সেখানে গিয়ে ভিড় করছে। তাদের নামমাত্র মজুরিতে কাজে লাগাচ্ছে ব্যবসায়ীরা। যেটুকু-বা সোনা ছিল, আছে, তা তারাই আত্মসাৎ করে নিচ্ছে। ব্রাজিল সরকার বাধা দিলে মারাত্মক দাঙ্গা বেধে যাবে। সরকার এখন অন্য ফন্দিফিকির খুঁজছেন।

আমাজন এলাকায় সোনার খোঁজে এই ধরনের রেষারেষি ও পাগলামি অবশ্য নতুন ঘটনা নয়। জীবনের মায়া তুচ্ছ করে ভাগ্যান্বেষীরা ওই এলাকায় বহু আগে থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুর্গম জঙ্গলে ও বন্ধুর পাহাড়ী এলাকায় এরা কেউ কেউ মারাত্মক রোগের শিকার হয়েছে। কেউ কেউ আবার মারা গিয়েছে অন্য ভাগ্যান্বেষীর ছুরি বা গুলিতে। সোনা এমনই জিনিস যে, একজন চোখের সামনে তা কুড়িয়ে নেবে এবং অন্যরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে—এমনটি ভাবা যায় না! একজনের সোনা অন্যজন হাতিয়ে নিতে চায়। তার জন্য যদি তাকে খুন করে ফেলতে হয়, তাও বিবেকে বাধবে না। আসলে বিবেক ব্যাপারটাই তাদের নেই। আশা করাও বোধ হয় উচিত নয়। ওরা প্রসপেক্টার। ভাগ্যান্বেষী। প্রয়োজনের মুহূর্তে ওদের বন্যপ্রাণীর থেকেও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে হবে। তা না হলে অস্তিত্ব রাখাই দায় হয়ে পড়বে।

ছুরি, গুলি কিংবা রোগ তাই ভাগ্যান্বেষীদের দুর্গম আমাজন এলাকা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। আমাজনের এক একটা নদীর গভীর তলদেশ পর্যন্ত তাদের হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে। সোনার খোঁজে তারা হয়েছে ডুবুরি। কিন্তু অতল জলেও আছে বিপদ। জলের নিচেই এক ডুবুরির সঙ্গে আর এক ডুবুরির সংঘর্ষ বেধে যায়। নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য যে-ছুরি ডুবুরি তার সঙ্গে নিয়ে যায়, সেই ছুরিই অন্যের প্রাণহরণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। সোনার লোভ মানুষকে এরকমই হিংস্র করে তুলেছে।

সেরা পেলাডার স্বর্ণতৃষার ঘটনা অবশ্য কিছুটা অন্য ধরনের। সোনা পাওয়া গেছে এরকম একটা গুজব হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে হাজার হাজার মানুষকে এখানে টেনে এনেছে। ভাগ্যান্বেষীরা সোনা খুঁজতে খুঁজতে আগেই ওখানে গিয়ে উপস্থিত হয়নি। কিন্তু অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে একই রকমের। বিহারে, বাংলায় সুবর্ণরেখা নদীর বালি চালতে চালতে সারাদিনে কয়েক কণা কাঁচা সোনা সংগ্রহ করতে দেখেছি বহু মানুষকে। সোনার খোঁজে তারা কিন্তু এতটুকুও চঞ্চল নয়। দলমা রেঞ্জ, বনজঙ্গল ও ছবির মতো সুন্দর একটি নদীর কোলে বরং তাদের শান্ত, মৌন প্রকৃতিরই একটি অংশ বলে মনে হয়। তারা চিত্রার্পিত। কিন্তু সেরা পেলাডায় চলছে তাণ্ডব। দৌড়ঝাপ, মারপিট, খুনোখুনি। গোল্ড রাশ। এক সময় ক্যালিফোর্নিয়াতেও লোকেরা এভাবে সোনার খোঁজে ছুটেছিল।

পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ নিজের কুক্ষিগত করার দৌড়ে কিছু মানুষ অবশ্য এর বহু আগে থেকেই অংশ নিয়েছে। হয়তো বা বলা যায়, এ এক চিরন্তন প্রবণতা। ছলে-বলে-কৌশলে সম্পদ হাতিয়ে নিতে হবে। তার জন্য যদি প্রকৃতি সম্পূর্ণ রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে যায়, সমগ্র মানবসমাজেরই বিপদ ঘনিয়ে আসে, তাতেও কিছু যায় আসে না। সেরা পেলাডায় তাণ্ডব শুরু হওয়ার আগে থেকেই বিভিন্ন এলাকার মানুষ আমাজনের জঙ্গল কেটে বসতি গড়ছিলেন। জঙ্গল কেটে তৈরি হচ্ছিল চাষের জমি। কারণ, জীবিকার কিছু একটা অবলম্বন তো চাই। লোকেরা চাকরি-বাকরি পায়নি বলেই সেরা পেলাডায় গিয়ে ভিড় করেছে। দারিদ্র্যই তাদের বাধ্য করেছে নিজেদের বাসভূমি ছেড়ে আসতে। এদিকে সেরা পেলাডা থেকে সড়ক ধরে কয়েক ঘণ্টা এগোলেই দেখা যাবে সরকার অন্য একটি প্রকল্পে কী বিপুল পরিমাণ অর্থই না বিনিয়োগ করেছেন। সেও এক খনি-প্রকল্প। কারাজাস পর্বতমালায় পাওয়া গিয়েছে লোহা। সমস্ত

পাওনা-গণ্ডা নিয়ে তর্কাতর্কি শেষ হয় হাতাহাতির ভিতর দিয়ে

এমনিতেই ব্রাজিল এখন চূড়ান্ত অর্থনৈতিক মন্দার কোলে ঢলে পড়ছে। এ হচ্ছে মৃত্যুঘুম। একবার ঢলে পড়লে আর উঠে দাঁড়ানো সহজ নয়। ধনী দেশগুলি কিংবা তাদেরই অর্থপুষ্ট আন্তর্জাতিক অর্থ-লগ্নি সংস্থাগুলির কাছ থেকে ধার-দেনা নিয়েও অবস্থা সামাল দেওয়া যায় না। এ ধরনের ঋণ মানুষকে আগে জাতে মারে, তারপর মারে ভাতে। অনুন্নত দেশে দেখা যায়, বিদেশ থেকে ধার-দেনা করে আনা টাকার অনেকটাই সুবিধাভোগী শ্রেণী গ্রাস করে নেয়। উন্নয়ন ও সমাজসেবামূলক প্রকল্পের, একটা ময়াজাল সরকার বিস্তার করেন। কিন্তু সর্ষের ভেতরে ভূত তো তৃতীয় বিশ্বেরই প্রবাদ। যাদের মাধ্যমে ওই সব তথাকথিত উন্নয়নমূলক কাজকর্ম হয়, তারাই পুরো টাকার কিছুটা রেখে বাকিটা খেয়ে নেয়। সবটাই খেয়ে নিতে পারত। কিন্তু সাধারণ মানুষকে ধোকা দেবার জন্য এখানে ওখানে কিছুটা রাস্তাঘাট তৈরি, কয়েকটা গৃহনির্মাণ ইত্যাদি করা হয়। সেগুলো দেখিয়ে বিদেশ থেকে আরও টাকাও আনা যায়। এই মিহি চালাকির বাইরে ব্রাজিলেরও থাকার কথা নয়। তাই সারা দেশ এখন সেরা পেলাডার দিকে তাকিয়ে মরীচিকার পেছনে ছুটছে। বিশ্বের ধনী দেশগুলি এটা বিলক্ষণ জানে, এবং অবস্থাটা উপভোগ করে।

ব্রাজিলের লোকদের প্রাণশক্তিরও প্রশংসা করতে হয়। দুর্নীতি ও সামাজিক অন্যায়ের শিকার হয়েও, তারা হতাশা ও বিষণ্ণতার কাছে নিজেদের সমর্পণ করে দেয়নি। ব্রাজিলের ফুটবলে এই ফূর্তি ও প্রাণশক্তিরই পরিচয় মেলে। কোনও প্রতিকূলতাই তাদের নিজস্ব ছন্দ নষ্ট করে দিতে পারে না। তারা প্রচণ্ড আশাবাদী। সাঙ্ঘাতিক রকমের আশাবাদী। তারা আরও বিশ্বাস করে, প্রতিটি মানুষেরই ধনী হবার অধিকার আছে। তবে সারা জীবন দুঃখ-কষ্টে কাটিয়ে বুড়ো বয়সে ধনী হবার কোনও মানে হয় না। ধনী হতে হলে এখনই হতে হবে। এই মুহূর্তে। তাই সোনার হরিণ ধরার নেশায় তারা মেতে উঠেছে।

সেরা পেলাডায় আজ সব শ্রেণীর মানুষকে দেখা যাবে। চোর, বাটপাড়, খুনী, জেল-পলাতক দাগী আসামী থেকে শুরু করে বারবনিতা পর্যন্ত কেউ আর বাকি নেই। ওখানে গিয়ে জড়ো হয়েছে উত্তর-পূর্ব ব্রাজিলের রুক্ষ, বন্ধুর জমির গরীব চাষীরা। রুক্ষ জমিতেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে এতদিন তারা কিছু ফসল ফলাত। এখন সেরা পেলাডা যদি তাদের ভাগ্য বদলে দেয়। ওদের মতোই এখানে ভিড় করেছে রুগ্‌ণ শিল্পগুলির ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা। দক্ষিণের সুসমৃদ্ধ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে ওদের অনেককেই এতদিন বেকার বসে থাকতে হত। সেরা পেলাডা অন্তত সেই অবস্থা থেকে ওদের মুক্তি দিয়েছে। ব্রাজিলের সামরিক সরকার সেরা পেলাডা অভিমুখী এই জনতরঙ্গ রোধ করতে পারেননি। প্রথম থেকে বাধা দিলে হয়তো কিছুটা সুফল পাওয়া যেত। কিন্তু তাঁরা দেরি করে ফেলেছেন। অগত্যা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সশস্ত্র পুলিসবাহিনী পাঠাতে হয়েছে। গর্তের অদূরে

পাহাড়টাই নাকি লোহা দিয়ে তৈরি। লৌহখনির জন্যই সরকার ওখানে টাকা ঢালছেন।

কিন্তু সেরা পেলাডার স্বর্ণপ্রাপ্তির খবর রটে যাওয়া মাত্রই দেখা গেল, শ্রমিকরা কারাজাস পাহাড় ছেড়ে দলে দলে এখানে চলে আসছে। লৌহখনির কাজে আর শ্রমিক পাওয়া যায় না। লোহার চেয়েও দামী সোনা। আর সোনা যদি কিছু সংগ্রহ করা যায়, তা হলে রাতারাতি ভাগ্য বদলে যেতে পারে। কে কতটা সোনা পেল, তার খবর নেই। কিন্তু দেখা গেল, আমাজনের জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে। এক একজন গায়ের জোরে এক একটি এলাকা দখল করে বসছে। তারপর সেই এলকায় উন্মাদের মতো খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করেছে। এ-জমির দখল আমার, সুতরাং জমিও আমার। মধ্যযুগ ফিরে এসেছে সেরা পেলাডায়। এখন ব্রাজিলের শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই জানে, সেরা পেলাডায় সোনা পাওয়া যাবে। চলো সেরা পেলাডা—এই অঘোষিত স্লোগান সারা ব্রাজিলের মানুষদের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ছন্দই বদলে দিতে চলেছে।

মাথা ঝিমঝিম-করা উঁচু মই। অসংখ্য মানুষের পায়ের চাপে যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে

বসিয়েছেন একটি ব্যাঙ্ক। সোনা পাওয়া গেলেই তা সরকারের নির্দিষ্ট দরে ওই ব্যাঙ্কে বিক্রি করে দিতে হবে। এটাই নিয়ম। এতে অবশ্য সোনার চোরাচালান বন্ধ হয়নি।

এখানে স্বর্ণান্বেষীদের বলা হয় গরিমপিয়েরো। এই গরিমপিয়েরোদের নিয়ে সেরা পেলাডা আজ হয়ে উঠেছে মিনি ব্রাজিল। আইন-শৃঙ্খলার রক্ষকদের চোখের সামনেই ঘটছে কত অবিচার ও প্রবঞ্চনার ঘটনা। তবু যে ওরা এখনও ভেঙে পড়েনি, তার কারণ একটাই। ব্রাজিলের মানুষ কঠোর পরিশ্রম করতে জানে। হাসিমুখে সহ্য করতে জানে সব অন্যায়-অবিচার। কিন্তু যখন রুখে দাঁড়ায় তখন আর তাদের হটিয়ে দেওয়া যায় না। সেরা পেলাডায় তাই কখনও যদি প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, তা হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

তবে এখানে যাঁকে পুলিস-প্রধান করে পাঠানো হয়, তিনি শ্রমিকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শক্তিসামর্থ্যও বেড়েছে। একসময় তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট-বিরোধী গোয়েন্দা অফিসার। তাঁর এমনই জনপ্রিয়তা যে, ব্রাজিল সরকার যখন সারা দেশে রাজনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী চালু করলেন, তখন স্বর্ণান্বেষীরা তাঁকে কংগ্রেসে নির্বাচিত করেন। এমন কী ওই স্বর্ণান্বেষীদের দিয়েই তিনি সেরা পেলাডার কাছাকাছি একটি শহরের নাম নিজের নামে করে নিয়েছেন। তাই মনে হয়, সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলনের যথেষ্ট কারণ থাকলেও, এই ভদ্রলোকের আমলে যদি তা আদৌ না হয়, তা হলেও অবাক হওয়ার কারণ ঘটবে না। মানুষের সব জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিয়ে রাখার আধুনিকতম ওষুধের নাম রাজনীতি!

তাই সেরা পেলাডায় গরীবরা ভুগছে। স্বর্ণপ্রসূ মাটির দখল নেবার মতো কোনও শক্তিশালী জোট তারা বাধতে পারেনি। ফলে মহাজনদের হয়ে তারা খেটে মরছে। বস্তা বস্তা মাটি পাথর খনিগর্ভ থেকে ওপরে তোলার সব থেকে বিপজ্জনক কাজটিতেই তাদের নিয়োগ করেছে ধনী মহাজনরা। গরীবরা এখানে দিনমজুর।

অবস্থা যে কী শোচনীয় তার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পরে। গত বছর অক্টোবর মাসে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও খনির কাজ বন্ধ রাখা হয়নি। বৃষ্টিতে মাটি ধসে বেশ কয়েকজন শ্রমিকের জীবন্ত সমাধি হয়। সবার চোখের সামনেই ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু সবাই তখন নীরব দর্শক। কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ানোর পর সবাই আবার যে যার বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছিল। মৃত সহকর্মীদের জন্য সমবেদনার সময়ও তারা পায়নি। সময় পায়নি বলা ভুল, দেওয়া হয়নি। ধুলো-কাদা মেশানো আকরিক সোনা গলানোর জন্য যে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়, তাও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। বহু মানুষ এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সরকার কিছু কিছু স্বাস্থ্যবিধি চালু করার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু দেখা গেল, এ ব্যাপারে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে ধনী ব্যবসায়ীরা। সরকারের পুলিস ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে তারা বার বার লেলিয়ে দিয়েছে শ্রমিকদের। সরকারি বাহিনীর সঙ্গে শ্রমিকরা যখন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, তখন একজনও ব্যবসায়ীকে ধারেকাছে দেখা যায়নি। উস্কানি দিয়ে তারা নিরাপদ আশ্রয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। উস্কানির মন্ত্র একটাই। সরকার তোমাদের খনি বন্ধ করে দেবার জন্য লোক পাঠাচ্ছে—শ্রমিকদের কানে কানে ফিস ফিস করে এটা বললেই ম্যাজিকের মতো কাজ হয়। তারা শাবল-গাঁইতি কোদাল—হাতের কাছে যা পায় তা নিয়েই লড়াইয়ে নেমে যায়। সেরা পেলাডার নাটকের মূল শিক্ষা এটাই। তারা আজ তাদের ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলছে।

মই থেকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। একবার পড়লে নীচের কাদায় ডুবে যাওয়া প্রায় অবশ্যম্ভাবী।

তাদের আধমরা করে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে নিদারুণ আতঙ্কে। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরে, ওরা তেমনই সেরা পেলাডার কাদামাটিটুকুই মুঠোয় ধরেছে। ওদের মনে একটা ধারণা গড়ে তোলা হয়েছে যে, খনি বন্ধ হয়ে গেলেই তাদের না খেয়ে মরতে হবে। তাদের বেকার হয়ে যেতে হবে। এবং বেকারি মানেই অনশন ও মৃত্যু। তাই সেরা পেলাডার শ্রমিকদের সরকারের বিরুদ্ধে পথ অবরোধ করতে দেখা গিয়েছে, দেখা গিয়েছে সরকারি বাড়িঘর আগুনে জ্বালিয়ে দিতে। ব্যবসায়ীরা তাদের দিয়েই বিক্ষোভ-মিছিল করিয়েছে, কারাজাস লৌহখনিতে সেই মিছিল পাঠিয়েছে, মিছিল থেকে দেওয়া হয়েছে সরকার বিরোধী স্লোগান। সরকারও ধোয়া তুলসীপাতা নন। শ্রমিকরা কীভাবে ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা করছে এটা দেখে তাঁরাও মজা পেয়েছেন।

সেরা পেলাডায় হিংসাই এক শ্রেণীর মানুষের প্রধানতম অস্ত্র। কিন্তু অবস্থা কি বদলাবে না? বঞ্চিত, শোষিত এই মানুষদের নিয়েই কি পৃথিবী একুশ শতাব্দীর স্বর্গে পাড়ি দেবে? সেরা পেলাডার স্যাঁতসেঁতে, ভিজে খনিগর্ভ থেকেই শোনা যাচ্ছে আশার বাণী। সেরা পেলাডার মাটির অধিকারের দাবি জানিয়েছে কিছু কিছু শ্রমিক। এ নিছক ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের দাবির প্রবঞ্চনা নয়, এ দাবির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মাটির প্রতি মানুষের সহজাত অধিকারের প্রশ্ন। তারা চায় সুন্দরভাবে বাঁচতে। খনির চারপাশে গড়ে ওঠা ঝুপড়ি ও ধাওড়াগুলি ভেঙে তাদের জন্য তৈরি করে দিতে হবে চমৎকার বাড়িঘর। সে সব বাড়িঘর বিলাসবহুল না হলেও, সেগুলি যেন স্বাস্থ্যকর হয়। ঘরে যেন খেলে বেড়ায় আলো হওয়া। সেই দাবিই উঠেছে সেরা পেলাডায়। শ্রমিকদের গায়ে যেন লাগে সোনার আভা। তারাও সমৃদ্ধির শরিক হতে চায়। দক্ষিণ-পূর্ব আমাজনের পাতাল থেকে চিরদিনের মানবতার এই কণ্ঠস্বরই শোনা যাচ্ছে।

এই কণ্ঠস্বর এখন ক্ষীণ হলেও ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠবে, আশা করা যায়। ■

প্রফেট

সমীর চৌধুরী

বাস থেকে নেমে সামান্য একটু পথ, কিন্তু কেন যেন আজ এইটুকু পথ হেঁটে যেতেই নিখিলের নিজেকে খুব ক্লান্ত বলে মনে হল। তখন বিকেল। মন কেমন করা হলদে আলো আর বিষণ্ণ দীর্ঘছায়ায় সমস্ত পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়ে আছে। পথের ধারের চায়ের দোকানটায় কয়েকজন লোক জটলা করছিল। নিখিল অন্যমনস্কভাবে একবার তাদের দিকে তাকালো। এর আগেও অনেকবার এরকম দেখেছে নিখিল, চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এক দঙ্গল লোককে জটলা করতে। বিশেষভাবে কখনও ওদের দিকে তাকায়নি, বা তাকানোর প্রয়োজনও মনে করেনি। আজ কিন্তু তাকালো। শুধু সে নয়, নিখিলের মনে হল লোকগুলোও যেন আজ বিশেষভাবে লক্ষ্য করছে তাকে। ফলে কেমন যেন এক কাঁপুনি অনুভব করল সে। যেন ওরা কিছু ভাবছে তার সম্পর্কে তার মনের অন্ধিসন্ধি জেনে ফেলেছে লোকগুলো।

এই পড়ন্ত বিকেলের আলোয় চারপাশের দৃশ্যাবলী যতটা স্পষ্ট হতে পারে—নিখিলের মনের গোপন গলিঘুঁজিগুলো যেন তার চেয়েও বেশি স্পষ্ট হয়ে পড়েছে ওদের সামনে। একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল নিখিল। কেমন যেন নার্ভাস বোধ করল। পরক্ষণেই ভাবল এটা কেমন করে সম্ভব। বুক পকেটে, তারপর প্যান্টের পকেটে হাত দিল সে। নিভার জন্য কেনা ট্যাবলেটগুলো ঠিকঠাক আছে দেখে আশ্বস্ত হল। তারপর বছর পাঁচেক আগেও কফি হাউসে আড্ডা দেওয়ার সময় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যেভাবে হাঁটত, সেইভাবে নিজস্ব ঢঙে সিগারেটের দোকানটার দিকে এগিয়ে গেল সে।

অন্যদিনের তুলনায় আজ একটু বেশিই সিগারেট নিল নিখিল। পুরো এক প্যাকেট। নতুন প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালো সে। দেখল চায়ের দোকানে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো এখন আর তাকে দেখছে না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে লোকগুলো কি সব নিয়ে যেন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। নিখিল ওদের আলোচনার বিষয়বস্তু জানার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ অনুভব করল না। সে বরং সামনের কারখানাটার গায়ে পড়ন্ত রোদের দিকে তাকালো একবার। পড়ন্ত রোদ্দুরের রঙ হলুদ। কিন্তু এতটা হলুদ কেন, কথাটা ভাবতে ভাবতে নিভার বাড়ির দিকে পা বাড়াল সে।

কিছুটা পথ হেঁটে এলেই একটা খাটাল। রাস্তার ওপরেই ছড়ানো ছিটোনো গোবর। কেমন

একটা বোঁটকা গন্ধ। একদিন নিভার কাছ থেকে রাত করে বাড়ি ফেরার সময় অন্ধকারে গোবরে পা পড়ে পিছলে যাচ্ছিল আর কি নিখিল! নিজেকে কোনরকমে সামাল দিয়েছিল সেদিন। বিরক্তি বোধ করেছিল। ভেবেছিল কোন দিন দিনের বেলায় এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় খাটালের মালিককে ডেকে কথাটা বলবে। কিন্তু বলা হয়নি। এখন নয়, পরে বলব— এই কথা ভেবেছে। যেমন এখন। মনে মনে খাটালের মালিককে রাস্তায় এইভাবে গোবর ফেলে রাখার জন্য ধমকে নিল একচোট। কিন্তু আসলে সে কিছুই বলল না। উদাসীনভাবে একবার শুধু টালির ছাউনি দেওয়া সেই ঘরটার দিকে তাকালো—খাটালের মালিক যেখানে থাকে। তারপর যেরকম হাঁটছিল, সেইভাবে হাঁটতে থাকল।

নিখিল এরকমই। কলেজে পড়ার সময় কি একটা ব্যাপার নিয়ে একবার অনুতোষের সঙ্গে গণ্ডগোল হয়েছিল তার। অনুতোষ তখন কবিতা লিখত। দু একটা লিটল ম্যাগাজিনে তার কবিতা ছাপা হচ্ছিল। বন্ধু-বান্ধব ছাড়া সে সব কবিতা কে-ই বা পড়ত। কিন্তু অনুতোষের ধারণা ছিল সে খুব বড় কবি। ফলে মাঝে মাঝে মদ খেয়ে মাতলামি করত আর খিস্তি দিত। সেই অনুতোষই একদিন নিখিলকে বলেছিল—'তুই শ্লা একটা আস্ত আঁতেল। খালি ভাববিই, কিন্তু সমাজের জন্য কোনদিন তোরা কিছু করতে পারবি না। সে ক্ষমতাও তোদের নেই।'

অনুতোষের কথায় নিখিল হেসেছিল। ইচ্ছে করলে পাল্টা জবাব সেও দিতে পারত। বলতে পারত— 'তুই-ই বা শ্লা সমাজের জন্য কি করছিস? তোর ঐ 'কোবতে' পড়ে সমাজের কোন উপকারটা হবে?' কিন্তু না, কিছুই বলেনি সে। বরং ভেবেছিল কথাটা নিয়ে। অনুতোষের কথাটার মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত আছে বলে মনে হয়েছিল তার। সত্যিই তো, সে নিখিল, বা অনুতোষ, বা আরো এই যে সব এত লোক বেঁচে আছে, বেঁচে থাকে—এই বেঁচে থাকার সার্থকতাটা কি? কেন আমরা বেঁচে থাকি? শুধুই বেঁচে থাকার জন্য? খাওয়া, পরা আর মৈথুনের জন্য? নাকি এর অন্য কোন মানে আছে?

অনুতোষের এই সামান্য কথাটা ধরে এত কিছু ভেবেছিল নিখিল। যেমন এখন। গোবর, ঘুঁটে, খুঁটিতে বাঁধা গরুগুলো, খাটালের মালিক, এদের সবাইকে নিয়েই কিছু ভাবল নিখিল। সত্যি কথা বলতে মনে মনে একটু আগে খাটালের মালিককে ধমকাচ্ছিল সে, এখন কিন্তু তার জন্য কেমন একটা করুণা বোধ করল। আহা, লোকটা কি-ই বা জানে! একটা গোটা গোলাপের বাগানের চাইতে ওর কাছে এক বস্তা খড়ের দাম অনেক বেশি। তাছাড়া এই নির্জন জায়গাটিতে খাটালটা যেন বেশ সুন্দর মানিয়ে গেছে। মনে মনে এই নির্জনতাকে ভালোবাসে নিখিল। কফি হাউসে আড্ডা দেওয়ার চাইতে, নিখিল যদি এই খাটালটার পাশে চুপচাপ বসে থাকতে পারত কিছুক্ষণ, তাহলে বোধহয় অনেক খুশি হত সে।

খাটাল পেরিয়ে কিছুদূর যেতেই পর পর কয়েকটা ঘরবাড়ি। এখানে নির্জনতা একটু কম, যদিও মাঝে মাঝে আগাছার জঙ্গল আছে, দু একজন পথচারী আছে। এরপর আরো ঘিঞ্জি এলাকা, তারপর আরো। শেষে চওড়া একটা উঠোন, উঠোনের এক কোণে একটা জুঁই ফুলের গাছ। খুবই পরিচিত দৃশ্য নিখিলের কাছে। ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই আবার একটু উত্তেজনা বোধ করল নিখিল। আর তখনই তার কানে ভেসে এল একটা করুণ গোঙানির শব্দ। একটু থমকে দাঁড়াতে হল নিখিলকে। নর্দমার সামান্য জলে একটা কুকুরের বাচ্চা পড়ে আছে। উঁচু পাড় টপকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছে না। তার এই করুণ গোঙানি পথচারীদের উদ্দেশ্যেই। যদিও কেউ দাঁড়াচ্ছে না তাকে দেখে। সবাই যেন খুব ব্যস্ত, খুব তাড়া আছে তাদের। নিখিল দাঁড়াতে কুকুরের বাচ্চাটা আরো জোরে দুবার ডেকে উঠল। কুকুরের বাচ্চার করুণ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে কি যেন একবার

ভাবল নিখিল। তারপর হাঁটা শুরু করল। অনুতোষ যেন পাশে দাড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা দেখছিল এতক্ষণ। কানে কানে বলে উঠল ম্লা আঁতেল ! খালি ভাববিই, কোনদিন কিছু করবি না তোরা !

॥ দুই ॥

নিখিলের ছোট বোন আরতি একদিন কাপড় গোছাতে গোছাতে বলেছিল— 'দাদা তোর মত কিন্তু কেউ নয়। আজকাল ছেলেরা অত ধরে বসে থাকে না !'

নিভার অসুখটা তখন এত পেকে ওঠেনি। সবাই আশা করছিল সেরে যাবে। ডাক্তারও সেই কথা বলেছিল। আরতি জানত। জেনেশুনেও ওকথা কেন বলেছিল কে জানে ! এখনও মাঝে মাঝে বলে— 'আহ্া, দাদা যদি তখন আমার

কথাটা শুনত !' নিখিল শোনে আর ভাবে। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন গোলমেলে মনে হয় তার কাছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যি, আরতি তার মত কেউ নয়। কেউ আর অত ধরে বসে থাকে না।

সে ধরে বসে আছে। শুধু ধরে বসে আছে নয়, ঝুলে আছে। অনুতোষ ঠিকই বলেছিল, নিখিল শুধু ভাবে। একটা জিনিস নিয়ে দশ রকমভাবে। নিজের কথা ভাবে, অন্যের কথা ভাবে, সোজা দিক দিয়ে ভাবে, উল্টো দিক দিয়ে ভাবে। আর এই ভাবে ভাবতে ভাবতে কখন যেন লক্ষ্য করে নিখিল, পড়ন্ত রোদ্দুরের রঙ হলুদ হয়ে এসেছে।

নিভার সঙ্গে আলাপ হবার মাসখানেক পরের কথা। ওর সঙ্গে পলু আর অজয়ের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল একদিন। সেদিন সিনেমা গিয়েছিল ওরা। ম্যাটিনি শো'য়ে সিনেমা দেখে যখন বেরিয়ে ছিল ওরা তখন এমনি বিকেল, চারিপাশে পড়ন্ত রোদ্দুর। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, রোদ্দুরের রঙ সেদিন অতটা হলুদ মনে হয়নি।

হল থেকে বেরিয়ে ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। হাঁটছিল আর পরস্পর টুকটাক শব্দ বিনিময় করছিল। নিভাকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। নিখিলের মনে হচ্ছিল, আজকের জন্য যেন নিভার বয়েস অনেকখানি কমে গেছে। এতে সে নিভার ওপর কৃতজ্ঞ বোধ করেছিল। আর যাই হোক পলু আর অজয় যেন ওকে পছন্দ করে।

ব্যাপারটা কিন্তু তা হয়নি। একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে কিছু খাবার পর নিভাকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছিল ওরা। কিছুক্ষণ নীরবতার পর নিখিলই কথা বলেছিল প্রথম। 'কি রকম দেখলি ?' অজয় কিছু বলেনি। যেন গভীরভাবে কিছু একটা ভাবছিল। পলু একটু ঠোঁট কাটা স্বভাবের— 'কিছু মনে করিস না মাইরি,' বলেছিল পলু, 'তুই একটা আস্ত গাধা !'

'কেন বলতো ?' পলুর কথায় আহত হয়েছিল নিখিল। নিজের সেই আহত ভাবটাকে লুকোবার চেষ্টা করেনি সে।

'যদি চাকরির জন্য বিয়ে করিস, আলাদা কথা। আর না হলে ওর মধ্যে এমন কিছু দেখলাম না, যা তোর মত ছেলেকে—'

'পলু !' নিখিলের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল ঘুরিয়ে এক চড় কষায় পলুকে। কিন্তু ব্যাপারটা সে পর্যন্ত গড়ায়নি। তার আগেই অজয় ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। দু পক্ষকেই সামাল দেয় সে।

এই ঘটনার পর নিভার সঙ্গে আর কোন বন্ধুর আলাপ করিয়ে দেয়নি নিখিল। কাউকে কিছু বলেওনি। পলুর ওপর রাগ হয়েছিল, অভিমান হয়েছিল, দুঃখও হয়েছিল। কিন্তু পলুকে যা বলার, তা সে মনে মনেই বলেছিল। তোরা শুধু ওর ওপরটাই দেখলি। তা তো দেখবিই। সেটাই তো আমাদের সমাজের রীতি। কিন্তু ওর মনটা কেউ দেখলি না তোরা। একবারও সংসারের জন্য ওর ত্যাগের কথাটা তোরা ভাবলি না কেউ। ছোট থেকে কি ভীষণ কষ্টের মধ্যে পড়াশোনা করেছে। ভাল ব্যাডমিন্টন খেলত বলে এই চাকরিটা পেয়েছে। তার চাকরি পাবার আগেই বাড়িটা বাঁধা পড়েছিল। চাকরি করে সেই বাড়ি ছাড়িয়েছে। দুটো বোনকে লেখাপড়া শিখিয়ে ভাল জায়গায় বিয়ে দিয়েছে। তারা এখন দূরে দূরে থাকে, খোঁজখবর নেয় না কেউ। প্রত্যেকেরই ভরপুর সংসার, স্বামী আর ছেলেমেয়ে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। আর এই মেয়েটা ? নিজের জীবনের সব সুখকে বিসর্জন দিয়ে সে এখন বুড়ো বাপ-মাকে দেখে, চাকরি করে, বাড়ি আসে, খায়, ঘুমোয়—নীরস একঘেয়ে জীবন। এই জীবনের কাছে কিছুই আর পাবার নেই তার। সেই মেয়েটা যদি আমাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখে, বেঁচে থাকার মধ্যে নতুন করে আনন্দ খুঁজে পায়, তাহলে কি খুব অন্যায় হবে ? না পলু, তুই যাই বল—আমি ভালোবাসি ওকে। সত্যিই ভালোবাসি—

নিখিলের এই ভাবনার কথা আর কেউ জানে না। সবটাই তার ভেতরের ব্যাপার। তবে আর যাই হোক, নিখিল সেইদিনই ঠিক করে ফেলেছিল তার ভেতরের কথা বন্ধু-বান্ধবদের আর কখনও জানাবে না সে। নিভা যখন তারই, তখন অন্যের এত মাথাব্যথার কি আছে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এর ঠিক কিছু দিন পরেই নিভা যখন প্রথম বিয়ের কথাটা তুলল, নিখিল অকারণেই পিছিয়ে গেল। কেন যে পিছিয়ে গেল নিজেও জানে না সে। আসলে এ সেই পুরনো রোগ তার। সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার না ভেবে দেখা পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না সে। যদিও ভেবে দেখার মত কিছু ছিলও না এর মধ্যে। এদিকে অফিস থেকে তাকে মাস তিনেকের জন্য বাইরে পাঠাবার কথা চলছিল। শেষ পর্যন্ত নিভার সঙ্গে তিন মাস পরে বিয়ে হবে—সে ফিরে এলেই—এরকম একটা চুক্তি হল। নিভাও এটা নিয়ে খুব একটা টানা-হেঁচড়া করল না। বাড়িতে তখন তার বাবার খুব অসুখ। বাবাকে ছেড়ে কোথাও যাবার কথা ভাবতে পারছিল না সে। সুতরাং তিন মাস ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি।

তিন মাস পরে নিখিল ফিরে এসেই শুনল, নিভা ক'দিন ধরে অফিস যাচ্ছে না। দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণা, বিছানায় পড়ে রয়েছে সে। খবরটা শুনেই বিকেলের দিকে নিভার কাছে গিয়ে হাজির হল নিখিল। ব্যাগে করে একগুচ্ছ ফুল নিয়ে গিয়েছিল। যখন সে ঘরে ঢোকে নিভা তখন বিছানায় শুয়েছিল। কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার শরীরটা। নিখিলকে দেখেই তার পাণ্ডুর মুখে আলোর বন্যা বয়ে গেল যেন। তাড়াতাড়ি উঠে বসল সে। নিখিল ফুলের তোড়াটা তার হাতে দিয়ে বলল—'তোমার জন্যে।' তারপর নিভাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তার মুখটা ধরে সজোরে একটা চুমু খেল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে মুখটা সরিয়ে আনতে হল তাকে। নিভার মুখে কি বিশ্রী কুৎসিত একটা গন্ধ। সমস্ত শরীরটা গুলিয়ে উঠল, তবু নিজেকে সংযত রেখে নিখিল বলল—'এই, দাঁত মাজো না কেন। দাঁতে ব্যথা বলে দাঁতও মাজো না বুঝি ?'

—'কই, না তো। দাঁত তো রোজ মাজি ?'

—'তাহলে—'

বাকিটা আর বলেনি নিখিল। কি ভেবে চুপ করে গেছিল একদম।

এর কিছু দিন পরেই দেখা গেল নিভার দাঁতের মাড়িগুলো কেমন যেন কালচে হয়ে গেছে। বড় ডেন্টিস্টকে দেখান হল। গাদা গাদা টাকা খরচা হল, বহু রঙ বেরঙের ওষুধ এল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষে অপারেশন। ওপরের মাড়িটা কেটে উড়িয়ে দিতে হল। ফলে আবার ভাবতে হল নিখিলকে। আরতি বলেছিল—'দাদা, তোর মত কিন্তু কেউ নয়। আজকালকার ছেলেরা অত ধরে বসে থাকে না।' কেন আরতি ওকথা বলেছিল কে জানে।

অপারেশনের পরে বেশ কিছুদিন সুস্থই ছিল নিভা। হাঁটা চলা করছিল। আগের চেয়েও বেশি প্রফুল্ল মনে হচ্ছিল তাকে। যদিও অফিসে আর যাচ্ছিল না সে। অফিস থেকে বেশ কিছুদিনের ছুটি নিয়েছিল। বিয়েটা এবার করে ফেললেই হয়। নিখিলকে তাড়া দিচ্ছিল সে। নিখিলও তাই চাইছিল। তবে বিয়ের আগে কিছুটা গোছগাছ করে নিতে চাইছিল সে। বাড়িটা রঙ করাতে হবে, কিছু ফার্নিচার কিনতে হবে। এছাড়া আরো কি কি কেনা যায়, করানো যায়—তাই নিয়ে ওদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হত। নিভার এসব ব্যাপারে প্রচণ্ড উৎসাহ। একদিন তো এই নিয়ে ছোটখাট একটা তর্কযুদ্ধও হয়ে গেল ওদের মধ্যে। নিখিল চেয়েছিল জানলার পর্দাগুলো সব নীল রঙের হবে। নিভার তাতে মত নেই। নিভা চায় একটু অন্যরকম করতে। ফলে তর্ক বাধল। শেষে নিখিলকে হার মানতে হল নিভার কাছে। ঠিক হল, জানলার পর্দা বালিশের ওয়াড়, প্রভৃতি ব্যাপারগুলো নিভার এক্তিয়ারেই থাকবে। কেনাকাটা যা করার, সেই করবে সব।

এইভাবেই চলছিল। বেশিদিন নয়, মাত্র মাসখানেক। সব রেডি, দিনক্ষণও প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। যদিও রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বিয়ে করবে ওরা—তবু কয়েকজন ঘনিষ্ঠ লোককে যখন জানানোর কথা ভাবা হচ্ছে—ঠিক সেই সময় একদিন, নিখিলের সঙ্গে সিনেমায় গেছিল নিভা ; ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সমস্ত মুখটা জুড়ে অসম্ভব যন্ত্রণা। ধীরে ধীরে গোটা মুখটা ফুলে উঠল বেলুনের মত। ডাক্তার ডাকা হল আবার। ডাক্তার পরীক্ষা করার পর ওষুধ দিলেন। তারপর নিভার নাকের কাছে ছোট একটা ফুসকুরি দেখিয়ে বললেন—'নাকে টিউমার হয়েছে, ওটাকে অপরারেশন করা দরকার।'

ছুটি বাড়াতে হল নিভাকে। নিখিলকে খবর দেওয়া হল। সে এসে সব দেখেশুনে অপারেশন করতে মত দিল। সুতরাং বাধ্য হয়েই বিয়েটা পিছোতে হল তাদের।

কিছুদিনের মধ্যেই নিভার টিউমার অপারেশন হল। ততদিনে তার শ্বাসনালীর সঙ্গে কণ্ঠনালীর ব্যবধানটুকু লুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে নিভা যা বলছিল, সবই নাকে নাকে শোনাচ্ছিল। নিখিল রোজ অফিস ফেরৎ এখানে চলে আসত। নিভার মাথার পাশে বসে টুকটাক কথাবার্তা বলত। এক দুই তিন—এইভাবে ঘণ্টাগুলো কেটে যেত।

নিভার মা চা করে দিত। মাঝে মাঝে ইনিয়ে বিনিয়ে নিখিলের কাছে নিজের দুঃখের কথা শোনাত। নিভার বাবা একটু কম কথা বলত। যখন বলত, তখন বেশির ভাগটাই থাকত তার যৌবনের কথা। পুরনো দিনের কথা বলতে ভদ্রলোক খুব ভালোবাসতেন।

এদিকে নিভা ধীরে ধীরে যতই সেরে উঠছিল, ততই অস্থির হয়ে উঠছিল বিয়ের জন্য। নিখিলেরও তাই মত। শুধু তাই নয়, নিখিল চাইছিল বিয়ের পর নিভাকে চাকরিটা ছেড়ে দিতে বলবে। নিভার আর চাকরি করার দরকার নেই। সে যা পায় তাতেই তাদের ভালোভাবে চলে যাবে।

নিখিল যখন এইসব ভাবছে, অফিস থেকে তখন তাকে আবার বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করল। খুব বেশিদিন নয়, মাত্র একমাসের জন্য। নিখিল ভাবল, ভালোই হল। নিভা সেরে উঠছে। ফিরে আসতে আসতে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। অফার তখন—

নিখিল নিভাকে যখন কথাটা জানাল, নিভা একটা বাচ্চা মেয়ের মত নাকি সুরে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। নিখিল তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাল শেষ পর্যন্ত। বলল—'এই তো মাত্র একমাস, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। যাবো আর আসবো। আর তারপরই আমাদের নতুন জীবন শুরু হবে। বলে আলতো একটা চুমু খেয়েছিল ওর কপালে।

কিন্তু কি আশ্চর্য ওর জীবনের গতি। একমাস পরে নিখিল যখন ফিরে এল, তার জন্যে তখন অন্য একটা খবর অপেক্ষা করছিল। স্বপ্নেও সে যে কথা কোনদিন ভাবতে পারেনি, তাই হয়েছে। ডাক্তাররা নিভার মুখে ক্যান্সারের লক্ষণ আবিষ্কার করেছে।

ছুটি শেষ হয়ে যাচ্ছিল নিভার। আবার ছুটি নিতে হল তাকে। বিয়ে পিছিয়ে গেল। স্বপ্নগুলো ক্রমশ যেন দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। জানলার পর্দা, বালিশের ওয়াড়, এরা ওষুধ, প্রেসকৃপশন আর পথ্যের ভিড়ে কোথায় যেন হারিয়ে যেতে লাগল।

নিখিলের যা স্বভাব, এই সব দেখে শুনে আবার ভাবতে শুরু করল সে। একটা মানুষ কষ্ট পায় কেন? কেন একটা মানুষ সারা জীবন মুখের রক্ত তুলে অন্যের জন্য পরিশ্রম করার পর, আজ এইভাবে পড়ে পড়ে কষ্ট পাচ্ছে? নিভা তো খারাপ কাজ করেনি কখনও। কখনও কারও অমঙ্গল চায়নি। তবে কেন এইরকম নিষ্ঠুরভাবে নিয়তির হাতে মার খাচ্ছে সে?

প্রশ্নগুলো ভাবায় নিখিলকে—নিখিলের যা স্বভাব। অনুতোষ জানতে পারলে বলবে—শ্লা, আঁতেল।'

যত দিন কাটতে লাগল নিভার অবস্থা আরো খারাপের দিকে যেতে লাগল। এর মধ্যে নিভার অফিসের লোকেরা নিভাকে এসে একদিন দেখে গেল। নিভা যাতে বাড়িতে বসে প্রতি মাসের মাইনের টাকাটা পায়, সে ব্যবস্থাও তারা করবে বলে কথা দিয়ে গেল। ঠিক হল, নিভাকে দেখাশোনা করার জন্য একজন লোকও রাখা হবে। নিখিলই লোক খুঁজে বের করার দায়িত্বটা নিল।

লোক এল। নিয়মিত ডাক্তার, ওষুধ, প্রেসক্রিপশন সবই চলতে লাগল। কিন্তু নিভার সেরে ওঠার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। ক্যান্সার ধীরে ধীরে সমস্ত মুখময় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। প্রথম যেদিকটা ধরেছিল সেদিকটা পচে গেছে প্রায়। নিভার মাথার পাশে বসতে এখন কষ্ট হয় নিখিলের। ভীষণ এক দুর্গন্ধে বমি আসে তার। ভাবে, মরে গেলেই বুঝি বাঁচে মেয়েটা। কিন্তু তা তো হবার নয়। নিভা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন ডাক্তারের লাভ, ততদিন নার্সের লাভ, ততদিন বুড়ো বাপ-মায়ের লাভ। কিন্তু নিভা? তার কথা কেউ ভাবে না, শুধ নিখিল ভাবে। কেননা এটাই তার স্বভাব। শুয়ে বসে অফিসে কাজ করতে করতে, সব সময়ই ভাবে সে। ভাবে, মানুষের ফোঁড়া হলে অনেকসময় সেই ফোঁড়া কাটতে হয়। কাটে ডাক্তাররা। সেটা অপরাধ নয়। কিন্তু বেঁচে থাকাটাই যেখানে বিষাক্ত, দেহের অভ্যন্তরে প্রাণ যেখানে পুঁজ হয়ে জমে আছে, সেখানে? সেখানে কে ছুরি চালাবে? সেখানে কে ডাক্তারি করবে?

॥ তিন ॥

সেই কুকুরের বাচ্চাটাকে ফেলে রেখে অনেকটা পথ পার হয়ে চলে এসেছে নিখিল। এখানটা তুলনায় অনেক ঘিঞ্জি। একটা মুদীর দোকানের সামনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকজন লোক। অন্যমনস্কভাবে একজন বিড়ি টানছে। পথের ধারে একটা কুকুর শুয়ে শুয়ে চোখ পিটপিট করছে। সবই আছে। কিন্তু কেন কে জানে, নিখিলের মনে হল কেউ নেই। অনন্ত শূন্যের মাঝে সে যেন একা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তার চারপাশে যা দেখছে সবই আসলে ছায়াবাজি। যদি সত্যিই এরা থাকত, তাহলে হয়ত কয়েক পা দূরে একটা কুকুরের বাচ্চাকে নর্দমায় পড়ে থাকতে হত না। নর্দমার জলে ঠাণ্ডার মধ্যে পড়ে কুকুরের বাচ্চাটা কাঁদছে, চিৎকার করে সাহায্য চাইছে, কিন্তু কেউ শুনছে না। নিখিল শুনেছে, কিন্তু কিছু করেনি, কেন করেনি?

মনে মনে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল নিখিল। তারপর নিখিলই আবার উত্তর দিল। বলল—'কি করব, আমার যে এখন অনেক কাজ। একটা মানুষ, জ্যান্ত মানুষ, নর্দমার ঠাণ্ডা জলের মধ্যে পড়ে গেছে। পড়েছে অনেকদিন আগে। ঠাণ্ডায়, পচা জলের মধ্যে পড়ে থেকে তার হাত-পাগুলোও পচে গেছে। মাংস চামড়া খসে খসে পড়ছে। বহুবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, ঠিক ঐ কুকুরের বাচ্চাটার মতই মানুষটাও উঠতে পারছে না। আর এখন চলছে তার শেষ অবস্থা। ওপরে উঠে আসার কোন উপায় নেই আর। শুধু নর্দমার পচা জলে, ঠাণ্ডায় পড়ে পড়ে মৃত্যু আছে। মানুষটাকে এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে একজনই, সে শুধু আমি।

বড় গোল উঠোনটার চত্বরে নিখিল যখন পা দিল, সূর্যের আলো তখন আরো নিবে এসেছে। মাথার ওপর ছাই রঙের আকাশ আর মনের মধ্যে বিষণ্ণ এক অনুভূতি নিয়ে বাড়িতে ঢুকল সে। বাড়ি মানে নিভাদের বাড়ি।

উঠোনটা পার হতেই দু'-তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙে দালান। সামনে ঘর। নিখিল দরজার চৌকাঠের সামনে দাঁড়াতেই কেমন এক দমবন্ধ করা গন্ধ এসে আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে। গন্ধটা রক্ত, ওষুধ, ইঞ্জেকসন অথবা পচা মাংসের কিনা—নিখিল তা বুঝতে পারল না। লক্ষ করল নিভা শুয়ে আছে, আর তার মাথার পাশে অন্ধকারে একটা প্রেতাত্মার মত সেই মাঝবয়েসী মহিলাটি বসে আছে। নিভাকে দেখাশোনা করার জন্য নিখিলই যাকে ঠিক করে এনেছে। একবার ভাবল বলে, ও তপুর মা, তোমার কি বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে? রোগীর মাথার পাশে ওভাবে বসে আছো, আলোটাও জ্বালাতে পারোনি, কিন্তু কি ভেবে কিছু বলল না আর। একবার গলা খাঁকারি দিয়ে, জুতোটা দরজার সামনে খুলে রেখে ঘরে ঢুকে পড়ল সে।

নিখিল ঘরে ঢুকতেই তপুর মা চমকে উঠে দাঁড়াল। বলল—'ও, আপনি। যাক, বাঁচালেন। বসে থাকতে থাকতে আমার ঘুম পেয়ে গেছিল প্রায়।'

নিখিল নিভার দড়ির মত শুকনো শরীর আর কুৎসিত মুখটার দিকে একবার তাকালো। তারপর গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল—কখন ঘুমিয়েছে?'

—'অনেকক্ষণ। ওঠার সময় হয়ে এল প্রায়—'

—'খেয়েছে?'

—'হ্যাঁ। গরম দুধ করে দিয়েছিলাম।' তারপর একটু থেমে যোগ করল ফের—'সকালের দিকে আজ এক কাণ্ড হয়েছে—'

—'কি রকম?' নিখিল তপুর মায়ের দিকে তাকায়। কিছুটা যেন বিরক্ত মনে হল তাকে। তপুর মা অতসব লক্ষ না করে মুখে চোখে একটা আতঙ্কের ভাব এনে বলল—'সকালে মুখ দিয়ে খুব রক্ত বেরিয়েছে, সাথে এই এতখানি মাংস।' বলে হাত দিয়ে মাংসের সাইজটা দেখাল।

—'তারপর?'

—'তারপর আর কি। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল, প্রক্সিভন খাইয়ে দিলাম। দিয়ে গা হাত পা ম্যাসেজ করলাম ঘণ্টাখানেক ধরে—'

নিখিল শুনল। যেন এসব কোন ব্যাপারই নয় তার কাছে। অন্য দিনের মত যন্ত্রণায় মুখ চোখ কুঁচকে উঠল না। শুধু শান্তভাবে পকেট থেকে দেশলাই আর সিগারেট বের করে একটা সিগারেট ধরাল সে।

নিভার মাথার পাশে বসেছিল নিখিল। তপুর মা বাথরুম থেকে একটু আসছি বলে অনেকক্ষণ হল বেরিয়ে গেছে। বসে বসে বিরক্তি লাগছিল তার। ঘরের চারপাশটা দেখছিল আর ভাবছিল। ভাবনাগুলো খুবই বিশৃঙ্খল আর এলোমেলো। তার মধ্যে কয়েকটা ভাবনা বার বার ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে আসছিল তার। নিভা আর একটা বাচ্চা কুকুর। দু'জনকেই উদ্ধার করা দরকার। কথাটা ভাবতেই উত্তেজনায় ঘেমে উঠল নিখিল।

একটু পরে নিভার মা বাসন্তী ঘরে ঢুকলেন। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, দাঁতে পানের ছোপ। নিখিলকে দেখে বললে, 'কখন এলে বাবা ?'

—'এই একটু আগে—'

দায়সারা উত্তর দিল নিখিল।

—'পাশের বাড়িতে গিয়েছিলাম একটু।' বলল নিভার মা— 'ওদের ছেলের মুখে ভাত আজকে। যাবো না যাবো না করেও গেলাম। কি করব, পাশের বাড়ি—'

নিখিল শুনছিল, হাসি পেল তার। কি অদ্ভুত মানুষ এরা। এই মেয়েটো—বিছানায় দড়ির মত শুকনো পাকানো শরীরটা নিয়ে যে পড়ে আছে আজ, যন্ত্রণায় কাঁদছে, ছটফট করছে—একদিন মুখের রক্ত তুলে সাংসারের জন্য খেটেছে, নিজের দিকে ফিরে তাকায়নি কখনও—আজ তার দিকে নজর দেবার সময় নেই কারও।

'তোমার মেসোমশাই তো বাজারে গেছেন।' খবরটা আগেই শুনেছিল নিখিল তপুর মায়ের মুখে, তবু নতুন করে আর একবার তাকে শুনতে হল নিভার মায়ের কাছে। —'কাল ওর ভাইপো-ভাগ্নীরা আসবে কলকাতা থেকে, খবর পাঠিয়েছে। নিভাকে দেখতে আসবে ওরা। ওদের জন্য আজ কিছু কেনাকাটা করতে গেলেন। কাল সকালে আবার একবার যেতে হবে মাংসটা আনতে—

নিভার মা চুপ করল। নিখিলের মনে হল তার মাথায় কে যেন এক কেটলী গরম জল ঢেলে দিয়েছে। জলটা মাথা বেয়ে সারা শরীরে গড়িয়ে পড়ছে। ইচ্ছে হচ্ছে চিৎকার করে এদের জিজ্ঞেস করে—তোমাদের লজ্জা করে না এখন মাংস খেতে ? লজ্জা করে না পাশের বাড়ির ছেলের মুখে ভাতে নেমন্তন্ন খেতে ?

কিন্তু আসলে কিছুই বলল না নিখিল। সে চুপ করে বসে রইল, আর বসে বসে ভাবতে লাগল। ভাবতে লাগল, আসলে 'জীবন' শব্দটার মানে কি ? জীবনের মূলে ন্যায় বলে কোন কথা আছে কিনা ; নাকি সৃষ্টির মূলে ন্যায় বলে সত্য বলে কোন কিছু নেই ! জীবন বলতে আমরা যা বুঝি সেটা আসলে মিথ্যা। মৃত্যুই মহৎ, যেহেতু এই শরীরের বিনাশ হলে আমাদের আর কোন যন্ত্রণা থাকে না।

অনুতোষ যেন আশেপাশে কোথাও ছিল। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ছোট্ট একটা ঠাট্টা ছুঁড়ে দিল নিখিলের দিকে। —'কি রে শ্লা আঁতেল। এখনও ভাববি নাকি ?' নিখিল অদৃশ্য অনুতোষের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল—'না।'

॥ চার ॥

ছ'টা বাজার পর তপুর মা'র কাজ শেষ। সুতরাং তপুর মা চলে গেছে। যাবার সময় একচোট দুঃখ করে গেছে নিখিলের কাছে। সে দুঃখ নিভার জন্য, নিভার কষ্ট দেখে, তা নয়। আসলে সবটাই নিজের জন্য। তপুর বাবা যা মাইনে পায় তাতে সংসার চলে না। ঘরের ভাড়া বাকি পড়েছে। ছেলের ইস্কুলের মাইনে। আরো কত কি। একসঙ্গে অনেকগুলো প্রয়োজন এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে। ভীষণ টাকার দরকার তপুর মায়ের। নিভা যতদিন বাঁচে, ততই ভালো তার। হে ভগবান, নিভা যেন আর কিছুদিন বাঁচে।

কথাগুলো শুনতে শুনতে জ্বালা ধরছিল নিখিলের বুকে। তপুর মা চলে যেতে একাই বসেছিল নিখিল। নিভার বাবা বাজার সেরে বাড়ি ফিরলেন।

—'কখন এলে ?'

—'অনেকক্ষণ।' জবাব দিল নিখিল।

নিভার বাবা বাজারের ব্যাগটা নামিয়ে রাখতে রাখতে গল্প শুরু করলেন। পুরনো দিনের গল্প। তখন বাজার কত শস্তা ছিল। পদ্মার ইলিশ কত সুস্বাদু ছিল, এই সব গল্প। এর আগেও বহুবার শুনেছে নিখিল। শুনতে শুনতে কান পচে গেছে নিখিলের। এখন মনে হয় ভদ্রলোকের বুঝি একটাই দুঃখ, আগের মত খাওয়া দাওয়ায় আর তেমন জুত হচ্ছে না। কোথায় গেল সেই সুস্বাদু পদ্মার ইলিশ, আহা রে। ভদ্রলোক দুঃখ প্রকাশ করতে করতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন, চায়ের জন্য তাগাদা দিতে। নিখিল সিগারেট ধরাল একটা।

নিভা যখন চোখ মেলে তাকাল, নিখিলের তখন চা খাওয়া হয়ে গেছে। ঘরে আর কেউ ছিল না। নিখিল মাথার পাশে বসেছিল। নিখিলের দিকে তাকাল নিভা। তারপর হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। —'আমি আর বাঁচতে চাই না নিখিল। ভীষণ যন্ত্রণা। আমি আর পারছি না ; আমাকে মুক্তি দাও তোমরা—

নিখিল নিভার দিকে তাকাল। এ নিভা সে নিভা নয়। যাকে নিখিল ছাড়া অন্য কোন পুরুষ কোন দিন স্পর্শ করেনি, তাকে স্পর্শ করেছে এক দুরারোগ্য ব্যাধি। দিন রাত কুরে কুরে খাচ্ছে। একদিকের গালের অর্ধেক মাংস খেয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ সেই মাংস, নিখিল যেখানে গভীর আবেগের সঙ্গে চুম্বন করত।

—'চুপ করে শোও, আসছি।' বলে উঠে গেল নিখিল। তারপর রান্নাঘরে মুখ বাড়িয়ে বলল—'মাসীমা, নিভার জন্য দুধ গরম করেছেন ?'

—'হ্যাঁ, হয়ে গেছে, দিচ্ছি।' জবাব এল রান্নাঘর থেকে। নিখিল নিভার কাছে ফিরে এল। লক্ষ্য করল নিভা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নিখিল নিভার দিকে তাকিয়ে বলল—'নিভা, তুমি আমার কাছে কিছু চাও ?'

নিভা কান্নাভেজা মুখে নিখিলের দিকে তাকাল। একটু অবাক হয়ে বলল—'না। আমি তো কিছু চাই না।'

—'আজ কিছু চাইবে না ?'

—'কেন ?'

—'এমনিই। তোমাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করছে।'

নিভা কিছু যেন ভাবল ; তারপর নিখিলের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে উল্টোদিকে তাকিয়ে বলল—'আমি মরে গেলে তুমি একটু কেঁদো—

নিখিল একথার কোন জবাব না দিয়ে হাসল শুধু।

একটু পরেই দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকল নিভার মা। —'আমাকে দিন।' বলল নিখিল। দুধের বাটিটা সাঁড়াশি সমেত চেপে ধরল সে।

—'তুমি খাওয়াবে ?'

—'হ্যাঁ। আপনি যান—'

নিভার মা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই নিভা বলল—'আমাকে কিছু ট্যাবলেট দাও, ভীষণ যন্ত্রণা করছে যে।'

—'লাগবে না। দুধটা খেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।' গম্ভীর মুখে জবাব দিল নিখিল। তারপর নিভার দিকে তাকাল। নিভা এখনও তার দিকে পিছন ঘুরে শুয়ে আছে। পকেট থেকে ট্যাবলেটগুলো বের করল নিখিল। একটা দুটো, তিনটে করে পুরো ছ'টা ট্যাবলেটই দুধের মধ্যে ফেলে দিল নিখিল, এসো শান্তি, ঐ রুগ্‌ণ অসহায় মেয়েটিকে চিরতরে শান্তি দাও।

খানিকক্ষণ পরে সবটুকু দুধই খাইয়ে দিল সে নিভাকে। একবার হাই তুলল নিভা। বলল—'বড় ঘুম পাচ্ছে নিখিল—'

—'ঘুমোও।' খুব প্রশান্ত মুখে হাসল নিখিল।

নিভার দুচোখের পাতা বুঁজে আসছে ধীরে ধীরে। নিখিল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। তাকে চলে যেতে দেখে নিভার মা বলল—'চললে ?'

—'হ্যাঁ।'

—'ও কি ঘুমোচ্ছে ?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিছু না খেয়েই চলে যাচ্ছো যে।'

—'আজ থাক।' বলল নিখিল, তারপর সোজা পথে নেমে পড়ল।

রাস্তায় নেমে খুব জোরে হন হন করে হাঁটতে লাগল নিখিল। ভাবল, আমি কি সত্যিই খুনী ? তাহলে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন ? আমি কাঁদছি কেন ?

হাঁটতে হাঁটতে নিখিল ঘিঞ্জি এলাকাটা পার হয়ে গেল। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিল সে। হঠাৎ একটা কুকুরের বাচ্চার করুণ ডাক ভেসে এল তার কানে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে এদিক ওদিক তাকাল সে। আর তখনই চোখে পড়ল নর্দমার অল্প জলে একটা কুকুরের বাচ্চা পড়ে রয়েছে। কাঁপছে বাচ্চাটা, হয়ত এখনই মরে যাবে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে নিচু হয়ে বসে কুকুরের বাচ্চাটাকে তুলে আনল নিখিল। ভাল করে তার গা মুছিয়ে দিল। হিসেব করল নিখিল, অন্তত ঘণ্টা তিনেক এখানে, এই নর্দমার মধ্যে বাচ্চাটা পড়ে রয়েছে। মিনিটে একজন করে হলেও একশ আশিজন পথচারী ইতিমধ্যে এই পথ দিয়ে চলে গেছে।

নিখিল উঠে দাঁড়াল, তারপর বিজয়ী বীরের মত অদৃশ্য অনুতোষের দিকে তাকিয়ে বলল—'দ্যাখ অনুতোষ, আমিও পারি। এই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে যন্ত্রণার থেকে মুক্তি দিতে না পারলেও, একটা কুকুরের বাচ্চা, আর একটা মানুষকে—

অঙ্কন : সুব্রত চৌধুরী

জলপথে ঘেরা ভেনিস শহরের দৃশ্য
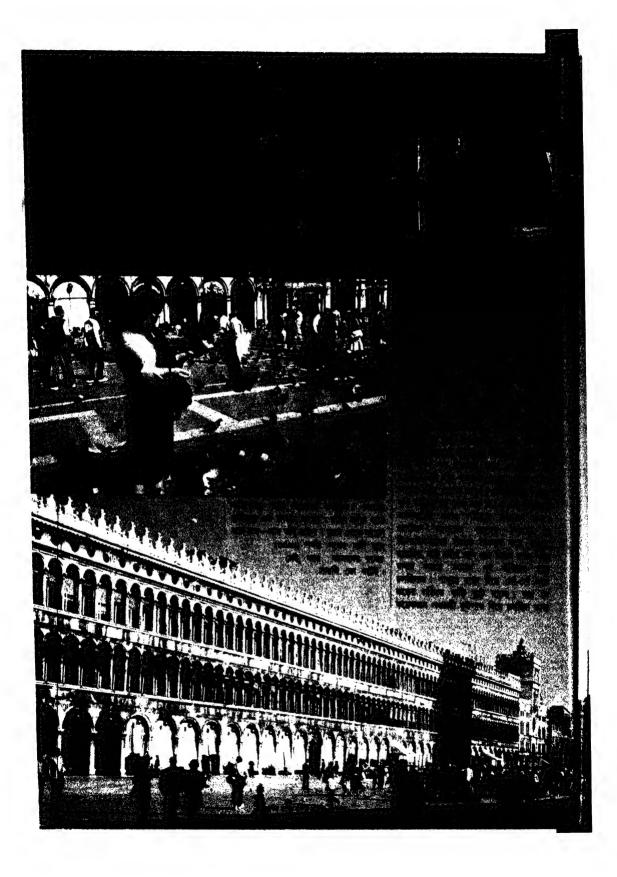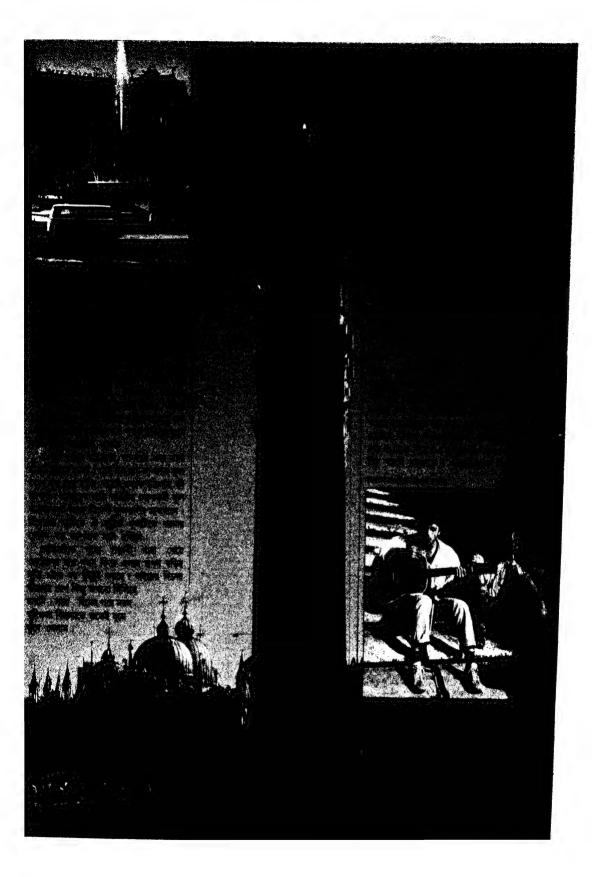
প্রবর্তনের পরে রোমান দেব-দেবীদের মূর্তিগুলি সরিয়ে দিয়ে এটিকে ক্যাথলিক চার্চে রূপান্তরিত করা হয়। এখানেই রয়েছে অমর শিল্পী র‍্যাফেলের সমাধি।

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম "তিন-পেনি" ঝরনা দেখতে, এর আসল নাম ট্রেভি ফাউনটেন। এই ঝরনা সম্বন্ধে চলিত আছে যে কেউ যদি এই ঝরনার দিকে পেছন ফিরে কোন কিছু কামনা করে তিন পয়সা জলে ফেলে, তার সেই ইচ্ছে তো পূরণ হয়ই তাকে নাকি আর একবার ট্রেভিতে ফিরে আসতেই হয়। পর্যটকদের দৌলতে প্রতি বছর ট্রেভির জলে এত পয়সা পড়ে যে ইটালির সরকারকে এই জল পরিষ্কার করাতে হয়।

আমার সঙ্গীদের দেখাদেখি আমিও জলে পয়সা ফেললাম—তবে ভারতীয় পয়সা। আর একবার রোমে ফিরে না গেলে বুঝতে পারব না আমার ইচ্ছেটা পূরণ হলো কিনা। ঝরনার সামনে প্রচুর বিদেশীর ভিড়—প্রায় মেলার মতো। দিনটা ঝকঝকে, আকাশ মেঘশূন্য, আবহাওয়া প্রায় আমাদের বসন্তকালের মতো।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল হলো কলোসিয়াম। একে প্রাচীন রোমের স্টেডিয়াম বলা যেতে পারে। গোলাকৃতি এই স্টেডিয়ামে দর্শকেরা গ্যালারিতে বসে পশু ও মানুষের লড়াই দেখতেন, হিংস্র উল্লাসে ফেটে পড়তেন। রোমের সেই যুগের অবসান হয়েছে বহুদিন ; এখন পড়ে

ভেনিসের বাজার

রয়েছে অতীতের স্মৃতি নিয়ে কলোসিয়ামের কঙ্কালটিমাত্র। অত্যাচারী সম্রাট নিরোর মৃত্যুর পরে রোমের মানুষেরা কলোসিয়ামকে আংশিকভাবে ধ্বংস করে অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল।

কলোসিয়াম থেকে কোচ আমাদের নিয়ে চললো ভ্যাটিকান সিটি—সেন্ট পিটার্স চার্চের দিকে। চার্চের পাশে পোপের আবাসস্থল। প্রতি রবিবার ঠিক বেলা বারোটায় মহামান্য পোপ নাকি তাঁর প্রাসাদের অলিন্দ থেকে রোমের সাধারণ মানুষদের দর্শন দেন, আশীর্বাদ জানান। আমরা যখন কোচ থেকে নামলাম তখনো ঘড়িতে বারোটা বাজেনি। এক বিরাট জনতা। চার্চের সামনে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে পোপের দর্শন লাভের আশায় অপেক্ষা করছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, পোপের দর্শন শেষপর্যন্ত মিললো না। বিশেষ জরুরি কাজে সেদিন তিনি রোমের বাইরে। তাই খানিক বাদে তাঁর রেকর্ড করা শুভকামনা প্রচারিত হতে শুরু করল। অপেক্ষারত মানুষেরা কিন্তু ঠিক ওইভাবে শান্ত হয়ে বসে সেই ভাষণ শুনলো।

চার্চের বাইরে ট্র্যাডিশনাল পোশাক পরে পোপের দুজন দেহরক্ষী দাঁড়িয়ে। এঁদের একজন আবার এক ভঙ্গিতে পাথুরে মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, অন্যজন কিন্তু চলাফেরা করছেন। আমি অনুরোধ করতে গার্ড সাহেব ছবি তোলার জন্য সামনে এসে দাঁড়ালেন।

এবারে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি ভেঙে আমরা চার্চের ভেতরে ঢুকলাম। এই সেই অতি প্রাচীন চার্চ যা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে। পরে রেনেসাঁসের সময়ে একে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরি করেছিলেন মাইকেল এঞ্জেলো এবং তৎকালীন সেরা স্থপতিরা। মাইকেল এঞ্জেলোর শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের অমূল্য নিদর্শন রয়েছে এখানে। চার্চের ভিতরে ঢুকে আমাদের গাইড নিয়ে গেল ডানদিকে। এখানে রয়েছে মাইকেল এঞ্জেলোর অসামান্য শিল্পকীর্তি 'Pieta' অথবা 'Pity'। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর দেহ কোলে নিয়ে মা মেরী বসে আছেন। এলিয়ে পড়া যীশুর দেহের প্রতিটি শিরা, উপশিরা পর্যন্ত কী সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। মনে হয়না পাথরের মূর্তি; রক্তমাংসের শরীর বলে ভ্রম হয়। মেরীর চোখে কী করুণ বেদনার ছাপ। তাঁর দুচোখ থেকে ঝরে পড়ছে তাঁর দেবসন্তানের জন্য অসীম মমতা। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে মাইকেল এঞ্জেলো এটি সৃষ্টি করেছিলেন।

রবিবার থাকায় চার্চের বিভিন্ন অংশে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিল। এত দেশী, বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা, ফিসফিসিয়ে কথা বলা, ছবি তোলার মধ্যে ধর্মভীরু রোমানরা, যাজকদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ এক মনে শুনে যাচ্ছেন। আমাদের মৃদু কিন্তু একটানা কলরব ওঁদের একাগ্রতার কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারছিল না।

চার্চের পাথরের দেয়ালে অপূর্ব সব শিল্পকর্মের নিদর্শন রয়েছে, চোখ ফেরানো যায় না। কিন্তু সময় কম, তার ওপরে রয়েছে আমাদের অবাঙালী বন্ধুদের ক্ষুধার তাড়না। কাজেই তাড়াতাড়ি শেষ করে এগিয়ে যাবার নির্দেশ এলো।

চার্চের একাংশে রয়েছে সেন্ট পিটারের কালো ব্রোঞ্জের মূর্তি। ডান পায়ের পাতা একটু সামনের দিকে এগিয়ে তিনি বসে আছেন, সৌম্য তাঁর মূর্তি। ভক্তরা সামনে দিয়ে যাবার সময়ে ওই পায়ের পাতা স্পর্শ করে যান। কত শতবছর ধরে তীর্থযাত্রী মানুষের হাতের স্পর্শে মসৃণ হয়ে গেছে পায়ের ওই অংশটুকু। আমার মাথাও আপনা থেকে নেমে এল ওঁর পায়ের কাছে, পাদস্পর্শ করে নিজেকে ধন্য মনে হলো।

মাইকেল এঞ্জেলো, ব্রামান্টে প্রমুখ অমর শিল্পীদের পাশাপাশি কত নাম-না-জানা শিল্পীদের অতুলনীয় শিল্পের নিদর্শন রয়েছে এখানে। শিল্প উৎকর্ষে তাদের কোনটির মূল্যই কিন্তু সামান্য নয়।

চার্চের বাইরের বিশাল প্রাঙ্গণের এক কোণে বসে আমরা আমাদের দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। সূর্য তখন মধ্য গগনে। রোদের তেজও বেশ।

এবারে আমাদের কোচ নিয়ে চললো টিভোলি গার্ডেনস্। রোম থেকে ১৭/১৮ মাইল দূরে পাহাড়ের ওপরে রয়েছে এই বাগানটি। ফুল আর ঝরনাই হলো এর প্রধান আকর্ষণ। পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমাদের কোচ বাগানের কিছু দূরে নামিয়ে দিল। জায়গাটিতে মেলার মতো বাজার বসেছে। রকমারি সুন্দর সব জিনিসের কেনা বেচা চলছে। বিদেশী মুদ্রার অভাব—কাজেই চোখ ফিরিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। গার্ডেনের ভেতরে ঢুকতে টিকিট কাটতে হলো। দরজা পেরিয়েই চোখে পড়ল ঝরনার জলের ফোয়ারা। আমাদের গাইড জানালেন—পানীয় জল, যদি তৃষ্ণার্ত বোধ করি তাহলে অনায়াসে আমরা ওই জল খেতে পারি। আকণ্ঠ জল পান করে তৃষ্ণা শুধু মিটলো না, ঠাণ্ডা জল মুখে, চোখে দিয়ে খুব সুস্থ বোধ করলাম। এবারে অনেক সিঁড়ি ভেঙে নিচে বাগানে যাবার পথ ধরলাম। আমাদের সঙ্গে বয়স্ক যে কয়েকজন সহযাত্রী ছিলেন তাঁরা একটু নেমে একটি বিশ্রামের জায়গায় বসে রইলেন, আমরা এগিয়ে গেলাম। পর্যটকদের সুবিধের জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা রয়েছে। পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে সিঁড়ি গেছে, মাঝে মাঝে রয়েছে বসার জায়গা—ক্লান্ত পথিকদের জন্য। অনেক সিঁড়ি ভেঙে যখন বাগানে এসে পৌঁছলাম তখন মনে হলো এই বুঝি স্বর্গের নন্দনকানন। চারিদিকে হরেক রকম অচেনা, অদেখা ফুলের মেলা আর ঝরনার বিচিত্র সব ফোয়ারা। ফোয়ারা এত সুন্দর আর এত বাহারের হতে পারে চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস হয় না। দুচোখ ভরে আমরা এই অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করলাম।

ফ্লোরেন্সে রক্ষিত মাইকেল এঞ্জেলোর অসাধারণ সৃষ্টি ডেভিডের মূর্তি

এবারে ফেরার পালা। রোম পরিক্রমা সাঙ্গ করে গাইড আমাদের বিদায় জানিয়ে চলে গেল। আমরা ফিরলাম হোটেলের পথে। আমাদের ড্রাইভার সাহেব জানালেন পরদিন সকাল আটটায় বাস ছাড়বে, আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল ফ্লোরেন্স।

রোম থেকে ফ্লোরেন্সের দূরত্বও খুব কম নয়।

পাহাড়ী রাস্তা ধরে আমাদের বাস দ্রুত গতিতে চলেছে। ক্রমশ নিচ থেকে ঘুরে ওপরে উঠছি। রৌদ্রোজ্জ্বল রোমকে পেছনে ফেলে আমরা ফ্লোরেন্সের পথে চলেছি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পথের দুধারে সূর্যমুখী ফুলের ক্ষেত। পথের যতদূর দৃষ্টি যায়—যেন হলদে কার্পেট বিছানো রয়েছে।

মাঝে মাঝে ছবির মত খামার বাড়ি চোখে পড়ছে ; কখনো বা পথ চলে গেছে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে। ফ্লোরেন্স একটি ছোট্ট উপত্যকা—চারদিক পাহাড়ে ঘেরা। ফ্লোরেন্সের কেন্দ্রস্থলে আমাদের বাস যখন থামলো তখন ঘড়িতে দেড়টা বাজে। ছোট্ট শহর এই ফ্লোরেন্সে বাস মাত্র কয়েক হাজার লোকের। স্থানীয় গাইড একটু বাদেই আমাদের শহর পরিক্রমা করাতে হাজির হলেন। একটি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে

রোমের টিভোলি গার্ডেন্স—স্বর্গের নন্দনকানন বলে ভ্রম হতেই পারে।

আমরা বাস থেকে নামলাম। প্রচুর লোক ব্যস্তভাবে রাস্তা দিয়ে চলেছে, সকলেরই হাতে একটি করে ছাতি। মোটর গাড়ি আর বাসের পাশাপাশি প্রচুর দু চাকার সাইকেল চলছে লক্ষ্য করলাম। ফ্লোরেন্সের কর্মব্যস্ত রাস্তা দিয়ে গাইডের সঙ্গে পা মিলিয়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। রাস্তা সরু, ফুটপাথও সরু। তবু পথচারীরা কিন্তু ফুটপাথ ছেড়ে গাড়ি চলার রাস্তায় নামেনা। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বিরাট বাড়িগুলি দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয় বাড়িগুলি অনেক পুরনো। প্রতিটি বাড়ির নীচে নানা ধরনের দোকান। ছোটখাটো একটা shopping centre বলা যেতে পারে।

রোমে যে মাইকেল এঞ্জেলোর শিল্পকলার নিদর্শন দেখেছি—তিনি কিন্তু এই ফ্লোরেন্স শহরেরই মানুষ ছিলেন। তাঁর জীবনের অনেকটা সময়ই কেটেছে ফ্লোরেন্সে। এই শহরেই সযত্নে রক্ষিত হয়েছে তাঁর সৃষ্ট ডেভিড। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা এই অসামান্য কীর্তি দেখার সুযোগ পাইনি। আমাদের এই ঝটিতি সফরের পথপ্রদর্শিকা নিয়ে গেলেন ব্যাপটিস্ট চার্চে। চার্চের ভেতরে অদ্ভুত রঙিন মোজেইকের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এখান থেকে বেরিয়ে আমরা সোজা গেলাম সিটি স্কোয়ার। এখানে রোমানদের বরুণদেবতা নেপচুনের একটি অসাধারণ মূর্তি রয়েছে। এই অঞ্চলে বেশ পুরনো কয়েকটি ইমারত চোখে পড়ল, এদের মধ্যে কয়েকটি সংরক্ষিত হয়েছে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে। ইটালির রেনেসাঁসে ফ্লোরেন্সই একদিন নেতৃত্ব দিয়েছিল—আজকের ফ্লোরেন্সকে একনজরে দেখে সে কথা বোঝা কি সম্ভব ? আমাদের কলকাতার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মতো ঘিঞ্জি রাস্তা ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে আমরা এসে পড়লাম আর্নো নদীর ধারে। অনেকগুলি সেতু ছিল এই নদীর বুকে। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়ে একটি ছাড়া আর সবকটি সেতুকেই জার্মান সৈন্যরা ধ্বংসে করে দেয়। সেই অবশিষ্ট প্রাচীন সেতুটি আমরা দেখলাম।

ফ্লোরেন্স থেকে ৮৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আমরা পিসা এসে পৌঁছলাম। এটিকে একটি ছোট হিল স্টেশন বলা যেতে পারে—অনেকটা আমাদের মানালির মতো। হোটেলে পৌঁছে বাস থেকে নামতেই বেশ ঠাণ্ডা বোধ হতে লাগলো। সুটকেশ থেকে সকলকেই গরম কাপড় বার করতে হলো। রোম থেকে ফ্লোরেন্স পর্যন্ত আমাদের কিন্তু গরম জামার প্রয়োজন হয়নি। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছবির মতো আমাদের ক্যালিফোর্নিয়া হোটেল। মার্কিন অনুপ্রবেশ থেকে কেউ রেহাই পায়নি। আজ সারা সন্ধে বিশ্রাম। হোটেলের বাগানে চেয়ারে বসে গল্পগুজব করে খানিকটা সময় কেটে গেল। পরদিন সকাল সাতটায় বাস ছাড়বে। তার মধ্যে আমাদের স্নান, প্রাতরাশ ছেড়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। কাজেই রাতের খাওয়া সেরে যে যার ঘরে ঢুকে গেলাম।

Pisa-র বিখ্যাত লিনিংটাওয়ার দেখে আমরা বেশ সকাল সকালই ভেনিসের দিকে যাত্রা করলাম। পিসা থেকে বাস আমাদের সোজা যেখানে নিয়ে এল সেটা ভেনিসের উপকণ্ঠে একটি ছোট মফস্বল শহর—নাম ট্রেভিসকো। মোটেই কোন নাম করা জায়গা নয়, কোনও ঐতিহাসিক খ্যাতিও নেই এর তবু এই সুন্দর ছবির মতো শহরটি বড়ো মনোরম মনে হয়েছিল। একটা রাত এই শহরে বিশ্রাম নিয়ে আমরা যাব ভেনিস।

দুপুরের খাওয়া আজ আমাদের পথেই সেরে নিতে হয়েছিল। যখন ট্রেভিসকোর হোটেল ফেলারিটাতে আমরা পৌঁছলাম তখন বেলা আড়াইটে। যে যার ঘরে ঢুকে মুখ, হাত ধুয়ে চা নিজেরাই তৈরি করে খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

সবই টালির ছাদ দেওয়া ছোট ছোট বাগানঅলা কটেজ—বলা যায় বাগানবাড়ির খুদে সংস্করণ—বাগান কটেজ। জানালায় অপূর্ব লেসের কাজ করা পর্দা। ইটালির মানুষ যে কত ফুল পাগল তার পরিচয় গত ক'দিনে যথেষ্ট পেয়েছি। ট্রেভিসকোও আজ আমাদের মুগ্ধ করলো।

হোটেলের সামনে বিরাট দুটি দোকান। খানিকটা উইন্ডোশপিং করে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। ঠিক করলাম স্টেশনারি দোকানের খোঁজ করে যদি পিকচার পোস্টকার্ড কিনে দেশে পাঠানো যায়। পথে ইটালিয়ান সাহেবদের দোকান আর পোস্ট অফিস বোঝাতেই হিমসিম খেয়ে গেলাম। যাই হোক খুঁজে পেতে একটা দোকান পেলাম। এখানে পোস্টকার্ড, ডাক টিকিট সবই মিললো। দোকানের গায়েই post box ছিল। কাজেই দোকানে দাঁড়িয়ে যে যার চিঠি লিখে, টিকিট লাগিয়ে ডাকে ফেললাম। এই চিঠিগুলি কিন্তু কলকাতায় পৌঁছেছিল চার মাস বাদে, আমি নিজেই চিঠি লেটার বক্স খুলে বার করেছিলাম।

আমাদের হোটেলটা শহরের যে অংশে সেটাকে পুরোপুরি আবাসিক এলাকা অথবা রেসিডেনসিয়াল এরিয়া বলা যেতে পারে। পথের দু'ধারে সাজানো সুন্দর বাড়ি। দোকান-পাট দু' তিনটি ছাড়া চোখে পড়ল না। এখানকার বাগানে ফুল গাছের সঙ্গে সঙ্গে সবজির গাছও রয়েছে। প্রতি বাগানেই টমেটো, আর পালংশাকের গাছ রয়েছে দেখলাম।

ট্রেভিসকো থেকে পরদিন সকালে আমরা ভেনিসের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম। জলনগরী

ভেনিসের যে ছবি কল্পনায় আঁকা আছে আজ তাকে চাক্ষুষ দেখব।

ভেনিসের যে জায়গাতে বাস আমাদের নামিয়ে দিল তার নাম পিয়াজেল রোমা। বহু বাস দেখলাম আমাদেরই মতো পর্যটকদের নিয়ে ওখানে জড়ো হয়েছে। এখান থেকে আমাদের স্টিমারে চড়তে হবে।

ভেনিসের বিশেষত্ব হল এর জলপথ। পুরো শহরটি জলে ঘেরা। টিকিট কেটেই স্টিমারে উঠতেই বড় ক্যানালের মধ্য দিয়ে স্টিমার আমাদের নিয়ে গেল সেন্টমার্ক স্কোয়ারের দিকে।

এক সময় ইটালির বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভেনিসের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। বাণিজ্যের সুবিধের জন্য বহু ব্যবসায়ী, সওদাগর এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। এখনো সেই সব প্রাচীন প্রাসাদ ও অট্টালিকা সেই অতীত দিনের সাক্ষ্য বহন করছে।

সেন্টমার্ক স্কোয়ারে নেমে দেখলাম প্রচুর পায়রা। বিদেশী ট্যুরিস্টরা পায়রা কাঁধে বসিয়ে দানা খাওয়াচ্ছে, ছবি তুলছে। এখানকার ব্যাসিলিকা, বেলটাওয়ার স্থাপত্যশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। চারপাশের দোকানে সুন্দর, সুন্দর ডিজাইনের লেস দেখে লোভ সামলানো দায়। ভেনিসের দুই শহর মুরানো আর বুরানো। মুরানো বিখ্যাত কাঁচের কাজের জন্য আর বুরানো লেসের জন্য। চোখে দেখা ছাড়া কেনাকাটা করার কোন উপায় আমাদের ছিল না। শুধু ভেনিসের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সওদা করলাম একটি সোনালি গণ্ডোলা।

মুরানোর বিখ্যাত কাঁচশিল্প দেখার জন্য আমরা গেলাম একটি কাঁচের কারখানায়। কারিগররা কিভাবে নানা ধরনের শিল্পকর্ম তৈরি করেন ট্যুরিস্টদের তা দেখানোর ব্যবস্থা এই কারখানায় রয়েছে। ভঙ্গুর কাঁচের মণ্ডকে আগুনে দিয়ে কি অপূর্ব সব জিনিস শিল্পীরা চোখের পলকে গড়ে ফেলছেন। কিন্তু এখানকার জিনিসপত্রের দাম আমাদের নাগালের বাইরে। কাজেই শুধু চোখ সার্থক করেই বেরিয়ে আসতে হলো।

এবারে আমাদের স্টিমার নিয়ে এল এক চার্চে। চার্চের প্রাঙ্গণ থেকে ভেনিসের বিশাল জলপথ অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি গণ্ডোলা—অনেকটা ময়ূরপঙ্খী নৌকোর মতো। এদের চালকদের প্রত্যেকের মাথায় রঙিন ফেট্টি বাঁধা, গায়ে রঙচঙে জামা। এরা কেউ কেউ আবার প্রায় ভাটিয়ালির মতো সুরে গান গাইছে। গানের ভাষা অজানা কিন্তু মনে হচ্ছিল এই গানের মধ্য দিয়ে ওরা ওদের মনের আনন্দ, বেদনাকেই প্রকাশ করছে। ক্যানালের জলের রঙ নীল—ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক সিগাল পাখি। চারিদিকে শুধু জল। আমাদের গাইড জলের ওপরে একটি সেতু দেখালেন। ভারী আকর্ষণীয় এই সেতুটি। নাম—রিওলটা ব্রীজ।

স্টিমারে করে ঘণ্টা তিনেক আমরা জলপথে ঘুরলাম। সরু ক্যানালের মধ্য দিয়ে যাবার সময় নজরে পড়ল বহু প্রাচীন সব অট্টালিকা। এদের প্রত্যেকরই বয়স কয়েক'শ বছরের কম নয়। জলে ডুবে আছে বাড়ির যে অংশ তাতে শ্যাওলা ধরে গেছে, কোথাও কোথাও বাড়ির গায়ে বেড়ে উঠছে জংলা গাছ। স্টিমারের মধ্যে আমাদের গাইড চারপাশের দৃশ্যাবলী সম্বন্ধে প্রায় ধারাবিবরণী দিচ্ছিলেন। অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন ইংরেজ কবি বায়রনের বাড়ি আর ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের প্রাসাদ। গণ্ডোলার মাঝিদের গানের সুর, সিগাল পাখির ডানা ঝাপটানির আর যাত্রীদের হাসি ও কথার রিনরিনে শব্দ আমাদের যেন বহু শতাব্দী পেছনে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ভাবতে আশ্চর্য লাগছিল কি করে এত শতাব্দী পরেও ঐ প্রাচীন বাড়িগুলি জলের ওপরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পঞ্চম শতাব্দীতে একদল অত্যাচারিত রোমান পালিয়ে এসেছিল এই খাঁড়ি দ্বীপে। বাঁচার তাগিদে জলের মধ্যে অসংখ্য গাছের গুঁড়ি ফেলে তারা ভেনিসের বনিয়াদ তৈরি করেছিল। তারপরে আস্তে আস্তে শুরু হয়েছিল ইমারত তৈরির কাজ। এই গাছের গুঁড়ি এত মজবুত যে এত শতাব্দীর ঘাত, প্রতিঘাত সহ্য করেও ভেনিস এখনও অটুট। এই মজবুত গাছের গুঁড়ির ওপরে এখনও দাঁড়িয়ে আছে দৃষ্টিনন্দন, শিল্পকর্মে অনুপম সব ইমারত।

১৫ থেকে ১৮ শতাব্দী শিল্পকলায় ভেনিসের এক স্বর্ণযুগ। বহু খ্যাতনামা শিল্পীর কীর্তি ভেনিসের বুকে এখনো সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির সাক্ষ্য দিচ্ছে। Doges Palace, মানমার্ক পিয়াজো, ক্যাথিড্রাল, বেলটাওয়ার সেইসব মহান শিল্পীদের অসামান্য শিল্পনিদর্শন।

ভেনিস হলো জলের দেশ। এখানকার মানুষের যাতায়াত প্রধানত জলপথে। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাবার জন্য নৌকো নিতে হয়।

পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নার আলোয় ভেনিসকে নিশ্চয়ই অপরূপ সুন্দর দেখায়। ইতিহাসের ছায়াঘেরা ভেনিস আমার মতো ক্ষণিকের অতিথির মন অতি সহজেই জয় করে নিয়েছিল। একদিন বাঁচার তাগিদে যে শহরের বনিয়াদ তৈরি হয়েছিল, পরবর্তীকালে ভেনিসের মহান শিল্পীরা তাকে তাঁদের অমৃতস্পর্শে যে রূপ দিয়েছিলেন তার পুরোপুরি না হলেও যে সামান্য পরিচয় পেয়েছি তাই আমার কাছে অসামান্য বলে মনে হয়েছে।

স্বপ্নে ঘেরা ভেনিসকে পেছনে ফেলে এবার আমরা এগিয়ে চললাম অস্ট্রিয়ার সীমান্তের দিকে।

ক্রমশ

লিনিং টাওয়ার, পিসা

চার্চের বাইরে ট্র্যাডিশনাল পোশাকে পোপের দুই দেহরক্ষী

বনসাই

রঞ্জন বাগচী

আলমপুর থেকে একটু দূরেই ধূলাগড় বাস স্টপ। নিশানামত বাস থেকে নেমে উল্টোদিকে তাকাতেই শিবেন দেখতে পেল একটা চওড়া পিচের সড়ক হাইওয়ের সঙ্গে সূক্ষ্মকোণে পশ্চিমদিকে চলে গিয়েছে। তার ধারেই সাঁতরা সাইকেল স্টোর্স। রতনদা যেমনটি বলে দিয়েছিলেন। রাস্তা পেরিয়ে দোকানে উঁকি মারতেই একজন কালো পেটা চেহারার লোক বেরিয়ে এল। পরিচয় দিতে হাতের বিড়িটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে ফেলে লোকটা অমায়িক হাসল। 'আপনিই নতুন মাস্টারমশাই ? এই যে আপনার সাইকেল। রেডিই আছে স্যার।'

একটা পুরনো হারকিউলিস। মুছেটুছে পাম্প দেওয়া। শিবেন সামান্য হেসে সাইকেলটা নিয়ে রাস্তায় নামল।

'সাইকেলে ধুলোগোড়ির মাঠটা কতক্ষণ নেবে ?' ঘাড় বাঁকিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল লোকটার দিকে।

'তা আধ ঘন্টাটাক। অবশ্য আজ হাওয়ার জোর আছে। আর দেখে মনে হচ্ছে আপনার অব্যেস নেই স্যার। তাই একটু বেশীই লাগবে মনে হয়।' লোকটা আবার হাসল। শিবেনের মনে হল ওর ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে লোকটা বোধ হয় কটাক্ষ করল।

তবে মনে মনে সময়টা আঁচ করে একটু শঙ্কিতই হল শিবেন। একবার আকাশের দিকে তাকাল, একবার সামনে রাস্তাটার দিকে।

রাস্তার ধারে কৃষ্ণচূড়াটায় লাল বিস্ফোরণ। এপ্রিলের তপ্ত বিকেল। একটু চা খেতে পারলে ভাল হত। কিন্তু আশপাশের দোকানগুলোতে এখনও ঝাঁপ ফেলা। আসলে মনের ভিতর তেমন জোর পাচ্ছিল না ও। একবার নিজের শিরা ওঠা হাতটা দেখল। কিন্তু না। এটা একটা চ্যালেঞ্জ।

একটু সকাল সকালই কারখানা থেকে বেরিয়েছে শিবেন। রতনদাকে বলে। অজানা জায়গায় সন্ধের আগেই যাওয়া ভাল। অন্তত প্রথম দিন।

প্যাডেলে পায়ের চাপ দিয়ে সাইকেলে উঠতে গিয়ে টাল খেয়ে গেল শিবেন। তবে পড়ল না। সামলে নিল কোনরকমে। কালো লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে। ওর সামনে বেইজ্জৎ হতে চায় না শিবেন। সমস্ত মনোযোগ সাইকেল আর রাস্তার দিকে দিয়ে ও প্যাডেলে চাপ দিল। একটু স্পীড দিলে নিশ্চয় এই টালমাটাল ব্যাপারটা থাকবে

না। বহুদিনের অনভ্যাস। সাইকেলটা কাঁপছে। আসলে আরও কিছু ওজন হলে যন্ত্রটা মসৃণ চলে। শিবেন এখন পালকের মত হালকা। তা ছাড়া কদিন ধরে স্নায়ুগুলোর উপর কোন নিয়ন্ত্রণই নেই যেন ওর। এক গ্লাস জল তুলতে গেলেও ভাবনা হচ্ছে শেষ পর্যন্ত তুলতে পারবে তো। অনেক যুদ্ধ করে স্নায়ুকে বশ করতে হচ্ছে। স্পীডটা সামান্য বাড়াতে সাইকেলটা ডানদিক বাঁদিক করে সোজা হয়ে গেল। শিবেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু নিজেকে আবার ওর একটা বনসাই বলে মনে হল সে সময়।

'বনসাই' জিনিসটা কি শিবেন কদিন আগেও জানত না।

মার্চ মাসের ৫ ড্রা দিতে গেলে বাড়ীওয়ালা কালু চক্কোত্তি গম্ভীরমুখে বলেছিল 'শিবেনবাবু, ঘরটা যে এবার ছাড়তে হবে। আমার দরকার। একটা স্টোররুম না হলে অসুবিধে হচ্ছে।' ঘর বলতে অবশ্য ব্যাঙের বাসার মত একচিলতে অন্ধকার গহ্বর, সামনে রান্নার জন্যে একটা ঘেরাটোপ। তবু এটাই ছাড়তে হবে শুনে শিবেনের পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠেছিল। ঘর না ছাড়াটা যে শিবেনের দরকার, সেটা আর ও বলতে পারেনি।

চুপচাপ ঘরে এসে স্ত্রী মমতাকে কথাটা বলতে ওর শীর্ণ মুখে উদ্বেগ ছাড়া আর কিছু দেখেনি শিবেন। বেচারি। শিবেনের মায়া হয়েছিল। ওকে আর কিছু না বলে জানলা দিয়ে ঘোড়ানিম গাছটার দিকে তাকিয়ে একটা বড় শ্বাস ফেলেছিল শিবেন। তারপর কি ভেবে পায়ে পায়ে আয়নাটার দিকে এগিয়ে গিয়ে নিচের দিকে চোখ রেখেছিল। খুঁটিয়ে দেখে নিজেকেই নিজে চিনতে পারছিল না। কিসের একটা কালো ছায়া যেন ওর সারা মুখে। চোয়ালের হাড় দুটো স্পষ্ট। রগের কাছে এরই মধ্যে অনেকগুলো চুল সাদা। বড় বড় চোখদুটো মাছের মত। ভাবলেশহীন। এ চোখে কি স্বপ্ন ছিল কোনদিন ? শিবেন মনে করতে পারছিল না। সর্বনাশা নেশার ট্যাবলেটগুলো কবে খেতে শুরু করেছিল মনে পড়ে না ওর। কিন্তু শুরু একদিন করেছিল বলেই না তার নখের আঁচড় আজ ওর সর্বাঙ্গে। অকালবার্ধক্যের ছাপ সারা মুখে। কিন্তু কেন ? ভাবতে চেষ্টা করল শিবেন।

অনেকদিন বাদে নিজের দিকে তাকিয়ে একটা ভোকাট্টা ঘুড়ির মত ভারসাম্যহীন লাগল নিজেকে। যেন শরীরের গোটা কাঠামোটাই, গোটা কঙ্কালটাই কেউ গজভুক্ত কপিত্থের মত খেয়ে নিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়বে শরীরটা। ভারী অসহায় বোধ করেছিল শিবেন।

অথচ বাড়ি পাল্টানোটা ওর কাছে কিছু নতুন অভিজ্ঞতা নয়। বহুবার বিড়ালেরছানাপোনা সরানোর মত তল্পি গোটাতে হয়েছে শিবেনকে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পালটে গিয়েছে। আজকাল ভাড়া নেবার আগে বাড়িওয়ালাকে যে সেলামী গুণে দিতে হয় তাতেই ধাত ছেড়ে যাবে শিবেনের। তা ছাড়া ভাড়াও এখন আকাশছোঁয়া। শিবেনের আয়ত্তের বাইরে। ব্যাঙের বাসা হলেও অনেকদিন এ পাড়ায় আছে। কম ভাড়ায়। কিন্তু বাড়ির মালিক চক্কোত্তিমশাই মহাধুরন্ধর লোক। নানা সাদা আর কালো কারবারে দু পয়সা কামিয়ে এখন সাধ হয়েছে বাড়িটা মাল্টিস্টোরিড করবেন। স্টোর রুমটুম অছিলা, সেটা শিবেন জানে। পুরনো ভাড়াটে তাই এখন ওঁর চক্ষুশূল। অবশ্য শিবেন জানে ওঠ বললেই ওঠানো যায় না। তার হুজ্জৎ অনেক। কিন্তু শিবেনই কি পারবে সে সব ঝক্কি সামলাতে ? ওর শরীরের কঙ্কাল খেয়ে নিয়েছে সময়। কিংবা সময় নয়। ওকে ছিবড়ে করে দিয়েছে ওরই কুঅভ্যাস। বারবিটিউরেট তার নখের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করেছে শিবেনের হৃদপিণ্ড, অন্ত্রনালী, পাকস্থলী। এখন ও আখমাড়াই কলের ছিবড়ে। কিংবা কুঅভ্যাসও নয়। সে অন্য কোন রাহু। মানুষেরই তৈরি।

আয়নার দিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করেছিল শিবেন। ওর চোখের সামনে আয়নার মধ্যে দিয়ে

হেঁটে গিয়েছিল এক বালক। ও স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল। পদ্মাপারের এক গণ্ডগ্রামে যে বালক হেঁটে যেত তাকে। অনেক ছোটবেলার স্মৃতি আজও অমলিন। কত ছোটবেলার কথা মানুষের মনে থাকে শিবেন জানে না। জননীর গর্ভের পবিত্র আঁধারেও কি শোনা যায় বাইরের পৃথিবীর কোলাহল ? শিবেন জানে না। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সময়ই ত ও পৃথিবীতে এসেছে। তাই বোধ হয় আজও ওর স্বপ্নে ভেঙে পড়ে ঘরদুয়ার, সভ্যতার তোরণ। এই বয়সেও ঘুম ভেঙে যায় বিমান আক্রমণে পর্যুদস্ত শহর-নগরের অসহায় পতন দেখে। ঘামে ভিজে যায় সর্বাঙ্গ। কানে বাজে দূরগামী প্লেনের একটানা শব্দ। তাড়া খাওয়া পশুর মত ছুটে

বেড়ায় ও। কিংবা এ হয়তো ছেলেবেলায় মা, মাসী, বড়মার মুখে শোনা গল্পের স্মৃতির তাড়না। নতুন যুগের মা বড়মা কি বর্গীর বা জুজুর ভয় না দেখিয়ে সেই দুরন্ত বালককে শান্ত করতে বিমান আক্রমণের গল্প বলতেন? শিবেনের মনে পড়ে না।

আজও সেই বালকের স্মৃতি উথালপাথাল করে পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে অনাত্মীয় পৃথিবীর পথে পা বাড়ানোর দিন বাবার বুকফাটা কান্নার শব্দ। ঈশ্বরদি স্টেশনে সেই বালক রেলের গাড়ি দেখে তাই বিস্মিত না হয়ে আতঙ্কে মুখ লুকিয়েছিল মায়ের বুকে। ও কি বুঝেছিল যে ওই বাষ্পীয় শকট সেদিন ওর সব নিশ্চিন্ত আশ্রয় আর নির্ভরতার সঙ্গে চিরকালের জন্যে ওর অস্ত্রোপচার করে দিচ্ছিল? শিবেন আন্দাজ করতে পারে না। ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে নানা বিচিত্র পরিবেশের ছবি। কতবার ডেরা পাল্টিয়ে নতুন পরিবেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা। সে যাত্রায় পরিবারের সমর্থ নারীপুরুষের পিছনে সেই বালকও কুণ্ঠায়, ভয়ে পথ হেঁটেছে। চক্রধরপুরে বাঙ্গালীটোলায়, খড়্গপুরে, আহিরীটোলায়। অপেক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়ের বাড়িতে এক কোণে অনধিকার প্রবেশকারীর মত মুখ বুজে কাটিয়ে দিয়েছে তার বাল্যকাল। তার কোন আবদার ছিল না, অধিকারবোধ ছিল না। সে কোন কিছুর জন্যে বায়না করতে শেখেনি। না একটি খেলার বলের জন্য, না লাট্টুর জন্য, না বইখাতার জন্য।

অথচ কি আশ্চর্য। সে বালকের মাথায় ঘুরত অনেক ছবি। ইস্কুলের ভাঙা চকখড়ি এনে লুকিয়ে মেঝেতে আঁকত বলিষ্ঠ রেখাচিত্র। অথচ হঠাৎ কেউ এসে পড়লে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলত নিজের শিল্পকর্ম। কারণ বড় কুণ্ঠা ছিল সে কিশোরের। খাতার পিছনে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে পদ্য লেখার খেলা খেলত সে। শব্দগুলো ওর মনে টুংটাং সুর তুলত। ও নিবিষ্ট হয়ে যেত। সে পদ্যের কোন পাঠক ছিল না তার। কারণ কুণ্ঠায় সে খাতা কোনদিন কাউকে দেখায়নি সে। সে যে অনধিকার প্রবেশকারী এটা সবসময় সে মনে রাখতো। বড়রা স্বভাবতই ওর মনের এই জড়তার খোঁজ রাখেননি। তাঁরা বড় ব্যস্ত ছিলেন খাবার জোগাড়ের ধান্দায়।

তাঁদের পায়ের পাশে ঘুরঘুর করা কে এক কিশোর মাথার মধ্যে মহীরুহ হবার স্বপ্ন জমায়। নানা বিভঙ্গে ডালপালার আগ্রহ ছড়িয়ে, আশেপাশের আর পাঁচটা গাছের মাথা ছাড়িয়ে বড় হবার স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখে অনেক পাখপাখালি হাতের আঙুলে ধরে রাখার, অনেক তক্ষক, পেঁচা, সাপ বুকের কোটরে ঠাঁই দিতে চায়, সে খবর তাঁরা রাখতেন না। তাই সে কিশোর একদিকে স্বপ্নের পাহাড় অন্যদিকে কুণ্ঠার খাদের মধ্যে সঙ্কীর্ণ গিরিপথে সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে হাঁটত। হাঁটতে হাঁটতে বড় হত। প্রাপ্তবয়স্ক।

জলে ডোবার আগে মানুষ নাকি অনেক ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে দেখতে পায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শিবেনও সেদিন দেখছিল স্মৃতির চলচ্চিত্র। স্মৃতি কি যন্ত্রণার? নইলে এক সদ্য যুবক সাহস করে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি তার ভালবাসার দিকে, এ স্মৃতি আজও কেন শিবেনের দীর্ঘশ্বাস আনে? একদিন সে যুবকের ভালবাসা লাল বেনারসী পরে কোথায় চলে গেল। যুবক অনায়াসে পথ ছেড়ে দিল। কারণ পথ ছেড়ে দেওয়াই তার স্বভাব হয়ে গিয়েছিল। অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সে শেখেনি। কিন্তু তবু এই দীর্ঘশ্বাস।

দর্পণ বড় নিষ্ঠুর। সেদিন অকস্মাৎ শিবেন দর্পণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের অনিকেত অস্তিত্বের কথা ভেবে বিব্রত হয়ে পড়েছিল। সে যেন শুধুই ঘটনাপ্রবাহে ভাসমান এক সত্তা, ঘটনার উপর যার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। একটা ভোকাট্টা ঘুড়ি, হাওয়ার টানে ভেসে যাওয়া ছাড়া কিছুই করণীয় নেই। আর এই অসহায় ভেসে যাওয়ার সময় কি নিদারুণভাবে শিবেন একা। তার এই সর্বগ্রাসী একাকীত্ব, তার ব্যর্থতার গ্লানি ঢাকতে প্রতিদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে সে চেতনার উপর ঘনতর অন্ধকার ঢেলে দিত, স্বেচ্ছায়।

ঘুমের বড়িগুলো তার রক্তে দ্রবীভূত হয়ে স্নায়ুগুলোকে অসাড় করে তাকে পৌঁছে দিত এক চৈতন্যপারের কল্পরাজ্যে। শিবেন সেখানে রাজা হয়ে কাটিয়ে দিত কিছুটা সময়। কিংবা হয়ত এভাবেই কেটে গেছে অনেকটা সময়। তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে গলে ঝরে গেছে গোলাপী মোমের মত।

শিবেন চমকে উঠেছিল রিণ্টুর গলার আওয়াজ শুনে। রিণ্টু, শিবেনের উত্তরাধিকারী, একটা বল নিয়ে লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকে বলেছিল, 'বাবা আমার একটা ব্যাট চাই।' ছেলেকে কাছে ডেকে শিবেন ওর বড় বড় চোখদুটোর দিকে গভীর মনোযোগে তাকিয়েছিল। রিণ্টুর চোখে কি স্বপ্ন ভাসতে শুরু করেছে? মানুষ কত বয়স থেকে স্বপ্ন দেখে? শিবেন আবোলতাবোল ভাবনায় আক্রান্ত হয়েছিল। 'দেব বাপী, কালই কারখানা থেকে আসবার সময় কিনে আনব।' ছেলেকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভেবেছিল ওর উত্তরাধিকারীকে আর কি কি দেওয়া উচত।' সে কি স্থিতির গভীর শিকড়? আমূল প্রোথিত স্থায়িত্ব?

শিবেনের চোখে জল এসে যাচ্ছিল। সে বড় অসহায়। তার কপালে সময়ের বলিরেখা, শিরা ওঠা হাতের পেশীতে শুধু অক্ষমতা, হৃদপিণ্ডে ভয়ের দামামা। কি পারে শিবেন? কতটুকু পারে?

শিবেনের সব কেমন জট পাকিয়ে যেতে লাগল। কোথাও কি ভুল হয়েছে দারুণরকম? শিবেনের মনে পড়েছিল সারথির কথা। সারথি ওর বাল্যবন্ধু। একটা বিদেশী ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করে। পার্ক স্ট্রীটে ওর অফিস। ওর কাছেই যেতে হবে। কোন চেনাজানা ডাক্তার নয়, বন্ধুর কাছেই উন্মুক্ত করা যায় নিজের গোপন ক্ষতচিহ্নগুলো।

শিবেন মুক্ত হতে চেয়েছিল তার কুঅভ্যাস থেকে। এটাই জরুরী। সন্ধ্যা হতেই ওর বুকের ভিতর হুলুস্থুল পড়ে যায়। মাথার ভিতর শঙ্খঘণ্টা বাজে। ভেঙে পড়ে ঘরদুয়ার। দূরাগত বিমানের শব্দে দিশেহারা হয়ে পড়ে শিবেন। পায়ের তলার মাটি কেঁপে যায়। নিরুদ্দেশ যাত্রার ভয়ে কেঁপে ওঠে ওর অন্তরাত্মা। তখন ওকে যেতেই হয় পাড়ার ওষুধের দোকানে। সারথিই পারবে ওর মুশকিল আসান করতে। শিবেন ঠিক করেছিল ওর কাছেই যাবে।

আর সারথির অফিসেই জানালার ধারে টবে বসানো ফুট দেড়েক উঁচু বটগাছটা শিবেন দেখতে পেয়েছিল। প্রথমে ভেবেছিল প্লাস্টিকের। আজকাল খুব উঠেছে এসব। চোখে আসলে ধন্দ লাগায়। কিন্তু না। কাছে গিয়ে দেখেছিল গাছটা সরু সরু ঝুড়ি নামিয়েছে দিব্যি, দু চারটে লালটুকটুকে ফলও ফলিয়েছে। একেবারে নির্ভেজাল। শিবেনের চোখ কপালে উঠেছিল। সারথিকে জিজ্ঞেস করতে ও হেসে বলেছিল 'বনসাই'। জাপান থেকে আমদানি শিল্পকর্ম। আরও অনেকগুলো আছে। দেবদারু, ইউক্যালিপটাস দেখবি? শিবেনের ভাল লাগেনি। ওর মনে হয়েছিল নিষ্ঠুরতা। আশপাশের গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে যে উদ্ধত ঘাড় তুলবে আকাশে, তার কোমরে এমন টবের ঘুনসি পরিয়ে জোর করে বামন বানিয়ে রাখা শিবেনের পছন্দ হয়নি। এতে আর যাই থাক, শিল্পবোধ নেই। এটা জাপানি শিল্প রসিকতা বলে মনে হয়েছিল ওর।

সারথির কাছে দরকারি উপদেশ শুনে ও নেমে আসছিল সিঁড়ি দিয়ে। তখন আবার নজর পড়েছিল দুঃখী বটগাছটার দিকে। টবটার নিচের দিকে একটা ভাঙা অংশ দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল ও। চারপাশে তাকিয়ে দেখেছিল, কেউ কোথাও নেই। একটানে ভাঙা অংশটার কাছ থেকে আরও খানিকটা ভেঙে ফাটলটা বাড়িয়ে দিয়েছিল শিবেন। তারপর দ্রুত পায়ে নেমে এসেছিল রাস্তায়। বনসাইটা তার এতদিনের রুদ্ধ আবেগ শিকড় দিয়ে ছড়িয়ে দিক, বিরাট ইমারতটার শুকনো গা বেয়ে নেমে যাক আরও নিচে, একদিন তা হলে সরস উর্বর মাটি হয়ত পেয়ে যাবে ও, আর সেদিন দৃপ্ত হাতে কাঁপিয়ে দেবে প্রাসাদের ভিত্তিমূল। এই সব চিন্তা করে শিবেন খুব উল্লসিত হয়েছিল।

সেই ওর বনসাইয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। রতনদার নির্দেশিত পথে যেতে যেতে শিবেনের এখন নিজেকেই বনসাই মনে হল।

কারখানার রতন সামন্ত বয়সে ও পদমর্যাদায় শিবেনের অনেক বড় হলেও ওকে খুব স্নেহ করেন। মাসের শেষে হাত পাতলে নিরাশ করেন না। শিবেনের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ওঁকে শিবেন বাড়ির সমস্যার কথাটা জানাতে ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'তা হলে তো তোর সামনে বড় সমস্যা?' তারপর দুদিন বাদে শিবেনকে ডাকিয়ে বলেছিলেন, 'টিউশন করতে পারবি?' 'টিউশন? হঠাৎ?' শিবেন অবাক হয়েছিল। রতনদা বিশদ করেছিলেন। ওঁর এক ধনী বন্ধু, প্রতাপ অধিকারী, থাকেন একটা গোবিন্দপুরে, ছেলেমেয়ে দুটির জন্যে গৃহশিক্ষক খুঁজছেন। কেউই ধুলাগোড়ির বিশাল মাঠ পেরিয়ে ছেলে পড়াতে যেতে চায় না। তা ছাড়া বাড়ি গিয়ে পড়ানোর চেয়ে মাস্টারমশাইদের কোচিং ক্লাসে অনেক বেশি

আর। প্রতাপবাবু দিলদরিয়া মানুষ। নিজে খুব লড়াই করে বড়লোক হয়েছেন। মন দিয়ে পড়ালে ভদ্রলোককে বলে মাইনের বদলে শিবেনের জন্য এক ফালি জমির বন্দোবস্ত করে দেবে রতনদা। শিবেন যে অঞ্চলে থাকে ভদ্রলোকের সেখানেও জমিজমা আছে বলে শুনেছে রতনদা। কিন্তু শিবেন কি পারবে? ওর যা চেহারার হাল হয়েছে তাতে ধূলাগোড়ির মাঠ সাইকেলে দুবার ঠেঙিয়ে নিয়মিত হাজিরা দেওয়া সম্ভব হবে কি? রতনদা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

শিবেনের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল প্রস্তাবটা। খুব জোরের সঙ্গে তাই ও বলেছিল 'খুব পারব রতনদা। পারতেই হবে। এ সুযোগ হাতছাড়া করা পাগলামি। তুমি ব্যবস্থা করে দাও। তুমি তো জান পড়াশোনায় বেশি দূর না এগোলেও যেটুকু এগিয়েছি ভালই এগিয়েছি। একটু ঝালিয়ে নিলেই সব মনে পড়ে যাবে।' তা ছাড়া সন্ধ্যার দিকে একটা কাজে ব্যস্ত থাকলেই শিবেনের মঙ্গল। নেশার কামড়টা বেশি সইতে হবে না। অবশ্য সেটা আর ও রতনদাকে বলেনি।

পশ্চিমদিকের পড়ন্ত সূর্য চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল শিবেনের। রাস্তাটা কিছু দূর গিয়ে বাঁক নিয়েছে উত্তরমুখো। গলার ঘণ্টি বাজিয়ে দুটো ছাগলছানা লাফাতে লাফাতে রাস্তা পেরোচ্ছিল। ওদের পাশ কাটিয়ে বাঁক নিতেই শিবেন অবাক। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে সরীসৃপের মসৃণ গতিতে চলে গিয়েছে, দু পাশে ছোট ছোট সবজি খেত আর সারবন্দী গাছ আর গাছ। আম, জাম, সজনে, শিরীষ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া—কি নেই। সবজি খেতে ঢ্যাঁড়স, লঙ্কা, হলুদ হয়েছে প্রচুর। অনেক জমির চারপাশে কলাগাছ কাঁদি ভর্তি কলার ভারে গর্ভিণী রমণীর মত ঝুঁকে আছে। মধুর ক্লান্তিতে। রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচূড়ায় রঙের হেলাফেলা।

উত্তরে বাঁক নেওয়ার পর চোখে রোদের তাতটা তত লাগছে না। হাওয়া বইছে শনশন। অশ্বত্থ গাছের কচি পাতার সমারোহে ফিসফাস আওয়াজ তুলে দূরের মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে। ধামা ভর্তি ঢ্যাঁড়স নিয়ে রাস্তার ধারে দুটো বাচ্চা ছেলে বসে আছে। খুব সস্তা হবে বোধ হয়। যাবার সময় কিছুটা নিয়ে যাবে শিবেন। মমতা ঢ্যাঁড়স ভালবাসে। কোনাকুনি হাওয়ার ঝাপটায় সাইকেল টানতে পারছে না জোরে। বুকের ভেতরটা এখনি হাতুড়ি পিটতে শুরু করেছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঊরুর পেশীতে টান ধরেছে। কিন্তু ওকে পৌঁছতে হবেই। মাঠের রাস্তায় পড়ার আগেই যদি দম শেষ হয়ে যায় সেই ভয়ে শিবেন গাছগাছালি দেখতে দেখতে ঢিমেতালে এগোতে লাগল।

অবশ্য দু পাশের এই পূর্ণতার মাঝখানে নিজেকে ওর আরও ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল। খর্বাকৃতি ঢ্যাঁড়স গাছের দিকে তাকিয়েও ওদের কেমন সুন্দর সার্থক মনে হচ্ছিল শিবেনের। দীর্ঘাকার অশ্বত্থ শিরীষের ব্যাপ্তি ও জেদি ঘাড়ে আকাশের দিকে তাকানো শিবেন বিস্ময়ে উপভোগ করছিল। পৃথিবীর রস থেকে নিজের প্রাপ্য অংশটুকু কেমন নিঃসঙ্কোচে টেনে নিচ্ছে গাছগুলো। শিবেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নাঃ, ও নেহাতই একটা বনসাই। বাতাসে মিহি ধুলো ঢুকছে নাকে মুখে। জিভটা শুকিয়ে চটচট করছে। দাঁত দিয়ে জিভটা চেঁছে খানিকটা থুথু ফেলল শিবেন। যেন নিজের ওপরই ঘেন্নায়।

আর কত দূর! এখনও তো গ্রামের চৌহদ্দিই শেষ হল না। ঘামে গেঞ্জি সপসপে। কপাল থেকে গড়িয়ে চোখের ওপর পড়ছে। ব্রেক কষল শিবেন। সাইকেলটা একপাশে দাঁড় করিয়ে রুমাল বার করে ঘাম মুছল। মাটির দিকে চোখ পড়তেই শিবেন অবাক। এই গ্রীষ্মে যেন তুষারপাত হয়েছে। উপরে তাকিয়ে দেখল একটা বলিষ্ঠ শিমুল বীজ ছড়াচ্ছে। ফটফট আওয়াজ হচ্ছে। ফলগুলো ফেটে অলৌকিক আশীর্বাদের মত ঝরে পড়ছে হালকা তুলোর রাশ। ইতস্তত। শিবেন একটুকরো তুলো হাতে তুলে নিল। কি অদ্ভুত কোমল। স্পর্শে শিহরণ জাগে। বড় পবিত্র, প্রায় স্বর্গীয় সেই শুভ্র কোমলতা। শিমুলের সার্থকতা মাখানো। শিবেনের ঘাড়ে মাথায় ঝরে পড়ল দু চারটে।

কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়ানো চলবে না। শিবেনকে যেতে হবে অনেকটা পথ। কতটা তার সঠিক হিসেব ও জানে না এখনও। প্যাডেলে পা রাখল ও।

সামান্য এগিয়েই গাছপালার ঘেরাটোপ শেষ। সামনে বিশাল মাঠ। মাঠের মাঝখান দিয়ে কুমারীর সিঁথির মত সরু রাস্তা সোজা উত্তরে। এখানে আবার সম্পূর্ণ অন্যরকম প্রকৃতি। রাস্তায় দু পাশে বিক্ষিপ্ত দু চারটে রুক্ষবাবলা, কিছু তাল আর নারকেল। মাটিতে রাস্তার ধার ঘেঁষে মুথাঘাসের জটলা।

একটু ঢাল বেয়ে নামলেই ধানের ক্ষেত। আদিগন্ত। এপ্রিলের হাওয়ায় দুলছে। বুঝি পুরুষ্টু ধানের গর্বে শিউরে উঠছে। রাস্তাটা এখানে এবড়োখেবড়ো। পিচের আস্তরণ উঠে খোয়া বেরোন। সাইকেলটা লাফাচ্ছে বড্ড। পাম্পটা বেশি দিয়েছে কালো লোকটা। সাবধানে গচ্চা বাঁচিয়ে চলল শিবেন।

কিছু দূর এগিয়ে রাস্তাটা উঁচু হয়ে একটা কাঠের পুলে মিশেছে। ও ভাবল সাইকেল থেকে নামতে হবে না। এমন আর কি উঁচু। একটা চাপ দিয়ে প্যাডেল করলেই উঠে যাবে পুল পর্যন্ত। কিন্তু পারা গেল না। হাঁপাচ্ছে শিবেন। শরীরে আর কিছু নেই। শুধু কাঠামোটা আছে, প্রাণশক্তি নিঃশেষ। বারে বারে সাইকেল থেকে নামাতে

অবশ্য বিশ্রাম পাচ্ছে পাটা। নইলে রোদে ঝলসানো বিরাট মাঠটা একটানা পেরোন ওর পক্ষে অসম্ভব।

কয়েকদিন যাতায়াত করলে ঠিক অভ্যাস হয়ে যাবে। গাছপালার আড়ালটা আর নেই। আকাশের হিলিয়াম বলটা আবার গাল গলা পুড়িয়ে দিচ্ছে। সারা গায়ে নুন জমে কেমন জ্বালা করছে। দিগন্তের কাছে গ্রামগুলো গরম হাওয়ায় কাঁপছে। ধোঁয়াটে নীল দেখাচ্ছে। গরমের অনুভূতিটা না থাকলে মনে হত কুয়াশা জমেছে ওখানে।

পুলটার কাছে তিনখানা বাঁশ পিরামিডের মত পোঁতা। শক্ত দড়ি ঝুলছে মাথা থেকে। একটা ছেলের মাথা উপরে উঠছে আবার পুলের জমানো মাটির আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে। শিবেন বুঝতে

পারল ও ডোঙ্গায় করে ক্ষেতে জল দিচ্ছে। পুলের উপর উঠে ও খানিকটা দম নিল। ছেলেটার মাঠে জল ঢালা দেখল খুঁটিয়ে। মাঠটা চিরে পুব থেকে পশ্চিমে একটা খাল চলে গিয়েছে। এটা কি নদী না নয়ানজুলি? জল রয়েছে ভালই। তবে সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে না। কচুরীপানা জমে আছে প্রচুর। দু চারটে শালুকও ফুটেছে। শিবেনের ভাল লাগছিল দাঁড়াতে। হাইটেনশন লাইন মাঠের মাঝখান দিয়ে আড়াআড়ি জ্যামিতি এঁকে চলে গেছে অনেক দূর। সেই ঝাঁপড়দহের দিকে। ওদিকটা বাড়িঘরগুলো অনেকটা স্পষ্ট। ঝাঁপড়দহের দিকে ট্রাকগুলো যাচ্ছে। এখানে অবশ্য কোন শব্দ আসছে না। চারদিকে আশ্চর্য নীরবতা। মাঝে মাঝে দু চারটে পাখির ডাক। সব শিবেনের পরিচিত নয়।

আজ নিয়ে কদিন ড্রাগ খায়নি ও মনে মনে হিসেব করল। ড্রাগ যখন খেত তখন ভিতরের ক্ষয়টা ধরতে পারেনি। রুটিনবাঁধা কাজগুলো করে ফেলত ঝোঁকে সারথি বলেছিল একমাত্র মনের অসীম জোরই ড্রাগ ছাড়ার সহায়ক। ওর নেশা ছাড়তে গেলে শরীরে মনে যে অসাধারণ কষ্ট হয় তা সহ্য করা নইলে অসম্ভব। অনেকেই নাকি সে কষ্ট সইতে না পেরে আবার ড্রাগ খায়। কদিনে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে শিবেন। সারাক্ষণ একটা অজানা ভয় আর আতঙ্কে কাটাতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, দূর ছাই। চুলোয় যাক সব। আপাতত বাঁচি। কিন্তু রিণ্টুর মুখটা মনে পড়ায় নিজেকে সংযত করেছে শিবেন। অঙ্কুরোদগমের সময় বীজ আগে মূল ছড়িয়ে দেয় মাটিতে। রিণ্টুর পায়ের তলার শিকড়ের স্থিতি আসুক, শিবেন মনেপ্রাণে চেয়েছে। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে ও।

হাওয়াটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গুমোট করছে। এপ্রিলের শেষ হতে চলল, অথচ এ বছর একদিনও ঝড়বৃষ্টি হল না। শিবেন আবার সাইকেলে উঠল। দুবার প্যাডেল করে পুলটার ঢাল বেয়ে ছেড়ে দিতেই অনেকখানি রাস্তা অনায়াসে চলে এল ও। রাস্তাটা এরপরে তাল নারকেলের জটলার মধ্য দিয়ে বাঁক নিয়েছে। একটা কটু গন্ধ এল ওর নাকে। তাড়ির আসর বসেছে গাছতলায়।

রাস্তাটার বাঁকে বাঁকে বিস্ময়। কিংবা শিবেনই অনেকদিন বাদে সুস্থ চোখে চারধারে তাকাচ্ছে, তাই অল্পেই বিস্মিত হচ্ছে ও। কিন্তু তাই বলে এই তেপান্তরের মাঠের মধ্যে একটা এত বড় বাড়ির ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে ও ভাবতে পারেনি। এখন বাড়িটার গা ঘেঁষে ইঁটের ভাটি। কামিনরা কাজ করছে। রাস্তার ধার ঘেঁষে বিরাট বাঁধানো পুকুর। গভীর জল টলটল করছে। শিবেনের হাতেমুখে জলের ঝাপটা দিতে ইচ্ছে হল। সাইকেলটা রেখে নেমে এল ঘাটে। বাঁধানো ঘাটটার একধার ভেঙে ঝুলছে। একটা বিরাট অশ্বত্থ তার শক্ত আঙুলে ধরে রেখেছে ভাঙা অংশটা। তার শিকড়ের কারিগরি এক অদ্ভুত ভাস্কর্য। শিবেন মুগ্ধ হল। জলটা গরম। তবু চোখেমুখে দিতে শিবেন আরাম পেল। রুমালে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াতেই একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ওর শরীর জুড়িয়ে দিল। একটু যেন অন্ধকার হয়ে এসেছে। আকাশের দিকে তাকাল শিবেন। যা ভেবেছে তাই। লাল সূর্যটা হারিয়ে গেছে উত্তর পশ্চিমের কালো একখানা মেঘের ষড়যন্ত্রে। ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে। বিব্রত বোধ করল শিবেন। এই বিশাল প্রান্তরে ঝড় উঠলে মাথা বাঁচানোর জায়গা নেই। গাছতলা নিরাপদ নয়। তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে উঠে এল ও। ঝড় ওঠার আগেই যদি ঝাঁপড়দহের রাস্তাটায় উঠতে পারে তা হলে দোকান টোকান পেয়ে যাবে নিশ্চয়। শিবেন জোরে প্যাডেল করতে লাগল।

কিন্তু কালবোশেখী যে এত দ্রুত মেঘ ছড়িয়ে দেয় আকাশে, আর খোলা মাঠে সে মেঘের যে এমন ভয়ঙ্কর চেহারা সেটা শিবেনের জানা ছিল না। আকাশের দিকে তাকিয়ে ও রীতিমত শঙ্কিত হল। মেঘ আকাশে উথলে উঠছে, পাক খাচ্ছে আর সে মেঘ এত নিচে যে নারকেলগাছগুলোর মাথায় চড়লেই যেন ছুঁয়ে ফেলা যাবে। একদল বক উড়ন্ত শিমুলতুলোর মত পুবদিকে চলে গেল। একটা দলছুট কাক ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে কোনগতিকে গাছপালার ফাঁকে এসে লুকোল। ঝড়টা এসেই গেল। সাইকেলটা কাঁপছে থরথর করে। শিবেন কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। কেবলই পুবদিকে টাল খেয়ে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে ও নেমে পড়ল।

এক ঝাপটায় ধুলো আর খড়কুটোয় ভরে গেল চারদিক। নাকে, মুখে, চোখে, কানে সর্বত্র ধুলো ঢুকে গেছে। চোখ কড়কড় করছে। কিছু দূর এগোলেই অবশ্য বড় রাস্তাটা। প্রতাপবাবুর বাড়িটা ওই রাস্তা ধরে সামান্য পুবে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এমন আকাশজোড়া বিদ্যুৎ শিবেন কোনদিন দেখেনি। কে যেন লেজার রশ্মি দিয়ে মেঘের বুক ফালাফালা করছে। কড়কড় আওয়াজ তুলছে যন্ত্রণাদীর্ণ মেঘ। সেই ভয়াবহ দৃশ্যে মাঠের মধ্যে একলা শিবেন আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়ল। এখন ফেরারও উপায় নেই। ওকে এগোতে হবেই।

শিবেনের কানের ভিতর ঝড়ের শোঁ শোঁ আওয়াজ যেন দূরাগত বিমানের শব্দ। চারদিকে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোয় উদ্ভাসিত অসহায় নারকেল, খেজুর, আর বাবলা। শিবেনের বুকের ভিতর শঙ্খধ্বনি, হুলুস্থুল। ওর সামনে যেন ভেঙে পড়ছে সব ঘরদুয়ার, নাটমন্দির। গোটা রাজ্যপাট সযত্নে গঠিত সভ্যতার তোরণ।

একি সেই বিস্মৃত দুঃস্বপ্ন যে স্বপ্নে তাড়িত হয়ে এক বালক বাবার হাত ধরে ঈশ্বরদি স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছিল? আজ এতদিন বাদে এই জনবিরল মাঠে তাকে ঝড়ের সুযোগে আবার আক্রমণ করছে। নাকি এ সর্বনাশা বারবিটিউরেটের শেষ প্রতিশোধ? শিবেন দিশেহারা হয়ে পড়ল। তবু ওকে পৌঁছতে হবে। শেষ শক্তিটুকু সংহত করে ও সাইকেলটা শক্ত করে চেপে ধরল। তারপর প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল।

বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। প্রায় অন্ধের মত দৌড়চ্ছে শিবেন। এমনিতেই ইদানীং সন্ধ্যাবেলা চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছে না। হয়ত ড্রাগের প্রতিক্রিয়া। ওর কপাল মন্দ। একটা গচ্চায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। সাইকেল সমেত পাশের খাদে। কাঁটাগাছে ছড়ে গেল সারা গা। হ্যান্ডেলটার আঘাতে একটা দাঁত নড়ে গেছে। মুখে নোনতা স্বাদ। রক্ত পড়ছে। শিবেনের সব শক্তি নিঃশেষিত। বৃষ্টির ফোঁটায় ভিজে যাচ্ছে শিবেনের আতপ্ত মুখ। খোলা বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে যেন ওর সত্তার গভীরে। ও আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল। যেন শিবেন আজন্ম ছুটে চলেছিল এক বিশাল প্রান্তরের পথে। তাড়া খাওয়া পশুর মত। আজ এতদিন পরে ও কবরের শান্তিতে সমাহিত। মাথার উপর দিয়ে অনন্তকাল বয়ে যাবে ঝড়। বৃষ্টি পড়বে। একদিন অবশেষে ও মাটি হয়ে যাবে। এখন সব উদ্যম অর্থহীন। আর কোথাও যাবার তাড়া নেই। ধূলাগোড়ির মাঠেই ও শুয়ে থাকবে চিরকাল।

কিন্তু হঠাৎই রিণ্টুর মুখটা ওর মনে পড়ে গেল। নাঃ। শুয়ে থাকা নয়। হেরে যাওয়া চলবে না। প্রতাপবাবুর বাড়িতে ওকে পৌঁছতেই হবে। উনি কেমন লোক, ওখানে শিবেন কি পাবে, এসব প্রশ্ন অবান্তর। ওকে মাঠটা পেরোতে হবেই।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে সাইকেলটা নিয়ে ও কোনক্রমে উঠে এল রাস্তায়।

একটু এগিয়ে বড় রাস্তার মোড়। দোকানে ঘরমুখো ভিজে মানুষের জটলা। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত শিবেন ওখানে পৌঁছে একজনকে জিজ্ঞেস করল প্রতাপবাবুর বাড়ির হদিশ। কয়েকজন সমস্বরে দেখিয়ে দিল। প্রতাপবাবু জনপ্রিয় মানুষ। ওখান থেকে বড় জোর মিনিটখানেক লাগবে। অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। অতএব আবার সাইকেল।

বাড়ির সামনে বিরাট গেট। চেঁচিয়ে ডাকতেই দারোয়ান গেট খুলে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করল, 'মাস্টারজী?' শিবেন বলল, 'হাঁ। প্রতাপবাবু হ্যায়?' 'হাঁ জী। আইয়ে, অন্দর আইয়ে।'

সাইকেলটা একপাশে হেলান দিয়ে রেখে শিবেন হাঁপ ছাড়ল। ঝড়ের বেগটা কমেছে। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। গাঁটগুলো যেন ছেড়ে যাচ্ছে। তবু কিসের যেন এক তৃপ্তিতে শিবেন আচ্ছন্ন বোধ করল।

কাঁপা হাতে সিগারেট ধরিয়ে একবুক ধোঁয়া টানতে টানতে শিবেনের মনে হল ওর পা দুটো অসম্ভব ভারি আর দীর্ঘ হয়ে মাটির ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। গভীর থেকে আরও গভীরে। যেন কোন সমর্থ বৃক্ষ মাটির গভীরে প্রোথিত করছে তার তৃষ্ণার্ত শিকড়। শিবেনের কোমরের কাছে ভেঙে টুকরো হচ্ছে এক অদৃশ্য বেড়ি, যেন বনসাইয়ের টব ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। আর কি আশ্চর্য। মাটি সাগ্রহে তার পথ করে দিচ্ছে। দু হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে শিবেন ভাবল এতদিনে ঊর্ধ্বাকাশে জেদি ঘাড় তুলে ডালপালা ছড়িয়ে ও একটা বিশাল গাছ হয়ে যাচ্ছে।

অঙ্কন : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

পরিবেশ: আর এক দিক

সমরজিৎ কর

সম্প্রতি নতুন দিল্লির কনট সারকাসে জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। বয়েস বছর সত্তর হবে। বিকেল গড়িয়ে গেছে তখন। চারদিকে ফুটে উঠেছে আলোর রোশনাই। পার্কের এক কোণে একটি বেঞ্চের এক পাশে নিশ্চুপ বসেছিলেন তিনি। অমন ব্যক্তিত্ব কদাচিৎ চোখে পড়ে।

আমি কি এখানে একটু বসতে পারি? তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম।

নিশ্চয়। ভদ্রলোক মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে তার পাশের জায়গায় বসতে বললেন। তারপর কতকটা স্বগতোক্তির মত বললেন, আজকাল এ সব ক্ষেত্রে কেউ অনুমতি চায় না।

তা কেন? আমি এখানে বসলে আপনি যাতে না অস্বস্তি বোধ করেন সেটা তো আমার বোঝা উচিত। আমি বললাম। ইউ আর টু পোলাইট। ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন।

কথা না বাড়িয়ে আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম।

কিছুক্ষণ বিরতি।

তারপর এ ক্ষেত্রে যা হয়, কোন একটি সূত্র ধরে বাক্যালাপ। শুরু হল দিল্লির কথা, ভারতের কথা, পৃথিবীর কথা। ভদ্রলোক বললেন, ভারতীয় সেনাবিভাগে তিনি মেজরের পদে কাজ করতেন। পৈতৃক বাড়ি লুধিয়ানায়। তবে দিল্লিতে বাস করছেন তিন পুরুষ। স্ত্রী মারা গেছেন দশ বছর হল। তিন ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে কলকাতায়। দুই ছেলে আর্মি অফিসার। একজন হায়দ্রাবাদে, আর একজন আম্বালায়। বড় ছেলের ওষুধের দোকান। কনট প্লেসে। তাঁর সঙ্গেই থাকেন তিনি।

কথা প্রসঙ্গে এক সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন তো আপনার অবসরের সময়। এই পার্কে নিশ্চয় আপনি রোজই আসেন?

হঠাৎ এমন একটি প্রশ্নে যেন হতাশই হলেন তিনি। বললেন, আগে রোজ আসতাম। এখন আসি না। জায়গাটা আজকাল আর ভাল লাগে না আমার।

তাঁর কথায় আশ্চর্য হলাম। বললাম, তা কেন? এমন সাজান বাগান। কত রকম গাছপালা; ফুল, ফোয়ারার আলোর রোশনাই—এ সব আপনার ভালো লাগে না?

ব্যাপার কি জানেন? মানুষ তো আর মনোহারী দোকানের সামগ্রী নয়? প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যা দেখছেন সবই তো কৃত্রিম। প্রকৃতির সুকোমল স্বতঃস্ফূর্ততা এখানে কোথায়? তারপর কাল হয়েছে এখানকার ভূগর্ভস্থ বিপণন কেন্দ্র।

তা কেন? দিল্লি বড় শহর। এখানে জায়গার বড় অভাব। তাই এখানকার ভূগর্ভে বহুটাকা খরচ করে গড়ে তোলা হয়েছে বড়সড় একটি বিপণন কেন্দ্র। এতে ক্রেতাদেরও যেমন লাভ, সেইসঙ্গে এই কেন্দ্রে প্রচুর দোকানপাট থাকায় বহু মানুষের কর্মসংস্থানও তো হয়েছে? এটাও কি কম লাভ?

জানি। যা আপনি বললেন, আমি অস্বীকার করছি না। বাট্‌ ম্যান ক্যান্ট লিভ উইথ ব্রেড অ্যালোন। এত বড় শহর। এত ঘরবাড়ি। তাদের মাঝে হাঁফ ছাড়ার মত কিছুটা ফাঁকা জায়গাও তো থাকা দরকার? যেখানে মানুষ নিজের ভিতরটা দেখতে পায়। একটু আত্মস্থ হওয়ার সুযোগ পায়। এমন একটি পরিবেশ যা মানসিকতাকে সুসংহত করতে সাহায্য করে। আপনার কি মনে হয়, কনট সার্কাসের এই পার্ক কখনো এসব করতে পারে?

এবার বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। বললাম, আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমার কথায় ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, পার্ক হল রিলাকসেসনের জায়গা। মানুষ সেখানে
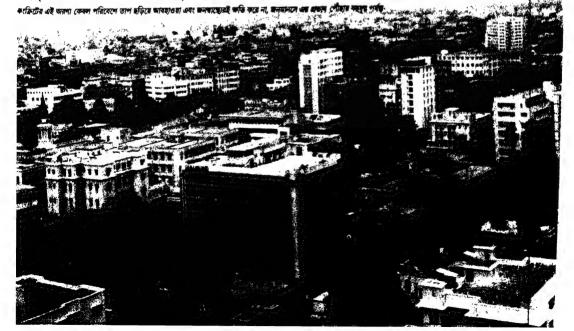
কংক্রিটের এই অরণ্য কেবল পরিবেশে তাপ ছড়িয়ে আবহাওয়া এবং জনস্বাস্থ্যেরই ক্ষতি করে না, জনমানসে এর প্রভাব পৌঁছায় বহুদূর পর্যন্ত।

কৌটোজাত তেজস্ক্রিয় আবর্জনা : পারমাণবিক চুল্লী থেকে যে রাশি রাশি তেজস্ক্রিয় জঞ্জাল বেরোচ্ছে, তা বিরাট সমস্যার কারণ

আসে হট্টগোল থেকে মুক্তি পেতে। পার্কের পরিবেশ হবে শান্ত, স্নিগ্ধ। সেখানে থাকবে এমন এক ধরনের বাতাবরণ যা মানুষকে যোগায় এক বিমূর্ত অনুভূতি। আর পাঁচজনের সান্নিধ্যেও যেখানে থাকবে প্রাইভেসি। মানুষ সেখানে বেড়াতে আসে, বেড়ানর জন্যেই আসে ; দৈনন্দিন ছক কাটা জীবন থেকে কিছুটা মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু এখানে, এই কনট সার্কাসের পার্কে বসলে আপনার কী মনে হয়। অজস্র মানুষের ভীড়। তাদের বেশির ভাগই আসে পার্কে নয়। এখানকার ভূগর্ভে, পালিকা বাজারে। বাজারে কেনাকাটার পর তাদের হট্টগোলে এই পার্কের পরিবেশ যা দাঁড়ায়, তাকে তখন আর অবসর বিনোদনের জায়গা বলে মনে হয় না। বরং বলতে পারেন, এ যেন এক যাত্রীনিবাস। যেন বড়সড় একটি রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুম। পার্থক্য শুধু, এখানে মাথার উপর কোনো ছাদ নেই।

স্বচ্ছন্দ পরিবেশের অভাবে বিচিত্র এক মানসিক যন্ত্রণা যে ভদ্রলোককে ব্যথিত করেছে, সেটা বুঝে উঠতে আমার অসুবিধে হয়নি।

প্রসঙ্গত দুটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। একটি ওয়েলস-এর অপরটি ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের।

বছর চার আগে গিয়েছিলাম ওয়েলস-এ লানবেরিসের সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের ডিনোওরিক পাম্প স্টোরেজ পাওয়ার স্টেশন দেখতে। চারদিকে পাহাড়, সামনে লেক। গ্রীষ্মে এই অঞ্চলে প্রচুর ভীড়। ব্রিটেনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসে মানুষ। অবসর বিনোদনের ব্যাপারে এ যেন স্বর্গরাজ্য। কিন্তু সরকার যে মুহূর্তে এখানে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে এগিয়ে এল, বাদ সাধল এ অঞ্চলের জনসাধারণ। তারা পরিষ্কার জানিয়ে দিল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হোক, আপত্তি নেই, কিন্তু এখানে বেশি সংখ্যক রাস্তা করা চলবে না। গাড়ি চলার যে পথঘাট তৈরি হবে, তার যানবাহন যাতে এখানকার পশুপাখিদের বিরক্ত না করে সেটা দেখতে হবে। পথগুলিও এমন সব জায়গা দিয়ে নিয়ে আসতে হবে যাতে গাড়িঘোড়া চললেও খুব বেশি না শব্দ হয়। বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসুক, সেই সঙ্গে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মোট কথা মানুষের চোখে জায়গাটা কোনো মতেই দৃষ্টিকটু হবে না। এটা পার্ক। পার্কের পরিবেশে একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃতিক আকর্ষণ থাকা দরকার।

জায়গাটা ঘুরতে গিয়ে দেখেছি, নাগরিকদের এই দাবি উপেক্ষিত হয়নি।

এ বছর গিয়েছিলাম দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় এডিসন উইণ্ড এনার্জি ফার্ম-এ। জায়গাটার নাম তেহাচাপি। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ১০০ মাইল দূরে। রুক্ষ গিরিসংকটের ভেতর দিয়ে চলে গেছে ফ্রি ওয়ে। তারপর পার্বত্য এলাকা। পাহাড়গুলির মাঝে মাঝে সবুজ উপত্যকা। কিছু লোকালয় এবং খামার। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে এই অঞ্চলে প্রবাহিত হয় বাতাস। সেই বাতাসের শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্যে এখানকার ব্যাপক এলাকায় বসান হয়েছে বায়ুচালিত জেনারেটার। সংখ্যায় ৩৭০০। পাখাগুলি ঘুরছিল। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন অজস্র বন পাখি। ডানা মেলে আকাশে ওড়ার জন্যে প্রস্তুত। কাছে যেতেই কানে এল প্রচণ্ড শব্দ। গর্জনের মত। শুনলাম এই যন্ত্রগুলি ৪৫০ মেগাওয়াটের মত শক্তি উৎপাদন করছে।

শক্তি উৎপাদনের এমন উদ্যোগ অভিনন্দনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু এই দৃশ্য যে কোনো মানুষের মনেই সৃষ্টি করে প্রচণ্ড ধাক্কা। উপত্যকায় মসৃণ ঘাস। পাহাড়ে পাহাড়ে গাছপালা। প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ আকর্ষণ—শক্তি উৎপাদনের যন্ত্রগুলি যেন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

এডিসন সংস্থার জনৈক অফিসার বললেন, এটাই আমাদের কাছে এখন বড় রকম সমস্যা। অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় খামারবাসীরা। কাছাকাছি অঞ্চলে যাঁরা বাস করেন তাঁরাও। শুনলাম এ নিয়ে এডিসন সংস্থার বিরুদ্ধে তাঁরা আদালতে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁদের অভিযোগ, বায়ুচালিত যন্ত্র বসিয়ে তাঁরা ঐ এলাকায় অবাঞ্ছিত শব্দ সৃষ্টি করেছেন। সেই শব্দে এ অঞ্চলের পশুপাখি পালিয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রগুলি সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট করেছে। স্থানীয় অধিবাসী এবং ভ্রমণার্থীদের মনের উপর এটা পীড়ন ছাড়া কিছু নয়।

ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার কি মনে হয় আদালতে ওঁরা জিতবেন ?

ম্লান হেসে ভদ্রলোক বললেন, জিতবেন। তার জন্যে আমাদের প্রচুর আর্থিক গুনাগার দিতে হবে। জানেন তো, মার্কিন দেশের পরিবেশগত আইন খুবই কড়া ? এবং তা নাগরিকদর পক্ষেই যায় ?

॥ দুই ॥

পরিবেশ নিয়ে গত দুই দশকে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। ১৯৭২ সালে স্টকহোমে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আহ্বানে বসল বিশ্ব সম্মেলন। পৃথিবীর পরিবেশ যাতে ভারসাম্য না হারায় সে দিকে লক্ষ রেখে ওই সম্মেলনে কিছু কিছু কর্মসূচীও নেওয়া হয়। সেই কর্মসূচীর অন্যতম ফলশ্রুতি আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষণ প্রকল্প বা ইউনাইটেড নেশন্‌স এনভাইরনমেণ্ট প্রোটেকশন প্রোগ্রাম-এর রূপায়ণ। এই প্রকল্পে সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় ভৌতিক এবং জৈবিক পরিবেশ। মানুষ এই দুই পরিবেশ কি ভাবে নষ্ট করছে তার জন্যে বিস্তর প্রচার চলল। এ নিয়ে মৌলিক এবং প্রায়োগিক গবেষণায় হাত দিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী।

বলা হল, গত দেড়শ বছরে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় তিন শতাংশ বেড়ে গেছে। জীবাশ্ম জ্বালানি, অর্থাৎ কয়লা ও তেল এবং বনের কাঠ অতিমাত্রায় পোড়ানোর ফলেই এই বৃদ্ধি। কার্বন ডাই অকসাইড ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ণ উত্তাপের বেশ কিছু অংশ শোষণ করে আবহাওয়ার গড় তাপমাত্রা বাড়িয়েছে। এভাবে চললে আবহাওয়ায় ঘটবে বিপর্যয়। দেখা দেবে জল-ঝড়-কুয়াশা এবং প্লাবন। কলকারখানা মোটরগাড়ি থেকে পরিত্যক্ত হয় জ্বালানির অবশেষ—ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাস এবং বিষাক্ত কণা। মানুষ পশুপাখি এবং গাছপালার পক্ষে যা

খুবই ক্ষতিকর। অতিরিক্ত ফসল ফলাতে গিয়ে চাষের ক্ষেতে ছড়ান হয় প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেনঘটিত সার। আলোকরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেই সার থেকে নির্গত হয় প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেনের অকসাইড। এই অকসাইড বাতাসে ভাসমান নানা রকম রাসায়নিক কণা এবং সূর্যের আলোর সংস্পর্শে বাতাসের অকসিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ভূসংলগ্ন বায়ুস্তরে তৈরি করে ওজোন গ্যাস। এই গ্যাস উদ্ভিদের অকসাইড ঊর্ধ্বাকাশে ওজোন স্তরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ওজোন স্তরকে হালকা করে দিচ্ছে। আকাশ পথে বেড়েছে জেট বিমানের আনাগোনা। রঙ এবং রেফ্রিজারেটারে বেড়েছে ক্লোরিনঘটিত যৌগের ব্যবহার। বিমান থেকে নির্গত গ্যাসীয় জঞ্জাল এবং ওই ক্লোরিন যৌগও ঊর্ধ্বাকাশের ওজোন স্তরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। হাল্কা করে ওজোন স্তর। সূর্য থেকে বিকীর্ণ হয় অতিবেগুনী রশ্মি। সেই রশ্মির একটি বড় রকম অংশ শোষণ করে ওজোন স্তর। অতিবেগুনী রশ্মি মানুষের শরীরে ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে, ক্ষতি করে উদ্ভিদ এবং পশুপাখির। ওজোন স্তর সেই ক্ষতির হাত থেকে মানুষ, পশুপাখি এবং উদ্ভিদজগৎকে রক্ষা করে। ওজোন স্তর হাল্কা হয়ে গেলে ভূপৃষ্ঠে বাড়বে অতিবেগুনী রশ্মির মাত্রা। অতএব সমূহ বিপদ।

অরণ্য এবং ক্ষেতখামারে ছড়ান হচ্ছে অতিরিক্ত কীটনাশক রাসায়নিক যৌগ। এই সব যৌগ কীটপতঙ্গের হাত থেকে গাছপালা রক্ষা করে যেমন, আবার বিপদও ঘটায়। মাটিতে থাকে নানারকম প্রাণী যারা পরোক্ষভাবে মাটির উন্নতি ঘটায়। যেমন কেঁচো। কীটনাশকের সংস্পর্শে এসে এসব প্রাণী মারা পড়ে, মাটির ক্ষতি হয়। চাষের ক্ষেতে ছড়ান কীটনাশক যৌগ সেচ অথবা বর্ষার জলের ধোয়ানির সঙ্গে মিশে জলাশয়ে পড়ে ক্ষতি করছে মাছ এবং বিভিন্ন জলচর প্রাণীর। গত তিরিশ বছরে কমেছে পানকৌড়ি, ডাহুক এমন কত রকম প্রজাতিরই না পাখি। এর জন্যে দায়ী ডি ডি টি। খাদ্যের মাধ্যমে তাদের শরীরে গিয়ে ঢোকে ডি ডি টি। ডি ডি টি তাদের ডিমের খোসাকে করে নরম। তাই দেখা যায়, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সামান্য আঘাতেই ডিমগুলি ফেটে যায়। ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়ার অবস্থা থাকে না।

শহরের জঞ্জাল, প্রচণ্ড শব্দ, কলকারখানার রাসায়নিক জঞ্জাল এক বিরাট সমস্যা। অতিরিক্ত চাষের দরুন চাষের ক্ষেতের মাটি আলগা হয়ে যাচ্ছে। জল এবং বাতাসে সেই মাটি বাহিত হয়ে নদী-নালায় পড়ে তাদের বুজিয়ে দিচ্ছে। ফলে বর্ষার সময় নদী-নালায় দেখা দিচ্ছে প্লাবন। বলা হচ্ছে, চাষের ক্ষেত এবং জনবসতি, কলকারখানার প্রসার ঘটাতে গিয়ে কেটে ফেলা হচ্ছে অরণ্য। ফলে বহু পশুপাখি হয় বিলুপ্ত হয়েছে, নয়ত বা অস্তিত্বের প্রান্ত সীমায় এসে বিলুপ্তির জন্যে অপেক্ষা করছে।

উপকূলবর্তী শহর, কলকারখানা এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাতায়াতকারী জাহাজের জঞ্জাল মহাসাগরগুলির ব্যাপক এলাকা করে তুলেছে

ডিডিটি এবং অন্যান্য অনেক রাসায়নিক পদার্থ এই বাদামী পেলিকানগুলির মত অনেক প্রাণীকেই অবলুপ্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে

কলুষিত। বন্যা প্রতিরোধ, সেচ এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে গড়ে তোলা হয়েছে অজস্র বাঁধ। এর ফলে প্রতি বছর কোন কোন অঞ্চলে দেখা দিচ্ছে খরা, কোথাও প্লাবন। এ ছাড়াও বড় বড় বাঁধ কোন কোন এলাকায় ভূকম্পনের সম্ভাবনা বাড়িয়েছে। পরিবেশে ছড়াচ্ছে পারদ, ক্যাডমিয়াম এবং আরো কত রকমের বস্তু। জল এবং খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে এই সব বস্তু সৃষ্টি করে দুরারোগ্য রোগ। পক্ষাঘাত, হৃদরোগ, চর্মরোগ প্রজননগত প্রভৃতি।

সমুদ্রে উপচে পড়া তেল বহু প্রাণীর জীবন সংশয়ের কারণ

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন সৃষ্টি করেছে আরো একটি বড় রকম সমস্যা। এ ধরনের শক্তিকেন্দ্র বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের উৎস। পারমাণবিক বিভাজনের ফলশ্রুতি হিসেবেই পাওয়া যায় এই সব আইসোটোপ। যাদের মধ্যে রয়েছে স্ট্রনশিয়াম, সিজিয়াম, আইওডিন প্রভৃতির আইসোটোপ। মানুষ এবং পশুপাখির ক্ষেত্রে এগুলি খুবই ক্ষতিকর। পারমাণবিক জঞ্জাল বলতে মুখ্যত এগুলিই বোঝায়। যথাযথ সংরক্ষণ করতে না পারলে এ সব বস্তু বিপদ ঘটাতে পারে।

দেখা গিয়েছে ভূগর্ভ-জল নিয়ে সমস্যা। চাষের জন্যে বসান হয়েছে অজস্র অগভীর এবং গভীর কূপ। তাদের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জল তুলে সেচ এবং পানীয় জলের সমস্যা মেটান হচ্ছে। আর তা করতে গিয়ে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর গেছে অনেক নেমে। গভীর স্তরে থাকে বেশি পরিমাণে লোহা এবং বিভিন্ন ধাতু। তাই সেই জল জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করে যেমন, মাটিরও ক্ষতি করে।

বলাবাহুল্য ১৯৭২ সালের পর থেকে এমন হাজারো সমস্যার ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পরিবেশ দপ্তর এবং বহু স্বেচ্ছা-প্রতিষ্ঠান। পরিবেশের উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং যথাযথ ব্যবহারের জন্যে গ্রহণ করা হয়েছে নানা কর্মসূচী। তার সুফলও ইতিমধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ্ এবং সাধারণের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে নানা রকম কর্মোদ্যোগ। সারা দেশে বনসৃজন হচ্ছে, ভূমির অবক্ষয় রোধের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শহরাঞ্চলের

আবর্জনাবাহিত জল পরিশুদ্ধ করে নদীনালায় ফেলার ব্যবস্থা হয়েছে। অজৈব সারের পরিবর্তে চালু করার চেষ্টা চলছে জৈব সারের, কীটনাশক যৌগের পরিমিত ব্যবহার, শব্দ দূষণ রোধ, বায়ুদূষণ রোধ এসব নিয়ে কাজও এগিয়েছে অনেকটা। সেই সঙ্গে চলছে নানা বিষয়ে গবেষণা। যেমন, প্রজননবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাহায্যে চেষ্টা চলছে নতুন প্রজাতির বীজ উৎপাদনের। এমন ধরনের বীজ যাদের গাছ নিজস্ব জৈবিক ক্ষমতায় মাটির উপাদান এবং বাতাসের নাইট্রোজেনের সাহায্যে তৈরি করবে প্রয়োজনীয় সার। এর ফলে জমিতে আর অজৈব নাইট্রোজেন সার ছড়াতে হবে না। এ সব গাছপালার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে। ফলে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু বা কীট ধ্বংসের জন্যে জমিতে আর কীটনাশক যৌগ ছড়াতে হবে না। রাসায়নিক উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে জ্বালান হয় কয়লা, তেল। এতে পরিবেশ দূষিত হয়। চেষ্টা

নগর বিস্তৃত হচ্ছে, পিছিয়ে যাচ্ছে জঙ্গল। কী এর পরিণতি?

চলছে বিশেষ বিশেষ প্রজাতির জীবাণু তৈরি করার। এই সব জীবাণু জীবরাসায়নিক বিক্রিয়া চালিয়ে তাপ উৎপাদন করবে। চালাবে রাসায়নিক পদ্ধতি। অনেকের ধারণা, ভবিষ্যতে আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন জীবাণুর সাহায্যেই করা যাবে। জৈব জঞ্জাল থেকে উৎপাদন করা যাবে জ্বালানি গ্যাস, তাপ এবং বিদ্যুৎশক্তি।

॥ তিন ॥

কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন হাল আমলের বড় বড় শহরগুলি। যে ধরনের পরিকল্পনায় পুরনো এই শহরগুলি তৈরি হয়েছিল, এখন তা অচল। তখন এ ধরনের শহরে জনসংখ্যা ছিল কম। যানাহন কম এবং পুরনো আমলের। আবর্জনা পরিষ্কার এবং নালা নর্দমার ব্যবস্থা অপ্রতুল। এখন তাদের পরিধি যত না বাড়ছে, তার চেয়ে বাড়ছে জনসংখ্যা। বাসস্থান এবং অফিসকাছারির জন্যে এ ধরনের বেশির ভাগ শহরেই গড়ে উঠছে কংক্রিটের তৈরি বহুতল ঘরবাড়ি। তাদের ফাঁকে ফাঁকে অথবা প্রান্তীয় অঞ্চলে হাউজিং এস্টেট। প্রয়োজনের তুলনায় পথঘাট কম। যেমন কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে। কলকাতার অবস্থা তো শোচনীয়। এ শহরে মানুষের চাপ বেড়েছে দারুণ। বেশির ভাগ পথ ঘাট সংকীর্ণ এবং সেকেলে অবস্থাতেই পড়ে আছে। উত্তর কলকাতা এখনো কেন যে ভেঙ্গে পড়েনি সেটাই রহস্য। অলিগলি, ঘরবাড়ি চেপে বসেছে। অনেক জায়গায় সূর্যের আলোও পৌঁছতে পারে না। জঞ্জালের কথা না হয় বাদই রইল।

বড়বাজার তো নরককুণ্ড। দৈনিক এখানে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয়। এ ধরনের বিপণন কেন্দ্রগুলিকে বিদেশে বলে 'ডাউনটাউন'। সরকার এবং ব্যবসায়ীদের যুগ্ম উদ্যোগে ডাউনটাউনগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় বিদেশে। ব্যবসায়ীরা মনে করেন বিপণনকেন্দ্র পরিষ্কার থাকলে ক্রেতারা স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন। তাতে ক্রেতা বাড়বে। পরিবেশও ভাল থাকবে। কিন্তু তেমন কোনও বলিষ্ঠ উদ্যোগ কলকাতায় গড়ে ওঠেনি।

কলকাতার মত চাপাচাপি শহরের সব চেয়ে বড় সমস্যা ঘরবাড়ি। কংক্রিটের বাড়ি সারাদিন ধরে শোষণ করে সূর্যের উত্তাপ। রাতের দিকে সেই উত্তাপ বিকিরণের মধ্যে কিছুটা পরিত্যক্ত হলেও, দেখা গেছে ঘরবাড়ির দেওয়াল এবং ছাদে কিছু পরিমাণ উত্তাপ প্রতিদিন উদ্বৃত্ত হিসেবে জমতে থাকে। ফলে শহরের আবহাওয়ার তাপমাত্রা তার আশপাশের শহরতলি এবং গ্রামাঞ্চল থেকে সব সময়ই কিছুটা বেশি থাকে। এটাও এক ধরনের দূষণ। ইংরেজিতে বলা হয় থার্মাল পলিউশন। অতিরিক্ত তাপমাত্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ—রক্তসংবহন এবং ফুসফুসের রোগ সৃষ্টি করতে পারে। অতিরিক্ত তাপমাত্রার দরুন শহরের বাতাস বেশি মাত্রায় আর্দ্র থাকে, যে সব জায়গায় সূর্যের আলো পড়ে না সে সব জায়গা স্যাঁতসেঁতে হয়। অতিরিক্ত আর্দ্রতা স্যাঁতসেঁতে অবস্থাটি বাড়িয়ে দেয়। ঘটায় নানারকম ক্ষতিকারক ছত্রাক এবং জীবাণুর বাড়বাড়ন্ত। শহরের অভ্যন্তরে এবং আশপাশে জলাশয় থাকলে দেখা দেয় আরো একটি জটিল সমস্যা। শহরের পরিবেশে তাপমাত্রা বেশি। তার বাতাসে থাকে ধূলিকণা অথবা কলকারখানা এবং মোটর যান থেকে নির্গত বিভিন্ন কণা। অতিরিক্ত তাপমাত্রায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বাড়ে। জলাশয়ের জল এবং ধূলিকণা পরিচলন পদ্ধতিতে শহরের ঊর্ধ্বাকাশে মাঝে মাঝে সৃষ্টি করে মেঘ। মেঘ থেকে বৃষ্টি। সে বৃষ্টির কোনো সময়কাল নেই। বছরের সব সময়ই ঘটতে পারে। এ ধরনের আবহাওয়ার নাম দেওয়া হয়েছে 'মাইক্রোক্লাইমেট'। এ ধরনের আবহাওয়া পৃথিবীর পুরনো শহর, যেমন কলকাতা, বোম্বাই, লণ্ডন, টোকিও, নিউইয়র্ক এবং লস অ্যাঞ্জেলেস-এ দেখা যায়। যানবাহন চলাচলে বা বিঘ্ন ঘটায়, ঘটায় পথ দুর্ঘটনা এবং বিভিন্ন রোগ। বৃষ্টি ছাড়াও এই আবহাওয়া কুয়াশা এবং ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে।

ইদানীং আর এক ধরনের দূষণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। যাকে বলা হয় 'ভিসুয়াল পলিউশন'। বড় বড় শহরে গড়ে উঠছে খানিকটা জায়গা জুড়ে একই ধাঁচের ঘরবাড়ি। যাদের নাম দেওয়া হয়েছে হাউজিং এস্টেট। সমান উচ্চতা, একই রঙ, একই জ্যামিতিক গঠনের ঘরবাড়ি নিয়ে গড়ে তোলা হয় এক একটি এস্টেট। দেখা গেছে কিছুদিন বাস করার পর এই সব ঘরবাড়ির বাসিন্দাদের মনের উপর সৃষ্টি হয় চাপ। ঘর বাড়ির একঘেঁয়ে গঠন তাদের চোখে পীড়ন সৃষ্টি করে। তারা মানসিক অবসাদের শিকার হয়। শহরের অভ্যন্তরে বহুতল বাড়িরও প্রতিক্রিয়া একই ভাবে দেখা দেয়। পথচলতি মানুষের চোখে ছোট্ট আকাশ, বাড়িগুলি দৈত্য। তাদের মনে হয়, এই বুঝি তাদের নিচে তারা চাপা পড়ল। শহরবাসীদের কাছে এটাও একটি বড় রকম মানসিক অস্বস্তি। দীর্ঘদিন এভাবে চললে নানা রকম মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে।

এইসব সমস্যা থেকে কিছুটা মুক্ত থাকার জন্যই শহরের অভ্যন্তরে গড়ে তোলা হয় একাধিক পার্ক। সেই পার্কের মাথার উপর থাকবে খোলা আকাশ। তার বিস্তৃত পরিবেশে থাকবে নানারকম গাছপালা, ফুলের কুঞ্জ, হয়ত থাকবে ছোট লেক। অথবা দায়হীন পদচারণার মত কিছুটা সবুজ মাঠ। এমন একটি পরিবেশ যেখানে গেলে কিছুক্ষণের জন্যে একঘেঁয়েমি ভুলে থাকা যায়। বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করা যায়। এ ধরনের পার্ক শহরের বদ্ধ বাতাস দূর করতেও সাহায্য করে।

সমস্যা হল, শহর কলকাতায় সে সুযোগ দ্রুত কমে গেছে। এ শহরে আদর্শ পার্ক বলতে যা বোঝায়, তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। ইদানীং কোনো কোনো পার্ককে শহর কর্তৃপক্ষ নতুন দিল্লির কনট সার্কাসের মত গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা ভাবছেন। ভূপৃষ্ঠে পার্ক, ভূগর্ভে বিপণন কেন্দ্র। রডন স্কোয়ার নিয়ে চলছে টানাপোড়েন। বলা হচ্ছে, একশ বছরের ওটা এঁদো পুকুর, পার্ক নয়। অতএব সেই পুকুর বুজিয়ে, সেখানে বিপণন কেন্দ্র খুললে ক্ষতি কি! ব্যাপারটা দুঃখের। একদা সেটা পার্কই ছিল। নগর পরিচালকদের উপেক্ষায় এখন তা এঁদো পুকুর। এটা পুকুরের কোনো দোষ নয়। সেটা সংস্কার করে সেখানকার পরিবেশ পার্কের মত গড়ে তোলাই তো যুক্তিযুক্ত। তা না করে সেখানে বিপণন কেন্দ্র খুললে কিছু লোকের হয়ত চাকরি হবে, কিন্তু সেখানকার অধিবাসীদের পক্ষে সেটা মোটেই কল্যাণের হতে পারে না।

ভূগর্ভস্থ বিপণন কেন্দ্রের উপর পার্ক—এমন টু-টায়ার ব্যবস্থা অপ্রাকৃতিক, মানুষের কাছে অসহনীয়ও। গোড়ায় মেজর সাহেবের জবানিতেই তা বোঝা যায়। পার্কের একটি নিজস্ব সত্তা থাকে। সুকোমল আকর্ষণ থাকে। সেখানে বাজারের পরিবেশ গড়ে তুললে তার মূল উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হয়। পার্ক পরিকল্পনার সময় সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। ■

জেতার চাবি যাঁদের হাতে

অশোক রায়

সব ক্রিকেট দলগুলির সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দুতে দু'একজন মধ্যমণি থাকেন। নির্ভরতার নিউক্লিয়াস। রিলায়েন্স কাপে যে আটটি দল এসেছে তার প্রতিটির মধ্যেই আছে একটি কিংবা দুটি 'কি-ম্যান'। এঁরাই দলের মেরুদণ্ড ; সাফল্যের প্রয়োজনে এঁরা প্রায় অপরিহার্য।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভিভিয়ান রিচার্ডসের কথা দিয়েই তবে 'স্টার্ট াভ-অল' বলি। অনেকেরই ধারণা বলা বাহুল্য ভুল ধারণা) মেজাজ এবং মানসিকতায় পার্থক্য রয়েছে লে টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটে মানভাবে সফল হওয়া যায় না। ভভ প্রমাণ করেছেন যোগ্যতা থাকলে দু ধরনের ক্রিকেটেই সমান াফল্য পাওয়া যায়। প্রায় সাড়ে ছ াজার টেস্ট রান-করা ব্যাট থেকেই এসেছে একদিনের ক্রিকেটের ১৯৬ রান (যার মধ্যে সেঞ্চুরি টি, সর্বোচ্চ ১৮৯ নট আউট)।

রিচার্ডস সম্পর্কে আমাদের একটা অন্য দুর্বলতা আছে। কারণ ৭৪ সালে প্রথম টেস্ট খেলতে ামেন ভিভ ভারতেরই বিরুদ্ধে। াঙ্গালোরে প্রথম টেস্টে ন্দ্রশেখরের লেগ স্পিন, গুগলি ার টপ স্পিনের তফাত বুঝতে ঝতেই ইনিংস দীপ নিবে যায় ভভের। কিন্তু এই হোমওয়ার্কটুকু য সত্যিই মন দিয়ে করা পরের টস্টেই তা দেখালেন ভিভ। চন্দ্রর লগ স্পিনে কামড় রইল না, বেদির ার্মার ঢোঁড়া সাপের যোগ্যতা পল, বেঙ্কটের অফ স্পিনের ধার ভোঁতা হয়ে গেল। একশোর ্যাজিক ফিগারে এসে পৌঁছলেন ভভ। সংযত শতরান। াত্মসম্মানীও।

এর পর শুরু হল আক্রমণ, জেকে নতুনভাবে চেনানোর য়োজন। বেঙ্কটকে দু পা এগিয়ে সে তুললেন নির্বিকার শ্চিন্ততায়। বল আকাশ পথে াজা উড়ে গেল স্ট্যাণ্ডে। না,

শ্রীকান্ত যেদিন ফর্মে ভারতও সেদিন ফর্মে
পাক ব্যাটিংয়ের মূল স্তম্ভ মিয়াঁদাদ

ছবি : নিখিল ভট্টাচার্য

স্ট্যাণ্ডে নয়, দর্শকাসন টপকে পেছনের লাগোয়া ফুটবল মাঠে। বিশাল ছক্কা। ওই এক মুহূর্তেই বোঝা হয়ে গেল, এবার থেকে বহু বোলারই এভাবে তাচ্ছিল্যে নির্বাসিত হবেন মাঠের বাইরে। ভিভ থেমেছিলেন ১৯২ রানে। এবং এরপর থেকে এই ধারণাটা তৈরি হয়ে গেল ব্যাট হাতে এই লোকটি ক্রিজে আসা মানেই রান-রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারের স্বেচ্ছাচারের শুরু। সেই প্রথম দেখা গেল অফ স্টাম্পের এক হাত বাইরের বল নিক্ষিপ্ত হচ্ছে স্কোয়ার লেগ থেকে মিড উইকেটের মধ্যে দিয়ে। লেগ স্টাম্পের বাইরের বল বিস্ময়করভাবে ছুটছে পয়েন্ট থেকে এক্সট্রা কভারে। পা, মাথা, কাঁধ, শরীর কিংবা ব্যাট অধিকাংশ সময়ই ব্যাকরণ-বিরোধী। তবু রান আসছে। এবং ব্যাটে-বলে হওয়ামাত্র ফেন্সিংয়ের ঝনঝন শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে শটের পেছনে পাঞ্চ কতখানি দানবিক! হ্যাঁ, এভাবেই ভিভ উঠে এসেছেন, একেবারে নিজস্ব ভঙ্গিতে। ব্যাট হাতে প্রভুত্ব করতে।

এবারের রিলায়েন্স কাপে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টিমে লয়েড নেই। নেই গ্রিনিজ এবং ল্যারি গোমস। ব্যাটিংয়ের পুরো দায়িত্ব রিচার্ডসের হাতে। কারণ হেনেস বাদে বাকিরা নতুন। ভঙ্গুর। তার ওপর মার্শাল, গার্নার, হোল্ডিং নেই। অনভিজ্ঞ পেসারদের সামনে অনুপ্রাণিত করার জন্য বড় রানের ইনিংস সাজিয়ে দিতে হবে রিচার্ডসকেই।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে যেমন রিচার্ডস, পাকিস্তান দলে তেমনি জাভেদ মিয়াঁদাদ। ব্যাটিংয়ের মূল স্তম্ভ। মাঠের বাইরে মিয়াঁদাদের অ্যাপ্রোচ খুব আলগা। হাসি-ঠাট্টা, অন্যের পিছনে লাগায় ওস্তাদ। বিশ্বাস করা কঠিন এই লোকটি মাঠে নামামাত্র পাল্টে যান কি অদ্ভুতভাবে। দলের বিপদেই সবচেয়ে বেশি করে টের পাওয়া

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে নেই ক্লাইভ লয়েডের মতো দক্ষ অধিনায়ক এবং নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান

যায় ক্রিজে মিয়াঁদাদ আছেন। এবং আছেন নির্ভরতা, প্রেরণা, বিশ্বাস নিয়ে। সিংহ-হৃদয় ক্রিকেটারটির মধ্যে আছে টগবগে লড়াই। জয়ের জেদ। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত সিরিজের শুরুতে মিয়াঁদাদ পাকিস্তান দলের সঙ্গে যেতে পারেননি। দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হওয়ায় তিনি ছিলেন স্বদেশে, স্ত্রীর কাছে। চিন্তিত অধিনায়ক ইমরানকে আশ্বস্ত করতে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে দ্বিতীয় ম্যাচেই সাসেক্সের বিরুদ্ধে হাঁকান সেঞ্চুরি। শুধু তাই নয়, টেস্ট সিরিজেও সর্বোচ্চ রান করেন, যার মধ্যে ২৬০ রানের একটা ক্লাসিক ইনিংস ছিল।

মিয়াঁদাদের কথা উঠলেই শারজায় ম্যাচের শেষ বলে ছক্কা মারার কথাটা এসে যায়। দীর্ঘদিন পরেও এই আলোচনা অনিবার্যভাবেই এক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায় আমাদের—ওই সময় মিয়াঁদাদ ছাড়া অন্য কেউ ক্রিজে থাকলে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান কি সত্যিই ম্যাচ জিততে পারতো? মিয়াঁদাদ না থাকলে কি হত সেটা সত্যিই অনুমানের বিষয়! কিন্তু তিনি থাকা মানেই তো জয়, জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবা সম্ভব নয়।

একদিনের ক্রিকেটে প্রায় চার হাজার রান (৩টি সেঞ্চুরি) সংগ্রহকারী মিয়াঁদাদ যদি ব্যাটিং বুনিয়াদ হন তা হলে নিঃসন্দেহে পাক-বোলিংয়ের সেরা অস্ত্রটি—ইমরান। ভারতের পিচে নখদন্তহীন ইমরানকে ইংল্যাণ্ড সফরে দেখা গেল তিনি ইমরানই আছেন। বলে সেই গতি, বিপজ্জনক লিফট, দুর্দান্ত ইনকাটার। দু দেশের মধ্যে সেরা উইকেট সংগ্রাহক (২১টি) হতে কোন অসুবিধা হয়নি তাঁর। ইমরানের সবচেয়ে বড় গুণ ওই গতির বোলার হয়েও লেংথ ও লাইন বজায় রাখেন চমৎকার। অতীত দিনের ব্রায়ান স্ট্যাথামের কথা মনে পড়ে। এই উপমহাদেশের পিচে রিলায়েন্স কাপের খেলাতেও ইমরানের বিধ্বংসী ফর্মের দিকে, সুতরাং পাকিস্তানকে তাকিয়ে থাকতেই হবে।

ইমরানের অবশ্য ভাগ্যটা ভাল যাচ্ছে। অধিনায়ক হিসাবে যা কিছু করছেন সাফল্য পাচ্ছেন। অধিনায়কত্ব সম্পর্কে রিচি বেনো বলেছিলেন, 'সফল অধিনায়কত্বের পিছনে ভাগ্যের একটা বড় ভূমিকা আছে। ইমরানের ক্ষেত্রেও ভাগ্যের এই ধারাবাহিক সহায়তাটুকু পাওয়া প্রয়োজন।'

রিলায়েন্স কাপে ভারতের প্রধান ভরসা নিঃসন্দেহে কপিলদেব। অন্তত পারফর্মেন্সের দিক দিয়ে গত বিশ্বকাপে কপিল ছিলেন বিশ্ব সেরা (৩০৩ রান এবং ১২ উইকেট)। '৮৩ সালে ভারতের বিশ্ব কাপ জয়ের পিছনে কপিলের অবদান সর্বাধিক এই ধারণা শুধু এই জন্য নয় যে, তিনি জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে অলৌকিক ১৭৫ রানের ইনিংস খেলে ভারতকে উদ্ধার করেছিলেন। এবং এ জন্যও নয় যে, তিনি নিখুঁত অধিনায়কত্ব করার জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছিলেন স্যার লেন হাটন, আসিফ ইকবাল, ক্লাইভ লয়েড প্রমুখের। অধিনায়ক কপিলকে ব্যাটে-বলে আত্মদৃষ্টান্তে দলকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রাণপাত করতে হবে, কপিলদেব ছাড়া অন্যান্য অল-রাউণ্ডারদের বিশ্বকাপের পারফরমেন্সের তুলনা করলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা। বথাম (৪০ রান, ৮ উইকেট), হ্যাডলি (৭১, ১৪), ট্রেভর চ্যাপেল (১৩৯, ৪), রবার্টস (৫৩, ১১), ইমরান (২৮৩, উইকেট নেই), ডি'মেল (৬৬, ১৭), ফ্লেচার (১৯১, ৭)।

কপিলদেবই পৃথিবীর একমাত্র ক্রিকেটার, ওয়ান ডে ক্রিকেটে যাঁর দু হাজার রান এবং শতাধিক উইকেট। পাঁচ কিংবা ছ নম্বরে ব্যাট হাতে দ্রুত কিছু রান তোলা এবং বল হাতে, বিশেষত, সেকেণ্ড স্পেলে (স্লগ ওভারে) টাইট লাইন ও লেংথে বিপক্ষকে বেঁধে রাখার ক্ষেত্রে এবারও কপিলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেই হবে।

বেপরোয়া কপিলের ব্যাট কতখানি ভয়ঙ্কর হতে পারে সে সম্পর্কে একটা ছোট্ট উদাহরণ এই প্রসঙ্গে সাজিয়ে দেবার লোভ সামলানো যাচ্ছে না।

ডাইনোসর বা টেরোড্যাকটিল ইত্যাদি সরীসৃপ দানবদের পদভারে প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবী একসময় কাঁপত। আশির দশকে ক্রিকেট বিশ্ব কেঁপেছে চার ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান পেসার রবার্টস-হোল্ডিং-মার্শাল-গার্নারের পেস ঝাপটায়। গতি এবং ভয়াবহতার তুঙ্গে-থাকা চার পেসারের বিরুদ্ধে অধিনায়ক কপিলের ব্যাট ঝলকে উঠেছিল '৮৩ পোর্ট অব স্পেনে। ৩টি ছয় এবং ১৩টি চারে সাজানো সেঞ্চুরিটি অর্জিত হয় মাত্র ৯৬ বলে।

আমরা জানি, অলৌকিক ইনিংস বারে বারে খেলা যায় না। কিন্তু বিশ্ব কাপের সোনালি হাতছানির জন্য কপিলদেবকে চাই শুধু ওই মেজাজে। আরেকবার। অকম্প কলিজার জন্যই তো তিনি কপিলদেব।

কপিলের সঙ্গে আরেকজন ভারতীয়র কথা প্রায় এক নিঃশ্বাসে চলে আসে—শ্রীকান্ত। ইনিংসের প্রথম শটটি থেকেই যিনি জীবনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। '৮৩ বিশ্ব কাপ ফাইনালে শ্রীকান্ত সর্বোচ্চ রান করেছিলেন শুধু এটা নয়, যে প্রচণ্ড স্কোয়ারড্রাইভে রবার্টসকে বাউন্ডারিতে পাঠিয়েছিলেন (বিস্মিত টিভি দর্শকদের ধারণা বলটা এখনও যাচ্ছে) সম্ভবত তারই মধ্যে ভারত খুঁজে পায় মাথা উঁচু করার সাহস এবং আত্মবিশ্বাস। ক্রিজের অন্য দিকে দাঁড়িয়ে গাওস্কর তাঁর চোখ দিয়ে শ্রীকান্তকে যেভাবে দেখেছেন এই প্রসঙ্গে তা একবার ফিরে দেখা যেতে পারে। "অসাধারণ রিফ্লেক্স, তীক্ষ্ণ চোখ। একটা ফাস্টেস্ট ডেলিভারিও অন্য যে কোন ব্যাটসম্যানের চেয়ে আগে পিক-আপ করার মত চোখ তার। আর রিফ্লেক্সটা এতই চমৎকার যে সেই বলেও শট নেবার মত বাড়তি কয়েক সেকেন্ড সময় বেশি পায়। এবং এই ব্যাপারগুলো সে পলকে ঘটাতে পারে বিপক্ষে হোল্ডিং, মার্শাল, ইমরান, বথাম, হ্যাডলি যে-ই থাকুক না কেন।" হ্যাঁ অল্প কথায় এই হলেন শ্রীকান্ত। ম্যাচের ওপর, বিপক্ষের সর্বনাশা পেসারের ওপর, প্রভাব বিস্তার করতে হলে ব্যাট হাতে শ্রীকান্তকে শ্রীকান্তর মতই খেলতে হবে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেস্টে এবং কলকাতায় ওয়ান-ডে ম্যাচে শ্রীকান্ত সেঞ্চুরি করেন। ইমরান-আক্রম-কাদির এতখানি

াঙ্খিত ইদানীংকালে আর কারোর
্যাটে হয়েছেন কি না সন্দেহ। ভাবা
ায়, ইমরানকে হুক করেছেন, বল
াক মানুষ সমান উঁচু দিয়ে মাঠের
াইরে পড়েছে ? শটের পেছনে কি
রিমাণ জোর থাকলে ওই উচ্চতায়
ল সীমানা টপকায়। হ্যাঁ, আবার
লছি এই হলেন শ্রীকান্ত।
্রাইভ-লোলুপ শ্রীকান্তের কাছে
সইটাই সবচেয়ে পছন্দসই উইকেট
যখানে বল পড়ার পর দ্রুত গতিতে
ছাটে। যে দিনটা সত্যিই শ্রীকান্তের
সদিন তিনি যে কোন বোলারকে
ন করে ফেলতে পারেন।
রিলায়েন্স কাপে ভারতকে জয়ের
সম্ভাবনায় উজ্জ্বল থাকতে হলে
শ্রীকান্তকে নিজের ফর্মে দেখতে
পাওয়া চাই।

অস্ট্রেলিয়া দলটি এই মুহূর্তে
বই সাদামাটা। ইদানীং সিরিজ
য়ের ঘটনা তারা প্রায় ভুলতে
সেছে। চারপাশের অন্ধকারের
ধ্যে আলোর সামান্যতম রেশ না
াকা সত্ত্বেও অভিমন্যুর হৃদয় নিয়ে
কা লড়াই করার চেষ্টা চালাচ্ছেন
ধিনায়ক অ্যালান বর্ডার। খুবই
বাক ঘটনা, অস্ট্রেলিয়ার মত এক
শাল ক্রিকেট জাত হঠাৎ এমন
ারকাহীন হয়ে পড়ল কী করে ?
র্ডার ছাড়া কোন ওয়ার্ল্ড ক্লাস
ক্রিকেটার দলে না থাকাই প্রমাণ
রে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কতখানি
ংস।

স্টাইলিস্ট ক্রিকেটারের
ালিকায় বর্ডার পড়েন না। কিন্তু
াশাপাশি এটাও অস্বীকার করার
পায় নেই সাম্প্রতিককালে যে
কান পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়াকে
বচেয়ে নির্ভরতা জুগিয়েছেন এই
-হাতি ব্যাটসম্যানটি। গ্রেগ
্যাপেল ক্রিকেট থেকে সরে
াঁড়াবার পর বর্ডারই ধারাবাহিক
ান দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াকে। প্রায়
াত হাজার ছুঁই-ছুঁই টেস্ট রানের
সেঞ্চুরি ২১টি) মালিক বর্ডার
য়ান-ডে ক্রিকেটেও ব্যাট হাতে
ফল। সেখানেও তাঁর ব্যাটে উঠে
সেছে ৩৯৫২ রান (সেঞ্চুরি
টি)। কিন্তু একা বর্ডার যত বড়
্যাটসম্যানই হোন, অধিনায়ক
িসাবে তিনি কিন্তু
হ-খেলোয়াড়দের সেভাবে উদ্বুদ্ধ
রতে পারেননি। অনুপ্রেরণায় বা
য়ের জেদে অস্ট্রেলিয়ানদের
গবগ করে ফোটাতে না পারার
্যর্থতাটুকু কিন্তু অধিনায়ক বর্ডারকে
তেই হবে।

ওয়ান-ডে সিরিজে ভারতকে চূর্ণ করার পর পাকিস্তান ১—২ ফলে একদিনের সিরিজ হেরেছে ইংল্যাণ্ডের কাছে। এমনকি শারজায় একটা দুর্বল ইংল্যাণ্ড দলের কাছেও হার স্বীকার করে পাকিস্তান। এই মুহূর্তে ইংল্যাণ্ড টিমে বথাম বা গাওয়ার নেই। সেই অর্থে 'তারকা' ক্রিকেটার কেউ নেই দলে। তবে সত্যি বলতে কি, এককভাবে না হলেও দলগতভাবে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু করায় টিমটা খারাপ চলছে না। এবং এজন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন অধিনায়ক মাইক গ্যাটিং।

আভিজাত্যের উপাদান না থাকলেও এই মুহূর্তে ইংল্যাণ্ড টিমে তারকার মর্যাদা পেতে পারেন সম্ভবত গ্যাটিংই। দুর্ধর্ষ ফর্মে আছেন। এম সি সি-র বাই-সেন্টেনারি ম্যাচে বিশ্বের সেরা বোলিংয়ের বিরুদ্ধে হাঁকান ১৭৯ রান। তার ঠিক আগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে করেন দুটি সেঞ্চুরিসহ (একটি ইংল্যাণ্ডের নিশ্চিত হারের মুখে) ৪৪৫ রান, দু দেশের মধ্যে যা সেরা সংগ্রহ। রিলায়েন্স কাপে গ্যাটিংয়ের ব্যাটিং আরও সাফল্য পেতে পারে। কারণ গত ভারত সফরে গ্যাটিং উল্লেখযোগ্য রান পাওয়ায় এই উপমহাদেশের পিচ সম্পর্কে তাঁর ধারণা যথেষ্ট পরিষ্কার। তবে একটা কথা বলে নেওয়া ভাল—ওয়ান-ডে ক্রিকেটে প্রায় দেড় হাজার রানের অধিকারী গ্যাটিংয়ের কিন্তু ম্যাচের রং বদলে দেবার মত বিধ্বংসী ক্ষমতা নেই।

ম্যাচের ভাগ্য উল্টে দেবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু মোটামুটি নির্ভরতা দিতে পারেন এমন ক্রিকেটার শ্রীলঙ্কার 'পকেট সাইজ' ক্যাপ্টেন দিলীপ মেণ্ডিস এবং রয় ডায়াস। দুজনেই ব্যাটসম্যান হিসাবে উচ্চাঙ্গের। ওয়ান-ডে

দুর্ধর্ষ ফর্মে আছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইক গ্যাটিং

শ্রীলঙ্কার রয় ডায়াস

ক্রিকেটে হাজারের ওপর রানও আছে। কিন্তু আমার মনে হয় শ্রীলঙ্কা দলের 'কি-ম্যান' অলরাউণ্ডার অর্জুন রণতুঙ্গা। অর্জুন বুদ্ধিমান ক্রিকেটার। শ্রীলঙ্কার ভবিষ্যত অধিনায়কত্বের সম্ভাবনা ওঁর মধ্যে আছে। ব্যাটে-বলে সমান পারদর্শী। প্রয়োজনে আক্রমণাত্মক এবং রক্ষণাত্মক খেলতে পারেন, যেটা একদিনের ক্রিকেটের পক্ষে খুবই দরকারি (রান ১০৪৮)। '৮৬-৮৭

পাকিস্তানের অধিনায়ক ইমরান খাঁ

সিরিজে কানপুরে ১৪ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ভারতকে রীতিমত বিপদে ফেলে দিয়েছিলেন। গুয়াহাটিতে ওকে প্রশ্ন করেছিলাম, "কোন ক্রিকেটারকে দেখতে সবথেকে আগ্রহী ?" অর্জুন বলেছিলেন, "নিজেকে, দশ বছর বাদে।" হ্যাঁ, এখন তৈরি হচ্ছেন অর্জুন, বেড়ে ওঠার লক্ষ্যে। বলা যায় না, হয়তো রিলায়েন্স কাপেই দেখা যাবে তিনি আরও এগিয়ে এসেছেন।

নিউজিল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় ভরসা রিচার্ড হ্যাডলি না আসায় নির্ভরতার কেন্দ্রে মার্টিন ক্রোকে ভাবা ছাড়া উপায় নেই। বিশ্বর সবচেয়ে বিপজ্জনক ফাস্টবোলিংসমৃদ্ধ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক টেস্ট সিরিজে ২টি সেঞ্চুরিসহ ৩২৮ রান করেন যা নিউজিল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ (একমাত্র গ্রিনিজের ওঁর চেয়ে বেশি রান ৩৪৪)। তিন ম্যাচের ওয়ান-ডে সিরিজেও ক্রোর রান দলের পক্ষে ছিল সর্বাধিক (১০২)। ভিভ

ছবি : শৈবাল দাস

রিচার্ডসের পরিবর্তে সমারসেট কাউন্টিতে যোগ দেন। এবং প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে থেকেও দলের সেরা ব্যাটসম্যানের ভূমিকা পালন করেন ৬৭.৭৯ গড়ে ১৬২৭ রান করে। নিউজিল্যাণ্ডের ঘরোয়া ক্রিকেট মরসুমেও সেরা ব্যাটসম্যানের স্বীকৃতি রেডপাথ পুরস্কার পান ক্রো। দু হাজার টেস্ট রান এবং একদিনের ক্রিকেটে দেড় হাজার রানের অধিকারী মার্টিন ক্রো আক্রমণে যতখানি অবাধ, ডিফেন্সেও ততখানি নিশ্ছিদ্র।

আই সি সি ট্রফি জয়ী জিম্বাবোয়ে এবারও বিশ্ব কাপে খেলার অধিকার পেয়েছে। গতবার বিশ্ব কাপে অস্ট্রেলিয়াকে গ্রুপ ম্যাচে পরাজিত করা এবং ভারতকে ১৭ রানে ৫ উইকেট ফেলে দিয়ে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া ছাড়া তেমন কিছু করেনি। এবারের দলে

নিউজিল্যান্ডের ভরসা মার্টিন ক্রো

শেষ হাসিটি কে হাসবেন—ভিভ রিচার্ডস না কপিলদেব ?

সব থেকে নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটার অলরাউণ্ডার কেভিন কারেন। গত বিশ্ব কাপে কারেন করেন ২১২ রান এবং পান ৫ উইকেট। বলে যথেষ্ট জোর আছে। সঙ্গী ফাস্টবোলার রসনের সঙ্গে এই কারেনই ভারতকে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে বিচার করলে অবশ্য ৪০ বছর বয়সী জিম্বাবোয়ের অধিনায়ক জন ট্রাইকস আছেন। ১৯৬৯-৭০ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি টেস্ট খেলেন তিনি। দীর্ঘদেহী এই অফ স্পিনার ভারতের ধীর গতির স্পিন সহায়ক উইকেটে কিঞ্চিৎ সাফল্যের মুখ দেখলে অবাক হবার থাকবে না।

তবে যে দলে যে তারকাই থাকুন না কেন ওয়ান-ডে ক্রিকেটে জিততে হলে টিমের ফিল্ডিংই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেরা ফিল্ডারের সম্পদ কোন দলে রয়েছে সেটাও এই প্রসঙ্গে একটু দেখে নেওয়া যাক।

ইমরান এবং গাওস্কর একাদশের মধ্যে প্রদর্শনী ক্রিকেট টিভির দৌলতে যেটুকু দেখা গেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে ভারতীয়রা মোটামুটি চমৎকার ফিজিক্যাল কণ্ডিশনে আছেন। আজহারকে যেভাবে পলকে বল তুলে বার তিনেক অভ্রান্ত থ্রোতে স্টাম্প ছিটকে দিতে দেখা গেল, তাতে স্পষ্ট হল তিনি ক্ষিপ্রতার তুঙ্গে রয়েছেন। ফিল্ডিং-এর গুণে বিশ্বের যে কোন টিমে হেঁটে-হেঁটে ঢুকে যাবেন আজহার। আজহারের সমগোত্রীয় আরেকজন হলেন মনিন্দর। কপিল, শ্রীকান্তও খুব পিছিয়ে নেই। ক্যাম্পে অরুণলালও ছিলেন চমৎকার কণ্ডিশনে। বিনির সাম্প্রতিক মেদ বৃদ্ধির কথা বাদ দিলে এটা বলা যায় লুকোবার মত ফিল্ডসম্যান আপাতত দলে কেউ নেই।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সেরা ফিল্ডার নিঃসন্দেহে রজার হার্পার। ওই দীর্ঘ শরীর চকিতে নামিয়ে যেভাবে বল পিক-আপ করেন এবং একই অ্যাকশনে ছোঁড়েন তা দেখার মত। আউটফিল্ডে অন্তত তিরিশ রান বাঁচাবার মত ছাঁকনিটি—গাস লোগি। স্লিপে রিচার্ডস (৬০টি ক্যাচ) এবং বিশ্বকাপের সেরা উইকেটকিপার জেফ দুজোঁ (১১৭ ক্যাচ, ১৩টি স্টাম্পিং) থাকছেন উইকেটের পেছনে, ঈগলের তৎপরতা নিয়ে। হেনেসের ক্যাচ ধরার সুনাম আছে যথেষ্ট।

পাকিস্তান টিমে নিঃসন্দেহে কীর্তিমান ক্রিকেটার হানিফের পুত্র শোয়েব মহম্মদ। পয়েন্টে শোয়েবের ক্ষিপ্রতা আমরা দেখেছি। অনেকখানি জায়গাও কভার করেন তিনি। সিলি পয়েণ্টে দাঁড়িয়ে ব্যাটসম্যানের সঙ্গে অহেতুক বকবক করে তাঁর স্নায়ুর ওপর চাপ ছড়াতে থাকবেন মিয়াঁদাদ। সহজ ক্যাচ অবশ্য পড়তে দেখেছি শ্লথগতির কদিরের হাত থেকে। তবে সব মিলিয়ে পাকিস্তানের গ্রাউণ্ড ফিল্ডিং উপেক্ষণীয় নয়।

টিমে একজন ডেরেক র‍্যাণ্ডালের মত ফিল্ডার নেই। নেই স্লিপে ফ্লেচারের মত বিশ্বস্ত কেউ। তবু একদিনের ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতায় ইংল্যাণ্ড প্রত্যাশাতীতভাবে এগিয়ে রয়েছে অন্যদের থেকে। কীভাবে রান বাঁচাতে হয়, কীভাবে একজনের ফিল্ডিং দুর্বলতা ঢেকে দিতে হয় পেশাদার ইংরেজরা তা ভালই জানেন। আলাদাভাবে কারুর নাম সেভাবে না উঠলেও ইংল্যাণ্ডের সার্বিক ফিল্ডিং ভালই।

টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডিং একসময় উচ্চ স্তরের ছিল। কিন্তু গ্রেগ ম্যাথুজ না আসায় টিমে দুর্দান্ত ফিল্ডারকে আলাদাভাবে চিনে নেওয়া মুশকিল। উইকেটকিপার টিম জোহরার কিংবা স্লিপে বর্ডার 'সেফ ক্যাচার'। কিন্তু আউট ফিল্ডে স্টিভ ওয়াগ ছাড়া নজরে পড়ার মত কে আছেন ? অথচ এই অস্ট্রেলিয়া টিমে একসময় পল শিহানের মত ফিল্ডার দেখেছি। স্লিপে সিম্পসন, ইয়ান কিংবা গ্রেগ চ্যাপেলের মত বিশ্বস্ত হাত এখন কোথায় ?

নিউজিল্যাণ্ড দলে সিলেকশন কমিটির ডন লিলি বলেছেন, এবারের বিশ্ব কাপের মত নিউজিল্যাণ্ড আর কখনও ফিটনেসের দিকে জোর দেয়নি। জিন ব্রেয়ারের তত্ত্বাবধানে শিবিরে কড়া শারীরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ট্রেনিংয়ের চাপে ৩৭ বছর বয়সী ইয়ন চ্যাটফিল্ড তো বলেই ফেলেছেন, "রীতিমত মাসলম্যান হয়ে ওঠাটা খারাপ নয়। তবে সেই সঙ্গে ক্রিকেটটাও তো খেলতে হবে।"

তবে লিলি একটা কথা বলেছেন যা থেকে বোঝা যাচ্ছে নিউজিল্যাণ্ড ফিল্ডিংয়ের ওপর জোর দিয়েছে কতখানি। "প্রত্যেকটা ওয়ান-ডে ম্যাচে দলের তিনজন জঘন্য ফিল্ডারও যদি দশটা করে রান বাঁচাতে পারে তা হলে উপকারটা নিউজিল্যাণ্ডেরই।"

শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের বয়সের গড় কিছুটা কমই (২৬ বছর)। সেই দিক দিয়ে মাঠে নড়াচড়ার ক্ষেত্রে টগবগ করা উচিত। ২৫ জনের দলে অন্তত ১২ জনের বয়স ২৫ পার হয়নি। উইকেটের পেছনে কুরুপপু মোটামুটি বিশ্বস্ত। রবি রত্নায়েকে এবং রোশন মহানামা ভাল ফিল্ডার।

জিম্বাবোয়ের ফিল্ডিং অন্তত গত বিশ্ব কাপের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় উন্নত মানের। তবে এবারের বিশ্ব কাপ দলের খেলোয়াড়দের বয়সের গড় ২৭-২৮ বছর। তৎপরতা দেখানোর পক্ষে নিঃসন্দেহে একটু বেশিই। তবে এটাও মেনে নিতে হবে জিম্বাবোয়ের ওয়ান ডে রেকর্ড খুবই ভাল। ফিল্ডিংয়ের মান আশাপ্রদ না হলে ফলের ওপর মন্দ প্রভাব পড়ত। ■

!!
শুশুক টানছে…এগোচ্ছেন অরণ্যদেব ও রাজা…

অরণ্যদেবের স্বর্গোদ্যানে…সমুদ্রের ধারে…
কী ব্যাপার ? বেঁচে আছে ?
নাড়ি খুব দুর্বল…এখান থেকে নিয়ে যাওয়া দরকার !

রাজা, এগুলো নিয়ে যা…
6/8

সাবধানে যাবি, রাজা !
জানি ।

শুশুক দুটি সঙ্গে -সঙ্গে চলেছে…

শুশুকের পিঠে চেপে চলে যাই । তাড়াতাড়ি হবে ।

???
সমুদ্রতীরে একে কুড়িয়ে পেয়েছি ।
কে এই মেয়েটি
ক্রমশ ● ৬

Liril
অঙ্গে অঙ্গে লিরিল-এর তরতাজা করা তরঙ্গ!
লিরিল
তরতাজা করা সাবান
লেবুর মত চনমনে তরতাজা করা সাবান।
LINTAS LR P 54 27

সং গী ত

ভক্তিই যার সম্পদ : নন্দকিশোর

নন্দকিশোর দাস

সাতাত্তর বছর বয়স, দেহ অকুঞ্চিত, কণ্ঠস্বর কিছু বসা, তবু এখনো সুরে বাঁধা। নন্দকিশোর দাস এখনো বড় সক্ষম কীর্তনীয়া। যেটুকু ঘাটতি পড়েছে গলায় তা পুষিয়ে দেন তাঁর ভক্তি রসাপ্লুত নিবেদনে, বিনয়ে, আন্তরিকতায়।

দুবছর আগে যেমন শুনেছিলাম, অতি সম্প্রতি ঠিক যেন সেখানেই ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন নন্দকিশোর। আসর বসেছিল প্রয়াত অশোককুমার সরকারের বাসভবনে। নন্দকিশোর আর তাঁর সহযোগীরা প্রতি বছরই অন্তত একবার এখানে গেয়ে যান। আসরের আগে কথায় কথায় জানালেন, এখনো দূরদর্শন থেকে ডাক পাননি। আকাশবাণীও একটু উদাসীন তাঁর প্রতি। বৃদ্ধ নন্দকিশোর তাতে দমিত নন। এখনো শিশুসুলভ সরলতায় বলতে পারেন, রং গাইয়ের সংখ্যাই বেশী। আসল জিনিসের কদর কই?

নিজে প্রবল শিল্পী। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, শিল্পী সৃষ্টিও করেছেন অনেক। তাঁদের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত তো বটেই, গুরুর চেয়েও হয়তো বা নামকরা। এরকম হতেই পারে। নন্দকিশোরকে তা বলে কোনো ঈর্ষার মালিন্য স্পর্শ করে না। তাঁর দোহারদের মধ্যে ছিলেন ছেলে হরেকৃষ্ণ দাস, ভাই গোবিন্দ দাস, দেবশরণ মণ্ডল, চন্দ্রকান্ত দাস, মৃত্যুঞ্জয় দাস, দিলীপকুমার দাস, মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু। শ্রীখোলে সুবোধচন্দ্র সাহা আর নন্দ মণ্ডল। প্রত্যেকেই দাপটের অধিকারী এবং যোগ্য সহযোগী।

সন্ধেবেলা আসর বসল দোতলার ঘরে। মালা দিয়ে বরণ করা হল প্রত্যেককে। নন্দকিশোর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দীনতায় আভূমি প্রণাম করলেন সবাইকে। তারপর গৌরচন্দ্রিকা।

গৌরচন্দ্রিকা মানেই ভক্তি। আপ্লুত ভক্তি। গৌরের কথা বলতে বলতে গাইতে গাইতে নন্দকিশোর যেমন বদলে যাচ্ছিলেন, তেমনি বদলে যাচ্ছিল শ্রোতৃবৃন্দও। ভক্তির জন্যই যেন নন্দকিশোরের সৃষ্টি।

দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকায় আবহে সঞ্চার করলেন এক ভাবাবেগ। আর তার পরেই রূপানুরাগ। রাধার চোখ দিয়ে কৃষ্ণকে যে কতভাবে কত বিচিত্র উপমায়, কত ধীরে-ধীরে দেখালেন তার বুঝি তুলনাই নেই। মাঝে মাঝে তাঁর চমৎকার ব্যাখ্যা যার মধ্যে ছেলেপনা নেই, বুদ্ধির প্যাঁচ নেই, অথচ হৃদয়ের প্রত্যক্ষ উত্তাপ আছে—আমাদের মুগ্ধ করল। বিশ্রুত পদকর্তাদের বিভিন্ন পদ গেঁথে গেঁথে তাঁর ওই মাল্য রচনা, সে যেন শ্রীহরির কণ্ঠলগ্ন হবে বলেই সেদিন যাত্রা করেছিল। সঙ্গে শ্রোতৃবৃন্দও চললেন হরির রূপদর্শনে। হরিকথায় যেমন কণ্টকিত রাধা, তেমনই কণ্টকিত শ্রোতাও।

শেষ নিবেদন সময়োচিত বর্ষাভিসার। রাধার অভিসারের কথা কে না শুনেছে বিভিন্ন গায়কের কণ্ঠে। নন্দকিশোর নিখুঁত তালে লয়ে নিবেদন করলেন সযত্নচয়িত বর্ষাবর্ণনের সঙ্গে শ্রীরাধার অভিসার কথা। অভিসারের প্রস্তুতি, যাত্রা, বাধা ও বাধা-অতিক্রম কত না কৌশল করতে হয়েছিল এই গৃহবধূকে। তার সমস্ত আকুলতা, বাঁধন ছেঁড়া প্রেম, উপচে পড়ল নন্দকিশোর ও তাঁর দোহারদের গলায়।

যা পাওনা ছিল তার বেশীই দিলেন নন্দকিশোর। তাঁর পরম সম্পদ ভক্তি। এ যার আছে তার সব আছে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রেম রঙ্গ স্মারক উৎসব

নিতান্ত কৈশোর অবস্থাতেই আফতাব-এ-মৌসিকি ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর গায়কীর অনবদ্য অনুকরণে রসিক সমাজকে যিনি একদিন বিস্মিত করেছিলেন, সেই ওস্তাদ শরাফৎ হুসেন খাঁই পরবর্তীকালে আগ্রা-আত্রৌলি ঘরানার সুযোগ্য ধারক ও বাহকরূপে সর্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছেন। অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন এই শিল্পীসত্তার স্বাভাবিক বিকাশ সঠিকভাবে সম্ভাবিত হয়েছে পিতা লিয়াকৎ হুসেন খাঁ (আত্রৌলি ঘরানা) ও মাতুল আতা হুসেন খাঁর (আগ্রা ঘরানা) উপযুক্ত নির্দেশনায়। এছাড়াও তিনি ছিলেন আগ্রা-আত্রৌলি-রঙ্গিলে ঘরানার মহারথী ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর প্রশিক্ষণে পরিপুষ্ট। আগ্রা ঘরের ক্রমবিলীয়মান জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সহজাত প্রতিভা ও ঘরানাগত শিক্ষার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা তাঁর অনন্য শিল্পীমানস ও সুদৃঢ় গায়কী শ্রোতাদের মনোরঞ্জনে কখনো ব্যর্থ হয়নি। শরাফৎ হুসেন খাঁর অকাল প্রয়াণে সঙ্গীতজগতের অপূরণীয় ক্ষতি পুনরুপলব্ধ হয়েছে কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে 'প্রেম রঙ্গে'র তত্ত্বাবধানে আয়োজিত শিল্পীর স্মরণসভায়। সঙ্গীত ও নৃত্যের তিন দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন ওস্তাদ আমজাদ আলি খাঁ। এই সন্ধ্যার প্রথম শিল্পী ছিলেন শরাফৎ পুত্র তরুণ গায়ক শৌকত শরাফৎ হুসেন খাঁ। ইনি পরিবেশন করেন পুরিয়া রাগের আলাপ ও খেয়াল, নায়েকী কানাড়া ও সুহার দুটি বন্দেজ এবং একটি ভৈরবী ঠুংরী। শুধুমাত্র শরাফৎ হুসেন খাঁর পুত্র বলে নয়, আগ্রা-আত্রৌলি শৈলীর উত্তরসূরীরূপে ও সুগায়ক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মহান দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই শৌকতের ওপর বিন্যস্ত। লয়কারী, বোল-বাঁট ও দ্রুত তানকারি অংশে শিল্পীর দক্ষতা প্রশংসনীয়। একটি স্বর্ণপদক উপহার দিয়ে ওস্তাদ আমজাদ আলি খাঁ শিল্পীকে উৎসাহিত করেন। তাঁকে যথাযথ তবলা ও হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেছেন শাফাৎ আহমেদ খাঁ এবং মেহফুজ খাঁ।

পরবর্তী শিল্পী ওস্তাদ আমজাদ আলি খাঁ শোনান একটি সুগ্রথিত মিঞা মল্লার, যার গৎ অংশে পরিবেশিত হয় অনবদ্য কয়েকটি ত্রিতাল রচনা এবং পরে স্বল্প পরিসরের মধ্যে দুটি রসঘন স্বর নিবেদন—তিলক-কামোদ এবং দেশ। তাঁর বাজনার আবেদন শুধু সুরের মায়াজাল সৃষ্টি বা নিখুঁত প্রকরণের জৌলুসেই সীমাবদ্ধ নয়—বিশিষ্ট ভাবদ্যোতক ব্যঞ্জনায়, ইঙ্গিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সুরের প্রার্থিত রূপমূর্তি। সেদিনের সান্ধ্য আসরের বিশেষ প্রাপ্তি ছিল শিল্পীর সঙ্গে শাফাৎ আহমেদ খাঁর প্রাণবন্ত তবলা সহযোগিতা।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে আগ্রা ঘরানার

প্রকরণ পারম্পর্য অক্ষুণ্ণ রেখে বারোয়া ও মেঘ রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান নাসির হুসেন খাঁ। পরিবেশনাটি গতানুগতিক হলেও শিল্পীর প্রথাসিদ্ধ গায়কী লক্ষণীয়। তাঁর সঙ্গে তবলা, হারমোনিয়াম ও সারেঙ্গীতে সার্থক সহযোগিতা করেছেন দ্বিজেন ঘোষ, মেহ্‌ফুজ খাঁ ও রমেশ মিশ্র।

এরপরে যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে সেতারে রাগ চন্দ্রকোষ ও চারুকেশী বাজিয়ে শোনান সুব্রত রায়চৌধুরী। সামগ্রিকভাবে সুরেলা নিবেদন। তাঁর সঙ্গে আকর্ষণীয় তবলা সহযোগিতা করেছেন অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়।

এই সন্ধ্যার সর্বশেষ শিল্পী ছিলেন কথক সম্রাট পণ্ডিত বিরজু মহারাজ। নির্ধারিত সময়ের অধিকাংশই পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানগুলিতে অতিবাহিত হলেও অবশিষ্ট স্বল্প সময়ের মধ্যেই এই অসামান্য শিল্পী দর্শকদের সর্বার্থে পরিতৃপ্ত করেছেন তাঁর সম্মোহনী

শরাফৎ হোসেন খা

আমজাদ আলি খাঁ

শিল্পোৎকর্ষে। বিষ্ণুবন্দনা, ঠাট, লুড়ি, আমদ, পরাণ, বিভিন্ন গিনতি ও তেহাই, টুকরা এবং দু'একটি স্বল্পাকৃতির গৎভাও-এর অনবদ্য পরিবেশনে লখনৌ ঘরানার রীতিবৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে শিল্পীকে পাওয়া গিয়েছিল এক অভাবনীয় রসোৎফুল্ল ও ঘনিষ্ঠ মেজাজে। উপজ অঙ্গের অসাধারণ লয়কারীর খেলায়, মঞ্চপরিক্রমার সাবলীল লাবণ্যে ও লঘুস্পর্শী, ক্ষিপ্র পাদপ্রকরণের দৃপ্ত ভঙ্গিমায় প্রতি মুহূর্তে বিচ্ছুরিত হয়েছে তাঁর স্বভাবসুলভ পারঙ্গমতা। শিল্পীর কিংবদন্তীস্বরূপ অভিনয়াংশে নিখুঁত ভাবব্যঞ্জনা রূপায়িত হয়েছে এক সূক্ষ্ম সংবেদ্য নান্দনিক সংযমে, যেখানে দর্শকদের সঙ্গে শিল্পীর অনায়াস একাত্মতা ঘটেছে অতি সহজে। শাফাৎ আহমেদ খাঁর অপূর্ব তবলাসঙ্গতে এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটির যথার্থ ভারসাম্য সুরক্ষিত হয়। পাখোয়াজ, কণ্ঠ ও সারেঙ্গীতে শিল্পীকে সহায়তা করেছেন জয়কিষণ, হরিশঙ্কর ও রমেশ মিশ্র।

তৃতীয়দিনের রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানের শুরুতে এইচ এম ভি'র প্রকাশিত ওস্তাদ শরাফৎ হুসেন খাঁর গাওয়া গানের একটি নতুন ক্যাসেটের আনুষ্ঠানিক মুক্তি ঘোষণা করেন পণ্ডিত শিবকুমার শর্মা। সুদীর্ঘ এই অধিবেশনের প্রথমেই ছিল প্রয়াত শিল্পীর সুযোগ্য শিষ্যা পূর্ণিমা সেনের কণ্ঠসঙ্গীত। ইনি জয়জয়ন্তী রাগের

শৌকৎ শরাফৎ হোসেন

একটি সুবিন্যস্ত খেয়াল, রামদাসী মহলার ও ছায়াবেহাগ রাগে ওস্তাদ শরাফৎ হুসেন খাঁর দুটি রচনা ও খাম্বাজে নিবদ্ধ একটি বন্দেশী ঠুংরী পরিবেশন করেন। কণ্ঠলাবণ্য, প্রথাসমৃদ্ধ গায়কী এবং সুচিন্তিত তানকারি ছিল তাঁর অনুষ্ঠানের প্রধান সম্পদ।

পরবর্তী শিল্পী প্রফেসর দেবু চৌধুরী সেতারে কৌশিক কানাড়া রাগ বাজিয়ে শোনান। গুণকেলী ও বসন্তমুখারী রাগে পণ্ডিত শর্মার সান্তুর বাদনের অনুষ্ঠানটি ছিল তাঁর রসবোধে ভরাট ও পরিপূর্ণ একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নিবেদন। উপরোক্ত দুই যন্ত্রশিল্পীর সঙ্গেই অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের সুদক্ষ তবলা সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অধিবেশনের তৃতীয় শিল্পী নয়না দেবী পরিবেশন করেছেন মিশ্র খাম্বাজ ঠুংরী, তিলং টপ্পা, কাজরী ও তাঁর সুপরিচিত 'বারমাস্যা'। শিল্পীর গায়নশৈলীর স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য—তবে বৈচিত্র্যপূর্ণ আঙ্গিকের অভাব ও সুরবিহারের সীমিত প্রয়োগে সুদীর্ঘ এই অনুষ্ঠানটির শেষাংশ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কণ্ঠ সহযোগী শুভা মুদ্গালের সুদক্ষ গায়নভঙ্গি এবং তবলায় সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের সপ্রতিভ সহযোগিতা অনুষ্ঠানটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।

ওস্তাদ ইউনুস্ হুসেন খাঁর কণ্ঠসঙ্গীতের মৌলিক আকর্ষণ ছিল দুটি স্বল্পপ্রচলিত রাগের নিপুণ ও সুদীর্ঘ বিন্যাসপ্রকল্প। প্রথমটি ছিল মেহবুব খাঁ (দরস পিয়া) রচিত আত্রৌলি ঘরানার চন্দ্রকোষ রাগ। 'পা দা ণা দা পা মা জ্ঞা পা মা, জ্ঞা ঋা সা' প্রভৃতি স্বররূপের প্রয়োগ বিশিষ্ট এই রাগটির সঙ্গে কোমল ঋষভযুক্ত কৌশিক কানাড়ার চলনের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। দ্বিতীয় নিবেদন ললিতা-সোহিনী রাগ পূর্বাঙ্গে ললিত ও উত্তরাঙ্গে সোহিনী রাগের সংমিশ্রণে সুগঠিত। সপ্তকের মধ্যাংশে দুটি রাগের সন্ধিক্ষণের সার্থক শ্রুতিমাধুর্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এরপরে তিনি পরজ-কালেংড়াতে একটি বন্দেজ গেয়ে শোনান। 'দা পা গা মা গা, ঋা দা সা (তার), নি দা পা, গা মা গা ঋা গা',—এই ধরনের স্বরসমন্বয় বিশিষ্ট বন্দেজটি ছিল আকর্ষণীয় ও সুগীত।

ওস্তাদ নিসার হুসেন খাঁ ছিলেন এই অনুষ্ঠানের সর্বশেষ শিল্পী। গোয়ালিয়র ঘরানার এই প্রবীণতম প্রতিনিধি ললিত ও পরজ রাগের খেয়াল এবং পরে একটি ভৈরবী তারাণা পরিবেশন করেন। বয়সোচিত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এদিনের পরিবেশনা থেকে সহজেই তাঁর পূর্বতন মননশীল গায়কী ও সার্বিক পারঙ্গমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। বিশেষত ললিত রাগের বঢ়াতে ও সরগম-এ তিনি এমন কিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপবিন্যাস করে দেখিয়েছেন যার অভিনবত্ব আজকের দিনের শ্রোতাদেরও বিমুগ্ধ করে। সবশেষে পরিবেশিত তারাণাটি ছিল একটি অনবদ্য রচনা। শিল্পীর সুযোগ্য শিষ্য তরুণ রসিদ খাঁ কণ্ঠসহযোগিতায় সামান্যতম সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করে তাঁর অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অপর কণ্ঠসহযোগী ছিলেন ওস্তাদ-পুত্র জুলফিকার খাঁ।

রাত্রিব্যাপী অধিবেশনে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সহায়ক শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন তবলায় শ্যামল বসু, সারেঙ্গীতে রমেশ মিশ্র ও হারমোনিয়ামে মেহ্‌ফুজ খাঁ। ক্যাসেটে নিবেদিত প্রয়াত শিল্পী ওস্তাদ শরাফৎ হুসেন খাঁর একটি গান দিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানের স্মৃতিভারাক্রান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে।

স্মরণীয় স্মৃতিসভা

স্বনামধন্য তবলাবাদক প্রয়াত কানাই দত্তর দশম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রসদনে একটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর অনুষ্ঠিত হয়। তবলা শিক্ষা ও অনুশীলনে বাঙালীদের উৎসাহিত করে তাদের আর্থিক ও সামাজিক কৌলীন্য সুরক্ষিত করার ব্যাপারে কানাই দত্তর অশেষ অবদান সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ গায়ক ও সঙ্গীত পৃষ্ঠপোষক শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গীতানুষ্ঠান শুরু হয় সেতারে কুশল দাসের পরিবেশিত ইমন রাগ দিয়ে। রাগালাপের পর্যায়ে মাঝে মাঝে স্বরসমন্বয়ের বিন্যাসে বৈচিত্র্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। রূপক তালে নিবদ্ধ দ্রুত গত অংশটি ছিল বেশ পরিচ্ছন্ন ও সুগ্রথিত। শিল্পীকে তবলায় সুসহযোগিতা করেছেন দেবাশিস সরকার। পরবর্তী কণ্ঠসঙ্গীতের আসরে বেহাগ রাগের খেয়াল গেয়ে শোনান মানস চক্রবর্তী— প্রথমে বিলম্বিত (একতাল) ও পরে দ্রুত (ত্রিতাল)। রাগের প্রথানুসারী বঢ়াত ক্রমপর্যায়ে

শঙ্কর ঘোষ ও শ্যামল বসু

সুবিন্যস্ত হয়েছে শিল্পীর বিশিষ্ট গায়কীর আধারে। উপস্থাপন পরিকল্পনার পরিণত দৃষ্টিভঙ্গী ও দৃঢ়তা তাঁর অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। সর্বাঙ্গিক সৌকর্যবৃদ্ধিতে অবশ্য বিভিন্ন প্রকরণ পারম্পর্যের আরেকটু সুসংহত রূপবিন্যাস প্রত্যাশিত ছিল। রাগপ্রধান গান গেয়ে তিনি তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন। তবলা সঙ্গতে শ্যামল বসু শিল্পীকে সর্বার্থে সহায়তা করেছেন। অন্যান্য সহযোগী শিল্পীরা হলেন দিলীপ পাত্র, ভানু দে ও পার্থ মজুমদার। এই সন্ধ্যার সর্বশেষ অনুষ্ঠানটি ছিল শ্যামল বসু ও শঙ্কর ঘোষের দ্বৈত তবলাবাদন। প্রথমে তাঁরা ত্রিতালে লহরা বাজিয়ে শোনান, এবং পরে সাড়ে চারমাত্রা বিশিষ্ট সৌরভ তাল। বিন্যাস পরিকল্পনার

মানস চক্রবর্তী

কুশল দাস

মৌলিকত্বে ও পরিশীলিত অভিব্যক্তির উৎকর্ষে এই অন্তিম পর্বটি ছিল অনবদ্য। বিভিন্ন লয়কারি ও ছন্দের কারুকার্যে সুসমৃদ্ধ এই আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানটিতে উভয়ের অসাধারণ শিল্পীসত্তার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। শ্যামল বসুর নমনীয় ও সুমিষ্ট বাদনভঙ্গীর অসাধারণ মেজাজ ও রসবোধের সঙ্গে নিখুঁতভাবে সম্মিলিত হয়েছে বোলবিন্যাসের ক্ষেত্রে শঙ্কর ঘোষের বিস্ময়কর প্রতিভা ও সুদক্ষ প্রয়োগভাবনার সার্বিক উৎকর্ষ। এই ধরনের মনোগ্রাহী ও মূল্যবান অনুষ্ঠানই স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ বাদ্যযন্ত্র হিসাবে তবলার আকাঙ্ক্ষিত মর্যাদা ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

বিনতা মৈত্র

আনন্দমঠ সংগীতায়নের অনুষ্ঠান

গিরিশ মঞ্চে আনন্দমঠ সংগীতায়ন-এর সপ্তম বার্ষিক অনুষ্ঠানটি ছিল নজরুল রচনা কেন্দ্রিক। প্রথমার্ধে একক কণ্ঠে নজরুলগীতি পরিবেশন করেছিলেন গোপা কাঞ্জিলাল। তাঁর কণ্ঠ চর্চিত, মোলায়েম এবং সুরময়। সূক্ষ্ম অলংকরণ প্রয়োগে রয়েছে সেই পরিচ্ছন্নতা। সেদিন 'সখী ঐ শোনো', 'বকুল চাঁপার বনে' কিংবা অন্যান্য গানে তাঁর সাংগীতিক গুণাবলীর পরিচয় সুপ্রকাশিত। তবে গান নির্বাচন সম্পর্কে কিছু বলতেই হয়। নির্বাচিত গানগুলির সুরের চলন অলংকরণ একই ধাঁচের। পরপর শুনতে শুনতে একঘেয়েমি আসে। নজরুলের বিভিন্ন ধরনের মেজাজের গান আছে। সেই বৈচিত্র্যের স্বাদ মিলল না শিল্পীর অসতর্ক চয়নে। আর একটি কথা : নজরুলসংগীতি পরিবেশনের ক্ষেত্রে একটি উপদ্রব সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায় তা হল ইন্টারল্যুডে তবলার অসংযমী দৌরাত্ম্য। এতে গানের ভারসাম্য কিছুটা নষ্ট হয়। সেদিনও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। তবলা সহযোগিতা করেছিলেন বাবলু রায়। দ্বিতীয়ার্ধে নজরুলগীতি অবলম্বনে নৃত্যনাট্য : চুয়াচন্দন (রচনা : নীলিমা সমাদ্দার)। হিন্দুরাজা নাগভট্টের একমাত্র পুত্র চন্দন আর কাশ্মীর-অধিপতি ললিতাদিত্যের কন্যা চুয়া—এরাই মুখ্য কুশীলব। কিশোর বয়সে একদিন চন্দন অপহৃত হয়ে যায়। তারপর বহুদিন পর কাশ্মীর রাজের রাজসভায় পিতামাতার সঙ্গে তার মিলন ঘটে। এই হল কাহিনী। নৃত্যাভিনয়ে চন্দনবেশী প্রশস্তি রায় চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম। অনুজা সরকার (চুয়া) নৃত্যে পটু। ঝরনা সাহা (উৎপল পর্ণা) প্রশংসনীয়। মীনা চক্রবর্তীর (নাগভট্ট) দরকার ছিল আর একটু অভিব্যক্তির। অঞ্জনা মণ্ডল (সেনাপতি) উল্লেখযোগ্য। লিপি চক্রবর্তীর (ললিতাদিত্য) মধ্যে একটু জড়তা ছিল। নৃত্যাংশ পরিচালনা করলেন গৌরীপদ মজুমদার। নেপথ্য গানে সংগীত পরিচালিকা গোপা কাঞ্জিলালের (চুয়া) পরিবেশনে সুরময়তা ছিল। পরিচ্ছন্ন গেয়েছেন অরুণা বোস (উৎপল পর্ণা)। অঞ্জন গুপ্ত (চন্দন) মন্দ নয়। অরূপ চক্রবর্তী (নাগভট্ট) চলনসই। শিপ্রা দে, তুষার দে ও অঞ্জন গুপ্তের

গোপা কাঞ্জিলাল

নেপথ্য সংলাপপাঠে প্রয়োজনীয় নাট্যরস ছিল। যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন গোবিন্দলাল চক্রবর্তী, পরেশ সরদার, ঋত্বিক বিশ্বাস ও সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়।

নিবারণ সংগীত সম্মেলন

আট বছরও পূর্ণ হয়নি মেয়েটির বয়স। অথচ দেড় ঘণ্টা ভরত নাট্যম পরিবেশন করল একজন পরিণত মেয়ের মত। প্রথম থেকে শেষাবধি দর্শকরা মোহাবিষ্ট। সত্যি, এ এক অপার বিস্ময়! কি নৃত্য প্রকরণ, কি অভিব্যক্তি, সব দিকেই তার পারঙ্গমতা অসামান্য। নির্দ্বিধায় বলা যায়, চর্চা অব্যাহত রাখলে সামনে তার আলোকজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আশা করা যাক, সেইদিকেই এগিয়ে যাবে দৃঢ় পদক্ষেপে কুমারী সোহিনী ব্যানার্জী। সেদিনের সোহিনীর নিবেদনে ছিল ভরতনাট্যমের বিভিন্ন নৃত্যপদ। 'বর্ণম'-এ জটিল ছান্দোবিন্যাস বড় সহজে রূপায়িত হয়েছিল। আবার শিবরঞ্জনী রাগে আদি তালে নিবদ্ধ 'তিল্লানা' ক্ষিপ্র পদবিন্যাসে সুচারু দৃষ্টিকর্মে চমকপ্রদ। 'অখিলাণ্ডীশ্বরী'—নিবেদনে দেবী দশভুজার বিভিন্ন রূপ প্রদর্শনে কিংবা শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক 'তরঙ্গম' নিবেদনে সোহিনী তার অভিনয় ক্ষমতারও সম্যক পরিচয় রেখেছে। আর এই 'তরঙ্গম'-এ একটি থালার ওপর দুপা রেখে নাচ সমগ্র নৃত্যানুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণীয় বস্তু। সার্থক সহযোগিতা দিলেন নাট্টুভঙ্গমে গুরু মীরা চন্দ্রশেখরণ,

সোহিনী ব্যানার্জী

কণ্ঠে সুন্দরী পদ্মনাভন, বেহালায় গীতা মূর্তি, মৃদঙ্গম-এ ডি. কান্নন ও হার্মোনিয়ামে অরবিন্দকুমার। রবীন্দ্রসদনে 'নিবারণ সংগীত সম্মেলন'-এর প্রথমার্ধটি এইভাবে স্মরণীয় হয়ে রইল।

যন্ত্র-কণ্ঠসংগীতে সমৃদ্ধ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বটিও মনে রাখার মত। পণ্ডিত মণিলাল নাগ সেতারে বাজিয়ে শোনালেন রাগ 'শ্রী'। প্রথমে আলাপ জোড়, পরে দুটি গৎ। মর্মস্পর্শী আলাপে রাগটি পূর্ণ বিভায় বিকশিত। স্বরসংগতি প্রয়োগে সেই শিল্পরসবোধ ও পরিণতমনস্কতার পরিচয়। জোড়টি সুবিন্যস্ত। একই রাগে বিলম্বিত গৎ-এ শোনা গেল হৃদয়স্পর্শী পদবিস্তার। ছন্দের কাজ ও তানকারিও এল নিপুণ পারিপাট্যে। এই গতে চিত্তাকর্ষক কয়েকটি বোল বাজিয়ে শোনালেন তবলা-সহযোগী অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে। সওয়াল জবাবও বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

মণিলাল নাগ

গিরিজা দেবী

দ্রুত গৎটি সুরময়। শেষে অনবদ্য ঝালা। মণিলাল নাগ ঝালা সবসময়ই ভালো বাজিয়ে থাকেন। সেদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রবীণা গিরিজা দেবীর কণ্ঠসংগীত—অনুষ্ঠানের আর এক স্মৃতিধার্য অভিজ্ঞতা। শিল্পীর প্রারম্ভিক নিবেদন সুরমল্লার রাগে বিলম্বিত খেয়াল। তাঁর কণ্ঠ নিখুঁত সুরে, রেঞ্জও চমৎকৃতিজনক। রাগের যথাযথ মেজাজটি ফুটে উঠল বিলম্বিত খেয়ালের বিস্তারপর্বে। এই খেয়ালের শেষার্ধে ও দ্রুত খেয়ালে উচ্চমানের তানকর্তন করলেন। কণ্ঠ-সহযোগী তাঁর দুই শিষ্যার মধ্যে বিজয়া যাদবের সুদক্ষ সহযোগিতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষে দুটি ঠুংরী গানে যেন পূর্ণরূপে পাওয়া গেল গিরিজা দেবীকে। প্রথমটি মিশ্র দেশী ঠুংরী, দ্বিতীয়টি কাজরী। মেজাজী, দাপটী, অসামান্য পরিবেশন। বয়স যেন নতজানু! শিল্পীকে যন্ত্রে সহায়তা করলেন রমেশ মিশ্র, (সারেঙ্গী) শুভেন চট্টোপাধ্যায় (তবলা) ও জয়ন্ত পাণ্ডে (হার্মোনিয়াম)।

গজল—একক কণ্ঠে

গজল ইদানীং প্রচণ্ড জনপ্রিয়। প্রায় হুজুগের মত ব্যাপার। অনেকক্ষেত্রেই অবশ্য গজল-ভজন-রাগপ্রধানে কোন ভেদাভেদ থাকছে না। নকল গজলের চমকেই অনেকে তৃপ্ত। সম্প্রতি যোধপুর অ্যাসোশিয়েসন-এর সৌজন্যে বরোদা-র শিল্পী রিঙ্কু ব্যানার্জীর গজল শোনার সুযোগ হল বিদ্যামন্দির প্রেক্ষাগৃহে। তাঁর গাওয়া গজলে অন্তত সেই চমকটুকু নেই। গানের আগে শিল্পী পরিচিতি দানে শিল্পীর উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিমের কথা বিশেষ ভাবে বলা হয়েছিল। তাঁর সার্বিক পরিবেশনে সেই উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিফলন ঘটল কি না সে বিষয়ে সামান্য সংশয়ের অবকাশ থাকলেও তাঁর কণ্ঠের সুরময়তা ও মাধুর্য সম্পর্কে

রিঙ্কু ব্যানার্জী

দ্বিমত হবার কারণ নেই। 'আঁখি চলি তো'—এই প্রথম গানেই কণ্ঠলাবণ্য সুপ্রকাশিত, কিন্তু আবেদন ততটা ফুটল কি? বরং পরের 'একবার জী ভর' কিংবা 'নিয়তে শাক ভরনা' গানে আবেদন ছিল। এবং আরো গভীরে যে যেতে পারেন তার পরিচয় মিলল এরপর আরো কয়েকটি গানে। গজলের বাণীর গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলাটা বাহুল্যই। শিল্পীর উচ্চারণ পরিচ্ছন্ন। সুতরাং সুরের সঙ্গে কথাকে চিত্রিত করতে পারলেন 'জিন্দা রহে তো কেয়া', 'মেরে হাম নাফেস' কিংবা 'আ পিলা দে সাকিয়া' গানে। প্রিলুড ইন্টারল্যুডে হার্মোনিয়াম, গীটার প্রাসঙ্গিক গানের মেজাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তালবাদ্যও সংযত।

তিনরকম

রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে গীতাঞ্জলি বিদ্যামন্দির আয়োজিত সান্ধ্য-সংগীতানুষ্ঠানে ছিল ভজন, বাংলা রাগপ্রধান, দাদরা—এই তিন ধরনের গানের সমারোহ। শিল্পী একজন: গৌরাঙ্গ সাহা। দু-পর্বে বিছানো অনুষ্ঠানে নানান স্বাদের গান শুনে বোঝা গেল বর্ষীয়ান এই শিল্পীর কণ্ঠে সুর এখনও সহজে খেলা করে। সাংগীতিক অলংকরণও আসে সুচারুরূপে। আর সার্বিকভাবে পরিবেশনে রয়েছে একটা স্পষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য। তবে উচ্চারণ দু-একটি ক্ষেত্রে একটু অপরিচ্ছন্ন বোধ হল।

প্রথম পর্বে শিল্পী শোনালেন মীরা, কবীর, ব্রহ্মানন্দ প্রমুখের ভজন। ভক্তিরসাশ্রিত অন্তর্লীন আবেদনই ভজনের মূল কথা। শিল্পীর গায়নভঙ্গী আবেগায়িত হলেও সব ভজনই যে আবেদনে নিটোল হয়ে উঠেছিল তা নয়। প্রকৃতপক্ষে সুরের চলন আর মধ্য কিংবা দ্রুত লয় সেদিনের প্রথম দিককার কয়েকটি গানের রসোত্তীর্ণ হবার পথে অন্তরায় ছিল। পরেরদিককার গানগুলি বরং গভীরতা পেয়েছিল। যেমন—'দরশন দো ভগবান' কিংবা 'প্রভুজী অব মোরে'।

ভজন-গানগুলির অধিকাংশেরই সুরকার শিল্পী স্বয়ং। ইমন, মিশ্র পিলু প্রভৃতি বিভিন্ন রাগরাগিনীর ব্যবহার ছিল সুরে।

ভজনের পর শিল্পী রচিত-সুরারোপিত বাংলা রাগপ্রধান। গানের কথা সাধারণ, সচরাচর যেমনটি শোনা যায় তেমনই—'কে যেন ডাকে আমারে', 'ফুলবনে ভ্রমরা আসে' কিংবা 'আজি কে এল যমুনায়' ইত্যাদি। চেনা কথা, চেনা রূপকল্প। সুর বিভিন্ন রাগাশ্রিত। শুনতে ভাল লাগল 'কে যেন ডাকে', 'বাঁশি যে বাজে না' আর 'বাঁধো ঝুলনা'। রাগপ্রধান গানের পরিবেশনে অতিরিক্ত অলংকরণ প্রয়োগের অদম্য ঝোঁক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কিন্তু বর্তমান শিল্পীর এই প্রবণতা নেই। এটা স্বস্তিদায়ক।

দাদরাও রচনা করেছেন শিল্পী। গাইলেন কয়েকটি। মন্দ নয় এটুকু বলা যায়। শেষে শ্রোতাদের অনুরোধে আবার ভজন। সংবেদনশীল নিবেদন। শিল্পীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিলেন তবলায় সুজিত সাহা, সারেঙ্গীতে মেহেবুব খাঁ।

স্মরণ

"যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা আমারে ভুলিও প্রিয়": অনুষ্ঠানের শুরুতেই সেদিন ভেসে এসেছিল এই গান সেই অননুকরণীয় কণ্ঠ ছুঁয়ে। নিছক প্রেমের গান। প্রিয়কে বলছেন শিল্পী—'আমারে ভুলিও'। কিন্তু এ তো গানের বাণী। আমরা কি বিস্মৃত হতে পারি এই শিল্পীকে? না, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়কে ভোলা যায় না। ত্রিশের দশকে খেয়াল-ঠুংরী গানে সঙ্গীতজগত মাতিয়ে তুলেছিলেন ভীষ্মদেব। তারপর অতর্কিত প্রস্থান। ১৯৪০-এ সব ছেড়ে চলে গেলেন পণ্ডিচেরী। বছর আটেক পর অবশ্য পাকাপাকিভাবে ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। কিন্তু শিল্পীকে ঠিক যেন আগের অবস্থায় পাওয়া গেল না। আগেই কয়েকটি রেকর্ড করেছিলেন—হিন্দী গান, বাংলা রাগপ্রধান কিংবা হার্মোনিয়াম বাদনের। আরও কিছু দিতে পারতেন নিশ্চিত। বাস্তবে যে তা আর ঘটল না সেটা দুর্ভাগ্যজনক। শুধু কণ্ঠশিল্পীই নন, তিনি একজন অতুলনীয় সুরস্রষ্টাও। নিজেরই গাওয়া 'জাগো আলোক লগনে', 'নবারুণ রাগে', 'শেষের গানটি ছিল'—প্রভৃতি গানে তাঁর সুরযোজনা

রণীয়। উল্লেখযোগ্য সুরারোপ
রেছিলেন কিছু বাংলা-হিন্দী
য়াছবিতেও। স্বল্পভাষী যশবিমুখ
ই কৃতী শিল্পী লোকান্তরিত হয়েছেন,
শ বছর হল। তাঁর স্মরণে অনুষ্ঠান
রে থাকেন যে দু-একটি সংস্থা তার
ন্যতম 'পঞ্চম সংগীত
হাবিদ্যালয়'। সম্প্রতি শিল্পীর প্রয়াণ
থি উপলক্ষে ভারতীয় ভাষা
রিষদ মঞ্চে এক স্মরণানুষ্ঠানের
য়োজন করেছিলেন 'পঞ্চম'।
ল্পীর অন্যতম প্রিয় ছাত্র কৃষ্ণচন্দ্র
ন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন কিছু বলেছিলেন
ল্পীর সম্পর্কেই। ভীষ্মদেবের গান
র কথায় 'ম্যাজিক'। পরে
বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরুদ্ধ হয়ে
নিয়েছিলেন একটি রাগপ্রধান।
স হয়েছে, শরীর তেমন সুস্থ নয়,
বু গানে একটা অন্য আমেজ।
গীতানুষ্ঠানে 'পঞ্চম'-এর
ত্রছাত্রীবৃন্দ পরিবেশন করলেন
মবেত কণ্ঠে রাগ-সম্পূর্ণ মালকোষ।
ত সরগম আর তান। তালিমবদ্ধ
বেদন। জোয়ারিযুক্ত কণ্ঠে
য়ামল্লার রাগে বিলম্বিত খেয়াল
য়ে অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন সুগত
র্জিত। তাঁর গায়নভঙ্গীতে পাওয়া
ল কিরানা ও আগ্রা ঘরানার
মন্বয়। বিলম্বিত খেয়ালে
স্তারের কাজ সুসংবদ্ধ। রাগরূপায়ণ
শ পরিপাটি। এই খেয়ালের
বার্ধে ও দ্রুত খেয়ালে তানকর্তব
ঠিত, দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং অবশ্যই
চ্ছন্ন। দুর্বলতা
তে—মন্দ্রসপ্তকে একটু
-অস্বাচ্ছন্দ্য আর দু-একটি ক্ষেত্রে
ও দ্রুত সরগম করার সময়ে
ন্য সুরের ঘাটতি। তবে,
ম্বিত ও দ্রুত বন্দীশ, সব মিলিয়ে
তাঁর পরিবেশন আকর্ষণীয় এবং
ভশ্রুতিসম্পন্ন একথা অনস্বীকার্য।
ক তবলায় সহায়তা দিলেন
মতাভ বটব্যাল। শেষ শিল্পী
তা মজুমদার। নজরুলগীতি,
প্রধানে তাঁর দক্ষতার পরিচয়
গ পেয়েছি, তবে খেয়াল শুনিনি।

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

এখানে বাগেশ্রী রাগে খেয়াল একেবারে নিরাশ করেনি। এই নিবেদনেও স্বাক্ষর ছিল তাঁর নিবিড় অনুশীলনের, সুরময় কণ্ঠ-নিপুণতার। তবে বিলম্বিত খেয়ালে বিস্তারের কাজ আর একটু সুবিন্যস্ত হতে পারত। সরগম ও তানকারী প্রশংসনীয়। দ্রুত গান ও শেষে গাওয়া ঠুংরীটিও রম্য। তবলায় ছিলেন তুষার রায়। উপরোক্ত দুজন শিল্পীকে হার্মোনিয়ামে সহায়তা দিলেন কাজী কামাল নাসের। পরিশেষে মাইক্রোফোনে আবার

সুগত মার্জিত

বেজে উঠেছিল ভীষ্মদেবের সেই অবিস্মরণীয় গান—'শেষের গানটি ছিল তোমার লাগি'।

স্বপন সোম

ন ৃ ত্য না ট্য

জলমগ্ন নৃত্যনাট্য

পনেরো সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়
য়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি
দ্রসরোবরে তাঁদের বার্ষিক জল
নুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।
রের প্রযোজনা : অভিজ্ঞান
লম।

বিগত কয়েক বছরের মতো এ বছরও প্রযোজনায় আড়ম্বরের ঘাটতি ছিল না—থাকার কথাও নয়। কিন্তু এবারের প্রযোজনায় যে সীমাহীন আপস লক্ষ করা গেল তা কল্পনাতীত বললে অত্যুক্তি করা হবে না—এ ধরনের প্রযোজনার সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেই বলতে বাধ্য হচ্ছি। এই সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেই তাই কাহিনী নির্বাচন করা সঙ্গত। একান্ত নিরুপায় হলে কেবলমাত্র ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতায় এই সীমাবদ্ধতা অনেকখানি কাটিয়ে ওঠা যায় যেমন এঁরা পেরেছিলেন তাসের দেশ প্রযোজনার ক্ষেত্রে। সেই প্রযোজনায় স্পষ্ট উপলব্ধি করা গিয়েছিল, কোনো চমক নয়, আন্তরিকতা সাধ আর সাধ্যের ব্যবধান অনেকখানি কমিয়ে এনেছিল।

যেখানে জলের মধ্যে আলো আঁধারে মায়াময় পরিবেশে একটি সৌন্দর্যও সৃষ্টি হতে চলেছিল সেখানে নিতান্তই অযথা এই সব মহিলা চরিত্রগুলি জলের উপরে পদোত্তোলনের ভঙ্গিতে অশ্লীলতার পর্যায়ে পৌঁছলেন—বেদনাদায়ক। মাঝে মাঝে জলের মধ্যে কিছু কিছু নক্সা গড়ে তোলার অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজন যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। কেন যে তা কেই বা জানে। এরই মধ্যে মীনাক্ষী গোস্বামী (দুষ্মন্ত), শ্রীপর্ণা ব্যানার্জি (শকুন্তলা), সুরজিৎ দেব (দুর্বাসা) অভিনীত চরিত্রগুলিকে

শ্রীপর্ণা ব্যানার্জি ও রঞ্জনা কর

এবারের প্রযোজনা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বলার প্রবৃত্তি হয় না। নিম্নমানের বললেও যথেষ্ট বলা হয় না। প্রকৃতপক্ষে এমন রুচিহীন প্রযোজনা ইন্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। নাট্যরূপ ও গীত রচনা কার তা জানার কোনো উপায় নেই। স্মারক-গ্রন্থে প্রযোজনা সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় অসংখ্য নাম মুদ্রিত থাকলেও এই নামটির অনুল্লেখ সম্ভবত ইচ্ছাকৃত। এমন অসংলগ্ন, এমন দুর্বল অপরিণত রচনা সচরাচর দেখা যায় না। গানগুলিও একই সুরে বাঁধা। আর গানের সুর! কদর্থে যা তথাকথিত যাত্রাকেও লজ্জা দেবে। পরিচ্ছদ পরিকল্পনায় শকুন্তলা সহ তপোবনবাসিনীদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছিল—তার সুযোগও ছিল।

যথাযোগ্য মর্যাদায় মূর্ত করেন। শকুন্তলা চরিত্রের গানগুলির কণ্ঠসংগীত শিল্পী ইন্দ্রাণী সেন সুখশ্রাব্য—এই পর্যন্ত। তাঁর দক্ষতা ও যোগ্যতার কোনো পরিচয় এখানে পাওয়া সম্ভব ছিল না। দুষ্মন্তের গানগুলি শঙ্কর ঘোষের কণ্ঠে বেমানান ঠেকেনি। আর এই চরিত্রের অভিনয়াংশ পাঠ করেছেন প্রদীপ ঘোষ। ওঁর সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছুই নেই।

পরিচালনা ও পরিচ্ছদ পরিকল্পনা : মীনাক্ষী গোস্বামী। সংগীত পরিচালনা : কল্যাণ সেন বরাট। বাদল দাসের আলোক সম্পাতে প্রযোজনার কোনো মাত্রা যুক্ত হয়নি। সামগ্রিকভাবে একটি হতাশা নিয়েই ফিরতে হয়েছে—যা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত।

সুভাষ চৌধুরী

চি ত্র ক লা

কালো মেঘ ও স্মৃতির চিত্রকল্প

তরুণ শিল্পী শৈবাল ঘোষের রেখাচিত্রের এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল চিত্রকূট গ্যালারীতে। আর্ট কলেজের কৃতী ছাত্র শৈবাল পরে কমার্শিয়াল চিত্রকলাতে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ইদানীং ছবি আঁকছেন আত্মপ্রকাশের প্রেরণায়। প্রদর্শনীতে ছিল মোট আটাশটি ড্রয়িং, কালি-কলমে আঁকা। ছবিগুলিকে ক্যাটালগে দু-ভাগে ভাগ

করা হয়েছিল দুটি বিষয়ানুগ নামের তলায়—'স্মৃতি' ও 'কালো মেঘ', যদিও প্রতিটি ছবির আলাদা নামও ছিল।

শিল্পীর কাব্যিক সংবেদনা ও জীবন সম্পর্কে তাঁর নানা ভাবনাই ছবিগুলির প্রত্যক্ষ প্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁর অঙ্কন-দক্ষতা, চিত্রকল্প ও আঙ্গিক-রচনায় চারুতার সঙ্গে তাঁর কল্পনাশক্তির সহজ সম্মিলনের ফলে অনেকগুলি ড্রয়িং এক স্বচ্ছ সজীবতার মাত্রা পেয়েছিল। ছবির ভাববস্তুতে ছিল দার্শনিক ও নৈতিক মেজাজের প্রাধান্য কিন্তু তা কখনও আক্ষরিক বিবৃতি হয়ে দাঁড়ায়নি।

প্রতিটি চিত্রকল্পে ছিল একটি রূপক কাহিনী ; মানব-মানবী, কখনও পশু সেই কাহিনীর চরিত্র। চিত্রপটে গাছ, পাখি, মেঘ, জল ইত্যাদির অবয়বে শিল্পী ভরে দিয়েছেন নানা প্রতীকী ব্যঞ্জনা।

'স্মৃতি' সিরিজের সাদায় কালোয় আঁকা চিত্রকল্পের বিষয় শিল্পীর নিজের জীবন ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অতি ব্যক্তিগত ভাবনা-অনুভব। প্রত্যক্ষ উল্লেখ যথাসম্ভব এড়িয়ে শিল্পী নানা প্রতীক ও রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন।

সব সময় সফল হয়নি ছবির স্বাভাবিক সপ্রাণ দৃষ্টিবাহিত ভাষায় সেই অভিজ্ঞতার চিত্রায়ণ। শিল্পীর নিজের প্রতিকৃতি কয়েকটি ছবিকে আত্মস্মৃতিতে ভারাক্রান্ত করেছে, কয়েকটি ছবিতে সচিত্রণের প্রবল ঝোঁক আছে।

কিন্তু অধিকাংশ ছবিই দর্শককে আকৃষ্ট করে সমৃদ্ধ ভাব-ব্যঞ্জনা ও আঙ্গিকের নানা সৌকর্যে। শিল্পীর ভাষায় ছিল মিনিয়েচার ও নানা লোকায়ত চিত্রকলার উপাদান। কিন্তু বটতলার প্রিন্ট ও কালিঘাটের পট তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে সবচেয়ে বেশী। সাদা জমির ওপর নানা পটবিভাজনে অবয়বকে সাজানোর মধ্যে তাঁর আধুনিক মানসিকতার পরিচয় ছিল। চুলের মত সঘন সরু আঁচড়ে শিল্পী আলোছায়ার মত বুনট রচনা করে অনেক সময় মানুষী অবয়বগুলি সুডৌল করে এঁকেছেন, কখনও কর্কশতা কখন ছন্দিত মসৃণতা আছে সেই বুনটে। রূপবন্ধে যেমন আরোপিত রূপ আছে তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক রূপ-বিকৃতিও আছে।

'বিড়াল' বা যামিনী রায়ের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত, 'বংশীবাদক' ছবি দুটি অন্যগুলির থেকে স্মৃতি বিষয়ের ন্যূনতায়, কম্পোজিশনের সারল্যে ভিন্ন। বিষয় ও রূপকল্পের সুষ্ঠু সাজুয্যে যে ছবিগুলি দর্শকদের সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সাক্ষী', 'আমন্ত্রণ,' 'অন্বেষণ,' 'তৃষ্ণা' ও 'নক্ষত্রের রাত্রি'।

'কালো মেঘ' পর্যায়ের ছবিগুলি বিষণ্ণ বাদামি রঙের কালিতে আঁকা। নানা অবয়বে, ঘন অন্ধকার বুনটে ছবির জমি ভরাট, নানা দুর্বোধ্য রূপক ও প্রতীকের ব্যবহারে ব্যঞ্জনার প্রত্যক্ষতা নেই, বিষয়ের ভারে চিত্রকল্প গতিময় হয়ে ওঠেনি যেমন 'কাগজের বাঁশি' নামের বেশ বড় ছবিটি। বিষয়ে, ভাবনায়, রূপবন্ধের ভাঙ্গাগড়ায় পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণার প্রভাব আছে ছবিগুলিতে। 'আলিঙ্গন' দেখে রবীন্দ্রনাথকেও মনে পড়ে। এসব সত্ত্বেও এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, ট্র্যাজিক অনুভব দর্শককে আবিষ্ট করে এই ছবিগুলির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে।

মনসিজ মজুমদার

ক্যা সে ট

তাই তাই তাই

তাঁর কোন ছেলে জাদুকর হবে, জানতেন না পি সি সরকার। তাই প্রত্যেকেরই নাম 'প' দিয়ে এমনভাবে রেখেছিলেন যে, যেই ম্যাজিককে পেশা করে পিতার সিংহাসনে বসুক, তার নাম হবে পি সি সরকার। বড় প্রফুল্ল ম্যাজিক দেখালেন রেজাল্টে। ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে আমেরিকা গেলেন মাস্টার্স ডিগ্রি আনতে। ডিগ্রি পেলেনও, কিন্তু এদেশে আনলেন না। ওখানে এখন বিশাল কোম্পানি খুলেছেন। তাঁর লেখা বই পড়ানো হয় বিশ্বের নানান বিশ্ববিদ্যালয়ে। ম্যাজিক এখন তাঁর নানা শখের একটা। ছবি আঁকা ও গান বাজনাও সমান প্রিয়।

প্রফুল্লচন্দ্র সরকারেরই ডাক নাম মানিক। এই নামেই এদেশে তাঁর সাম্প্রতিক নামডাক। বিশেষত ছোটদের কাছে। ম্যাজিক দেখিয়ে ছোটদের প্রিয় নন, প্রিয় গান

মানিক, শিখা, পিয়া ও পায়েল সরকার

শুনিয়ে। তাঁর সুরে, তাঁর লেখা গানে, তিনি কণ্ঠ দেন, তাঁর স্ত্রী শিখা গান লেখায় সাহায্য করেন, গলাও মেলান। আর মূল গাইয়ে দুজন হল দুই মেয়ে। ছোট পায়েল ও তার দিদি পিয়া। পিয়ার এখন ন বছর, পায়েলের ছয়। গত বছর এই পরিবারের একটি ক্যাসেট (ছুঁচো কত্তার বিয়ে) জনপ্রিয় হয়েছিল। এবারও বেরিয়েছে নতুন একটি ক্যাসেট।

মেয়েদের দিয়ে বাংলা গান গাওয়ানোর এই উদ্যোগের পিছনে মূল উদ্দেশ্যটাই প্রশংসার যোগ্য। বিদেশে থাকলেও ভারতীয়ত্ব ভুলতে চাননি প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর প্যাডের উপরে ভারতীয় রীতিতে আঁকা ছবি, চিঠিপত্রের মাধ্যম বাংলাভাষা। মেয়েদেরও বাংলা ভাষা ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে আগ্রহী করে তুলতে চেয়েছেন তিনি। তাই এই পরিকল্পনা। নিজের ক্ষমতাকে উজাড় করে গান লেখা, সুর দেওয়া। সে-গানে জাদু মেশানো। তাগিদটা পারিবারিক হলেও উদ্যোগের ফসল কিন্তু সর্বজনীন।

এবারের ক্যাসেট 'তাই তাই তাই'ও (সাউন্ড উইং কোম্পানি পরিবেশিত, (SWC 185) নিঃসন্দেহে ছোটরা লুফে নেবে। এতে রয়েছে একটি রবীন্দ্রসংগীত—'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে', পায়েল-পিয়ার যুগ্মকণ্ঠে। রয়েছে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বিখ্যাত 'হারাধনের দশটি ছেলে' অবলম্বনে সকলে মিলে শোনানো ছড়া-গান। এ-ছাড়াও তাই-তাই-তাই, ইকির মিকির চাম চিকির জাতীয় প্রচলিত ছড়া অবলম্বনে রচিত দুটি চমৎকার গান। আরও আছে। শিখা ও মানিক সরকারের লেখা 'স্বপ্নপুর থেকে', 'ছোট্ট পুতুল সোনা' ও 'মিষ্টি সকাল আকাশে'—এই তিনটি গান ও এর মধ্যে থেকে দুটি গানের সুর নতুন করে যন্ত্রসংগীতে শোনানো। যন্ত্রসংগীতের বদলে আরও দুটি ছড়া গান কি নিদেন পক্ষে দুটি ছড়া আবৃত্তি থাকলে বোধহয় বেশী ভাল হত। কিন্তু যা হয়েছে তা নিয়েও কম কাড়াকাড়ি পড়বে না। মানিক সুন্দর সুর দেন। কচি গলা দুটিও ভারি মিষ্টি ও আন্তরিক।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

বি বি ধ

দশম জন্মদিনে

দশ বছরে পা দিল আবৃত্তি আকাদেমি। ৩১ জুলাই সন্ধ্যায় কলামন্দির ভূতল মঞ্চে ঘড়ির কাঁটা ধরে সাড়ে ছ'টায় খুলে গেল পরদা।

আদিকবির প্রথম শ্লোক (মা নিষাদ) ও শপথবাক্য উচ্চারিত হল সম্মেলক কণ্ঠে, জ্বালা হল মঙ্গলপ্রদীপ। সারিবদ্ধভাবে একটি-একটি করে প্রদীপ হাতে তুলে নিভ্রান্ত হলেন সদস্যেরা। সহযোগী সংস্থাদের পাঠানো পুষ্পস্তবক ও কবি অরুণকুমার চক্রবর্তীর পুষ্পমাল্য শিরোধার্য করলেন আকাদেমির কর্ণধার নীলাদ্রিশেখর বসু। সংস্থার ন-বছরের পথ-চলার অভিজ্ঞতা যখন বলতে শুরু করলেন তিনি, স্বাগত জানালেন সকলকে, দেখা গেল, তাঁর কণ্ঠ আবেগাপ্লুত, স্বর রুদ্ধ।

পুরোধা গোষ্ঠী হিসেবে 'ছন্দনীড়' সংস্থাকে এবার সংবর্ধনা জানালেন আবৃত্তি আকাদেমি। মানপত্রটি হাতে নিয়ে প্রতিভাষণে কৃতজ্ঞতা জানালেন ছন্দনীড়ের উৎপল কুণ্ডু। বললেন,

...নীড় স্থাপিত হয়েছিল এই ...ভাববোধ থেকে যে, পুরোপুরি ...বৃত্তিকার তখন প্রায় ছিলেনই না। ...ন্য ক্ষেত্রে খ্যাতির সুবাদে কিছু ...শিল্পী কবিতা শোনাতেন বটে, কিন্তু ...াধারণভাবে আবৃত্তি-উৎসাহী ...্যক্তিরা একমাত্র প্রতিযোগিতার মধ্য ...য়েই কবিতা শোনাবার সুযোগ ...পতেন। এখন আবৃত্তিচর্চার ...তিষ্ঠান বেড়েছে, সুযোগ প্রসারিত। ...বু আত্মশ্লাঘার কোনও স্থান নেই। ...ক্ষ্য অর্জনের দীর্ঘ পথ এখনও ...তিক্রমণীয়। উৎপল কুন্ডু বলেনও ... খুব ভাল, এই আন্তরিক ভাষণে ... ধরা পড়ল এই সন্ধ্যায়। ...না প্রতিষ্ঠান থেকে একজন করে ...বৃত্তিশিল্পীকে আমন্ত্রণ ...নিয়েছিলেন আয়োজক-সংস্থা, ...ন্স্ সম্মেলক-নিবেদনও ছিল। ...ভ্রা বসুর সুযোগ্য পরিচালনায় ...াকাদেমির ছোটরা শোনালো ...ম-রাবণের ছড়া!' সব-মিলিয়ে ...শ জমাটি নিবেদন। দু-একটি ...রো ভুল ছিল। যেমন 'ধ্যাত' না ...ল 'ধ্যেত' বললে 'প্রেত'-এর সঙ্গে মিলটি মার খেত না। আমন্ত্রিতদের মধ্যে শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়, সমীরণ সান্যাল ও অসিত সমাদ্দারের নিবেদন মনোগ্রাহী। তবে শর্মিষ্ঠা কেন 'দশম বর্ষপূর্তি' বললেন, অসিত কেন অথর্ববেদ থেকে ঝাঁপ দিলেন হালকা-চাল ছড়ায়, বোঝা গেল না। প্রবীর ব্রহ্মচারীর কণ্ঠ সুস্থ ছিল না, রত্না মিত্রের ছন্দবোধ (রাজা আসে যায়) সংশয় জাগানো। সুকুমার ঘোষের নিবেদনে মৌলিকত্বের অভাব। মিনতি দে আধুনিক তিন কবির নাম আগে বলে নিয়ে এমনভাবে পরপর তিনটি কবিতা পড়ে গেলেন যে, কবিদের আলাদা অস্তিত্ব চেনাই গেল না। শুধুই চিত্রাঙ্গদার সংলাপ বেছে নেওয়ায় শুভ্রা বসুর প্রথম নিবেদনটি কিঞ্চিৎ খাপ ছাড়া, 'বিদায়' সুন্দর। ঘোষণায় ছিলেন অতনু সেনগুপ্ত। রবীন্দ্র কবিতাকে 'পদ্য' বলে উল্লেখ ও প্রতি ক্ষেত্রে অযথা কাব্যময় বাক্য ব্যয় কানে লেগেছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি আরেকটু ছোটমাপের হলে শ্রোতাদের প্রতি সুবিচার করা হত।

কবির জন্মদিন

...নিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হল পুরোটা ...ভরে উঠেছিল এমন নয়, অনেক ...ই ছিল খালি, তবু কবি বীরেন্দ্র ...ট্টোপাধ্যায় স্মরণকমিটি আয়োজিত ...বির ৬৮তম জন্মদিন-পালনের ...ষ্ঠানে অনুরাগীর সংখ্যাও নেহাত ... ছিল না। যে তরুণ কবিদের ...হ্বান জানিয়ে বলেছিলেন এই ...তাপ্রাণ সাধকটি—'তরুণ কবিরা/ ...মরা এগিয়ে এসো/ পৃথিবীর সব ...ফুরিয়ে যায়নি'—তাঁরা তাদের ...দ-শব্দে গাঁথা অর্ঘ্য নিয়ে হাজির ...লেন এই সভায়, এটাই বেশি করে ...বার। শ্রীরামপুরের তরুণ কবিরা ... এই দিনেই বার করে ফেলেছেন ...তের তরবারি' নামের একটি ...কার স্মরণসংখ্যা। অনুস্টুপের ...ণ-সংখ্যাটির মতো সামগ্রিক ...য়নের প্রয়াস এতে অবশ্য নেই, ... যেটুকু রয়েছে তাও কম মূল্যবান ...।

...ণ-কমিটির নানাবিধ কাজ-কর্মের ...র্কে এ-সন্ধ্যায় বললেন সমীর ...। তার আগে অতীন্দ্র মজুমদার, ...বীরেন্দ্রের দীর্ঘদিনের কবি বন্ধু, ...ছেন স্বাগত ভাষণ। শোকপ্রস্তাব ... করে সমর সেনের প্রতি ...বনত নীরবতাও হয়েছে ...াত। কমিটি বীরেন্দ্র ...পাধ্যায়ের স্মরণে বছরের সেরা কাব্যগ্রন্থকে পুরস্কার দেন। এ-বছর সব্যসাচী দেব তাঁর 'স্তব্ধ স্মৃতি বহমান স্রোত' গ্রন্থের জন্য পুরস্কার পেলেন অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্যের হাত থেকে। তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারবান ভাষণে জ্যোতি ভট্টাচার্য প্রথমেই বললেন, এ-পুরস্কার কোনও অগ্রজ কবির হাত থেকে পেলে বেশি ভাল হত। কিন্তু তিনিও যে কম যোগ্য নন, সে পরিচয় ফুটে উঠল তাঁর কবিতা বিশ্লেষণের বিদ্যুৎ-চমকের মধ্য দিয়ে। খুব সঠিকভাবেই মৃদু ভর্ৎসনা করলেন সব্যসাচীর তথা আরও বহু তরুণ কবির মানসতা ও লিখন ভঙ্গিমাকে। এই প্রসঙ্গেই আরেকটি কথা মনে হয়,

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুরস্কার-কমিটিতে যথাযোগ্য বিচারক থাকা সত্ত্বেও মনে হয়, পুরস্কারের জন্য যেন বিশেষ এক গোষ্ঠীর কাব্যগ্রন্থের দিকেই পক্ষপাত। সব্যসাচী খারাপ লেখেন না, কিন্তু তাঁর গ্রন্থটি কোন দিক থেকে 'শ্রেষ্ঠ' গ্রন্থ, বুঝতে অসুবিধে হয়।

কমিটি আয়োজিত স্মারক-বক্তৃতায় এবার বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিকৃতি সম্পর্কে বললেন সুমিতা চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্যে যদি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার উদাহরণ আরও থাকত, তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হত দৃঢ়তরভাবে। আর, চল্লিশের কবিতায় বেশ কয়েকটি নাম কেন অনুচ্চারিত, আবার দিনেশ দাস প্রমুখ কীভাবে চল্লিশে অন্তর্ভুক্ত, তা নিয়েও খটকা থেকে যায়। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার গান ও তাঁর কবিতার পাঠ আবৃত্তির অনুষ্ঠানে রজত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনুশ্রী-বিপুল চক্রবর্তীর নাম করতে হয়। কবি সম্মেলনও ছিল। অরুণ মিত্রের পরিচালনায়। অনিন্দ্য চাকী, নরেশ দাস, সুশান্ত বিশ্বাস, রাহুল পুরকায়স্থ ও কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা বেশ আশা জাগানো।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

এ তো নয় ভালোবাসা

বাংলা চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে উত্তমকুমারের জন্ম, মৃত্যু বা তাঁর জীবনপঞ্জী প্রায় মুখস্থই বলা চলে। তাই মূলধন করে কিছু কিছু সংস্থা তাঁর জন্মদিন ও মৃত্যুদিনে বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান করে থাকেন তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। এই সকল অনুষ্ঠানগুলিতে শ্রদ্ধা জানানোর থেকেও প্রকট হয়ে দেখা দেয় সংগঠকদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। বিজ্ঞাপিত বহু নায়ক-নায়িকাই থাকেন অনুপস্থিত—উদ্যোক্তারা দেখান নানারকম অজুহাত। কিন্তু বেশীদিন যে দর্শকদের বিজ্ঞাপনের মায়াজালে ভুলিয়ে রাখা যায় না—এই কথাটাই বহু সংস্থা মনে রাখেন না। মোহভঙ্গ তো হবেই। এইরকমই একটি অনুষ্ঠান উত্তমকুমারের জন্মদিনে নিবেদন করলেন উত্তম স্মৃতি সংসদ। সেখানে না ছিল কোন প্রাণের স্পন্দন না ছিল কোন রকম সুচিন্তা। গান ও আবৃত্তির মাধ্যমে এমন একটি গতানুগতিক অনুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন ছিল না মহানায়কের জন্মদিনে।

অনুষ্ঠানের শুরু তনুশ্রীশংকরের নৃত্যের মাধ্যমে। উত্তম-পরবর্তীকালে বাংলা চলচ্চিত্র কীভাবে হিন্দী ছবির ভাবধারায় প্রভাবিত তারই একটি সুচিন্তিত আলোচনা করলেন সেবাব্রত গুপ্ত। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বপ্না ঘোষাল রবীন্দ্রসংগীত শোনালেন। অসীমা মুখোপাধ্যায় নিরসভাবে মেমসাহেব ছবির দুটি গান শোনালেন। ধীরেন বসুর নজরুলগীতিতে নজরুল অনুপস্থিত। মঞ্চে এলেন দেবশ্রী রায়—দর্শকদের মধ্যে তুমুল আলোড়ন। এইভাবেই চলতে থাকল শিল্পীদের আসা যাওয়া। কিন্তু দর্শকরা তো আর উৎপলা সেন, রামকুমার

উত্তমকুমার

চট্টোপাধ্যায়কে দেখতে আসেনি। তাঁদের দেবতাদের তো দেখা নেই। বিটু সমাজপতির গানের সময় তাঁকে উদ্যোক্তারা মঞ্চের আড়াল থেকে গান চালিয়ে যেতে বললেন, প্রেক্ষাগৃহ থেকে আওয়াজ গেল "আর না"। বনশ্রী সেনগুপ্তের বেলাতেও সেই একই অবস্থা। রাত নটা কুড়ি মিনিটে দর্শকদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বিরতি ঘোষণা হল। ততক্ষণে সবাই বুঝে গেছেন আর কোনও শিল্পী নেই। যাই হোক বিরতির পর তুমুল কোলাহলের মধ্যে মঞ্চে এলেন সবিতা চৌধুরী। শুধুমাত্র হারমোনিয়মে তিনি যে কত অসহায় তা অনুভূত হল। সাতসুরের অধিকাংশই ঠিক ঠিক জায়গায় লাগল না। সেটা বুঝতে পেরেই তিনি অতি সংকোচের সঙ্গে জানালেন যে একেবারেই প্রস্তুত হয়ে আসেননি। শুধুমাত্র উত্তমকুমারের প্রতি ভালোবাসায় এসেছেন। কে যে ভালোবাসায় এসেছেন আর কে যে আসেননি বোঝা গেল না।

বারীন মজুমদার

দেশ

এক বিলুপ্ত প্রতিভা তরু দত্ত

কলকাতার রামবাগানের দত্ত পরিবারের অম্লান কুসুম তরু দত্ত তাঁর সারস্বত প্রতিভা স্ফুরণের সন্ধি মুহূর্তেই ঝরে গিয়েছিলেন মাত্র একুশ বছর বয়সে। তিনি স্বভাবে ছিলেন খাঁটি বাঙালী, শিক্ষায় ইংরেজ আর সহৃদয়-মানসিকতায় ফরাসী। একশো একত্রিশ বছর আগে এই কলকাতায় তিনি জন্মেছিলেন, মৃত্যু ঘটেছে এই শহরে।

উনিশ শতকের মধ্যদশায় নব্যশিক্ষিত বাঙালী সমাজের অগ্রবর্তী অংশ যখন সর্বতোরকমে ইংরেজিয়ানার শামিয়ানার নিচে কায়েম হয়ে বসার চেষ্টা করছেন অথচ অন্তঃপুরকে অর্গলবদ্ধ রাখতে বদ্ধপরিকর অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের খড়্গহস্ত অনুশাসন প্রায় আলোচনার বাইরে, তখন সেই প্রতিকূল স্রোতের উজানে তরু দত্তর আবির্ভাব রীতিমত বিস্ময়কর ঘটনা বলেই মনে হয়। পশ্চিমে বাংলার নিষিদ্ধ বাতায়ন নিজে হাতে খুলেছিলেন এই ক্ষণজন্মা, ক্ষণায়ু কিশোরী কবি। আর তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল যে, নিজের অজ্ঞাতসারেই তরু দত্ত ঘটিয়েছিলেন এদেশে নারীমুক্তির প্রথম নিঃশব্দ বিপ্লব। অনেকেই সে সময়ে তরুর জীবনের স্বরূপ এবং তার অতিসামান্য সংখ্যক রচনার অসামান্য তাৎপর্য ধরতে পারেননি। জীবদ্দশায় তরু যশ লাভ করেননি। তাঁর রচনা জনগ্রাহী হয়নি। লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গেছে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে দেশে বিদেশে অনেক আলোচনা হয়েছে। এর জন্য তিনটি কারণ দায়ী। তরুর স্বল্পায়ু জীবনের অনেকটাই কেটেছে বিদেশে। স্বদেশেও তাঁর দিনগুলি কেটেছে বাগমারির বাগানবাড়ির নির্জন চৌহদ্দির মধ্যে, নিবিড় নৈসর্গিক আবেষ্টনীর মধ্যে। বাঙালী সমাজের সঙ্কীর্ণতা একদিকে যেমন তরুকে সামাজিক মেলামেশায় বিমুখ করে তুলেছিল, করে তুলেছিল পরিবার মুখী, গল্পকাহিনী ও কবিতার অভিমুখী—অপরদিকে দুরারোগ্য ব্যাধির দরুন তাঁকে থাকতে হয়েছে গৃহবন্দী হয়ে। তৃতীয় কারণ তাঁর সৃজনমাধ্যম ছিল ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষা। সাধারণ বাঙালীর দুরধিগম্য হয়েছিল এই ভাষা। সেই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার, তরুর একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণটিই কেবল তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত হয়েছিল।

রামবাগানের বিখ্যাত দত্ত বংশ ছিল আভিজাত্যে এবং বিদ্যাবৈদগ্ধ্যের কৌলীন্যে কলকাতার গৌরব। সাহিত্যের ইতিহাসেও এই পরিবারের কীর্তিকথা চিরদিন সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। এই দত্তদের আদিবাস ছিল বর্ধমান জেলার অজপুর গ্রামে। আদি পুরুষ নীলমণি দত্ত [তরুর পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্তর পিতামহ] বর্ধমান থেকে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। নীলমণি নিজে আচারনিষ্ঠ হিন্দু হয়েও ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেননি। পূজা-অর্চনার পাশাপাশি নীলমণি পরধর্মেও সহিষ্ণু ছিলেন। নীলমণির পুত্র রসময় ইংরেজি শিক্ষা প্রচারে ইংরেজদের খুবই সহায়ক হয়েছিলেন। হিন্দু কলেজের সেক্রেটারি এবং ছোট আদালতের অন্যতম বিচারপতি রসময়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহটি ছিল রীতিমত বাছাইকরা ইংরেজি সাহিত্যে ঠাসা। এই রসময়ের পাঁচ পুত্রের মধ্যে তৃতীয় হলেন গোবিন্দচন্দ্র—শ্রীমতী তরুর পিতা। মধুসূদন, পিয়ারীচরণ সরকার প্রমুখের সতীর্থ গোবিন্দ ছিলেন হিন্দু কলেজের অন্যতম মেধাবী ছাত্র। ইংরেজিতে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন, কিঞ্চিৎ খ্যাতিও হয়েছিল এ ব্যাপারে। ইংরেজ সরকারের অধীনে উচ্চপদে চাকুরি করতেন। কিন্তু বাঙালীর স্বাজাত্যাভিমান ছিল তাঁর রক্তে। মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা এবং সাহসী। মর্যাদায় আঘাত লাগায় অনায়াসে তিনি অত বড় চাকরিও ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণের জন্য সাহিত্যচর্চায় নেমে পড়েছিলেন। শ্রীমতী তরুর প্রবাস জীবনে এবং ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষানবিশীতে এই পিতাই ছিলেন তাঁর সহচর অভিভাবক এবং অন্তরঙ্গ পথপ্রদর্শক। তরু ছিলেন যেমন তাঁর শোকতপ্ত জীবনে ছায়া-তরু, তরুর চরিত্রেও তাঁর ছায়াপাত প্রায় অনিবার্য ছিল। কলকাতায় গোবিন্দচন্দ্রের ১২ নম্বর মানিকতলা স্ট্রিটের বাড়িতে তরুর জন্ম হয় ১৮৫৬ সালের ৪ মার্চ। ছেলেবেলায় মায়ের প্রভাব পড়েছিল তরু এবং তাঁর ভাই বোনের ওপর। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী এবং পুরাণকথায় তাঁদের মন তৈরি হয়ে গিয়েছিল মায়ের কাছেই। ১৮৬২ সালের দত্ত বংশের সকলেই খ্রীস্টান হয়ে যান। তবে পরিবারের মধ্যে হিন্দু ভাবভাবনার একটা ফল্গুধারা বরাবরই বহমান ছিল। আর তরু ছিলেন প্রকৃতই এক স্থিতধী গাছের মত। তার শিকড় ছিল দেশের মাটিতে, শাখা প্রশাখা পাতাপল্লব অন্য আলো হাওয়ায় মেলা। জেমস ডার্মেস্টেটার তরুর মূল্যায়নে যথার্থই বলেছেন, এই বাঙালী মেয়েটি ছিল অতি আশ্চর্যজনক ও অদ্ভুত শক্তিসম্পন্না। জাতিতে ও ভাবধারায় সে হিন্দু, শিক্ষায় ইংরেজ, হৃদয়ে ফরাসী। সে কবিতা লিখতো ইংরেজী ভাষায়, কিন্তু গদ্য লিখতো ফরাসীতে...তার অন্তরে ছিল তিনটি ভাবধারার ত্রিবেণী সঙ্গম।

অল্প বয়স থেকেই তরু এবং তার দিদি অরু ইংরেজি ভাষায় দ্রুত শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। এক ইংরেজ মহিলার কাছে গানও শিখছিলেন তরু, তাঁর গলাটা ভালো ছিল। অরু আঁকতেন ছবি। একমাত্র পুত্র সন্তান অব্জুর মৃত্যুর পর গোবিন্দচন্দ্র তাঁর স্ত্রী ও কন্যা দুটিকে নিয়ে ১৮৬৯ সালে ইউরোপে চলে যান কয়েক বছরের জন্যে। প্রথম দিকে দক্ষিণ ফ্রান্সের নিস শহরে কিছুকাল বসবাস করেন। এখানেই এক আবাসিক স্কুলে দুই বোনের ফরাসী শিক্ষা শুরু হয়। কয়েক মাস চলে এই স্কুলের জীবন। তারপর বাড়িতে বাবার কাছে এবং এক ফরাসী গৃহশিক্ষয়িত্রীর কাছে ভাষা ও সাহিত্যে দ্রুত তালিম চলে।

নিস শহর থেকে পারী হয়ে তরুরা লন্ডনে চলে আসেন ১৮৭৩ সালে। প্রথমে চেয়ারিং ক্রশ হোটেলে, পরে ব্রমটনে ভাড়া বাড়িতে। নিসে যেমন অনেক ফরাসী পরিবারের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল, লন্ডনেও তেমনি বহু খ্রীষ্ট বিশ্বাসী মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সুযোগ ঘটে। এই লন্ডনে এসেই তরু ফরাসী কবিতার ইংরেজী অনুবাদ এবং ইংরেজীতে মৌলিক কবিতা লিখতে শুরু করেন। এই সময়ের একটি আনন্দদায়ক ঘটনা —ওঁদের আত্মীয়, দত্তপরিবারের আর এক শিরোমণি রমেশচন্দ্র দত্ত লন্ডনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। গোবিন্দবাবুর বাড়িতে তিনি প্রায়ই আসতেন এবং সাহিত্য আলোচনায় যোগ দিতেন। লর্ড লরেন্সের সঙ্গে তরুর পরিচয় এবং অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে এই বাড়িতেই।

ফ্রান্সই হয়ে উঠেছিল কুমারী তরুর দ্বিতীয় স্বদেশ। লন্ডনে বাস করেও তিনি জাতিস্মরের মত জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতেন ফ্রান্সের ভূপ্রকৃতির, আর সেখানকার প্রিয় মানুষগুলির। কবি মুসে, লামারাতন, ভিক্টর হুগো থেকে বোদলেয়ার পর্যন্ত প্রিয় কবিদের আবিষ্টকারী সব কবিতা ইংরেজিতে তরজমা করে চলেছিলেন তরু। 'ইণ্ডিয়ানা' উপন্যাসখ্যাত জর্জ সাঁর নতুনরীতির উপন্যাসগুলির মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রবার্তা। পেয়েছিলেন নিকট-ভবিষ্যতে উপন্যাস রচনার অবচেতন প্রেরণা।

ন্তু বিলেতের পাট হঠাৎই চুকিয়ে
ড়িঘড়ি দেশে ফিরে আসতে হল
াবিন্দচন্দ্রকে। অরুর স্বাস্থ্যের দ্রুত
বনতিতে দুশ্চিন্তিত দত্তমশাই
পরিবারে কলকাতায় ফিরে
সেছিলেন ১৮৭৩ সেপ্টেম্বর মাসে
ন্তু এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই
রের বছর ২৩ জুলাই অরু তাঁকে
ছড়ে চলে গেলেন। পুত্র শোকের
র এই কন্যাবিয়োগ তাঁকে তরু সর্বস্ব
রে তুলল। তরুও সর্বক্ষণের
হোদরাকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ। বাবার
াছে সংস্কৃতচর্চায় মনোনিবেশ
রলেন। কিন্তু যক্ষ্মারোগের জীবাণু
তদিনে তার মধ্যেও সংক্রমিত হয়ে
গছে অলক্ষ্যে। দুই বোনে যে
উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছিলেন
একদিন সেই কাজে হাত দিলেন তরু
ইবার। কিন্তু ভয়ঙ্কর কাশিতে মাঝে
াঝেই কাহিল হয়ে পড়ছিলেন তরু।
ভূত পরিশ্রমের ক্ষমতা ধীরে ধীরে
মে আসছিল। এই অবস্থায়ও
াব্যচর্চা চলেছিল আগের মতই।
তিমধ্যে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ এ শীফ্
্লেন্ড ইন ফ্রেঞ্চ ফিলডস প্রকাশিত
৮৭৬ সালের ২৪ মার্চ। বেঙ্গল
্যাগাজিনে বেরোয় তাঁর অনূদিত
বষ্ণুপুরাণের কয়েকটি সর্গ।
ীফ্-এর সমালোচনা এবং সুখ্যাতি
তে থাকে দেশে বিদেশে। ইতিমধ্যে
রু ক্লারিস বাদেব-এর La femme
ans l'Inde antique বইটি
নুবাদ করার জন্যে লেখিকার কাছে
নুমতি প্রার্থনা করে একটি চিঠি
লখেন। পত্রালাপে এবং তরুর
বিতার বইটি পড়ে বাদের মুগ্ধ হন
বং অনুমতি দেন কিন্তু 'প্রাচীন
ারতে নারী' বইটি আর অনুবাদ করা
য়ে ওঠেনি তরুর। ১৮৭৭ সালের
০ আগস্ট যক্ষ্মারোগে তরুর
ীবনাবসান হয়। মাত্র একুশ বছর
াঁচ মাস বয়সে তরু তাঁর প্রতিভার
তিশ্রুতি পূর্ণ না করেই চলে
গলেন। পিছনে রেখে গেলেন
শাকার্ত পরিবারের জন্যে তাঁর
মবর্ধমান খ্যাতি আর সেই সম্পূর্ণ
রে যাওয়া বহু আলোচিত ফরাসী
াষায় লেখা উপন্যাসটি। Journal
e Mademoiselle d'Arvers
কুমারী আরভের-এর দিনপঞ্জী)
মক আত্মজৈবনিক উপন্যাসটি
ারিস বাদের-এর মুখবন্ধ সংবলিত
য় পারী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল
৮৭৯ সালে। আর তরুর লেখা
টি গাথা কবিতার সংকলন এনসেন্ট
ালাড্স অ্যাণ্ড লিজেণ্ডস অব
ন্দুস্থান ছাপা হয়ে বেরোয় লণ্ডন
থেকে ১৮৮২ সালের ৩১ আগস্ট।
মৃত্যুর ঠিক পাঁচ বছর পরে।
ঝরা ফুলের গন্ধের মতই তরুর
কবিখ্যাতি এবং গদ্যরচনার সুযশ
ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরেই।
১৮৭৮ সালে তাঁর কাব্যগ্রন্থটির
দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়ে দ্রুত
নিঃশেষ হয়ে যায়। বিভিন্ন
পত্র-পত্রিকায় বিগদ্ধ সমালোচক
তারিফ করেন তরুর কবি ক্ষমতার।
তরুকে নিয়ে পৃথক নিবন্ধও
লেখেন আঁদ্রে থেরিয়ের। আন্দ্রিয়াঁ
দুপ্রে, জেম্স ডারমেস্টেটর, এডমণ্ড
গোসে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করেছেন
তরুর 'জুর্নাল দে মাদময়াজেল
দারভের' উপন্যাসের। এমন করুণ
মর্মস্পর্শী কাহিনী যে বালজাক ও
জর্জ ইলিয়ট-এর পক্ষেই রচনা করা
সম্ভব ছিল একথা বলেছেন তাঁরা।

জর্জ সাঁ ও জর্জ ইলিয়ট যদি তরুর
মতই একুশ বছরে মারা যেতেন
তাহলে পূর্বোক্ত দুজনও যে এর বেশি
রচনা রেখে যেতে পারতেন না এ
বিষয়ে সমালোচকরা নিশ্চিত। তরুর
রচনার সবচেয়ে বড় গুণ সরলতা ও
সবল বিশ্বাসের রুচিশীল আবেগ।
অন্য ভারতীয় লেখকের মত তিনি
কখনোই ইংরেজ কিংবা ফরাসীর মত
করে লিখতে চেষ্টা করেননি। তাঁর
বাঙালী-আনাকে খাড়া রেখে বিদেশী
ভাষাকে আপন নিঃশ্বাসের মতই
স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বকীয় ভঙ্গিতে
ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁর
রচনাশৈলীটি রমণীয় ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত
হয়ে উঠতে পেরেছে। তরুর কোন
পূর্ণাঙ্গ জীবনী অদ্যাবধি লেখা হয়নি।
হরিহর দাসের 'লাইফ অ্যাণ্ড লেটার্স
অব তরু দত্ত' নামক বইটির মধ্যে
কিছু শ্রুত ও স্মৃত ঘটনা এবং
পত্রসাক্ষ্যে তরুর জীবন ধরা রয়েছে।
বাংলায় রাজকুমার মুখোপাধ্যায় এই
অকালপ্রয়াত কবির অতি সংক্ষিপ্ত
জীবন-আলেখ্য ও মূল্যায়ন
করেছিলেন কিন্তু সেই গ্রন্থ আর
পুনর্মুদ্রিত ও পরিমার্জিত এবং
পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হল
না। ইতিমধ্যে তরুর মৃত্যুর পরে
একশো দশ বছর পর হয়ে গেছে।

প্রয়াণ

গত দু দশকেরও বেশী সময় যাবৎ অকাল প্রয়াত নারায়ণ
গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতির শিখাটি যিনি
তার রচনার মধ্য দিয়ে আমাদের
চোখের সামনে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন,
যাঁর নামের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য
জীবনের অগ্রবর্তী সহচর স্বামীর
নামটি ওতপ্রোত জড়িয়ে ছিল সেই
আশা দেবী ১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার
তাঁর একমাত্র পুত্র অভিজিৎকে রেখে
হঠাৎ চলে গেলেন।
আশা দেবীর জন্ম হয়েছিল কাশীতে
যদিও আদি নিবাস জলপাইগুড়িতে।
উক্ত দুই শহর এবং কলকাতায় তাঁর
শিক্ষাজীবন কেটেছে। তিনি ছিলেন
এম এ বি টি, ডি· ফিল (১৯৬১)।
প্রধান শিক্ষিকার কাজ করেছেন
বিদ্যার্থী মণ্ডল বালিকা বিদ্যালয়ে।
সিটি কলেজে অধ্যাপনা।
মাতৃসম্মেলনের প্রতিনিধিরূপে
সুইজারল্যাণ্ড ও রাশিয়ায় ভ্রমণ
(১৯৫৫)।
গ্রন্থাবলী : মেঘলা প্রহর, শিশু
সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, সুমতি নদীর
ঢেউ, টেনিদার পিসতুত ভাই মুসুরী,
হাসির গল্প, কুট্টিপিসি অ্যান্ড কোং,
লালতারা নীলতারা, লালচিঠির
আতঙ্ক, আসল টেনিদা, রঙীন বেলুন,
রক্তলিপি। মাসিক 'মহিলা' পত্রিকার
সম্পাদিকা ছিলেন এক সময়।

আসল টেনিদাকে যিনি
নিয়ে এসেছিলেন শিশু
সাহিত্যের আঙিনায়
তিনি আজ বিদায় নিলেন
হঠাৎই। প্রকৃতপক্ষে
প্রয়াত নারায়ণ
গঙ্গোপাধ্যায়কেই
সাহিত্যের মধ্য দিয়ে
উৎসর্গ করে
দিয়েছেন তিনি। শিশু
সাহিত্য নিয়ে তিনি
কেবল গবেষণাই করেননি
শিশুসাহিত্যের চর্চায়
নিমগ্ন ছিলেন তিনি
আমৃত্যু।

শরৎ পুরস্কার, ১৯৮৭

শরৎচন্দ্রের শতবর্ষ পূর্তি বছর
(১৯৭৬) থেকে 'শরৎ পুরস্কার'
দিয়ে আসছে শরৎ সমিতি। এ বারের
শরৎ পুরস্কার পেলেন অন্নদাশঙ্কর
রায়। এক অনুষ্ঠানে (বিড়লা
অ্যাকাডেমি মঞ্চ, ১৭ সেপ্টেম্বর
১৯৮৭) পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল
পুরস্কার তুলে দেন অন্নদাশঙ্কর রায়ের
হাতে।
শুরুতে অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যকৃতি
সম্পর্কে আলোচনা করেন
রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। অন্নদাশঙ্কর
প্রতিভাষণে (বাংলা এবং ইংরাজী
উভয় ভাষায়) তাঁর ষাট বছরের
সাহিত্যসৃষ্টির এক রূপরেখা তুলে
ধরেন শ্রোতাদের কাছে। তিনি
জানান যে ভবিষ্যতে তাঁর ব্যালাড
লেখার ইচ্ছা আছে।
রাজ্যপাল বলেন যে শরৎ-সাহিত্য
তিনি অনুবাদের মাধ্যমে পড়েছেন।
এর পর তিনি বলেন ভারতের বিভিন্ন
ভাষাভাষী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়
সাধনে সাহিত্যের এক বিশেষ ভূমিকা
আছে।
শরৎ সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়ন
অবিলম্বে হওয়া দরকার বলে
জানালেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন দেবীপদ
ভট্টাচার্য।

ক্রমশ

রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই

সুধীর চক্রবর্তী

রবীন্দ্রসংগীত/ শান্তিদেব ঘোষ/

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ/ কলকাতা/ ৪৫·০০.

আমাদের প্রতিদিনকার বস্তুজগতে এত চমকপ্রদ ঘটনা ঘটছে এবং আজকের রাজনীতিবহুল সমাজজীবনে এমনই পতন-অভ্যুদয় চলছে যে, তার অন্তরালে ঘটে-যাওয়া বহু ভাবময় সংঘটন আমরা জানতে পারি না। যেমন, এই বাংলা বছরের প্রথম মাসে প্রকাশ পেয়েছে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ থেকে শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসংগীত' বইয়ের ষষ্ঠ সংস্করণ তথা সপ্তম মুদ্রণ। এ-খবর যেমন আমরা জানতে পারিনি, তেমনই উপলব্ধি করতে পারিনি এই প্রকাশনার গুরুত্ব। অথচ রবীন্দ্রসংগীতের তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে যত জন বঙ্গ ভাষাভাষী গত চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁরা নন্দলাল বসুর আঁকা নৃত্যরত বাউলের রেখাচিত্র সমন্বিত প্রচ্ছদ আর তাঁরই বর্ণলিপিতে লেখা 'রবীন্দ্রসংগীতে' বইটির ঋণ স্বীকার করবেন। আজ রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে এত বই প্রকাশিত হয়েছে, হয়ে চলেছে সে বিষয়ে এমন বিচিত্রধর্মী নিবন্ধ ও গ্রন্থের প্রকাশনা যে, আলাদা করে শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসংগীত' বইটির দানের পরিমাপ করা কঠিন। কিন্তু নবীন প্রজন্ম তেমন করে না জানুন, আমরা অনেকে মানি যে, রবীন্দ্রতিরোধানের পরের বছর প্রকাশিত এই বই বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ রচনা। সেই থেকে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে যাঁদের কিছু ভাবতে হয়েছে বা লিখতে হয়েছে তাঁরাই অবিরলভাবে 'রবীন্দ্রসংগীত' থেকে সাহায্য পেয়েছেন। সেদিক থেকে এটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রথম আকরগ্রন্থ। বইটির অব্যাহত জনপ্রিয়তা ও ধারাবাহিক প্রকাশনার সন তারিখ অভ্রান্তভাবে বুঝিয়ে দেয়, রবীন্দ্রসংগীতে বাঙালীর চিন্তাচর্যার কতখানি বড় জায়গায় নিজের স্থান করে নিয়েছে। 'রবীন্দ্রসংগীত' প্রথম বেরোয় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ। এর পরবর্তী সংস্করণগুলির সন তারিখ এই রকম : দ্বিতীয় আশ্বিন ১৩৫৬, তৃতীয় পৌষ ১৩৬৫, পরিবর্ধিত সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯, পুনর্মুদ্রণ ফাল্গুন ১৩৭৬, পঞ্চম সংস্করণ পৌষ ১৩৮৬ এবং প্রস্তুত ষষ্ঠ সংস্করণ বৈশাখ ১৩৯৪।

শান্তিদেব শৈশব থেকেই রবীন্দ্রপ্রহরায় মানুষ। পাঁচ বছর বয়স থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের গানের দলের সদস্য এবং সারাজীবনই সেই অমল ঝর্ণাধারায় তাঁর অবগাহন যার নাম রবীন্দ্রসংগীত। এই বছর তাঁর বয়স হল সাতাত্তর। সেই বিচারে 'রবীন্দ্রসংগীত' বইতে ধরা আছে রবীন্দ্রগানের পরিমণ্ডলে বেড়ে-ওঠা এবং বেঁচে থাকা একজন মরমী গায়কের শৈশব থেকে প্রাণের সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত চেতনার অন্তর্জীবন। যে জীবনের ধ্রুবপদ সেই মহাজীবনের

গানে মেলানো। সেই জন্যই শান্তিদেবের রচনা ও গান এখনও পর্যন্ত সব অর্থে সবচেয়ে অমলিন রবীন্দ্রস্পর্শধন্য।

শান্তিনিকেতনের বাইরে রবীন্দ্রসংগীতের কোনো শিক্ষাসত্র যখন ছিল না, নির্ধারিত হয়নি সে বিষয়ে কোনো পাঠক্রম, তখন রবীন্দ্রনাথের গান রচনার অনন্যতা ও বিশেষত্ব বোঝাতে কেউ তেমন অগ্রণী হননি। আমাদের মনে পড়ে, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে এক উৎকৃষ্ট নিবন্ধের কথা, যা নিঃসন্দেহে শান্তিদেবের আগে লেখা। তার পরেই রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ শান্তিদেবের এই প্রবন্ধগুচ্ছের সূচনা ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালে। ভূমিকায় লেখা আছে : 'পূজনীয় গুরুদেবের গানের বিষয়ে বই প্রকাশ করবার ইচ্ছা তিন বছর পূর্বেও আমার মনে একেবারেই জাগেনি। ছেলেবেলা থেকে আপন আনন্দে গানই গেয়েছি, কোনোদিন ভাবিনি এ ধরনের কাজ আমাকে একদিন করতে হবে। যখন প্রথম গুরুদেবের গানের বিষয়ে লিখবার জন্যে তাগিদ আসতে লাগল, তখন অত্যন্ত সংকোচে লেখা শুরু করেছিলাম। রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে পূজনীয় গুরুদেবের কাছে উপস্থিত করেছিলাম। তিনি আমার চেষ্টার পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হন এবং লেখাটি পড়ে তাঁর মতামত লিখে দেন। তাঁর সেই মতামতটিই লেখার পথে আমার মনে প্রেরণা জাগিয়েছে।'

এই প্রেরণা যে কত ব্যাপক তার প্রমাণ প্রস্তুত সংস্করণের শেষ রচনা 'রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদের প্রভাব', যার রচনাকাল ১৩৯১। তার মানে ১৯৪১ সালের সূচনা থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত এই তেতাল্লিশ বছর ধরে শান্তিদেব ঘোষ লিখে চলেছেন কেবল রবীন্দ্রসংগীত বিষয়েই। ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা' নামে আরো একটি নিবন্ধ সংকলন।

শান্তিদেবের কাছ থেকে আমরা শুনেছি যে, রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে তাঁকে লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। সেই লেখায় প্রাথমিক খসড়া তিনি আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, জীবনের অন্তিম বছরগুলিতে রবীন্দ্রনাথ কেমন আগ্রহ ও উদ্বেগ বোধ করতেন তাঁর গানের স্বরূপ ও স্বভাব সবাইকে বোঝাতে। তিনি তখন ঘুণাক্ষরেও জেনে যাননি প্রয়াণের এক দশক পরে রবীন্দ্রসংগীত কী গর্বিত রাজকীয় মহিমায় আচ্ছন্ন করবে আমাদের। বোঝেননি যে তাঁর 'শেষ পারানির কড়ি' হয়ে উঠবে বাঙালির জীবনসর্বস্ব এবং গৌরবের সর্বোচ্চ শিখর। সেই জন্যই শান্তিদেবের এই ঐতিহাসিক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের শেষ বছরের কম্পিত হস্তাক্ষরে লেখা থাকে এমনও শোচনা : 'রাখাল যেমন একলা মনের আনন্দে কর্মহীন প্রহরগুলি ভাসিয়ে দেয় সুরে সুরে ; না থাকে কেউ জুড়ি তার না থাকে কেউ শ্রোতা আমার সেই দশা ছিল। আমার গান তখন অবজ্ঞার এমন কি বিদ্রূপের বিষয় ছিল।'

সেই ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে শান্তিদেব ঘোষ যখন সংকোচের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে লিখতে সচেষ্ট হন তখন প্রথম কাজ ছিল অবজ্ঞা আর বিদ্রূপ থেকে রবীন্দ্রগানের অকলুষ মাধুর্যটুকু শিক্ষিত বাঙালির কাছে তুলে ধরা। সেই সঙ্গে তিনি বুঝতেও চেয়েছিলেন নিজের মত করে রবীন্দ্রসংগীতের আলাদা মর্যাদা, তার অবস্থান ও সৃজনবৈচিত্র্য। সেই জন্য তাঁকে তখন এমন প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে যার শিরোনাম 'ভারতীয় সংগীতে গুরুদেবের স্থান'। আবার লক্ষ করি ১৩৯৪ সালে লেখা বর্তমান সংস্করণে সংযোজিত একটি ছোট নিবন্ধ, যার শিরোনাম 'রবীন্দ্রসংগীত কিভাবে গাইতে হয়'। এই নিবন্ধ একান্তভাবে গায়ক শান্তিদেবেরই লেখবার কথা, কেননা তিনি যেমন রবীন্দ্রনাথ আর দিনেন্দ্রনাথের গায়নে রবীন্দ্রগান শুনেছেন তেমনই নিজেও বহন করে চলেছেন সেই গায়নের বিরল পরম্পরা। তাঁর দুর্লভ ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতা থেকেই লেখা সম্ভব হয়েছে 'রবীন্দ্র জীবনের শেষ বৎসর', কিংবা 'কয়েকটি তথ্য' বা 'নেপথ্যের কথা'র মত রবীন্দ্রনাথের গান রচনার অন্তঃপুরের তথ্যবহুল কথা। আবার এখনও মনে হয় যে, নর্তক শান্তিদেব ছাড়া কেই বা লিখতে পারতেন 'শান্তিনিকেতনের ইত্যাধারা'র মত অজানা পরিমণ্ডলের প্রবন্ধ ? রবীন্দ্রনাথের গানে 'উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের প্রভাব', 'ধ্রুপদের প্রভাব' কিংবা

্যনাট্যের অভিনয়' বিষয়ে যখন তিনি লেখেন
ন নেপথ্য থেকে উঠে আসে তাঁর শিক্ষাগ্রহণের
কাপোক্ত বনিয়াদের স্মৃতি। রবীন্দ্রগীতির 'ছন্দ ও
' নিয়ে যখন লেখেন তখন সংগীতভবনের
ক শান্তিদেব কিংবা গায়ক শান্তিদেবের
ভিজ্ঞতা ফুটে ওঠে। এত সব প্রসঙ্গের পরেও
ন্তিদেবকে আমরা হয়ত বিশেষভাবে পাই অন্য
রেক নিবন্ধে যার নাম 'উদ্দীপক বা উল্লাসের
'। একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে কি যে,
নও এই সাতাত্তর বছরে তিনি দেখিয়ে দিতে
রেন তাঁর দৃপ্ত গায়নে কাকে বলে রবীন্দ্রনাথের
দীপনা আর উল্লাসের গান? এতদিক ভেবে তাই
মরা সিদ্ধান্ত করতে পারি সংকোচ থেকে যে
ন্থাবলীর সূচনা তার পরিণতি ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে
ক সুগভীর বিশ্বাসে। রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে হয়তো
রো বই লেখা হবে, কিন্তু শান্তিদেব ঘোষের
বীন্দ্রসংগীত' বই হয়ে থাকবে একক উদাহরণ,
নন্য এতে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে রবীন্দ্রগীতে
বেদিতচিত্ত এক সাধকের অসামান্য অনুভবের
খাচিত্র।

বীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রমিক-পর্বে বহু মানুষকে উদ্বুদ্ধ
রেছিলেন নানাজাতীয় কাজে। জগদানন্দ,
রিচরণ, বিধুশেখর, প্রভাতকুমার, এঁদের যাঁকে দিয়ে
মন কাজ করানো সংগত সেই নির্বাচন ও
রার্পণ ছিল সঠিক। কালীমোহন ঘোষকে
য়েছিলেন শ্রীনিকেতনের ভার। সেই
লীমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র যখন লেখাপড়ায়
শানুরূপ ফল দেখাতে পারলেন না তখন তাঁর
িতার পিতৃতুল্য' রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়োজিত
রলেন গানে এবং পরে সেই গান বিষয়ে লিখতে।
রই ফলে আমরা পাই লেখক শান্তিদেব ঘোষকে।
য়তো গায়ক-নর্তক-শিক্ষক এই ত্রিবিধ মূর্তিকে
তিক্রম করে শেষ পর্যন্ত 'রবীন্দ্রসংগীত' বইয়ের
খক শান্তিদেবের সত্তা অমলিন থাকবে। আমরা
নে রাখবো তাঁকে রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম আলোচক
পে এবং সেই প্রসঙ্গে নানা অজানা তথ্যের প্রথম
রবরাহকারী বলে। হয়তো তাঁর বিশ্লেষণ আমরা
র্থা মানিনি কিন্তু তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ও বিষয়গত
াগ্যতা সম্পর্কে আমাদের মনে তিনি বহুমান্য।
ই যোগ্যতা তাঁকে অর্জন করতে হয়েছে। অর্জন
রতে হয়েছে এক আন্তরিক কিন্তু স্পষ্ট লিখনভঙ্গী।

বীন্দ্রসংগীতকে তার সামগ্রিকতায় বুঝতে গিয়ে
কে আয়ত্ত করতে হয়েছে ভারতের উত্তর ও
ক্ষিণী গানের ধরন, এ দেশের কীর্তন ও
লাকসঙ্গীত, তাল, লয় ও ছন্দের আলাদা স্বভাব
বং গায়নের বিশিষ্টতা। তাঁকে সারাজীবন ধরে
য়ে এবং লিখে বোঝাতে হয়েছে যে 'গানে মাধুর্য
মিষ্টত্ব ফুটিয়ে তুলতে হলে মৃদুকণ্ঠে গাওয়াই
চিত' এ ধারণা অসমীচীন। তিনি বুঝেছেন :
মাদের দেশে সংগীত হল মূলত বেদনার
াশ। ... গুরুদেবের সংগীত জগৎটাও মূলত
চিত্র ও গভীর বেদনার প্রকাশ। বেদনার প্রকাশই
র গানের প্রধান বিষয়। সংগীতে এ পথে গুরুদেব
র্ণরূপে ভারতীয়।' ১৩৬৬ সালে শান্তিদেব
খেছেন রবীন্দ্রসংগীতের জাতিবিচার ও ভেদাভেদ
ল তাকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।
কলেই যাতে গাইতে পারে, গেয়ে আনন্দ দিতে
র' তাই করা উচিত। রবীন্দ্রসংগীতে
ভিজাত্যের গর্ব এনে অন্যের পক্ষে তাকে
অস্পৃশ্য করে রাখার তিনি ঘোর বিরোধী। এই
উদার মতামতের জন্যও প্রবৃদ্ধ শান্তিদেব আমাদের
সম্ভ্রম আদায় করেন।

রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ

রামদুলাল বসু

রবীন্দ্ররচনার রবীন্দ্রব্যাখ্যা/ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান/

বাংলা একাডেমি/ ঢাকা/ পঞ্চাশ টাকা

রবীন্দ্রকাব্যে নারীভাবনা/ রথীন্দ্রনাথ মজুমদার/

বুক ট্রাস্ট/ কল-৭৩/ ২৮·০০

রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য ও শিশু চরিত্র/ ইতিমা দত্ত/

জিজ্ঞাসা/কল-৯/ ৩০·০০

'নিজের রচনা সম্পর্কে আত্মবিশ্লেষণ শোভন হয় না'—একথা জেনেও প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, অনুরোধে উপরোধে, এমনকি আত্মপক্ষ সমর্থনের তাগিদে রবীন্দ্রনাথ আত্মরচনার সমালোচনা করেছেন। আত্মদর্শনের যে বিচিত্রমুখী প্রয়াস রবীন্দ্রকাব্যে বার বার দেখা গেছে, সেই প্রেরণাই সম্ভবত তাঁকে প্রাণিত করেছে নিজের রচনা সম্পর্কে কলম ধরতে। তাই আত্মদর্শনের পাশাপাশি আত্মসৃষ্টি দর্শনের কাজটিও সমান্তরাল ধারায় তাঁর রচনায় প্রবহমান। রবীন্দ্রসাহিত্যকে জানবার জন্য রবীন্দ্রকৃত সমালোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। কেন না এই ধরনের রচনা কেবলমাত্রসাহিত্য ব্যাখ্যা নয়, স্রষ্টার সৃষ্টি মানসের ইতিহাস-সূত্র দর্শন বিশেষ। রবীন্দ্র সাহিত্যের স্বরূপ জানবার জন্য রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-সমালোচকদের দিকে আঙুল দেখিয়েছেন, আর রবীন্দ্র-সমালোচকেরা সূত্র সন্ধানে রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হয়েছেন। নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সংশয়ী হলেও ("আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস/ জানি কালসিন্ধু তারে/ নিয়ত তরঙ্গাঘাতে/ দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি।") সৃষ্টিরূপ কীর্তি-র প্রতি প্রচ্ছন্নমোহ থেকে তিনি মুক্ত হননি। লিখেছেন তাঁর সৃষ্টি দর্শনের ও স্বাদ গ্রহণের আগ্রহে, কখনো বা সমালোচকদের জবাব দিতে। নিজের বিশাল ও বিচিত্র রচনাবলী সম্পর্কে তাঁর অবহিতিও সম্ভবত তাঁকে একাজে প্রেরণা জুগিয়েছে ("অনেক লেখায় অনেক পাতক/ সে মহাপাপ করব মোচন/ আমায় হয়ত করতে হবে/ আমার লেখা সমালোচন।") এইসব কথা মনে আসে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের "রবীন্দ্র রচনার রবীন্দ্রব্যাখ্যা" গ্রন্থটি প্রসঙ্গে। এই গ্রন্থে লেখক রবীন্দ্র রচনার রবীন্দ্রব্যাখ্যার সমালোচনা করেননি। করেছেন সংকলন। সেইসূত্রে সমান্তরাল ধারায় সংকলনটি হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রমানসের আত্ম ইতিহাস।
রবীন্দ্রসমালোচক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ বা রচনা থাকা সত্ত্বেও রহমান সাহেবের গ্রন্থটি পরিকল্পিত হয়েছে ভিন্ন ধারায়। যার ফলে রবীন্দ্রকথিত রবীন্দ্র-দর্শনের এই আয়োজন যেন কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনের এক স্বকৃত ইতিহাস হয়ে উঠেছে। 'রবীন্দ্রব্যাখ্যা'র এই বর্ণানুক্রমিক সংকলন কেবল রবীন্দ্ররচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সেইসূত্রে এসেছে রবীন্দ্রসম্পর্কিত প্রায় দু'শতাধিক প্রসঙ্গ যা রবীন্দ্রপরিচয়ের এক বর্ণোজ্জ্বল দিগন্ত খুলে দিয়েছে। লেখক তাঁর অভিপ্রায় সম্পর্কেও সচেতন—"এই গ্রন্থে এমন বেশ কিছু প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হলো যে-গুলোকে ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা বলা যায় না। যিনি ব্যাখ্যাতা তাঁকে বোঝার জন্য কৌতূহলী পাঠকের কাছে তাঁদের কোনো আকর্ষণ থাকলেও থাকতে পারে।" এই বক্তব্যের সঙ্গে গ্রন্থ পরিকল্পনার অভিনবত্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী সম্পর্কে রবীন্দ্রব্যাখ্যা ছাড়াও প্রসঙ্গত এসেছে আত্মবিশ্লেষণ, আত্মসংশয়, কবি পরিচয়, রবীন্দ্রনাথের ভুল, রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর, ছবি, গান, ধর্মমত, সাহিত্য-কর্ম, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ, আইডিয়াল প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্রব্যাখ্যা।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। গল্প গান প্রবন্ধ নাটক চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও আত্মপ্রত্যয় কম ছিল না। সংকলনে রবীন্দ্র প্রবণতার সেই বহুমুখী ধারাগুলি রবীন্দ্রভাষ্যে যেভাবে উদ্ধৃত হয়েছে তা দেখে চমৎকৃত হতে হয়। গানের প্রতি তাঁর টান যে বেশি ছিল সেকথা তাঁর আত্মমূল্যায়ন সূত্রে জানা যায়। গানে বাস্তব বিষয়কেও যে অকৃত্রিম ও নিবিড়করে প্রকাশ করা যায় সেই দাবি তাঁর 'শ্যামা' ও 'চণ্ডালিকা' সম্পর্কে ঘোষিত। তাঁর কথা থেকেই জানা যায় গানের উপর তাঁর আত্মবিশ্বাস কত বেশি ছিল—"যখন বাস্তব সাহিত্যের পাহারাওয়ালা আমাকে তাড়া করে তখন আমার পালাবার জায়গা আছে আমার গান।" গানের প্রতি তাঁর প্রত্যয়ের দিকটি দিলীপকুমার রায় ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিগুলির প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি সূত্রে আরো সমৃদ্ধ করতে পারত। দিলীপ রায়ের 'সাঙ্গীতিকী' এ প্রসঙ্গে মনে আসে। রচনার সমালোচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অসহিষ্ণুতার পরিচয়ও উদ্ধৃত হয়েছে। বিশেষ করে, টমসনকৃত সমালোচনার ছদ্মনামে প্রত্যুত্তর। রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের সংবেদনশীল দিকগুলি রবীন্দ্রভাষ্যে এভাবে ধরা পড়েছে। গ্রন্থ পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি সবিনয় বক্তব্য বর্ণানুক্রমিক রীতির পরিবর্তে রচনার কালানুক্রমিক পদ্ধতি গ্রহণ করলে রবীন্দ্রমানস বিবর্তনের ইতিহাসটি ধারাবাহিকতা পেতে পারতো। কেন না, রবীন্দ্রব্যাখ্যার এই সংকলন কেবলমাত্র আত্মসমালোচক রবীন্দ্রনাথকেই উন্মোচিত করেনি, অন্যার্থে রবীন্দ্রমানসের আত্মজীবনী হয়ে উঠেছে। এখানেই গ্রন্থটির অনন্যতা।

রবীন্দ্রনাথ মজুমদারের 'রবীন্দ্রকাব্যে নারী ভাবনা'য় নারীর দ্বৈত পরিচয় অন্বেষিত এবং প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি। (১) প্রেম-সৌন্দর্যের প্রতীক (২) ব্যক্তিত্ব ও প্রকৃতি পরিচয়। আলোচনায় নারী-সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে দেহ থেকে দেহাতীত প্রেমের ক্ষেত্রে উত্তরণের যেমন কাব্যনির্ভর ইতিহাস আছে, তেমনি পুরুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত নারীর ভূমিকাও অধীত হয়েছে। নারীর কল্যাণময়ী ও প্রেয়সীরূপ পুরুষ নিরপেক্ষ নয় বরং পুরুষ-নির্ভর বলেই অর্ধাঙ্গিনীরূপে দুর্গম কর্মপথ নারীর বরণীয় হতে পেরেছে। এই অর্জনই নারীর স্বাতন্ত্র্যের প্রেরণা। নারীকে প্রকৃতি ও পুরুষ নিরপেক্ষ করে নয়, বরং উভয়ের অনুষঙ্গে তার

পূর্ণতার স্বরূপ আবিষ্কারে লেখক রবীন্দ্রকাব্যে নারীর স্থানটি নির্দেশ করেছেন। তাঁর এই অধ্যয়ন ব্যাখ্যামূলক হয়েও স্বাদাত্মক। তবে বিষয় ও উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে পৌনঃপুনিকতার জন্য অধ্যায়গুলির কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। যথা, 'নারীর কল্যাণময়ী ও প্রেয়সীরূপ' 'সৌন্দর্য ও নারী প্রেম' 'যৌবনের জয় যাত্রায় সৌন্দর্য ও প্রেমের লীলা' ইত্যাদি। পরিবহনের ধারা আরো সংযত হলে আলোচনা সংহত হতে পারত। কিন্তু তথ্য ও দ্বৈতীয়িক সূত্রে প্রাপ্ত। তবে গ্রন্থটি চিন্তাগ্রাহী না হলেও রচনাগুণে চিত্তগ্রাহী হতে পেরেছে।

ইতিমা দত্তের 'রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য ও শিশু চরিত্র' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থটি একটি সুপরিকল্পিত রচনা। রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্যে এবং সমগ্র সাহিত্যে শিশু ও কিশোর চরিত্রের পরিচয় ও মনস্তত্ত্ব আলোচনার বিষয় বস্তুহলেও বাংলা সাহিত্যে এর পূর্বাপর যোগসূত্র নির্ণয়ে লেখিকা অধ্যয়নে সম্পূর্ণতা আনতে চেয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী বাংলা শিশুসাহিত্য ও চরিত্র সম্পর্কে একটি অখণ্ড ইতিহাস-বোধ জাগায়। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে লেখিকা 'ছড়া, লোকসাহিত্য, শিশু সাহিত্য : তুলনামূলক আলোচনা' এবং 'রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলো শিশু সাহিত্য' সম্পর্কে দুটি অধ্যায়ে ভূমিকা করেছেন এবং উপসংহার টেনেছেন 'রবীন্দ্র-সমসাময়িক শিশুসাহিত্য ও পরবর্তীকাল' অধ্যায়-এ।
'শিশুসাহিত্য ও শিশুচরিত্র আলোচ্য বিষয় হলেও লেখিকা কিশোর চরিত্রকেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন (পৃঃ ১১৬)। তাতে আপত্তি দেখি না। কিন্তু রবীন্দ্র-পূর্ব শিশুসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনায় উনিশ শতকের কথাসাহিত্যে শিশুচরিত্র ও সাহিত্য গুরুত্ব পায়নি। পেলে আলোচনার গভীরতা বাড়ত। বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী, সতীশচন্দ্র (বিষবৃক্ষ), তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতার গোপাল উল্লেখযোগ্য। ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী'—'বালক বালিকাদের কৌতূহল উদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ' ('অনুসন্ধান') একটি উপকথা। রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থটি 'বালক বালিকাদের ও তাহাদের পিতা- মাতা'র মনোরঞ্জন করিতে পারিবে' বলেছেন। কিন্তু অনালোচিত। বিদ্যাসাগরের 'ভোজনবিলাসী শয্যাবিলাসী' লালবিহারী দের 'চন্দ্রচূড় রাজপুত্র' ও অনুল্লিখিত। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার মানসিকতা কিভাবে কয়েকটি শিশুচরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল তার সবিস্তার আলোচনা বাঞ্ছনীয় ছিল। রবীন্দ্র সম-সাময়িক ও পরবর্তীকালের শিশুসাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনাটি সূত্রাকারে আছে। তবে, অনেক শিশুসাহিত্যিকই আলোচনার বাইরে। সুখলতা রাও, শ্যামাচরণ দে (বঙ্গের উপকথা), সত্যচরণ চক্রবর্তী (ঠাকুরমার ঝোলা), শিবরতন মিত্র প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'রবীন্দ্রকাব্যে শিশু' অধ্যায়ে 'চিত্র বিচিত্র'-এর উল্লেখ নেই। যদিও কাব্যটি শিশুদের জন্য সংকলিত। এগুলির কয়েকটি 'খাপছাড়া' 'গল্পসল্প' 'সে'-তে উদ্ধৃত হয়েছে মাত্র। 'চলচ্চিত্র' ১৩৪৭-এর শারদীয়া 'আনন্দবাজার'-এ বেরিয়েছিল। এ ধরনের কিছু তথ্যাভাব থাকলেও গ্রন্থটি রবীন্দ্রচর্চার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি সুপরিকল্পিত ও তথ্যনিষ্ঠ অধ্যয়ন। আরো উল্লেখযোগ্য এই যে, রবীন্দ্রনাথকে মধ্যমণি করে বাংলা শিশুসাহিত্যের পূর্বাপর যোগসূত্র রচিত হওয়ায় গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মর্যাদা বেড়েছে।

কর্মই তাঁর যজ্ঞ—আত্মদানের যজ্ঞ

ভবতোষ দত্ত

নিবেদিতা লোকমাতা (২য় খণ্ড)/
শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/কল-৯/৫০.০০

নিবেদিতা লোকমাতার প্রথম খণ্ডেই আমরা নিবেদিতার জীবনের রেখাচিত্রটি পেয়েছিলাম। তাঁর পূর্বজীবন, তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের সাহচর্য লাভ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে সমর্পিত জীবনের কথা, বিবেকানন্দের তিরোধানের পর রামকৃষ্ণসঙ্ঘত্যাগ এবং বিস্তৃত ভাবে নিবেদিতা—জগদীশ বসু প্রসঙ্গ সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ- বিবেকানন্দ- রমেশ দত্ত কাহিনী প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছিল।
বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর ভগিনী নিবেদিতার নয় বৎসরের কর্মজীবন দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচ্য। এই নয় বৎসরই আবার আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বের কাল। ১৯০২তে অনুশীলন সমিতি গঠিত হল ব্যারিস্টার পি মিত্রের প্রণোদনায়। কংগ্রেস এর আগেই গঠিত হয়েছিল দেশের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা রাজশক্তির গোচর করবার জন্য, সেই কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনের দীনতায় দেশের লোক অধীর হয়ে উঠেছিল। ফলে তৈরি হল নরমপন্থী আর চরমপন্থীর দল। পশ্চিম ভারতে গোখলে আর তিলক হলেন দুই দলের প্রতিভূ। এদিকে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন শুরু হল বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে। এই আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করল বিদেশী বর্জন উপলক্ষে।

বারাণসী কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী সর্বভারতীয় মর্যাদা লাভ করল। এই সময়টাই ছিল আমাদের জাতীয় চেতনা বিস্তারের প্রথম যুগ। আরও বেশ কয়েক বছর পরে গান্ধীজির আন্দোলনে জাতীয় চেতনা সমগ্র জাতির আবালবৃদ্ধবণিতাকে স্পর্শ করেছে। অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক সংগঠন দ্বারা দেশের যুবচিত্ত উদবোধিত হয়েছিল, আলিপুর বোমার মামলায় রচিত হল এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ।
এই নয় বৎসরের আশ্চর্য সব ঘটনা ব্যক্তি ও সংঘাত আমরা এই দ্বিতীয় খণ্ডেই পাচ্ছি। এসব ঘটনা ও ব্যক্তি আজ ইতিহাসের পটে উজ্জ্বল। রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস লেখা হয়েছে, একাধিক বিপ্লবী তাঁদের স্মৃতিকথা রচনা করেছেন (হেমচন্দ্র কানুনগোর 'বাংলার বিপ্লবপ্রচেষ্টা' ১ম সংস্করণ ১৯২৮ অনর্গল তিক্ততার উদ্গীরণ ছাড়া কিছু নয় পৃ ১৯১)। এ ছাড়া আছে সেকালের নেতাদের জীবনী, চিঠিপত্রের কিছু সংগ্রহ ইত্যাদি। শঙ্করীপ্রসাদ বসু শিক্ষামী নিবেদিতার জীবনালেখ্য রচনাসূত্রে এই যুগের একটা অসাধারণ চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। বইটি পড়ে পাঠক অভিভূত হয়ে যাবেন নিবেদিতার ব্যক্তিত্বের তীব্রতায়। গুরুর দেহাবসানের পর নিবেদিতা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নিজেকে ঢেলে দিয়েছেন। এ সময়ের নিবেদিতার পরিচয় পেতে হলে এই নয় বছরের বাংলার ও ভারতের রাজনীতির প্রবাহের ধারা এবং তার চরিত্রকে জানতে হয়। কিন্তু সেজন্য আলাদা বই না প... এই বইয়েই তার মূল বিষয়টি জানা যাবে। লে... প্রসঙ্গক্রমে সেই সময়ের রাজনৈতিক পটের প... দিয়েছেন। নিবেদিতাকে তিনি এই পরিপ্রেক্ষি... স্থাপন করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং নিবেদিতার ক্রিয়াকলাপের বিবরণ মিলিয়ে সেই যুগের পুরো ছবি পাঠক পেয়ে যাবেন। সেই স... অবশ্য মনে হয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে সমর্পিতা নিবেদিতার অধ্যাত্মজীবনের ছবিটি এতে ততটা প... না। নিবেদিতার পত্রাবলীতে অন্যের নানা বিবর... লিজেল রেমঁর বিবরণে এমন কিছু কি ছিল না য... এ দিকটি জানা যেত ?
নিবেদিতার সেই অগ্নিদীপ্ত জীবনকাহিনী চিন্তা ক... মনে হয় না কি তিনি তাঁর জীবনে গুরুর সাধনাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন ? দুঃখদারিদ্র্য শোষণ যে জাতিকে নিষ্ক্রিয় ও হতাশাদীর্ণ করেছে তার সেবা ব্রতই কি তিনি গ্রহণ করেননি ? এটাই কি স্বামী বিবেকানন্দের বৈদান্তিক চিন্তার মর্ম ছিল না—বা... লোপ করে কর্মব্রত গ্রহণ করা ? বিবেকানন্দের প্রচারিত বৈদান্তিক আদর্শ তো ছিল না জীবসেবার দায় থেকে পলায়ন করে ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকা! জীবের মধ্যে আপনাকে অনুভব করা, আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তোলাই তো বিবেকানন্দের বাণী। নিবেদিতার গুরু বলেছিলেন—তুমি অসীম শক্তি... এ কথা ভুলে যেও না। নিবেদিতা সেই পথেই এগিয়েছেন। বিদেশিনী তিনি কিন্তু ভারতবাসীকে আপন করে নিয়েছেন। ভারতবাসীকে পরাধীনতার দুঃখ থেকে মোচন করবার জন্য উপায় না দেখে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এ তাঁরই দুঃখ...

ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতার মতো অলস কল্পনাও তিনি সহ... করতে পারতেন না। তাঁর গুরুর মতোই এই তেজস্বিনী নারীর চিরন্তন প্রার্থনা ছিল, এই মূক জাতি মুখর হয়ে উঠুক, ভয়কে জয় করুক। এ দিক দিয়ে ভাবলে নিবেদিতা বিবেকানন্দের আদর্শকেই রূপায়িত করতে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। শঙ্করীবাবু ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, নিবেদিতার ভূমিকা আমাদের জাতীয় ইতিহাস রচনায় যথোচিত গুরুত্ব পায় না। তার কারণ বোধহয় এই যে নিবেদিতা প্রকাশ্যে কোনো দলের নেতৃত্ব করেননি। কোনো শোভাযাত্রা পরিচালনা করেননি। ১৯০৫-এ বেনারস কংগ্রেসের অধিবেশনে নিবেদিতা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেখানে প্রসঙ্গত তিনি বলেন 'আমার বিবেচনায় ভারতবর্ষে বিপুল জাতীয় চৈতন্যের উদ্বর্তন এবং তার বিরাট কণ্ঠস্বর ইউরোপের স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজন—যদি ইউরোপকে অমানবিকতার গহ্বরে উৎকট মৃত্যু থেকে উদ্ধার পেতে হয়।' এ কথা বিবেকানন্দেরই। এ জাতীয় চৈতন্যের উদবর্তন ঘটাবার কাজে নিবেদিতা লিপ্ত। প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মে তিনি লিপ্ত হননি! যেভাবে লিপ্ত হলে তিনি বিপিনচন্দ্র পাল চিত্তরঞ্জন দাশ তিলক বা গোখলের মতো গুরুত্ব পেতেন। নিবেদিতাকে বুঝতে গেলে তাঁর অন্তরের অধ্যাত্মবোধের অভিব্যক্তি হিসাবে তাঁর কর্মজীবনের ব্যাখ্যা করা দরকার। কর্মই তাঁর যজ্ঞ—আত্মদানের যজ্ঞ।
তাই এই দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রথম খণ্ডের যথার্থ পরিপূরক। প্রথম খণ্ড বিবেকানন্দের প্রভাবকে বরণ, দ্বিতীয় খণ্ড প্রভাবকে কর্মে রূপায়ণ। প্রথম

খণ্ডে জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগের বিস্তৃত বিবরণ ও তথ্য। এখানে রাজনীতি নেই। দ্বিতীয় খণ্ডের অধ্যায়গুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গ্রন্থকার নিবেদিতাকে কীভাবে উপস্থাপিত করতে চাইছেন। প্রথমেই আছে 'ভারতীয় নবজাগরণে নিবেদিতার ভূমিকা'। এই অধ্যায়টি প্রথম খণ্ড থেকে দ্বিতীয় খণ্ডে উত্তরণের ভাবগত পটভূমি। তারপর ক্রমেই জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপগুলিতে পাঠকের মনোযোগকে সংহত করে নিয়ে আসা হয়েছে পরের অধ্যায়গুলিতে ভারতে নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনের উন্মেষ পর্ব, বিপ্লবী প্রিন্স ক্রপকটকিন ও ওকাকুরা। এই কয়টি অধ্যায়ে নিবেদিতার বিপ্লবী জীবনের সূচনা এবং বিপ্লবী চিন্তার বিকাশ। ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কটি কৌতূহলোদ্দীপক। ওকাকুরা বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সংহত এশিয়ায় বাণীর সাহায্যে একটি নবীন চেতনা নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন এবং নিবেদিতা সেই আদর্শে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই ব্যাপারটা নিয়ে গুরুর সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হয়েছিল। বিবেকানন্দ ওকাকুরার অভিপ্রায় সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলেন না। ওকাকুরার চরিত্র আস্তে আস্তে যেভাবে উদ্ঘাটিত হতে লাগল নিবেদিতা তাতে বিরক্ত হলেন। ওকাকুরার এই চেহারা হয়তো অনেকের জানা নেই। লেখক তথ্য সাজিয়ে দেখিয়েছেন নিবেদিতা ছিলেন আপন চরিত্রে অটল। নিবেদিতা তাঁর জ্বলন্ত ভারতপ্রেম থেকে একচুলও বিচ্যুত হন নি। 'কালী দি মাদার' অধ্যায়ে (প্রথম খণ্ডে এর বিস্তৃত আলোচনা থাকলেও লেখক আবার বিষয়টি নিয়ে এসেছেন প্রসঙ্গটিকে ধারালো করবার জন্য) নিবেদিতার কল্পিত শক্তিকে রুদ্রপন্থার প্রেরণাদায়িনী দেখাবার জন্য লেখক নতুন করে অবতারণা করেছেন।

তারপরেই নিবেদিতা কল্পিত জাতীয় উৎসব, নিবেদিতার জাতীয়তা দর্শন, তার বৈপ্লবিক সম্পর্ক, স্বদেশী আন্দোলন, লর্ড কার্জন সম্পর্কে নিবেদিতা এবং তার বিভিন্ন অধ্যায়ে গোখলে রমেশদত্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং উইলিয়াম স্টেডের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের বিবরণ।

সব অধ্যায়েই তথ্যসম্ভার বিপুল। সে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সমকালীন পত্র পত্রিকা ও বই থেকে। লেখকের পরিবেশনের পদ্ধতির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। প্রচুর তথ্য ও বিবরণ উৎকলন করে দেয়, যার ফলে বক্তব্য আপনা থেকেই ফুটে ওঠে। এর ফলে বইটি হয়েছে ছোট বড়ো নানারকম উদ্ধৃতি ও রেফারেন্সে ভরা। কোনো অল্পশক্তিমান্ গবেষক হলে সংকলনের ভারে সম্পূর্ণায়ত ছবিটি চাপা পড়ে যেত লেখকের বক্তব্য কোনো স্পষ্ট চেহারা নিত না। বিবলিওগ্রাফী শঙ্করীবাবুর প্রাথমিক কাজ হলেও তিনি উঁচুদরের গবেষক বলেই দুষ্প্রাপ্য ও সুপ্রাপ্য সব রকমের অজস্র তথ্য সুবিন্যস্ত করে নিবেদিতার পূর্ণাবয়ব রূপ রচনা করেছেন। এই তথ্য সংগ্রহ থেকে শুধু যে নিবেদিতাকেই জানা যাচ্ছে তা নয়, সে-যুগের অনেক ঘটনা এবং অনেক ব্যক্তিকে পাঠক নতুন করে জানতে পারেন। ওকাকুরা গোখলে গান্ধী অরবিন্দর ব্যক্তিরূপ যেমন নতুন ভাবে জানবেন, তেমনি জানবেন রমেশচন্দ্র দত্ত এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে। এই দুটি অধ্যায় পড়ে মন শ্রদ্ধায় ও আনন্দে ভরে যায়। গোখলের মতিপরিবর্তন এবং গান্ধীর নিবেদিতাদর্শনে ভ্রান্ত ধারণা (যা তিনি আত্মজীবনীর মূল অংশেও বদলাতে চাননি পাদটীকার অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ছাড়া) রমেশচন্দ্রের প্রতি নিবেদিতার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং রামানন্দের নিবেদিতা সম্পর্কে অসীম কৃতজ্ঞতার স্মৃতি মন্থন এতদিন পরেও পাঠককে অভিভূত করে। রমেশচন্দ্র উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হয়েও ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমানকে যেভাবে এঁকেছেন তাঁর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে এবং ভিক্টোরিয়া যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাসে, নিবেদিতার মতো প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী মনস্বিনীও তাতে আকৃষ্ট ছিলেন। মডার্ন রিভিউতে নিবেদিতার বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে, পত্রিকা সম্পাদনায় সাহায্য যথেষ্ট করেছেন। স্বদেশী আন্দোলন অধ্যায়টি যথেষ্ট দীর্ঘ। এই অধ্যায়ে তিলকের লেখার অনুবাদ দিয়ে রাজনৈতিক আবহাওয়াকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। স্বদেশী যুগের বয়কট আন্দোলন তখনকার ভাবুক ও কর্মীদের কতখানি প্রভাবিত করেছিল তার পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় এই অধ্যায়ে। অধ্যাপক সুমিত সরকারের ইংরেজিতে লেখা স্বদেশী আন্দোলন বইটির সঙ্গে তুলনা করলে শঙ্করীবাবুর দৃষ্টিভঙ্গির গঠনাত্মক প্রকৃতিটি বোঝা যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার কার্যকলাপের সংবাদ তেমন নেই। ২২৯ পৃষ্ঠায় লেখক বলছেন 'তিলক ও তাঁর চরমপন্থী সহযোগীদের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগের বিষয়টি বোঝা যায় গোখলেকে লেখা ৫ অক্টোবর ১৯০৪ তারিখের চিঠি থেকে।' তিলকের প্রতি নিবেদিতার শ্রদ্ধা ছিল গভীর। তবু তিলকের উল্লেখ নিবেদিতার পত্রে বেশি নেই। লেখক এই নিয়ে অনুমান করেছেন মাত্র। এ বইয়ে বস্তুত অনুমানের অবকাশ লেখক কমই রেখেছেন। তবু কয়েকটি জায়গায় লেখক পাঠকের সাহায্যার্থেই অনুমানের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন কেন? (পৃ ৯৮-৯৯ দ্রষ্টব্য) বিবেকানন্দ নিজে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজন্যবর্গকে দলবদ্ধ করবার জন্য হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ঘুরেও সফল হননি। খবরটা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের। এ বিষয়ে শঙ্করীবাবু তাঁর সংশয় স্পষ্ট করেই বলেছেন।

বইটি পড়ে তৃপ্তি পেলাম। নিপুণ নাবিকের মতো লেখক তথ্যপ্রমাণের সমুদ্রের ভিতর দিয়ে পাঠককে ঠিক বন্দরটিতে পৌঁছে দিয়েছেন।

ছোটদের উপযোগী বিজ্ঞান

পার্থসারথি চক্রবর্তী

স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া/ অমরনাথ রায়/

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ/ কল-৭৩/ ২৫·০০

ছোটদের জন্য বিজ্ঞানের এনসাইক্লোপিডিয়া বাংলা ভাষায় খুব বেশি নেই। কোন বৈজ্ঞানিক শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা খুঁজতে হলে আজও আমাদের ইংরাজী গ্রন্থের দ্বারস্থ হতে হয়। অমরনাথ রায় প্রণীত 'স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া' সেই অভাব অনেকাংশে পূরণ করবে আশা করা যায়।

এই ধরনের এনসাইক্লোপিডিয়া শুধুমাত্র বিজ্ঞানের পরিভাষায় অভিধান মাত্র নয়—বরং তার চেয়ে আরো কিছু বেশি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নানারকমের জ্ঞাতব্য তথ্য ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা চিত্র সহযোগে এই গ্রন্থে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গ্রন্থে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ইংরাজী শব্দগুলি—যাদের সরাসরি বাংলা বানানে নিয়ে আসা হয়েছে, তারা বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো আছে। যেমন 'অ' বর্ণে পাওয়া যাবে অকজ্যালিক, অ্যাসিড, অক্টোপাশ, অক্সিডেশন, 'আ'-বর্ণে আইজ্যাক নিউটন, আইনস্টাইন, আলফারশ্মি, আইয়োডিন, অ্যামপিয়ার—এই সব।

গ্রন্থের সর্বত্র যদি এই একই নিয়ম বজায় থাকত তা হলে 'কাগজের' জায়গায় ইংরাজী 'পেপার' শব্দটি আসার কথা, 'কাচ' শব্দ ক-বর্ণে না এসে 'গ্লাস' শব্দ অর্থাৎ ইংরাজী 'জি' বর্ণে স্থান পেত। কখনও ইংরাজী শব্দ যেমন—'চ' বর্ণ চেইন রিঅ্যাকসন লেখা হয়েছে কিন্তু 'ম'-বর্ণের শব্দে 'ম্যাগনেটিক স্টর্ম' না লিখে লেখক এখানে লিখেছেন 'চৌম্বক ঝড়'। স্বভাবতই একটা নির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি লেখকের পক্ষে। বাংলা ভাষায় আর যে দু-একটি এনসাইক্লোপিডিয়া চোখে পড়েছে তাতে ইংরাজী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি পর পর সাজানো হয়েছে বাংলা পরিভাষাকে যথাসম্ভব বর্জন করে। এ ছাড়া সেখানে ইংরাজী শব্দ বিশেষ তাৎপর্য রক্ষা করে বাংলা বানানে ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয়, বিশেষ প্রচলিত ও যথাযথ অর্থবোধক বাংলা পারিভাষিক শব্দগুলি এনসাইক্লোপিডিয়ায় স্থান পাওয়া উচিত।

আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ইংরাজী শব্দের মূল ধ্বনি ও রূপ অবিকৃত রেখে সেগুলি বাংলা ভাষায় গ্রহণ করলে আমাদের ক্ষতি নয়—বরং লাভই বেশী। ফরমিক অ্যাসিডকে পিপীলিকা অম্ল, অক্সিজেন গ্যাসকে অম্লজান, হাইড্রোজেনকে উদজান, নিউট্রাল-কে উদাসীন, নিস্তড়িৎ, তড়িৎআধানহীন, তড়িৎ নিরপেক্ষ—এই সব না বলে বরং এই মূল ইংরাজী শব্দগুলি বাংলা ভাষায় সরাসরি অঙ্গীভূত করলে সেটা অবশ্যই আমাদের ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করবে, বুঝতেও যথেষ্ট সুবিধা হবে। বাংলা বানানে ইংরাজী শব্দের মূল উচ্চারণ সর্বত্র বজায় রাখা সম্ভব নয়—আলোচ্য গ্রন্থটিতেও সেটা করা সম্ভব হয়নি। যেমন 'ইপক্সি রেজিন' হয়েছে 'এপক্সি রেজিন', 'স্যালিসাইলিক অ্যাসিড' হয়েছে 'স্যালিসিলিক অ্যাসিড'।

আসলে বাংলা ভাষায় এনসাইক্লোপিডিয়া সংকলনের কাজটা বেশ কঠিন, ছোটদের জন্যে লেখা তো আরও কঠিন ব্যাপার। যত দূর মনে পড়ে স্বাধীনতার আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক (সম্ভবত ১৯১৪ সালে) ভূ-বিদ্যার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। জ্যোতির্ময় ঘোষ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গণিতের পরিভাষা গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ীর 'প্রাণীবিজ্ঞানের পরিভাষা' ছাপা হয়েছিল ১৯৪৩ সালে, সম্ভবত সেটা এখন দুষ্প্রাপ্য। স্বাধীনতার পরে যে সব বৈজ্ঞানিক অভিধান প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের

'বিজ্ঞান ভারতী', শুভেন্দুকুমার মিত্রের 'বৈজ্ঞানিক অভিধান', অমলেন্দু সেনের 'জীব অভিধান' এবং ১৯৭৬ সালের 'গাণিতিক পরিভাষা' (এটা প্রকাশ করেছেন Association for improvement of Mathematics Teaching, যদিও এই সংস্থার বাংলা পরিভাষা দেওয়া নেই) এবং বিমলকান্তি সেনের লেখা 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রসঙ্গে' খুবই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশ বাংলা বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা নিয়ে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। মনে হয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও এ নিয়ে রাজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সম্মিলিত প্রয়াস চালানোর যথেষ্ট প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।
সে যাই হোক এই সব ছোটখাটো ত্রুটির কথা বাদ দিলে অমরনাথ রায় প্রণীত 'স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া' পড়ে শুধু ছোটরাই নয়—বড়রাও আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের নানা মূল্যবান তথ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নিতে পারবেন।
বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখকের চিত্র সংবলিত রচনা কৌতূহলী কিশোর মনকে বিজ্ঞান সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। এ ছাড়া বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে ছোটদের জন্যে লেখা কিছু শব্দের বিস্তারিত আলোচনা নীরস বৈজ্ঞানিক তথ্যের মাঝখানে বেশ খানিকটা রিলিফের কাজ করে। যেমন 'মজার অংক', কোল্ড ফ্রেম বা শীতল শিখার মজাদার এক্সপেরিমেন্ট, হর্মোন নিঃসরণ না হলে কিভাবে বামনত্ব দেখা দেয়, দুনিয়ার সব চাইতে বড় ফুল 'র‍্যাফ্রেশিয়া আর্নল্ডি'র গল্প, বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিনের যাদুচক্র, যাদু ত্রিভুজ ও বর্গ, পক্ষিবিশারদ অজয় হোমের লেখা চেনা অচেনা পাখির চিত্র সংবলিত সরস বর্ণনা গ্রন্থের মর্যাদা বাড়িয়ে তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

গানের ভিতর দিয়ে

উৎপল চক্রবর্তী

আধুনিক বাংলা গান/ (সং) সুধীর চক্রবর্তী/
প্যাপিরাস/কল ৪/২৫.০০

লোকসাঙ্গীতিকী/ বুদ্ধদেব রায়/
ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ/ কল-১২/২৫.০০

পশ্চিমবঙ্গের লোক সংস্কৃতি ও সাহিত্যপ্রসঙ্গে/ গোপীনাথ সেন/
ভারতীয় লোকযান গ্রন্থমালা/ কল-৭৩/ ২০.০০

যখন বঙ্গ সংস্কৃতির ভুবনের দিকে আমরা চোখ রাখি, তখন চিনে নিতে অসুবিধে হয় না, গানই হলো এ সংস্কৃতির প্রথম আদি সেই শক্তি যা চর্যাপদ থেকে রবীন্দ্রনাথ স্পর্শ করে আজও স্পন্দিত, ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে বিচিত্র পর্বে বিচিত্ররূপে সক্রিয়। এমন একটি পর্বের নাম আধুনিক বাংলা গান।
সুধীর চক্রবর্তী তাঁর সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা গান' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ থেকে গৌরীপ্রসন্ন পর্যন্ত গীতকারদের গানের 'একটি নির্ভরযোগ্য সংকলন' 'শিক্ষিত বাঙালি ও শিষ্ট সমাজের হাতে তুলে দেবার' ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন। উদ্যোগটি গুরুত্বপূর্ণ, জরুরী—সম্পাদক অশিক্ষিত রসিকজনেরও ধন্যবাদের পাত্র হবেন। 'সংকলন প্রসঙ্গে আত্মপক্ষ' এবং 'প্রস্তাবনা' অংশে এই গান সম্পর্কে একটি বিস্তারিত আলোচনা তিনি করেছেন, যা শিল্পের এই বিশেষ শাখাটির পরিচয় নির্ণায়ক, কিন্তু তাঁর মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত সর্বথা তর্কাতীত নয়। কিছু অর্ধসত্য উক্তিও আছে, যেমন, 'এ জাতীয় গানের কোন উন্নতমানের সংকলন আগে হয়নি।' সম্ভবত তাঁর জানা নেই, সত্তর দশকে 'শস্য' নামে একটি পত্রিকায় প্রথম এগান নিয়ে কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ গায়ক ও কবি দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং সেখানে প্রায় আড়াইশো আধুনিক গানের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়—যেগুলি কবিতা ও সুরের সমন্বয়ে যথার্থই কাব্যসঙ্গীত এবং আজও কর্ণসুখকর।
তাঁর এ সিদ্ধান্ত অবশ্য মান্য—রবীন্দ্রনাথ আধুনিক গানের জনক। কিন্তু 'রবীন্দ্রনাথ থেকে আজকের গান পর্যন্ত যে প্রবাহ তাতে চলচ্ছবি নেই' এবং 'আধুনিক বাংলা গানের অগ্রগতিরও একটা ইতিহাস আছে'—উক্তি দুটি স্ববিরোধী এবং বিতর্ক উদ্রেকী কি নয়? আধুনিক চলচ্চিত্র, চিত্রশিল্প বা সাহিত্যের ধারাবাহিক উত্তরণের পাশাপাশি আধুনিক গানের স্থবিরতায় তাঁর মতো আমরাও ব্যথিত, উদ্বিগ্ন, কিন্তু একথা কি সত্য নয় যে এই গানের মান একদা চূড়া স্পর্শ করেছিল, জনপ্রিয়তায় ছিল শীর্ষস্থানীয় এবং দু-একজন ব্যতিক্রমী স্রষ্টার কাজ ছাড়া আজ বাংলা চলচ্চিত্র, চিত্রশিল্প বা সাহিত্য কি যথেষ্ট উন্নতমানের? অবনতি ঘটেছে কি শুধু আধুনিক গানেরই? আবার যখন কবিদের গীত রচনা প্রসঙ্গে শুধু প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ বা নিশিকান্তর নামোল্লেখ করেন তখন কুমুদরঞ্জন, আনন্দ বাগচী, গোবিন্দ চক্রবর্তী, সমরেন্দ্র বা কবিতা সিংহের অনুল্লেখ মন্তব্যের অসম্পূর্ণতা প্রকট করে—একই কারণে জগন্ময় মিত্র বা সুধীন দাশগুপ্ত বা নচিকেতার নামের অনুপস্থিতি আলোচনায় সম্পূর্ণতা আনে না। সংকলিত সঙ্গীতগুলির আসরে বহু যথার্থ কাব্যসঙ্গীতের অভাব অতৃপ্তি আনে। একই অতৃপ্তি শৈলেন রায় বা প্রণব রায়-এর বহু বিখ্যাত গান সংকলিত না হওয়ায়, গৌরীপ্রসন্ন 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু' বাদ যাওয়ায় এবং সর্বোপরি সলিল চৌধুরীর 'সেই মেয়ে' অন্তর্ভুক্ত না হওয়া—যে গান রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকলি'র আধুনিক রূপ—আধুনিক গানেরও এক নবদিগন্তের আভাসব্যঞ্জক। সংকলনটি তাই 'নির্ভরযোগ্য' বলতে দ্বিধা জাগে বৈকি।

তবু সম্পাদককে অশেষ ধন্যবাদ এই সংকলন গ্রন্থের জন্য। বিশেষ করে এই মুহূর্তে খুবই জরুরী ছিল এই গ্রন্থটি এই কারণে যে, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের উন্নাসিকতা যখন এ গানকে শিল্পমর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত, তখন সেটা যে তাঁদের বুদ্ধির ক্ষীণতা এটা প্রমাণ করার জন্যও। বঙ্গ সংস্কৃতির ভুবনে এ গানেরও যে অবদান আছে এ সত্য অস্বীকার করা সংস্কৃতমনের পরিচায়ক নয়। সম্পাদকের সঙ্গে আমরাও একমত, 'কোন উন্নতমানের পত্রপত্রিকায় নবীন গীতকারদের গান প্রকাশের আহ্বান নেই'। এটা অবিলম্বে প্রয়োজন। নইলে একটি বিখ্যাত আধুনিক গানের বাণী সত্য হয়ে উঠবে—'শুধু অবহেলা দিয়ে বিদায় করেছ যারে'। সম্পাদক ও প্রকাশককে পুনর্বার ধন্যবাদ বাঙালি মাত্রের সংগ্রহযোগ্য এই সংকলন গ্রন্থটির জন্য।

গ্রামে গাঁথা এ দেশের মানুষের প্রাণের সুর যে গানে গানেই মূর্ত তা বাংলার বিচিত্র লোকসঙ্গীত শুনলে সহজেই অনুভব করা যায়। 'লোক সাঙ্গীতিকা' গ্রন্থের লেখক বুদ্ধদেব রায় নিজে লোকসঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষক। তাই অনায়াসেই তিনি উভয় বাংলার লোকগানের তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক এই সুলিখিত আলোচনা উদাহরণ সহযোগে পরিবেশন করতে পেরেছেন এই গ্রন্থে যদিও তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়নি'। তবু ভারতীয় লোকগানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার লোকগানের এই ধরনের আলোচনার একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে শিল্পী, শিক্ষার্থী এবং গবেষক ও রসিকজনের কাছে। গ্রন্থটির শেষে বিভিন্ন লোকবাদ্যযন্ত্রের ও লোকদেবীর ছবি একনজরে গানের ভিতর দিয়ে সংস্কৃতির মূল প্রাণবান ভুবনকে দেখার সুযোগ এনে দিয়েছে। তবে আলোচনাগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াতে 'ঝুমুর' 'ঝাপান' ইত্যাদি বেশ কিছু অধ্যায়ে কিছু তথ্যগত অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে, যেমন ঝাপান শুধু মেদিনীপুর বা মানভূমে নয় বাঁকুড়াতেও হয়। ঝুমুরের শ্রেণীগত বিভাগে বৈঠকী বা টাঁড় ইত্যাদির পরিচয়ও নেই। তবু 'লোকসঙ্গীতে তাল', 'বাংলার লোকনৃত্য', 'লোকসঙ্গীত ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত' ইত্যাদি বিবিধ বিষয় আলোচিত হওয়াতে গ্রন্থটির সংগ্রহযোগ্যতা বেড়েছে। গ্রন্থমূল্য কিছু কম হলে পাঠকদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ত।

এ মন্তব্য কিন্তু গোপীনাথ সেন প্রণীত 'পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যপ্রসঙ্গে' গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। দীর্ঘকাল লোকসংস্কৃতি বিষয়ে চর্চারত গ্রন্থকার 'বাংলার লোকসাহিত্যের ইতিহাস', 'পশ্চমবাংলায় লোকসঙ্গীত', 'লোকসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ', 'বাংলার লোকসাহিত্যের পথিকৃৎ দীনেশচন্দ্র সেন' প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত বিস্তারিত মতামত ব্যক্ত করেছেন।
সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক অংশ সম্ভবত 'পশ্চিমবঙ্গ গীতিকা' শীর্ষক অধ্যায়টি। এতাবৎ অনালোচিত বিষয়টি তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে পুনরালোকিত হওয়াতে সংস্কৃতিপ্রেমীরা কৌতূহলী ও ভাবিত হবেন নিঃসন্দেহে। ফকির দাস কবিভূষণের 'সখিসোনা' বা খলিলের 'চন্দ্রমুখীর পুঁথি', রাইকৃষ্ণ দাসের 'সাঁওতাল বিদ্রোহের গান', 'মদনমোহন বন্দনা', 'কীর্তিচন্দ্রের গান', 'গোরার গান' বা 'হেষ্টিংসের রাস্তার গান' প্রভৃতি গাথাকাব্যগুলির উল্লেখ ও আলোচনা লুপ্তপ্রায় এক মূল্যবান সম্পদের পুনরুদ্ধারের মতোই মহৎ প্রয়াস। রাস্তার গানে যখন বাঁকুড়া জেলা গেজেটে বর্ণিত পুরনো রাস্তার নাম পেয়ে যাই বা 'মদনমোহন বন্দনা' বিষ্ণুপুরের ইতিহাস—তখন এগুলির ঐতিহাসিক মূল্যও অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে। আবার সখিসোনা বা বানভাসীর গান বা সাঁওতাল বিদ্রোহের গান—স্মরণ করিয়ে দেয় 'ময়মনসিংহগীতিকা'কে—একটা সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়—নৃত্য বা গীতিনাট্য বা নতুন আঙ্গিকে নাটকের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করলে পশ্চিমবঙ্গ গীতিকাও যে সংস্কৃতির ভুবনে নিজের স্থান করে নেবে—এজন্য বিশ্বাসও জাগে।
সংস্কৃতিপ্রেমী রসিকজন এ সিদ্ধান্তে সুস্থিত হবেন যে গানের ভিতর দিয়েই বঙ্গ সংস্কৃতির ভুবনকে প্রকৃতরূপে চেনা যায়।

ম

NO WB/CC/184/74. MH-By-SOUTH 60

২৪ অক্টোবর ১৯৮৭

দেশ

“একদিকে বৌমার কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে সে সংসারও পুরোদমে চালাচ্ছে”

“ স্পষ্ট মনে আছে সেদিনটার কথা। আমার বৌমা রাধা এবং আমি দু'জনেই তখন রান্নাঘরে ছিলাম। হঠাৎ রাধার হাতে ছিটকে পড়লো গরম তেল। আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'বৌমা শিগ্গিরই বরফ দাও।' কিন্তু রাধার উত্তর, 'কোথায়! আমার তো জ্বালা করছে না।' পরস্পরের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর চকিতে সেই ভয়ানক সন্দেহটা দু'জনের মনেই কশাঘাত করলো — তাহ'লে এটা কুষ্ঠরোগ নাকি? রাধা এক ছুটে বেরিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সারাদিন কিছুই খেলো না, আমাদের কোনো কথার জবাবও দিলনা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শুধু কাঁদে আর বলে, আমি চলে যাব, আমি চলে যাব। কোনো ভাবেই ওকে বোঝানো গেল না।

আমার ছেলে অতুল যখন বাড়ী ফিরলো, রাধা তখন কিছুটা শান্ত। তবে চোখ মুখ থেকে আতঙ্কের ভাব মুছে যায়নি। অতুল বললো, 'প্রথমেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। আমার স্থির বিশ্বাস, ভয় পাবার কিছু নেই।'

ডাক্তারবাবু দেখে বললেন যে এটা কুষ্ঠরোগ ঠিকই তবে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে। তিনি এও বললেন, কুষ্ঠরোগ, সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। এদিকে, রাধার রোগটা যেহেতু সংক্রামক নয়, সেহেতু তিনি বারংবার বললেন, চিকিৎসা চলাকালীন রাধা স্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবে এবং গৃহিণী হিসেবে তার স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।

আজ আমার রাধা একদিকে আমাদের সেবাযত্ন করছে, অন্যদিকে করছে বাড়ীর অন্যান্য কাজকর্ম — একই ভাবে। রাধা যখন ডাক্তারের কাছে যায়, আমি তখন সামলাই আমার দাদুভাইকে। রাধা ইতিমধ্যেই চিকিৎসায় উপকার পেতে শুরু করেছে। ঈশ্বরের অসীম কৃপা যে, চিকিৎসা শুরু করতে আমরা এক মুহূর্ত দেরী করিনি। এখন আমি নিশ্চিত জানি, আমার রাধা শিগ্গিরই সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে।”

কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায় — ভয় পাবেন না, চিকিৎসা করান

- গোড়াতে রোগ ধরা পড়লে এবং নিয়মিত চিকিৎসা করালে কুষ্ঠরোগে অঙ্গ বিকৃতি ঘটে না। চরম অবস্থায় অঙ্গ বিকৃতি ঘটলে সব সময় ভালো নাও হতে পারে।
- অন্যান্য সব সংক্রামক রোগের তুলনায় কুষ্ঠরোগ সব থেকে কম সংক্রামক।
- যে কোনো ব্যক্তিরই কুষ্ঠরোগ হতে পারে। তবে বেশীর ভাগ লোকেরই আছে নিজস্ব প্রতিরোধক ক্ষমতা।
- কুষ্ঠরোগের যেসব নতুন ঘটনা ধরা পড়ছে, তারমধ্যে ৩০% শিশু। তবে হ্যাঁ, কুষ্ঠরোগ বংশগত নয়।

প্রাথমিক লক্ষণসমূহ

- ত্বকে ফ্যাকাশে বা লাল্চে দাগ — মসৃণ, চকচকে অথবা শুষ্ক।
- দাগের অংশটুকু সম্পূর্ণ অসাড়।
- লোম উঠে যাওয়া অথবা ঐ অংশতে ঘাম না হওয়া।
- দাগের কাছে বা চারপাশে কাঁটা বেঁধার মত বা পিঁপড়ে হাঁটার মত অনুভূতি।

আপনার সমর্থন মূল্যবান

কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য আপনার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবগণ যে জানেন — এবিষয়ে সুনিশ্চিত হন এবং কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণের জাতীয় কর্মসূচীকে সমর্থন করুন। শুরুতে রোগ নির্ণয় করাতে এবং সরকারী ক্লিনিক ও হাসপাতালে নিয়মিত চিকিৎসা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করুন। স্বাভাবিক জীবনযাপনে কুষ্ঠরোগীদের সাহায্য করুন যাতে সমাজে তাঁরা নিজেদের স্থান খুঁজে নিতে পারে।

নিরাময়ের প্রকৃত পরশ আসবে আপনার কাছ থেকেই

React/0822/87/BEN

unicef

টাটা স্টীল

আরো বিবরণের জন্য লিখুন:
কুষ্ঠরোগ চেতনা অভিযান
ইউনিসেফ তথ্য সেবা কেন্দ্র
৭৩, লোদী এস্টেট, নতুন দিল্লী-১১০০০৩

কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রনের জন্য ভারত সরকারের কর্মসূচীর প্রতি সমর্থনসূচক এক যুক্ত জনসেবা।

সমষ্টিগত সমর্থনের অভাবে কুষ্ঠরোগীদের প্রকৃত পরিচয় গোপন থেকে যায়।

২০

একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, বলছে—কাজ করো। অন্যদিকে নেশা ধরাচ্ছে বনের সবুজ, রোদের সোনা, বলছে—ছুটি, ছুটি। রক্তকরবীর বিশুর মতো কাজের চাবুক আর ছুটির নিমন্ত্রণের দোলাচলে বয়ে চলে জীবন। কিন্তু আমাদের অনেকেরই সেই 'পায়ে শিকলি, মন উড়ু-উড়ু' দশা। শেষ পর্যন্ত পথে বেরোয় ছিন্ন-শিকল পলাতক মন। জীবন-পাথেয় আহৃত হয় পথ ও পথের প্রান্ত থেকে। কেউ খেপার মতো ঢুঁড়ে ফেরে দূর-দুনিয়ার কিনারে কিনারে। পাত্র পূর্ণ হয়, কারো বা 'তবু ভরিল না চিত্ত।' কারও বা আঁজলা ভরে যায় দুয়ার হতে অদূরেই। উনবিংশ শতাব্দীর

বঙ্গসমাজের বহু বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ঘরের পাশেই এমনি এক আশ্চর্য সবপেয়েছির দেশ খুঁজে পেয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, স্যার গুরুদাস, আশুতোষ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—কে নন! ছুটির বাঁশি বেজে উঠতেই সবাই বেরিয়ে পড়তেন সেই উপনিবেশের উদ্দেশে। তার মোহিনী মায়া আজও আছে। কিন্তু আজ আর বাঙালি যায় না সেখানে। স্মৃতিভারে পড়ে আছে সেই ছুটির ঠিকানা। এমনি কাছে-দূরের ছুটির ঠিকানা দিয়ে লেখা এবারের প্রচ্ছদ কথা। যে ঠিকানা শরতের সোনালি-নীল খামে লেখা।

১৭

ভারতের বাইরে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের নিয়ে উপর্যুপরি এমন সংকট বোধহয় আগে কখনও আসেনি। একদিকে শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় শান্তিবাহিনীকেই বিব্রত করে তুলছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক উগ্রগোষ্ঠী। আর একদিকে ফিজির জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদেরই সব অধিকার কেড়ে নিয়েছে সামরিক নায়ক রাবুকা। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি কোন পথে?

৮১

কাশ্মীরের গিলগিট অঞ্চলের ছোট্ট গ্রাম নবপুর। এখানেই আবিষ্কৃত হয়েছে এক শিল্পসম্পদময় আশ্চর্য বৌদ্ধ স্তূপ। ভারতীয় অণুচিত্রের আদি ইতিহাস এবার বোধ হয় নতুন করে লিখতে হবে এই মহামূল্যবান শিল্পনিচয়ের ভিত্তিতে।

৭১

একদা এই শহর কলকাতার বটতলায় জোব চার্নকের দরবার বসত। কিন্তু কেবল দরবার বা বৈঠকখানাই নয়, বহু জায়গাতেই বটতলাই হল বেচা-কেনার প্রশস্ত জায়গা। বটের ছায়ায় বেনিয়াদের আস্তানা বলেই নাকি বটগাছের ইংরেজি নাম— বেনিয়ান ট্রি আমাদের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সব সাধনার পীঠ, আমাদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে জড়ানো বটকে নিয়ে বিস্তারিত কথা।

৯২

কলকাতা মাঠে ভালো ফরোয়ার্ড দেখা যাচ্ছে না কেন? চিমা নিঃসন্দেহে আলোড়ন তুলেছেন এবং সেইজন্যই ভারতীয় খেলোয়াড়ের দক্ষতার অভাব আরও চোখে পড়ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এক প্রাক্তন ফুটবলারের বিচার বিশ্লেষণ এবারের 'খেলা'য়।

প্রকাশিত হল

বাণীব্রত চক্রবর্তীর

তিন-তিনটি রহস্যকাহিনী

সিংহবাহিনী রহস্য

দাম ১২·০০

একটি বই, তিন-তিনটি বিচিত্রস্বাদ রহস্যকাহিনী। 'সিংহবাহিনী রহস্য' আর 'রক্তাক্ত ওয়াটার্লু'র রহস্যভেদী এক ও অদ্বিতীয় সাত্যকি দত্ত। ইতিহাসের তরুণ শিক্ষক, বাংলা গোয়েন্দা-কাহিনীতে নতুন হলেও যোগ্য এক নাম।
পিতামহের পুরনো একটি ডায়েরি পড়ে আলোড়িত সাত্যকি দত্ত নেমে পড়ে রহস্য-উদ্ধারের কাজে। রহস্যের অতল থেকে উঠে আসে অতীতে। আসে ছবির মতো পুরনো কলকাতা, জাপানের কোনো বন্দর, আসে বর্তমান কলকাতা, আলিগড়, আর সেই অনুষঙ্গে অজস্র মানুষ। যে-সিংহবাহিনী মূর্তিতে আগ্রহী ছিলেন সাত্যকির পিতামহ, সেই মূর্তি নিয়েই এক শ্বাসরুদ্ধকর রহস্যের নতুন জটে জড়িয়ে পড়ে সাত্যকি।
সাত্যকির দ্বিতীয় কাহিনীটিও দারুণ। হেঁয়ালি-ভরা এক বিজ্ঞাপনের সূত্রে জমজমাট রহস্যকাহিনীর যবনিকা-উত্তোলন।
শেষ কাহিনীটিও বিষয়ে-স্বাদে অভিনব। ক্লাস এইট-এর কিংশুক কীভাবে শুনতে পেত জীবজন্তু, গাছপালা ও জনকল্লোলের ভাষা, কীভাবে তার মাস্টারমশাই তরুণ লেখক মাল্যবান উদ্ধার করল এই রহস্য, তাই নিয়ে এক তীব্র কৌতূহলকর ও চমকপ্রদ কাহিনী। প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী।

শৈলজারঞ্জন মজুমদারের

সাঙ্গীতিক স্মৃতিকথা

যাত্রাপথের আনন্দগান

দাম ১৬·০০

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস সি পরীক্ষায় যিনি সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী, ডাকসাইটে আইনজীবীর পুত্র হিসেবে যাঁর জন্য নির্দিষ্ট ছিল নেত্রকোণায় ওকালতির আসন, সেই শৈলজারঞ্জন মজুমদার কীভাবে হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রধানতম সুরের গুরু, কীভাবে— রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'বিজ্ঞানের রসায়ন রাগরাগিণীর রসায়নে পূর্ণ হল' তাঁর জীবনে, সে এক আশ্চর্য ইতিহাস। সেই ইতিহাসই শুনিয়েছেন শৈলজারঞ্জন তাঁর এই অনুপম আত্মস্মৃতিতে।
যেমন ব্যাপ্ত, বৈচিত্র্যময় জীবন ও কর্মপ্রবাহ, তেমনই বিস্ময়কর তাঁর স্মৃতির পরিধি। এই স্মৃতিকথার শুরু তাঁর চেতনার প্রথম প্রত্যূষে, যখন পাখির মতোই তিনি কণ্ঠে তুলে নিতেন ঠাকুমার মুখে শোনা কৃষ্ণবন্দনা। এরপর পাঠশালা ও ইস্কুল, ইস্কুল ছাপিয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন, অধ্যাপনা ও ওকালতি, তারপর শান্তিনিকেতনের নানা রঙের দিন।
শুধু রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের ও আশ্রম-জীবনের উষ্ণ ও অন্তরঙ্গ বর্ণনার জন্যই বরণীয় নয় এই আত্মজীবনী, পুরো বিশ শতকেরই টুকরো টুকরো চলচ্চিত্র চোখের সামনে তুলে ধরেছেন শতাব্দীর সমানবয়সী এই সঙ্গীতসাধক। নিখুঁত, জীবন্ত, বর্ণাঢ্য ও অমূল্য এই অনুলিখিত স্মৃতিকথা।

ছোটদের সেরা উপহার

শৈলেন ঘোষের
বাজনা — দাম ৬·০০
হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো — দাম ৮·০০
আমার নাম টায়রা — দাম ৮·০০
আজব বাঘের আজগুবি — দাম ৮·০০
জাদুর দেশে জগন্নাথ — দাম ৮·০০

সত্যজিৎ রায়ের
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা — দাম ১০·০০
এক ডজন গপ্পো — দাম ১৫·০০
বাদশাহী আংটি — দাম ১০·০০
যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে — দাম ৮·০০
যখন ছোট ছিলাম — দাম ১৫·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
ভয়ঙ্কর সুন্দর — দাম ১০·০০
হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি — দাম ৮·০০
সবুজ দ্বীপের রাজা — দাম ৮·০০
জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ — দাম ১০·০০
ডুংগা — দাম ১০·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
যাঁর নাম ঘনাদা — দাম ১০·০০
ঘনাদার ফুঁ — দাম ৮·০০
তেল দেবেন ঘনাদা — দাম ৮·০০

পার্থসারথি চক্রবর্তীর
কেমিক্যাল ম্যাজিক — দাম ৭·০০
রসায়নের ভেলকি — দাম ৫·০০
মজার একসপেরিমেন্ট — দাম ৬·০০
চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজব কথা — দাম ৮·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
গৌরের কবচ — দাম ১০·০০
বক্সার রতন — দাম ১০·০০
নৃসিংহ রহস্য — দাম ১০·০০
ভুতুড়ে ঘড়ি — দাম ১০·০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
পাঁচমুণ্ডির আসর — দাম ১০·০০
রাতের প্রহরী — দাম ২৫·০০

পূর্ণেন্দু পত্রীর
ম্যাকের বাবা খ্যাঁক — দাম ৭·০০

প্রকাশিত হচ্ছে

সুভাষ ভট্টাচার্যের

ছোটদের জন্য আনন্দপাঠ

বাংলা ভাষার সাত সতেরো

১১০০ কপি নিঃশেষ

কালকূট-এর

অচিনলোকের ভ্রমণোপন্যাস

ধ্যান জ্ঞান প্রেম

দাম ১৬·০০

ধুলো তাঁর পায়ে, তাঁর গায়ে। চেনা পথ ধরে কেবলই যাত্রা তাঁর অচেনা অঙ্গনে, অজানার সন্ধানে। কিন্তু সেবারের মতো অচিনলোকে আর কখনও যেন যাননি কালকূট।
সেই অচিনলোক, যেখানে ধ্যানের আসন আছে পাতা, জ্ঞান হয় অঙ্কুরিত। আর, প্রেরণা প্রেমে। সেই ধ্যান-জ্ঞান-প্রেমের সন্ধানেই কালকূট-এর যাত্রা। আর সেই যাত্রায় তুলে এনেছেন নতুন বিষ, নতুন অমৃত। অচিনলোক। কিন্তু লোকগুলো ? তারাও কি কম অচিন ? এই ধ্যান-জ্ঞান-প্রেমের ঠিকানায় যে-আশ্চর্য মানুষগুলির দেখা পেলেন কালকূট, ধ্যানজ্ঞানের যে-বিশিষ্ট পরিচয় এবং প্রেমের যে বৈচিত্র্যময় লীলার হদিশ নিয়ে ফিরলেন, তারই অনুপম অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ বিবরণী এই ভ্রমণোপন্যাসে। দেখতে না দেখতে ১১০০ কপি ফুরোল।

১১০০ কপি নিঃশেষ

সাধনা মুখোপাধ্যায়ের

প্রতিদিনের রান্নাঘরের সঙ্গী

ঘরোয়া রান্না

দাম ১২·০০

শৌখিন রান্নার জন্য অন্য বই, এ-বইতে নিত্যদিনের সহজ রান্না। অর্থাৎ সুক্তো, ঘন্ট, ডালনা, চচ্চড়ি, ছেঁচকি, ঝোল, ঝাল, ডাল, দম, খিচুড়ি, মাছ, মাংস, ডিম— এইসব। আর এরই মধ্যে মুখ-পালটাবার জন্য ঘি-ভাত কিংবা পিঠে-পায়েস, কোফতা-স্টু কি সহজ বিরিয়ানি। এ-সব রান্নার কলাকৌশল শেখাবার মানুষজন ক্রমশ দুর্লভ। তাই এই বিকল্প ব্যবস্থা।

পঞ্চম মুদ্রণ চলছে

সাধনা মুখোপাধ্যায়ের

জিভে-জল-আনা রান্না

জ্যাম জেলি আচার চাটনি

দাম ১৫·০০

যত রকমের হয় জ্যাম-জেলি আর আচার-চাটনি, স্কোয়াস আর সস, ভিনিগার কিংবা চিপস, আমসত্ত্ব বা মার্মালেড, কিংবা জিভে-জল-আনা যত টুকিটাকি— সবই এই বইতে শেখানো হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত ও স্বল্পব্যয়ী ঘরোয়া প্রস্তুতপ্রণালী।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ৩১-৪৩৫২

দণ্ডকারণ্য প্রকল্প ও মরিচঝাঁপি

'দেশ' পত্রিকার শারদীয় ১৩৯৪ সংখ্যায় (১৯৮৭) শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত "দণ্ডকারণ্যে নির্বাসন না পুনর্বাসন ?" প্রবন্ধে 'দণ্ডকারণ্য প্রকল্প' এলাকার কোরাপুট (ওড়িশা) জেলায় তিনি কী ধরনের কাজ করেছেন, তার একটা বিবরণ দিয়েছেন। ওখানে পাঠানো বাঙালী উদ্বাস্তুরা যাতে সামাজিক ও মানসিক দিক থেকে পুনর্বাসন পায় এবং স্থানীয় আদিবাসী ও বাঙালীদের মধ্যে শত্রুতার বদলে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেজন্য ১৯৭৯ সাল থেকে শ্রীদাশগুপ্ত কোরাপুট জেলাকে তাঁর স্থায়ী নিবাস ও কর্মক্ষেত্রে পরিণত করেছেন। এত বেশি বয়সে তিনি যে চ্যালেঞ্জকে বেছে নিয়েছেন, সেজন্য আমরা অনেকেই তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। কলকাতার পত্রপত্রিকার নির্বিকার মনোভাবের জন্য দণ্ডকারণ্যে পাঠানো বাঙালী উদ্বাস্তুরা এখন কোথায় কীভাবে আছেন, মানা ট্রানজিট ক্যাম্পে এখনও যাঁরা আছেন, তাঁরা কতকাল পরে মধ্যপ্রদেশ সরকারের দয়ায় পুনর্বাসন পাবেন, তা যেমন আমরা জানি না, তেমনি ওই বাঙালী উদ্বাস্তুরাও জানেন না।

শ্রীদাশগুপ্তের প্রবন্ধ পড়ে দণ্ডকারণ্যে পাঠানো উদ্বাস্তু এবং তাঁদের একাংশের পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসে স্বচেষ্টায় সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপে পুনর্বাসন এবং সেখান থেকে উৎখাত হওয়ার ব্যাপারে পাঠকদের মনে নিশ্চিতভাবে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে। সেই ভুল ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যেই এই চিঠি।

(১) দণ্ডকারণ্যে পাঠানো উদ্বাস্তুরা কেবল "দণ্ডকারণ্য প্রকল্প" এলাকা অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলা এবং ওড়িশার কোরাপুট জেলায় পুনর্বাসন (যা শ্রীদাশগুপ্ত বর্ণনা করেছেন) পায়নি, দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন ট্রানজিট ক্যাম্পে পাঠানো বাঙালী উদ্বাস্তুদের মধ্যপ্রদেশের প্রতিটি জেলা (মোট ৪৫টি, মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুরা ও গাদচিরোলি জেলা, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশে পুনর্বাসনের জন্য পাঠানো হয়। মানার ট্রানজিট ক্যাম্পে বর্তমানে বসবাসকারীরা কবে এবং কোথায় পুনর্বাসন পাবেন, তা মধ্যপ্রদেশ সরকার এখনও স্থিরই করেননি, চন্দ্রপুরার রিলিফ ক্যাম্পের অবস্থানকারীদের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। অন্যত্র যাঁদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, আমি এমন চারটি এলাকার উদ্বাস্তুদের সমস্যা এখানে জানাচ্ছি, যদিও আমার অভিজ্ঞতা দু বছর আগেকার। ইতিমধ্যে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে।

হোসাঙ্গাবাদ শহরের এক কোণে ৩৫ ঘর বাঙালী মৎস্যজীবীকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়, এখন তাঁদের সংখ্যা ৭০। তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া বাড়ি তৈরির পুরো টাকা পাননি, জমির মালিকানাও পাননি। নর্মদা নদীতে মাছ ধরে তাঁদের জীবিকা নির্বাহের কথা। নর্মদায় তিন মাস মাছ ধরা বে-আইনী, তাছাড়া অন্য সময়ে স্থানীয় অধিবাসীরা বাঙালী মৎস্যজীবীদের জাল, নৌকো ও মাছ কেড়ে নেয়। যে তিন মাস তাঁরা মাছ ধরতে পারেন না, সেই তিন মাস তাঁরা খাবেন কী ? মধ্যপ্রদেশ সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন উদ্বাস্তুমন্ত্রী রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁরা এসব জানিয়েছিলেন। কোনো ফল হয়নি। কলোনীর বাংলা মাধ্যমের প্রাথমিক বিদ্যালয় উঠে গিয়েছে, এখন শহরে হিন্দী মাধ্যমের স্কুলে ছেলেরা যায়, মেয়েরা যায় না—তারা নিরক্ষর থাকছে। কলোনির মেয়েরা এক মাইল দূরে পেপার মিলের অফিসারদের বাড়ি ঝিগিরি করে। পুরুষেরা মাছ-ধরা বাদে অন্যসব কাজ করে। মধ্যপ্রদেশ সরকার শহর উন্নয়নের নামে যে-কোনো দিন ওই বাঙালী উদ্বাস্তুদের উৎখাত করতে পারেন। উদ্বাস্তুরা তখন পথে পথে ঘুরবে। মধ্যপ্রদেশে গান্ধীসাগর ড্যামের পাশেও বাঙালী মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, সেখানেও তিন মাস মাছ-ধরা বন্ধ। এই সময়ে বাঙালী উদ্বাস্তুরা কী খেয়ে বাঁচবে ? আগে মৎস্যজীবীরা মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন ড্যামে মাছ ধরে মাছ বিক্রি করত, বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশান গঠিত হওয়ায় বাঙালী মৎস্যজীবীরা কেবল মাছ ধরার মজুরি পায়। দিল্লি বা ভোপালে বার বার দরবার করেও কোনো প্রতিকার হয়নি। বেতুল জেলার ৩৩টি নতুন বাঙালী গ্রামে যাওয়াও সহজ নয়। ইতারসি থেকে ৭৫ কিলোমিটার বাসে গিয়ে ৫ মাইল কাঁচা রাস্তা হাঁটলেই মিলবে প্রথম বাঙালী গ্রাম তাওয়াকাঠি। ২১ কিলোমিটার এলাকার বাঙালী গ্রামগুলির কোথাও পাকা রাস্তা নেই। বাংলা মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, তারপর আর পড়াশোনার সুযোগ নেই। বাংলা মাধ্যমে পড়ার পর হিন্দী মাধ্যমের স্কুলে ভর্তি হতেই পারে না, পাস করা তো দূরের কথা। বেতুলে ৪ বছর যাবৎ খরা চলছে। বাঙালীরা কোনো রিলিফই পায় না।

বাঙালী উদ্বাস্তুদের শতকরা ৯৯ জনেরও বেশি তফসিলী সম্প্রদায়ের। কিন্তু তাঁরা মধ্যপ্রদেশ সরকারের অফিস থেকে তফসিলী সার্টিফিকেট পান না, চাকরি পেতে হলে অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিস থেকে 'কাস্ট সার্টিফিকেট' সংগ্রহ করতে হয়। আমি অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'কাস্ট-সার্টিফিকেট' সংগ্রহকারী এমন একজনের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিলাম। মহারাষ্ট্রের বিদর্ভের গাদচিরোলি জেলায় মূলচেরা এলাকার ২৫টি বাঙালী গ্রামেও বর্ষাকালে যাওয়া কঠিন। তিনটি নদী পার হয়েই প্রথম গ্রাম মূলচেরাতে পৌঁছাতে হয়। এলাকায় বাঘ ও অন্য বন্যজন্তুদের উপদ্রব। এমন উদ্বাস্তু পরিবার পাওয়া যাবে না, যে-পরিবারের অন্তত একটি বলদ বাঘে খায়নি। জলাভাবে অনুর্বর জমিতে ফসল হয় না। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বাঙালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের নামে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় আদিবাসী এলাকার উন্নয়ন এবং তিনটি নদীর দুটিতে প্রস্তাবিত দুটি ড্যামে কাজের সময় ঠিকাদারী শ্রমিক পা: য়ার আশাতেই মহারাষ্ট্র সরকার বাঙালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে (?) রাজী হয়েছিলেন। দণ্ডকারণ্য প্রকল্প উঠে গেলে এইসব বাঙালী উদ্বাস্তুদের কথা আর কাউকে শোনানো যাবে না।

(২) শ্রীদাশগুপ্ত লিখেছেন, "যে-সব নিম্নবর্ণের ও সম্প্রদায়ের লোকেরা এইসব ক্যাম্পের অধিবাসী, তারা পূর্ববঙ্গে বেশিরভাগ ছিলেন ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। অবস্থাপন্ন ও ভদ্রসম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের উদ্যোগে নিজেরাই পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই করে নেন। অসহায় অতি দরিদ্ররাই ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এদের শিক্ষাদীক্ষার মানও ছিল নিচুদরের। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা বা নিজের অভাব অভিযোগ যথাযথভাবে উপস্থাপিত করার ক্ষমতাও সীমিত।" (পৃঃ ২৫২)।

শ্রীদাশগুপ্তের এই বক্তব্য আংশিক সত্য। ১৯৬৪ সালে পূর্বপাকিস্তানে দাঙ্গার পরে বিপুল সংখ্যায় যে উদ্বাস্তুরা এসেছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন কৃষিজীবী। দণ্ডকারণ্য প্রকল্পে প্রথম দিকে কেবল কৃষিজীবীদেরই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছিল, অন্যদের সেখানে যেতে দেওয়াই হয়নি। তাই পাকিস্তান সীমান্ত থেকেই ওই উদ্বাস্তুদের ট্রেন সোজাসুজি দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন ট্রানজিট ক্যাম্পে পাঠানো হত, ভদ্রসম্প্রদায়ের লোকদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানোই হয়নি। দণ্ডকারণ্যে বাঙালীদের পুনর্বাসনের জন্য যে-সব উদ্বাস্তু কেরানী দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলেন, তাঁরাও সেখানে পুনর্বাসনের কোনো সুযোগ পাননি, এমনকী দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের কোনো বাড়িও কিনতে পারেননি। একথা ঠিক যে, ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণকারীদের শিক্ষার মান ছিল নিচুদরের। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অবস্থাপন্ন কৃষকও ছিলেন। তাই ক্ষেতমজুরেরা জমি হারিয়ে রায়পুর শহরের রিকশা-চালক হয়েছে এবং আগেকার অবস্থাপন্ন কৃষকেরা রায়পুর জেলার সচ্ছল কৃষকে পরিণত হয়েছেন। অবস্থাপন্ন কৃষকেরাই মধ্যপ্রদেশে উন্নয়নশীল সমিতি গঠন করে দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা ? আই সি- এস শৈবাল গুপ্ত দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের চেয়ারম্যান হয়েও ভারত সরকারকে দিয়ে পুনর্বাসন উপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করাতে ব্যর্থ হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুতরাং গরিব কৃষিজীবীদের কথা শোনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

(৩) শ্রীদাশগুপ্ত মরিচঝাঁপিতে গিয়ে দণ্ডকারণ্য থেকে ফিরে আসা উদ্বাস্তুদের নিজেদের চেষ্টায় পুনর্বাসনের উদ্যম দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি সেই মুগ্ধতার বিবরণ দিয়েছেন : "জলে কাদায় কীভাবে যে দুর্জয় শক্তি ও সাহসে উদ্বাস্তুরা ঘর বাঁধবার জন্য লেগে আছে, সে দৃশ্য দেখে বিস্মিত হই। তাদের দুর্দশার কোনো বর্ণনা করা চলে না।

লতা-পাতা-কাঠ কেটে ঘর বানাবার দুর্দমনীয় উদ্যম, অপরদিকে পুলিশ ও সরকারী বাহিনী তাদের ঘিরে বসে আছে।... এক মনে তারা তাদের কাজ করে চলেছে, ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ি —সবাই। এ এক অদ্ভুত লড়াই। এমন লড়াই পৃথিবীতে কেউ কখনও কি দেখেছে বা শুনেছে ?" ১৪ বছর দণ্ডকারণ্যের বনবাসে তাঁরা যে অপরিসীম কষ্টভোগ করেছেন, তার পরিণতি হিসাবে তাঁরা সরকারী সাহায্য ছাড়াই নিজেদের উদ্যমে মরিচঝাঁপিতে নিজেদের পুনর্বাসন করছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক চক্রান্তে মরিচঝাঁপি দ্বীপের সেই পরীক্ষা আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়।

(৪) শ্রীদাশগুপ্ত লিখেছেন, "মরিচঝাঁপি ফাণ্ডে চাঁদা

দিয়েছিল লাখ লাখ টাকা, সে-সব টাকার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। যে-সব ভুঁইফোঁড় নেতা এদের উত্তেজিত ও প্রলুব্ধ করে মাতিয়ে দিয়েছিল, তাদের আর বিশেষ পাত্তা পাওয়া যায়নি।" (পৃঃ ২৪৮)।

শ্রীদাশগুপ্তের উদ্ধৃত দুটি বাক্যে তিন ধরনের বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। এক, মরিচঝাঁপির নেতারা লাখ লাখ টাকা মেরেছেন। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে আসার সময়ে চাঁদা তুলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সে টাকা মরিচঝাঁপি পৌঁছানোর আগে হাসানাবাদ ও বিভিন্ন এলাকায় থাকতে, কলকাতায় এসে বিক্ষোভ জানাতে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে মরিচঝাঁপিতে পুনর্বাসনেই খরচ হয়ে যায়। তারপর থেকে তফসিলী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতা ও গোষ্ঠী ছাড়া আরও অনেক লোক চাঁদা তুলে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের অনাহারের হাত থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিলেন। এই প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী, জ্যোতির্ময় দত্ত, অজিত চক্রবর্তী এবং প্রয়াত আয়কর অফিসার সন্তোষকুমার মল্লিক কলকাতায় গানের আসর করে টাকা তুলেছিলেন। সেখানে গান গেয়েছিলেন প্রয়াত দেবব্রত বিশ্বাস, প্রয়াত নির্মলেন্দু চৌধুরী, সুচিত্রা মিত্র, গীতা ঘটক প্রভৃতি। ওই টাকা সাময়িকভাবে মরিচঝাঁপির অধিবাসীদের মুখে অন্ন জুগিয়েছিল। ১৯৭৯ সালের ১৩ মে থেকে মরিচঝাঁপিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অপারেশানের সময় ঘরে আগুন দিয়ে দ্বীপ ছাড়তে বাধ্য করা সতীশচন্দ্র মণ্ডল, রঙ্গলাল গোলদার কোনোক্রমে জীবন হাতে করে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন, আর দুই নেতা রাইহরণ বাড়ৈ এবং অরবিন্দ মিস্ত্রী অপারেশনের আগেই কলকাতায় ছিলেন। তারপর পুলিশ দ্বীপের সব কিছু তছনছ করে। আমি ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে বনবিভাগের এক কর্মীর সহযোগিতায় পুলিশ পাহারায় মরিচঝাঁপিতে যেতে সক্ষম হই। সতীশ মণ্ডলের ঘরের মেঝেও পুলিশ পাহারার মধ্যে খোঁড়া হয়েছিল। সুতরাং মরিচঝাঁপির নেতারা ইচ্ছে করে হিসাব দেননি একথা বলা চলে না। লাখ লাখ টাকা মারার প্রশ্নই ওঠে না।

দুই, শ্রীদাশগুপ্ত মরিচঝাঁপির "নেতাদের পরে বিশেষ পাত্তা না পাওয়ার" কথা লিখেছিলেন। মরিচঝাঁপি অপারেশান শুরুর দিনে (১৩ মে, ১৯৭৯) উদ্বাস্তু উন্নয়শীল সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাইহরণ বাড়ৈ এবং যুগ্ম-সম্পাদক অরবিন্দ মিস্ত্রী কলকাতায় আমার বাড়িতেই ছিলেন। মরিচঝাঁপির অপারেশানের পর ৮০ জনের দমদম জেলে স্থান হয়। নেতাদের নামে বসিরহাট আদালতে কেস করা হয়। পুলিশও তাঁদের খোঁজ করছিল। তাই তাঁদের আত্মগোপন করতে হয়। সতীশ মণ্ডল পালিয়ে মধ্যপ্রদেশে চলে যান, দু বছর আগে গোপনে পশ্চিমবঙ্গে আসার সময়ে রায়পুর স্টেশনে কে বা কারা তাঁর মাথায় আঘাত করে এবং তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। রাইহরণ বাড়ৈ পালিয়ে বাংলাদেশে যান। সেখানে অবৈধভাবে প্রবেশের অপরাধে তাঁর জেল হয়। তিনি গত বছর ছাড় পান এবং তারপর তাঁর হারানো পরিবারের খোঁজ নিতে শুরু করেন। অরবিন্দ মিস্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে থেকে-যাওয়া উদ্বাস্তুদের নিরাপত্তার জন্য কাজ করতে থাকেন। রঙ্গলাল গোলদার রেললাইন বা পথের উপর আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের নিয়ে ঘুটিয়া শরিফের নিকটে সমবেতভাবে জমি কিনে 'পথের শেষ' গ্রামের পত্তন করেছেন। ফলে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের মধ্যে মরিচঝাঁপির নেতাদের পাত্তা না পাওয়া তাঁদের ইচ্ছাকৃত নয়।

তিন, ওই নেতারা একেবারেই ভুঁইফোঁড় ছিলেন না। তাঁরা দণ্ডকারণ্যের মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের উদ্বাস্তুদের নিয়ে উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি গঠন করে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের নানা অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং স্থায়ী পুনর্বাসন নিয়ে আন্দোলন করেছেন। এই নেতাদের দুজন খুলনা জেলায় কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের কাছেই সি পি এম নেতা সমর মুখার্জি, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী প্রভৃতি নেতারা বার বার গিয়েছেন ; বছরের পর বছর এঁরা কি ভুঁইফোঁড় নেতাদের কাছে যেতেন ? শ্রীদাশগুপ্ত যে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে মরিচঝাঁপিতে সকলকে কাজ করতে দেখেছেন, ভুঁইফোঁড় নেতাদের পক্ষে কি ঐ ধরনের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল ?

(৫) শ্রীদাশগুপ্ত দণ্ডকারণ্যের 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি'র নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যেন হাজার চল্লিশেক উদ্বাস্তুকে ওই নেতারা উত্তেজিত ও প্রলুব্ধ করে দণ্ডকারণ্য ছাড়তে বাধ্য করেছিল। অথচ কী নৃশংসতা, ষড়যন্ত্র ও ধূর্তামির মাধ্যমে এই উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত করা হয়েছিল, সে বিষয়ে শ্রীদাশগুপ্ত একেবারেই নীরব। তাঁরা কেন এসেছিলেন, সে বিষয়ে ১৯৭৮ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় একাধিকবার শৈবাল গুপ্ত ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন। এ বিষয়ে কয়েকটা বইও শ্রীদাশগুপ্ত পড়ে দেখতে পারতেন। যেমন, "দণ্ডকারণ্য থেকে ওরা কেন এলেন" (রণজিৎ সিকদার সম্পাদিত), "মরিচঝাঁপি" (নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত)। বামফ্রন্ট সরকারের নীতির জন্য মরিচঝাঁপি দ্বীপের শেষ দিককার প্রকৃত ঘটনা কলকাতার একমাত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'স্টেটসম্যান' এবং সান্ধ্য বাংলা দৈনিক 'জননী'তে ছাপা হত। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা পান্নালাল দাশগুপ্তকে প্রমোদ দাশগুপ্তের ভাই বলে জানত এবং তিনি উদ্বাস্তুদের উপর সরকারী দমননীতির প্রতিবাদ না করায় তারা তাঁর কথার জবাব দেয়নি। শ্রীদাশগুপ্ত বিমুগ্ধ বিস্ময়ে মরিচঝাঁপিতে সব বয়সী লোকদের যে কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা কেমন করে ধূলিসাৎ হল, তাও তাঁর জানা উচিত। সুন্দরবনের তদানীন্তন লোকসভা সদস্য শক্তি সরকারের চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের জনতা পার্টি এই তফসিলী উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়ায়। মরিচঝাঁপি দ্বীপের সামনের গ্রাম কুমিরমারির আর এস পি নেতারাও পুলিশী তাণ্ডবের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বার বার পুলিশ দিয়ে ব্লকেড করে এবং যোগাযোগের লঞ্চগুলি রিকুইজিশান করে, সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের গ্রেপ্তার করে সি পি এম নেতারা বাইরের লোকদের প্রকৃত ঘটনা জানতে দেননি সংবাদপত্রগুলির উপরেও এমন চাপ ছিল যে, তাঁরা কেবল সরকারী তরফের বক্তব্যই ছাপতে শুরু করেন। পশ্চিমবঙ্গের জনতা পার্টি উদ্বাস্তুদের পাশে শামিল হয় বলে, সি পি এমের প্রয়াত লোকসভা সদস্য জ্যোতির্ময় বসু জনতা-প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে বোঝান যে, 'উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যের পুনর্বাসন ছেড়ে সুন্দরবনের সংরক্ষিত অঞ্চলে গিয়ে

বন কেটে সাবাড় করছে এবং ওরা ওখানে থাকলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হতে পারে।' সুন্দরলাল বহুগুণার বন সংরক্ষণ নীতির সমর্থক মোরারজী দেশাই তাই সুন্দরবনের বন কাটতে দিতে পারেন না। আর দাঙ্গা হতে দিতে তো পারেনই না। জনতা সরকারের নগর-উন্নয়ন ও উদ্বাস্তুমন্ত্রী সিখান্দার বখতকে এ রাজ্যের উর্দুভাষী এম· এল· এদের মাধ্যমে একই কথা বোঝানো হল। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউটের এক সভায় ডেপুটি স্পীকার কলিমুদ্দিন সামস মাইনরিটি কমিটির সদস্যদের বলেন, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা সুন্দরবনের মুসলমানদের ফসল কেটে নিচ্ছে ও নানারকম হামলা করছে। কলিমুদ্দিন সামসের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তফসিলী কর্মীদের নেতা সন্তোষ মল্লিক বক্তৃতা দিতে দিতেই পড়ে গিয়ে মারা যান।

পশ্চিমবঙ্গ জনতা পার্টির কোনো কথাই যাতে কেন্দ্রীয় নেতারা না শোনেন, সেজন্য সি পি এমের তিন নেতা হরিকিষণ সিং সুরজিত, বাসবপুন্নিয়া এবং রামমূর্তি জনতা-সভাপতি চন্দ্রশেখরের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সাহায্য চান। চন্দ্রশেখর কথা দেন, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যাতে কোনো ব্যবস্থা না নেন, সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখবেন। (অনেকদিন পরে মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুদের ঘরে আগুন লাগানোর সময় টেলিগ্রাম পেয়েও তিনি কেন প্রতিবাদ করেননি আমার এই প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিক তাপস গঙ্গোপাধ্যায়ের সামনে চন্দ্রশেখর ওই কথা বলেছিলেন।) শ্রী ভি এম তারকুণ্ডের নেতৃত্বে গোবিন্দ মুখোটি, নয়নতারা সায়গল, সুমন দুবে এবং লায়লা কবির ফার্নাণ্ডেজকে নিয়ে সিটিজেন্স ফর ডেমোক্রাসির এক প্রতিনিধিদল ১৯৭৯ সালের মে মাসে মরিচঝাঁপি আসার কথা ছিল। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তদানীন্তন রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিংকে দিয়ে শ্রীতারকুণ্ডেকে এই বলে টেলিফোন করেন যে, উদ্বাস্তুরা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বন কেটে সাবাড় করছে আর বামফ্রন্ট তো উদ্বাস্তুদের বন্ধু, তাঁদের প্রতি কোনো নির্যাতনই হচ্ছে না। সুতরাং তিনি যেন প্রতিনিধিদল নিয়ে মরিচঝাঁপি না আসেন। কিন্তু তাতেও জ্যোতিবাবু সন্তুষ্ট না হয়ে ১৯৭৯ সালের ৯ মে দিল্লিতে শ্রীতারকুণ্ডের ডিফেন্স কলোনির বাসায় চলে যান এবং বলেন, 'মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের সমস্যা কোনো মানবিক সমস্যা নয়, একদল লোক বনাঞ্চলে বাস করে সুন্দরবনের বন কাটছে। সেজন্য সরকার তাদের ওখান থেকে সরাতে চান, উদ্বাস্তুদের প্রতি তাঁর দরদ কারও চেয়ে কম নয়, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এটাকে মানবিক সমস্যা হিসাবে প্রচার করছে।' জ্যোতি বসুর কথা শুনে শ্রীতারকুণ্ডে মরিচঝাঁপি যাওয়া স্থগিত রেখে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। জ্যোতি বসু শ্রীতারকুণ্ডের বাড়ি যান ৯ মে আর ১৩ মে থেকে শুরু হয় মরিচঝাঁপি অপারেশান —ঘরে আগুন দিয়ে উদ্বাস্তুদের দ্বীপ ছাড়া করার নৃশংসতা। এই নৃশংসতার জের এখনও চলছে। ১০৭৮ সালের ২৬ জানুয়ারি পুলিশ মরিচঝাঁপি ব্লকেড করে। (হাইকোর্টের নির্দেশে ওই ব্লকেড তোলা হয় ১১ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু ইতিমধ্যে না খেয়ে ও অসুখে মারা যান ২৩৯ জন।) ৩১ জানুয়ারি মরিচঝাঁপিতে গুলিচালনার সংবাদ পৌঁছে দিতে সফলানন্দ হালদার নদী সাঁতরে কুমিরমারি হয়ে কলকাতা চলে আসেন। তাঁর মুখে শোনা খবর ২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার কাগজে ছাপা হয়। পরের দিন যোধপুর পার্কের আশ্রয় থেকে বের হওয়ার পরেই সে নিখোঁজ হয়। একদিন পরে পুলিশ তাঁকে আলিপুর কোর্টে হাজির করে বে-আইনিভাবে ভারতে আসার অভিযোগে। পুলিশ কোন চার্জশীট না দিলেও সেই মামলা আজও প্রত্যাহার করা হয়নি।

নিরঞ্জন হালদার
কলকাতা-৪২

হাসপাতাল ও চিকিৎসা

আপনাদের সম্পাদিত 'দেশ' পত্রিকার ২৯ আগস্ট ৮৭'র সংখ্যায় 'মরিতে চাহিনা আমি' শিরোনামে বেশ কয়েকটি হাসপাতাল ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা পড়লাম। বিষয়টির মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই ঠিকই কিন্তু পত্রিকার পরিবেশনের গুণ নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কেউই ঠিক মত মাথা ঘামাই না অথচ মাথাভারি বিষয়, তা নিয়ে এখানে কিছু আলোচনা করতে চাই।
অনুন্নত দেশগুলিতে এমন কি উন্নতিশীল দেশগুলিতেও আজ অবধি এমন ধারণা পোষণ করা হয় যে গ্রন্থাগার জন জীবনে অপরিহার্য নয়, এ এক ধরনের বিলাসিতা মাত্র—প্রাচুর্যে ভরা অলস জীবনে ফাঁক ভরাট করতে কেবল গ্রন্থাগারের প্রয়োজন হয়।
এ সমস্ত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে কোন হাসপাতাল বা চিকিৎসালয়ের সংলগ্ন গ্রন্থাগারের কল্পনা তো হাস্যাস্পদ ব্যাপার, ভাবতেই পারেন না আমাদের দেশে কেউ। পত্র লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে হাসপাতালের গ্রন্থাগার স্থাপন সম্পর্কে, এ ধরনের মন্তব্য শুনতে হয়েছে।
আমার আলোচনা এখানে হাসপাতালে গ্রন্থাগার বা Medical library সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ থাকবে। হাসপাতাল যেমন রোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষার প্রয়োজনে জনজীবনে অপরিহার্য, ওষুধ প্রাণ রক্ষার প্রয়োজনে, তেমনি তার আনুষঙ্গিক হিসেবে অপরিহার্য ডাক্তার, নার্স, নানারকম যন্ত্রপাতি এমন কি খাট, বিছানা, রোগীর খাদ্য মায় বস্ত্র। এর কোনটির ঘাটতি থাকলে চিকিৎসার সব প্রচেষ্টাই অসম্পূর্ণ থাকবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অনেক সময় উদাসীন থাকেন।
এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে বহুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের কোন এক দূরবর্তী জায়গায় জনৈক চিকিৎসক ছুটিতে যাবার আগে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী তাঁর কার্যভার উপযুক্ত দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন কারো হাতে সঁপে দেওয়ার তাগিদে স্থানীয় থানার দারোগাবাবুর কাছে চিকিৎসালয়ের ভার দিয়ে যান এবং নির্দিষ্ট বোতলে নির্দেশ আঁটা অবস্থায় লাল নীল বিভিন্ন রঙের ওষুধ রেখে যান। যাতে দারোগাবাবু বিশেষ নির্দিষ্ট বোতল থেকে নির্দিষ্ট রঙের ওষুধ মিলিয়ে চিকিৎসাকার্য সমাধা করতে পারেন। আশা করি আমরা সে অবস্থা থেকে অনেক এগিয়ে গিয়েছি এবং আমাদের সমাজ ব্যবস্থা অনেক কল্যাণমুখী হয়েছে। সস্তায় কার্যসমাধা করার দিন এখন আর নেই। কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে হলে সুনির্দিষ্ট

উপায়ে তা সম্পন্ন করতে হবে। চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি জনহিতকর কাজে সস্তায় বাজিমাৎ করার উপায় নেই। যদি অবশ্য সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষা থাকে।

বর্তমান যুগে রোগীর চিকিৎসা শুধুমাত্র ওষুধ ও পথ্যেই সম্পন্ন হয় না। তার শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজনানুযায়ী নানারকম সাহায্যকারী প্রক্রিয়াও অবলম্বন করা হয়ে থাকে। যেমন : (১) Physiothepa হালকা ধরনের ব্যায়াম (light exercises), মর্দন (Massage) রশ্মি প্রয়োগ (ray treatment) ইত্যাদি।

(২) Psychotherapy : মানসিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে চিকিৎসা— মনোবিশ্লেষণ, Hypnotism ,প্রভৃতি। (৩) Occupational therapy বিভিন্ন ধরনের। ছোটখাটো কাজ দিয়ে রোগীকে ধীরে ধীরে আরোগ্য করে তোলা। Biblio therapy বই এর সাহায্যে রোগীর চিকিৎসা। এও একধরনের আধুনিক চিকিৎসা। রোগের চিকিৎসাসাপেক্ষ পর্যবেক্ষণের কারণে দীর্ঘদিন হাসপাতালে অবস্থান অনেক সহনীয় হয়ে ওঠে তাকে উপযুক্ত ধরনের বই পড়তে দিলে। একে ঠিক নিছক অবসর বিনোদন বলা যায় না বরং চিকিৎসার অঙ্গ হিসাবে এর প্রয়োজনীয়তা আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে। রোগের চিকিৎসায় রোগীর মনের প্রফুল্লতা বা সজীবতা রোগ নিবাময়ে অনেকাংশে সাহায্য করে। উপযুক্ত বই মনের এই অনুকূল অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। কাজেই চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবে বই এর ভূমিকা অবহেলা করার মত নয় মোটেই।

এছাড়াও হাসপাতালে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কোন শিক্ষাই স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় না। বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা বা কারিগরী প্রশিক্ষণ এসবই মূলত শিক্ষার্থীকে একটা নির্দিষ্ট মানে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে মাত্র। তাঁর শিক্ষার পরিসমাপ্তি সেখানেই হয় না। বরং তাঁর প্রকৃত শিক্ষার সূচনা হয় বলা যেতে পারে। ব্যবহারিক জীবনে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা অর্জন ও তৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য নিয়মিত পড়াশুনা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয় কর্মক্ষেত্রে, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক শিক্ষক ও কারিগরী প্রভৃতি বৃত্তিতে তা অতি প্রয়োজনীয়। গ্রন্থাগারের সাহায্য ছাড়া সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

সারা পৃথিবীতে প্রতিদিন হাজার হাজার পত্র পত্রিকায় লক্ষ লক্ষ প্রবন্ধ ও নানারকম প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। একমাত্র বিজ্ঞানের কারিগরী বিষয়ের ওপর প্রায় এক লক্ষ বই ছাপা হচ্ছে প্রতি বছর। নানারকম গবেষণা ও পেটেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন ছাপা হচ্ছে ২০ লক্ষ এবং প্রায় ৩০ লক্ষ প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে প্রতি বছর।

বিখ্যাত বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক Derek de solla Price-এর মতে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রতি ৫০ বছরে দ্বিগুণিত হচ্ছে, কিন্তু বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ের উপর বিভিন্ন গবেষণালব্ধ কাজের শতকরা হার দ্বিগুণিত হচ্ছে প্রতি ১৫ (পনের) বছর অন্তর। প্রতিদিন এই বিপুল সংখ্যক বই ও প্রবন্ধের মাধ্যমে নতুন নতুন আবিষ্কারের তথ্য সংবলিত বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছে। বিশেষ করে পুরোনো তথ্য ও তত্ত্বের পরিবর্তে নতুন তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ফলে, এই পরিবর্তনশীল জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে না পারলে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী বা চিকিৎসক প্রকৃত কল্যাণ সাধন করতে মোটেই সমর্থ হবেন না। বিশেষ করে যাঁরা নাকি মানুষের জীবন মরণ সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত, তাঁদের ক্ষেত্রে এই নিত্য নতুন জ্ঞান আহরণ এক অবশ্য করণীয় কর্তব্য।

আমাদের দেশে চিকিৎসকদের সাধারণত নতুন ওষুধ ব্যবহার করতে হলে ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার প্রকাশিত নির্দেশনামার ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, নির্দেশপত্র সব সময় স্বয়ং সম্পূর্ণ থাকে না, ব্যবসার খাতিরে তা সব সময় সত্যের অনুসারী হয় না। ফলে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ অনেক সময় মানুষের শরীরের উপর প্রতিকূল ক্রিয়া করতে দেখা যায়।

আমেরিকার বিখ্যাত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of California at San Francisco) মিলভার স্যাম দম্পতি এবং ডঃ ফিলিপ লী-এর লেখা 'মৃত্যুর ব্যবস্থাপত্র' (Prescriptions for Death) নামক বই থেকে জানা যায় যে পৃথিবীব্যাপী ওষুধ তৈরীর সংস্থাগুলির চরমতম সামাজিক দায়িত্বের অভাব রয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্য আমেরিকার দরিদ্রতর ও অধিকতর অনুন্নত দেশগুলিতেও ওষুধ বিক্রির ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা সন্দেহাতীত নয় মোটেই। কতকগুলি ওষুধের কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত না করে বা সে জন্য কোন উপযুক্ত সাবধানবাণী না দিয়ে তাঁরা বাজারে ওষুধ ছাড়েন। ফলে চিকিৎসকরা অনেক সময় ওষুধের ঠিক গুণাগুণ না জেনে শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করে এসব ওষুধ ব্যবহার করতে বাধ্য হন। কারণ তাঁরা প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার সুযোগ পান না বা নিত্যনতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগবিহীন হয়ে থাকেন। এর কুফল সুদূরপ্রসারী।

এসব ওষুধ পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে প্রায় এক দশকের ওপর নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সম্ভবত অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর প্রধান কারণ আমাদের দেশের অধিকাংশ চিকিৎসক আধুনিককালের এ ধরনের গবেষণালব্ধ ফলাফল সম্পর্কে নিজেদের ওয়াকিবহাল রাখতে পারছেন না। প্রধানত তাঁদের এ সুযোগ সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল বা চিকিৎসালয়গুলিতে দেওয়া হয় না মোটেই। কারণ কোন গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা নেই অধিকাংশ হাসপাতালে। ফলে, আধুনিককালে প্রকাশিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের পত্র পত্রিকা, যা নাকি সর্বাধুনিক জ্ঞানের একমাত্র উৎস তা তাদের পাবার উপায় নেই। ব্যক্তিগতভাবে এগুলি কিনে পড়া কারো পক্ষে সম্ভব হয় না, বর্তমান যুগে তার প্রয়োজনও নেই। কারণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই এ সমস্ত পত্র পত্রিকা যা নাকি সংখ্যায় প্রতিটি বিষয়ের জন্য শত শত প্রকাশিত হয়, তা প্রয়োজনানুসারে পাওয়া উচিত।

গতানুগতিক চিকিৎসার জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে। চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর বিশেষ ধরনের গবেষণা বা অনুসন্ধান চালানোর জন্য সে প্রয়োজন বহু গুণ বেশী, তা বলাই বাহুল্য। যেখানে হাসপাতালের অট্টালিকা, ওষুধ ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়, চিকিৎসকরা তাদের বিভিন্ন দাবীদাওয়া নিয়ে শহর কলকাতা গরম করেন। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় লালবাড়ি থেকে ভাষণ রাখেন চিকিৎসার স্বার্থের উন্নতির কথা ভেবে—সেখানে হাসপাতালে গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য কয়েক হাজার টাকা খরচা করার যৌক্তিকতা আশা করি এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হবে।

ভাস্কর দেব
কলকাতা-৩৬

সংক্ষিপ্ত ডাক্তারী কোর্স

বিগত ২৯ আগস্ট প্রকাশিত 'দেশে' আপনারা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে গিয়ে একটি ভুল তথ্য প্রকাশ করেছেন। বিষয়টি হলো—'সংক্ষিপ্ত

ডাক্তারী কোর্স । একথা ঠিক ১৯৮০ সালে প্রয়াত কমঃ প্রমোদ দাশগুপ্তর সৃষ্টি এই কোর্স আজ বন্ধ ; কিন্তু পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি চাকুরীর ব্যবস্থা হয়নি—এই তথ্য একদম ভুল । ১৯৮০ সালে যারা ছাত্র হিসেবে এই কোর্সে যোগ দিয়েছিল তারা দু বছর হলো সরকারি চাকুরীতে নিযুক্ত হয়েছে এবং তার পরবর্তী বর্ষের ছাত্ররা প্রায় পাঁচ মাস হলো সরকারী চাকুরী করছে । একথা ঠিক কোর্স শুরুর সময়ে ছাত্রছাত্রীরা যে প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসবাণী সরকারের থেকে পেয়ে যে উদ্যমে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল, সরকারি চাকরীর সঙ্গে সেই প্রতিশ্রুতি এবং যে যে বিষয়ে তারা শিক্ষা লাভ করেছে তার কোন যোগ নেই । এম বি বি এস এর পাঠক্রম এবং সকল বিষয় এই সংক্ষিপ্ত কোর্সে সংক্ষিপ্ত মেয়াদে (৩ বছর) পড়ানো হয় । মেডিসিন গাইনোকোলজি, সাজারী, ফরেনসিক মেডিসিন, আই,ই এন টি, ডেন্টাল,প্রিভেনটিভ অ্যান্ড সোসাল মেডিসিন ইত্যাদি পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা কোন রেজিস্ট্রেশন পায়নি—যা এই বিষয়গুলো পড়ে তাদের 'প্রাপ্য' । তাছাড়া পাশ করার পর মোট নয় মাস ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক ও উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৪০০ টাকা মাসিক ভাতাতে গ্রামীণ চিকিৎসা বিভাগের বিভিন্ন শাখাতে শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগ দেয় । এর পর তারা যে চাকরী সরকারের তরফ হতে পায় তার সঙ্গে গ্রামীণ সমাজে ডাক্তার হিসেবে চিকিৎসার কোন সুযোগ নেই ।

সবশেষে আপনাদের প্রকাশের একটি তথ্য জানাই । এই কোর্সের শিক্ষা যেখানে দেওয়া হয়েছে তা কোন স্কুল নয় । এটি একটি ইনস্টিটিউশন । স্কুল শব্দের অর্থ পাঠশালা বা বিদ্যালয় । আর ইনস্টিটিউশন অর্থ প্রতিষ্ঠান গৃহ বা A socity established for some object এই কোর্সে যে স্থানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তাতে কেবল চিকিৎসক তৈরির শিক্ষাই দেওয়া হয়েছিল ।

শ্রীপর্ণা দত্ত

[সংক্ষিপ্ত ডাক্তারী কোর্সের জলপাইগুড়ি শাখার ছাত্রী]

হাসপাতালের দুই চেহারা

২৯ আগস্ট ১৯৮৭ 'কলকাতার অসুস্থ হাসপাতাল' এই শিরোনামে যে রচনাটি বেরিয়েছে তা পাঠক সমাজকে বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা যে কতখানি নৈরাশ্যজনক ও হতাশাব্যঞ্জক তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে । দেবদূতবাবু এই নৈরাশ্যজনক অবস্থার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন । আজ যারা হাসপাতালে চিকিৎসার আশায় বেডে শুয়ে আছে অসহায়তার শিকার হয়ে তারা সুচিকিৎসা পায় না । ২০ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের লোক সুচিকিৎসার আশায় কলকাতায় আসতো এবং তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাইরের লোকও কলকাতায় সুচিকিৎসার আশায় নিশ্চিন্তে আসতো । কিন্তু বর্তমান হাসপাতালগুলির চিকিৎসা ব্যবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেই ছুটতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে । দেবদূতবাবুর এই উক্তি সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য । আমার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর দাস মহাশয় গত মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলা থেকে পি জি আই (চণ্ডীগড়) হাসপাতালে চক্ষু অপারেশনের জন্য যান । তাঁর ডান চোখে রেটিনা ডিটাচমেন্ট হয়েছিল । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কুড়ি বছর আগে ১৯৬৭ সালে জুন মাসে পিতৃদেবের বাম চোখের রেটিনা ডিটাচমেন্ট এর অপারেশন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছিল । কিন্তু বর্তমান হাসপাতালগুলির অব্যবস্থা, হাসপাতাল কর্মীদের কাজে গাফিলতি ও অবহেলা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা ইত্যাদি পিতৃদেবকে পি জি আই হাসপাতালে পাঞ্জাবের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও যেতে বাধ্য করেছিল ।

সেখানকার হাসপাতালের অবাঙালী ডাক্তার, নার্স ও সাধারণ কর্মীদের সেবামূলক মনোভাব ও সহযোগিতা আমার পিতাকে অভিভূত করেছে । সেখানে প্রতিটি ওয়ার্ডে, রুগীর সঙ্গে যে কোন একজন আত্মীয় রুগীর দেখাশোনার জন্য সবসময় থাকতে পারে, কেবলমাত্র ডাক্তার পরিদর্শনের সময়টুকু ছাড়া । রুগীর আত্মীয়স্বজনের সস্তায় খাওয়ার জন্য হাসপাতাল এরিয়ার মধ্যেই ক্যান্টিনের ব্যবস্থা আছে ।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মতো নিজের খরচে আয়া রাখার দরকার নেই । কোন বিশেষ রোগীর জন্য তার আত্মীয়কে বেশীদিন থাকতে হলে তার কাপড় ধোয়ার জন্য কাপড় প্রতি ২৫ পয়সা দিয়ে কাচানোর ব্যবস্থা আছে। রোগীর পথ্য ও খাদ্য উষ্ণ, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর । দুর্ভাগ্যক্রমে কখনও কোন ট্যাবলেট, ক্যাপসুল বা কোনও প্রয়োজনীয় ওষুধ যদি সেই সময় হাসপাতালে না থাকে, তাহলে রোগীর আত্মীয়স্বজনকে শুধু সেই বেলার জন্যই মাত্র ১টি ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল কিনে আনতে অনুরোধ করা হয় । যাতে রোগীর উপর আর্থিক চাপ না পড়ে । পিতৃদেবের মতে কেবল ডাক্তারই নয়, হাসপাতালের সমস্ত কর্মী সদাই ব্যস্ত কী ভাবে রোগীকে তাড়াতাড়ি আরাম ও আরোগ্য দেওয়া যায় । মোট ৯ দিন হাসপাতালে থাকা, এবং রেটিনা অপারেশন ও ওষুধপত্র ইত্যাদি নিয়ে কেবলমাত্র রুগীর জন্য খরচ হয়েছে মোট ১২০ টাকা । পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসার এত অব্যবস্থা কেন ? সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ হিসাবে আমার একটা অনুরোধ, প্রশাসন যদি শক্ত হাতে, সজাগ দৃষ্টি নিয়ে হাসপাতালের প্রতিটি পর্যায়ের দিকে লক্ষ্য রাখেন তাহলে আমরা হয়ত আবার আমাদের হৃতবিশ্বাস ফিরে পাবো ।

শিখা দাস

কানপুর

ডাক্তারের সমস্যা

'দেশ' ২৯ আগস্ট ১৯৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিবন্ধাবলী একজন মেডিকাল ছাত্র হিসাবে মনোযোগ নিয়ে পড়লাম । কিছুদিন আগেকার জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলন এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাবিষয়ক ব্যাপক বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংখ্যাটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে । গত কয়েক বছর রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রাজ্য জনস্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে কয়েকটি মতামত জানাতে চাই ।

রাজ্যের বর্তমান স্বাস্থ্যচিত্রে একটা জিনিস খুবই চোখে পড়ে । তাহল শহরে ডাক্তারের আধিক্য এবং

গ্রামগঞ্জে প্রচণ্ড অভাব। MBBS পাস করবার পর খুব অল্প ডাক্তারই চান শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে, যদিও শহর আঁকড়ে থাকার মূল্য হিসাবে তাঁদের অনেককেই বেকার অথবা আধা বেকার হয়ে থাকতে হয়। বর্তমানে এ রাজ্যে যে হারে ডাক্তার তৈরি হচ্ছে তাতে এই বেকারত্ব এবং আধা-বেকারত্ব ক্রমেই বেড়ে চলবে।
কিন্তু ডাক্তারদের গ্রামে যেতে কেন এই অনীহা? তাকি শুধু তাঁদের সেবামনস্কতার অভাবের জন্য? শুধু স্বার্থান্ধতার জন্য? মনে হয় না। ছয় বছর ডাক্তারি শিক্ষার পর যখন তাঁরা সরকারী চাকরিতে ঢোকেন তখন তাঁদের পোস্টিং হয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। এই সব কেন্দ্রে যা পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা তাতে শিক্ষাসম্মত ডাক্তারি করা অসম্ভব। ফলে সেবার ব্রত নিয়ে, সমস্ত ব্যক্তিগত অসুবিধা তুচ্ছ করে একজন তরুণ ডাক্তার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে দেখেন তাঁর দীর্ঘদিনের শিক্ষা প্রায় কোনো কাজেই লাগবে না সেখানে। আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা ছাড়া ডাক্তারি করা অসম্ভব। বর্তমানে মেডিকাল ছাত্রদের আধুনিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাবে সেই শিক্ষার প্রয়োগ তাঁরা করতে পারছেন না।
অন্যদিকে এটাও স্বীকার করতে হবে যে রাজ্যের যা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অবস্থার কিছুটা উন্নতি সম্ভব হলেও, প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্যব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়া অদূর ভবিষ্যতে সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রকে আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে শিক্ষিত করার স্বার্থকতা কোথায়? এতে পুরনো সমস্যার তো সমাধান হচ্ছে না বরং নতুন সমস্যা (যেমন বেকার ডাক্তার) সৃষ্টি হচ্ছে।
ভেলোরে বর্তমানে একটি Condensed course চালু হয়েছে গ্রামীণ ডাক্তার তৈরি করবার জন্য। এই সব ডাক্তারদের গ্রামের পরিস্থিতিতে কাজ করবার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত করা হচ্ছে। ফলে এঁরা যে শুধু গ্রামে গিয়ে কাজ করতে রাজি থাকবেন তাই নয়, গ্রামীণ পরিস্থিতিতে অনেক ভালো কাজ করতে পারবেন। উল্লেখযোগ্য, এই ধরনের একটি শিক্ষাসূচী পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক সময় চালু করেছিলেন। যে কোন কারণেই হোক তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু এই ধরনের কর্মসূচীই আমাদের জনস্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান। MBBS গ্রাজুয়েটের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে গ্রামীণ চিকিৎসকদের একটা Cadre গড়ে তুলতে হবে। MBBS পাস করা ডাক্তারদের সেখানেই নিয়োগ করতে হবে যেখানে তাঁরা তাদের শিক্ষাসম্মত চিকিৎসা করবার ন্যূনতম পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এই ব্যবস্থায় গ্রামে চিকিৎসকের অভাব এবং ডাক্তারদের মধ্যে বেকারী এই দুই সমস্যারই সমাধান হবে।

দীপায়ন মিত্র
কলকাতা

'প্রসঙ্গকথা'

'দেশ' পত্রিকায় (৮ আগস্ট) প্রকাশিত আমার চিঠি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্রটি (৫ সেপ্টেম্বর) পড়লাম। আমার চিঠির মূল বক্তব্য ছিল দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের তিনখানি চিঠি সম্পর্কে ('দেশ' সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৪)। আমি বলতে চেয়েছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত সম্মান গ্রহণে রবীন্দ্রনাথ অনিচ্ছা প্রকাশ করছেন এই চিঠিগুলোতে সেটি প্রমাণিত হয় না। শ্রদ্ধেয় উমাপ্রসাদবাবু আমার মূল বক্তব্য সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষকে লেখা কোন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কি এই মনোভাব জানিয়েছেন? আমার এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবার যোগ্যতম ব্যক্তি আমি উমাপ্রসাদবাবুকেই মনে করি, কিন্তু তাঁর চিঠিতে সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না।

প্রসঙ্গক্রমে আমি পাঠকসমাজকে জানাতে চেয়েছিলাম যে রবীন্দ্রনাথকে সাম্মানিক ডক্টরেট দেওয়ার ব্যাপারে পর্দার অন্তরালে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। নেহরু ম্যুজিয়মের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডঃ নন্দার বইটি পড়ার আগে পর্যন্ত আমি নিজেই এটি জানতাম না। উমাপ্রসাদবাবু জানতেন কিনা বলতে পারি না। যতদূর মনে পড়ছে "দেশ" পত্রিকার যে সংখ্যায় তিনি কারমাইকেলের পত্রটি প্রকাশ করেন সেই প্রবন্ধে হার্ডিঞ্জের চিঠির কোন উল্লেখ করেননি। উমাপ্রসাদবাবু দেখিয়েছেন যে হার্ডিঞ্জের চিঠির (২০-১০-১৩) দিন পনের আগেই কারমাইকেল আশুতোষকে চিঠি (৫-১০-১৩) দিয়েছিলেন। আমার ভ্রম স্বীকার করে নিলাম। অবশ্যই স্মৃতি আমায় প্রতারণা করেছে, কারণ কয়েক বছর আগে "দেশ" পত্রিকার যে সংখ্যায় কারমাইকেলের চিঠি তিনি প্রকাশ করেন সেটি এখন হাতের কাছে নেই। এ সত্ত্বেও বলব হার্ডিঞ্জের চিঠি স্থির চিত্তে পাঠ করলে স্পষ্টই প্রতীয়মাণ হয় যে রবীন্দ্রনাথকে সাম্মানিক ডক্টরেট দেওয়ার প্রশ্নে তিনি চাপ সৃষ্টি করছেন। পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে কোন এক মহল থেকে আপত্তি উঠেছিল সি আই ডি রিপোর্ট যাঁর সম্পর্কে বিরূপ তাঁকে সম্মানিত করার ব্যাপারে। প্রাদেশিক সরকারের তরফ থেকেই এই আপত্তি আসা স্বাভাবিক যে আপত্তি হার্ডিঞ্জ দৃঢ়ভাবে নাকচ করে দিচ্ছেন। কিন্তু যদি উল্টোটা হত? যদি হার্ডিঞ্জ জানাতেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে সি আই ডি রিপোর্ট সুবিধেজনক নয় তাঁকে সম্মানিত করা অনুচিত, তা হলে কী হতো? তাহলে কি কারমাইকেল অথবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে সহজে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করতে পারতেন?
ডঃ নন্দা তাঁর বইতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে হার্ডিঞ্জের একটি চিঠির উল্লেখ করেই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন, কারণ তাঁর গ্রন্থের বিষয়বস্তু গোখেলে, রবীন্দ্রনাথ নন। মনোযোগ সহকারে এই উদ্ধৃত চিঠি পড়ে আমার মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে হার্ডিঞ্জ ও কারমাইকেলের মধ্যে একাধিক চিঠির আদানপ্রদান হয়ে থাকবে। ২০শে অক্টোবরের আগে থেকেই চিঠি চলাচল হওয়া সম্ভব। এটি নির্ধারণ করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। নতুন দিল্লির নেহরু মুজিয়ম বা জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত হার্ডিঞ্জ পত্রাবলীর (মাইক্রোফিল্ম) কপি দেখলেই এটি জানা যাবে, যদিও এই মুহূর্তে রাজধানী অভিমুখে যাবার কোন পরিকল্পনা এই পত্রলেখকের নেই।
রবীন্দ্রনাথকে সাম্মানিক ডক্টরেট প্রদান করার কথা সর্বপ্রথম কে চিন্তা করেছিলেন—হার্ডিঞ্জ, কারমাইকেল, আশুতোষ অথবা অন্য কেউ—যথেষ্ট নথিপত্র সামনে না রাখলে বলা সম্ভব নয়। তবে এঁরা তিনজনই যে এই ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন সন্দেহ নেই। আমি কিন্তু আমার চিঠিতে প্রাতঃস্মরণীয় আশুতোষকে অবজ্ঞা করে কোন মন্তব্য করিনি। রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষের মধ্যে যে গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল তা কারও অবিদিত নয়। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত সারা বাংলায় রবীন্দ্র অনুরাগীর চেয়ে রবীন্দ্রবিরাগীর সংখ্যা কম ছিল না। অনুমান করি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মহলের (সিনেট, সিন্ডিকেট প্রভৃতি) সদস্যদের মধ্যে অনেকেই রবীন্দ্রবিদ্বেষী ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলতে আমি তাঁদের কথাই বলতে চেয়েছিলাম—স্যার আশুতোষের কথা নয়। মনে হয় শ্রদ্ধেয় উমাপ্রসাদ আমার চিঠির এই মর্ম অনুধাবন করতে পারেননি বলেই বিরক্ত বোধ করেছেন।
ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি কিন্তু আশুতোষের দারুণ ভক্ত। এমন আকর্ষণীয় অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ সহজে মেলে না। তাঁর অবদানের সঠিক মূল্যায়ন বোধহয় আজও হয়নি। স্যার আশুতোষ বলতে বোঝায় আমাদের জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ দিক, একটি বিশেষ যুগ।

সোমনাথ রায়
ইতিহাস বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বারোয়ারি কথা

১২ সেপ্টেম্বর তারিখের 'দেশ'-এ উৎপলকুমার সরকার মশাইয়ের চিঠিটি পড়ে আমরা যথেষ্ট উপকৃত হলাম। এর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। অবশ্য ভারতীর বিখ্যাত বারোয়ারি উপন্যাসের কথা আমি পূর্বেই লিখেছি। তিনি 'ভাগের পূজা'র কথা জানিয়ে ভালই করেছেন। সে বই এক কপি জলধরদা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, তা যথা নিয়মে হারিয়ে যায়। আর একটি বড় বারোয়ারি উপন্যাসের কথা বলা উচিত মনে করি। সেটি রসচক্র সাহিত্য সংসদ (?) থেকে প্রকাশিত হয়। আসলে আমাদের যে সাহিত্যিক আড্ডা ছিল রসচক্র নামে, তারই লেখকবৃন্দের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করে স্বর্গত রাধেশ রায় প্রকাশ করেন। এর বিশেষত্ব হচ্ছে প্রথম অধ্যায়টির লেখক ছিলেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র। চমকে যাবেন না, এর একটি ইতিহাস আছে। বহুদিন পূর্বে শরৎবাবু একবার কাশীতে যান, তখন ধরপাকড়ে পড়ে একটি উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ লিখে দেন—"বাড়ীর কর্তা" নাম দিয়ে। সেটি "প্রবাসজ্যোতি" পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল—যতটুকু মনে আছে। "প্রবাসজ্যোতি" অবশ্য শীঘ্রই নির্বাপিত হয়, অলকা মাসিকপত্রও স্থায়ী হয়নি—একমাত্র উত্তরাই বহুদিন চলেছিল।
শরৎবাবু যে ঐ উপন্যাসে আর হাত দেবার চেষ্টা করেননি তার কারণ—প্রথম অধ্যায় এমন অবস্থায় শেষ করেছিলেন—সে অবস্থার জটিলতা সরল করা সহজ নয়। একান্নবর্তী সংসারের কর্তা এক নববধূর কোন অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আদেশ করলেন বৌমাকে সারা দিন এক পাটি জুতো মাথায় করে উঠানে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সেইখানেই ক্রমশ টানা। বুঝুন ব্যাপার!
পরবর্তীকালে আর এক বিখ্যাত লেখকও এই অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর বহুপঠিত উপন্যাসে, তবে তার একটা সুব্যবস্থাও করেছিলেন।
শরৎবাবু সেই সময় প্রতি রবিবার রসচক্রে আসতেন, তাতেই রাধেশবাবুর (কবি কালিদাস রায়ের অনুজ) সকাতর প্রার্থনায় উক্ত 'উড়ো খৈ রাধেশায় নম' করেছিলেন। কিন্তু শরৎবাবুর পরে যাঁরা ঐ বইতে লিখেছিলেন তাঁদের কেউই তখন তেমন খ্যাতনামা হতে পারেননি— ফলে 'রসচক্র'র একটি সংস্করণেই ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটে। উৎপলবাবু যে জোড়া বা চারজন লেখকের যৌথ প্রচেষ্টার কথা বলেছেন, এমন পরবর্তীকালে অনেক ঘটেছে। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীন্দ্রলাল বসু ও সরোজ রায় চৌধুরীএঁরা যৌথভাবে একটা উপন্যাস লেখেন, নাম মনে নেই।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র
কলকাতা-৩১

কৈশোরের সঙ্গী

১৫ অগাস্টের "দেশ" পত্রিকাতে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা 'কৈশোরের সেরা সঙ্গী'তে মৌচাককে মনে পড়ে। আমার কৈশোরের অনেক মধুর স্মৃতির সঙ্গে মৌচাক বড় বেশী বিজড়িত, তাই আমার কথাটুকু লিখছি।
মৌচাকে গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখার জন্য একটা স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল—সম্ভবত তার নাম ছিল "গোলটেবিল বৈঠক"। ঠিক মনে করতে পারছি না—বহুদিনের কথা। তাতে আমার অনেক 'লিমেরিক' 'ধাঁধা' ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। একবার প্রতিভা বসু তাঁর ছোট্ট কন্যা মিমির উপর একটি কবিতা লিখেছিলেন, আমি আবার তার উপরে মিমিকে সম্বোধন করে একটা কবিতা লিখেছিলাম। সবচেয়ে উল্লেখ্য, আমি একটা পত্রবন্ধু (Pen friend) করার ব্যবস্থার জন্য মৌচাক সম্পাদককে লিখি। এবং সহৃদয় সম্পাদকমশাই মৌচাকের মাধ্যমে পত্রবন্ধুদের পত্র বিনিময়ের ব্যবস্থা করেন। এই সুযোগে আমি কয়েকটি অমূল্য বন্ধু পেয়েছিলাম। আরো অনেকে পেয়েছিলেন। কলকাতার বাইরেও আগ্রা, দানাপুর, কানপুর থেকেও চিঠি পেতাম। সেই সঙ্গে ডাকটিকিট বদল ইত্যাদিও চলতো। তখন বাংলা কোন পত্রিকাতে এ সুবিধা ছিল না, তাই এটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সে আজ পঞ্চাশ বছরেরও আগেকার কথা। এখনও সে ব্যবস্থা আছে কি না জানি না। আমি তখন স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী-মৌচাক আমার অতি প্রিয় পত্রিকা ছিল।
সংসারের দায়িত্ব কর্তব্যের চাপে, বয়সের বৃদ্ধিতে সে-সব কোথায় হারিয়ে গেছে। তাই নতুন করে মৌচাকের কথা পড়ে অনেক স্মৃতি জাগছে মৌচাককে ঘিরে।

ইলা মিত্র
নতুন দিল্লী-১৪

নামের বানান

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ তারিখে প্রকাশিত দেশ-এ (পৃঃ ১২) পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাঘা যতীনের নামের বানান সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে চেয়েছেন। তাঁর চিঠিটা ২৭ জুন ১৯৮৭ তারিখের দেশ এ (পৃঃ ১৩) প্রকাশিত মনোজকুমার মিত্রের একটি মন্তব্যের সূত্র ধরে লেখা। বাঘা যতীনের নামের বানান সম্পর্কে আমি একটি তথ্য জেনেছিলাম বাঘা যতীন ও যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বিপ্লব-সহকর্মী নলিনীকান্ত করের কাছে আজ থেকে ঠিক ন' বছর আগে। বর্তমানে লোকান্তরিত নলিনীকান্ত তখন দক্ষিণ কলকাতায় ৯ নং সাউথ এন্ড পার্কে থাকতেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় নব্বই বছর। যাঁরা তাঁকে ঐ সময় দেখেছেন তাঁরা জানেন ঐ বয়সেও তিনি শারীরিকভাবে কতখানি সমর্থ ছিলেন এবং তাঁর স্মৃতিশক্তি কত প্রখর ছিল। নলিনীকান্ত আমাকে বলেছিলেন: 'নানা বইয়ে এবং বিভিন্ন প্রবন্ধে দেখি দাদার (বাঘা যতীনের) নামের বানান লেখা হয় 'যতীন্দ্রনাথ'। এটা ভুল। দাদা নিজে 'জ্যোতিন্দ্রনাথ' বানান লিখতেন, সই করতেন আমি দেখেছি।" ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব বিষয়ে আমি ঐসময় জীবিত প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সাক্ষাৎ বক্তব্য সংগ্রহ করছিলাম। আমার অনুরোধে নলিনীকান্ত আমাকে ঐ সম্পর্কে তাঁর স্বলিখিত যে-বক্তব্য একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের আকারে দিয়েছিলেন তাতেও তিনি বাঘা যতীনের নামের বানান লিখেছিলেন 'জ্যোতিন্দ্রনাথ'। অবশ্য ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে 'জ্যোতিন্দ্র' কথাটি শুদ্ধ নয়। হওয়া উচিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'। তবে নলিনীকান্ত করের সাক্ষ্য-অনুসারে বাঘা যতীন ঐ বানানই লিখতেন।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
কলকাতা-৩

চুক্তিমন্ত্রী প্রসঙ্গে

দেশ, ২২ আগস্ট, ১৯৮৭ সংখ্যার সম্পাদকীয় (চুক্তিমন্ত্রী)-র এক জায়গায় লেখা হয়েছে 'তাঁর তৃতীয় চুক্তি শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনের সঙ্গে।' কিন্তু তৃতীয় চুক্তি তো হয়েছিল মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের প্রেসিডেন্ট লালডেঙ্গার সঙ্গে। এ-চুক্তির পর মিজোরামে শান্তি ফিরে এসেছে বলা যায়। চুক্তির পর অনুষ্ঠিত মিজোরামের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) পরাজিত হলেও একমাত্র মিজোরাম চুক্তিতেই রাজীব গান্ধী কিছুটা সফল।
তাহলে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনের সঙ্গে রাজীব গান্ধীর চুক্তিটি 'চতুর্থ চুক্তি' নয় কি?

সুহাসরঞ্জন কর
শিলচর, আসাম

বাঙলা ভাষা

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ 'দেশ' পত্রিকার প্রচ্ছদ নিবন্ধ 'ঘরে বাইরে আক্রমণ : বাঙলা ভাষা' লিখতে গিয়ে লেখক রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য যুক্তি ও তথ্য ছেড়ে কতকগুলি মন্তব্য করেছেন। এর প্রতিবাদ না করে থাকা গেল না।
চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভট্টাচার্যমহাশয় ভাষার আদমসুমারীতে পরিসংখ্যানজনিত ত্রুটি প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ১৯০১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত আদমসুমারীর পরিসংখ্যান বিচার করতে গেলে ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের ফলে বঙ্গভাষী সমাজের বৃহত্তর অংশই যে ভারতবর্ষের বাইরে চলে গেছে সেটা ভুললে চলবে কেন? ভট্টাচার্য মহাশয় কিন্তু এ ব্যাপারে কোন মন্তব্যই করেননি। দ্বিতীয়ত তিনি নিজেই 'হিন্দি দহতে কি কি উপভাষা বিসর্জন দেওয়া হয়েছে তার ফিরিস্তি দিয়েছেন যেমন আওধী, বাগলখণ্ডি, ভোজপুরী, ব্রজভাষা, ছত্তিশগড়ি মালবি, মগধি-মগহি, সুরগুজিয়া ইত্যাদি (তাঁর দেওয়া ৪৩টি উপভাষা তালিকা থেকে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করলাম)। মূল ভাষার উপভাষা অন্তত কথ্য উপভাষা থাকেই। মূল বঙ্গভাষী অঞ্চলে (বাংলা দেশকে নিয়ে) যে বাংলা ভাষায় লেখাপড়া চলে সেটাই বাংলা ভাষা বলে স্বীকৃত ও পরিচিত—ত্রিপুরী বাংলা, সিলেটী বাংলা, যশুরে বাংলা, বাহে বাংলা, রাঢ় বাংলা ইত্যাদি কথ্য উপভাষা। যাঁরা এসব উপভাষা বলেন তাঁরা মাতৃভাষা বলতে বাংলাই বলবেন—উপভাষাকে নির্দেশ করবেন না। তেমনি অসমীয়া ভাষার স্বীকৃত লেখাপড়ার ভাষা বা সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে গোয়ালপাড়া, কামরূপ বা শিবসাগরের কথ্য ভাষা মিলবে না। কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলায় এমনকি কলকাতার কথ্য ভাষাটাই সামগ্রিকভাবে বঙ্গসাহিত্যের স্বীকৃত ভাষা নয়—যেমন নয় উজনী অসমীয়া (শিবসাগর অঞ্চলের কথ্য ভাষা) সামগ্রিকভাবে অসমীয়া সাহিত্যের ভাষা। হিন্দির

উপভাষা মূল হিন্দিতে মিশে গেলে যদি আপত্তি ওঠে তাহলে তো এই পশ্চিম বাংলাতেই অন্তত ছয়টি উপভাষাকে ভাষার মর্যাদা দিতে হয়। ভট্টাচার্য মহাশয় কি তাই চান ? জলপাইগুড়ির বাহে উপভাষা যাঁরা বলেন তাঁরা যদি নিজেদের বাঙালী বলেন ও তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা বলে মানেন তাহলে কি এটা বলা ঠিক হবে যে বাংলা ভাষা জোর করে ওঁদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে কোন যুক্তিতে এ সিদ্ধান্ত করতে হবে যে আওধী, মাগধী, সুরগুজিয়া, মালবি যাঁরা বলেন তাঁদের মূল মাতৃভাষা হিসেবে 'হিন্দি'কে নির্দেশ করলে সেটা হল জোর করে হিন্দি চাপানো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে ভট্টাচার্য মহাশয় মারাত্মক একটি ভুল করেছেন। তিনি লিখেছেন—'অসমের কথা আর বলে কাজ নেই সেখানে অন্য রাজ্যের লোক চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে গেলে তাকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।' ভাষার নিবন্ধে হঠাৎ এরকম মন্তব্য কেন ? তারপরই তিনি লিখছেন—'অসমীয়া দেড়শ বছর আগে বাংলার উপভাষা ছিল।' এ মন্তব্য পড়ার পর রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় বাংলা বা অসমীয়া ভাষা বা সাহিত্যের ইতিহাস পড়েছেন এটা বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আলোচনা তথ্যনির্ভর হলে মূল্যবান হয়। মনগড়া কথায় বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্থাপন করা যায় কি ? অসমীয়া গদ্যসাহিত্য বাংলা গদ্যসাহিত্যেরও দুশো বছর আগে আরম্ভ হয়েছে। ভাষাবিদ প্রয়াত অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখাগুলো অন্তত মন দিয়ে পড়া উচিত ছিল—তাহলে ভট্টাচার্য মহাশয় এরকম ভ্রান্তিমূলক মন্তব্য করতেন না। এটা অনস্বীকার্য যে সাম্প্রতিক অসমীয়া বাংলা ভাষা নিয়ে যে নিষ্ফল মাতামাতি চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হবেন সমগ্র অসমীয়াভাষী মানুষ, এবং অবিশ্বাস, অসাম্য ও তিক্ততাই শুধু তাতে বাড়বে। লক্ষণীয় বাংলা ভাষা বা সাহিত্য ইতিহাসের কোন তথ্যসূত্র ভট্টাচার্য মহাশয় তার প্রদত্ত তালিকায় রাখেননি।

বিনয়েন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

কলকাতা-২৭

॥ ২ ॥

১২ সেপ্টেম্বর, 'বাংলা ভাষা' সংক্রান্ত সংখ্যার জন্য ধন্যবাদ। বাংলা ভাষা (ও সেইসঙ্গে বাংলা ভাষাভাষীদের) অবলোপনের জন্য যে উদ্যোগ চলছে সেই প্রেক্ষাপটে 'দেশ'-এর এই সংখ্যাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর 'ঘরে বাইরে আক্রমণ : বাংলাভাষা' নামক প্রবন্ধে এই ব্যাপারে অনেক তথ্য তুলে ধরেছেন। তাঁকে সাধুবাদ জানাই। এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। ১৯৫৫ সালে ভারত সরকার সংবিধানের ৩৪৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রতিও সরকারি চাকরীর ক্ষেত্রে অহিন্দীভাষী এলাকার জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত দাবী ও স্বার্থের প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য রেখে কী ভাবে এবং কতদূর সরকারী কাজে হিন্দী প্রয়োগ করা যায় তার সুপারিশ করবার জন্য' একটি কমিশন বসান। এর সদস্য হিসাবে এমন লোকদের নেওয়া হয় যাঁরা হিন্দীপ্রেমী বলে পরিচিত ছিলেন। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও একজন সদস্য নির্বাচিত হন। সুনীতিবাবু তাঁর হিন্দীপ্রেমের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি যে শুধু বাংলাদেশে হিন্দী প্রচার সমিতির সভাপতি ছিলেন তাই না, বাংলাদেশে তাঁর হিন্দী প্রচারের উৎসাহ এত প্রবল ছিল যে মোহিতলাল মজুমদার তাঁকে বাংলাদেশে হিন্দীর 'অম্বাসোদর' (Ambassador) নামে আখ্যাত করেছিলেন। এ হেন সুনীতিকুমার এই কমিশনের সদস্য হিসাবে থাকবার সুবাদে পর্দার অন্তরালে কীভাবে বাংলা তথা সমস্ত অহিন্দীভাষাকে শেষ করে দেবার ষড়যন্ত্র চলছে তা দেখেন। কমিশনের রিপোর্টে তিনি তাঁর অভিমত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। কমিশনের সভাপতি শ্রী বি জি খের তাঁকে তাঁর মত প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। একথা শ্রী খের ঐ রিপোর্টেই উল্লেখ করেছেন।

আচার্য সুনীতিকুমার বলেন যে, "এই (কমিশনের) সুপারিশগুলি কার্যকর হওয়ামাত্র ভারতে দু শ্রেণীর নাগরিক সৃষ্টি হবে। প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হবেন হিন্দীভাষীরা। তাঁরা তাঁদের ভাষার জন্যই হবেন উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর শ্রেণী। আর শুধু ভাষার জন্যই অহিন্দীভাষীরা হবেন নিম্নতর ও মূল্যহীন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। ফলে অহিন্দীভাষীরা চিরকালই হিন্দীভাষীদের কাছে অসহায় ক্রীতদাস হয়ে থাকবেন। আমি জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও চিন্তা ছাড়া কোন কথা বলিনে। প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত অহিন্দীভাষাগুলি নিজ নিজ প্রদেশে পর্যন্ত মূল্যহীন হয়ে পড়বে।" তিনি আরও বলেন, "সংবিধানের পবিত্র বিধানের নামে এইভাবে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের সূচনা আজ দেখতে পাচ্ছি। এটি হবে সম্পূর্ণ জাতি স্বার্থ বিরোধী। এইসব 'অলংঘনীয়' বিধানের ফলে শেষ পর্যন্ত ভারতে কতকগুলি ভাষাভিত্তিক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে।"

আচার্য সুনীতিকুমার মানসচক্ষে যা দেখেছিলেন তারই প্রথম অংশের পরিণত রূপের উল্লেখ রত্নেশ্বর বাবু করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ।

গোলাম মুরশিদ একটি আকর্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশরা এদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থে—এই কথাটি তাঁর উল্লিখিত বিষয় থেকে আর একবার প্রমাণিত হল। এ ব্যাপারে আরও ব্যাপক আলোচনা চাই। এগুলির অনুবাদে এদেশীয় ব্যক্তিদের হাত কতদূর ছিল তাও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

পূর্ণেন্দুনাথ নাথ

শান্তিপুর

বাগেশ্বরী বক্তৃতা

বছরের শুরু থেকে 'দেশ' পত্রিকা অনন্যসাধারণ ভাস্কর রামকিঙ্করের জীবনীমূলক উপন্যাস 'দেখি নাই ফিরে' প্রকাশ করতে আরম্ভ করায় অনেকেরই নজর কেড়েছে, কেননা এর লেখক আর এক অ-সাধারণ গদ্যশিল্পী সমরেশ বসু। আমিও প্রথম থেকেই একজন আগ্রহী পাঠক। কিন্তু ২২ আগস্ট '৮৭ তারিখের সংখ্যায় ২৫ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে লেখক এক জায়গায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় শিল্পের ওপর বক্তৃতার নাম হিসেবে প্রভাতমোহনের উক্তিতে ঐ বক্তৃতাকে বলেছেন—"বাগীশ্বরী বক্তৃতা"। কথাটি ভুল ; ওটি হবে "বাগেশ্বরী বক্তৃতা।" বাক্+ঈশ্বরী=বাগীশ্বরী হলেও যেহেতু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি করতে রাণী বাগেশ্বরীর (ব্যাকরণগত ভুল হলেও ঐ নামই ছিল তাঁর) নামে অর্থদান করা হয়েছিল সে কারণে ঐ বক্তৃতাগুলো 'বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা' নামে চিহ্নিত। আর তাই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইখানির নামও "বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী" (১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত)।

ঐ বইয়ের ভূমিকায় দেখি—"স্যার আশুতোষের প্রযত্নে ও খয়রার কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহের বদান্যতায় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পাঁচটি নূতন অধ্যাপক-পদের সৃষ্টি হয় ভারতীয় শিল্পকলা অধ্যাপনা সম্পর্কে 'রাণী বাগেশ্বরী অধ্যাপক'-পদ তন্মধ্যে একটি।" ঐখানে আরও লেখা আছে যে স্যার আশুতোষ এ বিষয়ে যোগ্য লোক হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই বেছে নিয়েছিলেন এবং "১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি প্রায় ত্রিশটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।" ডঃ স্টেলা ক্রামরিশ সম্পর্কে প্রভাতমোহনের উক্তি—"উনি এসেছিলেন উনিশ শো বাইশের নভেম্বরে।" অতএব মনে হতেই পারে যে ডঃ ক্রামরিশকে বোধ করি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং সেজন্যেই প্রভাতমোহনের উক্তি— "বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ গুণিজনদের ঐ বক্তৃতা করতে আমন্ত্রণ জানায়। আমি নিজেও ডঃ ক্রামরিশের বক্তৃতা শুনতে গেছি..."।

কিন্তু যতদূর জানা যায় ১৯২১ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত বাগেশ্বরী বক্তৃতা একমাত্র অবনীন্দ্রনাথই দিয়েছেন ; তাতে অনেক গুণীব্যক্তি আমন্ত্রিত হতেন বটে তবে শ্রোতা হিসেবে। লেখকসৃষ্ট চরিত্র প্রভাতমোহনের শান্তিনিকেতনে আসা প্রসঙ্গে উক্তি—"আমি এসেছিলাম শীতের ছুটির পরে। উনিশ শো তেইশে।" তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায়—১৯২২-এর নভেম্বর থেকে ১৯২৩-এর ফেব্রুয়ারী বা মার্চের মাঝে কোনো এক সময় ডঃ ক্রামরিশ হয়তো কোথাও বক্তৃতা দিয়ে থাকবেন এবং প্রভাতমোহন হয়তো তা শুনেওছেন। কিন্তু তা কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আহূত 'বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা'র অন্তর্গত কোনও বক্তৃতা ? এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানতেই এই চিঠি।

অমরেশ বিশ্বাস

রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়

আসানসোল

সংশোধন

'দেশ' ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সংখ্যায় 'ঘরে বাইরে আক্রমণ : বাংলাভাষা' শীর্ষক নিবন্ধে তিনটি সংখ্যা আমার ভুল লেখা হয়ে গেছে। ৪৬ পৃষ্ঠার প্রথম কলামের তলায় হিন্দুদের অনুপাত হবে ৮২·৭ ভাগ। ৮৭·৭ ভাগ নয়। শিখ হবে ১·৯, ১·৬ নয়। হিন্দুদের আনুপাতিক প্রধান্যের সংখ্যাটি হবে সাত। এগারো নয়। এই সমস্ত হিসেব ১৯৭১ সালের।

রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য

কলকাতা-৭০০০৫০

তেলতর্পণ

কিছুদিন আগেই আগ বাড়িয়ে সরকার সরষের তেলের দর বেঁধে দিয়েছিলেন পঁচিশ টাকা কেজিতে। এ ব্যাপারে সরকারী এলেম অতুলনীয়। সরকারের দুটি বাঁধনের খুব খ্যাতি আছে। এক লালফিতের বাঁধন, অন্যটি দ্রব্য মূল্যের। সাপে কামড়ানো মানুষের পায়ে তাগা বাঁধার মতই এই বন্ধন একেবারে পাকা, বিষ নামুক না নামুক, বাঁধন আর নামে না। ফলে দেখা যায়, প্রাকৃতিক নিয়মে ভোগ্যপণ্যের বাজার এক দিন নরম হয় কিন্তু বাজার দর আর নামে না। কারণ সেটি সরকারী অভয়মুদ্রায় বাঁধা। কিন্তু এই মওকায় কালোবাজারের মদত জুটে যায়। বিপণ্য বাজারে বিপন্ন ক্রেতা দিশেহারার মত ছুটে বেড়ায় 'ভাও' ভালাইয়ের অবকাশ পায় না। নায্য মূল্যের বর্ডার পেরিয়ে ধাঁধাগ্রস্ত মানুষ দু তিন গুণ বেশী দামের কাছে নতি স্বীকার করে।

এবারেও সেই একই প্রহসন সরকারী ঢক্কা নিনাদে অনুষ্ঠিত হল। এবার সরকারী ঢাকে কাঠি পড়েছিল পুজোর মাস খানেক আগেই। কিন্তু সেটা যে আসলে বিসর্জনের বাজনা তা টের পেতে দেরি হয়নি ভুক্তভোগী মানুষের। বাঙালীর কপালে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণই আশ্বাস। অন্য বাণী শোনা যায় দম ফুরোনোর পরে। স্বয়ং চেয়ারম্যান আর খাদ্যমন্ত্রী জোড় গলায় আশ্বাস দিয়েছিলেন, এবার পুজোয় মাভৈঃ। অন্তত তেল চিনি ময়দার অকুলান হবে না কোন মতেই। ব্যবসায়ীদের খেয়ালখুশি সরকার বরদাস্ত করবেন না কখনই। মজুতদারি কালোবাজারি তাঁরা ঠাণ্ডা করে দেবেন কঠোর হাতে। পশ্চিমবঙ্গ তো আর কানুনছুট মগের মুলুক নয়। পুলিশ তৈরি, প্রয়োজন হলে দাওয়াই হিসেবে ক্যাডাররা নামবে। কিন্তু এই বজ্র আঁটুনির মধ্যে কোথায় ফসকা গেরো ছিল কে জানে। এই বাংলায় নেতা থেকে আমলা ইস্তক সকলেই আজন্ম বাকসিদ্ধ। কিন্তু যা ঘটার তাই ঘটলো, মাথায় খুন চড়ার মত সরষের তেলের দাম তিরিশের কোঠা ছাড়ালো। সরোজবাবু নির্মলবাবু জ্যোতিবাবু নিশ্চুপ, না নিশ্চুপ না, সরোজবাবু জনগণকে রেপসিড খেতে বিধান দিলেন। তাঁদের হিসেব মত রেশন শপগুলো রেপসিড তেলে ভেসে যাবার কথা কিন্তু পুজোর দিন পনের আগে থেকেই রেশন শপ প্রায় নিস্তেল, শুধু কথার সলতে পাকানোই সার হল। পুলিশ নিশ্চুপ, ক্যাডার নিষ্ক্রিয়, ব্যবসায়ীরা বেপরোয়া। অধিকন্তু সরষের তেল বাজার থেকে সগৌরবে উধাও হয়ে গেল।

এটাই ঘটনা। কারো কারো মতে রটনা। কারণ রিপোর্টের সঙ্গে রটনার কোন মিল নেই। লক্ষ্মীপুজোর পর দিনও নাকি রেশনিং দপ্তর যে রিপোর্ট পেয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকায় রেপসিড তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে এবং পুজোর আগেও তা বলাবাহুল্য স্বাভাবিক ছিল। যে কোনো পদস্থ অফিসারের সঙ্গে অপদস্থ মধ্যবিত্তের এইখানেই তফাত। তাঁরা রেশন কার্ডধারী নাগরিক একথা অবিশ্বাস করতে সাহস হয় না কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা মেলে না। এগার টাকা ষাট পয়সা বাঁধা দরের সরকারী রেপসিড তেল যে খোলা বাজারের খেমটা রীতিতে ২০/২৪ টাকা দরে বিক্রী হচ্ছে এ রিপোর্ট তাঁদের কোথাও নেই। এনফোর্সমেন্ট বিভাগ থেকেও এমন কোন রিপোর্ট নেই। স্বয়ং নির্মলবাবুও এমন কোন খবর শোনেননি যাতে বিচলিত হতে হয়। ফলে কাগুজে হল্লাকে তাঁরা কেউই আমল দিতে প্রস্তুত নন।

সুতরাং কোন সর্ষে ভূত তাড়ানো আর কোন সর্ষের মধ্যে স্বয়ং ভূতের অধিষ্ঠান সেকথা এখন আর কেউ জানে না। তবে একটা কথা সুনিশ্চিত যে চোখে সর্ষে ফুল দেখার সৌভাগ্যও মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘুচে আসছে ক্রমশ। খাঁটি সর্ষে ফুল এখন প্রায় দিবাস্বপ্নের শামিল। ভোজন বিলাসী বলে বাঙালীর একদিন খুব নাম ছিল। সেটা সুনাম কি দুর্নাম ঠিক জানি না। তবে খাদ্যই যে তার চিরকালের স্বপ্ন এবং সমস্যা এক সঙ্গে সে-কথা অনস্বীকার্য। ভেতো বাঙালীর এক আদি পুরুষ অন্নপূর্ণার কাছে একটিই বর প্রার্থনা করেছিল : আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে। নৌকো কূলে ভিড়লে বরদাত্রী নেমে চলে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর আশীর্বচন এই শতাব্দীর আশীর দশকের শেষে এসেও ফলেনি। দুধে ভাতে দূরে থাকুক, মাছে ভাতেও বাঙালীর ছেলের আর ক্ষুন্নিবৃত্তি মেটেনি। নুন আনতেই তার পান্তা ফুরিয়ে গেছে চিরকাল। তারপর রাজা বদল হয়েছে, জমানা বদলেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। সেই স্বাধীনতায়ও চালশে ধরেছে। কাগজে কলমে যাইহোক দেশে খাদ্যাভাব রয়েছে। কিন্তু খাদ্যাভাব থাকলেও বাঙালীর খোরাকের অভাব ঘটেনি। বাঙালীর চারপাশে এখন এতই হাসির খোরাক যে হাসতে হাসতে তার বুঝি খুন হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। এক পয়সার তৈল কিসে খরচ হৈল এই হাসির প্রশ্নে আর যেতে চাই না।

বাড়ন্ত
ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান
একমাত্র কমপ্লান-এ আছে
২৩টি একান্ত প্রয়োজনীয়
খাদ্যগুণ যা ওদের শরীরের
পক্ষে দরকার—প্রতিদিন !
সাধারণত ১৫/১৬ বছর পর্যন্তই ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠার বয়েস।
প্রোটিন হোল এমন এক পুষ্টিকর উপাদান, যা বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের দৈহিক গঠনে সরাসরি কাজ দেয়। তাই এখন থেকে আপনার ছেলেমেয়েদের জন্যেও চাই কমপ্লান। কমপ্লান-এ আছে সেরা প্রোটিন অর্থাৎ দুধের প্রোটিন (২০%)। এছাড়া আছে আরো ২২ রকমের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ।
রকমারি মুখরোচক স্বাদগন্ধে পাওয়া যাচ্ছে এই কমপ্লান।
23
সুপরিকল্পিত মাত্রায়,
২৩টি একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ
ক্যালসিয়াম
সোডিয়াম
পাইরিডক্সিন (বি৬)
ক্লোরাইড
ভিটামিন বি১২
(সি এল রূপে)
ফলিক অ্যাসিড
পটাসিয়াম
ভিটামিন সি
ভিটামিন ডি
আয়োডিন
ভিটামিন ই
ভিটামিন এ
ভিটামিন কে
ভিটামিন বি১
দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।
Complan
কমপ্লান® -সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

বৈ দে শি কী

ফের বাঘের গর্জন, আবার রাবুকা

অরুণ বাগচী

পুজোর মুখে পর পর দু-দুটো পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে এবং উভয় ক্ষেত্রেই ফলাফল গুরুতর হতে পারে। প্রথমটা হল শ্রীলঙ্কার তামিল টাইগারদের নিয়ে সমস্যা। দ্বিতীয়টি দূর ফিজি দ্বীপে আর এক দফা সামরিক অভ্যুত্থান। এই দুই বিষয়েই ভারত কমবেশী জড়িত, আর ঘটনাচক্র এমন যে ভারতকে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতেই হবে। যদি না অবশ্য এর মধ্যে আচমকা ভাল কিছু ঘটে যায়।

গত সপ্তাহে দারুণ এক কার্টুন ছেপেছে টাইমস পত্রিকা। সমুদ্রের ধারে খেজুর গাছের নিচে আরাম কেদারায় নিশ্চিন্ত মনে বসে আছেন প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে। এক গাল হাসি হেসে বলছেন, 'রাজীবের ওপর আমার ভরসা আছে, ও ঠিক পারবে।' ওদিকে বেচারা রাজীব দড়িবাঁধা বিরাট এক বাক্সের ওপর চড়ে ঘামছেন। বাক্সের ভিতরে বিবিধ তামিল গোষ্ঠীকে পুরে দেওয়া হয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড মারপিট লাগিয়ে দিয়েছে এবং বাক্স ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছে। বাক্সের গায়ে লেখা, শ্রীলঙ্কা চুক্তি। কী বলতে চান কার্টুনিস্ট, তা অবশ্য খুবই স্পষ্ট। রাজীব তামিল গেরিলাদের সামাল দিতে পারছেন না, হিমসিম খাচ্ছেন তাদের শৃঙ্খলার ভিতর আনতে। আর নিজের দায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ওপর চাপিয়ে মহানন্দে আছেন শ্রীলঙ্কার ধূর্ত প্রেসিডেন্ট।

সবাই জানেন, কার্টুন আঁকিয়েদের বেলা অতিরঞ্জনই আর্ট। ওটা না করলে রঙ্গব্যঙ্গ কিছুতেই জমবে না। আমাদের লকসমন, কুট্টি, আবু বা সুধীর দার, সবাই ওই কাজটি অল্পবিস্তর করে থাকেন। কাজেই রাজীব বা জয়বর্ধনে সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করা হচ্ছে তা যদিও সর্বাংশে সত্য নয়, তবে সত্যের অস্থিমজ্জা তাতে আছে। ওটুকু স্বীকার করে নিয়ে জিজ্ঞেস করা চলে যে অত নিশ্চিন্ত কি জয়বর্ধনে সত্যি হতে পারেন? যদি শ্রীলঙ্কা চুক্তি ব্যর্থ হয়ে যায় তা হলে জয়বর্ধনের রাজনৈতিক ক্ষমতাও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাবে না কি? মন্ত্রিসভায় তাঁর প্রতিপক্ষরা ছেড়ে কথা বলবে? তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা কি এই সুযোগে সরকার উলটে দেবার চেষ্টা করবে না? তাদের জয়বর্ধনে ঠেকাবেন কোন যুক্তিতর্ক দিয়ে? না—শ্রীলঙ্কা চুক্তির ব্যর্থতা তিনি চাইতে পারেন না। হাজার হলেও রাজীব যদি বা দরকারমত হাত গুটিয়ে নিতে পারেন, জয়বর্ধনে তা কখনও পারবেন না। কারণ সমস্যাটা মূলত তাঁর দেশের এবং তাঁর সরকারের সমস্যা। রাজীব গান্ধীও অবশ্যই বিপদে পড়বেন। একেই তো তাঁর চুক্তি-প্রিয়তা নিয়ে বিস্তর হাসি ঠাট্টা হয়ে থাকে। তড়িঘড়ি চুক্তি করতে গিয়ে তিনি নিজের দলকেই ক্ষেত্রবিশেষে—যেমন আসামে বা মিজোরামে—ডুবিয়েছেন। তবে পঞ্জাব চুক্তিকে ওই পর্যায়ে ফেলা চলে না, শ্রীলঙ্কা চুক্তিকেও না। পঞ্জাব চুক্তি যে ঠিকমত লাগু হতে পারেনি এ জন্য যথেষ্ট খেসারত দিতে হচ্ছে ভারত সরকারকে, দেশের মানুষকে। শ্রীলঙ্কা চুক্তি ব্যর্থ হলে আন্তর্জাতিক দরবারে ভারতও বেশ অস্বস্তিতে পড়ে যাবে।

সংবাদ পড়ে মনে হতে পারে যে শ্রীলঙ্কায় তামিল পরিস্থিতির অবনতির জন্য মুখ্যত এল টি টিই বা তামিল টাইগারই দায়ী। তারা কিছুতেই গোষ্ঠীর সেই অংশটাকে বাগ মানাতে পারছে না যা তামিলদের স্বাধীনতা, বা তামিলদের জন্য আলাদা রাজ্য না আদায় করে হিংসার আন্দোলন থামাতে রাজী নয়। শুধু তাই নয়, তারা প্রস্তাবিত রাজ্যে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীকে থাকতে দিতেই প্রস্তুত নয়। উদারপন্থী তামিল সংস্থাকে অপদস্থ করে তারা এখন অন্যান্য চরমপন্থীদের পিছনে লেগেছে। সেই সঙ্গে ওই নেতৃত্বের একটা অংশ আবার প্রতিবাদমূলক অনশন ইত্যাদি শুরু করেছে যা বস্তুত অহিংস আন্দোলনের অঙ্গীভূত। অনশনে প্রাণ দিয়েছেন বিশিষ্ট তামিল টাইগার নেতা রসাইয়া পার্থিপণ (বা অমৃতলিঙ্গম থিলিপণ), এমন এক বেদনাদায়ক মৃত্যু যা পরিহার করা উচিত ছিল, সম্ভবও ছিল। শ্রীলঙ্কাস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জে এন দীক্ষিত, যিনি শ্রীলঙ্কা চুক্তির পিছনে ছিলেন সবচেয়ে বড় শক্তি, তিনি এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছেন, যাতে তামিল গেরিলাদের সমস্যা দ্রুত এবং সন্তোষজনকভাবে মিটে যায়। যে পাঁচ দফা দাবি আদায়ের জন্য পার্থিপণ (বা থিলিপণ) জীবন বিসর্জন দিলেন সেই দাবিগুলি নতুন কিছু নয়। সেগুলি আদায় করা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। চেষ্টার অসাধ্যও নয়। তা ছাড়া শ্রীলঙ্কা চুক্তিকে সফল হবার সুযোগ না দিয়ে এই মুহূর্তে ফের গণ্ডগোল বাধাতে যাওয়া শুধু অনৈতিক নয়,

অবিবেচনাপ্রসূতও বটে। মনে হতে পারে যে এল টি টি ই নেতৃত্ব যথেষ্ট পরিমাণে নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি বা দক্ষতার উপর আস্থা স্থাপন করতে পারছে না। তারা প্রতিপক্ষকে বন্ধু এবং সহযোগী বানাতে পারবে এই ভরসা রাখে না। তারা তাদের একেবারে খতম করে ফেলতে চায়। দেশের অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ—যেমন খ্রীষ্টান বা মুসলমান—তাদের সঙ্গেও বিশ্বাসের সম্পর্ক পাতাতে চায় না। ভাবা সম্ভব, ওই সুসম্পর্ক তামিল টাইগারদের পছন্দসই নয়। অথবা এ কথাও ভাবা যেতে পারে যে আড়াল থেকে কেউ তাদের উস্কে দিচ্ছে, এমন কেউ যার ইচ্ছে নয় তামিল সমস্যা মিটে যাক এবং ভারত ও শ্রীলঙ্কা উভয়েই নিশ্চিন্ত বোধ করুক। কোনও তৃতীয় বিদেশী শক্তি? শান্তিরক্ষার জন্য নিযুক্ত ভারতীয় বাহিনীকে অপদস্থ করে তামিলদের স্বার্থ কীভাবে রক্ষিত হবে? ভারত সরকারের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার তামিল উগ্রবাদীরা কি লড়তে চায়?

আবার রাবুকা

১৪মে তারিখের আগে সিতিভেনি রাবুকার নাম ফিজির বাইরে কেউই জানত না, দেশের ভিতরেও কজন জানত তা জোর করে বলা শক্ত। কিন্তু ওদিন এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাবুকা আন্তর্জাতিক নাম হয়ে গেলেন। ভারতীয় বংশোদ্ভব ডঃ টিমোসি বাভাদ্রার নেতৃত্বাধীন সরকারের পতন ঘটালেন রাবুকা। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের শান্তি সেদিন যেভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল সেটা সামাল দেওয়াই কষ্টসাধ্য ছিল। পাঁচ মাসের মধ্যে আবার রাবুকা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে তিনি দমে যাবার পাত্র নন। যা একবার করা যায় তা দ্বিতীয় দফাতেও করা সম্ভব। সহজ কথায় ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, যাকে আমরা বলি সংসদীয় গণতন্ত্র সেটা ফিজি দ্বীপপুঞ্জে আর কখনও সেভাবে ফিরবে কি না সন্দেহ। সেখানকার সামরিক বাহিনী, সংখ্যা তাদের যত কমই হোক, তারা ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে গেছে। তাদের আর বাইরে রাখা শক্ত হবে।

সৈন্যরা নিশ্চয় ক্ষমতালিপ্সু, কিন্তু সেটাই সব কথা নয়। ফিজিতে যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আমরা দেখছি, তা মূলত মেলানেশীয় স্বার্থের সঙ্গে বহিরাগত ভারতীয় বংশোদ্ভবদের স্বার্থের সংঘাত। এই ভারতীয়রাই দীর্ঘকাল ধরে দেশের অর্থনীতি কার্যত নিয়ন্ত্রিত করছে। এতে আদি বাসিন্দারা আদৌ খুশী নয়। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের কূট পদ্ধতি তারা আজও আয়ত্ত করে উঠতে পারেনি। ওই ব্যাপারে মাথা গলাতে যাওয়া মানে ভারতীয়দের চটানো এবং আর্থিক পরিস্থিতিকে জটিলতার মধ্যে ঠেলে দেওয়া। সেই ঝুঁকি ফিজির রাজনীতিকরা নিতে চাননি। কিন্তু ইতিমধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতাও ভারতীয়দের হাতে চলে যেতে পারে এই আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় ফিজিবাসীরা বিচলিত হয়ে পড়েছে। বিশেষত ১৭ বছর আগে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হবার পর যে রাতুস্যার কামিসেসে মারা এতদিন ধরে দাপটের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশ শাসন করে চলছিলেন, গত নির্বাচনে তাঁকে পরাস্ত করে দেন ভারতীয় বংশোদ্ভব ডঃ টিমোসি বাভাদ্রা। যেহেতু তাঁর দলেরই সংখ্যাধিক্য ছিল সেহেতু ডঃ বাভাদ্রাই নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন, যে মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যই ছিলেন তাঁর মতোই আদিতে ভারতীয়। এতে ফিজী স্বার্থের প্রবক্তারা বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁরা বলতে থাকেন যে প্রচলিত সংবিধান মোতাবেক যদি নির্বাচন হয় তবে ভারতীয়রাই তো চিরকাল দেশ শাসন করে যাবে। কারণ তাদেরই তো সংখ্যাধিক্য। গত আদমশুমারি অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৪৮·৬ ভাগ হল মূলত ভারতীয় আর ৪৬·২ ভাগ হল ফিজী। ফারাক অবশ্য এতই কম যে ভোটযুদ্ধে এটা সর্বদা বড় ব্যাপার হতে পারে না। কিন্তু জাতিগতভাবে বেশী সুবিধা যে ভারতীয়রাই ভোগ করবে, ভোটযুদ্ধে এবং ভবিষ্যৎ প্রশাসনে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেশে একটি উগ্রবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে যার নাম তুকাই। এরা বলতে শুরু করে যে ভারতীয়রা আমাদের রক্ত শুষে খাচ্ছে, এদের মেরে ধরে যে উপায়ে পার দেশ থেকে তাড়াও, এরা নির্বাসিত না হলে ফিজি রসাতলে যাবে—ইত্যাদি। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের যারা আসল বাসিন্দা, ফিজি কেবলমাত্র তাদেরই জন্য (ফিজি ফর দ্য ফিজিয়ানস), এই হল তাদের স্লোগান। এই উগ্রবাদীরা নানাভাবে ভারতীয়দের উত্যক্ত করতে শুরু করে। তাদের সম্পত্তি ধ্বংস করা, মারধর, ভীতিপ্রদর্শন, এমন কি গুপ্তহত্যাও ঘটতে থাকে। এই তুকাইদের নাড়া স্বকণ্ঠে নিয়ে কর্নেল রাবুকা, যিনি যাজক থেকে সেনাপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ, নির্বাচিত বাভাদ্রা সরকারের পতন ঘটিয়ে দিলেন।

এই পর্বে রাবুকাকে সংযত করা সম্ভব ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তার উপযুক্ত ভূমিকা সেদিন পালন করেনি। গভর্নর জেনারেল স্যার পেনাইয়া গানিলাউ চেষ্টা করে আটক বাভাদ্রাকে মুক্ত করে দেন, তাঁর ব্রিটেনে যাবার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু ইংল্যান্ডে গিয়েও সুবিধা করতে পারেননি পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ডঃ বাভাদ্রা। রানী এলিজাবেথ তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি (নিশ্চয়ই ব্রিটিশ সরকারের পরামর্শে!), রানীর সচিবের সঙ্গে কথা বলেই বাভাদ্রাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সংবিধানসম্মত, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত, নির্বাচিত এক সরকারের পতনের অর্থ কী দাঁড়াতে পারে তা কারুরই না বোঝার কথা নয়। কিন্তু সেদিন সবাই নির্বাক দর্শক সেজে থেকেছে। যখন পাঁচ মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার ক্যু করলেন রাবুকা তখন ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়ল। স্বয়ং রানী পত্র দিলেন গভর্নর জেনারেল স্যার পেনাইয়া গানিলাউকে। রাবুকার প্রতি কোনও সমর্থন তাতে নেই। ব্রিটিশ সরকার এবং দুই প্রধান রাজনৈতিক দল এ ব্যাপারে যে মনোভাব নিয়েছে তাও পুরো সমর্থনযোগ্য নয়। যাই হোক, সে কথায় পরে আসছি। রাবুকা যে কাণ্ডটি করেছেন তার কুফল কী হতে পারে সে সম্বন্ধে ব্রিটেনের যে সঠিক আন্দাজ আছে তা কিন্তু মনে হয় না।

রাবুকা কী করেছেন? তুকাই আন্দোলনকারীদের চাপে পড়েই হোক আর নিজস্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে গিয়েই হোক, রাবুকা ফিজি দ্বীপপুঞ্জের জাতিগত সমঝোতা নষ্ট করেছেন। নষ্ট করেছেন গণতান্ত্রিক চর্চার অবকাশ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। কিছু টালবাহানার পর তিনি দেশের সংবিধান রদ করে দিয়েছেন এবং ভারতীয়দের সর্বরকম নাগরিক অধিকার হরণ করে নিয়েছেন। এক হুকুমে ভারতীয়রা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে গেল। যেহেতু ব্রিটিশ সরকার তাঁর কড়া দাওয়াই পছন্দ করছে না সেহেতু রাবুকা নিজেকেই 'রাষ্ট্রপ্রধান' ঘোষণা করে দিয়েছেন—রানীও বাদ, রানীর প্রতিনিধি গভর্নর জেনারেলও বাদ। রাবুকা প্রথমটা ভেবেছিলেন যে কামিসেসে মারা প্রভৃতি ফিজি রাজনীতিকদের ইচ্ছেমত পরিচালনা করে ভারতীয়দের খর্ব করে দেওয়া যাবে। এখন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের বর্জন করে নিজেই নিজের নীতি প্রয়োগ করার কাজে লেগে গেলেন। আসলে রাবুকা ভয় পেয়েছিলেন যে ভারতীয়দের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক সমঝোতা করবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন স্যার কামিসেসে মারা। গভর্নর জেনারেল গানিলাউ ব্যবস্থাও করে ফেলেছিলেন যে ডঃ বাভাদ্রা এবং স্যার কামিসিসের নেতৃত্বে এক মিশ্র সরকার দেশের শাসনভার পরিচালনা করবে। যেদিন টিভিতে ওই সংবাদ ঘোষিত হবার কথা সেদিনই কর্নেল রাবুকার দ্বিতীয় অভ্যুত্থানের খবর প্রচারিত হল। স্যার পেনাইয়া গানিলাউ-এর পরিবর্তে টিভির পর্দায় আত্মপ্রকাশ করলেন লেঃ কর্নেল রাবুকা। দেশের সুপ্রিম কোর্ট রাবুকার কর্তৃত্ব মানতে আপাতত গররাজি। ফলে দুই বিচারপতি রাবুকার আদেশে গৃহবন্দী। সংবাদপত্র প্রকাশও আপাতত বন্ধ। রাবুকা বলেছেন, সেন্সরশিপ মেনে নিতে রাজি হলে তবেই আবার ছাপার অনুমতি দেওয়া হবে, নতুবা নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক অধিকার অবলুপ্তিত হল।

গত কয়েকদিনের মধ্যে ফিজির ঘটনাচক্র এত দ্রুত এবং এত বার পরিবর্তিত হয়েছে যে ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে তা বলা শক্ত। কিন্তু ব্রিটিশ নেতাদের বিচিত্র মনোভাব দেখে খাঁটি ইংরেজ ভক্তরাও বিমূঢ় হয়ে পড়ছেন। রাবুকা রানীর কর্তৃত্ব এবং গভর্নর জেনারেল অর্থাৎ রাজকীয় প্রতিনিধির কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ করছেন বলে ব্রিটিশ সরকারের মুখে তাঁর সমালোচনা শোনা গেল। অথচ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় বংশোদ্ভবরা যে তাদের নাগরিক অধিকার সহ সব কিছু হারাতে বসেছে সে জন্য কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। ফিজিতে ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় যায়নি। একদা তাদের পূর্বপুরুষদের জোর করে আখের ক্ষেতে কাজ করাবার জন্য ধরে নিয়ে গিয়েছিল তদানীন্তন ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ, ব্রিটিশ সরকারেরই অনুমোদনক্রমে। আজকে সেই লোকগুলিরই উত্তরসূরীরা মরল কি বাঁচল তা নিয়ে ব্রিটেনের, ব্রিটেনের টোরী বা শ্রমিক নেতাদের কিছুমাত্র উদ্বেগ নেই। এটা যে মানবিক অধিকার হরণের সামিল হচ্ছে, সেই কথাটাও তাদের নজরে আসছে না। ব্রিটেনের কাছে এটা কেউ আশা করে না। প্রজ্ঞ

মেঘলা দিন—লেক ডিস্ট্রিক্‌স

অঙ্কন : পরিতোষ সেন
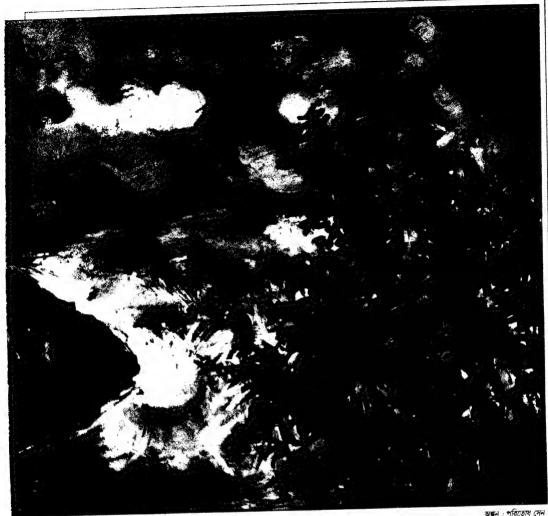
১৯৫০-এর ২৪শে জানুয়ারি। বেলজিয়মের রাজধানী ব্রাসেলস শহরে। এক অদ্ভুত পাকেচক্রে। সেখানকার ভারতীয় দূতাবাসের আওতায় আমার ছবির প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন সেই শহরের বার্গোমাস্টার (আমাদের দেশের মেয়রের তুল্য), সন্ধে সাড়ে ছ'টায়। অনেক কূটনীতিক এবং শিল্পরসিকেরা আমন্ত্রিত। Peter Scott-সংক্ষেপে "স্কটি"—নামে স্বল্প পরিচিত, অল্প বয়েসী এক মার্কিনী বন্ধু ফোন করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি প্রদর্শনীর উদ্বোধনে তাঁর এক ইংরেজ শিল্পী বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন কিনা? উত্তরে তাঁকে জানালাম, "প্লিজ্ ড্রিঙ্গ হার।"

অনেক নিমন্ত্রিতদের মধ্যে যথাসময়ে স্কটির সঙ্গে হেলেনও উপস্থিত হল। আমার একটি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "ক্যান্ আই বাই দিস পেন্টিং?" চটপট জবাব দিয়ে বললাম, "অবকোর্স ইউ ক্যান!" হেলেন বলল, "আই উইল সেন্ড দা চেক্ টুমরো।" (পাঠকদের কৌতূহল মেটাবর উদ্দেশ্যে জানিয়ে দিই, ছবিটি ছিল আমাদের দেশেরই একটি রৌদ্র-স্নাত দৃশ্যের। রাস্তার দু ধারে বটগাছের সারি তারই ভেতর দিয়ে মধ্যাহ্নের সূর্যের আলো এবং ছায়ার মায়াজাল তৈরী হয়েছে লাল জমিতে। শৈলীতে ইম্প্রেশনিস্ট ঘরানার। ছবিটির দাম ছিল ত্রিশ পাউন্ড। পরদিন স্কটির মারফত চেক্‌টি যখন আমার হাতে এল, তার ভাজ খুলে দেখি তাতে লেখা আছে, পঞ্চাশ পাউন্ড। তৎক্ষণাৎ সেটি ফেরত পাঠালাম, এবং সঙ্গে দিলাম এই মর্মে একটি দু'লাইনের চিঠিও—"হেলেন, তুমি ভুল করেছ। ছবির সঠিক দাম পঞ্চাশ নয়, ত্রিশ পাউন্ড। এই অঙ্কের একটি নতুন চেক্ পাঠিয়ে দিলে বাধিত হব।" খানিকক্ষণ পরই টেলিফোন বেজে উঠল। "হেলেন স্পিকিং! আই থট্ ইওর লাভলী পেন্টিং ওয়াজ আন্ডারপ্রাইসড্। তার ন্যূনতম দাম পঞ্চাশ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। প্লিজ অ্যাক্‌সেপ্ট্ ইট, উইল ইউ?" হায় ভগবান! পৃথিবীতে এমন পাগল লোকও আছে! কিন্তু একী ধরনের পাগলামি! না কি এ তার বদান্যতা! না কি তার বড়লোকি চাল! প্রথম সাক্ষাতে ঠিক ঠাহর করে না উঠতে পেরে আপাতত মনে মনে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, তার হৃদয় মহৎ! আমার সেদিনকার এ সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল ছিল, তার প্রমাণ পেতে আমাকে খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি।

এই ঘটনার পর হেলেনের সঙ্গে আমার আরও কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, আমাকে অপেরা এবং ব্যালে দেখাতে নিয়ে গেছে, ভালোভালো রেস্তোরাঁয় আমাকে আদর-আপ্যায়ন করেছে। ব্রাসেলস ছেড়ে ইংলন্ডে ফিরে যাবার আগে আমাকে তার ঠিকানা দিয়ে বলেছে, "উই মাস্ট্ কীপ ইন্ টাচ্ উইথ ইচ্ আদার! ইউ মাস্ট কাম টু লেইটন্ হল।"

গত চার বছর ধরে আমি প্যারিসের বাসিন্দা। চল্লিশ হাজার দেশি-বিদেশী জীবন-সংগ্রামী শিল্পীদের মধ্যে আমিও একজন। এতদিন খুব নিয়মিতভাবে না হলেও, আমাদের মধ্যে পত্রালাপ

অব্যাহত ছিল। প্রায় প্রত্যেক চিঠিতে হেলেন আমাকে জানিয়েছে যে, তার খুব আশা এবং বাসনা যে, আমি কার্নফোর্থ গেলে তার ছবি আঁকায় শুধু এক নতুন উদ্দীপনাই সে পাবে না, আঁকায় উন্নতিলাভও নাকি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও, প্রধানত আর্থিক কারণে, তা পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। প্রতি বছরের মত এবারও, নববর্ষ উপলক্ষে হেলেন কুড়ি গিনির একটি চেক্ উপহার পাঠিয়ে লিখেছিল যে, "তোমার চিঠি অনেকদিন পাইনি। আশা করি ভালো আছ এবং খুব ছবি আঁকছ! কার্নফোর্থে কবে আসছ?" তার চেক্ এবং চিঠি যখন এল তখন আমি কিঞ্চিৎ অসুস্থ। ডাক্তারের মতে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে আমার শরীরে অল্পবিস্তর রক্তশূন্যতা দেখা দিয়েছে। তাঁর উপদেশমত হাওয়া-বদল এবং ভালো খাদ্য—এ দুয়ের যোগাযোগ হলেই অল্পদিনের মধ্যেই শরীর স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। এ জরুরী সমস্যার সমাধানের কথা না ভেবেই, নানা কথার ফাঁকে, হেলেনকে আমার বর্তমান হালের কথা জানালাম। ব্যস্! সঙ্গে সঙ্গেই টেলিগ্রাম মানি-অর্ডার এবং ছোট্ট একটি সন্দেশ এসে হাজির—"মেক্ অ্যা বী-লাইন টু লেইটন হল।" কার্নফোর্থে আসার এবং মাসাবধি থাকার পেছনে, আপাতদৃষ্টিতে, এই সংক্ষিপ্ত উপক্রমনিকা তার উদার প্রাণ এবং আমার প্রতি নিঃস্বার্থ স্নেহের অনেক অভিব্যক্তির মধ্যে আরেকটি মাত্র।

হাত মুখ ধুয়ে, জামাকাপড় বদলে যথাসময়ে নিচে নেমে এলাম। হেলেন, ড্রিংকের ট্রে সাজিয়ে, আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। "হেল্প ইওরসেল্ফ" বলে ট্রে-সমেত ট্রলিটি আমার দিকে এগিয়ে দিল। হুইস্কি, পোর্ট, শেরি, জিন-এর বোতলে নানা খানদানি ছাপের লেবেল সাঁটা। ছোট্ট গ্লাসে পোর্ট ঢেলে জি, কে, চেস্টারটনের মত বিরাট বপুর উপযোগী একটি কৌচে হেলান দিলাম। সামনে পর পর তিনটি মস্ত কাঁচের জানালা। সাদা ভেলভেটের পর্দা দুদিকে সমানভাবে সরিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। বন্ধ জানালার ওপাশে পুকুর। তাতে অজস্র সাদা লিলি ফুটে আছে। দু'পাশে ফুলের বাগান। তার ওপর দিয়ে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ভাবী শরৎকালের দিনের শেষের আলো উঁকি ঝুঁকি মারছে। এই আলোর রশ্মি নাটকীয়ভাবে একদম শিকের মত সোজা হয়ে কখনো জলে কিংবা কখনো দূরে পাহাড়ের ছোট অংশে একটি স্পট্ লাইটের মত বিকিরিত হচ্ছে। ফ্রান্সের আলোর তুলনায় এখানকার আলো কিঞ্চিৎ অনচ্ছ, আলোর সঙ্গে সাদা চকের যেন ধুলো মেশান হয়েছে। সব মিলে এদেশের শ্রেষ্ঠ ল্যান্ডস্কেপ-পেন্টার কনস্টাবল-এর আঁকা ছবির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। তিনিই তো প্রথম তাঁর আঁকা অতি সাধারণ গ্রামীণ দৃশ্যাবলীকে তুলে ধরলেন সেই উচ্চপর্যায়ের মর্যাদায়, যা এপর্যন্ত শুধুমাত্র টার্নার এবং উইলসন-এর আঁকা ঐতিহাসিক এবং ধ্রুপদী ল্যান্ডস্কেপমালাই পেয়েছিল। ইংলন্ডের বিশিষ্ট আবহাওয়া, আলো এবং মেঘের নাটকীয় খেলা, উন্মুক্ত আকাশ, তার তলায় গাছপালা জল এবং কর্মরত মানুষজন আঁকায় যে দারুণ মুনশিয়ানা তিনি দেখিয়েছেন, তার জুড়ি ইংলন্ডের চিত্রকলায় আর কজন আছে!

এমন চমৎকার একটি আমেজকক্ষের চৌকাঠে পা দিয়েছি, ঠিক তক্ষুনি হেলেন ঘোষণা করল, "লেট আস গো।" এই বলে উঠে পড়ল।

স্টেশন-ওয়াগনে চেপে লিজের বাড়ির দিকে অগ্রসর হলাম, এই গ্রামীণ অঞ্চলের রাস্তাঘাট ততোটুকুই চওড়া যাতে করে দুটিমাত্র গাড়ি পাশাপাশি যাতায়াত করতে পারে। রাস্তার দুধারে পর পর সাজানো, আল্গা টুকরো পাথরের, তিনচার

'গ্রে-হাউন্ড মীট' অঙ্কন : পরিতোষ সেন

ফুট উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের দু'ধারেই ঢাল। তাই হয়ত এই ব্যবস্থা। গাঢ় ছাই রঙের সঙ্গে ঈষৎ তামা এবং রুপোর গুঁড়ো মিশ্রিত আলোতে মাঝে মাঝে ভেড়া কিংবা বেশ হৃষ্টপুষ্ট গরুদের নিঃশব্দে তাজা ঘাস খেতে দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নির্বোধ, অবলা চতুষ্পদী জীবদের সঙ্গে কোনও মেষপালক নেই। হেলেন বলল, "এরা সারারাত চরে বেড়ায় ভোর না হতেই যার যার ঘরে ফিরে যায়। কখনও দলছাড়া কিংবা দিশেহারা হয়ে গেলে, পোষা কুকুর এসে এদের তাড়া করে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনে।"

মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে, কোথাও বা, ছোটখাটো কটেজ ধরনের বাড়িঘর চোখে পড়ে। কাগজপত্রে পড়েছি যে, ইংলন্ডে, গড়পড়তা প্রতি বর্গমাইলে, য়োরোপের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়, জনসংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু গ্রামাঞ্চল এত ফাঁকা যে এ ধারণার বিরোধিতা করে। সন্ধ্যে এবং রাত্রির সন্ধিক্ষণের স্তিমিত আলোতে দেখা যায় প্রত্যেক বাড়ির সামনেই আছে ছোটখাটো বাগান। গোলাপ, লিলি, লিহক, গ্ল্যাডিওলা, ইত্যাদি ছাড়াও বুনো গোলাপের ঝোপে ঝাড়ে অজস্র ফুলের সম্ভার। কোথাও বা আইভি এবং অন্যান্য লতায় সারা বাড়ির দেয়াল ঢাকা পড়ে বাহারে দেখাচ্ছে। চিমনি দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে চারিদিকের ছবির নৈসর্গিক দৃশ্যটিতে কিঞ্চিৎ গতিশীলতা সৃষ্টি করেছে। একটা ভেজা, ঠাণ্ডা বাতাস আসন্ন শরৎকালের জানান দিচ্ছে।

লিজের বাড়ির দিকে যেতে যেতে, হেলেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার ফাঁকে ফাঁকে আমি রাস্তার ধারের মাইল পোস্টগুলোর দিকে নজর রাখছিলাম। তাছাড়া, ঘড়ির দিকে তাকিয়েও বুঝতে পারলাম যে, আমরা প্রায় একঘণ্টাকাল ড্রাইভ করে পঞ্চাশ মাইল অতিক্রম করেছি। আরও দশ মাইল এগোবার পর আমার কৌতূহল একটা বেলুনের মত ফুলে-ফেঁপে উঠছে টের পেয়ে অগত্যা হেলেনকে শুধালাম, "লিজের বাড়ি অনেক দূরে বুঝি?"

হেলেন বলল, "না, আর বেশি দূর নয়! এই পৌঁছলাম বলে!"

হেলেনকে জিজ্ঞেস করি, "ব্রিজ খেলার অনেক সাথী আছে বুঝি তোমার?"

হেলেন বলল, "আমরা সব মিলে প্রায় আটজন। বাই টার্ন-এর ওর বাড়িতে ব্রিজ-পার্টির বৈঠক হয়। আবহাওয়া ভালো থাকলে প্রতি হপ্তায় আমরা দুবার মিট্ করি। যার বাড়িতে বৈঠক হয়, খানাপিনার আয়োজন সেই করে।"

স্টেশান ওয়াগন আগাগোড়া সমান বেগে চলেছে তো চলেছেই। নব্বই মাইলের পোস্ট পেরিয়ে গেলাম। যতদূর চোখ যায় কোনো বাড়িঘরের লক্ষণ নেই। কোথাও একটি আলোর

বিন্দুও নজরে আসছে না। হঠাৎ হেলেন বলল, "আমার স্বামী জিমি অর্থাৎ জেমস রেনল্ডস কাল লিভারপুল থেকে আসবে উইক-এণ্ড কাটাতে। ইউ উইল লাইক জিমি। হি ইজ ভেরি ফ্রেণ্ডলি এ্যান্ড ইজি টু গেট্ অ্যালঙ্গ উইথ।" তারপর, একটু থেমে বলল, "কাল ব্রেকফাস্টে আমার মা এবং ছোট বোন মেরী এবং আমাদের পেইংগেস্ট জুডিথ-এর সঙ্গে তোমার আলাপ হবে। লেইটন হলের স্থায়ী বাসিন্দা বলতে আমরা মাত্র এই চারজন। অবশ্যই আমাদের খুড়তুতো ভাই পিটার রোজই একবার আসে। আমাদের এস্টেটের দেখাশোনা করে এবং চার বুড়ির খবরা-খবর নেয়। আগামী হপ্তায় আসবে স্পেন থেকে দুটি অল্পবয়সী মেয়ে। দু'হপ্তা খানেক কাটাবে। তাদের বাবা-মা ইংরিজি শেখার উদ্দেশ্যে এখানে পাঠাচ্ছেন। গত বছর এসেছিল গ্রীষ্মকালের শুরুতেই। এবার কেন জানি দেরি হল। মেয়ে দুটি দেখতে যেমন সুশ্রী তেমন স্বভাবেও।" দুটি সুন্দরী যুবতীর আসন্ন আগমনের সংবাদটি যে আমার মনে একটি মৃদু উত্তেজনার ঢেউ তুলল না একথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ হবে। কথায় কথায় হেলেন বলল, "আই হোপ্ ইউ ক্যান স্টে হিয়ার লঙ্গ। আই ওয়ান্ট টু পেইন্ট অ্যা লট্ হোয়াইল ইউ আর হিয়ার। তোমার কাছ থেকে আমার অনেক কিছু শেখার আছে।"

ইতিমধ্যে আমরা একশ-দশ মাইলের পোস্টটি পেরিয়ে গেছি। অল্পক্ষণের মধ্যেই অনতিদূরে রাস্তার ডান দিকে অনেকগুলো আকাশচুম্বী সাইপ্রেস গাছের উপর গাড়ির হেডলাইট পড়তেই হেলেন বলে উঠল, "হিয়ার উই আর।" একথা বলার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমরা একটি মনোরম ড্রাইভওয়ের ভেতর প্রবেশ করলাম। দুধারে ঘন সাইপ্রেসের সারি শেষ হতেই গাড়ি পোর্টিকোর তলায় এসে থামল। গাড়ির আওয়াজ শুনতেই লিজ ছুটে বেরিয়ে এসে হেলেনকে উষ্ণ আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, "হাউ আর ইউ ডার্লিং?" আমার সঙ্গে পরিচয় হতেই করমর্দন করে বললেন, "প্লিজড্ টু মিট্ ইউ! কাম্ ইন প্লিজ!" ঘরে ঢুকতেই বাঘের মত দেখতে দুটো কুকুর গর্জন করতে করতে আমার দিকে ছুটে এল। একটি ছিল "Dobermanns" অন্যটি ছিল "Labrador Retriever"। আমার ঘাড়ে লাফিয়ে ওঠে আর কি! "কীপ কোয়ায়েট!" বলে লিজের কাছ থেকে প্রচণ্ড ধমক খেয়ে জানোয়ার দুটো তৎক্ষণাৎ ল্যাজ গুটিয়ে শান্ত ছেলের মত বসে পড়ল। আমারও হৃৎপিণ্ডের গতি স্বাভাবিক হয়ে এল।

মস্ত হল ঘর। একপাশে ফায়ার প্লেসে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। তারই কাছাকাছি ব্রিজ খেলার টেবিল এবং চেয়ার। আরও দু'জন [illegible] [illegible] ড্রিংকস্ হাতে বসেছিলেন। [illegible] [illegible] চল্লিশ থেকে [illegible]শের মধ্যে। গড়পড়তা ইংরেজ মহিলাদের মত দীর্ঘাঙ্গী। মুখশ্রী মনে রাখবার মত কিছু নয় কিন্তু একেবারে শ্রীহীন বললেও অবিচার করা হবে। লাবণ্যময়ী ফরাসী কিংবা ইতালীয় স্ত্রীলোকদের মত ইংরেজ মহিলাদের মুখে কমনীয়তার ছাপ সুস্পষ্ট নয়। পোশাক-আশাকেও পূর্বোক্ত মহিলাদের সফিস্টিকেশানের অভাব। এতৎসত্ত্বেও, ব্যবহারে, আদব কায়দায় যে নিখুঁত একথার প্রমাণ এরই মধ্যে পেয়েছি।

উপস্থিত মহিলাদ্বয়ের সঙ্গে করমর্দনের পালা শেষ হতেই লিজ ড্রিংকসের টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "হোয়াট উড ইউ লাইক টু হ্যাভ্?" অনেকদিন ভালো হুইস্কি খাইনি বলে তাই একটা চাইলাম।

আমি ব্রিজ খেলি না, অর্থাৎ জানি না। জানলেও অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ, এঁদের পার্টনার তো আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে। তাই ভদ্রতার খাতিরে খানিকক্ষণ এঁদের খেলার নীরব দর্শক হয়ে থাকার পর, হস্টেসের অনুমতি নিয়ে আরেকটি হুইস্কি ঢেলে শেল্ফ থেকে একটা বই টেনে মস্ত একটা কৌচে হেলান দিলাম। ওক্-প্যানেলে মোড়া ঘর। পাশে ফায়ার প্লেস, ইতস্তত ষোড়শ শতাব্দীর ধ্রুপদী ইতালীয় শ্বেতপাথর এবং গিল্টি করা সুগন্ধী টেবিলের ওপর গোলাপ ঠাসা ফুলদানি, হাতে জাত-হুইস্কির গ্লাস এবং বই। পাশের টেবিলে, "থ্রী-কাসেলস্", "বালকান্ সোব্রানী"র টিন (সেকালে পঞ্চাশটা সিগারেটের টিন পাওয়া যেত), আর রাখা আছে হাভানার চুরুটের বাক্স। আমার তর্জনীর দুগুণ লম্বা এবং পুরুষ্টু একটি সিগার ধরাতেই মনে হল, "আঃ, জীবন কি মধুময়। চারবছর ধরে প্যারিসের একটানা দুঃখীরাম জীবন যাপনের পর এযেন একটি বাদশাহী অভিজ্ঞতা। ওমর খৈয়ামী ভাবের সাগরে তখন আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। কিন্তু কতক্ষণ!

বইটির নাম ছিল "নেচার অ্যান্ড দ্য গার্ডেনস অব ইংল্যান্ড"। আমার বর্তমান অবস্থায় যে কল্পরাজ্যে প্রবেশ করেছি সেখান থেকে পুষ্পপল্লবের রাজ্য তো মাত্র একটি পদক্ষেপ। বইটি খুলতেই যে অনুচ্ছেদটির ওপর চোখ পড়ল সেটি ছিল এই রকম। "There is something in the English Soul which rejoices in the works of Nature, or as if would have been called until very recently, of God, more than the works of man Nature, the English love, and after Nature, Art ইংরেজরা প্রকৃতি-পাগল জাত। বাগান সাজাবার আর্ট তাঁরা জানবেন না তো কারা জানবেন! আকাশ, মাটি এবং জল এ-তিনটি এলিমেন্টের এক অসাধারণ কাব্যিক সমন্বয় ঘটিয়েছেন তাঁরা তাঁদের এই বাগানের মাধ্যমে। বৃক্ষ এবং পুষ্পের অসংখ্য আকার এবং বর্ণের বৈচিত্র্য প্রকৃতির অব্যবহিত এবং অসাধারণ শরীরী সৌন্দর্যের যে-বিকাশ ঘটে তাকে আরও পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকর্তা মানুষের হৃদয়ে রোপণ করেন "পোয়েটিক সেন্টিমেন্ট"-এর বীজ। এ ব্যাপারে এদেশের [illegible] ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত। তাইতো এদেশে এত নেচার-পোয়েটসদের জন্ম এবং তাঁদের কাব্যের এত মহিমা।

এদেশের বিখ্যাত বাগান যাঁরা সৃষ্টি করেছেন তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ল্যান্ডস্কেপ পেন্টারদের দ্বারা। তাঁদের দর্শন ছিল "The least interference with nature"। অর্থাৎ প্রকৃতিতে যা অপূর্ণ থাকবে তাই শুধু পূর্ণ করা। বাগান তৈরির বেলায়, এ দর্শন ফরাসী দর্শনের সম্পূর্ণ খেলাপ। ফরাসী বাগিচার সৃষ্টিকর্তাদের দৃষ্টিতে বাগান মানেই হল "ফর্মাল ল্যান্ডস্কেপ্" যে-দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত হল সে-দেশের নিসর্গ-চিত্রকরদের ছবি।

চার-পাঁচ বছর ধরে প্যারিস বাসের সময় ইংলন্ডে কয়েকবারই এসেছি। প্রতিবারই এদেশের নয়নমুগ্ধকর প্রাকৃতিক শোভা দেখে মনে হয়েছে এখানকার লোকেরা প্রায় গোটা দেশের গ্রামাঞ্চলকেই একটি বিশাল বাগানের রূপ দিয়েছে। একেই তো প্রকৃতি এদেশকে তাঁর সমস্ত সম্পদ মুক্তহস্তে দান করেছেন—উপযুক্ত জলবায়ু, উর্বর জমি, অসাধারণ কায়িক পরিশ্রমের ক্ষমতা এবং "আউট্ডোর লাইফ"-এর প্রতি আসক্তি।—তদুপরি পেয়েছে কাব্যিক মেজাজ।

বইটির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তন্ময় হয়ে দেখছিলাম, এদেশের বনেদি বাড়ির বাগানের ছবি। শুধু নিজেদের দেশেরই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পার্বত্য অঞ্চলের নানা গাছপালা এনে এদেশের লোকেরা তাদের মাটি এবং জলবায়ুর সঙ্গে দিব্যি পোষ মানিয়ে নিয়েছেন। আমাদের হিমালয় অঞ্চল এবং চীন দেশে থেকে আমদানি করা রডোডেনড্রনের অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন এঁরা। এটি এ ধরনের অজস্র সফল গবেষণার মধ্যে একটি মাত্র উদাহরণ।

তাস খেলার উত্তেজনার ফাঁকে লিজ কখন যে লক্ষ্য করেছে যে আমার হাতের গ্লাসটি শূন্য তা টেরও পাইনি। পারফেক্ট হোস্টেসের এই তো সঠিক পরিচয়! তিনি আমার দিকে না তাকিয়েই হঠাৎ বলে উঠলেন, "সেন, প্লিজ ফিল-আপ্ ইওর গ্লাস!" বলা বাহুল্য, আক্ষরিকভাবে তাঁর আদেশ মেনে নিলাম।

ইতিমধ্যে সাদা লেসের কলারযুক্ত কালো ফ্রক পরিহিত এক মধ্যবয়েসী মহিলা ঘরে প্রবেশ করে নম্রস্বরে "গুড-ইভিনিং" সম্ভাষণ জানিয়ে ঘোষণা করল, "ডিনার ইজ রেডি"। যতদূর মনে পড়ে সে রাত্রির মেনুটা ছিল এইরকম—খুদে শামুকের স্যুপ, ডাকরোস্ট্, বেকড্পোটেটো, মাখন এবং যৎসামান্য মশলায় ছোঁক দেওয়া বিনস্ অ্যান্ড ক্যারটস্ এবং ফ্রেঞ্চ সালাদ। সঙ্গে ঠাণ্ডা ভিন্টেজ রেডওয়াইন। সর্বশেষে, একটি খাসা চেরি পুডিং। অ্যাপেল সসের সঙ্গে রোস্টটি যে অত্যন্ত মুখরোচক লেগেছিল, সেকথা ভেবে আজও জিভে জল আসে। ডিনারে পর ব্র্যান্ডি এবং অন্যান্য ভোজনোত্তর পানীয় পরিবেশনের পর লিজ এবং তাঁর বান্ধবীদের কাছ থেকে যখন বিদায় নিলাম তখন মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে। অনেককাল এত তন্দ্রাতুর বোধ করিনি। ফেরার পথে গাড়িতে প্রায়ই ঝিমিয়ে পড়ছিলাম। এত গরম পানীয়র পর কি আর মাথা সোজা রাখা যায়! বাড়ি পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত দুটো হল। দূর থেকে গাড়ির আওয়াজ পেয়ে হেলেনের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠল। হেলেন বলল, "সকাল ৯টায় গঙের আওয়াজ শুনতে

পেলেই ব্রেকফাস্টে নেমে এস। গুড্ নাইট, স্লিপ্ ওয়েল", বলে হেলেন চাপা সুরে শিস্ দিতে দিতে তার শোবার ঘরের দিকে উঠে গেল। আমিও লম্বা করিডর ধরে দক্ষিণের তেতলার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হলাম।

করিডরের দুধারে নিচের সারিতে ছোট ছোট নিসর্গ চিত্রের অয়েলপেন্টিং। ওপরের ধাপে একাধিক বারোশিঙ্গা হরিণের এবং আফ্রিকার বন্য মোষের মস্ত মস্ত মাথা সাজানো। তারই ফাঁকে ফাঁকে আছে নানা দেশের এক্সোটিক মৃত পাখি, ইংরেজিতে যাকে বলে "স্টাফড বার্ডস"। করিডরের শেষে একটি টিমটিমে আলো। তার বিরুদ্ধে বারোশিঙ্গার এবং মোষের মুণ্ডুগুলো একদম মিশ কালো রঙ ধরে কীরকম একটা ভুতুড়ে রূপ ধরেছে। তাদের চোখের মণিতে এই আলো এমনভাবে হাইলাইটের মত পড়েছে যে, চোখগুলো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। সব মুণ্ডুগুলো যেন হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠেছে, এক্ষুনি দেয়াল থেকে নেমে এল বলে। পাখিগুলোর দিকে চোখ পড়তেই মনে হল ওরা যেন ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকাচ্ছে, এক্ষুনি তারস্বরে ডাকতে শুরু করে দেবে। আর এখানে বেশিক্ষণ নয়। লাফিয়ে লাফিয়ে আমার ঘরের দিকে উঠে গেলাম।

একই জিনিস, বিশেষ ধরনের আবেষ্টনী, সময় এবং আলোয় কী অদ্ভুতভাবে রূপান্তরিত হতে পারে, এই মুণ্ডু এবং পাখিগুলো তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। ইতিপূর্বে কত জায়গাই তো এ জিনিস দেখেছি। কই, কখনো তো তাদের ভুতুড়ে বলে মনে হয়নি।

উচ্চতায় সমতল ভূমির চাইতে খানিকটা উঁচু বলে এই অঞ্চলে প্রায় সারা বছর ধরেই বেশ হাওয়া বয়। শরৎকালে বাড়ে, আর শীতকালে রীতিমত ঝড় বয়। চারিদিক এত নির্জন যে, হাওয়ার বেগ বাস্তবের চাইতে এখন অনেক বেশি মনে হচ্ছে। আমার ঘরের পশ্চিমের দেয়াল এবং জানালায় ধাক্কা খেয়ে সোঁ-সোঁ আওয়াজ হওয়ায় সে রাত্রি ঘুম আসতে শুধু দেরিই হল না কয়েকবার আচমকা জেগেও উঠেছিলাম।

প্রায় তিন ফুট ডায়ামিটারের ব্রোঞ্জের তৈরি গঙ্গ যখন ব্রেকফাস্ট টাইমের কয়েক মিনিট আগে বেজে উঠল, তখন লেইটন হলের ত্রিসীমানার মধ্যে কার সাধ্যি আছে যে, আরেকটু ঘুমিয়ে নেয়। পরে শুনেছিলাম এটি হেলেনের ঠাকুর্দার বাবা চীন থেকে এনেছিলেন। এটির ওজন নাকি পঞ্চাশ কিলোগ্রাম। এর আওয়াজ শুনে নাকি ভূতও পালিয়ে যায়। শুনে আশ্বস্ত হয়েছিলাম কারণ, প্রথমত ওই একটি জিনিসের ভয় অনেক রাতেই আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এখনও নেয়। তাছাড়া ল্যাঙ্কেশায়ার অঞ্চলের এ ব্যাপারে, বিশেষ খ্যাতি আছে বলে কোথাও পড়েছিলাম।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিচে নেমে এলাম। হেলেন বৈঠকখানায় বসে কাকে চিঠি লিখছিল। হেলেনের একটি নয়। চারটি কুকুর আমাকে দেখেই তেড়ে এল। তারস্বরে এমন এক ঐকতান জুড়ে দিল যে আমি থমকে দাঁড়ালাম। "দে আর হার্মলেস" বলে হেলেন তাদের তাড়া করে পাশের ঘরে বন্ধ করে দিচ্ছিল। আমি বাধা দিয়ে বললাম, "আহা! থাক না!"

একটু পরেই তাদের ঐকতান থামিয়ে আমার পায়ের কাছে তারা ঘুরে বেড়াতে লাগল। জাতে সব কটিই হল, কুকুর বিশেষজ্ঞরা যাকে বলেন, "টয়-ডগস্"। অর্থাৎ ছোট কুকুর। তার মধ্যে দুটি ছিল "স্প্যানিয়েলস" এবং অন্য দুটি ছিল "পমেরানিয়ানস্"।

চুম্বনের স্বরে তাদের প্রতি একটু আগ্রহ দেখাতেই, তারা আমার আদর পাবার জন্যে নিজেদের মধ্যে রীতিমত ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিল। এরপর থেকে যতদিন লেইটন হলে ছিলাম ততোদিন এদের সঙ্গে আমার সম্প্রীতি উত্তোরত্তর ঘনীভূত হয়ে উঠতে কোনও অসুবিধেই হয়নি। যথাক্রমে তাদের নাম ছিল—"হ্যামলেট্", "ড্যান্ডি," "ওফিলিয়া", "স্কারলেট্"।

ইংরেজদের কুকুর-প্রীতি প্রায় উপকথার স্তরের। (অবশ্যই ফরাসীদের বেড়ালপ্রীতিও কোন অংশে কম যায় না)। এ ব্যাপারে ইংরেজরা এত "সেন্টিমেন্টাল" যে তা যুক্তির সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে যায়। এখানে তার দুটি উদাহরণ দিলে পাঠকেরা আমার কথার তাৎপর্য পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রথমটি স্বদেশেরই একটি ঘটনা। ১৯৩৭ সালে, মাদ্রাজে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে চিত্রবিদ্যায় শাকরেদি করার সময়, ঘোরতর আর্থিক অনটন ঘোচাবার উদ্দেশ্যে, একদিন গোপাল ঘোষ আর আমি স্থির করলাম, যে, সে শহরের সাহেবপাড়ার সব বাড়ির দরজায় টোকা মারব। প্রকৃত শিল্পদরদী বলে সাহেবদের খ্যাতি ছিল। আমাদের বগলে জলরঙে আঁকা অনেক ল্যান্ডস্কেপের ছবি। পরপর দুটি বাড়ি থেকে বিশ্রীভাবে বিতাড়িত হলাম। তৃতীয় বাড়িটির প্রভু ছিলেন অল্পবয়েসী, কন্দর্পকান্তি, দুধে-আলতায় মেশান রঙের এক সাহেব। তাঁর ছটা পোষা কুকুর। আয়তনে ছোট এবং লোমশ। তিনি আমাদের আঁকা ছবি দেখার কোন আগ্রহ প্রকাশ না করেই বললেন, "তোমরা আমার সব ক'টা কুকুরের হুবহু পোর্টরেট এঁকে দিতে পারবে? যদি পার, তাহলে আমি তোমাদের প্রতি পোর্টরেটের জন্যে পঁচিশ টাকা করে দেব। যদি রাজী থাক, তাহলে কাল থেকে কাজে লেগে যাও। তোমরা দুপুরে, আমি না থাকলেও, এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবে। কিন্তু মনে রেখো প্রত্যেকটি কুকুরের চেহারার হুবহু মিল চাই। "তিনটি কুকুরের ছবি গোপাল ঘোষ আঁকলেন। তিনটি আঁকলাম আমি। চুপিসাড়ে এখানে বলে রাখি যে, মানুষের প্রতিকৃতি আঁকার বেলায় দর্শক, কিংবা পৃষ্ঠপোষকের খুঁতখুঁতে ভাব দেখা যায় এবং তার দরুন গোঁজামিল দেবার অবকাশ নেই বললেই চলে। কিন্তু কুকুরের প্রতিকৃতি আঁকার বেলায় গোঁজামিল দেবার অবকাশের কোন ঠিক ঠিকানা নেই। এতৎসত্ত্বেও, সাহেব আমাদের আঁকা ছবি দেখে এত খুশি হলেন যে, হুইস্কি এবং নানা সুস্বাদু খাবার পরিবেশনে আপ্যায়িত করতে কোনও ত্রুটি করলেন না। পরিশেষে করকরে নোট গুনে আমাদের হিসেব মিটিয়ে দিলেন।

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটির ঘটনাস্থল ছিল খাস বিলেতেই।

একদিন হেলেনের সঙ্গে গ্লাসগো শহরে একটি নিওরিয়ালিস্ট ইতালীয় সিনেমা দেখছি। ছায়াছবিটির নাম ভুলে গেছি। ছবির এক দৃশ্যে একটি বস্তিবাসীর পোষা কুকুর রাস্তার ধারে ইয়ে করবার বেলায় দ্রুতগামী একটি ট্রাকের তলায় গুঁড়িয়ে যায়। সে দৃশ্য দেখে হেলেন এমন এক বিকট চিৎকার করে উঠল যে হলের অনেক লোক অন্ধকারে ছুটে এল ব্যাপারখানা কী জানবার উদ্দেশ্যে। হেলেন বলল, "চল, এক্ষুনি হল থেকে বেরিয়ে যাই। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।" বেরিয়েই একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে আমরা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। বাড়ি ফিরে বোন মেরী এবং মাকে ঘটনাটির কথা বলায় তাঁরাও এত মর্মাহত হলেন এবং তাঁদের বাড়ির চতুষ্পদী কটির নিরাপত্তা সম্বন্ধে এতই চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে সে রাত্রি, শুতে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ কারু সঙ্গে তেমন বাক্যবিনিময় করলেন না।

হেলেনদের ডাইনিং হলটি বিশাল। ঘরের সঙ্গে মানানসই কালো পালিশ করা একটি টেবিল। অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ জন আমন্ত্রিতদের জন্যে অনায়াসেই একটি ব্যাঙ্কোয়েটের ব্যবস্থা হতে পারে। হলঘরটির এক কোণে দুটি মেয়ে, বয়েস কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে, হাল্কা ছাই রঙের ফ্রক, তার সঙ্গে সাদা কলার, পরে দাঁড়িয়ে আছে। এদের কথা হেলেনের কাছে আগে শুনিনি, তারা যে পরিচারিকা, সে কথা দাঁড়াবার ভঙ্গী এবং ইউনিফর্মের মত পোশাক দেখেই আঁচ করে নিলাম। আমাদের গুড্-মর্নিং সম্বোধন জানিয়ে হেলেন এবং আমার জন্যে নির্দ্ধারিত চেয়ারদুটি পেছনের দিকে টেনে তারা আমাদের বসতে অনুরোধ করল। আড় চোখে তাদের দিকে একটু তাকাতেই দুটি জিনিস আমার নজরে এল। প্রথমত তাদের দুজনের মধ্যে চেহারার বিস্ময়কর মিল। দ্বিতীয়ত, দুজনেই দেখতে ভারী মিষ্টি। হেলেন তাদের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বলল, "এটি হল ইজাবেলা, আর ওটি হল জুলিয়েটা (অর্থাৎ জুলিয়েট)! ইতালির Ravenna অঞ্চল থেকে এসেছে আমাদের কাছে। রান্না বান্না, এবং বাড়ির অন্যান্য কাজ করে। ওরা জমজ। বড্ড ভালো মেয়ে।" হেলেনের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই পরপর প্রবেশ করলেন হেলেনের মা, বোন মেরী এবং জুডিথ্। প্রথম পরিচয়ের পালা শেষ হতেই তিনজন প্রায় ঐকতানের মত সমস্বরে বলে উঠলেন, "ওয়েলকাম টু লেইটন হল।"

ব্রেকফাস্টে প্রথম পরিবেশিত হল পরিজ। তারপর Ox-tongue-এর সরু চাকলা, টোস্ট, চীজ, ঘরে তৈরি নানারকম জ্যাম, ছোট একটি মৌচাকসহ মধুর ভাণ্ডার। অবশেষে ক্রীমসহ টাটকা কফি। তাছাড়া টেবিলের ওপর রাখা ছিল টসটসে সবুজ এবং লাল আঙুর এবং ইংলন্ডের বিখ্যাত আপেল যার রঙ সেদেশের ঘাসের মতই সবুজ। বলা বাহুল্য, এ-সব কিছুই হেলেনদের ফার্ম-প্রোডাক্টস।

হেলেনের মা, Penelope Gillander, বসেছেন টেবিলের মাথায়। (লেইটন হলে

যতদিন ছিলাম, ততদিন তার এ স্থানটিতে আর কাউকে বসতে দেখিনি)। উপবিষ্ট অবস্থায়ও তাঁর কাঁধ এবং মাথাটি চেয়ার থেকে অনেক ওপরে ছাপিয়ে উঠেছে। উচ্চতায় প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি। হেলেনের কাছে আগেই শুনেছিলাম তাঁর বয়েস অষ্টাশি। দেখে মনে হয় বড় জোর সত্তর-বাহাত্তর। চামড়া এখনও বেশ টানটান। গোলাপী চিবুক। দুপাটি শক্ত দাঁতের অধিকারিণী। নিজের গাড়ি নিজেই চালান। কথাবার্তায়, চালচলনে আভিজাত্যের ছাপ তো আছেই তদুপরি আছে সম্রাজ্ঞীসুলভ ব্যক্তিত্ব। যদি সম্রাজ্ঞীর মুকুট, রাজদণ্ড এবং আনুষ্ঠানিক পোশাক-পরিচ্ছদ পরিহিত হতেন তাহলে, হঠাৎ দর্শনে, মহারানী ভিক্টোরিয়া বলে অনায়াসেই ভুল হতে পারত। আমার এ উক্তি যে অতিরঞ্জিত নয় তার প্রমাণ পেতে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি।

ব্রেকফাস্ট শেষে তিনি আমার হাত ধরে, টেনে, বাড়ির সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। মাতৃসুলভ স্নেহের সুরে বললেন, "কাম উইথ মি ডার্লিং।"

হেলেনদের বাড়িটি আসলে একটি কাসেল এরই শামিল। চারটি তলায় প্রায় ছত্রিশটি ঘর। তাছাড়া বেসমেন্ট তো আছেই। স্থাপত্যের শৈলীর দিক থেকে এই বিশাল ইমারতটিকে বলা যায় নানাপ্রকারের সমাবেশ এলিজাবেথিয়ান, জর্জিয়ান, এডোয়ার্ডিয়ান, ভিক্টোরিয়ান—এককথায়, খিচুড়ি। দূর থেকে দেখলে মনে হয় ছোটখাটো দুর্গ এবং অট্টালিকার একটি মাঝামাঝি ব্যাপার, শুধু উঁচু পাঁচিলের অভাব। এটি হেলেনের ঠাকুর্দার তৈরী। পেশায় তিনি ছিলেন, 'হিজ ম্যাজেস্টিজ কেবিনেট-মেকার'। অর্থাৎ ইংলন্ডেশ্বরের এবং তাঁর পরিবারের আসবাবপত্রের তাবৎ প্রয়োজন তিনিই মেটাতেন। সেই সুবাদে তাঁর পসার এত বিস্তৃতিলাভ করেছিল যে, অচিরেই তিনি এ অঞ্চলের একজন গণ্যমান্য জমিদার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ইংলন্ডের হাল আমলের আইন অনুযায়ী প্রচণ্ড ডেথ-ডিউটির বহর মেটাতে গিয়ে উত্তরাধিকারীরা অনেক জমিজামা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। আজ এই বিশাল বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করতে গিয়ে হেলেনদের এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে যা তাঁর ঠাকুর্দার পক্ষে অকল্পনীয় ছিল। যেমন, প্রতিবছর প্রায় চারমাস কাল এ বাড়িটি, সাধারণের জন্যে প্রতি শনিবার রবিবার সকাল এগারোটা থেকে সন্ধে পর্যন্ত খুলে রাখা হয়। আরেকটু খুলে বলি। এ অঞ্চলে, অর্থাৎ গোটা লেক ডিসট্রিক্ট-এ, প্রায় একশ পঞ্চাশখানা এ ধরনের বাড়ি আছে। এসবগুলোই কোনো না কোনো হল বলে পরিচিত। এর মধ্যে বেশ কটি হেলেনদের বাড়ি থেকে অনেক পুরনো। সব বাড়িরই কিছু না কিছু ইতিহাস আছে। এদের মধ্যে অনেকেরই আজ পড়তি অবস্থা। বেশির ভাগই রক্ষণাবেক্ষণের তাগিদে হেলেনদের মত ব্যবস্থার প্রচলন করেছে। বাসভর্তি ট্যুরিস্টরা আসে। তাদের গাইডেডট্যুর দেওয়া হয়। মধ্যাহ্ন ভোজন, চা পান এবং রাত্রি ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়, অবশ্যই আগেভাগে খবর দেওয়া বাধ্যতামূলক। বলা বাহুল্য, এসব যাবতীয় সার্ভিসের বদলে, তখনকার হিসেবে আট থেকে দশ পাউন্ড, মাথা পিছু চার্জ করা হত। ইংলন্ডের সবচাইতে নয়নমুগ্ধকর অঞ্চলটিতে বেড়ান, অল্পবিস্তর ঐতিহাসিক জ্ঞানলাভ এবং চর্বচূষ্য খাওয়া, এক কথায়, রথও দেখা এবং কলা বেচা দুইই হল।

লেইটন হলের পেছনে জাল দিয়ে ঘেরা একটি খোয়াড়। হেলেনের মার এক হাতে একটি প্লাস্টিকের প্যাকেট। খোয়াড়ের কাছাকাছি আসতেই একদল হাঁস এবং রাজহাঁস তারস্বরে প্যাক-প্যাক করতে করতে তাঁর দিকে ছুটে এল। এ মুহূর্তটির জন্যে এ-পাখিগুলো হাঁ করে অপেক্ষা করছিল। তিনি মুঠোমুঠো দানা ছড়িয়ে দিলেন। প্রত্যেকটি পাখিকে তিনি নাম করে Rosie, Gane, Suzy, Sally, Maggi, Dick, Bill, Harry ইত্যাদি— ডাকতেই নানা কৃতজ্ঞতাসুলভ আওয়াজে তাঁর দিকে তারা গলা বাড়িয়ে দেয়। চুম্বনের স্বরে আওয়াজ করে তিনি তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। মমতা এবং প্রীতির অদৃশ্য এক দীপ্তিতে কার্নফোর্থের সকালের আকাশবাতাস ভরে ওঠে। রোজী, সুজী, ম্যাগীরা তাদের দানা শেষ করে তৃপ্ত মনে নিকটবর্তী পুষ্করিণীতে ঝাপ দিল। লিলি ফুলে ভরা জলাশয়টিতে যেন আরও রঙ-বেরঙের ফুল ফুটে উঠল।

মিসেস গিলেন্ডার হঠাৎ আমাকে বললেন, "চল! লাঞ্চের পর আমার সঙ্গে আজ বেড়াতে যাবে। আমরা ট্রেনে যাব। ঘণ্টা খানেকের পথ। রেল লাইনের দুধারের দৃশ্য অতি মনোরম। তাছাড়া, শরৎকাল তো প্রায় এল বলে! এখন থেকেই অনেক গাছে রঙ ধরেছে। বসন্তের চাইতে এ ঋতুটি আমাদের অঞ্চলে আরও সুন্দর। তোমার খুব ভালো লাগবে।"

যথাসময়ে হেলেন আমাদের কার্নফোর্থ স্টেশনে পৌঁছে দিল। ছোট লুপলাইন। ট্রেন তিন চার মাইল এগোবার পর তিনি বললেন, "এ রেলপথ আমাদের বাড়ির পেছন দিক দিয়েই। সারাদিনে বড়জোর দুটি ট্রেন চলাচল করে। শীতকালে পাতাছাড়া গাছের ফাঁক দিয়ে আমাদের বাড়ি দেখা যায়। কিন্তু গ্রীষ্মে পড়ে যায় ঢাকা।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের ট্রেন এক উর্বর উপত্যকার ভেতর দিয়ে হুশ-হুশ করে এগিয়ে চলল। রেললাইনের দুধারে বিটরুট, শালগম, ফুল এবং বাঁধাকপির ক্ষেত। লোকজন প্রায় চোখেই পড়ে না। দূরে দুয়েকটি গ্রাম দেখা যায়। বাঁধা কপির সাইজ দেখে তাক লাগে। প্রয় দুটি ফুটবলের সমান। ফুলকপিগুলোও যেন এক একটি দ্বিগুণ ফুলের তোড়া। গ্রামের চারপাশের বৃক্ষরাজিতে উজ্জ্বল হলুদ, মরচেধরা লোহার কিংবা তামার রঙ ধরেছে। সেকি বাহার! মধ্যাহ্নের এক মোলায়েম আলোতে গোটা দৃশ্যটি সিক্ত। সব মিলে নিতান্তই একটি তৃপ্তিদায়ক চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা।

যে-স্টেশনে আমরা নামলাম তার নামটি আজ মনে পড়ছে না। কার্নফোর্থের মতই অনাড়ম্বর। ট্রেন থেকে নামতেই সুদীর্ঘ এবং সুবেশিত মধ্য বয়েসী এক ভদ্রলোক মিসেস্ গিলেন্ডারের গালে চুম্বন দিয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। স্যুট পরিহিত হলেও, তাঁর সার্টের কলার দেখে আচ করলাম, যে তিনি একজন ধর্মযাজক। তার নামটি মনে রাখার মত। 'রেভারেন্ড সাইডবটম'। বলা বাহুল্য, নামের সঙ্গে কোনো কায়িক গরমিল যে নেই তা প্রথম দর্শনেই লক্ষণীয়। তাঁর বাবা-মা এ অদ্ভুত নামাকরণে যতোই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করুক না কেন, প্রকৃতি তাঁর শরীরের এ অংশটুকুকে নির্দিষ্ট স্থানেই রেখেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এবং তার পর য়ুরোপ থেকে আগত এ অঞ্চলের শরণার্থীদের সাহায্যার্থে একটি চ্যারিটি-শো আয়োজন করার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সভা ডেকেছেন। তার সঙ্গে চা এবং মুখরোচক কেক—পেস্ট্রির সুব্যবস্থা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সভা শেষ। আবার সেই লুপলাইন ধরে ফেরার পালা।

ট্রেন হেলেনদের বাড়ির কাছে আসতেই মিসেস গিলেন্ডার অপ্রত্যাশিতভাবে এমন একটি কাণ্ড করে বসলেন যা দেখে হতবুদ্ধি ও বিস্মিত, হলাম বললেও কম বলা হয়। হঠাৎ তিনি উঠে অ্যালার্ম-চেনটি ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলেন। প্রচণ্ড কর্কশধ্বনির সঙ্গে রেলগাড়ির চাকা থেমে গেল। ভদ্রমহিলা তাঁর ব্যাগ থেকে দশ পাউণ্ডের দুটি নোট বের করলেন। এরপর তিনি কী করবেন? গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই গার্ড এসে হাজির। ভ্রূকুটির পরিবর্তে তাঁর মুখে স্মিত হাসি। যেন এঘটনার পূর্বাভাষ তিনি আগে থেকেই পেয়েছিলেন। আমি যেন একটি হেঁয়ালি দেখছি। মিসেস গিলেন্ডার গার্ডের হাতে নোট দুটি গুঁজে দিয়ে আমার হাত ধরে সম্রাজ্ঞীর মত প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এলেন। আমাকে বললেন, You see darling, it is much easier to pay a fine of twenty pounds and get down here than to go all the way to the station and then drive back home!" এতক্ষণে রহস্যের যবনিকার উদ্‌ঘাটন হল। বিনা কারণে অ্যালার্ম-চেন টানার জরিমানা বাবদ কুড়ি পাউণ্ড। ট্রেন থেকে বাড়ি পর্যন্ত সিকি মাইলের মধ্যে নেমে পড়ার প্রলোভনটি এতই প্রবল, যে তাঁর কাছে এটি গা থেকে একটা মাছি তাড়ানোর মতই তুচ্ছ ব্যাপার। এ ধরনের অবিশ্বাস্য কাণ্ড যে তিনি সুযোগ পেলেই করে থাকেন গার্ড মহাশয়ের স্মিত হাসি তারই সাক্ষ্য দিল। বৃক্ষকুঞ্জের নির্জন পথে হাঁটতে হাঁটতে তিনি বললেন, "I wanted to have a walk. It is so lovely out here. I rediscover my soul in this wood."

খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার পর নিচে নেমে এসে দেখি হেলেন তার স্টুডিও ঘরটির গোছগাছে ব্যস্ত। পরদিন থেকে ছবি আঁকা শুরু হবে বলে। স্থির হল যে, যদি আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে আশেপাশে কোনো গ্রামে গিয়ে ইজেল খাটাব।

তেলরঙে আঁকা হেলেনের কয়েকটি ছবি দেয়ালে টাঙান ছিল। সব কটাই স্টিল-লাইফ। সেগুলো সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট বক্তব্য জানতে চাইলে আমি বললাম, "এক পলস্তর রঙ শুকোতে

না শুকোতেই আরেক পলস্তর, তার ওপর আরেক পলস্তর—এইভাবে কাজ করার ফলে রঙ শুধু অত্যধিক পুরুই হয়নি, তার জেল্লায়ও ঘাটতি পড়েছে। ছবির কোনো অংশের ট্রিটমেন্ট কিংবা রঙের নির্বাচন যদি ঠিক না মনে হয়, তাহলে টার্পিন দিয়ে তা সম্পূর্ণ মুছে ফেলে, আরেকবার টাটকা রঙ লাগালে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখতে অসুবিধে হবার কথা নয়।"

হেলেনের স্টুডিও ঘরটি বেশ বড় রকমেরই। পশ্চিম দিকের দেয়াল জুড়ে মেঝে থেকে ছাদ অবধি, একাধিক বিশাল জানালা। না কি দরজা। কাঁচের ভেতর দিয়ে তাঁদের বাগান এবং অনতিদূরের অন্যান্য নানা গাছপালা, তার ওপর দিয়ে মস্ত একফালি আকাশ দেখা যায়।

হেলেন বাগান থেকে টাটকা একগুচ্ছ গোলাপী রডোডেনড্রন্ কেটে এনে একটি সবুজ স্বচ্ছ চৌকো ফুলদানিতে সাজিয়েছে। পরদিন হেলেন সেটিকে আঁকবে বলে। ঘরের হাওয়ায় টার্পিন এবং লিন্সীড তেলের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। গন্ধ নাকে যেতেই হাতটা নিশ্পিশ্ করে ওঠে। সামনেই দুটি ইজেলে মাঝারি সাইজের দুটি নিষ্কলঙ্ক ক্যানভাস রাখা আছে। একটি আমার এবং অন্যটি হেলেনের ব্যবহারের জন্যে। হেলেনকে বললাম, "আর কালকের অপেক্ষায় কেন?" কিন্তু ফুল আঁকায় আমার তেমন আগ্রহ নেই। জানালার ধারে একটা চেয়ারে হেলেনকে আমি বসতে বললাম। "রোবো। আমি জামাকাপড় বদলে আসি, চুল আচড়ে আসি"—হেলেনের এসব স্ত্রীসুলভ আবদার অগ্রাহ্য করে আমি তাঁকে জোর করেই চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। পোর্টরেট আঁকার বেলায় আমার লক্ষ্য হল এই যে মডেলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় রেখে, ছবির অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, রঙের নির্বাচন, ডিজাইন এবং ফর্মের বেলায়, যথেষ্ট স্বাধীনতা অবলম্বন করা। আমার এ মত অবশ্যই অনেকটা পোস্ট-ইমপ্রেশনিস্ট ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট। গাঢ় ইন্ডিগো রঙের পোশাক, পাকা পাকা পাতিলেবুর মত পশ্চাৎপট মুখের এবং হাতে হালকা গোপালী রঙের আভা, চুলে জংপড়া লোহার রঙ—এ তিনটি মৌল রঙের সঙ্গে সমন্বয়ের খাতিরে, এখানে ওখানে অন্য কিছু মিশ্রিত রঙের বিন্যাসে ছবিটি ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে, বেশ আকর্ষণীয়ভাবে এগিয়ে চলল। হেলেনের ডান হাতের মুঠো তার গালে, বাঁ হাত টেবিলের ওপর, তার ওপর কয়েকখানা বই এবং রডোডেনড্রন্ ফুলদান। ছবির সজ্জায়, অনেকটা ভ্যান্ গখের আঁকা বিখ্যাত "L'Arlesienne"-এর মত বলা যায়। ইতিমধ্যে সন্ধে প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। "বাকিটুকু কাল করা যাবে"—এই বলে হেলেনকে ছুটি দিলাম। চলে যাবার আগে হেলেন ছবিটিকে খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল, "আই উইল রিজার্ভ মাই কমেন্টস আন্টিল ইট্ ইজ ফিনিশড।" ছবির ব্যাপারে হেলেনের দৃষ্টিভঙ্গী যে ঈষৎ রক্ষণশীল তা আমার অজানা নেই। এ ব্যাপারে সে রয়েল অ্যাকাডেমির একজন কট্টর সমর্থক। রক্ষণশীলতা শুধু
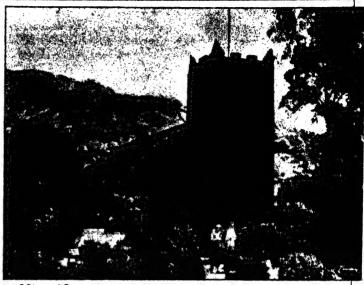
লেক ডিস্ট্রিক্ট-এর কাউন্টি চ্যাপেল

শিল্পকলার ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়। পোশাক-আশাক, বাড়িঘরের সজ্জায়, এমনকি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও এদের পুরো পরিবারই এই দর্শনে বিশ্বাসী।

খানিকক্ষণবাদেই ডিনারের গঙ্গ বেজে উঠল। নিচে নেমে দেখি সবাই বসবার ঘরের পাশে অ্যান্টিরুমে জড় হয়েছেন। প্রবেশ করতেই ডিনার জ্যাকেট পরা এক লম্বা-চওড়া পুরুষ উঠে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। "আই অ্যাম জিমি। প্লিজড্ টু মিট ইউ সেন! হেলেন টোল্ড মি অল অ্যাবাউট ইউ এভার সিন্স শি নিউ ইউ।" সবায়েরই হাতে ছোট গ্লাস। জিমি জিজ্ঞেস করল, "মে আই অফার ইউ সাম্ পোর্ট অর শেরি?" "শেরী প্লিজ!" বললাম আমি।

উপস্থিত সবাই ফর্মাল ডিনার ড্রেস পরিহিত দেখে আমি কিঞ্চিৎ অসোয়াস্তিবোধ করছিলাম। পরে বুঝেছিলাম যে এটা এ বাড়ির রেওয়াজ,

লেকের রুপোলি জল — অনচ্ছ আলোর দিগন্ত ঝাপসা হয়ে এসেছে

বাইরের কোনও আমন্ত্রিত ব্যক্তি থাকুক আর নাই থাকুক। আমার কাছে রেওয়াজটি ঈষৎ হাস্যাস্পদ ঠেকল। আমার পোশাক বলতে দু'টিমাত্র প্যান্ট, একটি কোট, আরেকটি মোটা খশখশে সোয়েটার। টাই-ফায়ের বালাই অনেকদিন আগেই ঝেড়ে ফেলেছি। তাই বর্তমান পরিবেশে কিঞ্চিৎ সংকোচ যে বোধ করিনি এমন কথা বলা যায় না।

খাবার টেবিলের ওপর প্রায় দু' ফুট উঁচু আর তেমনি পুরুষ্ট এক সারি মোমবাতি জ্বলছে। এই নিয়ন্ত্রিত আলোয় বেশ একটা উৎসবের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। টেবিলের ওপর খাঁটি চাঁদির ছুরি, কাঁটা, চামচগুলোতে এই আলো প্রতিফলিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এই সব আলোকে হাজার গুণে ছাপিয়ে উঠেছে হেলেনের মার কণ্ঠমালার মাঝখানে হীরের টুকরোটি। কোহিনুর দেখিনি। আমার চোখে এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে এটি হয়ত-বা তারই জুড়ি।

আজও ডিনারের প্রধান আহার্য হচ্ছে ডাক রোস্ট। কিন্তু সস্টা ছিল অন্য রকম। গত রাত্তিরে নিজের বাড়ির রোস্ট এবং আজকের রোস্ট খাওয়ার অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা ফারাক কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়ল। খাওয়ার পালা শেষ করে আমরা কফির পেয়ালা হাতে অ্যান্টিরুমের ফায়ার প্লেসের সামনে মৌজ করে বসেছি। হেলেনের মা আমাকে তাঁরই পাশের চেয়ারে বসতে আদেশ করলেন। তাঁর পায়ের কাছে কুকুর চারটি ঘুমোচ্ছে। কুকুরের যে মানুষের মত নাক ডাকে, জীবনে এই প্রথম তার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা হল। তাদের মধ্যে একটির পাগুলো হঠাৎ দ্রুতবেগে নড়েচড়ে উঠল। তার মুখটি হা-করে একবার খুলছে আর বন্ধ করছে। আমি অবাক হয়ে দেখছি। তাই দেখে হেলেন হেসে বলল, "হ্যামলেট ইজ চেজিং হিজ ফাদার্স গোস্ট ইন হিজ ড্রিমস্।" হায় ভগবান। তোমার

লীলার অফুরন্ত ভাণ্ডারের কতটুকুইবা খবর রাখি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "সেন, ডু ইউ প্লে ক্যানেস্টা ? দিস ইজ হোয়াট উই ডু এভরি ইভিনিং।" ইতিপূর্বে হাল আমলের এই তাশ খেলাটি না খেললেই, শিখে নিতে বেশি দেরী হল না কারণ, খেলার নিয়ম কানুন অনেকটা রামিরই মত। দুই প্যাক তাশ, তার মধ্যে চারটি জোকার। দুটি দান খেলার পর আচমকা এক চাপা ঢেকুর উঠে ডাক-রোস্টের সুঘ্রাণটা বেশ চাড়া দিয়ে উঠল। অসচেতনভাবে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "দ্য ডাক ওয়াজ ডেলিশাস্।" শুনেই মিসেস্ গিলেগুার যে মন্তব্যটি করলেন তা শুনে এই রোস্ট খাওয়ার সমস্ত সুখস্মৃতি এক লহমায় উবে গেল। "অব্ কোর্স! দ্যাট্ ওয়াজ সুজি। যেন এটুকুই যথেষ্ট নয়! পরমুহূর্তেই তিনি যোগ করলেন, "ওঃ! শি ওয়াজ সাচ্ অ্যা ডার্লিং।" নিতান্তই বিস্ময়কর হলেও, তাঁর এই উক্তি আমার মনে প্রচণ্ড এক কৌতূহল সৃষ্টি করল। রোজি সুজি, স্যালি বলে নামাকরণ এবং তাদের পুষ্টকরণ, তারপর ভক্ষণ। এখানে আমার কাছে ক্যাথোলিক দর্শন এবং পুরোপুরি হেডোনিস্ট দর্শনের মধ্যে একটা বিরোধ দেখা দিল। জানি না তিনি আমার মনের ভাবখানা ঠাহর করতে পেরেছিলেন কিনা। নিজের থেকেই তিনি আপাতদৃষ্টিতে, যে উদাসীন এবং সংবেদনবিহীন যুক্তি সুজি-ভক্ষণের সমর্থনে খাড়া করলেন আংশিকভাবে তা মেনে নিতে বাধ্য হলাম। তিনি বললেন, "উই হ্যাভ টু বি র‍্যাশেনাল অ্যাবাউট্ দিজ্ থিঙ্গস্! দিস্ ইজ দ্য ওনলি ওয়ে উই ক্যান কীপ্ দ্য বার্ড-পপুলেশন আণ্ডার কন্ট্রোল।" এটা ঠিকই যে, বাজারে বিক্রী করলেও সুজির চরম পরিণতিতে কোনো তফাৎ হত না!

কয়েক দান ক্যানেস্টা খেলার শেষে, এবং নিদ্রাদেবীর তাড়নার পূর্ব মুহূর্তে এ বাড়ির প্রতিদিনের নিয়ম হল, হয় বই থেকে ভূতের গপ্পো পড়ে শোনান, কিংবা মুখে বলে শোনান। এককে দিন একেকজনের পালা। এ পর্বের প্রথমটি শুনেই আমি উঠে পড়লাম এই অজুহাতে যে, অনেকক্ষণ ফায়ার-প্লেসের সামনে বসে থেকে নাকটা কী রকম শুকিয়ে আসছে, যাই বাইরে একটু পাইচারি করে আসি!

অভাব-অনটনের বোঝা যাদের বইতে হয় না, কিন্তু অফুরন্ত অবসর যাদের পক্ষে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, তারা চিত্ত বিনোদনের কত উদ্ভট উপায়ই না আবিষ্কার করে থাকেন!

বাড়ির বাইরে কাঁকরঢালা মস্ত চত্বরের চারপাশে উঁচু নিচু সবুজ ঢাল। এক ফালি চাঁদের আলো শিশিরসিক্ত এই ঢালে হালকা সবুজ-ছাই মিশ্রিত একটি মখমলি রঙ তৈরি করেছে। হঠাৎ সেই রঙের মাঝে আবছা সাদা-কালোর কতগুলো ছোপ্ একটা আচমকা নড়েচড়ে উঠল। তার মধ্যে কয়েকটা ছোপ ক্রমশই বড় হয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমার হাত-পা জমে যায় আর কি! এবার ছোপের সঙ্গে ফোঁশফোঁশ ধ্বনিও যোগ হল। ইমেজ অ্যান্ড সাউণ্ডের নিখুঁত মিশ্রণে আক্ষরিকভাবে দৃশ্যটি অ্যানিমেশন ফিল্মের রূপ নিল। এক দৌড়ে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করে সমবেত মণ্ডলীকে ঘটনাটি বলায়, হেলেন সবটাই উড়িয়ে দিয়ে বলল, "মাস্ট বি আওয়ার ব্ল্যাক-অ্যান্ড-হোয়াইট কাউজ্। দে কাম্ টু গ্রেজ্ হিয়ার এভ্রি নাইট।" তখনকার মত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও আমার গায়ে ছমছমে ভাবের খানিকটা থেকেই গেল। ঘুমেরই বারোটা বাজল!

পরদিন ব্রেক ফাস্টের সময় স্থির হল যে হেলেন আর আমি কয়েক মাইল দূরে গ্রামে গিয়ে ছবি আঁকব। তাই আমরা চটপট তল্পি-তল্পা গুটিয়ে নিয়ে সেই দিকে বেরিয়ে পড়লাম।

কয়েক ঘরের ছোট্ট একটি গ্রাম। খড়ের ছাদওয়ালা ঘরবাড়িগুলো চুনের পোঁচে আর সকালের আলোয় ঝকঝক করছে। কয়েকটা গরু আর ভেড়া ইতস্তত ঘাস খাচ্ছে। দু'য়েকজন কৃষক মইতে চড়ে খড়ের গাদায় কি করছে। রোদ-পড়ায় এই গাদাগুলোয় সোনালী রঙ ধরেছে। দূরে লেক ডিস্ট্রিক্টসের ধূসর পর্বতমালার পশ্চাৎপটে এই দৃশ্যটি বড়ই বাহারের লাগল। আমরা রাস্তার ধারে ইজেল খাটিয়ে এ দৃশ্যটি আঁকায় মনোযোগ দিলাম। অনেকাল পর আউটডোর স্কেচ্ করার অভিজ্ঞতাটি বেশ উপভোগ করছিলাম।

ঘণ্টাখানেক একটানা কাজ করার পর যখন থামলাম তখন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে ছবিটির প্রায় তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে গেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে দূরে গিয়ে দেখছি ছবিটি কেমন হল এমন সময় আবিষ্কার করলাম যে একটা গাড়ি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে এক মধ্যবয়েসী মহিলা। আমাদের ছবিগুলো নীরবে নিরীক্ষণ করছেন। তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখে চমৎকার একটি হাসি ধরে বললেন, "হ্যালো!"

হেলেন তার ছবিতে এত মোটা করে রঙ চাপিয়েছে যে আর সামলাতে পারছে না। দুয়েকটি জায়গায় রঙ মুছে ফেলে দিয়ে আমি বললাম, "এবার টাটকা রঙ লাগাও।" আমার এ উপদেশের ফল পেতে দেরি হল না।

ছবি শেষ করে আমি তল্পিতল্পা গুটোবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় সেই মহিলাটি এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "উড্ উই লাইক্ টু সেল্ দিস্ পেন্টি? ইফ্ সো আই উড বি ডিলাইটেড ইফ্ ইউ লেট মি হ্যাভ ইট ফর ফিফ্‌টি পাউন্ডস্।" এ কি! এ যে স্বয়ং ভাগ্যদেবীর সঙ্গে মোলাকাত! তাঁর দান প্রত্যাখ্যান করি কোন্ সাহসে! তাছাড়া, বেগারস্ ক্যান্ট বি চুজারস্—এ প্রবাদটি আমার মনে আসায় তক্ষুনি রাজি হলাম। তবে হেলেনের ছবিটি তিনি কিনলে আমি আরও খুশি হতাম যদিও, অর্থের প্রয়োজন তার চাইতে আমার আরও বেশি!

হেলেনের ছবি শেষ হবার আগেই মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হয়ে এল। হেলেনকে আশ্বাস দিলাম যে তার ছবি যে অবস্থায় আছে, তাতে করে বাড়িতে বসে অনায়াসেই সেটিকে সম্পূর্ণ করা যাবে। বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি জিমি চুরুট ধরিয়ে মস্ত পোর্সিলেন মাগে বীয়ার খাচ্ছে। আমার বলার অপেক্ষায় না থেকে আমাকেও এক মাগ্ ভরে দিল। জার্মেনীর ব্যাভেরিয়া থেকে আমদানি করা জাত-বীয়ার। চুমুক দিতেই মনে হল, বাঃ বেশ ত আছি!

আজকের লাঞ্চ বলা যায় সাদাসিদে। জিউলেত্তা। আর ইজাবেল্লা মিলে "Spaghetti à la Bolognaise" পরিবেশন করেছে। এ খাবারটি ইতিপূর্বে চেখে থাকলেও যমজ ভগিনীদ্বয়ের হাতের ছোঁয়াচ লেগে যেন অমৃতের সন্ধান দিচ্ছে। কিছুদিন আগে ইতালী ভ্রমণ কালে খাস Bologna শহরের একটি বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় এ বিশেষ খাবারটি খেয়ে রসনার যে অবিস্মরণীয় তৃপ্তি হয়েছিল আজ তার চাইতে কোন অংশে কম মনে হল না। একথা ভগিনীদ্বয়কে জানাতে তারা আহ্লাদে আটখানা হল। এই খাবারটির সঙ্গে মানিয়ে ইতালীয় রেড-ওয়াইন পরিবেশিত হল। তারপর, টাটকা ঘন ক্রীমে আপেলের টুকরো আর আঙুর সাঁতার কাটছে, এমন পুডিং। বাড়ির গরুর দুধের তৈরী ক্রীমের স্বাদই আলাদা। এমন পানীয় এবং ভোজনের পর কিঞ্চিৎ মৌতাত না করলে এ খাদ্যের প্রতি অবিচার করা হবে মনে করে বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিলাম।

সন্ধের আগে নিচে নেমে এলাম। দেখি জিমি আর হেলেনের খুড়তুতো ভাই পীটার মিলে বৈঠকখানা ঘরটিতে আরও বেশ কয়েকটি চেয়ার এনে, নতুন করে সাজাচ্ছে। ইজাবেল্লা গোলাপ ভর্তি ফুলদান নিয়ে এল। জিমিকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে আমায় জানাল যে, তার কিছু ব্যবসায়ী বন্ধুদের জন্যে কক্‌টেল পার্টির আয়োজন করা হচ্ছে।

জনা পনেরো আমন্ত্রিত অতিথি একের পর এক এসে হাজির হলেন। বেশীরভাগই স্বামী-স্ত্রী। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমাদের দেশের সঙ্গে কারবার করেন—কটন্ প্রোডাক্টসের। দু'জন মধ্যবয়েসী ছাড়া আর সবাই প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছেন। এঁদের সঙ্গলাভে আমার তেমন বাসনা না থাকা সত্ত্বেও, অমায়িক এবং "পারফেক্ট জেন্টেলম্যান" জিমির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা গেল না। আমার পার্শ্ববর্তিনী প্রৌঢ়াটি আমাকে জানালেন যে তিনি যৌবনে তাঁর পিতার সঙ্গে ভারত ভ্রমণ করেছেন। কথায় কথায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার এতদিন আগেকার ভ্রমণের সবচাইতে অবিস্মরণীয় সুখস্মৃতি কী?" উত্তরে তিনি যা বললেন তা যেমনই অভাবনীয় তেমনি হাস্যকর। সে কথা মনে এলে আজও আমার পেটে খিল ধরে যায়। তিনি বললেন, "of course it was the Aga Khan by moonlight" তাঁর উত্তরটি তৎক্ষণাৎ আমার মগজকে চ্যালেঞ্জ করে বসল। আগা খাঁ এবং মুন লাইট? এতো salvador Dali'র উপযুক্ত একটি ইমেজ। একদম সুর রিয়ালিস্টিক। আগা খাঁর সঙ্গে চন্দ্রালোকের সম্পর্কটা কী করে পাতান যায় তাই নিয়ে কয়েক মিনিট ধরেই মাথা ঘামাচ্ছি। তবুও মহিলাকে আবার জিজ্ঞেস করি, "আর ইউ সিওর ইট ওয়াজ দ্য আগা খাঁ বাই মুনলাইট?" তিনি এবার ঈষৎ বিরক্তির স্বরে এবং তাঁর চেয়ারের হাতলটি চাপড়ে বললেন, "আই অ্যাম্ অ্যাবসোলিউটলি পজিটিভ।" হঠাৎ আমার খেয়াল হল তাঁর স্মৃতি তাঁর মনে পর্বত প্রমাণ এক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

(এ রহস্য উদ্‌ঘাটনের পূর্বে পাঠকদের কয়েকটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। মহিলা যে আগা খাঁর কথা বলছেন তিনি হচ্ছেন বর্তমান আগা খাঁর ঠাকুর্দা। অর্থাৎ আলি খাঁর—রিটা হেওয়ার্থের স্বামীর—বাবা। তিনি পৃথিবীর সবচাইতে ধনবান ব্যক্তি বলে খ্যাত ছিলেন। দেখতে ছিলেন গোলগাল, মোটাসোটা, এবং খাটো। মাথায় প্রশস্ত টাক)। চন্দ্রালোকে সিক্ত এমন কী দৃশ্য আমাদের দেশে দেখা যায় যা দেশি-বিদেশী সবায়েরই স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকতে পারে? এ প্রশ্নটি মনে আসতেই জবাব পেতে আর দেরী হল না। ইতিমধ্যে অনেক পাঠকেরাই হয়ত ঠাহর করতে পেরেছেন যে, "ইট ওয়াজ দ্য তাজমহল বাই মুনলাইট।"

পরদিন ব্রেকফাস্টের পর ছবি আঁকছি। হেলেন, তার মা, বোন এবং মেরি গ্রামের গির্জায় প্রার্থনা সেরে এবং পাদ্রীসাহেবের সঙ্গে ছোট হাজরি করে তাদের বাড়ি ফেরার কথা। হঠাৎ পরপর দুম্-দুম্ করে অনেকগুলো আওয়াজ আমার কানে এল। একটু কান পাততেই বোঝা গেল এগুলো বন্দুক কিংবা পিস্তলের আওয়াজ। নিতান্তই শান্তিপূর্ণ এই পরিবেশটিতে এ ধরনের আওয়াজ আমাকে অহেতুকভাবে সন্ত্রস্ত করে তুলল। বাড়ির বাইরে এলাম। যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল সেদিকের ঘন গাছপালার দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখি স্বয়ং জিমি গোটা চারেক লোডেড পিস্তল নিয়ে টার্গেট-প্র্যাকটিস করছে। আমাকে দেখতে পেয়ে প্র্যাকটিস্ থামিয়ে বলল, "আই লাভ শুটিং অ্যান্ড হান্টিং! আগামী রবিবার আমাদের হান্টিং ক্লাবের বন্ধুরা মিলে একটা "Greyhound Meet"-এর ব্যবস্থা করেছি। ইট ইজ হাইলী এক্সাইটিং। ইউ মাস্ট কাম!" এই কথা বলার পর আমার দিকে একটি পিস্তল এগিয়ে দিয়ে বলল, "কাম! হ্যাভ এ গো অ্যাট ইট!" এই সব শয়তানী যন্ত্র ছোঁয়া তো দূরের কথা দেখলেই প্রাণটা কী রকম কুঁকড়ে যায়। তাই বললাম, "থ্যাঙ্ক ইউ! আই হ্যাভ টু ফিনিস মাই পেন্টিং!" জিমি বলল, "সামটাইমস্ আই ফিল টেরেব্‌লি বোরড হিয়ার।" মনে মনে মন্তব্য করলাম, "বাঃ! বোরডম্ কাটাবার উত্তম ব্যবস্থা বটে!"

ছবি আঁকা, গান বাজনা শোনা, বনের মধ্যে একা একা ঘুরে বেড়ানো, জীবনানন্দ দাশের ভাষায়, গেলাসে গেলাসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পান করা, তাস খেলা, ভূতের গপ্পো শোনা, সর্বোপরি, চব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খাবার এবং পানীয়—এ সবের মিশ্রণে কার্নফোর্থের দিনগুলো ঝড়ের বেগে উড়ে যাচ্ছে। ওই ভূতের গপ্পো শোনা ছাড়া আর সব কিছুই, একটি রাজকীয় অভিজ্ঞতা বলে মনে হচ্ছে। শরীর এবং মনে স্ফূর্তি আবার টগবগিয়ে উঠছে।

দেখতে দেখতে আরেকটা উইক-এণ্ড চলে এল। কাল রাত্তিরে স্পেন থেকে প্রত্যাশিত অতিথি দু'জন কখন যে এসে পৌঁছেছে তা টেরও পাইনি। ব্রেকফাস্টে তাদের সঙ্গে হেলেন আলাপ করিয়ে দিল। দুই বোন। বয়েসে দু'জনেই কুড়ির নিচে। একটির চোখ আর চুল কালো, অন্যটির

সবুজ প্রান্তরে শরতের অবিমিশ্র সৌন্দর্য

সোনালি চুল আর কলাপাতার মত সবুজ চোখ। মুখশ্রী এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুণাবলীতে উভয়েই এমন সমৃদ্ধ যেন সব কিছু পোশাক-আশাক ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে। বড়টির নাম মেলবা, ছোটটির নাম গিলেরমিনা। শিষ্টাচারে নিখুঁত। স্বভাবে হাসিখুসি। সব মিলে একদিকে স্নিগ্ধতা আরেক দিকে উষ্ণতা, এই দুই পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্যে একটা চাপা আগুন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হেলেন বলল, "আজ লাঞ্চের আগেই তার দুই ছেলে, রিচার্ড এবং জর্জ, উইক-এণ্ড কাটাতে আসবে।" দুই বোন তাই শুনে উল্লসিত।

যথাসময়ে পুত্রদ্বয় লাল রঙের একটি স্পোর্টস-কার চালিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে লাঞ্চে বসে গেল। গাল-গপ্পে এবং হাসির ফোয়ারায় লেইটন হলটি গমগমিয়ে উঠল। কথার ফাঁকে বোঝা গেল যে, দুই ভাই আগামী কালের "Hound-meet"-এ যোগদান করতে এসেছে। লাঞ্চ শেষ হতেই ছেলে এবং মেয়ের দল হাত ধরাধরি করে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। মেয়ে দু'টির আবির্ভাবে আমার মনে যে সাময়িক উত্তেজনা এবং একটি অনির্বচনীয় প্রত্যাশার ঢেউ উঠেছিল, নিরাশার সৈকতে তা

নিখুঁত বনেদিয়ানা ছুঁয়ে আছে বসবার ঘরের প্রতিটি আসবাবকে

মুহূর্তের মধ্যে আছাড় খেয়ে মিলিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গিয়ে একটানা অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে নিলাম।

চোখ খুলে দেখি অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি নেমে এলাম। জিমি যথারীতি কক্‌টেলের ট্রে সাজাতে ব্যস্ত। ছেলেমেয়েদের দেখতে না পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ওরা কি এখনো বাড়ি ফেরেনি?" জিমি বলল, ফিরেই ওরা চারজন গির্জেয় গেছে "Confession" করতে। ক্যাথোলিকদের এই ব্যাপারটা আমার কাছে বরাবরই এক বিকৃত মানসিকতার এবং অভ্যাসের পরিচয় দিয়েছে। যতখুশি ব্যভিচার কর তারপর গির্জেয় পুরোহিতের কাছে আত্মসমর্পণ করে তা স্বীকার কর। তাহলেই সাতখুন মাপ। অনেক ক্যাথোলিকই যে এই প্রথাটির অসদ্ব্যবহার করেন না, তাও স্বচক্ষে দেখেছি। ডিনারের পরও যুবক-যুবতীদের বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য হতে দেখা গেল। হয়ত কাল ভোরে উঠেই আবার "কনফেশন" করতে যাবে। বাস্তবে হয়েও ছিল তাই।

পরদিন, হাউণ্ড-মীটের উত্তেজনা আমাকেও পেয়ে বসল। যদিও, আমি দর্শক মাত্র। যারা প্রথম শ্রেণীর ঘোড়সওয়ার, এ ক্রীড়া শুধু তাদেরই জন্যে। কেন, সে-কথায় একটু পরেই ফিরে আসছি। জিমি, ছেলেমেয়েরা এবং পীটার নাকি ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েছে। হেলেন বলল যে, বেলা দশটা নাগাদ আমরা দু'জন ওদের ক্রীড়াস্থলে পৌঁছব।

প্রায় ঘণ্টা খানেক গ্রামীণ পথে ড্রাইভ করার পর হঠাৎ হেলেন বলে উঠল, "ওই যে, ওদিকে তাকিয়ে দেখ! ওরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে কেমন ছুটেছে!" সেদিকে তাকাতেই দেখি, একদল ঘোড়সওয়ার, টকটকে লাল কোট, ধপধপে সাদা ব্রীচেজ, মাথায় কাউন্টি ক্যাপের মত কালো টুপি, হাতে ছোট চাবুক এমারেল্ডী-সবুজ পশ্চাৎপটে, ঝোপ-ঝাড়, পাঁচিল, বেড়া, নালা ডিঙিয়ে, পড়ি কি মরি করে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে। তাদের আগেভাগে আরও দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে প্রায় পনেরো-কুড়িটা হিংস্র গ্রেহাউন্ড। এতসব দৌড়ঝাঁপ শুধু একটি ছোট্ট নিরীহ বুনো খরগোশ শিকার করার লোভে। এই ক্রীড়াটির নীতিগত বিচারে এখানে না বসাই ভালো মনে করি কারণ, এর স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক যুক্তিই খাড়া করা যাবে। চাক্ষুষ সমৃদ্ধির (visual richness) দিক থেকে দৃশ্যটি যে নিতান্তই মনোহরণকারী এবং উত্তেজনায় ভরপুর সেকথা আর অস্বীকার করি কী করে!

হঠাৎ একটা বিগেল বাজার শব্দ কানে এল। হেলেনকে জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলাম যে এ শব্দটির তাৎপর্য দুটি। প্রথমত, বিগেল বাজা মানে এই যে, গ্রেহাউণ্ডগুলো খরগোশ মেরেছে। দ্বিতীয়ত, সমস্ত ঘোড়সওয়ারকে যে যেখানে থাকুক না কেন, শিকার স্থলে অবিলম্বে চলে আসতে হবে। আমরাও কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছলাম। পীটারের মুখে একান থেকেও ওকান পর্যন্ত হাসি। এরই মধ্যে চারটি খরগোশ শিকার হয়েছে। রক্তাক্ত ওই নিরীহ

প্রাণী কটি একটি জালের ব্যাগে দলা পাকিয়ে আছে। কুকুরগুলোর অত্যন্ত ক্ষিপ্র দৃষ্টি। অনবরত মাটি শুকছে। এই তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তিই তাদের খরগোশের লুকোবার জায়গার খবর দেয়। সেদিকেই তারা ছোটে, তাদের পেছনে ছোটে ঘোড়সওয়ারও। এই ছোটায় কোনো বাধাই অলঙ্ঘনীয় নয়। চাই দুর্দান্ত সাহস, ক্ষিপ্র ঘোড়ার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, বেলাগাম ঘোড়ার সওয়ার হবার অনির্বচনীয় উত্তেজনা এবং আনন্দ ভোগের তীব্র বাসনা। কিন্তু এই আনন্দ সম্পূর্ণ বিপদ মুক্ত নয় কারণ, যেহেতু গ্রেহাউণ্ডগুলো কোনো নির্দিষ্ট পথে ছোটে না, সেহেতু ঘোড়ারও কোনো নির্দিষ্ট পথ নেই। বেড়া, পাঁচিল (স্বভাবতই খুব উঁচু নয়) ডিঙোতে গিয়ে, অনেক ঘোড়ারই পা ভাঙে, সওয়ার জখম হয়।

দু ঘণ্টাকাল এই উত্তেজনায় কাটাবার পর ঘোড়সওয়ারদের চিবুকগুলো অসাধারণ লাল হয়ে উঠেছে। দরদর করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। এক রাউণ্ড বীয়ার পানের পর পীটারের বিগেল আবার বেজে উঠতেই কুকুর এবং ঘোড়সওয়ার ছোটার জন্যে প্রস্তুত। পীটারের ঘোড়া লীড দিতেই সবাই সেদিকে ছুট দিল। একটি ঘন সবুজ উপত্যকার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনেক দূরে যখন আবার তাদের সঙ্গে দেখা হল তখন বেলা প্রায় দুটো বাজে। কুকুর, ঘোড়া, মানুষ তখন শ্রান্ত এবং অবসন্ন। সবসুদ্ধ ছটি খরগোশ শিকার হয়েছে। কাঠের আগুনে সবকটিকেই রোস্ট করা হচ্ছে। একটি চাঁদির রেকাবিতে অনেক রক্ত থকথক করছে। আরেকটিতে রাখা আছে খরগোশের থাবাগুলো। আগুনের চারপাশে গোল হয়ে আমরা সবাই বসে পড়লাম। পীটার লাল রঙের রেকাবিটি তুলে নিয়ে উপস্থিত সবায়ের গালে রক্তের ফোঁটা পরিয়ে দিল এবং এই ঘোষণা করল যে, কাঠের শীল্ডে মাউন্ট করে, নাম-ধাম-দিন-ক্ষণ-সাল লিখে প্রত্যেককে এককেটি থাবা উপহার দেওয়া হবে, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। "গ্রে হাউন্ড মীট"-এর এই আচার-অনুষ্ঠান নাকি আবহমান কালের।

পরদিন ব্রেকফাস্ট খেতে এসে দেখি জিমি, রিচার্ড এবং জর্জ—তিনজনই উধাও। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে যার যার কর্মস্থলের দিকে রওনা হয়ে গেছে। গত দুতিন দিনের প্রাণচঞ্চলতায় হঠাৎ যেন ভাটা পড়ল। বিশাল এই অট্টালিকাটি লোকের অভাবে কিরকম যেন আবার ঝিমিয়ে পড়ল। এই নির্জনতা খুবই উপভোগ্য। বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে আদর্শ সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মত নারীসঙ্গলিপ্সু যুবকের পক্ষে দিনের পর দিন, চারটি বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া এবং মধ্যবয়েসী মহিলার সঙ্গে সময় কাটানো খুব যে একটি সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না তা আর অস্বীকার করি কী করে!

মেলবার কলাপাতার মত সবুজ আর স্বপ্নময়ী চোখ দুটি আমাকে নিয়তই আকর্ষণ করে। আমি যখন ছবি আঁকি সে নীরবে পেছনে এসে দাঁড়ায়, সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। মুচকি হাসির বিনিময় হয়। এই ভাবে কয়েকদিন কাটাবার পর, একদিন বিকেলে আমি তাকে বলি, "লেট আস গো ফর অ্যা ওয়াক!" এ প্রস্তাবে সে তৎক্ষণাৎ সায় দিল। আমরা ঝোপে-ঝাড়ের দিকে অগ্রসর হলাম। ব্যাপারটি হেলেনের দৃষ্টি এড়াল না। তার গোঁড়া ক্যাথোলিক নৈতিকতা চাড়া দিয়ে উঠল। হয়ত তার ধারণায় আমার সঙ্গদোষে মেলবা একটা দৈহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারে।

ডিনারের পূর্ব মুহূর্তে আমাকে একান্তে ডেকে, নানা কথার ফাঁকে হঠাৎ আমার হাত ধরে সে অনুরোধ করল, "সেন প্লিজ ডোন্ট ডু এনিথিং উইথ মেলবা! প্রমিস?" প্রমিস না করে আর উপায় কি! শিকার হাত থেকে ফসকে যাবার এমন কত কাহিনীই তো আছে! কতোই আর শোনাব! আমার সে-বয়েসের জীবন-বৃক্ষে কত কুঁড়িই যে ফুল হয়ে প্রস্ফুটিত হবার আগেই ঝড়ে পড়েছিল তার হিসেব দিয়ে পাঠকদের আর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। রাত্রিভোজনান্তে যথারীতি ক্যানেস্টা খেলার পর হেলেন, "সদ্য ভূতের কাহিনী" বইটি গিলেরমিনার হাতে দিয়ে বলল, "আজ তুমি পড়ে শোনাও! এতে তোমার ইংরিজি উচ্চারণের আরো উন্নতি হতে বাধ্য।" যে গপ্পোটি সে শুরু করেছিল সেটির আরম্ভটা অনেকটা এই রকম ছিল। "স্কটল্যান্ড এবং ইংলণ্ডের সীমানায় নির্জন পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটি গ্রামে সদ্যবিবাহিত জোয়াকিম এবং মার্গারেট অঘোরে ঘুমচ্ছিল। তখন রাত প্রায় দুটো। হঠাৎ এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজে তারা উভয়েই ধড়ফড় করে উঠে বসল। নিচে খাবার ঘর থেকে অনেক কাঁচের এবং পোর্সিলেনের তৈরি বাসনপত্র চুরমার হবার শব্দ কানে এল। তাড়াতাড়ি সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখল যে, দরজা জানালা যেমন তারা খাবার শেষে বন্ধ করে রেখেছিল, ঠিক তেমনই আছে। অথচ ঘরের মধ্যে এক তাণ্ডব নৃত্য হয়ে গেছে! বিস্ময় এবং ভয়ে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হঠাৎ টেলিফোনের আওয়াজ শুনে ওরা দুজন চমকে উঠল। মার্গারেট দৌড়ে গিয়ে রিসিভার উঠিয়ে অনেকবার হ্যালো, হ্যালো বলল। কিন্তু ওদিক থেকে কোনো সাড়া নেই। মিনিট কয়েকবাদে আবার ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং! এবার জোয়াকিম টেলিফোন ওঠাতেই এক বহু পরিচিত মহিলার কণ্ঠ নিতান্তই আবদারের সুরে এবং খশখশে স্বরে বলল, "হ্যালো ডার্লিং।" শুনেই সে তৎক্ষণাৎ রিসিভারটি নামিয়ে রেখে মার্গারেটকে বলল, "কেউ নয়"। আমার এ রচনা সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক অংশটুকু পাঠকদের শুনিয়েই বই-এর কাহিনীর যবনিকা টানব! যার কণ্ঠস্বর জোয়াকিম শুনতে পেয়েছিল, সে ছিল তার বিবাহপূর্ব জীবনের উপেক্ষিতা নায়িকা। এই গ্লানি সহ্য করতে না পেরে, কড়িকাঠ থেকে ঝুলে নিজের প্রাণ সে নিজেই নিয়েছিল।

বই পড়ার শেষে হেলেনের বোন মেরি তত্ক্ষণাৎ বলে উঠল, "আরে! এতো অনেকটা আমাদের এ বাড়িরই এক ঘটনার মত!" কিঞ্চিৎ কৌতূহল এবং ভদ্রতার খাতিরে বললাম, "তাই নাকি!" তার গপ্পোটি শোনার কোনো ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও আমাকে শুনতেই হল।

বেশ কয়েক বছর আগে এক ভরা গ্রীষ্মে ফ্রান্স থেকে "শন্তাল্" (chantal) নামে এক সুন্দরী যুবতী ইংরিজি শেখা এবং ছুটি কাটাবার উদ্দেশ্যে লেইটন হলে কয়েক হপ্তা কাটিয়েছিল। ঠিক সেই সময় হেলেনের বড় ছেলে রিচার্ডের এক বন্ধুও লণ্ডন থেকে সেখানে ছুটি কাটাতে আসে। বিত্তবানের ছেলে। লাল রঙের ইতালীয় "ফেরারী" গাড়ি চালায়। চেহারায় তেমন সুশ্রী না হলেও, যৌবনরসে দীপ্ত। নাম জ্যাক্ গোল্ডিং। ব্যাপারখানা ঠিক যেন উনুনের ধারে মাখনের বাটি রাখার শামিল হল। ব্যস্ শন্তালকে দেখতেই জ্যাক লাট্টু। জ্যাক স্বভাবে মিষ্ট কিন্তু স্বল্পভাষী। কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের বন্ধুত্ব ঘনীভূত হয়ে প্রণয়ের রূপ নিল। এমন অবস্থায় যা হয় তাই হল। দেখতে দেখতে জ্যাক গোলিডং-এর ছুটি প্রায় শেষ। লণ্ডনে ফিরে যাবার আগের রাত্তিরে জ্যাক শন্তালকে বিবাহের প্রস্তাব জানাতেই, সে বাগ্‌দত্তা এই অজুহাতে সে জ্যাককে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করল।

পরদিন ব্রেকফাস্টে গোল্ডিং অনুপস্থিত। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর যখন কোনোই সাড়া পাওয়া গেল না তখন ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ঘর খুলতেই যে দৃশ্য উদ্ঘাটিত হল, তা দেখে সবাই মূর্ছা যায় আর কি! কড়িকাঠ থেকে জ্যাক্ গোল্ডিং ঝুলছে। না ভেবে চিন্তেই মেরিকে জিজ্ঞেস করি, "ঘটনাটি ঠিক কোন্ তলার কোন্ ঘরটিতে ঘটেছিল?" উত্তরে সে বলল, "তোমারই ঘরে?" আমার মেরুদণ্ড বেশ সিরসির করে উঠল, লোমকূপগুলো ঘামাচির মত ফুলে উঠল। আমাদের জীবনে অনেক সময়েই পরিস্থিতি এবং ঘটনার এমন সব বিস্ময়কর প্রবাহের সম্মুখীন হতে হয় যে তখন মনে প্রশ্ন জাগে, "Does art imitate life, Or, life imitates art?"

মেরির গপ্পো শেষ না হতেই টেলিফোন বাজার শব্দ শোনা গেল। টেলিফোনটি দেয়ালে টাঙান আছে এক লম্বা করিডরের শেষে। হেলেন গটগট আওয়াজ এবং শিস্ দিতে দিতে সেদিকে এগিয়ে গেল। "হ্যালো," বলার সঙ্গে সঙ্গেই হেলেনের বিকট চিৎকার শোনা গেল। আমরা সবাই, এমন কি হেলেনের বৃদ্ধা মা, ছুটে গেলাম। দৃশ্যটি ছিল অবিকল অ্যালফ্রেড্ হিচককের ছায়াছবির মত। দেয়াল থেকে ফোনের রিসিভারটি ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলছে। হেলেন অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়ে আছে। চোখ অর্ধনিমীলিত। মুখ নীল। হেলেনের মা, তাকে ঝাকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হেলেন, হু ওয়াজ ইট?" মেরি দৌড়ে গিয়ে এক জাগ ঠাণ্ডা জল এনে বেশ খানিকটা তার মুখে ছিটিয়ে দিল আর খানিকটা ঢেলে দিল তার গলায়। টেলিফোনের রিসিভার থেকে একটা অস্পষ্ট স্বর এখনও বেরুচ্ছে। হেলেন চোখ মেলে ক্ষীণ স্বরে বলল, "ইট ওয়াজ গোল্ডিং! সর্বনাশ। নামটি শুনে আমারও প্রায় হেলেনের মতই অবস্থা হল! হাত পা সব জমে যাচ্ছে। হাড়গুলো ঠকঠক করছে। দাঁতে দাঁত লেগেছে। আশ্চর্য! মিসেস গিলেণ্ডারের চোখেমুখে কোনই আবেগের চিহ্ন নেই। তিনি হঠাৎ রিসিভারটা তুলে জিজ্ঞেস

করলেন, "হ্যালো, হু ইজ ইট ?...হোয়াট ?...হু ? জন গোল্ডী ?" তিনি একটা পর্বতপ্রমাণ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "ওঃ ! ইট ইজ ইউ ? থ্যাঙ্ক গড় !"

আমরা সবাই হেলেনকে ধরে বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে এলাম। হেলেনের মা বললেন, "জন্ আগামীকাল লণ্ডন থেকে গ্লাসগো যাবার পথে একরাত্রি আমাদের সঙ্গে কাটাতে আসছে।" হেলেন বলল, ফোনে আমাকে শুধু গোল্ডিং স্পিকিং বলায় আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম।" জন্ ছিল জ্যাকের ছোট ভাই।

আর এক দণ্ডও এখানে নয়। কাল কিংবা বড়জোর পরশুর মধ্যেই এই স্থান ত্যাগ করতে হবে। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে এবং সবাইকে গুড নাইট বলে ওপরের দিকে উঠে গেলাম।

ঘরের সব কটা বাতি জ্বালিয়ে রেখে বই পড়ায় মন দিলাম। মনোযোগ দেব কি ! আমার মনের চার দেয়ালে তখন গোল্ডিং, গোল্ডিং-এর প্রতিধ্বনি ক্রমশই তারসপ্তকে উঠছে। বইটি বন্ধ করে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। কড়িকাঠের দিকে চোখ যেতেই মনে পড়ল যে, এ ওখান থেকেই একদিন জ্যাক গোল্ডিং নিজেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। আমার কল্পনাপ্রবণ মানসচক্ষে পরিষ্কার দেখতে পেলাম যে, তার ফ্যাকাশে অসাড় নিস্তেজ শরীরটা একটা আধো-ভাঙ্গা শুকনো ডালের মত ঝুলছে। হাওয়ায় ঈষৎ দুলছেও। এভাবে গোটা রাতটা কাটাব কী করে ? এসব কথা ভাবছি এমন সময় ঘরের ফায়ার প্লেসের দিক থেকে একটা খসখস আওয়াজ আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল। একটু থেমেই আবার শুরু হল। কী মুশকিল ! আজ প্রায় দু হপ্তা ধরে এ ঘরে রাত কাটাচ্ছি। অস্বাভাবিক কোনও আওয়াজ তো আজ পর্যন্ত কানে আসেনি। ভাবছি ঘর থেকে পালাই। নিচে নেমে হেলেনকে জাগিয়ে তুলে বলি যে, আমি তোমার ঘরে শোব। না না ! সেটা নেহাৎই পাগলামি হবে। না, এত ভয় পেলে চলবে কী করে। দেখা যাক না আওয়াজটা কিসের। এই ভেবে এক পা দু পা করে এগিয়ে গেলাম। ফায়ার প্লেসের পাশে একটা ওয়েস্ট পেপার বাসকেট রাখা ছিল। আওয়াজটা তার ভেতর থেকে আসছে কি ! অনুসন্ধান করার আগেই একটা ইঁদুর লাফ দিয়ে উঠতেই আমার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ থেমে গেল। রক্ত হিম হয়ে এল। দৌড়ে নিচে নেমে হেলেনের ঘরের দরজার সামনে উপস্থিত হলাম। কয়েক ঘন্টা আগেকার যেঅভিজ্ঞতারভেতর দিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল তারপর, তাকে এখন জাগানো নিতান্তই অমানুষিক কাজ হবে। কিন্তু কী করি ! আর যাই হোক্ নিজের বিছানায় আর কোনোমতেই ফিরে যাব না। অগত্যা করিডরে পায়চারি করেই রাত কাটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। দুঃসময় যখন কারুর আসে তখন জোঁকের মত লেগে থাকে। করিডরের দুপাশে বারোশিঙ্গার মুণ্ডুর বিস্ফারিত চোখগুলোর দিকে নজর যেতেই সোজা বৈঠকখানার আলো জ্বালিয়ে সোফায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ব্যস ! আর একদিনও এখানে থাকা নয়।

পরদিন নানা অজুহাত দেখিয়ে হেলেনের কাছ থেকে বিদায় নেবার অনুমতি চাইলাম। হেলেন কিছুতেই রাজী নয়। অগত্যা স্থির হল অন্তত আরেকদিন লেইটন হলে কাটাতেই হবে। সে রাত্রির ডিনারের মেনুটা সংক্ষিপ্ত হলেও মনে রাখার কারণ আছে। যথাক্রমে সেটি ছিল, গার্লিক স্যুপ্ উইথ পোচড্-এগ, লব্স্টার উইথ ফ্রাইড মাশরুম ল্যাম্ব রোস্ট, সালাদ এবং চীজ পুডিং। এই বিশেষ রোস্টটির প্রস্তুত প্রণালীর একটু ব্যাখ্যার দরকার। বাচ্চা ভেড়াটির গা চিড়ে তার ফাঁকে ফাঁকে বেকন ঠেসে দেওয়া হয়েছে। রোস্ট হবার পর সরু করে কাটা মাংসের টুকরোগুলো প্রত্যেকের প্লেটে আলাদা ভাবে সাজিয়ে ব্র্যান্ডি ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। তার সঙ্গে একটি সস্ যা তৈরী হয়েছে রেড-ওয়াইন টোমাটোর নির্যাস, বোন্ ম্যারো, থাইম অ্যান্ড নাট মেগের মিশ্রণে। নামে এবং ব্যাখ্যায় মনে হল পুরোটাই ফরাসী স্বাদে এবং গন্ধে ভরপুর।

আজ পয়লা সেপ্টেম্বর। সরকারীভাবে শরৎকালের শুরু। আকাশে ছাই এবং সাদা রঙের মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ঘন নীলের পোঁচ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কখনো রোদ, কখনো ছায়ার লুকোচুরির খেলায় আজ গোটা কার্নফোর্থ গ্রামটি অভূতপূর্বভাবে মনোরম লাগছে। গাছপালায়, ফলেফুলে শরতের রঙের যে মেলা বসেছে আমার নীরস কলমে তা যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারব না বলে এঁকে দেখালাম। খানিকক্ষণ পরেই লণ্ডনের দিকে পাড়ি দিতে হবে। গোছ-গাছ করে নিচে নেমে এলাম। সদর দরজার সামনে সবাই—মেরি, জুডিথ, গিলেরমিনা, মেলবা, জিউলেত্তা, ইজাবেল্লা—দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস পেনেলোপি গিলেন্ডারও। তাদের পায়ের কাছে আছে হ্যামলেট, ড্যাণ্ডী, ওফিলিয়া, স্কারলেট। তারা আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সবায়ের সঙ্গে করমর্দন এবং চুম্বনের পালা শেষ করে স্টেশান-ওয়াগনে প্রবেশ করতে যাব এমন সময় চারটি চতুষ্পদীই একসঙ্গে চাপা স্বরে অদ্ভুত আওয়াজ করতে থাকল। তারা আমাকে কী জানাতে চাইল তা অবশ্যই আমার পক্ষে ঠাহর করার উপায় ছিল না। যথাসময়ে ট্রেন এসে হাজির। হেলেন আমাকে জড়িয়ে ধরে দুগালে উষ্ণ চুম্বনে বিদায় দিয়ে আমার কোর্টের পকেটে একটা খাম গুঁজে দিল।

ট্রেনে বসে খামটি খুলে দেখি তাতে আছে একটি পঞ্চাশ পাউণ্ডের চেক্। সঙ্গে দু লাইনের চিঠি। "I hope you find it useful. Look after yourself. Come back to Carnforth. Love."

আজ অনেকদিন হল হেলেনের শরীরী সত্তা কার্নফোর্থে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু তার আত্মার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আজও অটুট আছে। থাকবে আমার এই পৃথিবীর মায়া কাটাবার পরও। আমি ছিলাম তার প্রথম এবং শেষ ভারতীয় বন্ধু। কেন আমায় সে তার অবিমিশ্র গভীর স্নেহের ডোরে বেঁধেছিল তা আমার কাছে আজও আকাশপ্রমাণ এক রহস্য হয়ে আছে। এ পৃথিবীতে কিছু লোক জন্মায় যাদের অভিধানে শুধু "দেওয়া" শব্দটিই থাকে। "নেওয়া" শব্দটি থাকে অনুপস্থিত। সে বিচারে হেলেন যে সার্থক ক্যাথোলিক ছিলেন তাতে আর সন্দেহ কি !

এ অঞ্চলের সবচাইতে বন্দিত কবির দু'টি ছত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে তার আত্মার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এই রচনাটি শেষ করাই উপযুক্ত মনে করি।

"The good die first,/ And they whose hearts are dry as summer dust/ Burn to the socket."

উন্মুক্ত আকাশ, তার তলায় গাছপালা জল— কনস্টাবলের আঁকা ছবির কথা মনে পড়িয়ে দেয়

"আগে থাকতে চাই দমভর শক্তি"

বললেন কপিল দেব
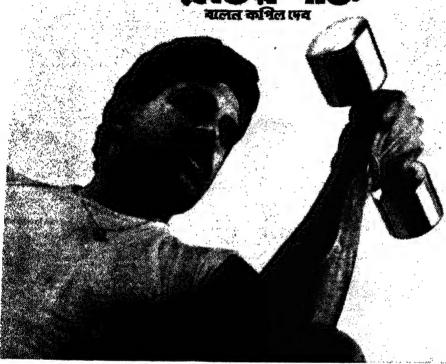
ব্যাটারি, যা দমভর শক্তিতে রয়েছে আগে

কপিল আর নিপ্পোর এক ব্যাপারে দারুণ মিল। উভয়েরই রয়েছে দমভর শক্তি।
নিপ্পো'র ভরপুর শক্তির কারণ হ'ল, ইণ্ডো-ন্যাশনাল আর জাপানের জগৎ প্রসিদ্ধ মাৎসুশিটা ইলেকট্রিকের সহযোগিতার ফলাফল—যে মাৎসুশিটা ইলেকট্রিক হল ন্যাশনাল, প্যানাসোনিক ও অন্যান্য নামকরা ব্র্যাণ্ডের প্রস্তুতকারক।
সুতরাং, যেকোনো ব্যাটারির আপনার দরকার হোক না কেন, চান শুধু নিপ্পো—বিশ্বশ্রেণীর ব্যাটারি, যার রয়েছে আধুনিকতম টেকনোলজি—আর অপরাজেয় শক্তি।

everest/87/INL/376-bn

কাছের যে দূর

সমীর মুখোপাধ্যায়

শুধু ছোটবেলাতেই নয়, বেশ বড়বেলাতেও, এখনও, যখন কোথাও যাবার থাকে না, যখন যেতে চাইছি না তোলাফটক ছাড়িয়ে তালডাঙা, তালডাঙা ছাড়িয়ে চারঠাকুরতলা, চারঠাকুরতলা ছাড়িয়ে খুনেপাড়া, খুনেপাড়া ছাড়িয়ে…, বাসে যেতে ইচ্ছে করছে না, অমন যে প্রিয় সাইকেল আমার তাতে সওয়ার হতে ইচ্ছে করছে না অথচ ঘরে বসে থেকে থেকে কাঁকড়াবিছের কামড় খাচ্ছি, হঠাৎ মনের মধ্যে এমনও হচ্ছে যদি কোন বন্ধু মন কেমন করা এই অবেলায় একটা লালরঙের মারুতি নিয়ে আসে, আমাকে চোখ ইসারায় ডেকে নিয়ে যায় মাইল পনেরো দূরে সেই দিল্লি রোডে সংগম রেস্টুরেন্টে, যেখানে গাছগাছালির তলায় বেতের চেয়ারে দুজনে বেশ মুখোমুখি সাব্যস্ত হয়ে বসি (মাত্র দুজনই। সংখ্যা বেশী হলে স্বপ্নভঙ্গ হবে)।

এমন সময় বাইরে দিল্লি রোডে শুরু হবে অঝোরঝরণ বৃষ্টি আর সেই বৃষ্টির পর্দা এফোঁড় ওফোঁড় করে ছিঁড়ে চলে যাবে গাঁক গাঁক করে হেডলাইট জ্বালানো এক একটি দৈত্যাকার লরি—কিন্তু এসব যখন হবারই নয়, সেই লাল মারুতি যখন আসবেই না, আসবে না সেই 'হেমন্ত-সন্ধ্যার বন্ধু', চোখ ইসারায় কেউ ডাকবেই না, তখন মাইল দুয়েক দূরে হেঁটে ব্যান্ডেল স্টেশনে একবার পৌঁছলেই হ'ল—সেও বড় কম উত্তেজক নয়।

আহা—ফ্লাডলাইটের নীচে সেই দৃশ্য, যত পরিচিত ততোটাই অপরিচিত—যা আমার ছোটবেলা ছাড়িয়ে বড়বেলাতেও সেই একই আছে। ব্যান্ডেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বন্ধুবিহীন বসে আছি, ভিড়ের গলা ছাপিয়ে কাক ঠোঁটে এ ও কথা বলে যাচ্ছে, টিনের সেডের ভেতর মাকরী আর সেডের বাইরে মাইল মাইল অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে হ্যালোজিনের ফ্লাডলাইট, মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে অনবরত, ট্রেন থেকে লোক হুড়মুড় করে নাবতে না নাবতেই তার চেয়েও হুড়মুড় করে লোক উন্মত্তের মত উঠে পড়ছে ট্রেনে, এরই মধ্যে বিটনুনের ছিটে দেওয়া চপ কে যেন কিচকিচিয়ে খাচ্ছে, আমি মাঝে মাঝে কাপুরের চা আর বাদামভাজার সঙ্গে নিঃশব্দে মচমচে একটু গল্প সেরে নিচ্ছি—হঠাৎ সেই অবাক—করা দৃশ্য, সেই একই মুখচ্ছবি। বিশাল বাইসনের মত অতিকায় একটি এম· জি· ইঞ্জিন, একটা ধোঁয়া-ওঠা ইঞ্জিন শ্বাস টানতে টানতে কখন নিঃশব্দে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেখান থেকে যেমন আমার ছোটবেলাতেও হত তেমনই এই বড়বেলাতেও টুপ করে নেমে পড়েছে সেই ড্রাইভারটি, তার চেহারার আজও কোন বদল হয়নি। ওর গায়ে কয়লার গুঁড়ো বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, তা এখান থেকেও। আর দেখতে পাচ্ছি ওর মুখে কী অপরিসীম ক্লান্তি—হঠাৎই দেখি—যেমন দেখতাম আগে, এখনও ঠিক তাই, ওর হাতে উঠে এসেছে একছড়া কলা আর ও কাঁউ কাঁউ করে একের পর এক গোগ্রাসে গিলছে। ঝকঝকে আলোয় ওর ঘামে ভেজা চকচকে মুখ কয়লার গুঁড়ো ছড়ানো ওর চওড়া পিঠ, দুপা ফাঁক করে দাঁড়ানো ওর বেপরোয়া ভঙ্গি—ওকে দেখে মনে হচ্ছে মায়ামঞ্চের এক দুর্ধর্ষ নায়ক, ওর পিছনে যেন চিত্রপটে আঁকা ইঞ্জিন, যেন রীতিমত ক্লান্ত হলেও জীবনের এখনও রহস্যময় কোন বাঁকের দিকে চলে যেতে উৎসুক।

আমার মনে আছে ছোটবেলায় একদিন স্বপ্নে দেবী সরস্বতী আমাকে দেখা দিয়েছিলেন। তখন তো আমি খুব নিষ্পাপ ছিলাম—তাই। উনি কোথায় যেন দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর মাথায় শিউলী ঝরে ঝরে পড়ছে, উনি তারই দুটি একটি হাতে নিয়ে লীলাচ্ছলে 'বড় হয়ে তোমার কী হতে ইচ্ছে

করে ?'— কত কীই তো লোকে ইচ্ছে করে, সফল নাই বা হল, যত অসম্ভবই হোক ইচ্ছে করতে আপত্তি কী, সাঁইবাবা হতে ইচ্ছে করে কেউ কেউ, বড় খেলোয়াড়, বড় গায়ক, বড় লেখক কিংবা রাজনীতিবিদ। আমার এমনই মতিচ্ছন্ন, দেবীর এ প্রশ্নের জবাবে সেদিন স্বপ্নে আমি নিদ্বিধায় জানিয়েছিলাম, 'সত্যি বলছি আমার ড্রাইভার হতে খুব ইচ্ছে করে।'

দেবীর অতো বুদ্ধি আর জ্ঞানও তো অনেক, তবু আমার এ জবাব শুনে তিনিও ভড়কে গেলেন। যে হাসিটি কেবলমাত্র তিনিই হাসতে জানেন সেই হাসিটি হেসে বললেন, 'ওমা ! এতো জিনিস থাকতে শেষ পর্যন্ত ড্রাইভার ! কী বুদ্ধি !' তারপর একটু ইংরেজী মিশিয়ে বললেন, 'তোমার ওদিকে অত ফ্যাশিনেশন কেন ?' বললাম, 'ড্রাইভার হলে বেশ সারা ভারত কেমন ঘোরা যাবে। ঐ রকম গাঁক গাঁক ক'রে ইঞ্জিন চালিয়ে দেশ দেশান্তর মাড়াতে মাড়াতে, সমতল, পাহাড়, উপত্যকা গুঁড়ো গুঁড়ো করতে করতে এই যে যাওয়া—এর চার্মই আলাদা। এসব কথা বলতেও এই দেখুন আমার গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠছে। উঃ ! আপনি তো সব পারেন, করে দিন না আমাকে ট্রেনের ড্রাইভার ! আমি তো বড় কিছু তেমন হতে চাইছি না।'

দেবী একটু বিমনা হয়ে গেলেন তারপর প্রসন্ন হেসে বললেন, 'তথাস্তু। ড্রাইভার না হয়েও তুমি থাকবে আজন্ম কোন রেলের ইঞ্জিনের ড্রাইভার। ঘরে আর তুমি থাকতে পারবে না। ঘর ছাড়া হয়ে ঘুরতে হবে তোমায় পথে পথে। কেমন, এই চেয়েছো তো।'

আমি আপ্লুত স্বরে বলেছি, 'এর চেয়ে ভালো আশীর্বাদ আমি চাই না।'

স্বপ্নে দেবীর সেদিনের সেই আশীর্বাদ আমার জীবনে কীরকম অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে—তা কেবল আমিই জানি। আজও যখন হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দাঁড়াই রাত আটটার পর, ঘরে ফেরার ট্রেন লেটে রান করছে শুনি, তখন পায়ে পায়ে তেরো নম্বর প্ল্যাটফর্মটির দিকে এগিয়ে যাই, হাতে ভারী ব্যাগ নেই তবু যেন ব্যাগ আছে এরকম একটা ভঙ্গী করতে ভালো লাগে, সঙ্গে কুলি নেই তবু যেন মাথায় হোল্ডঅল চাপানো একটা কুলি মনে মনে ঠিক করেনি, আমার পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে, নাচতে নাচতে যাচ্ছে কত মানুষ, সবাই বলছে দিল্লী চলো, দিল্লি চলো, বম্বে চলো, গোয়া চলো—তাদের ভাগ্যকে ঈর্ষা করতে করতে ভাবতে ভালোবাসি আমাকেও একজন যাত্রী ভেবে অন্য কেউ হয়তো ঈর্ষায় পুড়ে মরছে, আমি জানি এসব ভাবা মানেই যাওয়া। এমন হয়েছে কতবার। সত্যি সত্যি ব্যাগ সমেত আমি তেরো নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে হাজির হয়েছি। কোথায় যাবো কোন কিছু ঠিক করিনি। টিকিটের জন্যে আমার বিশেষ কোন ভাবনা নেই। রেলের অফিসে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। ভাবনা তো রিজারভেশন নিয়ে ? আমার সে ভাবনা নেই। ট্রেনে দুরাত্তির না ঘুমোলে চলে। খাওয়ারও ভাবনা নেই। এ ট্রেনটা তাহলে মাদ্রাজ চলল ? সেই সুদূর মাদ্রাজ। ভাবতেই রোমাঞ্চ

লাগে। এ ট্রেনটা কোথায় ? কে যেন বলল, রাজধানী এক্সপ্রেস। তাই ! গায়ে রোমহর্ষ দেখা দিল। আর এটা ? কে যেন বলল, রাজধানী এ্যানাউন্সমেন্ট হল, গোয়াগামী ট্রেন ছাড়ছে এক্ষুনি। সত্যি ? লোকগুলোর কী ভাগ্য ! ওরা গোয়া যাবে ? আহা—গোয়ার সী বীচ ! সেখানে নাকি পরীরা স্নান করে ! আমি এক একটা এ্যানাউন্সমেন্ট শুনি আর অভিভূত হয়ে যাই। তারপর উঠে পড়ি নিজের ট্রেনে।

সেবার মানে ১৯৭৪ সালে সারা ভারত রেলওয়ে স্ট্রাইক হয়, সেবার খুব মজা হয়। স্ট্রাইকের দিন তিনেক আগে হঠাৎ একটা সুযোগ জুটে গেল বম্বে যাবার। আমার ছেলের বয়েস তখন চার। তিনদিন লেগেছিল বম্বে যেতে। আমার খারাপ লাগেনি। ঐ প্রথম দু এক ঘন্টাই যা কষ্ট, তারপর ট্রেনের সংসারটা কেমন দেখতে দেখতে অভ্যেস হয়ে যায়। আসল সংসার যেন মনে হয় ছায়াবাজীর খেলা। তিন তিনটে দিন, আমার বেশ মনে আছে, বড় সুখে কাটিয়েছিলাম ট্রেনে।

তারপর বম্বে নেমেই সঙ্গে সঙ্গে সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আমি শহরে নেমেই এমন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম যে কী বলবো। দুপাশে বিশাল আয়তনের সারিবদ্ধ অট্টালিকা, একই ছাদ, একই উচ্চতা, আর মাঝখানে একটি—মুখ দেখা যায়

এমন—স্বচ্ছ দর্পণের মত সুমুখ খোলা এক আশ্চর্য বিস্তৃতি। হঠাৎ সম্পূর্ণ নবাগত আমাকে রাস্তাটা ডাকলো। সত্যি বলছি, ডাকলো। আর অবাক হয়ে দেখলাম আমি ক্রমাগত রাস্তার ফুটপাত ধরে ছুটছি। বম্বের চওড়া, মসৃণ, দর্পণের মত স্বচ্ছ নির্জন রাস্তাগুলি মাঝে মাঝেই আমাকে ডাকতো। অমন গায়ে গায়ে লাগানো অতো উঁচু উঁচু বাড়ী আমি বম্বে আসবার আগে এ জিন্দেগীতে কখনও দেখিনি। দুই বিশাল অট্টালিকার এক চিলতে ফাঁক দিয়ে আরবসাগরের নির্জন-নীল জলরাশি ছলকে উঠতো—আমি বাঘ-মার্কা দোতলা বাসের টঙ থেকে এ অমূল্য দৃশ্য নেশাখোরের মত উপভোগ করতাম। বেশ মনে আছে বম্বের বাসগুলির মাথায় ছিল মারাঠী লিপি। যেহেতু মারাঠী লিপি আমি পড়তে পারতাম না, যেহেতু কারুর কাছ থেকে শিখে নেবার আমার কোন তাড়া ছিল না, তাতেই খেলাটা খুব জমতো। আমি যে কোন জায়গা থেকে যে কোন বাসে উঠে পড়তাম। এখন চলুক না বাস যথা তথা। আমার সেদিন কোন তাড়া ছিল না, কী সুন্দর ছিল দিনগুলি, হুগলী একেবারে মুছে গিয়েছিল। কন্ডাক্টর আমাকে জিগ্যেস করলে বরাবরই আমার সহজ উত্তর ছিল, 'লাস্ট স্টপ'। কন্ডাক্টর আমার দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাতো, কিন্তু আগিয়ে দিতো লাস্ট স্টপের টিকিট। আমার ভরসা ছিল যত যাই হোক আমি তো ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস চিনি আর চিনি ক্রফার্ড মার্কেট।

বম্বেতে যে কদিন ছিলাম রেলওয়ে স্ট্রাইকের জন্য ঘরে ফেরার দিন ছিল অনিশ্চিত, পকেটের টাকা প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল—খুব কষ্টেসৃষ্টে, একবেলা না খেয়ে দিন গুজরান করতে হত তথাপি এই ব'লে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতাম যে এ ভ্রমণে আমি স্বজনবর্গ বা বন্ধু কাউকেই সঙ্গী হিসেবে পাইনি। কেননা এর আগে যেখানেই গেছি সেখানেই দংগল, সে বন্ধুদেরই হোক অথবা আত্মীয়দের। তারা আমার জীবনে ভ্রমণের আনন্দ একেবারে ঘুচিয়ে দিয়েছে। মহিলা থাকলে তো কথাই নেই। সব সময় কান খাড়া করে থাকো কখন তাদের পান থেকে চুন খসবার শব্দ হয়, সব সময় তাদের বস্তার মত বয়ে যাও, সব ব্যাপারেই তাদের নাক কুতুব মিনারের মত উঁচু, উঁহু, ওটা নয়, এটা কী এনেছো ! ওটা ঠিক তোমার মত বিচ্ছিরি। তাঁরা, মহীয়সী মহিলারা যেখানেই আমার কাঁধে ভর করেছেন, সেখানেই আমাকে জেরবার করে দিয়েছেন। এতো গেল মেয়েদের কথা। বন্ধুরাও এক একজন কম যায় নাকি ! এক একজন এমন ভাব দেখান তিনি যেন দয়া ক'রে আমাদের সঙ্গে এসে আমাদের পদে পদে কৃতার্থ করে দিচ্ছেন। এমনও কেউ কেউ আছেন তিনি এ জায়গায় এসেছেন শুধু নিরিবিলিতে টানতে। বোতলই টেনে যাবেন শুধু, শুধু বোতল, আমাদের টানবেন না একেবারেই। কারুর কারুর কিছু অন্য বাতিকও আছে তাতে কয়েকবার পুলিশের খপ্পরেও পড়তে হয়েছিলো।

শুধু বম্বে নয় আরও অনেক জায়গায় সবাই যেমন গেছে আমিও তেমনিই গেছি। তবু কেমন

ক'রে একদিন এই দূরভ্রমণ আমার ঘুচে গেল, কেমন ক'রে কাছের মধ্যে যে দূর আছে তার দেখা পেলাম সেও কম থ্রিলিং নয়। বোধহয় সূচনা হয়েছিল কাশ্মীর গোলকধাঁধার মত গলিতেই। ওখানকার গলিগুলি সত্যিই রোমাঞ্চকর। এর নানা ছাঁদ, নানা ডিজাইন—মেয়েদের চুল বাঁধার মত অনেকটা, তার কত যে শাখাপ্রশাখা, কতো কী আয়োজন, এখানটা একটু ফুলিয়ে, ওখানটার একটু গুঁজে দিয়ে, তাদের এই ব্যাপারটার মতই কাশ্মীর গলি। কিন্তু গলিতে প্রথম দিনই ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গিয়েছে আমার, চুঁচড়োর জিলিপির প্যাঁচের মত অগুন্তি গলি কিলবিলে সাপের মত আমার চোখের সামনে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। খুব চিনি, কতবার গেছি—তবু চুঁচড়োর বলরাম গলিতে যখন রাত্রে কোন কোন দিন আজও ঢুকে পড়ি সাইকেল নিয়ে, গলির দুপাশের বড় বড় রহস্যময়, গম্ভীর, বনেদি বাড়ীগুলির মাঝখান দিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতে কখন দেখি এমন একটা গলিতে এসে পড়েছি, যেটা থেকে বার হবার পথ জানিনা, সেটা ব্লাইন্ড লেনও না, অন্য একটা সরু 'পাড়া' দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যখন ভাবি পথ অবশেষে পাওয়া গেল তখন চমকে উঠে দেখি আমি সেই পুরানো জায়গাতেই ঘুরপাক খাচ্ছি। কানি গলি, দত্তগলিতে হঠাৎ ঢুকে পড়লে আজও আমার সেই একই বিভ্রান্তি হয়। তাহলে ? বলরাম গলি, কানি গলি, দত্তগলিতে ঘুরতে ঘুরতে আমার কী কাশ্মীর গলির বিখ্যাত গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাওয়া হয়ে যাচ্ছে না ? আরও একবার আপাত অসম্ভব এরকম অভিজ্ঞতা হল। হঠাৎ ভাগলপুর স্টেশনে এসে আমি অবাক হয়ে দেখলাম আমি অবিকল যেন ভোর পাঁচটার ব্যান্ডেল স্টেশনের বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি। সেই আমার দূরভ্রমণের শেষ। আমি যে সব জায়গায় গিয়েছি বা ভবিষ্যতে যেতে পারি—সে সব জায়গা আমার এই হুগলী, চুঁচড়ো শহরের মধ্যেই আছে। আমি তখন থেকেই তৎপর হলাম আমার সাইকেলের রেঞ্জের পনেরো ষোলো মাইলের মধ্যে অথবা বাসে কুড়ি বাইশ মাইলের মধ্যে আমার সমস্ত দূরভ্রমণ সারতে হবে। আমি নিশ্চিত হলাম· আমি পারবোই।

তখন থেকেই—আমাকে যারা বাড়ীতে ডাকতে আসে তারা সবাই জানে লোকটার নিজস্ব কোন বাড়ী নেই, ওই খাওয়া আর ঘুমনোর জন্যে যেটুকু বাড়ী দরকার সেটুকু বাড়ীর আশ্রয়—বাকি সময়টা—এমন কী চৈত্রের প্রখর দুপুর, শীত জর্জর সমাচ্ছন্ন ঘননিবিড় রাত্রি, লোকটা পথেই আছে, ভূতগ্রস্তের মত সাইকেল ঠেলছে একা একা সুদীর্ঘ জি টি রোড অথবা দিল্লি রোডে, কোথায় যাবে জানে না, শুধু তার যাওয়া হলেই হ'ল, কোথায়, কেন—সে সব জানার দরকারই নেই।

সকালবেলা নানা ঝামেলায় কাটে, দুপুরের গোটাটাই কাটে কর্মস্থানে, বিকেল শেষ হ'য়ে সন্ধ্যে এলেই লোকটার মধ্যে দ্বিতীয় আর একটি লোক জেগে ওঠে, সেই লোকটাই আসল, সেই লোকটাই বিশুদ্ধ লোক, যার সংসার নেই, ঘর গৃহস্থালি নেই, পিছুটান নেই, শুধু সে নিজে

মশাকে কি করে পাল্টা মার দেওয়া যায় !

মশার কামড়ের কষ্ট কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দূর হয়ে যায়। তবে তা থেকে পরে যা ঘটে তা অতি মারাত্মক : এর জীবাণু থেকে আসে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া ডেঙ্গু আর এনসেফালাইটিস ! কিন্তু ঐ চিন্তায় ঘুম নষ্ট করেন কেন ?

যেমন কুকুর তেমনি মুগুর

ঐ বিপদ থেকে আপনার পরিবারকে বাঁচানোর সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা হল বেগন স্প্রে-র ব্যবহার। হ্যাঁ, প্রতিদিন !

মশা সাধারণতঃ সূর্যাস্তের পরেই ঘরে ঢোকে। তাই মশা থেকে রেহাই পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হল—সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার শোয়ার ঘর ও বসার ঘরে স্প্রে করা আর দরজা- জানলা বন্ধ রাখা, ১০-১৫ মিনিট। সবচেয়ে ভালো ফল পেতে হলে অবশ্যই দেওয়াল, ঘরের আনাচে-কানাচে, জানলার ফ্রেম আর ভেণ্টিলেটরে রোজই স্প্রে করুন।

অন্যান্য পোকামাকড়কেও নাশ করে

আরশোলা, ছারপোকা আর ঘরের অন্যান্য পোকামাকড় থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে ছিটান বেগন স্প্রে। নিয়মিত বেগন স্প্রে করুন আর নিশ্চিন্তে হাসিমুখে শুয়ে পড়ুন। এবার বলুন—এই মিষ্টি প্রতিহিংসা ভালো লাগলো তো ?

২৫০ মি.লি. মিনি প্যাকেও পাওয়া যায়।

Trikaya BS 1.87 BEN

আছে।...চুঁচড়ো স্টেশনের তলা দিয়ে গাঢ় অন্ধকারে সাইকেল চালাচ্ছি—দুপাশে জলা জমি, মধ্যে সুবিস্তীর্ণ পথ, মাথার ওপর তারা-ভরা আকাশ আর পিছনে চুঁচড়ো স্টেশনের আলোর বলয়, কতক্ষণ চলেছি জানি না, সাইকেল ঠেলছি তো ঠেলছিই, সময় যেন মুছে গেছে, কোন একটা গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছি নিশ্চয়ই কিন্তু তা আমার নিতান্তই অজানা, হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হ'ল। ওটা কী ? এ কী অবিশ্বাস্য কাণ্ড। এ কী কোন জাদুকরের খেলা ? এ কী কেবলমাত্র আমাকে দেখাবার জন্যেই ?

সাইকেল থেকে নেবে আমি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলাম। একটা গাছ— খুব সম্ভব মহানিমই হবে, অনন্যা এক নর্তকীর মত কোমরে খাঁজ ফেলে বিবিধ মুদ্রা রচনা করে যেন আজন্ম দাঁড়িয়ে আছে আর তাকে ঘিরে পৃথিবীর সমস্ত জোনাকি ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছে। আমার বাহ্য জ্ঞান লোপ পেল। সেই মুহূর্তে আমার যেন মনে হল, আমি দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছি। আমার চোখ খুলে গেল। বুঝে গেলাম, ইনিই সেই সনাতনী প্রকৃতি, আমরা ক্ষ্যাপার মত এ নারী সে নারীর কাছে অপরূপ কিছু পাবো বলে ঘুরে বেড়িয়েছি, ইনি সে সবই জানেন, তাই আমাকে তাঁর এই অনন্ত রূপ দেখালেন, যেন বললেন, 'আমিই সব। সব রূপের শেষ জানা যায় আমাকে জানলে। তোর রূপ নেই অথচ তোর তৃষ্ণা বড় প্রবল। তাই তোকেই দেখালাম। নে, চোখ মেলে দেখে জন্ম সার্থক করে নে।'

আমি এই অলৌকিক মহাবৃক্ষের জোনাকি নৃত্য দেখে একটা গল্প লিখেছিলাম— 'চিন্তামণি মল্লিক ও নিশীথবৃক্ষ'।

.....কতদিন বাঘাশীতে (হুগলীর কোন কোন জায়গার শীত শীতের হরিদ্বারের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারে।) দেবানন্দপুর থেকে ফিরছি একা একা, দুপাশে ঘননিবিড় আমবাগানের গাঢ় অন্ধকারে জ্যোৎস্নার ডোরা ডোরা দাগ বিচিত্র প্যাটার্ন তৈরী করেছে, সাঁ সাঁ করে বাতাস বইছে। যেমন অন্তহীন পথ, অন্তহীন আমবাগানও তেমন, আর তেমনই অন্তহীন জ্যোৎস্না। হঠাৎ দেখি ঘাসে চাপড়া চাপড়া জোনাকি, একেবারে সেঁটে গেছে, কে যেন ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি বেশ গাঢ় করে আঠা দিয়ে ঘাসের গায়ে এঁটে দিয়ে গেছে। সাইকেল থেকে নেবে পড়েছি। বাঁশঝাড়ে সাইকেল ঠেস দিয়ে রেখে নিজের মনেই খেলে গেছি জোনাকি জোনাকি খেলা, ইচ্ছেমত আকাশে ছুঁড়ে দিয়েছি জোনাকির ফুল, বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছি একসঙ্গে অনেক জোনাকি, দু পকেট ভর্তি করে নীলটর্চ জ্বেলে রেখেছি, শহরের মুখে এসে দেখি তারা সব মৃত।

.....তালবনানী গ্রামের পথ দিয়ে সাইকেলে চলেছি, মগরা থেকে মাইল কয়েক দূর, হঠাৎ সামনে একটা খোলা মাঠ, কার্তিকের হিমে গোটা মাঠটাই যেন ভিজে গিয়ে মাটি থেকে খানিকটা উঁচুতে উঠে কুয়াশায় ভাসছে আর চাঁদটাকে মনে হচ্ছে চীনে লন্ঠন একটা— সে সব পিছনে ফেলে খানিকটা এগিয়েছি—একেবারে জমাট আঁধার, বলা যেতে পারে আঁধারের নিরেট দেয়াল একখানি, হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম, হাতড়ে হাতড়ে টের পেলাম ওটা একটা কলাগাছ, কেউ একজন কেটে রেখে গেছে—সকালে টেনে নিয়ে যাবে, হঠাৎ আমার ভেতর থেকেই হবে—কে একজন বলে উঠলো, 'অন্ধকারও তেমন সুলভ নয় আজকাল। এও দু নম্বরী মাল হয়ে গেছে আজকাল। তবে এ অন্ধকার তোমার জন্যে টাটকা করে রেখেছি। এক গেলাস টাটকা অন্ধকার—যতোটা পারো টেনে নাও। বাজে অন্ধকারে ঘোরো তাই অন্ধকারের আসল চেহারাটা দেখালাম।'

...এই তো সেদিন—সাহাগঞ্জের পুরনো রাস্তা দিয়ে সাইকেলে যাচ্ছি, ডানলপ গেটের কাছে যখন এসেছি তখন ওর উল্টোদিকে সিকি মাইলেরও কম দূরত্বে থাকা দ্বীপটির দিকে নজর তাকাচ্ছি, দেখি গড়ানটা দিয়ে একজন আওরাত, মধ্যবয়সিনী, প্রায় ছুটে ছুটে নাবছে। তার খোলা চুল, আসমানী শাড়ি, আসমানী শেমিজ উড়ছে তুমুল হাওয়ায়। কাছে আসতে দেখলাম তার নাকে নথ, হাতে লহটির বালা, আঁটো খোঁপা। জলের ধারে এসে সটান নৌকোয় উঠে নথ নেড়ে ও একটা ঝুপড়ি লক্ষ্য করে চেঁচাতে লাগলো, 'আরে ওই লাল্লুর বাপ, তুরন্ত আইয়ে না। আচ্ছা বেহুদা আদমী তু।' লাল্লুর বাপ পাশের একটা ঝুপড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো একটা বোতল হাতে, এসে মোটা গোঁফে তা দিয়ে আওরাতটির সঙ্গে নখরা জুড়ে দিলো।

'নৌকোটা কার ?' আমি কাকেই বা জিগ্যেস করি। সরাসরি লাল্লুর বাপকেই জিগ্যেস করলাম। তো—মরদটি কিছু বলবার আগেই

চলে গেল। কী আশ্চর্য, কতদিন এই পথে যাওয়া হল, এ পথ দিয়ে ফেরাও হল কতবার, দ্বীপটি হাজার বার দেখেছি কিন্তু আজ যেমন করে দ্বীপটি আমাকে ডাকছে তেমন করে কোনদিন ডাকেনি। দ্বীপে যাবার জন্যে মন বড় উচাটন করে উঠলো। সাইকেল জমা রেখে গড়ান রাস্তাটা দিয়ে সোজা হেঁটে জলের ধারে ভিজে ঘাসে গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনেই ছিল একটা লঞ্চ আর অদূরেই ছিল একটা নৌকো। লঞ্চওয়ালাকে জিগ্যেস করলাম, 'এই যে বড় ভাই। দ্বীপে যাওয়া যাবে ?' বড় ভাই তার নূরে একটু হাত বুলিয়ে হেসে বললে, 'বাবুজী এখন ভাঁটি। এখন নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু আসবার সময় নিয়ে আসতে পারবো না। যদিও দ্বীপটির পাশ দিয়ে যাবো আসবো। জল সরতে সরতে কাদা অনেকটাই বেরিয়ে পড়বে। লঞ্চ তখন ভেড়াবো কী করে ?' এখন কী করা, লঞ্চওয়ালা তো জায়গা দিলো না, ইতিউতি আওরাতটি নথ নেড়ে তড়বড় তড়বড় করে বললে, 'জী নৌকো আমাদের। আপনি যাইবেন ?'

'হ্যাঁ সেই রকমই ইচ্ছে। যদি নিয়ে যাও। তোমরাও তো দ্বীপে যাচ্ছো।'

'হ্যাঁ, দ্বীপেই আমাদের ঘরবাড়ি। ফ্যাক্টরীতে কাজ কাম করেন ?'

আমি কী আর বলি, একটু হাসলাম, বললাম, 'এ শহরেই আমি জন্মেছি। কতবার এই পথে গেছি। অথচ কোনদিন দ্বীপে যেতে ইচ্ছে করেনি। আশ্চর্য !'

'এতে অবাক হবার কী আছে বাবুজী। চোখ কী চোখের পাতা দেখতে পায় !'

আমি কোন জবাব দিলাম না শুধু বিস্মিত দৃষ্টিতে এই প্রথম ওকে নিরীক্ষণ করলাম।

'উঠুন। পা ধুয়ে নিন জলে। এ-হো নৌকা ছোড় দে। বাদাম উঠা।'
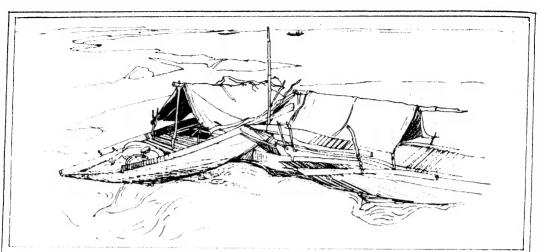
নৌকো চলতে লাগলো ছোট বড় ঢেউ-এর দোলায়। এ নাচন মন্দ লাগছে না। যতো দ্বীপের দিকে যাচ্ছি দ্বীপ ততোই একটু একটু করে তার রহস্যের ভাঁজ খুলে দিচ্ছে। যে নারী ভালোবাসে সেই তো ভেতরে ডাকে, ও যেন তাই, দ্বীপটি ক্রমাগত আমাকে তার ভেতরে ডাকছিলো। আশ্চর্য, আমি কী জন্মান্ধ ছিলাম এতোদিন ? ওকে দেখিনি কেন চোখ মেলে ?

'তোমরা এপারে এসেছিলে কেন ?'

আওরাতটি খিলখিল করে হেসে উঠলো, বলল, 'ওটা কী একটা কথা হল বাবুজী ? দ্বীপে তুমি জানো না—দোকান উকান কিছু নেই ? বাজার করতে, দোকান করতে আমাদের এপারে আসতেই হয়। তখন নৌকোটাই আমাদের ভরসা। ওটা করে আমরা চলি ফিরি। আজ এসেছিলাম অবশ্য খেলা দেখতে। খেলা বোঝো ? ফিল্ম। মিঠুনের—ডান্স ডান্স ছিল। ওকে বললাম, তু যাবি। ও বলল, তু যা। আমি চল্লু গিলবো। তো আমি খেলা দেখে ফিরলাম। ও বোতল হাতে ফিরছে।'

যতই দ্বীপটির কাছাকাছি আসছি ততই আমার উত্তেজনা বাড়ছে। ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে জলজ ঘাস, দ্বীপের জায়গায় জায়গায় জড়ানো বুনোলতা আর বিস্তীর্ণ কাশবন। যতো এসব দেখছি, ততোই মনে হচ্ছে ঘরের এতো কাছে—একে এতোদিন দেখিনি কেন ?

দ্বীপে পা দিতেই যেন বাতাসে বাতাসে হৈ হৈ পড়ে গেল। পৃথিবীতে এতো বাতাস আছে যে চুলের মুঠি ধরে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে—এখানে না এলে কিছুতেই তা' বুঝতে পারতাম না। আর সেই সবুজ কাশবন—যতদূর দৃষ্টি যায় নির্জন, পরিত্যক্ত, বিশাল দ্বীপটির প্রায় সর্বত্র তার রাজ্যপাট বিছিয়ে তুমুল হাওয়ায় দুলছে। দ্বীপে ওঠার পায়ে চলা রাস্তাটার এদিক ওদিক কতক জমি ফেটে গেছে চৌচির হ'য়ে। লালচে চওড়া চওড়া শক্ত,ধারালো, শুকনো ঘাস গজিয়েছে। 'ঘাসগুলো এরকম কেন' আমার কথার উত্তরে মরদটা বললে, 'ওরা ঐরকমই। মাটি চেঁচে পুঁছে সাফ করলেও ওরা দুদিন যেতে না যেতেই গজিয়ে যায়। ঐ জন্যেই তো এখানে বড় কোন চাষ হয়না। চাষ হয় শুধু ধুঁদুলের।' তাকিয়ে দেখলাম মাটির সঙ্গে, ঘাসের সঙ্গে মিশে ইতস্ততঃ অজস্র ধুঁদুল ফলে আছে।

'আসুন আমাদের ঘর।'

একটু উঁচুতে, যাকে প্রায় টিলা বলে, সেখানে সামান্য গাছগাছালির মধ্যে তিনখানি মাটির বড় বড় ঘর। ওরা আমাকে বসতে দিলে ঘর থেকে একটু দূরে নিমগাছের নীচে বাঁশের বেঞ্চিতে। আমি বেঞ্চিতে গিয়ে সটান একটু গড়িয়ে নিলাম। গোটা আকাশ সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো। দুমিনিট যেতে না যেতেই এক গ্লাস জল আর বাটিতে কী যেন নিয়ে আওরাতটি এলো। বললে, 'বাবুজী, গরীব লোক, কী আর দেব ! একটু পানি আর একটু শক্কর।'

'শক্কর কেন ?'

'দিতে হয় বাবুজী। শুধু পানি দেওয়া চলে না মেহমানদের।'

আমি চিনি আর জল খেয়ে বাঁশের মাচা থেকে নেবে গোটা দ্বীপটা একটু চক্কর দিতে গেলাম। যত হাঁটছি তত রহস্যময় লাগছে দ্বীপটি। সব থেকে যেটা আমাকে অবাক করছে তা হচ্ছে এর নির্জনতা। এতোবড়ো একটা দ্বীপ, শুধু একঘর বাসিন্দা ছাড়া এখানে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। যত হাঁটছি ততো নির্জনতা, ততো হাওয়া আর ততোটাই আমাকে ঘিরে জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। এক একবার কাশবনের দিকে যাচ্ছি, লুটোপুটি খাচ্ছি, কী জানি কী মনে করে ছুটছি—হয়তো ভাবছি নির্জনতা এবার আমার নাগাল পাবে না কিন্তু অলৌকিক কাণ্ড—যেখানে এসে থামছি সেখানেই ওঁৎ পেতে আছে যেন আরও বড় এক নির্জনতা, আর সেই সুবিশাল হাওয়া যা আমাকে প্রায় পাগল করে তুলেছে, আর অনবরত দ্বীপের সারা শরীর জুড়ে জলের অনন্ত, অফুরাণ, একঘেয়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।

না। আমার ফিরে যাবার কথা এখন আর ওঠেনা। কেন যাবো ? আমি ঠিক করলাম আজ আমি নিমগ্ন হবো। আর একটু পর পৃথিবীর সব রঙ মুছে গেলে এক অবিনশ্বর চাঁদ উঠবে আকাশে। আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে যাবো জলের ধারে। সেখানে ঘাসের চাপড়ার ওপর থেবড়ে ব'সে জলের মধ্যে পা দুটি ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকবো।

সামনে অনন্ত, রজতশুভ্র জলরাশি, ডাইনে বামে উন্মাদ হাওয়া, জলের চিরন্তন ছলাৎ ছলাৎ শব্দ আর সেই সুবিশাল নির্জনতা—যার চেয়ে কাম্য আর কিছু নেই।

রাত্রি যখন আরও নিবিড় হবে, সংসার নামক শব্দটা আমার কাছে যখন আর একটুও কোন অর্থ বহন করবে না, অনন্ত সেই কাশবন হয়ে উঠবে বিপুল এক তরঙ্গিত নদী, তখন এক নীলাভ ইচ্ছা আমাকে এই ঘাসের চাপড়ায় আর বসতে দেবে না, আমাকে প্ররোচনা দেবে, বলবে, 'সামনে অনন্ত জলরাশি, চারিদিকে উন্মাদ হাওয়া, তুমি কী এখনও চুপ করে থাকবে ? এসো না জলে ! জলের গভীরে'···। তুমি কি এখনও চুপ করে···, তুমি কি এখনও····'

তারপর দিন সকালে যখন আমি ঘরে ফিরি তখনও আমার ঘোর কাটেনি। এ দ্বীপে আমি আবার যাবো।

সে 'দেশে' সকলেই যেন যায়।

অঙ্কন : সমীর বিশ্বাস

ছুটির নিমন্ত্রণে

অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়

যতীন্দ্র-স্মৃতি—নওলাক্ষা মন্দির

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের গোলকুঠি ছবি : তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালী ভ্রমণপাগল জাতি, চিরায়ত প্রবাদ। কিন্তু দিন বদলায়। কালের রথচক্রে ঢাকা পড়ে যায় অতীত গৌরব। গৌরব সমুদ্রের বুকে জেগে ওঠে নানান ব্যর্থতার দ্বীপচিহ্ন। তাই একদিনের ভুবনজয়ী বাঙালীর ভাগ্যে আবার জোটে 'ঘরকুনো' অভিধা। কাব্যকার ব্যঙ্গ করে লেখেন, 'অন্যের পথ চাওয়া অন্নের কাঙালী'।

স্যার আশুতোষের গঙ্গাপ্রসাদ হাউস

ইউক্যালিপ্টাসের অ্যাভিনিউ : শেঠ ভিলা ছবি : তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়
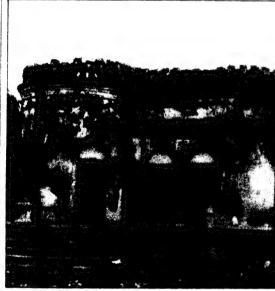
কিন্তু দিন যে সত্যিই বদলায়। নানান যন্ত্রণায়, অপমানে, আক্রমণে ক্লিষ্ট বাঙালী আবার একদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল। বুঝতে শিখল, 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে'।

ঊনবিংশ শতাব্দী। ভারতবর্ষ তখন ইংরেজদের কবলে। বাঙালী জীবনের চলেছে ঘোর দুর্দিন। কিন্তু তারই মধ্যে বাঙালীরা শুনতে পেল পথের ডাক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের একটি চরিত্র বিশু যেন সেই নতুন জেগে ওঠা, বাঙালীর মনোজগতের সার্থক প্রতিনিধি। তাই বিশু বলে, একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক; তারা জ্বালা ধরিয়েছে—বলছে 'কাজ করো'। অন্যদিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে—বলছে 'ছুটি! ছুটি!'
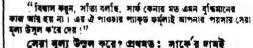
ছবি : সুজিত চট্টোপাধ্যায়

"বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি, সার্ফ কেনার মত এমন বুদ্ধিমানের কাজ আর হয় না। এর ঐ পাওয়ার প্যাক্‌ড ফর্মুলাই আপনার পয়সার সেরা মূল্য উসুল ক'রে দেয়!"

"আচ্ছা ভাই, আপনি কি দেখতে পান না যে এ দিয়ে লাভ পাওয়া যায় কত বেশী? একমাত্র সার্ফই আমার কাপড় ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে, আর কাপড় রাখেও দারুণ সুরক্ষিত। তাই তা দেখতেও সবসময় লাগে নতুনের মত —যার ফলে, আপনারও নানাভাবে সাশ্রয় হ'তে থাকে, আর, সেরা মূল্য উসুল করা বলতে, আমি ঐটিই বোঝাতে চেয়েছি।"

ঠিক আছে, মানলাম, কিন্তু ললিতা দেবী, শুধু ঐটুকুই কি সব?

"না, না, আরও আছে! সার্ফের ১/২ কিলো পাউডার অন্যান্য সাধারণ পাউডারের ১ কিলোর সমান হয়—যার মানেই হচ্ছে, সাধারণ পাউডারের ১ কিলো পাউডার যতগুলি কাপড় ধোয়, এর ১/২ কিলো দিয়ে ততগুলিই ধোওয়া যায়। তাহলে সার্ফ দিয়ে আরও লাভ দেখতে পাচ্ছেন তো?"

১ কিলো
সাধারণ পাউডার

১/২ কিলো
সার্ফ

অর্থাৎ এর মানে হ'ল, সার্ফ নিজস্ব উপায়ে আপনার পয়সা উসুল করে...

"..আর আপনি তার লাভ পান নানান দিক দিয়ে। সস্তার জিনিষ আর ভাল জিনিষ কেনায় তফাৎ থাকে। সেই জন্যেই তো সার্ফ কেনা সবসময়ই আরও বুদ্ধিমানের কাজ।"

বাঙালী পেল সেই ছুটির নিমন্ত্রণ। কারণও ঘটল। একদিকে গ্রামেগঞ্জে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাঙালীকে করল ভিটেছাড়া। আবার ওদিকে শহরের আবহাওয়া ধরাল পেটের অসুখ। এই দুই ব্যাধির আক্রমণ থেকে মুক্তি পেতে বাঙালীরা অন্যত্র ঘর বাঁধল। জাগল ছুটির নেশা। কিন্তু বিদেশে নয়, বাঙলারই পশ্চিমপ্রান্তে বনে জঙ্গলে ঢাকা একটি পাথুরে মালভূমি অঞ্চলে। নাম তার সাঁওতাল পরগণা।

তখন সেখানে মানুষ বলতে ছিল আদিবাসী কোল, ভিল, সাঁওতাল। শিকার ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। বন থেকে পেত ফল, মধু। সরল অভাবী জীবন। তাদের পায়ের তলায় মালভূমির গর্ভে অভ্র, তামা, কয়লা খনিজ সম্পদে ঠাসা। তারা সে খবর রাখত না। তারা বুঝতও না, এই অঞ্চলের জল যেমন সুস্বাদু, তেমনি পেটের পক্ষে পরম উপযোগী। পশ্চিমে হাওয়া যেমন শীতল মিঠে তেমনি স্বাস্থ্যদায়ক।

একদিন বাঙালী পেল তারই সন্ধান। ১৮৭১ সাল। সাঁওতাল পরগণায় হুগলী জেলার বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু মধুপুর-গিরিডি শাখা রেল লাইন পাতার ঠিকাদারি নিয়ে এ অঞ্চলে প্রথম এলেন। একদিন তাঁর সে কাজের মেয়াদও ফুরোল। কিন্তু বিজয়নারায়ণ আবিষ্কার করলেন তাঁর পেটের দূরারোগ্য পুরানো আমাশয়ের অসুখ অলক্ষ্যে এখানকার জলের গুণে সম্পূর্ণ সেরে গেছে। ঠিকাদারি কাজের কঠিন শ্রমেও তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েনি। তাই তিনি মধুপুরে বাসা বাঁধার সিদ্ধান্ত নেন। স্থানীয় লালগড় এস্টেট থেকে ৫ বিঘা জমি বার্ষিক আট-বারো টাকা খাজনায় বন্দোবস্ত নিয়ে গড়ে তুললেন মনোরম একতলা বাঙলো বাড়ি। বাড়ির সামনে পিছনে ফল আর ফুলের বাগান।

শুরু হল বাঙালীর সাঁওতাল পরগণায় আসা। তাঁরা এলেন। দেখলেন। তারপর গড়ে তুললেন নিজেদের মনোমত একটি উপনিবেশ—স্বাস্থ্যনিবাস।

রূপনারায়ণপুর থেকে ঝাঁঝা, আবার দুমকা-গিরিডি পর্যন্ত ছিল তার বিস্তৃতি। আয়তনে ৫,৪৭০ বর্গমাইল।

এ অঞ্চল, সেকালে ছিল অবিভক্ত বাঙলার অঙ্গীভূত হয়ে। ভারতবর্ষ তখন পরাধীন। আর বাঙালীরা নিয়েছে দেশকে স্বাধীন করার ব্রত। তাই তাদের ওপর আঘাত নামল। ব্রিটিশ সরকার মতলব আঁটলো, বাঙালীকে আর এককাট্টা করে রাখা নয়, টুকরো টুকরো করে ফেলতে হবে। তাই রাজধানী চলে গেল কলকাতা থেকে দিল্লীতে। বাংলা মায়ের আঁচল ছিঁড়ে করা হল দুফালা। ১৯১২ সাল। বাংলার সাঁওতাল পরগণা হয়ে গেল বিহার রাজ্যভুক্ত। বাঙালী হল, 'নিজ বাসভূমে পরবাসী'।

সাঁওতাল পরগণারও আয়তন গেল কমে। ঝাঁঝা, শিমুলতলা হল মুঙ্গের জেলা। গিরিডি চলে গেল হাজারীবাগ জেলার মধ্যে। এখন গিরিডি পেয়েছে জেলা শহরের মর্যাদা।

এই বিভাগ করল সেকালের ইংরেজ। কিন্তু প্রকৃতির অফুরান দাক্ষিণ্যের প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হল না বাঙালীর স্বাস্থ্য-উপনিবেশন। এ অঞ্চলে তাঁদের আসার উদ্দেশ্যও ছিল একটাই—হাওয়াবদল। অর্থাৎ ঋতুবিহার বা চেঞ্জে আসা। বাঙালীদের তাই নামও হল চেঞ্জারবাবু।

পূর্বপুরুষদের হারিয়ে যাওয়া চরণরেখা ধরে এবার আমারও যাত্রা সেই হাওয়া বদলের দেশে। সাধ—স্বচক্ষে দেখে আসা—কেমন ছিল তাঁদের স্বাস্থ্য গড়ার আনন্দ নিকেতন। কেমনই বা ছিল ছুটির নিমন্ত্রণের সেই নানারঙের দিনগুলি।

হাওড়া থেকে মেন লাইনে দেড়শো মাইল। রূপনারায়ণপুরে শেষ হল বাংলার সীমান্ত। শুরু হল সাঁওতাল পরগণা। দুপাশের প্রকৃতি পরিবেশও গেল বদলে। বাংলার দিগন্ত ছোঁয়া সবুজ সমতল হয়ে গেছে ঢেউ তোলা মালভূমি। চঞ্চল সমুদ্র যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। শাল, সেগুন, মহুয়া, পলাশের জটলা। দূরে দূরে আকাশের পটে নীল পাহাড়ের সারি।

রূপনারায়ণপুরের পরের স্টেশন মিহিজাম। এখনকার চিত্তরঞ্জন। তখনও রেল ইঞ্জিনের কারখানা হয়নি। এত দোকানপাট, লোক-লস্কর, ভিড়ও ছিল না। চারিদিক ছিল নিঝুম। বনে ঢাকা মালভূমি। সেই মালভূমির মাথায়, গায়ে উঠল বাঙালীদের বাড়ি। বাড়ি বলতে প্রায় সবই একতলা। ক্বচিৎ এক-আধটা দোতলা নজরে আসে। বাড়ির সামনে পিছনে বাহারী ফল আর ফুলের বাগান। বাগানে ঘাট বাঁধানো পুকুর। সারাবছর ধরে চলতে থাকল ভোজনবিলাসী অথচ পেটরোগা বাঙালীদের আসা যাওয়া। বিশেষ করে, অক্টোবর থেকে মার্চে। তাছাড়া, অন্যদিকেও সুবিধে। এই সময়ের মধ্যেই পড়ে পুজোর আর বড়দিনের ছুটি। বাঙালীরা তাঁদের বাড়ির নামও দিলেন চমৎকার। যেমন—আবহাওয়া, বিরাম, আরাম, বিশ্রাম, একান্তে, নিরিবিলি, খেলাঘর ইত্যাদি। এই নামাবলী থেকেও বোঝা যায়, একান্তে বিশ্রামলাভ আর হাওয়া বদল এই ছিল তাঁদের মনোবাসনা।

মিহিজামের পর জামতাড়া। এখানেও গড়ে উঠল স্বাস্থ্য-নিবাস। এলেন সেকালের মহাপুরুষেরা। এঁদেরকে কেন্দ্র করেই কোন কোন অঞ্চল সরগরম হয়ে উঠল। যেমন কারমাটার। 'করমা' হিন্দিভাষীদের লৌকিক দেবতা। 'টাঁর' শব্দের অর্থ পতিত ডাঙা। এই পতিত ভূখণ্ডে এসেছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। স্টেশনের লাগোয়া দক্ষিণে ১৪ বিঘা জমি কিনে তৈরি করেছিলেন, ছোট্ট সাধারণ একতলা বাড়ি। নাম—নন্দনকানন। বাকি জমিতে ছিল ফলের বাগান আর ভুট্টার খেত। আদিবাসীদের সেবা করে, রোগে ওষুধ পথ্য দিয়ে, তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা ভেবে ঈশ্বরচন্দ্রের দিন কাটত। বাঙালীর সেই তীর্থভূমি কারমাটারে গিয়ে একদিন হাজির হই। রাম যে নেই সে তো জানা ছিল, কিন্তু তার অযোধ্যারও এই হাল! স্টেশনের গায়ে ভিড় করে আছে একসারি ছোট-বড় বাড়ি। বাসা এবং ব্যবসাকেন্দ্র। সেই বাড়ির সারির এক ফাঁকে নোংরা দুর্গন্ধ গলি। এঁকে বেঁকে গিয়ে গলির প্রান্তে নন্দন কাননের প্রবেশদ্বার—বিদ্যাসাগরের বাসভূমি। চারিদিকে বড় বড় ঘাসের জঙ্গল।

স্যার আশুতোষের গঙ্গাপ্রসাদ হাউসের সম্মুখভাগ — ছবি : সুজিত চট্টোপাধ্যায়

অচেনা অতিথি দেখে ঘাসের জঙ্গল থেকে একজন লোক বেরিয়ে আসে। বয়স প্রায় ষাট। ঝাঁকড়া গোঁফ। কাঁধে টাঙি। পরিচয় দেয়। সে বাড়ির মালি। নাম—কার্তিক মণ্ডল। বলে, তারা তিন পুরুষ ধরে সে বাড়ির সেবা করছে। তার ঠাকুরদা কালী মণ্ডল ছিল বিদ্যাসাগরের মালি। ঘুরিয়ে দেখায় ঈশ্বরচন্দ্রের বসত বাড়ি। বলে, বিদ্যাসাগরজীর দেহান্তের পর সে বাড়ি হাত বদল হতে হতে চলে যায় মারোয়াড়ির হাতে। তখন নন্দন কাননের গাছপালা কেটে তারা ফাঁকা করে

দেয়। দরজা-জানলা চুরি হতে থাকে। হাল আমলে, বিহার বাঙালী সমিতি বাড়িটিকে উদ্ধার করে। তাঁদের উদ্যোগে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্যাসাগরের নামে একটি বালিকা বিদ্যালয়। রেল স্টেশনের নামও বদলে রাখা হয়—বিদ্যাসাগর।

কার্তিক জানায়, তখনকার কারমাটাঁরে ছিল তিনশ ঘর বাঙালীর বাস। সেই বাঙালীরা বিদ্যাসাগরজীর নামে একটা লাইব্রেরি করেছিল। দেখবেন ?

সে সব দেখতেই তো আমার আসা। সুতরাং, সঙ্গ ধরি। রেল স্টেশন পার হয়ে পথ চলে উত্তরদিকে। চওড়া রাস্তার দুধারে সেই পুরানো আমলের বাড়ি। অনেকখানি সীমানা ঘেরা। কিন্তু বয়সজীর্ণ। অভিভাবকহীন। এদিকের একেবারে শেষপ্রান্তে একটি দোতলা বাড়ির সামনে কার্তিক থামে। আমিও। দেখি, দোতলা বাড়ির উপর নিচে একখানা করে ঘর। দেয়ালে লেখা, বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি। ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। নিচে ঘরের দেয়ালে দুটি পাথরের ফলক গাঁথা। তাতে লেখা, ১৯৩১ সালে কারমাটাঁরের নব গৌর প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে স্থাপিত হয়, নব গৌর বিদ্যালয়। বিদ্যালয় নির্মাণে সাহায্যকারী দাতাদের নামও সেই ফলকে উৎকীর্ণ। তালিকার শীর্ষে আছেন শ্রীমতি নগেন্দ্রবালা ঘোষ। তিনিই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠানকে জমি দান করেন। নারী প্রগতি আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত বিদ্যাসাগরের বাসভূমি কারমাটাঁর, যেখানে সেকালে নারীর শিক্ষাপ্রসারে এই অগ্রণী ভূমিকা ! জীবনমরণ সীমানার ওপারে বিদ্যাসাগরের আত্মা বুঝি তৃপ্তি পায়। সেই নব গৌর বিদ্যালয় এখন হিন্দিভাষীদের রাজকীয় উচ্চবিদ্যালয়। অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি বাঙালীর ফেলে যাওয়া সেই কীর্তি।

কার্তিক স্তব্ধতা ভাঙে। বলে, সেকালে বাঙলা মুলুক থেকে চেঞ্জারবাবুরা আসতেন। যেমন বড় বড় বাড়ি ছিল, তেমনি ছিল বিশাল বাগান। সেখানে নানান কিসিমের ফুলের চাষ হত। চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপের সুনাম ছিল দেশজোড়া। কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী যেত সে সব ফুল। কার্তিকের কথা শুনি আর চেয়ে চেয়ে দেখি, পুরোন বাড়ির সংলগ্ন ভাঙা দেয়ালঘেরা পতিত জমি। সেই ফুল-কীর্তির নীরব সাক্ষী। সেকালের সেই ফুলবাগানের আরও এক সাক্ষী স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। ১৮৯৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর, শনিবার। 'কর্মাধার' থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে কবি লিখছেন, "গোলাপ ফুলে বাগান একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। একটা শিরীষ ফুলের গাছ আগাগোড়া ফুলে ভরে আছে, গন্ধে ভুর ভুর করছে।...টেবিলে আমার সামনে গুটিকতক ফুল জড়ো হয়ে আছে, একেবারে যেন নরম মিষ্টি আদরের মত, চোখের ঘুমের মত।"

কারমাটাঁরের কত কথা। কার্তিকের সঙ্গে পুরোন দিনের স্মৃতিচারণ করতে করতে একসময় স্টেশনে পৌঁছে যাই। এখান থেকে আমার যাত্রা হাওয়া বদলের আর এক তীর্থে—মধুপুরে। কার্তিকও ফিরে যাবে তার তিনপুরুষের ডেরায়। যাবার আগে সে হাতজোড় করে বলে, 'হুজুর, কসুর মাফ করবেন। আমার একটা সওয়াল আছে। বাবুজী, বিদ্যাসাগরজী তো বিদ্বান আদমি ছিল। বিদ্বান আর ভগওয়ান্ তো এক কিসিম। তার কোন জাতি থাকে ? লেকিন্ হামেশাই লোকেরা বলে বিদ্যাসাগর বাঙালী-বাঙালী। কাহে ?"

কার্তিকের প্রশ্নে স্তম্ভিত হয়ে যাই। অনুন্নত কারমাটাঁর। নিরক্ষর কার্তিক। অথচ, তার মুখে এ কি সুগভীর মানব প্রেমের বাণী ! কোন উত্তর খুঁজে পাই না। শুধু একটি কবিতা মনে পড়ে যায়, 'পরশমণির সাথে কি দিব তুলনারে, পরশ করিলে হয় সোনা।' কার্তিকও যেন সেই অরূপরতন। তিনপুরুষ ধরে বিদ্যাসাগরের সেবা করে তার মনেও ফলেছে সেই সোনার ফসল।

ঠন-ঠন করে বেজে ওঠে লোহার ঘণ্টা। ট্রেন আসছে। যাব মধুপুর। মাত্র ২২ কিলোমিটার। জংশন স্টেশন। সময় লাগে আধঘণ্টা। গিরিডি যেতে মধুপুরে ট্রেন বদল করতে হয়।

সেকালের মধুপুরে ছিল ছড়ানো-ছিটানো শাল মহুয়ার বন। সেই বন থেকে পাওয়া যেত উৎকৃষ্ট মধু। তাই নাম—মধুপুর। মধুপুরের এই মিষ্টি মিষ্টি নাম কিন্তু সার্থক করে তুললেন বাঙালীরাই। ১৮৭১ সালে বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু এ অঞ্চলে বসবাসের পত্তন করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৯০০ টাকায় মধুপুরের শেখপুরা অঞ্চলটিকেও কিনে ফেললেন। তখন এ অঞ্চলে বাসযোগ্য বাড়ি ছিল না। কুণ্ডুমশায় নিজের বাসস্থানের উল্টোদিকে সারি দিয়ে ছোট ছোট একতলা বাসাবাড়ি নির্মাণ করলেন। সে সব বাড়ি অল্প টাকায় ভাড়াও পাওয়া যেত। বাঙালীরা কুণ্ডুমশায়ের উৎসাহে আসতে লাগলেন হাওয়া বদলে।

সস্তা-গণ্ডার দিন ছিল। বাড়ি ভাড়া ছিল নামমাত্র। দূরের গ্রাম থেকে আসত চাষীরা। বাঁকে করে বাড়ি বাড়ি ফেরি করে বেড়াত টাটকা সবুজ সব্জী, মাছ, ঘানিতে পেষা সরষের তেল। পাওয়া যেত বটের আঠার মত ঘন টাকায় ষোল সের দুধ। মোটা লাল সর পড়া থকথকে দই। স্থানীয় নাম—মহুয়া দই। নরম তুলতুলে ডাব ডাব মাখন টাকায় আট-দশটা মুরগি। রসনার ষোল আনা পরিতৃপ্তি। বদহজমেরও ভয় ছিল না। পাতকুয়োর পাথর চৌয়া স্নিগ্ধ হজমী জল পান। হিমলাগা পশ্চিমের নির্মল বাতাস বুক ভরে গ্রহণ। নিয়ম করে সকালে বিকালে হাঁটাহাঁটি। ক্ষিধে দাউ দাউ করে উঠত।

জিনিসপত্রের এই জলের দর দেখে চেঞ্জারেরা উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠতেন, 'ড্যাম্ চীপ ! ড্যাম্ চীপ !' নিরক্ষর আদিবাসীরা সেই 'ড্যাম্ চীপ' শব্দের অনুকরণে চেঞ্জারবাবুদের বলতে শুরু করল, 'ডান্‌চীবাবু'।

পূর্ব বাংলা আর কলকাতা অঞ্চলের বাঙালীদের কাছে সে খবর অজানা রইল না। তাই মধুপুরের পাথরচাপটিতে এসে বাড়ি করলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী (প্রসাদপুর)। এলেন অসংখ্য বুদ্ধিজীবীরা। শিক্ষাক্ষেত্রের অমিতবীর্য পুরুষ বাঙলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এলেন বিশ শতকের গোড়ায়। তারও আগে স্যার আশুতোষের কাকা ইঞ্জিনিয়ার রাধিকাপ্রসাদ দেওঘরের কারস্টেয়ার্স টাউনে বাড়ি করেছিলেন। কিন্তু যশিডি হয়ে দেওঘর ব্রাঞ্চ লাইনে যাওয়ার সেকালে বিশেষ সুবিধা ছিল না। তাই আশুতোষ ১৯০৪ সালে কুণ্ডুবাবুর কাছ থেকে ১২ বিঘা জমি কিনে ১৯১২ সালে নির্মাণ করলেন প্রাসাদোপম অট্টালিকা। আশুতোষ-পুত্র রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ক'বছর আগে এই বিষয়ে একবার আলোচনার সৌভাগ্য হয়েছিল। বলেছিলেন, "বাবা ঠাকুরদার নামে বাড়ির নাম রাখেন গঙ্গাপ্রসাদ হাউস। গৃহপ্রবেশ হয় ২৯শে কার্তিক, ১৩১৯ সনে। সেবার বাবা আমাদের নিয়ে উঠেছিলেন কুণ্ডুবাংলোয়। গৃহপ্রবেশের দিন আমরা সারি বেঁধে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। সবার আগে চললেন ঠাকুরমা জগত্তারিণী দেবী—একটা গরুর লেজ ধরে। বাবার করা নতুন বাড়িতে তিনি প্রথম পা রাখলেন।"

আশুতোষ আত্মমগ্ন মানুষ ছিলেন না। আত্মীয়-স্বজন, অতিথি-অভ্যাগতদের নিয়ে তবে তাঁর আনন্দ আয়োজন সম্পূর্ণ হত। প্রাসাদতুল্য গঙ্গাপ্রসাদ হাউসেও তিল ঠাঁই থাকত না। তাই সে বাড়ির উল্টোদিকে কয়েক বিঘা জমি কিনে তৈরি করেন আরও একটা বাড়ি লোকে বলত, কাঁঠালতলার বাড়ি। ১৯২৪-এ আশুতোষের অকস্মাৎ তিরোধান। তাঁর মধুপুর-প্রীতি আমৃত্যু অটুট ছিল।

আশুতোষের এই মধুপুর প্রীতি দেখে বাঙালীদের মধ্যে হাওয়া বদলের একটা হিড়িক পড়ে গেল। বাহান্নবিঘায় রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র (অপরাজিতা), ডঃ আর আমমেদ (রিভার ভিউ), ডঃ হরেন মুখার্জি (স্বস্তিকা), লালগড়ে রাজা প্রদ্যুম্ন মল্লিক, রেল স্টেশনের কাছে মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর (টেগোর কট), নিমতলা রোডে কবি ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (দ্বিজাশ্রম) এসে গড়ে তুললেন মনোরম নিকুঞ্জঘেরা নিকেতন। বাহান্নবিঘায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পত্নী সোনামা 'শমধাম' বাড়িটিতে এসে নিলেন জীবনের শেষ আশ্রয়। শেখপুরার প্রান্তে হরলাটাঁরে বাড়ি করলেন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী (বাগচী ভিলা)। বাড়ির পিছনে ছিল বাঁশের বাগান, পুকুর। কিছুদিন আগেও বাগচী ভিলার ধ্বংসাবশেষ নজরে পড়ত। এখন সেখানে উঠছে অন্য কারও নয়া মঞ্জিল। আজও সেখানে বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ ওঠে। কিন্তু কাজলাদিদির কবি যতীন্দ্রমোহনের বাসভূমির শেষ ধ্বংসাবশেষটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

মধুপুরের অন্যপ্রান্তে উত্তরদিকে মালভূমির ওপরে প্রশান্ত সুন্দর এলাকায় গড়ে উঠল আরও কয়েকটি বাড়ি। সেখানকার 'রামকালী লজের' ৮৮ বছরের ভবানীপ্রসুন চট্টোপাধ্যায় সেই নানারঙের দিনগুলির সাক্ষী। বললেন, "সে ছিল অন্য এক জগৎ। বাবা ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় মধুপুরের জলের গুণে মুগ্ধ হয়ে ঐ অঞ্চলে বাড়ি করলেন। ঠাকুরদার নামে নাম হল রামকালী লজ। দশবিঘে জমিতে ছিল ফল, ফুলের বাগান

আর ঝাউগাছের সারি। তাই লোকে বলত, 'ঝাউ কোঠি'। বাবা কবিতা লিখেছিলেন, 'ঝাউ ঢাকা বাড়ি আমার যেন মেঘ ঢাকা বিজলী'। আমার দুই দাদা উকিল কুশীপ্রসূন ও ডাক্তার সীমাপ্রিপ্রসূন ছিলেন বিপ্লবী দলের সভ্য। কলকাতা থেকে ঝুড়িতে করে যখন গাছ আসত তাঁরা ঝুড়ির মধ্যে লুকিয়ে পিস্তল পাঠাতেন। রামকালী লজের গাছের গোড়ায় সেগুলো পুঁতে রাখা হত। ১৯১৬ সালে কলকাতায় তাঁরা গ্রেফতার হন।

কলকাতার প্রাচীনতম পরিবার বড়বাজারের বাঁশতলা স্ট্রিটের শেঠবাড়ি। রায়বাহাদুর নলিনীনাথের শরীর সারানো উপলক্ষে বিশ শতকের গোড়ায় তাঁরা মধুপুর আসেন। তখন বড়বাজার থেকে মধ্যে মধ্যে মানিকতলার পঞ্চবটী ভিলায় তাঁরা হাওয়াবদলে যেতেন। মধুপুরের জল আর বাতাসের সুনাম তাঁদের এদিকে টেনে আনে। ধীরে ধীরে পত্তন হয় শেঠভিলার। তৈরি হয় ফল আর ফুলের বাগান, টেনিস কোর্ট আর ইউক্যালিপ্টাসের উদার মুক্ত অ্যাভিনিউ।

পাথরচাপটির প্রান্তে বাড়ি করলেন তারকনাথ সাধু (মাতৃকা, সাধুসঙ্ঘ)। তারকনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও কন্যারা তারকনাথ ও পত্নী সিদ্ধেশ্বরীর নামে তৈরি করে দিলেন দুটি স্মৃতিমন্দির, যা এখন প্রবাসী বাঙালীর প্রধান মিলনকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এই স্মৃতিমন্দির সংলগ্ন জমিতে ১৯২৬ সালে নির্মিত হল জিতেন্দ্রনাথ মজুমদারের স্মৃতিতে একটি লাইব্রেরি।

মধুপুরের পানীয়াকোলা অঞ্চলে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের শ্বশুর ডাক্তার প্রতাপ মজুমদারের তিনটি বাড়ি নির্মিত হয়। কবিপুত্র দিলীপ রায় মামার বাড়িতে এসে উঠতেন। একবার তাঁর সঙ্গে মধুপুরে আসেন কবি অতুলপ্রসাদ সেন ও সাহানা দেবী। সাহানা দেবীর স্মৃতি কথায় হাসি আর গানে ভরা সেই দিনগুলির মধুর বর্ণনা পাওয়া যায়।

পাথরোলের রাজার ম্যানেজার রায় সাহেব মতিলাল মিত্র ছিলেন মধুপুরের প্রকৃত রূপকার। তাঁর প্রচেষ্টায় যেমন এ অঞ্চলে বাঙালীরা আসতে লাগলেন, তেমনি তিনি গড়ে তুললেন বিদ্যালয়। তাঁরই উদ্যোগে ১৯১১ সালে স্থাপিত হল এডওয়ার্ড জর্জ হাই স্কুল। স্যর আশুতোষের ইচ্ছা ছিল একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার। ১৯১২ সালের প্রদেশ বিভাগে তা আর সম্ভব হয়নি।

নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পাবার আশায় অসুস্থ কাজী নজরুল ইসলাম এসেছিলেন মধুপুরে। ১৯৪২ সালের ১৭ জুলাই কবি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখছেন, "শ্রীচরণেষু…মধুপুরে এসে অনেক Relief amd Relaxation অনুভব করছি। মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কমেছে। জিহ্বার জড়ত্ব সামান্য কমেছে। আপনি এত সত্বর আমার ব্যবস্থা না করলে হয়তো কবি মধুসূদনের মত হাসপাতালে আমার মৃত্যু হত। আমার স্ত্রী আজ প্রায় পাঁচ বছর পঙ্গু হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে। ওকে অনেক কষ্টে এখানে এনেছি…।"

মধুপুর ছিল ডঃ শ্যামাপ্রসাদের আবাল্য মধুর। পিতা আশুতোষের মতন তিনিও ছিলেন

দ্বিতীয় সংস্করণ।

দেওঘর থেকে প্রকাশিত বাঙলা বই, 'বৈদ্যনাথ কথা'
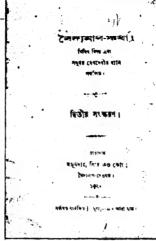
কর্মবীর। ব্যস্ত জীবন ছিল তাঁর। কিন্তু সামান্য সুযোগ পেলেই চলে আসতেন এখানে। একবার অসুস্থ শরীর নিয়ে বিশ্রাম নিতে এলেন গঙ্গাপ্রসাদ হাউসে। লিখতেন দিনলিপি। সেই দিনলিপিতে মধুপুরের অজস্র কথা পাওয়া যায়। ২২ জানুয়ারি, ১৯৪৬ সাল, বধুবার, রাত আটটায় শ্যামাপ্রসাদ লিখছেন, "এখানে ভোরে আর সন্ধ্যার আগে বেড়াতে কত ভাল লাগে… বেশ মাঠের ভিতর দিয়ে, পরিচিত, অপরিচিত পথ বেয়ে যেতে যেতে কত কথাই না মনের মধ্যে ভেসে ওঠে… সবার চেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় এই সময় বিশ্বস্রষ্টার অফুরন্ত মহিমা, তাঁর রাজ্যের মন ভোলানো শোভা, তাঁর প্রেম ও ক্ষমা। আকাশ, বাতাস, মানুষ, প্রকৃতি, সূর্য, চন্দ্র, তারা, ফল ফুল লতা—যা যেখানে দেখি সবই তাঁর দেওয়া। যা আনন্দ পেয়েছি তারই মোহে আবদ্ধ না থেকে যদি সেই সচ্চিদানন্দের নির্বাক বাণীর মধ্যে নিজের প্রেরণা খুঁজে পেতে পারি, তার চেয়ে প্রিয় আর কি হতে পারে!"

মধুময় এই মধুপুর। বাঙালীর বড়ো সাধের বিশ্রামতলা। নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতির প্রেম অনুভব আর হাসিকান্নার

১৮৪২ শকাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের আখ্যাপত্র

শ্রীভাগবত মাহাত্ম্যম্।
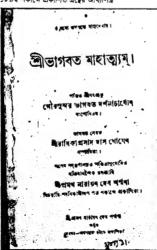
হীরাপান্নার স্মৃতিহার রচনা। সেইসঙ্গে দর্শনীয় স্থানের দর্শনও হয়ে পড়ল অনিবার্য। মধুপুরের ৫ মাইল পূর্বে পাথরোল। সেখানকার প্রাচীন কালীমন্দির ছুটির নেমন্তন্নে আসা বাঙালীদের কাছে তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল। পাথরোলের পাষাণী প্রতিমা অত্যন্ত জাগ্রতা দেবী বলে কথিত। শনি, মঙ্গলবার তাঁর পূজার শ্রেষ্টদিন। সেই দিনগুলোয় শয়ে শয়ে পশু বলি হয়। তীর্থক্ষেত্রে বয়ে যায় তাজা রক্তের গঙ্গা। পাথরোলের কাছাকাছি পাথরড়া বা জগদীশপুরের বুঢ়াই পাহাড়, অথবা বাহান্নবিঘার একান্তে 'কাপিল মঠ'—আকর্ষণ করলো স্বাস্থ্যকামী মানুষকে। সেই মধুপুর ঘুরে ঘুরে দেখি। পথে চলতে চলতে ফিরে ফিরে চাই। মিলিয়ে নিই কি ছিলো, কি নাই। কিন্তু হিসাব যে মেলে না। দিন চলে যায় 'খুঁজিতে খুঁজিতে'।

কিন্তু শুধু মধুপুরকে নিয়েই তো আর সাঁওতাল পরগাণা নয়। এ অঞ্চলের প্রাচীন এবং প্রধান শহর হলো দেওঘর। দেওঘর এখন জেলা শহর। এককালে ছিল অবিভক্ত বাংলার বীরভূম জেলার মধ্যে। দেওঘর হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থ। দেবগৃহ। এই 'দেবগৃহ' শব্দ থেকেই 'দেওঘর' নামেরও সৃষ্টি। এবার আমিও যাব সেই দেবগৃহে।

মধুপুর থেকে ট্রেনে আধঘন্টায় যশিডি। দেবগৃহের প্রবেশদ্বার। তারপর ইচ্ছে মত যাওয়া। সাধ হলে আবার ট্রেনে চেপে শাখা লাইনে দেওঘর। নাহলে আছে বাস, ট্রেকার, টেম্পো, রিক্সা এবং ঘোড়ার গাড়ি।

হয় হাওয়া বদল, নয় বদ্যিনাথ দর্শন—দেওঘরের এই দুই প্রধান আকর্ষণ। সেই বৈদ্যনাথ দর্শনে আসেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ১৮৬১ সালের মাঘ মাস। যশিডি থেকে দেওঘর আসতে তখন ছিল হাঁটা পথ। ঠাকুরও সেই হাঁটাপথ ধরলেন। সঙ্গী রাণী রাসমণির জামাতা মথুর। পথে ঠাকুরের চোখে পড়ল স্থানীয় অধিবাসীদের দুর্দশা। পেটে ভাত নেই। পরনে কাপড় নেই। মাথায় তেল নেই। এসব দেখে পরদুঃখকাতর ঠাকুর মথুরকে বললেন, 'আগে এদের ভাতকাপড় দে, মাথায় তেল দে তারপরে হবে বদ্যিনাথ দর্শন। মথুর পড়লেন বিপদে। সঙ্গে পথের কড়ি ভিন্ন আর একটি পয়সাও অতিরিক্ত নেই। তাই আপত্তি জানালেন। ঠাকুরও বেঁকে বসলেন। বাধ্য হয়ে মথুর কলকাতা থেকে নিয়ে গেলেন অতিরিক্ত অর্থ। প্রত্যেককে দেওয়া হল কাপড়, মাথায় তেল। তারপর একদিন পাঁঠা কেটে হল মহাপ্রসাদের ভোজ। প্রসন্ন হয়ে ঠাকুরও চললেন বৈদ্যনাথ দর্শনে। তাঁরা দেওঘরে ছিলেন সাতদিন। অনুমান করা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ দেওঘরের কারস্টেয়ার্স টাউনে মথুরবাবুর নিত্যধাম বাড়িটিতে অবস্থান করেন।

পৃথিবীতে কিছুই নিত্য নয়। তাই দেখি নিত্যধাম এখন হাতবদল হয়ে অন্যের দখলে। তেমনি অন্যের দখলে চলে গেছে স্বামী বিবেকানন্দের আনন্দকুটির। ছিল বাগবাজারের মুখার্জিদের স্বাস্থ্যনিবাস। স্বামীজী দেওঘরে

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়ী— 'মহুয়া'   *ছবি : তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়*   *ঈশ্বরচন্দ্রের নন্দনকানন*

আসেন তিনবার—১৮৮৯, ১৮৯০ এবং ১৮৯৮ সালে। এখানে এসে তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় দারোয়া নদীতে সূর্যাস্ত দেখতে যেতেন। বসতেন নদীর ধারে একটা বড় কালো পাথরের উপর। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) দমনকারী দারোগা মহেশ চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র উকিল প্রয়াত ভোলানাথবাবু। তিনি তখন কিশোর। রোজ বিকালে তাঁরাও দলবেঁধে যেতেন নদীর ধারে খেলা করতে। তিনি দেখতেন, কালো পাথরের ওপর বিবেকানন্দের প্রশান্ত ধ্যানগম্ভীর মূর্তি। পরণে গেরুয়াবাস। গোধূলির রাঙা আলোয় ফুটে উঠত স্বর্গীয় সুষমা। একবার নদীর চড়ায় ছোটাছুটি করার সময় ভোলানাথবাবুর জুতোর ফিতে খুলে যায়। তিনি জুতোর ফিতে বাঁধতে পারতেন না। স্বামীজীর চোখে পড়তেই তাঁকে ডাকেন এবং নিজের হাতে জুতোর ফিতে বেঁধে দিয়ে বলেন, 'জুতো পর অথচ ফিতে বাঁধতে জান না?'

পবিত্র স্মৃতিময় সেই আনন্দকুটির আর দারোয়া নদী। আজও সেই দারোয়া নদীতে সোনালী বালির বুক চিরে বহে চলে চিকন জলধারা। সূর্যের উদয় অস্ত যেমন ছিলতেমনই আছে। শুধু নেই সেই আনন্দকুটির। এখন তার নাম 'নন্দরাণী বিলা'। অবাঙালীর হোটেল। সেই সুগন্ধবহ অতীতের কথা ভাবতে ভাবতে মন দূরে কোথায় দূরে দূরে চলে যায়। দাদা, আপনি এখানে?

চমকে ফিরে তাকাই। আরে, বিশ্বনাথ! তুমি যে! কতদিন পর হঠাৎ দেখা! বিশ্বনাথ আমার পুরোন বন্ধু। এখন দেওঘরের বাসিন্দা। বিশু হেসে বলে, দেখছেন তো কেমন মেঘলা দিন। ঘরে বসে মন টিকল না। তাই ভাবলাম একটু ঘুরে আসি। তাছাড়া নতুন গাড়ি কিনেছি। বুঝতেই পারছেন। কিন্তু আপনি এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে?

বিশুকে মনের কথা খুলে বলি। তখনই সেও রাজী হয়ে যায়। বলে, জানেন তো বিহারীরা আমাদের কি বলে? বলে, 'হুজুগে বাঙ্গাল'। মানে হুজুগ প্রিয় বাঙালী। আমি ঠিক তাই। আজ আর থাক সব কাজ-কম্মো। বরং আপনার সঙ্গে এই সুযোগে আমারও আবার দেখা হয়ে যাবে বাঙালীদের সেই পুরোন বাড়িগুলো।

বিশু গাড়ি চালাতে থাকে। দেওঘর-যশিডি রোডের ওপর দিয়ে গাড়ির ক্যাঙ্গারু গতি। যেতে যেতে পথে পড়ে সৎসঙ্গ নগর। বাজারের কাছে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইনস্টিটিউশন্। ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ। দেওঘরের বৈদ্যনাথ মন্দিরের ইতিহাস রচনা তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধানমূলক কর্ম। তিনিও এখানে এসেছিলেন সেই হাওয়াবদলের যুগের প্রথমদিকে। স্কুলটির নাম তখন ছিল দেওঘর হাই স্কুল। প্রধান শিক্ষক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ বসু। এই বিদ্যায়তন থেকেই বিপ্লবী বারীন ঘোষও প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন।

একটা চওড়া রাস্তায় এসে গাড়ি থামায় বিশু। বলে, এটা রোহিণী রোড। জায়গাটার নাম—পুরানদহ। আর এই যে বাড়িটা দেখছেন, এখানে থাকতেন মনীষী রাজনারায়ণ বসু। ঋষি অরবিন্দের দাদামশায়। অবাক হয়ে দেখি, বহু মহাপুরুষের পদধূলি রাঙা সেই স্বাস্থ্যনিকেতন। বিশু বলে, উনিশ শতকে দেওঘরে ঋতুপরিবর্তনে যে কজন বাঙালী প্রথম আসেন রাজনারায়ণ বসু তাঁদের অন্যতম। আর রাজনারায়ণের এখানে আসার কারণটা জানেন তো?

স্বীকার করি, জানি না।

বিশু জানায়, রাজনারায়ণ ছিলেন মেদিনীপুরের সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক [illegible]র ছিল ব্লাডপ্রেসারের রোগ। তাই ডাক্তারেরা তাঁকে কাজ থেকে অবসর নিয়ে চেঞ্জে যাওয়ার পরামর্শ দেন। ঠিক সেই সময়ে রাজনারায়ণের বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায় এ অঞ্চলে স্কুল ইনস্পেক্টরের কাজে নিযুক্ত। তিনিই উদ্যোগী হয়ে রাজনারায়ণকে এখানে হাওয়া-বদলে নিয়ে আসেন। তিনি আমৃত্যু এখানেই ছিলেন। দেহও রাখেন দেওঘরে।

দেওঘরের পাণ্ডারা রাজানারায়ণকে কি বলত জানেন? বলত, 'আমাদের দোসরা বৈদ্যনাথ'।

বিশুর কথা মন দিয়ে শুনি। আর ভাবি, কি সব মানুষ ছিলেন! বইয়ে পড়েছি, রাজনারায়ণ বসু যখন অসুস্থ তখন এই বাড়িতে তাঁকে দেখতে আসেন কবি নবীনচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই পুণ্যভূমি ঘুরে ঘুরে দেখি। মনে হয় আরও কত বিখ্যাত মানুষেরা এই বাড়িতে এসেছিলেন কে জানে। প্রায় সেই সময়ে দেওঘরে বিশিষ্ট বদ্ধিজীবীদের এক সমাবেশও ঘটেছিল। এঁদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল, বায়ু পরিবর্তন। এসেছিলেন মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সঞ্জীবনী সম্পাদক—কৃষ্ণকুমার মিত্র, বসুমতীর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, হিতবাদীর সখারাম গণেশ দেউস্কর। অবশ্য দেউস্করের জন্ম দেওঘরে। ইনি ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় বংশজাত। কিন্তু বাংলা ভাষায় তাঁর ছিল অশেষ বুৎপত্তি।

বাইরে থেকে ঘুরে ঘুরে বাড়িটা দেখি। মনে হয়, 'স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি। ভারমুক্ত সে এখানে নাই।'

বিশু গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলে, 'মাথার ওপরে মেঘখানা দেখছেন তো। মনে হচ্ছে এখনই ঢালবে। জলদি করুন।'

তাড়াতাড়ি গাড়িতে চাপি। গাছের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় রাজনারায়ণের হাওয়া বদলের

ছবি : তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রস্মৃতিধন্য শশিভূষণ বসুর বাড়ি ছবি : তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়

কুঠি। পথের পাশে দেওদার আর ইউক্যালিপ্টাসের সারি। একালের নতুন গড়ে ওঠা বহুতল বাড়ি। তারই ফাঁকে ফাঁকে নজরে আসে কোথাও সেই পুরোন আমলের ঘরদোর। ভাঙা। স্যাঁতলা পড়া। মূর্তিমান অতীত।

বিশু জানায়, বাঙালীরা সেকালে শুধু ছুটি কাটাতে আর নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে এ অঞ্চলে আসতেন না। এ অঞ্চলে তাঁদের নানা কীর্তিও আছে। আমরা চলেছি সেইরকম একটা জায়গায়—করণীবাদের নওলাক্ষা মন্দিরে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে পৌঁছে যাই। বাগান পার হয়ে মন্দিরের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। প্রবেশমুখে শ্বেতপাথরের নারী মূর্তি। বৈধব্য বেশ।

বিশু বলে, ইনিই এই মন্দিরের নির্মাতা—চারুশীলা দাসী। জমিদার গৃহিণী। এঁর একমাত্র পুত্র যতীন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার জন্য এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। ১৩৪৮ সনে। সেকালে মন্দির তৈরী করতে খরচ হয়েছিল নয় লক্ষ টাকা—তাই মন্দিরেরও নাম নওলাক্ষা। চারুশীলা দাসী মহর্ষি বালানন্দের শিষ্যা ছিলেন। এই মন্দিরে বালানন্দেরও একটা অপরূপ মূর্তি আছে।

সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের ওপরে উঠে যাই। পাথর বাঁধানো প্রশস্ত মন্দির। প্রশস্ত মনোরম পরিবেশ। মন্দিরের কাছে পুকুরপারে চারুশীলার বাসস্থানও নজরে পড়ে। তার ওপাশে বালানন্দের আশ্রম।

মন্দির দেখে নেমে আসি। বাগানের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে বিশু বলে, শুধু মন্দির বা ধর্মপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা বাঙালীদের উদ্দেশ্য ছিল না। ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর পত্নীর নামে এখানে 'রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। আর শিক্ষাক্ষেত্রের কথা শুনবেন। নৃসিংহ নন্দী ১৯১০ সালে তাঁর বাবার নামে স্থাপন করেন 'দীনবন্ধু মধ্য বিদ্যালয়'। বাঙলাভাষীদের পড়াশুনার জন্য এখন সেটাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান। আর রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যুর পর রাজনারায়ণের স্মৃতিতে তৈরি লাইব্রেরির কথা বোধ হয় আপনি জানেন?

হেসে বলি, হ্যাঁ, সেটা আগেও একবার দেখেছি। কিন্তু এ তো বললে না, বাঙালীদের সেই সুস্থ সংস্কৃতি বোধ একালেও নষ্ট হয়নি। তাই দীনবন্ধু বিদ্যায়তনে এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তোমারই করা 'হংসধ্বনি' সঙ্গীতায়ন।

বিশু মাথা নিচু করে মাথা চুলকাতে চুলকাতে হাসে। বাগান পার হয়ে এসে আমরা আবার গাড়িতে চাপি। করণীবাগ পার হয়ে গাড়ি ঢোকে বাজারের কাছাকাছি কারস্টেয়ার্স টাউনে। একটা আধ ভাঙা বাড়ির সামনে গাড়ি থামে। ভাঙা গেটের গায়ে পাথরের ফলকে এখনও স্পষ্ট করে লেখা—'মালঞ্চ'। বিশু বলে, জানেন এখানে হাওয়া বদলে এসে কে থাকতেন?

পাথরোলের পাষাণী প্রতিমা ছবি : তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়

হেসে উত্তর দিই, জানি। খুব ভাল করে জানি। এখানে এসেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর লেখা দেওঘরের স্মৃতিতে এখানকার কথা আছে।

বিশু বেশ জোর দিয়ে বলে, আপনি বইয়ে পড়েছেন আর আপনাকে আমি এমন একজন মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারি যিনি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের আত্মীয়। তাঁর কাছে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিও আছে। সাঁওতালপরগণা আর তার ইতিহাসের খনি। নাম শরদিন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। এঁর বাবা রায়বাহাদুর ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে মামা ছিলেন। যাবেন সেখানে?

বলি, যাব মানে, এক্ষুনি চল।

বিশু সেইমত নিয়ে চলে। বাজার পার হয়ে কোর্টের গা দিয়ে গাড়ি চলে বারামাসিয়া অঞ্চলে। অল্পক্ষণের মধ্যে একটা সুন্দর একতলা বাড়ির সামনে গাড়ি থামে। বাড়ির নামটিও চমৎকার 'রূপসাগর'। বিশু আলাপ করিয়ে দেয়। প্রাথমিক পরিচয় চুকিয়ে শরদিন্দুবাবুকে বলি এখানে শরৎচন্দ্র এসেছিলেন, শুনেছি শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রও আপনার কাছে আছে। সে সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

শরদিন্দুবাবু বলেন, 'শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তাও ছিল। তাছাড়া আমার বাবাকে ভালও বাসতেন খুব। বাবা ছিলেন পেশায় ডাক্তার। তিনি বালেশ্বরের যুদ্ধে আহত বিপ্লবী বাঘা যতীনের শেষ মুহূর্তের চিকিৎসকও ছিলেন। এছাড়া তাঁর ছিল বিশেষ সাহিত্যপ্রীতি। গল্প লিখে সেকালে কুন্তলীন পুরস্কারও পেয়েছিলেন। রামচন্দ্র যখন এখানে আসেন বাবা তখন দেওঘর সদর হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। আসার আগে শরৎচন্দ্র বাবাকে ২৪, অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ি থেকে একটি চিঠিও লেখেন।' কথা থামিয়ে

শরদিন্দুবাবু উঠে যান। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরেও আসেন। হাতে শরৎচন্দ্রের সেই চিঠিখানি। আমাকে দেখতে দেন। তাতে লেখা—"প্রিয় সত্য—স্থান পরিবর্তনেরও অনেকে উপদেশ দিচ্ছেন। রবিবাবুর সেই শ্লোকটা মনে পড়ে—নিজের আশেপাশে চেয়ে—"নানান ছাপের জমলো শিশি, নানান মাপের কৌটা হল জড়ো, ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়ো, ডাক্তারেরা বললে তখন হাওয়া বদল করো।" অথচ, ভারি শীতকাতুরে লোক আমি, দেওঘরের কনকনে বাতাস মনে পড়লেই যাবার উৎসাহ zero ডিগ্রিতে এসে দাঁড়ায়।...বাবা বৈদ্যনাথধাম বাসের সংকল্প শেষ পর্যন্ত টিকবে কিনা জানিনে, কিন্তু টিকে যদি থাকে তো তুমি যে এখনও ওখানেই আছো এ একটা মস্ত সান্ত্বনা। খবর তোমাকে দেবই।...ইতি ৮ই পৌষ ১৩৪৩ ॥ শরৎ ॥"

চিঠি পড়া শেষ করি। শরদিন্দুবাবু বলেন, শরৎচন্দ্র এখানে আসেন ২রা মার্চ, ১৯৩৭ সালে। ছিলেন সে বছরের ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত। থাকতেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের মালঞ্চ বাড়িতে। এখানে এসে তাঁর স্বাস্থ্যও ভাল হয়। সেকথা আপনি পাবেন শরৎচন্দ্রের লেখা আর একটি চিঠিতে। চিঠিটি লেখেন তাঁর একান্ত স্নেহভাজন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। আপনি উমাপ্রসাদবাবুর 'শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গ' বইতে এ খবর পাবেন।

আমি তখনি জানাই, সে বই আমি পড়েছি। সেই চিঠিতে শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদবাবুকে (ডাকনাম—বিজু) লিখছেন,—"পরম কল্যাণীয়েষু, বিজু,...এখানে এসে ভালই আছি।...এখানকার এই বাড়িটি বেশ বড় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাজার প্রভৃতি দূরে নয়। অনতিকাল পূর্বে বৃষ্টি হবার জন্যে শীত আছে, ধুলো নেই।... সবাই বলচেন, চেপে মাসখানেক থাকতে পারলে সব দিকেই উন্নতি হবে। হয় যদি, স্বীকার করতেই হবে বর্তমান ফাঁড়াটা কাটলো এ যাত্রায়।-ইতি—১৯শে ফাল্গুন ১৩৪৩ শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

শরদিন্দুবাবু বলেন, শরৎচন্দ্র সেবার এখানকার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ পরিদর্শন করেন। সে সব অনেক কথা। দেওঘরে বাঙালীদের আসার অন্ত ছিল না। এখানে কবি নজরুলও এসেছেন। বিয়ের পর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। উঠেছিলেন পুরানদহে প্রসন্নপ্রসাদ বাড়িতে। বেলাবাগানে রাজশাহীর জমিদার গুপ্তবিপ্লবী সারদা দত্তের 'মঠ বাড়ি' ছিল। নজরুল বিপ্লবীদের সেই গোপন আস্তানায় যেতেন। আসতেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। বাবার কাছে চিকিৎসা করাতেন। দুজনের ছিল খুব শ্রদ্ধার সম্পর্ক।

হঠাৎ আমাদের কথাবার্তায় ছেদ পড়ে। গেট্ খুলে এগিয়ে আসেন এক ভদ্রলোক। শরদিন্দুবাবু তাঁকে দেখে সোৎসাহে বলেন, 'আরে এসো এসো। দেখ কি যোগাযোগ। তোমার কথাই তো ভাবছিলাম'। তারপর আমার সঙ্গে সেই ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দেন। আমিও খুশি হই। বলি, এসেছি দেওঘরে আর তাঁর কথা না জানলে যে গোড়াতেই গলদ থেকে যাবে।

ভদ্রলোক বিনয়ী। কাঁধ পর্যন্ত কোঁকড়ান চুল। পরনে ধুতি, জামা। মনীষী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের দৌহিত্র। তাঁকে আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য জানাই। তিনি বলেন, উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু সে সব কতকালের কথা। সব কি মনে আছে! শুধু মনে আছে, দাদামশায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার দেওঘরে হাওয়া-বদলে আসনে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। পুরানদহ অঞ্চলে থাকতেন। সে বাড়ি এখন লুপ্ত। আমার মা অক্ষয়চন্দ্রের ছোট মেয়ে ছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছি দাদামশায়ের বাড়ির সামনে ছিল গোচারণের সবুজ মাঠ। তাই দেখে তিনি কবিতাও লেখেন—কোমল শ্যামল তৃণ ঢাকা ধরাতল/বহুদূর ভরপুর সবুজ কেবল।

আমার মা হেমবরণীর সঙ্গে বিবাহ হয় পিতৃদেব রাধিকাপ্রসাদ ঘোষের। তিনি কলকাতায় ১৬৮ আপার সার্কুলার রোডের বাসিন্দা। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে হাওয়া-বদলে সেই যে তিনি দেওঘর এলেন তারপর আমৃত্যু এখানেই কাটান। তাঁর বাড়ির নাম 'অশত্থছায়া'। সেটি এখন আমাদের বাসস্থান। বাবা ভাগবত মাহাত্ম্যম্ গ্রন্থের প্রণেতা। সে গ্রন্থ দেওঘর থেকেই প্রকাশিত হয়। তিনি ভাগবতরত্ন উপাধিও লাভ করেন। পিতৃদেব সংস্কৃতে বাইবেলও অনুবাদ করেছিলেন।

শরদিন্দুবাবু চুপ করে শুনছিলেন। এখন বলেন, এ অঞ্চলে ছিল বাঙালীদেরই হাতে গড়া উপনিবেশ। তাই অফিস, কাছারি, সর্বত্র বাংলা ভাষাতেই কাজ হত। ১৩২০ সনে দেওঘর থেকে 'মজুমদার, সিংহ এন্ড কোং' বাংলায় 'বৈদ্যনাথ কথা' বইও প্রকাশ করেন।

আমি এসব শুনি, আর ভাবি, দেওঘরের কত কথা। কত স্মৃতি। কথা থেমে যায়। কিন্তু মনের আড়ালে স্মৃতি নিরন্তর স্মরণহারা অতীতকে সম্মুখে আনে।

শরদিন্দুবাবুদের অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়ি। বাইরে চেয়ে দেখি সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। অথচ সন্ধ্যা নয়। বিকাল। বর্ষা তার কালো ফরাসখানা আকাশজুড়ে বিছিয়ে দিয়েছে।

বিশ্বনাথ চট্পট্ গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলে, বৃষ্টি নামার আগে আপনাকে রিখিয়া যাওয়ার রাস্তাটা দেখিয়ে দিই। কাল না হয় সে জায়গাটাও ঘুরে আসবেন। এখান থেকে মাত্র দশ কিলোমিটারের পথ। আমি জানাই, রিখিয়া ক'বছর আগেই আমার ঘোরা হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি কি রিখিয়ার ইতিহাস কিছু জান?

সে স্বীকার করে, না জানি না।

আমি হেসে বলি, তাহলে শোন—সেকালে দেওঘরে বাঙালীদের এই জমজমাট সমাবেশ লক্ষ করে কেউ কেউ হাওয়া-বদলের আস্তানা গড়ার জন্য বেছে নিলেন আরো নিরালা নির্জন প্রান্তর। ১৮৮০-'৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কর্নেল কে পি গুপ্ত, মির্জা সুজা আলি বেগ খাঁ মোট নয়জন মিলে ঐরকম কতকগুলো মৌজা নির্বাচন করেন। এই রিখিয়া ছিল তার মধ্যে প্রধান। তাঁরা The Deoghar Agricultural Settlement Company ও প্রতিষ্ঠা করলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। উৎসাহী মানুষকে রিখিয়ায় থাকার জন্য নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে কম্পানি জায়গা দিত। কম্পানি ৩০ বছর কাজও চালায়। ১৯৫৬ সালের জমিদারী অধিগ্রহণ করার ফলে ঐ সংস্থা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ রিখিয়ায় এসে উঠতেন লালকুঠীতে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধু পত্নী বাসন্তী দেবী 'তালুক বহিঙ্গা' লিজ নিয়েছিলেন। আর দেশবন্ধুর অর্থ সাহায্যে তৈরি হয় দেওঘর-রিখিয়া রাস্তা, হরলাজুড়ি-বাবুডিহ্ রাস্তা ও কয়েকটি ব্রিজ। প্রতিবছর পুজোর সময় দেশবন্ধু এখানকার গরিবদুঃখীদের কাপড় দান করতেন।

বিশু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কি সব দরাজ মন ছিল তাঁদের।

আমি বলি, তাহলে ঘুরিয়ে নাও তোমার গাড়ি। রিখিয়ার রাস্তা না ধরে, চল যশিডি। সেখান থেকে ট্রেন ধরব। যাব গিরিডি।

সেইমত গাড়িও ঘোরে। বিশু জানায়, দেওঘরের পূর্ব-পশ্চিম কোণে রোহিণী বলে একটা গ্রাম আছে। শুনেছি, সেখানকার 'শীলস্ লজে' থাকতেন ঋষি অরবিন্দ আর তাঁর মা। স্থানীয় লোকেরা অরবিন্দ জননীকে বলত 'পাগলি মেম'। অরবিন্দের ভাই বারীন ঘোষ তো দেওঘরের হাইস্কুলে পড়েছেন। সেই সূত্রে রোহিণীর ঐ বাড়িতে আসতেন বারীনের অগ্নিযুগের বিপ্লবী বন্ধুরা। সেখানে গোপনে তাঁরা বোমা বানাতেন। একবার দেওঘরের দিঘরিয়া পাহাড়ে সেই বোমা ফাটিয়ে বোমার শক্তি পরীক্ষা করা হয়। এবং বিপ্লবী প্রফুল্ল চক্রবর্তী সেই ঘটনায় প্রাণ হারান। জানেন তো?

হেসে জবাব দিই, জানি। বইতে পড়েছি।

যশিডি স্টেশনে এসে বিশুর বাহন থামে। ততক্ষণে মেঘের সেই ঘনঘটা আর নেই। পশ্চিমের নীল আকাশে লেগেছে নানারঙের ছোপ। দূরে দিঘরিয়া পাহাড়ের নীলাঞ্জন ছায়া। মালভূমির সবুজ ঢেউ। এক আধটা শিমুল বা পলাশ গাছ সেই সুনীল উৎসবের মধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে। বিশু সেদিকে তাকিয়ে কবিতা বলে—

"কোনদিন গেছ কি হারিয়ে,
হাট-বাট নগর ছাড়িয়ে
দিশাহারা মাঠে,
একটি শিমুল গাছ নিয়ে
আকাশের বেলা যেথা কাটে?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশু চুপ করে। তারপর বলে, আপনার এ যাত্রায় আর ঝাঁঝা, শিমুলতলা যাওয়া হল না।

স্বীকার করি, এ যাত্রায় যাওয়া হল না বটে। তবে ঐ অঞ্চলে আগে কবার ঘুরে এসেছি। মধুপুর, দেওঘরের মত ওখানেও গড়ে উঠেছিল বাঙালীদের ছুটির বিশ্রামতলা। শিমুলতলায় লর্ড এস পি সিংহ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ি করেছিলেন। যে প্রান্তে লর্ড সিংহের বাড়ি লোকেরা তাকে বলত 'হাউস অফ লর্ডস' আর অন্য প্রান্তটিকে বলা হত 'হাউস অফ কমন্স'। সেকালে এই অঞ্চলটিও সাঁওতাল পরগণার মধ্যেই ছিল। অবশ্য একালে চলে গেছে

মুঙ্গের জেলায়।

ট্রেন এসে যায়। যাত্রী বোঝাই কামরার ঠেলাঠেলি ভিড়ে কোন রকমে মাথা গুঁজে দিই। বাইরে থেকে বিশু চেঁচায়, 'দাদা পকেটটা সামলে, আজকাল এখানেও···।' গাড়ির আওয়াজে বিশুর সব কথাটা কানে যায় না। কিন্তু বুঝতে পারি। এ অঞ্চল সেকালে ছিল সত্যিই রামরাজত্ব। চুরি ছিন্তাইয়ের নাম গন্ধ ছিল না। কালের গতি সব বদলে দিয়েছে।

আধ ঘণ্টায় মধুপুর। প্ল্যাটফর্মে গিরিডির সেই প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়িয়ে। দূরত্ব ৩৬ কিলোমিটার। ঘণ্টা খানেকের পথ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন ছাড়ে। সঙ্গীহীন আমি চোখ বুজে ভাবতে থাকি, গিরিডির কোথায় যাব, কি দেখব।

জগদীশপুরে গাড়ি থামে। পরের স্টেশন মহেশমুণ্ডা। তারপরই গিরিডি। জানালার ধারে চা-অলা হাঁক পাড়ে, চাগ্রাম—চাগ্রাম···। এক ভাঁড় চা নিয়ে টাকা দিই। চা-অলা বলে, 'খুদ্‌রা দিজিয়ে'। মহাসঙ্কট। পকেটে খুচরো নেই। উপায়! এদিকে যে চায়ে ঠোঁট ডুবিয়ে বসে আছি। ভাঙা হিন্দিতে চা-অলাকে বোঝাতে চেষ্টা করি। বেঞ্চের অপর প্রান্ত থেকে মোটা গলায় এক বয়স্ক ভদ্রলোক বলেন, ভায়া বুঝি বঙ্গসন্তান?

অসহায় মুখে তাকাই। বলি, হ্যাঁ।

তখনই সমস্যাও মিটে যায়। চা-অলার হাতেও দেখি ভদ্রলোক পয়সা ধরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করেন, গন্তব্য কি গিরিডি?

উত্তর দিই, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কোথায়?

বলি, সঠিক কোন ঠিকানা নেই। তবে ইচ্ছে, বাঙালীরা এ অঞ্চলে এককালে হাওয়া বদলে আসতেন। বিখ্যাত মনীষীরা গড়ে তুলেছিলেন নিজেদের মনোমত স্বাস্থ্যনিকেতন। সেই সব অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখব।

ভদ্রলোক বলেন, কিন্তু ভায়া হাওয়া যে বদলে গেছে। বাঙালীর সেই ঘরদোরগুলো ভেঙেচুরে কিছু মাটিতে মিশিয়েছে, কিছু যা বেঁচে আছে সে সব অন্যদের দখলে। শহরের ভোলও গেছে পাল্টে। চিনতে পারবেন কি? তা আপনার সঙ্গে কোন গাইড আছে নাকি?

হেসে বলি, আসছি, বাইরে থেকে, একাই।

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে জবাব দেন, দেখছি বুড়োটাকে বিপদে ফেললেন। চলুন, দেখা যাক। তা এ অঞ্চলের হিস্ট্রি কিছু সংগ্রহে আছে?

মাথা নাড়ি, আজ্ঞে না।

তিনি বলেন, ঢাল নাই তরোয়াল নাই নিধিরাম সর্দার। তা বেশ। তাহলে শুনুন। যতটুকু জানি বলছি—জানেন বোধ হয় এ অঞ্চলের মধ্যে খনিজ সম্পদে, বিশেষ করে অভ্র, তামা, কয়লায় সমৃদ্ধ গিরিডির মত জায়গা কমই আছে। ১৮৮২ সালে একদল ইংরেজ গিরিডিতে আসে। গিরিডি তখন গণ্ডগ্রাম ছিল। সেই গিরিডির কাছে বারগাণ্ডা নামে আর একটি গ্রামে ইংরেজেরা পেল তামার খনির সন্ধান। তারা গঠন করল "বারগাণ্ডা কপার করপোরেশন্"। কিন্তু কিছুদিন পর তারা বুঝল, এ ব্যবসায় লাভ নেই। তাই ১৮৯০ সালে তারা সে সব বিক্রি করে দিয়ে চলে গেল। কিনলেন কলকাতার কয়েকজন বাঙালী। তিনকড়ি বসু তখন গিরিডির পুরনো বাসিন্দা। তিনি বাঙালীদের উৎসাহ দিলেন। সাহেবদের বাঙলো বাড়িগুলোও তারা কিনে ফেললেন। শশিভূষণ বসু, ডাক্তার নীলরতন সরকার, সন্তোষের বাজার বড় ভগ্নিপতি সত্যানন্দ বসু। এসব ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। সেই হল গিরিডি অঞ্চলে বাঙালীদের উপনিবেশ গড়ার পত্তন। তাছাড়া এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য আর জল, বাতাসের গুণে মুগ্ধ হয়ে একের পর এক আসতে লাগলেন। পুজোর, বড়দিনের ছুটিতে বাঙালীদের ঢল নামত।

এদিকে গিরিডিতে ট্রেন পৌঁছে গেছে। জিনিসপত্র গোছগাছ করতে করতে তিনি বলেন, ভায়ার তো দেখছি ফিকির নেই। তা এই রাতের বেলাটা কাটবে কোথায়?

বলি, হোটেলে।

তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন, কি, হোটেলে? কেন আমি কি দোষ করলাম। শুনুন, ভাল চান তো চলুন আমার সঙ্গে। রাতটা কষ্ট করে বৃদ্ধের বাড়িতেই কাটিয়ে দিন। তারপর সকাল হোক। বেঁচে যদি থাকি তো সঙ্গে করে সব ঘুরিয়ে দেখাব।

না বলার সাহস হয় না। অতএব তাঁর পিছু নিই। ভদ্রলোক প্রবাসী বাঙালী। কর্মস্থল ছিল গিরিডি। এখন অবসর নিয়ে এখানেই আছেন। নাম শুনি, সদানন্দ ভদ্র। প্রবাসী বাঙালীর পরম আদর যত্নে আয়াসে সে রাত কাটে। পরদিন সকালে তিনি নিয়ে চলেন বাঙালীর সেই প্রায় অবলুপ্ত সাম্রাজ্যের দিকে।

গিরিডি এখন জেলা শহর। খনি অঞ্চল। লোকজন, হৈ চৈ, জমজমাট শহর। সেই ভিড় ঠেলে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাই নতুন বারগাণ্ডা অঞ্চলে। সে অঞ্চলেও দেখি পথের ধারে হাল ফ্যাশানের ছোট ছোট বাড়ি। ঠাসাঠাসি। তারই ফাঁকে ফাঁকে বাঙালীদের সেই হাওয়া বদলের কুঠী। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। বয়সজীর্ণ। শূন্যমন্দির যেন। স্তব্ধতার প্রতিমূর্তি।

সদানন্দবাবু বলেন, বাঙালীদের এদিকে হাওয়া-বদলে আসার যখন পত্তন হল তখন এসব ছিল অজ পাড়া-গাঁ। এখানে দাঁড়িয়েই দেখা যেত খাণ্ডোলি পাহাড়, উশ্রী নদী। ছিল শাল আর মহুয়ার বন। গিরিডি জেলখানার উল্টোদিকে একটা বাড়ির সামনে সদানন্দবাবু থামেন। বলেন, এটা শান্তিনিবাস। জেলা জজ অমৃতনাথ মিত্রের বাড়ি ছিল। এঁরই আত্মীয় ছিলেন স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। জগদীশচন্দ্র এখানে এসে উঠতেন। ১৯৩৭ সালে দেহও রাখেন এই বাড়িতেই।

সে বাড়িতে এখন আর ঢোকার উপায় নেই। হয়েছে অভ্র রফতানিকারীদের সংস্থা। বাইরে থেকেই চলে আসতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছই নতুন বারগাণ্ডার প্রান্তে। সেখানে দেখি হেরম্বচন্দ্র

রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে মামা ছিলেন। তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠি

মৈত্রের কমলাবাস। সদানন্দবাবু বলেন, হেরম্বচন্দ্রের মেয়ের নাম ছিল কমলা। তাঁরই স্মৃতিতে এই বাড়ি। কমলাবাসের উল্টোদিকে বড় গেটঅলা 'মহুয়া'। ভেতরে ঢুকে দেখি, প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে পাশাপাশি শালবনী, মহুয়া এবং উত্তরা। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়ি। সদানন্দবাবু জানান, উনিশ শতকের তিরিশের দশক নাগাদ প্রশান্তচন্দ্র স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিটিউটের একটি শাখা খোলেন। প্রশান্তচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাণী মহলানবিশ এ বাড়ি দান করে দেন। শোনা যায়, তাঁরই ইচ্ছানুসারে এখানে এখন স্থাপিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ মহিলা মহাবিদ্যালয়।

মাথার ওপর ভাদ্রের সূর্য। চিড়বিড়ে রোদ। গুমোট গরম। তারই মধ্যে দিয়ে আমরা হেঁটে পৌঁছে যাই বারগাণ্ডা চকে। চারিদিকে চা, পান, কাঠের গুমটির দোকান। জঞ্জাল। থিকথিকে ভিড়। তারই ফাঁকে ছোট্ট একটা গেট খুলে সদানন্দবাবু ঢুকে পড়েন। অনেকখানি সীমানা ঘেরা একটা বাড়ি। প্রাচীরের গায়ে সুঠাম চেহারার দীর্ঘ ইউক্যালিপটাস গাছ। তিনি বলেন, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের গোলকুঠি। আমরাও যৌবনে দেখেছি এ বাড়ির বাহারী গোলাপের বাগান। এটাও চলে গেল অবাঙালীর হাতে। সেকালে এই অঞ্চলে এসে বাসা বেঁধেছিলেন কবি কামিনী রায়ের স্বামী কে এন রায়, গগনচন্দ্র হোম। এসেছিলেন বাখরগঞ্জের জমিদার মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। কিনেছিলেন অভ্রের খনি। বাড়ি করেছিলেন শিশু-সাহিত্যিক সুনির্মল বসুর বাবা পশুপতি বসু। সুনির্মল বসু গিরিডি স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁর বাল্য ও কৈশোর এখানেই কেটেছে। স্যর নীলরতন সরকারও এইদিকে বাড়ি করেন। সেখানেই ১৯৪৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

কথা বলতে বলতে আমরা বেরিয়ে আসি। সদানন্দবাবু বলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ১৯১৪ সাল নাগাদ জার্মানীর সাহেব মায়ার্স তার বাড়ি বিক্রি করে দেন। ক্রিশ্চান হিলসের কাছে শালবন ঘেরা ভারি চমৎকার মনোরম বাঙলো। সেটি কিনে নেন গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

আমি চমকে উঠে বলি, গৌরীপুরের জমিদারের বাড়ি!

সদানন্দবাবু মুচকি হেসে বলেন, ভায়া যে বিষম খেলে। উত্তর দিই, তার যে কারণ আছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে গিরিডির ঐ ব্রজেন্দ্রকিশোরবাবুর বাড়িতে এসে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কবির শরীর তখন অসুস্থ। তাই প্রয়োজন হয়েছিল চেঞ্জের। কিন্তু এখানে আর আসতে পারেননি। চলে গিয়েছিলেন পাহাড়ে।

সদানন্দবাবু বলেন, কিন্তু কবি যে গিরিডিতে কয়েকবারই এসেছিলেন। উঠেছিলেন শশিভূষণ বসুর বাড়িতে। কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু সুহৃদ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের অতিথি হয়ে। আমরা সেইদিকেই তো যাচ্ছি।

পথের বাঁক ঘুরতে বাঁ হাতে দেখা যায় বাঙালীর করা মনোরম অথচ জীর্ণ 'উপলাপথ'। সুরেশচন্দ্র সরকারের বাড়ি। আর একটু এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে শশিভূষণ বসুর বাড়ি। কিন্তু রবীন্দ্র স্মৃতিধন্য সে বাড়ির হাল দেখে চোখে জল আসে। চাল নেই। ভাঙা দেয়ালে গজিয়েছে মহাকালের সাক্ষী অশ্বত্থচারা। নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

মনে হয়, বাঙালী যদি আবার কোনওদিন তার এই লুপ্ত সাম্রাজ্য ফিরেও পায়, ততদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এইসব মহামূল্যবান স্মৃতিকুঠিগুলি। বাঙালীরা গর্ব করে বলতে পারবে না, 'দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা সাধের কানন মোর।'

সদানন্দবাবু স্তব্ধতা ভাঙেন, কবি গিরিডিতে বসে যে দুটি কবিতা 'শিবাজি উৎসব' (১১ ভাদ্র, ১৩১১) এবং 'দান' (২৬ ভাদ্র, ১৩১২) রচনা করেছিলেন তা হয়তো এই বাড়িতে বসেই।

জবাব দিই, হয়তো তাই। কবির 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'ছোটনাগপুর' প্রবন্ধে এ অঞ্চলের একটা মনোরম বর্ণনা আছে। শুনবেন? সদানন্দবাবু অবাক হন, কাছে আছে নাকি? বেশ তাহলে শুনি।

আমি পড়তে শুরু করি—"রাত্রে হাবড়ায় রেলগাড়িতে চড়িলাম।...রাত চারটার সময় মধুপুর স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইল। অন্ধকার মিলাইয়া আসিলে পর প্রভাতের আলোকে গাড়ির জানালায় বসিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম। গাড়ি অবিশ্রাম অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাঙা মাঠের এক-এক জায়গায় শুষ্ক নদীর বালুকারেখা দেখা যায়; সেই নদীর পথে বড়ো বড়ো কালো কালো পাথর পৃথিবীর কঙ্কালের মতো বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে এক-একটা মুণ্ডের মত পাহাড় দেখা যাইতেছে। দূরের পাহাড়গুলি ঘন নীল, যেন আকাশের নীল মেঘ খেলা করিতে আসিয়া পৃথিবীতে ধরা পড়িয়াছে; আকাশে উড়িবার জন্য যেন পাখা তুলিয়াছে, কিন্তু বাঁধা আছে বলিয়া উড়িতে পারিতেছে না; আকাশ হইতে তাহার স্বজাতীয় মেঘেরা আসিয়া তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া যাইতেছে।... সকালে ছয়টার সময় গিরিধি স্টেশনে গিয়া পৌঁছিলাম।...সর্বপ্রথমে গিরিধি ডাক বাংলায় গিয়া স্নানাহার করিয়া লওয়া গেল। ডাক বাংলার যতদূরে চাই, ঘাসের চিহ্ন নাই। মাঝে মাঝে গোটাকতক গাছ আছে। চারিদিকে যেন রাঙামাটির ঢেউ উঠিয়াছে।"

পড়া শেষ হয়। দেখি, সদানন্দবাবু কাপড়ে খুঁটে চোখ মোছেন। কাঁপা গলায় বলেন, এ যে সত্যিই স্বর্গরাজ্য। গিরিডির উশ্রী নদী বা উশ্রীর ঝরনা, দূরের পরেশনাথ (৪৪৮১'), ভাদুয়া বা খাণ্ডোলি পাহাড়, তার কাছাকাছি শিরশিয়া ঝিল—এসবের সৌন্দর্য দেখেও ফুরোয় না। কবি সুনির্মল বসুর 'মনে পড়ে' কবিতায় এখানকার সুন্দর ছবি আছে—

মনে পড়ে অতীতের স্মৃতি অনাবিল,
উশ্রী নদীর জল করে ঝিলমিল;
আমলকি বনে বনে ছায়া কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে,
শিরশির করে ওঠে 'শিরশিয়া' ঝিল!

সদানন্দবাবু কবিতা শেষ করেন। আমি বলি, তাহলে বাঙালীদের হাতে গড়া এই সাধের স্বাস্থ্যনিবাস এভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেন?

সদানন্দবাবু জবাব দেন, দেখ ভায়া, পৃথিবীতে কিছুই চিরন্তন নয়। রোম সাম্রাজ্যও ভেঙে গিয়েছিল, ব্রিটিশদের যে সাম্রাজ্যে কখনও সূর্য অস্ত যেত না তারও কি হাল সেতো দেখতে পাচ্ছ। তেমনিই বাঙালীদেরও হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক মন্দা বাঙালীকে ধরাশায়ী করে ফেলল। তখন থেকেই চলে গেল সাঁওতাল পরগণার ওপর তাদের অন্তরের টান। বাংলা টুকরো হল। ওপার বাংলার বাঙালীরা জলের দামে বেচে দিলেন তাদের সেই বড় বড় বাড়ি। এপার বাংলার মানুষেরা যাঁরা তখনো আঁকড়ে থাকলেন তাঁদের এখানকার ভূসম্পত্তি, দেখা যাচ্ছে তাঁদের মৃত্যুর পর উত্তরপুরুষদের আর সেই আর্থিক সঙ্গতি নেই, হাওয়া-বদলের সাধও নেই। কারণ দৃষ্টিভঙ্গি গেল বদলে। ভেঙে গেল একান্নবর্তী পরিবার। শরিকী বিবাদে অভিভাবকহীন হয়ে গেল তাঁদের বাড়িগুলো। স্থানীয় লোকেদেরও চরিত্র বদলে গেল। বাঙালীদের বাড়ির মালি এককালে যে ছিল বিশ্বস্ত সেবক, পরিবারেরই আর একজন, সেই মালিরা অভাবে পড়ে হয়ে গেল ভক্ষক। চুরি হতে থাকল আসবাবপত্র, কড়ি-বরগা, দরজা জানাল। এমনকি বেদখল পর্যন্ত হয়ে গেল বাঙালীর পরম আদরের স্বাস্থ্যনিবাস। যুদ্ধের বাজারে ফাটকা কারবারে হঠাৎ নবাব হয়ে গেল অবাঙালী ব্যবসায়ীরা। তারাই এখন ছলে-বলে-কৌশলে গ্রাস করছে সেই স্বপ্নমধুর সাঁওতালপরগণার শেষ-মধুটুকু।

সদানন্দবাবুর কথায় সায় দিই, ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এখনো তো কেউ কেউ আসেন। যেমন দেওঘরের কুমুদিনীকুঞ্জের শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। পরিব্রাজক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এখনো তাঁর দীর্ঘ পথের পরিক্রমা সেরে প্রতিবছর বিশ্রামে আসেন মধুপুরে 'গঙ্গাপ্রসাদ হাউসে'।

সদানন্দবাবু বলেন, এঁদের দেখে কি মনে হয় না, এঁরা যেন বাঙালীর সেই হারিয়ে যাওয়া সাম্রাজ্যের শেষ দুটি স্তম্ভ। এঁরা সেই পুরনো প্রজন্মের মানুষ। তাই ছুটির নেমতন্ন এঁরা ফেরাতে পারেন না। কিন্তু তুমি তো আমাদের নবীন উত্তরপুরুষ। তোমার কেমন লাগে সাঁওতালপরগণা? মন খোলসা করে বলতো ভায়া।

আমি হেসে জানাই, ভাল। খুব ভাল। থাকি শহরে। সেখানকার ধোঁয়ায়-ধুলোয়, জ্যামে-জটে, নানান কাজের কলকব্জায় জীবন যখন ফ্রেমে আঁটসাঁট হয়ে বন্দী হয়ে পড়ে তখনই তো ছুটে আসি সাঁওতালপরগণার কোলে। কদিনের বিশ্রামেই আবার দেহ, মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। নিজেকে যেন নতুন করে জানতে পারি।

সদানন্দবাবু ধরা গলায় বলেন, বেশ, ভায়া বেশ। শুনে প্রাণটা জুড়োল। আমিও সেই মায়ায় পড়ে জীবনটা এখানেই কাটালাম। সাঁওতাল পরগণা ছিল আমার যৌবনের বৃন্দাবন, আর এখন হয়েছে বার্দ্ধক্যের বারাণসী। ■

দানব ও দেবতা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

৷৷ পঁয়তাল্লিশ ৷৷

প্যাসিফিকের কূলে ছোট্ট একটি সমুদ্র-নিবাস। নাম তার ইকসতাফা। ইকসতাপাও বলা যেতে পারে। বিমান যখন অবতরণ করল, মেকসিকোর আকাশে তখন অপরাহ্ণবেলার সূর্য ম্লান হয়ে আসছে। অবতরণ ক্ষেত্রে লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে। আকাপুলকোর ১৫০ মাইল উত্তরে এই পর্যটন কেন্দ্রটি ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। যাঁরা প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে নিরিবিলিতে সমুদ্র স্নান করতে চান, সোনালি বেলাভূমিতে শুয়ে রোদে পুড়ে তামাটে হতে চান, তাঁরা অনায়াসে এখানে চলে আসতে পারেন। মেকসিকো আমেরিকান ট্যুরিস্টদেরই বেশি চায়; কারণ তাঁদের পয়সা আছে। লস এঞ্জেলেস, হাউস্টন, স্যানফ্রানসিসকো, ডালাস এবং নিউ ইয়র্কের সঙ্গে সরাসরি বিমান যোগাযোগ। পর্যটকদের উদ্দেশ্যে ইকসতাফার প্রধান আমন্ত্রণ, a golden Pacific resort of uncommon innocence. নির্জন সমুদ্রসৈকত। বিলাসবহুল হোটেলের সমস্ত প্রকার আরাম। আআআ ইকসতাফা। আকাপুলকোর পৌরাণিক সহোদরা। এখনও যুবতী, এখনও নির্দোষ, শিশুর মতোই চপলা। ইকসতাফা মানে আনন্দ, উচ্ছ্বাস। দিবাস্বপ্ন। আবিষ্কার। চিরকাল মনে রাখার মতো দৃশ্য।

বিমানের সামনের দরজা দিয়ে প্রথমে নামলেন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও তাঁর সঙ্গীরা। মেকসিকো সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা এসেছেন স্বাগত জানাতে। এসেছেন ভারতের অ্যাম্বাসাডার ও তাঁর সহকারীরা। বিমানের পিছনের দরজায় যে সিঁড়ি লাগান হয়েছে তার বিভিন্ন ধাপে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি। প্রথমে পরিচয়ের পালা; তারপর হাতে হাতমেলানো। প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে সকলে চলে গেলেন। ধীরে ধীরে আমরা নেমে এলুম। আমাদের দায়িত্ব নিলেন ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীরা। মেকসিকোয় এখন ভারতের রাষ্ট্রদূত হলেন শ্রী কে· টি· সাটারাওয়ালা। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রী আর· সি· শর্মা এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করলেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন অ্যাম্বাসাডারের সোস্যাল সেক্রেটারি মিস লরা লুনা ট্রিলো। আর রয়েছেন থার্ড সেক্রেটারি শ্রী এ· কে· মুদগল।

এখানে রাষ্ট্রপ্রধানদের নিরাপত্তায় নেমেছেন সৈন্যবাহিনী। স্লেট রঙের ইউনিফর্ম। মাথায় হেলমেট। হাতে স্টেনগান। তবে লন্ডনের মতো অতটা আড়ষ্ট নয়। নিরাপত্তায় আলো বাতাস মোটামুটি খেলছে। সর্বত্রই বেশ একটা ঘরোয়া ভাব। আমরা অবশ্য সহজে নিষ্কৃতি পেলুম না। লরা লুনা ট্রিলো মেয়েটি বাতাসের মতো। মিষ্টি এতটুকু একটা মেয়ে। ফুলছাপ ফ্রক পরে ছিপছিপে শরীর নিয়ে কি দৌড়নোই না দৌড়চ্ছে! প্রজাপতির মতো উড়ছে।

আমাদের একে একে ফটো তোলা শুরু হল। ইনস্ট্যান্ট ফটো। পজেটিভ ক্যামেরা। নেগেটিভের মনে হয় কোনও কারবারই নেই। ফ্ল্যাশ অ্যান্ড ফটো। সেই ফটো নিমেষে একটা আইডেন্টিটি কার্ডে ল্যামিনেটেড হয়ে আমাদের গলায় গলায় ঝুলে পড়ছে। বিজ্ঞানের কি উন্নতি! পাশেই আমেরিকা। আমার মুখের ছোট্ট ডাকটিকিটের মাপে লাল একটি ছবি বেরিয়ে এল। দেখে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন নিকারাগুয়ার কোনও পলাতক বিপ্লবী। কার্ডটা বেশ বড়। নানা রঙে ছাপা। নকশা করা। বাঁ দিকে অংশগ্রহণকারী ছটি দেশের জাতীয় পতাকা। মাথার ওপর লেখা 'রিইউনিয়ন দ্য মেকসিকো সব্রে পাজ ওয়াই ডেসারমে'। ইকস্টাপা গ্রো।

আআআ ইকসতাপা প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে, সোনালি সমুদ্র সৈকত

ফাইভ-সেভেন অগাস্তো নাইনটিন এইটটি সিক্স। ডানপাশে ছবি, বাঁ পাশে নীলের ওপর রিভারসে ছাপা একটা গ্লোব্যাল ম্যাপ। একেবারে তলায়, স্যালোন কাবিল ডোস।

লন্ডনে এই প্যারাফারনেলিয়াটা যত সহজে হয়েছিল ; এখানে ততটা সহজে হল না। লরা লাফাচ্ছে। মুদগল ছোটাছুটি করছেন। শর্মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওদিকে হোটেলে যাবার গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। প্যান্ডিমোনিয়াম। চিরকাল যা হয় তাই হল। আমি ছাড়া পেলুম সব শেষে। তখন গাড়ি প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। আমাকে হয়তো ফেলে রেখেই চলে যেত। তখন কি হত ! সেই

মেকসিকোর মানুষ একটু অনাবরনের স্বাদতাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ

ভাবনায় আমি চলমান কোচে সামনের আসনের জানালার ধারে বসে মনে মনে নানারকম আতঙ্ক তৈরি করতে লাগলুম। নিজের ভাবনা নিয়ে বেশিক্ষণ থাকা গেল না। চারপাশ দিয়ে হুহু করে বয়ে চলেছে অচেনা দেশ মেকসিকোর দৃশ্যাবলী।

ইকসতাপা প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে নিরালা একটি সমুদ্র-নিবাস। ৫২৬৩ একরের একটি ভূখণ্ড। অজস্র নারকেল গাছ, ম্যানগ্রোভ, রঙীন ফুল আর লতাপাতা সমুদ্রের ধার ঘেঁষে মাইলের পর মাইল চলে গেছে। লোকসংখ্যা খুবই কম। নানা রকমের পাখির কলকাকলি। একদিকে সমুদ্র আর একদিকে সবুজ সিয়েরামাদ্রে পর্বত। যে জায়গা দিয়ে গাড়ি চলেছে সেই জায়গাটার নাম মনে হয় যিহুয়াতানেজা। শান্ত একটি পল্লী। সর্বত্র স্পেনের স্পর্শ। মাঝে মাঝে ইন্ডিয়ানদের চোখে পড়ছে। খর্বাকৃতি। গায়ের রঙ চাপা। কোথায় ইন্ডিয়া আর এঁদের নাম হয়ে গেল ইন্ডিয়ান ! ছোট ছোট দোকান। ছোট ছোট বাড়ি। বেশ মিষ্টি একটি পরিবেশ। প্রকৃতিকে মানুষ এখানে তেমন ভাবে খর্ব করতে পারেনি। মেকসিকোর প্রাকৃতিক বৈচিত্রের সঙ্গে পরিচয় হল। কাঁকুরে জমি। প্রচুর গাছপালা। সবই হয়তো চেনা ; আমার মনে হচ্ছে অচেনা। দেশ যখন অচেনা তখন গাছ, পাখি, জীবজন্তু, মানুষ প্রকৃতি সবই অচেনা হবে। যা দেখছি, সবেতেই বিস্ময় !

সন্ধের মুখে আমরা আমাদের বিশাল হোটেলে পৌঁছে গেলুম। বহুতল বাড়ি। একটা নয় একাধিক। হোটেল কমপ্লেক্স। রাষ্ট্রপ্রধানরা আসছেন বলে মিলিটারি বেসক্যাম্পের চেহারা নিয়েছে। স্লেট কলারের ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র সেনাবহিনী। মেকসিকান সৈন্যরা যেন পাথরে কোঁদা মূর্তি। হোটেল কমপ্লেকসের সামনে একখণ্ড ফাঁকা জমিতে দৈত্যের মত রাডার যন্ত্র। নিরাপত্তার চোখ মেলে রেখেছে।

হোটেলটা এত বড়, এত উঁচু, সহজে আপন করে নেওয়া যায় না। নিচেটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। ঝকঝকে কালো পাথর দিয়ে মোড়া। একপাশে রিসেপশান। মানি-একসচেঞ্জ কাউন্টার। সমস্যা একটাই। ভাষা। ইংরেজিতে কেউই তেমন সড়গড় নয়। তিন নম্বর ব্লকের চোদ্দতলায় ছশোছেচল্লিশ নম্বর ঘরে আমার ব্যবস্থা। পাশের ঘরে কুমকুম। এখানেও কুমকুম আমার সেভিয়ার। রিসেপশান চাবি ধরিয়ে দিয়েই কর্তব্য সমাধা করলেন। এইবার তুমি চরে খাও। মেক্সিকোয় হোটেল নিয়ে ভোগান্তির একশেষ। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে ব্যাপারটা কিছুই নয়। অথচ এমন এক ভুলভুলাইয়া ! কোথা দিয়ে কি গেছে ! এই পথ, ওই পথ। ছত্রিশ গণ্ডা লিফ্‌ট। ঠাসা অ্যামেরিকান ট্যুরিস্ট। ছেলে, মেয়ে, শিশু, কিশোর আনন্দে টগবগ করছে চারপাশে। প্রশান্ত মহাসাগর কতদূরে তখনও জানা হয় নি ; তবে পরিপূর্ণ পোশাকে কারুকেই দেখছি না ! বেশির ভাগই অর্ধনগ্ন।

খুঁজে খুঁজে আমি আর কুমকুম একটা লিফ্‌টে উঠলুম। কে যেন বললেন এইটাই আমাদের ব্লক। এই লিফ্‌টই আমাদের সঠিক স্থানে পৌঁছে দেবে। আমরা ঢুকলুম, আমাদের পিছন পিছন হুড়হুড় করে একদল মহিলা ঢুকলেন। ভিজে সুইমিং কস্টুম পরে। কোন দিকে তাকাই ! সব চেয়ে দুঃখ, আমাদের কেউ গ্রাহ্যই করছে না।

ঘরটি বড় চমৎকার। ঢোকার মুখে আলোকিত খাপে ঘরের নম্বর জ্বলছে। একপাশে লম্বা লম্বা কাঁচের জানলা। বিশাল বড় দুটো বিছানা। জানালায় ভারি ভারি পর্দা আছে ; তবে একপাশে সরানো। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। কি আছে বাইরে দেখাই যাক। অদূরে বিশাল সমুদ্র। ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাস ভাঙছে। আর অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে আর একটি বিশ বাইশতলা বাড়ি। পরিত্যক্ত। পরে জেনেছিলুম, দেখেওছিলুম, ফুটিফাটা হয়ে আছে। বিগত মেকসিকান ভূমিকম্পের স্মৃতি।

ঘরটা এত বড় আর এত মনোরম ; কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম। বাইরের আকাশ অন্ধকার। দূরে প্রশান্ত মহাসাগর। কে বলেছে প্রশান্ত ! আসলে খুবই অশান্ত। জানালার একটা পাল্লা খুলতেই এক ঝটকা সমুদ্রের বাতাস ঢুকে পড়ল। জানালাটা খুলে বেশ অস্বস্তি হল। হাঁটু পর্যন্ত রেলিং ; তারপর ফাঁকা। সাগর আমি আসছি, বলে একটু আবেগের অর্থ, সোজা নিচে, পাথর মোড়া রাস্তার ওপর। জানালাটা বন্ধ করে দিলুম।

বাথরুমের শাওয়ারটার কথা না বললে ঠিক হবে না। সে এক মজার জিনিস। কাঁচের ক্যাপসুলের ভেতর শাওয়ার। কল ঘুরিয়েই ভয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লুম ! কিছু ভুল করে ফেললুম না তো ! জলের বদলে ঝাঁক ঝাঁক

সোনালি বেলাভূমিতে শুয়ে রোদে পুড়ে যাঁরা তামাটে হতে চান

মেশিনগানের গুলি। কটাকট। ফটাফট। ভটাভট শব্দ। ধীরে চোখ মেলে তাকালুম। বেঁচে আছি। গুলি নয়, জলই পড়ছে। ঝাঁঝরা হইনি। জলেই ভিজেছি; কিন্তু শব্দ থামেনি। শাওয়ারের দিকে তাকিয়ে অবাক। বুটি লাগানো একটা চাকা গোল হয়ে ঘুরছে। জল চরকির মতো ঘুরে ঘুরে নেমে আসছে নিচে। কাঁচের খোপের রহস্যটা এবার বোঝা গেল। কেন এত সঙ্কীর্ণ? কাঁচে ধাক্কা লেগে জল পাক মেরে মেরে আমাকে ঘিরে জলের একটা আবর্ত তৈরি করেছে। আমাকে কিছুই করতে হচ্ছে না, শব্দটা সহ্য করা ছাড়া। জলের ঘূর্ণী আমাকে ঘষেমেজে দিয়ে যাচ্ছে। বাষ্পে কাঁচ আচ্ছন্ন। এমন শাওয়ার আমি আগে দেখিনি। পরেও আর দেখব না। এর নাম বোধ হয় 'মেকসিক্যান ডেসপ্যারেডো শাওয়ার'।

মেকসিকোর প্রশান্ত মহাসাগরের তটভূমি সুদীর্ঘ। মেকসিকোর ঐশ্বর্যই বলা চলে। এই তটভাগে আছে বন্দর, মৎস্যজীবীদের গ্রাম, সব রকমের, সব রুচির শহর। হারমোসিলোর অব্যবহিত পশ্চিমে কিনো বে থেকে আকাপুলকো পর্যন্ত এই সব বন্দর, গ্রাম আর শহর যেন বিশাল এক বাক্যের মাঝে মাঝে বসান কমার মতো। থামতে বলে; কিন্তু শেষ হয় না। কোনও দুটো জায়গা সমান নয়। এক এক জায়গার এক এক বৈচিত্র্য। ইকসতাপা আর জিহুয়াতানেজো দুটি নতুন কমা। বেকার সমস্যার সমাধানে আর অর্থনীতির উন্নয়নে মেকসিক্যান সরকার সম্প্রতি 'রিসর্ট ডেভালাপমেন্ট'-এর নতুন একটি পরিকল্পনা নিয়েছেন। জিহুয়াতানেজো অসম্ভব সুন্দর একটি গ্রাম। কিছুকাল আগেও এখানে আসার সহজ কোনও যোগাযোগ ছিল না। মহাপ্রস্থানের পথের মতো আঁকাবাঁকা প্রাচীন একটি পথ ছিল। নিজের বিমান থাকলে, সেই বিমানেও পৌঁছনো যেত। মেকসিকো সরকার জিহুয়াতানেজোর সঙ্গে সভ্য দুনিয়ার সহজ যোগাযোগের পথ খুলে দিলেও, প্রাচীন সৌন্দর্য, প্রাচীন জীবনছন্দ অটুট আছে। এখনও এক ডজন ঝিনুক আর ঠাণ্ডা বিয়ার হল প্রচলিত ব্রেকফাস্ট। আর ইকসতাফার জন্মদাতা হল কম্পিউটার। কম্পিউটারে ডিমটি পেড়েছে। আর তা দিয়েছে, শহর বিজ্ঞানীরা, সমাজতত্ত্ববিদ, কুবের জাদুকর আর পর্যটন শিল্পের বিশেষজ্ঞরা।

১৯৬০ সালের ঘটনা। মেকসিকোর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে হার্ভার্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু উৎসাহী যুবক কর্মী মেকসিকোর নানা অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে দেখলেন, একটিই মাত্র পথ, পর্যটন-শিল্পের বিকাশ। প্রথমে তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন আমদানি কমিয়ে রপ্তানি বাড়ানো। চেষ্টা করেছিলেন শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের। চেষ্টা করেছিলেন কৃষির উৎপাদন বাড়াতে; কিন্তু প্রতিবারই কম্পিউটার জানিয়ে দিল জাতীয় আয়

ঢেউ আছড়ান বেলাভূমি, পেছনে পাহাড়

ট্যুরিজমে যতটা বাড়বে অন্য কোনও কিছুতে ততটা বাড়বে না।

মেকসিকোয় ট্যুরিজম-শিল্পের নাম 'হসপিট্যালিটি বিজনেস'। আতিথেয়তার ব্যবসা। আতিথেয়তার ব্যবসা অসংখ্য কর্ম সৃষ্টি করে। বহু মানুষের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা হয়। যেমন কাস্টমস ইনস্পেকটার, ব্যাগেজ হ্যান্ডলার, ট্যাকসি ড্রাইভার, বেল বয়, রুম ক্লার্ক, চেম্বার মেড, বারটেন্ডার, ওয়েটার। এক একটা হোটেল ঘিরে এত ধরনের জীবিকা। এর বাইরে আছে হস্তশিল্প। ট্যুরিস্ট মানেই অঢেল কেনাকাটা। হস্ত আর কারুশিল্পের ভাল ভাল দোকান গজিয়ে ওঠে। শিল্পীদের মুখে হাসি ফোটে। দোকানে দোকানে কাজ পান আরও একদল মানুষ। মাল আনার জন্যে, নিয়ে যাবার জন্যে ট্রাক আর ট্রাক ড্রাইভারের প্রয়োজন হয়। সঙ্গীতজ্ঞরাও সুযোগ পান। গিটার হাতে গায়করা যাঁরা ছুটি কাটাতে এসেছেন তাঁদের মনোরঞ্জন করেন। প্রেমিক জুটি নাচতে থাকেন সুরের তালে তালে।

মেকসিকোয় প্রেমের বাতাস একটু জোরেই বইছে। ইকসতাপায় তার প্রমাণ পাওয়া গেল। যত রাত বাড়ছে হোটেল যেন ততই চঞ্চল হয়ে উঠছে। আমাদের দেশে সকালে ঘুম ভাঙে, এদেশে ঘুম ভাঙে রাতে। ওপাশে নারকেল কুঞ্জ। সেখানে শামিয়ানা খাটানো চারপাশ খোলা একটা খানাপিনার জায়গা। নামটা ভারি সুন্দর, 'কোয়ায়েতো'। আমাদের দলের অন্যান্যরা যে যার ঘরে ঢুকে পড়েছেন। সকলেই সাংঘাতিক ক্লান্ত। 'জেটল্যাগ' বলে একটা ব্যাপার আছে। দীর্ঘ সময় আকাশে উড়লে, এক গোলার্ধ থেকে আর এক গোলার্ধে হঠাৎ চলে এলে মানুষের শরীর ধরাশায়ী হতে চায়। আমাদের দলের নবীন আর প্রবীণ সকলেই মনে হয় ভূতলশায়ী। কুমকুমকে তেমন কাবু মনে হল না; তবে বেচারা হিথরোতে পড়ে

সারা দিন ঢেউ নিয়ে মাতামাতি

গিয়ে ভীষণ আহত হয়েছে। দলে আর কোনও মহিলা নেই। নিজেই নিজের পরিচর্যায় ব্যস্ত মনে হয়।

'কোয়ায়েতো' শামিয়ানায় বিখ্যাত গায়ক জুলিয়াস ইগলাসিয়াসের গান হচ্ছে। ডরাটগলা আর গিটারের সুর রাতের আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। অসম্ভব সুন্দর সুন্দর চেহারার প্রায় বিবস্ত্র ছেলেমেয়ে খানাপিনায় ব্যস্ত। জামাকাপড়ে নিজেরই লজ্জা করছে। ইকসতাপায় জামাকাপড় চলে না। টু পিস সুইমিং কস্টুামই এখানকার আদর্শ পোশাক। আমি অসভ্যের মতো প্যান্ট, জামা, জুতো, মোজা পরে ঢুকে পড়েছি। অনেকেই তাকাচ্ছেন। বের করে দেবার আগে আমি আর একপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলুম। সামনেই পাশাপাশি তিনটে সুইমিং পুল। পুল পেরিয়ে ওপাশে যাবার জন্যে তফাতে তফাতে পাথরের পিলার। লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হবে। আলোকের ঝরনাধারা শোনা ছিল। চোখে দেখলুম। রাত যেন দিন। সাত আটজন গম্ভীর মুখ প্রবীণ হোটেল কর্মচারী সুইমিং পুল পরিষ্কার করে জল ভরছেন। আর তো কয়েক ঘন্টা পরেই সকাল হবে তারই প্রস্তুতি চলেছে। দুটি পুল ইতিমধ্যেই টলটলে জলে ভরে উঠেছে। পুলের এপাশে ওপাশে অজস্র ঝকঝকে ডেকচেয়ার পাতা। ধনীর দুনিয়ায় আমি এক ছিঁচকে চোর। সব চেয়ারই খালি। মনে হল, আরাম করে বসি। সাহসে কুললো না।

ফাঁক ফাঁক পাথরের স্ল্যাবের ওপর দিয়ে টপকাতে টপকাতে যে জায়গায় এলুম, সেখানে সিঁড়ি নেমে গেছে ধাপে ধাপে। শেষের ধাপটি একটি জলাধার। পাপোশের বদলে জলপোশ। সমুদ্রসৈকত থেকে যাঁরা ফিরে আসবেন তাঁরা বাধ্য হবেন ওই জলে পা ডুবিয়ে এদিকে আসতে। এখানে জুতো পরার রেওয়াজ নেই। আমি জুতোমোজা খুলে জল ভেঙে নেমে গেলুম বেলাভূমিতে। বেশ রাত হয়েছে। বিশাল বেলাভূমি। অজস্র ফ্লাডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত। ডাইনে বামে যেদিকেই তাকাই সমুদ্রসৈকত দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। চতুর্দিকে হাত পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসার মতো ফাইবার গ্লাসের তৈরি নৌকাকৃতির আসন পড়ে আছে। একটাকে একটু নির্জনে টেনে এনে বসে পড়লুম। সামনে সমুদ্র ফুঁসছে। এত বড় ঢেউ আর এত তেজিয়ান ব্রেকার আমি আগে দেখিনি। হেলান দিয়ে শুয়েই পড়েছি। শরীর জুড়নো বাতাস। ঢেউ ভেঙে যখন গড়িয়ে আসছে ফ্লাডলাইটের আলোয় মনে হচ্ছে দুধসমুদ্রে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। সমুদ্র এত ফুঁসছে বলেই তারাটারা নিয়ে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের এই আকাশ যেন অনেক নিচে নেমে এসেছে।

আমার বাঁপাশে অল্প দূরে একদল ছেলেমেয়ে আগুন জ্বেলেছে। দুপাশে দুটো খোঁটা পুতে কি একটা ঝলসাচ্ছে। মনে হয় মাংসখণ্ড। একটি ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে স্প্যানিশ গিটার বাজিয়ে 'ব্যারিটোন' গলায় গান গাইছে।। বেশ শান্ত ভদ্র একটি 'বিচপার্টি'। রাত প্রায় বারোটা তবুও দলে দলে নারীপুরুষ নতুন করে সমুদ্রস্নানে আসছেন। কিশোর কিশোরীদের যে কি সাহস! ওই লাফানে রাতের সমুদ্রে কেমন অক্লেশে নেমে যাচ্ছে। দোতলা, তিনতলা সমান এক একটা ঢেউ ওদের টপকে চলে আসছে। সগর্জনে ভেঙে পড়ছে তটভূমিতে। মুহূর্তের জন্যে স্নানার্থীরা হারিয়ে যাচ্ছেন, পরক্ষণেই দুগ্ধশুভ্র ফেনায় বড় বড় কালজামের মতো মাথা ভাসছে। অনেক দূরে তটভূমি যেখানে সর্বাধিক আলোকিত সেইখানে একটি ছেলে আর মেয়ে একজন আর একজনের কাঁধে হাত রেখে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের ওপর দিয়ে ঢেউ ভেঙে ভেঙে চলে যাচ্ছে। স্বপ্ন কি ভাবে তৈরি করতে হয় মানুষ জানে। প্রশান্ত মহাসাগরের নৃত্য, সোনালি বেলাভূমি, উজ্জ্বল আলো, মধ্যরাত, ধনুকের মতো সাগরজলের ফেনা, স্লেট রঙের ভিজে বালির ওপর দিয়ে ছেঁড়া দোপাটির মতো ঘুরে ওপাশে, আরও ওপাশে ক্যানক্যান, আকাপুলকোর দিকে চলে গেছে। এই সমুদ্রের ঢেউয়ের ধরনধারণ অনেকটা কম্যান্ডোদের মতো। ঢেউ ওঠা আর ভাঙার কায়দাটা সব সময়েই প্রায় এক রকম। ঢেউ আসতে আসতে ঠিক একটা জায়গায় এসে কামানের গোলা ছোঁড়ার শব্দে লাফিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তটভাগে। অবিশ্রান্ত এই খেলাই চলছে।

হঠাৎ সমুদ্র থেকে এক মহিলা উঠে এলেন। এগিয়ে আসছেন আমারই দিকে। আমার পাশেই একটা শয়নাসন টেনে নিয়ে বসলেন। আড়চোখে দেখলুম। তাকাবার সাহস নেই। অলিভ রঙের দেহত্বক। আর্দ্র বলে আলো পড়ে ফসফরাসের মতো জ্বলছে। তিনি এতই সজীব ও সবুজ আর আমি এতই মৃত আর নির্জীব যে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে থাকাটাই শ্রেয় বলে মনে হল।

হঠাৎ ফটফট শব্দ আর জলের ছিটে গায়ে লাগাতে তাকাতে হল। মহিলা ইল্যাস্টিক লাগানো ব্রাটাকে বুড়ো আঙুল দিয়ে ধনুকের ছিলার মতো টানছেন আর ছেড়ে দিচ্ছেন। ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি শরীরের যথাস্থানে ফিরে গিয়ে চেপে বসছে। এই আন্দোলনে সাগরের জলকণা আনন্দের বার্তার মতো, মিষ্টান্ন ইতরে জনার মতো অধমে পরিবেশিত হচ্ছে। আমি কি উঠে যাবো, না বসে বসে দেখব সি-নিম্ফের কাণ্ডকারখানা।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

পূর্ব-পশ্চিম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তরপর্ব : ৮

আরিচা ঘাটে বিশাল যমুনা নদীর দিকে তাকিয়ে মামুন ভাবলেন, নিয়তি এবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে ? সামনে কী আছে ?

অন্ধকার হয়ে এসেছে। আজ আর নদী পার হবার কোনো উপায় নেই। অন্য সময় আরিচার এই ফেরীঘাটে কত ব্যস্ততা থাকে, আজ একেবারে শুনশান, একটাও লঞ্চ নেই, সৈন্যরা যাতে ব্যবহার করতে না পারে সেইজন্য সব কটা ফেরী লঞ্চ ওপারে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ঢাকা থেকে অনেকগুলো পরিবার এই ফেরীঘাটে এসে দাঁড়িয়ে আছে অসহায়ভাবে। কেউ কোনো কথা বলছে না, এমনকি শিশুরা পর্যন্ত ভয়ে চুপ করে আছে।

একটু পরে কয়েকটি ছেলে এসে বললো, আপনারা ইস্কুল বাড়িতে যান, ওখানে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। তাছাড়া আর কী করবেন !

সেই ছেলেরাই সাহায্য করলো মালপত্র বয়ে নিয়ে যেতে। স্কুলের দোতলার একখানা ঘরে আরও দুটি পরিবারের সঙ্গে জায়গা পেলেন মামুনরা। হেনা আর মঞ্জু শুয়ে পড়লো দেয়াল ঘেঁষে, মঞ্জুর ছেলে সুখুকে নিয়ে মামুন আবার বেরুলেন কিছু খাবার কিনে আনার জন্য। পুঁটুলিতে করে বেশ খানিকটা চিঁড়ে-গুড় নিয়ে এসেছেন মামুন, তা থাক ভবিষ্যতের জন্য, এখানে দু'একটা খাবারের দোকান খোলা রয়েছে।

সুখুর হাত শক্ত করে ধরে আছেন মামুন। ট্রাকে করে আরো লোক আসছে, ফেরী বন্ধ দেখে উদভ্রান্তভাবে ছোটাছুটি করছে অনেকে, এরপর আর ইস্কুল বাড়িতেও জায়গা হবে না। এত লোক রাত্তিরে থাকবে কোথায় ? দোকানগুলো থেকেও খাবার শেষ হয়ে যাচ্ছে দ্রুত, মামুন ছ'খানা রুটি আর কিছু শুকনো কাবাব জোগাড় করতে পারলেন অতি কষ্টে।

খাবারের দোকানে স্থানীয় একজন স্কুল মাস্টার বিবর্ণমুখে মামুনকে জিজ্ঞেস করলেন, ঢাকায় ঠিক কী হয়েছে বলেন তো ! নানাজনের কাছে নানারকম কথা শুনছি। আমার ফেমিলি আছে ঢাকায়, তাগো কোনো খবর পাই নাই।

মামুন শুধু বললেন, ঢাকার খবর ভালো নয় !

তা ছাড়া আর কী বলবেন মামুন। এখনো সব কিছুই যেন এক অবিশ্বাস্য, চরম দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। এ কী সত্যি হতে পারে যে নিজের দেশের সরকার রাস্তায় মিলিটারি নামিয়ে সাধারণ নিরীহ লোকদের পর্যন্ত গুলি করে মারছে ? কোনো যুক্তিতেই এটা বিশ্বাস করা যায় না, তবু এটাই ঘটছে। ঢাকার পথে পথে পড়ে আছে নির্দোষ মানুষের লাশ।

পঁচিশে মার্চ রাতে এই ভয়াবহ কাণ্ড শুরু হবার পর মামুন কোনোক্রমে বাড়ি ফিরে তারপর আর তিন চারদিন তিনি পথে বার হননি। তবু তিনি একসময় বুঝতে পারলেন যে ঢাকায় থাকা তাঁর পক্ষে কোনোক্রমেই নিরাপদ নয়। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খুঁজে আওয়ামী লীগের সদস্যদের খুন করছে, সেই সঙ্গে মারছে সাংবাদিক, অধ্যাপক ও ছাত্রদের। কোনো দেশের আর্মি কামান দেগে প্রেস ক্লাব উড়িয়ে দেয়, এরকম কেউ শুনেছে ? বাঙালী পুলিশদের মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছে, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌সের সৈন্যদের নিরস্ত্র করে খতম করে দেবারও চেষ্টা করেছে। ইয়াহিয়া খান কি উন্মাদ হয়ে গেল, সমগ্র বাঙালী জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে সে পাকিস্তান শাসন করবে ?

শেখ মুজিবের কোনো সন্ধান নেই। তিনি নিজেই আত্মগোপন করেছেন, না সৈন্যরা তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে গেছে, তা কেউ জানে না। কিন্তু জানতে পারা গেছে যে বাঙালীরা শুধু পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে না, দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। চট্টগ্রামে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স তুমুল লড়াই করছে পশ্চিম পাকিস্তানী আর্মির সঙ্গে। চট্টগ্রাম শহর থেকে কিছুটা দূরে কালুরঘাটে রেডিও ট্রান্সমিটিং সেন্টারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র, সেখান থেকে জাতির নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে জিয়াউর রহমান নামে একজন মেজর স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে।

গতকাল মামুন দেখলেন তাঁর বন্ধু কবি ও সাংবাদিক ফয়েজ আহমদকে। আর্মি এসে যখন প্রেস ক্লাবের লাল রঙের বিল্ডিংটাতে কামান দাগতে শুরু করে, তখন ফয়েজ ছিলেন ঐ প্রেস ক্লাবের দোতলায়। সাংঘাতিক ভাবে আহত হলেও তিনি সেখান থেকে পালিয়ে আশ্রয়

নিয়েছিলেন একটা মসজিদে। তিনদিন তিনরাত একটা বাথরুমে লুকিয়ে থেকে কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরেছেন। সেই ফয়েজ আহমদ মামুনকে বললেন, পালাও, ঢাকা থেকে পালাও, কোনো গ্রামে চলে যাও, ওরা আমাদের শেষ করে দেবে, 'ইত্তেফাক'-এ যারা এক লাইনও লিখেছে, তাদের কারুকে ওরা ছাড়বে না। মামুন, তুমি আজই সরে যাও ঢাকা থেকে।

ফিরোজা বেগম কয়েকদিন আগে ছোট মেয়েকে নিয়ে টাঙ্গাইলে বাপের বাড়িতে গেছেন, তাঁকে খবর দেবার উপায় নেই। মামুনের পক্ষে টাঙ্গাইলে যাওয়াও নিরাপদ নয়, সেখানেও নিশ্চয়ই তাঁর খোঁজ পড়বে। বড় মেয়ে হেনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার উদ্যোগ করতেই মঞ্জু এসে বললো, সেও তার ছেলেকে নিয়ে মামুনের সঙ্গে যাবে। বাবুল এখন ঢাকা ছেড়ে যেতে রাজি নয়, তবে মামুনের সঙ্গে তার স্ত্রী ও সন্তানকে পাঠাতে তার আপত্তি নেই।

একখানা গাড়ি জোগাড় করা হয়েছিল এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে। বিকেল চারটে থেকে কারফিউ, সকালে হঠাৎ গুজব শোনা গেল যে মীরপুরের কাছে ব্রীজটা উড়ে গেছে, ওদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না। কিন্তু রেডিওতে ঘোষণা করা হচ্ছে যে মীরপুরের ব্রীজ ঠিক আছে, যানবাহন সব চলছে স্বাভাবিক ভাবে। ঝুঁকি নিয়ে মামুন বেরিয়ে পড়লেন। মীরপুরের কাছে এসে দেখলেন, ব্রীজের পাশে আর্মি ঘোরাঘুরি করছে, ব্রীজটার ক্ষতি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এরমধ্যেই মেরামত করা হয়েছে অনেকটা।

মীরপুর ছাড়িয়ে আমিনবাজারের কাছে আসতেই চোখে পড়লো আর্মি কনভয়। মেশিনগানের লম্বা নলগুলো দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে। মামুন মাথা নীচু করে রইলেন, যেন তাঁর মুখ কেউ দেখতে না পায়। তাঁর অতি প্রিয় ঢাকা শহর ছেড়ে তিনি পালাচ্ছেন চোরের মতন। নয়ারহাটে পৌঁছোতেই শুনতে পেলেন পেছনে গোলাগুলির শব্দ। সেনাবাহিনী আবার কোথাও শুরু করেছে ধ্বংসযজ্ঞ।

কোথায় যে যাবেন মামুন তা এখনও ঠিক করতে পারেননি। একবার ভাবলেন, মানিকগঞ্জে তাঁর এক ছেলেবেলার বন্ধু থাকে, তার বাড়িতে উঠবেন। তারপর আবার ঠিক করলেন, ঢাকা থেকে আরও অনেক দূরে সরে যাওয়াই ভালো, পাবনা কিংবা বগুড়ার দিকে।

আরিচা ঘাটে এসে যে ফেরীর অভাবে এভাবে আটকা পড়তে হবে তা আগে কল্পনা করতে পারেননি। যদি কালকেও ফেরী না চলে? এই বিশাল নদী নৌকোতে পার হওয়া যায় বটে কিন্তু এত মানুষ এসে জমা হয়েছে, নৌকোও পাওয়া যাবে কী? হেনা, মঞ্জু আর সুখুকে সঙ্গে এনে তিনি আরও মুশকিলে পড়েছেন, একলা হলে তাঁর দুশ্চিন্তার কিছু ছিল না। যে-সব মানুষ উদ্যোগী হয়ে যে-কোনো পরিস্থিতিতে ঝটপট একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলতে পারে, মামুন যে সেই দলে পড়েন না। তিনি ভালো করে মিশতেই পারেন না অচেনা লোকের সঙ্গে।

খাবার নিয়ে ফিরে এসে ইস্কুল বাড়ির দোতলায় উঠতে উঠতে একজন লোককে দেখে মামুনের চেনা চেনা মনে হলো। বেশ হৃষ্টপুষ্ট কালো চেহারা, মোটা গোঁফ, মাথায় অনেক চুল, মামুনকে দেখে সেই মানুষটিও থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, মামুনভাই?

মামুনের তখনই মনে পড়ে গেল, এই মানুষটিকে তিনি ইত্তেফাক অফিসে দেখেছেন একসময়, সম্ভবত রিপোর্টারের কাজ করতো, খুব রসিক লোক, নিজে প্রাণ খুলে হাসতে এবং অন্যদের হাসাতে জানে। এর নাম এম. আর. আখতার। সবাই ডাকতো মুকুল বলে। মাঝখানে অনেকদিন এর সঙ্গে দেখা হয়নি।

এখন হাস্য পরিহাসের সময় নয়, প্রত্যেকের ভুরুতেই উদ্বেগ মাখানো, কথাও সব এক। চেনাশুনো কে কে মারা গেছে আর কার কার সন্ধান নেই। দু'চারটি কথার পর মামুন আখতারকে অনুরোধ করলেন, কাল নৌকোর ব্যবস্থা করতে পারলে আমাদেরও সঙ্গে নেবেন।

আখতার বললেন, অবশ্যই, অবশ্যই!

মাঝ রাত্তিরে সবাই যখন শুয়ে পড়েছে, নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে বাতি, কে ঘুমিয়েছে, কে যে জেগে আছে তা বোঝার উপায় নেই, তখন মামুন শুনতে পেলেন একটি নারী কণ্ঠের কান্না। কোনো ভাষা নেই, শুধু একটা টানা শব্দ, সে শব্দ যেন উঠে আসছে হৃদয়ের অতল গভীর থেকে, এমনই একটা তীব্র শোক আছে সেই কান্নার সুরে যা শুনলেই বুকটা মুচড়ে ওঠে।

একটু পরেই মঞ্জু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, মামুনমামা, কে কান্দে?

পাশ থেকে হেনা বললো, এই ঘরে কেউ না।

মামুন বুঝলেন, হেনা আর মঞ্জু জেগেই আছে, আজ রাতে বোধহয় কারুরই ঘুম হবে না। কান্নার শব্দটা এ ঘরের নয় ঠিকই। মামুন উঠে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। সব কটা ঘরেই মানুষজন ভরা, কোনো ঘরেরই দরজা বন্ধ নয়, মামুন একটার পর একটা ঘরে গিয়ে উঁকি মারলেন, কোনো ঘরেই সেই ক্রন্দনরতা নারীকে দেখতে পেলেন না। আরও অনেকে সেই কান্নার শব্দ শুনে উঠে বসেছে।

হঠাৎ মামুনের শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠলো। এই কান্না কি অশরীরী? কিংবা সারা দেশ জুড়ে স্বামীহারা, সন্তানহারা, ভাইহারা নারীরা যে কান্নার রোল তুলেছে, এই কান্না তারই প্রতীক। দেশ জননীই এমন আকুল হয়ে কাঁদছে।

পরদিন ভোরে উঠে ফেরীঘাটে এসে পাওয়া গেল একটা নৌকো। বিকেলের দিকে নৌকো পৌঁছোলো নগরবাড়ি। সেখানে এসে মামুন শুনলেন যে পাবনায় গণ্ডগোল চলছে খুব, সেই তুলনায় বগুড়ার খবর আশাপ্রদ। বগুড়ায় ছাত্ররা মুক্তিবাহিনী গঠন করে বেশ কিছু পাকিস্তানী সৈন্যকে হত্যা করেছে, বাকি সৈন্যরা পালিয়ে গেছে। বগুড়ায় আপাতত কোনো শত্রুর চিহ্ন নেই। সুতরাং মামুন ঠিক করলেন, পাবনার বদলে তিনি বগুড়ার দিকেই যাবেন।

কিন্তু যাওয়া যাবে কী করে? নগরবাড়িতেই শোনা গেল যে পেট্রল-ডিজেল পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও, বাস চলাচল বন্ধ হয়ে আসছে প্রায়। তা ছাড়া, নানান জায়গায় গ্রামের লোকেরা রাস্তা কেটে রেখেছে, যাতে আর্মির ট্রাক যেতে না পারে। বহুলোক এখন শহর ছেড়ে পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে গ্রামের দিকে।

বগুড়ার দিকের একটা বাস পাওয়া গেল ভাগ্যক্রমে। তাতেও অবশ্য যাওয়া গেল না শেষ পর্যন্ত, বাঘাবাড়ির কাছাকাছি এসে দেখা গেল রাস্তা বন্ধ, রাস্তার মধ্যে গাছ কেটে ফেলা রয়েছে, কিছুটা রাস্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এবার হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। মামুন সঙ্গে মালপত্র বিশেষ কিছু আনেননি, শুধু কয়েকটা কাঁধ ব্যাগ। সুখু বেশ হাঁটতে পারে, তাকে কোলে নিতে গেলেই বরং সে আপত্তি করে। হেনা আর মঞ্জু শহুরে মেয়ে, তাদের হাঁটার অভ্যেস নেই, চৈত্রমাসের গনগনে রোদে তাদের মুখ লাল হয়ে ওঠে।

বাঘাবাড়ির ঘাট পেরুবার পর পাওয়া গেল আর একটি অতি লজ্ঝরে চেহারার বাস। একটি ছোকরা কন্ডাকটর সেই বাসের গা চাপড়ে চাপড়ে বলছে, আসেন, আসেন, পংখীরাজ পংখীরাজ! লাস্ট ট্রিপ, আর চান্স পাইবেন না!

প্রতি মুহূর্তে থেমে যাবে থেমে যাবে ভাব করেও সেই বাসটা চলতে লাগলো বেশ। এক সময় তাকে বাধ্য হয়ে থামতে হলো অবশ্য, সেটা তার নিজের দোষে নয়। উল্লাপাড়া লেভেল ক্রসিং-এ রাস্তা বন্ধ, একটা মালগাড়ি দিয়ে সেই ক্রসিংটা আটকে দেওয়া হয়েছে। বাস রেল লাইনের ওপারে যেতে পারবে না। বাস থেকে নেমে আবার পদযাত্রা।

আখতার সাহেব করিৎকর্মা মানুষ, তিনি উল্লাপাড়া ডাক বাংলোতে রাত্তিরটা থাকার ব্যবস্থা করে ফেললেন। মামুনরা এই পরিবারটির সঙ্গ নিয়ে কিছুটা সুবিধে ভোগ করছেন। আখতার সাহেবের চেয়ে মামুন বয়সে প্রবীণ, তাছাড়া একটা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং জেল খেটেছেন বলে লেখক-সাংবাদিকদের কাছে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র, কিন্তু আখতারের মতন একজন চেনা লোক না পেলে কেউ এই ডামাডোলের মধ্যে তাঁকে পাত্তাই দিত না।

ডাকবাংলোর বেয়ারা-চৌকিদার সব উধাও। খাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই। হোটেলও নেই এখানে। শোনা গেল যে বাজারের কাছে একটা লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে, সেখানেই একমাত্র খাবার পাওয়া যেতে পারে। অগত্যা যেতে হলো সেখানেই। লঙ্গরখানায় অনেকেই পাত পেড়ে বসে গেছে, দেওয়া হচ্ছে শুধু গরম ভাত আর ডাল। আর কিছু না। আখতার সাহেবের ছেলে মেয়েরা আর সুখু মিঞা সেই ভাত ডাল নিয়ে বসে রইলো, তাদের ধারণা, এরপর কোনো তরকারি বা ভাজাটাজা আসবে। শুধু ডাল আর ভাত যে খাওয়া যায়, তা তারা জানেই না। মামুন দেখলেন, মঞ্জুর চোখ ছলছল করছে। তিনি ফ্যাকাসে ভাবে বললেন, এরপর যে ভাগ্যে

আরও কী আছে তা কে জানে।

সেই রাত্রে মামুনের হু হু করে জ্বর এসে গেল। মামুন নিজের ওপর মহা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এই কি জ্বরের সময় ? যেতে হবে আরও অনেকটা পথ। তার জ্বরের কথা টের পেয়ে গেলে অন্যরা বিব্রত হবে। কিছুতেই কারুকে জানানো চলবে না। সুখু তাঁর বুক ঘেঁষে শুয়েছে। বাচ্চা ছেলে হলেও সে জ্বরতপ্ত শরীর ছুঁয়ে বুঝতে পারবে ঠিকই, মামুন তাই খানিকটা সরে গেলেন।

বগুড়ায় মহিলা কলেজের সামনে ছাত্রদের সঙ্গে পাকিস্তানী আর্মির জোর লড়াই হয়েছে, শেষ পর্যন্ত খান সেনারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। আঁড়িয়াবাজারের মিলিটারি ক্যাম্পেরও পতন হয়েছে, জয় জয়কার পড়ে গেছে মুক্তিবাহিনীর। উল্লাপাড়াতেই শোনা গেল এই সব কাহিনী। বগুড়া শহরে জলেশ্বরীতলায় মামুনের এক শ্যালকের একটা ওষুধের দোকান আছে, সে যদি শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে না থাকে, তাহলে বগুড়ায় আশ্রয় পাবার কোনো অসুবিধে হবে না।

সারা রাত মামুন জ্বরের ঘোরে ছটফট করলেন, পরদিন সকালেও জ্বর ছাড়লো না। কিন্তু কারোকে জানতে দেওয়া হবে না। তিনি সকলের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে রইলেন।

আর বাস পাবার কোনো আশা নেই, তবে সাইকেল রিক্সা আছে। কিছু দূর অন্তর অন্তর রিক্সা বদল করে যাওয়া যেতে পারে। সুযোগ বুঝে রিক্সাওয়ালারা যাচ্ছেতাই ভাড়া হাঁকছে। না দিয়েই বা উপায় কী!

এই রিক্সা-যাত্রাতেও স্বস্তি নেই। এক মাইল দু' মাইল অন্তর অন্তরই রাস্তা কাটা। রিক্সাচালকরা আগেই চুক্তি করে নিয়েছিল যে রাস্তা কাটা থাকলে সওয়ারিদেরই রিক্সা ঘাড়ে করে অন্য ধারে নিয়ে যেতে হবে। মামুনের প্রায় একশো পাঁচ জ্বর, চোখ জ্বালা করছে, ঝাঁ ঝাঁ করছে কান, সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা, তবু তিনি টু শব্দটি করছেন না, যথাসময়ে রিক্সা বইবার জন্য কাঁধ দিচ্ছেন।

চান্দাইকোনা পৌঁছোবার আগে ঠিক ন'বার রিক্সা থেকে নেমে, রিক্সাটাকেই কাঁধে করে পার হতে হলো গর্ত।

চান্দাইকোনায় এসে এই তিনজন রিক্সাচালক আর যেতে রাজি হলো না। এবারে অন্য রিক্সা ধরতে হবে। এখানে একজন লোক হঠাৎ মামুনের সামনে এসে বললো, চেনা চেনা লাগে, আপনে 'দিন-কাল' পত্রিকার সম্পাদক সাহেব না ?

মামুন মৃদু হেসে বললেন, ছিলাম একসময়ে, এখন যে মালিক, সে-ই সম্পাদক। আমি বেশ কিছুদিন আগেই বিতাড়িত!

লোকটি বললো, আপনিই তো কাগজটা স্টার্ট করেছিলেন। সার, আপনার আর্টিকেলগুলো আমি সব পড়তাম, বড় ভালো লাগতো। আমার নাম এজাজ আহমদ, বগুড়ায় আমার বুক স্টল ছিল, ঢাকায় গিয়া আপনারে তিন চাইরবার দেখছি।

অতি ভক্তিতে লোকটি নীচু হয়ে মামুনকে কদমবুসি করতে যেতেই মামুন তার হাত ধরে বাধা দিলেন। এজাজ আহমদ চমকে উঠে বললো, এ কী, সার, আপনার হাত এত গরম···

চান্দাইকোনায় এম· আর আখতার মুকুলের পরিবারের সঙ্গে মামুনদের বিচ্ছেদ হলো। এজাজ আহমদ এরকম অসুস্থ অবস্থায় কিছুতেই মামুনকে যেতে দিল না বগুড়ায়। এক দৈনিক পত্রিকার খ্যাতিমান সম্পাদক এতখানি জ্বর নিয়ে আবার ঘাড়ে করে সাইকেল রিক্সা বইবেন, এই চিন্তাও যেন তার কাছে অসহ্য। চান্দাইকোনায় তার বাড়িতে কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার পর সে নিজে মামুনদের বগুড়ায় পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিল।

আখতার সাহেবের স্ত্রী মাহমুদা খানম রেবার সঙ্গে হেনা আর মঞ্জুর খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল এর মধ্যে, এখন ছাড়াছাড়ি হতে সজল হয়ে এলো ওদের চোখ। যেন আর কখনো দেখা হবে না।

এজাজ আহমদের বাড়িটি বেশ সুস্নিগ্ধ। বড় একটা উঠোনকে ঘিরে অনেকগুলি মাটির ঘর, চারপাশে প্রচুর গাছপালা, দু'দিকে দুটি পুকুর। মনোরম কোনো গ্রামের বাড়ি বলতে যে ছবিটি ফুটে ওঠে, ঠিক সেই রকমই বাড়ি। রয়েছে ধানের গোলা ও গোয়াল ঘর। উঠোনে একটা তুলসীমঞ্চ দেখে বোঝা যায় এককালে এটা হিন্দুর বাড়ি ছিল। এজাজ আহমেদের আদি বাড়ি ছিল বালুরঘাট, তার মরহুম পিতা একজন হিন্দুর সঙ্গে বাড়ি এক্সচেঞ্জ করে এদিকে চলে এসেছিলেন পার্টিশানের দু'বছর পরেই।

জ্বরের ঘোরে মামুন অজ্ঞান হয়ে রইলেন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা। একজন বৃদ্ধ এল এম এফ পাশ ডাক্তারকে পাওয়া গেল, তিনি শুধু নাড়ি টিপেই বললেন এ নির্ঘাৎ টাইফয়েড। বগুড়ায় জলেশ্বরীতলায় লোক পাঠিয়েও মামুনের শ্যালকের কোনো খবর পাওয়া গেল না, ওষুধের দোকান বন্ধ করে তার মালিক কোথায় পালিয়েছে কেউ জানে না। চতুর্দিকে লুঠপাট চলছে, ভয়ে এখন কেউই দোকান খোলে না। এমনকি নুন পর্যন্ত সাংঘাতিক দুর্লভ হয়ে উঠেছে।

প্রায় বিনা ওষুধে ও চিকিৎসায়, শুধু বেঁচে থাকার এক প্রবল তাগিদেই যেন মামুন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন সাতদিনের পর। শুধু নিজের জন্য বেঁচে থাকা নয়, মামুনের আর দীর্ঘজীবনের সাধ নেই, কিন্তু এই অচেনা জায়গায়, এমন দুঃসময়ে তিনি হঠাৎ মারা গেলে হেনা মঞ্জুদের কী হবে ? জ্বরের ঘোরেও মামুন সেই চিন্তাই করতেন। হেনা আর মঞ্জু দু'জনেরই মুখ শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে, চোখের নীচে কালি। জ্বরের ঘোর কাটবার পর হেনা আর মঞ্জুকে দেখে মামুনের মনে হলো, চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়লে মানুষ ও পশুর চোখের দৃষ্টির কোনো তফাৎ থাকে না।

সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ও অচেনা হয়েও এজাজ আহমদের পুরো পরিবার মামুনদের যে সেবা যত্ন করলো তার তুলনা নেই। মানুষের স্নেহ ভালোবাসা যে কোথায় কার জন্য জমা থাকে তার ঠিক নেই। চান্দাইকোনার মতন এক অখ্যাত জায়গায় যেন মামুনের অন্নঋণ ছিল।

জ্বর ছেড়ে যাবার পর মামুন সব খবরাখবর নিলেন। এই ক'দিনেই

অবস্থা অনেক বদলে গেছে। পঁচিশে মার্চের প্রথম আক্রমণের ঝোঁকে বাঙালীরা প্রচণ্ড মার খেয়েছিল। কতজন যে প্রাণ হারিয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। তারপর ই পি আর এবং ছাত্র-যুব মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধে বেশ কয়েকটা জায়গায় পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা মার খেয়েছে, ক্রোধ-উন্মত্ত জনতা তাদের ধরে ধরে ছিন্নভিন্ন করেছে। এখন আবার পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনী নতুন শক্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পুনর্দখল করে নিচ্ছে একটার পর একটা জায়গা। চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বোমা মেরে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। সেখানকার ই পি আর পশ্চাৎ অপসারণ করেছে ভারত সীমান্তের দিকে। যে-সব জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি ছিল, আর্মি এসে ফ্লেম থ্রোয়ার দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে সেইসব গ্রাম। যে-কোনো বাঙালী যুবককে দেখা মাত্র গুলি চালাচ্ছে, বাড়ি বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে যুবতী মেয়েদের। সেনাবাহিনীকে ঢালাও প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে লুণ্ঠন ও ধর্ষণের। বাবা-মায়ের সামনে মেয়েকে, স্বামীকে দাঁড় করিয়ে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করার ঘটনা শোনা যাচ্ছে প্রত্যেক দিন। শিশুদের শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে গুলি করছে চার পাঁচজন মিলে, যেন টারগেট প্র্যাকটিস।

এদিকে শুরু হয়েছে এক উৎপাত। গ্রামে গ্রামে লেগে গেছে বাঙালী-অবাঙালী দাঙ্গা। দেশ বিভাগের সময় বিহার থেকে যে-সব মুসলমান এইসব অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল, এই চব্বিশ বছরেও তারা বাঙালীদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেনি, তারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের

সমর্থক। আর্মি তাদের লেলিয়ে দিয়েছে বাঙালীদের বিরুদ্ধে।

মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের অস্ত্র গোলা বারুদ ফুরিয়ে এসেছে এর মধ্যেই, অসীম সাহসে তারা সেনাবাহিনীকে মাঝে মাঝে অ্যামবুশ করতে গিয়ে নিজেরাই মরছে দলে দলে।

এজাজ আহমদ সর্বশেষ খবর নিয়ে এলো, রংপুর, পার্বতীপুর, পুনর্দখল করে পাকিস্তানী আর্মি এগিয়ে আসছে হিলির দিকে। হিলির বর্ডার দিয়ে মুক্তি বাহিনীর ছেলেরা সীমান্তের ওপারে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে বলে আর্মি হিলিতে এসে ঐ বর্ডার বন্ধ করে দিতে চায়। তারপর তারা নওগা, বগুড়া ও আশেপাশে চিরুনি অপারেশন শুরু করবে।

এজাজ আহমদ ইতস্তত করে বললো, মামুনভাই, এই অবস্থায় আপনাদের আর এখানে ধরে রাখতে চাই না। বর্ডার খোলা থাকতে থাকতে আপনে ইন্ডিয়া চলে যান। আপনার সঙ্গে মেয়েরা রয়েছে, ওদের এখানে রাখা একেবারেই নিরাপদ নয়। পশুরা যে কী বীভৎস কাণ্ড করতেছে আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না মামুনভাই।

মঞ্জু পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল, সে বললো, মামুনমামা, আমরা ঢাকা ফিরে যেতে পারি না?

এজাজ আহমদ বললো, ঢাকায় ফেরার সব পথ বন্ধ। ঢাকায় গোলমাল আরও বেশী!

মামুন বললেন, ইন্ডিয়ায় যাবো কোন্ ভরসায়? তারা আমাদের আশ্রয় দেবে? আমাদের পাসপোর্ট-ভিসা কিছু নাই।

এজাজ বললো, অনেকেই যাচ্ছে। মামুনভাই, সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। এরপর বর্ডার সীল করে দিলে আর কোনো উপায় থাকবে না।

মামুন চেষ্টা করলেন বগুড়ায় এম আর আখতার মুকুলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, কিন্তু তাঁর সন্ধান পেলেন না। সেইদিনই জয়পুরহাটে এক বিরাট দাঙ্গার খবর পাওয়া গেল। চতুর্দিকে রব, আর্মি আসছে, আর্মি আসছে।

এজাজ আহমদ একটা জিপ জোগাড় করে দিল, অনেকটা দিশাহারার মতনই মামুন রওনা দিলেন হিলি সীমান্তের দিকে। মঞ্জু আর হেনাকে দেশের মধ্যে রাখা নিরাপদ নয়, তাদের জন্য আশ্রয় নিতে হবে অন্যদেশে! নাৎসী বাহিনী আক্রমণ করেছিল পোলাণ্ড, সেখানকার লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ-শিশু প্রাণ দিয়েছে, আর এখানে নিজের দেশেরই সেনাবাহিনী, একই ধর্ম...

ক্ষেতপাল এসে নদী পার হতে হবে, একটা কাঠের ব্রীজ রয়েছে এখানে, তার মাঝখানের অংশটা খোলা। গ্রামবাসীরাই সেটা খুলে রেখেছে। এখানে আবার দেখা পাওয়া গেল এম আর আখতার মুকুলের। মুকুল গ্রামবাসীদের বোঝাচ্ছেন যে তাঁদের সীমান্তে পৌঁছোনো বিশেষ প্রয়োজন, প্রবাসী সরকার গঠন করতে না পারলে এই লড়াই বেশীদিন চালানো যাবে না।

এই পথ দিয়ে সশস্ত্র অবাঙালীরা ঢাকার দিকে যাচ্ছে বলে গ্রামবাসীরা ব্রীজটা খুলে রেখেছিল। মুকুলের বাকপটুতায় মুগ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা ভাঙা অংশটা আনতে গেল।

মুকুল মামুনকে বললেন, মামুনভাই, দোয়া করেন, যাতে আর্মি এসে পড়ার আগেই আমরা বর্ডারে পৌঁছাতে পারি!

তারপর নদী পেরিয়ে, পাঁচবিবি হয়ে একসময় দুটি জিপ এসে থামলো জয়পুরহাট সুগার মিলের সামনে। মুকুল সাহেব আগে থেকে ব্যবস্থা রেখেছিলেন, সেখানেই গেস্ট হাউসে কাটানো হলো রাতটা।

পরদিনই পার্বতীপুর থেকে রেল লাইন ধরে কামান দাগতে দাগতে এগিয়ে এলো পাকিস্তানী বাহিনী। তাদের আগে হিলি পৌঁছোতেই হবে, নইলে আর কোনো উপায় নেই। এদিকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ছোট বাহিনী প্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়ে আছে।

রাত্রির অন্ধকারে বাতি না জ্বেলে যাত্রা করলো দুটো জিপ। মেয়েরা অবিরাম সুরা পাঠ করছে। মামুন স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, ভয় কিংবা উত্তেজনার চেয়েও দারুণ এক বিমর্ষতায় তিনি আক্রান্ত। চল্লিশের দশকে তাঁর মতন যারা পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য প্রাণপণ করেছিলেন আজ তাঁদেরই এরকম অসহায় অবস্থায় পালিয়ে যেতে হচ্ছে পাকিস্তান ছেড়ে! সে সময় কোথায় ছিল ইয়াহিয়া খান, কোথায় ছিল ভুট্টো সাহেব? আজ তারাই পাকিস্তানের রক্ষক ও ভক্ষক?

হিলি রেল স্টেশানে জিপ দুটো পৌঁছোলো রাত বারোটার পর। রেল লাইনের ওপারেই ভারত। যৌবনে মামুন অন্তত দু'বার এ পথে যাতায়াত করেছেন, কিন্তু তখন ওপারটা বিদেশ ছিল না।

মুকুলের সঙ্গে সিরাজগঞ্জের এস ডি ও শামসুদ্দীন সাহেব এসেছেন, তিনি আগেই জানিয়েছিলেন যে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের সঙ্গে কথা হয়ে আছে, তারা কারুকে ওপারে যেতে বাধা দিচ্ছে না। রেল লাইনের মাঝখানে এসে শামসুদ্দীন সাহেব থেমে গিয়ে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন, আমি এবার যাই!

মুকুল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, আপনি আমাদের সঙ্গে ওপারে আসবেন না?

শামসুদ্দীন সাহেব হেসে বললেন, বাঘাবাড়ির চরে আমি পজিশন নিয়ে আমার জোয়ানদের রেখে এসেছি। তারা আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। আমি কি এখন যেতে পারি? তাছাড়া আপনারা যাতে শিগগিরই সসম্মানে স্বাধীন বাংলায় ফিরে আসতে পারেন, তার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে তো!

হঠাৎ মঞ্জু হেঁচকি তুলে কেঁদে উঠতেই মামুন তাঁর মাথায় হাত রাখলেন। বলার কিছু নেই। বছরের পর বছর ভারত সম্পর্কে এমন প্রচার করা হয়েছে যে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ধারণা হয়ে গেছে যে ভারত হলো হিন্দু দুশমনদের দেশ। তারা এখন কী ভাবে আশ্রয় দেবে? যদি অপমান করে, লাথি-ঝাঁটা মারে? কতদিন থাকতে হবে সে দেশে, খরচ চলবে কী ভাবে? মামুনের কাছে মাত্র দু' হাজার পাকিস্তানী টাকা।

শেষবার মাতৃভূমির দিকে তাকিয়ে সবাই পার হয়ে এলো রেললাইন। একজন ভারতীয় সরকারি কর্মচারী অপেক্ষা করছিলেন এদিকে, তিনি বেশ ভদ্রভাবেই বললেন, আসুন, বেশী চিন্তা করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে! নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত আপনারা, ডাক বাংলোতে শোবার ব্যবস্থা আছে, তার আগে থানায় শুধু নাম ধাম লিখিয়ে নিতে হবে। আসুন।

রাত একটা। থানা মানে পুলিশ চেক পোস্ট, ছোট্ট একটা ঘর, সেখানে ইলেকট্রিসিটি নেই। একজন জমাদার লম্বা একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ জ্বেলে ধরেছে, আর বিরাট এক খাতা খুলে বসে আছে গেঞ্জি গায়ে এক রোগা সিড়িঙ্গে থানাদার। এই দলটিকে দেখে তিনি বললেন, লাইনে দাঁড়ান, এক এক করে বলুন নাম, বাপের নাম, সাকিন, পেশা।

লিখতে লিখতে মাঝপথে কলম থামিয়ে সেই রোগা পুলিশটি মুখ তুলে বললেন, ভাইগ্যাই যদি পড়বেন, তা হইলে এই গণ্ডগোলটা বাজাইলেন ক্যান, অ্যাঁ?

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। সবাই নীরব।

লোকটি আবার বললেন, এলায় আপনারা যে ভাগ্‌তেছেন, আপনাগো মনের অবস্থাটা কী? মানে কিনা, আপনাগো মনটা কেমন হাউ হাউ করতাছে?

লোকটির কর্কশ কণ্ঠের সঙ্গে খানিকটা বিদ্রূপ মেশানো। সদ্য ওপার থেকে এসে মাথাভর্তি বিরাট একটা প্রকাণ্ড অনিশ্চয়তার বোঝা নিয়ে যারা দাঁড়িয়েছে, তারা এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উত্তরে কী আর বলতে পারে!

পুলিশটি আবার বললো, বুঝছেন, আমাগো বাড়িও বর্ডারের হেই মুড়া, মানে বরিশাল। পঞ্চাশ সনের রায়টে বউ-পোলাপান লইয়া ভাগছি। এলায় বুঝছেন, আপনারা যখন আমাগো খেদাইছিলেন, তখন আমাগো মনডা এইরকমই করছিল! হে ভগবান, কত কিছু দেখাইলা। এবার তো দেখতাছি, হিন্দু-মুসলমান হগলই ভাগতাছে!

মামুন তাকালেন মুকুলের দিকে। তাঁর মুখখানা যেন পাথরের মতন।

সরকারি গাইড ভদ্রলোকটি আবার বললেন, ওসব কথা ছাড়ুন। একটু তাড়াতাড়ি করুন, রাত অনেক হয়েছে, এঁদের সঙ্গে বাচ্চাকাচ্চা রয়েছে...

দু'দিন পর হাওড়া স্টেশানে ট্রেন থেকে নামলেন মামুন। স্টেশানের বাইরে এসে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ওপারের কলকাতায় সবে মাত্র ভোর হচ্ছে। সেই কলকাতা, তাঁর ছাত্রজীবন ও যৌবনের কলকাতা। গত চব্বিশ বছরে এই শহর কতখানি বদলেছে কে জানে!

মামুন মঞ্জুকে বললেন, এক সময় তুই কলকাতায় আসার জন্য কী কান্নাকাটি করেছিলি, তোর মনে আছে মঞ্জু? দ্যাখ, শেষ পর্যন্ত তোর সেই কলকাতাতে আসা হলো!

(ক্রমশ)

অঙ্কন : অনুপ রায়

দেখি নাই ফিরে

সমরেশ বসু

চিত্র □ বিকাশ ভট্টাচার্য

॥ বিয়াল্লিশ ॥

চুম্বক। বইয়ের নাম। বিষয় চুম্বক লোহা আর ধাতুর সরল বিজ্ঞান। বেরিয়েছে গত আশ্বিনেই। বইয়ের লেখক শ্রীজগদানন্দ রায়। তাঁর বইয়ের 'নিবেদন'… "বিশ্বভারতীর কলাভবনের কৃতী ছাত্র শ্রীমান রামকিঙ্কর বেইজ পুস্তকের প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দিয়াছেন। এই সুযোগে তাঁহাকে…আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। শান্তিনিকেতন (বীরভূম) আশ্বিন, ১৩৩৫।"

জগদানন্দ রায় মহাশয়ের কৃতজ্ঞতা রামকিঙ্করের উপরি পাওয়ানা। যিনি পয়সায় তিনি ওকে দিয়ে কাজ করাননি। বইয়ের ভিতরের কিছু ছবি ও আঁর মণীন্দ্র এঁকেছে। তারপরে আবার ঐ আশ্বিনেই শ্রীজগদানন্দ রায়ের বই "তাপ" প্রকাশিত হয়েছে। আবার সেই "কলাভবনের কৃতী ছাত্র শ্রীমান রামকিঙ্কর" প্রসঙ্গ।

মণি গুপ্তদা কিছু ভুল বলেনি। বোধ হয় সে সংবাদটা নন্দলালকেও দিয়েছিল। নন্দলাল গৈরিকে এসেছিলেন। দুপুরের খাবার আগে। রামকিঙ্কর তখন 'চুম্বক'-এর ছবি আঁকছিল। ঐ কাজে কোনো শিল্পীরই মন বসতে পারে না। কিন্তু আঁকলে পয়সা মেলে। নন্দলাল ছুটি ফাঁকা গৈরিক বাড়িতে এসেছিলেন নিঃশব্দে। ও আঁকছিল মণি গুপ্তদার শেখানো মতো। নন্দলাল ঘরে ঢুকে ওর কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর গলা শোনা গিয়েছিল, "অনেক কাটাকুটি ছেঁড়াছিড়ি করেছো দেখছি। কাজগুলো শক্ত নয়। একবার ধরতে পারলে, সহজ হয়ে যায়। জানি, এ কাজে জাত শিল্পীর মন বসে না। কথাটা আমাকে প্রথম বলেছিল বিনোদ। তোমার চেয়ে টাকার দুশ্চিন্তা হয় তো বিনোদের কম। তবে তেমন কিছু কম নয়। উনিশ আর বিশ। ওর দাদার কাছে চাইলে পেতে পারে। বয়স তো হয়েচে। পাওয়া গেলেই তো চাওয়া যায় না।। সম্মানে লাগে। বিনোদ এসব কাজ টুকিটাকি করেচে। ওর তেমন ভালো লাগে না। না লাগারই কথা। ওকে বলেছিলুম, শিল্পীর হলো দুটো দায়। একটা জীবিকার দায়। আর একটা প্রাণের দায়। এখন যে কাজ করচো এটি জীবিকার দায়। এও শিল্পীরই কাজ। এটা করতে হবে, তাই করা। আর একটার কোনো জোরাজুরি নেই। তার সঙ্গে শিল্পীর প্রাণ-মনের ভাবের খেলা। এ কাজে হাত পাকিয়ে রাখলে, অসময়ে কাজ দেবে। আমি জগদানন্দবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি। শীগগিরই আরও কাজ পাবে। তারপর প্রভাত আসুক। সে এসব কাজে বেশ [illegible]। [illegible] বাবা মারা যাবার পরে সে নানারকম

ভেবেই এসব কাজে নেমেছে। শুনেচি সে কলকাতার পাবলিশারদের সঙ্গে চিঠি চালাচালি করে। বইয়ের ছবি এঁকে দেবার অর্ডার পাবার জন্য। প্রভাত এলে তোমার আরও কাজ মিলবে। নেপাল রায় মশাই, প্রভাত মুখুজ্জে, ওঁরাও বই লেখেন। ছবির দরকার। প্রভাত সে-সব বলতে পারবে।"

রামকিঙ্কর আঁকা থামিয়ে মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনেছিল। নন্দলাল ফিরে যেতে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। ফিরে তাকিয়েছিলেন, তাঁর চশমার কাঁচে ছিল উজ্জ্বল কিরণ, "কিঙ্কর, অন্ন চিন্তা চমৎকার। কথাটা শুনতে ভারি মজা। আসলে ওর চেয়ে চমৎকার চিন্তা আর কী আছে? সামনের বর্ষা গেলে তোমার ছাত্র জীবন শেষ। ওটা নিয়ম। কিন্তু মনে রেখো, নিয়মই এখানে গলার ফাঁস নয়। যাঁরা তোমাকে তিন বছর রেখেছেন, তারপরেও তাঁরা ছ'মাস রাখতে পারবেন। ভয় পেও না। ভেঙে পড়ো না। বয়স হলে সব ছেলেরই এক চিন্তা। সবাইকেই ঐ কথা বলি। আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে এখনও পুজোর কাজের আগে, একশো টাকা না পেলে, তোমার বৌঠানের হাতে কিছু দিতে পারি নে। এই অগ্রিম টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন আমার বন্ধু গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। ভেঙে পড়তে কতোক্ষণ। উঠে দাঁড়ানোই বড় কথা। তোমার সেই তেল রঙের বায়েন-বউ কলাভবনে রাখা আছে। আরও কয়েকটা জল রঙের ছবি বোধ হয় তোমার কাছে জমেছে। কলকাতার সোসাইটির একজিবিশনে পাঠাবো। বিনোদ আর তোমার সবচেয়ে বেশি দরকার। এসব কাজ ছাড়াও পুজোর ছুটিতে আরও বেশি কিছু ছবি আঁকবে। প্রত্যেকবারের মতো পাঠানো হবে লখনৌ, দিল্লি, মাদ্রাজে। আঁকো, চলি।" ঘরের বাইরে পা বাড়িয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে, গোঁফ জোড়ায় স্নিগ্ধ হাসি, "আর এ তো বাপু নিজেদের মধ্যে কথা। খুব দরকার পড়লে বলবে। দু চার টাকা।"

মাস্টারমশাই কখন চলে গিয়েছিলেন। রামকিঙ্কর মুখ ফিরিয়ে দেখছিল। তার চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিল। কতো কারণে চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। দুঃখে, অপমানে, বিপদ আর উদ্বেগ থেকে মুক্তিতে। দুঃসময়ের ভালবাসা, আশ্বাসে। আনন্দেও। মাস্টারমশাই সেই বুক ভরা আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন। মাস্টারমশাইকে এমনিতে মনে হয়, কম কথার মানুষ। আসলে তিনি যে কতো আবেগপ্রবণ, নিভৃতে কতো কথাই যে বলেন, না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। তিনি নানা সময়ে নানা কথা বলেছেন। জিজ্ঞেস করেছেন, যে-কথা,

শীতে স্নান করে কী আরাম। পাহাড়গুলোর নাম মনে রাখা ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাজা বিম্বিসার, অজাতশত্রু কি জরাসন্ধের কেউ ছিলেন? প্রভাতমোহন এতোটা বলতে পারেনি। রাজগীরেও বুদ্ধ আর মহাবীরের স্মৃতি। বেণুবন, আর জলাশয়, রাজা বিম্বিসারের বাগান বাড়ি ছিল। বুদ্ধ সেখানে বসে তাঁর ভক্ত শিষ্যদের সামনে বাণী দিতেন? পাহাড়গুলোর ওপরে মহাবীরের স্মৃতি বেশি। সমতলে বুদ্ধদেব। একমাত্র গৃধ্রকূট ছাড়া। সেখানে তিনি বসতেন। আর নিচের কারাগার থেকে রাজা বিম্বিসার তাঁকে দর্শন করতেন। বিম্বিসারকে তাঁর ছেলে অজাতশত্রু বন্দী করে রেখেছিলেন? আশ্চর্য! রামকিঙ্কর জানতো, বাপকে কয়েদ করা বা হত্যা করা, ওসব বুঝি সুলতান বাদশাদেরই কাণ্ড। অথচ সুলতান বাদশাদের কতো আগেই এ দেশে রাজা-বাবার রাজা-ছেলের বিবাদ! বুদ্ধকেও দেবদত্ত সেই রাজগীরেই কয়েকবার হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।

রাজগীর যেন চোখের সামনে জীবন্ত ইতিহাসের চলমান ছবি। চৈত্য, বিহার, স্তূপ আর ধ্বংসলীলার মধ্যে অজন্তার ছবিকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান—সকলের স্মৃতিচিহ্ন রাজগীরে দেখেছিল। রামকিঙ্করের গয়ার চেয়ে বুদ্ধগয়া বেশি ভালো লেগেছিল। বুদ্ধগয়ায় ছিল সেই বুদ্ধেরই স্মৃতি। বোধিলাভ করে, সেখানে তিনি গোপকন্যার পরমান্ন খেয়েছিলেন।

রামকিঙ্করের চোখে সে এক ছবি। বোধিবৃক্ষ ঘেরা পাথরের স্তম্ভ, অনেক রকম মূর্তি আর অলঙ্করণ। তারপরে পাটলিপুত্র আর পাটনা। হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যুগের ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্গে, চোখের সামনে ছিল অজস্র ছবি। কাশী-সারনাথ-প্রয়াগ। কাশীতে গিয়ে ধর্মশালার বদলে আলাদা আশ্রয় জুটেছিল। মুখ বদলানো খাবার সুখও। প্রভাতমোহনের মামার বাড়ি সেখানে। প্রভাতমোহন এমনিতে কোনো দিনই উপোসে রাখেনি। কিন্তু রামকিঙ্কর ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্ত হয়ে দেশে দেশে ঘুরেছিলে। প্রাণের ক্ষুধা। চোখের তৃষ্ণা। দিল্লি আগ্রা ফতেপুর। দেখা হবে কোনো দিন ভাবেনি।

দিল্লির ধর্মশালায় তিন বন্ধু পৌঁছেছিল শীতের সন্ধ্যার পর। সেখানে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। সব ঘরগুলো ছিল লোক ভরতি। বারান্দা উঠোনও খালি ছিল না। সব বয়সের স্ত্রী পুরুষরা সেখানে আগুন জ্বালিয়ে ভিড় করেছিল। তিন বন্ধুই তখন শীতে কাতর। বোঝা বয়ে আর হেঁটে ক্লান্ত। পঞ্চাশ টাকায় আর্যাবর্ত ভ্রমণ। সহজ কথা নয়! হোটেলে উঠার সঙ্গতি ছিল না। তবে প্রভাতমোহনের নজরে পড়েছিল একটি ঠাঁই। সেই জন্যই তো কথা, রাখেন কৃষ্ণ মারে কে? দেওয়ালের গায়ে ছিল একটা প্রকাণ্ড দেওয়াল আলমারি। কাঠের পাল্লা খুলে দেখা গিয়েছিল, পাথরের তিনটি থাক। প্রত্যেক থাকে একজন থাকতে পারতো অনায়াসে। তিন জনেই বিছানা খুলে পেতে ফেলেছিল। কিন্তু ধোঁয়ার উৎপাতে দম বন্ধ হবার অবস্থা। আলমারির কাঠের পাল্লা ভিতর থেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়েছিল। পুরোপুরি বন্ধ না। নিশ্বাস ফেলবার জন্য একটু ফাঁক রাখতে হয়েছিল। আর বোঝা পিঠে নিয়েই পরের দিন গিয়েছিল লালকেল্লা দেখতে। লালকেল্লা থেকে কুতুবমিনার। টাঙ্গায় চাপবার পয়সা ছিল না। ধু-ধু মাঠ, মরুভূমির মতো। আর ঝাঁটি বাবলার বন। উটের সারি। কুতুবমিনারের চেয়ে রামকিঙ্করের নজর কেড়েছিল পাশের হিন্দু মন্দিরের খোদাই করা মূর্তির স্তম্ভ। প্রভাতমোহন আর সুধীর ঘুরে ঘুরে দেখেছিল। রামকিঙ্কর সবখানেই কিছু কিছু স্কেচ করেছিল। মায় দিল্লির ধর্মশালার সেই উঠোন, বারান্দার আগুন। আগুন ঘিরে বসা ছায়া ছায়া মানুষ। পেন্সিলের স্কেচেই সেই দৃশ্যে ফুটেছিল এক রহস্যময়তা।

দিল্লি থেকে আগ্রা। আগ্রার তাজমহল। শীতের দুপুরে রোদ পোহাতে ভালো লেগেছিল। কিন্তু দুপুরের রোদে তাজমহল যেন কেউ না দেখে। সেই তাজমহলই শীতের শুক্লা কুয়াশা ছাওয়া রাত্রে এক স্বপ্নের ছবি হয়ে উঠেছিল। যমুনা যেন এক কুহকী নদী। তিন শিল্পীর কেউ সে-ছবি ভোলেনি। আর সুধীর সেই সময়ে তার বাঁশিটি বাজিয়েছিল। স্বপ্নের ছবিতে নেমে এসেছিল একটা অলৌকিকতা। রামকিঙ্করের চোখের সামনে একবার বাঁকুড়ার ছবি ভেসে উঠেছিল। বাড়ি, বাবা মা বউদি দিবাকর। আশু বিশ্বনাথ অতুল...গন্ধেশ্বরী দ্বারকেশ্বর, এক্তেশ্বরের মন্দির।

আগ্রা থেকে ফতেপুর, ফতেপুরের সেই জয়পুরি দেওয়াল চিত্র। দূর থেকে পানিপথ যুদ্ধক্ষেত্র। রামকিঙ্করের মাঝে মাঝেই মনে হয়েছিল, সত্যি ও বোধ হয় ঐ সব বইয়ে পড়া জায়গাগুলো দেখছিল না। বালি আর কাঁটা ঝোপ ঝাড় থেকে ক্রমে মরুভূমির দেশ রাজস্থানে। জয়পুর। প্রভাতমোহন নন্দলালের চিঠি নিয়ে এসেছিল। চিঠি ছিল জয়পুরের মহারাজার বাঙালি দেওয়ানকে লেখা। তিন বন্ধু প্রথমে উঠেছিল কলাভবনের ছাত্র বন্ধু সোভাগমল গেহলটের বাড়ি। একবেলা বন্ধুর বাড়িতে খেয়ে, অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিল মহারাজার বাঙালি দেওয়ানের কাছে। সোভাগমলকে বলা ছিল, যেন ওদের রান্না না করা হয়। মাস্টারমশাইয়ের চিঠি দিয়েছিল। দেওয়ান চিঠি পড়েছিলেন। এসো। বসো। গল্প হয়েছিল অনেক। বাঙালি দেওয়ান ভেবেছিলেন, গল্পেই বাঙালির ছেলের পেট ভরে। তা হলে? বেলা বারোটায় "এসো তা হলে।" বিদায়!

রামকিঙ্কর ভেবেছিল ভদ্রলোকের একটা স্কেচ করবে। সে-সাধ আর পূর্ণ হয়নি। শীতের দুপুরে তিন জোয়ানের পেটে তখন মহাপ্রাণী হাহাকার করছেন। রাস্তার ধারে হালোইকরের দোকান থেকে পুরি দিয়ে মহাপ্রাণীকে যখন ঠাণ্ডা করছিল, সোভাগমল তখনই সেই পথে! দৌড়ে পাশের গলিতে ঢুকে না পড়লে, ইজ্জত রাখা দায় হতো। পুরি জল গিলে, বিকাল পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়ে আবার সোভাগমলের বাড়ি। বড়লোক দেওয়ানের বাড়িতে থাকবার মতো ভালো জামাকাপড় তো নাই। বুঝলে সোভাগমল, তাই ফিরে আসতে হলো। সোভাগমলের বন্ধুকৃত্যে ছেদ পড়েনি। সে হয়েছিল বেড়াবার সঙ্গী। পুষ্করের সাবিত্রী পাহাড়, সন্ধ্যায় আরতির সময় বিশাল হ্রদের জলে পুরোহিতদের দেওয়া খাবার খাওয়ার জন্য কুমিরের ভিড়, সবই চিত্র। কেবল চিত্র না। মূর্তিও বটে।

রাজপুতানার সেই তাপ-ভরা কালো আকাশে এক খণ্ড চাঁদ, সোভাগমল গিয়েছিল আজমীর পর্যন্ত। সেখান থেকে চিতোরের টিকেট কাটা হতেই কোথা থেকে এসেছিল কলাভবনের পুরনো ছাত্র রঘুবীর সিং। রঘুবীরের ছিল এক কথা, চিতোর পরে হবে। এখন আমার বাড়ি চলো। টিকেট ফিরিয়ে দিয়ে নিজের থেকে ট্রেন ভাড়া দিয়ে, ত্রিশ মাইল দূরে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। রঘুবীরের মা বোনের কী আদর যত্ন। রামকিঙ্কর প্রচুর গান করেছিল। সুধীর বাঁশি বাজিয়েছিল। প্রভাতমোহন ছিল তক্কে তক্কে। যেই না রঘুবীর চোখের আড়াল হয়েছিল তিন বন্ধু পিঠে বোঝা নিয়ে পালা পালা ছুট! মা ভগ্নির আদর যত্ন যে কোথায় কতোটা সয়, কেউ বলতে পারে নাই।

রঘুবীরের বাড়ি থেকে পালিয়ে একেবারে উদয়পুরের বিনা পয়সার ধর্মশালায়। বিনা পয়সায় থাকো। কিন্তু মেঝে ছেড়ে খাটিয়ায় শুতে চাইলেই, খাটিয়া পিছু এক আনা ভাড়া। তিন খাটিয়া তিন আনায় ভাড়া নিয়ে, তিনবন্ধু গিয়েছিল রাজবাড়ির বাঙালি দেওয়ান প্রভাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। বুদ্ধি প্রভাতমোহনেরই। রামকিঙ্করের চোখে তখন রাজপুতনার দৃশ্য। দেওয়ানের কাছে যাবার উদ্দেশ্য ছিল, রাজবাড়ি দেখার অনুমতি প্রার্থনা। কিন্তু আবার বাঙালি দেওয়ান? উপায় ছিল না!

সংসারে কোনো কালে, কোনো কিছুই কি বাঁধা রীতির পথে চলেছে? মানুষ যে কতো রকম! আর কী বিপরীত! প্রভাস চট্টোপাধ্যায় তিন নবযুবা শিল্পীকে দেখে চমৎকৃত। কোথায় উঠেছো? বিনি পয়সার ধর্মশালায়? চলো এই মোটর গাড়িতে। গাড়িতে তুলে ধর্মশালায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে মালপত্র তুলে নিয়ে, একেবারে উদয়পুর হোটেলে। থাকার রাজকীয় ব্যবস্থা। রাজভোগ খাওয়া তাঁর গৃহে। যাও, বেড়াও, দেখ। কেবল রাজবাড়ি কেন। ঘুরে দেখ গোটা উদয়পুর। গাড়ি থাকলো তোমাদের হেফাজতে। উদয়সাগর যাও। পিছোলা হ্রদ দেখে

এসো। সেখানে ছিল কিছু শ্বেত পাথরের ঝাড়ি। ঘুরে বেড়াও। ফিরে এসে আমার সঙ্গে খাও। থাকো গিয়ে হোটেলে। প্রভাতমোহন বলেছিল, এঁর নাম সুজন প্রবাসী বাঙালি। হোটেলের ঘরে ঢুকলেই, স্কেচের ব্যাগ ফেলে দিয়ে রামকিঙ্কর তিনদিন মেলা গান করেছিল। সুধীর উদয়সাগরের ধারে বাঁশি বাজিয়েছিল। তারপরে তিনজনেই প্রভাস চট্টোপাধ্যায়ের স্কেচ করেছিল। নাম, ঠিকানা—শান্তিনিকেতন আর তারিখ লেখার পর। তিনটি স্কেচই চাটুয্যেমশাই চেয়ে নিয়েছিলেন। তিনটি স্কেচই কি একরকম হয়েছিল?

তা যদি হতো তবে তিন শিল্পী কেন! বন্ধু তারা বটে। শিল্পীর চোখ তাদের ভিন্ন। রাজপ্রাসাদে ছিল সেকালের অনেক ছবি। তার মধ্যে রবি বর্মার রানা প্রতাপ সিংহ। উদয়পুরের বাঙালি দেওয়ান প্রভাস চট্টোপাধ্যায়ের স্নেহ যত্ন আদর অমূল্য। তাঁর কাছ থেকে বিদায়ের সময় তিন বন্ধুর মন কেমন করেছিল।

রামকিঙ্করের সঙ্গে প্রভাতমোহনের ঘনিষ্ঠতা সেই সময়েই বন্ধুত্ব পেয়েছিল। অথচ দুর্দিনে সেই বন্ধুর কাছেই মুখ খুলতে পারেনি। আসলে রামকিঙ্কর ভাবতে পারেনি, প্রভাতমোহনের ঐ কাজে ভাগ চাওয়া যেতে পারে। ভেবেছিল, ঐ কাজ একান্ত প্রভাতমোহনেরই। মণি গুপ্তদা আর নন্দলাল প্রভাতমোহনের সঙ্গে কথা বলে রামকিঙ্করের কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরে কেবল প্রভাতমোহনই কাজ যুগিয়ে দিতো।

আশ্বিনের মধ্যে জগদানন্দ রায়ের দুটি বই বেরিয়েছিল। চন্দ্রা পুজোর ছুটিতে দেশে গিয়েছিল। রামকিঙ্করের ডাক এসেছিল, বাঁকুড়া থেকে। দুর্গাতলার দুর্গা প্রতিমার চক্ষুদান করতে হবে। জগদানন্দ রায় মশাইয়ের বইয়ের কাজ না পেলে, বাঁকুড়া যাওয়া হতো না। চন্দ্রাকে ছাড়া, কাজ কেবলই কাজ ছিল। কাজে প্রাণ ছিল না। চন্দ্রা দেশে গিয়েছিল। রামকিঙ্করের ভাগ্য। ও তখন বাঁকুড়া যেতে পেরেছিল। কিন্তু চন্দ্রার সেই অবাক অভিমানের জবাব দিতে হয়েছিল। মণি গুপ্তদার কথা শুনে যখন ওর চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, যখন ও চন্দ্রার আত্মহারা খুশির ডাকে সাড়া দিতে পারেনি, ঢুকে গিয়েছিল গৈরিক-এর ঘরে। রামকিঙ্কর বেশ কয়েকদিন চন্দ্রার দেখা পায়নি। অথচ দেখবার জন্য মন ভারি ছটফট করেছিল। নুটুদির বাড়ি গিয়ে দেখা পায়নি। ছুটির আশ্রমে বাঁধাধরা কয়েক বাড়ি ছাড়া যাবার জায়গাই বা কোথায় ছিল। রামকিঙ্কর বুঝতে পারেনি, চন্দ্রা ইচ্ছা করেই ওকে দেখা দেয়নি। জীবনে একজন ওর কাছে রাত্রের মেঘলা আকাশে ঝাপসা তারার মতো রহস্যময়। দেখা দিয়েও সে দেখা দেয় না। চলে গিয়েছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কেবল তার সেই তুলির টান যেন ওর হাতের শিরার রক্তে রয়েছে। সে ছিল একরকম। চন্দ্রা আর একরকম। চন্দ্রা ওর কাছে এসেছে রক্তের ধমনীতে আচমকা পা ফেলে। ওর পিছনটাকে ভুলিয়ে দিয়ে, কোথায় এক অচেনা পথে টেনে ছুটে চলেছে। রামকিঙ্কর সে পথ চেনে না। কিন্তু অচেনা পথের যাত্রায় ঝড় লেগেছে ওর শরীরে আর মনে। প্রেম! পীরিতি তাহারে কয়। কোনো দিকে তাকাবার অবকাশ ছিল না। জীবনের আসল ভয়টা কেটে যাবার পরে, চন্দ্রার জন্য প্রাণে শুরু হয়েছিল নতুন মাতামাতি। ধারাবতী ছিল রহস্য। চন্দ্রা অভিজ্ঞতা। ওর জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। ও জানে প্রেম পীরিতি ছাড়া যুবতী নাহি সে হয়।

কয়েকদিন পরে, জ্যৈষ্ঠের শেষ বিকালে চন্দ্রার দেখা মিলেছিল। আশ্চর্য! পথে হঠাৎ দেখা হয়নি। নিরালা শালবীথির এক আড়ালে সে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। রামকিঙ্কর প্রথমে দেখতে পায়নি। পুবের দিকে আপন মনে চলেছিল। অবিশ্যি চন্দ্রা ছিল ওর অচিন মনের সন্ধানে। চন্দ্রাকে ছাড়িয়ে কয়েক পা গিয়ে ও থমকে দাঁড়িয়েছিল। শালবীথিতে তখন গভীর সবুজ কেঁপে উঠেছিল কেমন করে? বর্ষা তখনও নামেনি। আর মৃদু কোনো গন্ধ কি ঘ্রাণে লেগেছিল? ও ফিরে দাঁড়িয়েছিল। চন্দ্রা! পাগল হয়ে খুঁজে ফেরার আবিষ্কার! চন্দ্রা মুখ তুলে তাকায়নি। যেন নিতান্তই শালবীথির

নিরিবিলিতে গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওর চুল ছিল খোলা। কচি দূর্বা রঙ শাড়ি আর লাল জামা ছিল গায়ে। ফর্সা মুখ গম্ভীর।
রামকিঙ্করের অবাক স্বর স্খলিত হয়ে ঝরেছিল, "চন্দ্রা!"
চন্দ্রা তবু মাথা তোলেনি। ঘাড় ফেরায়নি। চোখ তুলে তাকায়নি। যেন শুনতেই পায়নি। কে যাচ্ছিল। কে-ই বা কাকে ডাকছিল।
রামকিঙ্কর ভেবেছিল, সত্যি বুঝি চন্দ্রা ওকে দেখতে পায় নি। ওর ডাক শুনতে পায় নি। ও আবার ডেকেছিল, "চন্দ্রা!"
"কী বলছেন?" চন্দ্রা লালপাড়ের বাইরে ফরসা পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে লাল মাটি খুঁটছিল।
বলছেন! রামকিঙ্করকে আপনি? তুমি থেকে? অচতুর নায়ক। রমণীর মন চেনা তার দুঃসাধ্য ছিল। হাসতে ভুলে গিয়েছিল। এক পা কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। না, চন্দ্রার মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা যায়নি। মুখও তোলেনি। তাকায়ওনি। কেবল পা দিয়ে মাটি ঘষেছিল ঘন ঘন। রামকিঙ্করের প্রাণটা আঁটুপাটু করেছিল। কয়েকবার ঢোক গিলেছিল, "আমি রামকিঙ্কর।"
"সে তো দেখছিই।" চন্দ্রা কি একটু ঠোঁট টিপেছিল?
রামকিঙ্কর আকাশ থেকে পড়েছিল, "তবে তুমি আমাকে আপনি বলচ কেন?"
"তবে কী বলবো?" চন্দ্রা তখনও মুখ তুলে তাকায়নি।
রামকিঙ্করের চোখ মুখের অবস্থা একরকমই ছিল, "তুমি যে আমাকে নাম ধরে ডাকতে?"
"আর ডাকবো না।" চন্দ্রা মুখ তুলে তাকানো দূরের কথা, মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়েছিল।
রামকিঙ্করের মনে হয়েছিল, ওর প্রাণ চলে যাচ্ছে সবুজ শাড়ি আর লাল পাড়ে। গলার স্বর ছিল অস্পষ্ট, চন্দ্রা, আমি কী করেচি?"
"কী আবার?" চন্দ্রা দাঁড়িয়েছিল। "যাকে ডাকলে সাড়া না দিয়ে চলে যায়, তাকে ডেকে কী হবে?"
অই অই! কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল। মণি গুপ্তদার সঙ্গে কথা বলে, ও ঘরে চলে গিয়েছিল। চন্দ্রা তখন ওকে ডেকেছিল।
রামকিঙ্কর যতো ব্যগ্র, ততো আর্ত হয়ে উঠেছিল, "চন্দ্রা, তখন তোমার সামনে দাঁড়াবার উপায় ছিল না।"
চন্দ্রা মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল। কালো ডাগর চোখে ছিল জিজ্ঞাসা আর কৌতূহল। মুখের ভার যেন অনেকখানি হালকা হয়েছিল, "উপায় ছিল না? কী হয়েছিল? মণি গুপ্তদা বকেছিলেন?"
রামকিঙ্কর ঘাড় নেড়েছিল। মুখ নিচু করেছিল। চন্দ্রা আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি। উত্তরে পা বাড়িয়েছিল, "তুমি গৈরিক-এ যাও। আমি আসছি।"
রামকিঙ্কর পৌঁছুবার পর চন্দ্রা গৈরিক-এর ঘরে এসেছিল।
রামকিঙ্কর তখনও সেই বৃন্দাবনের নাটের চতুর অভিজ্ঞ নায়ক হয়নি। অনায়াসেই ঘটনাটা বলেছিল। বলতে বলতে গলা বন্ধ হয়ে এসেছিল। আবার একবার চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। আর চন্দ্রা খিলখিল করে হেসেছিল। ওর কালো চোখের তারায় দ্যুতি ফুটেছিল। তাকিয়েছিল রামকিঙ্করের চোখের দিকে। আর আচমকা হাত বাড়িয়ে রামকিঙ্করের মুখের ওপর হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল, "নুটুদির বাড়ি এসো। দেরি করো না। দেখা হয়েছিল, বলো না যেন।"

নধর চওড়া আর লম্বা সবুজ কলাপাতায় ঝড়ে ছুটেছিল, পাড় দেখিয়েছিল লাল মোচার মতো। রামকিঙ্করের চোখ ঝাপসা হয়নি। তাকিয়েছিল বাইরের দিকে। ভিতরে গান বাজছিল, "সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।/ সেই স্মৃতিটুকু কভু খনে খনে যেন জাগে মনে, ভুলো না..."

রামকিঙ্করের মনে খবরটা তেমন কিছুই আলোড়ন তুলতে পারেনি। বাঁকুড়ায় লর্ড কারমাইকেল যখন দত্তদের বাড়ি ঢুকেছিলেন, ও দেখেছিল এক খড়ের চালের ওপরে উঠে। ওর দিকে বন্দুক তুলে তাগ্ করেছিল গুরখা পুলিশ। গুলি করতো কি না কে জানে। ও পালিয়ে বেঁচেছিল।
সামনে পৌষমেলা। প্রভাতের দেওয়া কাজের সঙ্গে সঙ্গে পৌষমেলার ছবি আঁকাও চলছিল। খবর ছিল আগেই, ডিসেম্বর মাসের সতরো তারিখে আশ্রমে আসছেন বড় লাট আরউইন। রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনে আগেও লাট দেখেছে। এবারে ব্যাপার একটু অন্যরকম। শোনা গেল নন্দলালের ব্যাজার মুখে, "তোমাদের নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। ঘর থেকে না বেরোলেই হলো। যাতনা হয়েচে গুরুদেবের। এর আগে যেসব লাট বাহাদুরেরা এসেছেন। তাঁদের দায় দায়িত্ব গুরুদেব নিজেই নিতেন। দেখাশোনা করতেন শিক্ষকরা। কিন্তু এদানি দেশের অবস্থাগতিক নাকি সুবিধের নয়। গুরুদেব পুলিশকে দায়িত্ব নিতে বলেছেন। ফলে, বাঘে ছুঁয়েচে। পুলিশ বলেছে, শান্তিনিকেতনের লোকদের চিনবো কেমন করে? চেনবার মতো পোশাক তা হলে তাঁদের পরতে হবে। এখন

(গু)রুদেবের সঙ্গে আলোচনা করে, সাত তাড়াতাড়ি ঠিক হয়েছে, গরুয়া বসন আর লাল ফেট্টি। শাস্ত্রীমশাই, ক্ষিতিমোহনবাবু, (জ)গদানন্দবাবু থেকে নন্দলাল—সবাইকেই ঐ পোশাক পরতে (হ)বে।"...

(প্র)ভাতমোহনের কাছে অন্য খবর। লর্ড আরউনের আসা উপলক্ষে (র)ঙিন পোস্টার আঁকবার জন্য শিল্পী আসবেন কলকাতা থেকে। (প)োস্টার আঁকা হবে শ্রীনিকেতনের পল্লীসেবা আর কুটির শিল্প (কা)জের প্রচেষ্টার পরিচয় দেবার জন্য। কিন্তু মাস্টারমশাই নন্দলাল (আ)র তাঁর শিষ্য কলাভবনের ছাত্ররা থাকতে, রঙিন পোস্টার আঁকার (জ)ন্য কলকাতার শিল্পীরা কেন আসবেন? প্রভাতমোহন কথাটা (জি)জ্ঞেস করলো আগে তার সতীর্থদের। তার জিজ্ঞাসার জবাব (স)তীর্থদের কাছে পাওয়া সম্ভব ছিল না। সে ছুটলো গুরুপল্লীতে (ন)ন্দলালের কাছে। মাস্টারমশাই সব শুনে ঘাড় ঝাঁকালেন, "তাই (তো) হে। ও ব্যাপারে দায়িত্ব নিয়েছেন রথীনবাবু। তোমার কথায় (আ)মার সায় আছে। সময় বড়ো হাতে নেই। হাতে পাঁজি (ম)ঙ্গলবার। তুমি গিয়ে রথীনবাবুকে সামলাও আমার কথা জিজ্ঞেস (ক)রলে বলো, তোমাদের সঙ্গে আছি।"

প্রভাতমোহন ছুটলো রথীন্দ্র ঠাকুরের কাছে। সহজ কথা সে সোজা (ক)রেই বলতে ভালবাসে, "মাস্টারমশাই আর আমরা থাকতে, রঙিন (প)োস্টার আঁকার জন্য আর্টিস্ট আনাচ্ছেন কলকাতা থেকে?" নন্দলালবাবু কি তোমাদের সঙ্গে থাকবেন?" রথীনবাবুর গোঁফ দাড়ি (ক)ামানো ঝকঝকে ফরসা মুখে অবাক জিজ্ঞাসা, "তা ছাড়া সময় যে (ব)ড় কম। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সব করতে হবে। পারবে (তো)?"

প্রভাতমোহনের মনের জোর ছিল, "নিশ্চয় পারবো। আপনি (আ)মাদের কাজ দিয়ে দেখুন।"

"আচ্ছা, তুমি এখুনি একবার নন্দলালবাবুকে আমার কাছে পাঠিয়ে (দা)ও।" রথীন্দ্রনাথের ভুরু কোঁচকানো চোখে যেন তেমন ভরসা নেই, "কাজের ব্যাপারটা ওঁকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। তারপরে তোমরা লেগে পড়ো।"

শুরু হয়ে গেল ব্যস্ততা। সময় ছিল এতো কম, অথচ দায়িত্বটা ছিল এতো বেশি, প্রভাতমোহনের ডাকে, রামকিঙ্কর আর সুধীর ছাড়া বিশেষ কেউ সাড়া দিল না। দিতে ভরসা পেলো না। নন্দলাল বসে গেলেন পশ্চিমের নতুন কলাভবনের পশ্চিমের ঘরে। তখনও সে-বাড়ির কাজ শেষ হয়নি। দ্বারোদ্ঘাটনও হয়নি। প্রত্যেক পোস্টারের মধ্যে থাকতে হবে কিছু লেখা। আর ছ'টি করে ছকের মধ্যে রঙিন ছবি।

মাস্টারমশাই পেনসিলে কয়েকটা ছবি খসড়া করে দিলেন। প্রত্যেক পোস্টারে লিখতে হবে একই কথা। মাস্টারমশাই সেই দেওয়ালচিত্রের চর্চার মতো, কাগজে কথাগুলো লিখে, ছুঁচ দিয়ে অক্ষরের ওপর ছিদ্র করে দিলেন। ন্যাকড়ার পুঁটলিতে রঙ ভরে পোস্টারের কাগজে থুপতে বললেন। থুপতে থুপতে পোস্টারে পোস্টারে লেখা ফুটে উঠলো। তারপরে তুলি দিয়ে লেখন। ছকের মতো ছবির রেখা মাস্টারমশাই আঁকলেন পেনসিলের টানে। প্রভাতমোহন আর সুধীর ছবির মূর্তির মাথা হাত পা, জামাকাপড়ে তুলি দিয়ে রঙ ভরলো। রামকিঙ্কর রঙ দিয়ে চোখ মুখ এঁকে, তুলির শেষ টানে ছবিকে দিল তার পূর্ণতা। ভোর থকে সারা দিন, রাত্রেও যতোটা পারা যায়, কাজ করে যখন শেষ হলো, মাস্টারমশাই প্রথম পোস্টারগুলো দেখলেন। তাঁর চোখে আর মাথা ঝাঁকুনিতে অনুমোদন মিললো, "আর দেরি না করে, রথীবাবুকে দেখাও।"

রথীন্দ্রনাথ দেখলেন। মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি ফুটলো, "বেশ ভালো হয়েছে। কলকাতার আর্টিস্টদের প্রাপ্য তোমাদেরই পাওনা।" পাওয়ানাটা এলো নন্দলালের হাত দিয়ে। কয়েক দিনের যত্নের মতো পরিশ্রমের পারিশ্রমিক আট শো টাকা! মাস্টারমশাইয়ের চশমার কাঁচে কী হাসির কিরণ। হাত বাড়িয়ে টাকা বাড়িয়ে দিলেন প্রভাতমোহনের দিকে, তোমাদের পারিশ্রমিক। ভাগ করে নাও নিজেরা।

"আর আপনার ভাগ?" প্রভাতমোহন বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হাসলো, "আপনি তো আসল। আপনার ভাগ আপনি নিন। তারপরে আমাদেরটা দিন।"

নন্দলালের কৃষ্ণ মুখে প্রসন্ন হাসির ঝলক। মাথা নাড়লেন, "প্রভাত, আমি টাকা নেবো না। তুমি কারুসংঘ কর। তখন আমি শ্রম দান করে সংঘের অর্থভাণ্ডার ভরাবো। এ টাকা আমার ছাত্রদের প্রাপ্য।" টাকা গুঁজে দিলেন প্রভাতমোহনের হাতে, "তোমরা ভাগ করে নাও।"

শান্তিনিকেতনে শেষ ভাইসরয় এলেন। গেলেন। প্রভাতমোহন সুধীর রামকিঙ্করের কাছে সেটা কোনো ঘটনা না। জীবনে এতো টাকা উপার্জন সেই প্রথম। আর তিনজনের চোখের সামনেই ভেসে উঠলো শ্রমদাতা শিষ্যপ্রাণ মাস্টারমশাইয়ের মূর্তি।

(ক্রমশ)

প্রেমা

সহাবস্থান

সমীরণ দাস

টুলে বসে ক্লিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের পিওন হিসেব কষছে। কাল বিকেলে ডাইরেক্ট চেক-রিটার্ন নিয়ে গিয়েছিল, সেজন্য ট্যাক্সি ভাড়া পাবে। মিটার রিডিং-এর ওপর চল্লিশ পারসেন্ট। সেই হিসেবেই বিল জমা দিতে হবে। এদিক-ওদিক না হয়, চেকিং-এ ধরা পড়ে গেলে মুশকিল।

কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে একটা রগচটা লোক চিৎকার করছে, 'ফেব্রুয়ারি হয়ে গেল, এখনো ডিসেম্বরের ইন্টারেস্ট দেওয়া হল না। কি ব্যাপার, কবে হবে?'

একুশ নম্বর কাউন্টার ব্রাঞ্চের সবথেকে চালু কাউন্টার। কিন্তু কোন পারমানেন্ট স্টাফ নেই। যারা রিলিভিং হ্যান্ড তারাই পালাক্রমে কাউন্টারের লেজারদুটো চালায়। এখনো আঠারো শ অ্যাকাউন্ট পুরো হয়নি বলে পারমানেন্ট লোক দেয়নি। রিলিভাররাই চালিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তারা তো শুধু দিনের কাজটা করেই খালাস। বাদবাকি!

পারমানেন্ট লোক নেই বলে গত ছ'মাসের প্রোডাক্ট ফেলা হয়নি। ইন্টারেস্টও দেওয়া হয়নি। অমিতাভ দাস রিলিভিং স্টাফ, আজকের জন্য ওকে একুশ নম্বরে দেওয়া হয়েছে। সে নরম-নিচু স্বরে লোকটাকে বলল, 'আমি কি করব বলুন। এখানে ম্যানেজমেন্ট কোন পারমানেন্ট লোক দেয়নি। ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশানও হয়নি। কিন্তু আপনি কেন লুজার হবেন! আপনি বরং এক কাজ করুন, সোজা চেম্বারে চলে যান। গিয়ে ম্যানেজারকে বলুন, কেন ইন্টারেস্ট দেওয়া হয়নি?'

ম্যানেজারের নামে লোকটা একটু চুপসে গেল। চেম্বারে কি ভয় কে জানে। অমিতাভ লক্ষ্য করল, ঢুকবে কি ঢুকবে না করতে করতে লোকটা শেষ পর্যন্ত ঢুকেই পড়ল।

একটু পর ম্যানেজার বেরিয়ে এসে বললেন, 'অমিতাভ বাবু, প্রোডাক্টা একটু ধরুন। পার্টিরা গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে?'

লোকটা আবার ঘুরে কাউন্টারের ওপাশে চলে এসেছে। থুতনি ঝুলিয়ে দিয়ে বড় বড় চোখে অমিতাভর দিকে তাকাচ্ছে। এই ম্যানেজার বেশিদিন আসেননি ব্রাঞ্চে। আগে ছিলেন দিল্লিতে, ট্রান্সফার নিয়ে কলকাতা এসেছেন ধরাধরি করে। হেড অফিসে জোরাল লবি। এঁর সঙ্গে ঝামেলা পাকালে চাকরির ক্ষতি হতে পারে, তবুও অমিতাভ বলল, 'এখানে প্রোডাক্ট করা তো আমার কাজ নয়।'

'তাহলে কে করবে?'

'কেন, যে পারমানেন্ট স্টাফ, সে-ই!'

ম্যানেজার রেগে গিয়েও হাসি হাসি মুখে বললেন, 'কিন্তু এখানে তো কোন পারমানেন্ট স্টাফই নেই!'

অমিতাভ নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। ওর মধ্যে যেন কি হয়ে যায়। যে কথা বলার—বলা উচিত, পরিনামে কি হবে, সেটা না ভেবেই নির্দ্বিধায় বলে ফেলে। সে ম্যানেজারকে জবাব ফিরিয়ে দিল, 'সেটা কি আমার দোষ? ব্রাঞ্চের সবথেকে হেভী কাউন্টারে আপনারা পারমানেন্ট লোক দেননি কেন?'

ম্যানেজার গম্ভীর হলেন। চোখ দুটো সরু, সাপের মতো কুঁৎকুতে হয়ে গেল। নিষ্প্রাণ, নির্মম, নিষ্ঠুর—একটু আগেও যেখানে ভাসছিল সজীবতা, কৌতুক। অমিতাভ পরিষ্কার দেখতে পেল, মানুষের দৃষ্টি কি দ্রুত পালটে যায়! ম্যানেজার বললেন 'পারমানেন্ট স্টাফ কেন দি-ই-নি, সে কৈফিয়ত আপনাকে দেব না! আপনাকে করতে বলছি, আপনি করবেন।' ম্যানেজার চেম্বারে ঢুকে গেলেন।

অমিতাভ চলে এলো শুভজিতের টেবিলে। শুভজিৎ কর্মী ইউনিয়নের সেক্রেটারি। দীর্ঘদিন যাবৎ ট্রেড ইউনিয়ন করার ফলে চেহারা পোড় খাওয়া একটু কাঠিন্য আছে, সহজে বিচলিত হয় না। শুভজিৎ অমিতাভর কথা শুনে বলল, 'এভাবে মুখে মুখে তর্কটা না করলেই পারতে।'

একটা সাচ্চা ট্রেড ইউনিয়নের যেভাবে কাজ করার কথা, কর্মী ইউনিয়ন সেভাবে কাজ করছে না। অমিতাভর ক্ষোভ আছে সেজন্য। অনেক কথা বলারও আছে। শুভজিতের জবাবে উষ্মা প্রকাশ করল সে, 'কিন্তু আমি কি কিছু অন্যায় বলেছি?'

'সেটা বলোনি, তবে দিন কাল খারাপ, বোঝোই তো!'

'তোমরা আছ কি করতে?' শুভজিতের টেবিলে প্রায় সব সময়ই একাধিক স্টাফ ওকে ঘিরে থাকে। আড্ডা মারে, তারা অমিতাভর দিকে তাকাল। অমিতাভ থামল না, 'উচিত কথা বলব, উচিত কাজ করব, তবুও ম্যানেজমেন্টের কাছে মাথা নিচু করে থাকতে হবে!'

শুভজিৎ চোখ সরু করে তাকাল। অমিতাভ বিস্মিত হয়ে দেখল, একটু আগে ম্যানেজারের চোখে সে যে নির্মম, শীতল, ক্রূর দৃষ্টি দেখেছিল, শুভজিতের চোখেও অবিকল সেই দৃষ্টি। সে আর বাক্যব্যয় না করে নিজের কাউন্টারে চলে এল। অ্যালোকেশানের বাইরের কোন কাজ সে করবে না, তাতে যা হয় হবে!

অমিতাভ মুখ তুলে দেখল, পাশের কাউন্টার থেকে ক্যাশচেক রিলিজ করার পর জীবন বাবু চিৎকার করে ডাকছেন, 'মনোরঞ্জন—এই মনোরঞ্জন!' মনোরঞ্জন নেই। টেবিলের ওপর চেকটা ফেলে না রেখে নিজেই হাতে নিয়ে ক্যাশের দিকে এগোলেন, 'ডিপার্টমেন্টের ছেলেগুলো যা হয়েছে না!'

অমিতাভ বলল, 'জীবনদা, আপনি কেন? রেখে দিন, মনোরঞ্জনই নিয়ে যাবে।'

জীবনবাবু নাটকে অভিনয় করেন। এতক্ষণ টেবিলের ওপর খাতা খুলে নাটকের রোল মুখস্ত করছিলেন। 'ক্যাশচেক' বলে চিৎকার করে বার কয়েক ডাকার পর ত্বরিতে চেয়ার ছেড়ে উঠেই চেকটা রিলিজ করেছেন। অমিতাভর কথার জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ, রেখে দি—আর লোকজন এসে আমাকে গালাগাল দিয়ে যাক।'

অমিতাভ ভাবল, মনোরঞ্জনটা নিশ্চয়ই পার্টি ফিট করছে। ট্রেনের রিজার্ভেশানের দু'নম্বরী ব্যবসা ওর। পার টিকিট দশ টাকা এক্সট্রা, বুকিং কাউন্টারের লোকজনের সঙ্গে লাইন আছে। ব্রাঞ্চের অনেকেই সময়ে-অসময়ে ওর কাছ থেকে টিকিট নিয়েছে। কিন্তু অমিতাভ নেয়নি। নেবেও না। ব্যাপারটা খুব অপছন্দ ওর।

ম্যানেজার সুব্রত মিত্র টয়লেটে যেতে যেতে

শুনলেন, জীবনবাবু মনোরঞ্জনকে ডাকছেন। ফেরার সময়ও দেখলেন, মনোরঞ্জনকে পাওয়া যায়নি। জীবনবাবু নিজেই রিলিজ করা চেকটা ক্যাশ কাউন্টারে দিয়ে এসেছেন।

সুব্রত মিত্র কোন কথা না বলে কাঁচের দরজা ঠেলে চেম্বারে এসে বেল বাজালেন। রঘুনাথ এসে দাঁড়াল। সেলাম ঠুকল। সুব্রত বললেন 'মনোরঞ্জনকো বোলাও।'

এই ম্যানেজার জয়েন করার কিছুদিন পর থেকেই সমস্ত কর্মচারী সন্ত্রস্ত। ইনডিসিপ্লিন সহ্য করেন না। মনোরঞ্জনও কর্মী ইউনিয়নের সদস্য। শুভজিতের কানের কাছে মুখ নিয়ে রঘুনাথ ফিস ফিস করে বলল, 'বড় সাহেব মনোরঞ্জনকে ডাকছে। ও-তো এখন অফিসে নেই। কি বলব?'
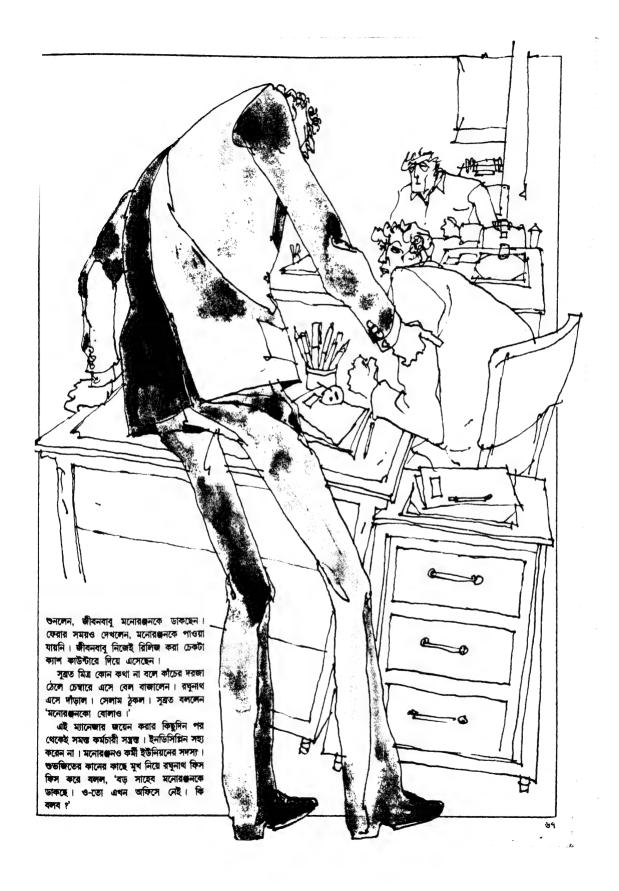
রঘুনাথ খুব খুশী । মনোরঞ্জন সব সময় ওর পেছনে লাগে। এই একটা সুযোগ, ম্যানেজার যদি মনোরঞ্জনকে টাইট দেয়, ও আরও খুশী হবে!

শুভজিৎ 'ক্লিন ক্যাশ' লিখছিল। রঘুনাথের দিকে তাকাল। ভাবল, ক্রিকেট ম্যাচ চলছে—ক্যান্টিনে টি ভি-র সামনে মনোরঞ্জন নেই তো! কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে হ'ল, সুব্রতবাবু আসার পর অফিস টাইমে টি, ভি, চালানো বন্ধ করে দিয়েছেন। তাহলে কোথায় গেল ছেলেটা '

দুটো বাজার আধঘন্টা পর মনোরঞ্জন ফিরল। অমিতাভ তাকিয়ে দেখল, ম্যানেজারের চেম্বারে ঢুকে বকুনি খেয়ে মুখ কাচুমাচু করে বেরিয়ে এল মনোরঞ্জন।

অমিতাভ দাসের চাকরি দশ বছর হতে চলল। পুরনো স্টাফ বলে রিলিভিং পুলে আছে। ওর সঙ্গে আরও তিনজন। কোন স্টাফ অ্যাবসেন্ট হলে ওরা তাদের জায়গায় বসে দিনের কাজটা তুলে দেয়।

সহজ-সরল মানুষ অমিতাভ। তবুও এই দশ বছরের অভিজ্ঞতায় ব্রাঞ্চের অনেক বৃত্তান্তই জেনে গেছে। নতুন ম্যানেজার কর্মচারীদের প্রাত্যহিক কাজের ধারাবাহিকতা অন্য দিকে চালিয়ে দিতে চান। খুব কর্মতৎপরতা দেখাতে চান হেড অফিসে তাঁর বসদের কাছে। সমস্ত কর্মচারীদের শাসনের মধ্যে রাখতে চান। কিন্তু অমিতাভর অভিজ্ঞতাপ্রসূত অনুভব যেন ওকে বলছে, এর পিছনে ম্যানেজারের অন্য উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু কি সেই উদ্দেশ্য অমিতাভ বুঝতে পারছে না।

অমিতাভ চারদিকে তাকাল। গোটা কুড়ি টেবিল। দুপাশে দু'জন স্টাফ। মাথার ওপর পাখা চলছে শ্লথ ভাবে। পুরনো ব্রাঞ্চ, দেওয়ালে দীর্ঘদিন রঙ লাগানো হয় না। সেই বিবর্ণ দেওয়ালের ওপর তিনটে ইউনিয়নের পোস্টার সাঁটা ছিল ইতস্তত। কিন্তু এই ম্যানেজার এসে সেই সব পোস্টার সরিয়ে দিয়েছেন। তিনটে ইউনিয়ন যৌথ ভাবে প্রতিবাদ করলে কাজটা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু সেরকম কোন অ্যাকশান কোন পক্ষই নেয়নি।

ব্রাঞ্চের পরিবেশ অমিতাভর ভাল লাগে না। একটা সিগারেট ধরাল সে। চারদিকে তাকাল । চারটে আলাদা আলাদা দ্বীপের মতো চারটে মানুষের মুখ ওর চোখের সামনে স্থির হ'ল।

একটু দূরে সুমিতার সঙ্গে অমিতের কথাবার্তা চলছে। অমিত মল্লিক কর্মী সমিতির ট্রেজারার। ব্যাঙ্কে চাকরির পাশাপাশি ছদ্মনামে ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিকতা করে। সে ম্যানেজারের ওপর খুব ক্ষেপে আছে। অফিসে কাজ না থাকলেও পাঁচটা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে! লেখাপত্রের কাজ করবে কখন! এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে হবে, লোকজনের সঙ্গে মিশতে হবে, খবর যোগাড় করতে হবে। প্রায় সবই বন্ধ।

একটা লোক থুতনি ঝুলিয়ে দিয়েছে কাউন্টারের ওপর, তার অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে কি যেন জানতে চায়। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল নেই সুমিতার। সে অমিতের কাঁধের ওপর মুখ নিয়ে ফিসফিস্ করে বলল, 'শনিবার সিনেমায় যাব কিন্তু। অনিল কাপুরের বই এসেছে, ভালো বই।'

অমিত ম্যানেজারের কথা ভাবছিল। বিড় বিড় করে বলল, 'দেব শালা একদিন ফাঁসিয়ে, সেদিন বুঝবে।' সুমিতা আঁতকে উঠে বলল, 'অ্যাঁ?'

অমিত বলল, 'না! তোমাকে না। শুয়োরের বাচ্চা ম্যানেজারকে, শালা দু'দিনের যোগী—সাপের পাঁচ পা দেখেছে। সুযোগ পেলে একেবারে টিপে মেরে ফেলব।' অমিত একটা লাল রঙের শার্ট পরেছে। জিন্‌সের প্যান্ট। মুখে দাড়ি। ওকে বেপরোয়া, রাগী যুবকের মতো মনে হচ্ছিল। সে সুমিতাকে বলে যেতে থাকল, কোন কোন হোমরা-চোমরার সঙ্গে ওর দহরম মহরম। লেখালিখির খাতিরে কার সঙ্গে ভাব-ভালবাসা। গ্র্যান্ড হোটেলে ক'বার লাঞ্চ বা ডিনার খেয়েছে নিমন্ত্রিত হয়ে। সুমিতা মুখ-হা করে এই সব জীর্ণ কথামালা শুনে যাচ্ছিল। এবং স্পষ্ট বোঝা যায়, এই সব কথার আবর্তেই সে দিনে দিনে আকৃষ্ট হয়েছে অমিতের দিকে। সে আবার বলল, 'মনে থাকে যেন অ্যাঁ? আজকেই রক্সি থেকে টিকিট কেটে আনবে কিন্তু।'

অমিতাভ দশটায় আসে। পাঁচটায় যায়। কাজে ফাঁকি দেয় না। যে সমস্ত কাজ ওর করার কথা নয়—সেই সব কাজ করে ম্যানেজারকে তুষ্ট করার বাড়াবাড়ি ইচ্ছাও ওর নেই। বরং ম্যানেজারের কাজ-কামে যাদের অসুবিধা হচ্ছে বেশি, তাদের থেকে ও-ই স্পষ্ট ভাবে বিভিন্ন সময়ে ম্যানেজারের যুক্তিহীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। এবং বুঝতেও পেরেছে, এজন্য দিনে দিনে ওর সম্পর্কে ম্যানেজারের তৈরি হয়েছে বিরূপ ধারণা।

অমিতাভর আলাদা কোন ধান্দা নেই। কিন্তু বুঝতে পারে, ব্যাঙ্কটাকে ব্যবহার করে কে কেমন নিজের ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নিচ্ছে অনৈতিক ভাবে। এবং অনিবার্যভাবে তারই ফলশ্রুতি এসে পড়ছে অন্যান্য সৎ কর্মীদের ওপর—।

অরুণ সিংহ কর্মী অ্যাসোসিয়েশনের হোমরা-চোমরা । বীমা কোম্পানীর দালালির এজেন্সী নিয়েছে বউ-এর নামে। ব্যাঙ্কের কাজটা ওর পার্ট-টাইমের মতো। কোন রকমে দিনের কাজটা শেষ করে বা অন্য কারুর ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দুটো-আড়াইটা নাগাদ প্রতিদিনই বেরিয়ে যায়। পরদিন এসে উপারচারে সই করে।

কালও সেরকম করেছিল অরুণ। আজ এসে দেখেছে, হাজিরা খাতায় ওর নামের সোজা লাল কালিতে লেখা, 'লেফ্‌ট্ অফিস্ উইদাউট পারমিশান।' ক্ষেপে গেল অরুণ।

অরুণের বাবার বড় ব্যবসা। ও নিজেও দালালী করে মোটা টাকা আয় করে। চাকরি করার দরকার হয় না। তবুও ব্যাঙ্কের চাকরি, ছেড়ে দেবে! ম্যানেজারের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার! এই সব লিখেছেন আমার নামের পাশে।' তার কথায় বিস্ময়। ম্যানেজার যেন অভাবিত, অত্যাশ্চর্য একটা কাজ করে ফেলেছেন।

কিন্তু ম্যানেজার এই ভাব-গম্ভীর চাতুরিকে প্রশ্রয় দিলেন না। জুলফির দাড়িতে পাক ধরেছে ম্যানেজারের। চোয়ালে দৃঢ়তা। তিন গম্ভীর ভাবে বললেন 'দেখতেই পাচ্ছেন। এখন সই করে সিটে যান, যদি কিছু বলার থাকে টিফিন টাইমে চেম্বারে এসে বলবেন।'

অরুণের মুখের ছদ্ম আবরণ খুলে গেল। সে চিৎকার করে বলল, চেম্বারে কেন? আমি কি চুরি করেছি যে গোপনে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলতে হবে! এখানেই আমার কথার জবাব দিন।'

অফিসের হাওয়া পাক খেতে খেতে ওপরে উঠছিল। চারপাশে ভিড়। সুব্রতর মুখ লাল হয়ে গেল। তিনি চারদিক তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা ভিড় করবেন না। যে যার সিটে চলে যান।' তারপর অরুণের দিকে তাকালেন।

অমিতাভ দূর থেকে দেখল, সেদিন ম্যানেজারের দৃষ্টিতে যে শীতল ক্রূরতা দেখেছিল—আজ সেখানে কিসের যেন অভাব। আত্মবিশ্বাসের কি? একটু কি বিচলিত লাগছে ম্যানেজারকে? সেদিন কি অমিতাভকে দুর্বল প্রতিপক্ষ মনে করেই ম্যানেজার অত কঠোর ভাবে আদেশ করতে পেরেছিলেন!

ম্যানেজার বললেন, 'দেখুন, ব্যাঙ্ক আমাকে কিছু কাজের দায়িত্ব দিয়েছে। আমাকে সেটা পালন করতেই হবে। আপনাদের হয়ত অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু আমার কিছু করার নেই।'

অরুণ বুঝল, এই মুহূর্তে জোর করে কোন লাভ হবে না । সে বিড় বিড় করতে করতে সিটে এসে বসল, 'দেখে নেব শালা তোমাকে!'

একটু দূরে শুভজিৎ ম্যানেজার ও অরুণের ঝগড়া শুনছিল। ভাবছিল, ছেলেগুলো কেন যে বোকার মতো সম্পর্ক খারাপ করে। এখন দিন কাল খারাপ। একটু সমঝে চলা দরকার।

শুভজিতের দাদা ইন্টিরিয়র ডেকরেটার। ব্রাঞ্চের সমস্ত কাজ তিনিই করেন। শুভজিৎ ব্রাঞ্চের সবথেকে বড় সংগঠনের সেক্রেটারি, অধিকাংশ স্টাফ ওর কথায় ওঠে-বসে। সেজন্য আগের ম্যানেজার কিছুটা চড়া রেটে হলেও ওর দাদার সঙ্গেই চুক্তি করেছিলেন শুভজিৎকে হাতে রাখার জন্য।

সুব্রত মিত্র সমস্ত পুরনো কোটেশান এবং ভাউচার কনসাল্ট করে দেখলেন, গত দু'বছরে শুভজিতের দাদার মারফত যে সমস্ত কাজ করানো হয়েছে, সবই মারকেট থেকে বেশ চড়ায়। তিনি শুভজিৎকে ডেকে বললেন, 'আপনার দাদাকে একটু দেখা করতে বলবেন।'

শুভজিৎ চোখ সরু করে তাকাল,, 'বলব। কিন্তু কি জন্য আমাকে যদি একটু হিন্‌ট্‌স্ দেন।'

'দেখুন!' থামলেন সুব্রত মিত্র। কয়েক মুহূর্তের জন্য অপ্রতিভতা তার মুখের ওপর সূক্ষ্ম আঁকিবুকি রেখা এঁকে গেল। কি ভাবে বলবেন! বলা ঠিক হবে কিনা! ভাবতে ভাবতেই বলে ফেললেন, 'উনি আপনার দাদা বলেই বলছি, এতাবৎ যে সমস্ত কাজ উনি করেছেন—সেই সব সম্পর্কেই ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

চতুর শুভজিৎ কিছুদিন যাবৎ ম্যানেজারের হালচাল দেখছে। মুহূর্তে বুঝে গেল, উনি কি বলতে চান। কি করতে চান। কপালে ভাঁজ পড়ল ওর। মনে মনে ভাবল, 'তোমার খুব তেল

বেড়েছে শালা। দাঁড়াও ব্রাঞ্চের স্টাফদের চটিয়ে তুমি কিভাবে কি কর, সেটা দেখছি।' বলল, 'ঠিক আছে, দাদাকে বলে দেব দেখা করতে।'

টিফিনের সময় ক্যাশের পাশ দিয়ে ম্যানেজার যাচ্ছিলেন, তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে কে যেন বলল, 'এখন কোন স্টাফই পেছন থেকে পেমেন্ট পাবে না। জমাও দিতে পারবে না। বাইরে আসতে হবে পার্টিদের মতো। ব্যাঙ্কে এখন নিয়মকানুন খুব কড়া।'

সুব্রত মিত্র দ্রুত পেরিয়ে এলেন। কোন কথা বললেন না। বুঝলেন, তাঁকে উদ্দেশ্য করেই কথাগুলো বলা হয়েছে। তা হোক, কোন অবস্থাতেই শৈথিল্য দেখাবেন না উনি।

অফিসের পরিবেশ দিন দিন অসহ্য লাগছিল অমিতাভর। আগে ব্রাঞ্চের মধ্যে যে সুস্থ পরিবেশ ছিল, এখন আর সেটা নেই। কেমন যেন লাগল অমিতাভর—বিস্ময়কর। অদ্ভুত। আমরা যেখানে জীবনের সবথেকে মূল্যবান সময়টাই কাটিয়ে যাই, সেখানে কেন একটু সুস্থ ভাবে নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা পাব না।

ব্রাঞ্চে যে তিনটে ইউনিয়ন, তাদের বক্তব্য, বক্তৃতা শুনেছে বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলনের সময়। তাদের কাজও দেখেছে। ব্যাঙ্ক ও ইউনিয়ন যেন ওদের পায়ের নিচের সিঁড়ি, যা বেয়ে বেয়ে কেবল ওপরে উঠতেই চাইছে সব। ভাল লাগে না। ভাল লাগছিল না ওর। সেদিন শুভজিৎকে বলল, 'আমরা যদি ঠিক থাকি তাহলে ভয়ের কি? ম্যানেজার আমাদের কি করতে পারে?'

শুভজিৎ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। অমিতাভ আবার বলল, 'নতুন ম্যানেজার যদি ডিসিপ্লিন আনতে চান, তাহলে আমাদের আপত্তির কি আছে।'

শুভজিৎ উত্তর দিল, ডিসিপ্লিন আনা আর যা খুশী তাই করা তো এক জিনিস নয়। স্টাফদের ডিসিপ্লিনড্ হতে বলবেন, অথচ নিজে ডিসিপ্লিনড্ হবেন না—সেটা তো কোন কাজের কথা নয়।'

অমিতাভ বলল, 'দেখ শুভদা, একটা ব্যাপার আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি। এখানে দেখছি তো, একজন ইনসিওরেন্সের দালালী করে, একজন টিকিট ব্ল্যাক করে, একজন রিপোর্টারি করে, অন্যান্যরাও নিজেদের ধান্দাতেই ব্যস্ত। তাদের অসুবিধা হচ্ছে বলেই তো এত চিৎকার। ব্যাঙ্ক কি ধান্দাবাজীর জায়গা। ওদিকে মানেজারও চাইছে, দমন নীতি চালিয়ে কিভাবে আরও ওপরে ওঠা যায়। আখের গোছান যায়!'

শুভজিৎ সামান্য রেগে গেল। আমরা সব ধান্দাবাজ—ছেলেটা বলে কি! কিন্তু উত্তেজিত হল না। এত বছর ট্রেড ইউনিয়ন করে ব্যাপারটা বেশ আয়ত্তে এনেছে ও, কি করে রেগে গেলে হাসতে হয়।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় অমিতাভর পাড়ার এক বন্ধু বলল, 'বিষ্ণুপুর যাবি?, আমার এক বন্ধু আছে, ওখানে বি ডি ও অফিসে চাকরি করে। লিখেছে যাওয়ার জন্য।'

অমিতাভ পালানোর কথাই ভাবছিল ক'দিন ধরে। রাজি হয়ে গেল। রাত্রি বেলায় ট্রেন। দুই বন্ধু ট্রেনে উঠে পড়ল। অফিসকে জানাল না। দিন সাতেকের ব্যাপার—পরে এসে চিঠি দিলেই হবে।

॥ দুই ॥

পাসিং রেজিস্টারে সি সি-ও ডি'র এনট্রি করা চেকগুলো নিয়ে মনোরঞ্জন ম্যানেজারের ঘরে ঢুকল। সুব্রতবাবু বিরূপাক্ষ মিত্রর দিকে তাকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'আস্তে'

মনোরঞ্জন রেজিস্টারটা টেবিলের ওপর নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অ্যাডভানস্ ডিপার্টমেন্টের অফিসার সাইন করে দিয়েছেন, এখন ফাইনাল পাসিং-এর জন্য ম্যানেজারের কাছে এসেছে। বি মিত্র অ্যান্ড কোম্পানীর সাত হাজার টাকার একটা চেক এসেছে। সেটা অফিসার পাস করেনি। চেকটা হাতে নিয়ে সুব্রত মিত্র বিরূপাক্ষর দিকে তাকালেন, 'আপনার সাত হাজারের চেক ফেরত চলে গেল।'

বিরূপাক্ষ একবার মনোরঞ্জনের দিকে তাকাল। সুবল রায়ের পেমেন্ট, খুব ভালো পার্টি। এই চেক বাউন্স করলে ভবিষ্যতে আর ক্রেডিটে মাল পাওয়া যাবে না। বিরূপাক্ষ মনোরঞ্জনের সামনে বলব না—বলব না করেও বলল, 'এটা অন্তত ছেড়ে দিন। সেকেন্ড ক্লিয়ারিং-এ যেগুলো আসবে, সেগুলো পাস না করলেও চলবে।'.

সুব্রত মিত্র বিরূপাক্ষর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সবকটা চেকেই সই করলেন। মনোরঞ্জন চেকগুলো নিয়ে লেজার কিপারের কাছে চলে গেল। বিরূপাক্ষ অ্যাটাচি খুলে 'ইণ্ডিয়া কিংস' বের করল। এগিয়ে দিল। সুব্রত মিত্র বললেন, 'আপনার কোম্পানীর প্রপোজালটা ছিল পাঁচ লাখ টাকার। কিন্তু ব্যাঙ্ক স্যাংশান করেছিল মাত্র দু'লাখ, তাই তো?'

মাথা নাড়ল বিরূপাক্ষ। সুব্রত আবার বললেন, 'দুটো জিনিস করতে হবে। আপনার বিজনেস কমার্শিয়ালি ভায়াব্‌ল, কিন্তু যথেষ্ট লোন না পাওয়ার জন্য রি-পেমেন্ট ভালো হয়নি—এই দুটো জিনিস এসট্যাব্‌লিস্ করতে হবে। পারবেন?'

বিরূপাক্ষ যেন তৈরিই ছিল। তৎপর ভাবে বলল, 'সি এম ডি এ'র একটা টেন্ডার পেয়েও কাজ করতে পারিনি, আটকে আছে টাকার জন্য। এটা তো হাতের কাছেই টাটকা ঘটনা।'

'ঠিক আছে।' সুব্রত মিত্র ধোঁয়া ছাড়লেন, 'তাহলে বি মিত্র অ্যান্ড কোম্পানীর সুদ সহ ডেবিট ব্যালান্স আড়াই লাখ টাকার অ্যাকাউন্ট ফ্রোজেন করার ব্যবস্থা করে দেব। এবং অ্যাকাউন্ট নাম্বার 'টু' ওপেন করে—এই অডারী কাজ কমপ্লিট করার জন্য বাকি তিন লাখ টাকা স্যাংশানের ব্যবস্থাও করে দেব। আমার কি থাকবে?'

বিরূপাক্ষ তাকাল। কথা বলল না। তার চোখের তারায় সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিভ্রান্তি একই সঙ্গে ছাতা মেলল। এরকম সোজাসুজি দাবী আসবে, ভাবতে পারেনি। তবুও এটাই ভাল হল। নাচতে নেমে ঘোমটা টানার কোন মানে হয় না। ম্যানেজারের মুখ থেকেই জানতে চাইল কি ওঁর ডিমান্ড।

সুব্রত বললেন, 'বোঝেন তো, রিজিওন অফিস থেকে ব্যাপারটা পাস্ করাতে হবে। শুধু আমি নই, আরও কয়েকজন আছে চেনে। আপনার তো দু দিকেই সুবিধা হচ্ছে। আড়াই লাখ টাকার অ্যাকাউন্ট ফ্রোজেন করিয়ে দেওয়ায় ঐ অ্যাকাউন্টে কোন ইন্টারেস্ট চার্জ হবে না। অন্য দিকে নতুন অ্যাকাউন্টে তিন লাখ পাবেন মাত্র 'টুয়েলভ্ পারসেন্ট' ইন্টারেস্টে। আমাদের কেন টেন পারসেন্ট দেবেন না?'

ফোন বাজল। কাঁচের দরজা ঠেলে অমিতাভ ঢুকল, সঙ্গে একজন দেহাতী, বৃদ্ধা মহিলা। ম্যানেজারকে টেলিফোনে কথা বলতে দেখে অপেক্ষা করল। দু মিনিট পর ফোন রাখতেই

বলল, 'এই গরিব মহিলা খুব বিপদে পড়েই আমাদের কাছে এসেছে ম্যানেজারবাবু। যে কোন লোক দেখেই বুঝবে, এর কেসটা জেনুইন। এবং সেজন্যই আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম। আপনি ফিরিয়ে দিলেন' তার কথায় বিস্ময়।

মহিলা ম্যানেজারের পা জড়িয়ে ধরল, 'তুমি আমার ছেলের মতো। আমাকে বাঁচাও বাবা।'

সুব্রত মিত্র বিরক্ত হলেন। একটু আগে মহিলা একবার এসেছিল। এখানে মহিলার মেয়ের অ্যাকাউন্ট আছে। মেয়ে লেখাপড়া জানে না। 'ইল্লিটারেট' অ্যাকাউন্ট। নিয়ম হল, এক্ষেত্রে পার্টি নিজে না এলে টাকা তুলতে পারবে না। 'স্পেসিমেন' কার্ডে ছবি লাগানো থাকে, সেটার সঙ্গে মিলিয়েই উইথড্রয়্যাল পাস করা হয়।

কিন্তু বৃদ্ধার মেয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে সাংঘাতিক। বৃদ্ধা টাকা তোলার ফর্মে মেয়ের টিপসই নিয়ে বেরিয়েছে। অ্যাকাউন্টে পাঁচ শ টাকা আছে, পাঁচ টাকা রেখে বাকিটা তুলতে চায়। এক্ষেত্রে একমাত্র ম্যানেজারই পারেন টাকা তোলার স্পেশ্যাল পারমিশন দিতে।

মহিলার কথায় মায়া হচ্ছিল অমিতাভর। ক্ষমতা থাকলে সে নিজেই পাস করে দিত উইথড্রয়্যালটা। ম্যানেজারকে বলল, 'ম্যানেজারবাবু, একমাত্র আপনিই পারেন। এজন্যই আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।'

'বুঝলাম, কিন্তু আমার পক্ষে তো ভাই সম্ভব নয়। আইনের বাইরে আমি যেতে পারব না।'

অমিতাভর মাথার লাল রক্ত গরম হয়ে গেল। ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, এইটুকু কাজ পারবেন না, তাহলে ম্যানেজার হয়েছেন কেন? ম্যানেজারের মুখ টকটকে হয়ে গেল। বিরূপাক্ষর দিকে তাকালেন, বললেন, 'সে কৈফিয়ৎ আপনাকে দেব না। আপনি আমাকে কাজ শেখাতে এসেছেন— গত এক সপ্তাহ আপনি ছিলেন কোথায়? উইদাউট নোটিশে কেন সাতদিন কামাই করেছেন? এখানে বিরক্ত করবেন না, যান সিটে যান। দেখছি আপনাকে আমি।'

অমিতাভ বলতে যাচ্ছিল, 'সে তো সবাই প্রয়োজনে না বলে ছুটি নেয়। পরে জয়েন করে চিঠি দেয়। কিন্তু বলতে গিয়েই বুঝল, একটু গণ্ডগোল হয়ে গেছে। টানা চারদিনের বেশি ছুটি নিলে নিয়ম অনুযায়ী আগে থেকে জানাতে হবে। পারমিশান নিতে হবে। নাহলে অফিস চিঠি ধরাতে পারে। অমিতাভ একটু দমে গেল। অসহায় ভাবে মহিলাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো।

বৃদ্ধা মহিলাকে খুব বিচলিত দেখাচ্ছে, 'হবে না বাবা।' অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'কতটাকা হলে এখনকার মতো চালিয়ে নিতে পারবেন?'

'ডাক্তার দেখাতে হবে। ওষুধ কিনতে হবে। অন্তত শ'খানেক না হলে তো চলবে না বাবা।'

অমিতাভ কিছুক্ষণ ভেবে নিজের অ্যাকাউন্টে একটা একশ টাকার উইথড্রয়্যাল দিয়ে দিল।

চেম্বারের মধ্যে ম্যানেজার বিরূপাক্ষর সামনে এই অপমান ভুলতে পারছিলেন না। অস্থিরতা অনুভব করলেন। হাওয়ায় চুল এলোমেলো হল। নিঃশব্দে সময় কাটতে থাকল। সিগারেটের ধোঁয়া উড়ল। বিরূপাক্ষর চোখে শঙ্কা। সুব্রত বললেন, 'এখন রিজিয়ন অফিসে যাব। আপনিও চলুন। প্রপোজালটা প্রেস করার আগে সবার সঙ্গে কথা বলে নেওয়া দরকার।'

বিরূপাক্ষ সঙ্গে সঙ্গেই রাজি। ম্যানেজার ওর গাড়িতে করেই বেরিয়ে গেলেন।

শুভজিৎ টেবিলের সামনে ভিড় নিয়ে বসে আছে। খোস গল্পই হয়। কিন্তু আজ ক'দিন মেজাজটা নষ্ট হয়ে আছে। দাদা এসেছিল, বলে গেছে, আগের থেকে একটু কম রেটে মাল দেবে। মারজিনটা প্রায় রাখবেই না। এতদিন ধরে কাজ করে আসছে—এক কথাতেই ম্যানেজার হঠিয়ে দেবে।

দাদার কথাগুলো ম্যানেজারকে বলতে হবে, কিন্তু কিভাবে বলবে! যদিও সে ব্যক্তিগত ভাবে ম্যানেজারের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করার জায়গায় যায়নি, কিন্তু কর্মচারীরা ম্যানেজারের ওপর ক্ষেপে আছে। সকলকেই টেনশানের মধ্যে ফেলে রাখতে চান উনি। গত সপ্তায় দু'বার বিকেল সাড়ে চারটেয় হেড অফিস থেকে সারপ্রাইজ ভিজিট দিয়ে গেছে। স্টাফদের ধারণা, সেটাও সুব্রত মিত্রের কারসাজি। কারণ, আগের ম্যানেজার থাকাকালীন এই রকম ভিজিট ছ'মাসে ন'মাসেই হয়েছে।

শুভজিৎ বুঝতে পারছে, আবার যদি দাদার হয়ে ম্যানেজারের কাছে অনুরোধ করে, তাহলে ওকে কিছুটা নিচু হতেই হবে। ম্যানেজারও আপার হ্যান্ড নেবে। কর্মচারীদের হয়ে সেরকম জোরাল ভাবে আর কিছু বলতেও পারবে না। তবুও দাদার এতগুলো টাকা, একটা চালু ব্যবসার এভাবে ক্ষতি করবে। ভবিষ্যতে যা হয় হোক, ম্যানেজারকে একবার বলতেই হবে। কিন্তু বিরূপাক্ষ মিত্রের গাড়িতে লোকটা গেল কোথায়।

অমিতাভ সিটের ওপর মাথা নিচু করে বসেছিল। সুমিতা কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কি অমিতদা, শরীর খারাপ?

অমিতাভ চমকে তাকাল, 'না তো!' চেম্বারে তর্কাতর্কি করেছে, সেটা কাউকে বলতে চাইছে না। ভিতরে ভিতরে অস্থিরতার মধ্যেও একটু শান্তি পাচ্ছিল। গরিব মহিলার উপকার করতে পেরেছে। কিন্তু না জানিয়ে সাত দিন অ্যাবসেন্ট ছিল বলে অফিস যদি অ্যাকশান নেয়।

সবকিছু ওলোট-পালোট করে দিয়েছে ম্যানেজার। তিন তিনটে ইউনিয়ন কিছু করতে পারছে না। সকলেই অস্থির হয়ে পড়ছে দিনেদিনে। অরুণের অসুবিধা সবথেকে বেশি। অফিস থেকে একদিনও বেরতে দেরি হলে লোকজনের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট ফেল হয়ে যায়। ইনসিওরেন্সের ব্যবসায় এটা খুব ক্ষতিকর। গত দু'মাস সেটাই হচ্ছে। প্রায় দু'হাজার টাকার ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেছে। কতদিন আর এরকম চলবে কে জানে।

সুব্রতবাবু বলে দিয়েছেন, 'আগে অফিস লিভ করতে পারেন, তবে ডিপারচারে সই করে টাইম পুট করে যাবেন।' কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। পরপর কয়েকদিন সেরকম হলে ম্যানেজমেন্টই ব্যাপারটাকে ক্যাপিটালাইজ করবে। চিঠি ধরাবে।

অরুণ বলল, 'শুভদা, একটা কিছু করতে হবে, এভাবে আর চলছে না।'

শুভজিৎ চারমিনার খায়। দাদার ব্যবসার ব্যাপারটা মনে পড়ল। প্যাকেটের ওপর সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে বলল, 'এ ব্যাপারে তো ভাই আমাদের ইউনিয়নের তরফ থেকে কিছু করার নেই। ম্যানেজার যা করছে, সবই অফিসের নিয়ম কানুন মেনেই। যতদিন না আমরা সুব্রতবাবুর অন্য কোন উইক পয়েন্ট পাচ্ছি, ততদিন কিছু করার নেই।'

অমিত মল্লিক লাফিয়ে এসে বলল, 'ব্যাঙ্কের হালের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রেস খুব উৎসাহী। ওরা লোন চেয়েছিল, পায়নি। প্রেস এজন্য ব্যাঙ্কের পেছনে লাগার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাছাড়া ব্যাঙ্কের কেচ্ছা কেলেঙ্কারি পাবলিক খাবেও খুব। আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছে ইনভেস্টিগেট করার।'

সবাই কৌতূহলী চোখে তাকাল। অমিত মল্লিক আবার বলল, 'হেড অফিসে আমি এই সব নিয়ে খোঁজ খবর করেছিলাম।'

শুভজিৎ বলল, 'ঐ-টা কর না। ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লিখলে তোমার চাকরি চলে যাবে।'

'জানবে কি করে, ছদ্মনামে লিখব।'

জীবনবাবু পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। নাটকে অভিনয়ের ভঙ্গীতে বললেন, 'কাজের কাজ কি হয়েছে সেটাই বলো। সুব্রত মিত্রর বিরুদ্ধে কিছু পেয়েছো?'

অমিত রহস্যময় হাসি হাসল, 'জাতে রিপোর্টার জীবনদা! এখানে পড়ে আছি নেহাত চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিলাম তাই। নাহলে এতদিন কোন কাগজেই আমাকে দেখতে পেতেন।'

ক্যাশের পেছনে সামান্য ভিড়। একটা নতুন ছেলে জয়েন করেছে। ওর একটা টেলিফোন এসেছে, মহিলার গলা। সেটা নিয়ে সুমিতা হাসাহাসি করছে ছেলেটার সঙ্গে, 'কি ব্যাপার। জয়েন করতে না করতেই ফাঁসিয়ে নিয়েছ ভাই!'

অমিত বলল, 'সুব্রত মিত্রকে যতটা সৎ ও নীতিনিষ্ঠ লোক বলে আমরা ভাবছি, আসলে ততটা সৎ কিন্তু উনি নন।'

'কেন?' সবাই উৎসাহিত হল।

'গভীর জলের মাছ। কর্মচারীদের ওপর প্রেসার ক্রিয়েট করে, তাদের অ্যাটেনশান সেদিকে টেনে নিয়ে তলে তলে হাজার হাজার টাকা কামিয়ে নিচ্ছে।'

'কি ভাবে?' শুভজিৎ সচকিত।

'আপনারা জানেন বিরূপাক্ষর একটা লোন অ্যাকাউন্ট আছে। বি মিত্র অ্যান্ড কোম্পানী। লোকটা এক নম্বরের মেয়েবাজ। নয়-ছয় করে টাকা উড়িয়েছে। দু' লাখ টাকার লোন পেয়েও ঠিকমতো ব্যবসা চালাতে পারেনি। সেই পার্টির অ্যাকাউন্ট ফ্রোজেন করে দিয়ে নতুন ভাবে আবার অ্যাকাউন্ট নাম্বার টু-তে লোন দেওয়া হচ্ছে। সুব্রত মিত্র হেড অফিসের লোকজনদের ইনফ্লুয়েন্স করে এটা করিয়ে দিচ্ছে কমিশন

খেয়ে ।— হেড অফিস থেকেই বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি আমি।'

শুভজিতের মনে পড়ল, সেদিন বিরূপাক্ষর গাড়িতেই বেরিয়ে, গিয়েছিল ম্যানেজার। জীবনবাবু বিজ্ঞের মতো জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু প্রমাণ তো নেই ভাই!

'জীবনদা, সবকিছুর প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকে না। ও যে ঘুষ খায়, সেটা হাতে নাতে ধরা সম্ভব নয়। কিন্তু বি মিত্র অ্যান্ড কোম্পানীর যা পাস্ট, তাতে কোম্পানীকে এই সুবিধা দেওয়া যে ব্যাঙ্ক বিজনেসের বিরোধী, সেটা প্রমাণ করা যায়— ।'

আর মাত্র দু'বছর চাকরি আছে জীবনবাবুর। ইতিমধ্যেই শান্তিবাদী হয়ে পড়েছেন। বললেন, 'কিন্তু ওঁর তো ভাই ওপর মহলে জানাশুনো আছে প্রচুর। কে আর নিজের ক্ষতি করার জন্য ওর বিরুদ্ধে যাবে বলো।'

'ওপর মহলে আমাদেরও জানাশুনো আছে জীবনদা। ও আমাদের অ্যাটাক করছে, বাঁচতে হলে আমাদেরও কাউন্টার অ্যাটাক করা দরকার। প্রেসকে কে না চমকায়! খবরের কাগজে একবার বেরিয়ে যদি যায়, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়, সেটা দেখুন।'

চারপাশের সবাই যেন অস্পষ্ট আলো দেখতে পেল। অমিত আবার বলল, 'শুভদা, আসুন একটা কিছু করা যাক।'

'কি করবে?' শুভজিতের চোখে জিজ্ঞাসা।

'আমরা সবকটা ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা সোজাসুজি বলব, আপনি আমাদের ওপর যে দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছেন, সেটা বন্ধ করতে হবে। নাহলে আমরা আমাদের মতো ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।'

কিন্তু সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও কেউ সোজাসুজি ম্যানেজারের দাপটের মুখোমুখী হতে চাইছে না। কি যেন ভয় সবার। এখন যা ব্যাঙ্কের অবস্থা, যে কোন সময় ম্যানেজারের রিপোর্টের ওপর একজন স্টাফের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে।

হেড অফিস থেকে একটা সারকুলার এলো, ব্যাঙ্ক প্রেমিসেসের মধ্যে কোন ইউনিয়ন অ্যাক্টিভিটি চলবে না। ইউনিয়নের কাজে কোন স্পেস অকুপাই করে রাখাও চলবে না।

কোনার দিকে তিনটে টেবিলের ওপর তিনটে ইউনিয়নের কাজ হয়—। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ড্রয়্যারের মধ্যে থাকে লিফলেট, পুস্তিকা, পত্রিকা। ম্যানেজার ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের ডাকলেন। হেড অফিসের সারকুলার দেখিয়ে বললেন, 'বুঝতেই পারছেন, আমার কিছু করার নেই। হাত-পা বাঁধা। ইউনিয়ন যে তিনটে টেবিল দখল করে আছে, সেগুলো ছেড়ে দিতে হবে।'

অমিত মল্লিক আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না, 'আপনার হাত-পা বাঁধা। প্রয়োজনে দড়ি কাটার ছুরি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন, কিন্তু টেবিল ছাড়া সম্ভব নয়।'

'প্রায়ই হেড অফিস থেকে ইন্‌সপেক্‌শানে আসছে। আমি চিঠি খেলে আপনি বাঁচাবেন?' ম্যানেজারের উত্তপ্ত স্বর।

'তিনটে টেবিলের জন্য আপনি চিঠি খাওয়ার ভয় পাচ্ছেন ম্যানেজার বাবু। কিন্তু সত্যি সত্যিই চিঠি খাওয়ার কাজ তো আপনি অবলীলায় করে যাচ্ছেন।'

'মানে?' সুব্রত মিত্রের কপালে ভাঁজ।

'বি মিত্র অ্যান্ড কোম্পানীর সঙ্গে আপনার প্রকৃত সম্পর্ক কি, সেটা আমাদের ভালোই নজরে আছে। আপনি ভাবছেন, কেউ কিছু জানে না, তাই না? প্রেস কিন্তু ব্যাঙ্কের এইসব ব্যাপারে খুব উৎসাহী।'

ম্যানেজার আর কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে সোজা চেম্বারে ঢুকে গেলেন। এইসব এরা জানল কোত্থেকে?

অমিতাভকে 'চার্জশিট' দেওয়া হয়েছে, অফিসকে না জানিয়ে এক সপ্তা ডুব মারার জন্য এই শাস্তি। আসল কারণ অবশ্য অন্য। সেদিন বৃদ্ধা-দেহাতী মহিলার ব্যাপার নিয়ে ম্যানেজারকে সে অপমান করেছিল বিরূপাক্ষর সামনে। তারপর থেকেই ম্যানেজার সুযোগ খুঁজেছেন। এই মুহূর্তে এটাও বুঝতে পেরেছেন, এখন ইউনিয়নের সঙ্গে অমিতাভর সম্পর্ক খারাপ। সুতরাং চিঠি ধরালে জোরাল কোন প্রতিবাদ আসবে না।

অমিতাভ ইউনিয়নের নেতাদের পরামর্শ চাইল। শুভজিৎ মনে মনে হাসল, কিন্তু মুখের ত্বকে গাম্ভীর্য অম্লান। খুব তো বড় বড় কথা বলছিলে সেদিন! আমরা সবাই ধান্দাবাজ—নিজেদের আখের গোছানর রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে বলেই লাফালাফি করছি! এখন?

এই মুহূর্তে অফিসের অবস্থাটাও আগের থেকে ভাল। ম্যানেজার একটা আপসে এসেছেন। আমরা ওঁকে কিছু বলব না, উনিও আমাদের রিলাক্সেশান দেবেন। এই অবস্থায় অমিতাভর ইস্যু নিয়ে আবার নতুন করে ঝামেলা পাকানোর কোন মানে হয় না। সুতরাং শুভজিৎ গম্ভীর মুখেই বলল, 'ঠিকই, ম্যানেজার চিঠি দিয়ে অন্যায় করেছেন। তবে তোমারও তো জানিয়ে ছুটি নেওয়া উচিত ছিল।'

'কিন্তু সবাই কি সেটা করে?'

'করে না ঠিকই। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি তো ভিন্ন। আমরা কি করি বলো।'

অমিতাভ অন্যান্যদের দিকে তাকাল। তাদের মুখের সামনেও ধোঁয়ার জাল। যা বোঝার বুঝে নিল সে। নিঃশব্দে নিজের সিটে এসে বসল।

নিজেকে খুব অসহায় ও নিরালম্ব লাগল অমিতাভর। টেবিলের ওপর মাথানিচু করে পড়ে রইল দীর্ঘ সময়। বুঝল, একটা দ্বিমুখী চাপের মধ্যে পড়ে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

অফিসের সবাই জেনে গেছে ব্যাপারটা। একে একে অনেকেই ওর কাছে আসছে। ওর কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে দেখছে। বলছে, এটা ঠিক করেনি ম্যানেজার। ইউনিয়নেরও উচিত হয়নি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করা। তাদের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছিল, অসংহত ক্ষোভ। অমিতাভর চোখে জল এসে যাচ্ছিল।

নিজেকে সংহত করার জন্য একটা সিগারেট ধরাল অমিতাভ। ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঢুকল বুকের মধ্যে। গলাটা চুলকে উঠল। কাশি পেল। টনসিলটা খুব খারাপ, ডাক্তার সিগারেট খেতে বারণ করেছে, তবুও ডাক্তারের কথা সব সময় মনে থাকে না।

কাশির দমক অসহ্য হলে সিগারেটটা ফেলে দিল অমিতাভ। গলার ভিতর থেকে দলা দলা ধোঁয়া বেরিয়ে এসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ মনে হ'ল, গোটা অফিসটাই যেন ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে ভরে গেছে, যা এখানকার স্বার্থান্বেষী মানুষদেরই পরিত্যক্ত নোংরামি, ক্লেদ, ঈর্ষা। দম বন্ধ হয়ে এলো ওর।

ব্রাঞ্চের কারুর সঙ্গেই অমিতাভর প্রাণের সম্পর্ক নেই। জীবনের এতগুলো বছর, এতটা সময় একসঙ্গে কাটিয়ে দিয়েও গভীর কোন সম্পর্ক তৈরি হয় না! হয়ত হওয়া সম্ভবতও নয়—।

ম্যানেজারের সঙ্গে তর্ক করেছিল অমিতাভ। বিরূপাক্ষর সামনে অপমানজনক কথা বলেছিল। কিন্তু কেন বলেছিল! ইউনিয়নও ওকে কোন শেলটার দিল না। ও স্পষ্ট বুঝতে পারল, চেতনার গভীরে ধীর অথচ নিশ্চিত ভাবে প্রোথিত হয়ে যাচ্ছে তীব্র হতাশার শিকড়। পাঁচটা বাজলে অ্যাটেনড্যান্স্‌ রেজিস্টারে সই করে অফিস থেকে বেরিয়ে এলো অমিতাভ।

কী জবাব দেবে সে এই চিঠির। এই চিঠি তার চাকরি জীবনের কি কি ক্ষতি করতে পারে। এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন উঠে এলো চিন্তার মধ্যে।

এই চিঠির একটা কপি চলে যাবে ওর পারসোনাল ফাইলে। ভবিষ্যতে প্রমোশনের সময় সেটা দেখবে ওপরমহল। নানা প্রশ্ন জাগবে। হয়ত ওর আর কোন পদোন্নতিই হবে না। সারা জীবন এই কেরানীর চাকরি করেই কাটিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু যারা সত্যি সত্যিই সমস্ত নিয়ম কানুন ভেঙ্গে চুরে তছনছ করে দিচ্ছে, অন্যায় করছে—তাদের কিছুই হল না। কেন হল না সেটাও অমিতাভ জানে। বোঝে। কিন্তু এখন কি করতে পারে ও, অসহায় ভাবে মেনে নেওয়া ছাড়া!

একজন সর্বস্বান্ত অস্থির মানুষের মতো দীর্ঘ সময় রাস্তার পোড়া পেট্রলের গন্ধের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে একা একা হাঁটতে থাকল অমিতাভ। কোন হিসেবই মেলাতে পারছে না, বেঁচে থাকার জায়গা এত কমে যাচ্ছে দিন দিন।

বাসে উঠল অমিতাভ। নামল। একটা বাড়ির সামনে এসে বেল টিপল। একজন অচেনা মহিলা দরজা খুলে দিল। অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'সুব্রতবাবু আছেন?'

'হ্যাঁ, আসুন।'

অমিতাভ নরম-নিচু ভাবে হেঁটে হেঁটে ঘরে এল। সোফায় এসে বসল। দরকার হলে ম্যানেজারের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না ও।

অঙ্কন : সুব্রত চৌধুরী

ছোঁয়া যায়

আনন্দ বাগচী

এরকমও ভয় করে একেক সময়, বুঝি অন্ধ হয়ে গেছি
যেন ব্ল্যাক আউটের রাত, চোখে রুমাল বেঁধেছে
চারপাশে চলমান চতুর সংসার
ছোঁয়া দিয়ে সরে যাচ্ছে, আমি মূর্খ, আমি
আহাম্মক কানামাছি
বৃত্তের ভেতরে শুধু হাতড়ে মরছি এখন সবকিছু
কাছের সব কিছু ঝাপসা, শুধু ঝাপসা কেন, অন্ধকার।

এরকম অন্ধ দিনে অকস্মাৎ যেন মনে হয়
অনেক ডাকঘর ঘুরে, আঘাটার সীলমোহর নিয়ে
বিস্মৃত খামের চিঠি ফিরে এল বহুদিন পরে
ঠিকানায় চেনা ঠেকছে বাঁকাচোরা হাতের অক্ষর
কলি ফুঁড়ে ফুটে ওঠা বিকলাঙ্গ পেন্সিলের ছবি
চোখে পড়লে এ বয়সে বুকের ভেতর যেরকম
হা-হা করে, মনে হয় রূপকথার পোড়ো ভিটে।
এ যেন কানের কাছে ভুলে যাওয়া আমার ডাকনাম
ঘুমের চটকা ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খোলা।

শৈশব এখন ঠিক এরকমই কাছে। খুব কাছে।
হঠাৎ তাকের বই সরালে নড়ালে চোখে পড়ে
কবেকার খেলনাপাতি, ধোবীখানাগামী পাঞ্জাবির
পকেটে চিরকুটখানা কারেন্সি নোটের মত লাগে
মাসকাবারের দুঃসময়ে। মনে হয়—
জুতোর ভেতরে ঢুকে বসে আছে হারানো মার্বেল,
এখন শৈশব ঠিক এরকমই কাছে। খুব কাছে।

আমি যখন

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

আমি যখন আয়নার দিকে তাকাই,
মনে হয়,
আমাকেই দেখছে আয়না।

আমি যখন কবিতার দিকে চোখ ফেরাই,
মনে হয়,
আমার চোখেও চোখ রেখেছে কবিতা।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে অজস্র মানুষ।
আমি যখন ঝুঁকে পড়ি সেই দিকে,
টের পাই
অজস্র উৎসুক দৃষ্টি আমার দিকেই ফেরানো।

আয়নার মধ্যে মানুষের ছায়া,
মানুষের বুকে কবিতা,
কবিতার ভিতরে এক মায়া-দর্পণ—

এর থেকে মুক্তি নেই আজ।
তাই আমি যখন,
তাই আমি যখন…

কোনোদিন

তরুণ চক্রবর্তী

কে কবে ভেবেছে তার
জীবন কৌতুক হবে কোনোদিন ?

সুবর্ণ কঙ্কন কিংবা অঙ্গুরী সাজানো হাতে দেখি,
উজ্জ্বলতা ক্ষয়ে ক্ষয়ে রঙিন ধাতুর ঘাম বসে যায় ;
রাত্রির আকাশ ছেড়ে চলে যায় শুকনো চাঁদ,—
চাঁদের মহিমা,
কে কবে কখন এসে দোলা দিয়ে যাবে
বলো কে ?

সুন্দর

প্রমোদ বসু

সুন্দর রয়েছে শুধু ওষ্ঠ আর কথার সন্ধিতে।

কথা চেটেপুটে খায়, ওষ্ঠ তাকে
ভালোবাসে ভারি।
জীবনে শাসায় কেন অসহ্য সুন্দর অস্ত্র
শান-দেয়া কথা, তরবারি ?

ভয় পাই। মিথ্যের দৌলতে মুখ নিচু করে রাখি।
ভালো মানুষের চোখে সরে আসি, পাছে

কথার ধারালো ভারে ওষ্ঠ খানখান হয়,
সুন্দর মাথা হেঁট করে ফেলে

মানুষের নষ্টতার কাছে।

আকীর্ণ প্রেম

মলয় সিংহ

তোমার মুগ্ধ-শরীর আবেশে এখনও ভ্রূণসন্ধ্যা
জেগে আছে ; স্তব্ধ রাত্রি ধর্ষণ শেষে উন্মত্ত হলো
বুঝি কেড়ে নিলো স্বাদ—
তোমার অন্তর থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে অমৃত গড়ালো ;
বলো এ বন্ধন মেনে নিলে তো ?

নক্ষত্র থেকে পৃথিবী—সবুজ সবুজ কুটিরের আলো
কিরণ্ময় পতঞ্জলি মানুষের ছায়াতে মিশলো
অব্যর্থ নিশানা তার ; সে চাইলো মানবের প্রেম ।

তাকে কতোদূর রক্ষা করা যাবে—সে কথা আপাতত থাক !

তোমার সমাজ গায়ে আতঙ্কের ছাপ কতোদিন বৃষ্টি হয়নি ব'লে
বল্লমের ফালে ঝুলে আছে ;
অনাদৃত গুল্মলতা অনাহারে ধূসর কেমন রয়েছে প্রতুল
তাকে আজ রস দিতে হবে ।
রসবতী গম্ভীরা মেদুরা ঢেলে দাও শরীরের পানি
আকীর্ণ সংসার যোগী রসনা চাইছে ;

তাকে কতোদূর শুদ্ধ করা যাবে—সেকথা মানুষই বুঝুক ।

শিকল হারানো স্বাধীনতা

মানস রায়চৌধুরী

ক্ষমতা অথবা
সেই ভালবাসা—যেন ইন্দ্রধনু
আনন্দ বিলোয় ।

তোমাকে লুণ্ঠন ক'রে
ভূপৃষ্ঠে করেছি সমতল
সমস্ত বর্তুল ভেঙে একহারা গড়নপিটন—

এই পরিবেশে তুমি কিছুই দেখনা
দেখ, এক মনে উদ্‌ভ্রান্ত নিজেকে

ভালবাসা, তুমি চেয়েছিলে
সব কিছু নিজের ঐশ্বর্য নিয়ে
রোদ্দুর পোহাবে, হায়
অথচ এখন

বেঁচে থাকা নানাভাবে প্রসারিত হয়ে
নতুন জীবন পায়··· আলিঙ্গনে ধৃত ।

কারাগার কাকে দেবে ? ওটা পন্থা এক
অন্য দিকে
রোদ্দুরে দৌড়িয়ে যায়
কিশোর নবীন হাওয়া, শিকল হারানো স্বাধীনতা ।

সেদিন দুপুরে

শুকতারা রায়

...তুমি চলে গেলে,
শুধু রয়ে গেল ঘরে তোমার দরদী গলায় মালার্মে—
"সেদিন ছিলো তোমার প্রথম চুমুর দিন"—
ক্যালেন্ডারে সুন্দর হরিণী । ছলোছলো চোখ । আমি ঋণী ।
ছাইদানে ধোঁয়া । খালি পেয়ালা কফির । স্মৃতির বুদ্‌বুদ্‌ ।
সরব নীরবতা ? সদ্য স্মৃতি শব্দ ক'রে ওঠে।
তোমার হাত ধরে, অনুভবের স্তর পেরিয়ে পেরিয়ে,
এখনো যাই ঘর থেকে ঘরে ।
কোথাও কান্না । কোথাও উপচে পড়া হাসি ।
স্মৃতির সিম্ফনীতে কতো সুরের ঐকতান ।
সময়ের ভারী পর্দা ঝুলছে । তবু তাকে ঠেলে
ঢুকতে চায় কোন সুদূরের ক্ষণ আমাদের কাছে ?

ফিরে আসা

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

বয়ঃসন্ধি সময়ের প্রেম
হু-হু দীর্ঘশ্বাস আর
বুকের ভিতরে দাহ
ফিরে এলো উত্তর চল্লিশে ?
প্রথা প্রচলিত পথে
সেই স্বপ্নের প্রবাহ
কিছু সুখ মিশে গেল বিষে ।

মন্দিরে ঘন্টাটি বাজিয়ে
দেবীকে জাগিয়ে যায়
অচেনা পাগল, তার
নিয়মের ছিল না বালাই ।
আজ শুধু অন্ধকার
হু-হু দীর্ঘশ্বাস আর
ঝাউ গাছে বাজে সাঁই সাঁই ।

ওগো প্রাচীন বট

অমিয়কুমার সরকার

শোনা যায় 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'— এই ছন্দোবদ্ধ বাক্যটি কবিগুরুর জীবনে নাকি প্রথম ছন্দের উন্মেষ ঘটায়। সেক্ষেত্রে শিশু রবির জানলার ফ্রেমে-বাঁধা পুকুর পাড়ে মহাকালের সাক্ষী অসংখ্য ঝুরিসমেত বটগাছটি বোধ হয় কবিত্বশক্তি বিকাশের আশ্চর্য ক্ষেত্র বললে কম বলা হয়। শুধু মহাকবি কেন, বটগাছ তো আমাদের সকলের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। ভারতে পুরা কাল থেকে আধুনিক যুগেও বটগাছের অস্তিত্ব সকলের মজ্জায় মজ্জায় বাসা বেঁধেছে। এই দেশের কৃষ্টি, সভ্যতা, ইতিহাস, দর্শন, ঐতিহ্য, সামাজিকতা, আধ্যাত্মিকতা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান সব কিছুতেই বটগাছের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

বাউলের আখড়া, কুস্তির আখড়া, তথাকথিত সেলুন, জুতো সেলাইয়ের খুপরি, হাটের দিনে আশ্চর্য মলম, দাঁতের মাজন, বিচিত্র মনোহারি দোকান, সার্কাসের তাঁবু, ম্যাজিকের টেবিল, ছাইমাখা আধুনিক সাধুবাবার আসন, কর্মক্লান্ত ঝাঁকামুটে, ঠেলাওয়ালার ঝাঁকা বা ঠেলায় বিশ্রাম, বাপ-ঠাকুর্দার দ্বিপ্রাহরিক তাস-পাশার আড্ডা, জুয়াড়িদের আড্ডা, ছোট ছেলেমেয়েদের গুলি খেলা, লাট্টু খেলা, এক্কা-দোক্কার আসর, পেট্রোম্যাকসের বিচ্ছুরিত আলোর সন্ধ্যায় যাত্রার আসর, কীর্তনের আসর, সাপ খেলা, বাঁদর খেলা, তেলেভাজার দোকান, চা-পান-বিড়ির দোকান, গণৎকারের ছক পাতানো পীঠ, গুরুমশাইয়ের পাঠশালা থেকে শুরু করে কোর্ট-কাছারি- উকিল- মোক্তার- মক্কেল- টাইপিস্ট, গ্রাম পঞ্চায়েতের শলা-পরামর্শ সবই তো বটতলা কেন্দ্রিক। মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সেও তো বটের ছত্র-ছায়ায় দেখা গেছে।

জীবনের সঙ্গে, জীবিকার সঙ্গে, সবরকম বয়সের সঙ্গে বটগাছের সখ্য চিরকালের। সর্বস্তরের, এমনকি সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবন-দর্পণে কোন না কোন সময়ে এর সুশীতল ছায়ার প্রতিফলন রয়েছে। শুধু কি বিচিত্র পেশার মানুষ— হরিয়াল, শালিক, টিয়া, ঘুঘু ইত্যাদি কতোরকমের পাখি, পোকামাকড়, পিঁপড়ে, মাকড়সা, বাঁদর, বাদুড়, কাঠবেড়ালি সবই তো বটের কাছে আশ্রয় নিয়ে সহাবস্থান করছে। মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে বটগাছের কাছে মধুভাণ্ডটি গচ্ছিত রেখে, মনের সুখে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। সারা ভারতবর্ষে কেন, এই পশ্চিমবঙ্গে কতো যে বটতলা আছে তার পরিসংখ্যান কারো জানা নেই।

বলতে কি, লোকসাহিত্য, লোকাচার, লোকসংস্কৃতি, লোকগীতি, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য, পুরাণতত্ত্ব, বিজ্ঞান এবং কিংবদন্তীতে বটের ব্যবহার এবং উল্লেখ এতোরকম ভাবে এসেছে তার মূল্যায়ন প্রায় অসম্ভব।

বটগাছের বৈজ্ঞানিক নাম Ficus benghalensis L. (ফাইকাস্ বা ফিকুস্ বেঙ্গলেনসিস) গাছটি সেই ১৭৫৩ সালে নথিভুক্ত করেন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক লিনিয়াস (Linnaeus), তাই গাছের নামের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের নামের আদ্যাক্ষরের লেজুড়। পরিবারটি Moraceae অন্তর্গত। ভারতে ফাইকাস্ বা ডুমুর জাতীয় গাছের প্রায় একশো বারোটি প্রজাতি রয়েছে। বটের সঙ্গে যে গাছটির নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে তা হল অশ্বত্থ-এর বৈজ্ঞানিক নামে পরে আসছি। বস্তুত একই পরিবারের দুটি গাছ বট এবং অশ্বত্থ ভারতে কৃষ্টি ও ধর্মের সঙ্গে যেমন, হৃদয়ের সঙ্গেও তেমনি অনেকখানি জুড়ে বসেছে।

বটগাছের ইংরেজি নাম বেনিয়ান ট্রি (Banyan Tree)—নামটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আছে। বেনিয়া বা হিন্দু বণিকেরা বটগাছের ছায়ায় বসে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতেন তাই 'বেনিয়া' থেকে 'বেনিয়ান'। বটগাছের সংস্কৃত নাম 'ন্যগ্রোধ' অর্থাৎ বিশাল এই গাছের নিচে ছোটখাটো সব গাছের অস্তিত্ব থাকে না বা তারা জন্মাতে পারে না। বটের আরও একটা নাম হচ্ছে—'বহুপদ' অর্থাৎ এর অনেক পা বা ঝুরি (Prop roots)। পালি এবং সংস্কৃত ভাষায় 'বৃত্ত' কথাটির অর্থ গোলাকার। রামায়ণে বটগাছকে বৃত্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ, দূর থেকে গাছটিকে লক্ষ করলে মনে হবে—বৃহৎ গোলাকার গাছ। এই বৃত্ত থেকেই—বাত্ত/ বত্ত/ বত/ বট এই রকমের রূপান্তরে আধুনিক নাকরণে ঠেকেছে বলেই মনে হয়।

কৃষ্ণ-বট বলে যে গাছটি সকলের মন কেড়ে

মূলশাখা হারিয়ে ঝুরির সাহায্যে জীবন-স্পন্দন বাঁচিয়ে রেখেছে। এই সমস্ত ঝুরি বা Prop root গাছটিকে অমরত্ব

নিয়েছে, তা বটগাছেরই পরিবারভুক্ত। এই গাছের পাতার নিচের অংশ জুড়ে পেয়ালার আকৃতি ধারণ করেছে। অনেকের বিশ্বাস গাছের এই পাতা বালক শ্রীকৃষ্ণের মাখন চুরির ভাণ্ড (Butter Cup)।

মহেঞ্জোদারোর অনেক মোহরে (৩০০০-২০০০ খ্রীঃ পূর্ব) কিংবা ভারতস্তূপের কিছু রেলিং-এ বটগাছের প্রতিকৃতি অঙ্কিত রয়েছে। হিন্দু পুরাণে কথিত আছে যে স্বয়ং ব্রহ্মা বটবৃক্ষে রূপান্তরিত হন। ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত আছে কেমন করে সাধু মার্কণ্ডেয় বটগাছে আশ্রয় নিয়ে বিধ্বংসী ঝড় এবং বন্যার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেন। এই গাছের পাতার ওপর স্বয়ং বিষ্ণু শিশুর রূপ ধরে দুর্দিনে ঘুমিয়ে ছিলেন। কাংড়া চিত্র-শিল্পে সুন্দরভাবে অঙ্কিত রয়েছে শিশু বিষ্ণু বটের পাতায় নিদ্রামগ্ন বা জয়পুরের পাথরে খোদাই করা বটের পাতায় বিষ্ণুর অপূর্ব শিশুমূর্তি—এই দুটো শিল্প-নিদর্শন আজও কলকাতার যাদুঘরে হাজার হাজার দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাথরে বিমূর্ত আশ্চর্য বটবৃক্ষ কল্পতরু হিসাবেই গোয়ালিয়রে অনেকের হৃদয় জয় করেছে।

কর্মক্লান্ত মানুষ বটের স্নেহ-ছায়ায় নিশ্চিন্তে বিশ্রামরত ছবি : অমিতাভ ভট্টাচার্য

বলতে কি, বট আর অশ্বত্থের জন্মকথা নিয়ে পুরাণে বা ধর্মীয় গ্রন্থে অজস্র কাহিনী রয়েছে। পদ্মপুরাণে কথিত আছে দৈত্য জলন্ধর স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকে রাজ্যচ্যুত করলে, ইন্দ্রের অনুরোধে শিব দৈত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জলন্ধরের পতিব্রতা স্ত্রী বিন্দা স্বামীর কল্যাণে এবং জীবন রক্ষার্থে বিষ্ণুর উপাসনা শুরু করেন। অপরপক্ষে ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতার প্ররোচনায় স্বয়ং বিষ্ণু বিন্দার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতে লাগলেন। ফলে শিব অনায়াসে জলন্ধরকে সংহার করেন। বিষ্ণু বিন্দাকে এই বলে আশ্বাস দেন যে, বিন্দার মৃত্যুর পর তার দেহ ভস্ম থেকে বট, অশ্বত্থ ইত্যাদি চার রকমের গাছ গজাবে যা সকলের নিত্যপূজা পাবে। পুরাণের অপর এক গল্প গাঁথায় বলা হয়েছে স্বয়ং পার্বতী যখন শিবের সঙ্গে একান্তে নিরালায় বিশ্রাম করছেন, তখন কিছু দেবতা সেই বিশ্রম্ভালাপে বিরক্ত করায় পার্বতীর অভিশাপে বিষ্ণু অশ্বত্থ আর রুদ্র বটগাছে পরিণত হন।

দেখা যাক বিজ্ঞান কি বলে? উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর চোখে এই ডুমুর জাতীয় বা ফাইকাস্ প্রজাতির প্রতি চিরদিনই একটা আকর্ষণ রয়েছে। ফাইকাস্ কথাটি ল্যাটিন, যার অর্থ সুস্বাদু ডুমুর ফল। বোধ হয় পৃথিবীর পরিচিত প্রাচীন ফলের মধ্যে এটি অন্যতম। এশিয়া মাইনর এবং ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে ফাইকাস্ ক্যারিকা (Ficus carica L.) বা আন্জিরের ফল প্রায় চার হাজার বছর আগে প্রাচীন মানুষেরা চাষ করতেন খাবার জন্যে। কথিত আছে, ডুমুরের এই পাতা বুনে প্রথম মানব এবং মানবীর সুন্দর সুগঠিত দেহের আবরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল যার কাহিনী বাইবেলে বর্ণিত রয়েছে।

ভারতে এই ডুমুর ফলের ইতিহাস যীশু খ্রীষ্টের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে। আফগানিস্তানে, বিশেষ করে গান্ধারে এর বন্য ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের সময়ে এই গান্ধার ভারতের অংশ হিসাবে চিহ্নিত ছিল। মৎস্যপুরাণে অবশ্য এক জাতীয় ডুমুরের উল্লেখ রয়েছে, সম্ভবত তা ফাইকাস্ রেসিমোজা (Ficus racemosa L." বা জগ্নি-ডুমুর।

নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, তুলনামূলক দর্শন এবং উদ্ভিদবিজ্ঞান ভারতবর্ষের ফাইকাস্ বা ডুমুর জাতীয় গাছ সম্পর্কে চমকপ্রদ সব তথ্যাদি যুগিয়েছে। এদিকে ফাইকাস-এর নানান প্রজাতির নামকরণে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরাও সাধারণ মানুষকে অবাক করে দিয়েছেন। যেমন ভারতীয় রবার গাছের নাম—ফাইকাস্ ইলাস্টিকা (Ficus elastica Roxb.) রবারের স্থিতিস্থাপকতার জন্য

দান করে, যার ফলশ্রুতি অক্ষয়বট ! ছবি : তপন দাস
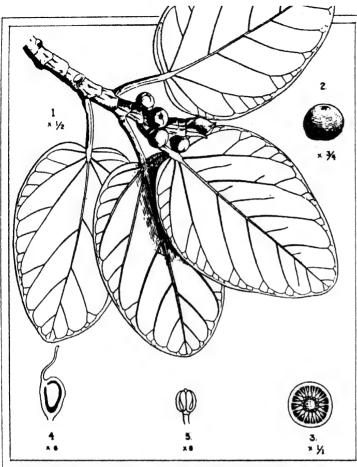
উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বটগাছের অংশবিশেষ—উপবৃত্তাকার মোটা পাতা ও বটফল সমেত কাণ্ডাংশ (১), বটফল ও তার খণ্ডিত রূপ (২ ও ৩), স্ত্রী-ফুলের গর্ভকেশর ও ডিম্বাশয়ের মধ্যস্থিত ডিম্বকের লম্বায়িত ছেদন (৪), পুরুষ-ফুলের একটি মাত্র পুংকেশর (৫), এখানে উল্লেখযোগ্য বটের ফুল খুবই ছোট, একলিঙ্গ—শাঁসালো পুষ্পাধারের ভিতর দিকে ক্রমান্বয়ে পুরুষ, স্ত্রী এবং সর্বশেষে বন্ধ্যা স্ত্রীফুল লোকচক্ষুর অন্তরালে ডুমুরের ফুলটি হয়ে বসে থাকে।

এই প্রজাতির নামকরণটি সকলের মনে ধরবে। পূর্বে উল্লিখিত কৃষ্ণবট—ফাইকাস্ কৃষ্ণি (Ficus Krishnae C. Dc.), অশ্বত্থ গাছ—ফাইকাস্ রিলিজিওসা (Ficus religiosa L.); বলতে গেলে এই গাছ ভারতবর্ষের ধর্মের প্রতীক। ধর্ম সংক্রান্ত নানাবিধ অনুষ্ঠান, আচরণবিধি এর সর্বাঙ্গ ঘিরে রয়েছে। এই গাছের অপর নাম বোধিদ্রুম বা বোধিবৃক্ষ—যা হিন্দু বা বৌদ্ধদের কাছে চির পবিত্র। বৃক্ষপূজার ইতিহাস তো Chalolithic Age, এমনকি আর্যদের পূর্বেও লিপিবদ্ধ রয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার মোহরে অশ্বত্থের দুই ডালের ফাঁকে নগ্নদেবতা অঙ্কিত রয়েছে বা অপরপক্ষে বলা যায় সিন্ধু উপত্যকার মানুষেরা 'অশ্বত্থ-অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা'র উপাসনা করতেন। হোরে-সিন্ধু সময়কাল থেকে সুবিস্তৃত বৈদিক যুগ, বৈদিক-উত্তর এবং আধুনিককাল পর্যন্ত অশ্বত্থের পূজার ট্র্যাডিশন তো সমানে বয়ে চলেছে। কঠোপনিষদ অশ্বত্থ গাছকে তো সর্বকালের মহাজাগতিক এক ডুমুর গাছ বলে চিহ্নিত করেছে যা আমাদের এই সুজলা সুফলা পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছে। ঋগ্‌বেদ, অথর্ববেদ অশ্বত্থ গাছের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। হিন্দুদের কাছে অশ্বত্থ গাছ স্বয়ং দেবতা ভবানীর, সেই সঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের বাসস্থান হিসাবে চিহ্নিত।

আদিম যুগে অশ্বত্থের দুই ডালের সংঘর্ষে আগুন জ্বালার যে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল—সেই প্রথায় আজও যজ্ঞের অনুষ্ঠানে আগুন জ্বালানো হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবৎ গীতায় (১০ম অধ্যায়, ২৬তম শ্লোক) বলেছেন—'অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং, দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ, অর্থাৎ সর্ববৃক্ষের মধ্যে আমিই সেই পবিত্র অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং দেবর্ষিগণের মধ্যে আমিই নারদ।' আবার গীতার অন্য এক শ্লোকে অশ্বত্থ গাছের বিভিন্ন অংশকে তিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে কেরালায় অশ্বত্থ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলতে কেউ সাহস করেন না। বাংলাদেশে সারা বৈশাখ মাস জুড়ে মেয়েরা অশ্বত্থ-পত্র-ব্রত পালন করেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে এই ব্রতের শুরু, উদ্দেশ্য তাঁদের সংসারের আপনজন বাবা, স্বামী বা ভাইয়ের মঙ্গল, সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করা।

রূপসী বাংলার বটগাছের নমুনা থেকেই বৈজ্ঞানিক নামকরণ—ফাইকাস্ বেঙ্গলেনসিস্ হয়েছে। হিমালয়ের পাদদেশের জঙ্গলে, বাংলাদেশে (অবিভক্ত বাংলা), পাকিস্তানে, দাক্ষিণাত্যে পাহাড়ের পাদদেশে, ভারতের অন্যান্য সমতল ভূমিতে এর মনোহর সবুজ সাম্রাজ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

বিষ্ণুপুরাণে সুপরসভা পর্বতে কয়েকশত যোজন ধরে বিশাল বটগাছের অস্তিত্ব রয়েছে যা সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। ভবভূতির উত্তররাম-চরিতে গয়ার ব্রহ্মাযোনি পর্বতে অক্ষয়বটের সুন্দর বর্ণনা সকলকে মুগ্ধ করবে। একবার রামচন্দ্র কর্মপোলক্ষে যখন অযোধ্যার বাইরে যান, দশরথ সীতাকে পিণ্ডদানের জন্য অনুরোধ করেন। রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে শোনেন যে সীতা ইতিমধ্যে পিণ্ডদান করেছেন। কিন্তু সীতার এই কাজের প্রমাণস্বরূপ তিনি অন্যের কাছে সত্যতা যাচাই করেন। আদ্যতুলসী নামে এক ব্রাহ্মণ আর ফল্গু নদী ভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেন। কিন্তু বটবৃক্ষ সীতার কাজের সত্যাসত্য রামচন্দ্রের কাছে ব্যক্ত করেন। ফলে সীতার আশীর্বাদে বটবৃক্ষ অমর বা অক্ষয়বটে রূপান্তরিত হয়।

বোধ করি, বটের এই অমরত্ব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এর দীর্ঘায়ুর জন্য দায়ী। বটগাছ কতো বছর বাঁচে ? এর হিসাব মেলা ভার। এক হাজার, দু হাজার বছর ? মনে হয়, বটগাছের বয়সের গাছপাথর নেই ! এর মূলগ্রন্থি (Main Trunk) মরে গেলেও ঝুরি বা Prop Root-এর সাহায্যে কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ পৃথিবী আঁকড়ে বেঁচে থাকে আর নতুন নতুন ডালপালা গজিয়ে অরণ্যের মতো বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়ে নেয়।

শিবপুর উদ্ভিদ উদ্যানের বিশাল বটগাছটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম গাছ। এর আকর্ষণ সব সময়ে সব দেশের ভ্রাম্যমাণ অতিথিদের কাছে দুর্নিবার। সুযোগ পেলেই তাঁরা এই অপূর্ব অসাধারণ গাছটি দেখে ভারত ভ্রমণ সার্থক করেন। এর প্রতিষ্ঠা সম্ভবত ১৭৮২ সালে। লুটিয়ে পড়া জটের সংখ্যা অনধিক ১৮০০, ছত্র-ছায়ার দৈর্ঘ্য ৪৫০ মিটার, উচ্চতা ৩০ মিটার। ভারতবর্ষে এরচেয়েও বড় বটগাছের হিসাব মিলেছিল। অন্ধ্র উপত্যকায় ৫২০ মিটার ছত্রচ্ছায়া, ৩০০০-এর ওপর ঝুরি-সমন্বিত বটগাছটির নিচে অনায়াসে কুড়ি হাজারের ওপর লোকের জমজমাট আসর বসতো। সবচেয়ে পবিত্র এবং অন্যতম বিশাল বটগাছের সন্ধান মিলেছে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এই তিন নদীর মিলনক্ষেত্রে অর্থাৎ এলাহাবাদের সঙ্গমতীর্থে। নদীয়া জেলায় হবিবপুরের কাছে আর বাঙ্গালোরে রামহালির বটগাছও কম যায় না !

বৈদিক যুগেও বড় বড় বটগাছের উল্লেখ রয়েছে। রাস্তার ধারে, গ্রামে, বাড়ির আঙিনায় বটগাছ লাগানোর ব্যাপক প্রচেষ্টা ছিল। হিন্দু, জৈন এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অন্ধ ধর্মবিশ্বাস—এই সমস্ত গাছে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত করতো। ফলে গাছগুলি আপন খেয়ালে বেড়ে উঠতো। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে বটগাছ
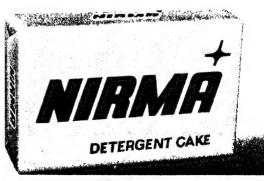
চুলের স্বাস্থ্য

মাথার চামড়ার নিচে গ্রন্থি থেকে তেল তৈরী হয় চুলের আহার যোগাতে। সে আহারে যখন ঘাটতি হয় তখনই বিপদ। চুল শুকনো ভঙ্গুর ও জৌলুসহীন হয়ে ওঠে। লম্বা চুলের ডগা চিরে যায়।

চুলের স্বাস্থ্য অটুট রাখতে ক্লিওপাট্রার আমল থেকে ক্যান্থারিস বিটল'এর রস ব্যবহার হয়ে আসছে। চুলের গোড়ায় ক্যান্থারাইডিন সযত্নে ম্যাসাজ করলে দেখবেন 'কিউটিকল' মসৃণ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে, আরও ভিতরের করটেক্স'এ রঙ কোষের অভাব পূরণ করবে। চুলে পাক ধরবে না সহজে।

বিশাল এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রতীক। আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথিতে বাংলাদেশে হিন্দু বিবাহিতা রমণীরা বটগাছকে সাবিত্রীজ্ঞানে পূজা দেন (বট-সাবিত্রী দিবস)—স্বামীদের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায়। শিবঠাকুর তো এই বটগাছের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। পুরাণে বর্ণিত রয়েছে বটের নিচে বসে শিব দক্ষিণমুখী থাকলে—তাকে 'দক্ষিণমূর্তি' বলা হয়। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ইত্যাদি ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে—যেখানে যেখানে বটগাছের অস্তিত্ব রয়েছে সেখানকার হিন্দুরা বটগাছের পূজা করে থাকেন। দেখা গেছে, এই গাছের গোড়ায় পুণ্যার্থীরা মৃত বংশধরদের উদ্দেশে শেষ পূজার্চনা করে তাদের তীর্থযাত্রা সমাপ্ত করেন। পঞ্চপল্লবের একটি পাতা বটপাতা—যা যে-কোন পূজা-আর্চায় লাগে। পূর্বে অশ্বত্থ, পশ্চিমে বট আর অন্য তিন দিকে বেল, আমলকী আর অশোক গাছ নিয়ে তন্ত্রে বর্ণিত 'পঞ্চবটী'।

হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ যে-কোন ধর্মাবলম্বী সাধু ব্যক্তি বট বা অশ্বত্থ গাছের নিচে সাধন-ভজন করতে ভালবাসেন। তাঁদের মতে ঈশ্বরের উপাসনার এরচেয়ে প্রকৃষ্ট স্থান আর নেই। বৌদ্ধধর্মের বোধিবৃক্ষ শুধু অশ্বত্থ নয়, বটও বটে! সম্রাট অশোক সুশীতল ছায়া আর আশ্রয়ের জন্য সারা দেশময় বট আর অশ্বত্থ গাছ লাগানোর নির্দেশ দেন। প্রাচীন ভারতীয় ঋষি বরাহ-মিহির অশ্বত্থ গাছের সঙ্গে বাড়ির সামনে বটগাছ রোপনের উপদেশ দিয়েছেন যার ফলে বাড়ির অধিবাসীরা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আর সুখের অধিকারী হবেন। এই গাছ দুটিকে অনেক সময় স্ত্রী আর পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। বট হচ্ছে পুরুষের প্রতীক, অশ্বত্থ নারীর। এরা পরস্পর বিবাহিত দম্পতি। সন্তান সম্ভাবনায় এদের পূজা অতি অবশ্য কর্তব্য বলে আজও মনে করা হয়। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষেরা সন্তান কামনায় এই গাছ প্রদক্ষিণ করে মন্ত্র উচ্চারণ করেন। বিশেষ করে পূর্ব ভারতে ছোট ইটের টুকরো বা পাথরনুড়ি দড়ি দিয়ে বেঁধে সন্তান কামনায় অনেক দম্পতি বট বা অশ্বত্থ গাছে ঝুলিয়ে দেন। বটের পাতা তো ষষ্ঠীপূজার (Fertility Cult) বা জামাইষষ্ঠীর অপরিহার্য অঙ্গ। এই গাছের সহস্রাধিক ঝুরি বা Prop root জীবনের দীর্ঘায়ুর প্রতীক। ষোড়শ-মাতৃক পূজা, নান্দীমুখ, শ্রাদ্ধ-শান্তিতে বটপাতার ব্যবহার রয়েছে।

ওড়িশার একাধিকবার বিপত্নীক-হওয়া ব্যক্তিকে বটের চারার সঙ্গে অশ্বত্থের চারার বিবাহ দেবার রীতি রয়েছে যার ফলস্বরূপ বিবাহিত পত্নী দীর্ঘায়ু প্রাপ্তা হবেন।

বটগাছের নিচে বেদী তৈরি করে তার ওপর বিভিন্ন আকৃতির পাথর—বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তির রূপ নিয়ে বহু যুগ ধরেই পূজা পাচ্ছেন। কেউ-বা শিব, কেউ-বা শীতলা, কেউ-বা ষষ্ঠী। কখনও-বা বিশাল মন্দির নির্মিত হচ্ছে—এই বটগাছকে কেন্দ্র করে। ভারতের একান্নটি পীঠস্থান—হয় বট না হয় অশ্বত্থ গাছ নিয়ে অগণিত ভারতবাসীর কাছে পবিত্র তীর্থস্থানে

প্রকৃতির কোলে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান আর কোথায় মিলবে? *ছবি : অমিতাভ ভট্টাচার্য*

পরিণত হয়েছে। বটকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত বিশাল মন্দির গড়ে উঠেছে তার মধ্যে সাঁইথিয়া রেল স্টেশনের কাছে নন্দিনীর (সতী বা পার্বতী) মন্দির, আর আসামের কামরূপে কামাখ্যার মন্দির সকলের পরিচিত।

শুধুমাত্র দেবদেবীরাই বটগাছকে কেন নিজেদের এক্তিয়ারে একচেটিয়া করে রাখবেন? ভারতের কিছু কিছু স্থানের অধিবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস এই বট-অশ্বত্থ গাছই অশরীরীদের প্রকৃত বাসস্থান। অথর্ববেদে কথিত আছে বটগাছ যক্ষ, গন্ধর্ব আর অপ্সরাদের বাসভূমি। ফলে এদের নিয়ে বট গাছকে কেন্দ্র করে অনেক কিংবদন্তী আর কুসংস্কার গড়ে উঠেছে।

আড়াই হাজার বছর আগে বিহারের বুদ্ধগয়ায় ভগবান বুদ্ধ অশ্বত্থ বা বোধিবৃক্ষের নিচে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। শোনা যায়, শ্রীলঙ্কায় অনুরাধাপুরে যে বোধিবৃক্ষ আজ অজস্র ডালপালা বিস্তার করে শত শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশ্রয় দিচ্ছে তা বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের অংশ থেকে জন্মেছে। প্রায় ২৫৮-২৪১ খ্রীঃ পূর্বে এই উদ্ভিদাংশ রোপণ করা হয় এবং সম্ভবত এই গাছটিই পৃথিবীর অন্যতম ঐতিহাসিক বৃক্ষ। সম্রাট অশোক তাঁর পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) ও কন্যা যথাক্রমে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে ঐ সময়েই বৌদ্ধধর্মের এবং কৃষ্টির প্রতীক বটগাছের চারা দিয়ে সিংহলে প্রেরণ করেন। আধুনিক যুগে স্বাধীনতা-উত্তর যে সমস্ত সাংস্কৃতিক দল বা Cultural Delegation বৌদ্ধ-অধ্যুষিত দেশে গেছেন—সবসময়েই তাঁরা ভালবাসা, বন্ধুত্ব এবং পুরাণত্বের প্রতীক ঐ বট বা অশ্বত্থের চারা সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

শুধু হিন্দু বা বৌদ্ধদের কাছেই বট বা অশ্বত্থ গাছ পবিত্র নয়—ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও এই গাছের ছত্রচ্ছায়াতে প্রার্থিত মঙ্গলময় ঈশ্বরের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। এই বাংলায় বটতলাকে 'পীরতলা' করে অনেক মুসলমান ফকির আর দরবেশ বাস করেন। অপরপক্ষে শিখেরা বট আর অশ্বত্থ গাছকে স্রষ্টা হিসাবে দেখেন।

এ দৃশ্য ভারতের সর্বত্র চোখে পড়ে। গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গবাদি পশুর অন্যতম খাদ্য এই বটপাতা। বিশালদেহী হাতি এই বটপাতার ওপরই নির্ভরশীল। অগণিত পাখি এই বটফল খেয়েই বেঁচে থাকে। খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষে বটফল অনেক সময় বিকল্প খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বটের দুধের মতো আঠা—ব্যথা, বেদনা, বাতে বিশেষ উপকারী। বটের ছাল—আমাশয়, পেটের অসুখ বা বহুমূত্র রোগে আশ্চর্যরকম ভাবে কাজ দেয়। বটের পাতা পুলটিস্ করে ফোঁড়ায় লাগালে ব্যথা কমে যায়। সর্বোপরি মনে হয়, বটের সর্বাঙ্গ দিয়ে যে সুশীতল ছায়ার আশ্রয় বা ঘেরাটোপ সেখানে হৃদয়ের ব্যথা, মনের ব্যথা নিয়ে হাজার হাজার ভারতবাসী ছুটে যাচ্ছে একটু উপশমের জন্যে।

দেখা যাচ্ছে বট, অশ্বত্থ গাছ দুটি সামাজিক, পৌরাণিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে ভারতের মানুষের মনে এই গাছকে কেটে ফেলা, ছেঁটে ফেলা, উপড়ে ফেলা ভয়ঙ্কর অপরাধের শামিল। এই গাছ কাটা ব্রহ্ম-হত্যারই নামান্তর মাত্র। এতোটুকু বীজ থেকে পর্বতপ্রমাণ মহীরুহে পরিবর্তনের চমকপ্রদ ঘটনায় বটগাছই বোধকরি সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই অত্যাশ্চর্য বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিকেরাও আজ সচেষ্ট। বট-বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি-হরমোন (growth hormone) ইনডোল-জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ, সেই সঙ্গে জিব্বারিলিন্ আর সাইটোকাইনিন সক্রিয় হয়ে ওঠে। বটগাছের চরিত্রের ধারক ও বাহক

বিশাল অরণ্য-সদৃশ বটগাছ—সবুজের সমারোহে সাম্রাজ্য বিস্তার করে আছে
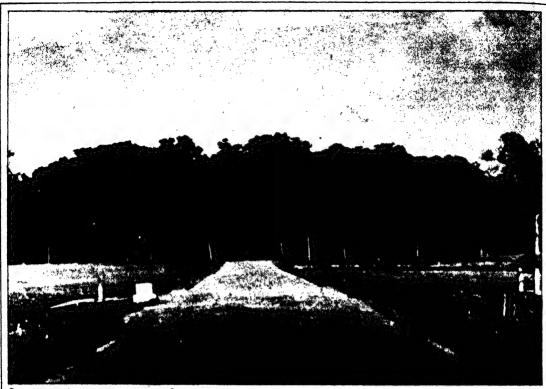
ছাব্বিশটি ক্রোমোসোমে সজ্জিত মুক্তমালার মতো gene সমূহের বিশ্লেষণের এই তিল থেকে তালের রহস্যের যবনিকাপাত ঘটবে। তবুও মানবজীবনে এই বিস্ময়কর দৃষ্টান্তের অনুপ্রেরণা চিরকালই থাকবে।

বীজ থেকে বটগাছের জন্ম-বৃত্তান্ত একটু আশ্চর্যের। কারণ, গাছ থেকে নিচের মাটিতে বীজ পড়ে জন্মায় না বললেই চলে। বটফল—পাখি বা অন্য কোন জন্তুর পাচকতন্ত্রের (gastro--intestinal tract) মধ্যে দিয়ে না এলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হচ্ছে পাখি বা জন্তুর পাচকতন্ত্রের অম্লরসে বট-বীজের আবরণ বা Seed Coat নরম হয়ে অঙ্কুরোদ্গমে উপযোগী হয়। সবচেয়ে যা লক্ষণীয় এই সমস্ত বীজ পাখি বা জন্তুর মারফত বাড়ির দেওয়ালে, গাছের মাথায় (খেজুর গাছ, তালগাছ ইত্যাদি), মন্দিরের খাঁজে পড়ে জন্মাতে শুরু করে। বাতাস আর বৃষ্টির জল থেকে বট-অশ্বত্থের চারা বাঁচার রসদ যুগিয়ে নেয়। বট-অশ্বত্থের এই সমস্ত চারা উপড়ে ফেলা, ছিঁড়ে ফেলা ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর কাছে সম্ভব নয়। ফলে ঐ সমস্ত বাড়ি, পাঁচিল, মন্দির কালপ্রবাহে শিকড়ের প্রচণ্ড চাপে ভেঙে পড়ে। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কাম্বোডিয়ার প্রাচীন হিন্দু মন্দির 'ওঙ্কারভাট' আর জাভার 'বরোবিদুর' আর গ্রাম্‌বাণামের হিন্দু মন্দির যা আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে।

যে গাছ জীবনভর শুধু দিয়েই গেছে—মায়ের মতো মুখ বুজে সব সহ্য করেছে, স্নেহ দিয়ে আগলে রেখেছে, তার দেহের প্রতিটি কোষ ভারতবাসীর কাছে একান্ত প্রিয়, নমস্য। পবিত্র স্রোতস্বিনী গঙ্গা যদি ভারতের অগণিত মানুষের প্রবহমান জীবনস্রোত বলে চিহ্নিত হয়, বটবৃক্ষের বিশাল সবুজ সাম্রাজ্য তবে সর্বংসহা ভারতাত্মার প্রতীক। এর সুন্দর, সুবিশাল, সুশীতল ছত্রচ্ছায়া—শত্রু-মিত্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কবি-অকবি, বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক, সাধু-অসাধু, কাপুরুষ-মহাপুরুষ, সুখী-দুঃখী, ধনী-নির্ধন, শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মনের অপার শান্তি, শান্তির নীড়, ক্ষণিকের আশ্রয়।

সংসারের হৃদয়হীন, শঠ এবং মেকি সভ্যতার মুখোসের অন্তরালে মানুষের পরম সম্পদ সবুজ মনটি পুড়ে পুড়ে যখন খাক হয়ে যাচ্ছে, প্রবঞ্চনার তুষাগ্নি বুকটাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে—এতোটুকু শান্তির স্থান পৃথিবীতে যখন দুর্লভ—বটবৃক্ষের পল্লবে পল্লবে স্নিগ্ধ মৃদুমন্দ সমীরণ, ডালে ডালে পাখির কূজন যেন পরমাত্মীয়ের হাতছানি। ছিন্নমূল বাস্তুহারার দল, দলে দলে যখন আপন-প্রিয় গ্রামটি ছেড়ে চোখের জলে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিল—সেই হাজার হাজার নরনারীকে শত সহস্র বটতলা সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছিল। সে আশ্রয় শূন্য আকাশের নিচে, তাপদগ্ধ ধরিত্রীর বুকে অতিথিদের অন্তত ক্ষণিক শান্তির বন্ধনে বেঁধেছিল। ভগ্ন-হৃদয়কে জোড় লাগিয়ে সর্বংসহা বটবৃক্ষ যখন পরম শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয় তা ভারত-আত্মার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করা মাত্র। চরম দুঃখ বা আনন্দের সন্ধিক্ষণে—জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে এতোবড় শিক্ষা আর কে দিতে পেরেছে?

জন্ম-জন্মান্তর ধরে মানুষের জীবন-শুরুর অধ্যায় থেকে শেষ পর্যন্ত নীল আকাশের নিচে জীবনের সব ঘটনার প্রতিচ্ছবি বটের অজস্র পাতায় পাতায় ভরে গেছে। তার মর্মরধ্বনি আমাদের জীবনের সঙ্গীত—কখনো তা বিষাদের, কখনো বা আনন্দের। যে কিশোরী বধূটি লাজরক্ত মুখে ঘোমটার আড়ালে গ্রামের আঙিনায় আলতা পায়ে একদিন দাঁড়িয়েছিল, খুনখুনে সধবা বুড়ির বেশে ধবধবে সাদা চুলে সিঁদুরের টকটকে লাল আবিরে চলে গেল—তার আগমনী ও শেষ বিদায়দৃশ্য বটগাছ নীরবে দাঁড়িয়ে দেখেছে। আবার যে চঞ্চলমতি বালক একদিন বটের ঝুরিতে দোলনা বেঁধে ছোট বোনের সঙ্গে আনন্দে দুলেছিল, সুদীর্ঘকাল বিদেশ প্রবাসের পর গ্রামে ফিরে অবাক বিস্ময়ে বটগাছের দিকে তাকিয়ে হারিয়ে যাওয়া বোনটিকে মনশ্চক্ষে হঠাৎ দেখে তার দু' চোখ জলে ভরে উঠেছে—সে দৃশ্যও তো বটগাছের নজর এড়ায়নি? জীবন সায়াহ্নে, পৃথিবীর এই লীলা সাঙ্গ করে, মায়ার বন্ধন কাটিয়ে যখন চলে যেতে হবে—মহাকালের সাক্ষীর কাছে শুধু একটা কথাই বলার থাকে—'ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে/ওগো প্রাচীন বট!'

এই নিবন্ধ রচনায় অপ্রকাশিত যে বিজ্ঞান-পত্রটির জন্য বিশেষভাবে ঋণী তা R. K. Basak and K. Thothathri রচিত— 'The ethnabotany of Ficus L. (Moraceae) in India'.

গিলগিটের বৌদ্ধস্তূপ ও ভারতের প্রাচীনতম অণুচিত্র

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের এক দুপুরবেলা। ভারতীয় উপমহাদেশের সুদূর উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর রাজ্যের লগিট অঞ্চলের একটি ছোট্ট গ্রাম—নাম নবপুর নউপুর (আজ যা পাকিস্তানের দখলে)। লগিট শহরের পশ্চিমে প্রায় তিন মাইল দূরে ক নদীর ধারে এই জনবসতি। এই গ্রামেরই হলেরা গরু ভেড়া চরাত এক টিলার কাছে। য়দিন ধরেই তাদের চোখে পড়ছিল টিলার পরে কিছু ধ্বংসস্তূপ। এদের মধ্যে সবচেয়ে ড়টির আকার নজর কাড়বার মত। রাখালরা স্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল যে এটির ভিতর থকে একটি বড় কাঠের খুঁটি বা লাঠি উঁচু হয়ে াড়িয়ে আছে, তার বেশ খানিকটা অংশ অন্য বংসাবশেষের মাথা ছাড়িয়ে শূন্যে উঠে গেছে।

মে মাসের ঐ দুপুরবেলায় একজন রাখাল কৌতূহলভরে এগিয়ে গেল ধ্বংসস্তূপে কি আছে দেখতে। কিছু খোঁড়াখুঁড়ির পরে সে পেল অনেক াটির চাকতি ; প্রায় টাকার আকারের, আর কিছু াঠের খুঁটি। ছেলেটি ভাবল সে বোধ হয় কোন বর খুঁড়ে ফেলেছে, যে কাজ তার মুসলমান র্মবিশ্বাসে গর্হিত বলে মনে হতে পারে। ও ভয় পেয়ে আর খুঁড়ল না, অবশ্য খবরটা জানিয়ে দিল গ্রামের বড়দের। বড়রাও পরামর্শ করে স্থির করল আর খোঁড়াখুঁড়ি না-করাই ভাল। কিন্তু ওদের মধ্যে একজন ঐ ধ্বংসস্তূপে গুপ্তধন পাবার আশায় সবার উপদেশ অগ্রাহ্য করে পরের দিন ভোরেই লেগে গেল সবচাইতে বড় ধ্বংসস্তূপটি খুঁড়তে। কিছুক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল প্রচুর গোলাকার মাটির চাকতি, ফলক ও বৌদ্ধস্তূপের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। এসব ছাড়াও পাওয়া গেল কাঠের এক বিরাট বাক্স, যার মধ্যে ছিল পাশাপাশি পুঁথিভরা পাঁচটি বাক্স। লোভী লোকটি হতাশ হয়ে পড়ল, কারণ সে খুঁজছিল ধনরত্ন, আর পেল কিনা ছেঁড়া পুঁথি যার কোনও মূল্য তার কাছে নেই। ওগুলি থেকেই রেহাই পাবার জন্য সেগুলি বাক্সসমেত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়ে দিল। কর্তৃপক্ষও এ-সম্পর্কে কিছু জানতেন না অথবা তাদের কিছু জানবার উৎসাহ ছিল না। পুঁথিভর্তি বাক্স পড়ে রইল গিলগিটের উজিরের (অন্য মতে তহ্‌শীলদারের) কার্যালয়ের এককোণে। বাক্সটির উপরে ধুলো জমতে লাগল।

চিত্র নং ৪ : মধ্য এশিয়ার কিজিলে প্রাপ্ত ৬ষ্ঠ শতাব্দীর এক চিত্র

এর কিছুদিন পর এক কার্বোশলকে প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ স্যার অরেল স্টাইন গিলগিটে এলেন। তিনি বাক্স আবিষ্কারের কথা শুনে ওটা দেখতে এলেন। এবার গিলগিটের নাটক জমে উঠল। স্যার অরেল পুঁথিগুলি দেখে আনন্দে উত্তেজিত, কারণ এই ধরনের পুঁথি তিনি আগেই চীনের অন্তর্গত মধ্য-এশিয়া অঞ্চলে দেখেছেন। প্রধানত ভূর্জপত্রের উপরে লেখা এই পুঁথিগুলি বিভিন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থের পুরাতন প্রতিলিপি। এগুলির অনেক কয়টিই আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রচলিত এক ধরনের শিল্পসুষমামণ্ডিত অলঙ্কৃত ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা। অভিজ্ঞ পুরাতত্ত্ববিদের মনে হল যে-ধ্বংসাবশেষ থেকে এগুলি উদ্ধার করা হয়েছিল, সেটি কোনও স্তূপের ভগ্নাংশ। চীনের অন্তর্গত মধ্য এশিয়ার কয়েকটি স্তূপের ভিতরে পুঁথি আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা তাঁর আগেই হয়েছিল।

এই আবিষ্কারের গুরুত্ব বুঝবার পর স্যার অরেল এই স্তূপ থেকে পাওয়া দুটি পুঁথি পাঠালেন লণ্ডনের ব্রিটিশ ম্যুজিয়ামে পরীক্ষার জন্য। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল এই আবিষ্কারের কথা।

এদিকে নবপুর গ্রামের লোকেরা ঐ ধ্বংসাবশেষ থেকে মাঝে মাঝে পুঁথির পাতা জোগাড় করে নিয়ে এসে কাঁচা ঘরের ছাদ ছাইবার বা ছাদের সঙ্গে খুঁটি বাঁধবার কাজে ব্যবহার করছিল। আবার কখনও কখনও পাতাগুলির উপরে অস্পষ্ট সোজা দাঁড়ান রেখাকে আরবী অক্ষর আলিফ পড়ে এবং এটিকে "আল্লাহ্" বা "ঈশ্বরের" নামের সংক্ষেপ মনে করে সেগুলিকে দিয়ে তাবিজও তৈরি করত। এক সূত্রের খবর অনুযায়ী স্যার অরেল ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যে দুটি পুঁথি পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জোগাড় করা, উপরোক্ত বাক্স থেকে নয়। যাইহোক, এই সব পুঁথিই এসেছিল একটি স্তূপেরই ধ্বংসাবশেষ থেকে।

এই আবিষ্কারের ফলে বিদ্বৎসমাজের কৌতূহল আস্তে আস্তে জেগে উঠল পুঁথিগুলি সম্বন্ধে। যে ধ্বংসাবশেষ থেকে সেগুলি পাওয়া তার প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কেও। ফরাসী পুরাতত্ত্ববিদ জে. হাঁকা ধ্বংসাবশেষটি দেখে একে এক স্তূপের ভগ্নাংশ বলে মত প্রকাশ করলেন। বিশ্ববিশ্রুত ভারততত্ত্ববিদ্ সিলভ্যাঁ লেভি, এখানে আবিষ্কৃত কয়েকটি পুঁথির উপর এক সুচিন্তিত প্রবন্ধও প্রকাশ করলেন। কিন্তু কাশ্মীর সরকারের দীর্ঘসূত্রতার জন্য আরও সাত বছর কেটে গেল ঐ ধ্বংসাবশেষে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুসন্ধানের উদ্যোগ নিতেই। অবশেষে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্টে কাশ্মীর সরকার পাঠালেন মধুসূদন কাউলকে ঐ স্থানে উৎখননের জন্য। এই উৎখননের ফলে নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে ধ্বংসাবশেষটি একটি বৌদ্ধস্তূপের। এটি একই সারিতে নির্মিত চারটি স্তূপের মধ্যে আকারে সবচাইতে বড়। এটির স্থান সারির বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয় ও ডান দিক থেকে তৃতীয়। হাঁকার মত কাউলও একে "সি" (c) নং স্তূপ বলে চিহ্নিত করলেন।

স্তূপগুলির পারস্পরিক অবস্থান ও তাদের যেকোনও দুটির মাঝে একই মাপের ফাঁকা জায়গার ছাড় থেকে মনে হয় যে সবগুলি স্তূপই একই পরিকল্পনা মত এক সময়ে নির্মিত। বড় স্তূপটি অর্থাৎ "সি" বা "গ" নং স্তূপটি বোধহয় ছিল দুটি চৌকা পাদপীঠের উপরে। এই পাদপীঠ দুটির বড়টির উপরে ছোটটি এবং তারও উপরে ছিল অণ্ড বা প্রায় অর্ধ গোলাকৃতি এক সৌধ। সাধারণত এই ধরনের সৌধর ভিতর থাকত নিরেট (অনেক সময় ছোট্ট একটি কুঠরি বাদ দিয়ে)। কিন্তু "গ" নং স্তূপের অণ্ড ছিল ফাঁপা। অর্থাৎ এর ভেতরে একটা বড় ঘর, যার চাল ও দুইপাশ ঠেকা দেবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল কাঠের খুঁটির। এর মধ্যে বাক্স ভর্তি পুঁথি, অসংখ্য মাটির তৈরি ক্ষুদ্রাকৃতি স্তূপ, মূর্তি উৎকীর্ণ মাটির ফলক ইত্যাদি রেখে স্তূপটি সবদিক থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ স্তূপটির নির্মাণ শেষ হবার পর ওটার মধ্যে ঢোকার উপায় ছিল না।

এইভাবে বই ও অন্যান্য দ্রব্য উৎসর্গ করে স্তূপ তৈরির প্রথা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। স্যার অরেল এর নিদর্শন দেখেছিলেন চীনের অন্তর্গত মধ্য-এশিয়ার কয়েকটি স্থানে। তুন হুয়াং বা দুন হুয়াং-এ প্রাপ্ত এক রেশমী টঙ্কায় এই ধরনের এক স্তূপ তৈরির ছবি আঁকা আছে।

নবপুরের গ নং স্তূপ থেকে উদ্ধার করা পুঁথিগুলির অধিকাংশই ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত বাক্সটির মধ্যে পাওয়া। ছয়টি সম্পূর্ণ (বা সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ মিলিয়ে ছয়টি) পুঁথি এবং বিভিন্ন পুঁথির কিছু পাতা পাওয়া গিয়েছিল ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের উৎখননে। এছাড়া কিছু পুঁথির পাতা পাওয়া গেছে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। ওরা এগুলি জোগাড় করেছিল ঐ স্তূপ থেকেই। পাকিস্তানের জনৈক সেনানীর কাছ থেকে বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ তুচ্চি যে কয়খানি গিলগিটে আবিষ্কৃত পুঁথি কিনেছিলেন তাও এসেছিল ঐ স্তূপ

চিত্র নং ৫ : মধ্য এশিয়ার কুমতুরাতে প্রাপ্ত ৮ম-৯ম শতাব্দীর এক চিত্র

নং ৬ : "গ" নং স্তূপে আবিষ্কৃত শিল্প সুষমামণ্ডিত অলঙ্কৃত ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা পুঁথির এক পাতা

ক বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে ঐ
় প্রাপ্ত বাক্সটি থেকে। ঐ বাক্সটির সব পুঁথি
মহাযুদ্ধের আগে শ্রীনগরে পাঠান সম্ভব
নি। যুদ্ধের শেষে ঐগুলি গিলগিটের কাছে
জর সেনানিবাসে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়। কিন্তু
৪৭-এ দেশবিভাগের কিছুদিন পর
াদারদের আক্রমণের সময় খুব সম্ভবত ঐগুলি
হয়ে যায় এবং পরে পাকিস্তানের বাজারে
় হতে থাকে বা লোকচক্ষুর আড়ালে হারিয়ে
। তুচ্চি ঐগুলির কয়েকটি কিনেছিলেন।
আজ বিশ্বের বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে "গ" নং স্তূপে
বৈকৃত পুঁথি ছড়িয়ে আছে। এই সব
গ্রহশালার মধ্যে আছে শ্রীনগরের স্যার প্রতাপ
হ মিউজিয়াম ও সেন্ট্রাল এশিয়ান মিউজিয়াম,
ল্লির ন্যাশনাল আর্কাইভ (?), কলিকাতার
িয়ান মিউজিয়াম, করাচির ন্যাশনাল মিউজিয়াম
ং লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। যে সকল
ণ্ডিত এই পুঁথিগুলি নিয়ে পড়াশুনা করেছেন
ং এগুলির বেশ কয়েকটি সম্পাদনাও করেছেন
দের তালিকায় এক অতি বিশিষ্ট নাম একজন
ঙালী পণ্ডিতের। তিনি নলিনাক্ষ দত্ত। একথা
বলেও ভাল লাগে।
দুঃখের বিষয় "গ" নং স্তূপে আবিষ্কৃত
থিগুলির কোনও সম্পূর্ণ তালিকা আজও
কাশিত হয়নি। তবে এগুলির অধিকাংশই
ণ্ডিতেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন। পুঁথিগুলি
র সবই ভূর্জপত্রের, কেবলমাত্র একটি
লপাতার ও আর একটি (?) কাগজের।
গুলির বিষয়বস্তু বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত এবং ভাষা
ক ধরনের সংস্কৃত, যা সবসময়ে ব্যাকরণসম্মত
। এই সঙ্কর জাতীয় সংস্কৃতকে পণ্ডিতেরা
Buddhist Hybrid Sanskrit বলে থাকেন।
আলোচ্য পুঁথিগুলির বেশকিছু পুঁথি আনুমানিক
ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রচলিত এক ধরনের
শিল্পসুষমামণ্ডিত অলঙ্কৃত ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা
(চিত্র নং ৬)। অন্যগুলি সারদা শ্রেণীর ব্রাহ্মী
লিপির বিকাশোন্মুখ স্তরের অক্ষরের আদলে লেখা
(চিত্র নং ৭)। নিয়মিত সারদা লিপির ব্যবহারের
প্রথম নিদর্শন ৮ম শতাব্দীর অষ্টম দশকের তারিখ
সমন্বিত হওে প্রাপ্ত একটি লেখ। সুতরাং
বিকাশোন্মুখ সারদা (proto-sarada) লিপির
ব্যবহার ৬ষ্ঠ শতাব্দীর অলঙ্কৃত ব্রাহ্মীর পরে এবং
মোটামুটিভাবে আনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে
হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। সেক্ষেত্রে স্তূপে
পাওয়া পুঁথিগুলির তারিখ ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম
শতাব্দী।

বৌদ্ধদের কাছে ধর্মবিষয়ক পুঁথি ছিল অতি
পবিত্র। এগুলিকে অনেক সময় ধর্মরত্ন বলা হয়,
এমনকি পূজা করা হত। কাজেই পুরাতন বা জীর্ণ
ও অব্যবহার্য পুঁথি ফেলে না দিয়ে কোনও স্তূপের
মধ্যে চিরকালের জন্য জমা রেখে সেই স্তূপের
পূজা করা বৌদ্ধদের কাছে অনেক বেশি কাম্য
হওয়া স্বাভাবিক। "গ" নং স্তূপেও রাখা হয়েছিল
প্রায় তিনশ বৎসর ধরে লেখা নানা পুঁথি। এদের
মধ্যে জমা রাখার তারিখের কাছাকাছি সময়ের
কিছু পুঁথিও থাকতে পারে। কারণ, পুঁথি লিখিয়ে
দান করলে বা রক্ষার ব্যবস্থা করলেও পুণ্য হত।

পুঁথিগুলির সঙ্গে যেসব ক্ষুদ্রাকৃতি স্তূপ উদ্ধার
করা হয়েছে সেগুলি অবশ্য বড় স্তূপের ভিতরে
রাখার উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছিল। মধ্য
এশিয়াতেও ফাঁপা স্তূপের ভিতরে এই ধরনের বহু
ক্ষুদ্রাকৃতি স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। স্তূপের ক্ষুদ্র
প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে পাওয়া গেছে মাটির চাকতি
এবং ভূর্জপত্রের তাবিজ। চাকতিগুলির উপরে
উৎকীর্ণ এক বিখ্যাত বৌদ্ধ সূত্র। তাবিজগুলিতে
বুদ্ধদেবের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে যে তিনি
যেন রাজা নন্দিদেবকে দীর্ঘায়ু ও শক্তিমান
করেন। অর্থাৎ স্তূপের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিগুলি
নন্দিদেব নামে এক রাজার সময়ের। ঐগুলি যদি
বড় স্তূপ নির্মাণের সময়ে তৈরি হয়ে থাকে তবে
তা নন্দিদেবের রাজত্বকালের এক কীর্তি। এখানে
উল্লেখযোগ্য যে এই রাজা নন্দিদেবের নামাঙ্কিত
ও বিকাশোন্মুখ সারদা লিপিতে অর্থাৎ ৭ম-৮ম
শতাব্দীতে লেখা এক পুঁথির পুষ্পিকাতে তাঁর ও
তাঁর মহিষীর সুরক্ষা ও শতায়ু প্রার্থনা করা
হয়েছে। এই পুষ্পিকাতে এই রাজার উপাধিসহ
পুরো নাম লেখা হয়েছে বহ্যসুবাহি পটোলষাহি শ্রী
নবসুরেন্দ্রাদিত্য নন্দিদেব।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে
৭ম-৮ম শতাব্দীর কোনও রাজা নন্দিদেবের
আমলে "গ" নং স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। ওর
ভিতরে যা কিছু পাওয়া গেছে তা আনুমানিক
৮০০ খ্রীষ্টাব্দের বা তার পূর্বের।

॥ খ ॥

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের উৎখননে যেসব পুঁথি
পাওয়া গিয়েছিল তাদের মধ্যে তিনটি ছিল কাঠের
মলাট সুদ্ধ। এগুলি প্রথমে রাখা হয় শ্রীনগরের
স্যার প্রতাপ সিংহ মিউজিয়ামে এবং কয়েক বৎসর
আগে ঐ মলাটগুলিকে এনে রাখা হয়েছে কাশ্মীর
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সেন্ট্রাল এশিয়ান
স্টাডিজের সংশ্লিষ্ট মিউজিয়ামে। এই তিন জোড়া
কাঠের মলাটের বর্তমান সংগ্রহ নং ৮০-১১৫,

ত্র নং ৭ : বিকাশোন্মুখ সারদা লিপিতে লেখা একটি পুঁথির পাতা

৮০-১১৬ ও ৮০-১১৭।

এদের মধ্যে ৮০-১১৫ নং মলাট দুটি "সংঘাতসূত্র" নামের এক মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থের বিকাশোন্মুখ সারদা লিপিতে লেখা ৭ম-৮ম শতাব্দীর একটি প্রতিলিপির সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল। প্রতিলিপিটি ভূর্জপত্রের উপরে লেখা। প্রসঙ্গত বলা যায় যে সংঘাতসূত্রে বুদ্ধের সঙ্গে দুই বোধিসত্ত্বের কথোপকথন জাতকের গল্প ইত্যাদি ছাড়াও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ শ্রবণ, পঠন, লেখন এবং সংরক্ষণের দ্বারা পুণ্য সঞ্চয়ের কথা বলা হয়েছে। এই গ্রন্থেরই এক অসম্পূর্ণ (?) প্রতিলিপি বেঁধে রাখা হয়েছিল ৮০-১১৬ নম্বর এক জোড়া মলাট দিয়ে। ভূর্জপত্রের উপর লেখা এই প্রতিলিপিটি খুব সম্ভবত ৬ষ্ঠ শতাব্দীর। মধুসূদন কাউলের মত অনুসারে ৮০-১১৭ নম্বর দুটি মলাট ঢেকে রেখেছিল "আর্যধর্ম" নামে তালপাতার উপরে লেখা একটি পুঁথিকে। এটি আনুমানিক ৬ষ্ঠ শতাব্দীর।

তিনজোড়া মলাট তিন রকমের কাঠের। উইলো গাছের কাঠে তৈরি ৮০-১১৫ নম্বর মালাট জোড়া। ৮০-১১৭ নম্বর মলাট জোড়া পপলার গাছের কাঠের। খুব সম্ভবত শিশুগাছের কাঠ দিয়ে তৈরি ৮০-১১৬ নং দুটি মলাট। মলাটগুলি আয়ত আকারের ; লম্বা ২৩ থেকে ২৭·৫ সেমি এবং চওড়া ৫ থেকে ৮ সেমি এর মধ্যে। কালের প্রভাবে সব কয়টিই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত। প্রত্যেকটি মলাটের একটি করে ছিদ্র লক্ষণীয় ; অবশ্যই এটির মধ্যে সুতা লাগিয়ে এটিকে সংশ্লিষ্ট পুঁথির পাতাগুলির সঙ্গে বেঁধে রাখা হত।

দুই জোড়া মলাটের (৮০-১১৬ ও ৮০-১১৭ নম্বর) প্রতিটির একদিকে রঙিন পদ্মের অলঙ্করণ। অন্য জোড়া মলাটের (৮০-১১৫ নং) একদিকে এই অলঙ্করণ এখন স্পষ্ট নয়। কিন্তু সব কয়টি মলাটের অন্যদিক সম্পূর্ণভাবে রঙিন অণুচিত্রে শোভিত।

যে জোড়া মলাটের নম্বর ৮০-১১৬, তার একটির রঙিন চিত্রে দেখা যায় যে চীবর (বা সন্ন্যাসীর পরিধেয় লম্বা বস্ত্র) পড়ে বজ্রপর্যঙ্ক আসনে উপবিষ্ট বুদ্ধ। তাঁর হাত দুটি ধর্মচক্র প্রবর্তন মুদ্রায় প্রদর্শিত। তাঁর মাথার উপরে ছাতা যার থেকে ঝুলছে মালা। তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে দুই ভক্ত। একজনের দুটি হাত আছে অঞ্জলিবদ্ধ মুদ্রায় অর্থাৎ জোড়বদ্ধ অবস্থায়, কিন্তু অন্যজনের দুটি হাতে ঢাল ও তরোয়াল। এটি বোধ হয় কোন সেনানীর প্রতিরূপ (চিত্র নং ১ ক)। এই দুই ভক্তেরই চিত্র আলোচ্য মলাট জোড়ায় অন্যটিতেও দেখা যায় বৌদ্ধ দেবতা বোধিসত্ত্ব পদ্মপানি বা অবলোকিতেশ্বরের সামনে প্রার্থনার ভঙ্গিতে করজোড়ে ও হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে। অবলোকিতেশ্বরের বাঁহাতে পদ্মের মৃণাল ডান হাত বিতর্ক মুদ্রায় প্রদর্শিত। এখানে লক্ষণীয় হল যে অবলোকিতেশ্বরকে দেখান হয়েছে এক ভক্তের মাথার পাগড়িতে পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ করতে (চিত্র নং ১ খ)।

ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ ও বৌদ্ধ বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁর থেকে উদ্ভূত দেবতা বোধিসত্ত্ব পদ্মপানি বা অবলোকিতেশ্বরকে দেখা যায় ৮০-১১৭ নম্বর

চিত্র নং ১ ক

চিত্র নং ১ খ : গিলগিটের কাছে নবপুরের "গ" নং স্তূপে আবিষ্কৃত ৮০-১১৬ নং মলাট জোড়ায় দুই অণুচিত্র

...টি জোড়ার একটিতে। এখানে অমিতাভ ...র উপর সমাধিস্থ। ছবির নিচের অংশে ...লোকিতেশ্বর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় এবং এক পা ... পায়ের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে রেখে ...য়ে। তাঁর মুকুটে অমিতাভর প্রতিকৃতি। তাঁর ... হাতে পদ্মের মৃণাল, অন্য হাত বরদ মুদ্রায় ... সামনে করজোড়ে ও হাঁটু গেড়ে বসা এক ...কে বর দান করছে (চিত্র নং ২ ক)। ...লাচ্য মলাট জোড়ার অন্যটিতে অমিতাভ ...ও রয়েছেন কমণ্ডলু হাতে মৈত্রেয়। তাঁর ... হাত বরদ মুদ্রায়, যেন সামনে করজোড়ে ও ... গেড়ে বসা ভক্তকে বর দান করছে (চিত্র নং ...খ)।

চিত্র নং ৩ ক : "গ" নং স্তূপে আবিষ্কৃত ৮০-১১৫ নং মলাট জোড়ার একটির অণুচিত্র

চিত্র নং ৩ খ : "গ" নং স্তূপে আবিষ্কৃত ৮০-১১৫ নং মলাট জোড়ার অন্যটির অণুচিত্র

পদ্মের উপরে বজ্রপর্যঙ্কাসনে ও সন্ন্যাসীর ...শে তিনজনকে উপবিষ্ট দেখা যায় ৮০-১১৫ ...ম্বর মলাট জোড়ার একটিতে। তিনজনেরই ...থার পিছনে প্রভাবলী। মাঝের জনের হাত দুটি ...র্মচক্র প্রবর্তন মুদ্রায় প্রদর্শিত। সুতরাং তিনি ...গৌতম বুদ্ধ। অন্য দুইজনের হাত সমাধি মুদ্রাতে ...কালের উপরে রাখা। এদের একজন অমিতাভ ...তে পারেন, অথবা দুইজন ধর্ম ও সঙ্ঘের দৈহিক ...কাশ হতে পারেন। সেক্ষেত্রে মলাটটিতে বৌদ্ধ ...ত্রিরত্নের অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের দৈহিক ...প্রতিরূপী চিত্রিত (চিত্র নং ৩ ক)। আলোচ্য ...মলাট জোড়ার অন্যটিতে দুই উপবিষ্ট দেবতার ...পাশে হাঁটু গেড়ে বসা দুই ভক্ত। একেবারে বাঁ ...পাশের জন বোধহয় নারী, অন্য ভক্তটি পুরুষ।

এদের হাতে লম্বা ও গোল মালা এবং দীপদান অর্থাৎ পূজার সামগ্রী। দুই দেবতার একজনকে সহজেই চেনা যায় ; কারণ তাঁর এক হাতে কমণ্ডলু। তিনি নিশ্চয় মৈত্রেয়। অন্যজনকে চেনা একটু কঠিন। তবে ওনার বাঁ কাঁধের পাশে পদ্মের উপর রাখা একটি মানুষের মুখ দেখা যায়। এটি যদি বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য পদ্মসম্ভবর প্রতীক হয়, তবে অচেনা মূর্তিটিকে পদ্মসম্ভবর প্রতিরূপ বলে চেনা যেতে পারে। এক বিশ্বাস অনুযায়ী প্রাচীন ওডিডয়ানের (বা এখনকার গিলগিটের কিছু দূরের সোয়াট অঞ্চলের) অধিবাসী পদ্মসম্ভব ছিলেন পদ্মজাত। তাঁকে তিব্বতের নৃপতি খ্রি-স্রঙ্-দে-সন্ (Khri-srong-tde-btsan) তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। এই নৃপতির রাজত্বকাল আনুমানিক ৭৪২ থেকে ৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং পদ্মসম্ভব জীবিত ছিলেন ৮ম শতাব্দীতে।

আলোচ্য মলাটগুলির চিত্রতে নানা রঙের সমাবেশ। এগুলির মধ্যে সাদা, কাল, লাল, হালকা সবুজ, হালকা হলদে, হালকা নীল, কমলা, জলপাই প্রভৃতি সমধিক উল্লেখযোগ্য। রং কখনই খুব গাঢ় বা ক্যাটকেটে নয়, প্রায়ই হালকা যেন একটা নরম ও স্নিগ্ধ আমেজের সৃষ্টি করে।

চিত্রগুলিতে রেখার গতি মোটামুটি সাবলীল। রেখার টানে ও উজ্জ্বল থেকে ক্রমশ ঘোর ছায়ের রংয়ের ব্যবহারে দেহের নতোন্নত অংশগুলি স্পষ্ট করা হয়েছে, মুখের ডৌল দেখান হয়েছে। এইসব বৈশিষ্ট্য গুপ্ত বাকাটক আমলের অজন্তার চিত্রে প্রদর্শিত মানের সমান না হলেও গুপ্ত শৈলীর (৪র্থ-৬ষ্ঠ শতাব্দী) প্রভাব এখানে লক্ষণীয়। অন্যদিকে অবলোকিতেশ্বরের একটি প্রতিরূপে (চিত্র নং ১ খ) কোমরের ও তলপেটের গড়ন শরীরের অন্য অংশের সঙ্গে বেমানান। অবলোকিতেশ্বরের আর এক প্রতিমূর্তির (চিত্র নং ২ ক) দেহের উপরের অংশ অত্যন্ত মাংসল। এতে অনেকে গান্ধার শৈলীর প্রভাব দেখতে পারেন। কিন্তু এখানে এই অংশ এতই মাংসল যে একে প্রায় নারীর দেহাংশ বলে মনে হতে পারে। পুরুষের দেহের এই ধরনের চিত্রণ মধ্য-এশিয়ার কোন কোন চিত্রে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ কিজিলে আবিষ্কৃত আনুমানিক ৬ষ্ঠ শতাব্দীর এক ছবির কথা বলা যায়—যাতে এক রাখালকে দেখান হয়েছে গরুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে (চিত্র নং ৪)।

অবলোকিতেশ্বরের শেষোক্ত প্রতিরূপের মাথার পিছনে প্রভাবলী ছাড়াও উপবৃত্তাকারে একটি বড় প্রভাবলী আছে। অবশ্য উপবৃত্তের নিচের অংশ বাদ গেছে এই প্রভাবলী থেকে। এই ধরনের দুই প্রভাবলী একসঙ্গে দেখা যায় মধ্য-এশিয়ার অনেক চিত্রে। প্রসঙ্গত কারাশারে প্রাপ্ত আনুমানিক ৭ম-৮ম শতাব্দীর এক চিত্রের এবং কুমতুরাতে আবিষ্কৃত আনুমানিক ৮ম-৯ম শতাব্দীর এক ছবির কথা উল্লেখ করা যায় (চিত্র নং ৫)।

উপরের আলোচনা থেকে মনে হয় যে শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে যদি মলাট-চিত্রগুলির তারিখ ঠিক করতে হয়, তাহলে ঐগুলিকে গুপ্তোত্তর যুগে ও ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শতাব্দীর মধ্যে কোনও এক সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে প্রস্তুত বলে মনে করা যায়। ৮০-১১৫ নং মলাট জোড়ার একটিতে যদি ৮ম শতাব্দীর বৌদ্ধ আচার্য পদ্মসম্ভবর প্রতিকৃতি আঁকা থাকে, তাহলেও ঐ চিত্রকে ৮ম শতাব্দীর পরবর্তীকালের বলে মনে করার কারণ নেই। এছাড়া এই তারিখ (৭ম-৮ম শতাব্দী) "গ" নং স্তূপ থেকে পাওয়া পুঁথিগুলির লিপিগত তারিখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (চিত্র নং ৬ ও ৭)। উপরে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে ঐ স্তূপের ভিতর থেকে যা কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে, তা সবই আনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের বা তার পূর্বের।

॥ গ ॥

এই মলাট-চিত্রগুলিকে আকার অনুযায়ী অণুচিত্র miniature painting-এর পর্যায়ে ফেলতে হবে। তারিখ সমন্বিত যেসব পুঁথিতে অণুচিত্র আছে বলে আমরা জানি তাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন হচ্ছে পূর্ব ভারতের পালরাজা মহীপালের ৬ষ্ঠ রাজ্য সংবৎসরে লিখিত "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি। ভারত শিল্পের বিখ্যাত ঐতিহাসিক সরসীকুমার সরস্বতীর মতে যে মহীপালের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের পুঁথি আমাদের জানা আছে, তিনি ঐ নামধারী দ্বিতীয় পাল নৃপতি। প্রথম মহীপালের রাজত্বকাল বোধ হয় আনুমানিক ৯৭৭ থেকে ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং ভারতীয় অণুচিত্রের জানা নিদর্শন ১০ম শতাব্দীর শেষ পাদের আগের নয়। পশ্চিম ভারতের অণুচিত্র সমেত সবচেয়ে পুরাতন দুটি পুঁথি যথাক্রমে ১০৬০ ও ১০৬৯ খ্রীষ্টাব্দের অর্থাৎ ১১শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের।

আমাদের আলোচ্য অণুচিত্রগুলি এই সব তারিখের অণুচিত্র শোভিত পুঁথিগুলির চেয়ে অনেক বেশি পুরাতন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ভারতে অণুচিত্র আঁকার ঐতিহ্য বহুদিনের। ৭ম শতাব্দীর কাদম্বরীতে যে পটচিত্রের উল্লেখ আছে তাকে অণুচিত্রের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। ৪র্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাম্রলিপ্তিতে ফা সিয়েন (বা ফা হিয়েন) বিভিন্ন মূর্তির যেসব চিত্র এঁকেছিলেন, সেগুলি বোধ হয় ছিল অণুচিত্র। সুতরাং ৭ম-৮ম শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অণুচিত্র আঁকার নিদর্শন দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

নবপুরের মলাট-চিত্রগুলি ভারতীয় অণুচিত্রের সবচেয়ে পুরনো জানা নিদর্শনের তারিখ ১০ম শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে অন্ততপক্ষে ৮ম শতাব্দীর শেষ পাদ অবধি অর্থাৎ দুশ বছর পেছিয়ে নিয়ে গেল। সুতরাং এই মলাট চিত্রগুলি ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে মহা মূল্যবান আকর সামগ্রী (source material(। ভারতীয় অণুচিত্রের (miniature painting-এর) আদিযুগের ইতিহাস আবার নূতনভাবে লিখতে হবে। ■

চিত্র নং ২ ক ও চিত্র নং ২খ : "গ" নং স্তূপে আবিষ্কৃত ৮০-১১৭ নং মলাট জোড়ার অণুচিত্র

৮০-১১৭ নম্বর মলাট জোড়ার একটিতে মৈত্রেয়র ডান চোখ এমনভাবে আঁকা হয়েছে যেন দেহের থেকে তার একাংশ একটু বেরিয়ে আছে। চোখ এইভাবে বড় করে দেখানর নিন্দা করা হয়েছে আনুমানিক ৭ম শতাব্দীর গ্রন্থ বিষ্ণুধর্মোত্তরে (৩য় খণ্ড, অধ্যায় ৪১, শ্লোক নং ৭-৮)। সুতরাং পরবর্তীকালে কয়েকটি পালযুগের অর্থাৎ পূর্ব ভারতীয় চিত্রে, বহু সংখ্যক পশ্চিম ভারতীয় চিত্রে ও কিছু সংখ্যক কাশ্মীর অঞ্চলের চিত্রে (যেমন অলচিতে রক্ষিত কয়েকটি চিত্রে) এই "দেহের থেকে বেরিয়ে আসা চোখ" আঁকার প্রবণতা দেখা গেলেও এই বৈশিষ্ট্যের শুরু অন্তত ৭ম শতাব্দীর মধ্যেই হয়ে থাকতে পারে। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে আলোচ্য মৈত্রেয় চিত্রটি ৭ম শতাব্দীর পরবর্তীকালের বলে ভাববার কারণ নেই।

কালো হীরে: সমস্যা অনেক

সমরজিৎ কর

ধানবাদ থেকে জিতপুর। মাঝপথে ঝরিয়া। মোটরে এ পথটুকু যেতে সময় লাগে মিনিট চল্লিশের মত। র্মল পথ। উঁচু-নিচু। পিচ উঠে মাঝেমধ্যে াখন্দ। ধানবাদের শহর এলাকা পেরোলেই খে পড়বে খনি-খাদ। ইংরেজিতে যাকে বলা ওপেন কাস্ট মাইন। ভূস্তরের উপর মাটি। টর নিচে পাথরের স্তর। তার নিচে কয়লা। ামাইট ফাটিয়ে পাথরের স্তর ভেঙ্গে ফেলা ছে। সেখান থেকে ছোট-বড় পাথরের চাঁই ল এনে স্তূপীকৃত করা হয়েছে চারপাশে। তৈরি ছে পাথরের বেড়। তার মাঝখানে গভীর । সেখান থেকে তোলা হচ্ছে কয়লা। আদর র যার নাম দেওয়া হয়েছে কালো হীরে। এ ঃ বিচিত্র রাজ্য।

সঙ্গে ছিলেন ধানবাদের সেন্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ সটিটিউটের দুই বিজ্ঞানী—শরৎকুমার থাপাধ্যায় এবং রামজীবন জয়সোয়াল।

রামজীবনবাবু বললেন, জানেন তো, একমাত্র তিক্রম শুধু ধানবাদ এলাকা। এই শহরটির চ কয়লার স্তর নেই। তারপর এ তল্লাটের সবটাই কয়লা অধ্যুষিত এলাকা। ঝরিয়া, আসানসোল, রানীগঞ্জ, ওদিকে দামোদর। সর্বত্রই কয়লা।

এই কয়লাই, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, বিহার এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে টেনে এনেছে মানুষ। অজস্র মানুষ। তাদের অনেকে খনির শ্রমিক, যানবাহনের মালিক; অনেকে বসেছে দোকানপাট বিছিয়ে। অনেকে ছোট ছোট শিল্পের কারবারী। ঝরিয়ায় ঢুকতেই চোখে পড়ল বেশ কিছু সংখ্যক গভীর খাদ। অনেকটা এলাকা জুড়ে। ভূগর্ভ থেকে কয়লা তুলতে গিয়ে ওই সব এলাকা বসে গিয়ে সৃষ্টি করেছে খাদ। দেখলাম, পথের আশপাশের মাটিও বসে গেছে। আরো বসছে। এর ফলে কোথাও ইটের বাড়িতে দেখা দিয়েছে ফাটল। ঘরবাড়ি কাত হয়ে ধস বেয়ে নেমে যাচ্ছে খাদের দিকে। মাঝে মাঝে পিচ ঢালা পথও বসে গেছে ধসের দরুন।

অজস্র বস্তি। ঘিঞ্জি ঘর-বাড়ি। ধূলি ধূসরিত বাতাস। নিচু মানের পানীয় জল। সব মিলিয়ে বিষাক্ত পরিবেশ। শুধু ধানবাদ অথবা ঝরিয়াতেই নয়, একই অবস্থা সর্বত্র। আসানসোল, রানীগঞ্জ—সর্বত্র।

শরৎবাবু বললেন, জনস্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে এ সব অঞ্চলে। এখানকার অনেকেই আমাশয় এবং আন্ত্রিক রোগের শিকার। এ ছাড়া, বুকের রোগ তো আছেই।

জিতপুরে ইনডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির নিজস্ব কোলিয়ারি। সকালের শিফ্‌ট শুরু হয়ে গেছে। এ সময় আশপাশে তেমন ভিড় থাকে না। একদিকে কোলিয়ারির অফিস বাড়ি। সামনে গ্যারেজ। আর একদিকে কোলিয়ারির নিজস্ব পাওয়ার হাউজ, রোপওয়ের চালন-কেন্দ্র এবং এলিভেটর অপারেশনের চালাঘর।

শরৎবাবু এবং রামজীবনবাবুর সঙ্গে গিয়ে হাজির হলাম ওয়ার্কস ম্যানেজার এস. কে. ঝা'র অফিসে। তরুণ যুবক। সুপুরুষ। ধানবাদের স্কুল অভ্ মাইনস থেকে লেখাপড়া সেরে কয়লা খনি এলাকায় কাজ করছেন বছর চোদ্দ পনেরো। চার বছর হল এখানে তিনি ওয়ার্কস ম্যানেজার। কিন্তু এই চার বছরেই খনি সংক্রান্ত পরিচালনা ব্যবস্থায় তিনি যে যথেষ্ট প্রাজ্ঞ হয়ে উঠেছেন, তাঁর কথাবার্তা শুনে সেটা বুঝে উঠতে অসুবিধে

াখনির নিরাপত্তা ও নানা সমস্যার সমাধানে তৎপর সেন্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ ইনস্ট

খনিগর্তে ভূ-চ্যুতি নিরাপত্তার জন্যে কাজ করছেন কুশলীরা

খনির সুড়ঙ্গের ছাদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সুলভ ব্যবস্থাবলী।

হয়নি।

রামজীবনবাবু তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই মৃদু হেসে তিনি বললেন, আপনি আসছেন সে খবর সেন্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ ইনসটিটিউট জানিয়েছেন। সুস্বাগতম। এসেছেন যখন, নিজের চোখেই দেখতে পাবেন, কয়লাখনির কত সমস্যা।

ঘরের এক কোণে ছোট্ট একটি যন্ত্র।

রামজীবনবাবু বললেন, এটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র—কনটিনিউয়াস মিথেন মনিটরিং সিস্টেম। জিতপুরের এই খনির মধ্যে কি পরিমাণ মিথেন গ্যাস জমছে, যন্ত্রটি নিয়মিত তার রেকর্ড রাখে। জানেন তো, মিথেন বিস্ফোরক গ্যাস। নিরাপত্তার জন্যে তাই এই গ্যাসের উপর প্রতিমুহূর্তে নজর রাখা দরকার। এ কাজটি আগে করা হত ডেভিস সেফটি ল্যাম্প এবং আরো কিছু কিছু ব্যবস্থার সাহায্যে। ল্যাম্পের আলোর আভা দেখে খনির ভেতর কতটা মিথেন বা কার্বন মনোকসাইড বা ডাইঅকসাইড জমেছে সেটা অনুমান করা হত। এ সব পদ্ধতি অবশ্য এখনো কাজে লাগানো হয়। তবে আধুনিক এই মনিটরিং সিসটেম কাজটি অনেক সহজে করতে পারে। যন্ত্রটি নিরাপত্তার দিক থেকে অনেক নির্ভরযোগ্যও বটে।

প্রশ্ন : খনির ভেতর কতটা মিথেন জমলে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে বলে আপনারা মনে করেন?

উত্তর : খনির মধ্যেকার বাতাসে মিথেনের মাত্রা ৫ থেকে ১৫ শতাংশ হলেই বিপদ। সে ক্ষেত্রে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে। তবে এখানে তার মাত্রা যাতে ১·২৫ শতাংশের বেশি না হয়, সে দিকে লক্ষ রাখা হয়। জিতপুরের এই খনির ভেতর প্রায় ২০০০ ফুট গভীরে চার জায়গায় বসান হয়েছে চারটে মিথেন সেনসার। খনির বাতাসে মিথেনের মাত্রা প্রতিমুহূর্তে কতটা দাঁড়াচ্ছে ওই সেনসারগুলি বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিচ্ছে এই মনিটরিং সিসটেমে। গ্রাফ কাগজে তা লিপিবদ্ধ হয়। সেই গ্রাফ দেখে অবস্থাটা বোঝা যায়। অবশ্য, মিথেনের মাত্রা আরো কমও যদি হয়, ধরুন ০·৭৫ শতাংশ, এ যন্ত্রের সাহায্যে তাও আমরা মাপতে পারি।

বিশেষ ধরনের এই মিথেন গ্যাসের মাত্রাজ্ঞাপক যন্ত্রটির ছকটি তৈরি করেছেন ধানবাদের কেন্দ্রীয় খনি গবেষণাগারের বিজ্ঞানী এবং কুশলীরা। সম্প্রতি মিথেন মাপার আরো উন্নত মানের যন্ত্র তৈরিতেও হাত দিয়েছেন তাঁরা। এটিতে থাকবে একটি কমপিউটার। যন্ত্রটির পরিকল্পনা এই গবেষণাগারের। তাঁদের ছক অনুযায়ী এটি তৈরি করছেন ইলেকট্রনিকস করপোরেশন লিমিটেড। আশা করা যায়, আগামী তিন-চার মাসের মধ্যেই এটি বসান সম্ভব হবে। এ ধরনের যন্ত্রের উদ্ভাবনা এবং সংস্থাপন করার কাজে এই গবেষণাগার যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

আর একটি বড় সমস্যা কয়লার স্তর। এই অঞ্চলের কয়লার স্তর তুলনামূলকভাবে অনেকটা পুরু। কয়লার স্তর কম পুরু হলে খনির ছাদ ধসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কম। প্রথমে শিলাস্তর, তার নিচে কয়লার স্তর। তারপর আবার শিলাস্তর। অর্থাৎ দুটি শিলাস্তরের মধ্যে কয়লার স্তর থাকে স্যান্ডউইচের মত। কয়লাস্তরের বেধ কম হলে সেই স্তর কেটে নেওয়ার পর উপরের যে শিলাস্তর থাকে তা ছাদের মত থেকে যায়, ভেঙে পড়ে না। কিন্তু কয়লার স্তর পুরু হলে, সেই স্তর কেটে নেওয়ার পর ছাদের জোর কম থাকে। সে ক্ষেত্রে তা ধসে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই সমস্যাটি দূর করার জন্যে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। কয়লার স্তর কেটে নেওয়ার পর সেই শূন্য স্থানটি বালি দিয়ে ভরাট করার দরকার হয়।

এই বালি একটি বড় রকমের সমস্যা। বললেন শ্রী ঝা। বালির উৎস বলতে তো সেই দামোদর নদীর বেড। এ তল্লাটের খনিগুলির জন্যে নিয়মিত বালি আনা হয় সেখান থেকে। প্রচুর বালি। দামোদরের কাছাকাছি অঞ্চলের বালি দ্রুত কমে যাচ্ছে। যা অবস্থা, তাতে বড় জোর আরো পঞ্চাশ ষাট বছর চলতে পারে। ইতিমধ্যে দামোদরের দূরাঞ্চল থেকেও আনা হচ্ছে বালি। এর জন্যে পরিবহনের খরচ বাড়ছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির সমাধানের জন্যে এগিয়ে এসেছে ধানবাদের খনি গবেষণাগার। বালির সঙ্গে ইস্পাত কারখানা, কয়লার ধৌতাগার এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের 'কোল অ্যাস' বা 'ফ্লাই অ্যাস' মিশিয়ে ভরাটের কাজ যাতে করা যায় সে নিয়ে গবেষণা করছেন তাঁরা। দেখলাম পদ্ধতিটি জিতপুরের এই খনিতেও কাজে লাগান হচ্ছে। এতে করে বালির সাশ্রয় হতে শুরু করেছে এরই মধ্যে।

বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত যে সব সমস্যা নিয়ে ধানবাদের খনি গবেষণাগার যে ধরনের কাজ করছে, দেখলাম শ্রী ঝা তাতে বেশ খুশীই। তবে এমন কিছু কিছু মৌলিক সমস্যা এখনো থেকে গেছে যাদের সুরাহা না হলে খনি-ব্যবসায় সার্বিক উন্নতি ঘটান কখনোই সম্ভব নয়। মন্তব্য করলেন তিনি।

কী ধরনের মৌলিক সমস্যার কথা আপনি বলতে চান? প্রশ্ন করলাম।

সে তো অনেক। যেমন ধরুন, লাল ফিতে। কয়লাশিল্প জাতীয়করণের পর কত সিদ্ধান্তই তো নেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে ভাল ভাল সিদ্ধান্তও আছে। কিন্তু লাল ফিতের ফাঁসে সব ব্যাপারেই বিলম্ব। কয়লাখনির বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত দিকগুলির উপর নিয়মিত নজরদারির জন্যে এখানে একটি কমপিউটারাইজড় যন্ত্র বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ফ্রান্সের সহযোগিতায়। সে কাজ বিলম্বিত। পোল্যান্ডের কোপেক্স (KOPEX) সংস্থার সহযোগিতায় এই খনির উন্নতি সাধনের জন্যে একটি পরিকল্পনা করা হয় ১৯৮৩ সালে।

...াবক ধানবাদের সেন্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ ইনসটিটিউট

কয়লা চুরি ও কর্মীদের উদাসীনতা বন্ধ করতে পারলে অর্থনীতি উৎসাহ পেত

...থন হিসেব করা হয়েছিল, এ কাজে ব্যয় হবে ...াট ২৮·২ কোটি টাকা। ওঁরা বলেছিলেন, ...দের পরিকল্পনা মত কাজ করলে ২৫০০ জন ...মিকের সাহায্যে এই খনি থেকে দৈনিক ২০০০ ...া কয়লা তোলা সম্ভব হবে। সে কাজ এখনো ...গোয়নি। তখন কাজে হাত দিলে ২৮·২ কোটি ...কাতেই চলত। এখন অনেক বেশি টাকা ...রকার। জিতপুরের খনি প্রকল্পের জন্যে সপ্তম ...ঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বরাদ্দ হয়েছে ১০০ কোটি ...কা। কিন্তু সে কাজ চালানোর মত উপযুক্ত ...ক্সপার্ট কোথায়? আর এক্সপার্টই বা কেন? ...ত বড় যে একটি খনি, ভাবতে পারেন, এখানে ...কজন মাইনিং এঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত নেই?

প্রশ্ন : ঠিক এই মুহূর্তে আপনাদের শ্রমিক ...ংখ্যা কত?

উত্তর : প্রায় আড়াই হাজার।

প্রশ্ন : দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ?

উত্তর : ১০০ টন। এখনো পর্যন্ত আমরা ...দকেলে পদ্ধতিতেই কাজ চালাচ্ছি। এতে ...ৎপাদন চলে অনেক ধীর গতিতে। এখানে প্রতি ...ম্যান শিফট'-এ উৎপাদন মাত্র দুই টনের মত। ...থচ উন্নত দেশগুলিতে এই পরিমাণ চার টন। ...্যাঁ, কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, প্রচুর যন্ত্র কেনা ...চ্ছে। তাতে লাভবান হচ্ছে শুধু 'মিডলম্যান'। ...িছু কিছু টেকনোলজি নিয়ে কাজ চলছে। যা ...আমাদের পরিবেশে অচল। শ্রমিকদের নিয়েও ...মস্যা। কয়লা শিল্প জাতীয়করণের পর একমাত্র ...া কাজ হয়েছে তা হল শ্রমিকদের মাইনে ...াড়ান। এ ছাড়া, আর তেমন কোন সুযোগসুবিধে ...াদের জন্যে গড়ে তোলা হয়নি। না তৈরি ...য়েছে উপযুক্ত আবাসন ব্যবস্থা, না সুষ্ঠু সামাজিক ...ীবনযাপনের উপযুক্ত পরিবেশ। ভাল ...িকিৎসক নেই। পানীয় জলের ভাল ব্যবস্থা ...নই। তাদের সামাজিক এবং মানসিক ...মস্যাগুলির সমাধানের জন্যে যে ধরনের উদ্যোগ ...রকার, তাও নেই। কয়লাখনির শ্রমিকদের এখন নিম্নতম বেতন মাসে ৮০০ থেকে ৯০০ টাকার মত। একই পরিবারের অনেকেই কাজ করে। স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা। হলে কি হবে। মাইনে পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই বাড়ন্ত। মদ্যপান এবং অসামাজিক কাজকর্মে অনেকেই ফতুর। শ্রমিকদের মধ্যে অনেকে সুদখোর। এ কাজে বাইরের লোকও রয়েছে। তাদের খপ্পরে পড়ে অনেকেই দারিদ্র্যের সমুদ্রে নিমজ্জিত। আগে কাজের মধ্যে ছিল নিয়মশৃঙ্খলা। এখন তার অভাব। আট ঘন্টা ডিউটি। অথচ অনেকে কাজ করে দুই ঘন্টা। তা করলে কতটা কয়লা কাটা যাবে, বলুন?

ফলে সব খনিতেই এখন উৎপাদনের পরিমাণ কম। শ্রমিকরা ঠিকমত কাজ না করলে কর্তৃপক্ষের বলার কিছু নেই। কারণ কিছু বলতে গেলেই ঝক্কি। রাজনৈতিক নেতারা মাঝপথে এসে দাঁড়ান। তাঁরা কাজের চেয়ে অকাজই করেন বেশি।

খনিগর্ভে নামার প্রাক্কালে

শ্রী ঝা বললেন, আমাদের খনি দেখবেন, চলুন।

ঘড়িতে তখন সকাল দশটা।

শরৎবাবু, রামজীবনবাবু এবং আমাকে নিয়ে শ্রী ঝা খনির প্রবেশ পথে এসে হাজির হলেন। সেখানে যেতেই জনৈক কর্মী একটি খাতা এগিয়ে দিলেন, "খনিতে নামার আগে দর্শকদের খাতায় সই করতে হয়, সেই সঙ্গে লিখতে হয় নাম ঠিকানা।" বললেন তিনি।

নাম লেখার পর আমরা সবাই মাউনটিং জুতো পরে নিলাম। কোমরে বেল্ট। বেল্টের সঙ্গে অকসিজেন বট্‌ল। বাঁ হাতে দেওয়া হল বৈদ্যুতিক টর্চ। ডান হাতে কাঠের শক্ত লাঠি, মাথায় হেলমেট।

রামজীবনবাবু বললেন, হেলমেটের উপর সব সময় নজর রাখবেন, মিঃ কর। যতক্ষণ খনির মধ্যে থাকবেন, খুলবেন না। লিফ্‌ট, লোহালক্কড়ের কাঠামো এ সবে মাথায় ঠোক্কর লাগার সম্ভাবনা থাকে, এর জন্যেই এই সাবধানতা।

দেখলাম, গেটের বাইরে কয়েকটি খাঁচা। খাঁচার মধ্যে মুনিয়া পাখি।

মুনিয়া পাখি কেন? শ্রী ঝা'কে জিজ্ঞেস করলাম।

আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন শ্রী ঝা। বললেন, খনির ভেতর বিষাক্ত গ্যাসের মাত্রা মাপার এই হল আদিম এবং অকৃত্রিম পদ্ধতি। এখন ইলেকট্রনিক্স সিস্টেম চালু হয়েছে। আগে তো এ সব ছিল না? তখন ডেভির সেফ্‌টি ল্যাম্পের শিখা দেখে বুঝে নিতে হত খনির মধ্যে জমে ওঠা বিষাক্ত গ্যাসের পরিমাণ। বিষাক্ত গ্যাস বলতে মুখ্যত কার্বনমনোকসাইডই বোঝায়। এ ছাড়া, কাজে লাগান হত মুনিয়া পাখি। বিষাক্ত গ্যাসের ব্যাপারে এই পাখি অত্যন্ত সংবেদনশীল।

বাতাসে এক শতাংশের ক্ষুদ্রতম অংশেও যদি বিষাক্ত গ্যাস থাকে, এই পাখি মারা যায়। তাই আগের দিনে খনির মধ্যে এই পাখি নিয়ে গিয়ে সেখানকার বাতাস বিষাক্ত কিনা তা জেনে নেওয়া হত। এখনো যে তা করা হয় না, বলব না। জরুরী অবস্থায় এই পাখির আমরা সাহায্য নিয়ে থাকি।

হাল আমলের লিফ্‌ট। দেখতে খাঁচার মত। লোহার তৈরি। সামনের অংশে ওঠে মানুষ। পেছনে একটু ঢালু পাটাতন। তার বিপরীত অংশে কয়লা বোঝাই আধার তোলার জন্যে। লিফটে গিয়ে উঠতেই নিরাপত্তা কর্মী আমাদের ভালভাবে দেখে নিলেন। তারপর সামনের দিকে শেকলে ঝোলানো একটি আংটা খুলে জেলের দেউড়ির মত একটি দরজা উপর থেকে টেনে লিফটের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

অতঃপর সংকেত।

লিফ্‌ট ধীর গতিতে খনির মধ্যে নামতে শুরু করল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অন্ধকার।

খনির মেঝের কাটিং পরীক্ষা করছেন কুশলীরা। সময় মত ব্যবস্থা না নিলে এই কাটিংই শেষ পর্যন্ত বড় রকম দুর্ঘটনা ঘটায়

কানে লিফটের ঘরঘর শব্দ। গায়ের উপর দিয়ে বয়ে গেল এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস। লিফ্‌ট এসে থামল এক সময়। আমরা তখন ভূগর্ভে, ২০০০ ফুট নিচে।

লিফটের বাইরে বেরোতেই দেখতে পেলাম বিদ্যুতের আলো। অত্যন্ত শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে বিশুদ্ধ বাতাস প্রবাহিত করা হচ্ছে খনির মধ্যে। আমরা সুড়ঙ্গ পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। জনৈক শ্রমিক এসে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। সুড়ঙ্গ পথের উপর সরু রেল লাইন। সেই লাইনের উপর দিয়ে কয়লা বোঝাই ভ্যান টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারের দড়ির সাহায্যে।

খনির মধ্যে সব সময়ই সাবধানে থাকতে হয়। দেখলাম, জিতপুরের এই খনিতে ধুলোমাটি কম। বাতাসও পরিষ্কার।

এক জায়গায় দেখলাম, কয়লা কাটার কাজ চলছে রাশিয়ান যন্ত্রের সাহায্যে। এক পাশে কয়লার স্তর। রেল লাইনের উপর অতিকায় একটি যন্ত্র। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে কয়লাস্তরের পাশ থেকে কেটে চলেছে কয়লা। কাটার সময় স্তরের উপর ছড়ান হচ্ছে জল। কয়লার সূক্ষ্ম কণায় বাতাস যাতে না ভরে যায় তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। সেই জল বয়ে চলেছে পায়ের নিচ দিয়ে। কাঠের বাক্স এবং দণ্ড দিয়ে এখানকার ছাদ আগলে রাখা হয়েছে ধস প্রতিরোধের জন্যে। কয়লা কাটার পর শূন্যস্থান বালি দিয়ে বোঝাই করা হচ্ছে। দেখলাম বাতাসের প্রবাহ চালু রাখা সত্ত্বেও এই অংশের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি। বাতাসও আর্দ্র। গরম এবং ঘামে অতিষ্ঠ হওয়ার মত অবস্থা।

লাঠির উপর ভর করে সন্তর্পণে আমরা এগোতে লাগলাম। ঢাল বেয়ে, নিচের দিকে। সাবধানে এগোতে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে অন্ধকার। হাতের টর্চ তখন একমাত্র অবলম্বন। লাঠির উপর ভারসাম্য বজায় রেখে চলা। একটু বেসামাল হলেই পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙতে পারে। কাঠ এবং লোহার কাঠামোয় এরই মধ্যে কয়েকবার মাথা ঠুকেছি। ভাগ্যে মাথায় হেলমেট ছিল, তাই রক্ষে।

জনৈক শ্রমিককে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার শিফ্‌ট কখন শুরু হয়েছে?

সকাল আটটায়। বললেন তিনি।

ছুটি কখন?

সেই বিকেলে, চারটেয়।

দুপুরে কখন খান?

কি যে বলেন? দুপুরে খাওয়া? এই জঞ্জালের মধ্যে কিছু খাওয়া যায়? সকালে এক পেট খেয়েই আমরা এই গর্তে ঢুকি। দেখতেই তো পাচ্ছেন, কয়লার গুঁড়ো আর কাদামাটিতে দেখছেন সবই অপরিষ্কার। এ অবস্থায় খাওয়া রোচে কখনো? বিকেলে ডেরায় ফিরে চানটান সেরে তবে খাওয়া।

খাটুনি। তার সঙ্গে এই পরিবেশ। এতক্ষণ না খেয়ে থাকাটা শরীরের পক্ষে মোটেই যে ভাল না, সে কথা না বললেও চলে। মনে হল খনি শ্রমিকদের স্বার্থের খাতিরে এ দিকটা ভেবে দেখা দরকার। দুপুরের দিকে শ্রমিকদের কি প্যাকেটে সুষম খাদ্য সরবরাহ করা যায় না?

শুনলাম, একমাত্র জিতপুরের এই খনিটি ছাড়া আর কোন খনিতে ফিলটার করা পানীয় জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে এ অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে আমাশয় এবং আন্ত্রিক রোগের প্রকোপ বেশি।

একটা জায়গায় দেখলাম, ইঁটের তৈরি লম্বা দেওয়াল।

শ্রী ঝা বললেন, এ বছর এপ্রিলে এখানকার স্তর থেকে গ্যাস বেরোচ্ছিল। তাতে অগ্নিকাণ্ডও ঘটে। তবে সময় মত প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা নেওয়ায় কোন বিপদ ঘটেনি। ঘটনাটি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা খনির কাজ এক মাসের জন্যে বন্ধ করে দিই। এটা আমাদের কাছে বড় রকম সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যাটির মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করেছেন ধানবাদের কেন্দ্রীয় খনি গবেষণাগার এবং মাইনস সেফটির বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের পরামর্শমত যে সব ফাঁক পথে আগুন দেখা দেয়, সেই পথগুলি 'বয়েলার অ্যাশ' এবং বেনটোনাইট-এর মিশ্রণ দিয়ে আমরা বন্ধ করে দিই। তারপর এক মিটার পুরু ইঁটের এই লম্বা দেওয়াল দিয়ে ঢেকে দিই। এখন আর কোন বিপদ নেই।

উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালে জিতপুরের এই খনিতে গ্যাস-বিস্ফোরণে মারা গিয়েছিল ৪০ জন শ্রমিক। এর দু' বছর পর ১৯৭৫ সালে খনিতে জল ঢুকে মারা যায় ৩৮০ জন।

রামজীবনবাবু বললেন, জিতপুর খনির ভেতর কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅকসাইড এবং মিথেন গ্যাসের পরিমাণ নিয়মিত মাপা হচ্ছে। এ সব গ্যাস বিপজ্জনক মাত্রা ছাড়ালেই স্বয়ংক্রিয় বিপদজ্ঞাপক সংকেত বেজে ওঠে।

জিতপুরের কয়লা পরিবহনের জন্য রেলগাড়ি বা ট্রাক ব্যবহার করা হয় না। এখান থেকে বার্নপুর ৫৩ কিলোমিটার পথ। জিতপুরের কয়লা রোপওয়ের সাহায্যে সেখানে পরিবাহিত হয়। এশিয়ায় এটিই দীর্ঘতম কয়লাবাহী রোপওয়ে।

শ্রী ঝাকে বললাম, এক পক্ষে ভাল। ট্রাক বা রেলগাড়িতে চুরি হয়, রোপওয়েতে সে সম্ভাবনা কম।

শ্রী ঝা মৃদু হেসে বললেন, অতটা আশাবাদী হবেন না। মাঝে মাঝে রোপওয়ের তার কেটে বা তা বিকল করে লুঠেরারা মাঝপথে কয়লা লুঠ করে। মিঃ কর, যদি চুরি বন্ধ করা যেত এবং শ্রমিকরা নিয়মমত কাজ করতেন, কয়লার মূল্য বৃদ্ধি অনেকটা ঠেকানো যেত।

জিতপুর থেকে ফিরে ধানবাদের সেন্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ ইনসটিটিউটের (কেন্দ্রীয় খনি গবেষণাগার) ডিরেক্টরের সঙ্গে কয়লা খনির বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সমস্যা নিয়ে কথা বলেছি। সে সব সমস্যার সমাধানে তাঁরা যা করছেন, এবং যথেষ্ট প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। [লেখকের আগামী সংখ্যায়]

চাই চিমার দিব্যদৃষ্টি

অশোক চ্যাটার্জি

হয়ত আমার দীর্ঘদিন মোহনবাগানে খেলার সুবাদে পরিচিতজনেরা ধরে নেন আমি মোহনবাগানের সমর্থক। তাই প্রতিবারই বড় খেলার আগে পরে কিছু প্রশ্ন এবং যুক্তি, পালটা যুক্তি আবেগ ইত্যাদির মুখোমুখি হতে হয়। স্বভাবতই এবারের ফিরতি লীগে মোহনবাগানের হারের পরও একই অবস্থা হয়েছিল। প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যে যে পালটা প্রশ্নটা আমি রেখেছিলাম সেই প্রসঙ্গ এখানেও উত্থাপন করি। 'নাইজেরিয়ান চিমার গোলে ইস্টবেঙ্গলের জয় কিংবা ইরানী সামাদের প্রথম খেলার সুযোগেই মাঠ মাত করে দেওয়াতে ভারতীয় ফুটবল ক ইঞ্চি এগোলো?' উত্তরটা আমার আপনার মত ফুটবল-অবোদ্ধা সকলেরই জানা, এক ইঞ্চিও এগোয়নি। তথাপি লর্ডসে গাওস্করের রাজকীয় শতরান ও প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেট থেকে বিদায় নেওয়ার সংবাদের থেকে তার তলায় ছাপা ছোট্ট হেডিং 'ইস্টবেঙ্গলে ইংল্যান্ডের ফুটবলার' এর উপর খেলার পাঠক পাঠিকারা বেশি করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কেন এমন হয়? একটাই উত্তর, এখনকার স্থানীয় খেলোয়াড়রা তাঁদের ক্রীড়াশৈলী দিয়ে দর্শকদের আকর্ষণ করতে পারছেন না। আরো সংক্ষেপ করে বলা যায় ফুটবল খেলার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ অর্থাৎ গোল করতে তারা তেমনভাবে সক্ষম নয়।

কেন সক্ষম নয়? কি কি কারণ তাদের 'নাসবন্দী' করে দিল? একেবারে তৃণমূল থেকে শুরু করা যাক।

যে ছেলেগুলো ফুটবল খেলছে তাদের গোড়ায় মেরে দিয়েছি আমরাই। ভাল করে তাদের খেতে দিইনি, ছুটতে বলিনি, বলিনি বড়দের কথা মানতে। তিনতলা বাড়ি দেখিয়ে বলেছি এটুকু উঠলেই তোর দায়িত্ব শেষ, তাকে মনুমেন্ট চেনাইনি। কোন রকমে কেরানী হয়ে বিদায় ক্ষান্ত দেওয়ার মানসিকতা আমাদের মজ্জাগত, ফুটবলের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। আমাদের সময় ভাল কোম্পানি অর্থাৎ মোহনবাগান, মহমেডান, ইস্টবেঙ্গলে ফুটবল-কেরানী হতে গেলেও আরও বেশি যোগ্যতা লাগত। তাই হয়ত নিতান্ত বাধ্য হয়েও তাদের কিছু শিখতে হত। দু চারটে পিকে, চুনী, বলরাম অবশ্যই এমনি এমনি জন্মাত, এখন দু একটা সুরজিত, কৃশানু জন্মায়। চুনীদের দেখে পরিমল, কাজল মুখার্জি, কান্নান, এই আমি অশোক চ্যাটার্জি প্রমুখ উৎসাহিত হয়ে ভাল খেলার চেষ্টা করেছি, কিংবা বড় দলে ঠাঁই পেতে ধরে নিন বাধ্য হয়েই মনোযোগী হয়েছিলাম। এখন বড় দলে খেলা অনেক সোজা হয়ে গেছে, তাই ছেলেদের আরও একটু ভাল হবার ইচ্ছেটুকু মরে গেছে। পি কে-র পর ডানদিকটা বছরের পর বছর সুরজিত সামলেছে, মাঝে দু তিন বছর মানস একটু জ্বলেছিল, তারপর ঐ অঞ্চল খাঁ খাঁ বিস্তীর্ণ অরণ্য, হাফলাইন থেকে উঠে আসা বিকাশ পাঁজিকে কখনও সখনও দৌড়তে দেখা যায়। বাঁ দিকটায় সেই যে ক'বছর মাথা নিচু করে বিদেশ চৌ-চৌ দৌড়েছিল এবং তারপর, দ্বিতীয় নাম করতে গেলে বার কয়েক ঢোঁক গিলেও সামাল দেওয়া যাবে না। সুতরাং ওপেনিংসটা করাবে কে। একা কৃশানু যে কিনা অধিকাংশ সময় আহত হয়ে মাঠের বাইরে থাকে। তারপর এখন বিজ্ঞান সম্মতভাবেই ডিফেন্সে ভিড় বেড়েছে, তাদের টপকানোর জন্যে যে ইনডিভিজুয়াল স্কিলের দরকার সেটা বেশির ভাগেরই নেই। স্কিল একটা প্রতিভা যার কিছুটা অবশ্যই সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হয় অর্থাৎ জন্মসূত্রে খানিকটা থেকে থাকে। বাকীটা পরিমার্জনের দায়িত্ব কোচেদের। এবং সেটা প্রাথমিক স্তরেই। কিন্তু কোচিংটা দেবে কে, ময়দান ভুষিমালে ভরে গেছে। ধার দেওয়ার বদলে আরও ভোঁতা করে দিচ্ছে তারা। দু-একটা অমল দত্ত, অরুণ ঘোষ, পি কে, নায়িম কতটুকু সামাল দেবেন। তাদের কাছে দাদাদের জোরে এবং ধরে যে সমস্ত বিকলাঙ্গরা আসছে তাদের চলৎশক্তি দিতেই বছর কাবার, তো স্কিল শেখাবেন কখন। সুতরাং বড় কোচেরা না চাইলেও 'মার লাথি—গো এজ ইউ লাইক ফুটবল।' তেকাঠি চেনাতে গেলে সেটা করতে হবে গোড়াতেই, ছোট

ভাল ফরোয়ার্ড ডিফেন্সের কি করুণ অবস্থা করতে পারে তার প্রমাণ চিমা

বগুলোতে যারা কোচিং করে
দের শতকরা নব্বইভাগ আর
ছু না হতে পেরে ফুটবল কোচ
য়েছে। নিজেরা তেমন কিছু
লত না, ডেডিকেশনও ছিল না
। তারা ছেলেদের মধ্যে ভাল
দার জেদ তৈরি করবে
ভাবে ?
আর এই কোচদের যারা
মদানী করছেন সেই কর্মকর্তারা
া দু নম্বরী ব্যবসা অথবা পেশীর
রে ময়দানে এসেছেন, চামড়ার
লকটি কখনই স্পর্শ করে
খনি, তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে
মিয়ে নেওয়া। টিকিটের কোটা,
্যান্য গ্রান্ট ইত্যাদি দিয়ে
জদের ব্যবসা কিংবা দেদার
লা মারার টাকার যোগাড়।
মাদের সময় কর্মকর্তাদের
ধিকাংশই ছিলেন প্রাক্তন
বলার, বাকিদের এক বৃহৎ অংশ
বল নিবেদিত প্রাণ, দু একটা
চিকে বাদুড়ের দলে যে ঢুকত না
নয়, তবে তারা বিশেষ কল্কে
ত না। ক্লাব থেকে এবার আসুন
তীয় পর্যায়ে। ভারতীয়
বলের. কর্মকর্তারা নিজেদেরটাই
ছাচ্ছেন কি করে আরও
লটি বাড়বে, গ্যারান্টি মানি
সবে, রাজনৈতিক প্রভাবশালী
ক্তদের মাসতুতো শ্যালকের
সতুতো ভাই-এর স্বর্গত ঘনিষ্ট
নর নামে ট্রফি খেলিয়ে তাঁদের
কনজরে পড়া যাবে। বেশি
র্মেন্ট তার ওপর অফিস ক্লাব
লতে খেলতে খেলোয়াড়দের
মতা তলানিতে ঠেকেছে।
রাং তারা কোন মতে কাজ
দিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, জেদ
বা ইচ্ছা কোন কিছুই থাকছে
। কারা দায়ী এ পর্যায়ে
লোচনা করতে গেলে দর্শকদের
থাও বলতে হবে। একটা মিস
লেই তারা খেলোয়াড়দের
র্দশ পুরুষের পিণ্ডদানের দায়িত্ব
য় নিচ্ছেন। ফলত
লোয়াড়েরা পেনাল্টি এরিয়ার
ধ্য গিয়েও পাস দিয়ে নিজের
য়িত্ব স্খালন করে দিচ্ছে। অথচ
টা মারলে একটা অন্তত গোল
। বাইরের এই চাপটা না
কলেও খানিকটা ভাল খেলা
। দায়ীদের বিরুদ্ধে একতরফা
মান দাগার পর এবার
া-প্রকরণ প্রসঙ্গে আসা যাক।
প্রথা-প্রকরণের দিক থেকে
বল বিজ্ঞানসম্মতভাবেই এগিয়ে
চলেছে। এখন রক্ষণভাগ অনেক বেশি মজবুত, যা গোল করার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের অন্তরায়। আমাদের সময় ৫—২—৩ ছকে খেলা হত। ষ্ট্যাণ্ডি এপেলটোটকে দেখে বাঘা সোম চালু করলেন চার ব্যাক। অর্থাৎ ৪—২—৪। এখন ৩—৩—৪ এ এসেছে। শেষের চারের সামনে অথবা পেছনে আরও একজনকে রেখে সুইপার কিংবা লিবেরো খেলানো হচ্ছে। অর্থাৎ এখন প্রথম কাজ হল নিজের ঘর সামলাও। সুযোগমত এগিয়ে যাও, এবং পিছিয়েও এস। আমাদের ছেলেরা অভিমন্যুর মত চক্রব্যূহতে ঢোকাটা জানে অর্থাৎ ডিফেণ্ডিং জোনে ভিড় বাড়ানো, কিন্তু আক্রমণে ওঠে না। আসলে এত পরিশ্রম করার ক্ষমতা বা ইচ্ছে তাদের নেই। ফলত গোলমুখে তেমন আক্রমণই হচ্ছে না, সাতজনের সঙ্গে দু-তিনজনের অসম লড়াই-এর ফলাফল যা হবার তাই হচ্ছে। বুক ফুলিয়ে বছরের পর বছর সুব্রত-মনোরঞ্জন-মহিযুলরা রাজত্ব করছে। এদের চ্যালেঞ্জ জানাতে সংঘবদ্ধ আক্রমণই উঠে আসছে না। কারুকে ছোট না করেই বলতে পারি, চুনী, বলরাম, পি কে তো অনেক বড় ব্যাপার, অসীম মৌলিক, হাবিব, পরিমল দে, ইন্দার সিং নিদেনপক্ষে আমার মত দু-চারটে ফরোয়ার্ড থাকলে এদের অনেক আগেই এই আমার মত বানপ্রস্থে গিয়ে কলম কপচাতে হত, একজন ভাল ফরোয়ার্ড পেলে ডিফেন্সের কি করুণ অবস্থা হতে পারে, সেতো এবার চিমা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বোধ হয় সাময়িক উত্তেজনাবশত অন্যদিকে চলে যাচ্ছি। মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

গোল করার জন্যে দরকার স্কীমিং, সুটিং এবং হেডিং। স্কীমিং সম্পর্কে বলতে গিয়ে সবিনয়ে জানাই এই ক্ষমতার অধিকারীর সংখ্যা অতীতেও খুব কম ছিল। এখনতো প্রায় শূন্য। ম্যাচ রিডিং অর্থাৎ প্রতিপক্ষ দলের খেলার ধরনকে সম্যক উপলব্ধি করে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যে আমার সহ-খেলোয়াড়দের কিভাবে খেলাতে হবে বা খেলাটাকে কিভাবে নিজেদের অধীনে আনতে হবে, এসব ভেবেই স্কীমিং করতে হয়। ছোটদলের কথা থাক, আজকের বড় দলে ভিড় করা অধিকাংশ খেলোয়াড়দের এতখানি চিন্তা করার শক্তিই নেই। শক্তি বাড়ানোর জন্যে যে নিবিড় অনুশীলনের প্রয়োজন সেটা করার ইচ্ছেও যে নেই সে কথাও বিভিন্নভাবে একাধিকবার এ নিবন্ধে বলা হয়েছে। কিন্তু এ-ধরনের বুদ্ধিমান দু একজন খেলোয়াড় থাকলে খেলার ছকটা যায় বদলে, রাসভ মগজ খেলোয়াড়রাও উদ্বুদ্ধ হয়। আমাদের সময়ে এই দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন চুনী, বলরাম, ইন্দার সিং এবং পরবর্তীকালে পরিমল দে, কাজল মুখার্জি, কান্নান এবং হাবিব। অতঃপর সুরজিত, সমরেশ, গৌতম, প্রসূন, পায়াসে গিয়ে শেষ। কৃশানু ভালো, তবে এই সারিতে আসে না। অথচ দু-চারটে অসাধারণ মুভই খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। চুনী এবং বলরামের প্রয়োগ ক্ষমতা এমন পর্যায়ের ছিল যা সবসময় সহ-খেলোয়াড়দের অভিভূত করে রাখত। আমার সৌভাগ্য এই যে চুনীদার সঙ্গে দীর্ঘদিন খেলেছি, যার ফলশ্রুতি দুবার টপ স্কোরার হওয়া। একবার মোহনবাগানের হয়ে, আর একবার ইস্টবেঙ্গলে থাকাকালীন। তাঁর খেলা দেখেই আমার পুরো খেলোয়াড় জীবনে উদ্বুদ্ধ ছিলাম।

'হেডিং' ব্যাপারটাই বোধহয় কলকাতা ময়দান থেকে উঠে গেছে। ইদানীং বড় টিমে হেড দিয়ে গোল করতে দেখেছেন ? একজন ভারতীয়কে বড় খেলায় শেষ হেড দিয়ে গোল করতে দেখা গেছে সে সাবির আলি, কৃশানুর মাথায় লেগে পিয়ারলেস ট্রফিতে মোহনবাগানের জালে একটা বল ঢুকেছিল ঠিকই, কিন্তু ওটাকে আমি হেডিং বলব না, আর কৃশানুর 'হেড' দেওয়ার ক্ষমতা কিংবা ইচ্ছা এবং সাহস (হ্যাঁ। সাহস) নেই। অথচ দীপু দাস, প্রদীপ ব্যানার্জি, অসীম মৌলিক, পান্নানারা যে সমস্ত দুরূহ জায়গা থেকে হেডে গোল করেছেন তা অচিন্তনীয়। এঁদের যেমন ছিল প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তেমনই সাহস।

অতঃপর সুটিং। না কামান দাগা শট আর ইদানীং ভারতীয় ফরোয়ার্ডসের পা থেকে বেরোয় না। ডিসুজা, আকবর এবং মাঝেমধ্যে মিহির বসুতেই শেষ। মিহির অবশ্য এখন হাফে খেলে। মাঝে মাঝে বার কাঁপানো শট আসে হাফলাইনের অমল রাজ, বিকাশ

এখন চুনীর মত ফরোয়ার্ড কোথায় ?

পাঁজিদের পা থেকে, তাতে দু-চারটে গোলও হয়। তবে যতই আমরা টোটাল ফুটবলের কথা বলি না কেন গোলকরার দায়িত্ব কিন্তু মারাদোনা, পাওলো রোসি, লিনেকারদের। এবং তাঁরা সেটা করে থাকেন।

গোল করার ক্ষেত্রে জোরালো পাঞ্চ যেমন দরকার, তেমন প্রয়োজন পেনাল্টি সীমানার মধ্যে মাথার ঠিক রাখা। আগেই আলোচনা করা হয়েছে ছেলেরা বক্সের মধ্যে এসে নিজেদের হারিয়ে ফেলে তাই তাদের নিশানা ঠিক থাকে না। অন্যান্য চাপ ছাড়াও এক্ষেত্রে অভাব একাগ্রতার, যেটা থাকা একান্তই প্রয়োজন।

মোটামুটিভাবে 'কি কি নেই' পর্যায়ে আলোচনা করা গেল। এখন প্রয়োজন সব 'না'গুলোকে 'হ্যাঁ' করার। আর এই হ্যাঁ করানোর জন্যে শুরু করতে হবে গোড়া থেকেই, সে কথাটা আমি কেন, সকলেই বলে থাকে। 'ক্যাচ দেম ইয়ং' কথাটা আজ নয় বোধহয় লর্ড ক্লাইভের আমল থেকেই চলে আসছে। শুধু 'ক্যাচ' করলেই অবশ্য হবে না 'কোচ দেম রাইট'। এটাই লাখ টাকার ব্যাপার। যাঁরা দায়িত্বে আছেন এবং যাদের দায়িত্বে আছেন তারা সচেতন হন। আমরা অপছন্দ ব্যক্তিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করা সারমেয়র মত শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি।

অনুলেখন—বিকাশ মুখোপাধ্যায়

টাকা আছে বন্ধু নেই

"আমি খুব ভয় পাই সার্কিটের অন্য সব মেয়েদের। এদের অধিকাংশই সমকামী। মা সঙ্গে না থাকলে আমার বুক টিপ টিপ করে।" সতের বছরের গ্যাব্রিয়েলা সাবাতিনি কথাটা বলেছে। আর্জেন্টিনার এই মেয়েটি আপাতদৃষ্টিতে হাসিখুশিতে

স্টেফি গ্রাফ

গ্যাব্রিয়েলা সাবাতিনি

ভরা। প্রচণ্ড সম্ভাবনাময়, নব্বই দশকে এক নম্বর হতে পারে তার যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি দেখাচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে যে এরকম একটা অশান্তি রয়েছে তা কজন ভাবতে পারবেন? স্টেফি প্রায় আর একজন। ওর অশান্তিটা আবার অন্য রকমের— নিঃসঙ্গতা। লন্ডনের ডেইলি মিরার পত্রিকা স্টেফি সম্পর্কে লিখেছে, 'ওর আঠার বছর বয়েস, এই বয়েসে কোটিপতি, সবই ঠিক আছে কিন্তু আজ পর্যন্ত স্টেফি কাউকে চুমু খেয়েছে কী? নিশ্চয়ই না।'

আসলে কমবয়সী যেসব মেয়েরা শীর্ষে উঠতে আগ্রহী তাদের জীবনটাই এরকম। টিন এজ-এর গোড়া থেকেই তাদের শিখতে হয় কিভাবে টেনিসের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে হয়। কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা মানে টেনিস জীবনকে অনিশ্চিত করে তোলার ঝুঁকি নেওয়া। পুরুষদের এতটা কষ্ট স্বীকার না করলেও চলে।

অবিবাহিত অথচ নামীরা যে কোনও কোর্টেই খেলুক না কেন, সবসময়ই তাদের আশেপাশে ভিড় করে থাকে গুণমুগ্ধ তরুণীরা। লেন্ডল, ক্যাশ বা মেন্সিরের মতো প্রতিষ্ঠিতরা তাদের বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে গোটা বিশ্ব ঘোরে। অতএব এদের নিঃসঙ্গ থাকার প্রশ্ন নেই। একই কথা প্রযোজ্য বিবাহিত টেনিস তারকাদের সম্পর্কে। ভিল্যান্ডার, ম্যাকেনরো, নোয়ারা ঘোরে ওদের স্ত্রীকে নিয়ে। মেয়ে টেনিস তারকারা স্বামীকে নিয়ে ঘুরছে এমন দৃষ্টান্ত কিন্তু খুব কম। এর কারণ হচ্ছে তাদের স্বামীরা বিখ্যাত স্ত্রীর সঙ্গে ঘুরতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ট্রেসি অস্টিনের বক্তব্য, যখন লোকে স্বামীদের উপেক্ষা করে আমাদের দিকে অটোগ্রাফের খাতা বাড়িয়ে দেয়, ওদের প্রচণ্ড 'ইগো'তে লাগে।

এ টি পি ক্রমপর্যায়ে প্রথম একশজন মেয়ের মধ্যে মাত্র বারজন বিবাহিত। এই যে সামান্য অংশটুকু বিবাহিত তারাও যে খুব সুখে আছে এমন মোটেই নয়। ক্রিশ এভার্টের বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, ভাঙতে যাচ্ছে হ্যানা মান্ডলিকোভারও।

যেহেতু উপযুক্ত বন্ধু জোগাড় করাটা কঠিন বেশির ভাগ মেয়েই একাকিত্ব বোধ যথাসম্ভব কাটায় বাবা-মার সঙ্গে থেকে। যেমন স্টেফি গ্রাফ। বাবাই ওর একমাত্র বন্ধু এবং তিনিই ওর সঙ্গে সব জায়গায় যান। বাবা-মা যদি সঙ্গে ঘুরতে না পারেন সেক্ষেত্রে এই দায়িত্ব নেন ট্রেনার বা ম্যানেজার। কিন্তু কাউকে না কাউকে এই দায়িত্ব নিতেই হয় কারণ হাসিখুশি, চনমনে না থাকলে মেয়ে কোর্টে নেমে ভালো খেলবে কি করে?

কোনও কোনও মেয়ে অবশ্য সাহস করে একাই বাইরের জীবনে উঁকিঝুঁকি মেরেছে। যেমন, হাঙ্গেরির অ্যান্ড্রিয়া তামাভেরি। সোনালি চুলের অদ্ভুত সুন্দরী এই মেয়েটি যখনই যে শহরে খেলেছে সেখানকার নাইট ক্লাব ও ডিসকোতে ঢুঁ মেরেছে পুরুষসঙ্গীর জন্য। ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ক্লডিয়া কোডে কিলশের কথায়, 'অ্যান্ড্রিয়া হচ্ছে সত্যিকারের পুরুষশিকারী।' এই অ্যাডভেঞ্চারের ফল কিন্তু ভালো হয়নি। ১৯৮৪তে ও ছিল ক্রমপর্যায়ে সপ্তম। আর এখন নেমে গেছে ১১৪ নম্বরে।

এখনকার মেয়ে তারকাদের এই অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল ক্রিশ এভার্ট লয়েডকে এবং তিনি চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন গোটা ব্যাপারটাকে। "এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে টিন এজ জীবনের গোড়া থেকে খাটতে হয়। আর খাটা মানে কি, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম। এখান থেকে ওখানে উড়ে গিয়ে টুর্নামেন্ট খেলা ইত্যাদি ইত্যাদি। অস্বাভাবিক একটা জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে মেয়ে টেনিস খেলোয়াড়রা বড় হয়। যে জীবনে টাকা আছে কিন্তু মানবিক কোনও অনুভূতি নেই। কিন্তু কি করা যাবে? মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়ই বা কি? দুই পৃথিবীরই ভালো দিকগুলো শুধু আপনি চাখবেন, এ তো হতে পারে না।"

ভারতের পাঁচজন

ভারতীয় হকির অবস্থা খারাপ হতে পারে কিন্তু ব্যক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন কিছু খেলোয়াড় যে এখনও দেশে বর্তমান তা যেন আবার বোঝা গেল এশিয়ান অলস্টার টিমের নির্বাচনে। এশিয়ান হকি ফেডারেশনের নির্বাচিত এই দলে ভারতের প্রতিনিধি পাঁচজন—মহম্মদ শাহেদ, এম পি সিং, হরদীপ সিং, সোমায়া, পারগত সিং। পাকিস্তান থেকেও নেওয়া হয়েছে পাঁচজনকে। একজন করে জাপান ও বাংলাদেশের। তিনজন যথাক্রমে দক্ষিণ কোরিয়া ও মালেশিয়া থেকে। লক্ষণীয় এশিয়ান গেমস চ্যাম্পিয়ন কোরিয়ার কাছে ইদানীং বেশ কয়েকবার হারলেও অলস্টার টিমে কিন্তু ভারতের খেলোয়াড় বেশি। এখনও এই স্বীকৃতিটুকু যে বেঁচে আছে সেটাই আশ্চর্যের, সুখের তো বটেই।

দ্বিতীয়বার

বছর চারেক মারিয়ানা সিমোনেস্কুর সঙ্গে ঘর করার পর বিয়র্ন বর্গ এই সম্পর্কের ওপর ইতি টেনে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি থাকতে শুরু করেন জেনিকে বোরলিং-এর সঙ্গে। জেনিকে কে বিয়ে না করলেও সুইডিশ এই মডেলের গর্ভে বছরদুয়েক আগে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মেছে। সম্প্রতি বর্গ এই সম্পর্কটিও ভেঙে দিলেন। তাঁকে এখন ঘুরতে দেখা গেছে লন্ডনের সপ্তদশী সুন্দরী মান্ডি স্মিথের সঙ্গে। বেচারি জেনিকে। যেহেতু বর্গের সঙ্গে আইনসম্মত বিয়ে তাঁর হয়নি, খোরপোষ হিসাবে কানাকড়িও পাবেন না তিনি।

শ্রদ্ধা বিনিময় সংঘ?

মিউচুয়াল অ্যাডমিরেশন সোসাইটি এই কথাটার কাছাকাছি বাংলা করলে দাঁড়ায়, পারস্পরিক শ্রদ্ধা বিনিময়ের সংঘ। ইমরান খাঁ ও মার্টিন ক্রো কি নিজেদের মধ্যে এরকম একটি সংঘ চালু করেছেন? সম্প্রতি লিখিত মার্টিন ক্রোর একটি প্রবন্ধের শিরোনাম দেখলে এরকম মনে হতে পারে। বছর দুই আগে ক্রো তখন সবে উঠছেন, ইমরান অসম্ভব প্রশংসা করেছিলেন তাঁর "নব্বই-এর দশকের সেরা ব্যাটসম্যান হতে যাচ্ছে মার্টিন ক্রো। আজহার বা রিচি রিচার্ডসনও দারুণ সম্ভাবনাময় তবে ক্রো ওদের থেকেও এগিয়ে।"

এবার মার্টিন ক্রো কি বলছেন শুনুন: শিরোনাম—ইমরানই সেরা অল রাউণ্ডার। ইমরান বল করতে আসছেন এর চেয়ে চমৎকার দৃশ্য আধুনিক ক্রিকেটে আর কিছু হতে পারে না। তিনশ উইকেটের অর্ধেকেরও বেশি উনি নিয়েছেন পাকিস্তানের প্রাণহীন উইকেটে। ইমরান যাঁরা শ্রেণীবিচার করার পক্ষে এই তথ্যটুকুই যথেষ্ট। ব্যাটসম্যান হিসেবেও উনি যথেষ্ট প্রতিভাবান। স্ট্রোক খেলতে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে সত্যি কথা কিন্তু এটা আমাদের মনে রাখতে হবে উনি বরাবরই অনেক বেশি মনোযোগ দিয়েছেন নিজের বোলিংয়ে। যা ব্যাটিংয়ে দিলে নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যান হতেন। সব থেকে বড় কথা ওর মস্তিষ্ক অত্যন্ত পরিষ্কার। যে কোনও ঘটনাকে যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা রাখেন।
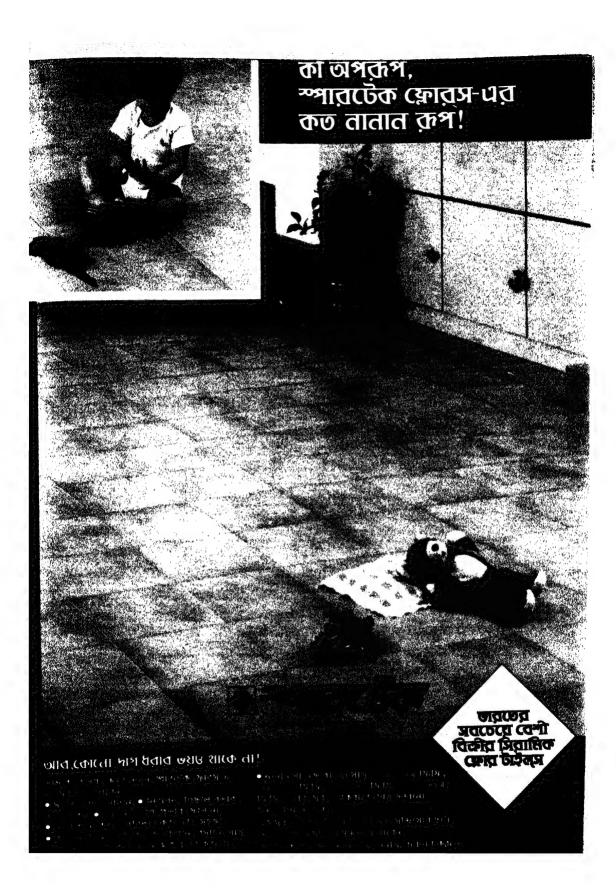
সেরা অলরাউণ্ডার বলতে আমি ওই একজনকেই বুঝি—ইমরান।

গৌতম ভট্টাচার্য

কী অপরূপ,
স্পারটেক ফ্লোরস-এর
কত নানান রূপ!
ভারতের
সবচেয়ে বেশী
বিক্রীর সিরামিক
ফ্লোর টাইলস
আর কোনো দাগ ধরার ভয়ও থাকে না!

মা কী করছে, বাবা ?
মেয়েটির মুখে ফুঁ দিচ্ছে ।
কেন ?
তাতে ওর নিশ্বাস নিতে সুবিধে হবে ।

সমুদ্রতীরে এ কাকে কুড়িয়ে পেলেন অরণ্যদেব ?
যাক, শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছে ।
এ কে ? কোত্থেকে এল ?

এই ছায়ায় এখন ঘুমোক । জেগে উঠলে কথা বলব ।

ওর নিশ্বাসের নলটা কাটা । কিসে কাটল ? মাছ ? পাথর ?

নাকি··· মানুষের ছুরি ?
?!

কখন ও জাগবে মা ?
গোল করিসনে, কিট ।

এ কী !
ভয় নেই । আমরা তোমার বন্ধু ।
হিজ···
চি···
6/15
ক্রমশ ● ৭

গোর্খাল্যান্ড : বিচ্ছিন্নতাবাদ না আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ?

গৌতম নিয়োগী

প্রসঙ্গ গোর্খাল্যান্ড/(সং) আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়/
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/কল-৯/১৫.০০

বিচ্ছিন্নতাবাদ ও গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন/(সং) বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়/
অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত/১৫.০০

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে পশ্চিমবাংলার উত্তর-প্রান্তিক জেলা দার্জিলিঙের পাহাড়ে শৈল শহরগুলি ঔপনিবেশিক এবং স্বাধীন ভারতবর্ষে সমতলবাসী জনগণের ভ্রমণ-পিপাসা চরিতার্থ করার জায়গা। ভ্রমণ-শিল্পকে আদৌ শিল্প বলা অনুচিত, তবু তাই বা ইংরিজি ট্যুরিজিম-ই ছিলো ঐ অঞ্চলের অর্থনীতির অন্যতম সোপান। স্থানীয় পাহাড়িয়া মানুষদের সবচেয়ে বড়ো শিল্প চা, কিন্তু তা ছিলো শ্রমবিক্রী করে মজুরী লাভের কর্মসংস্থান মাত্র এবং শিল্পের মুনাফা থেকে তারা যেমন ছিলো বিচ্ছিন্ন কিংবা অঞ্চলের আর্থিক উন্নয়ন তাদের কাছে ছিলো স্বপ্ন। অথচ জাতি হিসেবে তারা ছিলো পরিশ্রমী, বিশ্বাসযোগ্য ও সৎ এবং সেই কারণে পুলিশ কিংবা সৈন্যবাহিনীতে তারা অগ্রাধিকার পেতেন। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা পরাধীন ভারতে যেমন ছিলো, দেশ স্বাধীন হবার প্রথম পঁচিশ বছরও কেটে গেল তেমনই। কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্য সরকার কেউই এদিকে মনোযোগ দিলেন না। ইতোমধ্যে শুভ্র কিরীট মাথায় নিয়ে জেগে উঠেছে দার্জিলিঙ জেলা : বেড়েছে শিক্ষা, প্রসারিত হয়েছে চেতনা, দেখা গিয়েছে মধ্যবিত্ত মানসিকতা, আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধ। তখনই, সত্তর দশক থেকে এই চেতনায় আঘাত লাগলো যখন অর্থনৈতিক বঞ্চনার সঙ্গে যুক্ত হলো ভাষা ও সাংস্কৃতিক উপেক্ষা। পাহাড়ের বুকে কান পেতে তখনই শুনেছি উত্তপ্ত শব্দ, আনুগত্যে চিড় ধরার লক্ষণ। এই নিরীক্ষা ছিলো কর্মসূত্রে পাহাড়ে থেকে, ভাষা ও সংস্কৃতি ভালোবেসে আয়ত্ত করে, বুদ্ধিজীবী থেকে আমজনতা পর্যন্ত নানা শ্রেণীর সঙ্গে গভীর সৌহার্দ্যের সূত্রে মিশে। দাতান্তরে কেন্দ্রে জগা-খিচুড়ি সরকার আসার ফলে সারা ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা গেল বেড়ে এবং মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যা, যা আশির দশকে তীব্র আন্দোলনের আকার ধারণ করলো। যার অন্যতম পরিণতি আজ পশ্চিমবঙ্গের গোর্খাল্যান্ড দাবি নিয়ে গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের সহিংস সংগ্রাম। আজ স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে নির্দ্বিধায় বলা যায়, এই আন্দোলনের মতো অত্যন্ত জটিল, বিতর্কিত, তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে আর ঘটেনি। কেন এই
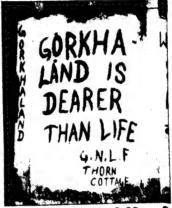
আন্দোলন ? কি এর চরিত্র ? এটা কি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ? না কি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই ?

প্রশ্নগুলির উত্তর সাধারণ মানুষের কাছে পরিষ্কার নয়। দুটি কারণে। এক, এর উত্তর বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরস্পর বিরোধীভাবে দিয়েছেন এবং সেইভাবে প্রচার করেছেন। জি এন এল এফ এবং তার নেতা সুভাষ ঘিসিং বলছেন একরকম, কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের মত অন্যরকম আবার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট অন্যমত পোষণ করেন। সূচনাতে না রাজ্য না কেন্দ্রীয় কেউই এর গুরুত্ব এবং ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনুমান করতে পারেননি ; পরে অবশ্য রাজ্য যথাসাধ্য এই আন্দোলন ঠেকাতে চেষ্টা করেছেন। সেই তুলনায় কেন্দ্রের নীতি স্ববিরোধী এবং অসামঞ্জস্য পূর্ণ কংগ্রেস দলের নানা নেতার মত। জনসাধারণ খবরের কাগজেও সর্বদা প্রকৃত চিত্র বুঝতে পারেন না। দ্বিতীয়ত অদ্যাবধি বুদ্ধিজীবী-সমাজও এ-ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নেননি। এই পরিস্থিতিতে গোর্খাল্যান্ড প্রসঙ্গে দুটি সংকলন প্রকাশ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। এই আন্দোলনের সমস্ত দিক স্পর্শ করে, তথ্য ও বিশ্লেষণের সমাহারে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সকলেরই প্রয়োজন—রাজনীতিবিদ, গবেষক, প্রশাসক, ছাত্র বা ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদ। সংকলন দুটি প্রায় সমধর্মী ; একটি সম্পাদনা করেছেন তরুণ সাংবাদিক আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ; অপরটি প্রবীণ সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। গুণগত উৎকর্ষে তারুণ্যের জয়, কারণ প্রথম সংকলনটি শ্রেষ্ঠতর। তবে দ্বিতীয়টি প্রকাশ করেছেন ব্যক্তিগত উদ্যমে ও অর্থে বঙ্গবাসী কলেজের এক অধ্যাপক ; তাঁর এই সাধু প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

পরিকল্পনায় ও সম্পাদনায় অনেক বেশি ভাবনার ছাপ আছে আলাপনের বইতে। তিনি সু-মুদ্রিত প্রকাশনায় যুক্ত করেছেন আট'টি সাক্ষাৎকার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু (সাক্ষাৎকারটি তিনি নিজে নিলে আরো খুশি হতাম), জি এন এল এফ নেতা সুভাষ ঘিসিং, কংগ্রেস (প্রাদেশিক) সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, দার্জিলিঙ জেলায় বামপন্থী—আন্দোলনের জনক রতনলাল ব্রাহ্মণ, সি পি আই (এম এল) দলের (একাংশের) নেতা সন্তোষ রাণা, সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী নরবাহাদুর ভাণ্ডারী এবং নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মনোমোহন অধিকারী এবং নেপালের সমাচারমন্ত্রী হরিবাহাদুর বাসেন্ত। বিবেকানন্দবাবু সংগ্রহ করেছেন দুটি সাক্ষাৎকার (অন্যের নেওয়া)—সরোজ মুখার্জী এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সি পি আই এম দলের দুই প্রবীণ ও নবীন নেতার। পাঠকগণ এগুলি পাঠ করলে বিভিন্ন দলের দৃষ্টিভঙ্গি অবগত হবেন।

গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের নানা দিক নিয়ে 'ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ' পর্যায়ে আলোচনা করেছেন কয়েকজন বাঙালি বুদ্ধিজীবী। গোর্খা ও বাঙালির দীর্ঘ ঐতিহাসিক সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘ সুন্দর রচনা লিখেছেন ডঃ সুকুমার সেন। অশোক রুদ্র, অশোক মিত্র, নিখিল চক্রবর্তী বিশ্লেষণ করেছেন নিজের মতানুযায়ী, তা আমাদের ভাবায়। সাংবাদিক তাপস মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি দরদী মনের, সহানুভূতিসম্পন্ন অথচ নিরপেক্ষ। তিনি সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন যে ১৯০৭ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত "অন্তত পনের বার দার্জিলিঙ পার্বত্য অঞ্চলটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৃথকীকরণের দাবি ওঠে। এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন প্রতিটি রাজনৈতিক দল।" অমলেন্দু গুহর মার্কসবাদী বিশ্লেষণটি সংক্ষিপ্ত অথচ বাস্তববাদী। 'চাই গণভোট' শীর্ষক লেখাটি প্রবীণ অন্নদাশঙ্কর রায় এলোমেলো, এমনকি 'গোর্খাদের সঙ্গে সদ্‌ভাব থাকাটাই আসল। অমন বিশ্বাসী দারোয়ান বা কাজের লোক কোথায় পাব ?' ধরনের বাক্য কুৎসিতভাবে আপত্তিকর। প্রবীণ পান্নালাল দাশগুপ্ত বরং যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ করেছেন। সবই আলাপনের বইতে।

বিবেকানন্দবাবুর বইতে প্রায় সকলেই একবাক্যে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনকে গালাগালি দিয়েছেন, বিচ্ছিন্নতাবাদী বলেছেন, কেন তা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেননি। এখানে অন্নদাশঙ্কর তার প্রবন্ধে এক

লাইনও ব্যয় করেননি গোর্খাল্যান্ড সমস্যা নিয়ে, অতুলচন্দ্র রায়, নিশীথরঞ্জন রায়, নিমাইসাধন বসু ইতিহাসের অধ্যাপক অথচ প্রত্যাশিত অন্তর্দৃষ্টি তথ্য সংগ্রহ, যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ কিছুই পেলাম না। কয়েকজন সাংবাদিক ও অধ্যাপকের লেখাও আছে। দায়সারা গোছের।
বিবেকানন্দবাবুর বইয়ের উল্লেখযোগ্য সংযোজন বাসুদেব মোশেল-কৃত 'গোর্খাল্যান্ড : ইতিহাস ও কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী' এবং পরিশিষ্ট যা পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন' পুস্তিকা থেকে প্রভূত পরিমাণে নেওয়া। আলাপনের বইতেও অলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'আন্দোলনের দিনপঞ্জী অতীব মূল্যবান, যেমন মূল্যবান ভারত-নেপাল চুক্তি সমেত সংযুক্ত অন্যান্য তথ্যপঞ্জী।

আঞ্চলিক ইতিহাসের খোঁজ

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

চেঞ্জিং প্রোফাইল অব দ্য ফ্রন্টিয়ার বেঙ্গল/বিনোদ এস দাস/
মিত্তল পাবলিকেশন/দিল্লী-৩৫/১৮০.০০

হলদিয়ার ইতিকথা (১ম খণ্ড)/বঙ্কিম ব্রহ্মচারী/
প্রকাশিকা : ভারতী জানা/মেদিনীপুর/২৫.০০

ব্রিটিশরাজ নিয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভারতে ইতিহাসের ছাত্র এবং গবেষককুল দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত থেকেছেন। বিদেশী শাসকবর্গ বিপুল এই দেশটিকে প্রশাসনের দিক থেকে একটি নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসার আগে, শিল্প-বাণিজ্যের মোটামুটি একটি নকশা গড়ে ওঠার আগে, ভারতের কী নিজস্ব কোনও সার্বিক ব্যবস্থা ছিল ? অর্থনীতির একটি নিজস্ব সার্বিক ধরন, যা 'ট্র্যাডিশনাল ইন্ডিয়া' হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ প্রশ্নের এই জবাবটি অনেকেরই গোলা লাগে এবং তা থেকে পরিত্রাণের পথও খোঁজা হয়। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থাটি, শিল্পবিপ্লব পুষ্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে, অন্তর্গত দুর্বলতার জন্যই দু হাত তুলে দিয়েছিল। এবং এর ফলে ভিক্টোরীয় প্রসাদপুষ্ট ভারত এক আন্তর্জাতিক শিল্পবিপ্লবের শরিক হয়ে পড়ে। ইতিহাসের এই নৈর্ব্যক্তিকতা সবটা ঠিক পণ্ডিতসুলভ নয়, এতে কিছু ভাগ, কিছু ফাঁকি আছে। এবং তার থেকেও বড় কথা বহুঘোষিত সেই শিল্পবিপ্লব কিছু রূপ নিয়ে, কবর-চিহ্নেই মুদ্রিত। সম্পূর্ণ কোনও শিল্পবিপ্লব এদেশে এখনও ঘটেনি।
সুবর্ণযুগের গল্পে মাতোয়ারা দেশপ্রেম এবং একপ্রকার আমদানিকৃত শিল্পবিপ্লবের রোম্যান্টিক গল্পে ঐতিহাসিকের পক্ষে সন্তোষ বোধ করা অসম্ভব। বিশেষ করে কেউ যদি অর্থনৈতিক-ইতিহাসের দিকটাতেই জোর দেন। অধ্যাপক বিনোদশঙ্কর দাসের 'চেঞ্জিং প্রোফাইল অফ দি ফ্রন্টিয়ার বেঙ্গল' পুস্তকটি রচিত হতে পারে এই দুটি বৃত্তের মধ্যকার ফাঁকটুকু ঘিরে।
বলাবাহুল্য এই প্রসঙ্গ ধরে বিভিন্ন স্কুলের ঐতিহাসিকেরা বহু কাজ করেছেন। এবং ঠিক এই মর্মে তর্কটি এখন যথেষ্ট ধূসর। মার্কসের 'এশিয়াটিক মোড অফ প্রোডাকশন'-কে ব্যবহার করে এখাতে এতটাই এগনো সম্ভব হয়েছে, যে ভারত ইতিহাসচর্চা আর ঠিক এই প্রশ্নে আটকে নেই।
বিনোদবাবু নিজেও তা জানেন, আর জানেন বলেই, জাতীয় ইতিহাসচর্চার ধারাটির সঙ্গেই তিনি তাঁর কাজকে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণার এক প্রধান অন্তরায় যথেষ্ট পরিমাণে তথ্যের অভাব। ব্রিটিশরাজের সময়কার কিছু নথিপত্র পাওয়া গেলেও তার আগেকার কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া কঠিন।

ভারতের মত বিশাল একটি দেশের বৈচিত্র্যও বিপুল। এখানে জাতীয় জীবনের প্রধান সুরটি অবিকৃতভাবে খুঁজে পেতে হলে আঞ্চলিক ইতিহাসকে গুরুত্ব দিতেই হবে। এক্ষেত্রে একটি উদ্বৃত্ত-ও পাওয়া সম্ভব আর তা হল রাজা-রাজড়ার ইতিহাসের গল্পের বাইরে নিচুতলার প্রাত্যহিক জীবনের সন্ধান। গণের মধ্যে প্রবাহিত প্রকৃত ইতিহাস। আধুনিক ইতিহাসচর্চা এই ঝোঁকটিকে ক্রমাগত আরও গুরুত্ব দিতে শিখছে। এটা এখন আর নিছক তথ্য ও উপাদান সংগ্রহের পদ্ধতি নয়, এটি এখন তত্ত্বের পর্যায়ে চলে এসেছে। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার চেষ্টার মধ্য দিয়ে লেখক শুরুর ওই ধাঁধাটির দিকে ধীরে এগিয়েছেন। এবং সংশয়হীনভাবে বলা যায় তাঁর পরিশ্রম অনেকখানিই সফল হয়েছে।
রেশম, লবণ, বস্ত্রশিল্প, কৃষিসম্পর্ক ইত্যাদি প্রসঙ্গের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত কৃষকবিদ্রোহ এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে যথাযোগ্য মর্যাদায়। অষ্টাদশ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত সময় কালের মধ্যে এক কালের জঙ্গলমহলের তথ্যপূর্ণ এই ধারাবিবরণী ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে 'সন অফ দি সয়েল'-এর অস্ত্র তুলে নেওয়ায় সমাপ্ত। বিপরীত খাতে মধ্যস্বত্বভোগী ও শিক্ষিত শহুরে বাবুসমাজের ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে একাত্মবোধ করার পর্যায়টিও ততোদিনে পরিণত হয়ে উঠেছে। অশ্রুসজল এক লবণকাহিনী, একচেটিয়া ব্রিটিশ বাণিজ্য ঢেউ-এ ডুবতে বসেছে। বণিকের মানদণ্ডের তখন রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হওয়ার সময়।

বঙ্কিম ব্রহ্মচারী মেদিনীপুরের মানুষ, 'হলদিয়ার ইতিকথা' সর্বাগ্রে সেকথা জানাতে পারে। এজন্যে বইটির পিছনের প্লার পড়ার কোনও দরকার হয় না। 'দোরোর জঙ্গলয়ের সেজন্য কোন ঠিকুজি রচিত হয়নি··· আশার কথা সে ইতিহাস অতিদূর অতীতে মিলিয়ে যায় নি।' একথা কোনও শহুরে ঐতিহাসিকের পক্ষে বলা কঠিন হোত, কারণ পুরনো বই, পত্রপত্রিকা এবং মহাফেজখানায় বাইরে তার দৃষ্টি চলে না। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার রসদ-ঘরটির প্রকৃত ঠিকানা আছে অন্যত্র। পুরাকীর্তি, মন্দির, ভাস্কর্য ইত্যাদিও পেরিয়ে। আছে ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনজীবনে। বহু পুরনো একটি দলিল ও পাট্টার কাগজ গবেষককে অনেকদূর এগিয়ে দিতে পারে। যা বঙ্কিম ব্রহ্মচারীর ক্ষেত্রে ঘটেছে।
১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এক বিঘা জমি চাষ করতে কী পরিমাণ খরচ হতো এবং জমির মালিকের কতটা লাভ থাকত সেই হিসেবও পাঠক এই গ্রন্থটিতে পেতে পারেন। জানতে পারেন মৃতের সৎকার থেকে স্বদেশী আন্দোলনে মুসলিম সমাজের ভূমিকার কথা। এছাড়া হলদিয়ার বিভিন্ন এলাকায় প্রভাবশালী বংশের পরিচয় থেকে তৎকালে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ধরনটিও। বিনোদবাবুর যা সমস্যা বঙ্কিমবাবুর সেইটিই সুবিধা, তবু কেন যে দুজনের এক যুগলবন্দী গড়ে ওঠে না! বঙ্কিমবাবু যদি তাঁর গ্রন্থ-পরিকল্পনায় আরেকটু যত্ন নিতেন, তাহলে তাঁর দুর্মূল্য তথ্যগুলি আরও বেশি মর্যাদা পেত। এখন যা অবস্থা, তাতে বইটি থেকে পেশাদার লেখক ও পণ্ডিতরা নিজেদের প্রয়োজন মত তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং যথেষ্ট সজ্জন হলে তবেই সূত্র হিসেবে পাদটীকায় বইটির নাম উল্লেখ করবেন।

মধুসূদন-সমালোচনার সংকলন

ভবতোষ দত্ত

মধুসূদন সাহিত্যপ্রতিভা ও শিল্পীব্যক্তিত্ব/(সং) দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ/
পুথিপত্র/কল-৯/৬৫.০০

মধুসূদনের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৭৩ সালে। তাঁর জীবিত কাল থেকেই তাঁর কাব্যের সমালোচনা শুরু হয়েছিল। সেই সময় থেকে ইদানীন্তন কাল পর্যন্ত তেতাল্লিশ জন সমালোচকের লেখা নিয়ে বর্তমান বইটি পরিকল্পিত। শুধু মধুসূদনের সাহিত্য নয়, তাঁর জীবনীটিও কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়, তাঁর ব্যক্তিস্বভাবও কম কৌতূহলের উদ্রেক করে না। তাঁর সাহিত্য জীবন ও ব্যক্তিত্বে বিভিন্ন সময়ে বাঙালি পাঠক কতখানি আকৃষ্ট হয়েছে, এই বইটি তার দলিল। সম্পাদক বলেছেন, তিনি যথাসম্ভব কালক্রম রক্ষা করে রচনাসন্নিবেশ করেছেন। এই ক্রমানুসরণের ফলে বাঙালি পাঠকের পরিবর্তনশীল রুচি ও রসবোধের একটা আভাসও এতে পাওয়া যায়। মধুসূদনকে নিয়ে আমাদের চিরকাল সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তাঁর সাহিত্য ও ব্যক্তিত্ব দুই-ই সেকালে এবং একালে বিতর্কের বিষয় হয়েছে। এক শ্রেণীর পাঠক তাঁর লেখায় উৎকৃষ্ট সাহিত্যগুণ খুঁজে পেয়েছেন, আর এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে মধুসূদনের লেখা নানা দোষত্রুটিতে পূর্ণ বলে মনে হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিত্বও তেমনই। একদিক দিয়ে সে ব্যক্তিত্ব অসাধারণত্বে মণ্ডিত, আর একদিক দিয়ে সংস্কারবিরোধী ধর্মান্তরিত বলে অশ্রদ্ধেয়। তবু মধুসূদনকে কেউ ভোলেনি। গত একশো দেড়শো বছরের মধ্যে কত কবি হারিয়ে গেছেন, তাঁদের কেউ কেউ আছেন ছাত্রপাঠ্য বইয়ের মধ্যে, কিন্তু মধুসূদন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার বাইরেও কালোত্তীর্ণ হয়ে আছেন। মধুসূদন-সাহিত্যের জোরটি কোথায়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে তাকে বোঝবার চেষ্টা

হয়েছে।

সেকালের এবং একালের সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অনেকখানি তবু মেঘনাদবধ কাব্য যে একটি শক্তিশালী কাব্য সেটা আমরা অনুভব করি। বড়ো কাব্যের লক্ষণই তাই। নানাভাবে নানা যুগে সে পাঠকের রসবোধকে উদ্বোধিত করে। সকলেই জানেন বালক রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে মেঘনাদবধ কাব্যের যে সমালোচনা করেছিলেন, সেটাই তাঁর শেষ কথা ছিল না। সম্পাদক এখানে সেই লেখাটিই উদ্ধৃত করেননি, তেমনি উদ্ধৃত করেননি বুদ্ধদেব বসুর লেখাটিও। সম্পাদকের এই নিয়ে সঙ্কোচ বোধ করার কারণ ছিল না। কেননা কোনোটাই মধুসূদন সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্ত হয়ে থাকেনি। তেমনই আশা করি, নারায়ণ চৌধুরী মশায় ব্যক্তিচবিত্রকে যেভাবে দেখেছেন সেটাই চরম হয়ে থাকবে না। বুদ্ধদেব বসুর ব্যঙ্গমিশ্রিত লেখাটিতে বরং মধুসূদনের প্রতিভা অনস্বীকার্য ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেবের অভিমতে রবীন্দ্রনাথের মতটি বিস্তৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

তিনি বাংলা ভাষার স্বভাবকে মেনে চলেননি। তাই তিনি যে ফল ফলালেন তাতে বীজ ধরল না; তাঁর লেখা সন্ততিহীন হল, উপযুক্ত বংশাবলী সৃষ্টি করল না।' (সাহিত্যরূপ, ১৩৩৫ বৈশাখ)

মোহিতলাল আবার পরবর্তীকালে দেখিয়েছিলেন মধুসূদনের ভাষার ভিত্তিটা হচ্ছে খাঁটি বাংলা। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র বা রাজনারায়ণ বসু যেভাবে মধুসূদনের কাব্যের বিচার করেছিলেন, বিশ শতকে সেভাবে কাব্যের বিচার হয়নি। পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা পদ্ধতি অবশ্য সেকালেই প্রযুক্ত হয়েছিল। মহাকাব্যের গঠন রীতি ও আদর্শ দিয়ে কাব্যের বহিরঙ্গ বিচার এবং ভারতীয় ঐতিহ্য দিয়ে অন্তরঙ্গ বিচার সেকালের থেকেই চলে এসেছে। কিন্তু শশাঙ্কমোহন সেন থেকে শুরু হল সমালোচনার নতুন পর্ব। তাতে মেঘনাদকে কোনো বিশেষ কাব্যশ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করার নিষ্ফলতা দেখিয়ে কাব্যান্তর্গত গভীর সত্যকে স্পর্শ করবার চেষ্টা আছে। মোহিতলালও তাঁকে অনুসরণ করেছেন। এই রকম ভাবগত ব্যাখ্যার দুটো দিক আছে—ঐতিহাসিক এবং মানবিক। উনিশ শতকের রেনাসাঁসের পরিপ্রেক্ষিকায় মধুসূদনের কাব্যের বৈশেষত্ব দেখানো আজকাল খুব প্রচলিত। বর্তমান বইতে এরকম দুটি লেখা আছে শীতাংশু মৈত্র এবং আবাবের আলীর।

আবার বিশুদ্ধ সাহিত্যকলার দিক দিয়ে মধুসূদন-সাহিত্যের বিচারও উঁচুমানের হয়েছে। প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের আলোচনা সেদিক দিয়ে বৈশিষ্ট। এ শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য আলোচনা [illegible]কুমার শিকদার, শিশিরকুমার দাশ, দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের। মধুসূদন-সাহিত্যের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার প্রয়াস দেখা যায় তাঁর কাব্যের উপাদান পরীক্ষার সূত্রে। সেকালে [illegible]নাথ সান্যাল, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এবং [illegible]গীন্দ্রনাথ বসু এদিক দিয়ে অনেক তথ্য দিয়ে [illegible]ছেন, প্রথম দুজন সম্পাদনা উপলক্ষে এবং [illegible]তীয়জন জীবনী রচনার উপলক্ষে। এই তিনজনের [illegible] লেখাই কিন্তু এই সংকলনে নেই। মধুসূদনের কাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সম্পর্কে এই তিনজন যা [illegible]লেছিলেন, তার চেয়ে অধিকতর গবেষণা আজ পর্যন্ত হয়নি। মূল গ্রীক ল্যাটিন মিলিয়ে গবেষণার প্রয়োজন এখনও আছে। অনেকদিন আগে ক্লার্ক সাহেব মেঘনাদবধের অষ্টম স্বর্গ ও মূল ডিভাইনা কমেডিয়ার নরক বর্ণনার তুলনা করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আরও কিছু হয়েছে কিনা জানা নেই। সেই তুলনায় প্রাচ্য প্রভাব দেখিয়ে বরং বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে। বর্তমান সংকলনে গার্গী দত্ত দেখিয়েছেন 'মধুসূদনের ভারতীয় উত্তরাধিকার', বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন 'প্রমীলার উৎস' (এই নিয়ে গার্গী দত্তের সঙ্গে বিতর্কের বিবেচনা করেছেন সম্পাদক), মানস মজুমদার করেছেন 'মধুসূদনের কাব্যে মিথ-এর প্রভাব', জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায় করেছেন 'মধুসূদনের অন্বয়'। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের আলোচনা করেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন এবং নীলরতন সেন। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের 'বঙ্গেতর ভারতীয় সাহিত্যে মধুসূদনের প্রভাব' লেখাটি কৌতূহলোদ্দীপক কিন্তু অতৃপ্তিকর। মধুসূদনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা দেখে মনে হল নীরেন্দ্রনাথ রায়ের এবং বিষ্ণু দের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সমালোচনা এবং জগন্নাথ চক্রবর্তীর চিত্রকল্পের আলোচনামূলক লেখা থাকলে ভালো হত। মধুসূদন-সমালোচনার সামগ্রিক পর্যালোচনা করেছেন সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। তিনি আলোচনা করেছেন মুখ্য সমালোচকদের অবলম্বন করে।

এই বইয়ের পরিশিষ্টটি মূল্যবান। এতে আছে মধুসূদনের জীবনের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি, মধুসূদনের রচনাবলী এবং তাঁর বইয়ের নানা সংস্করণের তালিকা, অ-গ্রন্থভুক্ত কবিতাবলীর তালিকা। মধুসূদন-সম্পর্কিত গ্রন্থের যথাসম্ভব সম্পূর্ণ পঞ্জি ইত্যাদি।

মধুসূদন দত্তের সাহিত্য নিয়ে এরকম সমালোচনা-সংকলন অভিনব। একসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির লেখা এর আগে পাওয়া যায়নি। সম্পাদককে এজন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় ও চিন্তা করতে হয়েছে। বইটি অবশ্যসমাদরণীয়।

রবীন্দ্রনাথ : নানা প্রসঙ্গ

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

স্বপ্ন সত্য রবীন্দ্রনাথ/অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/ কল-৯/ ২৫·০০

রবীন্দ্র-দিনপঞ্জী/অশোককুমার কুণ্ডু/ পুস্তক বিপণি/কল-৯/ ৩০·০০

পনেরোটি রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন 'স্বপ্ন সত্য রবীন্দ্রনাথ'। অত্যন্ত পরিশ্রমী লেখক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি নিয়ে যাঁরা চর্চা করেছেন, তাঁরা দেখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ বারবার পরিবর্তন করতেন। কিছুতেই যেন আশ মিটতো না। চূড়ান্ত সিদ্ধিতে পৌঁছোবার প্রচণ্ড প্রয়াস। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির এই 'রোমাঞ্চ' অনুভব করেছেন লেখক একটি প্রবন্ধে ('রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির রোমাঞ্চ')। পাঠ-পরিবর্তন, পাঠ-বিভ্রাট ও 'লুপ্ত' লেখা নিয়ে দুটি প্রবন্ধ। রবীন্দ্র-কবিতায় ইংরেজি শব্দসম্ভার বিষয়ে একটি। 'গত শতকে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বাজার', 'যে বছর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন সবচেয়ে বেশি', 'রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বিজ্ঞাপন : তাঁর কালে'—নামেই বোঝা যায় কী আছে লেখাগুলিতে। বহু তথ্যে ঠাসা। দুর্লভ বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি মুদ্রিত। 'সহজ পাঠ'-কে শিশুর প্রথম পাঠ্য বই হিসেবে আদর্শস্থানীয় বলে মানেননি অমিত্রসূদন। এ বিষয়ে তাঁর যুক্তিগুলি বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। রবীন্দ্র-নির্দেশিত গ্রহণ-বর্জন পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী কোনো কোনো স্থানে রক্ষা করেননি। অর্থাৎ রবীন্দ্র-নির্দেশ বা রবীন্দ্র-অনুমোদিত মুদ্রণ পরে রাখা হয়নি। নানা দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন লেখক। এগুলি নিয়ে বিশ্বভারতী চিন্তা করছেন শুনেছি। তবে নানা জট পাকিয়ে আছে। তা খুলতে হয়তো সময় লাগছে। যাই হোক, বিষয়টি উত্থাপন করে বিশ্বভারতীকে সজাগ রাখা ভাল।

'রাজা ও রানী' থেকে 'তপতী'-তে বিবর্তিত হওয়ার পথে মাঝখানে আছে 'ভৈরবের বলি'। এই নাটক স্বল্পজ্ঞাত, স্বল্পালোচিত। একটি পাণ্ডুলিপি ছিল সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। বর্তমানে এ পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত। সোমেন্দ্রনাথ বসু এই পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে প্রবন্ধ লেখেন রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩৭৩)। ১৯২৯ সালে গগনেন্দ্র ঠাকুরের উদ্যোগে পুরাতন এম্পায়ার থিয়েটারে (বর্তমানে রক্সি) 'ভৈরবের বলি' অভিনীত হয়—দুদিন। এই অভিনয়ের কোনো মুদ্রিত বিবরণ পান নি অমিত্রসূদন। দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর কুমারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর চিঠি থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন লেখক। তবে এই অভিনয়ের বিশদ বিবরণ কিন্তু প্রকাশিত হয়েছিল—'নাচঘর' পত্রিকায় (২০ বৈশাখ ১৩৩৬, পৃঃ ২)। তাতে অবশ্য ক্ষতি নেই কিছু। দুটি জায়গা থেকে পাওয়া খবরে বিবরণটি পূর্ণাঙ্গ হবে। প্রবন্ধের নাম 'ভৈরবের বলির পূর্বকথা ও পাণ্ডুলিপি পরিচয়'। বিবরণটি অবশ্য ভৈরবের বলির না 'পূর্বকথা', না পাণ্ডুলিপি-পরিচায়ক, অভিনয়-কথা মাত্র। 'পূর্বকথা' অংশের মধ্যে রাখা আছে 'রাজা ও রানী'-র অভিনয়ের কয়েকটি তারিখ, একটি বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি ও দুটি সমালোচনা। প্রশ্ন জাগে, এই সব কি ভৈরবের বলির পূর্বকথা? যদি তা হয়ই, তাহলে আরো তারিখ, আরো বিজ্ঞাপন ও আরো সমালোচনা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি তুলবে। তাছাড়া 'পূর্বকথা' ও 'পাণ্ডুলিপি পরিচয়' দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ, জৈবিক যোগ নেই দুই অংশে।

'ছবি ও ছন্দ : কবি ও নন্দ'—এখানে রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের লেখা ও রেখার পারস্পরিক সংযোগের এক বিস্তৃত ইতিহাস সংকলিত। লেখাটি ভাল। কিন্তু নামটা কানে লাগে। ছন্দের খাতিরে নন্দলাল বসুর নন্দত্বপ্রাপ্তি তৃপ্তিকর নয়। 'ইংলন্ডেশ্বরীর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ : একটি দুষ্প্রাপ্য শোকপ্রস্তাব'—প্রস্তাবটি উদ্ধার করে পুনর্মুদ্রণ করেছেন অমিত্রসূদন। রবীন্দ্রনাথের এই রানী-ভক্তিতে প্রথমে মুষড়ে পড়তে হয়। ভাবলে বোঝা যায়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও দেশকালের ঊর্ধ্বে নন। তিনিও ইংলন্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে দ্বিধাবিভক্ত মনের অধিকারী। ১৮৭৭ সালের জানুয়ারিতে ইংলন্ডেশ্বরীর 'ভারতসম্রাজ্ঞী'

খেতাব-ঘোষণায় রবীন্দ্রনাথ তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে জানান : 'তবে এই সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান ?/ ...ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক আমরা গাব না/ আমরা গাব না হরষ গান।' সেই রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে তাঁর প্রশস্তি গান, বলেন, 'বিপুল সাম্রাজ্যের জননীপদে-অধিষ্ঠিতা...তাঁহার রাজশক্তিকে মাতৃস্নেহের দ্বারা সুধাসিক্ত করিয়া...রাখিয়াছিলেন, ক্ষমা শান্তি এবং কল্যাণ যাঁহার অকলঙ্ক রাজদণ্ডকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল...' ইত্যাদি। দুই রবীন্দ্রনাথ—একাধারে।

'গল্পগুচ্ছের পিতা' প্রবন্ধে একটি মাত্র পিতাই লেখকের চোখে পড়লো। 'সমাপ্তি' গল্পের ঈশানচন্দ্র মজুমদার। ঈশানকে মনে পড়তেই পারে, কিন্তু 'দেনাপাওনা'র রামসুন্দর মিত্রকে মনে পড়ল না ? বা স্মরণে এল না 'অপরিচিতা' গল্পের পিতা শম্ভূনাথ সেনকে ?

'মৃত বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রের বিরোধ'—প্রবন্ধটির নামে চমক আছে। হঠাৎ মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝি প্ল্যানচেটেই নামিয়ে এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং ঝগড়াঝাঁটি করেছিলেন। না, তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর দশ মাস পরে রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর একটি সমালোচনা লেখেন 'সাধনা' পত্রিকায়। এই সমালোচনাটি সম্পর্কে অমিত্রসূদনের আপত্তি।

আপত্তি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে এবং তাঁর ভাষায়। এটিকে অমিত্রসূদন বলেছেন 'তীব্র আক্রমণ' 'তিরস্কার' ইত্যাদি। আমাদের কিন্তু মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের লেখাটিতে যুক্তি আছে। আর ভাষা ? স্পষ্ট এবং জোরালো। কিন্তু তা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেনি। 'তিরস্কার' বা 'তীব্র আক্রমণ' মনে হয়নি আমাদের। অমিত্রসূদন দীর্ঘকাল বঙ্কিম-চর্চা করেছেন। তাঁর বঙ্কিম-প্রীতি খুবই গভীর। তাই তিনি বঙ্কিম প্রসঙ্গে কি একটু বেশি স্পর্শকাতর ?

বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পত্রিকায় মুদ্রিত লেখা যখন গ্রন্থে আনতেন, তখন কেটে-ছেঁটে সম্পাদনা করতেন। এ তথ্য অমিত্রসূদন আমাদের অনেকবার জানিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি এ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেননি।

'রবীন্দ্র-দিনপঞ্জী'তে একটা তারিখ পাতার শীর্ষে। বিভিন্ন বছরে ঐ তারিখে রবীন্দ্রনাথ কী করেছেন তার বিবরণ সংকলন করেছেন ডঃ অশোককুমার কুণ্ডু। এইভাবে দিন ধরে ধরে গোটা রবীন্দ্রজীবন।

১২৫-তম জন্মবর্ষে অশোকবাবুর এই কাজ। খুবই শ্রমসাধ্য কাজ সন্দেহ নেই। উপযোগিতাও আছে এর। কিন্তু সীমিত ক্ষেত্রে। কালানুক্রমিক দিনপঞ্জীর উপযোগিতা হয়তো আরো বেশি। যাই হোক, একটি অন্য ধাঁচের দিনপঞ্জী পাওয়া গেল।

অনেকের নিশ্চয়ই কাজে লাগবে। এ জাতীয় বইয়ের মুদ্রণে আরো সতর্কতা দরকার। ভুল ছাপা হলে বইয়ের গৌরবহানি ও পাঠকের জ্ঞানহানি ঘটে, পরের সংস্করণে এই হানাহানি বন্ধ হবে আশা করব।

উপন্যাস, গল্প

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

পদ্মার পলিদ্বীপ/ আবু ইসহাক/
মুক্তধারা/ ঢাকা-১/ আশী টাকা

একদা বর্বর রাতে/
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ/
জগজ্জাত্রী পাবলিশার্স/কল-৯/ ২৫.০০

খদ্দের/তারাপদ রায়/
সংবাদ/কল-৭৩/১২.০০

যখন যুদ্ধ/সুচিত্রা ভট্টাচার্য/
সংবাদ/কল-৭৩/১০.০০

আবু ইসহাক ওপার বাংলার একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পদ্মার পলিদ্বীপে'র কাহিনী গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের সেইসব কৃষিজীবী মানুষদের বেঁচে থাকার কথা নিয়ে, পদ্মার মর্জির ওপর যাদের জীবন নিত্য দোলায়মান। পদ্মা প্রায়ই তার গতি পরিবর্তন করে। ফলে, হঠাৎ হঠাৎ জেগে ওঠে পদ্মার চর—মানুষ দখল নেয় সেই চরের, ফসল ফলায়। আবার হঠাৎই একদিন সে চর নদীর অতলে তলিয়ে যায়। 'আসুলী'রা (মূল ভূখণ্ডের মানুষের) এদের বলে "চরুয়া ভূত"। এমনি এক চরের মালিক-পুত্র ফজলকে কেন্দ্র ক'রে মাটি-নদী আর মানুষকে নিয়ে আবু ইসহাক জীবনের গল্প বলেছেন। যে জীবনের উত্থান-পতন, প্রেম, অনিশ্চয়তা সব গাঁথা আছে নদীর আর জমির সঙ্গে। মানব-সভ্যতার সেই আদিম কাল যেন আর এক রূপে আধুনিক জীবনে লুকিয়ে আছে। জমি দখলের চিরন্তন লড়াই। ফজলের জীবন কাহিনীতে যেমন ফিরে ফিরে এসেছে স্ত্রী রূপজান, প্রেমিকা জরিনার কাহিনী, তেমনি এসেছে লোভী অসৎ জঙ্গুরুল্লা। উপন্যাসের ঘটনা-বিন্যাসে তার চরিত্ররা লেখকের কলমে অদ্ভুত প্রাণবন্ত। তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী গোটা উপন্যাসে দিনের আলোর মত ছড়িয়ে আছে। এবং উপন্যাসটিকে একটি নির্দিষ্ট চরিত্র দিয়েছে। চোর হেকমতের জন্যও পাঠক মমতাবোধ করবেন। এই সামাজিক মনোভাবই এই উপন্যাসের প্রাণস্বরূপ। এইসব মানুষদের কাহিনী বলতে গিয়ে একবারও তত্ত্বের প্রশ্ন না তুলে কি স্বাভাবিকভাবে লেখক সমাজের "ডি-হিউম্যানাইজেশন" তুলে ধরেছেন। এই বইয়ের আর একটি উপরি পাওনা হল এর "শব্দ-পরিচিতি"। এপার বাংলার পাঠককে যা বাংলাদেশের ডায়লেক্টের মূল রসটি অনুভব করতে সাহায্য করবে।

"একদা বর্বর রাতে", "পদ্মাবতী" ও "গঙ্গাপুত্র" এই তিনটি উপন্যাসোপম বড় গল্প নিয়ে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের "একদা বর্বর রাতে।" শান্ত কাঁঠালিয়া ঘাটে একের পর এক যুবক খুন হ'তে থাকে। কে করে এই খুন ? কেনই বা করে ? এ প্রশ্ন শুধু পাঠকের নয়, লেখকেরও। আর এই রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে মানুষের চরিত্রের কত বিভিন্ন দিক যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। প্রথম থেকেই একটা টান-টান রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়া অনুসন্ধিৎসু পাঠককে পৌঁছে দেয় গল্পের শেষে।

আপাত নির্বিরোধী দীপহরিকে যখন ছুরি হাতে আততায়ীর জন্য অপেক্ষা করতে দেখেন পাঠক, অথবা নিতান্ত ভালমানুষ হেমন্তরঞ্জনের ভাগ্নি সুগন্ধা পালিয়ে যাওয়ায় হেমন্ত ভাবেন 'আরও ভাল কোন ছেলের সঙ্গে পালাতে পারত। কি স্বাভাবিকভাবে মানুষের চরিত্রের বহুমুখিনতা ধরা দেয়।

কাশ্মির জাতির উপকথা অবলম্বনে ১০৬৯ খৃষ্টাব্দের এক বাঙালিনীর প্রেমের গল্প 'পদ্মাবতী' রসোত্তীর্ণ প্রেমের গল্পের মতই যে কোন সময়ের একটি মেয়ের গল্প।

গঙ্গার তীরের শীতলডিহি গ্রামের গোপাল প্রেমে পড়ে অতিথি তিন্নির। সে প্রেম সাফল্য না পেলেও, গোপাল ভেঙে পড়ে না। নদীর জলে, নাকি বহতা জীবনে, আশ্রয় খুঁজে পায়, 'ঘরে ফেরে'। 'গঙ্গাপুত্র' গল্পে গোপালকে সামনে রেখে লেখক গ্রাম-বাংলার মানুষের সুখ-দুঃখে, জীবন-যাপনে সুদক্ষ শিল্পীর হাত রেখেছেন। গল্পের ভাঁজে ভাঁজে তাঁর জীবনবোধের প্রকাশ। পটভূমিকায় গ্রামের প্রকৃতিও এসেছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত স্বাভাবিকভাবে। ভুতু মাসি, অরুণ, নোলে ভটচায সকলে মিলে যে জীবনকে করে তুলেছে বিচিত্র—সেই জীবনই লেখকের উপজীব্য বিষয়।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত, তার রস-সাহিত্যের ধারাটি তেমন সুপুষ্ট নয়। বাঙালীর রসবোধ নেই একথা অতি বড় নিন্দুকও বলবে না। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে বাঙালী সিরিয়াস সাহিত্যেই বেশী মনোযোগী। মুষ্টিমেয় কিছু লেখক আছেন, যাঁরা সত্যিই রস-সাহিত্যের সার্থক স্রষ্টা। সম্প্রতি এই তালিকায় তারাপদ রায়ের নামটি যুক্ত হয়েছে। নিজেকে লেখক এ গ্রন্থে 'মাইনে করা হাস্যরসিক' বলেছেন। তাঁর চোদ্দটি রম্যরচনার এই সংকলনটি পড়ে কিন্তু আমার একবারও 'মাইনে করা' বলে মনে হয়নি। নিরাভরণ ভাষায় লেখা এ রচনাগুলি কেবল রম্যই যে তা নয়, এগুলি মিছরির ছুরিও বটে। আমাদের স্বভাবের, আচরণের এক একটি অসম্পূর্ণ বাঁকাচোরা দিকের দিকে তিনি তর্জনী তুলেছেন। 'খদ্দের' রচনার রমেশ কলকাতায় চাকরি করতে এসে বুঝতেই পারল না, 'বাবুদের বাড়িতে যারা আসে, তারা মক্কেল, না পেসেন্ট, না খদ্দের ? নাকি আরো কিছু আছে ?' সঙ্গে সঙ্গে শহর জীবনে চাকচিক্যের আড়ালে চাপা পড়া এক আধা-অন্ধকার জীবন আলোকিত হয়ে ওঠে। কিপ্টে মনোজ, জয়গোপাল, বাতিকগ্রস্ত বাগেশ্বর—এসবই আমাদের চারপাশের চেনা মানুষদের নতুন ক'রে চিনিয়ে দেয়। নিজেদেরও কি চেনায় না ?

এর আগে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ছোটগল্পের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে—তাই খুবই আগ্রহভরে আমি 'যখন যুদ্ধ' নামের উপন্যাসটি পড়তে শুরু করি। কিন্তু সত্যের খাতিরে আমায় স্বীকার করতেই হচ্ছে যে আমি আশাহত হয়েছি। বেঙ্গল মিলের শ্রমিক-ঘরণী পার্বতী মিলের সুদীর্ঘ স্ট্রাইকের সময় স্বামীর পাশে দাঁড়াতে চায়—শেষে রোজগারের জন্য বাড়ির বাইরে যেতে হয় তাকে। যে বাইরের জগতে নোংরা, লোলুপ মানুষেরাই কাজ দেবার মালিক। উপন্যাসের শেষে পার্বতীর আর ঘরে ফেরা হয় না। সে হারিয়েই যায়। এই মামুলি কাহিনীটিকে ভিত্তি করে পার্বতীর আর তার চারপাশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত

মানুষের জীবন-সংগ্রামই এই উপন্যাসের মূল বিষয়। কিন্তু কোথাওই সেই সংগ্রামের উত্তরণ ঘটল না। অনেক সময় লেখার ভঙ্গিমায় সাধারণ কাহিনীও অসাধারণ হয়ে ওঠে। বিশেষ কিছু পাঠকের প্রাপ্য হয়। এক্ষেত্রে, সে প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছি। সম্ভবত এটি সুচিত্রা ভট্টাচার্যের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। কিন্তু এ উপন্যাসের ভাবা তাঁর পরিণত কলমের পরিচয় দেয়। খুব স্বাভাবিকভাবে তিনি গল্প বলতে পারেন। যা কিনা একজন লেখকের লেখক হয়ে ওঠার প্রথম শর্ত।

ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস

বিনতা রায়চৌধুরী

আকাশপ্রদীপ/ রমাপদ চৌধুরী/
আনন্দ পাবলিশার্স/ কল-৯/ ১৬.০০

অচেনা আকাশ/ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়/
আনন্দ পাবলিশার্স/ কল-৯/ ২০.০০

রমাপদ চৌধুরী তার আকাশপ্রদীপ উপন্যাসটিতে বলতে চেয়েছেন মধ্যবিত্ত মানুষের সুখ ও অসুখের কথা। এই উপন্যাসে দেখা গেছে কলকাতার একটি সাজানো গোছানো অঞ্চলে কিছু সাজানো গোছানো জীবনের মানুষ শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু একটি অপরিচ্ছন্ন বস্তি এদের সুস্থ জীবন অসুস্থ করে তোলে। লেখকের ভাষায় যেন একটি 'ক্যান্সার স্পট'। এই বস্তির মানুষের অপরিষ্কার অসামাজিক জীবনযাপনের রেশ প্রায় সংক্রামক রোগের মত এরা এড়িয়ে চলতে চায়। বস্তিটাকে উচ্ছেদ করার ইচ্ছা ও চেষ্টা ভয়ানকভাবে খোঁচাতে থাকে মানুষগুলোকে। শেষপর্যন্ত বস্তিটাকে তুলে দিতে পেরে প্রত্যেকেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে কিন্তু এই স্বস্তি ক্ষণিকের, বস্তি তুলে দিলেও তুলে দেওয়া যায় না। বস্তির অপরিচ্ছন্নতা আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে ফুটপাতে ফুটপাতে। আর বস্তির সেই ফাঁকা জায়গাটাতে এক বিশাল অট্টালিকা আকাশপ্রদীপ উড়ে এসে যেন জুড়ে বসে সাধারণ মানুষগুলোকে দমবন্ধ করে মারতে চায়।
বস্তি এখানে প্রায় রূপকের মত এসেছে। লেখক তার নিজের ভাষায় যা বলেছেন— 'সব সংসারের মধ্যেই হয়তো একটা ছোট্ট বস্তি আছে। যা সব সুখ নষ্ট করে দেয়।' এই অদৃশ্য বস্তি ক্যান্সার স্পটের মত জেগে থাকে, তাকে নির্মূল করা যায় না, ছুরি ছোঁয়ালেই সে আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যায়। দীনেনবাবু, সুধাকান্তবাবু এবং অতীশবাবুও পারেননি তাদের জীবনের ম্যালিগন্যান্ট টিউমারগুলোকে কেটে বাদ দিয়ে সুস্থ হয়ে উঠতে। দীনেনবাবুর নয়নের মণি মনু সমাজবিরোধীর হাতে শিকার হয়েছে। সুধাকান্তর পরম ভরসার দিব্য মাদকের নেশায় তিল তিল করে নিঃশেষ হয়ে যেতে বসেছে। আর অতীশবাবু, এককালের প্রবল প্রতাপশালী মানুষটি অসহায়ভাবে আত্মসমর্পন করেছেন দুরারোগ্য ব্যাধির কাছে। তবু এত কষ্টের মধ্যেও লেখক একটি চরম সত্য কথা জানিয়েছেন, শুধু বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকাই বড় সুখ। সেটুকুই অনেক।' বারবার ব্যবহারেও শব্দকটিকে ক্লিশে মনে হয়নি। আর একজন মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে কথাটা যেন প্রতিবারই নতুন মাত্রা পেয়েছে।
উপন্যাসটি পড়ার পরে মনে রেশ রেখে যায়, ভাবায়। কয়েকটা লাইন মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়ে যায়, যেমন— 'তখনকার দিনে মানুষগুলো প্লেন ছিল, খাট-পালঙ্কে বাড়ির আলসেতে ডিজাইন থাকতো। এখন মানুষগুলো যত জটিল হচ্ছে আসবাব তত সিমপল।'

লেখক তার স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতাবলে শুধু ঘটনার ছবিই আঁকেননি, পৌঁছে গেছেন একেবারে মানুষের অন্তঃস্থলে। এই উপন্যাসের ব্যক্তি ও সমাজের গভীরতলের বোধগুলিকে মেলে ধরেছেন লোকচক্ষুর সামনে।

চেনা আকাশের রূপ-রস ফুরিয়ে যাবার পর অচেনা আকাশের নিষিদ্ধ লোভী হাত লেখক-নায়ক শ্রীকান্তকে হাতছানি দিয়ে শুধু ডাকেনি, রীতিমতো লুব্ধ করে তুলেছিল। সমস্যার এই বীজ দিয়েই সঞ্জীবের এই উপন্যাসের কাহিনী শুরু। তারপর মনের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে চলেছে শ্রীকান্ত, প্ররোচিত হয়েছে এক পাবলিশারের দ্বারা, যার উপদেশ হল, চরিত্রহীন না হলে নাকি মহৎ সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়।
দেহ ও মনে সমর্থ এবং একটু বেশী পরিমাণে সচেতন এই মানুষটিকে দেয়ালে মৃতা পত্নীর ছবি স্তোক দিয়ে শান্ত করতে অক্ষম, অক্ষম তার দেবদূতের মত পাঁচবছরের শিশু সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তাও। জ্ঞানপাপীর মত সে এগিয়ে চলে দুর্নিবার এক স্রোতের টানে, যার নাম মানুষীর প্রতি মানুষের টান। চিন্তায় ভোগী মানুষটি নিজেকে সংযত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু পতঙ্গের মত তাকে শেষপর্যন্ত ঝাঁপ দিতেই হয় আগুনে। অচেনা আকাশের শ্বাস টেনে শেষপর্যন্ত কি পায় শ্রীকান্ত তারই উন্মোচন এই উপন্যাসে। কালুর আত্মহত্যা, সমর্পণের পরও এষার প্রত্যাখ্যান ও সোমার আবেদন তার উপবাসী দেহমনকে এই সত্যে পৌঁছে দেয় যে যদিও সব গতানুগতিক তবু নর হয়ে নারীহীন ভাবে বেঁচে থাকা দুঃসাধ্য, 'দুজনে বেঁচে থাকাটা সহনীয়'।
অচেনা আকাশ সঞ্জীবের রচনার সেই অনন্য স্টাইলেরই একখানি ফসল। সেই স্টাইলের গুণেই এখানে শ্রীকান্তর লাম্পট্যচিন্তার ধরনে ও স্বশাসনের ভঙ্গিতে আমাদের রাগও যেমন হয় তেমন হাসিও এসে যায়। আবার একাকী চাঁদের আলোয় বসে যখন মৃতা স্ত্রীর স্মৃতির মধ্যে ধীরে ধীরে পুড়তে থাকে নায়ক তখন এক গভীর কারুণ্য মনকে স্পর্শ করে।
অচেনা আকাশ-এ বোধ আছে, বুদ্ধি আছে, রস আছে, মানবিকতা আছে, তবু এসব সত্ত্বেও এর সারা অঙ্গে এমন একটা শরীরমনস্কতা জুড়ে আছে যা কখনও কখনও ক্লান্ত করে।
সব মিলিয়ে উপন্যাসখানি আকর্ষণীয়, এর গতি পাঠককে টেনে রাখবে। তাছাড়া কৌতুকরস মিশিয়ে জীবনকে কেটে কেটে বিশ্লেষণ করার মধ্যেও একটা গভীর সত্যের ইঙ্গিত রয়েছে। ব্যাজাস্তুতি ভঙ্গিতে বলা অথচ দারুণ সত্যি কয়েকটা কথা রীতিমত ঝাঁকুনি দিয়ে যায়, যেমন— 'নিষ্ঠুরেরই তো দুনিয়া', 'ঘৃণায় দৈহিকমিলন তো রেপ,' 'গুজবের লম্বা জিভ' কিংবা যখন বলেন, 'চরিত্রহীনেরাই চরিত্র আঁকড়ে ধরে'।

বিজ্ঞানীদের জীবন ও কর্ম

পার্থসারথি চক্রবর্তী

বিজ্ঞানী চরিতাভিধান/ ধীমান দাশগুপ্ত/
বাণীশিল্প/কল-৯/৫০.০০

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানীদের চরিতাভিধান প্রণয়ন করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। ইতিপূর্বে অবশ্য বেশ কিছু বিজ্ঞানীদের জীবন ও কর্ম নিয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে— কিন্তু বেশির ভাগ গ্রন্থেই কোনও ধারাবাহিকতা রাখা হয়েছে বলে বোধ হয় না। সেদিক থেকে ধীমান দাশগুপ্তের লেখা 'বিজ্ঞানী চরিতাভিধান' গ্রন্থটি প্রশংসার দাবী রাখে।

আদি কাল থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বছর সময়ের মধ্যে থেকে নির্বাচিত করা হয়েছে প্রায় সাড়ে সাতশো জন বিজ্ঞানীকে। প্রথম খণ্ডে রয়েছে অ-বর্ণ থেকে ড-বর্ণ পর্যন্ত বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে সজ্জিত বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, প্রযুক্তিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের কথা। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই— যে সব বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্ম চরিতাভিধানে স্থান পাবে তাদের নির্বাচিত করা হবে কিভাবে? এছাড়া একই ব্যক্তিকে যখন গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, প্রযুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসা, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের শাখা নিয়ে লিখতে হচ্ছে তখন অসুবিধা দেখা দিলে সেটা স্বাভাবিক। আলোচ্য গ্রন্থে প্রায় সাড়ে তিনশোজন বিজ্ঞানীর বর্ণানুক্রম জীবন ও কর্মের কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি পরিভাষার তালিকা। লেখক ধীমান দাশগুপ্ত এই গ্রন্থ রচনায় যে সব বইয়ের সাহায্য নিয়েছেন সেগুলি হল আইজাক আসিমোভের বায়োগ্রাফিকাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, চেম্বার্স বায়োগ্রাফিকাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব্ সায়েন্টিস্টস্, উইলিয়ামসের বায়োগ্রাফিকাল ডিকসানারি অব্ সায়েন্টিস্টস এবং সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়া।
বিজ্ঞানী চরিতাভিধান রচনায় লেখক যদি বিজ্ঞানীদের ইংরাজী বর্ণমালা অনুসারে পরপর সাজাতেন তাহলে মনে হয় উচ্চারণের যেখানে অসুবিধা দেখা দেয়, সেখানে পাঠক ঐ ইংরাজী শব্দটির যথার্থ উচ্চারণ জেনে সহজেই তাঁর পছন্দসই বিজ্ঞানীর জীবনীতে চোখ বুলাতে পারতেন। এ ছাড়া গ্রন্থে অনেক খ্যাতিমান বিজ্ঞানী সম্পর্কে যতটা আলোচনা করা হয়েছে— অপেক্ষাকৃত কম খ্যাতিমান বিজ্ঞানী সম্পর্কে তার চাইতে কোনও জায়গায় বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে। গ্রন্থে বিজ্ঞানীদের ছবি খুবই কম দেওয়া হয়েছে। যে দু-একটি সন্নিবেশ করা হয়েছে, তাদেরও সঠিক জায়গায় বসানো হয়নি। পাচন ও প্রশ্বাসের সাধারণ জৈবপ্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ থেকে যে জৈব রসায়নের জন্ম, তা এর ফলে দৃঢ় ভিত্তি পেল (পৃঃ ১০১)— এই ধরনের লেখায় কোনও অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।
লেখক আরও একটু যত্ন নিলে সর্বাঙ্গসুন্দর 'বাংলায় লেখা বিজ্ঞানী চরিতাভিধান আমরা পেতাম। ■

সাংবাদিক প্রতিভা

সাহিত্যের আবেদন ব্যক্তির কাছে, নির্বাচিত মানুষের রসবোধের কাছে। কিন্তু সংবাদের আবেদন ব্যক্তিকে ডিঙিয়ে সমষ্টির কাছে, সমূহমানুষের— নির্বিশেষ জনগণের বিচারবুদ্ধি ও বিবেকের কাছে।

সাংবাদিকের জগৎ যেমন আবিশ্ব ব্যাপ্ত, বিষয় বৈচিত্র্যে জুড়িহীন, তেমনি আবার সাময়িকতায় সঙ্কীর্ণ, বিধি-বিধানে সীমিত, ব্যক্তিগত ভাবাবেগে বঞ্চিত। বলা যায় তাৎক্ষণিকতাই তাঁর তামাম এক্তিয়ার। সময়ের সমান মাপে পা ফেলেই চলতে হয় সাংবাদিককে। খবর সংগ্রহ, পরিপাক এবং পরিবেশনের মধ্যে গড়িমশির অবকাশ নেই। যুদ্ধের মতই তার জরুরি অবস্থা, রুদ্ধশ্বাস ব্যস্ততা।
আসলে লোক-চক্ষু উন্মীলন আর জনমত সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণই সাংবাদিকের কাজ। তাঁর কলম শল্যকর্মের ক্ষুরধার ছুরির মতই মর্মচ্ছেদী, ব্যবচ্ছেদী এবং নির্মম। যেন সমাজের রোগ নির্ণয় এবং আরোগ্যসাধনই প্রচ্ছন্ন নীতিপ্রেরণা ও আদর্শ। তাই সাহিত্যপত্র এবং সংবাদপত্র দুটি পৃথক মেরু, সেখানে দুই পৃথক পরিমণ্ডল, জলবায়ু, আবহাওয়া। কিন্তু সর্বজনীন সারথ্য অর্জন খুবই কঠিন কাজ। সে দায়িত্ব প্রতিভাবান সম্পাদকের, সংবাদপত্রের চরিত্রকে যিনি প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে সঞ্জীবিত করতে পারেন।
নিকটকালের মধ্যে উইলিয়াম হ্যালি এরকম একজন সম্পাদক, যাঁর চারপাশে অদৃশ্য এক চুম্বকক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল। উইলিয়াম হ্যালি ছিলেন ম্যানচেস্টার ইভনিং নিউজ পত্রিকার এক দীপ্যমান ম্যানেজিং এডিটর। ১৯৪৩ সালে বি বি সি-র ডাইরেকটার জেনারেল হয়েছিলেন। এই সংবাদসংস্থায় থার্ড প্রোগ্রাম চালু করেছিলেন তিনিই। যেমন পরবর্তীকালে দি টাইমস পত্রিকার সম্পাদক হয়ে পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদ সংযোজন করেছিলেন হ্যালি। এই বিবিধ কীর্তির জন্য তিনি সাংবাদিক জগতে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।
প্রতিভা ব্যাপারটাই বীজাকারে ধাঁধা, তার আরম্ভের মধ্যে আর এক প্রচ্ছন্ন আরম্ভ থাকে যেটা অনেক সময়েই সমকালের মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। হ্যালি-জীবনের অতি নগণ্য সূচনা পর্বটি ছিল এই রকমই। তখন কেউ কল্পনাই করতে পারেননি এই মানুষটা একদিন অতি দ্রুতগতিতে খ্যাতি ও ক্ষমতার তুঙ্গে উঠে যাবেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে স্কুলের পাট চুকিয়ে দিয়ে পরের বছর অয়ারলেস টেলিগ্রাফ অপারেটার হিসেবে জীবিকা শুরু করেন। যুদ্ধ শেষ হলে এই সামুদ্রিক চাকুরিজীবনে ইস্তফা দিয়ে নতুন কাজ খুঁজতে থাকেন। সাংবাদিকতার দিকে ঝোঁকটা এসে গিয়েছে ততদিনে। কিন্তু হ্যালির জীবন শুরু হয়েছিল সিঁড়ির একেবারে নিচের ধাপ থেকে। তিনি যে টাইমস পত্রিকার সম্পাদক হবেন একদিন, সেকথা বত্রিশ বছর আগে সেই ১৯২০ সালে অন্যের দূরে থাক, তাঁর নিজেরও স্বপ্নের অগোচরে ছিল। কিন্তু ভাগ্যের স্মিত কৌতুক এমনই যে সেই টাইমস-এরই সামান্য শর্টহ্যান্ড কপি-টেকার হয়ে ব্রাসেলস-এর ছোট্ট অফিসবাড়িতে তাঁর নতুন কর্মজীবন শুরু করলেন হ্যালি। টাইমস-এর ইউরোপীয়ান সংবাদদাতারা টেলিফোনে যে প্রতিবেদন পাঠাতেন সেই রচনা ব্রাসেলস থেকে, লন্ডনে পাঠানো হত। কপি গ্রহীতা হিসেবে হ্যালির দক্ষতা বেড়ে গিয়েছিল কারণ জন্মগতভাবেই ফরাসী আর ইংরেজী দুটি ভাষার ওপরেই দখল জন্মেছিল। তাঁর বাবা ছিলেন ইয়র্কশায়ারের লোক, মা ফরাসী। এডিথ সুসি গিবসন নামে যে তরুণীকে এই ব্রাসেলস অফিসে সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন তাকেই জীবনসঙ্গিনী করে নিলেন অবিলম্বে, বয়স তখন বুঝি কুড়িও পেরোয়নি।
কিন্তু কপি-গ্রাহক হিসেবে গতানুগতিক জীবনযাপনের বাসনা তাঁর ছিল না। তাই ম্যানচেস্টার ইভনিং নিউজ পত্রিকায় ফ্রি ল্যান্সার হিসেবে লিখতে শুরু করেন এই সময়। তাঁর ব্রাসেলস-এর চিঠি শীর্ষক রচনাগুলির উৎকর্ষ এবং আকর্ষণ পত্রিকাটির সম্পাদককে মুগ্ধ করে। ১৯২২ সালে হ্যালিকে তিনি সম্পাদকীয় বিভাগে টেনে নেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে নিজের যোগ্যতায় তিনি চীফ সাব এডিটারের পদে উন্নীত হন। ১৯৩০ সালে এক সঙ্কটময় পরিস্থিতি দেখা দিল। ম্যানচেস্টারে তৃতীয় একটি সান্ধ্য পত্রিকার উদ্ভব ঘটায় ইভনিং নিউজ আর ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার অস্তিত্ব রীতিমত নাড়া খেল। অবিলম্বে কিছু একটা করা উচিত। ম্যানেজার জন স্কট প্রবীণ কর্মীদের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে জরুরী বৈঠকে বসলেন। বুঝতে পারলেন হ্যালিই এব্যাপারে যোগ্যতম লোক। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ইভনিং নিউজের ম্যানেজিং এডিটরের পদে হ্যালিকে নিযুক্ত করলেন। সেইসঙ্গে গার্ডিয়ান পত্রিকার কনট্রোল বোর্ডেও তাঁর পদাধিকার বর্তালো। তখন হ্যালির বয়স তিরিশ বছরও পূর্ণ হয়নি। কিন্তু সেই নাটকীয় সন্ধিক্ষণে যা কিছু করতে হবে অতিদ্রুত গতিতেই করতে হবে কারণ মুমূর্ষু পত্রিকা দুটির আয়ু প্রায় অন্তিম পর্বে পৌঁছে গেছে। শুরু হয়ে গেল তিরিশের দশকের হাড্ডাহাড্ডি সান্ধ্য লড়াই। কঠোর নির্ভীক এক নীতিবাদী সেনাপতির মতই হ্যালির অভিযান শুরু হল ভেতরে বাইরে, শুরু হল নবীন-প্রবীণে ঝাড়াইবাছাই, রণকৌশলের সঙ্গে কর্মপদ্ধতি ঢেলে সাজালেন তিনি। সেই খোড়ো বছরগুলির কথা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা তাঁর অনুগামীরা সম্ভবত আজও ভুলে যাননি। এক অলৌকিক শক্তি যেন ভর করেছিল হ্যালির ওপরে। পত্রিকাই হয়ে উঠেছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিশ্রাম সব ভুলে অষ্টপ্রহর হ্যালি সজাগ এবং সক্রিয় থাকতেন ছাপাখানার চৌহদ্দির মধ্যে। সকলের আগে অফিসে আসতেন, সকলের শেষে অফিস থেকে বেরোতেন। দিনপঞ্জিকার মত এক অনুপুঙ্খ টাইমটেবল টাঙানো থাকতো নির্ভুল ঘড়ির মত, যা থেকে জানতে পারা যেত কখন তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে। নিরন্তর সচল সম্পাদক বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই। তাঁর নিজের ঘরে ছাড়া প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টেই তাঁর জন্যে ডেস্ক পাতা থাকতো। নিজের ঘরে চেয়ার পর্যন্ত ছিল না, এক বিশাল শেলফ, যেখানে থাকতো পেজ প্রুফের তাড়া। আর দুধের বোতল ও বানরুটি। তাঁর মধ্যাহ্নভোজনের একমাত্র উপকরণ। ঘর এবং অফিসের বাইরে সব ব্যক্তিগত সম্পর্ক মুছে ফেলেছিলেন অসামান্য দৌড়বাজের মত। তাঁর একমাত্র অবসর বিনোদন ছিল প্রতি সন্ধ্যায় ঘড়ি ধরে কুড়ি মিনিটের টেবল টেনিস আর কখনো কোনো উপলক্ষে গলফ খেলা। হ্যালি ছিলেন স্বাতন্ত্র্যবাদী এক একক ব্যক্তিত্ব। যে কোন প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন, প্রেস ক্লাব কিংবা সঙ্ঘের সভা-সমিতিকে তিনি সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। বন্ধুত্বকেও, পাছে তা নিয়মশৃঙ্খলাকে শিথিল করে দেয়।
ইভনিং নিউজের আর্থিক সাচ্ছল্য তেমন না এলেও, মিতব্যয়িতার সঙ্গে চলতে হলেও পত্রিকাটি যে সেরা সংবাদপত্র হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। হ্যালি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর কলাকুশলী। জনপ্রিয় সাংবাদিকতার প্রতি তাঁর এক আশ্চর্য

ানসিকতা ছিল। তিনি ছিলেন
নলস দ্রুত পড়ুয়া, সংবাদ ও
মালোচনা জগতের বিচিত্র ও
াধুনিক খবরে ওয়াকিবহাল রাখতেন
িজেকে। কৌতূহল ছিল বহুমুখী।
বচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁর প্রতি
াপ্তাহের সাহিত্য সমালোচনামূলক
চনাটি। ভাবুক, অনুপুঙ্খ সমালোচক
বং মানুষ হিসেবে তাঁর যথার্থ
রিচয় পাওয়া যেত যোশেফ সেল
ই কল্পিত নামে প্রকাশিত
চনাবলীর মধ্যে। দীর্ঘ সাত আট
ছর একটানা বকলমে তিনি এই
লখাগুলি লিখেছিলেন।

াঞ্চ্য সংবাদপত্রে যে স্বভাবতই
ংবাদের প্রাধান্য থাকবে, মূলত
্যথাবাহী হবে, মতামত পরিবেশন ও
্যাখ্যাদান হবে যথাসম্ভব গৌণকর্ম,
ই নীতিই তিনি প্রথম দিকে
নুসরণ করে চলেছিলেন। কিন্তু
প্যানীশ যুদ্ধ তাঁর দৃষ্টি বদল
টালো। পত্রিকা হয়ে উঠল
ীব্রভাষী, ভাবাবেগে গভীর ও
র্ভীক সমালোচনাত্মক। এদিকে যুদ্ধ
সে পড়ল ঘাড়ের ওপর। জন
টকেও যুদ্ধের প্রয়োজনে অন্য
ায়দায়িত্ব নিতে হল। তিনি হ্যালিকে
টি পত্রিকারই ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
রে দিলেন। স্কট ছিলেন এক
সামান্য মানুষ এবং তাঁর এক
িঃশব্দ গুণগ্রাহী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু,
য়সে বিশ বছরের বড় হয়েও।
ই পর্বে হ্যালি প্রেস অ্যাসোসিয়েশন
বং রয়টারের পরিচালক হিসেবে
উনাইটেড স্টেটস এবং অস্ট্রেলিয়ায়
ান এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে।
রস্পরের মধ্যে অনেক কালের ভুল
াঝাবুঝি এবং জটিলতাকে সহজ
ংবাদিক সমঝোতায় ফিরিয়ে
ানেন।
৯৪৩ সালে বি· বি· সি-র কর্তৃপক্ষ
াকে তাঁদের প্রধান সম্পাদকের পদ
হণ করতে অনুরোধ জানান।
ধান্বিত হলেও তিনি এই নতুন পদে
াগ দেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই
াইরেক্টর জেনারেলের পদে উন্নীত
। বি· বি· সি-কে তিনি দেখতে
য়েছিলেন এক শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষার
তিষ্ঠান হিসেবেই। এই সময়ে তিনি
রুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ত আরোগ্যলাভের পর আবার নতুন
্যমে বি· বি· সি-র পরিচালনায়
রে এলেন হ্যালি। তাঁর অন্তর্ভেদী
িগুজ্ঞান যে কোনো জটিল সমস্যার
প্র সমাধানে এবং সরলীকরণে
ধনো ভুল করেনি। বিশ্বযুদ্ধের সেই
চূড়ান্ত প্রহরে সেনা-মানসের কথা
চিন্তা করে প্রোগ্রামকে তিনি ঢেলে
সাজালেন। বৈচিত্র্যমণ্ডিত
বিষয়গুলিকে উদ্দীপক, সংক্ষিপ্ত এবং
জনপ্রিয় করে তোলার ফলে উর্ধ্বতন
মহলে তিনি এক অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব
হিসেবে স্বীকৃত হলেন। যুদ্ধের পরে
সামরিক অনুষ্ঠানকে রূপান্তরিত করে
দিলেন লঘু অনুষ্ঠানের আঙ্গিকে।
সর্বজনীন বিনোদনকে অব্যাহত রেখে
তার সঙ্গে যোগ করলেন থার্ড
প্রোগ্রাম। ধ্রুপদী সঙ্গীত, সাহিত্য,
শিল্পকলা এবং পাণ্ডিত্যের চতুরঙ্গ
ভাবনা বুদ্ধিজীবী মহলে জনপ্রিয় হয়ে
উঠলো অল্পদিনের মধ্যেই।
যুদ্ধকালীন স্থগিত দূরদর্শনকে আবার
ফিরিয়ে আনা হল ১৯৪৬ সালে।
কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা দিল আর্থিক
সঙ্কট। এর সমাধানকল্পে কমার্শিয়াল
টেলিভিশনের প্রস্তাব আসতে
থাকলো। হ্যালি বি বি সি ছেড়ে
আবার সংবাদপত্রের দিকে ঝুঁকলেন,
সম্পাদক হিসেবে যোগ দিলেন
টাইমস পত্রিকায় ১৯৫২ সালে। তাঁর
সংস্কারমুক্ত মন সব সময়েই
গতানুগতিকতাকে পিছনে ফেলে
এগিয়ে গেছে সাহসের সঙ্গে। টাইমস
পত্রিকাকেও তিনি কেবল
রক্ষণশীলতা থেকেই নয়,
দলবিশেষের মুখপত্র হওয়া থেকেও
মুক্ত করলেন। সমস্যাই ছিল হ্যালির
জীবনের কুরুক্ষেত্র। যেখানে যখন
নতুন দায়িত্ব নিতে গেছেন, সেখানেই
সমস্যার মোকাবিলার ভার পড়েছে
তাঁর ওপরে। সে চ্যালেঞ্জ তিনি গ্রহণ
করেছেন সানন্দে। টাইমসকেও শেষ
পর্যন্ত সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার পথের
সন্ধান দিয়ে ১৯৬৬ সালে পঁয়ষট্টি
বছর বয়সে সম্পাদনা থেকে
অব্যাহতি নিলেন। কিছুকাল আগে
ছিয়াশি বছর বয়সে এই মসিযোদ্ধার
জীবনাবসান হয়েছে।

লাগেরলফ

সেলমা লাগেরলফ প্রথম মহিলা তথা সুইডিশ যিনি
সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান
১৯০৯ সালে। মধ্য সুইডেনের
ভার্মল্যান্ড জেলার মারবাকা গ্রামে
তাঁর জন্ম ১৮৫৮ সালের ২০
নভেম্বর। ভার্মল্যান্ড-এর বৈশিষ্ট্য
এখানে লোকবসতি খুব কম।
চারিদিকে হ্রদ ও জলাশয়। অরণ্য ও
খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চল।
সপ্তদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলের
উদ্যমী কিছু ব্যক্তি খনিতে মনোযোগ
দেন নিজেদের ভাগ্য ফেরানোর
জন্য। এবং তাঁরা সফলও হলেন।
উদ্ভব হল বিত্তশালী এক অভিজাত
সম্প্রদায়ের। পরবর্তী দুই শতকে
ধীরে ধীরে এখানে গড়ে উঠল এক
নতুন ঐতিহ্য। এক নতুন সংস্কৃতি।
পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে স্থাপিত
হতে লাগল নানা শিল্প। ফলে সেই
নতুন অভিজাত সম্প্রদায় হল বিপন্ন।
নিজে এই সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায়
স্বাভাবিকভাবে এই সংঘাতের কথা
বিশেষভাবে বারে বারে লাগেরলফের
লেখায় এসেছে। এই সংঘাত যেমন
তাঁর লেখার অন্যতম বিষয়,
লোককথা ও উপকাহিনীও তাঁর
লেখার অপর প্রধান উপজীব্য।
শান্তিবাদী এই লেখিকা দ্বিতীয়
মহাযুদ্ধের সময় সুইডেনের
রাজপরিবারের মধ্যস্থতায় জার্মান
বন্দীশিবির থেকে সুইডিশভাষী এক
জার্মান লেখককে উদ্ধার করেন।
উল্লেখ্য পরবর্তীকালে এই লেখক,
নেলী সাখস্, ১৯৬৬ সালে সাহিত্যে
নোবেল পুরস্কার পান। ১৯১৪ সালে
লাগেরলফ সুইডিশ অ্যাকাডেমিতে
সদস্যা নির্বাচিত হন। তিনিই প্রথম
মহিলা যিনি এই সম্মানে ভূষিতা হন।
তাঁর সাহিত্যকৃতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য
তাঁর প্রথম উপন্যাস 'গোস্টা
বেরলিঙস্ সাগা'। প্রকাশিত হয়
১৮৯১ সালে। ইটালি ভ্রমণের শেষে
প্রকাশিত হল (১৮৯৭) 'দ্য
মিরাকল্স্ অভ অ্যান্টিক্রাইস্ট'।
বিষয়বস্তু সিসিলি দ্বীপের একটি
সম্প্রদায়ের মধ্যে চালু আধুনিক
সমাজবাদ। ঈজিপ্ত ও প্যালেস্টাইন
ভ্রমণের পরে অনুরূপভাবে বের হয়
(১৯০১-০২) দুই খণ্ডে
'জেরুজালেম' যা তাঁকে একজন
সার্থক ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা
দেয়। শিশুদের জন্য উল্লেখযোগ্য
রচনা : 'দ্য ওয়ান্ডারফুল
অ্যাডভেঞ্চার অভ নিল্‌স্' এবং 'দ্য
ফারদার অ্যাডভেঞ্চার অভ নিলস্'।
একটি ট্রিলজিও রচনা করেন তাঁর
জন্মস্থান ভার্মল্যাণ্ড নিয়ে—'দ্য রিং
অভ দ্য লোয়েনকোল্ড্স্'।
যে ম্যানর হাউসে লাগেরলফের
বাল্যকাল কাটে তা তাঁর পিতার
মৃত্যুর পর হস্তান্তরিত হয়ে যায়।
পরবর্তীকালে নোবেল পুরস্কারের
অর্থে তিনি কিনে নেন এবং সেখানেই
শেষ জীবন কাটান। নারী স্বাধীনতার
অন্যতম যোদ্ধা লাগেরলফ ১৯৪০
সালের ১৬ মার্চ ইহলোক ত্যাগ
করেন। বাংলা সমেত পঁয়তিরিশটি
ভাষায় তাঁর গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। ■

উদ্ভব হল বিত্তশালী এক অভিজাত সম্প্রদায়ের। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে স্থাপিত হতে লাগল নানা শিল্প। নতুন অভিজাত সম্প্রদায় হল বিপন্ন। এই সংঘাতের কথা বিশেষভাবে বারে বারে লাগেরলফের লেখায় এসেছে।

সং গী ত

এখানে থেমো না

সলিল চৌধুরী : ঐতিহ্যকে মেনেই তিনি নতুন পথ দেখালেন, কথায় ও সুরে

"দক্ষিণবঙ্গে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে, ফলে প্রচণ্ড ঝড় আসতে পারে। সমুদ্রে যাঁরা আছেন তাঁদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে···।" আকাশবাণীর অধিবেশনের শেষে আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তিতে এরকম ঘোষণা প্রায়ই শোনা যায়। যদি এরকম ঝড়ের সংকেত গানের জগতে পাওয়া যেত, তবে সঙ্গীতপ্রেমীরা স্বাগত জানাতেন। সেইরকম ভাবেই একটা ঝড় এসেছিল চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি। সেই ঝড়ের নাম সলিল চৌধুরী। বাংলা গানের প্রবহমান ঐতিহ্যকে মেনেই তিনি নতুন পথ দেখালেন, কথায় ও সুরে। এই ঝড়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নতুন ভাবে সাজানো যায়, লোকসঙ্গীত নিয়ে নতুন ভাবে ভাবানো যায়, আর বিদেশী অনুপ্রেরণা সঞ্জীবনী মন্ত্র হতে পারে। চার দশকের গান নিয়ে যখন ভারতীয় সঙ্গীত নৃত্য মহামেলা সলিল চৌধুরীর সৃষ্টির সালতামামি করেন—তখন অনুভব করা যায়, তাঁর মত স্রষ্টার জন্য ওই ধরনের অনুষ্ঠান কতো জরুরি। তবে, কমার্শিয়াল অনুষ্ঠানের মত নামী শিল্পীদের দিয়ে গান গাওয়ানো হয়েছে, কোন কালানুক্রম না মেনেই। আসলে চার দশকের গান নিয়ে বিশ্লেষণসহ চারদিন অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

সলিল চৌধুরীর চার দশককে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে গণনাট্য সংঘের গান, পাশাপাশি বরযাত্রী, পাশের বাড়ি কিংবা হিন্দি ছবি 'দো জমিনের' গান। দ্বিতীয় পর্বে বোম্বাইয়ের অভিজ্ঞতায় গানের ম্যারেঞ্জমেন্ট, আধুনিক গানের মধ্যেও অনেক দিনের চেনা ভাবনা, ছন্দ সব বদলে যাচ্ছে। বোম্বে ইয়ুথ কয়ার প্রতিষ্ঠান আর একবার সংগঠক সলিল চৌধুরীকে চিনিয়ে দিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের লোকসঙ্গীত তাঁর সৃষ্টিকেও প্রসারিত করল। তৃতীয় বাংলা গানের নতুন দিক খুলে যাওয়া, বিশেষত লতা মঙ্গেশকর এবং আরও কয়েকজনের গাওয়ার জন্য। চতুর্থ পর্বে অর্থাৎ বর্তমান দশকে শুধুই পুনরাবৃত্তি এবং আরও একটি বড় কাজ, রেকর্ডিং স্টুডিও করা। বহু যন্ত্রের নতুনভাবে ব্যবহার তিনি শিখিয়েছেন। বর্তমানে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রেকর্ডিং অঘটন ঘটাতে পারে। যদিও এখনো সেই প্রমাণ আমরা পাইনি, তবু প্রতীক্ষায় আছি। ইতিহাস কখনো বলে না, মহাকবি কালিদাসের কত সম্পত্তি ছিল, কিন্তু মেঘদূত, কুমারসম্ভবম, অভিজ্ঞান শকুন্তলম-ই লোকে মনে রেখেছে।

সাধারণ জলসায় গণনাট্য সংঘের গানের সময় শুধু হারমোনিয়াম ও তবলা সহযোগে গান শুনে লোকে হাততালি দিতে ভুলে যেত। প্রতিটি গানে হার্মনাইজেশন বাঙালি শ্রোতার কাছে ছিল অজানা। অনেক খ্যাতনামা শিল্পী অপেক্ষা করতেন, গণনাট্যের কোরাস সহযোগে গান গাইবার জন্য। সলিল চৌধুরীর মতে এই সম্মানের কাছে তাঁর ফিল্মফেয়ার পুরস্কারও তুচ্ছ হয়ে গেছে। এক বন্ধু ঠাট্টা করে বলেছিলেন কীর্তন ভেঙে বিপ্লবের গান করা যায় কি না ? চ্যালেঞ্জের জবাব সলিল চৌধুরী দিয়েছিলেন। 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা জাগছে তারা এই জনতা'— এই গানটির প্রেরণাও ঐতিহাসিক। দক্ষিণ ভারতীয় সুরের প্রেরণায় 'মানবো না এ বন্ধন' বাংলো গানে উদ্দীপনা সঞ্চার করল।

পূর্বসূরী বিনয় রায় মহারাষ্ট্রের জোয়ারা সুর এনেছিলেন। সলিল চৌধুরী তাঁর বাংলা গ্যানে আন্তর্জাতিক সব সুর একাকার করে দিলেন। অথচ এই স্মরণীয় পর্বের গান এই অনুষ্ঠানে ছিল মাত্র একটি, 'ও আলোর পথযাত্রী'। এখন সময় বড় কম তাই কোরাস গানের রিহার্সাল সম্ভব নয়। 'ও আলোর পথযাত্রী'র পিছনে রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতার অনুষঙ্গ থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথকে মনে রেখেই আরও অনেক গান অনুল্লেখিত যেমন, 'সেই মেয়ে' ছাড়াও 'রায় বাহাদুর' ছবিতে 'যায় দিন এমনি যদি যায় যাক না/ হিসাবের খাতার পাতা অঙ্কবিহীন থাক পড়ে থাক না।' এছাড়া নচিকেতা ঘোষের সুরে 'দেখতো তুমি চিনতে পারো কি' এবং আরও অনেক সুর বিশ্লেষণ করলে বোঝা যেত রবীন্দ্রনাথ কীভাবে এসব ক্ষেত্রে উপস্থিত।

কবিতায় সুরারোপের ক্ষেত্রে সলিল চৌধুরী স্মরণীয় হয়ে থাকবেন—কিন্তু এই আসরে তার কোন উদাহরণ পাওয়া গেল না। হয়তো উদ্যোক্তা সঙ্গীত নৃত্য মহামেলা অপরিচিত গান কিংবা শিল্পীদের নতুন ভাবে গান তোলানোর ঝুঁকি নিতে চাননি, নইলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষের পরিচিত কবিতা ছাড়াও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'অগ্নিকোণের তল্লাট জুড়ে' বা আরও অনেক গান আবিষ্কৃত হতে পারত। এমন কি নিজের কবিতা আবৃত্তি করেও শেষে 'গ্রাম নগর মাঠ পাথার বন্দরে তৈরি হও' সুর শুনে শ্রোতারা রোমাঞ্চিত হতে পারতেন। জানানো হল না সুকান্তর মৃত্যুর পর আবৃত্তি করতে করতে তাঁর অবাক পৃথিবী গানের কীভাবে সৃষ্টি হল। উৎপলা সেনের 'প্রান্তরের গান' ১৯৪৫ সালের হলেও ১৯৮৭ সালেও আধুনিক। অবলীলায় যেভাবে 'ভাঙিল সে ঘর ঝড়ের বায়ে, হায় হায় হায়'। স্বরগুলি লাগানো হয়েছে সেটা সুরকারদের ভাবাবে। 'আমার কিছু মনের আশা' গানটি লোকসঙ্গীত ভিত্তিক ; কিন্তু 'ঘরে আমার নাই চামেলী বাতায়নের ধারে/ আমার আছে'র চেয়ে নাই বেশি ভাঙ্গা তবু তো চাঁদ উঁকি মারে—আমি অনেক ছেঁড়াতালি দিয়ে যা ঢেকেছি দেখেও তোরা দেখিস না রে'— গানের কথা সম্পূর্ণ অন্য জগতে নিয়ে যায়।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় গাইলেন 'শ্যামল বরণী ওগো কন্যা'— গানটির মূল সুর বিদেশী। প্রথম তিনটি স্তবক শুনলে মনে হবে প্রেমের গান, কিন্তু শেষ স্তবকে 'ওগো তুমি বুঝি মোর বাংলা, আমার জীবন ধন সাধের সাধনা' গানটিকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায় (রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের সঞ্চারীর মত)। এইজন্যই গীতিকার সলিল চৌধুরী অনন্য। 'একদিন ফিরে যাব চলে' গানটি আগে হিন্দী ছবিতে হয়েছিল ('মায়া' ছবিতে দেবানন্দের মুখে) বাংলা গানে ভোক্যাল রিফ্রেনটি ছিল না—এখানে সেটি যোগ করা হয়েছে। হিন্দী 'অ্যায় দিল কঁহা তেরি মঞ্জিল' গানে রিফ্রেনটি করেছিলেন লতা মঙ্গেশকর। বিদেশে সুর বা অর্কেস্ট্রা থেকে আহরিত সুর বাজিয়ে জানালে সলিল চৌধুরীর মর্যাদা হানি ঘটত না। আধুনিক সুরকারেরাও অবনত হতেন না বিখ্যাত অর্কেস্ট্রার টুকরো নিয়ে কীভাবে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

'বাংলা গানের চার দশক' অনুষ্ঠানে অন্যান্য শিল্পী ও অভ্যাগতদের সঙ্গে সলিল চৌধুরী

'আমি আসছি' বা সবিতা চৌধুরীর 'সুরের এই ঝর ঝর ঝরনা' কিংবা শ্যামল মিত্রের 'যদি কিছু আমারে শুধাও' বা 'যা যারে যা পাখি' গানে অন্তরার রোমাঞ্চকর পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে জানালে। কিংবা সলিল চৌধুরীর 'এই রোকো পৃথিবীর গাড়িটা থামাও' হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'দুরন্ত ঘূর্ণীর এই লেগেছে পাক'—এই সব গানগুলির প্রিলিউড ইন্টারলিউডের অবলম্বন শোনালেই বা ক্ষতি কি ? মনে রাখতে হবে 'কোন এক গাঁয়ের বধূ' বা 'রানার' গানের ইন্টারলিউডও ছিল সামান্য। পরবর্তী যুগে সলিল চৌধুরীর অ্যারেঞ্জমেন্ট ঈর্ষণীয় এবং শিক্ষণীয় ব্যাপার। অক্টেভ বদল করা, ডিসকর্ড আনতে তিনি স্বমহিম—সেইসব ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ভবিষ্যতে হবে এই আশা রাখি।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রাণখুলে গাইলেন 'ঝিরঝির বরষায়' চার দশক আগের গান কালজয়ী হয়ে গেল। প্রতিটি লাইনের শেষে স্বরকম্পন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের একটি ম্যানারিজম—লক্ষণীয় ঘটনা এই গান বা 'অন্তবিহীন এই অন্ধকারের' গানে কোথাও দাঁড়ানোর সুযোগ না দেওয়া স্বতন্ত্র এক ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে পাওয়া গেল। সুরকার এইভাবে নতুন করে শিল্পীকে স্বাতন্ত্র্য দেন। 'অন্তবিহীন এই' গানের শব্দচয়ন,.ছন্দ, লক্ষণীয়, যা সলিল চৌধুরীর পক্ষেই সম্ভব, এই ছন্দের পরীক্ষা নির্মলা মিশ্রের গানেও লক্ষণীয় কিংবা সবিতা চৌধুরীর গাওয়া 'ও মোর ময়না গো' গানটিতে। অবাক করে দিয়েছেন অভিরূপ গুহঠাকুরতা 'আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম' গেয়ে। ষাটের দশকের গান মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের 'ঐ যে সবুজ বন বীথিকায়' গানের চলনটাও বারবার শোনার মত। গানের আচমকা স্বরগুলি ঝাঁপ দিয়ে যায় কিন্তু কখনই সুরের কাঠামোকে বিধ্বস্ত করে নয় (যা অনেকেই নকল করতে গিয়ে মরেন)। পিণ্টু ভট্টাচার্য, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, বনশ্রী সেনগুপ্ত, প্রত্যেকের গানে মাঝে মাঝে পুরনো সলিল চৌধুরী উঁকি দিয়ে যান কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় একই ছকের রকমফের। হৈমন্তী শুক্লার 'ভালবাসি বলে ভালবাসিনে' রাগভিত্তিক, কিন্তু ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'ঝনন ঝনন বাজে' বা মর্জিনা আবদাল্লা ছবিতে মান্না দে'র গাওয়া 'বাজে গো বীণা' এমনকি 'কিনু গোয়ালার গলি' ছবিতে সবিতা চৌধুরীর গাওয়া 'দক্ষিণা বাতাসে' গানের মত চমকে দেয় না। যত দিন গেছে সলিল চৌধুরী তত যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করেছেন।

নানারকম পরীক্ষায় তিনি ব্যস্ত। ফলে উৎপলেন্দু চৌধুরী যখন খুব কম যন্ত্র সহযোগে গান করেন তখন স্বাদ বদল হয়। যদিও 'আমায় ডুবাইলি রে' গানের ছকে বাঁধা তবু পাঁচমাত্রার পর 'সুখে দুখে মন মরালি ঘোর সাঁতার দিত অগাধ জলে' বলা মাত্র মনে হয়, সলিল চৌধুরী যেন বলছেন 'এই তো ফিরে এলাম'।

চার দশকের শেষ দশকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি অন্তরা চৌধুরীর জন্য শিশুসঙ্গীত (যদিও অন্তরার বয়েস এখন বেড়ে গেছে)। এই অসময়েও 'বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে' আর 'ও সোনা ব্যাঙ, ও কোলা ব্যাঙ' গান দিয়ে আসর জমানো হল। কিন্তু 'ও মাগো মা অন্য কিছু গল্প বল' গানটি স্থান পেল না—যে গান শিশুসঙ্গীত হয়েও বড়দের ভাবায়। একানড়ে ছড়াটি আবৃত্তি করা হল কিন্তু 'ও ভাইরে ভাই' বা 'অনেক ঘুরিয়া শ্যাসে আইলাম রে কইলকাত্তা' বা 'একদিন রাত্রে' ছবির 'এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়' গানগুলি গাইলে বোঝা যেত সলিল চৌধুরীর ব্যঙ্গ কত তীক্ষ্ণ।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আশা প্রকাশ করলেন 'সলিল ফিরে এসেছে'। বোম্বাই থেকে সলিল চৌধুরী ফিরেছেন ঠিকই তবে তাঁরই গানের কথায় প্রশ্ন করতে হয় 'দেখতো ছিন্ন বীণা বাজে কিনা ?' আমাদের উত্তর—আর সেইভাবে বাজে না। সলিল চৌধুরীর সুরের পুনরাবৃত্তির মতো এই প্রতিবেদনের অনেক কথাই পুনরাবৃত্ত। তার কারণ শিল্পীর প্রতি প্রতিবেদকের শ্রদ্ধা যেমন আন্তরিক, বেদনাও তেমনই মর্মান্তিক। তাই একই কথা ফিরে ফিরে আসে।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

রবিবিতানের একটি সন্ধ্যা

সম্প্রতি রবিবিতান সংস্থা রবীন্দ্রসদনে 'রবিবিতান-এর একটি সন্ধ্যা' শিরোনামে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত এই সংস্থা নামী দামী শিল্পী সহযোগে তাঁদের অনুষ্ঠানটি উতরে দিতে চাননি দ্বিতীয়ত অত্যন্ত সাহস করে 'ওগো বিদেশিনী' শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ পাঠাভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে পরিবেশিত হল নৃত্যগীত আলেখ্য 'এ ভরা ভাদরে'। শিরোনামেই স্পষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথের কোন গান এই নৃত্যগীতি আলেখ্যে সংকলিত হয়েছিল। প্রতিটি গানের সঙ্গে নৃত্য ছিল প্রায় আবশ্যিক। এই ধরনের অনুষ্ঠান নিশ্চিতভাবে নিতান্তই গতানুগতিক এবং খানিকটা ক্লান্তিকর। কিন্তু কখনো কখনো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে পরিবেশনের সৌন্দর্যসুষমায়। এক্ষেত্রে হয়তো তা বলা সঙ্গত হবে না। তবে আন্তরিকতার যে একটি মূল্য আছে তা প্রমাণিত হয়েছে একথা অনস্বীকার্য। কণ্ঠসংগীতে আশীষ ভট্টাচার্য, দীপক রুদ্র, অসিত মৈত্র, আনন্দ চন্দ, আভা বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীষা মুন্সী, মঞ্জুলা গুপ্ত আপন আপন যোগ্যতা অনুযায়ী গান গেয়েছেন। সম্মেলক গানগুলি দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপ্রস্তুত মনে হয়নি। স্নিগ্ধা গোস্বামী, সুস্মিতা সিনহা, শতরূপা দত্ত, অসিত ভট্টাচার্য প্রমুখ নেচেছেন গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা দৃষ্টিসুখকর হয়েছে—এই পর্যন্ত। নৃত্য নির্দেশনা : সুস্মিতা সিন্‌হা ও অসিত ভট্টাচার্য। সংগীত নির্দেশনা : আভা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আশীষ ভট্টাচার্য

দ্বিতীয়ার্ধে 'ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পো ও রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ক সংকলন 'ওগো বিদেশিনী' পাঠাভিনয়ের সংকলনটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী। দুটি চরিত্রে তাপস পাল এবং দেবশ্রী রায় কিছুটা আড়ষ্ট ছিলেন। হয়তো রবীন্দ্রনাথ, হয়তো অনভ্যাসই এর কারণ তবু মনে হয় দু'চার বার এরকম অনুষ্ঠান করলে এই আড়ষ্টতা তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। চরিত্রদুটির স্পন্দন বিকাশে সংকলনটি কিছুটা দীর্ঘতা দাবী করে। আবহ সংগীত সম্পর্কে আরো ভাববার অবকাশ আছে। সূত্রধরের কাজটি চমৎকার করেছেন সান্ত্বনা চৌধুরী। সুরহীন কণ্ঠ, স্পষ্ট উচ্চারণই এখানে প্রত্যাশিত ছিল। প্রয়োগ ও পাঠনির্দেশনার কৃতিত্ব আভা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সমগ্র অনুষ্ঠান অত্যন্ত দীর্ঘ কিন্তু পরিচ্ছন্ন।

রবীন্দ্র-বর্ষাসংগীত

সম্প্রতি দিনেন্দ্র সংগীতায়নের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে ভবতারণ সরকার বিদ্যালয় গৃহে রবীন্দ্র-বর্ষাসংগীত শিরোনামে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল, আড়ম্বরের দিক থেকে না হলেও আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার বিচারে তা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। দুটি

পর্বে বিন্যস্ত এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে প্রধানত শিক্ষায়তনের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকাসহ রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ বর্ষার গান পরিবেশন করেন। কয়েকটি গান পরিবেশিত হয় নৃত্যসহযোগে। গানগুলি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার সহায়তায় একটি সূত্রে গেঁথে নেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্বে একক কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান পরিবেশন করেন প্রফুল্লকুমার দাস।

প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে প্রধানত ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করায় কোনো কোনো গানের ক্ষেত্রে পরিবেশনায় দুর্বলতা স্পষ্ট হয়েছে যেমন 'ঝরো ঝরো ঝরো' গানটি। এই সম্মেলক গানটি কিছুটা অপ্রস্তুত মনে হয়েছে। একক গানের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক ভাবেই ছাত্রীরা সমান প্রস্তুত বা দক্ষ ন তবু সামগ্রিকভাবে সব ত্রুটি ঢাকা পড়েছে আন্তরিকতায়। একক কণ্ঠের গানগুলির মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ্য অঞ্জনা সরকারের 'গহনরাতে শ্রাবণধারা', পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আজি শ্রাবণ ঘন', শ্রীমৈত্রের 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে' এবং তপন মুখোপাধ্যায়ের 'সঘন গহন রাত্রি' গানগুলি। অধিকাংশে সম্মেলক গানগুলি সুগীত। নৃত্যে সুমিতা বসু, হৈমন্তী বসু, জয়িতা সিংহ ও মণিকা দাশ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠান বিশেষ মাত্রা পেয়েছে সংকলনের সংযত পরিকল্পনায়। পাঠ করেন শুচিস্মিতা গুপ্ত এবং উৎপল র। দুজনেই বেশ সপ্রতিভ কিন্তু তারই মধ্যে শুচিস্মিতার অকৃত্রিম বাচনভঙ্গিমা সহজেই আকৃষ্ট করে। এঁর মধ্যে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি আছে মনে হল। সব মিলিয়ে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠান।

দ্বিতীয়পর্বে কয়েকখানি রবীন্দ্রনাথের

প্রফুল্লকুমার দাস

বর্ষার গান একক কণ্ঠে পরিবেশন করেন প্রফুল্লকুমার দাস। প্রবীণ এই রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞর প্রধান পরিচিতি শিল্পী হিসাবে নয় একথা সকলেরই জানা। কিন্তু যাঁরা, বিশেষ করে উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা যদি তাঁর গান শোনেন তবে সহজেই তাঁর শিল্পীসত্তাটির পরিচয় পেয়ে যাবেন। অর্থাৎ তাঁর গায়নশৈলী থেকে অনেক কিছুই যে শেখার আছে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। প্রথমত একটি সুরের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়। গানের লয়ে দৃঢ়তা বিস্ময়কর। মুক্তছন্দ গানের চলন প্রক্রিয়া প্রভৃতি অনেক সাংগীতিক ক্রিয়াপরতার সঠিক সন্ধান মেলে তাঁর গানে যা সত্যিই আদর্শস্থানীয়। এদিনের গানের মধ্যে তিনি বার বার বুঝিয়ে দিয়েছেন আন্তরিকতা আর সনিষ্ঠ অনুশীলনের কি মহত্ব। সমগ্র অনুষ্ঠানে যন্ত্রসংগীতে সহযোগিতা করেন সলিল মিত্র (বেহালা), সৌমেন বসু (তারসানাই), কামাখ্যা খড় (তালবাদ্য), খেলেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (মন্দিরা)

সুভাষ চৌধুরী

ন ত্য

মণিপুরী নৃত্যের উৎস সন্ধানে

বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে পেশাদারিক অভিজ্ঞানপত্র বিলিকেই সাফল্যের মাপকাঠি বলে বিবেচনা না করে নবীন নৃত্য প্রতিভার আবিষ্কার যদি আচার্যোচিত সুকৃতির পরিচায়ক হয়, তা হলে সর্বাগ্রে মনে আসে মণিপুরী নর্তনালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কলকাতানিবাসী বিপিন সিংহের নাম। তিনি অন্তত এই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন, তাঁর নৃত্যশৈলীতে এই শহরেরই তরুণ নৃত্যপ্রতিভাকে তিনি পারদর্শিতার উচ্চস্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। নিদ্বির্ধায়

শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায়

বলি, দর্শনা ঝাভেরির পরবর্তী প্রজন্মে মণিপুরী নৃত্যের ধ্রুপদী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী রূপে যে দুজন তরুণী শিল্পী পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন তাঁরা হলেন প্রীতি প্যাটেল ও শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্প্রতি ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদ আয়োজিত এক সান্ধ্য অনুষ্ঠানে এই দুই তরুণী শিল্পী যে ব্যাখ্যা-সম্বলিত নৃত্য পরিবেশন করলেন, তা ছিল একাধারে শিক্ষামূলক ও রসোত্তীর্ণ। ধ্রুপদী নৃত্যকলার আস্বাদনে যা একান্ত প্রয়োজন সেই ছন্দ-তাল-লয়ের সম্মিলিত প্রকরণের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় ঘটানো ছিল এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

আপাতদৃষ্টিতে বৈচিত্র্যহীন লাস্যময় ও তরঙ্গায়িত অঙ্গসঞ্চালন বলে প্রতিভাত মণিপুরী নৃত্যশৈলীর অন্তর্নিহিত বিভিন্নতা প্রীতি ও শ্রুতি ফুটিয়ে তুললেন কখনও একক নৃত্যে, কখনও দ্বৈত উপস্থাপনায়। বিশেষ করে, তাঁদের পরিবেশিত লাইহারোবা ও মহিবি জগই-এর পরিবেশনে উপলব্ধি করা গেল, মণিপুরী নৃত্যের বৈচিত্র্যের আস্বাদনে প্রাক-বৈষ্ণব যুগের লোকায়ত ধারা থেকে আহরিত উপাদানের গুরুত্ব কতখানি। রাসলীলার অংশ ননী চুরির মত অতিপরিচিত নৃত্যাংশও এই শিল্পীদ্বয়ের উপস্থাপনার গুণে মনোহারী হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলতে পারি কলকাতার নৃত্যরসিকদের মধ্যে মণিপুরী নৃত্যের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কথা মনে রেখে অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদর্শন আরও বৃহৎ দর্শকমণ্ডলীর কাছে উপস্থিত

প্রীতি প্যাটেল

করার পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে।

বিক্রমণ নায়ার

চি ত্র ক লা

দাদুর দস্তানা : চীনা লণ্ঠন

সাদা দস্তানা দেওয়া হচ্ছিল ছাপাই ছবিগুলো দেখার জন্য। ছবির চেহারা বইয়ের মতো। প্রাগক্ষর যা কিছু তা কৃষ্টির পর্যায়ে পড়লেও, সভ্যতা-সংস্কৃতির শুরু কিন্তু লিপিকৌশল আবিষ্কারের পর থেকে। লিপি থেকে বর্ণমালা এবং গল্প কবিতা ধর্ম দর্শন লিপিবদ্ধ করার তাগিদ। সুমের আক্কাদে রৌদ্রপক্ক মৃন্ময় পুস্তকে, মিশরে, পশ্চিম এশিয়ায় শিলালিপিতে, প্রস্তর পুস্তকে, এ ছাড়াও চামড়ায়, তালপাতায়, প্যাপিরাসে এবং কাগজে। ইদানীং নানা দেশের নানা সময়ের বইয়ের যে আকারপ্রকার তাকে আদর্শ হিসাবে ধরে নিয়ে, লেখায় ছবিতে শিল্পীরা ব্যবহার করছেন। এক্ষেত্রে বইটা উপলক্ষ। গুটেনবার্গের জার্মানীতে ডুরারের হাতে ছাপাখানার গর্ভগৃহ থেকে উঠে ছাপাই ছবি এসেছিল—তাই না?

এ সব কথা মনে হল অ্যামেরিকান সেন্টারে শিল্পীদের শিল্পিত বইয়ের প্রদর্শনীতে। এগুলো বই নয়, ছাপাই ছবি আসলে। নয়াদিল্লির ৪র্থ কিংবা ৫ম বিশ্ব ত্রিবার্ষিকীতে প্রথম আমি জাপানী ভাস্করের কাজ দেখি এই ধরনের। একটি আদ্যিকালের ছাপা কুঁকড়ে যাওয়া পোকায় খাওয়া বই ব্রোঞ্জে করেছিলেন সেই মহিলা। রেশমী ছাঁচে তিনি খোলা পৃষ্ঠায় কথাও ছেপেছিলেন। ত্রিপিটক, গীতা, বাইবেল, আবেস্তা—ধর্মগ্রন্থ, বা ডাস ক্যাপিটাল কিংবা রেড বুকেরও, মানুষের মনের ওপর সেই অধিকার নেই আগের মতো, এমন একটা কথা বলতে চেয়েছেন তিনি হয়তো। এখানে বইয়ের আকারে প্রকারে ঐ ধরনের অন্য খেলা। লিথো অফসেট থেকে রঙীন এবং সাদা কালো জিরক্স ব্যবহার করে ছাপাই ছবি লেখা। বা মিশ্র মাধ্যম কিংবা রেশমী ছাঁচি। চিত্রশালার পেটুয়া এবং খবরের কাগজের ধামাধরা মহান শিল্পীদের বিরুদ্ধে এ এক জাগরণ। ছোট, বড়, কারুকাজ করা বইয়ের আকারে প্রতিষ্ঠানবিরোধী শিল্পীরা তাঁদের শিল্পসুকৃতিকে লক্ষের লক্ষ্যে

পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। আমেরিকার ভিত্তিচিত্র (ম্যুরাল) করেও জনসমক্ষে, আলোয়, শিল্পকে আনার চেষ্টা হচ্ছে ইদানীং।
প্রদর্শনীটা অসাধারণ। সেভেলসানের ভাস্কর্য ছাড়া এমন ভাল প্রদর্শনী মার্কিনীরা আনেননি, হয়তো তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্যের ওপর অবজ্ঞাবশত।
ছোট ছোট কার্ডের ট্যাগ, যা চীনা লন্ঠনের ওপরে ফুটো দিয়ে দেখা ঘুমোবার আগেই, আমি জানতাম স্বপ্ন দেখব। সত্য নয়, ওরা যা মৃত্যুর বিষয় বলে : তার ছোঁয়া শীতল এবং ভয়াবহ। চীনারা ছবি আর কবিতার এই একাত্ম একত্ব জানতেন।
বুঝেছিলেন আর্থার ওয়ালি এবং এজরা পাউন্ড। আমি নিজে লেখার রেখায় এই ব্যবহারে প্রথম পাত্রে তর, তারপর বুঁদ, শেষে বেহেড। শব্দ, মর্টারের দোহার দিয়েছে, করেছে সঙ্গত, কখনও বা যুগলবন্দী।

আমেরিকান সেন্টারে পুস্তক প্রদর্শনী

বিশ্বরূপ—ভিতরের গোলে মানচিত্র, আর ধাপে ধাপে নিসর্গ তলে তলে এঁকে এঁকে তোলা দৃশ্য।
অভিনবত্বের সঙ্গে কারিগরী কারিকুরি। যেমন ঘোরানো দরজার মতো খোপে খোপে আদম হবার দীর্ঘায়িত নররূপ। ছোট ছোট কাটা কথা : "আদম প্রলুব্ধ। হবা প্রতারিত। হবা আদমের দিকে তাকিয়ে নষ্টভ্রষ্ট মিথ্যা বললেন" (হি বিগাইলড, সি ডিসিভড। সি লুক্‌ট্‌ অ্যাট হিস আইজ অ্যান্ড টোলড আ উইকেড লাই) শিল্পী সেনড্রা লায়নার। স্যারা এল কুইসিং যেমন তুলোট কাগজে শুয়ে থাকার ব্যাপার অনুভূমিক রেখায় এঁকেছেন : একটি গাছ, তারচেয়ে বড় ফল রয়েছে আঁকা। পাশেই ফলটা কাটা ভেতরে বীজ। ছাপাই ছবির চূড়ান্ত জায়গায় খেলা—সত্য হল গাছ থেকে পাকা ফল মাটিতে পড়ার মতো। বীজ যেভাবে মাটি ফুঁড়ে বেরুবার জন্য চেষ্টা করেছিল, গাছ যেভাবে শিকড় গুঁজে দিয়েছিল মাটির ভেতর এবং আকাশে ডালপালা মেলেছিল, এই উপলক্ষেই ফলের উৎপাদন, যা পাকলে সহজে, নীরবে পড়ে। কিন্তু ফলেবুর পুরো প্রকরণ প্রক্রিয়া গন্তব্য নয়, এবং বীজ ফলের মতোই গন্তব্য। শিল্পী স্যানড্রা ভুইমার।

সন্দীপ সরকার

রে ক র্ড

রেকর্ড বিচিত্রা

আলোচ্য তিনখানি রেকর্ডের দুখানি রবীন্দ্রসংগীতের অন্যটি আধুনিক গানের। রবীন্দ্রসংগীতের দুখানি রেকর্ডের তিনজন শিল্পীর গান ইতিপূর্বেই গ্রামোফোন রেকর্ডে শোনা গিয়েছে। আধুনিক গানের শিল্পী রেকর্ডজগতে নবাগতা।
অনুভা মৈত্রর কণ্ঠে চারখানি রবীন্দ্রসংগীত প্রকাশ করেছেন ইনরেকো (স্টিরিও 5224-1203)। রেকর্ডের প্রথমদিকে 'পাখি বলে, চাঁপা আমারে কও' ও 'স্বপনপারের ডাক শুনেছি' এবং অন্য দিকে 'কবে তুমি আসবে বলে' ও 'আজি গোধূলিলগনে' গানগুলিতে শিল্পীর দৃপ্ত গায়নভঙ্গি আকর্ষণীয়—আড়ষ্টতাহীন। উচ্চারণ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতা আছে যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে গানের গভীরতা প্রকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মন্দ্রসপ্তকে স্বরস্থান আরো পরিচ্ছন্নতা দাবি করে।
তুলনামূলকভাবে প্রথম দুটি গান অধিকতর উজ্জ্বল। সব মিলিয়ে তাঁর গায়কীর মধ্যে একটি শিক্ষার ছাপ সুস্পষ্ট।
ভারতী রেকর্ড কোম্পানী 'তবু মনে রেখো' শিরোনামে যে সুপার সেভেন (S/BLRT 104) রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড প্রকাশ করেছেন তার শিল্পী হলেন যথাক্রমে সমরেন্দ্র দত্ত ও বীরেন্দ্র লাহিড়ী। এঁরা দুজনেই তিনখানি করে গান গেয়েছেন। সমরেন্দ্রের কণ্ঠটি সুরেলা চিকন।
তাঁর কণ্ঠে 'তুমি যে চেয়ে আছ' বা 'আমি কি গান গাব যে' শুনতে ভালো লাগে কিন্তু রেশ থাকে না কেন ? সম্ভবত গানে স্ফূর্তি কম বলেই এমনটি ঘটে। তবে এঁর গানে একটি আন্তরিকতা স্পষ্ট ধরা পড়ে। গানে স্বাভাবিক আবেগ সঞ্চারিত হলে আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। বীরেন্দ্র লাহিড়ী প্রথম গান 'যদি প্রেম দিলে না' গেয়েছেন মুক্ত ছন্দে। মুক্ত ছন্দ বলেই তো ছন্দোহীন নয়। এক্ষেত্রে গানের অন্তর্লীন ছন্দটি বজায় রাখা কঠিনতর হয়ে ওঠে। 'শ্রান্ত কেন ওহে' গানটিতে সুরের গভীরতা অনুপস্থিত। গায়কীর মধ্যে একটি আড়ষ্টতা আছে। রেকর্ডটির যন্ত্রানুষঙ্গের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—যা গানগুলিতে বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেছে।
ভারতী রেকর্ডে সংঘমিত্রা চ্যাটার্জির কণ্ঠে (S/BRMP/1053) দুখানি আধুনিক গান সার্বিক বিচারে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। প্রথমত শিল্পীর কণ্ঠটি সুরস্বচ্ছ এবং গায়নভঙ্গি অত্যন্ত সাবলীল। গানের মেজাজটিও ধরেছেন দৃঢ় প্রত্যয়ে। ভবেশ গুপ্ত রচিত প্রথম গান 'মন থেকে মুছে দিতে'র আবেদন অথবা সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিকল কেটে উড়িয়ে দে না'র ছন্দোময়তা শিল্পী অনায়াস দক্ষতায় রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রশান্ত চৌধুরীর সুরের কাঠামোতে যন্ত্রানুষঙ্গ প্রাণবন্ত করে তুলেছেন দূর্বাদল চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ করে দ্বিতীয় গানটিতে তাঁর সবিশেষ কৃতিত্ব স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবী রাখে। সংঘমিত্রা চ্যাটার্জির গানে একটি স্ফূর্তি আছে, আছে প্রাণবেগ—সে কারণেই রেকর্ডটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পেরেছে।

সুভাষ চৌধুরী

ক্যা সে ট

প্রেম : ঈশ্বরে ও মানবীতে

সি· বি· এসের নানারকম গানের মধ্যে প্রথমেই আগ্রহ বাড়িয়ে দেয় ফিরোজা বেগমের গান। ফিরোজা বেগমের গায়কি ঠিক আজকের মতো নয়। তাঁর গান সবসময় কথার মেজাজ বুঝে হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া। অন্যদিকে আজকের গানেতে কণ্ঠের সূক্ষ্ম কারুকার্য গানকে যে অন্য মাত্রা দেয় (সেটা ভাল কিংবা খারাপও হতে পারে) সেই ধরনের গায়কিতে তিনি অভ্যস্ত নন। অন্যদিকে কমল দাশগুপ্তের শিক্ষার জন্য তাঁর মধ্যে আমরা নজরুলগীতির সঠিক অবস্থান জানতে পারি। তাঁর গানের সংগীতানুষঙ্গ কিন্তু আধুনিক যুগের মত। "স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর" হয়তো এইরকম লয়েই গাওয়া হত। কিন্তু গানের মধ্যে এমন কতকগুলি গভীর ভাবনা আছে যা ছন্দের মজায় হারিয়ে যায়। "আমি দ্বার খুলে আর রাখবো না" বা "তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়" গানে অবশ্য সঠিক মেজাজ বজায় থাকে। "সই ভালো করে বিনোদ বেণী" গানটি এখন আসর জমানো গান। ফিরোজা বেগমের গান শুনে বোঝা যায় নজরুলের গজলাঙ্গ গান কতটা যাওয়া উচিত। "পথ হারা পাখি" গানটি সিরাজদৌল্লা নাটকের গান। পরের দিন যুদ্ধ। সিরাজদৌল্লা আলেয়াকে বলেন "যদি আর কোনো দিন দেখা না হয়—একটা গান কর আলেয়া" আলেয়া গান ধরে "পথ হারা পাখি" পাখি শুধু একা নয় সিরাজদৌল্লাও একা। একটি অপূর্ব নাট্য ভাবনা, গান শেষ হলে সকাল হয়, যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে হয়।"
"বাহিরে অন্তরে ঝড় উঠিয়াছে" এর সঙ্গে ঝড়ের আওয়াজ গানের কোনো শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় না দ্বিতীয়ত এই ঝড় শুধু অন্য ঘটনার প্রতীক, বাস্তবে সম্ভব নয়। অসাধারণ লাগে "প্রভাত বীণা তব বাজে" "পরি জাফরানী ঘাঘরী" গানটি। "শাওন রাতে যদি" গানটিতে ফিরোজা বেগম যথার্থভাবে মন্দ্র সপ্তকের মধ্যম এবং তার সপ্তকের পঞ্চম লাগিয়েছেন, যদিও আবার অযাচিতভাবে ঝড় আসে। (মান্না দে এবং সতীনাথ মুখোপাধ্যায় মন্দ্র সপ্তককে এড়িয়ে গেছেন) ফলে

তাঁর কণ্ঠের রেঞ্জ সম্পর্কে সকলেই নিঃসংশয়। ফিরোজা বেগম নিজেও জানেন অনেকগুলি গান নজরুলের সুর করা নয়—তবে সুরকারের নাম দেওয়া হয় না কেন? সে কি বিতর্কিত হওয়ার আশঙ্কায়?
সি· বি· এসের আর একটি উল্লেখযোগ্য ক্যাসেট শিশুদের গান। নার্সারি রাইমস্। যা এখন প্রতিটা ইংলিশমিডিয়ম স্কুলের পাঠ্য। শিশুরা এই ক্যাসেটে উপকৃত হবে। উপরি পাওনা বনরাজ ভাটিয়ার সঙ্গীত। যদিও কথার দিক থেকে অনেক গানে এমন শব্দ আছে এবং ভাবনা আছে, যেটা এদেশের পক্ষে হয়তো একটু গুরুপাক। অমৃতা ডিগে, আন্দ্রিয়া ডিসুজা, ডেভিড ডিসুজা, ধ্রুব গাণ্ডেরকর, সুমিত রাঘবন এই পাঁচজন শিশু শিল্পী গেয়েছে চমৎকার। বাঙালী শ্রোতা এই গান শুনতে শুনতে চমকে উঠবেন। একটা কথা অনস্বীকার্য আমাদের বাংলা স্কুলে প্রার্থনাসঙ্গীত হিসাবে দেশাত্মকবোধক কিছু গান গিলিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু শিশুদের মত করে গান শেখানো হয় না। সম্ভবত সি এল টি এবং অন্য কিছু প্রতিষ্ঠান চেষ্টা চালালেও সাধারণভাবে সব স্কুলে নয়, যাতে প্রথম থেকেই শিশুদের সঙ্গীত বোধ অঙ্কুরিত হতে পারে।

সি· বি· এস দুটি গজল গানের ক্যাসেট প্রকাশ করেছেন। সালমা আগা গেয়েছেন আটটি গান। এখন গীত গজল কাওয়ালি, ভজন সব একাকার। সালমা তাঁর কণ্ঠের জন্য একটি স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য সামশাদ বেগমের গান আমরা এখনও শুনি (বেগম আখতার নিশ্চয়ই এই গোত্রের মধ্যে পড়েন না) কিন্তু সালমা আগার গান আমরা দশবছর বাদে শুনব কি না সন্দেহ আছে। কারণ সুরকার এ ববি প্রায় সব গানই এক ছকে বেঁধেছেন। সবশেষে 'কমলা' ছবির গানে বাপী লাহিড়ীর সুরে গানটি অন্য মেজাজ আনে। এম আনোয়ার শৈফি বা গিলানীর গানের কথার মধ্যে বৈচিত্র্য কোথায়? গজল কাব্যপ্রধান—কিন্তু শুধু "তুম ঔর হাম, দিলকি ধড়কন"-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। গানগুলি শুনতে ভাল লাগে সালমা আগার গাওয়ার জন্য। নির্মল উধাসের গান নিঃসন্দেহে আবিষ্কার। তাঁর সুর অনেক সময় সীমানা পেরিয়ে কাওয়ালির দিকে চলে যায়। তবু কিছু সুর ও তাঁর গায়নভঙ্গী অনেককেই তৃপ্ত করবে। এখানেও অনেকে গান লিখেছেন পেয়ার, চাঁদ, দিল, শরাবের ছড়াছড়ি—কিন্তু হসরৎ জয়পুরী যখন লেখেন "পিনে দেয় হৈ নহি পিলানে কে দেয় হৈ নহি মেরে হুজুর,আপকে আনেকে দেয় হৈ" তখনই গানের চেহারা বদলে যায়। এছাড়াও এমন কিছু গান আছে যা ব্যতিক্রমী। নির্মল উধাসের রেকর্ডকে আগমন না বলে আবির্ভাব বলাই সঙ্গত।
মেগাফোন কোম্পানী প্রকাশ করেছেন উষা উত্থুপের আটটি গানের একটি সংকলন। উষা উত্থুপের কণ্ঠে যে স্বাতন্ত্র্য আছে, সেটি দুর্লভ। কিন্তু গান নির্বাচনে তিনি প্রায়শই ভুল করেন। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল সব সময় আহরণ করেছেন কিন্তু সেই বাংলা কথায় মিশে গেছে। পরবর্তীকালে হিমাংশু দত্তের 'তোমারি মুখপানে চাহি' আরও পরে 'পৃথিবী আমারে চায়' বা সলিল চৌধুরী, সুধীন দাশগুপ্তের অনেক গান বাংলা গানে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু উষা উত্থুপ ধরেই নিয়েছেন তিনি পপ সং-এর ছকটি গ্রহণ করবেন—সেই হিসাবে সুর বসানো হয়। প্রথমেই বিভ্রান্তি জাগে শব্দ নির্বাচনে। কারণ পপ গানে যে ছোট ছোট শব্দ—সেটা নির্বাচন করে গীতিকার বরুণ ঘটক সুন্দর গান রচনা করেছেন—কিন্তু লোকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুর কখনই কথার মেজাজ রেখে চলেনি। মাত্র দু'একটি গান যেমন ওয়ালজ ছন্দে 'কেন যে তোমারে চাই' গানটি শোনা যায়, কারণ সেখানে কথা দাঁড়ানোর অবকাশ আছে। "সবাই যদি ভাবতে বসে" গানটির সঙ্গে নানারকম চিৎকার গানের মেজাজের সঙ্গে মানায়নি। যদি শুনতেই হয় তবে আসল বিদেশী গানই প্রয়োজন মেটাতে পারে।
সিম্ফনী থেকে ভোজপুরি গানের ক্যাসেটে গান গেয়েছেন কুমকুম মুখোপাধ্যায়। ভোজপুরি গানের মেজাজ তিনি আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু লোক সঙ্গীতে অনিবার্যভাবে সুরের

একটা একঘেয়েমি আছে। সেইজন্য তাঁর সুর নির্বাচনে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। তাঁর নৈপুণ্য সত্ত্বেও—এক সময় একঘেয়েমির জন্য অনেক সুর হারিয়ে যায়।
শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় কিরণ কোম্পানী থেকে প্রকাশ করেছেন বাংলা ভজন। বাংলা ভজন প্রায় অবলুপ্ত। সেক্ষেত্রে তিনি নতুনভাবে ভজনকে প্রতিষ্ঠিত করলেন নৈপুণ্যের সঙ্গে। গানের আকৃতি, নিবেদন কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি (যা আজকাল প্রায়ই ওস্তাদী মারপ্যাচে হয়ে থাকে) একটি গান "মত যা মত যা যোগী" গানের আদলে রচিত। কিন্তু কিছু গানে "কৃষ্ণনামে যাক বিভাবরি" বা "নাচেরে নন্দদুলাল" গানে তাঁর গান কিছুটা আধুনিক কিন্তু তাতে কোনও ক্ষতি হয়নি। বরঞ্চ প্রমাণিত হয়েছে শুধু অনুপ জালোটাই পরমন্তপঃ নয়। প্রত্যেকটি গানের সুর শিল্পীই দিয়েছেন—ফলে সুরকার হিসেবেও তাঁর সম্ভবনা নিশ্চিত। রতন সাহা ও ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাও বেশ ভাল। শেষ গানটির সুর রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের, 'কি দিয়ে পূজিব' গানটি অনেকদিনের, তবু আচল মুদ্রা নয়। সবশেষে একটি কথা। তিনি উত্তরাধিকারে ঋদ্ধ। কিন্তু আমাদের কামনা তিনি উত্তরাধিকারে ধনী হয়েও নিজে কিছু করবেন—অনেক কিছু গ্রহণ করেও নতুন করে সাজাতে হবে।
নিশীথ সাধু বাংলা গানকে বাঁচিয়ে দিলেন। রজনীকান্তের গান এখন প্রায় শোনাই যায় না। ভাল গায়কের অভাব। এইচ এম ভি-র একটি ক্যাসেটে নিশীথ সাধু প্রাণভরে গেয়েছেন। প্রতিটি গানেই তিনি নিবেদিত। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তুনা ক্যাসেটকে মর্যাদা দিয়েছে অন্যদিকে যেভাবে "তোমারি দেওয়া প্রাণে" গানটি রচিত হয়েছে সেটা বলে দেওয়ার পর গানটির ছন্দ বর্জিত হওয়া উচিত ছিল। রজনীকান্তের গানের একটি সীমারেখা আছে। যে কোনো মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলে যেতে পারে। শুধু কথায় ধরা পড়ে যে রবীন্দ্রনাথ নয় অন্য কেউ রচয়িতা। এই বিভ্রান্তি ঘটেছে সহশিল্পী কাকলি সাহার "স্নেহ বিহ্বল করুণা ছলছল" গানে এবং "ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে" গানটির ব্যঙ্গ কিছুই অনুভূত হয় না। সম্ভবত নির্মল বিশ্বাসের তার সানাই গানগুলিকে প্রাণবন্ত করেছে। রজনীকান্তের গান অনুভবের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের থেকেও শ্যামাসঙ্গীতের কাছাকাছি। অন্তিম যাত্রার গান "কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব" নিশীথ সাধু ছন্দ ছাড়া অশেষ নৈপুণ্যে গাওয়া সত্ত্বেও পান্নালাল ভট্টাচার্যকে ভোলাতে পারেন না।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

বি বি ধ

আনন্দবঞ্চিতদের জন্য

হল-ভাড়ায় কোনও ছাড় দেন না রবীন্দ্রসদন, যদিও বছরের পর বছর ধরে 'শিশুরঙ্গন' যেভাবে আনন্দবঞ্চিত শিশুদের জন্য উন্মোচিত করে চলেছেন আনন্দ-উজ্জ্বল এক-একটি অনুষ্ঠানের সিংহদ্বার, তাতে কিছু 'ছাড়' দিয়ে সদনও হতে পারতো এই মহৎ প্রয়াসের অংশীদার। এতে অবশ্য পিছপা হননি শিশুরঙ্গন। প্রতি বছরই যেমন পুজোর আগের একটি সকালে তাঁদের আনন্দযজ্ঞে আমন্ত্রণ জানান সেইসব অনাথ, দুঃস্থ শিশুদের—যাদের কাছে রবীন্দ্রসদন এক স্বপ্নপুরী, এ-বছরও তেমনই একটি উৎসবমুখর প্রভাতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তাঁরা। শিশুরঙ্গনের সতের পূর্তি ছিল উপলক্ষ।

শিশুরঙ্গনের লক্ষ্য ও অর্জন নিয়ে শুরুতে কয়েকটি কথা বললেন সাধারণ সম্পাদক শৈলেন ঘোষ। অনুষ্ঠান অন্য মাত্রা পেল ঠিক এর পরের মুহূর্তেই, মঞ্চে যখন গান শোনাতে এলেন চেসায়ার্স হোমের আবাসিকরা। সবাই প্রতিবন্ধী, কেউ-কেউ ছিলেন হুইল চেয়ারে।

কিন্তু জীবন-যুদ্ধে এঁরা যে সাহসিক আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, তার পরিচয় মিললো নির্বাচিত গানের পরম্পরাতে। প্রথম গানটি ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত। 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়'—সম্মেলক কণ্ঠে উচ্চারিত এক পুণ্য প্রার্থনা। দ্বিতীয় গানটি শোনালেন প্রকৃতি সেনগুপ্ত, সুরেলা মাধুর্যমণ্ডিত পরিচ্ছন্ন তাঁর ভঙ্গি, 'নতুন সূর্য আলো দাও আলো দাও।' তৃতীয়টি ফের সম্মেলক, রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রার্থনায় আরেকবার কণ্ঠ মেলালো—'আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও।" পরবর্তী অনুষ্ঠানটি মঞ্চস্থ করল শিশুরঞ্জনের শিশুশিল্পীরা। 'ছড়ার সঙ্গে খেলা' নাম ছিল এই আয়োজনটির। রেলগাড়ির চলনের সঙ্গে মিলিয়ে 'ঝিকঝিক ঝিকঝিক' ছড়া ও কোরিওগ্রাফি। অভিনব ও দৃষ্টিনন্দন অনুষ্ঠান। ভাল লাগল পরের অনুষ্ঠানটিও। সুন্দরীমোহন এভিনিউ-এর অনুন্নত অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা নৃত্য-গীতের মিলিত ঔজ্জ্বল্যে রূপায়িত করল ফসল-কাটার উৎসবমুখর পরিবেশকে। গানটি ছিল, সলিল চৌধুরীর সুপরিচিত সেই "আয়রে আয়রে ছুটে।"

এরপর বিরতি। পরের পর্বে ছিল শৈলেন ঘোষের পরিচালনায় তাঁর নিজেরই লেখা নাটক 'রূপাকে নিয়ে রূপকথা।' শিশুরঞ্জন নিবেদিত এই নাট্যানুষ্ঠানটি, উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত বছরও মঞ্চস্থ হয়েছিল। এবং এবারেও ক্ষুদে দর্শকরা প্রতি দৃশ্যের শেষে স্বতঃস্ফূর্ত করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছে।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

হীরেন বসু স্মরণে

(১৯০৩—১৯৮৭)

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রয়াত হীরেন বসুর পরিচিতি প্রধানত গীতকার সুরকার হিসাবেই। বাংলা গানের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত সেন এমন কি অনেকাংশে নজরুল ইসলামও ছিলেন এককভাবে গীতকার ও সুরকার। সেই ধারা অব্যাহত রেখে বাংলা গানের ভাণ্ডার পরবর্তীকালে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম : হীরেন বসু।

শিশুকাল থেকে নাচ, গান এবং অভিনয়ে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। অমৃতলাল বসু এবং অমৃতলাল মিত্র প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত নাট্যসমাজে নিতান্ত শৈশবাবস্থায় তাঁর অভিনয় শিক্ষার তালিম শুরু হয়। সংগীতের ক্ষেত্রে অবশ্য নিয়মিত শিক্ষা শুরু হয় তুলনামূলকভাবে কিছু পরবর্তীকালে। ১৯২০ সালে প্রথমে লক্ষ্ণৌ ঘরানার রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের কাছে ধ্রুপদ এবং ক্রমে নগেন দাঁ, শুকদেব মিত্র ও মাস্তান গামার কাছে নিয়মিতভাবে খেয়াল গানের তালিম নেন। তাল লয় শিক্ষার ভিত দৃঢ় করার জন্য তালিম নেন দুর্লভ ভট্টাচার্যের কাছে। এই সময়েই নাটোরের মহারাজার সূত্রে জোড়াসাঁকো বাড়িতে যাতায়াত শুরু হয় এবং রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ প্রমুখের সম্পর্কে আসার সৌভাগ্য ঘটে।

সংগীতচর্চার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যজীবনের শুরু। প্রবাসী, মানসী ও মর্মবাণী, কল্লোল, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকায় গান কবিতা সহ বিভিন্ন ধরনের রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। হীরেন বসু নিজে প্রকাশ করেন ছোটদের জন্য পত্রিকা আলাপন। ১৯২৫ সালে শিশির মিত্র বিজ্ঞান কলেজ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে বেতারতরঙ্গে প্রথম যে সংগীত প্রেরণের প্রচেষ্টা করেন তাঁর গায়ক ছিলেন হীরেন বসু। পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯২৬-এ কর্মজীবন শুরু করলেন ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানীতে সুরকার গীতকার গায়ক হিসাবে। ১৯২৭-২৮ সালে কলকাতা বেতার কেন্দ্র এবং হিজ মাস্টার্স ভয়েসের সঙ্গে যুক্ত হলেন। রেকর্ড কোম্পানীর বৈদ্যুতিক রেকর্ডিং ব্যবস্থায় প্রথম রেকর্ডের শিল্পী ছিলেন হীরেন বসু। ১৯২৯-এ প্রচারিত টুইন রেকর্ডে মিস লাইটের গাওয়া হীরেন বসু রচিত ও সুরারোপিত 'শেফালি তোমার আঁচল খানি' গানটিতে প্রথম অর্কেষ্ট্রা ব্যবহৃত হল—বিক্রির হিসাবে যা আজও রেকর্ড। শিশুদের জন্য রচিত ও সুরারোপিত প্রথম রেকর্ডটির কৃতিত্বও হীরেন বসুর প্রাপ্য। পরবর্তীকালে শিশুদের জন্য প্রথম রেকর্ড নাটক 'মধুসূদন দাদার পালা'র রচয়িতাও ছিলেন তিনি।

চলচ্চিত্র জগতে তাঁর প্রবেশ Hush চুপ ছবির পরিচালক হিসাবে। ১৯৩১-এ 'জোর বরাত' ছবিতে তিনি সর্বপ্রথম প্লেব্যাক পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন। ঐ বছরেই 'ঋষির প্রেম' ছবিতে প্রথম আবহসংগীত ব্যবহৃত হল তাঁরই কৃতিত্বে। পরবর্তীকালে তিনি নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন। সেখানে তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'মীরাবাঈ'-এর বাংলা ও হিন্দী সংস্করণ। এখানেও একাধারে কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার, গীতকার ও সুরসংযোজক। এই সময় কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন তিনি। ১৯৩২ সালে মেগাফোন রেকর্ডে কানন দেবীর কণ্ঠে প্রথম গান ধৃত হল—গীতকার সুরকার হীরেন বসু। ১৯৩৪ সালে তিনি বোম্বাই চলে যান। সেখানে 'ধরম কী দেবী' পরিচালনা করেন—বোম্বাই চলচ্চিত্রজগতে এই প্রথম প্লে ব্যাক পদ্ধতির প্রবর্তন হল। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানভিত্তিক চলচ্চিত্র 'মহাগীত' (হিন্দী)র কাহিনীকার পরিচালক ও সংগীত পরিচালক ছিলেন হীরেন বসু। ১৯৩৮-এ মাদ্রাজে তেলেগু ছবি 'ভক্ত জয়দেব' পরিচালনা ও সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৯-এ সুদূর আফ্রিকায় গিয়ে 'আফ্রিকা মে হিন্দুস্থান' ছবি পরিচালনা করেন। তারপর বাংলায় ফেরেন। 'অমরগীতি' (৪০-৪১), 'কবি জয়দেব' (৪১-৪২), 'দাসী' (৪৪-৪৫) প্রভৃতি চলচ্চিত্রে তাঁকে বিভিন্ন ভূমিকার দায়িত্বে দেখা গেল। ১৯৪৫-এ কান ফেস্টিভালে 'দাসী' ছবিটি দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবির মর্যাদা লাভ করে। আবার বোম্বাই চলে যান তিনি। তার আগে ১৯৪৮-৪৯ সালে 'তুলসীদাস' পরিচালনা করেন। বোম্বাইয়ে 'মুক্তর' 'রমন' স্বামী যোবন' ছবির কাজ সেরে কলকাতায় সর্বশেষ ছবি পরিচালনা করলেন ১৯৫৫-৫৬ সালে—ছবির নাম 'একতারা'।

হীরেন বসুর প্রচেষ্টাতেই কলকাতা বেতার কেন্দ্রে সংগীতের বিচার ও প্রভাতী অনুষ্ঠানের সূচনা। বেতারে সংগীত শিক্ষার আসরের প্রবর্তকও তিনিই।

হীরেন বসুর প্রতিভা এত বিচিত্রমুখী যার বিস্তৃত বিবরণ দিতে হলে সম্পূর্ণ একটি প্রবন্ধের প্রয়োজন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'জাতিস্মরের শিল্পলোক' 'জাতিস্মরের পান্থশালা' 'কিন্নর কিন্নরী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর ইংরেজী ভাষায় রচিত 'ভারতীয় দর্শন ও সংগীত' বিষয়ক পাণ্ডুলিপি (বর্তমানে যন্ত্রস্থ) পড়ে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। হীরেন বসু দীর্ঘকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলের সদস্য, বেতার কেন্দ্রের অন্যতম উপদেষ্টা, বিচারক, প্রযোজক ও সংগীতপরিচালক হিসাবে বিশেষ দক্ষতা ও সততার পরিচয় রেখেছেন। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তিনি ছিলেন অন্যতম স্বীকৃত তথ্যচিত্র প্রযোজক।

অন্যান্য সব কৃতির কথা মনে রেখেও কেবল গীতকার সুরকার হিসাবেও হীরেন বসুর যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। প্রসঙ্গত কয়েকটি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'লিখিনু যে লিপিখানি', 'শুকনো শাখার পাতা ঝরে যায়', 'প্রিয়ার প্রেমের লিপি' ; পাহাড়ী সান্যালের কণ্ঠে 'আঁখিতে রহো গো নন্দদুলাল' ; ধীরেন দাসের কণ্ঠে 'শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও' ; ইন্দুবালার কণ্ঠে 'জ্বালো আজি আরতি দীপ' অথবা রবীন মজুমদারের কণ্ঠে 'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ'। প্রায় দেড় হাজার গান রচনা করেছেন এবং তার অধিকাংশের সুর রচনার কৃতিত্বও তাঁরই। তিনি ছাড়া তাঁর গানে সুরসংযোগ করেছেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, দুর্গা সেন, অনুপম ঘটক, রবীন চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় লাহিড়ীর মতো সংগীতকার।

ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত নিরহঙ্কারী প্রচারবিমুখ শান্তিপ্রিয় এই মানুষটি সম্পর্কে কিন্তু আমরা যথারীতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে বিমুখ থেকেছি। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের অথবা বেতারের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে নিতান্ত বাধ্য হয়েই তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল—এই পর্যন্ত এর বেশি কি তাঁর কিছু প্রাপ্য ছিল না ? মরণোত্তর হলেও প্রাপ্য সম্মান জানানোর সময় এখনো পার হয়ে যায়নি।

সুভাষ চৌধুরী

ম

ONIDA
SUPER HI FI COLOR

পালিশের জেল্লা আর কেরামতি কদিন থাকে? কিন্তু টাচ উড-এর সুরক্ষা আপনার সখের কাঠের ফার্নিচার বহুদিন ছিমছাম সুন্দর রাখে!

এবার এলো টাচ উড পলিইউরেথেন ক্লিয়ার উড ফিনিশ।
এটি কাঠের ফার্ণিচারের ওপর স্বচ্ছ কঠিন আস্তরণ ফেলে।
এ আস্তরণ পালিশের চেয়ে হাজার গুণ ভালো ভাবে
আঁচড় বা ময়লা ছোপ-পড়া প্রতিরোধ করে।

পালিশ যথেষ্ট মজবুত ঘাতসহ নয়

পালিশ করার পর কাঠের ফার্ণিচার ঝকঝকে সুন্দর দেখায় বটে কিন্তু চা-দুধ বা অন্য কোন তরল পদার্থ চলকে পড়লে এমন ময়লা ছোপ ধরে যে আবার পালিশ-না-করা পর্যন্ত সেগুলো চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যাপারটা হচ্ছে, পালিশ যে-আস্তরণ ফেলে সেটা যেমন পাতলা তেমনি পলকা, তাই ময়লা ছোপ বা আঁচড়ের দাগ-পড়া ঠেকাতে পারে না।

ফলে দু'এক মাসেই আপনার সখের ফার্ণিচার ময়লা ছোপ আর আঁচড়ের দাগ প'ড়ে খুব বিশ্রী দেখায়।

টাচ উড : পলিইউরেথেনের প্রচণ্ড শক্তি

টাচ উড-এ আছে সুদৃঢ় প্ল্যাস্টিক—পলিইউরেথেন, এটি যে স্বচ্ছ পুরু আস্তরণ ফেলে তা কাঠের গায়ে দারুণ ভাবে সেঁটে থাকে।

এই আস্তরণ গরম বা ঠাণ্ডা চলকে-পড়া তরল পদার্থের ছোপ এবং আঁচড়-পড়া দীর্ঘকাল প্রতিরোধ করতে পারে!

শুধু তাই নয় কাঠের নিজস্ব স্বাভাবিক জৌলুষ ধরে রাখে বছরের পর বছর। অথচ পালিশ করালে কদিন আর থাকত জেল্লা, পালিশ চাট-কোট দুদিনেই ম্যাড়মেড়ে কুশ্রী দেখাত।

মনের সুখে টাচ উড লাগান শুখোতে একটু সময় নেয় বটে কিন্তু সুরক্ষাও যে দেয় অনেক বেশি!

রঙের মতই টাচ উড একাধিক কোট লাগাতে পারেন—আর এ কাজ যে-কোন রঙের মিস্ত্রির কাছে কিছুই না। একবার পালিশ করার বদলে টাচ উড লাগিয়ে দেখুন, আপনার ফার্ণিচার বছরের পর বছর কী দারুণ সুন্দর দেখায়—ঝকঝকে একেবারে নতুনের মত।

টাচ উড পুরু, সুদৃঢ়, সুরক্ষাকারী আস্তরণ ফেলে যা পালিশ পারে না। তাই এটা শুখোতে একটু সময় নেয়, কিন্তু সেটা কোনমতেই দরজা-জানালা রঙ করার চেয়ে বেশি নয়।

টাচ উড সুরক্ষা ফার্ণিচারের প্রতিটি খাঁজ-খোজে অদেখা ফাঁক-ফোকরে, আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।

টাচ উড-এর গোড়ার খরচটা পালিশের চেয়ে সামান্য বেশি পড়ে বটে, কিন্তু পালিশের চেয়ে ঢের বেশি কাল ধরে সর্বাঙ্গীণ সুরক্ষা ও সৌন্দর্যে আপনার সখের কাঠের ফার্ণিচারগুলো ভরে রাখে বলে আখেরে অনেক বেশি গুণ পুষিয়ে যায়।

গ্লসি অথবা ম্যাট ফিনিশ

পালিশের বেলায় আপনার পছন্দের কোন সুযোগ নেই কিন্তু টাচ-উড পাবেন দু'রকম—গ্লসি অথবা ম্যাট ফিনিশ, আপনার যেমন পছন্দ। আর অনন্য টাচ উড স্টেনার-এর ছোঁয়ায় সাধারণ কাঠও দেখাবে খানদানী দামী কাঠের মত।

সহজে পাওয়া যায়

টাচ উড যে-কোন এশিয়ান পেন্টস্ ডীলারের কাছে পাবেন।

একবার টাচ উড লাগালেই বুঝবেন আপনার সখের কাঠের ফার্ণিচার কী সুন্দর ঝলমলে দেখায়, আপনার ঘর আলো করে রাখে।

TOUCH WOOD

মনের সুখে লাগান, কাঠে নতুন প্রাণ জাগান!

এশিয়ান পেন্টস্

৩১ অক্টোবর ১৯৮৭ পাঁচ টাকা

দেশ

িবারের সেকাল একাল

লা মজুমদার □ কল্যাণী দত্ত

চট্টোপাধ্যায় □ বিধান সিংহ

তে জাতীয় সংহতি

দত্ত

তোমার মুখের
একটু হাসি দেখবার জন্য
আমি সবকিছু ক'রতে রাজি।

ক্যাডবেরিস্ ডেয়ারী মিল্ক

তোমার ত'চাই
সবার সেরা—এ জিনিসটাই

ক্যাডবেরিস্ ডেয়ারী মিল্ক। তাজা ডেয়ারী দুধ দিয়ে তৈরী। আসল,
খাঁটি আর সরে ভরা।
তৃপ্তিভরা স্বাদের জন্য এই চকলেটের জনপ্রিয়তা ও চাহিদা আন্তর্জাতিক।
ক্যাডবেরিস্ ডেয়ারী মিল্ক। চকলেট তৈরীতে যারা অগ্রণী
এ তাদের অবদান।

48/BEN

"আদরের সোনামণি
শিখছে দিতে হামাগুড়ি
মনে জাগে ভয়
কখন যে কি হয়"

সময়ের সঙ্গে পাল্টায় প্রায় সবকিছুই।
শুধু পাল্টায় না মায়ের যত্ন, পরিচর্যা,
তাঁর চোখের মণি ছোট্ট সোনার ওপরে
রাখা স্নেহের নজরটি। তেমনি পাল্টায় নি
বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর ল্যাম্প ব্র্যান্ড
ফিনিয়ল। আজও তার গুণাগুণ ঠিক তেমনটিই
আছে–যা ছিল কয়েক পুরুষ আগেও।

বেঙ্গল কেমিক্যালের
ল্যাম্প ব্র্যান্ড

ফিনিয়ল

গুণে সাধারণ সব ফিনাইলের
থেকে শতগুণ সেরা

BC

সূচীপত্র

দেশ

১৪ কার্তিক ১৩৯৪ □ ৩১ অক্টোবর ১৯৮৭ □ ৫৪ বর্ষ ৫৩ সংখ্যা

প্র চ্ছ দ নি ব ন্ধ

বি শে ষ প্র ব ন্ধ

বি শে ষ নি ব ন্ধ

ভ্র ম ণ

বি দে শে র চি ঠি

গ ল্প

ক বি তা

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

ধা রা বা হি ক র চ না

খে লা

নি য় মি ত

প্র চ্ছ দ

অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

১৯

যূথ মানে দলবদ্ধ পশু-পাখি। নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রাণীকুল দল বেঁধে, যূথবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করে। তেমনি অনিবার্যতায় মানবের মধ্যেও গড়ে ওঠে যেমন সমাজ, তেমনি গঠিত হয় যৌথ পরিবার। যুগের বিবর্তনে আজ ভেঙে পড়ছে সেইসব যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার। সমাজকে বলছি জোট বাঁধতে, পরিবারকে বলছি জোট ভাঙতে। বিশ্বকে চাইছি এক নীড় ভাবতে। ঘরকে চাইছি গণ্ডিবদ্ধ করতে। ছোট পরিবারকেই বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে সুখের প্রতীক রূপে। এই নীতির মধ্যেই কি অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব নেই! পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডিত হচ্ছে না কি আমাদের সামাজিক সম্পর্কও? সুপ্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকেই যাকে ঘিরে গড়ে উঠত ঘর। সেই ধারা বয়ে এক মমতাময়ীর স্নেহাবলম্বনে বর্ধিত হোত একটি বংশ লতিকা। তারপরে নারীমুক্তির ডাকে মায়েরা বেরোলেন ঘর ছেড়ে, পরিবারের ভাঙন সেদিন থেকেই শুরু। যুগের দাবীতেই এই বিবর্তন। বিদেশে কী কোনও সংকট দেখা দিয়েছে এ নিয়ে? বাহুল্যবোধে বর্জিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও কি কদর বাড়ছে নতুন করে? আর্থ-সামাজিক অনিবার্যতায় ভেঙে যাওয়া যৌথ পরিবারকে ফিরিয়ে না এনেও নতুন যুগের উপযোগী কোনও নতুন ধরনের পরিবার হতে পারে কিনা এই নিয়ে এবারকার প্রচ্ছদনিবন্ধাবলী।

৭২

স্বর্গ কোথায় যদি নাও জানা যায়, দেবতাদের বাসভূমির ঠিকানা কিন্তু এই পৃথিবীর এইখানে, হিমালয়ের এই ছোট্ট, সুন্দর উপত্যকায়। বেদ-বর্ণিত ঋষি-মুনিদেরও আদি বাস এইখানে। এই তো স্বর্গের পথ। এখানেই দ্রৌপদীসহ অন্য ভ্রাতাদের অন্তিম সংস্কার করেন যুধিষ্ঠির। অপূর্ব এই উপত্যকা আজও ক্ষুব্ধচিত্তকে প্রশান্তি দেয়।

৫৪

নজরুল-চর্চায় গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। নজরুলের রচনা, নজরুল সম্পর্কিত গ্রন্থপ্রকাশ, গবেষণা প্রভৃতির প্রণোদনার সঙ্গে সঙ্গে নজরুলের গানের বিশুদ্ধ সাধনাও তাদের দায়িত্বসূচীর অন্যতম।

১৪

জন্মভূমিকে 'জননী' সম্বোধন পাই বাল্মীকির রামায়ণে। বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম ভারতভূমিকে জননী বলেন ঈশ্বর গুপ্ত। এমনি ধারায় একদা পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ এবং সবশেষে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমনঅধিনায়ক'। বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আমরা এক। এই বৈচিত্র্য নিয়েই রচিত আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, যা আর কোনও দেশের জাতীয় সঙ্গীতে নেই। এই আলোচনা।

৯৩

বিশ্বকাপের পরেই ইমরান আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নিচ্ছেন। অলরাউন্ডার ইমরান বিভিন্ন দলের কাছে বিভীষিকা, সম্প্রতি অধিনায়ক ইমরানও অসাধারণ সাফল্যের অধিকারী হয়েছেন। সুদর্শন ইমরানের আলাদা আকর্ষণ তো আছেই। এই নানা ছবিতেই ইমরানই এবারের 'খেলা'য়।

প্রকাশিত হল

সুভাষ ভট্টাচার্যের

বাংলা শেখার আনন্দপাঠ

বাংলা ভাষার সাত সতেরো

দাম ১০·০০

চঞ্চল বালিকা, নাকি চঞ্চলা বালিকা ? চঞ্চল মেয়ে, না চঞ্চলা মেয়ে ? দরিদ্ররা, নাকি দরিদ্রেরা—কোন্‌টা ঠিক ? কী কখন লিখতে হবে, কিই বা কখন ? রাম ও শ্যাম হবে, নাকি রাম আর শ্যাম ? ব্যাবসা শুদ্ধ ? না ব্যবসা হবে ? 'রিবেট বাদ দিয়ে দাম কত ?'—এই বাক্যটিতে কি ভুল রয়েছে ? থাকলে কী ধরনের ভুল ? শুধু কি বানান আর বাক্যগঠন নিয়ে এমনতর সমস্যা ? উচ্চারণেও বিস্তর খটকা। লিখি অ, উচ্চারণ করি ও। কখনও অ-কারান্ত উচ্চারণও হয়। কখন হয় ? বাংলা ভাষার এমন সাত-সতেরো নিয়েই এই বই। কিছু মজা আর কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা। সহজ, মজাদার ভঙ্গিতে গল্পচ্ছলে আলোচনা। বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য থেকে দৃষ্টান্ত তুলে দেখানো। লিখেছেন সুভাষ ভট্টাচার্য, বাংলা ভাষার প্রয়োগ নিয়ে এর আগে যাঁর অসামান্য বই। ছোটরাই তাঁর উদ্দিষ্ট, তাঁদের জন্য এ-বই আনন্দপাঠ, কিন্তু বড়রাও কম আনন্দ পাবেন না। প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী।

দ্বিতীয় মুদ্রণ চলছে

নবনীতা দেবসেনের

অ্যাডভেনচার-অভিজ্ঞতা

ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে

দাম ১৮·০০

কোথায় আসামের জোড়হাটে এক সাহিত্য সম্মেলন, আর কোথায় সেই তিব্বত সীমান্ত। তাও আবার প্লেনে-ট্রেনে শৌখিন ভ্রমণ নয়। এ-যাত্রা যাকে বলে একেবারে ডাকাবুকো স্টাইলে অ্যাডভেনচার। র‍্যাশনট্রাকে জোর করে জায়গা করে নিয়ে দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে ম্যাকমাহন লাইনের পাশে তাওয়াং পৌঁছনো। সেই লাসা-তাওয়াং রোড—যেখান দিয়ে চীনেরা এসেছিল। সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। অজানিতের পথে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার এই অনন্য অভিজ্ঞতাকেই এই বইতে তুলে ধরেছেন নবনীতা দেবসেন, তাঁর নিজস্ব, সরস, সপ্রতিভ ভঙ্গিতে। আশ্চর্য স্বাদু এই বই। কী বিষয়ে, কী বর্ণনায়। তথ্য, ইতিহাস, নিসর্গদৃশ্যের অপরূপ বর্ণনা, রোমাঞ্চ এ-সবই রয়েছে। কিন্তু সব ছাপিয়ে যা দুর্বার আকর্ষণ তা হল, প্রতিটি পদক্ষেপকে মুচমুচে মজা দিয়ে মুড়ে জীবন্ত করে তুলে ধরা—যার স্বাদ নবনীতা দেবসেনের বিশিষ্ট ও মেজাজী কলমে পরমরমণীয়।

লেখিকার অন্যান্য বই : স্বভূমি (উপন্যাস) ১০·০০

নটী নবনীতা (রম্যরচনা) ১৫·০০

ছোটদের সেরা উপহার

বুদ্ধদেব গুহর
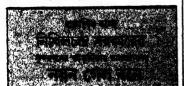
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে — দাম ৮·০০

বনবিবির বনে — দাম ৮·০০

মউলির রাত — দাম ১০·০০

গুগুনোগুম্বারের দেশে — দাম ১০·০০

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের

মামার বাড়ি — দাম ৮·০০

সত্যজিৎ রায়ের

গ্যাংটকে গণ্ডগোল — দাম ১০·০০

সোনার কেল্লা — দাম ১০·০০

বাক্স-রহস্য — দাম ১০·০০

কৈলাসে কেলেঙ্কারি — দাম ১০·০০

জয় বাবা ফেলুনাথ — দাম ১০·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং — দাম ৮·০০

ননীগোপাল চক্রবর্তীর

চরকাবুড়ী — দাম ৮·০০

যাদুঘরে চলো যাই — দাম ৬·০০

পীর ফকিরের আস্তানায় — দাম ৬·০০

ফুড়ুৎ গুড়গুড়ি — দাম ১০·০০

শৈলেন ঘোষের

স্বপ্নের জাদুকরী — দাম ৮·০০

টোরা আর বাদশা — দাম ৮·০০

খুদে যাযাবর ইসতাসি — দাম ১২·০০

ভূতের নাম আক্কুশ — দাম ১০·০০

মতি নন্দীর

ননীদা নট আউট — দাম ৬·০০

স্ট্রাইকার — দাম ১২·০০

স্টপার — দাম ১২·০০

কোনি — দাম ৮·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

মান্ধাতার টোপ ও ঘনাদা — দাম ১০·০০

ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস — দাম ৩৫·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল — দাম ১২·০০

কলকাতার জঙ্গলে — দাম ১০·০০

মিশর রহস্য — দাম ১২·০০

শেখর বসুর

বারোটি কিশোর ক্লাসিক — দাম ২০·০০

সাত বিলিতি হেরে গেল — দাম ৮·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ৩১-৪৩৫২
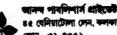
ক্রিকেট প্রেমিকদের হাতে-হাতে ফেরার বই

আনন্দবাজার পত্রিকা সংকলন

বাউন্ডারি ছাড়িয়ে

দাম ২০·০০

১৯৩৪ সালে প্রথম বসেছিল ইডেনে ক্রিকেট-আসর। তার পর থেকে পঞ্চাশ বছরে ইডেনে অনুষ্ঠিত যাবতীয় ক্রিকেট-টেস্টের খতিয়ান এই বইতে। সেই সঙ্গে, ১৯৬০ সাল থেকে বিভিন্ন টেস্ট ম্যাচের যে ধারাভাষ্য লিখেছিলেন পতৌদি, সুনীল গাওস্কর, আসিফ ইকবাল, ওয়াড়েকর, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বেরি সর্বাধিকারী, উমরিগর, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও মতি নন্দী প্রমুখ বাঘা-বাঘা খেলোয়াড়, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক—তাও এই বইতে মুদ্রিত। প্রতিটি টেস্টের স্কোরকার্ড, প্রতি দিনের স্কোর।

মতি নন্দীর

ক্রিকেট খেলতে, খেলাতে দেখতে, শুনতে অপরিহার্য সঙ্গী

ক্রিকেটের আইনকানুন

সাম্প্রতিকতম সংযোজনে সমৃদ্ধ দাম ১৫·০০

এবং

পাকিস্তান বনাম ভারতের টেস্ট-ক্রিকেটের (১৯৫২-৭৮) ফলাফল নিয়ে লেখা বই

খেলার যুদ্ধ

দাম ১২·০০

প্রকাশিত হয়েছে

বাণীব্রত চক্রবর্তীর

তিন-তিনটি রহস্যকাহিনী

সিংহবাহিনী রহস্য

দাম ১২·০০

একটি বই, তিন-তিনটি বিচিত্রস্বাদ রহস্যকাহিনী। 'সিংহবাহিনী রহস্য' আর 'রক্তাক্ত ওয়াটার্লু'র রহস্যভেদী এক ও অদ্বিতীয় সাত্যকি দত্ত। ইতিহাসের তরুণ শিক্ষক, বাংলা গোয়েন্দা-কাহিনীতে নতুন হলেও যোগ্য এক নাম।

পিতামহের পুরনো একটি ডায়েরি পড়ে আলোড়িত সাত্যকি দত্ত নেমে পড়ে রহস্য-উদ্ধারের কাজে। রহস্যের অতল থেকে উঠে আসে অতীতে। আসে ছবির মতো পুরনো কলকাতা, জাপানের কোনো বন্দর, আসে বর্তমান কলকাতা, আলিগড়, আর সেই অনুষঙ্গে অজস্র মানুষ। যে-সিংহবাহিনী মূর্তিতে আগ্রহী ছিলেন সাত্যকির পিতামহ, সেই মূর্তি নিয়েই এক শ্বাসরুদ্ধকর রহস্যের নতুন জটে জড়িয়ে পড়ে সাত্যকি।

সাত্যকির দ্বিতীয় কাহিনীটিও দারুণ। হেঁয়ালি-ভরা এক বিজ্ঞাপনের সূত্রে জমজমাট রহস্যকাহিনীর যবনিকা-উত্তোলন।

শেষ কাহিনীটিও বিষয়ে-স্বাদে অভিনব। ক্লাস এইট-এর কিংশুক কীভাবে শুনতে পেত জীবজন্তু, গাছপালা ও জলকল্লোলের ভাষা, কীভাবে তার মাস্টারমশাই তরুণ লেখক মাল্যবান উদ্ধার করল এই রহস্য, তাই নিয়ে এক তীব্র কৌতূহলকর ও চমকপ্রদ কাহিনী। প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী।

বিক্রমাব্দের সন্ধানে : লেখকের বক্তব্য

"দেশ" পত্রিকার গত ১ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত আমার নিবন্ধ "বিক্রমাব্দের সন্ধানে" সম্পর্কে ১২ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় মুদ্রিত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সমালোচনার উত্তরে এই চিঠির অবতারণা।
সমালোচকের মন্তব্য আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে নয়, ওতে ব্যবহৃত কয়েকটি নাম ও বানান সম্পর্কে।
সমালোচকের মতে বিখ্যাত অল্-বীরূনীর শুদ্ধ নাম "আবু রায়হান মুহম্মদ ইবন আহ্‌মদ আল-বিরুনি"। প্রাচীন খোরেজম্ রাজ্যের রাজধানী প্রাচীরবেষ্টিত উরগেঞ্জে প্রাচীরের "বাইরের" অঞ্চল (ফার্সী ভাষায় "বীরূন") থেকে যে সব লোক শহরে আসা-যাওয়া করতেন তাঁদের বলা হত স্থানীয় খোরেজমী ভাষায় "আবিজাক্" এবং ফার্সীতে "বীরূনী" অর্থাৎ "বহিরাগত"। এই সব লোক অধ্যুষিত শহরতলী গ্রামগুলির একটি ছিল কাস্ (এখন যার নাম হয়েছে "বীরূনী")। এই গ্রামে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে আহ্‌মদের পুত্র আবু (বা অবূ) রায়হান (বারাইহান) মুহম্মদের জন্ম। উরগেঞ্জের অধিবাসীদের কাছে তিনি ছিলেন এক "বীরূনী" বা "বহিরাগত"। তাঁর নামের সঙ্গে এই বিশেষণ যোগ করা হত ; এটা কিছুতেই তাঁর আসল বা মূল নামের অংশ নয়, যদিও তিনি "অল্-বীরূনী" বলেই সমধিক খ্যাত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও আরবী-বিশেষজ্ঞ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ যথার্থই লিখেছেন যে "লেখকের আসল নাম আবু রায়হান মুহম্মদ বিন আহ্‌মদ, জনসমাজে খ্যাত আল-বেরুনী নামে" (এই সম্পর্কে আঃ মঃ হবিবুল্লাহ, **আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব**, ঢাকা, ১৯৭৪, ভূমিকা ; Encyclopaedia of Islam, খণ্ড নং ২, নব সংস্করণ, লন্ডন ইত্যাদি, ১৯৫৮, পৃঃ ১২৩৬ ; F. Steingass, *A Comprehensive persian-English Dictionary*, লন্ডন, ১৯৬৩, পৃঃ ২১৯ ; ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। এখানে লক্ষণীয় যে জনাব হবিবুল্লাহ "ইবন" না লিখে "বিন" লিখেছেন। একইভাবে "বিন" ব্যবহার করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থের লন্ডন থেকে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এক বিখ্যাত সংস্করণে, যার সম্পাদক Edward C. Sachau (এডোয়ার্ড সি সাচাউ) (সমালোচক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কোন সাচাউ-এর নাম উল্লেখ করছি)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আলোচ্য নামটি লিখবার সময় সাধারণত "ইবন" নয়, "বিন" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও দুটিই সমার্থক। এখানে প্রচলিত শব্দ ব্যবহার না করার জন্য যদি কোনও ভ্রান্তি হয়ে থাকে তবে তা সমালোচকের, আমার নয়। এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, "অল্-বীরূনী" নামটি আরবী থেকে অন্য হরফে লেখার সময় বর্তমানকালে "আল-বীরূনী", "al-Bīrūnī", "আল-বেরুনী", "Alberuni" ইত্যাদি নানাভাবে লেখা হয়েছে।
কোনও নাম বা শব্দকে যে হরফে মূলত লেখা তার থেকে অন্য কোন হরফে লিখতে গেলে মূল লিপিতে ব্যবহৃত নাম বা শব্দটির বানান ও উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, যেমন আমরা করে থাকি বিশ্ব-বিশ্রুত Romain Rolland-এর নাম বাংলা হরফে লেখার সময়। Sachau-এর সংস্করণে অল্-বীরূনীর নাম সহ গ্রন্থের নাম যেভাবে ছাপা হয়েছে তার প্রথম শব্দটি নিশ্চয়ই "কিতাব্"। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সংস্করণটির সম্পূর্ণ নামের কথা মনে রেখে ওটি পড়তে গেলে আলোচ্য শব্দটির উচ্চারণ হতে পারে "কিতাবো" (এই সম্পর্কে F. Du Pre Thornton, *Elementary Arabic-A Grammar, R. A. Nicholson* সম্পাদিত, কেমব্রিজ, ১৯০৫, পৃঃ ১৭৭ দ্রষ্টব্য)। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-গ্রন্থাগারিক ও আরবী-বিশেষজ্ঞ জনাব আব্দুল খাল্লাক এই অভিমত পোষণ করেন। সমালোচক প্রয়োজন বোধ করলে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন।
"হিন্দি আন্" (বা "হিন্দিয়ান্") কথাটি Sachau সম্পাদিত সংস্করণের ৪৯ নং অধ্যায়ের আলোচিত অংশে আছে (এই সংস্করণের পৃঃ ২০৫ দ্রষ্টব্য)। এখানে মূল শব্দটি হচ্ছে "হিন্দি" যার অর্থ এক্ষেত্রে হবে হিন্দ্-এর অধিবাসী। "হিন্দু" নামটিও এক অর্থে এইভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সমালোচকের যথেষ্ট আরবী জ্ঞান থাকলে আলোচ্য অংশটি পড়ে দেখতে পারেন বা কোনও বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে পারেন।
এইবার আসি সমালোচনাটির সব থেকে বিস্ময়কর ও হাস্যকর অংশে। সমালোচক আমার একটি গ্রন্থের (*An Agrippan SourceA Study in Indo-Parthian History*এর) নামের সমালোচনা করে বলেছেন যে "পার্সিয়া" ও "পার্থিয়া" শব্দ দুটি নাকি একই নামের ইঙ্গিত করে এবং রোমক (Roman) হরফে লিখিত Parthia শব্দটির "শুদ্ধ উচ্চারণ পার্সিয়া"। প্রাচীন ইরাণ ও ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমভাগের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে যাঁদের সামান্য জ্ঞানও আছে, তাঁরা জানেন যে Persia ও Parthia মূলত দুটি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের নাম। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীর নৃপতি প্রথম দারয়বৌশ-এর (বা Darius-এর) কয়েকটি লেখতে "পার্স" ও "পর্থব" নাম দুটি যে দুটি ভূখণ্ড বুঝিয়েছে তার একটি অন্যটি থেকে পৃথক। এই সম্রাট নিজে ছিলেন "পার্স" দেশের লোক এবং তিনি যে সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন তার নানা অঞ্চলের মধ্যে একটি ছিল "পর্থব" (R. G. Kent, *Old Persian-Grammar, Texts, Lexicon*, দ্বিতীয় সংস্করণ, নিউ হ্যাভেন, ১৯৫৩, পৃঃ ১১৭, ১৩৬, ১৩৭, ইত্যাদি)। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার লেখকেরা প্রথম দেশটিকে Persia ও দ্বিতীয়টিকে Parthia নামে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এই দুটি দেশের অধিবাসীদের যথাক্রমে "পারসীক" ও "পহ্লব" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যদিও ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে পারস্যের রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে পর্থব বা Parthia অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তবু এর পৃথক সত্তা সম্পর্কে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। Parthia অঞ্চল, অর্সকীয় বংশের শাসনকালে সাম্রাজ্য হিসাবে Parthia-এর রাজনৈতিক সীমানার বিস্তার, Parthia-এর নামে পরিচিত ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে। এছাড়া *The Cambridge History of Iran*-এর তৃতীয় খণ্ডে সাধারণের জন্য সহজবোধ্য ভাষায় লেখা হয়েছে Parthian-দের ইতিহাস।
সমালোচক এইসব সাধারণ খবরও রাখেন না। তার উপরে আবার আমার বইটি না পড়ে এবং খুব সম্ভবত না দেখে তার নামের সমালোচনা করেছেন। কোনও বই না পড়ে তার সম্পর্কে মন্তব্য করা যে কোনও সৎ লেখকের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে আমার নিবন্ধে নামগত কোনও "গুরুতর ভ্রান্তি" নেই, যা খুঁজবার ব্যর্থ প্রয়াস করেছেন সমালোচক। অন্যদিকে "ইবন" ও "বিন" শব্দ দুটির মধ্যে যোগ্যতর শব্দটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর মতানুসারেই তিনি ভ্রান্ত।

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-২৯
[এ প্রসঙ্গে আর কোন চিঠি ছাপা হবে না]।

কলকাতায় ট্রাম

৫ সেপ্টেম্বরের 'দেশ' পত্রিকায় 'ট্রামের জন্য ভাবনা' শীর্ষক চিঠিপত্রে বিদ্যুৎ ভৌমিক যে চিঠিটি লিখেছিলেন সেই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি, কলকাতার রাস্তায় ট্রাম চলেছিল মোট দু তিনটি পর্বে। প্রথম পর্ব, ১৮৬৪ সালে। সেবার কলকাতায় এক প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি বিদেশী কোম্পানি ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালিয়েছিল সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে। কিন্তু ক্রমাগত লোকসান যাওয়ার ফলে সে পর্বে শীঘ্রই ইতি পড়েছিল। এই মর্মে নতুনতর উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ১৮৭২-৭৩ সালে এবং নিঃসন্দেহে এই দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ১৮৭৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। এক্ষেত্রে গৌতমবাবুই সঠিক। এই দ্বিতীয় পর্বের ট্রাম চলাচলের প্রতিবেদন তার পরের দিনের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় ফলাও করে বার হয়েছিল। এই পর্বে ট্রাম চালিয়েছিলেন (অবশ্যই ঘোড়ায় টানা) স্বয়ং সরকার বাহাদুর, রেল কোম্পানির সহায়তায়। এই পর্বের আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র ন মাস, সমাপ্তিকাল, ২০ নভেম্বর, ১৮৭৩। এর পর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আয়ু নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃতীয় পর্বের ট্রাম চলাচল শুরু হয় ১৮৮০ সালের ১লা নভেম্বর। সরকারিভাবে এই তারিখটিকেই কলকাতার ট্রামের সূচনাপর্ব বলে ধরা হয়। প্রমাণস্বরূপ ২৯ অক্টোবরের সম্পাদকীয়তে 'স্টেটসম্যান' লিখেছিল, 'The Tramway starts operation on the Ist, but how far it will prove successful remains to be seen.
কলকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রাম প্রথম চলেছিল ১৯০২ সালের ২৭ মার্চ। প্রমাণ আবারও 'স্টেটসম্যান' ২৮ মার্চের। সে লিখছে, 'The first regular service of electric tram cars commenced running yesterday on the Kidderpore section !' দ্বিতীয় বৈদ্যুতিক ট্রামপথটি চালু হয় ওই বছরেরই ১৪ জুন, কালীঘাটে। ১৯০৮ সালের মধ্যে কলকাতার সব জায়গায় বৈদ্যুতিক ট্রাম চলতে শুরু করে।

সুগত মিত্র
কলকাতা-৭০০০৮৯

বাঙালীর আশ্রয়

আপনাদের 'বাঙালীর আশ্রয়' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে শ্রীমতী রুবি সরকারের ১২ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত পত্র সম্পর্কে লিখছি। উক্ত সম্পাদকীয়তে এই শহর থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালী আদি বাসিন্দার উচ্ছেদ সম্পর্কে যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে তার প্রকৃত তাৎপর্য ও এর অন্যতম কারণ যে বাড়ীওলা-ভাড়াটিয়া সম্পর্কের তিক্ততা, এই সত্য শ্রীমতী সরকার উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি ভূমিহীন চাষী-জমিদার সম্পর্কের মত বাড়ীওলা-ভাড়াটিয়া সম্পর্ককেও ওই পর্যায়ে ফেলতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সরকারী-বেসরকারী অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, করণিক, ড্রাইভার, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, কিংবা অধ্যাপক বা ধনী ব্যবসায়ী—এই শহরে বাড়ীওলা অথবা ভাড়াটিয়া হিসাবে বসবাস করছেন। ওদের মূল পেশাটাই ওদের প্রকৃত শ্রেণী পরিচয়। এঁদের মধ্যে যাঁরা ধনী ও সুবিধাভোগী, তাদের মধ্যে বাড়ীওলাও আছেন, ভাড়াটিয়াও আছেন। কিন্তু কিছু স্বার্থসচেতন রাজনৈতিক নেতা সামন্ততন্ত্রের প্রতি মানুষের সহজাত বিদ্বেষকে বাড়ীওলার বিরুদ্ধে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করে আসছেন। আর অধিকাংশ ভাড়াটিয়ার মত শ্রীমতী সরকারও হয়েছেন ওই বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের শিকার। এর ফলে ওই দুই শ্রেণীর মধ্যে যে এক ধরনের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়েছে, তার পরিণাম যে উভয়ের পক্ষেই কত ভয়াবহ হতে পারে, সে বিষয়ে সচেতন হওয়ার সময় এসেছে। ৪০/৫০ বছর আগে হয়ত কোন বাড়ীওলা তাঁর উদ্বৃত্ত জায়গা ভাড়া দিয়ে নিজের কিছু আর্থিক সাশ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক শহরমুখী পরিবারের আশ্রয়ের প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন। ভাড়াটিয়া যতটা জায়গা নিয়ে থাকতেন, আর তার বিনিময়ে বাড়ীওলা যে ভাড়া পেতেন, তা তখনকার অর্থনীতি অনুসারে বাস্তবানুগ ছিল। এর পর শিক্ষাবিস্তার ও শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শহরমুখী প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। কিন্তু সেই অনুপাতে ক্রমশ ভাড়াবাড়ীর সংখ্যা না বেড়ে আনুপাতিক হারে কমে গেল। চাহিদা ও যোগানের সূত্র অনুসারে বর্তমানে বাড়ীভাড়া এই শহরে মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। কিন্তু ৪০/৫০ বছর আগে ভাড়া দেওয়া বাড়ীর ভাড়া কিন্তু বাড়েনি, অথবা বাড়লেও তা অতি সামান্যই। ভাড়াটিয়া নামমাত্র ভাড়ায় বসবাস করলেও, তিনিও সুখে নেই। বাড়ীওলা যেমন সামান্য ভাড়া থেকে বাড়ীর মেরামতি ব্যয়, ক্রমবর্ধমান পৌরকর মেটাতে অক্ষম হওয়ার মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন, ভাড়াটিয়াও জরাজীর্ণ বাড়ীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, জীবনের আশঙ্কা নিয়ে বাস করছেন। আর মামলা ? ও যেন ড্রাগের নেশা। এক বার ধরলে আর ছাড়া যায় না। শুধুই অর্থের অপচয়। এর মূলে রয়েছে ১৯৫৬ সালের পঃ বঙ্গ বাড়ীভাড়া আইন, যা ভাড়াটিয়ার স্বার্থ রক্ষা করছে বলে দাবী করা হয়। কেন এই আইনে কি প্রতি তিন বৎসর অন্তর মুদ্রামূল্যসূচকের ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধির বিনিময়ে ভাড়াটিয়ার জল, আলো ও বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের বাধ্যতামূলক সুবিধা, অথবা কিছু বিনিয়োগের বিনিময়ে বাড়ীর আধুনিকীকরণের সুবিধা বাড়ীওলার কাছ থেকে আদায় করা যেত না ? কারণ খাদ্য, পরিধেয় ও বিলাসদ্রব্যের ক্ষেত্রে যাঁরা বর্ধিত মূল্য দিয়েও ৪০/৫০ বছর ধরে ওই শহরে বাস করছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বাড়ীভাড়ার ক্ষেত্রেও ওই বর্ধিত ভাড়া দিতে অপারগ হতেন না। এই ধরনের আইন বলবৎ হলে ভাড়াটিয়াও আর আজীবন অন্যের বাড়ীতে কাটিয়ে দিতে চাইতেন না। সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে একটি বাড়ী তৈরী করে তার কিছুটা ভাড়া দিয়ে অবসর জীবনে একটা নিশ্চিন্ত আয় ও তারই সঙ্গে স্বগৃহে বাসের পরিতৃপ্তি উপভোগ করতেন। আর ভাড়াবাড়ীর সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে বাড়ীর ভাড়াও মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে থাকত। ভাড়াবাড়ীর স্বল্পতাজনিত যে কালোবাজারী, সেটাও বন্ধ হত। কিন্তু এখন কোন ভাড়াটিয়াই বাড়ী তৈরী করার ঝুঁকি আর নিতে চাইছেন না। কারণ তাঁরা জানেন যে ভাড়াটিয়ার ভাড়া বন্ধের কোন তাৎক্ষণিক প্রতিকার নেই। আর মামলা করলে তার নিস্পত্তি হতে বহু বছর কেটে যায়। অতএব প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুদ থেকে অবসরের পর নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি ও বাড়ীওলার সঙ্গে মামলা চালান ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। বাড়ীওলার 'মৌখিক প্রতিশ্রুতি' নয়, বর্তমান বাড়ীভাড়া আইনের জটিলতাই ভাড়াটিয়াদের বাড়ী তৈরী না করার মূল কারণ। পত্রলেখিকা পুরাতন ভাড়াটিয়াদের জন্য আজীবন ভাড়াটিয়াস্বত্ব চেয়েছেন। এর জন্য কি তিনি বর্তমান মুদ্রামূল্যসূচক অনুযায়ী বর্ধিত ভাড়া দিতে রাজী আছেন ? যদি তা না হয়, তিনি বুঝতে পারছেন না এই শহরে বসবাসেচ্ছু ভবিষ্যৎ ভাড়াটিয়া ও পুরাতন ভাড়াটিয়ার বংশধর, যার পরিবারবৃদ্ধির কারণে নূতন বাসস্থানের প্রয়োজন, তাদের কি সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। এর পর কি আর কেউ বাড়ীভাড়া দিয়ে নিজের আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করবে ? পত্রলেখিকা বাড়ীর মালিক হলে উনি নিজেও কি সেই ঝুঁকি নেবেন ? তখন এই যে দলে দলে মানুষ জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় আসছেন, তাঁরা থাকবেন কোথায়, গাছতলায় ?

তাই বলছি, ভাবাবেগে পরিচালিত না হয়ে, কত দুঃখে যে একজন বাড়ীওলা পিতৃপিতামহের স্মৃতিবহ বাড়ী অন্যের হাতে সমর্পণ করে শহরছাড়া হন সেটা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করুন। মান্ধাতার আমলের সামান্য ভাড়া, অর্থক্ষয়ী মামলা, পৌরকরের বোঝা, এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই একমাত্র কাম্য হয়ে দেখা দেয়। কয়েকটি দাবী বাড়ীওলা ও ভাড়াটিয়া যৌথভাবে সরকারের নিকট রাখতে পারেন। যেমন :

১। জমির বিক্রয়মূল্য মধ্যবিত্তের আয়ত্তের মধ্যে বেঁধে দেওয়া ও জমির কালোবাজারী রোধের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।
২। বাড়ী তৈরী ও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উদার গৃহনির্মাণ ঋণের ব্যবস্থা।
৩। নিজের বসবাসের জন্য অথবা পরিবারের বসবাসের জন্য ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে, গৃহনির্মাণের মালমশলার ক্রয়ের জন্য ভরতুকির ব্যবস্থা।
৪। বাড়ীভাড়া দেওয়ায় উৎসাহ দানের জন্য কো কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বাড়ীভাড়া আইনের সংশোধন।
৫। জাতীয় আবাসন নীতির রূপায়ণ।

এই দাবী সরকার মেনে নিলে মধ্যবিত্তের চাহিদা

অনুযায়ী বাড়ী সহজলভ্য হবে। তখন দেখা যাবে, কাল যিনি ভাড়াটিয়া ছিলেন, আজ তিনি একটি নূতন বাড়ীর মালিক। এতে ভাড়াটিয়া-বাড়ীওলা এই শ্রেণীসচেতনতাও হ্রাস পাবে। সম্প্রসারণশীল নগরসীমার মধ্যে বাস করবেন মধ্যবিত্ত মানুষেরাই।

সমীর ঘোষ

কলকাতা-২৯

‘বিচারের বাণী’

‘দেশ’ ১৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় সুখ্যাত প্রতিবেদক বিধান সিংহের ‘বিচারের বাণী’ প্রচ্ছদ নিবন্ধটি পড়লাম। অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি সমৃদ্ধ এই প্রতিবেদনে এই রাজ্যের অন্তঃসারশূন্য বিচার ব্যবস্থার একটি জীর্ণ প্রতিচ্ছবি সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। প্রতিবেদককে অভিনন্দিত করছি তাঁর সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। মামলা কেন জমে যাচ্ছে ক্রমাগত সে সম্বন্ধে অনেকেই নিজস্ব অভিমত পোষণ করেন। প্রতিবেদক কারণের খোঁজে আদালতের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন আর সংগ্রহ করেছেন বিস্তর তথ্য। তবুও বলি কিছু কারণ হয়তো-বা ওঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে যেগুলি প্রতিবেদিত হলে হয়তো স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'ত প্রতিবেদনটি। আর সেই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে পত্রলেখক জনসাধারণের কাছে কিছু তথ্যাদি পেশ করতে চায়।

যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামোর সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িত তাঁরা জানেন প্রশাসন যদি আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয় তবে মামলার স্তূপ কমানো অসম্ভব নয়। তবে সত্যি অথচ অপ্রিয় কথাটা বলে ফেলা ভাল। আদালতগুলিতে যদি বকেয়া মামলা না থাকে তাহলে অনেকেরই অসুবিধা হবে। আয় কমে যাবে। তাই প্রত্যক্ষে জনগণের অসুবিধায় দুঃখে অশ্রুপাত করলেও পরোক্ষে মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধিতে অনেকেই আনন্দিত হন। কেবল পশ্চিমবঙ্গেই বর্তমানে ষোল লক্ষ মামলা জমে আছে। তার মধ্যে ১৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ২৪১টিই নিম্ন আদালতে। কলকাতা হাইকোর্টে জমা মামলার সংখ্যা ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৭টি। এর মধ্যে রিট আবেদন আছে ৯২ হাজার। বাকি ৫০ হাজার বকেয়া মামলার মধ্যে আছে নিম্ন আদালত থেকে আসা উচ্ছেদ ও বিচ্ছেদের মামলা। নিম্ন আদালতে যত দেওয়ানি মামলা প্রতিবছর দায়ের করা হয় তার মধ্যে ৯০% হল উচ্ছেদ (বাড়িওয়ালা বনাম ভাড়াটিয়া) ও বিচ্ছেদ (স্বামী বনাম স্ত্রী) সংক্রান্ত মামলা।

প্রশ্ন করা যেতে পারে সত্তর ও আশির দশকে বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়া সম্পর্কিত মামলার সংখ্যা বাড়ল কেন? প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে West Bengal premises Tenancy Act/ 1956টি ভাল ভাবে পড়তে হবে। আর সব কিছু ভালভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় বাড়িওয়ালা/ভাড়াটিয়ার মধ্যে সম্পর্ক অবনতির জন্য দায়ী রাজ্য সরকারকৃত উপরোক্ত একপেশে আইনটি। আর নিম্ন আদালতে মামলার সংখ্যা বাড়ার পেছনে আছে ঐ একপেশে আইন যার ফলে কেবলমাত্র দেওয়ানি মামলার সংখ্যাই বাড়ছে না, বাড়ছে ফৌজদারী মামলার সংখ্যাও। রেন্ট কন্ট্রোলারের আদালতগুলি মামলার ভারে ন্যুব্জপ্রায়। ফয়সালার সংখ্যা শূন্য।

এরপর আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মুনসেফ কোর্টে বাড়িওয়ালা-ভাড়াটিয়া সংক্রান্ত মামলার কিছু আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করতে হলে যেতে হয় হাইকোর্টে। যেমন West Bengal Premises Tenancy Act-এর ১৭(২), ১৭(৩) ধারা উদ্ভূত ইনটারলকুটারী এপ্লিকেশনের উপর মুনসেফ যে আদেশ দেন তার বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা যায় একমাত্র হাইকোর্টে। এমন কি সিভিল প্রসিডিওর কোডের ১৫১ ধারা অনুযায়ী যে সব অ্যাপ্লিকেশনের শুনানী হয় মুনসেফ কোর্টে, তার বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করতে হলে যেতে হবে হাইকোর্টে। অথচ মুনসেফ কোর্টের ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করতে হয় জিলা আদালতে।

এরকম বৈষম্য হবে কেন? জজ কোর্টের বিচারকরা কেন মুনসেফ কোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আনীত আপীলের বিচার করতে পারবেন না? সামান্য অজুহাতে হাইকোর্টে যাবার সুযোগ করে দিচ্ছে কে? সে তো আমাদের দেশেরই আইন। জনগণের দায়ের করা মামলা যাতে বিলম্বিত হয়, ধান্দাবাজ মানুষরা যাতে যে কোনো অজুহাতে হাইকোর্টে যাবার সুযোগে মামলা চিরস্থায়ীভাবে ঝুলিয়ে রাখতে পারে, তারই জন্য ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে সিভিল প্রসিডিওর কোডে। মামলার সার বস্তু থাক বা নাই থাক বিচার বিলম্বিত করাই যেখানে মূল উদ্দেশ্য সেখানে বর্তমান আইন যথেষ্ট ফলপ্রসূ। সলুক সন্ধানীরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে চলেছেন। হাইকোর্টে একবার মামলা গেলে, বিচার পাওয়ার জন্য তীর্থের কাকের মত বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। বিস্তর টাকা খরচ না করলে যেমন মামলার শুনানীর দিন ঠিক করা যায় না সেখানে, তেমনি টাকা খরচ করে অন্তত এক যুগের জন্য বিচার বিলম্বিত করা সম্ভব। এসব নতুন নয়। যাঁরা হাইকোর্টের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা এসব বিষয়ে সম্যক অবগত। কিন্তু যে কোনো কারণেই হ'ক দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম বন্ধে প্রশাসনের আগ্রহ নেই। আর এসব কারণে হাইকোর্টে মামলা জমছে, পাহাড়-পর্বত তৈরি হচ্ছে। ভবিষ্যতে হবেও।

আইনের জটিলতা সরলীকরণের কথা প্রায়শই শোনা যায়। কিন্তু স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরও এদেশে অ্যাংলো স্যাক্সন পদ্ধতি চালু আছে। অথচ স্বাধীনতার পর কতগুলি Law Commission সৃষ্ট হল! কিন্তু জনসুবিধার্থে আইনের জটিলতা কতটুকু কমল! বিশিষ্ট আইনজীবীরা Law Commission-এর সঙ্গে যুক্ত। অনেক বিচারপতিও আছেন যাঁরা Law Commisssion-এর সদস্য। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত অনেক সিদ্ধান্ত ওঁরা কেন্দ্রের কাছে পেশ করতে পারেন যার ফলে আইনের মারপ্যাঁচই কমবে না, মামলার স্তূপও কমবে।

বিচার ত্বরান্বিত হক এইসব উক্তি হয়তো জনপ্রিয় অনেকেরই কাছে কিন্তু কিছু মানুষের কাছে যথেষ্ট অপ্রিয়ও। আর এরই জন্য মামলা মোকদ্দমা কমাবার কথা শোনা যায় মাঝে মাঝেই কিন্তু কাজের কাজ হয় না কিছুই। কথায় কথা বাড়ছে। যুক্তি তর্কের ঝড় উঠছে। কিন্তু জনসাধারণকে রিলিফ দেবে কে? বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? তাই বকেয়া মামলার স্তূপ বাড়তেই থাকবে। দাদুর আমলের মামলা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নাতি

চালাবে । আর দেশের আইনজীবীরা মাঝে মধ্যেই কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করবেন যথারীতি ।

সুবিমল মিত্র
কলকাতা-৬০

॥ ২ ॥

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হাইকোর্টে খোদাই করা আত্মজীবনী নামক প্রবন্ধে (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭, দেশ পৃঃ ৬৪ ৩য় কলামের ত্রয়োদশ লাইন) আছে জাস্টিস জন হাইড সুপ্রিম কোর্টে পুসনে (Puisne) জজ হিসাবে কর্মরত ছিলেন । Puisne য়ের উচ্চারণ 'পিউনি' হবে । পুসনে নয় । প্রধান বিচারপতি ছাড়া আর সব বিচারপতিকেই পিউনি জজ বলা হয় ।

আমিও হাইকোর্টেই ছিলাম । তদানীন্তন পিউনী জজ জাস্টিস লর্ড উইলিয়াম একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন । তিনি মাঝে মধ্যে 'স্টেটসম্যান'-এ লিখে বাঙালীর ইংরেজির কিছু কিছু সংশোধন করতেন । একবার দেখেছিলাম এই রকম একটি সংশোধনী । সাধারণত আমরা Rception কথাটার পূর্বে hearty বা 'cordial' বিশেষণ ব্যবহার করি । তিনি বললেন হবে warm reception এটাই appropriate. এই রকম আরও অনেক ছোট খাট ভুল তিনি শুধরে দিতেন । ইংরেজি ভাষা তো এখন অনাদৃত । ওর আর দাম কি ? দাম যে কতটা তা বাইরে গেলেই বোঝা যায় । অন্ধ্রে বা ম্যাড্রাসে তো দেখি ইংরেজিতেই কাজ সারা চলে । হিন্দি তারা বোঝেই না ।

সুধাংশুকুমার বসু
নিউ ব্যারাকপুর

বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে

১৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার "সমাজের মত আইনেরও রূপান্তর প্রয়োজন" শীর্ষকে যা প্রকাশিত হয়েছে সেই সম্পর্কেই এই চিঠি । মাননীয় বিচারপতির প্রতিটি অভিমত অত্যন্ত কালোপযোগী এবং গভীর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক । বর্তমানকালে বিচার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তা দূরীকরণের উপায় সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে ।

এই সূত্রে আমার দুই একটি বক্তব্য আছে । এক জায়গায় দেখা যাচ্ছে মাননীয় বিচারপতি বলছেন, "আমার পিতা ছিলেন সেটলমেন্ট অফিসার ।" এইখানে আপনাদের প্রতিবেদক নিশ্চয় লিখতে ভুল করেছেন । মাননীয় বিচারপতির পিতা রায়বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় এই লেখকের খুল্লতাত । তাঁকে শুধু সেটলমেন্ট অফিসার বললে খাটো করা হয় । তিনি ছিলেন ইংরাজ আমলের প্রথম ভারতীয় যিনি অবিভক্ত বাংলার ডাইরেকটর অব ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সার্ভেস পদটি স্বীয় কর্মক্ষমতায় অলঙ্কৃত করেছিলেন । তাঁর সুযোগ্য তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় বিখ্যাত চিকিৎসক ডঃ অরবিন্দবিহারী মুখোপাধ্যায়, এফ আর সি পি এবং কনিষ্ঠ মাননীয় বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখোপাধ্যায় ।

সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়
খড়দহ

নন্দকুমার প্রসঙ্গে

'দেশ' ১৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় কিশলয় ঠাকুর লিখিত "ফাঁসির মঞ্চ" নিবন্ধের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট । লেখককে ধন্যবাদ । ঐ নিবন্ধে কিছু তথ্যগত ত্রুটির উল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে করি । তা না হলে ঐতিহাসিক সত্য যাচাই হবে না । ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে এটা আমার কাছে কর্তব্য । মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল 'ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা এবং তাতে সাক্ষীর স্বাক্ষর জাল ছিল এই অভিযোগে তা কিন্তু নয় । প্রকৃত ঘটনাটি ছিল এইরকম : উৎকোচ গ্রহণে কুখ্যাত হেস্টিংসের কিছু কীর্তিকলাপ নন্দকুমার কাউন্সিলে প্রকাশ করলে এবং আরও কিছু কারণে অপদস্থ হেস্টিংস, নন্দকুমারের প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ হন এবং তাঁর প্রাণনাশে প্রবৃত্ত হন । সেই সুযোগ আসে জনৈক কমলউদ্দিন খাঁ জামিতা হিজলীর ইজারাদারের মাধ্যমে ।

কমলউদ্দিন নন্দকুমারের সাহায্যে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও আর্চডেকিন নামে কোন কর্মচারির বিরুদ্ধে জনৈক ফাউক নামিত বিশিষ্ট ইংরেজের মাধ্যমে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ কাউন্সিলে পাঠাতে চেয়েছিলেন । সেই সময় হেস্টিংস বিষয়টি জানতে পেরে কমলউদ্দিনকে বশীভূত করেন এবং নন্দকুমার, ফাউক ও নন্দকুমারের জামাতা রাধাচরণের নামে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ এই মর্মে দায়ের করেন যে, কমলউদ্দিন প্রকাশ করেছে যে—নন্দকুমার ও ফাউক তাঁর ও বারওয়েলের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের এক মিথ্যা আর্জি বলপূর্বক লিখিয়ে নিয়েছে ও মোহর করিয়ে নিয়েছে এবং ঐ গঙ্গাগোবিন্দের বিরুদ্ধে মামলা করবে না বলা সত্ত্বেও পূর্বে প্রদত্ত মিথ্যা আর্জি ঐ ব্যক্তিকে ফেরত দিচ্ছে না । সুপ্রিম কোর্ট এই অভিযোগ মূলে প্রাথমিক অনুসন্ধানের আদেশ দিলেও এই অভিযোগ তেমন গুরুত্ব পায়নি ।

হেস্টিংস এই অভিযোগ বিফল যাচ্ছে দেখে অন্য উপায় অবলম্বন করেন । সেই সুযোগ আসে মোহনপ্রসাদ নামিত হেস্টিংসের এক প্রিয়পাত্রের মাধ্যমে । মোহনপ্রসাদ জনৈক বুলাকীদাস শেঠ নামিত মহাজনের আমমোক্তার ছিলেন । নন্দকুমার কিছু মূল্যবান অলঙ্কার বিক্রয়ের জন্য বুলাকীদাসকে প্রদান করেন । মূল্য স্থির হয় ৪৮০২১ টাকা । কিন্তু সেই অলঙ্কার পরে বুলাকীদাসের বাটী থেক মীরকাসেমের সময় দেশে অরাজকতার আমলে লুঠ হয়ে যায় । তখন বুলাকী উক্ত অলঙ্কারের প্রকৃত মূল্য ও সুদ কোম্পানির নিকট থেকে তাঁর প্রাপ্য দুলক্ষেরও বেশী টাকা পেলে প্রদান করবেন এই মর্মে এক অঙ্গীকার পত্র নন্দকুমারকে লিখে দেন । এই অঙ্গীকারপত্রে বুলাকী মোহর করে দেন এবং মাতার রায় ও মহম্মদকমল নামে দুই ব্যক্তি নিজ নিজ মোহরাঙ্কিত করে এবং বুলাকীদাসের উকিল শীলাবৎ নিজ স্বাক্ষর প্রদানে সাক্ষী থাকেন ।

বুলাকীর মৃত্যুর পর কোম্পানির নিকট তাঁর প্রাপ্য টাকা থেকে নন্দকুমার সেই অঙ্গীকারপত্র বলে বুলাকীর একজিকিউটর পদ্মমোহন দাসের সম্মতিতে তাঁর প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করে নেন। মোহনপ্রসাদ সবই জানতেন। বুলাকীর মৃত্যুতে তাঁর বিধবা পত্নী এবং গঙ্গাবিষ্ণু নামে অপর এক আত্মীয় বুলাকীর সম্পত্তির মালিক হন। মোহনপ্রসাদ তখন তাদেরও আমমোক্তার। ইত্যবসরে ঐ অঙ্গীকারপত্রের সব সাক্ষীর মৃত্যু হয়। হেস্টিংসের ইচ্ছাক্রমে গঙ্গাবিষ্ণু কর্তৃক বুলাকীদাসের হিসাবপত্র সংক্রান্ত এক দেওয়ানি মামলা এবং ঐ অঙ্গিকারপত্র জাল এই অভিযোগে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক ফৌজদারী মামলা উত্থাপিত হয়। বিচারে এই রকম প্রমাণের চেষ্টা করা হয় যে, শীলাবতের মৃত্যু হয়েছে ঠিকই কিন্তু মাতাব রায় বলে কেউ ছিলেন না এবং মহম্মদ কমল কমলউদ্দিন খাঁ ব্যতীত আর কেউ নয়। ঐ অঙ্গীকারপত্রের সব সই জাল এবং মোহরাঙ্কনও জাল। বিচার শেষ পর্যন্ত প্রহসনে পর্যবসিত হয়। সবই ষড়যন্ত্রমূলক। প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পের ইচ্ছায় নন্দকুমার দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

তৎকালে জালিয়াতি ব্রিটিশ আইনে প্রাণদণ্ড যোগ্য অপরাধ ছিল। অথচ এতদ্দেশীয় আইনে ঐ অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধান ছিল না। ইতিপূর্বে ব্রিটিশ আইনবলে দু-দুবার জালিয়াতিতে প্রাণদণ্ডাজ্ঞার আদেশ রহিত হলেও মহারাজ নন্দকুমারকে ইচ্ছাপূর্বক রেহাই দেওয়া হয়নি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগের মামলার বিচারের দিন আরও পরে ধার্য ছিল। ওই মামলায় হেস্টিংসের বিরুদ্ধে কোনও আসামীর দোষ প্রমাণ হয়নি। কিন্তু বারওয়েলের বিরুদ্ধে নন্দকুমার ও ফাউক দোষী ও রাধাচরণ নির্দোষ সাব্যস্ত হন। কিন্তু সেতো অনেক পরের কথা।

নন্দকুমারের কাহিনী শেষ করে লেখক বলেছেন : এরও ১১ বছর আগে সিপাহী বিদ্রোহের নায়কদের ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা এক শতাব্দীর পর।

ইন্দুভূষণ মিশ্র

বক্সীবাজার, মেদিনীপুর

বাঙালীর মুখে বাংলা

রত্নেশ্বর ভট্টাচার্যের "ঘরে বাইরে আক্রমণ : বাংলা ভাষা" (দেশ, ১২ই সেপ্টেম্বর) প্রবন্ধে বাংলা ভাষার অধোগতির সবিস্তার আলোচনা মাতৃভাষার প্রতি বাঙালীর সচেতনতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে বলে মনে করি। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে ঐ অধোগতির একটা বড় কারণ, যার জন্য আমরা বাংলাভাষীরাই পুরোপুরি দায়ী, সে সম্বন্ধে কোন আলোকপাত করা হয়নি। আমরা পথে-ঘাটে, কর্মক্ষেত্রে অবাঙালী মাত্রেরই সঙ্গে অহেতুক ভুল হিন্দীতে কথাবার্তা বলে থাকি; যদিও তাঁদের অধিকাংশই বহুদিন পশ্চিমবঙ্গে থাকার সুবাদে বাংলাভাষা ভাল বুঝতে ত পারেনই, অনেকটা বলতেও পারেন। এই হিন্দী বলার পিছনে বাঙালীর অবচেতন মনে এক ধরনের হীনমন্যতাবোধ কাজ করে বলে মনে হয়। প্রাক-স্বাধীনতা কালের ইংরাজীর মত আমরা এখন হিন্দীকে রাজভাষার (রাষ্ট্রভাষা নয়) 'মর্যাদা' দিয়ে বসে আছি এবং সে কারণে বাংলায় কথা বলতে লজ্জা এবং সংকোচ বোধ করি।

আসামে বাঙালী, বিহারী, রাজস্থানী সবাই অসমীয়াদের সঙ্গে অসমীয়া ভাষাতেই কথা বলে থাকে, এটা সম্ভব হয়েছে যেহেতু অসমীয়ারা কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কথা বলে না। ফলতঃ এমন হয়েছে যে পথে-ঘাটে এবং কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরাও পরস্পর এবং নিজেদের মধ্যে অসমীয়াতেই কথাবার্তা বলে থাকে। অসমীয়ারা অন্যদেরকে অসমীয়া ভাষায় কথা বলতে বাধ্য করেনি, কিন্তু যেহেতু নিজেরা অসমীয়া ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলে না, সেহেতু অন্য ভাষাভাষীরা নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদেই অসমীয়া রপ্ত করতে বাধ্য হয়েছে। এটা অসমীয়াদের উগ্র ভাষাপ্রেমের নিদর্শন মনে হতে পারে, কিন্তু বিনা বলপ্রয়োগে এবং কারো ক্ষতি না করে নিজেদের মাতৃভাষাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করাকে কোনভাবেই দোষাবহ বলা যাবে না, এবং তাতে জাতীয় সংহতিও বিপন্ন হচ্ছে না।

ওড়িষা অধিবাসীরাও (পুরীর পাণ্ডারা ছাড়া) বাইরের লোকের সঙ্গে ওড়িয়া ভাষাতেই কথা বলে থাকে। উত্তরপ্রদেশে ইংরাজী শুনলে উক্ত প্রদেশবাসী মারমুখী মূর্তি ধরে, আবার তামিলনাড়ুতে হিন্দী বললে তারা নিরুত্তরে ঘৃণার চোখে তাকায়। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অবাঙালীই বাংলা বুঝতে ও বলতে পারেন। সে অবস্থায় তাঁদের সঙ্গে বাংলায় না বলে হিন্দীতে কথা বলে আমাদের হীনমন্যতা প্রকাশ করছি। বাংলাভাষাকে যদি আমরা সত্যিই মর্যাদার আসনে বসাতে চাই, তবে শুধু স্কুল, কলেজ অফিসেই নয়, বাংলাভাষা হওয়া উচিত আমাদের সর্বক্ষণের সর্ব কাজের ভাষা।

অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

কলকাতা-৩৮

নাট্য সমালোচনার সমালোচনা

৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭, তারিখে প্রকাশিত দেবাশিস দাশগুপ্তের প্রত্যুত্তর পড়ে চমৎকৃত হয়েছি। একটি রুশ নাটকের ইংরেজী অনুবাদের বাংলা রূপান্তরকে "মূল নাটক" বলার মত স্পর্ধা আমার নেই। অবশ্যই আমি "পাখি" পড়ি নি। কিন্তু, যেহেতু রূপান্তর মাত্রই পরগাছা, দ সিগাল-কে না জেনে পাখির গুণাগুণ বিচার কিভাবে সম্ভব বুঝতে পারছি না। আর "মূল" শব্দটির এই বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা দেবাশিসবাবুর নাট্যসমালোচনায় ছিল না কেন? বোধহয় দেবাশিসবাবু ধরে নিয়েছেন "দেশে"-এর পাঠককুল তাঁর বন্ধু রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রবর্তিত "original adaptation" তত্ত্বে বিশ্বাসী। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে ২৩ বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ সংকলনে রুদ্রবাবু লিখেছিলেন : "The earliest original drama in Modern Bengali ('Kirtibilas', G. C. Gupta, modelled after Hamlet) was written in 1852"।

আমার দেওয়া উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায় অশ্বারূঢ়া নিনাকে মঞ্চে প্রবেশ করানোর কোন অভিপ্রায় শেখভের ছিল না। পুরো দ সিগাল নাটকটি পড়লে আরও জানা যাবে এর বিষয়বস্তুর পক্ষে "প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে" দর্শককে "মেয়েটির গোত্রান্তর" বোঝানো একেবারেই অনাবশ্যক। অর্থাৎ "নিনা বা নমিতাকে একটি সাইকেল নিয়ে" মঞ্চে ঢুকিয়ে অজিতেশবাবু মোটেই সুবিবেচনার পরিচয় দেননি, বরং অনুবাদকের স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছেন। "এদেশের মাটিতে বিদেশের ফুল ফোটাতে" তিনি ব্যর্থ। সম্ভবতঃ এই কারণেই চেনামুখের নির্দেশক সাইকেলটি বাদ দিয়েছেন। তাছাড়া "horse" সমেত ইংরেজী বাক্যটির হুবহু বাংলা তর্জমায় এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হত ? আমি আক্ষরিক বাংলা অনুবাদে জেনে, সার্ত্র, ইওনেসকো, ব্র্যেশনার এবং ব্রেশটের নাটক প্রযোজনা দেখেছি। কই কখনও ত নিজেকে দেবতার আশিস থেকে বঞ্চিত হতভাগ্য মনে হয়নি ?

আমার শেষ প্রশ্নে আসি। যদি দেবাশিসবাবু পাখিকেই "মূল" মনে করেন, শেখভ বা স্তানিস্লাভস্কির প্রসঙ্গ টেনে এনেছিলেন কেন ? এই দুই বিদেশীর সঙ্গে ত অজিতেশবাবুর নাটকের কোন সম্পর্ক নেই।

ধরণী ঘোষ
কলকাতা ৩৩

প্রতিবেদকের স্বীকারোক্তি

১। রূপান্তর প্রসঙ্গেই আমি 'মূল নাটক' বলেছি। রূপান্তর শব্দটি আগে প্রয়োগ না করলে আমি রূপান্তরিত নাটক বলতাম। প্রতিটি শব্দের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই ধরণীর কোথাও সম্ভব নয়।

২। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের বন্ধু আমি ঠিকই, তবে রুদ্রের প্রসাদ আমি বেশী পাইনি, ফলে দারুণ দীপ্তি সহ্য হয় না।

৩। আবারও জোর দিয়ে বলছি, বাংলা নাটকে রূপান্তরের ক্ষেত্রে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্য উদাহরণ।

৪। বিদেশী নাটকের সঙ্গে যদি অজিতেশবাবুর সম্পর্ক না ঘোষিত হত, তবে তাঁকে এই ধরণীর অনেকেই অপবাদ দিতেন (যা এদেশে প্রায়শই হয়ে থাকে।)।

৫। ধরণীবাবু জানিয়েছেন, আক্ষরিক বাংলা অনুবাদে তিনি বিদেশী নাটক দেখেছেন। সেগুলি রূপান্তরিত নয়, ভাষান্তরিত নাটক। তাঁর অভিযোগ, 'কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত ?' এটাই রূপান্তরের মজা। তিনি বলেছেন 'মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত'—ইংরেজী নাটকের অনুবাদে 'বাইবেল' অশুদ্ধ হয়ে যেত নয়।

৬। এ কথা সত্যি মঞ্চের আত্মীয় না হয়ে শুধু শুষ্ক পাণ্ডিত্য নিয়ে এদেশের নাট্যসমালোচনায় অনেক ঘূর্ণীপাকের সৃষ্টি হয়েছে। এটাই নাট্যদেবতার অভিশাপ।

৭। আশা করব, সমালোচনা বুঝবার জন্য যেন পাশে বোধিনী না রাখতে হয়। কারণ পাণ্ডিত্যের কুয়াশা অনেক বৈতরণী পার হওয়ার শিওর সাকসেস।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

গোবিন্দরামের দুর্গাপূজা

রাধাপ্রসাদ গুপ্তের 'গোবিন্দরামের দুর্গাপূজা' (দেশ, ২৬ সেপ্টেম্বর, ৮৭) অতিশয় আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছি। নিবন্ধটিতে অনেক কিছু জ্ঞাতব্য তথ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। সুলিখিত নিবন্ধের একস্থলে (পৃঃ ৫৪) লেখক লিখেছেন "আমরা সবাই জানি শারদীয়া পূজাকে অকাল বোধন বলা হয়, যার সঙ্গে রামের নাম চিরকালের জন্য যুক্ত হয়ে আছে।" অকালবোধন সম্পর্কে লেখক একটা তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন কিন্তু রামায়ণের রামচন্দ্রের সঙ্গে এই অকাল বোধনের সংযুক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেননি। রামচন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত এই অকালবোধনের প্রবাদটি সম্বন্ধে কিছু আলোকসম্পাত প্রত্যাশিত ছিল। এই পত্র এ সম্বন্ধে দু-একটি কথা উপস্থিত করার প্রয়াস মাত্র।

শরৎকালে দুর্গোৎসব ও নরবলি সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রাচীন সংবাদের সন্ধান মেলে। Shaman Hwulili প্রণীত Life of Hiuen Tsiang (Trans Beal) গ্রন্থে দেখা যায় অযোধ্যাতে শরৎকালে দেবী দুর্গার পদতলে ডাকাতরা একটি সুন্দর কিশোরকে বলি দিয়ে পূজা দিত। আবার কথাসরিৎসাগর (একাদশ শতক) দেবী দুর্গার পদমূলে শরৎকালে অজস্র বলিদানের বিবরণ আছে। কিন্তু রামচন্দ্র প্রসঙ্গ নেই।

রামচন্দ্র অকালে অর্থাৎ শরৎকালে দুর্গাপূজা করে রাবণ বধে সমর্থ হয়েছিলেন বঙ্গদেশে এমনতর একটি মতবাদ প্রচলিত আছে। শারদীয় দুর্গোৎসব তারই স্মৃতি। মূল রামায়ণে এই শক্তিপূজা সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ নেই। মূল রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দেখি রণক্লান্ত রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অগস্ত্য ঋষির উপদেশ মত আদিত্য হৃদয় স্তব পাঠ করে সূর্যের উপাসনা করেন এবং রাবণ বধে সমর্থ হন। দেবী মাহাত্ম্যে রাজা সুরথ ও বৈশ্যসমিধ জগন্মাতার দর্শন কামনায় দেবীসূক্ত পাঠ করে দেবীর অর্চনা করেন। সুরথ রাজাও শরৎকালে পূজা করেননি। তখন বসন্তকাল। সেজন্য বাসন্তীপূজার প্রবর্তন। রাবণ বধের জন্য অকালে দুর্গাপূজার কাহিনী বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু শরৎকালে রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়নি। শরৎ ঋতু যুদ্ধকালও নয়। হেমন্ত ও বসন্ত যুদ্ধ উদ্যমের কাল। বাঙলার এই অকালবোধনের উৎস কৃত্তিবাসী রামায়ণ। কৃত্তিবাস পঞ্চদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দের লোক। কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে এই অকালবোধনের সঙ্গে রামচন্দ্রকে যুক্ত করেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কৃত্তিবাস কোন উৎস থেকে এ কাহিনী আহরণ করেন। মনেহয় 'কালিকা পুরাণ' এ কাহিনীর উৎস। 'কালিকা পুরাণ' কৃত্তিবাসের পূর্ববর্তী। বঙ্গদেশ ও আসাম অঞ্চলে 'কালিকা পুরাণ' রচিত হয়েছে পণ্ডিত মহলে এই রকম ধারণা প্রচলিত আছে। 'কালিকা পুরাণ'-এ শরৎকালে দুর্গোৎসবের বৃত্তান্ত আছে। অনুমান করা যেতে পারে কৃত্তিবাস এই অকালবোধন আখ্যান 'কালিকা পুরাণ' হতে আহরণ করেছিলেন। স্বভাবতই মনে হয় শরৎকালে রামচন্দ্রের অকাল দুর্গোৎসবের মূল উৎস 'কালিকা পুরাণ'। অষ্টম খ্রীষ্ট শতাব্দ হতে একাদশ খ্রীষ্ট শতাব্দের কোনো সময় 'কালিকা পুরান' রচিত হয়ে থাকবে।

অন্যত্র লেখক এই নিবন্ধে (পৃ ৫৫) মহিষাসুর মর্দিনীরূপিণী কতিপয় প্রাচীন ভাস্কর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীনতম মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিটির কথা উল্লেখ করেননি। এই দুর্গামূর্তিটির সন্ধান মিলেছে রাজস্থানের টঙ্ক জেলার উনিয়াড়ার নিকটবর্তী 'নাগর' নামক স্থানে। মূর্তিটি এখন অম্বর মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। বিশেষজ্ঞগণের মতে মূর্তিটি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের।

অংশুমান দত্ত
বালিটিকুরী, হাওড়া

অনুবাদ গল্প

৮ আগস্ট 'দেশ'-এ সি ভি শ্রীরামণএর 'কলমের গাছ' আমরা পড়লাম। অনুবাদ প্রকাশ করার জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমরা প্রায় ৪৫ বছর ধরে 'দেশ' পড়ছি ও রাখছি। কিন্তু সমস্ত শরীর ও মনে নাড়া দেওয়ার মত 'ছোট' গল্প আগে পড়েছি বলে মনে পড়ে না। অবশ্য আমাদের যথেষ্ট বয়স হয়েছে—তাই হয়ত ভুলে গেছি। মিঃ শ্রীরামন-এর প্রতি জানাই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

দীপা ভট্টাচার্য
রাঁচি-১

ছোট পরিবার কি সুখী পরিবার !

এক সময় আমরা বাস করতুম কল্পনার পৃথিবীতে। আকাশে উড়ব পাখির স্বাধীনতায়, এলো বিমান। সাগরের অতলে দেবো ডুব-সাঁতার। পেলাম ডুবোজাহাজ। চাঁদে যাবো এলো রকেট। আকাশে বিদ্যুতের ক্ষণ ঝিলিককে ধরে রাখব আমাদের গৃহকোণে স্বনিয়ন্ত্রণে, পেয়ে গেলাম বিদ্যুৎ। এমনি করে পেতে পেতে তৈরি হল কম্পিউটার, রোবট। শিক্ষিত, উন্নত মানুষকে আর কিছু মনে রাখতে হয় না। কম্পিউটারের মেমারিতে সব ঠাসা থাকে। কল্পনার যুগ হয়তো শেষ হয়নি। কাঠের চুল্লি থেকে পারমাণবিক চুল্লিতে এসেও কল্পনার মৃত্যু হয়নি যদিও মানুষ মারার বিরাট কল এখন যুদ্ধবাজদের হাতে।

কল্পনার যুগ হয়তো শেষ হয়ে আসছে। মানুষ মোটামুটি সবই পেয়েছে। এখন ভোগে আর সমপরিমাণ দুর্ভোগে পৃথিবী জরে আছে। শুরু হয়েছে পরিকল্পনার যুগ। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির পাশাপাশি চলেছে অর্থনীতির ছড়ি ঘোরানো ; যার মূল কথা হল, এই সবুজ গ্রহে মানুষকে আর যথেচ্ছ প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে না। বহু মুখ মানে অযথা দারিদ্র্য। জিভ দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি, এই নিয়তিবাদ আধুনিক দুনিয়ায় অচল। আধুনিক বিজ্ঞান মৃত্যুকে বিলম্বিত করতে শিখেছে। জন্মকেও সেই কারণে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। একসময় প্রকৃতি হনন করে পৃথিবীতে জীবনের সমতা আনত। মারি আর মহামারিতে জনপদ শূন্য হয়ে যেত। যুদ্ধ বিগ্রহে প্রয়োজন হত শয়ে শয়ে মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে যুদ্ধের আশঙ্কাও থমকে গেছে। গোটা দুনিয়াটাকে উড়িয়ে দেবার বিধ্বংসী ক্ষমতা হাতে নিয়ে বৃহৎ শক্তি রাজনীতির খেলা খেলছেন। মানুষ এখন আর ঈশ্বরের প্রজা নয়। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধির প্রজা। তাঁরা আহার যোগাবার ব্যবস্থা করলে আমাদের সন্তানাদি দুধে-ভাতে থাকবে। জীবিকা ছিনিয়ে নিলে ভিক্ষাপাত্র সম্বল হবে। ভূ-ভাগের কতটুকু কার দখলে থাকবে, তার সমাধান হবে অর্থের হিসাবে। দুনিয়ার জিম্মাদারী কেমন করে যে কিছু মানুষের দখলে চলে গেল, সে এক জটিল ইতিহাস। তরোয়ালের যুগ থেকে স্টেনগানের যুগ, সেই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি—যেটি এক প্রবাদের মতো—জোর যার মুল্লুক তার। শেষে মানুষেরই তৈরি আইনে, ভূমি হয়ে দাঁড়াল এক টুকরো কাগজ, যার নাম দলিল, পরচা। সেই কাগজেরই হাত বদলে, কেউ মালিক, কেউ ফকির। অর্থনীতিবিদ্‌গণ জনস্ফীতির আশঙ্কায় আতঙ্কিত হবার আগেই, মানুষ তার পরিবার ভাঙতে শিখেছে, বাঁধতে শিখেছে। নিজেদের সুবিধা অসুবিধা আর স্বার্থের সংঘাতে বড় পরিবার, বৃহৎ পরিবার ছোট হয়েছে, টুকরো হয়েছে। একান্নবর্তী পরিবারে হাঁড়ি আলাদা হয়েছে, চকমেলানো বিশাল বাড়িতে পাঁচিল উঠেছে। ভাইয়ে ভাইয়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়েছে। আইনজীবীদের পসার বেড়েছে। মধ্যবিত্তের জীবনধারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। জন্ম নিয়েছে আর একটি প্রবাদ, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। বৃত্তিজীবী মানুষের জগতে বাহুবলের মূল্য আছে। কৃষিতে বিজ্ঞান আসার আগে কৃষক পরিবারে নতুন জীবনের আগমন ছিল আশীর্বাদের মতো। যত জোড়া হাত তত জোড়া লাঙল। কলমজীবী মধ্যবিত্তের সংসারে যত হাত তত কলম নয়। একজনের উপার্জনে দশজনের বসে খাওয়ার যুগ শেষ হয়ে গেছে সেই ইংরেজ আমলের শেষপাদেই। দেশ ভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গে শুধু দেশটাই টুকরো টুকরো হল না যৌথ-পরিবারের ছিটে-ফোঁটা যা অবশিষ্ট ছিল তাও ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। 'যে যার সে তার' নীতিই এখন অনুসৃত। ইওরোপের ঢঙে জীবনযাত্রাপদ্ধতি নির্বাচিত হয়েছে। সমস্যা অনেক, জীবিকার সমস্যা, বাসস্থানের সমস্যা। শিক্ষার সমস্যা, মানুষে মানুষে সম্পর্কের সমস্যা।

যৌথ-পরিবার মানুষকে যে উদারতা শেখায় একক পরিবারে সে শিক্ষার সুযোগ নেই। একক পরিবার স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিসুখের আদর্শই সেখানে বড়। আমি বাঁচবো, আমি ভোগ করবো, আমি কম মেহনতে সুখে থাকবো আর সুখে থাকবে আমার ছোট্ট নিয়ন্ত্রিত পরিবার। চালু হয়েছে নতুন স্লোগান—ছোট পরিবার সুখী পরিবার। রাজ্যের স্বার্থে, ব্যক্তির স্বার্থে এই নীতির হয়তো প্রয়োজন আছে ; কিন্তু কখনই বলা হল না, ভালবাসার সংসার, নিরাপত্তার সংসারই হল সুখের। যৌথ-পরিবারে যে নিরাপত্তা ছিল মানুষের একক পরিবারে তা নেই। যৌথ-পরিবারে মানুষ নিজেকে কখনই নিঃসঙ্গ মনে করত না। শিশুরা ভালোবাসায়, ভালবেসে বড় হবার সুযোগ পেত। উদার, নিঃস্বার্থপর হবার শিক্ষা পেত। একসঙ্গে মানিয়ে চলার অভ্যাস হত। আধুনিক কাল মানুষকে লোভী থেকে আরও লোভী, ভোগী থেকে আরও ভোগী করেছে। অন্যদিকে ক্ষমতার অর্থনৈতিক সীমা বেঁধে দিয়েছে বাঁধা মাস মাহিনায়। ফলে সন্দিহান ছোট পরিবার ক্রমশই আরও সঙ্কীর্ণমনা হয়ে পড়ছে। আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। ইওরোপ আমেরিকার মতো কালে একটি মানুষ একটি পরিবার হয়ে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমেরিকায় বিবাহ প্রথা, সংসার গড়ার প্রথা কালে হয়তো উঠেই যাবে। এদেশেও সেই সম্ভাবনা প্রবল ; কারণ স্বামী, স্ত্রী, একটি কি দুটি সন্তানের সংসারেও বোঝাপড়ার প্রয়োজন। ত্যাগের প্রয়োজন। বোঝাপড়ার প্রয়োজন নিজেদের সঙ্গেও।

জাতীয় সঙ্গীতে জাতীয় সংহতি

ভবতোষ দত্ত

স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরে আজও ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে বিতর্ক শেষ হয়নি। এই সেদিনও দক্ষিণ ভারতে জনগণমন নিয়ে আপত্তি শোনা গেল। সে-বিতর্ক ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয় পর্যন্ত গড়িয়েছে। কেউ আপত্তি করেছেন, এ গান ঠিক দেশভক্তির গান নয়, ভগবদ্ভক্তির গান। সুতরাং নতুন গান তৈরি হওয়া দরকার যে গান সত্যি জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে পারবে। এই বিতর্কের সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ হিন্দি বা উর্দু ভাষায় লেখা জাতীয় সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তায় কথা বলছেন। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে সব সংশয়ের নিরসন যে এখনও ঘটেনি, ভারতীয় হিসাবে সেটা আমাদের নিয়তি। যে-দেশে এত অজস্র বৈচিত্র্য সে দেশের চিন্তার ধারাকে একটি খাতে বইয়ে দেওয়া শক্ত। অবশ্য দেশ বা জাতি সম্পর্কে তো কোনো সংশয় থাকবার কথা নয়। এ দেশ আমার বা আমি ভারতীয়—এই বোধ ভারতবর্ষ নামক ভূখণ্ডের যে-কোনো প্রান্তেরই মানুষের বোধ হওয়া উচিত। কিন্তু আজ চারিদিকে তাকালে অবস্থা যেন অত সহজ মনে হয় না। শকহুন পাঠান মোগল হিন্দু মুসলমান দ্রাবিড় আর্য কিরাত শবর—সবাইকে নিয়ে যে জাতি তার ইতিহাস অন্য দেশের মতো নয়। সে-কথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বলে গিয়েছেন এবং তাঁর গান 'জনগণমন'-এ তার স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে।

জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে বলতে গেলে স্বভাবতই জাতির ধারণাটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। কারণ জাতীয় সঙ্গীত কোনো সম্প্রদায় অর্থে জাতির গান নয়, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ, হিন্দু বা মুসলমানের গান নয়। জাতি সম্বন্ধে আমাদের এই পূর্বতন ধারণা থেকে উত্তীর্ণ হতে বহু সময় লেগেছে। এখনও আমরা উত্তীর্ণ হতে পেরেছি কিনা সন্দেহ। একরাষ্ট্র-পরিচালিত সমমনোভাবাপন্ন একটি বৃহৎ মানবসমাজকে আমরা আজকাল বলি জাতি। এর দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যে সর্বত্র। প্রায় সব দেশেই এক জাতির ভাবা একটা; কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক ভাবা থাকলেও ভাষার পার্থক্যটা বড়ো না হয়ে সমমনোভাবটাই বড়ো হয়েছে। তাই তারাও জাতি। ভারতবর্ষে ভাষা অজস্র, ধর্মও বহু, আচার বিধিও অঞ্চলভেদে বহু। আমরা যখন বলি, উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত একটি অখণ্ড ঐক্য বিরাজমান, তখন কথাটা হয়তো এক অর্থে ঠিকই বলি, তবু মনে রাখা দরকার এর মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমানের ধর্মের মধ্যেও আচার বিধিতে পার্থক্য আছে। এমনি করে আরও অন্যান্য সম্প্রদায়ের পার্থক্যকেও দেখানো যেতে পারে। তবু ইতিহাসের নিয়তি আমাদের সবাইকে একসূত্রে গেঁথেছে। আজ বহু বৈচিত্র্য ও বর্ণভেদ সত্ত্বেও আমরা একজাতি। এই বৈচিত্র্যকে নিয়ে যে জাতীয় সঙ্গীত সেটাই আমাদের সঙ্গীত। এ কথাটা মনে রাখার দরকার এই জন্যই যে, সম্ভবত পৃথিবীর আর কোনো দেশের জাতীয় সঙ্গীতে বৈচিত্র্যকে স্বীকার করবার দরকার হয় না।

এই বৈচিত্র্যকে নিয়ে আত্মচেতনার অভিব্যক্তির একটি ইতিহাস আছে। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত তারই প্রবণতায় আত্মপ্রকাশ করেছে। আমাদের পূর্বতন সাহিত্যে বা শাস্ত্রে আজকের মতো রাষ্ট্রনির্ভর জাতিচেতনার কথা পাওয়া যায় না। এই জাতিচেতনার সূচনা হল উনবিংশ শতাব্দীতে। প্রথমে দেশচেতনা তারপরে জাতিচেতনা। যে-মাটিতে বা যে-কূলে জন্মেছি, তার প্রতি আকর্ষণ মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক। বাল্মীকি রামায়ণের বঙ্গীয় সংস্করণে একটি সুন্দর শ্লোক আছে—

> ন সে স্বর্ণময়ী লঙ্কা রোচতে তাত লক্ষ্মণ।
> জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী॥

এই সমতা রাজনৈতিক অর্থে দেশপ্রীতি নয়, জন্মভূমির প্রতি স্বাভাবিক ভালোবাসা। এর কোনো কারণ খোঁজবার দরকার হয় না। উনিশ শতকে এই দেশপ্রীতিই সাহিত্যে ও সঙ্গীতে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তার রূপ একটু অন্যরকমের হল। দেশ বলতে একটা বিশেষ ভৌগোলিক সীমায় সীমাবদ্ধ ভূমিকে বোঝানোর দরকার। ভারতবর্ষ এবং বঙ্গদেশ তখন আমাদের সাহিত্যে ও কবিতায় স্থান নিয়েছে। সাহিত্যে দেশচেতনার স্থান পাওয়ার তাৎপর্য গভীর। কারণ শাস্ত্রে বা পুরনো সাহিত্যে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ কোনো অখণ্ড দেশের কথা প্রচলিত ছিল না। বিষ্ণুপুরাণে জম্বুদ্বীপের প্রশস্তি আছে। কিন্তু আমার দেশ বলে কবি কখনো নির্দিষ্ট সীমাকে নির্দেশ করেননি। ভারত বা বঙ্গভূমিকে স্বদেশ বলে নির্দেশ করে গৌরব বোধ করার দৃষ্টান্ত নেই। আমাদের পুরনো বাংলা সাহিত্যে সে-রকম কিছু পাওয়া যায় না। উনিশ শতকে ডিরোজিওর ইংরেজি কবিতায় প্রথম পাওয়া গেল To India my native land. বাংলা ভাষাতে ভারতবর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায় ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়। তিনিই প্রথম ভারতভূমিকে 'জননী' বলে সম্বোধন করেছিলেন—

> জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
> ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে ?

—এটা ১৮৪৭ সালে লেখা কবিতা। তখন থেকেই ধরা যেতে পারে ভারতবর্ষ কবিদের চেতনায় জননীরূপে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। বাংলাদেশ এবং বাঙালির কথা স্বাভাবিকভাবেই নানা উপলক্ষে পূর্ববর্তী লেখকদের লেখা থেকেই পাওয়া যায়। বাংলা ভাষাই ছিল এই বাংলাদেশচেতনার কারণ। সেটা বোঝা যায়, কিন্তু ভারতভূমিকে মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করে নেবার কল্পনা কী ভাবে এসেছিল বলা যায় না। কয়েক বৎসর পর মধুসূদন লিখেছেন 'বঙ্গভূমির প্রতি' সেখানে বঙ্গভূমিকেই তিনি জননী স্বরূপা জ্ঞান করেছেন। আর তাঁর অন্তিম প্রার্থনা ছিল 'জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ ভারতরতনে' (১৮৬৫)। এখানে ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশ মিশে গেছে।

দেশচেতনার সঙ্গে ক্রমে অনুভূত হল জাতিচেতনা। জাতিচেতনার সৃষ্টি বিশেষ তাৎপর্যসহ ঐতিহাসিক ঘটনা। যে-বঙ্গ এবং ভারতকে কবিরা দেশ হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন, তার অধিবাসীরা সবাই একটি সমাজে বদ্ধ। সেই সমাজ সম্বন্ধে একটা সমগ্রতা ও অখণ্ডতা বোধেই জাতিধারণার উদ্ভব। আগে আমরা ছোট ছোট গণ্ডিতে বাস করেছি। দেশচেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ বা জাতির অনুভব দেখা দিতে লাগল। নানা ধর্ম আছে তাতে, নানা মত এবং নানা রূপ নিয়ে এই বৃহত্তর জাতিকে আমার ক্ষুদ্রতর জাতির উর্ধ্বে স্থান দেবার কর্তব্যবোধ আমাদের কাছে নতুন আদর্শ স্থাপন করেছে। এই জাতিভাবনাটিও নতুন। তখনও পর্যন্ত ভারতীয়রা একজাতি কিনা—এ বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ আরম্ভ হয়নি কিন্তু অগোচরেই যেন একজাতীয়তাবোধ জেগে উঠেছে। কয়েকবছর পর বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে জাতিচেতনার বিশ্লেষণ করে লিখেছিলেন 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধ (১৮৭৩)। তাতে ভারতীয়দের মধ্যে একজাতীয়তাবোধ গড়ে উঠবার বাধা কোথায়, তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। বিভিন্ন যুগে বহু জাতির মিশ্রণে ভারতীয় জাতির বর্তমান রূপ। তাই ভারতীয়দের মধ্যে এতো বৈচিত্র্য। রবীন্দ্রনাথ বলবার আগেই উনিশ শতকের মনীষীদের দৃষ্টিতে ভারতীয় ইতিহাসের এই দিকটি চোখে পড়েছিল। তবু ভারতীয়রা সবাই যে এতো বৈচিত্র্য নিয়েই এক জাতি এ কথাটিও তাঁরা অনুভব করেছেন।

বৈচিত্র্যময় ভারতীয় জাতীয়তার সঙ্গীত প্রথম শোনা গিয়েছিল ১৮৬৭

সালের হিন্দুমেলায় অনুষ্ঠানে। হিন্দুমেলার পরিকল্পনা এসেছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র। তাঁরা অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসুর দ্বারা। রাজনারায়ণ জাতীয় 'গৌরবেচ্ছাসঞ্চারিণী সভাস্থাপনের প্রস্তাব' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশের লোকের মধ্যে জাতীয়তার ভাব সঞ্চারিত করা। এই ভাবটি নিয়ে নবগোপাল মিত্র আরম্ভ করেন হিন্দুমেলা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল। দেশানুরাগ জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে জাতীয় শিল্প প্রদর্শনী, দেশীয় খেলাধুলা, ব্যায়াম, কবিতাপাঠ ইত্যাদির আয়োজন হয়। এই মেলার উদ্‌বোধন হত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'গাও ভারতের জয়' গানটি দিয়ে।

মিলে সবে ভারতসন্তান, একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান।
ফলবতী বসুমতী, স্রোতঃস্বতী পুণ্যবতী
শতখনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়
গাও ভারতের জয়।

অতঃপর এই গানে ভারতের অতীত গৌরবগাথা ও আদর্শ চরিত্রের উল্লেখের দ্বারা উদ্দীপনা সৃষ্টির প্রয়াসে জাতীয় সঙ্গীতের পূর্বাভাস রচিত হয়েছে। ১৮৭৫-এ হিন্দুমেলায় বালক রবীন্দ্রনাথ যে 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতাটি পড়েছিলেন এই গানে ছিল তারই পূর্বসূত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৯-এর চৈত্র সংখ্যার বঙ্গদর্শনে রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বইটির সমালোচনায় এই গানটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে বললেন—

'রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক। এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।'

তখনও পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম গানটি কল্পনায় আসেনি। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গানটির মধ্যে দেশমূর্তি দেখা দিয়েছে, সেইসঙ্গে দেখা দিয়েছে জাতীয় উদ্দীপনা—

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়
যতোধর্ম স্ততো জয়।
ছিন্নভিন্ন হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?

এর প্রায় দশ বৎসর আগে রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যে রাজপুত স্বাধীনতার গৌরব কল্পনা করে কবি লিখেছিলেন—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম গানে এই দুই গানের ভাবনির্যাস ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের এই গানটিতে আর একটি বিশেষত্ব ছিল যার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পর রচিত রবীন্দ্রনাথের জনগণমন গানটিতে। জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে গিয়ে কবি ভোলেননি ধর্মের জয়ের কথা। মনে রাখা ভালো, 'যতোধর্ম স্ততো জয়' এই মহাবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন মহাভারতের যুদ্ধের প্রাক্কালে গান্ধারী। দুর্যোধন যখন জননীর কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে গেলেন, তখন গান্ধারী বলতে পারেননি—তোমাদের জয় হোক। তিনি বললেন যেখানে ধর্ম সেখানে জয়। আমাদের জাতীয় উদ্দীপনাতেও আমরা ধর্মকেই স্মরণ রেখেছি—যে-ধর্ম সর্বজনীন মানবধর্ম। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে এই তিনটে বৈশিষ্ট্যই দেখতে পাই—দেশের ভৌগোলিক প্রতিমা, ঐক্য ও সংহতি চেতনা এবং ধর্মবোধ। এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি একান্তই আমাদের। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গীতে দেশের জন্য গৌরববোধ আছে, দেশমূর্তিকেও উজ্জ্বল করে তোলার প্রয়াস আছে সেই সঙ্গে আছে একত্রে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেরণাদায়ক রৌদ্রভাব। রৌদ্রভাব আমাদের সেকালের

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত 'ভারত-মাতা'

প্রায় সব দেশাত্মবোধক গানেই থাকত। আজ মনে হয় তার দরকারও ছিল। একটি বিখ্যাত গান সরলা দেবীর 'হিন্দুস্থান'। এই গান প্রথম গাওয়া হয়েছিল কলকাতায় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশনে ১৯০১ সালে—

অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণি, গাহ আজি হিন্দুস্থান
মহাসভাউন্মাদিনী মম বাণি, গাহ আজি হিন্দুস্থান।
কর বিক্রম বিভব যশ সৌরভ পূরিত সেই নাম গান
বঙ্গ বিহার উৎকল মারাঠা গুর্জর পঞ্জাব রাজপুতান
হিন্দু পার্সি জৈন ইসাই শিখ মুসলমান,
গাও সকল কণ্ঠে সকলভাবে—নমো হিন্দুস্থান।
জয় জয় জয় হিন্দুস্থান, নমো হিন্দুস্থান।
ভেদরিপু বিনাশিনি মম বাণি, গাহ আজি ঐক্য গান।
মহাবলবিধায়িনি মম বাণি, গাহ আজি ঐক্য গান।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের অতীত গৌরববোধ, ভারতীয় জাতিসংহতি এবং প্রবল অনুপ্রেরণা এই গানটিতে সার্থকতর শিল্পরূপ লাভ করেছে। সংহতি ও বৈচিত্র্য একই সঙ্গে এতে আছে, রবীন্দ্রনাথের জনগণমন-এ সেই কল্পনারই নবরূপ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওই গানটি যেমন সরলা দেবী ও রবীন্দ্রনাথের গানের পূর্বরূপ, তেমনি বঙ্কিমের বন্দে মাতরমেরও অঙ্কুর সেখানেই। এই গান বঙ্কিমকে কতখানি অভিভূত করেছিল, বঙ্কিমের শ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্যই তার প্রমাণ। ১৮৭৫ সালে বঙ্কিম যখন বন্দেমাতরম গান রচনা করেন, তখন এই গানটি তাঁর মনে ছিল না তা হতে পারে না। বঙ্কিম তখন দেশভাবনায় মগ্ন। কিছুকাল আগে সুহৃদ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহাস' বেরিয়েছে যাকে তিনি বলেছিলেন একমুঠো সোনা। বাংলাদেশ ও বাঙালির ইতিহাস নিয়ে বঙ্কিম বেশ কিছুদিন থেকেই জিজ্ঞাসু ছিলেন। বাংলার ইতিহাস নেই বলে তাঁর দুঃখও কম ছিল না। রাজকৃষ্ণের বইতে তিনি বাঙালির গৌরবের প্রমাণ পেলেন। তাছাড়া বন্দেমাতরম রচনার অন্য উপলক্ষ্য ছিল। আনন্দমঠ তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। সত্যেন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে বন্দে মাতরম গানের মিল প্রধানত দু'দিক দিয়ে। দেশের একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরূপ দুজনের গানেই পাওয়া যায়, দুজনের গানেই আছে বীর্যের প্রণোদনা। 'ফলবতী বসুমতী স্রোতঃস্বতী পুণ্যবতী'র ছবিটি বঙ্কিমের গানে সুজলা সুফলা মাতৃভূমির রূপ নিয়েছে।

যে রূপান্তর বঙ্কিম করলেন সেটির তাৎপর্য হল সুদূর প্রসারী। সত্যেন্দ্রনাথের গানটি মূলত বিবৃতিধর্মী, তাতে ভাবাবেগের স্বতঃস্ফূর্ততা কম। বন্দেমাতরমে গড়ে উঠল এক মাতৃমূর্তি, সঙ্গীতের ঝঙ্কারে, ছন্দস্পন্দনে চিত্ররূপময়তায় বন্দে মাতরম হল একটি পরিপূর্ণ সার্থক কবিতা। এই গানের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এর নারীরূপ। দেশকে জননী বলে সম্বোধন করেছেন আগের কবি, কিন্তু মায়ের মূর্তিতে তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারেননি। বন্দে মাতরমের চোখে পড়বার মতো বৈশিষ্ট্য হল দুটি—একটি ওই দেবী বা মাতৃরূপ, অন্যটি এর বিষয়, বাংলাদেশ। সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং গণেন্দ্রনাথ যে-গান লিখেছিলেন, ভারতচেতনা তার অবলম্বন। কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ও লিখেছিলেন 'কতকাল পরে বল ভারত রে! দুখসাগর সাঁতারি পার হবে।' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।' হেমচন্দ্রের ভারতবিলাপ ভারতসঙ্গীত প্রভৃতি কবিতাও বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের যুগের রচনা। এই পরিপূর্ণ ভারতীয় দেশচেতনার মধ্যে বঙ্কিম যে-সঙ্গীত রচনা করলেন সেটি বঙ্গভূমিকে নিয়ে। আজকালকার সমালোচকেরা হয়তো বলবেন, বঙ্কিমের দেশচেতনা সংকোচনধর্মী। কথাটা নিয়ে তর্ক হতে পারে, কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। যে-সময় তিনি বন্দে মাতরম লেখেন, তার কিছু আগেই ভারত সম্বন্ধে প্রবন্ধও তিনি লিখছেন। তবু যে তিনি বাংলাদেশকেই তাঁর প্রগাঢ় দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করে নিলেন, তার কারণ বঙ্গভূমি স্বভাবতই অধিকতর প্রত্যক্ষের বস্তু, বিশেষ করে ভাষার মাধ্যম থাকায়। এটা বলার দরকার নেই যে সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদিত বঙ্গভূমির প্রশস্তি রচনার উদ্দেশ্য অবশ্যই বাঙালিকে জাতি হিসাবে আলাদা করে নেওয়ার জন্য নয়, সেটা তখন কল্পনাতেও ছিল না। বাংলার ইতিহাস এবং বাঙালি জাতি সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ লিখলেও ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জাতি হিসাবে ভাববার কোনো প্রমাণ কোথাও নেই।

এই বাংলাদেশকেই বঙ্কিম নারী প্রতিমায় রূপ দিলেন। তবে এই প্রতিমা ঠিক যে দুর্গা তা বলা চলবে না। তাঁকে বলেছেন ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী আবার তাঁকেই বলেছেন কমলা কমলদলবিহারিণী। অর্থাৎ তিনি দুর্গা এবং কমলা—কোনো একটা বিশেষ প্রচলিত রূপ তাঁকে দেননি। দুর্গার বরাভয় শক্তি এবং কমলার ঋদ্ধি সবকিছুরই তিনি সম্মিলিত প্রতিমা। আবার তিনি বাণীও। বঙ্কিমের দেশমাতৃকা শক্তি, ঐশ্বর্য, বিদ্যা, ধর্ম, মানুষের পরমার্থ বলতে যা বোঝায় সব কিছুরই প্রতীক। এবং তাঁর প্রত্যক্ষ রূপ হচ্ছে শস্যশ্যামলা শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিত বঙ্গভূমির নিসর্গ প্রকৃতি। এই বর্ণনার ফলে এই গানটির মধ্যে এসেছে ভাবরূপ, শুধু ঐতিহাসিক তথ্য নয়, কিংবা প্রত্যক্ষ উন্মাদনা সৃষ্টিও নয়। অবশ্য হিন্দুর দুর্গামূর্তি লক্ষ্মী সরস্বতীকে নিয়ে অসুরবিনাশিনী শক্তির ভাবমূর্তি। আমরা এমন একটা শক্তির আরাধনা করি যে শক্তি অশুভকে বিনাশ করবে এবং সেইসঙ্গে বিদ্যা ঋদ্ধি এবং সিদ্ধি দেবে। সেই মূল শক্তির রূপকল্পনা করা হয় লক্ষ্মী সরস্বতী বেষ্টিত দশভুজা মূর্তিতে। বঙ্কিমের মাতৃমূর্তিতেও সব শক্তির সমাহার। কিন্তু প্রচলিত কল্পনাতে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশের আলাদা আলাদা মূর্তি। বন্দে মাতরমের দেবীমূর্তি একজন, তিনি একাই সব বৃত্তি এবং কাঙ্ক্ষিত ধর্ম অর্থ মোক্ষের প্রতীক। সুতরাং মানুষ যে শক্তি বিদ্যা ও ধর্ম কামনা করে বঙ্কিমের দেশজননী সেই সবকিছুরই সংহত রূপ। এই কল্পনাতে দুর্গার প্রচলিত রূপ নেই, তবে মানুষের সকল কাম্যবস্তুর একটি রূপ কল্পিত, যার সঙ্গে মিশেছে স্বদেশের নিসর্গ রূপের চেতনা। সব মিলিয়ে বঙ্কিমের জননী হচ্ছেন প্রত্যক্ষ দেশচেতনা। কাব্য হিসাবে এর সার্থকতা হচ্ছে ভাবময়তার উত্তরণে। দেশের নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে দেশের মানুষের বাসনা ও আকাঙ্ক্ষাকে মিলিয়ে এর রচনা। বঙ্কিমের কমলাকান্তের একটি রচনায় কালসমুদ্রে নিমজ্জিতা দুর্গাকে আবার উদ্ধার করে নিয়ে আসবার স্বপ্ন আছে। সেখানে দুর্গাকেই বলেছেন 'চিনিলাম এই আমার দেশ'। ব্যক্তিগত বর্ণনাতেও দেখা যায়, বঙ্কিমগৃহে কোনো এক দুর্গাপূজার রাত্রিতে তাঁর মনে ভাবের প্রেরণা এসেছিল। বন্দে মাতরমের দেশমূর্তির উৎস হিসাবে অষ্টমী পূজার দিনের দুর্গাধ্যান হয়তো কাজ করেছিল। অর্থাৎ বঙ্কিমের একটা প্রবর্তনা এসেছিল ধর্মানুষ্ঠান থেকে, কিন্তু তাঁর উদ্দিষ্ট বস্তু ধর্মীয় প্রতিমা নয়। মাতৃমূর্তি কল্পনাতে ধর্মের রূপকল্প তিনি কাজে লাগিয়েছেন।

বোধ হয় দেশবোধকে সত্য এবং ভাবাবেগপূর্ণ করতে অভ্যস্ত ধর্মের সংস্কার বলাধান করে। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' গানটিতেও যাকে সম্বোধন করা হয়েছে, তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেশ নন, দেশের এবং মানবমাত্রেরই অধিষ্ঠাতা দেবতা—ব্রহ্ম। ব্রহ্মোপাসনায় তাঁকে স্মরণ করা হয় 'পিতা নোঽসি' বলে। তিনি পিতা, মাতা নন। অর্থাৎ নারীরূপে তাঁকে ভাবা হয়নি। জনগণমন গানটি সেদিন ব্রহ্মসঙ্গীতরূপেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে নির্দিষ্ট হয়েছিল ১৯১১ সালে। বন্দে মাতরম গানটি মনে ভাবাবেগের সৃষ্টি করে, শক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে অকল্যাণকে দূর করবার উৎসাহমূর্তি রচনা করে, জনগণমন গানে অনেকটা চিরন্তন ভাগ্যবিধাতার কল্পনায় মনকে শান্ত করে, নির্বেদ-জাতীয় ভাবমণ্ডল রচনা করে। এইজন্যই বন্দেমাতরম হিন্দুর ধর্ম চেতনা থেকে সৃষ্টি হলেও কর্মে ও অনুষ্ঠানে প্রবর্তিত করে—আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসেই তার সাক্ষ্য আছে। এ কথা তো সকলেরই জানা যে জনগণমনের ভাগ্যবিধাতা কোনো সম্প্রদায়ের সংস্কার থেকে কল্পিত নয়, তিনি হিন্দু-মুসলমান যে কোনো সম্প্রদায়েরই ধ্যানযোগ্য কল্পনা। বন্দে মাতরমের দেশজননী বিশেষ কোনো অনুষ্ঠেয় ধর্মের কল্পিত প্রতিমা না হলেও হিন্দুর প্রচলিত চিত্রকল্প দিয়ে তৈরি; মন্দিরে মন্দিরে প্রতিমা গড়বার কল্পনাতে সেই সংস্কার অলক্ষ্যে কাজ করেছে। সেইজন্যই পরে একশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে এই নিয়ে আপত্তিও হয়েছে।

আনন্দমঠে বন্দে মাতরম সন্নিবিষ্ট হবার পরেও দীর্ঘকাল এই আপত্তি শোনা যায়নি। আপত্তি হওয়ার রাজনৈতিক যোগাযোগ আমরা আলোচনা করছি না। জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে বন্দেমাতরমের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করছি। আমাদের জাতীয় জাগরণে মুসলমান সম্প্রদায় দীর্ঘকাল নানা ঐতিহাসিক কারণে কিছু উদাসীন ছিল। তখনকার বাংলাসাহিত্যে ও সমাজে হিন্দু ধর্মভুক্ত চিন্তা ও কর্মনায়কদেরই দেখতে পাই। বঙ্কিমও সে রকমই একজন ভাবুক। তাই তাঁর রচিত গানেও তার ছায়া পড়েছে। বিশেষ করে আনন্দমঠে প্রযুক্ত হওয়াতে এই গানের সাম্প্রদায়িক চেতনা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ সেই বইতে আঠারো শতকের মুসলমান রাজশক্তি সম্পর্কে মন্তব্য অকরুণ।

কিন্তু ইতিহাসের এ তথ্য অস্বীকার করব কী করে যে এই গান জাতীয় জীবনে কী অসাধারণ প্রেরণা দিয়েছে। এই প্রেরণার কারণ বন্দে মাতরমের প্রত্যক্ষ দেশবর্ণনা ও মানবিকভাবের রূপায়ণ। সত্য সত্যই মানুষের মন যে ভাবের আলোড়নে আলোড়িত হয়, এই গানে তারই প্রতিফলন। তাই সহজেই এই গান মনকে উদ্বেলিত করে। রচনার পরেও কয়েকবছর বঙ্কিম গানটি প্রকাশ করেননি। তারপর ১৮৮২ সালে আনন্দমঠে এটি যথাযোগ্যভাবে সন্নিবিষ্ট হলে, বাঙালি এই গানের কথা জানতে পারে এবং আলাদা করে এটি খ্যাতিলাভ করে। ১৮৮৫ সালে ঠাকুরবাড়ির বালক পত্রিকায় গান অভ্যাস বিভাগে এই গানটিকে উদ্ধৃত করে বিশেষিত করা হয় 'বিখ্যাত' বলে। সেইসঙ্গে একটি ছবিও ছাপা হয়েছিল হরিশচন্দ্র হালদারের আঁকা। ছবির বিষয় বহু সন্তান বেষ্টিত এক জননী। সেই জননী একজন

সাধারণ বাঙালি মূর্তি, তাতে কোনো পৌরাণিক গরিমা আরোপিত হয়নি। ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'বন্দে মাতরং'। এটি যে বঙ্কিমের গান থেকেই অনুপ্রেরিত তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু গানের দেবীর দৈবী ঐশ্বর্য এতে দেখানো হয়নি। আনন্দমঠে সন্নিবিষ্ট হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বিখ্যাত হয়ে পড়ার আরও নিদর্শন আছে। কবি হেমচন্দ্র লিখেছিলেন—

গাহিল সকলে মধুর কাকলি, গাহিল বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং সুখদাং বরদাং মাতরম্।

১৮৮৬ সালে কলকাতার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে হেমচন্দ্রের এই কবিতা লেখা। এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি। বন্দে মাতরম এই সভায় সত্য সত্যই গাওয়া হয়েছিল কিনা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের পরিবার সমাজে সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ তখন সকলেরই পরিচিত। সেই জন্যই অনুমান করা যায় কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তখন নবীন হলেও গান গাইবার জন্য আহূত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই গানটি রামপ্রসাদী সুরে, গানের বর্ণনাও খুবই সাধারণ আকুল ভাবের সরল অভিব্যক্তি—

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে আয় বলে ওই ডেকেছে কে
সেই গভীর স্বরে উদাস করে—আর কে কারে ধরে রাখে।।

এই গানে বন্দে মাতরমের ধ্রুপদী গাম্ভীর্য নেই, পৌরাণিক কল্পনা নেই, বন্দে মাতরমের মা যেন আমাদের ঘরের মা হয়ে এসেছেন, পুরাণের চণ্ডী যেমন রামপ্রসাদের আগমনী গানে ঘরের মেয়ে হয়ে এসেছিলেন। বঙ্কিমের মাতৃআহ্বান নানারূপে নানাভাবে ছড়িয়ে গিয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় সরল সুরের মধ্য দিয়ে দেশমাতাই নানাভাবে দেখা দিয়ে বাঙালি চিত্তকে ভরে দিয়েছেন।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি
ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে
মরি হায়, হায় রে—

কিংবা

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী

কিংবা

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে

ইত্যাদি বহুগানে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশকেই জননীরূপে আহ্বান করেছেন। দেশকে মা বলে ডাকাটা আমাদের রক্তের সংস্কারই বলতে পারি। এর কারণ খুবই সহজ—মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের মতো এতো সহজ স্বাভাবিক এবং নিকটতম সম্পর্ক আর নেই। শিশু মাকে সর্বদা ঘরে পায়, পিতা থাকেন তাঁর গাম্ভীর্য নিয়ে বাইরের কাজে।

বঙ্কিমের মাতৃভাবনার পৌরাণিক কল্পনা থেকে রবীন্দ্রনাথ সরে এসেছেন মায়ের লৌকিক রূপে। শুধু মাতৃভাবনায় নয়, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে আরও বহু স্বদেশী গান রচনা করেছিলেন। তার সবগুলি যে মাতৃরূপের প্রশস্তি তা নয়, আশা উৎসাহ উদ্দীপনা ভরসা জাগানোর জন্য সেগুলি রচিত। কিন্তু সেগুলি বাঙালিসমাজ ছাড়িয়ে প্রচারিত হয়নি। সেগুলি বাঙালিরই গান, বাঙালিরই সুর, বাঙালি হৃদয়কেই বিশেষভাবে স্পর্শ করে। বঙ্কিমের জাগানো বঙ্গচেতনারই পরবর্তী বিকাশ, তাই বোধ হয় বাঙালির মধ্যেই প্রচলিত। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ নামক ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে। একে বলতে পারি বাঙালি জাতীয়তাবাদ। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদ আমাদের মধ্যে ফলপ্রসূ হয়নি, হয়েছে অনেক পরে ১৯৭২-এ বাংলাদেশ নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্মের ফলে।

আবার বন্দে মাতরম সঙ্গীতের মধ্যে সপ্তকোটি বাঙালির কথা থাকলেও এ গানটিকে সর্বভারতই গ্রহণ করে নিয়েছিল জাতীয় সঙ্গীত বলে। ১৮৯৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের প্রথম দিনের উদ্‌বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ এই গানটি গেয়ে। তারপরেও জাতীয় কংগ্রেসে বিভিন্ন বৎসরে অধিবেশনের উদ্‌বোধন করা হয়েছে বন্দে মাতরম গান দিয়ে। এখানে অবশ্য একটি কথা বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৬-র অধিবেশনে বন্দে মাতরম গাইলেন, প্রবোধচন্দ্র সেন অনুমান করেন, 'তিনি সম্ভবত এই গানের প্রথম অনুচ্ছেদ সুখদাং বরদাং মাতরম পর্যন্তই গেয়েছিলেন। ১৯০০ সালে প্রকাশিত সরলাদেবীর "শতগান" পুস্তকেও শুধু এই অংশটুকুরই রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুর পাওয়া যায়।' পরে যখন জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচনের প্রয়োজন হয়, তখনও রবীন্দ্রনাথের মত ছিল এই যে বন্দে মাতরমকে যদি জাতীয় সঙ্গীত রূপে গ্রহণ করতেই হয়, তবে ওই প্রথমাংশটুকুকেই করা যেতে পারে।

বন্দে মাতরম গানটি কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই অনায়াসে প্রচারিত হয়ে গেল। দেশের মুক্তিকামী তরুণ সন্ত্রাসবাদীরা এই গানটিকে কণ্ঠে ধারণ করলেন। পরবর্তীকালে অনুশীলন সমিতি গঠিত হয় বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্মের নাম নিয়ে, তাঁরা আনন্দমঠ বন্দে মাতরম আর গীতা এই নিয়ে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গে ব্রতী হলেন। ফলে এঁদের মুখে মুখে বন্দে মাতরম বাংলার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। অরবিন্দ-তিলক বন্দেমাতরমকে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করে নিলেন। সখারাম গণেশ দেউসকর বাংলার ভাবধারাকে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করবার অন্যতম বাহক হলেন। সরলা দেবী কাশীর কংগ্রেস অধিবেশনে সপ্তকোটিকে ত্রিংশকোটিতে পরিবর্তিত করে সর্বভারতের ক্ষেত্রে এর প্রযোজ্যতা প্রতিপন্ন করেছিলেন। শাসক ইংরেজও পরোক্ষে বন্দে মাতরমকে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দিতে বাধ্য হলেন যখন এই গান গাওয়া নিষিদ্ধ হল এবং বন্দে মাতরম ধ্বনি উচ্চারণ করা শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হল। এই গানের গুরুত্ব স্বীকৃত হল এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে আলোচনাযোগ্য হওয়ায়, বিদেশে ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন আলোচনা প্রকাশিত হওয়ায়। আনন্দমঠ প্রধান উপলক্ষ্য হলেও গানের তাৎপর্য প্রাসঙ্গিক ভাবেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে বন্দে মাতরম আর বঙ্গভূমির প্রশস্তি রইল না, সে হল সমগ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। এ রকম প্রশ্ন কেউ তুলে ছিলেন কিনা জানি না যে, এতে তো সমগ্র ভারতের অন্তরের কথা নেই, এ কেবল বাংলা অঞ্চলের কথা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 'জাতিধর্ম' বা nation এবং nationality নিয়ে নানা আলোচনার সূত্রপাত হল। সমগ্র ভারতবর্ষ এবং তার সভ্যতার প্রকৃতির আলোচনা চলতে লাগল। সেই আলোচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি মনীষী। রবীন্দ্রনাথের এ সময়ের বিভিন্ন লেখায় ভারতের ইতিহাসের নিজস্ব প্রকৃতি এবং তার বৈচিত্র্যধর্ম, ভারতচিত্তের মানবতাবোধ—এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যাত হতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে তিনি যেমন বঙ্গভূমিকে নিয়ে প্রচুর গান রচনা করেছিলেন, কথা ও কাহিনীর দুই বিঘা জমিতে প্রণাম করে বলেছিলেন—

নম নম নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।

তেমনি আবার সেই সময়েই লিখছেন

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি
দিন আগত ওই ভারত তবু কই
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন-পশ্চাতে
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে।

কিংবা ভারতবর্ষের অতি অপূর্ব ভৌগোলিক মাতৃমহিমা—

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননীজননী।।
নীল-সিন্ধুজল-ধৌতচরণতল অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল
অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচল শুভ্রতুষারকিরীটিনী।।

ধ্যানী ভারতবর্ষের রূপ—

ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর
নদীজপমালা-ধৃত প্রান্তর
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে।

এই তৃতীয় গানটি সেই ভারতবর্ষেরই স্তুতি যে-ভারতকে কবি তাঁর নিজের দৃষ্টিতে দেখেছেন—শুধু কবির দৃষ্টিতে নয়, ইতিহাস-তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিতে। ভারতবর্ষের যে-অধ্যাত্মসাধনা হোমরত তপস্বীর প্রতীকে কবির নানা রচনায় প্রকাশিত, এখানে ভারতের হিমালয়-নদী প্রান্তরের প্রাকৃতিক

চিত্রে তাই কাব্যরূপ লাভ করেছে। আবার 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-বহুসংস্কৃতির দ্বন্দ্বমিলনের ইতিহাস রচনা করেছেন, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি যে বহুজাতির মিলনমূলক সভ্যতার কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করেছেন তার ছবি এঁকেছেন এই কবিতাতেই

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শকহুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন ॥

এই ছবিটিই কবি আবার দিয়েছেন জনগণমন গানটিতেও। শেষ পর্যন্ত জনগণমনই ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত হল। আকস্মিকভাবে নয়, এ গানেরও ইতিহাস আছে।

এ গান রচিত হয় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। রচনার একটি উপলক্ষ ছিল। এই উপলক্ষ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। আজ অবশ্য সংশয়াতীতভাবে তার অবসান হয়েছে। ১৯১১-র ৩০-এ ডিসেম্বর কলকাতায় পঞ্চম জর্জের আগমনের তিনদিন আগে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ইতিপূর্বে দিল্লিতে ভারতসম্রাট বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। এ জন্য বাঙালি নেতারা স্থির করেন কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে সম্রাটকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে। সেজন্য উপযুক্ত গানও চাই, গানটি রাজপ্রশস্তিমূলক হওয়া দরকার। সে-সময় রবীন্দ্রনাথের কথাই সবার মনে পড়ল। নেতৃস্থানীয় রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান জনৈক ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে এ-রকম একটি গান রচনা করে দিতে অনুরোধ করেন। তখন রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতে—

'রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, এই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমনঅধিনায়ক গানে সেই ভারত ভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন অভ্যুদয়বন্ধুর পন্থায় যুগযুগ ধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক।'

গানটি সম্রাটের রাজপ্রশস্তি নয় অবশ্যই, তবে রচনার উপলক্ষ ছিল সম্রাটের কলিকাতা আগমন। কলকাতা কংগ্রেসের প্রথম দিনে গাওয়া হল বন্দে মাতরম, দ্বিতীয় দিনে গাওয়া হল জনগণমন এবং একটি হিন্দি রাজপ্রশস্তিমূলক গান 'যুগজীব, মেরা বাদশা চই দিশ রাজ সবায়া'। এই গানটির রচয়িতা সরলা দেবীর স্বামী রামভূজ দত্ত চৌধুরী। তৃতীয় দিনে গাওয়া হল সরলা দেবীর 'অতীত গৌরব বাহিনি'। রাজস্তুতিমূলক হিন্দিগানটি গাওয়ার দিনে জনগণমন গান গীত হওয়ায় এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরবর্তীকালে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানটির সৌন্দর্য সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ছিল না বলেই এবং সেই গান অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করবে বলেই গাওয়া হয়েছিল। প্রশস্তির উদ্দেশ্যে নয়। প্রশস্তির উদ্দেশ্যে ফরমায়েশ দিয়ে রচিত হয়েছিল হিন্দি গানটি। কিন্তু এই জনগণমন গানটিই কয়েকদিন পর মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। তাতে পরিচয় হিসাবে লেখা হল 'ব্রহ্মসঙ্গীত'। এর দ্বারা আর কোনো সংশয়ই থাকে না যে জনগণমনের ভারতভাগ্যবিধাতা পরব্রহ্ম ছাড়া কেউ নন, সম্রাট তো ননই, দেশও নয়। এতে জাতীয় সঙ্গীত বলতে আমাদের যা ধারণা, দেশ-এর উদ্দিষ্ট নয় বলাতে এতে সেই ধারণার সমর্থন হয় না।

পরন্তু এই ব্রহ্মসঙ্গীতটিই জাতীয় সঙ্গীতরূপে বন্দে মাতরমের সঙ্গে গণ্য হয়েছিল অন্তত ১৯১৭ সাল থেকে। সেবারকার কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনেও এই গান গাওয়া হয় তৃতীয় দিনে। অবশ্য প্রথম দিনের উদ্‌বোধন হয়েছিল বন্দে মাতরম দিয়েই। রবীন্দ্রনাথের জনগণমন গানটি সমকালীন সাময়িক পত্রের বিবরণে 'Magnificient' 'Patriotic song' বলে বর্ণিত হয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বক্তৃতায় বললেন— It is a song of the victory of India. তারপর থেকেই এই গান জাতীয় সঙ্গীত বলেই গণ্য হয়ে আসছে। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে এর হিন্দি অনুবাদ জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এর দুটি ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন।

ব্রহ্মসঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত রূপে গ্রহণ করায় বাধা হল না কেন? তার কারণ ওই গান বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। ভারত ভাগ্যবিধাতা ব্রহ্ম বটে, কিন্তু তিনি যে ভারতের বিধাতা সেই ভারতেরই অধিবাসী আমরা। সেই ভারতের রূপ ফুটেছে এতে। সেই রূপ রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্ট, যার ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা দিয়েছেন নানা জায়গায়। এখানে আছে পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল এবং বঙ্গ অর্থাৎ ব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ এই ভারতভূমি যার অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদ বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা প্রভৃতি পর্বত এবং নদী। সরলা দেবীর অতীত গৌরববাহিনি গানে এই বিস্তৃত অঞ্চলগুলির উল্লেখ আছে। কবি এই সব অঞ্চলে ব্যাপ্ত জনসমাজের দিকে তাকিয়ে তাদেরই অন্তরের প্রার্থনাকে ভাষা দিয়েছেন। এই সমাজে আছে হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান এবং খ্রীষ্টান। এই বিস্তৃত ভারতসমাজ যাকে অন্য কবিতায় বলেছেন মহামানবসাগর। তারা পেরিয়ে এসেছে অনেক দুঃখের রাত্রি, অনেক সঙ্কটের মুহূর্ত। তাকে তিনি বলেছেন—

পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কট দুঃখত্রাতা।

আমাদের এতো বৈচিত্র্য, এতো স্ববিরোধিতা, এতো বিপ্লব থেকে উত্তীর্ণ করিয়ে দিতে যিনি পারেন, তিনি ভারত ভাগ্যবিধাতা এবং তিনি ঐক্যবিধায়ক।

সুতরাং জনগণমন গানের মূল মর্মটি হচ্ছে বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য। বিচিত্রকে নিয়েই এক ভারতীয় জাতি। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরের যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।'

এই গানটি নিছক গান নয়, এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভারতইতিহাস পাঠও আছে। প্রায় ১৯০১ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট ছিল নানা প্রবন্ধে কবিতায় এবং গোরা উপন্যাসে—এই গানটিতে তারই সংহত অভিব্যক্তি। সেই অর্থেই জনগণমন ভারতীয় জাতির গান। ভারতীয় জাতির বৈশিষ্ট্য এক ধরনের ধর্মপ্রাণতায়। সঙ্কীর্ণ অর্থে ধর্ম নয়, উদার অর্থে সেই নৈর্ব্যক্তিক দৈবানুভবকে কবি এই কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে আছে 'যতো ধর্মস্ততো জয়'। সেই ধর্মবোধ থেকে রবীন্দ্রনাথও এক পরম নৈর্ব্যক্তিক বিধাতার অনুভব লাভ করেছেন। তিনিই ভারতভাগ্যবিধাতা। দেশানুভবের সঙ্গে ঈশ্বরানুভবকে মেলানো অন্য দেশের জাতীয় সঙ্গীতের তুলনায় অভিনব অবশ্যই। কিন্তু এই অনুভব থাকাতে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধ কলুষমুক্ত হয়েছে। য়ুরোপে ধর্মহীন দেশচেতনার পরিণাম তো আমরা জানি। 'প্রতিনিধি' কবিতাতে শিবাজীর রাজধর্মের নির্দেশ গুরু রামদাস দিয়েছিলেন—

পালিবে যে রাজধর্ম
জেনো তাহা মোর কর্ম
রাজ্যালয়ে রবে রাজ্যহীন।

এই আত্মবিমুখ ত্যাগধর্মের উৎস এক ধর্মবোধ। সেই ধর্মকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে নিত্যস্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছেন।

এই ভাবটি মনে রাখলে বঙ্কিমের বন্দে মাতরমের সঙ্গে এর একটা ভিন্নতর দৃষ্টি বোঝা যায়। বঙ্কিম দেশজননীর অভয়মূর্তি রচনা করেছেন 'দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে' এবং 'বহুবলধারিণী'র উল্লেখ করে। বন্দে মাতরমে মায়ের শাসক এবং পালকরূপ দুইই আছে। এই প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় লিখেছিলেন—

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ
দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাটনেত্র আগুনবরণ।

এই মূর্তি তিনি জনগণমন গানে দেননি। তাতে এনেছেন শান্তি সহিষ্ণুতা মৈত্রী ও ঐক্য। বঙ্কিমের গানে উদ্দীপনা, অধীরতা, চাঞ্চল্য, এককথায় রজোগুণ। রবীন্দ্রনাথের গানে ভারতভাগ্যবিধাতার ধ্যান ও তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন।

যৌথপরিব
ছবি : অঞ্জন ঘোষ

এক হাঁড়ি বত্রিশ পাত

এরা আমার আপনজন
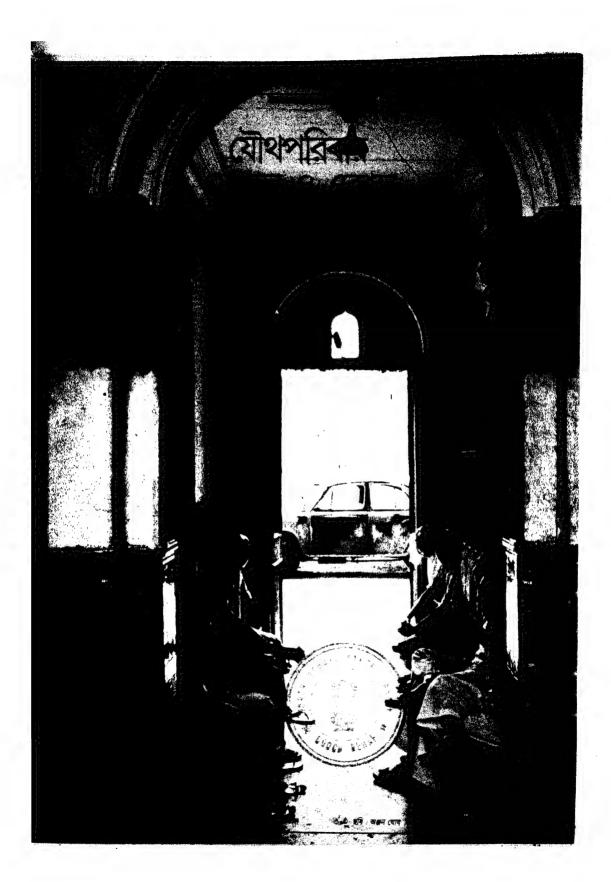
ছবি : অঞ্জন ঘোষ

অভিধানে দেখেছি যূথ মানে পশুপক্ষীর দল। তার থেকে হয়েছে যৌথ, অর্থাৎ যারা একসঙ্গে থাকে ; যূথপতি মানে যে যূথের প্রধান। সকলে না হলেও, অনেক প্রাণীই প্রধানত নিরাপত্তার কারণে দলবদ্ধ হয়ে থাকে। যাতে শত্রু এলে তাদের সকলের সঙ্গে লড়তে হয়। খাবার খুঁজতে হলে, একসঙ্গে খোঁজা যায় আর সেই থাকার জায়গাটি সবাই মিলে রক্ষা করা যায়। একজন প্রধান না থাকলে নিজেদের মধ্যেই ভেদের ভয় থাকে।

ঐ একই কারণে আদিমকাল থেকে মানুষও দলবদ্ধ হয়ে থাকত। এক-একটি দল মানে এক-একটি পরিবার। পরিবারে একজন কর্তাব্যক্তিও থাকত। শুনেছি প্রথমদিকে যৌথপরিবারগুলো মাতৃপ্রধান ছিল। তার একটা বড় সুবিধা, কি মানুষের কি জীবজন্তুর মায়েরা সাধারণত সন্তানের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে। যৌথপরিবারের এই গুণটিই ছিল প্রবলতম বন্ধন। নারীই হক বা পুরুষই হক, একজন মমতাময় ক্ষমতাশালী প্রধান বা পালক, বা যাই বলা যাক না কেন, না থাকলে যৌথপরিবার ভেঙে পড়ে। আবার এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে এই প্রবলতম স্থানটিই হল দুর্বলতম স্থানও বটে। 'এরা আমার আপনজন' এই বোধটি মানুষকে যেমন প্রবল করে, আবার তেমনি পঙ্গুও করে দেয়।

বহু মুখে শাকান্নের আয়োজনে বড় মা

যিনি পরিবার পত্তন করলেন, তিনি আপ্রাণ খেটে সন্তানসন্ততি, ভাইবোন সকলের লালন পালনের ও প্রাণরক্ষার দায়ও বহন করলেন। মেয়েগুলোকে বিয়ে দিলেন ; ছেলেরা হল সম্পত্তির সমান ভাগীদার। কিন্তু যতদিন সকলে একসঙ্গে আছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রত্যেকের ভাগ কমতে কমতে, কয়েক পুরুষে বড় বড় সম্পত্তিও উপে যায়। ব্যবসা থাকলে লাটে ওঠে।

১০০ বছর আগেও যৌথপরিবারের আরেক নাম ছিল একান্নবর্তী পরিবার। অর্থাৎ রোজগার এবং খরচ সবই পাইকিরিভাবে হত। একসঙ্গে রান্না হত। একটা আঁশের, একটা নিরামিষ হেঁসেল, এইটুকু তফাত। দু-তিন পুরুষে দুটো-চারটে বেয়াড়া ছেলের হয়তো বাকিদের সঙ্গে বনিবনা হত না। বড়কর্তা তেমন জবরদস্ত হলে হয়তো তাকে শায়েস্তা করে, আবার পোষ মানাতে পারতেন। নয়তো সরকার মশায়ের সাহায্যে তার অংশের দামের একটা হিসেব কষিয়ে, তার পাওনা চুকিয়ে এবং আশা করা যায় তার কাছ থেকে বিধিমতে রসিদ নিয়ে, বাড়ি থেকে বিদায় করে দিতেন।

এমন হলে বরং আত্মীয়তার সম্বন্ধটা কিছুটা রক্ষা পেত। প্রথমদিকের খেদ, রাগ, অভিমান পড়ে গেলে, পুরনো স্নেহের অনেকখানি রক্ষা পেত। নানা কারণে যৌথপরিবারের জনাকতক ছেলেকে গৃহত্যাগী হতে দেখা যেত। ধর্মান্তর গ্রহণ করলে তখনকার আইন তাদের ত্যাজ্যপুত্রের সমান জ্ঞানে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারত। তবে অনেকদিন আগেই সে নিয়ম পাল্টে

গেছিল। ক্ষুব্ধ গুরুজনরাই তাদের বাড়ি থেকে তাড়াতেন। ব্রাহ্ম সমাজের পত্তনেও এই বিতাড়িতরা সাহায্য করেছিলেন।

গৃহত্যাগী ধর্মত্যাগী হওয়ার চাইতেও বড় বড় বিভেদ ক্রমে দেখা দিতে লাগল। যৌথপরিবারের অংশীদারদের মধ্যে উঁচু উঁচু অদৃশ্য দেয়াল উঠে, যে একতা ছিল যৌথপরিবারের প্রধান শক্তি, তাকেই নষ্ট করে দিতে লাগল। হয়তো দুই বৌতে ঝগড়া দিয়ে শুরু হয়ে, যৌথপরিবারের এককেটা ভগ্নাংশে, অন্য বসতি প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গতির অভাবে, নয়তো স্রেফ ঢ্যাঁটামি করে, পুরনো পৈত্রিক বাড়ির দুখানি ঘরে পৃথগন্ন হয়ে বাস করতে লাগল। ছেলেপুলেদের বলা হল, 'খবরদার ওদের সঙ্গে খেলবি না!' এই সম্বন্ধের মলিনতা ভাষায় বোঝানো যায় না। অন্যান্য কারণেও বড় বড় যৌথপরিবারকে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়তে দেখা গেছে। কিন্তু তার একটা সুফল হয়েছে এই যে এইরকম নিষ্ঠুর গ্লানি কোনো শিশু মনে ছায়া ফেলার সুযোগ পায় না। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নতুন এক ধরনের বৃহত্তর এবং উদারতর যৌথপরিবার গড়ে উঠবার সম্ভাবনা ক্রমে কায়া নিচ্ছে। এ ছাড়া বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজকে রক্ষা করার কোনো উপায় দেখি না।

যখন সত্যি করে সেকালের যৌথ পরিবার ভেঙে পড়ল, বিশেষ কেউ আক্ষেপ করেছিল বলে মনে হয় না। আমি তার শেষ ভগ্নদশা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং সাহেবি নিয়মে ছোট ছোট পরিবারের প্রতিষ্ঠা থেকে তার বর্তমান নড়বড়ে অবস্থাও দেখছি। আগেকার নিয়মের সবটাই মন্দ ছিল না। এখনকার নিয়মেরও সবটুকু ভালো বলে মালুম দিচ্ছে না।

পুরনো ব্যবস্থার আরেকটা বড় দুর্বলতা ছিল, যা নিয়ে পশুপাখিদের মাথা ঘামাতে হয় না। তাদের খাওয়াবার ভার বিধাতা নিজেই নিয়েছিলেন, সুতরাং আগেকার নিয়মেই পরম নিশ্চিন্তে থাক। যতদিন না মানুষ তাদের বিচরণভূমির গাছ কেটে, গুলি করে তাদের প্রাণহানি করে, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করে। মানুষের সেই অন্য বড় দুর্বলতাটাই এর পিছনেও কাজ করছে। সেটি হল অর্থনীতি, বা ক্ষেত্রবিশেষে অর্থলোলুপতা। এই সর্বনাশের হাত থেকে কোনো জবরদস্ত যূথপতি হাতির পালকে যেমন রক্ষা করতে পারেনি, তেমনি কোনো ন্যায়বান শক্তিশালী বড়কর্তাও মানুষের পরিবারকে বাঁচাতে পারেনি। জন্তুরা সংখ্যায় কমতে কমতে নিঃশেষ হতে চলেছে আর আমরা সবার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীবরা বাড়তে বাড়তে নিঃসম্বল নিরবলম্ব হতে চলেছি। যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সব দেশের মেরুদণ্ড অর্থবলের কাছে তাকেও হার মানতে হয়েছে।

সর্বনাশটা শুরু হয়েছিল এই শতকের গোড়া থেকেই, যখন একটা পৈত্রিক সম্পত্তি এতগুলো প্রাণীকে পুষতে অক্ষম হল আর প্রত্যেক পরিবারের প্রায় অর্ধেক মানুষকে অর্থাৎ মেয়েদের স্রেফ অশিক্ষিত বোঝা বানিয়ে রাখা হত, তা প্রাচীনকালে তারা যতই মাতৃগিরি করে থাকুক না

উদারতর যৌথ পরিবার গড়ে উঠবার সম্ভাবনা ক্রমে কায়া নিচ্ছে

কেন। লেখাপড়া শেখানো তো হতই না, যথাসম্ভব দিনের আলো থেকে পর্যন্ত আড়াল করে রাখা হত। এখনো কলকাতার কয়েকটা সাবেকী বাড়ির ভিতরের উঠোনের ওপর দোতালায় তিনতলায় চারদিক ঘিরে যে সুন্দর বারান্দা দেওয়া আছে, তার প্রায় সবটাই কাঠের খড়খড়ি দিয়ে আব্রু করা। যদিও সে সব বাড়িরও মেয়েদের প্রায় সকলে শিক্ষিত ও স্বাধীন। তা ছাড়া পরদা জিনিসটা অ-হিন্দু এবং অ-ভারতীয় এবং অনুপ্রবেশকারী শত্রুদের বিকট উপহার। তা হলে খড়খড়ি ভেঙে ফেলছি না কেন? নিজেদের অপমান কি আমরা নিজেরাই অলঙ্কারের মতো গলায় পরে থাকতে ভালোবাসি?

উপজাতীয়দের কথা বাদ দিয়ে বলছি, সায়েব-মেমরা কেউ যৌথ পরিবার সমর্থন করে না। আমরাও স্বাধীন হয়ে অবধি ওদের ভক্ত শিষ্য হয়েছি। ওরা যা করছে, আমরাও তাই করছি। বারবার বলছি ওরা কেমন স্বামী-স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে থাকে। শ্বশুর-শাশুড়ি, দিদিমা-ঠাকুমা জাতীয় লোকদের পুষতে হয় না। তারা অবস্থা বুঝে সময় থাকতে বৃদ্ধ বয়সের বীমা, থাকার জন্য হস্টেল, মায় গোরস্থানে ৬/৭ ফুট

সাবেকী বাড়ির ভেতরের উঠোন, চারদিক ঘিরে সুন্দর বারান্দা খড়খড়ি দিয়ে আব্রু করা

করে জমি কিনে রাখে। এমন কি স্বামী-স্ত্রী তেমন পছন্দসই না হলে বার বার পাল্টে নিতেও পারে। কেউ কিছু মনে করে না। অবিশ্যি আমরাও এখন এ বিষয়ে চেষ্টাবতী হয়েছি।

তবে আমাদের ও সব সুখের দিন আসেনি। যদিও চেষ্টার অবধি নেই। মুশকিল হল আমরা বড় কুঁড়ে। ওতেই আমাদের কাল হল। বড় যৌথ পরিবারের যাবতীয় ঝামেলায় কাজ করবার লোকের অভাব ছিল না। ফালতু এবং ইচ্ছুক মাসি-পিসি-মামী-খুড়ি, এমন কি সম্পর্কে মাঐমা বলে বৌদিদিদের মা-রা পর্যন্ত গিজগিজ করতেন। কোথায় যে তাঁরা সব উপে গেলেন এই এক রহস্য। বিপদেআপদে তাঁরা পেছপাও হতেন না। নিজেদের মধ্যে মাঝেমাঝে খিটিমিটি করলেও, এটা চাই ওটা চাই বলে কোনো দাবিও ছিল না। কোথায় গেলেন এঁরা? এখন নিজেদের কাজ নিজেদের করা ছাড়া গতি নেই।

ছোট ছোট পরিবারে একশো রকম অসুবিধা দেখা যাচ্ছে, যৌথ পরিবারের নিষ্কর্মা বা সত্যি পঙ্গুদেরও একটা অধিকার ছিল। সকলের সঙ্গে তারাও সমান ভাগ পেত। ঐ সমতাটা দিব্যি মজার ছিল। এখন যেমন কেনাকাটা করতে পারাটাই হল বারো মাসের তেরোটা পার্বণের সবচাইতে আনন্দের ব্যাপার। তখন কেনাকাটার সঙ্গে মেয়েদের কোনো সম্পর্কই ছিল না। আমার চেনা এক যৌথ পবিবারের আদি বড়কর্তার দূরদৃষ্টির ফলে ২৫ বছর আগেও, সে বাড়ির সকলের শোবার একটা করে ঘর না হলেও, একটা বিছানা এবং দু বেলা ভাত বা রুটি আর দু বেলা জলখাবার মিনিমাগনা ধরা ছিল। তবে শৌখিন কিছু কিনলে, নিজের পয়সায়। পুজোয়, মাথা গুণে অবিকল একরকম পাড়ের ধুতি, শাড়ি বা এক দামের থান পেত সকলে। এখনও হয়তো পায়। কে জানে! কারো কিছু বলার থাকত না।

লোকে যে বলে বাংলার স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্ম জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কোলে, সে কথাটা এক দিক দিয়ে সত্যি হলেও, সেই স্বাধীনতা হল গিয়ে অনেকটা সামাজিক ক্ষেত্রের ব্যাপার। তার সঙ্গে আসল নারী মুক্তির বা কোনোরকম পারিবারিক ব্যাপারের চরম দায়িত্ব জড়িত ছিল না। এমন কি কোন ফাংশানে শাড়ি পরা হবে তাতে বয়স্কা মহিলাদের মত নিলেও, ঐ সাজে স্বাধীন মহিলারা যে ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠ অভিমুখে রওনা দেবেন, এ যে পুরুষ মস্তিষ্কের উদ্ভাবন সে কথা আর কাউকে বলে দিতে হবে না। এই ঘটনা বাংলার সামাজিক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করা হলেও, এতে পুরনো যৌথ পরিবারের ভিত ততটা নড়ে যায়নি, যতটা গেছিল যখন প্রায় একই সময়ে সমাজ সংস্কারকদের বাড়ির মেয়েরা লেখাপড়া শিখে টাকাকড়ি রোজগার করতে আরম্ভ করে দিলেন। আসলে সত্যিকার স্ত্রী-স্বাধীনতা যৌথ পরিবারের নিয়মকানুনের সঙ্গে খাপ খায় না।

সেই ১৯ শতকের শেষের দিক থেকে নানা সামাজিক কাজে মেয়েদের দেখা গেছে, কিন্তু তাঁরা বাড়ির কর্তার অমতে কিছু করাকে উপযুক্ত মনে করতেন না। তা করতে হলে যৌথ

যৌথ পরিবারের মধুর নিরাপত্তায় শেষ জীবন

পরিবারের একতার আদর্শের বাইরে পদক্ষেপ করতে হয়। ছিল অবিশ্যি তখনো কিছু কিছু এমন বেপরোয়া মেয়ে, কিন্তু যৌথ পরিবারের আরামের প্রাচীরে তাঁরা তেমন আঁচড় কাটতে পারেনি।

বলেছি তো যৌথ পরিবার ভেঙে যাবার প্রধান কারণটা অর্থনৈতিক। রোজগেরে মেয়েরা সেই কারণের মূলে বড় জোর তেল জুগিয়েছিল। কমবয়েসী বিধবা, বা অন্য কারণে যারা স্বামীর সহযোগিতা থেকে বঞ্চিতা, তাঁরা যৌথ পরিবারে অশ্রদ্ধার সঙ্গে আশ্রিতা হতেন। যদি কেউ কোনো বিদ্যা অর্জন করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেন, তাঁরা নিন্দা এবং স্বাধীনতা একসঙ্গে অর্জন করতেন এবং যৌথ পরিবারের দুর্বলতা প্রমাণ হত।

অবস্থা পড়ে গেলেও অনেকদিন পর্যন্ত ওয়ারিশরা ব্যক্তিগতভাবে রোজগার পাতি করে, একসঙ্গে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ধনী, মধ্যবিত্ত, অভাবী আর বেকারের পক্ষে এক বাড়িতে বাস করে, এক হেঁসেলের ভাত খাওয়া সম্ভবপর হলেও, যুক্তিযুক্ত নয়; বিশেষ করে যদি তারা একই বংশজাত হয়ে থাকে। আধুনিক নাগরিক জীবনে একটা মোটামুটি নিরাপত্তার ব্যবস্থাও থাকে। কাজেই সেই অজুহাতেও একসঙ্গে বাস করার কোনো সার্থকতা নেই।

আমার ছোটবেলাতেই দেখেছি বড় বড় যৌথপরিবার ভেঙে ছোট ছোট যৌথপরিবার হয়েছে। বুড়োবুড়ি, তাঁদের ছেলেমেয়ে, বড়জোর নাতিনাতনিরা। ছেলেদের কর্মক্ষেত্রও অনেক সময়ই নানা জায়গায়। স্বাভাবিকভাবেই এরকম নিঃশব্দে যৌথপরিবার বিদায় নিয়েছিল। এখন তার ৫০/৬০ বছরের মধ্যে ছোট ছোট পরিবারগুলোও দেখছি বিপন্ন।

আসলে স্বাধীন হব বলাটা যত সহজ, কাজের বেলায় ততটা নয়। ছোট বাড়ির ভাড়া আকাশচুম্বী। সেই মাসি-পিসিরা নিজেদের সমবায় সমিতিই গড়েছেন বোধ হয়; তাঁরাই বা কেন পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকবেন। জিনিসপত্রের দাম দশ পনেরো গুণ হয়েছে। কাজের লোকের মাইনেও তাই। তা ছাড়া সৎলোকেরা কারো দাসত্ব করতে চায় না, তাদের মনেও স্বাধীনতার আলো জ্বলেছে, তা সেটাকে আস্পর্ধাই বল আর যাই বল। অচেনা লোক রাখা নিরাপদ নয়। সবার ঘরে নিদেন দু তিনটি ছেলেপুলে। তাদের ঠাকুমারাও দুষ্প্রাপ্য, (হয়তো কোনো ক্যান্টিনে বা পত্রিকাতেই কাজ পেয়ে গেছেন)। এদিক একজনের আয়ে একটু সুষ্ঠুভাবে সংসার চালানো মুশকিল। তা ছাড়া বাড়িতে শিক্ষিতা গিন্নি থাকলে, তারও কিছু রোজগার করা কর্তব্য বই কি! স্বাধীনতা পেলে তার দাম দিতে হবে তো! কর্তা একা কত পারবেন? সত্যি কথা বলতে কি, এমন জানলে কজন যৌথ পরিবার তুলে দিতে চাইত? মা-ঠাকুমা হাসিমুখে যে কাজ নিখুঁতভাবে করতে পারাটাকেই গর্বের বিষয় বোধ করতেন, গিন্নি তাতে নাক শেঁটকান! মেমরা তো ঘরের সব কাজ করে। ওদের দেশে কোনোকালেই জমাদার ছিল না। আমরা নোংরা করতে পারি। কিন্তু সাফা করতে ঘেন্না হয়।

গিন্নিরও ছোটবেলায় দেখা বা মায়ের কাছে গল্প শোনা পড়ন্ত যৌথপরিবারের আরাম আনন্দের দিকটা ভেবে মেজাজ খিচড়ে যায়। সারাদিন অফিসের ধকলের পর কোথায় একটু আদরযত্ন পাবেন, তা নয়। ছেলেপুলেগুলো সারাদিন মা-বাবাকে পায়নি, তারাও কিছু আশা করে। 'অঙ্কটা যে মিলছে না, সেটা দেখিয়ে দেবে তো? তা ছাড়া খিদে পেয়েছে বড্ড ব্যাটা ফুচকাওয়ালা—ঐ যাঃ! বলে ফেললাম! কান

ধরছ কেন ? খিদে পেলেও খাব না ?' তার বড়টা বলে, 'বেশ আপিস কর আমরা রাস্তায় খেলব, নরেশের মাসির বাড়ি গয়ে চেয়ে খাব !'

ঐখানেই শেষ নয়। আপিসের টাইম আর স্কুলের সময় মোটামুটি একই হলে সমস্যার অনেকটা মিটত। তাতো হয় না। বাছাধনরা বেলা দুটোয় হাম-হাম করতে করতে বাড়ি আসবেন। তখন সদর দোরে সেফ্‌টি তালা দেওয়া। কাজেই পাড়ার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের জিম্মায় কিছুক্ষণ না রাখলেই নয়। সে ব্যবস্থা সম্ভব না হলে বোর্ডিং-এ দিতে হয়; তারো ছুটিছাটা থাকে। নয়তো বাপ-মায়ের একজনকে বাড়িতে থাকতে হয়; কিংবা পার্ট-টাইম কাজ করতে হয়; কিংবা বাড়ি বসে করা যায় এমন কাজও তো আছে।

এখানে একটা পুরনো কথা আবার বলি। ঘরকন্নার কাজ স্ত্রীকেই করতে হবে, তাই বা কে বলল ? দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দর্জি ও বিখ্যাত হোটেলে রান্না প্ল্যান করা থেকে পরিবেশন তো পুরুষরাই করে থাকে। স্ত্রী যদি খুব মেধাবী বা গুণী হয়, করুক না সে-ই রোজগার। সংসারের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার ঝামেলা ও আনন্দ স্বামীটি একটু বুঝুক। তাহলে আর দুজনে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পর স্বামীর বলতে ইচ্ছে করবে না, 'তুমি তা হলে বেশ সহজ কিন্তু ভালো ডিনারের ব্যবস্থা দেখ, আমি একটু বেরোই। কিছু কেনাকাটার থাকে তো বল। ফেরার পথে একটু দত্তদের বাড়িতেও ঢুঁ মেরে আসি। তবে সব চাইতে ভালো হয় মা-কে কাশী থেকে নিয়ে এলে। তাঁরো একা একা লাগে।'

আজকাল এই ধরনের কথাবার্তা হামেশাই শোনা যায়। তাতেই বোঝা যায় যে স্বামী-স্ত্রী ছেলে-মেয়ের সংসার সবসময় খুব আরামের নয়। এবং বলা বাহুল্য খুব নিরাপদও নয়। যৌথ

আমাদের পারিবারিক ভালবাসা বাস্তবিকই অনেক বেশি গভীর

পরিবারের নিরাপত্তাই ছিল তার সব চাইতে বড় সুবিধা। আদিম যুগ থেকে কি মানুষ কি জন্তু দল বেঁধে থেকেছে প্রধানত নিরাপত্তার কারণে। মানবসমাজে আবার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার সঙ্গে জুটেছে যার যার সম্পত্তির নিরাপত্তা। খালি বাড়ি পর্যন্ত জবরদখল হয়ে যায়। লোহার আলমারি ভেঙে সোনা রূপো কাঁসা পেতল স্টেনলেস স্টীল এবং নতুন নতুন দামী শাল, কাপড়চোপড় সব হাওয়া হয়ে যায়। আজকালকার দক্ষ গুণী চোরদের তুলনা হয় না। খাসা সব যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে, দামী দামী তালার একটুও ক্ষয়ক্ষতি না করে, সরু সরু স্ক্রু-ড্রাইভারের মতো অস্ত্র দিয়ে দিব্যি সুন্দর খুলে, গৃহস্থের কোনো সুদৃশ্য এবং দামী ব্যাগে ভরে সঙ্গে নিয়ে যায়। চোরের বাড়ির জিনিসপত্র বোধ হয় খুব সুরক্ষিত। সে যাই হক, যে নিরাপত্তাকে জীবমাত্রই আদিমকাল থেকে খুঁজে এসেছে, যৌথ পরিবারে তার অনেকটা পাওয়া গেছিল, কিন্তু ছোট ছোট একক পরিবারে বিশেষ করে এই অশান্তির যুগে তার কিছুই নেই।

কোনও কোনও পরিবারে দিদিমা ঠাকুমারা এখনও আছেন

আমি বলি কি চোর ছ্যাঁচড়ের লোভ লাগে এমন সব গয়নাগাটি বাসনপত্র মধ্যবিত্ত ঘরে না থাকাই ভালো। মেমরা তো খাশা খাশা নকল গয়না পরে। চোরেও নেয় না। তাছাড়া সব কাপড় কাচার, বাসন ধোবার, ঘর সাফের, ঘর গরমের মেশিন, টিভি ইত্যাদি যাবতীয় যন্ত্রপাতির জিনিসের ওরা বীমা করে রাখে। হারালে টাকা পায়। ওদের নকল করবার চেষ্টা করাই ভুল। আরেকটা কথাও ভুললে চলবে না, আমাদের পারিবারিক ভালোবাসা বাস্তবিকই অনেক বেশি গভীর। বুড়ো বাপ-মা, কিংবা অকৃতকার্য ভাইবোনের প্রতি ওদের কোনো কর্তব্য আছে বলে ওরা স্বীকারই করে না, খুড়ি জেঠি মাসি পিসির কথা তো ছেড়েই দিলাম। আমাদের যেন কখনো তেমন দুর্বুদ্ধি না হয়।

তাই বলে একথাও বলছি না যে সেকালের যৌথপরিবার আবার ফিরে এলে ভালো হয়। সে যৌথপরিবার সাম্যবাদবিরোধী ছিল। সে স্ত্রীর অধিকার মানত না। সে ছিল অতিরিক্ত রক্ষণশীল, অতীতকে আঁকড়ে থাকত। কিন্তু তারই মধ্যে যে একটা একতার ও মমতার আদর্শ ছিল, তাকে এখনও বাঁচিয়ে রাখা যায়। প্রয়োজনের ও স্বার্থের কারণে যে নতুন নিয়মের প্রতিষ্ঠা করা যায়, তার ফল ভালো হতে পারে।

আরো বলা দরকার; তবে চিত্রটা স্পষ্ট হবে। যৌথপরিবার ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সহায়। একক পরিবারের কোনো প্রভাব নেই। অনেক দেশের মতো আমাদের দেশেও সব চাইতে ক্ষমতাশালী সমাজ হল ধনী ব্যবসায়ীদের সমাজ। তারা প্রায় সকলেই এক ধরনের শৌখিন যৌথপরিবারের দৃষ্টান্ত। তাদের মিলিত শক্তির অসীম প্রতাপ। এ অঞ্চলের সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু তারাও ভদ্র এবং শিক্ষিত। অর্থবলে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ কোনো দিনই তাদের সমকক্ষ হতে পারবে বলে মনে হয় না। বর্তমানে তাদের কর্মী হতে পারলেই সন্তুষ্ট।

হয়তো আদর্শবাদের যুগই নয় এটা। যখন আমাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরা গাছতলায় কুটির বেঁধে থাকতেন আর রাজারা সেখানে গিয়ে তাঁদের উপদেশ নিতেন, সে দিন আর ফিরে আসবে বলে মনে করি না। সত্যের সম্মুখীন হওয়াই ভালো। আমাদের জ্ঞানার্জনের অনেক ক্ষমতা, কিন্তু বিষয়বুদ্ধি কম। পারিবারিক সম্পদ বাড়ানো দূরের কথা, সর্বস্ব খুইয়ে বসে থাকি। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরেন অনেকে। তার জোরে হয়তো নানারকম ব্যবসাও ফেঁদেছিলেন, কিন্তু তার কটি টিঁকেছে? নাম না করাই বাঞ্ছনীয়। এইসব মন্তব্য থেকে আমার প্রয়াত আত্মীয়স্বজনরাও বাদ যান না। জ্ঞানলাভের বুদ্ধি আর অর্থলাভের বুদ্ধি এক নয়। কোনো দিনও প্রথমটি ছেড়ে দ্বিতীয়টি ধরব না, তাও বলছি না। বিজ্ঞান বলে কত লোকে বিশ্ববিখ্যাত হয়। অন্য দেশে তাদের অনেক টাকাকড়িও হয় শুনেছি। আমরা বড়জোর চাকরি নিয়ে, নিজের বিদ্যে অন্যের ব্যবসায় খাটাই। তবু বলব আমাদের শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতির তুলনা নেই। সেগুলিকে রক্ষা করাও একটা বড় কাজ। এদিকে আমাদের আলাদা আলাদা একক সংসার পরিচালনা করতেই আমরা হিমশিম খেয়ে যাই। ছেলেমেয়েগুলোকে একটা চলনসই স্কুলের নিচু ক্লাসে ভর্তি করাও এক মহা সমস্যা। অবিশ্যি যথেষ্ট টাকা খরচ করতে পারলে সবই হয়ে যায়। একক পরিবারের তাও নেই।

নেই তো নেই। তার বদলে আছেটা কি? সংক্ষেপে আরেকবার ভেবে নেওয়া যাক। আছে সমান অধিকার। তাতে কি সুবিধা হচ্ছে? স্বাধীনতার অনতিবিলম্বে কয়েকটা কলমের আঁচড়ে মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার পেয়েছে। শুনেছি খনির নিচু তলায় স্বাস্থ্যের কারণে নারী ও শিশুদের কাজ করা বারণ, তাছাড়া সব পেয়েছে, সম্পত্তি, সুযোগ, আইনের প্রশ্রয়। এইটুকুই তাদের মূলধন। ভাবলাম বাঃ! সায়েব-মেমদের সঙ্গে আমাদের কোনো তফাত রইল না। আধুনিক গিন্নিরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন। স্বাধীনতার প্রথম আস্বাদটি বড় মিষ্টি ছিল। কারো অনুমতি নিতে হয় না। যেমন খুশি রাঁধাবাড়া যায়। যখন খুশি বেরুনো যায়। যে স্কুলে আবহমানকাল এ বাড়ির ছেলেরা পড়ে এসেছে, তাকে বর্জন করা গেল। কয়েকটা কুঁড়ে কাজের লোককে বাতিল করা গেল। এ যে দেশের স্বাধীনতার চাইতেও ভালো।

তার যে এত ফ্যাচাং উঠবে, তখন কে ভেবেছিল! মেমদের সংসার করার একটা দিকই আমরা জানতাম, ভারি ঝাড়াঝাপ্টা তাদের সংসার। এবার সায়েব-মেমদের ৬০/৭০ বছরের পুরনো সমস্যাগুলো আমাদের টিটকিরি দিচ্ছে। বিলেতে মাইনে করা কাজের লোক বলতে মধ্যবিত্তদের মধ্যে যাদের অবস্থা ভালো, তাঁরা হয়তো অনেক তোয়াজ করে একজন হোল-টাইমার রাখতেন। বলা দরকার তার আলাদা ঘর, তার মেঝেতে কার্পেট, দেওয়ালে বসানো টিভি চাই। নইলে রোজ, কিংবা সপ্তাহে তিনদিন কয়েক ঘণ্টা কাজ করে তারা চলে যেত। তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে হত, ভালো টাকা দিতে হত। এখন শুনি তাও পাওয়া দায়। এবং আমাদেরও সেই অবস্থা হতে বেশি দেরি নেই। ঘরের কাজকেও সম্মান দিতে শিখতে হবে।

সমস্ত জীবনযাত্রার প্যাটার্ন আমাদেরও বদলাতে হবে। রান্নাঘরেই সারাদিন কাটালে তো চলবে না। বাইরে চাকরি না করলেও, ঘরেই মেলা অন্য কাজ থাকে।

বাধ্য হয়ে খাওয়া-দাওয়াগুলোকে সংযত ও সঙ্কুচিত করে সময় ও স্বাস্থ্য উভয় রক্ষা করার ব্যবস্থা হল। আমাদের দুবেলা পেট ভরে খেয়ে

সাবেক পরিবারে ঠাকুরঘর, লক্ষ্মীর পাঁচালী, নারায়ণের সিংহাসন থাকবেই

অভ্যাস ছিল। আপিস-যাত্রীদের জন্যেও সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে ডাল তরকারি মাছের ঝোল দিয়ে ভাত রেঁধে দিতে হত। সায়েবদের মতো দিনে একবার পেট ভরে খাওয়া আর বার দু-তিন হাল্কা পুষ্টিকর খাওয়াই যথেষ্ট। একক পরিবারে তার সুবিধাও বেশি। হজম করার সুবিধাও হয়। যৌথপরিবার ভেঙে যাওয়াতে স্ত্রী স্বাধীনতার নতুন বিস্তার তো হয়েছেই; উপরন্তু রন্ধনপ্রণালী অনেক আন্তর্জাতিক ও যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। ভিটামিনের কথা জেনে গেছি। শুধু তাই নয়, রোজ একটা চিনিমোড়া বড়ি, কিছু কাঁচা স্যালাড আর যখনকার যে স্থানীয় ফলটা ওঠে, সেই সবের গুণগান করে করে, নিজেদের এবং বাড়ির সকলকে অভ্যস্ত করিয়েছি। এ যুগের বাঙালী ছেলেমেয়েরা পাচকবিহীন সংসারে মানুষ হয়ে, দিব্যি তাগড়াই শরীর আর মাথায় লম্বা হচ্ছে। বুড়োরা ৮০ বছর না পুরলে বুড়োই হতে চায় না। যৌথপরিবারের নরম বাসায় এসব সম্ভব হত না। এসবকে আমি অগ্রগতি বলি। পরের উপর নির্ভর করার অভ্যাসটিও অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছাড়তে হয়েছে। যাদের উদয়াস্ত কাজ করতে হয়, তাদের ফাঁকা গলাবাজি করার ফুরসৎ থাকে না। তাছাড়া নিজেরা খাটলে তবে খাটুনিকে সম্মান দেওয়া যায়।

তবু কিছুতেই মধ্যবিত্ত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। পিছনে অর্থবল না থাকলে শুধু গুণ দিয়ে কিছু হয় না দেখছি। গুণগুলোকেও ধনীরা টাকা দিয়ে কিনে রাখছে। তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার যে মনোবল দরকার তাও আমরা হারিয়েছি। নিজের আত্মীয় বন্ধুদের নিন্দা করি, দেশটাকেও আর ভালোবাসি না। কই আমাদের কবিরা তো কেউ দেশপ্রেমের গান লেখেন না! সায়েবদের বিরুদ্ধে তো অনেক লেখা হয়েছিল, এবার নিজেদের অধঃপতনের বিরুদ্ধেও একটু লিখুক। নতুন সমবায় গড়ে উঠুক।

মন্দের মধ্যে নাকি ভালোর বীজ থাকে; শাপে নাকি বর হয়। যৌথপরিবারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক নিয়মও ভেঙে পড়েছে। সামাজিক জীবন বলে আমাদের কিছু নেই। নাচ গান চলচ্চিত্র খেলাধুলো ভোট গণনা দিয়ে সমাজজীবন তৈরি নয়। যে সমাজের নিজের

পায়েই জোর নেই, তার আবার জাতীয় জীবনের উপর প্রভাব থাকে কি করে তাই আমার মাঝে মাঝে সমাজ-সমবায়ের কথা মনে হয়। সে-ই হল নতুন যুগের যৌথপরিবার। যারা আমাদের ঘিরে থাকে তারাই আমাদের পরিবার। তাদের ভালোমন্দে আমাদেরও ভালোমন্দ। যথাসম্ভব স্বয়ংনির্ভর সমাজ-সমবায় একটা প্রতাপশালী যৌথপরিবারের চাইতেও বলিষ্ঠ হতে পারে। প্রয়োজনের তাগাদায় যেটা গড়ে উঠেছে সেটি দৈবাৎ যারা ঐ বংশে জন্ম নিয়েছে, তাদের নিয়ে গড়ে ওঠা যৌথপরিবারের চাইতে বেশি আগ্রহী ও পরিশ্রমী হবে, এটুকু আশা করা যায়।

আমি বিশ্বাস করি মধ্যবিত্তকে বাঁচাতে হলে একটা আধুনিক ধরনের যৌথ ব্যবস্থা না হলেই নয়। গৃহহীনদের বাদ দিলে, সমাজের সে স্তরে হস্তশিল্পী আর পেশাদার কর্মীরা আছে, তাদের মধ্যে চমৎকার একটা সমাজ ব্যবস্থা চালু আছে, যাকে যৌথবন্দোবস্ত ছাড়া কিছু বলা যায় না। অবশ্য এইভাবে বাপের পেশা উত্তরাধিকারসূত্রে ছেলেতে বর্তিয়েছে বলেই শেষ পর্যন্ত সর্বনাশা জাতিভেদ প্রথারও সৃষ্টি হয়েছিল। এই নিয়মকে চালাবার কথাও ভাবছিলাম না ; এর শেষ ফল ভালো হয়নি। তবু আমাদের বুড়ি ধোপানীর গল্প না বলে পারছি না। তার ৭টা নাতনির পর যখন ৮ নং জন্মাল, সে আনন্দের চোটে পুজো দিয়ে মস্ত এক ঠোঙা প্রসাদ আমাদের দিতে এল। কে যেন বলেছিল, 'আবার একটা মেয়ে হল বলে আনন্দ করছ! তাও যদি ছেলে হত!' ধোপানী তাই শুনে চটে লাল, 'তোমরা দিদি লেকাপড়া শিখে ভদ্দর হয়েছ, তোমাদের কথা আলাদা। মেয়ে হলে মাথায় হাত, বিয়ে দেব কেমন করে। ছেলে হলেও ভাবনা, লেকাপড়া শেখাতে হবে. চাকরি পেতে হবে! তাই নিয়েই থাক তোমরা! আমাদের একটা ছেলেই হক কি মেয়েই হক, তার মানে কাজ করার জন্য ভগমান আরেক জোড়া হাত পাঠালেন! তাই খুশি হয়ে আমরা তাদের কোল পেতে নিই!' এই বলে হাসতে হাসতে চলে গেল।

ঐ যে বলে গেল 'কাজ করার জন্য আরেক জোড়া হাত পাঠালেন ভগমান, তাই নতুন আগন্তুককে কোল পেতে নিই!' ওকথা আমি ভুলতে পারি না। তার মানে সকলের জায়গা আছে, কাজ আছে। বিশেষ করে আজকাল যখন গোটা দু-তিনের বেশি বিশেষ কারো ছেলেপুলে হয় না। দুঃখের বিষয় এতকাল আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ হাতের কাজকে ঘৃণা করে এসেছিল। কেরানী হবে, তবু ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হবে না। যে হাত দুটো ছাড়া আমাদের এক মিনিটও চলে না, তাকে আমরা অসম্মান করে এসেছি। কেরানীগিরি সহজে না পেলে বরং বাড়িতে বেকার হয়ে বসে বসে রোজ পাশের বাড়ি গিয়ে তাদের খবরের কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখব। কর্মখালির কর্ম মানে বড় জোর কেরানীগিরি। সুখের বিষয়, সে আনন্দও উঠে যাচ্ছে, খবরের কাগজের দাম দৈনিক ১ টাকা কি তারও বেশি। পুরনো কাগজ সের দরে যারা কিনে নিয়ে যায় তারা অন্তত ৩ টাকা দেয়। তাদের মালিকরা নিশ্চয় আরো বেশি টাকা খরচ করে। বলা বাহুল্য তারা কেউ মধ্যবিত্ত বাঙালী নয়। আড়ালে একজন অন্য প্রদেশের কর্মীকে আমরা কোটিপতি করে দিচ্ছি তবু নিজেরা হাতের কাজে হাত লাগাব না। খরচ বাঁচাবার জন্য অনেকে বিজলি কনেকশনের গলতি নিজেরা সারাই, মোটর সারাই, কাঠের আসবাব বানাই, একজন দুঃসাহসিক ছেলে দিব্যি সুন্দর গোসলখানার বন্ধ পাইপ আবার চালু করে দেয়। প্রায় সব্বাই গুঁড়ো সাবানে কাপড় কেচে, মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করতে জানে। অনেকেই দরজির কাজ জানে। জ্যাম জেলি বড়ি আচার আমসত্ত্ব ইত্যাদি তৈরি করা খুব শক্ত নয়। এসব আমি মোটেই অবান্তর কথা বলে, পাঠকদের ভোলাতে চেষ্টা করছি না। আমার বক্তব্য হল আমাদেরও দুটো করে হাত এবং মগজে বুদ্ধি আছে, তাহলে আমরা

রান্নাঘরেই কাটবে জীবনের বেশি সময়

যৌথ পরিবারে পুরুষদের অবসর অনেক বেশি

বেকার বসে থাকব কেন ? সমবায় গড়তে পারি না ?

আসল কথা হল রুগ্ণ আর ভগ্নদেহ ছাড়া কারো বেকার হবার অধিকার নেই। ঐ হাত আর মাথাই হল সাধারণ মধ্যবিত্তের মূলধন। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে সংসার চালানোও যেমন মহা সমস্যা হয়ে উঠেছে, তেমনি আলাদা আলাদা যে যার ঘরে বসে নিজের নিজের সাধ্যানুসারে কাজ করারও দিন গেছে। যৌথভাবেই কাজ করতে হবে। তবে পুরনো যৌথ পরিবারের নিয়ম চলবে না। তার ভিত ছিল কোনো একটা পৈত্রিক সম্পত্তির বা ব্যবসায়ের উপর গড়া। এখন সেসব আমরা খুইয়েছি। বড় ব্যবসাতে সুবিধা করতে পারিনি। অতএব নতুন নিয়মে যৌথব্যবস্থা নিতে হবে। পরিবার না হলেও কারবার হবে এবং সমবায়ের নিয়মে হবে।

পৃথিবীর সব পরিকল্পনার মূলে একটা অভাব মোচনের চেষ্টা থাকে। ভালো ব্যবসায়ীরা শুনেছি ঐ কথা মনে রেখে, নানা উপায়ে নতুন নতুন অভাবের সৃষ্টি করেন। তারপর সেগুলো মোচন করেন। তাতে ব্যবসা বাড়ে। গোড়ায় ঐ অভাব বোধটুকু থাকলে, তবে ব্যবসার ভিত্তি স্থাপন করা যায়। আমাদের জীবন এখন অভাবে ভরতি। কতক খাওয়া পরা বাসস্থানের সেই পুরনো চাহিদা, যা একক পরিবারেও মেটানো যায়। বাকি অভাব আমাদের সামাজিক জীবনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেরা তৈরি করেছি। সেগুলো মেটানো তত সহজ নয়।

সে সমস্যা আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের একান্ত নিজস্ব। বড়লোকরা টাকা দিয়ে তাঁদের সব সমস্যা মিটিয়ে ফেলেন। মনে পড়ছে বেশ কিছু কাল আগে একজন ধনী ব্যবসায়ী আমার ডাক্তার স্বামীকে এক থলি টাকা দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এই দিয়ে আমি সব কিনতে পারি, এমন কি ভগবানকেও।' আমার স্বামী বলেছিলেন, 'সব পারলেও উটি পারবেন না আর এমন সব ব্যথা-যন্ত্রণা আছে, তাও সারাতে পারবেন না।' রুগী টাকাগুলো তুলে ফেলে বিষণ্ণ মুখে বলেছিলেন, 'তা সত্যি।' তবে আমাদের অমন সঙ্গীন অবস্থা নয়। আমাদের এন্তার ছোট ছোট অভাব যা রোজগারের টাকা বা অধীত বিদ্যা দিয়েও মেটাতে পারছি না। আমাদের ছেলেমেয়েরা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত, অভাব শুধু মূলধনের আর ব্যবস্থাপনার। নতুন যৌথব্যবস্থার উদ্দেশ্যই এই দুটি অভাব মেটানো, যেমন যৌথপরিবারের সাধারণ তহবিলে আর ঠাকুরদাদের অভিভাবকতায় এক কালে মিটত। একেই আমি সমাজ-সমবায় নাম দিয়েছি।

প্রথম কথা এত লোকের কখনই আপিসে চাকরি হতে পারে না। সেখানে পরীক্ষার ফল দেখে (এবং পারিবারিক ব্যবস্থাপনায়) লোক নেওয়া হয়। ভালো ছাত্রছাত্রীরা যাক সেদিকে। বাকি ৭৫% এর বি-এ, বি-কম্‌ও দরকার নেই। অন্তত আমার সমবায়ের জন্যে তো নেই। দশম শ্রেণী দিয়েই বেশির ভাগের চলবে। তারপর হাতেনাতে কিছু কাজ শিখে নিলে ভালো। আমাদের উদ্দেশ্য সাংসারিক জীবনের অভাব

অসুবিধা দূর করা আর সেই সঙ্গে বেকারত্ব ঘুচনো। এর চেয়ে বড় তাগাদা মধ্যবিত্ত জীবনে আর নেই।

এমন সমবায়ের পরিকল্পনা নিতান্ত আকাশকুসুমবৎ নয়। শান্তিনিকেতনের আর কলকাতার উপকণ্ঠের কোনো কোনো পাড়ায় এর সূত্রপাত দেখতে পাচ্ছি। মানুষের প্রথম দরকার বলতে আমরা বলি খাওয়া, তারপর পরা। বেশ কিছু অভাবী মধ্যবিত্ত পরিবার অসুবিধায় পড়ে, বাড়ির মতো রান্না বাইরের কয়েকটা পরিবারে সরবরাহ করে সংসার চালাচ্ছেন। উভয়েরই সমস্যা মিটছে। চাকরেদের তেতে পুড়ে এসে রাঁধতে হচ্ছে না; হাটবাজার থেকে মাছ কোটা, মশলা বাটা, উনুন ধরানো, কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে না। মাইনে পেয়েই প্রতি মাসের খাই-খরচাটা আর র‍্যাশন কার্ড থাকলে সেটি ধরে দিলেই হল। স্বাস্থ্য রক্ষাও সমস্যাভঞ্জন, দুই-ই হল। অন্য পরিবারটির অর্থসমস্যা মিটল; বেকারত্ব ঘুচল।

শুধু রান্নাঘর নয়; চাকরে মা-বাপের ছোট ছেলেমেয়ে আগলাবারও এইরকম ঘরোয়া ব্যবস্থা হতে পারে। তাদের তদারকির জন্য মাসের গোড়ায় কিছু দিয়ে একজন গিন্নিবান্নি গোছেরই হক, কি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্না কমবয়সী মেয়েই হক, তাঁর হাতে এ কাজের ভার দিয়ে দেওয়া যায়। ধরে নিচ্ছি সকলেই খানিকটা শিক্ষিত।

এর পিছনে একটা ব্যবস্থাপনা অবশ্যই দরকার। সমবায়ের জন্য চেনাজানা, বন্ধু ভাবাপন্ন বেশ ক'জন সদস্য চাই। তাঁদের এক বাড়িতে না হক, এক পাড়ায়, কিংবা হাঁটা পথের মধ্যে বাস করা চাই। নিয়মিত সদস্য চাঁদা দিয়ে সমিতিটিকে চালু করে নেওয়া উচিত। পরে যখন সব বিভাগ স্বয়ংনির্ভর, এমন কি লাভবান হয়ে উঠবে, তখনো চাঁদা দেওয়া, খাতায় নাম লেখা সদস্য ছাড়া কাউকে বড় একটা নেওয়া ঠিক হবে না। তবে কাজ শেখাবার জন্য মাইনে দিয়ে বাইরের শিক্ষক রাখা যায়, যতদিন না সদস্য কর্মীরা দক্ষ হয়ে ওঠেন। সেলাইয়ের কাজ; কাপড় কাচা ও ইস্ত্রির কাজ; বিজলির কাজ; পাম্পের ও পাইপের কাজ; কাঠের কাজ; গাড়ি মেরামতির কাজ; চুলকাটার সেলুন; নিজেদের সাইকেল, রিকশ, ইত্যাদির ডিপো; যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহের জন্য সমবায় দোকান। ছেলেমেয়েকে স্কুলে ভরতি করার সমস্যারও নিষ্পত্তি হয়, নিজেদের অনুষ্ঠান থাকলে পর। তবে আজকেই সবটা হয়ে উঠবে না; তবে দেখতে দেখতে আজ গড়িয়ে আগামী কালে পৌঁছবে। কেবলমাত্র ইচ্ছুক সদস্য নিয়েই এইরকম সর্বাঙ্গীণ সমবায় গড়তে হয়। যাদের ভালো লাগে না তারা না-ই বা এল।

ইদানীং সব সমস্যাকে ছাপিয়ে উঠেছে ছেলেমেয়েকে স্কুলে ভর্তি করা এবং তারপর পরীক্ষার জন্য তৈরি করা। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের প্রায় নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে উভয়ই। অথচ বহু শিক্ষক শিক্ষিকা ঐরকম পরিবেশ থেকেই এসেছেন। তার মানে প্রয়োজনটা আর তা মেটানোর উপায়টা, দুই-ই আমাদের হাতের মধ্যে রয়েছে। আমার মনে হয় আজকাল দুর্নীতির এত প্রসারের প্রধান কারণ হল বাড়িতে যদি বা মা-ঠাকুমা দুটো নীতির কথা বলেন, স্কুলের পাঠ্য তালিকা থেকে তাকে বিষবৎ বর্জন করা হয়েছে। কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের শিক্ষার কথা হচ্ছে না। তা ছাড়াও মানবধর্ম বলে একটা জিনিস আছে, যা ভালোমন্দের ভেদ শেখায়; ক্ষমা, দয়া, পরিশ্রমের মূল্য শেখায়। কোনো স্কুলে আজকাল তা-ও শেখায় না। তার ফলে জগৎ-জোড়া দুর্নীতির ঢেউ উঠেছে। তারও একটা ওষুধ পাওয়া যায়। কোনো সরকারী ব্যবস্থা হবে না নিঃসন্দেহে, কিন্তু যৌথপরিবারে যেমন আপনা থেকেই ছেলেমেয়েরা পারিবারিক নীতিগুলো রপ্ত করতে পারত, এক্ষেত্রে নতুন যৌথব্যবস্থায় স্কুলের শিক্ষা আর বাড়ির শিক্ষায় কোনো বিরোধ না থাকাতে, আদর্শগুলো আরো জোরালো হয়ে উঠবে।

হঠাৎ মনে হতে পারে আমি আকাশকুসুমের চাষ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে শুধু ঘরকন্নাটুকু নিজের দায়িত্ব মনে করে, বাকি সব সমস্যা সরকারের হাতে তুলে দিলে দেশের ও দশের মঙ্গল হবে না। মঙ্গল যে হবে না, তার প্রমাণ সব ক্ষেত্রেই প্রকট। আমরা তো আর গুণ বা বিশেষ কর্মক্ষমতা দেখে কোনো ব্যবস্থা নিই না, এমন কি সরকার তৈরি পর্যন্ত ভোটের জোরে করবার চেষ্টা করি। কিন্তু সম্ভব হলে আত্মীয়বন্ধু পাড়া-প্রতিবেশী মিলে ছোট ছোট যৌথব্যবস্থা, যাকে আমি সমাজ-সমবায় বলেছি, তা গড়ে তোলা যায়। সে-ই হল যৌথপরিবারের একমাত্র যুক্তিযুক্ত উত্তরাধিকারী। একাধিপত্যের দিন গেছে। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে কর্মক্ষম হয়েছে, কারো আদেশ মেনে আর সাবালকরা চলতে রাজি হবে না। পুরনো যৌথপরিবারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব এবং অযৌক্তিকও বটে।

ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন পরিবারের অসুবিধা এবং নিরাপত্তার অভাবও দিনে দিনে প্রমাণ হচ্ছে। কতটুকু দরকার মানুষের ? একটু ভালো খাওয়া-পরা; থাকবার একটা নিরাপদ আশ্রয়; ছেলেপুলে মানুষ করার ও শিক্ষা দেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা; সাধারণ মানের ছেলেমেয়েদেরও নিজের নিজের স্বাভাবিক শক্তি অনুসারে নানা বৃত্তি অবলম্বনের পথ করে দেওয়া। পাখিরাও তো এটুকু করে। বাচ্চাদের উড়তে শেখায়। সরু ডালে বাসা করে যেখানে কাঠবেড়ালিও উঠতে পারবে না। তেমন হলে, কাছাকাছি ঝাঁক বেঁধে থাকে, যাতে পরস্পরকে সাহস দিতে পারে। কিন্তু কক্ষনো একই বাসায় দু-জোড়া পাখি থাকে না। দু-জোড়া ছেড়ে আমরা বহুজোড়া এক বাড়িতে থেকে তার সুখ দুঃখ দুই বুঝেছি। এবার পাখিদের দেখে আমাদের শিক্ষা হক। ■

ছবি : অরুণ ঘোষ
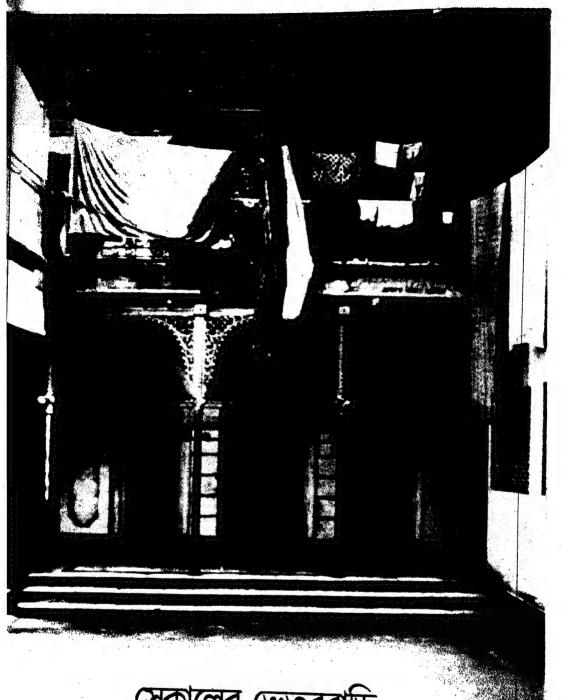
সেকালের ভেতরবাড়ি

কল্যাণী দত্ত

আমার কোন বন্ধুর ছেলে এক সময় তার মাকে বলেছিল—"বল কি ! সব সময় তোমাদের বাড়িতে বিশ-তিরিশ জন লোক থাকতই ? আবার কখনও চল্লিশ পঞ্চাশ জন হতো ? বাব্বা, ক্লাব না হোস্টেল ! অথচ তোমার দাদু তো ছিলেন অধ্যাপক !" খুব সত্যি কথা । কিন্তু পঞ্চাশ ষাট বছর আগে এইরকম মানুষ বেশ কিছু ছিলেন বই কি ! মধ্যবিত্ত ঘরে যা নিজের চোখে দেখেছি আর কানে শুনেছি সেইরকম দু'চারটে ঘরোয়া কথা বলার চেষ্টা করি—যা ওলোটপালোট হয়েও কিছু ছাপ রেখে গেছে স্মৃতির ভাঁড়ারে ।

বঙ্কিমী যুগ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সাহিত্যে অনেকেই যা লিখেছেন তার এক বড় অংশে একান্নবর্তী পরিবার তার ফুল ও কাঁটা দুই নিয়েই বিরাজ করছে । গল্প ছাড়াও সেখানে সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি, স্বদেশীয়ানা, প্রেম, ধর্ম সবই আছে। আমি তাই সেদিনের এক ধরনের অলস জীবনের অস্পষ্ট কিছু ছবি ফিরে ফিরে দেখার চেষ্টা করছি ।

কলকাতার যৌথ পরিবার অনেক সময় একটি বাড়িতে আবদ্ধ থাকত না, প্রায় গোটা পাড়া জুড়ে শেকড় গেড়ে বসত । সবাই সবাইকার হাঁড়ির খবর রাখত, সুখে দুঃখে ছুটে আসত, নিন্দে মন্দ, ঝগড়াঝাঁটি, কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি সবেরই ভাগাভাগি ছিল । সুগন্ধ বা সৌখিনতা ছিল না, তবে একটা অকপট, অমার্জিত রূপ ছিল । অধিকাংশ পরিবারের কর্তারা মাস গেলে কিছু টাকা গিন্নির হাতে ধরে দিয়ে বাকী সময় সাংখ্যদর্শনের পুরুষের মত আড়ালেই থাকতেন । গিন্নিরা কি শীত, কি গ্রীষ্ম রাত চারটেয় উঠে চৌবাচ্চার বাসি জলে স্নান করে, চুলে ঝুঁটি বেঁধে, তুলসীগাছে জল দিয়ে ঠাকুরঘরে একটা প্রণাম সেরে রান্নাঘরে আসতেন । তখন ভোর পাঁচটা বাজত, বেরোতেন আন্দাজ দুটো । তারপর ঠাকুরঘরের পালা সাঙ্গ করে বেলা আড়াইটে তিনটের আগে তাঁদের ভাত খাওয়া ঘটত না । আমাদের পাড়ার কোনও এক বাড়ির নাইবার ঘরে সত্যি সত্যি পাত্‌কো (পাতকুয়ো) দেখেছি—মুখে তার মস্ত পাথরচাপা । শুনতুম বেম্মদত্তিরা সেই পাথরটা মধ্যে মধ্যে তোলার নাকি চেষ্টা করত ! ওদিকে উঠোনে ভোর থেকে ছর্ ছর্ করে জল পড়ত কল থেকে, পাশেই মস্ত চৌবাচ্চা—তার পাড়ে সারি সারি কলাইএর বাটিতে কর্তাদের নিম বা পেয়ারা দাঁতন কিংবা অষ্টবজ্র মাজন । পরে এলো 'কলিনোস' টুথপেস্ট । মেয়েরা ব্যবহার করতেন তামাকের গুল বা ঘুঁটের ছাই । ছোটদের দল বাঁ-হাতে তেল-নুন কিংবা খড়ি-ফিট্‌কিরি নিয়ে হেলেদুলে বহুক্ষণ ধরে দাঁত মাজতো । তারপরে খাবার ঘরে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়েয় বসে দু'খানি লুচির সঙ্গে আলু-পটল-কুমড়োর ছেঁচকি, একটু সুজির মোহনভোগ কিংবা দুটি নারকোল নাড়ু খেত । বয়স্ক ছেলেরা বিছানায় শুয়ে ছটা নাগাদ চা খেতেন । তারপরে ধীরে সুস্থে মুখটুখ ধুয়ে খান দু'চার অতি ছোট ফুলকো লুচি ও ভাজাভুজি দিয়ে প্রাতরাশ সারতেন। জামাই এলে কিংবা ছুটিছাটার দিনে কচুরি সিঙ্গারা ইত্যাদি হরেকরকম নোন্‌তার বাহার খুলত। মেয়েরা বাড়িতে মা-দিদিমার কাছেই রান্না শিখতেন, তবু কোন কোন বাড়িতে উপলক্ষ বিশেষের জন্যে রান্নার বইও ছিল। তার মধ্যে বিপ্রদাস মুখুজ্যের "পাক-প্রণালী" আর "মিষ্টান্নপাক"-ই ছিল সেরা । বারো.মাস মাছ ভাত সবার জুটত । জামাই, কুটুম এলে তবেই মাংস কাঁকড়া আসত । ডিম খাওয়ার চল কম ছিল, আর তখন ডিম বলতে ছিল শুধু হাঁসের ডিম । মুরগীর ডিম, মাংস ছিল নিষিদ্ধ । মাছ নিয়ে রান্নার ঘটাই শুধু নয়—মাছের তত্ত্ব, মাছবরণ এসবও ছিল । বিশেষ বিশেষ শুভকর্ম মাছ ছাড়া চলত না । বেলা আটটা না বাজতে বাজতে আপিসের বাবুদের ভাতের তাড়া শুরু হত। যে সব বাড়িতে রাঁধুনীবামুন থাকত সেখানেও বউ-মেয়েরা তটস্থ থাকতেন সেই সময়টা । বাবুরা ('সকড়ি' তখুনি পেড়ে না নিলে এঁটো চণ্ডী আপিসে গিয়ে কাজ ভণ্ডুল করে দিতেন) খেয়ে উঠবেন, কেউ হাতে জল দেবে, গামছা এগিয়ে দেবে । পান মশলা, রুমাল এসব হাতে হাতে যোগান দেওয়া, পালিশ করা জুতো এগিয়ে দেওয়া ছিল নিত্য নৈমিত্তিক কাজ । কোন কোন বাড়ির বউদের আবার আরশিও এগিয়ে দিতে হত—টেরি ঠিক করে নিয়ে পানের ডিবে হাতে দুর্গানাম করতে করতে বাবুরা বাড়ির বাইরে পা দিতেন । তারপরে আসত ইস্কুল কলেজে পড়ুয়াদের খেতে বসার পালা । কুচোকাচাদের, রুগীদের, বুড়োদের মর্জিমাফিক খাইয়ে বাড়ির মেয়ে বউদের পালা শুরু হত । তারপরে ঝি-চাকরদের ভাত বেড়ে দিয়ে বাড়ির গিন্নিরা বেলা আড়াইটে আন্দাজ যখন খেতে বসতেন তখন প্রায়ই মাছ তরকারি কম পড়ে যেত । পড়ে থাকত ছ্যাঁচড়ার কাঁটা, চচ্চড়ির ডাঁটা, পাত্‌লা ডাল ও পাথরের খোরায় পুঁটি বা মৌরলা মাছের তলানি অম্বল । তাই দিয়ে তৃপ্তি সহকারে খেতেন তাঁরা । শুনেছি কোনো কোনো বাড়ির গিন্নিরা এই সময় আনিয়ে নিতেন উড়িয়া দোকানের ফুলুরি । মায়ের রান্না আর বউ-এর রান্না নিয়ে বাংলায় অসংখ্য ছড়া চালু আছে । দু'ই বাংলার দুটি ছড়া তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলুম না । প্রথমটি এপার বাংলার, "লাউ করে হাউ হাউ কে রেঁধেছে ?/ আমি তো রাঁধি নি বাবা, বউ রেঁধেছে/ আহা, তাইতো অভাগা লাউ মধু হয়েছে ।" অন্যটি ওপার বাংলার ঢাকার,—"মায়ে রাইন্ধে যেমন তেমন, বুইনে রাইন্ধে পানি/ আবাগী যে রাইন্ধা রাখে চিনির টুকরা খানি ।" খাওয়াদাওয়ার পাট শেষ হলে বিশ্রামের জন্যে অবেলায় একটু শুতেন গিন্নিরা—কেউ বা একখানি নবেল হাতে, কেউ বা রামায়ণ, মহাভারত নিয়ে । কমবয়সী মেয়ে বউয়েরা দুপুরে গল্পগাছা করতে করতে সেলাইফোঁড়াই, নানারকম এমব্রয়ডারি, সলমা চুমকি জরির টিপ নিজেদের কাপড়ে বসাতেন এছাড়া। কুরুসের লেস খুঞ্চেপোষ চটের ও কার্পেটের আসন বুনতেন, রবিবর্মার ছবিতে কাপড় পরাতেন, মিলের শাড়ির পাড় জুড়ে জুড়ে বাক্সের ঢাকা, কাঁথা সেলাই করতেন । রঙিন সুতোর ফুলপাতার নক্‌শা করে টেবিল ঢাকা করারও রেওয়াজ ছিল । এখনকার মত ঘরে ঘরে উলবোনার চলন হয়নি । হাতের কাজের মধ্যে আরও ছিল কাগজের ফুলমালা তৈরি, ঝিনুকের কাজ, পুঁতির কাজ, মাছের আঁশ দিয়ে ছবি আর সাজি তৈরি ইত্যাদি । এর জন্যে বিয়েবাড়ির দেড়/ দু'মনি মাছের বড় বড় আঁশ খুব যত্ন করে ধুয়ে রাখা হত । কোনো বাড়ির মেয়ে বউয়েরা বসত দুপুরে তাস নিয়ে—গ্রাবু, বিন্তি এই

সব খেলত। কেউ বা বায়ো ঘুঁটির 'বাঘবন্দী' কিংবা কড়ি নিয়ে 'গোলকধাম' খেলতেন। তাদের অবসরের আর একটি কাজ ছিল সুপুরি কুঁচনো। পানসাজা হত সকাল বিকেল—কতরকমের দোক্তাজর্দার কৌটোই যে থাকত। আইবুড়ো মেয়েদের ওপর থাকত পান সাজার ভার। মায়েরা বলতেন চুন খয়েরের আন্দাজ থেকেই রান্নায় হাত খোলে! আইবুড়ো মেয়েদের একজন বুড়ো মাষ্টারমশাই এসে একটু একটু করে পড়াতেন 'সীতার বনবাস' আর 'মেঘনাদ বধ'। সকালবেলাতে এই পড়াশোনার পালা হত। বিয়ের জন্যেই এই একটু আধটু পড়ানোর চলন ছিল। তাই বই শেষ হতে না হতে ঘটকি এসে মেয়ে পছন্দ করত—পাকা দেখা, আইবুড়োভাত পর্ব শেষ করে বিয়ে হলেই বাপের বাড়ির পাট শেষ হত। এই বিয়ের জন্যেই একটু গান শেখানোরও চলন ছিল। সন্ধ্যেবেলায় গা ধুয়ে, চুল বেঁধে অল্পবয়সী আইবুড়ো মেয়েরা গান গাইত হারমোনিয়াম বাজিয়ে—"তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে" বা এই গোছের কিছু। আর দু'একখানা রামপ্রসাদী গানও শিখে রাখত। খুব কম বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গানের চর্চা হত। যারা 'চয়নিকা' থেকে নিয়মিত কবিতা আবৃত্তি করত অনেকেই তাদের পাকা/ জ্যাঠা/ বিবি মেয়ে আখ্যা দিতেন। গোঁড়া বাড়ির মেয়েরা থিয়েটার করার কথা তখন ভাবতেই পারতেন না—আমার ছোটবেলায় দেখেছি দিদিরা ঘরের দরজা বন্ধ করে 'বিদায়-অভিশাপ' ইত্যাদি আবৃত্তি করতেন অভিনয়ের মতন। আমি তাদের খুব খোসামোদ করতুম একটা পার্টের জন্যে। বিরক্ত হয়ে এক দিদি আমাকে আপাদমস্তক একখানি নীল শাড়ি জড়িয়ে শুইয়ে রাখলেন ও অভিনয়ের সময় "এই সেই বেণুমতী" বলে আমার দিকে দেখালেন। ব্যস্‌, বর্তে গেলুম।

চারটে বাজলেই গিন্নিরা উঠতেন—শুরু হত টুকিটাকি কাজ। ঝিকে দিয়ে ছাদ থেকে বড়ি, আচার বা আমসত্ত্ব নামানোর পর সেগুলো গুছোনো, রোগা ভোগাদের ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করা। প্রায় সব বাড়িতেই দু'একজন রোগাভোগা বারোমাস থাকত। আর বারোমেসের দলে থাকতেন ঘর-জামাই, ছেমুটে (কম বুদ্ধি) বুড়ো-বুড়ি শ্বশুর বা শাশুড়ি, গণ্ডা দুই কুচোকাচা। এঁটো ভাত খাওয়া কাপড় কেচে, গা ধুয়ে, সন্ধ্যে-প্রণাম করে আবার ঢুকতেন রান্নাঘরে। রাত দশটা পর্যন্ত চলত সেখানকার পাট। মেয়ে বউয়েরা দেখত দুধের ভাগ—কর্তার ও জামাইদের ক্ষীর, ছেলেদের আধঘন, আফিংখোরের দুধ ও কচি ছেলেদের পাতলা দুধ বাটিতে বাটিতে তুলে রাখতে হত। এরই ফাঁকে ফাঁকে বয়ে চলত বারব্রতের উপোসের ধারা কিংবা পালপার্বণের উৎসবের পালা। কুটনো কোটার খুব আদর ছিল মেয়েমহলে। ধারাল বঁটিতে আলুভাজা কোটা হত। আশ্চর্যরকম সরু সরু করে। থোড়, মোচা, ডুমুর, কাঁচকলা, এঁচোড় এসব কুটতে হত এমনভাবে যাতে আঙুলে দাগ না লাগে! গোটা বাঁধাকপি একহাতে ধরে পলকে কুচিয়ে ফেলতেন তাঁরা জিরে জিরে করে। এক
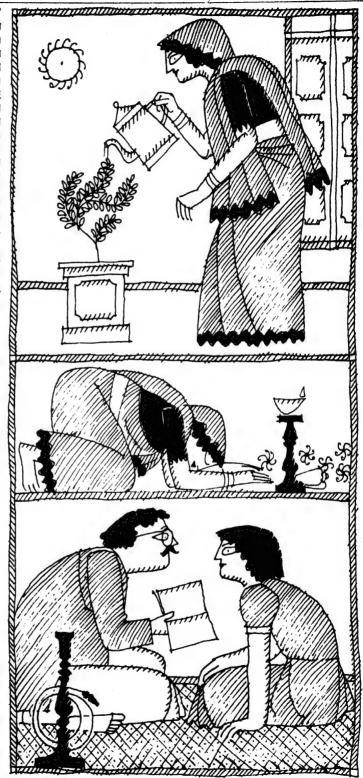
আলুরই কত রকমফেরের কোটার চলন ছিল—ঝোলের, ডালনার, চচ্চড়ির, ভাজার, আলাদা আলাদা হত, কোটা হত। কুটনো কোটার ওপরও ছিল কত ছড়া—"তুমি কোটো চালতা আর আমি কুটি লাউ/ গতরখাকী বউকে দাও এঁচোড় মোচার ফাউ।" কিংবা "তুমি কেমন বড়মানুষের ঝি/ তা কাঁচকলাটা কুটতে দেখে খোসায় বুঝেছি।" যৌথ পরিবারের ঝি-চাকরদের পরিবারের অঙ্গ হিসেবে দেখা হত। বেশি পুরনো ঝি-চাকরদের প্রতাপও খুব হত। বাড়ির ছোটদের শাসনের ও সহবৎ শেখানোর ভার তারা অনেকটাই নিজেদের হাতে তুলে নিত। তাবলে সোহাগেরও কমতি ঘটত না তাদের ব্যবহারে। আমাদের পরিবারে চল্লিশ বছর ধরে ছিল এমনই একজন। সবাইকার সে "লক্ষ্মণদাদা"। আমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরলেই নিজের পয়সায়, খেলনা, পুতুল, বাঁশি, খাবারদাবার কিনে দিত। ছুটিতে দেশে গেলে ফেরার সময় দেশ থেকে প্যাঁড়া, খাজা ও আরও কত মেঠাই আনত। তাছাড়া বিচি ছাড়ানো তেঁতুল, গাছের ফল, বাড়ির তৈরি আমচুর এইসব কত কি যে আনত! একবার সে মধুপুরের লোহার খেলনা এতো এনেছিল যে তারই দু'চারটে পঞ্চাশ বছর পরেও বাড়িতে থেকে গিয়েছিল! আমাদের পুরনো ঝি গিরিবালা এক গা গয়না পরে বাসন মাজত, বাটনা বাটত আর কথায় কথায় ছড়া কাটত। মেয়ে বউদের ডেকে ডেকে কাজও শেখাত—কত কাজ যে সে শিখিয়ে গেছে! তার কাছেই শিখেছি শুধু মাছ কুটলেই হয় না আরো কত কি চিনে জেনে রাখতে হয়, যেমন চিংড়ি মাছের পিঠ থেকে কালো সুতো বার করা, ইলিশের পেট থেকে সতীর কয়লা, বামুনের পৈতে, টিকটিকির ন্যাজ বার করা ইত্যাদি। মুড়ি আর খই ভাজতে জানত সে। যে ছেলের কথা ফুটতে দেরি হত তাদের মাকে গিরি বলত ভাজা খই মাটিতে পড়ার আগে লুফে নিয়ে ছেলেকে খাওয়াতে—ছেলের বোল ফুটবে তাড়াতাড়ি। নিকৃষ্ট জীবের প্রতি তার অহেতুক মমতা ছিল। ভাঁড়ারের আরশোলা, ইঁদুর মারলে সে দুঃখিত হয়ে বলত, "ঘরকন্নায় অমন ইঁদুর বাঁদর সবই থাকে গো!" মাকালীর পরেই ছিল তার মহারানীর প্রতি ভক্তি। ভিখারির দল সাধারণত রবিবারে আসত। তারা ছড়া কেটে আশীর্বাদ করত। মনে আছে এক হিন্দুস্থানী বুড়ি সুর করত—"সুহাগ-ভাগ বনা রহে/ বাল বাচ্চা ভালা রহে/ বাবুকা গদ্দী বড়া রহে।" ওদের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই গিরিবালা বকত, ভয় দেখাত যে ওরা চুরি করে নিয়ে যাবে। এক মাঝবয়সী শক্তসমর্থ ভিখারিনী বলেছিল, "আমি কি আজকের মানুষ গা? আমি হলুম গে বনেদী ভিখিরি। ওই মড়াঞ্চে মালা হাতে নই। গেরস্তের কল্যাণের জন্যেই আমাদের আসা।" বছরে একবার বদ্যিনাথ থেকে মিশিরজী আসত প্যাঁড়া আর মিছরি নিয়ে। পুরী থেকে পাণিগ্রাহী আসত বেঁটে লাল পাশবালিশের মত লম্বা থলিতে মহাপ্রসাদ আর গজা নিয়ে। ভুবনেশ্বর থেকে গর্গবটু আনত এলাচদানা, "কোরা" (সাদা শক্ত নারকোল নাড়ু) আর বিখ্যাত ঝাল মুড়কি।

আমাদের শোবার ঘরে না ছিল একটা খাট, না একটা আলমারি। ওই সব অতিথ-কুটুমকে নিয়ে প্রায় বিশপঁচিশ জন মেয়ে শোবে কি করে? বুড়িরা রাতে কেউ শ্বশুরের আমলের গল্প, কেউ দোল দুর্গোৎসবের, কেউ বা বৃন্দাবন কি সাবিত্রী পাহাড়ের গল্প বারে বারে বলতে চাইতেন। কাপড়চোপড় নিয়ে কোনো মহলই তেমন মাথা ঘামাত না। আমাদের জন্যে পুজোর সময় রাশি রাশি বঙ্গলক্ষ্মী কিংবা মোহিনী মিলের নেহাত সাদামাটা ধুতিশাড়ি আসত। তাঁতের দামী ধুতিশাড়ি 'এক চড়নের' অর্থাৎ একসঙ্গে চারখানা বোনা এলেও বাড়ির ছেলেমেয়েরা তা পেত না, কুটুম বাড়িতে পাঠানো হত সে সব। তাঁতের শাড়ির তখন এমন বাহার ছিল না—লালকালো পাড় এদিক ওদিক করে হয় 'গঙ্গাযমুনা' নয় 'সিঁথির সিঁদুর'। বাড়ির ছোটদের জন্যে জামা আসত সব একধরনের— কর্তার তরফের ছেলেমেয়েরা বা পিতৃহীন অন্যতর ছেলেমেয়েরা একই জামা পুজোর সময় পরত। তা নিয়ে কখনও কারুর মনে ক্ষোভ ছিল না। তখনকার বিয়েতে এ যুগের আদিঅন্তহীন শাড়ি সমুদ্রের দুইচার বিন্দু জলও ছিল না! খুব জাঁকের বিয়ে হলে দু'খানা বেনারসী, একটা করে ঢাকাই, শান্তিপুরী, নীলাম্বরী, টাঙ্গাইল বা ফরাসডাঙার সঙ্গে খান দু'চার বাগেরহাটের ডুরে—ব্যস্ এই ছিল ঢের দেওয়া থোওয়া। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ীদেবীর মুখে শুনেছি যে তাঁর ঠাকুমার (জয়পুরের মন্ত্রী সংসার চন্দ্র সেনের স্ত্রী) তিনটি বেনারসী তিনটি তামার ঘড়ার মধ্যে থাকত। একটি ছিল তাঁর নিত্যদিনের পুজার শাড়ি, অন্যটি ছিল বাড়িতে বিয়ের সময় জামাই কিংবা বউ বরনের শাড়ি, আর তৃতীয়টি ছিল জরিদার ভারী শাড়ি, সেটি বাইরে কোথাও যাবার দিনে পরতেন। বোম্বাই, মাদ্রাজী, ও পার্শী শাড়িরও চলন ছিল। তবে সে উঁচুমহলে। শীতকালে কাশ্মীর থেকে বেগুনী, কমলা, নস্যি ইত্যাদি রঙের ফুলদার গরম চাদর আনত কাবুলীরা। বাংলার ঘরে ঘরে এইসব চাদরকে তখন বলা হত "র্যাপার"। ফতুয়ার রেওয়াজ হবার আগে শীতে গায়ে দেবার জন্যে ছিল 'দোলাই' আর গরমের দিনে উড়ুনি। গেরস্তঘরে বিয়ের পর প্রথম বছরে নতুন জামাই পেত মাঝারি দামের একটি কাশ্মীরী শাল, তার পরের দু'বছর র্যাপার। চতুর্থবছরে পাড়ওয়ালা ভালো সুতীর চাদর। তখন ধারণা
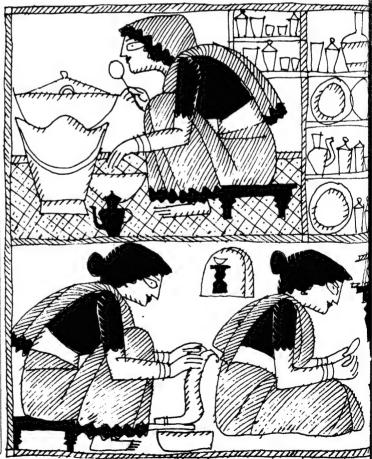
ছিল যে কারুকে কিছু দিলে তা চারবার দিতে হয়। কেন না চারবারের এই দান ছিল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগের প্রতীক। যেমন গঙ্গায় ডুব দিয়ে স্নান করার সময় চারটে ডুব দিতেই হত। এ সব ছিল মেয়েলি শাস্তর। যৌথ পরিবারে বারোমাসের আত্মীয় স্বজন ছাড়াও মাঝেমধ্যে আসাযাওয়ার 'লতাপাতার' জ্ঞাতিকুটুম্ব ছিলেন অনেক। আমাদের বাড়িতে এককালের ধনী দূর সম্পর্কের এক পিসিমা ফরাসডাঙ্গা থেকে আসতেন। তাঁকে আড়ালে বলা হত "ফরাসী পিসিমা"। নিরক্ষরা এই পিসিমা সুন্দর গান বাঁধতে ও গাইতে জানতেন। প্রথম দিনে খাওয়ার পরে তাঁকে পানের খিলি দেওয়াতে বলেছিলেন— "ওমা আমি কি ব্যাটাছেলে নাকি ? আমার জন্যে বাটা আনবি। নিজের চুন জর্দা নিজে নেব। আমাদের বউ খেটে মরে কিন্তু কাজের ঠাট জানে না—বড্ডো গেরস্তালি ভাব।" জলখাবারে লুচির সঙ্গে এ বাড়ির চিনি তাঁর চোখে ময়লা ঠেকায় তিনি মিশ্রী গুঁড়িয়ে দিতে বলেছিলেন, লুচির পাতে দিলেম চিনি/ মেঘের-কোলে সৌদামিনী। পিসিমা বলতেন, "তোদের পিসে বলেছিল কলকাতার বাবুদের
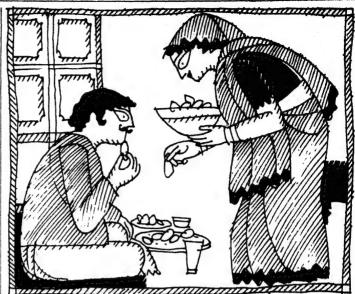
কেনাকাটার জায়গা তো মোটে তিনটি —আরমিনের (আর্মি অ্যান্ড নেভি), লেডেলার (হোয়াইটওয়ে · লেড'ল) আর আন্ডের সেনের দোকান। আর আমাদের চন্দননগরে গোটাটাই ঝলমলে বাজার—পয়সা ফেলতে জানলেই হয়। সম্পূর্ণ অন্য ধরনের আর একজন ছিলেন কাশীর পিসিমা—কোবরেজী টোট্‌কার একটি চলন্ত অভিধান। নিজে নিজে বহু তীর্থে ঘুরেছিলেন, সাধু দেখেছিলেন পেল্লায় পেল্লায়। উচিত অনুচিতের ব্যাখ্যা করতেন বলে আড়ালে তাঁকে বলা হত "বিধান পিসিমা"। ঝুলন পূর্ণিমার দিনে রাখী হাতে দলবেঁধে রাঁধুনী বামুনেরা আসত। টাকা, আধুলি সিকি ছিল তাদের বাৎসরিক পাবণী। পিসিমা বলতেন, "ওগো বউ, বামুনের হাতে কাটা পৈতে একটা করে ওইসঙ্গে ওদের দিও।" নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ বিধবা দুপুর বেলা চরকা ঘুরিয়ে সুতো কেটে যে পৈতে করেন তা দান করতে পারলে হবে অক্ষয় স্বর্গবাস এ ধারণা অনেকেরই ছিল। তবে তা জোটানো 'বাঘের দুধ' পাওয়ারই সামিল। আমাদের খুড়তুতো দিদি অল্পবয়সে বিধবা হবার পরে কাশীর পিসিমাই তাকে শাড়ি ছাড়িয়ে থান ধুতি পরালেন। বলতেন "নিষ্টে-কিষ্টে" না হলে কি বিধবা মানায় ?" তখন অন্য দিদিদের সবার খুব রাগ হয়েছিল। একবারও মনে পড়েনি যে পিসিমাকে এগারো বছর বয়সে বিধবা হয়ে থান ধরতে হয়েছিল। আমাদের ঠাকুর ঘরের পিদ্দিমে ছেঁড়া কাপড়ের সল্‌তে দেওয়া হত। বিধান পিসিমা বললেন, "ছিঃ ছিঃ বউ, ঠাকুরঘরে তুলোর সলতে দিতে হয়, কাপড়ের সল্‌তে অশুচি। পুরীর পাণ্ডাকে বলে দিও —একটাকায় এতো সল্‌তে দিয়ে যাবে যে সোমবচ্ছর চলবে। কাশীর নাগোয়ার পেল্লাদের মন্দির থেকে আদি কেশব অব্দি বিলি কেটে কেটে আমি সাধু দেখেছি। আমায় আর পূজো আচ্ছা শিখিও না বাছা।"

গেরস্তবাড়ির সদর উঠোন শুধু অতিথি কুটুম্বের জন্যে নয়, ফিরিওয়ালাদের জন্যেও খোলা থাকত। তাই সাড়া না দিয়েই আসত দুপুরে রেশমি চুড়িওয়ালী, পুরোনো কাপড়ের বদলে জাপানি কাপডিস, বাসনে নাম লেখাবেন ইত্যাদি। সন্ধ্যে হলে আসত কুলপী বরফ আর বেলফুল। খাঁটি ঘি, ঘট্‌কি, পুরনো ধাইমা, বষ্টুমী এদের সবার ছিল অবারিত দ্বার। প্রতি শনি-মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলায় আসত দাড়িওয়ালা "মুস্কিল আসান"। তার ঝাড়ন মাথায় বুলিয়ে সব রোগবালাই দূর করে দিত। পাঁচ পয়সায় সে আবার মৌলালীর দরগা থেকে জলপড়াও এনে দিত। তাঁতী বৌ আসত তার কাপড়ের গাঁটরি নিয়ে। বিকেল হলেই রাস্তার মোড়ে অবাক জলপান, নকুলদানা নিয়ে ফেরিওয়ালা আসত একপায়ে ঘুঙুর বেঁধে। আলুকাবলি ঘুগনিওয়ালার মাথায় থাকত মস্ত ঝাঁপ—একপয়সার আলুকাবলি আমরা জনাদুইতিন মিলে চেটে চেটে খেতুম পাতায়। চিনির লিচুওয়ালা, বুড়ির চুল, একপয়সার বায়স্কোপ, কাগজের ফুল বা বাঁশিওয়ালা—এদের জন্যে কত ছেলেমেয়ে যে পুজোর ঘরের জলচৌকি থেকে পয়সা চুরি করত! একান্নবর্তী কলকাতার গেরস্থালীর কথা কি যে বলি আর না বলি। দিদির শাশুড়ি বলতেন—"কথা কইতে জানলে হয়/ কথা শতধারে বয়।" তিনি ছিলেন কোন্নগরের মিত্তির বাড়ির মেয়ে, শ'য়ে শ'য়ে বড়ি দিতে আর তিনমাস ধরে আমসত্ত্ব দিতে মজবুত। আমের সময়ে রোজ একশো দেড়শো আম চিনি দিয়ে ফুটিয়ে ছেঁকে, ঘি-মাখা পাথরে, কাঁসায় বা কাঠের পরাতে, কলাপাতায়, শেতল পাটিতে, নানারকমের কাগ্‌তাড়ুয়াদের জন্যে একখানা "এঁটোসত্ত্ব" প্রত্যেকদিন দেবার নিয়ম ছিল। ছাঁচে আর অশথ্‌ পাতায় ঢেলে দেওয়া হত কোনটা একপাটে, কোনটা বা তিনপাটে। তাঁদের আমসত্ত্ব

আমাদের বাড়ি এলে জ্যাঠতুতো এক দাদা বলতেন, "অটম্ স্পেশাল", সাক্ষাৎ শরৎশশী (দিদির শাশুড়ির নাম) ব্রান্ড।"

পোষমাসের পিঠে পরবটাও ছিল খুব জমকাল। সেইকটা দিন ঘরে ঘরে মেয়েদের চুল বাঁধার সময়ও মিলত না যেমনটি ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর কবিতায় বলে গেছেন ঠিক তেমনই। খুব গরিবের ঘরেও সেদ্ধপিঠে, সরু চাকলি, পাটিসাপ্টা, পায়েস আর অন্যরকম পিঠে হত সেকথা আমরা কত ছোট গল্পে পেয়েছি। বিশেষ করে মনে পড়ে বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' গল্পটি। ভূত চতুর্দশীতে চোদ্দ শাক, শীতলা ষষ্ঠীতে গোটাসেদ্ধ, পাড়াশুদ্ধ ভাগ করে খাওয়া হত। এই খাওয়া নিয়ে গল্পের আর ছড়ার টুকরোও আছে। বাউনি (মকর সংক্রান্তির আগের দিনের নাম) সংক্রান্তি আর পয়লা মাঘ এই তিনদিনের পিঠের ভাগ শেয়ালকেও খাওয়াতে হত! শহর কলকাতায় শেয়াল দুর্লভ—তাই পাঁদাড়ের পথের কুকুরকে খাওয়ান হত। ঘরে ঘরে সে ক'দিন মেয়েদের রান্নার পাট প্রায় হতই না, পিঠে খেয়েই পেট ভরত। যে যত খেতে পারবে তাকে তত দিতে হবে, এই নিয়ম ছিল। কেন না বাড়ি বাড়ি পিঠে খাবার নেমনতন্ন হত। আর ছিল বারমেসে আচার, চাটনি, বড়ি করার চলন। গেরস্তপোষা দু'একটা জিনিস সব ঘরেই করে রাখা হত—যেমন আমসি, আমচুর, রসকুল, কুলচুর, ছড়া বা গোলা তেঁতুল। তাছাড়া আমড়া, জলপাই, চালতা, করমচা লঙ্কা এঁচোড়, সজনে খাড়া ওল এই সবের আচার চাটনি হত। সরষের তেল বা সামান্য গুড় দিয়ে খোরাখোরা। এ সব জিনিস হত আর এ সবের টাক্না দিয়ে বেড়াল ডিঙুনো ভাত গলায় নামত। ডাল ভিজিয়ে বেটে যে কত রকমের বড়ি দেওয়া হত—পোস্ত বা হিং মিলিয়ে তাতে কত বৈচিত্র্যও আনা হত! আমাদা, কিস্‌মিস্, কাঁচা আম দিয়ে 'এ' কেলাসের চাটনি ও জেলি করা হত। এগুলোকে বলা হত বিলিতি আচার। রুগীদের জন্যে নানারকমের মোরব্বা হত—কলা বেল (যাতে বিচি ও আঠা হয় না), আমলকি, গুলকন্দ ইত্যাদির। গুড়ের জন্যেই নাকি গৌড়দেশের খাতির। গুড়ে ঘোষ, গুড়ে মুখুজ্যে বলে দু'চারটি পরিবারের সুনাম ছিল তাঁদের অপরিসীম গুড় ভক্তির জন্যে। শীত পড়তেই পয়রা ও নলেন গুড়ের গন্ধ নাকে আসত। ঠাণ্ডা জাঁকিয়ে পড়লে তবেই ভাল পাটালি হত। কুটুম বাড়িতে নাগরীভরা রসালো খেজুরগুড়, লালকালো পাটালি, সরাগুড়, খুরি গুড়, নতুন গুড়ের মুড়কি মোয়া আর সন্দেশ পাঠাবার রেওয়াজ ছিল সবারই। বেলেঘাটার খালে নৌকা বোঝাই হাজার হাজার কমলা লেবু আসত সিলেট থেকে—সেগুলো কিন্তু কুটুমবাড়ির তত্ত্বে পাঠাবার মত জাতে ওঠে না—তাই বাড়ির ছোটরা ফেলাছড়া করে খেতে পেত।

কুটুমেরা তত্ত্বে উজ্জ্বল কমলা রঙের বড়ো বড়ো লেবু, পাতাশুদ্ধ ফুলকপি, কড়াইশুঁটি এইসব না পেলে ভারী ব্যাজার হতেন। বছরে দশবারো রকমের তত্ত্ব পেয়েও তাদের মন উঠত না। তীর্থ করে এলেও কুটুমবাড়িতে গয়ার পাথরের নয়তো ক্ষিতুরে বাটি, কটকি কিংবা জাজপুরি কাঁসি দিতেই হত। সিধু ঘটকের মুখে শোনা একটা ছড়া মনে পড়লো—"জষ্টি মাসে আম কাঁঠাল/ আষাঢ় মাসে ইলিশ/ ভাদ্দর মাসে তালের তত্ত্ব/ পুজোয় কুটুম পালিশ/ অঘ্রাণ মাসে শাল দোশালা/ পোষে গুড়ের নাগরী/ ফাগুন মাসে দোলের তত্ত্বে পিচ্‌কিরি আর পাগড়ি।" রসরাজ অমৃতলাল লিখেছিলেন—"কলকেতায় কোনো মেয়ের বাপ জামাইবাড়িতে পোষড়ার তত্ত্বে একেবারে দশবারোটা খেজুর গাছ আস্ত তুলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সব গাছগুলোর গলা ধরে এক একটা জ্যান্ত শিউলি (যে রস পাড়ে) ঝুলছিলো।" এমন নৈলে—এই শহরে জন্মে দীর্ঘজীবন নিয়ে আমরা তো এখানেই আছি তবু মনে হয় পুরনো কলকাতার কতটুকুই বা জানি! হাটখোলার যমদত্ত বলতেন, "সন্দেশ যত ছোট হচ্ছে বাঙালীর মাথার ঘিও তত কমছে।" খাস কলকাতায় সন্দেশ কিনতে গিয়ে একবার কি দুঃখ ভোগ করেছিলাম তা বলি শুনুন। অনেকদিন আগে দিব্যি আহ্লাদ করে বেলেঘাটা থেকে দর্জিপাড়ায় ছুটে গিয়ে এক বিখ্যাত ময়রার দোকানে বলেছিলুম দুদিন রেখে খাওয়া যায় এমন ভালো সন্দেশ দিতে। বুড়ো কর্তা হাঁ হাঁ করতে করতে এসে আপাদমস্তক আমাকে দেখে বলেছিলেন, "কোলকাতার কোথায় থাকেন? বলছেন দু'দিন রেখে আমাদের সন্দেশ খাবেন! ঘন্টা দু'তিন গেলেই এর স'দ, গন্ধ বদলে যায়। এ জিনিসটি থির হয়ে বসে তোকাতুকি খেতে হয়—একটু চেখে দেখুন দিকি, ওই গরম কড়া নেমেছে। মুখে না রুচলে হরি ঘোষ, ভীমঘোষ পেরিয়ে গুহদের কালীবাড়ী অবধি কান ধরে নিয়ে যাবেন।"

এবার যৌথ পরিবারের দু'জন অধ্যাপকের কথা বলে আমার স্মৃতির ঝাঁপির ডালা টেনে দেবো। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দেশ মুর্শিদাবাদের জেমোকান্দী। প্রতিবছর সেখান থেকে দলবেঁধে লোক আসত কলকাতার কালীঘাটে পুজো ও গঙ্গা স্নান করতে। তাঁর নাতি লালগোলার ধীরেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন যে একবার এইরকম জনা চল্লিশ অতিথিদের কাপড় শুকুতে দেওয়া ছিল বারান্দায়। পড়শীদের দুষ্টু ছেলে মজা দেখবার জন্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এই লঙ্কাকাণ্ডের খবর শুনেও অধ্যাপক নির্বিকার ছিলেন। দুষ্টের দমন না করে তিনি বিপন্ন অতিথিদের ব্যবস্থা করেছিলেন। ক্ষতি তাঁকে বিচলিত করে নি। এইরকম সহনশীলতার আরেকটি উদাহরণ অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া। আশ্রিত অতিথি, কুটুম্ব, অনাত্মীয় বন্ধু, পরিচিতে সর্বদা ভরা থাকত তাঁর বাড়ি। তাঁর নাতিনাতনিরা বলেন যে একাধিকবার মাঝরাতে হৈ চৈ শুনে জেগে উঠে তাঁরা দেখেছেন বাড়িতে কার না কার বিয়ে হচ্ছে। কন্যাকর্তাকে অধ্যাপক বলছেন —"তোমার ভাবনা কিসের? আমার বাড়ি তো রয়েছে।" এমন সদাব্রত তখন অনেক পরিবারেই ছিল। তাই তো তখন জীবন ছিল সহজ। যৌথ পরিবারের চাকাও তাই মসৃণভাবে গড়িয়ে চলত। এইসব বাড়িকে এখনকার দিনে ক্লাব, হোস্টেল বা ধর্মশালা যা ইচ্ছে ভাবা যেতে পারে বইকি। ■

অঙ্কন : সুব্রত চৌধুরী

ছোট পরিবার সুখী পরিবার

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

পরিবার ক্রমশ ছোট হচ্ছে। এক একটা বৃহৎ সংসার কয়েক টুকরো হয়ে গড়ে তুলছে পায়রার খোপের মত আবাসিকগুলি

আমার বাবার মামার বাড়িটি ছিল বিশাল। আত্মীয়স্বজনে বাড়ি গমগম করত। তাঁর মামা, মামিমা, তাঁদের ছয় সন্তান ছাড়াও ছিলেন বাবার দিদিমা ও তাঁর বোন। আমরা এঁদের বলতাম বড়মা এবং দাদিমা। আর ছিলেন বাবার দুই বিধবা মাসি তাঁদের দুই সন্তান সহ এবং স্বামী পরিত্যক্তা নিঃসন্তান আর এক মাসি। আমার বাবা ও দুই কাকাও এই বাড়িতেই মানুষ হয়েছিলেন। পরে যখন বাবা প্রথম নিজের সংসার পাতলেন তখনও এই বিশাল বাড়ির হাতায়ই রইলেন আর একটি ছোট বাড়িতে। আমার ছোটবেলাটা এখানেই কেটেছে। এই যৌথ পরিবারের সবকিছুই যে আহামরি ছিল তা কিন্তু নয়। ক্ষুদ্রতা নীচতা সবই ছিল। আশ্রিত ভাগ্নেদের সঙ্গে আদর আপ্যায়নে অতিথি ভাগ্নেদের প্রচণ্ড তফাৎ করা হত। বধূদের ওপর মানসিক নিপীড়নও বাদ যেত না। আমাদের মাকেও প্রায়ই দেখতাম মামি এবং মাসশাশুড়ীর মন্দ কথার তোড়ে টপটপ করে চোখের জল ফেলতে। কিন্তু এই সব কিছু ছাপিয়ে এখন যে স্মৃতিটি জ্বলজ্বল করে তা হল বাবার ছোটমাসির কথা। হেমপ্রভা বলে একটা পোশাকী নাম থাকলেও তিনি ছিলেন বোনপোদের ছোট মাসিমা, ভায়ের এবং বৌদির পটল, ভাইপো ভাইঝিদের 'পোটে' এবং আমাদের সবার ছোটদাদি। স্নেহপ্রবণ এই নারী মাত্র চোদ্দ বছরে বিধবা হন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়। সেই থেকে আজীবন কঠোর বৈধব্য পালন করেন। আমরা কখনও ছোটবেলার কথা জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'জানিস প্রথম প্রথম এই দশা হবার পর আমার খুব কষ্ট হত পাঁউরুটি আর বিস্কুট খেতে পারতাম না বলে। আর কিছু মনে নেই।'

ছোটদাদি ছিলেন সব বোনপোবৌদের ছেলেমেয়েদের বেবিসিটার। হাসিমুখে দায়িত্ব নিতেন। কখনও না বলতেন না এবং বিরক্ত হতেন না। আমাদের মা বাবা মাঝে মাঝে বাইরে গেলে আমরা খুব আনন্দে ওঁর জিম্মায় থাকতাম। হেসে গেয়ে নেচে কুঁদে তিনি আমাদের ভুলিয়ে রাখতেন। তাঁর বলা নানা রকম গল্পের মধ্যে যেটায় আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেতাম সেটা ছিল হাজারিবাগ থেকে পুশপুশ গাড়ি করে রাঁচি যাওয়ার এক রোমাঞ্চকর বিবরণ। সবথেকে মজা পেতাম যখন উনি ডিউটি শেষ হওয়া কুলিদের ডাক নকল করতেন। এক একটি গ্রামে এসে ঠ্যালার পালা শেষ হলেই কুলিরা চ্যাঁচাত "সাত জোড়া কুলি লাগি হুউউউউ।" সেই ডাক শুনে গাঁ থেকে চোদ্দজন কুলি মাঠ পাথার পেরিয়ে ছুটে আসত। এইভাবেই ঠেলতে ঠেলতে পুশপুশ গন্তব্যে পৌছত।

আজকের একক পরিবারের ছোট তরীতে এইসব ছোটদাদিদের কোন ঠাঁই নেই। আপনি কপনির স্বার্থের ধানেই সে বোঝাই হয়ে আছে। যৌথপরিবার ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে এইসব মানুষ যে কোথায় হারিয়ে গেছেন! আজকের মা বাবারা পয়সা দিয়েও পাবেন না এমন নিশ্চিন্ত নিরাপদ বেবিসিটার।

আর্থ-সামাজিক পালা বদলে পারিবারিক কাঠামোর আমূল বদল হয়েছে। আগের ধাঁচের যৌথপরিবার আর এখন সম্ভব নয়। এখনকার পারিবারিক কাঠামোতে দাদু ঠাকুমারাও বাড়তি। এখন হল "হম দো হামারা দো"র যুগ। এখন চাকুরে লোকের ট্যাক্স কাটার সময় বুড়ো মা বাবাকে dependent হিসেবে ধরা হয়না। ফ্ল্যাট

ছবি : তপন দাশ

যৌথপরিবারে সাফল্যের মূলে মেয়েদের অবদান ছিল

মাসে মাত্র কয়েক মিনিট ব্যয় করুন...
স্তন- ক্যানসার থেকে রক্ষা পান!

মাসে মাত্র কয়েক মিনিট ব্যয় করুন... স্তন-ক্যানসার থেকে রক্ষা পান। স্তন-ক্যানসার যে এক সাংঘাতিক গুপ্ত রোগ তা সব মহিলাই জানেন। এবার ঐ দুঃশ্চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্তি দিন। স্তন-ক্যানসার পুরোপুরি সারানো যায়। যে মহিলার ঐ রোগ একেবারে শুরুতেই ধরা পড়ে তিনি বাকী জীবনটা সুস্থ দেহে ও শান্তিতে কাটাতে পারেন।

সেরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হ'ল—প্রতিমাসে নিজেকে নিজেই একবার পরীক্ষা করে নিন মাত্র কয়েক মিনিট, যা আপনার জীবন বাঁচাবে!

দেখুন কি ভাবে: শুয়ে পড়ুন—প্রতিটি স্তন নিজের আঙুল দিয়ে আলতো করে টিপুন—স্তনের তলা থেকে বোঁটা পর্যন্ত, ছোট ছোট পাক দিয়ে। এবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও ঠিক ঐভাবে করুন। দেখুন—বুকে কোনো মাংসপিণ্ড বা শক্তগাঁট বা বুকের কোষ পুরু ইত্যাদি হয়েছে কিনা। দুটি বোঁটাতেই আলতো করে চিমটি কাটুন। কোনো রস দেখা গেলেই সত্বর আপনার ডাক্তারকে জানান।

কোনো ঝুঁকি নেবেন না। বছরে একবার সম্পূর্ণ ক্যানসার চেক- আপ করিয়ে নিন ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটির যেকোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে (ডিটেকশন সেন্টার) চলে আসুন অথবা আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

এখন ক্যানসার-বীমা!

ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটি প্রবর্তন করলো **ভারতের একমাত্র বীমা** পলিসি, যা ক্যানসার রোগ-ধরা বা তার চিকিৎসা বাবদ যাবতীয় খরচ যোগাবে। সামান্য কিছু টাকা দিন আর আপনি ও আপনার স্ত্রী/স্বামী দুজনেই ৪০,০০০ টাকার আওতায় থাকুন। আরো জিজ্ঞাসা থাকলে ফোন করুন।

অন্যান্য কেন্দ্রে দেখা করার জন্য যোগাযোগ করুন:

- [illegible] মেডিক্যাল সেন্টার ৪৮, [illegible] রোড, [illegible] মার্কেট, নিউ দিল্লী-১১০ ০০১, ফোন: [illegible]
- ১৫/এ [illegible] রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০, ফোন: [illegible]
- ১২৭, [illegible] স্ট্রীট, মাদ্রাজ-৬০০ ০০১, ফোন: [illegible]

ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটি

[illegible]

তাড়াতাড়ি ধরা পড়লে তাড়াতাড়ি সারা!

deCunha/ICS/2/87 BN

বাড়িতেও থাকে না বাড়তি ঘর। সব কিছুই এখন দুজনের সংসারের প্রয়োজন ভেবে তৈরী হয়। একজন কর্মীকে যে মাইনে (Family wage) দেয়া হয় সেটাও এইভাবেই হয়।

এই পটপরিবর্তনে ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চয় লাভবান হয়েছে। যৌথ পরিবারে নানাজনের সঙ্গে ঠোকাঠুকি ঘেঁষাঘেঁষি করে ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না। স্বৈরতন্ত্রী পারিবারিক কর্তা অথবা কর্ত্রীর ক্ষমতার অপব্যবহারও যৌথ পরিবারের একটি অসুবিধে। একক পরিবারে ইচ্ছেমত অনেক কিছু করা যায়, ভাবা যায়। জীবনটাকে নিজের ইচ্ছেমত গড়েপিটে নেয়া যায়। পুরুষের ক্ষেত্রে একক পরিবারে মানসিক বিকাশ হয়। আমাদের দেশের ছেলেরা বিয়ে করেও 'খোকা' মার্কা হয়ে থাকেন। কারণ, ছেলে হয়ে জন্মানর সুবাদে তাদের মায়েরা পায়ের তলায় কাদাটুকুও লাগতে দেন না। এইসব খোকারা একক পরিবারের দৌলতে এখন তাড়াতাড়ি সাবালক হচ্ছেন। তাঁদের স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতা, দায়িত্ববোধ এগুলোও আটকে থাকছে না। এখন আর পঞ্চাশ বছর বয়স অব্দি মা বাবার ঘাড়ে দায়িত্ব ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার যুগ নেই। এই স্বনির্ভরতা নিঃসন্দেহে একক পরিবার প্রথার একটি উজ্জ্বল দিক।

কিন্তু দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে থাকে উৎকণ্ঠা এবং অনিশ্চয়তা। যা থেকে অনেক পারিবারিক অশান্তির সূত্রপাত হয়। বড় পরিবারে সুখ দুঃখ ভাগ করে নেয়া যায়। কিন্তু "হম দো"র সংসারে কে নেবে দুঃখের ভাগ? কে বইবে সমস্যার বোঝা? আর আজকের জটিল জীবনে সমস্যা কি কিছু কম? যদি অফিসে গণ্ডগোল হয় স্ত্রীকে বলা যায় না, কারণ সেও চিন্তিত হবে। অথবা অন্যভাবে স্বামীকেও বলা যায় না। আজকাল যৌবনেই মা বাবার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। নিঃস্বার্থ উপদেশ তাঁরাই হয়ত দিতে পারতেন। কিন্তু যে সংসারের হাসি আনন্দের ভাগ তাঁরা বাইরের লোকের মত নিমন্ত্রিত হয়ে ভোগ করেন সে সংসারের উপদেশ দেয়ার হয়ত তাঁদের অধিকারই নেই কিংবা তাঁরাই কুণ্ঠিত হবেন। এই অবস্থায় মনের ওপর যে চাপ বাড়ে তার প্রকাশ হয় স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অশান্তিতে। এমনিতেই জীবনযুদ্ধে দুজনেই পরিশ্রান্ত। তার ওপর যদি নিজেদের মধ্যে খিটমিটি লাগে তাহলে মনের ভেতরের ধিকি-ধিকি অশান্তির আগুন হঠাৎ একদিন দাবানলের রূপ নেয়। শান্তির নীড় হয়ে ওঠে এক বিষময় বোঝা। যৌথপরিবারের সহনশীলতা একক সংসারে বিরল। পারস্পরিক দোষারোপ থেকে আরম্ভ করে মারধর পর্যন্ত গড়ায়। মা বাবার উপস্থিতির জন্যে এখনো অনেক ভারতীয় পুরুষ বাড়িতে মদের আসর বসান না। যৌথ পরিবারের অন্দর এবং বারবাড়ি থাকায় মদ খাওয়ার অসুবিধে ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে রক্ষণশীল মা-বাবার সামনে মদ খাওয়ার রেওয়াজ এখনো মধ্যবিত্ত সমাজে ততটা চালু হয়নি। এই আগলটা না থাকায় বাড়িতেই মদ খাওয়া এবং তার ফলে অশান্তি এখন একক পরিবারের মস্ত সমস্যা।

প্রথম যখন যৌথপরিবারগুলি একে একে ভেঙে যেতে থাকে তখন স্বামী-স্ত্রীর সংসারে দুজনেই কাজে বেরোতেন না। রুটিরুজি ছিল পুরুষের কাজ, আর স্ত্রী সুগৃহিণী হয়ে সংসারের কাজের মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণেই মেয়েদেরও ঘরের বার হতে হয়েছে। তার ওপর অনেক নারীরই এখন অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা একান্ত কাম্য। এর মধ্যে কোন অন্যায় নেই। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলেই কেন একজন মানুষ সারাজীবন আর একজনের হাততোলা হয়ে থাকবে! হোক না সে তার বাপ কিংবা স্বামী। বিবাহিতাদের ক্ষেত্রে বাইরের কাজ এনেছে অন্য সমস্যা। আমাদের মানসিকতা এখনো এত বদলায় নি যে একটি বৌ বাইরে কাজ করে বলে তাকে সংসারের কাজ থেকে রেহাই দেয়া হবে। অফিস যাওয়ার আগে এবং বাড়ি ফিরে বিবাহিতাদের যে কত কাজ করতেই হয় তার ঠিক নেই। যদিও এই অবস্থা একদিন নিশ্চয় পাল্টাবে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি একটি গুণী মেয়েকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি তখনই দেয় যখন সে ঘরে বাইরে সমান পটু। সেই বস্তাপচা 'যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না'-র ধুয়ো তুলে আশা করা হয় যে চাকরি করা বউ সংসারেও নিপুণা হবে। মেয়েরাও এই মূল্যবোধই আত্মস্থ করতে চেষ্টা করে যায় শ্যাম ও কূল দুই বজায় রাখার। এই বাড়তি পরিশ্রম তার শরীর ও মন দুয়ের পরেই অসম্ভব চাপ সৃষ্টি করে। একক সংসারের গৃহিণীর পাশে দাঁড়ানর মত কেউই থাকে না। আজকের বাজারে বিশ্বস্ত এবং নিপুণ কাজের লোক পাওয়া ভগবানের সঙ্গে দেখা হওয়ার মতই দুর্লভ। অবশ্য গৃহকর্মে যদি বাড়ির পুরুষটিও হাত লাগাতেন তাহলে মেয়েদের কাজের বোঝা কিছুটা লাঘব হত। যদিও কিছু কিছু পরিবারে এই অবস্থার বদল হচ্ছে; কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এখনো ছেলেরা গৃহকর্মে উদাসীন। ওটাকে মেয়েদের কাজ বলেই মনে করা হয়। বরঞ্চ আধুনিক নানা সরঞ্জাম খানিকটা কাজের সময় বাঁচিয়ে দেয়। কিন্তু দামের দিক দিয়ে সুলভ না হওয়ায় এগুলি অধিকাংশের হাতের বাইরে। তাই এ যুগের একক সংসারে কাজকরা বউ এখন পড়ি-কি-মরি করে কিনে ফেলছে ফ্রিজ। ঘরে আনছে গ্যাস, গ্রাইন্ডার মিক্সার ইত্যাদি। সবই ভাল কিন্তু ক্রমাগত বেঁচে থাকার জন্যে এই লড়াই আনছে মানসিকতার পরিবর্তন। সূক্ষ্ম অনুভূতির জায়গায় আসছে স্বার্থপরতা। যার ফলে নিজস্ব সংসারের গণ্ডি এবং চাকরি জগতের প্রমোশন বোনাসের বাইরে মনকে পাখনা মেলতে দেয়ার পথ প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে।

আর্থ-সামাজিক পালা বদলে পারিবারিক কাঠামোর আমূল বদল হয়েছে। এখন হল 'হম দো হমারা দো'-র যুগ

একক সংসারের গিন্নীর স্বাস্থ্যটি হতে হবে নিটোল। তা না হলে সে যদি শয্যা নেয় তাহলে সংসারের ঘানি হবে অচল। তাই ঘরে ঘরে দেখা যায় নিজের শরীর উপেক্ষা করে বউরা সাংসারিক স্থিতাবস্থা বহাল রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন একেবারে মুখ থুবড়ে না পড়া পর্যন্ত। বাইরের চাকরিতে সিক লিভ থাকলেও ঘরের কাজে নেই কোন ছাড়। নেহাত অপারগ হয়ে পড়লে শরীরকে বিশ্রাম দিলেও মনের চিন্তা কি যায়? সন্তানের এবং স্বামীর অসুবিধের কথা ভেবে রোগশয্যায়ও ভাবনার বিরাম নেই। তখন কি আর মনে হয় না, 'আহা বাড়িতে আর একজন মাথার ওপর থাকলে একটু কষ্ট কম হত।' একটা আশ্বাস দেয়ার মানুষ ওষুধের চেয়ে ভাল কাজ করে। একক পরিবারে এটির অভাব বড় বেশি।

চাকুরিরতা মায়েদের সন্তানদের নিয়েও আর

ছবি : অমিত দত্ত

এক সমস্যা। কে দেখবে ছেলেমেয়েদের তাদের অনুপস্থিতিতে? রাইচরণদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন পয়সা দিয়েও ভাল লোক পাওয়া যায় না। আর গেলেও একজন সম্পর্কহীন মানুষের হাতে সারাদিনের মত সন্তানকে রেখে যেতেও দ্বিধা হয়। একক সংসারে হাজার হাজার নারী আজ এই পরিস্থিতির সম্মুখীন। বিদেশে উন্নত ব্যবস্থায় মায়েরা এত অসহায় বোধ করে না। কিন্তু আমাদের দেশে একদিকে পুরোন পারিবারিক কাঠামোও ভেঙে পড়েছে, অন্যদিকে নেই কোন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের তরফে মায়েদের ভার লাঘব করার। আমাদের বড় বড় শহরে নেই সে হারে ক্রেশ যেখানে মা নিশ্চিন্তে শিশুকে রেখে কাজে যেতে পারেন। আর যে কটা আছে তাতে কজনের সাধ্য আছে রাখবার? সরকারি ব্যবস্থাপনায় এবং চাকরি ক্ষেত্রে আরো বেশি সংখ্যায় ক্রেশ থাকলে মাদের চিন্তা একটু কমে।

চাকরি করা মায়েদের মনে সন্তানকে রেখে কাজে বেরনোর জন্যে সব সময়েই এক ধরনের অপরাধবোধ কাজ করে

সন্তান অসুস্থ হলে মাকেই ছুটি নিয়ে তার দেখাশোনা করতে হয়। কাজের ক্ষতি হলেও মেয়েদের এটা মেনে নিতে হয়। এখানেও ছুটিটা মেয়েরাই নেন ছেলেরা নয়। এর কারণ আমাদের চাকরি করা মায়েদের মনে সন্তানকে রেখে কাজে বেরনোর জন্যে সব সময়ই এক ধরনের অপরাধবোধ কাজ করে। তার ওপর অসুস্থ সন্তানকে বাড়িতে রেখে কাজে গেলে সবার চোখে পড়বে তার মাতৃত্বের ঘাটতি। সুতরাং ছুটি নিতেই হয়। আর একটি দিকও আছে। আগেকার বড় সংসারে আমাদের মা, ঠাকুমা, দিদিমারা অভিজ্ঞতা দিয়ে যে জ্ঞান লাভ করতেন সেটা সংসারের কমবয়েসীরা কাজে লাগাত। সন্তান পালনে এই অভিজ্ঞতার দাম কিছু কম নয়। সবার হাতের কাছে থাকে না বেঞ্জামিন স্পক। একক সংসারে অনভিজ্ঞ নতুন মাটিকে ছোট ছোট ব্যাপারেও তাই হিমসিম খেতে হয়।

সন্তানকে সারাদিন সঙ্গ দিতে না পারার অপরাধবোধ থেকে মুক্ত হবার জন্যে মা তাকে ভুলিয়ে রাখে নানা উপহার দিয়ে। এর ফলে একক সংসারে শিশুটি খুব ছোট থেকেই দামি খেলনাপাতি ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। সে আর অল্পে খুশি হয় না। সব শিশুরই যে এই অবস্থা হয় তা অবশ্য নয়। কিন্তু সন্তানের এই চাহিদাও আর এক সমস্যা ডেকে আনে। না পেলে সে জেদী ও অবাধ্য হয়। তখন আবার আসে অন্য বিপদ। একটু বড় হলে সে খোঁজে অন্য উত্তেজনা। মাদকাসক্তি কিন্তু যৌথপরিবারের থেকে একক পরিবারে অনেক প্রকট।

সংসারে দিদিমা ঠাকুমার আদরের একটা অন্য মূল্য আছে। আমার জ্ঞান হওয়া অব্দি ঠাকুমা-ঠাকুরদা ফ্রেমে বাঁধান ছবি। দিদিমাও তাই। ছিলেন একমাত্র বোহেমিয়ান দাদামশাই। আমি তাই দিদিমা ঠাকুমাওলা সহপাঠিনীদের খুব হিংসে করতাম। ওদের কী মজা! জানি না আজকালকার ছেলেমেয়েরা এই ব্যাপারে হিংসুটে হয় কিনা। মূল্যবোধ পাল্টাচ্ছে। দিদিমা ঠাকুমার গল্পের জায়গা নিয়েছে এখন টিভি কিংবা ক্যাসেটে নানা রকম রূপকথা। সাংসারিক দায়দায়িত্বে বিপন্ন মা-বাবার কোথায় সময় গল্প বলার বা ভুলিয়ে রাখার। এর ফলে শিশু মনের কল্পনার যে জগত দিদিমারা খুলে দিতেন সেই জগত এখন অন্যদিকে বাঁক নিয়েছে। বড়দের জগতের বেশ খানিকটা ছিটকে এসে শিশুদের শৈশবকে সংক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে। একেতো ফ্ল্যাটের অল্প পরিসরে থাকা। শিশুর সামনেই হয় সবরকম আলোচনা। তার ফলে রূঢ় বাস্তব খুব তাড়াতাড়ি তাকে টেনে আনে বড়দের মূল্যবোধের জগতে। কোথাও তাদের মনে মনে হারিয়ে যাওয়ার পথে এসে পড়ে নানা বাধা। এই যুগের শিশুদের অতি দ্রুত শৈশব শেষ হয়ে যাওয়ার যে মানসিক ক্ষতি তা দামি জামাকাপড়, টিভি, বেড়ান, হোটেলে খাওয়া—কোন কিছু দিয়েই পূরণ করা যায় না।

শৈশব চলে যাওয়া ছাড়াও আছে শিশুর একাকিত্ববোধ। আগেকার দিনে বাড়ির বাইরে বন্ধুর দরকার বিশেষ হত না। নানা রকম তুতো ভাইবোনের মধ্যে ছিল এক সখ্য। তারপরে একক পরিবারেও ছিল ভাইবোনেরা। এখন পরিকল্পিত পরিবারে শিশুর খেলার সঙ্গীর বড় অভাব।

আসলে যৌথই হোক আর এককই হোক আমাদের পারিবারিক কাঠামো এখনো কিন্তু পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে গঠিত। গ্রন্থিগুলি আল্গা হয়ে এলেও এখনো খুলে আসেনি। আমরা অতীতের মধ্যেই খুঁজছি বর্তমান জীবনের মানে, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। সবকিছু ছেঁটে ফেলতে পারিনি। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই অদ্ভুত অবস্থার সামনে পড়বে না। কারণ যতই আমরা যৌথপরিবারের সুবিধে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলি বর্তমান সমাজে তাকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। সময়ের কাঁটা পিছিয়ে দেয়া যায় না। সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে ক্রমাগতই আমরা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি, পুরান মূল্যবোধের সঙ্গে নতুনের মেলবন্ধন ঘটাতে গিয়ে।

যৌথপরিবারে সাফল্যের মূলে মেয়েদের অবদান ছিল অনেক বেশি। কম বয়সে বউ হয়ে এসে নতুন সংসারে তারা মিশে যেত। কিন্তু এই যুগের স্বাধীনচেতা নারীর পক্ষে কি সম্ভব বিয়ের পরে তার আজন্ম লালিত ধারণাগুলিকে ছেঁটে ফেলা? আর কেনই বা একটি ব্যক্তিত্বে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দেবে? মেয়েরাই সব সময় মানিয়ে নিয়েছে তাই শান্তি বজায় থেকেছে। কিন্তু এই একতরফা মানিয়ে নেয়ার আশাটা অযৌক্তিক ও অন্যায়। ব্যক্তিত্বর সংঘাতে যৌথপরিবারগুলি টুকরো হচ্ছে, মেয়েদের দোষ নয়।

পারিবারিক নির্ভরতা কমে আসে রাষ্ট্রব্যবস্থা উন্নত হলে। সচ্ছল পশ্চিমে তাই দিদিমা ঠাকুমা শ্বশুর শাশুড়ীর দরকার হয় না। আমরাও সেই পথেই এগিয়ে চলেছি। অবশ্যই সে পথ নয় মুশকিল আসানের পথ। পরিবর্তিত মূল্যেবোধের সঙ্গে সঙ্গে আসছে নানা সমস্যা যার নেই কোন শেষ এবং নেই আশু সমাধান। কারণ যৌথ পরিবারের মূল্যবোধের প্রধান স্তম্ভ ছিল বাড়ির বড় এবং মেয়েদের অসীম ত্যাগ স্বীকার।

সভ্যতার মূল্যবোধে বাড়ির বড়র লেখা পড়া ছেড়ে সংসারের ভার নিয়ে নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ জলাঞ্জলি দিয়ে সারাজীবন অন্যের সুখের পথ মসৃণ করা এবং বিনিময়ে সারাজীবন ভাইদের শ্রদ্ধাভক্তি ভালবাসা পাওয়া অসম্ভব। মেয়েরাও এখন নিজেদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন। যদি নতুন করে পরিবারের বিন্যাস হত যেখানে প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিত্বকে সমান মূল্য দেয়া হবে তাহলেও সম্ভব নয় সেই পুরোন দিনে ফিরে যাওয়া। শত অসুবিধা সত্ত্বেও তাই একক পরিবারই টিকে থাকবে অন্য রকম ভাবে।

ছবি : অলক মিত্র

দেখি নাই ফিরে

সমরেশ বসু

চিত্র □ বিকাশ ভট্টাচার্য

॥ তেতাল্লিশ ॥

"শ্রীচরণকমলেষু প্রণামান্তে জানাই···
আহ্! প্রথমেই প্রণামান্তে জানাই লিখলে কেন?" বনবিহারীর ভুরু কুঁচকে উঠলো, "শতকোটি প্রণাম তো একেবারে শেষে লিখলেই পারতে। এটা তো চিঠি নয়। মনিঅর্ডার। লেখবার জায়গা একটুখানি। বেশ, তুমি কী লিখতে চাও, লেখো দিকি।"

রামকিঙ্কর লিখলো "···যে এই মনিঅর্ডারে এক শত টাকা পাঠাইলাম। আমি পূজার ছুটিতে যাইব। মাতৃদেবীকে বলিবেন। তাঁহাকে ও বৌদিদিকে প্রণাম দিবেন। আবার প্রণামান্তে, ইতি, শ্রীরামকিঙ্কর বেইজ।"

"বেশ হয়েছে।" বনবিহারী হাসলো, "প্রণামান্তে দিয়ে শুরু, প্রণামান্তে দিয়ে শেষ। কিন্তু তুমি তোমার বাবাকে আপনি করে বলো নাকি?"

রামকিঙ্কর অবাক চোখে তাকিয়ে মাথা নাড়লো, "না তো!"

"তবে মনিঅর্ডারে আপনি করে লিখলে কেন?" বনবিহারীর চোখে সকৌতুক জিজ্ঞাসা।

রামকিঙ্করের মোটা ঠোঁটের ফাঁকে নির্মল সাদা হাসি ফুটলো, "মনিঅর্ডার চিঠির লেখা ত। তাই।"

বনবিহারী কোনো কথা বললো না। হাসি চাপতে গিয়ে তার মুখ লাল হয়ে উঠলো। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। মনিঅর্ডারটা তুলে দেখলো। নাম ধাম ঠিকানা টাকার অঙ্ক যাবতীয় সে-ই ইংরেজিতে লিখেছে। রামকিঙ্করই লিখে দিতে বলেছে। ও বনবিহারীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মুখে বিব্রত হাসি, "কেটে 'তুমি' করে লিখব কী?"

"এই মনিঅর্ডারে?" বনবিহারীর দু চোখ গোল হয়ে উঠলো। তারপর হেসে মাথা নাড়লো, "কোনো দরকার নেই। চলো ডাকঘরে গিয়ে টাকাটা পাঠিয়ে দিই।"

পৌষমেলার পরে এখন অনেকেই ছুটিতে গিয়েছে। কলাভবনের বেশির ভাগ ছাত্রই রয়েছে। প্রভাতমোহন বর্ধমানে দেশের বাড়ি গিয়েছে। সে ফিরে এলে কারুসংঘের কাজ শুরু হবে। কাজ অবিশ্যি থেমে নেই। পৌষমেলায় সকলের সঙ্গে রামকিঙ্করের ছবিও খারাপ বিক্রি হয়নি। গত বছরের তুলনায় ভালো। কলকাতায় সোসাইটিতে শিক্ষক ছাত্রদের ছবি কিছু গিয়েছে। আর গিয়েছে বাইরে। দিল্লি লখনৌ মাদ্রাজে। প্রদর্শনী থেকে ছবি বিক্রির আশা কম। হলে ভালো। রামকিঙ্করের এখন অবস্থা ভালো। নন্দলাল বলেছেন আপাতত ইংরেজি বছরের গোড়া থেকে ঘরভাড়া আর খাওয়া বাবদ দশ টাকা যেন দেয়। জানুয়ারি মাস থেকে টাকা দেওয়া শুরু হয়েছে। সেই দারুণ উদ্বেগ থেকে ও এখন মুক্ত। মাস্টারমশাই আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন, "ভয় পাবার কিছু নাই। চলে গেলেই হল, বাকেও আশা করি। কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। বিনায়ক মাসোজী শিক্ষকের কাজে লেগেছে। রমেন নিয়োগী ভালো শেখাচ্ছে। কিন্তু যে-সামান্য টাকা তাকে দেওয়া হচ্ছে, তাতে পোষায় না। গুণী ছেলে। শিগগিরই বাইরে চাকরি পেয়ে যাবে। বিনোদবিহারীর একটা হিল্লে করবার খুব দরকার হয়ে পড়েছে। তোমাদের কারোকে আমি ছাড়তে চাই না। কিন্তু কলাভবনের হাল তো জানো, গরীব ঘরের মায়ের কাপড়ের মতন। এক দিক ঢাকে তো, আর এক দিক উদোম।"···

নন্দলাল মিথ্যা বলেননি। তবু এর মধ্যেই নতুন কলাভবন তৈরি শেষ। নতুন ভবনের দরজাও খুলে গিয়েছে। কলাভবনের পাকা বাড়ি! মাঘ মাসেই দ্বারোদ্ঘাটনের উৎসব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই উপলক্ষে কবিতা লিখেছিলেন:

হে সুন্দর, খোলো তব নন্দনের দ্বার,
মর্ত্যের নয়নে আনো মূর্তি অমরার।
অরূপ করুক লীলা রূপের লেখায়,
দেখাও চিত্তের নৃত্য রেখায় রেখায়॥

কবিতা লেখা ছাড়াও, তিনি নতুন কলাভবনের নাম দিলেন, 'নন্দন'। 'নন্দন' নামের সঙ্গে নন্দলালের নামটাও যেন জড়িয়ে আছে। বুঝতে কারোরই অসুবিধা হয়নি। ছাত্রছাত্রীরা নতুন কলাভবন পেয়ে ভারি খুশি। দক্ষিণে খেলার মাঠ। উত্তরে খোয়াই। যতো দূর চোখ যায়, ঢালুতে নেমে যাওয়া খোয়াইয়ের ওপারে আবার লাল ডাঙা উঁচুতে উঠেছে। মাঝে মাঝে দুই চারি তাল গাছের মাথা দেখা যায়। বাবলার ঝাড় তারই ফাঁকে ফাঁকে। আরও উত্তরে, দু এক শাল আর বেণুবাঁশের ছোট ঝাড় ঘিরে গুটিকয়েক মাটির ঘর, খড়ের চাল যেন ধু ধু করে। সাঁওতাল গ্রাম। "কী ভাগ্যি, আরও পশ্চিমে আমাদের যেতে হয় নাই।" নন্দলালের গোঁফের হাসিতে খুশির ঝলক দিয়েছিল, "সেই দ্বারিক থেকে শুরু। তারপরে শিশুবিভাগ। সেখান থেকে আরও পশ্চিমে এসেছিলুম লাইব্রেরির দোতলায়। এবার এলুম আরও পশ্চিমে। তাতে দুঃখ নাই। আমরা পশ্চিমের যাত্রী। ভাবো, আরও পশ্চিমে কলাভবন করার কথা উঠেছিল। তা হলে তো আমাদের আশ্রমের বাইরে চলে যেতে হতো। জমি নেবার সময় আমি আপত্তি করেছিলুম। কর্তারা কথা রেখেছেন। আমার শান্তি। আশ্রমের সীমার মধ্যেই আছি···"

বনবিহারী আর রামকিঙ্করের মাথায় হাত! মাস্টারমশাইয়ের শান্তি যে ওদের শান্তি না। কেবল কলাভবনের নতুন পাকা বাড়ি 'নন্দন' হয়নি। তার সঙ্গেই কিচেনের পশ্চিমে উঠেছে মেয়েদের পাকা বাড়ি হস্টেল—শ্রীসদন। বনবিহারী রামকিঙ্করের ক্ষতি ছিল না। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটেছে কিচেনে। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রভাত,
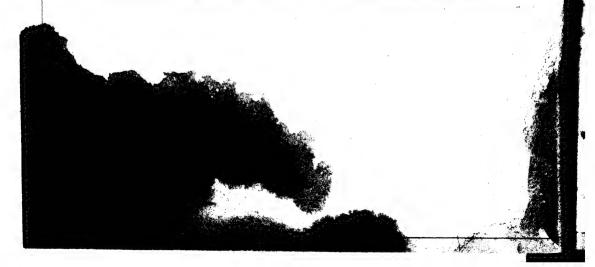
হিরণদিকে সে-কথা কে বোঝাবে। ঘণ্টা শোনা যায় না যে! কলাভবনের ছেলেমেয়েদের খেয়াল থাকে অন্য কারণে। তারা খিদের সময়, কান খাড়া রাখে। ঘণ্টার শব্দ পেলেই খেতে ছোটে। কথাটা কতোখানি বিশ্বাসযোগ্য, ভেবে দেখার দরকার আছে। এ বিষয়ে নিশ্চিকান্তর কোনো মাথাব্যথা নেই। আরও কয়েকজনের নেই। যেমন সত্যেন বিশি। তার চালচলনই আলাদা। জামা কাপড়ের বাহার নিয়েই সে প্রথম এসেছিল। তার মস্ত মোটা বিছানা দেখেও সবাই খুব অবাক হয়েছিল। ঐরকম মস্ত মোটা বিছানা কেন? খুলে দেখাও। খুলে দেখা গিয়েছিল, তোশক বালিশ লেপ চাদর ইত্যাদি ছাড়াও দুটি বেশ গতরওয়ালা পাশবালিশ! পাশবালিশ? এখানে পাশবালিশ ব্যবহার তো নিষিদ্ধ! পাঞ্জাবীতে সোনার বোতাম যদি-বা চলতে পারে, পাশ বালিশ চলতে পারে না। বেচারি! বাড়ির গুরুজনেরা বুঝতে পারেননি। সম্পন্ন ঘরের ছেলে। শান্তিনিকেতনে গেলেও আরামে থাকার বাধা কোথায়? আরামে বাধা নেই। বিলাসে বাধা। একটা না, দু দুটো পাশবালিশ! অবিশ্যি রফা হতে দেরি হয় নি। সত্যেনকে একটা পাশবালিশ ছাড়তে হয়েছিল। বেহাত হওয়া পাশবালিশটা নিয়ম করে এক একজন এক একদিন ব্যবহার করতো। সত্যেনকে সেটা মেনে নিতে হয়েছিল। অন্তত আশ্রমিক নিষেধটাকে পাশ কাটানো গিয়েছিল। কিন্তু সত্যেনের জীবনযাপনের হালচালই যে আলাদা। অতএব, হঠাৎ একদিন দেখা গিয়েছিল, একটি কাজের লোকের মাথায় সে তার তাবত মালপত্র চাপিয়ে আশ্রমের ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছো সত্যেন? একটা আলাদা বাসা পাওয়া গিয়েছে। শ্রীনিকেতনের পথে যেতে, ডান দিকে। সত্যেন চলে গিয়েছিল নতুন বাসায়। তার রান্না খাওয়ার ব্যবস্থাও আলাদা হয়েছিল। বড় ছেলেমেয়েদের কারোর কারোর সেইরকম ব্যবস্থা ছিল।
বনবিহারী আর রামকিঙ্করেরই যতো বেখেয়ালিপনা? ছাত্রছাত্রী বাড়া ছাড়া কমেনি। বেশির ভাগই কিচেনে খায়। বিশেষ করে কিচেনের হেঁশেলে মাছ ঢোকার পর। অবিশ্যি সব দিন একরকম হয় না। ঘণ্টার শব্দ শোনা যায় ঠিকই। কিন্তু না শোনার ঘটনাও মাঝে মাঝেই ঘটে। তখন অবেলায় কিচেনের পাশ দিয়ে অভুক্ত অবস্থায় যেতে যেতে, করুণ চোখে দুজনেই তাকায়। তাকালেই ধরা পড়তে হয়। হিরণদি ঠিক জানালায় দাঁড়িয়ে থাকেন, "এই যে, এই! তোমরা শোনো।"
রামকিঙ্কর তাকায় বনবিহারীর দিকে। বনবিহারী রামকিঙ্করের দিকে। চোখে চোখে জিজ্ঞাসা, "কী করা যায়?"
"কী হল?" হিরণদির স্বর চড়ে, "ডাকছি যে। শুনতে পাচ্ছো না?"
তারপরেও আর না শোনার কোনো কথাই থাকতে পারে না। অভুক্ত ক্ষুধার্ত, ওরাই যেন অপরাধী। পায়ে পায়ে গিয়ে হিরণদির সামনে দাঁড়ায়। হিরণদির গলার স্বর গম্ভীর শোনায়। কিন্তু একটা কৌতুকের সিঞ্চনে, গম্ভীর স্বরে কী একটা সুর যেন বাজে, "তোমরা খেতে আসোনি কেন?"
"ঘণ্টা শুনতে পাইনি।" বনবিহারীর চোখ থাকে রামকিঙ্করের ওপর।
রামকিঙ্করের পক্ষে জবাব দেওয়া অসম্ভব। হিরণদির স্বরে থাকে কৌতুক মেশানো অবিশ্বাসের সুর, "সবাই শুনতে পায়। খেতে আসে। কেবল তোমরাই শুনতে পাও না? যেদিন শুনতে পাও, সেদিনও তোমরা সেকেন্ড ব্যাচে খেতে আসো।"
"শুনতে পাইনি যে—"
"চুপ।" বনবিহারীর কথার মাঝখানেই ধমক। সেই সঙ্গে পানদোক্তার মৃদু গন্ধও বাতাসে ছড়ায়। "খিদেরও তো একটা সময় আছে। ঘণ্টা না বাজলে কি সময়মতন তোমাদের খিদেও পায় না? এসো, ভেতরে এসো।"
হিরণদির ডাক শোনায় প্রায় কড়া হুকুমের মতো। ভিতরে না গিয়ে উপায় থাকে না। ভিতরে ঢুকতে না ঢুকতেই, তাঁর স্বর ভেসে আসে, "একেবারে হাত ধুয়ে এসো।"
খাবার ঘরে ঢোকবার আগেই, জলের বালতি ঘটি থাকে। দুজনে হাত ধুয়ে ভিতরে যায়। হিরণদির নিরামিষ ভাত ব্যঞ্জন বাড়া তখন সারা। পাশাপাশি দুজনের আসন। মাছ থাকে না। অবেলায় অসময়ে, থাকবার কথাও না। আঁশের পাট মিটলে, বিধবা হিরণদি স্নান করেন। বাঙালী হিন্দু বিধবা কবে আর বেলা ঢলে যাবার আগে আতপ চালের ভাত আর নিরামিষ ব্যঞ্জন নিয়ে খেতে বসেন। হিরণদি তাঁর নিজের ভাগ থেকেই দুই ভাবী শিল্পীকে ভাত বেড়ে দেন। শিল্পীদেরও ভারি সঙ্কোচ। হিরণদির মুখের অন্ন তখন অমৃত বটে। কাজটা অন্যায়। সেই বোধেই অন্ন মুখে নিতে বাধে। বিশেষ করে বনবিহারী শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে ওঠে, "হিরণদি, আসলে, আমাদের খিদেই যে পায়নি।"

"এই ছেলে! একদম বাজে বকো না।" হিরণদির সে কি চোখ পাকানো! "যা দিয়েছি, দুজনে খেয়ে নাও। তোমার মায়ের নাম ঠিকানাটা আমাকে লিখে দিও।"
হিরণদির ভাত ব্যঞ্জন খেয়েই মাঝে মাঝে দুপুরে পেট ভরাতে হয়। অথচ, ঘণ্টাতলা থেকে দূরত্বটা সত্যি বেড়েছে। গৌরিক থেকে নতুন কলাভবনে হেঁটে যেতে সময় লাগে। বাতাস যদি এলোমেলো হয়, ঘণ্টার শব্দ ঠিক মতো অনেকের কানেই যায় না। দোষ কেবল দুজনের না, কিন্তু ঘণ্টার শব্দ সব চেয়ে কম শুনতে পায় দুজন। বনবিহারীকে বাড়ির ঠিকানা দিতে হয়েছে। হিরণদি শাসিয়ে রেখেছেন, ওর মাকে চিঠি লিখবেন। রামকিঙ্করের ঐসব নিয়ে তেমন ভাবনা ছিল না। তবে খেতে না পাবার কষ্ট কে-বা সহ্য করতে চায়। ওর জীবনে হিরণদির মতো স্নেহময়ী মহিলার দেখা পেয়েছে, সেই প্রথম। তিনি যে ওর মায়ের নামঠিকানা জানতে চাননি, সেটাই স্বস্তি। তবে ও পশ্চিম তোরণের দোতলা তখনও ছাড়তে পারেনি। নতুন কলাভবনে মূর্তি গড়ার কোনো আলাদা ঘর তৈরি হয়নি। হবে, শোনা গিয়েছে। ও যে-দিন সকাল থেকে তোরণ ঘরের দোতলায় মাটির কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সে-দিন ঘণ্টা বাজে ওর কানের পর্দার ঝঙ্কার তুলে। বনবিহারীও দেখা যায়, ঠিক সময়ে খেতে চলে আসে। অথচ দুজনে কলাভবনে আঁকায় ব্যস্ত থাকলেই, ঘণ্টার শব্দ ওদের কানে ঢোকে না।
শেষ পর্যন্ত ওদের দুজনের ঘণ্টার শব্দ থেকে রেহাই মিলেছে। রেহাই মিলেছে আঁকা দিয়েই। হিরণদি মস্ত বড় কাঠের ফ্রেমে মেয়েদের ব্লাউজের ডিজাইন তুলতেন এমব্রয়ডারি করে। ডিজাইনের কাজ করে দিতো ছাত্রীরা। ঐ কাজে বনবিহারীর হাত ছিল ভালো। রামকিঙ্করের খারাপ না, তবে অলঙ্করণের কাজে ওর আবার তেমন ঝোঁক ছিল না। নেহাত পয়সা রোজগারের জন্য, বইয়ের ছবি আঁকতে হয়। ওটা এখন জীবিকার দায়। শিল্পীর প্রাণের দায় না। হিরণদি ধরলেন দুই শিল্পীকে। তাঁর কাজের যোগাযোগ কলকাতার সঙ্গে, কিচেনের দায়িত্ব নেবার আগে থেকেই, তিনি সেলাইকে তাঁর জীবিকা করেছিলেন। বিশেষ করে মেয়েদের জামার গলা আর আর হাতার নানারকম রঙিন ডিজাইনের এমব্রয়ডারি। রামকিঙ্কর আর বনবিহারীকে ধরলেন, "সবাই বলে তোমাদের ডিজাইনের হাত ভালো। আমার কাজ করে দাও।"
দুই বন্ধু সানন্দে রাজি। হিরণদির কাজ বলে কথা! দুজনেই মনোযোগ দিয়ে হিরণদির জন্য ডিজাইন এঁকে দিতে শুরু করেছিল। হিরণদি ভারি খুশি! কারণ দুই শিল্পীর কাজই তাঁর কলকাতা ক্রেতাদের খুব পছন্দ। চাহিদাও বেড়েছে। বাড়তে বাড়তে অবস্থা এমন দাঁড়ালো, দুই শিল্পীর কাজ ছাড়া হিরণদির একটি দিনও চলে না। কে আর ঘণ্টার শব্দ শোনে, হিরণদি তখন তাঁর নিজের দায়ে, দুই খেয়ালী শিল্পীর মাছ-ভাত বেড়ে আলাদা করে রাখেন। সেই কথাটার মতো অবস্থা! যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। যাদের খিদে, তাদের মনে করিয়ে খাওয়াতে হয়।
রামকিঙ্করের মাঝে মাঝে ছেলেবেলার সেই দিন দুপুরগুলোর কথা মনে পড়ে যায়, ও নিজের মনে পুবের ঘরে ছবি এঁকেই চলেছে। আর মা সমানে ডেকেই যাচ্ছে, "অই কিঙ্কর, খাত্যে আয় রে। খাত্যে আয় রে..." হিরণদির অবস্থা তখন সেই রকম। সংসারের বিপরীত পথে, এক রকমের অন্যায়, প্রাণের একটা

সকৌতুক টানাপোড়েন চলে। হিরণদির যখন দায়, দুই শিল্পী তাদের খাবার সময়টা বেমালুম ভুলে যেতে লাগল। দুপুরের খাবার ওদের ইচ্ছা মতো যখন খুশি খায়। হিরণদি ওদের খাবার ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করেন। হিরণদির ওপর ঐ অত্যাচারের দাবিটাই ওদের একটা খেলা। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, হিরণদি তাঁর স্বার্থের জন্য অন্যায় সহ্য করছেন। কিন্তু খিদে ভুলে থাকা, দুই শিল্পীর সঙ্গে তাঁর নিজের প্রাণেও একটা খেলা বাসা বেঁধেছে। নারীর প্রাণে একটা অচিন ঠাঁই আছে। সে-ঠাঁইটি পীড়ন পিয়াসী। সে-পীড়ন স্নেহে সিঞ্চিত। তখন নির্বাক দুটি ব্যগ্র চোখ, আপনভোলা অভুক্ত দুটি নব যুবা শিল্পীর জন্য দূরের পথে চেয়ে থাকে। অত্যাচারটা তখন ভিন রসের ভিয়েনের মিঠে।
হিরণদি তবু বনবিহারীর মাকে চিঠি লিখতে ছাড়েননি। বালি থেকে বনবিহারীর মায়ের সে কি আনন্দ-ঘন উত্তর, "আপনি থাকতে আর আমার ছেলেদের জন্য ভাবনা নেই..."

জীবনটা চলেছে নানা ছন্দে। মাঘোৎসবের আয়োজন শান্তিনিকেতনে না হলেও, বসন্ত এসেছিল দুপুরের দুরন্ত ঝোড়ো বাতাসে ধুলা উড়িয়ে। এসেছিল খোয়াইয়ের রক্তচক্ষু আগুন ছড়িয়ে। তালের পিঙ্গল জটার ঝাপটায়। পলাশ শিমুল মাদারের লাল অঙ্গার আর মধু ফুলের ছড়ানো স্ফুলিঙ্গে। ঝরাপাতা শালের শ্বেত চূর্ণ ফুলের উড়ন্ত পাপড়িতে। কোকিল শ্যামা দোয়েলের গানে গানে।

গত বছরের মতো আম্রকুঞ্জে বসন্তোৎসব না হলেও, ঋতুরাজ তার নিজের লীলায় মেতেছিল। উৎসব তার স্বতোৎসারিত প্রাণে। সে কারোর অপেক্ষায় থাকে না। রামকিঙ্করের মনে হয়, শীতের পরেই যেন ওর ভিতর থেকে একটা ঠাণ্ডা অন্ধকার পর্দা সরে যায়। এই উচ্চ রাঢ় ভূমির বৈশিষ্ট্য, বসন্তের ঝোড়ো বাতাস লাগে ওর প্রাণে। কী এক উন্মাদনা মাতিয়ে তোলে। ভোর থেকে যদি মাটি দিয়ে কিছু গড়তে লেগে যায়, ঘণ্টাতলায় ঘণ্টা বেজে গেলেও শুনতে পায় না। অথচ নতুন কলাভবন থেকে পশ্চিম তোরণের দোতলার কতো কাছে ঘণ্টাতলা। যেদিন কলাভবনের পশ্চিমের ঘরে রঙ তুলি নিয়ে আঁকতে বসে, কোনো বন্ধুই ওকে ডেকে তুলতে পারে না। যতো গড়া, ততো ভাঙা। যতো আঁকা, ততো আঁকিবুঁকি কাটাকাটি। ক্রমেই ওর তুলির টান আর রঙের ব্যবহার যাচ্ছে বদলে। পশ্চিম তোরণের দোতলায় মাটি ঘেঁটে চটকে, কী যেন দাঁড় করাতে চায়, বুঝে উঠতে পারে না। অথচ কল্পনায় নানা মূর্তি গড়ে ওঠে। মানুষ পুরুষ বা মেয়ে, তারা কেউ কখনও বাস্তবের মূর্তি পায়। আবার বাস্তবের মূর্তিটা আঙুলের ছোঁয়ায়, গলায় হাতে পায়ে ঘাড়ে নতুন মাত্রা পায়। আর কেমন একটু অবাস্তব হয়ে ওঠে। আবার সব ভাঙচুরের মধ্যে মাটি দলা পাকিয়ে ওঠে।
প্রকৃতি ক্রমে ওর চোখে তার রূপ বদলাতে থাকে। রাত্রের অন্ধকারে কে ওকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে যায়। অন্ধকারে, কোন্ সব অজানা ফুলের গন্ধ মস্তিষ্কের কোষে কোষে কেমন নেশা ধরাতে থাকে। গৈরিকবাড়ির রাত্রের চামেলির গন্ধ সন্ধ্যার পর থেকেই ঘ্রাণে এসে ওকে ঘরছাড়া করে। কে যেন বলেছিলেন, অনেক আগে ব্রহ্মবান্ধব মহাশয় ঐ চামেলি গাছটি লাগিয়েছিলেন। ও গন্ধ ব্যাকুল পতঙ্গের মতো ছোটে না। কালো আকাশের বুক ভরা পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্র যেন ওর দিকে নিশ্চুপ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। ও তারা-ভরা সেই আকাশের দিকে তাকায়। চারপাশ থেকে ঘন গাছপালা ভিড় করে আসে। ও যে চলতে থাকে, তা ওর মনে থাকে না। কেবল দেখতে পায়, আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। গাছের ঘন কালো শরীরের আকার বদলে যাচ্ছে। আকাশের নিচে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে অন্ধকারে দিগন্তে এক আবছা আলো। হঠাৎ পাখার মৃদু সাঁ সাঁ শব্দে মুখ তুলে দেখতে পায়, তারা-ভরা টুকরো আকাশের তলা দিয়ে ডানা মেলে উড়ে চলেছে পাখি।
পাখি যেমন ঘর বাঁধার তৃণকুটা ঠোঁটে নিয়ে গাছের ডালে ফেরে, ও তেমনি রাত্রের অন্ধকারের সেই সব ছবি নিয়ে ঘরে ঢোকে। সামান্য বাতির আলোয় সেই মাত্র দেখে আসা ছবি যেন এক শিশুর তুলির টানে দুর্বোধ্য রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে।
কৃষ্ণপক্ষের পর শুক্লপক্ষে প্রকৃতির আর এক রূপ। জ্যোৎস্নার আলোয় গাছের ছায়ারা যেন নিশ্চুপ অথচ প্রাণপূর্ণ। প্রণাম করার মতোই নিচু হয়ে সেই ছায়ার গায়ে হাত বুলায়। হাত বুলিয়ে রেখা টানতে টানতে, নিজের গায়ে ধুলা মাখে। আর জ্যোৎস্নার রাত্রের প্রকৃতি এক জলস্থলের ঢেউ খেলানো দ্বীপপুঞ্জের মতো খেলা করতে থাকে। তারপর ধুলা থেকে হাত তুলে, চলে যায় খোয়াইয়ে। জ্যোৎস্নার খোয়াইয়ে এক হলুদ-নীলের মৌন সমুদ্র। সেই মৌন সমুদ্রের কাছে দূরে আলোক আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তালগাছ। বাবলা, আর পথ-হারা পথিকের মতো এক দুই শাল। তাদের জীবিত ছায়া জ্যোৎস্নায় শুয়ে থাকে। শুক্লপক্ষের সেই প্রকৃতিকে রামকিঙ্কর ওর ছবিতে ফুটিয়ে তোলে। ফুটিয়ে তোলে সেই জ্যোৎস্না-ভরা নীল-হলুদ মৌন সমুদ্রের এক ধারে বসে।
কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে, শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় আঁকা প্রকৃতির ছবি দিনের আলোয় বদলে যায়। নন্দলাল সেই ছবি হাতে তুলে নেন। এ তাঁরই দেখানো পথের ধারা, "দিনের আলোয় দেখা সব নয়। দিনের আলোয় দেখা গাছপালা মাঠ ঘাট খোয়াই, অন্ধকার রাত্রে একরকম, জ্যোৎস্না রাত্রে আর একরকম। সেই রাত্রিকে দেখতে হয় চুপ করে। এক জায়গায় বসে। দেখা যাবে, কিছুই একরকম থাকছে না। আকাশের তারারা জায়গা বদলাতে থাকে। আর ফাঁকে ফাঁকে মনে হয়, গাছপালারাও কেউ দাঁড়িয়ে নেই। সকলেই চলছে। তখন একবার উঠে, সেই গাছপালাকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। দেখতেও হয়। যদি ইচ্ছে হয়, তবে জ্যোৎস্নার বটের ছায়ায় মাটিতে খড়ি দিয়ে দাগা বুলিয়ে রেখে, পরে দিনের আলোয় দেখতে হবে। সেইখানে ধরা পড়ে থাকবে মধ্য রাত্রের চাঁদের আলোয় গাছের ছায়ার কী আকার ছিল। আর সেই আকারটাই হতে পারে একটা ছবি। কেবল দেখতে হবে, সেই ছায়ার ভেতরে আরও কোনো আকৃতি-প্রকৃতি আবছায়ার মতন ধরা দিচ্ছে কি না। যে-আঁকে, সে দেখতে পায় ভেতরের সেই রহস্য। কারণ রাত্রের জ্যোৎস্নায় যে-গাছ দেখা গেছলো, সে তার শেকড় গোড়া কাণ্ড আর নিচের শরীরটাকে স্পষ্ট করে দেখতে দেয় না।
"প্রকৃতির মধ্যে সময় ধরা দেয়, কিন্তু একটা জিনিস দেখবে, ছবিতে সেই সময়টা স্থির হয়ে নেই। কোথায় একটা দাগ টেনেছো, সেটা দাগ না হয়ে সেই কোন্ দূরে মিলিয়ে যায়। তখনই বোঝা যায়, ছবির মধ্যে ধরা আছে অসীমকে। এমন কোনো রঙের ব্যবহার অচল বলে মনে করি, যা একটা অচলকেই ধরে রাখে। সেইখানে তুমি মায়াবী। তোমার রঙের চোখ, তুলির টান, সবই মায়াবী। কোনো অচলকেই তুমি নিরেট করে রাখো না। প্রতিমার চক্ষুদানের সঙ্গে সঙ্গে যেমন দেবী প্রাণ পান, তোমার রঙের গুণে, তুলির ছোঁয়ায়, সেই অচলটা তেমনি প্রাণ পেয়ে যায়। সেই কারণেই শিল্পী স্রষ্টা।
"বলে থাকি, মরি মরি! আ মরি! তার মানে তো এই, আমি মরে যাই, তুমিই থাকো। সেই ভেতরের সুন্দরকে ধরা আঁকা ছবিই সেই মরি মরি। সেই ভেতরের সুন্দর যে-মুহূর্তে দেখা দেয়, তখনই শিল্পী আঁকে। সে সেই অনুভূতি আর অন্তর রহস্যের ভেতরের দেখা থেকে এঁকেছে। যখন চোখ ভরে গেল, মন মরে গেল, তখন কে শিল্পী তা ভুলেছি। কারণ শিল্পী আছে ছবিতে। শিল্পী নিজেই ছবি হয়ে আছে।
"চোখ আঁকে। মন আঁকে। চোখকে কে দেখায়? মন দেখায়। মনকে কে জাগায়। চোখ জাগায়। তখন চোখে মনে মাখামাখি। সেই তোমাদের পদাবলী গানের মতন, দুঁহু বিনা দুঁহু নাহি জানে। কিন্তু মন যদি বিক্ষিপ্ত থাকে, চোখ তার নজর হারায়। তেমনি নজরও ভুল করে। তখন সে মনকে ঠারে। তা হলে ধ্যানে বসতে হয়। শিল্পীর ধ্যান বসে হয় না। তার দেখা আর মনের ভেতর একটা ক্রিয়া চলতে থাকে। রসের ভিয়েনের মতো। ভিয়েন হলে মিষ্টি জমে। মন কেমন? না, ছুঁচের ডগায় সর্ষের দানার মতো।

তাকে ধরে রাখে কার সাধ্য । বুঝতে হবে, তোমার ডাক এসেছে । ছুঁচের ডগায় সরষের দানা ধরে রাখার ডাক এসেছে । কোথায় ? যেথায় খুশি । পাহাড়ে বনে সমুদ্রে নদী নালা পথে ঘাটে মাঠে । রাত্রের মন্দিরের আশেপাশে । দক্ষিণে নিচুবাংলার জলের ধারে । উত্তরে খোয়াইয়ের পথে পথে । তোমার দিন নাই । রাত্রি নাই । অন্ধকার নাই । আলো নাই । তুমি নিবিষ্ট হয়ে বস । মন দেখছে চোখ দেখছে । কেউ কারোর ছাড়াছাড়ি নাই । বিক্ষিপ্ত নাই । ছুঁচের ডগায় সর্ষের দানা স্থির ! সেই সে মাহেন্দ্রক্ষণ । কান পেতে শোনো, তোমার ভেতরে কে যেন বলছে, সুন্দর ! ঐ সুন্দরের বলাই নিয়ে মরি !

"মরবে তো । বালাইটিকে রেখে মরো । কেউ তোমাকে বলতে আসবে না । বালাই নিয়ে তখন তুমি বসে গ্যাচো । বালাই ফুটছে রঙে রঙে, তুলির টানে…"

নন্দলালের এই দেখিয়ে দেওয়া পথের ধারার যাত্রীসকল চলেছে তাদের নিজের টানে । রামকিঙ্কর একা না । বিনোদবিহারী থেকে বনবিহারী । নিশিকান্ত থেকে সুকুমার দেউস্কর । প্রভাতমোহন থেকে হরিহরণ । কেউ বাদ নেই ।

আঁকা আর গড়ার এই নানান ছন্দে জীবনটা চলেছে । সেই সঙ্গেই চন্দ্রা যেন কোন্ এক অচেনা পথে টেনে নিয়ে চলেছে । এ বছরের জ্যৈষ্ঠে রামকিঙ্কর তেইশ বছর ডিঙিয়ে চব্বিশে পড়েছে । আঠারো বছরের তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ কালো ডাগর চোখ চন্দ্রাও একটা বছর কাটিয়েছে এই আশ্রমে । গত পূজার ছুটিতে সে দেশে গিয়েছিল । রামকিঙ্করেরও ডাক ছিল বাঁকুড়ায় । ফিরে এসে দুজনের দেখা হতেই আবার চন্দ্রার হাতছানি দেখা গিয়েছিল । সেই হাতছানি আর কোনোদিনই নামেনি ।

বনবিহারী আর নিশিকান্তর সঙ্গে শ্রীনিকেতনের পথে, দক্ষিণের শালবনে রামকিঙ্করের দিবা-নিশি ভ্রমণ । কিন্তু সেই বনেই চন্দ্রা অসময়ে ডেকে নিয়ে যায় । সে বাস্তবিক হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যায় না । সে যখন খেলার মাঠের কোণ বরাবর আঁচল উড়িয়ে যায়, তখন রামকিঙ্করের ব্যগ্র উৎসুক চোখ চেয়ে থাকে । চন্দ্রা দূর থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকায় । সেইটুকুতেই তার হাতছানি দেখা যায় । ডাক শোনা যায় । সংক্ষিপ্ত সেই পথে, শালবন যেন কখন ওদের দুজনকে ঘিরে ধরতো । মনে হতো, গভীর বনে ওরা হারিয়ে গিয়েছে । চন্দ্রা যে কোন্ দিকে চলতো, আর কেনই বা তা এলোমেলো এদিকে

ওদিকে, রামকিঙ্কর বুঝতে পারে না । ও যখন ডান দিকের বনের ছায়ায় চন্দ্রার কাছে যেতে চায়, চন্দ্রা তখন বাঁয়ের আড়ালে হারায় । ও যখন বাঁয়ের আড়ালে যায়, চন্দ্রা তখন ওর পিছনে মুখ ফিরিয়ে, চলে যায় অন্য দিকে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও চন্দ্রার মুখোমুখি হয় । ও হয়, অথবা চন্দ্রাই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে । যেন নিতান্তই দেখাদেখি, মুখোমুখি । দাঁড়াতেই হয় । বনের কোন ছায়া ঝোপে টুনটুনি শিস দেয় । দোয়েল ডাকে । টুকরো আকাশ দেখা যায় । আর গাছের ফাঁকে ঝরা রোদ ওদের গায়ে মুখে । চন্দ্রার রক্তিম ঠোঁটে থাকে টেপা হাসি । রোদে যেন সোনা গলে মুখে । আর খোলা চুলে যেন মেঘের ফাঁকে পূর্ণ চাঁদ ।কালো চোখে বিদ্যুতের ছটা, "তুমি ! তুমি কেন বনে ?"

"তুমি এলে যে !" রামকিঙ্কর একটু-বা বিব্রতই । ওর মোটা ঠোঁটের ফাঁকে সাদা দাঁতের হাসি । কপালে রুখু চুলের গোছা, ভুরুর কাছে থমকানো ।

বাতাস না-ই থাকুক । তবু আঁচল যে খসে । আর চন্দ্রাকে আঁচল যে তুলতেই হয় । পাতা ঝরে টুপ টাপ্ । বুলবুলির শিস্ ভেসে আসে । চন্দ্রার কপট অবাক চোখের ভুরু জোড়া কুঁচকে ওঠে, "আমি এলেই তুমি আসবে ?"

"মনে হল, তুমি যেন আমাকে ডাকলে ?" রামকিঙ্করের স্বরে আত্মবিশ্বাসের সুরটা কেমন স্খলিত শোনায়, "ডাক নাই ?"

চন্দ্রা মুখের দু পাশ থেকে খোলা চুল টেনে সরায় । পিঠের পিছনে ছুঁড়ে দেয় । নাতিদীর্ঘ উদ্ধত শরীর যেন আঁচলকে বারে বারে ঝরিয়ে
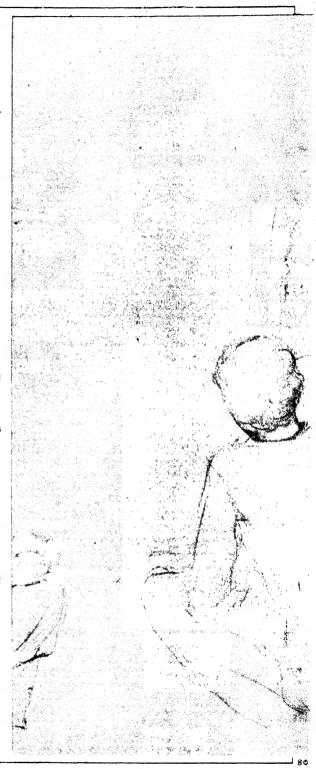
দেয় । কোন্ পাখি শিস দিয়ে ডেকে ওঠে । চন্দ্রা খিলখিল হাসে । তার প্রতি অঙ্গ থেকে সুধা উপচে পড়ে, "কেন তোমাকে ডাকবো ?"

"ডাক নাই ?" রামকিঙ্কর যেন কুহকি মায়ায় অবাক আর বিব্রত হয় । সূর্যাস্তের আকাশের মতো মুখের হাসি যাই যাই করে, "এমনিই ছুটতে ছুটতে একলা এই বনে চলে এলে ?"

চন্দ্রার হাসি থামে না । কোথায় শাড়ির আঁচল থোবে ? বক্ষান্তরে ? রয় না যে ! কতো আর খোলা চুলে বাঁধবে এলোখোপা ? খুলে খুলে যায় যে ! মাথা ঝাঁকায় বা নাড়ে, কিছুই বোঝা যায় না । অন্তত রামকিঙ্কর বোঝে না । কেবল ঘাড় বাঁকিয়ে চোখের কোণে তাকিয়ে হানে বাণ, "তাই তো এলাম ।"

রামকিঙ্কর জীবনে একজনকে দেখেছিল । সেই ওর আঠারো বছর বয়সে । তারপর ওর চব্বিশে এই উনিশ বছরের এক অচেনা কাঞ্চনবরণী । বাঁকুড়ার সেই একজন যেন অচেনার মধ্যেও চেনা ছিল । কিন্তু আদ্যন্ত চেনা কোনোকালেই বোধহয় হয় না । কেবল চিহ্ন থেকে যায় কিছু । সে রেখে গিয়েছে তার পটুয়া তুলির টানের এক অবাক অবিশ্বাস্য চিত্র-রেখা । কতো সাধনা করলে, মাত্র কয়েক টানে একটি মানুষকে পটে ফুটিয়ে তোলা যায় ? সে রেখে গিয়েছে একটা তপস্যার কঠিন পথ । আর যা সে দিয়েছিল, তা এক অপার রহস্যময় অনুভূতি । ব্যথা আর সুখের মধ্যে সে প্রসব করেছিল এক সিদ্ধকাম পুরুষকে । সে কোথায়, আর কোথায় বা সিদ্ধকাম পুরুষ, ও জানে না । আজ ওর সামনে এক ভিন্ জগতের পূর্ণ চাঁদ জ্যোৎস্নাময়ী । তার মধ্যে প্রতিমার লক্ষণ নেই । সে ওকে ডেকেছে কি ডাকেনি, এক বছরেও তা জানা হয়নি । সে ওর সঙ্গে গানের গলা মেলাতে গিয়ে হেসে মরে । অথচ তার নিজেরও নেই গানের গলা । সে ওর সঙ্গে বসে পট আঁকতে চায়নি । সে যেন ওকে পথের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে, কেবলই ঘুরছে । সে কতো তার রঙ ! কতো যে উত্তাপ ছড়ায় । আর রক্তে তোলে ঢেউ । সে এক আদ্যন্ত প্রকৃতি । সে শিক্ষাভবনের দুয়ারে কতোটা বিদুষী, ও জানে না । মনে হয় যেন পার হয়ে এসেছে জীবন-রহস্যের উত্তাল সমুদ্র । নইলে, ঐরকম হাসি সে হাসে কেমন করে । চোখে ঐ রকম বিদ্যুচ্ছটা হানে কী করে ? আর সে যে বড়ই ধরা-অধরা অঙ্গে মত্ত উদ্ধত রঙ্গে রঙ্গিনী হয়ে ওঠে ।

রামকিঙ্কর চন্দ্রাকে বুঝতে পারে না । অথচ চন্দ্রার দুরন্ত প্রকৃতির কাছে ও অন্ধ প্রমত্ত । চন্দ্রার সঙ্গে গত বছর বসন্তে, ওর প্রথম দেখার মধ্যে ছিল একটা চমক । খিলখিল হাসি আর মাদার রঙ শাড়ির আঁচল ওড়ানো উদ্ধত যৌবনের জীবন্ত মূর্তি । সেই চমকটা রয়েছে একরকম । তার কোনো বদল হয়নি । সৌভাগ্য ওর একটাই । ওর আঁকা-গড়ার ধ্যানের রাজ্যে, চন্দ্রা ওর আঁচল ওড়াতে পারেনি । ওর উদ্ধত অধরা শরীরের প্রকৃতি-ঝড়, সেখানে কোনো প্রলয় ঘটাতে পারেনি । কিন্তু যখনই ও আঁকার গড়ার জগত থেকে উঠে আসে, তখন চন্দ্রা হয়ে ওঠে সর্বগ্রাসী । অথচ বুঝতে পারে না, চন্দ্রা ওকে কোন অলক্ষের পথে টেনে নিয়ে চলেছে ।

চন্দ্রা নিজে থেকে ধরা না দিলে, রামকিঙ্কর ওকে ধরতে পারে না । কারণ ওর অতীতটা ওকে কখনও হাট করে সব দরজা খুলে দেয়নি । সেই সঙ্গে চন্দ্রাও রয়েছে একটা অচেনা আবছায়ার মধ্যে । রামকিঙ্করের আত্মবিশ্বাসের জোরটাও অতএব দৃঢ়বদ্ধ হতে পায়নি । চন্দ্রার ধরা-অধরার খেলার মধ্যে, ওকে পিছন ফিরতেই হয় । পা বাড়ায় বনের বাইরে ।

"রামকিঙ্কর, আমাকে এই বনের মধ্যে একলা ফেলে চলে যাচ্ছো ?" চন্দ্রার উদ্বিগ্ন করুণ স্বর ভেসে আসে ।

রামকিঙ্করের পায়ে বেড়ি । তারপরে ও বনের বইরে যাবে, সে-ক্ষমতা ওর ছিল ন । যে ওকে ডাকেনি, সে-ই দোষ দেয় । নালিশ করে । ঘাড় বাঁকানো মুখ আর কালো চোখের তারায় অভিমান । রক্তিম দুই ঠোঁট ফুলে ওঠে । আর বাঁকুড়ার যুগীপাড়ার যুবার প্রাণ কাতর হয়ে ওঠে । ফিরে পা বাড়াবার আগে, তবু একবার ভাবে, চন্দ্রার কোন্‌টা সত্যি ? ওর ভাবনার এই আগে-পাছে দোমনা ভাবের মধ্যেই, চন্দ্রা তখন শালগাছের তলায় বসে হাঁটু মুড়ে । আঁচল পড়ে থাকে হাঁটুর কাছে বিছিয়ে । খোলা চুলের রাশি । রামকিঙ্কর পায়ে পায়ে ফেরে । চন্দ্রার কাছে যায় । যে-চোখে কেবলই রঙ্গ আর কৌতুকের ছটা, সে চোখ বুঝি টলটলিয়ে উঠবে জলে । নত তার মুখ । স্বর্ণাভ গালের এক পাশে কালো চুলের গুচ্ছ ।

রামকিঙ্কর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, "ডেকেছ ?"

"জানিনে ।" শালের গায়ে হেলান দেওয়া শরীর আরও যেন এলিয়ে পড়ে । মুখ তোলে না । ভালো করে দেখাও যায় না । কেবল সেই সদারঙ্গিনী স্বরে অভিমানের স্বর বাজে, "একটু মায়া মমতা নেই ।" ঝটিতি সে পাশ ঘুরে বসে ।

রামকিঙ্কর দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারে না । কিন্তু চন্দ্রার অন্যায় নালিশে প্রাণ আতুর হয়, "মায়া মমতা কী ? জানি না । তোমাকে বনে ফেলে যাব, সে কথা একবারও ভাবি নাই ।"

"ভাবো নাই তো ওরকম ভাবে চলে যাচ্ছিলে কেন ?" চন্দ্রা মুখ তুলে তাকায় । ওর কালো চোখে তখন দ্যুতি । ঠোঁটে হাসি, "পাশে বসতে কেউ বারণ করেনি ।"

রামকিঙ্কর চন্দ্রার পাশে বসে । চন্দ্রার খোলা চুলের রাশি থেকে সুগন্ধ ছড়ায় । সেই চুলের গুচ্ছ কেমন করে যে রামকিঙ্করের গালে গলায় এসে ঠেকে যায়, কিছুই বোঝা যায় না । কাঁধের কাছে কোমল স্পর্শে আগুনের আঁচ ! আর গুন গুন গান বেজে ওঠে, "সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে,/ ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা⋯"

"কোথা যে গেছে ওরা বনের আড়ালে/ শুনি যেন ওরা কী কথা বলে⋯"

রামকিঙ্কর চন্দ্রার সঙ্গে গলা মেলাবার আগেই নিশিকান্তর স্বর ভেসে আসে, "সেই যে দেখেছিনু তোরা গেলি বনাঞ্চলে/ কোথা গেলি জোড়া ! কোন্ তরুতলে ? চন্দ্রাহত কিঙ্কর হে⋯"

চন্দ্রার গলায় গান খান খান । লাফ দিয়ে উঠেই দৌড় । রামকিঙ্করের পা অবশ । উঠে দাঁড়িয়েও ছুটতে পারে না । চন্দ্রার ছুটে চলা বনের পথে তাকিয়ে থাকে । বনবিহারীকে সঙ্গে করে নিশিকান্তর প্রবেশ । দু হাত তুলে কবি স্বরচিত কবিতা বলে, "কোন্ চন্দ্রালোকে তুমি নিজেকে হারালে/ অন্ধকার তো নাহি সেথা/ কিঙ্কর হে, তবু কেন পাই না দেখা এ বনস্থলে⋯"

রামকিঙ্কর নিজেই কি জানে, ও কোথায় হারিয়ে গিয়েছে ।

(ক্রমশ)

বিদেশের আধুনিক পরিবার জীবন

বিধান সিংহ

লণ্ডনের টুটিং বাস স্টপে বাজারের থলি হাতে দাঁড়িয়েছিলেন এক বৃদ্ধা। থলির ভারে ডান দিকে একটু বেঁকে গিয়েছেন। কাছে গিয়ে আলাপ করতে নাম বললেন, ওনীল। থাকেন ব্যাথমে। দামে একটু সস্তা হয় বলে এখানে বাজার করতে আসেন। প্রশ্ন করি, আপনি এতো কষ্ট করেন ? এই বয়সে, বাসে, এতদূর। আপনার স্বামী ? মহিলা বলেন, আমি বিয়ে করিনি। আমার বৃদ্ধা মার দেখাশোনা করার জন্য অবিবাহিতই থেকে গিয়েছি।

বলি, মার জন্য বিয়ে করেননি, বর্তমান ব্রিটেনে যে ধারা তাতে তো আপনাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। একগাল হেসে ওনীল বলেন—আমার বন্ধুরাও সবাই তাই বলে। কি করব বল ? দু ভাই বিয়ে করে বউ নিয়ে চলে গেল। বিধবা বৃদ্ধা মাকে কে দেখে ? তাঁর বয়স এখন নব্বুই। অবশ্য সরকারি পেনশন পান। কিন্তু নিজের লোকের দেখাশোনা তো দরকার।

একটু বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করি, আপনার মতো আরও অনেকে নিশ্চয়ই আছেন এদেশে ? চকিতে চটে যান মহিলা। বলেন হয়ত আছেন। খুঁজলে পাবে। আমি চার্চে যাই। অন্য বৃদ্ধারা আসেন। কত জন বলেন, সাত সাতটা ছেলে, কেউ খোঁজ নেয় না ? কেন, তুমি কাগজে পড়নি, খ্রিস্টমাসের উপহার নিয়ে বৃদ্ধ বাবাকে দেখতে এসে ছেলে ও ছেলের বউ শোনে, বাবা দু মাস আগেই মারা গিয়েছে। এই তো মা-বাবার খবর রাখার ছিরি। তবে হ্যাঁ মিথ্যা বলব না, আমার ভাইয়েরা ওরকম নয়। নিয়মিত সপ্তাহে একবার করে আসে, মাকে দেখতে। এক ভাই বৃহস্পতিবার, এক ভাই শনিবার।

তারপর সামলে নিয়ে বলেন, আমি একটু রেগে গিয়েছিলাম। আসলে কি জানো, দিনকাল বদলে গিয়েছে। আমাদের সময় মা-বাবা-ভাইদের নিয়ে থাকতাম। এখন আমাদের ঘরে ঘরে ফ্রিজ, ফোন, হিটার, গিজার, গাড়ি, বাড়ি, পেনশন, সরকারি চিকিৎসা, বাসে-ট্রেনে কনশেসন সব হল, কিন্তু ওরা হারিয়ে গেল। আমরা একা হয়ে পড়লাম। কেউ যে দু-দণ্ড আমাদের কথা শুনবে তা কারও সময় নেই। তুমি এতক্ষণ শুনছ তাই বলছি। জানো আমিও একদিন চাকরি করতাম। স্মিথ কোম্পানির নাম শুনেছো। সেখানে বিশ বছর চাকরি করেছি। আরও কয় বছর চাকরি ছিল। কিন্তু পুরো টার্ম চাকরি করা হল না। ওই মা। মাকে দেখতে হবে। টার্ম শেষ না করেই চাকরি ছেড়ে দিলাম। তাই আজ কোম্পানির পুরো পেনশন পাই না। কম পাই। তার সঙ্গে সরকারি পেনশন সপ্তাহে চল্লিশ পাউণ্ড। কষ্টে সৃষ্টে চলে যায়। মাগ্গিগণ্ডার বাজার।

পাশ্চাত্যদেশগুলির অনেক পরিবারেই এই ছবি আর দেখা যাবে না। পারিবারিক কাঠামো দ্রুত আমূল বদলে যাচ্ছে

বলতে বলতে বারবার বাসের আশায় তাকান। দেখো, কতক্ষণ হয়ে গেল, বাস আসে না। এই আর এক জ্বালা। বোঝা হাতে দাঁড়িয়ে থাক। মনে হল যেন কলকাতার এসপ্লানেডে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছি। ক্রমে চারদিকে ভিড় বাড়ছে। ভাবতে ভাবতেই বাস এসে গেল। মহিলা এগোলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, তোমার বাসও আসবে। এক কাজ কর, যে নম্বরের বাস চাই মনে মনে তার অন্য নম্বরটা খোঁজ, দেখবে ঠিক চলে আসবে তোমার নম্বরের বাস। ওই একই ব্যাপার। কলকাতায় চার নম্বর যখন দরকার তখন আসে পাঁচ, ছয়ের বেলায় চার।

মধ্যবিত্তের জীবন দেখছি সর্বত্রই এক। তবুও তার মধ্যে কিছু স্বাচ্ছন্দ্য লণ্ডনে অবশ্যই আছে। ওদের সে স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্যাও আছে। যা আমাদের থেকে আলাদা। আমাদের মতো বাবা, কাকা, জ্যাঠার যৌথ পরিবার ওদের স্মরণকালের মধ্যেই ছিল না। যৌথ পরিবার বলতে ওরা বুঝত মা-বাবা-ভাই-বোনের সংসার। এখন তাও থাকছে না। ওখানে সাবালক ছেলে মেয়ে তাঁদের মা-বাবার কাছ থেকে আলাদা থাকেন, এ কোনও নতুন কথা নয়। স্বাধীনচেতা ছেলে মেয়ে যেমন মা-বাবার সঙ্গে থাকতে চান না, বাবা-মাও তেমনি ছেলে মেয়ের থেকে স্বাধীনভাবে থাকতে চান। নতুন হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ওদের সমাজ ও পারিবারিক কাঠামোই ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো আমূল বদলে যাচ্ছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বড় বেশি প্রকট হচ্ছে।

কিন্তু এতে ওঁরা সুখে আছেন কি ? প্রশ্নটা রেখেছিলাম গ্লাসগোর ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এ ডি টমসনের কাছে। ২৯ জুলাই নিউ ক্যাসেল যাচ্ছি, লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া থেকে। তখনই আলাপ। প্রথমেই বলেছিলেন, ঘড়ি মিলিয়ে নিয়েছো তো ? নতুন লোক, এখন পাঁচটা। ঠিক আটটায় উঠে পড়বে সিট থেকে। তোমার স্টেশন এসে যাবে।

এই হল সাহেবদের এক রোগ। মনে মনে গজগজ করি, কালো চামড়া দেখলেই একটু বাড়িয়ে বলে দেবে। ট্রেনের টাইম দেখে ঘড়ি মেলাতে হবে। যত সব। যেন ওদের ট্রেন আর লেট করে না। তা বলুক। ট্রেনটা রেখেছে কিন্তু পরিষ্কার। প্রথম শ্রেণীর কামরা, ওঁরা বলেন একজিকিউটিভ ক্লাস। পুরো ট্রেনে কার্পেট পাতা। ঝকঝকে গদি আঁটা চেয়ার। সামনে টেবিল। অমনি একটা চেয়ারের পিছনে এক টুকরো কাগজের চিরকুট গোঁজা। ওটাই আমার রিজার্ভেশন। বলতে বলতেই ট্রেন ছেড়েছে। পাশে তাকিয়ে বুঝছি ট্রেন চলছে। ও আমাদের রাজধানী এক্সপ্রেসেও হয়। এমন আর কি ? তিন ঘণ্টার জার্নি। দেখাই যাবে এবার কি হয় ? কেমন চালাও তোমরা ট্রেন ? হুকার উঠবে। প্রতি স্টেশনে বিনা টিকিটের যাত্রী উঠে, প্রথমে রিজার্ভ সিটের হাতলে, তারপর ঠেলে এক চেয়ারে জোর করে দুজন বসবে। এসব হবে না। তখন দেখাবো সাহেব তোমাকে।

নিজের ভাবনায় বিভোর হয়েছিলাম। চটকা ভাঙল, টমসনের ডাকে। কী ভাবছ, দেশের কথা ? একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, না এই আর কি। টমসন বলে, তা কি বলছিলে যেন সুখের কথা ? অপার্থিব ব্যাপারগুলোর কথা বলতে পারব না। বাস্তবের কথা যদি বল—বলব মা-বাবা ভালো আছেন। গভর্নমেন্ট এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো ওঁদের দেখাশোনা করছে। শুধু আমার বাবা মা কেন, ব্রিটেনের তাবৎ বৃদ্ধ বৃদ্ধার জন্য, আমরা যারা চাকরি করি তারা ট্যাক্স দিচ্ছি। সে টাকায় সরকার ওঁদের দেখভাল করছেন। খারাপটা কি ? জীবনধারণের জন্য যা দরকার তা তো ওঁরা পেয়ে যাচ্ছেন। খাবার। থাকার জন্য বাড়ি, অসুখে ডাক্তার, চিকিৎসা।

বলি এই কি সব ? টমসন বলে, কী যে তুমি বলতে চাইছ তাই তো বুঝছি না। বাবা-মা আছেন নিজের মতো। নিজের বাড়িতে। আমরা আমাদের মতো। তিন সপ্তাহ পর একবার যাই

বাবা-মাকে দেখতে। সেটাই তো স্বাভাবিক।

প্রশ্ন করি, তোমার বাবা-মা কত টাকা পেনশন পান ? টমসন বলে, তা তো জানি না। বিস্মিত হয়ে বলি, বল কি, বৃদ্ধ বাবা-মা কত পেনশন পান, তাতে তাঁদের চলে কি না তাও জানো না ? টমসন বলে, না জানি না। ওঁরাও কখনও সাহায্য চান না। আমরাও সাহায্য করি না। এ আমাদের পারস্পরিক স্বাধীনতা। কেন একে অন্যের ব্যাপারে নাক গলাব।

ত্রিশ বছরের যুবক টমসন অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা। কোনও রকম রেখে ঢেকে কথা বলা পছন্দ করে না। সোজা বলে দেয়, আমি জানি তোমাদের ভারতীয় নিয়ম কানুনগুলো আলাদা। এসব কথা তোমার ভাল লাগছে না। তা দেখ বাপু, আমি বিয়ে করেছি। আমাদের জীবনটা আমাদেরই। আমার বাবা-মার নয়।

বললাম বিয়ে করেছ, তুমি নিজেও ম্যারেজ রেজিস্ট্রার। আজকাল তোমার ওখানে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি হচ্ছে কেমন ? এবার হেসে ফেলে টমসন। বলে, আজকাল বিয়ে রেজিস্ট্রি বড় কম হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি ডিভোর্সও বাড়ছে। তোমাদের তো শুনি ডিভোর্সও পছন্দ নয়। কী লাভ বলত ? সারাজীবন এক জায়গায় বদ্ধ হয়ে থেকে কী পাও তোমরা ? আর ওরকম একজনের সঙ্গেই বন্ধনহীন গ্রন্থিতে বদ্ধ হয়ে থাকতে হবে তারই বা কি মানে ? এ কঠোরতা কেন ?

বলি বনিবনা না হলে ডিভোর্সের বিধান আমাদেরও আছে। তবে শুধু পরিবর্তনের জন্যই ডিভোর্সকে ব্যবহার করাও কি ভাল। তুমিই বল ? এর বেশি আর ওকে কি বলি ! কারণ ওদেশে ব্যাপারটা তো আজ আর শুধু ডিভোর্সে থেমে নেই। আরও অনেকটাই এগিয়েছে।

ততক্ষণে সময়ও চলে গিয়েছে। টমসন বলে, নাও তোমার স্টেশন এসে গেল। ট্রেনটা আট মিনিট লেট করল। বিকাল পাঁচটায় ভিক্টোরিয়া ছেড়েছে। রাত আটটা আটে পৌঁছবার কথা। পৌঁছল আটটা ষোলতে। চমকে উঠি। রাত আটটা। বাইরে যে এখনও রোদ ঝকঝক করছে ! তা ছাড়া কেউ তো বিরক্তও করল না এই তিন ঘণ্টায়।

টমসনের কাছে শুধু জানতে চাই কতটা দূর লণ্ডন থেকে নিউ ক্যাসেল ? টমসন বলে, তিন শ মাইল। বল কি ? তিন শ মাইল তিন ঘণ্টায় ? ওকে আর বললাম না কলকাতা থেকে আমার দেশের বাড়ি জলপাইগুড়িও দেশভাগের আগে ছিল তিনশ মাইল। এখন কিছু বেশি। তাতেই এক রাত এক সকালের জার্নি। আমাদের [illegible]ও প্রথমে ছিল এই রকমই ঝকঝকে এবং গতি সম্পন্ন।

এই গতিসর্বস্বতা পাশ্চাত্যের সর্বত্র। সর্বদাই [illegible]টছে। পৃথিবীটাই যেন ছোট্ট হয়ে আসছে। কিন্তু তাতে ওরা কী পেল ? সেদিনই দুপুরে লণ্ডনে বি[illegible] সির লাঞ্চ রুমে ওদের ইস্টার্ন সার্ভিসের [illegible]নিয়র প্রডিউসার সেরাজ রহমান অনেকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন এক বাংলাদেশী তরুণী। তিনি চাকরি করেন লণ্ডনে। স্বামী পশ্চিম জার্মানিতে।

তিনি বললেন, আমেরিকায় আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে কলকাতার এক তরুণের। সেটা ১৯৭৯ সন। দুজনে সেই থেকে আমেরিকায় একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন।

আমার প্রশ্ন : একসঙ্গে থাকতে লাগলেন মানে ? বিয়ে ? এবার ঘরে উপস্থিত সবাই দিলেন সরস ধমক—আঃ এখানে এরকম বোকার মতো প্রশ্ন কর না।

তরুণী হেসে বলেন, ও আপনি বলছেন ইনস্টিটিউশনের কথা ? ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সাইনের ব্যাপার তো ? সেটা হল সাত বছর একসঙ্গে থাকার পর। ১৯৮৬তে। তাও কী হল জানেন ? ওরা কলকাতার কুলীন বামুন। ওদের বাড়ি থেকে সবাই বললেন, বিয়ে একটা না করলে কেমন দেখায়। আমাদের সমাজে কথা হবে ! আমরা বললাম, বেশ ব্যবস্থা কর। তারপর

কথা বলছেন ? স্বামী বলে ভাবতে এখনও যেন কেমন লজ্জা করে। অস্বস্তি হয়।

আর মাত্র একটি প্রশ্ন, আপনাদের ছেলেমেয়ে কটি ? তরুণী বলেন একটি ছেলে। বয়স ১৫। আমেরিকায় পড়ে।

সে কি ? আপনার সঙ্গে আপনার বন্ধুর আলাপ হল আট বছর, ছেলের বয়স ১৫ হয় কি করে ? তিনি বলেন ও আমার ছেলে। আমার বাল্যবিবাহ হয়েছিল।

এরপর আলোচনা শেষ হয়। বেরোতে বেরোতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার সেই প্রথম স্বামীর কি হল ? তিনি বলেন, মারা গিয়েছেন। তারপর যোগ করেন, এ সব কথা আলোচনায় আমার কোনও দ্বিধা নেই। কারণ এখানে এ সব অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। শুনেছি আপনাদের ওখানেও আজকাল হচ্ছে কিছু কিছু।

'ভালো মা হব। কিন্তু বিয়ে করে কোনো ছেলের অধীনতা স্বীকার করব না'—মেয়েদের অনেকেই এই ছকে জীবন বেঁধেছেন

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এলেন। সই সাবুদ হল। তখন বললাম, বিয়ে সাইন তো হল ? এবার কী করতে হবে ? একটা কিছু তো করতে হয়। তারপর মিষ্টি এনে ওদের বাড়িতেই বন্ধুবান্ধবদের মিষ্টি মুখ করানো হল।

তারপর থেকে ও আমেরিকায় আমি লন্ডনে। ও চলে এলো পশ্চিম জার্মানিতে, আমি লন্ডনেই রয়ে গেলাম।

এবার আমি বলি আপনাদের এ গল্পটা নামধাম সমেত লিখব ? অনুমতি দেবেন। সবার সামনে সজোরে মাথা নেড়ে তিনি বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ লিখবেন ! নাম পরিচয় সব দেবেন। আমরা তো লুকিয়ে কিছু করিনি। অন্যায়ও কিছু নয়। সবাইকে জানিয়ে শুনিয়েই সব কিছু হয়েছে।

তা আপনার স্বামী, লন্ডনে চাকরি নিয়ে আসতে চান না ? আমার এ প্রশ্নে একটু থতমত খেয়ে তরুণী বলেন, স্বামী ? ওঃ আপনি সুরেনের

আমরা সুখে আছি সেটাই কি বড় কথা নয়। আমি মুসলমান ওরা কুলীন বামুন। কই কোনও অসুবিধা তো হয় না। এখানে ড্রুরি লেনে এক বান্ধবীর সঙ্গে ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকি। অফিসের কাছেই থাকতে চাই। তাই ভাড়া বেশি। বছরে হাজার পাউন্ড।

কথা বলতে বলতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, থাক নামটা না হয় নাই দিলেন। সবই তো বললাম। আমার দিক থেকে অবশ্য অসুবিধা কিছু নেই। তবুও কলকাতায় ওঁর আত্মীয়স্বজন আছেন। শেষ পর্যন্ত আর তাঁর নাম দেওয়া গেল না। স্বামীর নামটাও কল্পিত।

এখানেই পেলাম এমন আরও ঘটনা যা আমাদের রীতি অনুযায়ী বিচিত্র। কিন্তু এদের নিয়মে স্বাভাবিক। এদেশের আধুনিক সমাজটাকে বুঝতে সাহায্য করবে তাই একটি উল্লেখ করি। বত্রিশ বছরের লাইজা কাজ করেন সেক্রেটারির।

থাকেন ছেলে বন্ধুর সঙ্গে। বছর পাঁচেক আগে হঠাৎ এসে অফিসের কর্তাকে বলেন, ছুটি চাই। ছেলে হবে। ততদিনে ছেলে বন্ধু ছেড়ে গিয়েছে। অনেকেই উপদেশ দেন, গর্ভপাতে। কিন্তু লাইজা রাজি নন। তিনি বলেন, ছেলেটা চাই। আমি ভালো মা হব। কিন্তু বিয়ে করে কোনও ছেলের অধীনতা স্বীকার করব না। তাঁর একটি মেয়ে হল। মেয়ের বয়স এখন সাড়ে চার। মেয়েকে নিয়ে লাইজা এখন থাকেন উত্তর কেন্সিংটনে নিজের ফ্ল্যাটে। দিব্যি আছেন। চাকরি করছেন। কুমারী মাতার দিকে কেউ বিদ্রুপ বা তাচ্ছিল্যের অঙ্গুলী নির্দেশ করে না। লাইজাও আর তাঁর সেই পুরোন ছেলে বন্ধুর খোঁজ করে না। যে ছেড়ে গিয়েছে তাকে সে বাঁধতে চায় না। সেই ছেলে বন্ধু হয়ত এখন আবার এক নতুন কোনও বান্ধবীর সঙ্গে সহ-অবস্থান করছে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ওদের জীবনে যে সুযোগ এনে দিয়েছে, এগুলি তার অপব্যবহার কি না সে প্রশ্ন আজ আর ওখানে কেউ প্রায় তোলেই না। পূর্ব পশ্চিমের সমাজ আলাদা। জীবনযাত্রার মানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও পরিবারকে ভাঙতে হবে কেন? আমাদের এশীয় চিন্তাধারায় তার কোনও যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কের বিরোধটা কোথায়?

ব্রিটেনে সরকারিভাবেই কিন্তু এই অবাধ স্বাধীনতা ও ইচ্ছামতো বাঁচার অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ওদের সরকারি রিপোর্টেই বলা হয়েছে গত বিশ বছরে ব্রিটেনের বিয়ের ধারা দারুণ বদলে গিয়েছে। ডিভোর্স বেড়েছে। বিয়ে কমেছে। ১৯৭২ সালে বিয়ে হয়েছিল চার লক্ষ আশি হাজার তিন শ। দশ বছরে বিয়ের সংখ্যা কমে গেল প্রায় দু লক্ষ।

সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল অবিবাহিত যুগলের সংখ্যা। ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলের সরকার কিন্তু এখনও পারিবারিক বন্ধনের উপর জোর দিচ্ছেন। বলছেন সুস্থ ও সবল পরিবারই সামাজিক উন্নতি এবং বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু।

কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ তাঁরা করতে চান না। তবে সমাজে সামান্য হলেও কিছু গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, আমাদের তোমরা প্রাচীনপন্থীই বল আর যাই বল, আমাদের কিন্তু বাপু এসব মোটেই ভালো লাগছে না। আমাদের এখনও রঙচঙে টুপি পরে মেয়ের বিয়ের দিন কনের মা হতেই ইচ্ছে যায়। এদিকে মেয়েরা অনেক এগিয়ে গিয়েছেন। চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, বিজনেস একজিকিউটিভ কোথায় নয়? 'সুপারওম্যান' বলে একটা কথাই চালু হয়ে গিয়েছে। তাঁরা জেট প্লেনে আজ এখানে কাল ওখানে ঘুরছেন। কনফারেন্স করছেন। ছেলেদের উপর হুকুম চালাচ্ছেন। জীবনে অতি সফল এই সব মহিলা এখন অনেক মায়েরই যুগপৎ দুঃখ ও গর্বের কারণ হয়েছেন।

এরকম 'সুপারওম্যানদের' কথা বলেছেন এক মা মাজারি জেরর্ড। এ সম্পর্কে তিনি লিখেওছেন। তিনি -হতে চান কনের মা। নাতি-নাতনির দিদিমা। তাঁর প্রতিবেশীরা যখন তাঁদের নাতি-নাতনির কথা বলেন তিনি দুঃখ পান। আশঙ্কিত হন তাঁর মেয়ের বুঝি আর বিয়েই হল না। মেয়ের বয়স হয়ে গেল ৩৩। এখনও বিয়ে করল না। মেয়ে একা তার অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। বিরাট তার অবস্থা। কিন্তু ওদিকে মাঝরাতে মায়ের ঘুম ভেঙে যায়। মেয়ে একা তার অ্যাপার্টমেন্টে কি করছে? নিরাপদে আছে তো। মেয়ের ছেলে বন্ধুর অভাব নেই। কিন্তু তিনি যে চান শক্ত সমর্থ এক জামাতা। সে তাঁর মেয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। সব দায়িত্ব নেবে। কিন্তু মেয়েকে বললেই বলে হবে হবে? মা তো চিন্তিত। আর কবে হবে। বয়স যে পেরিয়ে গেল। এদিকে মেয়ের বৈভব ও প্রতিপত্তি যত বাড়ছে বিয়ের বাজার যে ততই কমছে। অত বয়স পর্যন্ত কোন ছেলে তোমার জন্য আইবুড়ো হয়ে বসে আছে বল তো? মেয়ে বলে ৩৭ বছরের অনেক যুবক এখনও হাত পা ধুয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা মনে মনে বলেন, আর অপেক্ষা করছে! আসলে তোমরা বাছারা বৈষয়িক জীবনে এতো উপরে উঠেছো, এতো বন্ধু করেছো যে তোমাদের মতো 'সুপারওম্যান'কে ম্যানেজ করতে পারে তেমন ছেলেই আর ব্রিটেনে পাওয়া যাবে না। তোমরা আজ যে স্বাধীনতা ভোগ করছ সেটাই হবে তোমাদের ভাগ্য। অর্থাৎ স্বাধীনতা, শুধু স্বাধীনতাই তোমাদের বিধিলিপি। সারাজীবন তোমাদের স্বাধীনই থাকতে হবে। বর আর জুটবে না। তোমাদের জীবন দেখে মনে হয় যেন একটা এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে। চারদিকের শান্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যও উপভোগের সুযোগ নেই। এবং এই এক্সপ্রেস যখন যাত্রা শেষ করবে তখন সেটা হবে সঙ্গীবিহীন এক অতি নিরালা স্টেশন।

মায়ের আফসোস, আমরাই এদের ডানা মেলে উড়তে শিখিয়েছিলাম। কিন্তু চেয়েছিলাম একটা সীমানার মধ্যেই এরা উড়বে। সীমানা ছাড়িয়ে এরা যে সবকিছুর বাইরে চলে যাবে তা ভাবিনি। আজও আমার আর্থিক জীবনে সফল মেয়ে, আমার একমাত্র মেয়ে, খ্রিস্টমাসের সময় মনে করে আমাকে উপহার পাঠাতে ভোলে না। কার্ডও পাঠায়। কিন্তু আমি কি পাঠাই? মেয়েলি পোশাক, দামী সেন্ট আর তো 'সুপারওম্যানদে'র পছন্দ নয়। ও হয়ত চায় দেওয়াল ফুটো করার ড্রিলিং মেশিন। কিংবা কাঠ মসৃণ করার ইলেকট্রিক যন্ত্র। ওর আধুনিক ঘর সাজানোর জন্য দরকার। অথবা বাগানের ঘাস কাটার মেশিন। এ সব পছন্দ করাই আমার পক্ষে মুশকিল। পছন্দ করলেও এ সব উপহার পাঠাই কী করে। প্যাক করে, পার্সেল করাও তো বিরাট ব্যাপার। আসলে আমার স্বাধীন মেয়েই আমার পক্ষে বিরাট হয়ে উঠেছে। চলে গিয়েছে আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে।

এরকম সফল মেয়ে ও হতাশ মা আজ ওদেশে অনেক। এ নিয়ে কাগজে লেখালিখিও হচ্ছে। তবুও বলব এটাই ওদের সার্বিক রূপ নয়। এখনও অধিকাংশই কিন্তু আমাদের মতো ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরসংসার করছেন। বেশ স্নেহপ্রবণ। শনিবার সকালে ইওরোপের যে কোনও দেশের টয় মার্কেটে গেলেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। বার্লিন, লণ্ডন দু জায়গাতেই দেখেছি টয় মার্কেট আমাদের দেশের এক একটি মেলার মতো। সাড়ে আটটায় দোকান খুলতে ছেলেমেয়ের হাত ধরে মা-বাবা এসে হাজির। সাড়ে নটার মধ্যে একেবারে পা ফেলার জায়গা নেই। মায়ের হাত ধরে বাচ্চা ছেলের টানাটানি "মাম এটা নেবো, ওটা নেবো।" একেবারে আমাদের রথের মেলার দৃশ্য। ছেলেমেয়ে দামী জিনিস চায়। মা-বাবা হাত ধরে টেনে নিয়ে যান অন্যদিকে সস্তার খেলনার কাছে। আর হাত পা ছুড়ে ছেলের কান্না। ওদের খুব ঝোঁক ইলেকট্রিক ট্রেন, প্লেন, হেলিকপ্টার, বেতার গাড়ি, রোবট এবং শব্দের ইঙ্গিতে চলা ও ডাকা কুকুরের উপর। ইওরোপের এই খেলনার বাজার দখল করে ফেলেছে জাপান। বার্লিনে দেখেছি, অন্তত বেতার গাড়িগুলি ওদেশে তৈরি। লণ্ডনে প্রায় সবই 'মেড ইন জাপান'। এই ভিড়ে 'মেড ইন ইংলন্ড' হারিয়ে গিয়েছে। যদিও ওদেরও শ চারেক খেলনা প্রস্তুতকারক আছে।

ক্রেতাদের মধ্যে টুরিস্ট কিছু আছে। কিন্তু বেশির ভাগই স্থানীয় মানুষ। সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত তুফান মেলের মতো ছুটতে হয়। দম ফেলার সুযোগ নেই। রবিবার দোকান বন্ধ। তাই শনিবারটাই একমাত্র 'শপিং ডে'। সারা সপ্তাহের খাবার ও মুদিখানা থেকে ছেলেমেয়ের বায়না সামলানো সব ওই শনিবার। তাই প্রতি শনিবারই এই মেলা।

ঠিক এই ঝলমলে অবস্থা বাকিংহাম প্যালেসের সামনে। নিত্য বেলা এগারটায় ওখান দিয়ে যাব আর ভিড়ে ট্র্যাফিক জ্যাম। দাঁড়িয়ে পড়তেই হবে। ক্যামেরা হাতে, বাচ্চা কাঁধে, বিচিত্র বেশ ভূষায় সাহেব মেমেরা ওখানেও মেলা জমিয়েছেন। লোহার গেটের ওপাশে রাণীর বাড়ির বাইরের অঙ্গণে রঙচঙে পোশাকে ব্যাণ্ডবাদকরা ইংরেজি সুর বাজাচ্ছে। ঘোড়ায় চড়া রক্ষীরা একেবারে খাড়া দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পরই চলতে শুরু করেছে। রোজ রোজ এই একই দৃশ্য দেখার কি আছে বুঝি না। লণ্ডনের ওভারসিজ ভিজিটার্স অ্যাণ্ড ইনফরমেশন সার্ভিসের প্রতিনিধি মিস ভ্যালেরি কেবল সঙ্গে ছিলেন। ওঁদের সংস্থা সেন্ট্রাল অফিস অব ইনফরমেশন বা সি ও আইর আমন্ত্রণেই এবার ইংলণ্ডে আসা। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা এদের কী কাজকর্ম নেই। তোমরা এত কর্মব্যস্ত জাত। রোজ এরা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে কী করে। হেসে ভ্যালেরি বলেন—ওরা সবাই ট্যুরিস্ট। এই সময় রাণীর বাড়ির গার্ড বদল হয়। ওঁরা তাই দেখতে জড়ো হন।

ট্যুরিস্টের ভিড়ে ও চাকচিক্যে লণ্ডনের এক অন্য রূপ। বছর বছর পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে আর ওদের অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে। হোটেল, বাস, ট্যুরিস্ট কোচ এসবের রমরমা ব্যবসা। মধ্যবিত্তের ছেলেরা করে খাচ্ছে সরকারিভাবেই ওরা বলছেন: পর্যটন এখন ইংলণ্ডের এক প্রধান শিল্প। এতে আমাদের কর্ম সংস্থান বাড়ছে। ওঁরা

বলছেন দেশের যে অঞ্চলে বেকার বেশি সেখানে পর্যটন বাড়ান।

পর্যটক না থাকলে আজকের ইংলণ্ড অনেকটাই গরীব হয়ে যেত। দশ লক্ষেরও বেশি লোক আজ এই পর্যটনশিল্পে নানা কাজে রত। সরকারি হিসাবে প্রতি বছর ইংলণ্ডে পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষের কাজ সৃষ্টি হচ্ছে ট্যুরিস্টদের কল্যাণে। এসব কাজে গরীব বড়লোক মধ্যবিত্ত সবাই উপকৃত হচ্ছেন। বড় লোকরা করছেন হোটেল। একেবারে গরীবরা হোটেলে ওয়েটার। বাইরে পোর্টার। মধ্যবিত্ত, বিশেষ করে মহিলারা রিসেপনিষ্ট ও অন্য কাজ করছেন। দোকানিরা পাঁচ টাকার জিনিস সাত টাকায় বেচে লাল। এর উপর আছে বিমান কোম্পানিগুলির আয়। একটা দেশ বিদেশীদের কাছ থেকে কত টাকা কামাতে পারে ও সেই টাকায় কীভাবে নিজের সমাজ ও অর্থনীতিকে মজবুত করে, ব্রিটেন তার এক দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা নিজেরাও বাইরে যাচ্ছে খুব।

১৯৮৫ সালে পর্যটন বাবদে ওদের আয় ব্যয় ছিল মোট বারো শ কোটি পাউণ্ড। বিমান ভাড়া ছাড়া। এ বছর ওদেশে পর্যটক এসেছে রেকর্ড সংখ্যক—এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ। ১৯৮৪র থেকে এভাবে বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা একধাপে বেড়ে গিয়েছে শতকরা ১৮ ভাগ। ইংলণ্ডেরও মানুষ বাইরে দু কোটি ট্রিপ দিয়েছেন। খরচ করেছেন চার শ সাতাশি কোটি সত্তর লক্ষ পাউণ্ড। এতে অবশ্য ভারতের লাভ কিছুই হয়নি। কারণ এঁরা প্রধানতই গিয়েছেন ইউরোপের দেশগুলিতে। ভারতে নয়। কমনওয়েলথের দেশের সঙ্গে ব্যবসাও কমিয়েছেন। বাড়িয়েছেন ইউরোপে।

ওই সময় বিদেশী পর্যটকরা এসে ব্রিটেনে খরচ করেছেন পাঁচশ পঁয়তাল্লিশ কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড। অর্থাৎ এঁরা যতটা বিদেশে গিয়ে খরচা করেছেন বিদেশের লোক এখানে এসে খরচা করেছেন তার থেকে বেশি। যোগ-বিয়োগে এদের লাভ হয়েছে। একমাত্র ট্যুরিস্টদের কাছ থেকেই ইংলণ্ড ১৯৮৫ সালে প্রায় সাড়ে সাতান্ন কোটি পাউণ্ড বিদেশী মুদ্রা কামিয়েছে। ভাবা যায়!

ওরা কিন্তু ভাবছে। ওদের কিছু সাধারণ মানুষও ভাবতে শুরু করেছেন—এই বিদেশীদের কথা। ভাবছেন খদ্দের লক্ষ্মী। তাদের জন্য শহরটাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে চান। সচেতনতাও দেখলাম বয়স্কদের মধ্যেই বেশি।

বেকার স্ট্রিটে ৩ আগস্ট বিকাল পৌনে তিনটায় এক বৃদ্ধাকে দেখি রাস্তায় এখানে ওখানে পড়ে থাকা কাগজের টুকরো, ছোটখাটো ফলের খোসা তুলে ডাস্টবিনে ফেলছেন। একেবারে একা একা। পাশ দিয়ে মানুষের স্রোত এগিয়ে যাচ্ছে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। কাছে গিয়ে বললাম, মহাশয়া কি কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যা? এভাবে রাস্তার নোংরা পরিষ্কার করছেন।

বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, না আমি কোনও সংস্থার সদস্য নই। আমার নেই কোনও পরিবার। ছেলে মেয়েরা থাকে দূরে। আমার নাম

ছেলে-মেয়েরা বাবা-মাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না, বাবা-মাও কখনো সাহায্য চান না। এ তাদের পারস্পরিক স্বাধীনতা

কী জানো? আমার নাম স্ট্রেঞ্জ। এবং আমি স্ট্রেঞ্জই থাকতে চাই। আজকের দিনের ছেলেরা কি নোংরা হয়েছে দেখছো। রাস্তায় আবর্জনা ফেলছে। আমার যখন যৌবন ছিল তখন যদি এরকম কেউ করত তাকে আমরা ছড়ি দিয়ে পেটাতাম। তুমি জানো আমেরিকানরা বলছে, লণ্ডন এক নোংরা শহর। এরকম হলে তো আর কিছুদিন পর আমেরিকান ট্যুরিস্টরা এদেশে আসবেই না। তখন কী হবে? কী করব বল দিনকাল বদলে গিয়েছে। এখনকার ছেলেরা আমাদের কথা শুনছেই না। কথা না শোনার কথা সর্বত্রই সমান। ওদেশেও যেমন এদেশেও.তেমন বয়স্কদের অনুযোগ ছেলেরা বড় অবাধ্য হয়ে উঠছে। তবে সবাই সমান নয়।

মায়েরা সবকিছু মানতে না পারলেও ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন

কয়দিন ধরে ঘুরতে দেখা গেল বহু মেয়েই মা-বাবাকে বিশেষ করে মাকে খুবই ভালবাসে। বৃদ্ধ মা-বাবা তো মেয়ে বলতে অজ্ঞান। তা সে লিভারপুলের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীমতী বারবারা এইচ ফেনলনই হন অথবা নিউ ক্যাসেলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নিটসনই হন। দুজনেই যত্ন করে আমার ডাইরিতে নিজেদের নাম লিখে দিয়েছেন। শ্রীমতী বারবারা বার বার বলেছেন, জানো আমার মেয়ে নার্স। আমি এখন মেয়েকে দেখতে যাব। আমি নিজে স্যোসাল ওয়ার্ক করি। কাজ আছে। তবুও মেয়ের কাছে যেতেই হবে।

নিউ ক্যাসেলে সি ও আই প্রতিনিধি শ্রীমতী লিন ক্রেইগহেডও বললেন, তাঁর মা ৪৫ মাইল দূর থেকে বাসে মেট্রোতে এবং রেলে তাঁর কাছে আসেন। দু সপ্তাহে একবার আসা চাই-ই। নাতি-নাতনিদের ভীষণ ভালবাসেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে থাকতে বললে থাকেন না। 'মাম বলেন, নিজের বাড়ি ছেড়ে থাকতে ভাল লাগে না।'

আগে ছিল মাম্মি। এখন এঁরা বলেন মাম। প্রায়ই বাবা মা তাঁদের পুরোন পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে আসতে চান না। নতুন পরিবেশে আরও নিসঙ্গ হয়ে পড়বেন বলে ভয় পান। আবার আত্মসম্মানেও বাধে। মেয়ে জামাইর সংসারে থাকেন কি করে? ছেলের সংসারে থাকার ভাবনা খুব কম মা বাবাই ভাবেন তাঁরা মেয়ের কাছাকাছিই থাকতে চান।

নিউ ক্যাসেলেই নাতিকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় খেতে এসেছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এ জে নিটসন। আলাপ হতে আমার ডাইরিতে নিজের নামের নিচে লিখে দিলেন মেয়ে জামাইর নাম। মেয়ের নামের নিচে এম বি বি এস, এম আর সি পি, এম আর সি প্যাথ ডিগ্রিগুলি স্পষ্ট করে লিখে দিয়েছেন। তারিখ ৩০ জুলাই,

শহরে থাকার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবেন না, প্রায়ই বলেন আর লোক নেওয়াও সম্ভব নয়। ওদিকে জমির কারবারিরা জমির দর বাড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই লণ্ডনটা শুধুই ক্রোড়পতি ও জমির কারবারিদেরই জায়গা হয়ে যাবে।

ব্রিটেনের সরকারের বক্তব্য কিন্তু আলাদা। তাঁরা বলছেন, বন্ধ লণ্ডন ডক ও আশপাশের এলাকা উন্নয়নের জন্য তাঁরাও টাকা ঢালছেন। শহরে বাড়ি করাটা এখন অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। ব্যাঙ্ক ও বিল্ডিং সোসাইটি ঋণ দিচ্ছে। তার জন্য ট্যাক্স ছাড় পাওয়া যাচ্ছে। ফলে ভাড়া বাড়িতে থাকা লোকের সংখ্যা ক্রমেই কমছে। গত ৩৫ বছরে বাড়ির মালিকের সংখ্যা তিন গুণ বেড়েছে। ১৯৫১ সালে মালিক নিজে থাকেন এরকম বাড়ি ছিল চল্লিশ লক্ষ এখন তা হয়েছে এক কোটি বিশ লক্ষ। সরকারি বাড়িতে যাঁরাই থাকেন তাঁরাই ইচ্ছা করলে ওই বাড়ি কিনে নিতে পারেন। ১৯৭১ সালে বাড়ির মালিক ছিলেন শতকরা ৫১ জন। ১৯৮৫তে হয়েছেন ৬২ জন। অন্যদিকে ভাড়াটে কমেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ১৯৭৬-এ বাড়ি ভাড়া নেন শতকরা ৩১ জন। ১৯৮৫তে তা কমে হয়েছে ২৭।

ভাড়া বাড়ির থেকে ইউরোপে এখন কিন্তু বাড়ি করে নেওয়াটাই অনেকে সহজ মনে করছেন। ওখানে প্রায় সব দেশেই যে কোনও দেশের লোক বাড়ি করতে পারেন। তার জন্য তাঁর নিজের দেশ থেকে টাকা নিয়ে যাবার কোনও দরকার নেই। ব্রিটেনে বা সুইজারল্যান্ডে তো কথাই নেই। যাঁরা যে কোনও কোম্পানিতে চাকরি করেন বা নিজেদের ব্যবসা আছে তাঁরাই পুরো বাড়ি বা ফ্ল্যাটের দাম ঋণ পাবেন। মাইনে বা বার্ষিক রোজগারের তিন গুণ ধার পাওয়া যায়ই। অনেক সময় বিল্ডিং সোসাইটিগুলি পুরো বাড়ির দামটাই ঋণ দিয়ে দেন। অর্থাৎ নিজের ঘরের টাকা খরচ না করে বাড়ির মালিক হওয়া গেল। অবশ্যই মর্টগেজে। তারপর বিশ থেকে পঁচিশ বছরে মাসিক কিস্তিতে সেই টাকা শোধ করা।

জমি বাড়ির কারবার ইংলন্ডে এমন বেড়েছে যে লণ্ডন শহরে বি বি সি যে পাঁচটি বাড়ি লিজ নিয়ে আছে দু মাসে সেগুলি দুবার বিক্রি হয়েছে। দু মাস আগে প্রথমে কিনলেন এক বুলগেরিয় দালাল পাঁচ কোটি পাউন্ডে। তার চার পাঁচ সপ্তাহ-মধ্যে তিনি আবার বিক্রি করে দিয়েছেন। বি বি সি ২০০5 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লিজে আছেন। তাই ভাড়াটে হিসাবে তাঁরা থেকেই গিয়েছেন। যদিও পাঁচ বছর পর পর ভাড়া বাড়াতে হবে।

লণ্ডনে এখন একটি এক রুমের ফ্ল্যাটের দাম এলাকা বিশেষে ষাট হাজার পাউন্ড। বিশ বছরে শোধ করতে হলেও মাসে সুদ সমেত তিন শ পাউন্ডের মতো দিতে হয়। গড় রোজগার যদি মাসে আট শ পাউন্ড হয় তা হলে বাড়ির টাকা দিয়ে থাকে পাঁচ শ পাউন্ড। তার থেকে খাওয়া, বিদ্যুতের বিল, বাস, ট্রেন ভাড়া, ছেলেমেয়ের খরচা। কুকুর অনেকেরই থাকে, তার ব্যয়, সব মিটিয়ে হাতে কিছুই থাকে না। থাকলে এরা সেটা জমান বিদেশ ভ্রমণের জন্য। ভারতীয় টাকার

ছেলেমেয়ে যেমন মা-বাবার সঙ্গে থাকতে চান না, বাবা-মাও তেমনি ছেলে-মেয়ের থেকে স্বাধীনভাবে থাকতে চান

১৯৮৭।

দুটি নাতি একটি নাতনি। মেয়েকে দেখবেন বলে মেয়ের বাড়ির কাছেই বাড়ি নিয়েছেন। কিন্তু মেয়ের বাড়িতে থাকেন না। বললাম কেন? বৃদ্ধ বলেন: আমি স্বাধীনভাবে থাকতে চাই। আমি ছিলাম হেডমাস্টার। যখন অবসর নিয়েছিলাম তখন যা পেনশন পেতাম এখন তার থেকে বেশি পেনশন পাই।

সেটা কী রকম জানতে চাইতে বলেন, আমাদের এখানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পেনশনও বাড়ে। অবসর নেওয়ার সময় পেনশন ছিল বছরে সাড়ে চার হাজার পাউন্ড। এখন তা বাড়তে বাড়তে হয়েছে বছরে দশ হাজার পাউন্ড। তার সঙ্গে পাই সরকারের কাছ থেকে বার্ধক্য পেনশন। সপ্তাহে চল্লিশ পাউন্ড। বুড়োবুড়ির বেশ চলে যায়।

প্রশ্ন করি বয়স কত হল? গর্বের সঙ্গে বলেন কাল আমি ৭৪-এ পড়ব। সত্যিই গর্ব করার মতো। কী চেহারা! শক্ত সমর্থ। মনেই হয় না ষাট পেরিয়েছে।

বেশ আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বললেন, আজও আমি গাড়ি চালাই। এই যে, এগুলোর জন্য। মেয়ের তিন ছেলেমেয়ের জন্য। বলে সামনে পাঁচ বছরের নাতিকে দেখিয়ে দিলেন। বললেন ওর নাম পিটার। পিটার হেসে মাথা নাড়ে। বৃদ্ধ বলেন, আজ কেন এসেছি জান? আমার এক নাতনি আন্তর্জাতিক গ্রামে যাবে বলে নির্বাচিত হয়েছে। মেয়ের কাজ আছে সে পারবে না। আমারই নাতনিকে নিয়ে যেতে হবে। তা এই শ্রীমান বায়না ধরল—ওকেও রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে হবে। তাই গাড়ি ড্রাইভ করে চলে এলাম। ওদের নিয়েই আছি।

তাঁকে প্রশ্ন করি আজকাল এই যে বিয়ে না করে ছেলেমেয়ের একসঙ্গে থাকা শুরু হয়েছে এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? জোরের সঙ্গে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নিটসন বলেন: পস্তাবে। বুঝেছ, এরা পরে পস্তাবে। মোটেই ভাল হচ্ছে না এসব। তবে আশার কথা কী জানো ওসব স্বাধীন মতের লোক এখনও কম। আমার মেয়ে তো বিয়ে করেছে। দেখো ছেলেমেয়ে নিয়ে কেমন সুখে ঘরকন্না করছে। আমিও বৃদ্ধ বয়সে নাতি-নাতনি নিয়ে কেমন সুখে আছি। এই কি ভাল নয়।

মানতেই হল ভাল। বৃদ্ধ বলেন, তবে কি জানো, বাজার দরটা বড়ই চড়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া আমাদের এই নিউ ক্যাসেলে আগে যেখানে একশটি কয়লাখনি ছিল এখন পাঁচটিও নেই। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাহাজ কারখানা ছিল। তাও বন্ধ। সবার আর্থিক অবস্থা কিন্তু ভাল চলছে না।

এই বাজার দর নিয়েই ব্যতিব্যস্ত আজকের গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যবিত্ত। ওদের জাতীয় রোজগার সপ্তাহে গড়ে ১৯২ পাউন্ড। তার থেকে ট্যাক্স বাদ যাবে শতকরা ২৭ ভাগ। স্বামী স্ত্রী দুটি ছেলেমেয়ে মোটামুটি এই এখন ওদের শহরের সংসার। লণ্ডনে যারা পারেন তারাই বাড়ির জন্য বেশি টাকা খরচ করে অফিসের কাছাকাছি থাকতে চান। যাতে মিনিট পনেরর মধ্যে হেঁটে অফিসে চলে আসতে পারেন। কিন্তু খরচা টানতে গিয়ে অন্যদিকে কুলোয় না।

বছর তিনেক হল সরকার বাড়ি একেবারে করছেনই না। বাড়িভাড়া বেড়েছে। জমির দাম বেড়েছে তিন গুণ। এ সব অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। শোনা যায় এখন প্রাইভেট পেনশন নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্রিটেন সরকার বাড়িটাও মোটামুটি প্রাইভেট কোম্পানির হাতেই তুলে দিয়েছেন। ফলে তারা জমি ও ফ্ল্যাটের দাম বাড়াচ্ছেন অসম্ভব। আমরাও যেমন কলকাতায় হামেশাই বলি—মধ্যবিত্ত আর এই শহরে থাকতে পারবে না। কর্পোরেশন-ট্যাক্স কিংবা বাড়ি-ভাড়ার জন্যই শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে শহরতলিতে, লণ্ডনেও তেমনি এই সংকটের কথা অনেকেই তুলছেন। বলছেন, একদিকে নিয়োগকর্তারা এ

হিসাবে অবশ্য আট শ পাউন্ড অনেক টাকা। প্রায় ষোল হাজার টাকার উপর। মাসে এত টাকা শুনতে খুবই চমক লাগে। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম প্রায় দশ গুণ। আমাদের যে বাস ভাড়া বাট পয়সা ওদের তা দশ টাকা। ট্রেন ভাড়াও প্রায় দশ গুণ। একটি টুথব্রাশ যা এখানে তিন টাকা দাম তার দর ওখানে আঠারো টাকা। ডাল ভাত একটা তরকারি খেতে টাকার হিসাবে লাগবে সত্তর টাকা। একটি বন রুটি আট টাকা।

এর উপর জীবনযাত্রাও বড় জটিল ও যন্ত্রনির্ভর। তাতেও খরচ আছে। স্বামী-স্ত্রী কাজে যাবেন, ছোট ছেলেমেয়ে কার কাছে থাকবে? সেজন্য চাই বেবি সিটার। ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যান্ডের বহু মেয়েও এখন লন্ডনে এই বেবি সিটার বা ছেলেমেয়ে রাখার কাজ করেন। তাঁরা প্রধানত আসেন ইংরেজি শিখতে। এভাবে রোজগার করেন। নিজের বাড়ি বা ফ্ল্যাটে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রাখেন। মা-বাবার কাছ থেকে ঘণ্টা হিসাবে খরচ নেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের এতেও প্রচুর ব্যয়। মা-বাবা সিনেমা যাবেন, তাও ছেলেমেয়েকে ওই বেবি সিটারের কাছে রেখে যেতে হবে।

একটি কুকুরের জন্য মাসে খরচ কম করেও দেড় শ পাউন্ড তার উপর যদি সিনেমা যেতে হয় তা হলে তাকে রেখে যান কুকুরের খোঁয়াড়ে। তার জন্য ভাড়া দিতে হবে। ছুটিতে বেড়াতে গেলে কুকুরকে খোঁয়াড়ে রাখতে হয়। সে জন্য চার্জ দু সপ্তাহে দুশ পাউন্ড।

বাড়িতে কাজের লোকজন রাখার কোনও প্রশ্নই নেই। সকাল থেকে উঠেই কোনও মতে চা খেয়ে অফিসে দৌড়। প্রায়ই ফেরার পথে রাতের খাবার কিনে নিয়ে ফেরা। গরম করে খাওয়া। আয়েস করে খাওয়া বা গল্পগুজব, সোম থেকে শুক্রবারের মধ্যে এক অসম্ভব ব্যাপার। ওরই মধ্যে টিভি চলছে, গৃহিণী খাবার গরম করার ফাঁকে একঝলক দেখে নিচ্ছেন। কর্তা একটি ফোন সেরে নিচ্ছেন।

এরকম দেখতে দেখতে হাঁফ ধরে যেত। এক বাঙ্গালী দম্পতির কাছে প্রশ্ন করেছিলাম, এতো যে উপকরণ তা যদি ভোগ করার সময়ই না পেলেন তবে কী লাভ হল? কার পিছনে এতো ছুটছেন? ওঁরা জবাব দিয়েছিলেন: অর্থ। অর্থের পিছনে এই অর্থহীন ছোটাছুটি। রয়েসয়ে ভোগ করার উপায় নেই।

মধ্যবিত্তের পক্ষে রবিবারটা যায় বাড়ি পরিষ্কার করতে। কারণ বাড়ি সাফাইওয়ালা এসেই চার্জ করবে তিন পাউন্ড। সুতরাং আপনা হাত জগন্নাথ। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার সহায়ক। বাড়ির বাইরে—স্রেফ মইয়ে উঠে ঝাড়ো। গাড়ি ধোও। খাওয়ার পর ডিস ধোও। বাসন মাজো। হাজারো ঝক্কি। আমাদের দেশে কোনও গৃহকর্তা খাবার পর নিয়মিত নিজের ডিস নিজে ধুচ্ছেন, এ দৃশ্য কল্পনা করা যায়। স্বামী-স্ত্রী দুজনে চাকরি করলেও এদেশে ঘরের ঝামেলা সবই ওদের। সুতরাং আমাদের ছেলেরা কিন্তু সবাই এশীয় ব্যবস্থার দিকেই হাত তুলবে।

মৃত লয়ের জীবন। তবুও উপচারের অন্ত

পার্থিব বৈভবের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে আপনজনেরা। আত্মজের স্পর্শ পাবার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায় কাটে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জীবন

নেই। সরকারি হিসাবে গত দশ বছরে জীবনযাত্রার মান অনেকটাই বেড়েছে। সেই সময় বাড়িতে খাবার অভ্যাস কমেছে। ১৯৭৫ সালে মোট রোজগারের শতকরা ১৮·৩ ভাগ খরচ হত খাওয়া দাওয়ায়। ১৯৮৫তে তা কমে হয়েছে ১৪·৩ ভাগ। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী দুজনেই রোজগার করছেন। তাই বাড়িতে রান্নার পাট ক্রমেই কমে আসছে। আসছে বাইরে থেকে তৈরি খাবার।

একটি পরিবার ওখানে যা আয় করে ১৯৮৫তে দেখা যাচ্ছে তার শতকরা ৭·৪ ভাগই খরচ করে মদ খেয়ে। পাইপ বা সিগারেটে শতকরা ৩·৩ ভাগ। জামাকাপড় জুতো ৭, বাড়ির জন্য ১৪·৯, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ৫, বাড়ির জিনিসপত্র ৬·৬, পরিবহন ১৬·৮, শিক্ষা, আমোদ প্রমোদ ৯·২, অন্যান্য খরচা কেনাকাটা ১৪, বিবিধ

পর্যটকদের সহায়ক বিপণি। পর্যটন এখন এক প্রধান শিল্প

১·৫ ভাগ। অর্থাৎ একটি পরিবারকে তার আয়ের সব থেকে বেশি অংশই খরচ করতে হয় যাতায়াত খাতে তারপরই খরচা হল বাড়ি ভাড়া অথবা কিস্তি শোধে। এ ছাড়া ব্যবসায় বড় পোস্ট এবং সরকারি চাকরিতে বছরে আয় ১৫ থেকে ৩০ হাজার পাউন্ড। সংবাদপত্রের সম্পাদক, মন্ত্রী, সরকারের বড় আমলা, উচ্চপদের বিচারপতিরা পান বছরে ৩০ হাজার থেকে ১ লক্ষ পাউন্ড। এঁরা বড় লোক।

এইরকম সর্বশ্রেণীর রোজগেরে মানুষের বাইরে আছেন বিপুল সংখ্যক কর্মহীন লোক। হন্যে হয়ে যাঁরা কাজ খুঁজছেন। ১৯৮৬তে ইংলন্ডে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২ লক্ষ। মোট যত লোকের কাজ আছে কাজ না থাকা লোকের সংখ্যা তার শতকরা ১১·৭ ভাগ। পৌনে ছয় কোটি লোকের ওইটুকু দেশে এতো বেকার এক প্রচণ্ড অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। প্রায় প্রতিটি পরিবারের উপর এর চাপ এসে পড়ছে। বেকাররা ভাতা পাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু উন্নত দেশের জীবনযাত্রার যে মান তাতে তাদের টিকে থাকাই কষ্টকর।

সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। রেলে পাতাল রেলে বিনা টিকিটের যাত্রী বাড়ছে। গড়ে দু দিনে একজন আত্মহত্যা করছেন। ট্রেনের তলে পড়ে মরছেন দিনে গড়ে একজন। তার অর্ধেকই আত্মহত্যা। ১৯৮৫তে ব্রিটেনে ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন ১৬৭ জন। তার মধ্যে দুজন শিশু। বেআইনিভাবে ট্রেন লাইনে গিয়ে মরেছেন ১৩৫ জন। তার মধ্যেও ৯ জন ছোট ছেলে। রেল লাইনের দু ধারে তারের বেড়া দিতে ও রক্ষা করতে বছরে বিশ লক্ষ পাউন্ড খরচ হচ্ছে। তবু রক্ষা করা যাচ্ছে না। তার কেটে লোক ঢুকছে। চুরি করছে। অবশ্য জমি জবরদখল করে না।

লন্ডনে মেট্রোপলিটন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ডিভিশনের প্রধান আই এইচ ডেমিসন বলেন

ব্রিটিশ রেলের মোট দশ হাজার মাইল তার দিয়ে ঘেরা। তবুও বেআইনি প্রবেশ আটকানো যাচ্ছে না।

নিউ ক্যাসেলে টাইন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করা এক রেওয়াজ। মেট্রোর ম্যানেজার জন ব্যাগ এবং চিফ মেকানিকাল ও ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার রে স্পাউরেল বললেন, সেদিনই এক মহিলা টাইন নদীতে ঝাঁপ দিল। পুলিশ তাকে জল থেকে তুলল। তা তখন মহিলার সে কী রাগ। চটেমটে বলেন, কেন তোমরা আমাকে বাঁচালে? এখন আমি বাড়ি ফিরব কী করে? শহরতলি থেকে এসেছি। আমার কাছে বাড়ি ফেরার ভাড়া নেই। তারপর আমরাই তাঁকে পৌঁছে দিলাম। এর উপর আছে শতকরা বিশ জন বিনা টিকিটের যাত্রী।

বলেই নিয়ে গেলেন, কন্ট্রোল রুমের টিভির সামনে। দেখি ৪৭ মাইল মেট্রোর প্রতি স্টেশনের ছবি ফুটে উঠছে। একটি ট্রেন এসে দাঁড়ালো। ভিড়ের মধ্যে এক মহিলা কুকুর নিয়ে নামলেন। তার জন্য দরজা বন্ধ করতে একটু দেরি হল। সব দেখা যাচ্ছে। মাইকে নির্দেশও দিচ্ছেন।

ম্যাগনেটিক টিকেট প্রবর্তন করা হয়েছে। সেই টিকিট নিয়ে গেলাম। টিকিট না দিলে গেট খোলে না। মেট্রো চড়ে টাইনের সুড়ঙ্গ পেরিয়ে এলাম। বললাম এরপরও বিনা টিকিটে লোকে চড়েন কী করে? ওঁরা বললেন, গেট টপকে ঢুকে পড়ে। জুলাই মাসেই ধরা পড়েছে বিশ হাজার।

এর আগে বলেছি ব্রিটিশ মেল ট্রেনে স্বাচ্ছন্দ্যের কথা। বৃহত্তর লন্ডনের প্রকৃত অবস্থাটা দেখব বলে একদিন অফিস ছুটির সময় পিক আওয়ারে পিকাডেলি মেট্রো স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওরে বাস। এক একটি ট্রেন আসছে মুহূর্তে ভিড়। একেবারে কলকাতার অফিস টাইম। হঠাৎ প্ল্যাটফর্ম কাঁপানো হো হো হাসি। এক মহিলা একেবারে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। দরজা আর বন্ধ হয় না। দোষের মধ্যে মহিলা ছিলেন একটু মোটা।

তা দোষের কী আছে! পর পর পাঁচটি ট্রেনেই তো দেখলাম ওই একই অবস্থা। ভিড়ের চাপে দরজাই বন্ধ হতে চায় না। পাঁচটি ট্রেন ছেড়ে ষষ্ঠটিতে উঠলাম। অবশ্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল মাত্র বারো মিনিট। দু মিনিট পরপরই ট্রেন।

কিন্তু শহরতলিতে ব্রিটেনের ট্রেনে চড়ে চক্ষুস্থির। এ কী নোংরা। কিছু বুঝতে পারি না। এতদিন যত ট্রেনে চড়েছি সবই তো পরিষ্কার। তবে এটা এমন কেন? দেখলাম এই কামরাটি স্মোকিং জোন-এ। যত রাজ্যের সিগারেটের টুকরোতে একেবারে নোংরা। এতদিন সর্বদাই চড়েছি নো স্মোকিং কামরায়। এখন ওদের ধূমপান না করায় কামরাই বেশি। সুতরাং আরামে যেতে হলে তাতেই চাপুন।

যদিও সিগারেট ব্যবসায়ীরা মাথায় হাত দিয়েছেন। ওদের বিক্রি শতকরা বিশ ভাগ কমেছে। ওটা অবশ্য কোনও সামাজিক পরিবর্তন নয়। অসুখের ভয়ে। সমাজকে ওরা তেমন ভয় পায় বলে মনে হল না। সমাজও ভয় দেখাতে চায় না।

নইলে ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকার খোলাখুলি তাদের রিপোর্টে বলেছে, ইওরোপের বিভিন্ন দেশে অবিবাহিত যুগলের সংখ্যা যেভাবে বেড়েছে তার প্রভাব ব্রিটেনেও পড়েছে। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২-র মধ্যে ব্রিটেনে যত ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়েছে (প্রথম বিবাহ) তার শতকরা পঁচিশ জনই বিয়ের আগে একসঙ্গে থেকেছেন। ১৯৭০-এও থাকতেন মাত্র শতকরা চারজন। ১৯৮৪তে ব্রিটেনে বৈধভাবে যত গর্ভনাশ হয়েছে তার শতকরা ৩৭ ভাগই ছিল এরকম অবিবাহিত যুগলের। ১৯৮৫তে ডিভোর্স হয়েছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৩০০। ডিভোর্সি অথবা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়া মেয়েরাই বিয়ে না করে ছেলেদের সঙ্গে থাকছেন বেশি। ১৯৮৩-৮৪ সালে ১৮ থেকে ৪৯ বছরের অবিবাহিত মেয়েদের শতকরা ১২ জনই থেকেছেন ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে।

এর প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটেনের জন্মহার কমছে। একে বিয়ে হচ্ছে কম, যা হচ্ছে তাও দেরিতে। পরিবার ছিল আগে গড়ে চার ছেলে-মেয়ের। এখন হয়েছে দুই ছেলে-মেয়ের। ওদের যা জনসংখ্যা তাতে জন্মহার হওয়া উচিত শতকরা ২·১। ১৯৮৫তে হয়েছে ১·৮০। ফলে যুবকের সংখ্যা কমছে। অবসরপ্রাপ্ত ও বৃদ্ধ বৃদ্ধার সংখ্যা বেড়ে তার দায় এসে চাপছে রাষ্ট্রের ঘাড়ে। আজ ওদের জনস্বাস্থ্যের যা ব্যয় তার শতকরা ৪৫ ভাগই বয়স্কদের জন্য। ১৬ বছর বা তার কম

বয়সের লোকের সংখ্যা মাত্র শতকরা ২১। ছেলের থেকে মেয়ে বেশি। ফলে এই অবাধ স্বাধীনতার পাল্লাটি কিন্তু ছেলেদের দিকেই ভারি। ভারত যেখানে ভুগছে অতিরিক্ত জন্মহারে ওদের সমস্যা সেখানে অতিরিক্ত জন্ম নিয়ন্ত্রণের।

লোকসংখ্যা কমিয়েও বেকার সমস্যার মোকাবিলা করা যাচ্ছে না। নিউ ক্যাসেলে বন্ধ কয়লাখনি অঞ্চলে শতকরা পঞ্চাশ জনই বেকার। ওঁরা ঠাট্টা করে বলেন, অচিরেই দেখবেন নিউ ক্যাসেলেই কয়লা আনতে হবে। ওখানকার ট্র্যাডিশনাল জাহাজ শিল্পও বন্ধ। পশ্চিমবঙ্গে ট্র্যাডিশনাল চট ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের দুরবস্থায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে অনেকটাই সেরকম।

এর বিকল্পে আধুনিক যেসব কলকারখানা হয়েছে তাতে অত লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। ফলে দারিদ্র্য বাড়ছে। তা ছাড়া এখানে বয়স্ক লোকেরা চিরকাল কাজের জায়গায় থেকে কাজ করে এসেছেন। দূরে যেতে চান না। ছেলেরা চলে গিয়েছেন অন্যত্র কাজ নিয়ে। বয়স্করা পড়ে আছেন জরাজীর্ণ পুরোন বাসস্থানে। অর্ধেক বাড়ি ১৯৪৫-এর আগের।

আবার এরই বৈপরীত্যে নিউ ক্যাসেলকে কেন্দ্র করে সমগ্র পূর্বাঞ্চল জুড়ে তৈরি হয়েছে বিশ্বের আধুনিকতম রাস্তা। আঞ্চলিক ইঞ্জিনিয়র ট্রেভর নুটাল সেই রাস্তায় ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন কত বাইপাস। এক এক জায়গায় চার পাঁচটি রাস্তা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেসব রাস্তায় অবিরল ধারায় চলছে গাড়ির স্রোত। লণ্ডনে যখন ট্র্যাফিক জ্যাম এখানে তখন একেবারে বাধাহীন গতি। শহরের মধ্যস্থলে শপিং সেন্টার। অনবরত সুখী দম্পতিরা ছেলেমেয়ের হাত ধরে গাড়ি থেকে নামছেন। গাড়ি পার্ক করছেন। বিশাল পার্কিং-এর জায়গায় এত গাড়ি পার্ক করা হয়েছে যে, চালককে বললাম, এখানে তো মনে হচ্ছে মানুষের থেকে গাড়ি বেশি। চালকও বলেন—মাঝে মাঝে আমারও তাই মনে হয়।

এই মধ্যবর্তী অঞ্চলে বেকার কম। শতকরা ষোল। কয়লা-শহর কিন্তু ময়লা নয়। আমাদের রানীগঞ্জ, আসানসোলের সঙ্গে মেলে না। তবে এই আধুনিকতম শপিং সেন্টারে কিন্তু ডক ও জাহাজ এলাকার মানুষেরা আসেন না। এই আলোর নিচে দাঁড়িয়ে কে বলবে কয়েক মাইলের মধ্যেই আছে বর্ণহীন অন্ধকার।

এখানেই এমন মধ্যবিত্ত পরিবারের দেখা পেলাম যাঁদের তিনটি ছেলেমেয়ে। স্বামী শিক্ষক। অতি কষ্টে দিন চলে। ছেলে মানুষ করার জন্য ওই মহিলা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করেন অন্তত দু বছর ছেলেমেয়েকে মায়ের মানুষ করা উচিত। চাকরিতে অতদিন ছুটি পাওয়া যায় না। তাই তিনি চাকরি ছেড়েছেন। তিনি বলেন তবুও আমি খুবই ভাগ্যবান। দু বছর পর আবার একটা পার্ট টাইম কাজ পেয়েছি। তাই কোনও মতে চলছে। সবার তা জোটে না। তাদের কষ্টের শেষ নেই। তারপর যদি ক্ষুধার্ত স্বামী হন, অর্থাৎ বার বার খেতে চান, তা হলে তো সোনায় সোহাগা।

এখানেই আর এক গৃহিণী বারবোরা। তাঁর বাবার বয়স আশি। একেবারেই অথর্ব হয়ে পড়েছেন। শুধুই সরকারি দাক্ষিণ্যের ওপর রাখতে মেয়ের মন চায়নি। বাবাকে তাই নিজের কাছে এনে রেখেছেন। কিন্তু মুশকিল হয়েছে তাঁর বন্ধুবান্ধবরা এলে, বাড়িতে হইচই হলে বাবা বিরক্ত হন। নিজেকে নিজের ঘরে বন্ধ করে রাখেন। বারবোরার প্রশ্ন এখন তা হলে কি করি?

আবার লণ্ডনের দক্ষিণ উপকণ্ঠে আলাপ হল এক বাঙ্গালী দম্পতির সঙ্গে। মহিলা শিক্ষিকা। তাঁর মাকে দেখার কেউ নেই। তাই মাকে এনে নিজের কাছে রেখেছেন। তিনি বললেন, মাকে কাছে রেখেছেন শুনে তাঁর সহকর্মী সব শিক্ষিকাই অবাক হয়ে যান।

দুরকমই আছে। এজন্যই ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকার অর্থনীতিতে প্রাইভেটাইজেশন নীতি নিয়ে বলিষ্ঠভাবে সরকারের ঘাড় থেকে লোকসানের বোঝা নামিয়ে ফেলার চেষ্টা করলেও সমাজ সম্পর্কে রক্ষণশীল হতে পারছেন না।

বরঞ্চ চেষ্টা করছেন ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়াতে। ওদের দেশেও দারিদ্র্য আছে। আছে দুঃখ। তবে দেশটা তো আদিকাল থেকেই শিল্পোন্নত সুতরাং উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে মিলবে কেন? আমাদের দেশের থেকে জীবনযাত্রার মান যে ওদের উন্নত হবে এতেও আশ্চর্যের কিছু নেই। তবু দেখানোর চেষ্টা করেছি অতিমাত্রায় ব্যক্তি চেতনা এবং আপাত সমৃদ্ধি আজ পাশ্চাত্যে কিছু সমস্যারও জন্ম দিয়েছে। ব্রিটেনও সে সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। ওদের দেশে বৃদ্ধ বৃদ্ধার সব দায় নিয়েছে রাষ্ট্র ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু যত বেশি এ দায়িত্ব সমাজের ঘাড়ে যাচ্ছে ততই যেন বৃদ্ধ বৃদ্ধারা পরিবার থেকে আলাদা হয়ে পড়ছেন। সব থেকেও কি যেন নেই। পাড়ায় পাড়ায় দেখেছি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, তারা সবাই সরকারি সাহায্য পান। নাবালক ছেলেদের এক তৃতীয়াংশই কোনও না কোনও স্বেচ্ছাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। পাড়ার বৃদ্ধদের খবর রাখেন। তাদের অনেকের বাড়ির বাজার করে দেন। কাউকে এনে দেন রান্না করা খাবার। অসুখ হলে ডাক্তার ও নার্সের ব্যবস্থাও করেন এই সব প্রতিষ্ঠান। এ জন্য স্বাস্থ্য, সমাজ কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকার বছরে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কোটি পাউন্ড খরচ করেন। সরকারের মোট যা খরচ তার শতকরা ৩১ ভাগই ব্যয় হয় এই সামাজিক নিরাপত্তার জন্য। যার অধিকাংশই যায় বয়স্কদের পেনশন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে।

সংকটটাও এইখানে। ওদের হল স্বাচ্ছল্যের সমস্যা। আমাদের দারিদ্র্য ও আর্থিক অনটনের সমস্যা। দুটির চরিত্রই আলাদা। আমাদের দরিদ্র দেশ, বৃদ্ধ বাবা মার কোনও দায়িত্বই রাষ্ট্র বহন করে না। সুতরাং রোজগেরে ছেলেমেয়ে যদি বাবা-মাকে না দেখে তবে তাঁরা যাবেন কোথায়? ওদেশে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা পেনশন পাচ্ছেন। সুতরাং ছেলে ও ছেলেবউর হাত তোলা হয়ে থাকবেন কেন? কিছু না থাকলেও তাঁরা হোমে থাকতে পারবেন।

মধ্যবিত্তের পক্ষে রবিবারটা যায় বাড়ি পরিষ্কার করতে—ঘর ঝাড়ো, গাড়ি ধোও

সবই ঠিক। আমাদের অনেক বাবা মারই হয়ত দারিদ্র্যের জ্বালায় ঠিকমতো চিকিৎসা হয় না। তবুও শেষ সময় তাঁকে ঘিরে থাকে কতগুলি উদ্বেগ ব্যাকুল মুখ। সজল চোখ। তাই দেখে তিনি চোখ বোজেন। ওদের বাবা মা হাসপাতালের সুন্দর সহায় আধুনিক চিকিৎসায় শেষ মুহূর্তেও হয়তো খোঁজেন তাঁর আত্মজর একটু স্পর্শ। কিন্তু মেলে না। একা থেকে একাই তিনি চোখ বোজেন। পার্থিব বৈভবের মাঝে অনেক আগেই যে হারিয়ে গিয়েছে তাঁর আপনজন। ■

ঢাকা

নজরুল চর্চায় নতুন মাত্রা

হাসান হাফিজ

বাংলা সাহিত্যের যুগস্রষ্টা কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায় কেটেছে বাংলাদেশে, তাঁর অন্তিম শয্যাও রচিত হয়েছে এ দেশের মাটিতেই। নজরুল লিখেছিলেন, মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই—বাস্তবেও তাই ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে নজরুলের কবর। সেখানে নির্মিত হয়েছে একটি ছিমছাম স্মৃতিসৌধ। পাশের দীর্ঘ রাজপথটির নামও তাঁর নামে—কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ। নজরুলের জন্মজয়ন্তী, মৃত্যুবার্ষিকীতে এই স্মৃতিসৌধ সরব হয়ে ওঠে। হাজারো প্রাণের ব্যাকুল উষ্ণতায় অভিষিক্ত হন নজরুল। তাঁর সমাধি ফুলে ফুলে ঢেকে যায়, অনুরাগী ভক্তজনেরা প্রিয় কবিকে নিবেদন করেন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। বাংলাদেশের অজস্র সাংস্কৃতিক সংগঠন সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে নজরুলের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী। এই অনুষ্ঠানমালা বুদ্ধিজীবী, আলোচকসর্বস্বই থাকে না, সাধারণ মানুষের সপ্রাণ সম্পৃক্তিতে ব্যাপক, উজ্জ্বল, সফল হয়ে ওঠে। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় অবধি পাঠ্য তালিকায় অনিবার্যভাবে অন্তর্ভুক্ত আছেন নজরুল ইসলাম। তাছাড়া নজরুল সঙ্গীত সর্ব-স্তরের মানুষের মধ্যেই জনপ্রিয় ও আদৃত। বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় কবি সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ, কৌতূহল এবং অনুসন্ধিৎসা বেড়ে চলেছে ক্রমাগত।

নজরুলকে ঢাকায় আনা হয়েছিল ১৯৭২ সালের ২৪ মে। এই কবির গান ও কবিতা আমাদের মুক্তি যুদ্ধের সময়ে ছিল শক্তি ও প্রেরণার চিরঞ্জীব উৎস। 'বিদ্রোহী' ঝলসে উঠেছিল যাঁর কলমে ও চেতনায়, স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর আগমন এক স্মরণীয় ঘটনা। ঢাকার ধানমন্ডির একটি দ্বিতল বাড়িতে নজরুল ও তাঁর পরিবারের থাকার বন্দোবস্ত করা

বাংলাদেশের জাতীয় কবি

হয়েছিল। সেই বাড়িতে কবির অনুরক্তদের ভিড় সবসময় লেগেই থাকত। বিশেষ করে প্রচুর জনসমাগম ঘটত কবির জন্মজয়ন্তীতে। সেই বাড়িটি এখন 'কবি ভবন' নামে পরিচিতি পেয়েছে। নজরুল চর্চার একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান 'নজরুল ইনস্টিটিউট'-এর অবস্থানও এই কবি ভবনেই। সাহিত্য সঙ্গীতে অমর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে নজরুলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী দেয় ১৯৭৪ সালে। এ উপলক্ষে এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবও আয়োজিত হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালে কবিকে দেন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব। সাধারণ মানুষের হৃদয়-উৎসারিত প্রীতি-শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধার্ঘ্য নজরুল যেমন পেয়েছেন, তেমনি বাংলাদেশে পেয়েছেন সরকারী মর্যাদাও। ১৯৭৬ সালে তাঁকে দেওয়া হয় সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার 'একুশে পদক'। একই বছর তাঁকে সম্মানিত করা হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 'আর্মি ক্রেস্ট' দিয়ে। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট নজরুলের মৃত্যুর পর তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ চত্বরে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। তাঁর জানাজায় অংশ নিয়েছিলেন শোকতপ্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ। কবি পরিবারের জন্যে সরকার রাজধানীর অভিজাত এলাকা 'বনানী'-তে একটি বাড়ি বরাদ্দ এবং মাসে পাঁচ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন।

নিজস্ব স্টাইল নিয়ে নজরুল যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে উদিত হন, তখন থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর আলোচনা, সমালোচনা। নজরুলের ভাগ্যে একাধারে প্রশংসা, নিন্দা, আক্রমণ সব কিছুই জুটেছে বিস্তর। ১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার অ্যালবার্ট হলে বাঙালী জাতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। ওই সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, 'আমরা যখন যুদ্ধে যাব, তখন সেখানে নজরুলের গান গাওয়া হবে'। পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের কিছু প্রবীণ সাহিত্যিক, নজরুলের বন্ধু-বান্ধব, অনুরাগী, সুহৃদ কবির চিকিৎসা ও তাঁর পরিবারকে সহায়তার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করলেন। পাশাপাশি নজরুলজয়ন্তী উদ্‌যাপনও ব্যাপকতর হতে থাকল দিন দিন। সে সময়েই নজরুল চর্চা ও গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপারটি ভাবা হয়। ঢাকায় আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরাম, ইকবাল-নজরুল ইসলাম সোসাইটি, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে নজরুল একাডেমী ছিল পঞ্চাশ দশকে প্রতিষ্ঠিত নজরুল চর্চার প্রতিষ্ঠান। এর সবকটিই ছিল বেসরকারী উদ্যোগের। করাচীর নজরুল একাডেমী গড়েছিলেন প্রধানত সেখানকার প্রবাসী বাঙালীরা। করাচী নজরুলের সৈনিক জীবনের স্মৃতি জড়ানো স্থানও বটে। এই প্রতিষ্ঠান এখনো জীবিত বলে শুনেছি। ঢাকার 'নজরুল একাডেমী'র জন্ম ১৯৬৪ সালে। এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ বিলম্বিত হয় কয়েক বছর। '৬৭ সালে সরকারী অর্থানুকূল্যে একাডেমীর কর্মকাণ্ড শুরু হয়। এই প্রতিষ্ঠান থেকে নজরুল বিষয়ক কিছু বই, নজরুল সঙ্গীতের কিছু স্বরলিপি-গ্রন্থ

বেরিয়েছে। 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা' নামের একটি পত্রিকা প্রকাশও এই সংস্থার কার্যক্রমের একটি। নানাবিধ কারণে এই প্রতিষ্ঠানটি এখন আগের মত সক্রিয় নয়। এর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত খ্যাতিমান সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই আজ প্রয়াত। জীবিতদের বেশ কয়েকজন আজকাল আর নজরুল একাডেমীর সঙ্গে যুক্ত নয়।

বাংলাদেশে নজরুল চর্চার পথিকৃৎ ছান্দসিক, কবি আব্দুল কাদির। পাকিস্তান আমলে 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' নজরুল রচনাবলীর তিনটি খণ্ড বের করে। কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবার পর বাংলা একাডেমী নজরুল রচনাবলী প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নজরুল রচনাবলীর পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এ পর্যন্ত। সম্পাদনা করেছেন প্রয়াত আব্দুল কাদির। দীর্ঘকাল নজরুলের অনেক গ্রন্থ ছিল দুষ্প্রাপ্য। রচনাবলী প্রকাশের ফলে সেসব বই এখন পড়ার সুযোগ ঘটছে। এটি একটি বড়ো কাজ নিঃসন্দেহে। আব্দুল কাদির 'নজরুল রচনা সম্ভার' নামেও একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। নজরুলের অনেক অগ্রন্থিত রচনা রয়েছে এতে।

বাংলাদেশে নজরুল চর্চা ও নজরুল গবেষণার ক্ষেত্রে যাঁরা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সুফী জুলফিকার হায়দার, খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, মুস্তাফা নূর উল ইসলাম, মোবাশ্বের আলী, আতাউর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, রফিকুল ইসলাম, শাহাবুদ্দীন আহমদ, করুণাময় গোস্বামী, আব্দুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ।

নজরুল সঙ্গীত চর্চা বাংলাদেশে ক্রম প্রসার্যমান। পঞ্চাশের দশকে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী (বাফা) নজরুল-সঙ্গীতের শিক্ষাদান শুরু করে। সঙ্গীত শিক্ষায়তন 'ছায়ানট'-এর প্রতিষ্ঠার পর নজরুল-সঙ্গীত চর্চার পরিধি আরো বিস্তারিত হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপারটি পর্যায়ক্রমে আরো গুরুত্ব লাভ করে। এখন দেশের সবকটি গানের স্কুলেই নজরুল-সঙ্গীত গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়।

নজরুলের মৃত্যুর পর দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা নজরুলের জীবন ও সাহিত্যকর্ম বিষয়ে গবেষণা, রচনাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্যে সরকারী অর্থ ও ব্যবস্থাপনায় 'নজরুল ভবন' প্রতিষ্ঠার জন্যে সরকারের কাছে আবেদন জানান। সরকার এতে সাড়া দেন। কিন্তু নানা কারণে 'নজরুল ভবন' প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বর্তমান সরকারের বিশেষ উদ্যোগে ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'নজরুল ইনস্টিটিউট'-এর জন্ম হয়। এই প্রতিষ্ঠানের অফিস করা হয় নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত ধানমণ্ডির কবি ভবনে। নজরুল ইনস্টিটিউট এখনো সাংগঠনিক পর্যায়েই রয়েছে। তবু এই প্রতিষ্ঠানটি এর মধ্যেই উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ করেছে। নজরুল ইনস্টিটিউট অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য ও লক্ষ হচ্ছে : কবির রচনাবলী নিয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা ও অধ্যয়ন, দেশ-বিদেশ থেকে কবির সঙ্গীত ও অন্যান্য রচনা সংগ্রহ, সম্পাদনা, সংরক্ষণ ও প্রকাশনা, নজরুলের সাহিত্যকর্ম ও সঙ্গীত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা, প্রকাশনা ও প্রচার, নজরুল সাহিত্য, সঙ্গীত ও কবির অন্যান্য অবদান সম্পর্কে আলোচনা, সম্মেলন, বিতর্ক, সেমিনার, বক্তৃতামালার আয়োজন, নজরুল সাহিত্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত বই-পত্র এবং গানের রেকর্ড ও টেপ সংবলিত গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা, যথার্থরূপে নজরুল-সঙ্গীতের পরিবেশনা ও প্রচারের উদ্দেশে গানের স্বরলিপি প্রণয়ন, গ্রামোফোন রেকর্ড, বাণিজ্যিক টেপ, ছায়াছবি ও স্বরলিপির বই-এ যাতে গ্রহণযোগ্য মান রক্ষিত হয় তার তদারক, নজরুল-সঙ্গীত ও নজরুলের কবিতা আবৃত্তি বিষয়ে যথার্থ প্রশিক্ষণের আয়োজন, নজরুল বিষয়ে গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে পুরস্কার প্রদান।

নজরুল সংগীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহ

ধানমণ্ডির কবি ভবনে কোলকাতার অগ্নিবীণা গোষ্ঠীর সদস্যরা

নজরুল ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত চারজনকে নজরুল-গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে 'নজরুল স্মৃতি পুরস্কার' দিয়েছে। পুরস্কার প্রাপ্তা হলেন : সুফী জুলফিকার হায়দার, আতাউর রহমান, রফিকুল ইসলাম ও করুণাময় গোস্বামী। পুরস্কারের মান একটি স্বর্ণপদক ও পাঁচ হাজার টাকা। এই প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত বেরিয়েছে ত্রৈমাসিক 'নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা'র সাতটি সংখ্যা। সংগৃহীত হয়েছে নজরুলের হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি, তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের দুর্লভ

নজরুল সমাধি চত্বরে নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠান
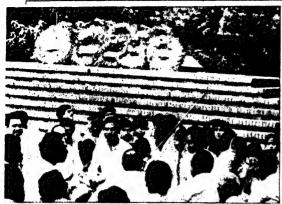
পুরনো সংস্করণ, নজরুলবিষয়ক গ্রন্থাবলী, নজরুল সঙ্গীতের বহু সংখ্যক আদি গ্রামোফোন রেকর্ড, নজরুল সম্পর্কিত গবেষণামূলক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, কবির জীবনভিত্তিক অনেক দুর্লভ আলোকচিত্র, নজরুল সম্পাদিত বিভিন্ন দুর্লভ পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি। নজরুল বিষয়ক কয়েকটি বই শিগগিরই বের করছে নজরুল ইনস্টিটিউট।

কবি নজরুলের গানের বাণী ও সুর বিকৃত হচ্ছে, এটা দীর্ঘদিনের অভিযোগ। এই বিকৃতি রোধের একমাত্র উপায় হল আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণী ও সুরের যথার্থ অনুসরণ। এই লক্ষ্যে সরকার নজরুল-সঙ্গীতের স্বরলিপির শুদ্ধতা যাচাই, প্রমাণীকরণ ও সত্যায়নের জন্যে 'নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি প্রমাণীকরণ পরিষদ' নামে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটিতে রয়েছেন বেগম লায়লা আর্জুমান্দ বানু (সভানেত্রী), শেখ লুৎফর রহমান, সোহরাব হোসেন, বেদারউদ্দিন আহমদ ও সুধীন দাশ। কমিটি আদি গ্রামোফোন রেকর্ডকেই নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই কমিটি অনুমোদিত ৫০টি গানের স্বরলিপি বেরিয়েছে দু'খণ্ডে। 'নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি'র স্বরলিপিকার হচ্ছেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সুধীন দাশ। তৃতীয় খণ্ডের কাজও শেষ—তা অচিরেই বেরুবে।

সামগ্রিক বিচারে এ দেশে শিক্ষার্থী ও শিল্পীদের মধ্যে স্বরলিপি অনুসরণের অভ্যাস বড়ো একটা নেই। কোন গান শুনে সেটির সুর ও গায়কী আয়ত্ত করা এক কথা এবং স্বরলিপি অনুসরণে তা আয়ত্ত করা ভিন্ন কথা। নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি অনুসরণে প্রশিক্ষণ এবং স্বরলিপির সুর অনুসরণ বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি এক্ষেত্রে জরুরী হয়ে পড়েছে। না হলে সুর ও বাণী বিকৃতি থেকে নজরুল-সঙ্গীতকে বাঁচানো যাবে না। নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি প্রমাণীকরণ পরিষদ-সত্যায়িত স্বরলিপি অনুসরণে নজরুল ইনস্টিটিউট হালে দু'টি দীর্ঘবাদন রেকর্ড ও দু'টি ক্যাসেট বের করেছে। কবি নজরুলের একাদশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এই প্রকাশনা। একটি রেকর্ডের নাম 'পাষাণের ভাঙালে ঘুম'। আরেকটি রেকর্ডে ধৃত হয়েছে ইসলামী গান—সেটির শিরোনাম 'বাজলো কি রে ভোরের সানাই'। এই রেকর্ড প্রকাশের জন্যে কণ্ঠশিল্পীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ দিয়েছেন বিশিষ্ট দু'জন নজরুল-সঙ্গীত শিল্পী সুধীন দাশ ও সোহরাব হোসেন। গান রেকর্ডের আগে শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক ও চলচ্চিত্র পরিচালক খান আতাউর রহমান। শুদ্ধ নজরুল সংগীতের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে এই রেকর্ড প্রকাশের উদ্যোগ। দীর্ঘবাদন রেকর্ড দু'টিতে রয়েছে ২৪টি গান, আর ক্যাসেটে গানের সংখ্যা ২৮। কণ্ঠশিল্পীরা হলেন : ফেরদৌসী রহমান, সোহরাব
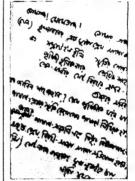
হোসেন, সুধীন দাশ, খালিদ হোসেন, নিলুফার ইয়াসমিন, রওশন আরা মুস্তাফিজ, ফাতেমা-তুজ-জোহরা, সাদিয়া আফরিন মল্লিক, এম. এ. মান্নান, যোসেফ কমল রড্রিকস, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, রাহাত আরা গীতি, শামসী ফারুক সিমকী, ফেরদৌস আরা ও জান্নাত আরা। অবশ্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এবছরই প্রথম নজরুল-সঙ্গীতের দীর্ঘবাদন রেকর্ড বের করেছে তথ্য-মন্ত্রণালয়। সেই রেকর্ডের নাম হচ্ছে 'এ কোন সোনার গাঁয়'। ওই রেকর্ড ও ক্যাসেট বিদেশে বাংলাদেশি মিশনগুলোর জন্যে। প্রকাশের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদেশে বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির ভাবমূর্তি উপস্থাপন। বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত রেকর্ড ক্লাব 'শ্রোতার আসর' ও নজরুল সঙ্গীতের রেকর্ড বের করেছে।

নজরুল, সম্ভবত সঙ্গীতেই সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল, সবচেয়ে বেশি সফল। তাঁর গানের বাণী ও সুর অবিকৃত রাখার দুরূহ দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে নজরুল ইনস্টিটিউট।

রেডিও-টেলিভিশনে প্রচুর গাওয়া হয় নজরুলসঙ্গীত। এসব আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণী ও সুর অনুসরণে শুদ্ধরীতিতে সবসময় গীত হয়, একথা বলা দুষ্কর। দেশে নজরুল-সঙ্গীত শিল্পীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু শুদ্ধতার দিকটি এতকাল উপেক্ষিতই থেকে গেছে। নজরুল ইনস্টিটিউট নবীন প্রতিষ্ঠান। এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতেই হয়তো আরো কয়েক বছর লেগে যাবে। প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী হওয়া যায়। এর নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ বিশিষ্ট নজরুল-গবেষক। এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠা তুলনাহীন।

বাংলাদেশে প্রকাশিত নজরুলবিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা বেশি নয়। বড়ো জোর গোটা ষাটেক নজরুলসম্পর্কিত গ্রন্থ বেরিয়েছে। নজরুলের বিচিত্র, ঘটনাবহুল জীবন, বৈচিত্র্যখচিত তাঁর রচনারাশি ও সঙ্গীতের তুলনায় এ সংখ্যা অপর্যাপ্ত। নজরুল বিষয়ে পত্র-পত্রিকা সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে প্রচুর লেখা। প্রকাশনা সংকট এবং অন্যবিধ বিঘ্নের কারণে এসব লেখা গ্রন্থাকারে বের হয় কম। তবে আগামী কয়েক বছরে এ দৈন্য কেটে যাবে অনেকটাই, সে লক্ষণ সুস্পষ্ট। বিশিষ্ট ব্রিটিশ কবি, অনুবাদক উইলিয়াম র‍্যাদিচি এ বছর বাংলাদেশ সফরের সময় নজরুল ইনস্টিটিউটে গিয়েছিলেন। নজরুল বিষয়ক গ্রন্থ, কবির আলোকচিত্র ও গবেষণা কর্মকাণ্ড দেখে র‍্যাদিচি প্রীত হন। তিনি নজরুলসম্পর্কে বই লিখবেন ও নজরুল কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করবেন বলে জানান। এ বছরই নজরুল ইনস্টিটিউটে এসেছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক নজরুল-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ নারায়ণ চৌধুরী। তাঁর একটি লেখা বেরিয়েছে নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকায়। এছাড়া কলকাতার অগ্নিবীণা সঙ্গীত গোষ্ঠীও এসেছিল ইনস্টিটিউটে। বি বি সি চ্যানেল ফোর নজরুলের ওপর একটি ফিল্ম তৈরি করছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নজরুল প্রফেসর' নামে একটি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে নজরুল-সাহিত্য, নজরুল-সঙ্গীত বিষয়ে কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা আছে বেশ। অনাগত দিনে নজরুল চর্চা আরো বিকশিত হবে, এখন চলছে তারই ভিত্তি তৈরির শ্রম, ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ কাজ। ■

সুরকার নজরুল

Lakme

কলকাতায় একদিন, সারাদিন

মানস রায়

অনেক তো হল, হিল্লি-দিল্লি, আগ্রা-তাজ, রক্সৌল-রাণীক্ষেত, কুলু-মানালি, তিরুপতি-বিবেকানন্দ শিলা—এবার নিজভূমে নিঃশব্দ ঘুরলে হয় না? একেবারে সকলের অগোচরে, টুকুটি কাউকে না জানিয়ে শামুক-মনে তিনশো বছরের বৃদ্ধ কলকাতা নামের সেই শহরটির পথের ধুলোর সঙ্গে ফাগ খেললে কেমন হয়? একদিন, সারা দিন।

এখনও এই শতাব্দীর বাতি নিবু-নিবু সময়ও, মাঝরাতে বড়সড় চাঁদ উঠলে অ্যান্টেনা-মাচা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা সারিবদ্ধ আকাশ-ছোঁয়া সুখী বাড়িগুলির মধ্যবর্তী অ্যাসফল্ট-মোড়া রাস্তায় গোরাদের ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাই যেন। কিংবা মাঝ-গঙ্গায় সাহেবের পানসীর ছপ্‌ছপ্ শব্দ। অথবা জাতীয় গ্রন্থাগারের ঘরের আনাচে-কানাচে ওয়ারেন হেস্টিংসের দীর্ঘশ্বাস। টাউন হলের গথিক থামে সাহেব-ঘোষকের দামামা। বেহালার করুণ সুরের মতো ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের দেবদূতের শিঙার শব্দ খানখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মাঝরাতের কলকাতার বুকে। সেন্ট জন চার্চের মাটির তলায় শায়িত এই শহরটির ক্লান্ত স্থপতি জোব চার্নক ডালা খুলে বেরিয়ে আসেন যেন। আবার নতুন করে শহর গড়বেন তিনি? বলবেন, থুড়ি, ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু সময়ের মিছিলে ভুলেরা তো খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। একবার ভুল হলে তাকে আর ফেরানো যায় না—এটা কি চার্নক জানেন না? নাকি মনে মনে আওড়াচ্ছেন তিনি, যা করার করে নিয়েছি আমি, এবার তোমরা ভোগো। ঠিক তখনই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কিংবা স্বাধীনোত্তর দাঙ্গায় মৃত মানুষগুলি যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়ায়। তাদের চোখে আগুন ঠিকরে পড়ে। কীসের ওই আগুন? প্রতিহিংসার, না ঘৃণার? মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি এত ঘৃণাও আসে। স্পষ্ট দেখতে পাই যেন কলকাতার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র, রাজ্য ও জেলার দুনিয়ার দরিদ্রতম মানুষগুলি পুবের দিকে তাকিয়ে আছেন। সৌভাগ্যের সেই দিনটির অপেক্ষায় তাঁরা : দুঃসহ অভাবের রাত

কলকাতার রাতের গঙ্গার রহস্যই আলাদা
ছবি : সুজিত ঘোষ

দক্ষিণেশ্বর : সর্বত্রই লোকের ছত্রাক
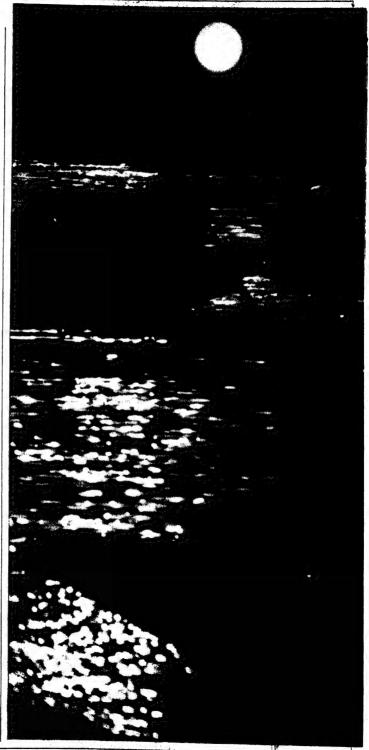
কেটে কবে পুব আকাশে সুখের সোনালী রোদ উঠবে। কবে তাঁরা কলকাতায় গিয়ে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবেন।

ক্রমপুঞ্জিভূত সময়ে গ্রাম, গঞ্জ হয়ে শহর এবং শেষে এই শেষ-সাতাশির কলকাতা বড় রহস্যময় হয়ে ওঠে। সাহেব, সাহেবের স্মৃতি, স্মৃতিসৌধ, সেকালের বাবু-রমণী, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দারিদ্র্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং পাঁচমিশেল মানুষের ভিড়ে এক জনপদে অনেক জনপদের সহাবস্থান যেন। মনে হয়, এ কলকাতাকে তো দেখিনি, কিংবা দেখেও যেন ঠিক এইভাবে দেখা হয়নি কোনওদিন, অনেকটা আটপৌরে গিন্নির মতো, অষ্টপ্রহর উপস্থিতি উপলব্ধির নয়। মাঝে মাঝে, এই কলকাতার মতোই তিনি অন্তঃস্থলে কোথায় যেন বাজেন। তখনই মনে হয়, ভাল করে দেখা হয়নি। অনেক দেখেছি, অনেককে দেখেছি, তবু তাঁকে যেন সেভাবে দেখা হয়নি। অথচ দিন গেছে দিনেরই মনে।

এই তো সেবার, সবাই মিলে দক্ষিণে গেলুম। হই হই ব্যাপার। পুজোর মুখে টিকিটের আকাল। মাসখানেক আগে পরিবারের সবাইয়ের জন্য হাফডজন টিকিট কাটা হল, তা-ও টিকিট পিছু কুড়ি টাকা ঘুষ দিয়ে। রিজার্ভেশন ফি, রেলের নয়, আপনার উপকারী বন্ধুর, যিনি আপনাকে আপনার পুরো পরিবারের জন্য ঝমাঝম্ রেলগাড়িতে রাতে নিশ্চিত শয়নে গ্যারান্টি দিচ্ছেন। বছরকার দিনে একবারই, পরিবারের জন্য এটুকু করা যাবে না। এরপর তো আছে নানান কেনাকাটা, সংসার গোছানো, বিরাট পুঁটলি বাঁধা, যাত্রার দিনে বাড়ির দোরগোড়ায় ট্যাক্সির হর্ন। পাড়ার লোকে তাকিয়ে দেখে। এই আক্রার দিনে যে লোকটা পরিবার সুদ্ধু বছর বছর হাওয়া বদলে বেরয়, তার ট্যাঁকের পরিধি মাপার চেষ্টা করে তারা। এতে একটা মজা আছে। লোককে দেখানো বা লোকের ঠারিয়ে দেখার মধ্যে মধ্যবিত্ত বাঙালি আনন্দ পায়। এক দাদা হঠাৎই কিস্তিতে তিন হাজারি এক স্টিরিও ক্যাসেট প্লেয়ার কিনল। সকাল বিকেল সেটাকে এত জোরে চালাত যে কানে তালা লাগার উপক্রম হত। বললে বলত, এত দাম দিয়ে সেটটা কিনলাম, লোকে জানবে না, নইলে পয়সা উঠবে কেন। লোকের পাগল পাগল অবস্থা, আরও তিন হাজারি সেটের উপস্থিতির জানান দিচ্ছে। মধ্যবিত্ত বাঙালির ঢাক পেটানোর পদ্ধতি একেবারেই আদি এবং বর্বর।

তো, অনেক ঘোরা হল। ঘুরছিই। উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম। দেশের নানা জায়গা, নানা স্থান। কিন্তু এইভাবে, এই ঘুরব বলেই, কলকাতায় কখনও ঘুরেছি। চব্বিশ প্রহর তো কলকাতার শরীরে লেপটে আছি, কিন্তু বুক ভরে তার আঘ্রাণ নিতে পারলুম কই। সকালে উঠে ঘুম-চোখে বাজার করা, প্রায় বাজার তুলে নিয়ে এসে সঞ্জীব চ্যাটুজ্জের বিলিতি বাঁশ মানে ফ্রিজে ভর্তি করা, দাড়ি কামানো, অফিস যাওয়া, অফিসে কাজের বদলে দমভর রাজনীতি চর্চা, অফিস শেষে মিনিবাসে লাইন, তারপর মুড়ির টিনে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফেরা। এবং শেষে, রাতে ; আহার ও শয্যাবিলাস অন্তে নিদ্রা। পরের দিন আবার সেই একই জীবনবৃত্তে গড্ডলিকাপ্রবাহ। এই অমোঘ প্রবাহে কলকাতার ঔরসজ রূপ-রস-গন্ধ প্রতিদিনকার কলকাতার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আমরা হাঁস নই, দুধ জল আলাদা করতে পারি না।

কিন্তু একদিন চেষ্টা করি না কেন। দোষ নেই তাতে। কেউ কি দুষবে ? কলকাতাকে আবার আলাদা করে দেখার কী আছে ? এই পোড়ামুখো কলকাতা, হাড়মাস জ্বালিয়ে খাচ্ছে, তার জন্য গোটা একদিন, সারাদিন ? শেষে হিন্দি ছবির রুপোলি ঢিসুম-ঢাসুম ছেড়ে বাংলা সিনেমায় নিত্যকার প্যানপ্যানানির পুনর্দর্শন ? কলকাতা বিলাস ? লোকে দুষুক। বেরিয়ে পড়া গেল।

দক্ষিণেশ্বর। অনেক ছোটবেলায় মায়ের হাত ধরে বোধহয় এক-আধবার এসেছিলাম। প্রবল বৃষ্টিতে দূরবর্তী দৃশ্যাবলীর মতো ঝাপসা সে স্মৃতি। স্পষ্ট নয় সব। তারপর আর এদিকে আসা হয়নি। কিছু না, স্রেফ অফিস-বাড়ি আর স্থূল চিন্তাতেই দিন গেল। মায়ের পায়ে অষ্টজবা দেওয়া হল না, মানতও চড়ানো হল না। মনে তো অপূর্ণ ইচ্ছারা কতই ঘোরাফেরা করে, একটির জন্য একদিনও আসতে পারতুম। নিদেন মানুষের ভিড়ে বেমালুম হারিয়ে যাওয়ার আনন্দেও তো আসতে পারতুম। মানুষ-আয়নায় নিজের

চিড়িয়াখানায় ভিড় প্রায় বছর ভর।
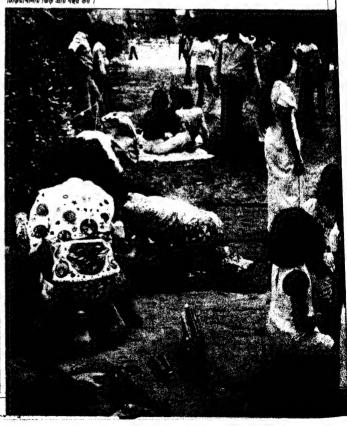
প্রতিবিম্বও তো দেখতে পারতুম। কেন যে আসা হয়নি এতকাল!

অস্পষ্ট যেটুকু মনে আছে, তাতে তো মন্দির যাওয়ার পথের দুধারে এতো রকমারি দোকানপাট ছিল বলে মনে হয় না। বিশেষ বিশেষ তিথি ছাড়া ভক্তেরও এত ভিড় ছিল না বছরভর। পঞ্চবটী ছিল শান্ত, স্নিগ্ধ। এখন যা দেখছি, তাতে তো মন্দিরসংলগ্ন এলাকা ছোটখাটো গঞ্জের চেহারা নিয়েছে। স্টেশন থেকে নেমে রাস্তায় পা দিলে রিক্সাওলাদের হাত ধরে টানাটানির মতো এখানকার দোকানীদের হাঁকাহাঁকি ও টানাটানি কেউ এড়াতে পারবে না। আর ভিড় যা, মনে হয় স্টেশনে সদ্য এসে থেমে-থাকা ট্রেন থেকে লোকের ঢল নেমেছে। গায়ে গা লেগে যায়। উৎসব-পার্বণে তো কথাই নেই। মন্দিরেও বিশাল লাইন ভক্তদের। কম করেও, সাধাসিধে দিনে, পুজোর ডালিতে মায়ের প্রসাদী ফুল পড়তে সময় লাগবে পৌনে একঘন্টা। মন্দিরচত্বরে লোক গিজগিজ করছে। নাটমন্দির, সারিবদ্ধ শিবমন্দির, রাধাগোবিন্দমন্দির, রামকৃষ্ণকক্ষ—সর্বত্রই লোকের ছত্রাক।

একটি ছেলে খেলা করছিল মন্দিরের প্রশস্ত উঠোনে। খেলা বলতে দৌড়োদৌড়ি। একটু দূরে তার সম্পন্ন বাবা-মা বসে। একটা বেশ ছুটির আমেজ। চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়ার মতো যেন

ন্যাশনাল লাইব্রেরি : এখন পড়ার চেয়ে কথা হয় বেশি। ছবি : অভিজিৎ ধর

বেড়াবার জায়গা মায়ের মন্দির। বাচ্চাকে নিয়ে তাই বেড়াতে আসা। পাশ কাটাবার সময় বাচ্চাটিকে শুধোই, কালীঠাকুরের সামনে এত হুড়োহুড়ি দাপাদাপি করছ, ঠাকুর পাপ দেবে না? বাচ্চা খিলখিল করে হেসে উঠল। যেন বোকার মতো কথা বলেছি। বলল, শিব ঠাকুর আমার দাদু, কালীঠাকুর দিদিমা। দিদিমার সামনে খেলছি, পাপ দেবে কেন? আজকাল বাচ্চারা ঠাকুর-দেবতাকে কত আপন করে নেয়। ওই সময় আমরা ওঁদের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতুম। গড় করতে করতে দিন যেত।

বেরিয়ে এসে ঘাটের কাছে এলুম। বালী ব্রিজ গঙ্গার ওপর আড়াআড়ি। নিচ দিয়ে যাত্রীবোঝাই নৌকো চলেছে। ওপারেই বেলুড়। ঘাটেও ভিড় কম নয়। স্নানার্থীর চেয়ে দর্শনার্থীর ভিড় বেশি। পুণ্যার্থী রমণী সিক্ত বসনে রাম তেরি গঙ্গা মৈইলির নায়িকা হয়ে ত্রস্ত চলেছেন ঘাটের ওপরে জামাকাপড় ছাড়ার নির্দিষ্ট ঘরে। এই ঘরটি আজও বদলালো না। আজও ভেজা কাপড়ে মহিলাদের প্রকাশ্যে পুরুষদের আদিরসের উপকরণ হতে হয়!

পঞ্চবটীতে খোলামেলা আদিরসের বানডাসি। সন্ধে-বিকেলে আরও বাড়ে। শিশুদের সঙ্গে আনলে দেখে দেখে শিশুরাও প্রেম করতে শিখে যাবে। গঙ্গার ধার বরাবর প্রেমিক যুগলের সার। আশেপাশে মাঠে তো আরও এসবই কি প্রেম, নাকি শুধুই শরীরী উত্তাপ আহরণ? প্রেম প্রেম খেলা? উত্তরণের আগেই ভোকাট্টা। এদের নিয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ যেমন উদ্বিগ্ন, তেমনি স্থানীয় পুলিশ। মাঝে মাঝে পুলিশি চড়াও হয় পঞ্চবটীতে। ভাবা যায়? চাকরি নেই, সংসারে শান্তি নেই, মনে শান্তি নেই। যুবক-যুবতীর প্রেম ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার আগুনে পুড়ে খাক হয় শুধু। পরিণতি পায় না। অবক্ষয় শুরু হয়েছে।

চলে আসি দক্ষিণে। দক্ষিণেশ্বর থেকে দক্ষিণে। কালীঘাট। আর এক শাক্তপীঠ। কলকাতার দুই প্রান্তে দুর্গতিনাশিনী, দুই হাত দিয়ে আগলে রেখেছেন যেন। তবু কলকাতার এত দুর্গতি কেন? কালীঘাটের কালীমন্দিরে এত অবক্ষয় কেউ কখনও আগে দেখেছে! মা এখন ভাগের মা। একগাদা সেবাইত, তাঁদের বংশ, তস্য বংশ। মা, মায়ের সম্পত্তি নিয়ে টানাটানি। এ তো গেল ভেতরের কহানি, বাইরে টানাটানি পাণ্ডাদের। মানুষের ভক্তি তাদের পুঁজি, তাই পুঁজির বপু বাড়াতে বেলেল্লাপনা। আর বেলেল্লাপনা লুম্পেনদের। অবাধ রাজ্য। যে কোনও শনিবার, পুজো-পার্বণ হলে তো কথাই নেই, কোনও ভদ্র রমণী মায়ের পায়ে অর্ঘ্য দিয়ে শালীনতা রেখে ফিরতে পারবেন? কোনও পুরুষ হলফ করে বলতে পারবেন যে, শনিবারের ওই ভিড়ে তাঁর পকেট সাফ হবে না? মানুষের নিচতারা কেন যে একসঙ্গে পীঠগুলোতে জড়ো হয়! এদের পাপ পুণ্যের ভয় নেই? নাকি নিঃসীম দৈন্যই এদের লাগাম-ছাড়া করেছে?

মন খারাপ হয়ে যায়। উত্তরমুখো হাঁটতে থাকি। সকাল এখনও ততটা বয়স্ক নয়, কিন্তু এই সাতসকালেই ভাদ্দরের রোদ চড়া। শহরে ইটকাঠে, শানবাঁধানো রাস্তায় ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ঘুরে ফিরছে সে রোদ। এই রোদ মাথায় নিয়ে রাত পোহাতেই নগর-রূপোপজীবিনীরা পথে নেমেছে। কারুই অভাব মেটেনি। যে দারিদ্র্যের শিকড় গভীরে প্রোথিত, সেই দারিদ্র্য অত সহজে

ছবি : তারাপদ ব্যানার্জী

পরপুরুষের অঙ্কে সারিবদ্ধ রাত কাটালেও যায় না। ভোর না হতেই তাই কৃশ শরীরগুলিতে সযত্ন ব্যবসায়িক পলেস্তরা।

সেতুর তলায় পড়ে আছে আদি গঙ্গা। ঘরের অবহেলিত বয়স্ক পুরুষটি যেন। ঘরের একটি জানলা বা বারান্দার একটি কোণে বরাদ্দ কাঠের চেয়ারটি অন্তঃপুরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে। ওই চেয়ারে বসেই দিনমান স্মৃতি রোমন্থন, দীর্ঘশ্বাস, এপাশ ওপাশ এবং অবশেষে রাত্তিরে নিদ্রা—ক্ষণিক জ্যান্তে মরা।

এখন যা অবস্থা হয়েছে আদিগঙ্গার, তাতে গঙ্গার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে। একটা খালও বলা যায় না তাকে এখন, বুক ভরাট হতে হতে এবং পাড় সরু হতে হতে এখন তা একটা বড়সড় নালার রূপ পেয়েছে বড়জোর। উত্তর কলকাতার প্রত্যন্তে এরকম নালার উপস্থিতি নজরে পড়ে। দিন কয়েক আগে নাকি জোয়ার এসেছিল এর খাতে। প্রৌঢ়ার ঋতুমতী হওয়া আর কি। তা' সেই জোয়ারের জল ধরে রাখতে পারেনি সে। দু'কূল ভাসিয়েছে। বাড়িঘর দোরও নাকি জোয়ারের জলে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

এইভাবে আদিগঙ্গাকে যাদুঘরের সামগ্রী করে রাখার দরকার কী? যারা দেখতে আসে, তারাও যে খুব একটা গর্বিত সুখে সুখী হয়, এমন নয়। প্রচণ্ড দুর্গন্ধে তাদের রুমাল চাপা দিতে হয় নাকে। মশা, মাছি, বিষ্ঠা, পচা আবর্জনায় অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে আদিগঙ্গাসংলগ্ন এলাকা। না হোমে না যজ্ঞে যখন, তখন বরং বুজিয়েই ফেলা হোক পূর্বপুরুষের গঙ্গা, তৈরি হোক রাস্তা। দু'হাজার সালের শিশুটিকে না হয় বুঝিয়ে বলা যাবে, এই রাস্তার নিচে তোমার পূর্বপুরুষের উদ্দেশে অর্পিত তর্পণের পবিত্র জল শায়িত আছে।

আদিগঙ্গাকে পিছনে ফেলে পৌঁছনো গেল ওয়ারেন হেস্টিংসের বেলভেডিয়ার বাড়িতে,এখন এখানে জাতীয় গ্রন্থাগার। ন্যাশনাল লাইব্রেরি। ১৯৫৩-র শীতে ন্যাশনাল লাইব্রেরির আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা। তার আগেও একটি লাইব্রেরি ছিল। নাম, ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি। ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরির জনক কার্জন সাহেব। তিনি বিভিন্ন দফতরের লাইব্রেরি ও ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিকে একসঙ্গে করে ১৯০৩ সালে চৌরঙ্গিতে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি খোলেন। পরে, দেশ স্বাধীনের পর, চৌরঙ্গি থেকে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি হেস্টিংসের এই বেলভেডিয়ার বাড়িতে চলে আসে। হেস্টিংসের বাড়িতে ইংরেজদের ওই লাইব্রেরি স্থানান্তরিত হওয়ার আগে বাংলার লেফটানেন্ট গভর্নররা থাকতেন এখানে।

বিশাল বাগান ঘেরা এই বাড়িটির অন্তঃপুরে যেতে গেলে পায়ে ধকল পড়বে। ধাপে ধাপে উঠে গেছে অনেক সিঁড়ি। সিঁড়ি, সিঁড়ির পর চত্বর, তারপর অন্দরমহল। অন্দরমহলে এখন লাখ ষোল বই, লাইব্রেরির, কর্মচারী এবং হাজার খানেক পড়ুয়া। যেন হাট। একে মিনমিন, দু'য়ে পাঠ, তিনে হট্টগোল, চারে হাট। সেই হাট বসে ন্যাশনাল লাইব্রেরির অন্দরে। আগেও এসেছি এখানে, তখন এত কথা হত না রিডিং রুমে। এখন পড়ার চেয়ে কথা হয় বেশি। আড্ডা। রিডিং রুমের চেয়ে বরং বলা ভাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট রুম। অনেক দিন পর পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল, এই চত্বরে ভাল জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, চলে এলেন ন্যাশনাল লাইব্রেরি। কিংবা রোদ-জল ও হকার, পুলিশের উৎপাত এড়াতে চাইছে প্রেমিক-যুগল, চলে এল এখানে। একটা রিডিং কার্ড করা থাকলেই হল, যা হোক একটা বই নামকোয়াস্তে সামনে খুলে গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর। সরকারি পাখা মাথার ওপর, পাখার হাওয়া, ভদ্র পরিবেশ, নিরুপদ্রবে নিশ্চিন্ত গল্পসল্প।

পায়ে পায়ে হেঁটে যাই চিড়িয়াখানা। প্রচণ্ড ভিড়। আগে শীতকালে পরীক্ষার পরটা এমন ভিড় হত। এখন এই ভিড় প্রায় বছরভর। মানুষের সমস্যা যত বাড়ছে ততই উৎসবমুখর হচ্ছে মানুষ। একদিন নয়, এখন প্রতিদিনই তার উৎসবের দিন।

বেলা বাড়ছে। ভাদ্দরের বেলার এই একটা সুবিধে। চড়চড়ে রোদ টানা হুমকি দিতে পারে না, মেঘেরাও আনাগোনা করে। এখন তেমনিই আচম্বিত মেঘের ছায়া সর্বত্র। বৃষ্টি নামবে? কোথা থেকে একটা রিজার্ভড বাস এল। দরজা খুলে নামল একদল অবাঙালি নারীপুরুষ, শিশুবৃদ্ধ। চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। কোথা থেকে আসছে এরা? দুমকা, ছাপরা, না আরও বহুদূর? কলকাতার হাতছানির খপ্পরে পড়েছে এরা। বাসের মধ্যে গামছা, ধুতি, জামা, মধুবনী নক্সাছাপা শাড়ি মেলা। বাসের বাইরেও একইভাবে ঝুলছে নিত্যকার পরনের উপকরণ। দলপতির পিছুপিছু জড়োসড় দলটি কোলে-কাঁখে বাচ্চা ও পুঁটুলি নিয়ে আড়ষ্ট পায়ে ঢুকে গেল চিড়িয়াখানার মধ্যে। আমিও ঢুকলুম। দলটি খানিক গিয়ে খোলা জায়গায় বসল। পুঁটুলি খুলে গেল। কাঁধের গামছা নেমে এল মাটিতে। কোলের শিশু তাতে শুল, চ্যাঁচাল। এর পরে কি নিত্যকর্মাদি শুরু হবে? এতখানি বাস ঠেঙিয়ে এসে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পর তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। চোখ ফেরালাম। কিন্তু অন্যদিকে তাকাব কী, সর্বত্রই, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মুক্ত আকাশের তলায় মিড ডে লাঞ্চ চলছে। শুধু পাত্র-পাত্রী আলাদা, আলাদা মেনুও। উচ্ছিষ্ট জমা হচ্ছে, কাকেরা ভিড় করে আছে, চিৎকারে কান পাতা দায়। এটা কি জু গার্ডেন না পিকনিক গার্ডেন? এগিয়ে যাই, বাঁদরের খাঁচার সামনে। ভিড়। সব বয়সেরই মানুষ সেখানে। জন্তুগুলো মানুষদের দেখে আনন্দ পাচ্ছে, মানুষরাও জন্তুগুলোকে দেখে আনন্দ পাচ্ছে। জীবজগতের দু'টি প্রাণী মুখোমুখি হয়ে একই সঙ্গে আনন্দে আটখানা। কেউ কেউ অবশ্য এরই মধ্যে বিরক্ত করছে বাঁদরদের। জন্তু-জানোয়ারদের বিরক্ত করার ঘটনা আগেও ঘটত, তবে তখন কর্তৃপক্ষের লোক থাকত, মানা করত। এখন কেউই থাকে না। যে যা পার করে যাও। চিড়িয়াখানার সর্বত্রই অবহেলা আর অযত্নের চিহ্ন। তারপর আনন্দ উপকরণও ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছে। আগে ছিল একটা হাতি, তার পিঠে চড়ে এক চক্কর ঘোরানো হত। এখন সে সবের বালাই নেই। উঠেই গেছে। অন্য কোনও আনন্দের ব্যবস্থা চালুও হয়নি। এখন চিড়িয়াখানায় গেলে দেখা যাবে প্রধানত কিছু দুর্বল বাঘ ও সিংহ, কিছু পাখি, হাঁস, বাঁদর-বেবুন, ভোঁদড় কাঁচের বাক্সে সাপ-মৃত কিনা বোঝা যায় না, প্রায় সারা বছরই ঘুমিয়ে থাকে, হরিণ, শেকল-বাঁধা পেটুক হাতি। আর সেই জিরাফ। ঘাড়-লম্বা উদাসীন জিরাফের বয়স কি বাড়ে না? অসমের গুয়াহাটি বা ওড়িশার ভুবনেশ্বরের চিড়িয়াখানা অনেক সাজানো গোছানো এবং সমৃদ্ধ।

মেঘলা হলে আলাদা কথা, কিন্তু রোদ চড়া হলে, বিশেষত চোত-বোশেখ বা ভাদ্দরে, নিতান্ত নাচার না হলে চিড়িয়াখানায় টো টো কোম্পানি করা যায় না। এরকম ফুটি-ফাটা রোদ হলে এই শান-বাঁধানো শহরে একঘেয়ে দিনটাকে একটু অন্য রকম করতে হলে বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ খারাপ নয়। ঘরে বসে কিছুক্ষণের জন্য মহাকাশে নক্ষত্রদের দেশে হারিয়ে যাওয়া। কলকাতার এটাও একটা দ্রষ্টব্য। তবে বাচ্চাদের নিলে চোখে ঠুলি পরতে হবে। বাচ্চাদের সঙ্গে বসে নক্ষত্র-তারার আলোয় তো যুগল লীলা দেখা যায় না। বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামে এই একটা অসুবিধা। এত ব্যাপকভাবে যে এখানে মদনদেব পূজিত হন তা ভাবা যায় না।

পাশেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। কলকাতার তাজমহল? স্মৃতি সৌধটির উদ্যানেও একই দৃশ্য। সন্ধে-রাতে আরও বাড়ে। দেহপসারিণীদের স্বাচ্ছন্দ্য যাতায়াত সৌধের পরিবেশকে অন্যরকম করে দেয়। তবু এখনও শিল্প-সৌকর্যে কলকাতার সম্পদ এই সৌধটি। সৌধটির ভেতর ঢুকলে হঠাৎই মনে হবে ব্রিটিশ-কাল শুয়ে আছে। মন্ত্রপূত জল ছিটলে আবার বুঝি সব নড়েচড়ে উঠবে। সৌধের চূড়ার বিষণ্ণ দেবদূত, দূর থেকে দেখলে মনে হয় পরী, উল্লাসে শিঙায় ফুৎকার দিয়ে উঠবে। রাণী ভিক্টোরিয়ার পিয়ানো বেজে উঠবে নানা সুরে। পোর্ট্রেট, পেইনটিংস্-এর ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসবে গোরা পুঙ্গবরা। শো-কেসের কাঁচের ডালা খুলে তারা যে যার সাজপোষাক পরে যার যা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। শো-কেসের ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজের ধুলো সাফ হবে, অস্ত্রশস্ত্রগুলি ধোয়ামোছা হবে। সাতাশির কলকাতা আচম্বিতে আঘ্রাণ নেবে দুশো বছর আগেকার ইতিহাসের

শুধু এই স্মৃতি-সৌধটিই নয়, কলকাতার গর্ব যাদুঘর, মনুমেন্ট বা শহিদ মিনার, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, রাজভবন, টাউন হল এবং একেবারে হালের পাতাল রেলও। কলকাতায় এসে এগুলি না দেখলে কলকাতা দেখা অপূর্ণ রয়ে যাবে। প্রায় একশ এগার বছর আগে দশ লাখ টাকায় তৈরি সরকারি স্থপতি ওয়াল্টার গ্যানভিলির ইতালিয় নক্সার যাদুঘরে এখন জায়গার অভাব। আরও জায়গা এবং টাকার দরকার। চাহিদা মতো ঠিকঠিক সবকিছু পেলে আরও সমৃদ্ধ করা যেত যাদুঘরটিকে। রক্ষণাবেক্ষণও হত সব যথাযথ। মাঝে তো শতাব্দী বৃদ্ধ এই যাদুঘরের বাড়িটির

দেওয়ালে ফাটল ধরেছিল। মেরামত করে সে যাত্রা রক্ষা পাওয়া গিয়েছিল। শহিদ মিনারের মাথার লাল রঙ কতটা বিপ্লববোধ মানুষের মনে জাগায় সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় শহিদ মিনারকে দেখে সাধারণ সচেতন মানুষ সম্ভ্রমে তাকিয়ে দেখে। এত দৈন্যর মধ্যে মিনারটা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে শহরের বুকে! যে কারুর কিংবা যে কোনও জিনিসের মাথা তুলে দাঁড়ানোটাই মধ্যবিত্ত কেজোদের কাছে একটা দারুণ ব্যাপার। দারুণ আশ্চর্যের। সেই আশ্চর্য মিনারের আগাপাশতলায় এখন শেষ বিকেলের রোদ।

এই শেষ-বিকেলের রোদ এখন রাজভবনের অলিন্দ, হাইকোর্টের ছাত, টাউন হলের চওড়া সিঁড়ি ছুঁয়ে। এই টাউন হলেই পঞ্চম জর্জ ও মেরির রাজ্যাভিষেক সংবাদ ঘোষিত হয়েছিল। এই টাউন হলের সিঁড়ির ওপরেই আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি স্যর জন নর্ম্যান। লটারি কমিটির টাকায় তৈরি হয়েছিল টাউন হল। তৈরি হতে লেগেছিল বছর আষ্টেক। শেষ-বিকেলের রোদে ইতিহাস কি কথা বলে ওঠে? স্পষ্ট যেন দেখা যায়, জঙ্গলে ভরা চৌরঙ্গি, শেঠেদের তাঁতশাল, জঙ্গল ফুঁড়ে হঠাৎই একটা পায়ে-হাঁটা সরু মেঠো পথ চলে গেছে দক্ষিণ দিকে, লালদীঘি, দীঘি পেরিয়ে পূব-পশ্চিমে টান। খাল, কেরানীদের আবাসস্থল রাইটার্স বিল্ডিং, উত্তরমুখো একটা রাস্তা। এখন তো লালদীঘি চত্বর ও চৌরঙ্গি এলাকা জমজমাট। চৌরঙ্গির মাটির নিচে আবার পাতাল রেল। দেশের প্রথম পাতাল রেল। পাতালে পরিচ্ছন্ন ট্রেন দ্রুতগামী, রবীন্দ্রসংগীত, শিল্পীর তুলির টান—ভাবা যায়?

সূর্য ডুবে যায় কখন। সন্ধে নামে। গঙ্গার ধারে বসে আছি। দূর-পাড়ে আলোর চুমকি জ্বলে ওঠে। নদীর বুকেও মাঝি-মাল্লাদের নৌকোয় আলোর সার। দাঁড়িয়ে-থাকা চিত্রার্পিত জাহাজও আলো ঝলমল। সব মিলিয়ে মনে হয়, কালো জমির শাড়িতে জংলা পাড়। উজ্জ্বল সোনালী জংলা।

শান বাঁধানো হয়েছে গঙ্গার পাড়। বসার জায়গাও করে দেওয়া হয়েছে। আগে এমনটি ছিল না। বাবার সঙ্গে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখতুম, নৌকোর দুলুনি দেখতুম, আর দেখতুম থম-মেরে-থাকা ঢাউস জাহাজ। এই জাহাজগুলো কি নড়ে না? দাঁড়িয়ে থাকবে অনন্তকাল? গঙ্গায় জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকলে কেন জানি না মনে হয় শৈশবের সেই জাহাজটিই দাঁড়িয়ে আছে। সব জাহাজকেই একই রকম লাগে।

আগে এত ভিড় হত না এখানে। এখন বেশ ভিড়। বসার বেঞ্চি একটাও খালি নেই। যুগল-বন্দী প্রেম তো আছে, তাছাড়াও আছে নানা শ্রেণীর মানুষ নানা মনে। আর আছে হকারের জুলুম। জুলুমের বেশিরভাগটাই অবশ্য প্রেমিক যুগলদের ওপর। একটা কথপোকথন কানে এল:

হকার: এক প্যাকেট চিপস্ নিন।

প্রেমিক: না, লাগবে না।

হকার: নিন না, একটাই তো।

প্রেমিক: বললাম তো, লাগবে না।

হকার: লাগবে না মানে, প্রেম করছেন লজ্জা করছে না।

প্রেমিক: প্রেম করলেই কি চিপস্ কিনতে হবে?

হকার: আলবাত। এখানে বসলেই কিনতে হবে। আমরা মরছি পেটের জ্বালায়। উনি করছেন ফুর্তি। ফুর্তির ট্যাক্সো লাগবে।

প্রেমিকা (ফিসফিসিয়ে): আঃ, একটা প্যাকেট কিনে নাও না। আপদ বিদেয় হক। নোংরা নোংরা কথা বলছে দেখছ না।

উঠে পড়া গেল। আর নয়। দুই যুবক, যারা হয়ত বেকার, দুই ভিন্ন বেশে পরস্পরে ঝগড়া করছে। একজনের সঙ্গিনী জুটেছে, অন্যজনের জোটেনি। কিংবা জুটেছে হয়তো, একেবারেই গাঁটছড়া বেঁধে। তাই জ্বালা বেশি। রাগও।

একটা নৌকো নিয়ে গঙ্গায় ভেসে পড়লুম। গঙ্গা বা বহতী এরকম কোনও নদীকে দেখলেই মনে পড়ে সেই যুগ যুগান্তরের জিজ্ঞাসা: নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ। আরে, নদী কী, আমি কোথা হইতে আসিয়াছি? বাবা-মা হইতে ঠিকঠিক উত্তর কি পাওয়া গেল? নাকি যথাযথ উত্তর পাওয়ার অপূর্ণতা রয়েই গেল? ভারী রহস্যজনক। আরও রহস্য বাড়ে এই রাতের গঙ্গায়। দুপাড়ে অলৌকিক সব জনপদ, নৌকোর ছইয়ে ঝুলছে ঘুম-ঘুম হ্যারিকেনের বাদামী আলো, দুলুনি, জল ভাঙার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। যা না অন্ধকার তার চেয়েও বেশি অন্ধকার লাগে গঙ্গার বুক। চোখ চলে না। মাথা জুড়ে ঢাউস একখানা আকাশ, তারারা, হেলে-পড়া চাঁদ। হাতে ঘড়ি না থাকলে মনে হবে অনেক রাত, সন্ধে-রাতেও অনেক রাত। গা ছমছম করে।

অথচ কলকাতা দর্শনে এসে গঙ্গায় বিহার হবে না, ভাবা যায়? কলকাতার সৌন্দর্যের অনেকখানি জুড়ে এই গঙ্গা। গঙ্গার কী হালই না হয়েছে এখন। পলি জমে জমে গঙ্গার বুকে অনেক জায়গায় চড়া জেগে উঠেছে। মরা গরু-বাছুর, জন্তুজানোয়ার, দু'পাশের কলকারখানার নোংরা, শহরের আবর্জনা-নালা সবই এসে পড়েছে গঙ্গায়। এক চামচ গঙ্গার জলে এখন শত শত মৃত্যুর হাতছানি। প্রাণদায়িনী এখন বিষিয়ে উঠেছে।

কেন এই অবস্থা গঙ্গার? আমরা কি একটু সযত্ন হতে পারতুম না। প্রকল্পের নামে কোটি কোটি টাকা গলে যাচ্ছে তা-না-তা-না করে। অথচ কলকাতার অন্যতম গর্ব এবং আকর্ষণ এই গঙ্গার প্রতি সকলেরই কেমন গা-ছাড়া ভাব। রক্ষকই শেষে ভক্ষক হয়ে উঠবে না তো। কলকাতার অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলার লোক হয়তো থাকবে না তখন।

কোথাও একটা অবক্ষয়ের চোরা স্রোত বইতে শুরু করেছে। চোরা স্রোতের টানে অসহায়ভাবে ভেসে চলেছে কলকাতা, কলকাতার জীবনযাপন এবং সম্পদ। আমরা কলকাতাকে ভালবাসিনি। দেশের দরিদ্রতম শহর কলকাতা, আরও দরিদ্রতম এর মানুষজন। পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব তিনটি রাষ্ট্র ও দেশের সবচেয়ে গরিব দু'টি রাজ্যের লাখ লাখ হতভাগ্য মানুষগুলি চেয়ে থাকে কলকাতার দিকে। তাদের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক শুধু দু'মুঠো অন্নের। প্রাণের টান কই? এদের কাছে কলকাতার যত্ন, কলকাতার ভালমন্দ চিন্তা করা কল্পনাতীত। যারা কলকাতার লোক, মনের এক চিলতে কোণে কোথাও হয়তো কলকাতার জন্য গর্ব লুকিয়ে থাকে, তারাও গা করে না! তারাও ভিনদেশীদের মতো, ভিনদেশীদের সঙ্গে অন্নসংস্থানের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। দিন কাটে উদরপূর্তির দুশ্চিন্তায়। ফলে চরম অবহেলা আর অযত্ন নামে দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাটের মন্দির,
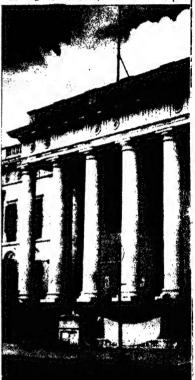
টাউন হল: শেষ বিকেলের রোদে ইতিহাস কি কথা বলে!

আদিগঙ্গা, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, যাদুঘর, গঙ্গা, রাস্তাঘাট সর্বত্র।

মন খারাপ হয়ে যায়। অবশ্য সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, কোনও ভ্রমণের সবটুকু তো সুখের নয়। পরিক্রমা শেষে মনের কোথাও যেন দুঃখরা বাসা বাঁধতে থাকে। এই সেবারও যখন দক্ষিণ পরিক্রমা করে ফিরছি, তখনও এরকমটিই হয়েছিল। সবাই ছিল সঙ্গে, মায় স্ত্রী-কন্যাও। তবু কেন ট্রেনের সেই মেয়েটির ওপর অধিকার জন্মে গেল। মেয়েটি তো আমার সঙ্গে কথা বলেনি, শুধু আটচল্লিশ ঘণ্টা ট্রেনে আর পাঁচজনের মতো ট্রেনবাসিনী হয়েছিল। তাকিয়ে ছিল কি? তবু কেন তাকে ছেড়ে আসতে কষ্ট হচ্ছিল? ■

ছবি: অলক মিত্র

ফেরা

চন্দ্রশেখর রায়

ক'দিনের উপচে-পড়া ভিড়ের ধকল সামলে শহরখানা এখন কাহিল। বিষণ্ণ। ভাঙারাস শেষ হয়েছে দিন তিনেক। দেশ দেশান্তর থেকে হাজার-হাজার মেয়েপুরুষ এসেছে হুজুগের টানে। তারা এখানকার মন্দিরে-মন্দিরে ঘুরেছে। রাস-মঞ্চের সাজসজ্জার কেরামতি দেখেছে। নাটমন্দিরে বসে বিশ্রাম করেছে। পুঁটলির চিঁড়ে-গুড় বের করে খিদে মিটিয়েছে। কেউ-কেউ হোটেল খুঁজছে। কেউ বা পথের ধারে উনুন ফেঁদে চালে-ডালে চড়িয়েছে। রাত্তিরবেলা যারা নাটমন্দিরে গা-গতর বিছোতে পেরেছে তারা ভাগ্যবান। যারা ঠাঁই পায়নি, তারা সরকারের অস্থায়ী ক্যাম্পে মাথা গুঁজেছে। বিচুলির বিছানায় ঘুমিয়েছে। শহর জুড়ে গণ্ডা আড়াই ক্যাম্প করে সরকার। তাতেও কুলোয় না। কত মানুষ গাছের তলে, ফাঁকা মাঠে রাত কাটায়। অঘ্রাণের হিমে মাথা ভিজে যায়। কাঁথা-কম্বল স্যাঁত স্যাঁত করে। এই ভাবেই দুটো দিন। তারপর ভাঙারাস। নবদ্বীপের রাস দিনেদিনেই শেষ। ওখানকার রাস শেষ করে ছোট ট্রেনে, বাসে আর লরিতে পিল পিল করে মানুষজন হামলে এসে পড়েছে শান্তিপুরে। চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক সেদিন বিকেল থেকেই মানুষের ভিড়ে থিক থিক। তখন সরকারের 'যাত্রীনিবাস' ভেসে যায় মানুষের স্রোতে। সারারাত এই ভিড়ের ধকল।

কিন্তু ভাঙারাসেই উৎসব ফুরোয় না। পরদিন 'ঠাকুর নামানো'। শোভাযাত্রার 'হাওদা' থেকে বিগ্রহ নামিয়ে মন্দিরে তোলা। মন্দিরের বিগ্রহ কাছ থেকে দেখার সে এক দুর্লভ সুযোগ। এটাও এক উৎসব। তাই শান্তিপুরের রাস্তায়-রাস্তায় এদিনও বহিরাগত মানুষের ভিড়। কীর্তন আর বাউল-গানের সুর গায়ে মেখে বাতাস যেন ডানা মেলে ওড়ে। মঠে-মন্দিরে, গোঁসাইবাড়ির চত্বরে ভক্তপ্রাণ মানুষ শেষ প্রণাম নিবেদন করে। ঠাকুর যেন সামনের বছর আবার তাদের টেনে আনেন এই শ্রীধামে।

এই উৎসবটি ছাড়া এখানে বাইরের মানুষের পায়ের ধুলো পড়ে না। কোর্ট-কাছারি, অফিস-আদালত কিছুই নেই এখানে। একটা অসুখ করলেও মানুষ ছোটে কৃষ্ণনগর। কল্যাণী। তাঁতের মতো জবুথবু একটি কুটির শিল্পের ওপর এ শহরের মরা-বাঁচা। ওটাই এখানকার লক্ষ্মীর ঝাঁপি। তাই ভাঙারসের দৌলতে এখানকার ব্যবসায়ীরা কিছু নতুন মানুষের মুখ দেখে। দু'পয়সা রোজগার করে। মহাজনের গদি থেকে দু'চারখানা তাঁতের কাপড়ও বিকোয়। কিন্তু

এখানকার গরীবগুর্বো তাঁতিদের বড় কষ্টে দিন কাটে। সেই পুজো থেকে এই রাস অবদি শুধু খরচের বহর। নাস্তানাবুদ অবস্থা। তাই ভাঙারাস এদের কণ্ঠের ফাঁস হয়ে ওঠে।

কালাচাঁদেরও হাত বড় শুকনো যাচ্ছে। পুজো থেকে কাজে ভাটা। তাঁতের তক্তায় বসা হয় কি হয় না। এই টাকা পয়সা নিয়েই আজ বাপের সঙ্গে খুব এক চোট হয়েছে। পাড়ার দু'একখানা চেনামুখ উঁকি দিয়েছে তাদের তাঁতঘরে। কেউ কোনো পক্ষের হয়েই কথা বলেনি। আজকাল কেউ কারুর বাড়ির ঝগড়ায় মাথা গলায় না। সকলেই নিজের চিন্তাতেই চমৎকার। তবু কানাইজ্যাঠাকে মধ্যস্থ মেনেছিল বাবা। বলেছিল, 'তুমিই বলো, কানাইদা, অ্যাতো বড় ছেলেরে আর কতদিন আমি বোইসে-বোইসে খায়াবো? এই আক্রাগণ্ডার দিনে...'

পাশ কাটাবার ফিকির খুঁজছিলে কানাইজ্যাঠা: 'ঝগড়া-দণ্ড কোরে অশান্তি বাড়াস নে। চুপ কর।'

'চুপ কোরেই তো থাকি।'—বাবা বলেছিল, 'কিন্তু ওর তো এট্টু হায়া থাকা দরকার। সেই পুজো ইস্তক অ্যাট্টা পয়সা ঠ্যাকায়নি, তা জানো?'

'তোদের সুংসারে ক্যানো যে অশান্তি হয় বুজি নে।'—কানাইজ্যাঠা বলেছিল, 'তুরা দুই বাপব্যাটায় খাটবি, খাবি। তোদের আবার সমিস্যে কিসের?'

'তুমিই বলো, দাদা।'

কানাইজ্যাঠা বলেছিল, 'যা কালাচাঁদ, কাজে চোলে যা, বাবা তোর বাপও তো বোসে থাকে না? সারাদিনই খাটচে। তোদের অশান্তি হবার কতা নয়।'

না, বাপ-ছেলের মধ্যে খুব একটা অশান্তি হয় না। শান্তিও নেই। দু'জন যেন দুই জগতের। কেউ কাউকে চেনে না। কারুর জন্যে কারুর মাথা ব্যথাও নেই। কালাচাঁদ পরের তাঁতে কাজ করে। বাবা বাড়িতে। ছেলে হপ্তায় কুড়িখানা টাকা দিয়ে খালাস। সংসারের দায়-দায়িত্ব বাবার। বাজার করা, রান্না করা, ছেলেকে খেতে দেওয়া সবই বাবা। কালাচাঁদ কোনো ঝামেলার মধ্যে থাকে না। খিদের সময় দু'মুঠো পেলেই হল।

সংসার সামাল দিতে তাঁতের মাকু কামাই যায়। কালাচাঁদের বাপের তেমন কাজ হয় না। গজগজ করে। কালাচাঁদ শোনে। কিন্তু বাপকে সাহায্য করতেও এগিয়ে আসে না। কখনো কখনো ইচ্ছে হয়। রাগ আর অভিমানের মাঝামাঝি একটা জায়গায় সে থির হয়ে থাকে।

অথচ, কালাচাঁদ চিরটাকাল এমনটি ছিল না। সে বাপের বড় আদরের ধন। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েও তার খুব দুঃখ খেদ ছিল না। বাপই তার মায়ের অভাব পুরিয়েছে। যখন যা চেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সেটি যুগিয়েছে বাবা। কালাচাঁদকে কাঁধের ওপর চড়িয়ে রাসের মেলা দেখতে গেছে। দোল-দুর্গোৎসবে সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছে। বাবুদের বাড়ি কেত্তন করতে গেছে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। বাপের কাছেই সে অ-আ ক-খ চিনেছে। তখন যেখানে বাবা সেখানেই কালাচাঁদ।

বড় হয়েও বাপ ছাড়া কালাচাঁদ কিছুই জানতো না। ইস্কুল ছেড়ে তাঁত বোনাও শিখেছে বাপের কাছে। বাবা সংসারের কাজ করতে তাঁত থেকে উঠে পড়লেই সেই তাঁতে কালাচাঁদ বসে পড়তো। এমনি করেই হাত পাকিয়েছে। তারপর পরের তাঁতে।

এই পরের বাড়ি কাজে গিয়েই কেমন যেন পালটে গেল। টাকা-পয়সার হিসেব বুঝতে শিখল। খোরাকির বরাদ্দ টাকা ছাড়া বাবার হাতে একটি বাড়তি পয়সা দিতে মন চায় না। বাপকে যেন খুবই স্বার্থপর বলে মনে হয়। বাপের মুখে শুধু অভিযোগ শোনে। কালাচাঁদ নাকি হতচ্ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। কাজ করে টাকা পয়সা উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছে। সখ-সৌখিন আর সিনেমাতেই ফতুর হচ্ছে। হাসি পায়! এমন কাঁচা বয়সে তুমি সখ-সৌখিন কিছু করনি? চিরকাল এই রকম ভোলেবাবা হয়েছিলে? আসলে বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হিংসুটে হয়। নিজের

রক্তের জিনিসও তখন পর হয়ে যায়।...

মতিগঞ্জের পুলের নির্জনে বসে একা একা বিষণ্ণ হচ্ছিল কালাচাঁদ। এমনিতেই রাসের ক'টা দিন তার বড় বিচ্ছিরি গেছে। সামান্য একটা উৎসব নিয়ে কেন যে মানুষের এত মাতামাতি ? কোনো মানে হয় না। শরীর রি-রি করে। মনিবের কাছে হাত পেতে পেতে দেনার অঙ্ক বেড়েছে। আজ বিকেলেও গোটা কুড়ি টাকার জন্যে মনিবের দুয়োরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁতে বসলে ডেলি একখানা করে কাপড় নামায়। সে কারণেই মনিব যেন খাতির করে। কিন্তু আজ আর খাতির দেখায়নি। কালাচাঁদকে দেখেই যেন তেতে উঠেছিল। বলেছিল, 'আবার কবে কাজকম্ম কোরবি তুরা ? তোদের চাহিদার তো শেষ দেকিনে! এদিকে আমার যে ফোতুন হবার অবোস্তা।'

কালাচাঁদকে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনিব শেষ কথাটি বলে দিয়েছিল, 'কাপুড় না হোলে আর অ্যাট্টা পয়সা কারুকে দিতে পারবো না।'

বেহায়ারার মতো মনিবের গরম হজম করেছিল কালাচাঁদ। পুজোর আগে হলে করতো না। তখন প্রতিটি তাঁতির বিষদাঁত গজায়। মনিবের মুখের ওপর বলে, অন্য তাঁতি দেখে নেবেন, আমি আর কাজ করব না। আপনার মতো অনেক মহাজন আমাকে ডেকে নেবে। কিন্তু এখন তাঁতিরা যেন শীতের সাপ। সব অপমান সহ্য করার দিন তাদের। কালাচাঁদ মিনমিনে গলায় বলেছিল, 'বড্ডো দরকার। দিন। কাল থেকে ঠিক কাজে বসবো।'

মনিব যেন ব্যঙ্গের 'আহা' শুনিয়েছিল। বলেছিল, 'দরকার না হোলে তুরা হাত পাততে আসবি ক্যানো ? ক'টা টাকার বড্ডোই দরকার তোদের। কিন্তু আমি যে নাচার, বাবা থাকলে কি তোদের ফিরাতে মন চায় ? এই সামনেই পোষ মাস। কেউ কাপুড় ছুঁচ্চে না। টাকার কি আমদানি আচে, বাপ।'

বাবাকে আজ কিছু দেবে ভেবেছিল। হ'ল না। শুধু হাতে ফিরেছে কালাচাঁদ। সব দিকেই আজ তার ঝাড় খাবার পালা। তার স্যাঙ্গুইন নম্বরটাও ফসকেছে। ওস্তাদের কাছে গিয়ে যখন শুনল 'রসগোল্লা', তখনি তার চোখ ট্যারা। প্রিয় 'চশমা' তাকে পথে বসিয়েছে। একটা টাকা শুধু শুধু। এখন পকেটে গোটা দুয়েক টাকা সম্বল। রাত্তিরে বাড়িতে আর পাত পেতে খাবে না। বাপের হাতে কিছু ধরে না-দেওয়া অবধি হোটেলেই চালিয়ে যাবে।

কালাচাঁদের চোখের সামনে এখন অন্ধকারে ডুবে আছে তার জন্মভূমি। একটু আগে গাছগাছালির ফাঁকে ঝিলিক ছড়িয়ে সূর্যিটা ডুবেছে। এবং তারপরেও উদার প্রকৃতির কোলে অনেক নাম না-জানা পাখির কিচির-মিচির। গঙ্গার ওপারে গুপ্তিপাড়ার ইস্টিশনে ট্রেনের শব্দ উঠেছে। খালপারের দোকানে-দোকানে মোমবাতি আর কেরোসিনের আলো জ্বলেছে। কখন যেন পেতলের দুর্গামন্দিরে আরতি শেষ হয়েছে। সবই যেন কেমন সিনেমার পর্দার ছবির মতো। একে একে এসেছে আর চলে গেছে। বোশেখ-জ্যেষ্ঠি মাসে প্রকৃতির এই রূপবদল এত টপ করে নজরে ধরা পড়ে না। দিন খাসা ছোটি হয়ে এসেছে।

এককালে এই খালপারটা বড় প্রিয় জায়গা ছিল কালাচাঁদের। কাজ থেকে উঠে খালের ধারে আসা চাই-ই। এই প্রকৃতি তখন কত পরিচিত ছিল। আজকাল আর আসা হয় না। সন্ধের এত কেরামতি তার চোখে যেন কতকাল ধরা পড়েনি। কাজলের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে অনেক কিছুই পাল্টে গেছে তার জীবনে। এ পরিবর্তনে যত সুখ ততই জ্বালা।...

বিন্দের সঙ্গে যখন পার্টি অফিসে যাওয়া-আসা ছিল, দুই বন্ধুতে এই খালপারে এসে গল্প করা ছিল, পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে বসে দেশের হালচাল নিয়ে আলোচনা, সে যেন এক অন্য জীবন। তখন মদ বুঝতো না। সাট্টা বুঝতো না। বিড়িই তখন একমাত্র নেশা। সিনেমা আর দামী জামা-প্যান্টের ওপর আকর্ষণ ছিল। তাঁতিঘরের ছেলে বলে কি ভদ্রলোকের মতো রাস্তায় বের হতে নেই? রাস্তাটাই ভাল লাগতো তার। কত মানুষজন। বন্ধুবান্ধব। কত দেখার বস্তু,শোনার বিষয়। বাড়িতে পা দিলেই সেই একা। আধবুড়ো একটা মানুষের সামনে দাঁড়ানো। যে মানুষটার সব কিছুই বুজরুকি, ভণ্ডামি, বাবলা অথবা গোঁসাইবাড়ি যেখানেই কেত্তন, সেখানেই গগন প্রামাণিক। অথচ, ওই মানুষটার বউ খুইয়েও মেয়েমানুষের ওপর টান। ছেলে হয়েও কালাচাঁদ হাড়ে-হাড়ে চিনেছে তার বাপকে। পাড়ার ছুঁড়িদের দিকে কেমন ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায়। গায়ে পড়ে রঙ্গ রসিকতা করে। রাস্তা দিয়ে অচেনা কোনো মেয়েছেলে হেঁটে গেলে তার তাঁতের মাকু থেমে যায়। ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে। এমন মানুষকে 'বাবা' বলতে ঘেন্না। ঘর যেন অসহ্য কালাচাঁদের।

একদিন কী কারণে যেন বিন্দেকে খুঁজে পেল না কালাচাঁদ। পাড়ায় নেই, পার্টি অফিসে নেই। লাইব্রেরিতে বসে যারা কাগজ পড়ে, তাদের মধ্যেও বিন্দে নেই। খালের ধারে নিত্যদিন ওরা যেখানটিতে বসে গল্প করতে করতে রাত করে ফেলে, সেখানেও বিন্দেকে পাওয়া গেল না। তবে কি বিন্দে সিনেমায় ঢুকলো? একা একাই খানিক খালের ধারে বসে থাকলো কালাচাঁদ। গোটা তিনেক বিড়ি শেষ করল। চা খেল। তবু সময় আর কাটে না। সন্ধে রাত্তিরে বাড়ি ঢুকতেও মন সায় দেয় না। তখন এই খালপার ধরে বরাবর পুবদিকে হাঁটা শুরু করল। উদ্দেশ্যহীন। বড়বাজার পেছনে ফেলে শ্যামচাঁদের ঘাটের দিকে হাঁটে কালাচাঁদ। বাঁ দিকে নিষিদ্ধ পল্লী। সার সার মেয়ে দাঁড়িয়ে। সে তাকায় না। বরং অজানা এক ভয়ে বড় বড় পা ফেলতে থাকে।

এদিক থেকে কালাচাঁদ ভিতু। সংশয়ী। সেই মা মারা যাবার পর মেয়েমানুষের সান্নিধ্য কেমন বস্তু তা জানে না সে। বড় হয়েছে বাপের কোলে। পুরুষ সান্নিধ্যে। মেয়েদের সম্বন্ধে এক বিজাতীয় দূরত্বে কেটেছে তার কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সন্ধিক্ষণ। সিনেমার পর্দায় যে-মেয়েদের দেখে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, রাস্তাঘাটে সেই মেয়েরাই কত পর-পর।

কিন্তু সেদিন একটি মেয়ে-কণ্ঠই তাকে সচকিত করে। একেবারে যেন পথ আগলে দাঁড়ায়। বলে, 'আসুন না ভাই।' কালাচাঁদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। অবাক হয়। মেয়েটি সুযোগ ছাড়ে না। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, 'যাবেন?'

কেমন করে মেয়েটির পেছন-পেছন সে গলির মধ্যে ঢুকেছিল তা যেন নিজেই জানে না। নেশার ঘোরের মতো অবস্থা। কিন্তু অচিরেই সে-নেশা ছুটে গিয়েছিল। গলির মধ্যে মূর্তিমান রাখাল নস্কর। কালাচাঁদের মহাজনের দোস্তি। এক সঙ্গে হাওড়ার হাটে যায় ফি সোমবারে। অনেক রকমের নাকি কারবার আছে তার। খুব সৌখিন মানুষ। কালাচাঁদকে দেখে এক গাল হাসে। কালাচাঁদের অবস্থা তখন কাহিল। হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পায় না। রাখাল নস্করই যেন তাকে উদ্ধার করে। বলে, 'লাজ লজ্জার কি আচে রে? এইচিস ঢুকে পড়।' মেয়েটিও রাখাল নস্করের সুরে কথা বলে, 'এসো। ভয়ের কিছু নেই।' রাখালই যেন ঠেলে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় কালাচাঁদকে। বলে, 'পুরুষ মানুষের আবার লজ্জা-ভয়টা কিসের। যা। কেউ টের পাবে না।'

সেই থেকে কালাচাঁদের নতুন সঙ্গী হল কাজল। সেই থেকে এই লাইনের মস্ত সহায় হল রাখাল নস্কর। এদিক থেকে নস্কর বেশ সাচ্চা। সত্যিই সে কালাচাঁদের এ ব্যাপারটা কাউকে জানায়নি। বরং পুলিস-টুলিসের হুজ্জতিতে কতদিন কালাচাঁদকে বাঁচিয়েছে সে। এর জন্যে কালাচাঁদ তার কাছে কৃতজ্ঞ। শুধু নস্কর যেদিন ঘরের দোর বন্ধ করে কাজলের সঙ্গে গল্প করে, সেদিন মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়। কখনো মনে হয়, কাজলের সঙ্গে একটা গভীর সম্বন্ধ তার। যে সম্বন্ধের নাগাল কালাচাঁদ কোনোদিনই পাবে না। কতদিন কাজলকেও জিজ্ঞেস করেছে। কাজল যেন খুলে কিছু বলে না। হাসে। বলে, 'নস্করবাবু একেনে সব মেয়ের কাচেই যায়। গল্প করে। আমার কাচেও আসে।' কিন্তু কালাচাঁদের মন ভরে না। সেই মুহূর্তে কাজলকে বড় রহস্যময়ী মনে হয়।

কিন্তু কাজলের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই সে যেন জীবনের নতুন মানেও খুঁজে পেয়েছে। পেয়েছে বেঁচে থাকায় নতুন স্বাদ। জীবনটা যে কত মূল্যবান সেটা টের পায় কাজলের সান্নিধ্যে। এক ধরনের নিরাপত্তাবোধও। এর আগে এমন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি সে কারুর কাছেই পায়নি। এখন কালাচাঁদ কাজলের শুধু বাঁধা খদ্দেরই নয়, একেবারে কাছের মানুষ। একজনের বুকের কথাটাও বুঝি আর একজন টের পায়। হপ্তায় তিন-চারটে দিন কাজলের কাছে না গেলে তার চলে না। বিচ্ছিরি লাগে। কাজল অনুযোগ করে, 'কী তুমি চাকরি করো যে, রোজ অ্যাকবার আসতে পারো না আমার কাচে!'

কালাচাঁদ বলে, 'চাকরি কোল্লে রোজই আসতাম। আমি যে তাঁত বুনি।'

'সোন্দের পরও তাঁত বোনো?'

কালাচাঁদ মিথ্যে করে বলে, 'হ্যাঁ, তাও কুনু-কুনুদিন বুনি বই কি!'

'আমার চে তুমার কাজটাই বড়ো, বলো?'

চুপ করে যায় কালাচাঁদ। এ কথার উত্তর দিতে পারে না। বুঝাতে পারে না, কাজের চেয়ে কাজলই আজকাল তার কত বড় হয়ে উঠেছে। চারিদিকের অন্ধকারে কাজলই একটা আলোর বিন্দু। হতাশা আর প্রবঞ্চনার মধ্যে সে-ই এখন একমাত্র সান্ত্বনার আশ্রয়। সে-আশ্রয় ছেড়ে কোথাও এক দণ্ড ভাল লাগে না। মাকু আর জ্যাকার্ড মেসিনের শব্দে যে-ছন্দ তৈরি হয়, তারমধ্যেও সে যেন কাজলের কণ্ঠস্বর শোনে। রাস্তায় সব চেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকেও এখন কাজলের কাছে নিষ্প্রভ লাগে। সে বুঝে ফেলেছে, পুরুষের জীবনে একটি মেয়েমানুষ কত জরুরি। যে-পুরুষ কোনো নারীর সোহাগ পায়নি, তার চেয়ে হতভাগা জগতে আর কেউ নেই। তাই বিন্দের সঙ্গে এখন কালাচাঁদের দেখা হয় কখনো-সখনো। অন্যান্য বন্ধুদের কাছে সে প্রায় অচেনা। অষ্টক্ষণ কাজলের চিন্তাতেই তার দিন কাটে।

তবু কালাচাঁদ কাজলের কাছে নিত্যিদিন যেতে পারে না। এদিকে কত চেনা-জানা মানুষের আনাগোনা। তাদের পাড়া থেকেও রোজই বড়বাজারে মানুষজন আসছে। বড় বাজার না হলে তাঁতিদের কাজ কারবার অচল। কারুর নজরে পড়ে গেলেই চিত্তির। রাখাল নস্কর তখন তাকে বাঁচাতে পারবে না। নিমেষে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে যাবে। গগন প্রামাণিক শুনবে, তার একমাত্র পুত্র সন্তানটি বড়বাজারের লাইনে যাওয়া-আসা করে। বাপকে সে তোয়াক্কা করে না, কিন্তু পাড়ার ছেলে-বুড়ো সকলে ছি ছি দেবে। বাঁকা চোখে তাকাবে। বিন্দে এখন রাজনীতি নিয়েই মেতে আছে। ডাকঘরের মোড়ে আজকাল প্রায়ই সে লেকচার দেয় মাইকের সামনে। গরীব দুঃখীর কথা বলে। সংগ্রামের কথা বলে। পাঁচজন মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। সে এখন খাসা মাতব্বর গোছের। কালাচাঁদেরও ওই রকম হবার কথা ছিল। হয়নি। কেমন করে সে যেন অন্য পথে চলে গেছে। তো ওই বিন্দেও শুনবে কালাচাঁদের এই অধঃপতনের কথা। মনে মনে হাসবে। ঘেন্না করবে তাকে। কাছে ডেকে আর কোনোদিন বিড়ি এগিয়ে দেবে না। যে কি না দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করার স্বপ্ন দেখতো, সে এখন কোথায় নেমেছে!

এই রকম একটা ভয় কালাচাঁদকে এখনো

তাড়িয়ে বেড়ায়। তাই ইচ্ছে থাকলেও রোজ সে ও লাইনে হাঁটে না। ওস্তাদের দোকানে গিয়ে বসে। গলায় দু'গেলাস ঢেলে মনটা একটু ফূর্তি মতো হলে পায়ে পায়ে বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ে।

কিন্তু ক'দিন আগে কাজলই তাকে 'নো এন্ট্রি'র নোটিস দিয়েছিল। বলেছিল, 'রাসের ক'টা দিন তুমি আর একেনে এসো না।' এই নিষেধের হেতুটা কালাচাঁদ জানে। কোনো প্রতিবাদ করেনি। এই সময়টিতেই এখানে বাইরের মানুষের ভিড়। সকলেই গোঁসাই-গোবিন্দ নয়। রাসের বিগ্রহ, রাইরাজা আর ময়ূরপঙ্ক্ষীর গান শোনার জন্যেই সকলে এখানে ছুটে আসে না। অন্য ধান্দাও থাকে। রাস মানেই নাকি রস। সেই রসের আবার কত না প্রকার ভেদ। রসিক মানুষ নিষিদ্ধপল্লী খোঁজে। কাজলরা ওভার টাইম চালিয়ে টু পাইস ইনকাম করে। কিছু বাড়তি পয়সার মুখ দেখে। যে-গলিটা সারা বছর দুঃখিনীর মতো প্রায় অন্ধকারে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, পথ চলতি মানুষকে তিনটি টাকার বিনিময়ে ঘরে ডেকে নেয়, রাসের সময় সেখানেই রাজকীয় ব্যাপার। খদ্দের গিজগিজ করে। যেন আর এক রাসের মেলা। এই মরসুমে অনেক নতুন মেয়েও আসে এখানে। রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর থেকে আসে। আসে কলকাতার সোনাগাছি থেকে। টিটাগড়-শ্যামনগর থেকে। গঙ্গা পার হয়ে কালনার বেশ্যারাও এখানে এসে ভিড় করে কটা দিন। লাইনের দালালরাই এই সব নতুন জিনিস আমদানি করে ব্যবসার খাতিরে।

এই সব বেত্তান্ত কাজলের মুখ থেকেই শোনা। একদিন কাজলও এই ভাবে এখানে এসেছিল। এসে এখানেই থেকে গেছে। ব্যবসার অবস্থা খুব রমরমা না হলেও, জায়গাটা বুঝি ভাল লেগেছিল তার। কিন্তু কালাচাঁদের মনে হয়, তার জন্যেই ভগবান এখানে থিতু করেছেন কাজলকে। দু'জনের এই মিলন ঘটানোর জন্যেই। কিন্তু এই মিলনটাও খুব সহজে ঘটেনি। ঘরের দোর বন্ধ করে একটা মেয়েমানুষের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতাটা তার কাছে খুব সুখের ছিল না। কাজলও বোধ হয় মনে মনে খাসা আমোদ লুটেছিল এই রকম এক আনাড়ি খদ্দের পেয়ে। সে-ই কালাচাঁদকে গড়েপিটে মানুষ করেছে।

আজ প্রায় একটি হপ্তা সেই কাজলের মুখ দেখেনি কালাচাঁদ। হাত শুকনো। এতদিন পর শূন্য হাতে কাজলের কাছে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। বিশেষ করে রাসের মতো এত বড় একটা পরবের পর। তার প্রিয় নম্বরটা যদি বিট্রে না করতো, তাহলে তার পকেটখানা দস্তুর মতো ভারী হয়ে থাকতো এখন। সাচ্চা একটা পুরুষ বলে নিজেকে ভাবা যেত। কিন্তু তা হয়নি। মনিবও তাকে ফিরিয়েছে। আজো শুধু শুধু ঘরে ফিরতে হবে। সিনেমা দেখে, একা-একা ঘুরেও আর সময় কাটে না। শেষ ভরসা ওস্তাদের দোকান। বাংলা মাল দু'গেলাস খেয়ে মেজাজটা চাঙ্গা করে। অনেক রাত্তির করে বাড়ি ফেরে। রান্নাঘরে ভাত ঢেকে রেখে বাবা হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে। কখনো বা নলি পাকাতে দেখে। চরকার ভোঁ ভোঁ শব্দের সঙ্গে গুন গুন করে : 'পাগলা নিতাইয়ের বোল, হরিবোল হরিবোল...'। কালাচাঁদ খায় কি খায় না। বাবাকে এড়িয়ে গুটি গুটি বিছানা পেতে শুয়ে পড়ে।

কাজলের কাছে যাওয়াটা আজ যেন খুবই জরুরি ছিল। বাপের সঙ্গে খিটিমিটি, সাট্টায় ফেল মারা, মনিবের মুখ ফেরানো সব মিলিয়ে মনটা যেন স্যাঁওটা দিনের তাঁতের মতো। 'বেসজ্ঞ'। আজ যেন ওস্তাদের জল মেশানো মাল তাকে চাঙ্গা করতে পারবে না।

হঠাৎ হো-হো হাসির শব্দে কালাচাঁদ পাশ ফিরে তাকায়। কিছুটা তফাতে তারই বয়সী দু'টি ছেলে বসে গল্প করছে। আবছা অন্ধকারে ওদের চেনা যায় না। কালাচাঁদ তাকিয়েই থাকে। চেনার জন্যে নয়। ওদের হাসিটাই যেন বড় আকর্ষণ। ওদের মতো প্রাণ খুলে সে যেন কতকাল হাসেনি। এক সময় ওদের হাসি হঠাৎই থেমে যায়। কালাচাঁদ তবুও দৃষ্টি ফেরাতে পারে না।

ওদের কথাবার্তার গুঞ্জন শোনা যায়। কান পাতে কালাচাঁদ। বুঝতে পারে, ছেলে দুটি তার মতো হতভাগা নয়। বেশ বিত্তবান। পরের বাড়ি তাঁত বুনতে বুনতে নিজের খান কয়েক তাঁত করেছে। দ্বিতীয় ছেলেটি কোন এক মহাজনের পুত্র। বাপের কারবার দেখে। প্রথম ছেলেটি এই বন্ধুকেই কাপড়-টাপড় দেয়। কালাচাঁদও তাঁতির ছেলে। দু'চারটে কথা কানে আসতেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলে। তবে ছেলে দু'টিকে চিনতে পারে না। হয়তো সুত্রাগড়ের দিকে কিংবা সা'পাড়ার ছেলে। ওই দুটো জায়গার তাঁতি ছেলেরাই এখন দু'পয়সা করেছে। শুধু তাদের পাড়ার ছেলেরাই উনপাঁজুরের মতো পরের কারখানায় 'তাঁতি' হয়ে থাকল।

আগে-আগে বাবা বলতো, 'কালাচাঁদ, এট্টু মন দিয়ে কাজটাজ কর। ঘরখানায় মিস্ত্রি না লাগাতি পাল্লে সামনের বাদলায় আর টেঁকবে না। ছাতটা জকোম হয়ে গিয়েচে।' কালাচাঁদও জানে সে কথা। প্রতি বর্ষায় ছাদে জল জমে। দেওয়াল বসে যায়। সেই ঠাকুর্দার আমলের ঘর। সুতরাং বাপের এ কথাটা সে ঠেলতে পারে না। রাজি হয়। বলে, 'তুমি সুংসারটা চালাও। খুরাকির টাকা আমি ক'মাস দেবো না। সেটা জমবে। তকুন ঘরে হাত দিয়া যাবে।' যুক্তিটা ভাল। বাবা তাই করে। কিন্তু মাসের পর মাস চলে যায়, কালাচাঁদের হাতে পয়সা জমে না। ভাল ভাল জামা-প্যান্ট-জুতোতেই সব শেষ হয়ে যায়।

আসলে, এ-পাড়ার তাঁতি-ছেলেরা সকলেই ওইরকম। সংসার গোছানোর দিকে মন নেই। বড়মানুষি ক'রে বেড়াবার ধান্দা। তো কালাচাঁদ একা ভাল ছেলে হবে কেমন ক'রে? সে বড়বাজারের মেয়েমানুষ চিনেছে। বাড়িতে খোরাকির বরাদ্দ টাকা দেয় না। বিন্দেও রাজনীতি করে ঘুরে বেড়ায়। বাড়িতে সেও কালাচাঁদ তুল্য। সুনীল-দীপুর বাড়িতেও এমনি অশান্তি। দীপুর মা ছেলের নামে সাতখানা করে লাগায় মানুষজনের কাছে। ফারাক নেই কোথাও। ঘরে-ঘরে শুধু খোরাকির টাকা নিয়ে বাপ-ছেলের কাজিয়া।

ছেলে দু'টিকে এখন কাঁটার মতো মনে হয় কালাচাঁদের। ওদের কথাবর্তায় আর কান দেয় না। নিজের অক্ষমতাটা যেন বড় হয়ে বাজে। পর পর দু'টো বিড়ি শেষ ক'রে উঠে দাঁড়ায়।

মরা মাছের চোখের মতো বিবর্ণ একখানা চাঁদের উঁকি পূব আকাশে। অশ্বত্থ গাছের পাতায় পাতায় হেমন্তের শীত শিশিরের নূপুর বাজাতে শুরু করে। রাণাঘাট থেকে সন্ধের বাস এসে মতিগঞ্জের মোড়ে থামে। কয়েকটা মানুষ নামে, ওঠে। রিকশার ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়। সাধুর দোকান থেকে বাস ছাড়ার বাঁশি বাজে। ট্রাফিক পুলিস দাঁড়িয়ে থাকে পুতুলের মতো। কালাচাঁদও ট্রাফিকের পাশাপাশি। এখন কোথায় যাবে এক মুহূর্ত ভাবে। কাজলের এত কাছে এসেও ফিরে যাওয়ার ব্যথাটা বুক খাবলায়।

'সুশ্রী'তে একখানা চটকদারি হিন্দি বই হচ্ছে। রাসের বাজারে ওইরকম ছবিই চলে। ও-সব ছবি দেখে আজকাল আর মন ভরে না। সেই একই গৎ: নায়ক-নায়িকা সুন্দর বনভূমিতে ঘুরে বেড়ায়। উটকো কোন মানুষের উঁকি-ঝুঁকি থাকে না। সেখানেও বোধ হয় 'নো এন্ট্রি' লেখা থাকে তৃতীয় ব্যক্তির জন্যে। সে বড় আজব দুনিয়া। নায়িকার মুখের গান কেড়ে নিয়ে দিব্যি গেয়ে যায় নায়ক। কত সহজেই জমে ওঠে প্রেম। সেখানে টাকা-পয়সার প্রশ্ন থাকে না। বাপ-ছেলের কথা কাটাকাটি থাকে না। বড় তাজ্জব ব্যাপার। আর কালাচাঁদ মাত্র দু' টাকার বাদশা। কিছুতেই কাজলের কাছে যাওয়ার সাহস খুঁজে পায় না। এখন সে কেবল ওস্তাদের দোকানেই গিয়ে বসতে পারে।

এই ক্ষমতাটুকুকে নিয়তি জ্ঞান করে সে ডাকঘরের দিকে পা চালায়। কার্তিক দাস রোড ধরে সোজা চলে যাবে নতুন হাটে। ওস্তাদের দোকানে।

পেতলের দুর্গামন্দিরের পাশে ছোট্ট মাঠের মধ্যে কারা যেন উনুন জ্বেলেছে। রাসযাত্রী নিশ্চয়। এই শীতের মধ্যে ফাঁকা মাঠেই হয়তো ওরা রাত কাটিয়ে দেবে। কিসের টানে এরা এখানে এমন কষ্ট স্বীকার করতে আসে কালাচাঁদ ভেবে পায় না। এখানকার রাসেরই-বা এত কী দেখার আছে? তো রাস তো মিটেছে, এবার মানে-মানে সরে পড় তুমরা। তুমাদের ধকল আর সহ্য হয় না।

আগে নাকি এক মাস রাসের মেলা চলতো। বাপের মুখে সে গল্প শুনেছে ছোটবেলায়। ফি বছর রাসে বাবা তখন তাকে 'সড়াঢোল' কিনে দিত মনে আছে। এখন দুর্গাপুজো বলো, রাস বলো কিছুতেই আর মন টানে না কালাচাঁদের। ফালতু।

এখনো লাইট এল না। আসবে কিনা তারও কোন ঠিকঠাক নেই। উৎসবের ক'টা দিন অনেক কেরামতি দেখিয়ে এখন বেপাত্তা। পর-পর কয়েকখানা লরির হেড লাইটে রাস্তাটা আলোকিত হয়। আলোর তীব্রতায় কালাচাঁদের চোখ ধাঁধায়। নাস্তানাবুদ অবস্থায় একটা অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে।

অনেক ছলাকলা দেখিয়ে গলিটা একটা বড়

রাস্তায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। অন্ধকারেও রাস্তাটা চিনতে পারে কালাচাঁদ। আর চিনতে পেরেই তার যেন চটক ভাঙে। সামনেই সিদ্ধেশ্বরীতলা। আর ক'পা এগুলেই সেই চেনা পথ। চওড়া সড়কের ধারে মেহগিনি ঘোড়া-নিমের ছায়া ছুঁয়ে অলৌকিক টানে ছিটকে গেছে একটা গলি। তাবৎ মানব সমাজ থুতু ছিটোয় যাদের নামে, ওই গলিতেই তাদের ওঠাবসা। বাঁচা-মরা। সামনেই মজা খাল। একরত্তি জল নেই। সেখানে চাষ-আবাদের বিপুল আয়োজন। কালাচাঁদ খালের ধার থেকে আবার খালের কাছাকাছি। বাঁশ বনে ডোম কানার মতো সে।

সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের সামনে অনেকক্ষণ দোনোমোনো করে দাঁড়িয়ে রইল। মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। পৌরুষের ইজ্জত রক্ষার চিন্তা। সে যে ওস্তাদের কাছেই যেতে চায় এখন। কিন্তু...

ঢালু পথে জল গড়িয়ে যাওয়ার মতো কালাচাঁদ মনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। মা সিদ্ধেশ্বরী যেন অসীম এক সাহসের বীজ বপন করেন তার মনে। নিমেষে সব বাধা উধাও। শূন্য পকেটের লজ্জা বেপাত্তা। হঠাৎই পৌরুষের অন্য এক ব্যাখ্যা। পায়ে-পায়ে এখন সেই চেনা পথে হাঁটে সে।

ঘোড়া-নিম গাছের তলে মধুর চায়ের দোকানে মশালের আদলে একটা ল্যাম্প জ্বলছে। কয়েকজন বসে গ্যাঁজাচ্ছে। রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকটি মেয়ে। অন্ধকারে তাদের মুখের সিগারেটের আগুন জ্বলছে-নিবছে। কারুর হাতের ট্র্যানজিস্টারে চটুল হিন্দি গান। এদিকের সব মেয়েরাই কালাচাঁদকে চেনে। সে ওদের কাছাকাছি হতেই কে একজন গেয়ে ওঠে

'আমরা নারী সারি-সারি জল আনিতে যাই/
পথের 'পরে দাঁড়িয়ে কালা লাজে মরে যাই/
হায় হায় লাজে মরে যাই ...'

সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো মেয়ে-কণ্ঠের হাসি আছড়ে পড়ে। টাটে বসে মধুও মুখ তুলে তাকায়। তখনি একখানা লরির আলোয় কালাচাঁদকে শনাক্ত করে সে। গলা উঁচিয়ে ডাকে, 'অ্যাই কালা! এদিকে শুনে যা ভেড়ের ভেড়ে।'

ততক্ষণে কালাচাঁদকে দু'টো মেয়ে পাকড়েছে। পান খাওয়াতে হবে পয়সা চাই।

কালাচাঁদ পকেট হাতড়ে একটা আধুলি বের করে ওদের হাতে গুঁজে দেয়। তারপর হাত তুলে মধুর উদ্দেশে বলে, 'মদু! ফিরার সুমায় দ্যাকা হব্যে।'

পা বাড়াতেই আবার বাধা। মঞ্জু এসে দাঁড়ায় সামনে। বলে, 'আমরা ভাবচি, তুমি বুজি রাসের ম্যালায় হাইরিই গেলে!'

'ক্যানো হারাবো? অ্যাই তো খাসা "মোরপঙ্খীর" গান শুনলাম।'— কালাচাঁদও রসিকতা করে: 'কিন্তু কলিযুগের নারীদের লজ্জা কুতায়? দিব্যি কালার মুকোমুকি দাঁইড়ে বাতচিত চালাচ্চে।'

মঞ্জু হেসে গড়িয়ে পড়ে। কালাচাঁদও হাসে। এদের হাসাহাসি দেখে আবার একটা রমণী-ব্যূহ তৈরি হয়। কালাচাঁদ বলে, 'রাস্তায় দাঁইড়ে রঙ্গ করার বিপদ আচে। আমি চোললাম।'

'কুতায় যাচ্চো?'—মঞ্জু বলে, 'কাজলির ঘরে লোক আচে।'

লোক আছে? কালাচাঁদ থমকে দাঁড়ায়। এক মুহূর্তের জন্যে মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায়। ঘরে লোক নেওয়াই কাজলের ব্যবসা। এতেই ওর রুজি-রোজগার। রাসের মেলায় এ ক'দিনে চেনা-অচেনা কত মানুষকেই তো ঘরে নিয়েছে। প্রতিদিনই সন্ধের পর খদ্দের ধরার জন্যে তাকে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়। একদিন এইভাবেই সে কালাচাঁদকেও ঘরে নিয়েছিল। এ নিয়ে দুঃখু খেদের কোন মানে হয় না। কাজলেরও পেট আছে। ভবিষ্যৎ আছে।

খুব সহজেই মনের বিষণ্ণতাকে ঝেড়ে ফেলে কালাচাঁদ। এমন কতদিনই তো হয়েছে, কাজলের ঘরের সামনে গিয়ে দেখে, ভেতর থেকে দোর বন্ধ। বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারপর খদ্দের বিদেয় করে এক অনাবিল হাসি ছড়িয়ে কাজল এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। পরম যত্নে ঘরে ডেকেছে কালাচাঁদকে। আজো তেমনিভাবেই তাকে ডাকবে কাজল।

এই শহরের চেহারার মতোই গলিখানাও এখন শুনশান। যেন এই মাত্তর পুলিসের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে এমনি থমথমে চালচিত্তির। কালাচাঁদ দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়ে উঠোনে। তিন দিকে খান ছয়েক ছোট ছোট ঘর। সব ঘরই অন্ধকার। শুধু কাজলের ঘর থেকেই বিবর্ণ একটু আলোর উঁকি। উঠোনের মধ্যিখানে ডাবগাছের গোড়া ঘেঁষে চুপচাপ অহল্যার প্রতীক্ষা কালাচাঁদের।

পুবদিকে বড় বড় ক'টা অশ্বত্থ আর মেহগিনি গাছের আড়ালে চতুর্থীর চাঁদ এখন কিশোরীর মুখ। পাশের পুকুরে সেই মুখের লুকোচুরি। চারিদিকে আলোছায়ার খণ্ড-খণ্ড ছবি। কাজলের এই উঠোনে কে যেন এঁকে থুয়েছে লক্ষ্মীপুজোর আলপনা। চাঁদের আলোর মতোই কালাচাঁদের মনে এক ধরনের প্রসন্নতার জেল্লা ঝিলিক মারে।

প্রায় একটা হপ্তা পরে কালাচাঁদকে দেখে কাজল নিশ্চয় প্রথমে আশ্চর্য হবে। অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে নেবে কি? সেই যেমন বিশ্বকর্মা পুজোয় হয়েছিল। দু'জনে পায়রাডাঙা থেকে সিনেমা দেখে ফিরছে, সন্ধের ট্রেন। একটা ফাঁকা কামরা দেখেই উঠেছে। কিন্তু রাণাঘাটে আসতেই সে-কামরা আর ফাঁকা থাকে না। সেই ভীড়ের মধ্যে কালাচাঁদ তাদের পাড়ার নিতাই মুকোকে দেখেই কঞ্চির মতো খাড়া। কাজলের সান্নিধ্য ছেড়ে একেবারে দরজার কাছে। কালীনারায়ণপুর গাড়ি থামতেই সে কামরা বদল করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

শান্তিপুর ইস্টিশানেও কালাচাঁদ গাড়ি থেকে নামলো সকলের শেষে। নেমে কাজলকে আর খুঁজে পায় না। অনেক ছুটোছুটির পর কাজলকে যখন খুঁজে পেল, তখন সে যেন একটা আগুনের ফুলকি। কালাচাঁদ যতই বোঝাতে চেষ্টা করে: বিশ্বাস কর, একটা চেনা লোক উঠেছিল গাড়িতে, কাজল ততই যেন দাউ দাউ জ্বলে ওঠে। বলে, 'বেশ্যা মেয়ের সঙ্গে ঘুরতে যোদি অ্যাতুই ঘেন্না, তবে মেশো ক্যানো আমার সঙ্গে! চোলে যাও সামনে থেকে। বেইমান!'

কাজল আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায়নি। কালাচাঁদের তোয়াক্কা না করে একাই রিকশো করে চলে গিয়েছিল তার ডেরায়। কিন্তু ব্যাপারটাকে সহজ করতে কালাচাঁদকে কম হিমসিম খেতে হয়নি। আজো হয়তো তেমনি করেই কাজল বলবে, 'বেইমান।' বলবে, 'তুমরা শুদু নিজের দিকটাই বোঝো। আমার কতাটা ভাবো না এট্টু।'

একটা কাচভাঙা হাসির আওয়াজ কালাচাঁদকে সচেতন করে। ঘরের মধ্যে কাজল হাসছে। আজ কি ভাল খদ্দের ধরেছে? রাস দেখতে আসা কোন বহিরাগত? মঞ্জু-টঞ্জুরা তো রাস্তায় মাছি তাড়াচ্ছে। মুহূর্তে কালাচাঁদের মনে চিন্তার হিজিবিজি। এবং তখনি দ্বিতীয়বার সেই মন-পাগল-করা হাসি শোনে সে।

কতদিন কথায়-কথায় কাজলকে জিজ্ঞেস করেছে: 'আচ্ছা, তুমি তো কতো পুরুষের সঙ্গেই মেলামেশা করো। তাদের কাউকে-কাউকে তুমার ভালো লাগে না?'

কাজল হেসেছে। বলেছে, 'তাদের সঙ্গে কি আমার ভালো লাগার সনমোন্দ?'

'আমার সঙ্গেও তো তুমার ভালো লাগার সনমোন্দ ছিলো না।'

'না, ছিলো না।'

'তবে?'

'সে তুমি বুজবা না।'—কাজল বলেছিল, 'সকোলিই একেনে আসে অ্যাট্টা উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য মিটিয়ে চোলে যায়। এর মোদ্যি আবার ভালো লাগার কী আচে?'

সোজা কথার খুব সোজা উত্তর কাজলের। কিন্তু এখন ওই হাসির মধ্যে সেই সোজা বস্তুটাই খুঁজে পায় না কালাচাঁদ। খদ্দেরের সঙ্গে এত হাসাহাসির কী আছে? ওদের কাছে খদ্দের তো লক্ষ্মীতুল্য। সেই লক্ষ্মীকে নিয়ে এমন মস্করা? এটাও তো এক ধরনের অসভ্যতা।

কয়েক মুহূর্ত হাসির রহস্য খোঁজে কালাচাঁদ। তারপর হঠাৎই রাখাল নস্করকে মনে পড়ে। রাখালবাবুর সঙ্গেই কি এখন ফষ্টিনষ্টি করছে কাজল? মনটা অভিমানে ভারী হয়ে ওঠে। না, কালাচাঁদের কথা ভাববার ফুরসুৎ নেই কাজলের। এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা অর্থহীন। ফেরার জন্যই মনে-মনে নিজেকে তৈরি করে ফেলে। কিন্তু ...

রাখাল নস্করের সঙ্গে কাজলের পিরিতটা একবার স্বচক্ষে দেখা দরকার। কথাটা মনে আসতেই এক দুর্বার ইচ্ছে কালাচাঁদকে নিমেষে পাগল করে তোলে। কিন্তু ঘরের ভিতরের দৃশ্য সে এখান থেকে দেখবে কেমন করে?

কাজলের ঘরের উত্তরদিকের জানালার একখানা কপাট ভাঙা। শীতের সময় হু-হু করে হাওয়া আসে। তখন একখানা চটের পর্দা ঝোলে। ঘরের পেছনে পাতলা জঙ্গল। ওখান থেকে জানালায় উঁকি দেওয়া কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। কালাচাঁদ এই হীন কৌশলটিকেই রহস্য উদঘাটনের শ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করল। কোনরকম চিন্তার অবকাশ না রেখে চোরের মতো পা টিপে টিপে সেই জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল

সে।

অনেকক্ষণ ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকে কালাচাঁদ। লজ্জা আর ভয় তাকে আড়ষ্ট করে দেয়। উঁকিই দেওয়া হয় না। যদি রাখালবাবু কিংবা কাজল তাকে দেখে ফেলে!

'নাও নাও, কাজ সারো। বোকুনি ভাল্লাগে না।'—কাজলের গলা।

'দু'টো কতা বলার জন্যেই তো একেনে আসা।'

জানালার এদিকে দাঁড়িয়ে কালাচাঁদ চমকে ওঠে। কোথায় রাখাল নস্কর? সে যেন ভেড়ুয়ার মতো থ। কালকাসুন্দার ঝোপে ঢিল মেরে কে যেন তছনছ করে দেয় ফুলের বিন্যাস। সেই যেন সুরেলা কণ্ঠস্বর। যে-কণ্ঠে জ্ঞানদাস আর চণ্ডীদাসের পদ গুনগুন করে। একা একা অনেক রাত্তির অবধি পোড়েন নলি পাকাতে পাকাতে যে-কণ্ঠ চরকার সুরে গেয়ে চলে: 'গৌরাঙ্গ বলিতে হয় পুলক শরীল ...।' কালাচাঁদ আর একদণ্ড থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তার মনের হাজারখানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ঘাড় উঁচিয়ে উঁকি দেয় জানালায়।

একটা সায়া আর ব্লাউজের সম্বল নিয়ে কাজল বসে আছে চৌকিতে। আর তারই পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে আছে গগন প্রামাণিক। নির্বিকার একটি কুপির আলোয় নিজের জন্মদাতাকে চিনতে এতটুকু ভুল হয় না কালাচাঁদের। দাহ করা কুশপুত্তলিকার মতো নিমেষে ছাই হয়ে যায় সে।

কাজল মুখিয়ে ওঠে: 'গপ্পো কোত্তে গেলে কিন্তু বেশী টাকা লাগবে, হুঁ!'

সমর্থনসূচক একটা হে-হে শব্দ ওঠে গগন প্রামাণিকের কণ্ঠে। হাসে। বলে, 'দোবো। দুটো টাকা বেশীই দোবো।'

'দুটো টাকা?'—কাজল যেন ছিলে-ছেঁড়া ধনুক: 'মাত্তোর!'

'ওর বেশী আর কুতায় পাবো?'

'তবে গপ্পো মারাতে এয়েচো ক্যানো একেনে?'

গগন প্রামাণিক বিষণ্ণ হাসে। বলে, 'আমার ঘরে বৌ নেই গো। বুড়ো হইচি। কুনু মেয়েমানুষ তো আমার পানে ত্যাকাবে না, গপ্পোও কোরবে না। তাই ...'

কাজল মুখে চুকচুক শব্দ তোলে: 'বড্ডো দুঃখের কতা গো!'

এই নির্দয় পরিহাস কানে তোলে না গগন প্রামাণিক। সে দুঃখের দোর হাট করে বলে যায়, 'কিন্তু মনডা অ্যাকুনো মেয়েমানুষ দেকলে হাঁকুপাঁকু করে গো। তুমাদের শরীলটায় বিধাতা কী যাদু দিয়েচেন জানি নে। নয়োন ভরে দেকেও খেদ্ মেটে না। ন' বচোর মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করেও রহস্যের তল পেলাম না।'

'আমার কাচে সেই তল খুঁজতি এয়েচো?'—কাজল মুখে হাত দু'খানা চাপিয়ে খিল খিল হেসে ওঠে। তার সারা শরীরে সে হাসির ঢেউ ভাঙে অনেকক্ষণ।

কালাচাঁদ জানালা থেকে সরে আসে। তাঁতের খিলি খুলে গেলে মাকু ছুটে গিয়ে যেমন কাপড় ফেড়ে দেয়, তেমনিভাবে তার বুকটা ফেড়ে দিয়েছে একটা বেয়াড়া মাকু। মনের মধ্যে এখন সেই আঘাতের যন্ত্রণা। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিটুকুও বুঝি খুঁজে পায় না সে।

বাপের প্রতি তার ঘেন্না অনেককালের। সেই কাজ করে পয়সা কামাবার পর থেকেই টের পেতে শুরু করে, গগন প্রামাণিক কত বড় বেইমান। সেদিন থেকেই বাপ যেন আর বাপের মতো থাকেনি। বাপের স্বভাব-চরিত্রও তার পছন্দ মাফিক ছিল না। কাজলের কাছে আসা-যাওয়ার ব্যাপারে তার মনে যেমন এক পাপবোধ ছিল, তেমনি সাহস কুড়িয়েছে এই ভেবে যে, গগন প্রামাণিকের মতো ভণ্ড ও হীন চরিত্রের রক্ত আছে তার দেহে। সে কোনদিন মহাপুরুষ হবে না। তাই যখন শোনে, লোকের কাছে তার বাপ নিন্দে-বান্দা করে বেড়াচ্ছে, তখন তার রাগ হয় বটে, কিন্তু দুঃখু হয় না। বরং ব্যাপারখানা ভেবে হাসি পায়। পৈতে পুড়িয়ে ভগবান!

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সেই বাপের প্রতিই কোথায় যেন একটু শ্রদ্ধাও লুকিয়ে ছিল। তা না হলে তার বুকে এখন এ যন্ত্রণা কেন? কেন সে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার শক্তি হারাচ্ছে?

ঘরের মধ্যে টুকরো টাকরা কথা। কথার তীক্ষ্ণ কণাগুলো নির্মমভাবে কানে এসে বিঁধে যায়। কালাচাঁদ তার কিছু শোনে, কিছু-বা শোনে না। পাতলা জঙ্গলের আশ্রয়ে একটি প্রাণহীন বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। এখান থেকে কেমন করে সে ঘরে ফিরবে জানে না। কারুর সাহায্য ছাড়া তার বুঝি এক পাও চলার ক্ষমতা নেই। কেউ কি তার হাতখানা ধরে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে এখানে? কিন্তু কোথায় যাবে সে? কাজলের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার আর ইচ্ছে নেই। গগন প্রামাণিকের মুখোমুখি হতেও নতুন এক ঘেন্না। এত বড় এক বিশ্বে তার মতো হতভাগার পা রেখে দাঁড়াবার জায়গা নেই।

এই মুহূর্তে কালাচাঁদের বুকে কান্নার ঝড়। অনেককাল পরে আজ বড্ড করে মাকে মনে পড়ে তার। ধূসর স্মৃতির মধ্যে থেকে সেই মুখখানা ঠিক-ঠিক উদ্ধার করা যায় না। 'মা' বলে একটা চাপা আর্তনাদ করে ঘরের জীর্ণ দেওয়ালে মাথা রাখে সে।

ঘরের ভেতর গগন প্রামাণিকেরও যেন কান্নার মতোই কণ্ঠস্বর। সে বলে, 'আমার এ-বুকখানায় বড্ডো ব্যাতা। রাতদিন প্রভুকে ডাকি, তিনি এ হতভাগার ডাক শোনেন না। বাসনার আগুনে আমাকে দোগ্ধে মাচ্চেন। ঠাকুর হরিদাস লক্ষহীরাকে মা বোলে ডেকিছিলেন। কৈ, আমি তো পারি নে?'

কাজল আবার খানিক হাসে। বলে, 'বুড়ো, তুমি খাসা রোসিক মানুষ আচো। কিন্তু টাকা বের করো। তবে তুমার রসের কতা শুনবো।'

'দোবো। তুমাকে আরো পাঁচটা টাকাই দোবো। তুমি খুশী তো?'

'পাঁচ টাকা?'—কাজলের কণ্ঠ আদরে তরল হয়: 'না, দশ টাকা!'

'থালে আমি জানে মোরে যাবো!'— গগন প্রামাণিক বুঝি কাজলের পা দু'খানা জড়িয়ে ধরতে পারে। বলে, 'কাল আমি হাঁড়ি চড়াতে পারবো না, বিশ্বেস করো।'

প্রত্যুত্তরে কাজল খুব মজার হাসি হেসে ওঠে। গগন বলে, 'নিজের কতা ভাবি নে। কিন্তু ছেলেডা ...'

কাজল কণ্ঠে এক তাচ্ছিল্যের শব্দ তুলে বলে, 'একেনে এসে ছেলে-ছেলে কোরো না তো। ও সব শুনতে আমার ভাল্লাগে না!'

অনেকক্ষণ যেন গগন প্রামাণিকের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। কাজলও নীরব। তবে কি...

খুব পরিচিত ও অভ্যস্ত এক শব্দ শোনার জন্যে কালাচাঁদ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। দু'পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে জানালায় উঁকি দেয়। কুপির কৃপণ আলোয় দেখে গগন প্রামাণিক তেমনি হাঁটু মুড়ে বসে আছে। চৌকির ওপর বসে কাজল যেন বিস্ময়ে থ। গগন প্রামাণিক কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছছে।

অনেকক্ষণ এইভাবে। জাতীয় সড়কে লরি ছুটে যাওয়ার ব্যস্ততা। খালপারে নতুন গজিয়ে ওঠা মানুষের বসতিতে জোনাকির মতো আলো জ্বলে। মাটি কামড়েছে অঘ্রাণের শীত। পৃথিবীখানা ঠিকঠাক আগের মতোই। শুধু কাজলের ঘরের পেছনটাই অন্যরকম। এলোমেলো।

গগন প্রামাণিক বলে ওঠে: 'জানো, এই টাকার জন্যিই আজ ছেলেডার সঙ্গে হুজ্জুতি কোরিচি আমি। মুকে যা এয়েচে তাই বোলিচি। কিন্তু ছেলে আমার ত্যামুন কোরে ঝগড়াই কোল্লো না। শুদু আমিই ...'

কাজল বলে, 'থালে ছেলে তুমার খুবই ভালো বোলতে হবে।'

'হ্যাঁ, ভালো।'—গগন প্রামাণিক বলে, 'কিন্তু আমার দুঃখু কি জানো? ছেলে আমার সঙ্গে কতা বলে না। বাবা বোলে ডাকে না।'

'তাই?'

'হ্যাঁ।'

শরীর মুচড়ে নিঃশ্বাস ফেলে গগন। বলে, 'কতোদিন ভেবিচি, ওরে কাচে ডেকে দুটো কতা বোলবো। সেই ছোটোব্যালার মতো আদোর কোরবো। পারি নে। শুদু ওর ওপর রাগ বেড়ে যায়।'

এই মুহূর্তে কালাচাঁদ নিজের শ্রবণ শক্তির ওপর আস্থা হারায়। অবিশ্বাস জাগে চোখ দু'টোর ওপর। ঘরের মধ্যে সত্যিই সেই গগন প্রামাণিকই বসে আছে তো?

'সেই অ্যাতোটুকু বয়েসে বাছা মাকে হাইরেচে। মা ক্যামুন জিনিস জানলো না। পিথিবিতে ও বড্ডো অ্যাকা। ওর মতো দুঃখী আর কেউ নেই।'—গগন প্রামাণিক এবার সত্যিই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

কালাচাঁদের চোখ দু'টোও কখন যেন ঝাপসা হয়ে যায়। একটু আগে তার বুকে কান্নার ঝড় উঠেছিল। এবার বর্ষণ শুরু। ...

চোখ মুছে তাকাতেই দেখে, লোডশেডিং-এর অন্ধকার ঘুচে শহরখানা আলোয় হাসছে। দূরে শ্যামচাঁদের মন্দিরে মন্দিরার বাদ্যি বেজে চলেছে। এবার সে বাড়ি ফিরতে পারবে।

অঙ্কন : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

কুলু দেশের কাহিনী

নন্দিতা মুখোপাধ্যায়

নগাধিরাজ হিমালয়ের কোলে পিঠে ছড়িয়ে আছে কত মন-ভোলানো চোখ-জুড়ানো জায়গা, তারই একটি ছোট্ট সুন্দর উপত্যকা কুলু বা কুল্লু।

ছোট্ট শহর কুলু আয়তনে ছোট হলেও সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে এর পর্বতে-কন্দরে, দেবদারু ও পাইনে ঘেরা সবুজ ঘন জঙ্গলে, সতলুজ, বিয়াস, সৈঞ্জ, তীর্থন, পার্বতী, সরোবরী চন্দ্রা, ভাগা, পাহাড়ী নদীগুলির মধুর-সঙ্গীতে। এর প্রশান্ত রহস্যময় বাতাবরণে যার খোঁজে সেই প্রাচীনকাল থেকে ঋষি-মুনি, দেবতা-গন্ধর্ব, কিন্নর-কিরাত, মানব-দানব, নাগ-নারায়ণ এবং মহাপুরুষেরা যুগে যুগে এখানে এসেছেন।

পঞ্জাবের কাছাকাছি যতগুলি পাহাড়ী অঞ্চল আছে তাদের মধ্যে থেকে সব চাইতে পুরনো এই কুলু অঞ্চল।

প্রাচীনকালে কুলুর নাম ছিল কুলুত। এখানে কোল জাতীয় আদিবাসীদের বাস ছিল। যাদের রাজা ছিল শম্বর। এদের থেকেই এই স্থানের নাম হয় কুলুত।

চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এই জায়গা কুলুত নামে খ্যত ছিল, পরে কাশ্মীররাজ জৈনুল আবেদিনের আক্রমণে এই রাজ্যটি তছনছ হয়ে যায়। এবং রাজ্যের সীমানার সঙ্গে সঙ্গে তার এই নামটিও ছোট হতে হতে আজকের এই কুলু নামে এসে পৌঁছয়।

কালের গতি কুলুতেও অনেক পরিবর্তন এনেছে। পাহাড় ফাটিয়ে, বন-জঙ্গল কেটে যাতায়াতের রাস্তা তৈরি হয়েছে। একদা যে জায়গা শুধু ঘন বনে ঘেরা মুনি-ঋষি, অসুর ও দেব-দানবের বাসস্থান ছিল এখন সেখানে গড়ে উঠেছে জনবসতি। এখানকার লোকেরাও অনেক আধুনিক হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু এটা শুধু এর বাইরের দিকের পরিবর্তন। ভেতরে ভেতরে এখানে এখনও চলে আসছে সেই পুরনো যুগের বিচার-বিশ্বাস ও পরম্পরা। কাল তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

আজও লোকে এই দেশকে ঠারা কড়ু বা আঠারো কড়রুর দেশ বলে মানে। কেমন করে এলো এই নাম?—প্রচলিত কাহিনী একবার মহর্ষি জমদগ্নি কৈলাস যাত্রা ও পরিক্রমা সেরে স্পিতি উপত্যকার রাস্তা ধরে কুলুর দিকে আসছিলেন, তাঁর সঙ্গে একটি ঝুড়িতে ছিল আঠারোটি দেবতার প্রতিমা। পথে চন্দ্রখনি পর্বতে এসে পৌঁছবার পর হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে বাতাস বইতে থাকে। এবং সেই বাতাসে ঝুড়ির প্রতিমাগুলি উড়ে গিয়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

যেখানে যেখানে তাঁরা পড়ে সেই সেই জায়গার দেবতারূপে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হন। তখন প্রতিটি দেবতার জন্যে আলাদা করে একটি ঝুড়ি

শীত কাটাবার জন্য রোহতাং পেরিয়ে কুলু উপত্যকায় নেমে আসছে ভেড়ার পাল

চন্দ্রা সরোবর। চন্দ্রা নদীর উৎস

নির্দিষ্ট হয়। কুলুই ভাষায় ঝুড়িকে বলে করডু বা করণ্ডী।

এইভাবে পবিত্র হিমালয়ের কোলে এই কুলুতেই সর্বপ্রথম সাকার মূর্তির স্থাপনা হয়। এবং তখন থেকেই মূর্তিপূজার প্রচলন হয়।

কুলুতে দেবী-দেবতাদের আনাগোনা ছিল বলে একে 'ভ্যালি অফ্ দি গড্‌স' বা দেবভূমিও বলা হয়ে থাকে। ধৌলাধার ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী দিয়ে ঘেরা এই কুলু-ভ্যালি এককালে সত্যিই দেবতাদের বাসস্থান ছিল। এর স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেব-মন্দিরগুলি তারই পরিচয় দেয়।

কুলুর এক পাশে শ্রীত্রিলোকনাথের মন্দির। অপর পাশে ভগবান পরশুরামের মন্দির—মাঝখানে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় স্থিত বিজলী মহাদেব ও শ্রীখণ্ড মহাদেবের মন্দির যেন সমস্ত উপত্যকাটির উপর নজর রেখে আছেন।

আজকে যে পাহাড়ী নদীটি কুলুর মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে তার নাম আমরা জানি বিয়াস বা বিপাশা বলে। পূর্বে এই বিয়াসের নাম ছিল আর্জীকিরা, যার কূলে ভৃগুবংশীয়েরা বসবাস করতেন। এই ভৃগুবংশের এক মহান তপস্বী ঋষি ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি এই স্থানে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার প্রচলন করেন।

কুলুর যে পাহাড়ে এখন ব্যাস-ঋষির আশ্রম দেখা যায় সেই পাহাড়ের নাম ছিল ভৃগুতুঙ্গ। যার আজ নাম হয়েছে রোহতাং (Rohtang)। এই ভৃগুতুঙ্গ থেকেই বেরিয়েছিল নদী আর্জীকিয়া।

ভৃগুতুঙ্গে ভৃগুতীর্থ বলে একটি জায়গায়

পাণ্ডুরোপে। পাণ্ডবেরা এই স্থানে চাষ করেছিলেন

জলের একটি ছোট ঝিল রয়েছে। প্রতিবছর লোকেরা এখানে এসে স্নানার্চনা করে ও ভৃগু-সরোবর পরিক্রমা করে নিজেদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবার আশায়।

জমদগ্নি পুত্র বিষ্ণুর অবতার শ্রীপরশুরামের মন্দির কুলুতে সতলুজ নদীর তীরে আউটর সিরাজের নিরমন্ড নামক স্থানে রয়েছে।

ক্ষত্রিয় দমন ও দুষ্টদের শাসন করার পর পরশুরাম হিমালয়ের দিকে যাত্রা করেন ও এই নিরমন্ড নামক স্থানে এসে তপস্যা করেন।

পিতার আজ্ঞায় পরশুরাম নিজের মায়ের শিরশ্ছেদ করেছিলেন এবং এই স্থানে মায়ের নির্মুণ্ড শব নিয়ে আসেন। পরে পিতার কাছে প্রার্থনা করে মাকে আবার জীবিত করেন। নির্মুণ্ড

কুলু ছাড়িয়ে একটু উপরে দেখা মেলে সমতলের গরু এবং তিব্বতী চমরী গাইয়ের সঙ্কর এই জন্তুর। এর নাম 'চুরু'

থেকে এই জায়গার নাম হয়েছে নিরমণ্ড বা নিমণ্ড্।

প্রতি বারো বছর অন্তর এখানে পুরানো রীতি অনুযায়ী নরবলি হয়। এখানে একটি গুহা আছে যেখানে বসে পরশুরাম তপস্যা করেছিলেন বলা হয়। তাঁর সেই সময়কার ব্যবহৃত কিছু কিছু জিনিস এখানো সেখানে রাখা রয়েছে। যার মধ্যে একটি আংটি আছে যার পরিধি বা ঘের দুই ইঞ্চি মাপের, একটি বিরাট আকারের গমের দানাও রাখা আছে।

বারো বছর অন্তর এই গুহা খুলে জিনিসগুলি বাইরে আনা হয়। এই গুহায় প্রবেশাধিকার একমাত্র সেই বংশের লোকেদের যাদের উপর সেই প্রাচীনকাল থেকে এই গুহা সংরক্ষণের ভার দেওয়া রয়েছে।

গুহার ভেতর প্রবেশ করার সময় যে প্রবেশ করবে সে চোখে কাপড় বেঁধে, লেঙ্গোটি পরে ভিতরে ঢোকে ও হাতের কাছে যা পায় তাই তুলে বাইরে আনে।

নিরমণ্ডে দুটি কুণ্ড আছে একটি পরশুরামের মন্দিরে অপরটি তাঁর মাতা রেণুকার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত অম্বিকা মন্দিরে।

এই দুটি কুণ্ডে ছাগ বলি দেওয়া হয়। অম্বিকা মন্দিরের কুণ্ডটি ছয় মাস আগে খোলা হয়। তখন সেখানে প্রতিদিন একটি করে ছাগ বলি হয়। এই কুণ্ডটি খোলার পর গ্রামের মাঝে একটি শুকনো ঝরনা আছে সেইটিতে ধীরে ধীরে জল আসতে আরম্ভ করে—পূজার কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটি সম্পূর্ণ ঝরনা-ধারায় পরিণত হয়। পূজা শেষে এর জল কলসিতে ভরে পরশুরামের গুহায় রেখে দেওয়া হয়।

দ্বাপর যুগের এক মহান তপস্বী ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ। বাল-ব্রহ্মচারী, উজ্জ্বল তেজসম্পন্ন এই মহান তপস্বী কুলুতের অধিবাসী ছিলেন। ইনি রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পৌরোহিত্য করেন যার ফলে জন্ম নেন শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ণ।

কুলুর বাজার নামক এক স্থান থেকে আরো আট মাইল উপরে স্কীর্ণ-টিলা নামে একটি জায়গা আছে যেখানে এই মহান তপস্বীর বসবাস ছিল। বাজারের একটু দূরে ঋষিশৃঙ্গের একটি আটমহলা মন্দির রয়েছে।

ত্রেতা যুগ অর্থাৎ মহাভারতের যুগের এক বিশেষ পাত্র বেদব্যাসের জন্মস্থানও এই কুলু। কুলুর কঁমাদ নামক গ্রামের একটু দূরে দরপোঙ্গন নামে একটি গ্রাম ও মন্দির রয়েছে যেখানে আগে বেদব্যাসের পিতা পরাশরের আশ্রম ছিলো। ঋষি পরাশরের পুত্র কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নামে এই গ্রামটির নাম দরপোঙ্গন হয়েছিল অনুমান করা হয়। কঁমাদের থেকে একটু উপরে ঋষি পরাশরের আশ্রম ও কুলুর ঢালপুর নামক জায়গার সামনে অবস্থিত উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় দরপোঙ্গন আশ্রম। এই জায়গার অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মনে হয় এটি ঋষি-মুনির আশ্রমের উপযুক্ত স্থান ছিল।

কুলুর ঢালপুর জায়গাটি এখন দোকান-বাজার, বাসের আড্ডা ও মানুষ-জনের কোলাহলে ভরা। আগে এখানে ছিল তপোবনের নিবিড় শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ, ঢালপুরের যেখানে এখন দুটি বড় বড় ময়দান রয়েছে আগে সেখান দিয়ে বয়ে যেতো বিয়াস নদীর জল।

মহর্ষি ব্যাস যেখানে বসে তপস্যা করেছিলেন সেই ভৃগুতুঙ্গকে ব্যাসঋষিও বলা হয়ে থাকে। আর যে নদীর এককালে নাম ছিল আর্জীকিয়া পরে মহামুনি বশিষ্ঠের শাপমুক্ত অর্থাৎ বন্ধন মুক্ত হয়ে নাম নিয়েছিল বিপাশা। তারপর ব্যাস বা বিয়াস নামে পরিচিত হয়। তারই তীরে বসে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদ রচনা করেছিলেন বলে মনে করা হয়।

ঋগবেদে যে সব ঋষিদের নাম পাই তার ভিতর বশিষ্ঠ, গৌতম, জমদগ্নি, পরাশর, ভৃগু, মনু, ধোবা, ইত্যাদি মাননীয় ঋষিরা এই কুলুতের অধিবাসী ছিলেন।

যে বশিষ্ঠের বন্ধন মুক্ত হয়ে নদীর নাম হয়েছিল বিপাশা। সেই বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম মানালি নামক স্থান থেকে দুই মাইল উপরে একটি তীর্থস্থানরূপে প্রসিদ্ধ।

এখানে রয়েছে বশিষ্ঠ মুনির প্রাচীন মন্দির এবং তার পাশেই গরম জলের প্রস্রবণ।

প্রচলিত কাহিনী রামচন্দ্র অশ্বমেধযজ্ঞ করার সময় লক্ষ্মণকে পাঠান গুরুদেব বশিষ্ঠকে অযোধ্যায় নিয়ে আসতে—তখন লক্ষ্মণ এই স্থানে আসেন ও গুরুদেবের আজ্ঞায় মাটিতে তীর নিক্ষেপ করে এই গরম জলের ফোয়ারা বার করেন। বশিষ্ঠ মুনির উদ্দেশ্য ছিল শীতে অত উঁচুতে জল জমে যায়। লোকেদের ঠাণ্ডা জলে কষ্ট হয়—তাদের এই কষ্ট দূর করা।

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে এই জল সালফারের জল, বিশেষ রোগের পক্ষে উপকারী।

কুলুতে মণিকর্ণ বলে অপর একটি জায়গা আছে যেখানে আবার ইউরেনিয়াম ওয়াটার পাওয়া গেছে।

বশিষ্ঠ এবং মণিকর্ণে যেখানে যেখানে উষ্ণ জলের ধারা বেরিয়েছে তাকে ঘিরে আধুনিক স্নানাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেয়েদের ও পুরুষদের আলাদা স্নানের জায়গা রয়েছে।

মানালি থেকে তিন মাইল উপরে গোশাল নামক গ্রামে গৌতমঋষির বসবাস ছিল।

বশিষ্ঠ তীর্থের থেকে আরো কিছু উপরে

প্রকৃতির অন্তহীন রূপবৈচিত্র্যই কি একে দেবভূমি করে তুলেছে!

চড়াই-এ ভৃগুতুঙ্গ পর্বতে ভৃগুমুনির আশ্রম ছিল।

মহারাজ মনু যাঁর থেকে মানবজনের উৎপত্তি তাঁর নিবাস ছিল মানালিতে। মানালির আগের নাম ছিল মন্বালয়। এখানে মনুর প্রাচীন মন্দির রয়েছে যেখানে লোকেরা তাঁকে ঋষি ও দেবতারূপে এখনও পুজো করে। তাঁর মন্দিরের একটু দূরে অলেউ নামক গ্রাম আছে যা মনু-কন্যা ইলার নামের সঙ্গে সমন্বিত।

ঋষি জমদগ্নি বাস ছিল হেমকূট অথবা বর্তমানে হামটা এবং মলানা বা মাল্যবান এই দুই স্থানে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পত্নী ঘোষার নিবাসস্থল ছিল লাহুলের তন্দী নামক স্থানে। স্থিত গোশাল গ্রামে যার আগেকার নাম তাঁর স্থান ঘোষালয় থেকে নাকি গোশাল হয়েছে। এইরূপ কুলুর সর্বত্র মুনি-ঋষিদের আশ্রম বা তপোবন।

গৌতমঋষির পুত্র বামদেবের একটি রচনার ছন্দের অনুসারে মনে হয় সৃষ্টির শুরুতে যখন চারিদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় চলছিল তখন নতুন জীব-জগতের শুরু হয় এই বিপাশা নদীর তীরে।

এই বিপাশা নদীর তীরেই তপস্যা করে আদি ভৃগু অগ্নিদেবকে পৃথিবীতে আনেন। সুতরাং দেখা যায় কুলু হচ্ছে সেই দেশ যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানব-জীবন ও সভ্যতার আদি ইতিহাস।

ভারতবর্ষের মহাকাব্য মহাভারতের মহান নায়ক পঞ্চপাণ্ডব এই কুলুতে তিনবার এসেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। প্রথমবার জতুগৃহ দহন থেকে রক্ষা পেয়ে পাণ্ডবেরা আসেন হিড়ম্বাসুরের দেশে। হিড়ম্বা রাক্ষস তখন এই পাহাড়ী প্রদেশের এক বিশাল অংশে রাজত্ব করত। লাহুল-স্পিতি থেকে নিয়ে গাড়বাল পর্যন্ত সেই সীমানা বিস্তৃত ছিল। মধ্যমপাণ্ডব ভীমের হাতে হিড়ম্বাসুরের মৃত্যু হয়—তখন তার বোন হিড়িম্বা ভীমকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর ভীম ও হিড়িম্বা মনালির আশেপাশে তাঁদের নববিবাহিত জীবনযাপন করেন এবং এক বছর পরে ভীমের ছেলে ঘটোৎকচ জন্মালে ভীম তাঁর মা ও ভাইদের কাছে ফিরে যান। তখন ঘটোৎকচের পালন-পোষণ পুরো করে তাকে হিড়ম্বাসুরের সমগ্র পার্বত্য-প্রদেশের রাজ্যভার সমর্পণ করে হিড়িম্বা মানালির কাছে ঢুংরি নামক স্থানে গিয়ে ঘোর তপস্যা করেন, এবং দেবতাদের মতো গুণ ও জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। ঢুংরিতে এই স্থানে হিড়িম্বা-দেবীর মন্দির রয়েছে।

পঞ্চপাণ্ডবের প্রথমবার কুলু যাত্রা কালে ধোম্য-মুনি তাদের কুলপুরোহিত হয়েছিলেন। ধোম্য-ঋষির তপোভূমিকে উৎকোচ তীর্থ বলা হয়। এই স্থানে নাকি ধৌম্যগণের বাস ছিল। জায়গাটি কুলুর জগৎসুখ নামক গ্রামের একটি বড় নালার আশেপাশে ছিল বলে অনুমান করা হয়। এই নালাটির নাম ধূঁআগন্ যা মনে হয় ধৌম্যগণেরই অপভ্রংশ।

মহাভারতের আদিপর্বে নিয়মভঙ্গের অপরাধে অর্জুন যখন বারো বছর বনজীবন যাপন করেছিলেন তখন ভৃগুতুঙ্গাদি তীর্থে গিয়েছিলেন।

পাণ্ডবগণের দ্বিতীয়বার কুলু যাত্রা হয় যখন জুয়াখেলায় সর্বস্ব হারিয়ে তাঁরা অজ্ঞাতবাসে বার

জনশ্রুতি আছে, ভৃগুতুঙ্গের এই পর্বতচূড়া থেকে দেবতারা পাথরের সিংহাসন কেটে নগরে রেখে এসেছিলেন

হন। এই সময় অর্জুন ইন্দ্রকীল পর্বতে যান ও ইন্দ্রদেবের দর্শন পান। ইন্দ্রের অনুমতি পেয়ে অর্জুন দেবাদিদেব মহাদেব শঙ্করের আরাধনা করেন পাশুপত অস্ত্রলাভের আশায়।

এই ইন্দ্রকীল পর্বত কুলু-মানালি হয়ে হামটা বা হেমকূটের রাস্তা ধরে স্পীতিভ্যালি যাবার সময় চোখে পড়ে। এদেশীয় ভাষায় এর নাম ইন্দ্রকীলা, এখানে এখনো পর্যন্ত কেউ যেতে পারেনি। এই স্থানে ইন্দ্রসান এবং দেউটি নামে দুটি পর্বতশৃঙ্গ আছে যা পর্বতারোহণকারীদের আকর্ষিত করে।

কথিত আছে সৃষ্টির শুরুতে যখন পাহাড়েরা যেখানে খুশি উড়ে বেড়াতো তখন মহাদেবী

মাঝখানে কালো উঁচু মতন ইন্দ্রকীল পর্বত

শবরীর আদেশে ইন্দ্র তাদের ডানা কেটে দেন ও সর্বশেষে পাহাড়টিকে কিলিয়ে বা ঠুকে বসিয়ে দেন বলে সেই পাহাড়টির নাম হয় ইন্দ্রকীল। এই স্থানে বসে ইন্দ্রদেব শাসনকার্য চালাতেন—এই লোক বিশ্বাস।
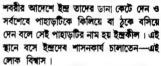
অর্জুন যখন পাশুপত অস্ত্রলাভের আশায় কঠোর তপস্যা করেন তখন শিব এবং পার্বতী কিরাত বা শবর ও শবরিণী বা কিরাতিনীর বেশে তাঁকে দেখা দেন। জগৎসুখ ও শুরু নামক গ্রামের মাঝে একটি স্থানে অর্জুন-গুফা নামক মন্দির আছে—এই মন্দিরের কাছেই শবরী দেবীর মন্দির। এই গ্রামের ও সমগ্র কুলান্তপীঠের অধিষ্ঠাত্রী এই দেবী শবরী। মহাদেবকে প্রসন্ন করে অর্জুন যে স্থানে পাশুপত অস্ত্রলাভ করেন সেই জায়গাটি ভৃগুতুঙ্গ ও বিজলী মহাদেবের মধ্যবর্তী পর্বতমালায় স্থিত। এই জায়গাটি বিজলেশ্বর মহাদেব নামে প্রসিদ্ধ।

কথিত আছে রুদ্রদেব প্রলয়কালে যখন পৃথিবীর উপর বিজলী অর্থাৎ বিদ্যুৎ নিক্ষেপ করতে থাকেন তখন আর্যরা ভীত হয়ে বশিষ্ঠ মুনির শরণাপন্ন হন। মুনির প্রার্থনায় রুদ্ররূপী শিব নিজের নিক্ষিপ্ত বজ্র আবার নিজের মধ্যে গ্রহণ করেন। যে জায়গায় এই ঘটনাটি ঘটে সেটি ব্যাস ও পার্বতীর সঙ্গম-স্থলে একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় বিজলেশ্বর বা বিজলী মহাদেবের মন্দির।

প্রতি বারো বছর অন্তর এই মন্দিরের উপর বিদ্যুৎ বর্ষিত হয় এবং মন্দিরের ভেতরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি সেই আঘাতে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই মন্দিরের পূজারী তখন গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে শুদ্ধ পবিত্র মাখন যোগাড় করে তা দিয়ে পাথরের টুকরোগুলি জুড়ে তাকে আবার তার পূর্বরূপ ফিরিয়ে দেন।

পাণ্ডবেরা হিমালয় যাত্রাকালে কুবেরের আশ্রমেও গিয়েছিলেন। পার্বতী নদীর তীরে

শ্রীবাকোটী পর্বত যার এখনকার নাম গিরুআকোঠী সেই পর্বতের ভিতরে কুবেরের সোনার মহল ছিল। পার্বতী নদীর তীরে বালিতে সোনার সন্ধান পাওয় যায় সুতরাং অনুমান করা যায় এর আশেপাশে কোথাও স্বর্ণখনি আছে যার সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি।

পাণ্ডবদের যাত্রার বর্ণনায় যে শ্বেতগিরি পর্বতের নাম পাওয়া যায় তা স্পীতি যাবার রাস্তায় পড়ে। তার এ যুগের নাম শিগরী। মাল্যবান পর্বত যার এখনকার নাম মলানা সেখানে কুবেরের মিত্র মণিমান রাক্ষস বাস করতেন। তাঁর নামে কুলুতে একটি সুপ্রসিদ্ধ স্থান আছে মণিকরণ বলে—এখানে শ্রীরামচন্দ্রের একটি প্রচীন মন্দির আছে। এখানে শিখদের গুরুগোবিন্দ এসে যে জায়গাটিতে ছিলেন সেই জায়গাটি ঘিরে শিখদের একটি গুরুদ্বারাও রয়েছে। মণিকরণের ভিতর দিয়ে নদী পার্বতী পাহাড় পাথর ডিঙিয়ে তার প্রচণ্ড জলরাশি নিয়ে বয়ে চলেছে। এখানে জলের স্রোত এত বেশি যে জল সাদা ফেনার মতো দেখায়। মণিকরণ থেকে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে এই নদী প্রচণ্ড স্রোতে দুধের মতো সাদা রঙ ধরে বলে সেই জায়গাটির নাম দুধগঙ্গা বলা হয়ে থাকে।

কুলুর নানা জায়গায় পাণ্ডবদের যাত্রার নানা চিহ্ন পাওয়া যায়।

নিরমণ্ডে পরশুরামের একটি স্থানে হিমালয় যাত্রা শেষে ফেরার পথে পাণ্ডবেরা কিছুদিন ছিলেন। একটি জায়গাতে তাঁরা মাটি ঢেলেছিলেন। সেই জায়গাটিতে কোন স্ত্রীলোকের আসা বারণ। কথিত আছে এই মাটি কাছে রেখে পাণ্ডবমাতা কুন্তীর মনে হঠাৎ কাম-বাসনা জাগ্রত হয়েছিল।

মহাভারতের মহাত্মা বিদুর কুলুর এক মেয়ে সুদঙ্গীকে বিয়ে করেন। তাঁদের দুটি ছেলে হয় মক্কড় আর ভোট নামে। এই দুই বালক ব্যাসমুনির আশ্রমে থেকে লালিত-পালিত হয়। ভোট বড় হয়ে নিজের রাজ্য স্থাপিত করেন যার নাম ভোটান। এবং মক্কড়ের স্থাপিত রাজ্য মকড়সা নামে খ্যাতিলাভ করে।

পাণ্ডবদের শেষবার কুলু যাত্রা হয় তাঁদের স্বর্গারোহণপর্বে। প্রবাদ আছে। জগৎসুখের কাছে প্রীনী গ্রামে স্থিত হামটা পর্বতের রাস্তা দিয়ে মৃত আত্মাদের নিয়ে যাওয়া হতো। কারণ যমপুরী ও স্বর্গের রাস্তা এদিক দিয়েই আরো এগিয়ে।

পাণ্ডবেরা এই রাস্তা ধরেই স্বর্গের পথে এগিয়েছিলেন। ভৃগুতুঙ্গ যাবার পথে যুধিষ্ঠির ছাড়া অপর পাণ্ডবগণ এবং দ্রৌপদী প্রাণত্যাগ করেন। তান্দী-সঙ্গম নামক স্থানে তাঁদের অন্তিম-সংস্কার করা হয়। তান্দী লাহুলে স্থিত। এই স্থানটি অত্যন্ত পবিত্র স্থানরূপে গণ্য করা হয়।

কুলুতে রামপুর-বুশহর নামক স্থানে সরাহন্ বলে একটি জায়গা আছে যেখানে একদা বানাসুরের রাজধানী শোণিতপুর ছিল। তাঁর কন্যা উষার সঙ্গে কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের বিবাহ হয়।

বৌদ্ধযুগের এক চীন যাত্রী হুয়েন সাং-এর লিপি থেকে জানা যায় সম্রাট অশোক [illegible] যে সকল স্থানে বুদ্ধদেব যাত্রা করেছিলেন সেই সকল স্থানে বুদ্ধদেবের স্মরণে একটি করে স্তূপ নির্মাণ করান। এমনি একটি স্তূপ কুলু দেশের মধ্যভাগে বানানো হয়েছিল। এ থেকে মনে করা হয় এখানে একদা ভগবান বুদ্ধেরও আগমন হয়েছিল।

কুলুতে নগর বলে একটি খুব সুন্দর জায়গা আছে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে নগরকে সেই সময়কার কুলুর রাজধানীরূপে গণ্য করা হতো। নগরের প্রধান আকর্ষণ নগরপ্রাসাদ যা একটি আধা-ঝুলন্ত পাহাড়ের চূড়ায় স্থাপিত। বরাগর কেল্লা থেকে পাথর আনিয়ে এটি তৈরী করিয়েছিলেন নগরের রাজা সিধ্ সিং। এই প্রাসাদের সঙ্গে জড়িত আছে একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী। রাজা একবার সভায় জিজ্ঞাসা করেন রাজ্যে পুরুষদের মধ্যে সব থেকে সুন্দর কে। রানী রাজসভায় এক পালোয়ানকে দেখিয়ে দেন। রানীর এই সত্য ভাষণে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা সেই পালোয়ান ও তাঁর রানী দুজনকে মৃত্যুদণ্ড দেন। পালোয়ানকে ফাঁসীতে ঝোলান হয়। রানী আত্মসম্মান বাঁচাতে ছুটে গিয়ে প্রাসাদের উপর থেকে ঝাঁপ দেন নিচে। এবং তাঁর দেহ মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হয়।

এই প্রাসাদ থেকে সমস্ত নগরের এবং বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য-প্রদেশের যে অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায় তা অবর্ণনীয়।

এই প্রাসাদের পাশেই একটি ছোট্ট মন্দিরের ভিতর একটি বিরাট পাথরের আসন রয়েছে। বলা হয় যখন দেশে কোন সঙ্কটকাল দেখা দিত তখন সব দেবতারা এখানে এসে একত্রিত হতেন। এই বিরাট পাথরের আসনটি নির্দিষ্ট ছিলো দেবসভার প্রধানের জন্যে। প্রাচীন যুগে আর্যরা যেমন সামনা-সামনি নিজেদের দেবতাদের সঙ্গে কথা বলতেন ও বিপদকালে তাদের পরামর্শ নিতেন—সেই পুরানো রীতি অনুযায়ী এখনও লোকেরা নিজেদের দেবতাগণকে বিপদের কথা বলে ও দেবতারা গুরু বা পূজারীর মাধ্যমে তাদের সঙ্কট মোচনের উপায় বলে দেন। এই জায়গাটির নাম জগতী-পুছ।

বিরাট এই পাথরের আসনটি সম্বন্ধেও একটি জনশ্রুতি আছে। এই শিলাসনটি ভৃগুতুঙ্গের একটি পর্বতচূড়া থেকে কেটে আনা হয়েছিল। দেবতারা মৌমাছির রূপ ধরে এই পাথরের আসনটিকে ঐ জায়গা থেকে নগরের এই স্থানে নিয়ে এসে রেখেছিলেন। দেবতাদের এই সিংহাসনকে জগতী-পৌট বলা হয়।

জগতী অর্থাৎ দেবতাদের আসন সমগ্র জগতের কেন্দ্রস্থল এই নগরে স্থাপিত রয়েছে।

নগরে দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে রয়েছে নিকোলাস রোয়েরিকের বাসস্থান। যেখানে রয়েছে তাঁর কিছু বিখ্যাত শিল্পকলার নমুনা।

আর রয়েছে বিষ্ণু মন্দির, ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর মন্দির ও কৃষ্ণ মন্দির।

কুলু সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে এই সেই স্থান যেখানে শত মন্দিরে হাজার দেবতা বাস [illegible]।

[illegible] পাওয়া যায়। কুলুর প্রতিটি [illegible] দেবস্থান রয়েছে। উচ্চ পর্বত চূড়ায় স্থিত প্রতিটি ঝিল একটি করে তীর্থস্থান। এর উচ্চ পর্বত-কন্দরে যোগিনীদের বাস। এর নদী, ঝরনা, নালা কোন না কোন দেবতা অথবা দেবর্ষির মাহাত্ম্যকথা বহন করে চলেছে।

কুলুতে আজও দশহরার দিন একশতেরও উপরে দেবতার দল মনুষ্যচালিত নিজের নিজের ডুলিতে বসে কুলুর ঢালপুরের ময়দানে এসে একত্রিত হন—এখানকার প্রধান দেবতা রঘুনাথজীকে শ্রদ্ধা জানাতে। ঐদিন রঘুনাথজী তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট বিশেষ রথে বসে সব দেবতাদের মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করেন। আমাদের বিজয়া দশমীর দিন থেকে শুরু হয় এদের দশহরার উৎসব। এই উৎসব চলে এক সপ্তাহ ধরে। কুলু এবং দূর-দূরান্তর থেকে লোকেরা আসে এই উৎসব দেখতে।

পুরাণের সঙ্গে এর যেমন সম্বন্ধ তেমনি ভারতের ইতিহাসেও কুলুর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। নন্দবংশ উচ্ছেদ করার জন্য চাণক্যের আদেশে কুলুর সেনাদলের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্তের নেতৃত্বে যে মহাযুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল সিন্ধুনদীর উপরে তাতেও কুলুর সেনাদল উপস্থিত ছিল। কুলু ও কাশ্মীরের সেনাদলের সহায়তায় যে বিজয়প্রাপ্তি হয়েছিল সেই বিজয়োৎসবে কুলুরাজ চিত্রবর্মাও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

এইভাবে কুলুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে যুগ যুগের কথা ও কাহিনী। যাঁরা একবার এখানে এসেছেন তাঁরাই অনুভব করে গেছেন এর মহিমা।

ডাঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর 'বিপাশা নদীর তীরে' বইতে উল্লেখ করেছেন—"সংসারে প্রসিদ্ধ এই কুলু উপত্যকা। আমি বলবো বিপাশা নদীর দেশ"। এই দেশের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কাহিনী, ইতিহাস, কিংবদন্তী, জীবন, যৌবন বিপাশা নদীর দুই কূলে পালিত হয়েছে। অদ্ভুত এবং রহস্যময় এই বিপাশা নদীর দেশ। এখানকার অরণ্য প্রান্তর, পর্বত-কন্দর, সবকিছুই অদ্ভুত এবং রহস্যময়। বিপাশা নদীর সঙ্গীতে উন্মত্ত দাঁড়িয়ে থাকা আকাশস্পর্শী পর্বতশ্রেণী এবং এর মাঝে পালিত সেই সভ্যতা যা রামধনুর থেকেও অধিক সুন্দর।'

শ্রী এম এস রন্ধাবা তাঁর পুস্তক কুলুর লোকগীতে লিখেছেন—'সত্যি কথা বলতে গেলে এই কুলু উপত্যকায় এমন কিছু আছে যা বিক্ষুব্ধ ও বিভ্রান্ত আত্মাকে স্ফূর্তি ও নবজীবন প্রদান করে।

এখানকার প্রকৃতি নানা রং-এ রূপে ও স্বরে মুখরিত। এই স্থানে বহু ঈশ্বরবাদ জন্ম নিয়েছে—সেই মতবাদ যার অনুসরণে গাছে গাছে, ঝরনায়, পাহাড়ে ও পশুপক্ষীতে দেবী-দেবতা নজরে আসে।

এর প্রাকৃতিক রূপ একই সঙ্গে সুন্দর ও ভয়ানক। সাত রং-এ রাঙানো বন, পাহাড়ের ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া আন্দোলিত সবুজ ক্ষেতের সারি, গভীর গহীন খাদ, অন্ধকার পর্বতের কন্দর, ভীমকায় হিমনদ, দুরূহ পথ, শান্ত স্নিগ্ধ হিমশিখর। সবেতে একই সঙ্গে সুন্দরের সঙ্গে ভয়ঙ্করের সমাবেশ দেখা যায়।

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে কুলু এক মহাকাব্য। ■

উত্তেজিত হয়ো না, ভয়ের কিছু নেই।
কিছুতেই আমার ভয়ের কিছু নেই!
হিজ...
হিসস্
গর্‌র্‌
চি

অরণ্যদেবের স্বর্গোদ্যানে···
কে আপনি ? আমি কোথায় ?
আগে তোমার পরিচয় দাও। তোমাকে আমরা সমুদ্রতীরে কুড়িয়ে পেয়েছি।
6/22

তোমার সঙ্গে ছিল ডুবুরির সরঞ্জাম, কিন্তু বাতাসের নলটা ছিল কাটা। তুমি যে বেঁচে আছ, এটাই তাজ্জব ব্যাপার।
এখন আমার মনে পড়েছে। আমার নাম অ্যান···

"বন্ধুদের নিয়ে আমি প্রমোদতরণী ভাড়া করে সমুদ্রে ছুটি কাটাতে বেরিয়েছিলাম···

আমি নামব না।
আমিও না।
আমি নামব।

"জর্জ ছিল ট্রেনার। ডুবুরির পোশাক পরে রোজ তার সঙ্গে আমি জলে নামতুম···

"একদিন আমি কোরালপুঞ্জের মধ্যে উজ্জ্বল কিছু দেখতে পাই···"
?!
ক্রমশ ● ৮
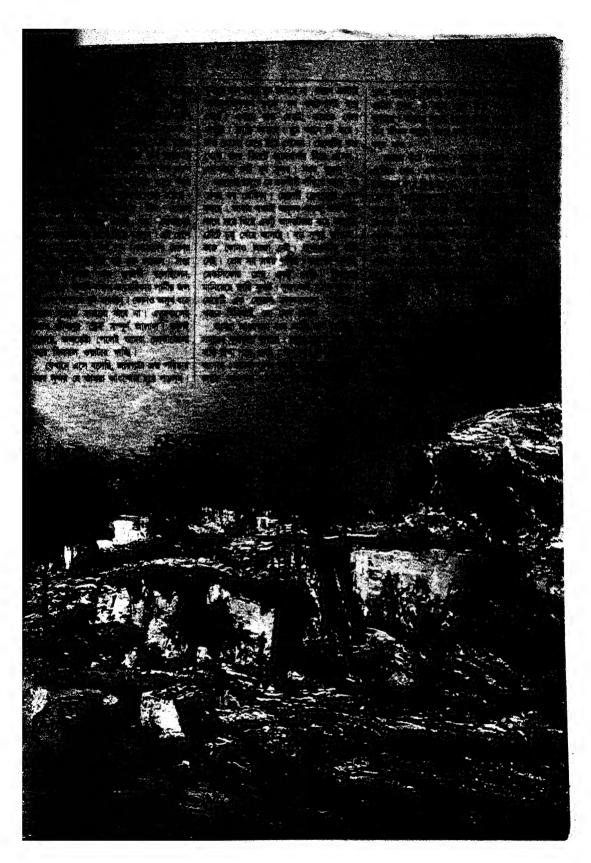
কমোড
পরিষ্কার করার
পুরানো সব
পদ্ধতিকে
এবারে বিদায় দিন।

ভারতে এলো নতুন হারপিক !
"এতোদিনে কমোড পুরোপুরি পরিষ্কার করার একটা পরিচ্ছন্ন উপায় পেলাম।"

হারপিকের ক্ষমতা অনেক বেশী

কমোড পুরোপুরি পরিষ্কার ও নিরাপদ করার কাজে হারপিকের ক্ষমতা অনেক বেশী। হারপিকের শক্তিশালী ফরমুলা আপনার কমোডকে কেবল উপর উপর পরিষ্কারই করে না, জীবাণুনাশ করে নিরাপদ করে রাখে।

হারপিকের সুবিধাও অনেক বেশী

ওইসব বিপদজ্জনক জিনিস যা বাজারে সস্তায় পাওয়া যায় সেগুলো নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে না। শুধু হারপিক স্প্রে করুন। ২০ মিনিট বাদে হাল্কা করে একটু ব্রাশ করে ফ্লাশ করুন। কোন ঝুটঝামেলার বালাই নেই। তাই হারপিকই হলো কমোড ভালো করে পরিষ্কার করার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন উপায়।

হারপিকের জুড়ি নেই

জীবাণুনাশের কাজেও হারপিকের জুড়ি নেই।
হারপিকের বোতলের বিশেষভাবে তৈরী স্প্রের সাহায্যে কমোডের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকা জীবাণু পর্যন্ত নাশ হয়। অন্য কোন সরঞ্জাম এসব জায়গায় পৌঁছতেই পারে না।

CLARION C-RCH-1

নেয়ারেরে। আর মেকসিকোর প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দ্য লা মাদ্রিদ রয়েছেন তাঁর নিজস্ব আবাসে। এই ছজনকে নিয়ে, অর্থাৎ ছ'টি দেশের রাষ্ট্র-প্রধানদের নিয়ে তৈরি হয়েছে 'গ্রুপ অফ সিক্স'। ইকসতাফার সর্বত্র টহল দিয়ে ফিরছে সশস্ত্র সেনাবাহিনী। ট্যুরিস্টদের কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। অ্যাটম বোমা ফাটল কি ফাটল না বয়ে গেল। তাঁরা এসেছেন আনন্দ করতে। গায়ে রোদ মাখতে। এসেছেন মাছ ধরতে। 'স্কুবা ডাইভিং' করতে।

বাকি রাতটুকু বিছানায় পড়ে ব্যর্থ চেষ্টা করেছি সামান্য একটু ঘুমোবার। হায় নিদ্রা। আকাশ চিরে সামান্য আলোর উঁকি দেখে বিশাল জানালার ধারে এসে বসেছি। সামনে সেই ভূমিকম্প বিধ্বস্ত বহুতল হোটেল বাড়ি। অদূরে অক্লান্ত সমুদ্র সমানে নেচে চলেছে। জিঙ্গো ড্যানস। হঠাৎ জানালার সামনে দিয়ে জলজ্যান্ত একটা মানুষ উড়তে উড়তে সমুদ্রের দিকে চলে গেল। চোখ দুটো একবার রগড়ে নিলুম। স্বপ্ন নয় তো। পরক্ষণেই একটি মেয়ে উড়ে গেল। আর বসে থাকা যায় না। ব্যাপারটা কি, দেখা দরকার। দরজা খুলে বাইরে এলুম। হোটেলের একজন মহিলা কর্মী একটা ট্রলি ঠেলে নিয়ে চলেছেন। প্রশ্ন করলুম, 'দিদিমণি, আকাশে মানুষ উড়ছে, ব্যাপারটা কী ?'

'সোজা ছাদে চলে যান, আপনিও উড়তে পারবেন।'

লিফটে চেপে ছাদে। বিশাল তার ব্যাপ্তি। টু পিস সুইমিং কস্ট্যুম পরে একদল পুরুষ আর মহিলা হই হই করছেন। একজনের পিঠে একটা জেটপ্রপেলার বাঁধা হচ্ছে। বগলের তলা দিয়ে স্ট্র্যাপ চালিয়ে। তরুণীর সাহস আছে। ইঞ্জিন স্টার্ট নিল। তরুণী টরপেডোর মত হুস করে আকাশে উড়ে গেলেন। ফ্লাইং বিউটি। উড়তে উড়তে তিনি ঝপাং করে উত্তাল সমুদ্রে গিয়ে পড়লেন। ছাদে হর্ষধ্বনি। একজন মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওয়ান্ট টু ফ্লাই ?'

হেসে বললুম, 'আই উইল ডাই ইন দি মিড এয়ার।'

মেয়েটি হাসল। কি ভাবল কে জানে। আমি অপার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। সূর্যোদয় হচ্ছে, জবাকুসুম সঙ্কাশং।

এই 'গ্রুপ অফ সিক্স'-এর জন্ম ১৯৮৪ সালের ২২ মে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উৎসাহে। ওই দিন যৌথ একটি আবেদন করা হয়েছিল পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন পাঁচটি দেশের প্রতি। আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ব্রিটেন আর ফ্রান্স হল সেই পাঁচটি দেশ। আবেদনে অনুরোধ করা হয়েছিল, পারমাণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা বন্ধ করুন। বন্ধ করুন পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন। বন্ধ করুন বিতরণ। পৃথিবীর মানুষ ত্রস্ত। ঠিকই, ১৯৪৫-এর পর পারমাণবিক বিস্ফোরণ আর কোথাও ঘটেনি ; কিন্তু মানুষের ভুলে, যন্ত্রের ভুলে যে কোনও সময় সর্বগ্রাসী দুর্ঘটনা ঘটে যেতে কতক্ষণ। ওই ঘোষণার সময় সুইডেনের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন ওলোফ পামে। তিনি আজ নিহত। নিহত শ্রীমতী গান্ধী। জুলিয়াস নেয়েরেরে সেই সময় ছিলেন, ইউনাইটেড রিপাবলিক অফ তাঞ্জানিয়ার প্রেসিডেন্ট।

১৯৮৫ সালের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী দিল্লিতে মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে 'গ্রুপ অফ সিকসে'র মিটিং ডেকেছিলেন। তখনও ওলোফ পামে জীবিত ছিলেন। পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের তিনি ছিলেন অতি উৎসাহী এক উদ্গাতা। পৃথিবীর এমনই পরিহাস, আততায়ীর গুলিতে সেই শান্তির দূতকে অকালে বিদায় নিতে হল।

১৯৮৫ সালের দিল্লি ঘোষণার মুখবন্ধে বলা হয়েছিল : 'চল্লিশ বছর আগে হিরোসিমা আর নাগাসাকিতে যখন পরমাণু বোমা বিস্ফোরিত হল, তখন মানবজাতি বুঝে গিয়েছিল সমূল ধ্বংসের অস্ত্র মানুষের হাতে এসে গেছে। আতঙ্ক হয়ে উঠল জীবনের সাথী। চল্লিশ বছর আগে পৃথিবীর সমস্ত দেশ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গড়ে তুলেছিল আন্তর্জাতিক একটি সংগঠন। সেই সংযুক্ত জাতিপুঞ্জ মানুষকে দেখিয়েছিল আশার আলো।

'সম্পূর্ণ অগোচরে, গত চার দশক ধরে, প্রতিটি জাতি, প্রতিটি মানুষ একটু একটু করে তাদের জীবন ও মরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের ছোট্ট একটি দল আর কিছু যন্ত্র দূর কোনও নগরে বসে সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। Every day we remain alive is a day of grace as if mankind as a whole were a prisoner in the death cell awaiting the uncertain moment of execution. And like every innocent defendant, we refuse to beiive that the execution will ever take place.

'কেন আজ আমাদের এই অবস্থা ! কারণ পারমাণবিক শক্তির অধিকারী দেশসমূহ সেই প্রাচীন যুদ্ধনীতি অনুসরণ করে চলেছেন। অথচ আজ তাঁরা যে অস্ত্রের অধিকারী, সেই অস্ত্র প্রাচীন রণনীতিকে অকেজো করে দিয়েছে।

'পারমাণবিক শ্রেষ্ঠত্ব অথবা সমতার কী অর্থ ? ওই সব দেশের সমরাস্ত্র ভাণ্ডারে ইতিমধ্যেই যে পারমাণবিক অস্ত্রের সঞ্চয় তৈরি হয়েছে, তাতে গোটা দুনিয়াকে বারো বারেরও বেশী নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। প্রাচীন নীতিই যদি ভবিষ্যতের পৃথিবীতে অনুসৃত হয় তাহলে আজ অথবা কাল মানবসভ্যতার ধ্বংস সুনিশ্চিত। কিন্তু পারমাণবিক যুদ্ধ নিবারণ করা সম্ভব যদি আমরা সকলে এক হয়ে সমস্বরে গর্জে উঠতে পারি, এগিয়ে দিতে পারি আন্তর্জাতিক দাবি, যুদ্ধ আমরা চাই না। আমরা বাঁচতে চাই।

'বায়ুমণ্ডল ও জীবজগতের সাম্প্রতিক নিরীক্ষা এক ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার ইঙ্গিত তুলে ধরেছে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিমেষে জনপদ যেমন নিশ্চিহ্ন করে, প্রচণ্ড উত্তাপ আর বিকিরণী শক্তিতে জীবন ধ্বংস করে, তেমনি খুব সীমিত পারমাণবিক যুদ্ধেও পৃথিবীর হিমমণ্ডলে নেমে আসবে পারমাণবিক শৈত্যপ্রবাহ। প্রাণচঞ্চল, আলোকময় এই পৃথিবীতে নেমে আসবে চির অন্ধকার। জমে যাওয়া এই গ্রহে তখন যে ধ্বংস নেমে আসবে তা প্রতিটি জাতিকে স্পর্শ করবে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে যারা বহুদূরে আছে তারাও রক্ষা পাবে না। এই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা ভেবেই আমাদের সমবেত দাবি, পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ করতে হবে চিরতরে। পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দিতে হবে।'

আমরা আছি হোটেল ডেল সলে ! আর সামিট মিটিং হবে হোটেল ক্রিস্ট্যালে। হোটেল ক্রিস্ট্যাল একেবারে পাশেই। মিনিট তিনেকের পথ। বেলা একটায় হোটেলের স্যালনে সেই

ইকসতাফার ক্রিস্ট্যাল হোটেলের সালোনে 'গ্রুপ অফ সিকস'

তথ্যাবলী। বিশ্বশান্তির এটি হবে এক মহৎ প্রতিশ্রুতি।

'একটা কথা বলতেই হবে। আমরা সবাই যেন সমরশক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছি। ছোট-বড় সব দেশের সরকারই যেন তুলনামূলক বৃহত্তর শক্তিধরদের দিকে তাকিয়ে আছে, নজর রাখছে অধিকতর সমৃদ্ধ সমর সংগঠনের দিকে।' গলব্রেথ কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। অল্প বিশ্রাম নিয়ে বললেন, 'এই আলোচনায় আমরা যেন নৈরাশ্যবাদী না হই। আমরা যেন এই প্রত্যয়ে দৃঢ় থাকি যে, পৃথিবী আমাদেরই দিকে। আমরা যেন একটা কথা পরিষ্কার জেনে রাখি আমাদের বিরোধীরা যে পরমাণু মৃত্যুবাণ, যে পারমাণবিক অবসান আমাদের উপহার দিতে পারে, তা কখনো রাজনৈতিক আকর্ষণীয় বস্তু হতে পারে না। মৃত্যুর প্রতিশ্রুতি কখনো ভোটারদের টানতে পারে না। আমরা যদি দুর্বলতা দেখাই, বিশ্বাস হারাই, অন্যরাও আমাদের দুর্বল, সংশয়ী বলে ধরে নেবে। আমাদের বলিষ্ঠ হতে হবে, বিশ্বাসী হতে হবে। প্রয়োজন হলে আমরা যেন কোনোমতেই রাজনৈতিক শত্রুকে আতঙ্কিত করে তুলতে পরাঙ্মুখ না হই।'

ক্রিস্টাল হোটেল, বাইরে সশস্ত্রপ্রহরা, ভেতরে বিশ্বশান্তির বৈঠক

গলব্রেথের পর উঠে দাঁড়ালেন মেকসিকোর প্রেসিডেন্ট মাদ্রিদ। চর্তুদিকে যত ক্যামেরা ছিল চমকাতে লাগল, শাটার টেপার ঠাস্ ঠাস্ আওয়াজ, রিভলবারের গুলি ছোঁড়ার মতো। সে যেন আর থামতে চায় না। যেন প্রলয় হচ্ছে। আলোর ঝলকানি গুলির শব্দ। যেন পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ঝাড়া পনেরো মিনিট। প্রেসিডেন্ট ফটো হলেন। এত প্রিয়! না ক্ষমতা! না চাপ! না দমনপীড়ন। কোনটা সত্যি?

ইকসতাপা পর্ব শেষ করে দু'দিন পরে শান্ত সমুদ্র নিবাস ছেড়ে আমরা সদলে উড়ে গেলুম মেকসিকো সিটি। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বিমান থেকে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল মিলিটারি ব্যাণ্ড। তালে তালে গর্জে উঠতে লাগল এক সঙ্গে ছত্রিশটি কামান। প্রেসিডেন্ট মাদ্রিদ ভারতের প্রাইম মিনিস্টারকে বলতে চাইছেন—রাজ সমারোহে এসো। রাজ সংবর্ধনা দেখে মনে হল, মুকুটের ভার এই কারণেই সহ্য হয়।

মেক্সিকোয় আমরা নামলুম বেলা চারটে বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। সুন্দর একটি বাসে চেপে আমরা চলেছি আমাদের হোটেলের দিকে। একজন স্প্যানিস মহিলা আমাদের সঙ্গে চলেছেন দোভাষী ও গাইড হয়ে। আধো আধো মিষ্টি ইংরেজিতে তিনি আমাদের শহরটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। অতি প্রাচীন সভ্যতা। প্রাচীন এক শহর। প্রাচীনের ওপর আধুনিকতার প্রলেপ। ৩৫ হাজার বছর আগে এশিয়া থেকে একদল মঙ্গোলীয় মানুষ শিকারের পেছনে তাড়া করতে করতে কখন এক নতুন মহাদেশে পৌঁছে গেল। তারা অবশ্য কলম্বাসের মতো নতুন মহাদেশ আবিষ্কারের আনন্দে চিৎকার করে ওঠেনি। কারণ তাদের বোঝারই ক্ষমতা ছিল না কোথা থেকে কোথায় তারা চলে এসেছে শিকারের পেছনে তাড়া করে। এশিয়া থেকে আমেরিকার ব্যবধান মাত্র পঞ্চাশ মাইল।

ন্যাশন্যাল মিউজিয়ামের প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপক পণ্ডিত যখন এই কথা বললেন, আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। সে আবার কি! হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আমরা ভারত থেকে এলুম, সে কি শুধু ঘুরে আসার জন্যে। ঐতিহাসিক আমাকে নিয়ে গেলেন বিশাল একটি মানচিত্রের সামনে। উত্তর গোলার্ধে, আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বেরিং সাগরের মাথার ওপর বেরিং স্ট্রেট। এপারে আমেরিকা ওপারে এশিয়া। দূরত্ব মাত্র ৫০ মাইল। 'আইস এজে' এই বেরিং স্ট্রেট জমে বরফ হয়েছিল। মঙ্গোলিয়ার দিক থেকে কিছু মানুষ উত্তরে উঠতে উঠতে ওপরে এসে নিজেদের অগোচরেই বরফ জমাট বেরিং স্ট্রেট পেরিয়ে চলে এল আমেরিকায়।

কলম্বাস আমেরিকায় পা রেখে যাদের দেখেছিলেন, আমেরিকার সেই মানুষেরা কোথা থেকে এলেন, কেমন করে এলেন, এই জিজ্ঞাসার উত্তর বেরিং স্ট্রেট। ফাদার জোস দা অ্যাকোস্টার এই সমাধান পণ্ডিতসমাজ সহসা খারিজ করে দিতে পারেননি। আলাস্কা অতিক্রম করে কেমন করে মঙ্গোলীয় মানুষরা দূর দক্ষিণে গিয়ে ইতিহাসের পরতে পরতে এক এক কালের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্মৃতি রেখে গেছে, অধ্যাপক আপন মনে বলে যেতে লাগলেন। শুনতে শুনতে অদ্ভুত একটা শ্রদ্ধার ভাব এল মনে। যে শহরে সাড়ে চারশো, পাঁচশো বছরের প্রাচীন গৃহও স্থাপত্য আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, যে দেশে ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, তরোয়াল, আহার, অনাহার পাশাপাশি বিরাজ করে আসছে ৩৫ হাজার বছরের আবর্তকালে, সেই শহরকে ভাল করে চিনতে হবে জানতে হবে।

আপাতত হারিয়ে যাই হোটেল কামিনো রিয়্যালের বিশাল গোলোক ধাঁধায়। বহুতল মানে কত তল? অতল বলেই মনে হচ্ছে। ষাট সত্তর তলা তো হবেই। মাটির তলাতেও ঢুকে আছে বেশ কিছু তল। লম্বায় চওড়ায় জনসংখ্যায় ছোটখাট একটি শহরের মতো। একটা তল থেকে আর একটা তলকে আলাদা করার উপায় নেই। সব তলই সমান। রিসেপসান, বিশাল আন্দোলিত ফোয়ারা, রেস্তোরাঁ, বার, ড্যান্সফ্লোর, ডিসকো। কোন ফ্লোরে আছি বোঝার উপায় নেই। কম্পিউটার যদি বলে না দেয়। এক একটা ফ্লোরকে আবার ভাগ করা হয়েছে লেভেলে, ফার্স্ট লেভ্‌ল, সেকেন্ড লেভ্‌ল, থার্ড লেভ্‌ল। কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবার এই প্ল্যান।

ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল ভারি ব্যাগ হাতে, হিসেব করলে প্রায় তিন চার মাইল, হোটেলের অলিতে গলিতে ঘোরা হয়ে গেল। বিকেল গড়িয়ে রাত হল। বহু সুন্দরীর দর্শন হল। গানের সুর শোনা হল। বর্ম, শিরস্ত্রাণ, অস্ত্রশস্ত্র, রথ, মায়া সভ্যতার মূর্তি, সৌরচক্র দেখা হল। প্রতিটি বাঁকে বিস্ময়। মনকে হাজার হাজার বছর পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দেবার আয়োজন। সব হল, হল না কেবল আমার কক্ষ-প্রবেশ। একেবারেই হারিয়ে গেছি। যাকেই জিজ্ঞেস করি, স্প্যানিশ ভাষায় একটি মাত্র উত্তর—কাবিলডোস?

শেষে বিশাল এক সিঁড়ির মাঝের ধাপের একপাশে বসে পড়লুম। আমার মতো অনেকেই বসে আছেন। সুন্দরী মহিলা, সুন্দর পুরুষ। সিঁড়ি উঠে গেছে বিশাল এক নাটমন্দিরের মতো মিলনকেন্দ্রে। সেখানে বহু ধরনের মানুষের কলগুঞ্জন। যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা মনে হয় আমার মতোই হারিয়ে গেছেন।

এই বিশাল শহরে, সুপ্রাচীন সভ্যতায় নিজেকে খুঁজে পাওয়া, সে আর এক দীর্ঘ কাহিনী।

সমাপ্ত

রঙীন ছবির শিল্পী, মেকসিকোর মোয়জেস গোমেজ

পূর্ব-পশ্চিম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তরপর্ব : ৯

এক সময় উত্তর ও মধ্য কলকাতার রাস্তাঘাট খুব ভালোই চিনতেন মামুন, চব্বিশ বছরের ব্যবধানে সব কিছুই যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। এখন কলকাতা একটা বিদেশী শহর, এতগুলি বছরে কত পরিবর্তন হয়েছে কে জানে, এই শহর কি তাঁদের সহৃদয়ভাবে গ্রহণ করবে? কোথায় থাকবেন কোনো ঠিক নেই। বালুরঘাট থেকে মালদা হয়ে কলকাতায় চলে এসেছেন শুধু এই ভরসায় যে এর মধ্যেই আওয়ামী লীগের অনেক নেতা, পূর্ব পাকিস্তানের বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপক কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হবে। কিন্তু এত বড় শহরে কোথায় সন্ধান পাবেন তাঁদের?

আগে একটা মাথা গোঁজার জায়গা ঠিক করা দরকার। হোটেল ছাড়া গতি নেই। কলকাতার হোটেলে মুসলমানদের থাকতে দেয় তো? ছেচল্লিশের দাঙ্গার স্মৃতি অবধারিতভাবে মনে পড়ে, এবং গা ছমছম করে ওঠে। মামুনদের ছাত্র বয়েসে চৌরঙ্গি, পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলকে বলা হত সাহেব পাড়া, আর পার্ক সার্কাস, বেকবাগান, কলুটোলা, মীর্জাপুর, কলাবাগান, রাজাবাজার ইত্যাদি অঞ্চলগুলো ছিল প্রধানত মুসলমান পাড়া। সেই সব অঞ্চলে অনেক মুসলমানদের হোটেল ছিল। কিন্তু এখনও কি সেই সব হোটেল আছে? অধিকাংশ হোটেলেই তো ছিল অবাঙালী মুসলমানদের।

বাস বা ট্রামে উঠলে ঠিক দিশা পাবেন না, এই জন্য মামুন বাধ্য হয়ে একটা ট্যাক্সি নিলেন। দাড়িওয়ালা, বলিষ্ঠকায় একজন পাঞ্জাবী সর্দারজী সেই ট্যাক্সির চালক, তার কোমরে কৃপাণ। লাহোর-করাচী থেকে বিতাড়িত শিখদের নিশ্চয়ই জাতক্রোধ আছে পাকিস্তানীদের সম্পর্কে, এই লোকটাও সেই রকম কেউ নাকি? মামুন যথাসম্ভব কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখে বললেন, চলিয়ে বেকবাগান।

হেনা আর মঞ্জুর মুখে উৎকণ্ঠার কালো ছায়া। তারা বারবার মামুনকে দেখছে চকিত দৃষ্টিতে। এই এক অচেনা বৃহৎ শহরে তাদের সামনে পড়ে আছে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। মঞ্জু ভেতরে ভেতরে দারুণ অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে, এখন মনে হচ্ছে, ঢাকা ছেড়ে চলে আসা তার উচিত হয়নি। আর কি কোনোদিন সে তার স্বামীকে ফিরে পাবে? বাবুল যেন ইচ্ছে করেই তাকে দূরে সরিয়ে দিল। ঢাকায় যদি এত বিপদ, তা হলে বাবুল কেন থেকে গেল সেখানে? মামুনমামাকে সে একটুও পছন্দ করে না, তবু মামুনমামার সঙ্গেই তাকে পাঠিয়ে দেবার এত উৎসাহ কেন তার?

মামুন কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে বললো, এই যে হাওড়া ব্রীজ দেখছিস তোরা, দ্যাখ মাঝখানে কোনো সাপোর্ট নেই, এত বড় ঝুলন্ত সেতু এশিয়ায় আর নেই। ঐ দ্যাখ কত লোক এই সাত সকালেই গঙ্গার পানিতে ডুব দিতে এসেছে, হিন্দুরা মনে করে গঙ্গায় তিনবার ডুব দিলেই সব পাপ দূর হয়ে যায়। ঐ পাড়াটা হলো বড়বাজার, মাউড়া ব্যবসায়ীদের বড় বড় দোকান।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করলো, মামুনমামা, বেকবাগানে তোমার চেনা কেউ আছে?

মামুন উত্তর দিতে ইতস্তত করলেন। কলেজ জীবনে তাঁর অনেক হিন্দু বন্ধু ছিল। ভারত সীমান্তে পা দেবার পর থেকেই তাঁর মনে পড়ছে তাঁর এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রতাপ মজুমদারের কথা। কিন্তু দীর্ঘকাল কেউ কারুর খোঁজ রাখেননি।

মামুন বললেন, চেনা তো অনেকেই আছে, আস্তে আস্তে খুঁজে বার করতে হবে।

তারপর তিনি সুখুর কাঁধ চাপড়ে বললেন, এই দ্যাখ ট্রাম। আগে তো কখনো ট্রাম দেখিসনি!

সুখু বিজ্ঞের মতন বললো, ট্রাম তো ইস্টিমারের মতন। মাটির উপরে চলে।

মামুন বললেন, ঠিক বলেছিস! আর ঐ দ্যাখ, দু'তলা বাস!

হেনা বললো, বাবা, কইলকাতায় এত মানুষ?

এখন মাত্র সকাল সওয়া ছ'টা, তবু পথে মানুষের স্রোত শুরু হয়ে গেছে। ব্রীজ শেষ হবার পর হ্যারিসন রোডের মুখটায় রিকশা, ঠ্যালাগাড়ি ও ঝাঁকা মুটেদের জটলা পাকানো। এইটুকু এসেই মামুন উপলব্ধি করেছেন যে তাঁর যৌবনের সেই সুন্দর, ঝকঝকে, প্রাণবন্ত শহরের সঙ্গে এখনকার কলকাতার বিশেষ মিল নেই। বাড়িগুলির চেহারা মলিন, রাস্তাগুলো হাড়

বার করা, আর যেদিকেই চোখ যায়, শুধু মানুষ, অসংখ্য মানুষ।

বেকবাগান ও পার্ক সার্কাস অঞ্চল ঘুরে শেষ পর্যন্ত একটা ছোটখাটো হোটেল পাওয়া গেল। নাম 'হোটেল মদিনা'। কাছেই একটি মসজিদ, সেই মসজিদ থেকে তখন মাইক্রোফোনে আজানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

হোটেলের মালিকের মুখে উর্দু শুনে মামুন হতচকিত হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল, পার্টিশানের পর অবাঙালী মুসলমানরা সবাই কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে। তা তো সত্যি নয় দেখা যাচ্ছে। এখানে এখনো এরা ব্যবসা চালায়? আশেপাশের বস্তিও মুসলমানদের।

তিনখানা বেডওয়ালা একটা বড় রুম পাওয়া গেল, ভাড়া দৈনিক পঞ্চান্ন টাকা। খাওয়ার খরচ আলাদা। মামুনের কাছে যা রেস্ত আছে, তাতে দশ-বারোদিনের বেশি চলবে না। মঞ্জুর হাতে দুটো সোনার বালা আর হেনার কানে দুটো মুক্তোর দুল, এইগুলো বিক্রি করলে কিছু পাওয়া যাবে, কিন্তু তারপর?

একটি অল্প বয়েসী ছোকরা তাদের নিয়ে এলো দোতলার ঘরে। দেওয়ালের রং ফাটা ফাটা, অন্ধকার-অন্ধকার ভাব, ঘরের মধ্যে আরশোলার ডিমের গন্ধ। মঞ্জু আর হেনার ঘর পছন্দ হয়নি, তবু মামুন তাদের বোঝালেন যে আপাতত এখানেই কয়েকদিন থাকতে হবে। দু'একদিন বিশ্রাম নেওয়া যাক, তারপর খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে হবে অন্য কোথায় যাওয়া যায়।

ছোকরাটিকে একটা টাকা বখশিস দিয়ে তিনি বললেন, একটু জল খাওয়া তো বাবা, বড় তেষ্টা পেয়েছে। কী গরম এখানে!

ছোকরাটি টেবিলের ওপর রাখা একটি টিনের জগে টোকা মেরে বললো, সাব, এতে পানি ভরা আছে। চা-নাস্তা খেতে হলে আপনাদের নিচে যেতে হবে। এই হোটেলে রুম সার্ভিস পাবেন না।

মামুন হাসলেন। বর্ডার পার হবার আগে, দারুণ সঙ্কট আর উত্তেজনার মধ্যেও এস ডি ও শামসুদ্দীন সাহেব শিখিয়ে দিয়েছিলেন, ইন্ডিয়ায় গিয়ে আর পানি বলবেন না, জল বলবেন। ওরা পানি শুনলে ভুরু কুঁচকায়। সেই থেকে মামুন হিলির ডাক বাংলোয়, বালুরঘাটে, মালদায়, ট্রেনে সব সময় সচেতনভাবে পানির বদলে জল বলে এসেছেন। অথচ, কলকাতার হোটেলের এক বেয়ারা তাঁর মুখের ওপর পানি বলে গেল!

মামুনদের ছাত্র বয়েসে জলপানি বলে একটা কথা প্রচলিত ছিল। স্কলারশিপের বাংলা। হয়তো হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ছাত্রদের কথা ভেবেই শব্দটা তৈরি করা হয়েছিল। অনেকদিন মামুন জলপানি শব্দটা শোনেননি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর হিন্দু আর মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মিলনের যে-কোনো প্রস্তাবই অপরাধ বলে গণ্য করা হত। পশ্চিম পাকিস্তানীদের চোখে হিন্দু মাত্রই কাফের এবং পাপের সঙ্গী। বাঙালী মুসলমানদের তারা আধা হিন্দু মনে করেই তো ঘৃণা করেছে! ভারত অর্থাৎ ইন্ডিয়াতেও নিশ্চয়ই তার বিপরীত ধারণাই গড়ে উঠেছে।

হেনা একটা বন্ধ জানলা ঠেলে ঠেলে খুলে দিয়ে বললো, বাবা, কইলকাতা শহরে, কী রকম যেন একটা গন্ধ।

মামুন জিজ্ঞেস করলেন, কী রকম গন্ধ রে?

দুবার জোরে জোরে শ্বাস টেনে, ভুরুতে ঢেউ খেলিয়ে বললো, কী জানি, ঠিক বুঝা যায় না, তবে অন্য রকম, ঢাকার মতন না।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করলো, মামুনমামা, আমরা কতদিন থাকবো এখানে?

এ প্রশ্নের উত্তর মামুনের জানা নেই। তিনি সুখুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখবি, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঘরের সংলগ্ন বাথরুম নেই, যেতে হবে বারান্দার এককোণে। সেখান থেকে ঘুরে এসে হেনা বললো, কী নোংরা! কাপড় ছাড়ার জায়গা নাই।

কলকাতা শহরে পঞ্চান্ন টাকা ভাড়ার হোটেল আর কত ভালো হবে। নিরাপত্তা আছে কিনা সেটাই বড় কথা। সেদিক থেকে মনে হয় ভয়ের কিছু নেই।

মামুন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোরা কাপড় টাপড় ছেড়ে নে, আমি একটা ঘুরা দিয়ে আসি।

একতলায় এসে দেখলেন, একজন লোক ইংরিজি কাগজ পড়ছে। মামুন পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দিলেন। প্রথম পৃষ্ঠায় ছ' কলমের হেড লাইনে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের সংবাদ। যশোরে একটা সাইকেল রিকশার ওপর তিনটি লাশের ছবি। বিদেশী সাংবাদিকদের বিবরণ।

পশ্চিম বাংলাতেও খুনোখুনির সংবাদ রয়েছে প্রথম পৃষ্ঠাতেই। নকশালপন্থী, পুলিশ, সি পি এম আর কংগ্রেসীদের লড়াই। শামসুদ্দীন সাহেব সাবধান করে দিয়েছিলেন, কলকাতার কোনো কোনো অঞ্চলে নকশালপন্থীরা নাকি অচেনা মানুষ দেখলেই খুন করে।

একটা বাংলা কাগজ কেনার জন্য মামুন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। এপ্রিল মাসের রোদ শরীরে আলপিন বিঁধিয়ে দেয়। এর মধ্যেই ট্রামগুলো টই-টুম্বুর ভর্তি, বাইরেও লোক ঝুলছে। মামুন হাঁটতে লাগলেন, কোন্ রাস্তা কোন্ দিকে গেছে তা তাঁর মনে পড়লো না। তবে পাড়াটা চেনা চেনা লাগছে। আগের তুলনায় অনেক ঘিঞ্জি হয়েছে, ফাঁকা জায়গা এক ইঞ্চিও পড়ে নেই কোথাও।

খানিক বাদে তিনি এসে পৌঁছোলেন চৌরাস্তার মোড়ে। এই জায়গাটা তাঁর স্পষ্ট মনে পড়লো। বাঁ দিকে পার্ক স্ট্রিটের পুরনো কবরস্থান। সামনে আরও এগিয়ে গেলে নতুন খ্রীষ্টানী কবরখানা, সেখানে শুয়ে আছেন মাইকেল মধুসূদন। ডান দিকে কিছু দূরে পার্ক সার্কাস ময়দান। রিপন স্ট্রিটের একটা মেসে মামুন কিছুদিন ছিলেন, সে জায়গাটা এখান থেকে বেশি দূর হবে না।

একখানা আনন্দবাজার কিনে মামুন চা খেতে ঢুকলেন এক দোকানে। দোকানটিতে নাস্তা খাওয়ার জন্য লোকেদের বেশ ভিড়। অধিকাংশ খদ্দের এবং লুঙ্গিপরা বেয়ারারা কথা বলছে উর্দুতে। দু'একটি টেবিলে উর্দু সংবাদপত্র। মামুনের হাতে বাংলা কাগজ দেখে অন্যরা কি তাঁকে হিন্দু ভাবছে? প্রথম দিন এসেই কলকাতা শহরের এই চিত্রটি দেখবেন, মামুন একেবারেই তা আশা করেননি।

আনন্দবাজার পত্রিকাটা মামুন দেখলেন অনেকদিন পর। যখন তিনি মুসলিম লীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন, তখন এই পত্রিকার নীতির সঙ্গে তাঁর খুবই মতবিরোধ ছিল। মনে আছে, একবার তাঁরা রাস্তায় এই কাগজ পুড়িয়েছিলেন।

এই পত্রিকায় এখন চলিত ভাষায় খবর লেখা হয়। মামুন বরাবর সাধু বাংলাতেই লিখে এসেছেন। যশোর-খুলনা-চট্টগ্রামের অত্যাচার ও সঙ্ঘর্ষের খবরই বেশি। ঢাকায় গুলি চালনা বিষয়ে রয়টারের খবরের একটি ছোট বক্স আইটেম। চতুর্থ পৃষ্ঠায় আবদুল আজাদ নামে একজনের লেখা ঢাকায় পঁচিশে মার্চ রাত্রির নারকীয় ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। মামুন মন দিয়ে লেখাটি পড়লেন, সত্যি কথাই লিখেছে, পড়লে মনে হয় লেখকটি ঢাকার একজন সাংবাদিক। কিন্তু আবদুল আজাদ কে? ঢাকার সাংবাদিক লেখকদের প্রায় প্রত্যেককেই মামুন চেনেন, হয়তো এই লোকটি ছদ্মনামে লিখেছে।

পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে হাজার হাজার রিফিউজি আসছে ভারতে, সে খবরও রয়েছে প্রথম পৃষ্ঠায়, সঙ্গে ছবি। মামুন ভাবলেন, তিনিও তো রিফিউজি।

পাশের টেবিলে কয়েকটি ছোকরা বোম্বাইয়ের একটি সিনেমা বিষয়ে আলোচনা করছে। দিলীপকুমার নামে একজন নায়ক নাকি আসলে মুসলমান, সে রাজকাপুর নামে আর একজন নায়কের চেয়ে যে অনেক বড় অভিনেতা, সেটাই ওদের বক্তব্য। নার্গিস ও সায়রা বানুর মতন দুই সুন্দরী অভিনেত্রীর সঙ্গে বোম্বাইয়ের আর কোনো মেয়ের তুলনাই চলে না। মহম্মদ রফি হেমন্তকুমারের চেয়ে অনেক বড় গায়ক।

কলকাতার কোনো চায়ের দোকানে যে এ ধরনের কথাবার্তা শুনবেন, মামুন কল্পনাই করতে পারেননি। এ যেন মীরপুরের কোনো দোকান। কোনো অলৌকিক উপায়ে কলকাতার এই রেস্তোরাঁটি কি চব্বিশ বছর আগের জগতেই রয়ে গেছে? কোনো হিন্দু কি এ দোকানে আসে না? দোকানের দরজার ওপর 'নো বীফ' লেখা একটা ছোট্ট বোর্ড ঝুলছে।

কলকাতা থেকে মাত্র শ'খানেক মাইল দূরেই মুসলমান এখন মুসলমানকে মারছে, খুন হচ্ছে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ, মুসলমানের ঘরের মেয়েদের ধর্ষণ করছে মুসলমান সৈন্য, গ্রামের পর গ্রাম জ্বলছে আগুনে, সে সম্পর্কে এখানে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই? এরা কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না? ওদের সামনে টেবিলে যে উর্দু কাগজ পড়ে আছে, তাতে কী লিখেছে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা সম্পর্কে? মামুন উর্দু শুনে বুঝতে পারলেও পড়তে পারেন না। ঐ লোকগুলির সঙ্গে কথা বলতেও মামুনের ভয়

করলো। নিদারুণ একাকীত্ব বোধের অবসাদে ছেয়ে গেল তাঁর বুক।

হোটেলে ফিরে এসে মামুন লম্বা এক ঘুম দিলেন। বিকেলে একবার ঘুম থেকে উঠে বেরুবার কথা চিন্তা করেও বেরুলেন না শেষ পর্যন্ত। কোথায় যাবেন? একটা কোনো চেনা মানুষের ঠিকানা তাঁর সঙ্গে নেই। এম আর আখতার মুকুলরা সদলবলে এসে কোথায় উঠবেন, সেটাও যদি জেনে রাখতেন! সহায়সম্বলহীন অবস্থায় কতদিন থাকতে পারবেন এই কলকাতা শহরে। এত বড় শহর, এর প্রকাণ্ড উদর, এখানে যে আসে সে-ই ঠাঁই পেয়ে যায়, তারপর কে মরলো, কে বাঁচলো, তা কেউ খেয়ালও করে না।

সন্ধে হতে না হতেই আবার ঘুমিয়ে পড়লেন মামুন। তাঁর শরীর পুরোপুরি সুস্থ নয়, টাইফয়েডের পরে এখনও গায়ে জোর পাননি।

হোটেলের আব্বাস নামে একটি বাচ্চা বেয়ারাকে এর মধ্যেই হাত করে নিয়েছে মঞ্জু, সে নিচের তলা থেকে চা-খাবার এনে দেয়। মঞ্জু আর হেনা দুজনে মিলে ঠেলাঠেলি করেও মামুনকে কিছু খাওয়াতে পারলো না।

পরদিন মামুন জোর করে ঝেড়ে ফেললেন অবসাদ। একটা কিছু করতেই হবে। তিনি ঠিক করলেন, তিনি কোনো খবরের কাগজের অফিসে যাবেন। সাংবাদিকরাই বলতে পারবে, পূর্ব বাংলার নেতাদের মধ্যে কে কোথায় উঠেছেন, মুক্তি আন্দোলন চালাবার জন্য কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি নিজেও সহজভাবে কথা বলতে পারবেন সাংবাদিকদের সঙ্গে।

আনন্দবাজার অফিসটা বর্মণ স্ট্রিটে না? একবার যেন গিয়েছিলেন কার

কাঁচের দরজার ওপাশে একটা কাউন্টার। তার এক পাশ দিয়ে লোকজন যাতায়াত করছে। মামুন সেখান দিয়ে ঢুকতে যেতেই একজন বেশ মোটা গোঁফওয়ালা বলিষ্ঠ ব্যক্তি প্রায় হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো, এই যে, কোথায় যাচ্ছেন?

মামুন বিনীতভাবে বললেন, সম্পাদক মশাইয়ের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

গোঁফওয়ালা লোকটি মুখে হাসি ছড়িয়ে বিদ্রূপের সুরে বললো, এডিটরের সঙ্গে দেখা করতে চান? চাইলেই কি দেখা করা যায় নাকি? আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

মামুন বললেন, জী না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাই।

—তবে দেখা হবে না। তিনি এমনি এমনি কারুর সঙ্গে দেখা করেন না।

—নিউজ এডিটরের সঙ্গে দেখা হতে পারে কী?

—তিনি খুব ব্যস্ত। যার তার সঙ্গে দেখা করেন না।

—তা হলে অন্য কোনো সাংবাদিকের সঙ্গে যদি দেখা করা যায়

—আপনার কী দরকার, কোথা থেকে এসেছেন, সেটা বলুন।

—দেখুন, আমি নিজেও একজন সাংবাদিক, ঢাকা থেকে এসেছি, যদি এখানে কারুর সাথে একটু আলাপ করা যায়

গোঁফওয়ালা লোকটি লাফিয়ে উঠে বললো, ঢাকা থেকে? জয় বাংলা? হ্যাঁ, হ্যাঁ আসুন আসুন। এই যে স্লিপে নাম লিখুন

সঙ্গে। কিন্তু কাগজটা নিয়ে দেখলেন অন্য ঠিকানা। এই জায়গাটা কোথায়? পোস্টাল জোন যখন কলিকাতা-১, তখন জি পি ও-র কাছাকাছি হবে।

মামুন বেরুবার উদ্যোগ করতেই হেনা জিজ্ঞেস করলো, মামা, আমরা কইলকাতা শহর দেখবো না?

মামুন বললেন, দেখবি, দেখবি, আমি তোদের নিয়ে যাবো সব জায়গায়, দু'একটা দিন সবুর কর।

মঞ্জু খাটের ওপর পা মেলে বসে আছে, শাড়িটা এলোমেলো, চুল বাঁধেনি, চোখ দুটো ফুলো ফুলো, সে যে গোপনে কান্নাকাটি করছে, তা দেখলেই বোঝা যায়।

মামুন বললেন, তোরা ঘর থেকে এক পাও বাইরাস না। সুখুকে দেখবি, যেন হুট করে রাস্তায় না যায়। আমি ঘুরে আসতেছি।

কলকাতা শহরে মামুন অন্তত দশ বারো বছর কাটিয়েছেন, এখন এই শহরে রাস্তা হারিয়ে ফেললে খুব লজ্জার বিষয় হবে। মোড়ের মাথায় এসে তিনি এসপ্লানেড লেখা একটা ট্রামে চড়ে বসলেন।

বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর তিনি পেয়ে গেলেন আনন্দবাজার অফিস। মস্ত বড় লোহার গেট, অনেকগুলি দ্বারোয়ান, এই পত্রিকার আগেকার অফিসের সঙ্গে কোনো মিলই নেই। একজন দ্বারোয়ান ভেতরে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিল।

লোকটির ব্যবহার সম্পূর্ণ বদলে গেল, খাতির করে নিজে এসে মামুনকে লিফটে তুলে নিয়ে গেলেন ওপরে, একটা টেবিলের সামনে গিয়ে বললেন, অমিতবাবু, ইনি ঢাকা থেকে এসেছেন, রিপোর্টার

অমিতবাবুও হাসি মুখে বললেন, আরে মশাই, বসেন, বসেন! বাড়ি কোন্ জেলায়? সিলেট নাকি?

সেই টেবিলের উল্টোদিকে একজন লম্বা মতন লোক নিউজ প্রিন্টের প্যাডে খসখস করে দ্রুত কী যেন লিখে চলেছে, মামুন তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, গাফ্‌ফার না?

লোকটি মুখ ফিরিয়ে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলকভাবে চেয়ে রইলো, তারপর বললো, মামুন ভাই? আমি শুনেছিলাম আপনাকে ধরে নিয়ে গেছে? ছাড়া পেলেন কী করে?

মামুন বললেন, না আমাকে ধরতে পারে নাই। হিলি বর্ডার দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীকে পেয়ে মামুন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। তাঁকে নিজের মুখে পরিচয় দিতে হলো না এখানে। গাফ্‌ফার কয়েকদিন আগেই এখানে এসেছেন, অনেকের সঙ্গে চেনা হয়ে গেছে।

অমিতাভ চৌধুরীর সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ করার পর গাফ্‌ফার বললেন, চলেন, আপনারে সন্তোষদার কাছে নিয়ে যাই। তিনিই এই কাগজের সর্বেসর্বা।

কিন্তু সন্তোষকুমার ঘোষের ঘরে তখন খুব ভিড়, ভেতরে ঢোকা গেল না। গাফ্ফার তাঁকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে অন্য কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার পর এলেন দেশ পত্রিকার ঘরে। সম্পাদকের সামনে গিয়ে বললেন, সাগরদা, ইনি সৈয়দ মোজাম্মেল হক, আমাদের ঢাকার খুব শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক, একটা ডেইলি পত্রিকার এডিটর ছিলেন। জঙ্গীবাহিনী এঁকে ধরতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে কোতল করে দিত। বহু কষ্ট করে পালিয়ে এসেছেন।

দেশ পত্রিকার সম্পাদক মধ্যমাকৃতি, হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, দেখলে খুব গম্ভীর মনে হয়। গাফ্ফারের কথা শুনে তিনি শুধু হাত তুলে নমস্কার করলেন, মুখ দিয়ে কিছু উচ্চারণ করলেন না।

মামুন বললেন, আমি এক সময় দেশ পত্রিকা নিয়মিত পড়েছি। সিক্সটি ফাইভের পর তো আমাদের ওখানে এদিককার কোনো পত্র-পত্রিকাই পাওয়া যেত না। অনেকদিন টাচ নাই। আজ আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হলাম।

সম্পাদক মশাই এবারেও একটিও কথা বললেন না।

গাফ্ফার বললেন, জানেন সাগরদা, দুটি মেয়ে আর একটি বাচ্চাকে নিয়ে মামুন-ভাই যেভাবে প্রায় দেড় শো মাইল রাস্তা পার হয়ে বর্ডার ক্রশ করে এসেছেন, সে এক রোমহর্ষক ব্যাপার।

সম্পাদক মশাই হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পেছন ফিরলেন। এবার বোঝা গেল তাঁর নীরবতার রহস্য। জানলার কাছে গিয়ে পানের পিক ফেলে এসে তিনি মুখে সহৃদয় হাসি ফুটিয়ে বললেন, আপনার অভিজ্ঞতার কথা লিখে দিন না আমাদের কাগজের জন্য। পূর্ব বাংলায় সত্যি সত্যি কী ঘটছে সব পাঠকরা জানতে চায়। দেরি করবেন না, কালই লিখে আনুন।

মামুন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আপনি যে বললেন, এতেই আমি ধন্য হয়ে গেলাম। লেখার চেষ্টা করবো অবশ্যই, যদি আপনার পছন্দ হয়...

খানিক বাদে গাফ্ফার মামুনকে নিয়ে ঢুকলেন সন্তোষকুমার ঘোষের ঘরে। ছোটখাটো চেহারার মানুষটি, গায়ে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি, তার এক জায়গায় মাংসের ঝোলের দাগ। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। স্বভাবটি যে অত্যন্ত ছটফটে তা অল্পক্ষণ দেখলেই বোঝা যায়। বাঁ হাতে একটা কাগজ তুলছেন, ডান হাতে একটা কাগজ ছুঁড়ে ফেলছেন, লম্বা সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে জল খেলেন এক চুমুক, আবার ধরিয়ে ফেললেন একটা সিগারেট। অন্য একজনের সঙ্গে কী নিয়ে যেন বকাবকি করছিলেন, সেই ব্যক্তিটি চলে যাবার পর গাফ্ফার সামনে এসে মামুনের পরিচয় দিলেন।

সন্তোষকুমার কপালের কাছে হাত তুলে বললেন, আস্সালাম আলাইকুম। বসুন! কী নাম বললেন? সৈয়দ মোজাম্মেল হক? নামটা চেনা চেনা...

ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করতে করতে ফস্ করে পকেট থেকে একটা ক্যাটকেটে সবুজ রঙের চিরুনি বার করে চুল আঁচড়ে নিলেন অকারণে। তারপর বললেন, সৈয়দ মোজাম্মেল হক? আপনি এক সময় সওগাতে কবিতা লিখতেন না? 'আশমানের প্রজাপতি' নামে আপনার কবিতার বই আছে, আমি পড়েছি। কিছুদিন 'দিন কাল' নামে একটি ডেইলি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'অনুসন্ধিৎসু' ছদ্মনাম দিয়ে আপনিই তো একটা কলাম লিখতেন, তাই না?

মামুন স্তম্ভিতভাবে তাকিয়ে রইলেন মানুষটির দিকে।

গাফ্ফার বললেন, মামুন ভাই, এই হচ্ছেন সন্তোষদা। ফ্যানটাসটিক মেমারি। বাংলা ভাষায় বোধ হয় একটাও ছাপার অক্ষর নাই, যা উনি পড়েন নাই। আমার নাম শোনামাত্রই উনি বলেছিলেন, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটা আপনার লেখা না?

সন্তোষকুমার গাফ্ফারকে এক ধমক দিয়ে বললেন, চুপ করো! আমি যখন কথা বলবো, তখন অন্য কেউ কথা বলবে না। আপনি পঁচিশে মার্চ রাত্তিরে ঢাকায় ছিলেন? মিলিটারি অ্যাকশান কিছু দেখেছেন নিজের চোখে?

মামুন বললেন, অনেক কিছুই দেখেছি।

সন্তোষকুমার বললেন, কালই সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখে আনুন। পার্সোনাল টাচ দিয়ে লিখবেন, প্রবন্ধ ট্রবন্ধ নয়, ঠিক যা-যা দেখেছেন

মামুন বললেন, দেশ পত্রিকার সাগরময় ঘোষবাবুও আমাকে ঐ বিষয়ে লিখতে বললেন।

সন্তোষকুমার চোখ রাঙিয়ে বললেন, ঐ সব দেশ পত্রিকা টত্রিকা ছাড়ুন। আমি বলছি, এখানে লিখতে হবে। দেশে লিখে ক' পয়সা পাবেন? এখানে রিফিউজি হয়ে এসেছেন, টাকার দরকার নেই? উঠেছেন কোথায়?

—একটা হোটেলে।

—ব্যাঙ্ক লুট করা টাকা এনেছেন নাকি?

মামুন এবারে হাসলেন। এই মানুষটির কথাবার্তায় একটা কঠিন ব্যক্তিত্ব আরোপের চেষ্টার মধ্যেও যে একটা সরল ছেলেমানুষী আছে, তা বুঝতে দেরি লাগে না।

সন্তোষকুমার আবার বললেন, গাফ্ফার এখানে লিখছে। সৈয়দ সাহেব, আপনি ইচ্ছে করলে এই কাগজে একটা রেগুলার ফিচার লিখতে পারেন। তাতে আপনার এখানকার খরচ চলে যাবে।

মামুন বললেন, আমাকে সৈয়দ সাহেব বলবেন না। বড্ড গালভারি শোনায়। অনেকেই আমাকে মামুন বলে ডাকে। আপনি আর আমি বোধ হয় এক বয়েসীই হবো।

সন্তোষকুমার আবার একটু ট্যারা হয়ে কিছু চিন্তা করে বললেন, আপনি যখন সওগাতে কবিতা লিখতেন, তখন আমি চাকরি করতুম মোহাম্মদী কাগজে, তা জানেন? আমার বাড়ি ছিল ফরিদপুর। আপনার বাড়ি...দাঁড়ান, দাঁড়ান, বলবেন না, উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছে, কুমিল্লা। তাই না?

আধঘণ্টা পরেই মামুনের মনে হলো, এই মানুষটির সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের চেনা। তিনি একবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো অনেককিছু জানেন, কলকাতায় আমার এক পুরনো বন্ধুকে খুঁজে বার করতে চাই, প্রতাপ মজুমদার, তাঁর কোনো সন্ধান দিতে পারেন?

—প্রতাপ মজুমদার? তিনি কী লেখেন? না, ঐ নামে কোনো লেখক নেই। কী করেন তিনি?

—মন্সেফ ছিলেন, এখন বোধ হয় সাবজজ বা ডিস্ট্রিক্ট জজ হয়েছেন। কলকাতায় থাকেন কিনা তাও অবশ্য জানি না।

—সেভাবে তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক যদি বাড়িতে টেলিফোন থাকে, গাইডে ঠিকানা পাওয়া যাবে।

মামুন চমৎকৃত হয়ে ভাবলেন, তাই তো, টেলিফোন গাইড দেখার কথা তো তার আগে মনে আসেনি?

সন্তোষকুমার আবার চ্যাঁচামেচি করে উঠলেন, গাইডটা কোথায় গেল? আর কাজের সময় ঠিক জিনিসটা পাওয়া যায় না, গুনধর, গুনধর! স্টুপিড কে এখান থেকে গাইডটা নিয়ে গেছে? যাও, তোমার আর চাকরি নেই!

টেলিফোনের ওপর সামনেই মোটা গাইডটা রাখা। গুনধর নামে বেয়ারাটি সেটি নিঃশব্দে এগিয়ে দিল। সন্তোষকুমার পাঁচ টাকার একটা নোট বখশিস হিসেবে তাকে ছুঁড়ে দিয়ে ফরফর করে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। তারপর বললেন, না, ও নামে কেউ নেই। আর কেউ চেনা নেই?

মামুন বললেন, আর একজন ছিল বিমানবিহারী, তার পদবী মনে নাই।

—ওভাবে কলকাতায় মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিছুদিন থাকুন, আস্তে আস্তে খোঁজ পাবেন। লেখাটা কিন্তু কালকেই চাই। আপনার কিছু টাকা অ্যাডভান্স লাগবে?

খানিকটা পরে গাফ্ফারের সঙ্গে আনন্দবাজারের গেট দিয়ে বাইরে এসে মামুন বললো, বুকখানা এখন হাল্কা লাগছে। এদেশে আমাদের শুভার্থী আছে সেটা ঠিক আগে বুঝি নাই। আচ্ছা গাফ্ফার, আনন্দবাজার অফিসে ঢোকার এত কড়াকড়ি কেন? গেটে পাহারাদার, খবরের কাগজের অফিস, অথচ কেমন যেন দুর্গ দুর্গ ভাব!

গাফ্ফার বললেন, নকশালদের ভয়ে এই ব্যবস্থা। নকশালরা যদি বোমা মেরে প্রেস উড়িয়ে দেয়! বামপন্থীদের এই কাগজের উপর খুব রাগ। এরা তো বলে জাতীয়তাবাদী দৈনিক, ইন্ডিয়াতে জাতীয়তাবাদ মোটেই ফ্যাসানেবল নয়। কলকাতার অনেক দেয়ালে দেখবেন চীনের চেয়ারম্যানের নামে প্রশস্তি।

মামুন বললেন, আনন্দবাজার বরাবরই অ্যান্টি পাকিস্তানী কাগজ। ঢাকায় বসে আমরা কেউ আনন্দবাজারের নামও উচ্চারণ করতাম না। এখন এই কাগজই আমাদের বড় সাপোর্টার। তুমি আর আমি এই কাগজের লেখক হতে চলেছি। একেই বলে নিয়তি! (ক্রমশ)

অঙ্কন : অনুপ রায়

মজার মুশকিল

সুনীল বসু

পৃথিবীতে উই পোকাও যা উচ্চিংড়েও যা পিপড়েও যা
মানুষও তাই, অবশ্য আমার কাছে
অবশ্য মন-মেজাজের—
অবশ্য আবহাওয়া অনুসারে—

এখন মানুষের টাক নিয়ে হয়েছে একটা মুশকিল
স্বামীদের টাককে কি রূপসী স্ত্রী-রা ভালবাসেন
নায়কের টাককে কি রূপসী নায়িকারা সহ্য করেন
আমি ভেবে দেখি কোন্ কোন্ বিখ্যাত মানুষদের
মাথা ভর্তি টাক ছিল—
টাক ছিল লেনিনের
টাক ছিল ওয়ালেস স্টীভেন্সের
টাক ছিল ভেরলেনের
টাক ছিল সোফিয়া লোরেনের স্বামীর
এবং অতএব আমিও টাকের অধিকারী
স্ত্রীর মন্তব্যে : ইস্ যদি তোমার টাক না থাকত !

পৃথিবীতে আমিও একটা পোকা, পিপীলিকা অথবা উচ্চিংড়ে
যদি একটা টাক আমার থেকেই থাকে
তাতে এতো মুষড়ে পড়ার কী আছে ?
আমি তো মোটেই বিখ্যাত না ।

কেউ নেই অপেক্ষায়

পারভেজ আহমেদ খান

ডায়রীতে লেখা ছিল চার সাত শূন্য ছয় পাঁচ সাত মিলিয়ে ফোন
করতে ও প্রান্তে বিস্ময় আপনি ঢাকায় এক্ষুনি আসছি তুমি এলে
অদেখা দীর্ঘ দিনের ডাক—পরিচিতি

স্বদেশ একদিন এ ভূমি তাই ছিল অথচ পর্যটক এই আমার আজকের
পরিচয় সোৎসাহে সবকিছু দেখালে আনকোরা নতুন সাজগোজ
চেনা শহরটাই বদলে গেছে আমিও কি সেই আমি আছি নির্বাসিত
গৃহহীন উদ্বাস্তুর ছাপ নিয়ে কেটে গেল কতকাল

কাছাকাছি এসেছি আমরা নির্জন ধানমণ্ডি লেক শীতের আদুরে বিকেল
আবেশী চুমু থিরিথিরি চোখের পাতায় কি গভীরে বলতে চেয়েছি শেষ
কথা···এড়িয়ে গেছ তখনি মায়াবী বাক্যটা উচ্চারণ করতে দাওনি
দৃষ্টিতে স্পষ্ট মানা ছিল এবং ছিল এক ধূসর সত্যি

যে কবিতা লেখে
নির্বাসিত
এবং গৃহহীন
তার থাকতে নেই বিশেষ কেউ
থাকে না কেউ অপেক্ষা করবার

সেই ফুল

মনুজেশ মিত্র

আমার দুহাতে সেই ফুল দাও ।
মেঘের কুচির মত বৃষ্টি হয়ে ঝরে ঝরে
পড়ুক ফুলের রেণু—আশ্চর্য মমতা—
আমার শিকড়ে ।
যেমন অনেক দূর থেকে এসে তৃষ্ণা নিবারণ,
আমিও তো দূর থেকে আসি এইভাবে ।
কিছু কি রয়েছে এত করুণ কোমল
যেখানে নিষ্ঠুর ঋজু কর্কশ পুরুষও চিরনত
রমণীর নিয়ত গভীরে ।
গভীর শিকড়ে, আহা, সেই স্থির আশ্চর্য মমতা
ফোটায় মায়াবী ফুল ।
পরাগে জড়িয়ে থাকে স্মৃতি—ভালবাসা—
থাকে নিষ্কম্প সুন্দর ।

পিছোতেই চাই

অজিত মিশ্র

আমার মনে নেই মায়ের দুধ খাওয়ার
প্রথম আস্বাদ
কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে
তোমার বুকে প্রথম যেদিন মুখ ঠেকিয়ে শিশু হয়েছিলাম···

প্রথম যেদিন প্রতারিত হলো আমার শৈশব
প্রথম যেদিন কেউ আমার সুখ্যাতি করলো
ঠাকুমা মারা যেতে আমার প্রথম আত্মীয়বিয়োগের যন্ত্রণা
আমার প্রথম মিথ্যে কথা বলা
এ-সবই ক্রমশ ফিকে হয়ে হলুদ বিবর্ণ হয়ে গেছে—

কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে
প্রথম যেদিন তোমার কুমারী শরীরে ঘ্রাণ নিতে নিতে
ডুবন্ত জাহাজের মতো তলিয়ে গিয়েছিলাম···

সুন্দরের পায়ে আত্মসমর্পণের সেই প্রথম স্মৃতি
আমি আজও ভুলতে পারিনি

এগিয়ে যাওয়া মানে তো
সেই সুখস্পর্শ স্মৃতি থেকে
সেই অতলান্ত প্রেম থেকে
ক্রমাগত দূরে সরে যাওয়া

বাস্তবিক
জীবনের একমাত্র দুর্লভ অভিজ্ঞতাকে ফিরে পেতে
আমি পিছোতেই চাই ॥

গোধূলি যখন বীণাপাণি

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

পালামের হাওয়াই বন্দর থেকে একবার
ইয়োরোপে যাবার পথে জন্মভূমির
রেখা প্রসারিত করে নিয়ে গিয়েছিলাম
ইটালি পর্যন্ত, মিকেলেঞ্জেলোর আত্মপ্রতিকৃতি ছেয়ে
দেখেছিলাম বাশুলির কাছ থেকে সদ্য-স্বপ্নাদেশ-পাওয়া
চণ্ডীদাসের হাসি।
অন্য একবার
ওস্তাদ আলাউদ্দীন খানকে দেখি
খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর পৌত্রকে হাওড়া স্টেশনের
ছিন্নমস্তা ভিড়ের ভিতরে তাঁর চিরায়ত সরোদ ছাড়াই
নিরপেক্ষ মানুষের ধুতুরাজঙ্গলে দাউদাউ
'আশিস্, আশিস' ডাক আমাকে আমার
নিজস্ব মৃত্যু পর্যন্ত নিষ্কৃতি দেবে না।
আরেকবার
চেয়ে দেখি স্কাইলাইন চিরে
মেহগনি রঙের দুহিতা
মিশে যাচ্ছে সূর্যাস্তে, আমার
এ বিষয়ে খুব স্পষ্ট কোনো
ধারণা ছিল না, কার ঘরে
জন্ম নিয়ে বিশ্বচরাচরে
সে হলো দুলহন স্বয়ংবৃতা,
এসব বোঝার অবকাশ
না দিয়ে আমাকে ওর পিতা
সাব্যস্ত করলেন কেন অতীন্দ্রিয় কে কমিশনার
সেসব জানি না।
শুধু জানি
একবারই এসব ঘটে, গোধূলি যখন বীণাপাণি!

নিস্তব্ধ মগ্নতায়

নীরোজ প্যাট্রিক

যখন বুকের কাছে লুকোনো পিস্তল
আর হাতের মুঠোয় কলম ছিল না—
তখন স্বপ্ন দেখলে চমকে উঠতাম
অজানিত ভয়ে কিংবা তীব্র আনন্দে।

যে-সব দেখতে চাওয়া একান্তই অসভ্যতা
সেই সবই স্বপ্নে যেদিন যেদিন দেখে ফেলতাম—
চমকে বিছানা ছেড়ে উঠে
এপাশ-ওপাশ তাকাতাম—সামনে
কেউ নেই'ত!

ছিঃ! কি সব আজে বাজে দৃশ্য—
রুমকির পোশাক-মোড়া বাইবেটা-ই ভীষণ
সুন্দর, ওর ভেতরটা এত্ত বিশ্রী!
ভাবলে গা তেতে উঠতো পাগলা-জ্বরে,
লজ্জায় কুঁকড়ে শুয়ে থাকতাম চুপচাপ
আর কাঁপতাম—ওর গোপন জিনিস
দেখে ফেলার আনন্দে।

যেদিন ঝণ্টুদা-দের হয়ে অ্যাকশনে
নামতে হতো—স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে, এবং
বরাদ্দ আগুনে-বোমাটা ছুঁড়ে দিয়ে
পালিয়ে যাবার সময় যদি দেখতাম—
ব্যাটন উঁচিয়ে পুলিশ তেড়ে আসছে পেছনে,

সেদিন মাঝপথেই আমচকা ঘুমটা
ভেঙে গেলে—ঝণ্টুদাকে গালাগালি করতাম
আর দেখতাম, বাবা শ্বাস-কষ্টে কাতরাচ্ছেন!

তাকে

ওয়াজেদ আলি

তাকে ফেলে দিতে পারবে না
সে তোমার হৃদয়-আঁধারে জোনাকির মায়া
শত বাদলেও মরে না কখনো
শুধু জেগে জেগে একা
ছুঁয়ে থাকে তোর গোপন বিজন

তাকে মুছে দিতে পারবে না
সে তোমার ব্যথার আকাশে রাঙা ধ্রুবতারা
শত ঝঞ্ঝাতেও মরে না কখনো
শুধু জ্বলে জ্বলে একা
এঁকে যায় তোর পথের নিশানা

বেঁচে থাকা

শান্তিকুমার দাস

গুঁড়ো গুঁড়ো সময়কে সেকেণ্ডের কাঁটায়
মোরগটা ঠোকরাচ্ছে। চেনা সূর্য দিয়ে শুরু
দিনের বেশ কিছুটা সময় তৈরি ছকের সঙ্গে
মোকাবিলা…

তারপর…
অনেক কিছুর ওপর যেমন হাত থাকে না,
নিয়ন্ত্রণও। সময়ের একটা দাগও পড়ে না কোথাও…

বুঝি, বালিশের তলায় চাপা পড়ে যায় আমার
বেঁচে থাকা…

ইমরানের ইচ্ছামৃত্যু

তানাজী সেনগুপ্ত

বেনসন হেজেস ফাইনালে পাকিস্তান পঞ্চাশ ওভারে করলো ন উইকেটে একশো ছিয়াত্তর। ভারতের জেতা উচিত। কিন্তু এই 'উচিত' ব্যাপারটাকে যিনি পছন্দ করবেন না তিনি তখন প্রবল উৎসাহে লাঞ্চ সারছেন। একটি বৃহদাকার পুষ্ট অস্ট্রেলীয় কলা, আঙুর, প্রচুর স্টিক, ফ্রুট স্যালাড এবং অন্যান্য আরও ফল নির্যাতিত হচ্ছে। এই লাঞ্চ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ভারতের এক 'ছোটখাটো' ক্রিকেটার প্রশ্ন করলেন—'ইম্মি, ব্যাপারটা কি ?' ইম্মি বুঝলেন না, ভাবলেন মাঠের একটি ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন। চেতন শর্মার বলে পরিষ্কার কট বিহাইন্ড হয়েছিলেন তিনি, আম্পায়ার দেন নি। সুতরাং প্রশ্নের জবাবে জড়তাহীন কণ্ঠে জানালেন, 'বেরিয়ে আসতে গিয়ে দেখি আম্পায়ার হাত তোলে নি। তাই...' —'ইম্মি' অর্থাৎ ইমরান আহমদ খান নিয়াজি এরকমই। সরাসরি, স্পষ্ট, ভানহীন। যা ঘটনা তা সরাসরি বলা পছন্দ করেন। একই সঙ্গে ইমরান অবশ্য আরও কিছু। আপসহীন, বিতর্কিত, দলের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে অটল, এক জমকালো আকর্ষণীয় ক্রিকেটার। উপরের ঘটনাটির যিনি বর্ণনাকারী সেই 'ছোটখাটো' ক্রিকেটার সুনীল গাওস্কর এবং ইমরান দুজনেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নিচ্ছেন আর কয়েকদিনের মধ্যেই। অর্থাৎ ক্রিকেট মাঠ থেকে হারাতে চলেছে দুই ভিন্নধর্মী ক্রিকেট-চরিত্র এবং আভিজাত্য।

'আভিজাত্য' শব্দটির উপর জোর দিতে চাই। ইমরানের সঙ্গে এই ব্যাপারটির বেন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। পাকিস্তানে বড় ক্রিকেটারের অভাব কোন দিনই হয়নি। ফজল মামুদ, হানিফ মহম্মদ, ইন্তিখাব আলম, মুস্তাক মহম্মদ, মজিদ খাঁ, জহির আব্বাস,

আসিফ ইকবাল, সরফরাজ নওয়াজ, ওয়াসিম বারি ইত্যাদি গালভরা নাম কিন্তু ইমরানের মত আর কেউ কি পেরেছেন তাঁর আভিজাত্যের ছোঁয়ায় পাকিস্তানী ক্রিকেটে একটা টগবগে নতুন স্রোত বইয়ে দিতে ? খেলার ফল যাই হোক না কেন, দল হিসেবে পাকিস্তানই যে এখন সব চেয়ে সংগঠিত, নিবেদিত প্রাণ এবং লড়াই ছাড়া এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বো না—এই মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ ক্রিকেটারে ভর্তি তার প্রধান প্রেরণা-শক্তি কি নয় স্বয়ং অধিনায়ক ইমরান ? একজন অস্ট্রেলীয় সাংবাদিক লিখেছেন, 'ইমরানের জন্য মাঠের মধ্যে ওঁর খেলোয়াড়রা প্রাণও দিতে পারে এবং এই প্রাণ দেওয়া শব্দগুলো এত সহজে লিখতে পারছি তার কারণ আক্ষরিক অর্থে সত্যিই ওঁরা প্রাণ দিতে পারে।'

ইমরানের আগে পাকিস্তানী ক্রিকেটের অবস্থা এক ঝলক একটু দেখে নেওয়া যাক। তা হলেই বোঝা যাবে খেলোয়াড় ইমরানের চেয়েও অধিনায়ক ইমরান পাকিস্তানী ক্রিকেটে কেন এত অভিপ্রেত। গত দশ বছরে যেখানে ভারতে ৩/৪ বারের বেশি অধিনায়ক বদল করা হয়নি, পাকিস্তানে সেখানে বদল করা হয়েছে অন্তত ৯ বার—ইন্তিখাব আলম (২ বার), মজিদ খাঁ, আসিফ ইকবাল, মুস্তাক মহম্মদ, ওয়াসিম বারি, জভেদ মিয়াদাদ, জহির আব্বাস এবং ইমরান খাঁ ঘুরে ফিরে এসেছেন। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে খেলা ছেড়েছেন মুস্তাক মহম্মদ, জহির আব্বাসের মত নামী খেলোয়াড়রা। মুস্তাককে অধিনায়কত্ব দেওয়া হয়নি ১৯৭৯-৮০ সালের ভারত সফরে কর্মকর্তাদের খেয়ালিপনায়। জহির এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন পাকিস্তানী বোর্ডের তৎকালীন সদস্যদের প্রতি যে তরুণ ক্রিকেটারদের লিখিত

ছবি : তপন দাস

কপিলদেব ছবি : গৌতম কয়াল

উপদেশ দিয়েছিলেন, 'বোর্ড কর্মকর্তাদের আগে কিভাবে হাতে রাখতে হয় তা শেখো, তারপর ব্যাট হাতে মাঠে নেবো।' শুধু খেলোয়াড়রা নয় কর্তারাও একের হাতে অন্যে নাজেহাল হয়েছেন পাকিস্তানে। কিছু দিন আগে লেফট্যানেন্ট কর্নেল রফি নসিম, পাকিস্তানী ক্রিকেট বোর্ডের অনারারি সেক্রেটারি শারজায় চ্যাম্পিয়নস্ ট্রফি দেখতে দেখতে খবর পেলেন তিনি বরখাস্ত হয়েছেন এবং তাঁর জায়গায় এসেছেন অন্য একজন। এই ছিল পাকিস্তানী ক্রিকেটের ভিতরের চেহারা। এখন ব্যাপারটা অনেকটা বদলে গেছে। আগে বোর্ড-কর্তারা নাচাতেন খেলোয়াড়দের। এখন খেলোয়াড় শিরোমণি ইমরান নাচান কর্তাদের। যদিও এই কর্তৃত্বের কথা ইমরান স্বীকার করেন না, তথাপি এখন যে খেলোয়াড়-নির্বাচনে ইমরানই শেষ কথা এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। জহির আব্বাস ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে, 'দেশকে যেহেতু ইমরান বেশ কিছু অবিশ্বাস্য জয় এনে দিয়েছে এবং দলকে বেঁধেছে একতায় তাই ও এখন যা বলবে বোর্ড মেম্বাররা তা ঘাড় হেঁট করে শুনবে, শুনতে বাধ্য হবে—সারা দেশ ইমরানের পিছনে এটা না বোঝার মতো মূর্খ তাঁরা নয়। অবশ্য নিজের দক্ষতায়, আহত হাঁটু নিয়ে আবার ফিরে এসে ইমরান যে আদর্শ দলের সামনে রেখেছে তাতে খেলোয়াড়রা উদ্বুদ্ধ না হয়ে পারে নি। এবং এই আদর্শ সে কাজ করেই স্থাপন করেছে। কি ব্যাটিং, কি বোলিং কি ফিল্ডিং সব দিক দিয়েই ইমরান নিজেকে অগ্নিপরীক্ষায় প্রমাণ করেছে। দলের সিনিয়র সুপারস্টার জভেদ মিয়াদাদকেও সে কৌশলে নিজের পক্ষে টেনে আনতে পেরেছে। ইমরান অনেকটা ইয়ান চ্যাপেলের মতো যে জানে নিজেকে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হয়।'

অনেকের অভিযোগ পাকিস্তানী দলে ইমরানই এখন প্রথম কথা, ইমরানই শেষ কথা এবং এই 'ডিক্টেটরশিপের' জন্য দল নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইমরান পছন্দ করেন নি বলেই নাকি ভারতে দুর্দান্ত সাফল্য পাওয়া সত্ত্বেও ইকবাল কাশিম পাকিস্তানী দলে নেই, ইমরানের না-পসন্দ বলেই স্টাইলিস্ট ওপেনার মহসিন খাঁ আজ বোম্বাই ফিল্মে ওপেনিং খুঁজছেন। ধরা যাক ইউনুস আমেদের কথা। দীর্ঘ বিরতির পর ইমরানই হঠাৎ তাঁকে ভারত সফরে নিয়ে এলেন এবং ইমরানই নাকি এখন তাঁকে আবার বিরতির জগতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে ইমরানের বক্তব্য, 'আমি কি বোকা নাকি! দলে যাঁর প্রয়োজন তাঁকে আমি আমার পছন্দ অপছন্দের জন্য বাদ দেব? কোন জয়ের পর অধিনায়ক হিসেবে পুরস্কারের ট্রফিটা যখন আমি হাতে নিই তখন কি আমি জানি না কাদের জন্য এটা সম্ভব হলো! যে খেলোয়াড় আমাকে ট্রফি জয়ে সাহায্য করবে তাঁকে আমি বাদ দিতে বলবো? তবে হ্যাঁ, আমি সব সময়েই চাই, দল যেন আমার মনোমত হয়। দল মাঠে নামাবো আমি, খারাপ খেললে ইট, গালাগাল খাবো আমি, আর টিম সিলেকশনে আমার কোন মত থাকবে না, এটা হতে পারে না।'

মাঠের বাইরেও কি ইমরানের আকর্ষণ কম!

ছবি : গৌতম চাটার্জী

এই স্পষ্ট নির্ভীক কথাবার্তা এক জনই বলতে পারেন, তিনি ইমরান। বিতর্ক বোধ হয় এইজন্যই ইমরানের পিছু ছাড়ে না। দলের স্বার্থে ইমরানও কাউকে ছাড়েন না। এবং সেইজন্যই বেশ কিছু দিন আগে পাকিস্তানী ক্রিকেট বোর্ডের সেক্রেটারিকে খেলোয়াড়দের ড্রেসিং রুম থেকে বের করে দিতে দ্বিধা করেন নি ইমরান। ইমরানের মুখেই শোনা যাক ঘটনাটা: 'উনি সেক্রেটারি বলেই ওঁর ক্ষমতার কোন সীমা নেই নাকি? ড্রেসিং রুমটা সম্পূর্ণ অধিনায়কের আয়ত্তে। এখানেই অধিনায়ক দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে কলাকৌশল ঠিক করে, কোন কোন খেলোয়াড় পোশাক বদলায়, কেউ কেউ উলঙ্গ হয়েই বসে থাকে। অর্থাৎ এটা সম্পূর্ণই খেলোয়াড়দের জায়গা। অধিনায়কের অনুমতি ছাড়া কেউই এখানে প্রবেশাধিকার পেতে পারে না। ভদ্রভাবে ওঁকে চলে যেতে বললে উনি যখন হম্বিতম্বি করতে লাগলেন তখনই আমি রেগে বলেছিলাম, "বেরিয়ে যান, এটা আপনার বৈকালিক বেড়ানোর জায়গা নয়"।'

অধিনায়ক ইমরানকে কোন সাফল্য সবাধিক খুশি করেছে? অবশ্যই ভারতের বিরুদ্ধে ভারতে এবং ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডে জয়লাভ। তবে ইমরান সবাধিক

খুশি হয়েছেন বোধ হয় পাকিস্তানের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে হারাতে পেরে—গত দশ বছরে ঐ দল প্রায় অপরাজিতই ছিল বলা যায়। ফৈজলাবাদে পাকিস্তান প্রথম টেস্টেই হারিয়ে দেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। 'মনের গোপন ইচ্ছা বাস্তবায়িত হলে কে না খুশি হয়'—সাংবাদিকদের কাছে উচ্ছ্বসিত আনন্দে জয়ের পরেই ইমরান মন্তব্য করেছিলেন। ইমরানের আর একটি ইচ্ছা, শেষ ইচ্ছাই বলা যায়, বাকি আছে তা হলো বিশ্বকাপ জয়। ইমরানের সহযোগীরা কি পারবেন ইমরানের এই শেষ ইচ্ছাকে সম্মান জানাতে? এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে তখন অবশ্য অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে যাবে ইমরান বাহিনী তাঁদের লক্ষ্য অভিমুখে কতখানি এগোতে পেরেছে।

অবশ্য এই এগোনো পিছোনোর ব্যাপারটা খেলোয়াড় ইমরানের কাছে মোটেই গুরুত্ব পায় না। 'রেকর্ড, অমরত্ব এসব আমার কাছে কোন ব্যাপারই নয়। মন দিয়ে খেলি, খেলাকে ভালবাসি। ভারত, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এদের বিরুদ্ধে জয় পেয়ে আমি আনন্দিত ঠিকই—কিন্তু না হলেই আমি একেবারে ভেঙে পড়তাম তা নয়। মাঠের বাইরের জীবনকে আমি ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে রাজী নই। খেলাকে আমি ভালবেসেছি আমার নিকট আত্মীয় এবং অক্সফোর্ডের ছাত্র জভেদ বার্কি আর মজিদ খাঁকে দেখে। ওরাই আমার আদর্শ। পরে অবশ্য কেরি প্যাকারের সিরিজে খেলতে গিয়ে সেরাদের খেলা দেখে অনেক শিখেছি, কাউন্টি খেলেও অনেক উপকৃত হয়েছি। এইভাবেই যতটা পেরেছি এগিয়েছি। তবে আমার ধারণা পাকিস্তানের সেরা বোলার হবে ওয়াসিম আক্রম। ও যেভাবে এগোচ্ছে আমার ক্রিকেট বোধ যদি ঠিক হয়, ওর বলেই আমার রেকর্ড ভাঙবে। পৃথিবীতে কোন স্থানই শূন্য থাকে না—আমি বিদায় নিচ্ছি ক্রিকেট থেকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চলে আসছে আক্রমের মত বোলার।' বিশ্বের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলারের কণ্ঠে এই প্রশংসা শুনে আক্রম তাঁর অধিনায়কের জন্য সর্বস্ব পণ করবে তাতে সন্দেহ কি!

সুদর্শন শিক্ষিত পাঠান ইমরানের কাছে জীবনের অন্যান্য আনন্দের মূল্য কম নয়। পারিবারিক ঐতিহ্য বিনষ্ট করতে চান না বলেই অক্সফোর্ডে পরীক্ষা চলাকালীন, এমনকি ১৯৭৫-এর প্রুডেনশিয়াল কাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অংশ নেন নি ইমরান। পড়া শেষ করেই সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন খেলায়। 'ক্রিকেট খেলবো বলেই একটা যুক্তিনিষ্ঠ শিক্ষিত মন গড়ে উঠবে না, তা তো হতে পারে না, আমার অনেক সংস্কৃতিবান শিক্ষিত বন্ধু আছেন যাঁরা ক্রিকেট ছাড়া অনেক বিষয়ই ভালো বোঝেন—তাঁদের সঙ্গে অনেক সন্ধ্যা আমার সুন্দরভাবে কেটে যায়। কিছুটা পড়াশোনা করেছিলাম বলেই তো ওদের সঙ্গে একাসনে বসতে পারি।' শিকার করতে দারুণ ভালবাসেন ইমরান। 'একটা রিভলভার নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে শিকারে ঘোরাঘুরির মজাই আলাদা। আমি স্মোক করি না, ড্রিংক করি না, জুয়া খেলি না, আমি সৎ মুসলমান বলেই নিজেকে মনে করি—তবে এই মনে করার ব্যাপারে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য আছে।'

প্রয়োজনের মুহূর্তে জ্বলে উঠতে পারেন ব্যাটসম্যান ইমরান

খেলোয়াড় ইমরান সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু আছে কি? 'গাধা' পরিসংখ্যানের একটু সাহায্য নেওয়া যাক। ১৯৭১ সালে ইমরান তাঁর টেস্ট যাত্রা শুরু করেন ইংল্যান্ডে, এই ১৯৮৭ সালে সেখানেই শেষ টেস্টটি খেললেন। এই দীর্ঘ ১৬ বছরের আন্তর্জাতিক জীবন কেমন কেটেছে ইমরানের? প্রথম দিকে তেমন সাফল্য পান নি তিনি। সাফল্য আসতে শুরু করে ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে। ব্যাটসম্যান হিসেবে নিজেকে দায়িত্বশীল করে তোলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে। বোলার হিসেবে সাফল্য আসে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ৩টি টেস্টে ১৮টি উইকেট লাভ করেন এবং ক্রিকেটের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেন সর্বকালের এক সেরা বোলার হিসেবে। বলে নানা বৈচিত্র্য এনে, দু দিকে সুইং করিয়ে ইমরান নাজেহাল করতে থাকেন ব্যাটসম্যানদের। বোলার হিসেবে ইমরানের সাফল্যের একটি প্রধান কারণ ইমরান বল করেন শুধুই গতি বা সুইংকে সম্বল করে না, তার সঙ্গে মিশে থাকে ক্ষুরধার বুদ্ধি। পতৌদি বলেছেন, 'ব্যাটসম্যানের দুর্বলতা বুঝে এই বুদ্ধির প্রয়োগই ইমরানের মূল অস্ত্র।' বোলার ইমরানের সেরা

রিচার্ড হ্যাডলি

সিরিজ ১৯৮২-৮৩ সালে ভারত সফরে। ৬টি টেস্টে তিনি ৪০টি উইকেট লাভ করেন। অলরাউন্ডার ইমরানের একটি বিশেষ সাফল্য একই টেস্টে শতরান এবং দশের অধিক উইকেট লাভ। ডেভিডসন এবং বথাম ছাড়া এ সাফল্য আর কারোর নেই। ১৯৮২-৮৩ সিরিজে ভারতের বিরুদ্ধে ফৈজলাবাদ টেস্টে ইমরান করেন ১১৭ রান এবং উইকেট পান ১৮৩ রানের বিনিময়ে ১১টি। তিন শো উইকেট ক্লাবেও ইমরানের বোলিং গড় দারুণ—লিলি, হ্যাডলি এবং ফ্রেডি টুম্যানেরই পরে। ৭০টি টেস্টে ইমরানের রান ২৭৭০, উইকেট ৩১১টি। উইজডেনের বর্ষসেরা অলরাউন্ডারের এর চেয়ে বেশি কী চাই?

সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের একটি ব্যাপারে একমত হতে দেখা গেল। বিশ্বকাপ উপলক্ষে যে কল্পিত বিশ্ব একাদশ তৈরি হচ্ছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উপমহাদেশের একটি নাম কিন্তু সবার তালিকাতেই ছিল—বলা বাহুল্য সেটি ইমরানের। একদিনের ম্যাচে ইমরানের স্মরণীয় খেলা কোনটি? অনেকের মতে একদিনের সেরা বোলিং যে ম্যাচটিতে করেছিলেন সেটিই অর্থাৎ ভারতের বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালে শারজায় রথম্যানস কাপের ম্যাচটি। ঐ ম্যাচে ইমরানের বোলিং গড় ছিল ১০ ওভার ২ মেডেন ১৪ রানে ৬ উইকেট। দিলীপ বেঙ্গসরকরের কাছ থেকেই শোনা গেছে ম্যাচটির রোমহর্ষক বিবরণ: 'দুদিকেই বল ঘোরাচ্ছিল ইমরান,

ইয়ান বথাম

অনুশীলনে পাক অধিনায়ক

বল তুলছিল উইকেটের মুখে এবং এত স্থির লক্ষ্যে বল করছিল যে খেলতেই পারছিলাম না আমরা। প্রথম দফায় ইমরান বোধহয় ছ ওভারও বল করেনি—কিন্তু ভারতের ব্যাটিং ক্ষীরটুকু একাই খেয়ে নিল এর মধ্যে—টপাটপ পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে। আমি তার এক অসহায় শিকার। ইমরান কি জাদু করেছিল! ভাবলাম বল ঢুকছে, ব্যাট চালিয়েই বুঝলাম দুর্দান্ত সুইং করে বেরিয়ে যাচ্ছে, আমার ব্যাটকে চুমু খেয়ে বল আশ্রয় পেল উইকেটকিপারের হাতে। ফিরে গেল শাস্ত্রী, শ্রীকান্ত, গাওস্কর, অমরনাথ, মদনলাল এবং আমি। একটা ড্রেসিং রুমকে যে শবাগার করে তোলা যায় ইমরান সেদিন তা দেখিয়েছিল।' একদিনের ম্যাচে শতাধিক উইকেটের অধিকারী ইমরান, 'শক' এবং 'স্টক' বোলার হিসেবে কত সিরিজেই যে এভাবে ত্রাসের সঞ্চার করেছেন তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন।

লন্ডনের এক সাংবাদিক লিখেছেন: 'জীবনে এই প্রথম আমি দেখলাম তিন মহিলা কোন এক বিষয়ে একমত হলেন। সেদিন ক্লাবে শুনলাম যেই আলোচনা এল ক্রিকেটে, সঙ্গে সঙ্গে তা পৌঁছে গেল ইমরানে, যেন ক্রিকেট মানেই ইমরান। তিনজন মহিলা মাত্র পাঁচ সেকেন্ড সময় নিলেন এই বিষয়ে একমত হতে যে, এত সুন্দর, স্মার্ট, দুরন্ত প্লেয়ার নাকি হয় না, এবং সে চুল উড়ছে বাতাসে, ঝকঝকে মেদহীন সুঠাম চেহারার ইমরান—ছুটে আসছেন বল করতে এর চেয়ে ভালো দৃশ্যও নাকি কল্পনা করা যায় না। ওঁদের বক্তব্য ইমরান কাউন্টি ক্রিকেটে আসার পরেই ওরা ক্রিকেট দেখতে মাঠে যাচ্ছে। পেস বোলিং, ইন সুইং, ডিপার ইত্যাদি কতকগুলি ক্রিকেটীয় টার্মও শুনলাম। বুঝলাম ইমরানের প্লে-বয় ইমেজ কোথায় পৌঁছেছে। আর একটা জরুরি তথ্য: তিন মহিলাই কিন্তু যুবতী এবং সুন্দরী।' এই প্লেবয় ইমেজে ইমরান কিন্তু খুব অখুশি। তাঁর রক্ষণশীল পরিবারে এই ইমেজ মোটেই মানানসই নয় ইমরান সেটা জানে। আর জানে বলেই তা কাটানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টায় সে ব্যস্ত। ইমরানের কথা, 'নাইট ক্লাবে যাই সুন্দরী বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করি ঠিকই। কিন্তু আমি তা তো সবসময়েই করছি না। কোন সুন্দরী মহিলা কি বুদ্ধিমতী হতে পারে না? তার সঙ্গে গল্প করলেই দোষ। যেহেতু আমি ব্যাচেলর সেহেতু কোন মেয়ের সঙ্গে আমাকে দেখলেই কাহিনীর জন্ম হয়। মেয়েদের সঙ্গে মেশাটাই দেখলো, এর জন্য কত ছেলের কাছেই যে হেনস্থা হয়েছি তা অনেকেই জানে না। বেশ আগে কেউ কেউ আমাকে দেখলেই তাঁদের মাস্‌ল দেখাতো, এটাই বোঝাতে যে আমার মত সেক্স সিম্বলকে ইচ্ছে করলেই সে আছাড় দিতে পারে।' ইংল্যান্ডের স্পিনার ফিল এডমন্ডসের স্ত্রী সাংবাদিকা ফ্র্যান্সিস এডমন্ডস মন্তব্য করেছেন, 'অনেকেই ইমরানের ভেতরের মনটার কথা জানে না। সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে এক ইংরেজ যুবতীর বহু দিনের সম্পর্ক ভেঙে গেছে। হতাশ ইমরান বলেছে এখন সামাজিক বিয়ে এই বয়সে (এই নভেম্বরে ৩৫ হবে) কতখানি টিকবে সন্দেহ আছে।'

ইমরানের স্ত্রী কেমন হবে? ইমরানের মতে, 'সে হবে মুক্তমনা। মাথাটাকে হেঁশেলে না রেখে বাইরের জগতেও তাকে কার্যকরী করে তুলবে।' ইমরান ক্রিকেট ছাড়ছেন। আশা করা যায় পরিবারের লোকেরা এইবার ছ' ফুট লম্বা সুঠাম দেহী পাঠানের জন্য সারা পাকিস্তান তোলপাড় করে সেই 'বুদ্ধিমতী সুন্দরী'কে খুঁজে আনবেন। তবে সেই দিন যে কত তরুণী 'কালা দিবস' পালন করবেন তা অবশ্য জানা যাবে না!

ইমরান চলে যাচ্ছেন। কিছু দুঃখ কি নিয়ে যাচ্ছেন না? 'না, এমনিতে কিছুই না, "কেন ইমরান যাচ্ছে না" বলার আগেই আমি বিদায় নিচ্ছি। তবে হ্যাঁ, দারুণ কিছু ছেলে পেয়েছিলাম, যারা আমার এবং দেশের জন্য আপ্রাণ লড়েছিল—ওদের সঙ্গ আর পাবো না, একসঙ্গে মাঠে নামবো না, এই একটা দুঃখ থাকবে।'

কিছু দিন আগে এক সাক্ষাৎকারে ইমরান বলেছেন, 'আমি আর সুনীল গাওস্কর দুজনেই ১৯৭১ সালে আন্তর্জাতিক খেলা শুরু করি। দুজনেই বিদায় নিচ্ছি একই বছরে। এই বাইসেন্টেনারি ম্যাচে প্রথম একসঙ্গে দুজনে ব্যাট হাতে খেললাম। সুনীল এত বড় ক্রিকেটার। যেদিন ও বিদায় নেবে সেদিন সত্যিই ভারতীয় ক্রিকেটের দুঃখের দিন।' কথাটা ভিন্নার্থে কি ইমরান সম্বন্ধেও প্রযোজ্য নয়?

চি ত্র ক লা

অন্য চোখ

বিনোদবিহারীর প্রদর্শনী দেখলাম আকাদমি অফ ফাইন আর্টসে। কেউ হয়তো বলবেন শ্রীমতী রাণু মুখার্জি ১৯৮০-র নভেম্বরে বা সাতের দশকে অনুরূপ প্রদর্শনী করেছেন। বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখলে কিন্তু অন্য কথা মনে হবে।

বিদেশে স্থায়ী সংগ্রহশালায় প্রিয় প্রধান এবং মহৎ অপ্রধান (গ্রেট মাইনর) শিল্পীদের কাজ তাঁদের নির্দিষ্ট কোণে গেলেই দেখা যায়। যেমন টেট গ্যালারিতে ব্লেকের কাজের জন্য রয়েছে ঘরখানা। লন্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারিতে তেমনি আছে ওলন্দাজ, স্পেনীয়, ফরাসি, ফ্লেমীয় বা আধুনিক পর্বের চিত্রকলার জন্য আলাদা আলাদা ঘর। ওলন্দাজ কলমের জায়গায় রেমব্রান্টের দিকটায় আছেন রেমব্রান্ট। ভারমির তাঁর কোণে। ডি হুকও রয়েছেন বহাল অর্জিত মহিমায়। কলকাতায় তেমন কিছু নেই। সুতরাং এমন ছোট ছোট মরণোত্তর প্রদর্শনীতেই স্থায়ী সংগ্রহশালার দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো। একলব্য ভাগ্যে সিনেমার পিটুলি গোলা জল, রয়েছে যখন

যেদিন ফুটল কমল

বিকল্প। চিত্রভাস্কর্যের গৌরব উপভোগের মানসিকতার জন্য তৃতীয় বিশ্বের ভাবনার দৈন্য উপযুক্ত নয়। আবার বিনোদবিহারীর মুখোমুখি হয়ে ভাল লাগল। তাঁকে এবার খুব সংস্কৃত এবং শালীন মনে হল। পূর্ব এশীয় কাজের লেখনরেখ (ক্যালিগ্রাফি) সূক্ষ্ম মোচড়কে দিশি দৃশ্যের খাতে ফেলতে চেয়েছেন। অঙ্কনে সরলতার প্রবণতাও রয়েছে।

পূজার ফুল

দীঘল করে নিয়ে অবয়বীদের রূপারোপ (স্টাইলাইজ) করার মধ্যে নিজস্ব ধরন স্পষ্ট। আঁটসাঁট ভূমিতে রচনাকে বাঁধলেও, ভেতরে ভেতরে ভূমি বিস্তারের আয়োজন রয়েছে। ফলে প্রতিচ্ছায়াবাদ থেকে নতুন প্রতিচ্ছায়াবাদ (ওরফে বিন্দুবাদী) ছবির মতো নিসর্গে আবহ তৈরি হয়েছে তাঁর ছবিতেও। এই সাদৃশ্যের কারণ ফরাসি দেশে আধুনিক আন্দোলনের সূত্রপাতে যেমন, তেমনি বিনোদবিহারীর ছবিতেও পূর্ব প্রাচ্যের ছবিল ধারণার প্রভাব। তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগে জাপানে গিয়েছিলেন। প্রতিচ্ছায়াবাদ এবং প্রতিচ্ছায়াবাদোত্তর আন্দোলনগুলিতে পূর্ব প্রাচীর প্রভাব রয়েছে অন্তরালে। বিনোদবিহারীতে অবশ্য অনেক প্রকাশ্যে আছে। কিন্তু দিশি ছাঁচে রূপবন্ধ (ফর্ম) এবং রূপারোপ করার জন্য, তাঁর ছবিতে পূর্ব প্রাচ্যের লেখনরেখ খেলা এবং ভূমিজ ধারনার প্রয়োগ প্রথমে চোখে পড়ে না। বরং আকাশ, বাতাস, প্রকৃতি ইঙ্গিতে সংকেতে এসে পড়ে। পঁচিশটা ছবি ছিল। জলরঙ টেম্পেরা, সাঁটা ছবি এবং পাথর ছাপ, লিনোকাটা, কাঠখোদাই এই তিন রকম ছাপাই ছবি নিয়ে ছিমছাম প্রদর্শনী। রাণু দেবী যদি ফ্রেম বা রাখার ব্যবস্থার উন্নতি না করেন অবিলম্বে, তবে ছবিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে।

"পদ্মফুল" ছবিটার কথায় আসি। এখানে কালো রঙের লেখনরেখ দিয়ে অঙ্কন করেছেন। তুলির প্রথম রঙ ভেজানো চাপ, পরে ক্রমশ ব্যবহারে শুকিয়েছে। ফলে কালো থেকে ধূসর রঙের স্তর তৈরি হয়েছে পাপড়ি এবং

শালফর

পাতার বাঁকে বাঁকে। তারপর সামান্য সামান্য রঙের ছোপ। তেমনি "স্থলপদ্ম" ছবিতে চতুষ্কোণের আভাস দিয়ে তার ওপর গাছটাকে বসিয়েছেন। বিলম্বিত বিস্তারে পটভূমি ব্যবহার করেছেন "সাঁওতাল" ছবিতেও। একপাশে রেখেছেন গাছ। দুটি প্রেমিক প্রেমিকা তন্ময় কথায়, আরেকটি নির্জন ঝোপের তলায়। ডালে বসেছে পাখি। গাছের পাতার অর্ধবৃত্তের ওপর দু সারি সমান্তরাল অর্ধবৃত্ত। একটিতে গ্রাম, দুই চাষী তাদের গরু। দিগন্তে বনরেখা। ফলে পূর্ব প্রাচীর ছবির মতো ভূমির বিস্তার ওপর থেকে নিচে। কোথাও আবার অনুভূমিক বিস্তার। কোথাও স্থাপত্যের খাড়া রেখা সাদা দিয়ে করে তার মধ্যে কালো ছায়াসুষমা, আর একটু রঙের ছোপ। "শালকর" ডিম্ব টেম্পেরায় আঁকা (তৈলচিত্র বলে ভুল করে লেখা)। পাট করা শাল প্রায় সবখানি খুলে দুপাশে দুজন কাশ্মিরী বসে দেখছে। বাঁ পাশের জনপ্রান্ত ঘেঁষে। ডানপাশের জন একটু সরে। রয়েছে আরেকজন মাঝখানে, কিন্তু পেছনে। তাকে পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে। ফলে রচনায় সমদ্বিবাহু চতুর্ভুজ এবং তিনটে ডিম্বাকার জ্যামিতিক সংস্থান নিয়ে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। সমুদ্ভাসিত পট। "মন্দিরের ঘণ্টা" (অঙ্কন) বা "বাগান" (টেম্পেরা) ছবিতে রয়েছে স্থাপত্যের চৌকো খাড়া রেখার প্রতিবেশে দুটি বা একটি মেয়ে। তাদের উল্টানো কলকের মতো দেখতে শাড়ির নিচেটা। ফুলন্ত গাছের গোল, বা মন্দিরে ঝোলানো ঘণ্টার আকার, সমতল রঙের বিস্তারকে পর্যায়ক্রমে তাৎপর্যমণ্ডিত আকারের সমন্বয়ে রচনার পরিসরে বেঁধেছে। লেখনরেখ কালো, স্থান বিশেষে সাদা দিয়ে বার করা হয়েছে। ভেতরে ভাঙা ভাঙা রেখায় মোটা পোঁচ সীমা রেখাকে অনুসরণ করেছে। আর এসবের সঙ্গে মেলানো কিছু ছোপ। স্থাপত্যের স্থিরতা যেন সর্পিল, রেখার ছন্দগতিতে প্রকাশমান তেমনি আবার।

তাঁর ছাপাই ছবির পটভূমিতে রেখার শুদ্ধ রূপবন্ধের অনুসন্ধান চলেছে। তা সে "ছাগল" বা কুণ্ডলী পাকানো "কুকুর" বা "উপবেশনকারী" বিষয় যাই হোক। ছাপাইয়ের মাধ্যমের বিশেষত্বকে পুরোপুরি কাজে লাগানো হয়েছে। কোথাও কালোর ভেতর থেকে সাদা রেখায় রূপবন্ধ উপস্থাপিত। কোথাও কালো সাদার সমাহারে। কোথাও সাদার প্রাধান্য কালো রেখার খেলা। কাঠখোদাইতে মূল সীমারেখার মধ্যে ছোট ছোট রেখার বুনোট। তার ছবির বিশেষত্বের প্রতিফলন আছে তাঁর ছাপাই ছবিতে।

পথে প্রবাসে জলছবি

এবং ঘর-গেরস্থালির হাঁড়ি-কুড়ি পেয়ালা পিরিচ এই নিয়েই নরনারায়ণ এবং ইরা চৌধুরীর প্রদর্শনী হয়ে গেল বালিগঞ্জ ফাঁড়ির চিত্রকূট গ্যালারিতে (১৫-৩০ সেপ্টেম্বর)। নরনারায়ণ মানে ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরী। এখন যিনি কেন্দ্রীয় ললিতকলা আকাদমির সভাপতি। কলকাতায় এই তাঁদের প্রথম প্রদর্শনী। কিন্তু যেটা অবাক করেছে বেশি সেটা হল ভাস্কর এনেছেন তাঁর চার আর পাঁচ দশকের জলছবি। কখনও শিলং পাহাড়ের শেষের কবিতার পরিবেশ। কখনো দেবতাত্মার কোলে নেপাল।। কখনও পুনশ্চ পারী, আর কখনও স্বপ্ন ঝরোকা ফ্লোরেন্স। জলরঙের ছবি হলেও, কিছু কিছু আছে দুরন্ত তুরন্ত রঙীন রেখাচিত্র।
আমাদের আধুনিক শিল্পকলার শুরু কবে থেকে এ নিয়ে তর্ক হতে পারে। অবনীন্দ্রনাথের সংগুরু ভ্রাতৃসঙ্ঘের (প্রি-রেফেলাইট ব্রাদারহুড অনুসরণে "বাঙলা কলমকে" যদি তাই ধরা যায়) সব কাজকে ঠিক আধুনিক বলা যায় না। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষাশেষি গগনেন্দ্রনাথ, যামিনী রায় এবং এখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথের হাতেই নতুন জাহ্নবী ধারা বইল। এই শতাব্দীর দুয়ের দশকের মাঝামাঝি। ইংলণ্ডে যেমন ১৯১০সাল নাগাদ "ম্যানে অ্যান্ড দ্য পোস্ট ইম্প্রেসেনিস্ট" প্রদর্শনীটি করে রজার ফ্রাই শিবের মতো আধুনিক শিল্পধারাকে মাথা পেতে এনেছিলেন, তেমনি আমাদের ক্ষেত্রে কোনও সঠিক তারিখ দেওয়া যায় না। তবে নবভারত শিল্পকলার আধুনিক জলবিভাজিকাগুলি হল দুয়ের দশক। তিনের দশকের মধ্যে যামিনী রায়ের এবং (পশ্চাদদৃষ্টিতে এখন মনে হয় আরও বেশি করে) রবীন্দ্রনাথ, বাঙলা কলমে গ্রহণের কালো ছায়া ফেলে দিলেন। রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারী এবং অমৃত শেরগিলের জন্য সে ছায়া প্রলম্বিত এবং আরও প্রগাঢ় হল। চারের দশকে "ক্যালকাটা গ্রুপের" জলকল্লোলে বাঁধ ভেসে কোথায় গেল। এই ছবির তারিখও ৪৫—৫০-এর মধ্যে এবং স্বভাবতই শঙ্খ চৌধুরীর জলচিত্রেও সেই আধুনিকতা। ছবিতে আখ্যানমূলক সচিত্রকরণের পীড়াদায়ক প্রবণতা যেমন নেই, তেমনি আর্ট কলেজের নিছক বর্ণনামূলক স্বচ্ছবর্ণের খেলাও নেই। আছে পটতলকে কোণাকুণি করে ভেঙে জাপানী শিল্পীদের মতো পটের অভ্যন্তরে শূন্যতার অবসর বাড়িয়ে নেওয়া। দ্বিমাত্রিকতা ঠিকঠাক রেখে এই সব জেন (Zen) ধরনের জলছবি, ছবিরই ভাষায়, কথা বলেছে। প্রথমত যেমন ধরা যাক একটি ছবির কথা। সেখানে জেড(Z)-এর মতো করে দুটি অনুভূমিক রেখাকে কোণাকুণি রেখা দিয়ে জুড়ে,, উঁচু থেকে দেখা পারীর দুটি সমান্তরাল রাস্তা এবং কৌণিক সংযোগকারী পথ, নৌকার ঘাট, নদীর পোল এঁকেছেন। ছবির নকশায় জ্যামিতির সুষ্ঠু প্রয়োগ অবাক করে। জাপানী জড়ানো পটের মতোই তার পটভূমির অবসর গড়ে ওঠে, বা গড়িয়ে পড়ে বলা যায় ওপর থেকে নীচে। কিংবা বয়ে যায় নদীর মতো অনুভূমিক। দ্বিতীয়ত শঙ্খ চৌধুরীর রঙ ব্যবহার খুবই তেজি, ফরাসী। ইংরেজী জলরঙের ভিজে স্বচ্ছতা নয়। ফলে শিলং-এর পাহাড়ী বাজার, বা পারীর রাস্তাঘাট, ফ্লোরেন্সের বহুতল বাড়ির জানালার ফ্রেমে আকাশের নীচে বাড়িঘরের আলিসা আর ছাদের ঢেউ, উপভোগ্য হয়ে ওঠে। তবে তাঁর ছবিতে ছন্দিত লেখনরেখ রেখা আবদ্ধ তৈরীর জ্যামিতি, রঙের টাটকা ব্যবহার, প্রায়শ বিনোদবিহারীকে মনে করিয়ে দেয়।
ইরা দেবীর কুম্ভকার কারুকৃতি, চিক্কণলেপ দেওয়া বা ছাড়া যাই হোক, বেশ আকর্ষণ করে। ঘটি, বাটি, হাঁড়ি, ফুলদানি, ঘণ্টা নানা উত্তাপে বিদগ্ধ। তবে এদেশের চারু কুম্ভকার দেশজ নানা আকার প্রকারকে ধরে পুরোপরি না এগিয়ে, প্রত্ন ক্রীট, এট্রুসকান, আইবেরীয়—ভূমধ্যসাগরীয় সূর্যোকরোজ্জ্বল হাঁড়ি কলসী জালার ভাবে বিভোর হচ্ছেন। ভারতীয় যাদুঘরে বা দিল্লির জাতীয় যাদুঘরে হরপ্পা নগরসভ্যতার আমল থেকে অদ্যাবধি নানা অঞ্চলে আমাদের নানারকম কুমোরের গড়া রূপ ছড়িয়ে রয়েছে। তার রূপান্তর ঘটালেই অন্য জায়গায় পৌঁছনো যাবে। ইরা দেবীর মধ্যে সেই প্রবণতা দেখে ভাল লাগল।
প্রবীণ প্রবীণার মনের বয়স এখনও নবীন নবীনার। জাত জ্যেষ্ঠতাত শিল্পীদের মধ্যে এও কম গৌরবের নয়।

সন্দীপ সরকার

ক্যা সে ট

পরশমণির গান

তরুণ মজুমদারের ছবি আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরযোজনা—এ-দুইয়ের মণিকাঞ্চনযোগে কতবার যে হিন্দি গানকে দূরে সরিয়ে সুধাবর্ষী হয়ে উঠেছে পুজো-প্যান্ডেলের অক্লান্ত উচ্চৈঃশ্রবা, সে হিসেব আর বুঝি আঙুলে গোনার নয়। তরুণ মজুমদারের আগামী ছবি 'পরশমণি'। সে ছবির গানের ক্যাসেট এবার তিন মাস আগে বাজারে চলে এল। শালিমার হোটেলের এক শীতল ও অন্তরঙ্গ সভায় গাথানি রেকর্ডস কোম্পানি সগর্বে জানালেন, এই ছবির গানের পরিবেশক তাঁরাই হয়েছেন। এই প্রথম। তাই এই আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর। এস আর গাথানি গানের ক্যাসেটটি তরুণ মজুমদারকে উপহার দিয়ে ক্যাসেটটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘটালেন। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান শশীভাই গাথানি। সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পূর্বনির্ধারিত ব্যস্ততায় অনুপস্থিত ছিলেন। 'পরশমণি'-র প্রধান গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালক তরুণ মজুমদারের ছবিতে গান-রচনা সম্পর্কে কৌতূহলকর কিছু তথ্য জানালেন। জানালেন, কত মনস্ক, সচেতন ও খুঁতখুঁতে তরুণবাবু। মুহূর্তে মুহূর্তে খবর নেন। পরামর্শ থাকলে, ভাবনা মাথায় এলে, তক্ষুনি জানিয়ে দেন। তরুণ মজুমদার বললেন, "সাধারণ গানের সঙ্গে ছায়াছবির গানের বিরাট ব্যবধান। ছবির গতি, সিচুয়েশন ও মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেখানে গান তৈরি হয়। সব মিলে একটা টিমওয়ার্ক সেখানে।" সকৌতুকে জুড়ে দিলেন—"অবশ্য আজ আমার পরীক্ষা নয়। সে পরীক্ষা তিনমাস পরে। ছবি রিলিজ হলে।"

'পরশমণি'র এই ক্যাসেটে আট বছরের শিশুশিল্পী ডায়না দাসের কণ্ঠ শোনা নিঃসন্দেহে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। আশা ভোঁসলের 'ঠুনকো শাখা', অমিতকুমার ও ডায়না দাসের 'টিক টিক টিক' হৈমন্তী শুক্লার 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ' বেশ উপভোগ্য। লতা মঙ্গেশকরের 'যায় যে বেলা যায়' একটা অনির্দেশ্য বিষাদের রেশ রেখে যায়।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

সং গী ত

তবু গাইতে হবে গান

এই সময়ের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য, প্রণাম করতে ভুলে যাওয়া। প্রণাম করার মত মানুষও কম। সুরচ্ছন্দমকে ধন্যবাদ তাঁরা অনেককেই ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে প্রণাম জানানোর সুযোগ দিলেন। বাংলা গানের সুবর্ণ অধ্যায়ের যিনি অন্যতম নায়ক, তাঁরই গানের সুবর্ণজয়ন্তী। তাঁর প্রথম রেকর্ডের গান 'যদি ভুলে যাও জানাব না অভিমান, আমি এসেছিনু তোমার সভায় দুদিন শোনাতে গান।' সুরকার সুবল দাশগুপ্ত। এই দিন আসরে এই গান শুনে মনে হল, দুদিন নয় পঞ্চাশটি বছর তাঁকে গান শুনিয়ে যেতে হল। আর অভিমানের কোন

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

সুযোগ নেই, কারণ সেদিন রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে প্রতিটি স্তরের মানুষ যেভাবে শ্রদ্ধা জানালেন, তাতে আবারও প্রমাণিত হল, যে-শিল্পীর গান হৃদয় ছুঁয়ে যায়, তাঁকে ভোলা যায় না।

প্রথম জীবনে সুবল দাশগুপ্তের সুরে আর একটি গান এই সভায় এসে মনে আসছিল। 'তুমি ফিরাবে কি শূন্য হাতে আমারে' শূন্য হাতে তাঁকে ফিরতে হয়নি, এই সভায় ভালবাসার, শ্রদ্ধার স্রোতে তিনি ভেসে গিয়েছেন। গানের মধ্যে একটি লাইন আছে 'যে তোমারে দিল যে পরাণ/ দিল সুর দিল এত গান,/ কিছু কি দেবার নাহি তারে।' এই কথাটিও এদিন অন্যভাবে মনে এসে যায়। আজ পর্যন্ত ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য কোন সরকারি স্বীকৃতি পাননি। কোন সাংস্কৃতিক সফরে বিদেশ যাত্রাও নয়। অতঃপর সরকারি নির্বাচন সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়। হতে পারে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য উদাসীন, কিন্তু আমাদের কর্তব্য আমরা করিনি। এইচ এম ভি একটি ফিল্মের গানের ক্যাসেট প্রকাশ করেছেন। আরও অনেক গান বাইরে রয়ে গেল যেগুলি শুনলে অনেকেই বাঙালীর গান সম্পর্কে ধারণা বদলাতেন। সবচেয়ে বড় কথা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে যার ফিল্মে ও রেকর্ডে এত গান—তার কোন পালানুক্রমিক সূচী প্রকাশিত হল না। একটি বিষয়ে তাঁর গানের রেকর্ড আছে। সাধক রামপ্রসাদ ছবিতে তিনি তেইশটি গান গেয়েছিলেন। গ্রামোফোন কোম্পানি সেই কর্তব্য পালনেও উদাসীন।

এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ প্রত্যেকেই তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করলেন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অনুজ শিল্পীকে শুভেচ্ছা জানালেন। আর অগ্রজ শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানালেন অনেক শিল্পী, খেলোয়াড়, সাংবাদিক। শুধু মাত্র প্রশস্তি নয়, প্রত্যেকের ভাষণ আন্তরিক। শিল্পীর সম্মান কখনই সরকারি স্বীকৃতির অপেক্ষায় থাকে না। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান এদেশে প্রায়শই হয়ে থাকে—কিন্তু এইভাবে বুকে টেনে নিতে পারেন ক'জন? মোহনবাগান মাঠ ছাড়া ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের উঁচুগলা কেউ শোনেনি। গান গাওয়ার সময় অবশ্য ত্রিসপ্তক তাঁর পরিধি। শৈলেন মান্না, প্রদীপ ব্যানার্জী প্রত্যেকেই স্বীকার করেন ধনঞ্জয় বাবুরা যখন মাঠে যেতেন তখন মাঠের পরিবেশ অন্যরকম ছিল। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বীকার করেন, কলেজে পড়বার সময় নকল করে ডান হাতে ঘড়ি পরতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু তাঁর মত গাইতে পারলেন না। উৎপলা সেন খালি গলায় 'এক হাতে মোর পূজার থালা, আর এক হাতে মালা' সুধীরলাল চক্রবর্তীর সুর দেওয়া গান করে শোনান। ভি বালসারা অ্যাকর্ডিয়ানে 'এই ঝিরঝির বাতাসে' গানটি বাজিয়ে শোনান—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য একটি মালা পরিয়ে দিলেন। এইভাবেই সমস্ত সন্ধ্যা ছিল উষ্ণ, অকৃত্রিম আনন্দসন্ধ্যা।

এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ছিল দীর্ঘ। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য যখন গান গাইতে বসলেন তখন রাত প্রায় ন'টা। তাঁর সমকালীন অন্য শিল্পীদের তুলনায় তাঁর কণ্ঠ এখনও অম্লান—কণ্ঠ একটু ভারী হয়েছে, কিন্তু পুরনো দিনের মতই তিনি অনায়াসে গান গেয়ে চলেন, প্রতিটি কথার আবেদন পৌঁছে দেন অব্যর্থভাবে। সেই কথা বা সুর এখন শিল্পী সব সময় পারেন না। যদি এখন তাঁকে দিয়ে পুরনো গানগুলি রেকর্ড করানো যেত তবে বাংলা গান আবার গভীরে ডুব দিতে পারত। আসরের সূচনা রবীন্দ্রসঙ্গীত—'এবার নীরব করে দাও হে তোমার' দিয়ে। দুটি মাত্র রেকর্ড আছে তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের। এদিনের আসরেও গান শুনে মনে হল, তাঁকে আরও রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড না করিয়ে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা খাতা না খুলেই তিনি পর পর গেয়ে গেলেন। অর্থাৎ প্রতিটি গানের সঙ্গেই তাঁর অন্তরের যোগ।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর পাশের একটি আসন খালি রেখেছিলেন সেই আসনটি তাঁর সঙ্গীত জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে যাঁদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল তাঁদের উদ্দেশ্যে। এই কৃতজ্ঞতাবোধ একজন শিল্পীকে পঞ্চাশ বছর পার হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। আত্মমর্যাদার জন্য কারও কাছে মাথা নত করেননি। অনেকবার বোম্বাই থেকে ডাক আসা সত্ত্বেও ফিরিয়ে দিয়েছেন। একমাত্র রাইচাঁদ বড়ালের সুরে 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' ছবিতে গান গাওয়া ছাড়া। বাংলার প্রতিটি সুরকারের সুরে তিনি গান গেয়েছেন এবং সম্পূর্ণ শিক্ষার্থীর মন নিয়ে। ফলে কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, অনুপম ঘটক, শৈলেশ দাশগুপ্ত, সুধীরলাল চক্রবর্তী সকলের সুরে তিনি যেমন আত্মমগ্ন, আবার 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিতে তাঁর গায়নভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে গেল। সলিল চৌধুরী, সুধীন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ঘোষ, শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গানেও তিনি নতুন চমক সৃষ্টি করতে পারেন। অনিল বাগচী বা অন্য কারো সুরে ভক্তিগীতিকে তিনি বাংলার সঙ্গীতজগতেও আবার প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন। গোকুলচন্দ্র নাগ ও সত্যেন ঘোষালের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষার প্রমাণ বিভিন্ন গানে।

সমগ্র অনুষ্ঠানে অজয় বসু ও প্রদীপ ব্যানার্জীর ঘোষণা মনে রাখার মত। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গীতপ্রেমীরা সকলেই একমত 'কে চায় গাভাসকার বা ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের অবসর গ্রহণ?' বহু নবীন শিল্পীর প্রতিষ্ঠার মূলে তিনি।

সুবল দাশগুপ্ত ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে ডাকতেন মিঃ দাদরা বলে, রাধাকান্ত নন্দী বলতেন 'লয়দার প্রভু'। গানের মত জীবনেও তিনি কখনও লয় বিচ্যুত হননি। শান্ত সমাহিত জীবন। এই সংবর্ধনাসভায় তাঁকে পচিশ হাজার টাকা দেওয়া হল। শিল্পী সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও একজন শিল্পীকে দিয়ে দিলেন। স্কুলের শিক্ষকদের আগ্রহে এই শিল্পী গান লিখতে আরম্ভ করেন। সংসার তখন বিপর্যস্ত, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পনের টাকা ফি স্কুলের শিক্ষকরা চাঁদা তুলে দিয়েছিলেন। নিজে গীতিকার ও সুরকার হিসেবে জনপ্রিয় হয়েও তনি সরে দাঁড়িয়েছেন।

অনুষ্ঠানের প্রথমে গান গাওয়া হল 'মাটিতে জন্ম নিলাম, মাটি তাই রক্তে মিশেছে'। প্রবীর মজুমদারের সুর করা এই বাংলা গান একটি স্মরণীয় সৃষ্টি।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের এই গানে এখনও সকলের রোমাঞ্চ জাগে। হয়তো শিল্পীর নিজের জীবনেও গানটি সত্য হয়ে উঠেছিল। 'কত যে বুকের পাঁজর/ আড়াল করে রুখল এ ঝড়' জীবনে বহুবার বাধা এসেছে, বাধা উত্তীর্ণ হয়েছেন। মিতবাক শিল্পী বার বার শিল্পীদের স্বার্থে বিদ্রোহী। বহুবার স্বেচ্ছা নির্বাসন বেছে নিয়েছেন, তবু লোকে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছেন। দায় বহন করার মত অনুজ ভরত খুব কম—আশা রাখি নির্বাসন থেকে ফিরে তিনি আবার রাজত্ব গ্রহণ করবেন।

ফুলের জলসায়

বিড়লা অকাদেমিতে "সঞ্চিতা" আয়োজিত নজরুলগীতির অনুষ্ঠানে শ্রোতা ছিল অল্প। কিন্তু প্রত্যেকেই সঙ্গীত-রসিক। সম্মানিত অতিথি ছিলেন—সাহিত্যিক বিমল মিত্র, সাংবাদিক সেবাব্রত গুপ্ত এবং সঙ্গীত

জগতের সম্মানিত বিমান ঘোষ। সুতরাং আসরের শিল্পী সুতপা গুহ ও ধীরেন বসু প্রাণ খুলে গেয়েছেন কারণ তাঁরা জানতেন, নেবার মত প্রাণও আছে। তাই শুধু আসর জমানো নয়, গভীরতার প্রতিবেদনও ছিল। অনেকেই জানেন না সাহিত্যিক বিমল মিত্র এক সময় গান গাইতেন। সম্ভবত সহপাঠী অনুপম ঘটকের সুরে রেকর্ডও আছে। সাংবাদিকতার সূত্রে সেবাব্রত গুপ্তের গান শোনাটা নেশা ও পেশা। আর বিমান ঘোষ প্রায় সমস্ত জীবনটাই সর্বস্তরের শিল্পীদের সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন, এবং সর্বতোভাবে বাংলাগানের জন্য নিবেদিত।

সুতপা গুহের কণ্ঠটি বেশ তৈরি। হয়তো নৈপুণ্যই মাঝে মাঝে বিভ্রান্তি ডেকে আনে। অনেক কাজ করার সময় সুর কম লাগে। অথচ সব সময় অলংকরণ ইঙ্গিত ছিল না। তাঁর কয়েকটি গানের মধ্যে শেষ গানে 'নিরজনে' যে কিভাবে প্রিয় দেখা দেবে সেটা নিয়ে সংশয় দেখা যায়। কারণ তবলার সঙ্গে দাপাদাপি কোন সময় নির্জনতার অবকাশ দেয় না। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, শেষ গানে তিনি চঞ্চল খাঁর তবলার সঙ্গে গানে সঙ্গত করেছেন।

একটি সম্পূর্ণ সন্ধ্যা নজরুলগীতির জন্য। সকলেই জানেন নজরুলের গানের বৈচিত্র্য অনেক শ্রষ্টাকেই শ্রদ্ধান্বিত করে। কিন্তু এই সন্ধ্যায় প্রায় সব গানই প্রেমসঙ্গীত। অর্থাৎ শুধুই ফুল, আগুনের ফুল্কি নয়। নজরুলের গজলাঙ্গ গানেও কাব্যপ্রধান, তবলা নয়। ধীরেন বসু এই সন্ধ্যায় নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। কাব্যসঙ্গীতে ধীরেন বসুর একটা আলাদা মেজাজ আছে। কণ্ঠের পরিচ্ছন্নতা না থাকলে কাব্যসঙ্গীত সপ্রাণ হয় না। "তোমার

ধীরেন বসু

আঁখির মত আকাশের দুটি তারা" বা প্রথম নজরুলগীতির রেকর্ড, সব গানেই তিনি শ্রোতাদের রোমাঞ্চিত করতে পারেন। "শাওন রাতে যদি" গানটিতে তাঁর কণ্ঠের সমৃদ্ধি প্রমাণিত হয়, কারণ এই গানে মন্দ্রসপ্তকে মধ্যম আর তারসপ্তকে পঞ্চম তিনি অবলীলায় পরিক্রমণ করতে পারেন। আবার "আমার গহীন জলের নদী" গানটিতে ইকো চেম্বারকে অদ্ভুতভাবে কাজে লাগানো হয়। আধুনিক যন্ত্র সবসময় ত্রুটি ঢাকার জন্য নয়—গানকে পল্লবিত করতে পারে সেটারই যথার্থ প্রমাণ পাওয়া গেল। শেষ গান "কেন কাঁদে পরান" গানটি অশেষ হয়ে থাকে। আরো তো সময় ছিল—তাঁর বক্তব্য সত্ত্বেও "যেদিন লব বিদায়" গানটি ভাল লাগেনি। কারণ গানটিতে নানা গোত্রের শব্দ থাকা সত্ত্বেও কোথায় যেন কথার সঙ্গে সুর মাপা যায় না—বিশেষত তবলার কেরামতির ঝোঁকটা আত্যন্তিক হওয়ায়। অনেক ফুলের মাঝে হঠাৎই ছন্দঃপতন। তফাতটা ফুল ও ফুলকপির।

'হৈমন্তী সন্ধ্যা'

জন্মলগ্ন ঠিক সময় হিসেব করে আসে না। এই সময়ের গানে হৈমন্তী শুক্লা একজন বিশ্বস্ত শিল্পী, যিনি সব রকম গানেই পরিক্রমণ করতে পারেন। কিন্তু প্রবাদপ্রতিম সব সুরকার এখন বিগত। ফলে তাঁকে কাজ করতে হয় ক্ষমতা নিয়েও সীমিত পরিসরে। চ্যানেলের সিগারেট কোম্পানির সৌজন্যে বিড়লা অকাদেমিতে যাদবপুর সাংস্কৃতিক উদ্‌যাপন কমিটির আয়োজনে হৈমন্তী শুক্লার একক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সেবাব্রত গুপ্ত, দীনেন গুপ্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, বিমান ঘোষ এবং গৌতম সেনগুপ্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে ভাষণ দিলেন, সেগুলি শুধু অনুষ্ঠানের জন্য প্রশস্তি ভাষণ নয়, আন্তরিক বক্তব্য।

হৈমন্তী শুক্লার কণ্ঠে রাগভিত্তিক গানগুলি চমকপ্রদ হয়। গানে তাঁর তৈরি কণ্ঠটিই কাজে লাগে, বাংলা গানের যে মেজাজ সেটা অধরা থেকে যায়। সেই বাংলা গান যা রাগভিত্তিক, কিন্তু কাঠামোটি বাংলার জলবায়ু নির্ভর সেগুলি অনন্য। যেমন প্রথম পর্বের গানে মান্না দের সুর করা 'আমার বলার কিছু ছিল না' বা আর একটি গান অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে 'এখনও সারেঙ্গীটা বাজছে'। দুটি গানই হৈমন্তী শুক্লাকে দীর্ঘস্থায়ী করবে, শ্রোতা বারবার শুনতে চাইবে। অসাধারণ গান গাওয়া সত্ত্বেও সরগম ছবির গান পার্থপ্রতিম চৌধুরীর সুরে 'গাইতে বসে আমি গাইব যে গান' নয়—কারণ এখানে তিনি প্রায় অঘটন পটিয়সী কিন্তু হৃদয় ছুঁতে পারেন না; শুধু তারিফ পেতে পারেন। ঠিক এইভাবেই রবিশঙ্করের সুরে 'অনুরাধা' ছবির গানের সুরানুবাদ 'কলাবতী রাগে' গাইলেন 'সেদিন ফিরে না আসে' বা আলি আকবরের সুরে 'চন্দ্রনন্দন রাগে' 'স্মৃতি শুধু থাকে' গানগুলি যা দুবছর আগে প্রকাশিত, নিখুঁতভাবে গাওয়া। সুরেও নতুন আকাশ, তবু তারও আগের গান শ্রোতা শুনতে চায়—এখানেই বাংলাগানের রহস্যের চাবিকাঠি। দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। তিনি গাইলেন, দুটি গানই চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত এবং সুগীত। তবে ভাববার কথা যে প্রয়োজন ছাড়া তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করেন না—ঠিক একইভাবে নজরুলগীতিও। যদি প্রচণ্ড ব্যস্ততায় আংশিক সময়ও এই সব গানের জন্য ব্যয় করতেন তবে তাঁর এবং শ্রোতাদের লাভ হত। শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের সুরে গানটি তাঁর যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন। মান্না দের সুরে 'সুখের দিনগুলি দূরে চলে যায়' গানের গায়কী বিস্মিত করে। সুরের মধ্যে অন্য মেজাজ; কিন্তু হৈমন্তী শুক্লা সেখানেও অনন্যা।

দ্বিতীয়পর্বে তিনি গাইলেন এ বছরের পূজার গান। রবীন্দ্র জৈনের সুর ও ছন্দে অভিনবত্ব আছে। ঠিক তেমনি ওয়াই. এস. মুলকীর সুর করা গান। ওয়াই. এস. মুলকী খুব কম

হৈমন্তী শুক্লা

বাংলাগানে সুর করেছেন। কিন্তু সব গানই ব্যতিক্রমী। সুরকার বর্তমানে প্রবাসে থাকার জন্য বাংলারই ক্ষতি হয়েছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে হৈমন্তী শুক্লার গান সব সময় প্রাণবন্ত হয় না। কারণ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যেভাবে সহজ সরল সুর করেন, হৈমন্তী শুক্লা সেই সংসারে কিছুটা বিব্রত। কিন্তু আবারও প্রমাণিত হল মান্না দের সুরে তিনি ঠিক জায়গা খুঁজে পান। সম্ভবত মান্না দে যে ধরনের সুর করেন বা গান করেন সেটা হৈমন্তী শুক্লার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়। যার মধ্যে রাগ আছে, সুরের ওঠানামা আছে অথচ বাংলার মেজাজ আছে—সেটা নানাভাবে আসতে পারে। মান্না দের সুরে তিনি নিজে ছাড়া, আর কেউ এতটা সফল হতে পারেননি। মান্না দেও উজাড় করে দিতে পারেন এবং হৈমন্তীও দু হাত ভরে নিতে জানেন। অঞ্জলির লগ্নের মত শিল্পীর জন্যও অনুকূল লগ্নের সুরকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

কবিতার গান

কবিতা একজন পাঠক মগ্ন হয়ে মনে মনে পড়বেন, নাকি সরবে পড়বেন বা শুনবেন, নাকি সুরারোপিত রূপে অর্থাৎ গীতরূপে শুনবেন—কিভাবে অনুভববেদ্য হয়ে উঠবে কবিতা, তা নিয়ে প্রহরপ্রসারী তর্ক চলতে পারে। দীক্ষিত পাঠকের কাছে কবিতা যে কোনো রূপেই পৌঁছে যায় এটা ঠিক, তবে সুরারোপিত হলে আরো অনেক মানুষের কাছে পৌঁছয় যাঁরা হয়তো কবিতায় তেমন দীক্ষিত নন। কবিতার দীপ্তিতে দ্যুতিতে তাঁরা মথিত হন। এরকম একটা সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত আছে সুরের সপক্ষে।

সম্প্রতি বিড়লা আকাদেমিতে ইন্ডিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানটি এ কারণে স্মৃতিধার্য থাকবে কিছুকাল। আধুনিক বাংলা কবিতার গীতরূপ নিয়ে পরীক্ষামূলক একটি অনুষ্ঠানের দায়িত্ব তাঁরা নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্থার পক্ষে মুরারিলাল আগরওয়াল, জগন্নাথ চক্রবর্তী ও আশিস সান্যাল প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলেছিলেন। স্বীকার করে নেওয়াই ভাল অনুষ্ঠানটি বেশ অগোছালো চেহারা ধরেছিল। নার্ভাস ঘোষককে একটি নাম ডাকার জন্য কাগজ দেখতে হয়। নাম ডাকা হচ্ছে, কবিরা আসছেন, গায়কেরা

আসছেন—সব মিলিয়ে স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মতো হয়েছিল।

ঘোষণা থেকে যত দূর বোঝা গেল, কল্যাণ ঘোষই মনে হয় কবিতাগুলিতে সুরারোপ করেছিলেন। কথায় ও সুরে সার্থক মেলবন্ধন হয়তো সর্বত্র হয়নি। কবিতার মর্মটি অনেক ক্ষেত্রেই ভেদ করতে পারেননি সুরকার, সুরের রসেই মজে গেছেন হয়তো। তবুও অনেক ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন তিনি। ভালোয় মন্দয় মিলে তাঁর প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।
এই অনুষ্ঠানে প্রবল অস্বস্তির কারণ হয়েছিল আবৃত্তিকারদের পাঠ কবিদের স্বকণ্ঠে কবিতাপাঠের পাশাপাশি। কবিদের সঙ্গে তাঁদের পাঠের বা আবৃত্তির অনেক তফাত ঘটে যায়। কণ্ঠচালনা হারিয়ে দেয় কবিতাকে। এ অনুষ্ঠানে তা ঘটেছেও। প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় যখন পড়েন 'এসো হাত ধরো' তখন দীপ্ত হয় অনুভবে কিন্তু যখন প্রবীর ব্রহ্মচারী পড়েন তাঁর কবিতা তখন তা নিষ্প্রাণ মূর্তি ধরে। আর দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠে তো প্রবল খবর পড়ার গন্ধ। শান্তনু দাস আশ্চর্য ভাল পড়েছেন তাঁর 'রাজেন্দ্রাণী' কবিতাটি। মগ্ন হয়ে পাঠ করেছেন আলোক সরকার, জগন্নাথ চক্রবর্তী, অরুণ বাগচী, অর্দ্ধেন্দু চক্রবর্তী। অমিতাভ চৌধুরী ছড়া পড়েছেন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে।

ইন্দ্রনীল সেন

ইন্দ্রনীল ঘোষ গেয়েছেন বেশ কয়েকটি গীতরূপ। এই যুবার কণ্ঠটি মধুর ও সুঠাম। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'জং' কবিতার সুরটি ভাল, শুনিয়েছিলও ভাল তাঁর কণ্ঠে। কল্যাণ ঘোষ গায়ক হিসেবে তেমন সমর্থ নন। কৃষ্ণা ঘোষের কণ্ঠে সুবিচার পেয়েছিল আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর 'কুঁচবরণ কন্যে'। গৌতম মিত্রের কণ্ঠে আশিস সান্যালের 'আবিলতাহীন নদীর জন্য' কবিতার গীতরূপটি যথার্থ আশ্রয় পেয়ে যায়। শক্তিব্রত দাসও ভাল গান করেন। প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'এসো হাত ধরো' তিনি চমৎকার গেয়েছেন। বন্দনা সিংহের কণ্ঠে দীনেশ দাসের 'স্বর্ণভস্ম'-এর গীতরূপটি মানিয়ে যায়।

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

সারল্য, মাধুর্য, আত্মনিবেদন

"শরীর হার মানিয়াছে,... কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই" : এক পত্রে রজনীকান্তকে তাঁরই সম্পর্কে একথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সত্যিই, রজনীকান্ত আমৃত্যু নিমগ্ন ছিলেন সঙ্গীতে তথা সঙ্গীতরচনায়। একাধারে কথাকার ও সুরকার। কথা-সুরের সহজ সারল্য মাধুর্যের আর এক নাম যে রজনীকান্তের গান সে কথা কি নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে? ভগবদ্‌বিশ্বাস, অকপট আত্মনিবেদন তাঁর সমগ্র সঙ্গীতসৃষ্টিতে নিবিড়ভাবে ব্যাপ্ত। অন্য ধরনের গানও যে রচনা করেননি তা নয়। অল্প হলেও তাঁর কাছে পেয়েছি প্রেমের গান, হাসির গান, স্বদেশবোধক গান।
রজনীকান্তের গানের মোটামুটি একটা চেহারা পরিস্ফুট হল সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে। ফেডারেশন হল সোসাইটি আয়োজিত 'রজনীকান্তের গান' শীর্ষক আসরে। আমন্ত্রণপত্র দেখে ধারণা হয়েছিল অনুষ্ঠানের একক শিল্পী দিলীপ কুমার রায়। প্রকৃতপক্ষে দিলীপকুমার রায় ছাড়াও পরিবেশনে ছিলেন তাঁরই গোষ্ঠী।

দিলীপ কুমার রায়

প্রথম গান হিসেবে 'সেথা আমি কি গাহিব গান' সার্থক চয়ন। এ-গানে ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য গৌরবের কথার পাশেই রয়েছে যেন ঈষৎ বিষাদও। গানটি সঠিক আশ্রয় পেয়েছিল অর্চনা ভৌমিকের পরিশীলিত কণ্ঠে। তাঁর আবেদন এসে পৌঁছেছিল হৃদয়ে। এছাড়া অর্চনা ভৌমিক গেয়েছিলেন 'পূর্ণ জ্যোতি তুমি', সেও উল্লেখ্য। অনুভা ঘোষের 'সখি রে মরম পরশে' চর্চিত। বাসবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ওই বধির যবনিকা' আবেদনময়। কণ্ঠস্বর সুন্দর স্বপ্না পালিতের। কিন্তু গানে তালবাদ্যের সঙ্গে যথাযথ বোঝাপড়া ঘটেনি। অরিজিৎ রায়চৌধুরী মোটামুটি পরিচ্ছন্ন গেয়েছেন।

পরিচ্ছন্ন গাওয়ার প্রচেষ্টাটুকু ছিল অগ্নিবীণ চ্যাটার্জীর, তবে আরও প্রাণ চাই। 'স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি' অশোক রায়চৌধুরীর পরিপাটি পরিবেশন, যদিও তাঁর কণ্ঠ তেমন আকর্ষক নয়। গানটি রজনীকান্তের স্বল্প প্রেমের গানের একটি। কান্তকবির একটি স্বদেশী গান বাংলার ঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁছেছিল একদিন। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'। নরম বিদেশীয় বস্ত্র পরিধানে অভ্যস্ত মোহমুগ্ধ বাঙালীকে তার সম্ভ্রমের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন রজনীকান্ত এই গানে। সম্মেলক কণ্ঠে সেদিন গানটি সঠিক প্রেক্ষা পেল। সমবেত কণ্ঠে 'ধীর সমীরে'-ও প্রাণবন্ত।
রজনীকান্ত-দৌহিত্র দিলীপ কুমার রায় গেয়েছিলেন কয়েকটি গান। মন্দ্রগভীর কণ্ঠ, স্বরক্ষেপণ, সব মিলিয়ে তাঁর গায়নের স্বাদ স্বতন্ত্র। গানের অন্তরে বড় সহজে চলে যেতে পারেন আর শ্রোতাদেরও নিয়ে যান সেই গভীরে। 'স্নেহবিহ্বল করুণা', 'এত আলো বিশ্বমাঝে' কিংবা 'পাতকী বলিয়ে কি গো' গানে তারই সাক্ষ্য। রজনীকান্তের শ্লেষাত্মক কয়েকটি গানের অন্যতম 'তোরা ঘরের পানে তাকা'। দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠ ছুঁয়ে লোকায়ত সুরের এই গানটি সরাসরি এসে আঘাত করে। যন্ত্রসহযোগিতায় ছিলেন সলিল মিত্র, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, শৈলেন চক্রবর্তী প্রমুখ। কান্তকবির গানের এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ফেডারেশন হল সোসাইটি ধন্যবাদার্হ।

মুকুলিকা-র নিবেদন

রবীন্দ্রসদনে 'মুকুলিকা'-র সাম্প্রতিক নিবেদন : 'একটি অনবদ্য সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা।' সন্ধ্যাটি যে সার্বিকভাবে অনবদ্য হয়ে ওঠে নি এও যেমন নির্দ্বিধায় বলা যায় তেমনি সুমুহূর্তও যে কিছু এসেছিল সেদিন, সে-বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। বিভিন্ন শিল্পী একক কণ্ঠে পরিবেশন করেছিলেন রবীন্দ্রসংগীত, আর ছিল কবিতা পাঠের একটি অনুষ্ঠান। প্রথমে বিপ্লব বক্সীর দুটি রবীন্দ্রসংগীত। গলাটি ভরাট, কিন্তু উচ্চারণে—স্বরক্ষেপণে এক প্রথিতযশা পুরুষ শিল্পীর প্রত্যক্ষ প্রভাব, এমন কি গান-নির্বাচনেও। এগোতে গেলে ওই প্রভাবকে পাশে সরিয়ে রাখতে হবে। মঞ্জু চৌধুরীর গান আগে শুনেছি। উল্লেখযোগ্য কিছু মনে হয়নি তখন। এবারের পরিবেশনেও পাওয়া গেল না কোন উন্নতির ইশারা। সেই অনাকর্ষক কণ্ঠ, অপরিচ্ছন্ন অলংকরণ, তালে-লয়ে দুর্বলতা কিংবা সূক্ষ্ম স্বরলিপি-বিচ্যুতি : এসবেরই প্রকাশ তাঁর গাওয়া কয়েকটি গানে।
এটা ঠিকই যে কণ্ঠ আর আগের মত সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে না, তবু সুচিত্রা মিত্র এখনও গানে রঙ ধরাতে পারেন, পারেন ছবি আঁকতে। সুতরাং 'এ পথ গেছে কোনখানে', 'বাহিরে ভুল হানবে যখন' কিংবা 'ও অকূলের কূল' সেই সহজ আবেদনটুকু নিয়েই হৃদয়ে এল। আর বরাবরই তাঁর গান-চয়নেও থাকে একটা স্পষ্ট বিশিষ্টতা। এদিনেও ছিল তার পরিচয়। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় শুনিয়েছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত। তাঁর 'মোরে বারে বারে ফিরালে' নিবিড় বেদনাকে

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়

আকীর্ণ করে যায়। আবেগদীপ্ত হয়ে আসে 'ভালবেসে সখী নিভৃতে যতনে।' অনেকবার শোনা হল তাঁর কণ্ঠে 'আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন' এই গানের ভেতরের আকুলতাটিকে বড় সহজে প্রকাশ করতে পারেন তিনি, তাই প্রতিবারই হৃদয়স্পর্শী।
উপরোক্ত চার শিল্পীকে যাঁরা যত্নে সহযোগিতা করলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : সলিল মিত্র, রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর দে, চন্দ্রকান্ত নীল ও শীতল গঙ্গোপাধ্যায়।
কয়েকটি কবিতা, দু-তিনটি চিঠি পাঠ করে শুনিয়েছিলেন অমলেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁর নিবেদনে ছিল রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আবার নজরুলেরও রচনা। নির্বাচন শুধু রবীন্দ্রনাথে সীমায়িত থাকলেই সমগ্র অনুষ্ঠানের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ হত। কণ্ঠস্বর তাঁর শ্রবণ সুখকর, কিন্তু উচ্চারণ সর্বত্র

সুচিত্রা মিত্র

স্পষ্টতা পায় নি। তারই মধ্যে উপভোগ্য হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'নাসিক হইতে খুড়ার পত্র'-পাঠ।
পরিশেষে : উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি ছিল, বিশেষত প্রেক্ষাগৃহে বসার জায়গার ব্যাপারে।

'মাস সিঙ্গার্স'। তাঁর রচনা 'আমরা তো তুমি নাই শহীদ' কিংবা 'নাম তার ছিল জন হেনরী' যেমন হৃদয়স্পর্শী, প্রেম ধাওয়ানের বিখ্যাত গান 'উঠা হ্যায় তুফান' কিংবা সলিল চৌধুরীর 'আমার প্রতিবাদের ভাষা' তেমনই উজ্জ্বল উদ্দীপ্ত।

মাস সিঙ্গার্সকে ধন্যবাদ। চমৎকার তাঁদের দক্ষতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া। শুভব্রত দত্তকে সঙ্গী করে সবিতাব্রত দত্ত শুনিয়েছিলেন মূলত কিছু স্বদেশী সংগীত। শুভব্রতর পাতলা অনাকর্ষক কণ্ঠ এই ধরনের গানের পক্ষে অনুপযুক্ত। সবিতাব্রত দত্তের কণ্ঠে অবশ্য সঠিক আশ্রয় পেয়েছিল একদা কে সি দে-র গাওয়া সুপরিচিত গান 'মুক্তির মন্দির'। মাঝে একবার পদাতিক গোষ্ঠী গেয়েছিলেন কয়েকটি গণসংগীত। অতি মামুলি পরিবেশন।

অনেক রকম

রবীন্দ্রগীতিআলেখ্য, কবিতাপাঠ, স্বদেশী গণসঙ্গীত : হরেক রকমের উপচারে সাজানো ছিল 'ভারতীয় গণ সংস্কৃতি সংঘ কলকাতা জেলা পরিষদ'-এর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা রবীন্দ্রসদনে। প্রারম্ভেই রবীন্দ্ররচনা অবলম্বনে গীতি আলেখ্য—'বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি'। শিরোনামেই স্বপ্রকাশ আলেখ্যর বিষয়টি। মানুষে-মানুষে অযথা হানাহানি নয়, চাই পারস্পরিক সৌহার্দ্য, শান্তি : এই যে কথাটি নানাভাবে বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ তাই মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছিল আলেখ্যটির। প্রসঙ্গত এসেছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কথা, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাঁর স্বদেশবোধক গান রচনার কথা। গ্রন্থনার উৎসে ছিল 'জীবনস্মৃতি', 'সভ্যতার সঙ্কট'—রবীন্দ্রনাথের এমত নানা রচনা। পাঠে ব্রজসুন্দর দাস সুকণ্ঠে পরিপাটি উচ্চারণে বিশিষ্ট। গ্রন্থনা ও সুপরিচালনার কৃতিত্বও তাঁরই। এক নারীকণ্ঠে ভাষ্যপাঠও মন্দ নয়। গানগুলি সুচয়িত। সার্বিকভাবে সম্মেলক গানসমূহ যতটা অনুশীলনবদ্ধ ততটা উজ্জ্বল নয়। ব্যতিক্রম : ঐ মহামানব আসে। 'সার্থক জনম আমার'—শ্রীনন্দা মল্লিকের কণ্ঠে দীপ্ত, আবেদনময়। সংগীত পরিচালক দিলীপ মিত্রের 'পিনাকেতে লাগে টঙ্কার' সুরে তালে সঠিক। কিন্তু দীপ্তি অনুপস্থিত। দ্বৈতকণ্ঠের গানটি মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। অনুষঙ্গে তালবাদ্য মাঝে মধ্যেই অপরিচ্ছন্ন, ডবল তবলা না থাকলেই ভাল হত।
দ্বিতীয় অনুষ্ঠান কবিতা নাট্যাংশ পাঠের শিল্পী তৃপ্তি মিত্র। কি পরিস্থিতিতে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র 'নবজীবনের গান' রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সেই স্বল্প ইতিবৃত্ত আছে 'নবজীবনের গান'-এর ভূমিকায়। সেই ভূমিকাটুকু আর 'নবজীবনের গান'-এর প্রথমাংশে পড়লেন তৃপ্তি মিত্র। প্রাণের উত্তাপে আবেগে উদ্বেল করা সে পাঠ। তারপর বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'জবানবন্দী'র দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে পাঠ। নাট্যরসসমৃদ্ধ, সংবেদনশীল পরিবেশন। শেষে শোনালেন সুকান্ত ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা।
লোকসংগীত গণসংগীতে সুখ্যাত হেমাঙ্গ বিশ্বাস সেদিন আসতে পারেননি অসুস্থতার কারণে। এই আশাভঙ্গের অনেকটাই অবশ্য পূরণ করে দিয়ে গেলেন তাঁরই পরিচালিত

তৃপ্তি মিত্র

কান্তকবির জন্মদিবস উপলক্ষে

নিজের গানের কথায় নিজেই সুর বসিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত। নজরুলও করেছেন, তবে তাঁর গানে অন্যের সুরযোজনাও প্রচুর। এঁদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্ত-দ্বিজেন্দ্র-লালের গানের যতটা প্রচার-প্রসার হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি। এই বিস্মরণ বা অবহেলা দুঃখজনক, লজ্জাজনকও বটে। তবে আশার কথা, স্বল্প হলেও কেউ কেউ এঁদের গানের অনুশীলনে নিয়োজিত।

যেমন রজনীকান্তের গানের নিবিড় চর্চায় ব্যাপৃত আছেন 'কাকলি' সংগীতসংস্থা। সাধুবাদযোগ্য এঁদের প্রয়াস। সম্প্রতি রজনীকান্তের ১২২তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে এক কাব্য-সংগীতসন্ধ্যার আয়োজন করেছিলেন 'কাকলি' যুবকেন্দ্রে। শুরু হয়েছিল আসর শুক্তি চৌধুরীর বেদগানে। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন যথাক্রমে রাজ্যেশ্বর মিত্র ও দিলীপকুমার রায়। 'রজনীকান্তের গানে রয়েছে সেই নিবিড় আকুতি আর গভীর আত্ম নিবেদন'—একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রজনীকান্ত-দৌহিত্র দিলীপকুমার রায় আরও বললেন যে ইদানীং রজনীকান্তের গানেরও বিকৃতি ঘটছে, এ-বিষয়ে এখনই সজাগ ও সতর্ক হওয়া দরকার। রাজ্যেশ্বর মিত্র একটি জরুরী বিষয়ে আলোকপাত করলেন। আজকাল ছেলে-মেয়েরা সব ধরনের গান না শিখে প্রথম থেকেই স্বতন্ত্র কোন সংগীত যথা—রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি বা উচ্চাঙ্গসংগীত শিক্ষা করে। ফলে বাংলা গানের সার্বিক পরিচয় তাদের কাছে অজানাই থেকে যায়। আর এইভাবেই বাংলা গানের অমূল্য সম্পদ আজ অবহেলিত। এবার সেদিনের সংগীত পরিবেশন প্রসঙ্গ। সমবেত গান দুটির প্রথমটির কথা অস্পষ্ট ছিল, দ্বিতীয় গানটির কথা বোঝা গেলেও গানটি তেমন উজ্জ্বলতা পায়নি। একক গান শুনিয়েছিলেন অনেকে। সঞ্জু বক্সীর উচ্চারণে 'স', 'শ'-এর দোষ। মাইক্রোফোনকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারেননি লতিকা মুখোপাধ্যায়, ইভা মুখোপাধ্যায়। মায়া দাস, মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সুরে-তালে গাইলেন। কিন্তু গানে প্রাণ কোথায়? গোপা নন্দী মন্দ নয়। মোটামুটি একটা মান রক্ষা করেছেন নমিতা ভট্টাচার্য, শুক্তি চৌধুরী। রূপা দে-র 'স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি' পরিশীলিত নিবেদন। ইন্দ্রা সরকারের দ্বিতীয়

রাজ্যেশ্বর মিত্র

গানটি উজ্জ্বলতর। সাবলীলতা ছিল চন্দ্রমা মুখোপাধ্যায়ের পরিবেশনে। অশোকা মুখোপাধ্যায়েরও দ্বিতীয় গানটি বেশি উল্লেখযোগ্য। 'কাকলি'র প্রাণপুরুষ নিশীথ সাধু গেয়েছিলেন কান্তকবির নানা স্বাদের গান। তাঁর শ্রবণসুখকর কণ্ঠে 'মধুর সে মুখখানি' লাবণ্যময়। তাছাড়া হাসির গান এবং অন্যান্য গানও উল্লেখযোগ্যতা পেয়েছিল। অনুরুদ্ধ হয়ে রজনীকান্তের দুটি গান শুনিয়েছিলেন দিলীপ কুমার রায়। তাঁর জোয়ারিযুক্ত কণ্ঠের স্বতন্ত্র গায়নভঙ্গীর গান শোনা এক সুখাবহ অভিজ্ঞতা। যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন সুনীল

চক্রবর্তী, পঞ্চানন বড়াল প্রমুখ। গান ছাড়াও কবিতাপাঠ ছিল। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রজনীকান্তের বিভিন্ন মেজাজের কয়েকটি কবিতা পাঠে তৃপ্তি দিয়েছিলেন। আসরে আদ্যন্ত ঘোষণার দায়িত্বও প্রতিপালন করলেন দেবদুলালবাবু। অনুষ্ঠানের মাঝে একবার 'কাকলি'-র প্রতি রজনীকান্ত-কন্যা শান্তিলতা দেবীর যত্নে ধৃত আশীর্বাণী শোনানো হয়েছিল।

স্বপন সোম

ন়ৃ ত্য

কথাকলি নৃত্যে কেরল

নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতের জাতীয় ঐক্য বোধহয় কবি, মনীষী ও ইতিহাসকারের উপলব্ধ সত্য, সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়। ইদানীং জাতীয় সংহতি নিয়ে এত দুশ্চিন্তাই তার প্রমাণ। কিন্তু এই বিশাল বহুজাতিক ও বহুভাষী দেশকে ঐক্য সূত্রে বাঁধা খুব সীমিত ক্ষেত্রে হলেও সফল হয়েছে সংস্কৃতির মেল বন্ধনে, কলকাতায় এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, বিশেষ করে নৃত্য-চর্চার ক্ষেত্রে। নৃত্য চর্চার সূত্রে বাঙালীর সঙ্গে ভাবগত আত্মীয়তা হয়েছে কেরল থেকে মণিপুর পর্যন্ত ভিন্নভাষী ভারতীয়ের। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের এই সব অনুপম নৃত্যকলা যে একই ভারতীয় ভাব-কল্পনায় পুষ্ট এবং এক ও অখণ্ড ভারতীয় সাংস্কৃতির অংশে এই চেতনা আপ্লুত করে যে-কোন নৃত্যানুষ্ঠানে। আবার নৃত্যকলার রীতি ও আঙ্গিক, বিষয়ে নিহিত থাকে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও পরিচিতি যা না জানলে সেই প্রদেশবাসীকে জানা হয় না। সম্প্রতি কলকাতা মলয়ালি সমাজম কেরলের জাতীয় উৎসব ওনম উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন বিদ্যামন্দিরে, যেখানে অকেরলীয় দর্শকের সুযোগ হয়েছিল নৃত্যের মাধ্যমে কেরলের জাতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কারের একটি বিশিষ্ট দিকের পরিচয় পাওয়ার। প্রথমেই ছিল শঙ্করনারায়ণ ও কেশবনের সম্মেলক চেড়ডা বাদন। আদিম অনুষঙ্গের ছন্দ-স্পন্দে বিন্যস্ত কথাকলি নৃত্যে অপরিহার্য চেড়ডার মন্দ্র-নিনাদে ছিল কেরলের প্রাগৈতিহাসিক অনার্য অতীতের ব্যঞ্জনা। এই চেড়ডা বাদনের উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তী নৃত্যনাট্যের জন্যে ভাবোদ্দীপক পরিবেশ রচনা, কারণ এই নৃত্যনাট্যের বিষয় ছিল কেরলভূমির পৌরাণিক জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে পরস্পর-বিরোধী আর্য ও অনার্য দাবির দ্বন্দ্ব। ভ্যালিয়ার রবি বর্মার একটি কবিতা নিয়ে রচিত এই নৃত্যনাট্যের উপাখ্যানে ছিল কেরলের আদি অসুররাজ মহাবলী এবং আর্য ব্রাহ্মণ মহাযোদ্ধা পরশুরামের মধ্যে এক কল্পিত মহাকাব্যিক যুদ্ধ। দ্রাবিড় পুরাণানুসারে বিষ্ণু বামনাবতারের ছদ্মবেশে কেরলের জনক-রাজ মহাবলীকে প্রতারিত করে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন. অন্যদিকে আর্য পুরাণ-কাহিনীতে পরশুরামকে চিহ্নিত করা হয়েছে সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত কেরলের স্রষ্টা বলে। দুই পৌরাণিক চরিত্রের দাবি ও দ্বন্দ্ব নাটকে শেষ হয়, বলা বাহুল্য পরশুরামের পরাজয়ে, কারণ মহাবলীর জনপ্রিয়তা আজও কেরলে অটুট। তাঁকে স্মরণ না করে কেরলের ওনম উৎসব হয় না।

নাটকে তাঁর বিজয় সূচিত করে যে আধুনিক কেরলবাসী আজও তাঁদের অনার্য পরিচিতি সগৌরবে আঁকড়ে আছেন। কেরলবাসীর এই পরিচিতি ও সংস্কার উপেক্ষা করে তাঁদের সংস্কৃতিকে জানা যায় না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই নাট্যবস্তুর আদর্শ নৃত্যমাধ্যম কথাকলি। উচিত ছিল কলকাতার প্রখ্যাত কথাকলি নৃত্যশিল্পীদের দিয়ে এই নাটক পূর্ণাঙ্গরূপে মঞ্চস্থ করা। দুই মহাবীরের ভূমিকায় কৃশতনু দুই তরুণী নর্তকীকে (প্রেমা মেনন ও অনীতা নায়ার) মানায়নি; যদিও কথাকলির মৌলিক নৃত্যভাষায় তাঁদের প্রশংসাযোগ্য অধিকার ছিল।

প্রথম দৃশ্যের সমবেত নৃত্য কাইকোট্টিকোলি ওনম উৎসবের আবহ রচনায় সার্থক হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্রীদের নিয়ে আধুনিক দৃশ্যটির সুষ্ঠু উপস্থাপনা হয়নি এবং কথাকলির বর্ণাঢ্য পোশাক ব্যবহার না করায় দৃশ্যাবলীর দৃষ্টিবাহিত আবেদন ক্ষুণ্ণ হয়েছিল অনেকটাই।

নটানমের ভরতনাট্যম

নটানম কলাক্ষেত্রের নৃত্য শিক্ষার্থীরা সম্মেলক ভরতনাট্যম নৃত্য পরিবেশন করলেন সম্প্রতি বিদ্যামন্দির মঞ্চে। তাঁদের গুরু খগেন্দ্র বর্মণও তিনটি

রঞ্জাবতী সরকার

একক নৃত্যপদ নিবেদন করেন। কলকাতায় ভরতনাট্যম চর্চার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান কলামণ্ডলমের নৃত্যানুষ্ঠান দেখে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁদের চোখে আলোচ্য অনুষ্ঠান কিছু স্বতন্ত্র বলে মনে হতে পারে বিশেষ করে ভরতনাট্যম নৃত্যভঙ্গির রূপায়ণশৈলীতে, সম্মেলক নৃত্যগুলির বিন্যাস ও পরিকল্পনায়। এই বৈশিষ্ট্যের কিছু ইঙ্গিত ছিল প্রতিষ্ঠানটির নামে। নামের সঙ্গে কলাক্ষেত্র কথাটি যুক্ত থাকায় মাদ্রাজ কলাক্ষেত্রের ভরতনাট্যম নৃত্যাদর্শের প্রতি প্রতিষ্ঠানটির আনুগত্য সূচিত হয়েছে।

নৃত্যবিন্যাসের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল প্রথমেই, সূচনার সম্মেলক নৃত্যপদ পুষ্পাঞ্জলিতে। এর পরে দুই তরুণ ও এক তরুণী নাচলেন খুব সুস্পষ্ট ও দৃপ্ত দেহচারণায়, চোখ ও পায়ের সাবলীল সঞ্চালনে নানা নৃত্য ভঙ্গির গণেশবন্দনা পদ কাউথুভম।

পরবর্তী দুটি পদ আলারিপু ও জাতিস্বরম-এ নৃত্যচারণার পরিচ্ছন্ন শৈলী, মঞ্চ জুড়ে নৃত্যবিন্যাসের নানা জটিল বৈচিত্র্য দেখা গেল। যদিও সকলের সমান নৈপুণ্য ছিল না এবং সঞ্চারণায় আরও পরিচ্ছন্ন রূপায়ণের অবকাশ ছিল। নৃত্যবিন্যাসে ছিল এক উচ্চাবচতাহীন মাত্রা এবং প্রায় আকস্মিক সমাপ্তি। শেষের পদ তিল্লানায় সঞ্চায়নের বিশেষ করে নৃত্যশিল্পীদের মঞ্চচারণার, পারস্পরিক সমন্বয়ে সামান্য শৈথিল্য ছিল। সম্মেলক নৃত্যপদগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে মনোজ্ঞ হয়েছিল বর্ণম। তিন জন নৃত্যশিল্পীর মধ্যে নৃত্ত ও নৃত্যাংশে অতি সুচারু নেচেছিলেন রঞ্জাবতী সরকার ও আরতি ঘোষ। নৃত্যভঙ্গির ও ছন্দসুষমার বৈচিত্র্যে তিন নর্তকীর সুশৃঙ্খলায় নানা নয়নশোভন নকশায় এই পদটির নৃত্য পরিকল্পনার নিখুঁত চারুতা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছিল। গুরু খগেন্দ্র বর্মণের নৃত্যকলায় প্রকরণগত নৈপুণ্য ছিল অসামান্য। ভরতনাট্যম নৃত্যভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করণকৌশল তাঁর অনায়াস আয়ত্তে। চোখ-মুখের প্রখর ব্যঞ্জনায় তাঁর নাচের এক বিশিষ্টতা ছিল। প্রথম পদমের শিব নৃত্যে তাঁর নৃত্যকলার সুষ্ঠু পরিচয় ছিল, তুলসীদাসের রামচরিতমানস নিয়ে রচিত কীর্তনমের সঞ্চারীভাবে তাঁর একাহারী অভিনয় নৃত্যে সুষ্ঠুভাবে

খগেন্দ্র বর্মণ

পরিবেশিত হল রামায়ণের কয়েকটি সুপরিচিত কাহিনী। এসব সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে তাঁর নাচ যে খুব মনোজ্ঞ হয়েছিল তা বলা যায় না।

মনসিজ মজুমদার

না ট ক

তপোক্লিষ্ট

অভিনন্দন সহ শিশির মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটক দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, রবিন্দ্রভারতী নাট্যকেন্দ্র (মুদ্রণ প্রমাদ নয়, এই বানানেই লেখা ছিল)। এই সংস্থা রবীন্দ্রভারতীর নাটক বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন। অর্থাৎ কেউ নাট্যচর্চায় উপাধিপ্রাপ্ত, কেউ বা উপাধির অপেক্ষায়। নাটকের আগে আলোচনায় অনুনয় চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের নাটক

্যাপকভাবে যাঁদের কাছ থেকে আমরা পাব বলে আশা করি, সেই টি প্রতিষ্ঠান হল বিশ্বভারতী ও বীন্দ্রভারতী। কারণ দুটি প্রতিষ্ঠানই বীন্দ্রনাথে নিবেদিত। কিন্তু গত য়েক দশকে দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে কান উজ্জ্বল ভাবনা আমরা পাইনি। ার নির্ভুল ধারণার শেষতম ংযোজন রবীন্দ্রভারতী নাট্যকেন্দ্রের ‌তপতী'।

া প্রেম একসঙ্গে ভাবতে পারে না, লতে পারে না, সেই প্রেম লুষিত। ধ্বংসই ডেকে আনে। এই ন্যই পাশাপাশি দুটি বিপরীত মেরুর প্রেম—বিক্রম ও সুমিত্রা এবং নরেশ বিপাশা। নাট্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ও নাট্য িক্ষার্থী এই ভাবনাটি সম্পূর্ণভাবে ঝতে পেরেছেন। এখানে রাজা ক্রমদেব (রবীন ভট্টাচার্য) সব সময় োজা হয়ে হাঁটেন, প্রায়শই উচ্চারণ াঝা যায় না, আর সুমিত্রা (মালা ট্টাচার্য) স্পষ্ট উচ্চারণ করেন, মনের ালায় তিনি কুঁজো হয়ে যান, কখনই োজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। জাদের কল্যাণে তিনি অংশ নিতে ারছেন না এই দুর্ভাবনায় মাঝে াঝে সংলাপ ভুলে যান। অন্যদিকে রেশ ও বিপাশার খুব মিল। দুটি মিকায় দেবব্রত দাস ও রত্না ন্বতী দুজনেই মৃদু স্বরে কথা লন, আন্তরিক প্রেম—তাই অর্ধেক া ভিতরেই থেকে যায়।

াষিণী অন্তত নাটকে কমপ্লিমেন্ট পারে না। বিপাশার গান সত্যি অন্তরের কথা, তাই মৃদু রণ। একবার সামনে থেকেই জন প্রবীণ দর্শক বলে ওঠেন, কটু গলা ছেড়ে গাও মা।' সঙ্গে ান যন্ত্র ছিল না। বিপাশার উজ্জ্বল লাপ শুনলে মনে হবে 'রাম তেরি া মইলি' দেখছি। নরেশ একটি ্ম ফুল নিয়ে ঢোকেন, বিপাশাকে টি দেওয়ার আগে মনে হয়, হাতে ্মী সিগারেটের প্যাকেট। কুমার নের ভূমিকায় সমর দাস, আদর্শে র। তাই পিতৃব্য চন্দ্র সেনকে ণাম করার আগে পর্যন্ত, মনে চ্ছিল, তাঁর হাত দুটি হাঁটুর সঙ্গে ধা রয়েছে। নরেশ ও বিপাশা শ্মীরে গেলেন সমস্যা নিরসনের ন্য। মিশনকে অনেক সময় পারেশনও বলা হয়। কাশ্মীরে রেশ ও বিপাশাকে মনে হবে গৈরিক্ যাপ্রোন পরিধান করে অপারেশন ায়েটার থেকে বেরিয়ে এলেন।

জা যে জিততে পারবে না—তা াগেই বোঝা গিয়েছিল, কারণ তাঁর তের লাঠিটা লাঠি না আখ বোঝা ়। তাঁর বিক্ষোভ শুধু চিৎকারে। কাশ্মীরের চরকে দেখে মনে হয়, সিরাজদৌল্লা নাটকের মহম্মদী বেগ। আমি অজ্ঞ, তাই জানি না—কাশ্মীরে হয়তো বাঁ হাতে রাজাকে পত্র দেওয়াই রীতি। নির্দেশক ধ্রুব দাস অভিনয় করেছেন দেবদত্ত চরিত্রে। তাঁর বাচনভঙ্গি বেশ ভাল, যদিও সেটা শিক্ষাক্রমে উত্তরাধিকার। তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।

আবহের দায়িত্ব অমিতাভ রায়ের। অপূর্ব একসপেরিমেন্ট। দামামাও শান্তভাবে বাজে। এক জায়গায় প্রজাদের চিৎকারে রানী উৎকর্ণ—কিন্তু কোন আওয়াজ শোনা যায় না। খুবই অর্থবহ। কারণ তার পরেই সুমিত্রার সংলাপ,—'আমি কেন বধির হলাম না' জাতীয়। হয়তো সেই ইঙ্গিতই দেওয়া হল। অনুষ্ঠান শুরুর আগে ডি· বালসারার রেকর্ডে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর বাজানো হয়, নাটকের মাঝখানেও মাঝে মাঝে—'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু' এবং আরও কিছু গানের বাজনা বেজে যায়, শুধু শূন্যস্থান পূরণের জন্য। প্রথমে 'সর্ব খর্বতারে দহে' গানের সঙ্গে একটি উদ্দাম নৃত্য।

তারপরে একে একে সকলে ঘোষকের দিকে তাকিয়ে চলে যান। মনে হয় ট্র্যাফিক পুলিস হাত দেখিয়েছে, তার দিকে তাকিয়ে রাস্তা পার হচ্ছেন সবাই। এরই মত উপরি পাওনা অথবা যন্ত্রণা বিপাশার নাচ। কয়েকজন পুরনারী আসেন, দুটি কথার পরেই সমস্বরে একই রকমভাবে বারবার হাসেন, বাংলা ফিল্মে যেমন 'বর এসেছে বর এসেছে' বলে একদল মেয়েকে দেখা যায়। গ্রামবাসীরা রসিকতা, বিদ্রোহ, সবই চিৎকার করে করেন। খুবই বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা, মনে হয় নদীর এপার থেকে ওপারের লোককে বলা হচ্ছে।

নাটকের আগে আলোচনায় ডঃ শিশির মজুমদার রবীন্দ্র নাটকের সঙ্গে লোকনাট্যের সংযোগ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আশা করি, তাঁর ক্ষোভ মিটেছে। শেষ দৃশ্যে একজন পুরোহিত যেভাবে পূজা অনুষ্ঠান করেন—তার জন্য পুরোহিত সমাজ আদালতের আশ্রয় নিতে পারেন। মন্ত্রী সুরাজ মুখার্জির বাচনভঙ্গি ভাল। এক জায়গায় তিনি সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসার ভঙ্গি করেন, পিছনে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। পরবর্তী দৃশ্যে সুমিত্রার আত্মাহুতির জন্য দুপাশে পর্দা সরে যায়। একটি শিশু দর্শক এই ঘোড়া ছোটানো দেখে খুব উল্লসিত, সে হাততালি দিয়ে বলে আলিবাবা,

'তপতী' নাটকের একটি দৃশ্য

আলিবাবা, শেষে দুপাশে পর্দা সরতেই সে চেঁচিয়ে ওঠে 'চিচিং ফাঁক'। নাটকের শেষে সুমিত্রার আত্মাহুতি, রাজা বিক্রম এসে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই নতমস্তক মনে হয় নাট্যভাবনা অনুযায়ী অনুতাপে নয়—এহেন প্রযোজনায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর উপাধি পাওয়ার আত্মগ্লানিতে।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

বি বি ধ

শরীরী অভিনয়

রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যানকে বেছে নিয়ে যখন মডার্ন মাইম সেন্টার মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান করেন তখন তার প্রয়োগে, ব্যাখ্যায় কিছু ভিন্নতর স্পন্দন থাকবে এমনতর আশা করা গিয়েছিল। সমকালীনতার আলোয় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে এই প্রযোজনা এমন ভাবনাও কাজ করেছিল। কিন্তু মডার্ন মাইম সেন্টার রবীন্দ্রসদনে তাঁদের প্রযোজনায় গতানুগতিকতার বাইরে পা বাড়াননি। এই দুই মহাকাব্যের জনরঞ্জক, মনোহারী, চটকময় অংশগুলিকেই নির্দেশক ও প্রধানতম অভিনেতা কমল নস্কর বেছে নিয়েছিলেন। প্রচারপত্রে মুদ্রিত তাঁর বায়ো-ডাটা থেকে বোঝা গেছে তিনি অনেক কাল ধরে মূকাভিনয় শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাঁর শারীরিক পটুত্ব মাইম অভিনয়ের উপযোগী এবং তাঁর অভিনয় দক্ষতাও স্বীকার্য কিন্তু তাঁর শরীরসৌষ্ঠবের দিকে কিছু অধিক নজর দেওয়া প্রয়োজন আছে বলে অনেকেই একমত হবেন। এ কারণেই সব চরিত্র বিশ্বাসযোগ্যতা পায়নি। হর্ষ দাসের আলোকপরিকল্পনা সুচিন্তিত ও সুপ্রযুক্ত। স্বীকার করতে বাধা নেই যে আলো একটি আলাদা মাত্রা যোগ করেছিল এই অনুষ্ঠানে। গুরুদায়িত্ব ছিল আবহেরও কিন্তু আবহ আপনমনে বেজে গেছে আর অভিনয় আপনমনে চলেছে। কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক ছিল না। কমল নস্করের সঙ্গে অভিনয়ে সহযোগিতা

কমল নস্কর

করেছিলেন শুভ্রা সান্যাল। তাঁর পটুতাও অবশ্যস্বীকার্য। বিভিন্ন অভিনয়ের অংশবিশেষে এঁরা দুজনেই কিছু উজ্জ্বল মুহূর্ত তৈরি করতে পেরেছিলেন। এঁদের শরীরী নির্মাণে 'সীতাহরণ' পর্বটি সর্বাধিক মনোগ্রাহী হয়েছিল।

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

পেঙ্গুইনের আনন্দ সংবাদ

মেরুপ্রমাণ দূরত্বের সেই পাখিটি গত বাহান্ন বছরে শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে এক অতি প্রিয়-পরিচিত প্রতীকে পরিণত হয়েছে। পেঙ্গুইন বলতে এখন আর সেই বিশেষ পাখিটি বোঝায় না, বোঝায় পেঙ্গুইন বুকস, কাগজের মলাটে সুলভ আর মূল্যবান দুর্লভ বই। প্রথমে যাকে নিছকই কাগজের নৌকো মনে হয়েছিল অনেকের, মনে হয়েছিল খেয়ালী ছেলেমানুষী খেলামাত্র, দেখা গেল অল্পকালের মধ্যে সে হয়ে উঠেছে এক দ্রুতগামী কাগজের জাহাজ। পেপারব্যাক বইয়ের পথিকৃৎ পেঙ্গুইন এখন নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রকাশক। দ্রুত মুনাফার দিকে না তাকিয়ে নীতিগতভাবে এ-যাবৎকালের গ্রন্থজগতের রূপরেখা বদলে দিতে পেরেছে সে। জনশিক্ষা ও লোকরুচির উৎকর্ষ সাধনের আদর্শ নিয়েই গ্রন্থবাণিজ্যে ব্রতী হয়েছিল পেঙ্গুইন। বিশ্বের সেরা সাহিত্য ও স্মরণযোগ্য লেখকদের সঙ্গে সর্বাধিক সংখ্যক পাঠকের শুভদৃষ্টি ঘটাতে হলে চাই সুলভ সংস্করণ, চাই সহজলভ্য করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সহজবোধ্য করে তোলা এবং সেইসঙ্গে প্রকাশনার একটা চিরায়ত মান বজায় রাখা। কেবল সৃজনশীল রসসাহিত্যেই নয়, বিশ্বজ্ঞানবিজ্ঞান ও বহুমুখী ইতিহাসের বিচিত্র বিষয়ে মানুষের কৌতূহলকে জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব পেঙ্গুইন সানন্দে বহন করে চলেছে। দুরূহ বিষয়কে সরল সাধারণগ্রাহ্য ও রম্যকরণের জন্য লেখকের বিদগ্ধ প্রসাদগুণ, সম্পাদকের সহজাগর ব্যক্তিত্ব এবং অনুবাদকের নিপুণ সঞ্জীবন প্রয়োজন। পেঙ্গুইন এই তিনটি ব্যাপারেই অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল। এপ্রসঙ্গে স্বভাবতই গুরুদাস চাটুজ্জে আর বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের কথা নতুন করে মনে পড়বে বাঙালী পাঠকের। সময়ের হিসেবে পেঙ্গুইনের অনেক আগেই এদেশে শস্তায় বই পরিবেশনের পরিকল্পনা নিয়েছিল এই দুটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান। গুরুদাসের আট আনা সিরিজের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থমালা অবশ্যই পেপারব্যাক অর্থাৎ নরম মলাটের বই ছিল না, কিন্তু বসুমতী নিউজপ্রিন্টে শক্ত নরম উভয় মলাটেই মূল্যবান গ্রন্থাবলীকে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সাহিত্যরুচির সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত ক্রয়-অভ্যাস তৈরি করে দিয়েছিলেন ঐরা অল্পকালের

মধ্যেই। কিন্তু তার বাজার ছিল দেশের সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ। পেঙ্গুইন পৌঁছে গেছে বিশ্বের দরবারে, বহির্বাণিজ্যের দরিয়ায়।

মাত্র দশখানা বই পুঁজি করে যে পেঙ্গুইন বুকস-এর প্রথম পদযাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৩৫ সালের ৩০ জুলাই আজ তার দখলে এসে গেছে পঁচিশ হাজারের বেশী টাইটেল। বছরে প্রায় ১২০০ নতুন বই বেরোয় এখন পেঙ্গুইন ও তার সহচর প্রকাশনা পেলিক্যান থেকে। এর এক-তৃতীয়াংশ বই-ই বিশেষভাবে এই প্রকাশনার জন্যে লেখানো, অর্থাৎ শক্ত মলাটের বই থেকে সুলভ মুদ্রণ নয়। একমাত্র গ্রেট ব্রিটেনেই ৭০০ নতুন বই বেরোয় বছর বছর। এছাড়াও পুরনো বই ও পুনর্মুদ্রণ মিলিয়ে ২৫০০ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ যাবৎ একটানা সবচেয়ে বেশী বিক্রী হয়েছে পেঙ্গুইনের যে বইটি সেটি জর্জ অরওয়েলের লেখা অ্যানিম্যাল ফার্ম, বেরিয়েছিল ১৯৫১ সালে। ১৯৮৫ সালে পেঙ্গুইনের সুবর্ণ জয়ন্তী বছর ইস্তকের হিসেবে বইটি বিক্রী হয়েছে ৬৮ লক্ষ কপি। সবচেয়ে দ্রুত বিক্রী হয়েছে আন্দ্রে এইটনের এফ-প্ল্যান ডায়েট। ১৯৮২ সালে প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ৪ মাসের মধ্যে বিক্রী হয়েছে প্রায় দশ লাখ কপি। ১৯৮৪ সাল পেঙ্গুইনের বই বিক্রীর তুঙ্গবর্ষ। পাঁচ কোটি বই বিক্রী হয়েছে এই বছরে। এই

হিসেবে বলা যায় ১·৫ সেকেন্ডে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও পেঙ্গুইনের একখানা বই বিক্রী হয়েছে। লন্ডনী পেঙ্গুইন এখন ৯টি দেশে তার শাখা বিস্তার করেছে। ব্রিটেন, ইউ এস এ, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, হল্যান্ড, স্পেন ও ভারতবর্ষ তার মানচিত্রের মধ্যে এসে গেছে। এগুলিকে বলা যায় পেঙ্গুইন 'উপনিবেশ'। স্থানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিভিন্ন শাখাগুলি বই প্রকাশের দায়িত্ব নেবে। এ বিষয়ে পরে আসা যাবে, তার আগে তার অতীত ইতিহাস একটু নাড়াচাড়া করা যাক।

পেঙ্গুইন বুকস যাঁর মানস সন্তান সেই অ্যালন লেন কিছু রুপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মাননি। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল অতি সামান্য ভাবেই। বডলি হেড নামক এক প্রকাশন সংস্থায় অ্যালেন শিক্ষানবিশীর কাজ

SUNIL GANGOPADHYAY

ARJUN

শুরু করেছিলেন সামান্যতম বেতনে। বই ছাপার কাজকর্মে তাঁর হাতেখড়ি এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছিল কাকা জন লেনের কাছে। মানুষটি ছিলেন এক-বগগা এবং ঝুঁকিপ্রবণ, গতানুগতির সংস্কারমুক্ত। বিদ্যাবুদ্ধির চেয়ে কাণ্ডজ্ঞান এবং ইনটুইশন দ্বারা চালিত হতেন।

একবার এক রেলস্টেশনে সময় কাটাবার জন্য পঠনযোগ্য কিছুই না পেয়ে সহজে হাতের কাছে পাবার মত প্রকাশনার পরিকল্পনা এসে যায়। সেরা ভ্রমণ হালকা বহন—কথাটাই পেপারব্যাকের আদি কথা। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব বডলি হেডের কর্তৃপক্ষের কাছে সেদিন উদ্ভট এবং দূরদৃষ্টিহীন ছেলেমানুষীই মনে হয়েছিল। তাঁরা তখন তাঁদের শক্ত মলাটের বইবাণিজ্যের শক্ত গেরোয় পড়ে কিছুটা হিমসিম খাচ্ছেন। বাজারে কাগজের মলাটের শস্তা বই আদৌ

লবে কিনা এবং চললে তার ফলে শক্ত মলাটের বইয়ের আখেরে ক্ষতি হবে কিনা এবিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। অ্যালেনের পীড়াপীড়িতে নিমরাজি হয়ে গেলেন।

অ্যালেন লেন প্রথম দশখানা বই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত জগতে ভাগ্যপরীক্ষা করতে। এই বইগুলির মধ্যে আঁদ্রে মরোয়ার এরিয়েল (শেলীর জীবনী), আর্নেস্ট হেমিংওয়ের এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস এবং আগাথা ক্রিস্টির দি মিস্টিরিয়াস অ্যাফেয়ার্স অব স্টাইলস আমাদের কাছে বিশেষ পরিচিত। বই তো বেরোলো কিন্তু বিলেতের প্রকাশক গ্রন্থবিক্রেতারা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। শক্ত মলাটের বইয়ে তাঁরা তখনও সংস্কারাচ্ছন্ন। এই ছ পেনী দামের শস্তা বই তাঁদের কাছে খেলো ব্যাপার মনে হল। বই বিক্রীর দরজা মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেলেও
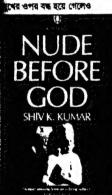
অ্যালেন কিন্তু চোখে অন্ধকার দেখলেন না, কারণ তিনি তো অন্ধকারে কপাল ঠুকতেই নেমেছেন। বইবিক্রেতাদের আশা ছেড়ে তিনি লন্ডনের শস্তা দামের এক বিখ্যাত পণ্যবিক্রেতা উলওয়ার্থ-এর শরণাপন্ন হলেন। এই চেইনস্টোরের শপ উইন্ডোতে পেঙ্গুইনের বই প্রদর্শনের অনুরোধ জানালেন অ্যালেন। অভাবিত সাড়া পাওয়া গেল। প্রায় আধ লাখেরও বেশী বইয়ের অর্ডার পাওয়া গেল। পেপারব্যাকের বাজার রমরমে হয়ে উঠলো। পেঙ্গুইনের ছ মাসের মধ্যেই দশ লক্ষ বই বিকিয়ে গেল অকল্পনীয়ভাবে।

ওই দশখানা বই ওই বছরেই অতিথি পাখির মত এসে হাজির হল ভারতে। প্রথমে যে পেঙ্গুইনকে মনে হয়েছিল মরসুমী পাখি, তা পাকাপাকিভাবে ডেরা গাড়লো প্রথমে এই কলকাতা শহরে, রূপা

Anees Jung

UNVEILING INDIA,

A Woman's Journey

কোম্পানীর সহযোগিতায়। সেই অর্থে পেঙ্গুইন ভারতের তথা কলকাতার নিকটাত্মীয়। তাছাড়া পেঙ্গুইনের আদিপর্বে কৃষ্ণ মেনন ছিলেন এই প্রকাশনার অন্তরঙ্গ এবং অন্যতম এক উপদেষ্টা ও সম্পাদক। তিরিশের দশকের শেষদিকে পেঙ্গুইনের কপাল অভাবিতভাবে খুলে গেল যুদ্ধের কৃপায়। সেনা বিভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দেখা দিল পেঙ্গুইন বুকস-এর চাহিদা। যুদ্ধরত মানুষের জন্য বিশেষ ধরনের বই যেমন টানতে থাকল তেমনি যুদ্ধকালীন ঘরবন্দী অবস্থায় জাতীয় ভাবনার পরিবর্তন হল। সাহিত্য সংস্কৃতি ও ইতিহাসের দিকে প্রবল আকর্ষণ দেখা দিল বুদ্ধিজীবী মানুষের। সে চাহিদা এই প্রকাশনা অক্লান্তভাবে পূরণ করে গেছে। স্যার অ্যালেন লেন হটকারীর মত বার বার ঝুঁকি নিয়েছেন, দিক বদলেছেন। তার ফল কখনো ভাল কখনো মন্দ হয়েছে কিন্তু সব মিলিয়ে তাঁর ম্যারাথন দৌড় অব্যাহত থেকেছে। লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার নিয়ে এরকমই এক সাময়িক ফ্যাসাদ বাধিয়েছিলেন তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর জয় সাহিত্যেরই জয় সূচনা করেছে।

পেঙ্গুইন স্রষ্টা অ্যালেন লেনকে জীবনের শেষ পর্বে নামতে হয়েছিল পেপারব্যাক যুদ্ধে। প্যান, কোরজি, ফোরস্কোয়ার, ফন্টানা প্রমুখ প্রায়

আধ ডজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে এক জবরদস্ত লড়াইয়ে।

১৯৭০ সালে অ্যালেনের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেঙ্গুইনের ভাগ্যলক্ষ্মীও বিদায় নিল। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠান হাত বদল হল কিন্তু উত্তরোত্তর লোকসানের বোঝা বেড়েই চলল। ১৯৭৮ সালে এই ডুবন্ত প্রকাশনার হাল শক্ত হাতে এসে ধরলেন পিটার মেয়ার। নানা জীবিকায় পোড়খাওয়া এই ধুরন্ধর মানুষটির খ্যাতি নিমজ্জিত গ্রন্থব্যবসায়ের পুনরুদ্ধারে।

আমেরিকায় অ্যাভন বুকস এবং পকেটবুক-এর প্রধান, একান্ন বছর বয়সী এই প্রবাদপ্রতিভা পেঙ্গুইনকে আবার ঢেলে সাজালেন। পুরনো রীতিনীতির বদল করে যুগোপযোগী এবং স্বয়ন্তরতায় ফিরিয়ে আনলেন পেঙ্গুইনকে। ব্যাকলিস্টের গলগ্রহ বোঝাকে অনেক ছাঁটকাট করে, মলাটের চিরকালীন সংস্কার কাটিয়ে, রক্ষণশীলতাকে অনেকটা শিথিল করে তিনি দ্রুত জনপ্রিয় গ্রন্থের দিকেও নজর দিলেন। সেইসঙ্গে নিলেন বৃহত্তম এক ঝুঁকি। অনেক ভেবে চিন্তেই। প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা ঢেলে তিনি পাঁচটি প্রখ্যাত অথচ রুগ্‌ণ প্রকাশন সংস্থাকে কিনে নিলেন পেঙ্গুইনের খাতে। সেই সঙ্গে ইংরেজি গ্রন্থের একমুখী রাস্তাকে তিনি দুমুখো করার পরিকল্পনায় যৌথ উদ্যোগে নামলেন পূর্ব পশ্চিমব্যাপী বিভিন্ন দেশে। পেঙ্গুইনের চীফ এক্সিকিউটিভ পিটার মেয়ার ভারতে তাঁদের যৌথ উদ্যোগ নিলেন আনন্দ পাবলিশার্সের সঙ্গে মিলিতভাবে। ভারতীয় লেখকের ইংরেজি রচনা এবং অনুবাদই প্রকাশ করবেন পেঙ্গুইন বুকস ইন্ডিয়া ভারতে এবং ভারতের বাইরে বিস্তৃত হবে তার বাজার। গ্রন্থ নির্বাচন, মুদ্রণ এবং পরিবেশন পারিপাট্যের দায় এই ভারতীয় প্রকাশকের এক্তিয়ারে। প্রথমে বছরে ১৫ খানা বই প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছেন এই সংস্থা। তিনটি উপন্যাস, একটি কবিতা সংকলন, একটি সমাজতত্ত্ব আর একটি জীবনী—মোট ছটি চিত্তাকর্ষক বই নিয়ে এই ১৭ অক্টোবরে তাঁদের প্রথম পদক্ষেপ ঘটলো।

বিষয়বৈচিত্র্যে এবং রচনার উৎকর্ষে এই ছটি গ্রন্থ পেঙ্গুইনের স্মৃতিভারাতুর পাঠককে আকর্ষণ করবে তাতে সন্দেহ নেই। বাঙালী লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাসটি বাংলা থেকে অনুবাদ করেছেন চিত্রিতা ব্যানার্জী-আবদুল্লা। ■
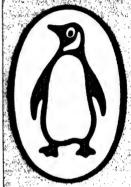
অক্টোবরের ছটি বইয়ের পর পেঙ্গুইন আরও সাতখানা বই ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করে ফেলেছেন। প্রতি মাসে একটি করে যে মাস পর্যন্ত যে [illegible]

বিশ্বকবির বিশ্বভ্রমণ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

বিদেশ ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ/ জয়তী ঘোষ/
মডার্ন কলম/কল-৯/ ৫০.০০

রবীন্দ্রজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প আলোচিত বিষয় নিয়ে ডঃ জয়তী ঘোষ 'বিদেশ ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক এই মূল্যবান বৃহৎ গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বহুবার বিশ্বপর্যটনের ফলে তাঁর চিন্তায় এবং ধ্যানধারণায় যে-পরিবর্তন ঘটেছিল তার কোনো ক্রমিক ইতিহাসনির্ভর তথ্যপঞ্জী ও বিবরণ এযাবৎ তেমনভাবে সংকলিত হয়নি। সম্প্রতি প্রকাশিত এ গ্রন্থটিকে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রমণ বিষয়ে একপ্রকার প্রামাণিক দলিল রূপে গ্রহণ করা যায়।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রজীবননির্ভর গবেষণা-গ্রন্থসমূহে এই বইয়ের নাম পাদটীকায় পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হবে।

আলোচনার প্রথমেই একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে—লেখিকা তাঁর বইতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপর্যটনের ইতিহাসের অর্ধাংশ এখানে সংকলিত। কিন্তু বইয়ের সুদৃশ্য মলাটে বা ভিতরের নামপত্রে এ-বিষয়ের কোনো নির্দেশ নেই। যে-কোনো পাঠক বইটি হাতে নিয়ে প্রথমে মনে করবেন—প্রকাশিত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বিদেশ ভ্রমণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ। বস্তুত তা নয়। কভারে বা টাইটেল-পেজে '১৯২১ সাল পর্যন্ত'—এইরূপ নির্দেশ থাকা উচিত ছিল। আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকব।

বর্তমান গ্রন্থে লেখিকা রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণ পর্বকে কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়েছেন। ইতিবৃত্ত রচনায় শ্রীমতী জয়তী প্রধান উপকরণরূপে বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসংক্রান্ত সমসাময়িক পত্রপত্রিকার কর্তিতাংশ ব্যবহার করেছেন। ইতিহাস প্রস্তুত কর্মে এই শ্রেণীর উপকরণ খুবই মূল্যবান। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ ও চিঠিপত্র এবং অন্যান্য নানা সূত্র থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে লেখিকা তাঁর রচিত ইতিহাসটিকে যথাসাধ্য সম্পূর্ণতা দান করতে চেয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জগতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে—তা যেমন জয়তী বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি কবির বিভিন্ন বিদেশবাস পর্বে বিদেশী বিশিষ্ট মনীষী ও সুধীজন—যাঁরা কবির সান্নিধ্যে এসেছিলেন—তেমন বহুজনের কথা এই গ্রন্থে সবিশেষ বিধৃত হয়েছে। বইটিতে রবীন্দ্রনাথের যে-সব দেশ ভ্রমণের বিবরণ ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে তা এই রকম : প্রথম পরিচ্ছেদ : ইংলন্ড (১৮৭৮-১৮৮০) ; দ্বিতীয়

ম্যাঞ্চেস্টার কলেজের অধ্যক্ষ এল পি জ্যাকস-এর সঙ্গে অক্সফোর্ডে রবীন্দ্রনাথ

পরিচ্ছেদ : ইংলন্ড (১৮৯০) ; তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইংলন্ড (১৯১২-১৩) ; আমেরিকা (১৯১২-১৩), [এই পরিচ্ছেদের অন্তর্গত ৬৫ পৃষ্ঠার একটি মূল্যবান অধ্যায় 'গীতাঞ্জলি ও নোবেল পুরস্কার'] ; চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জাপান (১৯১৬-১৭), আমেরিকা (১৯১৬-১৭) পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ইংলন্ড (১৯২০-২১), ফ্রান্স (১৯২০-২১), আমেরিকা (১৯২০-২১), নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়াম (১৯২০), সুইস দেশ (১৯২১), সুইডেন (১৯২১), চেকোস্লোভাকিয়া (১৯২১), জার্মানী (১৯২১)। গ্রন্থের ষষ্ঠ ও শেষ পরিচ্ছেদের শিরোনাম : যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম। ইংলন্ড আমেরিকা ফ্রান্স জাপান ভ্রমণের সঙ্গে এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের কি সম্পর্ক ? বস্তুত, সম্পর্কটি বড় গভীর, ভাবমূলক এবং বিশেষ তাৎপর্যবহ। এই পরিচ্ছেদে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণের ভূমিকা সবিস্তার বিশ্লেষিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ভাবনা ও বিশ্বমৈত্রীবোধের চেতনা রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণের পশ্চাতে কার্যকর ছিল। 'বিশ্বভারতী' নামক আইডিয়াটি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপর্যটনের সূত্রে কিভাবে ক্রমে গড়ে উঠেছিল, লেখিকার তথ্যবহুল ও যুক্তিনির্ভর আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পূর্বেই বলেছি এই গ্রন্থের প্রধান উপকরণ দেশ-বিদেশের পুরাতন সংবাদপত্রের কর্তিতাংশ থেকে সংগৃহীত। এ-কথা গ্রন্থের 'নিবেদনে' লেখিকা, এবং গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত মহাশয় বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। 'নিবেদন' ও 'ভূমিকা'র এই অংশ পাঠ করেই এই বইয়ের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হই। বুঝতে পারি কিছু নূতন কথা নূতন তথ্য নূতন সংবাদ এ-বই থেকে সংগ্রহ করা যাবে। নতুবা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রমণ-বিষয়ে প্রভাত মুখোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী দেবী, জ্যোতিষ ঘোষ প্রমুখ তাঁদের গ্রন্থে কী-বলেছেন না-বলেছেন তা তো আমাদের একরকম জানা আছে। এই কাজের পক্ষে পুরাতন সংবাদপত্রের সংবাদ যে খুবই মূল্যবান, তা জয়তী বিবেচনা করে গভীর বিচক্ষণতার ও যথার্থ গবেষক-মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি, দেশ-বিদেশের পুরাতন পত্র-পত্রিকার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রকাশিত যে-সব সংবাদ ও বিবরণ আজও আমাদের অজ্ঞাত—সে-সবের প্রতি আমাদের আগ্রহ এবং কৌতূহল তীব্র। লেখিকা বলেছেন রবীন্দ্রভবনে এই সংক্রান্ত যত পেপার-কাটিংস সংরক্ষিত আছে তা নিঃশেষে ব্যবহার করেছেন। বস্তুত তাঁর এই নিবেদনে আমরা পুরোপুরি খুশি নই। প্রথম প্রশ্ন—রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে যত পেপার-কাটিংস ফাইল আছে—তা কি বর্তমান গবেষণামূলক গ্রন্থের পক্ষে পর্যাপ্ত ? রবীন্দ্রভবনে যতটুকু সংগৃহীত আছে তাইতেই গবেষক সন্তুষ্ট হবেন কেন ? আমরা পাঠকরাই বা পরিতুষ্ট হব কেন তাতে ? বস্তুত এই কাজটিকে যদি পরিপূর্ণতা দিতে হয়, তবে, রবীন্দ্রনাথ যে-যে দেশে যখন-যখন ভ্রমণ করেছেন, সেই-সেই দেশের সেই-সেই সময়কার যাবতীয় সাময়িকপত্রের ফাইল দেখতে হবে, সেই দেশবাসীর বা দেশভাষীর সাহায্য নিতে হবে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভাল-মন্দ যেখানে যা বলা হয়েছে তা সব সংগ্রহ করতে হবে, প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক অংশসমূহ তরজমা করিয়ে নিতে হবে এবং শেষে সংগৃহীত সমস্ত উপকরণ সম্পাদন করে গ্রন্থ প্রণয়ন করতে হবে।

বর্তমান গ্রন্থে লেখিকা রবীন্দ্রভবন সংগ্রহালয় থেকে যে-উপকরণ সংগ্রহ করেছেন—তা সবই তিনি বাংলা ভাষায় তরজমা করে দিয়েছেন। তিনি যত-সংখ্যক পুরাতন সংবাদপত্র ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে ইংরেজি পত্রিকার সংখ্যাই সিংহভাগ। এটা তো লঘু-রচনার বই নয় ; পি· এইচ· ডি-র জন্য নির্মিত থিসিস—বড় আকারের গবেষণা-গ্রন্থ। এমন বইতে ইংরেজি সংবাদপত্র থেকে যত উদ্ধৃতি তার অধিকাংশের অনুবাদ করে দেবার প্রয়োজন হল কেন ? কিছু কিছু উদ্ধৃতি আবার ইংরেজিতেই আছে ; বাকি সব ইংরেজি কাগজের সংবাদ লেখিকা উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে নিজে অনুবাদ করে দিয়েছেন। লেখিকার ভাষা সুন্দর, মনে হয়, বাংলা প্রকাশিত কাগজ থেকে যেন বিবরণ পড়ছি। এই অনুবাদের জন্য তাঁকে যে অতিরিক্ত অনেকখানি পরিশ্রম

তে হয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু
মাদের বক্তব্য, এই গ্রন্থের জন্য ইংরেজি কাগজের
বাদ বাংলায় তরজমা করে দেবার প্রয়োজন ছিল
? ইংরেজি সংবাদগুলি ইংরেজিতে মুদ্রিত হলে
য়ের প্রামাণিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা আরও
ড়তো।
ীন্দ্রভবনে এমন অনেক পুরাতন জীর্ণ পেপার
টিংস আছে যেখানে পত্রিকার নামও নেই,
রিখও নেই। এখন গবেষকের কর্তব্য হল—সেই
গজের নাম কি এবং সেটি কোন তারিখের
বাদপত্রের কর্তিতাংশ—তার সংবাদ আমাদের
ান করে এনে দেওয়া। নতুবা নাম-গোত্রহীন
বাদপত্র ও তার সংবাদের মূল্য কি ? 'নামবিহীন
বাদপত্র' থেকে লেখিকা যে-সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন
তাৎপর্যহীন। বিভিন্ন ভ্রমণ-পর্যায়ের মধ্যে
পান-ভ্রমণ (১৯১৬-১৭) সংক্রান্ত বিবরণ কিছু
ল। জাপানী সংবাদপত্রের মধ্যে 'টোকিও
নাচী' ও 'ইয়রোডজ্জা' থেকে দুটি উদ্ধৃতি আছে ;
উদ্ধৃতি দুটিও জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের বই থেকে
ীত,—লেখিকা তা উল্লেখও করেছেন। কিন্তু
১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন জাপানে যান তখন
খানকার কাগজে-কাগজে 'ভারতীয় ঋষি-কবি'র
পর্কে কত যে অজস্র সংবাদ ছাপা হয়েছিল তা
আমরা জানি (দ্র., 'জাপানী সাংবাদিকদের
চোখে রবীন্দ্রনাথ : ১৯১৬', দেশ, সাহিত্যসংখ্যা,
৩৭৭ ; এবং 'নানা রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ)।
লেখিকার গ্রন্থে জাপানের পত্রিকা Osaka
Mainichi Shimbum, Osaka Asahi
Shimbum, Yomiuri Shimbum, Osaka Jiji
Shinpo ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকার কোন
সংবাদ নেই—নামোল্লেখও সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।
... ও মিস্টার আজুমা এক সময় জাপান থেকে
... কাগজের প্রয়োজনীয় ফটোকপি আনিয়ে
... করেছিলাম—'সাহিত্যসংখ্যা'য় তা ছাপা
হয়েছিল। এই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলাম এই কারণে
যে এই কাজের জন্য রবীন্দ্রভবন সংগ্রহের উপর
... নির্ভর করলে চলবে না। গবেষণাকে আরও
... আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে গেলে চাই আরও
অনুসন্ধান, আরও বিস্তারিত সংগ্রহ।
সামগ্রিকভাবে লেখিকা আমাদের হাতে যা তুলে
দিয়েছেন—তেমনভাবে ইতিপূর্বে আর কোনো গ্রন্থে
পাইনি। লেখিকাকে তাঁর রচিত এই সুপাঠ্য
গবেষণামূলক গ্রন্থটির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ
জানিয়েও বলবো—তিনি যে-কাজ করেছেন তারই
মধ্যে তিনি যেন সন্তুষ্ট না থাকেন। তাঁর অসন্তোষই
আমাদের সন্তোষের কারণ।

তিনটি ছবি নিয়ে গল্পসল্প

কমল সরকার

আলেখ্যমঞ্জরী/ পরিতোষ সেন/
জি. এ. ই. পাবলিশার্স/ কল-৬/ ১৫.০০

পরিতোষ সেনের আত্মজীবনীমূলক প্রথম গ্রন্থ
'জিন্দাবাহার লেন' পড়ে বুদ্ধিজীবীরা মুক্তকণ্ঠে তাঁর
প্রশংসা করেছিলেন। মাদ্রাজের গভর্নমেন্ট আর্ট
স্কুলের ছাত্র পরিতোষবাবুর শিল্পশিক্ষা লাভ ভাস্কর
দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে। দেবীপ্রসাদের
মতোই পরিতোষবাবু রেখার সঙ্গে লেখার প্রতিও
তন্নিষ্ঠ হয়ে উঠছেন ক্রমশ। 'জিন্দাবাহার'-এর পর
প্রকাশিত হয় 'আমসুন্দরী ও অন্যান্য রচনা'।
অতঃপর 'আলেখ্যমঞ্জরী'।
আলেখ্যমঞ্জরীতে রয়েছে তিনটি খণ্ডকাহিনী।
কাহিনী তিনটির যোগসূত্র হল, প্রত্যেকটিতে একজন
মহান শিল্পীর তিনটি অসামান্য ছবি আঁকার গল্প বলা
হয়েছে। আলেখ্যমঞ্জরীর শিরোনামের নিচে বইটির
উপনাম দেওয়া হয়েছে : 'তিনটি মাস্টারপিসের
নেপথ্য কাহিনী'।
পরিতোষবাবু এ গ্রন্থে মুঘল মিনিয়েচার শিল্পী
বিষেণদাসের 'মৃত্যুশয্যায় চিত্রকর এনায়েত খাঁ',
নিহালচাঁদের 'কিষেণগড়ের রাধা' এবং ভ্যান গখের
'চেয়ার' ছবি আঁকার বিষয়ে গল্প বলেছেন। ভূমিকায়
পরিতোষবাবু বলেছেন : "প্রথমত আমার দৃষ্টিতে এ
তিনটি ছবি তাদের নিজগুণে মহান। দ্বিতীয়ত, এ
তিনটি চিত্র এবং চিত্রকর সম্বন্ধে গল্প বানাবার মতো
মোটামুটি রসদ যোগাড় করতে পেরেছি।"
পরিতোষবাবু তারপর বলেছেন : "এ রচনা কটি
অল্পবিস্তর ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক হলেও, আসলে
এগুলো গল্প।" লেখা তিনটির প্রবহমান প্রসাদগুণ
আছে। তরতর করে এগিয়ে যাওয়া যায়।

ইতিহাসকে ভিত্তি করে কল্পনার ইমারত গড়েছেন
তিনি। কাহিনীর টানও আছে। কিন্তু পরিতোষবাবু
দাবি করলেও "এগুলো গল্প" নয়। গল্পের উপাদান
প্রত্যেকটিরই ছিল, তা নিয়ে পরিতোষবাবু নাড়াচাড়া
করেছেন মাত্র। কোথাও কোথাও গল্পের রুদ্ধশ্বাস
পরিস্থিতি তৈরিও হয়েছে। কিন্তু গল্পের কৌতূহল কি
ভাবে বজায় রাখতে হয়, আলাপ, বিস্তার থেকে
ঝালার দ্রুত লয়ে যাবার প্রক্রিয়া তৈরি করতে হয়,
পরিতোষবাবুর তা জানা নেই। এ কথা সত্যি যে,
তিনি গল্প-লেখক নন। 'ছোটও হবে, গল্পও হবে'
থেকে 'বিন্দুতে থাকবে সিন্ধুর গভীরতা'—
গল্পচিন্তার এইসব তত্ত্বকথার অন্তর্নিহিত সুরটা তিনি
ধরতে পারেননি। তাঁর সামনে 'মুন অ্যান্ড সিকস
পেন্স', 'লাস্ট ফর লাইফ', 'ম্যুলাঁ রুজ'-এর উদাহরণ
কিন্তু ছিল। তিনটি ছবির রচনা-কাহিনী তিনি সেই
ছাঁচে ঢালাই করবেন বলে বোধহয় স্থিরও
করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে গল্প জমেনি।
আগেই বলেছি সুখপাঠ্য রচনা। কিন্তু কিছু কিছু
অসঙ্গতি না থাকলেই যেন ভালো হত। প্রসঙ্গত
বলে রাখি, প্রথম দুটি রচনা সাধু ভাষায় লেখা।
শেষটি চলিত গদ্যে। সাধু বা চলিত গদ্যে কিছু এসে
যায় না। কিন্তু দুর্বল বাক্যের প্রাবল্য রয়েছে প্রচুর।
এ কারণে, মাঝে মাঝে বন্ধুর পথে হোঁচট খেতে
হয়েছে। যেমন : "সারা দুনিয়ার আলো এবং তাঁহার
বেগম নূরজাহা অনেক অনুনয় বিনয় করা সত্ত্বেও
বাদশাহ অনাহারে শুইয়া পড়িলেন।" এখানে 'এবং'
শব্দটির জন্যে সারা দুনিয়ার আলো এবং তাঁহার
বেগমকে দুজন আলাদা ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে।
প্রথম দুটি শব্দ যদি বেগমসাহেবার বিশেষণ হয়,
তাহলে 'এবং তাঁহার' শব্দ দুটি অধিকন্তু। এখানে
দোষ[illegible]য়, কারণ বাক্যের অভিপ্রেত অর্থ বদলে
যাচ্ছে।
দ্বিতীয় গল্পের বহু উদাহরণ থেকে একটি বাক্য বেছে
নেওয়া যাক : "তাহার মস্তক হইতে সমস্ত রক্ত
বিদ্যুৎ গতিতে নামিয়া আসিয়া তাহার গণ্ডদ্বয়ে দুইটি

লাল গোলাপের মত ফুটিয়া উঠিল"—মস্তক, গণ্ড, বিদ্যুৎগতি এবং লাল গোলাপ—তুমুল কাণ্ড। এবং বাক্যটি যেন মিশ্রিত উপমার উদাহরণ।

তৃতীয় গল্পে দেখি ভ্যান গখ তাঁর চেয়ারটা 'অবলোকন' করছেন। তাঁর চোখের "পলক থেমে যায়" (পলককে কি তিনি কোনও যানবাহনের সঙ্গে উপমা দিচ্ছেন ?)। "শারীরিক চক্ষু" অযথা। "অন্তশ্চক্ষুর"র সঙ্গে পার্থক্যের জন্যে প্রথমটির ক্ষেত্রে শুধু চোখ বললেই যথেষ্ট হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাক্য ব্যবহার কর্ণপটবিদারী, যেমন : "এই কুটুম্বিতা এমনই অসমান যে চেয়ারকে বাদ দিয়ে মানুষের চললেও, চেয়ারের চলে না।" এখানে "অসমান" শব্দের মানে আছে কি ? একটা চেয়ার "নিঃসঙ্গতার প্রতীক" হতেই পারে। কিন্তু চেয়ারটা ভ্যান গখের "মানসিক অবস্থার সমার্থক" হয় কি করে ? অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। অসাবধানে শব্দ প্রয়োগ করেন বলেই তাঁকে বড় মাপের গদ্যশিল্পী বলতে দ্বিধা হয়।

পরিতোষবাবু গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধের ভাষা এবং ছবির করণকৌশল ও আঙ্গিকের সমালোচনা মিশিয়েছেন। ফলে, কখনও মনে হয় গল্প পড়ছি, কখনও প্রবন্ধ বা সমালোচনা। যেমন দ্বিতীয় গল্প থেকে নেওয়া যাক : "নিহালচাঁদের রচনাশৈলীতে (? রচনাশৈলীর) যেটি প্রধান লক্ষণীয় দিক, সেটি শূন্য স্থানের (স্পেস) খেলা।" শিল্পসমালোচকের মতো এ রকম ভাষা প্রয়োগের উদাহরণ কত রয়েছে এই বইতে। ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ভাষা প্রয়োগের উদাহরণ : "সতেরো শ সাতচল্লিশ সাল। আহম্মদ শাহ আবদালী তখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। নানা চক্রান্তে এই দুর্বল বাদশাহের মসনদ টলমল হইয়া উঠিয়াছে। তাই রাজনৈতিক এবং সামরিক পরামর্শের জন্য সাবন্ত সিংহকে দিল্লী আসিবার জন্য বাদশাহ জরুরী বার্তা পাঠাইলেন।" এটি ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের ভাষা নয় কি ? —গল্পের বুনুনির মধ্যে ইতিহাস এবং শিল্পকলার আলোচনা কি ভাবে খেলাতে হয়, খেলিয়ে তুলতে হয়, সম্ভবত পরিতোষবাবুর সেটি জানা নেই। পরিতোষবাবু সমরসেট মম অথবা আর্ভিং স্টোন-এর মতো শিল্পীর জীবন নিয়ে গল্প লিখতে পারেননি। লিখেছেন এক জাতের রম্যরচনা।

'আলেখ্যমঞ্জরী'র শেষ রচনাটি পড়লে অনেকের মনে হতে পারে যে গগ্যার জন্যে গখ পাগল হয়েছিলেন। কিন্তু মনের চিকিৎসকেরা ইদানীং বলছেন যে 'সিজোফ্রেনিয়া' বা উন্মাদ অবস্থার জন্যে দায়ী সম্ভবত শারীর রসায়নের পরিবর্তন। তার সঙ্গে মানসিক আঘাত লাগা বা ঘটনার সংঘাত, দ্বন্দ্বের সম্পর্ক দৈবাৎ এবং কাকতালীয়। মানসিক টানাপোড়েন এবং চাপের ফলে মানুষ ন্যুরোটিক হয়। বাংলা ভাষায় পাগল এবং পাগলাটের মধ্যে যে তফাত করা হয় অনেকটা তেমনি। মনোরোগের সেই ন্যুরোটিক অবস্থা বিশ্লেষণে সারে। গখের আচরণে বহু আগে থেকেই সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ ছিল। 'লাস্ট ফর লাইফ'-এ মোমবাতির শিখার ওপর হাত রেখে পুড়িয়ে ফেলার ঘটনার কথা মনে করলেই একথা পরিষ্কার হবে। গখ জাত শিল্পীর প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন। সৃজনীশক্তির প্রবাহে তাঁর উন্মাদদশা চাপা ছিল। স্বভাবতই প্রসঙ্গটি বিজ্ঞানভিত্তিক নয়।

এসব ত্রুটি সত্ত্বেও বইটি সুখপাঠ্য এবং সংগ্রহযোগ্য। সংকলিত ছবি তিনটির মৃত্যুশয্যায় এনায়েত খাঁ এ বইয়ের অনন্য সম্পদ।

তিন রকম দৃষ্টিতে

মালবী গুপ্ত

বৈসূচনের সেনা/মহাশ্বেতা দেবী/
প্রমা প্রকাশনী/কল-১৭/২২.০০

হৃদয়তল/বিমল কর/
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/কল-৯/১৬.০০

পায়ে পায়ে পথ/মহীতোষ বিশ্বাস/
'মাঙ্গলিক'/উত্তরায়ণ/মধ্যমগ্রাম/২৫.০০

মহাশ্বেতা দেবীর কোন বই হাতে নিলে পাঠককে মেরুদণ্ড সোজা করে বসতে হয়। কারণ তাঁর শক্তিশালী কলমের গতির প্রচণ্ডতায় পাঠকের ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা যেন অবধারিত। তাই লেখিকার কাছে পাঠকের প্রত্যাশা এবং দাবি দুইই কিছু অতিরিক্ত যা তিনি প্রায়শই পূরণ করে থাকেন। তাঁর রচনার বিশাল ক্যানভাসটি গ্রাম এবং শহরের দুই প্রান্তকেই স্পর্শ করে আছে। এবং ক্যানভাসের চিত্রকল্পগুলিতে রঙের রূপারোপ সমসাময়িক, বাস্তবধর্মী এবং জীবন্ত।

তাঁর 'বৈসূচনের সেনা' বিষয়ের অভিনবত্বও দাবি করে। এই কলকাতা শহরে দোর্দণ্ড প্রতাপ সমাজবিরোধীদের নৃশংস অত্যাচারে কোণঠাসা মানুষের জীবন, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা এবং সর্বোপরি অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা—এই কাহিনীর বিষয়বস্তু। লেখিকার মতে—যখন এদেশে 'সমাজবিরোধী, অপরাধ নামক বৃহৎ শিল্প, তার পিছনে প্রশাসন ও রাজনীতির ভূমিকা বর্তমানে এক জরুরি গবেষণার বিষয়' তখন সেই গবেষণার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েই যেন 'বৈসূচনের সেনা'র আত্মপ্রকাশ। মস্তানদের গুরু শিবেন রায় যে কর্তা নামেই পাড়ায় বে-পাড়ায় পরিচিত, এবং যার মাথার ওপর আর একজন অদৃশ্য রাজনৈতিক 'বিগবস' আছেন যিনি ওপর থেকে কলকাঠি নেড়ে কর্তাকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন বিনিময়ে যার উদর আরো স্ফীত করার দায়িত্ব নেয় কর্তা, সেই কর্তার এক অপরাধের হঠাৎ সাক্ষী হয়ে পড়ায় নিরীহ নিম্নবিত্তের ধীরেন তলাপাত্রর ধড় কিভাবে মুণ্ডহীন হয়ে পড়ে তা পড়তে গিয়ে পাঠকের গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে। পাঠক সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তগুলো থেকে চোখ সরিয়ে নিতে চাইলেও লেখিকা যেন ঘাড় ধরে তাকে সেই সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রাখেন। আবার অভিরূপের নেতৃত্বে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা ও সমাজবিরোধী দলকে উৎখাত করার জন্য পাড়ায় শান্তি কমিটির সভায় এবং মিছিলে পাঠকও জনগণের বিশাল ভিড়ে মিশে যায়।

অভিরূপের মুখ দিয়ে লেখিকা যেন দেশের সমস্ত মানুষের কাছে এক আহ্বান জানাচ্ছেন, 'যে প্রত্যন্তে শান্তি রক্ষার জন্যে শান্তি কমিটি' গড়ুন, সমাজবিরোধীদের উচ্ছেদ করুন। আর এই কমিটির প্রতিটি সদস্যই হয়ে উঠতে পারেন এক একজন 'বৈসূচনের সেনা' যারা 'মানবসৃষ্ট অমঙ্গলকে ধ্বংস করতে' পারে। হয়তো সর্বত্র তাদের মিলিত চেষ্টা সফল নাও হতে পারে, কিন্তু চেষ্টাটা চালিয়ে যেতে হবে নিরন্তর নিজেদের বাঁচার তাগিদেই। নাহ, বক্তব্য কোথাও স্লোগান হয়ে ওঠেনি। বরং উপন্যাস হলেও 'বৈসূচনের সেনা' সমসাময়িক সমাজের যেন একটি প্রাসঙ্গিক দলিলচিত্র।

বিমল করের রচনা হয়তো বিষয় বৈচিত্র্যে তেমন অভিনব নয়। বরং একেবারে সাদামাটা আমাদের ঘরোয়া জীবনের খুঁটিনাটি, দৈনন্দিনতা। কিন্তু যাকে লেখক গভীর মমতায়, সযত্ন পরিমিত পরিশীলনে মূর্ত করে তোলেন, পাঠকের মগ্ন হৃদয়কে তা স্পর্শ কখনো বা ধ্বস্ত করে। 'হৃদয়তল'-এ লেখক এক মধ্যবিত্ত পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষা- স্বপ্ন- বাস্তবের টানাপোড়েন নিয়ে যেন এক ঠাস জমি বুনেছেন। প্রৌঢ় রজনীকান্ত ও স্ত্রী প্রতিভা কলকাতার

শহরতলীতে নিজেদের অসমাপ্ত বাড়িতে দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে সদ্য সংসার পেতেছেন। সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে রজনীকান্ত তাঁর নতুন বাড়িতে স্বপ্নের সাধগুলিকে মূর্ত করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু ছোট ছেলে অতীশ দেখছে 'বাবা নিজের বাড়ি নিয়ে যত খুশি, সন্তুষ্ট গদগদ—মা তেমন নয়'। বেকার অতীশ চাকরির চেষ্টা চালাচ্ছে। দাদা সীতেশ চাকরি করে। বিবাহিত জীবনের ইতি টেনে দিদিও চাকুরে। 'আমাদের বাড়ি'-কে ঘিরে পাঁচজনের সংসার হেসে খেলে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎই অশান্তির কালো মেঘ ঘনাতে শুরু করল। কোথাও ঘটনার ঘনঘটা নেই। কিন্তু অশান্তি চূড়ান্তে পৌঁছলে সীতেশ মায়ের প্রতি ঘৃণা, দিদির প্রতি অসম্মান প্রকাশ করায় প্রতিভা অসুস্থ হয়ে পড়েন। মণিকা বুঝতে পারে 'এ সংসারে পা রাখার জোর তার নেই।' মায়ের শরীর নিয়ে অতীশ উদ্বিগ্ন। আর অসুস্থ স্ত্রীর বিছানার পাশে বিনিদ্র রজনীকান্তর মনে—'এই বাড়ি তিনি কেন করেছিলেন?'—আশ্রয়, সুখ, শান্তি, আত্মতৃপ্তি ও ছেলেমেয়েদের জন্য। কিন্তু সেই সুখশান্তি কি তিনি, প্রতিভা পেয়েছেন? যে 'সুখশান্তি ইট কাঠ দরজা জানলার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে না। থাকে মানুষকে জড়িয়ে।' এবং কেন প্রতিভা বুঝতে পারছেন না যে সংসারে অধিকার, কর্তৃত্ব একসময়ে ছেড়ে দিতে হয়—ইত্যাদি গভীর প্রশ্ন জেগে ওঠে। পাঠকের হৃদয়তলেও ঐ অমোঘ প্রশ্নগুলি গিয়ে যেন কড়া নাড়ে। কাহিনীর প্রতিটি চরিত্র আমাদের যেন ভীষণ চেনা আপনজন। গল্পের শেষেও পাঠকের মগ্নচেতনা ক্ষণিক আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

যশোর জেলার বিলভাসান গ্রামে একসময়ে কিভাবে তেভাগা আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল, এলাকার জমিদার জোতদারদের অত্যাচারে নিরন্ন সহনশীল চাষীরাও একদিন কিভাবে তাদের দাবি ও অধিকার আদায়ের জন্য সংগবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এবং তাদের সেই চেতনাকে উদ্বুদ্ধ ও জাগরণের জন্যই জমিদারের শিক্ষিত পুত্র সত্যপ্রসাদের অক্লান্ত আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আন্দোলনের ব্যর্থতা—এইসব নিয়েই মহীতোষ বিশ্বাসের 'পায়ে পায়ে পথ' দীর্ঘ কাহিনী। মার্ক্সবাদের দীক্ষায় দীক্ষিত সত্যপ্রসাদ বুঝেছিলেন, 'চাষীদের মুক্তির একমাত্র পথ তাদের আত্মজাগরণ।' আর সেই মহাকার্যের ভার নিজে গ্রহণ করে সত্যপ্রসাদ বাড়ি ছেড়ে বিলভাসানে চাষীদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। চেষ্টা চালিয়েছেন, 'চাষীদের শ্রেণী বৈশিষ্ট্য বুঝিবার।' ক্রমে 'প্রাদেশিক কৃষকসভা'র নির্দেশে বিলভাসানে কৃষকসমিতি গড়ে তুলেছেন। গ্রামের মেয়ে বউদের নিয়ে মহিলা সমিতিও গড়ে উঠেছে। যাদের সক্রিয় বাধায় প্রবল প্রতাপ দারোগাকেও দলবল নিয়ে রণে ভঙ্গ দিতে হয়। চাষীদের দলবদ্ধ সশস্ত্র পাহারায় মাঠের ধান পাট কেটে তেভাগার ভাগ নিয়ে ঘরে ফেরায় স্থানীয় জোতদার জমিদারদের কোপদৃষ্টি পড়ে সত্যপ্রসাদের ওপর। পুলিশি তৎপরতায় তাঁকে পালিয়ে বেড়াতে হয়। তেভাগার অধিকার কায়েম করার জন্য কৃষকরা যখন মরণপণ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল তখন 'স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলায় তেভাগা সংগ্রামকে টুঁটি টিপে মারার সব ব্যবস্থাই যেন অবলম্বন করা হলো।'

সত্যপ্রসাদের গ্রেফতার এবং স্থানীয় স্কুলে পুলিশ ক্যাম্প বসার সঙ্গে সঙ্গে বিলভাসানের আন্দোলন পঙ্গু হয়ে গেল। রামদা কাস্তে তীর-ধনুক নিয়ে বিলভাসানের যে গরীব কৃষকরা সমস্ত অত্যাচারের প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, দালাল পুলিনকে হত্যা করেছিল। ঐভাবেই তাদের সেই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটল।

গ্রাম্যজীবনের পটভূমিতে দজ্জাল ফুলি, সিজি, কৈলাস, যতীন, ধনু পাগলা, গগন, সৌরভী, জলধর, চাঁপারা জীবন্ত হয়ে ওঠে। চাঁপা ও জলধরের কৈশোর প্রেম কাহিনী, একটু হাল্কা আমেজ আনে। কিন্তু সত্যপ্রসাদের প্রতি সৌরভীর প্রগলভতা কিঞ্চিৎ অস্বস্তি জাগায়। সব থেকে উজ্জ্বল এবং বৈচিত্রপূর্ণ চরিত্রটি হল ফুলির। যার 'সম্পর্কে পুলিশের মধ্যে বিস্ময় এবং আতঙ্ক আরো বেশি করে দানা বেঁধে' উঠেছিল।

গল্প-বলা এবং চরিত্র চিত্রণে লেখক অবশ্যই স্বচ্ছন্দ সাবলীলতার দাবি রাখেন। কিন্তু 'পায়ে পায়ে পথ' তেভাগা আন্দোলনের কাহিনী হলেও কোথাও যেন একটু আগুনের অভাব থেকে গেছে। সমস্ত পটভূমি নিয়ে চরিত্রগুলি যেন ঠিক জ্বলে উঠতে পারল না। পাঠক যেন ঠিক একাত্ম হতে পারে না।

বিলভাসানের মানুষজনের সঙ্গে হেঁটে যেতে পারে না একই পথে পায়ে পায়ে। একটা দূরত্ব যেন থেকেই যায়।

তিনটি বইয়েই একটা জিনিস ভাল লাগল। মুদ্রণ প্রমাদ প্রায় অনুপস্থিত।

হেমন্তের ফসল

কৃষ্ণা বসু

ঘুমিয়ে পড়ার আগে/ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/ কল-৯/ ১০.০০

এই বইটির সর্বত্র নিবিড় ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে মৃত্যু। অধিকাংশ কবিতায়, কোথাও সরাসরি, কোথাও পরোক্ষত, মৃত্যুর শীতল হাতের ছোঁওয়া অনুভব করা যায়। বইটির নামেও কবি সেই ঘুমের কথাই বলেছেন, যে ঘুম কখনো ভাঙার নয়।

'ওয়েটিং রুম' কবিতায় কবি আমাদের একটি ওল্ড-হোমের কথা বলেছেন, যেখানে সকলেই অপেক্ষা করে আছে যার যার নিজস্ব শেষ ট্রেন এসে গেলে চলে যাবার জন্য; অনুভবী পাঠকের বুঝে নিতে অসবিধা হয় না যে এই ট্রেন যাত্রীকে নিয়ে যাবে মৃত্যুর অন্ধকার প্রদেশে। সেই ওল্ড-হোমের শান্ত, ঠাণ্ডা, মৃত্যু-ছোঁওয়া পরিমণ্ডল এক ধরনের কালচেতনা ও দার্শনিকতা কবিতাগুলিতে ছড়িয়ে দিয়েছে। 'গল্পের বিষয়', 'সূর্যাস্তের দিকে', 'ঘুমিয়ে পড়ার আগে', 'একটা মিলের জন্য', 'ওয়েটিং রুম', 'রবিবারের সকালবেলায়' —এইসব কবিতাতেই সেই সবার মাথার উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকা মহাকালের কথা বলা হয়েছে; ফলে কবিতাগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে বড় ভালোবাসার এই জীবনের মুখশ্রীখানি শেষবারের মত দেখে নেবার ব্যাকুলতা। কবিতাগুলিতে মৃত্যুর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে পরাক্রান্ত জীবন, যার কোন বিকল্প নেই।

"কৃষ্ণচূড়ার যে ডালটা একেবারে পথের উপরে এসে/ ঝুঁকে পড়েছে,/ তার পত্র পল্লবে হাত বুলিয়ে আমি বলি,/ আমারও এবারে সাজ ফেরাবার সময় হয়ে এল, তাই/ বিদায় নিয়ে রাখি। (রবিবারের সকালবেলায়, পৃঃ ২৫) জীবনের প্রতি মমতা এবং মৃত্যুচেতনা পাশাপাশি বাস করছে কবিতাগুলিতে। এই বর্ষীয়ান কবি এক ধরনের স্মৃতি ভারাতুরতায় কখনো আবিষ্ট, 'অনেককাল আগের একটা ছবি' কবিতাটিতে এক নস্টালজিক মমতায় স্মৃতির জলরঙ ছবিকে ফুটে উঠতে দেখি— "সকাল বেলায়/ সিম আর বরবটির মাচার উপরে/ ঝলমল করছে/ রোদ্দুরের চুমকি বসানো ওড়না।/ চাঁদকপালি গোরুটার মুখের সামনে/ ফ্যানের গামলা বসিয়ে দিয়ে/ এঁটো থালাবাসনের ডাঁই হাতে নিয়ে/ খিড়কি-পুকুরের ঘাটের দিকে যাচ্ছে/ এ বাড়ির বড় বৌ।" কোনো কবিতায় দুলে উঠেছে রহস্যমায়া, "চিত্রার্পিত ভঙ্গিটি তার,/ সে আছে দাঁড়িয়ে দরজায়,/ যেন ছোঁয়া লাগে চিরায়মানায়/ অচির জীবনচর্যায়।" কোনো কোনো কবিতায় এক প্রসন্ন ক্ষমায় পরিণত কবি অতিক্রান্ত জীবন ও সেই জীবনের মানুষগুলির দিকে তাকিয়েছেন, ফলে এক ধরনের প্রসাদগুণ এই কবিতাগুলিতে উদ্ভাসিত।

একথা বিবেকী পাঠকের অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, চল্লিশের দশকের এই গুরুত্বপূর্ণ কবি-ই একদিন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠকের নান্দনিক বোধের কাছাকাছি বাংলা কবিতাকে প্রতিস্থাপিত করে কৃত্রিম দুরূহতার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন তাকে। এই কবির অত্যন্ত সফল ও বিখ্যাত কবিতাগুলি পাঠকের

অনুভব ও বোধির সঙ্গে সার্থক কমিউনিকেশনের হিরণ্ময় সেতুতে মিলিত হয়েছে বারে বারে। অবশ্য কখনো কখনো এই কমিউনিকেশনের একটি সম্ভাব্য বিপদ থেকে যায়, সরলীকরণের বিপদ ; সুখের ও শ্রদ্ধার বিষয় এই-ই যে, এই কবি সেই বিপদকে হেলায় অতিক্রম করে এসেছেন বারে বারে। কোনো কোনো চমৎকার চিত্রকল্প পাঠককে আবিষ্ট করে, যেমন অল্প বয়সে দেখা গঙ্গার বর্ণনায় কবি তৈরি করছেন এইসব পঙ্‌ক্তি, "নদী এখানে উদয়াস্ত এক দৈব করুণাধারার মতো বইছে। পড়ন্ত যৌবন বেলার মতোই সে শান্ত, আর/ দূরগামী জাহাজের বিদায়বাণীর মতোই সে গম্ভীর।" এই ধরনের প্রচুরতর সুন্দর চিত্রকল্পে, কথ্যভঙ্গির অনায়াস লাবণ্যে যিনি তাঁর পাঠকদের এই কবিতাগুলি উপহার দিয়েছেন, তাঁর আতুর মৃত্যুভাবনাকে মুছে দিয়ে আমরা তাঁর সুদীর্ঘ সৃষ্টিশীলতা-ই প্রার্থনা করি। বইটির প্রচ্ছদে বিভিন্ন সেডের নীল রঙের নিবিড় প্রতিভাসে ঘুমিয়ে পড়ার আগের একটি স্নিগ্ধ মায়া তৈরি করেছেন প্রচ্ছদশিল্পী প্রবীর সেন। গেট আপের পরিচ্ছন্নতায়, প্রচ্ছদের সুষমায় শোভন উপস্থাপনার জন্যও এই কবির অনুরাগী পাঠকদের কাছে এই বইটির আদর বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে করি।

ভালো সিনেমা, খারাপ সিনেমা

সোমেন গুহ

চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ/আনোয়ার হোসেন পিণ্টু/ লুক-থ্রু প্রকাশনী/চট্টগ্রাম/কুড়ি টাকা

চলচ্চিত্র প্রসঙ্গের ভূমিকাতে মুহম্মদ খসরু জানিয়েছেন যে এই বইয়ের লেখক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র। পিণ্টু বর্তমানে চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক। তাঁর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে বের হয় চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা 'লুক থ্রু'। মুহম্মদ খসরু আরও লিখেছেন যে, 'বাঙলাদেশে ছবি তৈরীর পাশাপাশি চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বই ও পত্র পত্রিকা প্রকাশ এখন বহু গুণ বেড়েছে। শেলফে শেক্সপীয়র, টলস্টয়, বালজাক, রবীন্দ্রনাথ, হেমিংওয়ের সঙ্গে একত্রে ঠাঁই করে নিয়েছেন চ্যাপলিন, আইজেনস্টাইন, বুনুয়েল, বার্গম্যান, কুরোশাওয়া, ফেলেনি এবং সত্যজিৎ। শিল্প মাধ্যমটির কৈশোরকালেই চলচ্চিত্র-সমালোচনা লিখে খ্যাতিমান হয়েছিলেন সাহিত্যের তিন বিশিষ্ট পুরুষ : জেমস এগি, য়র্গ লুই বোর্হেস এবং গ্রাহাম গ্রীন। চলচ্চিত্র সংক্রান্ত এঁদের আলোচনাগুলো শিল্পরূপে এতো সমৃদ্ধ যে গ্রন্থাকারে সংকলিত এসব রচনা ধ্রুপদী চলচ্চিত্রালোচনারূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।'

তরুণ পিণ্টুর চলচ্চিত্রবোধ অসাধারণ। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখার এটি একটি সুদৃশ্য সংকলন। নিজে শিল্পী বলেই বইয়ের প্রতি পাতায় যত্নের ছাপ পাওয়া গেছে। স্থির চিত্রগুলি আর্ট পেপারে ছাপা হলে বইটি আরও মূল্যবান হত। উত্তম সেনের প্রচ্ছদ এককথায় চমৎকার। সাইফুল কবীরের স্কেচও সুন্দর। ছাপা এবং বানানে কিছু ভুল লক্ষ করা গেছে।

যে যে বিষয়ের মধ্যে শ্রীমান পিণ্টু আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন, সেগুলি হল, কবিতার চলচ্চিত্ররূপ প্রসঙ্গে, চলচ্চিত্রে উপমা রচনা, বাংলা ছবির গান প্রসঙ্গে, প্রামান্য চিত্র ও 'অভিজ্ঞতা'র ধন-ভাণ্ডার, সমাজ শিল্পশৈলী ও 'সূর্য দীঘল বাড়ী,' 'সত্যজিৎ রায় ও 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', ঋত্বিক চলচ্চিত্রে শিশুর ভূমিকা, রবার্ট ফ্ল্যাহার্টির আদিবাসী মমতা, রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্র ভাবনা ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা।

রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মদিনে যখন আমরা এই পুস্তক সমালোচনায় মনোনিবেশ করেছি তখন মুরারি ভাদুড়ীকে (নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর সহোদর) ১৯২৯ সালে লেখা কবির চিঠির কিছু অংশ তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'ছায়াচিত্র এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে—তার কারণ কোনো রূপকার আপন প্রতিভার বলে তাকে এই দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে পারেনি। করা কঠিন, কারণ কাব্যে বা চিত্রে বা সঙ্গীতে উপকরণ দুর্মূল্য নয়। ছায়াচিত্রের আয়োজন আর্থিক মূলধনের অপেক্ষা রাখে, শুধু সৃষ্টিশক্তির নয়।' সেইজন্যই সত্যজিৎ রায় তাঁর বিষয় চলচ্চিত্র গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'সিনেমাকে কবে থেকে "বই" বলা শুরু হল জানি না।' রবীন্দ্রনাথের পুরো চিঠিটার প্রতিলিপি এখানে তুলে ধরেছেন লেখক। উপন্যাস বা গল্প পাঠের পর তার চলচ্চিত্ররূপ দেখবার মানসেই সাধারণ দর্শক সিনেমাকে 'বই' বলেন। এবং গল্প অথবা উপন্যাসের সঠিক চিত্ররূপ দেখতে না পেলেই তাদের মন খারাপ হয়। শিক্ষিত মহলেও এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অশোক রুদ্র মশাই 'নষ্টনীড়'-এর চিত্ররূপ চারুলতা দেখে সত্যজিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যদিও বিষয় চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রুদ্রমশাইয়ের চিঠিটা ছাপাবার সৌজন্য দেখান নাই। রবীন্দ্রনাথ এবং বিশ্বভারতীর ভয়ে অধিকাংশ পরিচালকই রবীন্দ্র গল্প উপন্যাসের সঠিক চিত্রায়ণ করতে পারেননি। হয়ত ক্ষমতারও অভাব ছিল। সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের একটা তুলনামূলক আলোচনা এই গ্রন্থে থাকলে পাঠকেরা লাভবান হতেন। এবং রবীন্দ্রনাথ যে আর্থিক মূলধনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সে সম্পর্কেও লেখক কোন আলোচনায় আসেননি।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

'ছায়াচিত্রের আয়োজন আর্থিক মূলধনের অপেক্ষা রাখে।' এখন সিনেমা তৈরীর খরচ অনেক। সাদাকালোয় লোকের মন ভরে না। বম্বের কোটি টাকার বাজেট এবং একটি হিন্দী ছবির ৫০০ প্রিন্টের (লোকসভার প্রাক্তন সদস্য অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন প্রিন্টের ট্যাক্স ছাড়ের প্রবল দাবি লোকসভাতে করবেন বলেছিলেন) সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলা ছবিতেও অন্তত কয়েক লক্ষ কালো টাকা ঢালতে হচ্ছে। প্রযোজক সেই টাকা ফেরত পেতে চান। বামফ্রন্ট সরকার যে টাকা অনুদান হিসেবে দিয়েছিলেন সেই টাকায় অধিকাংশ পরিচালকই গাড়ি বাড়ি করেছেন, ছবি না করে। সরকার এখন তাঁদের পলিসি বদলেছেন। এখন টাকা দিচ্ছেন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য মাথায় রেখেই। এম এস সথ্যুর মত বম্বের বামপন্থী পরিচালকও বেঁচে থাকার জন্য আপোসের পথ ধরেছেন। আংশিক সরকারী সাহায্যে নকশাল আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তোলা ছবি 'কঁহা কঁহা সে গুজর গয়া' সম্প্রতি 'নন্দনে' দেখে সবাই প্রশ্ন করছেন, এটা আর্ট ফিল্ম, না কমার্শিয়াল ফিল্ম ? জটিলতা এড়াবার জন্য সমালোচক এবং সাধারণ দর্শকদের ফিল্ম সম্পর্কে বলা উচিত ভাল ছবি অথবা খারাপ ছবি। সেই ভাল মন্দের বিচারের দায়িত্ব নিয়েছেন আনোয়ার হোসেন পিণ্টুর মত সিনেমার ভাষা সম্পর্কে সচেতন সমালোচকেরা। পিণ্টুর বাংলা ভাষার ওপর দখলও যথেষ্ট। তাছাড়া রয়েছে একটি কাব্যিক মন। সিনেমার ভাষা যে সাহিত্যের ভাষা থেকে আলাদা এ সম্পর্কে বিদেশী পুস্তক অনেক থাকলেও বাংলায় ডঃ নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র (১৯৪৭ পর্যন্ত) একমাত্র পুস্তক। পিণ্টুর মত নিবেদিত প্রাণ চলচ্চিত্র কর্মীরাই এ বিষয়ে আরো প্রাসঙ্গিক পুস্তক লিখবেন এমন ইঙ্গিত এ পুস্তকে আছে।

ঋত্বিক চলচ্চিত্রে শিশুর ভূমিকা একটি মূল্যবান সংযোজন। ঋত্বিক ঘটক ১৪ বছর বয়সে বাড়ী থেকে পালিয়ে মাটি আর মানুষের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিয়েছিলেন তেমনটি নিয়েছে 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'র খুদে নায়ক কাঞ্চন।

লেখক দেখিয়েছেন ঋত্বিকের সমস্ত ছবিতেই এই খুদে কাঞ্চনরা বার বার এসেছে। ঋত্বিকের এই শিল্পকর্মের পেছনে বুর্জোয়া পত্রিকার সমালোচকেরা অবক্ষয়ের প্রশ্ন তুলে ছবির মহত্ত্বকে অস্বীকার করেন। এবং ঋত্বিককে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেন। লেখক বলেছেন, 'মৃতপ্রায় ঈশ্বরের (যিনি একদা আত্মহননের পথে পা বাড়িয়েছিলেন) আজ পুনর্জাগরণ নবজাতক বিনুর হাতে। আসলে এরা কোথাও থেমে থাকেনি। বাধা বিপত্তি পেরিয়ে তাদের সত্তা বারে বারে এগিয়ে চলার কথা বলে।' 'সত্যজিৎ রায় ও গুপী গাইন বাঘা বাইন' প্রবন্ধে লেখক সেই সমস্ত সমালোচকদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি যাঁরা শিশু চলচ্চিত্রের দোহাই দিয়ে এই ছবিকে এতদিন অবহেলার স্তরে ফেলে রেখেছিলেন। উনি এও লিখেছেন, 'তবে রায়ের ফ্যান্টাসি চ্যাপলিনের সমগোত্রীয় কিনা জানি না ; কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, ফ্যান্টাসির আঙ্গিকে বাস্তবতার আর্তি প্রকাশের কঠিন কাজটি তাঁর হাতে এক অনন্য শিল্প ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠিত।'

বাংলাদেশে নির্মিত মহিসউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলীর শিল্পসম্মত ছবি 'সূর্য দীঘল বাড়ী' লেখকের মতে 'নব্যদিক উন্মোচনকারী' শিল্প। ভারত-বাংলাদেশের মত ধর্মতান্ত্রিক প্রধান দেশে ফকির, মৌলভী, বা পুরোহিতদের সামাজিক অবস্থান সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী উঁচুতে। বলা যায় শাকের, নিয়ামত আমাদের ধর্মীয় গোঁড়ামিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে বেশ মূর্ত করে তুলেছেন।

লেখকের সঙ্গে আমরা একমত documentary film এর বাংলা 'প্রামান্য চিত্র' হওয়া উচিত, 'তথ্যচিত্র' (News) নয়।

চলচ্চিত্র বিষয়ক বাংলা বইয়ের গ্রন্থপঞ্জী এবং পুস্তকাকারে ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্রনাট্য সমূহের তালিকাদুটি মূল্যবান। লেখকের নাম ভবিষ্যতে পরিচালকদের তালিকায় দেখতে পেলে খুশি হব। ■

ম

ধুরী
১৭, ২৭ ফে ১৯৮২ : ৪৫, ক
৪৬, ১৬ ফে ১৯৭৪ : ১৯০, ক
৪৭, ৬, ৮ ডি ১৯৭৯ : ৩২ ক
২১, ২২ মা ১৯৬৯ : ৭৫৪, ক
নেই ৫০, ৫০, ১৫ অ ১৯৮৩ : ৪৩,

৪০, ৪ আ ১৯৭৩ : ১৬, ক
দিকে ৪২, ৫২, ২৫ অ ১৯৭৫ :

৩৩, ৩৪, ২৫ জুন ১৯৬৬ : ৮৮৪,

২০ অ ১৯৭৩ : ৯৯৮, ক
দেখে ৩৮, ৩৮, ২৪ জু ১৯৭১ :

গায়ে ৪৫, ৫১, ২১ অ ১৯৭৮ : ৩৯,

পক্ষে ৪৩, ৪৩, ২১ আ ১৯৭৬ :

ন ৪৮, ৫, ২৯ ন ১৯৮০ : ১৩, ক
৭, ২১, ২২ মা ১৯৮০ : ১৪, ক
৫০, ৬, ১১ডি ১৯৮২ : ৩২, ক
৪, ৪৬, ১০ সে ১৯৭৭ : ৩৯, ক
৪৯, ৩৯, ৩১ জু ১৯৮২ : ৩০, ক
১৯ মা ১৯৭৭ : ৫১৪, ক
১৪, ১ ফে ১৯৭৫ : ১২, ক
: ৩৫২, ক
৯, ৩৫, ১ জু ১৯৭২ : ৯৫৬, ক

মাদ্রাজ ৩৫, ৯ (বি), ৩০ ডি
৯০৩, স
ও ভবিষ্যৎ ৩৭, ৯ (বি), ২৭ ডি

াসরে শা ১৯৬৯ : ৩২৩-৩২৭, স

৯, ২১, ২৭ মা ১৯৮২ : ১৯, ক

২, ২৯ মা ১৯৫৮ : ৬৩১, ক
২, ১১ জুন ১৯৬৬ : ৬৭৫, ক
৩ এ ১৯৫৪ : ৫৪০, ক
৯ ফে ১৯৫৭ : ১২৪, ক
১২, ২ এ ১৯৬০ : ৬৮২, ক

৯, ৩১ জু ১৯৮২ : ৩১, ক
, ২৯, ২১ মে ১৯৮৩ : ১৩, ক
ডি ১৯৮২ : ৩৮, ক
১৩ ফে ১৯৮২ : ১৫ ক
, ৭, ১৫ ডি ১৯৭৯ : ৬৪, ক
অন্বেষণে ৪৭, ৩৫, ২৮ জু

য়, অনু
২৯ জুন ১৯৬৭ : ৭০৩, ক

। সা ১৯৮১ : ১২৯-১৩৬, স
৪২
, ৪৩ ; ২২, ৫০ ; ২৩, ২৮ ;

২৪, ৩১ ; ২৭, ১৮ ; ৩৮, ৩৫ ; ৪৩, ৪৮ ; ৪৭, ১২ ; ৪৮, ২৫—৪৮, ২৬ ; ৫০, ১৯ ; ৫০, ২৪
মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী ২৩, ২৮ ; ৫০, ২৪
মৃত-অমৃত। আনন্দ বাগচী ৩৭, ৩৬
মৃত ইলিশের চোখে। বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ২৯, ১৫
মৃত বন্ধুর জন্য কয়েক লাইন। শান্তনু দাস ৪১, ১১
মৃত রামধনু। মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ৪৬, ২৩
মৃত সৈনিকদের উদ্দেশে। দিনেশ দাস ৩০, ২৩
মৃতেরা। বুদ্ধদেব বসু ৩৪, ১৩
মৃত্তিকা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শা ১৯৬৬
মৃত্যু। অজিত দত্ত ২২, ২৯
মৃত্যু। অঞ্জলি দাশ ৪৬, ৪১
মৃত্যু। কমল চক্রবর্তী ৪২, ৪৫
মৃত্যু আর বীজের প্রবাদ। পিনাকী ঠাকুর ৪৬, ৩৭
মৃত্যু আর মন। শিশিরকুমার দাশ ২১, ১৫
মৃত্যু-ইচ্ছা ২২, ৩১
মৃত্যু-ইচ্ছা। বিমল কর ২২, ৩১
মৃত্যু ঐ হিরো একদিনই। দেবী রায় ৪৯, ৩৬
মৃত্যুকেও মৃত মনে হয়। কামাল মাহবুব ৩৮, ৩৯
মৃত্যুতে সমর্পিত। ফিরোজ চৌধুরী ৪৭, ৪৫
মৃত্যুদণ্ড। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩২, ১১
মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে বিপক্ষে ৪২, ৩১, ৩১ মে ১৯৭৫ : ৩২৭, সম্পা
মৃত্যুদূত এসেছিল ভব সভা হতে। প্রমথনাথ বিশী ২৮, ২৭ (সা)
মৃত্যু নিয়ে কারবার ৩১, ৩৭, ১৮ জু ১৯৬৪ : ১০৭১
মৃত্যু নিয়ে গেছে বাজি। জয়োৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭, ৩১
'মৃত্যু পরাহত'। স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায় ৪৬, ৪৮
মৃত্যু পূর্ব। পরিমল চক্রবর্তী ৪৯, ২৩
মৃত্যু বলয়ে। কালীপদ কোঙার ৩৫, ৩২
মৃত্যু সংবাদ। মৃণাল দত্ত ৩৭, ৫২
মৃত্যু সম্পর্কে আরো। ভাস্কর চক্রবর্তী ৪৩, ৪০
মৃত্যুহীন বিয়োগ। সমরেশ বসু ৪২, ৫০
মৃত্যুর অধিক খেলা। আমিতাভ দাশগুপ্ত সা ১৯৮০
মৃত্যুর এপারে এবং ওপারে। প্রফুল্ল রায় ৩৭, ২৬
মৃত্যুর গহ্বরে। শংকর চট্টোপাধ্যায় ৩৩, ২
মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা। অজয় দাশগুপ্ত ৩৬, ৩১
মৃত্যুর ঘোড়া। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৩৬, ৪৬
মৃত্যুর নিয়ম। আনন্দ বাগচী ৩৮, ৯
মৃত্যুর পথ। দিব্যেন্দু পালিত ৩১, ৪২
মৃত্যুর পর। কল্যাণ সেনগুপ্ত ৫০, ৩২
মৃত্যুর পর। প্রবোধবন্ধু অধিকারী ২৫, ৩০
মৃত্যুর পরে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২৩, ৩৭
মৃত্যুর পরে। রাজলক্ষ্মী দেবী ৩৬, ২২
মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৩৯, ৩৮
মৃত্যুর ফাঁদ ৩১, ৪৪, ৫ সে ১৯৬৪ : ৩৯৯
মৃত্যুর রং। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ২৪, ২
মৃত্যুর শীতল ছুঁয়ে। রঞ্জন ভাদুড়ী ৪০, ৪৭
মৃত্যুঞ্জয় রায়
আর্জেন্টিনায় বিদ্রোহ ২২, ৩৫, ২ জু ১৯৫৬ : ৭৬০-৭৬৩, স
গুয়াতেমালা ২১, ৩৫, ৩ জু ১৯৫৪ : ৬৬২-৬৬৬, স
গোয়া, দমন, দিউ ২১, ৩৯, ৩১ জু ১৯৫৪ : ৯১১-৯১৫, স
দিল্লী—পুরাতন ও নূতন ২১, ১১, ১৬ জা ১৯৫৪ : ৭৪১-৭৫১, স
নেকড়ে বালক ২১, ২২, ৩ এ ১৯৫৪ : ৫৩৮-৫৪০, স
পেরঁ-র পতন ২২, ৪৯, ৮ অ ১৯৫৫ : ৭৩৫-৭৩৯, স
বন্যা ২১, ৫১, ৩০ অ ১৯৫৪ : ৭৯১-৭৯৫
বিক্ষুব্ধ মরক্কো ২২, ৪৬, ১৭ সে ১৯৫৫ : ৫১৩-৫১৭, স
যুগোস্লাভিয়া ২২, ৬, ১১ ডি ১৯৫৪ : ৪০৯-৪১২, স
শার্লক হোমস ২১, ৩১, ৫ জুন ১৯৫৪ : ৩৯৩-৩৯৫
মৃত্যুঞ্জয় সেন
কুসুম গন্ধের জন্যে ৫০, ৩৯, ৩০ জু ১৯৮৩ : ১৫, ক
দ্বিতীয় প্রার্থনা ৪৯, ৮, ২৬ ডি ১৯৮১ : ২৯, ক
নীল আন্দামান সবুজ নিকোবর ৪৪, ৪৯, ১ অ ১৯৭৭ : ৪১-৪৭, স
বেঁচে থাকবে বাগান ৫০, ২৬, ৩০ এ ১৯৮৩ : ৫৯, ক
মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ
জিন জিন-প্রযুক্তি এবং মানব-কল্যাণ সা ১৯৮১ : ৬৫-৭৬, স
মৃদুল দাশগুপ্ত
রূপ ৫০, ৩২, ১১ জ ১৯৮৩ : ১৩, ক
মৃদুল মুখোপাধ্যায়
ছোঁয়া ৪৯, ৪৮, ২ অ ১৯৮২ : ৩৯, ক
প্রতিভা ৪৭, ২৫, ১৯ এ ১৯৮০ : ৫৫, ক
বদলে যায় ৪৯, ৮, ২৬ ডি ১৯৮১ : ২৯, ক
সহবাস ৪৬, ৪২, ১৮ আ ১৯৭৯ : ৩৮, ক
মৃন্ময়ী। তারাপদ রায় ২৯, ১৪
মেক আপ ও সেট। পূর্ণেন্দু পত্রী ৩৬, ৯ (বি)
মেক আপ, চলচ্চিত্রে দেখুন চলচ্চিত্রে, রূপসজ্জা
মেক্সিকো অলিম্পিক। ধ্রুবেন সেন ৩৫, ৪০
মেক্সিকো অলিম্পিক। মুকুল দত্ত ৩৬, ৯ (বি)
মেক্সিকো—বিবরণ ও ভ্রমণ ৩১, ৩৭ ; ৪৬, ৩—৪৬, ৪
মেঘ। আবদুস সাত্তার ২৫, ৩৩
মেঘ। আলোক সরকার শা ১৯৭৬
মেঘ। হরপ্রসাদ মিত্র ৩৯, ১৭
মেঘ ও রৌদ্র। কেতকী কুশারী ডাইসন ৩২, ৩৪
মেঘকুন্তলের ঘরের কেল্লা। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় শা ১৯৬১
মেঘ ডেকেছে শুনেই। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ৪৩, ৪০
মেঘনাদ সাহা ২৩, ১৮ ; ৩৪, ১২ ; ৪৭, ১৪
মেঘপুঞ্জায় নগ্ন নৃত্য। নীহার বড়ুয়া ২১, ৪৭
মেঘবরণ চিতা। অমরেন্দ্রনাথ গুহ ৪৯, ৪৮
মেঘ বৃষ্টি আলো। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বি ১৯৭০
মেঘ বৃষ্টি রোদ। রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১, ৪
মেঘ রাগ। সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত ২৩, ৪৫
মেঘলা দিন। বিষ্ণু দে শা ১৯৫৯
মেঘলা দিনে। বনফুল শা ১৯৫৯
মেঘলা দিনের গাছ। রত্নেশ্বর হাজরা ৩৯, ১৯
মেঘস্বাতী। সঞ্জয় ভট্টাচার্য শা ১৯৫৪
মেঘালয় ৩৭, ২৪
মেঘালয় ৩৭, ২৪, ১১ এ ১৯৭০ : ১০৪৫
মেঘে আকাশ ঢাকা। হরপ্রসাদ মিত্র ৩৫, ৩
মেঘের নীচে আমরা। হরপ্রসাদ মিত্র ২৫, ৩৮
মেঘের মধ্য দিয়ে। প্রতিমা রায় ৫০, ২৬
মেচ-উপজাতি। হীরাচরণ নারজিনারী ৫০, ৮
মেচ জাতি ৫০, ৮
মেজবাহউদ্দীন আহমদ খান

Modern
&
Sulzern
SUITINGS · SHIRTINGS · SAFARIS

DESH WEEKLY 31 OCTOBER 1987 RE
NO WB/CC/184/74. MH-By-SOUTH 6